প্রবাসী ১৩৩১ বৈশাখ—আশ্বিন

২৪শ ভাগ, প্রথম খণ্ড

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

লেখকগণ ও তাঁহাদিগের রচনা

লেখকগণ ও তাঁহাদিগের রচনা

চিত্র-সূচী

চিত্র-সূচী

"জবাকুসুম" বর্ষ-বন্দনা

হীরামন তোতা

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৪শ ভাগ
১ম খণ্ড

বৈশাখ, ১৩৩১

১ম সংখ্যা

লীলা-সঙ্গিনী

দুয়ার-বাহিরে যেমনি চাহি রে
মনে হল যেন চিনি,—
কবে, নিরুপমা, ওগো প্রিয়তমা,
ছিলে লীলা-সঙ্গিনী?
কাজে ফেলে মোরে চলে' গেলে কোন্ দূরে!
মনে পড়ে' গেল আজি বুঝি বন্ধুরে?
ডাকিলে আবার কবেকার চেনা সুরে—
বাজাইলে কিঙ্কিণী!
বিস্মরণের গোধূলি-ক্ষণের
আলোতে তোমারে চিনি!

এলোচুলে বহে' এনেছ কি মোহে
সেদিনের পরিমল?
বকুলগন্ধে আনে বসন্ত
কবেকার সম্বল?
চৈত্র-হাওয়ায় উতলা কুঞ্জ-মাঝে
চারু চরণের ছায়া-মঞ্জীর বাজে,
সেদিনের তুমি এলে এদিনের সাজে
ওগো চিরচঞ্চল!
অঞ্চল হতে ঝরে বায়ুস্রোতে
সেদিনের পরিমল!

মনে আছে সে কি সব কাজ, সখি,
ভুলায়েছ বারে বারে।
বন্ধ দুয়ার খুলেছ আমার
কঙ্কণ-ঝঙ্কারে।
ইসারা তোমার বাতাসে বাতাসে ভেসে
ঘুরে ঘুরে যেত মোর বাতায়নে এসে,
কখনো আমের নব মুকুলের বেশে,—
কভু নব মেঘ-ভারে।
চকিতে চকিতে চল-চাহনিতে
ভুলায়েছ বারে বারে।

নদী-কূলে কূলে কল্লোল তুলে
গিয়েছিলে ডেকে ডেকে।

বনপথে আসি' করিতে উদাসী
কেতকীর রেণু মেখে।
বর্ষা-শেষের গগন-কোণায় কোণায়,
সন্ধ্যা-মেঘের পুঞ্জ সোনায় সোনায়
নির্জ্জন ক্ষণে কখন্ অন্য-মনায়
ছুঁয়ে গেছ থেকে থেকে।
কখনো হাসিতে কখনো বাঁশিতে
গিয়েছিলে ডেকে ডেকে।

কি লক্ষ্য নিয়ে এসেছ এ বেলা
কাজের কক্ষ-কোণে?
সাথী খুঁজিতে কি ফিরিছ একেলা
তব খেলা-প্রাঙ্গণে?
নিয়ে যাবে মোরে নীলাম্বরের তলে
ঘর-ছাড়া যত দিশা-হারাদের দলে,
অযাত্রা পথে যাত্রী যাহারা চলে
নিষ্ফল আয়োজনে?
কাজ ভোলাবারে ফেরো বারে বারে
কাজের কক্ষ-কোণে!

আবার সাজাতে হবে আভরণে
মানস প্রতিমাগুলি?
কল্পনাপটে নেশার বরণে
বুলাব রসের তুলি?
বিবাগী মনের ভাবনা ফাগুন-প্রাতে
উড়ে চলে' যাবে উৎসুক বেদনাতে,
কলগুঞ্জিত মৌমাছিদের সাথে
পাখায় পুষ্পধূলি।
আবার নিভৃতে হবে কি রচিতে
মানস প্রতিমাগুলি?

দেখ না কি, হায়, বেলা চলে' যায়—
সারা হয়ে এল দিন।
বাজে পূরবীর ছন্দে রবির
শেষ রাগিণীর বীণ।
এতদিন হেথা ছিনু আমি পরবাসী,
হারিয়ে ফেলেছি সেদিনের সেই বাঁশি,
আজ সন্ধ্যায় প্রাণ ওঠে নিঃশ্বাসি'
গানহারা উদাসীন।
কেন অবেলায় ডেকেছ খেলায়,
সারা হয়ে এল দিন।

এবার কি তবে শেষ খেলা হবে
নিশীথ-অন্ধকারে?
মনে মনে বুঝি হবে খোঁজাখুঁজি
অমাবস্যার পারে?
মালতী-লতায় যাহারে দেখেছি প্রাতে
তারায় তারায় তারি লুকাচুরি রাতে?
সুর বেজেছিল যাহার পরশ-পাতে
নীরবে লভিব তা'রে?
দিনের দুরাশা স্বপনের ভাষা
রচিবে অন্ধকারে?

যদি রাত হয়—না করিব ভয়,—
চিনি যে তোমারে চিনি।
চোখে নাই দেখি, তবু ছলিবে কি,
হে গোপন-রঙ্গিণী?
নিমেষে আঁচল ছুঁয়ে যায় যদি চলে'
তবু সব কথা যাবে সে আমায় বলে',
তিমিরে তোমার পরশ-লহরী দোলে
হে রস-তরঙ্গিণী!
হে আমার প্রিয়, আবার ভুলিয়ো,
চিনি যে তোমারে চিনি।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মবাদ

এক সময়ে জনকরাজার সভাতে অনেক ব্রাহ্মণ সমবেত হইয়াছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিলেন যাজ্ঞবল্ক্য। ইঁহার সহিত ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে অনেক ব্রাহ্মণের বিচার হইয়াছিল। এই সময়ে যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মবিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই অদ্য আলোচিত হইবে।

১। উষস্তব্রাহ্মণ (বৃহঃ ৩।৪)

বৃহদারণ্যক উপনিষদের 'উষস্ত-ব্রাহ্মণ' নামক অংশে লিখিত আছে যে উষস্ত যাজ্ঞবল্ক্যকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন :—

"হে যাজ্ঞবল্ক্য! যিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যিনি সর্ব্বান্তর আত্মা, তাঁহার বিষয়ে বল।"

"সর্ব্বান্তর আত্মা" অর্থ "সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা"। এখানে প্রশ্ন হইল "ব্রহ্ম কে?" সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা কে? প্রশ্ন হইতেই বুঝা যাইতেছে যে যিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, তিনিই ব্রহ্ম।

ইহার উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—

"এই তোমার আত্মাই সর্ব্বান্তর আত্মা।"

প্রশ্নের উত্তরে বলা হইল—মানবের যে আত্মা, সেই আত্মাই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা।

ইহাতে উষস্ত সন্তুষ্ট হইলেন না। সেইজন্য আবার প্রশ্ন করিলেন—

"হে যাজ্ঞবল্ক্য! কোন্‌টি সর্ব্বান্তর?"

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—

"যিনি প্রাণ দ্বারা নিশ্বাসাদির কার্য্য করেন, তিনিই তোমার আত্মা ও সর্ব্বান্তর। যিনি অপান দ্বারা অপানন কার্য্য করেন, তিনিই তোমার আত্মা ও সর্ব্বান্তর। যিনি ব্যান দ্বারা ব্যানোচিত কার্য্য করেন, তিনিই তোমার আত্মা ও সর্ব্বান্তর। যিনি উদান দ্বারা উদানোচিত কার্য্য করেন, তিনিই তোমার আত্মা ও সর্ব্বান্তর।"

এখানে প্রাণ অপান ব্যান ও উদানের কথা বলা হইল; এসমুদায়ই প্রাণের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—"যিনি এই-সমুদায় দ্বারা কার্য্য করেন, তিনিই আত্মা ও সর্ব্বান্তর।"

এখানে মানবের আত্মাকেই যে সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা বলা হইল, সে-বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য যে-ভাবে মানবের আত্মাকে বর্ণনা করিলেন, উষস্ত তাহাতে প্রীত হইলেন না। সেইজন্য তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"লোকে যেমন বলে—'ঐপ্রকার বস্তু গরু', 'ঐপ্রকার বস্তু অশ্ব', তোমার উপদেশও হইল সেইপ্রকার। যাহা সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যাহা সর্ব্বান্তর আত্মা, তাহাই আমাকে বল।"

গো, অশ্ব প্রভৃতিকে যে-ভাবে দেখা যায়, লোকে আত্মাকেও সেইভাবে দেখিতে চায়। উষস্তও এই-ভাবেই আত্মাকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য প্রথমে যে উত্তর দিয়াছিলেন এবারও সেই উত্তরই দিলেন। তিনি বলিলেন—

"তোমার এই আত্মাই সেই সর্ব্বান্তর।"

উষস্ত এবারও বলিলেন—"হে যাজ্ঞবল্ক্য! কোন্‌টি সর্ব্বান্তর?"

এবার যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—"দৃষ্টির দ্রষ্টাকে দেখিতে পারিবে না, শ্রুতির শ্রোতাকে শ্রবণ করিতে পারিবে না, মনের মননকর্ত্তাকে মনন করিতে পারিবে না, বিজ্ঞানের বিজ্ঞাতাকে জানিতে পারিবে না। তোমার এই আত্মাই সর্ব্বান্তর।"

ঋষি এস্থলে বলিতেছেন, আত্মাই দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা ও বিজ্ঞাতা। দ্রষ্টাকে দেখা যায় না, শ্রোতাকে শ্রবণ করা যায় না, মন্তাকে মনন করা যায় না এবং বিজ্ঞাতাকে জানা যায় না।

ঋষি কেন এপ্রকার বলিয়াছেন, তাহা "উপনিষদের ব্রহ্ম" নামক প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

দ্রষ্টার যদি দ্রষ্টা থাকিত, তাহা হইলে প্রথম দ্রষ্টাকে

আর দ্রষ্টা বলা হইত না, সে হইত দৃষ্ট বস্তু। এইরূপ দ্বিতীয় দ্রষ্টার যদি একজন দ্রষ্টা স্বীকার করা যায়, তাহা-হইলে দ্বিতীয় দ্রষ্টাকেও দৃষ্টবস্তু বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হয়। আমরা এইরূপ যতই অগ্রসর হই না কেন, সর্ব্বোপরি একজন দ্রষ্টা থাকিবেই; এ দ্রষ্টার আর দ্রষ্টা নাই। দ্রষ্টাকে কে দেখিতে পারে? যিনি দেখিবেন তিনিই যে দ্রষ্টা। এইরূপ আত্মাই শ্রোতা মন্তা ও বিজ্ঞাতা, ইহার আর শ্রোতা মন্তা ও বিজ্ঞাতা নাই।

অশ্বগবাদিকে দৃষ্টি শ্রুতি মনন ও জ্ঞানের বিষয়ীভূত করা যায়, কিন্তু সেভাবে আত্মাকে বিষয়ীভূত করা যায় না। যিনি বিষয়ীভূত করিবেন তিনিই যে আত্মা। আত্মা বিষয় নহে, আত্মা নিত্য বিষয়ী।

বর্ত্তমান যুগে কেহ কেহ মনে করেন যে মানবের একটি আত্মা আছে এবং পরমাত্মা এই মানবাত্মার অন্তরাত্মা। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য এপ্রকার স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, প্রত্যেক মানবের যাহা আত্মা তাহাই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। এই আত্মাই পরব্রহ্ম।

ইহাই উষস্ত-ব্রাহ্মণের সিদ্ধান্ত।

২। কহোল-ব্রাহ্মণ (বৃহঃ ৩।৫)

'কহোল-ব্রাহ্মণ' নামক অংশেও যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মবাদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এস্থলে প্রষ্টা কৌষীতক-পুত্র কহোল; তিনিও যাজ্ঞবল্ক্যকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন :—

"যিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যিনি সর্ব্বভূতের অন্ত-রাত্মা, হে যাজ্ঞবল্ক্য! তিনি কে? আমাকে বল।"

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—"তোমার আত্মাই সেই সর্ব্বান্তর-আত্মা।"

কহোল পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কোন্‌টা সেই সর্ব্বান্তর আত্মা?"

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—

"যিনি ক্ষুধা তৃষ্ণা শোক মোহ জরা ও মৃত্যু অতি-ক্রম করিয়াছেন (তিনিই সর্ব্বান্তর আত্মা)। ব্রাহ্মণগণ এই আত্মাকে অবগত হইয়া বিত্তৈষণা লোকৈষণা পরি-ত্যাগ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন।"

যাজ্ঞবল্ক্য যাহা বলিলেন তাহার অর্থ এই—

মানবের যাহা আত্মা, তাহাই সর্ব্বান্তর আত্মা অর্থাৎ আত্মাই ব্রহ্ম।

কিন্তু সাধারণতঃ লোকে মনে করে আত্মারই ক্ষুধা তৃষ্ণা শোক মোহ জরা ও মৃত্যু। এইজন্য যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশ এই যে—এসমুদায় মানবের ধর্ম্ম বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আত্মা এসমুদায়ের অতীত। মানবাত্মা, ক্ষুধা তৃষ্ণা শোক মোহ জরা ও মরণের অধীন হইয়া রহিয়াছে এই-প্রকার মনে হয় বটে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আত্মা এ-সমুদায়কে অতিক্রম করিয়াছে।

"কহোল-ব্রাহ্মণ" আলোচনা করিয়াও দেখা গেল যে মানবের আত্মাই ব্রহ্ম, কিন্তু লোকে মানবাত্মাকে যে-ভাবে কল্পনা করে মানবের আত্মা সেপ্রকার নহে; এই আত্মা দেহধর্ম্মের অতীত।

৩। অন্তর্যামি-ব্রাহ্মণ (বৃহঃ ৩।৭)

অন্তর্যামি-ব্রাহ্মণে, প্রশ্ন করিতেছেন উদ্দালক আরুণি; এবং উত্তর দিতেছেন যাজ্ঞবল্ক্য। উদ্দালকের প্রশ্ন এই :—

"সেই অন্তর্যামী কে, যিনি অন্তরস্থ থাকিয়া ইহলোক পরলোক ও সর্ব্বভূতকে নিয়মিত করিতেছেন।"

"অন্তর্যামী" শব্দের একটা ভুল অর্থ প্রচলিত আছে। অনেকে মনে করেন, "যিনি অন্তরের সমুদায় কথা জানেন, তিনিই অন্তর্যামী।" কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ এই :— "যিনি অন্তরকে নিয়মিত করেন, কিংবা অন্তরস্থ থাকিয়া ভূতদিগকে নিয়মিত করেন, তিনিই অন্তর্যামী।" এস্থলে এই অর্থেই 'অন্তর্যামী' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

উদ্দালক প্রশ্ন করিয়াছেন—"অন্তর্যামী কে?"

যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর এই :—

"যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত, অথচ পৃথিবী হইতে পৃথক্, পৃথিবী যাঁহাকে জানে না কিন্তু পৃথিবী যাঁহার শরীর এবং পৃথিবীর অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি পৃথিবীকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনি তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী ও অমৃত।"

পৃথিবী বিষয়ে এই মন্ত্রে যাহা বলা হইল, ইহার পরবর্ত্তী ২০টি মন্ত্রে অন্যান্য আধিদৈবিক, সমুদায় আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক বস্তু বিষয়েও ঠিক এই কথাই বলা হইয়াছে। এবিষয়ে মোট ২১টি মন্ত্র আছে। ইহার মধ্যে ১২টি

আধিদৈবিক, ১টি আধিভৌতিক এবং ৮টি আধ্যাত্মিক বস্তু-সম্বন্ধী। ১২টি আধিদৈবিক বস্তুর নাম এই :—পৃথিবী জল অগ্নি অন্তরীক্ষ বায়ু দ্যৌ আদিত্য দিক্‌সমূহ চন্দ্র-তারকা আকাশ তম এবং তেজ। সর্ব্বভূতকে আধি-ভৌতিক বস্তু বলা হইয়াছে।

৮টি আধ্যাত্মিক বস্তুর নাম এই :—

প্রাণ বাক্ চক্ষু শ্রোত্র মন ত্বক্ বিজ্ঞান ও মানব-বীজ।

এই ২১টি মন্ত্রে সবই এক; পার্থক্য কেবল নামটি লইয়া। একটি মন্ত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে পৃথিবী, অপর একটি মন্ত্রে ব্যবহার করা হইয়াছে জল, অপর মন্ত্রে অগ্নি, এইরূপ। আমরা এই ২১টি মন্ত্র পৃথক্-পৃথক্-ভাবে উদ্ধৃত করিলাম না। একটি বাক্য দ্বারাই এইসমুদায়ের অর্থ ব্যক্ত করা যাইতেছে। এই ২১টি মন্ত্রে বলা হইয়াছে এইরূপ :—

"যিনি পৃথিব্যাদি ২১প্রকার বস্তুতে অবস্থিত, অথচ এইসমুদায় হইতে পৃথক্, এইসমুদায় যাঁহাকে জানে না, এইসমুদায় যাঁহার শরীর, এইসমুদায়ের অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি এইসমুদায়কে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনি অন্তর্যামী ও অমৃত।"

মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণে যাজ্ঞবল্ক্য এই জগতের বাস্তব সত্তা স্বীকার করেন নাই। এই স্থলে তিনি বলিয়াছেন আত্মা যখন স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, তখন দ্বিতীয় বা পৃথক্ কোন বস্তু থাকে না। অন্তর্যামি-ব্রাহ্মণে যাজ্ঞবল্ক্য স্বীকার করিয়াছেন—যে আত্মা হইতে পৃথক্ বস্তু আছে। সমুদায় আধিদৈবিক আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক বস্তু আত্মা হইতে পৃথক্, কিন্তু এইসমুদায় বস্তু আত্মার দেহ এবং আত্মা এইসমুদায়ের অন্তর্যামী অর্থাৎ নিয়ন্তা।

যাজ্ঞবল্ক্যের মতে মানবের আত্মাই জগদাত্মা এবং জগতের নিয়ামক। এস্থলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় নাই। যিনি জীবে, তিনিই সর্ব্বত্র; যিনি এই মানবাত্ম-রূপে অবস্থিত থাকিয়া এই দেহকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত থাকিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নিয়মিত করিতেছেন। কোন কোন দ্বৈতবাদী হয়ত কল্পনা করিয়া লইবেন যে "এই দেহে জীবাত্মাও আছেন এবং পরমাত্মাও আছেন। পরমাত্মাই নিয়ন্তা; তিনি দেহকেও চালিত করিতেছেন এবং জীবাত্মাকেও চালিত করিতেছেন।" এখানে স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক যাজ্ঞবল্ক্য এপ্রকার মত পোষণ করেন না। তাঁহার মতে আত্মা একই; সেই আত্মাই দেহের অভ্যন্তরে থাকিয়া দেহকে নিয়মিত করিতেছেন। সাধারণ লোকে ইঁহাকে জীবাত্মা বলে, কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য বলেন ইনি "আত্মা"। আমরা দেহ-সম্বন্ধী আত্মাকে জীবাত্মা বলি আর বিশ্ব-ভুবনের আত্মাকে পরমাত্মা বলি। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য এপ্রকার কোন ভেদ করেন নাই।

সর্ব্বশেষে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন :—

"তিনি অদৃষ্ট, কিন্তু দ্রষ্টা; তিনি অশ্রুত, কিন্তু শ্রোতা; তাঁহাকে মনন করা যায় না, কিন্তু তিনি সকলের মনন-কর্ত্তা; তিনি অবিজ্ঞাত কিন্তু বিজ্ঞাতা। ইনি ভিন্ন কেহ দ্রষ্টা নাই; ইনি ভিন্ন কেহ শ্রোতা নাই; ইনি ভিন্ন কেহ মন্তা নাই, ইনি ভিন্ন কেহ বিজ্ঞাতা নাই। ইনিই তোমার আত্মা, ইনিই অন্তর্যামী ও অমৃত, ইনি ভিন্ন আর সবই আর্ত্ত।"

এখানেও আত্মাকে দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা ও বিজ্ঞাতা বলা হইল এবং ইহাও বলা হইল যে এই আত্মা অদৃষ্ট অশ্রুত অ-মত ও অবিজ্ঞাত। কেন এই আত্মাকে দর্শনাদি করা যায় তাহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

অন্তর্যামি-ব্রাহ্মণে ব্রহ্ম শব্দের উল্লেখ নাই। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য আত্মার বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সিদ্ধান্ত

"আত্মাই ব্রহ্ম"।

৪। গার্গী-ব্রাহ্মণ (বৃহঃ ৩।৮)

গার্গী বাচক্নবী যাজ্ঞবল্ক্যকে দুবার প্রশ্ন করিয়াছিলেন। প্রথমবারে কি আলোচনা হইয়াছিল, তাহা আমরা এস্থলে বর্ণনা করিব না। দ্বিতীয় বারের প্রশ্ন এবং তাহার উত্তরই আমাদিগের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। সুতরাং তাহাই আমরা আলোচনা করিব।

গার্গী বলিলেন—"যাজ্ঞবল্ক্য! যেমন কাশী কিংবা বিদেহ দেশের বীরপুত্র ধনুতে জ্যা রোপণ করিয়া শত্রু-বিদারী দুইটি শর হস্তে লইয়া উপস্থিত হয়, আমিও তেমনি

দুইটি প্রশ্ন লইয়া তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইতেছি। তুমি আমাকে এই প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর দাও।"

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—"গার্গী! জিজ্ঞাসা কর।"

গার্গী বলিলেন—"যাহা দ্যুলোকের ঊর্দ্ধে, যাহা পৃথিবীর অধোতে, ইহাদিগের অন্তরস্থ এই যে দ্যৌ এবং পৃথিবী, যাহা অতীত, যাহা ভবিষ্যৎ······এইসমুদায় কোন্ বস্তুতে ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান?"

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—"এসমুদায় আকাশে ওতপ্রোত-ভাবে বর্ত্তমান।"

গার্গী বলিলেন—

"যাজ্ঞবল্ক্য! তুমি আমার এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছ, তোমাকে নমস্কার। অপর প্রশ্নের জন্য মনকে প্রস্তুত কর।"

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—

"গার্গী! জিজ্ঞাসা কর।" দ্বিতীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বে গার্গী প্রথম প্রশ্নই আবার জিজ্ঞাসা করিলেন এবং যাজ্ঞবল্ক্যও ঠিক সেই উত্তরই দিলেন। তিনি বলিলেন—"এইসমুদায় আকাশে ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান।" তখন গার্গী জিজ্ঞাসা করিলেন—

"এই আকাশ কোন্ বস্তুতে ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান?"

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—

"হে গার্গি! ব্রাহ্মণগণ বলেন, ইনি সেই অক্ষর।"

ইহার পরে যাজ্ঞবল্ক্য যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাকে চারি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(ক)

প্রথমে বলিলেন—অক্ষর কি নহেন।

"তিনি স্থূল নহেন, অণু নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন, লোহিত নহেন, স্নেহবস্তু নহেন, ছায়া অন্ধকার নহেন, বায়ু নহেন, আকাশ নহেন; তিনি অসঙ্গ অ-রস অ-গন্ধ অ-চক্ষু অশ্রোত্র বাগিন্দ্রিয়বিহীন মনোবিহীন তেজো-রহিত প্রাণরহিত মুখরহিত; তিনি অপরিমেয়, তিনি **অন্তর-রহিত** তিনি **বাহ্য-রহিত,** তিনি ভোজন করেন না, এবং কাহা কর্ত্তৃক ভুক্ত হয়েন না।"

(খ)

ইহার পরে যাজ্ঞবল্ক্য অক্ষরের ক্ষমতা বিষয়ে বর্ণন করিয়াছেন—

"হে গার্গি! এই অক্ষরের প্রশাসনে চন্দ্র ও সূর্য বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। হে গার্গি! এই অক্ষরে প্রশাসনে নিমেষ মুহূর্ত্ত অহোরাত্র অর্দ্ধমাস মাস ঋতু ও সম্বৎসরসমূহ বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। হে গার্গি এই অক্ষরের প্রশাসনে পূর্ব্ববাহিনী (কিংবা পূর্ব্ব দেশস্থিতা) নদীসমূহ শ্বেত পর্ব্বত হইতে প্রবাহিত হইতেছে; পশ্চিমবাহিনী নদীসমূহ (কিংবা পশ্চিম দেশস্থিতা নদীসমূহ) এবং অন্যান্য নদীসমূহ নিজ নিজ দিকে প্রবাহিত হইতেছে। হে গার্গি! এই অক্ষরে প্রশাসনে লোকসমূহ বদান্যগণকে প্রশংসা করে, দেবতা সমূহ যজমানের এবং পিতৃপুরুষসমূহ দর্ব্বী হোমের অনুগত হয়েন।"

(গ)

ইহার পরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—"সেই অক্ষরকে জানিতে হইবে। হে গার্গি! এই অক্ষরকে না জানিয়া যে ইহলোকে আহুতি প্রদান করে, এবং বহু বৎসর তপস্যা করে, তাহার সেই কার্য্য ক্ষয়শীল হয়। হে গার্গি! এই অক্ষরকে না জানিয়া যে ইহলোক হইতে প্রস্থান করে সে কৃপণ। হে গার্গি! যে এই অক্ষরকে জানিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করে, সে ব্রাহ্মণ।"

(ঘ)

তাহার শেষ উপদেশ এই:—"হে গার্গি! এই অক্ষরকে দেখা যায় না, কিন্তু তিনি দর্শন করেন; তাঁহাকে শুনা যায় না, কিন্তু তিনি শ্রবণ করেন; তাহাকে মনন করা যায় না কিন্তু তিনি মনন করেন; তাঁহাকে জানা যায় না, কিন্তু তিনি জানেন। তিনি ভিন্ন কেহ দ্রষ্টা নাই, তিনি ভিন্ন কেহ শ্রোতা নাই, তিনি ভিন্ন কেহ মননকারী নাই তিনি ভিন্ন কেহ বিজ্ঞাতা নাই। হে গার্গি! এই অক্ষরে আকাশ ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে।"

এই ব্রাহ্মণে "ব্রহ্ম" শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই; ইহা পরিবর্ত্তে "অক্ষর" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যাহার 'ক্ষর'

অর্থাৎ বিনাশ বা পরিবর্ত্তন নাই, তাহারই নাম "অক্ষর"। এই অক্ষরকে যেভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং যখন ইহাকে দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা এবং বিজ্ঞাতা বলা হইয়াছে, তখন বলিতেই হইবে, আত্মাই এই অক্ষর।

'আত্মা' বলিলে কেহ হয়ত ইহাকে দেহ বা জড় বলিয়া মনে করিতে পারে, সেইজন্য বলা হইয়াছে, ইহা স্থূল অণু হ্রস্ব দীর্ঘাদি নহে। কেহ হয়ত মনে করিতে পারে ইহা দেহবিশিষ্ট; এইজন্য বলা হইয়াছে ইহা অচক্ষু অশ্রোত্র ইত্যাদি। এই আত্মা ছায়া বা অন্ধকারের ন্যায় কোন বস্তু (বা অবস্থা) নহে। লোকে মানবাত্মাকে সীমাবিশিষ্ট বলিয়া মনে করে, এইজন্য বলা হইল—ইহা "অপরিমেয়"। সাধারণতঃ মনে হয় মানবাত্মার অন্তর এবং বাহ্য উভয়ই আছে, সেইজন্য বলা হইল এই অক্ষর অন্তর্বাহ্য-ভেদ-রহিত।

এই আত্মা সর্ব্বশক্তিশালী ইহা বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে ইহার প্রশাসনে চন্দ্রসূর্য্যাদি বিধৃত হইয়া রহিয়াছে এবং স্ব স্ব কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে।

এই আত্মাকে জ্ঞানের বিষয়ীভূত করা যায় না, ইনি বিষয় নহেন, ইনি বিষয়ী। ইহা বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে ইনি দর্শন শ্রবণাদি করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহাকে দর্শন শ্রবণাদি করা যায় না।

৫। শাকল্য-ব্রাহ্মণ (বৃহঃ ৩।৯)।

বিদগ্ধ-শাকল্য নামক একজন ব্রাহ্মণ যাজ্ঞবল্ক্যকে অনেক বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রশ্নের মূল বিষয়:—"কোন্ পুরুষ সমুদায় আত্মার পরমাশ্রয়?"

প্রায় সমুদায় মানবই বহু পুরুষ ও বহু আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে; শাকল্যও তাহাই করিতেন। যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত বিচারে তিনি আটজন পুরুষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই পুরুষগণের নাম—(১) শারীর পুরুষ, (২) কামময় পুরুষ, (৩) আদিত্যস্থ পুরুষ, (৪) শ্রোত্রসম্বন্ধী পুরুষ, (৫) ছায়াময় পুরুষ, (৬) আদর্শস্থিত পুরুষ, (৭) জলস্থিত পুরুষ এবং (৮) পুত্রময় পুরুষ। যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত আলোচনায় শাকল্য প্রথমে বলিলেন, শারীর পুরুষই সমুদায় আত্মার আশ্রয়; ইহার পরে সাতবার অবশিষ্ট সাতটি পুরুষকে সমুদায় আত্মার পরমাশ্রয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

পুরুষ আটটি; ইহাদিগের প্রকৃতি ভিন্ন, বাসস্থান ভিন্ন, এবং কাম্যবস্তুও ভিন্ন। যাজ্ঞবল্ক্য এইসমুদায় পুরুষকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করেন নাই। কিন্তু তিনি বলিয়াছেন—যিনি এইসমুদায় পুরুষকে কার্য্যে প্রেরণ করেন, এবং কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করেন, এবং এইসমুদায় পুরুষকে অতিক্রম করেন, তিনিই ঔপনিষদ্ ব্রহ্ম।

শাকল্য যে-সমুদায় পুরুষের কথা বলিয়াছেন তাহাদিগের কাহারও সত্তাই নিরপেক্ষ নহে, সকলেই ব্রহ্মের অধীন, ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত এবং ব্রহ্ম কর্ত্তৃক পরিচালিত। আত্মাই এই ব্রহ্ম।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন:—এই আত্মার বিষয়ে কিছুই বলা যায় না। কেবল বলা যায়:—

"এই আত্মা 'নেতি নেতি'—ইহা নয়, ইহা নয়। ইনি অগ্রাহ্য, ইহাকে গ্রহণ করা যায় না; ইনি অশীর্য্য, ইনি শীর্ণ হয়েন না; ইনি অসঙ্গ, ইনি কোন বস্তুতে আসক্ত নহেন; ইনি অবদ্ধ, ইনি ব্যথা প্রাপ্ত হন না এবং হিংসিত হন না (৩।৯।২৬)।

সিদ্ধান্ত

জনক-সভায় যে তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা এই:—

১। আত্মা এক এবং এই আত্মাই ব্রহ্ম।

২। কোন কোন স্থলে বলা হইয়াছে এই আত্মা অন্তর্বাহ্য-ভেদরহিত।

৩। ইহা হইতে কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন যে এই জগতের বাস্তব সত্তা নাই। যে আত্মার অন্তর বাহির নাই, যাঁহার নিকট কোনপ্রকার ভেদ নাই, তাঁহার অন্তরে বা বাহিরে এই বিচিত্রতা-পূর্ণ জগৎ থাকিতে পারে না। সুতরাং এই জগৎ অস্তিত্ববিহীন। এপ্রকার সিদ্ধান্ত করা অসম্ভব নহে। যাজ্ঞবল্ক্যও কোন কোন স্থলে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

৪। কিন্তু এ জগতের যে বাস্তব সত্তা আছে, তাহাও কোন কোন স্থলে উক্ত হইয়াছে। অন্তর্যামি-ব্রাহ্মণে বলা হইয়াছে যে এই জগৎ ব্রহ্মের অঙ্গ কিন্তু ব্রহ্ম হইতে পৃথক্।

৫। আত্মাই দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা ও বিজ্ঞাতা। সুতরাং ইহাকে দর্শন শ্রবণ ও মনন করা যায় না এবং জানা যায় না।

৬। আত্ম-তত্ত্বের শেষ উপদেশ 'নেতি', 'নেতি'—ইহা নয়, ইহা নয়।

যাজ্ঞবল্ক্য জনক-রাজার নিকটে যে ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহা পর-প্রবন্ধে আলোচিত হইবে।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

"জীবন-মরুভূমি"

(১) অবস্থা

নরহরি প্রেমে পড়িয়াছে !!!!!!!!!!!

(২) ব্যবহার

কি করিয়া বুঝাইব তাহার হৃদয়ে কি প্রহেলিকাময় ভাব-সংগ্রাম চলিতেছে? সে চাঁদের আলোয় বসিয়া বসিয়া অবশেষে ঘুমাইয়া পড়ে। কবিতার ছন্দে তাহার ভাবনা চিন্তা কথা স্বপ্ন ও প্রলাপ; এমন কি ছন্দে না মিলিলে সে কোনো কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করে না। কত খাবার সে খায়ই না, কেননা তাহাদের নাম কবিতায় ব্যবহার করা চলে না। রসগোল্লা!! শুনুন একবার নামটা! কি করিয়া কোনো সৌন্দর্য্যপিপাসু কবি উহা খাইতে পারে তাহা নরহরি ভাবিয়াই পায় নাই। শেষে কি রসপিপাসু নরহরির রসসমুদ্র গোল্লায় পরিণত হইবে!

ভাল বিপদ্! এমন সুন্দর খাবারটা শুধু নামের টাল সাম্‌লাইতে না পারিয়া গোল্লায় গেল! নরহরি সিঙ্গাড়াই বা খায় কি করিয়া, আর মেটিরিয়া-মেডিকাই বা পড়ে কি বলিয়া?

এই গদ্যময় জগতের বস্তুতন্ত্রের চাপে কোকিলের ডাকটুকুও না শুনিতে পাইয়া নরহরির জীবন বিষময় হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ঘোর বর্ষায় কলিকাতা সহরে কোকিল ডাকিবে কোথা হইতে? অগত্যা গ্রামোফোনে কোকিলের কণ্ঠস্বরের মত একটি ইংরেজী গানের রেকর্ড্ পাইয়া তাহার সাহায্যেই নরহরি ক্ষুধিত হিয়ার হিক্কার উৎপীড়ন হইতে নিস্তার লাভ করিল। নরহরির ডাক্তারী-পড়ুয়া বন্ধুবর্গ তাহার অবস্থা দেখিয়া তাহাকে নানান্ প্রকার ব্যাধিতে আক্রান্ত বলিয়া স্থির করিয়াছে, কিন্তু তাহার ব্যাধি কি তুচ্ছ ডাক্তারে বুঝিতে পারে? সে যে প্রেমে পড়িয়াছে!

প্রেম—এই প্রেমে রোমিও পড়িয়াছিল, জুলিয়েট্ পড়িয়াছিল, শকুন্তলা পড়িয়াছিল, দুষ্মন্ত পড়িয়াছিল, সাবিত্রী পড়িয়াছিল, সত্যবান্ পড়িয়াছিল; নল ও দময়ন্তীও এই প্রেমেই পড়িয়াছিল। এই প্রেমের তাড়নাতেই সূর্পণখা নাসিকা বলিদান দিয়াছিল ও ইহারই প্রকোপে রাবণ থিয়েটারী পোষাক পরিয়া ভিখারীর সাজে সীতা হরণ করিয়াছিল! আর আজ নরহরিও এই প্রেমেই পড়িয়াছে! এক নিমিষে সে এই অপূর্ব্ব প্রেমরাজসভার একজন সভাসদ হইয়া গেল! তাহার আশে পাশে বিখ্যাত প্রেমিকগণ কাতারে কাতারে দণ্ডায়মান! দিব্যচক্ষে নরহরি দেখিল আজ সেও তাহাদেরই একজন্ হইয়া জীবন ধন্য করিয়াছে। নরহরি আকুলকণ্ঠে বলিল, "ভাই রোমিও! তোমায় যে বিষজ্বালায় জর্জ্জরিত করিয়া চিরনির্ব্বাণ লাভ করে, আজ আমার হৃদয়েও যে সেই একই বিষ, একই ভাবে প্রবেশ করিয়াছে। এস ভাই, তোমার বুকের অনল আমার সহানুভূতির অশ্রুজলে নিভাইয়া শান্তি লাভ করো।" রোমিও দুইহাত বাড়াইয়া ইতালিয়ান্ আলিঙ্গনে নরহরির কলেবরে রোমাঞ্চ আনয়ন করে। সেই নিবিড় নিভৃত হৃদয়ের অন্তরালস্থিত গোপন পরশস্পন্দনে নরহরি নিঝুম হইয়া বসিয়া থাকে—বাজে লোকে বলে—তাহার লৈথার্জিয়া এন্‌সেফেলাইটিস্ স্লীপিং সিক্‌নেস্ হইয়াছে।

হৃদয়ে প্রেম থাকিলে হাওয়াতেও কি এক অপূর্ব্ব-রসের আস্বাদ পাওয়া যায় তাহা শুধু নল দময়ন্তী নরহরি-প্রমুখ ভাগ্যবন্ত প্রেমিক-প্রেমিকাগণই বলিতে পারেন;

সে রসে বঞ্চিত থাকিবে এই ভয়ে নরহরি দিবানিশি মুখব্যাদান করিয়া জীবনযাপন করে। জিহ্বা তাহার ঐ সুধানির্ঝরিণীর মধুস্রোতে সর্ব্বদা সরস হইয়া থাকে—কিন্তু অজ্ঞ নর অঙ্গে অর্থহীন মর্ম্মঘাতী ডাক্তারী যন্ত্রপাতি বহন করিয়া নিজেকে জ্ঞানী ও গুণীজন ভ্রমে অহংকারমত্ত হইয়া বলে "নরহরির য়্যাডেনইড্‌স্ হইয়াছে!"

বিজ্ঞান বলে কোনো অঙ্গ ব্যবহার না করিলে তাহা শুকাইয়া নষ্ট হইয়া যায়। এই বাস্তবের পঙ্কিলতাময় সংসারে, যাহারা আত্মার ব্যাপার লইয়া সদা-সর্ব্বদা তন্ময় হইয়া থাকে, তাহাদের পক্ষে বাস্তবের সহিত যথাযথ সম্বন্ধ-রক্ষা ক্রমশঃ অসম্ভব হইয়া উঠে। নিগূঢ় আধ্যাত্মিক প্রেমের পূজারী নরহরি ক্রমশঃই বাস্তবের কদর্য্য অসামঞ্জস্যে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে। সে শ্যামবাজারের ট্রামে উঠিয়া এসপ্লানেডের টিকিট চাহিয়াছিল। বস্তুতন্ত্রবিষময় সংসারে পুষ্পসৌরভবিমূর্চ্ছিত মনোবৃত্তিগুলিকে কোনো প্রকারে জীবিত রাখিয়া যে বাঁচিয়া আছে তাহার পক্ষে ওরূপ একটু ভ্রমপ্রমাদ কি অস্বাভাবিক? তাহাতে রূঢ় টিকিট-বিক্রেতা তাহার আহার্য্য- ও পানীয়-বিচার সম্বন্ধে তীব্রভাষা ব্যবহার করায় ক্ষুব্ধ নরহরি ট্রাম হইতে সত্বর নামিয়া পড়িল। ব্যথিত হৃদয় তাহাকে ক্ষণিকের জন্য দিক্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য করিয়া দিল। যেদিকে মুখ করিয়া চলন্ত ট্রাম হইতে নামা উচিত তাহার বিপরীত দিকে মুখ করিয়া শিথিল চরণে ট্রাম হইতে অবতরণ-চেষ্টায় সে সফল হইল বটে, কিন্তু চরণ-যুগল তাহার মাটিতে না পড়িয়া উর্দ্ধমুখ হইয়া ছিন্ন মোজার আবরণ পাদুকাদুটিকে রূঢ় কণ্ডাক্টরের সহিত অসহযোগের ও প্যাসিভ্ রেজিষ্ট্যান্সের পতাকা-রূপে জগতের সম্মুখে সগৌরবে হাওয়ায় দুলাইতে লাগিল। পিঠে তাহার কিছু গোময় ও কর্দ্দম লাগিয়া রহিল বটে, কিন্তু মুখে তাহার ছিল সফলতার জ্যোতি এবং বুকে তাহার ছিল বাস্তবের কড়া-বহুল হস্ত দ্বারা অস্পর্শিত নিছক প্রেমের কয়েকটি পবিত্র অশ্রুকণা। লাগিলই বা পিঠে ধূলা, বাজিলই বা শরীরে ব্যথা—হৃদয় তাহার ভালবাসার পূর্ণতায় বেলুনের মত সকল কিছু তুচ্ছ করিয়া উর্দ্ধে উর্দ্ধে ভাসিতেছিল।

এই ঘটনাটি লইয়া অনেকে অনেক-কিছু বলিল। কেহ নব্যজ্ঞানলব্ধ মূর্খতায় অভিভূত হইয়া বলিল—নরহরির শরীরে অসংখ্য হুক্-ওয়ার্ম্ বাসা বাঁধিয়া কালযাপন করিতেছে; কেহবা তর্কশাস্ত্র সম্বন্ধীয় কেতাব ক্রয় করিলেই সুতর্ক আপনা হইতে আসে, এই ভ্রমে পড়িয়া তর্ক করিল—যদি নরহরি অতিরিক্ত চা পান করিয়া ও রাত্রি জাগিয়া ভর্জ্জিত কুক্কুট-ডিম্ব ভক্ষণ করিয়া তাহার ব্লাড্-প্রেসারটির সর্ব্বনাশসাধনই না করিয়াছে, তাহা হইলে তাহার মাথা ঘুরিয়া ট্রাম হইতে পতন কি বিনা কারণে হইল? নরহরিই শুধু বুঝিল যে প্রেমবিহ্বলতার মূল্য তাহাকে শারীরিক কষ্ট স্বীকার করিয়াই দিতে হইবে এবং তাহাতে তাহার কোনো অসোয়াস্তি হইল না।

(৩) পোষাক

বাহ্য জগতের সহিত যে প্রেমিকজনের কোনো সম্বন্ধ থাকিতে পারে, ইহা সহজে প্রত্যয় হয় না; কিন্তু তাহাদের সাজসজ্জা দেখিয়া মনে হয় এই মাটির পৃথিবীর সহিত ভেজাল-বিহীন ভাবরাজ্যের বুঝি বা একটি সূক্ষ্ম সংযোগ-তন্ত্রী হতাশের শেষ আশার মতই জোর করিয়া নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে। এই জোর করার ভাবটাই খুব চোখে পড়ে। নরহরি এই নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম করে নাই। প্রেমিকজনের সম্মানরক্ষার্থ নখ-শিখ বর্ণনার চিরাগত প্রথা অনুসারে আমরা তাহার পদযুগল হইতে ক্রমশঃ উর্দ্ধারোহণ করিয়া তাহার টেড়ী পর্য্যন্ত আসিয়া আমাদের জ্ঞানপিপাসার নিবৃত্তি করিব।

তাহার পাদুকা দুটিকে দেখিলে মনে হয়, যেন ঐ পদ-পল্লবে ভাগ বসাইবার জন্য জগতের সকল জুতা সতত উদ্‌গ্রীব (অথবা উদ্‌জিহ্ব) হইয়া নরহরিপদযুগলের দিকে শনৈঃ শনৈঃ আগুয়ান হইতেছে, তাই উক্ত পদযুগলের মালিক লপেটাদ্বয় স্বার্থরক্ষার্থ ফণা ধরিয়া পাদুকাজগৎকে "যুদ্ধং দেহি, যুদ্ধং দেহি, বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র-প্রমাণ পায়ের চামড়া নখ ফোস্কা বা কড়া ছাড়িব না" বলিয়া সম্মুখ-সমরে আহ্বান করিতেছে। তাহাদের বীরদর্পে আজ দুই বৎসর যাবৎ নরহরির শ্রীচরণ অপর পাদুকাস্পর্শে কলুষিত হয় নাই।

মোজা জোড়াটা তাহার শতযুদ্ধের জয়-পতাকারি মতই ছিন্ন ও মালিন্য-গৌরবে গর্ব্বিত। তাহাদের দম্ভাতেই

বাহিরের আলো বাতাস নরহরির চরণপরশে জীবন ধন্য করিতে পারে।

তাহার পরনের ধুতিখানি অর্দ্ধমলিন হইলেও পাড়-সৌষ্ঠবে আত্মমর্য্যাদা বজায় রাখিয়াছে। রামধনুর সপ্তবর্ণই তাহার পাড়ে অধিষ্ঠিত, এবং প্রত্যেকটি বর্ণই নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবার জন্য সেই পাড়ে হৃদয়ের সকল আবেগ ঢালিয়া প্রচণ্ডরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহাদের রেষারেষির ফলে ধুতির পাড়খানি সঙ্কীর্ণ রণক্ষেত্রের মতই বিপজ্জনক বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু সেই রণক্ষেত্রের উপরে আকাশের মত অনন্ত-বিস্তৃত একখানি নীল পাঞ্জাবী সবকিছু ব্যাপিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। যেন ধুতির ছুরির-সাহায্যে-কোঁচান ক্রুদ্ধমূর্ত্তি পাড়খানার ভয়েই পাঞ্জাবীটি চরণ ছাড়িয়া সাবধনতার খাতিরে কয়েক ইঞ্চি ঊর্দ্ধে রহিয়াছে। পাঞ্জাবীর বোতাম-গুলি জার্ম্মানদেশ হইতে তাহাদের নকল সোনা ও আসল কাচে সজ্জিত সৌন্দর্য্য লইয়া নরহরির বুকে স্থান পাইবে এই আশাতেই বহুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছিল। সে আশা সফল হওয়ায় আনন্দের আতিশয্যে কোনো কোনোটি কাচহারা হইয়া গিয়াছে।

তার পর সেই চশ্‌মাখানি! অতল সমুদ্রের কচ্ছপ ও খনির গভীর সোনা দুইয়ে মিলিয়া তার পীতবর্ণের কাচদুটি ধরিয়া বিরাজমান। নরহরির তৃষ্ণার্ত্ত আঁখির আকুলতা সেই পীত পিঞ্জরের ভিতর দিয়া শীর্ণকায় বন্দীর মতই লোকের প্রাণে করুণার উদ্রেক করে। যেন তার দৃষ্টি জগৎকে ব্যাকুল হইয়া বলিতেছে, "ওগো!

কেন?

কোথায়?

হায়!

সে কি আর?

ওঃ!!!

উঃ! ইত্যাদি।

সে দৃষ্টির কাহিনী ভাষায় বলা যায় না; আলোকচিত্রে তাহা প্রস্তরপুষ্পের মতই অসাড় দেখায়; সিনেমায় বুঝি তাহার নিবিড় ভাবলালিত্যের একটু আভাস ক্ষণিকের জন্য পাওয়া যায়। অবগুণ্ঠনবতীর সরমের মত সেই চাহনি চশ্‌মার অন্তরালে মর্ম্মদহনের ব্যথা অঙ্গে মাখিয়া আহত মরালের মত গোপনে মৃত্যু-প্রতীক্ষা করিতে "চাই কিন্তু পারি না" বলিয়া অপরাধীর মত জড়সড় হইয়া রহিয়াছে। সেই চাহনি দেখিয়া নরহরির মানস-প্রিয়া মুহুর্মুহু মূর্চ্ছিতা ও চিরবন্দিনী!

আর সেই টেড়ী! বটবৃক্ষ যেমন স্বভাব-সুন্দর হইয়া বাড়িয়া উঠে, মানুষের কৃত্রিমতার যন্ত্র যেমন বটবৃক্ষকে কেয়ারী করিতে সাহস পায় না, তেমনিই নরহরির চুল স্বভাবসৌন্দর্য্যময় গতিতে তাহার মেরুদণ্ড বাহিয়া বহুদূর আসিয়া পড়িয়াছে। মাথার উপর তাহা বিচিত্র ভঙ্গীতে অবস্থিত। কোথাও প্রলয়তুফানের মত তাহা তরঙ্গায়িত, কোথাও তাহা টেনিস-কোর্টের মতই সমতল, কোথাও তাহাতে উত্তেজনা অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, আর কোথাও তাহা মরণের ন্যায় শান্ত ধীর! এ যেন তাহারই হৃদয়ের বাহ্যিক প্রতিচ্ছবি।

হায়, এ হেন নরহরিকে তাহার ডাক্তারীপোড়ো বন্ধুবর্গ "প্যাকমধরা সারসপক্ষী" আখ্যায় বিভূষিত করিয়াছিল! কেন তাহাদের এ দুর্ম্মতি হইল তাহা বুঝাইতে হইলে আরও একটি কথা বলা প্রয়োজন।

(৪) চলন

হাঁটিয়া বেড়াইলে নরহরিকে কিঞ্চিৎ অপার্থিব-রকম দেখায়। মনে হয় যেন এই উদ্দাম পৃথিবীতে সে একটা বিরাট্‌ জিজ্ঞাসার চিহ্নের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহার মস্তক সুদীর্ঘ গ্রীবার উপর সম্মুখে ঝুলিয়া পড়িয়া অবস্থিত। যেন পৃথিবীর কোলে তাহার জীবন-সর্ব্বস্ব হারাইয়া সে আজীবন হারামণির অন্বেষণে চঞ্চল হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অধোদেশে দীর্ঘ রুগ্ন শরীর পূর্ব্ব-বর্ণিত সাজসজ্জায় মণ্ডিত হইয়া আকাশপ্রদীপের বংশ-দণ্ডের ন্যায় বর্ত্তমান। সে যেন জগৎকে জিজ্ঞাসা করিতেছে "তবে কেন মিছে ভালবাসা?" প্রতিপদক্ষেপে নরহরি প্রমাণ করিয়া দেয় যে ভগবান্‌ মানুষের পদযুগলকে পথ অতিক্রম করিবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন: তাহা হইতে জুতা ঝুলাইয়া রাখিবার জন্য নহে। যাহারা পরশ্রীকাতর তাহারা বলিত যে তাহার হণ্টন দেখিলে মনে হয় কোনো শুচিবায়ুগ্রস্ত উষ্ট্র সন্তর্পণে মন্দিরপথে চলিয়াছে।

চলিবার সময় নরহরি এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া চলিত! কারণ, মানুষ শুধু সম্মুখে তাকাইয়াই চলিবে এমন ইচ্ছা ভগবানের থাকিলে, তিনি মানুষের ঘাড় স্থির অচল করিয়াই সৃষ্টি করিতেন। তাঁহার ইচ্ছা যে বিপরীত-প্রকার তাহার প্রমাণ মানুষের ঘাড় নাড়িবার ক্ষমতা। এই কারণে ভগবদ্‌ভক্ত নরহরি ভগবানের ইচ্ছার বিপরীত কার্য্য করিত না। তাহার সম্মুখে-ঝুলিয়া-পড়া মস্তক যখন ইতস্তত সঞ্চালনে ভগবদ্-উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়তা করিত, তখন সত্যই মনে হইত যে তাহার ঘূর্ণায়মান গ্রীবার গতিভঙ্গীর অন্তরালে কোনো নিগূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত আছে। বন্ধুগণ বলিত নরহরির "উদ্দেশ্য ভাল নয়"। কিন্তু নিন্দুক যাহারা, তাহাদের কথায় বিশ্বাস করা কি বুদ্ধিমানের কাজ ?

(৫) কাহিনী

কলিকাতার বাহিরে কোনো একটি ছোট সহরে নরহরিদের বাসস্থান। সেখান হইতে তাহার পিতা প্রত্যহ ডেলি-প্যাসেঞ্জারী করিয়া একটি মার্চেন্ট্ আফিসে বড়-বাবুগিরি করিতেন। বেশ দুপয়সা তাহাতে তাঁহাদের আয় হইত।

নরহরি পিতামাতার একমাত্র সন্তান, সাদরে লালিত পালিত ও চর্ব্বিত-মস্তক। বাল্যকালাবধি সনাতন রীতি (অথবা ভীতি) অনুসারে তাহাকে বাহিরের আলো বাতাস, উপযুক্ত ও যথেষ্ট খাদ্য, স্বাস্থ্যকর (মূল্যবান্ নহে) পোশাক, খেলাধূলা, "গোঁয়ার্ত্তুমি", "একরোখামি" ইত্যাদি দোষ হইতে দূরে রাখিয়া "মানুষ" করা হয়। ফলে নরহরি অকালে প্লীহাগ্রস্ত, শীর্ণদেহ জন্মভীরু ও পরনির্ভর হইয়া বাড়িয়া উঠে। তাহাকে "মানুষ" করা লইয়া তাহার পিতামাতার প্রায়ই সশব্দ চিন্তার বিনিময় চলিত। ফলে নরহরির বিশ্বাস হইয়া দাঁড়ায় যে পুরুষজাতিকে সায়েস্তা রাখিবার জন্য স্ত্রীলোক ভগবানের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। স্ত্রীলোক যে আবার কোনো আকর্ষণের বস্তু একথা মাতৃ-অঞ্চলান্তরালস্থিত নরহরি কখনও স্বপ্নেও ভাবে নাই। এবং ম্যাট্রিকুলেসন পাস্ করা অবধি তাহার এই বিশ্বাস স্থির ও অচল ছিল। সে "প্রাইভেট" পরীক্ষা দেয়, স্কুলে কখনও যায় নাই। কেননা স্কুলে গেলে ছেলেরা "খারাপ" হইয়া যায় এইরূপ একটি জনরব তাহাদের অন্তঃপুর অবধি পৌছিয়াছিল। কিন্তু পাস করিবার পরে তাহাকে কুসংসর্গের বিপদ্ মস্তকে করিয়াই কলিকাতায় কলেজে যাইতে হইল। অবশ্য সে তাহার পিতার মতই ডেলি-প্যাসেঞ্জারী করিত। কিন্তু তাহাতেও সে আর সংসর্গ-দোষ-মুক্ত থাকিতে পারিল না। কলেজের বই বলিয়া নরহরি শীঘ্রই উপন্যাস পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। মাতা ভাবিলেন পুত্রের পাঠে অসাধারণ মনোযোগ, নতুবা সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একমনে নিত্য নূতন মোটা মোটা পুস্তক হস্তে করিয়া বসিয়া থাকে কেন?

ক্রমে দেখা গেল কলেজে দেরী হইয়াছে ছুতা করিয়া নরহরি বন্ধুদিগের সহিত ম্যাটিনীতে বায়স্কোপ দেখিতেছে বহির্জগতের সঙ্গে এইরূপে পরিচয় হওয়ার ফলে ইহার পর হইতেই তাহার কলেজের সম্মুখে রাস্তায় দাঁড়াইয়া গাড়ি-ঘোড়া দেখিবার সখ কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় বাড়িয়া গেল; বিশেষ করিয়া মেয়েস্কুলের বাস্ যাইবার সময় তাহার রাস্তায় উপস্থিত থাকা একান্তই প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল। নিজের মাতা ব্যতীত অপর কোনো নারীকে যে কখনও দেখে নাই, তাহার পক্ষে কলিকাতার নূতন জীবন একটি স্বপ্নময় জীবন হইয়া উঠিল। নাটক নভেল ও সিনেমায় তাহাকে এই শিক্ষাই দিল, যে, নারী শুধু পুরুষকে শাস্তি দিবার জন্য স্থূলবপু কাংস্য-বিনিন্দিত-কণ্ঠ মারাত্মক-অলঙ্কার ও মর্ম্মভেদী-বচন-বিন্যাস প্রভৃতি নিদারুণ উপকরণে সৃষ্ট প্রলয়ের অবতার নহে। পুরুষকে মায়ামুগ্ধ করিয়া শৃঙ্খলাভিলাষী বন্দীতে ও আনন্দবিহ্বলতার জড়ত্বে পরিণত করিবার সম্মোহন-বাণও নারীই। নরহরি তাহার আজন্ম শিক্ষার ফলে পরহস্তে জীবন সমর্পণ করিবার আনন্দটা খুবই উপলব্ধি করিতে পারিত। সে চাহিত আপনাকে বিলাইয়া দিতে, প্রেমিকের মত আত্মবিস্মৃত হইয়া প্রেমানন্দে মজিয়া যাওয়াটা তাহার কাছে বড়ই আদর্শ অবস্থা বলিয়া বোধ হইত। কলিকাতার কলেজে পাঠ করিয়া ও নানা-প্রকার নূতন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে পড়িয়া নরহরির অবস্থা নিরামিষভোজী পরিবারের সন্তানের রেস্তরাঁ-পরিবৃত হইয়া বাস করার মতই হইল।

তাহার নমনীয় মন সদাই লুব্ধ লোলুপ হইয়া প্রেম ও নারী লইয়া জল্পনা-কল্পনা করিত।

ইতিমধ্যে অধিক পাঠ প্রয়োজন হওয়ায় তাহাকে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে হইল। মির্জ্জাপুরের এক মেসে তাহার বাসস্থান স্থির হইল। কল্পনা আজকাল তাহার উপর এত অধিক অত্যাচার সুরু করিল যে সে প্রণয়-পাত্রীর অভাবে আপন মনে বসিয়া প্রেমপত্র লিখিত। তাহার পত্রগুলির মধ্যে অর্থহীন ভাষায় সে শুধু এইটুকুই বুঝাইয়া দিত যে "শূন্য মন্দির" তাহার আর সহ্য হইতেছে না।

প্রেমপত্র লিখন ও দ্রুততালে বক্স্-হার্‌মোনিয়াম বাজাইয়া জগৎকে নিজের সুরবোধের অভাব জ্ঞাপন ব্যতীত, ছাদে দাঁড়াইয়া চারিদিকের বাড়ীগুলিতে তাহার "প্রিয়া" "মানস প্রতিমা" "হৃদয়েশ্বরী" "কুহকিনী" অথবা ঐজাতীয় কিছু হইবার উপযুক্ত কেহ আছে কিনা দেখাও তাহার একটা কাজ হইয়া দাঁড়াইল।

পাশের বাড়ীতে জানালার ধারে বসিয়া কে একটি নারী সেলাই করিত। তাহার মুখ নরহরি দেখিতে পাইত না, কিন্তু দেখিত সে একখানা আধ-ময়লা ধূসর রংএর শাড়ী [illegible]রিয়া নিজ কাজে ব্যস্ত থাকে। সে ভাবিত—হয়ত ঐ মে[illegible]য়েটির অবস্থা খারাপ, অন্ন-সংস্থানের জন্য হয়ত উহাকে কাজ [illegible] করিতে হয়। নরহরি স্থির করিল তাহাকে সাহায্য করিবে [illegible]। কিন্তু অপরিচিতের দান কি সে গ্রহণ করিবে? যদি সে [illegible]লে যে উহাকে ভালবাসে তাহা হইলে হয়ত প্রেমের খাতিরে [illegible] নরহরির দেওয়া অর্থ গ্রহণ করিতে পারে। ইহার পর ক[illegible]য়েক ঘণ্টার মধ্যেই নরহরি ঐ মেয়েটির সহিত ভালবাসায় লি[illegible]প্ত হইয়া পড়িল। অর্থাৎ সে বুঝিতে পারিল যে ঐ মেয়েটির [illegible] প্রতি ভালবাসায় তাহার হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়া রহিয়াছে এবং [illegible] সে ভার লাঘব করার একমাত্র উপায় তাহাকে পত্রলিখন।

যথা চিন্তা তথা ক[illegible]র্য্য। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নরহরি প্রণয়ের হতাশ্বাসে ভরা একখানি পত্র একটি টাকায় মুড়িয়া সেই জানালার মধ্য দিয়া ঘরের মধ্যে ছুঁড়িয়া ফেলিল। সে আশায় আশায় রহিল যে এমন গভীর প্রণয়ের প্রতিদান পাইবেই।

বিকাল বেলা মেসের একতলায় তুমুল কোলাহল শুনিয়া নরহরি দেখিতে গেল কি ব্যাপার। গিয়া দেখিল একজন শীর্ণকায় ব্যক্তি নিজ মস্তকের সযত্নরক্ষিত কয়েক গাছি চুলও রাগে প্রায় উপ্‌ড়াইয়া ফেলিবার জোগাড় করিতেছে। ক্রোধে তাহার শ্যামবর্ণ মুখখানা উহারই মধ্যে একটু লাল হইয়া উঠিয়াছে। সে বলিতেছে যে তাহার বৃদ্ধা পিসিমাতার সহিত অকথ্য-রকম পত্রালাপ করিয়া রসিকতা করিবার চেষ্টা যে ব্যক্তি করিয়াছে, তাহার লজ্জা এবং প্রাণভয় দুইএরই অভাব দেখা যাইতেছে। সে নাকি ইচ্ছা করিলে মেসে আগুন ধরাইয়া মেসবাসী সকলের মাংসে কুক্কুর বিড়াল ও অন্যান্য অনেকরকম জানোয়ারের ভোজের বন্দোবস্ত করিতে বিশেষ দ্বিধা বোধ করিবে না। তাহার অধীনে নাকি কলিকাতার বেশীর ভাগ গুণ্ডা ও অপর-প্রকার দুর্জ্জন কাজ করে এবং তাহার পিসিমাতাকে পত্রলিখন যমরাজকে নিমন্ত্রণ-পত্র প্রেরণের সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ উপায়। ইত্যাদি।

বহুকষ্টে তাহাকে থামাইয়া মেসের অধ্যক্ষ সকলকে ডাকিয়া নানাপ্রকার কঠিন কথা শুনাইলেন। নরহরির তখন আর কিছু শুনিবার মত অবস্থা নহে। একনিমিষে যাহার প্রাণ-প্রতিমা যৌবন বা কৈশোর হইতে অকস্মাৎ বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়া যায়, তাহার মর্ম্মবেদনা অপরে কি বুঝিবে? তাহার সমস্ত অন্তরখানি জুড়িয়া কালো মেঘের মত একটি নিবিড় বেদনা সকল আশা ও সকল আনন্দের আলোক গভীরতিমিরাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। যে তাহার প্রিয়া হইতে-হইতে হইল না, যাহার প্রণয়দৃষ্টি তাহার পানে চাহিতে চাহিতে চাহিল না, যাহার কুহকে সে ভুলিতে ভুলিতে ভুলিল না, যে তাহাকে ভ্রান্তির খেলা খেলাইয়া চিরদিনের মত বিদায় গ্রহণ করিল, তাহার কথা নরহরি কোন্ প্রাণে ভুলিবে? অদৃষ্টের এই গুপ্ত-ঘাতকের মত ব্যবহারে নরহরির নবীন হৃদয় নিরাশার হলাহলে বিবর্ণ হইয়া উঠিল।

(৭) বর্ত্তমান

অতঃপর গল্পের সূচনায় যে প্রেমিক-নরহরির বর্ণনা করা হইয়াছে তাহার কথা বলা প্রয়োজন। তাহার ঐরূপ অবস্থা বিনা কারণে হঠাৎ হয় নাই। কি করিয়া

সে ঐরূপ বিপদ্জনক-রকম প্রেমে পড়িল, সেই কথাই এখন বলা হইবে।

নরহরি আজকাল মেডিক্যাল কলেজে পড়ে। পিতা ঠিক করিলেন পুত্র ডাক্তার হইলে তাঁহার প্রতিপত্তি সহরে অক্ষুণ্ণ থাকিবে; সুতরাং পুত্র, ডাক্তার হইবার পক্ষে সকলপ্রকার অনুপযুক্ততা থাকা সত্বেও, পিতৃআজ্ঞা পালনার্থে মেডিক্যাল কলেজে চলিল। কিন্তু এখানে যেমন একদিকে আহত ভেকের উপর ছুরি চালাইতে নরহরির সবিশেষ বেদনা বোধ হইত, অপরদিকে তেম্নি সহপাঠিনী অনেকগুলি থাকাতে ভেকের সহিত তাহার সহানুভূতি দেখাইবার অবসর অত্যধিক ছিল না। সহপাঠিনীদিগের মধ্যে অনেকেই নরহরির নিকট অপ্সরীর ন্যায় রূপসী প্রতীয়মান হইতেন, কেননা ক্ষুধা থাকিলে রন্ধনের দোষক্রটি সহসা দৃষ্টিগোচর হয় না। নরহরির নিকট প্রেমে পতন একটা নৈতিক প্রয়োজন, একটা বিশেষ কর্ত্তব্যের রূপ ধারণ করিয়াছিল। সুতরাং সে যে সহপাঠিনী সুবসনার সহিত ভালবাসায় পড়িবে তাহার আর আশ্চয্য কি? কিন্তু সুবসনা তাহার সেই গোপন ভালবাসার কারণ হইলেও, সে বিষয়ে তাঁহার কোনো জ্ঞান ছিল না। শত শত ছেলের মধ্যে যে একজন বিশেষ করিয়া তাঁহারই জন্য ঢেউ খেলাইয়া টেড়ী কাটে, অভিনব সাজে শীর্ণ দেহ সজ্জিত করে ও ক্লাসের কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়া তাঁহারই সৌন্দর্য্য উপভোগে তন্ময় হইয়া থাকে, তাহা তিনি জানিবেন কি করিয়া? শত শত টেড়ী সাজ-সজ্জা ও আকুল চাহনির মধ্যে কোন্গুলির মূলে তিনি নিজেই রহিয়াছেন তাহা না বুঝিলে কি সুবসনাকে দোষী করা চলে?

নরহরি তাঁহার নিকটে বসিবে বলিয়া সকল কায্য ফেলিয়া, প্রক্সি দেওয়া ভুলিয়া, প্রত্যহ অনেক সময় থাকিতে ক্লাসে যাইতে আরম্ভ করিল ও কখনো তাঁহার নিকটে আসিতে পারিলে ব্যাকুলনয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া সশব্দে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিত। কিন্তু সুবসনা চেতনাহীনের ন্যায় নরহরির সকল চেষ্টা, সকল নীরব আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া আপনমনে পড়াশুনায় ব্যস্ত থাকিতেন।

এইপ্রকারে ছয় মাস কাটিয়া গেল। নরহরির জীবন নিরাশার বিষে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। প্রত্যেক দিন দিবা-অবসানে সে বিদেশী হ্যারিকেন নিবাইয়া দিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া উপন্যাসে যেরূপ বিবরণ আছে, সেইরূপ করিয়া মনোকষ্টে "আহত বৃশ্চিকের ন্যায়" ছট্ফট্ করিত। শত শত নায়ক তাহার পূর্ব্বে যেরূপ ধূলায় পড়িয়া কাঁদিয়াছে, নরহরিও, সেই বিশাল প্রেমসেবক সংঘেরই একজন বলিয়া, নিত্য কখন ধূলায় লুটাইয়া ও কখন প্রচণ্ডরূপে বুক চাপ্ড়াইয়া ক্রন্দন করিয়া সংঘধর্ম্ম পালন করিত। কষ্টে ও আবেগের তাড়নায় তাহার মুখ বিবর্ণ, আকৃতি বিকৃত ও চুল সজারুর কাঁটার মত খাড়া হইয়া উঠিত। সে কোকিল ডাকিলে কঠোর কর্ত্তব্যের খাতিরে সজোরে দীর্ঘনিশ্বাস না ফেলিয়া জলগ্রহণ করিত না। আকাশে মেঘ দেখিলে তাহার "উদ্বেল হৃদয়" সুদূরের পানে চাহিয়া সুবসনার কটা চোখদুটিকে "কাজল আঁখি" বলিয়া মনে পড়াইত। প্রেমের নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি পালনে তাহার দিন বেশ কাটিয়া যাইতেছিল কিন্তু একদিন মুহূর্ত্তের মোহে ভুলিয়া সে একটা নির্ব্বুদ্ধিতা করিয়া ফেলিল।

সেদিন কলেজের একজায়গায় সিঁড়ি দিয়া নরহরি নামিয়া আসিতেছিল। মনে তাহার একটা শান্ত নির্ব্বিকার ভাবই বিরাজ করিতেছিল। হঠাৎ দেখিল সুবসনা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছেন। দেখা মাত্র তাহার মনে পড়িল সেই উপন্যাসটির কথা, যাহার নায়ক সিঁড়ি দিয়া গড়াইয়া নায়িকার পদতলে পড়ার ফলে উভয়ের মিলন অসম্ভব-রকম সহজ হইয়া যায়। নরহরি হঠাৎ কিপ্রকার পাগলের মত হইয়া গেল। তাহার মনে হইল, এখনি সে সুবসনার পদতলে পড়িয়া হয় আত্মবলিদান দিবে, নয় তাঁহার প্রেমলাভে সক্ষম হইবে।

কলেজের একজন ছেলে, যে নির্দ্দোষ আমোদ বলিয়া লজিক পড়িত এবং পরে নরহরির 'ব্লড্ প্রেসর্' সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিল, সেই ছেলেটি, ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল। সে বলে যে সে দেখিল সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া নরহরি হঠাৎ কিরকম যেন করিতে লাগিল। তাহার মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল এবং চক্ষুদুটি একটু টেরা হইয়া যেন নাসিকার দোষগুণ পরীক্ষা আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ টলিয়া হঠাৎ নরহরি একেবারে তিন

আহত বৃশ্চিকের ন্যায় ছটফট্ করিতে লাগিল

করিতে লাগিল। কখনো জ্যোৎস্নাবিবশ নিশীথে কল্পনা-সৈকতে সুবসনা তাহাকে সমগ্র হৃদয় ঢালিয়া প্রেম জ্ঞাপন করে, কখনো বা নিভৃত রজনীর কোলে তাহারা দুইজনে হাত-ধরাধরি করিয়া, অনন্তের পানে দুই বাহু বাড়াইয়া 'আসি, আসি' বলিয়া ছুটিয়া চলে। কখনো আবার নির্জ্জন সমুদ্র-সৈকতে নরহরি যখন ভয়ব্যাকুল চাহনিতে দূরে তরণী আছে কি নাই দেখিতে ব্যস্ত, তখন আলুলায়িতকুন্তলা সুবসনা সুমিষ্ট-বংশী-বিনিন্দিত কণ্ঠে পশ্চাৎ হইতে বলিয়া উঠে "পথিক, তুমি কি পথ ভুলিয়াছ?"

চার ধাপ গড়াইয়া মাটিতে আসিয়া পড়িল। সম্ভবত তাহার একেবারে জ্ঞান লোপ পায় নাই, কেননা তাহার পড়ার মধ্যে আত্মরক্ষার একটা আভাস ছিল। বেচারী সুবসনা নরহরির পতনের তিন চার মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে হঠাৎ কি মনে করিয়া সিঁড়িতে না উঠিয়া পার্শ্বের ঘরে চলিয়া যান, তাহা না হইলে সে নাকি তাঁহারই উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িত। লজিক-পড়ুয়া ছেলেটি পরিশেষে বলিল, নরহরির ডিম্ব ভক্ষণ ত্যাগ করা নিতান্তই উচিত।

নরহরি জ্ঞান হইয়া দেখিল একজন ডোম তাহাকে বাতাস করিতেছে। ফুৎকারে তাহার আশার বুদ্বুদ ভগ্ন হইয়া গেল দেখিয়া সে হঠাৎ উঠিয়া পড়িল এবং অনেকের বারণ অগ্রাহ্য করিয়া মেসে চলিয়া গেল। ইহার পর কিছুদিন সে সুবসনা ব্যতীত অন্য বিষয়েও একটু মন দিল। কিন্তু হৃদয়ে যে আগাছা একবার বাড়িয়া উঠে, তাহাকে অল্পসময়ের মত ছাঁটিয়া কাটিয়া ছোট করিয়া রাখা যাইলেও তাহার মূল যতদিন থাকে ততদিন তাহা কচুরীপানার মত শত অত্যাচার সহ্য করিয়া বারে বারে মাথা তুলিয়া উঁচু হইয়া উঠে। জোর করিয়া তাহাকে ছাঁটিলে কাটিলে তাহা আরও দ্রুতবেগে বাড়িয়া উঠে মাত্র।

কয়েক সপ্তাহ যাইতে না যাইতে নরহরি আবার কল্পনা-রাজ্যে সুবসনার পরম আদরের ধন হইয়া বিচরণ

নরহরি দেখিল সুবসনা ব্যতীত জীবন-ধারণ অন্তত কর্ত্তব্যের খাতিরেও তাহার পক্ষে অসম্ভব। সে যেমন করিয়া হউক সুবসনার ভালবাসা পাইবেই পাইবে স্থির করিল।

অমৃতবাজার-পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপনে সে দেখিল এক ব্যক্তি শাস্ত্রসম্মতভাবে মানুষকে উল্কি পরাইয়া সর্ব্বক্ষেত্রে সফলতার পথে অগ্রসর করিয়া দিবে এইরূপ আশ্বাস দিয়াছে। খরচও তাহাতে কমই হইবে। নরহরি খিদিরপুরে তাহার নিকটে উপস্থিত হওয়াতে, সে ব্যক্তি দুই মিনিটের মধ্যেই বুঝিতে পারিল যে কোনো কঠিন-হৃদয়ার নির্ম্মম কবলে পড়িয়াই নরহরির সকল সুখ-শান্তির অবসান হইয়াছে। সে বলিল যে বাম-বক্ষের উপর উর্ব্বশীর মূর্ত্তি লাল ও নীল রংএ ২১/৪ ইঞ্চি করিয়া উল্কি করিলে প্রেমে সফলতা ও টাকপড়া নিবারণ—এক ঢিলে দুইটি পক্ষী আহত করার মতই সুখকর ও সহজভাবে সাধিত হইবে। এ বিষয়ে একজন মুক্তিয়ারের সলেফাফা প্রশংসাপত্রও সে দেখাইতে প্রস্তুত আছে। মোট খরচ ১৩৶০ মাত্র। নরহরি এত সহজে অল্প খরচে কার্য্য সাধিত হইবে জানিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার জামা খুলিয়া ফেলিল ও দুই ঘণ্টা ধরিয়া উল্কিকারের সূচিকার দংশনে জর্জ্জরিত হইয়া ও ১৩৶০ পরসাৎ করিয়া হৃদয়ের উপর রক্তাক্ত ব্যাণ্ডেজের অন্তরালে

উর্ব্বশীকে লইয়া যখন মেসে ফিরিল, তখন তাহার মুখদর্শনে মনে হইল, যে, প্রাণের ব্যথা হয়ত বা সত্যকার ব্যথার মতই মর্ম্মভেদী। কিন্তু হায়, উর্ব্বশী নরহরির হৃদয়ে চির-দিনের মত স্থান পাইলেও তিনি সে অধিকারের মূল্য-স্বরূপ তাহাকে সুবসনার ভালবাসা আহরণ করিয়া দিলেন না। লাভের মধ্যে এই হইল যে নরহরি অতঃপর মেসের কল-তলায় স্নান করা ত্যাগ করিল। ক্ষুদ্র স্নানের ঘরের সম্মুখে তৃষিত চাতকের মত প্রত্যহ তাহাকে স্নানার্থে অপেক্ষা করিতে দেখা যাইত।

এই সময়ে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রীগণ স্থির করিলেন তাঁহারা টেনিস খেলিবেন; এবং তাঁহাদের উৎসাহে শীঘ্রই একটি কোর্ট ছাত্রীদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল। সেই কোর্ট এক অভিনব টেনিসের লীলাভূমি হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু ছাত্রীদের টেনিস-জ্ঞানের সপক্ষে এটুকু বলা দরকার যে প্রত্যহই তাঁহাদের মধ্যে কেহ না কেহ অন্তত একবার বল্‌টিকে র‍্যাকেটের সাহায্যে আঘাত করিতেন এবং সপ্তাহে প্রায় দুইতিনবার বল্‌টি যথাস্থানে গমন করিত।

(৮) সমাপ্তি

প্রোফেসর ক—এর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিবারণ। সে টেনিস খেলায় খুবই উৎসাহী ও তৎপর। সেই কারণে তাহাকে কলেজের সকলেই খুব পছন্দ করিত। প্রত্যহই তাহাকে সর্ব্বাগ্রে ক্রীড়াক্ষেত্রে দেখা যাইত এবং সেই সর্ব্বশেষে উক্তস্থান ত্যাগ করিত।

ছাত্রীদিগের ক্লাবের কাপ্তেন ছিলেন স্বয়ং সুবসনা। তাঁহার ক্রীড়াতে খুবই দ্রুত উন্নতি দৃষ্ট হইতেছিল। এমন কি সকলে বলিতে আরম্ভ করিল যে শীঘ্রই সুবসনা অনেক পুরুষ খেলোয়াড়কে সহজেই পরাভূত করিতে পারিবেন। তাঁহার নাকি ওভারহেড্ স্ম্যাশ্ নামক মারখানি অত্যন্তই সুসম্পন্ন হয় এবং সার্ভিস্‌ও তাঁহার বিশেষ উন্নতিশীল।

কিছুদিন পরেই দেখা গেল যে ছাত্রীদের ক্লাবে ছাত্র ও প্রোফেসর-জাতীয় খেলোয়াড়গণ নিমন্ত্রিত হইতেছেন এবং মিক্স্‌ট্ ডাব্‌ল্‌স্ অর্থাৎ একজন পুরুষ ও একজন নারী একদিকে হইয়া খেলা খুবই প্রচলিত হইয়া গেল। কিন্তু সকল ছাত্রেরা সে নিমন্ত্রণ পাইত না, কেবল ছাত্রী খেলোয়াড়দিগের বন্ধুবর্গই সে সম্মানে সম্মানিত হইত। প্রোফেসর ক— এবং তাঁহার ভ্রাতা নিবারণ প্রায়ই মিক্স্‌ট্ ডাব্‌ল্‌স্ খেলিতেন এবং তাঁহাদের উৎসাহেই নাকি ঐরূপ খেলার দ্রুত উন্নতি হইতেছিল। ইহাতে কলেজে নিবারণের প্রতিপত্তি আরও বাড়িয়া গেল এবং যে-সকল ছাত্র কদাপি কোনো-প্রকার খেলার ছায়াও মাড়াইত না, দেখা গেল তাহারাও টেনিস-ক্লাবের সভ্য হইতে দলে দলে অগ্রসর হইতেছে।

নরহরি সকলপ্রকার খেলাধূলাকে আজন্ম শিক্ষা ও প্রেম-দর্শনের প্রভাবে বর্ব্বরতা ও পাশবিকতার মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু সুবসনার হস্তে টেনিস-র‍্যাকেট দেখিয়া তাহার এই আজীবন যত্নে প্রতিপালিত মনোধর্ম্মে একটা সাংঘাতিক নাড়া পড়িল। সে হঠাৎ দেখিল যে এই খেলাই যুগধর্ম্ম। তাহার পর বন্ধুবান্ধব ও সম-প্রেমিকগণকে বিস্ময়-সাগরে হাবুডুবু খাওয়াইয়া নরহরি ১৭৲ টাকা দিয়া একখানা র‍্যাকেট কিনিয়া ফেলিল; এবং উক্ত অস্ত্র হস্তে লইয়া যখন সে নিবারণকে গিয়া বলিল যে সে টেনিস খেলিবে, তখন একান্তই সুস্থ শরীর বলিয়া টেনিস-কাপ্তেনের সে যাত্রা আকস্মিক মৃত্যু হইল না।

নরহরি সাতদিনের মধ্যেই বুঝিয়া ফেলিল যে র‍্যাকেট দিয়া বল্‌টাকে আঘাত করিয়া জালের অপর পার্শ্বে পাঠানোই টেনিস-খেলার উদ্দেশ্য। প্রথমে সে ভাবিয়াছিল যে অপর ব্যক্তি দ্বারা প্রেরিত বল্‌টিকে বাঁচাইয়া চলাই খেলার উদ্দেশ্য এবং র‍্যাকেট্‌খানা আত্মরক্ষার একটা শেষ অস্ত্র মাত্র। ইহার পরেও নরহরি বহুকাল ধরিয়া বুঝিতে সক্ষম হইল না যে কেন র‍্যাকেট্‌খানা বলের অনুসরণ করিবে না, এবং তাহার ভুল ধারণার ফলে তাহার সহিত খেলা একটা সাহসের কার্য্য বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু হায়, ছাত্রীদের ক্লাবে নরহরির ডাক আর আসে না! সে হতাশ হইয়া উঠিতেছিল। অনেক ভাবিয়া সে স্থির করিল যে নিবারণের সহিত ভাব করিলে তাহার সুবসনার ক্লাবে নিমন্ত্রিত হইবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং সে বিশেষ চেষ্টা করিয়া নিবারণের সহিত ভাব করিতে ব্রতী হইল। প্রথম প্রথম সে নিবারণকে তাহার নিজের লিখিত কবিতা পড়িয়া শুনাইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু খোলা হাওয়া ও

প্রচুর ভক্ষণের পক্ষপাতী নিবারণ সে প্রলোভন খুব সহজেই সম্বরণ করাতে, তাহাকে অন্য উপায় খুঁজিতে হইল। অতি অল্পায়াসেই সে বুঝিতে পারিল যে নিবারণের বন্ধুত্ব-ভাবপ্রবণতার কেন্দ্র হৃদয় নহে, উদর। এবং এই জ্ঞান-লাভের ফলে নরহরির বহু অর্থ কলেজের অন্ধকার রেস্তরাঁটিতে পরহস্তগত হইতে লাগিল। নিবারণ অতি সহজেই নরহরিতে আত্মসমর্পণ করিল এবং কলেজের সকলে বলিতে লাগিল নরহরি মানুষ হইয়া উঠিতেছে। একদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে নিবারণ নরহরিকে বলিল, "ওহে, আজ চল না মেয়েদের কোর্টে টেনিস পেটা যাক্। তোমার যা খেলা তাতে তারা খুসি বই দুঃখিত হবে না।" নরহরি বহুকষ্টে হৃদয়ের আনন্দ-ক্রন্দন সম্বরণ করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা।" আজ তাহার কি শুভদিন! যে নিদারুণ বিরহবেদনা তাহার জীবন ব্যাপিয়া আজ এতকাল ধরিয়া তাহাকে জীবন্মৃত করিয়া রাখিয়াছে, বুঝি বা আজ গোধূলির স্নিগ্ধ আলোকে তাহার অবসান হইতে চলিল। হৃদয় তাহার কোন্ এক অজানা আনন্দের স্পন্দনে চঞ্চল হইয়া উঠিল।

"নরহরি, আজ তোমার প্রেমের তপস্যা পূর্ণ হইতে চলিল। ভক্তহৃদিনিঃসারিত রক্তে আজ দেবতা তুষ্ট হইয়া ভক্তকে ঈপ্সিত ধনে পুরস্কৃত করিবেন। নরহরি, যে ক্ষিপ্ত প্রেমজ্বালা তোমায় জীবনের সুদীর্ঘ দিবসগুলির ভিতর দিয়া কুক্কুরের শৃগাল-তাড়নের মত করিয়া দৌড় করাইতেছিল, আজ বুঝি তাহার কবল হইতে তুমি সফল প্রেমের শান্তিময় গহ্বরে আশ্রয়লাভ করিতে চলিলে। হৃদয় তোমার আনন্দের অশ্রুজলে সিক্ত সরস হইয়া উঠিতেছে। নরহরি, তুমি সাধক, তুমি তাপস, তুমি বুদ্ধের মত বাস্তব-পঙ্কিলতামুক্ত, প্রেমের অনলে তোমার হৃদয় শোধিত স্বর্ণের ন্যায় পবিত্র, উজ্জ্বল!"

বুকের উপরে উর্ব্বশীর মূর্ত্তিখানি চন্দনে অভিষিক্ত করিয়া, টেনিসের পোষাক পরিয়া নরহরি নিবারণের সহিত মেয়েদের ক্লাবে খেলিতে গেল। পরনে তাহার আর সেই লাল পাঞ্জাবীও নাই, সেই লপেটাও নাই, সেই বিচিত্র পাড়ের বস্ত্রও নাই। সাদা পাত্‌লুন পরিয়া তাহাকে কোনো পাশ্চাত্য কবির শ্যামবর্ণ সংস্করণ বলিয়া মনে হইতেছিল। হাতের র‍্যাকেট্‌খানা সে তিন আঙুলে ধরিয়া নিজের অন্তরের ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিতেছিল।

হঠাৎ সে শুনিল নিবারণ বলিতেছে, "ইনিই নরহরি-বাবু, কবি ও দার্শনিক। খুব ভাল লোক। ইত্যাদি।" দেখিল সম্মুখে সুবসনা কমনীয় হাস্যে টেনিস্‌কোর্ট আলো করিয়া দণ্ডায়মানা। নরহরির রোমাঞ্চ হইল, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ তাহার কেশ তৈললিপ্ত থাকাতে সেই রোমাঞ্চের কোনো চিহ্ন সেখানে দেখা গেল না।

নিবারণ বলিল, "নরহরি, তুমি এঁর সঙ্গে পার্ট্‌নার্‌শিপে খেল, আমি মিস্ —এর সঙ্গে খেল্‌ছি।" নরহরি এই পার্ট্‌নার্‌শিপ্‌কে নিদর্শনাত্মকভাবে ব্যাখ্যা করিয়া আনন্দে শিহরিয়া উঠিল।

খেলা আরম্ভ হইল। নরহরি উপর্য্যুপরি চারবার-সার্ভ করিয়া জালে বল্ লাগাইয়া দেখিল সুবসনা তাহার দিকে প্রেমপূর্ণ নয়নে চাহিতেছেন। সে বিহ্বল আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। তার পর নিবারণের সার্ভিসের পালা। সে বেশ সজোরে সার্ভ্ করিত। কিন্তু সুবসনা সে সার্ভিস্ অবাধে ফিরাইয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া নরহরি কিরূপ একটা স্বভাব-প্রেরিত ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিল। সে ক্রমে আপনা হইতেই সুবসনার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। যেন কোনো অজানা শক্তি তাহাকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহার প্রেয়সীর পানে লইয়া যাইতেছে। সে হঠাৎ দেখিল যে কেমন করিয়া সে সুবসনার অতি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। সুবসনা তখন মিস্ —এর প্রক্ষিপ্ত একটি লব্ অর্থাৎ ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত বল্ লইয়া ব্যস্ত। তাঁহার মুখে দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ভাব আলোর মত ফুটিয়া উঠিয়াছে; ইচ্ছা বল্‌টিকে মাথার উপর হইতে সজোরে আঘাত করিয়া বিপক্ষের কোর্টে ফেলিবেন। তাঁহার এই-প্রকার মার কলেজে বিখ্যাত।

নরহরি শুধু একবার সেই শক্তিময়ীর মুখের দিকে চাহিল। শুনিল কে পরুষকণ্ঠে বলিতেছে, "গেট্ আউট্ ফ্রম্ হার্ নোজ্, ইউ ইডিয়ট্!" তার পর সব অন্ধকার। সুবসনার ওভার্‌হেড্ স্ম্যাশ্ বলে না লাগিয়া তাঁহার ভক্তের মস্তকেই লাগিল, এবং ফলে ভাবপ্রবণ নরহরির মূর্চ্ছা ও পতন। সকলে ভীষণ অপ্রস্তুত হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি

নরহরিকে উঠাইয়া একটা ঘরে লইয়া যাওয়া হইল। প্রোফেসর ক— নিকটেই ছিলেন। তিনি আসিয়া বলিলেন বিশেষ কিছু হয় নাই এবং আঘাতকারিণীকে মিষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন। মিষ্ট ভর্ৎসনার কারণ ছিল।

নরহরির মূর্চ্ছা ও পতন

নরহরির তখন সবে জ্ঞান হইতেছে। সব-কিছু আবছায়া ও দুর্ব্বোধ্য লাগিতেছে। সে শুনিল কে বলিতেছে, "মাই ডিয়ার, ইউ আর্ পার্ফেক্ট্‌লি ডেন্‌জারাস্। ফ্যান্সি স্ম্যাশিং দ্যাট্ পুওর্ ইন্‌ফ্যান্ট্ অন্ দি হেড! তোমার সহধর্ম্মের মধ্যে ডাক্তারী পাঠ চল্‌তে পারে, কিন্তু স্বামীকে অতিক্রম করে' পরাক্রম দেখানো উচিত নয়।" নরহরি ভাবিতেছিল, কে কাহার স্বামীকে অতিক্রম করিল? এমন সময় নিবারণ বলিয়া উঠিল, "বৌদি, তুমি বাপু বিলেত গিয়ে উইম্‌ব্‌ল্‌ডনে খেলো। এ প্লীহাগ্রস্ত দেশে তোমার স্থান নেই।" নরহরি একটা ভয়ঙ্কর সন্দেহের বশীভূত হইয়া উঠিয়া বসিতে গেল। প্রোফেসর ক—বলিলেন, "আপনি উঠ্‌বেন না। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন। আমার স্ত্রী আপনার কাছে বসে' অনুতাপ করুন।"
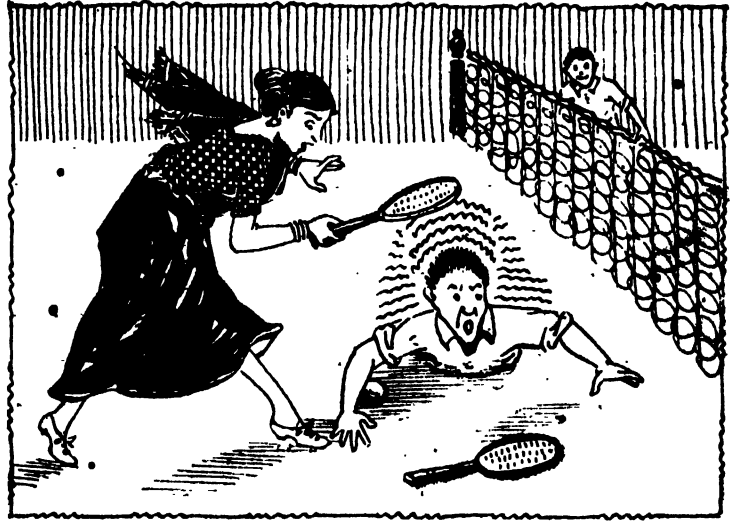
সুবসনা তাহার নিকটে আসিয়া বসিলেন। নরহরি সম্ভবত মাথার যন্ত্রণাতেই বিকৃত মুখ করিয়া চক্ষু বুজিল।

"শুভগ্রহ"

গোপন-চারিণী

শুধু মনে আছে সেটা আকাশ-প্রদীপ দেওয়ার মাস।

মানুষ মাটির শৃঙ্খলে বাঁধা হ'য়ে বদ্ধ কারায় অন্ধের মত অন্ধকারে হাতড়ে মরছে বটে, কিন্তু সে নক্ষত্র-লোকের কথা একেবারে ত ভুলতে পারেনি, তাই তার গৃহ-শিখর থেকে সে দীপ জ্বেলে রাখে তারকাদের অভিনন্দন করতে, শুধু জানাতে "ভুলিনি, আজো একেবারে ভুলিনি।" ছলনা, বঞ্চনা, কাড়াকাড়ি, মারামারি, দুর্ব্বল আশা আর বিবর্ণ মুখের মাটির খেলাঘর থেকে আকাশের প্রতি তার ঐটুকু সম্ভাষণ!

বিদেশে এসে আস্তানা গেড়েছিলাম একজায়গায় আর দুবেলা খেতে যেতাম আমার পাতানো মার বাড়ী। একটা বাড়ীরই মাঝখান দিয়ে ভাগ করে' দুদিকে দুই গরীব গৃহস্থ থাক্‌তেন। একদিকে আমার পাতানো মা আর তাঁর ছেলে আমার বন্ধু সহদেব, আর এক দিকে আর-একটি পরিবার।

প্রথম দিনই এসে ভুল করে' অনধিকার প্রবেশ করতে যাচ্ছিলাম। চকিতে একটি মৃণাল-শুভ্র মুখের আভাস আর সঙ্গে সঙ্গে একটি তুষার-ধবল বসনে অবগুণ্ঠিতা মূর্ত্তি সরে' যেতে দেখে চমকে দাঁড়ালাম। ওদিক থেকে মা ডেকে বললেন—"ওদিকে কোথায় যাচ্ছিস রে? এদিকে

যে !" দু'বাড়ীর মধ্যে যাবার একটি মাত্র দরজা থাকাতেই এই বিভ্রাট।

কাজের ফেরে দু'মাসের জায়গায় ছ'মাস লেগে গেল। শেষাশেষি যেতে আস্‌তে রাত হ'তে। মাকে বল্‌লে শুনতেন না, খাবার আগ্‌লে বসে' থাক্‌তেন অত রাত পর্য্যন্ত। দরজার পর অনেকটা পথ অন্ধকার। একদিন হোঁচট খেয়ে পড়ে' গিয়ে একটু ব্যথা পেয়েছিলাম। মাকে অতিরিক্ত কষ্ট দেবার ভয়ে সে কথা জানাইনি।

তার পরের রাত্রে বারোটার সময় সন্তর্পণে দরজা খুলে পা বাড়াব, দেখি না সাম্‌নে একটি প্রদীপ জ্বালানো রয়েছে। ভাব্‌লাম মার কাছে কিছু লুকানো থাকে না। তার পর থেকে প্রত্যহ দরজার কাছে একটি প্রদীপ জ্বল্‌ত।

সহদেব একেবারে সাধু—নিরামিষাশী। কিন্তু আহার-বিষয়ে অহিংসা পরম ধর্ম্ম আমার কোনোকালে ছিল না। সহদেব বল্‌ত—"শিকারে বুনো-মানুষের খাদ্য আমিষ হ'তে পারে, সভ্য মানুষ আমিষ খাওয়ার উপরের স্তরে উঠেছে।" আমি তর্ক কর্‌তাম। তবু এই নিয়ে মাকে বিব্রত কর্‌তে ভারি লজ্জা হ'ত। মাকে বল্‌তাম—"আজকাল আমার মাছ না হ'লেও চলে, তুমি কেন ও নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হও মা।" মা শুন্‌তেন না, বল্‌তেন—"তুই চুপ করে' খেয়ে যা দেখি। তোর কিসে চলে না-চলে তোর চেয়ে আমি ভাল বুঝি।" যেদিন থেকে তাঁর স্বামী মারা গিয়েছিলেন আর ছেলে সংসারে থেকেও সন্ন্যাসীর মত থাক্‌তে আরম্ভ করেছিল সেইদিন থেকেই মার বাড়ীতে আমিষের পাট উঠে' গিয়েছিল। তাই মাকে এমন করে' কষ্ট দিতে মন সর্‌ত না। একদিন বল্‌লাম—"তুমি যদি ফের কাল মাছ রাঁধ মা, আর তোমার এখানে খেতে আস্‌ব না বলে' দিচ্ছি।" তার পরদিনও যখন পাতে মাছ পড়্‌ল তখন একটু রাগ করে'ই বল্‌লাম—"এত করে' বল্‌লাম তবু তুমি শুন্‌লে না মা! তুমি কি ভাব এমন করে' তোমায় দিয়ে মাছ রাঁধিয়ে খেয়ে সত্যি আমার কিছু সুখ হবে—"

মা হেসে বল্‌লেন—"না বাবা, না, আজ আর আমি রাঁধিনি, মাছ আনাইওনি—ওদের বাড়ীর মেয়েটি নিজে রেঁধে দিয়ে গেছে। তাতে তোর আপত্তির কি আছে?"

...কে এই মেয়েটি ভাবতে ভাবতে নীরবে খেতে লাগ্‌লাম। তার পর থেকে কিন্তু কোনোদিনই আহারে আমিষের অভাব দেখ্‌তে পাইনি। মাকে এই নিয়ে বলাতে মা বলেছেন—"কি কর্‌ব বাবা, যেরকম করে' কাকুতি-মিনতি করে' দিয়ে যায়, 'না' বল্‌তে পারি নে।" কে জানে, আমায় মাছ খাওয়াবার জন্যে হয়ত মারই এ একটা ছল।

ছেঁড়া শার্টটার দিকে চেয়ে মা সেদিন বল্‌লেন—"দুটি ছেলেই হয়েছে আমার সমান পাগল; ওই ছেঁড়া জামাটা পরে' বেড়াতে কি লজ্জাও একটু হয় না রে।"

আমি হেসে বল্‌লাম—"না মা, তোমার ও-ছেলেটির মত ভোলানাথ আজও হ'তে পারিনি। সেলাই কর্‌বার উপায় নেই বলে'ই ছেঁড়া-জামাটা চালিয়ে নিই।"

মা বল্‌লেন—"কেন, আমি কি মরে' গেছি রে!"

"তোমার এখনো সেলাই কর্‌বার মত চোখের জোর আছে তা ত জান্‌তাম না মা!"

মা বল্‌লেন—"তুই জামাটা রেখে যাস্ ত, তার পর বোঝা যাবে বুড়ি মার চোখের জোর আছে কি না-আছে।"

তার পরদিন জামাটা হাতে নিয়ে অবাক্ হ'য়ে গেলাম, বল্‌লাম—"ক্ষমা করো মা, সেকালের মেয়েগুলোকে অত সোজা ভেবে বড় ভুল করেছিলাম বুঝ্‌ছি। সেকালের মেয়েগুলোর সম্বন্ধে আমাদের অন্যায় ধারণা বদ্‌লান দরকার।"

মা হেসে বল্‌লেন—"না বাবা, ও একালের মেয়েরই কাজ। সেকালের বুড়ির চোখে ফোঁড়-সেলাই করবার মত জোর থাক্‌তে পারে, অমন পরিপাটি রীপু কর্‌বার মত জোর নেই।"

আমি বল্‌লাম—"কি রকম?"

মা বল্‌লেন—"ও-বাড়ীর মেয়েটি বড় ভালো, নিজে চেয়ে নিয়ে গিয়ে সেরে দিয়েছে।"

অনেক কথা জিজ্ঞেস কর্‌তে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু চুপ করে' জামাটা নিয়ে চলে' গেলাম।

সেদিন অন্ধ তারা-হীন আকাশ পৃথিবীর উপর অর্থহীন গভীরতা নিয়ে চেয়ে ছিল। শুধু ঝড়বৃষ্টির উচ্ছৃঙ্খল মাতামাতিতে নির্জ্জন পথ ধ্বনিত হচ্ছিল। রাত তখন

একটা অত ঝড় বৃষ্টি সত্বেও মার বাড়ীতে বাধ্য হ'য়ে গেলাম, নইলে মা সমস্ত রাত ভাত নিয়ে বসে' থাক্‌বেন, ভাব্‌বেন, শুধু এই জেনে। খোলা দরজা দিয়ে ঢুকলাম—ভিতরে গাঢ় অন্ধকার। বাতাস হেঁকে যাচ্ছিল আর দুর্য্যোগের রাতের অভিসারিকা বর্ষা-নিশীথিনীর পায়জোর বাজ্‌ছিল অবিশ্রান্ত জলের ধারায় ঝম্ ঝম্ ঝম্! হঠাৎ বাঁ-পাশের দরজা খুলে' গেল। লণ্ঠনের আলোকে আঁধার কেটে গেল, দেখ্‌তে পেলাম শুধু আভরণ-হীন একটি শুভ্র বাহুর অর্দ্ধাংশ। একটা জিনিষ সেদিন লক্ষ্য করেছিলাম, কাপড়ের যে প্রান্তটুকু বাহুর সঙ্গে দেখা যাচ্ছিল তাতে কোন পাড়ের চিহ্ন মাত্র নেই। মাথা নীচু করে' ঘরে গিয়ে দেখ্‌লাম ঢাকা-দেওয়া খাবারের পাশে মা ঘুমিয়ে পড়েছেন।

শুধু আমায় একটুখানি পথ দেখাবার জন্যে দুরন্ত রাত্রির প্রহর কেউ বিনিদ্র হ'য়ে কাটিয়েছে—একথা কল্পনা করবার মত দুঃসাহস বা অহঙ্কার আমার ছিল না, তবে…

অদ্ভুত এই অপরিচিতা রহস্যময়ীর আচরণ!

যাবার দিন মা কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন, বল্‌লেন—"অত দূর-দেশে কাজ শিখ্‌তে না গেলে কি চল্‌ত না বাবা, যা তোরা ভালো বুঝিস কর্, কিন্তু মার মুখের দিকে চাইলিনে এই বড় দুঃখ্যু। একজন ত সন্ন্যাসী হয়ে রইল, তুই কাছে থেকে বিয়ে থা করে' সংসারী হবি—দেখ্‌ব বলে' কত আশা ছিল, তা নয়, তুই চল্‌লি একেবারে একটু আধটু দূরে নয় সাগর-পারে দেশান্তরে। তোদের ত আর মায়া-মমতা নেই।"

নত হ'য়ে মার পায়ের ধূলো নিয়ে বল্‌লাম—"আশীর্ব্বাদ করো, মানুষ হ'য়ে তোমার কোলে ফিরে' আসি তাড়াতাড়ি।"

মা বল্‌লেন—"আশীর্ব্বাদ ত রাতদিন করছি বাবা—কিন্তু একটা কথা আজ আমার রাখ্‌তে হবেই তোকে। তোরা আজকালকার ছেলে এসব মানিস্ নে জানি, কিন্তু আজ শুধু না-হয় আমার খাতিরেই আর আপত্তি করিস্‌নে।" তার পর আমার চাদরের খুঁটে পূজার ফুল-বিল্বপত্র বেঁধে' দিলেন।

আমি বল্‌লাম—"ঠাকুর দেবতা মানি বা না-মানি মা, এই ফুল-বিল্বপত্রের সঙ্গে তোমাদের স্নেহের যে অক্ষয় কবচ বেঁধে' দিলে সেটাকে না মেনে পারি নে।"

মা বল্‌লেন—"সে তোরা যা বলিস, আমরা ঠাকুর দেবতা বলে'ই মানি। আমি ত নিজে আজ ঘরের কাজ নিয়েই সকাল থেকে আছি, যেতে পারিনি। ও-বাড়ীর মেয়েটি আজ সকালে ঠাকুর-বাড়ী গিয়েছিল, যত্ন করে' এই নির্ম্মাল্য নিজে এনে দিয়েছে—দেখিস্ যেন পায়ে না ঠেকে। আর ভালাভালি পৌঁছেই একটা খবর দিতে ভুলিস্‌নে বাবা। যতদিন না খবর পাব কেমন করে' আমার দিন যাবে ভগবান্‌ই জানেন।"

কান্না আস্‌ছিল। বিমর্ষমুখে গাড়ীতে উঠে' বস্‌লাম।

* * * * * *

জীবনের ম্লান গোধূলি-বেলা এসেছে আজ। পাতানো মা আর নেই, বন্ধুও নেই, বিদেশীর দেশে স্বজন-হীন আমি নিরুদ্দেশের পারের খেয়ার প্রতীক্ষা করছি। সেদিনকার সে রহস্যময়ী মেয়েটির কোনো খবর আর কখনো পাইনি, পাবার চেষ্টাও করিনি। সে কেমন, একটু চকিত আভাসে ছাড়া ভালো করে' দেখ্‌তেও পেলাম না। জীবনের পথ-ধূলিতে তা'র ক'টি চিহ্ন আছে মাত্র—শুক্‌নো ফুল আর পাতা, আর রীপু-করা একটা পুরোনো জামা। শুধু শুনেছিলাম সে একটি তরুণী বাল-বিধবা। আজো বিচার করতে সাহস হয় না সেদিন যে আশাতীত মমতা যে অযাচিত করুণা দেখে' বিস্মিত হয়েছিলাম তা কিসের—স্নেহের, না……

শ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র

আরোগ্য-স্নান

সে আমাদের সঙ্গে একই ইস্কুলের একই ক্লাশে পড়িত —তার নাম ছিল রামতনু। কিন্তু ছেলেরা নামটির পূর্ব্বে ছোট একটি উপসর্গ জুড়িয়া দেওয়াতে তাহা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—আরামতনু। এই নূতন নামকরণে কোন্ পক্ষের যে দোষ তাহা লইয়া বাদানুবাদ করিবার পূর্ব্বে ইহার ইতিহাসটুকু শুনিলে বিচারে সাবধান হওয়া যাইতে পারে।

আমাদের ইস্কুলটিতে এত বিভিন্ন-প্রকারের ছেলে আছে যে হঠাৎ ইহার উপমা মেলে না। এই অসংখ্য-প্রকার বিভিন্নতার মধ্যেও রামতনু স্বীয় ব্যক্তিত্বটিকে খর্ব্ব হইতে দেয় নাই। দারুণ গ্রীষ্মের দুপুর বেলায় যখন সকলে গায়ের কৃত্রিম আবরণ খুলিয়া ফেলিয়া চামড়াখানি পর্য্যন্ত খুলিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তখন সে তার ঘাড়ের-কাছে-তেলে-মলিন হাতের-কাছে-সূতা-বাহির-করা প্রাচীন আল্‌পাকার কোটটি গায়ে দিয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া ইংরেজী গ্রামার পড়িত! যদি জিজ্ঞাসা কর এই ব্যবহারের অর্থ কি—তবে প্রবীণ বৈজ্ঞানিকের মত সে পেন্সিলটি নাড়িয়া উত্তর দিবে যে বাহিরের তাপের সহিত শরীরের আভ্যন্তরীণ তাপের সমতা রক্ষা না করিয়া চলিলে উৎকট ব্যাধি-বিশেষ জন্মাইবার আশঙ্কা আছে।

তাহার শুইবার ঘরে গেলে দেখা যায় ছোট বড় মাঝারি লাল নীল কালো স্বদেশী বিদেশী নানা-রকমের ঔষধের শিশি সাজানো, সেটি একটি ছোটোখাটো ঔষধালয় বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খাইতে কেহ তাহাকে দেখে নাই—কারণ তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ যখন পরিমাণে অল্প এবং স্বাদে বিকৃত নয় তখন উহা ঔষধের মধ্যে গণ্য হইতেই পারে না। যে হেতু যে ঔষধ পরিমাণে যত বেশী এবং আস্বাদনে যত বিকৃত, রোগের পক্ষে তাহা ততই অধিক বজ্র-স্বরূপ। রাত্রিবেলায় তাহাকে স্মেলিং সল্টের শিশিটি লইয়া বারে-বারে ঘ্রাণ গ্রহণ করিতে দেখা যায়। শুইবার সময় তিন-চারিটি ঔষধের শিশি তাহাদের উৎকট গন্ধ লইয়া তাহার নিদ্রা পাহারা দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। কারণে এবং অকারণে ঔষধ খাইতে কেহ তাহার এতটুকু আপত্তি কখনো দেখে নাই। যখন সে প্রথমে ইস্কুলে আসিয়াছিল তখন তাহার কণ্ঠদেশে ও বাহুতে একরাশি ছোট বড় মাদুলি ছিল; বিশেষতঃ কণ্ঠেরটিকে ছোটো-খাটো একটি ঢোলক বলিলেও বেমানান্ হয় না। ইস্কুলের ছেলেদের বচনকে সে বেশি ভয় করিত না—কিন্তু পাছে তাহারা এই অক্ষয়-কবচগুলি অপহরণ করে এই ভয়ে সমস্ত মাদুলিগুলি বস্ত্রান্তরালে তাহার কোমর-দেশে একটি মেখলার সৃষ্টি করিয়াছিল। শীতের শেষে দক্ষিণের বাতাস দিতেই যেমন পৃথিবী রং বেরঙের ফুলে ভরিয়া যায়—তেম্‌নি যেমন একটু শীতের হাওয়া দিয়াছে অম্‌নি রামতনুর বাক্সের ভিতর হইতে লাল নীল ফ্লানেলের টুক্‌রা বাহির হইয়া তাহার শরীরের নানাস্থান অধিকার করিয়া বসে। জ্যোৎস্না-রাত্রিতে যখন আর-সকলে বাহিরে গল্প গুজব গান বাজ্‌না করিতেছে, তখন রামতনু মাথায় কাপড় জড়াইয়া খড়ম পায়ে দিয়া পড়িতে বসে। জান্‌লাটা ভালো করিয়া ভেজাইয়া দেয়—আর মশা মারিতে গিয়া গালের উপরে সজোরে চপেটাঘাত করে। মোট কথা, এ জগতে যত ঠাণ্ডা মশা মাছি ধূলা আবর্জ্জনা, সকলেরই যেন একমাত্র লক্ষ্য দীন-হীন রামতনু!

(২)

এত সাবধান থাকিতেও রামতনুর আজ দুইদিন হইল জ্বর হইয়াছে। ডাক্তার দিনের মধ্যে চারবার আসে। খাটের উপর অগাধ লেপের তলায় রামতনু—একপাশে তাহার মুখখানা দেখা যায় ফ্লানেল- ও কাপড়-জড়ানো। অন্ধকার রাত্রে যেমন ষ্টেশনের দুই পাশে তাকাইলে সিগ্‌নালের লাল নীল আলো দেখা যায়—তাহার খাটের চারিপাশে সেইরকম লাল নীল নানা-রকমের ঔষধের শিশি রোগকে বিভীষিকা দেখাইতে চেষ্টা করিতেছে।

পূর্ণিমা রাত্রি। ধরণী-গগনের কানায় কানায় জ্যোৎস্নার আলো ভরিয়া উঠিয়াছে—কোথাও এতটুকু ফাঁক নাই। মাঠের মধ্যে চাঁদের আলো স্বর্গের আভাসের মত কাঁপিয়া উঠিতেছে। দূরে দিক্‌চক্রবালে বনরেখা নিবিড়-রহস্যময়। অদূরে নদীর জলে আলো পড়িয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। বাতাসে গাছের পাতা মৃদুশব্দে কাঁপিতেছে, যেন ঘুমন্ত পৃথিবী স্বপ্নের ঘোরে কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছে। শেফালির গন্ধ, বাঁশীর সুর, নদীর কলতান আকাশ জুড়িয়া ভাসিতেছে!

হঠাৎ বাতাসে রামতনুর ঘরের জান্‌লাটা একটু খুলিয়া গেল। তাহা বন্ধ করিবার জন্য রামতনু অতিকষ্টে উঠিয়া জান্‌লার ধারে গেল। সহসা বাহিরে তাহার দৃষ্টি পড়িল —এক মুহূর্ত্তে তাহার মনে হইল যেন সে মুক্তি-সাগরের তীরে আসিয়াছে। এ কী আনন্দ! ঘরের ভিতরটিতে শোক-দুঃখ-ব্যথা-রোগের যন্ত্রণা; আর বাহিরে ওই চাঁদের আলোয় স্বর্গের কি স্বপ্ন মাখানো আছে। নদীর জলে কি অমৃত, তার কলতানে কি আহ্বান, বাতাসে কি পরশ, আহা আকাশে কি পুলক! রামতনু অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিল দূরে কে একজন গান করিতেছে। একবার ভাবিল—ও মানুষ, না প্রেত? হঠাৎ তাহার বুকের মধ্যে ছাঁৎ করিয়া উঠিল। কিন্তু তার পরের মুহূর্ত্তেই গানের ভাষা বুঝিল—গানের একটি পদ একটি ছেঁড়া ফুলের মত ভাসিয়া আসিল—"তারা চাঁদের চোখে চমক হেনে যায় চলে'।" রামতনু একবার ভাবিল যাই নামিয়া ওই শান্তি-স্বর্গের নন্দন-কাননে; ওখানে রোগের জ্বালা জুড়াইবার অমৃত আছে। কিন্তু জান্‌লার লোহার গরাদে তাহাকে বাধা দিল। সহসা কল্পনার স্বপ্নরাজ্য কঠিন বাস্তবের স্পর্শে চূর্ণ হইয়া গেল। এতক্ষণ জান্‌লার কাছে দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া রামতনু নিজেই অবাক্ হইল; তাড়াতাড়ি জান্‌লা বন্ধ করিয়া দিয়া একবার ঘড়ি দেখিল; তার পর একমাত্রা ঔষধ খাইয়া লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল!

পরদিন সকাল-বেলা রামতনু জাগিয়া ভাবিতে লাগিল কাল রাত্রির ঘটনা সত্য না স্বপ্ন! যদি স্বপ্ন হয় তবে কী ভীষণ স্বপ্ন; নিশিভূতে পাওয়া একেই বলে! আর সত্য হইলে ইহার অপেক্ষা হাসির কাণ্ড আর হয় না। মাঝে মাঝে নিজের দুর্ব্বলতা স্মরণ করিয়া রামতনু হাসিতে লাগিল। এই-রকম ভাবনা-চিন্তার দোলায় দোলায় তার সকালটি কাটিয়া গেল। দুপুর-বেলা সমস্ত প্রান্তরখানি তপ্ত রৌদ্রে স্নাত; মনে হইতেছে যেন কোন্ স্বর্গীয় এক মধুচক্রের মধু ঝরিয়া পড়িতেছে—সমস্ত ধরণী তাই মধুর মনে হইতেছে। রামতনু জান্‌লার ফাঁক দিয়া তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতে লাগিল—উদাস প্রান্তর আকাশের শেষ পর্য্যন্ত শুইয়া পড়িয়া রহিয়াছে;—রৌদ্রের রং কাঁচা সোনার মত; আকাশের রং গভীর নীল;—বনরাজি রৌদ্রতাপে গভীর শ্যামবর্ণের মত দেখাইতেছে;—নূতন ধানক্ষেতের সবুজটুকুর তুলনা নাই। মাঠের মধ্যে গরু চরিতেছে, রাখাল বটের ছায়ায় বসিয়া বাঁশী বাজাইতেছে, অদূরে যেখানে বর্ষার জলে ক্ষয় হইয়া কাঁকর বাহির হইয়া পড়িয়াছে সেই রক্তবর্ণ অনুর্ব্বর ভূখণ্ডে রৌদ্র-মরীচিকা কাঁপিয়া কাঁপিয়া কি অসীম রহস্য আনয়ন করিয়াছে! সেই রৌদ্র-করুণ শরৎ-মধ্যাহ্নটির ছবি, দূরের শ্যামায়মান বেণুবনের ব্যাকুল কম্পন যেন রোগ-যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট অতিসাবধানী ওই রামতনুকেই ডাকিতেছে। রামতনু মুগ্ধনয়নে শয্যার উপর বসিয়া বসিয়া শরতের খেলা দেখিতে লাগিল। ক্রমে বেলা পড়িয়া পড়িয়া সন্ধ্যা হইয়া অবশেষে রাত্রি আসিল। আঃ! জ্যোৎস্নাময়ী রজনী! ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে রামতনুর ঘরের জান্‌লা বন্ধ। সে ভাবিতে লাগিল জান্‌লা খুলিয়া দিবে কিনা? কিন্তু পাছে ঠাণ্ডা লাগে এই ভয়ে জান্‌লা খুলিয়া দিল না। কত কি ভাবিতে ভাবিতে অবশেষে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

রাত্রে জ্বরের ঘোরে রামতনু স্বপ্ন দেখিল। যেন সে একটা অন্ধকার ঘরে বন্ধ। ছোট্ট ঘর। আলো বাতাস এত কম যেন তাহা কোন দুর্ভিক্ষ-পীড়িত রাজ্য হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। ক্রমে মনে হইতে লাগিল যেন তাহার দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে। সে যখন বাতাসের জন্য চীৎকার করিতেছে তখন রাশি রাশি ফ্লানেল-কোট, কম্ফর্টার, ঔষধের শিশি, ডাক্তারের বিল ঝরিয়া পড়িতেছে। জলের জন্য ছাতি ফাটিয়া চীৎকার করিতেছে, তখন এক শিশি কুইনাইন-মিক্শ্চার—উঃ কি তিতো! আলো যখন চাহিল তখন অন্ধকার—ঝুড়ি ঝুড়ি অন্ধকার, অমাবস্যা

রাত্রির অন্ধকার, দিনের তালতলীর ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, পোকার গর্ত্তের অন্ধকার, বটের ছায়ার অন্ধকার পড়িতে লাগিল। দূরে একটি আলো জ্যোৎস্না-রাত্রির তারার মত ক্ষীণ, ক্ষীণ দীপশিখার মত অনুজ্জ্বল। ক্রমে তাহা বড় হইতে লাগিল। অবশেষে রামতনুর মনে হইল সে একটি জানলার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাকাইয়া দেখিতে পাইল বাহিরে জ্যোৎস্নার আলোয় কত লোক খেলা করিয়া গান করিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের কি আনন্দ! কি মুক্তি! এমন সময় মনে হইল ঔষধের শিশিগুলি গড়াইয়া গড়াইয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। রাস্তা যেমন রোলারের ভারে সমান হইয়া যায়, তাহাকেও সেইরূপ করিবার ইচ্ছা। সে এক লাফ দিয়া যেন ঘরের বাহিরে আসিয়া পড়িল।

বাহিরে লাফাইয়া পড়িয়াই রামতনুর মনে হইল সে কিভার-মিক্শ্চারের মস্ত বড় একটা নীল শিশির মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে, সেই ঔষধের তলানি সবুজ, থিতানি সোনালি, আগুনের ফুল্কির মতন তার বুদ্বুদ! রামতনু আরামে তনু ঢালিয়া সেই ঔষধসমুদ্রে অবগাহন করিতে লাগিল। তার জ্বরের জ্বালা, অসুখের সন্তাপ যেন অমৃত-স্নানে জুড়াইয়া গেল। রামতনু আরামে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আঃ! যেমন অসুখ, তেম্নি ঔষধ, তেম্নি তার বোতল—সব বিরাট্! ধন্বন্তরির ঔষধ-সমুদ্রের নীল বোতলে তার আজ আরোগ্যস্নান হইতেছে! তার এক সহপাঠী সানন্দে রামতনুর পিঠে বিরাশি সিক্কার ওজনে এক চড় বসাইয়া বলিল—আরামতনু, আজ হিমে যে!

রামতনু জাগিয়া দেখে সে মুক্ত আকাশের তলে দাঁড়াইয়া—জ্যোৎস্নাপ্লাবনে তার সর্ব্বাঙ্গ পরিস্নাত হইয়া যাইতেছে। সে স্বপ্নাবিষ্টের মত কোট কম্ফর্টার খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া একা সুদূর নির্জ্জন মাঠের মধ্যে ছুটিয়া চলিয়া গেল। বাহিরে তখন পূর্ণিমার পূর্ণ চাঁদ সারা রাত্রির জাগরণে লাল রঙের হইয়া আকাশের সীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে লালের বর্ণনা করা যায় না। জ্যোৎস্নাতে তারাগুলি দেখা যাইতেছে না—যেন তাহারা অরুণের রথের সাড়া পাইয়া এক ঝাঁক পাখীর মত উড়িয়া গিয়াছে। কেবল শুকতারাটি অতি অস্পষ্টভাবে আসন্ন-বিধবা রমণীর ভালে অনুজ্জ্বল সিন্দুরবিন্দুর মত জ্বলিতেছে! ভোরের শীতল উত্তরে হাওয়াটি নদীর উপর দিয়া, ধান-ক্ষেতের উপর দিয়া, শিশিরের স্নিগ্ধ স্পর্শ বহিয়া, শিউলির গন্ধ মাখিয়া বহিয়া আসিতেছে। ঘাসে ঘাসে শিশির পড়িয়া কেমন সুন্দর ও স্নিগ্ধ দেখাইতেছে। রামতনু ভোর পর্য্যন্ত পাগলের মত মাঠে মাঠে ধান-ক্ষেতে কাশবনে নদীর তীরে শিউলীতলায় ঘুরিয়া বেড়াইল। মুক্তির স্বাদ সে পাইয়াছে।

দুপুর-বেলায় ডাক্তার রামতনুকে দেখিতে আসিল। তাহার আর সে ভাব নাই—সে অনাবৃত অঙ্গে বসিয়া আছে, মুখে তাহার মুক্তির আভাস। ডাক্তার হাত দেখিয়া বলিল জ্বর নাই, অসুখ সারিয়া গিয়াছে। অন্য সকলে ডাক্তারের কাছে গত রাত্রির ঘটনা উল্লেখ করিয়া তাহাই অসুখ সারিবার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিল। কিন্তু বিজ্ঞ ডাক্তার তাহা কানেই তুলিল না—কেবল মাথা নাড়িয়া বলিল—"বটে বটে! যে ওষুধ দিয়েছিলাম, অসুখ না সেরে যায় কোথায়!"

শ্রী প্রমথনাথ বিশী

ইংরেজী মাসের নামরহস্য

বাংলামাসের নাম সব সংস্কৃত। জ্যোতিষ-শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে বিশেষ বিশেষ নক্ষত্রের নামে তাহাদের নাম হইয়াছে। প্রত্যেক মাসে দিনের সংখ্যাও সেই জ্যোতিষ-শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে স্থির হয়। ইংরেজী মাসের নাম কিন্তু সেরূপ নয়। উহা সেকালের রোমানদের দেওয়া; জ্যোতিষ শাস্ত্রের সহিত উহার কোনো সম্পর্ক নাই। এই নামগুলি কেমন করিয়া হইল, তাহাই আজ বলিব।

ইংরেজী প্রথম মাস জানুয়ারী 'জেনাস্' নামক দেবতার নাম অনুসারে হইয়াছে। এই দেবতার সম্মুখ পিছন উভয় দিকে মুখ; বাম হাতে একটি চাবি। ইনি আরম্ভ ও শেষের দেবতা। বৎসরে যেমন বারো মাস, ইহাঁর মন্দিরে তেম্‌নি বারোটি দেবতা। এই মন্দির যুদ্ধের সময় খোলা থাকিত এবং রোমানরা কোনো কিছু সুন্দরভাবে আরম্ভ বা শেষ করিতে চাহিলে ইহার পূজা করিতেন। ইনি আবার স্বর্গের দ্বাররক্ষক ছিলেন। বৎসরের প্রথম মাসে ভাবুক লোকে গত বৎসর যাহা পিছনে পড়িয়াছে এবং আগামী বৎসর যাহা সম্মুখে রহিয়াছে স্বভাবতই তাহার কথা ভাবিয়া থাকেন। এই-জন্য রোমানরা দুইমুখো আরম্ভ ও শেষের দেবতার নাম অনুসারে বৎসরের প্রথম মাসের নাম রাখিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় মাস ফেব্রুয়ারী এক সময় বৎসরের শেষ মাস ছিল; কিন্তু যীশুখৃষ্টের জন্মের ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে উহাকে জানুয়ারীর ওদিক্ হইতে আনিয়া এদিকে বসাইয়া দেওয়া হয়। ইংলণ্ডে আগে মার্চ্চ্ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ হইত; তখন ফেব্রুয়ারী পুনরায় শেষ মাস হইয়াছিল; এখন আবার দ্বিতীয় মাস হইয়াছে।

সেকালে লুপার্‌কাস্ দেবতার সম্মানার্থে রোমানরা 'ফেব্রুয়া' নামক একটি শুদ্ধি-উৎসব করিতেন। এই উৎসব করিয়া তাঁহারা ধর্ম্মে শুদ্ধ হইতেন মনে করিতেন। অবশ্য এই উৎসব-উপলক্ষ্যে আহারাদি এরূপ গুরুতর হইত যে, মন শুদ্ধ হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। যাহা হউক, এই 'ফেব্রুয়া' উৎসবের নাম অনুসারে এই মাসের নামকরণ হইয়াছে।

তৃতীয় মাস মার্চ্চ্ রোমানদের রণদেবতা 'মার্স্'-এর নাম অনুসারে হইয়াছে। 'মার্স্' ভয়ঙ্কর যোদ্ধা, তাঁহার এক হাতে দীর্ঘ বর্শা ও অন্য হাতে অতি উজ্জ্বল ঢাল এবং মাথায় বৃহৎ মুকুটের চারিদিকে বিদ্যুৎ খেলা করিতেছে। 'মার্স্' অতি বলশালী বলিয়া রোমানরা সকল কাজের জন্যই তাঁহার পূজা করিতেন। ওদেশে এসময় প্রায়ই ঝড় বৃষ্টি হয় বলিয়া 'মার্স্'-এর নাম অনুসারে এ মাসের নাম হইয়াছিল।

দারুণ শীতে সমস্ত প্রকৃতি যেন জড়সড় ও অচেতন হইয়া পড়ে। শীতের শেষে মার্চ্চের ঝড়বৃষ্টির অন্তে বসন্তের রাণী 'এপ্রিল' আসিয়া আবার জগতে চেতনা সঞ্চার করে এবং তাহার মধুর স্পর্শে সমস্ত প্রকৃতি যেন খুলিয়া যায়, ডালে ডালে ফুল ফোটে, গাছে গাছে পাখী গাহে। এ-সময় সুপ্ত প্রকৃতি জাগিয়া উঠে, তরুণ লতা-পাতা জন্মলাভ করে। এই সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া রোমানরা আশ্চর্য্য হইয়া বলিতেন—"ইহা সব খুলিয়া দেয়"; এবং তাহা হইতে এ মাসের নাম হইল এপ্রিল, উন্মোচনকারী।

পঞ্চম মাস মে 'মাইয়া' নামক দেবীর নাম অনুসারে হইয়াছে। রোমান্-মতে সমস্ত পৃথিবীকে "য়্যাট্‌লাস্" নামক এক দেবতা কাঁধে করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন। 'মাইয়া' এই অ্যাট্‌লাসের সাত কন্যার একজন। ইহাঁর পুত্র 'মার্কারি' দেবতাদের সংবাদবাহক বলিয়া বিখ্যাত। ইহাঁদের সাত ভগ্নীকে দেবরাজ জুপিটার আকাশে একস্থানে তারকা করিয়া রাখিয়াছেন। সাতটির একটি 'শিশিফাস্' নামক একজন মানুষকে বিবাহ করেন। কোনও কারণে দেবরাজ 'শিশিফাস্‌কে' কঠোর শাস্তি দিলে, সেই দুঃখে তিনি মুখ লুকাইয়া অদৃশ্য হইয়াছেন।

ষষ্ঠ মাস জুন সম্বন্ধে একটু গোলমাল আছে। কাহারও মতে এটি 'জুনো' দেবীর নাম, কাহারও মতে এটি রোমের

বিখ্যাত 'জুনিয়াস্' বংশের নাম। 'জুনো' জুপিটারের পত্নী, অত্যন্ত গর্ব্বিতা ও ঈর্ষাপরায়ণা; জুনিয়াস্ প্রাচীন রোমের অতি বিখ্যাত লোক, কিন্তু গর্ব্বিত, অবিনয়ী ও নিতান্ত রূঢ়। এই দুইজনে জুনমাসের অধিকার লইয়া গোলমাল।

সপ্তম মাস জুলাই। যখন মার্চ্চ্ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ হইত, তখন ইহার নাম ছিল কুইন্‌টিলিস্ অর্থাৎ পঞ্চম মাস। রোম-সম্রাট্ জগদ্বিখ্যাত জুলিয়াস্ সিজার্ দেশের পঞ্জিকায় নানাপ্রকার গলদ দেখিয়া, উহার সংস্কার করেন এবং জানুয়ারীকে বৎসরের প্রথম মাস করেন। ফলে পঞ্চম মাস সপ্তম মাসে পরিণত হইল এবং তাঁহার সম্মানার্থ রোমানেরা উহার নাম রাখিলেন জুলাই।

যেমন জুলিয়াস্ সিজারের নাম অনুসারে জুলাই মাস হইয়াছে, তেম্‌নি তাঁহার প্রপৌত্র অগাষ্টাসের নাম অনুসারে অষ্টম মাসের নাম হইয়াছে আগষ্ট্। ইহার পূর্ব্ব নাম ছিল সেক্‌স্‌টিলিস্ অর্থাৎ ষষ্ঠ মাস। আগষ্ট্ মাসের আসল নাম ছিল অক্‌টেভিয়স্। তিনি প্রথমতঃ মার্ক্ এণ্টনি ও লেপিডাসের সহিত একযোগে রোম-সাম্রাজ্য শাসন করিতেন। পরে তিনি রোমের একক সম্রাট্ হন এবং তাহার গৌরব বহুগুণ বর্দ্ধিত করেন। রোমান্‌রা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাঁহার নাম অগাষ্টাস্ অর্থাৎ মহান্ রাখেন এবং সেই নাম অনুসারে অষ্টম মাসের নাম অগাষ্টে পরিবর্ত্তিত করেন। এই অষ্টম মাসে তাঁহার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি ঘটিয়াছিল। তখন অষ্টম মাসে ছিল ৩০ দিন, জুলাইয়ে ৩১ দিন। জুলিয়াস্ সিজারের মাসের চেয়ে তাঁহার মাসে ১দিন কম হইলে অগাষ্টাস্ রাগ করিতে পারেন মনে করিয়া, রোমান্‌রা ফেব্রুয়ারী মাস হইতে ১দিন লইয়া আগষ্ট্ মাসের শেষে জুড়িয়া, তাহাকেও ৩১দিন করিয়া দেন।

জুলিয়াস্ সিজার্ এবং অগাষ্টাস্ উভয়ের নামই এরূপে সম্মানিত হইবার উপযুক্ত। উভয়েই রোম-সাম্রাজ্যের গৌরব ও রোমান্ সভ্যতা দেশ-বিদেশে বিস্তার করেন। সিজার্ ব্রিটেন্ জয় করেন এবং ব্রিটন্‌দিগকে সভ্যতা শেখান। তিনি নিজে পণ্ডিত লোক ছিলেন। তাঁহার ন্যায় বীর জগতে খুব কমই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ওদিকে অগাষ্টাসের রাজত্বকালে রোম্-সম্রাজ্যের চরম উন্নতির যুগ; কৃষি বাণিজ্য এবং বিদ্যার চর্চ্চায় রোম এসময় তাহার গৌরবের শীর্ষস্থানে উঠিয়াছিল।

ইহার পরের চারিটি মাসের নামই; প্রাচীন প্রথায় যখন মার্চ্চ্ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ হইত, তখনকার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। জানুয়ারী মাস হইতে বৎসর আরম্ভ হইলে সপ্তম মাস নবম, অষ্টম মাস দশম, নবম মাস একাদশ এবং দশম মাস দ্বাদশ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু নাম বদ্‌লায় নাই। মানুষের স্বভাবই এমন যে, সে সহজে প্রাচীন প্রথা বদ্‌লাইতে চাহে না তা' সে যতঅর্থহীনই হউক, আর ক্ষতি-করই হউক। এইজন্য চারিটি মাসের নাম হাস্যকর হইয়া পড়িয়াছে। সেপ্টেম্বর অর্থ সপ্তম, অক্টোবর অর্থ অষ্টম, নভেম্বর অর্থ নবম এবং ডিসেম্বর অর্থ দশম; অথচ তাহারা বর্ত্তমানে যথাক্রমে নবম দশম একাদশ এবং দ্বাদশ মাস। পঞ্জিকা বদ্‌লানোর সঙ্গে এই নামগুলিও বদ্‌লানো উচিত ছিল; কিন্তু রোমান্‌রা তাহা করেন নাই এবং সেইজন্য আজও পর্য্যন্ত তাহাই চলিতেছে। আজকাল কিন্তু কেহ ঐ নামগুলির অর্থের কথা মনে করে না, নাম ত নাম, তা' তাহার অর্থ যাহাই হউক।

শ্রী বিজয়কুমার ভৌমিক

মেরু আবিষ্কার—

চারজন শ্বেতাঙ্গ এবং একজন এস্কিমো নারী উত্তর মেরুর নিকটবর্ত্তী র‍্যাঙ্গল দ্বীপে কেমনভাবে আটকা পড়িয়া যায়, কিছুদিন পূর্ব্বে তাহার বিবরণ প্রকাশ পাইয়াছে। এই পাঁচ জনের মধ্যে কেবল মাত্র এস্কিমো নারীটি সভ্যজগতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে আর সকলে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এই এস্কিমো মহিলাটির নাম এডা ব্ল্যাকজ্যাক্। যে কয়জন এই মেরু আবিষ্কারে গিয়াছিল, সকলেই অল্পবয়স্ক এবং পরম উৎসাহী ছিল। উহারা দুই বৎসর পূর্ব্বে এই নির্জ্জন বরফে ঢাকা দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিতে যায়—তাহাদের ইচ্ছা ছিল র‍্যাঙ্গল দ্বীপটিকে বর্ত্তমান ইংলণ্ডরাজের নামে অধিকার করা। অনেকের ধারণা, এই দ্বীপটি অদূর ভবিষ্যতে জাপান এবং ইংলণ্ডের মধ্যপথে, আকাশ-জাহাজের একটি প্রধান আড্ডা হইবে। এই আকাশ পথ উত্তর মেরুর উপর দিয়া হইবে। জাপানেরও নাকি এই স্থানটির উপর বিশেষ লোভ ছিল। মেরু আবিষ্কার এবং নূতন দেশ দেখার লোভ এই পাঁচটি তরুণ প্রাণকে বিশেষভাবেই আলোড়িত করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

এডা ব্ল্যাকজ্যাক্—মেরু-আবিষ্কারীদলের নারী সহযাত্রী

লোরেন নাইট—মেরু আবিষ্কারী দলের নেতা বয়স ২৮ বৎসর

রাঙ্গল দ্বীপের একটি দৃশ্য

মিন্টন গেল্‌ বয়স ১৯ বৎসর, মেরু প্রদেশ সম্বন্ধে সবচেয়ে অনভিজ্ঞ এবং সব চেয়ে উৎসাহী যাত্রী

টরণ্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র, একজন তরুণ কানাডিয়ান্ এই দলের নামেমাত্র নায়ক ছিল তাহার নাম এলান্ ক্রফোর্ড। বাকি সকলেই ছিল আমেরিকান্। লোরেন্ নাইট, ফেডারিক্ ষ্টেফান্‌সন্‌এর সঙ্গে পূর্ব্বে মেরু আবিষ্কারে গিয়াছিল, কিন্তু উনিশ বছর বয়সের যুবক মিন্টন গেলের মেরুপ্রদেশ সম্বন্ধে কোনো প্রকার জ্ঞান ছিল না।

যে-সব দল মেরু আবিষ্কারে যায় তাহারা প্রায় ক্ষেত্রেই সঙ্গে জনকয়েক করিয়া এস্কিমো লয়, কারণ এস্কিমোর সাহায্য ব্যতীত মেরু প্রদেশে চলা ফেরা করা একপ্রকার অসম্ভব। কিন্তু এই নবীন মেরু-আবিষ্কারকের দল সঙ্গে একজন মাত্র এস্কিমো স্ত্রীলোক লইয়াছিল। অবশেষে এই মহিলাটি মাত্র প্রত্যাগমন করিয়াছে।

এই মেরু-আবিষ্কারকের দল একটা জাহাজ ভাড়া করিল। বরফের উপর চলাফেরার সুবিধার জন্য স্লেজ এবং স্লেজটানা কুকুরও খরিদ করিল। খুব গোপনে এই-সব উদ্যোগ করিয়া তাহারা যাত্রা করিল। ইহাদের যাত্রার পর দুই বছর পর্য্যন্ত লোকে ইহাদের কথা প্রায় ভুলিয়া গেল। তাহার পর হঠাৎ ইহাদের সম্বন্ধে খোঁজ পড়ায় একদল লোক ইহাদের খুঁজিতে বাহির হইল। এই সন্ধানকারীর দল মেরুপ্রদেশে অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া এবং নিজেদের প্রাণ বিপন্ন করিয়া ইহাদের সন্ধান পাইল। সন্ধানকারী দলের একজন বলিতেছেন- "দূরে একটা চলন্ত কি যেন দেখ্‌তে পেলাম, একটু কাছে এলে পর বুঝ্‌তে পারলাম, একজন স্ত্রীলোক। সে পশুলোমের পোষাক পরে' ছিল। তার চেহারা এবং চোখ দেখে' আমরা ভয় পেয়ে গেলাম। সে আমাদের কাছে এসেই জিজ্ঞাসা করলে ক্রফোর্ড, গেলে এবং মরার কই? আমরা বল্‌লাম জানিনে। তখন সে হতাশভাবে বল্‌লে "আর কেউ নেই, আমি একলা। জুন মাসের ২২শে নাইট মারা গিয়াছে। আমি ফিরে' যেতে চাই, আমার মায়ের কাছে। এই কথা বল্‌তে বল্‌তে সে অজ্ঞান হ'য়ে প্রায় পড়ে' যাবার মত হ'ল, আমি তাকে তাড়াতাড়ি ধরে' ফেল্‌লাম। তার জ্ঞান হ'লে পর সে ছোট মেয়ের মত কাঁদতে লাগ্‌ল। তার পর আমরা তার তাঁবু দেখ্‌তে গেলাম। চারিদিক্ কুয়াশায় ঢাকা। তাঁবু ছেঁড়া অবস্থায় রয়েছে। তাঁবুতে একটা ভাঙা ষ্টোভ্ রয়েছে, কিছু জ্বালানি কাঠও দেখ্‌তে পেলাম। এডা ষ্টোভ্ জ্বালিয়ে চা তৈরী করবার জোগাড় করছে এমন সময় দেখ্‌লাম একটা বেড়াল কোণা থেকে বেরিয়ে এল। এমন স্থানে বেড়াল দেখে' আমরা চমকে গেলাম। এডা বল্‌লে এই বেড়ালটা না থাকলে সে পাগল হ'য়ে যেত। সমস্ত দ্বীপে আর কোনো প্রাণী নেই বল্‌লেই হয়।"

ক্রফোর্ড, মরার্ এবং গেলের কথা জিজ্ঞাসা করায় এডা বলে "তাহারা স্লেজ্ বোঝাই করিয়া যখন চলিয়া গেল তখন আমি তাঁবুর ভিতর বসিয়া কাঁদিতেছিলাম। তাহারা যাইবার কিছুকাল পরেই ভীষণ তুষারপাত এবং ঝড় আরম্ভ হয়। তার পর তাহাদের আর কোনো খোঁজ পাই নাই।" এই তিন জন বোধ হয় খাদ্য বা লোকালয় খুঁজিবার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছিল এবং পথে বরফ-চাপা পড়িয়া মরিয়াছে। নাইট্ অসুখে ভুগিতে ভুগিতে মারা যায়। খাদ্যের মধ্যে সীল মাছ এবং দু-একটা পাখী এডা শিকার করিয়া আনিত। পথ্যের অভাবেই নাইট মারা যায়। সন্ধানকারীর দল নাইটের তাঁবুতে গিয়া দেখি তাঁবুর দুয়ারে কতকগুলা বাক্স জমা করা আছে,— পাছে নেকড়ে বা অন্য কোনো-প্রকার জন্তু তাঁবুতে প্রবেশ করে এই ভয়ে। সন্ধানকারীদের একজন নাইটের মৃতদেহ দেখিয়া বলেন, "কেবল শুষ্কচর্ম্মাবৃত নাইটের মৃতদেহকে দেখিয়া আমি ভাবিতেও পারি নাই যে ইহা সেই সদাহাস্যময় বন্ধু নাইটের মৃত দেহ।"

এডা যখন সন্ধানকারীদের জাহাজ দেখিতে পায় তখন তাহার মনোভাব কিপ্রকার হয় তাহা তাহার কথায় বলিব :—"সকাল বেলায় চা খাইবার সময় অদ্ভুত শব্দ শুনিতে পাইয়া বাহিরে আসিয়া দূরবীণের সাহায্যে জাহাজ দেখিতে পাইলাম। আনন্দে আমার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। আমি মনে করিয়াছিলাম ক্রফোর্ড্ গেলে এবং মরার্ ফিরিয়া আসিবে।"

কত কষ্ট সহ্য করিয়া অবশেষে এই কয়েকজন দেশের জন্য নিজেদের প্রাণ দান করিল। ইহারা মরিয়া গেছে সত্য, কিন্তু ইহারা যে কাজ

আরম্ভ করিয়া গেছে তাহা সফল হইবার পূর্ব্বসূচনা হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসর র‍্যাঙ্গল দ্বীপে ১ জন শ্বেতাঙ্গ এবং ১৩ জন এস্কিমো বাস করে; মনে হয় কিছুদিনের মধ্যেই দ্বীপটি লোকালয়ে পরিণত হইবে।

মুক্তার চাষ—

জাপানে মুক্তার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কারখানার মালিকের নাম কোকিচি মিকিমোতো। এইখানে সমুদ্র হইতে তোলা মুক্তা আনিয়া পরিষ্কার করিয়া বিদেশের বাজারে চালান দেওয়া হয়

একদিনের মুক্তা ফসল—সমান মাপের

জাপানীরা মুক্তার বিশেষ ভক্ত নয়, কিন্তু বিদেশীদের মুক্তার প্রতি টান দেখিয়া তাহারা দুই পয়সা রোজগারের পথ ত্যাগ করিতে পারে নাই। মিকিমোতো বহুকাল হইতেই মুক্তার চাষ করিতেছেন। বহুকাল পূর্ব্বে টোকিও কলেজের অধ্যাপক কোকিচি মিৎসুকিরি, মিকিমোতোকে বলেন যে চেষ্টা করিলে ইচ্ছা-মত মুক্তা কিছু পরিমাণে উৎপন্ন করিতে পারে। ১৮৮০ সালে মিকিমোতো অনেক টাকা খরচ করিয়া মুক্তার চাষ আরম্ভ করেন। আট বৎসর পরে এই স্থান হইতে মুক্তা বাজারে চালান দেওয়া হয়। মিকিমোতো তাতোকু দ্বীপটি ইজারা লইয়াছেন। ইহার চারিদিকের ৩০ মাইল সমুদ্র তাহার ইজারার মধ্যে। এই সমুদ্রের কিছু অংশ ঝিনুকদের জন্য বিশেষভাবে বাধা হইয়াছে। সমুদ্রের তলে ছোট ছোট পাথর ছড়ান আছে। এই সমস্ত পাথরের উপর বাচ্চা ঝিনুকেরা বাসা করিয়া পড়িয়া থাকে। তিন বছর ইহাদিগকে এমনিভাবে বাড়িতে দেওয়া হয়। তিন বছর পরে এইসমস্ত ঝিনুকের মধ্যে একটুকরা করিয়া ঝিনুকের খোলার কুচি ভরিয়া দিয়া সমুদ্রের আর-এক অংশে চালান দেওয়া হয়। এইখানে ইহাদিগকে জলের ২০ ফুট নীচে এক ফুট অন্তর অন্তর রক্ষা করা হয়। পাঁচ বছর পর ডুবুরির সাহায্যে ইহাদিগকে তোলা হয় এবং মুক্তা বাহির করিয়া বিক্রয় করা হয়। এক একটি মুক্তার দাম ৮০০ পর্য্যন্ত হয়।

মুক্তা-ডুবুরিরা প্রায় সকলেই স্ত্রীলোক। এই স্ত্রীলোকেরা বেশ শক্ত এবং শক্তিমতী। ইহারা সাধারণত ১৮ হইতে ৩০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কাজ করিতে পারে। জাপানের সীমা প্রদেশে এই ডুবুরিরা একপ্রকার বিশেষ জাতি হইয়া পড়িয়াছে। পুরুষ অপেক্ষা নারীরা নাকি ডুবুরির কাজ ভাল করিতে পারে, কারণ তাহাদের দম বেশী এবং তাহারা জলে পুরুষদের অপেক্ষা অধিক সময় থাকিতে পারে। এই-সমস্ত নারীদের স্বামীরা মুক্তা চাষের অন্যান্য কাজে নিযুক্ত থাকে। ডুবুরিরা সূতীর পায়জামা এবং জামা পরে, মাথায় সূতীর শাদা রংয়ের টুপি পরে। ডিসেম্বর মাস মুক্তা তুলিবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। তবে অন্য সময়েও মুক্তা তোলা চলিতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে জাপানে প্রায় দুই কোটি টাকা মূল্যের মুক্তা উৎপাদন হয়।

ডুবুরিরা মুক্তা তুলিতেছে

পোকামাকড়ের কথা—

বর্ত্তমান সভ্যতার দিনে মানুষ কতরকমের যে আকাশ-জাহাজ তৈরী করিতেছে তাহার ঠিকানা নাই। প্রকৃতিও এই কাজে নেহাৎ পিছাইয়া নাই মানুষ যদি প্রকৃতির সৃষ্টি-করা কতকগুলি ফড়িং ইত্যাদিকে পর্য্যবেক্ষণ করে

সুতার সাহায্যে মাকড়সা উড়িতেছে

তবে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া যাইবে। এই-সমস্ত অদ্ভুত জীবগুলিকে সৃষ্টি করিতে প্রকৃতিকে যে কতখানি বুদ্ধি খরচ করিতে হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। একরকমের মাকড়সা আছে, তাহারা বহুদূর পর্য্যন্ত লাফাইয়া পড়িতে পারে। আর একপ্রকার মাকড়সা

পায়ের স্থাপনার সাহায্যে ব্যাঙ উড়িতে পারে
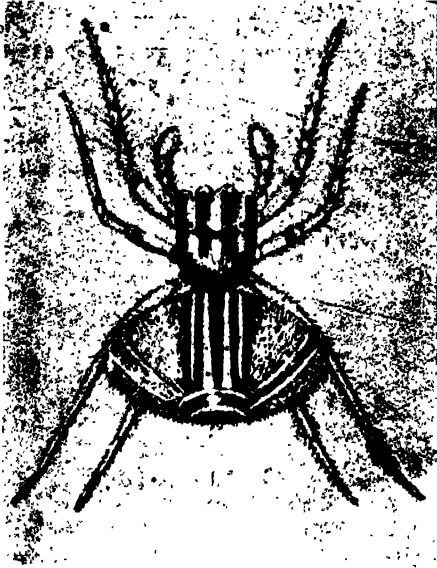
পেটের মধ্যে হাওয়া ভরিয়া মাকড়সা বেলুনের মতো উড়িতে পারে
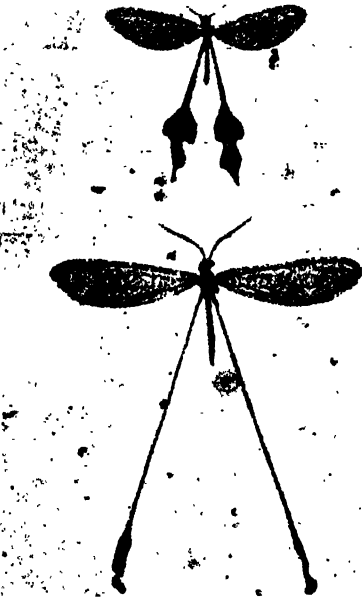
এই পোকাগুলি লম্বা এবং চওড়া ডানার সাহায্যে আরামে হাওয়ায় ভাসিতে পারে

বহুদূর পর্য্যন্ত উড়িয়া যাইতে পারে। বোর্ণিয়োতে একপ্রকার ব্যাঙ্ আছে তাহারা গাছে গাছে দিব্য আরামে উড়িয়া বেড়ায় ইহাদের পায়ের গঠন ঠিক উড়িবার মত করিয়া তৈরী। হাঁসের পায়ের গঠনের সঙ্গে এই ব্যাঙের পায়ের গঠনের অনেক মিল আছে।

একপ্রকারের মাকড়্সা বহু উচ্চ হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িবার সময় পা শক্ত করিয়া মুখ দিয়া একপ্রকার লালা নিঃসৃত করে। এই লালা হাওয়াতে লাগিবামাত্র সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূতায় পরিণত হয়। নীচে নামিবার সময় এই সূতাগুলি হাওয়াতে ভাসে এবং মাকড়সা ধীরে ধীরে নীচে নামিতে থাকে। ইহার সাহায্যে তাহারা বহু দূরে আকাশেও বিহার করিতে পারে।

নিউ সাউথ্ ওয়েল্‌সে একপ্রকার মাকড়সা উঁচু স্থান হইতে নীচে লাফাইবার সময় পেট ফুলাইয়া হাওয়ার ভর করিতে করিতে নীচে নামে।

ছবি দেখিলে এই-সব অদ্ভুত জীবের কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে।

বোবার দস্তানা—

ইয়োরোপের বোবা লোকেরা একপ্রকার দস্তানা ব্যবহার করে। এই দস্তানার উপর ইংরেজি সব কয়টি অক্ষর এবং একটি "ইয়েস" [হাঁ] এবং একটি "নো" [না] লেখা থাকে। অনেক প্রশ্নের জবাব কেবল হাঁ না

কালা বোবার অক্ষর লেখা দস্তানা

করিয়াই দেওয়া যায়। কাজেই এই দুইটি কথা বিশেষভাবে লেখা হইয়াছে। আমাদের দেশেও বাংলা হরফে ইহার প্রচলন করা সহজেই হইতে পারে। লেখক কালা-এবং বোবা-ইস্কুলের লোকেদের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

মানুষ এবং পোকামাকড়ের যুদ্ধ—

বর্ত্তমান সময়ে আমরা খবরের কাগজে নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধে অনেক কিছু পড়িতেছি। সকলেই ব্যস্ত রহিয়াছে, তাহার শত্রুপক্ষকে নিরস্ত্র করিবে কি উপায়ে, এই চিন্তায়। কিন্তু পোকামাকড়ের দল যে কি ভীষণভাবে মানুষকে চারিদিক্ হইতে আক্রমণ করিতেছে, তাহার খোঁজ অনেকেই রাখেন না। এবং একদল বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক যে এই পোকা-মাকড়ের দলকে ধ্বংস করিবার জন্য কি ভীষণ যুদ্ধ করিতেছেন, তাহাও অনেকে জানেন না।
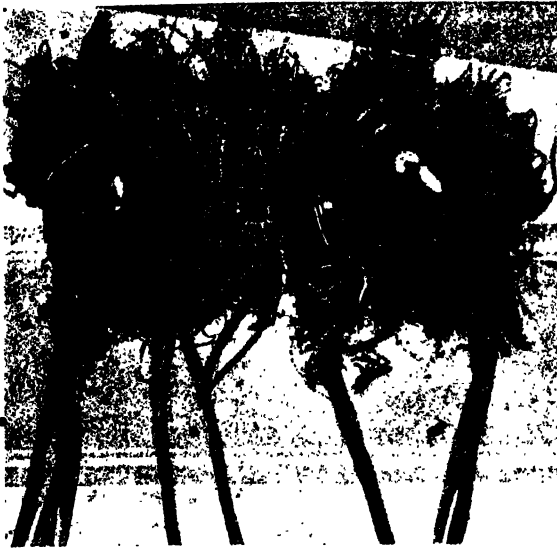
চারাগাছের গোড়ার পোকা
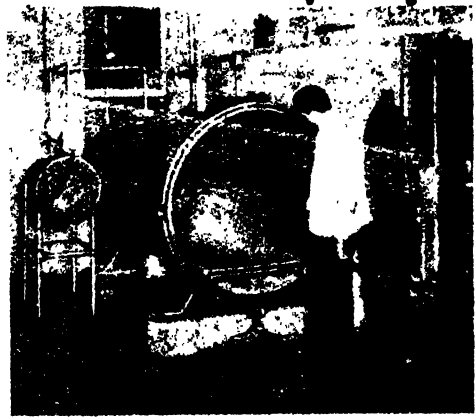
চারাগাছ তুলা ইত্যাদি দ্রাবকে কলে পোকামাকড় হইতে শুদ্ধ করা হয়

পোকামাকড়ের দল একদেশ হইতে অন্যদেশে চালান হয়। তুলার সঙ্গেও অনেক পোকা দেশ-বিদেশে গমনাগমন করে। আমেরিকার বৈজ্ঞানিকেরা ইহা বন্ধ করিবার চেষ্টা

জাপানের এই গুটিপোকাগুলি ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর সবদেশের গাছপালায় ছড়াইয়া পড়িবে

আমাদের দেশে পোকামাকড় দেশের কি পরিমাণ অর্থ নষ্ট করিতেছে, তাহার কোনো হিসাব নাই। আমেরিকার পণ্ডিতেরা হিসাব করিয়াছেন যে সেখানে পোকামাকড়ের দ্বারা প্রতি বৎসর ৪০০ কোটি টাকার শস্য ফলমূলাদি নষ্ট হয়। এই পরিমাণ প্রতিদিনই বাড়িয়া চলিয়াছে এবং এই বৈজ্ঞানিকের দল না থাকিলে হয়ত এই পোকামাকড়ের দল এতদিনে পৃথিবী হইতে আমাদের দূর করিয়া দিয়া নাতি নাতনি লইয়া আরামে বসবাস করিত। এই-সমস্ত পোকামাকড় যে কেবল ফল এবং শস্যই খাইয়া ফেলে তাহাই নয়, ফলের বৃক্ষ এবং অন্যান্য শস্য জিনিষও নষ্ট করিয়া ফেলে। এইসব কারণে দেখা যায় যে অনেক গাছের ফল বছর বছর কমিতে কমিতে অবশেষে আর ফল ফলে না এবং গাছও শুকাইয়া যায়। পোকামাকড় এক গাছ হইতে আর-এক গাছে এবং অবশেষে সমস্ত উদ্যানে এবং ক্রমে এক উদ্যান হইতে আর এক উদ্যানে এবং অবশেষে সমস্ত দেশের গাছে ছড়াইয়া পড়ে।

এই-সমস্ত পোকা মাকড় নানা-প্রকারের আছে। কতকগুলি পোকা প্রতিদিন ১০,০০০ হইতে ৫০,০০০ পর্যন্ত বাচ্চা প্রসব করে। এই হিসাব-মত বছরে পোকার সংখ্যা কি ভয়াবহ পরিমাণে বৃদ্ধি পায় তাহা সহজে অনুমেয়। এসিয়াতে একপ্রকার পিচ-ফলের পোকা আছে। এই পোকা এখন আমেরিকাতেও গিয়াছে এবং আপেল-গাছ এবং ফল আক্রমণ করিয়াছে। এই পিচ্-মথ প্রতিবছর ১,২০ কোটি টাকার আপেল ভক্ষণ করে।

জাপানের একপ্রকার গুব্‌রে পোকা এসিয়া এবং আমেরিকার সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেছেন যে এই পোকাকে তাড়ান একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার হইবে, ইহারা কিছুকাল পরে সবরকমের ফল এবং শস্য নষ্ট করিতে আরম্ভ করিবে।

এক দেশ হইতে অন্য দেশে জাহাজে করিয়া ফল এবং ফলের গাছ চালান হয় এবং এই সঙ্গে নানা-রকম নূতন নূতন পোকাও এক দেশ হইতে আর-এক দেশে চালান হয়। এইভাবেই অনেক-রকম পোকা পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়ে। নানা-রকম ... সঙ্গে

করিতেছেন। আমেরিকাতে এক-একটা জাহাজের সঙ্গে কি পরিমাণ নূতন নূতন পোকার আমদানি হয় দেখুন—হলাণ্ড ১৪৮, বেলজিয়াম্ ১৩০, ফ্রান্স ১৪৭, ইংল্যাণ্ড ১০৪, জাপান ৯১, এবং জার্মেনি ১২।

আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট আজকাল যে-সব দ্রব্যে পোকা থাকিবার আশঙ্কা বেশী সেইসব দ্রব্য বিদেশ হইতে আসিবামাত্র তাহা নানা-প্রকার ঔষধের সাহায্যে শোধন করিয়া লইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাতে অনেক পোকা বিনষ্ট হয়, কিন্তু একেবারে সব হয় না। বিদেশাগত দ্রব্য সময়ে সময়ে পাহারার চোখে পড়ে না। অনেকে আমদানি খাজনা বাঁচাইবার জন্য অনেক মাল চুরি করিয়া দেশের মধ্যে চালান দেয়। এইজন্য গবর্ণমেণ্টের চেষ্টা সত্ত্বেও অনেকরকম নূতন পোকা দেশের মধ্যে প্রবেশ করে। এমন অনেক পোকা আছে, যাহাদের খালি চোখে ফলের উপরে বা ভিতরে দেখা যায় না কিন্তু অণুবীক্ষণে দেখা যায়। আমেরিকান্ গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক বছর অনেক টাকা ব্যয় করিয়া এই-সমস্ত পোকামাকড় বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এখানে ৫ খেটা

দেশেও হয়। [illegible] ২২,৩০০। কোন আমাদের দেশে এখনো কোনো প্রকার আয়োজন হয় নাই।

আনারসের চাষ—

হাওয়াই দ্বীপে প্রচুর আনারসের চাষ হয়। এই বৎসর ৩ ফুট চওড়া এবং .০ ইঞ্চি মোটা

কাগজে ঢাকা ক্ষেতে আনারস গাছ

কাগজের দ্বারা আনারসের ক্ষেতকে ফালি ফালি করিয়া ঢাকা হইতেছে এবং কাগজ ছিদ্র করিয়া আনারসের গাছ লাগান হইতেছে। ইহার ফলে আনারস শতকরা ৪০টি করিয়া বেশী জন্মিয়াছে; এবং ফলও ভাল হইতেছে। কালিফোর্নিয়াতে টমাটো এবং ষ্ট্রবেরি ফলও এইভাবে চাষ করিয়া ফসল শতকরা ৬০ বেশী হওয়াতে লাভও অতি প্রচুর হইয়াছে।
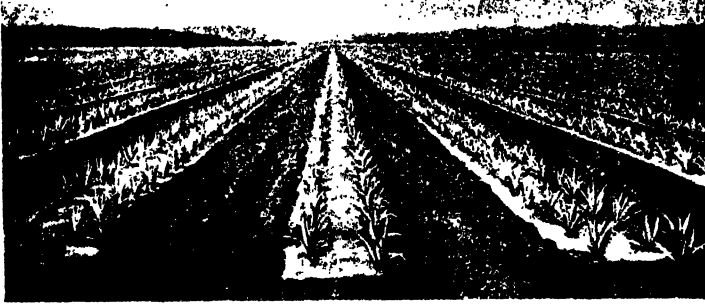
ক্ষেতে পাতিবার কাগজ সাধারণ কাগজ নয়—ইহা ফেল্ট ও অ্যাস্ফাল্ট মিশাইয়া তৈরী; দেখিতে অনেকটা ব্লটিংএর পেপারের মতো। এই কাগজ সারি সারি করিয়া পাতা হয় এবং মাটি ধার হইতে ৬ ইঞ্চি ভিতরের দিকে এই-প্রকার খুব ভাল হইতেছে। এই বৎসর ৪২৫০ মাইলেরও বেশী কাগজ আনারস-ক্ষেতে পাতা হয়। ইহাতে খরচ পড়ে মোট দুই সারি করিয়া গাছ লাগান হয়। কাগজের দুই ধারে মাটি চাপা দেওয়া হয়, কারণ তাহা না হইলে কাগজ উড়িয়া বা মুড়িয়া যাইতে পারে। এই কাগজ-পাতার ফলে আনারস-গাছের আশে-পাশে আগাছা জন্মাইতে পারে না এবং নীচের মাটিও সরস থাকে—রৌদ্রে শুখাইয়া যায় না।

অন্যান্য জিনিষের চাষও এমনিভাবে করা যাইতে পারে কিনা তাহার পরীক্ষা হইতেছে। এই-প্রকারে আনারস গাছ লাগাইয়া দেখা গিয়াছে যে ইহাতে কেবল ফসল বেশীই হয় না প্রত্যেকটি ফলের আকারও বৃদ্ধি পাইতেছে।

এই কাগজ হাতে বা কলের সাহায্যে দুই রকমেই ক্ষেতে পাতা যাইতে পারে।
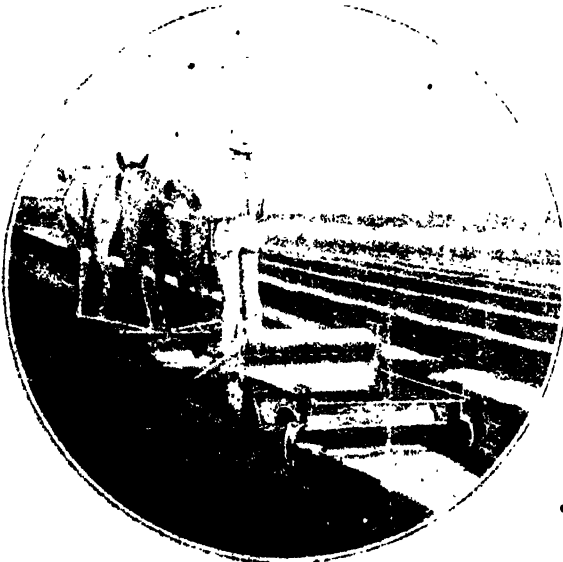
ঘোড়ায় টানা কলেও কাগজ পাতা যায়

কলের সাহায্যে ক্ষেতে কাগজ পাতা হইতেছে

কল ঘোড়ায় টানে এবং ইহাতে কাগজের দুই পাশে মাটিচাপ কলেই দেয়।

রেল-সাইকেল—

রেল-পথে চলিবার উপযোগী একপ্রকার গাড়ী তৈয়ার হইয়াছে। ইহাকে বাইসাইকেলের মত প্যাডেল করিয়া চালাইতে হয়। সঙ্গে সামান্য জিনিষপত্র এবং হাতিয়ার লইবার স্থানও আছে। গাড়ীখানি খুবই হাল্কা এবং বেশ জোরে যায়। চালকের বসিবার জন্য সাইকেলের মতো সিট্ আছে। যাহারা জঙ্গল পাহারার কাজ করে তাহাদের পক্ষে এই গাড়ী বিশেষ উপযোগী।

—

রেল-সাইকেল

মোটর-লাফ-

ছবিতে দেখুন একজন মোটর-বাইকওয়ালা কেমন আকাশে

মোটর সাইকেলে ৮৪ ফুট লাফ

উড়িতেছে। খানিকটা ঢালু জায়গার উপর দিয়া আসিয়া মোটর হঠাৎ শূন্যের মধ্য দিয়া ৮৪ ফুট চলিয়া গেল। মাটি হইতে ৯½ফুট উঁচু দিয়া মোটর-বাইক উড়িয়াছিল। শূন্যে মোটর-বাইককে সোজা করিয়া ধরিয়া রাখা খুব বাহাদুরির কাজ। মাটিতে পড়িয়া বাইকওয়ালা এবং বাইক উভয়েই সামান্য একটু জখম হইয়াছিল।

মহীশূর রাজপ্রাসাদ—

রাজ্যে বিশেষ বিশেষ উৎসব উপলক্ষে মহীশূরের রাজপ্রাসাদকে আলোকমালায় সজ্জিত করা হয়। সমস্ত প্রাসাদটি হাজার হাজার বৈদ্যুতিক বাতিতে ছাইয়া ফেলা হয়। রাত্রের অন্ধকারের বুকের উপর এই আলোক-

আলোক মালায় সজ্জিত মহীশূর রাজপ্রাসাদ
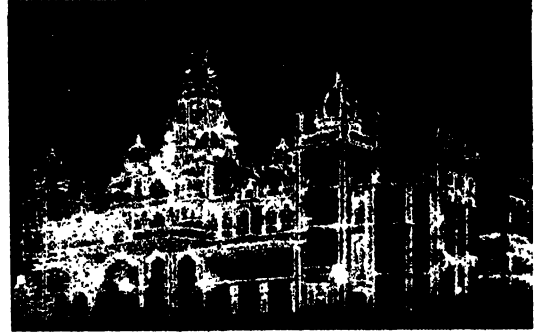
মালায় সজ্জিত প্রাসাদ এমন মনোহর দেখায় যে লোকে ইহাকে পৃথিবীর সবচেয়ে জাকজমকওয়ালা রাজপ্রাসাদ বলে। ছবিতে সামান্য একটু আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

ব্যাঙের ছাতার কাজ—

জাপানের বাঁশ-ব্যবসায়ীরা বাঁশের গায়ে একপ্রকার ব্যাঙের ছাতা
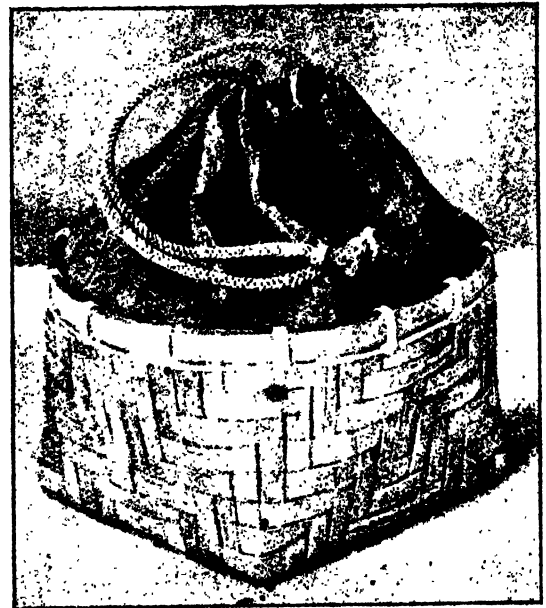
পরাশ্রয়ী ব্যাঙের ছাতা বাঁশের গায়ে নানা রকম রং করে

জন্মায় তাহাতে বাঁশের গায়ে নানা-রকমের রং হয়, বাঁশের ঝুড়ির গায়ে এই রং বেশ চমৎকার দেখায়।

ভস্ম-উদ্ধার—

ঘর-বাড়ীতে আগুন লাগিলে অনেক জিনিস পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়—তবে কতক কতক জিনিস পুড়িবার পরও উদ্ধার করা যায়, কিন্তু দলিল পত্র এবং অন্যান্য দরকারী কাগজ উদ্ধার করা যায় না; আমরা এই জানি। ইহাতে অনেক ধনীর একেবারে সর্ব্বনাশ হইয়া যায়, তাহাদের প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া পথে বসিতে হয়। আগুনের তাপে যদি কাগজপত্র দলিল নোট ইত্যাদি পুড়িয়া একেবারে গুঁড়ো ছাই না হইয়া যায় তবে তাহা আর নষ্ট করিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে না। কালিফো-

অঙ্গারীকৃত কাগজ রাসায়নিক প্রথায় উদ্ধার হইলে কেমন দেখায়

রাসায়নিক অঙ্গারীকৃত কাগজের লেখা উদ্ধার করিতেছেন

র্নিয়ার বিখ্যাত ডাক্তার এড্‌ওয়ার্ড ও হাওয়ার্ড নানাপ্রকার পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে এই-সব দগ্ধ দলিল পত্র ইত্যাদি উদ্ধার করা যায়। ব্যাঙ্ক ইত্যাদিতে আগুন লাগিলে সিন্দুকের মধ্যস্থিত কাগজ পত্র নোট ইত্যাদি একেবারে পুড়িয়া যায় না, কিন্তু অতিরিক্ত তাপে ঘোর কালো হইয়া যায়, এবং তাহার উপর কালির দাগ ছাপ ইত্যাদি সব লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নয়, কালির দাগ ছাপ ইত্যাদির উপর অঙ্গারের একটা কালো পর্দ্দা পড়িয়া যায়। রাসায়নিক উপায়ে এই পর্দ্দাটাকে তাড়াইতে পারিলে দলিলের উপরের সব লেখাগুলি পড়িবার মত স্পষ্ট হইয়া উঠে।

এই প্রক্রিয়াটি মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে আবিষ্কার হইয়াছে। যদি আরো বহুপূর্ব্বে হইত তবে পম্পিআই ইত্যাদি লুপ্ত সহরের তল হইতে যে সমস্ত অঙ্গারীভূত কাগজ পত্র পাওয়া গিয়াছিল তাহার পাঠ উদ্ধার করিয়া তাহাদের সম্বন্ধে হয়ত বহু নূতন কথা জানিতে পারিতাম। আরও বহু অগ্নিকাণ্ডে অনেক ব্যাঙ্ক ইত্যাদি নষ্ট হইয়াছে। সেই সময় এই অঙ্গারীভূত-লিখন উদ্ধার-প্রণালী জানা থাকিলে অনেক ধন সম্পদ্ রক্ষা পাইত।

এই-সমস্ত পরীক্ষার সময় ঐ বিখ্যাত ডাক্তার বলেন: "অনেক পোড়া কাগজের উপর আঙ্গুল দিয়া মুখের থুতু লাগাইয়া দেখিয়াছি, যে, লেখাটি পড়িবার মত স্পষ্ট হইয়া উঠে।" তিনি আরো বলেন যে সাধারণ ম্যানিলা খামই বহুমূল্য কাগজপত্র রাখিবার পক্ষে প্রকৃষ্ট। চামড়ার থলিতে দলিল নোট ইত্যাদি রাখা ভাল নয়, কারণ অতিরিক্ত তাপ পাইলে চামড়ার মধ্যস্থিত কাগজপত্র চামড়ার রসে সিদ্ধ হইয়া তাল পাকাইয়া উঠে· তখন আর তাহা উদ্ধার করা যায় না।

এই কয়খানি অঙ্গারীকৃত কাগজে লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইল

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

[২৩]

একদিন প্রত্যূষে সুরেশ্বর ও মাধবী তাহাদের চর্কা-ঘরে বসিয়া চর্কা কাটিতেছিল, এমন সময়ে পথে কে ডাকিল, "সুরেশ্বর, বাড়ী আছ ?"

সুরেশ্বর উঠিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া বিস্মিত হইল। দেখিল সজনীকান্ত পথে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছে।

তাড়াতাড়ি নামিয়া গিয়া বৈঠকখানার দ্বার খুলিয়া সুরেশ্বর সজনীকান্তকে সযত্নে ভিতরে আনিয়া বসাইল।

"কবে এলেন ?"

সজনীকান্ত একমুখ হাসিয়া কহিল, "এলাম ছুটি হ'তেই, কাল বিকালে এসেছি। তার পর, তুমি আর আমাদের ওখানে যাও না কেন বল দেখি ? আছ কেমন ? শরীর কিছু খারাপ নেই ত ?"

সজনীকান্তের প্রশ্নের প্রথমাংশের কোনো উত্তর না দিয়া সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া বলিল, "না, শরীর ভালই আছে।"

"শরীর ভাল আছে, তা হ'লে যাও না কেন ?"

সোজাসুজি কোনও উত্তর না দিয়া সুরেশ্বর স্মিতমুখে বলিল, "আপনি ত সবে কাল এসেছেন, তা হ'লে কি করে' জান্লেন যে আমি যাইনে ?"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বেগের সহিত সজনীকান্ত বলিল, "একটা জেলার লোক নিয়ে কারবার করি, আর এইটুকু বুঝ্তে পারব না ? তুমি কি মনে কর আমরা সব কথা শুনেই বুঝি ?—না, দেখেই বুঝি ?" বলিয়া সজনীকান্ত সপুলক অহঙ্কারের সহিত সুরেশ্বরের দিকে স্মিতমুখে চাহিয়া রহিল।

সজনীকান্তের এই আত্মাভিমানে সবিশেষ পুলকিত হইয়া সুরেশ্বর বলিল, "তা হ'লে, কেন যাইনে, তা-ই বা আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন কেন ? তা-ও ত আপনি না শুনে'ই বুঝে' নিতে পারেন ?"

সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া সজনীকান্তের অধরোষ্ঠে গর্ব্বের কঠোর হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। বলিল, "তা'-ই বুঝ্তে পারিনি, মনে কর্ছ নাকি ? কেন যাও না, বল্ব, শুন্বে ?"

সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমি ত জানি-ই, আমাকে আর বলে' কি হবে ?"

সজনীকান্ত কিন্তু সুরেশ্বরের এ অনাগ্রহ-প্রকাশে নিবৃত্ত না হইয়া সদর্পে কহিল, "দিদির দুর্ব্যবহারের জন্য যাও না। বল, ঠিক বলেছি কি না ?"

সুরেশ্বরের মুখ নিমেষের জন্য রঞ্জিত হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া সে শান্ত সুদৃঢ়স্বরে বলিল, "আমাকে ক্ষমা কর্বেন সজনী-বাবু, আমি এসব আলোচনায় যোগ দিতে অক্ষম !"

সজনীকান্ত হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "তুমি ভদ্রলোক, তুমি একথা মুখের কথায় স্বীকার কর্বে না তা আমি জানি। কিন্তু মনে মনেই বুঝ্তে পার্ছ, আমি ঠিক বলেছি কি না। তা বলে' যেন মনে কোরো না যে কেউ আমাকে এ কথা বলেছে তবে আমি জেনেছি। আমরা হাকিম চরিয়ে খাই, সুরেশ্বর ! বুঝ্লে ? ডান হাত পাতি ডিক্রীদারের কাছে, বাঁ হাত পাতি দেনদারের কাছে, আর চোখ রাখি হাকিমের উপর !"

সজনীকান্তের এই যুক্তি ও যোজনা-বিহীন আস্ফালনের কোনো প্রতিবাদ না করিয়া সুরেশ্বর নীরবে হাসিতে লাগিল।

সজনীকান্ত বলিতে লাগিল, "পূজোর ছুটিতেই যাবার সময়ে দিদির একটু ভাবান্তর দেখে গিয়েছ্লাম। এবার এসে তোমাকে দেখ্তে না পেয়ে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করায় আসল কথাটা কেউ বল্লে না। দিদি বল্লেন, 'কেন আসে না তা বল্তে পারিনে', সুমিত্রা বল্লে 'কেন আসেন না সে-কথা বল্বার মতন নয়', আর ঘোষ-মশায় বল্লেন 'কেন আসে না সে-কথা না বলাই

ভাল।' কিন্তু শাক দিয়ে কি আর মাছ ঢাকা দেওয়া যায়, সুরেশ্বর? আসল কথাটা আমি ধরতে পেরেছি কি না তুমিই তার সাক্ষী!" বলিয়া সজনীকান্ত হাসিতে লাগিল।

এবারও সুরেশ্বর কোনো কথা না বলিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সজনীকান্ত বলিয়া উঠিল, "কিন্তু যাই বল সুরেশ্বর, তোমার উপরদিদির রাগ হ'তেই পারে! আহা বেচারী কত কষ্ট করে' একটি হাকিম পাত্র জুটিয়েছে, আর তুমি মেয়েটির কানে কি-এক মন্তর ঝেড়ে দিয়ে একেবারে বিষম গোলযোগ বাধিয়েছ। যে ছিল ছেলেবেলা থেকে পুরোদস্তুর মেম-সাহেব, সে হ'য়ে গেল একেবারে যোগিনী! পিয়ানো আর হার্ম্মোনিয়ম্ বাজিয়ে বাজিয়ে যে লোকের কান ঝালাপালা করে' দিত সে এখন দিনরাত একটা চর্‌কা নিয়ে বসে' চরোর চরোর কর্‌ছে। দিদি ত ক্ষেপে ওঠ্‌বার মতন হয়েছেন! আমার মনে হয় রোজ সকালে অন্ততঃ একবার করে' তোমাকে অভিশাপ না দিয়ে দিদি বোধ হয় জলস্পর্শ করেন না।" বলিয়া সজনীকান্ত উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিল।

সজনীকান্তের মুখে সুমিত্রার বর্ণনা শুনিয়া সুরেশ্বরের যত্নাবরুদ্ধ হৃদয় নিমেষের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিল, কিন্তু তখনি সে নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া স্মিতমুখে কহিল, "তার জন্য আর আপনার দিদির বিশেষ করে' দোষ কি বলুন? দেশের আর বিদেশের সমস্ত লোকই ত প্রত্যহ অপরিমিত পরিমাণে ও-জিনিসটা আমাদের দিচ্ছে।"

সজনীকান্ত বলিল, "দেবে না কেন, সুরেশ্বর? তোমরা যে দেশের সমস্ত লোককেই পাকে জড়িয়েছ! চাকরের চাকরী, উকিলের ওকালতী, ব্যবসাদারের বাণিজ্য, মাতালের মদ, কোন্ বিষয়ে তোমরা হস্তারক হওনি বলো? এমন কি বিয়ের পাত্রীটি পর্য্যন্ত তোমাদের জুলুম থেকে রক্ষা পেলে না।" বলিয়া সজনীকান্ত উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিল।

সজনীকান্তের শেষ কথায় সুরেশ্বরের মুখে কৌতুকের মৃদু হাস্যটুকু, দিনান্তকালীন সূর্য্যাস্ত-প্রভার মতন, দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া গেল। কথাটার সত্য মিথ্যা পরীক্ষা না করিয়াই এই কথা ভাবিয়া তাহার মন একটা অপরিসীম ক্ষোভে ভরিয়া উঠিল যে যেমন করিয়াই হউক বিমান ও সুমিত্রার মধ্যে আবির্ভূত হইয়া সে একটা বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার জন্য সে স্বয়ং কতটা দায়ী কার্য্য-কারণের মধ্যে তাহার কতখানি যোগ আছে, সমগ্র ব্যাপারটার লাভ-লোক্‌সান, ন্যায়-অন্যায়ের কি হিসাব, এসকল বিচারের মধ্যে প্রবেশ করিতে তাহার একেবারেই প্রবৃত্তি হইল না; শুধু, যাহা একান্ত সত্য, ঘটনারূপে যাহা অনুপেক্ষণীয়, তাহারই কথা মনে করিয়া সুরেশ্বর অন্তরের মধ্যে একটা দুঃসহ গ্লানি ভোগ করিতে লাগিল।

সুরেশ্বরের মুখে ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া সজনীকান্ত সহাস্যমুখে বলিল, "রাগ কর্‌লে নাকি হে সুরেশ্বর? তুমি মনে কিছু কোরো না, আমি পরিহাস কর্‌ছিলাম।"

সুরেশ্বর ফিকা হাসি হাসিয়া কহিল, "না, না, রাগ কর্‌ব কেন? দুঃখিত হবার কথায় রাগ কর্‌লে চল্‌বে কেন?"

সজনীকান্ত সুরেশ্বরকে প্রবোধ দিবার অভিপ্রায়ে বলিল, "দুঃখিত হবার কথাই বা কি করে'? মা যদি নিজের মেয়েকে সাম্‌লাতে না পারে তা হ'লে তুমিই বা কি কর্‌বে আর আমিই বা কি কর্‌ব বলো?"

এ আলোচনা আর অগ্রসর হইতে না দিবার অভিপ্রায়ে সুরেশ্বর বলিল, "তা বটে।"

"সুরেশ্বর, আমার একটা অনুরোধ রাখ্‌বে?"

কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সুরেশ্বর বলিল, "কি বলুন?"

"আজ সন্ধ্যাবেলা একবার আমাদের বাড়ী বেড়াতে যাবে?"

"আপনি ত জানেন আমি আজকাল আপনাদের বাড়ী যাইনে।"

"প্রতিজ্ঞা করে' নাকি?"

সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া বলিল, "প্রকাশ্যভাবে এমন কিছু প্রতিজ্ঞা করিনি; কিন্তু প্রতিজ্ঞা না করে'ও ত অনেক কাজই করি, আর করিনে।"

এ-উত্তরে অকারণ আশান্বিত হইয়া সজনীকান্ত ঈষৎ নির্ব্বন্ধসহকারে বলিল, "তা হ'লে যদি বিশেষ আপত্তি না থাকে ত আজ একবার যেয়ো না?"

সুরেশ্বর তেম্‌নি স্মিতমুখে বলিল, "আপত্তি শুধু ত আমারই নয়; অন্যলোকেরও আপত্তি থাক্‌তে পারে ত?"

সজনীকান্ত ব্যগ্রভাবে কহিল, "তা যদি বল ত আমার খুব বিশ্বাস তুমি গেলে কেউ আপত্তি করবে না। সুমিত্রা ত বরং খুসীই হবে।"

সজনীকান্তের কথা শুনিয়া সুরেশ্বর ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমাকে ক্ষমা করবেন সজনীবাবু, আপনি তা হ'লে সুমিত্রাকে ঠিক বোঝেন না। আমি গেলে তিনি খুসী হবেন না; আর তা যদি হন তা হ'লে আমি তাতে দুঃখিতই হব!"

সজনীকান্ত বিমূঢ়ভাবে ক্ষণকাল সুরেশ্বরের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "আমাকেও তুমি ক্ষমা কোরো সুরেশ্বর, শুধু সুমিত্রাকে কেন, তোমাকেও আমি ঠিক বুঝিনে! তুমি গেলে, সুমিত্রা খুসী হ'লে তুমি দুঃখিত হবে আর সুমিত্রা দুঃখিত হ'লে তুমি খুসী হবে, এসব গোলমেলে কথার মানে আমি যদি কিছুমাত্র বুঝ্‌তে পারি! তোমার শিষ্যটিও ঠিক তোমারই মত হেঁয়ালীতে কথা কইতে শিখেছে। তার কথা যেন আরও গোলমেলে! তুমি আর যাও না শুনে কাল যখন বল্‌লাম যে তোমাকে আজ ধরে' নিয়ে যাব, তখন সুমিত্রা কি বল্‌লে শুনবে?"

সুরেশ্বরের মুখ ঈষৎ আরক্ত হইয়া উঠিল। সে অন্য দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই ধীরে ধীরে বলিল, "আন্দাজি কথা না বলাই ভাল। যা আপনি নিজে ঠিক বুঝ্‌তে পারেননি তা বল্‌তে গিয়ে ভুল করতে পারেন।"

সজনীকান্ত হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "তা বড় মিছে বলনি। তোমাদের কথার অর্থ বোঝাই ভার। আচ্ছা, সে-কথা না হয় যাক। তোমাকে যেতে বল্‌ছিলাম কেন তা জান, সুরেশ্বর?"

সুরেশ্বর মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না, তা' ত জানিনে।"

সজনীকান্তের মুখে সকৌতুক হাস্য ফুটিয়া উঠিল।—'যশোর থেকে সের পাঁচেক ছানাবড়া এনেছি,—খেয়ে দেখ্‌তে কেমন জিনিস।"

সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া বলিল, "যখন যত্ন করে' সেখান থেকে নিয়ে এসেছেন তখন বুঝ্‌তেই পারছি খুব ভাল জিনিস।"

প্রসন্ন-গম্ভীর-কণ্ঠে সজনীকান্ত বলিল, "কত দাম পড়েছে জান?"

সুরেশ্বর একটু ভাবিয়া বলিল, "দশ-বারো টাকা হবে।"

"একটি পয়সা নয়, অথচ জিনিস একেবারে পয়লা কোয়ালিটির!" বলিয়া সজনীকান্ত মুগ্ধ অপলক নেত্রে সুরেশ্বরের দিকে চাহিয়া রহিল।

সুরেশ্বর ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমার কথা হেঁয়ালী বলে' অনুযোগ করছিলেন, কিন্তু আপনার কথা যে দুর্ভেদ্য হেঁয়ালী! পাঁচ সের ছানাবড়ার এক পয়সাও দাম নয়। এ কি করে' হয়?"

সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া উচ্ছ্বসিত রবে হাসিয়া উঠিয়া সজনীকান্ত বলিল, "এই বোঝ! অথচ হয় খুব সহজেই। একজন ময়রার একটা ডিক্রি জারী করাবার আছে; তাকে বল্‌লাম যে বড়দিনের ছুটিতে বোনের বাড়ী যাব কিছু ছানাবড়া চাই। ব্যস্, একেবারে নগদ পয়সা দিয়ে হাঁড়ি কিনে পাঁচ সের ছানাবড়া বাড়ী পৌঁছে দিয়ে গেল! কি বল্‌ব সুরেশ্বর, ডিক্রি ডিস্‌মিসের ক্ষমতাটাও যদি হাতে থাক্‌ত তা হ'লে আর ছানা-বড়া নয় একেবারে সোনার বড়া আদায় করতাম।" বলিয়া সজনী হাসিতে লাগিল।

সুরেশ্বর বলিল, "বড় ক্ষমতার একটা আবার অসুবিধা আছে যে যথেচ্ছা তা ব্যবহার করা চলে না। যেমনভাবে যখন ইচ্ছে ছড়ি ঘুরিয়ে বেড়িয়ে বেড়ানো চলে, কিন্তু তরোয়ালকে অধিকাংশ সময় সাবধানে খাপে পুরে' রাখ্‌তে হয়।"

সজনীকান্ত হাসিয়া বলিল, "তা বটে; কিন্তু ঝোপ বুঝে' কোপ দিতে পারলে তরোয়াল একবার খাপ থেকে বার করলেই দিন কিনে নেওয়া যায়!"

উপমায় পরাজিত হইয়া সুরেশ্বর নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল।

"ছানাবড়া দু'চারটে খেলে খুসী হ'তে, সুরেশ্বর।"

সুরেশ্বর স্মিতমুখে বলিল, 'কি করব বলুন, কপালে না থাকলে আর কেমন করে' হয়?"

ছানাবড়া খাইবার জন্য সুমিত্রাদের বাটী যাইতে সুরেশ্বরকে কোনওপ্রকারে সম্মত করিতে না পারিয়া

সজনীকান্ত উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "তা হ'লে আর কি হবে, আমি চল্লাম।"

সুরেশ্বর সজনীকান্তের গতি রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "তা হবে না, সজনী-বাবু; দয়া করে' যখন পায়ের ধুলো দিয়েছেন তখন একটু মিষ্টি-মুখ করতেই হবে।"

সজনীকান্ত মাথা নাড়িয়া সবেগে বলিল, "বেশ লোক ত তুমি! তুমি নিজে যখন খাবে না আমাদের ওখানে, তখন আমিই বা তোমার বাড়ী কেন খাব?"

সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া বলিল, "সেইজন্যই ত আপনার আমাদের বাড়ী আরও খাওয়া উচিত। নইলে মনে হবে যে আপনি রাগ করে' খেলেন না।"

এবারও অবশেষে সুরেশ্বরেরই জয় হইল। কিছুক্ষণ বাদানুবাদের পর সজনীকান্ত জলযোগ করিতে সম্মত হইল।

আহার করিতে করিতে সজনীকান্ত বলিল, "এবার আর এখানে ভাল লাগ্‌ছে না, সুরেশ্বর। বাড়ীতে আমোদ-আহ্লাদের নাম-গন্ধ নেই। ঘোষ-মশায় ত গীতা আর উপনিষদের মধ্যে এমন করে' ঢুকেছেন যে তাঁকে টেনে বার করাই কঠিন ব্যাপার! সুমিত্রা চর্‌কা নিয়ে দিবারাত্র ঘড়োর ঘড়োর করছে, আর দিদি সুমিত্রাকে নিয়ে ঘ্যানোর ঘ্যানোর করছেন। কাল সন্ধ্যার সময়ে বিমান এসেছিল, গল্পগুজবও করছিল, কিন্তু যাই বল, ও হাকিম-টাকিমদের সঙ্গে আমাদের তেমন সুবিধা হয় না!"

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই সজনীকান্তের খেয়াল হইল যে, হাকিমদের সম্বন্ধে সহসা এমন একটা স্বীকার করিয়া ফেলিয়া সে নিজেকে কতকটা খর্ব্ব করিয়াছে। মনে মনে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া ভুলটা যথাসম্ভব শুধ্‌রাইয়া লইবার উদ্দেশ্যে সে তাড়াতাড়ি বলিল, "কি জান সুরেশ্বর? দিবারাত্র হাকিম ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয় ব'লে হাকিমের গন্ধ পর্য্যন্ত আর ভাল লাগে না! সেবার তুমি যখন যেতে তখন কিরকম জম্‌ত বল দেখি? তোমার সঙ্গে লড়াই ঝগ্‌ড়া করে'ও সুখ পাওয়া যেত!"

ঈষৎ হাসিয়া সুরেশ্বর বলিল, "লড়াই-ঝগ্‌ড়ার ধর্ম্মই হচ্ছে লমা। তা ছাড়া মিষ্টি জিনিসের সঙ্গে নোন্‌তা জিনিস একটু মুখ-রোচক লেগেই থাকে।"

সজনীকান্ত ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "তা নয়, সুরেশ্বর। মিষ্টি হ'লেই যদি মিষ্টি লাগ্‌ত তা হ'লে গুড় আর চিনি ছেড়ে লোকে অন্য কোনো জিনিস খেত না।"

আর কোনও উত্তর না দিয়া সুরেশ্বর নীরবে হাসিতে লাগিল।

পথে বাহির হইয়া সজনীকান্তকে আগাইয়া দিতে দিতে সুরেশ্বর মুক্তারাম-বাবুর ষ্ট্রীটের মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইল।

সজনীকান্ত স্মিতমুখে বলিল, "এই তোমার সীমানা নাকি? আর এগবে না?"

সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া কহিল, "না; মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট্ আমার এলাকার বাইরে।"

সবেগে মাথা নাড়িয়া সজনীকান্ত বলিল, "এ কিন্তু তোমার একেবারে ভুল ধারণা, সুরেশ্বর! আমি স্বচক্ষে দেখ্‌ছি সেখানে তোমার হুকুম ত জারি রয়েছে, চর্‌কা চল্‌ছে, খদ্দর চল্‌ছে, তবু তুমি বল্‌বে যে তোমার এলাকার বাইরে?"

আরক্ত মুখে ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সুরেশ্বর বলিল, "সেটা আমার হুকুমত নয় সজনীবাবু, আমি যাঁর হুকুমে চলি তাঁর হুকুম। অনাদি কাল থেকে যিনি ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে গড়্‌ছেন সেই মহাকালের এলাকা সর্ব্বত্র।"

নিঃশব্দে ক্ষণকাল সুরেশ্বরের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সজনীকান্ত বলিল, "আমি তোমার ওসব সাজানো কথা বুঝ্‌তে পারিনে, সুরেশ্বর; আমি সহজে যা বুঝ্‌ছি তা হচ্ছে এই যে দিদির বাড়ী আর তুমি কখনও না গেলেও সেখানে যা মূল গেড়ে এসেছ তা উচ্ছেদ করা দিদির সাধ্য নয়! এমন কি এখন আর তোমারও সাধ্য নয়!" বলিয়া সজনীকান্ত হাসিতে লাগিল।

এবার সুরেশ্বরের মুখ সীসার মত নিষ্প্রভ হইয়া গেল। এ প্রসঙ্গে আর কোনো কথা না বলিয়া সে বলিল, "আচ্ছা তা হ'লে এখন আসি। আর আপনাকে আট্‌কে রাখ্‌ব না।" বলিয়া করজোড়ে সজনীকান্তকে নমস্কার করিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

গৃহে পৌঁছিয়া উপরে উঠিতেই সুমিত্রার সহিত সজনীকান্তের সাক্ষাৎ হইল। প্রাতঃকাল হইতে

সজনীকান্তের অনুপস্থিতির জন্য ইহার মধ্যে কয়েকবার তাহার অনুসন্ধান হইয়াছিল সে-কথা সুমিত্রা জানিত।

সে সজনীকে দেখিয়া বলিল, "সকালবেলা থেকে চা-জলখাবার না খেয়ে কোথায় গিয়েছিলে, মামাবাবু? মা তোমার খোঁজ কর্‌ছিলেন।"

সজনী একটু শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি কোথায়?"

সুমিত্রা বলিল, "কাল রাত থেকে মাথাটা ধরে' রয়েছে, মা এখন একটু শুয়েছেন। চলো আমি তোমায় চা আর খাবার দিই।"

কথাটা শুনিয়া মনে মনে একটু আশ্বস্ত হইয়া সজনীকান্ত বলিল, "খাবারের দর্‌কার নেই, শুধু এক কাপ্ চা দাও, তা হ'লেই হবে। খাবারটা তোমার গুরুবাড়ীতেই সেরে এসেছি।"

সজনীকান্তের কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া সুমিত্রা বিস্মিত হইয়া কহিল, "আমার গুরুবাড়ী? বিনোদ-বাবুর বাড়ী গিয়েছিলে বুঝি?"

বিনোদ-বাবু বহুদিন সুমিত্রাকে ইংরেজী সাহিত্য শিক্ষা দিয়াছিলেন, এবং তাঁহার গৃহও নিকটে।

সজনীকান্ত সহাস্যমুখে কহিল, "না, গো, বিনোদ-বাবু নয়! তোমার নতুন গুরু, যার মন্ত্র অথবা মন্ত্রণায় বিগ্‌ড়ে তুমি আমার দিদিটিকে পাগল করে' তুলেছ! সুরেশ্বরের বাড়ী গিয়েছিলাম।" তাহার পর কণ্ঠস্বর অনুচ্চ করিয়া কহিল, "দিদিকে যেন বোলো না আমি সুরেশ্বরের বাড়ী গিয়েছিলাম; তা হ'লে হয়ত আমার উপরও রেগে যাবেন।"

সুমিত্রা আরক্ত হইয়া বলিল, "তা আমি বল্‌ব না; কিন্তু সুরেশ্বর-বাবুকে এখন অব্যাহতি দিলেই ভাল হয়, মামাবাবু!"

সজনীকান্ত সুমিত্রার কথার তাৎপর্য্য সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বলিল, "অব্যাহতি না দিয়ে আর উপায় কি? আমি ত গিয়েছিলাম তাকে ধরে' আন্‌বার জন্যে; কত সাধ্য-সাধনা কর্‌লাম, কিন্তু কিছুতেই আস্‌তে রাজি হ'ল না। আমি যখন বল্‌লাম 'তুমি গেলে আর কেউ না হোক সুমিত্রা ত বিশেষ খুসী হবে' তখন কি বল্‌লে শুন্‌বে?"

শুনিবার কোনো আগ্রহ সুমিত্রা মুখে প্রকাশ করিল না, কিন্তু শুনিবার জন্য সে নিরুদ্ধনিশ্বাসে উৎকর্ণ হইয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল।

সুমিত্রার উত্তরের জন্য এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া সজনী বলিল, "বল্‌লে 'আপনি তা হ'লে সুমিত্রাকে জানেন না। আমি গেলে সুমিত্রা খুসী না হ'য়ে দুঃখিতই হবে। আর সে যদি খুসী হয় তা হ'লে আমি দুঃখিত হব'। আমি দেখ্‌লাম এসব হেঁয়ালী কাটিয়ে তাকে নিয়ে আসা অসম্ভব। তখন অগত্যা সন্দেশ-রসগোল্লায় পেট ভরিয়ে চ'লে এলাম।—ভাল করিনি?" বলিয়া সজনীকান্ত হাসিতে লাগিল।

সুমিত্রা স্মিতমুখে বলিল, "বেশ করেছ।" কিন্তু মুখের হাসি যে কোনো কোনো সময়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে চোখের জলে পর্য্যবসিত হইয়া যায় তাহা সে জানিত না। তাই, "দাঁড়াও মামাবাবু, আমি তোমার জন্যে চা নিয়ে আসি" বলিয়া উদ্বেল অশ্রু কোনো-প্রকারে ক্ষণকালের জন্য চাপিয়া রাখিয়া সে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল। (ক্রমশঃ)

শ্রী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ঐতিহাসিক নাটক

মানুষ যতদিন হইতে রঙ্গমঞ্চে তাহার নিজেরই আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতির অনুকরণ করিতেছে ততদিন হইতেই পৃথিবীর সমস্ত দেশে ঐতিহাসিক আখ্যান বা উপাখ্যান লইয়া নাটক রচনা হইতেছে। সকল দেশেই ঐতিহাসিক নাটক আছে এবং নাট্যকার ইতিহাসের আখ্যান বা উপাখ্যান লইয়া জনসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য তাহাতে তাঁহার নিজের কল্পিত কতক ঘটনা ও চরিত্র প্রবিষ্ট করাইয়া নাটকের সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণতা বিধান করিয়া থাকেন।

আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে ঐতিহাসিক নাটক আদৃত হইয়া আসিতেছে। বিশাখদত্তের "মুদ্রারাক্ষস" এবং কালিদাসের "মালবিকাগ্নিমিত্র" অতি উচ্চ অঙ্গের ঐতিহাসিক নাটক। কালিদাস ও বিশাখদত্ত কোন্ সময়ের লোক তাহা এখনও স্থির হয় নাই বটে কিন্তু তাঁহাদের এই দুইখানি ঐতিহাসিক নাটকের মূল উপাখ্যান পণ্ডিতেরা সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। ঐতিহাসিক এফ্‌ ডবলিউ টমাস্ বলেন—

"অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে রচিত হইলেও বিশাখদত্তের প্রকৃষ্ট-লিপিকৌশলপূর্ণ রাজনৈতিক নাটক মুদ্রারাক্ষসে ঐ রাজবংশের উৎপত্তিকালের ঘটনার কতকগুলি মোটামুটি আভাস আছে।"...কেম্ব্রিজ হিষ্ট্রি অভ্ ইণ্ডিয়া, ভলুম ১, পৃষ্ঠা ৪৬৭।

মালবিকাগ্নি সম্বন্ধে অধ্যাপক ই জে র‍্যাপ্‌সন্ বলেন—

"কালিদাসের সর্ব্বপ্রথম নাটক মালবিকাগ্নিমিত্রে পুষ্যমিত্রের রাজত্বকালের কতকগুলি ঘটনার প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। বিদর্ভ দেশের (বেরার) রাজকন্যা মালবিকা ছদ্মবেশে বিদিশার রাজা ও পুষ্যমিত্রের রাজপ্রতিনিধি অগ্নিমিত্রের সভায় বাস করিতেছিলেন; তাঁহারই সহিত অগ্নিমিত্রের প্রেমের কাহিনী নাটকটির আখ্যানবস্তু। ৪০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোনো সময়ে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে এক বসন্ত-উৎসব উপলক্ষ্যে এই নাটকটি উজ্জয়িনীতে অপর এক রাজপ্রতিনিধির সভায় অভিনীত হয়। প্রায় সমস্ত সংস্কৃত নাটকের মত মালবিকাগ্নিমিত্র ষড়যন্ত্রের কাহিনী ভিন্ন অধিক কিছু নহে। নাটকটির মূল উদ্দেশ্য ঐতিহাসিক নয়; কিন্তু ইহার কতগুলি চরিত্র একেবারে বাস্তব বলিয়া মনে হয়; এবং শেষ অঙ্কে বিদিশা রাজ্যের নিকটবর্ত্তী রাজ্যের ইতিহাসের কথা বেশ সঙ্গতভাবে যোজনা করা হইয়াছে। এগুলি যে বাস্তবতায় প্রতিষ্ঠিত নয় তাহা মনে করা যুক্তিযুক্ত হইবে না।"—কেম্ব্রিজ হিষ্ট্রি অভ্ ইণ্ডিয়া, ভলুম ১, পৃষ্ঠা ৫১৯।

মধ্যযুগের রঙ্গমঞ্চের কথা আমরা কিছুই জানি না, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় যে ভারতবর্ষ যতদিন স্বাধীন ছিল ততদিন এদেশে নাটকের আদর ছিল। বাঙ্গালাদেশের মুসলমানের অধিকার লোপ পাইলে আবার নূতন করিয়া নাটকের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই নূতন ধরণের নাটক পাশ্চাত্যের আদর্শে গঠিত। প্রথমে আমাদের দেশে পৌরাণিক আখ্যায়িকা লইয়া নাটক রচিত হইত। পরে ঐতিহাসিক নাটক রচনা আরম্ভ হইয়াছিল। আচার্য্য বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া অভিনীত হইবার পরে নূতন ঐতিহাসিক নাটক রচনা আরব্ধ হইয়াছিল। যে-সকল গ্রন্থকার ঐতিহাসিক নাটক রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও শ্রীযুত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ শীর্ষস্থানীয়। গিরিশচন্দ্র ঘোষের ঐতিহাসিক নাটকগুলি বহুদিন পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল এবং শুনিতে পাওয়া যায় যে, তাহাদের অনেকগুলি অভিনয়কালে তাদৃশ সমাদর লাভ করে নাই। আধুনিক নাটককারদিগের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার চন্দ্রগুপ্ত, প্রতাপসিংহ, সাজাহান ও দুর্গাদাস ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বাঙ্গালীর সমাজে অভিনীত ও আদৃত হইয়াছে। কিন্তু ঐতিহাসিকের নিকট তাঁহার নাটকগুলি ভ্রম-পরিপূর্ণ।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক হয়ত নাটক-হিসাবে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট, কিন্তু একটি দোষের জন্য তাহা কখনও বাঙ্গলা ইতিহাস-সাহিত্যে সমাদর লাভ করিবে না। ঐতিহাসিক নাটকের পক্ষে এই দোষটি মহাদোষ এবং এই দোষের জন্য ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সমস্ত ঐতিহাসিক নাটক ঐতিহাসিক আখ্যা লাভ করিবার যোগ্য নহে। দ্বিজেন্দ্রলাল অনেক সময়ে জানিয়া শুনিয়াও তাঁহার নাটকে এই দোষটি পরিত্যাগ করিতেন না। তিনি নাটকে বীর-রস এবং উত্তেজনার আমদানী করিবার জন্য অনৈতিহাসিক ঘটনার অবতারণা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার "প্রতাপসিংহ" নামক নাটকে তিনি ক্ষুদ্র-বৃহৎ অনেক অনৈতিহাসিক ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন, একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলে বাঙ্গালী মাত্রেই সেগুলিকে অতথ্য বলিয়া ধরিতে পারিবেন। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে সেগুলি সমস্ত উল্লেখ করিতে পারিলাম না, কেবল উদাহরণস্বরূপ দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিলাম। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিরচিত "প্রতাপসিংহ" নামক নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে সেলিমের সহিত বাক্যালাপ করিয়াই আকবরের কন্যা মেহেরউন্নিসা চতুর্থ দৃশ্যে অবগুণ্ঠন পরিত্যাগ করিয়া একেবারে একাকিনী শক্তসিংহের শিবিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। শুধু তাহাই নহে, তৃতীয় অঙ্কের সপ্তম দৃশ্যে মেহেরউন্নিসা একেবারে প্রতাপসিংহের শিবিরে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। রঙ্গমঞ্চের সাময়িক উত্তেজনা আনিয়া উপস্থিত করিবার জন্য এত বড় ইতিহাস-বিরুদ্ধ কথা আর কোনও দেশের, আর কোনও ভাষার নাটকে স্থান পাইয়াছে

কিনা সন্দেহ। মোগল-সম্রাট্ আক্‌বরের মেহেরউন্নিসা নামে কোন কন্যা থাকুক বা না থাকুক তাহাতে কিছু আসে যায় না; কিন্তু আক্‌বরের কন্যা যে গোপনে প্রতাপসিংহের শিবিরে গিয়াছিলেন এ-কথা বলিবার অধিকার কাহারও নাই। আমার যতদূর স্মরণ হয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পূর্ব্বে কোন নাটককার এরূপভাবে ইতিহাসকে লঙ্ঘন করিতে সাহস করেন নাই।

দ্বিজেন্দ্রলাল ও গিরীশচন্দ্র বহুদিন আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং তাঁহাদিগের নাটক লইয়া বর্ত্তমানকালে আলোচনা করা বৃথা। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে যে অসত্যের ধারা প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন দশ পনের বৎসর পরেই তাহার ফলে বাঙ্গালা সাহিত্যে ঐতিহাসিক নাটকের কি পরিণাম হইয়াছে তাহা প্রদর্শন করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান বৎসরে কলিকাতার সাধারণ বা বৈতনিক রঙ্গমঞ্চে তিনখানি নূতন ঐতিহাসিক নাটক অভিনীত হইয়াছে—

(১) মনোমোহন রঙ্গমঞ্চে আলেক্‌জাণ্ডার, পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক, শ্রী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

(২) ষ্টার রঙ্গমঞ্চে ইরাণের রাণী, শ্রী অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। এই নাটকখানির মুখপত্রে ঐতিহাসিক ছাপ মারা নাই, তথাপি ইহা কেন ঐতিহাসিক-নাটক-পর্য্যায়ভুক্ত করা হইল তাহার কারণ যথাস্থানে বিবৃত করিব।

(৩) মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত ললিতাদিত্য, ঐতিহাসিক নাটক, শ্রী নিশিকান্ত বসু রায় বি-এল্ প্রণীত।

পর্য্যায়ক্রমে ধরিতে গেলে আলেক্‌জাণ্ডার নাটকখানিকেই প্রথম ধরিতে হয়, কারণ বর্ত্তমান বর্ষে ইহাই প্রথম নাটক।

আলেক্‌জাণ্ডার নাটকখানি অভিনয় দেখিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই, মুদ্রিত গ্রন্থ পাঠ করিয়া অভিনয় দর্শনের ইচ্ছা উড়িয়া গিয়াছিল। নাট্যকার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই নাটকে মাকেদন্-রাজ আলেক্‌জাণ্ডার বা সেকেন্দরের ভারত- ও পারস্য-জয়ের বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া এই নাটকখানি রচনা করিয়াছেন। আলেক্‌জাণ্ডারের পারস্য- ও ভারত-বিজয় সম্বন্ধে দেশী ও বিদেশী নানা ভাষায় বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। আমাদের বাঙ্গালা ভাষাতেও যে এ-সম্বন্ধে দুই-একখানি গ্রন্থ নাই তাহা নহে, কিন্তু গ্রন্থকার পারস্য-রাজ দারা ও আলেক্‌জাণ্ডারের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত আলেক্‌জাণ্ডার নাটকে দেখিতে পাওয়া যায় যে পারস্যরাজ দারা যখন মাতাল অবস্থায় প্রাসাদে দাঁড়াইয়া আছেন তখন তিনি নেপথ্যে আলেক্‌জাণ্ডারের জয়ধ্বনি শুনিতেছেন—"তৃতীয় দৃশ্য। রাজ-প্রাসাদ। মাতাল অবস্থায় দারায়ুস টলিতেছে, বেসাস্ তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিতেছে।"

"দারা। আরে যাও বেসাস্। আমি যাব না। আজ তারা আমোদ কর্‌ছে আর তুমি বল কিনা গ্রীকেরা আক্রমণ কর্‌ছে? তুমি মাতাল হয়েছ বেসাস।

"বেসাস্। সম্রাট্! আর একটু, এখনি প্রাসাদ আমরা অতিক্রম কর্‌তে পারব। চলে' আসুন সম্রাট্! আপনি বাঁচ্‌লে পারস্যের আবার সব হবে।"

দারা বা দারায়ুসের এই যে চিত্র বাঙ্গালী নাট্যকার আঁকিয়াছেন ইহা সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক। দারা বা দারায়ুসের প্রকৃত নাম দরিয়াবুস্। মাকেদন্-রাজ অ্যালেক্‌জাণ্ডার যখন পারস্যদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন তখন যে-রাজা বিশাল পারসিক সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন তিনি দরিয়াবুস্ নামের তৃতীয় রাজা। তিনি কাপুরুষ ছিলেন না এবং অ্যালেক্‌জাণ্ডার তাঁহার পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ করিয়াই বিনা বিবাদে পারসিক সাম্রাজ্যের রাজধানীতে প্রবেশ করেন নাই। এসম্বন্ধে নাট্যকার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণরূপে অলীক। তাঁহার অ্যালেক্‌জাণ্ডার নাটকে দেখিতে পাওয়া যায় যে দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে, ফিলিপের মৃত্যুর পরে তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে অ্যালেক্‌জাণ্ডার একেবারে পারস্যের রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে ৩৩৪ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে আন্দাজ পঁয়ত্রিশ হাজার সৈন্য লইয়া অ্যালেক্‌জাণ্ডার এসিয়াদেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন। এসিয়া-মাইনরের মধ্যভাগে ফ্রিজিয়ার শাসনকর্ত্তা বা ক্ষত্রপ

অর্ধিত বহু সৈন্য লইয়া তাঁহার গতি রোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বহু কষ্টে গ্রানিকুস-নদীতীরে অ্যালেক্‌জাণ্ডার অর্ধিত ফার্ণাক আভিজ্য মিথ্রদত প্রভৃতি পারসিক ক্ষত্রপদের পরাজিত করিয়াছিলেন। এই গ্রানিকুস-নদী ইউরোপ ও এসিয়াখণ্ডের মধ্যবর্ত্তী এলেসপণ্ড-সমুদ্রতীর হইতে অধিক দূরে অবস্থিত নহে। পর বৎসর পারসিক সম্রাট্ তৃতীয় দরিয়াবুস্ স্বয়ং সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সাইপ্রাস দ্বীপের অদূরে ভূমধ্যসাগর-তীরে অ্যালেক্‌জাণ্ডারের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধে পারসিক সেনা যে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল, ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ মুক্তকণ্ঠে সে কথা স্বীকার করেন

"পারস্য-সেনা-দলের সর্ব্বোৎকৃষ্ট যোদ্ধা যে বেতনভুক্ গ্রীক্ সৈনা তাহারা এইখানে আলেক্‌জাণ্ডারের সেনাদলকে আক্রমণ করে। যে খণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ হয় তাহা ভীষণ হইয়া উঠিয়াছিল এবং মাকেদনের ক্ষতি বড় সামান্য হয় নাই। ......ইতিমধ্যে পারস্য-দলের ডাহিনে সশস্ত্র অশ্বারোহী পারসিক সৈন্যগণ অদ্ভুত সাহস দেখাইয়াছিল। তাহারা সাহসিকতার সহিত পিনারুস্-নদী অতিক্রম করে ও প্রবলভাবে থেসালিয়ান্‌দিগকে আক্রমণ করে। থেসালিয়ান্‌দিগের সহিত তাহারা হাতাহাতি যুদ্ধ চালাইতেছিল, এমন সময় খবর আসে যে, ডেরায়াস্ পলায়ন করিয়াছেন ও বামভাগের সৈনাদল নিহত হইয়াছে।"—হিষ্টোরিয়ানস্ হিষ্ট্রি অভ দি ওয়াল্‌র্ড্ লণ্ডন ১৯০৭, ভল্যাম ৪, পৃষ্ঠা ৩০৩।

এই যুদ্ধ ইসাসের যুদ্ধ নামে ইতিহাসে পরিচিত এবং এই যুদ্ধে সহস্র সহস্র পারসিক সৈন্য এবং অর্যম রেবমিথ্র অতিজ্য এবং মিশর দেশের ক্ষত্রপ সবক নিহত হইয়াছিলেন। ৩৩৩ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে পরাজিত হইয়া পারস্যরাজ দারা পলায়ন করিলে অ্যালেক্‌জাণ্ডার টায়ার ও গাজা অবরোধ করিয়াছিলেন এবং ৩৩২ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে মিশরদেশ জয় করিয়াছিলেন। ৩৩১ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে অ্যালেক্‌জাণ্ডার মিশর দেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তৃতীয় দরিয়াবুস্ সমস্ত পারসিক সাম্রাজ্যের সৈন্য সমাবেশ করিয়া প্রাচীন নিনিভ নগরের অনতিদূরে অ্যালেক্‌জাণ্ডারকে বাধা দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। যে-স্থানে এই যুদ্ধ হইয়াছিল তাহার নাম আরবেলা। এই নগর বা গ্রাম প্রাচীন ও আধুনিক পারস্যদেশের পশ্চিম সীমায় অবস্থিত। গ্রীক্ ঐতিহাসিকগণ মুক্তকণ্ঠে পারসিক সেনার যুদ্ধ-কৌশলের কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন্

"প্রভূত সামরিক অন্তর্দৃষ্টির সহিত মেসোপটেমিয়ার নিকটে পারস্যরাজের যুদ্ধক্ষেত্র নির্ব্বাচিত হইয়াছিল।"—হিষ্টোরিয়ানস্ হিষ্ট্রি অভ্ দি ওয়াল্‌র্ড্ লণ্ডন ১৯০৭, ভল্যুম ৪, পৃষ্ঠা ৩২০।

"যাহা কিছু সুযোগ সুবিধা লাভ করা তাঁহার শক্তিতে সম্ভব রাজা তাহার যথাসাধ্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কর্ত্তরী-সন্নদ্ধ রথ চালনার সুবিধার জন্য রাজা খুব সাবধানতার সহিত একটি প্রকাণ্ড জমি পরিষ্কার করাইয়া সমতল করাইয়া দিয়াছিলেন। এবং যুদ্ধক্ষেত্রের পশ্চাতে সুবেষ্টিত আরবেলানগরে তিনি সামরিক জিনিসপত্র রাখিয়া দেন। পরবর্ত্তী-কালের আলঙ্কারিকগণ সমারোহপ্রিয়তা ও অল্পবুদ্ধিতার জন্য ডেরায়াস্‌কে দ্বিতীয় জেরাক্‌সিসের সহিত সানন্দচিত্তে তুলনা করিয়াছেন। কিন্তু ডেরায়াসের এই শেষ যুদ্ধপরিচালনার অপক্ষপাত বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, তিনি তাঁহার মহৎ পূর্ব্বপুরুষের ন্যায় হিস্তাস্‌পেসের পুত্র এই নামের সম্পূর্ণ যোগ্য ছিলেন।"

—ঐ, পৃষ্ঠা ৩২১।

"পারসিকেরা বাস্তবিক পক্ষে প্রবল আক্রমণ আশঙ্কা করিয়াছিল এবং তাহার জন্য প্রস্তুতও হইয়াছিল। ডেরায়াস্ এই আক্রমণের সম্ভাবনা আশঙ্কা এরূপ করিয়াছিলেন যে বিকালবেলা তিনি সমস্ত সৈন্যকে ব্যূহবদ্ধ করিয়া দাঁড় করাইয়া সমস্ত রাত্রি তাহাদিগকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিয়া রাখেন। ইহার ফল এই হয় যে, সকালে তাহারা নিস্তেজ ও অবসন্ন হইয়া পড়ে; আর তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা বেশ সতেজ ও প্রবল হইয়া আসে।

ডেরায়াস্ নিজে যে যুদ্ধাদেশ লিখাইয়াছিলেন, তাহা যুদ্ধ বাধিবার পরে ম্যাসিডোনিয়ান্‌দের হাতে পড়ে। এবং অ্যারিষ্টবুলাস্ তাঁহার পত্রিকায় তাহা নকল করিয়া দেন।...ডেরায়াস্ সৈন্যদলের মধ্যভাগে ছিলেন।"

—ঐ, পৃষ্ঠা ৩২৩।

পারস্যরাজ তৃতীয় দরিয়াবুস্ কাপুরুষ ছিলেন না, তিনি স্বয়ং আরবেলার যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। তিনি দুইবার যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা কাপুরুষতার জন্য নহে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নেপোলিয়ান বোনাপার্টি ও বিংশ শতাব্দীতে বহু ইউরোপীয় জাতির সেনাপতি বহুবার পলায়ন করিয়াছেন। দরিয়াবুস্ পলায়ন না করিলে হয়ত তিনি বন্দী বা নিহত হইতেন এবং বিশ্বাসঘাতক বেসাস্ তাঁহাকে হত্যা না করিলে হয়ত কোন নূতন যুদ্ধক্ষেত্রে অ্যালেক্‌জাণ্ডারকে পারস্যরাজের সম্মুখীন হইতে হইত।

সে যাহাই হউক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত আলেক্‌জাণ্ডার নাটকে গ্রানিকাস্, ইসস্ ও আরবেলা যুদ্ধত্রয়ের নাম নাই। পারস্যরাজ দরিয়াবুস্ অ্যালেক্‌জাণ্ডার কর্ত্তৃক পারস্য আক্রমণকালে রাজপ্রাসাদে বসিয়া মদ্যপান করিতেছিলেন না। সুরেন্দ্রনাথের অঙ্কিত দারা ইতিহাসের দারা নহেন তিনি এই বাঙ্গালী নাট্যকারের

কল্পনা-প্রসূত একজন কাল্পনিক রাজা। নাট্যকার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কল্পনা-পরিপূর্ণ অ্যালেক্জাণ্ডার নামক যে নাটক রচনা করিয়াছেন তাহা ঐতিহাসিক নাটক নহে, তাহা শিশুরঞ্জন গল্পমালার ন্যায় দিদিমার কাহিনী। উচ্চশিক্ষাভিমানী বাঙ্গালী গ্রন্থকার মুদ্রিত বাংলা অথবা ইংরেজী গ্রন্থ না পড়িয়া অথবা পড়িয়া এইরূপ কল্পনা ঐতিহাসিক নাটকে চালাইয়া গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন, খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীতে তাহা দেখিলেও আশ্চর্য্য বোধ হয়। বাঙ্গালা গ্রন্থ এখন পৃথিবীর সর্ব্বত্র পঠিত হয়, হয়ত কোন দিন কোন বিদেশী পাঠক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত অ্যালেক্জাণ্ডার নাটক পাঠ করিয়া বলিবে যে বিংশ শতাব্দীর উচ্চশিক্ষাভিমানী বাঙ্গালী এইরূপে ইতিহাস চর্চ্চা করিয়া থাকে। তখন সমস্ত বাঙ্গালী জাতিকে লজ্জার অবগুণ্ঠনে মস্তক আবৃত করিতে হইবে।

বর্ত্তমান বৎসরের দ্বিতীয় ঐতিহাসিক নাটক, দি আর্ট থিয়েটার লিমিটেড্ পরিচালনে ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত, শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত "ইরাণের রাণী"। অপরেশ বাবু প্রবীণ নাট্যকার, তিনি খ্যাতনামা অভিনেতা এবং বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতার একটি প্রধান রঙ্গমঞ্চের অধ্যক্ষ। তিনি কেবল নাট্যকার নহেন, উপন্যাস-রচনায়ও সিদ্ধহস্ত। "ইরাণের রাণী" নাটকখানিতে তিনি যেভাবে সত্য গোপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত অশোভন হইয়াছে। "ইরাণের রাণী" নাটকখানিতে তিনি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অথবা নিশিকান্ত বসু রায়ের ন্যায় "ঐতিহাসিক নাটক" বলিয়া কোন কথা লিখিয়া দেন নাই, কিন্তু তাঁহার নাটকের প্রতিছত্রে যে ঐতিহাসিক শব্দটা মুদ্রিত না থাকিলেও ফুটিয়া বাহির হইতেছে একথা তিনি গোপন করিবেন কেমন করিয়া? নাটকখানি পারস্য দেশের ইস্পাহান্ নগরের, সুতরাং দেশ বদ্লাইবার তাঁহার কোন উপায় নাই। তিনি তাঁহার গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায় "ইংরাজী নাটক অবলম্বনে" লিখিয়া দিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি যখন দেশ কাল ও পাত্র এই তিনই বদ্লাইয়াছেন তখন এই নাটকের দোষ-গুণের জন্য তিনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী। দেশ পারস্য দেশের দক্ষিণ ভাগ, কালের কথা তিনি গোপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু সে চেষ্টা একেবারেই সফল হয় নাই। তাঁহার নাটকের কুশীলবগণের নামে ও কথায় তাঁহার নাটকের প্রকৃত কাল ধরা পড়িয়া গিয়াছে। "ইরাণের রাণী" নাটকের পুরুষগণের নাম দাউদ, দারা, ইসুফ্ ও নাদের। দারা নাদের পারসিক শব্দ। আরবগণ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে পারসারাজ যাজদাজির্দ তৃতীয়কে পরাজিত করিলে এবং সমস্ত পারস্যদেশ মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে তবে আরবী নাম পারস্যদেশে প্রবেশ করিয়াছিল। অপরেশ-বাবু বলিতেছেন যে রাজার নাম ছিল দাউদ, তাঁহার সময়ে ইস্পাহানে অগ্নিমন্দির ছিল, "প্রথম অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য। স্থান ইরাণের রাজধানী ইস্পাহান। সময় দ্বিপ্রহর।

[পশ্চাতের পটে অঙ্কিত ইস্পাহানের বৃহৎ অগ্নিমন্দির দেখা যাইতেছে: পারসিক গঠন, রঙীন পাথরের গাঁথনি; রাস্তার উপর হইতেই মন্দিরে প্রবেশ করিবার বৃহৎ সিঁড়ি; সিঁড়ির দুই পার্শ্বে পাথরের দুইটি প্রকাণ্ড সিংহ।]"

অপরেশ বাবুর এই উক্তিগুলি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। মুসলমান বিজয়ের পরে অগ্নি-উপাসক কোন রাজা পারস্য দেশে রাজত্ব করেন নাই এবং ইস্পাহান নগরে কোন অগ্নিমন্দির ছিল না। অপরেশ-বাবুর মতে খোরাসানের রাজার নাম জাফর শা। জাফর নামটিও আরবী। অপরেশ-বাবুর নাটকের নায়কের নাম দারা জোরেয়ার, জোরেয়ার শব্দটি আরবী, পারসী নহে। অপরেশ-বাবু আর-একস্থানে লিখিয়াছেন যে "পশ্চাতে বৃহৎ দরজা দিয়া কাল-পোষাক-পরিহিতা বেগমের প্রবেশ।" (পৃষ্ঠা ১৬।) বেগম শব্দটি আরবী বা পারসী নহে, ইহা তুর্কী শব্দ এবং এখনও পারস্য দেশে ব্যবহার হয় না। এই নাট্যকার আর-একস্থানে লিখিয়াছেন "গ্রীকদের সঙ্গে একটা খণ্ড যুদ্ধে এক বিশ্বাসঘাতক কর্ত্তৃক প্রতারিত হ'য়ে তিনি বন্দী হন।" (পৃঃ ৬।) অপরেশ-বাবু কোন্ ইতিহাসে দেখিয়াছেন যে পারস্যের মুসলমান রাজাদের সহিত গ্রীক রাজাদের বিবাদ হইয়াছিল? অগ্নি উপাসনার চিত্র, অগ্নি-উপাসক রাজা, অগ্নি-মন্দিরের পুরোহিত প্রভৃতির চিত্র দাউদ নামক ইস্পাহান রাজের রাজ্যে আনিয়া অপরেশ-

বাবু যে কল্পনার আমদানি করিয়াছেন তাহা বোধ হয় ইহার পূর্ব্বে পৃথিবীর কোন ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

বর্ত্তমান বৎসরের তৃতীয় ঐতিহাসিক নাটক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বসু রায় প্রণীত "ললিতাদিত্য"। এই নাটকখানি মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত এবং ইহার প্রথম পত্রে লেখা আছে "ঐতিহাসিক নাটক"। নাট্যকার বাঙ্গালা ও ইংরেজী ভাষায় লিখিত মুদ্রিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ পাঠ করিয়াও ইচ্ছা করিয়া কতকগুলি অযথা ইতিহাসবিরুদ্ধ কথা তাঁহার নাটকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যে সময়ে কাশ্মীর-রাজ ললিতাদিত্য জীবিত ছিলেন সে সময়ে গৌড়দেশে কেহ স্বাধীন রাজা ছিলেন না। অথচ বসুরায় মহাশয় বলেন যে গৌড়ের রাজার নাম ভূপাল সেন। সে সময়ে যিনি গৌড় দেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন তিনি কান্যকুব্জের রাজা যশোবর্ম্মার করদ বা শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি ললিতাদিত্যের ভয়ে তাঁহাকে অনেক হস্তী দিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে কাশ্মীর যাইতে হইয়াছিল। কাশ্মীরে ললিতাদিত্য পরিহাসপুর-নগরে পরিহাস-কেশব নামক বিষ্ণুমূর্ত্তিকে জামিন রাখিয়া গৌড়পতিকে অভয় দিয়াছিলেন। অথচ তাহার পরেই ললিতাদিত্য পরিহাসপুরের নিকটে ত্রিগ্রামী নামক স্থানে এই গৌড়পতিকে হত্যা করিয়াছিলেন। গৌড়পতির প্রভুভক্ত অনুচরেরা প্রতিশোধ-গ্রহণ-মানসে তীর্থযাত্রার ছলে কাশ্মীরে প্রবেশ করিয়া পরিহাসপুরে গিয়াছিল। তাহারা পরিহাস-কেশব মূর্ত্তি চিনিতে না পারিয়া সেই মন্দিরে রামস্বামীর মূর্ত্তি ধ্বংস করিয়াছিল। তাহারা যখন মন্দির-মধ্যে ছিল তখন কাশ্মীরের রাজধানী প্রবরপুর বা শ্রীনগর হইতে ললিতাদিত্যের সৈন্য আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু প্রভুভক্ত গৌড়বীরগণ কাশ্মীরের সৈন্যগণের আক্রমণে বাধা না দিয়া একমনে রামস্বামীর মূর্ত্তি ধ্বংস করিতে করিতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিল। এইজন্য কাশ্মীরের কবি কহ্লন মিশ্র মুক্তকণ্ঠে গৌড়বীরগণের প্রভুভক্তির গুণ গান করিয়া গিয়াছেন।

নাট্যকার শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বসুরায় দেখাইয়াছেন যে ললিতাদিত্যের আদেশে গৌড়দেশে অথবা গৌড়ের সীমান্তে গৌড়রাজ ভূপালসেনকে হত্যা করা হইয়াছিল। (ললিতাদিত্য নাটক পৃঃ ৮৫-৮৬)। তাহার পরে ভূপালসেনের ভ্রাতুষ্পুত্র কাশ্মীরে গিয়া ললিতাদিত্যের জয়স্তম্ভ চূর্ণ করিয়া আসিয়াছিলেন এবং পরে ললিতাদিত্য অনুতপ্ত হৃদয়ে গৌড়ে আসিয়া তাঁহার পালিতা কন্যা চম্পার সহিত নিহত গৌড়রাজের ভ্রাতুষ্পুত্র জয়ন্তের বিবাহ দিয়াছিলেন। গৌড়বাসী কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের জয়স্তম্ভ ধ্বংসের কথা ইতিহাসে লেখে না এবং ইতিহাসে লিখিত গৌড়বীরগণের প্রভুভক্তি ও বীরত্বের কথা বসুরায় মহাশয়ের নাটকে স্থান পায় নাই।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বাঙ্গালা ভাষার ঐতিহাসিক নাটকে যে কল্পনার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন তাহার ফলে বর্ত্তমান বর্ষে ঐতিহাসিক নাটক তিনখানি উন্মাদের প্রলাপে পরিণত হইয়াছে। ইতিহাসের ছাত্ররূপে আমি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বসুরায় মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা যেন মাতৃভাষা ও জাতীয় সাহিত্যের মুখের দিকে চাহিয়া ভবিষ্যতে ঐতিহাসিক নাটক রচনার সময় মুদ্রিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ পাঠ করিয়া নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন।

শ্রী রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

"ওবক্"-বন্দর*

(যাত্রাপথে)

(পিয়ের লোটি)

সূর্য্যোদয় হইয়াছে। আমরা এখন এডেনের উপসাগরে-- এই প্রদেশটা চিরকালই গরম ও মরীচিকার অধিষ্ঠানভূমি।

আমাদের সম্মুখে (যাহারা অপরিবর্ত্তনীয় নীল-আকাশ-সমন্বিত ভারত-বর্ষ হইতে ফিরিয়া আসিতেছে) দিক্‌চক্রবাল এক্ষণে একটা গুরু আবরণ-বস্ত্রে, একটা ধূসর-বেগুনে ও কালিম রঙে আবৃত।

যারা দূর হইতে ভূমি চিনিতে অভ্যস্ত সেই নাবিকের চক্ষে উহার নীচে নিশ্চয়ই মাটি আছে বলিয়া প্রতীতি হয়। না দেখিয়াও অনুমান করা যায়--এইসকল মেঘ-রাশি, না যেন কি-একটা অস্বচ্ছ ও নিশ্চল পদার্থ। বেশ মনে হইতেছে, উহারা কতকগুলা দ্বীপ।

কেহ পূর্ব্ব হইতে বলিয়া না দিলেও সন্দেহ হয়:--এইরূপ বাষ্প-রাশির দ্বারা যে পদার্থ এই আকাশকে মলিন করিয়াছে, তাহা অবশ্যই প্রকাণ্ড হইবে, শক্তিশালী হইবে, অপরিমেয় হইবে; ঐ দূর অঞ্চলে কতক-গুলা বড় বড় গঠন, একটা মহাদেশের অনন্ত রেখাবলী যেন দেখিতেছি বলিয়া অনুভব করা যায়।

বস্তুতই একটা মহাদেশ-- এবং সর্ব্বাপেক্ষা গভীর, সর্ব্বাপেক্ষা অপরিবর্ত্তনীয় মহাদেশ:--আফ্রিকা।

ক্রমেই আমরা উহার নিকটে অগ্রসর হইতেছি। তখন, প্রথম দৃষ্টিতে একটা সিধা একাকার, এক-ঘেয়ে-রকমের শৈলপিণ্ডের চিত্র নেত্র সমক্ষে ফুটিয়া উঠিল। উহা শক্ত বালুরাশির ভিতর অবস্থিত এবং "খদ্"-কাটা সরু সরু পথে সমাকীর্ণ। প্রভাতের সূর্য্যকিরণে, সুগভীর ছায়ার পশ্চাতে উহা খুব উজ্জ্বল গোলাপী আভা-বিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়। আভ্যন্তরিক প্রদেশের পশ্চাদ্‌ভাগ অন্ধকারে পর্দ্দাটা এখনও খুব বেশী পরিস্ফুট আকারে বিদ্যমান। কতকগুলা মেঘ, কতকগুলা পাহাড়, গভীর অন্ধকারের মধ্যে, জড়পুট্‌লি হইয়া, একাকারভাবে অবস্থিত।-- যেন একপ্রকার আদ্যা সৃষ্টির বিশৃঙ্খল বিক্ষুব্ধ জড়পিণ্ডরাশি, যেখানে পৃথিবীর সমস্ত ঝড়-ঝটিকা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। এই ঝিক্‌মিকে শৈলপিণ্ড যাহা ভুঁই-মাটির প্রথম স্তর--এই শৈলপিণ্ডকে নেত্রের দ্বারা অনুসরণ করিতেছে--ইহা দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া যাইতেছে, সেই একই-রকম বিষাদাচ্ছন্ন অব্যবহার্য্য, মৃত; যখন এইরূপ দৃষ্টি এড়াইয়া ক্রমাগত দূরে সরিয়া যায় তখন, যাহার স্থানের অপ্রতুলতা নাই সেই মরুময় মহাদেশের প্রশস্ততা সম্বন্ধে একটা জ্ঞান লাভ হয়; উষ্ণ ও উজাড় সুবিস্তীর্ণ আফ্রিকার একটা আভাস পাওয়া যায়।

ইতস্ততঃ কতকগুলা ঝোপ-ঝাড়--একটু বেশী কাছে আসিলেই ঠাওর করা যায়। ঝোপ গাছগুলা দেখিতে ছোট ছোট গোলাকার ফুলের তোড়ার মত, ছোট ছোট আতপত্র-ছাতার মত। উহার সবুজ রং ম্লান হইয়া গিয়াছে, অতিরিক্ত সূর্য্যের তাপে শুকাইয়া গিয়া নীল হইয়া গিয়াছে; উহাদের পত্র-পল্লব এরূপ লঘু ও শীর্ণ যে মনে হয় যেন উহারা স্বচ্ছ।

দেশে আমরা আসিয়া পৌঁছিয়াছি উহা দাঁকালিদের দেশ। দাঁকালিরা তাদ্‌জুরার সুল্‌তানের অধীন। এই উপকূলের ধার দিয়া একটু নীচে অবরোহণ করিলেই ফরাসীদের আড্ডা "ওবকে" আনা যায়।

একটা ভাস্বর বাষ্পের মধ্যে এই ওবক্ শীঘ্রই দেখা দিল। মরীচিকা-সুলভ একটা কম্পনে এই বাষ্পরাশি অবিরত চঞ্চল। প্রথমে একটা বড় নূতন ইমারৎ, এডেনের গৃহাদির মত বারাণ্ডা--ধব্‌ধবে সাদা বালু-রাশির উপর অবস্থিত, দূর হইতে দেখা যায়। ইহা কোম্পানী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত; এই কোম্পানী যাত্রাপথের জাহাজদিগকে কয়লা সরবরাহ করিত। এখানে ঐ একটি মাত্র গৃহ, এই লক্ষ্মীছাড়া দেশের ভিতরে, এই গৃহের একটা সুখস্বচ্ছন্দতার ভাব, একটা নিরাপদ্ নির্ব্বিঘ্নতার ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

তাহার পর, শুষ্ক মৃত্তিকার একটা দেয়ালের ঘের; সেই ঘেরের ভিতর একটা অট্টচূড়ার শৃঙ্গদেশের ভগ্নাবশেষ। দেখিলে মনে হয় যেন খুব প্রাচীন কোনো একটা মসজিদের ধ্বংসাবশেষ; কিন্তু আসলে গণনায় উহার অস্তিত্বকাল তিন বৎসরের মাত্র। উহা ফরাসী রেসিডেণ্টের প্রথম আবাস-গৃহ; আরব কারাগৃহের ধরণে নির্ম্মিত হয়। বিগত বৎসর এক সুন্দর রাত্রিতে আবিসিনিয়ার পাহাড়-পর্ব্বত হইতে হঠাৎ একটা বন্যা নামিয়া উহাকে ভূমিসাৎ করিয়া দেয়।

একটা ক্ষুদ্র গ্রাম, তাহার পরেই একটা আফ্রিকাদেশীয় পল্লী; ওখানকার মাটিও বালির মতনই, উহার লাল্‌চে ধূসর রং, সূর্য্যের উত্তাপে একইরকম হাজা পোড়া। উহার কুটীরগুলা দর্‌মার, খুব নীচু, দেখিতে পশু-আবাসের মত; দূর হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, অদ্ভুত পুতুলের মত ৪।৫ জন নড়াচড়া করিতেছে, উহাদের লাল হল্‌দে কিম্বা সাদা রংএর খুব উজ্জ্বল পোষাক সেই পোষাকের মধ্য হইতে লম্বা লম্বা কালো হাত বাহির হইয়াছে--আবার, আর কতকগুলা লোক একেবারে উলঙ্গ, তাহাদের ছায়া-ছবি বানরের মত।

পরিশেষে ঐ অদূরে, একপ্রকার অন্তরীপের উপর কতকগুলা ছোট ছোট নূতন বাড়ী;--লাল টালির ছাদ; সবশুদ্ধ ১০।১২টা বেশ সু-সমভাবে শ্রেণীবদ্ধ; চেহারাটা একটা কারখানার মত, কিংবা মজুর-সহরের মত। ইহাই সরকারী ওবক্--শাসনকর্ত্তার ওবক্ সেনানিবাসের ওবক্। চারিদিক্‌কার বিরাট মরুর উপর, ইহা যেন একটা ছোট্ট বেখাপ্পা জিনিস বলিয়া মনে হয়।

যে জায়গাটাকে "ওবক্-বন্দর" বলে, সেইখানকার প্রশান্ত জলের উপর আমরা নোঙ্গর করিলাম। বস্তুতই ইহা একটা বন্দর; বারদরিয়ার উত্তাল তরঙ্গ ওখানে আসিতে পারে না; উহা বেশ একটু সুরক্ষিত আশ্রয়স্থান। কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে তাহা মনে হয় না; কেননা, যে প্রবালের ঘেরের দ্বারা উহা সংরক্ষিত, সেই ঘেরটা একেবারেই জলের সমতল; সমুদ্রের সমস্ত নিশ্চল নীলবর্ণের উপর ঈষৎ সবুজ রঙের, একটা গোল রেখা অতিকষ্টে দৃষ্টিগোচর হয়।

আমরা খুব একটা গরম জায়গায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এই প্রভাতকালে সবে আটটা বাজিয়াছে, ইহারই মধ্যে, যেন একটা বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডের খুব কাছে আছি বলিয়া মনে হইতেছে, আমাদের গাল রগ যেন পুড়িয়া যাইতেছে এইরূপ অনুভব করিতেছি। এবং সমুদ্রের উপরে, নিকটবর্ত্তী আলোকময় বালুরাশির উপরে, জানিনা কি উন্মদ-

---

* পূর্ব্ব আফ্রিকার অন্তর্গত এডেন উপসাগরের উপকূলস্থ বন্দর (ফরাসী সোমালিল্যাণ্ড) এক সময়ে ফরাসীদের অধিকারভুক্ত ছিল।

ভাবেই প্রতিফলিত হইতেছে। কিন্তু কোচীন-চীনে ও আনামে যে "বয়লারের" আর্দ্র উত্তাপ আমরা পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছি তাহার তুলনায় এখানকার এই উষ্ণতা শুষ্ক ও অনেকটা স্বাস্থ্যকর; এখানে যে বায়ু বহিতেছে, যেখান হইতেই আসুক না উহা আফ্রিকা ও আরবের জল-হীন বড় বড় মরুভূমির উপর দিয়া আসিতেছে সন্দেহ নাই। বেশ অনুভব করা যায় এই বাতাসটা বিশুদ্ধ, এমন-কি জীবনপ্রদ বলিলেও বলা যাইতে পারে।

কবোষ্ণ জলের উপর, ডিঙ্গি যোগে যাত্রা করিয়া, অল্প সময়ের মধ্যেই ডাঙ্গায় পদার্পণ করিলাম; লাল মাটি যেন আগুনে পুড়িতেছে। তাহার পর, একটা বালির সরু পথ দিয়া একটা কেল্লা ময়দানের মত জায়গায় আসিয়া পড়িলাম; এই ময়দান সমুদ্রের উপর আধিপত্য করিতেছে। ময়দানের চারিদিকে লাল টালি-বিশিষ্ট ছোট ছোট বাড়ী। এই স্থানটা য়ুরোপীয় ওবকের অন্তর্ভুক্ত।

মধ্যস্থলে শাসনকর্ত্তার আবাস-গৃহ; পলাস্তারা-করা একটা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হয়। সিঁড়িটা শুষ্ক কর্দ্দম ও ঈষৎধূসরবর্ণের পলাস্তারা দ্বারা নির্ম্মিত; কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রি সর্দ্দারদিগের অভ্যর্থনারই উপযুক্ত। এই ধাপগুলার উপরেই আবাস-গৃহ; ফাঁক-বিশিষ্ট গরাদে ছাড়া উহার আর কোন দেয়াল নাই; গৃহটি মুর্গির খাঁচার মত খাড়া হইয়া আছে; উহার ভিতর দিয়া সমস্ত বাতাস প্রবেশ করিতে পারে। উহার সম্মুখে চারিটা ক্ষুদ্র কামান—এই তোপসজ্জা একটা হাস্যকর ব্যাপার আর একটা মাস্তুলের ডগায় একটা ফরাসী পতাকা উড়িতেছে। অন্য গৃহগুলা একই-রকমে নির্ম্মিত, এই শাসনকর্ত্তার জাঁকালো আবাস-গৃহের প্রত্যেক দিকে সৌসামাসহকারে শ্রেণীবদ্ধ। এইসব গৃহে ৬০ কি ৮০ তোপখানার লোক এবং নৌবিভাগের পদাতিকেরা বাস করে। ইহারাই ওবকের দুর্গরক্ষী সৈন্য।

এই গোরা অঞ্চলের রক্ষণার্থ একটা সামান্য বেড়া; আতপত্র-ছাতার আকার কতকগুলা ঝোপ-গাছ সারিসারি ও পাশাপাশি জমির উপর শ্রেণী-বদ্ধ করিয়া এই বেড়া প্রস্তুত হইয়াছে। যেন বড়বড় কণ্টকময় ফুলের তোড়া।

এই ঘরের ভিতর কতকগুলি সতর্ক ও ব্যস্ত সৈনিক ঘোরা ফেরা করিতেছে। এক্ষণে উহারা প্রাতর্ভোজনের আয়োজনে ব্যাপৃত। কোচিন-চায়না ও টন্‌কিনে যেরূপ দেখিতাম, এখানে সৈনিকদিগের মুখ সেরূপ টানা-টানা ও ফ্যাকাশে দেখিলাম না। উহাদের ভাল চেহারা; সাদা শিরস্ত্রাণ মাথায়, খাকি একটা জামা গায়ে;—সৌর উত্তাপের প্রভাবে, উহাদের মুখে একটা স্বাস্থ্যের ভাব লক্ষিত হয়। বেদুইন্ আরবদিগের মত উহাদের নগ্ন বাহু শ্যামল হইয়া পড়িয়াছে।

উহারা রান্না করিতেছে; প্রকৃত শাক প্রকৃত সব্জি তুলিয়া আনিয়াছে; এই নিছক মরুর মাঝে এইসব শাকসব্জি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। মনে হয় উহারা একটা বাগান তৈয়ারী করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছে; এবং উহাতে প্রচুর জলসেক করায় এইসমস্ত শাক-সব্জি গজাইয়া উঠিয়াছে। উহাদের মধ্যে নিগ্রো শিশুরা খেলা করিতেছে। এই ক্ষুদ্র জীবগুলা আরব ও ভারতবাসীর যৌন-মিলন হইতে উৎপন্ন। উহাদের টানা টানা চোখ, ওষ্ঠযুগল বেশ পাৎলা পার্শ্বমুখ বেশ সুন্দর। এই ওবকের বেশ একটা জীবন্ত ভাব আছে।

একটা বালুময় গভীর গিরি-পথ কাফ্রি-গ্রাম হইতে এই সৈনিক-অঞ্চলটাকে পৃথক্ করিয়াছে; মনে হয়, একবৎসরের মধ্যে এই গ্রামটা খুব বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু যাই হোক্—এই লোকগুলা কোথা হইতে আসে? অনতিদূরেই যখন মরুভূমি চারিদিকে বিস্তৃত, তখন কোন্ রাস্তা দিয়া, কোন্ বিজন পথ দিয়া উহারা এখানে আসিয়া সম্মিলিত হয়?

ইহা নিশ্চিত, ওবকে বাণিজ্যব্যাপারের একটি অতীব ক্ষুদ্র কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে ইহা একটি ছোট রাস্তা মাত্র আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইয়া লম্বা চলিয়া গিয়াছে সৌরকর-কবলিত এই রাস্তাটি সারি-সারি ২০।৩০টা গৃহের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়াছে। এমন কি, প্রবেশ পথে, প্রকৃত দেয়ালবিশিষ্ট একটা ক্ষুদ্র গৃহ অবস্থিত, মুরদিগের ধরণে গঠিত; এদেশে "আবস্যাত্" মদের ইহা একমাত্র দোকান। একটি য়ুরোপীয় উপনিবেশ, ইহারই মধ্যে আমাদের সৈনিক-দের ব্যবহারের জন্য এই দোকান খুলিয়াছে। বাদবাকী সমস্তই দেশীয়-দিগের কুটীর—এত নীচু যে উহার চাল হাত দিয়া স্পর্শ করা যায়; কতকগুলা গাঁঠ-ওয়ালা কাষ্ঠের দ্বারা পরিবৃত, কাষ্ঠখণ্ডগুলা দেখিতে পুরাতন অস্থির মত, দোমড়ানো বৃদ্ধের জঙ্ঘার মত (যে ঝোপঝাড়ে শাসনকর্ত্তার গৃহের বেড়া নির্ম্মিত—সেই একই ঝোপঝাড়); এবং একটার সঙ্গে আর-একটা সেলাই-করা কতকগুলা দর্মা দিয়া আচ্ছাদিত। যেন কতকগুলা জোড়া-তাড়া-দেওয়া ছিন্নবস্ত্র। মাটি পদদলিত, দুর্গন্ধ-করা; পরিত্যক্ত ময়লা জিনিসের সহিত মিশ্রিত; এইসব জঞ্জাল পচিতেছে শুকাইয়া যাইতেছে। অগণ্য মাছির পাল বাতাসে উড়িতেছে।

আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য দুইটি কৃষ্ণবর্ণ তরুণী আসিয়া উপস্থিত হইল। পাতলা পাতলা ঠোঁট মুখে কপট দুষ্টামির হাসি, একজন পথচলতি কাফ্রি-বালক, পরিচয় করিয়া দিবার ভাবে বলিল, "এরা দাকালি মাদাম"। এই রমণীরা টাট্‌কা-ছাড়ানো বাঘের চামড়া আমাদের নিকট বিক্রয় করিতে আসিয়াছে; উহাদের মধ্যে এক-জনের কাঁধের উপর একটা চাম্‌ড়া ঝুলিতেছে। এই "মাদাম-দাকালিদের" অদ্ভুতরকমের মাথা; উহারা উহাদের জলজ্বলে চোখ ঘুরাইতে ঘুরাইতে, আমাদের নিকট কত বর্ব্বরধরণের মুখভঙ্গি করিতে লাগিল; সূর্য্যের আলোয় মনে হইতে লাগিল তেলে-মাজা আবলুস কাঠের মতো যেন উহাদের গাত্রচর্ম্ম চিক্‌চিক্ করিতেছে।

বরাবর এই রাস্তার ধারে ছোট ছোট কাফি-ঘর, ছোট ছোট দোকান। এইসব দর্মা-ঘরে কিছু-না-কিছু পান করিবার থাকে, কিছু-না-কিছু কেনা বেচা হয়। এইসমস্তের মধ্যে একটা উপস্থিত-মতো-করিয়া তুলিবার ভাব, পান্থশালার ভাব রহিয়াছে—যেন ভাবী কাফ্রি-বাজারের এইখানে সূত্রপাত হইয়াছে।

আরব-ধরণের কাফি-ঘর; এইখানে, বড় বড় তামার গড়্‌গড়ায় ধূমপান করিতে করিতে, ছোট ছোট পেয়ালায় পানীয় দ্রব্য পান করা হয়; এইসব পেয়ালা এডেন হইতে আনীত। এইখানে গোলাপী রঙের তর্মুজ ও আক্ বেদার পার হইতেছে।

দোকানগুলা যার-পর-নাই ক্ষুদ্র; খোপ-ওয়ালা একটা টেবিলের উপর জিনিসপত্র সাজানো রহিয়াছে;—একটা খোপে কিছু চাল, আর-একটা খোপে একটু লবণ; কিছু দারচিনি, কিছু জাফ্রান, কিছু আদা, তার পর উদ্ভট রকমের ছোট ছোট পেয়ালা। ঐ একই দোকানদার কাপড়ের পাগ্‌ড়িও বিক্রী করে, কাফ্রি-ব্যবহৃত ধুতিও বিক্রয় করে।

ক্রেতা ও বিক্রেতা (সবশুদ্ধ হদ্দ ২০০ জন) সকল জাতিরই অন্তর্গত লোক। খুব কৃষ্ণবর্ণ কাফি, চিক্‌চিকে কোক্‌ড়া চুল, নগ্ন গাত্র, বেশ উন্নত দেহভঙ্গী। আরব রং-করা বড় বড় চোখ, সাদা কিংবা উজ্জ্বল সবুজ কিংবা সোনালি জর্দা রঙের পরিচ্ছদ। কপিশবর্ণ মুখের রং, লম্বা ও পাত্‌লা গড়ন; রাজহংসের মত গ্রীবা, ছাগলের মত পার্শ্বমুখ, লাল-রং-করা লম্বা চুল, কাঁধের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। রজত ধাতুর উপর যেন মেরিনো-মেষের গাত্র হইতে ছাঁটা পশম। দাকালিরা শামুকের হার গলায় পরিয়াছে। আর দুই তিন জন মালাবার যেন পথ ভুলিয়া এখানে আসিয়া পড়িয়াছে এই জটলার মধ্যে পার্শ্ববর্ত্তী ভারতের একটা স্মৃতি জাগাইয়া তুলিয়াছে।
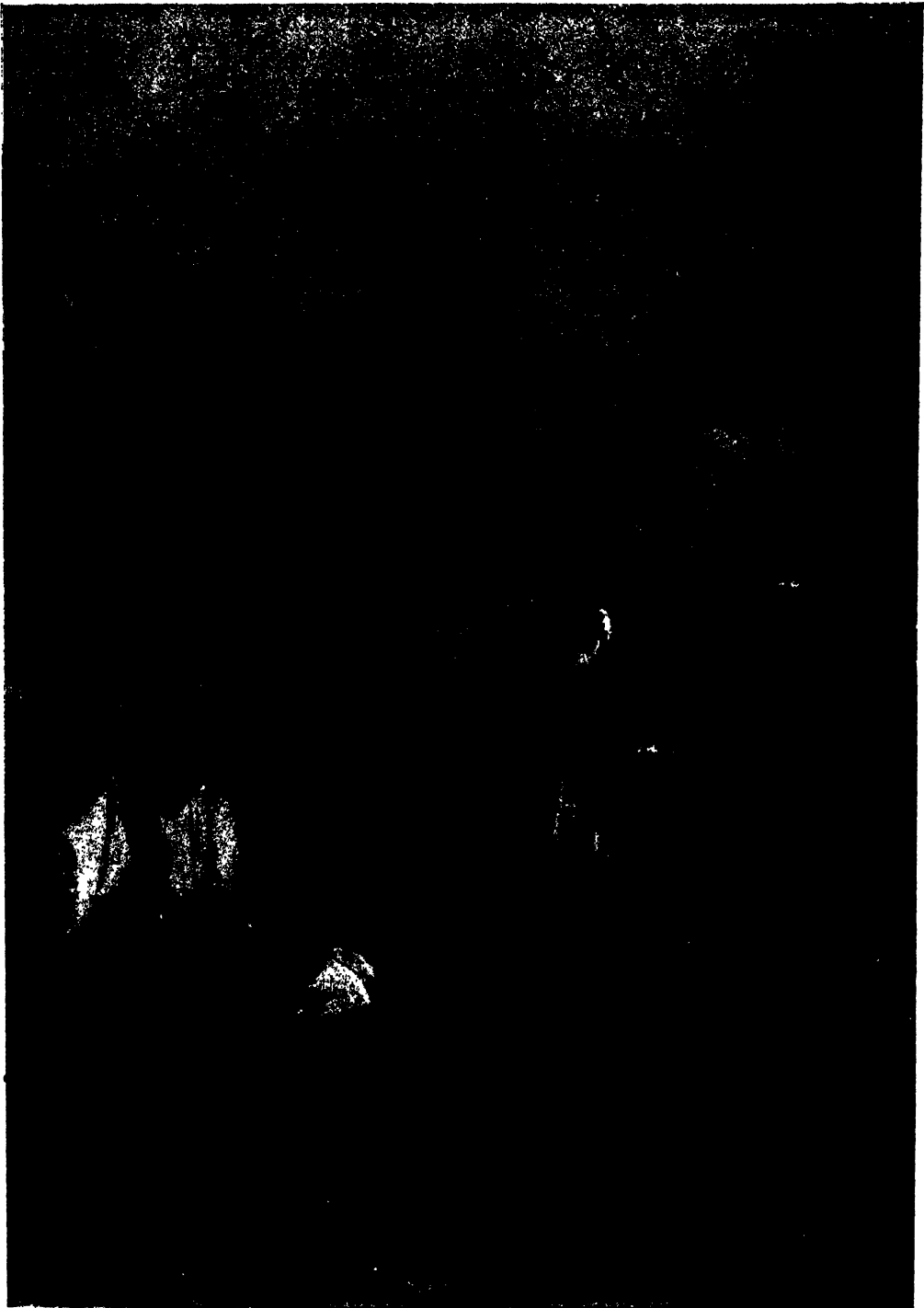
চৈতন্যদেব ও ঈশ্বরপুরীর সাক্ষাৎ

চিত্রকর—শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীযুক্ত নবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৌজন্যে

কাফ্রি-ঘরগুলা ছোট ছোট খড়ের খোপের মত; উহার পশ্চাদ্ভাগে লোকগুলা বিশৃঙ্খলভাবে একসঙ্গে বসিয়া জুয়া খেলিতেছে কিংবা সুরা পান করিতেছে। কেহ কেহ বা পাশা খেলিতেছে।

আবার কেহ কেহ মরুভূমির একটা অপেক্ষাকৃত সাদাসিধে খেলা বাছিয়া লইয়াছে। এই খেলা হইতেছে বালির উপর নানা-প্রকার সম্মিলিত রেখা কাটা। দুইজন কাফ্রি একেবারে উলঙ্গ রক্ষা-কবচের অলঙ্কারে বিভূষিত, খুব উৎসাহের সহিত তাস খেলিতেছে, মধ্যে মধ্যে তাসের পিট্‌গুলা টেবিলের উপর সজোরে আছ্‌ড়াইয়া ফেলিতেছে। উহাদের বুনো হাতে সত্যিকার তাস দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

উহাদের পাশে, আর তিন জন ডমিনো (দশ-পঁচিশ?) খেলিতে বসিয়া গিয়াছে। ইহারা কপিশবর্ণ ও পাত্‌লা-গঠনের একজাতীয় লোক। উহারা চুলে সাদা রং দেয়। এখন উহাদের চুল, একটা ভিন্ন রংএর প্রস্তুত মশলার দ্বারা আচ্ছাদিত, কাল উহা উঠাইয়া ফেলিয়া আবার শ্রী হইবে; এ মশ্‌লাটা একটা ঘন জমাট শক্ত ছালের আকারে মাথার উপর রহিয়াছে। দেখিলে মনে হয় “মমির” গায়ে যে শক্ত চুণের প্রলেপ থাকে সেইরূপ চুণের প্রলেপ।

এই খেলুড়েদের মাথার উপর যে দর্মার চাল আছে, তাহাতে কষ্টেসৃষ্টে একটু ছায়া হয়। সূর্য্যের কিরণ, ভীষণ সূর্য্যের কিরণ, ঝাঁঝ্‌রার শত ছিদ্রের মত, উহার ভিতর দিয়া প্রবেশ করে। এবং উহার চারিদিকে যেসব অগ্নিতপ্ত কুটীর দৃষ্টির বহির্ভূত তাহারাও এই অনাম আফ্রিকার মধ্যে জ্বলিতেছে, পুড়িতেছে......

শীঘ্রই এই গ্রামের শেষপ্রান্তে আসিয়া পড়া গেল। শেষের দিকের চারিটা গৃহ অন্যগুলা হইতে একটু বিচ্ছিন্ন হইয়া একটা বালুকাস্তূপের উপর অবস্থিত; উহা বিলাসিনীদের মহল; উহারা দেখিতে মন্দ নহে; এইসব হারসি, সোমালি, কিংবা দাঁকালি-জাতীয় রমণী, উহাদের দ্বারে কুটীরে অপেক্ষা করিতেছে। উহাদের লাল দীর্ঘ পরিচ্ছদ উহাদের পদ-গুল্‌ফে ও মণিবন্ধে ভারী ভারী রূপার বলয়; যেন শিকারের সন্ধানে বসিয়া আছে; মুখের ভাবটা আধো রহস্যময়, আধো হিংস্র-ভীষণ। এই কৃষ্ণবর্ণ নির্লজ্জতার মধ্যে খুব একটা গাম্ভীর্য্য আছে। উহারা ধর্ম্মের অনুষ্ঠানের মতো উহাদের ব্যবসা চালাইতেছে এবং একটা সাদা চক্‌চকে মুদ্রার জন্য, কি ফরাসী সৈনিক, কি বেদুইন্, কি রক্ষা-কবচ ধারী কাফ্রি যে-কেহ রাস্তা দিয়া চলিয়াছে, তাহাকেই উহারা মাদিণার মিষ্টি হাসি হাসিয়া আহ্বান করিতেছে।

এই অঞ্চলটা শেষ হইয়া গেলেই, সুগভীর ঝিক্‌মিকে মরীচিকা সঙ্কুল সূর্য্যদীপ্ত করাল মৃত্যুরূপী মরুভূমি আরম্ভ হয়।

এখানেও ভূমির একটা নকলের মতো, ঈষৎ সবুজ রংএর একটা জিনিস রহিয়াছে: বাগান, সেই প্রখ্যাত বাগান যাহা সৈনিকেরা, জল সেকের দ্বারা সযত্নে তৈয়ারী করিয়াছে ও বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। উহা ছাড়া আর কিছুই নাই। আমাদের সম্মুখে এই শূন্যপ্রদেশটা প্রসারিত মানচিত্রে যাহা “মৃগ-মালভূমি” নামে নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

দিক্‌চক্রবালের শেষ প্রান্তে, ভূমির পার্শ্বদেশে, সেই চিরন্তন একই শৈলজাল ও গিরিমালা এই উজাড় বিস্তারটাকে সীমাবদ্ধ করিয়াছে। একটা আকাশের অন্ধকারের সহিত মিশিয়া, দূরত্বের সঙ্গে সঙ্গে আরও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়া এই উচ্চ পর্ব্বতগুলা একটা স্তূপাকার ছায়া-মূর্ত্তির মত সর্ব্বত্রই অঙ্কিত হইয়াছে। এইসব অভ্যন্তর অঞ্চলে “সাদা” লোকদিগের গতিবিধি নাই। এই অভ্যন্তর প্রদেশ যাহা আজ একরূপ রহস্যাচ্ছন্ন, উহা হইতে আবার বালুরাশির স্বর্ণরঞ্জিত দীপ্তিচ্ছটা বাহির হইবে, জ্বলন্ত আলোক নিঃসৃত হইয়া আবার চোখ ঝল্‌সাইয়া দিবে।

এই “মৃগ-মালভূমির” উপর দিয়া যতই আমরা অগ্রসর হইতেছি এই তাল ঢালি ও তিনটি গৃহসমেত এই ক্ষুদ্র “ওবক” দূরত্বের মধ্যে নামিয়া পড়িতেছে, মুছিয়া যাইতেছে, অন্তর্হিত হইতেছে; ভাস্বর ও বিষাদময় সমতলভূমি আমাদের চতুর্দ্দিকে নিয়তই বাড়িয়া চলিয়াছে।

সমুদ্রও দৃষ্টি বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছে। তবুও মাটির উপর প্রবালের শাখা প্রশাখা ও শামুক দেখিতে পাওয়া যায়। ইতস্তত কতকগুলা লোহিতাকৃত তৃণ গুচ্ছ; কতকগুলা অদ্ভুত চারা-গাছ; উহার সবুজ রং এরূপ ম্লান হইয়া গিয়াছে যে মনে হয় সূর্য্য বুঝি উহার রং উদরস্থ করিয়াছে। তার পর, একটু দূরে দূরে, যেন ইংরেজী বাগান তৈরী করিবার জন্যই এইসব চক্রাকৃতি শীর্ণ ঝোপঝাড়। উহাদের সরু ও উজ্জ্বল পত্রপল্লব স্বকীয় শীর্ণ বৃন্তের উপরে দক্ষিণে ও বামে হেলিয়া রহিয়াছে। উহা একটা বিশেষ “লজ্জাবতী”;— আফ্রিকা দেশের এই চিরন্তন লজ্জাবতী যাহা অভ্যন্তর প্রদেশের সমস্ত অনুর্ব্বর ভূমিতে জন্মায় সেনেগালের বালুরাশির মধ্যে, বড় মরুভূমির ওধার পর্য্যন্ত; এই লজ্জাবতী গাছ হইতে কিছুই উৎপন্ন হয় না, উহা কোন কাজে আসে না। এমন কি একটু ছায়া দানও করে না......

কাহারা এইরকম জমি পোষণ করে? এই কিছু পূর্ব্বে আমরা ওবক গ্রামের আদিম নিবাসী পাত্‌লা ও কপিলবর্ণ, বিড়াল-মুখো বুনো-রকমের দুষ্ট, যে “দাঁকালি” দিগের কথা বলিয়াছিলাম, নিশ্চয় তাহারাই। এইসব লোক এই দেশের সঙ্গে বেশ খাপ খাইয়াছে। উহারা এখানে ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া জীবন যাপন করে; বালির মধ্যে জঙ্গলের মধ্যে উহারা বিরলভাবে অবস্থিতি করে; এবং এখানকার চিরন্তন উত্তাপ, মনে হয় উহাদিগকে শুখাইয়া ফেলিয়াছে, উহাদের শরীরকে হরিণের মত পাৎলা করিয়া দিয়াছে।

আমাদের যাত্রাপথে কতকগুলি লোকের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল; উহারা অভ্যন্তর প্রদেশ হইতে আসিতেছে, পিঠে হাল্কা বোঁচ্‌কা-বুঁচ্‌কি; আগেকার মত “মাদাম দালালিদের” আর-এক দল, শুভ্র সুন্দর দন্তপংক্তির ভিতর হইতে সেই একইরকম কপট হাসি হাসিতে-হাসিতে আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আর-একটা বাঘ-চর্ম্ম উহারা আমাদের নিকট বিক্রয় করিবার নিমিত্ত সম্মুখে বিছাইয়া দিল।

এই সমতল ভূমির মধ্যে, দূর হইতে দূরান্তরে, উত্তপ্ত মাটির উপর লোকেরা আড্ডা গাড়িয়াছে। উহারা পশুর মতো মাথা নোয়াইয়া উহাদের কুটীরে প্রবেশ করে। ঐখানে উহারা বসিয়া থাকে - উহাদের সঙ্গে রহিয়াছে কতকগুলা গাধার বাচ্চা, কতকগুলা চাম্‌ড়ার বোতল, কতকগুলা রক্ষা-কবচ, এবং খুন-খারাপিধরণের কতকগুলা তলোয়ার ও ছোরা। নিশ্চল, অলস,- উহারা ব্যবসার উদ্দেশে, কিংবা শুধু দর্শনের জন্য ওবকের অভিমুখে আসিয়াছে। উহাদিগকে কেহই বড় একটা সাদর অভ্যর্থনা করে না, বরং উহাদিগকে দেখিয়া লোকে ভয় পায়। এখানকার বাসিন্দা এবং উহারা উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎকার ঘটিলে উভয়েরই মন বিস্ময় ও অবিশ্বাসে পূর্ণ হয়।

এখন বেলা ১১টা।. এইসব মরীচিকার মধ্যে এইসব বালুরাশি হইতে প্রতিক্ষিপ্ত কিরণের মধ্যে, সমস্তই ঝিক্‌মিক্ করিতেছে, সমস্তই কম্পিত হইতেছে। মাটি হইতে একটা নেত্রান্ধকারী প্রভা সমুত্থিত হইতেছে।

আমরা দূর হইতে দেখিতে পাইতেছি, কতকগুলা খুব-সাদা জিনিস, মাঠের উপর স্তূপাকারে অবস্থিত। কোনো অলৌকিক শক্তি যোগে ওখানে একটু বরফ পড়িল নাকি? কিংবা কতকটা চূন, কিংবা কতকগুলা পাথর? কিন্তু না উহা যে নড়িতেছে। তবে বোধ হয় আরব-ধরণে মাথা-ঢাকা কতকগুলা লোক?—কিংবা কতকগুলা পশু? হরিণ? ঘোড়া? যাই ইচ্ছা তাহারই সহিত সাদৃশ্য আছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, এমন-কি সাদা হাতিরও সহিত; কেননা, কি দূরত্ব কি বৃহত্ব সে সম্বন্ধে একটা সম্পূর্ণ ধারণা আর হয় না। একটু দূরস্থ সব জিনিসই বিরূপ ও পরিবর্ত্তনশীল হইয়া পড়িয়াছে।

উহা কতকগুলা ভেড়া বই আর কিছুই নহে। ভেড়াগুলা একটু মজার-রকমের, গায়ের রং খুব সাদা, মাথা বেশ কালো, এবং ইজিপ্টের মেষের মতো পুচ্ছ হাতপাখার মতো চারিদিকে ছড়ানো। না-জানি কি-প্রকার তৃণ চর্ব্বণ করিবার জন্য এইসব দুর্লভ-জাতীয় মেষগুলাকে দিনের বেলা এখানে পাঠান হইয়া থাকে; এবং সূর্য্য অস্ত হইলে—হিংস্র জন্তুদের বাহির হইবার পূর্ব্বেই উহাদিগকে তাড়াতাড়ি আবার ওবক্-গ্রামের দিকে লইয়া যাওয়া হয়।

এই অসীম মরুভূমির মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে, এই শেষ জীবন্ত প্রাণী আমাদের নয়নগোচর হইল। একটু পরেই মধ্যাহ্ন আসিয়া পড়িল। এই সময়ে সাদা লোকেরা কখনই ঘরের বাহির হয় না। আমরা সব দেখিবার জন্যই এখানে আসিয়াছি—আমাদের অবিবেচনার ফল আমাদিগকে ভোগ করিতেই হইবে। সাদা কাপড়ের ভিতর দিয়া আমাদের কাঁধের উপর একটা অনল-দহন-জ্বালা অনুভব করিতে লাগিলাম। চলিবার সময়, মাটিতে আমাদের আর ছায়া পড়িতেছে না, পায়ের নীচে একটা ছোট্ট কালো চক্র মাত্র আমাদের পায়ের নীচে আসিয়া থামিতেছে! সূর্য্য উচ্চ গগনে, ঠিক্ আমাদের মাথার উপর;—সেখান হইতে সোজাভাবে অনল-কণা পৃথিবীর উপর বর্ষণ করিতেছে।

কোথাও কিছু নড়িতেছে না; উত্তাপে সমস্তই মরিয়া গিয়াছে; অন্যান্য দেশে, এই গ্রীষ্ম মধ্যাহ্নে যাহারা অবিরাম শব্দ করে সেই কীটদিগেরও সঙ্গীত আর শোনা যায় না। সমস্ত মরুভূমির মধ্যে কম্পন ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে—কেবলই কম্পন, কম্পন, কম্পন ইহার গতি অবিরাম, দ্রুত ও জ্বরভাবাপন্ন; কিন্তু কল্পনার সামগ্রীর মতো, স্বপ্নের মতো একেবারেই নিস্তব্ধ।

খুব সুদূর পর্য্যন্ত, কি-একটা অনির্দ্দেশ্য জিনিস প্রসারিত,—মনে হয় যেন এমন একটা চলমান জলপ্রবাহ কিংবা একটা ফিন্‌ফিনে "গজ"-কাপড় হাওয়ায় নড়িতেছে—যাহার অস্তিত্ব মাত্র নাই, যাহা মরীচিকা বই আর কিছুই নহে। দুরন্ত লজ্জাবতীর গাছগুলা অদ্ভুত আকার ধারণ করিয়াছে; এই প্রবঞ্চক জলরাশির মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া মাঝের দিকে উহারা দ্বিগুণিত হইয়া পড়িয়াছে—এই প্রবঞ্চক জলরাশি নিঃশব্দে সমস্ত বালুরাশিকে আক্রমণ করিয়াছে একটি নিশ্বাস না ফেলিয়াও নড়া-চড়া করিতেছে। এবং তৎসমস্ত হইতেই স্ফুলিঙ্গ নিঃসৃত হইয়া চোখ ঝল্‌সাইয়া দিতেছে, শরীরকে ক্লান্ত করিতেছে।

এই মরুভূমির বিষাদময় বিরাট্ দীপ্তিচ্ছটা কল্পনাকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলে।

দূর পশ্চাতে সেই একই অন্ধকেরে পাহাড়পর্ব্বত, পর্ব্বতের মাথার উপর গুরুভার জলদস্তূপ পর্ব্বতের এইদিকে, একপ্রকার অপরিস্ফুট তমসাচ্ছন্ন উজাড় ভূমিতে আসিয়া সমস্ত পর্য্যবসিত হইয়াছে; সুগভীর কৃষ্ণবর্ণের মধ্যে দৃষ্টি হারাইয়া যায়; ইহাই আফ্রিকার অভ্যন্তর-দেশ; ইহা সমস্ত অন্ধকার ও ঝড় ঝটিকার পশ্চাতে অবস্থিত।

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

আরবী ছন্দের বাঙ্গলা তর্জ্জমা

গত ১৩২৮ সালের চৈত্র সংখ্যা প্রবাসীতে বন্ধুবর কাজী নজ্‌রুল ইস্‌লাম সাহেব ১৮টি আরবী ছন্দের অনুবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু আরবী ছন্দের সমষ্টি ১৮ নহে —১৯। তা' ছাড়া তিনি এক-একটি ছন্দের নাম দিয়া তাহার মাত্র একটি করিয়া দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। ইহাতে স্বভাবতঃই মনে হয়, ছন্দগুলি একক-ভাবেই সম্পূর্ণ, অর্থাৎ উহাদের আর কোন শাখা-প্রশাখা নাই। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নহে। কয়েকটি ছন্দ ছাড়া আর সবগুলিরই বহু শাখা-প্রশাখা আছে, আর সেগুলি পরস্পর এত স্বতন্ত্র যে, প্রত্যেকটিকে এক-একটি মূল বলিলেও ভুল বলা হয় না। বস্তুতঃ অধিকাংশ স্থলেই আরবী ছন্দের নাম-করণ এক-একটি গ্রুপ্ বা বিভাগেরই নাম-করণ। এক্ষেত্রে কোন-একটি বিশিষ্ট ছন্দের পরিচয় দিতে হইলে তদন্তর্গত ছন্দ-সমষ্টির যে-কোন একটি ইচ্ছামত উল্লেখ করিলেই চলিবে না, সবগুলিরই উল্লেখ করিতে হইবে, কেননা ঠিক ততখানিই সত্য। বলা বাহুল্য, এই কারণেই একটি সম্বন্ধে উহার নাম যতখানি সত্য, অপরটি সম্বন্ধেও আমি আরবী ছন্দের সম্পূর্ণ অনুবাদ করিলাম। পাঠক দেখিবেন, কাজী নজ্‌রুল ইস্‌লাম সাহেবের অনূদিত ১৮টি ছন্দ ছাড়া যেগুলি অবশিষ্ট আছে, সেগুলি সংখ্যায় কত বেশী এবং কত বিচিত্র, নূতন ও মধুর।

এতদ্ব্যতীত কাজী সাহেব কয়েকস্থলে আরবী ছন্দ-সূত্রের উচ্চারণ ঠিকমত ধরিতে পারেন নাই, কাজেই সেই-সেই স্থলে তাহার অনুবাদও ভুল হইয়াছে। তা' ছাড়া এমন দুই-একটি ছন্দ-সূত্র লিখিয়াছেন—যাহা আমাদের কাছে সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া বোধ হইল। জানি না, সেগুলি তিনি কোথায় পাইয়াছেন। যথাস্থানে পাঠক ইহার উল্লেখ দেখিতে পাইবেন।*

* এস্থলে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, আরবী ও ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত ছন্দশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ এবং বাঙ্গলা সাহিত্যের মৌনী সেবক বারাকপুর নিবাসী বন্ধুবর মৌলবী সৈয়দ নেজামউদ্দিন আহ্‌মদ সাহেব বহু আয়াস স্বীকার করিয়া "ওরুজে সইফী" "চাহার গুলজার" ইত্যাদি ছন্দ-পুস্তক ঘাঁটিয়া আমাকে সমুদায় আরবী ছন্দের মূল-সূত্রগুলি লিখিয়া দিয়াছেন এবং এতৎসম্বন্ধীয় যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় আমাকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—পাঠক, ছন্দ-সূত্রের যেখানে "।" চিহ্ন দেখিতে পাইবেন, সেখানে দীর্ঘ উচ্চারণ করিবেন; এবং যেখানে "—" দেখিবেন, সেখানে উচ্চারণ একটু টানিয়া রাখিবেন। বাঙ্গলা অনুবাদও তদনুযায়ী পড়িবেন, নতুবা আর্‌বী ছন্দের মাধুর্য্য ও তাহার তড়িৎ-চপল লীলায়িত ধ্বনি-বৈচিত্র্য বাঙ্গলা ভাষায় ধরা পড়িবে না।

(১) তবীল

ফউলুন | মফাঈলুন | ফউলুন | মফাঈলুন
ফউলুন | মফাঈলুন | ফউলুন | মফাঈলুন

কানের দুল | চুড়ির শিঞ্জিন, | কি সুন্দর | মলের রিন্‌ঝিন্,
কি সুন্দর | তোমার কেশ-পাশ! | হৃদয় মোর | অধীর দিন্‌-দিন্! *

(২) মদীদ্

ফাএলাতুন | ফাএলুন | ফাএলাতুন | ফাএলুন †

নাইক' তুল মোর | প্রাণ-বঁধুর | চোখ জুড়ায় তার | অঙ্গ-নূর ;
স্বর্গ কোন্ ঠাঁই | কোন্ সুদূর ?… | এই ত মোর ভাই | স্বর্গ-পুর।

(৩) বসীত্

মস্‌তাফ্‌আলুন | ফাএলুন | মস্‌তাফ্‌আলুন | ফাএলুন

মন্থর পবন | বয় ধীরে, | সন্ধ্যার আঁধার | দুই তীরে,
তর্ তর্ তরীর | শির চলে | থম্‌থম্ নদীর | বুক চিরে।

(৪) ওয়াফের

মফাআলাতুন | মফাআলাতুন | মফাআলাতুন | মফাআলাতুন ‡

গভীর বেদনায় | হৃদয় ভেঙে যায়, | পরাণ কাঁদে হায় | আকুল পিয়াসায়,
সকল আশা মোর | বিফল হ'ল ভাই, | জীবন রাখি আর | এখন কী আশায়।

(৫) কামেল **

মতাফাআলুন | মতাফাআলুন | মতাফাআলুন | মতাফাআলুন

বসোরার গোলাপ | যেন দুই কপোল, | বিজুলীর মতন | আঁখি-যুগ চপল,
হাসিময় নধর | রাঙা দুই অধর | চুমি' মোর জীবন | হ'ল আজ সফল।

* বাঙ্গলা অনুবাদগুলি আমি ছন্দসূত্রের মতই মাত্রা (মিটার) দিয়া সাজাইয়া গেলাম। পরে ইচ্ছা করিলে যে-কোন ভাবে ইহাকে সাজান যাইবে। বুঝিবার সুবিধার জন্যই এইরূপ করিলাম।

† আর্‌বী ছন্দ-সূত্র সর্ব্বত্রই দ্বি-চরণ-বিশিষ্ট। কিন্তু বাহুল্যবোধে সংক্ষেপের খাতিরে আমরা এখন হইতে মাত্র এক চরণেরই উল্লেখ করিব। বলা বাহুলা, দ্বিতীয় চরণও অবিকল প্রথম চরণের অনুরূপ।

‡ কাজী সাহেব "মফাআল্‌তুন" লিখিয়াছেন। উহা ভুল, "মফাআলাতুন" হইবে। সুতরাং তাঁহার বাঙ্গলা অনুবাদও এস্থলে ভুল হইয়াছে। তুলনা করিবার সুবিধার জন্য এস্থলে তাঁহার বাঙ্গলা অনুবাদ উদ্ধৃত করিলাম :—"কানের তার দুল্, দোদুল্ দুল্ দুল্……" ইত্যাদি।

** এই পাঁচটি খাস আরবী ছন্দ।

(৬) যদীদ্

(ক) ফাএলাতুন | ফাএলাতুন | মস্তাফ্আলুন *

মুক্ত কেশ-পাশ | স্নিগ্ধ-ধীর হাস | তুল্-তুল্ বয়ান,
কর্ণে দুল্ তার | কণ্ঠে ফুল্-হার | ঢুল্ ঢুল্ নয়ান।

(খ) ফা'লাতুন | ফা'লাতুন | মফাআলুন

কোন্ বেদনায় | কাঁদ্‌ছিস্ বল্ | শয়ন লুটি'—
উচ্ছল-জল- | -ছল্-ছল-ছল | নয়ন দু'টি

(৭) কারিব

(ক) মফাঈলুন | মফাঈলুন | ফাএলাতুন †

হৃদয়-মন্দির | নিখিল মন্দির | কেন্দ্র লোক তোর
আসুক তুচ্ছ | আসুক উচ্চ | মুক্ত রো'ক দোর

(খ) মফাঈল্ | মফাঈল্ | ফাএলাতুন

বেদন-হীন | হৃদয়-বীণ্ | সুর যে নাই তার,
আঘাত দাও | আঘাত দাও | তীব্র বেদনার।

(গ) মফউল | মফাঈল্ | ফাএলাতুন

দশ দিক্ | আঁধার আজ | ঘোর এ বরষায়,
সই তুই | থাকিস্ আর | কার সে ভরসায়?

(ঘ) মফাঈল | মফাঈল | ফাএলাত

মিলন চাই | মিলন চাই | দুই হিয়ায়
কোথায় পাই | কোথায় পাই | দিল্-পিয়ায়!

(৮) মশাকেল ‡

(ক) ফাএলাতুন | মফাঈলুন | মফাঈলুন **

পাস্ ত করলুম, | এখন চিন্তা | কোথায় যাই ভাই?
হায়রে আফ্‌শোস্ | হেথায় ঠাঁই নাই | হোথায় ঠাঁই নাই!

* কাজী সাহেব লিখিয়াছেন :—"ফাএলাতুন | ফাএলাতুন | মফাআয়লুন"। জানি না কোথায় পাইয়াছেন।

† কাজী সাহেব লিখিয়াছেন—"মফাআলুন, মফাআলুন, ফাএলাতুন।" জানি না কোথায় পাইয়াছেন। যদি "মফাঈলুন" কে "মফাআলুন" করিয়া থাকেন, তবে ভুল হইয়াছে।

‡ (৬), (৭) ও (৮) এই তিনটি ফার্সী ভাষার খাশ ছন্দ। অবশিষ্ট ১১টি আরবী, ফার্সী, তুর্কী সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি।

** কাজী সাহেব লিখিয়াছেন—"ফাএলাতুন, মফাআয়লুন, মফাআয়লুন।" তিনি সর্ব্বত্রই "মফাঈলুন"কে "মফাআয়লুন" করিয়াছেন। "বহ্র উভয়ের 'ওজন' ঠিক একরূপ হওয়ায় তাঁহার বাঙ্গলা অনুবাদ ভুল হয় নাই।

(খ) ফাএলাত	মফাঈল	মফাঈল
দুই হিয়ায়	বিভেদ নাই	বিভেদ নাই,
অয়ি সখি,	আমার যা'ই	তোমার তা'ই।

(৯) হজ্‌য

(ক) মফাঈলুন	মফাঈলুন	মফাঈলুন	মফাঈলুন
হে মোর লক্ষ্মী	হৃদয়-মক্ষি,	তোমার চাঁদ-মুখ	কতই সুন্দর!
তোমার কণ্ঠে	পীযূষ বর্ষে,	তোমার সব গা'য়	সুবাস কুন্দ'র!

(খ) মফাঈলুন	মফাঈলুন	মফাঈলুন	মফাঈল।—
অরুণ-উজ্জ্বল	গগন-মণ্ডল,	মেঘের চিহ্নই	কোথাও নাই তার,
এমন সুন্দর	সময় নাই আর	খোদার মঙ্গল-	আশিস্ চাইবার।

(গ) মফাআলুন	মফাআলুন	মফাআলুন	মফাআলুন
আপন মনের	বেদন নিয়ে	গেলাম করি'	মরণ বরণ;
পরম-পিতা	শেষের দিনে	আমায় দিও	চরণ শরণ।

(ঘ) মফাআলুন	মফাআলুন	মফাআলুন	মফাএল।—
অচিন পথের	পথিক আমি,	পথের খবর	না হোক্ জানা,
তা' হোক তবু	বিফল তোদের	সকল বাধা	সকল মানা।

(ঙ) ফাএলুন	মফাঈলুন	ফাএলুন	মফাঈলুন
অয়ি নারি,	তোমার নাই তুল,	সব মধুর	তুমিই যার মূল!··
এই ধরার	বক্ষে জুড়াবার	নীর তুমি,	বেহেস্তের ফুল!

(চ) মফ্‌উল	মফাঈলুন	মফ্‌উল	মফাঈলুন
আজ মোর	ধরায় নন্দন,	শেষ মোর	হিয়ার ক্রন্দন,
মন যার	ধেয়ান-নিমগন	সেই দেয়	বাহুর বন্ধন!

(ছ) মফ্‌উল	মফাঈল	মফাঈল	মফাঈল
মোর প্রাণ	সদাই ধায়	কোথায় কোন্	অলখ দেশ,
ওই নীল	আকাশ-গায়	সাগর-পার	আঁখির শেষ! *

---

* পড়িবার রীতি ঠিক এইরূপ হইবে :—

মফ ! উল্ মফা ! ঈল্ মফা ! ঈল্ মফা ! ঈল্

মোর ! প্রাণ সদাই ! ধায় কোথায় ! কোন্ অলখ্ ! দেশ

(চ) (ঝ), (ঞ)ও এইরূপ ওজনে পড়িবেন। বাঙ্গলা ছন্দে এ-হেন গতি-ভঙ্গী সম্পূর্ণ অভিনব।

(জ) মফ্‌উল	মফাঈল	মফাঈল	ফউলুন
ক্রন্দন	ভারত-মার	মূর্চ্ছায় আজ	কে আর বল্‌?
বন্ধন	সকল গায়	তাহার সার	চোখের জল্‌!

(ঝ) মফাঈল্‌	মফাঈল	মফাঈল	মফাঈল্‌
বারেক জাগ্‌	অলস দল	সুমুখ চল্‌	সুমুখ চল্‌,
ঘুচুক লাজ	সরম ভয়	জাগুক প্রাণ	মনের বল!

(ঞ) মফাঈল	মফাঈল	মফাঈল	ফউলুন
সকল ভেদ	হউক চুর,	মিলুক সব	হৃদয়-পুর,
উজল হোক	দেশের মুখ,	সকল লাজ	হউক দূর।

(ট) মফাঈলুন	মফাঈলুন	মফাঈলুন
হে ভাই হিন্দু	হে ভাই মোস্‌লেম	ভারতবর্ষের,
তোদের ভাগ্যে	সমান ভাগ সব	দরদ্‌ হর্ষের।

(ঠ) মফাঈলুন	মফাঈলুন	মফাঈল
দেশের মুক্তি	জাতির উত্থান	যদিই চাও—
জীবন দাও গো	জীবন কর দান	জীবন দাও।

(ড) মফাঈলুন	মফাঈলুন	ফউলুন
গভীর দুঃখে	আকুল কণ্ঠে	শুধায় দেশ—
হে মোর সন্তান	এ ঘোর রাত্রির	কোথায় শেষ?

(ঢ) মফাঈল্‌	মফাঈল্‌	মফাঈল্‌
আসুক রোগ,	আসুক শোক,	আসুক দুখ্‌,
নাশুক মোর	সুখের ঘোর,	ভাসুক বুক।

(ণ) মফাঈল্‌	মফাঈল্‌	ফউলুন
শ্যামল-বেশ	কাজল-কেশ	আমার দেশ,
রূপের আর	গুণের তা'র	কোথায় শেষ!

(ত) মফ্‌উল	মফাআলুন	মফাঈলুন
ভরপুর	ব্যথায় দুঃখে	হৃদয়-কন্দর,
কাজ নাই	লেখায় আমার	নূতন ছন্দ'র।

(থ) মফ্‌উল	মফাআলুন	মফাঈল
আফ্‌শোস্‌!	দেশের মাঝে	মানুষ নাই,
স্বার্থই	আসন নেছে	সকল ঠাঁই।

(দ)	মফ্উল	মফাআলুন	ফউলুন
	দেশ-মা'র	আশার আলো	যুবক-দল !
	বল্ ভাই	কোথায় তোদের	মনের বল ?

(ধ)	মফ্উলুন	ফাএলুন	মফাঈল্
	মুক্তির পথ	নয় সহজ	মোটেই ভাই,
	রক্তের দাগ	এই পথের	সকল ঠাঁই।

(১০) রজ্য

(ক)	মস্তাফ্আলুন	মস্তাফ্আলুন	মস্তাফ্আলুন	মস্তাফ্আলুন
	ভীম-গর্জনে	যুদ্ধের ভেরী	ওই শোন্ বাজে	সব দেশ ঘেরি',
	মুক্তির তরে	চাই প্রাণ বলি	সাজ্ সাজ্ ওরে	নাই আর দেরী।

(খ)	মস্তাফ্আলুন	মস্তাফ্আলুন	মস্তাফ্আলুন	মস্তাফ্এল্।--
	শোন্ শোন্ কাফের	নাম মোর বাপের	হজরৎ আলী	বীর-কুল-সেরা,
	সত্যের সাধক	মোস্লেম্ মোরা,	অন্যায়-পাপের	দাস নয় এরা।

(গ)	মফ্তাআলুন	মফ্তাআলুন	মফ্তাআলুন	মফ্তাআলুন
	অন্ধকারের	বন্ধ টুটি'	উঠল জেগে	রক্ত-রবি,
	বিশ্ব-বিভুর	বন্দনাতে	বস্ল এসে	ভক্ত কবি।

(ঘ)	মফ্তাআলুন	মফাআলুন	মফ্তাআলুন	মফাআলুন
	অস্ত-রবির	হিরণ-কিরণ	বিশ্ব হ'তে	বিদায় নিল',—
	ঘোম্টা-ঘেরা	বধূর মতন	সন্ধ্যা-তারা	উদয় হ'ল।

(ঙ)	মফাআলুন	মফ্তাআলুন	মফাআলুন	মফ্তাআলুন
	শারদ-শশীর	শুভ্র করে	নিখিল জগৎ	আত্ম-হারা,
	এখন ঘরে	বন্ধ যারা	জগৎ-মাঝে	অন্ধ তা'রা।

(চ)	মস্তাফ্আলুন	মস্তাফ্আলুন	মস্তাফ্আলুন
	বন্ধুর পথের	কোন্ দূর-পথিক	এই দিন-শেষে
	নির্ব্বাক্ ধ্যানে	কার সন্ধানে	যাও কোন্ দেশে ?

(ছ)	মফ্তাআলুন	মফ্তাআলুন	মফ্তাআলুন
	পুষ্প সম	ওষ্ঠ তাহার	স্নিগ্ধ-স্মিত,
	কণ্ঠ-বীণার	ঝঙ্কারে মোর	মুগ্ধ চিত্ত।

(জ)	মফাআলুন	মফাআলুন	মফাআলুন
	সে কোন্ বনের	উদাস-করা	বাঁশীর স্বরে
	হৃদয় আমার	পাগল হ'য়ে	বেড়ায় ঘুরে !

(১১) রমল

ক)	ফাএলাতুন	ফাএলাতুন	ফাএলাতুন	ফাএলাতুন
	হায় রে হায় হায়	তীব্র বেদনায়	কার এ কণ্ঠের	উঠল ক্রন্দন,
	আজ এ সন্ধ্যায়	কোন্ সে নিষ্ঠুর	ভাঙ্গল বুক তা'র	টুটল বন্ধন।

(ঠ) ফাএলাতুন | ফাএলাতুন | ফাএলাতুন

এই যে বিশ্বের | বিত্ত-সম্পদ্ | নিত্য নয় ভাই !
চিত্ত সৌরভ | সেই ত গৌরব, | তার যে ক্ষয় নাই !

(ড) ফাএলাতুন | ফাএলাতুন | ফাএলাত

মুক্ত কণ্ঠে | নৃত্য-রঙ্গে | গাও গজল,
শুষ্ক দিল্ মোর | প্রেম-তরঙ্গে | হোক্ সজল।

(ঢ) ফাএলাতুন | ফাএলাতুন | ফাএলুন

বিশ্ব উজ্জ্বল | পূর্ণচন্দ্রের | রোশ্‌নায়ে,
মুগ্ধ অন্তর | পুষ্প-পুঞ্জের | খোশ্‌বায়ে।

(ণ) ফাএলাতুন | ফা'লাতুন | ফা'লুন

বিশ্ব ছায় ওই | গম্ভীর পাপ- | রাত্রি,
শঙ্কা-বিহ্বল | পুণ্যের পথ- | যাত্রী।

(ত) ফাএলাতুন | ফা'লাতুন | ফা'ল।

পরতে সাজ যার | গান্ধীর ওই | খদ্দর,
নয়ক' নয় সেই | আজকার দিন | ভদ্দর।

(১২) মনসরাহ্

(ক) মস্‌তাফ্‌আলুন | মফ্‌উলাতুন | মস্‌তাফ্‌আলুন | মফ্‌উলাতুন *

অন্তর আমার | ভরপুর বেদ্‌নায়, | তা'য় মোর কিছুই | খেদ নাই, খেদ নাই।
দুঃখই মধুর | দুঃখই সুন্দর, | যেই জন প্রেমিক | সার তা'র বেদ্‌নাই।

(খ) মফ্‌তাআলুন | ফাএলা- | মফ্‌তাআলুন | ফাএলা—

রুদ্র-দিনের | এই আলোয় | সুপ্ত র'বি | হায় রে হায় !
চক্ষু মেলে | দ্যাখ্ সবাই | যাচ্ছে চলে' !— | আয় রে আয় !

(গ) মফ্‌তাআলুন | ফাএলুন | মাফ্‌তাআলুন | ফাএলুন

মুক্তি-লগন | যায় ব'য়ে, | সার-যে বোঝা | নে তুলে,
দুঃখ-সাগর | পার হবি,— | যাত্রা-তরী | দে খুলে।

(ঘ) মফ্‌তাআলুন | ফাএলাত | মফ্‌তাআলুন | ফা—

ধ্বান্ত-তিমির | যায় টুটে, | রাত্রি হ'ল | ভোর—
বিশ্ব-ধরার | শ্যাম শোভা | চোখ জুড়াল' | মোর।

* কাজী সাহেব এই ছন্দ-সূত্রটিকে উল্টাইয়া "মফ্‌উলাতুন। মস-তাফ্‌আলুন। মফ্‌উলাতুন। মস্‌তাফ্‌আলুন" করিয়াছেন

(ঙ) মফ্‌তাআলুন	ফাএলাত	মফ্‌তাআলুন	ফ'
বাদ্‌লা-মেঘের	দিন গেল,	শেষ হ'ল বর্‌-	ষা,
ওই আকাশের	নীল আগে	দিল্ করি' কর্‌-	সা।

(চ) মফ্‌তাআলুন	ফাএলাত	মফ্‌তাআলুন
ঘোম্‌টা-ঘেরা	মুখখানি	পল্লীবধূর,
লজ্জা-ভরা	চোখ দু'টি	স্নিগ্ধ মধুর !

(ছ) মফ্‌তাআলুন	ফাএলাত	মফ্‌উলুন
সই লো তোমার	দুই চোখে	নীল্-অঞ্জন,
স্বপ্ন-লোকের	তুই যে 'হুর'	দিল্-রঞ্জন !

(১৩) মোজারাহ্

(ক) মফাঈলুন	ফাএলাতুন	মফাঈলুন	ফাএলাতুন
আঘাত দাও মোর	ক্ষুদ্র বক্ষে,	চালাও নিষ্ঠুর	লক্ষ খঞ্জর,
গভীর বেদনায়	রইব নির্ব্বাক্	হউক চূর্ণ	বক্ষ-পঞ্জর।

(খ) মফ্‌উল	ফাএলাতুন	মফ্‌উল	ফাএলাতুন
বুল্‌বুল্	আজ এ সন্ধ্যায়	বিল্‌কুল্	হর্ষ চঞ্চল !
ঢুল্‌ঢুল্	উড়্‌চে কার ওই	রঙ্গীন্	রেশ্‌মী অঞ্চল ?

(গ) মফ্‌উল	ফাএলাত	মফাঈল	ফাএলাতুন
সুন্দর	ওই সুন্দর	আকাশ-তল	মুগ্ধ-দর্শন,
সুন্দর	এই ধরার	বাতাস-জল	পুষ্প-বর্ষণ !

(ঘ) মফ্‌উল	ফাএলাত	মফাঈল	ফাএলাত
দাও দাও	দাও তোমার	গোপন-প্রেম-	মন্ত্রণা ;
দূর হোক্	মোর হিয়ার	সকল তাপ-	যন্ত্রণা !

(ঙ) মফ্‌উল	ফাএলাত	মফাঈল	ফাএলুন
মোস্‌লেম,	বল্ দেখি	কখন আর	জাগ্‌বি রে !
নিরজীব	হীন হ'য়েই	চিরকাল	থাক্‌বি রে ?

(চ) মফাঈল্	ফাএলাত	মফাঈল	ফাএলাত *
ভোরের বায়	বও যবে	প্রিয়ার দ্বার	পাশ দিয়ে,
এসো তা'র	আধ-ফোটা	কুসুম-গা'র	বাস নিয়ে।

* পড়িবার রীতি এইরূপ হইবে :-

মফা-	ঈল্ ফাএলাত	মফা-	ঈল্ ফাএলাত
ভোরের	বায় বও যবে	প্রিয়ার	দ্বার-পাশ দিয়ে

এরূপ গতি-ভঙ্গীও বাঙ্গলা ছন্দে সম্পূর্ণ অভিনব। (ঘ) ও (ঙ)ও এই 'ওজনে' পড়া যায়।

(ছ)	মফ্‌উল্	ফাএলাত	মফাঈলুন
	নাই নাই	নাই ঘরে	হৃদয়-লগ
	বল্ ভাই,	বল্ কে সয়	এ-সব ঝক্কি।

(১৪) মক্‌তাজেব *

(ক)	ফাএলাত	মফ্‌তাআলুন	ফাএলাত	মফ্‌তাআলুন
	ওই এল	মুক্তি-লগন,	ওঠ্ জেগে	সুপ্তি-মগন!
	দ্যাখ্ চেয়ে	রক্ত-আলোয়	যায় ছেয়ে	পূর্ব্ব গগন!
(খ)	ফাএলাত	মফ্‌উলুন	ফাএলাত	মফ্‌উলুন
	চিত্ত যার,	পূত্-নির্ম্মল,	বিত্ত যার	জ্ঞান-সম্পদ্,
	মুক্ত যা'র	মন্-মন্দির,	বিশ্বে তা'র	নয় কম্ পদ।

(১৫) মযতস্

(ক)	মফাআলুন	ফা'লাতুন	মফাআলুন	ফা'লাতুন +
	শাওন রাতের	ঘোর বরষায়	বেদন জাগায়	সেই মুখখান,
	বিয়োগ-ব্যথায়	ভরপুর মোর	মিলন-ব্যাকুল	এই বুকখান!
(খ)	মফাআলুন	ফা'লাতুন	মফাআলুন	ফা'লির্‌ন্‌—‌
	আকাশ আজি	নীল-নির্ম্মল	মেঘের যে নাই	তিল বিন্দু
	তারায় তারায়	রূপ-ঝল্‌মল্	প্রদীপ-ভাস।	নীল-সিন্ধু।
(গ)	মফাআলুন	ফা'লাতুন	মফাআলুন	ফা'লাত
	গলে তোমার	মুক্তার হার,	দুল্‌ছে দোদুল	অঞ্চল,
	কানে তোমার	কাঞ্চন-দুল	গতির বেগে	চঞ্চল।
(ঘ)	মফাআলুন	ফা'লাতুন	মফাআলুন	ফা'লুন
	স্বাধীন আমি!	কোন্ শয়তান	আমায় করে,	বন্দী!
	বিফল তাহার	সব চেষ্টা,	সকল অভি-	সন্ধি!
(ঙ)	মফাআলুন	ফা'লাতুন	মফাআলুন	ফা'র্‌—‌
	কখন্ যেন	শেষ হয় প্রাণ	সকল সময়	ভয় পাই!
	পরকালের	সম্বল মোর	যোগাড় কিছুই	হয় নাই!

* এই ছন্দটি কাজী সাহেব আদৌ উল্লেখ করেন নাই।

+ কাজী সাহেবের ছন্দ-সূত্র :—
"মসতাফ্‌আলুন কাএলাতুন মস্তাফ্‌আলুন কাএলাতুন"। জানি না কোথায় পাইয়াছেন।

(১৬) সরীহ্

(ক) মস্‌তাফ্‌আলুন ¦ মস্‌তাফ্‌আলুন | মফ্‌উলাতুন

নয় এই জীবন | মিথ্যার স্বপন, | কাজ কর্, কাজ কর্!
এই দীন্-ভবন ¦ নয় তোর আপন, | স্বর্গই তোর ঘর!

(খ) মফ্‌তাআলুন ¦ মফ্‌তাআলুন ¦ ফাএলুন

ধন্য কামাল! | ধন্য তোমার | আঙ্গোরা!
ধন্য তোমার | নব্য সাঙ্গো- | পাঙ্গরা!

(গ) মফ্‌তাআলুন | মফ্‌তাআলুন | ফাএলা—

অন্তরে মোর | সঞ্চিত ঘোর | অন্ধকার,
মুক্ত আলোক | যায় না সেথা, | বন্ধ দ্বার!

(১৭) খাফীফ্

(ক) ফাএলাতুন | মস্‌তাফ্‌আলুন | ফাএলাতুন

দুঃখ-দৈন্য | বিল্‌কুল্ অলীক, | নয় চিরন্তন!
দুঃখ-দৈন্যের | পর্দার আড়াল | রয় যে নন্দন!

(খ) ফাএলাতুন | মফাআলুন | ফা লাতুন

দিগ্-দিগন্তর | মুখর করি' | গায় বুল্‌বুল্,
পত্র-পুঞ্জের | আড়াল দিয়ে | চায় ফুল-কুল!

(গ) ফাএলাতুন ¦ মফাআলুন | ফা'লাত

আয় রে রঙ্গীন | কিরণ-মাখা | ফাল্‌গুন!
ডাক্‌ছে ত্যাখ্ ওই | ঝরা পাতার | ডাল-গুন্!

(ঘ) ফাএলাতুন ¦ মফাআলুন | ফা'লুন

লক্ষ্য-হীন এই | জীবন-তরী | বাচ্ছি,
মৌন-সন্ধ্যায় | পারের পানে | যাচ্ছি!

(ঙ) ফাএলাতুন | মফাআলুন | ফাএলুন

সুখ ও সম্পদ্ | কিছুই মোদের | লক্ষ্য নয়,
তুচ্ছ রোগ-শোক | জীবন-মরণ | দুঃখ-ভয়।

(চ) ফাএলাতুন | মফাআলুন | ফা'লা—

তীব্র বেদনায় | কাঁদে হৃদয় | হায় গো—
ঠাঁই যে নাই মোর | 'তোমার সোনার | না'য় গো'।

(১৮) মোতাকারিব

(ক)	ফউলুন	ফউলুন	ফউলুন	ফউলুন
	আকাশ-তল	সুনির্ম্মল,	মেঘের দল	কোথায় বল্ ?
	বিফল তোর	করুণ রব	'ফটিক জল'	'ফটিক জল' !
(খ)	ফউলুন	ফউলুন	ফউলুন	ফউল্
	খোদার নূর	মোহাম্মদ	মহান্ সেই	রসুল,
	বেদীন ভাই	সবাই কর্	তারই 'দীন'	কবুল।
(গ)	ফউলুন	ফউলুন	ফউলুন	ফো'ল
	সরাব লাও,	গজল গাও	মাতাও মন-	দিল্,
	নূপুর-ঘা'য়	মুখর হোক্	হৃদয়-মন্-	জিল।
(ঘ)	ফ'লুন	ফউলুন	ফ'লুন	ফউলুন
	মুখখান	গোলাপ-ফুল,	কেশ-পাশ	দোদুল্ দুল্,
	টুক্-টুক্	অধর-কোণ,	চুম্বন	দে বুল্বুল্ !
(ঙ)	ফউলুন	ফ'লুন	ফউলুন	ফ'লুন
	সিঁদুর-টিপ	উজ্জ্বল,	করুণ-থির	দৃষ্টি !
	রিনিক-ঝিন্	কঙ্কণ,	কি সুন্দর	মিষ্টি !
(চ)	ফউলুন	ফউলুন	ফউলুন	
	মোদের আর	অভাব নাই	কিছুই ভাই,—	
	মানুষ চাই	মানুষ চাই	মানুষ চাই !	

(১৯) মোতাদারেক

(ক)	ফাএলুন	ফাএলুন	ফাএলুন	ফাএলুন
	দাও তোমার	কর্-পরশ	এই নীরব	হৃদ্-বীণায়,—
	সব বেদন	যা'ক্ দূরে,	সুর উঠুক	সুর-হীনায় !
(খ)	ফা'লুন	ফা'লুন	ফা'লুন	ফা'লুন
	জয় হোক্	দেশ-বীর	নির্ভীক	গম্ভীর !
	জেল-ঘর	হোক্ তার	মুক্তির	মন্দির !
(গ)	ফাএলুন	ফা'ল	ফাএলুন	ফা'ল
	যার যাহা	সাজ,	ধর তাহা	আজ,
	হোক্ ছোট	কাজ,	নাই তাহে	লাজ !
(ঘ)	ফাএলুন	ফা'লুন	ফাএলুন	ফা'লুন
	যায় চলে'	বন্ধ,	মন নিরা-	নন্দ,
	ওই এল	সন্ধ্যা,	শেষ কর	ছন্দ !

গোলাম মোস্তফা

[কোন বিষয়ে যাঁহার লেখা সমালোচিত হয়, তিনি জবাব দিলেই সে-বিষয়ে বাদ প্রতিবাদ শেষ হইয়া যায়।]

স্বাচ্ছন্দ্যবিজ্ঞানের একটি দিক্

গত বৎসর আষাঢ় মাস হইতে শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বাচ্ছন্দ্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রবাসীতে মাঝে মাঝে লিখিয়া আসিতেছেন। তাঁহার সহিত আমাদের মতদ্বৈধ না থাকিলেও অনেক স্থলে পাশ্চাত্য ধনবিজ্ঞানমূলক স্বাচ্ছন্দ্য নীতির প্রতি তাঁহার অধিকতর পক্ষপাতিত্ব লক্ষিত হওয়ায় সামাজিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অপর দিক দেখাইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম।

ব্যক্তিগত কি সামাজিক সুখ এবং স্বাচ্ছন্দ্য কাহাকে বলে সে সম্বন্ধে কূটতর্ক বাদ দিলে, আমরা দেখিতে পাই, যে আমাদের সকল প্রকার সুখ অভাব-মোচন বা আকাঙ্ক্ষা-নিবৃত্তির উপরেই নির্ভর করে। তৃষ্ণার্তই যেমন জলের প্রকৃত মিষ্টত্ব অনুভব করে তেমনি অভাব-ক্লিষ্ট ব্যক্তিই সুখের প্রকৃত অধিকারী। চরম সুখলাভ হয় তখনই যখন সকল অভাব পরিপূর্ণ হয়। অতএব সুখানুভূতির দুইটা দিক্ আছে একটি অভাব, অপরটি ভোগ। অভাবের প্রসার ও তদনুরূপ ভোগবস্তুর উত্তরোত্তর বিস্তৃতিতেও যেমন সুখলাভ হইতে পারে, আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি ও তৎপরিমিত সংযত ভোগেও ঠিক তেমনি স্বাচ্ছন্দ্যের সম্ভাবনা। সুতরাং কোন সমাজের স্বাচ্ছন্দ্য পরিমাপ করিতে হইলে সেই সমাজের শুধু অভাব-নিষ্কাশন বা জীবনযাত্রা নির্বাহের প্রণালী লক্ষ্য করিলেও চলিবে না, আবার শুধু সেই সমাজের ভোগ্য বস্তুর তালিকা দেখিলেও চলিবে না। উভয় দিকের সামঞ্জস্য কতটা হইয়াছে, তাহাই বিচার করিতে হইবে এবং তজ্জন্য প্রধানতঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রত্যেকটি বিশেষ ও সমষ্টিগতভাবে [illegible] করিতে হইবে। যথা

১। সামাজিক আয়। ২। অভাবানুভূতি বা জীবনযাত্রা নির্বাহের প্রণালী। ৩। ভোগ্য-বস্তুর পরিমাণ। ৪। সামাজিক আয়ের বণ্টন। ৫। জাতীয় বৈশিষ্ট্যের ধারা।

এইগুলির মধ্যে কোনটিকেই অগ্রাহ্য করা যায় না। [illegible] অর্থনীতিবিদ্গণ সকল সমস্যার প্রতি যথোপযুক্ত মনোযোগ দেন নাই বলিয়া তাঁহাদের স্বাচ্ছন্দ্যনীতিও অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে এবং তাঁহারা সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যকে পরিমেয় ও অপরিমেয় দুই ভাগে ভাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহার ফলে হইয়াছে এই যে বস্তুতান্ত্রিকতাময় [illegible] অভাবের বৃদ্ধি ও তদনুযায়ী ভোগ্য-বস্তুর উদ্ভাবন পাশ্চাত্য স্বাচ্ছন্দ্যের মূলমন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে ও সেই ব্যক্তি এবং সেই সমাজ স্বাচ্ছন্দ্যের উন্নত সোপানে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া পরিগণিত হইতেছে, যাহার বা যাহাদের জীবন-যাত্রার প্রণালী অধিকতর ব্যয়বহুল। জাতীয় জীবনের ধারা ও অভাবানুভূতির বৈশিষ্ট্যের প্রতি কোন লক্ষ্য না করিয়াই অনেকে বলিতেছেন যে, ইংলণ্ড ও আমেরিকাবাসীগণ ভারতবাসী অপেক্ষা অনেক সুখী ও স্বাচ্ছন্দ্য-ভোগী, কারণ তাহাদের ভোগ্যবস্তুর পরিমাণ অনেক বেশী। অনেকে হয়ত এরূপ ভাবিতেও দ্বিধা বোধ করেন না যে, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি সংযত পুরুষগণের জীবনযাত্রার পদ্ধতি অত্যন্ত নীচুদরের এবং ভোগবিলাসী অমিতব্যয়ী সমাজশোষণকারী ধনশালীদিগের জীবনযাত্রা [illegible] হইয়াছে, সে [illegible] হিসাবে সমাজের [illegible] ঠিক বলিয়াই [illegible] ভুল হওয়ার সম্ভাবনা। [illegible] তাঁহারা সকল দিক দেখিয়া চলিতে চান না। [illegible] সামাজিক [illegible] সমাজে [illegible] একটা [illegible] সকলেরই লক্ষ্য করিতে হইবে [illegible] চেষ্টা [illegible] কিন্তু সামাজিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের [illegible] সন্দেহ নাই। সমাজের [illegible] সামাজিক ও ব্যক্তিগত সুখের [illegible] সামাজিক সুখ [illegible] পরিমাপ করিবার [illegible]

[illegible] সুখের [illegible] করা যায় না [illegible] সমাজের [illegible] প্রয়োজনীয় [illegible] প্রথম [illegible] অভাবের [illegible]

১। অবশ্য প্রয়োজনীয় [illegible] আকাঙ্ক্ষা। ৩। অবশ্য-প্রয়োজনীয় বস্ত্র ও বাসস্থানের অভাব। ৪। রোগচিকিৎসার আকাঙ্ক্ষা। ৫। পুত্র কন্যার [illegible] শিক্ষার প্রতি লক্ষ্য। [illegible] মনুষ্য [illegible]

[illegible] অবশ্য প্রয়োজনীয় [illegible] তারতম্য হইয়া থাকে। [illegible] স্বাচ্ছন্দ্যের যেমন [illegible] অভাব সকল অনুভূত হইতে থাকে। [illegible] লোক এই সকল-প্রকার অভাবের [illegible] করিতে প্রয়াসী হয়, সে সমাজে [illegible] স্বাচ্ছন্দ্য বিরাজ করিতেছে [illegible] গেলেও একটি মাপকাঠি [illegible] নিকট হইতে নিজ ব্যক্তিত্বের জন্য [illegible] সমাজকে যাহা দেয় তাহা [illegible] জীবনযাত্রা প্রণালী তত [illegible] গান্ধী, যীশুখৃষ্ট অথবা মোহাম্মদ [illegible] বিলাসপরায়ণ [illegible] অপেক্ষা সমাজে অধিক স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন [illegible]। জীবনযাত্রা প্রণালীর উচ্চতা নীচতা

হস্তলিপি। এই হস্তলিপিতে যীশুর ঐ উক্তি নাই। কিন্তু প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় শতাব্দীতে লুকের যে হস্তলিখিত পুস্তক ছিল, বোধ হয় তাহাতে যীশুর ঐ উক্তি লিপিবদ্ধ ছিল। কেন না লুকের দ্বিতীয় তৃতীয় শতাব্দীর বিভিন্ন ভাষায় যে-সমস্ত অনুবাদ এখনও বর্ত্তমান আছে, তাহাতে যীশুর ঐ উক্তি লিপিবদ্ধ আছে। এতদ্ব্যতীত দ্বিতীয়, তৃতীয় শতাব্দীর খ্রীষ্টীয় লেখকগণ যীশুর ঐ বাণী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ইহাতে অনুমিত হয় লুকের প্রাচীন হস্তলিপিতে যীশুর ঐ বাণী লিপিবদ্ধ ছিল।

নূতন নিয়মে কেবল লুকের মধ্যে যীশুর ঐ উক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। লুক একজন কৃতবিদ্য চিকিৎসক ছিলেন। তিনি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া যীশুর পূর্ণ জীবনী লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কারণ তিনি থিয়ফিল নামক একজন বিশেষ লোকের জন্য যীশুর জীবনী লিখিয়াছিলেন। মহাপুরুষদিগের অনেক সত্য উক্তি মুখে মুখে রক্ষিত হয়। এইজন্য বোধ হয় মথি, মার্ক্ এবং যোহনে যীশুর ঐ বাণী উল্লিখিত না থাকিলেও লুক আপন পুস্তকে যীশুর ঐ বাণী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। যীশুর জীবনী শিক্ষা উপদেশাদি পাঠ করিলে ঐ বাণী যীশুর মুখের বলিয়াই অনুমিত হয়।

মার্ক্ এবং যোহনে যীশুর ঐ উক্তি নাই বলিয়া অথবা ভ্রমক্রমে বোধ হয় লুকের চতুর্থ শতাব্দীর লেখক মথি যীশুর ঐ বাণী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। চতুর্থ শতাব্দীর পরে আবার লুকের হস্তলিপিতে যীশুর ঐ উক্তি দৃষ্ট হয়।

যে-সমস্ত পণ্ডিত পুরাতন হস্তলিপি বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ঐ বাণী যীশুর বলিয়া গ্রাহ্য করিয়াছেন। তাই বাইবেলে লুকের মধ্যে যীশুর ঐ বাণী স্থান পাইয়াছে।

লুকের দ্বিতীয় তৃতীয় শতাব্দীর অনুবাদগুলিতে এবং দ্বিতীয় তৃতীয় শতাব্দীর খৃষ্টীয় লেখকগণ কর্ত্তৃক ঐ বাণী যীশুর বলিয়া উল্লিখিত হইলেও কি ঘোষ মহাশয় বলিতে চান উহা যীশুর উক্তি নহে ?

গোপালচন্দ্র খান

প্রত্যুত্তর

ক্রুশবদ্ধ হইয়া যীশু শত্রুর জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন কি না, তাহাই আলোচ্য বিষয়।

প্রচলিত মত এই, যে, তিনি ঐ সময়ে এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন :— "পিতঃ! ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কারণ ইহারা জানে না, যে, ইহারা কি করিতেছে"। লুক, ২৩৷৩৪।

বাইবেলে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর প্রার্থনা নাই। কিন্তু বহু সমালোচক বলিতেছেন, "ইহা প্রক্ষিপ্ত"। ইহার প্রতিবাদ হইবারই কথা। কিন্তু 'প্রবাসীতে' প্রতিবাদী যাহা বলিয়াছেন, তাহার কোন প্রমাণ দেওয়া হয় নাই (এবং ইহার কোন প্রমাণ নাইও)। সুতরাং তাঁহার সিদ্ধান্তের কোন মূল্য নাই। কিন্তু অশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত এবং এমন কি শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যেও ঐ প্রার্থনা-বিষয়ে অসত্য মত প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। এইজন্য এবিষয়ে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক মনে হইতেছে।

ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া যীশু যে-সমুদায় বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে মথি,মার্ক্ লুক ও যোহন এক কথা বলেন না। ইঁহাদিগের গ্রন্থে সাতটি উক্তির কথা আছে।

মথি ও মার্কের মত

মথি ও মার্কের গ্রন্থে লিখিত আছে যে যীশু এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন :—"আমার পিতা, আমার পিতা, কেন আমাকে পরিত্যাগ করিলে ?" (মথি ২৭৷৪৬ ; মার্ক্ ১৫৷৩৪)।

লুকের মত

লুকের অনুমোদিত গ্রন্থে আছে তিনটি উক্তি। প্রথম উক্তি :— "পিতঃ! ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কারণ ইহারা জানে না ইহারা কি করিতেছে।" লুক ২৩৷৩৪। দ্বিতীয় উক্তি :—"তুমি অদ্য আমার সঙ্গে স্বর্গে যাইবে।" লুক ২৩৷৪৩। একজন চোরকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলা হইয়াছিল। তৃতীয় উক্তি :—"পিতঃ! তোমার হস্তে আমি আমার আত্মাকে সমর্পণ করিতেছি।" লুক ২৩৷৪৬।

যোহনের মত

যোহনের মতে যীশু তিনবার বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন। লিখিত আছে ক্রুশ-কাষ্ঠের নিম্নভাগে মেরী ও যোহন দণ্ডায়মান ছিলেন। প্রথম উক্তি মেরী ও যোহন বিষয়ক। ১। যোহনকে লক্ষ্য করিয়া যীশু মেরীকে বলিলেন—"দেখ—এই তোমার সন্তান।" মেরীকে লক্ষ্য করিয়া যোহনকে বলিলেন—"দেখ, এই তোমার মা।" (যোহন, ১৯৷২৬,২৭)। ২। দ্বিতীয় উক্তি :—"আমি পিপাসিত।" (১৯৷২৮) ৩। তৃতীয় উক্তি "শেষ হইল" (১৯৷৩০)।

বাইবেলেই এইপ্রকার মতভেদ। সুতরাং যীশুর উক্তি-বিষয়ে যে বাদানুবাদ হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? এমন কি এই সাতটির মধ্যে একটিও যীশুর উক্তি কি না সে-বিষয়েও সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে।

বাইবেলের মূল ও অনুবাদ

(ক)

ওয়েষ্টকট্ এবং হর্ট্ ১৮৮১ সালে নূতন বাইবেলের যে গ্রীক্ সংস্করণ বাহির করিয়াছেন, তাহাতে এই অংশকে (লুক ২৩৷৩৪) দ্বিগুণিত বন্ধনী [[ ]] মধ্যে আবদ্ধ করা হইয়াছে। ইহার অর্থ এই অংশ প্রক্ষিপ্ত। ইঁহারা একস্থলে বলিয়াছেন যে ইঁহারা মনে করেন গ্রীক্ নিউ টেষ্টামেণ্টের তিন শাখা; ইহার পশ্চিম শাখাতে 'লুক ২৩৷৩৪ অংশ (পিতঃ, ইহাদিগকে ক্ষমা কর,ইত্যাদি) প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। প্রথমে' অল্পসংখ্যক হস্তলিপিতেই ইহা আবদ্ধ ছিল, পরে ইহা সর্ব্বত্র প্রচলিত হয়।—৬৮ পৃষ্ঠা। নানাপ্রকার বিচার করিয়া ইঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন :—"এই অংশ যে অন্য স্থল হইতে আসিয়াছে, সে-বিষয়ে আমরা সন্দেহ করিতে পারি না।"

গ্রীক্ টেষ্টামেণ্ট্ বিষয়ে ইঁহারা ইংলণ্ডে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন; ইঁহাদিগেরই সিদ্ধান্ত "লুক ২৩৷৩৪ অংশ প্রক্ষিপ্ত"।

ল্যাক্‌মান্ নামক পণ্ডিত তাঁহার বাইবেলের সংস্করণে এই অংশকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বন্ধনীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছেন। —ওপেন কোর্ট্ ১৯১২, পৃঃ ১৭৯।

ভেল্‌হাউসেন নামক সুবিখ্যাত পণ্ডিত বাইবেল-শাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ। তিনিও বলেন ঐ অংশ যে প্রক্ষিপ্ত তাহাতে সন্দেহ নাই—ওপেন কোর্ট ১৯১২, পৃঃ ১৭৯,১৮০।

এস্‌লিন কার্পেণ্টার একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত। ইঁহার মতেও এই অংশ প্রক্ষিপ্ত।—দি ফাষ্ট্ থ্রি গস্‌পেল্‌স্, পৃঃ ২৫, ২৯৩।

এন্সাইক্লোপীডিয়া বিব্লিকা একখানা বিশেষ প্রামাণিক গ্রন্থ। ইহাতে লিখিত আছে :—"মথি প্রভৃতির লিখিত সুসমাচারের পশ্চিম শাখায় এই-প্রকার প্রায় বিশটি প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে।"

এইস্থলে লেখক প্রধান দশটি স্থলের নাম করিয়াছেন ; ইহার মধ্যে লুকের পূর্ব্বোক্ত অংশও (২৩।৩৪) একটি।

টোয়েণ্টিয়েথ্ সেঞ্চুরী নিউ টেষ্টামেণ্ট্ নামক নূতন বাইবেলের নূতন অনুবাদে ঐ অংশকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া ইহার অনুবাদকে বন্ধনীর মধ্যে আবদ্ধ করা হইয়াছে।

ইংরেজী বাইবেলের যে সংস্করণ প্রচলিত তাহার নাম অথরাইজড্ ভার্শ্যন্ (অনুমোদিত অনুবাদ)। ইহাতে অনেক ভুল আছে। এই-জন্ম ১৮৮০।১৮৮১ সালে ভুল সংশোধন করিয়া এক নূতন সংস্করণ বাহির করা হয়। ইহার নাম রিভাইজড্ ভার্শ্যন্ (সংশোধিত অনুবাদ)। এই অনুবাদের পার্শ্ব-টীকাতে লেখা আছে :—প্রাচীন কালের কোন কোন আপ্তবাক্ ব্যক্তি এই অংশ বর্জ্জন করিয়াছেন :—"এবং যীশু বলিলেন—হে পিতঃ। ইহাদিগকে ক্ষমা কর কারণ ইহারা জানে না যে ইহারা কি করিতেছে।"

(ঙ)

অধ্যাপক স্মিথ্, এক্‌সিডিউস নামক গ্রন্থে (পৃঃ ১৪৪) এবং ওপেন কোর্ট্ নামক পত্রিকাতে (১৯১২; পৃঃ ১৭৯—১৮১) এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন যে লুকের ঐ অংশ প্রক্ষিপ্ত।

(চ)

কেইম্ জার্ম্মান্ দেশের একজন স্বনামখ্যাত পণ্ডিত। তিনি যীশুর এক সুবিস্তীর্ণ জীবনচরিত লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহারও মত ঐ অংশ প্রক্ষিপ্ত।—জিসাস্ অভ্ ন্যাজারা, ভল্যুম ৬, পৃঃ ১৫৫—১৫৬ দ্রষ্টব্য)।

(ছ)

প্রসিদ্ধ দার্শনিক মার্টিনো বলেন, লুক ২৩।৩৪ যীশুর উক্তি কি না সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে।—দি সীট্ অফ্ অথারিটি ইন্ রেলিজ্যন পৃঃ ৭১০—৭১২। তবে এই অংশ লুকের মূল গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে কি না—সে বিষয়ে তিনি এস্থলে বিচার করেন নাই।

প্রক্ষিপ্ত বলি কেন ?

এখানে কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন—"এ অংশকে কেন প্রক্ষিপ্ত বলা হইতেছে ?" সংক্ষেপে ইহার উত্তর দেওয়া যাইতেছে।

অধ্যাপক ডব্লিউ বি স্মিথ্ বলেন—কোন কোন হস্তলিপিতে এই অংশ আছে ; কিন্তু প্রাচীনতম হস্তলিপিতে নাই। কোন কোন অনুবাদেও এই অংশ পাওয়া যায়, কিন্তু প্রাচীনতম অনুবাদে এ অংশ নাই। যাহাকে সিনাই পর্ব্বতে প্রাপ্ত সিরিয়া ভাষায় অনুবাদ বলা হয় তাহাতে ইহা নাই। এই অনুবাদ অল্পকাল পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই অনুবাদ আবিষ্কৃত হওয়ায় অনেক প্রাচীন মত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।—ওপেন কোর্ট্ ১৯১২, পৃঃ ১৭৯।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

[লেখক আরও বিস্তর প্রমাণ ও যুক্তি দিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে তাহা ছাপিলাম না।—প্রবাসীর সম্পাদক।]

লামা-ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য

তিব্বত দেশের সকল স্থানেই একটি জিনিস দর্শকের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সে জিনিসটির নাম চর্টেন বা স্তূপ। প্রত্যেক মন্দির ও বিহারে এই স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধু ও লামাগণের অস্থ্যাবশেষ কিম্বা প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রেই বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি বা বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থের প্রতিলিপি এই-সকল স্তূপে সংরক্ষিত হইয়া থাকে। যাঁহারা ধর্ম্মশীল, তাঁহারা কোন ব্রত উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বা কোন পুণ্যকর্ম্ম সম্পূর্ণ হইবার সংকল্প করিয়া এই স্তূপ স্থাপন করিয়া থাকেন।

পঞ্চভূতের প্রতীকস্বরূপে এই স্তূপ নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এই স্তূপের পাদদেশ—যাহাকে ভিত্তি করিয়া এই স্তূপ অবস্থিত, তাহা সমতল নিরেট গাঁথনি মাত্র। তাহাই পৃথ্বীতত্ত্ব। তদুপরি, নৌকার নিম্নভাগের ন্যায় অর্দ্ধ-গোলাকার গঠন=অপস্তত্ত্বের চিহ্ন। তাহার উপর স্তম্ভের ন্যায় উচ্চ যে অঙ্গ তাহাই অগ্নিতত্ত্বকে নির্দ্দেশ করে। তাহার উপরে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি যে অংশ স্থাপিত তাহাই বায়ুতত্ত্ব এবং তাহার উপরে পাতার ন্যায় যাহা অঙ্কিত তাহাই আকাশ-তত্ত্ব। তৃতীয় স্তর অগ্নিতত্ত্বের উপরিভাগ একটি ছত্রে সংবদ্ধ থাকে, তাহা রাজছত্রের চিহ্ন। বিশ্বের চক্রবাল গিয়াণ্টসি নগরে যে সুবর্ণ-বিহার আছে, তাহার উপরিভাগে যে তাম্রখণ্ডে মণ্ডিত সুবৃহৎ, ছত্র বিদ্যমান, তাহাতে সূর্য্যকিরণ পতিত হইলে এরূপ জ্যোতিষ্মান্ হইয়া উঠে যে সেদিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং সেইজন্য সেই বিহারের নাম সুবর্ণ-বিহার হইয়াছে। এই সুবৃহৎ বিহারে অনেকগুলি মন্দির ও তিনটি দীক্ষার প্রকোষ্ঠ আছে। এই তিনটি দীক্ষা-প্রকোষ্ঠ সম্বন্ধে মাদাম ব্লাভাট্‌স্কি বলিয়াছেন প্রথম প্রকোষ্ঠের নাম অবিদ্যা। এই প্রকোষ্ঠের মধ্যে যে জ্যোতি তুমি দেখিতে পাইবে, তাহাতেই তুমি জীবিত রহিয়াছ এবং তাহাতেই তুমি লয় হইয়া যাইবে। দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠের নাম (অপরা) বিদ্যা। ইহাতে তুমি স্বার্থ-প্রবণ হইয়া যে-সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াছ, তাহা ফলোন্মুখ হইয়াছে দেখিতে পাইবে, কিন্তু প্রত্যেক ফলের মধ্যেই লালসারূপ সর্প প্রসুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছে। তৃতীয় প্রকোষ্ঠের নাম প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞাকে লাভ করিয়া সর্ব্বজ্ঞতার অফুরন্ত উৎস, অসীম সমুদ্র নিত্য বর্ত্তমান দেখিতে পাইবে। এই স্তূপের নিকটে অনেক প্রার্থনা-চক্র দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রেণীবদ্ধভাবে এই চক্রগুলি সজ্জিত থাকে। এই প্রার্থনা-চক্র উদ্‌ভাবনে লামাগণের আধ্যাত্মিক ভাবের যে বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা বিশেষভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রার্থনা-চক্র ফাঁপা গোলাকার ঢোলের আকারে প্রায় তিন ইঞ্চি লম্বা হইতে আরম্ভ করিয়া খুব বৃহৎ আকারের হয় ; তাম্র বা রৌপ্যে নির্ম্মিত হয়, এবং একটি লৌহ-শলাকার উপরে ঐ চক্র এরূপ সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয় যে ইচ্ছামাত্রেই ঐ চক্র ঘুরাইতে পারা যায়। চক্রের বাহিরে সংস্কৃত দেবনাগর অক্ষরে "ওঁ মণিপদ্মে হুং" এই মন্ত্র খোদিত আছে, ইহার অর্থ (হুং) পদ্মের মধ্যে যে মণি রহিয়াছে, তাহা আমি স্মরি। সেই তাম্র বা রৌপ্য আধারের মধ্যে স্তোত্র, পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থের সারবচন, ধারণী, মন্ত্র প্রভৃতি ন্যস্ত থাকে। এই চক্রের সহিত একটি সামান্যাকারের শৃঙ্খল বা হাতল সংবদ্ধ থাকে। তাহার দ্বারা ইচ্ছামত ক্ষিপ্রবেগে বা মন্দবেগে চক্রকে ঘুরাইতে পারা যায়। চক্র বামদিক্ হইতে দক্ষিণাবর্ত্তরূপে সর্ব্বদা ঘুরাইবার নিয়ম। অন্যভাবে ঘুরাইলে, তাহাতে প্রকৃতির বিরুদ্ধ শক্তির সহিত সংঘর্ষ হইয়া থাকে।

তিব্বতবাসী নরনারীগণ এই ধর্ম্মচক্র ঘুরাইবার জন্য দিনরাত্রির মধ্যে অনেক সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন। জপ ও চক্রঘূর্ণন একই ফলপ্রদ। এবং ইহা ধ্যানের সহায়তাকল্পে শান্তিপ্রদ ভাব আনয়ন করিয়া সাধককে সমাধি অবস্থায় আনয়ন করে। বুদ্ধদেবের "সদ্ধর্ম্ম"—যাহা মৃগদাবে তিনি প্রথম জগতে প্রচার করেন, তাহা—"ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন" নামে খ্যাত। এই ধর্ম্মচক্র-ঘূর্ণন তাহারই প্রতীক মাত্র। তিব্বতে

লামা বা সাধারণ ব্যক্তিগণ সকলেই কর্ম্মোপলক্ষে গৃহের বাহির হইলেও "ধর্ম্মচক্রঘূর্ণন" চলিতে থাকে ; কথাবার্ত্তা চলে বটে কিন্তু ধর্ম্মচক্র ঘূর্ণনের বিরাম নাই। ইহা দেখিতে বড়ই বিচিত্র। বাজারে বৃদ্ধগণ পণ্যবিক্রয়ের জন্য আসিয়াছেন তাঁহারাও নীরবে "ধর্ম্মচক্র" ঘূর্ণনে ব্যস্ত আছেন এবং ক্রেতাগণের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

বিহারের বাহিরে প্রাঙ্গণমধ্যে ভিত্তিতে শ্রেণীবদ্ধভাবে "চক্র" সকল বিন্যস্ত থাকে ; ধর্ম্মপিপাসুগণ সেই পথে গমন করিবার সময় তাহা ঘূর্ণন করিয়া থাকেন। মন্দিরগুলির মধ্যে সাধারণতঃ খুব বড় একটি "ধর্ম্মচক্র" দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার সহিত একটি ঘণ্টাও সংযুক্ত থাকে, চক্রটি যতবার ঘূর্ণিত হয়, ঘণ্টাটিও ততবার বাজিতে থাকে ইহাতে ঘূর্ণমান চক্রের সংখ্যাও গণনা করা হইয়া থাকে। অনেক নদীর স্রোতের মুখে এইরূপ প্রকাণ্ড "ধর্ম্মচক্র" এরূপভাবে স্থাপন করা হয়, যাহাতে নদীর স্রোতোবেগে চক্র আপনা আপনি ঘুরিতে পারে। রাস্তার মধ্যে বিশেষতঃ নগরের চৌমাথায় বা গ্রামের ভিতরের পথে ও গৃহস্থের বাটীর ভিতের মধ্যেও এইরূপ "ধর্ম্মচক্র" রক্ষিত হয় এবং তাহার সহিত বুদ্ধদেবের বা বৌদ্ধধর্ম্মোক্ত সাধুগণের বা সিদ্ধলামাগণের মূর্ত্তিও রক্ষিত করিয়া রাখা হয়। যে-সকল স্থানে এই পবিত্র মূর্ত্তিসমূহ ও চক্র সংরক্ষিত হয় সেই স্থান অতিক্রম করিতে হইলে, দক্ষিণ দিকে পরিক্রমণ করিয়া সেই-সকল পবিত্র মন্দির ও বিহার অতিক্রম করিতে হয়।

"ওঁ মণিপদ্মে হুং" মন্ত্রের অনেক প্রকার অর্থ করা হইয়া থাকে ইহার যথার্থ অর্থ "পদ্মের অভ্যন্তরে যে মণি বিদ্যমান তাহাতে ভক্তি করা" অর্থাৎ সত্যধর্ম্ম আদিবুদ্ধে অবস্থিত। আদিবুদ্ধ পদ্মোপরি সমাসীন। পদ্ম বৌদ্ধধর্ম্মে ব্রহ্মাণ্ডের প্রতীক মাত্র। ইহার মূল মৃত্তিকায় নিহিত থাকে, মৃত্তিকার অর্থাৎ পৃথিবীর অধিবাসীগণের সহিত সেইজন্য ইহার তুলনা দেওয়া হয়। মনুষ্যগণ আধ্যাত্মিক বিষয় লাভের জন্য অভিলাষ করেন, সেইজন্য তাঁহাদের ইচ্ছাকে উদ্দীপ্ত করিয়া অবলোকিতেশ্বর ভূবর্লোকের ঊর্দ্ধে, প্রেরণ করেন, তাহাই জলময় প্রদেশ ; তাহা অতিক্রম করিয়া আকাশ ময় প্রদেশে শুদ্ধ আধ্যাত্মিক রাজ্যে ধর্ম্ম পরিণতি লাভ করিয়া পূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত হয় ; তখন পদ্ম বিকাশ লাভ করে।

"ওঁ" হিন্দুগণের শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে, ইহার অর্থ অনেক প্রকার। ইহা হিন্দুগণের বেদের সার মন্ত্রেরও সার। অ, উ, ম, এই ত্রিবর্ণের যোগে ওঁ মন্ত্র হইয়াছে! অ এবং উকার যোগে ও এবং ম তাহাতে যুক্ত হইয়াছে। হিন্দুরা ইহাকে ঈশ্বরের বাচক বলেন, এবং ত্রিমূর্ত্তির, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর- -অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ— বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আরও প্রাচীনতর ইহার এক ব্যাখ্যা আছে,—অ অর্থে অগ্নি ; উ অর্থে বরুণ ; এবং ম অর্থে মরুৎ ; বায়ু! অনেকে প্রণবকে এত দুর পবিত্র ও গুহ্য বলিয়া সম্মান করিয়া থাকেন যে ইহা উচ্চারণ বা লিখিতে ভীত হইয়া থাকেন এবং এই প্রণবের পরিবর্ত্তে অন্য শব্দ উচ্চারণ করিয়া ও লিখিয়া থাকেন।

তিব্বতে শাস্ত্রের সারবচনগুলি লিখিয়া তাহা দ্বারা ধ্বজা পতাকা করিয়া বাটীর ও বিহারের চতুর্দ্দিকে উড়াইয়া দেওয়া হয় ; তাহার দ্বারা অমঙ্গলকারী ভূতগণের অপসরণ হইয়া থাকে। ভূতাপসারণের ইহাই প্রধান উপায়।

এই চক্র সম্বন্ধে সূর্য্যের সহিত যে বিশেষ সম্বন্ধ আছে এবং সূর্য্যের পথস্থ যে চক্র, তাহা ঋগ্বেদ ৬ষ্ঠ মণ্ডল ৫১।৪, শতপথ ব্রাহ্মণ, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্, গৃহ্যসূত্র প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থ মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

উইলিয়াম সিম্পসন্ তাঁহার দি বুদ্ধিষ্ট প্রেয়িং হুইল্ নামক গ্রন্থের ৯০ পৃষ্ঠায় এ-বিষয়ের বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রী বলাইচাঁদ মল্লিক

প্রতীক্ষা

আস্‌বে তুমি দিনের শেষে ছিনু প্রতীক্ষিয়া,
পথের পানে পলক হারা নয়ন দুটি দিয়া।
সব শেষে যে পথিক তারাও চ'লে যাওয়ার পরে,
সন্ধ্যারই আবছায়া-আঁধার বিজন-প্রান্তরে
পথটি পড়ে' অন্তহীন একা,
মাঠেরই বুক-চেরা গভীর বেদনার এক রেখা।

সবই তখন স্তব্ধ ছিল, বক্ষে শুধু মম
নিবিড় হ'য়ে উঠ্‌ছিল যে শব্দ ক্ষীণতম,
দিচ্ছিল সে নাড়া কেবল কল্পনারই ভবে
অবশ-হওয়া মুহূর্ত্তেরই অন্তরে অন্তরে।
পথের শিরে নিলয়-সীমা নীলে
উত্তরীয়খানি তোমার উড়িয়ে তুমি দিলে।

স্তব্ধতারি দিগন্তরে ঢেউ খেলিয়ে যায়,
পথ নহে সে, পরাণ যে এই কাঁপ্‌ল তব পায়।
যতই কাছে এলে, বুকের শব্দটুকু মম
উঠ্‌ল বেজে পাষাণ পরে অশ্বখুরের সম,
অপেক্ষিত যত নিমেষ পল
এক সাথে এ বুকের মাঝে হ'ল যে চঞ্চল!

আবার যবে বাহির হ'য়ে আঙন মোর হ'তে
ফিরলে তুমি অন্ধকারে স্পন্দহারা পথে,
বুকের আমার শব্দটি সে কাঁপ্‌ল থেমে থেমে
ডুব্‌ল শেষে অবশ প্রাণের অতল পানে নেমে ;
বাজ্‌ল কানে নিজেরই নিশ্বাস,
মর্ম্মরিত হারা বনের বেদন-উচ্ছ্বাস।

বন্ধু মম, এই কি হবে তোমার আসা যাওয়া!
এর লাগি' সে পলক-হারা আকুল পথ-চাওয়া!
পরশ তব জল্‌বে আমার গহন হিয়া-তলে,
দাহনে তার ফাট্‌বে শুধু উঠ্‌বে না কি জ্ব'লে
জমাট-বাঁধা বেদনখানি মোর--
বিদ্যুতেরি পরশ-পাওয়া বজ্র সুকঠোর।

এর চেয়ে যে পরশ তব বিষের মত হ'য়ে,
বুকের যত শোণিত-স্রোতে গোপন রয়ে রয়ে
চেতনা মোর বেদনা মোর সকল অপহরি'
একলা যদি থাক্‌তো জেগে দিবস বিভাবরী,
অপ্‌রাজিতা-ফলের মত কালো
নিকষ-ঘন অবশ বুকে, সে তব ছিল ভালো।

শ্রী সুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য

পাখীর গান

কতরকমের পাখীর গান তোমরা শুনিয়াছ। দোয়েল, শ্যামা, পাপিয়ার গান বুলবুল্, শালিক প্রভৃতির রব হইতে পৃথক্। কোকিলের কুহু, ময়ূরের কেকা ও কাকের কা-কা, এইসবে কত প্রভেদ।

সকাল বেলা, 'পাখী সব, করে রব, রাতি পোহাইল' ও সমস্ত দিনে তাহাদের রবের আর বিরাম থাকে না। অনেক পাখী রাত্রিতে নীরব হয়, কিন্তু ফাল্গুন-চৈত্র মাসে, জ্যোৎস্না-রাত্রিতে, কোকিল ও পাপিয়ার গান সারা রাত্রি শুনা যায়। কিন্তু পাখী কেন গান করে বলো দেখি?

অধিকাংশ পাখীর স্বর ছানা হইবার পূর্ব্বেই ফুটিয়া উঠে, ও এই সময় গত হইলে গান বন্ধ করে। প্রাণে আনন্দ হইলেই গান আসে; পাখীর শাবক-সম্ভাবনার সময়ে তাহাদের প্রাণে আনন্দ ছাপিয়া উঠে, ক্ষুধা-তৃষ্ণা মিটিলেও আনন্দ হয়, জ্যোৎস্না রাত্রিতে, নিশিশেষে, দিনের উত্তাপ দূর হইলেও পাখীর প্রাণে হর্ষের উদয় হয়, সেইজন্য সেই সময়ে পাখী গান করে। যাঁহারা পিঞ্জরে পাখী পুষিয়া থাকেন, তাঁহারা জানেন যে কোন বিশেষ দিনে পাখীকে গান করাইতে হইলে, পূর্ব্বদিনে তাহাকে আহার কম দিতে হয়, ও যেদিন পাখী ডাকিবে, সে দিন তাহাকে পরিতোষপূর্ব্বক আহারাদি দিয়া, তাহার পিঞ্জরের আবরণ খুলিয়া দিতে হয়, তখন সে আনন্দে গান করে।

পাখীর ঘ্রাণ-শক্তি বড় অল্প। পতঙ্গের মত বিহঙ্গ গন্ধে আকৃষ্ট হয় না, তাহারা স্বজাতিকে কণ্ঠস্বরে খুঁজিয়া বাহির করে। অবশ্য তাহাদের চক্ষুও খুব ক্ষমতাশালী, সকল প্রাণী অপেক্ষা পাখীর দৃষ্টি-শক্তি অধিক, কিন্তু প্রথমে তাহারা গলার স্বরে অন্য পাখীকে আহ্বান করে ও পরে চক্ষের দ্বারা খুঁজিয়া পায়। মুনিয়া পাখী একটি থাকিলে তাহার স্বর শুনিয়া অনেক বন্য মুনিয়া আসিয়া থাকে ও এইরূপেই অনেক পাখী ধরা হয়। কোকিল প্রভৃতির স্বর অনেক দূর হইতে শুনিতে পাওয়া যায়।

আবার পাখীদের মধ্যে পুরুষ পাখীই গান করে, স্ত্রী-পক্ষী পারে না। কোকিলের রব পুংপক্ষীর, ইহার দ্বারা সে স্ত্রীপক্ষীকে আহ্বান করে; কোনো কোনো স্ত্রী-পক্ষী একরকম স্বরে পুং-পক্ষীকে আহ্বান করে বটে, কিন্তু তাহাকে 'গান' বলা যায় না, তবে কখনো কখনো পিঞ্জরাবদ্ধ স্ত্রী-পক্ষীকে গাহিতে দেখা গিয়াছে, তাহা কদাচিৎ। মোটের উপর, সকল গায়ক পক্ষীই পুরুষ, স্ত্রী-পক্ষীর 'গলা' নাই।

আবার গায়ক পক্ষী মাত্রেই ছোট হয়। বিশাল-দেহ অসট্রিচ্ প্রভৃতি গান গাহিতে পারে না। আবার অনেক পাখীর গান গাহিবার উপযুক্ত কণ্ঠ আছে, কিন্তু তাহারা গায় না। আমাদের পরিচিত চড়ুই গাহিতে পারে এবং শিক্ষা দিলে সুন্দর শিস্ দেয়। একটি কেনেরি পক্ষীকে ইংরেজী নাচের সুর শিখান হইয়াছিল। আমাদের কাকের কণ্ঠ এরূপ যে সেও চেষ্টা করিলে গাহিতে পারে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে প্রায় গায়ক পক্ষী মাত্রেই উজ্জ্বল বর্ণের হয় না। "কোকিল যে কাল তাতে কিবা আসে যায়" ইহা প্রায় সকল গায়ক পাখীর বেলায় খাটে। যাহাদের রূপ নাই তাহাদের গান আছে। যদিও সকল রূপহীন পাখী গায়ক নহে বটে কিন্তু অধিকাংশ উজ্জ্বল বেশধারী পক্ষীই গীতহীন।

এতক্ষণ কেবল পাখীর গানের কথাই বলিলাম। পাখীরা যে আবার বাদ্যও বাজায় তাহা বোধ হয় জান না। গীত মানে যাহা কণ্ঠ হইতে হয়; বাদ্য মানে যাহা অন্য কোনো যন্ত্রের সাহায্যে করা যায়।

ময়ূর প্রভৃতি ডানা নাড়িয়া বাদ্য করে। আমেরিকার

একরকম হাঁস এইরূপে শব্দ করে যে তাহা প্রায় অনেক দূর হইতে মেঘ ডাকার মত বোধ হয়। কেহ বা ঝুমঝুমির মত, কেহ বা অন্যরকম শব্দ ডানার পালক দ্বারা করিয়া থাকে।

কোনো পাখী আবার গীত ও বাদ্য দুই করে, 'হুপি' পাখী, যাহা বাঙ্গালা দেশেও দেখা যায়, তাহারা গাছে ঠোঁট ঠুকিয়া ও সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠে একরকম শব্দ করিয়া গীত-বাদ্যের সাধ মিটায়। বসন্তগৌরী ও কাঠঠোক্‌রাও শুষ্ক ডালে ঠোঁটের দ্বারা বেশ তাল দেয়।

শ্রী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

নিদ্রা

শরীর সুস্থ রাখ্‌তে হ'লে, এমন কতকগুলি নিয়ম আছে যা পালন না কর্‌লে একেবারেই চলে না। নিদ্রা সেইসব দর্‌কারী জিনিসের মধ্যে একটি। আহারটাকেই আমরা সবচেয়ে দর্‌কারী বলে' জানি। কিন্তু নিদ্রা যে তার চেয়েও বেশী প্রয়োজনীয় সেটা অনেকেরই মনে আসে না। হিসাবে প্রকাশ, বায়ুর অভাবে পাঁচ মিনিটে, জলের অভাবে সাত দিনে ও নিদ্রার অভাবে দশ দিনে মানুষ মরে' যায়। খাদ্যাভাবে কতদিন মানুষ বাঁচে তার সঠিক খবর এখনও পাওয়া যায়নি। অতএব দেখা যাচ্ছে, নিদ্রা শরীরের পক্ষে কম প্রয়োজনীয় বস্তু নয়!

সাধারণতঃ আমরা কতক্ষণ নিদ্রা যাই? ৬ হইতে ৮ ঘণ্টা কাল। তা হ'লে ভেবে দেখো সারাজীবনে এক নিদ্রাতেই আমরা এক তৃতীয়াংশ সময় অতিবাহিত করি। অর্থাৎ যে ব্যক্তির বয়স ১০০ বৎসর তাহার জীবনের প্রায় ৩৩টি মূল্যবান্ বৎসর একমাত্র নিদ্রাতেই কেটে গেছে। এবিষয়ে ডাক্তারের পরামর্শ চাইলে তাঁরা বল্‌বেন যে কতক্ষণ ঘুমোতে হবে তার কোনো বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই। যতক্ষণ না শরীর বেশ ঝর্‌ঝরে হয় ততক্ষণ ঘুমোনো দর্‌কার। আর-একটি কথা, খাওয়ার উপরেই নিদ্রার পরিমাণ বেশী নির্ভর করে। যে খায় বেশী হজম কর্‌বার জন্য তার পক্ষে ঘুম একটু বেশীক্ষণ দর্‌কার হবে। শুনা যায় 'এডিসন' সাহেব রোজ চার-পাঁচ ঘণ্টার বেশী ঘুমোতেন না। তিনি দিনে একবার মাত্র আহার কর্‌তেন।

তার পর দেখ্‌তে হবে নিদ্রাকালে কিরূপভাবে শয়ন করা উচিত। ইহার উত্তর এই যে পাশ ফিরে' শয়ন করাই প্রশস্ত। পৃথিবীতে এমন কোন জীব নেই যে চিৎ হ'য়ে শোয়। একমাত্র মানুষকেই চিৎ হ'য়ে শুতে দেখা যায়। এ-বিষয়ে মানুষের উচিত পশুদের অনুকরণ করা। কারণ চিৎ হ'য়ে শুলে নিদ্রার নানারকম ব্যাঘাত হ'য়ে থাকে। অনেককে এজন্যে ঘুমোতে না ঘুমোতেই উঠে' ঘুরে' বেড়াতে দেখা যায়। কিন্তু পাশ ফিরে' শুলে কোনরূপেই নিদ্রার অস্বচ্ছন্দতা উপলব্ধি হয় না। শরীরের বাঁমদিকে হৃৎপিণ্ড ও পাকস্থলী থাকে। সেজন্য চিকিৎসকগণ ডান পাশ ফিরে শোবার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কারণ ডান-পাশ ফিরে শুলে হৃৎপিণ্ডে বা পাকস্থলীতে চাপ পড়্‌বার কি অন্য কোনপ্রকার অনিষ্ট হবার ভয় থাকে না।

গুড়িসুড়ি হ'য়ে শোয়াও এক মস্ত বদ্-অভ্যাস। যতদূর পারা যায় সমান হ'য়ে শোয়া সকলেরই কর্ত্তব্য।

দিবানিদ্রা অবশ্য পরিহার্য্য। ইহা প্রায়ই আলস্যের জন্মদাতা। অধিকন্তু ইহার ন্যায় স্বাস্থ্যহানিকর কুঅভ্যাস আর দুটি নেই।

নিদ্রা যাবার সময়ে সর্ব্বদাই মনকে প্রফুল্ল রাখ্‌বে। এ সময়ে কাহারও দুশ্চিন্তায় মনকে জর্জ্জরিত করা উচিত নয়। এর কারণ বল্‌ছি। নিদ্রা যাবার পূর্ব্বে যা ভাবা যায়, নিদ্রার সময়ে প্রায়ই তা স্বপ্নাকারে মানসচক্ষে উদিত হয়। কিন্তু সে-সময়ে যদি স্বপ্ন এসে মনকে ভারাক্রান্ত করে' তোলে, তা হ'লে নিদ্রার সময়ে মনের বিশ্রাম লাভ হয় না। আর সেইজন্যই নানাবিধ মানসিক ব্যাধির উৎপত্তি হ'য়ে থাকে।

সকালে যখন ঘুম ভাঙ্‌বে তখনই বিছানা ছেড়ে ওঠা উচিত। তা না করে' অনেকে যে অলসভাবে অনেকক্ষণ ধরে' বিছানায় গড়াগড়ি দেয়, সেটা ভাল নয়।

শয়ন-গৃহে যাতে ভাল করে' বাতাস চলাচল কর্‌তে পারে তার বন্দোবস্ত কর্‌তে হবে। কারণ নিদ্রাকালে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য বায়ুর প্রাচুর্য্য অত্যাবশ্যক।

নিদ্রা শরীরের একটি প্রধান ঔষধ। জাগরিত অবস্থায় যেসকল স্নায়ু কার্য্য করে' শ্রান্ত হ'য়ে পড়ে, নিদ্রা তাদের সতেজ করে' তোলে। তা ছাড়া নিদ্রা থেকে উঠে'

আমাদের প্রাণে একটা নবজীবনের সাড়া পড়ে' যায়, বিপুল উৎসাহে ও নবীন আনন্দে আমাদের সজীব হৃদয়-তন্ত্রী ঝঙ্কৃত হ'য়ে ওঠে।

শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

—

মঙ্গল গ্রহে

সে অনেক দিন পরের কথা। বাঙালীর তখন আর জগতে ভীতো বলে' নাম নেই। এখন তার ভেতো নাম ঘুচে' গেছে। জগতের মাঝে সে একটা আসন পেয়েছে; জগতের যে-কোন বড় কাজেই সে এখন অংশ গ্রহণ করে, পেছিয়ে পড়ে' থাকে না। কোনো নতুন দেশ আবিষ্কার করতে হ'লে, কোনো তুঙ্গশৃঙ্গ পর্ব্বতে আরোহণ করতে হ'লে বাঙালী পিছিয়ে থাকে না, সকলে আগে মাথা পেতে দেয় সেইসব কাজে। এখন পুরানো ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, কত অসম্ভবকে সম্ভব করতে গিয়ে কত বাঙালী প্রাণ দিয়েছেন,—প্রাণ দিয়ে অমর হয়েছেন!

এখন থেকে অনেক বছর আগে, এক আমেরিকান্ সাহেব, যে একরকমের প্রকাণ্ড হাউই তৈরী করে' চন্দ্রের দিকে ছুঁড়েছিলেন, আর যেটা ঠিক চন্দ্রে গিয়ে পৌঁছেছিল সেরকম হাউইএর এখন অনেক উন্নতি হয়েছে। আর সে উন্নতি করেছেন একজন বাঙালী বৈজ্ঞানিক। সেটা এখন এত তেজে ছোটে যে মঙ্গল গ্রহ অবধি যায়। তাই সবদেশের বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা মিলে সেই বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিককে ধরেছে যে, একজন কেউ সেই হাউইএ চেপে মঙ্গল-গ্রহ অবধি যাক। সেখানে কে আছে, কি আছে দেখে' আসুক। কিন্তু যে-সে কেউ গেলে ত চলবে না। এমন একজনার যাওয়া চাই, যে কিনা এমন তেজীয়ান্ হাউই তৈরীর নিয়মকানুন মালমশ্‌লা জানে, যাতে মঙ্গল-গ্রহ থেকে এম্‌নি করে'ই ফিরে' আস্‌তে পারে। কিন্তু বাঙালী ছাড়া আর কেউ ত এর নির্ম্মাণ-প্রণালী জানে না, তাই একজন বাঙালীরই যাওয়া দরকার। তাই তিনি নিজেই যেতে চাইলেন। কিন্তু আমরা তাঁর সহকারীরা কেউই তাঁকে যেতে দিতে চাইলাম না। কারণ এ কাজটা বিপদ্-সঙ্কুল; এমন বিপদ্ ঘট্‌তে পারে যাতে করে' প্রাণটাও যেতে পারে। তা ছাড়া সেখানে হয়ত হাউই-তৈরীর মাল-মশ্‌লার অভাবও ঘট্‌তে পারে যাতে এ-পৃথিবীতে ঘুরে' আসাও অসম্ভব হ'তে পারে। এ অবস্থায় তাঁকে যেতে দেওয়া যায় না। কারণ তিনি থাক্‌লে জগতের অনেক উপকার করতে পারবেন। তাই সহকারীদের মধ্য থেকেই আমরা একজন যাব ঠিক হ'ল। সহকারীদের মধ্যে আমিই ছিলাম সব চাইতে ছোট। আর তা ছাড়া সংসারেও আমার আমার-বল্‌তে কেউ ছিল না। আর-সকল-কারই বিয়ে হয়েছে; মারা গেলে পরিবারের অন্নুপায় হবে। তাই আমারই যাওয়া ঠিক হ'ল। ঠিক হ'ল এভারেষ্ট থেকে হাউই ছোড়া হবে। এভারেষ্ট তখন আর দুরারোহ ছিল না।

রেডিয়ো-ফোনে জগতের সব বৈজ্ঞানিককেই এ-সংবাদ জানানো হ'ল। এক ঘণ্টার মধ্যেই অনেকেই উত্তর দিলেন আমার যাবার সময় তাঁরা উপস্থিত হবেন।

যাবার দিন ঠিক সময়েই এভারেষ্ট-চূড়ায় উপস্থিত হলাম। দেশের অনেক বড় বড় লোক ও আমার গুরুদেব—সবাই সেখানে আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন। গুরুদেব নিজেই হাউই তৈরী থেকে আরম্ভ করে' ছোড়্‌বার বন্দোবস্ত পর্য্যন্ত সব ঠিক করে' রেখেছিলেন।

হাউইটি ছোড়্‌বার উপযোগী করে' সাজানো রয়েছে। আগুন দিলেই উল্কাবেগে ছুট্‌তে আরম্ভ করবে। ক্রমে যাবার সময় হ'য়ে এল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে শোঁ শোঁ শব্দে এরোপ্লেনে করে' বৈজ্ঞানিকেরা চারদিক্ থেকে সেখানে উপস্থিত হলেন। যখন কেউই বাকী রইলেন না তখন আমি তাঁদের কাছ থেকে বিদায় চাইলাম। তাঁরা সবাই আমার প্রশংসা করলেন আর আশা দিলেন কার্য্যোদ্ধার করে' ফিরে' আস্‌তে সক্ষম হব। আমি আর কালবিলম্ব না করে' হাউইএর মধ্যে ইস্পাতের তৈরী ঘরে হাসিমুখে প্রবেশ করলাম। লোহার ঘরের বাইরে এমন-সব বৈজ্ঞানিক ওষুধপত্র আছে যে হাজার গরম হলেও বাইরেই সেটা থেকে যাবে, ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে'ই দেখি আমার বসবার চেয়ার আর একটা এ্যালুমিনিয়ামের টেবিল রয়েছে। টেবিলের উপর খানা-ফোন সাজানো। খানাফোনে সবরকম খাবারেরই এসেন্স আছে। যা

খেতে ইচ্ছে যাবে, ইন্‌ডেক্স্‌ ঘুরিয়ে দিলেই এক ফোঁটা এসেন্স্‌ পড়্‌বে আর তাইতেই তোমার আকাঙ্ক্ষা মিটে' যাবে। চেয়ারে বসে'ই উপরের দিকে চেয়ে দেখ্‌লাম ছাদের সাথে তুখানা লেন্স্‌ আঁটা। লেন্স্‌ দিয়ে একবার আকাশের অবস্থাটা দেখে' নিলাম। হাউইএর উপর-দিক্‌টা—যে-দিক্‌টাতে আমার ঘর সেটাই—ছিল সরু আর ওজনে কম। নীচের দিক্‌টা ছিল ভারী।

আমি চারদিক এঁটে-সেঁটে বসে' সঙ্কেত কর্‌তেই শুন্‌লাম বাইরে ব্যাণ্ড্‌ বেজে উঠ্‌ল। আর সাথে সাথে ঘরখানা কেঁপে উঠ্‌ল; বুঝ্‌লাম আমি মঙ্গল-গ্রহের দিকে অগ্রসর হলাম। শোঁ। শোঁ। শব্দে ভীষণ-বেগে উল্কার মতন ছুটে' চল্‌লাম।

চলেইছি; চলেইছি; ক্রমে বেগটা বেড়ে উঠ্‌ল। বুঝ্‌লাম বাতাসের আওতা ছেড়ে গেছি; এবারে ইথারের মধ্য দিয়ে চলেছি। খেয়ে নিলাম। তার পর মাথার উপরকার লেন্স্‌ দিয়ে চেয়ে দেখ্‌লাম চন্দ্রটা অনেক বড় দেখাচ্ছে। সেই শক্তিশালী লেন্সের সাহায্যে বুঝ্‌লাম, চন্দ্রে জীব-জন্তু জন প্রাণী কিছুই নেই; আছে কেবল পাহাড় আর পাথর। চন্দ্রের চারিদিক্‌টাই কুয়াসার মত একটা কি পদার্থে ঢাকা। জল নেই এক ফোঁটাও। যতক্ষণ চন্দ্রের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম ততক্ষণ হাউইয়ের বেগটা যেন একটু কমে' গিয়েছিল—কারণ, চন্দ্রের আকর্ষণ। ক্রমে চন্দ্র ছাড়িয়ে যেতেই আবার ভীম-বেগে ছুটতে লাগ্‌লাম। ছুটে' চলেছি; দেখ্‌তে পেলাম মঙ্গল-গ্রহের উপর সব যেন কিসের দাগ কাটা। আর সেসব দাগগুলো উত্তরমেরু আর দক্ষিণ-মেরু থেকে বিষুব-রেখা পর্য্যন্ত। এসব দেখ্‌তে দেখ্‌তে এগিয়ে চলেছি। ক্রমে মঙ্গলের পাশে তুটো চাঁদ দেখ্‌তে পেলাম। আমাদের যেমন একটা চাঁদ, মঙ্গলের তেম্‌নি তুটো চাঁদ।

আরও খানিকটা এগুতেই হঠাৎ একবার ডিগ্‌বাজী খেলাম, আর এই সময়টাতেই হাউইয়ের আগুন নিভে গেল। বুঝ্‌লাম এবারে মঙ্গলের আকর্ষণের মধ্যে গিয়ে পড়েছি। হাউইটা এমনি চুলচেরা হিসাবে তৈরী ছিল যে পৃথিবীর আকর্ষণের বাইরে গেলেই আগুন নিভে যাবে। ডিগবাজী খেয়েই কিন্তু পৃথিবীর দিকে নজর পড়্‌ল। দেখ্‌লাম পৃথিবীটাকেও এখান থেকে তেম্‌নি ছোট দেখাচ্ছে যেমন কিনা পৃথিবী থেকে সন্ধ্যা-তারা দেখা যায়। এই ডিগ্‌বাজী খাবার কারণ ঐ যে কোন জিনিষের ভারী অংশ-টাতেই আকর্ষণ বেশী হয়।

এবার আবার পড়্‌তে আরম্ভ কর্‌লাম। এটা ঠিক জানি যে মঙ্গল-গ্রহের উপরই পড়্‌ব; তবে জলের উপর পড়্‌তেও পারি, ডাঙায় পড়্‌তেও পারি। যেখানেই পড়ি না কেন কোন আশঙ্কা নেই, কারণ জলে পড়্‌লে নৌকোর মতই ভাস্‌ব এম্‌নিভাবেই ঘরখানা তৈরী। আর ডাঙায় পড়্‌লেও ভয় নেই—ঘরের নীচেই এমন-সব স্প্রীং-আঁটা যে হাজার বেগে পড়্‌লেও চুরমার হবার ভয় নেই।

পড়্‌ছি, পড়্‌তে পড়্‌তে দেখি একজায়গায় আমার মাথার উপর দিয়ে খান-কয়েক এরোপ্লেনের মতন কি উড়ে গেল। তাতে যেন মানুষের মতও দেখ্‌লাম। আমি একটু অবাক্‌ হলাম। তার পর আর খানিকক্ষণ পড়্‌বার পর হঠাৎ একটা ভয়ানক ধাক্কা খেলাম। আর সেই ধাক্কার চোটেই ঘরের মেঝে থেকে খানিকটা শূন্যে উঠ্‌লাম। কোন জিনিষ বেগে যেতে যেতে বাধা পেলে ঠিক ততটা বেগ সাম্‌লাতে হয়। দোলন থাম্‌তেই আমি দরজা খুলে' বেরিয়ে পড়্‌লাম। দেখি আমার চারিপাশে আমাদের মানুষের মতনই কতকগুলো জীব অবাক্‌ হ'য়ে চেয়ে রয়েছে। লম্বা-চৌড়ায় তারা আমাদের চাইতে অনেক বড়। তারাই প্রথমে কথা বল্‌লে। কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। আমি হাত নেড়ে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিতে বল্‌লাম। তারা আমাকে টেনে নিয়ে একটা টেলিস্কোপের কাছে গেল। তাতে চেয়ে দেখ্‌তে ইসারা করে' বোঝালে আমি পৃথিবী থেকে আস্‌ছি। আমি টেলিস্কোপের ভিতর দিয়ে চেয়ে দেখি পৃথিবীতে কি হয় না হয় সবই এর সাহায্যে দেখা যায়—এম্‌নি শক্তিশালী এটা। বুঝ্‌তে পার্‌লাম এরা বিজ্ঞানে আমাদের চাইতে অনেক উচ্চে। তারা আমায় বুঝিয়ে দিলে আমি যে রওনা হয়েছি তা দেখ্‌তে পেয়ে তারা আমার আশা কর্‌ছিল। তার পর খানিক আগে আমি পড়্‌ছি দেখে' এরোপ্লেন পাঠিয়েছিল দেখ্‌তে ব্যাপার কি? দেখ্‌লাম সেখানটাতে মস্ত বড় তারহীন

টেলিগ্রাফের যন্ত্র। ইসারায় বল্‌লে যে তারা অনেক দিন থেকেই পৃথিবীতে খবর পাঠাচ্ছে কিন্তু কোন উত্তর পায়নি। বুঝ্‌লাম আমাদের তারহীন টেলিগ্রাফের যন্ত্রগুলোতে যে মাঝে মাঝে অবোধ্য সঙ্কেত-শব্দ ধরা পড়্‌ত তা এরাই পাঠিয়েছে।

তার পর তারা আমায় সে-দেশের বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা করুলে। আমি সেখানেই দিন কয়েক তাদের সঙ্গেই রইলাম। ক্রমে ক্রমে ইঙ্গিত ও সেই সঙ্গে শব্দ শুনেও তাদের ভাষা অনেকটা বুঝ্‌তে শিখ্‌লাম। তাদের অনুকরণে শেষে নিজেও উচ্চারণ করে' পর্য্যন্ত তাদের সঙ্গে বাক্যবিনিময় করেছি। তাদের মধ্যে খুব সুখেই দিন কয়েক কাটিয়েছিলাম। কোনো অভাবই আমার ছিল না। তার পর দিনকয়েক গেলে দ্রুতগামী এরোপ্লেনে চড়ে' মঙ্গল প্রদক্ষিণ করুলাম। দেখ্‌লাম বিষুব-রেখার কাছটাতেই এসব লোকেরা বাস করে। মেরুর কাছে, পৃথিবীর মতই লোক বিরল। কিন্তু এদের বসতিতে বৃষ্টি হয় না এক ফোঁটাও। তাই চাষ-বাসের সুবিধার জন্য এরা মেরু থেকে বিষুবরেখা অবধি বড় বড় খাল কেটে এনেছে। যখন বরফ গলে, খাল বেয়ে এ-প্রদেশে জল আসে আর তাইতেই চাষ-বাস চলে। এত বড় খাল কাটা কম বুদ্ধি ও কম অধ্যবসায়ের কর্ম্ম নয়! শস্যের ক্ষেত্রগুলো এত বিস্তৃত যে মর্ত্ত্যের লোকে কল্পনা করুতেও পারবে না। এই খালগুলো পৃথিবী থেকে টেলিস্কোপের সাহায্যে কাল কাল দাগ বলে' প্রতীয়মান হয়। ক'দিন ধরে' এদের সব বেড়িয়ে দেখ্‌বার পর আমি পৃথিবীতে ফিরে' আস্‌তে চাইলাম। তাদের কাছে হাউই তৈয়ারির মশলা চাইলে তারা বুঝ্‌তে পারুলে না, আমায় ল্যাবরেটারীতে নিয়ে গেল। সেখানে এত পদার্থ দেখ্‌লাম যা পৃথিবীতে কখনো দেখিনি। ক'দিন পরে' হাউই তৈরী করুবার পর তাঁদের কাছ থেকে চোখের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে পৃথিবীতে ফিরে' এলাম।

শ্রী নির্ম্মলকুমার রায়

—

দর্জ্জির বুদ্ধি

অনেকদিন আগেকার কথা। বিক্রমাদিত্য তখন এ দেশের রাজা। ভাত-কাপড়ের জন্য লোকের এখন যেমন মেহনৎ করুতে হয়, তখন তেমন করুতে হ'ত না। বছরের ভিতর অনেকগুলো দিন থাকৃত ছুটির দিন; তা'তে কাজ করুতে হ'ত না, অথচ মাইনে পাওয়া যেত; সুতরাং কর্ম্মকর্ত্তাদের বিরক্তি হ'লেও কর্ম্মচারীরা নতুন কোন ছুটির সৃষ্টিতে খুব আনন্দ পেত। এম্‌নি সময়ে একটা নতুন ছুটির হুকুম বেরুল মহারাজ বিক্রমাদিত্যের জন্মদিন। দেশসুদ্ধ লোকে মহাখুসী। ছুটির দিনে লোক নিযুক্ত হ'ল তদন্ত করুবার জন্যে যে সবাই ছুটি মান্‌ছে কি না। বাস্তবিক সকলেই পর্ব্বটি আনন্দের সঙ্গে পালন করুছিল, কাজকর্ম্ম বন্ধ করে' ফূর্ত্তি করুছিল; খালি একজন দর্জ্জি, সে রোজকার মতো তার অভ্যস্ত কাজ সেলাই ফোঁড়াই করে'ই চলেছিল। বেশীক্ষণ সে রাজকর্ম্মচারীর চোখ এড়াতে পারেনি, শীঘ্রই ধরা পড়্‌ল এবং তাকে রাজার কাছে নিয়ে যাওয়া হ'ল; রাজা জিজ্ঞাসা করুলেন আমার হুকুম অমান্য করে' আমার জন্মদিনের ছুটিতে তুমি কাজ করুছিলে কেন? দর্জ্জি বিনীত-ভাবে উত্তর দিলে—'হুজুর রোজ আমার আট আনা রোজগার করা দরকার, তা না হ'লে আমার চলে না, তাই কাজ করুছিলাম।' রাজা জিজ্ঞাসা করুলেন—"ঠিক আট আনা তুমি রোজ কি কর?" দর্জ্জি বল্‌লে—

"শুধিতে আগের ধার লাগে দুই আনা,
দুই আনা ধার দিই, দু আনাতে খানা,
দু'আনা হারাই রোজ ধর্ম্ম-অবতার,
তাই আট আনা রোজ করি রোজ্‌গার।"

রাজা বিস্ময়ের সহিত দর্জ্জির এই অদ্ভুত শ্লোক শুন্‌ছিলেন এবং কিছুকাল ভেবে যখন কোন মানে আবিষ্কার করুতে পারুলেন না তখন দর্জ্জিকেই এর মানে জিজ্ঞাসা করুলেন। দর্জ্জি বল্‌লে—আমার এক বুড়ো বাপ আছেন, তিনি আমাকে ছোটবেলা খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছিলেন, এখন তিনি কাজ করুতে পারবেন না, তাঁকে প্রত্যহ দু আনা করে' দিই,—এটা আমি তাঁর আগে দেওয়া ধার-শোধ মনে করি। আমার ছেলেকে দিই রোজ দু'আনা; আমি যখন বুড়ো হব, তখন সে এই ধার শোধ দেবে। নিজের খোরাকীর জন্য লাগে

দু'আনা; আর স্ত্রীকে দিই দু'আনা,—এটা আমি হারানো মনে করি, কারণ আমি মারা গেলে সে ফের বিয়ে করবে, আমার কথা মনেও করবে না।" রাজা এই অর্থ শুনে' খুব খুসী হলেন এবং দর্জিকে ছেড়ে দিলেন, কিন্তু বলে' দিলেন যে যদি এই অর্থ একশ'বার রাজার মুখ দেখবার আগে কাকেও বলে তবে তার প্রাণদণ্ড হবে। তার পর সভায় গিয়ে রাজা পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করলেন—

"শুধিতে আগের ধার * * ইত্যাদি। এর অর্থ কি?"

পণ্ডিতেরা অবাক্। রাজা বললেন যে এক হপ্তার ভিতর যদি তোমরা এর মানে বলতে না পার, তবে রাজ-সভায় আর তোমাদের স্থান হবে না। পণ্ডিতেরা অনেক মাথা ঘামিয়েও এক হপ্তার ভিতর কিছু আবিষ্কার করতে পারলেন না; শেষ দিন সবাই বিষন্নমুখে সভায় চললেন। হঠাৎ কালিদাসের মাথায় এক বুদ্ধি এল; তিনি ভাবলেন যে দর্জির সঙ্গে দেখা হবার পরই রাজা এ প্রশ্ন করেছেন, সুতরাং তার সঙ্গে এ শ্লোকের কোন সম্বন্ধ আছেই। তিনি তখনি দর্জির বাড়ী হাজির হলেন এবং এর অর্থ বের করবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। সে লোকটা প্রথমে কিছুই বলবে না, অবশেষে লোভ দেখিয়ে তাকে রাজি করা হ'ল এবং ঠিক হ'ল একশ' টাকা তাকে আগাম দিতে হবে তবে সে অর্থ বলবে। তাই করা হ'ল। দরজি তখন প্রত্যেক টাকাটি ভাল করে' পরীক্ষা করে' বাক্সে পুরে শ্লোকের অর্থ বলে' দিলে। কালিদাস এক ছুটে রাজসভায় গিয়ে দেখলেন পণ্ডিতেরা বিমর্ষ হ'য়ে বসে আছেন আর রাজা জমকাল পোষাকে মস্ত উঁচু সিংহাসনে বসে' সেই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করছেন। কালিদাস তখনি মানে বললে। রাজা চমকে উঠে' বললেন—"বিশ্বাস-ঘাতকতা! আচ্ছা! আমি আসছি।" এই বলে' গুপ্তকক্ষে গিয়ে দর্জিকে তলব করলেন এবং সে এলে অগ্নিমূর্ত্তি হ'য়ে বললেন—কোন্ সাহসে তুমি আমার হুকুম অমান্য করেছ? দরজি জানালে, সে কোন হুকুম অমান্য করেনি। রাজা বললেন, তবে কালিদাস কি করে' সে শ্লোকের অর্থ জানলে? দরজি বললে—আপনার হুকুম-মতো, একশ'টি টাকার উপর একশ'বার আপনার মুখ ভালো করে' দেখে' তবে মানে বলে' দিয়েছি। রাজা শুনে হেসে বললেন—আমার সমস্ত পণ্ডিতের চাইতে তোমার বুদ্ধি বেশী। এবং তাকে বেশ মোটা-রকম বক্শিষ দিয়ে বিদায় করলেন।

শ্রী নগেন্দ্রনাথ সেন

বর্ষ-বরণ

দীপ্ত দিনের আলো
মুছিয়ে দিতে দীর্ঘ রাতের পুঞ্জীভূত আঁধার ঘন-কালো
আসে যেমন রঙীন হেসে নবীন প্রভাতে;
ঊষার উজল স্বর্ণ-প্রপাত উচ্ছ্বসিত ধারায়
ছড়িয়ে পড়ে যেমন তারায় তারায়
আকাশ ছেয়ে পূবের সভাতে;
তেম্‌নি কি আজ পূর্ণ দ্বাদশ মাসের
সঞ্চিত শোক সকল ব্যথার জমাট দীর্ঘশ্বাসের
ভুলিয়ে দিতে দুঃখ, দহন-জ্বালা,
নববর্ষ নাম্‌ল এসে
গহন-পারে মোহন হেসে
জড়িয়ে কেশে বন-চামেলীর মালা!

তুহিন-শীতল শুভ্র শীতের শেষে
সকল দেশে দেশে
উঠেছে যার আগমনীর সাড়া,
নিবিড় বনের স্তব্ধ মনের মাঝে
পুনর্নবীন সাজে
সেজে ওঠার গিছ্‌ল প'ড়ে তাড়া!
দিবানিশি অশ্রান্ত তার ডাকে
মত্ত কোকিল যাকে
ফাগুন থেকে করছে আবাহন,
আজ প্রভাতে আচম্বিতে দেখলে সবাই তারে
এই ধরণীর বিরাট্ সিংহদ্বারে
দাঁড়িয়েছে সে রাখতে নিমন্ত্রণ!

নিদাঘ-দূতে দেখ্‌তে এল পূর্ণিমা আজ ছুটে,
জড়িয়ে দেহ জ্যোতির্গেহ জ্যোৎস্না-উজল-বাস
ভূমির পরে লুটে।
অতিথি তার প্রিয়
অগ্নি-বরণ অঙ্গে দিয়ে উশীর-উত্তরীয়
এসেছে ঐ কাল-ব'শেখের প্রলয়-রথে চড়ে' ;
বেলকুঁড়ি তার গলায় গাঁথা,
মাথায় কনক-চাঁপার ছাতা,
ঢুলছে বুকে পুষ্পোপবীত টাট্‌কা জুঁয়ের গোড়ে !
নীল চোখে তার প্রেমের অনল জাগে,
কি আনন্দে গভীর অনুরাগে
চাইছে যেন সবার মুখের পানে,
সেই নয়নের প্রীতির পরশ পেয়ে
পুলক-রসে ছেয়ে
দিগন্ত আজ উঠ্‌ল ভ'রে গানে।
তরু-লতার তরুণ বধূ যত
আপন-হারার মত
কুঞ্জ-পথে বেরিয়ে এল, ওরে,
ঘোম্‌টা খুলে পড়্‌ছে তাদের মাথার ;
চক্‌চকে ওই চিকণ কচি পাতার
ফিঁকে সবুজ আঙ্‌রাখা আজ প'রে
দাঁড়িয়ে আছে অধীর কুতূহলে
শাল-তমালের দলে
দেবদারুদের বন ;
খবর নিয়ে সবার দ্বারে দ্বারে
ফির্‌ছে বারে বারে
দখিন-হাওয়া উতল উচাটন !
নবদূর্ব্বা উল্লসিত চিতে
বিছিয়ে দিয়ে আজকে চারিভিতে
নবীন তৃণের হরিৎ আঁচলখানি
শিউরে ওঠে হঠাৎ ক্ষণে ক্ষণে
চেনা পায়ের নূতন নূপুর সনে
মিলন এবার নিকট হ'ল জানি !
বর্ষ এল ! এল আবার যেন
অজানা কোন্ অচিন লোকের হেন
প'রে নূতন দিগ্বিজয়ীর বেশ !
তার নয়নের বাঁকা-তড়িৎ ভুরু
ইঙ্গিতে যার আজকে প্রথম দিন হবে ফের শুরু,
আদেশে তার অতীত হ'ল শেষ,
বাজিয়ে শিঙা শ্মশান-শিবের বাজন্
বিদায় দিলে গাজন
সব পুরাতন পার্ব্বণীকে আজ ;
এই নিখিলের নব রূপের আলো
চোখে আবার লাগ্‌বে ব'লে ভালো
পরিয়ে দেবে নূতন ক'রে নবীনতর সাজ !
বর্ষ-রথের বদ্‌লে বারো চাকা
যুগ্ম-ছবি ষড় ঋতুর রং-বেরঙে আঁকা
দেখাবে সে নূতন ক'রে ফের,
বধূর বুকে জাগিয়ে তুলে আশা,
শিশুর মুখে অস্ফুট তার ভাষা,
ভুলিয়ে দেবে পুরাতনের জের।
আস্‌বে আবার আষাঢ়ে তার এলিয়ে চিকুর
আকুল বর্ষারাণী,
ঝরিয়ে মেঘের বুক-চেরা তার বাদল ঝর্ণাখানি,
কেয়ার বনে কদম-ঝাড়ের তলে,
সোনার কিরণ-করঙ্ক-ভার উজাড় করে' দেশে
শরৎ আবার আস্‌বে অমল হেসে,
কমল-মালা দুল্‌বে গো তার গলে !
নিশির শিশির কুঞ্জবালায়
সাজিয়ে দেবে মোতির মালায়
দুল্‌বে লতা পাতার কানে তরল হীরার দুল ;
হিম ফুরালেই মকর-মেলা
ফাল্গুনে ফের ফাগের খেলা
নূতন রঙে করবে রঙীন অশোক-বনে ফুল !

*　　*　　*　　*

এল নবীন, এল তরুণ ;
হাত ধরে' তার নূতন অরুণ
আনন্দে ওই উঠ্‌ছে যেন হেসে,
পথ চেয়ে তার ছিল যারা
চৈত্র-রাতে নিদ্রা-হারা
বরণ ক'রে নিল তারা ব্যাকুল হ'য়ে এসে !

শ্রী নরেন্দ্র দেব

ভুল ভাঙ্গা—শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত—অমর সিরিজ ১নং। অমর লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২৲। পৃঃ ১—৩১১।

বইখানি প্রসিদ্ধ অভিনেতা ৺ অমরেন্দ্রনাথ দত্তের পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক বিরচিত। গ্রন্থকার হাস্য-রসিক, তিনি এই গ্রন্থে উপহাস পরিহাস প্রভৃতি হাস্যের বহুবিধ বিভাগে নিজের কৃতিত্ব দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রথমেই পিতৃশ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিনে মাথা কামাইবার উপলক্ষে তাঁহার গল্পের নায়ক শরৎচন্দ্র ঘোষের যে চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য। এই জাতীয় সিকি- বা অর্দ্ধ-শিক্ষিত বানর কলিকাতার ধনী এবং অভিমানী কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে নিত্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর লোক কেবল কলিকাতাতেই দেখিতে পাওয়া যায়, কলিকাতার অনুকরণে এখনও মফস্বলে প্রচলিত হয় নাই। ভৈরবচন্দ্র ঘোষের চিত্রটিও নিখুঁত। অশিক্ষিত কিন্তু পাশ্চাত্যশিক্ষা-প্রয়াসী ধনী উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশনিবাসীর চিত্র। লেখকের প্রধান দোষ এই যে তিনি অল্প কথায় নিজের মনের ভাব বুঝাইতে পারেন না এবং শরৎ ও ভৈরব ঘোষের চিত্রটি স্পষ্ট করিয়া তুলিতেই তাঁহার ৩১১ পাতা বইয়ের ২০০ পাতা শেষ হইয়া গিয়াছে। এই বাচালতা দোষে তাঁহার গল্পটি ভাল জমিতে পায় নাই।

শরৎচন্দ্রের মত যুবা এখনও কলিকাতায় দুই চারিটি আছেন, তাঁহারা মুখে রং মাখিয়া দিনের বেলায় পথে বাহির হন, বিলাতী সুগন্ধ ছড়াইয়া আপনাদিগকে ময়ূরপুচ্ছ ষড়াননের মত সর্ব্বদাই কন্দর্প-কান্তি-বিশিষ্ট মনে করেন।

ভুল ভাঙ্গা গল্পটির শেষটি ভাল নহে। শরতের পরিণামটা সম্পূর্ণরকমে অস্বাভাবিক। এই জাতীয় "বাবু" প্রায় যকৃৎ-বিস্ফোটক হইয়া, উদরী হইয়া অথবা অপঘাতে মরে, নতুবা উচ্ছৃঙ্খলতার নিদর্শন-স্বরূপ পথে পথে ভিক্ষা করে।

যশোহর-খুলনার ইতিহাস—দ্বিতীয় খণ্ড—শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্র কবিরঞ্জন, বি-এ, এম্-আর-এ-এস্ প্রণীত। ১৩২৯। মূল্য ৬৲। পৃঃ ৷০—১৷৵, ১—৮৮৪।

এই প্রকাণ্ড গ্রন্থে দৌলৎপুর হিন্দু একাডেমীর অধ্যাপক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের যশোহরের ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ শেষ হইল। এই খণ্ডে মোগল ও ইংরেজ আমলের ঐতিহাসিক বিবরণ আছে। গ্রন্থের সহিত যশোহর ও খুলনা জেলার একখানি ত্রিবর্ণ মানচিত্র এবং অনেকগুলি এক-বর্ণের মানচিত্র আছে। গ্রন্থকারের অসাবধানতার জন্য চিত্রগুলি ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই। গ্রন্থের ৮৮৪ পাতার মধ্যে অন্যূন ৩০০ পাতা প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস। গ্রন্থের এই অংশই সুখপাঠ্য। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার প্রতাপাদিত্যের সহিত মোগলদের যুদ্ধ সম্বন্ধে যে-সমস্ত নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা অবলম্বন করিয়া এই অংশ রচিত হইয়াছে। গ্রন্থের ৪০৩ হইতে ৫১২ পাতা পর্য্যন্ত কেবল বংশ-পরিচয় এবং এই অংশটি গ্রন্থের কলঙ্ক। মিত্র মহাশয়ের মত শিক্ষিত ঐতিহাসিক যে কি জন্য কতকগুলি প্রাচীন ও আধুনিক জমিদার-বংশের গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারা গেল না। ৫১২ পৃষ্ঠা হইতে ৬৩১ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত সীতারাম রায়ের ইতিহাস। ইহা প্রকৃত ইতিহাস। অবশিষ্ট ২৫০ পৃষ্ঠার মধ্যে ৭৫৮ হইতে ৭৯৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত নীল-বিদ্রোহের ইতিহাস বিবৃত আছে। অবশিষ্ট পত্রাঙ্কগুলি ইতিহাস নামের কলঙ্ক। বিংশ শতাব্দীতে উচ্চশিক্ষাভিমানী একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোককে ইতিহাসের আবরণে এইরূপভাবে সময় ও অর্থ নষ্ট করিতে দেখিলে দুঃখিত হইতে হয়। বৈদ্য-বংশ, ব্রাহ্মণ-সমাজ, কায়স্থ-সমাজ প্রভৃতির এবং জমিদার-বংশের বিবরণ বাদ দিলে গ্রন্থখানি এরূপ অতিকায় এবং দুর্ম্মূল্য হইত না। বর্ত্তমান সময়ে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর মধ্যে ছয় টাকা দিয়া একখানি বই কিনিতে পারেন এমন লোক অতি অল্পই আছেন।

গ্রন্থের প্রথম চিত্রখানি প্রাচীন মুদ্রার চিত্র। ইহা দ্বিতীয় খণ্ডে কেন ছাপা হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা গেল না। এই চিত্রে অতি প্রাচীন রজত-নির্ম্মিত "পুরাণ" হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পাঠান রাজা দাউদ শাহের মুদ্রা পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। একটি অস্পষ্ট মুসলমানী মুদ্রা উল্টা করিয়া ছাপা হইয়াছে।

শ্রী রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মণিকাঞ্চন—উপন্যাস। শ্রী ফণীন্দ্রনাথ পাল, বি-এ। ভোলানাথ লাইব্রেরী, ৩০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দেড় টাকা। আশ্বিন ১৩৩০।

আধুনিক বঙ্গদেশের একটি বিশেষ সমাজের বিষয়ে লেখকের বিশেষ কোন জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা নাই কিন্তু তিনি সেই সমাজকে লইয়া নাড়াচাড়া করিতে গিয়া বইখানিকে অসম্ভবরকম যা-তা জিনিষে বোঝাই করিয়াছেন। অনেক সময় অসম্ভব ব্যাপার পড়িয়া আমোদ পাওয়া যায়— এই বইখানিও প্রায় তাই হইয়াছে। লেখকের কল্পনার দৌড় আছে। তবে বইখানির বাঁধাই ভাল।

পূরবী—কবিতার বই। শ্রী নলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়। আট আনা। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৩০।

স্বরাজের পথে—শ্রী নলিনীকান্ত গুপ্ত। প্রবর্ত্তক পাব্‌লিশিং হাউস্, চন্দননগর। বৈশাখ ১৩৩০।

প্রবন্ধগুলি সুলিখিত এবং সুচিন্তিত।

স্নেহের শাসন—উপন্যাস। শ্রী সরোজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্, কলিকাতা। দুই টাকা।

উপন্যাসের মধ্যে উপদেশের পরিমাণ কমাইলে বইখানি একরকম হইত। উপদেশের চাপে উপন্যাস মারা গিয়াছে। বইএর দামও অত্যন্ত বেশী হইয়াছে।

নতুন খাতা—কবিতার বই। শ্রী কিরণধন চট্টোপাধ্যায়। ১৷৹। কবির পরিচয় নূতন করিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। কবিতাগুলি ঝরঝরে এবং কবির হাত বড়ই মিঠে। কবিতাগুলির ছন্দ সুন্দর; ভাবে ভরপুর—আজকাল মাসিকপত্রের পৌনে চার হাত লম্বা কবিতার মত অনাবশ্যক ফেনানো এবং অপাঠ্য ভাবে পূর্ণ নয়। এই কবির কবিতাগুলি নদীর স্রোতের মত অবাধ, তাহার কোথাও বাধা নাই। প্রতিদিনের ঘরের কথা, সামান্য সুখ-দুঃখের কথা, সবই কবির দরদী মনে আঘাত করিয়া নূতন ভাবে এবং কথায় মোহন হইয়া উঠিয়াছে।

ঘুমের আগে—শ্রী উমা গুপ্তা।

ছেলেমেয়েদের বই। কল্লোল পাব্লিশিং, ১০-২ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা।

গল্পগুলি মন্দ নয়—যাহাদের জন্ত লেখা তাহারা পড়িয়া আনন্দ পাইবে। তবে বইখানির মলাট আরো একটু রংচঙে ছবিওয়ালা না করিলে ছেলেমেয়েদের ভাল না লাগিতে পারে।

মুক্তির দিশা—ছোট গল্পের বই। শ্রী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। বারো আনা। ১৩৩০।

গল্পগুলি পড়িতে বেশ লাগে। লেখার ভঙ্গীও বেশ ঝরঝরে। মোট সাতটি গল্প আছে। 'বাজার-খরচের খাতা' গল্পটি বোধ হয় একটি ফরাসী গল্পের অনুকরণে লেখা হইয়াছে।

গ্রন্থকীট

বেনো-জল

ছাব্বিশ

যে-আনন্দের আভায় রতনের কল্পনা এতক্ষণ রঙীন হ'য়ে ছিল, হঠাৎ যেন-কার নিষ্ঠুর অভিশাপে এক লহমায় তার সমস্ত সৌন্দর্য্য নিঃশেষে মুছে গেল·········

সুমিত্রা যে তার প্রেমকে এমনভাবে আহত করবে, হতাশ ভিক্ষুকের মতন তাকে যে ফিরে' যেতে হবে, এটা ছিল রতনের চিন্তার অতীত। যে-সুমিত্রা সেদিন অন্যায়-ভাবেও তার প্রেমকে লাভ করবার জন্যে পাগল হ'য়ে উঠেছিল, সেইই কিনা আজকে তাকে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করলে না!······ রতনের বার-বার মনে হ'তে লাগল যে, জগতের মধ্যে সব-চেয়ে যুক্তিহীন ব্যাপার হচ্ছে স্ত্রী-চরিত্র!

গেল-ক'দিন ধ'রে রতনের সমস্ত চিন্তা সুমিত্রাকেই কেন্দ্র ক'রে ধীরে ধীরে নতুন এক পৃথিবী গ'ড়ে তুলছিল। রতন আর সুমিত্রা,— মাত্র এই দুটি বাসিন্দা নিয়েই পৃথিবী যেন বিচিত্রতায় অপূর্ব্ব হ'য়ে উঠেছিল;—চারিদিক্ ফুল-ফল-শ্যামলতার সমারোহে মোহনীয়, চাঁদের আলোক-ডালায় চির-পূর্ণিমার ইঙ্গিত, কোকিল-পাপিয়ার গানের তালে চির-বসন্তের জাগরণ—আর সেই উৎসব-রাজ্যের মাঝখান দিয়ে পুলকের বিপুল জোয়ারে ভেসে চলেছে তাদের দুই যুক্ত আত্মার নিশ্চিন্ত প্রেম—ঠিক যেন এক-বোঁটায় ফোটা দুটি তাজা ফুলের মত!

কিন্তু সেই মনের পৃথিবীকে রতন আর মনের ভিতরে খুঁজে পেলে না।······লক্ষ্যহীনের মতন পথে পথে অনেকক্ষণ ধ'রে ঘুরে ঘুরে, শেষটা সে শ্রান্ত হ'য়ে আনন্দ-বাবুর বাড়ীতে ফিরে এল।

তার মুখ দেখেই পূর্ণিমা চমকে উঠল।

রতন ঘরের কোণে গিয়ে একখানা চেয়ারের উপরে ব'সে পড়ল, কোন কথা বললে না। পূর্ণিমাও সাহস ক'রে কিছু বলতে পারলে না।

অনেকক্ষণ পরে রতন জিজ্ঞাসা করলে, "আনন্দ-বাবু কোথায়?"

—"রুগী দেখতে বেরিয়েছেন।"

রতন আবার স্তব্ধ হ'য়ে কি যেন ভাবতে লাগল। তার পর আস্তে আস্তে বললে, "পূর্ণিমা দেবী, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

—"অনায়াসে!"

—"আমি যখন কটকে ছিলুম, সুমিত্রা কি আমার সম্বন্ধে কোন কথা আপনাকে বলেছিল?"

—"হ্যাঁ।"

—"কি কথা?"

পূর্ণিমা সব বললে।

—"কিন্তু এ কথা ত আপনি আমাকে জানান-নি!"

—"সুমিত্রার কথা আমি আমলেই আনি-নি।

আপনি যে স্থমিত্রাকে অপমান কর্‌তে পারেন, এটা বিশ্বাস করা সম্ভব নয়।"

রতন তিক্ত-স্বরে বল্‌লে, "না, আমি সত্যিই তাকে অপমান করি-নি,—কিন্তু সে আজ আমাকে যে অপমান করেছে, তার ব্যথা আমি কিছুতেই ভুল্‌তে পার্‌ছি না!"

পূর্ণিমা সচকিত-কণ্ঠে বল্‌লে, "রতন-বাবু, আপনি কি বল্‌ছেন!"

রতন প্রথমটা চুপ ক'রে রইল। তার পর পূর্ণিমার মুখের পানে তাকিয়ে বল্‌লে,"পূর্ণিমা দেবী, আপনি আমার বন্ধু, আপনার কাছে আমি কোন কথা লুকোতে চাই না। স্থমিত্রাকে আমি ভালোবাসি। আমি জান্‌তুম, সেও আমাকে ভালোবাসে—এ-কথা আমি তার নিজের মুখ থেকেই শুনেছি। কিন্তু আজ সে আমাকে পথের একটা কুকুরের মত তাড়িয়ে দিয়েছে!"

পূর্ণিমা ঘাড় হেঁট ক'রে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

রতন যেন নিজের মনেই ব'লে যেতে লাগ্‌ল, "পূর্ণিমা দেবী, ছেলেবেলা থেকেই আমি কেবল দুঃখের পর দুঃখের আঘাতই পেয়েছি। আজ এতদিন পরে আমি ভেবেছিলুম যে, জীবনে এবারের মত দুঃখের পালা বুঝি শেষ হ'ল। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, বিধাতা ব'লে যদি কেউ থাকেন, তবে আমার কপালে তিনি সুখ লেখেন্‌-নি।"

পূর্ণিমা আস্তে আস্তে বল্‌লে, "রতন-বাবু, আজকের দুঃখ দুদিন পরে হয় তো আর মনে থাক্‌বে না। ভগবানের দয়ায় মানুষের শোক-দুঃখ ভোল্‌বার শক্তি আছে—আপনি এতটা বিচলিত হচ্ছেন কেন? আজ আপনি অগাধ সম্পত্তির মালিক—"

বাধা দিয়ে রতন উত্তেজিত-স্বরে ব'লে উঠ্‌ল, "আপনিও আমার কাছে ঐ টাকার কথা তুল্‌ছেন! আগে আমি ধনীকে ঘৃণা কর্‌তুম, আজ থেকে টাকাকেও ঘৃণা কর্‌তে শিখ্‌ব। টাকার দাম কতটুকু, স্থমিত্রা-দেবী? অর্থ দিয়ে রাজ্য কেনা যায়, কিন্তু অর্থ দিয়ে কি জ্যান্ত হৃদয় কিন্‌তে পারেন? আমি চাই এক দরদী হৃদয়, তার বিনিময়ে আমার সমস্ত সম্পত্তি বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত আছি।"

পূর্ণিমা মাটির দিকে চেয়ে প্রায়-অস্ফুট-স্বরে বল্‌লে, "স্থমিত্রাকে পেলেই কি আপনি সুখী হন?"

রতন বিরক্তি-ভরে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বল্‌লে, "ও নাম আর আমার কাছে কর্‌বেন না।"

পূর্ণিমা বল্‌লে, "আমি যদি তার কাছে গিয়ে আপনার কথা বলি—"

—"না, না, না! টাকা দিয়েও হৃদয় কেনা যায় না, ভিক্ষা ক'রেও কেউ তা পায় না। ভিক্ষুকের মতন তা গ্রহণ কর্‌তে আমি রাজি নই—এর জন্যে চিরদিন যদি হাহাকার কর্‌তে হয়, তাও স্বীকার। এমন মানুষকে আমি ভালোবাস্‌তে চাই না, যার হৃদয়ের উপরে আমার কোন দাবি নেই।"

—"তবে স্থমিত্রার কথা ভুলে যান!"

—"হ্যাঁ। সেই চেষ্টাই কর্‌ব, কিন্তু ভুল্‌তে পার্‌ব কিনা জানি না। মানুষের প্রাণ অবলম্বন খোঁজে,—কিন্তু দুনিয়ায় আমার ত কোন বন্ধুই নেই, কাকে অবলম্বন ক'রে স্থমিত্রাকে আমি ভুল্‌ব, পূর্ণিমা দেবী?"

পূর্ণিমা ক্ষুব্ধ-কণ্ঠে বল্‌লে, "রতন-বাবু, পৃথিবীতে সত্যিই কি আপনার কোন বন্ধু নেই? আমার বাবা, আর আমি কি আপনার বন্ধু হবারও অযোগ্য? এ কথাটা অন্ততঃ আমাদের সাম্‌নে আপনি বল্‌বেন না।"

রতন অপ্রতিভ-ভাবে দৃষ্টি নত কর্‌লে।

পূর্ণিমা বল্‌লে, "আমাদের বন্ধুত্বের কোন নিদর্শনই আপনি কি পান-নি? আমরা কি স্বার্থের জন্যে—"

বাধা দিয়ে, পূর্ণিমার একখানি হাত চেপে ধ'রে আবেগ-ভরে রতন বল্‌লে, "মাপ কর্‌বেন পূর্ণিমা দেবী, মাপ কর্‌বেন। আমার কথায় বিষ আছে, তাই নিজের অজান্তেই আত্মীয়কেও আমি পর ক'রে ফেলি। আপনারা যে আমার কত-বড় বন্ধু, সে কথা আমার মুখ প্রকাশ কর্‌তে না পার্‌লেও, আমার বুক ভালো-রকমেই জানে।"

মানুষের হাতের স্পর্শে কি শক্তি আছে জানি না, কিন্তু তার দ্বারা প্রায়ই মনের গোপনতা প্রকাশ পায়। রতনের হাতে হাত রেখে পূর্ণিমা বুঝ্‌লে, সে মিথ্যা বল্‌ছে না।.........

হঠাৎ রাস্তার ধারের জান্‌লার নীচে একখানা গাড়ীর

চাকার শব্দ এসে থামল। পূর্ণিমা তাড়াতাড়ি নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, "বোধ হয় বাবা এলেন।" ব'লেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তারপরে সে যখন আবার ফিরে এল, তখন তার মুখ দেখে রতনের মনে হ'ল, সে মুখ যেন মড়ার মুখ! রতন কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই, পূর্ণিমার পিছনে পিছনে ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল স্থমিত্রা!

স্তম্ভিত-দৃষ্টিতে রতন অবাক্ হ'য়ে স্থমিত্রার দিকে তাকিয়ে রইল, তার ভাব দেখে' মনে হ'ল, সে যেন নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছে না।.........

স্থমিত্রা সকৌতুকে হেসে উঠে বললে, "অমন ক'রে আমার পানে চেয়ে আছেন কেন রতন-বাবু? আমি কি প্রেতাত্মা?"

—"তুমি,—তুমি—তুমি—"

—"রতন-বাবু কি হঠাৎ তোৎলা হ'য়ে গেলেন?"

—"তুমি এখানে কেন?"

—"কেন, এখানে আমার প্রবেশ নিষেধ নাকি? তা হ'লে সে নিষেধ আমি মানব না।"

রতন গম্ভীর-মুখে স্তব্ধ হ'য়ে রইল।

স্থমিত্রা এগিয়ে এসে বললে, "আপনার সঙ্গে আমার গোপন কথা আছে।"

শুনে'ই পূর্ণিমা আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

স্থমিত্রা হাসি-ভরা-মুখে বললে, "রতন-বাবু, আমার ওপরে রাগ করেছেন?"

—"কিছু না! কোন্ অধিকারে তোমার ওপরে রাগ করব?

"—যে-অধিকারে আগে করতেন।"

—"তখন আমি তোমার শিক্ষক ছিলুম।"

—"বেশ ত, আবার আপনি আমার মাষ্টার-মশাই হোন্। কাল থেকে আবার আমি ছবি-আঁকা শিখব।"

—"আমি আর তোমাকে শেখাতে পারব না।"

—"পারবেন না! কেন?"

রতন শ্লেষ-কটু-স্বরে বললে, "কারণ, এখন যে আমি ধনী! পরের দাসত্ব করব কেন?"

স্থমিত্রা বুঝলে, এই শ্লেষের আসল উদ্দেশ্য কি। কিছুক্ষণ সে স্তব্ধ হ'য়ে রইল। তার পরেই আচম্বিতে রতনের সামনে হাঁটু গেড়ে ব'সে প'ড়ে বললে, "কিন্তু আমি যদি আপনার দাসীত্ব করি, তা হ'লে?" তার স্বরে আর কৌতুক বা তরলতার লেশমাত্র ছিল না।

রতনের নত-নেত্র স্থমিত্রার মুখের দিকে বিস্মিত-ভাবে স্থির হ'য়ে রইল। এই স্থমিত্রা কি সত্য-সত্যই একটি মূর্ত্তিমন্ত হেঁয়ালি? সে কি পাগল? না তার সঙ্গে আবার সে ছেলে-খেলার অভিনয় করছে? রতন কিছুই বুঝতে পারলে না।

স্থমিত্রা কাতর-কণ্ঠে বললে,"রতন-বাবু, আমার কথার উত্তর দিন।"

রতন বললে, "তুমি কি জানতে চাও?"

—"আপনি আবার আমাদের বাড়ীতে যাবেন?"

—"আজকের অপমানের পরেও? না স্থমিত্রা, আমি তা পারব না।"

—"আমাকে ক্ষমা করুন রতন-বাবু, আমাকে ক্ষমা করুন। অভিমানে আর রাগের বশে আমি যা বলেছি, তা আপনি ভুলে যান। আমার মুখের কথা আমার মনের কথা নয়। আমি নিজের ভ্রম বুঝতে পেরেছি। এতদিন পরেও আপনি কি আমাকে চিনতে পারলেন না?"

—"তোমাকে চেনা অসম্ভব, স্থমিত্রা।"

—"তা হ'লে আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন না?"

—"তাইতেই যদি তুষ্ট হও, তবে আমি তোমাকে না-হয় ক্ষমাই করছি। কিন্তু তোমাদের বাড়ীতে আর আমি যেতে পারব না।"

স্থমিত্রা বিদ্যুতের মতন দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "রতন-বাবু! পুরীতে একদিন আপনাকে বলেছিলুম, আর আজও বলছি,—আপনাকে আমি কিছুতেই ছেড়ে দেব না। সেবারে আপনি আমার কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু এবারে আর সে স্থযোগও পাবেন না। আজ থেকে আমি ছায়ার মতন আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকব—এই আমার পণ। মিনতিতে আপনার মন গলবে না—আমি জোর ক'রে আবার আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব—দেখি, কে আমাকে বাধা দেয়।" এই ব'লেই সে দুই হাতে রতনের দুই হাত ধরলে।

রতন বেগতিকে প'ড়ে বল্‌লে, "কি কর সুমিত্রা, কি কর!"

রতনের হাত ধ'রে টান্‌তে টান্‌তে সুমিত্রা বল্‌লে, "চলুন, আমাদের বাড়ীতে।"

—"আহা আগে আমার কথাই শোনো।"

—"কথাবার্ত্তা সব বাড়ীতে গিয়ে শুন্‌ব। আমি লুকিয়ে পালিয়ে এসেছি, বাড়ীর সবাই এতক্ষণে বোধ হয় ভেবে সারা হচ্ছেন—চলুন শীগ্‌গির।"

—"আচ্ছা, একবার পূর্ণিমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে দাও।

রতনের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে সুমিত্রা চুপিচুপি বল্‌লে, "আর কারুর সঙ্গে আপনাকে দেখা কর্‌তে দেব না, এখনি হয়ত আপনার মত বদ্‌লে যাবে।"

—"কি মুস্কিল! সুমিত্রা, তুমি কি আমাকে একেবারে বন্দী ক'রে ফেল্‌তে চাও?"

—"হ্যাঁ, আজ থেকেই।"

—"মুক্তি দেবে কবে?"

—"এ-জীবনে নয়।"

সাতাশ

সন্ধ্যার পরে বাড়ীতে ফিরে এসে আনন্দ-বাবু পূর্ণিমাকে দেখ্‌তে পেলেন না। এমন ত কোন দিন হয় না! তিনি বাড়ী ফেরার সঙ্গে-সঙ্গেই সর্ব্বপ্রথমে দেখ্‌তে পান, পূর্ণিমার হাসি-হাসি মুখ-খানি। একটু আশ্চর্য্য হয়ে তিনি আস্তে আস্তে ছাদের উপরে উঠ্‌লেন।

পরিপূর্ণ চাঁদের আলো তখন সারা-আকাশে যেন স্বপন-সায়রে রূপের ঢেউ তুলে' পৃথিবীর শিয়রে উপ্‌চে পড়্‌ছিল। আনন্দ-বাবুর ছাদের বাগানও আজ জ্যোৎস্নার আলিম্পনে বিচিত্র হ'য়ে উঠেছে।

একটা প্রকাণ্ড কাঠের টবের উপরে একরাশ হাস্নুহানা ফুটে', খানিক আলো খানিক কালো মেখে বসন্তের বাতাসকে গন্ধে মাতাল ক'রে তুল্‌ছে। তারই ওপাশে গিয়ে আনন্দ-বাবু দেখ্‌লেন, পূর্ণিমা একখানা ক্যাম্বিসের আরাম-কেদারায় চুপ ক'রে একলাটি শুয়ে আছে।

আনন্দ-বাবু প্রথমটা ভাব্‌লেন, পূর্ণিমা ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু তিনি কাছে গিয়ে দাঁড়াবা মাত্র পূর্ণিমা মৃদুস্বরে বল্‌লে, "বাবা?"

আনন্দ-বাবু মেয়ের পাশে আর-একখানা আসনে ব'সে বল্‌লেন, "একলাটি এখানে কি হচ্ছে মা?"

—"শরীরটা আজ ভালো নেই বাবা!"

—"সে কি, অসুখ-টসুখ করে-নি ত? দেখি!" আনন্দ-বাবু মেয়ের কপালে হাত দিয়ে দেখ্‌লেন, তপ্ত কি না। কপালের তাপ স্বাভাবিক বটে, কিন্তু তাঁর হাতে জলের মত কি লেগে গেল! আনন্দ-বাবু সচমকে মেয়ের মুখের পানে ভাল ক'রে তাকালেন;—পূর্ণিমার চোখে ও গালে চাঁদের আলোতে কি চক্‌চক্ করছে!

আশ্চর্য্য হ'য়ে তিনি বল্‌লেন, "পূর্ণিমা, তুই কাঁদ্‌ছিস্?"

পূর্ণিমা ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লে, "না বাবা, কাঁদ্‌ব কোন্ দুঃখে? বোধ হয় একদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধ'রে আকাশের দিকে চেয়ে ছিলুম ব'লেই চোখ দিয়ে জল পড়েছে।"

আনন্দ-বাবু আশ্বস্ত হ'য়ে উপদেশ দিলেন, "অমন ক'রে একদৃষ্টিতে আকাশ-পানে চেয়ে থেক না, তা হ'লে চোখ খারাপ হবার সম্ভাবনা।" তার পর তিনি ধীরে ধীরে ছাদ থেকে নীচে নেমে গেলেন।

পূর্ণিমা আবার একলাটি শুয়ে শুয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌ল। আকাশের জ্যোৎস্না স্রোতে মাঝে মাঝে পাত্‌লা মেঘ-গুলি ভেসে যাচ্ছে—কী হাল্‌কা তাদের জীবন! বাধা নেই, গণ্ডী নেই, চিন্তা নেই,—নীলিমার অসীম হৃদয়ে, আলো-আঁধারির আবর্ত্তনের মধ্যে, দিন রাত নীরবে ভেসে চলা আর ভেসে চলা ছাড়া আর কিছু তারা জানে না। তাদের গতির তালে তালে যে অশ্রুত-রাগিণীর মৌন-ঝঙ্কার বাজ্‌ছে, নিজের প্রাণের কানে পূর্ণিমা যেন তা শুনতে পেলে!·········পৃথিবীর মানুষরা আজ কবিত্বের আগে চায় ভাষাতত্ত্ব, নীরব রাগিণীর অর্থ তাই তারা আর বুঝ্‌তে পারে না, এবং এই বিশ্বপ্রকৃতির বিপুল নাট্য-শালায় চারিদিক্ থেকে নিত্য যে বিচিত্র স্তব্ধতার সঙ্গীত উঠ্‌ছে, তাদের কারুর কানে তার ছন্দ ধরা পড়ে না। ঐ সূর্য্য-চন্দ্র, গ্রহ-তারা, অনন্ত আকাশ, এই পৃথিবীর নরম মাটি, তৃণের শ্যামলতা, ফুলের রাঙা মুখ—এরাও ভাবুকের কাছে চুপিচুপি যে কথা কয়, যে গান গায়, যে বাঁশী বাজায়, তার মাধুর্য্য কি ঝরণার সুর বনের মর্ম্মর,

সাগরের ধ্রুপদ, কোকিল-পাপিয়ার গান বা দখিন-হাওয়ার তানের চেয়ে কম উপভোগ্য ?···

মেঘের গতি-রাগে যে গান বাজ্‌ছে, পূর্ণিমা এক প্রাণে তা শুন্‌ছে বটে, কিন্তু তার মনে হ'ল, আজকের এই পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার মধ্যেও যেন অভিশপ্ত অমাবস্যার অন্ধ-রাগিণীর স্বর মিশিয়ে গেছে এবং যে স্বর শুন্‌লে চাঁদের ঐ অমল আলোক কমল এখনি শুকিয়ে ম্লান হ'য়ে যাবে! আলোর ভিতরে আঁধারের এই বাণী কেন আজ সে শুন্‌তে পাচ্ছে? এমন ত সে আর কোন দিন শোনে-নি!

পিছন থেকে রতনের গলা পাওয়া গেল—"পূর্ণিমা দেবী, শুন্‌লুম না'কি আপনার শরীর ভালো নেই?"

পূর্ণিমা তাড়াতাড়ি উঠে ব'সে বল্‌লে, "না এমন-কিছু নয়। আপনি বসুন।"

রতন বস্‌ল। পূর্ণিমা লক্ষ্য করলে, রতনের ভাব-ভঙ্গীতে আজ যেন কেমন একটা আনন্দের আভাস ফুটে' উঠ্‌ছে!

পূর্ণিমা বল্‌লে, "আপনি ত সুমিত্রাদের ওখান থেকেই আস্‌ছেন?"

রতন উৎসাহিত-কণ্ঠে বল্‌লে, "হ্যাঁ! আর আমার কোন দুঃখ নেই—এখন আমি এত সুখী যে, পৃথিবীতে দুঃখ ব'লে কোন কিছু আছে ব'লেও আমার মনে হচ্ছে না!"

পূর্ণিমা নীরবে পাশের হাস্নুহানার দিকে হাত বাড়িয়ে বৃন্ত ধ'রে এক গোছা ফুল নাকের কাছে টেনে এনে আঘ্রাণ নিতে লাগল।

রতন বল্‌লে, "সুমিত্রার সঙ্গে আমার সব বিরোধ মিটে' গেছে। কিন্তু বেচারী সুনীতি! তার শুক্‌নো মুখ দেখে আমার বড় কষ্ট হ'ল!"

পূর্ণিমা অন্যমনস্ক-স্বরে বল্‌লে, "কেন?"

—"বিনয়-বাবুর বাড়ীতে কুমার-বাহাদুরের আনা-গোনা বন্ধ হ'য়ে গেছে। কিন্তু সুনীতি বোধ হয় তাঁকে ভালোবাসে।"

পূর্ণিমা করুণ-স্বরে বল্‌লে, "হ্যাঁ, নারী বড় অসহায়। সহজ বিশ্বাসে আত্ম-সমর্পণ করে ব'লেই তার দুঃখ কেউ ঠেকাতে পারে না।" একটু থেমে সে আবার জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি দেশে যাবেন বল্‌ছিলেন। কবে যাবেন?"

রতন উৎফুল্ল-কণ্ঠে বল্‌লে, "সপ্তাহ-খানেক পরে। একেবারে সুমিত্রাকে নিয়ে দেশে ফিরব।"

হাস্নুহানার গুচ্ছকে সজোরে মুষ্টির মধ্যে চেপে ধ'রে পূর্ণিমা বল্‌লে, "তা হ'লে আপনাদের বিবাহের সব ঠিক হ'য়ে গেছে?"

—"হ্যাঁ। আরো দুদিন সবুর করলেও চল্‌ত, কিন্তু বিনয়-বাবুর ইচ্ছা, এই হপ্তার মধ্যেই সব কাজ শেষ ক'রে ফেলেন।"

পূর্ণিমা স্তব্ধ হ'য়ে হেঁট-মুখে বৃন্ত থেকে ফুলগুলিকে অকারণে ছিঁড়ে' ফেল্‌তে লাগ্‌ল।···

রতন বল্‌লে, "আজ কি চমৎকার চাঁদের আলো!"

পূর্ণিমা সাড়া দিলে না।

রতন বল্‌লে, "পূর্ণিমা-দেবী, আজ আমাকে গান শোনাতে হবে! অনেকদিন আপনার গান শুনি-নি।"

পূর্ণিমা মৃদুস্বরে বল্‌লে, "পারব না।"

—"কেন, আজকের রাত যে গানের রাত, আজ ত চুপ ক'রে থাক্‌লে চল্‌বে না!"

পুষ্পহীন বৃন্ত মাটির উপর ছুঁড়ে' ফেলে দিয়ে পূর্ণিমা প্রায়-অবরুদ্ধ-কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌ল, "মাপ করবেন রতন-বাবু, আজ আমাকে গান গাইতে বল্‌বেন না!"

পূর্ণিমার কণ্ঠস্বরে চম্‌কে রতন তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে।

ভাঙা-ভাঙা গলায়, থেমে থেমে পূর্ণিমা বল্‌লে, "আপনি যাকে ভালোবাসেন তাকে আজ পেয়েছেন, আপনার এই সুখে আমিও সুখী হয়েছি, কিন্তু—" হঠাৎ তার স্বর বন্ধ হ'য়ে গেল, সে আর কথা কইতে পার্‌লে না।

আনন্দ-বাবুর মত রতনও দেখ্‌লে, চাঁদের আলোতে পূর্ণিমার দুই চোখে কি চক্‌চক্ করছে! অত্যন্ত বিস্ময়ে সে ব'লে উঠ্‌ল, "ওকি, ওকি, আপনি কাঁদছেন কেন?"

কোন জবাব না দিয়ে পূর্ণিমা দুই হাতের ভিতরে নিজের মুখ লুকিয়ে ফেল্‌লে।

রতন তার দিকে একটু এগিয়ে এসে কোমল-স্বরে

বল্‌লে, "পূর্ণিমা দেবী, আপনার কি হয়েছে আমাকে বলুন!"

কান্না-ভরা গলায় পূর্ণিমা বল্‌লে, "সে কথা শুনে' আপনার কোন লাভ নেই, দয়া ক'রে আর কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌বেন না, আজ আমাকে মুক্তি দিন।"—বল্‌তে বল্‌তে সে উঠে' দাঁড়াল, তার পর তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চ'লে গেল।.........

স্তম্ভিতের মতন রতন সেইখানেই ব'সে রইল—পূর্ণিমার সমস্ত মন খোলা-পুঁথির মত চোখের সাম্‌নে নিয়ে।.........পূর্ণিমার এই অশ্রুর স্মৃতি সে কি আর এ-জীবনে ভুল্‌তে পার্‌বে ?

সমাপ্ত।

শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায়

পরমাণুর প্রকৃতি

নব্য রাসায়নী বিদ্যার প্রকৃত প্রসার আরম্ভ হয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। এই সময়েই সুইডেন্ দেশবাসী রসায়নবিৎ পণ্ডিত বার্জ্জিলিয়স্ রসায়ন-জগতে একচ্ছত্র সম্রাট্‌রূপে রাজত্ব করিতেছিলেন। বার্জ্জিলিয়স্ তাঁহার অনাড়ম্বর ক্ষুদ্র পরীক্ষাগারে যে অতি সূক্ষ্ম পরীক্ষামূলক গবেষণা করিয়া গিয়াছেন তাহা বিংশ শতাব্দীর অতি বড় পণ্ডিত রাসায়নিককে পর্য্যন্ত স্তম্ভিত করিতেছে। বার্জ্জিলিয়সের প্রতিভা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্ফুরিত হইয়াছিল মূলপদার্থসমূহের আপেক্ষিক আণবিক ভার-নির্ণয়-ব্যাপারে। বর্ত্তমান যুগের "বিলাসী" রাসায়নিক-কুল একদিনের জন্যও পরীক্ষাগারে তাড়িতশক্তি বা অন্য কোন সুবিধার অভাব ঘটিলে আর্ত্তনাদে গৃহ মুখরিত করেন, আর বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ বার্জ্জিলিয়স্? সাংসারিক অস্বচ্ছলতার প্রতি বিন্দুমাত্র দৃক্‌পাত না করিয়া যোগী সন্ন্যাসীর মত এই পণ্ডিত স্বল্পপরিসর একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠকে একাধারে শয়নাগার, রন্ধনশালা ও পরীক্ষাগারে পরিণত করিয়াছিলেন। একটি বৃদ্ধা দাসী ছিল সে গৃহের কর্ত্রী। তাহারই আদেশে বার্জ্জিলিয়সকে নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য যেন-তেন-প্রকারেণ সমাধা করিতে হইত। সুইডেনের এই দারিদ্র্যব্যঞ্জক সামান্য পরীক্ষাগারে আতিশয্যের চিহ্নমাত্রও ছিল না—ছিল কেবল পরীক্ষকের অপূর্ব্ব মনীষা ও একনিষ্ঠ সাধনা।

বার্জ্জিলিয়সের পূর্ব্বে প্রতিভাবান্ রাসায়নিকের আবির্ভাব যে না হইয়াছে তাহা নহে। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের রাসায়নিক জার্ম্মাণ পণ্ডিত শীলার কৃতিত্বও বড় কম নহে—তবে পরিমাপমূলক অনুসন্ধানে শীলা বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন নাই।

যে-সময়ের বিষয় আমরা আলোচনা করিতেছি, সেই সময়ে ইংলণ্ডের একজন শিক্ষক একটি আণবিক মতবাদ প্রচার করেন। পরিমিত পদার্থকে অনন্তকাল বিভাগ করিয়া যাওয়া সম্ভবপর কি না এবং অসম্ভব হইলে বস্তুর এই চরম অবস্থার স্বরূপ কিরূপ ইহা লইয়া অনেকেই বহুকাল হইতে চিন্তা করিতেছিলেন। দার্শনিক পণ্ডিতেরা বহুপূর্ব্বেই দার্শনিকভাবে ইহার একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। পরন্তু এই দার্শনিক মীমাংসার কোন পরীক্ষামূলক প্রমাণ ছিল না বলিয়া বৈজ্ঞানিক সমাজে সাগ্রহে গৃহীত হয় নাই। ড্যাল্টন্ প্রথমে মূল ও যৌগিক পদার্থের বিভিন্নতা নির্দ্দেশ করিয়া কয়েকটি স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম প্রচার করেন। ড্যাল্টনের মতে প্রত্যেক মূল পদার্থের অবিভাজ্য চরম অংশ যাহা পরমাণু বলিয়া অভিহিত হয় অন্য সকল পরমাণু হইতে ভার ও অন্যান্য ধর্ম্ম দ্বারা বিশিষ্ট হয়। বস্তুর নিত্যতা-নিয়ম (প্রিন্‌সিপ্‌ল অভ্ কন্‌সারভেশন অভ্ মাস্) অনুসারে পরমাণুর বিনাশ নাই। রাসায়নিক সংমিশ্রণে ইহার ভার বা অন্য কোন বস্তু-ধর্ম্মের বিকার হয় না এবং পূর্ণসংখ্যক পরমাণু একটি যৌগিক অণুনির্ম্মাণে প্রয়োজন হয় ইহাই হইল ড্যাল্টনের আণবিক মতবাদের মূল কথা। ইহার সাহায্যে ড্যাল্টন্ তৎকালে প্রচলিত রাসায়নিক সংমিশ্রণের কতকগুলি

স্মৃতিপট

চিত্রকর শ্রী অখিলকুমার রায়ের সৌজন্যে
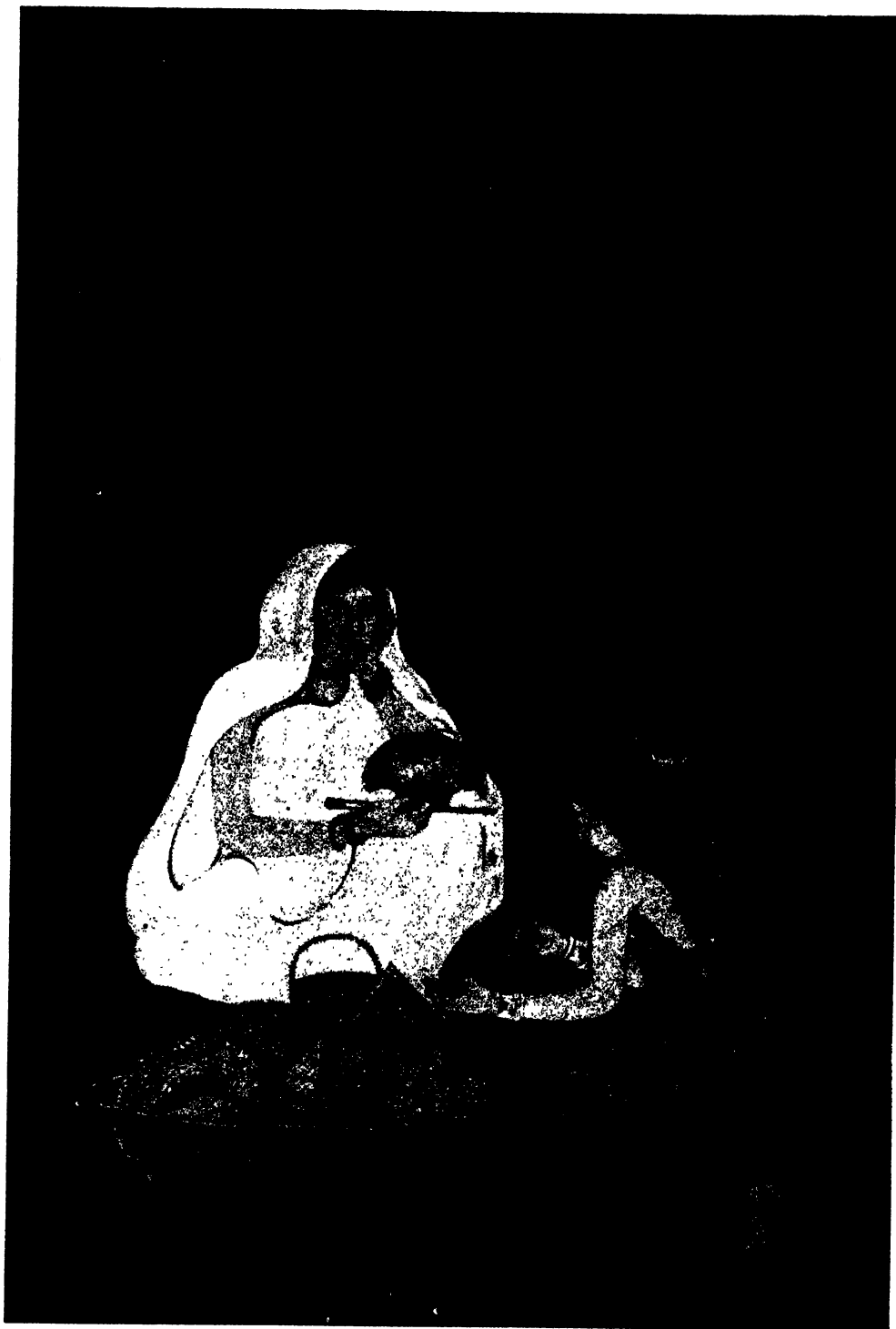
নিয়ম ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে যৌগিক রাসায়নিক পদার্থ বিশুদ্ধাবস্থায় যে কোনো উপায়েই সংগৃহীত হউক্ না কেন, প্রত্যেকটিতেই মূল পদার্থগুলি একই পরিমাণে, সম্মিলিত হইয়া অবস্থান করে, ইহাই রাসায়নিকের বিশ্বাস। 'লবণ' একটি যৌগিক পদার্থ—সমুদ্রের লবণাক্ত জল হইতে বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে ইহা পাওয়া যাইতে পারে, আবার মধ্যভারতের পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতেও ইহা সংগৃহীত হইতে পারে। এই উভয়বিধ লবণকে শোধিত করিয়া রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে বিশ্লিষ্ট মূল পদার্থ দুইটি একই পরিমাণে উভয় ক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছে। ড্যাল্টন্ বলিলেন যেহেতু প্রত্যেক-প্রকারের পরমাণুর ভার স্বতন্ত্র এবং রাসায়নিক সম্মিলনে কোন অজ্ঞাত শক্তি-প্রভাবে পরমাণুগুলি বিশেষভাবে পরস্পরের সান্নিধ্যে অবস্থান করে মাত্র। একটি অন্যটির মধ্যে অন্তঃপ্রবিষ্ট হয় না, সুতরাং আণবিক পরিমাণের এই নিত্যতা বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যাহা হউক ড্যাল্টনের পরমাণুবাদ যে নব্য রসায়ণের উন্নতির জন্য অনেকাংশে দায়ী ইহা অবিসংবাদে স্বীকৃত হয়।

এই সময়েই বার্জ্জিলিয়স্ মূল পদার্থগুলির আণবিক ভার নির্ণয়কার্য্যে নিযুক্ত হন এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধেই এক বিস্তৃত তালিকা প্রকাশ করেন। কিন্তু পক্ষপাতশূন্য হইয়া দেখিতে গেলে, রসায়নশাস্ত্র এ বিষয়ে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ এক জন ইতালীয় পণ্ডিতের নিকট। আভোগেড্রো যাহা বলিতে চাহিয়াছিলেন তাহা প্রথমে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিতে পারেন নাই— বস্তুতঃ তাঁহার নিয়ম প্রথমে স্বয়ং-বিরোধী হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং রাসায়নিক-সমাজে আদৃত হয় নাই। কয়েক বৎসর পর, আভোগেড্রোর এক প্রিয় শিষ্য, ক্যানিজ্জেরো আন্তর্জ্জাতিক বৈজ্ঞানিক সভাতে অধ্যাপকের বক্তব্য অতি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন এবং গুরুভক্তির নিদর্শনস্বরূপ সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আভোগেড্রোর উপর অর্পণ করেন। রসায়ন-শাস্ত্রের সহিত যাঁহার কিছুমাত্রও পরিচয় আছে তাঁহার নিকটেও আভোগেড্রোর নাম অতি সুপরিচিত। কিন্তু কয়জনে এই মূল্যবান্ সত্যের প্রকৃত আবিষ্কারক ক্যানিজ্জেরোর নাম শুনিয়াছেন?

কাঠিন্য, তারল্য এবং বায়বীয়ত্ব বস্তুর অতি পরিচিত ধর্ম্ম। ইহার কোনটিই রাসায়নিক ধর্ম্ম নহে কারণ তুষারকে উত্তাপ-সাহায্যে ক্রমশঃ জল ও বাষ্পে পরিণত করিলে এই পরিবর্ত্তনে বস্তুধর্ম্মের বিকার হয় বটে পরন্তু কোনপ্রকার রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সাধিত হয় না। এক্ষণে প্রশ্ন উঠিবে পদার্থের এই অবস্থা-বিকৃতির কারণ কি? বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে একদল পদার্থতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে এই অবস্থাভেদ আণবিক সংহতির আপেক্ষিক দূরত্বের বিভিন্নতার উপর নির্ভর করিতেছে। কথাটা আরো বিশদ করিয়া বলা আবশ্যক। মূল পদার্থের অবিভাজ্য চরম অংশ যেমন পরমাণু (অ্যাটম্), যৌগিক পদার্থের চরম অংশ সেইরূপ অণু (মলিকিউল)। অবশ্য অণু হইতে রাসায়নিক বিশ্লেষণ সাহায্যে দুই বা ততোধিক পরমাণুর উদ্ভব হইতে পারে। দুঃখের বিষয় বাংলা ভাষায় অণু এবং পরমাণু একই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

পদার্থতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন, পদার্থ যে আণবিক-সংহতিতে ঘটিত, তাহাদিগের মধ্যে আকর্ষণী এবং বিকর্ষণী এই উভয়প্রকার বিপরীত-ধর্ম্মী শক্তি বর্ত্তমান। কঠিন অবস্থায়, বস্তুর এই আণবিক আকর্ষণী শক্তি বিকর্ষণী শক্তি অপেক্ষা প্রবলতর এবং নিকটবর্ত্তী দুইটি অণুর মধ্যে আপেক্ষিক দূরত্ব অল্প।

বাষ্পাবস্থায় পদার্থে ইহার বিপরীত ধর্ম্মগুলি প্রবল এবং তরল অবস্থায় এই উভয়প্রকার শক্তির পরিমাণের মধ্যে বিশেষ অসামঞ্জস্য থাকে না। পদার্থের অণুগুলি আবার নিশ্চল নহে—অবিশ্রান্ত ইতস্ততঃ দ্রুত ধাবমান। বস্তুর উষ্ণতা যত বাড়িতে থাকে এই আণবিক গতি ততই ক্ষিপ্রতর এবং আণবিক দূরত্ব বৃদ্ধি পাইতে থাকে। উত্তাপে যে বস্তুর আয়তন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ইহা আর কাহার না জানা আছে?

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত আণবিক মতবাদের এক বিশিষ্ট যুগ কাটিয়া গিয়াছে,—বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে আর-এক নূতন যুগ আরম্ভ হইয়াছে। পুরাতন যুগের মতবাদ পরমাণুর প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশেষ

করিয়া কিছুই বলিতে পারে নাই—পরমাণু অবিভাজ্য এবং বিভিন্ন পদার্থের পরমাণু বিভিন্নধর্ম্মী ইহাই ছিল পুরাতন স্বতঃসিদ্ধ মত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সার্ উইলিয়ম্ ক্রুক্‌স্, রান্‌ট্‌গেন্ প্রভৃতি পণ্ডিতেরা দেখাইয়াছিলেন যে স্বল্পবায়ুবিশিষ্ট একটি কাচ গোলকের মধ্যে বলশালী তাড়িতোর্ম্মি প্রবেশ করাইয়া দিলে অন্তঃস্থিত বায়বীয় অণুসমূহ সূক্ষ্ম তাড়িতকণিকায় বিশ্লিষ্ট হইয়া ভীষণ বেগে পরিচালিত হয়। এই সূক্ষ্ম তাড়িত-কণিকাগুলিই ইলেক্‌ট্রন্ নামে অভিহিত হয়। বিভিন্ন বস্তু হইতে সঞ্জাত হইলেও এই কণিকাগুলির ভার এবং অন্তঃস্থিত তড়িতের পরিমাণ একই থাকে। ইহা হইতে অনুমান করা কি অসঙ্গত যে, সকল পরমাণুই ইলেক্‌ট্রনের সমষ্টি মাত্র! এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে তাড়িত-শক্তির দুইটি বিপরীতধর্ম্মী প্রকৃতির সহিত আমরা পরিচিত—এই উভয়বিধ তড়িৎ সম-পরিমাণে একত্র অবস্থান করিলে, পদার্থে বিদ্যুতের অস্তিত্ব অনুভূত হয় না। ইংরেজীতে এই দুইপ্রকার তড়িৎকে সংযোগ (পজিটিভ্) ও বিয়োগ (নিগেটিভ্) তড়িৎ নামে অভিহিত করা হয়। যেহেতু সমগ্র পরমাণুটিতে তাড়িতশক্তি অবর্ত্তমান এবং পরমাণু এক শ্রেণীর বৈদ্যুতিক কণিকা দ্বারা গঠিত, সুতরাং ইহাই অনুমান করা স্বাভাবিক যে পরমাণুমধ্যে উভয়বিধতড়িৎ সম-পরিমাণে অবস্থিতি করিতেছে। এইভাবে পরমাণুর বৈদ্যুতিক প্রকৃতির পরিকল্পনা না করিলে পরমাণু-মধ্যে সংযোগ অথবা বিয়োগ তাড়িতের আতিশয্য থাকিয়া যায় এবং সমগ্র পরমাণুটিকে আর বিদ্যুদ্বিহীন বলা চলে না। পরমাণুর এই বৈদ্যুতিক প্রকৃতির বিষয় প্রথম প্রকাশ করেন, প্রসিদ্ধ ইংরাজ পদার্থতত্ত্ববিৎ সার্ জে, জে, টম্‌সন্। টম্‌সন্ দেখাইলেন যে বিয়োগ তড়িৎ-সংযুক্ত এই ক্ষুদ্র কণিকাগুলির ভার নিতান্তই অল্প—১৭৬০টি ইলেক্‌ট্রন্ একত্র করিলে তবে লঘুতম পরমাণু হাইড্রোজেন্ পরমাণুর সমকক্ষ হয়। টম্‌সন্ প্রতিভাসম্পন্ন পদার্থ-শাস্ত্রবিৎ—সুতরাং গণিত-শাস্ত্রে তাঁহার শ্রদ্ধা অসাধারণ। নানা যুক্তি জাল বিস্তার করিয়া সূক্ষ্ম হিসাব করিয়া তিনি দেখাইয়া দিলেন যে পরমাণু গোলকের মধ্যে সংযোগ-তড়িৎ সমভাবে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে আর ইহারই ভিতর বিয়োগ-তড়িৎ-সংযুক্ত কণিকাগুলি চতুর্দ্দিকে নানাভাবে অবিশ্রান্ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন পরমাণুর বৈশিষ্ট্যই এই যে প্রত্যেকটির মধ্যে বিভিন্ন-সংখ্যক তড়িৎকণা ভিন্ন-ভিন্নরূপে চারিদিকে ধাবিত হইতেছে। পরীক্ষা-মূলক গবেষণার সম্মুখে কিন্তু টম্‌সনের এ গণিতশাস্ত্রানুমোদিত পরমাণু টিঁকিতে পারিল না—টম্‌সনের বিরুদ্ধে যিনি প্রথম প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন তিনি টমসনের প্রিয়তম শিষ্য রাদার্‌ফোর্ড্।

রাদার্‌ফোর্ডের নাম এখন শুধু ইংলণ্ডে আবদ্ধ নহে। র‍্যাডিয়ো-অ্যাক্‌টিভিটি শাস্ত্রের জন্মদাতা বলিয়া রাদার্‌ফোর্ড এখন বিশ্ববিখ্যাত। এই গুরুশিষ্যের নিকট পদার্থশাস্ত্র যে কি-পরিমাণে ঋণী তাহা নির্দ্দেশ করিবার সময় এখনও আসে নাই তবে একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে হেলম্‌হোল্‌ৎজ্, ফ্যারাডে, কেল্‌ভিন বা ম্যাক্স্‌ওয়েলের স্থান যেখানে ইঁহাদের স্থান তাহা অপেক্ষা নিম্নে নহে। রাদার্‌ফোর্ড বলিলেন পরমাণু-গোলকের মধ্যে টম্‌সন্ সংযোগ-তাড়িতের যে সম-বিভাজ্যতার পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহা সম্ভবতঃ সত্য নহে পরমাণু-গোলকের মধ্যে এমন একটি বিন্দু বিদ্যমান যাহাতে পরমাণর সমগ্র সংযোগ-তড়িৎ সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। রাদার্‌ফোর্ড্ আরও বলিলেন যে এই বিন্দুমধ্যেই (নিউক্লিয়াসে) পরমাণর সমস্ত ভার জড়ীভূত হইয়া রহিয়াছে; বাহিরের ইলেক্‌ট্রন্‌গুলি, যাহারা সৌর জগতের গ্রহ-উপগ্রহের ন্যায় এই বিন্দুকে বেষ্টন করিয়া নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে তাহারা পরমাণুর ভারের জন্য দায়ী নহে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে তড়িতের যে দুই বিভিন্নরূপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে তাহাদিগের মধ্যে একটিই বস্তুতে তাহার অতি পরিচিত ধর্ম্ম 'ভার' আরোপ করিতেছে! কথাটা প্রথমে রহস্যপূর্ণ মনে হইতে পারে কারণ বহু বৎসর পূর্ব্বে কেল্‌ভিন্ প্রভৃতি পণ্ডিতেরা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে বিশাল আকাশ সমুদ্রে যে ঈথর-তরঙ্গের উৎপত্তি হইতে-তেছে তাহারাই কতকগুলি বিদ্যুৎসৃষ্টির জন্য দায়ী। এ ঈথর-তরঙ্গের সঙ্গে "ভার" বা অন্য কোন বস্তু-ধর্ম্মের কি

সম্বন্ধ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন সে-বিষয়ে আমাদের ধারণা সেরূপ স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই তখন একাধিক দার্শনিক লেখক লিখিয়াছেন যে আধুনিক পরমাণুবাদ একটা মূল্যবান্ সত্য প্রমাণ করে। বস্তুর শেষ পরিণতি যদি বৈদ্যুতিক শক্তিতে হয় ধরিয়া লওয়া যায়, তবে বস্তুর পরিণতি যে এক অনির্দ্দিষ্ট শূন্যতায় তাহা উপলব্ধি করিতে বিশেষ আয়াস আবশ্যক করে না। আধুনিক পরমাণুবাদ, জগৎ মায়াময় এবং ইহসংসারের সকল বস্তুই অনিত্য এই বৈদান্তিক তথ্যের অনুকূলে মত প্রদান করে কি না বলা কঠিন, তবে পদার্থের চরম পরিণতি যে শুধু বৈদ্যুতিক শক্তিতে একথা এখনও জোর করিয়া বলা চলে না। বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে হইলে র‍্যাডিওঅ্যাক্‌টিভিটি শাস্ত্রের কয়েকটি মোটামুটি কথা জানা আবশ্যক। সকলেই জানেন যে বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক এবং তাঁহার মনস্বিনী পত্নী রেডিয়ম্ নামক একটি অদ্ভুত পদার্থের আবিষ্কার করেন। দেখা গিয়াছে, রেডিয়ম্ হইতে অনবরত শক্তির স্বতঃ বিকিরণ হয়—ইহাকে নিয়ন্ত্রিত করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে। অন্য যে-সকল পরিবর্ত্তন এতাবৎ কাল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বিষয়ীভূত হইয়াছে তাহারা সকলেই পারিপার্শ্বিক অবস্থা-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হয় কিন্তু রেডিয়ম্‌সংক্রান্ত পরিবর্ত্তনে এই নিয়ম একেবারেই খাটে না। আবার কিছু দিন পরে দেখা গেল, যেকাচপাত্রের মধ্যে ক্ষুদ্র রেডিয়ম্-কণিকা আবদ্ধ ছিল তাহাতে কয়েকটি নূতন পদার্থের আবির্ভাব হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে যাঁহারা সংশয়বাদী তাঁহারা প্রথমে কথাটা উড়াইয়া দিতে চাহিলেন। কেহ বলিলেন যে প্রাপ্ত সীসক (লেড) রেডিয়মের তেজঃপ্রভাবে কাচ-পাত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছে, কারণ জানা ছিল যে সাধারণ কাচে যে সামান্যপরিমাণ সীসক না থাকে এমন নহে। বহু বাদ-বিতণ্ডার পর অবশেষে সডি, ফায়াজ প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গের গবেষণার ফলে স্থির হইল যে রেডিয়মের পরমাণুর ভিতর কোন অজ্ঞাত কারণে শক্তির আতিশয্য ঘটিয়া থাকে এবং তাহার ফলে রেডিয়ম্-পরমাণুর কতক অংশ বিশ্লিষ্ট হইয়া স্বল্পভার পরমাণুতে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে এবং কাচ-পাত্র মধ্যে যে সীসক বা হিলিয়ম্ পাওয়া যায় তাহা রেডিয়ম্-পরমাণুর বিশ্লেষণ হইতেই সঞ্জাত। পরমাণুর এই ধ্বংসবাদ যদি সত্য বলিয়া মানিয়া লই তবে যৌগিক অণু হইতে ইহার আর বিশেষত্ব রহিল কি! নব্য বিজ্ঞান পরমাণুর শক্তির এই আতিশয্যের কারণ নির্দ্দেশ করিতে অক্ষম এবং এই ধর্ম্ম কেন শুধু অপেক্ষাকৃত গুরুভার মাত্র কয়েকটি পরমাণুর ভিতর আবদ্ধ তাহা বৈজ্ঞানিক বলিতে পারেন না। এ-সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মহলে—বিশেষভাবে ইংলণ্ড ও জার্ম্মানীতে দ্রুত গবেষণা চলিতেছে এবং আশা আছে অদূর ভবিষ্যতে এই গুপ্ত তথ্যটি বৈজ্ঞানিকের সমক্ষে আত্ম-প্রকাশ করিবে। তর্কের খাতিরে যদি মানিয়া লই যে, সকল পরমাণুকেই ইচ্ছানুসারে পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া স্বল্পভার পরমাণুতে পরিণত করা সম্ভবপর, তাহা হইলে মানুষ চতুষ্পার্শ্বে ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত বস্তুনিচয়কে অনন্ত শক্তির আধার মনে করিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইবে। পরশ-পাথরের অস্তিত্ব তখন আর দিবাস্বপ্ন বলিয়া মনে হইবে না। তবে একথা স্বীকার্য্য যে, লৌহকে স্বর্ণে পরিণত করিতে যে প্রচণ্ড শক্তির প্রয়োজন হইবে তাহার মূল্যের তুলনায় স্বর্ণের মূল্য যৎসামান্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। বিশালকায় এঞ্জিন চালাইবার জন্য আর রাশি রাশি অঙ্গার বা তৈলের আবশ্যক হইবে না, সামান্য ধূলিমুষ্টির মধ্যে যে বিরাট্ শক্তি নিহিত আছে তাহার সাহায্যে বর্ত্তমান সভ্যতার শেষ চিহ্নটুকু মুছিয়া ফেলা সম্ভবপর হইবে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক সার্ অলিভার্ লজ্ এই আণবিক শক্তির বিশালতাকে লক্ষ্য করিয়া ইউরোপকে আশার বাণী শুনাইয়াছিলেন, কিন্তু কে বলিবে ইউরোপের যান্ত্রিক সভ্যতা যে-যুগের আশা-পথ চাহিয়া বসিয়া আছে তাহা প্রলয়ঙ্করী ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে দেখা দিবে কি না।

রেডিয়ম্ ও তাহার সমধর্ম্মী বস্তুগুলি যখন শক্তি বিকিরণ করিতে থাকে তখন তিনপ্রকারের রশ্মি নির্গত হয়। গ্রীক্ বর্ণমালার প্রথম তিনটি অক্ষর দ্বারা ইহাদিগকে বিশিষ্ট করা হয়। রাসায়নিক পরীক্ষার ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, আল্‌ফা রশ্মিসমূহ তড়িৎসংযুক্ত হিলিয়ম্ নামক বাষ্পের পরমাণুর সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই

নহে। প্রশ্ন উঠিল এই হিলিয়ম্ পরমাণুগুলি আসে কোথা হইতে! রাদারফোর্ডের বিশ্বাস যে পরমাণুর কোষ-মধ্যেই (অ্যাটোমিক নিউক্লিয়াসেই) এই হিলিয়ম্ পরমাণুগুলি অবস্থান করে এবং ইহারাই পরমাণুর সমগ্র ভারের জন্য দায়ী। তড়িৎসংযুক্ত এই হিলিয়ম্ পরমাণুগুলিকে বলা হয় প্রোটন্। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে পরমাণুর অন্তঃস্থিত প্রোটন্ ও ইলেকট্রন্ যথাক্রমে সংযোগ- ও বিয়োগ-তড়িৎ বহন করে। পরন্ত প্রোটন্ ইলেকট্রন্ অপেক্ষা প্রায় ছয় সহস্র গুণ অধিক ভারী। সুতরাং মনে করিতে পারি যে পরমাণুর ভার নির্ভর করে সংযোগ-তড়িৎযুক্ত কণিকাগুলির উপর, কারণ প্রোটনের তুলনায় ইলেকট্রন্-গুলির ভার যৎসামান্য। ইহা হইতেই দেখা যাইতেছে, রাদারফোর্ডের এই পরমাণুবাদ স্বীকার করিয়া লইলে রেডিয়ম্ জাতীয় বিশ্লেষণ সুচারুভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

রাদারফোর্ডকেও তাঁহার এক ভূতপূর্ব্ব বিদেশী শিষ্যের নিকট আংশিক পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। গত বৈশাখ সংখ্যার 'প্রবাসীতে' কোপেনহেগেন্-নিবাসী অধ্যাপক নীলস্ বোরের অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বোরের আণবিক মতবাদই বর্ত্তমান সময়ে শ্রেষ্ঠ পরমাণুবাদ বলিয়া স্বীকৃত হয়। সুখের বিষয়—বাংলা দেশেও এই নূতন বিষয়ের গবেষণা আরম্ভ হইয়াছে এবং খ্যাতনামা দুই-একজন বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিকের এই বিষয়ের গবেষণা বিদেশে সাদরে গৃহীত হইয়াছে।

পরমাণুর প্রকৃতির আর-এক নূতন আলোক প্রদান করিয়াছেন দুইজন বিখ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিক সডি এবং অ্যাস্টন্। অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে যে বর্ত্তমান বর্ষে অ্যাস্টন্ রসায়ন শাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন। বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক সার্ জে জে টম্‌সনের অনুরোধে অ্যাস্টন্ পরীক্ষামূলক গবেষণার সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছেন কোনো-একটি মূল পদার্থের পরমাণুগুলির সকলেই যে সমভার-বিশিষ্ট এমন নহে; ফলতঃ স্থলবিশেষে একইপ্রকারের পরমাণুর মধ্যে ক্রম-বিভাগ থাকিতে পারে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, সাধারণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে সীসকের আণবিক ভার নির্ণয় করিলে দেখা যায় যে সীসক-পরমাণু হাইড্রোজেন-পরমাণু অপেক্ষা দুই শত সাত গুণ ভারী অর্থাৎ সীসকের আপেক্ষিক আণবিক ভার ২০৭। কিন্তু ইহা হইতে প্রমাণিত হয় না যে সকল সীসক পরমাণুগুলিরই ভার এই সংখ্যা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। এই পর্যান্ত বলা যাইতে পারে যে, সাধারণ সীসকের পরমাণুর ভার গড়ে দুইশত সাত। বস্তুতপক্ষে এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান যে বস্তুতে দুই বা ততোধিকরূপ পরমাণু বিদ্যমান থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে ড্যাল্টনের পরমাণুবাদ যাহার মতে মূল পদার্থের সমস্ত পরমাণুই সমভার-বিশিষ্ট ও সম-ধর্ম্মী এবং যাহা প্রায় একশত বৎসর ধরিয়া বৈজ্ঞানিকেরা নতমস্তকে মানিয়া লইয়াছেন—তাহার মধ্যেও গলদ বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

রসায়নশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ লোকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এই নিত্য পরিবর্ত্তনশীল আণবিক মতবাদ লইয়া রাসায়নিক পরীক্ষামূলক গবেষণা চলে কেমন করিয়া! উত্তরে বলা যাইতে পারে যে ড্যাল্টনের মতবাদ বৃদ্ধ হইয়া পড়িলেও এখনও সম্পূর্ণ কার্য্যের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে নাই—নূতনের মোহে রাসায়নিক পুরাতনকে নির্ম্মমভাবে পরিত্যাগ করেন নাই। নূতন আবিষ্কারের ঔজ্জ্বল্যে আমরা ভুলিতে পারি না যে রসায়নের সেই শৈশবযুগে যদি বার্জ্জিলিয়ম্, ড্যাল্টন্, ক্যানিজ্জেরো না থাকিতেন তবে আধুনিক যুগের এসকল "চমকপ্রদ" আবিষ্কার সম্ভবপর হইত না। অর্দ্ধ বা এক শতাব্দীর পরে এইসকল নব আবিষ্কার, যাহা লইয়া আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিকগণ গৌরব অনুভব করিতেছেন, সম্ভবতঃ ভ্রমাত্মক প্রতিপন্ন হইবে—সুতরাং বৈজ্ঞানিক যদি গত শতাব্দীর প্রথমভাগের আবিষ্ক্রিয়াগুলিকে মূল্যহীন বলিয়া নাসিকা সঙ্কুচিত করেন তবে এক শতাব্দী পরে তাঁহার নিজের অবস্থা কি দাঁড়াইবে তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

শ্রী সুবোধকুমার মজুমদার

সারদামণি দেবী

শাস্ত্রে গৃহস্থের প্রশংসা আছে, সন্ন্যাসীরও প্রশংসা আছে। শাস্ত্রে ইহাও লিখিত আছে এবং সহজ বুদ্ধিতেও ইহা বুঝা যায়, যে, গার্হস্থ্য আশ্রম অন্য সব আশ্রমের মূল। কিন্তু গৃহস্থ মাত্রেরই জীবন প্রশংসনীয় বা নিন্দনীয় নহে, সন্ন্যাসীমাত্রেরও জীবন প্রশংসনীয় বা নিন্দার্হ নহে। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভগবদ্দত্ত শক্তি, হৃদয়-মনের গতি, প্রভৃতির দ্বারা স্থির হয়, যে, ভগবান্ কিরূপ জীবন যাপন করিয়া কি কাজ করিবার নিমিত্ত কাহাকে সংসারে পাঠাইয়াছেন। যিনি যে আশ্রমে আছেন, তদুচিত জীবন-যাপন করেন কি না, তাহা বিবেচনা করিয়া তিনি আত্ম প্রসাদ বা আত্ম-গ্লানি অনুভব করিতে পারেন। যিনি যে আশ্রমের মানুষ, কেবল সেই আশ্রমের নামের ছাপটি দেখিয়া তাঁহার জীবনের উৎকর্ষ অপকর্ষ, সার্থকতা ব্যর্থতা নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। ব্যক্তি-নির্বিশেষে গৃহস্থাশ্রম অপেক্ষা সন্ন্যাসের বা সন্ন্যাসাশ্রম অপেক্ষা গার্হস্থ্যের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বিবেচিত হইতে পারে না।

সাধারণতঃ ইহাই দেখা যায়, যে, যাঁহারা সন্ন্যাসী, তাঁহারা হয় কখনও বিবাহই করেন নাই, কিম্বা বিবাহ করিয়া থাকিলে পত্নীর সহিত সমুদয় সম্বন্ধ বর্জ্জন করিয়া ও তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন। পরমহংস রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী ছিলেন, কিন্তু তিনি চব্বিশ বৎসর বয়সে

শ্রীমতী সারদামণি দেবী

শ্রীমতী সারদামণি দেবী

বিবাহ করিয়াছিলেন। বাল্য-কালে যখন তাঁহার বিচার করিবার ক্ষমতা ছিল না তখন, কিম্বা তাঁহার অনভিমতে, কেহ তাঁহার বিবাহ দেন নাই। তাঁহার বিবাহ তাঁহার সম্মতিক্রমে হইয়াছিল—তাঁহার জীবন-চরিতে লিখিত আছে, যে, তাঁহারই নির্দ্দেশ অনুসারে পাত্রী নির্ব্বাচন হইয়াছিল। কিন্তু তিনি একদিকে যেমন পত্নীকে লইয়া সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় ঘর করেন নাই, তাঁহার সহিত কখন কোন দৈহিক সম্বন্ধ হয় নাই, অন্য দিকে আবার তাঁহাকে পরিত্যাগও করেন নাই; বরং তাঁহাকে নিকটে রাখিয়া স্নেহ, উপদেশ ও নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহাকে নিজের সহধর্ম্মিণীর মত করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার জীবনের একটি বিশেষত্ব।

কিন্তু বিশেষত্ব কেবল রামকৃষ্ণের নহে। তাঁহার পত্নী সারদামণিদেবীরও বিশেষত্ব আছে। সত্য বটে, রামকৃষ্ণ সারদামণিকে শিক্ষাদি দ্বারা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন; কিন্তু যাঁহাকে শিক্ষা দেওয়া হয়, শিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাহার দ্বারা উপকৃত ও উন্নত হইবার ক্ষমতা তাঁহার থাকা চাই। একই সুযোগ্য গুরুর ছাত্র ত অনেক থাকে, কিন্তু সকলেই জ্ঞানী ও সৎ হয় না। সোনা হইতে যেমন অলঙ্কার হয়, মাটির তাল হইতে তেমন হয় না।

এইজন্য সারদামণি দেবীর জীবন-কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার কোন জীবন-চরিত নাই। পরমহংস দেবের জীবন-চরিতে প্রসঙ্গক্রমে সারদামণি দেবী সম্বন্ধে স্থানে স্থানে অল্প অল্প যাহা লিখিত আছে, তাহা দ্বারাই কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে হয়। সম্ভব হইলে, রামকৃষ্ণ ও সারদামণির ভক্তদিগের মধ্যে কেহ এই মহীয়সী নারীর জীবন-চরিত ও উক্তি লিপিবদ্ধ করিবেন, এই অনুরোধ জানাইতেছি। হয় ত একাধিক জীবনচরিত লিখিত হইবে। তাহার মধ্যে একটি এমন হওয়া উচিত, যাহাতে সরল ও অবিমিশ্রভাবে কেবল তাঁহার চরিত ও উক্তি থাকিবে, কোন প্রকার ব্যাখ্যা, টীকা টিপ্পনী, ভাষ্য থাকিবে না। রামকৃষ্ণেরও এইরূপ একটি জীবন-চরিতের প্রয়োজন। ইহা বলিবার উদ্দেশ্য এই, যে, রামকৃষ্ণমণ্ডলীর বাহিরের লোকদিগেরও রামকৃষ্ণ ও সারদামণিকে স্বাধীন ভাবে নিজ নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারে বুঝিবার সুযোগ পাওয়া আবশ্যক। মণ্ডলীভুক্ত ভক্তদিগের জন্য অবশ্য অন্যবিধ জীবন-চরিত থাকিতে পারে।

গৃহস্থাশ্রমে রামকৃষ্ণের নাম ছিল গদাধর। "সাংসারিক সকল বিষয়ে তাঁহার পূর্ণমাত্রায় উদাসীনতা ও নিরন্তর উন্মনা ভাব দূর করিবার জন্য" তাঁহার "স্নেহময়ী মাতাও অগ্রজ উপযুক্ত পাত্রী দেখিয়া তাঁহার বিবাহ দিবার পরামর্শ স্থির" করেন।

"গদাধর জানিতে পারিলে পাছে ওজর আপত্তি করে, এজন্য মাতা ও পুত্রে পূর্ব্বোক্ত পরামর্শ অন্তরালে হইয়াছিল। চতুর গদাধরের কিন্তু ঐ বিষয় জানিতে অধিক বিলম্ব হয় নাই। জানিতে পারিয়াও তিনি উহাতে কোনরূপ আপত্তি করেন নাই; বাটীতে কোন একটা অভিনব ব্যাপার উপস্থিত হইলে বালক-বালিকারা যেরূপ আনন্দ করিয়া থাকে, তদ্রূপ আচরণ করিয়াছিলেন।"

চারিদিকের গ্রাম-সকলে লোক প্রেরিত হইল, কিন্তু মনোমত পাত্রীর সন্ধান পাওয়া গেল না। তখন গদাধর বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটী গ্রামের শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যার সন্ধান বলিয়া দেন। তাঁহার মাতা ও ভ্রাতা ঐস্থানে অনুসন্ধান করিতে লোক পাঠাইলেন। সন্ধান মিলিল। অল্প দিনেই সকল বিষয়ের কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া গেল। সন ১২৬৬ সালের বৈশাখের শেষভাগে শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পঞ্চমবর্ষীয়া একমাত্র কন্যার সহিত গদাধরের বিবাহ হইল। বিবাহে তিন শত টাকা পণ লাগিল। তখন গদাধরের বয়স ২৩ পূর্ণ হইয়া চব্বিশ চলিতেছে।

গদাধরের মাতা চন্দ্রাদেবী

"বৈবাহিকের মনস্তুষ্টি ও বাহিরের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য জমীদার বন্ধু লাহা বাবুদের বাটী হইতে যে গহনাগুলি চাহিয়া বধূকে বিবাহের দিনে সাজাইয়া আনিয়াছিলেন, কয়েক দিন পরে ঐগুলি ফিরাইয়া দিবার সময় যখন উপস্থিত হইল, তখন তিনি যে আবার নিজ সংসারের দারিদ্র্যচিন্তায় অভিভূতা হইয়াছিলেন, ইহাও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। নববধূকে তিনি বিবাহের দিন হইতে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। বালিকার অঙ্গ হইতে অলঙ্কারগুলি তিনি কোন্ প্রাণে খুলিয়া লইবেন এই চিন্তায় বৃদ্ধার চক্ষু এখন জলপূর্ণ হইয়াছিল। অন্তরের কথা তিনি কাহাকেও না বলিলেও গদাধরের উহা বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। তিনি মাতাকে শান্ত করিয়া নিদ্রিতা বধূর অঙ্গ হইতে গহনাগুলি এমন কৌশলে খুলিয়া লইয়াছিলেন, যে, বালিকা উহা কিছুই জানিতে পারে নাই। বুদ্ধিমতী বালিকা কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে বলিয়াছিল, "আমার গায়ে যে এইরূপ সব গহনা ছিল, তাহা কোথায় গেল?" চন্দ্রাদেবী সজলনয়নে তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া সান্ত্বনা প্রদানের জন্য বলিয়াছিলেন, 'মা! গদাধর তোমাকে ঐ সকলের অপেক্ষাও উত্তম অলঙ্কার-সকল ইহার পর কত দিবে।'"

শ্রীমতী সারদামণি দেবী

চন্দ্রাদেবী যে অর্থে এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন, সে অর্থে না হইলেও অন্য অর্থে ভবিষ্যৎকালে কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছিল।

"এইখানেই কিন্তু এই বিষয়ের পরিসমাপ্তি হইল না। কন্যার খুল্লতাত তাহাকে ঐদিন দেখিতে আসিয়া ঐকথা জানিয়াছিলেন এবং অসন্তোষ প্রকাশপূর্ব্বক ঐ দিনেই তাহাকে পিত্রালয়ে লইয়া গিয়াছিলেন। মাতার মনে ঐ ঘটনায় বিশেষ বেদনা উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া গদাধর তাঁহার ঐ দুঃখ দূর করিবার জন্য পরিহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন, 'উহারা এখন যাহাই বলুক করুক না, বিবাহ ত আর ফিরিবে না?'"

ইহার পর সন ১২৬৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে সারদামণি সপ্তমবর্ষে পদার্পণ করিলে কুল-প্রথা অনুসারে স্বামীর সহিত পিত্রালয় হইতে দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী কামারপুকুর গ্রামে শ্বশুরালয়ে আসিয়াছিলেন।

অতঃপর বহু বৎসর রামকৃষ্ণ কামারপুকুরে ছিলেন না। ১২৭৪ সালে তিনি, যে ভৈরবী ব্রাহ্মণী তাঁহার সাধনে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহার এবং ভাগিনেয় হৃদয়ের সহিত, কামারপুরে আবার আগমন করেন।

বহুকাল পরে তাঁহাকে পাইয়া এই দরিদ্র সংসারে এখন আনন্দের হাট-বাজার বসিল, এবং নববধূকে আনাইয়া সুখের মাত্রা পূর্ণ করিবার জন্য রমণীগণের নির্দ্দেশে জয়রামবাটী গ্রামে লোক প্রেরিত হইল। বিবাহের পর সারদামণি একবার মাত্র স্বামীকে দেখিয়াছিলেন। তখন তিনি সাত বৎসরের বালিকা মাত্র। সুতরাং ঐ ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহার কেবল এইটুক মনে ছিল, যে, ভাগিনেয় হৃদয়ের সহিত রামকৃষ্ণ জয়রামবাটী আসিলে বাড়ীর কোন নিভৃত অংশে লুকাইয়াও তিনি রক্ষা পান নাই,

হৃদয় তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া কোথা হইতে অনেকগুলি পদ্ম ফুল আনিয়া, বালিকা মাতুলানী লজ্জা ও ভয়ে সঙ্কুচিতা হইলেও, তাঁহার পা পূজা করিয়াছিল। ইহার প্রায় ছয় বৎসর পরে তাঁহার তের বৎসর বয়সের সময় তাঁহাকে শ্বশুর-বাড়ী কামারপুকুর লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে তিনি এক মাস ছিলেন, কিন্তু রামকৃষ্ণ তখন দক্ষিণেশ্বরে থাকায় তাঁহার সহিত দেখা হয় নাই। উহার ছয় মাস আন্দাজ পরে আবার শ্বশুর-বাড়ী আসিয়া দেড় মাস ছিলেন। তখনও স্বামীর সহিত দেখা হয় নাই। তাহার তিন চার মাস পর, যখন তিনি বাপের বাড়ীতে ছিলেন, তখন খবর আসিল, রামকৃষ্ণ আসিয়াছেন, তাঁহাকে কামারপুকুর যাইতে হইবে। তখন তাঁহার বয়স্ তের বৎসর ছয় সাত মাস।

রামকৃষ্ণ এই সময়ে একটি সুমহৎ কর্ত্তব্য-সাধনে যত্নবান্ হইলেন। পত্নীর তাঁহার নিকট আসা না-আসা সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ উদাসীন থাকিলেও, যখন সারদামণি তাঁহার সেবা করিতে কামারপুকুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি তাঁহাকে শিক্ষা-দীক্ষাদি দিয়া তাঁহার কল্যাণ-সাধনে তৎপর হইলেন। রামকৃষ্ণকে বিবাহিত জানিয়া

"শ্রীমদাচার্য্য তোতা পুরী তাঁহাকে এক সময়ে বলিয়াছিলেন, 'তাহাতে আসে যায় কি? স্ত্রী নিকটে থাকিলেও যাহার ত্যাগ বৈরাগ্য বিবেক বিজ্ঞান সর্ব্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ থাকে, সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মে যথার্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই যিনি সমভাবে আত্মা বলিয়া সর্ব্বক্ষণ দৃষ্টি ও তদনুরূপ ব্যবহার করিতে পারেন, তাহারই যথার্থ ব্রহ্ম-বিজ্ঞান লাভ হইয়াছে; স্ত্রী-পুরুষে ভেদদৃষ্টিসম্পন্ন অপর সকলে সাধক হইলেও ব্রহ্ম-বিজ্ঞান হইতে বহুদূরে রহিয়াছে।'"

তোতা পুরীর এই কথা রামকৃষ্ণের মনে উদিত হইয়া তাহাকে দীর্ঘকালব্যাপী সাধন-লব্ধ নিজের বিজ্ঞানের পরীক্ষায় এবং নিজ পত্নীর কল্যাণ-সাধনে নিযুক্ত করিয়াছিল। কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইলে তিনি কোন কাজ উপেক্ষা করিতে বা আধাসারা করিয়া ফেলিয়া রাখিতে পারিতেন না। এ বিষয়েও তাহাই হইল।

"ঐহিক পারত্রিক সকল বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে তাঁহার মুখাপেক্ষী বালিকা পত্নীকে শিক্ষা প্রদান করিতে অগ্রসর হইয়া তিনি ঐ বিষয় অর্দ্ধনিষ্পন্ন করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। দেবতা, গুরু ও অতিথি প্রভৃতির সেবা ও গৃহকর্ম্মে যাহাতে তিনি কুশলা হয়েন, টাকার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন, এবং সর্ব্বোপরি ঈশ্বরে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া দেশকাল-পাত্র-ভেদে সকলের সহিত ব্যবহার করিতে নিপুণা হইয়া উঠেন, তদ্বিষয়ে এখন হইতে তিনি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন।"

চৌদ্দবৎসর বয়সের সময় যখন সারদামণি দেবীর স্বামীর নিকট হইতে শিক্ষালাভ আরম্ভ হয়, তখন তিনি স্বভাবতঃই নিতান্ত বালিকা-স্বভাব-সম্পন্না ছিলেন। কারণ,

"কামারপুকুর অঞ্চলের বালিকাদিগের সহিত কলিকাতার বালিকাদিগের তুলনা করিবার অবসর যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনি দেখিয়াছেন, কলিকাতা অঞ্চলের বালিকাদিগের দেহের ও মনের পরিণতি স্বল্প বয়সেই উপস্থিত হয়, কিন্তু কামারপুকুর প্রভৃতি গ্রামসকলের বালিকাদিগের তাহা হয় না। ... ... পবিত্র নির্ম্মল গ্রাম্য-বায়ু সেবন এবং গ্রাম-মধ্যে যথাতথা স্বচ্ছন্দবিহারপূর্ব্বক স্বাভাবিকভাবে জীবন অতিবাহিত করিবার জন্যই বোধ হয় ঐরূপ হইয়া থাকে।"

পবিত্রা বালিকা রামকৃষ্ণের দিব্য সঙ্গ ও নিঃস্বার্থ আদর যত্ন লাভে ঐ কালে অনির্ব্বচনীয় আনন্দে উল্লসিত হইয়াছিলেন। পরমহংস দেবের স্ত্রীভক্তদিগের নিকট তিনি ঐ উল্লাসের কথা অনেক সময়ে এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন :—

"হৃদয়-মধ্যে আনন্দের পূর্ণ ঘট যেন স্থাপিত রহিয়াছে, ঐকাল হইতে সর্ব্বদা এইরূপ অনুভব করিতাম—সেই ধীর স্থির দিব্য উল্লাসে অন্তর কতদূর কিরূপ পূর্ণ থাকিত তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে।"

কয়েক মাস পরে রামকৃষ্ণ যখন কামারপুকুর হইতে কলিকাতায় ফিরিলেন, সারদামণি তখন অনন্ত আনন্দ-সম্পদের অধিকারিণী হইয়াছেন—এইরূপ অনুভব করিতে করিতে পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিলেন।

"উহা তাঁহাকে চপলা না করিয়া শান্তস্বভাবা করিয়াছিল, প্রগল্ভা না করিয়া চিন্তাশীলা করিয়াছিল, স্বার্থদৃষ্টিনিবদ্ধা না করিয়া নিঃস্বার্থ-প্রেমিকা করিয়াছিল, এবং অন্তর হইতে সর্ব্বপ্রকার অভাব-বোধ তিরোহিত করিয়া মানব-সাধারণের দুঃখকষ্টের সহিত অনন্তসমবেদনাসম্পন্না করিয়া ক্রমে তাঁহাকে করুণার সাক্ষাৎ প্রতিমায় পরিণত করিয়াছিল। মানসিক-উল্লাস প্রভাবে অশেষ শারীরিক কষ্টকে তাহার এখন হইতে কষ্ট বলিয়া মনে হইত না এবং আত্মীয়বর্গের নিকট হইতে আদর-যত্নের প্রতিদান না পাইলে মনে দুঃখ উপস্থিত হইত না। ঐরূপে সকল বিষয়ে সামান্যে সন্তুষ্টা থাকিয়া বালিকা আপনাতে আপনি ডুবিয়া তখন পিত্রালয়ে কাল কাটাইতে লাগিলেন।"

কিন্তু শরীর ঐস্থানে থাকিলেও তাঁহার মন স্বামীর পদানুসরণ করিয়া এখন হইতে দক্ষিণেশ্বরেই উপস্থিত ছিল। তাঁহাকে দেখিবার এবং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার জন্য মধ্যে মধ্যে মনে প্রবল বাসনার উদয় হইলেও তিনি উহা যত্নে সম্বরণ পূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করিতেন; ভাবিতেন, প্রথম দর্শনে যিনি তাঁহাকে কৃপা করিয়া এত দূর ভালবাসিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে ভুলিবেন না—সময় হইলেই নিজের নিকট ডাকিয়া লইবেন।

শ্রীমতী সারদামণি দেবী

শ্রীমতী সারদামণি দেবী গোরুর গাড়ীতে দেশে যাইতেছেন

"ঐরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল এবং হৃদয়ে বিশ্বাস স্থির রাখিয়া তিনি ঐ শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। আশাপ্রতীক্ষার প্রবল প্রবাহ বালিকার মনে সমভাবেই বহিতে লাগিল। তাঁহার শরীর কিন্তু মনেরঅবস্থায় সমভাবে থাকিল না, দিন দিন পরিবর্ত্তিত হইয়া সন ১২৭৮ সালের পৌষে তাঁহাকে অষ্টাদশবর্ষীয়া যুবতীতে পরিণত করিল। দেবতুল্য স্বামীর প্রথম-সন্দর্শনজনিত আনন্দ তাঁহাকে জীবনের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখ হইতে উচ্চে উঠাইয়া রাখিলেও সংসারে নিরাবিল আনন্দের অবসর কোথায়?—গ্রামের পুরুষেরা জল্পনা করিতে বসিয়া যখন তাঁহার স্বামীকে 'উন্মত্ত' বলিয়া নির্দ্দেশ করিত, 'পরিধানের কাপড় পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া হরি হরি করিয়া বেড়ায়'—ইত্যাদি নানা কথা বলিত, অথবা সমবয়স্কা রমণীগণ যখন তাঁহাকে 'পাগলের স্ত্রী' বলিয়া করুণা বা উপেক্ষার পাত্রী বিবেচনা করিত, তখন মুখে কিছু না বলিলেও তাঁহার অন্তরে দারুণ ব্যথা উপস্থিত হইত। উন্মনা হইয়া তিনি তখন চিন্তা করিতেন—তবে কি পূর্ব্বে যেমন দেখিয়াছিলাম তিনি সেরূপ আর নাই? লোকে যেমন বলিতেছে, তাঁহার কি ঐরূপ অবস্থান্তর হইয়াছে? বিধাতার নির্ব্বন্ধে যদি ঐরূপই হইয়া থাকে তাহা হইলে আমার ত আর এখানে থাকা কর্ত্তব্য নহে, পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহার সেবাতে নিযুক্ত থাকাই উচিত। অশেষ চিন্তার পর স্থির করিলেন, তিনি দক্ষিণেশ্বরে স্বয়ং গমনপূর্ব্বক চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিবেন, পরে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তদ্রূপ অনুষ্ঠান করিবেন।"

ফাল্গুনের দোল-পূর্ণিমায় শ্রীচৈতন্য দেবের জন্মতিথিতে সারদামণি দেবীর দূরসম্পর্কীয়া কয়েকজন আত্মীয়া এই বৎসর গঙ্গাস্নান করিবার নিমিত্ত কলিকাতা আসা স্থির করেন। তিনিও তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা তাঁহার পিতাকে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করায় তিনি কন্যার এখন কলিকাতা যাইবার অভিলাষের কারণ বুঝিয়া, তাঁহাকে স্বয়ং সঙ্গে লইয়া কলিকাতা যাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। জয়রামবাটী হইতে কলিকাতা রেলে আসা যাইত না, সুতরাং পাল্কীতে কিম্বা পদব্রজে আসা ভিন্ন উপায় ছিল না। ধনী লোকেরা ভিন্ন অন্য সকলকে হাঁটিয়াই আসিতে হইত। অতএব কন্যা

ও সঙ্গীগণের সহিত শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হাঁটিয়াই কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইলেন।

"ধান্যক্ষেত্রের পর ধান্যক্ষেত্র এবং মধ্যে মধ্যে কমল-পূর্ণ দীর্ঘিকানিচয় দেখিতে দেখিতে, অশ্বত্থ বট প্রভৃতি বৃক্ষরাজির শীতল ছায়া অনুভব করিতে করিতে, তাঁহারা সকলে প্রথম দুই দিন সানন্দে পথ চলিতে লাগিলেন। কিন্তু গন্তব্যস্থল পৌঁছান পর্য্যন্ত ঐ আনন্দ রহিল না। পথশ্রমে অনভ্যস্তা কন্যা পথিমধ্যে একস্থানে দারুণ জ্বরে আক্রান্ত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে বিশেষ চিন্তান্বিত করিলেন। কন্যার ঐরূপ অবস্থায় অগ্রসর হওয়া অসম্ভব বুঝিয়া তিনি চটীতে আশ্রয় লইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।"

প্রাতঃকালে উঠিয়া শ্রীরামচন্দ্র দেখিলেন, কন্যার জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে। পথিমধ্যে নিরুপায় হইয়া বসিয়া থাকা অপেক্ষা তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়াই শ্রেয় মনে করিলেন। কন্যারও তাহাতে মত হইল। কিছুদূর যাইতে না যাইতে একটি পাল্কীও পাওয়া গেল। সারদামণি দেবীর আবার জ্বর আসিল, কিন্তু আগেকার মত জোরে না আসায় তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন না, এবং ঐ বিষয়ে কাহাকেও কিছু বলিলেনও না। রাত্রি নয়টার সময় সকলে দক্ষিণেশ্বর পৌঁছিলেন।

সারদামণিকে এইরূপ পীড়িত অবস্থায় আসিতে দেখিয়া রামকৃষ্ণ সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন।

"ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর বাড়িবে বলিয়া নিজ গৃহে ভিন্ন শয্যায় তাঁহার শয়নের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং দুঃখ করিয়া বারম্বার বলিতে লাগিলেন, 'তুমি এতদিনে আসিলে? আর কি আমার সেজ বাবু (মথুর বাবু) আছে যে তোমার যত্ন হবে?' ঔষধ পথ্যাদির বিশেষ বন্দোবস্তে তিন চারিদিনেই শ্রীশ্রী মাতাঠাকুরাণী আরোগ্য লাভ করিলেন।"

ঐ তিন চারি দিন রামকৃষ্ণ তাঁহাকে দিনরাত নিজ গৃহে রাখিয়া ঔষধপথ্যাদি সকল বিষয়ের স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিলেন, পরে নহবৎ-ঘরে নিজ জননীর নিকট তাঁহার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। সারদামণি এখন বুঝিলেন, রামকৃষ্ণ আগে যেমন ছিলেন, এখনও তেমনি আছেন, তাঁহার প্রতি তাঁহার স্নেহ ও করুণা পূর্ব্ববৎ আছে। তিনি প্রাণের উল্লাসে পরমহংস দেব ও তাঁহার জননীর সেবায় নিযুক্ত হইলেন, এবং তাঁহার পিতা কন্যার আনন্দে আনন্দিত হইয়া কয়েকদিন পরে বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

রামকৃষ্ণ পত্নীর প্রতি কর্ত্তব্যপালনে মনোনিবেশ করিলেন। অবসর পাইলেই তিনি সারদামণিকে মানবজীবনের উদ্দেশ্য এবং কর্ত্তব্যসম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষাপ্রদান করিতে লাগিলেন। শুনা যায়, এই সময়েই তিনি পত্নীকে বলিয়াছিলেন, 'চাঁদা মামা যেমন সকল শিশুর মামা, তেমনি ঈশ্বর সকলেরই আপনার; তাঁহাকে ডাকিবার সকলেরই অধিকার আছে; যে ডাকিবে, তিনি তাহাকেই দর্শন দানে কৃতার্থ করিবেন। তুমি ডাক ত তুমিও তাঁহার দেখা পাইবে।' কেবল উপদেশ দেওয়াতেই রামকৃষ্ণের শিক্ষাপ্রণালী পর্য্যবসিত হইত না। তিনি শিষ্যকে নিকটে রাখিয়া ভালবাসায় সর্ব্বতোভাবে আপনার করিয়া লইয়া তাহাকে প্রথমে উপদেশ দিতেন, পরে শিষ্য উহা কাজে কতদূর পালন করিতেছে সর্ব্বদা সে বিষয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতেন এবং ভ্রম-বশতঃ সে বিপরীত অনুষ্ঠান করিলে তাহাকে বুঝাইয়া সংশোধন করিয়া দিতেন। সারদামণির সম্বন্ধেও এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন। সামান্য বিষয়েও রামকৃষ্ণের এরূপ নজর ছিল, যে, তিনি পত্নীকে বলিয়াছিলেন, 'গাড়ীতে বা নৌকায় যাবার সময় আগে গিয়ে উঠ্‌বে, আর নাম্‌বার সময় কোনও জিনিষটা নিতে ভুল হয়েছে কিনা দেখে শুনে সকলের শেষে নাম্‌বে।'

কথিত আছে, সারদামণি একদিন এই সময় স্বামীর পদ-সম্বাহন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'আমাকে তোমার কি বলিয়া বোধ হয়?' রামকৃষ্ণ উত্তর দিয়াছিলেন, 'যে মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়াছেন ও সম্প্রতি নহবতে বাস করিতেছেন, এবং তিনিই এখন আমার পদসেবা করিতেছেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলিয়া তোমাকে সর্ব্বদা সত্য সত্য দেখিতে পাই।' রামকৃষ্ণ সকল নারীর মধ্যে, অতি হীনচরিত্রা রমণীর মধ্যেও, বিশ্বের জননীকে দেখিতেন।

"উপনিষৎকার ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যমৈত্রেয়ী-সংবাদে শিক্ষা দিতেছেন—'পতির ভিতর আত্মস্বরূপ শ্রীভগবান্ রহিয়াছেন বলিয়াই স্ত্রীর পতিকে প্রিয় বোধ হয়; স্ত্রীর ভিতর তিনি থাকাতেই পতির মন স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে।' (বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৫ম ব্রাহ্মণ।)"

এই সময়ে রামকৃষ্ণ ও সারদামণি এক শয্যায় রাত্রি যাপন করিতেন। দেহবোধবিরহিত রামকৃষ্ণের প্রায় সমস্ত রাত্রি এইকালে সমাধিতে অতিবাহিত হইত। এই

সময়ের কথা উল্লেখ করিয়া রামকৃষ্ণ যাহা বলিতেন, তাহাতে বুঝা যায়, যে, সারদামণি দেবীও যদি সম্পূর্ণ কামনাশূন্য না হইতেন তাহা হইলে রামকৃষ্ণের "দেহ-বুদ্ধি আসিত কি না, কে বলিতে পারে?" পৃথিবীর নানা কার্য্যক্ষেত্রে অনেক প্রসিদ্ধ লোকদের পত্নীদিগের সম্বন্ধে কথিত আছে, যে, তাঁহারা উহাঁদের সহায় হইয়া উহাঁদের জীবনপথ সর্ব্ববিধ সংসারিক বাধাবিঘ্ন হইতে মুক্ত না রাখিলে উহাঁরা এত মহৎ কাজ করিতে পারিতেন না। অনেক মহৎলোকের পত্নী কেবল যে পতিকে সংসারের খুটিনাটী ও নানা ঝঞ্ঝাট হইতে নিষ্কৃতি দেন, তা নয়, অবসাদ নৈরাশ্য ও বলহীনতার সময় তাঁহার হৃদয়ে শক্তি ও উৎসাহেরও সঞ্চার করিয়া থাকেন। আমাদের সমসাময়িক ইতিহাসে রামকৃষ্ণের সুস্পষ্ট মূর্ত্তির অন্তরালে সারদামণি দেবীর মূর্ত্তি এখনও ছায়ার ন্যায় প্রতীত হইলেও, তিনি সাত্ত্বিক প্রকৃতির নারী না হইলে রামকৃষ্ণও রামকৃষ্ণ হইতে পারিতেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ আছে।

বৎসরাধিক কাল অতীত হইলেও যখন রামকৃষ্ণের মনে একক্ষণের জন্যও দেহবুদ্ধির উদয় হইল না, এবং যখন তিনি সারদামণি দেবীকে কখন জগন্মাতার অংশভাবে এবং কখন সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা বা ব্রহ্মভাবে দৃষ্টি করা ভিন্ন অপর কোন ভাবে দেখিতে ও ভাবিতে সমর্থ হইলেন না, তখন রামকৃষ্ণ আপনাকে পরীক্ষোত্তীর্ণ ভাবিয়া ষোড়শী পূজার আয়োজন করিলেন, এবং সারদামণিদেবীকে অভিষেকপূর্ব্বক পূজা করিলেন। পূজাকালের শেষ দিকে সারদামণি বাহ্যজ্ঞানরহিতা ও সমাধিস্থা হইয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে।

ইহার পরও তিনি অহঙ্কৃতা হন নাই, তাঁহার মাথা বিগ্‌ড়াইয়া যায় নাই।

ষোড়শীপূজার পর তিনি প্রায় পাঁচ মাস দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন। তিনি ঐ সময় পূর্ব্বের ন্যায় রন্ধনাদি দ্বারা রামকৃষ্ণ ও তাঁহার জননীর এবং অতিথি-অভ্যাগতের সেবা করিতেন এবং দিনের বেলা নহবৎ-ঘরে থাকিয়া রাত্রে স্বামীর শয্যাপার্শ্বে থাকিতেন। সকল প্রকারের খাদ্য ও রন্ধন রামকৃষ্ণের সহ্য হইত না বলিয়া অনেক সময়েই তাঁহার জন্য আলাদা রান্না করিতে হইত। সেই সময় দিবারাত্র রামকৃষ্ণের "ভাব-সমাধির বিরাম ছিল না" এবং কখন কখন "মৃতের লক্ষণসকল তাঁহার দেহে প্রকাশিত হইত।" কখন্ রামকৃষ্ণের সমাধি হইবে, এই আশঙ্কায় সারদামণির রাত্রিকালে নিদ্রা হইত না। এই কারণে তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত হইতেছে জানিয়া রামকৃষ্ণ নহবৎ-ঘরে নিজের মাতার নিকট তাঁহার শয়নের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এইরূপে একবৎসর চারিমাস দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া সারদামণি দেবী সম্ভবতঃ ১২৮০ সালের কার্ত্তিক মাসে কামারপুকুরে ফিরিয়া আসেন।

তখনকার কথা স্মরণ করিয়া সারদামণি দেবী উত্তর-কালে কখন কখন স্ত্রী-ভক্তদিগকে বলিতেন,

"সে যে কি অপূর্ব্ব দিব্যভাবে থাক্‌তেন, তা ব'লে বোঝাবার নয়! কখন ভাবের ঘোরে কত কি কথা, কখন হাসি, কখন কান্না, কখন একেবারে সমাধিতে স্থির হয়ে যাওয়া—এই রকম সমস্ত রাত! সে কি এক আবির্ভাব আবেশ, দেখে ভয়ে আমার সর্ব্বশরীর কাঁপ্‌ত, আর ভাব্‌তুম কখন রাতটা পোহাবে। ভাবসমাধির কথা তখন তো কিছু বুঝি না;—একদিন তাঁর আর সমাধি ভাঙ্গে না দেখে ভয়ে কেঁদে-কেটে হৃদয়কে ডেকে পাঠালুম। সে এসে কানে নাম শুনাতে শুনাতে তবে কতক্ষণ পরে তাঁর চৈতন্য হয়। তার পর ঐরূপে ভয়ে কষ্ট পাই দেখে তিনি নিজে শিখিয়ে দিলেন—এই রকম ভাব দেখ্‌লে এই নাম শুনাবে, এই রকম ভাব দেখ্‌লে এই বীজ শুনাবে। তখন আর তত ভয় হত না, ঐ সব শুনালেই তাঁর আবার হুঁস্ হত।"

সারদামণি দেবী বলিতেন—

এইরূপে প্রদীপে শল্‌তেটি কিভাবে রাখিতে হইবে, বাড়ীর প্রত্যেকে কে কেমন লোক ও কাহার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, অপরের বাড়ী যাইয়া কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, প্রভৃতি সংসারের সকল কথা হইতে ভজন কীর্ত্তন ধ্যান সমাধি ও ব্রহ্মজ্ঞানের কথা পর্য্যন্ত সকল বিষয় ঠাকুর তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছেন।

কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক ভদ্রমহিলা দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের দর্শনে আসিয়া নহবৎখানায় সমস্ত দিন থাকিতেন। রামকৃষ্ণ ও তাঁহার জননীর জন্য রন্ধন ব্যতীত ইহাঁদের জন্য রান্নাও সারদামণি করিতেন, এবং কখন কখন বিধবাদের জন্য গোবর গঙ্গাজল দিয়া তিনবার উনুন পাড়িয়া আবার রান্না চড়াইতে হইত।

একবার পাণিহাটির মহোৎসব দেখিতে যাইবার সময় রামকৃষ্ণ জনৈক স্ত্রী-ভক্তের দ্বারা সারদামণি দেবীকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, তিনি যাইবেন কি না;—"তোমরা ত যাইতেছ, যদি ওর ইচ্ছা হয় ত চলুক।"

সারদামণি দেবী ঐ কথা শুনিয়া বলিলেন, 'অনেক লোক সঙ্গে যাইতেছে, সেখানেও অত্যন্ত ভিড় হইবে, অত ভিড়ে নৌকা হইতে নামিয়া উৎসব দর্শন করা আমার পক্ষে দুষ্কর হইবে, আমি যাইব না।' তাঁহার এই না-যাওয়ার সঙ্কল্পের উল্লেখ করিয়া পরে রামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "অত ভিড়—তাহার উপর ভাব-সমাধির জন্য আমাকে সকলে লক্ষ্য করিতেছিল,—ও (সারদামণি) সঙ্গে না যাইয়া ভালই করিয়াছে, ওকে সঙ্গে দেখিলে লোকে বলিত 'হংস হংসী এসেছে।' ও খুব বুদ্ধিমতী।" তার পর পত্নীর বুদ্ধির ও নির্লোভিতার দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বলেন—

"মাড়োয়ারী ভক্ত (লছমীনারায়ণ) যখন দশ হাজার টাকা দিতে চাহিল তখন আমার মাথায় যেন করাত বসাইয়া দিল; মাকে বলিলাম, 'মা! এত দিন পরে আবার প্রলোভন দেখাইতে আসিলি!' সেই সময় ওর মন বুঝিবার জন্য ডাকাইয়া বলিলাম, 'ওগো, এই টাকা দিতে চাহিতেছে, আমি লইতে পারিব না বলিয়া তোমার নামে দিতে চাহিতেছে, তুমি উহা লও না কেন, কি বল?' শুনিয়াই ও বলিল, 'তা কেমন করিয়া হইবে? টাকা লওয়া হইবে না—আমি লইলে ঐ টাকা তোমারই লওয়া হইবে। কারণ আমি উহা রাখিলে তোমার সেবা ও অন্যান্য আবশ্যকে উহা ব্যয় না করিয়া থাকিতে পারিব না; সুতরাং ফলে উহা তোমারই গ্রহণ করা হইবে। তোমাকে লোকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে তোমার ত্যাগের জন্য—অতএব টাকা কিছুতেই লওয়া হইবে না।' ওর ঐ কথা শুনিয়া আমি হাঁপ ছেলিয়া বাঁচি!"

যাঁহাকে দরিদ্রতাবশতঃ বিপৎ-সঙ্কুল দুই তিন দিনের পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া দক্ষিণেশ্বর যাইতে হইত, ইহা সেইরূপ অবস্থার নারীর নিস্পৃহতা ও সুবিবেচনার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

"সারদামণি দেবী পাণিহাটীর মহোৎসব দেখিতে না যাওয়ার কারণ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "প্রাতে উনি আমাকে যে ভাবে যাইতে বলিয়া পাঠাইলেন তাহাতেই বুঝিতে পারিলাম উনি মন খুলিয়া অনুমতি দিতেছেন না। তাহা হইলে বলিতেন—হাঁ, যাবে বৈ কি। ঐরূপ না করিয়া উনি ঐ বিষয়ের মীমাংসার ভার যখন আমার উপরে ফেলিয়া বলিলেন, 'ওর ইচ্ছা হয় ত চলুক', তখন স্থির করিলাম যাইবার সঙ্কল্প ত্যাগ করাই ভাল।"

সারদামণি দেবী বাঙালী হিন্দু-কুল-বধূ, সুতরাং সাতিশয় লজ্জাশীলা ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরের বাগানে নহবৎখানায় তিনি দীর্ঘকাল স্বামীর ও অতিথি-অভ্যাগতের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন অল্প লোকেই তাঁহাকে দেখিতে পাইত। রাত্রি তিনটার পর কেহ উঠিবার বহু পূর্ব্বে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য স্নানাদি সমাপন করিয়া তিনি যে ঘরে ঢুকিতেন, সমস্ত দিবস আর বাহিরে আসিতেন না,—কেহ উঠিবার বহু পূর্ব্বে নীরবে নিঃশব্দে আশ্চর্য্য ক্ষিপ্রকারিতার সহিত সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া পূজা জপ ধ্যানে নিযুক্ত হইতেন। অন্ধকার রাত্রে নহবৎখানার সম্মুখস্থ বকুলতলার ঘাটের সিঁড়ি বাহিয়া গঙ্গায় অবতরণ করিবার কালে তিনি এক দিবস এক প্রকাণ্ড কুম্ভীরের গাত্রে প্রায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। কুম্ভীর ডাঙ্গায় উঠিয়া সোপানের উপরে শয়ন করিয়া ছিল; তাঁহার সাড়া পাইয়া জলে লাফাইয়া পড়িল। তদবধি সঙ্গে আলো না লইয়া তিনি কখন ঘাটে নামিতেন না। এইরূপ স্বভাব ও অভ্যাস সত্ত্বেও স্বামীর কঠিন কণ্ঠরোগের চিকিৎসার জন্য শ্যামপুকুরে অবস্থানের সময় "এক মহল বাটীতে, অপরিচিত পুরুষ-সকলের মধ্যে, সকল-প্রকার শারীরিক অসুবিধা সহ্য করিয়া তিনি যে ভাবে নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।" "ডাক্তারের উপদেশ-মত সুপথ্য প্রস্তুত করিবার লোকাভাবে ঠাকুরের রোগবৃদ্ধির সম্ভাবনা হইয়াছে, শুনিবামাত্র সারদামণি দেবী আপনার থাকিবার সুবিধা-অসুবিধার কথা কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া শ্যামপুকুরের বাটীতে আসিয়া ঐ ভার সানন্দে গ্রহণ করেন।—তিনি সেখানে থাকিয়া সর্ব্বপ্রধান সেবাকার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।" তিনি তখনও রাত্রি ৩টার পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিতেন, এবং রাত্রি ১১টার পর মাত্র দুইটা পর্য্যন্ত শয়ন করিয়া থাকিতেন। হিন্দু-কুল-বধূ হইলেও তিনি প্রয়োজন হইলে পূর্ব্বসংস্কার ও অভ্যাসের বাধা অতিক্রম করিয়া প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সাহসের সহিত যথাযথ আচরণে কতদূর সমর্থা ছিলেন, তাহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ একটি ঘটনার বিবরণ দিতেছি।

স্বল্পব্যয়সাধ্য যানের অভাব, অর্থাভাব প্রভৃতি নানা কারণে সেকালে সারদামণি দেবী অনেক সময়ে জয়রামবাটী ও কামারপুকুর হইতে দক্ষিণেশ্বর হাঁটিয়া আসিতেন। আসিতে হইলে পথিকগণকে ৪।৫-ক্রোশ-ব্যাপী তেলো-ভেলো ও কৈকলার মাঠ উত্তীর্ণ হইতে হইত। ঐ বিস্তীর্ণ প্রান্তরদ্বয়ে তখন নরহন্তা ডাকাইতদের ঘাটি ছিল। প্রান্তরের মধ্যভাগে এখনও এক ভীষণ কালীমূর্ত্তি দেখিতে

শ্রীমতী সারদামণি দেবী

পাওয়া যায়। এই 'তেলোভেলোর ডাকাতে কালী'র পূজা করিয়া ডাকাইতেরা নরহত্যা ও দস্যুতায় প্রবৃত্ত হইত। এই কারণে লোকে দলবদ্ধ না হইয়া এই দুটা প্রান্তর অতিক্রম করিতে সাহসী হইত না।

একবার রামকৃষ্ণের এক ভাইপো ও ভাইঝি এবং অপর কয়েকটি স্ত্রীলোক ও পুরুষের সহিত সারদামণি দেবী পদব্রজে কামারপুকুর হইতে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিতেছিলেন। আরামবাগে পৌঁছিয়া তেলোভেলো ও কৈকলার প্রান্তর সন্ধ্যার পূর্ব্বে পার হইবার যথেষ্ট সময় আছে ভাবিয়া তাঁহার সঙ্গীগণ ঐ স্থানে অবস্থান ও রাত্রিযাপনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিল। পথশ্রমে ক্লান্ত থাকিলেও সারদামণি দেবী আপত্তি না করিয়া তাঁহাদের সহিত অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা বার বার আগাইয়া গিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া তিনি নিকটে আসিলে আবার চলিতে লাগিলেন। শেষ বাঁর তাঁহারা বলিলেন, এইরূপে চলিলে এক প্রহর রাত্রির মধ্যেও প্রান্তর পার হইতে পারা যাইবে না ও সকলকে ডাকাইতের হাতে পড়িতে হইবে। এতগুলি লোকের অসুবিধা ও আশঙ্কার কারণ হইয়াছেন দেখিয়া তিনি তখন তাঁহাদিগকে তাঁহার নিমিত্ত পথিমধ্যে অপেক্ষা করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, 'তোমরা একেবারে তারকেশ্বরের চটিতে পৌছে বিশ্রাম করগে, আমি যত শীঘ্র পারি, তোমাদের সঙ্গে মিলিত হচ্ছি।' তাহাতে সঙ্গীরা বেলা বেশী নাই দেখিয়া জোরে হাঁটিতে লাগিল ও শীঘ্র দৃষ্টির বহির্ভূত হইল। সারদামণি দেবীও, ক্লান্তি সত্ত্বেও যথাসাধ্য দ্রুত চলিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রান্তরমধ্যে পৌছিবার কিছু পরেই সন্ধ্যা হইল। বিষম চিন্তিতা হইয়া তিনি কি করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, দীর্ঘাকার ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ এক পুরুষ লাঠি কাঁধে লইয়া তাঁহার দিকে আসিতেছে। তাহার পিছনেও তাহার সঙ্গীর মত কে যেন একজন আসিতেছে মনে হইল। পলায়ন বা চীৎকার বৃথা বুঝিয়া তিনি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অল্প ক্ষণের মধ্যেই লোকটা তাঁহার কাছে আসিয়া কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'কে গা এসময়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছ?' সারদামণি বলিলেন, 'বাবা, আমার সঙ্গীরা আমাকে ফেলে গেছে, আমিও বোধ হয় পথ ভুলেছি; তুমি আমাকে সঙ্গে ক'রে' যদি তাদের নিকট পৌছিয়ে দাও। তোমার জামাই দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতে থাকেন। আমি তাঁরই নিকট যাচ্ছি। তুমি যদি সেখান পর্য্যন্ত আমাকে নিয়ে যাও, তা হ'লে তিনি তোমার খুব আদর যত্ন কর্‌বেন।' এই কথাগুলি বলিতে না বলিতে পিছনের দ্বিতীয় লোকটিও তথায় আসিয়া পৌছিল, এবং সারদামণি দেবী দেখিলেন, সে স্ত্রীলোক, পুরুষটির পত্নী। তাহাকে দেখিয়া বিশেষ আশ্বস্তা হইয়া তিনি তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে বলিলেন, 'মা, আমি তোমার মেয়ে সারদা, সঙ্গীরা ফেলে যাওয়ায় বিষম বিপদে পড়েছিলাম; ভাগ্যে বাবা ও তুমি এসে পড়্‌লে, নইলে কি কর্‌তাম বল্‌তে পারি নে।'

সারদামণির এইরূপ নিঃসঙ্কোচ সরল ব্যবহার, একান্ত বিশ্বাস ও মিষ্ট কথায় বাগ্‌দি পাইক ও তাহার স্ত্রীর প্রাণ একেবারে গলিয়া গেল। তাহারা সামাজিক আচার ও জাতির পার্থক্য ভুলিয়া সত্যসত্যই তাঁহাকে আপনাদের কন্যার ন্যায় দেখিয়া তাঁহাকে খুব সান্ত্বনা দিতে লাগিল, এবং তিনি ক্লান্ত বলিয়া আর তাঁহাকে অগ্রসর হইতে না দিয়া নিকটস্থ গ্রামের এক দোকানে লইয়া গিয়া রাখিল। রমণী নিজ বস্ত্রাদি বিছাইয়া তাঁহার জন্ত বিছানা করিয়া দিল ও পুরুষটি দোকান হইতে মুড়ি-মুড়কি কিনিয়া তাঁহাকে খাইতে দিল। এইরূপে পিতামাতার ন্যায় আদর ও স্নেহে তাঁহাকে ঘুম পাড়াইয়া ও রক্ষা করিয়া তাহারা রাত কাটাইল এবং ভোরে উঠিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া তারকেশ্বর পৌছিল। সেখানে এক দোকানে তাঁহাকে রাখিয়া বিশ্রাম করিতে বলিল। বাগ্‌দিনী তাহার স্বামীকে বলিল, 'আমার মেয়ে কাল কিছুই খেতে পায়নি; বাবা তারকনাথের পূজা শীঘ্র সেরে বাজার হ'তে মাছ তরকারি নিয়ে এস; আজ তাকে ভাল ক'রে খাওয়াতে হবে।'

বাগ্‌দি পুরুষটি ঐসব করিবার জন্ত চলিয়া গেলে সারদামণি দেবীর সঙ্গী ও সঙ্গিনীগণ তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তিনি নিরাপদে পৌছিয়াছেন দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে

লাগিল। তখন তিনি তাঁহার রাত্রে আশ্রয়দাতা বাগ্‌দি পিতামাতার সহিত তাঁহাদের পরিচয় করাইয়া দিয়া বলিলেন, 'এঁরা এসে আমাকে রক্ষা না কর্‌লে কাল রাত্রে যে কি কর্‌তুম, বল্‌তে পারি না।'

তাহার পর সকলে আবার পথচলা আরম্ভ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলে সারদামণি দেবী ঐ পুরুষ ও রমণীকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বিদায় প্রার্থনা করিলেন। তিনি বলিয়াছেন,

"এক রাত্রের মধ্যে আমরা পরস্পরকে এতদূর আপনার করিয়া লইয়াছিলাম যে, বিদায়-গ্রহণ-কালে ব্যাকুল হইয়া অজস্র ক্রন্দন করিতে লাগিলাম। অবশেষে সুবিধামত দক্ষিণেশ্বরে আমাকে দেখিতে আসিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ পূর্ব্বক ঐকথা স্বীকার করাইয়া লইয়া অতিকষ্টে তাহাদিগকে ছাড়িয়া আসিলাম। আসিবার কালে তাহারা অনেক দূর পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে আসিয়াছিল, এবং রমণী পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষেত্র হইতে কতকগুলি কড়াই-শুঁটি তুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আমার অঞ্চলে বাঁধিয়া কাতরকণ্ঠে বলিয়াছিল, 'মা সারদা, রাত্রে যখন মুড়ি খাবি, তখন এইগুলি দিয়ে খাস্।' পূর্ব্বোক্ত অঙ্গীকার তাহারা রক্ষা করিয়াছিল। মিষ্টান্ন প্রভৃতি দ্রব্য লইয়া আমাকে দেখিতে মধ্যে মধ্যে কয়েকবার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। উনিও আমার নিকট সকল কথা শুনিয়া ঐ সময়ে তাহাদিগের সহিত জামাতার ন্যায় ব্যবহারে ও আদর-আপ্যায়নে তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। এখন সরল ও সচ্চরিত্র হইলেও আমার ডাকাত-বাবা পূর্ব্বে কখন কখন ডাকাইতি যে করিয়াছিল, একথা কিন্তু আমার মনে হয়।"

১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ পরমহংস দেব দেহ-ত্যাগ করেন। তখন সারদামণি দেবীর বয়স ৩৩ বৎসর। আমি শুনিয়াছিলাম, স্বামীর তিরোভাবের সারদামণি দেবী বিধবার বেশ ধারণ করেন নাই। ইহা সত্য কি না জানিবার জন্য পরমহংস দেবের ও সারদামণি দেবীর একজন ভক্তকে চিঠি লিখিয়াছিলাম। তিনি উত্তর দিয়াছেন :—

"শ্রীশ্রীমৎপরমহংস দেবের দেহরক্ষার সময় মা হাতের বালা খুলিতে গেলে, শ্রীশ্রীপরমহংস দেব, জীবিত অবস্থায় রোগহীন শরীরে যেমন দেখিতে ছিলেন, সেই মূর্ত্তিতে আসিয়া মার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলেন—আমি কি মরিয়াছি যে তুমি এয়োস্ত্রীর জিনিষ হাত হইতে খুলিতেছ? এই কথার পর আর মা কখন শুধু-হাতে থাকেন নাই—পরিধানে লাল নরুন-পেড়ে কাপড় এবং হাতে বালা ছিল।"

আত্মার অমরত্বে এইরূপ বিশ্বাস সকলের থাকিলে সংসারের অনেক দুঃখ পাপ তাপ ও দুর্গতি দূর হয়।

স্বামীর তিরোভাবের পর সারদামণি দেবী ৩৪ বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন। তিনি ১৩২৭ সালের ৪ঠা শ্রাবণ ৬৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাহার পরবর্ত্তী ভাদ্র মাসের "উদ্বোধন" পত্রে তাঁহার ব্রত, ত্যাগ, নিষ্ঠা, সংযম, সকলের প্রতি সমান ভালবাসা, সেবাপরায়ণতা, দিবারাত্র অক্লান্ত ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান ও নিজ শরীরের সুখদুঃখের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনতা, তাঁহার সরলতা, নিরভিমানিতা, সহিষ্ণুতা, দয়া, ক্ষমা, সহানুভূতি ও নিঃস্বার্থপরতা প্রভৃতি গুণ কীর্ত্তিত হইয়াছিল। তাঁহার স্বামীর ও তাঁহার ভক্তেরা তাঁহাকে মাতৃসম্বোধন করিতেন এবং এখনও মা বলিয়াই তাঁহার উল্লেখ করেন। এই মাতৃসম্বোধন সার্থক হউক।

[সারদামণি দেবীর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত রচনা আমার পক্ষে নানা কারণে সহজ হয় নাই। তাঁহাকে প্রণাম করিবার ও তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য আমার কখনও না হওয়ায় তাঁহার সম্বন্ধে আমার সাক্ষাৎ কোন জ্ঞান নাই। পুস্তক ও পত্রিকা হইতে আমাকে তাঁহার বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইতেও যথেষ্ট সাহায্য পাই নাই। "শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ" আমার প্রধান অবলম্বন। ছোট অক্ষরে যাহা ছাপা হইয়াছে, তাহা ছাড়া অন্য অনেক স্থলেও ঐ পুস্তকের ভাষা পর্য্যন্ত গৃহীত হইয়াছে। "উদ্বোধন" হইতেও অল্প সাহায্য পাইয়াছি। ইহার দুটি প্রবন্ধে ভক্তিউচ্ছ্বসিত ভাষায় তাঁহার নানা গুণের বন্দনা আছে। যে-সকল কথায় কাজে ঘটনায় আখ্যায়িকায় ঐ-সকল গুণ প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহার কিছু কিছু লিখিত হইলে ভাল হয়। যাহাতে মানুষের অন্তরের পরিচয় পাওয়া যায়, এমন কোনও কথা কাজ ঘটনা আখ্যায়িকাই তুচ্ছ নহে। কাহারও জীবন্ত ছবি মানুষের নিকট উপস্থিত করিতে হইলে এগুলি আবশ্যক। "শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ" ব্যতীত, সারদামণি দেবীর যে-সকল ফোটোগ্রাফ হইতে ছবি প্রস্তুত করাইয়াছি, সেই-গুলির এবং কয়েকটি সংবাদের জন্যও আমি ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথের নিকট ঋণী। তাঁহাকে তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।]

শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

বাংলায় মৎস্য-পালন ও ব্যবসায়

মৎস্য বাংলাদেশের একটি প্রধান ও বিশেষ প্রয়োজনীয় খাদ্য। কিন্তু উহা ক্রমশঃই আমাদের দেশে দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িতেছে। ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে যে পরিমাণে মৎস্য হাটে বাজারে পাওয়া যাইত এখন আর সে পরিমাণে পাওয়া যায় না। মূল্য প্রায় অনেক জায়গায় দ্বিগুণ কিম্বা তদপেক্ষাও বেশী হইয়াছে। কাটতির আধিক্যবশতঃ এবং মৎস্য-সংরক্ষণ জনন ও পালন সম্বন্ধে ঔদাসীন্যের জন্য নদী পুষ্করিণী খাল ও বিলে মৎস্যের সংখ্যা হ্রাস হইয়া আসিতেছে। প্রতিবিধানের কোন উপায় অবলম্বিত না হইলে, পরিণামে মৎস্যকুল এক-প্রকার লুপ্ত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। মৎস্যের মতন প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাব ঘটিলে লোকের অবস্থা যে কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা অনুমান করা বোধ হয় কঠিন নহে। আমাদের দেশের অধিকাংশ গৃহস্থ ভদ্রলোকের আপন আপন বাড়ীর সীমার মধ্যে দুই-একটি পুষ্করিণী আছে। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে অনায়াসে স্ব স্ব পুষ্করিণীতে মৎস্য পালন করিয়া ব্যবসা হিসাবে প্রচুর লাভ করিতে পারেন এবং নিজেদের আহার্য্য মৎস্যের অভাবও দূর করিতে পারেন। নিম্নে দেখাইতেছি এক বিঘা পরিমিত জমিতে কৃষি-জাত দ্রব্যে যে লাভ দাঁড়ায়, সেই পরিমিত পুষ্করিণীতে মৎস্য পালনে উহা অপেক্ষা ৮।৯ গুণ বেশী লাভ করা যায়।

পুষ্করিণীতে প্রায় সকলপ্রকারের মৎস্য-পালন করিয়া লাভবান্ হওয়া যায়। রোহিত, কাত্‌লা, মিরগেল, কালবোস মৎস্য পালনে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ফল পাওয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ ইহাদের পোনা পাওয়া দুষ্কর নহে; দ্বিতীয়তঃ মূল্য হিসাবে ইহাদের দর বেশী হয়। যদিও বাংলাদেশের প্রায় সর্ব্বস্থানে বোয়াল কই শোল চিতল সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ ডিম পাওয়া বড়ই দুষ্কর। বোয়াল শোল চিতল সংহারক মৎস্য। অন্য মৎস্যকে ইহারা খাইয়া ফেলে। ডিম পাওয়া গেলেও যখন উহারা বাড়িতে থাকে, তখন উহাদিগকে অন্য মৎস্য খাওয়াইতে হয়। এই-সব কারণে ইহাদের পালন রোহিত মৎস্য অপেক্ষা কঠিন ও ব্যয়সাধ্য।

বর্ষা-ঋতুতে যখন নূতন জলে নদীসমূহ পরিপূর্ণ হইয়া যায়, সেই সময় মৎস্য ডিম পাড়িতে আরম্ভ করে। ডিম্বাণুসকল জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া ভাসিতে থাকে, কাপড় কিম্বা এই উদ্দেশ্যে যে এক-প্রকার জাল প্রস্তুত হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা উহা ধরিতে হয়।

আষাঢ়ের প্রথমে বা অম্বুবাচীর সময় যে-সকল ডিম আমদানি হয়, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এই সময়ের ডিম বেশ সতেজ ও সজীব, জলাশয়ে ছাড়িলে ইহার প্রায় একটিও নষ্ট হয় না, সমস্তই ফুটিয়া থাকে এবং পোনাসমূহ শীঘ্র বর্দ্ধিত হয়। রোহিত কাতলা বাটা প্রভৃতির ডিম একটি হাঁড়ির মধ্যে জল সহ রাখিয়া, উপরে একখানি কাপড় বিছাইয়া, যদি কিছুক্ষণ বন্ধ করিয়া রাখা যায়, তবে দেখা যায় যে ডিমগুলি একস্থানে মিলিত হইয়া জমাট বাঁধিয়াছে। অন্য মৎস্যের ডিম হইলে এরূপ জমাট বাঁধে না। ডিমগুলি হাঁড়ির মধ্যে অনায়াসে বাঁচিতে ও বাড়িতে পারে, কিন্তু পুনঃ পুনঃ জল বদ্‌লাইয়া দেওয়া দরকার। ডিম পাড়ার প্রায় ৮।১০ দিন পরে ডিম ফুটিয়া পোনা বাহির হয়। হাঁড়িতে বাঁচিতে পারে বলিয়া অনেক সময় এই অবস্থায় রেলে ষ্টিমারে অনেক দূর পাঠান হইয়া থাকে। ডিমের দর সব সময় একরকম থাকে না। টাট্‌কা ডিম এক কুণিকার দাম প্রায় ৮।৯ টাকা। এক কুণিকায় প্রায় ৬০০০।৭০০০ ডিম থাকে। কিন্তু ছোট পোনার দাম প্রায় হাজার-করা ১২৲ হইতে ১৬৲ টাকা। ডিম হইতে পোনা তৈয়ারী করিয়া বিক্রয় করাও খুব লাভজনক ব্যবসা। বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশে এই নিয়ম প্রচলিত নাই। বিহার উড়িষ্যা প্রদেশের জন্য

২৬২০০০ মৎস্যের পোনা বাংলা-গভর্ণ্মেণ্ট্ গত বৎসর এখান হইতে চালান দিয়াছেন।

বর্দ্ধন করিবার পুষ্করিণী অর্থাৎ যেখানে ডিম বা পোনা মৎস্য ছাড়া হয়, তাহা খুব বেশী বড় বা গভীর না হওয়াই ভাল। কারণ, তাহা না হইলে, দরকার অনুযায়ী মৎস্য ধরিতে বেগ পাইতে হয়। বর্দ্ধন করিবার পুষ্করিণীর নিম্নে ঘাস বা পরিষ্কার খড় রাখিয়া দিতে হয়। সেই খড় বা ঘাসে ডিম সংলগ্ন হইয়া থাকে। জল একটু ঘোলা করিয়া দেওয়া দরকার। ঐ পুষ্করিণীতে কোন-প্রকার সংহারী মৎস্য বা ভেক থাকিতে পাইবে না। পঙ্কোদ্ধার করা হইলেই ভাল হয়। কোন-প্রকার নালা না থাকে সে বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। ডিম ছাড়িবার ৭।৮ দিন পরে ডিম ফুটিলে পর, মৎস্যের পোনা একটু বর্দ্ধিত হওয়া পর্য্যন্ত ঐ পুষ্করিণীতে রাখিয়া দিতে হয় এবং এই সময় ময়দা চাল ডালের গুঁড়া উহাদিগকে খাইতে দেওয়া আবশ্যক।

পোনা একটু বড় হইলেই চালিয়া সংস্কার-করা বৃহৎ পুষ্করিণীতে ছাড়িয়া দিতে হয়। ইহাতেও কোন সংহারক মৎস্য কচ্ছপ না থাকে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। জলে কিছু শেওলা জন্মিতে দেওয়া মন্দ নয়। কলমী শাক ও কাশগুরা সবচেয়ে ভাল। যে পুষ্করিণীতে খাদ্যের পরিমাণ বেশী থাকে সেখানে মৎস্য বেশী বাড়ে ও ওজনে বেশী হয়। বাংলা দেশে এক-প্রকার অতি ছোট চিংড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলি প্রায় সমস্ত বৎসর ধরিয়াই ডিম পাড়ে। রোহিত কাত্লা মৎস্য এই ছোট চিংড়ি খায়, অন্য কোন মৎস্য খায় না। জান্তব পদার্থ যাহা খায়, উহা প্রায়ই অনুজীবাণু এবং অতি ক্ষুদ্র শম্বুক গুগ্লি। এইসকল অণুজীব উহাদের প্রধান খাদ্য নহে; উহারা উদ্ভিজ্জ পদার্থই অধিক পরিমাণে ভক্ষণ করে।

উপযুক্ত খাদ্য ভিন্ন মৎস্য কখনও বর্দ্ধিত হইতে পারে না। কৃত্রিম খাদ্য প্রথমে দেওয়ার কোন আবশ্যকতা নাই। কিন্তু যদি বৎসরের শেষে দেখা যায়, যে পরিমাণে মৎস্যের বাড়া উচিত ছিল তাহা বাড়ে নাই, তাহা হইলে কৃত্রিম খাদ্য প্রদান করা উচিত। তখন ভাত ময়দা চাল ইত্যাদি দেওয়া যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন নাইট্রোজেন্-মিশ্রিত পদার্থগুলি মৎস্য-বৃদ্ধির বিশেষ সাহায্য করে। মৎস্যের উপকরণ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, সাড়ে বারো মণ মৎস্যে ২০ ভাগ নাইট্রোজেন্, ৮॥ ভাগ ফস্ফরিক এসিড, ও ৪॥০ ভাগ পটাস্ এবং তৈলজ পদার্থও শতকরা ১৯ ভাগ। মৎস্যের খাদ্যেও এই উপকরণ থাকা চাই। কার্পাসের বীজের খৈল ইহাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য। ইহাতে হাজার-করা নাইট্রোজেন্ ৬৬·০ ভাগ, ফস্ফরিক এসিড ৩১·২ ভাগ থাকে। কিন্তু এগুলি বেশী পরিমাণে জলে ফেলিলে, জল নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

মৎস্যের বৃদ্ধির জন্য কেবল খাদ্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। আহারের ন্যায় অঙ্গ-সঞ্চালন শরীর-বৃদ্ধির আর-একটি কারণ। পোনাগুলি একটু বড় হইলে ২।১টি সংহারক মৎস্য পুষ্করিণীতে ছাড়িয়া দিলে মন্দ হয় না। উহারা তাড়া দিয়া পোনাগুলিকে সর্ব্বদা চঞ্চল রাখে, ইহাতে তাহাদের শরীর বৃদ্ধি পায়। মধ্যে মধ্যে জাল ফেলিয়াও তাড়া দেওয়া উচিত। অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন রেলওয়ে ও তাল-গাছের নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণীর মৎস্য খুব শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হয়। রেল-গাড়ীর যাতায়াতের ও তালবৃন্তের শব্দে ইহারা ভয়ে দৌড়াইয়া থাকে, এই অঙ্গ-সঞ্চালনই ইহাদের শরীর-বৃদ্ধির কারণ। পুষ্করিণীতে রজকের কাপড় কাচার বন্দোবস্ত থাকা ভাল। প্রথমতঃ কাপড় কাচার শব্দে মৎস্য ভীত হইয়া দৌড়ায় এবং ইহাতে অঙ্গ-সঞ্চালন হয়। দ্বিতীয়তঃ বস্ত্রের ময়লা ক্ষার প্রভৃতি খাদ্যরূপে তাহারা প্রাপ্ত হয়।

এক বিঘা পরিমিত একটি পুষ্করিণীতে, ডিম ফুটাইয়া পোনা বিক্রয় করিলে এক বৎসরে কত লাভ হইতে পারে, তাহার হিসাব দেওয়া গেল * —

ব্যয়। (১)

মৎস্যের ডিম ফুটাইবার জন্য একবিঘা পরিমিত একটি পুষ্করিণীর বাৎসরিক খাজনা ৪৫৲

* এই আরবায় মস্তিষ্কের চিন্তা-প্রসূত নহে। কলিকাতার সহরতলীতে জনৈক বন্ধু হাতে-কলমে মৎস্য চাষ করিয়া যে ফল পাইয়াছেন, তাহারই বিবরণ। গ্রামদেশে ইহা অপেক্ষাও খরচ কম পড়িবে; সুতরাং লাভ বেশী হইবে।——লেখক

গ্রীষ্মকালে পুষ্করিণীর সংস্কারের খরচ	২০৲
চতুষ্পার্শ্বে বাঁশের বেড়া ও মাটির বাঁধ (বৃষ্টির জল গড়াইয়া না প্রবেশ করে) দিবার খরচ	৫৲
১২ কুণিকা প্রথম আমদানির সতেজ ডিম ক্রয় ১০৲ হিসাবে	১২০৲
তত্ত্বাবধান ও পাহারার জন্য একজন মালি, মাসিক ১৫৲ বেতনে	১৮০৲
মোট ব্যয়	৩৭০৲

মৎস্যের পোনা-বিক্রয়ের আয় (১)

১২ কুণিকা ডিমে প্রায় ৭২০০০ পোনা হইবে। ১২০০০ বাদে ৬০০০০ পোনার মূল্য হাজার (কম করিয়া) ১২৲ টাকা হিসাবে মোট ৭২০৲

পোনা বিক্রয় হইবার পর, ভাদ্র মাসে আবার ঐ পুষ্করিণীতে ডিম ছাড়িতে হইবে। এই সময় ডিম খুব সস্তা। ৪৲ টাকা হিসাবে ১৫ কুণিকা ডিম ছাড়িলেই হইবে। এই ডিমের পোনা হইলে একবিঘা-পরিমিত পুষ্করিণীতে তাহা পালন করা অসম্ভব। অন্ততঃপক্ষে যদি ১০ হাজার পোনাও বাঁচে এবং ছয়মাসও যত্নের সহিত পালন করা যায়, তাহা হইলে গড়ে এক-একটা মৎস্য কমপক্ষে দেড় পোয়া ওজনের হইবে। ১০৲ মণ হইলেও এই ৯০ মণ মৎস্যের মূল্য ৯০০৲

আয় (১)	৭২০৲
দুই বারে মোট আয়	১৬২০৲
দ্বিতীয় বারে মৎস্য ধরিবার, খাদ্যের, ও অন্যান্য বিষয়ে খরচ (বেশী করিয়া) —	২০০৲
প্রথম বারের খরচ (১)	৩৭০৲
দুইবারে মোট ব্যয়	৫৭০৲
নিট লাভ	১০৫০৲

রীতিমত খাদ্য প্রদান করিলে, বৎসরে গড়ে মৎস্য প্রায় ১ সের ওজনে হয়। দ্বিতীয় বৎসর ১৷৷০ সের ও তৃতীয় বৎসর তিন সেরের উপর হয়। কোন্ পুষ্করিণীতে কত পোনা ফেলিতে হইবে, তাহা পুষ্করিণীর আকারের উপর নির্ভর করে। অতিরিক্ত লাভের আশায় খুব বেশী পোনা এক জায়গায় ফেলা উচিত নহে। বড় পুষ্করিণীর মৎস্য ২।৩ বৎসর পরে বিক্রী করিলে উপরিউক্ত লাভের অপেক্ষা আরও লাভ বেশী হইবে।

রোহিত কাত্‌লা ভিন্ন অন্যান্য মৎস্য—যেমন শোল, বোয়াল কই মাগুর ভেট্‌কী চিংড়ি প্রভৃতি পালনে প্রচুর লাভ আছে। কিন্তু, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহাদের ডিম বা পোনা সংগ্রহ করা একটু কষ্টকর।

অন্যান্য ব্যবসায়ের ন্যায় মৎস্যের ব্যবসায়েও প্রচুর লাভ আছে। মূলধন লইয়া যাহারা ব্যবসা বরিতে ইচ্ছুক, তাহারা মুঙ্গের পাওয়া গোয়ালন্দ প্রভৃতি স্থান হইতে কলিকাতায় পোনা চালান দিতে পারেন। সুখের বিষয় আমাদের দেশের শিক্ষিত লোক আজকাল, চাকুরী না পাইয়াই হউক, কিম্বা ব্যবসায়ের প্রতি সম্মান ও স্বীয় মঙ্গল প্রভৃতি বুঝিয়াই হউক, এই ব্যবসায় আরম্ভ করিতেছেন। অন্যান্য ব্যবসায়ের ন্যায় ইহাতেও বেশ শিক্ষার প্রয়োজন। সকল বিষয় না জানিয়া শুনিয়া এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে যে লাভ হইবে, এ আশা করা বৃথা।

কলিকাতাতে মৎস্য আমদানি করাই লাভজনক। এখানে মৎস্য যে দরে বিক্রী হয় অন্য কোথাও এরূপ দুর্ম্মূল্য নহে। এতদ্ভিন্ন, এখানে যত কাটতি, অন্যত্র তাহা হয় না। গত তিন বৎসর মফঃস্বল হইতে এখানে কি পরিমাণ মৎস্য আমদানি হইয়াছে দেখা যাক্ :—

১৯১৯—২০ সালে

মণ	সের		টন
২৯৭৫৪২	২৭	বা	৯৫৭৮·৪০

১৯২০—২১ সালে

মণ	সের		টন
৩৭০১১৯	২৪	বা	১৩৫৯৬৫০

১৯২১—২২ সালে

(১) রেলে	মণ	সের	টন
আসাম-বেঙ্গল	২৩,৬৬২	২১	৮৬৯,২৩
বারাসত-বসিরহাট লাইট্	৩২,৩২০	০	১,১৮৭·২৭
বেঙ্গল প্রোভিন্‌শ্যাল	১	০	·০৪
বেঙ্গল-নাগপুর	৪৩,৮৬৮	১০	১,৬১১·৪৯

	মণ	সের	টন
বেঙ্গল নর্থ-ওয়েষ্টান	৩৪০	১৮	১২·৫০
ই বি আর	২৩০,৬০৩	১৮	৮,৪৭১·১৪
ই আই আর	৫,৪৬৫	৩	২০০·৭৫
হাওড়া-আম্তা লাইট্ রেল	৭২৬	০	২৬·৬৭
হাওড়া-শিয়াখালা	৮	০	·৩০
কালীঘাট-ফল্তা	১,২১৪	১০	৪৪·৬০
রেলে মোট	৩৩৮,২০৯	০	১২·৪২৩·৯৯
(২) ষ্টীমারে			
কলিকাতা ষ্টীম ন্যাভিগেশন কোং	৩৪৪	০	১২·৬৪
মোট	৩৪৪		১২·৬৪
(৩) নৌকায়			
কলিকাতা খাল	১৯,৩৭৭	০	৭১১·৮১
পোর্ট কমিশনার জেটী	১,২৪৮	১৭	৪৫·৮৬
মোট নৌকায়	২০,৬২৫	১৭	৭৫৭·৬৭
(৪) রাস্তায়	৫৮,৫০৬	৭	২,১৪৯·২০
মোট আমদানী	৪১৭,৬৮৪-২৪		১৫,৩৪৩·৫০

সুতরাং দেখা যাইতেছে ১৯১৯-২০, ১৯২০-২১ এই দুই বৎসর অপেক্ষা ১৯২১-২২ সালে যথাক্রমে শতকরা ৩৩ এবং ১৩ ভাগ বেশী আম্‌দানি হইয়াছে; ইহার বেশীর ভাগ আবার পূর্ব্ববঙ্গ হইতে।

শুষ্ক চিংড়ি মৎস্যেরও খুব কাটতি আছে। গত বৎসর কলিকাতা ও চট্টগ্রাম পোর্ট্ হইতে যথাক্রমে ২২৮০৯ হন্দর ও ৪৭৪০ পাউণ্ড্ শুষ্ক চিংড়ি রেঙ্গুনে রপ্তানি হইয়াছে। উহার মূল্যও কম নহে; কলিকাতা পোর্টের রপ্তানি মালের মূল্য ৯৯৭,৯৬৯৲ টাকা এবং চট্টগ্রামের ১৮০০৲ টাকা। পূর্ব্ববঙ্গের নদী হইতেই চিংড়ি অধিকাংশ ধরা হয়। পালন করিয়া চিংড়ি মৎস্য শুষ্ক কেহ করে না। বর্ষাকালে পূর্ব্ববঙ্গের প্রায় সকল বড় বড় নদীতে জেলেরা উহা প্রচুর পরিমাণে ধরে। পূর্ব্বেই উহাদিগকে দাদন দিয়া রাখিতে হয়। ধরার সঙ্গে সঙ্গে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া বস্তাবন্দি করিয়া রাখিয়া দিলে ২।৩ মাসে কোনপ্রকারে নষ্ট হয় না। তার পর সুবিধা বুঝিয়া যেখানে কাটতি বেশী সেখানে চালান দিতে হয়। ব্রহ্মদেশে আকিয়াব রেঙ্গুন মৌলমেন প্রভৃতি সহরে যাহারা খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করে তাহারা ইহা ক্রয় করে।

বাংলায় মৎস্য-সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির জন্য গভর্ণমেণ্ট্ যাহা করিতেছেন, তাহা সমুদ্রে বিন্দুবৎ। এজন্য হতাশ হইলে চলিবে না। দেশের লোকের যদি আত্মসম্মান-জ্ঞান থাকে, স্বাধীন ব্যবসায়ের উপর শ্রদ্ধা থাকে, তবে নিজেদের মঙ্গলের জন্য ও দেশের ধন-সম্ভার বৃদ্ধির জন্য, তাঁহারা পরের উপরে নির্ভর করিবেন না, আশা করি।

শ্রী শরৎচন্দ্র ব্রহ্ম

অবরোধ-প্রথা

ভারতে মুসলমান-আক্রমণের পূর্ব্বেও যে সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারে অবরোধ-প্রথা প্রচলিত ছিল তাহার নানা-প্রকার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বাল্মীকি-রামায়ণে নানাস্থানে অবরোধের উল্লেখ আছে। যথা :—

১। রাবণের মৃত্যুর পর যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া মন্দোদরী বিলাপ করিবার সময়ে বলিতেছেন আমি তোমার মহিষী হইয়া এত লোকের সম্মুখে আসিয়াছি ইহা দেখিয়াও তুমি কুপিত হইতেছ না কেন?

২। রাবণের মৃত্যুর পর বিভীষণ সীতাকে যখন রামের কাছে আনিয়াছিলেন, তখন সে-স্থান হইতে সকল পুরুষদের সরাইয়া দিয়াছিলেন দেখিয়া রাম বলিতেছিলেন সীতা এখন বিপন্না, এখন তাঁহার লজ্জা করিবার সময় নহে।

৩। বনবাসে যাইবার পূর্ব্বে সীতাকে সাধারণ অযোধ্যাবাসীরা দেখে নাই।

এরূপ প্রমাণ ছাড়া ঐতিহাসিক প্রমাণ এইরূপ পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে উত্তর-ভারতের প্রায় সকলদেশেই শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমার কাছাকাছি ঝুলনের সময়ে কুলকামিনীদের একটা মহোৎসব প্রচলিত ছিল, ও এখনও কিছু কিছু আছে। মুসলমানদের বহুকালব্যাপী অত্যাচারে ইহা লোপ পায় নাই বটে, কিন্তু এখন ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার গুণে লোপ পাইতে বসিয়াছে। সে উৎসবের গানের আভাসে বোধ হয়, এই সময়ে অবিবাহিতা কন্যারা ও অল্পবয়স্কা বধূরা পিত্রালয়ে গিয়া উৎসব করিত। শুভদিনে স্নানান্তে দেবীর পূজা করিয়া, তাহাদের, প্রত্যেকে এক বা একাধিক দোনাতে কিছু মাটি দিয়া তাহাতে কতকগুলি যব পুতিয়া, দোনাটি কোনও পবিত্র স্থানে অন্ধকারে রাখিয়া দিত। অন্ধকারে পীত বর্ণের যবের গাছগুলি হইলে তাহাকে "ভুজরিয়া" বলে। পূর্ণিমার দিন এই ভুজরিয়ার দোনা জলে বিসর্জ্জন দিয়া আবার প্রসাদীস্বরূপ তুলিয়া গাছগুলি ধুইয়া লইতে হয়। নগরের বাহিরে, কোনও জলাশয়ের কাছে বড় বড় গাছে দোলা খাটাইয়া দোল খাইতে ও গীত গাহিতে হয়। তাহাদের ভ্রাতারা তাহাদের রক্ষা করে। যাহার ভ্রাতা নাই সে কাহাকেও ধর্ম্ম-ভ্রাতা নিযুক্ত করিয়া রক্ষা করিবার ভার দেয়। উৎসব শেষে ভ্রাতাদের কানে দু-একটি ভুজরিয়া [যবের গাছ] গুঁজিয়া দিয়া অর্চ্চনা করে ও প্রণাম বা আশীর্ব্বাদ করে। ভ্রাতারাও আশীর্ব্বাদ বা প্রণাম করিয়া ভগ্নীদের উপহার দিয়া থাকে। এখনও এ-উৎসবের কিঞ্চিৎ শেষাংশ মির্জাপুর ও কাশীর মধ্যপ্রদেশে আছে, তাহাকে কজরী-উৎসব বলে। মুসলমান রাজত্ব-কালে এই কজরী-উৎসবের সময়ে মুসলমান বীরেরা যুদ্ধ বা লুট করিয়া সুন্দরী সংগ্রহ করিত। ক্ষত্রিয়েরা প্রাণপণ করিয়া আপনাদের ভগ্নী বা ধর্ম্ম-ভগ্নীদের রক্ষা করিত।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষার্দ্ধে চন্দেলদের রাজধানী মহোবা নগরে এইরূপ উৎসব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী জাঁক-জমকের সহিত হইত। অজমীর-পতি চোহান পৃথ্বীরাজ মহোবার এ সুনাম সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি ১২৩৯ সম্বতের শ্রাবণ মাসে আপনার সমস্ত সৈন্য ও সামন্ত লইয়া মহোবার পৌনী [পার্ব্বণী] দেখিতে আসিলেন। তিনি এই সময়ে রাজকন্যাকে হরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি কৃতকার্য্য হন নাই বটে কিন্তু কীর্ত্তি-সাগরের তীরে যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে সাগরের জল রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

যুক্তপ্রদেশে আলহার গান প্রচলিত আছে। এই গানের সহিত এই যুদ্ধের কথাও গীত হইয়া থাকে। মহোবায় রাজকন্যা চন্দ্রাবলী ও রাজ-রাণী মলহনা এক সহস্র সখী সহিত পৌনী করিতে কীর্ত্তি-সাগরের তীরে যাত্রা করিলেন। এই কীর্ত্তি-সাগর তখনকার চন্দেল-রাজ পরমর্দ্দিদেবের পূর্ব্ব-পুরুষ কীর্ত্তিবর্ম্মার কীর্ত্তি, ও মহোবা নগরের কাছে এখনও চন্দেল রাজাদের কীর্ত্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। রাণী ও রাজকুমারীর দোলাগুলি সুবর্ণ-সূত্র-গ্রথিত হরিৎবর্ণ কাপড় ঢাকা, দোলার কাষ্ঠাংশ হরিৎ বর্ণে রঞ্জিত। বাহকদের পরিহিত ধুতি অঙ্গরাখা পাগ ইত্যাদিও হরিৎবর্ণে রঞ্জিত। সখীদের দোলাগুলিও হরিৎবর্ণে রঞ্জিত ও হরিৎ কাপড়ে বেষ্টিত। সকলের শাটী কাঁচলী ওড়না হরিৎ বর্ণে রঞ্জিত। দর্শকেরাও ঐরূপ হরিৎবর্ণের বেশ ধারণ করিয়া আসিয়াছে। সাগরতীরে বড় বড় গাছে দড়ি খাটাইয়া দোলনা করা হইয়াছে। এই দড়িগুলিও হরিৎবর্ণের রেশমের। রাজবাটী হইতে যাত্রা করিবার সময়ে রাণী মলহনা প্রত্যেক সখীর দোলাতে এক এক হাঁড়ি উৎকৃষ্ট বারুদ তুলিয়া দিলেন ও সকলের হাতে এক-একখানি ভাল ইস্পাত ও এক-একখানি চকমকি-পাথর দিলেন। প্রত্যেক সখী ও রাজকন্যাকে এক-একখানি বিষাক্ত ছুরি দিলেন ও এক এক মোড়ক মহুরী [অতি প্রখর বিষ] দিয়া সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—"আমাদের পৌনীর পরিণাম এ-বৎসর কি হইবে একমাত্র ভগবানই জানেন। মহোবার প্রধান রক্ষক বীর ভ্রাতৃদ্বয় আল্হা ও উদন রাগ করিয়া কনোজে গিয়া বসিয়া আছেন আর চোহান রাজ পৌনী দেখিবার ছল করিয়া সাত লক্ষ সেনা

লইয়া আসিয়াছেন। অতএব তোমরা সকলে শপথ কর যদি চোহান তোমাদের রক্ষকদের মারিয়া বা পরাজিত করিয়া তোমাদের বন্দী করে তাহা হইলে কেহই জীবিত অবস্থায় অজমীর যাইবে না। তোমাদের যে বিষাক্ত ছুরি দিয়াছি তাহা পেটে মারিলে নিশ্চয় মৃত্যু হইবে। তাহাতে সাহস না হইলে বারুদে আগুন দিবে। তাহার অবসর না পাইলে মহুরী মুখে দিবে। কিন্তু কখনও চোহানের গৃহে পদার্পণ করিবে না।" এইরূপ উপদেশ দিয়া সকলকে শপথ করাইয়া রাণী সাগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যুবরাজ ত্রৈলোক্য বর্ম্মা, তাঁহার অনুজ রণজিৎ ও রাণী মলহনার ভ্রাতার পুত্র অভয় এই তিন জন সৈন্য সহ হরিৎ-বর্ণ পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া রমণীদের রক্ষকরূপে যাত্রা করিলেন।

উৎসব শেষ হইবার পূর্ব্বে, এক সময়ে চোহান বীর আপনার সেনাপতিদের আজ্ঞা করিলেন—"যেরূপে পার রাজকুমারীকে বন্দিনী করিয়া আন, আমার পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ দিব।" চোহান সামন্তরা যুদ্ধ করিতে করিতে রাজকুমারীর দিকে অগ্রসর হইয়া এক বিষম বাধা পাইলেন। কোনও কারণে অদ্বিতীয় বীর ভ্রাতাদ্বয় আল্হা ও উদন মহোবা ত্যাগ করিয়া কনোজ-পতি জয়চন্দ্রের আশ্রয়ে বাস করিতেছিলেন; পৃথ্বীরাজের আগমন-সংবাদ পাইয়া উদন থাকিতে পারিলেন না। আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু জয়চন্দ্রের ভ্রাতার পুত্র লাখন্ রাণাকে সসৈন্যে সঙ্গে লইয়া মৃগয়ার ছল করিয়া কনোজ ত্যাগ করিলেন। পথে সসৈন্যে সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া কীর্ত্তি-সাগরের একতীরে ধুনি জ্বালাইয়া বসিয়া ছিলেন। চোহান সামন্তরা দেখিল রাজকুমারী এক গাছতলায় বারুদ পাতিয়া তাহার উপর চকমকি লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, ও তাঁহার চতুর্দ্দিকে সন্ন্যাসীরা অদ্ভুত কৌশলে যুদ্ধ করিতেছে। তাঁহারা অগ্রসর হইতে সাহস করিলেন না। উদন ও লাখনের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পৃথ্বীরাজ পলাইয়া গেলেন। চন্দ্রাবলী, কিন্তু, উদনের যুদ্ধ-কৌশল দেখিয়া তাহাকে চিনিয়া ফেলিলেন। এই ঘটনার কয়েক মাস পরে পৃথ্বী আবার আক্রমণ করিয়া চন্দেল-রাজ্যের পশ্চিমাংশ জয় করিয়া লইলেন।

অতএব এরূপ সুযোগে যে কেবল মুসলমানেরাই সুন্দরী সংগ্রহ করিত তাহা নহে, হিন্দু ক্ষত্রিয়েরাও করিত। সম্ভবতঃ মুসলমানেরা এই হিন্দু ক্ষত্রিয়দের অনুকরণ করিয়াছিল মাত্র। তবে, প্রভেদ এই ছিল যে হিন্দু রাজারা কন্যা হরণ করিয়া শাস্ত্রমত বিবাহ করিতেন, ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে এইরূপ হরণ-বিবাহই প্রচলিত ও সম্মানিত ছিল। কিন্তু মুসলমানেরা দাসী করিয়া রাখিত বলিয়া অনেক কন্যা আত্মহত্যা করিত।

মৃজাপুর ও কাশীর মধ্যে যে ক্ষত্রিয় বীরেরা মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করিয়া রমণীদের রক্ষা করিয়াছিল ও যুদ্ধে দেহ রক্ষা করিয়াছিল তাহাদের প্রতিমূর্ত্তি ঐ প্রদেশে আজ পর্য্যন্ত পুজিত হয়। মুসলমানদের চক্ষুর অন্তরালে কুলবালাদের রাখিবার জন্য অবরোধ-প্রথার কঠোরতা বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। কিন্তু এ অবরোধ-প্রথা সম্ভ্রান্ত হিন্দু-পরিবারে মুসলমান-আক্রমণের পূর্ব্বে যে ছিল তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

অবরোধ-প্রথা খৃষ্টজন্মের ৫।৬ শত বৎসর পূর্ব্বে, বুদ্ধদেব ও জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর-স্বামীর সময়ে ছিল, তাহা জৈন সাহিত্যের নানা গল্পে প্রমাণিত হয়। জৈন সাহিত্যে আছে যে মহাবীর-স্বামীর সময়ে, মগধের সাম্রাজ্য স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে বৈশালী একটি প্রবল রাজ্য ছিল। সেই রাজবংশের এক রাজকন্যা একদিন অন্তঃপুরের রাজ-উদ্যানে একাকিনী বেড়াইতেছিলেন। হঠাৎ একজন ধনবান্ দুষ্ট বণিকের দৃষ্টিতে পড়িলেন। বণিক্ তাহাকে হরণ করিয়া পলাইল। পথে যাইতে যাইতে আপন উগ্র-স্বভাবা স্ত্রীর কথা ভাবিয়া রাজকন্যাকে এক গভীর বনে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। দস্যুরা রাজকন্যাকে ধরিয়া কৌশাম্বীর এক অপত্যহীন শ্রেষ্ঠীর কাছে দাসীরূপে বিক্রয় করিল। শ্রেষ্ঠী রাজকন্যাকে আপনার কন্যারূপে পালন করিতে লাগিল। কিন্তু শ্রেষ্ঠী-পত্নী সন্দেহ করিয়া তাহাকে কষ্ট দিত। একবার স্বামীর অনুপস্থিত থাকার কালে কন্যার মাথা মুড়াইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধাবস্থায় এক অন্ধকার ঘরে বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছিল। এই সময়ে মহাবীর-স্বামী নগরে বিচরণ করিতেছিলেন। রাজকন্যা কোনও মতে পলাইয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। এই কন্যা পরে প্রসিদ্ধা

জৈন সাধ্বী হইয়াছিলেন। যখন বৈশালীর মত প্রবল রাজ্যের রাজকন্যার এরূপে হরণ সম্ভব ছিল, তখন সম্ভ্রান্ত কুলকামিনীদের অবরোধে আবদ্ধ রাখা ছাড়া আর উপায় ছিল না। কুলকামিনীদের সম্ভ্রম রক্ষা করিবার জন্যই এ প্রথার প্রচলন হইয়াছিল।

উত্তর-ভারতের পশ্চিমাংশে অর্থাৎ পঞ্জাবে মুসলমানেরা ১০২০ খৃষ্টাব্দে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল ও ইহার প্রায় তিন শত বৎসর পরে দক্ষিণে প্রবেশ করিয়াছিল। সর্ব্বপ্রথমে আলাওউদ্দীন খিলজী আপন বৃদ্ধ খুল্লতাত জলালউদ্দীন ফিরোজ খিলজীর সেনাপতিরূপে দাক্ষিণাত্যের দেবগিরি [আধুনিক দওলতাবাদ—অওরঙ্গাবাদের নিকট] আক্রমণ (১২৯৫ খৃঃ) করিয়াছিলেন ও পরে বৃদ্ধকে পুত্র সহ যমালয়ে প্রেরণ করিয়া যখন স্বয়ং সম্রাট্ হইয়া বসিলেন তখন আপনার সেনাপতিকে দক্ষিণে লুট করিতে পাঠাইয়াছিলেন। ইহার পর দাক্ষিণাত্যে মুসলমানদের রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল বটে কিন্তু সমস্ত দক্ষিণ-ভারতে মুসলমানদের আধিপত্য কোন কালেই হয় নাই। দক্ষিণ-ভারতে এমন অনেক দেশ আছে যেখানে কখনও অহিন্দু আধিপত্য হয় নাই—যেমন আধুনিক ত্রিবাঙ্কুর দেশ। এদেশ এখন বিদেশী ইংরেজের অধীনতা স্বীকার করিয়াছে বটে কিন্তু সাক্ষাৎ শাসনকর্ত্তা এখনও হিন্দু বৈষ্ণব। পূর্ব্বে কখনও এখানে অহিন্দু সভ্যতার প্রভাব বিস্তৃত হয় নাই। এ দেশের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ নম্বুদ্রী। ইহারা কোনও কালে অহিন্দুর শাসনে বাস করে নাই। বৈদিক কালে নম্বুদ্রীদের যে-সকল সামাজিক নিয়ম ছিল তাহা বোধ হয় এখনও প্রচলিত আছে, অতি অল্পই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ব্রাহ্মণ-কুমারেরা পৈতা ধারণ করিবার সময়ে নাম মাত্র ২।৪ দিবস ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে, নিভৃতে বসিয়া ফলাহার করে ও বড় জোর সন্ধ্যা-আহ্নিকের মন্ত্র মুখস্থ করে; তাহার পর দণ্ডটি জলে ভাসাইয়া সংসারী হয়। কিন্তু নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণ-কুমার ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিয়া ঘরে আবদ্ধ থাকে না। সে গৈরিক বসন পরিয়া দণ্ড ধারণ করিয়া গুরুগৃহে গিয়া বেদ অধ্যয়ন করে। গুরু শিষ্য এক-গ্রামবাসী হইলে কখন কখন লুকাইয়া গৃহে আসে বটে, কিন্তু গুরু ভিন্ন-বা দূর-গ্রামবাসী হইলে সেরূপ সুযোগ হয় না। ব্রহ্মচারী ৫।৭।৯ বা ১১ বৎসর গুরুগৃহে বাস করিয়া পাঠ সমাপন করে। এই দীর্ঘকাল সে ব্রহ্মচারীর কঠোর নিয়মগুলি পালন করে। যাহারা মেধাবী তাহারা এই অবসরে বিদ্বান্ বলিয়া পরিচিত হয়, কিন্তু যাহাদের মেধা নাই তাহাদের অন্ততঃ তিন বৎসর গুরুগৃহে থাকিয়া নিত্যকর্ম্মগুলি শিক্ষা করিতে হয়। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে গুরুর অনুমতি লইয়া শুভদিনে আবার এক যজ্ঞ করিয়া ব্রহ্মচারীর বেশ ও দণ্ডটি গুরুর হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়া সাধ্যমত গুরু-দক্ষিণা দিয়া সংসারে প্রবেশ করিবার অনুমতি গ্রহণ করে। এইরূপে গৃহে ফিরিয়া সুবিধা-মত বিবাহ করে। তাহাদের বিবাহে প্রাচীন বৈদিক কালের পদ্ধতি এখনও প্রচলিত। এই নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণদের কেবল জ্যেষ্ঠ পুত্র উত্তরাধিকার লাভ করে, অন্য পুত্রেরা যাবৎ-জীবন ভরণ-পোষণের অধিকার মাত্র পাইয়া থাকে। প্রত্যেক বংশে কেবল জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্রাহ্মণ কন্যা-বিবাহ করিয়া বংশ রক্ষা করে। অন্য পুত্রেরা ক্ষত্রিয় নায়র-কন্যার সহিত "সম্বন্ধম্" (বিবাহ) করে। ঐ নায়র-কন্যার গর্ভজাত সন্তানেরা নায়র হয়। তাহাদের পিতা ব্রাহ্মণ-কুমার বলিয়া তাহাদের সম্মানও নাই, অসম্মানও নাই। জ্যেষ্ঠ পুত্র অপুত্রক হইলে বা পুত্র-জন্মের পূর্ব্বেই স্বর্গ লাভ করিলে দ্বিতীয় পুত্র ব্রাহ্মণ-কন্যা বিবাহ করিয়া বংশ রক্ষা করে। তাহার যদি নায়র পত্নী ও তাহার গর্ভজাত সন্তানাদি থাকে তবে তাহারাও সংসারে স্থান লাভ করে, কিন্তু তাহারা নায়র, অতএব তাহাদের দ্বারা বংশ রক্ষা হয় না। বংশ রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণ-কুমারীর গর্ভজাত পুত্র-সন্তান হওয়া প্রয়োজনীয়। এই নিয়মে ব্রাহ্মণ-পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় না, বরং অকাল-মৃত্যুতে কমিবার সম্ভাবনা। এই নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণ-মধ্যে অবরোধ-প্রথা অতি কঠোর। কোনও নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণীকে, যে-কোনও কারণে, পথে হাঁটিতে হইলে একখানি মোটা সাদা চাদর দিয়া আপনার আপাদমস্তক এমন করিয়া ঢাকিতে বা জড়াইতে হয় যে পায়ের তলা হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত কোনও অংশ কাহারও দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না। এরূপ জড়াইলে তাহার স্বাধীনভাবে হাঁটিবার ক্ষমতা থাকে না। অতএব এক সম্ভ্রান্ত নায়র-রমণী তাহার হাত ধরিয়া ও অন্য হাতে

এক বৃহৎ ছাতা মাথায় ধরিয়া লইয়া যায়। ছাতার উদ্দেশ্য বর্ষা বা রৌদ্র হইতে রক্ষা করা নহে। তাহার উদ্দেশ্য যে যদি কেহ পাশের উচ্চ ছাদে দোতালা তেতালায় থাকে, সে যেন ঐ রমণীকে দেখিতে না পায়। নম্বুদ্রী রমণী-মাত্রকেই এই নিয়ম পালন করিতে হয়। অপেক্ষাকৃত নির্ধনদেরও এইরূপে পথ হাঁটিতে হয়। বিবাহের সময় যখন নম্বুদ্রী বর বিবাহ-স্থানে আসিয়া দাঁড়ায়, তখন ভাবী শাশুড়ীর বরণ করা নিয়ম; কিন্তু ভাবী শাশুড়ী জামাতা অথবা অন্য পুরুষের সম্মুখে ঐরূপ চাদরাবৃত না হইয়া বাহির হইতে পারেন না। অতএব একজন সম্রান্ত নায়র-রমণীকে আপনার প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন ও তাঁহাকে পাঠাইয়া দেন। সে বিবাহের সময়ে শাশুড়ীর প্রতিনিধিরূপে বরণ আশীর্ব্বাদ ইত্যাদি সকল কৃত্য করে। এই নিয়মে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে প্রাচীন বৈদিক কালে সম্রান্ত বংশে অবরোধের কঠোরতা বড় অল্প ছিল না। তবে, সাধারণ অব্রাহ্মণ বংশে—এমন কি সম্মানিত ক্ষত্রিয় নায়র বংশেও—অবরোধ-প্রথা ছিল না, এবং এখনও নাই।

অনেকের ধারণা মুসলমানদের মধ্যে অবরোধ-প্রথা অতি কঠোর ও তাঁহারাই ভারতে এ প্রথা আনিয়াছেন। উপরোক্ত আলোচনাতে বেশ জানা যায় যে তাঁহারা এ প্রথার প্রবর্ত্তক নহেন, তাঁহাদের ভারতে আগমনের পূর্ব্বেই, এমন কি ইস্‌লাম ধর্ম্ম স্থাপিত হইবার বহু পূর্ব্বে ভারতে এ প্রথা ছিল। মুসলমান, সমাজে, স্থান-বিশেষে, অবরোধ-প্রথা কঠোর বা শিথিল হইতে পারে, কিন্তু তাহার সহিত ইস্‌লাম ধর্ম্মের কোনও সংশ্রব নাই। মুসলমান ধর্ম্মে অবরোধ বা পর্দা সম্বন্ধে এইমাত্র ঈশ্বরাজ্ঞা আছে যে "স্ত্রীলোকেরা আপনার শরীর এরূপ আবৃত করিয়া বস্ত্র ধারণ করিবে যে অনাবৃত দেহ সাধারণ পুরুষের চক্ষে না পড়ে।" সেইজন্য আরব ইরাণ মিশর তুর্কি কাবুল ইত্যাদি মুসলমানদের দেশে বোরকার প্রচলন হইয়াছে। বোরকা পরিয়া কুলকামিনীরা পথে ঘাটে হাটে মাঠে যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারেন, সকলের সহিত প্রয়োজন-মত কথা বলিতে পারেন, গৃহাগত অতিথির সৎকার করিতে পারেন, সাধারণ মস্‌জিদে উপাসনা করিতে পারেন। ভারতে, দক্ষিণ-হায়দ্রাবাদ সর্ব্বাপেক্ষা বড় মুসলমান রাজ্যের রাজধানী। সেখানকার প্রধান মস্‌জিদে—মক্কা মস্‌জিদে—কতক অংশ লোহার তারের বেড়া দিয়া ঘেরা; তাহার মধ্যে স্ত্রী-উপাসিকারা নমাজ পাঠ করিয়া থাকেন। শুক্রবারে অথবা কোনও ঈদের নমাজের সময়ে স্ত্রী ও পুরুষ উপাসক উপাসিকা একই ইমামের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া এক-সঙ্গে নমাজ পাঠ করে। কেবল পুরুষেরা দালানের এক দিকে ও স্ত্রীরা অন্যদিকে বোরকা পরিয়া দাঁড়ায়।

ভারতে আসিবার পূর্ব্বে যে সম্রান্ত মুসলমান মহিলারা এইরূপে ইচ্ছামত বোরকা পরিয়া বন্ধু-বান্ধবদের বাটীতে যাতায়াত করিত, তাহারাই এখানে আসিয়া দেখিল সম্রান্ত হিন্দু মহিলারা অবরোধে বাস করেন, তাঁহাদের পক্ষে পথে ঘাটে হাঁটা নিন্দনীয়। অতএব তাঁহারাও হিন্দুদের দেখা-দেখি অন্তঃপুরবাসিনী হইলেন। এরূপ না করিলে তাঁহাদের সম্মান থাকে না। ক্রমে হিন্দুরা মুসলমানদের অত্যাচারে ভয়ে অবরোধ-প্রথা কঠোর হইতে কঠোরতর করিতে বাধ্য হইলেন। মুসলমানেরাও সম্মান রক্ষার জন্য কঠোর-তর নিয়মে আবদ্ধ হইলেন। এই অবরোধ প্রথা এখন স্থান-বিশেষে এমন কঠোর রূপ ধারণ করিয়াছে যে না দেখিলে বিশ্বাস করা কঠিন। ভারতবর্ষের বৃহত্তম মুসলমান রাজ্যের রাজধানী হায়দ্রাবাদ মুসী নামে একটি ক্ষুদ্র নদীর উভয় তীরে অবস্থিত। (প্রাচীন নাম মুচকন্দ নদী। মুসলমানেরা দুইটি পাশাপাশি নদীর নাম মুসী ও ঈসী রাখিয়াছিল। হায়দ্রাবাদ নগর হইতে ৪।৫ মাইল দূরে এই দুই নদী সম্মিলিত হইয়াছে) গত ১৯০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষে হঠাৎ একদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে এই নদীর জল বাড়িতে আরম্ভ হয় ও ৪।৫ ঘণ্টার মধ্যে ৪০ ফুট জল বাড়িয়া ওঠে। তাহাতে সহস্র সহস্র গৃহ ভূমিসাৎ হয় ও বহু অধিবাসী জীবন হারায়। সেই রাত্রে একজন ভদ্র মুসলমান গৃহস্থ আপনার ভগ্নী ও স্ত্রীকে পলাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিয়া একখানি গাড়ী খুঁজিতে গৃহত্যাগ করেন। তখন সকলেই আপন আপন প্রাণ লইয়া পলাইতেছে। তিনি অনেক অনুসন্ধান করিয়াও কোনও-প্রকার গাড়ী পাইলেন না। যে নগরের মস্‌জিদে স্ত্রী-পুরুষেরা এক পংক্তিতে দাঁড়াইয়া উপাসনা করে সে নগরে অর্দ্ধরাত্রেও কুলকামিনীদের হাঁটিয়া পথে বাহির হওয়া
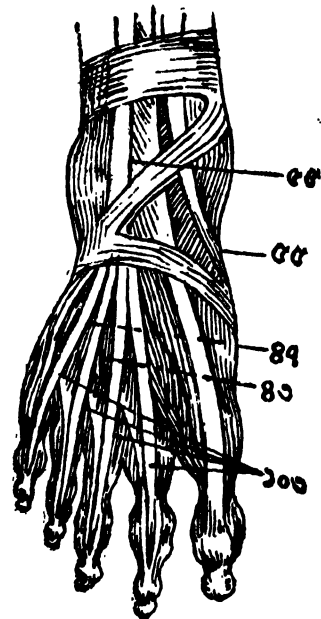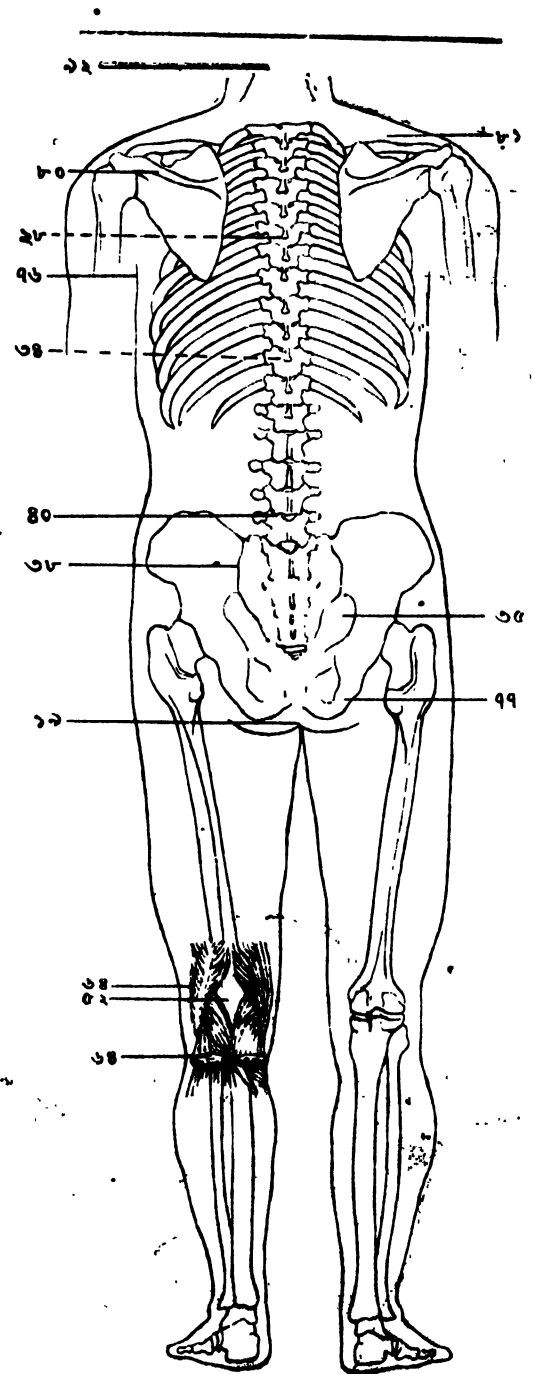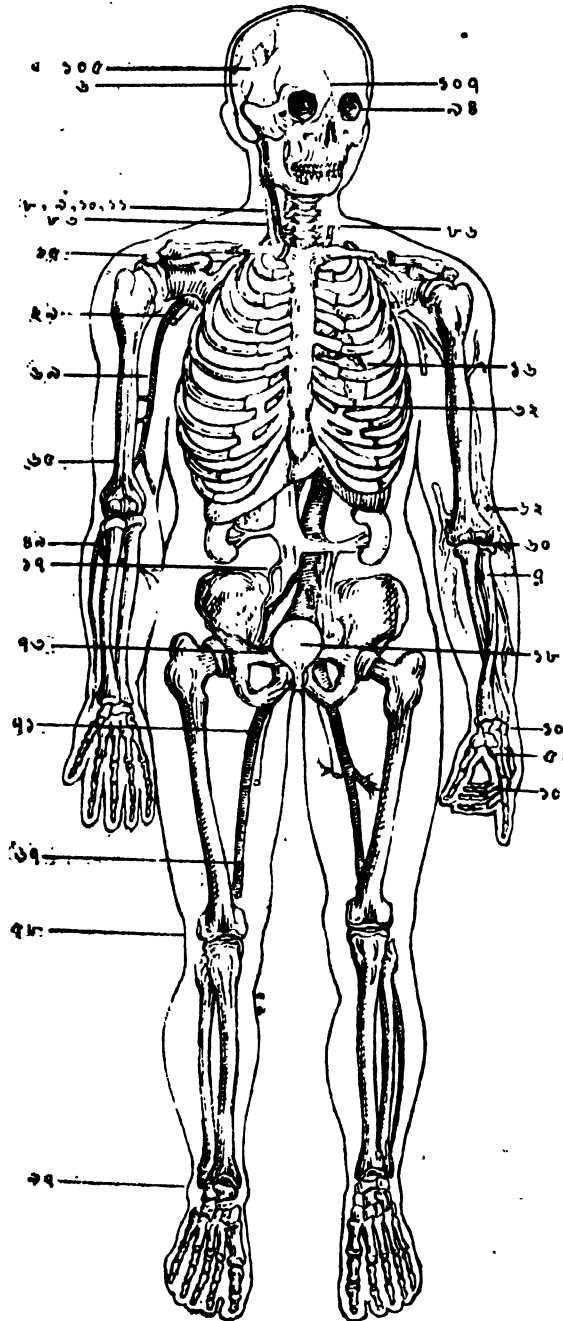
নিন্দনীয়। যখন তিনি গাড়ী না পাইয়া গৃহে ফিরিলেন তখন তাঁহার বাটীর পাশের গলিতে প্রায় চার হাত গভীর জল ভীষণ স্রোতে প্রবাহিত হইতেছে। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে তাঁহার বাটীর উচ্চতম অংশ জলমগ্ন হইল। তিনি দূরে দাঁড়াইয়া স্ত্রী ও ভগ্নীকে দেখিতে পাইলেন কিন্তু সাহায্য করিতে পারিলেন না। পরদিন দ্বিপ্রহরের পর যখন আপন গৃহে প্রবেশ করিলেন তখন দেখিলেন আঙ্গিনায় এক বৃক্ষে দুইটি রমণীর মৃতদেহ ওড়না দিয়া বাঁধা রহিয়াছে। বোধহয় আঙ্গিনার জল বাড়িলে তাহারা স্রোত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আপনাদের দেহ বৃক্ষে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু পরে হঠাৎ জল বাড়িয়া তাহাদের জীবনলীলা শেষ হইয়াছিল। এই প্লাবনে বহু কুলকামিনী পলাইতে না পারিয়া জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিল।

শ্রী অমৃতলাল শীল

লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মর্ম্মচিত্র

৫—অধিপতি ; ২০—সীমন্ত (সম্মুখস্থ) ; ৮৮—ফণ ; ৯০—বিধুর

৬৩--আনি ; ৪৭—তল ; ৫৫—কূর্চ্চ ;
১০৩—কূর্চ্চ-শিরা ;

৬—শঙ্খ ; ৭—শঙ্খ ; ৮—১১— কণ্ঠশিরা ; ১৬—হৃদয় ; ১৭—নাভি
১৮—বস্তি ; ২৫—অপলাপ ; ২৯—স্তন-রোহিত ; ৩২—স্তন-মূল
৪৯—ইন্দ্রবস্তি ; ৫৪—কূর্চ্চ ; ৫৮—জানু ; ৬০—কূর্পর ; ৬২—আনি ;
৬৫—উর্ব্বী ; ৬৭—উর্ব্বী ; ৬৯—লোহিতাক্ষ ; ৭১—লোহিতাক্ষ ;
৭৩—বিটপ ; ৮৩—নীলা ; ৮৬— মন্যা ; ৯৪—অপাঙ্গ ; ৯৭—গুল্ফ ;
১০০—মণিবন্ধ ; ১০২—কূর্চ্চশিরা ; ১০৫—উৎক্ষেপ ; ১০৭—স্থাপনী

১৯—পায়ু ; ২৮— অপস্তম্ভ ; ৩৪—বৃহতী ; ৩৫—পার্শ্বসন্ধি
৩৮—কটিক তরুণ ; ৪০— নিতম্ব ; ৫২—ইন্দ্রবস্তি ; ৬৪—আনি
৭৬— কক্ষধর ; ৭৭—কুকুন্দর ; ৮০—অংস-ফলক ;
৮১—অংস ; ৯২—কৃকাটিকা ।
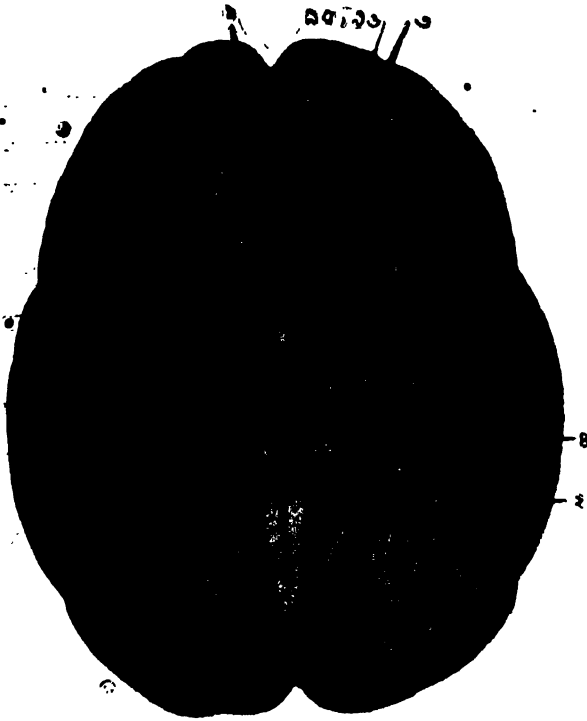
১—শৃঙ্গাটক (গন্ধবাহী) ; ২—শৃঙ্গাটক (শব্দবাহী),
৩—শৃঙ্গাটক (রূপবাহী) ; ৪—শৃঙ্গাটক (রসবাহী)
৯৫—আবর্ত্ত ; ৯৬—আবর্ত্ত

৪১—ক্ষিপ্র ; ৪৫—তল ; ৫৩—কূর্চ্চ

পদ-চালনা (পায়তারা)

"গহ্বর" ও "নির্ঘাত" শিক্ষার সঙ্গেসঙ্গেই শিক্ষকগণ বিভিন্ন পদ্ধতির পদচালনা শিক্ষা দিবেন। লিখিত ভাষা দ্বারা পদচালনার বর্ণনা অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়ে; প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তসহ উপদেশ-সাহায্যেই পদ-চালনা শিক্ষা করিতে হয়। নিম্নে সামান্যমাত্র প্রাথমিক আভাস লিখিত হইল।

পদচালনা প্রথম শিক্ষাকালে প্রতিপক্ষের সঙ্গে নিজ ব্যবধানকে ব্যাস ধরিয়া একটি বৃত্ত কল্পনা করিয়া লইয়া, এই কল্পিত বৃত্তের পরিধিক্রমেই চলিতে হইবে। প্রতিপক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বের দিকে সরিতে হইলে, "হাতকাটির" প্রতিকারের ভঙ্গীতে লাঠি ঘুরাইয়া নিজ দক্ষিণ পার্শ্ব সুরক্ষিত রাখিতে হইবে এবং সঙ্গে-সঙ্গে দক্ষিণ পদ তুলিয়া বাম পদের সম্মুখ দিয়া আনিয়া ও বাম পদ অতিক্রম করিয়া পূর্ণমাত্রায় পদবিক্ষেপ করিতে হইবে; তৎপরে নিজবাম দিকে পূর্ব্ব-বর্ণিত পরিধি লক্ষ্যে পূর্ণমাত্রায় বাম পদ বিক্ষেপ করিয়া দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুলী দক্ষিণ পাদ-পার্ষ্ণির (দক্ষিণ গোড়ালীর) স্থানে স্থাপিত করিয়া প্রতিপক্ষের মুখামুখি হইয়া বিশুদ্ধভাবে অভিযান স্থিতিতে (কেল্লাবন্দীতে) দাঁড়াইতে হইবে।
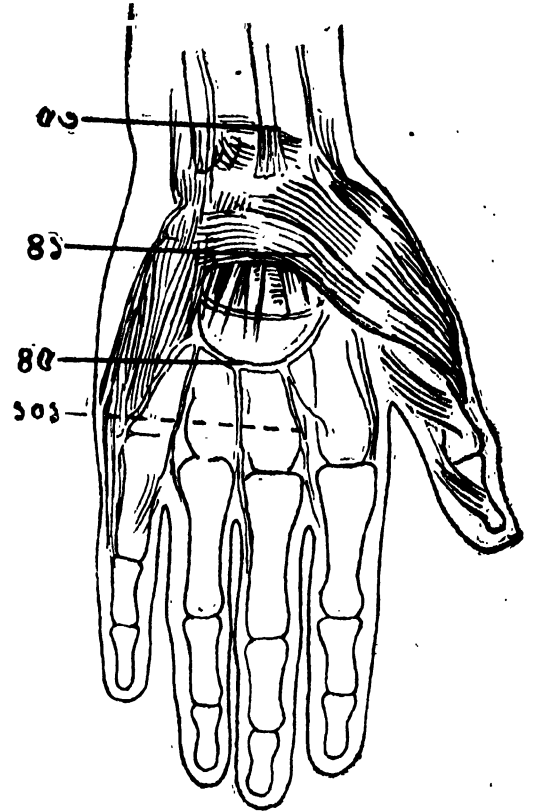
প্রতিপক্ষের বাম পার্শ্বের দিকে সরিতে হইলে "উল্টা-মোচার" প্রতিকারের ভঙ্গীতে লাঠি ঘুরাইয়া নিজ বাম পার্শ্ব সুরক্ষিত রাখিতে হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে বাম পদ তুলিয়া দক্ষিণ পদের সম্মুখ দিয়া আনিয়া ও দক্ষিণ পদ অতিক্রম করিয়া পূর্ণমাত্রায় পদবিক্ষেপ করিতে হইবে; তৎপরে নিজ দক্ষিণ দিকে পূর্ব্ব-বর্ণিত পরিধি লক্ষ্যে পূর্ণমাত্রায় দক্ষিণ-পদ বিক্ষেপ করিয়া

উভয় পদের অঙ্গুলীতে ভর করিয়া কিঞ্চিৎ বামাবর্ত্তে ঘুরিয়া অথবা বামপদের বৃদ্ধাঙ্গুলী ঐ পদের পাষ্ণির স্থলে স্থাপন করিয়া প্রতিপক্ষের মুখামুখি হইয়া অভিযান-স্থিতিতে বিশুদ্ধ-ভাবে দাঁড়াইতে হইবে।

এইরূপ গতি করিবার কালে সর্ব্ব সময়েই সতর্ক থাকিতে হইবে যেন লাঠি কিম্বা অসি নিজ শরীর ও প্রতিপক্ষের মধ্যে থাকিয়া শরীর সুরক্ষিত রাখে।

বাম হস্তে শৃঙ্গ থাকিলে, শৃঙ্গ দ্বারা সর্ব্বদা হস্তদ্বয় সুরক্ষিত রাখিবার কল্পনায়, অনুরূপ গতিতে শৃঙ্গ চালনা করিতে হইবে এবং পদ-চালনা-কালে বর্ণনা-অনুরূপ হস্ত ও পদের চালনায় সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইবে।

পদ-চালনা দ্বারা প্রতিপক্ষের সন্নিহিত হইতে হইলে পূর্ব্ব-বর্ণিত বৃত্তের ব্যাস ক্রমশঃই হ্রস্ব করিবার চেষ্টা করিতে হইবে; অর্থাৎ পদ-বিক্ষেপগুলি সাধারণ প্রণালী অপেক্ষা প্রতিপক্ষের অধিক সন্নিকটবর্ত্তী করিয়া ফেলিতে হইবে। প্রতিপক্ষ হইতে দূরে সরিতে হইলে ইহার বিপরীত।

ক্ষিপ্রকারিতা সহ পদ-চালনা দ্বারা, প্রতিপক্ষ তৎকালীন তাহার পদচালনার প্রক্রিয়াগুলি পূর্ণ করিবার পূর্ব্বেই তাহার পার্শ্বদেশে আসিয়া পড়িতে পারিলেই আক্রমণের পক্ষে যথেষ্ট সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ঐরূপ করিতে হইলে যে-কোন পার্শ্বের পদ-চালনা-কালে বর্ণনানুরূপ প্রথম পদবিক্ষেপটি লম্ফ-সহযোগে সম্পন্ন করিতে হয়। প্রতিকার-কল্পে প্রতিপক্ষকে কখন বা লম্ফ-সহযোগে কখন বা "অবনমন"-সহযোগে পদ-বিক্ষেপ করিতে হয়।

আক্রমণ-কালীন পদচালনাকালে "নির্ঘাত" পর্য্যায়ে বর্ণিত সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয় বলিয়া পূর্ব্ব-বর্ণিত পদ-চালনার প্রক্রিয়া-সম্পর্কে সময়ে সময়ে কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে।

পদচালনায় দক্ষতার বিভিন্নতা হেতুও অসি-ধারীগণের উৎকর্ষ-সম্পর্কে যথেষ্ট তারতম্য ঘটিয়া থাকে।

বিনোদ (বিনোট্)

এক হস্ত কিম্বা এক হস্ত ছয় অঙ্গুলী পরিমিত কিঞ্চিৎ স্থূল ও দৃঢ় যষ্টিসহযোগে অসি-ধারী-ব্যক্তির সম্মুখীন হওয়া এবং তাঁহার অসি কাড়িয়া লওয়া কিম্বা তাহাকে প্রতিহত করিবার বিভিন্ন কৌশলের নামই "বিনোদ" অথবা "বিনোট্"।

এই পদ্ধতির কৌশলপ্রয়োগের ফলে আশাতীত আকস্মিক সফলতা দর্শনে গুণগ্রাহী দর্শকগণের এবং প্রয়োগ-কারীরও যথেষ্ট চিত্ত-বিনোদন হয় বলিয়াই ইহার নাম "বিনোদ" (অপভ্রংশে "বিনোট্") হইয়াছে।

নিম্নে কতিপয় মাত্র সহজসাধ্য কৌশল বর্ণিত হইল। শিক্ষার্থীগণ অনুশীলন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা স্বকীয় যোগ্যতা বৃদ্ধি করিয়া লইবেন।

"ফুরৎ" "তুরৎ" ও "জুরৎ" অর্থাৎ মন চক্ষু ও শরীর এই তিনটির সমবেত ক্ষিপ্রকারিতার প্রভাবেই "বিনোদের" দক্ষতা-সম্পর্কে উৎকর্ষ জন্মিয়া থাকে।

প্রত্যুৎপন্নমতিগণ যখনই যে-ভাবেই যে-কর্ম্মেই লিপ্ত থাকুন না কেন সামান্য আভাস-প্রাপ্তি মাত্রই তাঁহারা তৎকালোচিত সতর্কতা-অবলম্বনে সমর্থ হইয়া থাকেন। বিনোদের কৌশলগুলি জ্ঞাত থাকিলে প্রয়োজন-কালে হস্তে উপযুক্ত যষ্টি না থাকিলেও নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে অনুরূপ কোন পদার্থ সংগ্রহ করিয়া লওয়া একেবারে অসম্ভব হয় না; তথাপি আত্ম-রক্ষা-হেতু সর্ব্বদাই কোনও কিছু সঙ্গে রাখা নিতান্তই বিধেয়। বিনোদ প্রয়োগের উপযোগী ক্ষুদ্র যষ্টি সঙ্গে রাখা বিশেষ অসুবিধা-জনকও নহে।

১ম বিনোদ
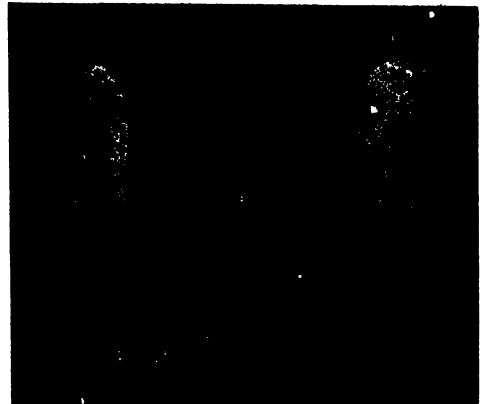
ঐরূপ যষ্টি সঙ্গে আছে এমত অবস্থায় যদি কোন অসি-ধারী কিম্বা সলাঠি ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তবে হাব-ভাব-ভঙ্গী অবলোকন করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যেই মানসিক নিশ্চয়াত্মিকা-শক্তি-প্রভাবে অসিধারী কিম্বা সলাঠি ব্যক্তির অভিপ্রায় স্থির করিয়া সঙ্গে-সঙ্গেই সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। যথা প্রথম চিত্রে।

২য় (ক) বিনোদ

২য় (খ) বিনোদ

যদি বুঝিতে পারা যায় যে অসি ধারী কিম্বা সলাঠি ব্যক্তি আক্রমণের উপক্রম করিতেছে তবে সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকেও প্রস্তুত হইতে হইবে। যথা দ্বিতীয় চিত্রে।

প্রথম পাঠ

"শির" হইতে "তামেচা"র অভ্যন্তরে আক্রান্ত হইলে পদচালনার প্রণালীর অনুরূপ ঈষৎ বামাবর্ত্তে ঘুরিয়া সম্মুখে

৩য় বিনোদ

ও বামে পূর্ণমাত্রায় দক্ষিণ পদ-বিক্ষেপসহ তুরন্তে অগ্রসর হইয়া আক্রমণকারীর "মণি-বন্ধ অধঃ"তে যষ্টি দ্বারা সজোরে প্রহার করিতে হইবে। যথা তৃতীয় চিত্রে।

অসিধারীর প্রতিকার

প্রতিকার হেতু অসি-ধারীও সঙ্গে সঙ্গেই তুরন্তে ঈষৎ

৪র্থ বিনোদ

দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরিয়া সম্মুখে পূর্ণমাত্রায় বাম-পদ-বিক্ষেপ করিয়া বিনোদ-প্রয়োগকারীর দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করিয়া লাঠি কিম্বা অসি ঘুরাইয়া মস্তক-পৃষ্ঠ আক্রমণের উদ্যোগ দেখিবে এবং সঙ্গে-সঙ্গেই বাম হস্ত দ্বারা বিনোদ-প্রয়োগ-কারীর দক্ষিণ কফোণিতে (কনুইতে) সজোরে আঘাত করিবার উপক্রম করিবে। যথা চতুর্থ চিত্রে।

৫ম বিনোদ

বিনোদ-প্রয়োগ-কারীর প্রতি-প্রতিকার

প্রতিকার হেতু বিনোদ-প্রয়োগ-কারীও তুরন্তে দক্ষিণাবর্ত্তে অর্দ্ধেক ঘুরিয়া সম্মুখে বাম-পদ-বিক্ষেপ সম্পন্ন করিয়া, (প্রয়োজন হইলে লম্ফ-সহযোগে), অসি-ধারীর দক্ষিণ পার্শ্বে পতিত হইয়া, বাম হস্তে অসি-ধারীর দক্ষিণ স্কন্ধে সজোরে আঘাত করিয়া যষ্টির পশ্চাৎ-বিন্দু দ্বারা "শঙ্খমর্ম্মে" অথবা অন্য কোনও মর্ম্মে আঘাতের উপক্রম করিবে।* যথা পঞ্চম চিত্রে।

৭ম বিনোদ
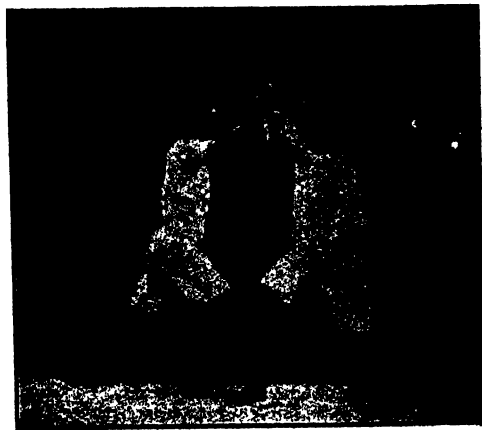
অসি-ধারীর পুনঃপ্রতিকার ও নিষ্কৃতি

অসিধারীও তুরন্তে "অবনমন"-সহযোগে দক্ষিণাবর্ত্তে অর্দ্ধেক ঘুরিয়া, (প্রয়োজন হইলে সামান্য লম্ফ-সহযোগে) বামপার্শ্বে পূর্ণমাত্রায় বাম পদ বিক্ষেপ-সম্পন্ন করিয়া বিনোদ-প্রয়োগ-কারীর সম্মুখীন হইবার উপক্রম করিবে। এমত অবস্থায় বিনোদ-প্রয়োগ-কারীকেও ঈষৎ দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরিয়া
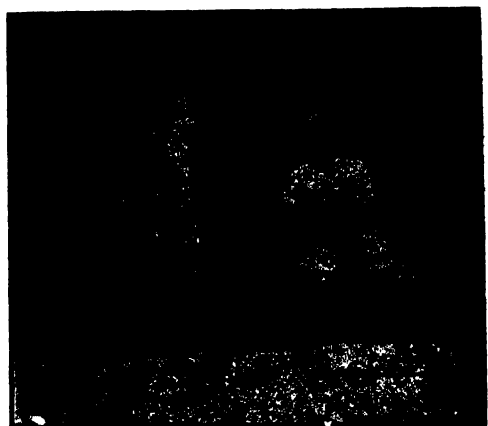
৬ষ্ঠ বিনোদ

৮ম (ক) বিনোদ

অসি-ধারীর সম্মুখীন হইয়া প্রস্তুত হইতে হইবে; নতুবা তাহার কোমর হইতে পদ পর্য্যন্ত অরক্ষিত থাকিবে। যথা ষষ্ঠ চিত্রে।

"বিনোদ"-সম্পর্কিত সমস্ত বর্ণনাগুলি সম্বন্ধেই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যে-কোনও প্রক্রিয়ার উপক্রমের সঙ্গে-সঙ্গেই প্রতিপক্ষকে ক্ষিপ্রকারিতা সহ তুরন্তে তাহার প্রতিকার অবলম্বন করিতে হইবে। প্রক্রিয়ার বিশুদ্ধতা থাকিলেও ক্ষিপ্রকারিতার তারতম্য অনুসারেই সাধারণতঃ জয় পরাজয় ঘটিয়া থাকে।

"বিনোদ"-সম্পর্কিত সমস্ত বর্ণনাগুলি সম্বন্ধেই উভয় ব্যক্তিকেই সম-বলশালী সম-কৌশলী ও সম-ক্ষিপ্রকারী ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। প্রকৃত ঘটনাকালে বর্ণনানুরূপ আঘাত-প্রয়োগ অপেক্ষা ভিন্নরূপ আঘাত-প্রয়োগও অবস্থা-বিশেষে অধিক কার্য্যকারী ও ফল-প্রদায়ী হইতে পারে।

বর্ণিত প্রক্রিয়াগুলি যাহার পর যেটি নির্দ্দিষ্ট হইল তাহা কেবল শিক্ষা ও অভ্যাসের সুবিধা হেতু মাত্র, কিন্তু প্রকৃত ঘটনাস্থলে কিম্বা আততায়ী-সংঘর্ষ-কালে ঐরূপ ক্রমিক ধারা কদাচ নির্দ্দিষ্ট থাকিতে পারে না। প্রকৃত ঘটনাস্থলে যখনই যে প্রক্রিয়াটির সুযোগ ঘটিবে তখনই তাহার প্রয়োগ করিতে হইবে। প্রতিকার সম্বন্ধেও ঐরূপ; কোনও প্রক্রিয়ার প্রতিকার বিভিন্ন-স্থলে ও বিভিন্ন-কালে সুযোগ অনুসারে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার প্রতিকার হেতুও প্রযুক্ত হইতে পারে।

দ্বিতীয় পাঠ

"উল্টামোঢ়া" হইতে "ভাণ্ডার" অভ্যন্তরে আক্রান্ত হইলে সামান্য অবনমন সহযোগে ঈষৎ বামাবর্ত্তে ঘুরিয়া দক্ষিণ পদ সম্মুখে ও বামে পূর্ণমাত্রায় বিক্ষেপ করিয়া সঙ্গে-সঙ্গেই অসি-ধারীর "মণিবন্ধ অধঃ"তে সজোরে আঘাত করিতে হইবে। যথা সপ্তম চিত্রে।

অসি-ধারীর প্রতিকার

প্রতিকার হেতু অসি-ধারী তুরন্তে ঈষৎ দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরিয়া সঙ্গে-সঙ্গেই বাম হস্তে বিনোদ-প্রয়োগকারীর দক্ষিণ মণিবন্ধ কিম্বা কফোণি (কনুই) আক্রমণ করিবে এবং লাঠি ঘুরাইয়া মস্তক-পৃষ্ঠে আঘাত করিবার উপক্রম করিবে। যথা অষ্টম চিত্রে।

৮ম (খ) বিনোদ

বিনোদ-প্রয়োগকারীর প্রতি-প্রতিকার

বিনোদ-প্রয়োগ-কারীও তুরন্তে দক্ষিণাবর্ত্তে অৰ্দ্ধেক ঘুরিয়া সঙ্গে-সঙ্গেই বাম হস্তে অসি-ধারীর দক্ষিণ কফোণিতে (কনুইতে) সজোরে আঘাত করিবে এবং যষ্টি দ্বারা "ভ্রূকুটিতে" অথবা সুযোগানুরূপ যে-কোন মর্ম্মে আঘাত করিবে। যথা নবম চিত্রে।

৯ম বিনোদ

অসি ধারীর পূর্ব্ব-বর্ণিত প্রতিকারের সঙ্গেই বিনোদ-প্রয়োগকারী বাম হস্তে অসিধারীর চক্ষু আক্রমণ করিতে পারিলে আশুই তাহার সুফল পাওয়ার অধিক সম্ভাবনা থাকে। যথা অষ্টম (ক) চিত্রে।

অসি ধারীর পুনঃপ্রতিকার

অসি-ধারীও তুরন্তে দক্ষিণাবর্ত্তে অর্দ্ধেক ঘুরিয়া বাম হস্তে বিনোদ-প্রয়োগ-কারীর দক্ষিণ কফোণিতে সজোরে আঘাত করিবে এবং নিজ দক্ষিণ হস্ত মুক্ত করিয়া লাঠি কিম্বা অসি দ্বারা উপযুক্তরূপে আঘাত করিবার উপক্রম করিবে। যথা দশম চিত্রে।

১০ম বিনোদ
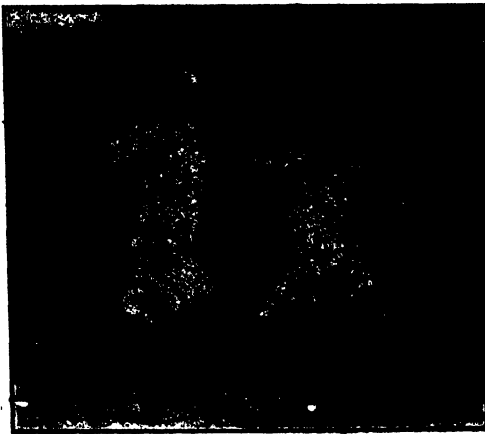
১১শ বিনোদ

বিনোদ-প্রয়োগ-কারীর পুনঃ-প্রতিকার ও নিষ্কৃতি

বিনোদ-প্রয়োগকারীও তুরন্তে বামপদ ঈষৎ অগ্রসর করিতে করিতে বাম হস্তে সজোরে আঘাত করিয়া নিজ দক্ষিণ হস্ত মুক্ত করিয়া লইবে এবং অসিধারীকে "তামেচা"য় প্রহারের উদ্যোগ করিবে। অসি-ধারীও বিনোদ-প্রয়োগ-কারীকে "তামেচা" কিম্বা গ্রীবান্ প্রভৃতিতে আঘাত করিবার উপক্রম করিবে। তদবস্থায় পরস্পরে পরস্পরের আঘাত স্ব স্ব অস্ত্র দ্বারা প্রতিহত করিয়া উভয়েই নিষ্কৃতি পাইবে। যথা একাদশ চিত্রে।
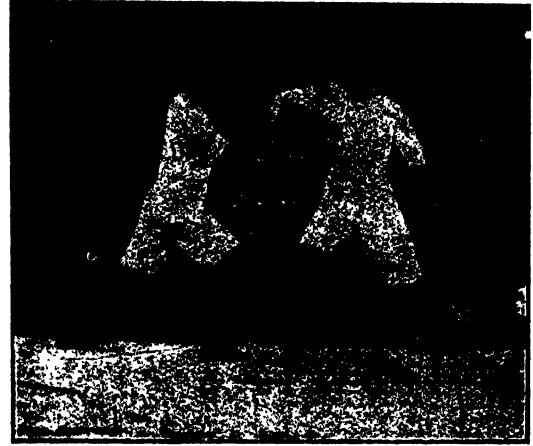
১২শ বিনোদ

তৃতীয় পাঠ

"ভাণ্ডার" "উল্টা অঙ্ক" প্রভৃতিতে আক্রান্ত হইলে তুরন্তে ঈষৎ বামাবর্ত্তে ঘুরিয়া দক্ষিণ পদ পূর্ণমাত্রায় সম্মুখে বিক্ষেপ করিয়া যষ্টি নিম্নমুখ রাখিয়া সজোরে অসি-ধারীর দক্ষিণ "মণিবন্ধ অধঃ"তে আঘাত করিতে হইবে। যথা দ্বাদশ চিত্রে।

প্রতিকারাদি ৮ম (ক) চিত্র-সম্পর্কিত বর্ণনার অনুরূপ।

চতুর্থ পাঠ।

"চিরের" আক্রমণে বিনোদ-প্রয়োগ-কারী তুরন্তে দক্ষিণ পদ পূর্ণমাত্রায় অগ্রসর করিয়া যষ্টি দ্বারা অসি-ধারীর দক্ষিণ "মণিবন্ধ পূর্ব্ব"তে সজোরে আঘাত করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গেই বাম হস্তে অসি-ধারীর দক্ষিণ শঙ্খে ও দক্ষিণ কর্ণে সজোরে আঘাত করিবে। যথা ত্রয়োদশ চিত্রে।

১৩শ বিনোদ

অসি-ধারীর প্রতিকার

অসি ধারীও তুরন্তে ঈষৎ দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরিয়া বামপদ সম্মুখে আনিয়া বাম হস্তে বিনোদ-প্রয়োগকারীর বাম মণিবন্ধে সজোরে আঘাত করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গেই অসি ঘুরাইয়া বিনোদ-প্রয়োগ-কারীর মস্তকে প্রহার করিবার উপক্রম করিবে। যথা চতুর্দ্দশ চিত্রে।

১৪শ বিনোদ

নিস্কৃতি

প্রতিকার হেতু বিনোদ-প্রয়োগ-কারীও যষ্টির পশ্চাৎ-বিন্দু দ্বারা অসি-ধারীর উদরে কিম্বা পার্শ্বে আঘাতের উপক্রম করিবে; এবং নিস্কৃতি হেতু অসিধারীও ঈষৎ বামাবর্ত্তে ঘুরিয়া সামান্য লম্ফ-সহযোগে দক্ষিণ পার্শ্বে সরিয়া আসিয়া বিনোদ-প্রয়োগ-কারীর সম্মুখীন হইয়া পড়িবে।

পঞ্চম পাঠ

"হুলের" আক্রমণে বিনোদ-প্রয়োগকারী তুরন্তে ঈষৎ বামাবর্ত্তে ঘুরিয়া সামান্য লম্ফ-সহযোগে অগ্রসর হইতে হইতে দক্ষিণ পদ পূর্ণমাত্রায় সম্মুখে অগ্রসর কয়িয়া অসি-ধারীর মণিবন্ধে সজোরে আঘাত করিবে। যথা পঞ্চদশ চিত্রে।

১৫শ (ক) বিনোদ
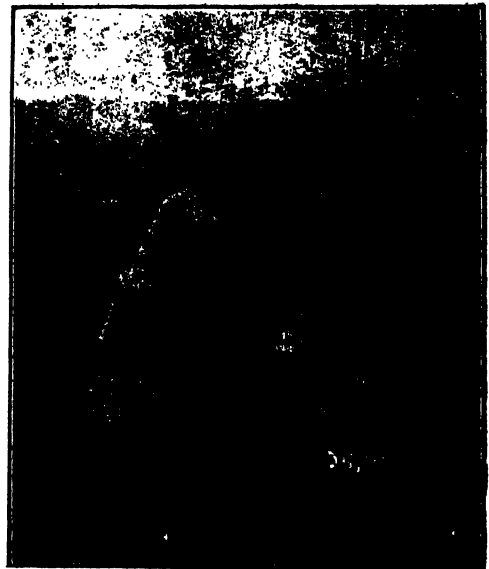
১৫শ (খ) বিনোদ

অবসর পাইলে বিনোদ-প্রয়োগকারীও সঙ্গে সঙ্গেই তুরন্তে দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরিয়া ৫ম কিম্বা ৯ম চিত্র-সম্পর্কিত বর্ণনার অনুরূপ প্রক্রিয়ার উপক্রম করিবে।

অসি-ধারীর প্রতিকার

প্রতিকার হেতু অসি-ধারীও তুরন্তে দক্ষিণাবর্ত্তে অর্দ্ধেক ঘুরিয়া সঙ্গে-সঙ্গেই অসি ঘুরাইয়া "শির" প্রভৃতি আক্রমণের উপক্রম করিবে এবং বাম হস্তে বিনোদ-প্রয়োগকারীর দক্ষিণ কফোণিতে সজোরে আঘাত করিবে। যথা ষোড়শ চিত্রে।
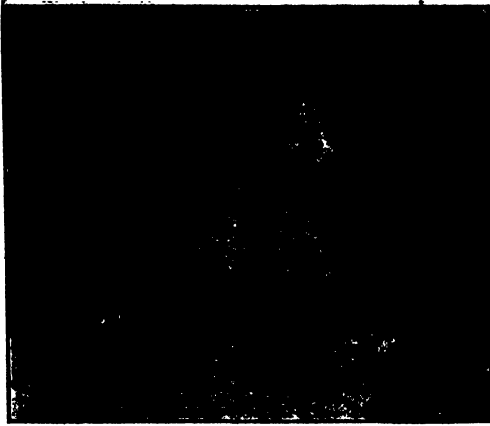
১৬শ বিনোদ

বিনোদ-প্রয়োগ-কারীর প্রতি-প্রতিকার

বিনোদ-প্রয়োগ-কারীও তুরন্তে দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরিয়া

১৭শ বিনোদ

অসি-ধারীর দক্ষিণ পার্শ্বে পতিত হইয়া বাম হস্তে অসি-ধারীর দক্ষিণ কফোণিতে সজোরে আঘাত করিবে এবং যষ্টির পশ্চাৎ-বিন্দু দ্বারা বক্ষের যে-কোনও মর্ম্মে আঘাতের উপক্রম করিবে। যথা সপ্তদশ চিত্রে।
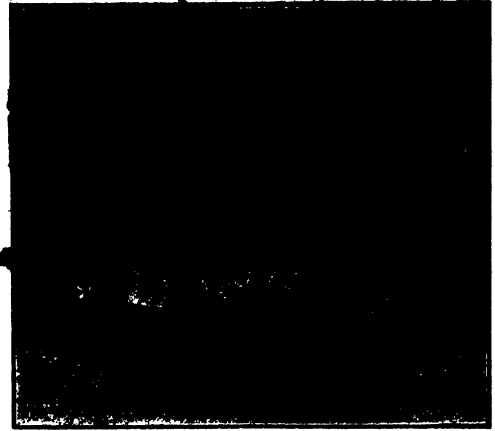
১৮শ বিনোদ

অসি-ধারীর পুনঃপ্রতিকার

অসি-ধারীও তুরন্তে বাম হস্তে বিনোদ-প্রয়োগ-কারীর দক্ষিণ মণিবন্ধে সজোরে আঘাত করিয়া সঙ্গে-সঙ্গেই দক্ষিণাবর্ত্তে অর্দ্ধেক ঘুরিয়া, নিজ বাম হস্ত দ্বারা বিনোদ-প্রয়োগ-কারীর দক্ষিণ মণিবন্ধে সজোরে আঘাত করিয়া নিজ দক্ষিণ হস্ত মুক্ত করিয়া বিনোদ-প্রয়োগ-কারীর "শির" "সাণ্ড" প্রভৃতিতে আঘাতের উপক্রম করিবে এবং বাম

১৯শ (ক) বিনোদ

হস্ত দ্বারা বিনোদ-প্রয়োগকারীর বাম হস্তকে প্রতিরোধ করিয়া রাখিবে। যথা অষ্টাদশ চিত্রে।

বিনোদ-প্রয়োগ-কারীর পুনঃপ্রতিকার

বিনোদ-প্রয়োগকারীও তুরন্তে ঈষৎ বামাবর্ত্তে ঘুরিয়া সঙ্গে-সঙ্গেই অসি-ধারীর বাম হস্তের মণিবন্ধে সজোরে যষ্টি দ্বারা আঘাত করিয়া নিজ বাম হস্ত মুক্ত করিয়া লইবে এবং বাম হস্ত দ্বারা অসিধারীর মণিবন্ধে সজোরে আঘাত করিবে। যথা ঊনবিংশ চিত্রে।

১৯শ (খ) বিনোদ
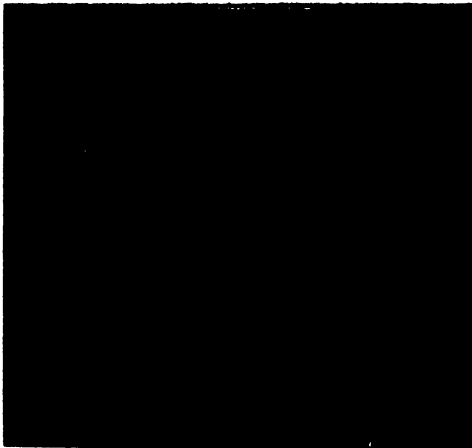
২০শ বিনোদ

নিষ্কৃতি

অসি-ধারীও তুরন্তে বাম হস্ত অপসারিত করিয়া বিনোদ-প্রয়োগ-কারীর যষ্টির আঘাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া বাম হস্ত দ্বারা বিনোদ-প্রয়োগ-কারীর বাম হস্তে সজোরে আঘাত করিয়া দক্ষিণ হস্ত মুক্ত করিয়া লইবে এবং প্রতিপক্ষের মস্তকে প্রহারের উপক্রম করিবে, বিনোদ-প্রয়োগ-কারীও "তামেচায়" প্রহারের উপক্রম করিবে। যথা বিংশ চিত্রে।

তদবস্থায় অসি-ধারী ঈষৎ বামাবর্ত্তে ঘুরিয়া সামান্য লম্ফ সহযোগে দক্ষিণ পার্শ্বে সরিয়া বিনোদ-প্রয়োগকারীর সম্মুখীন হইয়া পড়িবে, নতুবা তাহার বামহস্ত অরক্ষিত থাকা হেতু পুনরাক্রান্ত হইবে।
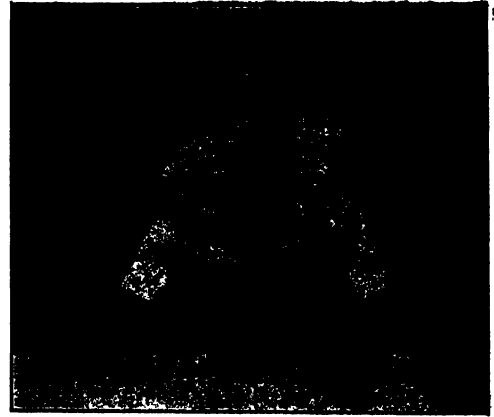
২১শ বিনোদ

ষষ্ঠ পাঠ

"সাণ্ড্", "বাহেরা", মোঢ়া" প্রভৃতিতে আক্রান্ত হইলে ঈষৎ বামাবর্ত্তে ঘুরিয়া দক্ষিণ পদ পূর্ণমাত্রায় সম্মুখে বিক্ষেপ করিয়া যষ্টি দ্বারা আক্রমণ-কারীর দক্ষিণ মণিবন্ধে সজোরে আঘাত করিতে হইবে। (অথবা ঈষৎ "অবনমন" সহযোগে দক্ষিণ কফোণিতে আঘাত করিতে হইবে)। যথা একবিংশ চিত্রে।

অসি-ধারীর প্রতিকার

প্রতিকার-কল্পে অসি-ধারী তুরন্তে (বিনোদ-প্রয়োগ-কারীর প্রথম প্রচেষ্টার সঙ্গে-সঙ্গেই) অৰ্দ্ধেক ঘুরিয়া পূর্ণ-

মাত্রায় বামপদ সম্মুখে বিক্ষেপ করিয়া বিনোদ-প্রয়োগ-কারীর দক্ষিণ পার্শ্বে পতিত হইয়া বাম হস্তে বিনোদ প্রয়োগ-কারীর দক্ষিণ কফোণিতে সজোরে আঘাত করিবে এবং সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার মস্তকে কিম্বা বাম পার্শ্বে অসি দ্বারা আঘাতের উপক্রম করিবে। যথা দ্বাবিংশ চিত্রে।
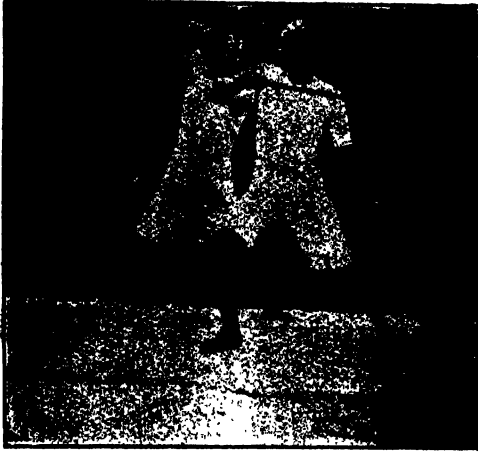
২২শ বিনোদ

প্রতি-প্রতিকার-কল্পে বিনোদ-প্রয়োগ-কারীও তুরন্তে একাদশ চিত্র-সম্পর্কিত বর্ণনার অনুরূপ প্রক্রিয়া করিবে।

২৩শ বিনোদ

সপ্তম পাঠ

"মোঢ়া" হইতে "কোমর"-অভ্যন্তরে আক্রান্ত হইলে তুরন্তে ঈষৎ বামাবর্ত্তে ঘুরিয়া দক্ষিণ পদ পূর্ণমাত্রায় সম্মুখে বিক্ষেপ করিয়া মুষ্টি নিম্নমুখ রাখিয়া তদ্দ্বারা অসি-ধারীর দক্ষিণ মণিবন্ধে সজোরে আঘাত করিতে হইবে। যথা ত্রয়োবিংশ চিত্রে।

অসি-ধারীর প্রতিকার

প্রতিকার-কল্পে অসিধারীও তুরন্তে দক্ষিণাবর্ত্তে অর্দ্ধেক ঘুরিয়া বাম পদ পূর্ণমাত্রায় সম্মুখে বিক্ষেপ করিয়া বাম হস্তে বিনোদ-প্রয়োগ-কারীর দক্ষিণ কফোণিতে সজোরে আঘাত করিবে এবং সঙ্গে-সঙ্গেই অসি দ্বারা তাহার মস্তকে কিম্বা বাম পার্শ্বে আঘাতের উপক্রম করিবে। যথা চতুর্বিংশ চিত্রে।

২৪শ বিনোদ

২৫শ (ক) বিনোদ

২৫শ (খ) বিনোদ
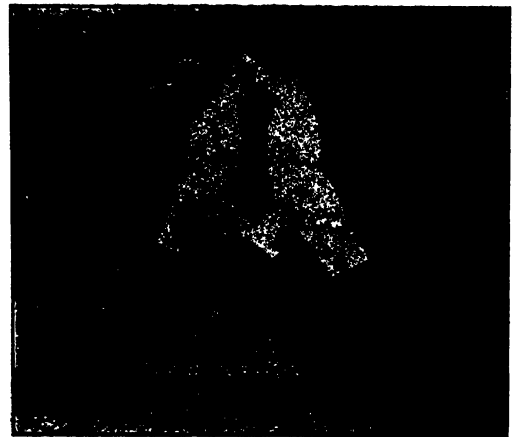
বিনোদ প্রয়োগ-কারীর প্রতি- প্রতিকার

প্রতিকার-কল্পে বিনোদ-প্রয়োগ-কারী তুরন্তে ঈষৎ দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরিয়া বামহস্তে অসি-ধারীর দক্ষিণ কফোণিতে সজোরে আঘাত করিবে, এবং সঙ্গে-সঙ্গেই যষ্টি দ্বারা কিম্বা যষ্টির পশ্চাৎ-বিন্দু দ্বারা অসি-ধারীর অণ্ডকোষে কিম্বা বস্তি অথবা উদরস্থিত যে কোনও মর্ম্মে আঘাতের উপক্রম করিবে। অব্যাহতির সূচনাহেতু অসি-ধারীও তুরন্তে দক্ষিণাবর্ত্তে অর্দ্ধেক ঘুরিয়া দক্ষিণ পদ সম্মুখে ও বাম পদ পশ্চাতে বিক্ষেপ করিয়া বাম হস্তে বিনোদ-প্রয়োগ-কারীর দক্ষিণ মণি-বন্ধে আক্রমণের উপক্রম করিবে। যথা পঞ্চবিংশ চিত্রে।

অবস্থাবিশেষে পূর্ব্ব-বর্ণিত প্রক্রিয়া নিম্নাঙ্কিত পঞ্চবিংশ (খ) চিত্রের অনুরূপও হইতে পারে।

নিষ্কৃতি হেতু অসি-ধারী পূর্ব্ব-বর্ণিত প্রক্রিয়ার উপক্রমের সঙ্গে-সঙ্গেই তুরন্তে বিনোদ-প্রয়োগকারীর দক্ষিণ মণি-বন্ধে কিম্বা কফোণিতে সজোরে আঘাত করিয়া (অবস্থা-বিশেষে দক্ষিণাবর্ত্তে কিম্বা বামাবর্ত্তে ঘুরিয়া) বিনোদ-প্রয়োগকারীর সম্মুখবর্ত্তী হইয়া পড়িবে।

অষ্টম পাঠ

"কোমর" হইতে "চাপ্‌নি" অভ্যন্তরে আক্রান্ত হইলেও সপ্তম পাঠের বর্ণনার অনুরূপ অগ্রসর হইয়া অসি-ধারীর দক্ষিণ মণিবন্ধে যষ্টি দ্বারা সজোরে আঘাত করিতে হইবে। যথা ষড়্‌বিংশ চিত্রে

২৬শ বিনোদ
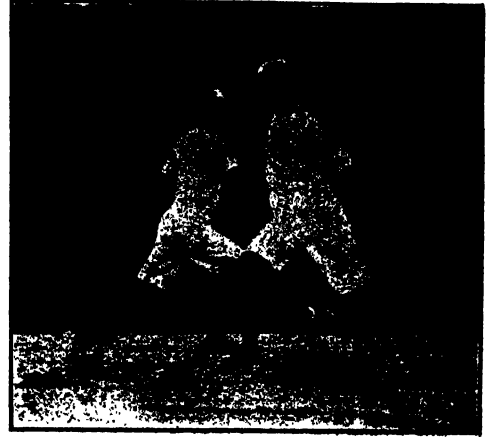
অসি-ধারীর প্রতিকার

প্রতিকার-কল্পে অসি-ধারীও তুরন্তে দক্ষিণ পদ ঈষৎ পশ্চাতে আনিয়া ও সঙ্গে-সঙ্গে দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরিয়া বিনোদ-প্রয়োগ-কারীর দক্ষিণ বাহু আক্রমণ করিয়া নিজ দক্ষিণ বাহু মুক্ত করিয়া লইবে। যথা সপ্তবিংশ চিত্রে।

বিনোদ-প্রয়োগ-কারীর প্রতি-প্রতিকার

সম্ভবপর হইলে বিনোদ-প্রয়োগকারীও তুরন্তে বাম হস্ত দ্বারা প্রথমে অসি-ধারীর দক্ষিণ কফোণি ও পরে বাম
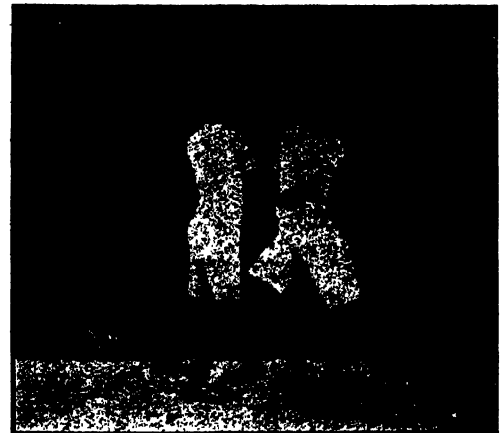
২৭শ বিনোদ

মণিবন্ধে সজোরে আঘাত করিয়া নিজ দক্ষিণ হস্ত মুক্ত করিয়া লইবে এবং তুরন্তে বাম হস্ত দ্বারা অসি-ধারীর দক্ষিণ হস্ত সজোরে প্রতিরোধ করিয়া যষ্টির পশ্চাৎ-বিন্দু দ্বারা অসি-ধারীর নিম্ন হনুর তলদেশে ("জনকদানে") সজোরে আঘাত করিবে। যথা অষ্টবিংশ চিত্রে।

২৮শ বিনোদ

অসি-ধারীর পুনঃপ্রতিকার

প্রতিকার হেতু বিনোদ-প্রয়োগ-কারীর পূর্ব্ববর্ণনানুরূপ প্রক্রিয়ার প্রারম্ভের সঙ্গে-সঙ্গেই অসি-ধারী তুরন্তে বাম হস্ত দ্বারা বিনোদ-প্রয়োগ-কারীর দক্ষিণ হস্ত-পৃষ্ঠে সজোরে আঘাত করিয়া বামপদ পশ্চাৎ দিকে পূর্ণমাত্রায় বিক্ষেপ

২৯শ বিনোদ

করিয়া অসি দ্বারা বিনোদ-প্রয়োগ-কারীকে মস্তক প্রভৃতিতে আঘাতের উপক্রম করিবে। যথা ঊনত্রিংশ চিত্রে।

নিষ্কৃতি হেতু বিনোদ-প্রয়োগ-কারী নিজ বাম হস্ত দ্বারা অসি-ধারীর বাম হস্তে সজোরে আঘাত করিয়া নিজ দক্ষিণ হস্ত মুক্ত করিয়া লইবে এবং ঈষৎ দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরিয়া প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হইয়া পড়িবে।

নবম পাঠ

"আনি" প্রভৃতির আক্রমণে বিনোদ-প্রয়োগ-কারী ঈষৎ "অবনমন" সহ দক্ষিণ "বেতসী"তে "জানু-বিজানু" গতি দ্বারা অগ্রসর হইয়া দক্ষিণ পদ সম্মুখে পূর্ণমাত্রায় বিক্ষেপ করিয়া তুরন্তে বাম হস্ত দ্বারা অসিধারীর গলদেশ আক্রমণ করিবে এবং সঙ্গে-সঙ্গেই যষ্টির পশ্চাৎবিন্দু দ্বারা "স্তনমূল" "স্তনরোহিত" কিম্বা "হৃদয়" মর্ম্মে আঘাত করিবে। যথা ত্রিংশ চিত্রে।
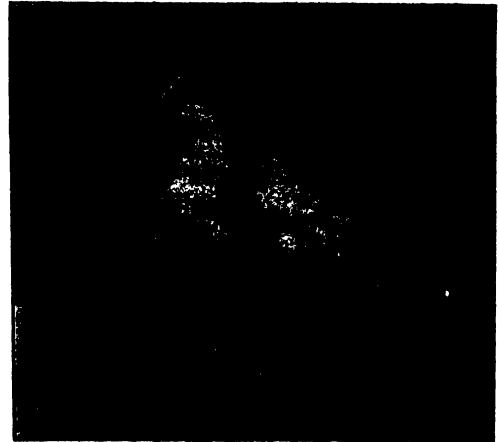
৩০শ বিনোদ

প্রতিকার হেতু অসি-ধারী তুরন্তে বাম হস্ত দ্বারা বিনোদ-প্রয়োগ-কারীর বাম মণিবন্ধে সজোরে আঘাত করিয়া নিজেকে মুক্ত করিয়া লইবে এবং তুরন্তে দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরিয়া বিনোদ-প্রয়োগ-কারীর দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করিবে।

নিষ্কৃতি হেতু বিনোদ-প্রয়োগকারীও তুরন্তে দক্ষিণাবর্ত্তে অর্দ্ধেক ঘুরিয়া অসি-ধারীর সম্মুখীন হইয়া পড়িবে।

"বেতসী"—দণ্ডায়মান অবস্থা হইতে ঈষৎ অবনত হইয়া শরীর দক্ষিণে বামে সম্মুখে কিম্বা পশ্চাতে, যে-কোন দিকে বেতসলতার ন্যায় হেলাইয়া যে অঙ্গ-চালনা, তাহারই নাম "বেতসী" গতি।

"জানু-বিজানু"—কোন জানুই ভূমি স্পর্শ করিবে না, অথচ উভয় বঙ্ক্ষণ (কুঁচ্‌কি) এবং উভয় জানুই বিভিন্ন ভঙ্গীতে বক্র থাকিবে, তদবস্থায় অঙ্গ-চালনার নামই "জানু-বিজানু"।

"বিনোদ" প্রয়োগ হেতু যষ্টির পশ্চাৎ-বিন্দু হইতে চারি অঙ্গুলী পরিত্যাগ করিয়াই হস্ততল দ্বারা যষ্টি মুঠা করিয়া ধরিতে হয়।

বিনোদের কৌশল প্রয়োগ করিতে হইলেই প্রতিপক্ষের অতিসন্নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িতে হয়, অত অল্প দূরত্বে ক্ষুদ্র যষ্টির আঘাত যত কার্য্যকারী হয়, অসি কিম্বা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ লাঠির আঘাত তত কার্য্যকারী হয় না, কারণ তদবস্থায় অসি কিম্বা লাঠির চালনাতেও কিছু বাধা উৎপন্ন হয়, এবং তাহাদের দোলন-কেন্দ্রও প্রতিপক্ষের শরীরের বহির্দ্দেশে আসিয়া পড়ে। সেই-হেতুই অধিকাংশ স্থলে অসি-কৌশল অপেক্ষা "বিনোদ"-কৌশল অধিক কার্য্যকারী হইয়া থাকে।

শ্রেষ্ঠ অসি-ধারীগণ অসি দ্বারাই "বিনোদের" কৌশল প্রয়োগেও সুদক্ষ হইয়া থাকেন, এবং সংঘর্ষ-কালে কদাচ কোন বিষয়েই বিচলিত হন না।

(ক্রমশঃ)

শ্রী পুলিনবিহারী দাস

ক্ষয়িষ্ণু জেলাগুলির উন্নতির উপায়

বঙ্গের যেসব জেলার লোক-সংখ্যা নানা কারণে কমিয়াছে, তাহাদের অবস্থা ভাল করিতে হইলে বাহিরের সাহায্যের প্রয়োজন আছে বটে; কিন্তু প্রধানতঃ সেই সেই জেলার লোকদিগকেই, নিজেদের দুরবস্থা হইয়াছে বলিয়া বুঝিয়া, সেই দুর্দ্দশা দূর করিবার উপায় অনুসন্ধান করিতে হইবে, এবং উপায় জানিয়া তাহা অবলম্বন করিতে হইবে। অর্থাৎ তাহাদের বাহ্য উন্নতি হইবার আগে ঐসব জেলার মানুষগুলির হৃদয়মনের পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক। উন্নত স্থানসকলের সহিত তুলনা করিয়া নিজেদের অবনত অবস্থা বুঝিবার মত জ্ঞান তাহাদিগকে লাভ করিতে হইবে। তার পর কি কি উপায়ে অবস্থার উন্নতি হইতে পারে, তাহা জানিতে হইবে; এবং সর্ব্বশেষে সেইসকল উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

ইহার মধ্যেও একটি কথা বলিতে বাকী রহিয়া গিয়াছে। অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে, মানুষের চেষ্টার দ্বারা উন্নতি যে হইতে পারে, এই বিশ্বাস থাকা একান্ত আবশ্যক। মাটী চষিয়া তাহাতে সার ও জল দিয়া বীজ বপন করিলে ও তাহার পর নিয়মমত যত্ন করিলে শস্য উৎপন্ন হয়, এই বিশ্বাস নিরক্ষর কৃষকেরও আছে। কৃষক দার্শনিকের মত যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় না, যে, মানুষের চেষ্টার ফলদাতা একজন আছেন, তাঁহারই নিয়মে চেষ্টার ফল ফলে। কিন্তু যুক্তি তর্ক না করিলেও প্রত্যেক মানুষই যতরকম কাজ ও চেষ্টা করে, তাহার মূলে এই স্বাভাবিক বিশ্বাস গূঢ়ভাবে নিহিত আছে, যে, মঙ্গলময় ফলদাতা বিধাতার নিয়মে উন্নতির যথোচিত চেষ্টা করিলে উন্নতি হয়, হিতের যথোচিত চেষ্টা করিলে হিত হয়, যে-রকম কাজ করা যায় তাহার সেইরূপ ফল হয়।

অতএব ক্ষয়িষ্ণু জেলাসকলের হিত যাঁহারা করিতে চান, তাঁহারা উহার লোকগুলিকে নানা উপায়ে তাহাদের অবস্থা সম্বন্ধে সজাগ করুন। বক্তৃতা দ্বারা, ম্যাজিক লণ্ঠন ও অন্যান্য উপায়ে ছবি দেখাইয়া, পুস্তক পুস্তিকা পত্রিকা লিখিয়া ও প্রচার করিয়া তাঁহারা বুঝাইয়া দিউন, যে, ঐ-সব জেলার অবস্থা কত হীন হইয়াছে। তাহার পর, চেষ্টা করিলে উন্নতি যে হইতে পারে, সেই বিশ্বাস জাগাইয়া তুলুন। এবং সঙ্গে সঙ্গে উন্নতির উপায়সকল নিজেরা

অবলম্বন করুন, এবং অন্য সকলকেও তদ্রূপ উপায় অবলম্বনে প্রবৃত্ত করুন।

আগেই বলিয়াছি, যে-সব জেলার উন্নতি করিতে হইবে, তাহার অধিবাসী মানুষগুলির হৃদয়-মনের পরিবর্ত্তন উন্নতির মূলসূত্র। মানুষগুলি যদি এখনকারই মত অজ্ঞ, চেষ্টাহীন, সদাচরণ ও অসদাচরণ সম্বন্ধে জ্ঞানহীন বা উদাসীন এবং পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসহীন থাকে, তাহা হইলে আরব্য-উপন্যাসের আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপের মত ঐন্দ্রজালিক শক্তি দ্বারা যদি কেহ ঐ জেলাগুলিকে নন্দন-কাননে পরিণত করে, তাহা হইলেও দেখা যাইবে, যে, কিছুকাল পরে আবার এইসব অঞ্চলের দুর্দ্দশা হইয়াছে। উন্নতি এমন একটি জিনিষ নয়, যে, একবার পাইলে ঠিক্ সেই অবস্থাতেই বরাবর থাকে। সামান্য দৃষ্টান্তের দ্বারাই ইহা বুঝা যায়। একটি খুব সুন্দর খুব মজ্‌বুৎ বাড়ী যদি কাহাকেও দেওয়া যায়, এবং যদি সে প্রত্যহ তাহা পরিষ্কার না করে এবং মধ্যে মধ্যে তাহা মেরামত না করায়, তাহা হইলে তাহা কয় দিন সুন্দর থাকে, এবং কত বৎসরই বা তাহা টিকিয়া থাকে? যদি কোথাও একটি ভাল পুকুর প্রতিষ্ঠা করা যায়, কিন্তু যদি তথাকার লোকেরা এখনকার মত আবর্জ্জনা নিষ্ঠীবন মলমূত্রাদি দ্বারা তাহার জলকে দূষিত করে এবং মধ্যে মধ্যে তাহার পঙ্কোদ্ধার না করায়, তাহা হইলে ঐ পুকুর কতদিন মানুষের ব্যবহারের যোগ্য থাকে? কাহাকেও যদি বেশ উর্ব্বর জমি দেওয়া হয়, কিন্তু সে যদি ক্রমাগত বৎসরের পর বৎসর তাহাতে শস্য উৎপাদন করিতে থাকে অথচ সার না দেয়, তাহা হইলে তাহার উৎপাদিকা শক্তি কত দিন থাকে? ইউরোপে, আমেরিকায়, জাপানে এক এক বিঘা জমি হইতে যে যে শস্য যত পরিমাণে জন্মে, ভারতবর্ষে তাহা অপেক্ষা অনেক কম জন্মে। তাহার একটি কারণ উপযুক্ত সার না দেওয়া। বাকী কারণ চাষের অন্যান্য বিজ্ঞান-সম্মত উপায় অবলম্বন না করা।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, মানুষের একবার কোন-প্রকারে উন্নত অবস্থায় পৌঁছিলেই চলিবে না, সেই উন্নত অবস্থা বজায় রাখিবার জন্য তাহাকে সর্ব্বদা সজাগ ও সচেষ্ট থাকিতে হইবে।

চুম্বক। নিজেদের দুরবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা ও অপরসকলকে সেই জ্ঞান দেওয়া; চেষ্টা করিলে দুরবস্থা দূর করিয়া উন্নতিলাভ করা যায়, ঈশ্বরের ইহাই মঙ্গল নিয়ম, এই বিশ্বাস দৃঢ় ও উজ্জ্বল করা; প্রত্যেক বিষয়ে উন্নতির উপায় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা; সেইসকল উপায় অবলম্বন করা; উন্নত অবস্থা বজায় রাখিবার জন্য সর্ব্বদা অবহিত ও সচেষ্ট থাকা;—এইগুলি উন্নতির মূল-সূত্র।

বঙ্গের ক্ষয়িষ্ণু জেলাগুলির মধ্যে বাঁকুড়া ক্ষয়িষ্ণুতম। এইজন্য ইহার কথা আগে লিখিতেছি। অন্যগুলির সম্বন্ধেও পরে লিখিবার ইচ্ছা আছে।

শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

বাঁকুড়ার উন্নতি

বাঁকুড়া জেলা বঙ্গের ক্ষয়িষ্ণুতম জেলা। ইহার দুরবস্থার কথা গত চৈত্রমাসের প্রবাসীতে "বঙ্গের ক্ষয়িষ্ণুতম জেলা" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছি। ইহার উন্নতি করিতে হইলে কি কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, সে-বিষয়ে দুছার কথা বলিব। আগেকার প্রবন্ধে বলিয়াছি, উন্নতি করিতে হইলে প্রথমেই মানুষকে বুঝিতে ও বুঝাইতে হইবে, যে, তাহার দুরবস্থা হইয়াছে। এইজন্য দুরবস্থার জ্ঞান আবশ্যক। জ্ঞানলাভ ও জ্ঞান-দান নানা রকমে হইতে পারে। যদি কাহারও যথেষ্ট টাকা ও লোক থাকে, তাহা হইলে তিনি বহুসংখ্যক বক্তা নিযুক্ত করিয়া জেলার গ্রামে গ্রামে লোক পাঠাইয়া বক্তৃতা দ্বারা সকলকে তাহাদের দুর-বস্থার কথা জানাইতে পারেন, ঈশ্বরের মঙ্গল নিয়ম অনুসারে তাহারা চেষ্টা করিলে উন্নতি করিতে পারে

এই বিশ্বাস জাগাইয়া তুলিতে পারেন, উন্নতির উপায়-সকল বলিয়া দিতে এবং তাহা অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিতে পারেন। অবশ্য বক্তাগণ ম্যাজিক লণ্ঠন ব্যবহারও করিতে পারেন। কিন্তু এত বেশী টাকা ও লোক কাহারও নাই। এত বেশী টাকা ও লোক কাহারও না থাকিলেও, যাহার যাহা আছে তাঁহার সাহায্যেই এইরূপ চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু জ্ঞান একবার দিলেই তাহা চিরকাল মানুষের মনে থাকে না, সদিচ্ছা একবার মানুষের জন্মিলেই তাহা চিরকাল থাকে না, বা প্রবল থাকে না; পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিবার ও করাইবার প্রয়োজন হয়। প্রত্যেক মানুষের এইপ্রকার স্মরণের সমুচিত ব্যবস্থা লেখা-পড়া জানিলে সহজে হইতে পারে। পুস্তক পুস্তিকা পত্রীতে যাহা লেখা থাকে, তাহা আমরা যতবার দরকার পড়িয়া মনে রাখিতে পারি। এইজন্য আমরা যে দিকেই উন্নতি করিতে চাই না কেন, সকল অধিবাসী লেখা-পড়া জানিলে সেই চেষ্টা করিবার জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ যত সহজে করা যায়, অন্য কোন উপায়ে তাহা করা যায় না।

কোন দিকে উন্নতির চেষ্টা আরম্ভ করিবার আগে আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলকে লেখাপড়া শিখাইয়া ফেল, তাহার পর ঐ চেষ্টা কর,—আমরা এরূপ পরামর্শ দিতেছি না। কারণ, বস্তুতঃ সকল বিষয়ে উন্নতি পরস্পর-সাপেক্ষ। একটি দৃষ্টান্ত লউন। স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হইলে উপযুক্তরকম থাকিবার ঘর, খাদ্য, বস্ত্র, পরিষ্কার রাস্তা, ঘাট, পুকুর, নর্দ্দমা এবং স্বাস্থ্যরক্ষাবিষয়ক নিয়ম-সকলের জ্ঞান চাই। এই সব পাইতে হইলে যথেষ্ট ধন চাই। ধন উপার্জ্জন করিতে হইলে জ্ঞান চাই ও শ্রম-পটু সুস্থ শরীর চাই, সৎচরিত্র চাই। জ্ঞান লাভ করিতে হইলেও আবার বেতন পুস্তকাদির দাম প্রভৃতির জন্য টাকা চাই। অতএব, গাছ আগে না বীজ আগে, বলা যেমন কঠিন, তেমনি সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি করিতে হইলে কোন্ দিকে চেষ্টা প্রথমে করিতে হইবে, তাহা স্থির করা যায় না। কিন্তু তাহা স্থির না করিলেও ক্ষতি নাই। সকলরকম চেষ্টারই সূত্রপাত একই সমিতি বা লোকের দ্বারা কিম্বা ভিন্ন ভিন্ন সমিতির ও লোকের দ্বারা একই সময়ে আরব্ধ হইতে পারে।

আমরা আলোচনার সুবিধার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দিকের উন্নতির বিষয় পরে পরে বলিব বটে, কিন্তু সকল দিকেই চেষ্টা করিতে হইবে। যাহার যে যে দিকে চেষ্টার সুবিধা বা ঝোঁক বেশী, তিনি, অন্য কাহারও অন্য দিকের চেষ্টার বাধা না দিয়া বা বিরোধী না হইয়া, সেই সেই দিকে চেষ্টা করিবেন।

শিক্ষা

বাঁকুড়া জেলার ১০,১৯,৯৪১ জন লোকের মধ্যে মোট ১,১২,২৮৪ জন লিখিতে পড়িতে পারে। বাকী নয় লক্ষ সাত হাজার লোককে লেখাপড়া শিখাইতে হইবে। ৫,১০,৬০৭ জন স্ত্রীলোকের মধ্যে মোটামুটি ৪৮০০ স্ত্রী-লোক লিখিতে পড়িতে পারে। বাকী পাঁচ লক্ষ পাঁচ হাজারকে লেখা-পড়া শিখাইতে হইবে। মোটামুটি পাঁচ লক্ষ নয় হাজার পুরুষের মধ্যে মোটামুটি এক লক্ষ সাত হাজার লেখা-পড়া জানে। বাকী চারি লক্ষ দুই হাজার পুরুষকে লেখা পড়া শিখাইতে হইবে।

যে-সব ছেলে ও মেয়ের বয়স এখনও কম আছে, তাহাদের জন্য যথেষ্টসংখ্যক সাধারণ বিদ্যালয় ও পাঠশালা স্থাপন করিয়া সকল ছেলেমেয়েকে তথায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু যাহারা প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছে, সাধারণ পাঠশালা ও বিদ্যালয়ে যাইবার যাহাদের বয়স নাই এবং দিনের বেলা রোজ্‌গার করিতে হয় বলিয়া যাহাদের সেখানে যাইবার সময়ও নাই, তাহাদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এত লোকের শিক্ষার বন্দোবস্ত করা খুব বৃহৎ ব্যাপার। কিন্তু তাহাতে ভয় পাইলে চলিবে না। আরম্ভ যত সামান্যভাবেই হউক, ভগবানের উপর বিশ্বাস রাখিয়া করিতে হইবে।

স্কুলে যাইবার যাহাদের বয়স আছে, তাহাদের জন্য বাঁকুড়া জেলায়, উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্ন প্রাইমারী পাঠশালা পর্য্যন্ত মোট শিক্ষালয় ১৯২৩ সালের ৩১শে মার্চ্চ ১৩৯৭টি ছিল। তাহাতে মোট ছাত্রছাত্রী ছিল ৪৩৮৩৯ জন;—ছাত্র ৩৯০৪৮, ছাত্রী ৪৭৯১। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, যে, বালিকাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার খুব কম হইয়াছে, বালকদের অষ্টমাংশের

কম। উল্লিখিত তারিখে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে একটিও বালিকা পড়িত না, ১১টি মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে পড়িত, ৪০টি মধ্য বাংলা বিদ্যালয়ে, ৪৬৭৫টি প্রাইমারী বিদ্যালয়ে।

১৯২৩ সালের ৩১শে মার্চ্চ ১৬টি উচ্চ ইংরেজী, ৩৭টি মধ্য ইংরেজী, ১১টি মধ্য বাংলা এবং ১১৪৫টি প্রাইমারী বিদ্যালয় ছিল। তা ছাড়া বিশেষ শিক্ষার জন্য ১৭৩টি বিদ্যালয়, এবং প্রাইভেট বিদ্যালয় ১৫টি ছিল।

১৯১১-১২ সালে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৪৯০৫০ ছিল। তাহা অপেক্ষা এখন অনেক কম হইয়াছে।

সকল বালকবালিকাকে উচ্চ শিক্ষা দিবার সঙ্কল্প এখন আমরা মনে স্থান দিতেছি না। কেবল যদি পাঁচ হইতে দশ বৎসর বয়সের বালকবালিকাদের শিক্ষার বিষয় ভাবি, তাহা হইলে দেখিতে পাই তাহাদের সংখ্যা ১,৪৮,২১১। উহাদের মধ্যে (প্রাইমারী বিদ্যালয়ে) শিক্ষা পায় মোট ৩৩৪৯৬ জন। বাকী বার আনারও বেশী ছাত্র-ছাত্রী কোন শিক্ষা পাইতেছে না; যাহারা শিক্ষা পাইতেছে তাহাদের জন্য ১১৪৫টি প্রাইমারী স্কুল আছে। সুতরাং আরও প্রায় ৩৫০০ প্রাইমারী স্কুল চাই।

যদি ১০ হইতে ১৫ বৎসরের সব বালক-বালিকাকে শিক্ষা দিতে চাওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যায়, তাহাদের মোট সংখ্যা ১,১৯,৩৪৬। বালিকাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায়, এই বয়সের বালকদের মোট সংখ্যা ৬৬১৫১। তাহাদের মধ্যে মোটামুটি ৬৫০০ জন শিক্ষা পাইতেছে। বাকী ৬০,০০০ ছেলের শিক্ষার জন্য মধ্য বাংলা ও ইংরেজী ও উচ্চ ইংরেজী শিক্ষালয় অনেক হাজার চাই।

বাঁকুড়া জেলায় যে-যে জাতি বাস করে, তাহাদের মধ্যে সাঁওতালেরা সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী—১,০৪,৯১২। তাহার পর ক্রমান্বয়ে বাউরী ৯৫,৮৫১; ব্রাহ্মণ ৯৪,৫৯২; তেলী ৬৪,৫৭৫; গোয়ালা ৬২,৯২৫; বাগ্‌দী ৫৫,০৭৭; সদ্‌গোপ ৪৩,০১৬; লোহার ৪১,৮৮৬; ইত্যাদি। ব্রাহ্মণ ছাড়া এইসমস্ত জাতির মধ্যেই শিক্ষার বিস্তৃতি ও উন্নতি অত্যন্ত কম; যাঁহারা শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তৃতি বিষয়ে মন দিবেন, তাঁহাদিগকে এই কথাটি মনে রাখিতে হইবে। তা ছাড়া, স্ত্রীলোকদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তৃতি ও উন্নতি যে খুব কম, তাহা আগেই বলিয়াছি।

অল্পবয়স্ক ও প্রাপ্তবয়স্ক সব অধিবাসী লিখিতে ও পড়িতে শিখিলেই উন্নতি হইবে না। অল্পশিক্ষিত ও উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত সকলের জন্য যথাযোগ্য এরূপ পুস্তকাদি চাই, যাহা পড়িয়া সকলে নিজেদের ও সমাজের কল্যাণ সাধন করিতে পারে। এরূপ সাহিত্য পড়িবার রুচি জন্মান চাই। তদ্ভিন্ন, যে-যে ব্যবসা, কারুকার্য্য, শিল্প, কৃষি প্রভৃতি দ্বারা জেলার লোকে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহা শিখাইতে হইবে।

কোন দেশে বা জেলায় নিম্নতম হইতে সর্ব্বোচ্চরকম শিক্ষার বিস্তার করিতে হইলে শিক্ষা দিবার জন্য যথেষ্ট-জ্ঞানবান্ ও যথেষ্টসংখ্যক লোক চাই। উচ্চ শিক্ষার অন্য প্রয়োজন ছাড়িয়া দিলেও, কেবল শিক্ষক জোগাইবার জন্যও উচ্চ শিক্ষা আবশ্যক।

উচ্চ শিক্ষার জন্য বাঁকুড়া সহরে ওয়েস্‌লিয়ান্ কলেজ আছে। এই কলেজটি খুব উৎকৃষ্ট। ইহা সহরের এক প্রান্তে স্বাস্থ্যকর প্রশস্ত স্থানে অবস্থিত। তাহা খুব বিস্তৃত। তাহাতে ছাত্রদের অধ্যাপনার শ্রেণী-কক্ষসমূহ, জ্যোতিষিক পর্য্যবেক্ষণ-মন্দির, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার, লাইব্রেরী প্রভৃতি আছে, এবং ছাত্রাবাসও আছে। তদ্ভিন্ন একটি ভাল অবস্থায় রক্ষিত জলাশয়ও আছে। কলেজের হাতার মধ্যে প্রিন্সিপ্যাল কিম্বা অন্য একজন অধ্যাপকের সপরিবারে থাকিবার স্থান আছে। ছাত্রদের খেলিবার জায়গাও আছে। এইসকল দিকের বন্দোবস্তে ইহার সমকক্ষ কোন কলেজ কলিকাতায় নাই। এখানে বি-এ, ও বি-এস্‌-সি পর্য্যন্ত পড়ান হয়। বিজ্ঞানের মধ্যে এখন পদার্থ-বিজ্ঞান ও রাসায়নী বিদ্যা শিখান হয়। কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান এবং ভূবিদ্যা শিখাইবার বন্দোবস্ত করিবারও ইচ্ছা আছে। কৃষি সম্বন্ধে কেজো শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ক্লাস খুলিবার ইচ্ছা আছে। বাঁকুড়া জেলার ধন-সম্পত্তি না বাড়াইলে উহার অবস্থা ভাল হইবে না। সর্ব্বাগ্রেই অবশ্য কৃষির উন্নতি ও বিস্তৃতি সাধন করিতে হইবে; এবং তাহার জন্য কৃষি শিক্ষা দেওয়া চাই। তাহার পর বাঁকুড়ার খনিজ ও উদ্ভিজ্জ সম্পত্তির সুব্যবহার করিয়া ধন বাড়াইতে হইলে ভূবিদ্যা ও উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানের জ্ঞান কাজে লাগিবে। এসব দিকে কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আছে।

বর্ত্তমানে কলেজটির ছাত্রসংখ্যা ৪৯৯। প্রায় অর্দ্ধেক ছাত্র বাঁকুড়া জেলার হইলেও ইহা বাংলার অন্য সব জেলারও কাজে লাগে। ২০৯ জন ছাত্র বাঁকুড়ার, ১৯ জন মেদিনীপুরের, ১৭ জন বীরভূমের, ৩৩ জন মানভূমের, ৮২ জন বর্দ্ধমানের, এবং বাকী ১৩৯ জন অন্যান্য জেলার। ইহাদের মধ্যে হিন্দু ৪৮৭, মুসলমান ৪, এবং দেশী খৃষ্টিয়ান্ ৮ জন। খৃষ্টিয়ান্দিগের মধ্যে একজন সাঁওতাল ও একজন হাড়ি জাতীয়। হিন্দুদের মধ্যে ৪টি ছাত্র শুঁড়ি ও ৩টি কলু।

কলেজের অধ্যাপক-নিয়োগ-নীতি উৎকৃষ্ট। কর্ত্তৃপক্ষ জানেন, যে, বাঁকুড়া জেলার অধিবাসী এবং এই কলেজের প্রাক্তন ছাত্র লোকদের ইহার প্রতি দরদ বেশী হইবে। শিক্ষাদাতাদের মধ্যে আট জন বাঁকুড়া জেলার, এবং সাত জন কলেজের প্রাক্তন ছাত্র।

কলেজের হাতার দুটি ছাত্রাবাসে ১৫৭ জন ছাত্র থাকে। প্রত্যেকের এক-একটি স্বতন্ত্র কক্ষ। আরো ছাত্রাবাসের খুব প্রয়োজন আছে। কলেজ ও ছাত্রাবাস কলেজেই উৎপন্ন বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা আলোকিত হয়। উহার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারের আস্‌বাব এবং কোন কোন সরঞ্জাম বাঁকুড়াতেই নির্ম্মিত।

কলেজের কয়েকজন ছাত্র সহরে একটি নৈশ বিদ্যালয় চালাইয়া থাকে।

বাঁকুড়া সহরে অন্তঃপুরিকাদের শিক্ষার জন্য কিছু ব্যবস্থা আছে। শিক্ষয়িত্রীর বেতন গবর্ণ্‌মেণ্ট্ দেন। মিউনিসিপালিটী মাসিক ২০৲ টাকা সাহায্য করেন। এই প্রশংসনীয় চেষ্টার আরও বিস্তৃতি আবশ্যক।

বাঁকুড়া ব্রাহ্ম-সমাজের তত্ত্বাবধানে একটি নৈশ বিদ্যালয় ও একটি শিশুদের নীতি-বিদ্যালয় পরিচালিত হয়। তদ্ভিন্ন ম্যাজিক্ লণ্ঠন সহযোগে নানাবিধ শিক্ষা দিবার এবং বাউরী বালকদিগের মধ্যে কাজ করিবার চেষ্টাও হইতেছে।

বিষ্ণুপুর পণ্যশিল্প বিদ্যালয়ের বিষয় পরে লিখিতেছি।

কৃষি

আমরা চৈত্রমাসের প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, যে, বাঁকুড়া জেলায় বাংলা দেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কম বৃষ্টি হয়, প্রতি বর্গমাইলে সর্ব্বাপেক্ষা কম ফসল জন্মে, এবং প্রতি বর্গ-মাইলে লোকসংখ্যাও সর্ব্বাপেক্ষা কম। এই জেলায় চাষের যোগ্য জমি যত আছে, তাহার অল্প অংশেই চাষ হয়; জল সেচনের বন্দোবস্ত করিতে পারিলে বাকী সমস্ত জমিতেও চাষ হইতে পারে। তাহা হইলে এ-জেলার লোকসংখ্যা কমিবে না, বরং বাড়িবে।

বৃষ্টি এ-জেলায় কম হয়। সুতরাং আকাশ হইতে যে জল পড়ে, তাহা ধরিয়া রাখিবার বন্দোবস্ত করা উচিত। সমস্ত বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখা সম্ভবপর নহে। কারণ, তাহার অনেক অংশ খাল ও নদী বাহিয়া চলিয়া যায়, কতক মাটির নীচে যায়, ইত্যাদি। কিন্তু পুকুর, দীঘি, বাঁধ, প্রভৃতি নামে অভিহিত নানাপ্রকার জলাশয়ে অনেক জল ধরিয়া রাখা যাইতে পারে। তা ছাড়া, ছোট ছোট যে-সব খাল, "জোড়", প্রভৃতিতে সম্বৎসর অল্প অল্প জল বহে, তাহাতে উপযুক্ত স্থানে দরকার-মত পাথরের, ইটের বা মাটির বাঁধ দিলে বড় জলাশয় বা কৃত্রিম হ্রদ প্রস্তুত হইতে পারে। তাহা হইতে খাল কাটিয়া জল লইয়া গিয়া বিস্তর জমিতে জল সেচন করা যাইতে পারে।

বাঁকুড়া জেলায় বর্ত্তমান অধিবাসীদের পূর্ব্বপুরুষদিগের এই উভয় দিকেই দৃষ্টি ছিল। এখনও এই জেলায় অন্যূন ত্রিশ হাজার জলাশয় আছে। তাহার মধ্যে অনেকগুলির নাম বাঁধ। ইহার অধিকাংশ বহুকাল পঙ্কোদ্ধার না হওয়ায় ভরাট হইয়া গিয়াছে। কতকগুলির পাড় ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় বা জল সেচনের জন্য কাটিয়া পুনর্ব্বার বাঁধিয়া না দেওয়ায় তাহাতে জল সামান্যই থাকে। এইগুলির পঙ্কোদ্ধার করা প্রয়োজন। তদ্ভিন্ন, খাল বা জোড় নামক ছোট নদীগুলিতে বাঁধ দিয়া জল সঞ্চয় করিবার প্রাচীন দৃষ্টান্তও এ-জেলায় আছে। জল-সেচনের জন্য সুদীর্ঘ কৃত্রিম খাল-খননের দৃষ্টান্তও আছে।

কিন্তু অতীতকালে যাহা ছিল, পঙ্কোদ্ধার, মেরামত প্রভৃতির অভাবে তাহাদের অধিকাংশ হইতে কোন সুফল এখন পাওয়া যাইতেছে না। বরং অনেক স্থানে তাহা রোগের কারণ হইয়া রহিয়াছে।

অধুনা পুরাতন জলাশয়গুলির পঙ্কোদ্ধার ও মেরামতের জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ চেষ্টার সূত্রপাত হইয়াছে। কুমার রমেন্দ্র-

কৃষ্ণ দেব যখন বাঁকুড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন, সেই সময় ঐ জেলায় একটি কৃষি-সমিতি স্থাপিত হয়। শ্রীযুক্ত গুরু-সদয় দত্ত ম্যাজিষ্ট্রেট্ থাকার কালে, ঐ সমিতিকে "কৃষি ও হিতসাধন সমিতি" নাম দিয়া নূতন করিয়া গড়া হয়। ইহার যতপ্রকার উদ্দেশ্য এবং ইহা যে যে কাজ এ পর্য্যন্ত করিয়াছে, তাহা "বাঁকুড়া-লক্ষ্মী" নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকাতে লিখিত হইয়াছে। আমরা সংক্ষেপে তাহার কোন-কোনটির উল্লেখ করিব।

এই সমিতির চেষ্টায় এবং সরকারী কোন কোন বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের সাহায্যে জেলায় বিরাশিটি "জলসরবরাহ সমবায় সমিতি" স্থাপিত হইয়াছে, এবং সেগুলি আইন অনুসারে রেজিষ্টারী করা হইয়াছে। আরও অনেক সমিতি স্থাপনের প্রস্তাব চলিতেছে। প্রতিষ্ঠিত সমিতিগুলির দ্বারা অনেক জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার ও মেরামত হইয়াছে ও হইতেছে, এবং কয়েকটি ছোট নদী বাঁধিয়া কৃত্রিম হ্রদ প্রস্তুত করিয়া তাহা হইতে খাল কাটিয়া জল লইয়া গিয়া জমিতে জল দিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে ও হইতেছে। ইতিমধ্যেই যাহা হইয়াছে, তাহার দ্বারা আনুমানিক ছাব্বিশ হাজার বিঘা জমিতে কোন বৎসরই জলাভাবে অজন্মা হইবে না, বলা যাইতে পারে।

এইসকল সমিতির দ্বারা কিরূপ কাজ হইতেছে, তাহা দেখিবার জন্য আমি গত বৎসর মাঘ মাসে বাঁকুড়া গিয়াছিলাম, কিন্তু পীড়িত হইয়া পড়ায় সব জায়গায় যাইতে পারি নাই। একদিন মোটর-গাড়ী ভাড়া করিয়া বাঁকুড়া সহর হইতে যাতায়াতে প্রায় পঞ্চাশ মাইল অতিক্রম করিয়া দুটি ছোট নদীর বাঁধ দেখিয়া আসিয়াছিলাম। প্রথমে তালডাংরা থানার নিকটবর্ত্তী রুক্মিণী খালের বাঁধ দেখিতে যাই। ইহা মাটির বাঁধ; পরে সম্ভবতঃ পাকা করা হইবে। কিন্তু এখনই ইহাতে কাজ চলিতেছে। যে-সব জমিতে আগে বৎসরে একবার ধান্য হওয়াই দুর্ঘট ছিল, এখন তাহাতে ধান্য ছাড়া গম ও অন্যান্য ফসলও হইতেছে। তা ছাড়া রুক্মিণী খালের কৃত্রিম হ্রদ হইতে পয়ঃপ্রণালী কাটিয়া জল আনিয়া একটি পুকুর জলপূর্ণ করা হইয়াছে দেখিলাম। তাহা জলে থৈ থৈ করিতেছে। গমের ক্ষেতের হরিৎ শোভা দেখিলে

রুক্মিণী-খালের বাঁধ

চোখ জুড়ায়। রুক্মিণীর খালে বাঁধ দিয়াছেন "রুক্মিণী খাল জলসরবরাহ সমবায় সমিতি লিমিটেড্"।

তাহার পর পাঁচমুড়া গ্রামের নিকটবর্ত্তী আমঝোড় নামক ক্ষুদ্র নদীর উপর পাকা পাথরের বাঁধ দেখিতে যাই। এই বাঁধ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন পাঁচমুড়ার "গুরুসদয় জল সরবরাহ সমবায় সমিতি লিমিটেড্"। ইহার বিস্তৃত কৃত্রিম জলাশয়ের পরিষ্কার গভীর নীল জলরাশি দেখিয়া সেই শীতের দিনেও স্নান করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। অনেক জলচর পাখীও সেখানে দেখিলাম। বাঁধের উপর দিয়া অতিরিক্ত জল উপ্‌চিয়া স্রোতের আকারে পড়িতেছে।

এই দুই জায়গার বাঁধের কয়েকটি ফোটোগ্রাফ হইতে ছবি প্রস্তুত করাইয়া এখানে দিলাম। তাহা দেখিলে সে সম্বন্ধে পাঠকদের কিছু ধারণা হইবে।

"শালবাঁধ জল-সরবরাহ-সমিতি" হরিণমুড়ি খাল নামক নদী বাঁধিয়া পাঁচ হাজার বিঘা জমিতে জল জোগাইবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহার ব্যয় পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা হইবে অনুমিত হইয়াছে। চৌদ্দখানা গ্রামের লোকে এই বাঁধ দ্বারা উপকৃত হইবে। ইহার কাজ এখনও শেষ হয় নাই।

কেবল বাঁকুড়া জেলার জন্য প্রকাশিত কাগজ ভিন্ন অন্য কাগজে এসকল সমিতির পূরা বৃত্তান্ত দেওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু এই জেলার জল সরবরাহের জন্য যে চেষ্টা হইতেছে, তাহা যে প্রকৃত পথ এবং সমিতিগুলি যে অত্যন্ত ও একান্ত আবশ্যক সাতিশয় হিতকর কাজ করিতেছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সমিতি গঠন করিতে হইলে প্রথমে কয়েক জন লোক সভ্য হন এবং সমবায়-সমিতিবিষয়ক আইন অনুসারে আপনাদিগকে তদ্রূপ সমিতি বলিয়া রেজিষ্টারী করেন। তাহার পর তাঁহারা নিজেরা চাঁদা করিয়া যে টাকা তুলিয়াছেন, তাহা দেখাইয়া কেন্দ্রীয় সমবায়-ব্যাঙ্ক্ হইতে আবশ্যক-মত বাকী টাকা ধার করেন, এবং তাহার সুদ দেন। এইরূপ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক্ একটি বাঁকুড়ায় ও একটি বিষ্ণুপুরে আছে।

এইসকল সমিতি যাহাতে জেলার সর্ব্বত্র স্থাপিত হয়, তাহার চেষ্টা জনসাধারণের ও গবর্ণমেণ্টের করা কর্ত্তব্য। জনসাধারণ নিজেদের কর্ত্তব্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

তালডাংরা রুক্মিণী-খাল—বাঁধ হইতে তালডাংরা গ্রাম পর্য্যন্ত

তাঁহারা জোট বাঁধিয়া স্বাবলম্বন দ্বারা নিজেদের হিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এবং তাহার দ্বারা আত্মশক্তি উপলব্ধি করিতেছেন। চাষের ফল হইতে তিন পক্ষের লোক লাভবান্ হন,—রায়ৎ, জমিদার ও গবর্ণ্মেণ্ট্। রায়ৎরা পরিশ্রম করা ব্যতীত সমিতি গঠন ও তাহার চাঁদা দান দ্বারা নিজেদের কর্ত্তব্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; বাঁকুড়া জেলার অধিকাংশ জমির জমিদার বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ-বংশ এ-পর্য্যন্ত কোটির অধিক টাকা বাঁকুড়া হইতে পাইয়াছেন, কিন্তু উহার জলসেচনের জন্য আধ পয়সাও খরচ করেন নাই, অন্য জমিদারেরাও কি করিয়াছেন জানি না; গবর্ণ্মেণ্ট্ সামান্য কিছু করিতেছেন। গবর্ণ্মেণ্ট্‌কে দেশের লোকে কোথাও কিছু করিতে বলিলে গবর্ণ্মেণ্ট্ তাহাদিগকে প্রায়ই আত্মনির্ভর স্বাবলম্বন প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ দিয়া ক্ষান্ত হন। কিন্তু গত জানুয়ারী মাসে লাট লিটন বাঁকুড়া দেখিয়া আসিবার পর তথাকার ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত ব্রজদুর্লভ হাজরা মহাশয়কে চিঠি লিখিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, যে, জলসরবরাহ-সমবায়-সমিতির কাজগুলি খুবই উৎসাহজনক। "এই-সকল সমিতির সভ্যেরা দেখাইয়াছেন, যে, দরিদ্র জনসমষ্টি দ্বারাও কিপ্রকারে ধন উৎপন্ন হইতে পারে, এবং আমি আশা করি, যে তাহাদের দৃষ্টান্ত ব্যাপকভাবে অনুসৃত হইবে। আমি পূর্ব্বে কোন কোন উপলক্ষ্যে বলিয়াছি, যে, স্থানীয় লোকেরা যে পরিমাণ চেষ্টা করে, গবর্ণ্মেণ্টের সাহায্য সেই অনুপাতে হওয়া উচিত; এই নীতি অনুসারে বাঁকুড়ার লোকেরা গবর্ণ্মেণ্ট্-সাহায্যের উপর বলবৎ দাবী স্থাপন করিয়াছেন। আমি এই প্রশংসনীয় চেষ্টা ভুলিব না, এবং দেখিব, যে, ইহা যথাযোগ্য উৎসাহ লাভ করে।"

গবর্ণ্মেণ্ট একজন সুযোগ্য কৃষি ও জলসেচন এঞ্জিনীয়ার এবং তাঁহার অধীনে একজন সার্ভেয়ার নিযুক্ত করিয়াছেন বটে। কিন্তু আরও অনেক কর্ম্মচারী ও টাকা চাই। গ্রামে গ্রামে গিয়া সমিতি গঠন করিতে লোকদিগের প্রবৃত্তি উৎপাদন ও তাহাদের দ্বারা সমিতি গঠন করান দরকার। তাহার জন্য অনেক লোক চাই। যতগুলি ছোট নদীতে সম্বৎসর জল বহে, তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান জরিপ করিয়া বাঁধের নক্সা-আদি প্রস্তুত করিবার জন্য আরো সার্ভেয়ার চাই। তা ছাড়া, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলি যাহাতে সমবায় সমিতিগুলিকে ঋণ দিবার জন্য যথেষ্ট টাকা পায়, তাহার বন্দোবস্তও চাই। বাঁকুড়ার অধিবাসী বা বাঁকুড়ার স্থাবরসম্পত্তির মালিক যে-কেহ এই ব্যাঙ্কের অংশীদার হইতে পারেন। প্রথম বৎসর বাঁকুড়ার ব্যাঙ্ক্ শতকরা ৭॥০ মুনফা দিয়াছেন শুনিয়াছি।

গত দশবৎসরে বাঁকুড়ার দুইবার দুর্ভিক্ষে সরকারকে সাড়ে তের লক্ষ টাকা খরচ করিতে হইয়াছে। ইহা কেবল অন্নদান-আদির ব্যয়। এ-টাকা আর সরকারী তহবিলে ফিরিয়া আসিবে না। তা ছাড়া দুবারে ষোল লক্ষ টাকা কৃষিঋণ দিতে হইয়াছে। ঋণের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা কেবল দানের টাকাটার বিষয়েই কিছু বলিতেছি। কয়েক বৎসর অন্তর দুর্ভিক্ষ বাঁকুড়ায় প্রায়ই হয়। তাহা নিবারণের জন্য দুইবারে সরকারী তহবিল হইতে যে সাড়ে তের লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছে, তাহার একটি পয়সাও ফিরিয়া আসিবে না। কিন্তু যদি ঐ সাড়ে তের লক্ষ বা দশ লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কে মজুদ রাখিলে তাহার যত সুদ হইত, বৎসর বৎসর সেই পরিমাণ টাকা জলসরবরাহ-সমিতি স্থাপন ও তাহাদের সাহায্যার্থ গবর্ণ্মেণ্ট্ ব্যয় করেন, তাহা হইলে মূলধনটাও বজায় থাকে, এবং বাঁকুড়া জেলায় দুর্ভিক্ষও আর হয় না। লর্ড্ লিটন তাঁহার অঙ্গীকার অনুসারে বাঁকুড়াকে সরকারী সাহায্য দিতে বাধ্য। সাহায্য করিবার যে উপায় আমরা নির্দ্দেশ করিলাম, তাহা তিনি বিবেচনা করিয়া দেখুন।

এখানে একটি অবান্তর কথা বলিতে হইবে। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে অনেক লোক গবর্ণ্মেণ্টের সহিত কোন সংস্রব রাখার বিরোধী। বাঁকুড়া জেলায় যেসব জলসরবরাহ-সমিতি হইতেছে, তাহা গবর্ণ্মেণ্টের আইন অনুসারে রেজিষ্টারী হইতেছে, এবং সরকারী এঞ্জিনীয়ার সার্ভেয়ার প্রভৃতির পরামর্শাদিও তাহারা পাইতেছে। তথাপি আমার বিশ্বাস এই, যে, এই জেলার কংগ্রেস্-কর্ম্মীদের এইসব কমিটি গঠনে লোককে সাহায্য দেওয়া ও উৎসাহিত করা উচিত। শুনিয়াছি জেলার অসহযোগ-নেতা অধ্যাপক অনিলবরণ
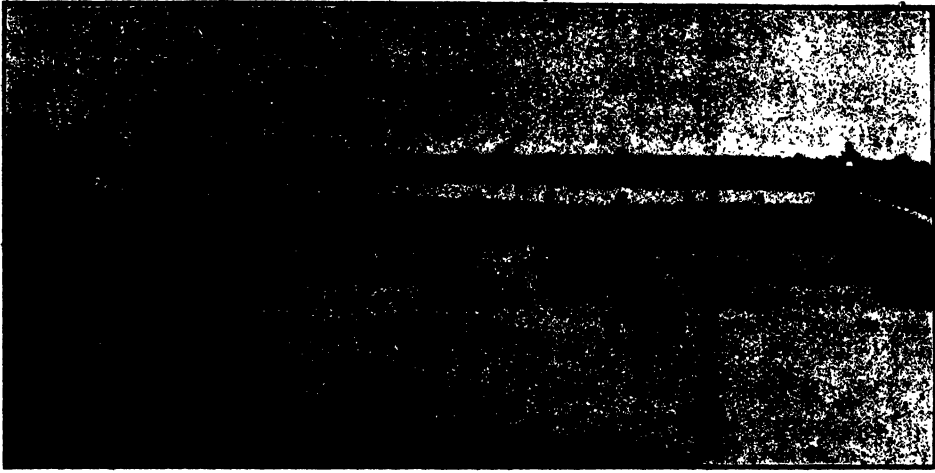
বাঁকুড়া-জেলার একটি বাঁধের লক্‌-গেট বা আটক-কপাট উপ্‌চাইয়া জল-প্রবাহ

রায় সমিতিগুলির বিরোধী নহেন। তাঁহার মত ত্যাগী ও বিবেচক লোকের বিরোধী না হইবারই কথা।

গবর্ণ্‌মেণ্টের সম্পূর্ণ সংস্রব ত্যাগ এ-পর্য্যন্ত কোন অসহযোগী করিতে পারেন নাই। সকলকেই গবর্ণ্‌মেণ্টের ডাক ও টেলিগ্রাফ বিভাগের সাহায্য লইতে হয়, সর্‌কারী রেলগাড়ীতে যাতায়াতও সকলেই করেন। ইহাতে কোন অপমান নাই, দাস্যও নাই। কারণ আমরা, ব্যবসার নিয়ম অনুসারে, যে যে সুবিধা পাই তাহার মূল্য-স্বরূপ মাশুল দিয়া থাকি। সমবায়-সমিতিগুলিও রেজিষ্টারী করিবার ফী দেন, ব্যাঙ্ক্‌ হইতে যে টাকা ঋণ গ্রহণ করেন তাহার সুদ দেন, সর্‌কারী কৃষি এঞ্জিনীয়ার প্রভৃতির বেতন জনসাধারণের প্রদত্ত ট্যাক্স হইতেই দেওয়া হয়।

অন্য সমুদয় খবরের কাগজের মত মহাত্মা গান্ধীর ইয়ং ইণ্ডিয়া কাগজ, শ্যামসুন্দর-বাবুর সার্ভেণ্ট্‌, অনিল-বরণ-বাবুর সারথি, চিত্তরঞ্জন বাবুর ফর্‌ওয়ার্ড্‌, প্রভৃতি অসহযোগী কাগজ আইন অনুসারে রেজিষ্টারী করা হইয়াছে বলিয়া কম ডাকমাশুলে যায়। সার্ভেণ্ট্‌ ও ফর্‌ওয়ার্ডের কোম্পানী দুটিও গবর্ণ্‌মেণ্টের আইন অনুসারে রেজিষ্টারী করা। অতএব, আশা করি লোকে দুর্ভিক্ষের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যে জলসর্‌বরাহ সমিতি করিতেছে, তাহাতে কংগ্রেস্‌-নেতাদের আপত্তি বা অমত হইবে না; বরং তাহাতে তাঁহারা উৎসাহই দিবেন।

যদি সম্পূর্ণ বেসর্‌কারীভাবে জল জোগাইবার কোন বন্দোবস্ত কেহ করিতে পারেন, তাহা ত খুবই ভাল। কিন্তু এ-জেলায় যাহা হইতেছে, তাহাতে বাস্তবিক লোকদের আত্মশক্তির বিকাশ হইতেছে। একটু আইনের সংস্রব আছে বলিয়া যদি কেহ আপত্তি করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সকলরকমে সর্‌কারী ডাক টেলিগ্রাফ রেল রেজিষ্টারী প্রভৃতি বিভাগের সহিত সংস্রব আগে ছাড়িতে হয়। কিন্তু তাহা করিবার প্রয়োজন নাই; অধিকন্তু তাহা দুঃসাধ্য। আমার মতে, আমরা সকলেই যেমন আবশ্যক-মত সর্‌কারী ডাক টেলিগ্রাফ রেল ও রেজিষ্টারী বিভাগকে আমাদের কাজে লাগাই, তেম্‌নি বাঁকুড়াবাসী আমাদিগকে সর্‌কারী সমবায় কৃষি শিল্প বিভাগগুলিকেও কাজে লাগাইতে হইবে। জল সর্‌বরাহ জীবন-মরণের ব্যাপার। আত্মসম্মান রক্ষা করা আবার প্রাণরক্ষা করা অপেক্ষাও আবশ্যক। বাঁকুড়াবাসীকে দুই চারি বৎসর অন্তর দুর্ভিক্ষ-গ্রস্ত হইয়া বাহিরের লোকের নিকট হইতে ভিক্ষা চাহিয়া প্রাণ বাঁচাইতে হয়। এই অপমান ও লজ্জা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য জল-সর্‌বরাহ-সমবায়-সমিতি গঠন সর্ব্বতো-ভাবে কর্ত্তব্য। তাহা দ্বারা চাষের জল ও পানীয় জল উভয়ের বন্দোবস্ত হইবে। চাষ হইতে ধন হইবে। তাহার দ্বারা শিক্ষালাভ, স্বাস্থ্যলাভ, ও অন্য নানাবিধ উন্নতির সুবিধা হইবে।

জল সরবরাহ-ছাড়া এই জেলার কল্যাণের জন্য আরও অনেক-কিছু করিতে হইবে; কিন্তু জল সরবরাহ করা চাই-ই চাই। ইহা একান্ত প্রয়োজনীয়।

গৌরবজনক মৃত্যুও পৃথিবীতে অনেকের হয়। কিন্তু দশ বৎসরে বাঁকুড়ায় যে এক লাখের উপর লোক কমিয়াছে, ইহাতে কোন গৌরব নাই। যাহাতে লোকে অনশনে ও নিবার্য্য ব্যাধিতে না মরে, তাহার চেষ্টা, আমরা যে যতটুকু পারি, করা সকলের কর্ত্তব্য। গ্রামের মায়েরা একক্রোশ দুইক্রোশ তিনক্রোশ পথ ভীষণ রৌদ্রে হাঁটিয়া এক এক কলসী জল কাদা হইতে নিষ্কাশনের চেষ্টা করিতে থাকিবে, দুর্ভিক্ষে ও নানা রোগে হাজার হাজার লোক মরিবে, অথচ আমরা আলস্যে কালযাপন করিব, ইহা ঠিক নয়। সেইজন্য আমরা মনে করি, জলসরবরাহ-সমবায়-সমিতি গঠনে সাহায্য করা সহযোগী অসহযোগী সরকারী বেসরকারী সব লোকেরই কর্ত্তব্য।

অনেক জায়গায় পুষ্করিণী, দীঘি, বাঁধ বা খালে বাঁধ দিয়া নির্ম্মিত কৃত্রিম হ্রদ হইতে সহজে জল সেচনের উপায় না হইতে পারে। কূপ হইতে বা অন্য নিম্ন স্থান হইতে উঁচু জায়গায় জল তুলিবার জন্য পাম্প্ বা দমকল ব্যবহারের আবশ্যক হইতে পারে। বাঁকুড়ানিবাসী অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের উদ্ভাবিত একটি পাম্প্ দ্বারা তাঁহার বাড়ীর কুয়া হইতে একজন কামিন্ (মজুরাণী) স্বচ্ছন্দে জল তুলিতেছে, গত বৎসর মাঘ মাসে দেখিয়া আসিয়াছি। কামিন্ তিন চারি ঘণ্টা জল তুলিলেও ক্লান্ত হয় না। যোগেশ-বাবুর ঘরকন্নার জল, বাগানের জল, তাঁহার পুত্রের পটারির জল, সব এই পাম্প দ্বারা তোলা হয়। পেটেণ্ট্ লওয়া হইয়া গেলে ইহা তিনি প্রস্তুত করাইয়া অল্প মূল্যে বিক্রী করিতে পারিবেন।

পণ্য শিল্প

চাষ এই জেলার লোকদের প্রধান উপজীব্য এবং চাষের উন্নতি ও বিস্তৃতি খুব হইতে পারে। তথাপি শুধু চাষের দ্বারা ইহার অধিবাসীদের যথেষ্ট ধনাগম ও উন্নতি হইবে না, এবং শুধু চাষেই সমস্ত বৎসর নিয়মিত পরিশ্রম করিবার অভ্যাস জন্মিবে না। ধনই সব-কিছু নহে। আলস্য ত্যাগ করিয়া পরিশ্রমে অভ্যস্ত হওয়া মনুষ্যত্বলাভের প্রধান উপায়। শ্রমশীলতা ব্যতিরেকে সদ্‌গুণশালী হওয়া যায় না। অতএব শুধু ধনের জন্য নহে, মানুষ হইবার জন্যও সমস্ত বৎসর নিয়মিত শ্রম করিবার মত কাজ চাই। এইরূপ কাজ, চাষ ও পণ্য-দ্রব্য উৎপাদন, উভয়প্রকার বৃত্তি অবলম্বন দ্বারা পাওয়া যাইবে।

মনুষ্যত্বের কথা যখন উঠিয়াছে, তখন এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখি, যে, সচ্চরিত্র না হইলে, কৃষি, শিল্প, বা অন্য যে-কোন বৃত্তিই অবলম্বন করা যাক্ না, তাহাতে উন্নতি করা যায় না। কখন্ কোন্ জিনিষটি প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইবে প্রভৃতি বিষয়ে নিজের কথা রাখা, ঠিক্ সময়ে কাজে উপস্থিত হওয়া, এবং বিনা তত্ত্বাবধানেও নির্দ্দিষ্ট কাল মন দিয়া কাজ করা, একটা কাজ হাতে লইয়া দু-একদিন কাজ করিয়া তাহার পর বহু দিন অদৃশ্য না হইয়া যাওয়া, জিনিষের দাম ও উৎকর্ষ সম্বন্ধে ক্রেতাকে না ঠকান, এইসমস্ত গুণ সচ্চরিত্র লোকের থাকে। এই-সব বিষয়ে বাংলার অন্যান্য স্থানের কারিগর ও শ্রমিকদের মত বাঁকুড়া জেলার কারিগর ও শ্রমিকদেরও অখ্যাতি আছে। বেশী আছে কি কম আছে, তাহার বিচার করা কঠিন, তাহা করিয়া কোন লাভও নাই। দোষগুলি দূর করাই আসল কাজ। তাহা সুদৃষ্টান্ত ও সুশিক্ষা ভিন্ন হইবে না। দুঃখের বিষয়, আমরা শিক্ষিত ব্যক্তিরাও অনেক স্থলে এইরূপ দোষে দোষী। সুতরাং আমরা যদি অন্যকে শিক্ষা দিতে চাই, তাহা হইলে আমাদিগকে নিজেই আগে ভাল হইতে হইবে।

ব্যভিচার, মাত্‌লামি প্রভৃতি গুরুতর দোষ যে দূর করিতে হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

অন্যান্য জেলার মত এই জেলায় খনিজ প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ কি কি জিনিষ পাওয়া যায়, এবং তাহার কোন্‌গুলি মানুষের কাজে লাগে বা লাগিতে পারে, তাহার একটি বিবরণ সংগৃহীত ও প্রকাশিত হওয়া উচিত। তাহার পর দেখিতে হইবে, কোন্ কোন্ জাতের লোকের আগে কি কি কৌলিক কাজ ছিল, এখন কি কি আছে, ও কি পরিমাণে আছে। কৌলিক কাজ কাহাদের সম্পূর্ণ বা

বাঁকুড়া জেলার একটি বাঁধের লক্-গেট বা আটক-কপাট

কতক গিয়াছে, তাহার বৃত্তান্ত এবং সেই কারণে তাহাদের সংখ্যা হ্রাস হইতেছে কি না, তাহার বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে হইবে। যাহাদের কৌলিক কাজ একেবারে বা কতক গিয়াছে, তাহাদিগকে পুনরায় সেই কাজে লাগান যায় কি না, নতুবা নূতন কি কাজ দেওয়া যায়, তাহা বিবেচনা করিতে হইবে।

এই-সকল অনুসন্ধান ও তত্ত্বনির্ণয়ের সুবিধা গবর্ণ্‌মেণ্টের যেমন আছে, অন্য কাহারও তেমন নাই। কিন্তু গবর্ণ্‌মেণ্টের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। জেলার কংগ্রেস-কর্ম্মীরা এই কাজটির ভার লইলে খুব ভাল হয়। বাঁকুড়া-সম্মিলনীও এই কাজটি করিলে তাহার কর্ত্তব্যই করা হইবে। আমরা যে-সব বিষয় সম্বন্ধে লিখিতেছি, সেই সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান আহরণ ও বিস্তার এবং তদ্বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য জেলার একটি মাসিক কাগজ থাকা উচিত। ত্রৈমাসিক "বাঁকুড়া-লক্ষ্মী" আছে বটে, এবং ইহাতে বেশ দরকারী লেখাও বাহির হয়। কিন্তু ইহা নিয়মিতরূপে বাহির হয় না। একটি মাসিক কাগজ বাহির হওয়া উচিত এবং তাহা বাঁকুড়া-সম্মিলনী বাহির করিলেই ভাল হয়।

বাঁকুড়ায় যে যে পণ্যশিল্প আগে প্রচলিত ছিল বা এখনও আছে, তাহার উল্লেখমাত্র করিতেছি, বিস্তারিত বৃত্তান্ত দিবার স্থান হইবে না। আগে কাপাসের চাষ ও চর্কায় সূতা কাটা খুব প্রচলিত ছিল। এখনও অল্প পরিমাণে আছে, কিন্তু তাঁতিরা প্রায়ই কলের সূতায় কাপড় বুনিয়া থাকে। তাহাতে তন্তুবায়জাতীয় সকলের না হউক, অনেকের অন্নসংস্থান হয়। নানাবিধ পণ্যশিল্প সম্বন্ধে আমরা কতকগুলি সংবাদ "বাঁকুড়া-লক্ষ্মী" হইতে সংকলন করিয়া দিতেছি।

এই জেলায় পূর্ব্বে রেশমী সূতা হইতে গরদ তসর ইত্যাদি নানা জাতীয় রেশমী বস্ত্র বহু পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া দেশবিদেশে চালান হইত; বিষ্ণুপুর অঞ্চলের তাঁতিরা এই শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। বাঁকুড়ার অন্তঃপাতী গোপীনাথপুর, রাজগ্রাম, বিরসিংপুর প্রভৃতি গ্রামের ও বড়জোড়া সোণামুখী প্রভৃতি অঞ্চলের তাঁতিরাও রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত করে। জেলার স্থানে স্থানে গুটিপোকার চাষও আছে—তুঁতিয়া নামক এক শ্রেণীর মুসলমান এই কাজ করে। তাহাদের অবস্থা বড়ই হীন। মুর্শিদাবাদ মালদহ ইত্যাদি জেলা হইতে তাহারা বীজ আনে, কিন্তু আগের মত ফসল হয় না। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায় তাহারা শিখে নাই এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীর মত ইহারাও মহাজনের অত্যাচার ভোগ করে।

এখানকার কাঁসা-পিতলের বাসন প্রসিদ্ধ। বাহ্য চাকচিক্যে খাগড়াই বাসনের সমকক্ষ না হইলেও অন্যান্য জেলায় ইহার যথেষ্ট আদর আছে ও প্রতিবৎসর এই জেলার কারিকরের প্রস্তুত বহু সহস্র টাকার বাসন বাঁকুড়ার বাহিরে রপ্তানী হয়। ইহাদের উন্নতি সাধন করা প্রয়োজন।

বাঁকুড়া সহরে ও সন্নিকটবর্ত্তী কয়েকটি গ্রামে ভাল জুতা প্রস্তুত হয়। ইহারা কলিকাতার বা বিলাতের প্রস্তুত চামড়া লইয়া কাজ করে। ইহা ছাড়া মফঃস্বলে অনেক মুচি নিজেদের গ্রাম্য প্রণালীতে চামড়া "কস্" করিয়া ব্যবহার করে। চামড়া প্রস্তুত করিবার উপযোগী অধিকাংশ পদার্থই বাঁকুড়ার জঙ্গলে সুলভ, সুতরাং এখানে চেষ্টা করিলে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চামড়া কস্ করিবার উপায় অতি সহজেই প্রচলিত হইতে পারে।

বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত শাসপুরের তৈয়ারী ছুরি কাঁচি ক্ষুর প্রভৃতি ইস্পাত দ্রব্যের নামও উল্লেখযোগ্য। বাংলা দেশের মধ্যে শাসপুরের ছুরি কাঁচি বহুদিন হইতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

১৯২২ সালে বাঁকুড়ায় যে স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহাতে

"জেলায় প্রস্তুত শঙ্খনির্ম্মিত নানাবিধ সৌখীন দ্রব্য, পিত্তল-কাঁসা-নির্ম্মিত বিবিধ বাসন, এবং লাহা ও রেশম শিল্প দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হইয়াছিল। বাঁকুড়া জেলা কো-অপারেটিভ্ ইন্ডাষ্ট্রীয়াল ইউনিয়ান হইতে এখানে তাঁতিগণের তৈয়ারী নানাপ্রকারের চাদর গামছা ঝাড়ন সরু ও মোটা ধুতি সাড়ি, জামার ছিট, টুইল, তোয়ালে প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি ও স্থানীয় কুম্ভকারগণের তৈয়ারী মাটীর নানাবিধ জিনিষ দেখিয়া দর্শকমাত্রেই প্রশংসা করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরের রেশম ও পট্টবস্ত্রের উল্লেখ বাহুল্যমাত্র। কারণ ইহা চিরপ্রসিদ্ধ। কিন্তু তথাকার বাবু রামসর্ব্ব ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কাষ্ঠশিল্পদ্রব্যাদি দেখিয়া দর্শকগণ প্রকৃতই আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। ঐ-সকল শিল্পদ্রব্য বিখ্যাত বিলাতী কাষ্ঠ শিল্পাপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে।"

নানা রকম শিল্পের উন্নতির জন্য চেষ্টা এই জেলায় কিয়ৎপরিমাণে হইয়াছে। মুচিদিগকে আধুনিক প্রণালীতে চামড়া পরিষ্কার ও কষ্ করিতে শিখাইবার চেষ্টা হইতেছে। ইহা স্থায়ীভাবে হওয়া উচিত।

এখানকার লালবাজার ও নূতনচটীর মুচিরা কেহ কেহ এই কষায় প্রণালী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা হইতে প্রয়োজনীয় মসলা আনাইয়া চামড়া কষায় করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং কেহ বা সুটকেস, মণিব্যাগ তৈয়ারী করিয়াছে। গঙ্গাজলঘাটী, কোতলপুর, শিরোমণিপুর থানার কয়েকজন মুচি প্রথম হইতে সর্ব্বদা এখানে থাকিয়া অতীব আগ্রহ এবং যত্ন সহকারে এই কাজ শিক্ষা করিয়াছে। খৃষ্টিয়ান গ্রামের দুজন ভদ্রলোক এই শিক্ষাদানের ফলে অতিশয় উপকার পাইয়াছেন। তাঁহারা নিজ হাতে ক্রোম্ চামড়া তৈয়ারী করিতেছেন এবং মেশিনের অনুকরণে একটি পালিশ করার যন্ত্র ও একটি রোলার যন্ত্র কাঠ দ্বারা তৈয়ার করিয়াছেন। এই শিল্প শিক্ষা করিয়া এবং নিজ হাতে চামড়া কষায় করিয়া তাঁহারা বুঝিয়াছেন, যে, তাহাতে তাঁহাদের উন্নতি হইতে পারে।

এই জেলায় কাঁচা চামড়া অনেক পাওয়া যায়, এবং কষ্ করিবার জন্য শাল অর্জ্জুন ও আসন গাছের ছাল এবং হরিতকীও প্রচুর পাওয়া যায়। সুতরাং চামড়া কষ্ করিবার এবং চামড়ার জিনিষ প্রস্তুত করিবার ব্যবসা এখানে খুব চলিতে পারে।

রেশম চাষ বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর মিঃ প্রভাতচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির হইয়াছে, যে ওন্দা গ্রামের নিকট ২০ বিঘা জমি গ্রহণ করিয়া রেশম-কীট জনন ও পালন করা হইবে। ইহাতে বাঁকুড়ার রেশমপ্রস্তুতকারীগণের যে প্রভূত উপকার সাধিত হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পুনিসোল, চিঙানি ও মোড়ার গ্রামে রেশম শিল্পের প্রবর্ত্তন ও উন্নতির চেষ্টা হইতেছে।

এই জেলায় অনেক তাল-গাছ আছে। তাহার রস হইতে গুড় চিনি ও মিছরী প্রস্তুত হইতে পারে।

ঘর ছাইবার জন্য রাণীগঞ্জের টালির কথা অনেকেই জানেন। ঐরূপ টালি বাঁকুড়া পটারিতে প্রস্তুত হইতেছে। অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার রায়, এম্-এস্‌সী, ইহার কর্ত্তা। আমরা এই পটারি ও তাহাতে প্রস্তুত টালি এবং জল নিঃসারণের নল মুরি প্রভৃতি দেখিয়াছি; প্রস্তুত করিবার প্রণালীও দেখিয়াছি। আমাদের বিবেচনায় জিনিষগুলি ভালই হইতেছে। প্রতিবৎসরই গ্রীষ্মকালে কোন না কোন গ্রামে আগুন লাগার সংবাদ পাওয়া যায়, তাহাতে কখন কখন পাড়াকে-পাড়া পুড়িয়া যায়। খড়ের চালে আগুন লাগার ভয় সর্ব্বদাই থাকে। তা ছাড়া আজকাল খড়, বাঁশ, দড়ি, ঝাঁটি, সবই আক্রা হইয়াছে, মজুরের বেতনও বাড়িয়াছে। টিনের বা "করগেটের" চাল কেহ কেহ করে বটে; তাহাতে ঘর ভয়ানক গরম ও অস্বাস্থ্যকর হয়। এ অবস্থায় টালির ব্যবহার সুবিধাজনক এই

শিল্পটির দ্বারা বহুলোক প্রতিপালিত এবং শিক্ষিত হইবে।

১৯২১ সালের সেন্সস্ অনুসারে এ-জেলায় কয়লার খনির সংখ্যা দুটি; তাহাতে মোট ৫৩ জন লোক কাজ করে। সুতরাং খনি দুটি ছোট। এ-জেলায় অন্যান্য খনিজদ্রব্যও আছে, কিন্তু তাহা কাজে লাগাইবার কোন আয়োজনের উল্লেখ নাই। ছুতারের কারখানা ১টি, পিতলের বাসনের কারখানা ২টি, চাল প্রস্তুত করিবার কল ২টি প্রভৃতির উল্লেখ আছে। সব রকম কারখানায় মোট ৪৫১ জন পুরুষ ও স্ত্রীলোক কাজ করে। ইহা খুব কম।

নিজের নিজের সহরে বা গ্রামে থাকিয়াই যাহাতে অধিকাংশ লোক কোন না কোন শিল্পের কাজ করিতে পারে, এরূপ বন্দোবস্তই প্রার্থনীয়।

"বিষ্ণুপুর শিল্পবিদ্যালয়"।

আধুনিক উন্নত প্রণালীতে কোন কোন রকমের শিল্প নিয়মিতরূপে শিখাইবার চেষ্টা "বিষ্ণুপুর শিল্পবিদ্যালয়ে" হইতেছে।

বর্ত্তমানে এই বিদ্যালয়ে সাধারণ এবং উচ্চ অঙ্গের বয়ন, তুলার সুতা ও রেশমীসুতা রং-এর এবং সূত্রধরের কার্য্যে দেশীয় এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির সাহায্যে উন্নত প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়। শীঘ্রই লোহার, পিতলের ও টিনের কারখানা খোলা হইবে। সেখানেও উপযুক্ত প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে। নিরক্ষর ছুতার তন্তুবায় ও অন্যান্য শিক্ষিত অশিক্ষিত ভদ্রলোক ছাত্র—এই দুই শ্রেণীর ছাত্রই ভর্ত্তি করা হয়। নিরক্ষর ছাত্রদিগকে কার্য্যোপযোগী বাঙ্গালা লেখাপড়া ও অঙ্ক শিখাইয়া লওয়া হয়। স্কুলে প্রতি বিভাগে এক বৎসর কার্য্য শিক্ষা করিতে হইবে। কোন ছাত্র ইচ্ছা করিলে এক বিভাগের কার্য্য শেষ করিয়া অন্য বিভাগে ভর্ত্তি হইতে পারে। স্কুলে বর্ত্তমানে কোন মাসিক বেতন দিতে হয় না। তবে ভর্ত্তি হইবার সময় "কশন্ ফি" বাবত ৫৲ টাকা জমা দিতে হয়। স্কুলের কার্য্য শেষ হইলে ছাত্র এই টাকা ফেরৎ পাইবেন। স্কুলের সন্নিকটেই ছাত্রাবাস আছে। ছাত্রাবাসে থাকিবার কোন ভাড়া দিতে হয় না। অন্য খরচ মাসিক ৮৲ আট টাকা মাত্র। স্কুলের শিক্ষক ছাত্রাবাসে থাকেন। ছেলেদের তত্ত্বাবধানের বেশ সুবন্দোবস্ত আছে। স্কুলের ছাত্রেরা যে-সব জিনিষ তৈয়ার করিবেন, তাহার আবশ্যক দ্রব্যাদি স্কুল হইতে দেওয়া হয়। জিনিষ বিক্রয় হইলে ছাত্র লভ্যাংশের দুই-তৃতীয়াংশ এবং স্কুল-কমিটি একতৃতীয়াংশ পাইবেন। যতদূর দেখা যায় পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী ছাত্র দুই মাসের পরেই নিজের খাই-খরচ নিজেই রোজগার করিতে সক্ষম

বিষ্ণুপুর টেক্‌নিক্যাল্ স্কুলের কয়েকজন শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তি

বিষ্ণুপুর টেক্‌নিক্যাল্ স্কুলের রন্ধনশালা ও বাংলা পড়ানোর ঘর। বামে—আপিস ও গ্রন্থাগার: দক্ষিণে—ছাত্রাবাস।

হন। মোট ২০৲ টাকা খরচ করিয়া এখানে এক বৎসর কার্য্য শিক্ষা করিলে প্রত্যেক ছাত্রই অনায়াসে স্বাধীনভাবে তাঁহার জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারিবেন, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বর্ত্তমানে এই বিদ্যালয়ে ভিন্ন জেলার ছাত্রসংখ্যাই বেশী। এই বিদ্যালয়ে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি সুলভ মূল্যে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়:—ধুতি, গামছা, তোয়ালে, মশারির ফিতা, বিছানার চাদর, লেপের ওয়াড়, কোটের ও শার্টের কাপড়, গরদের থান ইত্যাদি; টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ, আল্‌মারী, খড়ম, দেরাজআলী, ফটোফ্রেম্, কপাট, চৌকাট, বাক্স ইত্যাদি।

এই শিল্পবিদ্যালয় আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। ইহা বেশ উঁচু, খোলা ও স্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থিত। ছাত্রদের শিক্ষার ও বাসের বন্দোবস্ত ভাল। নানা-প্রকার সুন্দর তোয়ালে, সূতি ও রেশমী কাপড়, কাঠের নানাবিধ আস্‌বাব বিক্রীর জন্য রহিয়াছে দেখিলাম। নিকটস্থ বনের নানাপ্রকার কাঠ কাজে লাগাইবার চেষ্টা হইতেছে দেখিলাম। লাল পদ্মের মত রং একরকম কাঠ আমার বেশ ভাল লাগিয়াছিল। বিষ্ণুপুরের মত ছোট একটি সহরের লোকেরা ইহার জন্য থোক পঁচিশ হাজার টাকা দিয়াছিলেন, এবং এখনও অনেক টাকা মাসিক চাঁদা দেন। ইহা প্রশংসার কথা। আরও অনেক টাকার দরকার। অন্য জেলার ছাত্রই এখানে বেশী। সুতরাং বঙ্গের সকল জায়গা হইতে এই বিদ্যালয়টির সাহায্য পাইবার ন্যায্য দাবী আছে। বর্দ্ধমান রাজবংশ বিষ্ণুপুরের রাজবংশের বহুবিস্তৃত জমিদারীর এখন মালিক। মহারাজাধিরাজ এই বিদ্যালয়কে এককালীন একলক্ষ টাকা, এবং মাসিক ৫০০ টাকা দিলে যথোপযুক্ত কাজ হয়। ইহার মাসিক খরচ ২৮৫ টাকা হয়। তাহার মধ্যে ১৩৫ টাকা সর্ব্বসাধারণকে চাঁদা দ্বারা তুলিতে হয়। অন্যান্য বৃত্তান্ত মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও শিল্পবিদ্যালয়ের প্রধান উদ্যোক্তা ও সভাপতি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল ঘোষের নিকট প্রাপ্তব্য।

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা

ম্যালেরিয়া ও কুষ্ঠরোগের প্রাদুর্ভাব এই জেলায় কোন্ কোন্ অংশে কিরূপ, তাহা চৈত্রমাসের প্রবন্ধে বলিয়াছি। ইহার স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য পূর্ত্তকার্য্য কি কি আবশ্যক, তাহা সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগের লোকদের সমস্ত জেলা ঘুরিয়া স্থির করা কর্ত্তব্য, এবং কর্ত্তব্যনির্ণয় হইয়া গেলে তাহা সম্পন্ন করা উচিত। বিষ্ণুপুর মহকুমার সব স্থানেই জল-নিঃসারণের সুবন্দোবস্ত নাই, এবং চাষের জন্য নদীতে বাঁধ দিলেই তাহার দ্বারা ম্যালেরিয়ার সৃষ্টি হইবে, সেন্সস্ রিপোর্টের এই ধরণের মত ঠিক্ নয়। বাঁধ দিয়াও দেশকে স্বাস্থ্যকর রাখিবার এঞ্জিনীয়ারিং ব্যবস্থা হইতে পারে। তদ্ভিন্ন স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রচার এবং জঙ্গল ডোবা আদি পরিষ্কার করণ প্রভৃতি যে-সব কাজ লোকেরা নিজে করিতে পারে, তাহাতে তাহাদিগকে প্রবৃত্ত করান উচিত। জেলার কৃষি ও

বিষ্ণুপুর টেক্‌নিক্যাল স্কুলের সূত্রধরের কাজ শিখিবার শ্রেণীর কার্য্যরত ছাত্রগণ

হিতসাধন সমিতি এবিষয়ে মুদ্রিত উপদেশ কিছু প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু নিরক্ষর দেশে মুদ্রিত উপদেশের কার্য্যকারিতা বেশী নয়। সেইজন্য শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজন বিশেষরূপে অনুভূত হয়। স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রচার সম্বন্ধে কংগ্রেসকর্ম্মীদিগের এবং বাঁকুড়া-সম্মিলনীরও কর্ত্তব্য রহিয়াছে।

ভাল পানীয় জলের অভাবে অনেক পীড়া ও সাধারণতঃ স্বাস্থ্যহানি হয়। চাষের নিমিত্ত জল সরবরাহের যে-সব বন্দোবস্ত হওয়া উচিত এবং ক্রমশঃ হইতেছে, তাহার দ্বারা পানীয় জলের অভাবও দূর হইবে। অবশ্য পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগকে পানীয় জলের পুকুর দূষিত না-করিতে শিখাইতে হইবে।

ম্যালেরিয়া কালাজ্বর ওলাউঠা ইনফ্লুয়েঞ্জা কুষ্ঠ প্রভৃতিতে চিকিৎসার অভাবে বিস্তর লোক মারা যায়। অথচ চিকিৎসার যথেষ্ট বন্দোবস্ত নাই। এই জেলার ৪টি সহর ও ৫৯৯৯টি গ্রামে ১০,১৯,৯৪১ জন মানুষের বাস। ইহা আয়তনে ২৬২৫ বর্গমাইল। এত বড় ভূখণ্ডের এত লক্ষ মানুষের জন্য মোটে দুটি হাঁসপাতাল আছে। দুটিই মিউনিসিপ্যালিটির। তা ছাড়া মেয়েদের জন্য একটি ডাফ্‌রিন্ হাঁসপাতাল, এবং পুলিস কর্ম্মচারীদের জন্য একটি হাঁসপাতাল আছে। সর্ব্বসাধারণকে বিনা মূল্যে ঔষধ দিবার ডিস্পেন্সারী মোট ১৪টি আছে। পুলিস হাঁসপাতাল বাদে অন্য হাঁসপাতাল তিনটিকেও ইহার মধ্যে ধরা হইয়াছে। প্রত্যেক ১৮৮ বর্গমাইলে একটি করিয়া দাতব্য ঔষধালয়! ইহা নিতান্তই অপ্রচুর। মানুষগুন্তি হিসাবে প্রতি ৭২৮৫৩ জন মানুষের জন্য একটি করিয়া দাতব্য ঔষধালয় আছে! দাতব্য ঔষধালয়গুলির ছয়টি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের; বোর্ড আর-একটি খুলিবেন। নফরচন্দ্র কোলে ঔষধালয়টি সম্পূর্ণ বেসরকারী। মালিয়াড়া বেসরকারী ঔষধালয় কিছু সাহায্য পান। বাঁকুড়ার

অধিকাংশের মালিক বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজের এদিকে কোন দানখয়রাৎ নাই।

এই বিস্তৃত ভূখণ্ডে এতগুলি সহর ও গ্রামের দশ লক্ষের উপর লোকদের জন্য চিকিৎসক কত আছে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কবিরাজী চিকিৎসা ও হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা কয় জন করেন, এবং তাঁহারা কিরূপ শিক্ষা পাইয়াছেন, তাহার কোন আনুমানিক তথ্যও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। যাঁহারা এলোপ্যাথী চিকিৎসা করেন, তাঁহাদের সংখ্যা, যে-সব পাস্‌করা কম্পাউণ্ডার চিকিৎসায় কিছু নাম করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও ধরিয়া মোট আনুমানিক ১২০ জন হয়। মেডিকেল কলেজ ও স্কুলের পাস্‌করা ডাক্তারের সংখ্যা আনুমানিক ৭০ হইবে। সংখ্যাগুলি একেবারে নির্ভুল নহে। পুরা ১২০ জন চিকিৎসক ধরিলেও দেখা যায়, যে, প্রতি ৮৫০০ জন লোকের জন্য একজন ডাক্তার আছেন। ইহাতেও ঠিক ধারণা হয় না। কারণ, সহর কয়টি ও বড় গ্রামগুলিতেই চিকিৎসকেরা বেশীর ভাগ থাকেন। বাকী জায়গার লোকেরা দূরত্ব ও দারিদ্র্যবশতঃ চিকিৎসকের সাহায্য পায় না।

চিকিৎসা-বিদ্যালয়

জেলার চিকিৎসকের অভাব দূর করিবার জন্য, বাঁকুড়া-সম্মিলনী কর্ত্তৃক বাঁকুড়া মেডিক্যাল স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। ইহার বিবরণ গত বৎসরের আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যায় দিয়াছি। ইহা সহরের বাহিরে অতিশয় উচ্চ, খোলা, বিস্তৃত, স্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থিত। ছাত্রদের অধ্যাপনাকক্ষ, ছাত্রাবাস, খেলিবার জায়গা, প্রভৃতি উৎকৃষ্ট। আমি যখন গত মাঘ মাসে উহা দেখিতে গিয়াছিলাম, তখন ছাত্রদের সুস্থ বলিষ্ঠ ও উৎসাহপূর্ণ চেহারা দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিলাম। সহর হইতে ইহা এরূপ দূরে, যে, তথাকার চিত্তবিক্ষেপের কোন কারণ এখানে নাই।

শব-ব্যবচ্ছেদের ঘরটি বিদ্যালয় হইতে কিঞ্চিৎ দূরে খোলা মাঠের মধ্যে স্থিত। আমি যখন গিয়াছিলাম, তখন দেখিয়াছিলাম, যে, তিনটি শব তিনটি টেবিলে আছে, ব্যবচ্ছেদ আরম্ভ হইয়াছে, তা ছাড়া আরো অনেক টেবিলে শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ রহিয়াছে।

শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রেরা যাহাতে সাধারণ পীড়ার চিকিৎসা করিতে পারে, কখন্ যোগ্যতর ডাক্তার ডাকা উচিত তাহা স্থির করিতে পারে, স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রচার করিতে ও স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারে, এইরূপ শিক্ষা মেডিক্যাল কলেজের পাস্‌-করা অধ্যাপকেরা এখানে দিয়া থাকেন। স্থানীয় ওয়েস্‌লিয়ান কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ব্রাউন সাহেব ইহার অবৈতনিক তত্ত্বাবধায়ক। তিনি সর্ব্ববিধ জনহিতকর কার্য্যে উৎসাহী। গ্রামে থাকিয়া সন্তুষ্টচিত্তে চিকিৎসা কার্য্যে ব্রতী থাকিতে পারেন, এই-রূপ চিকিৎসক প্রস্তুত করা এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য।

ইহা বাঁকুড়ায় অবস্থিত হইলেও ইতিমধ্যেই কুড়িটি জেলা হইতে ছাত্র আসিয়া ইহাতে ভর্ত্তি হইয়াছে। তাহাদের নাম ও ছাত্রসংখ্যা দিতেছি। বাঁকুড়া ৩৮, মেদিনীপুর ১১, বর্দ্ধমান ৫, বীরভূম ৯, হুগলী ৩, মানভূম

শ্রীযুক্ত ঋষিবর মুখোপাধ্যায়
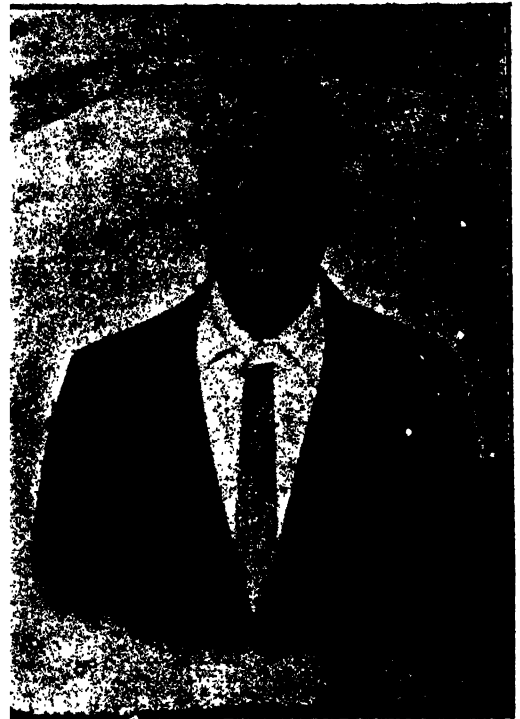
•২, চব্বিশ পরগণা ২, পাবনা ৯, ফরিদপুর ২, ঢাকা ১২, মৈমনসিংহ ১, মুর্শিদাবাদ ৩, রাজশাহী ২, বরিশাল ২, শাহাবাদ ১, চট্টগ্রাম ১, নোয়াখালি ১, ত্রিপুরা ৩, শ্রীহট্ট ৩, জলপাইগুড়ি ১ ;—মোট ২৮৫।

এত দূর দূর স্থান হইতে ছাত্র আসায় বুঝা যাইতেছে, যে, ইহা দেশের একটি অভাব পূর্ণ করিতেছে। অতএব ইহা সকল জেলার লোকদেরই সহানুভূতি ও সাহায্য পাইবার অধিকারী। ইতিমধ্যেই কাশ্মীরের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি কলিকাতানিবাসী শ্রীযুক্ত ঋষিবর মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইহাকে একটি বৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকা ও ছোট ছোট আরও পাকা ঘর এবং দুটি পুকুর, টেনিস্ ফুটবল প্রভৃতি খেলিবার জায়গা, সব্‌জী বাগান, ইত্যাদি সমন্বিত মজ্‌বুত বেড়া দিয়া ঘেরা ৭০ বিঘা জমী দান করিয়াছেন। এই সম্পত্তি তিনি বাঁকুড়ার লোকপুর পল্লীতে নীলকর ইংরেজ কোম্পানীর নিকট হইতে কিনিয়াছিলেন। মেডিক্যাল স্কুলের কাজ অনেক দিন হইতে এইখানে হইতেছিল। দাতার সর্ত্ত অনুসারে বার্ষিক মেরামৎ খরচার জন্য স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ দশহাজার টাকার ওয়ার্ বণ্ড্ ডাক ও টেলিগ্রাফ্ বিভাগের একাউণ্টেণ্ট্ জেনারেলের হস্তে গচ্ছিত রাখায়, এক্ষণে তিনি উহা রেজিষ্টরী করিয়া দান করিয়াছেন। এখন সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে পারে, এ জেলার বৃহত্তম জমিদার বর্দ্ধমানাধিপতি কি দিবেন? বিদ্যালয়টির জন্য আবশ্যক ১০০ শয্যা-বিশিষ্ট হাঁসপাতাল তিনি দিলে আমরা সাতিশয় কৃতজ্ঞ হইব।

কুষ্ঠ

এই জেলায় ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কুষ্ঠরোগের প্রাদুর্ভাব বেশী। ইহাতে এমন গ্রাম আছে, যে, তাহাকে কুষ্ঠীর গ্রাম বলিলেও চলে। অন্ততঃ একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসককে গবর্ণমেণ্ট্ বা ডিষ্ট্রীক্ট্ বোর্ডের পক্ষ হইতে রাখা উচিত, যিনি সমস্ত জেলায় কুষ্ঠের সংক্রামকতা ও তাহা হইতে রক্ষার উপায় বুঝাইয়া দিবেন। ইহা কংগ্রেসকর্ম্মীদের এবং বাঁকুড়া-সম্মিলনীরও কাজ। কুষ্ঠের যে নূতন ইঞ্জেক্‌শন্ চিকিৎসা হইয়াছে, তাহারও প্রচলন খুব দরকার। আমরা যতদূর জানি, এখন বাঁকুড়া সহরের কুষ্ঠাশ্রমে ও হাঁসপাতালে এবং ডাক্তার কার্ত্তিক মিত্রের দ্বারা এই চিকিৎসা হইতে পারে। খৃষ্টিয়ান্ মিশনারী চিকিৎসক ডাক্তার ডেভিড্‌সন্ এই চিকিৎসা করেন। দুঃখের বিষয় বেশী রোগী চিকিৎসা-প্রার্থী নহে।

কুষ্ঠের প্রাদুর্ভাব এই জেলায় কেন এত বেশী, এবং কোন্ কোন্ জাতির মধ্যে কি কারণে বেশী, তাহার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান হওয়া উচিত; ঐ অঞ্চলে একটি চলিত মত আছে, যে, দুশ্চরিত্রতাজনিত ব্যাধি হইতে ইহার উৎপত্তি হয়। এই মত কত দূর সত্য বলিতে পারি না। তদ্ভিন্ন, সংক্রমণ দ্বারা সৎলোকদেরও হইতে পারে। ঐ অঞ্চলে অবনত কোন কোন শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের সহিত কতকগুলা তথাকথিত উচ্চতম শ্রেণীর পুরুষদেরও ব্যভিচার বশতঃ কুৎসিত রোগ বেশী হয়, তাহা তথাকার কোন কোন চিকিৎসককে বলিতে শুনিয়াছি। ইহা সত্যও বটে, যে, অনেক "নিম্ন" ও "উচ্চ" শ্রেণীর লোকদের নীতিজ্ঞান নাই বলিলেই চলে।

রাস্তা ইত্যাদি

এই জেলার রাস্তাগুলির মধ্যে যে-সব রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণ ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ড্ ও পাব্লিক্ ওয়ার্ক্‌স্ বিভাগ করেন, তাহার মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৭৮০ মাইল হইবে। আরও রাস্তা হওয়া উচিত, এবং রাস্তাগুলি সুরক্ষিত হওয়া উচিত। নতুবা চাষ, বাণিজ্য, মানুষের যাতায়াত, চিকিৎসা, শিক্ষা, প্রভৃতি কিছুরই সুবিধা হয় না। কিন্তু ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ডের আয় সামান্য, ১৯২০—২১ সালে মোট ২০০৫৬৭ টাকা ছিল। আয় বাড়া উচিত। রাস্তাগুলির ধারে গাছ থাকা উচিত। আগে যাহা ছিল, তাহাও নির্মূল হইতেছে। মোটের উপর এই জেলায় জালানি কাঠ ও অন্য প্রয়োজনের জন্য সব বন কাটিয়া ফেলায় মহা অনিষ্ট হইতেছে। শোভা ত যাইতেছেই, অধিকন্তু বায়ুর সরসতা হ্রাস ও শুষ্কতা বৃদ্ধি হওয়ায় উত্তাপ বাড়িতেছে, এবং জীবনধারণ অপেক্ষাকৃত কষ্টকর হইতেছে। অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় "বাঁকুড়া-লক্ষ্মীতে" লিখিয়াছেন :—

> একসময়ে বাঁকুড়া জেলা জঙ্গলাবৃত ছিল। কিন্তু অর্থগৃধ্নু মানবের নির্দ্দয় হস্ত কর্ত্তৃক এই জেলা তাহার বৃক্ষসম্পদ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে

এবং সুন্দর বনভূমিগুলি একরূপে কঙ্করময় বা প্রস্তরময় পতিত ভূমিতে অথবা গভীর কর্দ্দমময় স্থানে পরিণত হইয়াছে। বৃহৎ শাল বৃক্ষ প্রায় নাই; আবশ্যক হইলে অন্য জেলা হইতে আনয়ন করিতে হয়। জ্বালানী কাঠ এত মহার্ঘ (বিশেষতঃ এই সহরে) যে ইহার দর কলিকাতা অপেক্ষা কম নহে। এখানের রজকেরা বস্ত্র পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত কাঠের ছাইএর অভাবে সোডা ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছে। ফলে আমাদের বস্ত্রগুলি নষ্ট হইতেছে। গো-মহিষাদির আহার্য্য একেবারে নাই বলিলেই হয়। ইহা অপেক্ষা দুরবস্থার কারণ এই, যে এ জেলায় মৃত্তিকার জল সঞ্চয় করিবার শক্তি লুপ্ত হইয়াছে; অধিকাংশ বৃষ্টির জল গড়াইয়া গিয়া নদীতে প্রবল বন্যার সৃষ্টি করে এবং নদীর নিম্নদেশে বন্যার স্রোতে ধ্বংস-লীলার অবতারণা করে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় বিষয় এই যে ঐরূপ বন্যার সময় প্রতিবৎসর মৃত্তিকার উর্ব্বরা-শক্তিটুকু ধৌত করিয়া লইয়া যায়। কালক্রমে ইহার ফল এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, জল সরবরাহ করিবার জন্য আমাদিগকে অধিক মনোযোগী হইতে হইয়াছে এবং শীঘ্রই হয়ত দেখিতে পাইব যে মৃত্তিকার উর্ব্বরা-শক্তি সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইয়াছে।

রাস্তার ধারে এবং উন্মুক্ত স্থান মাত্রেই যথেষ্ট পরিমাণে গাছ লাগাইলে কিছু প্রতিকার হইতে পারে।

যাঁহারা আমাকে এই প্রবন্ধ রচনায় সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

[এই প্রবন্ধে মুদ্রিত সমুদয় ছবির ফোটোগ্রাফ্ বাঁকুড়ার দে এণ্ড্ সন্স্ কর্ত্তৃক গৃহীত।]

শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

চিত্র-পরিচয়

(১) হীরামন তোতা—একজন অশ্বারোহী বনপথে যাইতে যাইতে গাছের উপর সুন্দর রংচঙা একটি হীরামন তোতা পাখী দেখিতে পাইয়াছে।

(২) শ্রীচৈতন্যদেব ও ঈশ্বর পুরীর সাক্ষাৎ—চৈতন্যদেব গয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া ঈশ্বরপ্রেমে এমন তন্ময় হইয়া উঠেন যে আর ঘরে থাকা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইল। তিনি ঈশ্বর পুরীর প্রেমনিষ্ঠা ও বৈরাগ্যের কথা শুনিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব কাটোয়া নগরে গিয়া ঈশ্বর পুরীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট সন্ন্যাসের দীক্ষা গ্রহণ করেন।

(৩) প্রতীক্ষমানা—একটি রমণী তাঁহার প্রিয়তমের জন্য উৎসুক হইয়া পথ চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে।

(৪) স্মৃতি-পট—একজন ডালাওয়ালী বাঁশের চেঁচাড়ির তৈরি ডালা পাখা বিক্রয় করিতে আনিয়াছে। একটি মা একখানি পাখা তুলিয়া লইয়াছেন—ঠিক এমনি একখানি পাখার সঙ্গে তাঁহার হারানো ছেলের স্মৃতি বিজড়িত হইয়া আছে, হয়ত এইরকম একখানি পাখা তাঁহার ছেলের প্রিয় ছিল, হয়ত এমনি একখানি পাখা দিয়া তাঁহার ছেলের অসুখের সময় তিনি বাতাস করিতেন—তাই এই পাখাখানির বুকে সেই হারানো ছেলের ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে, পাখাখানি তাঁহার স্মৃতিপট হইয়া উঠিয়াছে।

চারু

চিঠিপত্র

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত 'প্রবাসী' সম্পাদক মহাশয় শ্রদ্ধাস্পদেষু—

মৎপ্রণীত "ঘরের কথা ও যুগ-সাহিত্য" নামক পুস্তকের ১৯৯-২০০ পৃষ্ঠায় আমি লিখিয়াছিলাম যে আমার ছোট-কালের লেখা অনেকগুলি কবিতার পাণ্ডুলিপি যাহা আমি কুমিল্লায় ফেলিয়া আসিয়াছিলাম, তাহা আমার অজ্ঞাতসারে শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বেশ্বর গাঙ্গুলী মহাশয়ের পুত্র লইয়া ব্রহ্মদেশে চলিয়া গিয়াছেন।

এখন আমি দেখিতেছি, আমি যাহা জানিয়াছিলাম ও শুনিয়াছিলাম তাহা অমূলক। মদীয় সুহৃৎ বিশ্বেশ্বর-বাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর গাঙ্গুলী মহাশয় এখন "মাইমো"র প্রতিষ্ঠাপন্ন 'এ্যাড্ভোকেট', তথায় তিনি একজন গণ্যমান্য লোক। আমি ভুল-বিশ্বাসে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহাতে তাঁহার ও তৎপরিবারবর্গের মনে অযথা কষ্ট দিয়া পরিতপ্ত হইয়াছি। এইজন্য আমি প্রকাশ্যভাবে এই পত্রে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি এবং বীরেশ্বর-বাবুর ইচ্ছাক্রমে 'প্রবাসী'তে এই পত্রখানি ছাপাইবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করিতেছি। বস্তুতঃ তিনি আমার কোন কবিতার পাণ্ডুলিপি নেন নাই।

"ঘরের কথা ও যুগ-সাহিত্য" পুস্তক হইতে ঐ অংশ তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা শীঘ্রই করিতেছি।

৭, বিশ্বকোষ লেন,
বাগবাজার, কলিকাতা
১৯শে চৈত্র, ১৩৩০ সন।

বিনীত
শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন

বিদেশ

খিলাফৎ—

ধর্ম্মতন্ত্রের প্রভাব হইতে রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিতে না পারিলে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রসমূহের সহিত শক্তির দ্বন্দ্বে আঁটিয়া উঠিতে পারা যাইবে না, ইহা বুঝিতে পারিয়া তুরস্কের বর্ত্তমান ভাগ্যনিয়ন্তাগণ খলিফাকে পদচ্যুত করিয়া খিলাফতের অবসান ঘটাইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে; যাহাতে তুরস্ক-সাম্রাজ্যে কাহারও একাধিপত্য না চলিতে পারে সেজন্ত সভাপতিরও ক্ষমতার অনেক সঙ্কোচ ঘটাইয়া তুরস্ককে প্রকৃত গণতন্ত্রে পরিণত করিবার চেষ্টাও দেখা গিয়াছে। খলিফা দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন; কিন্তু জাতির বদ্ধমূল ধর্ম্ম-বিশ্বাস যাহাতে বজায় থাকে তাহার কোনই ব্যবস্থা তুরস্কের শাসকবর্গ করেন নাই, একথা সহজে বিশ্বাস হয় না। সেজন্ত ভারতের খিলাফৎ-কমিটি প্রকৃত সংবাদ জানিবার জন্ত তুরস্ক সরকারের নিকট তার করিয়াছেন; কিন্তু সংবাদ এখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই। তুরস্কে খিলাফতের অবসান ঘটিয়াছে দেখিয়াই মুসলমান-প্রধান দেশ-সমূহে আপন প্রভাব বজায় রাখিবার জন্ত ইংরেজ-সরকার আপনার তাঁবেদার কোনও এক নৃপতিকে খলিফা করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। এরূপ ক্রীড়াপুত্তলিও মেলা সহজ। হেজ্জাজের ইংরেজ-মনোনীত রাজা হুসেন ইংরেজ-সরকারের সহায়তা লাভ করিয়া আপনাকে খলিফা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু তাঁহার চিরশত্রু নেজদের সুলতান এই ব্যাপারে তাঁহার প্রতিকূলতা করায় আরবজাতি তাঁহাকে খলিফা বলিয়া স্বীকার করিয়া লয় নাই। এদিকে মিশরের মুস্লিম-জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এল্ আজহারের উলেমাবর্গ মিশর-সম্রাট্ ফুয়াদকে খলিফা-পদে বরণ করিতে উৎসুক।

কোরাণে খলিফা নির্ব্বাচিত হইবার বিধিই আছে। সেই বিধি অনুসারে একটি সর্ব্বমোস্লেম উলেমা কন্ফারেন্স করিয়া খলিফা-বরণের প্রস্তাবও হইয়াছে। একদল লোক আবার ভারতীয় মুসলমান-সম্প্রদায়কে সন্তুষ্ট করিবার জন্ত হায়দ্রাবাদের নিজামকে খলিফাপদে বৃত করিবার জন্ত খুব আগ্রহ দেখাইতেছেন। ইংরেজ-সরকার যেমন সম্রাট্ হুসেনের দাবীর সমর্থন করিতেছেন, ফরাসী-সরকার আবার তেমনই নিজের সুবিধার কথা ভাবিয়া নেজদের আমীর ইব্ন্ সাউদের দাবীর সমর্থন করিতেছেন। কাজে-কাজেই খিলাফতের ব্যাপার লইয়া একটা নূতন মস্ত সমস্যা ইউরোপীয় রাষ্ট্রজগতে দেখা দিয়াছে।

ফ্রান্সের আদর্শ-চ্যুতি—

যুদ্ধের ফলে যে নৈতিক অবনতি ঘটে জেতার জীবনে তাহা আরও স্পষ্টরূপে দেখা দেয়। জয়লাভের গৌরবে মদমত্ত হইয়া জেতা যে বিজিতের উপর অত্যাচার করে, তাহাই নহে। নিজের দেশেও নানাপ্রকার কুকর্ম্মের প্রসার ঘটিয়া জাতির অধঃপতনের আরম্ভ হয়। ফরাসী জাতির জীবনে এরূপ নানাপ্রকার দুর্গতি দেখা দিয়াছে। যুদ্ধে যে-সমস্ত ফরাসী প্রজা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহাদের ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ কিছু সাহায্য করিবার ব্যবস্থা ফরাসী-সরকার করিয়াছেন। এই সাহায্য দানের ব্যবস্থা যাঁহাদের উপর ছিল এই সম্পর্কে তাঁহাদের অনেক কেলেঙ্কারীর কথা প্রকাশ পাইয়াছে। সরকারী হিসাব-পরীক্ষক সাহায্য দানের হিসাবের সামান্ত একটু অংশমাত্র পরীক্ষা করাতে পঞ্চাশকোটি ফ্র্যাঙ্ক জুয়াচুরি ধরা পড়িয়াছে। ধ্বংসপ্রাপ্ত অঞ্চলের পুনর্গঠনের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ম্যাসিয় রেইবেল্ হিসাব-পরীক্ষাকার্য্যে যথাসম্ভব ব্যাঘাত জন্মাইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। পঁয়াকারে-মন্ত্রী-সভা যখন এইসমস্ত কেলেঙ্কারীর কথা অবগত হইলেন, তখন তাহা চাপা দিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া উক্ত দুষ্কর্ম্মের সাহায্যই করিয়াছেন। বিখ্যাত বার্ত্তাশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ম্যাসিয় লুশেয়ার এ-ব্যাপারে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। এ-ব্যাপার প্রকাশিত হইয়া পড়াতে তাঁহার চরিত্র এমনই কালিমালিপ্ত হইয়াছে যে ফ্রান্সের ভাগ্যনিয়ন্তা হইবার তাঁহার যে আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাহা আর কখনও সফল হইবে বলিয়া মনে হয় না। ফরাসী-সরকার স্থির করিয়াছিলেন যে দরিদ্র প্রজাগণই সর্ব্বাগ্রে ক্ষতিপূরণস্বরূপ কিছু অর্থসাহায্য লাভ করিবে। কিন্তু পুনর্গঠন-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীগণ দোকানী পসারী চাষী মুদী এবং গরীব গ্রামবাসীদিগকে সর্ব্বাগ্রে সাহায্য না করিয়া কারখানার মালিক, ফ্যাক্টরীর মালিক ও বড় বড় আড়তদারদিগকেই সকলের অগ্রে সাহায্য দান করিয়াছেন। এইরূপ করার অন্তরালে গোপনে উৎকোচ গ্রহণের অভিসন্ধিই যে ছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। গরীব গ্রামবাসীদিগকে সাহায্য করা হইয়াছে বলিয়া যে আট শত কোটি ফ্রাঙ্কের হিসাব দেওয়া হইয়াছে তাহার অর্দ্ধেক টাকা যে গরীব লোকদিগের নিকট পৌঁছায় নাই ইহা সন্দেহ করিবারও যথেষ্ট কারণ আছে বলিয়াই প্রকাশ। এদিকে অর্থাভাবে গরীব প্রজারা তাহাদের জমিজেরাত এবং ক্ষতিপূরণের দাবী বৎসামান্ত নগদ টাকার পরিবর্ত্তে বেচিয়া ফেলিতে বাধ্য হইতেছে। প্রকাশ যে পুনর্গঠন বিভাগের বড় বড় কর্ম্মচারীগণ বেনামিতে সেগুলি ক্রয় করিয়া যথেষ্ট লাভবান্ হইতেছেন। ঘরের ব্যাপারে যেমন স্বরাষ্ট্র বিভাগ যথেষ্ট কেলেঙ্কারী করিয়াছেন, পরের ব্যাপারেও তেমনই পররাষ্ট্র-বিভাগে অত্যাচারের চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িতেছেন। বিগত সেপ্টেম্বর মাসে জার্ম্মান্ জাতি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বন্ধ করিয়াছে। কিন্তু রফার সর্ত্তকে অবহেলা করিয়া ফরাসী কর্তৃপক্ষ এখনও রাইন্ল্যাণ্ডে ৫৬৪ জন, হেসিতে ২৭১ জন, প্যালাটিনেটে ৩৬৮ জন এবং রুরে ১১২২ জন জার্ম্মান রাজবন্দী করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাঁরা ফ্রান্সের অন্তায় আদেশ অমান্ত করিয়া কারাবরণ করিয়াছিলেন। দেশের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে গিয়াই ইহাঁরা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রতিরোধ অবসানের পূর্ব্বে জার্ম্মান-সরকার যে রফা করেন, তাহার সর্ত্তে ইহাঁদিগকে মুক্তি দিবার প্রতিশ্রুতি করাইয়া লইয়াছিলেন। ভবিষ্যতে বাধা দিবার চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মূল করিবার জন্ত ফরাসী-সরকার ইহাঁদের জব্দ করিতে চাহেন। তাই

রকার সর্ত্তও দূর করিয়া ফরাসী-কর্ত্তৃপক্ষ ইহাঁদের প্রতি নির্য্যাতন করিতেছেন।

শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ

কোচিনে সত্যাগ্রহ—

কোচিন প্রদেশের ভাইকম নামক স্থান হিন্দুদের মন্দিরের জন্য সুপ্রসিদ্ধ। উক্ত দেব-মন্দিরের চারিপাশ দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে তাহাতে অস্পৃশ্য-মন্ত জাতির লোকদের অধিকার নাই। এই অন্যায়ের প্রতিবাদের জন্য গত ৩০শে মার্চ্চ একদল অস্পৃশ্য-মস্ত জাতির স্বেচ্ছাসেবক ঐ নিষিদ্ধ রাস্তা দিয়া ভ্রমণ করিবার জন্য বহির্গত হন। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষগণ শান্তি এবং শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ মোতায়েন রাখিয়াছিলেন এবং নিষেধাজ্ঞাও প্রকাশ্য রাস্তার স্থানে স্থানে টাঙাইয়া রাখা হইয়াছিল। তাহা সত্ত্বেও স্বেচ্ছাসেবকেরা নিজেদের ন্যায্য অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সেই পথ দিয়া গমন করিতে থাকেন। ফলে পুলিশ তিনজন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহাতে স্বেচ্ছাসেবকদের উৎসাহ হ্রাস হয় নাই। ৬০ জন স্বেচ্ছাসেবক এই নিষিদ্ধ রাস্তা দিয়া চলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। প্রত্যহ প্রাতে তিনজন করিয়া স্বেচ্ছাসেবক সত্যাগ্রহ করিতে বাহির হইয়া পুলিশের হাতে বন্দী হইতেছে। প্রথম দলের স্বেচ্ছাসেবকদের বিচারও শেষ হইয়া গিয়াছে। বিচারক তাহাদের প্রত্যেককে তিনশত টাকার জামিন মুচলিকা দিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা তাহাতে অস্বীকৃত হওয়ায় তাঁহাদের প্রতি ছয় মাসের অশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

কোচিনের জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কেশব মেনন, মাধবম্ প্রভৃতির উপর দণ্ডবিধির ১২৭ ধারা অনুসারে এক আদেশ জারী করিয়াছিলেন। এজাভাস ও পুলায়ক সম্প্রদায়ের লোকদিগকে নিষিদ্ধ রাস্তায় ভ্রমণ করিবার জন্য তাঁহারা যাহাতে উৎসাহিত না করেন এই আদেশে সেইজন্য তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা এই আদেশ মান্য না করাতে তাঁহাদের প্রতি ছয় মাস অশ্রম কারাদণ্ড প্রদত্ত হইয়াছে। এখন শ্রীযুক্ত জর্জ জোসেফ এই সত্যাগ্রহ পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

ভারতে বোল্‌শেভিক ষড়যন্ত্র—

কানপুরে আটজন লোককে বোল্‌শেভিকদের এজেন্ট বলিয়া অভিযুক্ত করা হইয়াছে। গত ১৭ই মার্চ্চ হইতে তাঁহাদের মামলার শুনানী হইতেছিল। আসামীদের পক্ষে কোনো উকিল ছিল না। ইহাঁরা নাকি ভারতবর্ষে আন্তর্জাতিক সঙ্ঘতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছেন। ইহাঁদের উদ্দেশ্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আওতা হইতে ভারতকে বিপ্লবের দ্বারা বিচ্ছিন্ন করা। চাষা এবং কুলী এই উভয় সম্প্রদায়কেই আন্দোলনে আকৃষ্ট করা ইহাঁদের লক্ষ্য। কংগ্রেসকেও ইহাঁরা হাত করিতে চান। রুশিয়া হইতে টাকা আনিয়া কাজ চালানো ইহাঁদের কল্পনা ছিল। নিষিদ্ধ পুস্তিকা এবং সংবাদপত্রাদি প্রভৃতি আমদানি করিয়া ইহাঁরা নাকি বিপ্লববাদ প্রচার করিতেন।

চারিজন আসামীকে ১২১ ধারা অনুসারে বিচারের জন্য দায়রাতে সোপর্দ্দ করা হইয়াছে।

ট্যাক্স বন্ধের আন্দোলন—

গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের জমীর উপর হইতে অতিরিক্ত ট্যাক্স উঠাইয়া লইতে অস্বীকার করায় মাদ্রাজের মায়াবরম্ নামক স্থানের মিরাশ-দারদিগের একটি কনফারেন্সে স্থির হইয়াছে যে এই অতিরিক্ত ট্যাক্স দেওয়া হইবে না এবং গবর্ণমেণ্ট যদি বেশী জোর-জবরদস্তি করেন তবে জমি চাষ করাও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

মন্ত্রীর বদান্যতা—

বিহার-উড়িষ্যার স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীযুক্ত গণেশ দত্ত সিংহ প্রকাশ করিয়াছেন যে তিনি যত দিন হইতে মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত আছেন ও পরে থাকিবেন তত দিন তাঁহার বেতনের তিন-চতুর্থাংশ অর্থাৎ বৎসরে ৪৮ হাজার টাকা স্বায়ত্ত-শাসন-বিভাগের অন্তর্গত সাধারণ স্বাস্থ্য-বিভাগের জন্য দান করিবেন। ঐ টাকায় যে ফণ্ড প্রতিষ্ঠিত হইবে হাসপাতালসমূহের ইন্‌স্পেক্টর-জেনারেল সেই ফণ্ডের প্রেসিডেণ্ট এবং স্বায়ত্তশাসন-বিভাগের সেক্রেটারী ঐ ফণ্ডের সেক্রেটারী হইবেন। বিহার প্রদেশের শিশুমঙ্গল কার্য্যে বিশেষতঃ অনাথ-শিশুদের কল্যাণার্থে এই ফণ্ডের টাকার সুদ ব্যয়িত হইবে।

মন্ত্রীদের মাহিনা—

আসাম-ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মন্ত্রীদের মাহিয়ানা মাসিক ১৫০০৲ টাকা ধার্য্য করিবার জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। প্রস্তাবটি সভায় পরিগৃহীত হইয়াছে।

অসহযোগীর অদ্ভুত দণ্ড—

স্বরাজ্যের বেজওয়াদার সংবাদদাতা জানাইয়াছেন,—কিছু দিন পূর্ব্বে স্থানীয় কাউন্সিলে দেওয়ান্ বাহাদুর বালাজিরাও নাইডু গারু প্রস্তাব করেন, অসহযোগীদের বাড়ীতে জল সরবরাহ করা হইবে না। গবর্ণমেণ্ট অসহযোগ-আন্দোলন কোনো প্রকারে থামাইতে না পারিয়া এই উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। কোনো কোনো রায়তের বাড়ীতে নাকি সত্য সত্যই জল-সরবরাহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের অপরাধ—তাহারা খদ্দর পরিধান করে, নিজেদের সাধ্যানুসারে স্বরাজ্য-ভাণ্ডারে সাহায্য করে এবং সভা-সমিতিতে যোগ দান করে।

গাইকোয়াড়ের দান—

বরোদার গাইকোয়াড় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বভারতীতে বার্ষিক ছয় হাজার টাকা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। সম্প্রতি গাইকোয়াড় ঘোষণা করিয়াছেন যে, প্রতিবৎসর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বা সাহিত্যিককে আড়াই হাজার টাকার পুরস্কার এবং মাসিক একশত টাকা হিসাবে বৃত্তি গাইকোয়াড় রাজ-সরকার হইতে প্রদান করা হইবে। এবৎসর ঐ পুরস্কার ও বৃত্তি অধ্যাপক রাধা-কুমুদ মুখোপাধ্যায়কে প্রদান করা হইয়াছে।

শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায়

কানপুরে গুলি—

কানপুর কটন্ মিলসের শ্রমিক ও মিলের কর্ত্তৃপক্ষগণের সহিত বোনাস্ ও মজুরী লইয়া সম্প্রতি মনোমালিন্য হয়। ফলে মিলের শ্রমিকগণ ধর্ম্মঘট করে ও মিলের সম্মুখে জমায়েৎ হইয়া তাহাদের প্রাপ্য টাকার জন্য দাবী করেন। কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের কথায় কোন প্রকার কর্ণপাত না করায় তাহারা সামান্য উত্তেজিত হয়। ইহাতে ভীত হইয়া মিলের মালিকগণ পুলিশে খবর দেয় ও অবিলম্বে ফৌজ আসিয়া উপস্থিত

হয়। সহরের ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিশ-সাহেব উভয়ই সঙ্গে আসেন। তাঁহাদের সঙ্গে স্থানীয় ডাক্তার মুরারীলালও ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া শ্রমিকদিগকে শান্ত করিতে চেষ্টা করেন। অল্পকাল পরে অধিকাংশ শ্রমিক ঘটনাস্থল পরিত্যাগ করে। সামান্য কয়েক শত লোক তাহাদের প্রাপ্য টাকা না লইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিতে অস্বীকার করায় পুলিশ তাহাদিগকে জোর করিয়া বাহির করিবার জন্য তাহাদিগের দিকে অগ্রসর হয়। প্রকাশ যে শ্রমিকেরা ইহাতে উত্তেজিত হইয়া তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কয়েকটি ইট প্রাটকেল নিক্ষেপ করে। এই কারণে সহরের ম্যাজিষ্ট্রেট এই নিরস্ত্র শ্রমিকদের উপর গুলি চালাইতে আদেশ প্রদান করেন। ফলে ৪ জন শ্রমিক পুলিশের গুলিতে প্রাণত্যাগ করে ও প্রায় ১০০ শত শ্রমিক আহত হয়। স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির কর্ম্মীরা ও মিউনিসিপ্যালিটি হতাহত শ্রমিকদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য দান করিয়াছেন ও করিতেছেন।

নিরস্ত্র ভারতবাসীদিগের উপর পুলিশের গুলি বর্ষণের দৃষ্টান্ত ইহাই প্রথম নহে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কালীঘাটে ট্রাম ডিপোর নিকটেও এইরূপ গুলি বর্ষণ হয়। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজের কুম্ভকোণমে, বোম্বাইএ মালেগাঁওয়ে ও নাগপুরের নিরস্ত্র জনতার উপর পুলিশ কর্ত্তৃক গুলি বর্ষিত হইয়াছিল। সুতরাং কানপুরের ঘটনায় বিস্মিত বা আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

প্রভাত সান্যাল

বাংলা

বাংলার রোগ—

বাঙ্গালার হাঁসপাতালের খবর।—বাঙ্গালাদেশের হাঁসপাতাল এবং ডিসপেন্সারিসমূহের ১৯২০, ১৯২১ এবং ১৯২২ সালের ত্রৈবার্ষিক রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। এই রিপোর্টে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাঙ্গালা ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত প্রদেশ। এই রিপোর্টে দেখা যায়, ঐ তিন বৎসর বাঙ্গালা দেশের হাঁসপাতাল এবং ডিসপেন্সারিগুলিতে যত রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে, তাহার তিনভাগের একভাগেই ম্যালেরিয়ার রোগী। ১৯২০ সালে হাঁসপাতাল এবং ডিসপেন্সারিগুলিতে ২, ২৭৯,০০০ লোক চিকিৎসিত হয়, ১৯২১ সালে হয় ২,৩৫০, ৩৬৭ জন এবং ১৯২২ সালে ১,৯৮৮, ৫৭৭ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছিল। অবশ্য নিজের বাড়ীতে যে-সব রোগী চিকিৎসিত হয় তাহাদের সংখ্যাও ইহার অপেক্ষা বেশী ছাড়া কম নহে; আবার কতকজন হয় ত চিকিৎসার সুবিধা লাভই করিতে পারে না, ভগবানকে ভরসা করিয়া থাকিয়া দিন কাটায়। এইসমস্ত বিষয় বিবেচনা করিলে ম্যালেরিয়া বাঙ্গালায় যে কি সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে, কিছু উপলব্ধি করা যায়। বুঝা যায় চিকিৎসার অভাব বাঙ্গালায় এখনও কত বেশী। রিপোর্টে প্রকাশ, ঐ তিন বৎসরে বাঙ্গালা-দেশের হাঁসপাতাল এবং ডিসপেন্সারির সংখ্যা ৯৪টি বাড়িয়াছিল—৭৬৫ হইতে ৮৫৯টি হইয়াছিল। রিপোর্টে বাঙ্গালা সরকারের সার্জ্জন্ জেনারেল্ বলিয়াছেন,—ডিসপেন্সারির বৃদ্ধির হার যদি এই ভাবে চলে অর্থাৎ বৎসরে ৩১টি করিয়া ডিসপেন্সারি বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে আর ৭ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা দেশের লোকদের চিকিৎসার অভাব দূর হইবে। তাঁহার আশা সার্থক হউক, আমরা এই কামনা করি।

—সম্মিলনী

কলেরা ও বসন্ত।

বঙ্গে ১৯২২ সালে কলেরা ও বসন্ত রোগে মোট ৫১, ৭১২ জন মারা গিয়াছে; ইহার পূর্ব্ব বৎসরে এই দুই রোগে মোট ৮০,৫৪৭ জন মারা পড়িয়াছিল; ১৯২২ সালে বসন্ত রোগে মৃত্যু-সংখ্যা অনেক কম,—এই বৎসরে ঐ রোগে ৭,৮৬৪ জন মরিয়াছে, কিন্তু ১৯২১ সালে ৮,১৫৭ জন, ১৯২৩ সালে ৩৬,১৯০ জন এবং ১৯১৯ সালে ৩৭,০১০ জন বসন্ত রোগে প্রাণ হারাইয়াছিল। বঙ্গের সর্ব্বত্র অবৈতনিক টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু জেলা-বোর্ড প্রভৃতি অর্থাভাবে বেতনভুক্ত টিকা-প্রদানকারী লোক পর্য্যাপ্ত পরিমাণে নিযুক্ত করিতে পারিতেছেন না।

ম্যালেরিয়া।

বঙ্গে ১৯২২ সালে ম্যালেরিয়া জ্বরে মোট ৭৮৫, ২৬৮ জন লোক মারা গিয়াছে; ইহার পূর্ব্ব বৎসর ১,০৪০,৩৬৮ জন লোক ম্যালেরিয়ায় মারা পড়িয়াছিল। বঙ্গের প্রতি জেলাতেই ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর সংখ্যা কমিয়াছে বটে, কিন্তু ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে এমন লোকের সংখ্যা কমে নাই, অপিচ বাড়িয়াছে। সেইজন্য স্বাস্থ্য-বিভাগের মন্ত্রী জেলাবোর্ড প্রভৃতিকে ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের প্রতিকার উদ্দেশ্যে জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহের সাহায্য গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

কালাজ্বর।

কালাজ্বর সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত ১৩টি জেলায় পরীক্ষা করা হইয়াছে এবং দেখা গিয়াছে, বর্দ্ধমানে যতগুলি গ্রামে পরীক্ষা হইয়াছে তন্মধ্যে শতকরা ২৩টি গ্রামে কালাজ্বর বিদ্যমান। এই তদন্তের ফলে পল্লীগ্রামের প্রায় তিন শত চিকিৎসককে কালাজ্বরের চিকিৎসা সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে বঙ্গের হাঁসপাতালসমূহে কালাজ্বরদুষ্ট রোগীর সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িতেছে। ১৯১৯ সালে ৪,৩০০ জন কালাজ্বরগ্রস্ত রোগী হাঁসপাতালে ভর্ত্তি হইয়াছিল, কিন্তু আলোচ্য ১৯২২ সালে ১৮,০০০ রোগী ভর্ত্তি হইয়াছে। (নায়ক)

—এডুকেশন গেজেট

যৌথ সমিতি—

যৌথ সমিতিসমূহের বার্ষিক রিপোর্ট সমালোচনায় গবর্ণমেণ্ট যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ ১৯২৩ সালের ৩০শে জুন যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে সর্ব্বপ্রকার সমিতির সংখ্যা ৬৬৭৯ হইতে ৭৮২২ অর্থাৎ শত করা ১৭১ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সমিতির মূলধনও তিন-কোটি ৩৩ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে। কুসীদজীবী কর্ত্তৃক উৎপীড়িত কৃষক-সমাজকে ঋণ-জাল হইতে মুক্ত করিয়া মিতব্যয়িতা শিক্ষা দিবার একমাত্র উপায় দেশে সমবায় ঋণদান সমিতির বহুল বিস্তার। বঙ্গদেশে সমবায় সমিতি-সমূহের শতকরা নব্বইটি ঋণদানের জন্যই প্রতিষ্ঠিত। গত বৎসরে এগুলা সমিতির বিস্তার আশাপ্রদ। সমবায় কৃষি সমিতির সংখ্যা এক বৎসরে চারি হইতে সাতে উঠিয়াছে মাত্র। ইহা সন্তোষজনক বলিয়া গবর্ণমেণ্টের সহিত আমরা একমত হইতে পারিলাম না। কৃষিই দেশের প্রধান অবলম্বন। কৃষি-সম্পর্কে সমবায়-নীতি অবলম্বন না করিলে উন্নততর বৈজ্ঞানিক কৃষি-প্রণালী দেশে প্রচলিত করা দুরূহ হইবে। পাঞ্জাবে মিষ্টার ক্যালভার্ট যে কৃষি-সমবায়-নীতি অবলম্বন করিয়া যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছেন বঙ্গদেশে তাহা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

—মোহাম্মদী

পুলিশ পোষণের খরচ—

বাঙ্গালা প্রদেশের ১৯২২এর পুলিশ-কার্য্যবিবরণী সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে। ইনস্পেক্টর জেনারেল্ হাইড সাহেব যে-ভাবে এই রিপোর্ট সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা সত্যই কৌতুকাবহ। পুলিশের এই বড় সাহেব অর্থাভাবে বড় ক্রন্দনটাই কাঁদিয়াছেন; কোনরকম উন্নতি তিনি করিতে পারেন নাই, কারণ রাজ-সরকার হইতে রজতখণ্ড মাফি তেমন মেলে নাই। হায়রে দুরদৃষ্ট!

পুলিশ বাবদে বাঙ্গালার ব্যয় হইয়াছে ১ কোটি ৪৮ লক্ষ ৩১ হাজার ২৭৯৲ টাকা; ১৯২১এ ব্যয় হইয়াছিল, ইহার চেয়ে ১ লক্ষ ২১ হাজার, ৩৪০৲ টাকা কম। তবে ১৯২২এ যে ব্যয় দেখান হইয়াছে তাহা এখনও সম্পূর্ণ নহে, একাউণ্টেণ্ট জেনারেলের আফিস হইতে পুরা হিসাব পাওয়া যায় নাই। গত ১৯২৩ এর কৌন্সিল অধিবেশনের সময় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় দেখাইয়াছিলেন যে ১৯০৪—৫ হইতে ১৯২২—২৩ এর মধ্যে পুলিশের ব্যয় শতকরা ২৫০৲ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে। তবুও পুলিশের দৈন্ত ক্রমে নাই। একদিকে দেশে অনাহার, দুর্ভিক্ষ, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কলেরা, জলকষ্ট—আর এক দিকে পুলিশের জন্য দেখিতে দেখিতে দ্বিতল ত্রিতল সৌধ লালবাজারে, ভবানীপুরে, শিবপুরে, গড়িয়া উঠিতেছে। কি বিসদৃশ অসামঞ্জস্য!—

—সারথি

বাল্যবিবাহের কুফল—

ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে ডাক্তার গৌর সম্মতির বয়স বার হইতে চৌদ্দ করিবার জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৫ ধারার একটি সংশোধনমূলক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাব সমর্থন করিতে উঠিয়া সরকার পক্ষের সদস্য কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের প্রসূতিদের মৃত্যু-সংখ্যার একটি হিসাব দিয়াছেন; এদেশে বাল্যবিবাহের ফল কিরূপ ভীষণ হইতেছে, সেই হিসাব হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। মিঃ এলেন্ বলেন, সম্মতির বয়স যদি ষোল বৎসর করা যায়, তাহা হইলে এদেশের মেয়ের স্বাস্থ্য, শিশুদের স্বাস্থ্য অন্য কথায় সমগ্র জাতির স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটিবে। তিনি একটি হিসাব দেখাইয়া বলেন, গত ১৯২১ সালে প্রসব-সম্পর্কে কলিকাতা এবং বোম্বাইতে হাজার-করা ২৫ জন প্রসূতির মৃত্যু ঘটিয়াছিল; অপর পক্ষে, ইংলণ্ডে এই বৎসরে সন্তানপ্রসবে হাজার-করা ৪ জনেরও কম প্রসূতি মারা যায়। বক্তা বলেন, গত যুদ্ধে ৪৭ হাজার ভারতবাসী এবং ৬ লক্ষ ৬০হাজার ইংরেজ প্রাণ দিয়াছিল, ইহাদের এইভাবে জীবন দানের জন্য আমরা সকলেই গর্ব্ব অনুভব করি, কিন্তু হাজারে এই যে ২৫ জন প্রসূতির মৃত্যু ইহার ফল ভারতের পক্ষে কিরূপ ভীষণ হইতেছে, কেহ ভাবিয়া দেখেন কি? যদি হাজার-করা দশজন প্রসূতিকেও বাঁচান যায়, তাহা হইলে ভারতের ত্রিশ লক্ষ লোক, এবং হাজারে ২০ জন প্রসূতিকে রক্ষা করিতে পারিলে, ৬০ হইতে ৭০ লক্ষ লোকের জীবন রক্ষিত হয়, এমন কথা বলা যাইতে পারে। অবশ্য বাল্যবিবাহই যে সব ক্ষেত্রে প্রসূতির অকালমৃত্যুর কারণ, ইহা নহে; তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে ইহাই কারণ, ইহাতে সন্দেহ নাই। মিঃ এলেনের কথা আমরাও সমর্থন করি। ডাক্তার গৌর যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন, সংস্কারশীল হিন্দুরা সমাজকে যাঁহারা জীবন্ত জাগ্রত করিয়া তুলিতে চাহেন, তাঁহারা সকলেই সে প্রস্তাবের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিবেন। তবে কথা হইতেছে, সামাজিক যে-সব কুসংস্কার আমাদের ভিতরে আছে, শুধু আইনের দ্বারাই সেগুলি দূর করা যাইবে না, শিক্ষার বিস্তারই প্রধানতঃ আবশ্যক। সাধারণত দেখা যায়, আমাদের সমাজের যে-সব শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার তেমন বিস্তার নাই, সেইসব শ্রেণীতেই বাল্যবিবাহ প্রভৃতি বেশী। যাহা হউক ডাক্তার গৌরের প্রস্তাবিত সংস্কার যদি এই কুপ্রথা দূরীকরণে কিছুমাত্র সাহায্য করে, তাহা হইলেও আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের সে সুযোগ পরিহার করা উচিত নহে। কারণ প্রসূতি এবং শিশুদের অকালমৃত্যুর সংখ্যা যেমন এদেশে বেশী, তাহাতে আমাদের আরও বিশেষ উপেক্ষা করা চলে না। এমন অকালমৃত্যু হ্রাস করিবার জন্য আমাদিগকে সকল দিক্ হইতে চেষ্টা করিতে হইবে।

—সারথি

মধুসূদন দত্তের স্মৃতিরক্ষা—

একথা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন যে পরলোকগত কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত পুরাতন হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। গত ২৩ শে জানুয়ারী হিন্দুস্কুলে কবিবরের শতবার্ষিক জন্মোৎসব সভায় মাজ্যবর শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে বিদ্যালয় গৃহে মধুসূদনের স্মৃতিরক্ষার জন্য বর্দ্ধমানের মাজ্যবর মহারাজাধিরাজ বাহাদুরকে সভাপতি করিয়া একটি কমিটী গঠিত হইয়াছে। কবির নিজের বিদ্যামন্দিরে তাঁহার স্মৃতি রক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। সভাক্ষেত্রে বর্দ্ধমানাধিপতি অর্থের জন্যে যে আবেদন করিয়াছেন, আশা করি তাহাতে প্রতি বাঙ্গালীর হৃদয়ই সাড়া দিবে। প্রেসিডেন্সি কলেজ ও হিন্দুস্কুলের বর্ত্তমান ও ভূতপূর্ব্ব ছাত্রগণের নিকট আমি আমার বিশেষ প্রার্থনা জানাইতেছি। এই দুইটি বিদ্যালয়ই পূর্ব্বে হিন্দুকলেজ নামে পরিচিত ছিল। স্মৃতিরক্ষা সম্বন্ধে প্রস্তাবাদি আমার নিকট পাঠাইতে হইবে। টাকাকড়ি পাঠাইবার ঠিকানা—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন, বি-এ, কমিটির সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ, হিন্দুস্কুল, কলিকাতা।

প্রেসিডেন্সি কলেজ,
কলিকাতা।

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়
সম্পাদক,
হিন্দুস্কুল মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্মৃতি সমিতি।

দান—

ঢাকার সংবাদে প্রকাশ যে ভাগ্যকুলের রাজা শ্রীনাথ রায়,রাজা জানকীনাথ রায় বাহাদুর ও তাঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্রগণ মিট্‌ফোর্ড হাঁসপাতালের চক্ষুচিকিৎসার ওয়ার্ডের উন্নতির জন্য ২৪০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এই টাকা দ্বারা উক্ত ওয়ার্ডে পুরুষদের জন্য আরও কয়েকটি শয্যা বাড়ানো হইবে এবং স্ত্রীলোকদের জন্য ১৪টি শয্যার ব্যবস্থা করা হইবে। বাহিরের রোগীদিগকে ঔষধ দিবার জন্যও একটি দালান তোলা হইবে। ইহাতে জনসাধারণের অনেক অসুবিধা দূর হইবে।—এডুকেশন গেজেট

তিরওয়ার রাজা দুর্গানারায়ণ সিং গত জুলাই মাসে তিরওয়ায় এক ইংরেজী স্কুল স্থাপিত করিয়াছেন। সেই স্কুলের জন্য ইতিপূর্ব্বে ১৫,০০০৲ খরচ করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি ঐ শিক্ষালয়ের জন্য এক কমিটির হাতে ২,৩৭,০০০ টাকা দিয়াছেন—১,৩০,০০০ টাকা স্কুলের গৃহাদির জন্য ৭,০০০ টাকা প্রাথমিক সরঞ্জামপত্রাদির জন্য দিয়াছেন, আর ১,০০,০০০ টাকার গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটির বার্ষিক সুদ ৬,০০০৲ শিক্ষালয়ের জন্য নূতন নূতন, প্রকারে ব্যয়িত হইবে।—

—এডুকেশন গেজেট

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম ও অবৈতনিক হিন্দুবালিকা বিদ্যালয়ের (৭৷২ বিডন রো, কলিকাতা) ত্রিতলবাড়ী এবং মন্দির নির্ম্মাণ সাহায্যে নিম্নলিখিত দান সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে:—শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার বসু ৫০০৲, জনৈক ভদ্রলোক ২৫০৲, দ্বিতীয় ভদ্রলোক ৬০০৲, শ্রীসারদাচরণ কুণ্ডু ১০০৲, শ্রীকমলকৃষ্ণ কুণ্ডু ১০০৲, জনৈক মহিলা ১৫০৲, শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (এলাহাবাদ) ১৫০৲।

—স্বরাজ

বাংলার লস্কর—

বঙ্গের ৮৩২ জন লস্কর বিগত মহাযুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জন্য প্রাণ দিয়াছে। তাহাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ প্রিন্সেপস্ ঘাট ও হেষ্টিংস্‌এর মধ্যে একটি স্তম্ভ প্রস্তুত হইয়াছে। গতপূর্ব্ব বুধবার অপরাহ্নে বঙ্গের গবর্ণর স্মৃতিস্তম্ভের আবরণ উন্মোচন করিয়াছেন।

লস্কর মেমোরিয়াল কমিটির সভাপতি মিঃ জে, ডোনাল্ড তাঁহার বক্তৃতার এই স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপনার ইতিহাস বিবৃত করেন। ১৯১৯ সালে

লায় জন করিয়া ইহার জন্য আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। কিপ্রকারে কি করা যায় এসম্বন্ধেও স্মৃতিচিহ্ন কি আকারে রাখা যায় তৎসম্বন্ধে বহু আলোচনা হয়। শেষে বঙ্গের লস্করেরা বলে, যে, এমন একটা স্তম্ভ স্থাপন করিতে হইবে যাহা সমুদ্রগামী জাহাজ হইতে দেখা যায়। যে ৮২,০০০ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে তন্মধ্যে জাহাজ কোম্পানিরা ৫০,০০০ দিয়াছেন আর সদাগরের দোকান হইতে ১৮,০০০ টাকা পাওয়া গিয়াছে। আরো ৯,০০০ হইলে লস্করদের নাম পাথরের উপর লিখিয়া রাখা যাইতে পারে।

স্তম্ভের আবরণ উন্মোচনের কালে গবর্ণর যে বক্তৃতা করেন তাহার মর্ম্ম এই :—এই লস্করেরা তাহাদের কর্ত্তব্য ঠিকমত না করিলে আমাদের বাণিজ্যপথগুলি রক্ষিত হইত না, এবং আমরা বাঁচিয়া থাকিয়া আমাদের সৈন্যদিগকে বিজয় লাভ করিবার জন্য রক্ষা করিতে পারিতাম না।

কলিকাতার ও চাটিগাঁর সকল জাহাজের সকল লস্করেরা বাঙ্গালী ছিল। কেবল তাহাই নয়। মিশরে ও ইটালে, গ্রেট বিটেনে ও কেপ কলোনিতে বঙ্গদেশ হইতে নাবিকদল গিয়াছে। বঙ্গদেশ হইতে রেঙ্গুনে ৬০০৫, কলম্বোয় ৭১০০ ও বোম্বাইএ অনুমান ৩৪,৭৫০ লস্কর গিয়াছে। অর্থাৎ বঙ্গদেশ কলিকাতা ও চাটিগাঁর সকল জাহাজের সকল লস্কর ত জোগাইয়াছেই, তদতিরিক্ত, রেঙ্গুন, কলম্বো ও বোম্বাইএর ৩০৬ জাহাজের সব নাবিক জোগাইয়াছে।

এই স্তম্ভ বঙ্গ ও শ্রীহট্টের ৮৩২ জন লস্করের স্মৃতির জন্য স্থাপিত। ইহারা সাম্রাজ্যের জন্য প্রাণ দিয়াছে।

ইহাদের মধ্যে ২০৩ জন কলিকাতা ও হাওড়ার, আর ৫৬৭ জন বঙ্গের অন্য অন্য জেলার। রুশিয়ার সর্ব্বোত্তোরস্থ বন্দর আর্চ্যানজেল যাত্রায় ৩৩ জনের প্রাণ যায়। যত দূর যাওয়ার নিয়ম নাই এবং যে নিয়মের বেশী কাজ করার কথা ছিল না, ততদূরে গিয়া তদতিরিক্ত সময় তাহারা কাজ করিয়াছে স্বেচ্ছায়। ৪৭ জন জর্ম্মণীতে অন্তরায়িত হইয়া সেখানেই মরে, আর বাদবাকী কামানের গোলায় বা টর্পেডোতে প্রাণ হারায় বা জন্মের মত অঙ্গহীন হয়।

—এডুকেশন গেজেট

বাঙালী কুস্তিগীর—

বাঙ্গালী কুস্তিগীর সম্বন্ধে লিখিতে গেলে সর্ব্বপ্রথমে মনে পড়ে শ্রীযুক্ত গোবর-বাবু এবং তাঁহার পিতার কথা। এই ভাববিলাসের দিনে যে দুএকজন বাঙ্গালী পালোয়ান হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই গোবর-বাবুর "সাক্রেদ"।

স্বয়ং গোবর-বাবুর সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কথা শুনিয়াছেন এবং পড়িয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে তিনি সম্প্রতি আমেরিকাতে ট্র্যাজলার নামে বিশ্বজয়ী বীরকে হারাইয়া দিয়াছেন। গোবর-বাবুই এখন বিশ্ববিজয়ী পালোওয়ান।

গোবর-বাবুর অন্যতম সমসাময়িক ভীমভবানী অকাল মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

যে দুইজন বাঙ্গালী কুস্তিগীর এখন বাঙ্গালাতে উপস্থিত রহিয়াছেন তাঁহাদের নাম দাসুবাবু এবং বনমালী ঘোষ।

দাসুবাবু বাঙ্গালা ১৩০৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বয়স যখন ষোল সেই সময়ে তিনি গোবর বাবুর নিকট কুস্তি শিখিতে যান। তেইশ বৎসর বয়সের সময় তিনি তাঁহার "ওস্তাদের" সহিত কোলাপুর গমন করেন। সেখানে তাঁহারা ৬ মাস অবস্থান করেন।

কোলাপুর অবস্থান-কালে দাসুবাবু কোলাপুরের রাজার ৩০০ শত পালোয়ানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কয়জনকে কুস্তিতে হারাইয়াছেন।

দুই বৎসর পূর্ব্বে শিবপুরে বিখ্যাত পালোয়ান কিঙ্কর সিংএর পুত্র সুরৎ সিংকে তিনি পরাস্ত করেন। সম্প্রতি হাওড়ার কেওড়াপাড়ার ঘাট রোডে কয়েকটি প্রতিযোগিতার কুস্তি হইয়া গিয়াছে। লাহোরের জগদ্বিখ্যাত পালোয়ান করিম বক্সের সক্রেদ কমরুদ্দিনের সহিত দাসু-বাবুর কুস্তি হয়। ইহাদের কুস্তি ১৮ মিনিট ধরিয়া চলিয়াছিল। এই কুস্তিতে দাসুবাবু যে-সকল প্যাচ দেখাইয়াছিলেন তাহা সত্যই বিস্ময়কর। এই কুস্তিতেও দাসুবাবু কমরুদ্দিনের সমকক্ষ হইয়াছেন।

আর-একজন পালোয়ান বনমালী ঘোষ, ইহার বয়স ২৫ বৎসর। বনমালীবাবু গোবরবাবুর সহিত আমেরিকা গিয়াছিলেন। আমেরিকা হইতে ইনি গত সেপ্টেম্বর মাসে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। আমেরিকাতে বনমালীবাবু বিস্মোর ভ্রাতাকে ২।০ ঘণ্টার কুস্তির পর পরাজিত করেন।

সাড়ে চার কোটি বাঙ্গালীর মধ্যে আমরা তিন চার জন প্রকৃত পালোয়ানের সন্ধান পাইলাম। ইহার মধ্যেও একটা লক্ষ্য করিবার আছে। বাঙ্গালী হিন্দু অপেক্ষা বাঙ্গালী মুসলমান অধিক দুর্ব্বল বলিয়া মনে হইতেছে। কারণ বাঙ্গালী মুসলমান পালোয়ানের নাম ত আমরা একটিও শুনিতে পাই না।

যাহা হউক আমাদের ধারণা যদি ভ্রমাত্মক হয় তবেই আমরা আনন্দিত হইব। আমরা আশা করি আমরা আরও অনেক বলবান্ বাঙ্গালীর সন্ধান পাইব।

—এডুকেশন গেজেট।

ভীষণ কুসংস্কার—

পাবনার সুরাজ পত্রিকা লিখিয়াছেন :—"সুজানগর থানার অন্তর্গত কামারহাট সাকিনের গদাধরচন্দ্র সাহার স্ত্রী এক পুত্র সন্তান প্রসব করিয়া ২১ দিন আঁতুড় ঘরে থাকে। গত ৫ই কার্ত্তিক রবিবার প্রত্যূষে উক্ত আঁতুড় ঘরে অগ্নি সংযোগ হওয়ায় শিশু সহ প্রসূতি আগুনে পুড়িয়া মারা গিয়াছে। সকলেই বাড়ীতে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও আঁতুড় ঘর স্পর্শ করিলে গঙ্গা স্নান করিতে হইবে এই কথা প্রকাশ করিয়া প্রসূতির কোনপ্রকার সাহায্য না করায় প্রসূতি আর্ত্তনাদ করিতে করিতে শিশু সন্তানসহ অগ্নিতে নিজেকে পূর্ণাহুতি দিয়াছে। থানায় এজাহার করা হইয়াছে।"

—২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ

—সেবক

আমাদের কার্য্যালয়ের ঠিকানা পরিবর্ত্তন

আমাদের লেখক, গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা, ক্রেতা, প্রভৃতিকে জানাইতেছি, যে, প্রবাসী-কার্য্যালয় ৯১নং আপার সার্কুলার রোড্ গৃহে স্থানান্তরিত হইয়াছে। ইতি।

প্রবাসীর স্বত্বাধিকারী
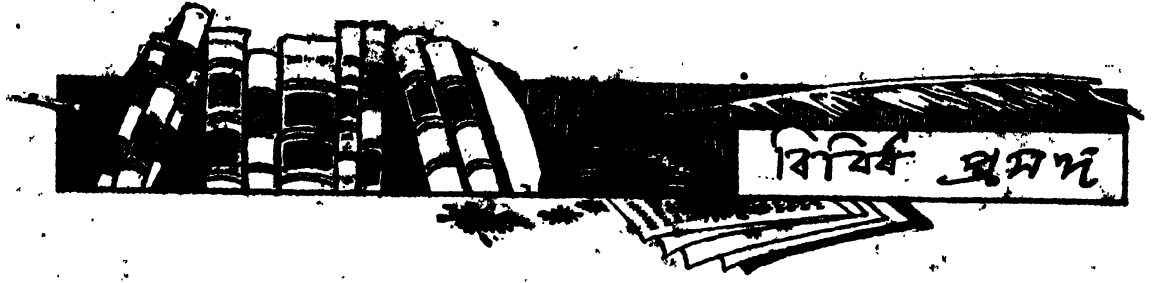
রাষ্ট্রিয় পরাধীনতার প্রকারভেদ

রাষ্ট্রিয় পরাধীনতা নানা-প্রকারের। বিদেশী এবং বিদেশবাসী রাজার বা জাতির অধীনতা পরাধীনতা। আমরা ইংলণ্ডের রাজার ও ইংরেজ জাতির অধীন। ইহা একপ্রকার পরাধীনতা। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রমণ্ডলের অধীন। ইহাও পরাধীনতা।

মাঞ্চু জাতি বহু শতাব্দী পূর্ব্বে চীন জয় করিয়াছিল। তাহাদের সম্রাট্ চীনের সম্রাট্ হইয়া চীনের রাজধানী পেকিনে রাজত্ব করিতেন। মাঞ্চুরা বহু শতাব্দী ধরিয়া চীন দেশে বাস করিয়া চীনেরই লোক হইয়া গিয়াছিল; সম্রাট্ও তাই। তথাপি চীন জাতির এই পরাধীনতা সহ্য না হওয়ায় তাহারা শেষ সম্রাট্ একজন শিশুকে পদচ্যুত করিয়া সাধারণতন্ত্র স্থাপিত করে। ইংলণ্ডের লোকেরা ফ্রান্স্‌নিবাসী নর্ম্যান্ জাতির রাজা উইলিয়ম কর্ত্তৃক একাদশ শতাব্দীতে পরাজিত হইয়া পরাধীন হয়। কিন্তু উইলিয়ম ও তাঁহার বংশধরেরা ইংলণ্ডেই বাস করিতেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের ক্ষমতা কমাইয়া ইংলণ্ডের লোকেরা আপনাদের অধিকার বাড়াইয়া লইতে থাকে। রাজা জনের আমলে অনেক অধিকার অভিজাত-বর্গ হস্তগত করে। তথাপি যখন প্রথম চাল্‌স্ ইংলণ্ডের রাজা, তখনও ইংরেজরা এই বিদেশী রাজার বংশসম্ভূত নৃপতির এতটা অধীন ছিল, যে, যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে হইয়াছিল। দ্বিতীয় জেম্‌সের সময়ও আর এক বার বিপ্লব ঘটে।

নিজের দেশের ও নিজের জাতির রাজার অধীনতাও পরাধীনতা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবের সময় ষোড়শ লুই ফ্রান্সের রাজা ছিলেন। তিনি নিজে ফরাসী। তথাপি তিনি পদচ্যুত হন। তুরস্কের ভূতপূর্ব্ব সুলতান্ নিজে তুর্ক। তিনি পদচ্যুত হইয়াছেন। গ্রীসের ভূতপূর্ব্ব রাজা গ্রীক্। তিনিও পদচ্যুত হইয়াছেন, যেমন জার্ম্মেনীর জার্ম্যান্ সম্রাট্ পদচ্যুত হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের মধ্যে নেপাল একমাত্র স্বাধীন রাজ্য। কিন্তু নেপালের লোকেরা স্বাধীন নহে। গুর্খারা রাজপুতানা হইতে গিয়া নেপাল জয় করে। সেখানে তাহারাই ক্ষমতাশালী জাতি; অন্যেরা তাহাদের অধীন। অথবা ঠিক্ বলিতে গেলে, প্রধান মন্ত্রী মহারাজা স্যার্ চন্দ্র শম্‌শের জঙ্ সর্ব্বেসর্ব্বা।

যে-দেশের লোকেরা নিজে কিম্বা আপনাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা দেশের সমুদয় কাজ চালায় এবং অন্য দেশের সহিত সন্ধি-বিগ্রহ-আদি করে, তাহারাই বাস্তবিক স্বাধীন। এরূপ দেশে, যেমন ইংলণ্ডে, রাষ্ট্র-ভূষণ ও সমাজভূষণ একজন রাজা থাকিলেও, তাহাতে স্বাধীনতা খর্ব্ব হয় না।

—

স্বাধীনতা লাভের উপায়

যুদ্ধ পরাধীন জাতিদের স্বাধীনতা লাভের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ উপায়। যে পরাধীন জাতি যুদ্ধ করিয়া স্বাধীন হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই যে স্বাধীনতাকামী ছিল, এবং প্রত্যেকেই যে তাহাদের প্রভু স্বেচ্ছাচারী রাজার বা শাসনকর্ত্তা বিদেশী জাতির বিরোধী ছিল, এমন নয়। কেহ কেহ এই রাজা বা বিদেশী জাতির পক্ষেও ছিল। কিন্তু যে যে ক্ষেত্রে স্বাধীনতার যুদ্ধ সফল হইয়াছে, তাহার কারণ এই, যে, স্বাধীনতাকামীদের দলই প্রবলতর ছিল। অন্য যাহারা রাজার বা বিদেশী জাতির পক্ষে ছিল, তাহারা হয় প্রবলতর পক্ষের ভয়ে রাজাকে

বা বিদেশী জাতিকে কোন সাহায্য করিতে পারে নাই, কিম্বা সেরূপ সাহায্য সত্ত্বেও তাহাদের স্বাধীনতালিপ্সু স্বদেশবাসীরা জয়ী হইয়াছিল।

ভারতবর্ষ পরাধীন দেশ। ইহাকে কেমন করিয়া স্বাধীন করা যায়, এই চিন্তা অনেকের মনেই উদিত হয়। অধিকাংশ বা প্রায় সমস্ত স্বাধীনতাপ্রার্থী ভারতীয় যুদ্ধ করিয়া দেশকে স্বাধীন করিবার চিন্তা ছাড়িয়া দিয়াছেন। গত মহাযুদ্ধের সময় বিদেশ হইতে জাহাজে অস্ত্র পাঠাইয়া এদেশে বিদ্রোহ ও রাষ্ট্রবিপ্লবের সহায়তা করিবার চেষ্টা হইয়াছিল; কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইয়াছিল। তাহার পর রাজনৈতিক হত্যা হইয়াছে বটে, কিন্তু দস্তুরমত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা ও আশা কেহ রাখেন কি না, জানি না। এরূপ কোন দল থাকিলে, সম্ভবতঃ তাহা ক্ষুদ্র।

যুদ্ধ দ্বারা স্বাধীন হইবার ইচ্ছা ছাড়িয়া দিবার কারণ দুটি। প্রথম কারণ এই, যে, বর্ত্তমান কালে যুদ্ধ করিতে হইলে যে-সকল বৈজ্ঞানিক অস্ত্র শস্ত্র রণতরী বায়ুযান প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজন হয়, ভারতীয়দের তাহা প্রস্তুত বা সংগ্রহ করিবার উপায় বর্ত্তমানে নাই; এবং দক্ষতার সহিত এই-সকল ব্যবহার করিবার মত শিক্ষাও ভারতীয়দের এখন নাই, তাহা লাভ করিবার উপায়ও আপাততঃ নাই। দ্বিতীয় কারণ, অহিংসা-নীতির অনুসরণ। সাত্ত্বিক প্রকৃতির অনেক মানুষের মত এই, যে, কোন কারণেই অন্য মানুষের প্রাণ বধ করা উচিত নয়, স্বাধীনতার নিমিত্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াও কাহারও প্রাণ বধ করা উচিত নয়।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, হিন্দুধর্ম্ম কেবল অহিংসাই শিক্ষা দেয়। আমাদের বিবেচনায় তাহা ভুল; কারণ, সম্পূর্ণ অহিংসাবাদী হিন্দু আছেন ও থাকিতে পারেন বটে. কিন্তু এমন কোন একখানি হিন্দু শাস্ত্র বোধ হয় কেহ দেখাইতে পারিবেন না, যাহা আগাগোড়া অহিংসার সমর্থক। বিষ্ণু-উপাসকদেরই অন্য সকল হিন্দু অপেক্ষা অহিংসাবাদী হইবার কথা। কিন্তু হিন্দুমতে বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় যুদ্ধের সমর্থন করিয়াছেন। তিনি নিজেও যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং অন্যতম অবতার শ্রীরামচন্দ্রও যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, হিন্দুধর্ম্ম সকল অবস্থায় অহিংসার সম্পূর্ণ সমর্থক হউন বা না হউন, ইহা নিশ্চিত, যে, ভারতবর্ষের কতক লোক যুদ্ধ করা বর্ত্তমান অবস্থায় অসাধ্য বা দুঃসাধ্য বলিয়া উহার বিরোধী, এবং কেহ কেহ অহিংসা-নীতির অনুসরণ করেন বলিয়া উহার বিরোধী। কতজন বাস্তবিক কোন্ কারণে উহার বিরোধী, তাহা স্থির করিবার উপায় নাই।

যে কারণেই হউক, স্বাধীনতা-লাভের ইতিহাস-প্রথিত উপায় যুদ্ধ ভারতীয়েরা অবলম্বন করিতে পারে না। অথচ স্বাধীনতার মত অমূল্য ধনের আশাও ত ছাড়া যায় না। উহা চাইই চাই।

ভারতীয় রাজনৈতিকদের মধ্যে এক দল আপনাদের নাম দিয়াছেন উদার-নৈতিক বা লিবারেল্। তাঁহারা এখনও আশা করেন, যে, বক্তৃতা করা, প্রস্তাব ধার্য্য করা, খবরের কাগজে লেখা, এদেশে ও ইংলণ্ডে আবেদন নিবেদন আন্দোলন করা, ইত্যাদি উপায়ে তাঁহারা কতকগুলি অধিকার পাইবেন। কিন্তু তাঁহারা নিজেও বিশ্বাস করেন না, যে, এই উপায়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়া যাইতে পারে; তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চান, মনের শান্ত অবস্থায় তাঁহাদের কেহ এ-কথা বোধ হয় প্রকাশ করিয়া বলেনও নাই। অবশ্য, কেনিয়ায় ভারতীয়দের দাবী গ্রাহ্য করাইতে না পারিয়া শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী বলিয়াছিলেন বটে, যে, ভারতীয়দিগকে তাহা হইলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে যাইতে হইবে। কিন্তু এটা হইতেছে অভিমানের কথা। সম্পূর্ণ স্বাধীনতালাভ উদারনৈতিক দলের প্রকাশ্য লক্ষ্য নহে। অসহযোগীদিগের মধ্যেও এবিষয়ে দুই দল আছে। মহাত্মা গান্ধী, ভারতবর্ষ আভ্যন্তরীণ বিষয়ে আত্মকর্ত্তৃত্ব পাইলে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজের সর্ব্বত্র ভারতীয়েরা ন্যায্য অধিকার পাইলে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত ভারতের সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে চান না। তিনি যাহা চান, তাহা না পাইলেও ভারতবর্ষকে ব্রিটিশসাম্রাজ্যভুক্ত রাখিতেই তিনি চেষ্টা করিবেন, এমন কথাও তিনি বলেন নাই। অন্য একদল অসহযোগী আছেন যাহারা প্রকাশ্য ভাবে বলিয়াছেন, যে, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভই তাঁহাদের লক্ষ্য; যেমন পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহরু, মৌলানা হস্রৎ

মোহানী, ইত্যাদি। ইহার মানে এ নয়, যে, ইহাঁরা তাঁকেই ভারতবর্ষকে আজই স্বাধীন করিতে চান বা করিবার আশা করেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহারা কি চান, তাহাই তাঁহারা খুলিয়া বলিয়াছেন। হয়ত সবাই তাই চান, কেবল সুবুদ্ধি-বশতঃ মুখ ফুটিয়া বলেন না। অবশ্য এমন লোকও অনেক দেখা যায়, যাঁহারা কল্পনাই করিতে পারেন না, যে, ভারতীয়েরা কখন স্বাধীনতা লাভ ও রক্ষা করিবার পক্ষে যথেষ্ট একতা শক্তি ও সর্ব্ববিধ যোগ্যতা লাভ করিতে পারিবে।

ঠিক কোন্ পথ অবলম্বন করিলে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইতে পারিবে, এবং সম্ভবতঃ কখন্ স্বাধীন হইবে, তাহা বলিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। কেবল নিজের মনের কথা এইটুকু বলিতে পারি, যে, সম্পূর্ণ স্বাধীনতাই চাই, তার চেয়ে কম কিছু নয়। ইংরেজের শাসন ভাল নয়, অতএব স্বাধীনতা চাই;—আমাদের যুক্তিমার্গ এরূপ নয়। কেহ যদি সত্য সত্যই প্রমাণ করিয়া দেন, যে, ইংরেজ-শাসন উৎকৃষ্টতম, তাহা হইলেও স্বাধীনতা চাই। কারণ, "মানুষ" বলিতে এমন একটি প্রাণী বুঝায়, যে নিজে সমান পদবীতে আরূঢ় আর দশ মানুষের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া নিজের সব কাজ করিতে সমর্থ। এই সামর্থ্যেরই নাম স্বাধীনতা। যে জাতি নিজে নিজের সব কাজ করিতে পারে না, তাহারা মানুষের জাতি নহে।

ঠিক কোন্ পথ অবলম্বন করিলে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইতে পারিবে,তাহা বলিতে না পারিলেও, স্বাধীনতা লাভ কিরূপ অবস্থার উপর নির্ভর করে, তাহা বুঝিতে ও বলিতে আমরা সবাই পারি। প্রথম অবস্থা এই, যে, দেশের সকলের কিম্বা অন্ততঃ অধিকাংশের বা সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী দলের মনে স্বাধীনতা-লাভের ইচ্ছা অন্য সব ইচ্ছা অপেক্ষা প্রবল হইবে। দ্বিতীয় অবস্থা এই, যে, এই প্রভাবশালী দলের নির্দ্দিষ্ট উপায় বা পন্থা বা প্রণালী সম্বন্ধে সকলে একমত না হইলেও, অধিকাংশ লোক বা সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী দল তাহার অনুসরণ করিবে; অন্ততঃ, ইহা ত চাইই, যে, এত লোক তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিবে না, যাহাতে তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়।

অসহযোগ-প্রচেষ্টায় যে উপায় বা কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহার কোন সমালোচনা করা এখন আমাদের অভিপ্রেত নহে। কিন্তু তাহা সফল না হইবার কারণ এই, যে, আমরা যেরূপ অবস্থার কথা বলিয়াছি, দেশে সে অবস্থা উপস্থিত হয় নাই। সমুদয় বা অধিকাংশ ছাত্র স্কুল কলেজ ত্যাগ করে নাই, এবং যাহারা করিয়াছিল, তাহাদেরও অধিকাংশ আবার ফিরিয়া আসিয়াছিল; দেশের অতি অল্পসংখ্যক লোকই আইনের ও সরকারী আদালতের সাহায্য লওয়া হইতে বিরত হইয়াছিল বা হইয়াছে, প্রধান অসহযোগীরাও কোন কোন বিষয়ে আইনের ও সরকারী কোন কোন কার্য্য-বিভাগের সাহায্য লইয়াছেন; অতি অল্পসংখ্যক উকীল ব্যারিষ্টার আইন-ব্যবসা ছাড়িয়াছিলেন,—যাঁহারা ছাড়িয়াছিলেন, তাঁহাদেরও অনেকে আবার তাহা করিতেছেন; দেশের অধিকাংশ লোক খদ্দর প্রস্তুত করা দূরে থাক্, খদ্দর ব্যবহারও করে নাই, এবং স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী ছাড়া অন্য অসহযোগীরা চর্‌কায় সূতা কাটা ও তাঁতে কাপড় বোনা অপেক্ষা তৎসম্বন্ধে বক্তৃতা বেশী করিয়াছেন; অস্পৃশ্যতায় বিশ্বাস কার্য্যতঃ ত্যাগ এবং কার্য্যতঃ তাহা দূরীকরণের চেষ্টা অপেক্ষা তদ্বিষয়ে বক্তৃতাই বেশী হইয়াছে; হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যও বেশী পরিমাণে স্থাপিত হয় নাই; ইত্যাদি।

এই-সমস্ত বিষয়ে কাজ চালাইতে বলা হইয়াছিল। তাহার পর, ভবিষ্যতে আবশ্যক হইলে, ট্যাক্স্ না দেওয়া, এবং সৈনিক-বিভাগে, পুলিশ-বিভাগে এবং অন্যান্য সমুদয় সরকারী কার্য্য-বিভাগে চাকরী না করা, এই দুটি উপায়ও অবলম্বিত হইবার কথা ছিল। ট্যাক্স্ না দিবার মত জাতির মনের ভাব ও দেশের অবস্থা হইয়াছে কি না, স্থির করিবার নিমিত্ত এক কংগ্রেস-কমিটি সব প্রদেশে বেড়াইয়া স্থির করেন, যে, মনের ভাব ও অবস্থা উহার অনুকূল নহে। সরকারী চাকরী না করা সম্বন্ধে বিবেচনারও প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই; কারণ, ইহা সবাই জানে যে, মাহিনার চাকরের ত কথাই নাই, গবর্ণমেণ্টের অবৈতনিক চাকরী করিবার লোকও দেশে যথেষ্ট রহিয়াছে।

আমরা আগে বলিয়াছি, স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ কোন

দেশে আরম্ভ হইলে, যদি সেই দেশেরই কতক লোক, তাহাতে যোগ না দিলেও, তাহার বিরোধী হইয়া স্বাধীনতা-সমরে যথেষ্ট বাধা দিতে না পারে, তাহা হইলে তাহা স্বাধীনতালাভের পক্ষে একটা অনুকূল অবস্থা বলিয়া বিবেচিত হয়। গৃহ-শত্রু থাকিলে কোন প্রচেষ্টা সফল হয় না। অসহযোগ-প্রচেষ্টা যুদ্ধ কথাটির প্রচলিত অর্থে যুদ্ধ নহে। কিন্তু যুদ্ধের ন্যায় ইহাও গবর্ণমেণ্টকে কাবু করিবার একটি উপায়। স্বাধীনতা-যুদ্ধ যে-কারণে ব্যর্থ হইতে পারে, ইহাও সেই কারণে ব্যর্থ হইয়াছে। অর্থাৎ কোন দেশে স্বাধীনতা-প্রয়াসী দলকে বাধা দিবার এবং তত্রত্য বর্ত্তমান রাজা বা শাসকদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিবার লোক যদি জাতির মধ্যেই থাকে, তাহা হইলে স্বাধীনতা-লাভ দুঃসাধ্য বা অসাধ্য হইয়া উঠে। আমাদের দেশেও দেখা যাইতেছে, যে, অসহযোগ আন্দোলনের প্রারম্ভিক ও প্রস্তুতিবিধায়ক কার্য্যপ্রণালী অনুসরণ করিবার লোক অপেক্ষা উহা অনুসরণ না করিবার ও উহাতে বাধা দিবার লোক বেশী ছিল। অসহযোগ-প্রচেষ্টার চরম উপায় যে গবর্ণমেণ্টের যথেষ্ট ট্যাক্স-প্রাপ্তি এবং চাকর-প্রাপ্তি অসম্ভব করিয়া তোলা, তাহা অবলম্বন করিবার মত অবস্থা ত হয়ই নাই।

অসহযোগীদের মধ্যে কৌন্সিল-প্রবেশ-পক্ষীয় দলেরও বিফল-প্রযত্ন হইবার কারণ এই, যে, আমরা স্বাধীনতা-যুদ্ধে জয়লাভের জন্য যে যে অবস্থা আবশ্যক বলিয়াছি, সেগুলি বিদ্যমান নাই। প্রত্যেক প্রদেশের কৌন্সিল এবং সমগ্রভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় যদি নির্ব্বাচকেরা কেবল বা অধিকাংশ স্বরাজ্য-দলের লোক পাঠাইতেন, তাহা হইলে ঐ দলের লোকেরা যাহা করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা করিতে পারিতেন। অবশ্য,তাহা করিলেও,গবর্ণমেণ্ট অচল হইত না। কিন্তু এবার তাঁহারা যতটুকু করিতে পারিয়াছেন, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট যে পরিমাণে চিন্তিত ও বিব্রত হইয়াছেন, তাহা অপেক্ষা গবর্ণমেণ্টকে বেশী চিন্তিত ও বিব্রত হইতে হইত;—পরে ফল যাহাই হউক।

একটা কথা আমাদের সকলকে মনে রাখিতে হইবে —আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বা তাহা অপেক্ষা কম রাষ্ট্রীয় অধিকার ও ক্ষমতা, যাহাই লাভ করিতে সমর্থ হই না কেন, তাহা হয় ব্রিটিশ জাতিকে বুঝাইয়া রাজি করিয়া লইতে হইবে, নতুবা তাহা তাহাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও আদায় করিয়া লইতে হইবে। রাজি করিয়া লইতে হইলেও প্রমাণ করিতে হইবে, যে, আমরা সবাই বা অধিকাংশ লোক দাবী সম্বন্ধে একমত, কাড়িয়া লইতে হইলেও প্রমাণ করিতে হইবে, যে, আমাদের সকলের বা অধিকাংশের ঐক্যজনিত-শক্তি আছে।

উদার-নৈতিক দলের নেতাদের বক্তৃতা আদি হইতে মনে হয়, যে, তাঁহারা আপাততঃ সামরিক-বিভাগ এবং দেশী রাজ্যগুলির সহিত সম্পৃক্ত বিভাগ ছাড়া ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ সব কাজ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ক্ষমতা চান। সফল স্বাধীনতা-যুদ্ধ দ্বারা যেমন কখন কখন খুব শীঘ্র স্বাধীনতা লব্ধ হইতে পারে, শান্তির পথে তত শীঘ্র ফল পাওয়া যাইতে পারে না; হয়ত একেবারে সমস্তটা না পাইয়া ক্রমশঃ সবটা পাওয়া যাইতে পারে। এইজন্য ভাবিতেছিলাম, ভারতের রাষ্ট্রীয় দাবী সম্বন্ধে উদার-নৈতিক দল ও স্বারাজিক দল কত দূর পর্য্যন্ত একমত, উভয় দলের নেতারা পরামর্শ করিয়া তাহা স্থির করিয়া, তাহাকেই ভারতীয়দের ন্যূনতম দাবীরূপে উপস্থাপিত করিলে কেমন হয়? ব্রিটিশ জাতিকে বুঝাইতে হইলে ইহা একটা পথ।

চরম পন্থা অবশ্য পড়িয়াই আছে। এই গরীব, বেকারবহুল, প্রতিযোগী নানা সম্প্রদায়ে পূর্ণ দেশে বিদেশী গবর্ণমেণ্টকে যথেষ্ট চাকরবিহীন কখন্ করা যাইবে, বলা যায় না; কিন্তু কোন কোন স্থানে ট্যাক্স না দেওয়ার চেষ্টা হয়ত কিছুদিন পরে আরম্ভ হইতেও পারে। কিন্তু তাহাকে অন্ততঃ একটা প্রদেশব্যাপী করিতে না পারিলে তাহাতে ঈপ্সিত ফললাভের আশা আছে কি? প্রজারা ট্যাক্স না দিলে, গবর্ণমেণ্টকে জোর করিয়া তাহা আদায় করিতে হইবে। তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডে ও সভ্য জগতের অন্যত্র লুণ্ঠনজীবী বলিয়া প্রতীত হইবেন। এই ভাবে দেশের কাজ বরাবর চালান যায় না। ইহার শেষ দুই প্রকারে হইতে পারে;—হয় গবর্ণমেণ্ট জোর করিয়া ট্যাক্স আদায়ের চেষ্টা ছাড়িয়া দিবেন এবং প্রজাদের মত-অনুযায়ী শাসন-প্রণালী স্থাপন করিবেন, নতুবা প্রজারাই ট্যাক্স দিতে বাধ্য হইবেন এবং তাঁহাদের পরাধীনতার

মাত্রাও বাড়িতে পারে। ফল কি-প্রকার হইবে, তাহা প্রজাদের প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা এবং সর্ব্বপ্রকার দুঃখ-সহিষ্ণুতা ও প্রাণ পণ করিবার ক্ষমতার উপর নির্ভর করিবে।

—

স্বরাজ্য-দলের বাধা-দান-নীতি

স্বরাজ্যদল যে সব বিষয়ে সুসঙ্গতভাবে বাধা-দান-নীতি প্রয়োগ করিতে পারেন নাই, তাহার জন্য সম্ভবতঃ দলের নেতারা বা সমুদয় সভ্য দায়ী নহেন। কিন্তু যদি তাঁহারা কোন-প্রকার লোভ দেখাইয়া বা লুব্ধতা চরিতার্থ করিয়া দল পুরু করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধ পক্ষ সেই খেলায় তাঁহাদিগকে পরাজিত করায় তাঁহাদের চেষ্টা সফল না হইয়া থাকে, তাহা হইলে অগত্যা উভয় পক্ষের, বিশেষতঃ খেলার প্রবর্ত্তকদিগের, নিন্দা করিতেই হইবে। স্বরাজ্যদল এই বলিয়াই কৌন্সিলগুলিতে যাইতে চাহিয়াছিলেন এবং নির্ব্বাচন-লড়াই ফতেও করিয়াছিলেন, যে, দ্বিবিভক্ত শাসন-প্রণালী ও কৌন্সিলগুলি তাঁহারা ধ্বংস করিবেন। ঠিক্ তাহা করিবার সামর্থ্য তাঁহাদের নাই জানিয়া তাঁহারা যে পূর্ব্ব-ঘোষিত নীতির কতকটা পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাদিগকে দোষ দিতেছি না। অবস্থা দেখিয়া কার্য্য-নীতি ও কার্য্য-প্রণালী পরিবর্ত্তন করা দোষা-বহ নহে। কিন্তু বাধা-প্রদাতারা বজেটের যে যে বরাদ্দ নামঞ্জুর করিতে পারিয়াছেন, ও যাহা মঞ্জুর করিয়াছেন, তাহার সকলগুলির মধ্যে কোন একটি সুসঙ্গত ও সুচিন্তিত নীতি সকল স্থলে ধরিতে পারা যাইতেছে না। দৃষ্টান্ত দিতেছি।

আব্‌গারী-বিভাগের ব্যয় মঞ্জুর হইয়াছে, কিন্তু স্কুল-পরিদর্শকদের বেতনাদি বাবদে ব্যয় মঞ্জুর হয় নাই। মদ গাঁজা আফিং প্রভৃতি উৎপাদন ও তাহাদের বিক্রীর তদন্ত করা, এবং তাহার কাট্‌তি বাড়াইয়া সরকারের রাজস্ব বাড়ান, স্কুল-পরিদর্শন অপেক্ষা জাতির পক্ষে কি অধিক কল্যাণকর ও একান্ত আবশ্যক কাজ? জেলের বরাদ্দ তাঁহারা নামঞ্জুর করিয়াছেন, কিন্তু পুলিশের বরাদ্দ কোন কোন দফায় কমাইলেও মোটামুটি টাকাটা মঞ্জুর হইয়াছে। অর্থাৎ, ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের মতে পুলিশের আসামী-চালান্ কাজ ও আসামীদের কারাদণ্ড-বিধান চলিতে থাক্, কিন্তু কয়েদীদিগকে আটক রাখিবার লোক এবং তাহাদিগকে খাইতে দিবার টাকা যেন না থাকে! চিকিৎসা-বিভাগের অনেক লোককে, টাকা মঞ্জুর না হওয়ায়, যে বর্‌খাস্ত করিতে হইতে পারে, তাহার মধ্যেই বা কি সুসঙ্গত কারণ আছে? তাহারা কি আব্‌গারী বিভাগের লোকদের চেয়েও অকেজো?

আমরা বলিতেছি না, যে, দল-বিশেষের দোষে বা গুণে এই-সব অসঙ্গতি ঘটিয়াছে; কিন্তু ইহা নিশ্চয়, যে, বাধা-দাতা সভ্যদের মধ্যে অব্যবস্থিতচিত্ত, চিন্তায় অনভ্যস্ত, বা অতিরিক্ত পরিমাণে স্বার্থ-সিদ্ধি-লোলুপ লোক কতকগুলি আছে।

দায়িত্ব-মূলক গবর্ণ্‌মেণ্ট্

দ্বিবিভক্ত শাসন-প্রণালী যখন প্রবর্ত্তিত হয়, তখন সর্‌কার-পক্ষ হইতে বলা হইয়াছিল, যে, কতকগুলি বিষয় ও বিভাগ থাকিবে, যাহা হস্তান্তরিত ও মন্ত্রীদের হস্তে অর্পিত হইবে। তাহার কাজ মন্ত্রীরা ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের অধিকাংশের মত অনুসারে চালাইবেন, অর্থাৎ উহার জন্য তাহারা ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী থাকিবেন। ব্যবস্থাপক সভায় যদি এমন কোন প্রস্তাব ধার্য্য হয়, যাহাতে বুঝায় যে মন্ত্রীদের উপর উহার আস্থা নাই, তাহা হইলে মন্ত্রীরা আর কাজ করিতে পারিবেন না। ইহাই নূতন শাসনপ্রণালীর মর্ম্ম বলিয়া লোকে বুঝিয়াছিল। কারণ, যদি ব্যবস্থাপক সভার মতকে অগ্রাহ্য করিয়া মন্ত্রীরা কাজ করিতে পারেন, তাহা হইলে দায়িত্ব-মূলক গবর্ণমেণ্টের কোন মানে থাকে না, উহা প্রহসনে পরিণত হয়।

অথচ বাংলাদেশে দেখিতেছি, মন্ত্রীদের বেতন মঞ্জুর হয় নাই, অর্থাৎ ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ সভ্য মনে করেন, যে, ওরূপ লোককে বেতন দিয়া রাখা টাকার অপব্যবহার; তথাপি মন্ত্রীরা মন্ত্রী আছেন। ইহা ভারত-শাসন আইনের অনুযায়ী কি না, তাহার একটা পরীক্ষা হওয়া দর্‌কার।

একটা খবর রটিয়াছে, যে, শিক্ষা-বিভাগের ও চিকিৎসা-বিভাগের কতকগুলি কর্ম্মচারীকে এই ওজুহাতে তিন মাসের নোটিস্ দিয়া বরখাস্ত করা হইবে, যে, ব্যবস্থাপক সভা তাঁহাদের বেতন মঞ্জুর করেন নাই। কিন্তু ভারতশাসন আইনে আছে, যে, হস্তান্তরিত বিভাগগুলির কোন টাকার মঞ্জুর না হইলে তাহা চালাইবার জন্য আবশ্যক টাকা গবর্ণর্ স্বয়ং মঞ্জুর করিতে পারেন। যদি কোন কারণে মন্ত্রীদের অস্তিত্ব না থাকে, তাহা হইলে গবর্ণর্ স্বয়ং হস্তান্তরিত বিভাগগুলির ভার নিজের হাতে লইয়া তাহা চালাইবার মত টাকা স্বয়ং মঞ্জুর করিতে পারেন।

এইরূপ কোন ব্যবস্থা না করিয়া গবর্ণর্ যে অনেক কর্ম্মচারী ছাড়াইয়া দিবেন বলিয়া সংবাদ বাহির হইয়াছে, তাহার মধ্যে অনেকে গূঢ় অভিসন্ধি দেখিতে পাইতেছেন। অর্থাৎ গবর্ণ্‌মেণ্ট্ দেশের লোককে যেন প্রকারান্তরে বলিতে চাহিতেছেন, "দেখ, তোমাদের স্বদেশবাসীরা ইঁহাদের বেতন মঞ্জুর করে নাই; আমরা কি করিতে পারি বল? এমন লোককে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করাই তোমাদের ভুল হইয়াছে।" কোন কাজের মধ্যে কোন দুরভিসন্ধি আছে কি না, নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন; কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আরোপিত অভিসন্ধি থাকা অসম্ভব মনে হইতেছে না। যাহা হউক, যদি গবর্ণ্‌মেণ্টের এরূপ মৎলব থাকে, তাহা হইলে তাহার ফল উল্টা হওয়াও বিচিত্র নহে। কারণ, লোকে ইহা ত সহজেই জিজ্ঞাসা করিতে পারে, যে, গবর্ণর্ কেন তাঁহার আইনপ্রদত্ত ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া বিভাগগুলি চালাইবার মত টাকা মঞ্জুর করিলেন না। এইসব কর্ম্মচারী ব্যতিরেকে বিভাগ দুটির কাজ আগেকার মত সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে কেমন করিয়া চলিতে পারে?

আর যদি বহু কর্ম্মচারীকে ছাড়াইয়া দিয়াও এই দুটি বিভাগ চলিতে পারে, তাহা হইলে গবর্ণ্‌মেণ্টের হস্তে রক্ষিত রিজার্ভ্‌ড্ বিভাগগুলির কর্ম্মচারী কমাইয়া দিলেই বা সেগুলি কেন না চলিবে? কিন্তু তাহা কমাইতে গেলেই ত শ্বেত আম্‌লাবর্গ মহা কোলাহল উত্থাপিত করেন।

ভারতশাসন আইনটির একটি মজা দেখুন। গবর্ণ্‌মেণ্টের হস্তে রক্ষিত রিজার্ভ্‌ড্ কোন বিভাগের জন্য বরাদ্দ টাকা নামঞ্জুর করিবার ক্ষমতা ব্যবস্থাপক সভার নাই বা কেবল নামে মাত্র আছে; কেন না, উহার কোন বরাদ্দ সভা নামঞ্জুর করিলেও গবর্ণর্ তাহা অবিলম্বে মঞ্জুর করিতে পারেন। তাহাতে ফল এই হয়, যে, রক্ষিত বিভাগগুলির কোন কর্ম্মচারীর চাক্‌রী যাইবার সম্ভাবনা নাই বলিলেই হয়।

কিন্তু হস্তান্তরিত বিভাগগুলির জন্য বরাদ্দ টাকা বাস্তবিকই নামঞ্জুর করিবার ক্ষমতা ব্যবস্থাপক সভার আছে। সুতরাং এইসব বিভাগের কর্ম্মচারীদের চাক্‌রী যাইবার সম্ভাবনা আছে, এবং এই বিভাগগুলিই দেশী মন্ত্রীদের হাতের বিভাগ। অতএব আইনের মধ্যেই এরূপ বন্দোবস্ত রহিয়াছে, যাহাতে দেশী মন্ত্রী ও দেশী সভ্যেরা লোকের বিরাগভাজন হইতে পারে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, তোমরা টাকা নামঞ্জুর করিয়া বিরাগভাজন হও কেন? বজেটে যে যে দফায় যত টাকা লেখা থাকে, তাহাতে "হাঁ" বলিলেই পার। গবর্ণ্‌মেণ্টের অভিপ্রায় তাহাই বটে। কিন্তু তাহা হইলে বজেটটা ব্যবস্থাপক সভার মতের জন্য পেশ্ করাই বা হয় কেন? এবং রক্ষিত বিভাগগুলির জন্য বেশী টাকা রাখিয়া হস্তান্তরিত বিভাগগুলির জন্য কম কম টাকা রাখিলে, তাহার প্রতিবাদ কেমন করিয়া করা যায়? দেশে জুলুম জবর্‌দস্তী অত্যাচার হইলে সে-সম্বন্ধে জন-সাধারণের মতের প্রভাব গবর্ণ্‌মেণ্ট্‌কে অনুভব করাইবারই বা উপায় কি আছে? সে-সব বিষয়ে কোন প্রস্তাব ধার্য্য হইলে আইন অনুসারে তদনুযায়ী কাজ করিতে গবর্ণ্‌মেণ্ট্ বাধ্য নহেন, এবং অধিকাংশ স্থলে গবর্ণ্‌মেণ্ট্ তাহা অগ্রাহ্যই করিয়া থাকেন।

—

ইংরেজ জাতি ও ইংরেজের শাসন-প্রণালী

এইরূপ কথা মধ্যে মধ্যে শুনা যায়, যে, ব্যক্তিগতভাবে এবং জাতিগতভাবে ইংরেজদের সহিত আমাদের কোন ঝগ্‌ড়া নাই, ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের শাসন-প্রণালীরই আমরা

বিরোধী। ইহা সত্য, যে, কোনও ইংরেজের প্রতি আমাদের বিদ্বেষ থাকা উচিত নয়, সমুদয় ইংরেজের সমষ্টি ইংরেজ জাতির প্রতিও আমাদের বিদ্বেষ থাকা উচিত নয়। এমন ইংরেজও আছেন যিনি ভারতীয়দের প্রতি অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করিয়া আমাদের প্রত্যেকের চেয়ে বেশী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে তথ্য নির্ণয় ও তাহার প্রতিকার করিবার নিমিত্ত আমাদের চেয়ে বেশী বিদেশভ্রমণ করিয়াছেন, কষ্ট ও লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছেন এবং পরিশ্রম করিয়াছেন, এবং কাগজে বার বার লিখিয়াছেন, যে, সম্পূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতবর্ষের একমাত্র লক্ষ্য হইতে পারে। আমরা এরূপ একজনকে জানি, অন্যেরা আরও ভারতবন্ধু ইংরেজের বিষয় অবগত থাকিতে পারেন। সুতরাং সমুদয় ইংরেজকে আমাদের বিরোধী মনে করিবার কারণ নাই।

কিন্তু ভারতে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত ইংরেজদের শাসন-প্রণালী ত স্বতন্ত্র দেহ- ও প্রাণবিশিষ্ট একটি জীব নহে, যে, ইংরেজ জাতিকে বেকসুর খালাস দিয়া আমরা সেই জীবটিকেই তাহার ভুল ও দোষ দেখাইয়া তাহার সংশোধনের চেষ্টা করিব। হইতে পারে, যে, এই শাসনপ্রণালী যখন ক্রমশঃ উদ্ভাবিত ও প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তখন তাহার প্রয়োজন ও উপকারিতা ছিল। কিন্তু এখন উহার আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

উহার উদ্ভাবন ও প্রবর্ত্তন ইংরেজ জাতির লোকেরাই করিয়াছিল। উদ্ভাবক ও প্রবর্ত্তকদের মধ্যে অল্প লোকই এখন জীবিত আছে, সুতরাং কাহারও ইচ্ছা থাকিলেও তাহাদের সহিত ঝগড়া করিবার বা তাহাদিগকে শাস্তি দিবার উপায় নাই। কিন্তু ইংরেজ জাতির লোকেরাই ঐ প্রণালী প্রচলিত রাখিয়াছে। এখানে এই আপত্তি উঠিতে পারে, যে, যাহারা প্রচলিত রাখিয়াছে, তাহাদিগকেই দায়ী কর, সমস্ত ইংরেজ জাতিকে কেন দায়ী করিতেছ? দায়ী এইজন্য করিতেছি, যে, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শাসন-প্রণালী হইতে যে সাংসারিক লাভ, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি উৎপন্ন হয়, সমগ্র ইংরেজ জাতি তাহা ভোগ করিতেছে; দায়ী এইজন্য করিতেছি, যে, ইংলণ্ডের লোকেরা পার্লেমেণ্টে তাহাদের প্রতিনিধিদের দ্বারা বর্ত্তমান প্রণালীর মূল উচ্ছেদ বা পরিবর্ত্তন করাইতে পারেন, অথচ করিতেছেন না।

অতএব ইহা যদিও সত্য, যে, ব্যক্তিগত বা জাতিগত ভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আমাদের কোন বিদ্বেষ থাকা উচিত নয়; তথাপি সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সত্য, যে, তাহাদের সহিত আমাদের এই বিরোধ আছে, যে, আমাদিগকে বঞ্চিত রাখিয়া তাহারা সমস্ত জাতি নানা প্রকার সুবিধা ভোগ করিতেছে, এবং এরূপ শাসনপ্রণালী তাহারা প্রচলিত থাকিতে দিয়াছে, যাহা দ্বারা তাহারা লাভবান্ হয় কিন্তু আমাদের অনিষ্ট হয় ও আমাদের মনুষ্যত্ব খর্ব্ব হয়। শুধু তাহাই নহে। তাহারা আমাদের কৃতজ্ঞতার দাবী করে, আমরা দোষ দেখাইলে তাহারা আত্মপ্রশংসায় মেদিনী পূর্ণ করে, এবং আমরা কোন পরিবর্ত্তন ঘটাইবার চেষ্টা করিলে তাহারা তাহাতে যথাসাধ্য বাধা দেয়।

এইসকল কারণে আমরা মনে করি, ইংরেজের শাসনপ্রণালী ও ইংরেজ জাতি উভয়েরই সহিত আমাদের বিরোধ আছে। "ইংরেজ জাতি" আমরা "অধিকাংশ ইংরেজ" অর্থে ব্যবহার করিতেছি। আমরা মনে করি না, যে, নেশ্যন্ বা জাতি হিসাবে কোন জাতিই ন্যায়বান্, বিশেষতঃ যে-সব বিষয়ের সহিত তাহাদের স্বার্থ জড়িত সেইসব বিষয়ে। এই হেতু অনেক খ্যাতনামা ভারতীয় রাজনীতিজ্ঞের ব্যবহৃত "বৃটিশ সেন্স্ অব্ জাষ্টিস্" অর্থাৎ "বৃটিশ ন্যায়বুদ্ধি" কথাগুলিকে আমরা একটি কাল্পনিক বস্তুর বর্ণনা বলিয়া মনে করি। ন্যায়বুদ্ধি সম্বন্ধে ব্রিটিশ-জাতি অন্য জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিবারও কোন প্রমাণ পাই নাই।

—

"রঙীন" ও "বিবর্ণ" মানুষ

যে-সব জাতি আপনাদিগকে শ্বেত বলিয়া থাকেন, তাঁহারা বাস্তবিক শ্বেত নহেন, ঈষৎ লাল্‌চে কটা। অন্য সব জাতিকে তাঁহারা কলার্ড্ অর্থাৎ বর্ণবিশিষ্ট বা রঙীন বলিয়া থাকেন। তাহা হইলে তাঁহাদিগকেও বর্ণহীন বা বিবর্ণ বলা যাইতে পারে।

রঙীন ছবি আজকাল সব দেশে মাসিক হইতে দৈনিক পর্য্যন্ত নানা কাগজে দেখা যায়। এই ফ্যাশান্ হইতে অনুমান হয়, যে, রঙীন ছবির আদর আছে। কিন্তু "রঙীন" মানুষরা সর্ব্বত্রই অবজ্ঞার পাত্র, "বিবর্ণ" মানুষরাই সর্ব্বত্র শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত। ইহার কারণ কি ?

১৯২৪ সালের হুইটেকার পঞ্জিকা বলেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ১৯১১ সালে মোট ছয় কোটি "বিবর্ণ" মানুষ ছিল। বাকী সাঁইত্রিশ কোটি "রঙীন" মানুষ। এই ছয় কোটি মানুষ অন্য সাঁইত্রিশ কোটির প্রভু। অবশ্য ইহা ঠিক্, যে, মোটের উপর ঐ ছয় কোটির মধ্যে যত লোকের বৈজ্ঞানিক, যান্ত্রিক ও অন্যবিধ জ্ঞান আছে, এবং দলবদ্ধতা আছে, অন্য সাঁইত্রিশ কোটির মধ্যে তাহা নাই। এই তথ্যের মধ্যে ক্ষমতার আধিক্য ও অল্পতার কারণের কিছু সন্ধান পাওয়া যায়।

তাহা হইলেও মৌলবী আব্দুল করিম ও শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কর্ত্তা হইলে "রঙীন" লোকদের সুবিধা হইতে পারিত। তাহারা চাকুরী এবং সাম্রাজ্যিক অন্য সবরকম সুবিধা ও ক্ষমতার শতকরা ৮৬ ভাগ পাইত এবং "বিবর্ণ"দিগকে ১৪ ভাগে সন্তুষ্ট হইতে হইত। প্রকৃতি ও বিধাতা এখনও ভাল করিয়া ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্-বিদ্যা আয়ত্ত করিতে না পারায় কেবল সংখ্যা অনুসারে সাংসারিক ক্ষমতা ও সুখ-সুবিধার ভাগ-বখ্‌রা হইতেছে না।

এই অবিচারের প্রমাণ আর এক দিক্ দিয়া দেখুন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে হিন্দুদের সংখ্যা একুশ কোটির উপর, মুসলমানদের দশ কোটি, খৃষ্টিয়ানদের আট কোটি, বৌদ্ধদের এক কোটি কুড়ি লক্ষ, ইত্যাদি। কিন্তু আট কোটি খৃষ্টিয়ানের ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্য অন্য সব লোকদের সমষ্টির ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যের চেয়ে বেশী। এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই পরাধীন হইলেও ১০ কোটি মুসলমানের সম্বন্ধে যে ভয়ের ভাব আছে, একুশ কোটি হিন্দুর সম্বন্ধে তাহা নাই। সেইজন্য কখন কখন মনে একটু সন্দেহ হয়, যে, সংখ্যাধিক্যই সম্ভবতঃ দাবী সাব্যস্ত করিবার একমাত্র উপায় নহে।

রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্ব-এশিয়া ভ্রমণ

আজকাল স্কুলের ছেলেরাও জানে, যে, পুরাকালে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব এশিয়া মহাদেশের মধ্য, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ অংশে এবং প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে বিস্তৃত হইয়াছিল। এখনও তাহার নিদর্শন অনেক দেশের ও দ্বীপের প্রাচীন মন্দিরাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রমাণ সাধারণ লোকেরাও বুঝিতে পারে। পণ্ডিতবর্গ আরও প্রমাণ ঐসব দেশের ধর্ম্ম, সাহিত্য, নানাবিধ শিল্প এবং আচারব্যবহার হইতেও আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রধানতঃ বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শিক্ষকগণ ভারতীয় জ্ঞান বিজ্ঞান সভ্যতা এশিয়ায় বিস্তার করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের সহিত এশিয়ার অন্য দেশগুলির সম্বন্ধ থাকায় কেবল যে তাহারাই উপকৃত হইয়াছিল, তাহা নয়; ভারতবর্ষেরও উপকার হইয়াছিল।

বহুশতাব্দী পরে একজন ভারতীয় মনীষী চীনদেশে ভারতের বাণী প্রচার করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। পেকিন বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে তথায় বক্তৃতা করিতে আহ্বান করিয়া আপনাদের হৃদয়মনের উৎকর্ষের পরিচয় দিয়াছেন। যে জাতি অন্য জাতিসকলের মধ্যে যত বেশী পরিমাণে সাধারণ মানবত্ব দেখিতে পাইয়া নিজ আচরণ দ্বারা তাহা স্বীকার করে, সে জাতি তত শ্রেষ্ঠ। উদারভাবে নানা মত, আদর্শ, ও সভ্যতার আলোচনা করিয়া তাহার সার অংশ নিজের করিয়া লইতে পারা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের উপর নির্ভর করে। কোন মানুষ যদি পরিচিত অপরিচিত আগন্তুকদিগকে নিজের বাড়ীতে স্থান দিয়া তাঁহাদের যথোচিত আদর যত্ন করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আমরা অতিথিপরায়ণ বলি ও তাঁহার আতিথেয়তার প্রশংসা করি। সেইরূপ যে জাতি নানা মত চিন্তা ভাব আদর্শ প্রভৃতির জন্য মনের দ্বার খুলিয়া রাখে, তাহার মানসিক আতিথেয়তা আছে বলিয়া আমরা প্রশংসা করি।

পৃথিবীর মধ্যে এখনও দুইটি বড় দেশে পর-মত-সহিষ্ণুতা, পরমত সম্বন্ধে ঔদার্য্য এবং মানসিক আতিথেয়তা বিশেষভাবে বিদ্যমান আছে। ভারতবর্ষ ও চীন সেই দুইটি দেশ। ভারতবর্ষে মধ্যে মধ্যে হিন্দুমুসলমানের

ঝগড়া, স্বতঃ কিম্বা তৃতীয় পক্ষের প্ররোচনায়, হয় বটে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহা জোর করিয়া বলা যায়, যে, এদেশে যে পরিমাণ পর-মত-সহিষ্ণুতা আছে, চীন ছাড়া অন্য কোন বড় দেশে তাহা নাই। 'সভ্য' ইউরোপের অবস্থা দেখুন। স্পেনে মুসলমান ধর্ম্ম ছিল, কিন্তু স্পেনের খৃষ্টিয়ানরা তাহাকে নির্ম্মূল না করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই। আধুনিক সময়েও গ্রীকের অধীনস্থ স্থানসকল হইতে তুর্ক্ মুসলমানরা তাড়িত হইয়াছে (এবং তাহাদের জন্য অর্থ ভিক্ষা করিতে তুর্ক্ প্রতিনিধিরা ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন), তুর্কের অধীনস্থ স্থানসকল হইতে খৃষ্টিয়ান গ্রীকেরা তাড়িত হইয়াছে। বহু বৎসর ধরিয়া এই কথা বার বার শোনা গিয়াছে, যে, খৃষ্টিয়ানেরা ম্যাসিডোনিয়ায় মুসলমানদিগকে নির্ম্মূল করিবার চেষ্টা করিয়াছে, এবং মুসলমানেরা আর্মেনিয়ায় খৃষ্টিয়ানদিগকে নির্ম্মূল করিতে চেষ্টা করিয়াছে।

চীনে কংফুচের ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম, "তাও" ধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম, খৃষ্টীয় ধর্ম্ম, ইহুদী ধর্ম্ম, এবং নানা আদিম পার্ব্বত্য জাতিসকলের প্রকৃতি-পূজা ধর্ম্ম প্রচলিত আছে। অধিকাংশ চীন (যাহারা মুসলমান বা খৃষ্টিয়ান নহে) কংফুচের ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম এবং "তাও" ধর্ম্ম তিনটিই মানে। "তাও" ধর্ম্ম বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইতে ক্রিয়াকলাপ গ্রহণ করিয়াছে। ভারতবর্ষেও প্রচলিত হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মে পরস্পরের প্রভাব লক্ষিত হয়।

এই দুটি দেশের মধ্যে অতীত কালে যে হৃদয়মনের যোগ ছিল, আধ্যাত্মিক যোগ ছিল, তাহা পুনঃস্থাপিত হইলে এক নূতন যুগের আরম্ভ হইবে, বলা যায়। এইরূপ যোগের তুলনায় রাজনৈতিক সন্ধি ও বুঝাপড়া অতি তুচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ী। চীন ভাষায় এখনও ভারতীয় নানা গ্রন্থের অনুবাদ আছে। তাহার সবগুলির মূল এখন বর্ত্তমান নাই। তদ্ভিন্ন চীনের সাম্রাজ্যিক লাইব্রেরীতে বহু সংস্কৃত পুথি আছে। এইসব অনুবাদের ভারতীয় অনুবাদ এবং সংস্কৃত পুথিগুলির মুদ্রণ একান্ত আবশ্যক।

গত কয়েক বৎসরে চীনের আশ্চর্য্য মানসিক জাগরণ হইয়াছে। যে পরিবর্ত্তন ও উন্নতি ঘটিতে ইউরোপের অনেক শতাব্দী লাগিয়াছে, চীনে এক পুরুষের মধ্যে, কোন কোন বিষয়ে দশ বৎসরের মধ্যে, তাহা ঘটিতেছে। আমাদের দেশে এই সেদিন রবি-বাবুর বিদায়-সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষ্যে একটা আজব্ চীজ্ স্বরূপ রেডিও দ্বারা গান শুনাইবার চেষ্টা হইয়াছিল। চীনে বহু বৎসর হইতে ব্যবসা বাণিজ্যে পর্য্যন্ত রেডিওর ব্যবহার চলিত হইয়াছে। চীনেরা অবিচারিত চিত্তে পাশ্চাত্য যা-তা লইতেছে না; সবই সমালোচক ও বিচারকের দৃষ্টিতে পরখ করিয়া লইতেছে। প্রতিবৎসর হাজার হাজার চীন ছাত্র নানা দেশে বিদ্যালাভার্থ যাইতেছে। এখন চীনদেশে কোথাও কোথাও অশান্তি ও শৃঙ্খলার অভাব আছে বটে; কিন্তু তাহা কাটাইয়া উঠিয়া উহার অধিবাসীরা মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে বলিয়া আশা আছে। এ-হেন দেশের সহিত ভারতের হৃদয়মনের যোগ বাঞ্ছনীয়।

রবীন্দ্রনাথ চীন ছাড়া জাপান, বলী দ্বীপ, শ্যাম, কাম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশেও যাইবেন।

—

বিশ্বভারতীতে স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা

বোলপুরের শান্তিনিকেতনে যে ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম আছে, তাহা রবি-বাবুর বিদ্যালয় বলিয়া পরিচিত। ইহাতে বালকদের মত বালিকারাও শিক্ষা পায়। এই বৎসর এখান হইতে একটি বালিকা প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছে। কিন্তু পাশ করান এখানকার বিশেষত্ব নয়।

বালিকাদের শিক্ষা দান বাংলাদেশের এক কঠিন সমস্যা। দেশে অবরোধ-প্রথা চলিত থাকায়, এবং একদিকে পশুপ্রকৃতি ও অন্যদিকে ভীরু লোকদের অস্তিত্ব থাকায়, বালিকারা একটু বড় হইলেই তাহাদিগকে গাড়ী করিয়া স্কুলে আনিতে ও বাড়ী পাঠাইতে হয়। ইহাতে শিক্ষাদানের ব্যয় অত্যন্ত বাড়িয়া যায়, এবং সেই কারণে বালিকারা প্রায়ই প্রাথমিক শিক্ষা অপেক্ষা অগ্রসর হইতে পারে না। তা ছাড়া, বাড়ীতে ও স্কুলে উভয়ত্র বদ্ধ বাতাসে কালযাপন করায় তাহাদের স্বাস্থ্যও খারাপ হয়। এই কারণে, যে-সব জায়গায় বালিকারা অসঙ্কোচে স্বচ্ছন্দে খোলা জায়গায় চলাফিরা করিয়া মুক্ত বায়ু সেবন

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চীন-যাত্রার জন্য শান্তিনিকেতন হইতে যাত্রা করিবার সময় বিশ্বভারতীর ছাত্র শ্রীমান্ গৌরগোপাল রায়চৌধুরীর তোলা ফোটোগ্রাফ হইতে

করিতে পারে, সেইখানে তাহাদের শিক্ষালাভ বাঞ্ছনীয়। শান্তিনিকেতন এইরূপ স্থান।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ব্যবস্থা স্ত্রীশিক্ষার খুব অনুকূল;—ছাত্রীরা কোন স্কুলে বা কলেজে না পড়িয়াও প্রবেশিকা হইতে এম্ এ পর্য্যন্ত সমুদয় আর্ট্‌স্ পরীক্ষা দিতে পারে। এই ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া বিশ্বভারতীর কর্ত্তৃপক্ষ শান্তিনিকেতনে ছাত্রীদিগকে ইণ্টারমীডিয়েট ও বি এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত অধ্যাপনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইংরেজী, সংস্কৃত, পালি, ফ্রেঞ্চ্, গণিত, ইতিহাস প্রভৃতিতে তাঁহারা এখানে সাহায্য পাইতে পারেন। ছোট মেয়েদের চেয়ে বড় মেয়েদের মানসিক শ্রম অধিক হয় বলিয়া তাঁহাদের জন্য মুক্ত বায়ু ও অঙ্গচালনা আরও বেশী দরকার। তাহার পক্ষে শান্তিনিকেতন অতি উপযোগী স্থান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করান অবশ্য বিশ্বভারতীর প্রধান উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু যাঁহারা তাহা চান, তাঁহাদেরও সুবিধা হইবে, ইহাই বলা আমাদের উদ্দেশ্য। এখানে চিত্রাঙ্কন-বিদ্যা, সঙ্গীত, গৃহকর্ম্ম ও গৃহশিল্প, আহতের প্রাথমিক সাহায্য ও শুশ্রূষা, প্রভৃতি শিক্ষারও সুবিধা আছে। শান্তিনিকেতন ডাকঘর ঠিকানায় বিশ্বভারতীর অধ্যক্ষকে চিঠি লিখিলে সকল বিষয়ের সংবাদ ও তথ্য জানিতে পারা যায়।

—

তীর্থস্থান ও মহাবীর দল

তীর্থস্থানসকলে যাত্রীদের নানা অসুবিধা ও তাহাদের উপর নানা অত্যাচার হয়। তাহা দূর করিবার জন্য স্বামী বিশ্বানন্দ মহাবীর দল গঠন করিয়াছেন। উদ্দেশ্য প্রশংসনীয়। মহান্ত ও পাণ্ডাদের সুশিক্ষার বন্দোবস্তও চাই।

স্ত্রীলোকদের উপর পশুপ্রকৃতি লোকেরা দেশের নানা স্থানে, বিশেষতঃ উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গের কোন কোন জেলায়, যেরূপ অত্যাচার করিতেছে, তাহার প্রতিকারের জন্যও প্রত্যেক গ্রামে এইরূপ এক একটি দলের প্রয়োজন। ছাত্রেরা এখন গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ী যাইতেছেন। তাঁহারা নিজ নিজ গ্রামে এইরূপ দল গড়ুন। এইসব স্থানের হিন্দু পুরুষ এবং স্ত্রীলোকদের সাহস দৃঢ়তা ও প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিবার ক্ষমতা না বাড়িলে সম্পূর্ণ প্রতিকার করা দুঃসাধ্য। সর্ব্বত্র হিন্দুদের ভীরুতা ও দুর্ব্বলতার লজ্জাকর প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ইহা আমাদিগকে অত্যন্ত অনিচ্ছা ক্লেশ ও লজ্জার সহিত লিখিতে হইতেছে।

পশুপ্রকৃতি লোকদিগকেও সুশিক্ষা দ্বারা মানুষ করিতে হইবে।

—

রাষ্ট্রীয় পরাধীনতাই কি সব দুঃখের কারণ ?

মানুষের স্বভাবই এই, যে, সে নিজের দুঃখের জন্য অন্যকে দোষী করিতে পারিলে বেশ আরাম বোধ করে। সেইজন্য এখন আমাদের যত দুঃখ-দুর্দশা তাহার সমস্ত দোষটা বহুসংখ্যক স্বদেশপ্রেমিক রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার উপর চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হন। অন্যেরা যে আমাদিগকে অধীন করিতে পারিয়াছে, তাহাতে আমাদের কি কোন

দোষ ছিল না? এ-প্রশ্নটা বারবার আমরা কেন জিজ্ঞাসা করি না, তাহার আলোচনা না করিয়া এখন আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা বলি।

রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা তোফা আরামদায়ক ও গৌরব-জনক জিনিষ, আমরা এরূপ কোন অদ্ভুত কথা বলিতে যাইতেছি না। কিন্তু উহাই যদি সকল দুঃখের কারণ হইত, তাহা হইলে যে-যে দেশে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আছে, তাহাদের কোন দুঃখ থাকিত না। ইংলণ্ড স্বাধীন; কিন্তু সেখানে বহু বৎসর ধরিয়া এত ধর্ম্মঘট হইতেছে কেন, এত খনি নষ্ট হইয়াছে কেন, এত লক্ষ লোক বেকার কেন, এত দুশ্চরিত্রতা, পানমত্ততা, কুৎসিত ব্যাধির প্রাদুর্ভাব কেন? আমেরিকাও ত খুব স্বাধীন। সেখানে বড় বড় রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারী নিজ নিজ সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া "উপরি পাওনা"র দ্বারা বড়মানুষ হইতেছে কেন? তথায় ঘুস, এবং নিগ্রো, ইহুদী ও সাধারণতঃ শ্রম-জীবীদের উপর জুলুম ও অত্যাচার, এবং বিবাহ-সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ এত বেশী কেন?

অন্য দেশের কথা ছাড়িয়া দিয়া নিজের দেশে আসি। রাজনৈতিক কারণে অসহযোগীরা স্বীকার করিতেছেন, যে, অস্পৃশ্যতায় বিশ্বাস নিন্দনীয় এবং উহার উচ্ছেদ করা উচিত। এই অস্পৃশ্যতা জিনিষটা বহু শতাব্দী ধরিয়া কোটি-কোটি লোকের মনুষ্যত্বকে পিষিয়া ফেলিয়াছে, এবং তাহাদের অশেষ দুঃখের কারণ হইয়াছে। কিন্তু ইহা ইংরেজ-রাজত্বের সঙ্গে ভারতবর্ষে আসে নাই। ইহা তাহার আগে হইতেই ছিল। ইহা মুসলমানেরাও এদেশে আনে নাই; বরং দেখা যায়, যে, যে-সব প্রদেশে ও অঞ্চলে মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ও দীর্ঘকালস্থায়ী ছিল, তথায় অস্পৃশ্যতার প্রকোপ অপেক্ষাকৃত কম; এবং যেখানে মুসলমান রাজত্ব স্থাপিত বা দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই, তথায় উহার প্রকোপ বেশী।

ইহার আনুষঙ্গিক যে আর-একটা দোষ, দরিদ্রের উপর ধনীর, দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার, ইহাও পরাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে এদেশে আমদানী হয় নাই; আগে হইতেই ছিল।

বস্তুতঃ, সামাজিক অত্যাচার ও পরাধীনতা মানুষকে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার জন্য পরোক্ষভাবে প্রস্তুত করে। মানুষের মেরুদণ্ড, ঘাড়, ও মাথা একটা করিয়াই থাকে। যে-জাতির অধিকাংশ লোকের মেরুদণ্ড সামাজিক কারণে বাঁকা ও নরম, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে তাহা হঠাৎ সোজা ও শক্ত হইয়া উঠিতে পারে না; যাহাদের মাথা ও ঘাড় সামাজিক কারণে নুইয়াই আছে, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে তাহা হঠাৎ উঁচু ও খাড়া হইয়া উঠিতে পারে না। সেইজন্য দেখা যায়, যে, যাহারা ইংরেজ-প্রভুকে অগ্রাহ্য করিতে শিখিতেছে, তাহারা অনেকে আবার এক-একজন দেশী প্রভু খাড়া করিতে ও তাঁহার পদানত হইতে ব্যগ্র।

পরাধীনতা জিনিষটা খুব খারাপ। রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা সাতিশয় অনিষ্টকর। সামাজিক পরাধীনতাও খুব অনিষ্ট-কর। কেহ কেহ মনে করেন, এক-একটা করিয়া কাজ হাতে লওয়া ভাল;—আগে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার উচ্ছেদ সাধন করা যাক্, তার পর সামাজিক পরাধীনতা বিনষ্ট করা যাইবে। কিন্তু ইহা ভুল। সবরকম উন্নতি পরস্পর-সাপেক্ষ। সামাজিক জুলুম দূর না করিলে আমরা সংঘবদ্ধ হইতে পারিব না, এবং সংঘবদ্ধ না হইলে আমরা স্বাধীন হইতেও পারিব না। ইহা যদি সত্য না হইত, তাহা হইলে মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও হিন্দুমুসলমানের মিলনকে স্বরাজের ভিত্তি বলিয়া প্রচার করিতেন না।

আমরা যদি স্বাধীন হইতাম, তাহা হইলেও অস্পৃশ্যতার বিনাশ এবং সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব বর্দ্ধন আবশ্যক হইত। সব মানুষকে মানুষ বলিয়া মানা মনুষ্যত্বের একটি লক্ষণ।

—

ত্রিবাঙ্কুড়ে অস্পৃশ্যতা

ত্রিবাঙ্কুড়ে ভাইকম্ নামক স্থানে একটি দেবমন্দির আছে। দক্ষিণভারতের অনেক জায়গার মত সেখানেও মন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তী রাস্তা দিয়া "অস্পৃশ্য" লোকেরা যাইতে পারে না। কিন্তু তাহারাও ত মানুষ। তাহারা বলিতেছে, তাহারা ঐসব রাস্তা দিয়া যাইবে; যাইতে আরম্ভও করিতেছে। ত্রিবাঙ্কুড় দেশী রাজ্য। উহার রাজার গবর্ণমেণ্ট এই "অনাচার" বন্ধ করিতে বলেন। কিন্তু "সত্যাগ্রহী"রা তাহা না শুনায়

তাঁহাদের গ্রেফ্‌তার হইতেছে। প্রয়াগ, কাশী, অযোধ্যা, মথুরা, বৃন্দাবন, কোথাও এমন সাধারণ রাস্তা নাই, যাহা দিয়া মেথরেরাও যাইতে পারে না। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে, কেরলে, আছে। এইজন্য স্বামী বিবেকানন্দ কেরলকে ভারতবর্ষের পাগ্‌লা-গারদ বলিয়াছিলেন।

অথচ এই ত্রিবাঙ্কুড় ভারত-সাম্রাজ্যের সব প্রদেশ ও রাজ্য অপেক্ষা শিক্ষায় অগ্রসর; কেবল পুরুষদের প্রাথমিক শিক্ষায় ব্রহ্মদেশের নীচে। তাহার দ্বারা ইহাই প্রমাণ হয়, যে, কেবল লেখাপড়া শিখিলেই মানুষ মানুষ হয় না।

—

নমঃশূদ্রদিগের খৃষ্টিয়ান্ হইবার ইচ্ছা

খবরের কাগজে এই সংবাদ বাহির হইয়াছে, যে, হাজার হাজার নমঃশূদ্র, হিন্দুসমাজের "উচ্চতর" জাতিদের দ্বারা অবজ্ঞাত ও লাঞ্ছিত হওয়ায়, খৃষ্টিয়ান্ হইতে ইচ্ছা করিতেছেন। "উচ্চতর" জাতিদের যদি এবিষয়ে কোন কর্ত্তব্যবোধ থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা বক্তৃতা, সভায় প্রস্তাব ধার্য্যকরণ, প্রভৃতি মৌখিক ব্যাপার ছাড়া কাজে কিছু করুন।

খৃষ্টিয়ান্ সমাজেও শাদা ও কালার সমান স্থান নাই, এবং "উচ্চজাতি" হইতে যাঁহারা খৃষ্টিয়ান্ হইয়াছেন, তাঁহারা অনেকে "নিম্নশ্রেণী"র খৃষ্টিয়ান্‌দিগকে নিজেদের সমান মনে করেন না। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে খৃষ্টিয়ানদের মধ্যে যেরূপ জাতিভেদ আছে, বঙ্গে তাহা নাই; এবং হিন্দু নমঃশূদ্র অপেক্ষা খৃষ্টিয়ান্ নমঃশূদ্রের হিন্দুসমাজের নিকট হইতে অধিক বাহ্য সম্মান পাইবার সম্ভাবনা।

নমঃশূদ্রদের প্রতি ব্রাহ্মসমাজেরও কর্ত্তব্য আছে। তাহা করিতে হইলে যে সহৃদয়তা, ঈশ্বরে বিশ্বাস ও মানব-প্রকৃতিতে বিশ্বাসের প্রয়োজন, তাহা ব্রাহ্মদিগের থাকিলে তাঁহারা কিছু করিতে পারিবেন।

—

রসিক লাল দত্ত

আর্‌ এল্‌ দত্ত নামে পরিচিত ডাক্তার রসিক লাল দত্ত খুব বড় চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার জীবনের বড় বড় কথা খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে। তাহার পুনরাবৃত্তি না করিয়া আমরা একটি অজ্ঞাত ছোট ঘটনার বিষয় বলিতেছি।

সে ৪০ বৎসরেরও আগেকার কথা। তখন ডাক্তার দত্ত বাঁকুড়ার সিবিল সার্জ্জন।

সেই সময়ে বাঁকুড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট্ এণ্ডাসন্ সাহেব, ঘরে আগুন লাগিলে তাহা নিবাইবার জন্য স্কুলের ছেলেদের একটি ফায়ার ব্রিগেড্ বা অগ্নি-নিবাপক দল গড়িয়াছিলেন। তাহাদের একটা দম্‌কল, কতকগুলি বাল্‌তি, বাঁশের সিঁড়ি, প্রভৃতি ছিল। কোথাও আগুন লাগিলেই বীগ্‌ল্ বাজিত, আর অমনি ছেলেরা ও তাহাদের নেতারা দম্‌কল, বাল্‌তি প্রভৃতি লইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইত। এক দিন কতকগুলি বালক জেলখানার অদূরবর্ত্তী পোদ্দার-পুকুরের পাড়ের একটি বাড়ীতে বসিয়া গল্প করিতেছে, এমন সময় জেলের নিকট একখানা ছোট খড়ের ঘরে আগুন লাগার খবর তাহারা পাইল। তাহারা তৎক্ষণাৎ ঘরটার দিকে গেল। ডাক্তার দত্ত জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন, জেল দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনিও বাহির হইয়া আসিলেন। তখনও দম্‌কল সিঁড়ি আদি আসিয়া পৌঁছে নাই। দু-একজন ছেলে ঘরটার যে-যে দিকের চালে তখনও আগুন লাগে নাই, তাহার খড় টানিয়া ফেলিবার ও তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য কোন প্রকারে চালে উঠিয়া পড়িল। একটি বালক উঠিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও উঠিতে পারিতেছিল না। ডাক্তার দত্ত তাহা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ হুইয়া ঘাড় পাতিয়া দিলেন। বালক তাঁহার কাঁধে চড়িয়া চালে উঠিল। তাহার পর সকলের চেষ্টায় আগুন বিস্তৃত হইতে না পারায়, নিকটস্থ অন্য সব ঘর রক্ষা পাইল।

বালকের সহৃদয়তা ও সাহস

গত বারুণী যোগে গঙ্গাস্নান উপলক্ষ্যে পাবনা জেলার হিমাইৎপুরের ষ্টীমার ঘাটে অনেক যাত্রীর ভিড় হইয়াছিল। ভিড়ের মধ্যে একটি ছয় বৎসরের বালক স্রোতের বেগে ভাসিয়া যাইতেছিল। হিমাইৎ-পুরের সৎসঙ্গ বা তপোবন বিদ্যালয়ের তের বৎসর-

বয়স্ক ছাত্র শ্রীমান্ প্রমথনাথ দাস শিশুটির প্রাণরক্ষা করিয়াছে।

বাংলা অনেক বিদ্যালয়পাঠ্য বহিতে বিদেশের ছেলেদের সাহসের আখ্যান থাকে। আমাদের দেশের এইসব সাহসের বৃত্তান্তও সংগৃহীত ও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়া উচিত।

—

গোটা দুই প্রশ্ন

কাগজে দেখিলাম, কানপুরের কারখানার শ্রমজীবীদের উপর পুলিশ গুলি চালানতে কয়েক জনের মৃত্যু হইয়াছে, এবং তার চেয়ে অনেক বেশী লোক আহত হইয়াছে। শ্রমজীবীরা নাকি অশান্ত হইয়া ভীড় করিয়া শান্তিভঙ্গ, না ঐরূপ কিছু-একটা, করিতে যাইতেছিল। ইহা সরকার পক্ষের কথা। গুলি চালানটা বড় একঘেয়ে হইয়া উঠিতেছে। এখন নূতন কিছু করা হউক, জগৎ-রঙ্গমঞ্চের দর্শক মানবজাতি বলিতে পারে, "আংকোর, আংকোর", "আবার কর, আবার কর"।

বিলাতে রয়াল হিউমেন্ সোসাইটি নামক একটি সমিতি আছে। কেহ নিজের জীবনকে বিপন্ন করিয়াও যদি অপরের প্রাণরক্ষা করে, তাহা হইলে সেই দয়া ও সাহসের কাজের জন্য এই সমিতি তাহাকে পদক, সার্টিফিকেট প্রভৃতি দিয়া থাকেন। আমাদের অভিলাষ এই, যে, ভারতীয় পুলিশ বিভাগকে যেন এই সভার পদক দেওয়া হয়। কারণ, পুলিশের লোক জনতা হইলেই ত অনেক লোকের প্রাণ বধ করিতে পারে; তাহা না করিয়া তাহারা এমনভাবে গুলি চালায়, যে, তাহাতে মোটে কেবল ২।৪ জনের প্রাণ যায়; বাকী লোকদের প্রাণরক্ষা হয়। যাহাদের প্রাণ রক্ষা হয়, তাহাদের পক্ষে পুলিশকে আক্রমণ করা একেবারে অসম্ভব হয়। সুতরাং পুলিশের লোকেরা নিজেদের বিপৎসম্ভাবনাকে অগ্রাহ্য করিয়া লোকের প্রাণরক্ষা করায় উক্ত সভার পদক পাইবার অধিকারী।

এই যুক্তিমার্গ অনুসরণ করিতে রয়াল্ হিউমেন সোসাইটি অনিচ্ছুক হইতে পারেন তাঁহাদের কাজ সোজা করিবার জন্য আমরা নীচে দুটি প্রশ্ন দিতেছি। ইহার কোন-একটা উত্তর পাইলেই তাহার জোরে ভারতীয় পুলিশকে উক্ত সোসাইটি পদক পুরস্কার দিতে পারিবেন।

১ম প্রশ্ন। গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে কোন্ কোন্ ধর্ম্মঘট, হরতাল, ইত্যাদি উপলক্ষ্যে ভারতীয় পুলিশ গুলি না চালাইয়া জনতাভঙ্গ, শৃঙ্খলা-স্থাপন ইত্যাদি করিয়া মানুষের প্রাণরক্ষা করিয়াছিল?

২য় প্রশ্ন। গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে কোন্ কোন্ বৎসর, মাস, বা সপ্তাহে ভারতবর্ষের কোথাও পুলিশ নিজেদের প্রাণের মায়া ছাড়িয়া দিয়াও বেসরকারী কোন জনতার উপর গুলি চালায় নাই?

আমাদের প্রশ্ন-দুটিতে যেপ্রকারের ধর্ম্মঘট ও হরতাল আদি, কিম্বা যেপ্রকার বৎসর, মাস ও সপ্তাহের উল্লেখ করিতে বলিয়াছি, তাহার উল্লেখ পাইলেই সেই প্রমাণের বলে রয়াল্ হিউমেন্ সোসাইটি পুলিশ বিভাগকে পদক দিতে পারিবেন। কারণ, ইহা অতি সত্য কথা, যে, ভারতীয় জনতার হাতে পুলিশের প্রাণ সর্ব্বদাই বিপন্ন; তাহা সত্ত্বেও পুলিশ গুলি না চালাইলে তাহাদের দয়া ও প্রাণভয়হীনতা প্রমাণিত হয়।

—

স্বরাজ্য-দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ

একখানি বাংলা সাপ্তাহিক এবং একটি ইংরেজী পুস্তিকায় দেখিলাম, কালীঘাটের কালীমন্দিরে এক সভায় শ্রীযুক্ত হরিদাস হালদার শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশকে জিজ্ঞাসা করেন, যে, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ও কলিকাতা মিউনিসিপাল কৌন্সিলের সভ্যের পদ তাঁহার দল ও দলের পুঁজি বাড়াইবার জন্য প্রার্থীদিগকে টাকা লইয়া বিক্রী করিতেছেন কি না। পুস্তিকায় ও কাগজে দেখিলাম, মিঃ দাশ ইহার কোন জবাব দেন নাই। সত্য হইলে ইহা দুঃখের বিষয়। ইহার জবাব দেওয়া উচিত ছিল, এবং এখনও জবাবের প্রয়োজন আছে। যাঁহাদের প্রকৃত লোকহিতৈষণা আছে এবং হিত করিবার মত চরিত্র জ্ঞান ও অন্যবিধ যোগ্যতা আছে, তাঁহাদেরই জনসাধারণের

প্রতিনিধি হওয়া উচিত। টাকার থলির ওজন এবং টাকার দ্বারা পদ ক্রয়ের অবৈধ ইচ্ছা, যোগ্যতার মাপকাঠি হওয়া উচিত নয়। যাহারা অবৈধ ভাবে টাকা খরচ করিয়া প্রতিনিধিত্ব লাভ করা হেয় মনে করে না, তাহারা প্রতিনিধির পদের ও ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া অবৈধ উপায়ে টাকা রোজ্গার করিতেও পারে। পাশ্চাত্য কোন কোন দেশে দলের টাকা বাড়াইবার জন্য সভ্যপদ বিক্রী, উপাধি বিক্রী, প্রভৃতি ক্ষমতার অপব্যবহার প্রবলতম দল করিয়া থাকে। যাহারা এই-প্রকারে প্রতিনিধি হয়, তাহারা কেহ কেহ পরে পদের ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া আগেকার খরচটা সুদসমেত পোষাইয়া লয়, বরং তাহা অপেক্ষাও বেশী রোজগার করে। এই-প্রকার কুরীতি আমাদের দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিলে তাহা অত্যন্ত দুঃখের ও লজ্জার বিষয়। যদিই স্বরাজ্যদল এই দোষে দোষী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাহারা দোষনির্মুক্ত থাকেন, দেশহিতৈষী মাত্রেই এই ইচ্ছা করিবেন।

—

মফস্বলে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব

এই সময়ে বাংলা দেশের নানা স্থানে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব প্রতিবৎসর হইয়া থাকে। যথেষ্ট নির্ম্মল পানীয় জলের অভাব ইহার একটি কারণ। সংখ্যা হিসাবে দেশে ছোট ও বড় জলাশয় যে কম আছে তাহা নহে। কিন্তু কালক্রমে এইসব পুকুর দীঘি বাঁধ এবং কোথাও কোথাও নদী পর্য্যন্ত ভরাট হইয়া গিয়াছে। পঙ্কোদ্ধার ও পুনরায় খননের বন্দোবস্ত হয় নাই। যে-সব জলাশয় খননের সময় একজনের সম্পত্তি ছিল, তাহা পরে অনেকের হইয়াছে। তাহাদের ঐক্যের অভাবে বা ধনের অভাবে কিম্বা উভয় কারণেই পঙ্কোদ্ধার হয় নাই। পূর্ব্বে জলাশয় প্রতিষ্ঠা পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত, এবং এই বিশ্বাস সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখন অনেক ধনী লোকের সে বিশ্বাস নাই; এবং যাহাদের তাহা আছে, তাহাদের টাকা নাই। অধিকন্তু, বড় বড় অনেক জমীদার রায়তদের রক্তশোষণ করিয়া নিজ নিজ গ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় বিলাসে মগ্ন থাকেন, জমীদারীর জলাভাব প্রভৃতির দিকে মন দেন না। অনেক জমীদারের জমীদারী যে জেলায়, সে জেলায় কোন কালেই তাঁহাদের নিবাস ছিল না এবং এখনও নাই; সুতরাং ঐ জেলার প্রতি তাঁহাদের কোন মায়া মমতাও নাই। প্রত্যেক জমীদারই এই-প্রকার, তাহা আমরা বলিতেছি না; কর্ত্তব্যপরায়ণ জমীদারও আছেন; কিন্তু বহুসংখ্যক জমীদার যে কর্ত্তব্যবিমুখ, তাহা অস্বীকার করিবার জো নাই। যাহারা পরিশ্রম করিয়া ধন উৎপাদন করিবে, তাহারা পুরুষানুক্রমে দুঃখ ভোগ করিবে, এবং যাহারা পরিশ্রম করিবে না তাহারা অতীতকালের কোন একটা দলিলের বলে পুরুষানুক্রমে আলস্য সত্ত্বেও আরামে বিলাসে থাকিবে, এরূপ ব্যবস্থা চিরস্থায়ী হইতে পারে না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে জমীদারী বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে "চিরস্থায়ী।" কিন্তু মানবীয় কিছুই চিরস্থায়ী নহে। ভূমির খাজনার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কর্ত্তা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ও চিরস্থায়ী হইবে না। পরিবর্ত্তন হইবেই। আমরা কেবল এই প্রার্থনা করি, যে, রুশিয়ায় যে-ভাবে রক্তপাত সহকারে ভূস্বামী ও মূলধনী সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ করিয়া আমূল পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছিল, অহিংসা মহামন্ত্রের উদ্ভবস্থান ভারতে তাহা যেন কখনও না হয়। যদি গবর্ণমেণ্ট, ভূস্বামী, ও ধনী লোকেরা সময় থাকিতে নিজ নিজ কর্ত্তব্য করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষে এ-প্রকার ভীষণ বিপ্লব কখনও ঘটিবে না। নতুবা ঘটিতে পারে।

ভবিষ্যতের কথা ছাড়িয়া দিয়া বর্ত্তমানের দিকে দৃষ্টিপাত করি। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের সময়কার স্বদেশী আন্দোলনের যুগে, কোন কোন স্থানে যুবকেরা স্বহস্তে জলাশয় খনন করিয়া স্থানীয় জলাভাব দূর করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে সেইরূপ সৎকাজ যুবকেরা কোথাও করিতেছেন কি না, অবগত নহি।

গ্রামের লোকেরাও মিলিত চেষ্টা দ্বারা কূপখনন এবং পুরাতন জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার করাইয়া অন্ততঃ একটি করিয়া জলাশয় পানীয় জলের জন্য আলাদা করিয়া রাখিতে পারেন। ইহা ব্যতীত, বাঁকুড়া জেলায় যেমন জল-সরবরাহ-সমবায়-সমিতিসকল গঠিত হইতেছে, জলের অভাব দূর করিবার তাহা প্রকৃষ্ট উপায়। "বাঁকুড়ার উন্নতি" নামক প্রবন্ধে ইহার বৃত্তান্ত দৃষ্ট হইবে।

বঙ্গীয় হিতসাধন-মণ্ডলী এবং কোন কোন জেলার সম্মিলনী, হিতকরী সভা, হিতসাধিনী সমিতি, ইত্যাদিও কোথাও ওলাউঠার আবির্ভাব হইলে তথায় চিকিৎসক ঔষধ যন্ত্র ও পথ্য পাঠাইয়া থাকেন। ইহাঁদের হাতে যথেষ্ট টাকা সর্ব্বসাধারণের দেওয়া উচিত। যথেষ্টসংখ্যক চিকিৎসক ও অন্য কর্ম্মীরও অভাব আছে। এইজন্য দেশে ভাল চিকিৎসা-বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করা একান্ত আবশ্যক। যেগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার স্থায়িত্ব-বিধান আগে করিতে হইবে

গ্রীষ্মের ছুটি ও ছাত্রদের কর্তব্য

লোকহিতকর যা-কিছু কাজ, ছাত্রেরা যুবকেরা করুক, আর আমরা দিব্য আরামে কাল কাটাই; এরকম মনের ভাব আমাদের কোন কালে ছিল না, এখনও নাই। কেহ নিজে যাহা করিতে ইচ্ছুক নহেন, অন্যকে তাহা করিতে বলা তাঁহার উচিত নয়। আমাদের বয়সোচিত কাজ ও পরিশ্রম করিতে আমরা ইচ্ছুক বলিয়া যুবকদিগকেও আমাদের মনের অভিলাষ কিছু বলিতেছি।

পৃথিবীর বহু দেশে 'য়িউথ মুভ্মেন্ট্' বা "তরুণদের প্রচেষ্টা" নামক এক বিশাল প্রচেষ্টা ভিন্ন ভিন্ন নামে নিজের প্রভাব ও কার্য্যক্ষেত্র বিস্তার করিতেছে। এই প্রচেষ্টার মূলীভূত কারণ এই, যে, আগেকার লোকেরা, বৃদ্ধেরা, প্রৌঢ়েরা, পৃথিবীর কাজ, দেশের কাজ, যেভাবে করিয়াছিলেন, তাহাতে "সভ্যতম" ও প্রবলতম দেশসকলও ধ্বংস-মুখে প্রায় উপস্থিত হইয়াছে; তরুণেরা নব আলোক দেখিয়া নূতন করিয়া মানবসমাজের কাজ করিতে চান। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, আগেকার যুগে লোকে মুখে যাহাই বলুক, দেশহিতৈষিতার মানে এই ছিল, বৈধ অবৈধ যে উপায়েই হউক নিজের দেশকে ধনশালী ও শক্তিশালী করিতে হইবে। তাহাতে ধরা রক্তাক্ত হইয়াছে। এবং ঐ নীতির অনুসরণ করায় বাস্তবিক যে কোনও দেশের সব লোক ধনী ও ক্ষমতাশালী হইয়াছে, তাহাও নহে; কতকগুলি লোক মাত্র ধনী ও ক্ষমতাশালী হইয়াছে। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। গত মহাযুদ্ধের ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আগেকার চেয়ে বিশালতর হইয়াছে। কিন্তু ব্রিটিশজাতির সব লোকের সুবিধা হয় নাই। লক্ষ লক্ষ বেকার লোককে রাজকোষ হইতে মাসহারা দিয়া বাঁচাইয়া রাখা হইয়াছে; ধর্ম্মঘট ত লাগিয়াই আছে। লক্ষ লক্ষ লোক প্রায় গৃহহীন অবস্থায় কাল কাটায়। তাহার ফলে ইংলণ্ডে এক সরকারী কমিটি সতের লক্ষ বাড়ী নির্ম্মাণের এক প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন। শ্রমজীবীরা ও তাহাদের নিয়োগকর্ত্তারা চায় তার চেয়েও বেশী; তারা চায় পচিশ লক্ষ বাড়ী।

এখানে একটা অবান্তর কথা বলি। বাংলার ব্যবস্থাপক সভায় সরকার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত বলিয়াছিলেন, যে, জল সরবরাহ করা গবর্ণমেন্টের কাজ নয়। কিন্তু বিলাতে গবর্ণ্মেন্ট্ যে লক্ষ লক্ষ লোককে অনেক বৎসর করিয়া অন্নবস্ত্র যোগাইতেছেন, এবং এক্ষণে ঘরবাড়ীও সরবরাহ করিতে যাইতেছেন, সে বিষয়ে তিনি কি বলেন?

যাহা হউক, আমরা বলিতে যাইতেছিলাম, আগেকার যুগে যাহাকে প্যাট্রীয়টিজ্‌ম্ বা স্বদেশপ্রেম বলা হইত, তাহাতে দেশে দেশে ঝগড়া বিবাদ ও বিদ্বেষ এবং যুদ্ধ ঘটিয়াছে, এবং প্রত্যেক দেশের মধ্যেও শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিরোধ লাগিয়া আছে। অতএব, মানবসমাজের কাজ নূতন নীতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। জগতের তরুণরা ইহা করিবেন। "তরুণ প্রচেষ্টা"র সব কথা এখানে আমরা বলিতে চেষ্টা করিব না। ইহার উল্লেখ করিলাম, কেবল ইহাই দেখাইবার জন্য, যে, কেবল বঙ্গদেশেই তরুণবয়স্ক পুরুষ ও নারী উভয়ের উপর মানবের ভবিষ্যৎ গড়িবার গুরুভার অর্পিত হয় নাই, অন্যত্রও হইয়াছে; অথবা, ঠিক্ বলিতে গেলে, অন্যদেশের তরুণের ঈশ্বরের প্রেরণায় স্বয়ং সেই গুরুভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছেন।

বঙ্গের তরুণ সম্প্রদায় মহৎভাবের প্রেরণায় কাজ করিতে অভ্যস্ত। তাঁহারা যে সত্য বা ভ্রান্ত পথের পথিক হইয়া প্রাণ দিতে পারেন, তাহাও দেখা গিয়াছে। আমরা আগেই বলিয়াছি, পাশ্চাত্য জাতিরা দেখিয়াছে, যে, বিদ্বেষের পথে, পরস্পরকে বিনাশের পথে কল্যাণ নাই; অথচ তাহারা দেখিয়াও দেখিতেছে না। আমরা যেন সে পথ পরিহার করি। দেশে দেশে বন্ধুত্ব, জাতিতে জাতিতে বন্ধুত্ব, শ্রেণীতে শ্রেণীতে বন্ধুত্ব, ইহাই নবযুগের বাণী।

কতকগুলি বয়স্ক লোক অহংকেন্দ্র লোকদের মধ্যে চাকরীর ও সম্মানের পদের ভাগ বখরা করিয়া দিয়া তাহার উপর স্বরাজের ভিত্তি স্থাপন করিতে চান। চাকরীর সংখ্যা সীমাবদ্ধ; এবং যাহারা বেতন বা মজুরী না পাইলে কাজ কখন করেন নাই, তাঁহারা বেতন পাইলেও দেশের সেবা অপেক্ষা বেতনপ্রাপ্তিটাকেই বড় করিয়া দেখিবেন। অন্য দিকে অবৈতনিক সেবার অন্ত নাই, সীমা নাই। উহার মহত্ত্বেরও অবধি নাই। পৃথিবীর মধ্যে কাহারা বেশী বেতন পাইয়াছিল, তাহাদের কথা কে ভাবে? কিন্তু পৃথিবীর অবৈতনিক সেবকদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার বিরাম নাই, সীমা নাই; তাঁহাদের শক্তির অন্ত নাই। তাঁহারাই মানব-হৃদয়ের উপর রাজত্ব করিতেছেন। তরুণ সম্প্রদায় যেন অবৈতনিক লোকসেবার ডাকই শুনেন; সেই সেবা কে কত করিবে, তাহারই প্রতিযোগিতা পড়িয়া যাক্। এই সেবাই স্বরাজ।

ইতিপূর্ব্বে দেশের কোন কোন অভাব সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছি। তাহার একটির বিষয় আর-একবার বলি।

নারীর উপর অত্যাচারের প্রাদুর্ভাব বাংলা দেশে অত্যন্ত বাড়িয়াছে। অন্য কোন প্রদেশের সংবাদপত্রে এরূপ সংবাদের বাহুল্য দেখিতে পাই না। বাঙালীর

ইহা অপেক্ষা কলঙ্ক আর নাই। যুবকেরা এই কলঙ্ক মোচন করুন। নতুবা বাঙালীজাতি ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হউক। যুবকেরা পবিত্রচেতা হউন, সাহসী হউন, বিপন্নের সাহায্য ও উদ্ধারের জন্য অস্ত্রচালনায় অভ্যস্ত হউন। লাঠিখেলায় ও যুযুৎসুতে অভ্যস্ত হউন। উভয়ের সম্মিলনে যে আত্মরক্ষা ও আর্ত্তরক্ষার প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহা শিক্ষা করুন। পুলিশ চুরি ডাকাতি নারী-হরণ আদি সব বিপদ্ হইতে মানুষকে বাঁচাইতে পারিতেছে না, পারিবার কথাও নয়।

নারীর উপর অত্যাচারে প্রধানতঃ নিম্নশ্রেণীর তথাকথিত মুসলমানেরা জড়িত থাকায়, সমুদয় মুসলমান সম্প্রদায়ের অখ্যাতি ও কলঙ্ক হইতেছে। আমলাগাছীর শ্রীমতী বরদা-সুন্দরীকে হরণ করিয়া কয়েক জন তথাকথিত মুসলমান শাস্তি পাওয়ার পর, ঐ অঞ্চলের হিন্দুমুসলমান এক সম্মিলিত বৃহৎ সভায় এইপ্রকার পাশবিক দুষ্কার্য্যের নিন্দা করিয়াছেন, দুর্ব্বৃত্তদের শাস্তিতে আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং পুলিশের যে যে কর্ম্মচারী এই মোকদ্দমা উপলক্ষে অবৈধ আচরণ করিয়াছে, তদন্তের পর তাহা সত্য বলিয়া প্রমাণ হইলে গবর্ণ্মেণ্ট্কে তাহাদিগকে শাস্তি দিতে বলিয়াছেন। মুসলমান-সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ নিজসমাজ-ভুক্ত সকল লোকের সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করুন; এবং নারী-হরণ বিষয়ে তাঁহাদের ধর্ম্মের উপদেশ কি, তাহা প্রকাশ করুন। নারীর সহিত ব্যবহার সম্বন্ধে অসংযমে পৃথিবীতে সমগ্র মুসলমান-সমাজের অধোগতি হইয়াছে। যে তুরস্কের নব অভ্যুত্থান হইয়াছে, যে মিশরের পুনরুত্থান হইয়াছে, সেই উভয় দেশের মুসলমান মহিলারা বহু-বিবাহের বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিয়াছেন। ইহা হইতে এদেশের মুসলমানেরা বুঝিতে পারিবেন, যে, স্ত্রীজাতির সহিত পুরুষের সম্পর্কের আদর্শ তুরস্কে ও মিশরে উন্নত হওয়ায় তবে তাহারা উন্নত হইয়াছে; এবং সেই উন্নতি রাখিবার ও বাড়াইবার জন্য তাহারা বহুবিবাহ বন্ধ করিতে চাহিতেছে। আলীগড়ে মুসলমান মহিলাদের যে সভা হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহারাও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। পুরুষদের অনেক স্ত্রীকে বিবাহ করাতেই যখন মুসলমান মহিলাদের আপত্তি, তখন পুরুষদের নারীর সহিত অবৈধ গর্হিত সম্বন্ধের যে তাঁহারা বিরোধী হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা হইতে আশা হয়, যে, মুসলমান-সম্প্রদায় কলঙ্কনির্ম্মুক্ত হইতে পারিবেন। বাংলা দেশের তরুণ সম্প্রদায় নব যুগের ডাক শুনিয়া চলেন, এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছি। বঙ্গের অধিকাংশ যুবক মুসলমান; তাঁহারা যেন বধির হইয়া না থাকেন। নারীর সম্মান রক্ষায় তাঁহারা অগ্রণী হউন।

—

স্বাধীনতা-রক্ষার যোগ্যতা

স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে যেরূপ যোগ্যতার প্রয়োজন হয়, তাহা রক্ষা করিতে হইলেও সেইরূপ যোগ্যতা আবশ্যক হয়। আমরা স্বাধীনতা পাইবার যোগ্য কি না, সেবিষয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়াছে; আমরাও অনেক লিখিয়াছি। স্বাধীনতা যদি কেহ লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার যোগ্যতার কথা আর কেহ তুলে না।

কিন্তু স্বাধীনতা পাইলে আমরা তাহা রক্ষা করিতে পারিব কি না, তাহা আমাদের ভাবিবার বিষয়। ইংরেজরা ত ধমক দিয়া বলেন, "আমরা চলিয়া গেলে আর কেহ আসিয়া তোমাদের দেশ দখল করিবে; তোমাদের আত্মরক্ষার শক্তি নাই।" অথচ আমাদের আত্মরক্ষার শক্তি অর্জ্জন ও শিক্ষা লাভের পথ ইংরেজরাই আগ্‌লাইয়া রহিয়াছেন। ইংরেজের প্রভুত্ব থাকিতে ভারতীয় লোকেরা যে কখন ভারতীয় সৈন্যদলের কর্ত্তা ও নেতা হইবেন, তাহার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। ইংরেজপ্রভুত্বের অবসানে ভারতীয় সেনাদলের পরিচালকগণ ভারতীয় হইতে পারেন। কিন্তু ইংরেজ-প্রভুত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই যদি অন্য কোন বিদেশীর প্রভুত্ব স্থাপিত হয়, তাহা হইলে কি হইবে, বলা যায় না। ভবিষ্যতের গর্ভে কি নিহিত আছে, জানি না।

কিন্তু দেশের স্বাধীনতা রক্ষার আর-একটা দিক্ আছে, তাহারও আলোচনা করা ভাল। কানাডা এবং আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রমণ্ডলের (ইউনাটেড্ ষ্টেট্সের) মধ্যে কোন প্রকার পরিখা দুর্গ নাই। কানাডার এমন কোন সৈন্যবল নৌবল নাই, যে, আমেরিকার সহিত

যুদ্ধ করিতে পারে। আমেরিকা যে ইংলণ্ডকে ভয় করে, তাহাও নহে। অথচ, কানাডা নিরাপদ আছে। ইউরোপের ডেন্‌মার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, পোর্টুগাল প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশগুলির এমন সামরিক শক্তি নাই, যে, বৃহৎ শক্তিশালী জাতিদের আক্রমণ তাহারা প্রতিরোধ করিতে পারে। তথাপি কেহ তাহাদিগকে আক্রমণ করে না ও তাহাদের স্বাধীনতা হরণ করে না। ইহার কারণ কি? একটা কারণ অবশ্য এই, যে, এই-সব দেশ কেহ আক্রমণ করিলে, শেষ ফল যাহাই হউক, ইহারা কেহ সহজে স্বাধীনতা বিসর্জন দিবে না এবং ইহাদের দেশের বড় বড় লোকেরা বিশ্বাসঘাতক গৃহশত্রু হইবে না; ইহারা শেষ পর্য্যন্ত লড়িয়া দেখিবে;—ইহা জানা কথা। দ্বিতীয় কারণ, এই যে, জার্মেনীর ফ্রান্স্‌ ও বেলজিয়ম আক্রমণ ব্যতিক্রম-স্থল হইলেও, ইউরোপীয় লোকদের চক্ষে যে-সব দেশ সভ্য তাহাদিগকে আক্রমণ করা পাশ্চাত্য জনসাধারণের লোকমতের বিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সভ্যতার লক্ষণ ও প্রমাণ কি? ইউরোপীয় কোন একটা ছোট দেশের কথা ধরুন। দেখিবেন, উহারা নিজেদের ক্ষুদ্রতম গ্রামের সব কাজ হইতে আরম্ভ করিয়া রাষ্ট্রের কাজ পর্য্যন্ত সমস্ত নিজেরা শৃঙ্খলা ও দক্ষতার সহিত চালাইতেছে। সাহিত্য, সঙ্গীত চিত্রাদি কলা, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, প্রভৃতির চর্চ্চা তাহারা নিজেরা করিতেছে, এবং অন্য দেশের সহিত এ বিষয়ে তাহারা কি আদান প্রদান করিবে, তাহারা নিজে তাহা স্থির করিতেছে। নিজেদের শিক্ষাপ্রণালীর, বাণিজ্যের, পণ্যশিল্পের, ব্যাঙ্কের, রাস্তা ঘাট খাল রেলওয়ের, তাহারা নিজেরা চালক। তাহারা জগতের সভ্যতা-ভাণ্ডারে কিছু দিয়াছে এবং এখনও দিতেছে। তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লুপ্ত হইলে জগতের ক্ষতি হইবে। জার্মেনীর ধ্বংস নিবারণের পক্ষে এই একটা যুক্তি দেখান হইয়াছে, যে জার্মেন জাতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না থাকিলে মানব জাতি বিজ্ঞান দর্শন ললিতকলা পণ্যশিল্প প্রভৃতি বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

আমাদিগকে দেখিতে হইবে, যে, আমাদের পূর্ব্বজদিগের কীর্ত্তি যত মহৎই থাকুক না কেন, আমরা সভ্যজাতি-সমাজে, সকল বিষয়ে বর্ত্তমান কালে পাংক্তেয় হইতে, সমকক্ষ বলিয়া বিবেচিত হইতে, পারি কি না। ভারতবর্ষ যদি জগৎকে সভ্যতার উপাদান এমন কিছু দিতে থাকে, যাহা হইতে মানব-সমাজ বঞ্চিত হইতে চায় না, তাহা হইলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-লোপ জাতিসমষ্টি সহ্য করিবে না।

এখানে অনেকে বলিবেন, ভারতবর্ষ পরাধীন বলিয়া জগৎকে কিছু দিতে পারিতেছে না। ইহা সত্য হইলেও আংশিক সত্য মাত্র; সম্পূর্ণ সত্য নহে। আমরা পরাধীন বলিয়া যে একটা গ্রাম বা একটা সহরকেও তকতকে চকচকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে পারি না, একটা কোন বিদ্যার ভাল করিয়া চর্চ্চা করিতে পারি না, কিম্বা আরও নানাদিকে উন্নতি করিতে পারি না, ইহা সত্য নহে। পরাধীনতা সত্ত্বেও আমরা অনেক বিষয়ে আদর্শের দিকে বহুদূর অগ্রসর হইতে পারি।

শুধু ভারতবর্ষের নয়, পৃথিবীর সকল দেশেরই স্বাধীনতা-রক্ষার সর্ব্বপ্রধান উপায় হইবে মানব-জাতির আদর্শকেই আমূল বদ্‌লাইয়া ফেলা। ইহা ভারতবর্ষের অসাধ্য নহে। ভারতের শিক্ষকেরা রাজশক্তি দ্বারা নহে, ধর্ম্মোপদেশের দ্বারা, আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা বহু হিংস্র অসভ্য মানুষকে শান্ত শিষ্ট সভ্য করিয়াছিলেন। ভারতের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ আধ্যাত্মিক নেতারা পৃথিবীর সমুদয় জাতিকে ইহা হৃদয়ঙ্গম করাইতে সমর্থ হইতে পারেন, যে, ব্যক্তি-বিশেষের সম্পত্তি চুরি অপেক্ষা এক একটা দেশের ও জাতির সম্পত্তি চুরি গুরুতর অপরাধ, একজন মানুষের প্রাণবধ অপেক্ষা যুদ্ধে বহু মানবের প্রাণনাশ এবং এক একটা জাতির স্বতন্ত্র-অস্তিত্ব-লোপ গুরুতর অপরাধ; দুর্ব্বল অনগ্রসর জাতিদিগকে ১৫।২০ বৎসরের অনধিক নির্দ্দিষ্টকাল শিক্ষা দিয়া নিজ কার্য্যনির্ব্বাহে সমর্থ করিয়া দেওয়াই শক্তিশালী জাতিদের বৈধ কাজ, তাহাদের সম্পত্তি শোষণ ও তাহাদিগকে নির্বীর্য্য করিয়া পদানত রাখা দস্যুতা মাত্র; হৃদয় মন আত্মার বিভবই প্রকৃত বিভব, ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া সাংসারিক ঐশ্বর্য্যলোলুপ হইলে কেবল ধ্বংসের পথেই অগ্রসর হইতে হয়। ভারতবর্ষ যদি কাহারও সম্পত্তির উপর, কাহারও দেহ-মনের উপর লোভ না রাখেন, যদি ভারতবর্ষ আন্তরিক সত্যনিষ্ঠা অহিংসা ও মৈত্রী দ্বারা চালিত হন, তাহা হইলে তিনি অভয় পদ পাইবেন, অপর সকলকে সেই ভাবের বশবর্ত্তী করিতে পারিবেন।

চৈতন্যদেবের মূর্চ্ছা

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৪শ ভাগ
১ম খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১

২য় সংখ্যা

বকুল-বনের পাখী

শোনো শোনো ওগো, বকুল-বনের পাখী,
দেখ ত, আমায় চিনিতে পারিবে না কি?
নই আমি কবি, নই জ্ঞান-অভিমানী,
মান অপমান কি পেয়েছি নাহি জানি,
দেখেছ কি মোর দূরে-যাওয়া মনখানি,
উড়ে-যাওয়া মোর আঁখি?
দেখেছ কি কিছু আমায় তোমারি সম,
অসীম-নীলিমা-তিয়াষী বন্ধু মম?

শোনো শোনো ওগো, বকুল-বনের পাখী,
কবে দেখেছিলে মনে পড়ে সে কথা কি?
বালক ছিলাম, কিছু নহে তার বাড়া,
রবির আলোর কোলেতে ছিলেম ছাড়া,
চাঁপার গন্ধ বাতাসের প্রাণ-কাড়া
যেত মোরে ডাকি' ডাকি'।
সহজ রসের ঝরনা-ধারার পরে
গান ভাসাতেম সহজ সুখের ভরে।

শোনো শোনো, ওগো বকুল-বনের পাখী,
কাছে এসেছিনু ভুলিতে পারিবে তা' কি?
নগ্ন পরাণ ল'য়ে আমি কোন্ সুখে
সারা আকাশের ছিনু যেন বুকে বুকে,
বেলা চলে' যেত অবিরত কৌতুকে
সব কাজে দিয়ে ফাঁকি।
শ্যামলা ধরার নাড়ীতে যে তাল বাজে
নাচিত আমার অধীর মনের মাঝে।

শোনো শোনো, ওগো বকুল-বনের পাখী,
দূরে চলে' এনু, বাজে তার বেদনা কি?
আষাঢ়ের মেঘ রহে না কি মোরে চাহি?
সেই নদী যায় সেই কলতান গাহি',—
তাহার মাঝে কি আমার অভাব নাহি?
কিছু কি থাকে না বাকি?
বালক গিয়েছে হারায়ে, সে কথা ল'য়ে
কোনো আঁখিজল যায়নি কোথাও রয়ে?

শোনো শোনো, ওগো বকুল-বনের পাখী,
আর বার তারে ফিরিয়া ডাকিবে না কি ?
যায়নি সেদিন সেদিন আমারে টানে,
ধরার খুসিতে আছে সে সকল খানে ;
আজ বেঁধে দাও আমার শেষের গানে
তোমার গানের রাখী।
আবার বারেক ফিরে চিনে লও মোরে,
বিদায়ের আগে লও গো আপন করে'।

শোনো শোনো, ওগো বকুল-বনের পাখী,
সেদিন চিনেছ, আজিও চিনিবে না কি ?
পার-ঘাটে যদি যেতে হয় এইবার,
খেয়াল-খেয়ায় পাড়ি দিয়ে হব পার,
শেষের পেয়ালা ভরে' দাও, হে আমার
সুরের সুরার সাকী !
আর কিছু নই, তোমারি গানের সাথী,
এই কথা জেনে আসুক ঘুমের রাতি।

শোনো শোনো, ওগো বকুল-বনের পাখী,
মুক্তির টীকা ললাটে দাও ত আঁকি'।
যাবার বেলায় যাব না ছদ্মবেশে,
খ্যাতির মুকুট খসে' যাক নিঃশেষে,
কর্ম্মের এই বর্ম্ম যাক না ফেঁসে,
কীর্ত্তি যাক না ঢাকি'।
ডেকে লও মোরে নামহারাদের দলে
চিহ্নবিহীন উধাও পথের তলে।

শোনো শোনো, ওগো বকুল-বনের পাখী,
যাই যবে যেন কিছুই না যাই রাখি'।
ফুলের মতন সাঁজে পড়ি যেন ঝরে',
তারার মতন যাই যেন রাত ভোরে,
হাওয়ার মতন বনের গন্ধ হরে'
চলে' যাই গান হাঁকি'।
বেণুপল্লব-মর্ম্মররব সনে
মিলাই যেন গো সোনার গোধূলি-খনে॥

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রহ্মবাদ

(জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে)

(বৃহঃ ৪।১, ২)

(১) প্রথম দিনে

এক সময়ে জনক রাজা যাজ্ঞবল্ক্যকে ব্রহ্মবিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। স্বীয় মত ব্যাখ্যা করিবার পূর্ব্বে তিনি জানিতে চাহিয়াছিলেন কোন্ আচার্য্য তাঁহাকে ব্রহ্ম-বিষয়ে কি উপদেশ দিয়াছেন। ছয় জন ঋষি তাঁহাকে ছয়প্রকার উপদেশ দিয়াছিলেন ; জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে তাহাই বলিলেন। সে ছয়টি মত এই :—

(১) জিত্ব শৈলিনী বলেন—"বাক্ই ব্রহ্ম।"
(২) উদঙ্ক শাল্বায়ন বলেন—"প্রাণই ব্রহ্ম।"
(৩) বর্কু বার্ষ্ণ বলেন—"চক্ষুই ব্রহ্ম।"
(৪) গর্দ্দভীবিপিত বলেন—"শ্রোত্রই ব্রহ্ম।"
(৫) সত্যকাম জাবাল বলেন—"মনই ব্রহ্ম।"
(৬) বিদগ্ধ শাকল্য বলেন—"হৃদয়ই ব্রহ্ম।"

প্রত্যেক উপদেশেরই কিছু বিশেষত্ব আছে। প্রাচীন কালে অনেকে মনে করিতেন বাক্ প্রাণ চক্ষু শ্রোত্র মন ও হৃদয় দ্বারাই আত্মা গঠিত। কেহ শ্রেষ্ঠ স্থান দিতেন বাক্‌কে, কেহ দিতেন প্রাণকে, কেহ বা চক্ষু প্রভৃতিকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিতেন। এই বাক্ প্রাণ ইত্যাদি

ছয়টির মধ্যে যেটি শ্রেষ্ঠ, তাহাকেই মুখ্যভাবে আত্মা বলা হইত। প্রত্যেক আচার্য্যেরই বলিবার উদ্দেশ্য ছিল "আত্মাই ব্রহ্ম।" "আত্মা কি?"—এই বিষয়ে মতভেদ হওয়াতেই কেহ বলিয়াছেন 'বাক্ই ব্রহ্ম', কেহ বলিয়াছেন "প্রাণই ব্রহ্ম", কেহ চক্ষু ইত্যাদি অপর কাহাকেও ব্রহ্ম বলিয়াছেন।

যাজ্ঞবল্ক্য ইহার কোন মতকেই অসত্য বলিয়া অগ্রাহ্য করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—সাধারণভাবে এ সমুদায় মতই আংশিকরূপে সত্য। মানুষ দেশ-কাল লইয়াই থাকে এবং দেশ-কালের সাহায্যেই চিন্তা করিয়া থাকে। কিন্তু আত্মা বা ব্রহ্ম পারমার্থিকভাবে দেশ-কালের অতীত। কিন্তু লৌকিকভাবে আমরা বলিতে পারি তিনি দেশ-কালেও প্রকাশিত। তাঁহার এই প্রকাশ বুঝিতে হইলে বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই তাহা বুঝিতে হইবে।—ইহাই যাজ্ঞবল্ক্যের মত। তিনি এ-বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এই :—

(ক)

ব্রহ্ম প্রজ্ঞাস্বরূপ, ইহা বাক্ দ্বারাই অবগত হওয়া যায়; কারণ বেদাদি শাস্ত্র এবং যজ্ঞাদি সমুদায়ই বাঙ্ময়।

(খ)

ব্রহ্ম প্রিয়, ইহা প্রাণের সাহায্যেই অবগত হওয়া যায়। প্রাণ মানুষের কত প্রিয়! মানুষ প্রাণের জন্য কি না করে?

(গ)

ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, ইহা চক্ষু দ্বারা জানা যায়। কারণ, লোকে চক্ষু দ্বারা যাহা দেখে তাহাই সত্য বলিয়া মনে করে।

(ঘ)

ব্রহ্ম অনন্ত-স্বরূপ—ইহা শ্রোত্রের সাহায্যে জানা যায়। কারণ লোকে দিক্‌সমূহের সাহায্যেই শ্রবণ করিয়া থাকে এবং এই দিক্‌সমূহ অনন্তপ্রসারিত।

(ঙ)

ব্রহ্ম আনন্দ-স্বরূপ—ইহা মন দ্বারাই অনুভব করা যায়। মন না থাকিলে কাম্য বস্তু কামনাও করা যায় না এবং ভোগও করা যায় না।

(চ)

ব্রহ্ম স্থিতি-স্বরূপ—ইহা হৃদয় দ্বারাই অনুভব করা যায়। কারণ হৃদয়েই সমুদায় ভূত প্রতিষ্ঠিত।

যাজ্ঞবল্ক্য আরও বলিয়াছেন যে বাঙ্ময় ব্রহ্ম, প্রাণময় ব্রহ্মাদি দেশের আশ্রিত। ইহাদিগের প্রত্যেকেরই আশ্রয়-স্থল আকাশ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আমরা বাক্ ইত্যাদিকে জানিতে গিয়া দেশাতীত কোন সত্য জানিতে পারিতেছি না। কিন্তু আত্মা বা ব্রহ্ম দেশের অতীত। লৌকিকভাবে বাক্ ইত্যাদিকে ব্রহ্ম বলা যাইতে পারে কিন্তু পারমার্থিকভাবে ইহারা ব্রহ্ম নহে।

প্রকৃত তত্ত্ব

ইহার পরে যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মের প্রকৃত তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে গিয়া একটি অসম্ভব ঘটনা কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা এই :—

মানুষের দক্ষিণ চক্ষুতে একটি পুরুষ দৃষ্ট হয় এবং বাম চক্ষুতেও অপর একটি পুরুষ দৃষ্টিগোচর হয়। শরীরের অভ্যন্তরে হৃদয়াকাশে ইহারা পরস্পর সম্মিলিত হইয়া থাকে। এই সম্মিলিত অবস্থাই "আত্মা"।

এই বর্ণনা নিতান্তই মনঃকল্পিত। কিন্তু ইহা হইতে ঋষির মনোমত ভাব বুঝা যাইতেছে। আমরা আমাদের ভাষায় ঋষির অভিপ্রায় এইভাবে বর্ণনা করিতে পারি :—

আত্মা যেন কূর্ম্মের ন্যায় নিজ অঙ্গকে প্রতিসংহরণ করিয়া হৃদয়াকাশে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। সেই স্থল হইতে আত্মা যেন নিজের দুইটি শুণ্ডকে চক্ষু পর্য্যন্ত প্রসারিত করিয়া দেন। আত্মা এইভাবে চক্ষুতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করেন।

ইহার পরে ঋষি যাহা বলিয়াছেন তাহার অর্থ এই :—

এই চক্ষুদ্বয় হইতে আত্মার প্রাণসমূহ সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছে। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম ঊর্দ্ধ অধঃ—এ সমুদায়ই আত্মার প্রাণ। প্রাণই প্রসারিত হইয়া এই-সমুদায় দিক্-রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এই যে অনন্তবিস্তৃত আকাশ, ইহা আত্মারই প্রাণ।

কিন্তু ইহা ঋষির শেষ কথা নহে। তিনি পরে যাহা

বলিয়াছেন তাহাতে মনে হয় এ-সমুদায়ই লৌকিক ভাব; পারমার্থিকভাবে আত্মা দেশ কালের অতীত। এস্থলেও তাঁহার সিদ্ধান্ত এই :—

এই আত্মা "নেতি" "নেতি"—'ইহা হয়', 'ইহা নয়'। ইহা অগ্রাহ্য, ইহাকে গ্রহণ করা যায় না; ইহা অশীর্য্য, ইহা শীর্ণ হয় না; ইহা অসঙ্গ, কোন বস্তুতে আবদ্ধ হয় না; ইহা অবদ্ধ, ইহা ব্যথিত বা হিংসিত হয় না (বৃহঃ ৪।২)।

(২) দ্বিতীয় একদিনে

অপর একদিন জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে ব্রহ্ম-বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন (বৃহঃ ৪।৩,৪)। এ-স্থলেও সিদ্ধান্ত— "আত্মাই ব্রহ্ম"।

(ক)

প্রথমে প্রশ্ন হইয়াছিল—"মানুষ কোন্ জ্যোতির সাহায্যে সংসারের কার্য্য সম্পন্ন করে?"

ইহার উত্তর এই :—সূর্য্য চন্দ্র ও অগ্নির সাহায্যে। যে সময়ে সূর্য্য-চন্দ্রাদি থাকে না, সে সময়ে শব্দের সাহায্যে মানুষ কার্য্য করে। যখন শব্দও থাকে না, তখন মানুষ "আত্মজ্যোতি" দ্বারা সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করে।

এখানে যে আত্ম-রূপ জ্যোতির কথা বলা হইল, ইহা শুনিয়া, জনক জিজ্ঞাসা করিলেন :—"সেই আত্মা কে?"

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন :—প্রাণসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া যে বিজ্ঞানময় ও জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ হৃদয়ে অবস্থিতি করেন, তিনিই আত্মা"। (৪।৩।৭।)

(খ)

ইহার পরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—"এই আত্মা—ইহলোক ও পরলোক—এই উভয় লোকেই বিচরণ করেন, ইহাতে আত্মার একত্ব বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। আমাদিগের মনে হয় এই আত্মা চিন্তা করেন, এই আত্মা ক্রীড়া করেন; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আত্মা চিন্তাও করেন না, ক্রীড়াও করেন না।"

মূলে আছে "ধ্যায়তি ইব: লেলায়তি ইব" (বৃহঃ ৪।৩।৭) অর্থাৎ এই আত্মা যেন ধ্যান করিতেছেন, যেন ক্রীড়া করিতেছেন। "ইব" শব্দ ব্যবহার করিয়া ঋষি বুঝাইতেছেন যে আত্মা ধ্যানও করেন না, ক্রীড়াও করেন না। মানব ভ্রমবশতই মনে করে—আত্মা চিন্তা করিতেছেন, আত্মা ক্রীড়া করিতেছেন।

ইহার পরে ঋষি বলিতেছেন :—"স্বপ্নাবস্থায় আত্মা ইহলোক অতিক্রম করেন এবং মৃত্যুর অতীত হন। এই অবস্থায় আত্মা 'স্বয়ং জ্যোতি' হইয়া বিহার করেন। স্বপ্নাবস্থায় আত্মা যাহা দর্শন করেন, যাহা উপভোগ করেন, সেসমুদায়ই আত্মা স্বয়ং সৃষ্টি করেন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে স্বপ্নাবস্থা জাগ্রদবস্থারই স্মৃতি।" এস্থলে যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—"এ মত অসত্য। এই অবস্থায় আত্মাই-কর্ত্তা; আত্মাই সমুদায় বস্তু সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং উপভোগ করেন।"

(ঘ)

ইহার পর ঋষি বলিতেছেন পুরুষ যখন সুষুপ্ত হয়, তখন আত্মা স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। ইহা ব্রহ্মাবস্থাই (৪।৩।৩২)

এই অবস্থার বিবরণ এই—"যেমন লোকে প্রিয়া-স্ত্রীকর্ত্তৃক 'সম্পরিষ্বক্ত' হইলে বাহ্য বা অন্তর কিছুই জানে না, তেমনি এই পুরুষ প্রাজ্ঞ-আত্মা কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইলে বাহ্য বা অন্তর কিছুই জানে না। ইহাই ইহার আত্মকাম, অকাম, ও শোক-রহিত অবস্থা। এই অবস্থায় পিতা অপিতা হন, মাতা অমাতা হন, লোক অলোক হন, দেব অদেব হন, স্তেন অস্তেন হন, ভ্রূণহা অভ্রূণহা, চণ্ডাল অচণ্ডাল, পৌল্কস অপৌল্কস, শ্রমণ অশ্রমণ, তাপস অতাপস হন। পুণ্য ইহার অনুগমন করে না, পাপ ইহার অনুগমন করে না। তখন এই পুরুষ হৃদয়ের সমুদায় শোক হইতে বিমুক্ত হয়।"

এখানে যাহা বলা হইল তাহা দুর্নীতি প্রশ্রয়ের কথা নহে, তাহা অদ্বৈতবাদের কথা। বিশুদ্ধ-অদ্বৈতবাদিগণ বলেন আত্মা যখন স্বরূপ প্রাপ্ত হন, তখন তাঁহার নিকট এই জগৎ থাকে না, এবং তাহার দ্বৈতজ্ঞান থাকে না। যেখানে জগতই নাই সেখানে পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন শত্রু মিত্র ইত্যাদি কোথায়? সংসারের পাপপুণ্য দ্বৈতমূলক। যেখানে দ্বিতীয় মানবই নাই সেখানে পাপ পুণ্য কিপ্রকারে সম্ভব হইবে? এইজন্যই বলা হয়

অদ্বৈত জ্ঞান হইলে আত্মা পাপপুণ্যের অতীত হয়। যাজ্ঞবল্ক্য যাহা বলিয়াছেন, তাহার অর্থও ইহাই।

অদ্বৈত ভাব

ইহার পরে যাজ্ঞবল্ক্য পূর্ব্বোক্ত অদ্বৈতভাব আরও বিশদ করিয়াছেন। এবিষয়ে তিনি এই-প্রকার বলিয়াছেন :— "এই অবস্থায় সেই সুষুপ্ত আত্মা দর্শন করেন না, দর্শন করিয়াও দর্শন করেন না। (দর্শন করেন, তাহার কারণ এই যে নিত্য বর্ত্তমান আত্মা নিত্যদ্রষ্টা এবং) দ্রষ্টার দৃষ্টি কখন বিলুপ্ত হয় না, যেহেতু আত্মা অবিনাশী। (দর্শন করেন না, কারণ) তাঁহা হইতে পৃথক্ দ্বিতীয় এমন কোন বস্তু নাই যাহা তিনি দর্শন করিবেন। (বৃহঃ ৪।৩।২৩)। এই অবস্থায় তিনি আঘ্রাণ করেন না, আঘ্রাণ করিয়াও আঘ্রাণ করেন না। (আঘ্রাণ করেন, তাহার কারণ নিত্যবর্ত্তমান আত্মাই নিত্যঘ্রাতা এবং) ঘ্রাতার ঘ্রাণ কখন বিলুপ্ত হয় না, যেহেতু ইহা অবিনাশী। (আঘ্রাণ করেন না, কারণ) তাঁহা হইতে দ্বিতীয় বা পৃথক্ এমন কোন বস্তু নাই যাহা তিনি আঘ্রাণ করিবেন। (৪।৩।২৪)। এই অবস্থায় তিনি রসাস্বাদন করেন না, রসাস্বাদন করিয়াও রসাস্বাদন করেন না। (রসাস্বাদন করেন তাহার কারণ এই যে নিত্যবর্ত্তমান আত্মাই নিত্য-রসয়িতা এবং) রসয়িতার রসাস্বাদন কখন বিলুপ্ত হয় না। (রসাস্বাদন করেন না, তাহার কারণ এই যে) তাঁহা হইতে দ্বিতীয় বা পৃথক্ এমন বস্তু নাই যাহা তিনি আস্বাদন করিবেন। (৪।৩।২৫)। এই অবস্থায় তিনি কিছু বলেন না, বলিয়াও বলেন না, (তিনি বলেন, তাহার কারণ এই যে নিত্যবর্ত্তমান আত্মাই নিত্যবক্তা এবং) বক্তার বক্তৃত্ব কখন বিলুপ্ত হয় না, যেহেতু ইহা অবিনাশী। (তিনি বলেন না তাহার কারণ এই) তাঁহা হইতে দ্বিতীয় বা পৃথক্ এমন বস্তু নাই যাহা তিনি বলিবেন। (৪।৩।২৬)। এই অবস্থায় তিনি শ্রবণ করেন না, শ্রবণ করিয়াও, শ্রবণ করেন না। (তিনি শ্রবণ করেন, তাহার কারণ এই যে নিত্যবর্ত্তমান আত্মাই নিত্যশ্রোতা এবং) শ্রোতার শ্রুতি কখন বিলুপ্ত হয় না, যেহেতু ইহা অবিনাশী। (তিনি শ্রবণ করেন না, তাহার কারণ এই যে) তাঁহা হইতে দ্বিতীয় বা পৃথক্ এমন কোন বস্তু নাই যাহা তিনি শ্রবণ করিবেন। (৪।৩।২৭)। এই অবস্থায় তিনি মনন করেন না, মনন করিয়াও মনন করেন না। (তিনি মনন করেন তাহার কারণ এই যে নিত্যবর্ত্তমান আত্মাই মনন-কর্ত্তা এবং) মন্তার মনন কখন বিনষ্ট হয় না, যেহেতু ইহা অবিনাশী। (তিনি মনন করেন না তাহার কারণ এই যে) তাঁহা হইতে দ্বিতীয় বা পৃথক্ এমন কোন বস্তু নাই যাহা তিনি মনন করিবেন। (৪।৩।২৮)। এই অবস্থায় তিনি স্পর্শ করেন না, স্পর্শ করিয়াও স্পর্শ করেন না। (স্পর্শ করেন, তাহার কারণ এই যে নিত্যবর্ত্তমান আত্মাই স্প্রষ্টা এবং) স্প্রষ্টার স্পর্শ কখন বিলুপ্ত হয় না, কারণ ইহা অবিনাশী। তিনি স্পর্শ করেন না তাহার কারণ এই যে) তাঁহা হইতে দ্বিতীয় বা পৃথক্ এমন কোন বস্তু নাই যাহা তিনি স্পর্শ করিবেন। (৪।৩।২৯)। এই অবস্থায় তিনি জানেন না, জানিয়াও জানেন না। (তিনি জানেন, তাহার কারণ এই যে নিত্যবর্ত্তমান আত্মাই নিত্যজ্ঞাতা এবং) জ্ঞাতার জ্ঞান কখন বিলুপ্ত হয় না, যেহেতু ইহা অবিনাশী। (তিনি জানেন না, কারণ) তাঁহা হইতে দ্বিতীয় বা পৃথক্ এমন বস্তু নাই যাহা তিনি জানিবেন।" (৪।৩।৩০)

ইহার পরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন :—"(আত্ম-রূপ) এই সমুদ্রই এক দ্রষ্টা এবং এই আত্মা অদ্বৈত। ইহাই ব্রহ্মরূপ লোক। ইহাই পরমা গতি ইহাই পরমা সম্পৎ, ইহাই পরম আনন্দ।" (৪।৩।৩২)

এই-সমুদায় মন্ত্রে যাজ্ঞবল্ক্য যাহা বলিলেন তাহার অর্থ এই :—

সুষুপ্ত অবস্থাতে আত্মা ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থাতে কোন দ্বিতীয় বা পৃথক্ বস্তু থাকে না। সুতরাং আত্মার পক্ষে দর্শন শ্রবণ মননাদি কোন কার্য্যই সম্ভব হয় না।

যাজ্ঞবল্ক্য আরও বলিয়াছেন যে আত্মা নিত্যই দ্রষ্টা ঘ্রাতা রসয়িতা বক্তা শ্রোতা মন্তা স্প্রষ্টা ও বিজ্ঞাতা। দ্বিতীয় বস্তু নাই বলিয়া দর্শনাদি কার্য্য সম্পন্ন হয় না। কিন্তু সেজন্য ইহা বলা যায় না যে দ্বিতীয় বস্তুর অভাবে আত্মার দৃষ্টিশক্ত্যাদি বিলুপ্ত হইয়াছে।

আত্মার বা ব্রহ্মের প্রকৃত অবস্থা কি, যাজ্ঞবল্ক্য এ-স্থলে তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার দর্শনের শেষ সিদ্ধান্ত কি তাহাও বলা হইয়াছে। ইহার পরে তাঁহার আর নূতন কিছু বলিবার ছিল না। সুতরাং এই স্থলেই তাঁহার উপদেশের পরিসমাপ্তি হইতে পারিত।

কিন্তু গ্রন্থে দেখিতে পাই, তিনি জনককে আরও উপদেশ দিয়াছিলেন। দর্শনশাস্ত্রের দিক্ হইতে এই উপদেশের বিশেষত্ব বা গভীরত্ব নাই। তবে ইহার কোন কোন অংশ দ্বারা তাঁহার অদ্বৈতবাদ দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। ইহার কয়েকটি মন্ত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

(ক)

'এই ইহাই আমি'—এইভাবে যিনি আত্মাকে অবগত হইয়াছেন, তিনি কি ইচ্ছা করিয়া কোন বস্তুর কামনায় এই শরীরে দুঃখ ভোগ করিবেন? (বৃহঃ ৪।৪।১২)

(খ)

এই গহন শরীরে প্রবিষ্ট আত্মাকে যিনি লাভ করিয়াছেন, এবং সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তিনিই বিশ্বকৃৎ, তিনিই সকলের কর্ত্তা। (স্বর্গাদি) লোক তাঁহারই এবং তিনিই (এই-সমুদায়) লোক। (৪।৪।১৩)

(গ)

প্রাণসমূহের মধ্যে যিনি বিজ্ঞানময়, যিনি হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ আকাশে অবস্থিত, তিনি মহান্ অজ আত্মা। তিনি সকলের বশী, সকলের শাসনকর্ত্তা, ও সকলের অধিপতি। সাধুকর্ম্ম দ্বারা তিনি শ্রেষ্ঠ হন না। অসাধু কর্ম্ম দ্বারা তিনি হীন হন না। ইনিই সর্ব্বেশ্বর, ইনিই সমুদায় ভূতের অধিপতি, ইনিই সমুদায় ভূতের পালক। লোক-সমূহ যাহাতে বিচ্ছিন্ন হইয়া না যায়, এইজন্য তিনি সেতু-স্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন। (৪।৪।২২)

এই কয়েকটি মন্ত্রে বলা হইল যে—মানবে যিনি আত্মা, অর্থাৎ আমরা যাঁহাকে মানবাত্মা বলি, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই বিশ্বভুবনের অধিপতি।

নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি মন্ত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আত্মার প্রকৃতি ও ক্ষমতার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে :—

(ঘ)

ইনিই মহান্ অজ আত্মা; ইনিই অজর অমর অমৃত অভয় ব্রহ্ম। (৪।৪।২৫)

(ঙ)

এই যে আত্মা—যিনি ভূত-ভবিষ্যতের ঈশ্বর, স্বপ্রকাশ (বা জ্যোতির্ম্ময়),—ইঁহাকে যিনি সাক্ষাৎভাবে দর্শন করিয়াছেন, তিনি কিছুতেই ভীত হন না। (৪।৪।১৫)

(চ)

যাঁহার পশ্চাৎভাগে দিন ও সম্বৎসর প্রবর্ত্তন করিতেছে, সেই জ্যোতির জ্যোতি আয়ুঃস্বরূপ এবং অমৃতস্বরূপকে দেবগণ উপাসনা করিয়া থাকেন। (৪।৪।১৬)

(ছ)

যাঁহাতে পঞ্চজন এবং আকাশ প্রতিষ্ঠিত, আমি তাঁহাকে আত্মা বলিয়া জানি; আমি অমৃত-স্বরূপ ব্রহ্মকে জানিয়া অমৃত হইয়াছি। (৪।৪।১৭)

ভাষ্যকারগণ বলেন এস্থলে পঞ্চজন অর্থ গন্ধর্ব্বাদি পঞ্চ শ্রেণী, কিংবা ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ এবং নিষাদ, কিংবা পঞ্চেন্দ্রিয়।

(জ)

যাঁহারা তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র এবং মনের মন বলিয়া জানেন তাঁহারাই সেই পুরাতন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মকে নিশ্চিতরূপে জানিয়াছেন। (৪।৪।১৮)

আত্মাকে লক্ষ্য করিয়াই এই-সমুদয় মন্ত্র রচিত হইয়াছে এবং এই-সমুদয় স্থলে আত্মাকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে।

যাজ্ঞবল্ক্যের মতে আত্মা এক এবং এই আত্মা অন্তর-বাহ্য-ভেদরহিত। কিন্তু আমরা জগতে বহুত্ব দেখিতেছি। এই বিরোধী মতের মীমাংসা কি? যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন :—

(ঝ)

"মন দ্বারাই তাঁহাকে দর্শন করিতে হইবে। তাঁহাতে নানাত্ব নাই। তাঁহাতে যেন নানাত্ব (নানা ইব) রহিয়াছে—এই-প্রকার যে দর্শন করে, সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয় (৪।৪।১৯)

ব্রহ্মে নানাত্ব নাই—ইহা ঋষি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন।

ইহা ছাড়াও তিনি "নানা ইব" এই ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার অর্থ "যেন নানা"। ইহা দ্বারা তিনি বুঝাইতেছেন যে লোকে যে ব্রহ্মে নানাত্ব দেখে ইহা ভ্রমাত্মক। সাধারণ মানব সর্ব্বত্রই নানাত্ব দেখে কিন্তু জ্ঞান দ্বারা বুঝিতে হইবে যে "কুত্রাপি নানাত্ব নাই।"

উপসংহার

যাজ্ঞবল্ক্য তিনটি স্থলে নিজ মত ব্যাখ্যা করিয়াছেন—(১) মৈত্রেয়ীর নিকট, (২) জনক-সভায় প্রকাশ্য বিচারে, (৩) জনক রাজার নিকট। আমরা তিনটি প্রবন্ধে এই-সমুদায় মত ব্যাখ্যা করিয়াছি। আলোচনা করিয়া আমরা তাহার মতের বিষয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি তাহা এই :—

(১)

এক মাত্র আত্মাই বর্ত্তমান এবং এই আত্মাই ব্রহ্ম। মানবাত্মাতেই প্রথমে আত্মার জ্ঞান হয়। কিন্তু লোকে এই আত্মাকে ক্ষুধা তৃষ্ণা শোক মোহ জরা ও মৃত্যুর অধীন বলিয়া মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আত্মা এই-সমুদয় দেহ-ধর্ম্মের অতীত। এই যে আত্মা ইনিই ব্রহ্ম।

(২)

এই আত্মা অন্তর্বাহ্য-ভেদ-রহিত। আত্মা হইতে পৃথক্ কিংবা দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই। সুতরাং আত্মা বাহ্য-রহিত। ইহার অন্তরে কোনপ্রকার ভেদ নাই। দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে হইলে, আমরা আকাশের দৃষ্টান্ত দিতে পারি। আকাশ যেমন সর্ব্বত্রই একপ্রকার, ইহাতে যেমন কোনপ্রকার ভেদ নাই, আত্মার প্রকৃতিও ঠিক সেই-প্রকার। আত্মা 'একরস', প্রজ্ঞানঘন।

(৩)

আত্মার বহির্ভাগে কোন বস্তু নাই। আত্মা হইতে পৃথক্ বা দ্বিতীয় বস্তু নাই ইহাই ঋষির মত। কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি—এই জগৎ রহিয়াছে। ইহা কিপ্রকার? সিদ্ধান্ত করিতে হইবে—এ-জগৎ ভ্রমাত্মক; ইহার বাস্তব সত্তা নাই। যাজ্ঞবল্ক্যের মূল দার্শনিক মত গ্রহণ করিলে অন্যপ্রকার সিদ্ধান্ত করিবার কোন উপায় নাই। ঋষি নিজেও অনেক স্থলে এইপ্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু আবার কোন কোন স্থলে এজগতের বাস্তব সত্তা ও আত্মা হইতে পৃথক্ বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন (বৃহঃ ৩।৭)।

অবশ্যই বলিতে হইবে ইহাতে "আত্ম-বিরোধ" হইয়াছে।

(৪)

যাজ্ঞবল্ক্যের মতে আত্মার অন্তরে কোনপ্রকার ভেদ নাই। কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি আত্মা বহুত্বপূর্ণ। ইহাতে কত ভেদ;—কত ভাব, কত চিন্তা, কত ইচ্ছা! যাজ্ঞবল্ক্যের মত গ্রহণ করিলে এই ভেদ এবং ভেদজ্ঞানকে ভ্রমাত্মকই বলিতে হইবে। ঋষি নিজেও এই ভেদকে অসত্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 'ধ্যায়তীব, লেলায়তীব' (বৃহঃ ৪।৩।৭) ইত্যাদি বচন দ্বারা আত্মার চিন্তা ও কার্য্য প্রভৃতিকে ভ্রমাত্মক বলা হইয়াছে।

(৫)

যতক্ষণ আমাদিগের দ্বৈত-জ্ঞান কিংবা দ্বৈতরূপ ভ্রম থাকে, ততক্ষণই আমাদিগের প্রতি এই উপদেশ—"সেই আত্মাকে দর্শন শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে হইবে।"

এস্থলে আমাদিগকে কল্পনা করিয়া লইতে হয় যে আত্মা যেন একটি দ্বিতীয় বস্তু, এবং অপর বস্তুকে যেমন জ্ঞানের বিষয়ীভূত করা যায়—এই আত্মাকেও তেমনি জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিতে হইবে।

(৬)

কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এই দ্বৈতমূলক জগতেও আত্মাকে দর্শন শ্রবণ মননাদি করা যায় না। যে দেখে সেই যে আত্মা, তাহাকে আবার দেখিবে কে? সেই যে দেখে! যে শ্রবণ করে সেই যে আত্মা, তাহাকে আবার শ্রবণ করিবে কে? সেই যে শ্রবণ করে! এইরূপ আত্মাকে মননও করা যায় না। আত্মা নিত্যই বিষয়ী, তাঁহাকে জ্ঞানের বিষয়ীভূত করা যায় না। এইজন্য যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—বিজ্ঞাতারম্ অরে কেন বিজানীয়াৎ (বৃহঃ ২।৪।১৪ ; ৪।৪।১৫)—বিজ্ঞাতাকে কিপ্রকারে জানিবে?

(৭)

আত্মা দেশকালের অতীত। কিন্তু অনেক স্থলে

তাঁহাকে এমনভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে যেন তিনি দেশ-কালের অধীন। ব্যবহারিকভাবে এইপ্রকার বর্ণনাকে 'আপাত-সত্য' বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু পারমার্থিকভাবে ইহা সত্য নহে। তাঁহাকে কোন-প্রকারেই বর্ণনা করা যায় না। তাঁহার বিষয়ে কেবল বলা যায়—"নেতি", "নেতি", 'ইহা নয়' 'ইহা নয়'।

অপরাপর ঋষির ব্রহ্মবাদ পরে আলোচিত হইবে।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

শিল্পী অবনীমোহন

অবনীমোহন আজ আর নেই। মাসাধিক আগে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। যাঁরা তব্‌লা-সঙ্গতের মূল্য বোঝেন ও যাঁরা ৺অবনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুপম সঙ্গত একবারও শুনেছেন, এ সংবাদে তাঁদের মনে দুঃখ না হ'য়েই পারে না। কারণ অবনীমোহন ছিলেন একজন সত্য শিল্পী (আর্টিষ্ট্) এবং সত্য শিল্পীর উৎকর্ষ অভ্যাসে বাড়লেও তার উৎস প্রকৃতি-দত্ত প্রতিভা। প্রতিভা চিরকালই বিরল—তাই একজন সত্য শিল্পীর মৃত্যু বেশী ক'রেই আক্ষেপের বিষয়।

তব্‌লা-বাজানোতে আবার শিল্প (আর্ট) কি ? এ-কথা অনভিজ্ঞের মনে হওয়া আশ্চর্য্য নয়। সাধারণতঃ এ-কথাও মনে হওয়া আশ্চর্য্য নয় যে "তব্‌লা-বাজানো আর এমন শক্ত কি ? ও ত একটু অভ্যাস করলে সকলেই পারে।" কেম্ব্রিজে একটি তরুণ বাঙালী ছাত্র আমার কাছে একবার গম্ভীরভাবে বলেছিল, "ভিক্টর হুগোর লে মিজেরাব্‌ল্ ? লিখেছে ভাল বটে, কিন্তু ও আর শক্তটা কি ? চেষ্টা করলে ত আমিও অমন বই লিখতে পারি।" প্রথমটা আমার মনে হয়েছিল যে হয় সে মূর্খ, না হয় পাগল, না হয় একজন অসামান্য প্রতিভাশালী ছেলে বা "মিউট্ ইন্‌গ্লোরিয়াস্ মিল্‌টন্ !" কিন্তু পরে যখন দেখা গেল তাকে এ সংজ্ঞাগুলির মধ্যে একটিরও অন্তর্ভুক্ত করা চলে না, তখন আমাকে এ-কথাগুলি ভাবিয়ে দিয়েছিল মনে আছে। কিন্তু ভেবে দেখে' ও পরে অনেক দেখে' শুনে' আমার মনে হয়েছিল যে বস্তুতঃ কোনও বিষয়ে কিছুই না জান্‌লে সে বিষয়ে মতামত দেওয়ার মত সহজ কাজ সংসারে খুব কমই আছে। কারণ, একটু স্থির- ও নিরপেক্ষ-ভাবে বিচার করার অভ্যাস না থাক্‌লে এরূপভাবে না-ভেবে-চিন্তে কথা বলাটাই দেখা যায় মানুষের পক্ষে বেশী স্বাভাবিক হ'য়ে ওঠে। সুতরাং তব্‌লা-বাজানো সম্পর্কে পূর্ব্বোক্ত রকম মতামত দেওয়ার সঙ্গে কেম্ব্রিজের ছেলেটির দৃশ্যতঃ হাস্যকর মতামতের মূলগত প্রকৃতির যে বিশেষ ভেদ আছে এমন কথা মনে করার বিশেষ কারণ নেই। তব্‌লা সুন্দর ও যথাযথভাবে বাজানোর মধ্যে যে কতখানি শিল্প থাক্‌তে পারে তা যিনি ও-রসে বঞ্চিত তিনি কখনই ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌বেন না, বা ভারতীয় সঙ্গীতে তব্‌লা যে কি অনুপম সৃষ্টি তাও উপলব্ধি করতে পার্‌বেন না।

কোনও ললিত কলারই মনোজ্ঞতম বিকাশের কথা আমরা বোধ হয় সম্পূর্ণ বস্তুনিরপেক্ষ-(অ্যাব্‌ষ্ট্রাক্‌ট্) ভাবে ভাব্‌তে পারি না। অর্থাৎ যেমন "সাদা" কথাটি শুন্‌লেই আমাদের মনে হয় দুধের বা তুষারের বা কোনও শ্বেত পদার্থের কথা, তেম্‌নি কোনও যন্ত্রে নৈপুণ্যের কথা মনে হ'লেই মনে হয় কোনও বিশেষ শিল্পীর কথা, যাঁর মধ্যে দিয়ে সে নৈপুণ্য আমাদের কাছে কোন স্মরণীয় দিনে প্রকাশ পেয়েছিল। তব্‌লার আর্টের কথা আমার মনে হ'লেই অবনী-বাবুর কথা মনে হয়, কারণ তব্‌লায় তাঁর তুল্য আর্টিষ্ট্ বা শিল্পী আমি খুব কমই দেখেছি।

যেমন কোনও কোনও দৃশ্য দেখা যায় হয়ত একবার মাত্র কিন্তু তা ভোলা যায় না সারা জীবনেও, তেম্‌নি সঙ্গীতরাজ্যেও দুচারটি স্মৃতি এমন আছে যা আমাদের মনে স্থান পায় হয়ত এক আধ ঘণ্টার জন্য, কিন্তু তা ভোলা যায় না আমরণ। অবনী-বাবুর বাজনা আমি

সবসুদ্ধ শুনেছিলাম হয়ত পাঁচ-ছয় দিন মাত্র, কিন্তু তাঁর বাজ্‌নার ভঙ্গী, তন্ময়তা, মিষ্টতম কারুকার্য্য আজও যেন আমার কানে বাজ্‌ছে। তাঁর বাজানো আমার এত ভাল লেগেছিল যে তখন ছাত্রাবস্থাতেও আমি মাসাধিক কাল তাঁর কাছে তব্‌লা শিখেছিলাম। পরে হয়ত তাঁর চেয়ে নিপুণ বাদক দেখেছি বা বিস্ময়কর বাজ্‌না শুনেছি, কিন্তু তাঁর মধ্যে যে জিনিষটির পরিচয় পেয়েছিলাম সে জিনিষটির পরিচয় বোধ হয় ঠিক্ সেভাবে আর কখনও পাইনি।

তাঁর মধ্যে ছিল, গানের সঙ্গে একটা স্বাভাবিক সহানুভূতি। তাঁর মধ্যে ছিল, দরদ্। তাঁর মধ্যে ছিল, গানের সৌন্দর্য্যকে বাড়াবার আন্তরিক চেষ্টা। ছিল না কেবল—তব্‌লায় অযথা কৃতিত্ব দেখাবার প্রয়াস। ছিল না গানকে তব্‌লার আওয়াজের চোটে নষ্ট ক'রে দেবার প্রযত্ন। ছিল না—গায়কের সঙ্গে রেষারেষি ক'রে গানবাজনার রসকে নষ্ট ক'রে দেবার অধ্যবসায়।

দেখা যায় যে প্রায় প্রত্যেক শিল্পেরই মহিমাসম্বন্ধে কোনও বিশেষ ব্যক্তি আমাদের চোখ ফুটিয়ে দেন যেন এক মুহূর্ত্তেই। বছর পাঁচেক আগে ঠুংরি গানের মহিমাসম্বন্ধে একজন আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছিল মাত্র এক রাত্রির মজ্‌লিশে। সে হচ্ছে এলাহাবাদের বিখ্যাত জানকী বাই। গানবাজ্‌নায় তব্‌লার মহিমা সম্বন্ধে আমার চোখ খুলে' যায় তেম্‌নি অবনী-বাবুর বাজ্‌না শুনে'। আমাদের সঙ্গীতে সুর সর্ব্বপ্রধান হ'লেও তাল এই সুরের বড় কম সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করে না। তবে এ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি কর্‌তে হ'লে ঠিকমত তব্‌লা-সঙ্গত চাই। কারণ বেখাপ্পা সঙ্গতে যেমন গানকে একেবারে নষ্ট ক'রে দিতে পারে, যথাযথ সঙ্গত গায়কের উদ্ভাবনীশক্তির তেম্‌নি সহায়তা কর্‌তে পারে, এ-কথা যিনিই শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর সঙ্গত শুনেছেন তিনিই জানেন। তা ছাড়া আমাদের সঙ্গীতে তব্‌লা পাখোয়াজ ঠিকমত বাজাতে জান্‌লে তার ফলে খানিকটা পাশ্চাত্য হার্‌মনির রস পাওয়া যায়। তবে এ-রস পেতে হ'লে বাদকেরও গানের রসটি কোথায় তা বুঝ্‌তে পারা দর্‌কার। বলা বাহুল্য এজন্য একটু অন্তর্দৃষ্টি ও সৌষ্ঠবজ্ঞান দর্‌কার যেটা সকলের মধ্যে সমানভাবে বিরাজ করে না। এবিষয়ে কিন্তু অবনী-বাবু ছিলেন একজন সত্যকার শিল্পী। তা ছাড়া অবনী-বাবুর মিষ্টি হাত যেন যাদু জান্‌ত কোথায় কি বোল্, কোন্ সময়ে কি ঠেকা। (তা আবার কোন্ চালের ঠেকা) বাজাতে হবে সে সম্বন্ধে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ছিল একজন বর্‌ন্ আর্টিষ্টের—স্বভাবশিল্পীর। তাঁর বাজ্‌না শুনে' আমি প্রথম উপলব্ধি করি তব্‌লা-বাজানো কত বড় আর্ট্ হ'তে পারে; আরও উপলব্ধি করি যে ঠিক্-মত তব্‌লা বাজানো এত বড় আর্ট যে এতেও বিশেষরকম প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ না কর্‌লে শুধু অভ্যাসের জোরে হয়ত রাম শ্যাম হওয়া যায় কিন্তু অবনীমোহন হওয়া যায় না। অবনী-বাবুর বাজ্‌না যিনি শুনেছেন তিনি জানেন যে আমার এ কথা অত্যুক্তি নয়। অবনী-বাবু নাকি মৃদঙ্গও বাজাতেন চমৎকার। তাঁর মৃদঙ্গ বাজানো শোনার সৌভাগ্য আমার হয়নি, কিন্তু আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় যে মৃদঙ্গেও তিনি একজন যে-সে বাজিয়ে ছিলেন না।

শিল্পী যায়, কিন্তু তার স্মৃতি থাকে। তার মধ্যে সত্য যেটুকু, সুন্দরের স্ফুরণ যেটুকু সেটুকু কখনও নষ্ট হ'তে পারে না। স্বামী বিবেকানন্দ বল্‌তেন যে মহৎ চিন্তা নাকি কখনও নষ্ট হয় না—গুহা-মধ্যে থেকে চিন্তা কর্‌লেও তাকে সমগ্র পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হ'তেই হবে। সঙ্গীত-রাজ্যে সত্য সৌন্দর্য্যের বিকাশ সম্বন্ধেও এ-কথা বলা চলে। হয়ত অনেক সময় কিছুদিনের জন্য সে সৌন্দর্য্য বহির্জগতে বিকশিত হ'তে পারে না, মানুষের স্মৃতিজগতে উপ্ত থাকে, কিন্তু একদিন না একদিন সে আবার পুষ্পিত হ'য়ে পল্লবিত হ'য়ে নূতন অভিজ্ঞতার আলোয় আরও বিচিত্র, আরও সমৃদ্ধ, আরও উজ্জ্বল হ'য়ে ধরা দেয়।

অবনীমোহন গেছেন। কিন্তু তাঁর স্মৃতি শত শত সঙ্গীতানুরাগীর মনে বিরাজ কর্‌বে যাদের মধ্যে বর্ত্তমান লেখক অন্যতম। তাই আমি আজ শ্রদ্ধাপূর্ণ কৃতজ্ঞ-অন্তরে তাঁদের মুখপাত্র হিসেবেই আজ এই যৎসামান্য তর্পণে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য মনে কর্‌লাম।

শ্রী দিলীপকুমার রায়

কষ্টিপাথর

অরুণের কথা

ক্রোটনের বেড়ায় ঘেরা সবুজমাঠের গালিচার উপর লাল রঙের যে ছোট্ট দোতলাখানি আমার ষ্টুডিওর একেবারে লাগোয়া, তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমি এর আগে কখনো এত সজাগ হইনি, যেমনটি সেদিন হয়েছিলাম।

আর্টিষ্টের চোখে যা সুন্দর, প্রকৃতি যেন পশ্চিমের এ-সহরটিতে সে-সমস্তই দু হাতে বিলিয়েছিল; তা ছাড়া মানুষও তাকে কৃত্রিমতার চাপে আড়ষ্ট করে' দেয়নি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে আইনের নীরস ধারাগুলাকে রসিয়ে তুল্‌বার জন্যই দাদা এইখানে ওকালতি সুরু করেছিলেন কি না খবর রাখিনে, আমার কিন্তু মনে হচ্ছিল চিরদিনের চাওয়া জিনিসটাকে এখানে এসে আমি পেয়ে গেছি। ... দাদা মক্কেল, আর বৌদি গেরস্থালির জন্য নীচের ঘরগুলো পছন্দ করেছিলেন, আমি বেছে নিয়েছিলেম ছাদের উপরকার নিরিবিলি ঘরখানি আমার ষ্টুডিওর জন্যে। সেখান থেকে আমার চোখে বাইরের যে দৃশ্য আস্‌ত তাতে আমার অন্তরের ক্ষ্যাপাটি আনন্দে নেচে নেচে উঠ্‌ত।

কাছে-দূরে ছোট বড় পাহাড়গুলো আকাশপানে মুখ তুলে' কোন্ যুগ থেকে দাঁড়িয়ে আছে কেউ তা জানে না। তাদের পায়ের তলায় সবুজ মাঠ, মাথার উপর নীল আকাশ। মনে হয়, এই সবুজ মাঠ পেরিয়ে পাহাড়ের বুক বেয়ে উঠ্‌লেই ঐ নীল আকাশটিকে দু হাতে জড়িয়ে ধরা যায়। পূবের পাহাড়ের চূড়োর উপর থেকে যখন আলোশিশুগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ে' এই দিকে সাঁতার কেটে আস্‌তে থাকে আমি তখন মুগ্ধনয়নে চেয়ে থাকি; আবার যখন সারাদিনের খেলাশেষে তারা পশ্চিমের পাহাড়ের আড়ালে লুকোচুরির ছলে ডুব দেয় তাদের অপূর্ব্ব লীলা আমার বুক কানায় কানায় ভরে' তোলে।......

বাইরের সংসারের সাথে লেনা-দেনা আমার কোনও দিনই ছিল না, নিজের খেয়ালে আমার দিনগুলো ভাদ্রের নদীর মত ব'য়ে যাচ্ছিল, এবং আমার বাইরের অভাব-অভিযোগের ভার স্নেহশীল দাদা ও বৌদির কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে আমি আমার কল্পনার রঙীন নাওে ভেসে যাচ্ছিলেম সুখ-স্বপ্নের মদির-আনন্দ-বিহ্বল প্রাণে। ভোরের রূপের ঢংএ, সাঁঝের আলোর রংএ মশ্‌গুল হ'য়ে যে-সব ছবি আমি তুলির আঁচড়ে ফুটিয়ে তুল্‌তেম হয়ত তার কোনটা বিক্রী হ'ত, কোনটা হ'ত না, তাতে আমার সুখদুঃখ কিছু ছিল না, হিসেব-নিকেশও কেউ চাইত না।......

কিন্তু হঠাৎ কে যেন আমার বুকের ভিতর জানিয়ে দিয়েছে আমার স্বপ্ন-গড়া জীবনের চেয়েও মধুরতর কিছু এই বাস্তব সংসারটায় আছে। তারিখটা ঠিক মনে নেই, কিন্তু ক্ষণটা বেশ মনে আছে। সারা বিকেল একখানি প্রাকৃতিক দৃশ্য এঁকে শ্রান্ত হ'য়ে মুক্ত ছাদে পায়চারি কর্‌ছিলেম। আকাশে চাঁদ উঠেছিল গৌরী তরুণীর ললাটখানির মতন, আর জ্যোৎস্না কোন্ যৌবনময়ী রূপরাণীর রূপালী আঁচলখানির মতন দিগ্‌দিগন্তে লুটিয়ে পড়েছিল। পাহাড়ের মাথায়, গাছের পাতায় তার ঝিকিমিকি। আর কোন্ অচিন্ পাখীর সুর তা ছন্দময় করে' তুলেছিল। আমি সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে তা অনুভব কর্‌ছিলেম। হঠাৎ পাশের লাল বাড়ীর ছাদের উপরকার একটি মূর্ত্তি আমায় আকৃষ্ট কর্‌লে। প্রথমটা মনে হ'ল, বুঝি বা কোনও গ্রীক্-ভাস্করের তৈরী মর্ম্মর-ছবি,—তেম্‌নি নিখুঁত, তেম্‌নি ভাবময়। বোধ করি আন্‌মনে অপলক-চোখে তার দিকে চেয়ে ছিলেম। সে ছাদের অপর পাশে সরে' যেতে বুঝ্‌লেম সে প্রাণহীন মর্ম্মরমূর্ত্তি নয়, এবং তরুণীটি আমার দৃষ্টির খোঁচায় সঙ্কুচিত হয়েছে মনে করে' লজ্জিত হলেম। তাড়াতাড়ি ষ্টুডিওর ভিতর ঢুকে' পড়্‌লেম, কিন্তু অনেকক্ষণ তার জ্যোৎস্না-ধোয়া মুখখানি আমার চোখের কাছে ভেসে বেড়াল। ওপাশের জানালাটা খোলা ছিল। আমার দৃষ্টিটা ঐ দিকে একে-

বারে ছুটে' গিয়ে পড়ল, কিন্তু তখন সে নীচে নেমে গেছে।

বৌদি কখন ঘরে ঢুকেছিলেন টের পাইনি। তাঁর ডাকে ধড়্‌মড়িয়ে উঠ্‌তে তিনি বল্‌লেন—"আজ কি হ'ল তোমার, ঠাকুর-পো! রোগা মানুষ, আজ সন্ধ্যার আগে খাওয়া উচিত ছিল। চাঁদের দিকে চেয়ে বুঝি খিদে-তেষ্টা ভুলে-যেতে হয়? ওঠো—"

ঘড়ির পানে চেয়ে লজ্জিত হ'য়ে উঠ্‌লেম, বল্‌লেম—"তাইত, ন'টা বেজে গেছে এরি ভিতর! ছবিটা নিয়ে—"

বৌদি আরো অপ্রস্তুত করে' দিলেন—"চাঁদের আলোয় ছবি আঁক্‌বার মতন চোখ তোমার নয়, সেদিন চশ্‌মার কাচ বদ্‌লেছ। কি ভাব্‌ছিলে বলো ত?"

তাঁর কথায় কোনও ইঙ্গিত ছিল কি না তিনিই জানেন, কিন্তু আমার বড় লজ্জা হ'ল।

খেয়ে দেয়ে এসে জানালার কাছে টুর্গেনিভের একখানা বই হাতে করে' যে-দিকে চেয়ে ছিলেম তা আর যাই হোক বইয়ের পাতা নয়। ও-ছাদটায় দুটি মেয়ের আবির্ভাবের খবর পেতে আমার এতটুকু দেরী হয়নি। বৌদি যে ঐ মেয়েটির সঙ্গে ভাব করে' নিয়েছেন তা বুঝ্‌তে পেরে যেমন খুসী হ'লেম তেম্‌নি আবার বৌদির খুঁৎ ধরে' অখুসী হ'তেও দেরী হ'ল না। তিনি বৌ-মানুষ, ও-বাড়ীতে নিজে না যেয়ে তাঁকেও খবর দিয়ে আনাতে পার্‌তেন; আর গেছেন যদি, অমন ফুট্‌ফুটে-আলোয়-নাওয়া ছাদ ফেলে ঐ মেয়েটিকে নিয়ে ঘরের ভিতর যাবার তাঁর এত তাড়া কেন?......

রাগ করে' জানালার কাছ থেকে সরে' আস্‌বার উপক্রম কর্‌ছি এমন সময় ওবাড়ী থেকে হার্মোনিয়ামের সুরে সুর মিলিয়ে কার কণ্ঠ জেগে উঠ্‌ল। কি মিষ্টি গান! মনে হ'ল সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উপর যেন সুধাবর্ষণ হচ্ছে।......

বৌদির উপর মিছামিছি অখুসী হয়েছিলেম, ইচ্ছা হ'ল তাঁর কাছে মাপ চাইতে। তিনি তাঁকে ঘরের ভিতর ডেকে না নিলে ত চাঁদিনী রাতটা এমন সফল হ'ত না। তাঁর গান থেমে গেলেও গানের সুর আমার বুকের তারে ঝঙ্কৃত হ'তে লাগ্‌ল। আমার বুকের ভিতর যে একটি বীণা আছে, এই প্রথম জান্‌তে পার্‌লেম।......

প্রতিভার কথা

ঠাকুরপোকে এতদিন আপন-ভোলা শিল্পী বলে'ই জান্‌তেম, কিন্তু তাঁর ভিতর যে একটি প্রেমিক ঘুমিয়ে ছিল আজ ক'দিন ধরে' তা যেন প্রকাশ পেয়েছে। বোধ করি রূপকথার রাজকন্যার মত সকলের বুকের ভিতরই এমন একটি ঘুমন্ত প্রেম লুকিয়ে থাকে যা রাজপুত্রের একদিনকার সোনার কাঠির স্পর্শে হঠাৎ চোখ মেলে' চায়।

কতদিন ঠাকুরপোর কাছে শুনেছি যে শিল্পের সঙ্গে তাঁর ঘরকন্না পাতানো পাকাপাকি হ'য়ে গেছে, সেখানে আর কারুর ঢুক্‌বার উপায় নেই এবং মেয়ের বাপদের তিনি এমনভাবে হাঁকিয়ে দিয়েছেন যে তাঁর উক্তিতে অবিশ্বাস কর্‌বার কিছু ছিল না। কিন্তু আজ যেন তাঁকে আর-একটি মানুষ বলে' সন্দেহ হচ্ছে। ঠাকুরপোর দাদাটি ত সংসারের যত কিছু খুঁৎ আমার কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে খালাস। ঠাকুরপোর ব্যাপার তাঁকে বলেছিলেম, তিনি চট্‌ করে' জবাব দিলেন দোষটা নাকি আগাগোড়া আমার, কারণ এ-বয়সের মানুষের ঠোঁটের কাছে পেয়ালা-ভরা নেশার সর্‌বৎ এগিয়ে দিলে সে হিতাহিত বিচার না করে' তাতে চুমুক দিয়ে বিহ্বল হ'য়ে উঠ্‌বেই।...বাঃ রে! আমি নাকি তাঁর খোকা-ভাইটির ঠোঁটের কাছে নেশার পেয়ালা এগিয়ে দিয়েছি! কথার ছিরিতে পিত্তি জ্বলে' যায়।...আচ্ছা, কি দোষ আমার? আমি তার সঙ্গে ঠাকুরপোর ঘনিষ্ঠতা করে' দিইনি, আর মাথার দিব্যি দিয়ে তাকে ভালবাস্‌তেও বলিনি। জীবনটা উপন্যাস নয় যে লেখকের কলমের একটি খোচায় নায়ক-নায়িকার নিমেষের দেখাতেই প্রেমের সিন্ধু উথ্‌লে উঠে, তা থেকে সমুদ্র মন্থনের চেয়েও বেশী সুধা বা বিষ উঠ্‌বে। উপন্যাস ও বাস্তব জীবনের ভিতর তফাৎ কতখানি ঠাকুরপোর বয়সী পুরুষের পক্ষে জানা নিতান্তই উচিত।...

লতিকা ক'টি দিনের জন্যে তার মামা রত্নাকর-বাবুর বাড়ীতে বেড়াতে এসেছিল। রত্নাকর-বাবুর পরিবার

ভাল, আমার সঙ্গে খুবই মাখামাখি। লতিকার সঙ্গে আমার ভাব হ'য়ে গেল। একদিন লতিকা এবাড়ীতে বেড়াতে এলে আমার ঘরে টাঙান একটি ছবির প্রশংসা করতেই চিত্রকরটি যে আমারই দেওর এ-পরিচয় দেবার লোভ সাম্‌লাতে পার্‌লেম না। লতিকা তাঁর আরো ছবি দেখ্‌বার আগ্রহ প্রকাশ করায় আমার চাবি দিয়ে ষ্টুডিওর তালা খুলে' তাঁকে দেখালেম। ঠাকুরপো তখন বেরিয়েছিলেন। শিল্পে তাঁর ওস্তাদী হাত, প্রদর্শনীতেও ঢের পদক পেয়েছেন। লতিকা ভারি খুসী হ'ল তাঁর আঁকা ছবি দেখে'।

ঠাকুরপোর অনুপস্থিতিতে ষ্টুডিওতে ঢোকা অমার্জ্জনীয় অপরাধ, কারণ 'অনার্টিষ্টের' আনাড়ী হস্তার্পণে নাকি আর্টের চোখ কাণা হ'য়ে যায়। লতিকা আনন্দের আতিশয্যে ছবিগুলো যে-ভাবে হাৎড়ে দেখ্‌ছিল আমার ভয় হ'ল আজ ঠাকুরপো ফ্যাসাদ বাধাবেন; কিন্তু তিনি ফিরে' এসে এতটুকুও বিরক্তি প্রকাশ কর্‌লেন না।

ঠাকুর-পো খেতে বসে' বল্‌লেন—"কাকে নিয়ে ষ্টুডিওতে গিয়েছিলে?"

তাঁকে খুসী কর্‌বার জন্যে বল্‌লেম—"রত্নাকর-বাবুর ভাগ্নী লতিকা। ভারি প্রশংসা কর্‌লে তোমার ছবিগুলোর। সব ত আর দেখান গেল না।

ঠাকুরপো খেতে খেতে বল্‌লেন—"বাইরেরগুলো ভালো নয়। দেরাজের চাবী তোমার রিংএ নেই বুঝি?" তাঁর মুখে এ-রকম অনুমতি নূতন।

ঘণ্টা-খানেক পরে ঠাকুরপোর জন্যে খাবার-জল রাখ্‌তে গিয়ে দেখি ঘরটি ওলটপালট করে' ফেলেছেন, যার ফলে বাইরের ছবি দেরাজে, দেরাজের ছবি বাইরে এসেছে! যে ছবিগুলো প্রদর্শনীতে পুরস্কৃত হয়েছে, ময়লা হবার ভয়ে সেগুলো তিনি কাগজে মুড়ে' দেরাজে রাখ্‌তেন, আজ সেগুলোর বাইরে স্থান পাবার কারণ বুঝতে আমার দেরী হ'ল না।

পরের দিনে লতিকা আস্‌তে আমি নিজে থেকেই তাকে উপরে নিয়ে গেলাম। বেচারা শিল্পীটি যার জন্যে অত মেহন্নত করে' ষ্টুডিও গুছিয়েছেন সেই 'শিল্পী-প্রেয়সীর' পায়ের আল্‌পনা ও-ঘরে একবার না পড়লে শিল্পের অপমান হয়।

ঠাকুরপো দূরের কোন্ পাহাড় দেখ্‌তে যাবেন বলে' বেরিয়েছিলেন। এ-সুযোগে লতিকার কাছে রবি বাবুর সোনার তরীর সেই গানটা শিখে নিতে ইচ্ছা হ'ল। ঠাকুপোর হার্ম্মোনিয়াম্ ষ্টুডিওতেই ছিল। লতিকার গান শেষ হ'লে তখুনি তা শিখ্‌তে চেষ্টা কর্‌লেম, কিন্তু হার্ম্মোনিয়ামে আমার বিদ্যার দৌড় "কতকাল পরে" ও এই শ্রেণীর দু-একটা গানের স্বরলিপি অবধি; কাজেই লতিকার কাছ থেকে এগানটির স্বরলিপি লিখে' ভবিষ্যতে তা সাধ্‌বার জন্যে নীচ থেকে আমার গানের খাতা আন্‌তে ছুটলেম। বাইরে যেয়ে দেখি ঐ দিক্‌কার জানালার কাছে ঠাকুরপো দাঁড়িয়ে, তাঁর মাথাটি কাঁধের উপর যেন ভেঙে পড়েছে। আমার পায়ের শব্দ পেয়ে চম্‌কে উঠে তিনি সিঁড়ি বেয়ে ছুটে' পালালেন! আমার ভারি হাসি পেলে। চোরের মত বাইরে না দাঁড়িয়ে ঘরে যেয়েও ত তিনি গান শুন্‌তে পার্‌তেন। লতিকা স্কুলে-পড়া শিক্ষিতা মেয়ে, আমি অনুরোধ করলে ভদ্রতার খাতিরে সে নিশ্চয়ই তাঁর সাম্‌নে গান করত।...

আর-একদিনের কথা। বিকেলের দিকে নীচের ঘরে আমি আর লতিকা গল্প কর্‌ছিলেম। হঠাৎ ঠাকুরপোর হাঁকাহাঁকিতে উপরে যেতে হ'ল। তিনি তখন ছাদের উপর ক্যামেরা গুছিয়ে ফোটো তুল্‌বার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। আমি অবাক্ হ'য়ে বল্‌লাম—"কার ফোটো তোলা হচ্ছে?"

তিনি বল্‌লেন—"তোমার। নতুন আঁকা স্ক্রিন্‌টা কালই থিয়েটার-পার্টির লোকেরা নিয়ে যাবে। তা ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড্ করে' চমৎকার ফোটো হবে। যাও শীঘ্র প্রস্তুত হ'য়ে এসো।"

আমি অবাক্ হ'য়ে বল্‌লাম—"এখুনি?"

তিনি তাড়া দিয়ে বল্‌লেন—"এখুনি নয় ত কি? এর পরে আলো নিভে যাবে।"

স্ক্রিনের আগে দুখানি চেয়ার দেখে'ই আমি আদত কথাটা বুঝে' নিলেম। লতিকাকে নিয়ে এসে যখন বস্‌লেম, তখন দিনের আলো নিভে যাওয়ার ভয়ে ফোটোগ্রাফারটিকে একটুও ব্যস্ত দেখা গেল না। তিনি লতিকার

বস্‌বার ভঙ্গিমা নিয়ে এত মাথা ঘামালেন যে ঐ নিভে-যাওয়া রোদের তাপেই আমাদের মাথা কাট্‌বার উপক্রম হ'ল।

ক'দিন পরে কি কাজে ঠাকুরপোর ঘরে গিয়ে দেখি তিনি তন্ময় হ'য়ে কি আঁক্‌ছেন। নতুন কি তাঁর তুলি থেকে বেরুচ্ছে দেখ্‌বার জন্যে পিছন থেকে উঁকি মেরে দেখি সেদিনকার তোলা ফোটো থেকে লতিকার একখানি আলাদা ছবি তৈরী হচ্ছে। আমার উপস্থিতি টের পেয়ে তিনি এম্‌নি বিবর্ণমুখে তা উপুড় করে' রাখ্‌লেন যেন চুরি কর্‌তে গিয়ে ধরা পড়ে' গেছেন।...

বেচারা যে ফুলশরের ঘায়ে জর্জ্জর হ'য়েছে এর পরে সে-সন্দেহ করা বোধ করি অন্যায় কিছু নয়।...

রত্নাকর-বাবুর স্ত্রীকে দিয়ে লতিকার মায়ের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করে' একখানা চিঠি লিখ্‌ব কি না ভাব্‌ছি। পাত্র-পক্ষের বেশী গরজ দেখানোটা শোভা পায় না, কিন্তু অবস্থা যেমন দাঁড়িয়েছে, সে বিচার করা চল্‌বে না হয়ত।

লতিকার কথা

মামা-বাবুর পীড়াপীড়িতে স্কুলের ছুটি হ'তে যখন তার পশ্চিমের নতুন-কেনা বাড়ীর উদ্দেশ্যে বেরুই, তখন ভাবিনি আমাদের বোর্ডিংএর দারোয়ান মূর্ত্তিমান্ নোংরামি ঝণ্টু সিংএর দেশটা এত সুন্দর। পথ-ঘাটের প্রশংসা আমি কর্‌ছিনে, বাংলার শহরগুলোর সুখ-সুবিধা এখানে নেই, কিন্তু যা আছে তা বাইরের অসুবিধাগুলো ছাপিয়ে উঠ্‌বার পক্ষে যথেষ্ট। সত্যি, পাহাড়গুলোর দৃশ্য কি মহান্! চারিদিক্‌কার শালবনের ভিতর থেকে যে পাহাড়গুলো আকাশের পানে মাথা তুলে' উঠেছে সেগুলো দেখে মনে হয় যেন সত্যযুগের তপোবনে ধ্যানমগ্ন ঋষিরা বসে' আছেন।

দোতলার উপর দাঁড়ালেই পাহাড়গুলো দেখা যায়। কোনটা বড়, কোনটা ছোট। বড় বড় পাহাড়ের ঠিক তলায় ছোট্ট পাহাড়গুলোকে মনে হয় যেন শিশুপাহাড় মায়ের হাঁটু ধরে' কোলে উঠ্‌বার আব্‌দার কর্‌ছে। দূরের লম্বা পাহাড়ের সারিটাকে প্রথম দিন আমি মেঘ বলে' ভুল করেছিলেম। পাহাড় ছাড়া বোধ করি চন্দ্র-সূর্য্যের আলোর খেলা অনুভব করা চলে না। ভোরে, সন্ধ্যায়, পূর্ণিমা রাতে এখানে যে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হয়, তা বোঝাতে হ'লে আমার কবি হওয়া দর্‌কার। থাক্, দুদিনের জন্য বেড়াতে এসে আর কবি হ'য়ে কাজ নেই।...

ও-বাড়ীর প্রতিভার সঙ্গে ভারি ভাব হ'য়ে গেছে। দিব্বি বৌটি! সে স্কুলে পড়েনি, কিন্তু তাকে অশিক্ষিতা বলা চলে না। মেশ্‌বার ক্ষমতা তার আশ্চর্য্যি, দুদিনে আমাকে এমন আপনার করে' তুলেছে যেন আমাদের কতকালের চেনা। ভারি ভালো মেয়েটি। তার স্বামী বড়লোক নন, যা উপার্জ্জন করেন, তাতে তার শুয়ে বসে' সময় কাটানো চলে না, কিন্তু খাটুনীর ভিতর যে হাসিটুকু তার ঠোঁটের পাশ থেকে উছ্‌লে পড়ে তাতে মনে হয় তার কোনও অভাবই নেই। তার ভিতরকার ঐ যে পরিপূর্ণ আনন্দের ধারা সেইটিই তাকে এত মিষ্টি করেছে।

তার স্বামীর একটি ভাই আছে, তার উপর প্রতিভার যা টান বোধ করি আপনার ভাইয়ের উপরও মানুষের অত টান হয় না। লোকটি চিত্রকর। ছবি আঁকার নেশায় ডুবে' তিনি নাকি বাইরের কোনও খোঁজ-খবর রাখেন না। তাঁর কখন কি দর্‌কার তাও নাকি তাঁর মনে থাকে না এম্‌নি আন্‌মনা তিনি। তাই তাঁর বৌদিকে তাঁর তালাসি কর্‌তে হয় মায়ের মতন।

প্রথম দিন তাঁকে যখন দেখি ভেবেছিলেম লোকটা হয় পাগল, নয় হতভাগা। ছাদের উপর চাঁদের তলায় দাঁড়িয়ে আমি পাহাড়ের শোভা দেখ্‌ছিলেম। হঠাৎ দেখি লোকটা যেন হাঁ করে' আমায় গিল্‌ছে। ভারি রাগ হ'য়েছিল তাঁর অশিষ্টতায়। কিন্তু পরের দিন প্রতিভাদের বাড়ী বেড়াতে যেয়ে তার ঘরে একখানি ছবি দেখে' যখন জান্‌তে পার্‌লেম তার চিত্রকর ঐ লোকটি, তখন আমার মনের তিক্ততা উবে গেল। চমৎকার চিত্রটি! প্রতিভা উপরে নিয়ে গিয়ে তার দেওরের ষ্টুডিও দেখালে। হাঁ, চিত্রকর বটে তার দেওর! চিত্র কম দেখিনি, আর্ট্-সম্বন্ধে একটু জ্ঞানও ছিল, বুঝ্‌লেম একে আর্টিষ্ট্ বলা যেতে পারে। লোকটির উপর শ্রদ্ধা হ'ল।

প্রতিভা তাঁর সম্বন্ধে খুব সার্টিফিকেট্ দিলে, তাঁর

খ্যাতির, তাঁর স্বভাবের। বুঝ্‌লেম অনেক কবি ও শিল্পী যেমনটি হ'য়ে থাকে, ইনিও তেম্‌নি খেয়ালে চলেন।···

ছবির খাতিরে তাঁর ষ্টুডিওতে ক'দিন আনাগোনা কর্‌লেম। ভেবেছিলেম এই আন্‌মনা লোকটিকে মোটেই লজ্জা কর্‌ব না, কিন্তু সেদিন আমাদের ফোটো তুল্‌বার সময় লোকটি আমার বস্‌বার ভঙ্গিমা নিয়ে এত বেশী মাথা ঘামিয়েছিলেন যে প্রতিভার কাছে আমার বাস্তবিক লজ্জা কর্‌ছিল। আর্টিষ্ট্‌টির সঙ্গে আলাপ থাক্‌লে তাঁকে নিশ্চয় জিজ্ঞেস কর্‌তেম, আমাকে তিনি তাঁর আদর্শরূপে ঠাউরে নেবার মৎলবে আছেন নাকি?···

শিল্পীদের বোধ করি সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান কম, নৈলে কি তাঁরা আর্টের উৎকর্ষ দেখাবার জন্যে যা আবৃত রাখার রীতি সে-সব অনাবৃত করে' দেখান!···

তরুণের কথা

দুদিনের জন্যে সে এসেছিল, চলে' গেছে। আমার তাতে মুষ্‌ড়ে পড়্‌বার কোনও কারণ হ'তে পারে না। কিন্তু মনকে যেন যুক্তিতর্ক দিয়ে বুঝিয়ে রাখ্‌তে পারিনে। মনে হয়, দুদিনের জন্যে এসে সে আমায় এমন কিছুর সন্ধান দিয়ে গেছে যা অপূর্ব্ব, এবং তার বদলে যা নিয়ে গেছে তা বাদ দিয়ে কিছুই থাকে না। বোধ করি মানুষের অন্তর একটা ফোটোগ্রাফের কাঁচের মতন। এক-একটা মুখ যেন ক্ষণিক দেখায় একেবারে গেঁথে যায়। বেশী দিন তাকে দেখিনি, কিন্তু তার মুখ মনে রাখ্‌বার জন্যে একদিনের দেখাই যে যথেষ্ট। বাস্তবিক কি সুন্দর সে! ভগবান্ বোধ করি তাকে জ্যোৎস্না নিংড়ে তৈরী করেছেন। দৈত্য ছলনা কর্‌তে মোহিনীর সৃষ্টি হয়েছিল। দৈত্য মুগ্ধ হয়েছিল, কিন্তু তাকে সুদর্শনের আঘাত সইতে হয়েছিল। আমার বুকে যে ব্যথা বোধ কর্‌ছি তাও সুদর্শনেরই আঘাত!···

তাকে দেখ্‌বার জন্যে আমি কত লুকোচুরি করেছি, সে-সব বল্‌লে হয়ত রুচিবাগীশেরা ছি ছি কর্‌বেন, কিন্তু আমি তাঁদের জিজ্ঞেস করি জীবনের যে-সময়টায় প্রাণে আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে কেউ যদি সে-সময় ফল্গুর ধারাটি ঘোলাটে না করে' শুধু অঞ্জলি ভরে' তা পান করে তাতে কি সে অপরাধ ক'রে বসে? বাগানে যে ফুল ফোটে তাকে নখে না ছিঁড়ে যদি কোনও বালক দূরে দাঁড়িয়ে তার শোভা দেখে, তাকে কি মন্দ ছেলের দলে গুরুমশায়রা ফেলে' থাকেন?···

কি অনুপম সে! যৌবন-পুষ্ট তার নিটোল স্বাস্থ্যের উপর দিয়ে একটা প্রাণের স্রোত যেন তর্‌তর্ করে' নেচে চলেছে। তার ভঙ্গিমায় ছন্দ, কথায় সঙ্গীত!

যেদিন কৌশলকরে' তার ফোটো তুলি সেদিন কালো পর্দ্দার আড়াল থেকে চোখের ক্ষুধা মিটিয়ে তাকে দেখেছিলেম, কিন্তু তাতে চোখের আশা যেন বেড়ে গেছে। কবি বলেছেন—"জনম জনম হাম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল।" আমার অন্তরের কথা। হয়ত ঠিক এম্‌নি অনুভূতি থেকে কবি তাঁর বুকের ভাষাকে রূপ দিয়েছিলেন।···

বৌদি আমায় ধরে' ফেলেছেন বলে' সন্দেহ হচ্ছে। তিনি যেন আজকাল আমার সম্বন্ধে একটু গম্ভীর হ'য়ে উঠেছেন।

কাল যখন খেতে বসেছি তখন তিনি ধীরে ধীরে আমার বিয়ের কথা পাড়্‌লেন। প্রথম কান দুটো গরম হ'য়ে উঠেছিল, কিন্তু তাড়াতাড়ি বল্‌লেম—"আমি ত চিরকালের মানুষটিই আছি, বদ্‌লে যাইনি।" শেষের কথাটা যেন আমার কানেই মিথ্যা বলে' ধরা পড়ে' গেল।

বৌদি বল্‌লেন—"পরিবর্ত্তনশীল জগতে মানুষের চোখের সম্মুখে প্রতিদিন এমন অনেক দৃশ্য আসে যাতে মানুষ হয় ত নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আর-একটি মানুষ হ'য়ে যায়। এ ত হর্‌দম্ হচ্ছে।"

"আমার কি পরিবর্ত্তন দেখ্‌লে?"—বলে'ই মুখ নীচু কর্‌লেম।

"দেখ্‌তে অবশ্য পাইনি। অপরে সব দেখ্‌তে পায়ও না।"

"যখন পাবে তখন খোঁজ কোরো", বলে' থালার দিকে অসম্ভব মনোযোগ দিলেম।

রাত্রিতে বিছানায় শুয়ে অনুতাপ হ'ল বৌদিকে ধরা দিইনি বলে'। অন্তরে আমি যা হয়েছি বাইরে তার বিপরীত পরিচয় দিয়ে [illegible]

হয়ত বৌদি কোনও বিহিত করতেও পারতেন, ভাবতেই শিরাগুলোর রক্ত চঞ্চল হ'য়ে উঠল। বৌদিকে ধরা দেবো কি না ভেবে স্থির করতে পারছিনে।...

প্রতিভার কথা

ঠাকুরপোর স্বাস্থ্য এমন কি খারাপ হয়েছিল তা অবশ্য ডাক্তারদের বিবেচ্য, আমার কিন্তু স্থির ধারণা তাঁর রোগ দেহে নয়, মনে। বায়ু পরিবর্ত্তনের নাম করে' হঠাৎ তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়েছেন, এজায়গাটা নাকি তাঁর পক্ষে ভারি অস্বাস্থ্যকর হ'য়ে পড়েছে, অথচ দেখি ছুটির দিনে বাংলাদেশ ভেঙে স্বাস্থ্যান্বেষী লোকেরা এইদিকে ছুটে আসে।

কারণটা আমি বেশ জানি, এবং সেজন্যই তাঁকে ধরে' রাখতে তেমন পীড়াপীড়িও করিনি, থাক্ তবু দেশ-ভ্রমণে তাঁর মনটা যদি চাঙ্গা হ'য়ে ওঠে।...

নিজের বোকামির জন্যে আমার ভারি অনুতাপ হয়। রত্নাকর-বাবুর স্ত্রী লতিকার মায়ের উত্তরখানি আমাকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন যে এক ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে তাঁর মেয়ের সম্বন্ধ অনেক আগে থেকেই স্থির হ'য়ে আছে, এবং হয়ত দু-তিন মাসের ভিতর বিয়ে হবে। এমনতর একটা ভয় আমি পূর্ব্বাবধিই করছিলেম। ঠাকুরপো যে কতখানি আঘাত পাবে তা ভেবে খুবই কষ্ট হ'ল। চিঠিখানি ছিঁড়ে' জানলা গলিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে ভারমনে বিকেলের খাবার তৈরী করতে গেলেম। যখন চা ও খাবার নিয়ে ঠাকুরপোর ঘরে গেলেম, দেখলেম তিনি চোখ বুজে' ইজি-চেয়ারে পড়ে' আছেন। আমি ডাকতে তিনি চোখ মেললেন, কিন্তু তখনো চোখের কোণে জলের দাগ। আমার মনটা ছাং করে' উঠল। খাবার দিয়ে প্রথমেই ছুটে' গেলেম আমার জানলার তলায়, দেখলেম চিঠির টুকরো সেখানে নেই। এর পরে ঠাকুরপোর চোখের জলের কারণ আর অজ্ঞাত থাকতে পারে না।

পর দিন ঠাকুরপো স্বাস্থ্যের দোহাই দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ওঁর দাদা ভিতরের খবর কিছু জানতেন না, আমিও জানাইনি, ছোট ভাইটির ব্যথার কথা শুনে' তিনি ত আর খুসী হ'তে পারতেন না।

আমার চিরদিন ধারণা ছিল কোমলতার বালাই পুরুষের ভিতর নেই, তা মেয়েদেরই একচেটিয়া; পুরুষের ভালবাসা প্রথম যৌবনের নেশার বিহ্বলতা বই কিছু নয়। ঠাকুরপোর জীবন দেখে' আমার সে ভুল ভেঙে গেছে। পুরুষ হ'য়ে যে ব্রহ্মচর্য্যশীলা বিধবার নৈষ্ঠিক জীবন বরণ ক'রে নেয় তার প্রেম কত কোমল, কত দৃঢ়! আমার মনে হয় ভালমন্দ সকলকার ভিতরই আছে; খাঁটি কথাটার অর্থ সব অভিধানেই এক।...

কাল ঠাকুরপোর চিঠি পেয়েছি। বোধ করি ব্যথা চেপে রাখতে না পেরে অজ্ঞাতে তিনি তা প্রকাশ করে' ফেলেছেন। কি করুণ তার সুর! চিঠি পড়ে' আমার দু-চোখ ফেটে হু হু করে' জল ঝরেছে। বোধ করি কখনো অত কাঁদিনি।...তিনি এক জায়গায় লিখেছেন—"আকাশ অত বিশাল, তবু যখন ঝড় ওঠে আর মেঘগুলো গৃহহারার মত নানাদিকে ছুটোছুটি করে আশ্রয়ের জন্যে, তখন আকাশ তাকে হাত বাড়িয়ে আশ্রয় দিতে পারে না; তেমনি আজ তোমাদের বিপুল স্নেহও যেন আমাকে ঘিরে' রাখবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এর জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী আমি। ঝড়ের সঙ্গে লড়াই না করে' আমি যেন ঝড়ের কোলে গা ঢেলে দিয়েছিলেম। তার ফল আমায় ভুগতে হবেই! আমি ভেসে চলেছি, এ-চলার শেষ কোথায় জানিনে।"...এ-বয়সে তিনি বিবাগী হ'য়ে ভেসে বেড়াচ্ছেন ভাবতে ভারি কষ্ট হয়। কোনও রকমে তাঁকে সংসারের ভিতর এনে ফেলতে পারলে হয়ত বা তাঁর পরিবর্ত্তন হ'ত। একটি ভাল মেয়ে খুঁজে তাঁকে ধরে' আনতে হবে।...

রত্নাকর-বাবু সপরিবারে দেশের বাড়ীতে গেছেন। ইচ্ছা হয় লতিকার মনের খবর জানতে। তার প্রতি ঠাকুরপোর গভীর ভালবাসার আকর্ষণ কি তার হৃদয় স্পর্শ করেছিল? না করে' থাকলেই বরং ভাল।

অরুণের কথা

দিনের পর দিন মাসের পর মাস কি অজানা আশার পিছনে উল্কার মতন ঘুরে বেড়াচ্ছি অনেক সময় নিজেই যেন বুঝে' উঠতে পারিনে। আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ডাক্তারেরা এমন কোনও আশঙ্কা করেননি যে পশ্চিমের

ঐ শহরটি ছেড়ে বেরিয়ে পড়াই জীবন বাঁচানোর একমাত্র উপায়। কিন্তু আমার অন্তরের ডাক্তারটি যে হতাশ হ'য়ে পড়েছিল।...

কিছু দিন হ'ল বম্বে এসে একটা ষ্টুডিও খুলেছি, কাজ নিয়েছি। জীবনটা কোনও কাজের ভিতর বিক্ষিপ্ত হ'তে চাচ্ছিল, কর্ম্মহীন অলস জীবনের অবিচ্ছিন্ন ব্যথাভরা চিন্তায় যেন পুড়ে' পুড়ে' ছাই হ'য়ে যাচ্ছিলেম। কাজের নেশায় একটু যেন সাম্‌লে নিয়েছি। আমার ছবিতে যে-মুখের আদরা ফুটে' ওঠে তা আমার বুকের রক্তে কল্পনার তুলিতে লেখা। একটা বায়োস্কোপের কাজ পেয়েছি; সেখানে মাঝে মাঝে যে দৃশ্য দেখান হয় তার প্লট ছবি সবই আমার তৈরী। তা গল্প নয়, বল্‌তে গেলে আমার জীবনের ক'টি পাতা। তা দেখে' দর্শকেরা যখন প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে আমি তখন কোঁচার খুঁটে চোখ মুছি। কিন্তু বুকের ব্যথা কালির আঁচড়ে ফুটিয়ে তোল্‌বার একটা দুঃখ-ভরা সুখ আছে। যাকে চেয়েছিলেম এবং যাকে না পেয়ে জীবনটা একেবারে ব্যর্থ বলে' বোধ হচ্ছিল সে যেন অতর্কিতভাবে আমায় ধরা দিয়ে যায় আমার তুলির রংএর ভিতর।...সে-দিন অভিনয়-শেষে যখন নিজের ঘরে এই-সব নানা কথা ভাব্‌ছিলেম তখন নির্ম্মল-বাবু তাঁর ফোটোর তাগিদ দিতে এলেন। লোকটি ক'দিন ধরে' ক্রমাগত তাগিদের চোটে আমায় উদ্‌ব্যস্ত করে' তুলেছিল। শুনেছিলেম স্ত্রী মারা যাবার পর তিনি আবার বিয়ে করা স্থির করেছেন। এ-শ্রেণীর লোক, যারা প্রেম নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, তাদের প্রতি কোন কালে আমার শ্রদ্ধা নেই। তিন-তিন বারের ফোটো তিনি বাতিল করায় আমি ধারণা করে' ফেলেছিলেম তাঁর উদ্দেশ্য কৃত্রিমতার ছোপে চেহারাখানা বিশের কোটায় টেনে নেওয়া। স্ত্রীর সঙ্গে বয়সের ব্যবধানটা অনেকে কৃত্রিম উপায়ে ঢাক্‌তে চেষ্টা করে।

আমি তখন কল্পনার তুলিতে প্রেমের স্বর্গীয় সুষমা আঁক্‌ছিলেম। এই অপ্রেমিকের আবির্ভাবে ভারি বিরক্তি বোধ হ'ল। বাস্তবিক মানুষ একদিন যাকে নিজের সবখানি দান করে, তার মৃত্যু হ'তে না হ'তে সে সব দানের জিনিষ আবার অপরকে তুলে দেয় কি করে'? আমার মনে হয়, যতদিন উপভোগের উপায় থাকে মানুষের প্রেম ততদিন বেঁচে থাকে, আর যেদিন সে উপায় লোপ পায় প্রেমও সেদিন মরে' যায়। ছি! ছি! মানুষ প্রেমটাকে কি ছোট করে' ফেলে।...

নির্ম্মলের কথা

মানুষ পরকে প্রবঞ্চনা করে' কিন্তু নিজকেও যে এত ফাঁকি দেয় এর আগে আমি তা জান্‌তেম না। দু'বছর আগেকার কথাটাই ভাবি, যখন প্রথম বিয়ে করি। উজ্জ্বল বিবাহ-সভায় তার সরম-কম্পিত তুল্‌তুলে হাতখানি হাতে ধরে' যখন তাকে জীবন-মরণের একমাত্র সঙ্গিনী বলে' স্বীকার করেছিলেম, তখন কিন্তু ঐ স্বীকারোক্তিটাকে এতটুকু সন্দেহ আমার হয়নি। তারপর দুটি জীবনের ভিতর বিরহ-মিলন মান-অভিমানের লুকোচুরি আমাদের চারপাশে সাতটি-রংএ-ঝলমল যে ইন্দ্রধনুটি গড়েছিল, ভেবেছিলেম পৃথিবীর সমস্ত আঁধারের মাঝেও এইটি আমাদের বুক আলোকিত করে' রাখ্‌বে।...

কিন্তু তার মৃত্যুর পর দু'টি বছরও আমার সে প্রেম বেঁচে রইল না। হয়ত থিয়েটারের অভিনেতার মতনই আমি পার্ট্‌ বদ্‌লে আবার আসরে নাব্‌তেম, যদি না একটি প্রেমিক তার জীবনের কষ্টিপাথরে আমার নীচ আচরণটা কষে' দেখাত।...তার কথাটাই আজ বল্‌ব।

বম্বের এক চিত্রকর, চিত্র এঁকে ইনি বেশ নাম করেছিলেন। তাঁকে আমার একটি ফোটো তৈরী কর্‌তে দিয়েছিলেম, আমার ভাবী স্ত্রীকে উপহার দিবার জন্যে। ষোল আর তিরিশ, বয়সের ব্যবধানটা কিছু আকাশ-পাতাল নয়, তবু দোজবর বলে' যদি আমার ত্রিশ বছরটাকেই সে চল্লিশ বলে' ভুল করে' বসে সেই ভয়ে তিনটি ফোটো বাতিল করে' চতুর্থবার লজ্জার মাথা খেয়ে তাকে ফোটোখানি 'রিটাচ্‌' কর্‌তে বলেছিলেম।...শেষদিন ফোটোগ্রাফারের জেরায় বিরক্ত হ'য়ে উঠেছিলেম, কিন্তু তার মুখেও অমন ঘৃণার রেখা ফুটে' উঠ্‌বার কি কারণ হ'তে পারে প্রথমটা তা বুঝ্‌তে পারিনি। সে বল্‌লে—"মানুষের আদত যা, তার উপর মিথ্যার ছোপ দেওয়া অপরের পক্ষে

সম্ভব হ'তে পারে, কিন্তু সত্যের উপর যার সৌন্দর্য্যের ভিত্তি তার পক্ষে এ অসম্ভব।" সে ঝাঁঝের সঙ্গে তার বাক্সের ডালা খুলে' ফেল্‌লে আমার ফোটো ফিরিয়ে দিতে, কিন্তু বাক্স থেকে যে ছবিখানি উঁকি দিলে তা দেখে' আমি একেবারে আঁৎকে উঠ্‌লেম। বিস্ময়ে এক মিনিট স্তব্ধ থেকে তার পর হঠাৎ ছবিখানি কেড়ে নিয়ে আমি চেঁচিয়ে বল্‌লেম—"কোথায় পেলেন এ?" সে অবাক্ হ'য়ে আমার পানে চাইলে। আমি তেম্‌নি স্বরে বল্‌লেম—"নীতির লেক্‌চার ত খুব হচ্ছিল, কিন্তু আর্টিষ্টের নীতি-জ্ঞানের জ্বল্‌জ্বলে প্রমাণ দেখ্‌ছি।" একটু ক্ষণের জন্যে তার মুখ একেবারে সাদা হ'য়ে গেল। আমি আরও ঘা দিয়ে বল্‌লেম—"পরস্ত্রীর ছবি বাক্সে লুকিয়ে রেখে তার পর—"

সে কি যেন বল্‌তে চেষ্টা কর্‌লে, কিন্তু তাতে তার ঠোঁট শুধু নড়ে' উঠ্‌ল, স্বর ফুট্‌ল না। আমার রক্ত তখন টগবগ করে' ফুট্‌ছিল। তার কাঁধে একটি ঝাঁকুনী দিয়ে বল্‌লেম—"কোথায় পেলেন এ ছবি বল্‌তে হবে আপনাকে।"

সে কাতর-চোখে আমার পানে চাইলে। আমার তখন দয়া কর্‌বার মতন মনের অবস্থা নয়, বল্‌লেম—"হয় আপনি কুভাব নিয়ে এ ছবি বাক্সে লুকিয়ে রেখেছেন, অথবা সে—"

সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—"ছি ছি ছি!" তার পর বোধ করি আমার উদ্যত ইঙ্গিতের ভয়ে বল্‌লে—"এ ছবির সঙ্গে অনেক ব্যথার স্মৃতি জড়ান। এতকাল এ কাহিনী গোপন ছিল, এবং চিরকাল থাক্‌তও; কিন্তু আপনি যে ইঙ্গিত কর্‌লেন তার পর আর তা গোপন রাখা চলে না, কারণ আপনি তার অম্লান জীবনের উপর কালো কালী ঢেলে দিচ্ছেন। শুনুন সে কাহিনী।"

সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বল্‌তে লাগ্‌ল—"তুলির রংএ বিশ্বের রূপ ফুটিয়ে তোলাই ছিল আমার সুখ, এর চেয়ে বড় সুখ আমার জানা ছিল না। কিন্তু এক রক্ত-রাগ সন্ধ্যায় আমার অন্তর-ফলকে যে রঙের ছোপ লেগে গেল আমার শিল্পী-জীবনের পাতায় তা একেবারে নূতন। নারীর দেহ ঘিরে' যে এত রূপের সমাবেশ হ'তে পারে এর আগে তা কল্পনা কর্‌তে পারিনি। সেদিন প্রথম আমার বুকের ভিতর একটি তরুণ প্রেমিকের অস্তিত্ব অনুভব কর্‌লেম।"

আমি গম্ভীর-স্বরে প্রশ্ন কর্‌লেম—"আর সে?"

সে বল্‌লে—"সে জান্‌তে পারেনি, কারণ আমার ভীরু স্বভাব তাকে দূর থেকে অনুভব করে'ই তৃপ্ত হচ্ছিল। বৌদির সঙ্গে তার ছিল ভাব। বৌদিকে গান শেখাবার জন্যে তার সাধা স্বর যে-রাগিণীর সৃষ্টি কর্‌ত আমার বুকের ভিতর তা যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল আমি ছাড়া আর কেউ বোধ করি তা জান্‌তে পারেনি।...এই ফোটো সেই প্রভাবের ফল।... তরুণ বুকের অরুণ নেশায় আমি তার ফোটো তুলেছিলেম সত্য, কিন্তু তাতে এতটুকু মলিনতা ছিল না। বাগানের ফোটা ফুল যে একদিন অপরের পূজোয় উৎসৃষ্ট হ'য়ে ঘ্রাণের অযোগ্য হ'য়ে যাবে একথা কখনো ভাবিনি, আমি তাকে ভেবেছি শুধু বিশ্ব সৌন্দর্য্যের উদ্যানে চির-অনাঘ্রাত অম্লান-কুসুম বলে'।"

আমি স্তব্ধ হয়ে তার ইতিহাস শুন্‌ছিলেম, বল্‌লেম—"পরে জেনেছেন যে সে পরের স্ত্রী?"

সে বল্‌লে—"জান্‌তে চাইওনি আমি। কি প্রয়োজন আমার? তাকে পাওয়া আমার সম্ভব নয়, এ কথা জেনে আমার অশান্ত মন আমায় প্রথমটা ঝড়ের বেগে বাইরে উড়িয়ে ফেলেছিল, আমার অন্তরের শিল্পী তখন আমায় হাত বাড়িয়ে তুলে' নিয়েছে—বাইরের খেলার ভিতর দিয়ে তাকে পাওনি তুমি, তোমার রঙের খেলার ভিতর দিয়ে তাকে পেতে ত কোনও বাধা নেই। তোমার সমস্ত তুলি দিয়ে সমস্ত রঙের ভিতর, সৌন্দর্য্যের ভিতর তাকে ফুটিয়ে তোলো,—শিল্পীর কাছে এই যে শ্রেষ্ঠ পাওয়া।... সেদিন থেকে আমার সমস্ত রং, সমস্ত চিত্র দিয়ে তাকে ঘিরে রেখেছি, আমার কল্পনার চোখে সে প্রতিক্ষণ জ্বল্‌জ্বল্ কর্‌ছে। একে ঘিরেই আজ আমি বিখ্যাত চিত্রকর।"

আমি অবাক্ হ'য়ে বল্‌লেম—"তার খোঁজ নেননি আপনি?"

সে বল্‌লে—"রক্তমাংসের সে সেদিন থেকেই আমার চোখে মরে' গেছে, আর তার কল্পনার মূর্ত্তিখানি বেঁচে উঠেছে।"

"আমি বল্‌লেম—"বিবাহ করেননি?"

সে বল্‌লে—"না।"

আমি বল্‌লেম—"তার কোনও স্মৃতি-চিহ্ন আপনি পেয়েছিলেন?"

সে বল্‌লে—"ভালবাসার পাতায় লেনা-দেনার হিসাব-নিকাশ নেই। কোমলতা সৌন্দর্য্য পবিত্রতার যে মূর্ত্তি আমার চোখে আঁকা রয়েছে তাই কি যথেষ্ট স্মৃতিচিহ্ন নয়?… অনেক সময় ভাবি তার স্মৃতির প্রতি আমার এ আকর্ষণ কি পাপ? কিন্তু আমার অন্তর বলে, রক্তমাংসের দেহটাকে বাদ দিয়ে যে ভালবাসা তা ত এ পৃথিবীর কিছু নয়, উপভোগেচ্ছাটাকে ঘিরেই কালিমা, ঐটাকে সরিয়ে দিতে পার্‌লেই চাঁদের আলো।"…

সে দূরের আকাশটার পানে চাইলে, মেঘগুলো তখন গায়ে বিচিত্র রং মেখে প্রজাপতির মত নীলের দেশে ছুটোছুটি কর্‌ছিল।

আমার বুক অপূর্ব্ব শ্রদ্ধার ভারে নুয়ে পড়্‌ছিল। ছবিখানি নামিয়ে রেখে আস্তে আস্তে বাড়ী ফিরে' এলাম।…

স্ত্রীর প্রতি অপর পুরুষের আকর্ষণের কাহিনী বোধ করি এম্‌নি নীরবে কেউ কখনো সয়নি। কিন্তু আমার মনে হ'তে লাগল তা' মহান্ ভালবাসার কথা,—এ যেন এক পূজারীর প্রাণ-ঢালা নীরব পূজা। তাকে সে পায়নি, পাবার আশা নেই জেনেও তার প্রেম এতটুকু শ্লথ হয়নি! আর আমার? কি তরল, অগভীর!

তার কথাটা আমার কানে ঘুর্‌ঘুর্ কর্‌তে লাগ্‌ল—"উপভোগেচ্ছাটাকে ঘিরে'ই কালিমা, ঐটে সরিয়ে দিতে পার্‌লেই চাঁদের আলো।" কত বড় কথা! এ-কথাটা বুঝ্‌লে কি আবার বিয়ের কল্পনা মনে স্থান দিতেম!

অন্তরকে আর চোখ ঠেরে ঠকান চল্‌ল না, আজ যে কষ্টিপাথরে আমার প্রেম কষা হ'য়ে গেছে।… আজ বুঝ্‌তে পেরেছি কি নীচ এই পুরুষজাতটার প্রেম! মনে হচ্ছে, স্ত্রীর কাছে প্রেম-নিবেদন আমাদের অন্তরের কথা নয়, তার যৌবনের কাছে স্তুতিবাক্য।

ড্রয়ার টেনে কাগজ বার ক'রে বন্ধুর কাছে চিঠি লিখ্‌লেম—নূতন বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে ফেল্‌তে। লতিকার একখানি ফোটোও আমার কাছে ছিল না। একবার ইচ্ছা হ'ল অরুণ-বাবুর কাছ থেকে নিয়ে আসি; কিন্তু ভেবে দেখ্‌লেম আমার চেয়ে তিনিই এর যোগ্যতর অধিকারী। পেয়ে যে হারিয়ে ফেলেছে তার চেয়ে, না-পেয়েও যে হারায়নি তার দাবী যে ঢের বেশী একথা অস্বীকার কর্‌বার ক্ষমতা কারু নেই, এবং মৃত্যুর ওপার অবধি যদি প্রেমের সূক্ষ্ম আকর্ষণ থাকে তা হ'লে পরজন্মে তার আর আমার ভিতর লতিকার উপর কার বেশী দাবী সে-কথা মীমাংসা কর্‌তে দেরী হ'ল না।…

লতিকার মৃত্যুর দিনে মনটা যেমন আলোড়িত হয়েছিল, আজকেও তেম্‌নি হ'ল। সেদিন হয়েছিল মৃত্যু তাকে কেড়ে নিয়েছে বলে', আর আজ হ'ল অরুণ তাকে জয় করেছে বলে'। একজন তাকে কেড়ে নিয়েছিল হত্যা করে', আর একজন কেড়ে নিয়েছে ভালোবেসে; কিন্তু আজ দ্বিতীয়টি যেন আমায় চাব্‌কে দিচ্ছিল।…

শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র বসু

হায়দারাবাদ-নগর সংস্কার

দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদ "নগর-সংস্কার সমিতির" (সিটি ইম্‌প্রুভ্‌মেণ্ট্ বোর্ড্) ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুত পি এ ভব্‌নানী পূর্ত্ত-বিদ্যায় একজন বিশেষজ্ঞ। তিনি নিজাম-রাজধানীর উন্নতিকল্পে এই কয় বৎসরের মধ্যে যেরূপ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বস্তুতই প্রশংসনীয়। পূতিগন্ধময় প্লেগ-গ্রস্ত স্থানসমূহকে তিনি সুদৃশ্য ও স্বাস্থ্যপ্রদ স্থানে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন; অধিকন্তু বর্ত্তমানে ইহা দরিদ্রোপযোগী আবাসস্থানও বটে। কোন ইংরেজ এইরূপ একটি ব জ

হায়দারাবাদের বর্ত্তমান নিজাম মহামহিমান্বিত মীর ওস্মান্ আলী খাঁ

রাজা-মহারাজারাও তাহার দ্বারা নক্সা করাইবার জন্য কতই না মোটা মাহিনার ব্যবস্থা করিতেন!

নদীতীরস্থ উদ্যান

নিজাম রাজ্যে উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু প্রায় নাই বলিলেই চলে। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, শ্রীযুক্ত ভবনানী নিজাম সরকারের অধীনে উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়া সসম্মানে বাস করিতেছেন। প্রথমতঃ তাঁহার রচিত উদ্যানগুলির কথাই বলা যাক।

কুৎব্ শাহী বংশের পঞ্চম বাদ্‌শা মহম্মদ কুলি কুৎব্-শাহ্ চারি শতাব্দী পূর্ব্বে হায়দারাবাদ নগরটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা এক শতাব্দী-ব্যাপী বা তদূর্দ্ধ কাল নিজাম-রাজ্যের রাজধানী স্বরূপে রহিয়াছে। এই প্রাচীন নগরের পাদদেশ চুম্বন করিয়া কলনাদিনী কল্লোলিনী মুসী প্রবাহিত হইতেছে। বৎসর কয়েক পূর্ব্বে এক প্রলয়প্লাবনে মুসীর জলরাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া করিলে তাহা পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দুন্দুভি-নিনাদে প্রচারিত হইত! আমাদের দেশের

হায়দারাবাদের পরলোকগত নিজাম মহামহিম মীর মহবুব আলী খাঁ

হায়দারাবাদের নদীতীরস্থ উদ্যান—পশ্চাতে হাইকোর্ট-গৃহ
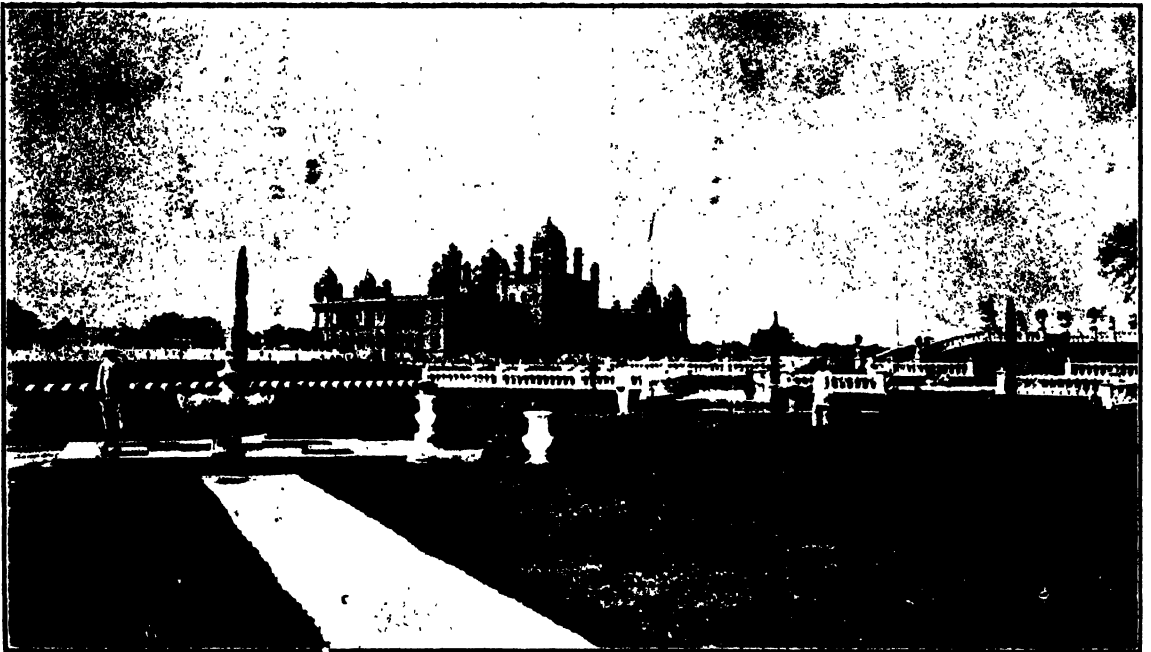
হায়দারাবাদের হাইকোর্ট-গৃহ

ভয়াবহ তরঙ্গভঙ্গে এমন ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছিল যে, ধন প্রাণ রক্ষা পাইবে বলিয়া কেহ আশা করে নাই। এমন কি, প্রবলপ্রতাপান্বিত তৎকালীন নিজাম মীর মহ্‌বুব আলী খাঁ পুরাতন পুলের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সেতুর উপর দিয়া প্রবহমান প্রমত্ত জলরাশির তাণ্ডব-নৃত্য-দর্শনে অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। আকস্মিক বিপদের কঠোর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, হায়দারাবাদের অধিবাসীরা হৃদয়ঙ্গম করিল যে তাহাদের স্বাস্থ্যহানির কি বিষম ভয় দূর হইল। সেই ভীষণ প্লাবনে নদীর উভয় পার্শ্বস্থ কুশ্রী পল্লীসমূহ ও আঁকা-বাঁকা সরু গলিগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। বিপদ্ অনেক সময় মুক্তির সুখপ্রদ নূতন পন্থা আবিষ্কার করে। মর্ত্ত-মানব আমরা না বুঝিয়া সর্ব্বমঙ্গলময় ভগবানের উপর দোষারোপ করিয়া থাকি!
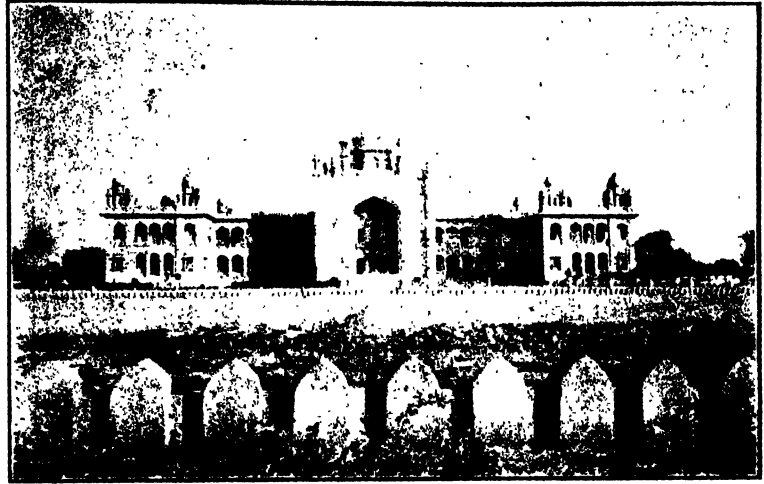
হাইকোর্টের সম্মুখস্থ ময়দান—সংস্কার-কার্য্যের পূর্ব্বে

নদীর উভয় তীর, বহু বৎসর যাবৎ নগরের যাবতীয় আবর্জ্জনা ফেলিবার জায়গারূপে ব্যবহৃত হইতেছিল। দুর্গন্ধময় পাইখানা, কসাইখানা এবং হীনাবস্থা সমাধি-স্থান ব্যতীত তথায় অন্য কিছু দৃষ্টি-গোচর হইত না। সেইখানেই অন্ধকার ও পূতিগন্ধময় বহু নর্দ্দমা ছিল। বস্তুতঃ পীড়ার আশঙ্কায় তথায় এক মুহূর্ত্ত নিশ্চিন্ত মনে দাঁড়াইবার সুবিধা ছিল না।

কল্পনার সাহায্য ব্যতীত ইহা ধারণাও করা যায় না যে, এরূপ একটি অপকৃষ্ট স্থানের উন্নতি-সাধন করতঃ ইহা প্রমোদোদ্যানে পরিণত করা হইয়াছে। ইহাতে যে শুধু শহরটির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা হইয়াছে তাহা নহে, অধিকন্তু ইহা সেখানকার অধিবাসীদের আরা-মোদ্যানরূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।
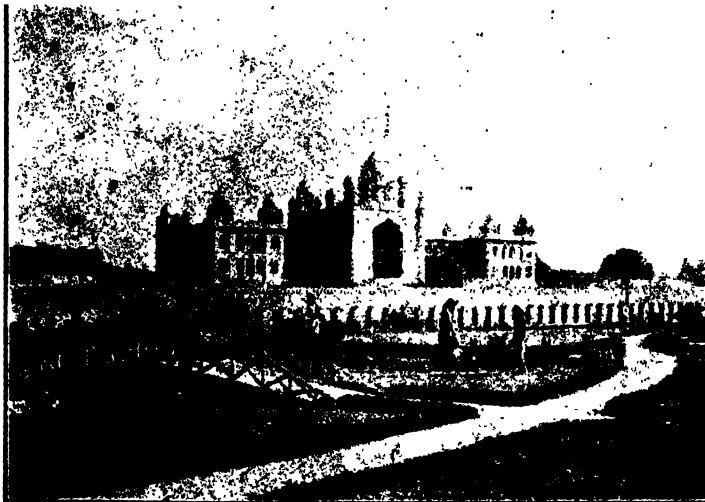
হাইকোর্ট-গৃহের সম্মুখস্থ ময়দান—শহর সংস্কারের পরে

শ্রীযুত ভব্‌নানী সংস্কার-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করা হইল যে, মুসী নদীর উভয় পার্শ্বস্থ মুক্তস্থানে কেহ কোন পাকা বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে পারিবে না। সরকার পক্ষ হইতে মালিকদিগকে উপযুক্ত মূল্য দানে স্থানটি সরকারের ব্যবহারের জন্য রাখা হইল। তারপর পাইখানা ও কসাইখানাগুলিকে স্থানান্তরিত করা হইল। বীভৎস নর্দ্দমাগুলির সংস্কার সাধন করিয়া
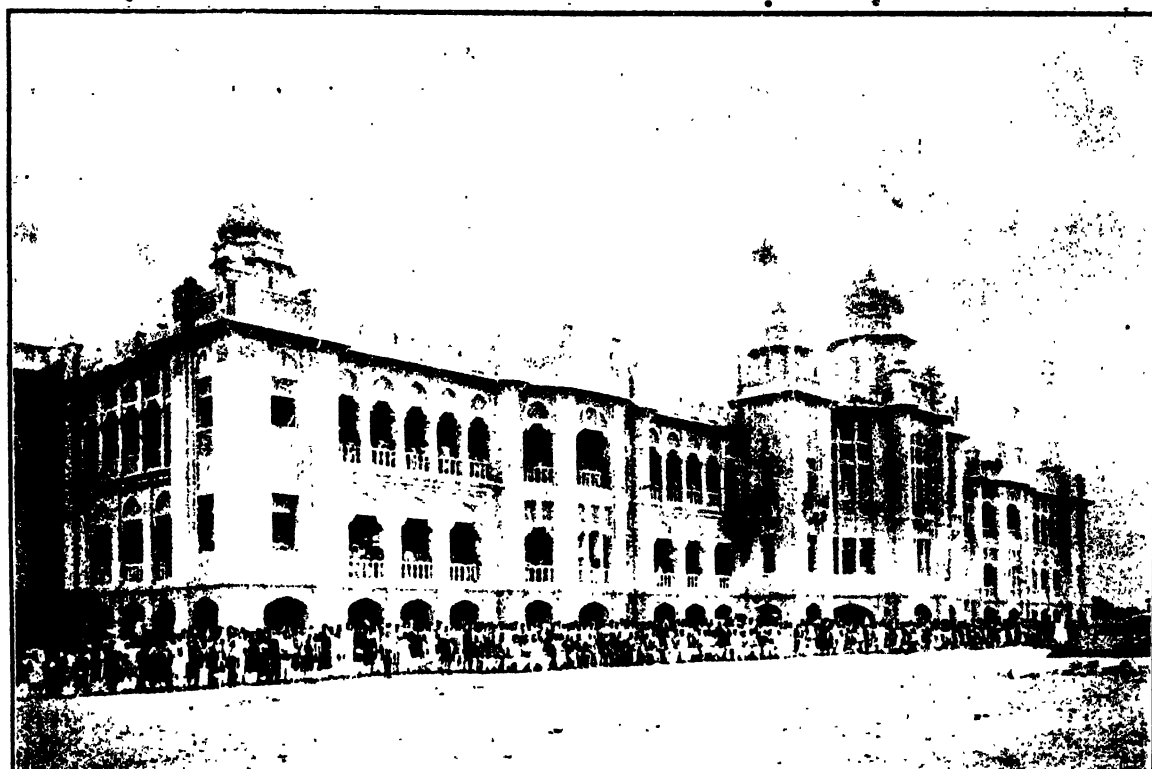
হায়দারাবাদের সিটি স্কুল গৃহ

হায়দারাবাদের নদী-তীরের বাগান ও সিটি হাই স্কুল গৃহ

হায়দারাবাদ শহরের চকের পশ্চাতে চার মিনার

ঢাকিয়া রাখা হইল। এক্ষণে আফ্‌জলগঞ্জ সেতুর উভয় পার্শ্বে একক্রোশ ব্যাপিয়া বাঁধা সুদৃঢ় প্রাচীর গাঁথা হইয়াছে।

মুসী নদীর উত্তরতীরে পাথর বসান একটি সুবিস্তৃত রাজপথ প্রস্তুত হইয়াছে। তৎপার্শ্বে উচ্চ আদালত, গভর্ণমেণ্ট্ সিটিস্কুল প্রভৃতি সুমনোহর হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মিত হইয়াছে।

নদীর অপর পার্শ্বে সবুজতৃণাচ্ছাদিত প্রস্রবণ-বিধৌত "মোগল-উদ্যান" তৈয়ারি করা হইয়াছে। তৎপার্শ্ববর্ত্তী পাথরে-বাঁধান সুবিস্তৃত রাস্তার অপরদিকে নিজামের দাতব্য-চিকিৎসালয় প্রভৃতি প্রাসাদতুল্য ভবনসমূহ নির্ম্মাণ করা হইতেছে।

বাম তীরে অগণিত সমাধিস্থান থাকাতে বাগান করার প্রতিবন্ধক যথেষ্ট ছিল। নিজাম একজন গোঁড়া মুসলমান। তিনি কখনও সমাধিগুলিকে স্থানভ্রষ্ট করিবার অনুমতি দিতেন না। তিনি সম্মত হইলেও জনসাধারণ হইতে প্রতিবাদের একটি কোলাহল উত্থিত হইতই, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কিন্তু শ্রীযুক্ত ভব্‌নানী ত্রই দিক্ রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ভব্‌নানীর সুকৌশলে সেই স্থান একাধারে পবিত্র সমাধিস্থান ও নয়নানন্দদায়ক উদ্যান হইয়াছে। অসংখ্য সমাধিমণ্ডপের একত্র সমাবেশ হেতু স্রোতস্বিনীর রূপালী রঙ্গের ঠিক পাশেই উদ্যানের সবুজ রেখা চিত্রিত করা অসম্ভব বলিয়াই মনে হইত। কিন্তু ভব্‌নানী অসাধারণ নিপুণতাসহকারে অসম্ভবকেও সম্ভব করিয়াছেন। সুবিন্যস্ত গুল্ম-পরিবেষ্টিত সমাধিমণ্ডপের উন্নত শীর্ষদেশ বিচিত্র লতা দ্বারা আচ্ছাদিত করা হইয়াছে। নিজামের সুশিক্ষিত

হায়দারাবাদের চার মিনারের চক্

কার্য্য সহসা থামিয়া গিয়াছে। রেসি-ডেন্সীর সীমা পর্য্যন্ত আসিয়াই সংস্কারকার্য্য শেষ করা হইয়াছে, কারণ, ইংরেজ-রাজপ্রতিনিধির বাসস্থান নিজাম-রাজ্যর অন্তর্ভুক্ত হইলেও রাজনৈতিক চুক্তিমতে ইহাকে প্রতিনিধিরই অধিকারে ও শাসনাধীনে বলিয়া ধরা হয়।

আশা করা যায়, শীঘ্রই আভ্যন্তরীণ শাসন-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন হইবে। তখন নদীতীরস্থ উদ্যানগুলিকে আরও বিস্তৃত করিতে কোনও প্রতিবন্ধক থাকিবে না। শ্রীযুক্ত ভবনানীও অভিলসিত কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার সুযোগ পাইবেন।

নবাব নিজামৎ জং বাহাদুরের নাম এখানে উল্লেখ-যোগ্য। এইরূপ একজন উচ্চশিক্ষিত জনপ্রিয় ব্যক্তি নগর-সংস্কার সমিতির সভাপতিরূপে আসীন না থাকিলে, বোধ হয়, পূর্ত্ত-বিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতপ্রবর ভবনানীর প্রতিভা কোন কাজেই আসিত না।

কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সাধকের কঠোর সাধনার ফলেই মৃত্যু-সহচর প্লেগের আবাস-ভূমি আজ সুগন্ধ-গন্ধবহ-সেবিত স্বাস্থ্যপ্রদ পরমরমণীয় স্থানে পরিণত হইয়াছে।

নদীর পার্শ্ববর্ত্তী উদ্যানগুলি অতীব রমণীয় হইয়াছে। চিরহরিৎ সাইপ্রেস্ বৃক্ষগুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে সুকোমল তৃণাচ্ছাদিত সমতল ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বিবিধ কৌশলে নির্ম্মিত কৃত্রিম জলপ্রপাতসমূহ হইতে অজস্র বারি-ধারা নির্গত হইয়া এক অদ্ভুত বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

ইংরেজ-রাজপ্রতিনিধির বাস-স্থানের সীমায় পৌছিয়াই সংস্কার-

সদর রাস্তার সংস্কার সাধন

অনুমতি পাইলে শ্রীযুক্ত ভবনানী নদীতীরস্থ সুবৃহৎ বাজারটির সম্মুখে একটি সুদৃশ্য ফটক নির্ম্মাণ করিতে চাহেন। তখন হায়দারাবাদের সমগ্র দ্রব্যাদির কেন্দ্র-স্থল চার-মিনার বিশেষ মনোরম স্থান হইতে পারে। সংস্কার করিলে স্থানটি কিরূপ রমণীয় ও স্বাস্থ্য-

চার মিনারের চকের অপর একটি দৃশ্য
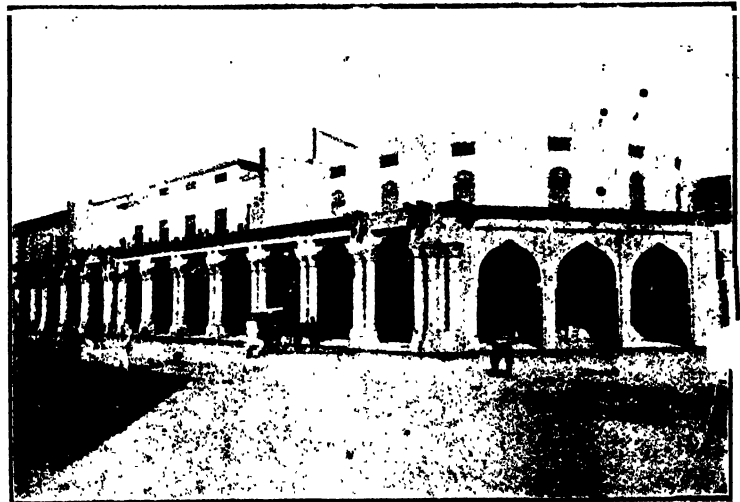
প্রদ হইবে. তাহা প্রমাণিত করিবার জন্য, শ্রীযুক্ত ভব্‌নানী ইতিপূর্ব্বেই উক্ত সীমার পার্শ্ববর্ত্তী প্রধান রাস্তা-গুলিকে সুপ্রশস্ত করিয়াছেন এবং বারান্দাযুক্ত দ্বিতল বিপণীশ্রেণী তৈয়ার করিয়াছেন।

নগরের পার্শ্বস্থিত কদর্য্য রাস্তার সংস্কার

নগরের বিভিন্নঅংশস্থিত কদর্য্য রাস্তাসমূহের যেরূপ উন্নতি করিয়াছেন, তাহা হইতে শ্রীযুক্ত ভব্‌নানীর আধুনিক নগর নির্ম্মাণে দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

হায়দারাবাদ শহরের একটি রাস্তা—সংস্কারের পূর্ব্বে

পূর্ব্ব মালিক যাহাতে সংস্কৃত ভবনগুলির পুনরধিকার প্রাপ্ত হয় প্রত্যেকটি নক্সা এইরূপভাবে তৈয়ার করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই সমস্ত স্থানটির সংস্কার-কার্য্য শেষ করিয়া অপর অংশের অধিবাসীদিগকে সংস্কৃত স্থানে বসবাস করিতে দেওয়া হয়। এইরূপে শূন্যস্থানে সংস্কার-কার্য্য পুনঃ আরম্ভ করা হইয়া থাকে।

অনেক স্থানে কেবলমাত্র অস্বাস্থ্যকর কদর্য্য বাড়ী-গুলিকে নষ্ট করা হইয়াছে। অন্যগুলি যথাসম্ভব পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে, এবং সেগুলিতে যথোপযুক্ত আলো ও বায়ু চলাচলের সুব্যবস্থা হইয়াছে। সদর রাস্তাগুলি সুপ্রশস্ত করিয়া স্থানে স্থানে উন্মুক্ত জায়গায় খেলার মাঠ করা হইয়াছে। জলের কল ও বৈদ্যুতিক আলোর বন্দোবস্ত এবং প্রণালীর ব্যবস্থাও হইতেছে।

হায়দারাবাদ শহরের একটি রাস্তা—সংস্কারের পরে

কালোপযোগী সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া কেহ কেহ স্ব স্ব বাড়ীর সম্মুখভাগের উন্নতি-বিধান করিতেছেন। ইহার ফলে সমগ্র রাজ্যটি কদর্য্যত্ব পরিহার করিয়া সুশোভন স্বাস্থ্যপ্রদ স্থানে পরিণত হইতেছে।

কোন কোন অংশে শ্রীযুক্ত ভব্‌নানী আরও উচ্চাভিলাষের পরিচয় দিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপে "নামপল্লী"র সংস্কারকার্য্য উল্লেখ করা যায়।

নগরের মাল-সরবরাহের প্রধান কেন্দ্রস্থলের নিকটবর্ত্তী হওয়াতে এই স্থানটি প্লেগ বিসূচিকা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার সংক্রামক রোগের আকর

হায়দারাবাদের দাতব্য চিকিৎসালয়

হায়দারাবাদে রাজ-সরকারের অল্প-বেতনের কর্ম্মচারীদের বাস-গৃহ ;
এই বাড়ীগুলি মাসিক ৫৲ টাকায় ভাড়া দেওয়া হয়

ছিল। সুদৃশ্য বাড়ী একখানাও ছিল না। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, কর্দ্দম-নির্ম্মিত কুঁড়েঘরগুলিতে নির্ম্মল বায়ু চলাচলের কোন পথ ছিল না। খোলার চালের ঘরগুলির একটি মাত্র দরজা থাকিত। তথায় প্রায় কুড়ি একর জায়গায় সম্পূর্ণ নূতন ধরণে গৃহাদি নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।

সাধারণের গমনাগমনের জন্য কয়েকটি সরাসর রাস্তা রাখা হইয়াছে। সদর রাস্তা হইতে কতকগুলি ছোট রাস্তা

বাহির হইয়াছে। পথের উভয় পার্শ্বে সুদৃঢ় বাড়ী ও গোশালা শ্রেণীবদ্ধভাবে নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। সকল বাড়ীর আয়তন সমান নহে। আকার ও সুবিধা-অসুবিধার পার্থক্য আছে। ইহাতে গৃহ-বিচ্যুত গরীব লোকেরা পুনরায় স্ব স্ব অবস্থানুসারে বাসস্থান মনোনীত করিবার সুযোগ পাইয়াছে। শ্রেণীবদ্ধভাবে গৃহাদি নির্ম্মিত হওয়াতে প্রচুর পরিমাণে উন্মুক্ত স্থান রাখা সত্ত্বেও সংস্কৃত স্থানটি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোকের বাসোপযোগী হইয়াছে। বাড়ীর মূল্য ও ভাড়া যথাসম্ভব দরিদ্রোপযোগী করা হইয়াছে।

হায়দারাবাদ রাজ-সরকারের চাপরাশীদের থাকিবার গৃহ—এই বাড়ীগুলিতে অতি সামান্য ভাড়ায় থাকিতে পারা যায়

সংস্কার-কার্য্য দ্বারা নামপল্লী প্লেগমুক্ত করা হইয়াছে, একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। খোলার চালের ঘর এখন আর নাই। নূতন গৃহগুলিতে ইঁদুর প্রবেশ করিতে পারে না। সংস্কারের পর হইতে এপর্য্যন্ত কোন সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব তথায় হয় নাই।

বিভিন্ন শ্রেণীর গরীবের জন্য বিভিন্ন মূল্যের গৃহ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে, যথা—

শ্রেণী	মূল্য	আংশিক ভাড়া
১	১৫০০৲	৪॥০ বা ৫৲
২	৯৫০৲	২॥০
৩	৫৫০৲	১৷৹
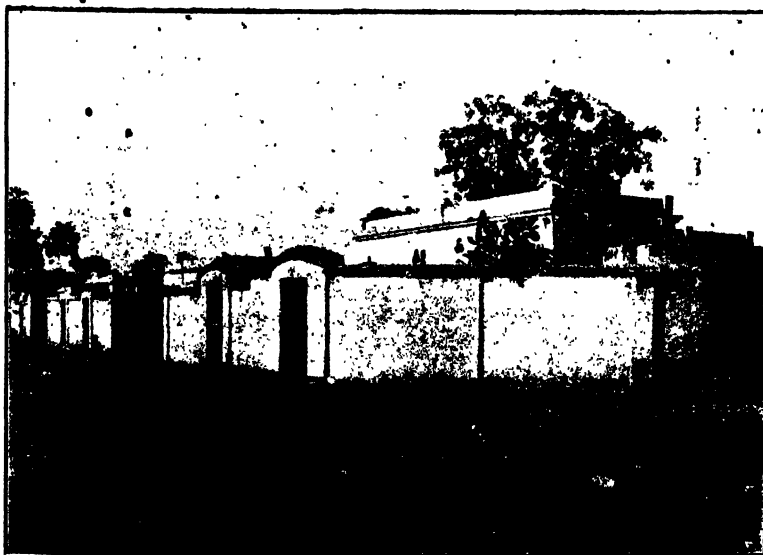
১২৲ টাকার অন্যূন মাসিক আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রকেই এই-সকল গৃহ ভাড়া দেওয়ার উপযুক্ত বিবেচনা করা হয়।

ছোট বড় সকল বাড়ী সম্পূর্ণ আলাদাভাবে তৈয়ার করা হইয়াছে প্রত্যেক বাড়ীতে কল, পাইখানা, রান্নাঘর ও শুইবার ঘরের সুবন্দোবস্ত আছে। পুরমহিলাদিগের জন্য প্রত্যেক বাড়ীতে প্রাচীর-বেষ্টিত একটি অংশ আছে। হায়দারাবাদের লোকেরা 'পর্দ্দা'র বিশেষ পক্ষপাতী।

শহর সংস্কার সমিতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত [illegible]

যাহারা স্ব স্ব গৃহাদি আপন ব্যয়ে সংস্কৃত করিতে সমর্থ.

তাহাদিগকে প্রায় ক্রয়দরে জায়গাগুলি ফেরৎ দেওয়া হইয়াছিল। ফেরৎ দেওয়ার নিয়ম এই ছিল যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক জায়গা কাহাকেও দেওয়া হইবে না এবং প্রকৃত মালিক ভিন্ন জমি-ব্যবসায়ী কোন দালালকে জায়গা দেওয়া নিষিদ্ধ। মালিকেরা যাহাতে স্ব স্ব অধীনস্থ জায়গার উন্নতি-সাধন করিতে সমর্থ হয়, তজ্জন্য তাহাদিগকে অল্প সুদে অর্থ-সাহায্য করা হইবে।

নক্‌সামত সংস্কারকার্য্য সম্পূর্ণ শেষ করিতে নিজাম-মুল্লায় প্রায় আট লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে। মোটামুটি হিসাবে ব্রিটিশ ভারতের ১০০ একশত টাকা হায়দারাবাদের ১১৬ টাকার সমান।

সহরতলীস্থ গৃহাদি নির্ম্মাণের নক্‌সা

উপকণ্ঠস্থিত কতকগুলি স্থানের উন্নতি-কল্পেও শ্রীযুক্ত ভব্‌নানী তাঁহার নক্‌সামত কার্য্য করিয়াছিলেন। নূতন মিটার গেজ রেলওয়ে ষ্টেশনের চতুর্দ্দিকস্থ সংস্কার-কার্য্য বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

নদীরতীরস্থ সংস্কার কার্য্য আরম্ভ করিয়াই মিটার গেজ ষ্টেশন পর্য্যন্ত 'মুআজ্জামজাহী' ও 'আজমজাহী' নামে দুইটি রাজপথ করা হইয়াছিল। রাস্তাগুলি ৬৪ ফুট প্রস্থ ও প্রায় দেড় মাইল দীর্ঘ। রাস্তাগুলি সম্পূর্ণ আধুনিক ধরণে তৈয়ার করা হইয়াছে। রাস্তার উভয়পার্শ্বে বৃক্ষ-বীথিকা ও ফুটপাথ আছে। জল-নিঃসরণের ও যাত্রীর যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত আছে।

এই রাস্তাগুলির পার্শ্বে স্থানে স্থানে নব্যধরণে উন্মুক্ত মাঠ রাখা হইয়াছে। ডাকঘর, থানা, হাঁস্‌পাতাল, শুল্কাগার, বিদ্যালয় প্রভৃতি সরকারী কার্য্যালয়ের জন্য যথেষ্ট স্থান আছে। অবশিষ্ট স্থানটিকে খণ্ড খণ্ড চতুষ্ক বা চক করিয়া মালিকদিগকে ফেরৎ দেওয়া হইয়াছে। ইতিমধ্যেই মালিকেরা কোন কোন অংশে সুবিধাজনক হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

রেলওয়ে ষ্টেশনের পূর্ব্বদিকে প্রায় ৩০ ত্রিশ একর ভূমি সাধারণ গৃহাদি নির্ম্মাণের জন্য পৃথক্ রাখা হইয়াছে। 'ওপাল রোড' এবং 'নিউগুড্‌স্ শেড্' রোডের সান্নিধ্যে এইরূপ বাড়ী কয়েকটি নির্ম্মিত হইয়াছে।

(ওয়েলফেয়ার্-এ প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সন্ত নিহাল সিংহের প্রবন্ধ অবলম্বনে।)

শ্রী হরেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মরীচিকা

ছোট বেলায় আমার মা মারা যান। সেজন্য আমি বাপের খুব আদুরে ছিলাম। আমার আর কোন ভাই বোন ছিল না। বাবাকে সকলে আবার বিয়ে কর্‌বার জন্য অনেক অনুরোধ করে। কিন্তু পাছে সৎমা আমাকে কষ্ট দেন এই ভয়ে তিনি আর বিয়ে করেননি। এক বিধবা পিসীমা আমাদের সঙ্গে থাকৃতেন—তিনিই আমাকে মানুষ করেন।

বাবার মস্ত জমিদারী ছিল। কিন্তু আমরা কল্‌কাতাতেই থাক্‌তাম। জমিদারী ছাড়া বাবার আরও অনেক কার্‌বার ছিল, সেইজন্য জমিদারী দেখ্‌বার ভার এক খুড়তত ভাইএর উপর দিয়েছিলেন।

আমাকে অল্প বয়সে বিয়ে দেবেন না ঠিক করে' লরেটোতে ভর্ত্তি করে' দিয়েছিলেন। কিন্তু পিসীমার মোটেই ইচ্ছা ছিল না যে আমি মেমদের স্কুলে পড়ি। আমি কিন্তু স্কুলে যেতে খুব ভালবাস্‌তাম। বাড়ীতে সমবয়স্ক কেউ ছিল না—সেখানে সঙ্গী সাথী পেয়ে বেঁচে গিয়েছিলাম।

হেসে খেলে ১২।১৩ বৎসর কেটে গিয়েছিল। কিন্তু চোদ্দ বছর পূর্ণ হবার কিছু পরেই একটা নূতন ঘটনা ঘট্‌ল। একদিন স্কুল থেকে এসে দেখি পিসীমা আমার কাপড়ের আল্‌মারী খুলে' মহাকাণ্ড আরম্ভ করে' দিয়েছেন। ব্যাপার কি জিজ্ঞেস কর্‌তেই পিসীমা একগাল

হেসে বল্লেন—"আজ একজন নতুন লোক আস্‌বে, তাই তোর একটা ভাল কাপড় বের করছি।" তখন আমার পেট ক্ষিদেতে চোঁ চোঁ করছিল, তাই পিসীমাকে খাবারের জোগাড় দেখার বদলে কাপড় নিয়ে টানাটানি করতে দেখে' বড়ই রাগ হ'ল। "সাজ্‌গোজের কথা পরে হবে। এখন চলো ত আমায় খেতে দেবে।" এই বলে' বইগুলো দড়াম করে' টেবিলে ফেলে কাপড় ছাড়তে আমার ঘরে ঢুকে পড়লাম।

পেট ঠাণ্ডা হ'লে পিসীমাকে জিজ্ঞেস করলাম—"তোমাদের নতুন অতিথিটি কে শুনি?" পিসীমা তখন শতমুখে তার বর্ণনা আরম্ভ করে' দিলেন—এমন রূপবান্ গুণবান্ বিদ্বান্ ছেলে আর ভূভারতে নেই ইত্যাদি। আমি কোন সাড়াশব্দ না দিয়ে চলে' এলাম। ঘরে ঢুকে' টেবিল থেকে একখানা বই টেনে নিয়ে খাটে শুলাম। কিন্তু বইয়ের পাতা খুলতে না খুলতে শুনি পিসীমা বল্‌ছেন—"বই নিয়ে শুলি যে, কাপড় ছাড়বিনে?"

"এখন আর পারিনে পিসীমা, বেড়াতে যাবার আগে ছাড়্‌ব।"

"দাদা ত আজ বেড়াতে যাবে না।"

"কেন?"

"কেন কি? বাড়ীতে লোক বেড়াতে এলে তাকে ফেলে' কেউ বেড়াতে যায়!"

জল হোক, ঝড় হোক, শত কাজ ফেলে'ও বাবা প্রতিদিন সন্ধ্যায় বেড়াতে বের হতেন। কিন্তু আজ সেই নিত্যকর্ম্মে বাধা দিতে আসছেন যিনি—সেই অপরূপ মানুষটিকে দেখ্‌বার জন্য একটু কৌতূহল হ'ল।

কিছুক্ষণ পরে উঠে পড়লাম—একটা সাদা ভইয়ালের ব্লাউজ ও হেলিওট্রপ্ রঙের জরিপেড়ে সাড়ী পরলাম—বেণী করে' চুলে রিবন্ বাঁধলাম, জরির নাগ্‌রা জুতা পায়ে দিলাম। তার পর জানালার কাছে চেয়ার টেনে "শালি" পড়তে বস্‌লাম। কিন্তু মন বসল না—মন বড়ই চঞ্চল লাগ্‌ছিল।

অল্পক্ষণ পরেই আমার ডাক পড়ল বস্‌বার ঘরে। কেমন যেন লজ্জা করছিল। কোনও রকমে পর্দ্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকে' পড়লাম। বাবা আলাপ করিয়ে দিলেন—তাঁর অনেক কালের এক মৃত বন্ধুর ছেলে, নাম সমরেশ রায়, কলিকাতায় থেকে এম্-এ পড়েন ইত্যাদি।

আমি কোনও রকমে নমস্কার করে' ব'সে পড়লাম। আগন্তুকের সঙ্গে বাবা গল্প করছিলেন। আমি ইত্যবসরে লোকটিকে দেখে' নিলাম। রং ফর্সা নয়, কিন্তু উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, লম্বা চওড়া, বেশ পৌরুষব্যঞ্জক চেহারা। মুখের ভাবটি ভারি সুন্দর, খুব সুপুরুষ না হ'লেও ভারি প্রিয়দর্শন চেহারা।

বাবার সঙ্গে কে একজন দেখা করতে এলেন। "তোমরা গল্প কর, আমি এক্ষুনি আস্‌ছি" বলে' বাবা উঠে' গেলেন। আমি মহা বিপদে পড়লাম। কিন্তু সেই "নতুন মানুষটি" বেশ সপ্রতিভভাবে গল্প জুড়ে' দিলেন। সুতরাং আমারও লজ্জা অনেকটা ভেঙে গেল। কথাবার্ত্তায় সেদিন সন্ধ্যেটা বেশ কেটে গেল। বাবা তাঁকে মাঝে মাঝে আস্‌বার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। সেদিন রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে সমরেশ-বাবুর কথাই ভাব্‌ছিলাম। বেশ ভালো লেগেছিল তাঁকে—যদিও একদিনে মানুষকে বিশেষ কিছুই চেনা যায় না।

উনি প্রায়ই আমাদের বাড়ী আস্‌তেন। ক্রমেই বেশ ঘনিষ্ঠতা হ'ল—রোজই সন্ধ্যে হ'লে তিনি আস্‌বেন আশা করতাম। বাবার মনের ভাব কতকটা বুঝ্‌তে পেরেছিলাম, সেজন্য একটু লজ্জাও করত। কিছুদিন পরে পিসীমা ভাল করে'ই জানিয়ে দিলেন। আমি মুখে যদিও বললাম যে কিছুতেই বিয়ে করব না, কিন্তু মনে মনে কিছুতেই অস্বীকার করতে পারলাম না যে তাঁকে বেশ ভালো লেগেছে। অবিশ্যি তখনই যে খুব একটা ভালবাসা হয়েছিল তা নয়। আমি প্রথম দর্শনেই প্রণয়ে পড়া স্বীকার করিনে। তাঁকে খুবই ভালোবেসেছিলাম, কিন্তু একদিনে নয়, ক্রমে ক্রমে। প্রথম দর্শনে যেটা হয়, সেটা ভালবাসা নয়, মোহ। যাক্ সে কথা। প্রেমতত্ত্ব আলোচনা করবার দিন আমার ফুরিয়ে গেছে।

বিয়ের কথা পাকাপাকি হ'য়ে গেল। ওঁর এক মামা ছাড়া আর কেউ ছিল না—তিনিও বিয়েতে মত দিলেন। পিসীমা বিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন। কিন্তু বাবা বল্লেন—"আমার ত একটা মেয়ে, তাকে

বিদায় দেবার জন্ত এত ব্যস্ততা কিসের। এইখানেই বিয়ে ঠিক রইল, ধীরে সুস্থে দেওয়া যাবে।"

তার পর থেকে তিনি রোজই আস্‌তেন। সে দিনগুলো কত সুখেই কেটে গিয়েছিল! সে-সব কথা এখন স্বপ্ন বলে'ই মনে হয়। কিন্তু আমার সুখের ঘোর হঠাৎ ভেঙে গেল। ওঁর মামা ওঁকে বিলেত পাঠাবেন ঠিক কর্‌লেন। এ-সংবাদে বাবাও খুব খুসী হলেন। কিন্তু আমার মন একেবারে খারাপ হ'য়ে গেল। আমি ওঁকে যেতে বারণ কর্‌তাম, কিন্তু উনি আমাকে আদর করে' কত বোঝাতেন, "লক্ষীটি, তুমি মন খারাপ কোরো না। ২।৩ বছর দেখ্‌তে দেখ্‌তে কেটে যাবে। তার পর যখন ফিরে আস্‌ব, তখন এই বিচ্ছেদের পর মিলন আরো কত সুখের হবে।" কিন্তু শেষ বিদায়ের দিন যতই ঘনিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল আমার মনও ততই উতলা হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। বিদায় নেবার দিন এল—চোখের জলে ভেসে তাঁকে বিদায় দিলাম। ক'দিন বড়ই নিরানন্দভাবে কেটে গেল। তার পর ওঁর চিঠি এল। চিঠিখানা বুকে চেপে একটু শান্ত হ'লাম—প্রতি ছত্রে ছত্রে কত ভালবাসার কত সান্ত্বনার কথা "তোমার আরও কষ্ট হবে বলে' আমি কিছু বলিনি, কিন্তু তোমাকে ছেড়ে আস্‌তে যে আমার কত কষ্ট হয়েছে তা বলে' বোঝাতে পারিনে। এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছি তোমাকে না দেখে এতদিন থাকা একটা অসম্ভব ব্যাপার। ইচ্ছে কর্‌ছে তোমার কাছে ছুটে' যাই।" এম্‌নি কত কি লিখেছেন। বার বার চিঠিখানা পড়্‌লাম। তবু যেন আশা মেটে না।

দিন কাট্‌তে লাগ্‌ল। প্রতি মেল্ ডে'র জন্ম মনটা উদ্‌গ্রীব হয়ে' থাক্‌ত। চিঠি আস্‌বার দিন আর কোনো কাজেই মন যেত না—কখন চিঠি পাব কেবল তাই ভাব্‌তাম! চিঠি এলে যে তা কতবার পড়্‌তাম তা বল্‌তে পারিনে। তিনি সব সময় এমন মিষ্টি করে' চিঠি লিখ্‌তেন।

* * * *

একটি বছর কেটে গেছে। বিশেষ কোনো পরিবর্ত্তন হয়নি। কিন্তু সময়ে সবই সহে যায়। তাই আমারও মনের বিষাদ কতকটা কমে' এসেছিল। অবশ্য এখনও তাঁর জন্ম মন তেম্‌নি ব্যাকুল হ'ত, তাঁর চিঠি যখনই আস্‌ত বড় আনন্দ পেতাম, তবু আগেকার চাইতে কষ্টের তীব্রতা অনেকটা কমে' এসেছিল।

আমার নিরালা জীবনে আর-একটি সঙ্গী জুটেছিল। আমাদের বাড়ীর পাশে এক ব্যারিষ্টার বাড়ী কিনেছিলেন; তাঁর মেয়ে নিভার সঙ্গে আমার খুব ভাব হ'য়ে গিয়েছিল। অল্প দিনের মধ্যে বন্ধুত্বটা এমন জমে' উঠেছিল যে আমরা দুজনে পরস্পরকে না দেখে' একদিনও থাক্‌তে পার্‌তাম না। সে যদি দৈবাৎ কোনো দিন মামার বাড়ী যেত তা হ'লে আমার বড্ড খালি-খালি বোধ হ'ত।

নিভার ছোটমামা অমর-বাবু খুব 'স্বদেশী' ছিলেন—কখনও বিলাতী জিনিষ ব্যবহার কর্‌তেন না, সর্ব্বদাই মোটা দেশী কাপড় গায় দিতেন। ছোটমামার সঙ্গে নিভার খুব ভাব। তিনি প্রায়ই ওদের বাড়ী আস্‌তেন। সেইজন্ম আমার সঙ্গেও আলাপ হয়েছিল। আমিও তাঁকে 'ছোটমামা' বল্‌তাম। অল্প দিনের মধ্যেই 'ছোট-মামা' আমাদের এমন ভজালেন যে আমরা স্বদেশীয়ানা আরম্ভ করে' দিলাম। লরেটো ছেড়ে বেথুনে ঢুক্‌লাম (যদিও সেটা খুব স্বদেশীগিরি নয়)। সব বিলাতী কাপড় বিলিয়ে মোটা কাপড় পর্‌তে আরম্ভ কর্‌লাম এবং যতদূর সম্ভব বিলাতী-বর্জ্জন কর্‌লাম। বারীন্ ঘোষেরা এর কয়েক বছর আগেই নির্ব্বাসিত হয়েছিলেন—সেই-সব গল্প তিনি খুব কর্‌তেন এবং আমরাও খুব উত্তেজিত হ'য়ে সে-সব শুন্‌তাম। ইচ্ছে কর্‌ত আমরাও কিছু করি। কিছুদিন পর 'ছোটমামা' বল্‌লেন যে তাঁরা অনেকে মিলে ষড়যন্ত্র কর্‌ছেন ইংরেজ-রাজত্ব শেষ কর্‌বার জন্যে। আমরাও ইচ্ছে কর্‌লে অনেক সাহায্য কর্‌তে পারি। কিন্তু আমাদের এসব কথা খুব গোপনে রাখ্‌তে অনুরোধ কর্‌লেন, কারণ ফাঁস হ'লেই সর্ব্বনাশ। আমরা দুজনে ত একেবারে মেতে উঠ্‌লাম। নাওয়া-খাওয়া ত্যাগ করে' রাতদিন কত গোপন-পরামর্শ, কত কল্পনা জল্পনাই না হ'ত।

এম্‌নিভাবে দিন কাট্‌ছিল। আগে মন আমার কোন্ এক অজানা বিদেশে ঘুরে' বেড়াত। কিন্তু আজকাল অনেক ভাববার বিষয় জুটেছে। তাই কত সময় ওঁ—

না ভেবে অন্য কথা ভাবি। কখনও কখনও বা দেশের ভাবনায় এমন তন্ময় হ'য়ে যাই যে তাঁর অস্তিত্বও মনে থাকে না। তাই বলে' যে তাঁকে ভুলে' গিয়েছিলাম কিম্বা ভালবাস্‌তাম না তা নয়, কিন্তু আগের মতন কেবল তাঁর চিন্তাতেই ভরপুর হ'য়ে থাক্‌তাম না। আগে যেমন রাতদিন তাঁর কথাই ভাব্‌তাম, প্রতিদিন সকালে কাগজ খুলে'ই মেল্ ডে'র খবর নিতাম, আজকাল ততটা করিনে৷ বটে, কিন্তু তবু খুবই ভালবাসি তাঁকে—নানান্ কাজের মধ্যেও তাঁকে ভাব্‌তে বড় ভাল লাগে। 'ছোটমামা' অনেক সময় বল্‌তেন—"বিয়ে কর্‌লে মেয়েরা কিছু করে না। তোমরা বিয়ে না করে' দেশের কাজ করো।" সেই-সব শুনে মাঝে মাঝে ভাব্‌তাম যে বিয়ে কর্‌ব না। কিন্তু আবার যখনই কল্পনা কর্‌তাম যে তাঁর সঙ্গে আমার সব সম্বন্ধ ঘুচে গেছে, তিনি অন্য কাকে বিয়ে করেছেন, তখনই অসহ্য বেদনায় বুক ভরে' উঠ্‌ত। অথচ দেশের জন্য সর্ব্বত্যাগী হ'য়ে কিছু কর্‌বার চিন্তাও আমাকে মাতিয়ে তুল্‌ত—রাজনীতি-চর্চ্চায় কেমন যেন মাদকতা আছে। মাঝে মাঝে ওঁকে লিখ্‌তাম—"বড় ইচ্ছে করে দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করি। বিয়ে কর্‌লে মানুষ নিজের ও সংসারের কথা নিয়ে ভুলে' থাকে। তাই ভাবি নিজের সুখ ছেড়ে দেশের কাজ করাই উচিত। তোমাকে ভালবাসি না বলে' একথা লিখ্‌ছি ভেবো না—খুবই ভালবাসি—কিন্তু তবু মনে হয় প্রেয় ছেড়ে শ্রেয়কেই বরণ করা উচিত।" উনি কত দুঃখ করে' কত বুঝিয়ে লিখ্‌তেন—"সংসার করাই মেয়েদের প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য। অ্যানার্কিষ্ট্ হওয়া মেয়েদের ···বিশেষতঃ বাঙ্গালী মেয়েদের—মোটেই সাজে না। তুমি যাদের পরামর্শে মেতে উঠেছ কোন্‌দিন হয়ত দেখ্‌বে যে তোমাকে অকূলপাথারে ভাসিয়ে তারা সরে' পড়েছে, কিম্বা সকলেই পুলিসের হাতে ধরা পড়েছে—সেটা কি ভালো হবে?" কিন্তু শেষাশেষি বিরক্ত হ'য়ে লিখ্‌তেন—"যদি বিয়ে না করে' বেশী সুখী হও তা হ'লে বিয়ে নাই বা কর্‌লে? দয়া করে' আমাকে বিয়ে কর্‌বার কোনোই দর্‌কার নেই।" ক্রমে তাঁর চিঠি ছোট হ'য়ে আস্‌তে লাগল। কত আশায় তাঁর চিঠি খুল্‌তাম, কিন্তু যখন দেখ্‌তাম ২।৪ লাইন কিম্বা বড় জোর ১।২ পাতা চিঠি, তখন চোখের জল সাম্‌লাতে পার্‌তাম না। বেশ বুঝ্‌তে পেরেছিলাম যে তিনি আমার প্রতি উদাসীন হ'য়ে দূরে সরে' যাচ্ছেন। চিরজীবনের মতন তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছি, তাঁর উপর আর আমার কোনও অধিকার নেই—একথা ভেবে চোখের জলে ভাস্‌তাম, অথচ দেশের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেছি মনে করে'ও কেমন একটা শান্তি পেতাম। সুতরাং আমি দোটানায় পড়ে' হাবুডুবু খাচ্ছিলাম। নিভাকে সব বল্‌তাম। সে কখনও বল্‌ত—"তুই বিয়ে কর্, তা না হ'লে সারাজীবন কেঁদে মর্‌বি।" আবার কখনও বা বল্‌ত—"না ভাই, বিয়ে করিস্‌নে, আমরা দুজনে মিলে' দেশের কাজ কর্‌ব।"

বছর খানেক পরে খবর পেলাম উনি পরীক্ষায় পাশ করেছেন, সর্‌কারী চাক্‌রী নিয়ে আস্‌বেন। শেষকালে গবর্ণমেণ্ট্-সার্ভেণ্টের স্ত্রী হ'তে হবে ভেবে মনটা বড় সঙ্কুচিত হ'য়ে গেল। কিন্তু হঠাৎ ভগবান্ আমাকে এমন দুঃখ দিলেন যে তার তুলনায় সব ভাবনাই তুচ্ছ হ'য়ে উঠ্‌ল। আমাকে সংসারে অনাথা করে' বাবা চলে' গেলেন। এই সাংঘাতিক শোকে আমি পাগলের মতন হ'য়ে গেলাম। বাবার এক খুড়তুত ভাই ছাড়া আর কেহ ছিল না—তিনিই আমার অভিভাবক হলেন। এদিকের কাজকর্ম্ম সব নিষ্পত্তি হ'লে আমি কাকাবাবুর সঙ্গে তাঁদের বাড়ী গেলাম। পিসীমা কাশীবাসিনী হলেন।

কাকাবাবুর বাড়ীতে তাঁর স্ত্রী ও একটি ছেলে ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। তাঁরা আমাকে খুবই যত্ন কর্‌তেন। কিন্তু আজন্মের ঘরবাড়ী ও পিতৃস্নেহ হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে একেবারে মুষড়ে গিয়েছিলাম। বাবা পরেশদা'কে (কাকাবাবুর ছেলে) পড়্‌বার জন্য জার্ম্মানী পাঠিয়েছিলেন। সে কিছুদিন আগে সমস্ত ইউরোপ ঘুরে দেশে ফিরে এসেছে। সে আমাকে দেশ-বিদেশের কথা বলে' প্রফুল্ল কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ত। পরেশদার অসাধারণ বর্ণনা কর্‌বার শক্তি ছিল। সেজন্য তার মুখে নানান্ দেশের নানান্ গল্প শুন্‌তে বড়ই ভাল লাগ্‌ত।

পরেশদাদা আমাকে প্রায়ই বল্‌ত—"দেখ উমা, এমন জীবন্মৃত হ'য়ে থাকিস্‌নে। আমাদের দেশে অনেক

কাজ কর্‌বার আছে। তোরা না লাগ্‌লে আমরা একা কিকরে' পেরে উঠ্‌ব? ইউরোপ-আমেরিকায় মেয়েরা কত কাজ কর্‌ছে, আর তোরা কি চিরকাল ঘরের কোণে বসে' থাক্‌বি?" এই-সব শুনে' দেশের কাজ কর্‌বার জন্য মনটা মেতে উঠ্‌ত। কিন্তু যখন পরেশ-দাদা বল্‌ত যে "দেখ্‌ যদি বিয়ে কর্‌বি ঠিক করে' থাকিস্‌, তা হ'লে তোর দ্বারা কিছু হবে না, মিথ্যে দুদিনের জন্য এসে আমাদের কাজের গণ্ডগোল করে' দিস্‌নে।" আমার মনটা একটু দমে' যেত—মানস-পটে বহুদিন-আগে দেখা বড়-পরিচিত একখানি মুখ মনে পড়ে' সব ঝাপ্‌সা করে' দিত। কখনও চুপ করে' থাক্‌তাম—কখনও বা অতিকষ্টে চোখের জল সাম্‌লে বল্‌তাম—"আচ্ছা পরেশদা, বিয়ে না কর্‌লে যদি আমার দ্বারা দেশের কোনো উপকার হয় তা'হ'লে বিয়ে কর্‌ব না।"

'ছোটমামা' অর্থাৎ অমর-বাবু প্রায়ই আস্‌তেন—পরেশদার সঙ্গে তাঁর খুব ভাব ছিল। সেজন্য অল্পদিনের মধ্যেই জান্‌তে পার্‌লাম যে ওঁরা সব এক দলেরই লোক—দেশ-উদ্ধারের জন্য উঠে'-পড়ে' লেগেছেন। ঠিক্‌ হ'ল যে নিভা ও আমি ওঁদের দলের অন্তর্ভুক্ত হব।

২।৪ দিন পরে পরেশদা কাগজপত্র এনে বল্‌লে—"সমর-বাবু ফিরে' এলে তাকে দেখে' তুই হয়ত সব ভুলে' যাবি। তার চেয়ে বরং তুই এখনি একেবারে লিখে' দে, যে, বিয়ে কর্‌বিনে।" আমি চুপ করে' রইলাম। "কি ভাবছিস্‌ লিখ্‌বিনে?"

"থাক্‌ ভাই, তিনি এলে মুখেই বলা যাবে।"

পরেশদা বিরক্ত হ'য়ে বলে' উঠ্‌ল—"যাঃ, তোর দ্বারা কিছু হবে না। এত দুর্ব্বল হ'লে কি আর দেশের কাজ হয়? মেয়েদের কোনো মনের বল নেই বলেই ত আমাদের দেশের এই দশা।"

স্ত্রীজাতির অপবাদ মোচন কর্‌বার জন্য তাড়াতাড়ি কলম তুলে' নিয়ে লিখে' দিলাম :—

"আজ আমি তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি—তোমাকে ভালবাসি না বলে' নয়—কর্ত্তব্য বলে'। অনেক ভেবে দেখ্‌লাম যে সুখই সংসারে সব চেয়ে বড় জিনিষ নয়। তাই বিয়ে না করে' দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ কর্‌ব ঠিক করেছি। এখন বেশ অনুভব করি যে আগের তুলনায় তোমার প্রণয়ের আবেশ অনেক কম হ'য়ে গেছে। সেজন্য মনে হয় আমাকে না হ'লেও তোমার চল্‌বে, বিশেষ কিছু কষ্ট হবে না। ভগবানের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি—তুমি সুখী হও। তোমার চরণে অনেক অপরাধ কর্‌লাম, ক্ষমা কোরো। যদি পরজন্ম থাকে তা' হ'লে আবার যেন তোমার দেখা পাই। বিদায়।"

চিঠিখানা পাঠিয়ে দিয়েই মন ভেঙে গেল—অবসাদ শরীর মন ছেয়ে ফেল্‌লে। কিন্তু মনের দুঃখ চেপে রেখে কাজ কর্‌তে লাগ্‌লাম। তখন আমাদের কাজ খুব জোরে চল্‌ছিল। আমরা অনেকরকম সাহায্য কর্‌তাম, সে-সব গোপন কথা এখন না বলাই ভালো। কাজ কর্‌তে গেলে টাকার দর্‌কার—পরেশদাদের পুঁজি ফুরিয়ে এসেছিল। সেজন্য ঠিক হ'ল যে নিভা ও আমি বাড়ী বাড়ী গিয়ে চাঁদা সংগ্রহ কর্‌ব। আমরা দুচার বাড়ী গিয়েওছিলাম, কিন্তু কিছু বিশেষ লাভ হ'ল না—বেশী লোকই তাড়িয়ে দিলে। তা ছাড়া পুলিশ টের পেলে ফাঁস হ'য়ে যাবে বলে' টাকা তোলা বন্ধ করা হ'ল। কিন্তু পরেশদা বল্‌লে—"যেমন করে হোক্‌ আমাদের টাকা জোগাড় কর্‌তেই হবে। দেশের লোকদের দেওয়া উচিত। কিন্তু তারা যখন স্বেচ্ছায় দেবে না, আমরা কেড়ে নেব। সৎকাজের জন্য জোর জুলুম কর্‌লে কোনো দোষ নেই।" অনেকে সায় দিল, আবার কেউ কেউ আপত্তি কর্‌লে, তাই কিছুই ঠিক হ'ল না। কিন্তু কিছুদিন পর পরেশদা'রই জিত্‌ হ'ল। তাঁরা রাতদুপুরে ডাকাতি করে' টাকা আন্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন। দেশে হৈ চৈ পড়ে' গেল। শেষে ওঁদের এমন সাহস বেড়ে' গেল যে দিনের বেলায়ও টাকা আদায় আরম্ভ করে' দিলেন। কেমন করে' পুলিশের চোখে ধুলো দিলে, কেমন করে' কৃপণ মহাজনকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় কর্‌লে, এই-সব ওঁরা এসে গল্প কর্‌তেন। এ-সব শুনে' যে একটুও গর্ব্ব হ'ত না তা নয়, কিন্তু তবু মনটা কেমন খুঁৎখুঁৎ কর্‌ত।

একদিন সকালে কাগজ খুলে' ইন্‌ওয়ার্ড্‌ প্যাসেঞ্জারস্‌-দের মধ্যে ওঁর নাম দেখ্‌লাম। মন আশায় নেচে উঠ্‌ল,

তিনি এসে কি একবারও দেখা কর্‌তে আস্‌বেন না? আমার এত দেখ্‌তে ইচ্ছে করে, তাঁর কি করে না? আবার মনে হ'ল, কেন আস্‌বেন, ঐ-রকমভাবে প্রত্যাখ্যান করার পরও।

দুই তিন মাস কেটে গেল, তাঁর কোনও সংবাদই পেলাম না। একেবারে নিরাশ হ'য়ে গেলাম, কোন কাজেই আর মন দিতে পার্‌তাম না। এই সময় আবার নিভাও দূরে চলে' গেল। তাকে বড় ভালবাস্‌তাম। সে দূরে চলে' যাওয়ায় আমার মন একেবারে ভেঙে গেল। তার বাবার শরীর খারাপ হওয়ায় তারা কল্‌কাতার সম্বন্ধ একেবারে ঘুচিয়ে গেল। সে যেদিন বিদায় নিয়ে চলে' গেল সেদিনকার কথা আজও মনে হয়—দুজনে কত কান্নাই কেঁদেছিলাম। তখন কি জান্‌তাম ভগবান্ আমাদের জন্য কি রহস্য গড়ে' তুল্‌ছিলেন।

নিভা চলে' যাবার সঙ্গে-সঙ্গেই আমাদের দল ভেঙে গেল। পরেশ-দারা সকলেই ধরা পড়্‌লেন—সমস্ত ষড়যন্ত্র ফেঁসে গেল। পরেশ-দা দুই বৎসরের জন্য শাস্তি পেলেন। খুড়ীমারা একেবারে মুষ্‌ড়ে গেলেন। আমি নিজের সব দুঃখ ভুলে' তাঁদের সেবা কর্‌তে লাগ্‌লাম। দিন কারো জন্য বসে থাকে না।—সুখেদুঃখে দুটি বছর কেটে গেল। পরেশ-দা ফিরে এলেন। আমার ধৈর্য্য-বাঁধ ভেঙে আস্‌ছিল। তাই কিছুদিন পরে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়্‌লাম দেশ বেড়াতে।

* * * *

অনেক বৎসর পরের কথা বল্‌ছি। আমি এখন মুসৌরীতে আছি। সন্ধ্যেবেলা খোলা বারান্দায় বসে' সূর্য্যাস্ত দেখ্‌ছিলাম। পাহাড়ের গায়ে সূর্য্যাস্ত দেখ্‌তে বড় ভাল লাগ্‌ছিল। সমস্ত আকাশ রাঙা রঙে রঞ্জিত করে' সূর্য্যদেব ধীরে ধীরে বিদায় নিচ্ছিলেন—তাঁর আলোয় ধবলগিরি ঝল্‌মল্ কর্‌ছিল, চারিধার আলোকিত হ'য়ে উঠেছিল। সেই দৃশ্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে নিজের কথা মনে হ'ল—আমিও ত জীবনসন্ধ্যায় এসে দাঁড়িয়েছি, কিন্তু আমার প্রভায় একটি জীবনও ত রাঙা হ'য়ে ওঠেনি। কত কি করব ঠিক করেছিলাম, কিন্তু কৈ কিছুই ত কর্‌তে পারিনি! জীবন আমার ব্যর্থ হয়েছে। আজ কত কথাই না মনে জাগে। যারা উল্কার মতন আমার জীবন-পথে এসে ক্ষণেকের জন্য আমার চোখ ঝল্‌সিয়ে আবার গভীরতর অন্ধকারে ডুবিয়ে দিয়ে চলে' গেছে, তাদের কথা মনে পড়ে। কিন্তু সেজন্য আমার কারও উপর কোনো আক্রোশ নেই—নিজের ভাগ্যদোষেই সব হারিয়ে বসেছি।

আজ সকলেরই কথা মনে হয়। তারা কে কোথায় আছে কিছুই জানিনে। শুনেছি পরেশ দা ও নিভার ছোটমামা দুজনেই বিয়ে করে' সুখেস্বচ্ছন্দে আছেন। নিভার সঙ্গে আর দেখা হয়নি, কিন্তু যখন আমি নানান্ দেশ বেড়িয়ে লাহোরে পৌঁছাই তখন খবর পেয়েছিলাম—সে সমরেশ রায় নামে একটি বিলেতফের্ত্তা বড় গবর্ণমেণ্ট্ অফিশিয়াল্‌কে বিয়ে করেছে। আমাদের বন্ধুত্বের কি রহস্যময় পরিণাম! এখবর পেয়ে বিমূঢ় হ'য়ে গিয়েছিলাম -নিভা যে আমার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়েছে একথা ভাবতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু তার দোষই কি? আমি যাকে ইচ্ছে করে' পায়ে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছি, তাকে সে মাথায় করে' তুলে নিয়েছে। আমি ত নিজের দুঃখ নিজেই ডেকে এনেছি—এ যে আমার "স্বখাত সলিলে ডুবে' মরা"। কিন্তু যখনই ভাবি নিভা—আমার এত আদরের নিভা—সব জেনে শুনে' একাজ করেছে, তখন আমার বুকের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত পর্য্যন্ত মথিত হ'য়ে ওঠে - কিছুতেই চোখের জল সামলাতে পারিনে।

শ্রী মালতী রায়

"রিক্ত"

এক

সেদিন একটা মোটা কাগজের তাড়া লইয়া বসিয়াছিলাম। এই পলিটিক্যাল কেসের বাণ্ডিলটা কিছুদিন হইতে আমার কাছে আসিয়া পড়িয়া ছিল, এটাকে ষ্টাডি করিয়া প্রথম আদালতে আমাকেই 'কেস্‌টা ওপ্‌ন্‌' করিতে হইবে। কাগজে মনঃসংযোগ করিলাম। কয়েক পৃষ্ঠা পড়িবার পরই একটা নাম আমার চোখে পড়ায় আমি চমকাইয়া উঠিলাম। এ কি! এ যে সেই নাম, সেই চিরপরিচিত নাম, যা আমার শত কাজের ভিতরও আমার অন্তরের অভ্যন্তরলোক দীপ্ত রেখা টানিয়া রাখিয়াছে! তাও কি সম্ভব? সে কি! সেই কি অবশেষে এব্যাপারে সংশ্লিষ্ট হইয়া, গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছে? আর আমাকে কর্ত্তব্যদায়ে তাহারই বিরুদ্ধে অভিযোগ চালাইতে হইবে! না, এ হয়ত সে না, পৃথিবীতে দুইজনের কি এক নাম থাকিতে পারে না? মনকে বুঝাইলাম যে আমার এই আসামী আমার পরিচিত কেহই না; ইহাদের দুইজনের কেবলমাত্র নামেরই সাদৃশ্য আছে।

মনটা বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল, কিছুতেই তাহা আর ত কাগজে নিবিষ্ট করিতে পারিলাম না। চারিধার হইতে কতগুলি এলোমেলো কথা আমার মনের ভিতর ঘোলট পাকাইয়া তুলিতে লাগিল। একে একে জীবনের কাহিনী মনের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল।

শৈশবটা আমার সকলের মতনই আনন্দ ও হাসির ভিতর দিয়াই কাটিয়া গিয়াছিল। যৌবনে পা দিবার আগেই আমার এক সঙ্গিনী জুটিয়াছিল, সে বেণু। বেণু আর আমি সমবয়সী। অল্প বয়স হইতেই তাহার সহিত আমার আলাপ। মনে পড়ে ছোটকালে একদিন খেলিতে খেলিতে তাকে বিরক্ত করায় সে রাগিয়া আমার গালে চটাপট চড় বসাইয়া দিয়াছিল ও খাম্‌চাইয়া আমার নাকের ডগা হইতে খানিকটা মাংস উপ্‌ড়াইয়া ফেলিয়াছিল। তাহার সেই অত্যাচার আমি নীরবে সহ্য করিয়াছিলাম, ফিরিয়া তাহার গায়ে হাত তুলিবার পর্য্যন্ত চেষ্টা করি নাই।

বেণু ছিল আমার সমবয়স্কা, সে ও আমি এক ক্লাসেই পড়িতাম। তাহার স্কুল ভাল না আমার স্কুল ভাল, মেয়েরা ভাল না ছেলেরা ভাল—এইরূপ নানা-রকম তুমুল তর্ক প্রায়ই আমাদের মধ্যেই হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন দিন ইহার কোন মীমাংসায় আমরা উপনীত হইতে পারি নাই। আমাদের শৈশবের এই প্রীতি ও মেলামেশা শৈশব পার হইবার সঙ্গে সঙ্গে কমিয়া যায় নাই, এ-বিষয়ে আমাদের পিতা-মাতাও কোন দিন কোন কথা বলেন নাই। বড় হইয়াও আমরা উভয়ে উভয়েব সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতাম।

বেণু যে সুন্দরী, একথাটা আমি একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিলাম। তখন আমরা সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ি, স্কুল হইতে ফিরিতে সেদিন আমার দেরী হইয়াছিল। বাসায় ফিরিয়া তাড়াতাড়ি কিছু জলযোগ করিয়া আমি বেণুদের বাসার উদ্দেশ্যে ছুটিলাম। বেণুদের বাসায় যখন পৌছাইলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। পশ্চিমাকাশে শেষ চুম্বন আঁকিয়া দিয়া প্রেম-বিহ্বল নয়নে অরুণদেব পৃথিবীর পানে শেষ দৃষ্টি চাহিয়া লইতেছেন তিনি যেন পৃথিবীর মায়া কাটাইয়াও কাটাইতে পারিতেছেন না।

বেণু বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিল, বোধ হয় আমারই অপেক্ষায়। আমাকে দেখিয়া আমার অভ্যর্থনার জন্য হাত বাড়াইয়া সে অগ্রসর হইল। হাসিয়া বলিল "এত দেরী হ'য়ে গেল তোমার আজ; বাবা এতক্ষণ তোমার জন্য ব'সে ব'সে এই বেরিয়ে গেলেন; চলো পিসী তোমার জন্য ভিতরের বারান্দায় ব'সে আছেন।" হঠাৎ একটা নতুন কিছু আমার চোখে আসিয়া পড়িল, আমি দেখিলাম বেণু অসামান্যা রূপসী। বুকের ভিতর একটা

অভিনব আলোড়ন অনুভব করিলাম। সন্ধ্যা-তারা তখন মিটিমিটি আমাদের মাথার উপর হাসিতেছিল।

বেণু বোধ হয় এ-সব কিছুই লক্ষ্য করে নাই, সে হাসিতে হাসিতে আমার হাত ধরিয়া ভিতরে টানিয়া লইয়া গেল। অল্প সময়ের মধ্যেই আমি আমার মনের ভাব দমন করিলাম।

সেদিন হইতে আমার মনের ভিতর একটা নূতন ভাবের সৃষ্টি হইল। এতদিন বেণুর সহিত যে মিশিয়াছি তাহা কেবলমাত্র বন্ধুর মত, আমাদের সম্পর্কের ভিতর কোন মত্ততা ও সঙ্কোচের স্থান ছিল না, তাহা ভরা ছিল কেবল মাত্র গভীর প্রীতি ও সৌহৃদ্যে। কিন্তু সেদিন আমার সব উল্টাইয়া গেল, আমি বুঝিলাম যে আমি আর ঠিক আগের মতনটি নাই, বেণুকে আর আমি ঠিক আগের চক্ষে দেখিতে পারি না। আমি বুঝিলাম বেণু আমাকে নূতন আকর্ষণে টানিতেছে। তার পর যতদিন বেণুর সহিত আমার দেখা হইয়াছে ততদিন সর্ব্বদাই একটা মত্ত ইচ্ছা আমার বুক ঠেলিয়া উঠিতে চেষ্টা করিয়াছে, প্রাণপণ শক্তিতে আমি তাহা দমন করিয়াছি।

আমাদের জীবনে যেদিন নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল সেদিন একাদশী। বেণুদের বাড়ীর সম্মুখে একটা বড় পুকুর ছিল। বেণু তাহার ঘাটে বসিয়া একাকী গাহিতেছিল—

"আজ শুক্লা একাদশী
হের নিদ্রাহারা শশী
স্বপ্ন-পারাবারের খেয়া একলা চালায় বসি'।"

সেই সময় আমি সেখানে উপস্থিত হইলাম। সেদিন বেণুকে বড়ই সুন্দরী দেখাইতেছিল। জ্যোৎস্নার আলিঙ্গনে তাহার সমস্ত দেহ ভরিয়া একটা অপূর্ব্ব মাধুরী ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আমি আর নিজেকে সাম্‌লাইতে পারিলাম না, ধীরে ধীরে তাহার দিকে দুই পা অগ্রসর হইলাম। বেণু দাঁড়াইয়া উঠিল, সে আমার উন্মত্ত দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়াছিল। আমি চাহিয়া দেখিলাম তাহার দৃষ্টি আধ-সঙ্কোচ আধ-ভীতি আধ-আনন্দভরা। আরও দুই পা অগ্রসর হইলাম, বেণুও অগ্রসর হইয়া আসিল, উভয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বাক্য-ব্যয়ের পূর্ব্বেই আমি ফিরিলাম, সেও চলিয়া গেল। আকাশের চাঁদ একটু আগেই একখণ্ড মেঘের নীচে লুকাইয়াছিল, হঠাৎ সেখান হইতে লাফাইয়া বাহির হইয়া এক ঝলক হাসিয়া সমস্ত পৃথিবীকে হাসাইয়া তুলিল।

দুই

তার পর হইতে আমরা তেমনই মিলিতাম, মাঝে মাঝে নির্জ্জনে উভয়ে উভয়ের হাত ধরিয়া পায়চারি করিতাম। একদিন তাহাদের বাড়ীর পিছনে তাহাকে কোলে তুলিয়া কতকটা হাঁটিয়াও ছিলাম। আমাদের ভিতর প্রেমালাপ বড় একটা হইত না। প্রেমালাপ তখন পর্য্যন্ত আমরা ভাল করিয়া শিখিও নাই।

কিছুকাল পরে আমরা উভয়ে ম্যাট্রিক দিলাম। আমি প্রথম বিভাগে পাস করিলাম, কিন্তু বেণু মেয়েদের মধ্যে প্রথম হইল, অন্যান্য পুরস্কারের উপর সে মাসিক কুড়ি টাকার বৃত্তি পাইল। আমাদের কাহারও অবস্থা ভাল ছিল না। বেণুর এই বৃত্তি পাওয়াতে তাহার বিশেষ সুবিধা হইল; সেস্থানে মেয়েদের স্কুল ছিল না, বৃত্তি না পাইলে হয়ত তাহার কলিকাতায় যাইয়া পড়িবার সুবিধা হইত না। বৃত্তির উপর সামান্য সাহায্য করিলেই যখন তাহার চলিয়া যাইবে তখন আর তাহার কিছুই অসুবিধা রহিল না, বেণু পড়িতে কলিকাতায় চলিয়া গেল। আমাদের ওখানে ছেলেদের কলেজ ছিল, যদিও সেটা তেমন ভাল নয়। বৃত্তি পাইলে তবুও কলিকাতার কথা তোলা যাইত, কিন্তু তাহা যখন পাই নাই তখন সেখানে পড়া ছাড়া আমার গত্যন্তর ছিল না। আমি সেখানেই পড়িয়া রহিলাম। বেণুর সহিত আমার ছাড়াছাড়ি হইল।

বেণুর সহিত আমার যে-সব চিঠিপত্র চলিত, তাহাতে প্রেমের নাম-গন্ধও ছিল না।

পূজার ছুটিতে বেণু বাড়ী আসিল। বেণু আসিবার কিছু দিন পূর্ব্ব হইতেই আমার মন থাকিয়া থাকিয়া পুলকে নাচিয়া উঠিতেছিল। এতদিন পরে তাহাকে দেখিব, তাহার না জানি কত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, তাহাকে দেখিলে কথা কি কি বলিতে হইবে, কি কি

সংবাদ দিতে হইবে এইসব নানা চিন্তা মনের ভিতরটা তোল্‌পাড় করিয়া তুলিতেছিল। বেণু আসিল, তাহাকে আনিতে ষ্টেশনে গিয়াছিলাম। কিন্তু মনের আকুলতা মনেই জমাট বাঁধিয়া রহিয়া গেল, কিছুই তার কাছে খুলিয়া বলিতে পারিলাম না।

সে আসিবার পর কয়েকদিন তাহার দেখা পাওয়া ভার হইল, সে ছিল তাহার স্থানীয় মেয়ে বন্ধুদের সহিত দেখা করিতে ব্যস্ত। দারুণ অভিমান হইল, মনে করিলাম আর তাহার সহিত দেখা করিতে যাইব না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সে আমাকে ডাকে। কিছুদিন রাগ করিয়া রহিলাম কিন্তু বেশী দিন তাহা পারিলাম না, একটা অদৃশ্য শক্তি নিয়ত আমাকে তাহার দিকে আকর্ষণ করিতেছিল।

সেদিন [illegible]-পূর্ণিমা, জ্যোৎস্না-প্লাবনে পৃথিবীর সকল থম্ থম্ করিতেছিল। অলক্ষ্য আকর্ষণে প্রকৃতি সবাইকে বাহিরে টানিতেছিল, এ-সময় ঘরে থাকা যেন অসম্ভব। থাকিয়া থাকিয়া আমার কেবল মনে হইতেছিল "আবার কেন ঘরের ভিতর, আবার কেন প্রদীপ জ্বালো"। বেণুর সহিত আমার দেখা হইল তাহার বাড়ীর সম্মুখের মাঠের উপর—সে একাকী সেখানে পায়চারি করিতেছিল। আমাকে দেখা মাত্রই আনন্দে তাহার মুখ হাসিয়া উঠিল, আমার হাত ধরিয়া সে বলিল "তোমায় দেখে' আমার যে কি ভাল লাগ্‌ছে ভানু; তা আমি মুখে বল্‌তে পারিনে।" মনে মনে অনেক কথাই ভাবিয়া আসিয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম যে তাহার আচরণের জন্য তাহাকে কঠিন ভাষায় অভিযুক্ত করিব, তাহার উপর অভিমান করিয়া থাকিব, কিছুতেই শুনিব না; কিন্তু তাহাকে আমার ডাক-নামে সম্বোধন করিতে শোনায় আমার ভিতরে সব গোল পাকাইয়া গেল। সে অনেক দিন আগেই আমাকে এ-নামে ডাকা ছাড়িয়া দিয়াছিল, সেদিন সহসা তাহার মুখে এ-নাম শুনিয়া আমার চিত্ত মাতিয়া উঠিল, সমস্ত ভুলিয়া আমি তাহার হাত ধরিয়া নিজের হাতে ভরিয়া রাখিলাম।

ভাব মুগ্ধের মতন উভয়ে উভয়ের পানে তাকাইয়া-ছিলাম, কেহই কোন কথা বলিতেছিলাম না। বেণুর এক হাত ছিল আমার হাতের ভিতর অন্য হাত সে প্রীতিভরে আমার মাথায় বুলাইতেছিল।

তিন

তাহার পর কালের আবর্ত্তনে অনেক কিছুই হইয়া গেল। [illegible] তাহার পিতার মৃত্যুতে বেণু বড়ই [illegible] ছিল। সংসারে [illegible] ও দূর সম্পর্কের এক পিসী ছাড়া আপনার বলিতে তাহার কেহই ছিল না। পিতার মৃত্যুর পর কোন সাহায্য পাওয়া ত দূরের কথা, পিসীর ভরণ-পোষণের ভারও তাহার স্কন্ধে আসিয়া পড়িল, চাকরী লওয়া ছাড়া তাহার আর অন্য উপায় ছিল না। কলেজে বেণু সবারই খুব প্রিয়পাত্রী হইয়া উঠিয়াছিল, প্রিন্সিপাল তাহাকে পড়া ছাড়িতে দিলেন না, স্কলারশিপের উপর যাহা দরকার তিনিই তাহা দিতেন।

বেণু বি-এ পাশ করিল খুবই কৃতিত্বের সহিত। অনেক টাকার পারিতোষিক সে ইহাতে পাইয়াছিল। মেয়েদের কোন এম্-এ কলেজ ছিল না, তাই সে ট্রেনিং-এ ভর্ত্তি হইল। আমিও সেবার বি-এ পাশ করিয়া এম্-এ ও ল পড়িতে কলিকাতায় গেলাম। কলিকাতায় যাইয়া শুনিলাম বেণুর দুইটি চাকরী হইয়াছে। একটি চাকরী এলাহাবাদে ও আর-একটি কলিকাতায়। এলাহা-বাদের টার মাহিনা কিছু মোটা।

আমি দুই দিন বেণুর বাসায় যাইয়া ফিরিয়া আসিয়া-ছিলাম, কোন দিনই তাহাকে বাসায় পাই নাই। শেষ দিন বেশ একটু ঝাঁজাল ভাষায় তাহার নামে একখানা চিঠি লিখিয়া রাখিয়া আসিলাম। পরদিনই চিঠির উত্তর আসিল। সে লিখিয়াছিল যে এ কয়দিন তাহাকে অনেক কাজে বাহিরে বাহিরে ঘুরিতে হইতেছিল, তাই আমার সঙ্গে দেখা হয় নাই। পরশু সে এলাহাবাদে যাইতেছে, আমি যেন অতি অবশ্য আজ -সন্ধ্যায় তাহার সহিত দেখা করি। সে এলাহাবাদে যাইতেছে! এ যে আমি মোটেই আশঙ্কা করি নাই। আমি ভাবিয়াছিলাম যে সে নিশ্চয়ই কলিকাতার চাকরী লইবে। আমি কলি-কাতায় আসিবার পরও সে সে এমনি করিয়া আমাকে

ছাড়িয়া এলাহাবাদে চলিয়া যাইবে এ-চিন্তা আমাকে বড়ই ব্যথিত করিল!

সন্ধ্যায় তাহার বাসায় গেলাম। ঘরে বসিয়াই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি নাকি এলাহাবাদে যাচ্ছ, পাগল নাকি ?"

বেণু স্থির-গম্ভীর-স্বরে উত্তর দিল—"হাঁ সমস্তই ঠিক হ'য়ে গেছে।"

আমি—কিন্তু তা ফেরাতে হবে।

বেণু—কেন ?

আমি—তুমি ত এখানেও চাকরী পেয়েছ, এ-চাকরী নাও না কেন ?

বেণু—এলাহাবাদের চাকরীটা অনেক ভাল, সেখানে প্রস্পেক্টস্ও অনেক বেশী। আমারও ভবিষ্যতের দিকটাও চেয়ে দেখ্‌তে ত হবে।

পাগলে, সে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিতেছে, কিন্তু সে কি জানে না এ পৃথিবীতে তাহাকে সমস্ত চিন্তার হাত হইতে রেহাই দিয়া তাহার সমস্তের ভার মাথায় তুলিয়া লইবার জন্য আমি আগ্রহে লোলুপ হইয়া রহিয়াছি। পরম আবেগে তাহার হাত ধরিয়া আমি বলিলাম,—"তোমার ভবিষ্যৎটা আমার হাতে তুলে' দাও না কেন ?" সে যেন কিছুই বুঝিতে পারিল না এইভাবে আমার প্রতি তাকাইয়া রহিল। আমি বলিতে লাগিলাম—"এতদিন পরে আমি তোমার কাছে এলাম, আর তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে চাও।" বেণু হাসিল, ও আদর-ভরে আমার হাত নাড়িতে নাড়িতে উত্তর দিল "পৃথিবীতে ত কেউ কারো সঙ্গে চিরদিন একস্থানে থাকতে পারে না।"

আমি—কিন্তু তুমি-আমিও কি পারিনে ? বলো সত্যি ক'রে বলো, তুমি আমাকে ভালোবাস কি না, তুমি আমার হ'তে চাও কি না ?

বেণু—এ-পৃথিবীতে আমি ত একমাত্র তোমারই।

আমি—তবে, তবে কেন তুমি এলাহাবাদ যাচ্ছ ?

বেণু—তার অর্থ ?

আমি—তুমি এখানকার চাকরীটা নাও, চারটে বছর অপেক্ষা কর; তিন বছরে আমার ল শেষ হ'য়ে যাবে। চার বছরের মধ্যে আমার অবস্থা ফিরবে, তখন তুমি এসে আমার ঘর আলো কর্‌তে পারবে।

এতক্ষণে যেন সে কথাটা বুঝিল। সে হাসিয়া বলিল —"আমি ত বিয়ে কর্‌ব না।" তাহার হাসির ভিতর দুষ্টামি ... চোখে পড়িল।

আমি অবাক্ হইয়া ... মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। মৃদু হাসিয়া সে আবার বলিতে আরম্ভ করিল —"তুমি অবাক্ হ'য়ে যাচ্ছ আমার কথা শুনে', ভাব্‌ছ যে এত ভালবেসেও বিয়ে কর্‌তে চায় না, এর অর্থ কি ? তোমার হয়ত মনে হচ্ছে যে আমি ঠাট্টা কর্‌ছি কিন্তু সত্যিই এ আমার প্রথম ও শেষ কথা, কিছুতেই এ টল্‌বার নয়। আমি যদি তোমাকে বিয়ে করি তবে ত তুমি আমাকে গিন্নী বানাবে ? চিরদিন তোমার কাছে আমাকে আটকে রাখ্‌বে ? তোমার কাছে সর্ব্বদা থাকায়, ভবিষ্যতে তোমার পথে দেখা পেলে যে আনন্দ তার সুখ হ'তে আমি চিরদিনই বঞ্চিত হ'য়ে থাকব। আর দূর থেকে আমাকে দেখে' তুমি মুগ্ধ হ'য়ে আছ কিন্তু একসঙ্গে কিছুদিন থাকলে হয়ত তোমার সমস্ত মোহই কেটে যাবে। তা ছাড়া মানুষের জীবনে ভুলভ্রান্তি সবই আছে, বিয়ের পর পদে পদে একের খুঁৎ অন্যের চোখে এসে প'ড়ে, আমাদের সমস্ত ভালবাসার মধ্যে একটা দারুণ অশান্তি এনে দেবে। বিয়ে কর্‌লে আমাদের সমস্ত ভালবাসা দৈনন্দিন কর্ম্ম-জীবনের খুঁটিনাটি অশান্তিতে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠবে, তা আমি প্রাণ ধ'রে কিছুতেই হ'তে দিতে পারব না। তোমাকে আমি সমান-চোখে চিরদিনই দেখে' এসেছি, তোমাকে আমি স্বামী ভেবে কোন দিন ভক্তি কর্‌তে পার্‌ব না। তা ছাড়া আমি চাই মুক্ত বাতাস, বিবাহ-জীবনের বদ্ধ-কুঠরীতে আমার প্রাণ টিক্‌বে না।" সেদিন তাহাকে ধরিয়া অনেক অনুনয় করিয়াছিলাম, তাহার পা ধরিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে তাহাকে বিবাহ করিয়া আমি বদ্ধ করিব না, তাহাকে চিরদিনই মাথার মণি করিয়া রাখিব, সে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকিবে, ইচ্ছা-মতন নিজে চলিতে পারিবে ও আমাকে চালাইতে পারিবে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, তাহার প্রতিজ্ঞা অটল রহিল। তাহার মুখে সেই এক কথা, যে আমরা

একে অন্যকে পাইলে পাইবার আকাঙ্ক্ষাটা নিবিয়া যাইবে ও সেই সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ভালবাসাও উবিয়া যাইবে।

বেণু এলাহাবাদে চলিয়া গেল। প্রত্যহ ডাকে আমাদের চিঠি চলিত। আমি তাহার কাছে যত চিঠি লিখিতাম সবই অনুযোগ ও কাতর অনুনয়ে ভরা। তাহার আশা আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও ছাড়িতে পারি নাই।

হঠাৎ বাড়ী হইতে সংবাদ আসিল, পিতা পীড়িত আমাকে এখনই বাড়ী যাইতে হইল। বাড়ী আসিয়া দেখিলাম যে পিতার অবস্থা খুবই খারাপ, মৃত্যু প্রায় তাহার শিয়রে আসিয়া পৌছিয়াছে। দুই মাস ভুগিয়া পিতা ভালো হইলেন। এই দুই মাস এত ব্যস্ত ছিলাম যে ভালো করিয়া নিশ্বাসটুকু ফেলিবারও আমার অবসর হয় নাই। বেণুর কাছেও কোন চিঠি লিখিতে পারি নাই। মুক্তি পাইয়াই কলিকাতায় ছুটিলাম ও সেখানে যাইয়া শুনিলাম যে আমার নামে কতকগুলি পত্র আসিয়াছিল কিন্তু মেসের ছেলেরা সেগুলি হারাইয়া ফেলিয়াছে। রাগে সমস্ত শরীর জ্বলিতে লাগিল।

বেণুর কাছে পত্র লিখিলাম, কোন উত্তর আসিল না। টেলিগ্রাম করিলাম, তাহাও ফেরৎ আসিল। সেদিনই সে যে-কলেজে চাকরী করিত তাহার অধ্যক্ষের কাছে টেলিগ্রাম করিলাম, উত্তর আসিল যে বেণু দেড়মাস হইল আর-একটা ভাল চাকরী পাইয়া এলাহাবাদ ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহা তিনি জানেন না। কপালে করাঘাত করিতে লাগিলাম। হায়রে! বেণুর চিঠির সঙ্গে-সঙ্গে যে আমার জীবনের সমস্ত সুখ আমাকে ত্যাগ করিয়াছে।

চার

তার পর আজ পর্য্যন্ত বেণুর কোন সংবাদ পাই নাই। চিরদিনের তরে সে আমার চোখে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাই আজ হঠাৎ সে-নামটা চোখে পড়ায় অতীত স্মৃতি বুকের ভিতর এই আলোড়ন তুলিয়া দিয়াছে। জীবনে আমি অনেক ধাপ উঠিয়াছি, আমার সুখ-সম্পদ্ সবাই ঈর্ষ্যার চোখে দেখিয়া থাকে। সুন্দরী বড় ঘরের মেয়ে আমার স্ত্রী, আমার কন্যারা কলিকাতা সমাজে শিক্ষায় ও সৌন্দর্য্যে নামজাদা। অর্থেরও আমার অভাব নাই, গাড়ী-ঘোড়া, মোটর সবই আমার হইয়াছে, আমার স্ত্রী পরিবার সবাই বছরে ছয় মাস দার্জ্জিলিং, পুরী ইত্যাদি স্থানে থাকিয়া আসিতে পারে। চারিদিক্ হইতে প্রাচুর্য্য আমাকে বেড়িয়া ধরিয়াছে, অভাব আমার কিছুরই নাই এক মাত্র বিশ্রাম ছাড়া। কাজ, কেবল কাজ। ইচ্ছা করিলে ইহার কতক ছাড়িয়া আমি যে তাহার পরিবর্ত্তে বিশ্রাম বাছিয়া লইতে পারি না তাহা নহে, কিন্তু কাজের নেশা আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল, কাজ ছাড়া আমি একদণ্ড চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিতাম না। জীবন-সংগ্রামে ঢুকিয়া আজিকার মতন এতক্ষণ বিনা-কাজে আমি কোন দিন বসিয়া থাকি নাই। কাজই যে ছিল আমার জীবনের একমাত্র সম্বল, বাহির ছাড়া আঁকড়াইয়া ধরিবার আমার কিছুই যে ছিল না; আমার অন্তরটা যে বেণু চিরদিনের জন্য শূন্য করিয়া দিয়া গিয়াছিল। ঢং করিয়া ঘড়িতে একটা বাজিল তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলাম।

* * * *

শত চেষ্টায়ও কেস্‌টা ভাল করিয়া করিতে পারিলাম না। কর্ত্তব্য-হানির জন্য বিবেক আমাকে খোঁচা দিতেছিল কিন্তু কি করিব মানুষের সাধ্যেরও ত একটা সীমা আছে। মোকদ্দমার দিন কোর্টে যাইতে আমার পা সরিতেছিল না—যদি সেখানে যাইয়া দেখি এ বেণু সে-ই? তবে? আর ভাবিতে পারিলাম না, কোনমতে মনটাকে দমাইয়া মোটরে উঠিলাম। কোর্ট-রুমে ঢোকামাত্রই সবাই আমার মূর্ত্তি দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল। সবার মুখেই এক প্রশ্ন—আমার কোন অসুখ হয় নাই ত? একেই মন উদ্বেলিত, তাহার উপর এইসব প্রশ্ন আমাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল।

বিচারক আসিয়া এজলাসে বসিবার পরই আসামীদের আনা হইল। নিমেষে আমার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল, আমার সর্ব্বাঙ্গ বেতস-লতার মতন কাঁপিতে লাগিল। সেই মুখ, বয়সের দাগ পড়িলেও সেই-ই। সে কি ভুলিবার! এ যে চিরদিন অন্তরের ভিতর গভীর খাদ কাটিয়া রহিয়াছে। বেণু তেমনি আছে, তেমনিই সুন্দর ও দীপ্ত তাহার

মুখখানা আসন্ন বিপদের ভয়ে তাহাকে কিঞ্চিৎ-মাত্রও বিচলিত করিয়া দিতে পারে নাই।

আসামী যেই হউক আমাকেই 'কেস্ ওপ ন্' করিতে হইবে, কর্ত্তব্য ত প্রাণের দিকে কখনই চাহিয়া দেখে না। কথা বাহির হইতে চাহিতেছিল না কে যেন আমার মুখ চাপিয়া ধরিয়াছিল। অতি কষ্টে আমি উচ্চারণ করিলাম "ইওর্ অনার"। কথাটা অস্পষ্টভাবে মিলাইয়া গেল। হঠাৎ বেণুর দৃষ্টি আমার উপর পতিত হইল। চারি চোখ মিলিল, উভয়ে উভয়কে চিনিলাম। আমার চারি-দিকে পৃথিবী ঘুরিয়া উঠিল, টেবিল, চেয়ার, জজ, লোকজন সব একাকার হইয়া গেল, তার পর প্রথমে লাল, তার পর কাল—তার পর যে কি তা আমার মনে নাই।

*　　*　　*　　*

দুই বছর ভুগিয়া আমি সারিয়া উঠিলাম, শুনিলাম বিচারে বেণুর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হইয়াছে। শেষ দিন বিচার-কক্ষে বেণু হাসিয়া বলিয়াছিল "দেশের জন্য এ-দণ্ড-গ্রহণ আবার পরম সৌভাগ্য।"

কাজ-কর্ম্ম সমস্তই ছাড়িয়া দিয়াছি, তবুও বাঁচিয়া রহিয়াছি। আমার নিজের বলিতে এখন কিছুই নাই, আমার অন্তর বাহির ভরিয়া রহিয়াছে একটা বিরাট্ রিক্ততা।

শ্রী বামাপ্রসন্ন সেন গুপ্ত

গাছের দেহ

পর পর অনেকগুলি ইট সাজাইয়া যেমন একটি বড় অট্টালিকা হয়, উদ্ভিদের দেহও সেইরূপ অসংখ্য অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থদ্বারা গঠিত। এগুলিকে জীব-কোষ বা সংক্ষেপে কোষ বলা হয়। এই কোষগুলি এত ক্ষুদ্র যে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ভিন্ন খালি চোখে দেখাই যায় না। গাছের মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল, ফল সমুদয় অংশই এই কোষ দ্বারা গঠিত।

একটি বীজ ভিজাইয়া মাটিতে পুঁতিয়া দিলে দুই একদিনের মধ্যেই তাহা অঙ্কুরিত হয় ও তাহা হইতে ছোট চারা বাহির হয়। দেখিতে দেখিতে দিনে দিনে চারাটি একটু একটু করিয়া বড় হইতে থাকে ও নূতন পাতা, শাখা-প্রশাখা ও পরে ফুল-ফলে পরিশোভিত হয়। গাছের এই বৃদ্ধি, এই নূতন নূতন অংশের আবির্ভাব, ইহা ঐ কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াই ঘটে।

যে-প্রণালীতে নূতন নূতন কোষের সৃষ্টি হয় তাহাকে কোষ-বিভাগ বলা হয়। একটি কোষই আপনা হইতে ভাঙ্গিয়া দুইটা হইয়া যায়, পরে কিছুক্ষণ পর ঐ ক্ষুদ্র কোষ দুইটা বড় হইয়া পূর্ব্বের আকার প্রাপ্ত হইলেই পুনরায় ভাঙ্গিয়া চারিটিতে পরিণত হয়। পরে চারিটি হইতে আটটি, আটটি হইতে ষোলটি, এইরূপে অনবরত নূতন নূতন জীবকোষের সৃষ্টি হইতে থাকে। যে-সমস্ত কোষ হইতে এইরূপে নূতন জীব-কোষের উৎপত্তি হয় তাহাদিগকে সজীব কোষ ও যে-সমস্ত কোষের ঐরূপ শক্তি নাই তাহাদিগকে নির্জীব কোষ বলা হয়। নির্জীব কোষ গাছের কাঠকে শক্ত করে ও গাছের ভিতরের সরস অংশটিকে রৌদ্র-বৃষ্টি প্রভৃতি হইতে রক্ষা করে।

সব কোষের আকৃতি সমান নহে। কোনটি গোলাকার, কোনটি বৃত্তাকার, আবার কোনটি বা বহুকোণ-বিশিষ্ট,—এইরূপ নানা-আকারের হয়।

কোষের গঠন :—প্রত্যেক কোষের গঠনে তিনটি প্রধান অংশ থাকে, যথা—(১) কোষ-প্রাচীর (২) জৈবনিক ও (৩) মধ্য-বস্তু। ইহাদের বিষয় নিম্নে বিশেষ করিয়া আলোচনা করা যাইতেছে।

(১) কোষ-প্রাচীর :—দুধের উপর যেমন সর পড়ে সেইরূপ প্রত্যেক কোষ একটি অতি সূক্ষ্ম পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে, উহাকে কোষ-প্রাচীর বলে। সকল কোষের

াষ-প্রাচীর সমান পুরু নহে। এই কোষ-প্রাচীরই ছের কাঠকে শক্ত করে। গাছের যে-সব অংশের াষ প্রাচীর পাৎলা, সে-সব অংশ তেমন শক্ত হয় না। ছের পাতা, ফল, পাকা ফল প্রভৃতির কোষের কোষ চীর পাৎলা, সুতরাং পাতা প্রভৃতি তেমন শক্ত তে পারে না। কোষ-প্রাচীর পুরু হইয়াই কাঠে রণত হয়।

কোষ প্রাচীর সেলিউলোস্ নামক একপ্রকার পদার্থ া গঠিত। সেলিউলোসে, অঙ্গার, জল-জান ও অম্ল জান তিনটি সরল পদার্থ ওজনে যথাক্রমে ৪৫ : ৬ : ৫০ অনুপাতে আছে। সেলিউলোস্ দ্রব আইওডিন যোগে হলুদবর্ণ হয়, পরে তাহাতে এক ফোঁটা গন্ধক-বক দিলে উহা সুন্দর নীলবর্ণে পরিণত হয়।

(২) জৈবনিক :—জৈবনিক জীবনের জড়ীয় ভিত্তি-প। জীবনের সকল কার্য্যের মূল এই জৈবনিক। জৈবনিক প্রকার অর্দ্ধ তরল বর্ণহীন পদার্থ, ইহা কোষের কোষ-চীরের ভিতরে মৌচাক বা ফেনার মতন দেখা যায়। ােষের মধ্যে ইহা স্থির হইয়া থাকে না, পরন্তু অনবরত াকারে, উপর হইতে নীচে, নীচে হইতে উপরে নানা-ক ঘুরিয়া বেড়ায়। জৈবনিকের ভিতরে প্রায়ই নকগুলি একপ্রকার অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা দেখা যায়। ষ-প্রাচীর পাৎলা ও স্বচ্ছ হইলে অনুবীক্ষণ-যন্ত্র-ােয্যে এই দানাগুলিকে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে া যায়। উহা অনেকটা নদীর স্রোতের কর্দ্দমময় ার মত দেখায়। জৈবনিক কয়েকটি বিভিন্ন পদার্থের মশ্রণে উৎপন্ন। তাহার উপাদানগুলির মধ্যে অঙ্গার, জান, অম্লজান, যবক্ষারজান, ফস্ফোরাস ও গন্ধক ন। সজীব কোষের ভিতর জৈবনিক কোষ-প্রাচীরের ক সংযুক্ত থাকে, কিন্তু ১২০° ভাগে গরম করিলে উহা ন শ্বেত অংশের ন্যায় জমিয়া যায়। আইওডিন াগে জৈবনিক পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করে।

উদ্ভিদের দেহ যেমন আমাদের দেহও ঠিক সেইরূপ খা কোষ দ্বারা গঠিত এবং উদ্ভিদ্ দেহের জৈবনিকও জীব-দেহের জৈবনিকের মধ্যে কিছুই পার্থক্য বুঝা যায় না।

(৩) মধ্য-বস্তু :—কোষের ভিতর জৈবনিকের মধ্যে জৈবনিক দ্বারা পরিবৃত একটি ক্ষুদ্র গাঢ় পদার্থ থাকে, উহাকে মধ্য-বস্তু বলে। মধ্য-বস্তু ও জৈবনিক মূলতঃ একই-রকম পদার্থ। মধ্যবস্তুর কার্য্য যে কি তাহা ঠিক বুঝা যায় না, কিন্তু প্রত্যেক কোষেই এই মধ্য-বস্তু থাকে। মধ্য বস্তু-বিহীন জীব-কোষ কখনও দেখা যায় না। পূর্ব্বে যে কোষবিভাগ কার্য্যের কথা বলা হইয়াছে তাহাতে কোষের এই মধ্য-বস্তুটাই সর্ব্বপ্রথমে ভাঙ্গিয়া দুই ভাগ হইয়া যায়।

কোষের ভিতরকার সমস্ত অংশটাই সর্ব্বদা জৈবনিক দ্বারা পূর্ণ থাকে না, মধ্যে মধ্যে খানিকটা করিয়া স্থান শূন্য থাকে। ওগুলিকে শূন্য গহ্বর বলে। ঐ শূন্য গহ্বরগুলি কোষ-রস-নামক একপ্রকার তরল পদার্থে পূর্ণ থাকে। এই কোষ-রসের মধ্যে জলে দ্রবীভূত, কয়েকপ্রকার চিনি, লবণ, তৈল, ও উদ্ভিজ্জাত অম্ল প্রভৃতি থাকে।

উপরিউক্ত পদার্থগুলি ছাড়া অনেক কোষে আরও কয়েকটি পদার্থ দেখা যায়। তন্মধ্যে হরিৎ-কণিকা-দানা প্রধান; ঐ হরিৎ-কণিকা থাকার জন্যই গাছের পাতা প্রভৃতি অমন সুন্দর সবুজরংয়ের দেখায়। উচ্চশ্রেণীর সমস্ত উদ্ভিদ্-দেহেই হরিৎ-কণিকা দানার আকারে থাকে। উহাকে হরিৎ-কণিকা-দানা বলা হয়। নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদে হরিৎ-কণিকা-দানার আকারে না থাকিয়া প্রায়ই জৈবনিকের মধ্যে ছড়াইয়া থাকে।

হরিৎ-কণিকা শুধু যে গাছকে সুন্দর সবুজ রং দেয় তাহা নহে, পরন্তু হরিৎ কণিকার উপর গাছের অনেক কার্য্য-নির্ভর করে। হরিৎ-কণিকাই গাছের খাদ্য পরিপাক কার্য্য সাধন করে, সুতরাং যেসমস্ত গাছ মাটি বা বাতাস হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে তাহাদের হরিৎকণিকা নহিলে চলে না। ব্যাঙের ছাতা প্রভৃতি কয়েকটি নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদে হরিৎ-কণিকা নাই, সেইজন্য উহাদের রং কখনও সবুজ হয় না।

শ্রী হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বিদ্যার্ণব

[এই বিভাগে চিকিৎসা ও আইন-সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে যাঁহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বোত্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। যাঁহাদের নামপ্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাঁহারা লিখিয়া জানাইবেন। অনামা প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না। একটি প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের এক পিঠে কালিতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিয়া পাঠাইলে তাহা প্রকাশ করা হইবে না। জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ করা সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত। যাহাতে সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্‌দর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত, যাহার মীমাংসায় বহু লোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতূহল বা সুবিধার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংসা পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দাজী না হইয়া যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রশ্ন এবং মীমাংসা দুয়েরই যাথার্থ্য সম্বন্ধে আমরা কোনরূপ অঙ্গীকার করিতে পারি না। কোন বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোন জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছাধীন—তাহার সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনরূপ কৈফিয়ৎ আমরা দিতে পারিব না। নূতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন করিয়া সংখ্যাগণনা আরম্ভ হয়। সুতরাং যাঁহারা মীমাংসা পাঠাইবেন, তাঁহারা কোন্ বৎসরের কত-সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন।]

জিজ্ঞাসা

(১৯০)

আমাদের দেশে একটি কথা আছে যে

আম ডাকে বান,
তেঁতুল ডাকে ধান।

অর্থাৎ যে বৎসর আম খুব বেশী হয়, সে বৎসর বান ডাকে। উদাহরণ—গত বৎসর খুব আম হওয়াতে কিরূপ ভীষণ ভীষণ বন্যা হইয়াছিল। আর যে বৎসর খুব বেশী তেঁতুল হয়, সে বৎসর বেশ ধান হয়। এইরূপ হইবার কারণ কি? ইহার কোনরূপ ঐতিহাসিক তথ্য বা বৈজ্ঞানিক তথ্য আছে কি না? থাকিলে তাহা কি?

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ গুহচৌধুরী

(১৯১)

"রাসোল্লাসতন্ত্র"

সম্প্রতি একখানা হস্তলিখিত চৈতন্যচরিতামৃত পুঁথির মধ্য হইতে উল্লিখিত "রাসোল্লাসতন্ত্রের" দুইটি পৃষ্ঠা পাইয়াছি। দুইটি পৃষ্ঠাই বাংলা অক্ষরে লেখা ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত। শেষে লেখা আছে "ইতি শ্রীরাসোল্লাসতন্ত্রে রাধাকৃষ্ণয়োঃ রাসঃ সমাপ্তঃ"। যে পুঁথিখানির মধ্যে এই পৃষ্ঠা দুইটি পাওয়া গিয়াছে, তাহা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকৃত চৈতন্যচরিতামৃতের নকল। ১২০১ সনে বাহাদুরবাজার-নিবাসী রাধামোহন দাস বৈরাগী কর্ত্তৃক লিখিত। এখন প্রশ্ন এই যে, রাসোল্লাস-তন্ত্র নামে কোন সংস্কৃত গ্রন্থ এপর্যন্ত আবিষ্কৃত বা মুদ্রিত হইয়াছে কি না? হইয়া থাকিলে ঐ গ্রন্থের রচয়িতা কে এবং কোন্ সময়ে রচিত?

শ্রী তারাপদ লাহিড়ী

(১৯২)

"আলো"

প্রদীপ নির্ব্বাপিত করিলে 'আলো' কোথায় যায়?

মহ ফুজার রহ মান খাঁন

(১৯৩)

আহ্নিক-গতি অনুসারে, চব্বিশ ঘণ্টায় পৃথিবী মেরুদণ্ড অবলম্বন করিয়া একবার সম্পূর্ণভাবে ঘুরিয়া আসে। তাহা হইলে যদি একখানি বিমান-পোত কলিকাতার উপরে আকাশে উঠিয়া পূর্ণ বারো ঘণ্টা সেখানে থাকিবার পর আবার অবতরণ করে, সেখানি কলিকাতার ঠিক বিপরীতে, পৃথিবীর অপরার্দ্ধাংশে যে স্থান আছে, সেখানে না অবতরণ করিয়া কোন্ নিয়মানুসারে আবার ঠিক্ কলিকাতাতেই অবতরণ করে? মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্বের সঙ্গে এপ্রশ্নের কোনও সম্পর্ক আছে কি না?

স্নেহময় সান্যাল

(১৯৪)

শাহ সুজা

শাহ সুজার পরিবারবর্গের বিস্তারিত পরিচয়, আরাকানের কোন্ রাজার রাজত্ব-কালে কোন্ সময়ে তাঁহার বিনাশ, তাঁহার স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাদের পূর্ণ নাম ও সবিশেষ পরিচয় এবং তাঁহাদের বিনাশের কারণ যদি কেহ অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রকাশ করেন, তবে অত্যন্ত বাধিত হইব।

মোহাম্মদ মোখলেছর রহমান

(১৯৫)

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর বাল্য-জীবনী কোন্ গ্রন্থে বর্ণিত আছে। তাঁহার উত্তর-কালের জীবনীও সম্যক্ জানা যায় না। কেবল মহাপ্রভুর সহিত যেটুকু অঙ্গাঙ্গীভাবে সংশ্লিষ্ট তাহাই জানা যায়। তাঁহার বিস্তৃত জীবনী অবগত হইবার কোন গ্রন্থ আছে কি? থাকিলে কোথায় পাওয়া যায়?

শ্রী তারাপদ লাহিড়ী

(১৯৬)

অশোকের আক্রমণ-কালে কলিঙ্গে কে রাজা ছিলেন? তখন ভারতে বৌদ্ধ-বিহার ছিল কি? স্থাপয়িতা কে? প্রধান আচার্য্যের উপাধি কি ছিল? অশোক যে মন্ত্রীর সাহায্যে রাজা হইয়াছিলেন তাঁহার নাম কি? অশোকের দিগ্বিজয়ী সেনাপতি কে? রাজা হইবার সময়ে অশোকের কটি সন্তান ছিল? কি নাম? রাণী বা রাণীরা কে? কুনালের জন্ম হইয়াছিল কি না? তিষ্যরক্ষিতা কোন্ রাজার কন্যা?

শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্র

(১৯৭)

কাল-বৈশাখী

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের বৈকাল বেলায় মাঝে মাঝে ভয়ানক ঝড় জল হয়—ইহাকে কাল-বৈশাখী বলে। এই কাল-বৈশাখী কেন হয়? এস্থলে 'কাল' শব্দটির অর্থ কি?

শ্রী জগদীশচন্দ্র দে

(১৯৮)

প্রাচীন ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাচীন ভারতে আমরা তিনটি শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম দেখিতে পাই। যথা—নালন্দা, তক্ষশিলা ও বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়। তন্মধ্যে তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয় কখন কাহা দ্বারা সংস্থাপিত হয়? এবং উহার অবস্থান বা কোথায় ছিল? বর্ত্তমানে উহার নাম কি?

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

(১৯৯)

প্রাচীন বাংলা ভাষায় "ঢোল সহরত" এই শব্দটি নানা স্থানে পাওয়া যায়; বর্ত্তমান সময়েও কোন কোন লেখক এই শব্দটির ব্যবহার করেন; 'সহরত' এই শব্দটির অর্থ কি? এবং ইহা কোন্ ভাষা হইতে বাংলা ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে?

শ্রী অবনীমোহন দাশগুপ্ত

(২০০)

খদ্দরের কাপড়ের পাড়ে যে স্থায়ী কালো রংএর ছাপ দেওয়া হইতেছে—(যাহা পূর্ব্বে বৃন্দাবনী কাপড়ে ব্যবহৃত হইত) ঐ রং কোথায় প্রাপ্তব্য বা উহা প্রস্তুত-করার উপায় কি?—ঐ কার্য্যে ব্যবহৃত কাষ্ঠের ছাপ কোথায় পাওয়া যায়?

শ্রী মহেন্দ্রনাথ করণ

(২০১)

বাঙালী সেনার যুদ্ধ

"আমাদের সেনা যুদ্ধ করেছে সজ্জিত চতুরঙ্গে,
দশাননজয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহের সঙ্গে।"

— ৺ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

দশাননজয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহ কে? তাঁহার সহিত বাঙালী সেনার যুদ্ধ হইবার কারণ কি? ইহার কোনও বিস্তারিত ইতিহাস পাওয়া যায় কি?

শ্রী দুর্গাচরণ রায় চৌধুরী

(২০২)

পুরীধামে রথযাত্রা নাকি প্রাচীন বৌদ্ধ রথ-যাত্রার বংশধর, এটা অনেক ঐতিহাসিক বলে থাকেন। রথের দেবতা জগন্নাথ। এজন্য সব জায়গাতেই রথের সময় জগন্নাথমূর্ত্তিই রথে চড়েন। যেখানে জগন্নাথ নেই সেখানে অভাবে শালগ্রাম বা ঐরূপ অন্য কোন দেবতার ব্যবস্থা করা হয়। এই রথ আষাঢ় মাসের উৎসব। যদি বা কার্ত্তিক মাসে "শ্রীকৃষ্ণের রথযাত্রা" ব'লে আর-একটা পর্ব্ব আছে সেটা অতি অজ্ঞাত অখ্যাত। সম্ভবতঃ এই রথ-যাত্রারই ভিন্ন-সাময়িক সংস্করণ।

যাই হোক সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে শান্তিপুরের রথযাত্রা। সেখানে জগন্নাথ বা শালগ্রামাদি রথের দেবতা নন। রথের দেবতা হচ্ছেন রঘুনাথ। এই রঘুনাথ-মূর্ত্তি প্রকাণ্ড, বীরাসনে উপবিষ্ট। তার যদি রং সবুজ না হ'য়ে পীত হ'ত তবে অবিকল বুদ্ধমূর্ত্তি হ'য়ে দাঁড়াত, অথবা সিংহলের দু একটা বুদ্ধমূর্ত্তিকে যদি সবুজ বর্ণ করা হয় তবে মূর্ত্তিগুলি একবারে শান্তিপুরের রঘুনাথ হ'য়ে দাঁড়ায়।

এখন জিজ্ঞাস্য যে—শান্তিপুরে রঘুনাথের রথ, কেন আর কোন্ পুঁথির বিধানে হয়? এবং জগন্নাথের রথযাত্রা আর রঘুনাথ ও বুদ্ধ-মূর্ত্তি এই তিনটির মধ্যে কোন কুটুম্বিতা আছে কি না, থাকলে তা কতদিনের?

শ্রী নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী

(২০৩)

পাটে পোকা

পাটে 'ছট্‌কা' পোকা লেগে পাটের পাতা ও ডগা খেয়ে নষ্ট করে। এই পোকার হাত হ'তে কি ক'রে অব্যাহতি পাওয়া যায়?

মহম্মদ মনসুর্ উদ্দীন শাহজাদপুরী

(২০৪)

হরিদ্রা

হিন্দু বিবাহে হরিদ্রা অতিশয় শুভজনক বলিয়া বিবেচিত হয় কেন? নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলে শ্রীপঞ্চমীর দিন ও কার্ত্তিক-সংক্রান্তিতে গাত্রে হরিদ্রা অনুলেপন করিয়া স্নান করার প্রথা দৃষ্ট হয়। ইহাকে প্রাদেশিক ভাষায় "ছিরি তোলা" (শ্রী তোলা) অর্থাৎ সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধন করা বলে। উৎকল প্রদেশেও অনেক নরনারী শরীরের শ্রীবর্দ্ধনের আশায় গাত্রে হরিদ্রা লেপন করিয়া স্নান করিয়া থাকে। সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে "গার্শী" পর্ব্বের পরদিবস মধ্যাহ্নে পর্ব্বে-ব্যবহৃত হলুদ গায় মাখিয়া স্নান করার রীতি আছে, কিন্তু সেটা দেহের সৌন্দর্য্যের জন্য নয়, চর্ম্মরোগ নাশের জন্য। জ্যোতিষ-শাস্ত্রে হরিদ্রাকে সর্ব্বৌষধির মধ্যে গণনা করা হয় কেন?

শ্রী জগচ্চন্দ্র পোদ্দার

—

মীমাংসা

(১০০)

(ক) কাশীযোড়া পরগণা মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। (খ) মেদিনীপুর জেলায় তমলুক মহকুমায় যে কাশীযোড়া নামক স্থান আছে তাহার সহিত সম্বন্ধ নাই। (গ) কাশীযোড়ার রাজা নরনারায়ণ রায়ের মৃত্যুর পর ১৭৫৬ খৃঃ তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজনারায়ণ রায় রাজপদে অভিষিক্ত হন। তিনি রাজবল্লভপুর নামক গ্রাম স্থাপন করিয়া তথায় গড়বেষ্টিত বাস-ভবন নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ১৭৬৬ খৃঃ ৺ রঘুনাথ জীউর মূর্ত্তি স্থাপন-পূর্ব্বক স্থানটি রঘুনাথ-বাটী নামে অভিহিত করেন। ১৭৭০ খৃঃ রাজনারায়ণ রায়ের মৃত্যু হয়। শ্রী

(১৬৩)

"রামাভিষেক" "সতীনাটক" "পদ্যমালা" "বক্তৃতা-মালা" "হিন্দু আচার ব্যবহার" প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ-প্রণেতা, তাৎকালিক গণ্যলেখক স্বর্গগত বাবু মনোমোহন বসু ১২৭৯ সালের ১লা বৈশাখ হইতে "মধ্যস্থ" নামে পত্র সম্পাদন ও প্রচার করেন। বঙ্গীয় পাঠ্যসমাজের সকলেই জানেন, যে, এই ১২৭৯ সালের বৈশাখ মাস হইতে বঙ্কিম-বাবুর "বঙ্গদর্শন" প্রচার হয়। এই সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজের নেতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অন্য অনেকের সঙ্গে মতানৈক্য হওয়ার জন্য কেশব-বাবু নববিধান ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টি করেন। নববিধান ব্রাহ্মসমাজের এই বাড়াবাড়ি মতের বৃদ্ধি ও গোলযোগ নিবারণের জন্য আদি ব্রাহ্মসমাজ এবং প্রাচীন হিন্দুসমাজ বিধিমত চেষ্টা করেন। শোভাবাজার রাজবংশের রাজা কমলকৃষ্ণ দেব, কালীকৃষ্ণ দেব, পাথুরেঘাটার ঘোষ বংশের প্রধানগণ ও অন্য অনেক হিন্দু,

আদিসমাজের শীর্ষমণি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তদ্বংশীয় অনেকে, ইংরেজী ন্যাশন্যাল্ পেপারের সম্পাদক বাবু নবগোপাল মিত্র, "হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা"-প্রণেতা প্রসিদ্ধ বাবু রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি "মধ্যস্থ"-সম্পাদক মনোমোহন-বাবুর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই পত্রিকা প্রথমে সাপ্তাহিক আকারে প্রকাশিত হইত। এক বৎসর পরে সম্পাদকের অসুস্থতা-নিবন্ধন ইহা পাক্ষিক ও শেষে মাসিক আকারে পরিণত হয়। উহার বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩।৵৹ ছিল।

"প্রাচীন হিন্দুসমাজের গোঁড়ামি ও নবীন-ভাবাপন্ন যুবকদের চাপল্য নিবারণ-কল্পে উভয়ের মাঝামাঝিভাবে এই 'মধ্যস্থ' পত্রিকা যথোচিত চেষ্টা করিবে" সম্পাদক মহাশয়ের এইরূপ সংকল্প ছিল।

শ্রী অক্ষয়কুমার বসু বিদ্যাবিনোদ সাহিত্যভূষণ,
ভূতপূর্ব্ব "মধ্যস্থ" পত্রিকার
সহকারী সম্পাদক ও কার্য্যাধ্যক্ষ

(১৬৫)

সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারত

প্রক্ষিপ্তাংশ-বিবর্জ্জিত সংস্কৃত বা তাহার বঙ্গানুবাদ রামায়ণ ও মহাভারত একখানিও নাই। "বঙ্গবাসী" সংস্করণ রামায়ণ ও তাহার বঙ্গানুবাদ এবং নীলকণ্ঠীয় টীকা-সম্বলিত সংস্কৃত মহাভারত ও স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের অনূদিত মহাভারত প্রক্ষিপ্ত-বিবর্জ্জিত নহে।

রামায়ণের উত্তরাকাণ্ড সমস্তই প্রক্ষিপ্ত। বাহুল্য-ভয়ে কেবল প্রসিদ্ধ একটি স্থান নির্দ্দেশ করিতেছি। শূদ্র তপস্যা করিয়াছিল বলিয়া ব্রাহ্মণ-বালকের মৃত্যু এবং তজ্জন্য শূদ্র তপস্বী শম্বুকের শিরশ্ছেদ করিবার গল্পটি যে নিছক প্রক্ষিপ্ত তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। শূদ্রের তপস্যা হেতু ব্রাহ্মণ-বালকের মৃত্যু হইলে সমুদায় ব্রাহ্মণ-বালকেরই মৃত্যু হওয়া উচিত ছিল। তাহা না হইয়া কেবল একটির মৃত্যু হইল কেন? সুন্দরাকাণ্ডে (৪৮ সর্গ ৭-১২ শ্লোক) দেখা যায় রামের জন্মের বহুপূর্ব্বে কুম্ভ নামক মহর্ষির পুত্রের দশবর্ষ বয়সেই মৃত্যু হইয়াছিল। তখনও শূদ্র তপস্যা করে নাই। তবে মহর্ষি কুম্ভ ঋষির দশবর্ষ-বয়স্ক পুত্রের মৃত্যু হইয়াছিল কেন? এই গল্পে বলা হইয়াছে—"সত্য যুগে ব্রাহ্মণ, ত্রেতা যুগে ক্ষত্রিয়, দ্বাপর যুগে বৈশ্য এবং কলিযুগে শূদ্রের তপস্যায় অধিকার" (উত্তরাকাণ্ড ৮৭ সর্গ ২১-২৮ শ্লোক)। ত্রেতাযুগে রামের জন্মের বহু পূর্ব্বের বৈশ্য ও শূদ্র তপস্বীর কথা কিন্তু রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে রহিয়াছে।

রাজা দশরথ অনবধানে যে তাপসকুমারকে হত্যা করিয়াছিলেন সেই তাপস বৈশ্য এবং ঐ তাপস-কুমার তাঁহারই শূদ্রা পত্নীর গর্ভ-সমুদ্ভূত (অযোধ্যাকাণ্ড ৬৩ সর্গ ৫১ শ্লোক)। অনুলোমাসু মাতৃবর্ণা (বিষ্ণু ১৬ অঃ ২ শ্লোক) সুতরাং বৈশ্য তাপসের এই পুত্র শূদ্র। এই পুত্রও কিন্তু তাপস এবং ব্রহ্মবাদী ছিলেন (৬৪ সর্গ ২৪ শ্লোক)। অতএব ত্রেতা যুগে বৈশ্য শূদ্রের তপস্যা নিষিদ্ধ ছিল না। পরন্তু বেদেও অনেক শূদ্র ঋষির রচিত বহু মন্ত্র রহিয়াছে। বেদ কিন্তু সত্য যুগের। তপস্যা না করিলে ঋষি হওয়া যায় না। বেদমন্ত্র-রচয়িতা শূদ্র যখন ঋষি, তখন সত্য যুগেও শূদ্রের তপস্যার অধিকার ছিল। অতএব কলিযুগ ব্যতীত অপর যুগে শূদ্রের তপস্যার অধিকার নাই ইহা আদৌ সত্য নহে। সুতরাং শূদ্রের তপস্যা হেতু ব্রাহ্মণ-বালকের মৃত্যু হওয়ার গল্পটা প্রক্ষিপ্ত।

অপর কাণ্ডে রাম-সীতার যে বয়স-সংখ্যা রহিয়াছে তাহাও প্রক্ষিপ্ত। তাপসবেশে রাবণ পঞ্চবটী বনে রামের আশ্রমে উপস্থিত হইলে অতিথি মনে করিয়া সীতা তাপসবেশী রাবণকে বলিয়াছিলেন—"দ্বাদশ বর্ষ হইল আমি ইক্ষ্বাকু-কুলে আসিয়াছি অর্থাৎ রামের সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে। এক্ষণে আমার বয়স ১৮ বৎসর এবং আমার পতি রামের বয়স ২৫ বৎসর (আরণ্যকাণ্ড ৪৭ সর্গ ১০ শ্লোক)। সীতার বয়স ১৮ বৎসর হইতে ইক্ষ্বাকু-কুলে আসার ১২ বৎসর বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে ৬ বৎসর। অতএব দেখা যাইতেছে বিবাহ সময়ে সীতার বয়স ছিল মাত্র ৬ বৎসর। কিন্তু হরধনু ভাঙ্গিবার সময় রাজা জনক বিশ্বামিত্র ঋষিকে বলিয়াছিলেন— সীতা "বর্দ্ধমানা" অর্থাৎ যৌবনসম্পন্না হইলে অনেক রাজা আসিয়া সীতার পাণি প্রার্থনা করিয়াছিলেন (আদিকাণ্ড ৬৬ সর্গ ১৫ শ্লোক)। ছয়-বৎসর-বয়স্কা বালিকাকে পূর্ণযুবতী বলা যায় কি? বিশ্বামিত্র ঋষি যখন যজ্ঞ রক্ষার্থ দশরথের নিকট হইতে রামকে লইয়া যান, তখনই রাম হরধনু ভঙ্গ করেন। দশরথের নিকট হইতে লইয়া যাইবার সময় দশরথ রামকে পঞ্চদশ বৎসরের বালক বলিয়াছিলেন (আদিকাণ্ড ২০ সর্গ ২ শ্লোক) এই পনর বৎসর এবং বিবাহের বার বৎসর মোট হয় ২৭ বৎসর বয়সে রামের বনগমন। কিন্তু সীতা বলিয়াছিলেন বনগমন-সময়ে রামের বয়স ২৫ বৎসর। বিবাহের পূর্ব্বে সীতা যেমন পূর্ণযুবতী ছিলেন, রামও পূর্ণযুবক ছিলেন (আদিকাণ্ড ৭২ সর্গ ৭ শ্লোক)। এবং বিবাহান্তে রামসীতা একান্তে বিহার করিতেন (আদিকাণ্ড ৭৭ সর্গ ১৪ শ্লোক)। যুবক যুবতী না হইলে একান্তে বিহারের কথা বাল্মীকি বলিতেন না। পনর বৎসরের বালকের ছয় বৎসরের বালিকা লইয়া একান্তে বিহার আদিকবি বাল্মীকির বর্ণনা কখনই নয়। অতএব রামসীতার বয়স যে প্রক্ষিপ্ত ইহাতে সন্দেহের অবকাশই নাই। ইহা যৌবনবিবাহ-বিদ্বেষী বাল্য বিবাহের পক্ষপাতী কোনও ধুরন্ধরের দ্বারা রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। গণিত-বিজ্ঞানে তাঁহার জ্ঞান এবম্বিধ পনর এবং বার যোগ করিলে যে ২৭ হয় ইহাও তাঁহার জ্ঞান নাই। এবং পনর ও ছয় বৎসর বয়সের বালক-বালিকাকে যুবকযুবতী বলা যায় না তাহাও তাঁহার মাথায় খেলে নাই। অতএব প্রক্ষিপ্তাংশ-বিবর্জ্জিত সংস্কৃত কি তাহার বঙ্গানুবাদ রামায়ণ নাই।

বর্দ্ধমানের মহারাজা স্বর্গীয় মহতাব্ চন্দ্ বাহাদুর এসিয়াটিক সোসাইটির মুদ্রিত সংস্কৃত মহাভারত অবলম্বনে কয়েক পর্ব্বের বঙ্গানুবাদ করানোর পর হস্তলিখিত প্রাচীন ৫ খানা মহাভারত সংগৃহীত হইলে তাহার সহিত এসিয়াটিক সোসাইটির মুদ্রিত সংস্কৃত মহাভারতের পাঠ-বৈষম্য দর্শন করিয়া তাহা পরিত্যাগ করেন। তাহাতে তাঁহার বহু অর্থ-ক্ষতি হয় এবং ঐ সংগৃহীত প্রাচীন পুথির পাঠ মিলাইয়া সংশোধনান্তে মুদ্রিত করাইয়া তাহারই বঙ্গানুবাদ করাইয়া বিতরণ করিয়াছিলেন। বঙ্গবাসী এই বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত করিয়া অল্পমূল্যে বিক্রয় করিতেছেন। এবং বর্দ্ধমানের মহারাজারও বোম্বাই-মুদ্রিত এবং কলিকাতার কাঁসারি-পাড়া নিবাসী স্বর্গীয় তারকনাথ প্রামাণিকের হস্তলিখিত সংস্কৃত মহা-ভারতের সহিত পাঠ ঐক্য করিয়া নীলকণ্ঠের টীকা সমেত প্রকাশ করেন। কাজেই এই মহাভারতের সহিত বর্দ্ধমানের মহারাজার অনূদিত ও বঙ্গবাসীর মুদ্রিত মহাভারতের মিল নাই। বর্দ্ধমানের মহারাজা এসিয়াটিক সোসাইটির মহাভারত হইতে অনূদিত পর্ব্বগুলি বহু অর্থ ক্ষতি স্বীকার করিয়াও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটীর মুদ্রিত সেই পাঠ-বৈষম্য পূর্ণ সংস্কৃত মহাভারত অবলম্বনেই অনুবাদ করাইয়াছিলেন; সে অনুবাদও সংক্ষেপ। সুতরাং যথাযথ অনুবাদ বলা যায় না। অতএব সংস্কৃত কি তাহার বঙ্গানুবাদ কোন রামায়ণ ও মহাভারতই প্রক্ষিপ্তাংশ-বিবর্জ্জিত নয়। কোন কোন পর্ব্বে ৪৫ অধ্যায় পর্য্যন্তও প্রক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

শ্রী বৈকুণ্ঠনাথ দেব

(১৬৭)

প্রবাসীর চৈত্র সংখ্যায় বেতালের বৈঠক স্তম্ভে ১৬৭ নং উত্তরে শ্রীযুক্ত সরলকুমার অধিকারী মহাশয় বরোদা কলা-ভবন টেকনিকেল ইনষ্টিটিউটে

ইলেক্‌ট্রিকেল্ ইন্‌জিনিয়ারীং শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা যথার্থ নহে। এখানে ইলেক্‌ট্রিকেল্ ইন্‌জিনিয়ারীং বলিয়া কোন বিভাগ নাই। মেকানিকেল ইন্‌জিনিয়ারীংএর সঙ্গে ইলেক্‌ট্রিকেল ইন্‌জিনিয়ারীং (বোথ্ থিওরেটিক্যাল্ এণ্ড্ প্র্যাক্‌টিক্যাল্) শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, বোধ হয় শীঘ্রই এখানে ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইন্‌জিনিয়ারীং বিভাগ খুলিবে। ভারতীয় অন্যান্য টেক্‌নিকেল্ ইন্‌ষ্টিটিউট্ অপেক্ষা এখানে প্রাক্‌টিক্যাল্ ট্রেনিং ভাল হইয়া থাকে।

শ্রী ধীরেন্দ্রচন্দ্র বসু

(১৭৭)

ভীষ্মের মৃত্যু-তিথি

মহাভারতের যুদ্ধের সময় নিশ্চয়রূপে স্থির হয় নাই। ভীষ্মের মৃত্যু-তিথি ঠিক জানিতে পারিলে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শীল মহাশয় তাহা নিশ্চয়-রূপে স্থির করিবেন এজন্য সহায়তা চাহিয়াছেন। এবং ভীষ্মের মৃত্যু-তিথি নিশ্চয়রূপে অবধারণ করিতে হইলে যে আপত্তি খণ্ডন হওয়া উচিত তাহাও তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার কথাগুলি এই—

"ভীষ্মের মৃত্যু শুক্লাষ্টমীতে ধরা হয়। ভীষ্ম পতনের পর ৫৮ দিন (দিন নয় ৫৮ রাত্রি) বাঁচিয়াছিলেন। ৫৯তম দিবসে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। ৫৯ দিনে চান্দ্র দুইমাস হয়। শুক্লাষ্টমীতে মৃত্যু হইলে দুই মাস পূর্ব্বে শুক্লনবমীতে ভীষ্মের পতন হইয়াছিল। সেদিন যুদ্ধের দশম দিন। তাহার বার দিন পর (যুদ্ধের চতুর্দ্দশ দিবসে) রাত্রে যুদ্ধ হইয়াছিল, সেদিন শুক্লা ত্রয়োদশী হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সন্ধ্যার পর অন্ধকারে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া অর্জ্জুন সৈন্যদের যুদ্ধক্ষেত্রেই ঘুমাইতে বলিয়াছিলেন। ত্রিযামা রজনী গত হইলে চন্দ্রোদয় হইল ও যুদ্ধ আরম্ভ হইল (দ্রোণ পর্ব্ব ১৮৫ অধ্যায়)। অতএব সেদিন কৃষ্ণা ত্রয়োদশী ছিল।

ভীষ্মের পতন ও মৃত্যুর কোন তিথির উল্লেখই মহাভারতে নাই। ভীষ্ম পতনের পর ৫৮ রাত্রি বাঁচিয়াছিলেন। এই ৫৮ রাত্রির পর (৫৯ তম দিনে) তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। মৃত্যুর দিন উত্তরায়ণ প্রবৃত্ত হইয়াছিল। মাঘ মাস, মাসের তিন ভাগ অবশিষ্ট ছিল। সেদিন দিবারাত্রি সমান এবং শুক্লপক্ষ ছিল। এইমাত্রই মহাভারতে পাওয়া যায়। ইহার বেশী কিছু পাওয়া যায় না। বেশী না পাইলেও ভীষ্মের মৃত্যু-তিথি নির্ণয় হইতে পারে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে শ্রীযুক্ত শীল মহাশয়ের কথাগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতে চাই।

ভীষ্ম ১০ দিন, দ্রোণাচার্য্য ৫ দিন, কর্ণ ২ দিন, শল্য অর্দ্ধ দিন এবং শল্য পতনের পরদিন, অর্দ্ধদিন গদাযুদ্ধ এই ১৮ দিন মহাভারতের যুদ্ধ হইয়াছিল। দশম দিবসের যুদ্ধে অপরাহ্ণ-সময়ে ভীষ্মের পতন হইয়াছিল। এই দশম দিন শুক্লা নবমী হইলে যুদ্ধ আরম্ভের প্রথম দিন অমাবস্যা হওয়া উচিত। নচেৎ দশম দিন শুক্লনবমী হয় না। অতএব যুদ্ধের দশম দিন অমাবস্যা হইলে যুদ্ধের তৃতীয় দিন শুক্লা দ্বিতীয়া হয়। শুক্লাদ্বিতীয়াতে সূর্য্য অস্তগত হইতেই চন্দ্রোদয় হয়। কিন্তু ভীষ্ম পর্ব্বে (৫৯ অঃ ১৩৯ শ্লোকে) দেখা যায় যুদ্ধের তৃতীয় দিন সূর্য্য অস্তগত হইলে সন্ধ্যা-সমাগমে এরূপ অন্ধকার হইয়াছিল যে সহস্র সহস্র উল্কা ও প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়া তদালোকে অবলোকন করত সৈন্যদিগকে শিবিরে যাইতে হইয়াছিল। অমাবস্যা হইতে তৃতীয় দিন শুক্লাদ্বিতীয়া। এই দিন সূর্য্য অস্তগত হইতেই চন্দ্র উদিত হয় সুতরাং সূর্য্য অস্তগত হইলে এরূপ অন্ধকার হয় যে শিবিরে যাইতে সৈন্যদের সহস্র সহস্র উল্কা ও প্রদীপ প্রকাশিত করিবার প্রয়োজন হইতে পারে। যুদ্ধের দশম দিন শুক্লা নবমী হইলে যুদ্ধের নবম দিন শুক্লাষ্টমী। শুক্লাষ্টমীতে সূর্য্য অস্তগত হইবার পর চন্দ্রোদয় হয়; সুতরাং সূর্য্য অস্তগত হইবার পর কখনও অন্ধকার হয় না। কিন্তু যুদ্ধের নবম দিনও সূর্য্য অস্তগত হইবার পর অন্ধকারে যুদ্ধ অসম্ভব হইলে সৈন্যের অবহার করিতে হইয়াছিল (ভীষ্ম পর্ব্ব ১১০ অঃ ১-৪ শ্লোক)। পতনের পঞ্চাশৎ রাত্রির পর (৫৯তম দিনে) ভীষ্মের মৃত্যু হইয়াছিল, (অনুশাসন পর্ব্ব ১৬৭ অঃ ২৭ শ্লোক)। পতনের দশম দিন শুক্লা নবমী হইলে ৫৮ রাত্রির পর শুক্লাষ্টমী হয় না, শুক্লা সপ্তমী হয়। অতএব ভারতযুদ্ধ অমাবস্যার দিন আরম্ভ হয় নাই। সুতরাং ভীষ্মের পতন ও ও মৃত্যু-দিন শুক্লা নবমী ও শুক্লাষ্টমী ছিল না। অমাবস্যার দিন প্রথম যুদ্ধারম্ভ না লইলে যুদ্ধের দশম দিন যেমন শুক্লানবমী এবং যুদ্ধের চতুর্দ্দশ দিন শুক্লা ত্রয়োদশী হয় না, পূর্ণিমার দিন প্রথম যুদ্ধ আরম্ভ না হইলেও যুদ্ধের দশম দিন তেমনি কৃষ্ণানবমী এবং যুদ্ধের চতুর্দ্দশ দিন কৃষ্ণা ত্রয়োদশী হয় না। কিন্তু মহাভারতে দেখা যায় যুদ্ধ আরম্ভের প্রথম দিন সূর্য্য অস্তগত হইলেই অন্ধকারে যুদ্ধ অসম্ভব হওয়াতে সৈন্যের অবহার করিতে হইয়াছিল (ভীষ্ম পর্ব্ব ৪৯ অঃ ৫২।৫৩ শ্লোক)। পূর্ণিমার দিন সূর্য্য অস্তগত হইবার পর অন্ধকার হয় না সুতরাং অন্ধকারের জন্য যুদ্ধও অসম্ভব হয় না। অতএব যুদ্ধের প্রথম দিন যখন পূর্ণিমা ছিল না তখন যুদ্ধের দশম দিন ও চতুর্দ্দশ দিন কৃষ্ণা নবমী ও কৃষ্ণা ত্রয়োদশী ছিল না।

যুদ্ধের চতুর্দ্দশ দিন (এইদিন দ্রোণাচার্য্যের যুদ্ধের চতুর্থ দিন) রাত্রিতে যুদ্ধ হইয়াছিল। সন্ধ্যার পর এইদিন অন্ধকারে যুদ্ধ অসম্ভব হইলে উভয় পক্ষই সহস্র সহস্র উল্কা ও প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়া তদালোকে যুদ্ধ করিয়াছিল (দ্রোণ পর্ব্ব ১৬১ অঃ ১২-১৮ শ্লোক)। সে-সময়ে উল্কা ও দীপালোকে যুদ্ধ হওয়ার কথা উক্ত অধ্যায় হইতে ১৭৬ অধ্যায় পর্য্যন্ত রহিয়াছে। অতএব সন্ধ্যার পরে যুদ্ধ অসম্ভব হইলে অর্জুন সমরাঙ্গনেই সৈন্যদিগকে ঘুমাইতে এবং ত্রিযামা যামিনী গতে চন্দ্রোদয় হইলে যুদ্ধ করিতে বলিবার কোন কারণই নাই। বিশেষতঃ কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর ক্ষীণ চন্দ্রের ক্ষীণালোকে যুদ্ধ হওয়াও অসম্ভব। পরন্তু ১৮৬ অধ্যায়ে দেখা যায় সৈন্যগণ রাত্রিতে যুদ্ধ করিয়া সূর্য্যোদয়েই অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল (৩-৬ শ্লোক)। কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর চন্দ্রোদয়ের দুই ঘণ্টান্তরেই সূর্য্যোদয় হয়। ত্রিযামা রাত্রি পর্য্যন্ত ঘুমাইলে দিবসের শ্রান্তি-ক্লেশ অপনীত হইয়া যায় সুতরাং দুই ঘণ্টা কাল যুদ্ধ-শ্রমে পরিশ্রান্ত হওয়া অসম্ভব। ১৮৫ অধ্যায়ে দেখা যায় সূর্য্য উদিত হইতেছে দেখিয়া উভয় পক্ষই বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সূর্য্যোপাসনা করিয়া দ্বিধা বিভক্ত কৌরব সৈন্য যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইতেই সূর্য্য প্রকাশিত হইয়াছিল (১- ৪ এবং ৫৮।৬০ শ্লোক)। এবং ১৮৬ অধ্যায়েও আবার সূর্য্য উদিত হইতেছে দেখিয়া সন্নিহিত থাকিয়াই কুরু-পাণ্ডবগণ সূর্য্যোপাসনা করিয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যে যাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিল সূর্য্যোদয়েও সে তাহার সঙ্গেই যুদ্ধে সমাসক্ত হইয়াছিল (১২ শ্লোক)। দুই অধ্যায়েই যখন একই সময়ে দুইবার সূর্য্যোদয়, দুইবার সূর্য্যোপাসনা এবং দুইবারই সূর্য্য প্রকাশিত হইতে দেখা যায় তখন অবশ্যই ইহার একটি অধ্যায় পরস্ব,—মহাভারতরচয়িতার নহে। সুতরাং সন্ধ্যার পর অন্ধকারে যুদ্ধ অসম্ভব হইলে যখন সহস্র সহস্র উল্কা ও প্রজ্বলিত প্রদীপের আলোকে যুদ্ধ হইয়াছিল, তখন অন্ধকারে যুদ্ধ অসম্ভব হইলে ত্রিযামা যামিনীর পর চন্দ্রোদয় হইলে যুদ্ধ করিবার জন্য সমরাঙ্গনেই ঘুমাইয়া থাকা বর্ণিত ১৮৫ অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত বলিতেই হইবে। স্বপক্ষের অলায়ুধবধে রথোপরি শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যসম্বন্ধীয় ১৭৮ অধ্যায় হইতেই এই প্রক্ষিপ্তাংশ আরম্ভ।

শুক্লা নবমী এবং কৃষ্ণাষ্টমীতে যে ভীষ্মের পতন ও মৃত্যু হয় নাই এবং যুদ্ধের চতুর্দ্দশ দিনের রাত্রিতে যে শুক্লা বা কৃষ্ণা ত্রয়োদশী হইতে পারে না প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে ভীষ্মের মৃত্যু-তিথি নির্ণয় করিতে যত্ন করিতেছি। মহাভারতের যুদ্ধের প্রথম দিনের তিথি নির্ণয় করিতে

ভীষ্মের পতন ও মৃত্যু-তিথি পাওয়া যাইবে। অতএব তাহাই নির্ণয় করিতেছি।

মহাভারতের যুদ্ধ যে অষ্টাদশ দিন হইয়াছিল উপরে বলিয়াছি। যে অষ্টাদশ দিন যুদ্ধ হইয়াছিল তন্মধ্যে যুদ্ধের প্রথম দিন হইতেই একাদিক্রমে ষোড়শ দিন পর্য্যন্তই সূর্য্য অস্তগত হইলে অন্ধকারে যুদ্ধ অসম্ভব হওয়াতে সৈন্যের অবহার করিতে হইয়াছিল (ভীষ্ম পর্ব্ব ৪৯ অধ্যায় হইতে কর্ণ পর্ব্ব ৩০ অধ্যায়)। ভীষ্মের প্রথম দিনের যুদ্ধ পর্য্যন্তই এই ষোড়শ দিন। প্রথম দিনের যুদ্ধ হইতেই কর্ণের অমাবস্যার পরবর্ত্তী প্রতিপদ্ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পঞ্চদশ দিন শুক্লপক্ষ। শুক্লপক্ষের প্রতিপদের চন্দ্র দৃষ্টি-গোচর হয় না বলিয়া সূর্য্য অস্ত হইলেই অন্ধকার হয় বটে কিন্তু অপর কয় তিথিতে সূর্য্য অস্তগত হইলে অন্ধকার হয় না। প্রতিপদের পর হইতে কোন কোনও তিথিতে সূর্য্য অস্তগত হইবার পরে এবং তৎপরে সূর্য্য অস্তগত হইবার পূর্ব্ব হইতেই চন্দ্রোদয় হইতে থাকে সুতরাং শুক্লপক্ষে সূর্য্য অস্তগত হইবার পর একাদিক্রমে ষোড়শ দিন অন্ধকার হয় না। অতএব মহাভারতের যুদ্ধের প্রথম দিন শুক্ল পক্ষ ছিল না। এবং শুক্লপক্ষে মহাভারতের যুদ্ধ হয় নাই। পূর্ণিমার পরবর্ত্তী প্রতিপদ্ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত পঞ্চদশ দিন কৃষ্ণপক্ষ। কৃষ্ণপক্ষের এই পঞ্চদশ দিন এবং শুক্লা প্রতিপদ্ এই ষোড়শ দিনই সূর্য্য অস্তগত হইলেই একাদিক্রমে অন্ধকার হয়। মহাভারতের যুদ্ধের ষোড়শ দিন সূর্য্য অস্তগত হইলেই যখন অন্ধকার ছিল তখন এই কৃষ্ণপক্ষেই মহাভারতের যুদ্ধ হইয়াছিল। এবং মহাভারতের যুদ্ধের প্রথম দিন কৃষ্ণা প্রতিপদ্ ছিল। অতএব কৃষ্ণা প্রতিপদে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। যুদ্ধের প্রথম দিন কৃষ্ণা প্রতিপদ্ হইলে যুদ্ধের দশম দিন কৃষ্ণা দশমী হয়। দশম দিনের যুদ্ধে ভীষ্মের পতন; অতএব কৃষ্ণা দশমীতে ভীষ্মের পতন হইয়াছিল। দশমীর দিন কৃষ্ণা দশমী হইলে যুদ্ধের চতুর্দ্দশ দিন কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী হয়। যুদ্ধে পতনের পর ভীষ্ম ৫৮ রাত্রি বাঁচিয়াছিলেন,—৫৯তম দিনে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল (অনুশাসন পর্ব্ব ১৬৭ অঃ ২৭ শ্লোক)। ভীষ্মের পতনের দশম দিন কৃষ্ণা দশমী হইতে গণনায় মৃত্যুর ৫৯তম দিন কৃষ্ণাষ্টমী হয়। অতএব কৃষ্ণা দশমীতে ভীষ্মের পতন এবং কৃষ্ণাষ্টমীতে মৃত্যু হইয়াছিল। আমাদের এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে যে আপত্তি হইতে পারে তাহা এই—

১। দশমদিনের যুদ্ধে ভীষ্মের পতনের পূর্ব্বে দ্রোণাচার্য্য যেসকল দুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে ("অবাক্‌শিরাশ্চ ভগবানুদতিষ্ঠত চন্দ্রমাঃ।" ভীষ্মপর্ব্ব ১১২ অঃ ১২ শ্লোক) অধোকোটি হইয়া চন্দ্রোদয় একটি। ভীষ্ম অপরাহ্ণ সময়ে পতনের কালে সূর্য্যকে দক্ষিণায়নে দর্শন করিয়াছিলেন (ভীষ্মপর্ব্ব ১১৯ অঃ ৯৩ শ্লোক)। অতএব সূর্য্য অস্তগত হইবার পূর্ব্বে দ্রোণাচার্য্য যখন চন্দ্রকে অধোকোটি হইয়া উদিত হইতে দর্শন করিয়াছিলেন তখন ভীষ্মের পতনের দশম দিন শুক্লানবমী ছিল বলা যাইতে পারে।

২। মৃত্যু-দিন ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন—মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্য যুধিষ্ঠির। ত্রিভাগ-শেষঃ পক্ষোঽয়ং শুক্লো ভবিতুমর্হতি। (অনুশাসন পর্ব্ব ১৬৭ অঃ ২৮) এখন দেখা যাইতেছে ভীষ্মের মৃত্যু-দিন যে তিথিই হউক শুক্ল পক্ষ ছিল।

প্রথম আপত্তি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে একাদিক্রমে যুদ্ধের ষোড়শ দিনেই সূর্য্য অস্তগত হইলেই যে অন্ধকার হওয়াতে সৈন্যের অবহার করা হইত উপরেই তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং যুদ্ধের দশম দিনের পূর্ব্বাপর নবম ও একাদশ এই দুই দিনই সূর্য্য অস্তগত হইলেই যখন অন্ধকার হইয়াছিল (ভীষ্ম পর্ব্ব ১০৬ অঃ ৮৫ ও ১০৭ অঃ ১।২ এবং দ্রোণ পর্ব্ব ১৫ অঃ ৪৯।৫০ শ্লোক) তখন মধ্যবর্ত্তী দশম দিন চন্দ্র উদিত হওয়াই অসম্ভব। বিশেষতঃ অধোকোটি হইয়া চন্দ্র উদিত হওয়া বিজ্ঞান-সম্মতও নয়। মহাভারত-রচয়িতার পক্ষে এরূপ অবৈজ্ঞানিক কথা বলাও সম্ভবপর নহে। অতএব অধোকোটি হইয়া চন্দ্রোদয় হওয়ার কথাটা পরস্ব বলিতেই হইবে।

দ্বিতীয় আপত্তি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে ভীষ্মের মৃত্যুর দিন তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন অদ্য অষ্টপঞ্চাশৎ রাত্রি আমি নিশিতাগ্র (তীক্ষ্ণ) শরসমূহে শয়ান রহিয়াছি; আমার বোধ হইতেছে যেন শত-বর্ষ গত হইয়াছে" (অনুশাসন পর্ব্ব ১৬৭ অঃ ২৭ শ্লোক)। এবং ভীষ্ম পতনের সময় সূর্য্যকে দক্ষিণায়নে দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন "সূর্য্য যত দিন দক্ষিণাবর্ত্তে (দক্ষিণায়নে) থাকিবে ততদিন আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব না। সূর্য্য দক্ষিণ দিক্ পরিত্যাগ করিয়া উত্তরদিগবলম্বী (উত্তরায়ণ) হইলে আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব" (ভীষ্ম পর্ব্ব ১২০ অঃ ৫১।৫৩ শ্লোক)। উত্তরায়ণ দেবতাদিগের দিন এবং দক্ষিণায়ন দেবতাদিগের রাত্রি। এই দক্ষিণায়নে দেবতাগণ নিদ্রিত থাকেন, সুতরাং দক্ষিণায়নে মৃত্যু হইলে সদগতির হানি হয়। এবং উত্তরায়ণে মৃত্যু হইলে সদগতির হানি হয় না। এজন্যই ভীষ্ম দক্ষিণায়নে প্রাণ পরিত্যাগ না করিয়া সদগতির নিমিত্ত উত্তরায়ণের প্রতীক্ষায় শানিতাগ্র (তীক্ষ্ণ) শরসমূহোপরি শয়ান থাকিয়া অষ্টপঞ্চাশৎ রাত্রি ভীষণ যাতনা সহ্য করিয়াছিলেন। উত্তরায়ণ যেমন দেবতাদিগের দিন এবং দক্ষিণায়ন রাত্রি বলিয়া দেবতাগণ দক্ষিণায়নে নিদ্রিত থাকেন, কৃষ্ণ পক্ষ তেমনি পিতৃলোকের দিন এবং শুক্ল পক্ষ রাত্রি। সুতরাং শুক্ল পক্ষে পিতৃলোক নিদ্রিত থাকেন (মানব-সংহিতা ১ম অঃ ৬৬।৬৭ শ্লোক)। দক্ষিণায়নে দেবতাগণ নিদ্রিত থাকেন বলিয়া দক্ষিণায়নে মৃত্যুতে যেমন সদগতির হানি হয়, পিতৃলোকের নিদ্রিত থাকার সময় শুক্ল পক্ষে মৃত্যুতে তেমনি সদগতির হানি হয়। সদগতির হানি হইবে বলিয়া যে ভীষ্ম দক্ষিণায়নে প্রাণ পরিত্যাগ করেন নাই, উত্তরায়ণের প্রতীক্ষায় অষ্টপঞ্চাশৎ রাত্রি তীক্ষাগ্র শরসমূহোপরি শয়ান থাকিয়া ভীষণ ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ সেই ভীষ্ম সদগতির হানিকর শুক্ল পক্ষে কখনও প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পারেন না—করেনও নাই। সদগতির নিমিত্ত কৃষ্ণ পক্ষে প্রাণ পরিত্যাগ করাই তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। সুতরাং কৃষ্ণ পক্ষেই তিনি প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অনুশাসন পর্ব্বের ১৬৭ অধ্যায়ের ২৮ শ্লোকের "পক্ষোঽয়ং শুক্লো" দেখা যায়। ঐ জায়গায় "পক্ষোঽয়ং কৃষ্ণো" ছিল। শুক্ল পক্ষে মৃত্যু সদগতির হানিকর ইহা অপরিজ্ঞাত কৃষ্ণ পক্ষে মৃত্যু ভীতি-ভূত-গ্রস্ত কোন অজ্ঞ লোক কৃষ্ণ পক্ষে ভীষ্মের মৃত্যু অসঙ্গত মনে করিয়া "কৃষ্ণো" স্থানে "শুক্লো" করতঃ শুক্লাষ্টমীতে ভীষ্মের মৃত্যু প্রচার করিয়াছেন। মহাভারতের যুদ্ধের প্রথম দিন কৃষ্ণা প্রতিপদ্ হইতে গণনায় কোনপ্রকারেই ভীষ্মের মৃত্যুর দিন কৃষ্ণপক্ষ ব্যতীত শুক্ল পক্ষ হয় না।

সাহিত্য-সম্রাট্ স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার কৃষ্ণ-চরিত্রের ১ম খণ্ডের ৫ম পরিচ্ছেদে অয়ন-গতি ধরিয়া মহাভারতের (কুরুক্ষেত্রের) যুদ্ধের সময় নির্ণয় করিয়াছেন। তাহাতে কিছু ভুল আছে। শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয়ের স্মরণার্থ উল্লেখ করিলাম।

শ্রী বৈকুণ্ঠনাথ দেব

(১৮০)

রাজসাহীর বিদ্রোহী জমিদার উদয়নারায়ণ রায়। কেদারেশ্বর মুখুটী নামক একজন বংশজ রাঢ়ী ব্রাহ্মণের পুত্র রাম গোবিন্দ গৌড়বাদশাহের খাস মুন্সী ছিলেন। মুন্সীদিগকে লেখাপড়ার কার্য্য করিতে হয়। যাঁহারা লেখাপড়ার কার্য্য করেন তাহাদিগকে "লালা" বলা হইত। এইজন্য কায়স্থ-দিগকে "লালা" বলা হয়। ইনিও খাস মুন্সী থাকিয়া লেখাপড়ার কার্য্য করিতেন বলিয়া ইহাকেও লালা রাম-গোবিন্দ বলিত। সাঁওতাল,

াঙ্গড় চুহারদিগের আক্রমণ নিবারণ নিমিত্ত "রাজসাহী দিগর" নামক ারি পরগণা এবং রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়া ইনি রাজসাহীতে রাজধানী াপন করিয়াছিলেন। ইঁহারই বংশধর রাজা উদয়নারায়ণ মুরশীদ ুলী খ র অত্যাচারে রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। কিন্তু আত্মহত্যা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। ইঁহার জমিদারী ও রাজা উপাধি নাটোর াজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রামজীবন রায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাই নাটোর াজবংশের প্রথম সম্পত্তি, এইজন্য নাটোরের রাজাদিগকে রাজসাহীর রাজা লে। এই উদয়নারায়ণ দ্বাদশ ভৌমিকের একজন। ইনি রাঢ়ীশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাহেরপুর এবং পুঁটিয়ার রাজারা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। তাঁহাদিগের সহিত ইঁহার কোন সম্বন্ধই নাই। তাহেরপুরের রাজাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে একজনার নামও রাজা উদয়নারায়ণ ছিল। তিনি রাজ্যচ্যুত হন নাই। (বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস)।

শ্রী বৈকুণ্ঠনাথ দেব

(১৮১)

গত ফাল্গুন মাসে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের সেতুর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে শোন নদের উপর রেলওয়ে সেতু আছে-- গঙ্গা কিংবা কর্ম্ম নদীর উপর কোনও সেতু নাই। কথাটি ঠিক নয়. "গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড" ধরিয়া গেলে শোন-ইষ্ট-ব্যাঙ্ক-ষ্টেশনটির ধারে যেমন শোন নদের ব্রীজ পাওয়া যায়-- গয়ার নিকট কর্ম্ম নদীর এবং কাশীর নিকট গঙ্গারও তেমনি রেল-ব্রীজ পাওয়া যায়।

শ্রী দীনবন্ধু আচার্য্য
শ্রী গৌরহরি আচার্য্য

(১৮৯)

বৈষ্ণবচূড়ামণি শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত বেদান্তদর্শনের গোবিন্দভাষ্য এবং উক্ত গোবিন্দভাষ্যের তৎকৃত একখানা টীকা এবং শ্রীল শ্যামলাল গোস্বামী কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদ সমেত বেদান্তদর্শনের একটি সংস্করণ কলিকাতা ১৫ নং গোপীকৃষ্ণ পালের লেন, পুরাণ-কার্য্যালয় হইতে শ্রী কৃষ্ণগোপাল ভক্ত কর্ত্তৃক ১৮১৬ শকাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত সংস্করণে শ্রীল শ্যামলাল গোস্বামী. "গোবিন্দভাষ্য বিবৃতি" নামে একটি বিস্তৃত সমালোচনাও বাঙ্গালায় লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে উক্ত সংস্করণের পুস্তক পাওয়া যায় কি না আমার জানা নাই। আমার নিকট একখানা আছে। উক্ত গোবিন্দ ভাষ্যের টীকাখানা শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কৃত কি না. তদ্বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না। তবে প্রকাশক মহোদয় বিদ্যাভূষণ মহাশয়েরই কৃত বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। আমার পিতামহ গোলোকগত মহারাজ বীরচন্দ্র দেববর্ম্মা মাণিক্য বাহাদুর উক্ত পুস্তক প্রকাশে আর্থিক সাহায্য করিয়াছিলেন। পুস্তকখানিও তাঁহাকেই উৎসর্গ করা হইয়াছে।

শ্রী রণবীরকিশোর দেববর্ম্মা

ঝটিকা-সাধন

দেশের ভিতর জম্‌চে যখন ময়লা-ধূলো,
চার-ধারেতে যায় না খোলা জান্‌লাগুলো,
ক্রন্দনে আর অন্ধকারে
জঞ্জালেরি গন্ধে হা রে,
মিথ্যে কেন চিত্তে তখন বন্দী রাখ ?
—ঝড়কে ডাকো !

* * *

বদ্ধ-সীমার জীবন-নদে স্রোত জাগে না,
গণ্ডী-ঘেরা রইতে যখন মন লাগে না,
ঢেউ-বীণাকে থামিয়ে দিয়ে,
আসর জমায় ব্যাংরা গিয়ে,
শ্যাওলা-ঘেরা আঁতের তলায় জম্‌চে পাকও,
—ঝড়কে ডাকো !

* * *

মুক্তি-লোকের স্বপ্ন জাগে পথের শেষে,
রাত্রি-দিবা যাত্রী চলে ভক্ত-বেশে,
বাধ্‌লে চরণ মাঝখানেতে,
হঠাৎ কাঁটা-জঙ্গলেতে,
হতাশ হ'য়ে অগ্র-গতি থামিওনাকো,
—ঝড়কে ডাকো !

* * *

ঘুমপুরীতে হারিয়ে গেছে সোনার-কাটি,
অশ্রুজলে তপ্ত স্বপন আগ্‌লে ঘাঁটি,
ছন্দ-হারা তন্দ্রা চোখে,
বন্ধ করে চন্দ্রালোকে,
জ্যান্তে যখন অজান্তে সব ম'রেই থাক,
—ঝড়কে ডাকো !

* * *

মন-বুড়োরা যায় চ'লে ঐ ঠক্‌ঠকিয়ে,
যৌবনেতেই ভীমরতিতে বক্‌বকিয়ে !
সুখকে ভেবে দুখের ছায়া
ককিয়ে ওঠে—'জগৎ মায়া' !
জরার চাপে নড়্‌বড়ে হা ! জীবন-সাঁকো,
—ঝড়কে ডাকো !

* * *

ময়লা-ধূলো, ঝোঁপ-ঝাপ আর পথের কাঁটা,
পাগ্‌লা ঝোড়ো সাফ্ ক'রে দ্যায় চালিয়ে ঝাঁটা,
বজ্র ছুঁড়ে অট্ট হেসে,
গণ্ডী এবং নিদ্রা নেশে
দীর্ণ করে শীর্ণ জরার জীর্ণ জাঁকও,
ঝড়কে ডাকো, ঝড়কে ডাকো, ঝড়কে ডাকো !

শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায়

গান

যখন এসেছিলে অন্ধকারে
চাঁদ ওঠেনি সিন্ধুপারে।
হে অজানা, তোমায় তবে
জেনেছিলেম অনুভবে,
গানে তোমার পরশখানি
বেজেছিল প্রাণের তারে॥
তুমি গেলে যখন একলা চলে'
চাঁদ উঠেছে রাতের কোলে।
তখন দেখি পথের কাছে
মালা তোমার পড়ে' আছে,
বুঝেছিলেম অনুমানে
এ কণ্ঠহার দিলে কারে॥

(প্রাচী, ফাল্গুন ১৩৩০) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

গান

আমি সন্ধ্যাদীপের শিখা
অন্ধকারের ললাটমাঝে পরানু রাজটীকা।
তার স্বপনে মোর আলোর পরশ
জাগিয়ে দিল গোপন হরষ,
অন্তরে তার রইল আমার
প্রথম প্রেমের লিখা॥
আমার নির্জ্জন উৎসবে
অম্বরতল হয়নি উতল পাখীর কলরবে,
যখন তরুণ রবির চরণ লেগে
নিখিল ভুবন উঠ্‌বে জেগে,
তখন আমি মিলিয়ে যাব
ক্ষণিক মরীচিকা।

(শান্তিনিকেতন-পত্রিকা, মাঘ ১৩৩০) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

গান

আয়রে মোরা ফসল কাটি।
মাঠ আমাদের মিতা, ওরে আজ তারি সওগাতে
মোদের ঘরের আঙন সারা বছর ভরবে দিনে রাতে।
মোরা নেব তারি দান,
তাই যে কাটি ধান,
তাই যে গাহি গান,'
তাই যে সুখে খাটি।
বাদল এসে রচেছিল ছায়ার মায়াঘর
রোদ এসেছে সোনার যাদুকর।
শ্যামে সোনায় মিলন হল মোদের মাঠের মাঝে,
মোদের ভালবাসার মাটি যে তাই সাজ্‌ল এমন সাজে।
মোরা নেব তারি দান,
তাই যে কাটি ধান,
তাই যে গাহি গান,
তাই যে সুখে খাটি।

(শান্তিনিকেতন-পত্রিকা, মাঘ ১৩৩০) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

গান

যে কেবল পালিয়ে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায়
ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে,
সে কি আজ দিল ধরা গন্ধে-ভরা
বসন্তের এই সঙ্গীতে।
ও কি তার উত্তরীয় অশোক-শাখায় উঠ্‌ল দুলি'
আজি কি পলাশবনে ঐ সে বুলায় রঙের তুলি,
ও কি তার চরণ পড়ে তালে তালে
মল্লিকার ঐ ভঙ্গীতে।
না গো না দেয়নি ধরা হাসির ভরা দীর্ঘশ্বাসে যায় ভেসে,
মিছে এই হেলা-দোলায় মনকে ভোলায়, ঢেউ দিয়ে যায় স্বপ্নে সে।
সে বুঝি লুকিয়ে আসে বিচ্ছেদেরি রিক্ত রাতে
নয়নের আড়ালে তার নিত্যজাগার আসন পাতে,
ধেয়ানের বর্ণছটায় ব্যথার রঙে
মনকে সে রয় রঙ্গিতে।

(শান্তিনিকেতন-পত্রিকা, ফাল্গুন, ১৩০০) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

গান

এবার অবগুণ্ঠন খোল খোল।
গহন মেঘমায়ায় বিজন বনছায়ায়
তোমার আলসে অবলুণ্ঠন সারা হ'ল।
শিউলিসুরভি রাতে
বিকশিত জ্যোৎস্নাতে,
মৃদু মর্ম্মর গানে তব মর্ম্মের বাণী বোলো।
বিষাদ-অশ্রুজলে
মিলুক সরম-হাসি,
মালতীবিতানতলে
বাজুক বঁধুর বাঁশি।
শিশিরসিক্ত বায়ে
বিজড়িত আলোছায়ে
বিরহ-মিলনে গাঁথা
নব প্রণয়-দোলায় দোলো॥

(শান্তিনিকেতন-পত্রিকা, ফাল্গুন, ১৩৩০) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চঞ্চলেরে শুনাইছে স্তব্ধতার ভাষা,
যা'র রাত্রি-নীড়ে আসে যত ক্লান্ত আশা।
বাঁশি কেন প্রশ্ন করে, "বিশ্ব কোন্ অনন্তের পানে
চলে নিত্য অজানার টানে?"

যায় যাক্, যায় যাক্,
আসুক দূরের ডাক,
যাক্ ছিঁড়ে সকল বন্ধন।
চলার সংঘাত-বেগে
সঙ্গীত উঠুক জেগে
আকাশের হৃদয়-নন্দন।
মুহূর্ত্তের নৃত্যচ্ছন্দে ক্ষণিকের দল
যাক্ পথে মত্ত হ'য়ে বাজায়ে মাদল;
অনিত্যের স্রোত বেয়ে যাক্ ভেসে হাসি ও ক্রন্দন,
যাক্ ছিঁড়ে সকল বন্ধন!

(ভারতী, চৈত্র, ১৩৩০) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

মহাকবি সার্ মহম্মদ একবাল

ভারতীয় মোসলেম কবিগণের মুকুটমণি মহাকবি সার্ মহম্মদ এক্‌বালের নাম আজ জগদ্বিখ্যাত। সুবিখ্যাত নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির উপযোগী বলিয়া এবার যে কয়জন কবির নাম প্রচারিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে মহাকবি এক্‌বালের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এক্‌বাল বিশ্ব-প্রেমের বিরাট্ ও মহান্ সঙ্গীত সৃষ্টি করিয়াছেন :—

"চীন ও আরব হামারা হিন্দুস্থান হায় হামারা;
মোস্‌লেম হায় হাম্‌সারা, জাহাঁ হায় হামারা!"
"আরব আমার ভারত আমার চীনও আমার নয় গো পর;
জগৎ-জোড়া মোস্‌লেম আমি সারাটি ভুবনে বেঁধেছি ঘর।"
"আজমী খাম হায় তু কেয়া, হায় লও হেজাজী হায় মেরী;
নোগ্‌মায়ে হেন্দী হায় তু কেয়া হায় লও হেজাজী হায় মেরী।"

অনুবাদ—

"কি আসে যায় আজ্‌মী ভাষায়, ভাবটি আমার আরবের;
ছন্দ আমার হেন্দী কিন্তু সুরটি আমার হেজাজের।"

কবির আরও কয়েকটি কবিতার ভাবানুবাদ—

"বিশ্ব তোমার জন্মভূমি, বিশ্ববাসী তোমার ভাই;
সত্য তোমার ধর্ম্ম যখন শত্রু তোমার কেহই নাই।
সাম্প্রদায়িক ভাগ্য থাকে দেশের সঙ্গে বিজড়িত;
সঙ্কীর্ণতার উপরে তার সৌধ-ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।
তাহার মাঝে থাক্‌তে কভু পারবে নাক সত্য যে;
ধরার বুকে চরণ চাপি মুক্তপদে চল্‌বে সে;
খুঁজতে কেন হবে তারে দেশ-বিশেষের অন্তরে;
তুচ্ছ মাটি পূজতে কেন হবে মিছা মন্তরে?
সকল দেশের প্রভু যিনি সত্যে তাঁহার নির্ভর;
দেশ জাতি আর ভাষা ভুলে সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ কর!"
"সার্থক সে জাতীয়তা মৃত্যু যাহার সঙ্গে,
জন্ম যাহার বহু প্রাণের এক অনুপম রঙ্গে।
ধর্ম্ম যাঁহার বিশ্ববাসীর হিতসাধনে আত্মদান,
সাগর-নদীর বিঘ্ন কাটি ছুটে যাহার বর্ম্ম-যান।
আরোহী যার এক দিকেতে বেঁধে রাখে সৃষ্টি;
যাঁদের প্রাণের একই ভাবে নেচে উঠে দৃষ্টি।"
"একই তূণের তীর আমরা ছুটি গো এক লক্ষ্যে;
যদিও মোরা ছড়িয়ে আছি বিপুল ধরার বক্ষে
এক আমাদের ধর্ম্মনীতি একইরকম বেশ;
ভ্রাতৃভাবের জীবন মোদের একই পথে শেষ।"
"আল্লার দাস আমরা সবে ইঙ্গিতে তার আছি স্থির;
ফেরাউনের কাছে কভু হয় না নত মোদের শির।
আরব-নবীর ভক্ত মোরা ভ্রাতৃভাবে বদ্ধ মন,
বিশ্ববাসী ভ্রাতা মোদের ভুলতে নারি কদাচন।
দেশ-বিদেশের ভেদ-বাঁধনে আমরা কভু মানি না;
মানব জাতে "ম্লেচ্ছ যবন" ব'লে কভু জানি না।
বিশ্বমাঝে যেথান হ'তে ডাকে কেহ ব'লে ভাই।
সাগর পাহাড় আকাশ বাতাস চিরে মোরা ছুটে যাই।"
"হায়রে অবোধ ভুলছ কি গো আত্মা তোমার কোন্ দেশের?
সীমার মাঝে ডুবছ তুমি ভুলে মুক্তি অনন্তের!

(ইস্‌লাম-দর্শন, আষাঢ়, ১৩৩০) মোহাম্মদ মজফ্‌ফর উদ্দিন

—

সাহিত্যের মূলতত্ত্ব

মানুষ বহুকাল ধরে' বহুরূপে সাহিত্য এবং কলার চর্চ্চা করে' এসেছে সেই প্রচেষ্টার মূল উৎস কোনখানে তা দেখতে হবে। দেখতে হবে কোন্ আদর্শ নিয়ে সাহিত্যে সঙ্গীতে এবং অন্যান্যরূপে মানুষ আত্ম প্রকাশ করে।

মানুষকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়। উপনিষদেও তাই দেখতে পাই—সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ নিঃসন্দেহ আমাদের আত্মারও তিনরূপ আছে—আছি, জানি, রচনা করি। আজ আমি সেই তৃতীয়টির কথা বলব।

কিন্তু প্রথমেই আমাদের বেঁচে থাকতে হবে, তার সঙ্গে অন্ন-বস্ত্র-সমস্যার যোগ রয়েছে। আমাদের টি'কে থাকতে হবে। এইজন্য আমাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করতে হবে। কিন্তু কেবলি কি সেই কথাই হবে, একটিও কি বাজে কথা বলা চল্‌বে না?

মানুষের যে জ্ঞানরূপ আছে সেই তাকে বিশ্রাম করতে দেয় না। প্রয়োজনের সীমার এক জায়গায় রেখা টানা যেতে পারে। জ্ঞানের মধ্যে যে অসীমতা আছে তাই আমাদের প্রয়োজনের সীমাকে অতিক্রম করে' নিয়ে যায়।

জীবনযাত্রার গণ্ডীতে যে মানুষ সম্পূর্ণ থাকতে পারে না তার কারণ যে তার চেয়ে একটা বড় কিছু আছে। কেবলমাত্র বেঁচে থাকার জন্য মধ্য-আফ্রিকার লোকেরা দিন আনে দিন খায়; কেবল মাত্র তারা টি'কে আছে।

কলা-বিদ্যা কি আমাদের জীবনে একান্তভাবে সম্বদ্ধ নয়? জীবনযাত্রার পক্ষে জ্ঞানের কিছু প্রয়োজন আছে, কিন্তু খানিকটার বেশী জানবার দরকার নেই।

সন্তুষ্ট না হওয়ার মধ্যে বড় সত্য আছে এবং মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলে। এইজন্য মধ্য-আফ্রিকার লোকেরা যেমন-তেমন করে' টি'কে থাকে। কিন্তু যেখানে মানুষ তার সমস্তটা বিকাশ করতে পেরেছে সেখানে সে সন্তুষ্ট হ'ল না। কেন হ'ল না? সকলেই যে বৈজ্ঞা-নিকতার কাজে প্রবৃত্ত হয় তা কখনই, কেবল নিজের জন্য

চঞ্চলেরে শুনাইছে ধ্রুবতার ভাষা,
যা'র রাত্রি-নীড়ে আসে যত শ্রান্ত আশা।
বাঁশি কেন প্রশ্ন করে, "বিশ্ব কোন্ অনন্তের পানে
চলে নিত্য অজানার টানে?"

যায় যাক্, যায় যাক্,
আসুক দূরের ডাক,
যাক্ ছিঁড়ে সকল বন্ধন।
চলার সংঘাত-বেগে
সঙ্গীত উঠুক জেগে
আকাশের হৃদয়-নন্দন।
মুহূর্ত্তের নৃত্যচ্ছন্দে ক্ষণিকের দল
যাক্ পথে মত্ত হ'য়ে বাজায়ে মাদল;
অনিত্যের স্রোত বেয়ে যাক্ ভেসে হাসি ও ক্রন্দন,
যাক্ ছিঁড়ে সকল বন্ধন।

(ভারতী, চৈত্র, ১৩৩০)   শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

মহাকবি সার্ মহম্মদ একবাল

ভারতীয় মোস্লেম কবিগণের মুকুটমণি মহাকবি সার্ মহম্মদ একবালের নাম আজ জগদ্বিখ্যাত। সুবিখ্যাত নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির উপযোগী বলিয়া এবার যে কয়জন কবির নাম প্রচারিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে মহাকবি একবালের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। একবাল বিশ্ব-প্রেমের বিরাট্ ও মহান্ সঙ্গীত সৃষ্টি করিয়াছেন:—

"চীন ও আরব হামারা হিন্দুস্থান হ্যায় হামারা;
মোস্লেম হ্যায় হাম্সারা, জাহাঁ হ্যায় হামারা!"
"আরব আমার ভারত আমার চীনও আমার নয় গো পর;
জগৎ-জোড়া মোস্লেম আমি সারাটি ভুবনে বেঁধেছি ঘর।"
"আজমী খাম হ্যায় তু কেয়া হ্যায় লও হেজাজী হ্যায় মেরী;
নোগ্মায়ে হেন্দী হ্যায় তু কেয়া হ্যায় লও হেজাজী হ্যায় মেরী।"

অনুবাদ—

"কি আসে যায় আজ্মী ভাষায়, ভাবটি আমার আরবের;
ছন্দ আমার হেন্দী কিন্তু সুরটি আমার হেজাজের।"

কবির আরও কয়েকটি কবিতার ভাবানুবাদ—

"বিশ্ব তোমার জন্মভূমি, বিশ্ববাসী তোমার ভাই;
সত্য তোমার ধর্ম্ম যখন শত্রু তোমার কেহই নাই।
সাম্প্রদায়িক ভাগ্য থাকে দেশের সঙ্গে বিজড়িত;
সঙ্কীর্ণতার উপরে তার সৌধ-ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।
তাহার মাঝে থাকতে কভু পারবে নাকি সত্য যে;
ধরার বুকে চরণ চাপি মুক্তপদে চলবে সে;
খুঁজতে কেন হবে তারে দেশ-বিশেষের অন্তরে;
তুচ্ছ মাটি পূজতে কেন হবে মিছা মন্তরে!
সকল দেশের প্রভু যিনি সত্যে তাঁহার নির্ভর;
দেশ জাতি আর ভাষা ভুলে সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ কর।"
"সার্থক সে জাতীয়তা [illegible] যাহার সঙ্গে;
[illegible] যাহার [illegible] এক [illegible] সঙ্গে।

আরোহী যার এক দিকেতে বেঁধে রাখে সৃষ্টি;
যাঁদের প্রাণের একই ভাবে নেচে উঠে সৃষ্টি।"
"একই তূণের তীর আমরা ছুটি গো এক লক্ষ্যে;
যদিও মোরা ছড়িয়ে আছি বিপুল ধরার বক্ষে,
এক আমাদের ধর্ম্মনীতি একইরকম বেশ;
ভ্রাতৃভাবের জীবন মোদের একই পথে শেষ।"
"আল্লার দাস আমরা সবে ইঙ্গিতে তাঁর আছি স্থির;
ফেরাউনের কাছে কভু হয় না নত মোদের শির।
আরব-নবীর ভক্ত মোরা ভ্রাতৃভাবে বদ্ধ মন;
বিশ্ববাসী ভ্রাতা মোদের ভুলতে নারি কদাচন।
দেশ-বিদেশের ভেদ-বাঁধনে আমরা কভু মানি না;
মানব-জাতে "ম্লেচ্ছ যবন" ব'লে কভু জানি না।
বিশ্বমাঝে যেথান হ'তে ডাকে কেহ ব'লে ভাই।
সাগর পাহাড় আকাশ বাতাস চিরে মোরা ছুটে যাই।"
"হায়রে অবোধ ভুলছ কি গো আল্লা তোমার কোন্ দেশের;
সীমার মাঝে ডুবছ তুমি ভুলে মুক্তি অনন্তের।

(ইস্লাম-দর্শন, আষাঢ়, ১৩৩০)   মোহাম্মদ মজফ্ফর উদ্দিন

—

সাহিত্যের মূলতত্ত্ব

মানুষ বহুকাল ধরে' বহুরূপে সাহিত্য এবং কলার চর্চ্চা করে' এসেছে, সেই প্রচেষ্টার মূল উৎস কোনখানে তা দেখতে হবে। দেখতে হবে কোন্ আদর্শ নিয়ে সাহিত্যে সঙ্গীতে এবং [illegible] মানুষ [illegible] প্রকাশ করে।

মানুষকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা দেখতে পাই—সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ নিঃসন্দেহ আমি তিনরূপ আছে—আছি, জানি, রচনা করি। আজ আমি [illegible] কথা বলব।

কিন্তু প্রথমেই আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। তার সঙ্গে অন্ন-বস্ত্র-সমস্যার যোগ রয়েছে। আমাদের টিঁকে থাকতে হবে। এইজন্য আমাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করতে হবে। কিন্তু কেবলি কি সেই কথাই হবে, একটিও কি বাজে কথা বলা চলবে না?

মানুষের যে জ্ঞানরূপ আছে সেই তাকে বিশ্রাম [illegible] প্রয়োজনের সীমার এক জায়গায় রেখা টানা যেতে পারে। জ্ঞানের মধ্যে যে অসীমতা আছে তাই আমাদের প্রয়োজনের সীমাকে অতিক্রম করে' গিয়ে যায়।

জীবনযাত্রার গণ্ডীতে যে মানুষ সম্পূর্ণ থাকতে পারে না তার কারণ [illegible] তার চেয়ে একটা বড় কিছু আছে।* কেবলমাত্র বেঁচে থাকার জন্য মধ্য আফ্রিকার লোকেরা দিন আনে দিন খায়; কেবল মাত্র তারা টিঁকে আছে।

কলা-বিদ্যা কি আমাদের জীবনে একান্তভাবে সম্বন্ধ [illegible] জীবনযাত্রার পক্ষে জ্ঞানের কিছু প্রয়োজন আছে, কিন্তু খানিকটার বেশী জানবার দরকার নেই।

সন্তুষ্ট না হওয়ার মধ্যে বড় সত্য আছে এবং মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলে। এইজন্য মধ্য-আফ্রিকার লোকেরা যেমন-তেমন [illegible] টিঁকে থাকে। কিন্তু যেখানে মানুষ তার [illegible] বিকাশ করতে [illegible]

মানুষ প্রাণপাত করছে, সীমা লঙ্ঘন করছে, কিন্তু কেবল নিজের ব্যবস্থা করার জন্য নয়। কখনই স্বার্থ এত বড় সত্য নয় যা তাকে এত বড় করতে পারে।

আমাদের মধ্যে ভূমা আছেন। তিনি কেবল আমাদের গণ্ডীর মধ্যে লিপ্ত রাখতে চান না, ক্রমাগতই আমাদের সীমা অতিক্রম করিয়ে মহত্তের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান।

শুধু আমি টিঁকে থাকলেই হ'ল না, আমার সমাজ টিঁকে থাকা চাই। আমার টিঁকে থাকা যখন সকলের টিঁকে থাকার সঙ্গে যুক্ত করি, তখনই সকলের মঙ্গলের সহিত ব্যক্তির মঙ্গলের সম্ভব হয়। একটা বড় সত্যের উপর এর ভিত্তি নির্ভর করছে। যে অসীম সত্যের উপর এর ভিত্তি নির্ভর করছে, সেই অসীম সত্যের উপর ব্যক্তিগত টিঁকে থাকা নির্ভর করে, সবারই মঙ্গল নির্ভর করে। এই কথা যখন মানুষ বোঝে তখন সে নিজে বেঁচে থাকবার জন্য চেষ্টা করে না, সে অসীমের জন্য প্রাণপাত করে। তখনই টিঁকে বড় হ'তে পারি।

আমার টিঁকে থাকা যখন অনেকের সঙ্গে যুক্ত করি, তখন আত্মজ্ঞান থাকে না। কিন্তু সকলেই যেখানে আছে, সেখানে আমি আছি, সেইখানে মানুষ অসীম সত্য পেয়েছে। যিনি আপনাকে বহুর মধ্যে এবং বহুকে আপনার মধ্যে দেখতে পান তিনি মুক্ত। যে জাতি তা জানতে পেরেচে তারা ধন্য হয়েছে, তারা পরিত্রাণ পেয়েছে।

তা হ'লে দেখছি আমাদের মধ্যে যেমন বেঁচে থাকবার ইচ্ছা, যেমন জানবার কৌতূহল আছে, তেমনি সীমাকে বড় করবার একটা ইচ্ছা আছে। তার নাম দেওয়া যেতে পারে আনন্দ। এমন একটা কিছু আছে যা জ্ঞানের কৌতূহল থেকে, টিঁকে থাকা থেকে, আর সব দ্বন্দ্ব থেকে ক্রমাগত বড় হ'য়ে চলেছে। মানুষের যেখানে আলোক, সেখানে তার নিস্তার নেই; সেটা হচ্ছে তার অসীম, সেটা তাকে বের করে' দিতেই হবে, সেটাই তার ভূমা।

যেই বাঁশি বাজল সে অমনি ছুটে' চলল, পথের ঠিকানা নেই, সে ছুটে' চলল; আমি দেবো, আমি পাবো, এই ভাবনায় সে অস্থির, আপনাকে সে ধারণ করতে পারে না।

প্রকাশের মূল হচ্ছে আনন্দ।

আমার জিনিষ যখন আমার কাছে ন্যস্ত তখন তার প্রকাশ নেই। বৃহৎ বৃহৎ সাম্রাজ্য আজ কোথায়, সেগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে গেল। আওরঙ্গজেব কোথায় আছে? নেই সে, কোথাও নেই। বরং যে দারাকে সে মেরেছে তার সাধনা এখনো আছে। কিন্তু তাজমহলকে কি বলব? সবাই বলে যে আমরা সবাই যুগে যুগে ওর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি আমার রূপ, তার মৃত্যু নেই, কেন না তার সৌন্দর্য্য বিশ্বের সৌন্দর্য্য।

বিশ্বকে কি সমস্ত জিনিষ দিলেই নেয়? অনেকেই অনেক কিছু দেন, কিন্তু যেখানে বিশ্বের সুরে আমার সুর মেলে তাই সে নেয়।

প্রকাশের মূলে ঐশ্বর্য্য। কৃপণতায় প্রকাশ নেই। তাই সত্যম্ অনন্তম্। কোন্ প্রকাশে সবচেয়ে মুগ্ধ হলাম?—অনন্তের ঐশ্বর্য্যের প্রকাশে এবং আমি তার ভাগ পাওয়াতে।

(পরিচারিকা, ফাল্গুন, ১৩৩০) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সেনেট্ হলে প্রথম বক্তৃতা থেকে অনুলিখিত।)

—

সাহিত্যের রসতত্ত্ব

সাহিত্যের অর্থ কি তা সমাজের অলঙ্কার-শাস্ত্রে রয়েছে। তা নিয়ে আমি আলোচনা করব না। সাহিত্য আমাদের নানা প্রয়োজন সাধন করে' থাকে, ছেলেদের শিক্ষা হ'তে ম্যালেরিয়া ডিপার্টমেণ্ট পর্য্যন্ত বাক্যের দ্বারা যা কিছু প্রকাশ করা যায় তাই হ'ল সাহিত্য। আজ আমার আলোচনার বিষয় রস-সাহিত্য, যাতে কোনো রকম সামাজিকতার সম্বন্ধ নেই।

প্রাণ ধারণের জন্য আমাদের বিশেষ কতকগুলি চিত্ত-বৃত্তি রয়েছে। এই বৃত্তির প্রয়োজনের উদ্বৃত্ত অংশ খরচ করার নাম হচ্ছে খেলা। খেলা নিছক বাজে নয়, অপ্রয়োজনীয় নয়। যে প্রকাশটা আনন্দরূপে আত্মপ্রকাশ করে, তাকে আমি খেলা বলি। খেলার ভেতর আছে একটা নকল করা। কুকুর খেলা করে, শিকারের নকল করে; বিড়ালছানা যখন কোনো জিনিষ নিয়ে খেলা করে তখন ইঁদুর-ধরা নকল করে। কিন্তু সাহিত্য কি তাই? শিল্পকলাও কি তাই? আমাদের বেঁচে থাকবার বৃত্তির যা উদ্বৃত্ত রয়েচে তা খরচ করবার আনন্দই কি এই কলা-সাহিত্যের আনন্দ? আমার মন ত কিছুতেই তাতে সাড়া দেয় না। কবি বললে—"শরৎচন্দ্র পবন মন্দ"। মেটিরিওলজিক্যাল-বিদ্যায় মানুষ হয়ত ঠিক বলে' দেবে কবে চাঁদ উঠেছিল, কতটা বাতাস বয়েছিল। এ বলার দ্বারা কিন্তু তৃপ্তি হয় না। কীট্‌সের সেই পাত্রের কবিতার বর্ণনায় বাহিরের কথার বর্ণনা তিনি দেননি, দিয়েছেন তিনি অবর্ণনীয়ের ইঙ্গিত। কেবল মাত্র প্রয়োজনের অনুসরণ করে' সেই পাত্রের বর্ণনা হয়নি—নিজের ভিতর সুপরিস্ফুট সুষমাযুক্ত পরিপূর্ণতা কবি প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন; হয়ত কখনো কখনো তার সঙ্গে প্রতিদিনের ব্যাপার থাকলেও থাকতে পারে।

সমস্ত সাহিত্য ও কলার ভিতরের কথা এই যে আমাদের ভিতরে একটা ঐক্যের আদর্শ রয়েছে। এই ঐক্য কি? ধরো আমি গোলাপের আনন্দ পেয়েছি। তা হ'ল বাহিরের দৃষ্টির আনন্দ নয়, তা তার ভিতরের রঙের ও রূপের যে সুষমা রয়েছে তা, যে পরিপূর্ণ একটা ঐক্য আপনার ভিতর আপনি লাভ করেচে তাতে কোথাও আতিশয্য নেই।

এর ভিতর আরেকটা কথাও আছে। এই যে ঐক্য এটার বেশী ভাব রয়েছে সমস্তর সঙ্গে, সর্বত্রের সঙ্গে। আমরা যখন কোনো উদ্দেশ্য মনে নিয়ে কোনো কাজ করি, তখন আমরা কর্ম্মের মধ্যে উদ্দেশ্যের ঐক্য গঠন করি। কিন্তু এই চেষ্টার দ্বারা আমরা জগৎকে খণ্ডিত করি, নিখিল বিশ্বের সঙ্গে চেষ্টার সামঞ্জস্য থাকে না। বিপুল বিশ্বের সৌন্দর্য্যকে দূরে ফেলে' দিয়ে আমাদের সমস্ত চিন্তা ঐ এক ঐক্যকে ভাবতেই ব্যস্ত থাকে। সে ঐক্য পূর্ণ আনন্দের ঐক্য নয়, সমস্ত জগতের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য নেই। এ-সবের স্থান রস-সাহিত্যে নেই।

কিন্তু একটা গোলাপ, যে তার আপনার ভিতর নিখিল বিশ্বের প্রাণের কথা প্রকাশ করেছে, ঐ ঐক্য সমস্ত বিশ্বকে আহ্বান করেছে, এই ঐক্যই যথার্থ ঐক্য; সেইটাকে প্রকাশ করাই পরম কথা। অসীমের আকূতিকে নিজের কর্ম্মে ব্যক্ত করবার জন্য প্রাচীন কবিদের সাহিত্য-কথা সৃষ্টি হয়েছিল। "আকাশ ক্রন্দসী!" অসীমের বেদনাতে অন্তহীনরূপে আপনাকে নিরন্তর ছড়িয়ে ফেলে' দিয়ে—আকাশে আকাশে সমস্ত আকাশের সেই বেদনা নিয়ে কলা-শিল্পী যে একখানা ভাস্ তৈরী করেছে তা জল তুলবার জন্য নয়, তা শরীরের পিপাসা নিবৃত্তি করবার জন্য নয়। এই রঙীন পাত্র তার সকলের চেয়ে বড় পিপাসা কতকটা নিবৃত্তি করবার জন্য। তার ভিতরের একটা পরিপূর্ণতার বেদনা রয়েছে যা বলছে—আমাকে তোমার মানস-অন্তরে প্রকাশ করো হে, প্রকাশ করো! যা বলছে—নিত্য আমাকে প্রকাশ করো, প্রকাশ করো। এই ক্রন্দন-আহ্বান ও আকূতিকে মানুষ অবজ্ঞা করতে পারেনি। সমস্তকে অবজ্ঞা করে' ঠেলে' ফেলে' দিয়ে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে সব ছেড়ে যে সেই ক্রন্দন প্রকাশ করতে ছুটেছিল।

মানুষ কি কেবল প্রকৃতির তাড়া, প্রকৃতির চাবুক খেয়ে কাজ করবে? না। সে ত নিত্য প্রকৃতিকে অবজ্ঞা করছে। যখন আমি গান গেয়েছি তখন এই একটা কথাই আমাকে নিত্য উদ্বিগ্ন করেছে—গানের ধারার মধ্যে যেমন তোমায় ভাসিয়ে দিলে, তাতে সমস্ত জগতের একটা পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেল। এটা কি সাবজেক্টিভ্? এটা কি একটা মানসিক অবস্থা? একথার এই উত্তর আমি বলেছি—এই গানের প্রভাবে আমাকে স্বর্গলোকে নিয়ে গেল।

সত্য ও তথ্য দুটো কথা আছে। দুটোর মধ্যে মুলগত পার্থক্যও আছে। তথ্য মানে যেমনটি তেমনি। সেইটি যাতে আশ্রয় করেছে তাই হ'ল সত্য। যা ব্যক্তির রূপ তাতে আছে একটা সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধতা। এইরূপ যা আমার ব্যক্তিগত বিশিষ্টতার মধ্যে নিবদ্ধ তা একটা বড় সত্যের উপর নির্ভর করে। আমার তথ্য বা আমার ফ্যাক্‌ট্‌এর কোনো পরিচয় নেই। পরিচয় সর্ব্বদা ইউনিভার্সাল্ বা ব্যাপক। তথ্যের পরিচয় সত্ত্বে।

যাকে আর্ট্ বা সাহিত্য বলি তা যদি তথ্যমূলক হয় তবে তা অত্যন্ত নীচেকার। গুণী তথ্যকে প্রকাশ করতে চায় না, তারা বলে তথ্যের জগৎ অন্ধকারময়, সেটা হয়ত বৈজ্ঞানিক পরিচয়। কিন্তু গুণীর ক্ষেত্র হ'ল রসের ক্ষেত্র। জ্ঞানের বিরুদ্ধতা করা চলে, রসের বিরুদ্ধতা চলে না। তথ্য হ'ল মজুররূপী। ইলাষ্ট্রেশন্ আর্ট্ নয়। তাই রূপ ও রসের সত্যকে প্রকাশ করতে গেলে তথ্যকে অবজ্ঞা করতে হয়। একটা ছড়া আছে—

খোকা এল নায়ে
লাল জুতুয়া পায়ে।

জুতাটা তথ্য। কিন্তু খোকার মায়ের জুতুয়া চীনা-বাড়ীর জুতা নয়, জুতুয়া জুতার চাইতে অনেক বড় কথা।

বস্তু-পদার্থ অনেক সঙ্কীর্ণ; রস-বস্তু পদার্থের চাইতে ঢের বেশী, তা প্রকাশ করতে হ'লে তথ্যমূলক ভাষায় ও রেখায় চলবে না। এখানে ছেলেমানুষী চলবে না। যারা রস-বিষয়ে প্রবীণ তারা তথ্য সম্বন্ধে ভয় করে না।

ভাষায় একটা মুস্কিল এই যে প্রত্যেক শব্দের অভিধান-নির্দ্দিষ্ট অর্থ রয়েছে, সেটা মস্ত বাধা। কবিকে সেই শব্দের বাধা অতিক্রম করে' অনির্ব্বচনীয়কে কি করে' প্রকাশ করতে হবে তাই ভাবতে হবে।

যৌবনের কোণে মোর মন হারাল,
রূপের পাথারে আঁখি ডুবিল।

পাথারে আঁখি-ডোবাটা বৈজ্ঞানিকদের কাছে কেমনতর। আবার ধরুন, "পাষাণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে", সাধারণের কাছে এটাও অসম্ভব। কিন্তু কবির কাছে তা নয়। গল্প শেষ হ'য়ে গেলে ছেলে বলে—তার পর? তার পর? কিন্তু রসজ্ঞ বলবে—আর বলবার দরকার নেই। অর্ব্বাচীন বলে—ও হ'ল না, আরো কিছু আছে। তথ্য তাই চিত্র-কলা ও সাহিত্যের অঙ্গ নয়। জাতকের গল্প অবলম্বন করে' একটা কবিতায় লিখেছিলাম, প্রভু বুদ্ধের লাগি ভিখারীকে নানাজনে সোনাদানা দিচ্ছিল, ভিখারী তা নেয়নি, শেষে এক কাঙ্গালিনী তার ছিন্ন বসনখানা অঙ্গ হতে খুলে' দিলে প্রভুর জন্য। কবিতা শুনে' একজন বলেছিলেন, এটা ছেলেদের বইয়ে থাকা উচিত নয়। তিনি বললেন—মেয়েটার নির্লজ্জতা সমাজে আকৃষ্ট হ'তে পারে, এটা সমাজে গ্রহণকালে সমাজের স্বাস্থ্যহানি হ'তে পারে। ইনি গিয়েছিলেন তথ্য খুঁজতে।

তথ্যকে অগ্রাহ্য করে' সাহিত্য এবং চিত্রবিদ্যা আপনার পথ অনুসরণ করবে। তাহাতে এমন করে' চলবে যে সে ভাষা আপনার কথাকে বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে আড়ে আড়ে বলবে—

আধ চরণে　　আধ চরণে
আধ মধুর হাস।

এতে শুধু চলা নেই, শুধু শারীরিক প্রক্রিয়া নেই। এটা বৈজ্ঞানিক মতে পারাপ হ'লেও তথ্যের দিকে অত্যন্ত মূঢ়। সাহিত্যের সত্য ও বৈজ্ঞানিক সত্যে ঢের প্রভেদ, সাহিত্যের সত্য বস্তু-ধর্ম্ম মানে না। আমার এক বন্ধু তিনি ডাক্তার; যখন তিনি ডাক্তার তখন তিনি হলেন নিছক তথ্য। সে ডাক্তার শুধু মাত্র তথ্য নয়, যদি সে বন্ধু হয়—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল,
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল!

ডাক্তার হয়ত সেদিন জন্মেছে, কিন্তু তার ভিতরে যে রসের সত্য রয়েছে তা কবে শেষ হয়েছে এটা ধারণা করতে পারিনে। এটা আমাকে এত করে' বলতে হ'ল তার কারণ এই যে সাহিত্য ও চিত্র-কলা সম্বন্ধে অনেকেই মিথ্যাভাব পোষণ করে' থাকেন। জ্ঞানদাসের একটা কথা আছে—

এক দুই গণনাতে অন্ত নাহি পাই,
রূপে গুণে রসে প্রেমে আপনা বিলাই।

তথ্যের গণনা মাপা যায়। কিন্তু আমি যেখানকার কথা বলছি সেখায় নামতা কসতে হয় না, তা রূপে গুণে রসে প্রেমে আত্মহারা। এক দুই তিনের মাপকাঠি নিয়ে আমাদের রসের এলাকায় এসে সার্ভে ডিপার্টমেন্টের লোক অনেক ভুল দেখেন, কিন্তু ওটা বড় ভুল নয়।

রসের কথা যেন অরসিকে না বলে। সর্ব্বদাই পকেটে মেজারিং রড্ রয়েছে তাই নিয়ে অরসিক সত্যের ক্ষেত্রে তথ্যকে বড় করে' দেখে। সেগুলো মেপে দেওয়া যায় তা প্রমাণও করা যায়। কিন্তু সত্য ত মাথার উপর নেই, তাই আপনি না বুঝলে তা প্রমাণ করা শক্ত।

(কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দোসরা মার্চ্চের সেনেটহলের বক্তৃতা থেকে শ্রীযুক্ত তারানাথ রায় কর্ত্তৃক অনুলিখিত।—'আত্মশক্তি।')

(পরিচারিকা, ফাল্গুন, ১৩৩০)　　শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খৃষ্টোৎসব

"তাই তোমার আনন্দ আমার পর
তুমি তাই এসেছ নীচে।
আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে।—"

দুইয়ের মধ্যে একের যে প্রকাশ তাই হ'ল যথার্থ সৃষ্টির প্রকাশ। নানা বিরোধে যেখানে এক বিরাজমান সেখানেই মিলন, সেখানেই এককে যথার্থভাবে উপলব্ধি করা যায়। আমাদের দেশের শাস্ত্রে তাই এক ছাড়া দুইকে মানতে চায়নি। কারণ দুইয়ের মধ্যে একের যে ভেদ তার অবকাশকে পূর্ণ করে' দেখলেই একেকে যথার্থভাবে পাওয়া যায়। এইটিই হচ্ছে সৃষ্টির লীলা। উপরের সঙ্গে নীচের যে মিলন, বিশ্বকর্ম্মার কর্ম্মের সঙ্গে ক্ষুদ্র আমাদের কর্ম্মের যে মিলন, বিশ্বেতে নিরন্তর তারই লীলা চলছে। তার দ্বারা সব পূর্ণ হ'য়ে রয়েছে।

যাঁরা বিচ্ছেদের মধ্যে সত্যের এই অখণ্ড রূপকে এনে দেন তাঁরা জীবনে নিয়ত আনন্দবার্ত্তা বহন করে' এনেছেন। ইতিহাসে এইসকল মহাপুরুষ বলেছেন যে কোনোখানে ফাঁক নেই, প্রেমের ক্রিয়া নিত্য চলেছে। মানুষের মনের দ্বার উদ্ঘাটিত যদি নাও হয় তবু এই প্রক্রিয়ার বিরাম নেই। তার অস্ফুট চিত্তকমলের উপর আলোকপাত হয়েছে, তাকে উদ্বোধিত করবার প্রয়াসের বিশ্রাম নেই। মানুষ জানুক বা নাই

জাগুক, সমস্ত আকাশ ব্যাপ্ত করে' সেই অস্ফুট কুঁড়িটির বিকাশের জন্যে আলোকের মধ্যেও প্রেমের প্রতীক্ষা আছে।

তেমনিভাবে এক মহাপুরুষ বিশেষ করে' তাঁর জীবন দিয়ে এই কথা বলেছিলেন যে লোকলোকান্তরে যিনি তাঁর অভ্রচুম্বিত আলোকমালার প্রাসাদ সৃষ্টি করেছেন, সেই বিচিত্র বিশ্বের অধিপতিই আমার পিতা, আমার কোনো ভয় নেই। এই বিরাট্ আকাশের তলে যাঁর প্রতাপে পৃথিবী ঘূর্ণ্যমান হচ্ছে তাঁর শক্তির অন্ত নেই, তা অতি প্রচণ্ড।—তার তুলনায় আমরা মানুষ কত নগণ্য সামান্য জীব। কিন্তু আমাদের ভয় নেই, এইসকলের অন্তর্যামী নিয়ন্তা আমারই পরম আত্মীয়, আমারই পিতা। বিশ্বের মূলে এই পরম সম্বন্ধ যা শূন্যকে পূর্ণতা দান করেছে, মৃত্যুশোকের উপর আনন্দধারা প্রবাহিত করছে সেই মধুর সম্বন্ধটি আজ আমাদের অন্তরে অনুভব করতে হবে। আমাদের পরম পিতা যিনি, তিনি বলছেন যে 'ভয় নেই, সূর্য্যচন্দ্রের মধ্যে আমার অখণ্ড রাজত্ব, আমার অমোঘ নিয়ম অলঙ্ঘ্য, কিন্তু তুমি যে আমারই, তোমাকে আমার চাই।' যুগে যুগে মাভৈঃ বাণী যাঁরা পৃথিবীতে আনয়ন করেন তাঁরা আমাদের প্রণম্য।

এম্নি করে'ই একজন মানব-সন্তান একদিন বলেছিলেন যে আমরা সকলে বিশ্বপিতার সন্তান, আমাদের অন্তরে যে প্রেমের পিপাসা আছে, তা তাঁকে স্পর্শ করেছে। একথা হ'তেই পারে না যে আমাদের বেদনা-আকাঙ্ক্ষার কোনো লক্ষ্য নেই, কারণ তিনি সত্যই আমাদের পরম সখা হ'য়ে তাঁর সাড়া দিয়ে থাকেন। তাই সাহস ক'রে মানুষ তাকে আনন্দ-দায়িনী মা, মানবাত্মার কল্যাণ-বিধায়ক পিতা-রূপে জেনেছে। মানুষ যেখানে বিশ্বকে কেবল বাহিরের নিয়ম-যন্ত্রের অধীন বলে' জানছে সেখানে সে কেবলই আপনাকে দুর্ব্বল অশক্ত করছে; কিন্তু যেখানে সে প্রেমের বলে সমস্ত বিশ্বলোকে আত্মীয়তার অধিকার বিস্তার করেছে সেখানেই সে যথার্থভাবে আপনার স্বরূপকে উপলব্ধি করেছে।

এই বার্ত্তা ঘোষণা করতে একদিন মহাত্মা যীশু লোকালয়ের দ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি ত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হ'য়ে যোদ্ধবেশে আসেননি, তিনি ত বাহু-বলের পরিচয় দেননি, তিনি ছিন্ন চীর পরে' পথে পথে ঘুরেছিলেন। তিনি সম্পদবান্ ও প্রতাপশালীদের কাছ থেকে আঘাত-অপমান প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি যে বার্ত্তা নিয়ে এসেছিলেন তার বদলে বাইরের কোনো মজুরী পাননি, কিন্তু তিনি পিতার আশীর্ব্বাদ বহন করেছিলেন। তিনি অকিঞ্চন হ'য়ে দ্বারে দ্বারে এই বার্ত্তা বহন করে' এনেছিলেন যে ধনের উপর আশ্রয় করলে চল্বে না, পরম আশ্রয় যিনি তিনি বিশ্বকে পূর্ণ করে' রয়েছেন, তিনি দেশ-কালকে পূর্ণ করে' বিরাজমান, তিনি "পরম আনন্দঃ পরমা গতিঃ" এই কথা উপলব্ধি করবার জন্য যে ত্যাগের দরকার যারা তা শেখেনি তারা মৃত্যুর ভয়ে ক্ষতির ভয়ে প্রাণকে বুকে করে' নিয়ে ফিরেছে—অন্তরের ভয় লোভমোহের দ্বারা শ্রদ্ধাহীনতা প্রকাশ করেছে। এই মহাপুরুষ তাই আপনার জীবনে ত্যাগের দ্বারা মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত হ'য়ে মানুষের কাছে এই বাণী এনে দিয়েছিলেন। তাই তিনি মানবাত্মার পরম পথকে উন্মুক্ত করবার জন্য একদিন দরিদ্র বেশে পথে বার হয়েছিলেন। যে-সব সরলপ্রকৃতির মানুষ তাঁর অনুগমন করেছিল তারা সম্পূর্ণরূপে তাঁর বাণীর মর্ম্ম বুঝতে পারেনি। তারা কিসের স্পর্শ পেয়েছিল জানিনে, কিন্তু ভক্তিভরে তাদের মাথা অবনত হ'য়ে গিয়েছিল। তাদের মাথা নীচুই ছিল—কারণ তাদের পরিচয় নাম ধাম কেউ জানত না, তারা সামান্য ধীবর ছিল। তারা যীশুর বাণীর প্রেরণা অনুভব করেছিল, একটি অব্যক্ত মধুর রসে তাদের অন্তর আপ্লুত হয়েছিল। এম্নি করে' যাদের কিছু নেই তারা পেয়ে গেল। কিন্তু যারা গর্ব্বিত তারা এই পরম বার্ত্তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

এই মহাত্মার বাণী যে তাঁর ধর্ম্মাবলম্বীরাই গ্রহণ করেছিল তা-নয়। তারা বারে বারে ইতিহাসে তাঁর বাণীর অবমাননা করেছে, রক্তের চিহ্নের দ্বারা ধরাতল রঞ্জিত করে' দিয়েছে—তারা যীশুকে একবার নয়, বার বার ক্রুশেতে বিদ্ধ করেছে। সেই খৃষ্টান নাস্তিকদের অবিশ্বাস থেকে যীশুকে বিচ্ছিন্ন করে' তাঁকে আপন শ্রদ্ধার দ্বারা দেখ্লেই যথার্থভাবে সম্মান করা হবে। খৃষ্টের আত্মা তাই আজ চেয়ে আছে; বড় বড় গির্জ্জায় তাঁর বাণী প্রচারিত হবে বলে' তিনি পথে পথে ফেরেননি, কিন্তু যার অন্তরে ভক্তিরস বিশুষ্ক হ'য়ে যায়নি তারই কাছে তিনি তাঁর সমস্ত প্রত্যাশা নিয়ে একদিন উপনীত হয়েছিলেন। তিনি সেদিনকার কালের সবচেয়ে অখ্যাত দরিদ্র অভাজনদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বিশ্বের অধিপতিকে বলেছিলেন যে "পিতা নোঽসি", তুমি আমাদের পিতা।

মানুষ জীবন ও মৃত্যুকে বিচ্ছিন্ন করে' দেখে, এই দুইয়ের মধ্যে সে একের মিল দেখে না। যেমন তার দেহে পিঠের দিকে চোখ নেই ব'লে কেবল সামনেরই অঙ্গকে মেনে নেওয়া বিষম ভুল, তেম্নি জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে আপাত অনৈক্যকেই সত্য বলে' জানলে জীবনকে খণ্ডিত করে' দেখা হয়। এই মিথ্যা মায়া থেকে যারা মুক্তিলাভ করে' অমৃতকে সর্ব্বত্র দেখেছেন তাঁদের আমরা প্রণাম করি। তাঁরা মৃত্যুর দ্বারা অমৃতকে লাভ করেছেন, এই মর্ত্ত্যলোকেই অমরাবতী সৃজন করেছেন। অমরধামের তেমন এক যাত্রী একদিন পৃথিবীতে অমরলোকের বাণী নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, সেই কথা স্মরণ করে' আমরাও যেন মৃত্যুর তমোরাশির উপর অমৃত-আলোর সম্পাত দেখ্তে পাই। রাত্রিতে সূর্য্য অস্তমিত হ'লে মূঢ় যে সে ভাবে যে আলো বুঝি নির্ব্বাপিত হ'ল, সৃষ্টি লোপ পেলে। এমন সময়ে সে অন্তরীক্ষে চেয়ে দেখে যে সূর্য্য অপসারিত হ'লে লোক-লোকান্তরের জ্যোতির্ধাম উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে—মহারাজার এক দরবার ছেড়ে আর-এক দরবারে আলোর সঙ্গীত ধ্বনিত হচ্ছে। সেই সঙ্গীতে আমাদেরও নিমন্ত্রণ বেজে উঠেছে। মহা আলোকের মিলনে যেন আমরা পূর্ণ করে' দেখি। জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানকার এই অখণ্ড যোগ-সূত্র যেন আমরা না হারাই। যে মহাপুরুষ তাঁর জীবনের মধ্যেই অমৃত-লোকের পরিচয় দিয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুর দ্বারা অমৃতরূপ পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছিল। আজ তাঁর মৃত্যুর অন্তর্নিহিত সেই পরম সত্যটিকে যেন আমরা স্পষ্ট আকারে দেখ্তে পাই।

(শান্তিনিকেতন-পত্রিকা, চৈত্র, ১৩৩০) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গান

আমার শেষ পারাণীর কড়ি কণ্ঠে নিলেম গান,—
একলা ঘাটে রইব না গো পড়ি'।
আমার সুরের রসিক নেয়ে,
তারে ভোলাব গান গেয়ে,
পারের খেয়ায় সেই ভরসায় চড়ি।
পার হব কি নাই হব তার খবর কে রাখে,
দূরের হাওয়ায় ডাক দিল এই সুরের পাগ্লাকে।
ওগো তোমরা মিছে ভাব,
আমি যাবই যাবই যাব,
ভাঙ্ল দুয়ার কাট্‌ল দড়া দড়ি।

(শান্তিনিকেতন-পত্রিকা, চৈত্র) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলা ভাষার আঁদাড়ে-পাদাড়ে

দ্বিস্বরের কেঁচো খুঁড়িতে সর্প বাহির

নূতন ব্রতী॥ দুইস্বর অ্যাক আঁধরে জোতা,
চক্ষে দেখেছে কে কবে কোথা?

ষিম্বরানন্দ স্বামী॥ ষিম্বর কীরূপ—দেখনি তা কি ?
পঞ্চ বোমায় ফুটা'বে আঁখি !

প্রথম বোমা

আতপতপ্ত অতিথি॥ দোই কই ! মিঠাই আর না ! বাঁচি দই পে'লে !
পরিবেষ্টা॥ এই যে ছুই খুরি দই ! পাতে দিই ঢেলে॥

গঠিত যদিচ সরস পদ্যে—
পোরা আছে এ'র পেটের মধ্যে
নেহাত কম না—ছয় প্রকার
(ছোরা ছুরি যেন শাণিতধার)
ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর
ইকারান্ত জোড়াম্বর।
অকারপ্রধান—দই
আকারপ্রধান—মিঠাই
ইকারপ্রধান—দিই
উকারপ্রধান ছুই
একারপ্রধান—এই
ওকারপ্রধান—দোই।

দ্বিতীয় বোমা

কোনো বউ কাটিছে লাউ বঁটিতে চিরি চিরি।
কোনো বউ শিউলির মালা গাঁথিছে ধীরি ধীরি॥
কেউ বলে "গোউর তো এলি—কোথায় তোর ভুলু।
পুতুলের তা'র বিয়ে যে আজ ! উলু উলু উলু উলু !"
ভিতরে যদি বিতর আঁখি,
দেখিতে তবে রবে না বাঁকি,
ছয় ছয় তরো ভয়ঙ্কর
উকারান্ত জোড়াম্বর।
অকারপ্রধান—বউ
আকারপ্রধান—লাউ
ইকারপ্রধান—শিউলি
উকারপ্রধান—উলু-উলু
একারপ্রধান—কেউ
ওকারপ্রধান—গোউর।

তৃতীয় বোমা

ভিখারী ব্রাহ্মণ॥ লও খাও দেও থোও—ক্রোড়পতি হ'য়ে জিও !
কলির গৃহকর্ত্তা॥ ছুওরে কে আছ ! দশ খা দ্যাও ! বড় উনি মোর প্রিয়।

ব্রাহ্মণের কপাল-দোষে
বেরিয়ে প'ল ঘন ঘোষে
ছয় ছয় প্রলয়ঙ্কর
ওকারান্ত জোড়াম্বর।
অকারপ্রধান—লও
আকারপ্রধান—খাও
ইকারপ্রধান—জিও
উকারপ্রধান—ছুওর
একারপ্রধান—দেও
ওকারপ্রধান—থোও।

চতুর্থ বোমা

বিএর বাড়ীর রাখিতে মান,
ছুই জাএ বসি সাজিছে পান॥
বড় জা মাখিছে চুন-খএর।
ছোটো জা করিছে খিলি তোএর॥
এহেন সময়ে বটঠাকুর
করিতে আসিল শ্রান্তিদূর॥
ভাইবো'এর পানে ক্ষণেক চেয়ে,
মনে মনে বলে "নাজানি কে এ"॥
ছোটো জা হইয়া অপ্রতিভ,
ঘোমটা টানিয়া কাটিয়া জিভ,
খিলি ফেলে থুএ পালা'ল বালা !
বড় জা হাসিয়া বলে "কী জ্বালা" !!॥
মস্ত বোমা এ—কে রাখে আটকি !
ছয় দিকে ছয় পড়িল ছটকি।
বিষম এ যে ভয়ঙ্কর
একারান্ত জোড়াম্বর।
অকারপ্রধান—খএর
আকারপ্রধান—জাএ
ইকারপ্রধান বিএর
উকারপ্রধান—থুএ
একারপ্রধান—কে এ
ওকারপ্রধান—তোএর।

পঞ্চম বোমা

ডাকিছে দেআ, ফুটিছে কেআ,
গোয়ালে ঢুকিছে গোরুরা সবে।
ভ'রেছে কুআ, চলিছে রুআ,
কি আর ভাবনা তোমার তবে॥
ভা'য়ে ভা'য়ে মিছে ঝগড়াঝাঁটি !
আধাআধি লও বিষয় বাঁটি॥
কেন আর ঘোরো ভবের ধন্দে !
হরিগুণ গাও মন-আনন্দে॥
জ্যান্ত বোমা যে—ঠ্যাকানো ভার !
পেটে গুমরিছে ছয় প্রকার
গম্ভীর শবদকর
আকারান্ত জোড়াম্বর।
অকারপ্রধান—মনআ-নন্দে
আকারপ্রধান—আধাআ-ধি
ইকারপ্রধান—কি আর
উকারপ্রধান—কুআ
একারপ্রধান—কেআ
ওকারপ্রধান—গোআল।
ষিম্বরের ছড়া ছড়াছড়ি॥

(১) ইকারান্ত॥

(১/০) অই, আই।

থই থই ক'চ্চে জল, আসচে রে জোয়ার।
তাই তাই তাই ক'চ্চে বাছাটি আমার॥

(১৵০) ইই=ঈ, এই।

নভে উদিল যেই নব স্বরগ,
ফুটিল যমুনায় নীল নীরজ॥
অরুণ-রনজিত নীল নীরজ আছে কি যমুনার নীরে ?
নীরে তা যমুনার নেই ত নেই আছে তা যমুনার তীরে॥
তরুণারুণ পীতধড়া, তনু নীলিম শাম।
সনাল কমল জিনি বঙকিম সুঠাম॥

(১৵৹) উই, ওই।

আশু বলে "দশুই আজ", বীরু বলে "বারোই।"
নীরুই বলিছে অ্যাকা "আজিকে অ্যাগারই" ॥

(২) উকারান্ত ॥

(২৵৹) অউ, আউ।

দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠ্‌ল উননের আগুন ॥
রাঁধিতে বসিল বউ-দুজন নিম-সিম-বেগুন ॥
বড় বউ বলে "শুক্‌তুনির বাঁকি নেই বড় আর।
লাউ দিয়ে মুগের ডা'ল রাঁধিব এইবার।"
ছোট বউ বলে, আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম মুছি',
"কচি লাউ রেখেচি দিদি, করিয়া কুচিকুচি ॥"
বড় বউ বলে "তা জানিস্ নে? নাউ ও না ও—'লাউ'!
কচিলাউ লো কচিলাউ! বলিস্‌নে কচিনাউ ॥"

(২৶৹) ইউ, এউ।

মিউ মিউ করে বেরালছানা য'দিন চোখ না ফোটে।
চোখ ফুটলেই মেউ মেউ করি মেনীর কোলে যোটে ॥

(২৷৹) উউ=উ, ওউ

"দূর হ! দূর হ!" বলে মেজদাদা, "কী ক'চ্ছিস তোরা।"
"দোউড়ো-দোউড়ি কচ্চি" বলে, ছেলেদুটি আন্‌কোরা ॥

(৩) ওকারান্ত ॥

কি কও কি কও! কও কি কও কি! শুনি হাসিবে যে লোক!
কি চাও কি চাও! চাও কি চাও কি! সাফ্ বলো—গিলো না ঢোক!

(৩৵৹) ইও, এও।

ছিও ছিও, ছিও ছিও, থামে না যে পোড়া হাঁচি!
নাকেও চোখেও ঝরচে জল—চা আইলে বাঁচি?
কাউকেও দেখ্‌চি নে হেতা! যাকেই ডাকি—নাই সে!
সাড়াও ছায় না কেউ—কাছেও না আইসে!
ডাক শুনি বলিলা আসি গৃহিণী ঠাক্‌রোণ—
"শাঁখ বাজচে শুনচ না? লেগেছে যে গেরোন!
সবাই গেছে গঙ্গা নাইতে করম কাজ ফেলে।
গরম চা দেবো তইরি করে', গেরোন ছেড়ে গেলে ॥"

(৩৷৹) উও, ওও।

এমন পড়ুও কাগাতুও কে কোথায় দেখিয়াছে!
পড়ালেই পড়ে মধুর তানে, তুড়ি দিলেই নাচে ॥
হাত বাড়ালেই হাতে বসে, সব কাজে পটু ও।
ধরিতে গেলে কামড় ছায়, ডরে না একটুও!
কবে কে ওকে বলিয়াছিল "কে তুমি গো কাগাতুও!"
সেই অবধি ও "কে তুমি গো!" ধরেছে এই ধুও ॥
দুপর বাজলে অতিথিশালার থামের মাথায় বোসে,
ঠাকুরের প্রসাদ-লোভে—শেখা কথা এই ঘোষে :-
এই গাড়ু! এই গামছা! পা ধোও! লাঠিখানি কোণে থোও!
এসো না এ সেবার ঘরে, পা যদি না ধোও।

(৪) আকারান্ত ॥

(৪৵৹) অআ, আআ।

প্রাণের কথা ॥ * ॥ কত আর কাঁদিবে সই! আসিত যে অ্যাক ডাকে,
এখন মাথা খুঁড়িলেও পাবে না আর তা'কে ॥ * ॥
জ্ঞানের কথা ॥ তমআবৃত্ত জলআগারে পড়িলে চেতনালোক,
না রহে কোনো ভাবনা, না রহে দুখশোক ॥
প্রাণের কথা ॥ * ॥ উড়োপাখীর ফিরিয়া আসা, বৃথা আসা লো সই!
আর লো দোঁহার ব্যথা দোঁহে আধাআধি বাঁটি লই! * ॥
জ্ঞানের কথা ॥ * ॥ আশাবায়ুর উপরে শুধু, করি রহে যে ভর,
আশা আশা আশায় তা'র কৃশায় কলেবর ॥
দুরাশাআসবে মাতিলে মন, হাত বাড়ায় সে চাঁদে।
নিরাশা-আফিঙে হইলে অসাড়, পড়ি যায় ঘোর ফাঁদে ॥

(৪৶৹) ইআ, এআ।

দুই পা হাঁটিয়া হইয়া কাবু,
তাকিআ ঠ্যাসান দিলেন বাবু ॥
নাটুকিআ বলে "নাটকখানি রচিনু বহুযতনে।
শ'দুই টাকার চাঁদা দিলে, বাঁধা র'ব চরণে ॥"
জোয়ালাপ্রসাদ জহরী বলে, বাড়াইয়া সাধাহাত,
"হীরা কা'কে বলে দেখুন এই! কেআবাত—কেআবাত!"
নদিআ থেকে এলেন গুরুজি, হাতে জপমালা ঝুলি।
গদি ছেড়ে গদিআন বাবু লইলেন পদধুলি ॥
গায়ে তাঁর অশুচিতার আঁচ লাগে পাছে,
চেআরে বসাইয়া তাঁকে বসিলা পায়ের কাছে ॥
জহরী বলে নাটুকিআ'কে "চাঁদার খাতাখানা
বিনাবাক্যে বলিতেছে 'বড় আমি সেয়ানা!'"
শেআনে শেআনে কোলাকুলি হয়, কখনো কদাচিৎ।
অনেক সময় ঘটিয়া দাঁড়ায় ঠিক্ তাহার বিপরীত ॥
তেমন পাকা শেআনে শেআনে ছ্যাপা হ'লে—ওরে বাপা!
ঘাড় করি আড় দাঁড়া দোঁহে, বুকে দিয়া দুহাত চাপা ॥
ঠাহরিয়া দেখি, দোঁহে দোঁহার, মু-আঁখি হাত-পা ধড়,
মানে মানে ভাগে স্ব স্ব ঠাই, দোঁহাকে দোঁহে করি গড় ॥

(৪৷৹) উআ, ওআ

কবিদেরে নমি—জানেন না তাঁরা এমন বিষয় নেই।
বেস্ একটি বলেন কথা—সে কথাটি এই ॥
শীত-বস্তুর জানে শুধু—কাঙাল যারা দীন;
জানু আর কৃশানু আর ভানু - এই তিন ॥
মানোআরি গোরাগুলা বুনা জানোআর।
দুনা দামে নারিকেল কিনি' খোসা চিবায় তা'র ॥

(৫) একারান্ত

(৫৵৹) অএ, আএ

তলে তলে ন-এ না-এ টাএ টাএ মিল
অথচ দুয়ের ভেদ ঠ্যাকানো মুস্কিল ॥
আটপৌরে ন, "না," সাকার—
এ "ন" নিরাকার।
দুই ন—দুই না'র ভেদ, আরো চমৎকার ॥
দুই ন-এ আঠারো হয়, হ্যাঁ হয় দুই না-এ।
দাঁড়াইলে বিপদ ঘটে, পা দিয়া দুই নায়ে ॥

(৫৶৹) ইএ, এও

আমি এসে বো'সে আছি ঘণ্টা খানেক ধরি।
তুমি এসেছ বাঁচিলাম! এইবার ছাড়িবে তরী ॥
মেয়েগুলিকে হৈনু আমি বিএ দিএ খালাস।
ঘাড় থেকে নেবে গেল বোঝা, ঘাড়ে লাগিল বাতাস ॥

(৫৷৹) উএ, ওএ

ঝাঁকে ঝাঁকে ওড়ে জোড়া পায়রা, দুএ দুএ খোপে ঢোকে।
পো'এ বো'এ পোরে গৃহীর গৃহ, লোকালয় লোকে লোকে ॥

(শান্তিনিকেতন-পত্রিকা, চৈত্র) শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

গ্রাণ্ড্ ট্রাঙ্ক্ রোড

চলিয়াছ তুমি সড়কের রাজা
কলিকাতা হ'তে পেশবার,
সুবিধা পেয়েছ কত নদ নদী
নগরীর সাথে মেশ বার।
আঙুর পেস্তা কিস্‌মিস্
পেতে জিভ করে নিস্‌পিস্;
ডাকে খাইবার-গিরি-পথ, ডাকে
ডাকিনী এলায়ে কেশ-ভার।

পাকুড় পাথরে চুনার আদরে
কাঁকরে কাঁকরে ছয়লাপ,—
কোথা কালো কোথা শুভ্র পাংশু
কোথা লাল করে জয়-লাভ।
পথে পথে ছায়া-ছত্র,
হিরণ হরিৎ পত্র,
সিন্ধু বরুণা গঙ্গা যমুনা
দর্শনে হরে' লয় পাপ।

কোথাও গো-গাড়ী আদার ব্যাপারী
জাহাজের খোঁজে চল্‌ছে,
টঙ্গা এক্কা পাঙ্গা ছক্কা
লক্কার মত টল্‌ছে।
ছুটেছে অশ্ব তুষ্ট—
উষ্ট্রের দল পুষ্ট,
কোথাও মোটর ভাপ্‌রা উগারি'
দাপটে দুনিয়া দল্‌ছে।

সাঁওতাল কুলি কোথাও করিছে
আয়োজন আল্ বাঁধ বার,
খর্জ্জুর-গাছে রজ্জুতে বাঁধা
বংশী ও হাঁড়ি রাঁধ্‌বার।

কাবুলীরা লাঠি হস্তে
চলেছে—চাহে না বস্‌তে;
জননীর কোলে ছোটে ছেলে ওই
তোড়্‌জোড় করে' কাঁদ্‌বার।

কোথাও চলেছে ওড়্‌না উড়ায়ে
পরি সার্ট্ সায়া সুকৃতনু
টোপ টুপি আর পাগড়ীর সাথে
খোলা-শির ভ্রমে ভুক্কন।
চলে পল্টন মার্চ্চে,—
পরমায় সব বাড়্‌ছে,
কোথাও লাঙ্গা সন্ন্যাসী চলে
সবকেশী সবলুপ্তম্।

কোথাও নিকানো মাটির ছাদেতে
বধূরা কাটিছে চর্‌কা,
রাঙা পাথরের বুরুজের গায়ে
মর্ম্মরে-গাঁথা ঝর্‌কা।
রূপসী কৃষক-কন্যা
ছুটায় রূপের বন্যা;
কোথাও ঢেকেছে রমণীর দেহ
রমণীয় সব বোর্‌কা।

বহু-ভাষী তুমি কথা কও কভু
উর্দ্দু ফার্‌সী বাঙ্‌লায়,
হিন্দি পস্তু সবে ওয়াকিফ
বলো কে তোমারে সাম্‌লায়।
সুর সে তোমারে হাত্‌ড়ায়
ঠুংরী কাজ্‌রী দাদ্‌রায়;
ঘটাও সৌখ্য খান্দানী সেখ,
বাবু, শেঠ, লালা, লাঙ্‌লায়।

ধর্ম্ম তোমার বিশ্বজনীন,
পথে পথে তব মন্দির,
নগরে নগরে কত মস্‌জিদ
গির্জ্জাও প্রতিদ্বন্দ্বীর।
সমাধির সব গম্বুজ—
কাল-নীরে শ্বেত অম্বুজ—
রয়েছে দাঁড়ায়ে স্বরগ মরতে
ফন্দি করিছে সন্ধির।

পথ দেখাইয়া পানিপথ দিয়ে
ভাঙ গড় কত দিল্লী,
কোথাও তোমার বাজিছে সারঙ
কোথাও ডাকিছে ঝিল্লী।
কোথাও মিনার উঠ্‌ছে
কোথা বীণা-তার টুট্‌ছে,
কোথাও উগ্র ব্যাঘ্রের বাসা
কোথাও আভীর-পল্লী।

তুমি নিয়ে যাও দুর্ব্বার সেনা
কামান অশ্ব হস্তী,
দেশের ফসল নষ্ট করিয়া
ছড়ায়ে মৃতের অস্থি।
লয়ে' যাও দিবা রাত্রি
ঝোলা ঝাণ্ডা ও যাত্রী,
সোহাগে কোথাও লোহাকে গলাও
দরিয়ায় স্থাপ বস্তি।

বাংলা হইতে সঙ্গে নিয়েছ
গোবর সর্ষে বাব্‌লায়,
সটান চলেছে দৌড়ে কোথায়
ধরিয়া কে তায় আগ্‌লায়।
সার্‌ভাইভ্যাল্ শ্রেষ্ঠের
ওটা যে নিয়ম কুষ্টের,
হরি রাখে যায় মারিবে কে তায়—
বাঘে সাপে নাহি খাব্‌লায়।

স্বর্গ না হোক ভূ-স্বরগ যেতে
সড়ক বানালে সের শা,
সিধা আগাগোড়া, নয় বাঁকাচোরা,
কোনোখানে নয় তের্‌চা।
ভারতের দুই প্রান্ত
এক করে' তবে ক্ষান্ত,
গঙ্গার তুমি সঙ্গীই বট
দেখে' মনে হয় ঈর্ষা।

তুমিই মিশালে আমে আখ্‌রোটে
আলু-বোখারায় চাল্‌তায়,
এক পদ্দায় ফুটি সন্দায়
পুণ্‌কো পালং পল্‌তায়,
বাঙ্গালী এবং তুর্কে,
দুর্গাবাড়ী ও দুর্গে,
জর্দ্দার সাথে সাঁচিপান আর
সুর্ম্মার সাথে আল্‌তায়।

তুমিই মিশালে শালে মস্‌লিনে
হুঁকা কাছে এল ফর্‌সী,
মিহিদানা পাশে বেদানা বসিল
বর্শার কাছে বড়্‌শী।
হিঙ কলায়ের পার্শ্বে
চিনে' লওয়া আর ভার সে,
ভুট্টা বালাম বাস্‌মতি সব
একদম পাড়াপড়্‌শী।

বিল্‌কুল ভাই তক্‌লিফ নাই
হরঘরই সব ছুট্‌ছে,
কোথা থাকে-থাক্ ময়ূরের ঝাঁক্
টিয়া টাক্‌সোনা উড়্‌ছে;
হরিণ ঊষর ক্ষেত্রে
চাহিছে আকুল-নেত্রে,
বাঙালীর ছেলে বাঙ্‌লার লাগি'
তবু আঁখিমন ঝুর্‌ছে।

শ্রী কুমুদরঞ্জন মল্লিক

বাণিজ্যে সাম্রাজ্যিক সুবিধা ও ভারতবর্ষ

যুদ্ধের পর হইতেই ইংরেজ জাতি বাণিজ্যে সাম্রাজ্যিক সুবিধা-নীতি (ইম্পিরিয়েল প্রেফারেন্স্) প্রবর্তন করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। বাণিজ্য-জগতের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তাঁহারা স্বার্থরক্ষার জন্য সজাগ হইয়া উঠিয়াছেন। এই নব-বিধানের ফলে আমাদের ভারতবাসীর লাভালাভের হিসাব খতিয়ান্ করিয়া দেখা উচিত।

বাণিজ্যে সাম্রাজ্যিক-সুবিধা প্রদানের কথাটা যে আজকাল এই নূতন করিয়া আরম্ভ হইয়াছে তাহা নহে। বুয়ার যুদ্ধের পর জোসেফ্ চেম্বার্লেন্ এই নূতন নীতি প্রবর্ত্তন করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল দুইটি। প্রথমতঃ এই নূতন নীতির ফলে বৃটিশ-সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ স্বার্থবদ্ধ হইয়া একত্রিত হইবে। দ্বিতীয়তঃ ইংরেজের শিল্প-বাণিজ্য বিদেশীদিগের প্রতিযোগিতা এড়াইয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। কিন্তু তখন অনেক তর্ক-বিতর্কের পর ইহা 'ধামাচাপা' ছিল। বিগত য়ুরোপীয় কুরুক্ষেত্রের ফলে ইংরেজ জাতি বুঝিয়াছেন বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে একতা না থাকিলে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি করিতে না পারিলে সাম্রাজ্যের শান্তি নাই, এবং ভবিষ্যতে মহাবিপদ্ উপস্থিত হইতে পারে। তাই স্বার্থের খাতে ইংরেজের তরফ হইতে এই নূতন নীতি প্রবর্ত্তনের কথাটা পুনরায় উঠিয়াছে।

বাণিজ্যে সাম্রাজ্যিক সুবিধার অর্থ এই যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশগুলি পরস্পরের মধ্যে বাণিজ্যে যে সুবিধা ভোগ করিবে, সাম্রাজ্যের বাহিরের কোন দেশ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কোনও দেশের সহিত বাণিজ্যে সেই সুবিধা ভোগ করিতে পাইবে না। বাণিজ্যে কোনও দেশকে সুবিধা প্রদান করিতে হইলে সেই দেশের পণ্যদ্রব্য আমদানী করিবার সময় উহার উপর শুল্কের হার কমাইয়া অথবা একেবারে উঠাইয়া দিতে হয়।

বাণিজ্যে সাম্রাজ্যিক সুবিধা-নীতি অবলম্বন করিলে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত যে-কোনো দেশজাত পণ্যদ্রব্যের উপরে শুল্কের হার কমাইয়া সাম্রাজ্যের বাহির হইতে আমদানির উপরে শুল্কের হার বাড়াইয়া দিতে হইবে।

ভারতবর্ষের স্বাভাবিক বহির্বাণিজ্যের হিসাব হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে ভারতের আমদানির শতকরা ৬১ ভাগ আসে ইংলণ্ড্, স্কট্‌লণ্ড্, ও আয়ারলণ্ড্ হইতে, পাঁচ ভাগ আসে বৃটিশ-সাম্রাজ্যভুক্ত অন্যান্য দেশ হইতে, আর বাকী ৩৪ ভাগ আসে সাম্রাজ্যের বাহিরের বিভিন্ন দেশ হইতে। আমাদিগের রপ্তানির শতকরা প্রায় ২২ ভাগ যায় ইংলণ্ড্ স্কট্‌লণ্ড্ ও আয়ারলণ্ডে; প্রায় ২২ ভাগ যায় সাম্রাজ্যের ভিতরে অন্যান্য দেশে এবং ৫৬ ভাগ যায় সাম্রাজ্যের বাহিরে।

আমরা ইংলণ্ড্ স্কট্‌লণ্ড্ ও আয়ারলণ্ড্ হইতে যাহা আমদানি করি তাহার অধিকাংশই শিল্পদ্রব্য এবং ঐ-সব দেশে যাহা রপ্তানি করি তাহার বেশীর ভাগই খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচা মাল। ভারতের সহিত উপনিবেশের বাণিজ্যেও অনেকটা ঐপ্রকারের। আমরা ইংরেজের নিকট হইতে যাহা আমদানি করি তাহা ইংরেজকে অপরাপর জাতির সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া বিক্রয় করিতে হয়। কিন্তু ভারতের বেশীর ভাগ রপ্তানির সহিত টক্কর দিবার দেশ নাই।

ইংরেজ ও অন্যান্য জাতির সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যের যে অবস্থা তাহাতে এই নূতন নীতি অনুসারে ভারতবাসী ইংরেজকে কি সুবিধা দিতে পারে এবং ইংরেজের নিকট হইতেই বা কি সুবিধা পাইবার আশা করিতে পারে তাহা হিসাব করিয়া দেখা যাক। এই নূতন নীতির সমর্থকগণ বলিয়া থাকেন যে, এই নীতি অবলম্বিত হইলে ভারতবাসীর একটা বড় সুবিধা এই হইবে যে, ইংরেজজাতি ভারতের বাণিজ্যকে সুবিধা প্রদান করিয়া ভারতীয় জিনিষ আদর করিয়া ক্রয় করিবেন। ইংরেজ-

জাতি যদি ভারতবাসীকে বাণিজ্যে সুবিধা প্রদান করিতে চান, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ভারতবর্ষ হইতে যে যে জিনিষ বেশী পরিমাণে আম্‌দানি হয় তাহার উপর আমদানী শুল্ক কমাইয়া অথবা উঠাইয়া দিতে হইবে। ইংরেজ ভারতবর্ষ হইতে বেশী পরিমাণে আম্‌দানি করেন তুলা চাম্‌ড়া পাট লাক্ষা চা চাউল রবার বীজ গম পশম এবং বিভিন্নপ্রকারের খনিজ-পদার্থ ইত্যাদি। ইহার মধ্যে পাট লাক্ষা ও চা ত কার্য্যতঃ ভারতবর্ষের একচেটিয়া ব্যবসা। এই কয়টি জিনিষের উৎপাদনে ভারতবর্ষের সমকক্ষ পৃথিবীতে আর কেউ নাই। লঙ্কাদ্বীপের চা পৃথিবীর অতি সামান্য অভাবই পূরণ করিতে পারে। সুতরাং ইংরেজ ভারতীয় পাট লাক্ষা ও চায়ের উপর আম্‌দানী শুল্ক কমাইয়া দিলেও ভারতের বিশেষ লাভ নাই, আর না কমাইলেও ভারতবর্ষের কোনো ক্ষতি নাই। কারণ পৃথিবীর বাজারে সকল জাতিই ভারতবর্ষের চা পাট ও লাক্ষা ইত্যাদি কিনিয়া থাকে।

ব্রিটিশ্ গভর্ণ্‌মেণ্ট্ ভারতবর্ষের তামাক চা ও কাফির উপরে আম্‌দানী শুল্ক কিছু কমাইয়াছেন। ইহাতে ভারতীয় তামাক ব্যবসায়ী ও কাফি-ব্যবসায়ী কিছু সুবিধা পাইতে পারে। কিন্তু ইংরেজের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যে কাফি ও তামাকের স্থান নগণ্য। ভারতীয় চায়ের উপর আম্‌দানী শুল্ক কমাইয়া যে ইংরেজ ভারতের চায়ের আদর করিতেছেন বলিতেছেন, সেই সুবিধা ও আদর না করিলেও ভারতবর্ষের কোনো ক্ষতি হইত না, কারণ পৃথিবীর বাজারে ভারতবর্ষই চায়ের প্রধান জোগানদার। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে থাকিল গম যব ও চাউল। ইংরেজ যদি তাঁহার দেশে ভারতের গম যব ও চাউলের ব্যবসার সুবিধা করিয়া দিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাকে অন্যান্য দেশ হইতে এই কয় জিনিসের আম্‌দানির উপর শুল্ক বসাইতে হইবে অথবা শুল্কের হার বাড়াইতে হইবে। ইহাতে বিলাতে খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়িবার সম্ভাবনা। স্বাধীন-দেশের লোক পরাধীন ভারতবাসীর দরদে খাইয়া বাঁচিবার জন্য যে বেশী পয়সা ব্যয় করিবে ইহা সম্ভবপর মনে হয় না। এইরূপে বিলাতের বাজারে ভারতবর্ষের কাঁচামালের সুবিধা করিয়া দিতে যাইয়া ইংরেজ যদি অন্যান্য দেশ হইতে কাঁচামালের আম্‌দানির উপর শুল্ক স্থাপন করেন অথবা শুল্কের হার বৃদ্ধি করেন তাহা হইলে মোটের উপর বিলাতে কাঁচামালের আম্‌দানী কমিয়া যাইয়া দাম বাড়িবার সম্ভাবনা। কিন্তু কাঁচামালের দাম বাড়িলে শিল্পজাত পণ্যদ্রব্য আর সস্তা থাকিবে না। ইহাতে ইংরেজের শিল্প-বাণিজ্যের সমূহ ক্ষতি। সুতরাং কাঁচামালের বেলাও ইংরেজ এই নূতন নীতি অবলম্বন করিতে চাহিবেন না। সাম্রাজ্যিক সুবিধা-নীতির প্রধান পাণ্ডা চেম্বারলেন্ সাহেবও বলিয়াছেন—"আমি জোরের সহিত বলিতেছি যে, আমি কাঁচামালের উপর শুল্ক বসাইতে নারাজ।"

উপনিবেশগুলির সহিতও আমাদিগের রপ্তানী-বাণিজ্যের অবস্থা এমন নহে যে আমরা এই নীতিতে কিছু লাভবান্ হইতে পারি।

আমরা একে একে দেখিলাম এই নূতন নীতি অবলম্বন করিয়া ইংরেজ ভারতবর্ষকে কার্য্যতঃ কোনো সুবিধা করিয়া দিতে পারেন না। এখন দেখা যাক ইংরেজ এই নব-বিধানের ফলে আমাদের দেশে কি সুবিধা ভোগ করিতে পারেন। আমরা বিলাত হইতে যে-যে জিনিস আম্‌দানি করি তাহার মধ্যে প্রধান তুলার-তৈরী জিনিস, যেমন কাপড় ইত্যাদি, রাসায়নিক-দ্রব্য, ঘর-বাড়ী তৈরী করিবার মাল-মশলা, চাম্‌ড়ার-তৈরী জিনিস, লৌহনির্ম্মিত দ্রব্য, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি, ইস্পাত-নির্ম্মিত দ্রব্য, সুরা, মোটর-গাড়ী, কল-কব্জা, রবারের-তৈরী জিনিস, সাবান ও গন্ধদ্রব্য, মনোহারী জিনিস, পশমের তৈরী দ্রব্যাদি, সিগারেট ইত্যাদি। এই তালিকার কোনো কোনো জিনিস আমাদের স্বদেশী শিল্পের প্রতিযোগী। ভারতবর্ষের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিযোগিতা ক্রমশঃ বাড়িবে ছাড়া কমিবে না। একটি ছোট চারা গাছ যতদিন শক্ত না হয় ততদিন যেমন ইহাকে বেড়া দিয়া ঘিরিয়া চারিদিকের উপদ্রব হইতে রক্ষা করিতে হয়, তেমনি কোনো দেশের নূতন শিল্পকে চারিদিগের প্রতিযোগিতার হাত হইতে মুক্ত করিয়া না দিলে উহা টিকিয়া থাকিতে পারে না। আমাদিগের

স্বদেশী দুর্ব্বল শিশু-শিল্পকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সবল সুপ্রতিষ্ঠিত বিদেশী-শিল্পের প্রতিযোগিতা বন্ধ করিতে হইবে। তাহা না করিয়া আমরা যদি এই নূতন নীতি-অনুসারে আদর করিয়া আমদানী শুল্ক কমাইয়া বিলাতী-মাল ভারতের বাজারে বরণ করিয়া লই তাহাতে ইংরেজের লাভ ষোল আনা। কারণ ভারতের এত বড় বাজার তাহার দখলে ভাল করিয়া আসিবে। আমেরিকা জাপান ও জার্ম্মানীর প্রতিযোগিতার হাত হইতে মুক্ত হইয়া তিনি কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিতে পারিবেন। আর আমাদের লাভ? আমরা পরিবার কাপড়খানা হইতে আরম্ভ করিয়া শিশুর খেলনা পর্য্যন্ত সকল প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য বিদেশী ব্যবসায়ীর দয়ার উপর নির্ভর করিয়া "নিজ বাসভূমে পরবাসী" হইয়া থাকিব।

আর কতকগুলি জিনিস আছে যাহা ভারতের বাজারে বিক্রয় করিতে হইলে ইংরেজকে জাপান জার্ম্মানী ও আমেরিকার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হয়। এই-সব মাল বিক্রয়ে দুই উপায়ে ইংরেজকে সুবিধা করিয়া দেওয়া যায়। প্রথমতঃ সাম্রাজ্যের বাহির হইতে এই-সব জিনিসের উপর আমদানী-শুল্কের বর্ত্তমান হার বজায় রাখিয়া বিলাতী-মালের উপর শুল্ক কমাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

কিন্তু ইহাতে ভারতের রাজস্বের আয় কমিবে। দ্বিতীয়তঃ বিলাতী-মালের উপর বর্ত্তমান শুল্ক বজায় রাখিয়া সাম্রাজ্যের বাহির হইতে আমদানির উপর শুল্ক বাড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ইহাতেও জিনিসের দাম চড়িবার সম্ভাবনা। সকলভাবেই ইংরেজের লাভ হইলেও ভারতের লোকসান। যদি ভারতবর্ষের রপ্তানির উপর শুল্কের হার বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলেও ভারতবর্ষের ক্ষতি। কারণ, আমাদিগের রপ্তানির ৫৬ ভাগ যায় সাম্রাজ্যের বাহিরে বিভিন্ন দেশে। বাড়তি রপ্তানী শুল্কের ফলে ঐ-সব দেশে ভারতবর্ষ-জাত জিনিসের দাম বাড়িয়া যাইবে। পৃথিবীর বাজারে বেশী-দরে ভারতের জিনিস কে কিনিবে? ইহার ফলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে আমরা আমাদের বেসাতির বড় খরিদ্দার হারাইব। সে ক্ষতি সাম্রাজ্যের ভিতরে বিক্রয় দ্বারা পূরণ হইবে না। বিশেষতঃ এই নূতন বাণিজ্য-নীতি অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষ যদি কোনও স্বাধীন দেশের স্বার্থের হানি করে তাহা হইলে সেই দেশ তখনই পরাধীন ভারতবর্ষের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিবে। ইহাতেও ভারত-বর্ষের ভয়।

ভারতবর্ষের আমদানি-রপ্তানির হিসাব খতিয়ান করিয়া যাহা দেখা গেল তাহাতে বাণিজ্যে সাম্রাজ্যিক সুবিধা-নীতি প্রবর্ত্তন করিলে ইংরেজের এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের লাভ হইতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষের লাভের চেয়ে লোকসানই বেশী। এই নব-বিধানের ফলে ভারত-বর্ষে হইবে রাজস্বের ক্ষতি, বৈষয়িক অবনতি, জিনিস-পত্রের চড়া দর, বাণিজ্য-যুদ্ধ এবং বহির্বাণিজ্যের ধ্বংস। এইরূপ অবস্থায় ভারতবাসী এই নীতিতে সায় দেয় কি করিয়া? বৃটিশ সাম্রাজ্য ইংরেজের। কাজেই সাম্রাজ্যকে সংহত করিয়া ইহার উন্নতির জন্য যে-কোনওরূপ স্বার্থ-ত্যাগ করা ইংরেজের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু যে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ভারতবাসী **পারিআ**-স্বরূপ, যে সাম্রাজ্যের দেশে দেশে ভারতবাসী মানবের স্বাভাবিক অধিকারটুকু ভোগ করিতে না পাইয়া অপমানিত হয়, সেই সাম্রাজ্যের দোহাই দিয়া ভারতবাসীকে অবশ্যম্ভাবী বিপদের মধ্যে টানিয়া আনিয়া এত বড় স্বার্থ-ত্যাগ করিতে বলাটা কি শোভন?

শ্রী নরেন্দ্রনাথ রায়

দেবতা-তত্ত্ব

পরব্রহ্ম বা সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বরের পরই দেবতা বা দেবগণ আমাদিগের আরাধ্য বস্তু। দেবতা কাহাকে কহে ?

দেবতা কাহাকে কহে, ইহা লইয়া একালের ও সেকালের আর্য্যগণ অনেকেই অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন ও বলিতেছেন, কিন্তু একমাত্র শতপথ-ব্রাহ্মণ ও মহর্ষি জৈমিনি ভিন্ন অন্য কাহারই কথা প্রকৃত নহে। বায়ু-পুরাণ বলিছেন যে—

ততো মুখে সমুৎপন্না দীব্যতস্তস্য দেবতাঃ।

যতোঽস্য দীব্যতো জাতাস্ তেন দেবাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

৮—৯ অ

সেই সৃষ্টিকর্ত্তা আত্মভূ ব্রহ্মা যখন ক্রীড়া করিতে-ছিলেন, তখন তাঁহার মুখ হইতে যাঁহারা উৎপন্ন হন, তাঁহাদিগের নামই দেবতা।

কিন্তু বেদে দেবগণের জন্ম প্রভৃতির যে বিবরণ রহিয়াছে, ভগবান মনু দেবগণের উৎপত্তি-বিষয়ে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে, বায়ু-পুরাণের এই উক্তি সম্পূর্ণই অলৌকিক। কাহারও মুখ, নাসিকা, বক্ষ, জানু, বা পদাঙ্গুষ্ঠাদি হইতে কাহারও কোনও জন্ম প্রভবাদি হয় নাই ও হইতে পারে না, ইহা বেদ ও যুক্তি বিরুদ্ধ কথা।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, দেবগণ, মনুষ্যগণ হইতে উচ্চশ্রেণীর জীব ও তাঁহাদিগের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র তেজ বা জ্যোতি আছে বলিয়া তাঁহাদিগের হইতে আমাদিগের এত স্বাতন্ত্র্য ও হীনতা। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত পক্ষে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা কখনই "দেবগণ কোনও শ্রেষ্ঠ প্রাণী" ইহা নির্দ্দেশ করিবেন না এবং তাঁহাদিগের মধ্যে নর-সুলভ গুণ-দোষাদির সত্তা ভিন্ন যে একটা বিশেষ কোন জ্যোতিঃ বা তেজঃ-পদার্থ ছিল, তাহাও নহে। আমরা দেখাইব তাঁহারা ও আমরা একই এবং তাঁহাদিগের ও আমাদিগের কার্য্যক্ষেত্রও একই ছিল। আমরা প্রমাদে পড়িয়া নর ও জাতি তাঁহাদের উপাসনা করিয়াছি ও এখনও না করিতেছি তাহা নহে, দেবতারা উপাস্য ও পারলৌকিক বস্তু, আমরা উপাসক ও ঐহিক জীব, একথা সত্য নহে। আমর মানুষ ব্রাহ্মণদিগকেও দেবতা বলিয়া থাকি।

দেবাধীনং জগৎ-সর্ব্বং মন্ত্রাধীনাস্তু দেবতাঃ।

তে মন্ত্রা ব্রাহ্মণৈর্ জ্ঞাতাস্ তস্মাৎ ব্রাহ্মণো দেবতা॥

কিন্তু এই উপরিধৃত বচনে, ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের দেবত্বের যে বিকাশ দিতেছেন, ইহা সম্পূর্ণ বেদ-বিরুদ্ধ অলীক উক্তি। সকল জগৎ দেবাধীন, ইহা মিথ্যা কথা। তাহা হইলে দৈত্য দানব ও অসুরেরা দেবতাদিগকে স্বর্গ-ভ্রষ্ট করিয়া কেন তাড়াইয়া দিতে পারিলেন? দেবতারা মন্ত্রাধীন, ইহাও ষোল আনা অন্ধ-বিশ্বাস ও কুসংস্কার। কেন না দেবতারা অসর্ব্বজ্ঞ মানুষ (নর) ছিলেন, কেহ গোপনে বা স্থানান্তরে মন্ত্র পাঠ করিলে তাঁহারা তাহা টেরও পাইতেন না। আর ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রজ্ঞ বলিয়াও তাঁহাদের দেবতা আখ্যা হয় নাই। ফলতঃ স্বর্গের দেবগণের নামান্তর ছিল 'ব্রাহ্মণ', কেন না তাঁহারা (ব্রহ্ম বেদং জানাতীতি ব্রাহ্মণঃ) ব্রহ্ম বা বেদ জানিতেন। তাঁহারা যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন, এজন্যও তাঁহাদিগকে সকলে 'ব্রাহ্মণ' শব্দে নির্দ্দেশ করিতেন। ব্রাহ্মণা ব্রতচারিণঃ।—নিঘণ্টু।

ভৌম স্বর্গের সেই দেবতাখ্য নর-ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের ভ্রাতৃব্য দৈত্য-দানব কর্ত্তৃক স্বর্গ-ভ্রষ্ট হইয়া ভারতে আগমন করাতেই লোকে তাঁহাদিগকে যেমন 'ভূসুর' ও 'ভূদেব' (ভূ-ভারত, ভূদেব—ভারতাগত দেব) বলিত, তদ্রূপ 'ব্রাহ্মণ ও দেবতা বলিয়াও সংসূচিত করিত। ফলতঃ স্বর্গের ইন্দ্রাদি দেবগণ ও ভারতের ব্রাহ্মণ দেবতারা (জাতি ব্রাহ্মণ নহে, এ-ব্রাহ্মণ সমগ্র আর্য্য-জাতি) একই বস্তু এবং ইহারা কেহই কাহার মুখ নাসিকাদি হইতে

প্রস্তুত নহেন। তবে দেব নামের ব্যুৎপত্তি ও প্রকৃতার্থ কি? কেহ কেহ বলেন—দিবি ভবো দেবঃ—যাঁহারা দিব্ বা স্বর্গ-প্রভব, তাহাদের নামই দেবতা। কিন্তু একথাও ষোল আনা সত্য নহে। প্রথমতঃ দিব্ শব্দে যে লোকে দ্যো ও দ্যুলোক উভয়ই বুঝিয়া থাকেন, তাহা প্রমাদ। দ্যো আদি-স্বর্গ মঙ্গলিয়া, আর দিব্ ব্রহ্মার উত্তর-কুরু প্রভৃতি স্থান।

পঞ্চপাদং পিতরম্

দ্বাদশাকৃতিং দিব আহুঃ।

ঋগ্বেদ, অথর্ব্ববেদ ও প্রশ্নোপনিষদের এই মন্ত্রে ঋষি 'পিতরং' পদে পিতা দ্যো (দ্যৌর্নঃ পিতা) ও দিব শব্দে ব্রহ্মার দ্যুলোক বুঝাইয়াছেন ও উহাদের স্বাতন্ত্র্যও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উহার অর্থ—পিতা বা পিতৃ ভূমি দ্যো পাঁচ পোয়া ও দিব্ দ্বাদশ পোয়া। পাঁচ্ ও বারোতে যে অনুপাত, আদি-স্বর্গের ভূমি-পরিমাণ ও ব্রহ্মার দ্যুলোকের ভূমি-পরিমাণেও সেই অনুপাত।

সুতরাং যাঁহারা দিব্-প্রভব, তাঁহারা দেবতা হইলেও যাঁহারা দ্যো-প্রভব, তাঁহারাও দেবতা না ছিলেন তাহা নহে। অপিচ মাতা মনুর সন্তানেরা দিব্ ও দ্যো-প্রভব এবং এক কশ্যপের সন্তান হইলেও তাঁহারা বৈনতেয়াদির ন্যায় কেহই দেব-পদ-ভাক্ ছিলেন না। অতএব "দিবি ভবো দেবঃ" এ পরিভাষা ব্যাহত হইতেছে। তবে শতপথ-ব্রাহ্মণ যে বলিয়া গিয়াছেন যে—"বিদ্বাংসো বৈ দেবাঃ",—ইহাই প্রকৃত সংবাদ। স্বর্গবাসীদিগের মধ্যে যাঁহারা কৃতবিদ্য বা বিদ্বান্ ছিলেন, বিদ্যা ও বিনয়াদি দ্বারা দীপ্তি পাইতেন, (দিব দীপ্তৌ) তাঁহারাই দেবতা নামে প্রখ্যাতি লাভ করেন। মহর্ষি জৈমিনিও দেব বা দেবতা শব্দের গুণবান্ অর্থই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

অর্থেন ত্বপকৃষ্যেত দেবতানাম্

অচোদনার্থস্য গুণভূতত্বাৎ। ১৪

গুণশ্চ অনর্থকঃ স্যাৎ। ১৮।১ পা—২ অ

তত্র শবর-স্বামী মহত্বং নাম ইন্দ্রস্য গুণো ভবতি ইতি দেবতাভিধানম্। ইন্দ্র গুণে মহান্ ছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার অভিধান দেবতা। তাহা হইলেই জানা গেল যে, কেবল দিবপ্রভবত্ব দেবত্বের নিদান নহে।

যাহা হউক দেবতা কাহাকে কহে, তাহা বলা গেল, এইক্ষণ দেবগণের প্রকারভেদ বলা যাইবে।

দেবতা কত প্রকার?

দেবতা জড়, নর ও কল্পিত ভেদে তিনপ্রকার। অগ্নি (আগুন), জল, সূর্য্য (তপন), উদূখল, মুষল, উষা, ইহারা জড়-দেবতা। আর ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতি নর-দেবতা এবং শীতলা, ষষ্ঠী, জয়দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, জ্বরভৈরব, মহাকাল (মাথাল), সত্যপীর, কালী, ছিন্নমস্তা ও তারা প্রভৃতি অষ্টাদশ মহাবিদ্যা কল্পিত-দেবতা, ইহাদের কোন অস্তিত্বই ছিল না, নাইও।

সর্ব্বাদৌ আদি-স্বর্গের ব্রহ্মাদি নরগণ বিদ্যাবত্তা-নিবন্ধন দেব বা দেবতা উপাধিতে সমলঙ্কৃত হন। তাই শুক্লযজুঃ বলিয়া গিয়াছেন যে—অগ্নির্দেবতা, বাতো দেবতা, সূর্য্যো দেবতা, চন্দ্রমা দেবতা, বসবো দেবতা, রুদ্রা দেবতা, আদিত্যা দেবতা, মরুতো দেবতা, বিশ্বে-দেবা দেবতা, বৃহস্পতির্দেবতা, ইন্দ্রো দেবতা, বরুণো দেবতা। ২০ ক—১৪অ অর্থাৎ মহর্ষি অগ্নি, মহর্ষি বায়ু, রাজা চন্দ্র, ধব প্রভৃতি অষ্টবসু, শিব প্রভৃতি একাদশ রুদ্র, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বরুণ ও সূর্য্য, দ্বাদশ অদিতি-নন্দন, ঊনপঞ্চাশৎ মরুৎ (ইন্দ্র-সৈনিক), বসু প্রভৃতি দশ জন বিশ্বানন্দন বিশ্বেদেব ও দেবগুরু বৃহস্পতি দেবতা-পদবাচ্য।

কিন্তু ইহা প্রকৃত দেব-পরিচয় নহে। ইঁহারা সংখ্যায় তেত্রিশ কোটি ছিলেন। আমরা স্থানান্তরে ঋতু প্রভৃতি এই নরদেবগণের সবিস্তার বিবরণ বিবৃত করিব। প্রথমে এই নরদেবগণের কোনও উপাস্য বস্তু ছিল না। তৎপর এক সময়ে এই সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহর্ষি অথর্ব্বা, অরণি-সংঘর্ষণ দ্বারা সর্ব্বাদৌ আদি-স্বর্গে জড় অগ্নির উৎপাদন করিলে, সকলে উহার দীপ্তি সন্দর্শন ও শীত-নিবারণাদি গুণ প্রত্যক্ষ করিয়া ভক্তিভরে অগ্নি বৈ দেবতা—ইহা বলিয়া কৃতজ্ঞতা-প্রযুক্ত উহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। তদবধি জড় অগ্নি, জড় জল ও জড় সূর্য্য প্রভৃতি জড় পদার্থ, ইন্দ্রাদি দেবগণের উপাস্য দেবতায় পরিণত হইলে, জগতে জড় দেবতার আবির্ভাব হয়। ঋগ্বেদে উক্ত হইয়াছে।—

সূক্তবাকং প্রথমম্ আদিৎ অগ্নিম্ আদিৎ হবিরজনয়ন্ত দেবাঃ।

স এষাং যজ্ঞো অভবৎ তনূপাঃ তং দ্যৌর্বেদ তং পৃথিবী তমাপঃ॥

৮—৮৮সূ—১০ম

উহার সায়ণ-ভাষ্য—প্রথমং পূর্ব্বং সূক্তবাকমিদং দ্যাবা-পৃথিবীত্যাদি বাক্যং মনসা নিরূপয়ন্তি আদিৎ অনন্তরম্ এব অগ্নিং মথনেন উৎপাদয়ন্তি আদিৎ অনন্তরম্ এব দেবা হবিরজনয়ন্ত জনয়ন্তি স বৈশ্বানরঃ অগ্নিঃ এষাং দেবানাং যজ্ঞোযষ্টব্যঃ অভবৎ ভবতি। স তনূপাঃ শরীরাণাং রক্ষিতা চ ভবতি। তম্ অগ্নিং দ্যৌ দ্যুলোকো বেদ জানাতি, তম্ অগ্নিং পৃথিবী ভূমিরপি জানাতি তম্ অগ্নিং আপঃ অন্তরিক্ষঞ্চ জানাতি।

দত্তজার অনুবাদ—দেবতারা প্রথমে সূক্ত সৃষ্টি করিলেন, পরে অগ্নি আর হোমের দ্রব্য সৃষ্টি করিলেন। সেই অগ্নি ইঁহাদিগের শরীররক্ষাকারী যজ্ঞ-স্বরূপ হইলেন। আকাশ, পৃথিবী ও জলের সহিত সেই অগ্নির পরিচয় আছে।

এই ভাষ্য ও অনুবাদ উভয়ই বিকৃত, এজন্য আমরা পৃথক্ ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হইলাম।

প্রকৃতার্থবাহিনী—দেবা বিশ্বসাধ্যাদি-দেবগণাঃ প্রথমং পূর্ব্বম্ আদিৎ আদিতঃ সুর্ব্বাদৌ আদি স্বর্গে সূক্তবাকং সূক্তবাক্যং বেদমন্ত্রমিতি যাবৎ তথা অথর্ব্বা অরণি-সংঘর্ষণেন সর্ব্বাদৌ আদি স্বর্গে (ত্বামথর্ব্বা পুষ্করাদধি নিরমন্থত, দিবস্পরি প্রথমং জজ্ঞে অগ্নিরিতি চ মন্ত্রবর্ণাৎ) অগ্নিং তথা দেবাঃ সর্ব্বাদৌ আদি-স্বর্গে হবিঃ ঘৃতঞ্চ অজনয়ন্ত উৎপাদিতবন্তঃ। ততঃ তনূপাঃ হিমাৎ দেহ-রক্ষাকারী সঃ অগ্নিঃ এষাম্ অথর্ব্বাদি-দেবানাং যজ্ঞঃ যজনীয়ঃ অর্চ্চনীয়ঃ অভবৎ স এব জড়াগ্নি সর্ব্বাদৌ জগতি উপাস্য দেবতা ইতি ধ্যেয়ং হিমক্লেশ-নিবারণাৎ কৃতজ্ঞা দেবা অগ্নে রুপাসকা অভবন্। তং জড়াগ্নিং দ্যৌর্বেদ জানাতি লক্ষণয়া দ্যোলোকবাসিনো দেবা আদি-স্বর্গ-বাসিন ইন্দ্রাদয়ঃ জানন্তি। পৃথিবী ভারতবর্ষঞ্চ আপঃ অন্তরিক্ষঞ্চ তং বেদ জানাতি। ভারতবাসিনঃ সর্ব্বে অপোগ-স্থানাদি-বাসিনশ্চ সর্ব্বে নরাঃ তমগ্নিং-জানন্তি ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—বিশ্বদেব ও সাধ্য-প্রভৃতি দেবতারা সর্ব্বাদৌ প্রথমে আদি-স্বর্গে বেদমন্ত্রের সৃষ্টি করেন। দেবতারা সকলের প্রথমে সর্ব্বাদৌ দধি হইতে গব্য-ঘৃতের উৎপাদন করেন। তৎপর সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহর্ষি অথর্ব্বা সকলের আদিতে অতি প্রথমে অরণি-সংঘর্ষণ দ্বারা অগ্নির উৎপাদন করেন, সেই অগ্নি দেবগণকে শীত হইতে রক্ষা করিলে, অথর্ব্ব প্রভৃতি দেবতারা সেই জড়াগ্নির উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। ইহার পূর্ব্বে জগতে উপাস্য-উপাসক বলিয়া কথা ছিল না। আদি স্বর্গবাসী দেবতারা, ভারতবাসী লোক ও অন্তরিক্ষবাসী সকলে এই অগ্নির উৎপত্তি ও উপাসনার বিষয় অবগত ছিলেন।

দৃশেন্যো যো মহিনা সমিদ্ধঃ,
অরোচত দিবিযোনির্ বিভাবা।
তস্মিন্ অগ্নৌ সূক্ত-বাকেন দেবাঃ,
হবির্ব্বিশ্বে আজুহবুস্তনূপাঃ॥ ৭-ঐ

উহার সায়ণভাষ্য—যো বৈশ্বানরঃ অগ্নিঃ মহিনা মহত্বেন দৃশেন্যঃ সর্ব্বদর্শনীয়ঃ সমিদ্ধঃ সম্যক্ দীপ্তো দিবি যোনিঃ দ্যুস্থানো বিভাবা দীপ্তিমাংশ্চ সন্ অরোচত দীপ্যতে তস্মিন্ বৈশ্বানরে অগ্নৌ তনূপাঃ শরীরাণাং রক্ষকা বিশ্বে সর্ব্বে দেবাঃ সূক্ত-বাকেন ইদং দ্যাবাপৃথিবীত্যাদিনা বাক্যেন স্তোত্রানাং বচনেন বা হবিরাজুহবুঃ আভিমুখ্যেন জুহবুঃ॥

দত্তজার অনুবাদ—যে অগ্নি-বিশেষ প্রজ্বলিত হইয়া সুশ্রী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আকাশে স্থান গ্রহণ করিয়া ঔজ্জ্বল্যের সহিত শোভা পাইতে লাগিলেন, সেই অগ্নিতে শরীররক্ষাকারী সকল দেবতা সূক্ত পাঠ করিতে করিতে হোমের দ্রব্য সমর্পণ করিলেন।

'তনূপা' বিশেষণটি অগ্নির, এজন্য আমরা এই মন্ত্রেরও স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা করিলাম।

প্রকৃতার্থবাহিনী—মহিনা মহত্বেন দৃশেন্যঃ (কপোল-চলমেতৎ) দর্শনীয়ঃ সুদর্শন ইতি যাবৎ দিবি আদি-স্বর্গে যোনিঃ উৎপত্তিঃ বিভাবা প্রভাবো যস্য এবম্ভূতস্ তনূপাঃ দেহরক্ষাকারী অগ্নিঃ সমিদ্ধঃ প্রজ্বালিতঃ সন্ অরোচত অদীপ্যত বিশ্বেদেবাঃ সর্ব্বে দেবগণাঃ তস্মিন্ তনূপি অগ্নৌ

সূক্ত বাকেন সূক্ত-বাক্যেন বেদমন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বকং হবিঃ ঘৃতাদিকং আজুহবুঃ আহুতিং প্রদত্তবন্তঃ।

যে অগ্নির, উৎপত্তিস্থান আদি-স্বর্গ, যাহার প্রভাব অসীম, যে অগ্নি সুদর্শন, যাহা প্রজ্বলিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছিল, দেবতারা বেদমন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক উহাতে ঘৃতাহুতি প্রদান করিয়াছিলেন।

যাহা হউক ক্রমে জল ও জড়-সূর্য্য প্রভৃতি উপকার ও অপকার দ্বারা দেবগণের আরাধ্য বস্তুতে পরিণত হইলে, জগতে জড়োপাসনার প্রচলন হয়। এই অগ্নি, জল ও সূর্য্যাদিই জড় দেবতা এবং ইহাদের উপাসনার জন্য "অগ্নিমীলে পুরোহিতং," "আপো হিষ্ঠা ময়োভুবঃ," "আপঃ সর্ব্বা দেবতাঃ," "তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যম্ ভর্গো দেবস্য ধীমহি" ইত্যাদি মন্ত্র প্রণীত হয়।

ইহার বহুকাল পরে মানুষ অত্যুন্নতির মহাপতনের পর তান্ত্রিক তামস-যুগে পুনরায় মোহান্ধকার-সমাচ্ছন্ন ও কুসংস্কার-সমাবিষ্ট হইলে তদানীন্তন লোকেরা বসন্ত প্রভৃতি রোগ দ্বারা সমাক্রান্ত হইয়া উহার নিদান শীতলা প্রভৃতি মিথ্যা দেবতার কল্পনা করিয়া লন। ইহা ছাড়া হিন্দুগণ প্রত্যেক বস্তুরই এক একটি একাধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পনা-বলে সৃজন করিয়া লইয়াছিলেন, উহাদিগেরও কোনও অস্তিত্ব কোনও দিন ছিল না। যেমন গৃহের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা, বাস্তু-দেবতা। প্রতি পৌষ সংক্রান্তিতে কাফুলা বা ঙ্কিকা গাছের গোড়ায় ইহার পূজা হইয়া থাকে। ইহার নিকটও মেষ ও ছাগ বলি দিতে হয়। তবে জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বরুণ, বৃষ্টির অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা পর্জ্জন্য বা ইন্দ্র, বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সরস্বতী (ব্রহ্মার কন্যা) ও ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা লক্ষ্মী ইহাঁরা কল্পনা বলে অধিষ্ঠাত্রী-দেবত্ব পাইলেও কল্পিত বস্তু নহেন, পরন্তু নর-দেবতা ও নারী-দেবতা।

আর একপ্রকার কল্পিত দেবতার নাম "অভিমানিনী" দেবতা, ইহাদেরও কোন মূল বা ভিত্তি নাই, ইহা নির্জ্জলা, কুসংস্কার ও কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠাপিত। যে যে স্থলে শঙ্করাদি ভাষ্যকারেরা মন্ত্রের প্রকৃতার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, তথায়ই তাঁহারা এই অগতির গতি মিথ্যা ও অলীক অভিমানিনী দেবতার শরণ লইয়াছেন। দুঃখের বিষয় ইহাই যে একালের অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তিও (যেমন নববিধান সমাজের পরম শ্রদ্ধেয় ৺ গৌরগোবিন্দ দেবগুপ্ত উপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি) এই কল্পনা-স্রোতে ভাসিতেন। আমরা দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্য এখানে একটি সভাষ্য গীতা-বচনের সমাহার করিব।

অগ্নির্জ্যোতি রহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ।

২৪—৮ অ

উহার শ্রীধরস্বামী-টীকা—অগ্নি জ্যোতিঃ শব্দাভ্যাম্ তে অর্চিষম্ অভিসম্ভবন্তি ইতি শ্রুত্যুক্তা অর্চ্চিরভিমানিনী দেবতা উপলক্ষ্যতে। অহরিতি দিবসাভিমানিনী, শুক্ল ইতি শুক্ল-পক্ষাভিমানিনী উত্তরায়ণরূপাঃ ষণ্মাসা ইতি উত্তরায়ণাভিমানিনী এতচ্চ অন্যাসামপি শ্রুত্যুক্তানাং সংবৎসর দেবলোকাদিদেবতানাম্ উপলক্ষণার্থম্। ২৪

শঙ্কর-ভাষ্য—অগ্নিঃ কালাভিমানিনী দেবতা, তথা জ্যোতিরপি দেবতৈব কালাভিমানিনী। অথবা অগ্নি-জ্যোতিষী যথাশ্রুতে এব দেবতে। ইত্যাদি। ২৪

এখানে শ্রীধর ও শঙ্কর যে এই-সকল অভিমানিনী দেবতার নাম লইয়াছেন, ইহা অতীব অলীক নির্দ্দেশ। সায়ণও বহুস্থলে এইরূপ প্রমাদের উদ্গিরণ করিয়াছেন। ফলতঃ গীতার এই ২৪, ২৫ ও ২৬ শ্লোক ও ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৯০ সূক্তের ২য় মন্ত্রের অহঃ, রাত্রি ও সংবৎসর শব্দ এবং ৮৮ সূক্তের ১৫শ মন্ত্রের শ্রুতি শব্দ যথাক্রমে তন্নামক জনপদ ও ভৌম দেব-যান পিতৃ-যান পথের বাচক মাত্র। ফলতঃ এক সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ ভিন্ন আর কেহ কোনও স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নহেন ও অভিমানিনী দেবতা কথাটিরও কোনও পদার্থগ্রহ হয় না, উহা কল্পনা-মহাসাগরের ফেন-বুদ্বুদ্ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

৺ উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন

ভারতে মদের আমদানি ও সরকারের আবগারী আয়

বর্ত্তমানে আমাদের জাতীয় জীবনে যত-রকম বিপদ্ সমুপস্থিত হইয়াছে, তন্মধ্যে আমরা যে ক্রমাগত চরিত্রহীন হইয়া পড়িতেছি ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক ও চিন্তনীয়। একটা জাতি কি-পরিমাণে মদ গাঞ্জা প্রভৃতি মাদক-দ্রব্য ব্যবহার করে, তাহা বিচার করিয়া ঐ জাতির চরিত্র কিরূপ তাহা অনেকাংশে নির্দ্ধারণ করা যায়। যদি দেখা যায় যে মাদক-দ্রব্য ব্যবহার লোকে ত্যাগ করিতেছে, তাহা হইলে বুঝিতে পারা যায় দেশবাসী সৎকর্ম্মে ও নীতিতে ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে। আবার যদি দেখা যায় যে কোনও দেশে ক্রমে অধিকতর-পরিমাণে লোক নেশা করিতে অভ্যস্ত হইতেছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সেই দেশ ক্রমে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে।

ভারত কি পরিমাণে মদ (স্পিরিট সহ) বিদেশ হইতে আমদানি করে এবং ভারত সরকারের আবগারী আয় বৎসর বৎসর কি-পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহা দেখাইবার জন্ম নিম্নে হিসাব দেওয়া গেল।

(১) ভারতে মদের আমদানি

সন	টাকা
১৯১১ ১২	১৯৩৯৬০০০
১৯১২ ১৩	২১৩৩২০০০৲
১৯১৩ ১৪	২২৩৭১০০০
১৯১৪ ১৫-	১৭৭৪২০০০৲
১৯১৫ ১৬-	১৮৭৩৭০০০
১৯১৬ ১৭--	-২৩৩০১০০০
১৯১৭ ১৮—	২৪৯৯৬০০০
১৯১৮ ১৯	৩৩০২১০০০
১৯১৯ ২০-	৩৩৭৪১০০০
১৯২০ ২১	৪৯০০২০০০
১৯২১ ২২ -	২৭৮৩১৫৪৭
১৯২২ ২৩--	৩৪২৭৩৮৫৪
১৯২৩ ২৪-	৩২১৪৫০৮০৲

(২) মাদক দ্রব্য বিভাগে ভারত সরকারের আয়

সন	টাকা
১৯০৯ ১০	-৮৯৩৭৪৫৭০৲
১৯১০ ১১	৯১৮২৯৮৫২৲
১৯১১ ১২	৯৯১৯৬৫১৩
১৯১২-১৩--	-১০৭৬৪৫৭৯৫৲
১৯১৩ ১৪---	১১৬৫৪০৭৬০৲
১৯১৪ ১৫—	১২৬০২৩৫৩০৲
১৯১৫ ১৬--	-১২৫৩১৩৮৪১৲
১৯১৬-১৭—	১২১৬২৫১৪৪৲
১৯১৭-১৮—	১৩০২৭০৮৫৯৲
১৯১৮-১৯—	১৪৪৩৬২৬৭৮৲
১৯১৯ ২০—	১৬৩৭৩২৯২৭৲
১৯২০-২১—	১৮১৩৯৫৫৩৩৲
১৯২১ ২২—	২০৪৩৬৫৩৫৯৲

প্রথম হিসাবটি হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, আমাদের এই নিরন্ন দেশ হইতে বৎসর বৎসর কোটি কোটি টাকা এই পাপের জন্ম বিদেশের ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছে। বিদেশী শিল্প-জাত-দ্রব্য আমাদের দেশী শিল্প ও অর্থ দুই নষ্ট করিয়া আমাদিগকে পরমুখাপেক্ষী করিতেছে বটে কিন্তু এই পাপ একদিকে দেশের অর্থ ও অন্যদিকে মনুষ্য-জীবনের পরমার্থ মনুষ্যত্ব—নষ্ট করিতেছে। প্রজাসাধারণের নৈতিক ও আর্থিক উন্নতি সাধন করাই সরকারের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। মদ ও গাঁজা-সেবন এই উভয়বিধ উন্নতিরই পরিপন্থী। সুতরাং উহার অবাধ বন্ধ বিক্রয় করিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য। কিন্তু সদাশয় (?) সরকার বাহাদুর এ পাপ নিবারণে কতদূর সত্ববান্, তাহার দৃষ্টান্ত দেশ বহুবার পাইয়াছে। যাহা হউক, ১৯২০-২১ সালে ৪৯০০২০০০৲ টাকার মদ ভারতে আমদানি হইয়াছিল। ১৯২৩-২৪ সালে (হাল নাগাদ) ঐ স্থানে আমদানি মদের মূল্য ৩২১৪৫০৮০৲ টাকা। মহাত্মার আন্দোলনের চেষ্টা এই হ্রাসের একমাত্র কারণ না হইলেও, একটি কারণ, নিশ্চয়ই বটে।

আবগারী বিভাগে ভারত-সরকারের বৎসর বৎসর প্রচুর আয় হইয়া থাকে। এই আয়ের পরিমাণ ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইয়াই চলিয়াছে। দ্বিতীয় হিসাবটি হইতেই ইহার সত্যতা স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। সমস্ত মদ, গাঁজা চরস প্রভৃতি নেশার দোকান সরকার ইচ্ছা করিলে তুলিয়া দিতে পারেন অথবা দোকানের সংখ্যা ক্রমে কমাইয়া ৬।৭ বৎসরে একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। সরকার কিন্তু প্রজা সাধারণের সুবিধার জন্য এমন ব্যবস্থা করিয়া দিতেছেন যাহাতে সকলে নিরাপদে অনায়াসে মাদক দ্রব্য সেবন করিতে পারে। মার্কিন-গবর্ণমেণ্ট যুক্ত-রাজ্য মধ্যে মদের দোকান বা মদের ব্যবসা তুলিয়া দিয়াছেন। নিজের দেশের পক্ষে অহিতকর বুঝিতে পারিয়া চীন বহুকালের পুরাতন আফিমখোর-জাতির আফিম এক মুহূর্ত্তে বন্ধ করিয়া দিলেন। চীন-সরকারের অত বড় একটা আবগারী আয় বন্ধ হইয়া গেল—আর আমাদের দেশে উত্তরোত্তর এই পাপের আয় বৃদ্ধিই হইতেছে।

জন সাধারণকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারিলে এবং তাহারা স্বাস্থ্যের নিয়ম প্রতিপালনে বদ্ধ-পরিকর হইলেই, এই সর্ব্বনাশের নেশা অনেকাংশে হ্রাস হইবে, সন্দেহ নাই। সুতরাং যাঁহারা গঠন-কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন, এরূপ দেশের কল্যাণ-কামী ও সেবক-বৃন্দ দেশে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-কথা-প্রচারে ব্রতী হইলেই দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে।

শ্রী শরৎচন্দ্র ব্রহ্ম

মোটর বাড়ী—

আমেরিকার আইওয়াতে একজন ভদ্রলোক একখানা মোটরকারের উপর একখানি ছোট-খাট বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই মোটর গাড়ীতে তিনি, তাঁহার স্ত্রী, এবং দুই সন্তান লইয়া আরামে দেশ ভ্রমণ করেন। ঘরের মধ্যে বিজুলী-বাতির বন্দোবস্ত আছে, ঝড়-বৃষ্টিও কোন কষ্ট দিতে

মোটরকারের উপর বাড়ী

পারে না। ঘরে প্রবেশ করিবার জন্য গাড়ীর পাশে এবং পিছনে দুইটি দুয়ার আছে। এতরকম সরঞ্জাম থাকা সত্ত্বেও গাড়ীর ওজন সাধারণ গাড়ী অপেক্ষা বিশেষ বেশী নহে।

অভিনব গ্যাস্ ষ্টোভ্—

একপ্রকার নূতনধরণের গ্যাস ষ্টোভ্ বাহির হইয়াছে। ইহা

অভিনব গ্যাস্ ষ্টোভ

পকেটে করিয়া যেখানে ইচ্ছা বহন করিয়া লওয়া যায়। একটি গ্যাস্ ট্যাঙ্ক‌ও আছে, এই গ্যাসে চারজন লোকের পঁচিশ বারের রান্না চলিতে পারে। রাত্রিকালে এই গ্যাসের সাহায্যে বাতির কাজ চালানো যাইতে পারে। পূর্ণ-অবস্থায় এই গ্যাসের ট্যাঙ্কটির ওজন বড় জোর সের দুই হইতে পারে।

'এক্স্-রে'র কথা—

মানুষের এবং অন্যান্য জীব জন্তুর শরীরে কোথায় কি আছে বা কি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তাহা খালি চোখে দেখিবার কোন উপায় নাই, কিন্তু

মানুষের গলায় ধাতব খৃষ্ট মূর্ত্তি—'এক্স্-রে'র সাহায্যে দেখা যায়

'এক্স্-রে'র সাহায্যে শরীরের অভ্যন্তরের সবই দেখা যায়। একজন লোকের গলায় একটি ধাতুনির্ম্মিত ছোট মূর্ত্তি আট্‌কাইয়া গিয়াছিল। দশদিন পরে হাঁসপাতালে তাহার গলার 'এক্স্-রে' ছবি লওয়া হয়। ছবি দেখিলে বোঝা যায় মূর্ত্তি কেমনভাবে গলায় আট্‌কাইয়া আছে। এই ফোটোর সাহায্যে বিনা যন্ত্রে গলা হইতে এই মূর্ত্তি বাহির করা হয়।
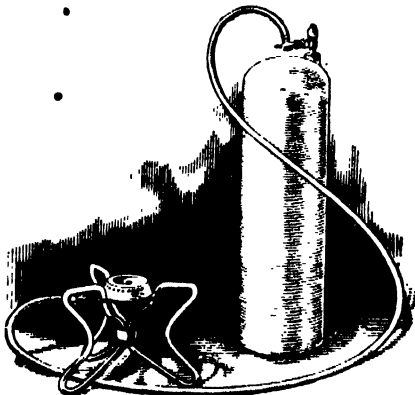
কাঠ-খোদাইয়ের বাহাদুরী

একজন কাঠ-খোদাইকারী কয়েক মাস পরিশ্রম করিয়া একটি কাঠের বল খোদাই করিয়াছেন। এই খোদাইএর মধ্যে দ্বিতীয় আর একটি বল আছে এবং দ্বিতীয় বলের মধ্যে আর একটি তৃতীয় বল আছে. আশ্চর্য্যের বিষয় একটি মাত্র কাঠের টুক্‌রা হইতে এইসব বলগুলি খোদাই করা হইয়াছে। আর একটি কাঠের টুক্‌রা হইতে এই মিস্ত্রি একটি বলের
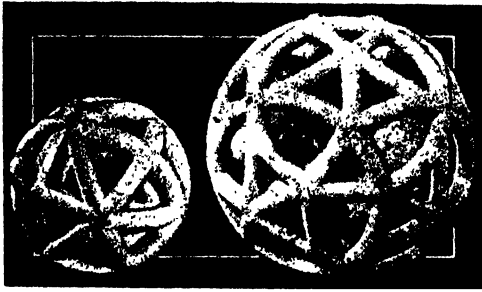
কাঠের খোদাই জালের মধ্যে কাঠের বল। সমস্তই এক টুক্‌রা কাঠ হইতে খোদাই করিয়া বাহির করা হইয়াছে

মধ্যে ছয়টি বল খোদাই করিয়াছেন। উপরের বলটিকে জাল বলিয়া মনে হয়, এবং ভিতরের বলগুলির উপর তাহা বোনা হইয়াছে বলিয়া ভ্রম হয়।

—

তিমি-শিকার—

ডেনমার্কের সমুদ্র উপকূলে একটি তিমি মাছ হঠাৎ কম জলে আসিয়া পড়ে এবং তাহার গায়ে একটা মাছ-ধরা নৌকা ঠোক্কর খায়। তার পর সেই তিমি মাছটিকে চারিদিকে ঘেরাও করিয়া বন্দুকের গুলিতে আহত করা

এবং সে তিমি দেখিলে লোহার তৈরী একটা প্রকাণ্ড কল বলিয়া মনে হয়

হয়। বন্দুকের গুলি খাইয়াও এই তিমি মাছটি তাহার মানব-শত্রুদের সঙ্গে প্রায় সাত ঘণ্টা লড়াই করিয়া প্রাণ-ত্যাগ করে। তার পর তাহাকে টানিয়া ডাঙ্গায় তোলা হয়। তিমিটি ৫৭ ফুট লম্বা।

রাস্তা-হাঁস্‌পাতাল—

বার্লিনে সব চেয়ে বেশী লোক, গাড়ী-ঘোড়া যাওয়া-আসা করে এমন এক রাস্তার মোড়ে একটি ছোট কাঠের ঘর আছে। এই ঘরের মধ্যে ষ্ট্রেচার, ফোল্ডিং বেড্, নানারকম ঔষধ-পত্র তুলা, ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি সবই আছে। রাস্তায় হঠাৎ কাহারো কোন আঘাত লাগিলে হাঁস্‌পাতালে যাইবার পূর্ব্বে এই স্থানে প্রথম-সাহায্য লাভ করিতে পারে। কাঠের ঘরটির দেওয়ালের বাহিরের দিকে এই রাস্তা-হাঁস্‌পাতালটির প্রয়োজন এবং আরো অনেক কিছু লেখা আছে। আমাদের দেশে বিশেষতঃ কলিকাতার মত সহরে এইপ্রকারের কোনরকম বন্দোবস্ত থাকিলে খুব ভাল হয়।

বার্লিন সহরের রাস্তা হাঁসপাতালে- প্রাথমিক সাহায্যদানের সবই এই ক্ষুদ্র হাঁসপাতালের মধ্যে আছে

আমাদের এখানে অনেক সময় লোক না মরা পর্য্যন্ত তাহার কোন সাহায্য আসিয়া পৌঁছায় না। কলিকাতা কর্পোরেশন এ বিষয়ে কিছু করিতে পা

জন্তুর চিকিৎসা—

পশুশালায় যেসমস্ত জন্তুদিগকে বন্দী করিয়া রাখা হয়, তাহাদের প্রায়ই নানা-প্রকার অসুখ-বিসুখ হয়। পশুদের চিকিৎসা করা অতি শক্ত ব্যাপার, কারণ পশুরা ঔষধ পত্র ব্যবহার করিতে মানুষদের মতো অভ্যস্ত নয়—অন্তত এখন পর্য্যন্ত হয় নাই। সিংহ এবং বিড়াল-জাতীয় অন্যান্য পশুদের থাবাতে একপ্রকার অসুখ হয়—ভিতরের দিকে থাবার মাংস বাড়িয়া যায়, কোনরকম ব্যায়ামাদি না করিলেই এইপ্রকার হয়। এই
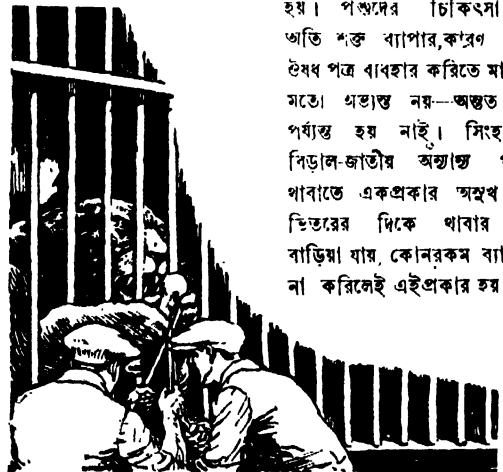
সিংহের থাবা খাঁচার বাহিরে টানিয়া অস্ত্রোপচার করা হইতেছে

অতিরিক্ত মাংস না কাটিয়া ফেলিলে পশুরাজ বড়ই কষ্ট পান। সিংহকে ধরিয়া খাবার মাংস কাটা বড় সহজ নহে। অনেক সময় খাঁচার মধ্যে কম্বলে করিয়া ক্লোরোফর্ম্ ফেলা হয় এবং সিংহ অজ্ঞান হইলে পর তাহার খাবার মাংস কাটা হয়। আর একবার এক সিংহিনীর খাবার মাংস কাটিবার পূর্ব্বে তাহাকে ৪৮ ঘণ্টা অনাহারে রাখা হয়, তার পর খাঁচার বাহিরে একটুকরা রক্ত মাখা হাড় ধরা হইলে, সিংহিনী তাহার থাবা খাঁচার বাহির করিয়া হাড় ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। চিকিৎসক এই অবসরে একটা প্রকাণ্ড কাঁচি দ্বারা তাহার খাবার অতিরিক্ত মাংস কাটিয়া ফেলিল।

বাঁদরের হাত ব্যাণ্ডেজ করিয়া গলায় কাঠের চাক্তি পরানো হইতেছে—ইহাতে সে দাঁত দিয়া ব্যাণ্ডেজ কাটিতে পারিবে না

গৃহপালিত শান্ত পশুদের রোগ ধরা বিশেষ শক্ত নয়, কারণ তাহাদের শরীর পরীক্ষা, টেম্পারেচার ইত্যাদি লওয়া সহজেই হয়, কিন্তু অশান্ত বন্যপশুকে এইসব করা একেবারেই অসম্ভব। সামান্য-সামান্য অসুখে পশুকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থায় খোলা হাওয়ায় রাখিলেই সে সুস্থ হয়। ঔষধ খাওয়াইতে হইলে ঔষধকে কোনপ্রকার প্রিয় খাদ্যের মধ্যে ভরিয়া দিতে হয়, তাহা না হইলে পশুকে ঔষধ খাওয়ান অসম্ভব।

পশুর পা ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া গেলে তাহার চিকিৎসা করা অতি দুরূহ ব্যাপার। কারণ ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলে সে তাহা দাঁত দিয়া কাটিয়া ফেলিবেই। একবার একটা বাঁদরের হাত ভাঙ্গিয়া যায়, তাহার হাতে ব্যাণ্ডেজ করিয়া গলায় একটা গোল কাঠের চাকৃতি পরাইয়া দেওয়া হয়, তাহাতে সে দাঁত দিয়া তাহার হাতের ব্যাণ্ডেজ কাটিতে পারিল না।

ক্লোরোফর্ম্ করিয়া পশুচিকিৎসা

অনেক সময় পশুর চিকিৎসককে নানা-প্রকার উদ্ভট উপায় ঠাওরাইয়া পশুর চিকিৎসা করিতে হয়, তাহার কোনপ্রকার বর্ণনা দেওয়া যায় না। পশুর চিকিৎসা কিরূপ ব্যাপার তাহা ছবিগুলি দেখিয়া কতকটা আন্দাজ করা যাইবে।

—

পালঙ্ক-দেরাজ—

ছবিতে দেখুন, পালঙ্কের তলা হইতে কেমন একটি দেরাজ বাহির হইয়া আসিয়াছে। খাটের চারিপাশে এইরকম চারিটি দেরাজ রাখা যাইতে পারে- ইহাতে ঘরের অনেক স্থান অনাবশ্যক বাক্স-প্যাট্রা হইতে বাঁচিয়া যায়, অথচ জিনিষপত্র, কাপড়-চোপড় রাখিবার স্থান সঙ্কুলানও

পালঙ্ক-দেরাজ
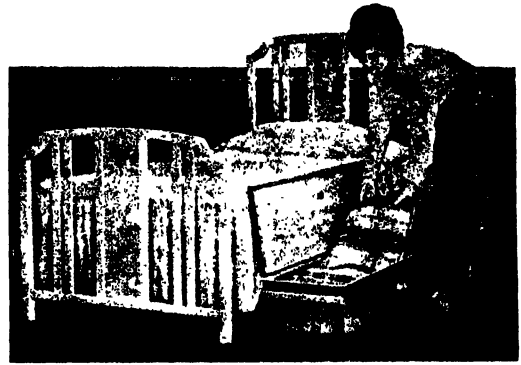
হয় না। এইরকম দেরাজ তৈরী করাও বিশেষ শক্ত নয়, যে কোন ছুতোর মিস্ত্রি ইহা তৈরী করিতে পারে। কলিকাতার মতো সহরে, যেখানে ঘরভাড়া প্রচুর, লোকে এইরকম পালঙ্ক, দেরাজ ইত্যাদির ব্যবহার করিলে অনেক সুবিধা পাইতে পারে।

—

একজনে চালানো বৃহৎ জলের কল—

যুক্ত-রাষ্ট্রের ক্যালিফোর্ণিয়া সহরে স্যাক্রামেন্টো নদী হইতে জল সরবরাহ করিবার জন্য একটি জলের কল নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। জল প্রথমে ফট্‌কিরি এবং ক্লোরিন গ্যাসের সাহায্যে পরিষ্কার করা হয়, তাহার পর সেই জল পরিষ্কৃত বালির মধ্য দিয়া লইয়া একেবারে ট্যাঙ্ককে হইলে সহরের অনেক কলে যায়। এই জলের কল হইতে প্রতিদিন ৪৮,০০০,০০০ গ্যালন জল সরবরাহ করা হয়। এই কল তৈরী করিতে খরচ পড়িয়াছে ৩,০০০,০০০ ডলার অর্থাৎ ঐ সংখ্যার প্রায় চারগুণ টাকা। সমস্ত কল বিদ্যুতের সাহায্যে চলে। সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এত বড় বৃহৎ ব্যাপার চালাইতে মাত্র একজন লোকের দরকার হয়। একটি সুইচ-বোর্ডে কলের বিভিন্ন অংশ চালাইবার সুইচ আছে।

ঘণ্টায়-মাইল নৌকা—

ঘণ্টায় এক মাইল চলিতে পারে এমনভাবে একটি নূতনধরণের জাহাজ ইংলণ্ডে তৈয়ারী হইয়াছে। ইহা দেখিতে অনেকটা ডিরিজিবল্ আকাশ-

ঘণ্টায় মাইল নৌকা। ওপরে—জলের মধ্যে নৌকা কেমন ভাবে চলে।
নীচে নৌকা খানির সম্পূর্ণ রূপ

জাহাজের মতন। সমস্ত জাহাজটি ইস্পাতে তৈরী। এই জাহাজের ওজন সমান মাপের ঐরকম অন্য জাহাজের অপেক্ষা প্রায় তিন গুণ কম, কাজেই বেশী জোরওয়ালা ইঞ্জিন্ (ইহার ওজনও বেশী) ইহার মধ্যে রাখিতে পারা যায়। এই জাহাজটিতে জলের বাধাও অপেক্ষাকৃত কম লাগায় বেগ খুব বেশী হয়। ইঞ্জিনের জোর ৪৫০ হর্স্ পাওয়ার। ইহার ১৮টি সিলিণ্ডার এবং ইহা গ্যাসোলিনে চলে। জাহাজটির দুই পাশে দুটি ডানা আছে, ইহার সাহায্যে জাহাজ ঢেউয়ের উপর দিয়া খুব বেগে চলিতে পারে।

—

র্যাডিওর কথা —

কলিকাতায় আজকাল র্যাডিওর চলন কিছু-কিছু হইতেছে। রবীন্দ্রনাথের চীন-যাত্রার পূর্ব্বাহ্নে আলিপুরে র্যাডিওতে, সমাগত ভদ্রলোক এবং মহিলাদিগকে সঙ্গীত শোনানো হয়। কিন্তু আমেরিকা এবং ইউরোপে যেমন র্যাডিও প্রচলন হইয়াছে, আমাদের দেশে এখনো সেইরকম হয় নাই। আমেরিকায় আজকাল প্রত্যহ একটি সেণ্ট্রাল্ ষ্টেশন হইতে দেশের চারিদিকে নানা-প্রকার সঙ্গীত, বক্তৃতা এমন কি ক্লাশের পড়ার লেক্‌চারও ব্রড্‌কাষ্ট অর্থাৎ ছড়ানো হয়। ইহাতে অসংখ্য লোক অসংখ্যরকমের উপকার এবং আনন্দ লাভ করে। ইংলণ্ড্ এবং আমেরিকার মধ্যে ওয়্যারলেস্ অর্থাৎ বেতার-বার্ত্তা আদান-প্রদানের খুব চমৎকার বন্দোবস্ত হইয়াছে। এই বেতারের সাহায্যে প্রত্যহ কোটি কোটি টাকার ব্যবসা চলিতেছে।

আমেরিকার ওহিও প্রদেশের কালা-বোবাদের, খুব জোরালো অ্যাম্প্লিফায়ারের (স্বর-বর্দ্ধক যন্ত্র) সাহায্যে, মানুষের কথা এবং গান শোনাইবার বন্দোবস্ত পৃথিবীতে এই প্রথম হইয়াছে। কালা-বোবারা ইহার সাহায্যে পৃথিবীর অনেক আনন্দ উপভোগ করিবে। তাহার

র‍্যাডিওর সাহায্যে বধিরকে মানুষের কথা এবং গান শোনানো হইতেছে

জীবন এখন আর অখণ্ড মরুভূমি থাকিবে না। যে কালা এতদিন পর্য্যন্ত কামানের শব্দও শুনিতে পাইত না, সেও এই এ্যামপ্লিফায়ারের সাহায্যে সবই শুনিতে পাইবে।

ব্রুকলিন সহরের হেন্‌রি ফারকুহ্‌ নামে এক ভদ্রলোক ক্যান্‌ভাস পেটিতে একপ্রকার অভিনব র‍্যাডিও সেট বসাইয়াছেন। ইহার সাহায্যে স্বর-বর্দ্ধক-যন্ত্রে স্বর বাড়ানোও চলিবে। বহুদূর হইতে শব্দ ধরা এবং বহুদূরের শব্দ শোনা এই ক্যান্‌ভাসের পেটির উপর র‍্যাডিও-সেটের দ্বারা চলিবে। সেট্‌টি দেখিতে সুদৃশ্য এবং ওজনও খুব কম। অতি সহজে পকেটে বা পেটির মত করিয়া যেখানে ইচ্ছা বহন করিয়া লইতে পারা যায়।

ক্যান্‌ভাসের পেটিতে র‍্যাডিও রিসিভিং সেট—ইহার সাহায্যে "লাউড-স্পিকার" অর্থাৎ স্বর-বর্দ্ধক যন্ত্র চালানো যাইতে পারে

নিউইয়র্কে একটি র‍্যাডিও ব্রড্‌কাষ্টিং ষ্টেশন প্রায় ৫০,০০০ ডলার খরচ করিয়া তৈয়ার হইয়াছে। এইখান হইতে দেশের সকল স্থানের লোক প্রত্যহ নানা-প্রকার সঙ্গীত, ঐক্যতানবাদন ইত্যাদি শুনিতে পাইবে। এখন কোন লোককে গীত-বাদ্য যে স্থানে হইতেছে সেইখানে আসিয়া গান শুনিতে হইবে না—আপনার ঘরে বসিয়া ইচ্ছামত সবই শুনিতে পাইবে।

যুক্ত রাষ্ট্রের প্রভিডেন্স্‌ নামক স্থানের একজন লোক পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র একটি র‍্যাডিও সেট তৈরী করিয়াছেন। এই র‍্যাডিও-সেট্‌টিকে মাত্র চারিটি ডাক টিকিট দিয়া ঢাকা যায়।
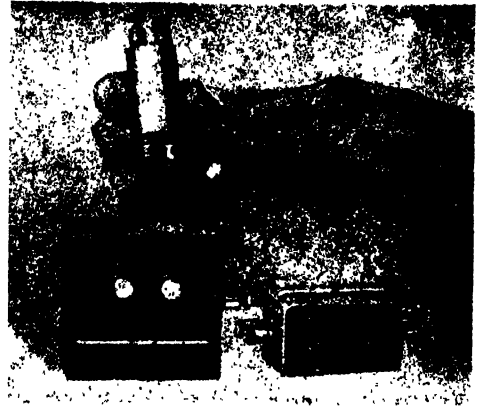
পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র র‍্যাডিও সেট- ইহার ব্যাস ৬ মাত্র ৫ ইঞ্চি

এই র‍্যাডিও সেট্‌টির ব্যাস ৫।৮ ইঞ্চি এবং লম্ব মাত্র ১ ইঞ্চ। ২০ মাইলের মধ্যে যাহা কিছু ব্রড্‌কাষ্টেড্‌ হয়, অর্থাৎ যেসব খবর বা গীত-বাদ্য ছড়ান হয়, সবই এই অতি-ক্ষুদ্র র‍্যাডিও-সেটে ধরা এবং শোনা যায়।

সুইডেনেও গবর্ণমেণ্ট্‌ হইতে কতকগুলি ব্রড্‌কাষ্টিং ষ্টেশন করিবার বন্দোবস্ত হইতেছে—যেসমস্ত লোক রিসিভিং সেট্‌ অর্থাৎ কেবল খবর ধরিবার যন্ত্র রাখিবে তাহাদিগকে কিছু টাকা জমা দিয়া অনুমতি-পত্র গ্রহণ করিতে হইবে। এই-ভাবে যে অর্থলাভ হইবে তাহা দেশের

মোটর বাসের উপর র‍্যাডিও কন্‌সার্ট ইত্যাদি ধরিবার তার

পুলিশদের মশারি কিনিবার জন্য খরচ হইবে না, র‍্যাডিওর উন্নতি-কল্পেই ব্যয় হইবে। র‍্যাডিও-খবর-ছড়াইবার যন্ত্র সকলকে দেওয়া হয় না, কারণ তাহা হইলে নানা-প্রকার বাজে খবর চারিদিকে ছড়াইয়া নানা প্রকার গোলমাল করা যাইতে পারে এবং সেণ্ট্রাল ব্রড্কাষ্টিং ষ্টেশনগুলির কাজেও নানা রকম বিশৃঙ্খলা হইতে পারে।

শঙ্খকে য়্যাম্প্লিফায়াররূপে ব্যবহার করা হইতেছে

এখন হইতে খনির মধ্যে কুলিরাও র‍্যাডিও সেট সঙ্গে রাখিতে পারিবে। নিউইয়র্কে হাড্সন্ নদীর ৯০ ফুট নীচে খনিতে বসিয়া র‍্যাডিও কন্সার্ট শোনা গিয়াছে। ৩০ ফুট জলের এবং ৬০ ফুট মাটির, দুইটি স্তর ভেদ করিয়া র‍্যাডিও-প্রেরিত খবর এবং ঐক্যতান-বাদন ঠিক গিয়াছিল—কোনপ্রকার বিকৃত হয় নাই। জলের বহু নীচে ডুবুরিরাও এই-প্রকারের মাটির বা জাহাজের লোকের সঙ্গে যোগ রাখিতে পারিবে। খনি ধসিয়া গেলে বা জাহাজ ডুবিয়া গেলে অনেক লোক মাটি এবং জলের দ্বারা আবদ্ধ হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মারা যায় না—র‍্যাডিও বার্ত্তা প্রেরণ এবং গ্রহণ করিবার যন্ত্র তাহাদের নিকট থাকিলে তাহাদের রক্ষা করা যাইতে পারিবে—ইহার পরীক্ষাও সফল হইয়াছে।

ক্যালিফোর্নিয়ার মোটর বাসে র‍্যাডিও ঐক্যতান-বাদন শ্রবণের বন্দোবস্ত হইয়াছে। গাড়ীর আরোহীরা পয়সা না দিয়া নানা-প্রকার গান-বাজনা শুনিতে শুনিতে ভ্রমণ করিতে পারিবে। এই মোটর-বাসের রিসিভিং সেটে বহুদূর হইতে প্রেরিত গান-বাজনা ধরা যায়।

সমুদ্র হইতে পাওয়া বড় বড় শাঁখকে র‍্যাডিও অ্যাম্প্লিফায়ারের কাজে লাগানো যাইতে পারে। ছবি দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, কেমন করিয়া একটি শঙ্খকে মাজিয়া ঘসিয়া "লাউড্-স্পিকার"-রূপে ব্যবহার করা হয়। ইহা কেবল দেখিতেই সুদৃশ্য নয়, কাজেও খুব চমৎকার—ধাতব লাউড্-স্পিকার হইতে কোন অংশে খারাপ নয়।
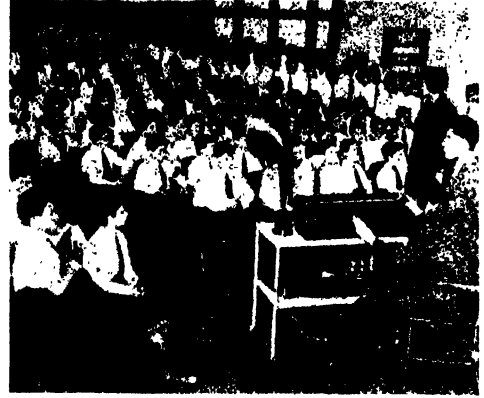
র‍্যাডিওর সাহায্যে সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া যাইতেছে

নিউইয়র্কের বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে র‍্যাডিওর সাহায্যে সঙ্গীত শেখানো হয়। ইহার ফলে ছাত্রেরা একই সময়ে, একইভাবে, একই সঙ্গীত নির্ভুলভাবে শিখিতে পারে। হাজার হাজার ছাত্র সামান্য মাত্র পয়সা খরচ করিয়া সঙ্গীত শিখিতে পারে।

গ্যাস্ মুখোস্—

বর্ত্তমান সময়ের সৈন্য এবং নাবিকদিগকে নানা-প্রকার বিপদ্-আপদের মধ্যে সকল সময় বাস করিতে হয়। বিশেষতঃ যুদ্ধের সময় বিপক্ষদল যে কতরকম বিষাক্ত গ্যাস ছাড়িয়া প্রতিপক্ষকে বিপন্ন করে তাহার ঠিকানা নাই। খনির কাজেও শ্রমিকদিগকে নানা প্রকার গ্যাসের মধ্যে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে হয়। রসায়নাগারেও রাসায়নিককে অনেক-রকম বিষাক্ত গ্যাস লইয়া নাড়া-চাড়া করিতে হয়। এইসমস্ত গ্যাসের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য নানারকমের গ্যাস-মুখোসের প্রবর্ত্তন হইয়াছে, এই মুখোস পরিয়া যে কোন গ্যাসপূর্ণ স্থানে যাওয়া চলে, কোন বিপদের ভয় নাই।

বিভিন্ন প্রকারের গ্যাস মুখোস

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

পাবনায় নমঃশূদ্র-সমস্যা

প্রায় পনর বৎসর ধরিয়া নমঃশূদ্র ও তথাকথিত অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর সেবায় নিযুক্ত আছি। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের "অবনত জাতির উন্নতি-বিধায়িনী-সমিতি" প্রতিষ্ঠিত করি। তৎপরে তাহার কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত হইতে থাকিলে পশ্চিম-বঙ্গের সমিতির সহিত তাহা মিলিত হয়। বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ রাজমোহন দাস রায় সাহেব মহাশয়ের অদ্ভুত কর্ম্মশীলতা-গুণে এই সমিতির কার্য্য এখন বিশেষ প্রসারিত হইয়াছে। হাই স্কুল, মাইনর স্কুল, পাঠশালা, নৈশ-বিদ্যালয় এই চারি শ্রেণীর চারি শতাধিক বালক ও বালিকা-বিদ্যালয় এই সমিতির সাহায্যে পরিচালিত হইতেছে। কলিকাতা ৪৯।২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে এই সমিতির বর্ত্তমান প্রধান কার্য্যালয় অবস্থিত। শুধু শিক্ষাবিস্তারই এই সমিতির কার্য্য নহে; তথাকথিত নিম্নশ্রেণীগুলির সর্ব্বপ্রকার উন্নতি-সাধন ইহার লক্ষ্য। নমঃশূদ্র বন্ধুগণ আমাকে ভালবাসেন এবং তাঁহাদের আপনার লোক বলিয়া মনে করেন। আমি এখন কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছি। বয়োবৃদ্ধি ও শারীরিক অকর্ম্মণ্যতাবশতঃ গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহাদের সেবা করিতে পারি না। কিন্তু বঙ্গদেশের নানাস্থানের কলিকাতা-প্রবাসী অনেক নমঃশূদ্র যুবক আমাদের কলিকাতাস্থ গৃহে সর্ব্বদা যাতায়াত করেন ও নমঃশূদ্র জাতির উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদের জাতির উন্নতির জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করি।

যশোহর জিলার কলিকাতা-প্রবাসী নমঃশূদ্রগণ কলিকাতায় একটি ক্ষুদ্র সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। তাহার সভাপতি মহাশয়ের নিকট আমি জানিতে পারি যে, সিরাজগঞ্জের অন্তর্গত কোন কোন স্থানের প্রায় দুই হাজার নমঃশূদ্র খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। সিরাজগঞ্জ কংগ্রেস কমিটির ও হিন্দুসভার সম্পাদক মহাশয়গণের সহিত তাহার এই সম্বন্ধে যে পত্র ব্যবহার হইয়াছিল, তিনি আমাকে তাহা দেখাইলে শারীরিক অসুস্থতা-সত্ত্বেও সেখানে যাইবার জন্য আমার মন ব্যাকুল হইয়া উঠে। আমি ব্রাহ্ম; সরল ধর্ম্ম-বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কাহারও ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ আমি নিন্দনীয় মনে করি না। বিশেষতঃ খ্রীষ্টধর্ম্মে জাতিভেদ-প্রথা বিদ্যমান না থাকায় এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে বর্ত্তমান জড়তাগ্রস্ত হিন্দুসমাজে বাস করিয়া নমঃশূদ্রগণ নানারূপে যে হীনতা সহ্য করিতেছেন তাহা হইতে তাঁহারা মুক্তিলাভ করিবেন, আমি এরূপ বিশ্বাস করি। কিন্তু নমঃশূদ্রগণকে আমি ভাল করিয়াই জানি, দুই হাজার অশিক্ষিত নমঃশূদ্র সরল ধর্ম্মবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিবে, এই কথা বিশ্বাস করিতে আমার প্রবৃত্তি জন্মে নাই। হিন্দু-সমাজের উৎপীড়ন এবং খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকদিগের প্রচার-প্রচেষ্টাই এই চঞ্চলতার কারণ বলিয়া আমার মনে হইল। সিরাজগঞ্জের পত্রগুলিতেও এই ভাবই ব্যক্ত হইয়াছিল। নমঃশূদ্রদিগকে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে দেখিলে একটি কারণে আমার চিত্ত নিতান্ত ব্যথিত হয়। আমি দেখিয়াছি, নিম্নশ্রেণীর চিন্তাবিহীন লোকেরা খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাহাদের মধ্যে একটি বিজাতীয় ভাব পুষ্টি লাভ করে। দেশের জনসাধারণ হইতে তাহারা আপনা-দিগকে পৃথক্ মনে করিতে আরম্ভ করে। ভারতের মুসলমানগণ যেমন এদেশের অধিবাসী হইয়াও অনেকেই আপনাদিগকে মক্কা, মদিনা ও তুরস্কের সহিত অধিকতর যুক্ত মনে করে এইসকল খ্রীষ্টিয়ান্‌ও তেমনি স্বদেশবাসী অপেক্ষা বিদেশী স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগকে বেশী আপনার মনে করে। আমি সরল মনে বিশ্বাস করি, তাহারা খ্রীষ্টিয়ান্ হইয়া যাহা পাইতে আকাঙ্ক্ষা করে হিন্দুধর্ম্মে থাকিয়াই তাহা পাইতে পারে। আমি কাহারও সঙ্গে তর্ক করিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু বৈদাদি শাস্ত্র আলোচনা করিয়া

আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে, আদিকালে হিন্দুসমাজে জাতিভেদ ছিল না, নব নব সত্য গ্রহণ করিবার জন্য হিন্দু সমাজের দ্বার অবারিত ছিল। পরবর্ত্তী কালে প্রচলিত জাতিভেদের অধীনতা, মানুষের বিবেক-বিরোধী শাস্ত্রের অধীনতা এবং রাজনৈতিক অধীনতা হিন্দুসমাজে যে জড়তা আনয়ন করিয়াছে, তাহার জীবনস্রোত যেরূপ অবরুদ্ধ করিয়াছে, তাহাতেই সমাজ এমন ধ্বংসের মুখে চলিয়াছে। নমঃশূদ্রজাতির মন হিন্দুসমাজের উৎপীড়নে যখন ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, তখন সকল আবর্জ্জনা-বর্জ্জিত হিন্দুধর্ম্মের পবিত্র সরল সুন্দর রূপ তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত করা আমি অতিশয় প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। কোন শাস্ত্র যদি মানবের প্রকৃত কল্যাণের বিরোধী হয় সেই শাস্ত্রকে অগ্রাহ্য করিতে হইবে। তাহাতে খাঁটি হিন্দুধর্ম্ম বিনষ্ট হইবে না। আবর্জ্জনা-মুক্ত হইয়া তাহা উজ্জ্বল ও শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বসু এম্-এ, বি-এল্ মহাশয় এবং সঞ্জীবনী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় সিরাজগঞ্জের নমঃশূদ্রদিগের নিকট যাইতে আমাকে উৎসাহিত করিলেন। আমি আমার পুত্র শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ ও আমাদের সমিতির পরিচালিত যশোহর মালিয়াট রামমোহন রায় মধ্য ইংরেজী স্কুলের হেড্‌মাষ্টার আমার একান্ত স্নেহভাজন শ্রীমান্ বনমালী গোস্বামীকে সঙ্গে লইয়া ১১ই এপ্রিল রাত্রিকালে সিরাজগঞ্জ যাত্রা করি। সিরাজগঞ্জের ষ্টেশনমাষ্টার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দাস মহাশয় আমাকে লিখিয়াছিলেন, আন্দোলন-কেন্দ্র সিরাজগঞ্জের নিকটবর্ত্তী জামতৈল ষ্টেশন হইতে তিন মাইল দূরে। আমি ও শ্রীমান্ বনমালী ১২ই এপ্রিল উষাকালে জামতৈল ষ্টেশনে নামিলাম এবং শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথকে কংগ্রেস কার্য্যালয়ে ও হিন্দুসভায় যাইয়া আন্দোলনের তথ্য সংগ্রহ করিতে সিরাজগঞ্জে পাঠাইয়া দিলাম।

জামতৈল হইতে আমরা পদব্রজে তিন মাইল পথ চলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী নমঃশূদ্র-গ্রাম গোপালপুরে উপস্থিত হইয়া তারিণীচরণ সরকার নামক এক সম্পূর্ণ অপরিচিত নমঃশূদ্র গৃহস্থের আতিথ্য গ্রহণ করি। তারিণীচরণ মধ্য-বয়স্ক লোক, ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এখন কৃষিকর্ম্মেই নিযুক্ত আছেন। আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া তিনি সাদরে আমাদিগকে বাসস্থান ও অন্ন দান করেন। গোপালপুর ও অন্যান্য বহু নমঃশূদ্র-গ্রাম ভ্রমণ করিয়া এবং নিম্নলিখিত সীতানাথ সরকার-প্রমুখ বহু নমঃশূদ্রের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া আমরা সিরাজগঞ্জের নমঃশূদ্র-আন্দোলনের সম্বন্ধে যে তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা নিম্নে বর্ণনা করিলাম।

গোপালপুর হইতে মাইল দুই দূরে বানিয়াগাতি নামে নমঃশূদ্র-গ্রাম। এই গ্রামে সীতানাথ সরকার নামক এক প্রভাবশালী নমঃশূদ্রের বাস। তাঁহার বয়স অনুমান ৫০।৫৫ বৎসর। তিনি স্বাধীনচিত্ত এবং স্বজাতির কল্যাণকামী মানুষ। লেখাপড়া তিনি অতি সামান্যই জানেন, তাঁহার সাংসারিক অবস্থা তেমন উন্নত নহে। তাঁহা অপেক্ষা অধিক অর্থশালী ও অধিক শিক্ষিত বহু নমঃশূদ্র ঐ অঞ্চলে আছে। কিন্তু স্বাধীনচিত্ততা ও মানসিক দৃঢ়তা-বলে তিনি ঐ অঞ্চলের নমঃশূদ্রের নেতৃস্থান অধিকার করিয়াছেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া দেখিয়াছি, এই নেতৃত্বের মূলে শ্রদ্ধার ভাগ অতি অল্পই আছে। সীতানাথ সরকারকে শ্রদ্ধা করে অতি অল্প লোকে, কিন্তু অল্পাধিক ভয় করে সকলেই। নমঃশূদ্রজাতি অশিক্ষিত বলিয়া তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ-ভীতি অত্যধিক, কিন্তু সীতানাথ ব্রাহ্মণের প্রতি নিতান্তই বীতরাগ। তিনি ব্রাহ্মণকে বে-দম প্রহার করিয়া জলে চুবাইয়া একবার ছয়মাস কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, নমঃশূদ্রগণ হিন্দু নয়, হিন্দু হইলে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ তাহাদের জলস্পর্শ করে না, তাহাদিগকে ধোপানাপিত দেয় না, তাহাদের কূপ হইতে জল উঠাইতে দেয় না, বিড়াল-কুকুরকে ঘরে ঢুকিতে দেয়, তাহাদিগকে ঘরে ঢুকিতে দেয় না, কেন? নিম্ন শ্রেণীর তথাকথিত মুসলমানের দুষ্প্রবৃত্তির আক্রমণ হইতে প্রবল নমঃশূদ্রজাতি বাহুবলে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণের মান-ইজ্জত রক্ষা করিতেছে কিন্তু হিন্দুরা ত নমঃশূদ্রদের প্রতি ফিরিয়াও চায় না। তাহাদের উন্নতির জন্য তাহাদিগের মধ্যে শিক্ষা-

বিস্তারের জন্য কোন চেষ্টাই করে না। সিরাজগঞ্জের অষ্ট্রেলিয়ান্ মিশনের পাদ্রিগণের দ্বারা নমঃশূদ্রজাতির কল্যাণ হইতে পারে বুঝিয়া তিনি পাদ্রীদিগের সাহায্য-প্রার্থী হন। পাদ্রীগণও এই সুযোগে নমঃশূদ্রদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে থাকেন। কঠিন পীড়ায় ঔষধ পথ্য দান, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদিগকে খেলনা, জামা, মিষ্টান্ন ইত্যাদি দিয়া এবং কোলে পিঠে করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করা, এবং ডিষ্ট্রীক্ট্ বোর্ডের যৎসামান্য সাহায্য-প্রাপ্ত প্রাইমারী বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদিগকে তাঁহাদের মিশন হইতে কিছু কিছু সাহায্য-প্রদান, স্কুলগৃহ-নির্ম্মাণে-সাহায্য দান প্রভৃতি উপায়ে তাঁহারা নমঃশূদ্রের অন্তরে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ জন্মাইতে চেষ্টা করিতেছেন। এইসকল সাহায্য-প্রাপ্ত পাঠশালায় বাইবেল পাঠ ও যীশুর নিকট প্রার্থনা এবং খ্রীষ্ট সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া হয়। এই শিক্ষা এমনই প্রসার লাভ করিতেছে যে উষাকালে তিনবৎসরবয়স্ক শিশু পিতামাতার কোলে জাগ্রত হইয়া "জয় প্রভু যীশু" গান করে। একটি তিনবৎসরবয়স্ক শিশুর পিতা তাঁহার পুত্রের সম্মুখেই এই কথার সাক্ষ্য দিতেছিলেন, আর অমনি শিশু আমাদিগকে শুনাইবার জন্য তাহার আধ-আধ ভাষায় গান ধরিল "জয় প্রভু যীশু, জয় প্রভু যীশু"। পাদ্রী-মহোদয়গণের এই প্রচার-প্রচেষ্টা নিতান্তই প্রশংসাহ ও স্বধর্ম্মপ্রীতির পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি বিশেষ-ভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, মিশনারীদিগের এই-সকল সদয় ব্যবহারে তাঁহাদিগের প্রতি নমঃশূদ্রদিগের চিত্ত কৃতজ্ঞ হইয়াছে বটে কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণের জন্য তাহাদের চিত্ত মোটেই অগ্রসর হয় নাই। সীতানাথ সরকার প্রমুখ কয়েকজন লোক এ-বিষয়ে অগ্রসর হইয়াছে মনে হইল। কিন্তু আমার সরল ও উদার ধর্ম্মমতের কথা শুনিয়া সীতানাথ নিজেই আমাকে বলিলেন, "আপনি বড় দেরীতে আসিয়াছেন। এরূপ মতের কথা আমি শুনিয়াছি, কিন্তু চেষ্টা করিয়াও ইহার বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই।" সীতানাথের গৃহে একজন বি-এ উপাধিধারী ও একজন অপেক্ষাকৃত অল্পশিক্ষিত নমঃশূদ্র খ্রীষ্টান বাস করিতেছেন, দেখিতে পাইলাম। তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের প্রতি নমঃশূদ্রদিগের বিরাগ জন্মাইয়া দিবার জন্য যথারীতি চেষ্টা করিতেছেন। সীতানাথ স্বাধীনচিত্ত মানুষ হইলেও অশিক্ষিত। তাঁহার শিক্ষা-হীনতার সাহায্যে তাঁহার হিন্দুসমাজের প্রতি বিদ্রোহী চিত্তে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিরাগ জন্মাইয়া দেওয়া কিছুই কঠিন কাজ নহে। খ্রীষ্টিয়ানদিগের নিকট শুনিয়া হিন্দুদিগের শবদাহ রীতির প্রতি সীতানাথের নিতান্ত অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, দেখিলাম। আমিও মৃতদেহ সমাধিস্থ করা অপেক্ষা দাহ করাই বিজ্ঞানসঙ্গত বলিয়া মনে করি জানিয়া তিনি আমার সহিত তর্ক করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু আমি ইহার যৌক্তিকতা বুঝাইয়া দিলাম। আজকাল অনেক ইউরোপীয় ভদ্রলোকও দাহ-প্রথার অনুরাগী হইতেছেন শুনিয়া বিস্মিত হইয়া তিনি উপস্থিত খ্রীষ্টিয়ান ভদ্রলোকটির দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিলে, তিনিও আমার উক্তির সত্যতা স্বীকার করিলেন। তখন তিনি মুখাগ্নি-প্রথার নিন্দা আরম্ভ করিলেন। আমিও এই প্রথার সমর্থন করি না জানিয়া তিনি নিরুত্তর হইলেন। আত্মশক্তির উপর সরকার মহাশয়কে কিঞ্চিৎ অধিক নির্ভরশীল দেখিলাম। তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলে আর কত লোক খ্রীষ্টিয়ান হইবার সম্ভাবনা জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর করিলেন "আমি খ্রীষ্টিয়ান হইলে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারিবে এ-অঞ্চলে এমন লোক ত দেখি না।" ১৩ই এপ্রিল প্রাতঃকালে বানিয়াগাতি গ্রামে সীতানাথ সরকার মহাশয়ের বাড়ীতে এইসকল আলোচনা হয়। তৎপরে আমরা তাঁহার গৃহে জলযোগ করিবার সময় খ্রীষ্টিয়ান ভদ্রলোক দুইটি এবং আমাদের সহিত তাঁহাকে একত্র আহার করিতে অনুরোধ করায় তিনি তাহা এড়াইয়া গেলেন। শুনিয়াছিলাম, গলার তুলসীর মালা তিনি ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছেন কিন্তু তাঁহার উন্মুক্ত কণ্ঠে বড় বড় তুলসীর মালা রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। তৎপরে তাঁহাদের সহিত একসঙ্গেই আমরা গোপালপুরে ফিরিয়া আসিলাম। নমঃশূদ্রদিগের খ্রীষ্টিয়ান হইবার ইচ্ছা দূর করিবার জন্য সেদিন অপরাহ্ণে সিরাজগঞ্জের হিন্দু ভদ্রলোকদিগের চেষ্টায় একটি সভার আয়োজন হইয়াছিল। কলিকাতা

হিন্দুসভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী, রামকৃষ্ণ মিশন হইতে শ্রীযুক্ত করুণানন্দ স্বামী, সত্যমাতা নামে কাশীর একজন সন্ন্যাসিনী, মান্দ্রাজের ব্যায়াম ও ব্রহ্মচর্য্য প্রচারক অধ্যাপক নাইডু এবং সিরাজগঞ্জের ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের বহু উচ্চশ্রেণীর ভদ্রলোক ও বহুসংখ্যক নমঃশূদ্র-প্রধান এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। নাইডু মহাশয় সভাপতির পদে বৃত হইয়াছিলেন। প্রমত্ত হরি-সংকীর্ত্তনের পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। অধিকাংশ নমঃশূদ্র-প্রধান সেই সংকীর্ত্তনে ভক্তির সহিত যোগ দিয়া প্রমত্তভাবে নৃত্য করিয়াছিলেন।

সভায় দূরাগত প্রায় সকলেই এবং নিকটবর্ত্তী স্থানেরও অনেকেই বক্তৃতা করিয়াছিলেন। আমার সঙ্গী নমঃশূদ্র শ্রীমান্ বনমালী গোস্বামীও সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতা দিবার অভ্যাস না থাকিলেও সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে আমাকেও কিছু বলিতে হইয়াছিল। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ নমঃশূদ্রদিগকে আচরণীয় করিয়া অবশ্যই লইবেন, কিন্তু নমঃশূদ্রগণ শুধু তাহাতেই যদি তৃপ্ত হন তবে তাঁহাদের কোনই উন্নতি হইবে না; নমঃশূদ্রদিগের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার, স্বাস্থ্যের ও সমাজের উন্নতি, কৃষি ব্যাঙ্ক-স্থাপন, চর্কা ও তাঁতের প্রচলন, এইসকল উপায়ে তাহাদের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি-সাধন করিতে হইবে, আমরা এইসকল কথাই বলিয়াছিলাম। বক্তৃতার পর উপস্থিত ব্রাহ্মণ কায়স্থাদির মধ্যে অনেকে নমঃশূদ্রাদির প্রদত্ত জলপান এবং সন্দেশ বাতাসা প্রভৃতি আহার করেন। স্থানীয় ব্রাহ্মণ কায়স্থদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাদের জল গ্রহণ করেন নাই কিন্তু তাঁহারাও নমঃশূদ্রদিগকে আচরণীয় করিবারই পক্ষপাতী বলিয়া প্রকাশ করিলেন। ক্রমে ক্রমে সমাজস্থ সকলকে সম্মত করিয়া তাঁহারাও নমঃশূদ্রদিগকে জলাচরণীয় করিয়া লইবেন, এইরূপ মত প্রকাশ করেন। অদূরবর্ত্তী স্থলবসন্তপুরের যুবক-জমিদার শ্রীযুক্ত শিবেশচন্দ্র পাকড়াশী, এম্-এ, বি-এল্, মহোদয় সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি হৃদয়বান্ পুরুষ। সভাভঙ্গের পরে তাঁহার নেতৃত্বে পরিচালিত ভক্তিবিগলিত সংকীর্ত্তন শুনিয়া বড়ই মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তিনি আশা করেন, স্থলবসন্তপুরের ব্রাহ্মণসমাজ দ্বারাও ক্রমে ক্রমে নমঃশূদ্রদিগকে আচরণীয় করিয়া লইতে পারিবেন।

এইরূপ ২।৪ ঘণ্টা সভাসমিতির উপর আমার বিশেষ আস্থা না থাকিলেও এই সভা দ্বারা একটি উত্তম মঙ্গলকর্ম্মের সূত্রপাত হইল বলিয়া মনে হয়। সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে না হইলেও, এই যে নমঃশূদ্রদের জল পাবনা অঞ্চলে আচরণীয় হইতে আরম্ভ হইল, আমার মনে হয়, নানা ঘাত-প্রতিঘাত সহিয়া হিন্দুসমাজে তাহা স্থায়ীভাবেই আচরণীয় হইয়া থাকিবে। নমঃশূদ্রগণ যদি আত্মোন্নতি সাধনে মনোযোগী হন, তবে ক্রমে অন্নও চলিবে এবং সুদূর ভবিষ্যতে বিবাহাদিও চলিবে আশা করি।

সভার পরদিন নানা স্থান হইতে আগত সকলেই চলিয়া গেলে আমরা আমাদের প্রকৃত কার্য্য আরম্ভ করিলাম। গোপালপুর হইতে ১৫ মাইলের মধ্যে ৫০।৬০টি নমঃশূদ্র গ্রাম। এইসকল গ্রামে অন্ততঃ পনের হাজার নমঃশূদ্রের বাস। এই অঞ্চলের নমঃশূদ্রদিগের মধ্যে ধর্ম্ম, শিক্ষা সমাজ ও অর্থনৈতিক অবস্থা জ্ঞাত হইবার জন্য সমস্ত অঞ্চলটি ঘুরিয়া দেখিতে ইচ্ছা করিলাম। এখন পদব্রজে ছাড়া এই অঞ্চলে ভ্রমণের আর অন্য উপায় নাই। ভাল রাস্তাঘাট নাই। অধিকাংশ স্থলে কর্ষিত বন্ধুর ক্ষেত্রের উপর দিয়া শূন্যপদে চলিতে হয়। চৈত্র-বৈশাখের রৌদ্রে মৃত্তিকা অতিশয় উত্তপ্ত হয়। একটি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ-করা নমঃশূদ্র যুবক আমাদের সঙ্গী হইল। তাহাকে লইয়া আমরা উষাকালে ভ্রমণে বাহির হইতাম। পথে যত নমঃশূদ্রগ্রাম পড়িত তাহাতে কিছুকাল বসিয়া গ্রামের তথ্য সংগ্রহ করিতাম, মিশনারীদিগের কার্য্যের বিবরণ শুনিতাম এবং মধ্যাহ্নে কোন নমঃশূদ্র-গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিতাম; অপরাহ্ণে পুনরায় এই প্রণালীতে পথ চলিতাম। রাত্রিকালে কোন বর্দ্ধিষ্ণু নমঃশূদ্র গ্রামে উপস্থিত হইয়া গ্রামের প্রধান নমঃশূদ্রদিগকে আহ্বান করিতাম। বহুলোক উপস্থিত হইত। শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্না রাত্রি—উঠানে বসিয়া তাহাদের লইয়া রাত্রি ১২টা, ১টা পর্য্যন্ত ধর্ম্ম, সমাজ ও শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা করিতাম। তাহারা অতিশয় আগ্রহের সহিত আমাদের কথা শুনিয়াছে, আমাদের কার্য্য প্রণালীর সমর্থন করিয়াছে

এবং তাহাদের মধ্যে কাজ করিবার জন্য ব্যাকুল অনুরোধ জানাইয়াছে। সমস্ত অঞ্চলটির অবস্থা যথাসম্ভব অবগত হইয়া এবং তাহাদের মধ্যে কার্য্যারম্ভের প্রাথমিক ব্যবস্থা করিয়া আমি ঢাকায় চলিয়া আসিয়াছি। নারায়ণগঞ্জের নমঃশূদ্রদিগের মধ্যেও খ্রীষ্টিয়ান হইবার আন্দোলন হইতেছে জানিয়া এই অঞ্চলটিও দেখিয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছি।

সিরাজগঞ্জের নমঃশূদ্রদিগের মন হইতে খ্রীষ্টিয়ান হইবার ইচ্ছা সম্পূর্ণ দূর হইয়াছে এরূপ বলা যায় না, কিন্তু সেই ইচ্ছা খুবই দুর্ব্বল হইয়াছে। তাহাদের মনের চাঞ্চল্য দেখিয়া মুসলমানগণও তাহাদিগকে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য ডাকিতেছে। বানিয়াগাতি গ্রামে এক বিরাট্ সভা করিয়া মুসলমানেরা নাকি বলিয়াছে যে, হিন্দুসমাজ তোমাদিগকে এত নিগৃহীত করিতেছে, অবিলম্বে তাহার আশ্রয় পরিত্যাগ কর, কিন্তু তোমরা খ্রীষ্টিয়ান হইবে কেন? আমরা তোমাদের স্বদেশী ভাই, পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে আসিয়া আমাদের সহিত মিলিত হও; সকল নিপীড়ন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া শান্তি পাইবে। কিন্তু নমঃশূদ্রগণ এই আহ্বানে সাড়া দেয় নাই। মানব-প্রকৃতি রক্ষণশীল, ধর্ম্মান্তর গ্রহণ মানুষের রুচিবিরুদ্ধ। সহজে মানুষ পিতৃপিতামহের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে না।

আর-একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করিতেছি। নমঃশূদ্রগণ সাধারণতঃ স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধী। তাহাদের অনেকে অন্তরের সহিত বিশ্বাস করে, স্বরাজ অর্থ তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা। যদি এদেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হয় তবে নমঃশূদ্রদের তাহাতে কোন লাভ নাই বরং তাহাদের প্রতি উচ্চশ্রেণীর উৎপীড়ন বাড়িবে মাত্র। আমি জানি, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া নমঃশূদ্রগণ নানা স্থানে কংগ্রেস্ ও স্বদেশীর বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন করিয়াছে। যদি ইহাদিগকে স্বদেশানুরাগী করিতে হয় তবে শুধু বক্তৃতা করিলে চলিবে না, ইহাদিগকে আপনার করিয়া লইয়া ইহাদিগের সেবা করিতে হইবে। গোপালপুরের সভায় নমঃশূদ্রদের উন্নতিকল্পে কংগ্রেসানুরাগী যুবকের তুবড়ির ন্যায় বক্তৃতার বাহার দেখিয়াছি। কিন্তু সেই বক্তাই সমাজের দোহাই দিয়া পরমুহূর্ত্তে নমঃশূদ্রদিগের জলগ্রহণ করিতে অসম্মত হইলেন। এইরূপ অপকর্ম্ম দ্বারা স্বদেশীর প্রতি নমঃশূদ্রদিগের বিরাগ জন্মিলে তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না।

আমি অনেক নমঃশূদ্র-প্রধান স্থান দেখিয়াছি, কিন্তু সিরাজগঞ্জ অঞ্চলের ন্যায় সুন্দর কার্য্যক্ষেত্র আর দেখি নাই। এই অঞ্চলে একচাপে বহু নমঃশূদ্রের বাস। ইহাদের অধিকাংশের সাংসারিক অবস্থা সচ্ছল, ইহারা কৃষক। অনেক স্থানের নমঃশূদ্র অপেক্ষা ইহাদের আচার ব্যবহার মার্জ্জিত। এই অঞ্চলটি বেশ স্বাস্থ্যকর। ম্যালেরিয়া নাই। নমঃশূদ্রদের অধিকাংশের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সুন্দর আলো-হাওয়া-বিশিষ্ট। কিন্তু এসকল সত্ত্বেও ইহাদের বংশবৃদ্ধি অতি অল্প। এক একজনের ৮।১০টি সন্তানের মধ্যে ২।১টি জীবিত আছে কেহ কেহ বা নির্ব্বংশ হইতে চলিয়াছে। অনুসন্ধানে বুঝিলাম বাল্য বিবাহই ইহার কারণ। কিন্তু বাল্যবিবাহের দোষ ইহাদিগকে বুঝাইয়া দিবার কেহ নাই। বুঝাইয়া দিলে দুদিনেই যে এই কুপ্রথা দমন হইবে এমন নহে; কিন্তু দৃঢ়তার সহিত কার্য্য আরম্ভ করিলে ধীরে ধীরে তাহার সুফল অবশ্যই ফলিবে।

এই অঞ্চলের নমঃশূদ্রদিগের মধ্যে কার্য্য করিবার জন্য বাহির হইতে বেশী অর্থসংগ্রহের আবশ্যক হইবে বলিয়া মনে হয় না। প্রয়োজন শুধু প্রেমপরায়ণ ধৈর্য্যশীল সেবকের। নমঃশূদ্রদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিলে তাহারা নিজেরাই অর্থ দিবে। বিদ্যালয়প্রতিষ্ঠা, ধর্ম্মগোলা স্থাপন, চর্‌কা প্রচলন, হরিসংকীর্ত্তন ও স্বজাতির উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনার জন্য মাঝে মাঝে জাতীয় সম্মিলন প্রভৃতি কর্ম্মের যেরূপ প্রণালী আমরা স্থির করিয়াছি, তাহার অনুসরণ করিয়া চলিলে এই অঞ্চলের বিরাট্ নমঃশূদ্রজাতি ক্রমে একটি নূতন প্রাণময় শক্তিশালী সম্প্রদায়ে পরিণত হইবে সন্দেহ নাই। আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া, ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া আমরা কার্য্যারম্ভ করিয়াছি; আশা করি, দেশের কল্যাণকামী, নরনারায়ণের সেবার্থী, ত্যাগী যুবকদল এই কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন এবং সর্ব্বসাধারণ আশীর্ব্বাদ ও সহানুভূতি দ্বারা এই কল্যাণ কর্ম্মে সাহায্য করিবেন।

শ্রী হেমেন্দ্রনাথ দত্ত

নববর্ষের আব্‌দার

খবরের কাগজগুলো যদি না থাকৃত তবে আজ নববর্ষ এল কি না বোঝাই যেত না। বছর ফুরাল কিন্তু ঘড়ি যে-ভাবে ঘণ্টা দিয়ে জানিয়ে যায় ঘরের সবাইকে দিন গেল রাত এল বা রাত পোহাল দিন হ'ল সেই-ভাবে কোথাও কোনখানে কোন সাড়া কি পড়্‌ল দেশে নূতন বছরের আগমনীর সুর ধ'রে? নতুনের বাঁশি বাজ্‌ল, না যে-ভাবে গেল বছর চলেছিল সেইভাবে এ-বছর চল্‌ল? এ কি মূকের দেশ, এটা কি বিজন সহর যেখানে সাড়া শব্দ বলে' কিছুই নেই? ইষ্টার ডিম ফুটে' নববর্ষে যে ছুটিটা বেরিয়ে এল সেটার খবর আপিসে আদালতে সর্ব্বত্র দৌড়ে গেল এবং সাড়া ও তাড়া প'ড়ে গেল ছুটিতে আনন্দ করতে। নতুন খাতার পাতা উল্টে' গেল সেটা দেখে নিলে সবাই এক রাত্রি বাতি জ্বালিয়ে, কিন্তু কালবৈশাখির মেঘের পারে তারা যে নতুন বছরের সংবাদ দিলে সেটা শুধু গাছের পাতাগুলোই অনুভব করলে। দেখি নতুন সবুজে সেজে বার হ'ল তারা, তারা-ফুলের মালা দুলিয়ে দিলে বনস্পতির গলায়। কোন দূর দেশ থেকে উৎসবের খবর পেয়ে ছুটে' এল কোকিল পাপিয়া, বন-ভবন মুখর হ'ল গানে গানে, উৎসবের আসরে দিন রাত চল্‌ল উৎসব ঋতুতে ঋতুতে দীপক মেঘমল্লার কত কি রাগরাগিণী বেজেই চল্‌ল সারা বছর ধরে' জলে স্থলে আকাশে, প্রতিপলে প্রতি মুহূর্ত্তে, সকালে সন্ধ্যায় দিনে রাতে, আর মানুষের ঘরে নববর্ষ যে এসেছে তার পতাকা-স্বরূপ দেখা দিলে কেবলমাত্র দেয়ালে লট্‌কানো নতুন পঞ্জিকার একখানা পাতা গেজেট্‌-করা ছুটির হিসেব নিয়ে। বড় হিসেবী মানুষ উৎসবে,—সে তাই সময়টার অপব্যয় করতে নারাজ হ'ল কবিদের হাতে উৎসবের বাঁশি পঞ্জিকাকারের হাতে উৎসবের তালিকা প্রস্তুতের ভার দিয়ে তারা নিজের কাযে লেগে গেল—মিটিং, স্মৃতি-সভা, শ্রাদ্ধ, সভা, খদ্দরপ্রচার দরিদ্র-নারায়ণের উপাসনা ইত্যাদি ইত্যাদি নানা দর্‌কারী কায অক্লান্তভাবে করেই চল্‌ল গত বছরের মতো এ বছরও, এই হ'ল নতুন বছরের সঙ্গে আমাদের প্রায় ভারতের যোগাযোগের সঠিক ইতিহাস। মানুষের কাজের তাড়া ও সাড়া উৎসবের সুরকে চেপে মার্‌লে, আর বিশ্ব-প্রকৃতির কাজের তাড়া উৎসবের বাঁশির সাড়ার সঙ্গে সুর মিলিয়ে চল্‌ল সারা বছর। আমাদের টাউন-হলে, গাঁয়ের মিউনিসিপাল্ আফিসে ছাত্র-সমিতি পাবলিক্ লাইব্রেরী সাহিত্য-সভা, ধর্ম্ম-সভা প্রভৃতিতে যত কাজ তার চেয়ে অনেক বেশি, অনেক প্রয়োজনীয় কাজ চলেছে মাঠে-ঘাটে, বনে-জঙ্গলে, আকাশে-বাতাসে, জলে-স্থলে, এমন কি মরুভূমিটাতেও। কিন্তু সেই কাজের মাঝে সুর কোথাও ত বাদ যাচ্ছে না। আনন্দ মূর্চ্ছিত হচ্ছে না, সেখানে জন্মাচ্ছে সব আনন্দে মরছে সব আনন্দে আর মানুষ আমরা সভায় দাঁড়িয়ে নিজের আনন্দে জাত বলে' প্রচার কর্‌ছি এবং ঘরে এসে নিরানন্দের ফাঁসি ইচ্ছা করে' গলায় দিয়ে আত্মহত্যা কর্‌ছি—নূতন পুরাতন গত-আগত, অনাগত সব কালে! মানুষের এমন কাজে বাজ পড়ুক-- এই প্রার্থনা নববর্ষে যদি করে' বসি, তবে এমন কোনো শক্তিমান্ দেবতা আছেন কি না যিনি এ-আব্দার পূর্ণ করতে পারেন? কাজেই কাজ থেকে ছুটি নতুন বছর পুরোনো বছর কোন বছরেই নেই মানুষের, এটা নিশ্চয় নিশ্চয়।

শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খেলা

চিত্রকর শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৌজন্যে

[২৪]
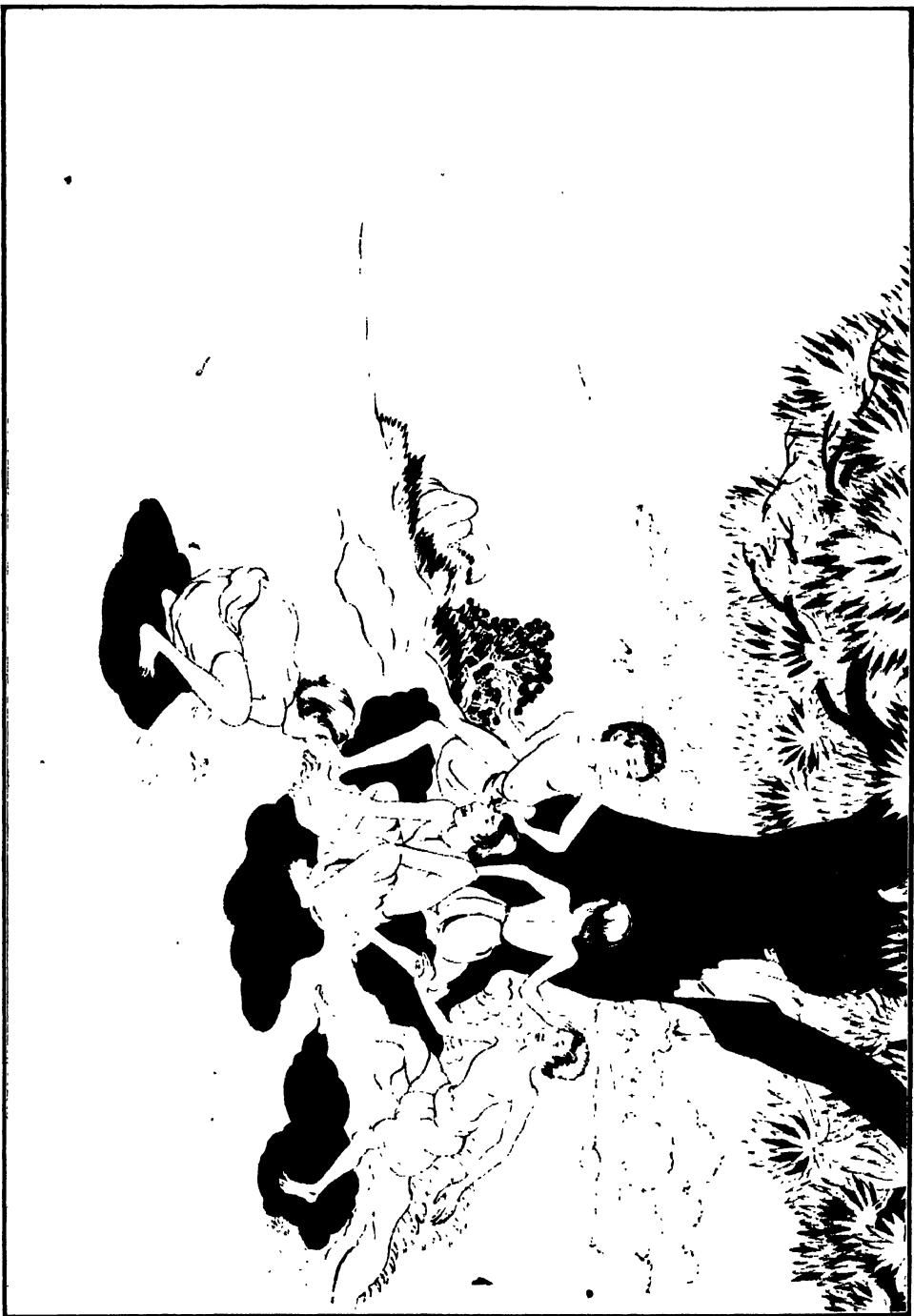
সমস্ত দিনটা সুরেশ্বর নানা কৌশলে নিজেকে ভুলাইয়া রাখিল। সজনীকান্তের সহিত কথোপকথন এবং তদুদ্ভূত চিন্তা যাহাতে তাহার চিত্ত অধিকার করিতে না পারে তজ্জন্য সে সমস্ত দিনের মধ্যে একবারও নিজেকে অবসর দিল না। গৃহে যতক্ষণ রহিল তারাসুন্দরী ও মাধবীর সহিত গল্প করিয়া কাটাইল। দ্বিপ্রহরে মাণিকতলা ষ্ট্রীটে তাঁত-শালায় নিজেকে নিরবসরভাবে ব্যাপৃত রাখিল এবং তৎপরে প্রয়োজনে এবং অপ্রয়োজনে গৃহ হইতে গৃহান্তরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া রাত্রি নয়টার সময়ে গৃহে ফিরিয়া আসিল।

কিন্তু আহার সমাপন করিয়া সে যখন শয্যায় গিয়া আশ্রয় লইল তখন সারা দিন ধরিয়া যাহাকে নানা উপায়ে রোধ করিয়াছিল তাহাকে আটকাইয়া রাখিবার আর কোনও উপায়ই খুঁজিয়া পাইল না। ক্ষুধার্ত্ত কীট-পতঙ্গের মত তুণিবার চিন্তারাশি তাহার চিত্ত জুড়িয়া বসিয়া দংশন করিতে লাগিল। কিন্তু দংশনের যন্ত্রণা হইতেও তাহার বেশী যন্ত্রণা হইল এই কথা ভাবিয়া, যে দংশন হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার মতন কোনও শক্তি বস্তুতঃ তাহার নাই!

সমস্ত দিন সর্ব্বপ্রকার চিন্তা হইতে কেমন করিয়া সে নিজেকে মুক্ত রাখিয়াছিল তাহা স্মরণ করিয়া এখন সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে সেরূপে ভুলিয়া থাকার মধ্যে শক্তির কোনও পরিচয় ত ছিলই না, পক্ষান্তরে তদ্দ্বারা শক্তির অভাবই ব্যক্ত হইয়াছিল। নিজেকে ভুলাইয়া রাখিয়াছে বলিয়া যতক্ষণ সে মনে করিতেছিল ততক্ষণ যে প্রকৃতপক্ষে সে অপরকেই ভুলাইয়া রাখিয়াছিল একথা বুঝিতে তাহার বাকী রহিল না; এবং বুঝিতে পারিয়াই নিজের দুর্ব্বলতা উপলব্ধি করিয়া তাহার ন্যায়-প্রবণ হৃদয় অপরিমেয় লজ্জায় ও নৈরাশ্যে ভরিয়া গেল।

নিদ্রার জন্য দীর্ঘকাল বৃথা সাধনা করিয়া বিরক্ত হইয়া সুরেশ্বর ছাদের উপর মুক্ত আকাশতলে আসিয়া দাঁড়াইল। গভীর নিশীথে পৌষমাসের শীত-সংক্ষুব্ধ কলিকাতার স্তব্ধ রাজপথে দীপাবলী তখন পাংশু হইয়া জ্বলিতেছিল, এবং উপরে কৃষ্ণাষ্টমীর নিষ্প্রভ-চন্দ্রালোকে তারকাশ্রেণী মার্জ্জিত মণির মতন চক্‌চক্ করিতেছিল। একটা উজ্জ্বল তারকার প্রতি সুরেশ্বর বহুক্ষণ ধরিয়া অন্যমনস্ক হইয়া চাহিয়া রহিল; তাহার পর সহসা যখন খেয়াল হইল যে আকাশের তারকা অলক্ষিতে ধীরে ধীরে কোনও চকিত নেত্রের কৃষ্ণ-তারকায় পরিণত হইবার উপক্রম করিয়াছে তখন সে নিরতিশয় বিরক্তি-ভরে পরিত্যক্ত শয্যাতেই ফিরিয়া গেল!

পরদিন প্রভাতে সুরেশ্বরকে দেখিয়া তারাসুন্দরী উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "অসুখ করেছে নাকি সুরেশ? এত শুক্‌নো দেখাচ্ছে কেন?"

সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া বলিল, "না, অসুখ কিছু করেনি মা! কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি তাই বোধ হয় শুক্‌নো দেখাচ্ছে।"

"ঘুম ভাল হয়নি কেন? কাল বুঝি সারা রাত জেগে প্রবন্ধ লিখেছিস্?"

সুরেশ্বর মাথা নাড়িয়া স্মিত-মুখে বলিল, "তা হ'লে শুক্‌নো দেখাত না মা। কোনও কাজ নিয়ে রাত জাগ্‌লে আমার কষ্ট হয় না।"

সুমিত্রাদের লইয়া সুরেশ্বরের কাহিনী তারাসুন্দরীর, সবটা জানা না থাকিলেও, সবটা অবিদিতও ছিল না। মাধবীর নিকট যতটুকু শুনিয়াছিলেন তাহার সহিত সুরেশ্বরের ঘুম না-হওয়ার কোনও কার্য্য-কারণের যোগ কল্পনা না করিয়া তিনি এম্‌নিই জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ রে সুরেশ, আজ কাল ত আর সুমিত্রাদের কোনও কথা বলিস্‌নে? তাদের বাড়ী আর যাস্‌নে বুঝি?"

তারাসুন্দরীর এই প্রশ্নে সুরেশ্বর মনে-মনে ঈষৎ চিন্তিত

হইয়া উঠিল। কিন্তু তখনি সহাস্যমুখে বলিল, "না মা, কয়েকদিন থেকে আর তাদের বাড়ী যাইনে।"

"রণে ভঙ্গ দিলি নাকি?—পেরে উঠ্‌লিনে তাদের সঙ্গে?" বলিয়া তারাসুন্দরী হাসিতে লাগিলেন।

সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া বলিল, "যতদিন সত্যি-সত্যি রণ চলেছিল ততদিন ভঙ্গ দিইনি; কিন্তু অবশেষে অবস্থাটা এমন হ'য়ে দাঁড়াল যে ভঙ্গ না দিয়ে আর পারা গেল না।"

পুত্রের কথায় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তারাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে সে-দিন আবার মাধবীকে দিয়ে সুমিত্রাকে চর্‌কা পাঠিয়ে দিলি যে?"

"সুমিত্রা একটা চর্‌কা চেয়েছিল তাই পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।"

বিস্মিত হইয়া তারাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুমিত্রা নিজে থেকে চেয়েছিল?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া সুরেশ্বর বলিল, "হ্যাঁ, নিজেই চেয়েছিল।"

ইহাতে তারাসুন্দরীর কৌতূহল বৃদ্ধি পাইল; তিনি বলিলেন, "তার পর চর্‌কার গতি কি দাঁড়াল? কোন কাজে আস্‌ছে? না, অকেজো আস্‌বাবের দলে পড়ে' শুধু সাজানই আছে?"

সুরেশ্বর স্মিতমুখে বলিল, "তা'ত বল্‌তে পারিনে মা। তবে আমার বিশ্বাস একেবারে অকেজো হ'য়ে পড়ে নেই।"

সুরেশ্বরের এ-বিশ্বাস বস্তুতঃ যে ভুল ছিল না, দিন পনের পরে তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল। সে-দিন সন্ধ্যার পর গৃহে ফিরিয়া সুরেশ্বর দেখিল তাহাদের বৈঠকখানায় বিমানবিহারী একাকী বসিয়া অপেক্ষা করিতেছে।

ইহাতে অবশ্য বিস্ময়ের কিছুই ছিল না, কিন্তু দুই চারিটা মামুলী কথাবার্ত্তার পর বিমানবিহারী যখন একটা কাগজে-মোড়া বাণ্ডিল ও একখানা খামে-মোড়া চিঠি সুরেশ্বরের হস্তে দিয়া বলিল 'সুমিত্রা তোমাকে পাঠিয়েছে' তখন সুরেশ্বর সত্য-সত্যই বিস্মিত হইল। বাণ্ডিলটা একটু টিপিয়া দেখিয়া বুঝিতে না পারিয়া সে বলিল, "কি আছে এতে?"

বিমানবিহারী স্মিতমুখে বলিল, "আমার কর্ম্মফল! কবে, কোথায়, কি কুকর্ম্ম করেছিলাম তা জানিনে, কিন্তু কাঁধে ক'রে সজ্ঞানে তার ফল ব'য়ে বেড়াচ্ছি!"

বিমানবিহারীর সহিত আর কোনও কথা না কহিয়া সুরেশ্বর খাম ছিঁড়িয়া চিঠি-খানা খুলিল এবং সেই দুই ছত্রের চিঠি পড়িতে পড়িতে অপরিসীম সন্তোষে এবং আনন্দে তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তৎপরে বাণ্ডিলটা খুলিয়া তন্মধ্যস্থ সামগ্রী অবলোকন করিয়া তাহার আনন্দ দ্বিগুণ বিস্ময়ে রূপান্তরিত হইয়া গেল। সুমিত্রা তাহার স্বহস্তপ্রস্তুত সুতা যাহা কয়েকদিনের পরিশ্রমে সে কাটিতে পারিয়াছে, তাহা চর্‌কার মূল্য-পরিশোধের হিসাবে সুরেশ্বরকে পাঠাইয়াছে।

সুরেশ্বরের মুখে সুপ্রকট ভাবের ক্রীড়া লক্ষ্য করিয়া বিমানবিহারী কহিল, "খুব খুসী হচ্ছ সুরেশ্বর?"

প্রফুল্লমুখে সুরেশ্বর বলিল, "তা হচ্ছি বই কি?

"মনে হচ্ছে স্বরাজ খানিকটা এগিয়ে এল?"

সুরেশ্বর তেম্‌নি স্মিতমুখে বলিল, "হ্যাঁ, তা-ও মনে হচ্ছে!"

বিমানবিহারী ক্ষণকাল নিঃশব্দে সুরেশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "আচ্ছা, আর এ-রকম ক'টা খদ্দরের সুতোর বাণ্ডিল তৈরী হ'লে একেবারে স্বরাজ লাভ হয় তার হিসাব দিতে পার?"

বিমানবিহারীর কথা শুনিয়া একমুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া সুরেশ্বর বলিল, "পারি। আর একটা বাণ্ডিল হ'লেই হয়, যদি সেটা যথেষ্ট বড় হয়!" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

সুরেশ্বরের বিদ্রূপে ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া বিমান কহিল, "তা যেন হ'ল; কিন্তু সেই যথেষ্ট বড় বাণ্ডিলটি অবলীলাক্রমে ভস্মে পরিণত কর্‌তে অপর পক্ষের কতটুকু বারুদ খরচ কর্‌বার দর্‌কার হয় তার হিসাব জান কি?"

সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া বলিল, "না, সে হিসাব আমি জানিনে, তোমার হয়ত জানা আছে; না জানা থাকে ত এই ছোট বাণ্ডিলটাই নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করে' দেখ্‌তে পার, এটুকু ভস্ম কর্‌তে কতটুকু বারুদের দর্‌কার হয়। তার পর সেই যথেষ্ট বড় বাণ্ডিলের অনুপাত অঙ্ক কষে' বার করো।"

পকেট হইতে দেশলাইয়ের বাক্স বাহির করিয়া একটা

কাঠি হস্তে লইয়া বিমান-বিহারী স্মিতমুখে বলিল, "এই কাঠিটার মুখে যতটুকু বারুদ আছে ততটুকুই যথেষ্ট।"

খোলা বাণ্ডিলটা বিমানবিহারীর সম্মুখে স্থাপিত করিয়া সুরেশ্বর বলিল, "বেশ তা হ'লে পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক্, কিন্তু তার আগে সুতোটা কতখানি ওজনে আছে তা দেখে' রাখা দর্কার।" বলিয়া বিমানবিহারীকে কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া সুরেশ্বর ত্বরিতপদে ভিতরে প্রবেশ করিল।

দাঁড়িপাল্লা- ও বাট্খারা-হস্তে সুরেশ্বরকে সিঁড়ি দিয়া নামিতে দেখিয়া মাধবী বলিল, "এসব কি হবে দাদা?"

"কাজ আছে; পরে বল্ব।" বলিয়া সুরেশ্বর প্রস্থান করিল। মাধবী কৌতূহলী হইয়া সুরেশ্বরের পিছনে পিছনে বৈঠক্খানার দ্বারপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

দাঁড়িপাল্লা-হস্তে সুরেশ্বরকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বিমানবিহারী হাস্য করিয়া বলিল, "তুমি যে সত্য-সত্যই দাড়ি পাল্লা নিয়ে এসে হাজির কর্লে সুরেশ্বর!"

সুরেশ্বর ঈষৎ বিরক্তিভরে বিমানবিহারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "তা ত কর্লাম। কিন্তু তুমি কি এতক্ষণ শুধু মিথ্যা অভিনয় কর্ছিলে?"

সুরেশ্বরের তিরস্কারে মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়া বিমানবিহারী বলিল, "আমি না হয় মিথ্যা অভিনয় কর্ছিলাম, কিন্তু তুমি যে সত্যই অভিনয় কর্তে আরম্ভ কর্লে!"

সুরেশ্বর প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "না, না, অভিনয় নয় বিমান! কথাটাকে বাজে কথা দিয়ে চাপা দিতে গেলে চল্বে না। আজ বাস্তবিকই আমার পক্ষে একটা কথা বোঝাবার, আর তোমার পক্ষে সেই কথাটা বোঝ্বার সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। শক্তি যে কত রকমে অবস্থা-বিশেষে ব্যর্থ হ'য়ে যেতে পারে তার একটা দৃষ্টান্ত তুমি আজ নিজেই উপস্থিত করেছ।" বলিয়া সুরেশ্বর প্রথমে সুমিত্রার প্রস্তুত সুতা ওজন করিয়া দেখিল, তৎপরে তাহা হইতে কয়েক গুচ্ছ বিমানবিহারীর সম্মুখে স্থাপিত করিয়া বলিল, "এই রইল সুমিত্রার হাতে-কাটা কয়েক-গোছা সুতা, আর তোমার হাতে রয়েছে দেশলাই-য়ের বাক্স। তুমি বল্ছ তার একটা কাঠিই এই সুতাটুকু ভস্ম করে' দিতে পারে; আর আমি বল্ছি তোমার কাঠি-ভরা সমস্ত বাক্সটাই সে-বিষয়ে একেবারে অক্ষম। পরীক্ষা করে' দেখ কার কথা ঠিক্, আর কার কথা ভুল।"

বিমানবিহারী হাসিয়া উঠিয়া বিদ্রূপের স্বরে বলিল, "হ্যাঁ, এ একটি দুরূহ সমস্যা বটে! পরীক্ষা করে' না দেখ্লে কিছুতেই বলা যাবে না! একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে ধরিয়ে দিলে এ সুতাটা পুড়ে' যাবে তুমি কি তা' অস্বীকার কর?"

সুরেশ্বর সবেগে বলিল, "আমি কিছুই স্বীকার বা অস্বীকার কর্ছিনে! আমি শুধু দেখ্তে চাই যে তোমার দেশলাইয়ের কাঠিতে সুমিত্রার কাটা সুতা বাস্তবিকই পুড়ে' ছাই হ'য়ে যেতে পারে কি না। সব জিনিসের হিসাবই অত সহজ ধারায় চলে না বিমান! পৃথিবীতে যত মানুষ আছে ততগুলা তরবার তৈরী হ'লেই সকলের গলা কাটা পড়ে না!"

এবার আরও অধিক জোরে হাসিয়া উঠিয়া বিমান বলিল, "অতএব আগুন ধরিয়ে দিলে এটুকু সুতা পুড়্বে না? বাঃ বেশ চমৎকার যুক্তি ত? এ ন্যায়-সূত্রও তোমাদের চর্কা কেটে বার করেছ নাকি? অমাবস্যার দিন চাঁদ ওঠে না অতএব রসগোল্লা খেতে মিষ্টি লাগে, এইরকম তোমার যুক্তি।"

এ বিদ্রূপে কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া সুরেশ্বর শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে বলিল, "তা আমি জানিনে, আমি শুধু এই জানি যে তোমার দেশলাইয়ের কাঠিতে সুমিত্রার সুতা পুড়ে' ছাই হ'তে পারে, এ তুমি এখনও প্রমাণ কর্তে পারনি!"

এবার আর না হাসিয়া বিমান বলিল, "একথা বারবার ব'লে তুমিই বা কি প্রমাণ কর্ছ তা ত জানিনে! কাপাস তুলো আর দেশলাইয়ের কাঠির মধ্যে দাহ্য-দাহক সম্পর্ক আছে তাও তোমাকে প্রমাণ করে' দেখাতে হবে নাকি?"

সুরেশ্বর পূর্ব্ব-ভঙ্গীতে বলিল, "সে তোমার ইচ্ছে! কিন্তু না দেখালে কিছুতেই প্রমাণ হবে না যে তোমার দেশলাইয়ের কাঠিতে সুমিত্রার সুতা পুড়ে' ছাই হ'তে পারে। আর আমি দু-মিনিট অপেক্ষা কর্ব, তার পর সুতো তুলে' রেখে দেবো।"

পুনঃ পুনঃ উত্যক্ত হইয়া বিমানবিহারী ভিতরে ভিতরে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল। এবার সে সহসা সমস্ত সহিষ্ণুতা হারাইয়া হস্তস্থিত দেশলাইয়ের কাঠিটা জ্বালিয়া সূতার গুচ্ছ-গুলায় আগুন ধরাইয়া দিয়া বলিল, "তবে দেখো পোড়ে কি না।"

মুহূর্ত্তের মধ্যে সূতাটা জ্বলিয়া উঠিল এবং পর মুহূর্ত্তেই কক্ষ-মধ্যে মাধবী দ্রুতপদে প্রবেশ করিয়া আর্ত্ত-স্বরে বলিতে লাগিল, "ছি, ছি, কি কর্‌লেন! কেন এমন কাজ কর্‌লেন? সুমিত্রার এত কষ্ট-করে' কাটা প্রথম সূতোটা কিছুতেই না পুড়িয়ে ছাড়্‌লেন না?"

কাজটা করিয়া ফেলিয়াই বিমানবিহারী বিস্ময়ে ও ক্ষোভে বিমূঢ় হইয়া গিয়াছিল, তাহার উপর মাধবীর দ্বারা এরূপে তিরস্কৃত হইয়া সে কি করিবে বা বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া ব্যস্ত হইয়া ফুঁ দিয়া আগুনটা নিভাইয়া দিল। আগুন নিভিল বটে, কিন্তু সেই অৰ্দ্ধবিদগ্ধ পদার্থ হইতে উত্থিত ধূমে এবং দুর্গন্ধে কক্ষটা দেখিতে দেখিতে ভরিয়া গেল!

কেমন করিয়া কোথা দিয়া সহসা কি একটা কুৎসিত ঘটনা ঘটিয়া গেল! ক্ষুব্ধসন্ত্রস্ত নেত্রে বিমান-বিহারী সেই কুণ্ডলীভূত ধূমের প্রতি চাহিয়া রহিল; তাহার মনে হইল যেন এক-একটি সূতার পাক হইতে শত শত ধূম-পাক নির্গত হইয়া তাহার কণ্ঠরোধ করিবার উপক্রম করিতেছে! আতঙ্কে তাহার মুখ দিয়া বাক্য নিঃসরিত হইতেছিল না, দুঃখে ও ঘৃণায় তাহার শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছিল!

"এ আরও খারাপ কর্‌লে বিমান। একেবারে ছাই হ'য়ে যেত, সে ভালো ছিল; ধোঁয়া করে' তুমি ঘরের হাওয়াটা পর্য্যন্ত বিগড়ে দিলে! তোমার বারুদেরই আজ জয় হোক্!" বলিয়া বিমানবিহারীর শিথিল মুষ্টি হইতে দেশলাইয়ের বাক্সটা লইয়া সুরেশ্বর কাঠি জ্বালিয়া পুনরায় সেই অৰ্দ্ধ-দগ্ধ সূতার গুচ্ছ ভাল করিয়া ধরাইয়া দিল।

এবার চতুর্দ্দিক্ হইতে আগুনটা বেশ ভাল করিয়া জ্বলিতে লাগিল। বিমান ও মাধবী কোন কথা না বলিয়া সেই লেলিহান অগ্নি-শিখার দিকে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

"তুমি যাকে পুড়িয়ে মেরেছিলে, আমি তার সৎকার কর্‌লাম বিমান," বলিয়া সুরেশ্বর মৃদু-মৃদু হাসিতে লাগিল।

তদুত্তরে বিমানবিহারী সুরেশ্বরকে কোনও কথা না বলিয়া নিমেষেরে জন্য মাধবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। কিন্তু দৃষ্টিপাত করিয়াই মাধবীর মুখের অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া সে চমকিত হইয়া গেল! শ্মশান-ক্ষেত্রে প্রিয় আত্মীয়ের দেহ পুড়িতে দেখিয়া লোকে যেমন করিয়া তাকাইয়া থাকে, মাধবী ঠিক তেমনি করিয়া সেই প্রজ্বলিত সূতার দিকে চাহিয়া ছিল! গভীর বেদনার আঘাতে তাহার মুখখানা শুষ্ক অসাড়; দুঃখার্ত্ত নেত্রতলে সঞ্চীয়মান অশ্রু!

সমস্ত সূতাটা পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গেলে সুরেশ্বর বলিল, "বাকি সূতাটারও এই ব্যবস্থা করবে নাকি বিমান? তোমার দেশলাইয়ে কাঠি এখনও আছে, না ফুরিয়েছে?"

অপ্রসন্ন-দৃষ্টিতে সুরেশ্বরের দিকে চাহিয়া বিমান কহিল "সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে সুরেশ্বর। তোমার পরিহাসেরও একটা সীমা আছে বোধ হয়?"

সুরেশ্বর স্মিতমুখে বলিল, "তা যদি হয়, তা হ'লে অপর পক্ষের বারুদেরও একটা সীমা থাকা সম্ভব।"

এ-কথার আর কোনও উত্তর না দিয়া মাধবীর দিকে চাহিয়া বিমান বলিল, "দেখুন আপনার পক্ষে এতখানি ব্যথার কারণ হ'য়ে আমি বাস্তবিকই দুঃখিত হয়েছি। আপনি দয়া ক'রে আমাকে ক্ষমা করুন্!"

মাধবী অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ঈষৎ বেগের সহিত বলিল, "না, না, আমার জন্যে দুঃখিত হবার আপনার কোন কারণ নেই! আপনি যে এতটা কষ্ট ক'রে কাটা এতখানি দেশের সূতো আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দিলেন এইটেই আপনার একমাত্র দুঃখ হওয়া উচিত ছিল!"

এ-কথায় অপ্রতিভ হইয়া বিমান বলিল, "আমি হয়ত কথাটা ভাল করে' প্রকাশ কর্‌তে পারিনি। আপনার জন্য দুঃখিত হওয়ার অর্থই তাই।" তাহার পর একমুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া বলিল, "এর ক্ষতিপূরণস্বরূপ যেটুকু সূতা আমি পুড়িয়েছি তার দামের চতুর্গুণ কি আটগুণ আমি দিতে প্রস্তুত আছি।"

মাধবী উত্তেজিত হইয়া আরক্তমুখে বলিল, "কিন্তু সে-রকম দাম নিতে ত কেউ প্রস্তুত নেই! এর ক্ষতি-পূরণ অমন করে' হয় না। আপনাকে কিছু কর্‌তে হবে না। যা কর্‌বার, আমরাই কর্‌ব!" তাহার পর সুরেশ্বরের দিকে চাহিয়া বলিল, "দাদা, এর জন্যে একটা প্রায়শ্চিত্ত হওয়া উচিত! কাল তোমাতে-আমাতে একটা প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ব।"

সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া বলিল, "এ-ব্যাপারটাকে তুই অমন ক'রে দেখ্‌ছিস কেন মাধবী? দেখিস্, এর ফল অবশেষে ভালই হবে। এতখানি ছাই আর ধোঁয়া কখনও বৃথা যাবে না।"

প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া মাধবী বলিল, "সে ভাল ফল যখন হবে, তখন হবে। উপস্থিত আমাদের বাড়ীতে যে এতখানি চর্‌কার সূতা পুড়্‌ল তার একটা প্রায়শ্চিত্ত হওয়া চাই।"

"কি প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে চাস্ বল্?"

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া মাধবী বলিল, "কাল আমরা নিরম্বু উপোষ করে' সমস্ত দিন চর্‌কা কাট্‌ব।"

"বেশ; তাই হবে।"

সুরেশ্বরের দিকে চাহিয়া বিমানবিহারী বলিল, "অপরাধ কর্‌লাম আমি, আর তোমরা কর্‌বে প্রায়শ্চিত্ত?"

সুরেশ্বর স্মিতমুখে বলিল, "অপরাধ করেছ ব'লে যদি সত্যি-সত্যিই ধারণা হ'য়ে থাকে তা হ'লে তুমিও যা হয় একটা কিছু প্রায়শ্চিত্ত কোরো। আর তা যদি না হ'য়ে থাকে ত এই যে মৌখিক ভদ্রতাটুকু প্রকাশ কর্‌লে তার দ্বারাই তোমার নিষ্কৃতি হোক!"

কতকটা মাধবীর উপস্থিতির জন্য এবং কতকটা অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কার আতঙ্কে বিমানবিহারী তাহার যত্নাবরুদ্ধ আক্রোশকে পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর মতন মনের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া গৃহে ফিরিয়া গেল। রাত্রে বহু বিলম্বের পর যে নিদ্রা অবশেষে আসিল, দুঃস্বপ্নের দ্বারা তাহা অবিরত খণ্ডিত হইতে লাগিল, এবং যে অগ্নি বহু পূর্ব্বে সুরেশ্বরের বাটীতেই নিভিয়া গিয়াছিল স্বপ্নের মধ্যে তাহা বারম্বার প্রজ্বলিত হইয়া শতগুণ ধূম উদ্‌গীর্ণ করিতে লাগিল। বিমানবিহারী সভয়ে দেখিল সেই ঘূর্ণায়মান ধূম-কুণ্ডলীর মধ্যে পড়িয়া সুমিত্রা অসহ্য যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে, এবং তাহার সুবর্ণ-সদৃশ মুখমণ্ডল ধূম-প্রভাবে তাম্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে!

অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া বিমানবিহারী জাগ্রত হইয়া দেখিল কক্ষমধ্যে দিবালোক প্রবেশ করিয়াছে। উপস্থিত বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া প্রথমটা সে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সমস্ত কথা স্মরণ করিয়া একটা গভীর অপ্রসন্নতায় তাহার চিত্ত মলিন হইয়া উঠিল।

আহার করিতে বসিয়া দুই-চারি গ্রাস খাওয়ার পর সহসা বিমানবিহারীর মনে পড়িল যে তাহারই জন্য মাধবী ও সুরেশ্বর উভয়ে অনাহারে দিন যাপন করিতেছে। মনে পড়িবামাত্র তাহার কণ্ঠদেশ যেন ধীরে ধীরে অবরুদ্ধ হইয়া আসিল, মুখের মধ্যে যে খাদ্য ছিল তাহা আর কিছুতেই কণ্ঠ দিয়া নামিতে চাহিল না! দুই-চারিবার অন্ন ও ব্যঞ্জন নাড়িয়া-চাড়িয়া বিমান আহার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।

দূর হইতে সুরমা দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরপো না খেয়ে উঠে' পড়্‌লে যে?"

বিমান মৃদু হাসিয়া বলিল, "গলায় বড় লাগ্‌ছে, বউদি।"

"তবে একটু দুধ গরম করে' এনে দিই, খাও।"

"জল পর্য্যন্ত খাবার উপায় নেই!"

চিন্তিত হইয়া সুরমা বলিল, "কি হয়েছে গলায়? ঘা-টা হয়নি ত? ডাক্তার দেখালে না কেন?"

বিমান তেম্‌নি অল্প হাসিয়া বলিল, "দর্‌কার নেই, কাল নাগাৎ ভাল হ'য়ে যাবে!"

কাছারীতে বিমানবিহারীর ধমকে আর্‌দালী-চাপ্‌রাশীর দল সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল, আম্‌লারা হাকিমের মূর্ত্তি দেখিয়া পলাইয়া পলাইয়া বেড়াইতে লাগিল এবং উকিল-মোক্তার-দের সহিত বিমানের কথায়-কথায় অকারণে কলহের সৃষ্টি হইতে লাগিল।

যে ক্রোধের প্রায় সমস্তটাই চাপা থাকিয়া মাঝে-মাঝে অতি সামান্য অংশ এইরূপে প্রকাশ পাইতেছিল, তাহা

সহসা আগুনের মত দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল যখন সন্ধ্যার পর সুরেশ্বর তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

"আবার কি মতলবে এসেছ ?"

সুরেশ্বর স্মিতমুখে বলিল, "সদুদ্দেশ্যে। চর্কার দাম পরিশোধ হ'য়ে সুমিত্রার পাঁচ আনা পয়সা উদ্বৃত্ত হয়েছে, সেইটে তোমাকে দিতে এসেছি।"

সহসা আগ্নেয়গিরির মতন বিমানবিহারী উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। "আমি কি সুমিত্রার খাজাঞ্চী, না তোমার পিওন্, যে আমাকে পাঁচ আনা পয়সা দিতে এসেছ ?"

বিমানবিহারীর ঔদ্ধত্যে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া সুরেশ্বর শান্তভাবে কহিল, "সুমিত্রার তুমি খাজাঞ্চী কি না সে বিচার তুমি সুমিত্রার সঙ্গে কোরো, কিন্তু আমার যে তুমি পিওন্ নও সে-কথা আমি অকপটে স্বীকার কর্‌ছি। কিন্তু তুমি যখন আমার বাড়ী ব'য়ে কাল সুমিত্রার চিঠি আর সুতো দিয়ে এসেছিলে, তখন তোমার বাড়ী ব'য়ে পাঁচ আনা পয়সা তোমাকে দিয়ে যাবার অধিকার আমার আছে ব'লে আমি বিশ্বাস করি।"

একথার কোনও উত্তর না দিয়া তপ্ত হইয়া বিমান-বিহারী বলিতে লাগিল, "কিন্তু কাল নিজের বাড়ী বসে' ভাইয়ে-বোনে কোমর বেঁধে অমন ক'রে আমাকে অপমানিত আর উৎপীড়িত কর্‌বার কি অধিকার তোমাদের ছিল শুনি ?"

সুরেশ্বরের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল; কোনওপ্রকারে সে নিজেকে সংবৃত করিয়া লইয়া বলিল, "না, তুমি যেমন ঘরে বসে' গৃহাগতকে অপমান কর্‌বার অধিকার রাখ তেমন অধিকার আমাদের কারও ছিল না। তোমার কাছে আমি আজও হার্‌লাম।"

মুখ বিকৃত করিয়া বিদ্রূপের স্বরে বিমানবিহারী বলিল, "চুপ করো, চুপ করো সুরেশ্বর! তোমার উপর, আর তোমার ওই বিনিয়ে-বিনিয়ে কথা-বলার উপর আমার আর কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নেই! তোমার ধার-করা মহত্ব একেবারে ধরা পড়ে' গেছে। দস্যুবৃত্তির উদ্দেশ্যেই যে সুমিত্রাকে তুমি দস্যুর হাত থেকে উদ্ধার করেছিলে তা বুঝ্‌তে আর কারও বাকি নেই! চর্কা তোমার চক্রান্ত, আর খদ্দর তোমার ছলনা! শুন্‌লে ?"

সরক্ত-স্মিতমুখে সুরেশ্বর বলিল,"শুন্‌লাম! কিন্তু আর বেশী শুনিয়ো না, কি জানি সেসব শুনে' যদি আর-একজন গুণ্ডার হাত থেকে সুমিত্রাকে উদ্ধার করা দর্‌কার বলে' মনে হয়!"

"উদ্ধার করা ?" বিমান হাসিয়া উঠিল। "মহত্বের আবরণে নিজেকে ঢেকে রাখ্‌বার বিষয়ে তোমার চমৎকার শিক্ষা আছে দেখ্‌ছি! বাঘের হাত থেকে ছাগল-ছানাকে সিংহ যে-রকম উদ্ধার করে তোমার উদ্ধার সেইরকম ত? ঠিক পরহিতার্থে নয় বোধ হয় ?"

সুরেশ্বর ক্ষণকাল গভীরবিস্ময়ে বিমানবিহারীর দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, "প্রেমের দ্বন্দ্বে বিজয়ী হবার এ ঠিক্ পথ নয় বিমান। সুমিত্রাকে লাভ কর্‌তে হ'লে তুমি তার চিত্ত অধিকার কর্‌বারই চেষ্টা করো। আমার সঙ্গে কলহ-বিবাদ কর্‌লে ত কোন ফল হবে না! আমি তোমাকে কথা দিয়ে যাচ্ছি ভাই, তোমাদের পথ থেকে আমি একেবারে সরে' দাঁড়ালাম!"

বিমানবিহারীর উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়া সুরেশ্বর দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

[২৫]

ইহার পর, নদী যেমন করিয়া সাগর-বক্ষে নিজেকে সমর্পণ করে ঠিক্ তেম্‌নি করিয়া সুরেশ্বর দেশের কার্য্যে নিজেকে সমর্পিত করিল। সে সুগভীর নিমজ্জন লক্ষ্য করিয়া মাধবী পর্য্যন্ত চিন্তিত হইয়া উঠিল। সে বুঝিতে পারিল যে ইহা স্বাভাবিক অবগাহন নয়; নিজেকে লুপ্ত করিবার জন্য ইহা অতলে অবতরণ।

কিছুদিন পরেই সুরেশ্বরের এই অধীর তৎপরতা এক বৎসরের জন্য সর্‌কারের কারাগৃহে অবরুদ্ধ হইল।

ক্রমশঃ

শ্রী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যুযুৎসু

শুধু হাতে প্রতিপক্ষের ও আততায়ীর সম্মুখীন হওয়ার, কিম্বা তাহারা অসিধারী অথবা অস্ত্রশস্ত্র-সম্পন্ন থাকিলে তাহাদের অসি ও অস্ত্র-শস্ত্র কাড়িয়া লওয়ার এবং তাহাদিগকে প্রতিহত করিবার বিভিন্ন কৌশলের নামই "যুযুৎসু।"

অসি সম্পর্কে "যুযুৎসুর" যে যে কৌশল প্রযোজ্য হইতে পারে, কেবল মাত্র তাহা হইতেই কতিপয় সহজসাধ্য পাঠ নিম্নে বর্ণিত হইল। প্রত্যক্ষ গুরু-উপদেশ, মৌলিকত্ব ও উদ্ভাবনী শক্তি প্রভাবে শিক্ষার্থীগণ নিজ নিজ উৎকর্ষ সাধন করিয়া লইবেন।

"ফুরৎ," "তুরৎ," "জুরৎ," অর্থাৎ মন, চক্ষু ও শরীর এই তিনটির সমবেত ক্ষিপ্রকারিতা এবং "মুদ্" "সুদ্" ও "জুদ্" অর্থাৎ মন, বুদ্ধি ও অঙ্গচালনার বিশুদ্ধতা ও স্থৈর্য্যের প্রভাবেই যুযুৎসুর দক্ষতা-সম্পর্কে উৎকর্ষ জন্মিয়া থাকে। এবং "বিনোদ" সম্পর্কে সাধারণভাবে যে যে বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, "যুযুৎসু" সম্পর্কেও তাহা প্রায় সর্ব্বরূপেই প্রযোজ্য।

১ম যুযুৎসু (ক)

প্রথম পাঠ

"হুল" প্রয়োগের উপক্রমের সঙ্গে সঙ্গেই যুযুৎসু প্রয়োগকারী তুরন্তে বামাবর্ত্তে অর্দ্ধেক ঘুরিয়া সঙ্গে-সঙ্গেই দক্ষিণ পদ সম্মুখে ও ঈষৎ বামে অগ্রসর করাইয়া নিজ দক্ষিণ পার্শ্বের লক্ষ্যে লম্ফ প্রদানের উপক্রম করিবে। যথা প্রথম চিত্রে। এবং তদবস্থায়ই প্রতিপক্ষ কর্ত্তৃক "হুল" প্রয়োগের সঙ্গে-সঙ্গেই সতর্কতার সহিত অসির অগ্রবিন্দুর গতির লক্ষ্য হইতে শরীর বাম পার্শ্বে অপসৃত রাখিয়া চক্ষুর নিমেষে লম্ফ প্রদানে "হুল" প্রয়োগকারীর দক্ষিণ পার্শ্বের দিকে লক্ষ্যে অতি সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া নিজ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাহার মণিবন্ধ ধরিয়া ফেলিতে হইবে। ধরিবার কালে নিজ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সম্মুখে ও ঊর্দ্ধ দিকে থাকিবে। যথা দ্বিতীয় চিত্রে।

২য় যুযুৎসু (খ)

২য় (ক) যুযুৎসু

৩য় (ক) যুযুৎসু

২য় (গ) যুযুৎসু

৩য় (খ) যুযুৎসু
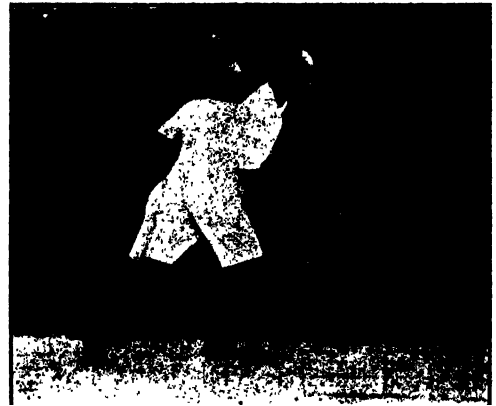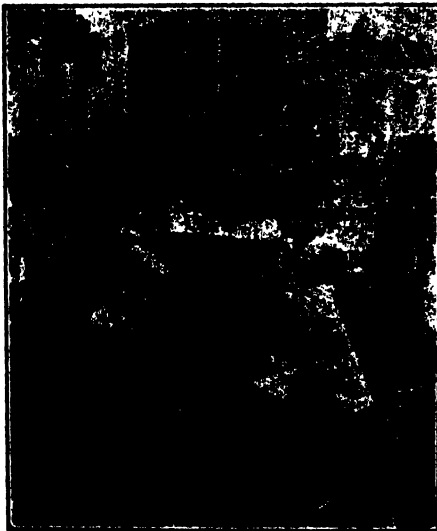
[পুনঃ পুনঃ অভ্যাস দ্বারাই এই কৌশলটির, তথা অন্যান্য কৌশলেরও, বিশুদ্ধতা সাধন করিয়া লইতে হয়।]

তৎপর যুযুৎসু প্রয়োগকারী তুরন্তে দক্ষিণাবর্তে "হুল" প্রয়োগকারীর দক্ষিণ বাহুর উপর হইতে তাহার শরীর ও বাহুর মধ্য দিয়া নিজ বাম হস্ত প্রবেশ করাইয়া নিজ বাম প্রকোষ্ঠের (অগ্রবাহুর) বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দিকের অস্থি পার্শ্বোপরি "হুল" প্রয়োগকারীর দক্ষিণ কফোণি (কনুই) স্থাপন করিয়া দক্ষিণ হস্তে তাহার মণিবন্ধ সজোরে নিম্নের দিকে চাপিয়া ধরিবে। যথা তৃতীয় চিত্রে।

বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে এই কৌশল তুরন্তে প্রয়োগ করিতে পারিলে "হুল" প্রয়োগকারীর দক্ষিণ হস্ত সম্পূর্ণ আড়ষ্ট হইয়া পড়িবে; এবং তদবস্থায় তাহার অসি কাড়িয়া লওয়া কিম্বা তাহাকে বন্দীভাবে চালনা করা সম্পূর্ণই সম্ভব হইবে।

প্রতিকার-কল্পে যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অসিধারী তুরন্তে দক্ষিণাবর্তে ঘুরিয়া "হুলের" প্রয়োগ সংহরণ করিয়া যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর পৃষ্ঠদেশ আক্রমণ করিবে; কিম্বা যুযুৎসু-প্রয়োগকারী তৎপূর্ব্বেই

বাহু ধরিয়া ফেলিলে, তুরন্তে বাম হস্ত দ্বারা নিম্নে বর্ণিত "ব্যাঘ্র থাবার" প্রয়োগে যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর চক্ষু আক্রমণ করিয়া নিজকে মুক্ত করিয়া লইবে।

দ্বিতীয় পাঠ

"চিরের" আক্রমণে যুযুৎসু-প্রয়োগকারী তুরন্তে দক্ষিণ পদ সম্মুখ-লক্ষ্যে অগ্রসর করিয়া ঈষৎ লম্ফ-সহযোগে
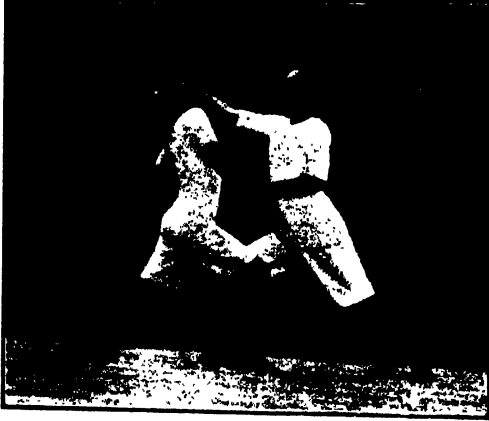
৪র্থ (ক) যুযুৎসু

"চির"-প্রয়োগকারীর অতি সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া বাম হস্তে অসিধারীর দক্ষিণ মণিবন্ধে সজোরে আঘাত করিয়া ঐ হস্ত অবরোধ করিয়া রাখিবে এবং সঙ্গে সঙ্গেই দক্ষিণ হস্তে "ব্যাঘ্রথাবার" প্রয়োগে তাহার চক্ষু আক্রমণ করিবে। যথা চতুর্থ চিত্রে।

৪র্থ (খ) যুযুৎসু

"ব্যাঘ্রথাবা" প্রয়োগের প্রারম্ভে প্রথমতঃ মণিবন্ধ ভঙ্গ-ভাবে ও অঙ্গুলীগুলির অগ্রবিন্দু নিম্নমুখে থাকিবে, এবং বাহু উত্তোলিত করিয়া প্রয়োগের উপক্রমের সঙ্গে সঙ্গেই মণিবন্ধ হস্তপৃষ্ঠের দিকে বক্র হইতে থাকিবে এবং সমগ্র কর-পল্লব ও অঙ্গুলীগুলি ক্রমে উর্দ্ধমুখ হইলে তীব্রগতিতে সমগ্র হস্ত অগ্রসর করিয়া তর্জ্জনী ও অনামিকা দ্বারা পরস্পরে আততায়ীর দক্ষিণ ও বাম চক্ষুতে সজোরে আঘাত করিতে হইবে; সঙ্গে সঙ্গেই মধ্যমা ভ্রূ-মধ্যে এবং হস্ততল নাসিকার অগ্রভাগে পতিত হইবে।

বাম হস্তে "ব্যাঘ্রথাবা" প্রয়োগে পূর্ব্ব-বর্ণনা মধ্যে "বাম" স্থলে "দক্ষিণ" ও "দক্ষিণ" স্থলে "বাম" ধরিয়া লইলেই হইবে।

"ব্যাঘ্রথাবার" প্রতিকার-কল্পে নিজ করতল দ্বারা প্রয়োগকারীর "মণিবন্ধপুরঃ"তে (হাতকাটি পেশেতে) সজোরে আঘাত করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই ঈষৎ "অবনমন" সহ অগ্রসর হইয়া আক্রমণের উপক্রম করিতে হইবে। অথবা ঈষৎ অবনমনসহ সম্পূর্ণ দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরিয়া পুনরায় প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হইয়া আক্রমণসহ অগ্রসর হইতে হইবে।

"ব্যাঘ্রথাবায়" আক্রান্ত হইলে কদাচ চক্ষু মুদ্রিত করিতে নাই, কিম্বা মুখ ফিরাইয়া সম্মুখ-দৃষ্টি, সতর্কতা ও চিত্ত-স্থৈর্য্যের ব্যাঘাত জন্মাইতে নাই। যতদূর সম্ভব তীব্র দৃষ্টিতে আক্রমণকারীর দৃষ্টি-প্রভাব বিহ্বল করিয়া দৃষ্টি মধ্য দ্বারাই স্বকীয় মনের তেজসহ প্রতিপক্ষের মন নিস্তেজ করিয়া দিতে হইবে। তবে যাহার প্রভাব অধিক তাহারই জয়লাভের অধিক সম্ভাবনা।

তৃতীয় পাঠ

"শির," "তামেচা" প্রভৃতির আক্রমণে যুযুৎসুপ্রয়োগ-কারী ঈষৎ বামাবর্ত্তে ঘুরিয়া তুরন্তে দক্ষিণ পদ অগ্রসর করিয়া অসিধারীর দক্ষিণ পদের দক্ষিণ পার্শ্বে স্থাপন করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাম হস্তে অসিধারীর মুষ্টির অগ্রভাগ ধরিয়া ফেলিবে এবং তাহার কফোনি ধরিবার উপক্রম করিবে। যথা পঞ্চম চিত্রে।

৫ম যুযুৎসু

তৎপর অপ্রতিহত-গতিতে অঙ্গ-চালনাসহ তুরন্তে দক্ষিণ হস্ত উর্দ্ধে ও বাম হস্ত নিম্নের দিকে চালনা করিয়া অসিধারীর হস্ত সম্পূর্ণ আড়ষ্ট করিয়া ফেলিবে। যথা ষষ্ঠ চিত্রে।

৬ষ্ঠ (ক) যুযুৎসু
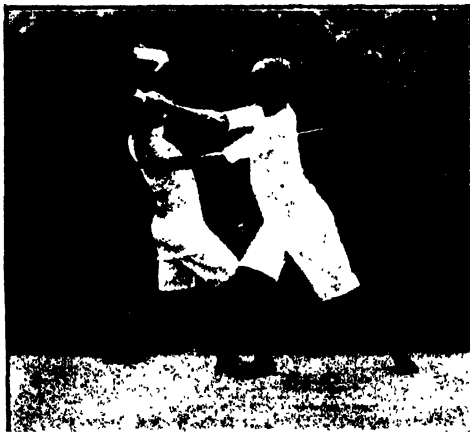
বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে এই কৌশল প্রয়োগ করিতে পারিলে অসিধারীর হস্ত হইতে অসি স্খলিত হইয়া পড়িবে এবং সে নিজেও ভূমিতে পতিত হইবে।

প্রতিকার-কল্পে অসিধারী তুরন্তে দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরিয়া যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর দক্ষিণ পার্শ্বে পতিত হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গেই অসি ঘুরাইয়া মস্তক পৃষ্ঠ আক্রমণ করিবে।

৬ষ্ঠ (ক) যুযুৎসু

যুযুৎসু-প্রয়োগকারী অসিধারীর হস্ত ধরিয়া ফেলিলে অসিধারী তুরন্তে বাম হস্তে "ব্যাঘ্রথাবা" প্রয়োগ করিয়া নিজকে মুক্ত করিয়া লইবে।

চতুর্থ পাঠ

"সাগু" "বাহেরা" প্রভৃতির আক্রমণে তুরন্তে বাম হস্ত দ্বারা অসিধারীর মুষ্টি-পৃষ্ঠে সজোরে চাপিয়া ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গেই ঈষৎ বামাবর্ত্তে ঘুরিয়া দক্ষিণ পদ পূর্ণমাত্রায় সম্মুখে বিক্ষেপ করিয়া অসিধারীর দক্ষিণ প্রগণ্ডস্থ উর্ব্বীমস্থে দক্ষিণ

৭ম (ক) যুযুৎসু

স্তের চারিটি অঙ্গুলীর অগ্রভাগ সজোরে চাপিয়া ধরিতে হইবে। যথা সপ্তম চিত্রে।

৭ম (খ) যুযুৎসু

তৎপরে তুরন্তে দক্ষিণাবর্ত্তে অর্দ্ধেক ঘুরিয়া বামপদ সম্মুখে ও বামে পূর্ণমাত্রায় বিক্ষেপ করিয়া অসিধারীর দক্ষিণ পার্শ্বে পতিত হইয়া বামহস্তে বাম-গতিতে ও দক্ষিণ ও দক্ষিণ গতিতে সুকৌশলে ও সজোরে চালনা করিলেই অসিধারীর হস্ত আড়ষ্ট হইয়া পড়িবে এবং সে ভূমিতে পতনোন্মুখ হইবে। তদবস্থায় উভয় হস্ত তাহার দক্ষিণ মণিবন্ধ বামাবর্ত্তে সজোরে মুচ্‌ড়াইয়া অসি কাড়িয়া লওয়া নিতান্তই সহজ-সাধ্য হইবে।

প্রতিকার কল্পে প্রক্রিয়ার প্রথমাবস্থাতেই বাম হস্তদ্বারা যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর মণিবন্ধে সজোরে আঘাত করিয়া নিজ হস্ত মুক্ত করিয়া লইতে হইবে এবং দক্ষিণাবর্ত্তে অর্দ্ধেক ঘুরিয়া যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর দক্ষিণ পার্শ্বে পতিত হইয়া পুনরাক্রমণের উপক্রম করিতে হইবে।

বিলম্ব হইয়া পড়িলে "ব্যাঘ্রথাবার" প্রয়োগে নিজকে মুক্ত করিয়া লইতে হইবে।

পঞ্চম পাঠ

"মোঢ়া", "দে" প্রভৃতির আক্রমণে তুরন্তে ঈষৎ বামাবর্ত্তে ঘুরিয়া উভয় হস্তে অসিধারীর মুষ্টি ধরিয়া ফেলিতে হইবে যেন উভয় হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী অসিধারীর হস্তপৃষ্ঠে পতিত হয় এবং বাম হস্ত অসিধারীর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দিকে এবং দক্ষিণ হস্ত তাহার কনিষ্ঠাঙ্গুলীর দিকে থাকে; তৎপরে প্রথমতঃ অসিধারীর মুষ্টি তাহার করতলের দিকে সজোরে বক্র করিয়া তুরন্তে তাহার মণিবন্ধ সজোরে বামাবর্ত্তে মুচ্‌ড়াইয়া দিতে হইবে। যথা অষ্টম চিত্রে।

৮ম (ক) যুযুৎসু

৮ম (খ) যুযুৎসু

তৎপর অতি সহজেই অসিধারীর অসি কাড়িয়া লওয়া সম্ভব হইবে। এই প্রক্রিয়ার ফলে অসিধারীর হস্ত সম্পূর্ণ আড়ষ্ট হইয়া যাইবে এবং সে নিজেও ভূমিতে পতনোন্মুখ হইবে।

প্রতিকার হেতু অসিধারী তুরন্তে বাম হস্তে যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর মণিবন্ধে সজোরে আঘাত করিয়া তাহার চেষ্টা ব্যর্থ করিবে, (প্রয়োজন হইলে ঈষৎ দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরিয়া পড়িবে) এবং লাঠি ঘুরাইয়া যুযুৎসু-প্রয়োগকারীকে পুনরাক্রমণ করিবে। যথা নবম চিত্রে।

৯ম যুযুৎসু

বিলম্ব হইয়া পড়িলে অসিধারী তুরন্তে ব্যাঘ্রথাবার প্রয়োগ করিবে।

অসিধারীর প্রতিকার ব্যর্থ করিতে হইলে যুযুৎসু-প্রয়োগকারীকে তুরন্তে বামাবর্ত্তে ঘুরিয়া হস্ত-চালনা দ্বারা অসিধারীর হস্ত-প্রক্রিয়া ব্যর্থ করিয়া নিজকে মুক্ত করিয়া পুনঃ প্রতিকারসহ অসিধারীর সম্মুখীন হইতে হইবে।

ষষ্ঠ পাঠ

"বাহেরা", "মোচা" প্রভৃতিতে আক্রান্ত হইলে তুরন্তে দক্ষিণ পদ অগ্রসর করিয়া অসিধারীর অতি সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া দক্ষিণ কর-তল তাহার নিম্ন হনুতলে এবং বাম করতল মস্তকশীর্ষে স্থাপন করিয়া অতি ক্ষিপ্রকারিতাসহ হস্ত চালনায় অসিধারীর মস্তক বামাবর্ত্তে মুচ্‌ড়াইয়া দিতে হইবে। এই প্রক্রিয়াকালে যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর উভয় হস্তেরই অঙ্গুলীর অগ্রভাগ অসিধারীর বাম দিক্ লক্ষ্যে নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। যথা দশম চিত্রে।

এই প্রক্রিয়ার ফলে অসিধারীকে চিৎ-ভাবে ভূতলশায়ী করা সম্ভবপর হয়।
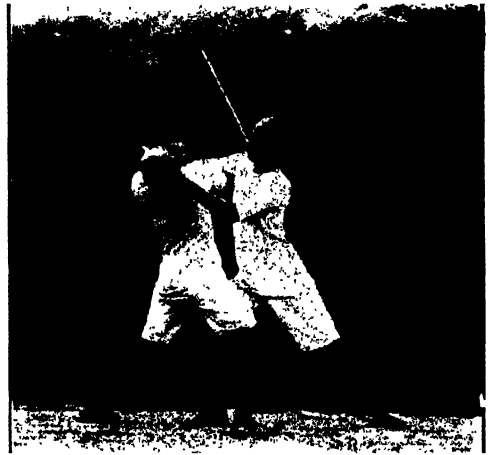
১০ম (ক) যুযুৎসু

১০ম (খ) যুযুৎসু

প্রক্রিয়ার প্রারম্ভ সহ সমগ্র দক্ষিণ উরুদেশ অসিধারীর উভয় উরুমধ্যে সম্যক্‌রূপে প্রবেশ করাইয়া দিতে পারিলে, [যথা দশম (ক) চিত্রে] অসিধারীর তৎকালোচিত অঙ্গ-চেষ্টা সম্পূর্ণরূপেই অবরুদ্ধ হইয়া পড়িবে।

প্রতিকার নিমিত্ত অসিধারী তুরন্তে বাম হস্ত দ্বারা "ব্যাঘ্রথাবার" প্রয়োগ করিবে; অথবা যুযুৎসু-প্রয়োগ-কারীর মণিবন্ধপূরঃতে সজোরে আঘাত করিয়া ঈষৎ "অবনমন" সহ দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরিয়া তাহার "অণ্ডকোষ"

"বস্তি" অথবা অন্য কোনও মর্ম্মে অসিমুষ্টি দ্বারা সজোরে আঘাত করিবে।

প্রতি-প্রতিকার হেতু যুযুৎসু-প্রয়োগকারীকে সম্পূর্ণ বামাবর্ত্তে ঘুরিয়া পুনরায় অসিধারীর সম্মুখীন হইতে হইবে।

সপ্তম পাঠ

"কোমর", "অঙ্ক" প্রভৃতির আক্রমণে তুরন্তে দক্ষিণ পদ পূর্ণমাত্রায় অগ্রসর করিয়া ক্ষিপ্রকারিতাসহ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা অসিধারীর "মণিবন্ধ পূরঃ"তে ধরিতে হইবে এবং দক্ষিণাবর্ত্তে অর্দ্ধেক ঘুরিবার উপক্রমসহ বাম পদ সম্মুখে আনিতে আনিতে বাম হস্ত দ্বারা অসিধারীর কফোণি-পৃষ্ঠে সজোরে আঘাত করিতে হইবে এবং তৎসঙ্গেই হস্ত-চালনায় অসিধারীর মণিবন্ধ ঊর্দ্ধদিকে ও তাহার কফোণি নিম্নের দিকে সজোরে চাপিয়া তাহাকে বিহ্বল করিয়া ফেলিতে হইবে। যথা একাদশ চিত্রে।
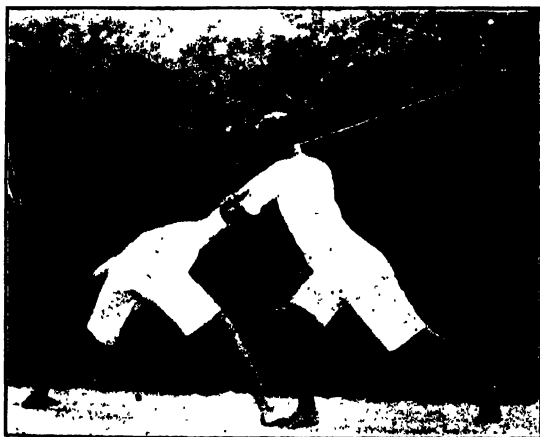
১১শ (ক) যুযুৎসু

তৎপরে অষ্টম চিত্র-সম্পর্কিত বর্ণনানুরূপ প্রক্রিয়ায় অসি কাড়িয়া লওয়া নিতান্তই সহজ হইয়া পড়িবে।

প্রতিকারাদি ষষ্ঠ পাঠের অনুরূপ। অথবা ঈষৎ বামাবর্ত্তে ঘুরিবার উপক্রমসহ তীব্র-গতিতে অঙ্গ চালনা দ্বারা দক্ষিণ হস্ত মুক্ত করিয়া ক্রমে ঊর্দ্ধ ও বাম দিক্ হইতে অসি-চালনা দ্বারা পুনরাক্রমণ করিতে হইবে।

অষ্টম পাঠ

"আসর," "চাপ্নি" প্রভৃতির আক্রমণ তুরন্তে দক্ষিণ

১১শ (খ) যুযুৎসু

পদ অগ্রসর করিয়া অসিধারীর অতি সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া দক্ষিণ হস্তে তাহার "মণিবন্ধ-পৃষ্ঠে" সজোরে আঘাত করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গেই বাম হস্তে "ব্যাঘ্রথাবার" প্রয়োগ করিতে হইবে। যথা দ্বাদশ চিত্রে।

১২শ (ক) যুযুৎসু

প্রতিকারের হেতু অসিধারী তুরন্তে বাম হস্তে যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর বাম মণিবন্ধে সজোরে আঘাত করিয়া নিজ চক্ষু মুক্ত করিয়া লইবে এবং সঙ্গে সঙ্গেই দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরিবার উপক্রমসহ তীব্রবেগে নিজ দক্ষিণ হস্ত মুক্ত করিয়া অসি-চালনাসহ পুনরাক্রমণের উপক্রম করিবে।

১২শ (গ) যুযুৎসু

নবম পাঠ

“মন্,” “ভাণ্ডার” প্রভৃতির আক্রমণে তুরন্তে ঈষৎ বামাবর্ত্তে ঘুরিয়া দক্ষিণ পদ পূর্ণমাত্রায় সম্মুখে ও বামে অগ্রসর করিয়া দক্ষিণ হস্তে অসিধারীর দক্ষিণ মণিবন্ধ ধরিতে হইবে এবং বিদ্যুদ্বেগে দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরিয়া অসি-ধারীর পশ্চাতে যাইয়া ও সঙ্গে সঙ্গে তাহার দক্ষিণ হস্ত তাহার পশ্চাতে লইয়া বাম হস্তে অসিধারীর মণিবন্ধ ও দক্ষিণ হস্তে কফোণি ধরিয়া সজোরে তাহার প্রকোষ্ঠ (পুরোবাহু) ঊর্দ্ধদিকে ঠেলিয়া দিতে (বিপ্রকর্ষণ করিতে) হইবে। তুরন্তে এই কৌশল-প্রয়োগ করিতে পারিলে অসিধারী অধোমুখে ভূপতিত হইবে। যথা ত্রয়োদশ চিত্রে।

প্রতিকার-কল্পে অসিধারীকে তুরন্তে “অবনমন” সহ দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরিয়া যযুৎসু-প্রয়োগকারীর সম্মুখীন হইতে হইবে।

দশম পাঠ

“সাকেন্,” “করক্” প্রভৃতির আক্রমণে তুরন্তে ঈষৎ বামাবর্ত্তে ঘুরিয়া দক্ষিণ পদ পূর্ণমাত্রায় সম্মুখে ও বামে বিক্ষেপ করিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গেই দক্ষিণ হস্তে অসিধারীর

১৩শ যুযুৎসু

দক্ষিণ মণিবন্ধ প্রতিরোধ করিয়া বিদ্যুদ্বেগে দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরিয়া অসিধারীর পশ্চাতে যাইয়া পিছন হইতে অসি-ধারীর গলদেশ দক্ষিণ হস্তে জড়াইয়া ধরিয়া প্রকোষ্ঠের (পুরোবাহুর) বৃদ্ধাঙ্গুলীর দিকের অস্থিপার্শ্ব দ্বারা তাহার কণ্ঠ-নালী সজোরে চাপিয়া ধরিতে হইবে এবং বাম হস্তে অসিধারীর বাম মণিবন্ধ কিম্বা বাম বাহু সজোরে আকর্ষণ করিয়া তাহাকে দক্ষিণ পার্শ্বে ভূতলশায়ী করিবার উপক্রম করিতে হইবে। যথা চতুর্দ্দশ চিত্রে।

১৪শ (ক) যুযুৎসু

অথবা পূর্ব্ববর্ণিত প্রক্রিয়ানুরূপ পশ্চাতে যাইয়া বাম বাহু দ্বারা কণ্ঠ-নালী চাপিয়া ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে অসিধারীর

অসি মুষ্ট বামাবর্তে মুচড়াইয়া তাহার অসি কাড়িয়া লইতে হইবে। যথা পঞ্চদশ চিত্রে।

১৫শ যুযুৎসু

প্রতিকার-কল্পে অসিধারী ও যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তুরন্তে ঈষৎ "অবনমন" সহ দক্ষিণাবর্তে ঘুরিয়া অসি-চালনাসহ যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর সম্মুখীন হইয়া পুনরাক্রমণের উপক্রম করিবে।

একাদশ পাঠ

"আনি" প্রভৃতির আক্রমণে তুরন্তে দক্ষিণ পদ অগ্রসর করিয়া বিদ্যুদ্বেগে "অবনমন"সহ "জানু-বিজানু"তে বসিয়া পড়িয়া দক্ষিণ ও বাম হস্তে পরস্পরে অসিধারীর বাম ও দক্ষিণ পদের গুল্ফ সন্ধির সম্মুখ-পার্শ্বে সজোরে আঘাত করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গেই মস্তক দ্বারা নিম্ন হইতে অণ্ডকোষে ও বস্তি-মর্ম্মে সজোরে আঘাত করিতে হইবে। যথা ষোড়শ চিত্রে।

১৬শ (ক) যুযুৎসু

১৬শ (খ) যুযুৎসু

অথবা, পূর্ব্ববর্ণিত প্রক্রিয়ানুরূপে বসিয়া পড়িয়া তুরন্তে উভয় হস্তে পরস্পরে অসিধারীর গুল্‌ফসন্ধিদ্বয়ের পশ্চাৎ-পার্শ্বে ধরিয়া সজোরে সম্মুখে আকর্ষণ করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গেই দক্ষিণ স্কন্ধ দ্বারা অসিধারীর দক্ষিণ জানু-সন্ধিতে সজোরে আঘাত করিতে হইবে। যথা সপ্তদশ চিত্রে।

১৭শ যুযুৎসু

শেষোক্ত প্রক্রিয়া বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে সম্পন্ন করিতে পারিলে অসিধারী চিৎ হইয়া ভূপতিত হইবে।

প্রতিকার-কল্পে অসিধারীকে সম ক্ষিপ্রকারিতাসহ তুরন্তে লম্ফ সহযোগে দক্ষিণাবর্তে অর্দ্ধেক ঘুরিয়া সঙ্গে সঙ্গেই অসি চালনা দ্বারা যুযুৎসুপ্রয়োগকারীর দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করিতে হইবে। যথা অষ্টাদশ চিত্রে।

১৮শ যুযুৎসু

প্রতি-প্রতিকার কল্পে যুযুৎসু-প্রয়োগকারীকেও তুরন্তে দক্ষিণাবর্তে অর্দ্ধেক ঘুরিয়া পূর্ণ বিক্রমে অসিধারীর সম্মুখীন হইতে হইবে।

"বিনোদ" ও "যুযুৎসু" সম্পর্কিত সমস্ত বর্ণনাতেই দক্ষিণ হস্তের প্রাধান্য কল্পনা করিয়া লওয়া হইয়াছে। বাম হস্তের প্রাধান্য কালে ঐ-সমস্ত বর্ণনা-মধ্যে "দক্ষিণ" স্থলে "বাম" ও "বাম" স্থলে "দক্ষিণ" ধরিয়া লইলেই হইবে।

যাহারা অসি-চালনায় সুদক্ষ তাহাদের প্রতি "বিনোদ" কিম্বা "যুযুৎসু"র কৌশল প্রয়োগ করা নিতান্ত সহজ সাধ্য নয়; কিন্তু যাহারা অসি কৌশলের সঙ্গে "বিনোদ" ও "যুযুৎসু"র কৌশলেও সুদক্ষ তাহারা অসিযুদ্ধ-কালে সুযোগ-মতে "বিনোদ" ও "যুযুৎসু"র কৌশল-প্রয়োগেও সমর্থ হন বলিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাধারণতঃ তাহাদেরই উৎকর্ষ লক্ষিত হইয়া থাকে, তাই "পদচালনা" "বিনোদ" এবং 'যুযুৎসু'র দক্ষতা-অর্জ্জন-সহযোগেই অসি-শিক্ষার পূর্ণতা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

ক্ষত-প্রতিকার

অসি-শিক্ষা-কালে প্রায়ই সামান্য সামান্য আঘাত সহ্য করিতে হয়; সময়ে সময়ে রক্তপাতও হইয়া থাকে এবং মস্তকাস্থির উপরিস্থিত চর্ম্মও ছিন্ন হইয়া যায়। ঘটনাস্থলে প্রায়ই উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্য লাভ সম্ভবপর হয় না বলিয়া ঐসমস্তের প্রতিকার হেতু কতিপয় সহজসাধ্য উপায়ও লিপিবদ্ধ হইল। যথা :—

১। বেগুন-পাতা মর্দ্দন করিয়া ঐ বিশুদ্ধ রস ক্ষতমধ্যে প্রবেশ করাইয়া অবশিষ্ট মর্দ্দিত পদার্থগুলি ক্ষতোপরি প্রয়োগ করিয়া, বেগুন-পাতা দ্বারাই তাহা ঢাকিয়া পরে বস্তি বন্ধন করিয়া দিতে হয়।

আহত স্থান হইতে রক্ত নির্গত না হইয়া যদি ঐ স্থান লাল বর্ণ কিম্বা কৃষ্ণাভ লাল বর্ণ ও বেদনাযুক্ত হয়, তাহা হইলেও ঐরূপ বস্তি-বন্ধনে উপকার দর্শে।

২। মিষ্টিকুমড়ার পাতা ও লতা, গ্যাঁদাফুলের পাতা, বিশল্যকরণীর পাতা মোচা, থোড় প্রভৃতিরও

রস এবং অবশিষ্ট মর্দ্দিত পদার্থ পূর্ব্বোক্তরূপে প্রয়োগ করিলে অনেক স্থলে সুফল পাওয়া যায়।

৩। দূর্ব্বা ও চাউল একত্রে, কিম্বা শুধু দূর্ব্বা পেষণ করিয়া (অসুবিধা হইলে চর্ব্বণ করিয়া) নির্গত রস ক্ষতোপরি প্রয়োগ করিয়া অবশিষ্ট পিষ্ট কিম্বা চর্ব্বিত পদার্থসহ ক্ষতোপরি বস্তি বন্ধন করিয়া দিলেও সত্বর ক্ষত আরোগ্য হয়।

৪। হরিদ্রা পিষিয়া কিঞ্চিৎ চুণের সহিত মিলাইয়া ঈষৎ উষ্ণ করিয়া ক্ষতোপরি প্রয়োগ করিয়া বস্তি বন্ধন করিয়া দিলেও উপকার দর্শে।

☞ অবশ্য রক্তবাহী কোন বিশেষ শিরা কিম্বা ধমনী ছিন্ন হইলে কিম্বা কোন মর্ম্মস্থল আহত হইলে পূর্ব্বোক্ত উপায়সকলে বিশেষ ফল পাওয়া সম্ভবপর হয় না।

৫। চক্ষু আহত হইলে তাড়াতাড়ি উষ্ণ মোহন-ভোগসহ চক্ষুতে বস্তি বন্ধন করিয়া দিতে হয়; কিম্বা উষ্ণ স্বেদ দিতে হয়।

৬। আঘাত-প্রাপ্তি হেতু কোনও সন্ধিস্থল বেদনাযুক্ত হইলে কিঞ্চিৎ লবণ সংযুক্ত করিয়া সর্ষপ তৈল মর্দ্দন করিয়া দিতে হয়।

৭। আহত ব্যক্তিকে তাহার তৃপ্তি অনুরূপ উষ্ণ মোহনভোগ সেবন করাইতে হয়।

[আমার সামান্য অভিজ্ঞতার অনুরূপে "লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা" এইবারে সম্পূর্ণ হইল। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ ভুল, ভ্রান্তি ও ত্রুটিগুলি নির্দ্দেশ করিয়া আমাকে জ্ঞাপন করিলে নিতান্তই বাধিত ও উপকৃত হইব।]

শ্রী পুলিনবিহারী দাস
৯০।৩ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

মানুষের জীবন-রক্ষায় ইঁদুর

(যুক্তরাষ্ট্রের) জন্ হপ্‌কিন্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়ো-কেমিষ্ট্রির অধ্যাপক ডাক্তার এল্‌মার্ ভি ম্যাক্‌কলাম্, মানুষের খাদ্যতত্ত্ব-বিষয়ে একজন প্রধান পণ্ডিত। কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে তিনি মানুষের কোন্ খাদ্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় এবং শরীরবর্দ্ধক এই তত্ত্ব নির্ণয়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। মানুষ জানে না, কোন খাদ্য তাহার সর্ব্বাপেক্ষা দরকারী—সেইজন্য ডাক্তার ম্যাক্‌কলাম্ এই সত্য আবিষ্কারে ইঁদুরের সাহায্য লইয়াছেন। ইঁদুরের সাহায্যে এই কার্য্যে ডাক্তার ম্যাক্‌কলাম্ যে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা কয়েকজন প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিকের সাক্ষ্যে বুঝিতে পারা যায়। কোন একজন লোক এপর্য্যন্ত এই বিশেষ কার্য্যে এতদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

ডাঃ এল্‌মার ভি ম্যাক্‌কলাম—
মনুষ্য-খাদ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে একজন পৃথিবীবিখ্যাত পণ্ডিত।
বিজ্ঞানাগারে কাজ করিতেছেন
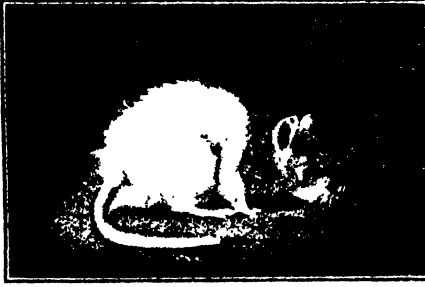
কিন্তু ডাঃ ম্যাক্‌কলাম্ দীর্ঘকাল ধরিয়া পরীক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া যাহা বুঝিতে পারিয়াছেন এবং আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই।

খাদ্য ইঁদুরের দেহের কি পরিবর্তন ঘটায়—দুইটি ইঁদুরের বয়স এক—
একটি খাঁটি দুধ খাওয়ান হয় অন্যটিকে হয় নাই,
তাই তাহার এই অবস্থা

তিনি এখনও ইঁদুর লইয়া নানাপ্রকার পরীক্ষা করিতেছেন, তাঁহার আশা আছে যে ইঁদুরের সাহায্যে তিনি এমন কতকগুলি মনুষ্য খাদ্য-তত্ত্ব আবিষ্কার করিবেন, যাহার ফলে আমাদের দেহ এবং প্রাণ বর্ত্তমান অপেক্ষা অধিকতর কাল কার্য্যক্ষম এবং সুস্থ থাকিবে। বাল্টিমুরে ডাঃ ম্যাক্‌কলামের বিজ্ঞানাগার একটি দেখিবার জিনিস। তাঁহার বিজ্ঞানাগারের প্রদর্শনী জানালাগুলিতে (show-windows) একবার চোখ পড়িলে বুঝিতে পারা যায়, তিনি কতপ্রকার সরঞ্জাম লইয়া এই কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

"ইঁদুরের সাহায্য না লইয়া ছুঁচোর সাহায্য লইয়াও এই কার্য্য করা চলিত," কেহ কেহ এই কথা বলিতে পারেন, কিন্তু ছুঁচোর স্বভাব বড় খারাপ, কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে তাহার ব্যবহার চলিতে পারে না—ছুঁচোর কোনপ্রকার সামান্য বুদ্ধি-বিবেচনা পর্য্যন্তও নাই। তাহা ছাড়া সে মানুষের সঙ্গে বনিবনা করিয়া চলিতে পারে না। ইঁদুরের মধ্যে একটা যথোচিত ভদ্রতা আছে, সাহস আছে এবং সে অনেক কিছু বুঝিতে পারে। এইজন্য ডাক্তার ম্যাক্‌কলাম্ ইঁদুরকেই তাঁহার বিজ্ঞানাগারের সঙ্গী করিয়াছেন।

ডাঃ ম্যাক্‌কলামের পরীক্ষাগারে হাজার খাঁচায় হাজার-হাজার ইঁদুর আছে। এইসমস্ত খাঁচা দেওয়ালে, জানালায়, টেবিলে ইত্যাদি নানা স্থানে সারি সারি করিয়া সাজান আছে। একটা একটা ইঁদুরকে এক-একরকম খাবার দেওয়া হয়, এবং সেই খাদ্যের ফল কি হয়, তাহা প্রত্যহ লক্ষ্য করা হয়, এবং অবশেষে তাহা মনুষ্য-খাদ্য তালিকার বিশেষ-বিশেষ নামে লিখিত হয়। ইঁদুরের খাদ্যের নানারকম তারতম্য, অদলবদল করিয়া ডাক্তার ম্যাক্‌কলাম্ বিশেষ-বিশেষ ইঁদুরকে সবল করেন, দুর্ব্বল করেন, অথবা অকাল-বৃদ্ধ করেন। খাদ্যের তারতম্যের উপর ইঁদুরের স্বাস্থ্য ভাল-মন্দ হওয়াও নির্ভর করে। প্রত্যহ নিয়মমত নির্দ্দিষ্ট খাদ্যদানে একটি ইন্দুরকে বহুকাল ধরিয়া যৌবনে রাখা যায়—ইহাও পরীক্ষিত হইয়াছে।

ডাঃ ম্যাক্‌কলাম্ গত তের বছর ধরিয়া এই কার্য্য করিতেছেন। পরীক্ষায় যতরকম সিদ্ধান্ত পাইতেছেন বা পাইয়াছেন সকলই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এইসমস্ত সিদ্ধান্ত হইতে কয়েকটি মূলসূত্র আবিষ্কার করিতে পারা যাইবে এবং সেই সূত্র অনুসারে মানুষের দরকারী একটি খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করিলে, মানুষের শরীর এবং জীবন বর্ত্তমান অপেক্ষা অনেক বেশী দিন সুস্থ সবল এবং কার্য্যক্ষম থাকিবে বলিয়া মনে হয়।

ডাঃ ম্যাককলাম্ বলেন যে মানুষের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কার্য্যে ইঁদুরের মতন এমন সুবোধ এবং সুন্দর জন্তু আর নাই। তাহাদের স্বভাব অতি মোলায়েম, সহজে নাড়াচাড়া করা যায় এবং খাদ্যের ফলাফলের জন্যে তাহাদের ওজন করিতে মাত্র কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগে—এইসমস্ত কাজে ইঁদুর মানুষকে কোনপ্রকার বেগ দেয় না। ইঁদুরের আরও কয়েকটি বিশেষ গুণ আছে—তাহাদের শরীর খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায় এবং একসঙ্গে অনেক

াচ্ছা হয়। ইঁদুরকে লইয়া নানারকম জেরা করিবার াজ চলিতে পারে, এই জেরা অবশ্য মৌখিক নহে, রীরের বৃদ্ধির এবং ওজনের তারতম্যের দ্বারা হয়। দুরকে বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষা-পাত্রও বলা চলে, যদিও নেক বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের পরীক্ষাকার্য্যে জন্তুর ্যবহারকে ঘৃণা করেন। ইঁদুরকে, বিজ্ঞানাগার-জন্তু থেবা জন্তু-বিজ্ঞানাগার, যাহা ইচ্ছা বলা চলে।

কতকগুলি ইঁদুরের উপর বিশেষ-বিশেষ খাদ্যের ে ফল পাওয়া গিয়াছে তাহা অতি অদ্ভুত এবং বিস্ময়কর। কটি ইঁদুরকে প্রোটীন-হীন কতকগুলি খাদ্য খাওয়ান য়। কিছু দিন পর দেখা যায় তাহার শরীর ছোট হইয়া াসিতেছে। মানুষ মাংস হইতেই এই প্রোটীন বেশী রিমাণে গ্রহণ করে। কিন্তু যদি কিছু দিন পরে এই বশেষ ইঁদুরটিকে আবার প্রোটীনপূর্ণ খাদ্য দেওয়া হয় বে তাহার শরীর আবার বৃদ্ধি পাইবে।

নিয়মাধীন খাদ্যের সাহায্যে স্ত্রী ইঁদুরকে বন্ধ্যা রিয়া দেওয়া যায়—এমন কি তাহার স্বভাবের এমন রিবর্ত্তন করা যায়, যে সে তাহার সন্তানদের হত্যাও রিবে। ইঁদুরদের সন্তানবাৎসল্য অতি প্রবল ইহা াশা করি সকলেই জানেন।

স্বাভাবিক খাদ্যের পরিবর্ত্তন করিয়া অন্যপ্রকার াদ্যের ব্যবস্থা করিলে ইঁদুরের নানাপ্রকার ব্যাধি ন্মান পাইতে পারে। একই বয়সের এবং একই াস্থ্যের দুইটি ইঁদুরকে দুইপ্রকার খাদ্যদানের ফলে

সুখাদ্য খাইয়া ইঁদুরটির দেহশ্রী সুন্দর হইয়াছে—এইরকমের ইঁদুর পলাইতে বা কামড়াইতে চেষ্টা করে না।

এই ইঁদুরটির হাড় অধিক নরম হইয়া গিয়াছে উপযুক্ত খাদ্যাভাবই ইহার একমাত্র কারণ। শতকরা ৫০ হইতে ৭০ জন শিশু এই হাড় নরমিতে আক্রান্ত হয়

একটি অকালবৃদ্ধ হইয়া পড়িল এবং আর-একটি দ্বিগুণ সবল হইয়া উঠিল। একটিকে অস্বাভাবিক খাদ্য দেওয়া হয় এবং অন্যটিকে তাহার স্বাভাবিক খাদ্য দেওয়া হয়।

একবার একজন ভদ্রলোক ডাঃ ম্যাক্‌কলামের বিজ্ঞানাগারে দুইটি খাঁচায় দুইটি ইঁদুর দেখিতে পান। একটি সবল সুন্দর এবং জীবনের আতিশয্যে চঞ্চল। অন্যটি বৃদ্ধ, ক্ষীণ দেহ, দেখিলে মনে হয় যেন কোনপ্রকারে নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়া আছে। ভদ্রলোকটি ডাঃ ম্যাক্‌কলামকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এই বৃদ্ধ ইঁদুরটিকে বোধ হয় এবার ত্যাগ করিবেন—এই ইঁদুরটি বোধ হয় অনেকগুলি ইঁদুরের পিতা এবং ইহার বয়সও অনেক।" ডাক্তার একটু হাসিয়া বলিলেন "ঐ যুবক এবং সবল ইঁদুরটির ঐ বৃদ্ধ ইঁদুরটি জনক—দেখিতে বৃদ্ধ কিন্তু ঐ ইঁদুরটির বয়স মাত্র চার মাস, অস্বাভাবিক খাদ্য গ্রহণ করিয়া উহার এই পরিণতি হইয়াছে।"

বর্ত্তমানে ডাক্তার পি জি সিপ্‌লির সঙ্গে একত্র ডাক্তার ম্যাক্‌কলাম জীবজন্তুর হাড়সংগঠন সম্বন্ধে নানাপ্রকার গবেষণায় ব্যস্ত আছেন। হাড় নরম হওয়া মনুষ্যের সম্বন্ধে তাঁহারা বিশেষভাবে কারণ অনুসন্ধানে রত হইয়াছেন। অখাদ্য এবং বাজে খাদ্য খাইয়া শতকরা ৫০ হইতে ৭০ জন শিশুর শরীর জীবনযুদ্ধের জন্য অনুপযুক্ত হইয়া গঠিত হয়। শিশু-খাদ্যের একটি উপযুক্ত

একই জাতের এবং একই বয়সের দুইটি ইঁদুরের বিভিন্ন খাদ্য খাওয়া কি হয় দেখুন। বড় ইঁদুরটিকে মাখন খাওয়ান হয়—মৃতপ্রায় ছোট ইঁদুরটিকে শাক সবজী চর্ব্বি খাওয়ান হয়

করিতে থাকেন। তিনি খাদ্য-স্বাচ্ছন্দ্যের মাপকাঠি লইয়া ঘুরিয়া বেড়ান না। তিনি বলেন যে যদি কোন রাঁধুনীকে বলা যায় যে "তুমি লোক প্রতি এত ভাগ প্রোটীন, এত ভাগ ভাইটামিন্, এত ভাগ অমুক ইত্যাদি দিবে" এবং সেই সঙ্গে তাহাকে বলা হয় যে অমুক দ্রব্যের এত ওজনে এত ভাগ প্রোটীন ইত্যাদি আছে, তবে তাহার কার্য্য একপ্রকার অসম্ভব হইবে। হিসাব-নিকাশের যাহা কিছু কাজ তাহা বৈজ্ঞানিক করিয়া দিবে। রাঁধুনীকে কেবল খাদ্য-তালিকা দিলেই যেন সে উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিতে

তালিকা প্রস্তুত করিতে পারিলে জাতীয় জীবনের যে কত উন্নতি হইবে তাহা কথায় বলা যায় না, কারণ শিশুরাই একটা জাতির ভবিষ্যৎ আশা এবং ভরসার স্থল। এই কার্য্যে সফল হইতে হয়ত বহু বৎসর লাগিবে, কিন্তু অবশেষে যে সফলতা লাভ করা যাইবে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই, কারণ ডাঃ ম্যাক্‌কলাম একজন পাকা বৈজ্ঞানিক।

এই ইঁদুরটির পলিনিউরাইটিস্ অর্থাৎ একরকমের স্নায়বিক পীড়া হইয়াছে। একপ্রকার ভাইটামিন হীন খাদ্য খাইয়া এই অবস্থা

ডাঃ ম্যাক্‌কলাম খাদ্যের সহিত মস্তিষ্কের সম্বন্ধ কি তাহা আবিষ্কার করিয়াছেন। মস্তিষ্কের কার্য্য বৃদ্ধ বয়সেও সতেজ রাখিবার জন্য কিপ্রকার খাদ্যের দরকার ডাঃ ম্যাক্‌কলাম তাহা আবিষ্কারও করিয়াছেন। ডাঃ ম্যাক্‌কলাম কয়েকটি খাদ্য দ্রব্যকে লইয়া তাহাদের শেষ পরমাণুটির পর্য্যন্ত মানুষের শরীরের পক্ষে উপযোগিতা সম্বন্ধে পরীক্ষা করিবেন। টেবিলের উপর রক্ষিত খাদ্যসম্ভার দেখিয়া ডাঃ ম্যাক্‌কলাম ঐ খাদ্য-সম্ভারের মধ্যে মানুষের উপযোগী কতখানি কি আছে, তাহা এক মুহূর্ত্তেই বলিয়া দিতে পারেন। এই কার্য্যটি বড় সহজ নহে, বহুবার ধরিয়া খাদ্য সম্বন্ধে নানাপ্রকার পরীক্ষা করিয়া ডাঃ ম্যাক্‌কলামের পক্ষে এই কার্য্যটি সহজ হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিক বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে ডাক্তার ম্যাক্‌কলাম খাইবার সময়েও হাতে কাগজ-পেন্‌সিল লইয়া কেবল যোগবিয়োগ গুণভাগ

কম আহারে চোখ কি অবস্থা হয় দেখিবার জিনিষ। বাঁদিকে—ইঁদুরের স্বাভাবিক চোখ, মাঝখানে চর্ব্বিহীন খাদ্য খাইয়া চোখের পাতায় একপ্রকার অসুখ হইয়াছে, ডানদিকে—ঐ রোগের চোখের পাতার ফোলা অবস্থা

পারে—বৈজ্ঞানিককে এই কথা মনে রাখিয়া চলিতে হইবে।

ডাঃ ম্যাক্‌কলাম্ শরীর-স্বাচ্ছন্দ্যের এবং রুচির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া একটি খাদ্যতালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। প্রত্যেক লোকের দিনে তিনবার করিয়া ভোজন করাই যথেষ্ট বলিয়া মনে হয়। ডাঃ ম্যাক্‌কলামের খাদ্য-ব্যবস্থা রোগীর পথ্য নয়—ইহা সুপাচ্য, সুভোগ্য, রুচিকর এবং শরীরের পক্ষে অতি উপযোগী। এই খাদ্য-ব্যবস্থা ইঁদুরের সাহায্য ব্যতিরেকে করা সম্ভবপর হইত বলিয়া মনে হয় না।

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

জেনি

(Victor Hugo)

১

তখন রাত্রি। গরীবের সামান্য কুটীর, কিন্তু বেশ গরম ও আরাম প্রদ; আধো-গোধূলী আলোতে পূর্ণ; এই আলোর ভিতরের জিনিষগুলা খুব অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে; উনানে ভস্মাচ্ছাদিত জ্বলন্ত অঙ্গার ঝিকমিক করিতেছে এবং উহার উত্তাপে মাথার উপরকার কড়ি-বর্গাগুলা কালো হইয়া গিয়াছে। দেয়ালের গায়ে জেলিয়াদিগের মাছধরা জাল ঝুলিতেছে। ঘরের কোণে একটা তাকের উপর কতকগুলা সামান্য ধাতব হাঁড়ি কুঁড়ি ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। একটা দীর্ঘ ভূ-পতিত মশারী সমেত একটা বড় শয্যা—তাহার পাশে গোটা-দুই পুরাতন চৌকির উপর একটা গদি প্রসারিত। এই গদির উপর নীড়শায়ী-পক্ষী-শিশুর ন্যায় পাঁচটি ছোট ছোট শিশু নিদ্রিত। শয্যার পাশে পালং-পোষের উপর মাথা চাপিয়া, ছেলেদের মা নতজানু হইয়া বসিয়াছিল। একলা রমণী। কুটীরের বাহিরে কৃষ্ণবর্ণ সমুদ্র, ঝোড়ো ফেন-পুঞ্জ তটের উপর আছড়াইয়া গোঁ-গোঁ শব্দে আর্ত্তনাদ করিতেছিল।

বাল্যকাল হইতেই সে জেলিয়া। একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না, বিশাল জলরাশির সহিত প্রতিদিনই তাহার সংগ্রাম চলিত; কেননা প্রতিদিনই ছেলেদিগকে খাওয়াইতে হইবে এবং প্রতিদিনই বৃষ্টি হোক্, বাদল হোক্, ঝড় হোক্—মাছ ধরিবার উদ্দেশ্যে তাহার ডিঙ্গি সমুদ্রবক্ষে ভাসিয়া পড়িত। সে যখন তার চার-পালের ডিঙ্গিতে করিয়া নিঃসঙ্গভাবে সমুদ্রের উপর মৎস্যজীবীর ব্যবসায় চালাইত, সেই সময় তাহার স্ত্রী গৃহে থাকিয়া পুরাতন পালগুলায় তালি লাগাইত, জালগুলা মেরামৎ করিত, এবং যে ছোট্ট উনোনটির উপর মাছের ঝোল টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিত সে দিকেও তাহার নজর রাখিতে হইত। যখনই তার পাঁচটি ছেলে ঘুমাইয়া পড়িত অমনি সে নতজানু হইয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিত যেন তরঙ্গ ও অন্ধকারের সহিত সংগ্রামে তাহার স্বামী বিজয়ী হয়। এইরূপভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা [illegible] তাহার পক্ষে কঠিন ছিল। তরঙ্গ-রাজির মধ্যে একটা ছোট্ট দাগের মত একটা জায়গায় শুধু মাছ ধরিবার সম্ভাবনা ছিল,—জায়গাটা তার ঘর অপেক্ষা হদ্দ দুইগুণ চওড়া,—অন্ধকারাচ্ছন্ন, খামখেয়ালি ধরণের; এখানে ঐ চলন্ত মরুর উপর কেবলি পরিবর্ত্তন হইতেছে; তথাপি কেবল নিছক নৈপুণ্য এবং জোয়ার-ভাঁটা ও বায়ু-জ্ঞানের সাহায্যে শীত-রাত্রির কোয়াসা ও ঝড় ঝাপটার মধ্যে ঐ স্থানটা আবিষ্কার করিতে হইবে। এবং ঐ খানে যখন তাহার পাশ দিয়া চঞ্চল তরঙ্গ সকল মরকত-সর্পের মত চলিয়া যাইত এবং অন্ধকার-উপসাগরটা সম্মুখে গড়াইয়া যাইত, ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইত, এবং নৌকার সটান্ দড়ি-দড়াগুলা ভয়ে যেন আর্ত্তনাদ করিত—সেই সময় সেই বরফ-জমা সমুদ্রের মধ্যে সে তাহার জেনিকে ভাবিত; এবং জেনিও তাহার কুটীরে বসিয়া স্বামীর কথা মনে করিয়া অশ্রু-বর্ষণ করিত।

ঐ সময়ে যখন সে তাহার কথা ভাবিতেছিল আর ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে ছিল, গাংচীলের কর্কশ চীৎকার তাহাকে বাধিত করিল এবং সাগর শৈলের উপর তরঙ্গ-গর্জ্জন তাহার অন্তঃকরণে ভীতির সঞ্চার করিল। কিন্তু সে সর্ব্বদাই ভাবনা চিন্তায়—দারিদ্র্যের ভাবনা-চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকিত। তাহার ছেলে-মেয়েগুলি শীত-গ্রীষ্মে খালি পায়ে চলিত। গমের রুটি তাহারা কখনই খাইতে পাইত না; কেবল যবের রুটি খাইত। ও মা, কি হবে। কামারের হাঁপরের যাঁতার মত বাতাস গর্জ্জাইতেছে এবং সাগরের উপকূল, কামারের নেহাই (anvil)-এর মত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সে অশ্রু-বর্ষণ করিতে লাগিল ও থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। আহা! সেইসব হতভাগিনী স্ত্রী যাদের স্বামী সমুদ্রের উপর ভাসিতেছে! এই কথাটা শুনিতে কি ভয়ানক! —"আমার যারা প্রিয়জন—সেই বাপ, প্রণয়ী, ভাই, ছেলে—সকলেই ঝড়ের মধ্যে!" কিন্তু জেনি আর একটা কথা ভাবিয়া আরও অসুখী হইয়াছিল। তাহার স্বামী একাকী—এই দারুণ রাত্রে একাকী ও অসহায়। আহা মা বেচারি! এখন সে বলিতেছে, "আমার ইচ্ছা করে, ওরা বড় হ'য়ে উঠে ওদের বাপকে সাহায্য করে।" পাগলের স্বপ্ন! ভবিষ্যতে যখন উহার পিতার সঙ্গে ওরা ঝড়ের মধ্যে থাকিবে, তখন আবার সে সাশ্রু-লোচনে বলিবে:—"এখনো যদি ওরা শিশুই থাকিত তবে বেশ হইত।"

২

জেনি তার লণ্ঠন ও তার 'ক্লোক্'টা লইল। মনে মনে ভাবিল "এখন দেখ্‌বার সময় হয়েছে—সে ফিরে আস্‌ছে কি না, সমুদ্র একটু ঠাণ্ডা হয়েছে কি না, সঙ্কেত-মাস্তুলে এখনো আলো জ্বল্‌ছে কি না।" সে ঘরের বাহির হইল। কিছুই দেখা যায় না—দিগন্ত-দেশে কেবল একটা সাদা রেখার দাগ। বৃষ্টি পড়িতেছিল—প্রভাতের

(ঘ) তৈল উৎপাদন।

(ঙ) কাচ, এনামেল্ ও চীনামাটির দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ

(২) এঞ্জিনীয়ারিং শিল্পাদি যথা :—

(চ) যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ।

(ছ) শক্তি-উৎপাদনকারী কল নির্ম্মাণ।

(জ) গতিশীল যান নির্ম্মাণ।

(৩) বয়ন-শিল্পাদি (রেশম, পশম, কার্পাস, কৃত্রিম রেশম, পাট ইত্যাদির বয়ন)

(৪) অস্ত্র ও বিস্ফোরক পদার্থসকল প্রস্তুত করা।

(৫) দৃষ্টি-যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ।

উপরোক্ত তালিকার প্রত্যেকটি বিষয় একে একে বিচার করিলে বোঝা যায়, যে, কোন্ কোন উপায় আমরা কতটা অবলম্বন করিতে সক্ষম হইয়াছি, ও জ্ঞান, বুদ্ধি এবং অর্থব্যবসায় থাকিলে আরও কতটা পারিতাম। ইহা দেখাইবার ইচ্ছা আছে। কিন্তু সমস্ত বিষয়গুলিই অত্যন্ত দুরূহ। কোনও একজনের পক্ষে সবগুলির উপযুক্তভাবে বিচার ও বর্ণনা করা অসম্ভব। আমার যেটুকু জানা আছে, তাহা লিখিতেছি এবং যে যে বিষয়ে কিছুই জানা নাই, সে সম্বন্ধে কিছু কিছু সন্ধান দিবার চেষ্টা করিব।

এখন বিশেষভাবে উপায়গুলি পৃথক ভাবে বিচার ও বর্ণনা করা হউক।

প্রথম শ্রেণী :—

খনিজ-পদার্থ

মাটির নীচে বা গায়ে যেসকল ব্যবহারযোগ্য প্রাকৃতিক জড় পদার্থ পাওয়া যায়, সবই এই বিভাগে পড়ে। আমাদের দেশের প্রধান খনিজ বস্তুগুলির নাম দিলাম। তাহার সঙ্গে উৎপন্ন বস্তুর গড় পড়তায় বাৎসরিক মূল্যের পরিমাণও দিলাম।

খনিজ পদার্থের নাম	বাৎসরিক মূল্য।
কয়লা	১২৯২০০০০০৲ টাকা
সোনা	৩৪০০৭০০০৲ "
আকরিক ম্যাঙ্গানিজ	২২৫০০০০০৲ "
খনিজ তৈল (কেরোসিন জাতীয়)	৮০০০০০০০৲ "
আকরিক সীসা	১২০০০০০০৲ "
লবণ	১১১০০০০০৲ "
আকরিক রৌপ্য	৯০০০০০০৲ "
অভ্র (মাইকা)	৭৫০০০০০৲ "
সোরা	৫২০০০০০৲ "
আকরিক ও শোধিত টিন (রসাঞ্জন)	২৫০০০০০৲ "
আকরিক লৌহ	২১০০০০০৲ "
রত্নাদি প্রস্তর	২৬০০০০০৲ "
আকরিক ক্রোমাইট্	৫৪০০০০৲ "
আকরিক তাম্র	৭৭৫০০০৲ "
মোনাজাইট্ বালি	৪৫০০০০৲ "
উল্‌ফ্রাম	৪৫০০০০৲ "

এ ছাড়া আরও অনেক অল্পমূল্য নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষ আমাদের দেশে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়, যেমন ইমারতী পাথর, চুন পাথর, শ্লেট, মার্ব্বল ইত্যাদি। এক কথায় যে কোন খনিজ দ্রব্য, যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলে, বিশুদ্ধ হইলে ও বাজার দর হিসাবে খরচ পোষাইলেই, লাভের উপায় হইয়া দাঁড়ায়। তবে কোন কোন জিনিষের চাহিদা বেশী, সুতরাং তাতে লাভও বেশী, আবার অন্য কিছুতে হয়ত লাভ অপেক্ষাকৃত কম।

সাধারণতঃ পলিমাটির (alluvial) দেশে কোনও-প্রকার খনিজ পাওয়া যায় না। জমি পাহাড়ে হইলে, কিম্বা খুব কাঁকরে ভরা থাকিলে, সেখানে খনিজ পদার্থ থাকা সম্ভব। বাংলা দেশের প্রায় সমস্তই পলিমাটিতে ভরা। তবে বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, ও ময়মনসিংহের কিছু অংশ খনি থাকার উপযুক্ত জায়গা।

এখন আকর আবিষ্কারের ও খনিজ পদার্থ হইতে অর্থোপার্জ্জনের জন্য কি কি করা দরকার, তাহা বলিতেছি।

প্রথমেই উপযুক্ত আকরের জন্য অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। ইহা প্রস্পেক্টার বা খনিজ-সন্ধাতা শ্রেণীর লোকের দ্বারা হয়। ইহাদের মোটামুটি ভূবিদ্যা, ভূতত্ত্ব ও খনিজবিজ্ঞান জানা থাকে। ইহা ভিন্ন এইপ্রকার

কাজ করিতে হইলে বিশেষ কষ্টসহিষ্ণু, সবল ও সাহসী হওয়া দরকার। কেননা, দিনের পর দিন বনে জঙ্গলে ও দুর্গম পথহীন দেশে হাঁটিয়া বেড়ান দুর্ব্বল, ভীরু বা আরামপ্রিয় লোকের পক্ষে অসম্ভব।

অবশ্য কোনও ভূতত্ত্ববিদ্ যদি একাজ করেন, তাহা হইলে খনিজের আবিষ্কার ভাল রকমে হয়। কিন্তু এ-প্রকার কাজে তাঁহার মজুরি পোষাইবে কি না সন্দেহ। নিয়ম এই, যে, ভূতত্ত্ববিদ্, যে অঞ্চলে খনিজ থাকা সম্ভব, তাহা মোটামুটি নির্দ্দেশ করিয়া দেন। তার পর খনিজ-সন্ধাতা তন্ন তন্ন করিয়া সেই স্থল খুঁজিয়া দেখেন। অনেক স্থলে সন্ধাতা স্বাধীনভাবেও খনিজ পদার্থ খুঁজিয়া দেখেন।

আকরের অবস্থিতির প্রধান নিদর্শন খনিজ পদার্থের টুক্‌রা। জলের তোড়ে ও অন্যান্য স্বাভাবিক কারণে আকরের কাছাকাছি জায়গায় ভাঙ্গা টুক্‌রা পাওয়া যায়। নিপুণ ও অভিজ্ঞ সন্ধাতা পাহাড়ের ফাটালে, পাহাড়ের গায়ের জলের পথে ও নিকটবর্ত্তী নদীর চড়ায় এই-সব খুঁজিয়া বাহির করেন। স্বভাবতঃই আকরের যত কাছে যাওয়া যায়, ততই এইপ্রকার খনিজখণ্ড বেশী পাওয়া যায়। এইপ্রকারে ধীরে ধীরে চিহ্ন অনুসরণ করিয়া আকরে পৌছান যায়। অনেক স্থলে আকরের কিছু অংশ মাটি ভেদ করিয়া স্তূপাকৃতি হইয়া থাকে। সেই জন্য মাটির উপর স্বাভাবিক স্তূপ অতি সাবধানে পরীক্ষা করা দরকার হয়। খনিজ পদার্থ চারিদিকের ভূমিস্তর অপেক্ষা কঠিন হইলেই এইপ্রকার স্তূপ হইয়া উঠে। কোথাও বা ক্ষেতের আলের মত সঙ্কীর্ণ ও দৃঢ় স্তর হয়। আবার খনিজ পদার্থ অপেক্ষাকৃত নরম হইলে চারিদিকে উঁচু জমির মাঝখানে খালের মত হইয়া আকর থাকে।

আকর ধাতব জিনিষের হইলে অনেক স্থলে রঙের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়। যেমন, লৌহের আকরের পাশের জমি লাল ও হলদে রঙের হয়। আকরিক তাম্রের নিদর্শন গাঢ় সবুজ রং। এইসব বিভিন্ন রং শিক্ষিত ও ও অভিজ্ঞ সন্ধাতা সহজেই চিনিতে পারেন। এইরূপ আরও অনেক উপায়ে আকরের প্রথম আবিষ্কার হয়।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, যে, সাধারণ প্রস্তরখণ্ডে ও খনিজপদার্থখণ্ডে প্রভেদ কিপ্রকারে বুঝা যাইতে পারে। এই প্রশ্নের উত্তর সহজ নহে। প্রভেদ বুঝিতে হইলেই খনিজ-বিজ্ঞান কিছু জানা থাকা দরকার। তবে মোটামুটি কয়েকটি পরীক্ষা করিলেই প্রভেদ অধিকাংশ স্থলেই ধরা পড়ে। বর্ণের বিশেষত্ব, আপেক্ষিক গুরুত্ব, আপেক্ষিক কাঠিন্য, ও কষের রং, এই কয়টি পরীক্ষা জানা থাকিলেই কাজ চলে। পরে কিছু অভিজ্ঞতা হইলেই চাক্ষুষ দর্শনই অধিকাংশ স্থলে যথেষ্ট হয়।

আকরের আবিষ্কার হইলে তৎপরে খনিজ বস্তুটির যাচাই করা প্রয়োজন হয়। কয়েক খণ্ড খনিজ পদার্থ খনিজতত্ত্ববিদের কাছে পাঠান হয়। তিনি রাসায়নিক এবং অন্যান্য পরীক্ষা করিয়া বলেন, যে, তাহা কিপরিমাণে বিশুদ্ধ ও তাহা হইতে কি কি পদার্থ পাওয়া যাইতে পারে। পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হইলে একজন বিশেষজ্ঞ ভূতত্ত্ববিদ্‌কে পাঠান হয়। তিনি আকর যথাযথভাবে পরীক্ষা করিয়া বলেন, যে, তাহাতে কিপরিমাণ খনিজ পাওয়া যাইতে পারে এবং তাহার উত্তোলন বা আহরণ কিরূপ ব্যয়সাধ্য হওয়া সম্ভব। ইহার পর বাজারে পাঠাইবার খরচ, কুলি-মজুর সংগ্রহের উপায়, ও বাজার দর, ইত্যাদি বিষয় বিচার করা হয়। সকল বিষয়ে বিশেষজ্ঞদিগের মত অনুকূল হইলে, খনিবিদ্ নিয়োগ করিয়া, অন্ততঃ খনিবিদের উপদেশ গ্রহণ করিয়া, কার্য্যারম্ভ করা হয়। অবশ্য আকরের উর্দ্ধতম অধিকারীর নিকট হইতে খনিজস্বত্ব ক্রয় করিতে বা ইজারা লইতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশেষ অনুসন্ধানের পূর্ব্বেই এই কাজ সারিয়া লওয়াই যুক্তিযুক্ত। কেননা, পরে, অন্য অনেকে স্বার্থের জন্য বাধা দিতে পারে।

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা হইতে খনির কার্‌বার যে নেহাৎ সহজ নহে, আশা করি ইহা স্পষ্টই বোঝা যায়। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে দেশীয় লোকেরা এই বিশেষ লাভবান্ ব্যবসায়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েন। অথচ বিদেশী ব্যবসায়ীগণ এই একই কাজে কোটীশ্বর হইতেছেন। কারণ, দেশী ব্যবসায়ী প্রায় সর্ব্বদাই বিশেষজ্ঞের অভিমতের জন্য টাকা খরচ করিতে নারাজ। ফলে, প্রথমে কিছু টাকা কম লাগে, কিন্তু পরে শত শত ভুল হওয়ায় লাভের স্থলে লোক্‌সান্

দাঁড়ায়। কখনও বা অচল কারবারে অজ্ঞতাবশে অনেক টাকা ঢালিয়া মূলধনীসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়েন।

এইরূপ অজ্ঞতামূলক দৃষ্টিকার্পণ্য দেশী ব্যবসায়ীর ক্ষতির সর্ব্বপ্রধান কারণ। এবং ইহা শুধু খনির কাজে নহে, প্রায় সকলরকম পণ্য-শিল্পের কারবারেই দেখা যায়।

এইরূপ কাজে সর্ব্বপ্রথমেই খনিজ-সন্ধাতা আবশ্যক, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সন্ধাতার উচিত, প্রথমে ভূতত্ত্ব বিষয়ে কিছু জ্ঞান লাভ করা। প্রথমে কোন সরল পুস্তক পাঠ করিয়া পরে উপযুক্ত দেশে ভ্রমণ করিয়া এই বিদ্যা আয়ত্ত করিতে হয়। ক্রমে কার্য্যক্ষেত্রে ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। ভূপৃষ্ঠ বহুপ্রকার স্তরের সমষ্টি। কোন্ স্তর আগ্নেয়, কোন্‌টি জলজ, কোন্‌টি প্রাচীন, কোন্‌টি আধুনিক—এবিষয়ে জ্ঞান থাকিলে কাজ অনেক সহজ হইয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন স্তরের ভিন্ন ভিন্ন বিশেষত্ব আছে। যেমন, টিন, উল্‌ফ্রাম্, ইত্যাদি ধাতুর আকর কেবল প্রাচীন আগ্নেয় স্তরেই পাওয়া যায় এবং আমাদের দেশে কেরোসিন জাতীয় খনিজ তৈল আধুনিক স্তরেই পাওয়া যায়।

স্তরের মধ্যেও স্থল-বিশেষে আকর থাকার সম্ভাবনা বেশী। যেমন "ডাইক্" এর স্থিতিস্থল প্রায়ই কোনও না কোন খনিজ পদার্থ ধারণ করিয়া থাকে। (কোন এক প্রকার পদার্থের স্তরের কাটলে বাঁধের বা প্রাচীরের আকৃতিবিশিষ্ট অন্যবিধ পদার্থরাশিকে ডাইক্ বলে।)

আকর অন্বেষণের উপায় জানিবার পর খনিজ পদার্থ চিনিতে বা "সনাক্ত" করিতে শিখিতে হয়। কেননা, অনেক সময় বহুমূল্য খনিজ পদার্থ দেখিতে সাধারণ পাথরের টুক্‌রার মতই হয়।

সন্ধাতার পক্ষে, মোটামুটি খনিজটি কিপ্রকার বস্তু, তাহা জানা দরকার। সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করার জন্য বিশেষ যন্ত্রাদি আবশ্যক ও তাহা বিশেষজ্ঞ ভিন্ন অন্যের পক্ষে ব্যবহার করাও সম্ভব নহে। সাধারণতঃ যে-যে উপায় চিনিবার জন্য ব্যবহৃত হয়, সেগুলির বর্ণনা নীচে দিলাম।

বর্ণ—কয়েকটি আকরিক জিনিষের বিশেষ বর্ণ থাকে। যেমন তাম্রের অনেকগুলি আকরিক পদার্থ নীল বা সবুজ হয়, লৌহের গন্ধক-যৌগিক দ্রব্যের পিতলের মত রং হয়।

চাক্‌চিক্য (lustre)—চাক্‌চিক্য দুইপ্রকার। প্রথম, মসৃণ ধাতু-গাত্র যেরূপ চিক্কণ; দ্বিতীয়, ধাতু ভিন্ন অন্য পদার্থ মসৃণ অবস্থায় যেরূপ। এই চাক্‌চিক্যের পার্থক্য দেখা অল্প অভ্যাসেই সহজ হইয়া আসে।

কাঠিন্য—খনিজ পদার্থের সমতল গাত্রে অন্য কোন বস্তু দ্বারা আঁচড় কাটিবার চেষ্টা করিলে খনিজ যে পরিমাণে তাহা প্রতিরোধ করে (অর্থাৎ তাহাতে যত কম আঁচড় পড়ে) উহার কাঠিন্য ততই অধিক। এই কাঠিন্যের পরিমাপ কতকগুলি খনিজের দ্বারা হয়। এই খনিজগুলির আপেক্ষিক কাঠিন্য জানা থাকায়, এক এক টুক্‌রা করিয়া সবগুলি সঙ্গে থাকিলে যে-কোনও খনিজের কাঠিন্য মোটামুটি ধরা যায়। অজ্ঞাত খনিজটিকে একে একে এই খনিজগুলি দিয়া কাটিবার চেষ্টা করা উচিত। যে খনিজের দ্বারা আঁচড় কাটা যাইবে, অজ্ঞাত বস্তুটির কাঠিন্য তাহা অপেক্ষা কম এবং তাহার নীচের খনিজের সমান কিম্বা তার চেয়ে বেশী।

যে খনিজগুলি কাঠিন্যের পরিমাপ জন্য ব্যবহার করা হয়, সেগুলির নাম এবং আপেক্ষিক কাঠিন্য দিলাম।

নাম	কাঠিন্য	সাধারণ পরিমাপ
তালক বা অনম্ভ (talc)	১	
জিপ্‌সম্ (gypsum) বা হরসোঠ	২	হাতের নখের কাঠিন্য ২॥
ফফেদ্-সুর্ম্মা (calcite)	৩	পয়সার সমান কাঠিন্য
ফ্লুয়োরাইট্ (fluorite)	৪	(লোহার) পেরেকের কাঠিন্য ৪॥
আপাটাইট্ (apatite)	৫	
অর্থক্লেজ্	৬	লোহার উখার সমান কঠিন
স্ফটিক (quartz)	৭	
পুষ্পরাগ (topaz)	৮	
কুরুবিন্দ (corundum)	৯	
হীরা	১০	

অতি অল্প খনিজ ৭ অপেক্ষা বেশী কঠিন। বহুমূল্য রত্ন ও মণিসকল সবই ৭ অপেক্ষা অধিক কঠিন।

কষ-পরীক্ষা—যেমন সোনা কষ্টি-পাথরে ঘষিয়া তাহার কষ পরীক্ষা করা হয়; তেমনি খনিজ পদার্থ সকলকে ঘষা কাচ কিম্বা পালিস্‌হীন চীনামাটির প্লেটে ঘষিয়া কষ পরীক্ষা করা হয়। কষের রং দেখিলে খনিজ অনেক সময় বেশ চেনা যায়।

আপেক্ষিক গুরুত্ব—সমান পরিমাণের জলের তুলনায় খনিজ কত ভারী, তাহার নিরূপণ দ্বারা আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্দ্ধারণ করা হয়। এই পরীক্ষা অতি সহজ এবং ইহার যন্ত্রাদির মূল্যও অল্প।

খনি ও খনিজের বিষয়ে আরও অধিক জানিতে হইলে বিশেষ বিশেষ পুস্তক দ্রষ্টব্য।

এখন আমাদের দেশে কি কি খনিজ পাওয়া যায়, তাহাতে কিপরিমাণ কাজ হয় ও এদেশীয় লোকের হাতে সে ব্যবসায় কতটা আছে, তাহা দেখা যাউক।

খনি ও খনিজ সম্বন্ধে আলোচনায় বহুমূল্য মণি-রত্নাদির কথা সর্ব্বাগ্রে মনে হয়। সুতরাং সেই সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য, তাহার দ্বারা আরম্ভ করাই শ্রেয়ঃ।

বহুমূল্য প্রস্তরাদি।—

হীরা, হীরক, বজ্র (diamond)।—

রাসায়নিক বর্ণনা—অঙ্গারের রূপান্তরমাত্র (Allotrpic form of carbon)

আকার বা সংস্থান (form) স্বাভাবিক অবস্থায় অষ্টকোণ, একমাত্রিক (cubic)।

বর্ণ। হীরা বিশুদ্ধতম অবস্থায় বর্ণহীন হয়। কিন্তু প্রায় সকলপ্রকার বর্ণের হীরা দেখা যায়। অল্প হল্‌দে রঙের অনেক পাওয়া যায় এবং তার পরেই সবুজ রঙের। গাঢ় নীল ও লাল রঙের হীরা দুষ্প্রাপ্য এবং সেই জন্যই অত্যন্ত দামী। বাজারে যত হীরা আসে, তাহার সিকি অংশ সম্পূর্ণ বর্ণহীন এবং দোষহীন। আরও সিকি অংশ অল্প-বিস্তর বর্ণযুক্ত, বাকী সম্পূর্ণ রঞ্জিত।

কাঠিন্য—কাঠিন্য পরিমাপে ১০ অর্থাৎ পৃথিবীতে জ্ঞাত বস্তুসকলের মধ্যে কঠিনতম এবং অভেদ্য।

শ্রেষ্ঠ পরীক্ষা—কাঠিন্য।

আপেক্ষিক গুরুত্ব—৩·৫১ হইতে ৩·৫২।

পুরাকালে আমাদের দেশ হীরার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। জগতের অধিকাংশ ঐতিহাসিক হীরার জন্মস্থান ভারতবর্ষ। কোহীনুর, অর্‌লফ্‌, হোপ্‌ (নীলবর্ণ), মহা মোগল ইত্যাদি অনেক হীরা জগদ্বিখ্যাত। কিন্তু আজকাল এদেশে হীরা প্রায় পাওয়া যায় না। ক্বচিৎ কদাচিৎ এক-খানি পাওয়া যায়।

হীরার উৎপত্তি কোনও বিশেষ ভূস্তর বা বিশেষ-প্রকার প্রস্তরে নহে। আফ্রিকার প্রসিদ্ধ হীরাখনি-সকল অতি প্রাচীন আগ্নেয়গিরির মুখ-গহ্বরস্থিত নীলাভ মাটির মধ্যে অবস্থিত।

আমাদের দেশে পুরাতন বিন্ধ্যগিরি স্তরে হীরা পাওয়া যায়। দক্ষিণে কার্ণুল ও ধার্‌ওয়ার্‌ নামক প্রস্তরশ্রেণীতেও পাওয়া যায়।

এদেশে হীরার আকর প্রধানতঃ তিন জায়গায় আছে। প্রথম কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর তীরবর্ত্তী দেশে, দ্বিতীয় মধ্য প্রদেশে (সম্বলপুর অঞ্চলও ইহার মধ্যে গণ্য), তৃতীয় বুন্দেলখণ্ডে পান্না রাজ্যে। অন্য কয়েকটি জায়গায়ও কখন কখন হীরা পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে সকলকে হীরার আকর বলা চলে না।

মান্দ্রাজ প্রদেশের কড্ডাপাহ্‌ অঞ্চলের হীরাবাহক স্তরে কয়েক শত বৎসর ধরিয়া কিছু কিছু করিয়া হীরা পাওয়া যাইতেছে। হীরাবাহক ভূমির বর্ণনা এইরূপ; যথা:—

প্রথমে এক হাত প্রমাণ মাটি, বালি, কাঁকর ও বেলে মাটি, তাহার নীচে তিনহাতপ্রমাণ শক্ত নীল বা কাল এঁটেল মাটি। ইহার পর আসল হীরার মাটি প্রায় দুইহাতপ্রমাণ গভীর। হীরার মাটির প্রধান লক্ষণ তাহার মধ্যে অনেক বড় বড় পাথরের নুড়ি। এই সমস্ত অংশই প্রায় সমানভাবে নুড়ি, কাঁকর ও মাটির সমষ্টি।

মান্দ্রাজে বেলারী অঞ্চলে বজ্রকরুর, গুঞ্জীগুণ্টা এবং গুটি, এই গ্রামসকলের নিকটে হীরা পাওয়া যায়। নিকটবর্ত্তী পাহাড়ের ভগ্নখণ্ডে এই গ্রামসকলের চারিদিক্‌ ভরা। এই ভগ্ন খণ্ডমধ্যেই হীরা পাওয়া যায়। বৃষ্টি পড়িলেই গ্রামবাসীগণ হীরার সন্ধানে বাহির হয়।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে প্রায় ৭০ রতিপ্রমাণ একটি অতি সুন্দর হীরা এখানে পাওয়া যায়। এখন এই হীরা গর্ডনর্‌ নামে বিখ্যাত।
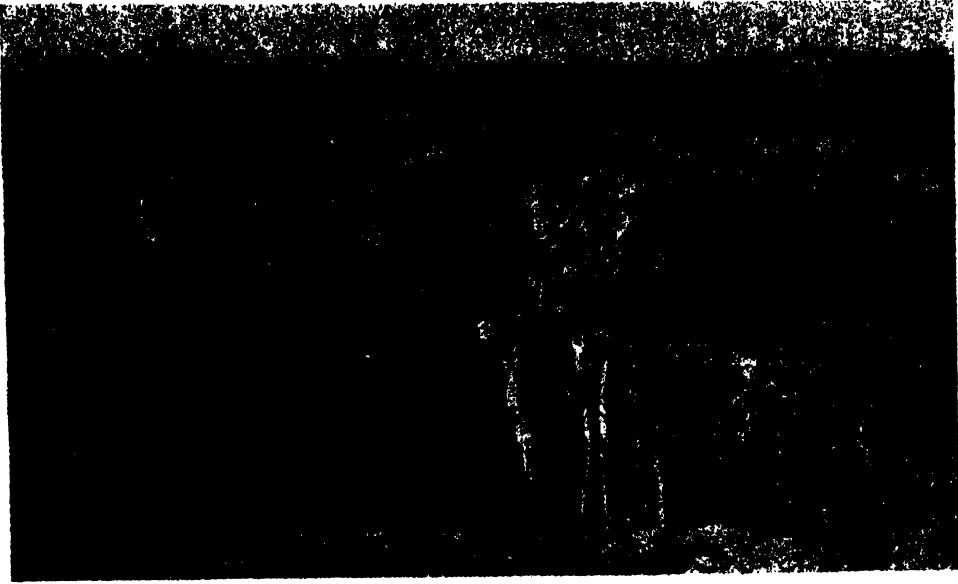
দক্ষিণ আফ্রিকার কিম্বার্লী হীরকখনি

প্রসিদ্ধ ইউজিনি হীরাও এইখানেই পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া শোনা যায়। এক গরীব চাষা এই প্রস্তরখানি তাহার লাঙ্গল মেরামতের মজুরী হিসাবে এক কামারকে দেয়। কামার প্রথমে ইহাকে মূল্যহীন মনে করিয়া ফেলিয়া দেয়। পরে খুঁজিয়া লইয়া মান্দ্রাজে আরাটুন্ নামে এক বণিক্‌কে ৬০০০ টাকায় বিক্রী করে। আরাটুন্ সম্রাট্ তৃতীয় নেপোলিয়নকে অনেক দামে ইহা বিক্রয় করে। এইরূপ অন্য অনেক মহামূল্যবান্ হীরা এখানে পাওয়া গিয়াছে। প্রসিদ্ধ পিট্ হীরা ও "মহা মোগল" হীরাও এখানেই পাওয়া গিয়াছিল, ইহা অনেক বিশেষজ্ঞের মত।

ভুবনবিখ্যাত গোলকোণ্ডার নিকট কোনও হীরার খনি নাই। তবে বোধ হয় কৃষ্ণা ও গোদাবরী অঞ্চলের খনিসমূহ গোলকোণ্ডা জেলার আগেকার চৌহদ্দির মধ্যে ছিল। মধ্য-প্রদেশ ও উড়িষ্যার সীমানায় সম্বলপুরেও হীরা পাওয়া যায়। বিশেষতঃ মহানদী ও ব্রাহ্মণী নদীর সঙ্গম-স্থল এইজন্য বিখ্যাত।

বুন্দেলখণ্ডে পান্না-রাজ্যে কয়েক জায়গায় হীরার খনি আছে। এখানেও এখন পর্য্যন্ত অল্প-স্বল্প কাজ

উপরোক্ত যে কয় জায়গার নাম করা হইল, সকল স্থানেই হীরার অন্বেষণ, খনন ও আহরণ অতীব আদিম প্রথা অনুসারে করা হয়। কখনও বা খনন করিয়া হীরার আকর দেখিয়া অজ্ঞান-বশতঃ লোকে চিনিতে পারে না। আবার কখনও ভুলক্রমে হীরা-বিহীন স্থানে খনি খুঁড়িয়া পরিশ্রম ও সময়ের অপব্যবহার করে।

এই দেশ এককালে হীরকের জন্মভূমি বলিয়া ভুবন-বিখ্যাত ছিল। এখন বৎসরে সামান্য ত্রিশ-চল্লিশ হাজার টাকার হীরা খনি হইতে আহরণ করা হয়। হীরার প্রাচীন আকর-ভূমি এদেশ হইতে এখনো লুপ্ত হইয়া যায় নাই। এবং ইহাও সত্য, যে, সেসকল আকর এখনও নিঃশেষ হইয়া পড়ে নাই। নিপুণ সন্ধাতা এবং বিচক্ষণ ব্যবসায়ী কিছুমাত্রায় কর্ত্তৃপক্ষের সাহায্য পাইলে (হীরার খনির ইজারা গবর্ণমেণ্টের হাতে) এখনো প্রচুর লাভ করিতে পারেন।

পৃথিবীর মধ্যে এখন দক্ষিণ আফ্রিকার খনিসকল সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হীরা "কলিনান্" ঐ দেশেরই এক খনিতে পাওয়া যায়।

কার্য্য-প্রণালীর দোষে আমাদের দেশে এই কাজ

নামক ইয়োরোপীয় জহুরী ১৬৬৫-৬৯ খৃষ্টাব্দে এই দেশ ভ্রমণের বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। তাহাতে হীরা খনন, আহরণ ইত্যাদির প্রথা-সম্বন্ধে যাহা পাওয়া যায়, এখনও এদেশে সেইসবই দেখা যায়। তিন শতাব্দীতে বিন্দুমাত্র অগ্রসর হওয়ার চিহ্ন নাই।

হীরা-খনন সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, হীরা-কর্ত্তন সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই বলা যায়। বিদেশে কৃত্রিম উপায়ে, কর্ত্তন, ঘর্ষণ ইত্যাদি প্রক্রিয়াদ্বারা হীরকের আকার পরিবর্ত্তন করিয়া তাহার সৌষ্ঠব, দীপ্তি ও আভার বৃদ্ধি করা হয়। এদেশে অতি প্রাচীন প্রথায় হীরক কাটা ও পালিশ করা হয়। তাহাতে উহার শ্রীবৃদ্ধি অপেক্ষা আয়তনের প্রতি অধিকমাত্রায় দৃষ্টি থাকে। ফলে হীরা-কর্ত্তন এখন সম্পূর্ণভাবে বিদেশীর হস্তগত ব্যবসায়। এদেশীয় মণিকারেরা বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে।

আজকাল হীরা, ভূষণ ভিন্ন অন্য অনেক কাজে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং অতি উৎকৃষ্ট না হইলে যে তাহার আদর হয় না, তাহা নহে। কর্ম্মক্ষেত্রে হীরার কাঠিন্যই ইহার প্রধান গুণ বলিয়া পরিগণিত হয়।

চুনী, পদ্মরাগ, মাণিক্য (ইংরেজী রুবী)—

রাসায়নিক বর্ণনা—এলুমিনা বা এলুমিনিয়ম্ অক্সাইড্। এলুমিনিয়ম্ ধাতু ও অক্সিজেন বা অম্লজান বায়ুর যৌগিক পদার্থ।

কাঠিন্য—৯; সুতরাং হীরার পরেই ইহা কঠিনতম পদার্থ।

আপেক্ষিক গুরুত্ব—৪·১।

বর্ণ—রক্ত (লাল)। শ্রেষ্ঠ পদ্মরাগ অল্প নীলাভ রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। ব্রহ্মদেশীয় পদ্মরাগ বাজারে সর্ব্বাপেক্ষা আদৃত। সেখানকার মণিকারসকলের মতে "আহত পায়রার মুখ হইতে যে নীলাভ রক্ত বাহির হয়, ঠিক সেইপ্রকার বর্ণের পদ্মরাগই উৎকৃষ্ট"।

সংস্থান, ভাস্বরতাপাদন বা স্ফটিকী-ভবন-রীতি (সীষ্টেম্ অব্ ক্রিষ্টালিজেশ্বন্)—ষট্‌কৌণিক।

আকার (form)—ছয় পল-বিশিষ্ট ক্রকচায়ত বা প্রিজ্‌ম্, এবং ছয়পার্শ্ব পিরামিড্; সাধারণতঃ উপল-খণ্ডের ন্যায় কোণ-বিহীন।

পুরাকালে রত্ন-মধ্যে পদ্মরাগকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা হইত। এখনও পদ্মরাগ উত্তম বর্ণ ও আভাযুক্ত হইলে এবং দীপ্তিমান্ হইলে সমান ওজনের হীরা অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্ হয়।

পদ্মরাগ-পরীক্ষা প্রধানতঃ কাঠিন্য এবং ডাইক্রস্কোপ বা দ্বিবর্ণবীক্ষণ যন্ত্রের ব্যবহার দ্বারা করা হয়। হীরা ভিন্ন অন্য কোন প্রাকৃতিক বস্তু পদ্মরাগ ভেদ করিতে পারে না। কার্ব্বণ্ডম্ নামক কৃত্রিম পদার্থও পদ্মরাগ ভেদ করিতে পারে।

এদেশে পদ্মরাগের খনি ব্রহ্মদেশে মোগোক নামক স্থানে এবং সিংহল দ্বীপে আছে।

মোগোকে মর্ম্মর-প্রস্তরের স্তরের মধ্যে পদ্মরাগের আকর আছে। এইখানের খনির অধিকাংশ এক ইংরেজ কোম্পানীর হাতে। কিছু অংশ ব্রহ্মদেশবাসীদিগের নিজস্ব।

পদ্মরাগ দুই রতি প্রমাণ হইলে হীরার তুল্য মূল্যের হয়। তাহার অধিক হইলে হীরা অপেক্ষা অনেকগুণ মহার্ঘ হয়।

পদ্মরাগ কুরুবিন্দ প্রস্তরের রক্তবর্ণ স্বচ্ছ রূপান্তর মাত্র।

নীলমণি, নীলকান্ত মণি, নীলা (ইংরেজী স্যাফায়ার্)—

এই রত্ন পদ্মরাগের অথবা কুরুবিন্দের নীলবর্ণ রূপান্তর মাত্র। সুতরাং গুণ পরীক্ষা ইত্যাদি সমস্তই একপ্রকার; কেবল বর্ণের প্রভেদ।

নীলমণি ব্রহ্মদেশে মোগকে, এবং কাশ্মীরে পাওয়া যায়। ব্রহ্মদেশের খনি হইতে প্রচুর-পরিমাণে এই রত্ন পাওয়া যায়। কাশ্মীরের খনি অতি উচ্চ গিরিপৃষ্ঠে দুর্গম স্থানে অবস্থিত হওয়ায় সেখান হইতে মণি-আহরণ বিশেষ কষ্টসাধ্য। শ্রেষ্ঠ নীলমণি শ্যামদেশে পাওয়া যায়।

ব্রহ্মদেশের খনির অধিকাংশ ইংরেজ কোম্পানীর হস্তগত। নীলমণি, হীরা ও পদ্মরাগ অপেক্ষা অনেক সুলভ। পদ্মরাগ ও নীলমণি যেরূপ কুরুবিন্দের বর্ণযুক্ত রূপ, সেইপ্রকার বর্ণহীন স্বচ্ছ কুরুবিন্দও পাওয়া যায়। চলিত ভাষায় তাহার নাম "পোখরাজ"।

মরকত, পান্না (ইংরেজী এমারাল্ড)—

রাসায়নিক বর্ণনা—এলুমিনিয়ম্ ও বেরিলিয়ম্ ধাতু-দ্বয়ের সহিত বালুসারের যোগে উৎপন্ন যৌগিক পদার্থ।

কাঠিন্য—৭'৫

আপেক্ষিক গুরুত্ব—২'৭

সংস্থান বা ভাস্বরতাপাদন-রীতি—ষট্‌কোণিক।

আকার—ছয়-পার্শ্ব-যুক্ত ক্রকচায়ত বা প্রিজম্।

বর্ণ—হরিৎ।

শ্রেষ্ঠ মরকত গাঢ় হরিদ্বর্ণ মখমলের ন্যায় বর্ণযুক্ত, স্নিগ্ধ ও দোষহীন হইবে। রত্ন-মধ্যে মরকতই সম্পূর্ণ দোষহীন-রূপে সর্ব্বাপেক্ষা দুষ্প্রাপ্য। মরকতের প্রধান দোষ মণির অঙ্গমধ্যে অস্বচ্ছ বা ভিন্নবর্ণের দাগ।

মরকতের খনি আমাদের দেশে নাই। কিন্তু পৌরাণিক গ্রন্থাবলী হইতে অনুমান হয়, যে, পূর্ব্বকালে পঞ্জাব-হিমালয়ের উত্তরাংশে ইহা পাওয়া যাইত। এখন দক্ষিণ আমেরিকার কলম্বিয়া-রাষ্ট্রে মুজো-নামক স্থানের মরকত-খনিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

নীলাভ মরকত (ইংরেজী একোয়ামেরীন্)—

ইহা মরকতের নীল রূপান্তর মাত্র। ইহা মরকত অপেক্ষা সুলভ।

এদেশে কাশ্মীরের প্যাদ্দ‍্ তহ্‌শীলে দাঞ্জো-নামক গ্রামের খনিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। মান্দ্রাজে কোইম্বাটুর, রাজপুতানায় আজমীর এবং টোঙ্করায়সিং, এইসকল স্থানেও ইহা পাওয়া যায়। কাশ্মীরের খনি কাশ্মীররাজের অধিকারে আছে। অল্পদামী রত্নের মধ্যে এইটি অত্যন্ত সুদৃশ্য।

বেরিল-প্রস্তরের বিভিন্ন রূপান্তর মরকত, নীলাভ মরকত, পীত মরকত ইত্যাদি রাসায়নিক বা খনিজতত্ত্ব-বিদের মতে একই পদার্থ। ইহার মধ্যে মরকত (পান্না এমার‍্যাল্ড্) ভিন্ন অন্য সবই এদেশে অল্পাধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।

বৈদূর্য্য, লশুনিয়া (ইংরেজী ক্রীসোবেরিল্, ওরিয়েণ্ট্যাল্ ক্যাট্‌স্ আই)—

রাসায়নিক বর্ণনা—এলুমিনিয়ম্ ও বেরিলিয়ম্ ধাতুর সহিত অক্সিজেন বা অম্লজান বায়ুর যৌগিক পদার্থ। স্বল্পপরিমাণ লৌহের সংমিশ্রণে বর্ণপ্রাপ্তি হয়।

কাঠিন্য—৮'৫।

আপেক্ষিক গুরুত্ব—৩'৮।

সংস্থান—ত্রৈমাত্রিক, ছয়-পার্শ্ব যমজ স্ফটিক।

বর্ণ—পীত, ধূসর, হরিৎ এবং কৃষ্ণ বর্ণের বিভিন্ন ছায়া। শ্রেষ্ঠ বৈদূর্য্য, গাঢ় জলপাই রং, চন্দ্রকলাযুক্ত ও মধ্য ভাগে উপবীতবৎ চঞ্চল আলোক-রেখা-যুক্ত (বেতস বা বেতাস গুণ)।

ইহার বিড়ালাক্ষ (cat's eye) নামের হেতু, ইহার মার্জ্জার-নয়নবৎ আকারও পিঙ্গল বর্ণ।

বৈদূর্য্যের প্রধান খনি সিংহল দ্বীপে। রাজপুতানায় কিষনগড়-রাজ্যেও অল্প পরিমাণে ইহা পাওয়া যায়।

পুলক (পল্‌কা ?), ওপ্যাল্—

রাসায়নিক বর্ণনা—জলযুক্ত বালুসার।

কাঠিন্য—৫'৫ হইতে ৬।

আপেক্ষিক গুরুত্ব—২ হইতে ২'২।

সংস্থান—সংস্থানবিহীন (অ্যামর্‌ফাস্)।

বর্ণ—বিভিন্ন বর্ণের, শ্বেত হইতে কৃষ্ণ বর্ণ পর্য্যন্ত। পুলক, অল্পস্বচ্ছ, ইন্দ্রায়ুধ তুল্য চঞ্চল বর্ণযুক্ত দীপ্তিমান্ মণি। উত্তম পুলক অগ্নিসম উজ্জ্বল, এবং অল্প উত্তাপে অধিক দীপ্তিমান্ হয়। কখনও বা মধ্যদেশে আলোক-সূত্র যুক্ত হয় (ক্যাট্‌স্ আই ওপ্যাল)।

এদেশে মান্দ্রাজে, রাজ্‌মহলে ও অন্যান্য কয়েক জায়গায় পুলক পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু সেসকল হাঙ্গেরী বা অষ্ট্রেলিয়ার পুলকের সমতুল্য নহে।

তুরঙ্গ-মণি, ফিরোজা, টার্কোইজ্—

রাসায়নিক বর্ণনা—ফস্ফরাস্, এলুমিনিয়ম্, তাম্র, লৌহ, মাঙ্গানিজ্ অক্সিজেন বায়ু ও জলের যৌগিক পদার্থ।

কাঠিন্য—৬।

আপেক্ষিক গুরুত্ব—২'৭৫।

সংস্থান—সংস্থানহীন (অ্যামর্ফাস্)।

বর্ণ—অস্বচ্ছ হরিৎ নীলাভ। মধ্যে শ্বেতছায়াযুক্ত। ফিরোজা প্রধানতঃ পারস্য-দেশে পাওয়া যায়। এদেশে স্বল্প-মূল্য মণি-মধ্যে ইহার আদর আছে বলিয়া বর্ণনা দিলাম। এদেশে কোথাও বিশেষ কার্য্যকারীভাবে ইহা পাওয়া যায় নাই। রাজপুতানায় আজ্‌মীরে অল্প কিছু পাওয়া যায়।

স্ফটিক (ইংরেজী রক্ ক্রিষ্ট্যাল্)—

রাসায়নিক বর্ণনা—বালুসার (সিলিকা)।

কাঠিন্য—৭।

আপেক্ষিক গুরুত্ব—২.৬।

সংস্থান—ষট্‌কৌণিক।

আকার—ছয়-পার্শ্ব পিরামিড, এবং প্রিজ্‌ম্।

বর্ণ—বর্ণহীন স্বচ্ছ যথা বিমল, ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ (স্মোকি কোয়াজ্), নীলাভ বেগুনী বা ধূমল (এমেথিষ্ট্), যথা রাজাবর্ত্তস্ফটিক, রক্তাভ (রোজ কোয়াজ), ইত্যাদি।

স্বল্প-মূল্য ভূষণ-প্রস্তরের মধ্যে স্ফটিকাদিই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে এমেথিষ্ট্ বা রাজাবর্ত্ত স্ফটিকের আদর অন্যসকলের অপেক্ষা অধিক। রাজাবর্ত্ত ও অন্যান্যপ্রকার স্ফটিক এদেশে অপরিমিত-পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রায় সকল পর্ব্বত-প্রধান অঞ্চলেই অল্প-বিস্তর ইহার আকর পাওয়া যায়। জব্বলপুরে, রাজ-মহলে, সাঁওতাল পরগণায়, পঞ্জাবে শতদ্রুর উপত্যকায়, ময়ূরভঞ্জে, মধ্য-প্রদেশে ছিন্দওয়ারায়, কুমায়ন অঞ্চলে, মান্দ্রাজের তাঞ্জোর জেলায় নদীসকলের গর্ভে, কাশ্মীরে ও আরও অনেক স্থানে ইহার খনি আছে।

স্ফটিকের কর্ত্তন-প্রণালীর উপর উহার মূল্য নির্ভর করে। দুঃখের কথা, যে, এদেশীয় মণিকারগণের বিদ্যা বা উদ্যমের অভাবে এই আয়কর পদার্থের ব্যবহার ও ব্যবসায় অতি অল্প পরিমাণেই হইয়া থাকে।

গোমেদ, জার্কণ, জার্গুন।

রাসায়নিক বর্ণনা—জার্কন-ধাতু, বালুসার ও অক্সিজেন বায়ুর যৌগিক পদার্থ।

কাঠিন্য—৭.৫।

আপেক্ষিক গুরুত্ব—৪ হইতে ৪.৬।

সংস্থান—চতুষ্কৌণিক।

আকার—দ্বাদশ-পার্শ্ব প্রিজ্‌ম্ (পল)।

বর্ণ—রক্তবর্ণ, পিঙ্গল, শ্বেত, পীতবর্ণ, কখন কখন নীল ও হরিৎ-আভাযুক্ত।

এই স্বল্প-মূল্য রত্ন অতি সুন্দর, দীপ্তিমান্ ও স্বচ্ছ হইয়া থাকে। ইহার বিশেষ গুণ এই, যে, প্রচণ্ড উত্তাপে ইহার বর্ণ নষ্ট হইয়া অধিকতর দীপ্তির বিকাশ হইয়া থাকে। অনেক শঠ মণিকার এই প্রস্তর অগ্নি-সাহায্যে দীপ্তিমান্ করিয়া ইহাকে হীরা বলিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে।

বিভিন্নবর্ণের জার্কন বিভিন্ননামে পরিচিত। রক্ত-বর্ণ প্রস্তর হাইয়াসিন্থ ও পিঙ্গলবর্ণ প্রস্তর জাসিন্থ নামে প্রচলিত। রক্ত ও পীতবর্ণ জার্কন এদেশে গোমেদ নামে পরিচিত। সিংহল দ্বীপে, মান্দ্রাজে, ভিজাগাপটামে, উড়িষ্যায় ও কুমায়নে ইহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

তুরমলী, টুর্ম্মালীন্—

রাসায়নিক বর্ণনা—অতীব কঠিন; দ্বাদশ মৌলিক পদার্থের সংযোগে উৎপন্ন যৌগিক পদার্থ।

কাঠিন্য—৭.৫

আপেক্ষিক গুরুত্ব। ৩।

সংস্থান—রম্বহিড্র্যাল্। তিনপার্শ্ব প্রিজ্‌ম্।

বর্ণ—নানাবর্ণ ও আভা। সাধারণতঃ গাঢ় বর্ণ।

ইহার বর্ণ উজ্জ্বল নহে। ভারতবর্ষে ইহার খনি প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই আছে। সিংহল দ্বীপের খনিই প্রসিদ্ধ।

পুষ্পরাগ, পোখরাজ, টোপাজ্—

রাসায়নিক বর্ণনা—এলুমিনিয়ম্ ধাতু, বালুসার, অক্সিজেন বায়ু ও ফ্লুরোরিন্ বায়ুর যৌগিক পদার্থ।

কাঠিন্য—৮।

আপেক্ষিক গুরুত্ব—৩.৫।

সংস্থান—রম্বিক।

আকার—প্রিজ্‌ম্, শেষ অংশদ্বয় অসমান।

বর্ণ—শ্বেত, নীলাভ, হরিৎ, রক্তাভ, পীতাভ এবং অন্যান্য বর্ণের মিশ্র।

ব্রহ্মদেশে যথেষ্ট পাওয়া যায়। এদেশে দুষ্প্রাপ্য।

সৌগন্ধিক, স্বগন্ধি, স্পিনেল—

রাসায়নিক বর্ণনা—এলুমিনিয়ম্ ও ম্যাগ্নেশিয়ম্ ধাতু এবং অক্সিজেন বায়ুর যৌগিক পদার্থ।

কাঠিন্য—৭ হইতে ৮।

আপেক্ষিক গুরুত্ব—৩.৬।

সংস্থান—একমাত্রিক।

বর্ণ—নানা বর্ণের।

এই রত্নের প্রধান গুণ এই, যে, রত্ন যে কোন বর্ণের হউক না কেন, তাহার অভ্যন্তর হইতে প্রক্ষিপ্ত আলোক-রশ্মি সর্ব্বদাই পীতাভ হইয়া থাকে। ব্রহ্মদেশে মোগোকের পদ্মরাগ-খনিতে ইহা প্রচুর পাওয়া যায়।

নীলগন্ধি, তাম্র, তাম্ড়ি, তাম্ড়া, গার্ণেট্—

রাসায়নিক বর্ণনা—প্রধানতঃ বালুসার, এলুমিনিয়ম ধাতু, লৌহ, চূণ এবং অক্সিজেন বায়ুর যৌগিক পদার্থ। বিভিন্নপ্রকার গার্ণেটে বিভিন্ন পরিমাণে অন্যান্য মৌলিক পদার্থও থাকে।

কাঠিন্য—৭ হইতে ৭.৫। উভারোভাইট্ নামক সুন্দর হরিৎ-বর্ণ গার্ণেটের কাঠিন্য ৮ পর্য্যন্ত হয়।

আপেক্ষিক গুরুত্ব— ৩.৫ হইতে ৪.৩ পর্য্যন্ত।

সংস্থান—একমাত্রিক। দ্বাদশ পার্শ্ব এবং চতুর্ব্বিংশতি পার্শ্ব।

বর্ণ—সাধারণতঃ রক্তবর্ণের নানা-প্রকার আভা।

ঈষৎ রক্তাভ হইতে ঘোর রক্তবর্ণ। সাধারণতঃ নীলাভ রক্তবর্ণ। হরিৎবর্ণ তাম্রও পাওয়া যায়।

এদেশে যথেষ্ট পরিমাণে এই প্রস্তর পাওয়া যায়। কিন্তু আভরণ-হিসাবে বিশেষ প্রচলন না থাকায় বিশেষ ব্যবসায় নাই। সিংহল দ্বীপের রক্তাভ তাম্র সিনামন্ ষ্টোন্ নামে খ্যাত।

পুষ্তিকা, পেরিডোট্—

রাসায়নিক বর্ণনা—বালুসার, ম্যাগ্নেসিয়ম্ লৌহ ও নিকেল ধাতুত্রয় এবং অক্সিজেন বায়ুর যৌগিক পদার্থ।

কাঠিন্য—৬.৫।

আপেক্ষিক গুরুত্ব—৩.৩৫।

সংস্থান—ত্রিমাত্রিক।

বর্ণ—পীতাভ হরিৎ।

রত্ন-মধ্যে ইহা অপেক্ষাকৃত নরম। পুরাকালে ইহার আদর প্রায় হীরার সমতুল্য ছিল।

এই দেশে ইহা দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু ব্রহ্মদেশে মোগোক-অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা হইতে সহজেই বোঝা যায়, যে, এদেশে মণিরত্ন কত আছে। কিন্তু তাহা সংগ্রহ বা কর্ত্তনের চেষ্টা আমাদের মধ্যে অতি অল্পই আছে। অথচ রত্নালঙ্কার এদেশে যত ব্যবহার হয় এরূপ খুব অল্পই অন্য দেশে আছে।

এদেশের রত্নআহরণকারীগণ অতি অশিক্ষিত দরিদ্র নিম্নশ্রেণীর লোক। তাহাদের অন্বেষণ ও আহরণ, দুই অত্যন্ত আদিম এবং বৈজ্ঞানিকউৎকর্ষহীন প্রথায় হয়। ফল, ব্যর্থ পরিশ্রমের জন্য বিষম দারিদ্র্য। খননের স্থান-নির্ব্বাচন এবং খনন-কার্য্য আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে হইলে লাভ অবশ্যম্ভাবী, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। কর্ত্তৃপক্ষের প্রতি বিশেষ দোষারোপ কেবল এক স্থলে করা যায়। ব্রহ্মদেশীয় মোগোক-অঞ্চলের যেসকল অধিবাসী পদ্মরাগ ইত্যাদি খনন ও আহরণ করে, তাহাদিগের খননের অনুমতি-পত্রে এইরূপ সর্ত্ত আছে, যে, তাহারা খনন-কার্য্যে আধুনিক যন্ত্রাদি ব্যবহার করিতে পারিবে না। এই সর্ত্ত অতীব দূষণীয়। কিন্তু যে-সময়ে এইরূপ সর্ত্তে তাহাদিগকে আবদ্ধ করা হইয়াছিল, সে-সময় আর নাই। এখন কর্ত্তৃপক্ষ ঐরূপ সর্ত্ত করাইতে পারেন কি না, সন্দেহ।

রত্ন-কর্ত্তন সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা আরও গভীর। এদেশে অধিকাংশ তথাকথিত মণিকার রত্ন-ব্যবসায়ী মাত্র, তাঁহারা কেবলমাত্র ক্রয়-বিক্রয়-কার্য্য বোঝেন। অথচ অল্প-মূল্য মণি-রত্নাদি আধুনিক উপায়ে কর্ত্তন ও পালিশ করিলে এদেশে বিক্রয় হয় এবং রপ্তানিরও সম্ভাবনা যথেষ্টই আছে।

ঘড়িতে মণি ব্যবহার করা হয়, সকলেই জানেন। ঘড়ির বিজ্ঞাপনে "১২টি মণিযুক্ত," "১৫টি মণিযুক্ত" ইত্যাদি বর্ণনা সকলেই দেখেন। এই মণি সাধারণতঃ তাম্ড়া বা তাম্র প্রস্তর ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। এদেশে ঐ কার্য্যের উপযুক্ত তাম্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার কোনও ব্যবহার নাই বলিলেই চলে।

মণি-পরীক্ষা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই কিছু বলিয়াছি। এখানে আরও কিছু বলিতেছি।

কৃত্রিম মণি-রত্নাদির প্রচলন আজকাল অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। প্রবঞ্চকেরা প্রায়ই কৃত্রিমকে অকৃত্রিম বলিয়া চালায়। এই অনুকরণ প্রধানতঃ বিশেষ উপায়ে প্রস্তুত কাচের দ্বারা হয়। নিম্নলিখিত পরীক্ষাগুলির দ্বারা অকৃত্রিম ও এইরূপ কৃত্রিম মণির প্রভেদ নিরূপণ করা যায়।
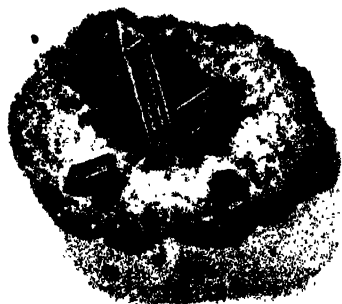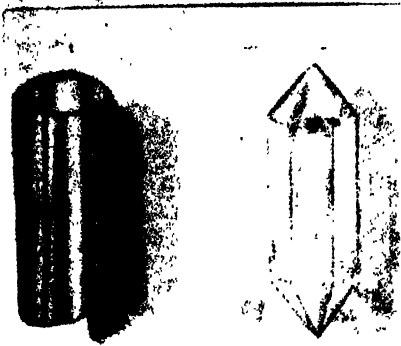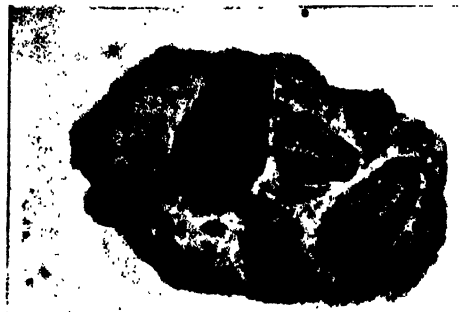
অকৃত্রিম মণি

১। প্রতিসরণ সংখ্যা (রিফ্র্যাক্টিভ ইন্‌ডেক্স) ২.৪ পর্য্যন্ত।
২। হীরা, তাম্র ও রসাগন্ধিক ছাড়া অন্য সকলই দ্বিবর্ত্তনগুণযুক্ত (double refracting).
৩। বহুরাগত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আছে। (প্লিয়োক্রোয়িক)
৪। প্রায় সকল মূল্যবান্ মণির কাঠিন্য ৭ এর ঊর্দ্ধে।
৫। আপেক্ষিক গুরুত্ব ৪ এর নীচে।
৬। অণুবীক্ষণের সাহায্যে সূক্ষ্ম স্তর ও বিজাতীয় পদার্থ মণির ভিতরে দৃষ্ট হয়।
৭। রণ্টগেন্ রশ্মিতে স্বচ্ছ দেখায়।

কৃত্রিম (কাচ) মণি

১। বর্ত্তনীর সংখ্যা কদাপি ১.৬৫ এর অধিক।
২। একবর্ত্তনগুণযুক্ত বা মিথ্যা দ্বিবর্ত্তনগুণযুক্ত (স্থায়ী নহে)।
৩। বহুরাগত্বহীন।
৪। কাঠিন্য ৭ এর নীচে।
৫। আপেক্ষিক গুরুত্ব সাধারণতঃ ৪ এর ঊর্দ্ধে।
৬। অণুবীক্ষণের সাহায্যে ভিতরে বর্ত্তুলাকার বুদ্বুদ ও বক্র রেখা দেখা যায়।
৭। রণ্টগেন রশ্মিতে অস্বচ্ছ দেখায়।

ইতিপূর্ব্বেই দ্বিরাগ-দর্শন বা দ্বিবর্ণবীক্ষণ যন্ত্রের ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু বলা হইয়াছে। নিম্নে কয়েকটি মণির দ্বিরাগ বর্ণের তালিকা দিলাম।

রত্নের নাম	স্বাভাবিক বর্ণ	দ্বিরাগদর্শন যন্ত্রে প্রথম রূপের বর্ণ	দ্বিতীয় রূপের বর্ণ
হীরা	শ্বেত পীত ইত্যাদি	(দ্বিরাগ বিহীন)	
লকান্তমণি বা নীলা	নীল	হরিতাভ পীত	নীল
হ্মদেশীয় পদ্মরাগ	রক্ত	ঊষারক্তিম	রক্ত
ামদেশীয় পদ্মরাগ	রক্ত	পিঙ্গলাভ রক্ত	ঘোর রক্ত
রকত	হরিৎ	পীতাভ হরিৎ	নীলাভ হরিৎ
রনীল হরিন্মণি	ক্ষীণনীল স্বচ্ছনীল	সিন্ধুজলহরিৎ	ফিরোজা
ীলচ্ছায় হরিন্মণি (আকুয়ামেরিন্)	সিন্ধুজলহরিৎ	খড়বৎ শ্বেত	ধূসর নীল
বদূর্য্য	পীত	স্বর্ণাভ পিঙ্গল	হরিতাভ পীত
চুর্ম্মলী	রক্ত	রোহিত	গোলাপী
	হরিৎ	পেস্তার বর্ণ	নীলাভ হরিৎ
	নীল	হরিতাভ ধূসর	"নীলবড়ি" নীল
ুক্তিকা	জলপাই হরিৎ	পিঙ্গলাভ পীত	সিন্ধুজলহরিৎ
ুষ্পরাগ পীত	রক্তাভ পীত	খড়বৎ ঈষৎ পীত	গোলাপী।

অধুনা রাসায়নিক উপায়ে এবং প্রচণ্ড উত্তাপের সাহায্যে নানাপ্রকার রত্নাদি প্রস্তুত হইতেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অধিক ব্যয়সাধ্য বলিয়া বা স্বাভাবিক রত্নের তুল্য গুণযুক্ত নহে বলিয়া এইরূপ রত্ন ব্যবসায়-হিসাবে সফল হয় নাই। কেবল কুরুবিন্দ-জাতীয় মাণিক্য ও মণিসকল কার্য্যকারী রূপে প্রস্তুত হইয়াছে।

রাসায়নিক হিসাবে স্বাভাবিক রত্নে ও তাহার এইরূপে প্রস্তুত অনুকরণে কোনও প্রভেদ নাই। কেননা উভয়েই একই উপাদানে প্রস্তুত। কিন্তু সচরাচর উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বোঝা যায়। অকর্ত্তিত অবস্থায় এইরূপে প্রস্তুত পদ্মরাগ বা নীলকান্তমণির স্ফটিক আকার থাকে না। স্বাভাবিক রত্নের তাহা কিছু থাকে। স্বাভাবিক রত্নের ভিতর অতি সূক্ষ্ম রেখাসকল অন্তর্নিবিষ্ট থাকে। এইরূপ রেখাবিহীন স্বাভাবিক রত্ন অতীব বিরল। অণুবীক্ষণের সাহায্যে ইহা দেখা যায়। রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত রত্নে অন্তর্নিবিষ্ট বর্ত্তুলাকার বুদ্বুদ থাকে।

রত্ন যদি সম্পূর্ণ দোষহীন হয়, তাহা হইলে এইরূপ বিচার প্রায় অসম্ভব।

এইরূপে প্রস্তুত অন্যান্য রত্ন স্বাভাবিক রত্নের সমুদয় জড়ীয় গুণ (physical properties) যুক্ত হয় না।

প্রতিবৎসর এই দেশে বহু সহস্র রতিপ্রমাণ রাসায়নিক পদ্মরাগ আমদানি হয়।

পরিশেষে বক্তব্য এই, যে, শিক্ষিত রত্ন-পরীক্ষক এবং নিপুণ ও কর্ম্মকুশল মণি-কর্ত্তনকারী এই দেশে যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিতে পারেন। জ্ঞান, অধ্যবসায় ও সততা এবং কিছু মূলধন এই কার্য্যের জন্য প্রয়োজন।

এই প্রবন্ধে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের পরিভাষা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হইয়াছে। রত্নাদির বাংলা নাম সম্পূর্ণই তাঁহার "রত্ন-পরীক্ষা" হইতে গৃহীত হইয়াছে।

শ্রী কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

বাঙ্গালার কথা

(২০শে বৈশাখ পর্যন্ত)

বিধবা-বিবাহে মহাত্মার অভিমত—

বোম্বাই প্রদেশের লিমড়ীতে উদীচ্য ব্রাহ্মণ-সমাজের সভাপতি শ্রীযুক্ত ডি বি স্বকুল প্রয়োজন মত কোন কোনও স্থলে বিধবা-বিবাহ দেওয়া উচিত, সভাপতির অভিভাষণে এই মত প্রকাশ করায় গোঁড়া ব্রাহ্মণ সমাজে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত স্বকুল পূর্ব্বেই তাঁহার অভিভাষণের খসড়া মহাত্মাজীর দৃষ্টার্থে পাঠান এবং তাঁহার অভিমত প্রার্থনা করেন। বৈধব্য-জীবনের ব্রহ্মচর্য্যের উচ্চাদর্শ মহাত্মাজী সমর্থন করেন এবং উহা দ্বারা হিন্দুসমাজের যে অশেষ কল্যাণ হইয়াছে তাহাও প্রদর্শন করেন, কিন্তু যতদিন সমাজে বিপত্নীক পুরুষগণ পুনর্ব্বিবাহের লালসা সংযত করিতে পারিতেছেন না, ততদিন পর্যন্ত বিধবা-বিবাহ-সমস্যার গুরুভার আমাদের বহন করিতে হইবে। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, বাল-বিধবা দেখিলেই তাঁহার অন্তর শোকার্ত্ত হইয়া উঠে এবং পুনর্ব্বিবাহের পরিবর্ত্তে চিরন্তন বৈধব্যের কোন অপরিহার্য্য প্রয়োজন তিনি দেখেন না। এক্ষেত্রে তিনি ব্যক্তিগত বিবেক সম্মত না হইলেও বিধবা-বিবাহ দেওয়া ছাড়া উপায়ান্তর দেখেন না। যাহাদের স্বামী-সহবাস হয় নাই, এমন বালিকার বিবাহ সম্বন্ধে তিনি শ্রীযুক্ত স্বকুলের সহিত একমত। মহাত্মাজী যুবক যুবতীগণের বিবাহের বয়স নির্দ্দিষ্ট করিবারও পক্ষপাতী।

— আত্মশক্তি

নতুন করে' গড়া—

এই সেদিন ভাটপাড়ায় ব্রাহ্মণদের যে মহাসম্মিলন হ'য়ে গেল, তাতে সমগ্র হিন্দু-সমাজের অভাব অভিযোগের আলোচনা হয়নি। সমাজের সকল স্তরের লোকদের সামাজিক সমান অধিকার প্রদানের চেষ্টা সমবেত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতরা করেননি। অধিকন্তু হিন্দু-সমাজের উন্নতি সাধন করতে যাঁরা চান, তাঁদেরই কাজের নিন্দা করেছেন।

এমন অবস্থায় সমাজের জন্য সমগ্র হিন্দুজাতির যে আজ আর ব্রাহ্মণদের বিধানের দিকে চেয়ে থাকা চলে না, একথা সকল হিন্দুই স্বীকার করবে। তাই আজ হিন্দুদের গোঁড়া বামুনদের অপেক্ষায় বসে না থেকে নিজেদেরই নতুন ক'রে সমাজ গড়ে' নিতে হবে। যে ব্রাহ্মণরা অব্রাহ্মণ হিন্দুদের সঙ্গে উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে সম্মত থাকবেন, তাঁরা হিন্দুর শ্রদ্ধা থেকে নিশ্চয়ই বঞ্চিত হবেন না, যাঁরা এপথে বিঘ্ন ঘটাবেন, জাতি তাঁদের সহজেই উপেক্ষা করে এগিয়ে যেতে পারবে। আজ বাঁচতে হ'লে হিন্দুকে এই পথই অবলম্বন করতে হবে।

সিরাজগঞ্জে যে হিন্দুসভার অধিবেশনের কথা হচ্ছে, আমরা আশা করি সে সভায় হিন্দুর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির একটা পথ স্থির করা হবে।

— বঙ্গবাণী

বীরভূমে ভীষণ কলেরা—

বঙ্গীয় স্বাস্থ্য-সমিতির ডিরেক্টর ডাঃ বেণ্টলির উপদেশ-মত বাঙ্গালার সাধারণ স্বাস্থ্য-সমিতি একদল উপযুক্ত চিকিৎসক বীরভূমে কলেরা-নিবারণ-কল্পে প্রেরণ করিয়াছেন। ডাঃ বসুর কলেরা নিবারণকারী দল ইতঃপূর্ব্বেই ২৪ পরগণায় যথেষ্ট কার্য্যক্ষমতা দেখাইয়াছেন। এই দলটি বীরভূমের সর্ব্বাপেক্ষা কলেরা-সংক্রামিত স্থানে খুব জোর কাজ চালাইয়াছেন। এই দলটি দুবরাজপুরে কার্য্য করিতেছেন। উক্ত স্থানে ইতিপূর্ব্বেই বহুসংখ্যক লোক কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। এই স্থানের মৃত্যুসংখ্যা শোচনীয়ভাবে বৃদ্ধি পাইয়া উঠিয়াছিল, এই কলেরা-নিবারণকারী দল এখন সেখানকার মৃত্যু-সংখ্যা অনেকটা কমাইয়া ফেলিতে সক্ষম হইয়াছেন। ভীষণ জলাভাব-নিবন্ধন এখানে শস্যাদি কিছুই হয় নাই। এখানে এখন প্রধান করণীয় বিষয় হইল জলাভাব দূর করিবার জন্য কূপাদি খনন করা। এইসমস্ত অঞ্চলে কেবল কয়েকটি মাত্র জলাশয় পুকুর আছে। কিন্তু তাহাতে জল মোটে ইঞ্চিখানেক মাত্র আছে। তাহাও কর্দ্দম-পরিপূর্ণ. এই কর্দ্দমপূর্ণ জল পান করাতে রোগ আরও ভয়ানকভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। আরও ভয়ের কারণ এই যে, এখানকার যে অঞ্চলে রোগ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে আর কোন গ্রামের বা অঞ্চলের লোক রোগ-আক্রমণের ভয়ে তাহাদিগকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইতেছে না। এইসমস্ত কারণে দুর্ভিক্ষও এই দেশে ভীষণ বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছে। রোগ এবং দুর্ভিক্ষাক্রান্ত অঞ্চল হইতে অনশন এবং শোচনীয় মৃত্যুর খবর প্রায়ই পাওয়া যাইতেছে। বঙ্গীয় ছাত্র কনফারেন্সের ভাইস প্রেসিডেণ্ট যোগেশ চন্দ্র বসুর নেতৃত্বাধীনে একটি কূপ-খনন দল গঠন করা হইয়াছে, একদল জলাভাবাক্রান্ত স্থান-সমূহে অনেকগুলি বড় বড় কূপ খনন করিয়াছেন। ডাঃ বেণ্টলিও স্বেচ্ছাসেবকগণের সহিত মিলিত হইয়া কোদাল লইয়া কূপ-খননে লাগিয়া গিয়াছেন, কিন্তু জলাভাবই এখানে একমাত্র দূর করণীয় বিষয় নহে, অচিরে খাদ্যাভাব দূর করিবার ভারও গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যান্য কারণের সঙ্গে অন্নাভাবও এই অঞ্চলের অধিবাসীদিগের মৃত্যুর অন্যতম কারণ। বঙ্গীয় স্বাস্থ্য-সমিতি অন্নাভাব দূর-করণার্থে ভালাস নামক স্থানে একটি অন্নদান-কেন্দ্র খুলিয়াছেন, এই কেন্দ্রে ৪০০ লোককে খাদ্য সরবরাহ করা হইতেছে। একটি জেলাকে অন্নাভাবের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে একটি উপযুক্ত অর্থ-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করা অত্যাবশ্যক। বাঙ্গালার জনসাধারণকে এজন্য মুক্তহস্তে অর্থ-সাহায্য করিতে হইবে। যাঁহারা যাহা দিতে চাহেন, বস্ত্রই হউক অর্থই হউক তাহা ১০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট বঙ্গীয় স্বাস্থ্য সমিতি অফিসে পাঠাইবেন।

— হিন্দুস্থান

খুলনায় কায়স্থ-সম্মিলন—

এবার খুলনায় কায়স্থ সম্মিলন হইয়া গেল। প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে মহাশয় একদিন সভাপতি হইয়াছিলেন।

সামাজিক ব্যাপার হইতে বিলাতফেরতার দল এতদিন নিজেদের তফাৎ রাখিয়াছিলেন। আজকাল কিন্তু ইহাঁরা অসঙ্কোচে সামাজিক ঘোঁট পাকাইতেছেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, কিরণচন্দ্রের মত আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তিও ক্ষত্রিয়ত্বের নেশায় "দেববর্ম্মা" উপাধি গ্রহণের প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারেন নাই। যাঁহারা অনুন্নত শ্রেণীকে উঠাইতে চাহেন, তাঁহারা আবার পৈতা পরিয়া নিজেদের তফাৎ রাখিতে চান্ কেন? এরহস্য বুঝিতে কাহারই বাকী নাই। যতদিন পর্য্যন্ত প্রকৃত হিন্দুর মত ইহাঁরা মনে-মুখে এক হইতে না পারিবেন, ততদিন চালাকি করিয়া কখনই সমাজ-সংস্কার করা চলিবে না।

—পল্লীবাসী

জলাচরণ-সভা—

সহযোগী "প্রতিনিধি"তে প্রকাশ—গত ৩০শে চৈত্র সিরাজগঞ্জ হইতে শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী, শ্রীমৎ করুণানন্দ স্বামী, শ্রীমতী শান্তিমাতা মাদ্রাজ হইতে আগত শ্রীযুক্ত এম. সি. নাইডু, শ্রীযুক্ত কুলকুণ্ডলিনী প্রসাদ গুপ্ত বি. এল প্রভৃতি বহু উকীল ও সমাজস্থ উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু ভদ্রলোক গোপালপুরে একটি সভা করেন। প্রায় চারিশত নমঃশূদ্র সভায় উপস্থিত হন। সভায় স্বধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন এবং নমঃশূদ্র ও অন্যান্য অনাচরণীয় জাতির প্রতি সমবেদনা ও প্রীতি প্রকাশ করিয়া বক্তৃতা করেন। সভাস্থলেই উচ্চ শ্রেণীস্থ ভদ্রলোক নমঃশূদ্র দ্বারা আনীত জল ও তৎসহ বেলের সরবৎ ও মিষ্ট প্রভৃতি আনন্দের সহিত খাইয়াছেন। এইবারকারে নমঃশূদ্রগণ অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন। যতদূর বুঝিতে পারা গেল তাহাতে দুইটি লোক ছাড়া কাহারও বর্ম্মাত্ব গ্রহণের মাত্রও আকাঙ্ক্ষা নাই। —টাঙ্গাইল হিতৈষী

কলিকাতার মোটর-দুর্ঘটনা—

কলিকাতায় প্রায় প্রত্যহ এত ঘনঘন মোটর-দুর্ঘটনা হইতেছে যে, সহরবাসীদের নিতান্ত আশঙ্কার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। গত কয়েকদিনের মধ্যে সহরের উত্তরে বাগবাজারে ও দক্ষিণে ক্লাইভ-ষ্ট্রীটে উপর-উপর কয়েকটি শোচনীয় ঘটনা হইয়াছে। গরীব লোকেরা এরূপভাবে আর কতকাল প্রাণ হাতে লইয়া চলাফেরা করিবে? কিছুদিন পূর্ব্বে মোটর দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য কতকগুলি কড়া নিয়ম জারি হইয়াছিল। সেগুলি কি ইতিমধ্যেই অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে? যদি দুর্ঘটনার জন্য মোটর-চালকদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা না হয় এবং মোটরের গতিবেগ নিয়মিত করিবার জন্য কড়া নিয়ম প্রচলিত না করা যায়, তবে উহার প্রতিকার অসম্ভব। সহরের কর্ত্তাদের জানা উচিত, যে, জনকত মোটর-বিহারী ধনীদের বিলাস বা খেয়ালের চেয়ে সহরের গরীবদের প্রাণের মূল্য কিছু মাত্র কম নহে। যে-জিনিষটি মোটর-ওয়ালাদের চোখে দুর্ঘটনা মাত্র তাহা গরীবদের পক্ষে জীবন-মরণের সমস্যা। কলিকাতা কর্পোরেশনের কি এসম্বন্ধে কিছুই করিবার নাই?

—আনন্দবাজার

বঙ্গে আর্য্য-সমাজের প্রচার-কার্য্য—

পূর্ব্ববঙ্গে দেড় হাজার নমঃশূদ্রাদি অচ্ছুত ভ্রাতাগণের আর্য্য-সমাজ-কর্ত্তৃক শুদ্ধি ও জলাচরণীয় করণ হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি পণ্ডিত শঙ্করনাথ তাঁহার সভার তিনজন উপযুক্ত প্রচারক পূর্ব্ববঙ্গে বৈদিক ধর্ম্ম প্রচারার্থ পাঠাইয়াছেন। নদীয়া জেলা ও ফরিদপুর জেলা যেখানে মিলিত হইয়াছে তথায় নদীয়া জেলার অন্তর্গত শিকারপুর-নামক এক গণ্ড-গ্রামে এক বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে প্রায় দুই হাজার দর্শকবৃন্দ ছাত্র, প্রায় এক হাজার বা ততোধিক নমঃশূদ্র, তেওর ভুঁইমালী ও ধাত্রী চারি সম্প্রদায়ের অচ্ছুত ভ্রাতৃগণ উপস্থিত হন। সমাগত লোকের আজ্ঞানুসারে উক্ত এক হাজার অচ্ছুত ভ্রাতাগণকে যথারীতি বৈদিক হোমাদি সম্পাদন করিয়া ও তৎসহ প্রায়শ্চিত্তাদি সমাপনের পর শুদ্ধ করিয়া সর্ব্বাগ্রে আর্য্য পণ্ডিতগণ ঐ ভ্রাতাগণের হস্ত-প্রদত্ত জল পান করেন। তৎপরে যেসকল উচ্চপদস্থ হিন্দুগণ এই সভার আয়োজন করিয়াছিলেন, তাঁহারা স্বইচ্ছায় সকলের সম্মুখে নির্ভীকচিত্তে ইহাদের হস্ত-প্রদত্ত জল পান করায়, দর্শকবৃন্দের অধিকাংশ হিন্দু ভ্রাতাগণও ঐ কার্য্যে যোগদান দিয়া এইসমস্ত ভ্রাতাগণকে হিন্দু-সমাজে প্রকাশ্যভাবে জলাচরণীয় করিয়া দেন। সভা-ভঙ্গের পূর্ব্বেই ৫।৬ ক্রোশ দূরের বাগচী জামশেরপুর গ্রামের ব্রাহ্মণ-জমিদারগণ ও অপরাপর উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুগণ আর্য্য-সমাজের প্রচারকগণকে তাঁহাদিগের গ্রামে গিয়া প্রচার করিতে অনুরোধ করায় উপরোক্ত তিনজন আর্য্য-প্রচারক তথায় উপস্থিত হইয়া খুব জোরের সহিত প্রচার করিয়া তৎপরে প্রায় ১৫০০ দর্শকবৃন্দের সম্মুখে প্রায় পাঁচ শত নমঃশূদ্র, ভুঁইমালী ও ধাত্রী সম্প্রদায়ের লোককে যথারীতি শুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে জলাচরণীয় করা হয় ও উপস্থিত উচ্চ শ্রেণীস্থ হিন্দুগণ ঐরূপ সংশুদ্ধ ভ্রাতাগণের সহিত পরম প্রেম-সহকারে আলিঙ্গন করিয়া নিজ ভ্রাতা স্বরূপে গ্রহণ করেন। আমরা আশা করি যে, শীঘ্রই আর্য্য-প্রচারকগণ আরও এইরূপ শুদ্ধি কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবেন।

—স্বরাজ

খাদি-প্রতিষ্ঠান—

বীজ-বপনের সময়—বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ্টির পর কাপাসের বীজ বপন করিবার প্রকৃষ্ট সময়। মাটি রসাল না হইলে বীজ মরিয়া যাইবে। সেইজন্য যখন দেখিবেন যে বৃষ্টির জল পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে, রৌদ্রের প্রখর তাপে কাপাসের চারাগুলি শুকাইয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই, তখনই বীজ বপন করিবেন।

বীজ-বপনের নিয়ম—বীজ বপন করিবার সময় বীজগুলিকে একবার জলে ভিজাইয়া লইবেন। জমি ভাল করিয়া তৈয়ার হইলে ১৮ ইঞ্চি বা ১ হাত অন্তর লাইন করিবেন। প্রত্যেক লাইনের উপর আবার ঠিক ১৮ ইঞ্চি বা ১ হাত অন্তরে দুইটি করিয়া বীজ বপন করিবেন। বীজগুলি ১ আঙ্গুল হইতে ২ আঙ্গুল মাটির নীচে পড়া চাই। ২ আঙ্গুলের বেশী মাটি চাপা পড়িলে বীজ গজাইবে না। ২ আঙ্গুল ১॥ ইঞ্চি ধরিতে পারেন। একটি বীজ যদি খারাপ থাকে, তবে অপরটা হইতে গাছ উঠিবে। যদি দুইটি বীজ হইতে গাছ বাহির হয় তবে একটু বড় হইলে একটি গাছ তুলিয়া ফেলিবেন। কারণ দুইটি গাছ একসঙ্গে পুষ্টিলাভ করিতে পারে না—একটির রস দুইটিতে ভাগ করিয়া লওয়ার জন্য দুইটি গাছই নিস্তেজ হয় ও ফসল কম দেয়।

বীজ-বপনের ক্ষেত্রে—কাপাসের চারাগুলি বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের বাঁচিবার জন্য জলের দরকার হয় বটে, কিন্তু বেশী তাহারা গ্রহণ করিতে পারে না। গাছের গোড়ায় জল জমিয়া থাকিলেই তাহাদের শিকড়গুলি নষ্ট হইয়া যাইবে। সেইজন্য দেখিবেন যেন কাপাসের জমি নীচু না হয়—বৃষ্টির জল পড়িবামাত্র তাহা যেন শীঘ্র বাহির হইয়া যাইতে পারে। গাছগুলি যখন ৭ ইঞ্চি লম্বা হইয়া উঠিবে, তখন একবার জমিটি নিড়াইবার ব্যবস্থা করিবেন। কারণ এই সময় আগাছা উঠিয়া কাপাসের চারাগুলিকে নষ্ট করিয়া দিবার সম্ভাবনা আছে।

—বন্দেমাতরম্

বঙ্গের চুরি-ডাকাতি—

অনাবৃষ্টির ফলে অভাব-অনাটন ও রোগ-ব্যাধির স্রোত সমস্ত দেশের উপর দিয়া চুরি-ডাকাতি ও লুণ্ঠনের স্রোত যেন অপ্রতিহত-গতিতে ঢেউ

খেলিয়া চলিয়াছে। গত সপ্তাহে বঙ্গদেশের প্রায় প্রত্যেক জেলায় এমন কি কলিকাতার বুকের উপর পর্য্যন্ত ভয়াবহ ডাকাতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতার স্বনামধন্য পুলিশ কমিশনার মিঃ টেগার্টের প্রবল প্রতাপে চোর-ডাকাতের দল অনেকটা শায়েস্তা হইলেও মফঃস্বলে পুলিশের শোচনীয় দুর্ব্বলতা ও অকর্ম্মণ্যতার জন্য পল্লীগ্রামে উহাদের অখণ্ড রাজত্ব স্থাপিত হইতে বসিয়াছে। আধুনিক বেঙ্গল পুলিশের কাপুরুষতার জন্য চোর-ডাকাত ও দুষ্ট লোকে উহাদিগকে আদৌ গ্রাহ্য করে না। পূর্ব্বে সাহসী, বলবান্ ও কার্য্যদক্ষ লোকদিগকে পুলিশে চাকুরী দেওয়া হইত। তাহারা সময়-সময় শিষ্টের উপর জুলুম অত্যাচার করিত সত্য, কিন্তু দুষ্টের দমন এবং চোর-ডাকাত-দলনেও তাহারা বিশেষ সিদ্ধহস্ত ছিল। এক্ষণে তাহাদের পরিবর্ত্তে যেসকল ক্ষীণদেহী, চপল ও কাপুরুষ কলেজী ছোকরার দলকে পুলিশের চাকুরী দেওয়া হয়, ইহাদের না আছে সাহস, না আছে তেজস্বিতা এবং না আছে সেইরূপ কার্য্যদক্ষতা। বিশেষতঃ অন্যান্য কাপুরুষদের তুলনায় পুলিশ কর্ম্মচারীরা বেতনও যথেষ্ট বেশী পায় বলিয়া ইহারা ঐ-সব হাঙ্গামে না জড়াইয়া নাকে তেল দিয়া আরামের জীবন অতিবাহিত করিতেই বেশী অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। আজকাল পুলিশ চুরি-ডাকাতির যেধরণের তদন্ত করে, তাহা একটা অতি অকার্য্যকর মামুলী অভিনয় মাত্র। নিতান্ত সাধারণ চোরও এমন পুলিশকে গ্রাহ্য করে না। পাকা চোর এবং ডাকাত দলের ত কথাই নাই; ইহার ফলে লোকের ধন-প্রাণ লইয়া মফঃস্বলে বাস করা ঘোর বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে! আমরা এইসকল ব্যাপারের প্রতি গবর্ণমেণ্ট এবং রক্ষিত বিভাগের বড় কর্ত্তাদের তীব্র দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

— মোসলেম হিতৈষী

বাঙ্গালায় ডাকাতি—

গত মার্চ্চ মাসে বাঙ্গালায় ১১২টা ডাকাতি হইয়াছে। গত বৎসর ঐ মাসে বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানে মোট ১৩৮টা ডাকাতি হইয়াছিল। গত ১২ই এপ্রেল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে বাঙ্গালা-দেশে মোট ৫২টা ডাকাতি হইয়াছে।

— আত্মশক্তি

পাট—

পাট বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে বৎসরে যত টাকা মূল্যের পণ্য বিদেশে রপ্তানি হয়, পাটের মূল্য তাহার এক পঞ্চমাংশ। ১৯২৩ ইং সনে ভারতের সমস্ত রপ্তানি দ্রব্যের মোট মূল্য ৩২১॥০ কোটি টাকা; তন্মধ্যে পাটের কাঁচা মালের মূল্য প্রায় ২০ কোটি ও তৈয়ারী মালের মূল্য ৪২ কোটি টাকা; এই ৬২ কোটি টাকা মোট পাটের মূল্য। এতদ্ব্যতীত এদেশেও মজুত এবং ব্যবহৃত পাট ছিল। তাহার মূল্যও কম নয়। এ-সবই বাঙ্গালার ঐশ্বর্য্য। গড়ে বৎসরে প্রায় ৫ কোটি মণ পাট বাঙ্গালায় উৎপন্ন হয়। বাঙ্গালার লোক-সংখ্যাও প্রায় ৫ কোটি, সুতরাং প্রায় জন প্রতি এক মণ পাট উৎপন্ন হয়। মোট উৎপন্নের প্রায় অর্দ্ধেক মাল দ্বারা কলিকাতার মিলে বস্তা এবং চট তৈয়ার হয়, এবং বাকী প্রায় অর্দ্ধেক বিদেশে কাঁচা অবস্থায় রপ্তানি হয়। কাঁচা মাল প্রায় সমস্তই বিলাতে প্রেরিত হয় এবং তথায় ডাণ্ডি সহরে বস্তা ও চট প্রস্তুত হয়। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে ৮১টি চট-কল আছে। ইহার সমস্তই বিদেশীয় কর্ত্তৃক পরিচালিত। ২টি নূতন কল ভারতবাসী কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে এবং এই দুইটিই মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী কর্ত্তৃক পরিচালিত। বাঙ্গালীর মিল একটিও নাই। এই ৮১টি চট-কলে ২৮৪৩৫৫ জন লোক মজুরের কাজ করে, ইহার প্রায় সমস্তই বোধ হয় অ-বাঙ্গালী মজুর! বাঙ্গালা দেশে নানাস্থানে মোট ৩৩২টি কাঁচা পাটে গাঁইট বাঁধার কল আছে। তাহাতে ৩৭৬৮৭ জন লোক খাটে। ইহারও বোধ হয় অর্দ্ধেকের উপর অ-বাঙ্গালী মজুর।

পাট ভারত-সাম্রাজ্যের একটি অতি মূল্যবান্ ও অতুলনীয় সম্পত্তি। কলিকাতায় স্থিত পাটের কলসমূহে গত তিন বৎসরে প্রতিবৎসর গড়ে প্রায় ৫ কোটি টাকা নেট্ মুনাফা হইয়াছে। ১৯১৯ ও ১৯২০ ইং সনে এই-সব কলে প্রতিবৎসরে ১২ কোটি টাকা নেট্ মুনাফা হইয়াছে। বিলাতের কলের উৎপন্ন দ্রব্যের মুনাফাও এইরূপে ৫ কোটি ধরিলে গড়ে বৎসরে পাটের নেট্ মুনাফা প্রায় ১০ কোটি টাকা হয়। ইহা বাদে মিলের কর্ম্মচারীর বেতন, কমিশন্ ইত্যাদি অন্যান্য খরচের বহু টাকাও বিদেশীয়দের হস্তেই যায়। তৎপরে রেল-ষ্টীমার ভাড়া, ইনস্যুরেন্স খরচ ইত্যাদি প্রায় সবই বিদেশীয়েরা পায়। এই-সব খরচের টাকার হিসাব ধরিলে প্রায় আরও ১০ কোটি টাকা পাট হইতে আদায় হয়।

সুতরাং দেখা যায় প্রায় ২০ কোটি টাকা পাট হইতে বৎসরে আদায় হয়। ভারত-গভর্ণমেণ্টের ভূমি-রাজস্বের আয় বৎসরে ২৫।৩০ কোটি টাকা। সুতরাং বৎসরে পাটের লাভ যাহা হয় সমগ্র ভারত-গভর্ণমেণ্টের ভূমি-রাজস্বের আয়ও প্রায় তাহাই হয়। পাটের কারবার সংক্রান্ত লাভের অবস্থা এই। এখন এই পাটের কারবার বাঙ্গালীর হাতে থাকিলে এবং বাঙ্গালী দ্বারা পরিচালিত হইলে এই ২০ কোটি টাকা পাটের লাভই এদেশেই থাকিবে, এবং প্রত্যেক বাঙ্গালী তাহাতে বৎসরে ৪৲ টাকা মুনাফা পাইবে। মুনাফা এবং পাটের মোট দাম ধরিলে জন প্রতি ২০৲ টাকা প্রত্যেক বাঙ্গালী বৎসরে পাইবে। সুতরাং প্রায় ১০০ কোটি টাকা বৎসরে বাঙ্গালায় থাকিবে। সমগ্র ভারত-গভর্ণমেণ্টের আয় প্রায় ১১০ কোটি টাকা। সুতরাং সমগ্র ভারত-গভর্ণমেণ্টের যে আয় সে আয় এক বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালীদের হাতেই থাকিবে। বাঙ্গালার বিশেষত্বই এই, কিন্তু বাঙ্গালী তাহা বুঝিতেছে না। পাট হাত করিতে পারিলেই বাঙ্গালায় প্রকৃত স্বরাজ স্থাপিত হইবে। যতদিন বাঙ্গালার পাটের কারবার বাঙ্গালী দ্বারা পরিচালিত না হইবে ততদিন বাঙ্গালীর ভাত-কাপড় জুটিবে না এবং মুখে হাসি ফুটিবে না। বাঙ্গালীর অস্তিত্ব পাটের উপর; যতদিন নিজের উৎপন্ন পাটের লাভ বাঙ্গালী না পাইবে ততদিন বাঙ্গালীর দুরদৃষ্ট ঘুচিবে না।

— বাণিজ্য বার্ত্তা

বাণিজ্যের হিসাব—

ভারতের বাণিজ্য বিভাগের ডিরেক্টর ১৯২২—২৩ খ্রীষ্টাব্দের আলোচনা-পুস্তিকা সম্প্রতি প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহার এই বিবরণীতে ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ভারতের আমদানি এবং রপ্তানী বাণিজ্যের কথা আলোচিত হইয়াছে। পাঠকবর্গ স্মরণ রাখিবেন যে, ভারতের রপ্তানির অর্থ ভারতের কাঁচা মাল বিদেশে প্রেরণ। ভারতের আমদানির অর্থ ভারতের প্রেরিত কাঁচা মালে বিলাতে পণ্য প্রস্তুত হইয়া, ভারতে পুনরাগমন।

ডিরেক্টর জেনারেল বলিতেছেন যে, আলোচ্য বর্ষে তাহার পূর্ব্ব বৎসরের অনেকগুলি বিশেষত্ব বজায় থাকিলেও বৎসরের শেষভাগে অনেকটা শুভ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। ভারতবর্ষের গুদামে বিদেশী পণ্য থাকাতে, ভারতবর্ষ বিদেশী পণ্য ক্রয় করিতে পারে নাই সত্য—কিন্তু ভারতবর্ষ বেশী পরিমাণে তাহার পণ্য বিদেশে রপ্তানি করিয়াছে।

বিলাত, জাপান ও মার্কিণ হইতেই সাধারণতঃ ভারতবর্ষে পণ্য আসে—যুদ্ধের পর জর্ম্মানী, অষ্ট্রীয়া, রুশিয়া ভারতবর্ষের হাট হইতে বিতাড়িত হইয়াছে—বিলাতী বণিক্ ভারতবর্ষের হাটে একাধিপত্য করিতে উৎসুক হইলেও তাহাদের বন্ধু জাপান ও মার্কিনকে কিছু বলিতে পারে নাই—জাপান ও মার্কিন বিলাতী বণিকের এই চক্ষু-লজ্জার সুযোগ গ্রহণ করিয়া, ভারতবর্ষের হাট অধিকার করিতে চেষ্টা করিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ফ্রান্স রুর দখল করিলেও ভারতের রপ্তানির কিছুমাত্র ক্ষতি হয়

ই—জাপান, মার্কিন এবং ইংলণ্ড ভারতের কাঁচা মাল খুব বেশী পরিমাণেই ক্রয় করিয়াছে।

আমদানির মধ্যে এক বিলাতী বস্ত্রের আমদানি বৃদ্ধি পাইয়াছে—অন্য সব পণ্যের আমদানি কমিয়া গিয়াছে। আমদানি কাপড়ের পরিমাণ ৫০ কোটি হইতে ১০০ কোটি গজ এবং মূল্য ১৫ কোটি হইতে ৫৮ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই কাপড়ের হিসাব পরিবর্জ্জন করিলে, আমদানি-জিনিষের পরিমাণ শতকরা ২২ ভাগ কমিয়াছে। টাকার হিসাবে শত ২০ কোটি টাকা হইতে ১ শত ৭৪ কোটি টাকায় নামিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর ৯ কোটি টাকার উপর গম আমদানি হইয়াছিল, এবৎসর মোটে ৩৫ লক্ষ টাকার গম ভারতবর্ষে আসিয়াছে। চিনির আমদানি ২৭ কোটি টাকা হইতে ১৫ কোটি টাকায়, কলকব্জা, মিলের জিনিষ, রেলওয়ে জিনিষ, গাড়ী প্রভৃতি ৩৪ কোটি ও ১৯ কোটি টাকা হইতে যথাক্রমে ২৩ কোটি এবং ১১ কোটি টাকায় নামিয়াছে। বিদেশ হইতে ভারতের কয়লার আমদানিও ৬ কোটি টাকা হইতে ৩ কোটি টাকায় নামিয়াছে।

রপ্তানির হিসাবে দেখা যায় যে, পূর্ব্ব বৎসর ৪৪ কোটি টাকার পাট ও পাটের জিনিষ রপ্তানি হইয়াছিল—এবৎসরে ৬৩ কোটি টাকার পাট ও পাটের জিনিষের রপ্তানি হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ৭ লক্ষ টন অধিক তুল, তিল, সরিষা প্রভৃতি তেল বীজ, ১০ কোটি টাকা মূল্যের অধিক রপ্তানি হইয়াছে; ১৭ কোটি টাকার অধিক কার্পাস বিদেশে চালান হইয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বিদেশী বণিক্ এদেশের বাণিজ্যে এখনও লাভ করিতেছে—আমরা এত চীৎকার করিয়াও তাহাদের দৃঢ় বন্ধন তিলমাত্র শিথিল করিতে পারি নাই। —বন্দেমাতরম্

বাংলার কয়লা :—

ইণ্ডিয়ান্ মাইনিং ফেডারেশনের গত অধিবেশনে সভাপতি মি. এন্, ..., সরকার বাঙ্গালার কয়লার বাজারের বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা বিশেষরূপে বর্ণনা করেন। বাঙ্গালার কয়লা-রপ্তানিতে যে ক্ষতি হইয়াছে এখনও তাহার পূরণ হয় নাই। বাঙ্গালার কয়লা-রপ্তানির পথে বহু বাধা-বিঘ্ন রহিয়াছে, বিদেশী কয়লা প্রচুর পরিমাণে আমদানি হইতেছে। এই বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের ঔদাসীন্য বাঙ্গালার পক্ষে আরও ক্ষতির কারণ হইয়াছে। দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা হইতে যে পরিমাণ কয়লা বিদেশে রপ্তানি হইত, বর্ত্তমান সময়ে তদপেক্ষা অনেক কম হইতেছে এবং দেশীয় খনিগুলির অস্তিত্বরক্ষাই সমস্যার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। আফ্রিকা ও বিলাত হইতে এদেশে কয়লা পাঠাইতে যেপরিমাণ খরচ পড়ে, এক বাঙ্গালা হইতে বোম্বাই নগরে কয়লা পাঠাইতে তদনুপাতে খরচ অনেক বেশী। অধিকন্তু বিদেশী ব্যবসায়ীরা উত্তরোত্তর উৎসাহই পাইয়া আসিতেছে। এইরূপ তীব্র প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে বাঙ্গালার প্রতি গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি না পড়িলে বাঙ্গালার কয়লা ব্যবসায়ের কিরূপ অবস্থা দাঁড়াইবে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

—বাণিজ্য-বার্ত্তা

নারী-রক্ষা-সমিতি :—

বাঙ্গালা প্রদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে নারী-হরণের অনেক ঘটনার সংবাদ ক্রমাগত পাওয়া যাইতেছে। এই জঘন্য পাপ রোধ করিবার জন্য কয়েকদিন পূর্ব্বে কলিকাতা নগরীর কতিপয় নেতৃস্থানীয় ও দেশহিতৈষী ভদ্রলোক ভারত-সভাগৃহে একটি সভায় সমবেত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ঘটনা হইয়াছে, এই বর্ষে নারী-হরণের ঘটনা তাহার মধ্যে শতকরা আশিটা ঘটিয়াছে বলিয়া বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সেইজন্য সুবন্দোবস্ত করিবার উদ্দেশ্যে "নারী-রক্ষা সমিতি" নামে একটি সমিতি গঠন করা আবশ্যক। এই সমিতি বাঙ্গালার নারীগণের রক্ষার বন্দোবস্ত করিবে। সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নে বিবৃত করা হইল :—

(১) কি-পরিমাণে এই অত্যাচার হইতেছে এবং তাহার গুরুত্ব কত, তাহা ঠিক ও উপরোক্তভাবে নির্দ্ধারণ করিবার জন্য নারী-হরণের ঘটনাগুলির হিসাব সংগ্রহ করিতে হইবে। আদালতে যেসকল ঘটনা বিচারের জন্য উপস্থিত হয় এবং পুলিশ ষ্টেশনসমূহে যেসকল ঘটনার রিপোর্ট করা হয়, তাহা হইতে হিসাব সংগ্রহ করার প্রস্তাব করা হইতেছে।

(২) পল্লী অঞ্চলে দুর্ব্বৃত্তগণ যেসকল পরিবারের উপর অত্যাচার করিতে পারে বলিয়া আশঙ্কা আছে এবং যাহাদিগকে সাহায্য করিবার আবশ্যকতা আছে সেইসকল পরিবারসমূহকে রক্ষা করিবার জন্য ঐসকল অঞ্চলে পল্লীরক্ষী দলসমূহ গঠন করিতে হইবে।

(৩) দুর্ব্বৃত্তগণ যেসকল নারীকে হরণ করিবে, সেইসকল নির্য্যাতিতা নারীগণের সন্ধান করিবার জন্য ও সেই হতভাগিনী নারীদের উদ্ধারে পুলিশকে সাহায্য করিবার জন্য উদ্ধারকারী দলসমূহ গঠন করিতে হইবে।

(৪) যাহাদের উপর অত্যাচার করা হইবে তাহাদিগকে আইনঘটিত ব্যাপারে, আর্থিকভাবে এবং অন্যান্যরকমে সাহায্য করিতে হইবে।

(৫) নির্য্যাতিতা নারীগণকে উদ্ধার করিবার পর সামাজিক বাধা অতিক্রম করিয়া তাহাদিগকে পুনরায় তাহাদের বাড়ীতে গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৬) যে-স্থলে সামাজিক কঠোরতার চাপে নির্য্যাতিতা নারীদিগকে তাহাদের বাড়ীতে পুনর্গ্রহণের ব্যবস্থা করা না যায়, তাহা হইলে একটি "রেস্কিউ হোম" প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

সভায় কলিকাতার "শিশুসহায় ও মাতৃমঙ্গল সমিতির" সম্পাদক কয়েকটি আবশ্যক যুক্তি উপস্থিত করেন।

সমিতির নিম্নলিখিতরূপ কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি গঠিত হইয়াছে—সভাপতি—শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাস, সহকারী সভাপতি—লেডী অবলা বসু, শ্রীমতী কামিনী রায়, রাজা জানকীনাথ রায়, স্যার্ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র আচার্য্য, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও মৌলবী মুজিবর রহমান। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বসু ও রেভারেণ্ড বিমলানন্দ নাগ। কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু। সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত সীতানাথ গোস্বামী, কমলকিশোর সিংহ ও শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু।

সভাস্থলে প্রায় এক সহস্র টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। ঐ টাকা লইয়া সমিতি আপাততঃ কার্য্য আরম্ভ করিবেন। সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র ও সহকারী সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ গোস্বামী শীঘ্রই রঙ্গপুরে যাইবেন। —আনন্দবাজার পত্রিকা

গাইবান্ধায় জমিয়ৎ-উলেমা :—

গাইবান্ধায় একটি শক্তিশালী জমিয়ৎ কমিটি স্থাপিত হইয়াছে। মৌলবী মহীউদ্দীন, ওমিজ উদ্দীন, সিরাজল হসেন খান প্রভৃতি

কথিত নৈতিক অবনতি দূরীকরণ, যুবকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করা, গুণ্ডাদের হাত হইতে নির্য্যাতিত স্ত্রীলোকদিগকে রক্ষা করা ও অন্যান্য সামাজিক উন্নতি-বিধায়ক কার্য্যে মনোনিবেশ করিবেন। স্থানীয় গোরস্থান রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে একটি গোরস্থান কমিটিও গঠন করা হইয়াছে।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

স্বর্গীয়া কুমারী পরিমল সিদ্ধান্ত বি-এ :—

নলহাটি ব্রাহ্ম-সমাজের কুমারী পরিমল সিদ্ধান্ত বি-এ, বিগত ২১শে এপ্রিল রবিবার দারুণ যক্ষ্মারোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি গত বৎসর বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতার শিক্ষা-বিভাগে কার্য্য করিতেছিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম ২৩ বৎসর মাত্র ছিল, তাঁহার সরল অমায়িক ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ ছিলেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় নীলকান্ত সিদ্ধান্ত, কুমারী পরিমলের যখন ৮ মাস বয়ঃক্রম, সেই সময় পরলোক গমন করিয়াছিলেন। কুমারী পরিমল ও তাঁহার তিনজন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দরিদ্রতার মধ্যে প্রবল সংগ্রাম করা সত্ত্বেও নিজেদের অধ্যবসায়-গুণে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কুমারী পরিমল বীরভূম জেলার মধ্যে একমাত্র মহিলা বি-এ, ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মিঃ নির্ম্মল সিদ্ধান্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সুখ্যাতির সহিত এম্-এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে গিয়াছিলেন এবং সেখানে ইংরেজী সাহিত্যে ডবল ট্রাইপস্ পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের রিডারের পদে নিযুক্ত আছেন। মধ্যম ভ্রাতা মিঃ অমল সিদ্ধান্ত এম্-এ, বি-টি, আমেরিকায় অধ্যয়ন করিতেছেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ বিমল সিদ্ধান্ত কলিকাতা মেডিকেল কলেজের শেষ এম-বি পরীক্ষা দিয়া জার্ম্মেনিতে শিক্ষা করিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। বীরভূম জেলার মধ্যে এইরূপ সুশিক্ষিত পরিবার অতি বিরল। অত্যন্ত দরিদ্রতার সহিত প্রবল সংগ্রাম করিয়াও নিজেদের চেষ্টা ও অধ্যবসায়-গুণে এইরূপ উচ্চ শিক্ষা পাইতে পারেন এইরূপ পরিচয় অতি বিরল। কুমারী পরিমলের অকাল মৃত্যুতে আমরা গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। —বীরভূম-বার্ত্তা

কলিকাতায় মেয়র ও ডেপুটি মেয়র।—

কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল মিটিংএ মিঃ সি, আর, দাশ মেয়র এবং মিঃ এইচ্, এস্, সুহরাওয়ার্দ্দী ডেপুটি মেয়র নির্ব্বাচিত হইবার পর মিঃ দাশ কার্য্য-তালিকা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা প্রকাশ করা হইল।

কার্য্য-তালিকা :—

(১) অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা
(২) দরিদ্রদিগের জন্য বিনা পয়সায় মেডিকেল সাহায্য
(৩) খাঁটি ও সস্তা খাদ্য ও দুগ্ধ-সরবরাহ
(৪) পরিষ্কার ও ময়লা জল অধিকপরিমাণে সরবরাহ
(৫) বস্তী ও ভিড়ের মধ্যে ভাল স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা
(৬) দরিদ্রদিগের জন্য গৃহবাস-নির্ম্মাণ
(৭) সহরতলীগুলির উন্নতি-সাধন
(৮) যাতায়াতের অধিক পরিমাণে সুবিধা
(৯) কম ব্যয়ে ভাল শাসনের ব্যবস্থা। —মোস্‌লেম হিতৈষী

স্বরাজের স্বরূপ :—

কলিকাতা কর্পোরেশনে স্বরাজের যে নমুনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অপূর্ব্ব এবং অতুল্য। স্বরাজীরা কলিকাতার বোকা করদাতাদিগকে ভুলাইয়া অতিরিক্ত ভোটের জোরে অধিকাংশ কমিশনর পদ দখল করায় কর্পোরেশনের বিশিষ্ট পদ এবং বিভিন্ন চাকুরী লইয়া তাহাদের মধ্যে বিষম কাড়াকাড়ি লাগিয়া গিয়াছে। ইহারা অন্যদলের অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত লোকদিগের দাবি অম্লানবদনে উপেক্ষা করিয়া নিতান্ত নির্লজ্জের মত কেবল নিজেদের দলের লোকদিগকে মেয়র, ডেপুটি মেয়র ও অল্ডারম্যান্ প্রভৃতি দায়িত্বপূর্ণ পদে নির্ব্বাচন করিতেছে। কর্পোরেশনের চাকুরী-গুলিতেও ইহাদের শ্যেনদৃষ্টি পড়িয়াছে। ভিন্নদলের লোকদিগকে তাড়াইয়া কেমন করিয়া কেবল নিজেদের দলের অপোগণ্ডগুলিকে পোষা যায় ইহারা সেজন্য অধীর ও উন্মত্ত হইয়া উঠিতেছে। যাঁহারা স্বরাজী দলভুক্ত নহেন, তাঁহাদের যেন এইসকল স্থানে কোনই দাবিদাওয়া বা অধিকার নাই। আবার এইসকল পদ ও চাকুরী লইয়া স্বরাজীদের নিজেদের মধ্যেও কামড়া-কামড়ি হইতেছে। দল ভাঙ্গাভাঙ্গি চলিতেছে। "দাশ-শাসমল সংবাদই" একথার জ্বলন্ত প্রমাণ। স্বরাজীরা যে কিরূপ প্রকৃতির লোক, এইসকল ব্যাপারেই তাহার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। ইহারা যদি কখনো দেশের শাসন-যন্ত্র হাতে পায়, তবে বোধ হয়, বিরুদ্ধ দলেরা কাঁচা-মাথা দুই হাতে কাটিতেও কুণ্ঠিত হইবে না। দেশবাসী আর কতকাল ইহাদিগকে প্রশ্রয় দিয়া এইরূপ অনর্থ ঘটাইতে থাকিবে।

—মোস্‌লেম হিতৈষী

নারী-নির্য্যাতন—

যে শ্রেণীর নারী-নির্য্যাতনের কথা আজকাল প্রায় প্রত্যহই আমরা সংবাদপত্রে পাঠ করিতেছি, ইহা সে শ্রেণীর নহে;—ইহা ভারতের কারাগারে,—একজন মহীয়সী মহিলার প্রতি কর্ত্তাদের হৃদয়হীন দুর্ব্যবহার। আমরা যখন শুনিয়াছিলাম, পাঞ্জাবের প্রসিদ্ধ মহিলা-কংগ্রেস-কর্ম্মী, শ্রীমতী পার্ব্বতী দেবীকে এক বৎসর ৪ মাসের জন্য কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাদণ্ড বিধান করা হইল, তখনও যেমন আশ্চর্য্য হই নাই, এখন তিনি কারাগৃহে নির্য্যাতিতা হইতেছেন শুনিয়াও তেমনি বিস্ময় প্রকাশ করিতেছি না।

পৌরুষ ভারতবর্ষ ছাড়িয়া গিয়াছে—আমাদেরও—শাসকগণেরও। যাঁহারা ক্ষমতা ও শক্তির দর্পে নারীর প্রতি এমন কঠিন হইতে পারেন এবং যাঁহারা ইহা শুনিয়াও নিশ্চিন্তভাবে উপেক্ষা করিতে পারেন,—তাঁহাদের মানসিক অধোগতি যুক্তি-তর্কের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। এ-সব বিষয় লইয়া ক্ষুব্ধ-অভিমানে আলোচনা করিতেও লজ্জা হয়। আমাদেরই একজন ভগ্নী—আমাদের জন্যই কারাগারে। যে-আদর্শের সাধনায় তাঁহার এই দুঃখ-ভোগ—সেই আদর্শকে আমরা অবজ্ঞায়, উপেক্ষায় নিত্যই মলিন করিয়া ফেলিতেছি, একথা কি দিনান্তেও ভাবি? ইহার সমুচিত উত্তর,—এই কাপুরুষোচিত দুর্ব্যবহারের একমাত্র প্রতিকার—খদ্দর পরিধান, অস্পৃশ্যতা পরিহার এবং কংগ্রেস-কেন্দ্রে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া।—ইহা আমরা যতই ভুলিতেছি, আমাদের দুর্দ্দশা ততই বাড়িয়া চলিয়াছে। দুর্দ্দশাপন্ন ব্যক্তি যেমন নীরবে অপমান সহ্য করে, এই দুর্ভাগা জাতির অবস্থাও তদ্রূপ। —আনন্দবাজার পত্রিকা

বগুড়ায় ভীষণ অন্নকষ্ট—

গতপূর্ব্ব বৎসর বগুড়ায় ভীষণ বন্যায়, উক্ত জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। গত দুই বৎসর যাবৎ উক্ত অঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দ ফসল উৎপন্ন করিতে না পারায়, তাহারা ভীষণ কষ্টে দিন কাটাইতেছিল। অধুনা তাহাদের আর অন্ন জুটিতেছে না। লোকের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছে এবং সকলের প্রতিদিন ক্ষুধায়

দুরবস্থা হইলেও, কতকাংশ বঙ্গীয় রিলিফ্ কমিটির কার্য্যস্থলের মধ্যে পড়ায় তথাকার অধিবাসীবৃন্দ কোন-মতে দুইটি অন্ন পাইতেছে। কিন্তু অন্যান্য অংশে অধিবাসীবৃন্দের অন্ন-কষ্টের করুণ কাহিনী অবর্ণনীয়। ক্ষেতলাল থানার অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়। কোন কোন গ্রামে লোকে অনাহারে, কোন কোন গ্রামে লোকে বেল, ডুমুর, প্রভৃতি খাইয়া দিন অতিবাহিত করিতেছে। এদিকে কালাজ্বর রাজত্ব করিতেছে। এই দুরবস্থায় লোকের উপকার-মানসে, হাট-সহরের অধিবাসীরা একটি সাহায্য-সমিতি গঠন করিয়া কিছু কিছু কার্য্য করিতেছেন। বগুড়া জেলা কংগ্রেস-কমিটি তজ্জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। বঙ্গীয় রিলিফ্ কমিটির পক্ষ হইতে এ-অঞ্চলে কর্ম্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। উক্ত অঞ্চলের ভূম্যধিকারী নাটোরের মুকুল জমিদারের নিকট হইতেও সাহায্য সংগ্রহ করা হইতেছে। কিন্তু অবস্থা যেরূপ গুরুতর, তাহাতে স্থানীয় সাহায্যের দ্বারা এ-অবস্থার প্রতিকার সম্ভবপর নহে। এ কারণ-আমরা দেশের যাবতীয় দয়াবান্ ব্যক্তিদিগের নিকট যথোপযুক্ত সাহায্য-প্রার্থী হইতেছি। যিনি যাহা পারেন, বগুড়া জেলা কংগ্রেস-কমিটির সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিলে সাদরে গৃহীত হইবে। যদি কেহ বিস্তারিত বিবরণ জানিতে চান তবে কংগ্রেস অফিস হইতে সানন্দে জানান হইবে। —বন্দে মাতরম্

সতীর হস্তে লম্পটের শাস্তি—

ঢাকা ধামরাই থানার অধীন এক গ্রামে বিনোদবিহারী সাহার বাস। গত জানুয়ারী মাসে একদিন রাত্রিকালে বিনোদ তাহার পুরোহিত ললিত আচার্য্যের অনুপস্থিতিতে তাহার যুবতী স্ত্রীর নিকটে নিজের কু-অভিপ্রায় জানায়। ব্রাহ্মণ-পত্নী বিনোদকে তিরস্কার করিয়া বলে যে যদি সে তাহার গায়ে হস্তক্ষেপ করে তবে তাহার ভবলীলা সাঙ্গ হইবে। বিনোদ যুবতীর কথা শুনিয়া হাসিয়া তাহাকে ধরিতে গেল। সতী রমণীর দেহে শতগুণ বলের সঞ্চার হইল। সে একখানি দা লইয়া "তবে রে পিশাচ এই দেখ" বলিয়া ললিতের দেহ ক্ষতবিক্ষত করিল। স্বামী বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া পুলিশে সংবাদ দেয়। —সময়

নারীনির্য্যাতন—

এলাহাবাদ হইতে শ্রীযুক্ত চিরনজীলাল শর্ম্মা জানাইতেছেন যে, উত্তর-ভারতে নারী-নিগ্রহের সংখ্যা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুলিশ ও রেলের কর্ম্মচারীদের সহায়তায় এই পাপকার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। রেল-ষ্টেশনে, ওয়েটিংরুমে, গাড়ীতে নারী-নিগ্রহের কথা হিন্দী কাগজে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি নিজেও ২১৪টি ঘটনা অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন। শ্রীযুত চিরনজীলাল শর্ম্মা বলিতেছেন যে, এ বিষয়ে খুব তীব্র আন্দোলন হওয়া কর্ত্তব্য এবং যাহাতে এইসমস্ত ছদ্মবেশী পুলিশ ও রেল-কর্ম্মচারীদের কঠোর শাস্তি হয়, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। শ্রীযুক্ত শর্ম্মার প্রস্তাব আমরা সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করি। তিনি বোধ হয় জানেন না, বাঙ্গালায় এই নারী-নিগ্রহ ব্যাপারটি অন্য এক কুৎসিত আকার ধারণ করিয়াছে; আর বাঙ্গালীরা এরূপ জড় ও কাপুরুষ হইয়া উঠিয়াছে যে, শেষে হয়ত নিজেদের নারী-নির্য্যাতনের প্রতিকারের জন্য তাহাদিগকে ভারতের অন্য প্রদেশের লোকের সাহায্য লইতে হইবে। —আনন্দবাজার পত্রিকা

[ইহা অত্যন্ত লজ্জার বিষয় হইবে এবং ইহার দ্বারা নারী-নির্য্যাতনের প্রতিকারও হইবে না। যাহারা আত্মরক্ষা করিতে পারে না, অন্যেও তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। মৃত্যুকে বরণ করাই তাহাদের —প্রবাসীর সম্পাদক]

ভারতে বিদেশী দেশলাইয়ের কারখানা—

ষ্টকহলমের সংবাদে প্রকাশ যে, সুইডিস্ ম্যাচ তৈয়ারীর কারখানার মালিকগণ তাঁহাদের মূলধন বৃদ্ধি করিয়া উহা ১৯ কোটি ক্রাউনে পরিণত করিয়াছেন। তাঁহারা এই অতিরিক্ত মূলধন দ্বারা বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ ও করাচীতে দেশলাইয়ের কারখানা স্থাপন করিবেন। —আনন্দবাজার পত্রিকা

[বিদেশ হইতে আমদানি পণ্যের উপর শুল্ক এড়াইবার জন্য বিদেশীরা সব পণ্য সম্বন্ধেই এই কৌশল অবলম্বন করিবে। এইজন্য এখনই আইন হওয়া উচিত, যে, যাহার মূলধনের অন্ততঃ শতকরা ৭৫ অংশ ভারতীয়দের নহে, সেরূপ কোম্পানী এদেশে স্থাপিত হইতে পারিবে না। —প্রবাসীর সম্পাদক।]

গাঁজা-চাষীগণ কর্ত্তৃক কৃষি-সচিবের সম্বর্দ্ধনা—

নওগাঁয়ের (রাজসাহী) ৩০শে এপ্রিল তারিখের সংবাদে প্রকাশ, যখন কৃষি-সচিব মাননীয় মিঃ গজনবী সাহেব সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন, কয়েকজন সরকারী কর্ম্মচারী ও মুসলমান উকীল মোক্তার ষ্টেশনে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন।

কৃষি-সচিব এখানে অবস্থানকালে উত্তর-বঙ্গ-সেবাশ্রম, লোকাল বোর্ড অফিস ও গাঁজা-চাষীদের সমবায় সমিতি পরিদর্শন করিয়াছিলেন। প্রকাশ, যে মহকুমা হাকিম ও সেক্রেটারীর আদেশানুসারে স্থানীয় স্কুলের হেড্ মাষ্টার মহাশয় কৃষি-সচিবের সম্বর্দ্ধনায় যোগদান করিবার জন্য স্কুলের ছাত্রদিগের উপর এক নোটিশ জারি করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে ছাত্রদিগের অভিভাবকগণ ইহাতে প্রতিবাদ করায় মাষ্টার মহাশয় বাধ্য হইয়া তাহার নোটিশ প্রত্যাহার করিয়াছিলেন।

স্থানীয় গাঁজা-চাষীগণ কৃষি-সচিবের সম্বর্দ্ধনার জন্য এক সান্ধ্য-ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সহরের কোন গণ্য-মান্য ভদ্রলোক তাহাতে যোগদান করেন নাই। সভাক্ষেত্রের প্রবেশ-দ্বারে মোটা মোটা অক্ষরে "সহযোগীদের সম্বর্দ্ধনা" এই কয়েকটি কথা লিখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। —বন্দেমাতরম্

শ্রী হ

রাজ-বন্দী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস—

পূর্ণবাবু আজ অষ্টমবার রাজ-আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন। মাদারীপুরের অস্ত্র-আইনের অপরাধী পূর্ণচন্দ্র প্রথম দেখা দিলেন ১৯১১ সনে প্রথম রাজনীতিক আসামী সাজিয়া। অস্ত্র-আইনের বাছা বাছা তিনটি ধারা তাঁহার উপর প্রয়োগ করা হইল, এবং অনেক পরিশ্রম করিয়াও তাঁহার কোন অপরাধ প্রমাণ করিতে না পারিয়া দুই বৎসর পরে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অব্যাহতি দিতে বাধ্য হইলেন।

তখন দেশে ঘোর অশান্তির উত্তপ্ত হাওয়া জোর প্রবাহে বহিতেছিল। সরকারের ধারণা ছিল ছেলের দল ডাকাত। কিন্তু ডাকাতের পিঠে যে স্বদেশী ছাপ দেওয়া ছিল তাহার প্রমাণ হইল দ্বিতীয়বারের ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায়। পূর্ণবাবু তাঁহার বহু বন্ধুবান্ধবের হাত ধরিয়া বন্দীশালায় উপস্থিত হইলেন। ১৯১৩-১৪ দুই বৎসর সমানে আইনের কসরৎ করিয়া, বুদ্ধির চাল চালিয়া পূর্ণ-বাবু সদলে ফিরিয়া আসিলেন।

তাঁর তৃতীয় বিচার ১৯১৫ সনে রাজদ্রোহ অভিযোগে। সরকারের বাছা বাছা মৃত্যুবাণ প্রায় ৭।৮টি ভীষণ ধারা তাঁহার প্রতি নিক্ষিপ্ত হইল। কিছু প্রমাণ করিতে না পারিয়া সরকার অনুপায় হইয়া পড়িলেন। মোকদ্দমা তুলিয়া লইলে আসামীকে বেকসুর খালাস দিতে হইবে বলিয়া তাও পারেন না, আবার রাখিলেও ইজ্জৎ থাকে না। কাজেই নিরুপায়ের বন্ধু ১১০ ধারা চাপাইয়া মুচলেখার দায়ে আটক রাখাই স্থির হইল।

রাজ-বন্দী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস

আইনের ফাঁকির সুযোগ ছাড়িয়া দেওয়া পূর্ণ-বাবুর অভ্যাস ছিল না। তাই তিনি জামিন চাহিলেন। কিন্তু সরকার যে আইন-ভঙ্গের অছিলায় পূর্ণ-বাবুকে আটক রাখিলেন তাঁহারা নিজের সেই আইন নিজেই ভাঙ্গিলেন। জামিন নামঞ্জুর হইল। বৎসর পার হইতে না হইতে ভারত-রক্ষা-আইন পাশ হইল এবং তদনুযায়ী পূর্ণ-বাবুকে অন্তরীণ করা হইল। ১৯১৫ সনের ১২ ফেব্রুয়ারী তাঁহাকে পৃথক্‌ভাবে বন্দী করিয়া ৫ই মে তারিখে অন্তরীণ করিবার আদেশ জারি করা হইল।

পূর্ণ-বাবুকে দশমাসকাল নানা কদর্য্য স্থানে বৃথা ঘুরাইয়া রাজ-বন্দী করিয়া জেলে পূরা হইল।

১৯২০ সালে তিনি অব্যাহতি পাইলেন।

পূর্ণ-বাবু বাহিরে আসিয়া দেখিলেন বাংলার যুবক-শক্তি তখন বিধ্বস্ত। তাই সে শক্তির পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি বেঙ্গল্ পলিটিক্যাল্ সাফারারস্ কন্‌ফারেন্স্ আহ্বান করিলেন। কলিকাতায় নিঃসহায়ের দল বৈঠক করিয়া দেখিল তাহাদের কত বন্ধুবিয়োগের, কত দুঃসহ নির্য্যাতনের, কত লাঞ্ছনার, কত নীরব নয়নজলের অভিষেকের মধ্যে জাতীয় ইতিহাসের প্রথম ভিত্তি রচিত হইয়া গিয়াছে।

এই কন্‌ফারেন্সের অব্যবহিত পরেই মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগের বার্ত্তা কংগ্রেস-মঞ্চ হইতে প্রথম প্রচারিত হইল। পূর্ণ-বাবু নাগপুরের কংগ্রেস-অধিবেশনেই অহিংসাত্মক অসহযোগ গ্রহণ করিয়া আসিলেন।

পূর্ণ-বাবু সহজে কোন জিনিষ গ্রহণ করেন না। কিন্তু যেটা ধরেন বিশেষ বিবেচনা করিয়াই ধরেন এবং মনে-প্রাণেই ধরেন। তাই ১৯২১ সনের পরে এক বৎসর পার হইতে না হইতে তিনি বিরাট শান্তি-সেনা-বাহিনী গড়িয়া তুলিলেন এবং বাংলার বিভিন্ন জিলায় জিলায় শান্তি-সেনা প্রেরণ করিয়া অসহযোগের অভয় মন্ত্র বহু গ্রামের নিভৃততম গৃহে পর্য্যন্ত প্রেরণ করিলেন।

আমলাতন্ত্র কথাকে ভয় করে না, ভয় করে তাঁকে যিনি যুবক-শক্তি সংযত করিয়া চালাইতে জানেন। তাই শান্তি-সেনা-বাহিনীর নেতা পূর্ণ-বাবুকে করাচী মন্তব্য সমর্থনের জন্য ১৯২১ সনের ২৫ নবেম্বর কারারুদ্ধ করা হয়।

কোর্ট্ না-মানার যুগে আসামীর তরফ হইতে কোন কথা বলা চলে না বলিয়া সরকার সহজেই এক বৎসর সশ্রমকারাদণ্ডের আদেশ জারি করিয়া তাঁহাকে ফরিদপুর জেলের অতিথি করিয়া রাখিলেন। কর্ত্তৃপক্ষের কাহারো কাহারো মতে লোক হিসাবে শাস্তি লঘু হইয়াছে বলিয়া সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭।২ ধারা লাগাইয়া আরো দুই বৎসর জুড়িয়া দেওয়া হইল।

কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন বা স্বেচ্ছাসেবক হওয়া বে-আইনী বলিয়া ঘোষণার পরে ফরিদপুর জেলে প্রায় ৫০০ শত স্বদেশী বন্দীকে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। এই সময় জেল কর্ত্তৃপক্ষ এবং স্বদেশী আসামীদিগের মধ্যে স্বাভাবিক বিরোধ একটু ঘোরাল হইয়া উঠিতেছিল, এবং সরকারের প্রতিকারের চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছিল বলিয়া পূর্ণ-বাবুকে ঢাকায় চালান দেওয়া হইল। ঢাকা জেলেও সরকারের একই দুরবস্থা মোচনের জন্য তাঁহাকে বহরমপুর জেলে স্থানান্তরিত করিয়া সরকার হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

পূর্ণ-বাবুকে সরকার কি চক্ষে দেখেন জানি না, কিন্তু ১৭ ধারার সকল আসামীকে মিয়াদের কাল পূর্ণ হইবার এক-বৎসর দেড়-বৎসর পূর্ব্বে ছাড়িয়া দেওয়া হইল, কিন্তু পূর্ণ-বাবুর বেলাতেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইল। তিনি সকল বন্দীর প্রথমে জেলে গিয়াছিলেন এবং পূর্ণ তিন বৎসর কাল খাটিয়া সকলের মুক্তির পর ১৯২৪ সনের জানুয়ারী মাসের ৫ই ফিরিয়া আসেন।

তিনি বাংলার বিশৃঙ্খল কর্ম্মীদল আর-একবার সঙ্ঘ-বদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। কার্য্যভার হাতে লইবার অব্যবহিত পরেই মুক্তির পর ২ মাস গত হইতে না হইতেই ১৯২৪ সনের ৮ই মার্চ তাঁহাকে ১৮১৮ সনের তিন রেগুলেশন্ অনুসারে দিনাজপুর জিলা সম্মিলনীর সভামণ্ডপ হইতে গ্রেপ্তার করিয়া লওয়া হয়।

অনবরত জেলে থাকার ফলে তাঁহার কতকগুলি সাংঘাতিক পীড়া জন্মিয়াছে। বর্ত্তমানে গভর্ণ্‌মেণ্ট্ তাঁহার স্বাস্থ্যের কি ব্যবস্থা করিতেছেন?

পূর্ণ-বাবু যতবার জেলে গিয়াছেন, অশেষ ক্লেশ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া বাহিরে আসিয়াই আবার তাঁহার কার্য্যে দ্বিগুণ উৎসাহে লাগিয়া গিয়াছেন। এইটাই তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব। পূর্ণ-বাবু যে কয়েক দিন কার্য্য করিতে সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাহারই মধ্যে যে ভলাণ্টিয়ার দল গড়িলেন তাহাতেই তাঁহার কর্ম্ম-নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রী :—

—

ভারতবর্ষ

(২০শে বৈশাখ পর্য্যন্ত)

পরলোকে শ্রীমতী রানডে—

বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ সমাজ-সংস্কারক মহামতি রানডের

শ্রীমতী রমাবাঈ রানডে পরলোক গমন করিয়াছেন। ইঁহার মৃত্যুতে মহারাষ্ট্র-সংস্কার-পন্থীদল একজন বিশিষ্ট কর্ম্মীকে হারাইল। পতিপ্রাণা রমাবাই যাবতীয় সংস্কার-কার্য্যে তাঁহার মহানুভব স্বামীর সঙ্গিনী ছিলেন এবং নারীজাতীর উন্নতি ও শিক্ষাদান এবং অনুন্নত-সমাজের উন্নতি-কল্পে আজীবন কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি অধিকতর আগ্রহের সহিত সংস্কার-আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন এবং পুণা সেবা-সদনের অধ্যক্ষরূপে এযাবৎ নানা জনহিতকর কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ভারতীয় নারীদের উন্নতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া তিনি যে আদর্শ দেশের সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন, সেই আদর্শে দেশের নারী-জাতিকে অনুপ্রাণিত করিবার চেষ্টা করাই তাঁহার পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদনের প্রকৃষ্ট উপায়।

নিখিল-ভারত স্বরাজ্য-দলের বৈঠক—

সম্প্রতি বোম্বাইয়ে নিখিল-ভারতীয় স্বরাজ্যদলের একটি গোপন বৈঠক বসিয়াছিল। প্রকাশ, যে, এই বৈঠকে নানা বিষয়ের মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। স্থির হইয়াছে, যে, মধ্য-প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার নূতন নির্ব্বাচনের সময় যাহাতে পুনরায় স্বরাজ্যদলের জয় হয় তাহার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা হইবে। উক্ত দলের কার্য্য-তালিকার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন করা হইবে না বলিয়া স্থির হইয়াছে। বর্ত্তমান কার্য্য-তালিকাই খুব জোরের সহিত চালানো হইবে। ট্যারিফ্ বোর্ডের রিপোর্ট আলোচনা করিয়া ব্যবস্থা-পরিষদের স্বরাজ্য সদস্যদিগকে পরামর্শ দেওয়া এবং ব্যবস্থা-পরিষদের আগামী অধিবেশনে স্বরাজ্য-দলের কার্য্য-তালিকা নির্দ্দেশের জন্য একটি কমিটি গঠন করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে। এই বৈঠকে পণ্ডিত নেহরু, শ্রীযুক্ত পটেল, জয়াকার, রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, কেলকার প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ সভাতে যোগদান করেন নাই।

বিদেশী পর্য্যটকের উপর পুলিশের অত্যাচার—

মিঃ পিটার জ্যাভিস্কি একজন আমেরিকাবাসী দেশ-পর্য্যটক। তিনি দেশ-পর্য্যটনে বাহির হইয়া চীন, জাপান, মধ্যএশিয়া প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া গত ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষে উপস্থিত হন। তিনি কাকিনাড়া কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। মিঃ জ্যাভিস্কি ধুতি-চাদর পরিয়া খুব সরল-ভাবে ভারতবাসীদের সহিত মেশামিশি করেন বলিয়া অনেকের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হইয়াছে। কিছুদিন যাবৎ তিনি মাদ্রাজে একটি আশ্রমে বাস করিতেছেন। মাদ্রাজের পুলিশ তাঁহার উপর কড়া পাহারা দিতেছে। পুলিশের অনাবশ্যক বাড়াবাড়িতে বিরক্ত হইয়া মিঃ জ্যাভিস্কি মাদ্রাজের আইন-সচিবের নিকট লিখিয়াছেন :—"আমি মিঃ গান্ধিকে ভালবাসি, তাঁহার অনুচরদিগের সহিত মেশামিশি করি এবং আমার মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া বলি,—এই জন্যই কি আপনারা আমাকে সকলের সম্মুখে হেয় প্রতিপন্ন করিতে এবং আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিতে এই-প্রকার কড়া পাহা-রার ব্যবস্থা করিয়াছেন ? জগতের যে-কোন দেশে গমন করিবার স্বাধীনতা আমার আছে, কিন্তু আপনার নিজের দেশে কি আপনার সে স্বাধীনতা আছে ? একজন বিদেশীর প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিলে তাহার কতদূর অসুবিধা হয়, তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারেন। আমার জন্যও যদি না বোঝেন, অন্ততঃ আপনার যেসকল দেশবাসী বিদেশে আছে, তাহাদের বিষয়ে চিন্তা করিয়া আপনার ইহা বোঝা উচিত। গত ডিসেম্বর মাসে কাকিনাড়া-কংগ্রেসে আমি যদি ভারতবাসীদিগের স্বাধীনতা-প্রিয়তা দেখিতে না পাইতাম, তাহা হইলে আমি অনেকদিন পূর্ব্বেই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিতাম যে, ভারতবাসীগণ মিথ্যা চাটুবাদ, উপাধি এবং অর্থের খাতিরে একটা জাতি-হিসাবে তাহাদের জন্মগত অধিকার বিক্রয় করিয়াছে—কাজেই তাহারা আমেরিকার কোনপ্রকার অধিকার পাইবার উপযুক্ত নহে। আপনাদের নিজের গৃহে যে অধিকার নাই, অথবা যে অধিকার লাভের জন্য আপনারা চেষ্টা করেন না, অন্যের নিকট তাহা আপনারা কি করিয়া দাবী করিতে পারেন ? আমি আপনাকে আরো বলিতেছি যে, অন্য কোন দেশে এরূপ প্রকাশ্যভাবে পুলিশ কাহারও অনুসরণ করে না। এই কার্য্য দ্বারা আপনারা আপনাদের সন্তান-সন্ততিদের সম্মুখে এক খারাপ আদর্শ স্থাপন করিতেছেন এবং ইহার ফলে ভারতবর্ষ একটা পুলিশের লোকের জাতি হইয়া উঠিতে পারে। জনসাধারণের অর্থ যদি এইপ্রকারের আত্ম অপমানকারক কার্য্যে ব্যয় না করিয়া দেশের বালকবালিকাদের শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হইত, তাহা হইলে দেশের প্রভূত উপকার হইত। আমি জানি, আমার এই পত্র আপনি আপনাদের মতো গ্রহণ করিবেন। হয়ত গোঁফে একটু চাড়া দিয়া আমার উপর দ্বিগুণভাবে পাহারার ব্যবস্থা করিবেন। আমি মিঃ গান্ধি এবং তাঁহার অনুচরদিগকে ভালবাসি এবং আমি স্মিতমুখে আপনাদিগকে উপেক্ষা করিব এবং যতদিন পর্য্যন্ত আপনার বীরগণ তাহাদের রণ-কুঠার তাহাদের নিজেদের নিকটেই রাখিয়া দিবে এবং আপনিও আপনার হস্ত আমার নিকট হইতে দূরে রাখিবেন, ততক্ষণ আমি আপনাদের এই নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য আমাদের কন্‌সাল অথবা ওয়াশিংটনকে ব্যতিব্যস্ত করিব না। কেবল আমি নহি, সমস্ত স্বাধীন জগৎ মহাত্মা গান্ধির ন্যায় মানুষকে ভালবাসে। তিনি নির্ভয়ে তাঁহার জন্মগত অধিকার লাভের দাবী করেন। আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইতেছি যে, আপনাদের ন্যায় শিক্ষিত লোক কি করিয়া এরূপ লোককে ঘৃণা করিয়া পদদলিত করিতে পারে।

তাঞ্জোরে ট্যাক্স-বন্ধ আন্দোলন

সরকার অন্যায় করিয়া ট্যাক্স্ বর্দ্ধিত করায় তাঞ্জোরের মিরাশদারগণ ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন আরম্ভ করে। ট্যাক্স্ বন্ধ করিয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ অনেকের ধান ক্রোক করে। ক্রমে এই ক্রোকী ধান নীলামে বিক্রয় করিবার চেষ্টা হয় ; কিন্তু কেহই নীলামে ডাকে না। তখন জেলে ব্যবহার করিবার জন্য সরকার পক্ষ হইতে, অতি সামান্য টাকায়, এই ধান ডাকিয়া লইবার চেষ্টা করা হয়। সম্প্রতি আয়ম্পাদিতে মিরাশদারদিগের একটি বৈঠক বসে। মাদ্রাজের কংগ্রেস-নেতা শ্রীযুক্ত রাজগোপালাচারী সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে মিরাশদারদিগকে বিশেষভাবে উপদেশ দেন। মিরাশদারদিগের নেতা শ্রীযুক্ত পান্টুলু আয়ার বলেন যে এপ্রিল কিস্তি হইতে পুনরায় ট্যাক্স্ বন্ধ করিয়া দিয়া সত্যাগ্রহ আরম্ভ করা হইবে।

ভারতের লৌহ শিল্প ও সংরক্ষণ-নীতি

বিদেশী শিল্পের অবৈধ প্রতিযোগিতায় অনেক ভারতীয় শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। এমত অবস্থায় সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করিলে কোন কোন দেশীয় শিল্প টিঁকিয়া থাকিতে পারে কি না তাহা অনুসন্ধান করিবার জন্য, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সম্মতি-অনুসারে, গত বৎসর ট্যারিফ্ বোর্ড গঠিত হয়। ইহার সভাপতি ছিলেন দিল্লীর সরকারী দপ্তরের মিঃ রেণ্ডী, পুণার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালে ও ব্রহ্মদেশের শ্রীযুক্ত জিন্‌ওয়ালা। ট্যারিফ্ বোর্ডের সদস্যেরা ভারতের ভিন্ন-ভিন্ন প্রদেশ ঘুরিয়া তদন্ত করিয়া সম্প্রতি তাঁহাদের মত প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতের লৌহ-শিল্প, বিদেশী লৌহ-শিল্পের প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিতেছে না, বহু বিশেষজ্ঞ বোর্ডের সম্মুখে এইরূপ সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। কতিপয় বিদেশী বণিকের পক্ষ হইতেও সংরক্ষণ-নীতির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করান হইয়াছিল। কিন্তু সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া বোর্ড লৌহ-শিল্পের অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়াছেন। বোর্ড নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, বিদেশ হইতে আমদানি লৌহজাত-দ্রব্যের উপর মাশুল না বসাইলে ভারতীয় লৌহ-শিল্প আত্মরক্ষা

করিতে পারিবে না। অতএব বোর্ডের মতে আপাততঃ তিন বৎসরের জন্য বিদেশী লৌহ-শিল্পের উপর মাশুল বসাইয়া পরীক্ষা করিতে হইবে। বোর্ডের মত ভারত-সর্‌কার গ্রহণ করিবেন কি না তাহা এখনও জানা যায় নাই। সম্প্রতি একটি সরকারী সংবাদে জানা গিয়াছে, যে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে এসম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করা হইবে। তবে ভারতীয় লৌহশিল্প রক্ষার ইহাই যে প্রধান উপায় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মাত্র তিন বৎসরের নিমিত্ত এরূপ ব্যবস্থা হইলে চলিবে না—এসম্বন্ধে পাকাপোকি ব্যবস্থা হওয়া দরকার।

এস্থানে বলা আবশ্যক ভারতীয় লৌহ-শিল্পের ন্যায় ভারতীয় কয়লার ব্যবসাও বিপদগ্রস্ত। যে-দক্ষিণ-আফ্রিকা ভারতবাসীকে নানা প্রকারে নিগৃহীত করিতেছে সেইখানকার আমদানি কয়লাই ভারতীয় কয়লার প্রধান শত্রু। ভারত-সর্‌কারও প্রকারান্তরে এ-বিষয়ে দক্ষিণ-আফ্রিকাকে সাহায্য করেন। এ বিষয়েও একটা প্রতিকার হওয়া অবশ্য-প্রয়োজনীয়।

বিদেশী বস্ত্র ও মুসলমান—

মৌলানা সৌকত আলী দীর্ঘকাল রোগভোগের পর সুস্থ হইয়া নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক বিবরণ দিয়াছেন :—"কোন কোন মুসলমান নেতা নাকি বলিয়াছেন যে, মুসলমানদের পক্ষে বিলাতী কাপড় পরিধান করা আপত্তিজনক নহে—এইরূপ একটি ভ্রান্তিপূর্ণ সংবাদ বাহির হইয়াছে। এই প্রকার সংবাদ যে মিথ্যা তাহা বলা বাহুল্য। ধর্ম্মের দিক্ দিয়া এবং অর্থনীতির দিক্ দিয়াও বিদেশী কাপড় বর্জ্জন করা আমাদের কর্ত্তব্য। বরং পূর্ব্বাপেক্ষা এখন আমাদের এ-বিষয়ে আরও বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত। এ-সম্বন্ধে কোন মুসলমানেরই অন্যরূপ ধারণা করা সঙ্গত নহে। ঈদের সময় ভাল কাপড় চোপড় পরা মুসলমানদের রীতি। নিজের আত্মীয় স্বজনেরা স্বহস্তে যে কাপড় বুনিয়াছে, তাহাই হইতেছে সব-চেয়ে উৎকৃষ্ট কাপড় এবং তাহাই পরিধান করা কর্ত্তব্য।"

ভাইকোম সত্যাগ্রহ :—

ভাইকোম সত্যাগ্রহ-আন্দোলন পূর্ব্বের ন্যায় পূর্ণবেগে চলিতেছে। মাদ্রাজের ভূতপূর্ব্ব অ্যাড্‌ভোকেট্ জেনারল্ শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার সম্প্রতি স্বয়ং ভাইকোমে গিয়া প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন তাঁহাতে তিনি সত্যাগ্রহীদের আন্দোলন সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত বলিয়াছেন। ভারতের সকল হইতেই এই আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি-সূচক বাণী প্রেরিত হইয়াছে। শিরোমণি গুরুদ্বার-কমিটি ভাইকোমে একটি অন্ন-সত্র স্থাপন করিবার জন্য ১২ জন অকালী কর্ম্মী প্রেরণ করিয়াছেন।

জাইটো হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধীয় বে-সর্‌কারী তদন্ত :—

মাদ্রাজের স্বরাজ্য-পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত পানিক্কার, নিখিল-ভারত কংগ্রেস-কার্য্যকরী সমিতির প্রস্তাবানুযায়ী জাইটোর হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে এক দীর্ঘ রিপোর্ট বাহির করিয়াছেন। রিপোর্টে প্রকাশ যে :—

(১) জাঠা শেষ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অহিংস ছিল।

(২) জনতার নিকট লাঠি ছাড়া কোনও মারাত্মক অস্ত্র ছিল না এবং তাহারা শান্ত ছিল। তাহাদের নিকট কোন আগ্নেয়াস্ত্র ছিল না, একথা সুনিশ্চিত।

(৩) নাভা-শাসনকর্ত্তার কার্য্য কোনপ্রকারেই ন্যায়সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না এবং যদি জনতাকে সতর্ক করিবার জন্যই বন্দুক ছোঁড়া হইয়া থাকে তাহা হইলেও এত দীর্ঘ সময় ধরিয়া গুলি-বর্ষণ কখনই সঙ্গত হয় নাই।

আমেরিকার সাংবাদিক মিস্‌টার জিমাণ্ডও বলিয়াছেন, যে, জনতার নিকট ও জাঠার সভ্যদের নিকট কোন আগ্নেয় অস্ত্র ছিল না। সুতরাং তাহারা যে আগে বা পরে গুলি ছুঁড়ে নাই, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

মহিলা ছাত্রীর কৃতিত্ব :—

কুমারী নিত্যলীলা চট্টোপাধ্যায় পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান বর্ষের প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। বঙ্গের বাহিরে এই বাঙ্গালী ছাত্রীটির কৃতিত্বে আমরা বিশেষভাবে আনন্দিত হইয়াছি।

শিক্ষায় দান :—

মুসলমানগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার কল্পে বোম্বাইয়ের সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী স্যার্ ইব্রাহিম্‌ভাই বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে দশ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। ইহা অতীব প্রশংসনীয়। বাংলাদেশেরও ধনী মুসলমানদের এইরূপ দানের সংবাদ পাইলে তাহা অতীব আহ্লাদের বিষয় হইবে।

রেলগাড়ীতে গোরার অত্যাচার :—

করাচী হইতে খবর আসিয়াছে যে, সিন্ধুদেশের প্রসিদ্ধ কংগ্রেস-কর্ম্মী শ্রীযুক্ত আর্. কে. সিদ্ধ রেলগাড়ীতে কতকগুলি কাপুরুষ গোরা সৈনিকের দ্বারা অপমানিত হইয়াছেন। সৈনিকেরা যে গাড়ীতে ছিল, শ্রীযুক্ত সিদ্ধ সেই গাড়ীতে উঠেন; এই অপরাধে তাহারা তাঁহাকে কুৎসিত গালাগালি, পদাঘাত ও মুষ্ট্যাঘাত প্রভৃতি করিতে থাকে। শ্রীযুক্ত সিদ্ধ এই পশুবলের ঔদ্ধত্যে ভীত না হইয়া পুনঃপুনঃ গাড়ীতে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করেন এবং পুনঃপুনঃ প্রহৃত হন। ষ্টেশন-মাষ্টার প্রভৃতি সৈনিকদের এই ব্যবহারের প্রতিবাদ করিলেও তাহারা কর্ণপাত করে নাই। শ্রীযুক্ত সিদ্ধ বলেন যে, গোরা-সৈনিকেরা তাঁহাকে মারিয়া ফেলিলেও তিনি ঐ গাড়ী ছাড়িবেন না। শেষে অনেক বচসার পর সৈনিকেরা সকলেই ঐ গাড়ী ত্যাগ করিয়া যায় এবং শ্রীযুক্ত সিদ্ধ গাড়ীতে থাকেন। তিনি প্রকৃত সত্যাগ্রহীর মতোই কার্য্য করিয়াছেন।

আমলাতন্ত্রের যথেচ্ছাচার :—

মিঃ সুব্বা রাও বেজওয়াদা টেলিগ্রাফ্ আফিসের কর্ম্মচারী। সতের বৎসর কাল ধরিয়া তিনি সুখ্যাতির সহিত চাকুরী করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি তিনি গোয়েন্দা বিভাগের কু নজরে পড়িয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট হয় যে তাঁহার অল্পবয়স্কা কন্যা তিলক-স্বরাজ্য ভাণ্ডারে পাঁচ টাকা চাঁদা দিয়াছে, এবং তিনি 'হিন্দু', 'বোম্বে-ক্রনিকেল্' প্রভৃতি জাতীয়দলের সংবাদপত্র পাঠ করেন। তাঁহার তৃতীয় অপরাধ তিনি খদ্দর পরিধান করিয়া থাকেন। খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত এক ব্রাহ্মণ বলিয়াছিল, গান্ধীকে মহাত্মা না বলিয়া দুরাত্মা বলাই সঙ্গত; তাহাতে সুব্বারাও বলেন, তুমি স্বয়ং দুরাত্মা, তাই সকলকে নিজের মতো মনে কর। এইসমস্ত গুরুতর অপরাধে মাদ্রাজের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়াছেন। মিঃ সুব্বারাও সরকারের নিকট আপীল করিয়াও কোন ফললাভ করিতে পারেন নাই। এই পরাধীন দেশে নিজ পছন্দমতো কাপড় পরিবার ও সংবাদপত্র পাঠ করিবার অধিকারও দেশীয় রাজকর্ম্মচারীদের নাই। ভারতীয় ব্যবস্থাপক-সভায় প্রশ্নের উত্তরে হোম মেম্বার হেলি সাহেব বলিয়াছিলেন, তাঁহার ডিপার্টমেন্টে চারিখানা "হিন্দু" ও ছয়খানা "বোম্বে ক্রনিকেল" লওয়া হয়। যে সংবাদপত্র ভারত-গবর্ণমেণ্ট্ একখানির স্থলে ছয়খানি গ্রহণ করিতে পারেন, তাহাই ক্রয় করার অপরাধে সতের বছরের চাকুরী খোয়াইতে হয়, এরূপ স্বেচ্ছাচারিতার দৃষ্টান্ত ভূতপূর্ব্ব জারের রাজ্যেই সম্ভবপর ছিল।

শ্রী প্রভাত সান্যাল

বিদেশ

মোস্‌লেম জগৎ—

তুরস্ক ও মিশরের অভ্যুত্থানে সমগ্র মোস্‌লেম জগতে যে একটা আন্দোলনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে তাহার ঢেউ পারস্য ও ইরাকেও আসিয়া পৌছিয়াছে। ইরাকের আরব অধিবাসীদিগকে শান্ত রাখিবার অভিপ্রায়ে বিশ্বযুদ্ধাবসানে ইংরেজ সরকার তথায় স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদান করিবার ছলে একটা নাম মাত্র রাষ্ট্র তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় ইংরেজের মিত্র আমীর হুসেনের পুত্র ফৈজুলকে আমীরের পদে বরণ করিলেন। আরব অধিবাসীগণ কিন্তু নেজদের আমীর ইবন সাউদেরই পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহাদের সে আকঙ্ক্ষাকে পদ দলিত করিয়া ফৈজুলকে রাজত্ব প্রদান করিবার অন্তরালে আরব-জাতিকে দুই দলে বিচ্ছিন্ন করিবার একটা প্রচ্ছন্ন অভিসন্ধি ইংরেজ-রাষ্ট্রনৈতিকগণের ছিল।

সম্রাট্ ফৈজুল সিংহাসনে আরোহণ করিয়া কিন্তু ইংরেজের অভিপ্রায় অনুসারে চলিতে রাজি হইলেন না। আরবজাতির দাবি-দাওয়া আদায় করিয়া লইবার জন্য তিনি আন্দোলন আরম্ভ করিয়া-দিলেন। ইংরেজ সরকার বিপদ্ গণিয়া হুসেনের শরণাপন্ন হইলেন এবং নানা রাষ্ট্রনৈতিক চালবাজির পর ফৈজুল ইংরেজ সরকারের সহিত একটা রফানিষ্পত্তিতে আসিয়া পৌছাইতে স্বীকৃত হইলেন।

তাঁহার সহিত ইংরেজ সরকারের যে-সমস্ত রফানিষ্পত্তি হইল তাহা অ্যাংলোইরাক্ সন্ধি-সর্ত্ত নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এই সন্ধি-সর্ত্ত লইয়া আবার ইরাকে গোলযোগের সূচনা হইয়াছে। ইরাকের জাতীয় দল এই সন্ধি গ্রহণ করিবার বিরুদ্ধে এক তীব্র আন্দোলন সৃজন করিয়াছেন। ইরাকের রাজধানী বাগদাদকে কেন্দ্র করিয়া এই আন্দোলন সমস্ত আরবদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অসন্তোষের বহ্নি যে ইরাকের মধ্যেই আবদ্ধ আছে তাহা নহে; ইহা নেজদ ট্রান্স্‌জর্ডনিয়া, মক্কা প্রভৃতি অঞ্চলেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইরাকের শাসন পরিষদের যাঁহারা সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশ সভ্যই ইংরেজ জাতির অনুরক্ত ছিলেন। ইংরেজের দয়াতেই তাঁহাদের এই সম্মানলাভ ঘটিয়াছে, দেশশাসনের এই সুযোগ মিলিয়াছে বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল কিন্তু বর্ত্তমান আন্দোলন এমনই তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে যে শাসন পরিষদের সভ্যগণও তাহার প্রভাব এড়াইয়া চলিতে পারিতেছেন না। পরিষদের একশত সভ্যের মধ্যে মাত্র চৌদ্দজন সভ্য অ্যাংলোইরাক্ সন্ধি সর্ত্তের সমর্থন করেন, বাকী আর সকলেই ইহার বিরোধী। আন্দোলনকারীগণের ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে ইংরেজ সরকার যুদ্ধের পূর্ব্বে যেসমস্ত দাবি রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন এখন তাহা কার্য্যে পরিণত করিতেছেন না। মুসল প্রদেশ ইরাকের অধীনে রাখিবার জন্য ইংরেজ সরকার সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। কিন্তু তুরস্কের বিরাগ-ভাজন হইবার ভয়ে এখন ইংরেজ সরকার তাহাতে তেমন উৎসাহ দেখাইতেছেন না। বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার সুবিধার জন্য ইরাকের যে সীমা রেখা নির্দ্দিষ্ট হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া ইরাকবাসীর বিশ্বাস সে সীমা-রেখা আপন রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজনের অন্তরায় বলিয়া ইংরেজ সরকারের বিবেচনা হওয়াতে ইংরেজ সরকার সেই সীমা-রেখা পর্য্যন্ত ইরাক্ রাজ্যের বিস্তৃতি দেখিতে ইচ্ছুক নহে। ভূতপূর্ব্ব অটোম্যান্ সরকারের ঋণের ভার—ইরাক্-রাজ্যের স্কন্ধে অনেকখানি দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু ইরাকের অর্থ-নৈতিক ভিত্তিকে দৃঢ় করিবার জন্য কোনওপ্রকার আর্থিক সাহায্য [illegible] করেন নাই।

নেজদের আরবগণের আক্রমণ হইতে ইরাকের স্বাধীনতা বজায় রাখিতে যে বিরাট্ জাতীয় ফৌজের ভার ইরাক্ রাজ্যকে বহন করিতে হইতেছে তাহার চাপে ইরাকের সামরিক ব্যয় অসম্ভবরকম বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই ব্যয়ভার সংক্ষেপ করিবার কোনও উপায় যদি ইংরেজ সরকার না করেন তবে ইরাক্ সরকার ঋণেরভারে শীঘ্রই দেউলিয়া হইয়া পড়িবে। ইরাক্‌কে জাতিসমূহের সংঘের সভ্য হইবার অধিকারও দেওয়া হয় নাই। ইরাকের জাতীয় দল এইসমস্ত অভিযোগের প্রতিকার চাহেন এবং ইংরেজের খবরদারির (mandate) অবসান ঘটাইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। ইংরেজের বিরুদ্ধে সেখানকার অধিবাসীদের মনেরভাব যে কিরূপ তীব্র হইয়াছে তাহা সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। শাসনপরিষদের দুইজন সভ্য ইংরেজ সরকারের খুব অনুরাগী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিগত ১৩ই এপ্রিল বাগ্‌দাদ শহরে প্রকাশ্য রাজপথে তাঁহাদিগকে এই অপরাধে হত্যা করার অভিপ্রায়ে ছুরিকাঘাত করা হইয়াছে। আততায়ীদের প্রতি জনসাধারণের সহানুভূতি থাকাতে তাহারা ধরা পড়েন নাই। এই ব্যাপারে রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। অন্যদিকে অ্যাঙ্গোরা সরকার খলিফাকে পদচ্যুত করাতে সমগ্র মোসলেম জগতে একটা নূতন আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। কোন কোন মোস্‌লেম রাষ্ট্র অ্যাঙ্গোরার এই চালটির সমর্থন করিতেছেন এবং অন্য কতকগুলি রাষ্ট্র নূতন খলিফাকে নির্ব্বাচিত করিয়া রাষ্ট্রে ধর্ম্মতন্ত্রের প্রাধান্য বজায় রাখিবার পক্ষপাতী। এই নূতন আন্দোলনের সুযোগে মোস্‌লেম জগতে আপনার প্রাধান্য বিস্তার করিবার সুযোগ পাইয়া মিশরের নেতৃবৃন্দ কাইরো শহরে সার্ব্বমোস্‌লেম বৈঠকের প্রথম অধিবেশন যাহাতে হইতে পারে সেই চেষ্টা দেখিতেছেন। এই অধিবেশনের প্রধান আলোচ্য বিষয় হইবে অ্যাঙ্গোরার এই চালটির আলোচনা। প্রয়োজন অনুভূত হইলে নূতন খলিফা নির্ব্বাচনও এই বৈঠকের একটি বিষয় হইবে।

ক্ষতিপূরণ-সমস্যা—

বিশ্বযুদ্ধের অবসানে যেসমস্ত মহা মহা সমস্যা ইউরোপীয় রাষ্ট্রনীতি-আসরে দেখা গিয়াছিল, একে একে প্রায় তাহার সবগুলির মীমাংসা সম্ভবপর হইল, কেবল মাত্র জার্ম্মাণীর নিকট ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়া লইবার পন্থা আবিষ্কৃত না হওয়াতে একটি বিরাট্ সমস্যা বাকী রহিয়া গেল। এই ক্ষতিপূরণ-সমস্যার ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাজ্য হস্তক্ষেপ করিতে নারাজ হইয়া সরিয়া পড়াতে ইহা আরও জটিল হইয়া পড়ে।

ইংরেজ ও ফরাসীর মধ্যে যুদ্ধাবসানে যে সন্দেহের বীজ উপ্ত হইয়াছিল তাহা ক্ষতিপূরণের ব্যাপার লইয়া ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতে উঠিতে এমন এক অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল যে মিত্রতা বন্ধন টুটিয়া আসিয়াছিল। কাজে-কাজেই ইউরোপের শক্তিসমূহের মধ্যে দলাদলি বাড়িয়া উঠিয়া একটা নূতন দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। সঙ্গে সঙ্গে সামরিক সাজসজ্জা বাড়িয়া উঠিয়া নিরস্ত্রীকরণ দরবারের সকল সিদ্ধান্তকে ব্যর্থ করিয়া দেয়। যুক্ত-রাজ্যের একটি প্রিয় রাষ্ট্রনৈতিক মত এইরূপে ব্যর্থ হয় দেখিয়া মার্কিন যুক্তরাজ্যের সভাপতি কুলিজ ইউরোপীয় রাষ্ট্রনৈতিক জগত হইতে সরিয়া থাকা আর সঙ্গত বিবেচনা না করিয়া গোলযোগ মিটাইয়া ফেলিবার জন্য চাপ দিতে লাগিলেন। ফলে মিত্রশক্তিবর্গ গোলযোগ মীমাংসার একটি সূত্র খুঁজিবার জন্য দুইটি কমিশন বসাইলেন। একটি কমিশনের কর্ত্তা হইলেন রেজিন্সাল্ড ম্যাক্‌কেনা ও অপরটির কর্ত্তা হইলেন মিঃ ডয়েস্। সম্প্রতি এই দুইটি কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইতেছে।

ব্রিটেন, ইতালী ও বেল্‌জিয়াম এই কমিশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন এবং তাহার নির্দ্দেশ-অনুসারে এখনই কার্য্যারম্ভ করিয়া

দিতে উৎসুক হইয়াছেন। ডয়েস-কমিটির অর্থ-নৈতিক সিদ্ধান্তের অন্তরালে যে মূল নীতিটি রহিয়াছে, তাহার ভিত্তি যে খুব দৃঢ় ও ন্যায়-সম্মত, তাহা ফরাসী জাতিও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু ইহা গ্রহণ করিতে ফ্রান্সের বাধা আছে বলিয়া ফরাসী রাষ্ট্র-তন্ত্রের কর্ণধার পঁয়কারে জানাইয়াছেন। তিনি বলেন যে, জার্ম্মাণী যে ডয়েস্-কমিটির নির্দ্ধারিত প্রণালী গ্রহণ করিয়া সেই অনুসারে কার্য্য করিবেন তাহার নিশ্চয়তা কি? জার্ম্মাণী যেপর্য্যন্ত নিদ্ধারণ মানিয়া চলার জন্য জামিন না দিবেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত জার্ম্মাণীকে বিশ্বাস করিয়া রুর ও রাইন উপত্যকা পরিত্যাগ করিয়া আসা ফ্রান্সের পক্ষে সম্ভবপর নহে। জার্ম্মাণী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিলে তাহার কি শাস্তি হইবে তাহার ব্যবস্থাও নির্দ্ধারণে থাকা উচিত বলিয়া ফ্রান্সের বিশ্বাস। জার্ম্মাণীকে বিশ্বাস করা সম্ভব কি না, ইহাই মিত্র-শক্তিবর্গের নিকট একটি গুরুতর প্রশ্ন। জার্ম্মাণীর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাহার ফলাফল পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সাহস ইংলণ্ড ও ইতালীর আছে। কিন্তু ফ্রান্স এরূপ একটি পরীক্ষা করিয়া আর নিজেকে বিপন্ন করিতে সম্মত নহেন। ফরাসী রাষ্ট্রনীতি-বেত্তারা বলেন যে, জার্ম্মাণীতে যে জাতীয় দল ক্রমশঃ প্রাধান্য লাভ করিতেছেন তাহার প্রমাণ হিট্‌লার মামলার রায় হইতেই স্পষ্ট পাওয়া যায়। হিট্‌লার বিদ্রোহের নেতাদিগের যেরূপ অল্প শাস্তি দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতেই জার্ম্মাণীর বর্ত্তমান মনোভাব বুঝা যায়, কাজে কাজেই ফ্রান্স্ জার্ম্মাণীকে বিশ্বাস করিতে সাহস পাইতেছেন না। সেজন্য ইংলণ্ড ও ফরাসীতে আবার মতান্তর ও মনান্তরের উপক্রম হইয়া সমস্যার মীমাংসা সুদূরপরাহত হইয়াছে। আপনার সৃষ্ট এইসমস্ত সমস্যার জাল হইতে ইউরোপ কবে মুক্তিলাভ করিবে তাহা কে জানে?

বাইরনের শত-বার্ষিক স্মৃতি-সভা—

বিগত ১৯শে এপ্রিল তারিখে কবি বাইরনের শত-বার্ষিক মৃত্যু-দিবস-উপলক্ষে ইউরোপের নানাস্থানে স্মৃতি-সভা ও উৎসব হইয়া গিয়াছে। গ্রীসের স্বাধীনতা-অর্জ্জন বাইরনের অক্লান্ত চেষ্টার ফলেই সম্ভব হইয়াছিল। তাই লণ্ডনের হাইড্ পার্কে বাইরনের যে মর্ম্মর মূর্ত্তি আছে, তাহা ইংলণ্ডের গ্রীক্-অধিবাসীবর্গ পুষ্পমাল্যে সজ্জিত করিয়া আপনাদের ভক্তি-অর্ঘ্য প্রদান করেন। লণ্ডনের কবিতা-আলোচনা সমিতির পক্ষ হইতেও পুষ্পমাল্য প্রদান করা হইয়াছিল। হ্যারোর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বাইরন শিক্ষা-লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তথায়ও মহাসমারোহের সহিত উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। হাক্‌নাল টর্কার্ড চার্চ্চে বাইরনের দেহাবশেষ রক্ষিত আছে। সেইজন্য এক-দল ভক্ত তাঁহাদের এই পুণ্য তীর্থে গমন করিয়া আপনাদের ভক্তি নিবেদন করেন। গ্রীসের মিসলংগি শহরে বাইরনের হৃদয় রক্ষিত আছে। গ্রীক্-সরকারের তরফ হইতে সেখানেও উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। ইতালী-দেশে বাইরন অনেক দিন বিহার করিয়াছিলেন। তাঁহার যৌবনের লীলাক্ষেত্রের নানাস্থানেও তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

ভবিষ্যৎ

আমার অন্তর মাঝে সতত নেহারি
হিংসা দ্বেষ গেছে যেন এই ধরা ছাড়ি
চিরতরে। সব দ্বন্দ যেন গেছে ঘুচে,
সকল বন্ধনরেখা শূন্যে গেছে মুছে
সলিল বিন্দুর মত। দরিদ্র জনার
মর্ম্ম ভেদি' ওঠে যেই আর্ত্ত হাহাকার
আকুল ক্রন্দন যেই—সে আর্ত্ত রোদন
নাহি আর, শেষ হ'ল ব্যথার বোধন।
অন্তরে হেরিনু আমি ভুবন ভরিয়া
নূতন প্রেমের রাজ্য উঠিছে গড়িয়া,
রবির করের মত জ্ঞানের আলোক
স্বর্গের বায়ুর মত ছেয়ে সর্ব্ব লোক।
মোদের মাঝারে যেই নিদ্রিত দ্যুলোক
তাহার পরশে বিশ্বে সর্ব্বত্র পুলক।

হুমায়ুন কবির

চলা

চারিদিকে কোলাহল, স্রোতের কল্লোলে
মুখরিত দশদিশি; সূর্য্য চন্দ্র দোলে
প্রচণ্ড প্রবাহে মাতি'; তীব্রবেগে ধায়
জীবন মরণ জুড়ি' বিপুল ধারায়
অস্তিত্বের অন্তর্গূঢ় উদ্দাম প্রেরণা
পশ্চাতে ফেলিয়া দূরে; নিত্য উদ্ভাবনা
দুর্জ্জয় জীবনগানে সম্মুখেতে ছোটে,
নাহি চিন্তা পরিণাম, শুধু হয়ে'-ওঠে!
মানবের মনে প্রেম, সেও শুধু চলা
চিত্ত হ'তে চিত্তপানে বিদ্যুৎচঞ্চলা
অন্ধ কামনার বেগ, পূর্ণের পিয়াসা
দিকে দিকে আপনার খুঁজে' মরে ভাষা।
সুন্দরে ভীষণে মিলি' প্রাণে ও অপ্রাণে
নিরন্তর এ কি লীলা চলিছে কে জানে!

শ্রী অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ক্রুশে-বিদ্ধ যীশুর প্রার্থনা

[বরিশালের ব্যাপ্টিষ্ট মিশন্ হাউস হইতে শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র দাস লিখিয়াছেন—

"মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় কি কি যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া ক্রুশে বিদ্ধ যীশুর প্রার্থনা প্রক্ষিপ্ত বলেন তাহা জানিবার জন্যই আমরা সামান্য কিছু লিখিয়াছিলাম। প্রত্যুত্তরে ঘোষ মহাশয় বিস্তারিত লিখিয়াছিলেন, কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় আপনারা তাঁহার সমস্ত প্রমাণ ও যুক্তি মুদ্রিত করেন নাই। ঘোষ মহাশয়ের সমস্ত যুক্তি ও প্রমাণ জানিবার জন্য আমরা নিতান্ত ইচ্ছুক।"

এই ইচ্ছা-বশতঃ দাস-মহাশয় মহেশ বাবুর লিখিত সমগ্র প্রত্যুত্তরটি চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাহার কিয়দংশ বৈশাখের প্রবাসীতে ছাপা হইয়াছিল, অল্প-কিছু নষ্ট হইয়া গিয়াছে, বাকী যাহা আমাদের হাতে ছিল, তাহা ছাপিতেছি। গোপাল বাবুকে না পাঠাইয়া প্রকাশ করাই সঙ্গত বোধ করিলাম। কারণ, ইহা যখন প্রকাশ্যভাবে তর্ক-বিতর্কের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে, তখন মহেশবাবুর বক্তব্য সম্বন্ধে গোপাল-বাবু ভিন্ন অন্য অনেকেরও সে বিষয়ে কৌতূহল হইতে পারে। —প্রবাসীর সম্পাদক।]

[বৈশাখের প্রবাসীতে প্রকাশিত অংশের অনুবৃত্তি]

যুক্তি-বৈচিত্র্য

প্রাচীন পুস্তকে ঐ অংশ নাই এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক পুস্তকে ঐ অংশ আছে, ইহার কারণ কি? ইহার একমাত্র সদুত্তর এই, যে, লুকের মূল গ্রন্থে এই অংশ ছিল না, উত্তরকালে ইহা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

কিন্তু যুক্তি দুইপ্রকার—প্রাণের যুক্তি ও জ্ঞানের যুক্তি। প্রাণ চায় প্রিয়জনকে বড় করিতে এবং বড় দেখিতে। জ্ঞান যদি ইহা না করিতে পারে, তবে প্রাণ স্বতঃই নিজের যুক্তি উদ্ভাবন করিবে। অতি বিশ্বাসী খৃষ্ট-সেবকগণ সেইজন্য জ্ঞানময় যুক্তিতে শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই। "আমাদিগের প্রভু এত উচ্চ কথাটি বলেন নাই, ইহা কি হইতে পারে? তিনি নিশ্চয় বলিয়াছিলেন; তবে কিনা লুকের প্রাচীন পুস্তকে ইহা লেখা হয় নাই।" এইরূপ যুক্তির অবতারণা তাঁহারা করেন।

নেস্‌ল্ নামক একজন খ্যাত-নামা পণ্ডিতও এই প্রকার ভাবময় কল্পনাই করিয়াছেন। তিনি প্রথমে স্বীকার করিয়াছেন, যে, লুকের প্রাচীনতম পুস্তকে ঐ অংশ নাই—

The verdict must be, as it seems, that they do not belong to the earliest form of the Gospel of Luke, but were inserted in some copies in a very early time, not later than the second century.

(প্রাচীনতম হস্তলিপিতে নাই, তবে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল প্রাচীন কালেই, কিন্তু দ্বিতীয় শতাব্দীর পরে নহে।) ইহা স্বীকার করিয়াও তিনি বলিতেছেন—

The acknowledgment that the passage does not originally belong to the book in which it is now included, is compatible with the assumption that it is a true record of what Jesus really said from a source of which the origin is no longer known. (Open Court, 1912, p. 178.)

অর্থাৎ "ঐ অংশ প্রক্ষিপ্ত ইহা স্বীকার করিয়াও বলা যাইতে পারে, যে ইহা যীশুর উক্তি, যদিও ইহার মূল জানা যাইতেছে না।"

ইহা জ্ঞানের কথা নহে, ইহা অন্ধ বিশ্বাসের কথা।

আর একটি অদ্ভুত যুক্তি এই :—

'প্রাচীনতম গ্রন্থে এ অংশ ছিল। ইচ্ছা করিয়াই কোন সম্পাদক ঐ অংশ বর্জন করিয়াছেন। প্রভুকে যাহারা হত্যা করিয়াছিল, তাহাদিগের প্রতি প্রেম ও ক্ষমা!—ইহা হইতেই পারে না।' এই ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া কোন ব্যক্তি ঐ অংশ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। উত্তরকালে আবার ঐ অংশ পুনর্গৃহীত হইয়াছে।"

ওয়েষ্টকট এবং হর্ট পূর্ব্বোল্লিখিত পুস্তকে এইপ্রকার যুক্তির বিষয়ে এইরূপ বলিয়াছেন :—

"Wilful excision, on account of the love and forgiveness shown to the Lord's murderers, is absolutely incredible." P. 68.

অর্থাৎ ইহা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য।

আর একটা যুক্তি এই—"ভুলক্রমে এক সময়ে ঐ অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছিল।" ইহাও অন্ধ বিশ্বাসের কথা, জ্ঞানের কথা নহে। প্রমাণের অভাবে এ-মতও গ্রহণীয় নহে।

বাইবেলের যে কথাটি অমূল্য এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ভুলক্রমে নানাশ্রেণীর পুস্তকে সেই কথাটি বর্জ্জিত হইবে, ইহা নিতান্তই অযৌক্তিক ও অবিশ্বাস্য। এই বর্জ্জন এক-খানা পুস্তকে নহে, মূল গ্রন্থের বহু হস্তলিপিতে এবং বহুপ্রকার অনুবাদে।

কোনপ্রকার যুক্তিদ্বারাই প্রমাণ করা সম্ভব হয় নাই, যে, ঐ অংশ যীশুর উক্তি।

কেন যীশুর উক্তি নহে

প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার দ্বিতীয় এক পথ আছে। যীশুর চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া বিচার করা যাইতে পারে, যে, ঐ উক্তি যীশুর হইতে পারে কি না।

যীশুর প্রাণ-ভয়

আমরা মডার্ণ রিভিউ পত্রিকাতে (১৯২৪, জানু, পৃঃ ১৮) আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, যে যীশু সমস্ত জীবন প্রাণ-ভয়ে ভীত এবং আত্ম-রক্ষার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। যখনই কোন বিপদের আশঙ্কা দেখিতেন, তখনই তিনি অন্যত্র পলায়ন করিতেন (যোহন ৭।১০ ; ৮।৫৯ ; মথি ১২।১৪, ১৫ ; ১৪।১৩ ; মার্ক ৩।৭ ইত্যাদি)। শত্রুগণ যখন তাঁহাকে বন্দী করিবার জন্য গেৎশিমানী নামক স্থানে উপস্থিত হইতেছিল, তখনও তিনি পলায়ন করিবার জন্য ইচ্ছা করিতেছিলেন (মথি ২৬।৪৬ ; মার্ক ১৪।৪২)। প্রতিকূল ঘটনা উপস্থিত হইলে তিনি যে কেবল নিজেই পলায়ন করিতেন, তাহা নহে ; শিষ্যগণকেও পলায়ন করিবার উপদেশ দিতেন

(মথি ১০।২৩)। যীশু যে ভীরু ছিলেন, এ-অপবাদ প্রাচীন কালেও ছিল। অরিজেনের গ্রন্থ পাঠ করিলে বুঝা যায়, যে, সেল্‌সাসের এক অভিযোগ এই ছিল যে, ধৃত হইবার পূর্ব্বে যীশু প্রাণ-রক্ষার জন্য নিন্দনীয়ভাবে লুকাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

("tried to escape by disgracefully concealing himself." Origen. *Con. Cels.* ii. 10).

শেষ অবস্থাতে তিনি প্রাণ-ভয়ে ভীত হইয়া গেৎশিমানী-নামক স্থানে পলায়ন করিয়াছিলেন এবং আত্ম-রক্ষার্থ তরবারী ক্রয় করিবার জন্য শিষ্যগণকে উপদেশ দিয়াছিলেন (লূক ২২।৩৬-৩৮)। যিনি প্রাণ-ভয়ে এত ভীত, যিনি দেহ-রক্ষার জন্য এত ব্যস্ত, তিনি ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া কি অপরের বিষয় চিন্তা করিতে পারেন? তিনি নিজ-দুঃখ এবং বিপদের কথাই ভাবিবেন, ইহাই স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে ঘটিয়াছিলও তাহাই। মথি ও মার্ক বলেন, তিনি ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া এই কথা বলিয়াছিলেন:—"আমার পিতা, আমার পিতা, কেন আমাকে পরিত্যাগ করিলে?" (মথি ২৭।৪৬; মার্ক ১৫।৩৪)।

যীশুর অবস্থা ভাবিলে কাহার না প্রাণ কাঁদিয়া উঠে? কাহার না অশ্রু-জল বিগলিত হয়? প্রার্থনাও কি হৃদয়-বিদারক! এমন প্রার্থনা সমালোচনা করিতেও হৃদয় ব্যথিত হয়। কিন্তু গত্যন্তর নাই, সেইজন্যই এই সমালোচনার অপরাধে অপরাধী হইতে হইল।

যীশুর জীবন-চরিত লিখিয়াছেন চারিজন—মথি, মার্ক, লূক ও যোহন। অনেক পণ্ডিত মার্কের গ্রন্থকেই প্রাচীনতম গ্রন্থ বলিয়া মনে করেন, কেহ কেহ বলেন মথির গ্রন্থই প্রাচীন। যদি উক্ত চারিজনের মধ্যে এই স্থলে কাহারও কথা বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে মথি ও মার্কের কথাই বিশ্বাস করিতে হইবে। আর অবিশ্বাস করিবার কারণও কিছু নাই। যীশুর সমুদয় জীবনের সঙ্গে এই প্রার্থনার সামঞ্জস্য রহিয়াছে। অপর সময়েও তিনি প্রাণ-রক্ষার কথা ভাবিতেন; ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াও নিজের কথাই ভাবিয়াছিলেন।

যীশুর ক্রোধ ঘৃণা ও বিদ্বেষ

ফ্যারিসি, স্যাডুসি, ও ইহুদী সমাজের অন্যান্য নেতৃস্থানীয় লোক এবং জেনটাইল্‌দিগকে যীশু কি চক্ষে দেখিতেন, তাহা আমরা মডার্ণ রিভিউ পত্রিকাতে (১৯২৩, আগষ্ট; অক্টোবর; ১৯২৪, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি) আলোচনা করিয়াছি। তিনি বিরোধীদিগকে শেয়াল, কুকুর, শূয়ার, সর্প, সর্পের বংশধর, নরকের সন্তান; ভণ্ড, অন্ধ, মূর্খ ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করিতেন (মথি ১৫।২৬; মার্ক ৭।২৭; মথি ৭।৬; লূক ১২।৩১, ৩২ ইত্যাদি)। যাহারা তাঁহাকে গ্রহণ করিত না, তাহাদিগের জন্য অনন্ত নরকে স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহাদিগের বাড়ী-ঘর, দেশ, পুত্র-পৌত্রাদি ধ্বংস-প্রাপ্ত হইবে—এই-প্রকার অভিসম্পাত করিতেন। যাঁহার প্রকৃতি এই-প্রকার, তিনি কি ক্রুশ-কাষ্ঠে বদ্ধ হইয়া যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া শত্রুগণের প্রতি প্রীতি দেখাইতে পারেন?

বধ্য-ভূমিতে যাইবার সময়ও যিনি বলিয়া গিয়াছেন, যে, জেরুজিলাম-বাসী বিষম দুর্বিপাকে পতিত হইবে এবং সমূলে ধ্বংস-প্রাপ্ত হইবে। তিনি কি কখন ইহারই অব্যবহিত পরে তাহাদিগের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিতে পারেন? সুতরাং যীশুর চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া বিচার করিলেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়, যে, যীশুর পক্ষে মৃত্যুর সময়ে শত্রুগণের কল্যাণ কামনা করা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

অভিসন্ধি

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, কি উদ্দেশ্যে লূকের ঐ অংশকে প্রক্ষিপ্ত করা হইয়াছে। অনেকে মনে করেন, ইহার এই কয়েকটি কারণ:—

বাইবেলের প্রাচীন অংশে উক্ত হইয়াছে—

"He was numbered with the transgressors, and he bare the sin of many and made intercession for the transgressors." Isaiah. 53. 12.

অর্থাৎ "তাঁহাকে অপরাধিগণের মধ্যে গণ্য করা হইয়াছিল; তিনি বহু লোকের পাপ-ভার বহন করিয়াছিলেন এবং অপরাধিগণকে ক্ষমা করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন।"

প্রমাণ করিতে হইবে, যীশু ত্রাণ-কর্ত্তা; প্রমাণ করিতে হইবে, যীশুতে প্রাচীন বাইবেলের বাণী পূর্ণ করা হইয়াছে। অনেক পণ্ডিত মনে করেন, এই জন্যই লূকের ঐ অংশকে (২৩।৩৪) প্রক্ষিপ্ত করিয়া উক্ত ঘটনাকে যীশুর জীবনের ঘটনা বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে।

(Strauss, Life of Jesus, p. 682; New Life of Jesus, Vol. II, p. 378; Keim, Jesus, Vol. VI, Pp, 155-156; Renan, Life of Jesus, Chapter 25; etc.)

আরও একটা উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। সে উদ্দেশ্য যীশুকে ক্ষমাশীল, উদারচেতা ও বিশ্বপ্রেমিক বলিয়া প্রতিপন্ন করা। বাইবেলে এই-প্রকার উচ্চ উপদেশের অভাব নাই। কিন্তু যীশু নিজের জীবনে এই-প্রকার দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন নাই। তিনি বিরোধীদিগকে কখনও প্রীতির চক্ষে দেখেন নাই এবং তাহাদিগকে কখনও ক্ষমা করেন নাই। প্রত্যুত নানা ঘটনায় তাহাদিগকে অভিসম্পাতই করিয়াছিলেন।

কিন্তু 'হীদন্'-(heathen) দিগের আদর্শ ছিল অন্যপ্রকার। লাই-কার্গাস্ অ্যাল্‌ক্যাণ্ডারকে যে-ভাবে ক্ষমা করিয়াছিলেন, যীশুর জীবনে সেপ্রকার ক্ষমা কোথায়? যাহারা পৌত্তলিক, তাহারাও যীশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে, ইহা কখন হইতে পারে না। ইহার একটা প্রতিবিধান করা আবশ্যক হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এই-প্রকার ভাবদ্বারা প্রণোদিত হইয়াও কোন যীশুভক্ত লূকের পুস্তকে ঐ অংশ প্রক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

বাইবেলের প্রেরিতদিগের ক্রিয়া নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, যে, ষ্টিফেন্‌কে যখন হত্যা করা হয়, তখন তিনি এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

"Lord, lay not this sin to their charge" (p. 7. 60.)

"প্রভো! এই অপরাধের জন্য ইহাদিগকে দায়ী করিও না"।

যীশুর ভ্রাতা জেম্‌সকেও হত্যা করা হইয়াছিল। 'ইউসিবিয়াসের গ্রন্থে লিখিত আছে, যে, হেগেসিপাস্ ঐ মৃত্যুর এক বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। ঐ বিবরণ হইতে ইউসিবিয়াস্ মৃত্যুকালীন এই উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন:—

"O Lord, God, Father, forgive them, for they know not what they do" (Eus. H. E. 2. 23.)

"হে প্রভো! হে ঈশ্বর! হে পিতঃ! ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কারণ ইহারা জানেনা ইহারা কি করিতেছে।"

ষ্টিফেন্ এবং জেম্‌স্ মৃত্যুর সময়ে শত্রুগণের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আর মথি ও মার্ক বলেন, যীশু মৃত্যুর সময় আকুল হইয়া নিজের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই-প্রকার বিসদৃশ ঘটনা যীশুর পক্ষে গৌরবজনক নহে। কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন, ইহার একটা প্রতিকার করিবার জন্যও কোন খৃষ্ট-শিষ্য লূকে ঐ অংশ (২৩।৩৪) সংযোজন করিয়া দিয়াছেন।

উপসংহার

আলোচনা করিয়া আমরা এই সমুদায় সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি—(১) যীশুর প্রাচীনতম জীবন-চরিতে এ-ঘটনার উল্লেখ নাই। (২) লূকের প্রাচীনতম হস্ত-লিপিতে ঐ অংশ পাওয়া যায় না। (৩) লূক-রচিত গ্রন্থের প্রাচীনতম অনুবাদে এই অংশ নাই। (৪) বাইবেল্-শাস্ত্র-বিষয়ে

যাঁহাদিগের বাক্যকে 'আপ্ত বাক্য' বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাঁহারাও এই মত পোষণ করেন। (৫) যীশুর চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, যে, যীশুর পক্ষে ক্রুশ-বিদ্ধ অবস্থায় ঐ-প্রকার প্রার্থনা করা সম্ভব নহে। (৬) ইহুদীদিগের নিকট প্রমাণ করা আবশ্যক, যে, প্রাচীন বাইবেলের বাণী যীশুর জীবনে পূর্ণ হইয়াছে; 'হীদেন্'দিগকে জানান আবশ্যক, যে, যীশুও ক্ষমাশীল এবং উদারচেতা ছিলেন। খৃষ্টিয়ানদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক, যে, জেম্‌স্ ও ষ্টিফেনের পূর্ব্বে যীশুও শত্রুর জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন লোকে মনে করেন, এই সমুদয় কারণে লূক-রচিত গ্রন্থে ২৩।৩৪ অংশ প্রক্ষিপ্ত করা হইয়াছে।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

হায়দরাবাদে বাঙ্গালীর সংখ্যা

ফাল্গুনের প্রবাসীতে দক্ষিণ হায়দ্রাবাদে বাঙ্গালীর সংখ্যা ১৯২১ সালে শূন্য লেখা হইয়াছিল, কিন্তু তখন আমরা অনেকগুলি বাঙ্গালী সেখানে ছিলাম। অতএব এ-ভুল কিরূপে হইল জানিবার জন্য আমি Director, Government Statistics Hyderabad-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, উত্তর পাইয়াছি :—

There are 293 Bengalis in Hyderabad—172 males and 121 females. Vide Table XI Census Report 1921.

শ্রী অমৃতলাল শীল

[সেন্সস্ রিপোর্টের যে ভল্যুমে সমুদয় ভারতবর্ষের সব প্রদেশের ও দেশী রাজ্যের সংখ্যা দেওয়া আছে, আমরা তাহাতে হায়দরাবাদে বাঙ্গালীর সংখ্যা পাই নাই। প্রবাসীর সম্পাদক।]

বৈশাখের প্রবাসীতে চিত্র

চৈতন্য দেব ও ঈশ্বর-পুরীর প্রথম সাক্ষাৎ নবদ্বীপে হয়। দ্বিতীয় সাক্ষাৎ গয়াতে। সেইখানে তিনি নিমাইকে গার্হস্থ্য মন্ত্র দিয়াছিলেন। নিমাই কাটোয়াতে কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস লইয়াছিলেন। সন্ন্যাসের গুরু ঈশ্বর-পুরী নহেন। ইহা ছাড়া ছবিতে দৃশ্য বাংলা দেশের। যে বৃদ্ধটি দাঁড়াইয়া তাঁহার পরনে সাদা ধুতি। ঈশ্বর-পুরী সন্ন্যাসী, তাঁহার পরনে গৈরিক ধুতি হওয়া উচিত। অতএব ছবির উদ্দেশ্য আর কিছু হইবে; শ্রী চৈতন্যদেব ও ঈশ্বর-পুরীর সাক্ষাৎ হইতে পারে না।

শ্রী অমৃতলাল শীল

বড়োদায় বাঙ্গালীর সংখ্যা

ফাল্গুন সংখ্যার প্রবাসীতে বাঙ্গালীর সংখ্যা লিখিতে গিয়া আপনি লিখিয়াছেন বড়োদায় এখন বাঙ্গালী আছে জানি, কিন্তু, ১৯১১ বা ১৯২১ কোন সালে তাহাদের উল্লেখ নাই কেন, তথাকার বাঙ্গালীরা বলিতে পারিবেন।" Census of India 1921, Volume XVII-A, Baroda State Part II Imperial Tables by Satyavrata Mukherjee M. A. (Oxon) Supdt. of Census Operations, Baroda. State Table P. Language Page 44. Language and Dialects heading 8 Eastern Group মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় বড়োদায় ৯৩জন বাঙ্গালী ১৯২১ সালে ছিল তন্মধ্যে বড়োদা সহরেই ৫২জন পুরুষ ও ৩৪জন স্ত্রীলোক ছিল।

শ্রী উপেন্দ্র চন্দ্র সেন,
সম্পাদক, বাঙ্গালী ক্লাব, বড়োদা

[আমরা সেন্সস্ রিপোর্টের সমগ্র-ভারতীয় বহিটিতে বড়োদার বাঙ্গালীর সংখ্যা পাই নাই বলিয়া ঐরূপ লিখিয়াছিলাম। প্রঃ সঃ।]

ভ্রম-সংশোধন

গত বৈশাখের প্রবাসীতে "আরবী ছন্দের বাঙ্গালা তর্জ্জমা"য় কয়েকটি ভুল রহিয়া গিয়াছে। নিম্নে সংশোধন করিয়া দেওয়া হইল :—

পৃষ্ঠা ও লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৬ পৃষ্ঠা, প্রথম স্তম্ভের শেষ ভাগে	কেননা ঠিক ততখানিই সত্য। বলা বাহুল্য, এই কারণেই একটি সম্বন্ধে……..করিলাম।	কেননা, একটি সম্বন্ধে উহার নাম যতখানি সত্য অন্যটি সম্বন্ধেও ঠিক ততখানি সত্য। বলা বাহুল্য, এই কারণেই আমি আরবী ছন্দের সম্পূর্ণ অনুবাদ করিলাম।
৪৯ পৃষ্ঠা, "হজয্" এর "(ঙ)" ২য় চরণ	এই ধরার। বক্ষে জুড়াবার।	এই ধরার। উষর বক্ষে।
ঐ "(চ)" ২য় চরণ	মন যার। ধেয়াম নিমগম।	মন যার। ধেয়ান-মগ্ন।
৫০ পৃষ্ঠা "(ঠ)" ২য় চরণ	জীবন দাও গো। জীবন কর দান।	জীবন দাও গো। জীবন দাও গো

স্বরাজ্য দল ও চাকরীর যোগ্যতা

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে সর্ব্বসাধারণের অধিকাংশ প্রতিনিধি স্বরাজ্যদলের লোক বলিয়া উহা এখন ঐ দলের দখলে আসিয়াছে। উহার প্রধান কয়েকজন অবৈতনিক ও বেতনভোগী কর্ম্মচারী ঐ দলের লোক। নিম্নস্তরের কত কর্ম্মচারী ঐ দল হইতে নিযুক্ত হইতেছেন, তাহার ঠিক্ খবর জানি না। কিন্তু শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু রাজনৈতিক কারণে নিপীড়িত লোকদিগকে তাঁহার নিকট আবেদন করিবার জন্য খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন বলিয়া এইরূপ অনুমিত হইয়াছে, যে, নীচের দিকের কতকগুলি চাকরীও ভূতপূর্ব্ব অন্তরীণ, রাজবন্দী, ইত্যাদি ব্যক্তিগণ পাইয়াছেন ও পাইবেন।

নিজের দলের লোককে চাকরী দেওয়া নীতির অনেক সমালোচনা খবরের কাগজে হইয়াছে। আমরাও মডার্ণ্ রিভিউ কাগজে এই নীতির সমালোচনা করিয়াছি। কিন্তু কিরূপ সমালোচনার আমরা পক্ষপাতী নহি, তাহাও বলা দর্‌কার।

খবরের কাগজে এবং মুখে মুখে এইরূপ সমালোচনা হইয়াছে, যে, সুভাষ-বাবু যদি সিভিল্ সার্ভিসে থাকিতেন, তাহা হইলে এখন তাঁহার বেতন ৬০০ কিম্বা ৭০০ হইত, কিন্তু তিনি মিউনিসিপ্যালিটিতে দেড় হাজার টাকার কাজ পাইয়াছেন। ইত্যাকার কথা বলিয়া তাঁহার স্বার্থত্যাগের অলীকতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু আমরা এরূপ সমালোচনার পক্ষপাতী নহি। তিনি যখন সিভিল্ সার্ভিসে ইস্তফা দেন, তখন কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কাজ তাঁহার হইবে, ইহা কেহ জানিত না, কল্পনাও করে নাই। তিনিও কল্পনা করেন নাই। সুতরাং তিনি ভবিষ্যতে বেশী টাকার চাকরী পাইবার আশায় সিভিল্ সার্ভিসে ইস্তফা দিয়াছিলেন, এবং তদ্দ্বারা তিনি স্বার্থত্যাগের বাহবাও পাইলেন, এবং তাঁহার আর্থিক লোকসানও হইল না, এইরূপ ইঙ্গিত করা ঠিক্ নয়। তাঁহার স্বার্থত্যাগ খাঁটি; তাহার প্রশংসা তাঁহার ন্যায্য পাওনা। তিনি সর্‌কারী চাকরী ছাড়িয়া দেশের প্রকৃত সেবাও করিয়াছেন;—তাহার একটি দৃষ্টান্ত, জলপ্লাবনে বিপন্ন উত্তরবঙ্গের লোকদের সাহায্যার্থ তাঁহার প্রভূত পরিশ্রম।

যেহেতু স্বরাজ্যদল কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে প্রবল হইয়াছেন, অতএব স্বরাজ্যদলের কাহারও উহার কোন পদে অধিষ্ঠিত হওয়া উচিত নয়, এরূপ মতেরও আমরা সমর্থন করি না। ইংরেজরা এখন ভারতবর্ষের মালিক, এবং অধিকাংশ ইংরেজ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পরিচিত। সেই কারণে কেহ যদি বলে যে, ভারতবর্ষে কোন ইংরেজের বা কোন খৃষ্টিয়ানের সর্‌কারী চাকরী পাওয়া উচিত নয়; তাহা কি ঠিক্ হইবে? ইংলণ্ডের পার্লেমেণ্টে এখন শ্রমিকদলের প্রাধান্য হইয়াছে; এবং শ্রমিকদলের অন্যতম সভ্য মিঃ রাম্‌জে ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড্ প্রধান মন্ত্রী হইয়া মন্ত্রীসভা গঠন করিয়াছেন। কিন্তু শ্রমিকদলের প্রাধান্য হওয়ায় একথা কেহ বলে না, যে, শ্রমিকদলের কোন লোকেরই অবৈতনিক বা বৈতনিক কোন সর্‌কারী চাকরী ইংলণ্ডে পাওয়া উচিত নয়।

স্বরাজ্যদলের লোক হওয়াটা চাকরীর অন্যতম যোগ্যতা বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত নয়, অযোগ্যতা বলিয়াও বিবেচিত হওয়া উচিত নয়। সেই জন্য স্বরাজ্যদলের সভ্য সুভাষ-বাবুর মনোনয়নটাই অন্যায় হইয়াছে, এরূপ আমরা মনে করি না। প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহক কর্ম্মচারীর পদের জন্য তিনি যোগ্যতম লোক কি না,

তাহার স্বতন্ত্র বিচার হইতে পারে ও হওয়া উচিত। এই বিচার করিবার মত সব খবর আমাদের জানা নাই। তবে এই কথা বলিতে পারি, যে, আমরা সুভাষ-বাবুর কর্ম্মিষ্ঠতা, কার্য্যনির্ব্বাহের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশংসাই শুনিয়াছি। অভিজ্ঞতার কথা অবশ্য উঠিতে পারে। কিন্তু উহারও দুই দিক্ আছে। অভিজ্ঞতার গুণের দিক্‌টা সকলেই জানেন বা অনুমান করিতে পারেন। উহার অন্য একটা দিক্ আমরা সব সময় মনে রাখি না। কোন একটা প্রতিষ্ঠানের দোষ থাকিলে, তাহা অভিজ্ঞ লোকদের গা-সওয়া হইয়া যায়; তাহা আর তাঁহাদিগকে পীড়া দেয় না। তাহার একটা দৃষ্টান্ত দেখুন। যখন বাবু সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান্ নিযুক্ত হন, তখন তিনি মিউনিসিপ্যালিটির একজন বড় চোর ধরিয়াছেন, এইরূপ সংবাদ কাগজে বাহির হয়। কিরূপে বাবু বিজয়কৃষ্ণ বসুর সাহায্যে চোর ধরিলেন, তাহার এমন বর্ণনা কাগজে বাহির হইয়াছিল যেন বায়োস্কোপে প্রদর্শিত ঘটনার মত তাহা পাঠকদের চোখের সাম্‌নে ঘটিতেছে। তাহার পর যে কি হইল, তাহা আর শোনা গেল না; এবং পরেও আর তিনি কোন চোরের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন বলিয়া শুনি নাই। বোধ হয়, চৌর্য্যটা প্রথমে তাঁহার মনকে যত আঘাত করিয়াছিল, পরে ক্রমে ক্রমে আর ততটা করে নাই—উহা গা-সওয়া হইয়া গিয়াছিল; কিম্বা তিনি চোর ধরা-রূপ সৎকাজটা হয়ত পরে গোপনেই করিয়া থাকিবেন। অন্য কারণও থাকিতে পারে।

এইটি অভিজ্ঞতার মন্দ দিক্। অবশ্য এমন লোকও পৃথিবীতে আছেন, যাঁহারা ক্রমাগত দোষ দেখিলেও, দোষগুলা তাঁহাদের গা-সওয়া হয় না। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কোন ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান্ আমাদিগকে ঐ প্রতিষ্ঠানটিতে উৎকোচ-গ্রহণ ও চৌর্য্যের প্রাদুর্ভাবের কথা বলিয়াছিলেন; এই কারণে কেহ কেহ ইহাকে ক্যাল্‌কাটা করপোরেশ্যন্ না বলিয়া ক্যাল্‌কাটা করাপ্‌শ্যন্ বলিয়া থাকেন। অতএব এই সব দোষের সহিত অতি-পরিচয়ে বা তৎসমুদয়ের সহিত নিত্য-সংঘর্ষে যাঁহাদের হৃদয়মনে কড়া পড়িয়া যায় নাই, এমন কোন কর্ম্মিষ্ঠ ও সৎলোক ইহার প্রধান কর্ম্মী হওয়া মন্দ নয়। তা ছাড়া, পুরাতন ঝাঁটায় ঘরে যে সব জায়গার আবর্জ্জনা ও ময়লা সাফ্ হয় না, নূতন ঝাঁটায় তাহা হইতে পারে।

বিশেষ কোন দলের লোক বলিয়াই কাহাকেও চাকরী দেওয়াতেই আমাদের আপত্তি। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস্-কমিটি এক প্রস্তাব ধার্য্য করেন, যে, পুরাদস্তুর অসহযোগী কংগ্রেস্‌ওয়ালাকেই যেন কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহক ও ডেপুটি কার্য্যনির্ব্বাহক কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হয়। আমরা এরূপ প্রস্তাব ও তাহার ভিত্তীভূত নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী।

ভারতীয় খবরের কাগজসকলে যে যে বিষয়ে ভারতের মুসলমান গবর্ণ্‌মেণ্ট্‌কে ব্রিটিশ গবর্ণ্‌মেণ্ট্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হয়, তাহার মধ্যে একটি এই, যে, মুসলমান আমলে হিন্দুদিগকেও অভিযানে ও অন্য সময়ে প্রধান সেনাপতি, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা, প্রভৃতি উচ্চ পদ দেওয়া হইত; এবং তাহা "পিণ্ডি-রক্ষা" নীতি অনুসারে দেওয়া হইতনা। শ্রেষ্ঠ বলিবার কারণ কি? কারণ এই, যে, জাতি বা ধর্ম্মের বিচার না করিয়া যোগ্যতম লোককে অনেক কাজ দেওয়া হইত। ইংলণ্ডে পূর্ব্বে ইহুদী ও রোম্যান্ ক্যাথলিক্‌দিগকে চাকরী দেওয়া হইত না। কিন্তু আধুনিক কালে ইহুদী ও রোম্যান্ কাথলিক্‌গণও অতি উচ্চ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। যেমন রোম্যান্ ক্যাথলিক্ লর্ড্ রিপন ভারতের বড়লাট হইয়াছিলেন, ইহুদী লর্ড রেডিং বড়লাট হইয়াছেন, ইত্যাদি। ইংলণ্ডের লোকেরা কেবল প্রটেষ্টাণ্ট খৃষ্টিয়ানদিগের মধ্য হইতে কর্ম্মচারী নিয়োগ না করিয়া অন্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায় হইতেও করায় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে শ্রমিক গবর্ণ্‌মেণ্ট্ মন্ত্রীসভায় পর্য্যন্ত অ-শ্রমিক লর্ড্ চেম্‌স্‌ফোর্ড্‌কে লইয়াছেন। অন্যান্য সভ্য দেশেও ধর্ম্মসম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সরকারী চাকরী দেওয়া হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান গবর্ণ্‌মেণ্ট্ খৃষ্টিয়ান্ গবর্ণ্‌মেণ্ট; কিন্তু চাকরী অখৃষ্টিয়ান্‌দিগকেও দেওয়া হয়।

মানুষের উপর ধর্ম্মের প্রভাব যেরূপ ব্যাপক, গভীর ও প্রবল, রাজনৈতিক মতের প্রভাব তেমন নয়; এবং প্রত্যেক ধর্ম্মের অনুবর্ত্তীগণ নিজ সম্প্রদায়ের লোকদিগকে স্বভাবতঃ অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে

করেন। ধর্ম্ম মানুষকে, তাহার চরিত্র ও ব্যক্তিত্বকে, যেমন করিয়া গড়ে, অন্য কোন প্রভাব বা মত তেমন করিয়া গড়িতে পারে না। তথাপি, ধর্ম্মের এই অসাধারণ প্রভাব ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও, ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে, যোগ্যতা অনুসারে, কর্ম্মচারী নিয়োগ ক্রমেই অধিকতর পরিমাণে প্রচলিত হইতেছে, এবং তাহা ঠিক্ই হইতেছে। খৃষ্টিয়ান্ বা হিন্দু বা মুসলমান সমাজ হইতেই যোগ্যতম কর্ম্মচারী পাওয়া যাইবে, ইহা মনে করা যদি ভুল হয়; তাহা হইলে কংগ্রেস্দল, অসহযোগীদল, বা স্বরাজদল হইতেই যোগ্যতম কর্ম্মচারী পাওয়া যাইবে, ইহা মনে করা কি ভুল নয়? নিশ্চয়ই ভুল। ইহা শুধু ভুল নয়। এরূপ নীতি অনুসারে কর্ম্মী মনোনয়ন করিলে ঐ ঐ দলের বহির্ভূত যোগ্য লোকদের উপর অবিচার করা হয়; এবং অবিচার কখনও কল্যাণকর হইতে পারে না। ইহার কুফল শুধু অন্য দলের উপর অবিচার ও তাহাদের অসন্তোষ উৎপাদনেই পর্য্যবসিত হয় না। যে-দলের প্রতি পক্ষপাত করা হয়, তাহারও অনিষ্ট ইহার দ্বারা হয়। সাংসারিক লাভালাভ গণনা না করিয়া যাহারা কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ে বা রাজনৈতিক দলে যোগ দেয়, তাহারাই উহার শ্রেষ্ঠ অংশ, তাহারাই উহার শক্তিমত্তার কারণ হয়। যাহারা অন্নের লোভে, ধনের প্রত্যাশায়, কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ে বা দলে যোগ দেয়, তাহারা উহার দুর্ব্বলতা ও অধোগতির কারণ হয়। তাহাদিগকে লোকে ভেতো বলে। দুর্ভিক্ষের সময় বা অন্য সময় যাহারা অন্নের জন্য খৃষ্টিয়ান্ হইয়াছে, মান্দ্রাজ অঞ্চলে তাহাদিগকে রাইস্ ক্রিশ্চ্যান্ বা ভেতো খৃষ্টিয়ান্ বলে। স্বরাজ্যদলের নেতারা কি ভেতো স্বারাজ্যিকের প্রাদুর্ভাব দেখিতে চান্?

অসহযোগীরা প্রথম হইতেই কাউন্সিলে যাইবেন না, কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটী ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড আদিতে যাইবেন, স্থির করেন; অথচ শেষোক্তগুলিও "শয়তানী" গবর্ণমেণ্টের সৃষ্ট, এবং তাহাদের ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ। এই জন্য কউন্সিলে না গিয়া মিউনিসিপ্যালিটিতে গেলে অসহযোগী থাকা যায়, এই মতের সম্পূর্ণ-অভ্রান্ততা আমরা কখনও বুঝিতে ও স্বীকার করিতে পারি নাই। এখন ত ঠিক্ হইয়া গিয়াছে, যে, কউন্সিলে গেলেও অসহযোগী থাকা যায়। গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠিত কোন আফিসে বা স্কুলে, এমন কি সরকারী-সাহায্য-প্রাপ্ত স্কুলেও, কেহ ১৫।২০ টাকার চাকরী করিলে, সে হইল অতি অধম ও হেয় "সহযোগিতা-কারী" এবং "গোলাম"; কিন্তু গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠিত মিউনিসিপ্যালিটিতে দু-শ পাঁচ-শ হাজার দেড় হাজার টাকার গবর্ণমেণ্ট্-অনুমোদন-সাপেক্ষ চাকরী করিলেও তিনি হইলেন অতি নমস্য "অসহযোগী"! ইহার রস উপভোগ্য বটে।

"ভদ্রলোক" ডাকাত

ফরিদপুরে সম্প্রতি পাঁচ জন ভদ্রসন্তানের বিচারান্তে ডাকাতির উদ্যোগ অপরাধে শাস্তি হইয়াছে। ইহারা কলিকাতায় প্রেসে কম্পোজিটারি প্রভৃতি কাজ করিত; ম্যাট্রিক্ পাস ফেল আছে। একদিন তাহাদের মনে হইল, ১০।২০, টাকায় দিন গুজরান হয় না। ছোরা, বন্দুক প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া গোয়ালন্দের অপর পারে কাঞ্চনপুর গ্রামে কোন ধনী সাহার গৃহে ডাকাতির জন্য রওনা হইল, এবং গোয়ালন্দে গোয়েন্দার সাহায্যে ধৃত হইয়া ফরিদপুরে আনীত হইল। ডাকাতিগুলি যে অর্থাভাবজনিত, ইহা তাহার অন্যতম প্রমাণ।

কাবুলীর প্রতিষ্ঠা

বাংলার কোন জেলার সদরে এক কাবুলী ফেরিওয়ালাকে হত্যা করা অপরাধে দুটি ভদ্র যুবকের বিচার হয়। জুরী তাহাদিগকে নিরপরাধ বলেন। জজ হাইকোর্টে রেফারেন্স্ করেন। তাহার প্রকৃত হেতু—আমীরের প্রতিনিধি বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টকে তাড়া দিয়াছিলেন। কাবুলীরও এখন জগতে প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, কিন্তু বিদেশে বিভূঁয়ে আমাদের কেহ নিহত হইলে দেখিবার লোক নাই। অথবা, বিদেশের কথাই বা বলি কেন? স্বদেশে, দেশী রাজ্যে, যেমন নাভায়, কেহ হত হইলেও কি তাড়া দিবার লোক আছে?

"ব্রিটিশ" শান্তি

ইংরেজ ঐতিহাসিক ও অন্যবিধ লেখকেরা বলেন,

যে, ইংরেজ রাজত্বের আগে এদেশে মানুষের ধন প্রাণ ইজ্জৎ নিরাপদ্ ছিল না; ইংরেজেরা উহা নিরাপদ্ করিয়াছেন। ইংরেজরা ক্রমে ক্রমে সমস্ত দেশটি হস্তগত করিয়া আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ বন্ধ করিয়াছেন (মোপ্‌লা বিদ্রোহের মত ব্যাপার ধর্ত্তব্য নহে বলিয়া মানিয়া লইলাম), ইহা সত্য কথা। ইহার উদ্দেশ্য ও ফলাফলের বিষয় আলোচনা করিব না।

কিন্তু যুদ্ধ বন্ধ হইয়াছে বলিয়া ভারতবর্ষে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে পারি না। সশস্ত্র ও নরহত্যা-সম্বলিত ডাকাতির সংখ্যাবাহুল্য এবং অত্যাচরিতা নারীর সংখ্যাবাহুল্য প্রমাণ করিতেছে, যে, ধন প্রাণ ইজ্জৎ নিরাপদ্ নহে, এবং দেশে শান্তি বিরাজ করিতেছে না।

ইহাও সত্য নহে, যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমবর্দ্ধে—ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের যুগে—এবং তাহার পূর্ব্বের কোন শতাব্দীতে ভারতে যত যুদ্ধ ও রক্তপাত হইয়াছিল, ইউরোপে তত্তৎকালে ভারতের সমানপরিমাণ কোন ভূখণ্ডে তাহা অপেক্ষা কম যুদ্ধ ও রক্তপাত হইয়াছিল। বরং বেশীই হইয়াছিল। ইংরেজ-রাজত্ব স্থাপনের প্রাক্‌কালে ও পূর্ব্বকালে ভারতের অবস্থা যাহা ছিল, তাৎকালিক ইউরোপের সহিতই তাহার তুলনা করা উচিত। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থার সহিত ব্রিটিশ শাসনের আগেকার কালের অবস্থার তুলনা করা উচিত নহে। অর্থাৎ আমরা ইহাই বলিতে চাই, যে, ইংরেজরা ভারতবর্ষকে কোন একটা অসাধারণ রকম অশান্তির অবস্থা হইতে উদ্ধার করেন নাই; সেকালে ঐরকম অশান্তি অন্যদেশেও ছিল।

ভারতবর্ষে ইংরেজরা কিরূপ শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাও জানা কর্ত্তব্য। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশির যুদ্ধের পরই ইংরেজরা, নামে না হইলেও, কার্য্যতঃ বাংলা দেশের প্রভু হন। তাহার পঞ্চাশ বৎসর পর প্রথম লর্ড মিণ্টো গবর্ণর জেনেরাল্ হইয়া আসেন। পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া ইংরেজদের অধীনে থাকিয়াও বাংলার অবস্থা কিরূপ ছিল, দেখা যাক্। যে-সব প্রমাণ এখানে উদ্ধৃত হইবে, তাহা মেজর বামনদাস বসু মহাশয়ের লিখিত "ভারতে খৃষ্টিয়ান্ শক্তির অভ্যুদয়" ("Rise of the Christian Power in India") নামক মূল্যবান্ ইতিহাসের চতুর্থ ভল্যুম্ হইতে গৃহীত। উহা এখন যন্ত্রস্থ। এই প্রমাণগুলির জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

বসু মহাশয় লিখিয়াছেন:—

Lord Dufferin, in his famous speech at St. Andrew's Dinner, Calcutta, on the 30th of November, 1888, said:—

"Indeed, it was only the other day that I was reading a life of Lord Minto, who mentions incidentally that in his time whole districts within twenty miles of Calcutta were at the mercy of dacoits, and this after the English had been more than fifty years in the occupation of Bengal."

তাৎপর্য্য। লর্ড ডফারিন্ ১৮৮৮ সালের এক বক্তৃতায় বলেন, যে, তিনি লর্ড মিণ্টোর জীবনচরিতে পড়িয়াছেন, যে, তাঁহার আমলে কলিকাতার বিশ মাইলের মধ্যে সমগ্র কয়েকটা জেলার ধন-প্রাণ ডাকাতদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিত, এবং বাংলাদেশ ৫০ বৎসর ইংরেজের দখলে থাকার পরও তাহার অবস্থা এইরূপ ছিল।

বসু-মহাশয় দেখাইয়াছেন, যে, সেকালের ইংরেজ গবর্ণ্মেণ্ট এই ডাকাতদের উচ্ছেদসাধনের জন্য কোন উপায় অবলম্বন করেন নাই। তাহার কারণের আলোচনাও তিনি করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের একখানি ইতিহাসের লেখক জেম্‌স্ মিল্ তাঁহার বহিতে লিখিয়াছেন:—

"This class of offences did not diminish under the English Government and its legislative provisions. It increased, to a degree highly disgraceful to the legislation of a civilized people. It increased under the English Government, not only to a degree of which there seems to have been no example under the native Governments of India, but to a degree surpassing what was ever witnessed in any country in which law and government could with any degree of propriety be said to exist." (V. 387).

তাৎপর্য্য। ইংরেজ-গবর্ণ্মেণ্ট ও তৎপ্রণীত আইনাদির অধীনে ডাকাতি প্রভৃতি এই শ্রেণীর অপরাধ কমে নাই। তাহা বাড়িয়াছিল,—এরূপ অধিক মাত্রায় বাড়িয়াছিল, যে, তাহা কোনও সভ্য জাতির ব্যবস্থাদির পক্ষে সাতিশয় অপযশকর। ইংরেজ শাসনে ইহা এতদূর বাড়িয়াছিল, যে, তাহার দৃষ্টান্ত কেবল যে ভারতবর্ষের দেশী কোন রাজত্বকালে পাওয়া যায় না তাহা নহে; কিন্তু যে-কোন দেশে আইন ও গবর্ণ্মেণ্ট আছে বলিয়া কোনপ্রকারে বলা যায়, এরূপ কোন দেশেই ডাকাতি আদির মাত্রা কোন কালে যাহা দেখা গিয়াছিল, ইংরেজ রাজত্বে ঐরূপ অপরাধের মাত্রা তাহাকে অতিক্রম করিয়াছিল।"

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অংশে স্যার্ হেনরী ষ্ট্রেচী নামক ভারতের একজন ইংরেজ জজ লিখিয়াছেন :—

"The crime of dacoity has, I believe, increased greatly, since the British administration of justice."

"আমি বিশ্বাস করি, ব্রিটিশ বিচারপ্রণালীর প্রবর্ত্তন কাল হইতে ডাকাতী অপরাধ অতিশয় বাড়িয়াছে।"

১৮০৮ খৃষ্টাব্দে রাজশাহী বিভাগের সার্কিট্ জজ লিখিয়াছেন :—

"That dacoity is very prevalent in Rajeshahye has been often stated. But if its vast extent were known; if the scenes of horror, the murders, the burnings, the excessive cruelties, which are continually perpetrated here, were properly represented to Government, I am confident that some measures would be adopted to remedy the evil. Yet the situation of the people is not sufficiently attended to. It cannot be denied, that, in point of fact, there is no protection for persons or property."

তাৎপর্য্য "রাজশাহীতে যেডাকাতির প্রাদুর্ভাব বেশী, তাহাঅনেকবার বলা হইয়াছে। কিন্তু যদি ইহার বিশাল পরিমাণ লোকের জানা থাকিত; যদি ইহার আনুষঙ্গিক ভয়াবহ দৃশ্য, খুন, গৃহদাহ ও মনুষ্যদাহ এবং নানা আত্যন্তিক নিষ্ঠুরতার বিষয় গবর্ণমেণ্টকে বিহিতভাবে জানান হইত; তাহা হইলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ইহার প্রতিকারকল্পে কোনও উপায় অবলম্বিত হইত। তথাপি, লোকদের অবস্থার প্রতি যথেষ্ট মন দেওয়া হয় না। ইহা অস্বীকার করা যায় না, যে, বাস্তবিক মানুষের প্রাণ বা সম্পত্তি রক্ষার কোন বন্দোবস্ত নাই।"

ডাকাতদের কার্য্যকলাপ ও প্রতাপ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক জেম্‌স্ মিল্ লিখিয়াছেন :—

"Such is the military strength of the British Government in Bengal, that it could exterminate all the inhabitants with the utmost ease; such at the same time is its *civil* weakness, that it is unable to save the community from running into that extreme disorder where the villain is more powerful to intimidate than the Government to protect."

(V. p: 410).

তাৎপর্য্য "বঙ্গে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সামরিক শক্তি তখন এরূপ ছিল, যে, উহা দেশের সমুদয় অধিবাসীকে অবলীলাক্রমে হত্যা করিতে পারিত; কিন্তু সেই সময়েই উহার সিবিল বা অসামরিক দুর্ব্বলতা এত ছিল, যে, উহা জনসমাজকে সেইরূপ আত্যন্তিক বিশৃঙ্খল অবস্থা হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই, যে-অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের রক্ষা করিবার শক্তি অপেক্ষা দুর্বৃত্তের ভীতি উৎপাদনের ক্ষমতা অধিক হইয়াছিল।"

বর্ত্তমান বৎসরে ও গত কয়েক বৎসরে আমরা দেখিয়াছি, যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট্ রাজনৈতিক অশান্তি ও আন্দোলন দমন করিবার নিমিত্ত সৈন্যদলের সাহায্য লইয়াছেন, এবং সামরিক আইন জারি করিয়াছেন শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে কোম্পানীর গবর্ণমেণ্টের সামরিক শক্তি এত বেশী থাকা সত্ত্বেও তাহা কেন ডাকাতি দমনে প্রযুক্ত হয় নাই, তাহা আমরা বলিতে অসমর্থ। সমুদয় বঙ্গবাসীকে অনায়াসে মারিয়া ফেলিবার ক্ষমতা যাঁহাদের ছিল তাঁহারা তদপেক্ষা ন্যূনসংখ্যক ডাকাতদিগকে কেন জব্দ করেন নাই বা মারিয়া ফেলেন নাই?

১৮০৯ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী মিঃ ডাউড্‌স্‌ওয়েল্ রিপোর্ট করিয়াছিলেন :—

"To the people of India there is no protection, either of persons or of property."

"ভারতবর্ষের লোকদের দেহ কিম্বা সম্পত্তি কিছুই রক্ষিত হয় না।"

লর্ড্ মিণ্টো নিজে তাঁহার একটি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন :—

"They (the dacoits) have of late come within thirty miles of Barrackpore. The crime of gang robbery has at all times, though in different degrees, obtained a footing in Bengal. The prevalence of the offence, occasioned by its success and impunity, has been much greater in this civilised and flourishing part of India, than in the wilder territories adjoining, which have not enjoyed so long the advantages of a regular and legal government; and it appears at first sight mortifying to the English administration of these provinces that our oldest possessions should be the worst protected against the evils of lawless violence."

তাৎপর্য্য। ডাকাতরা বারাকপুরের ৩০ মাইলের মধ্যে আজকাল আসিয়া পৌঁছিয়াছে। দলবাঁধিয়া ডাকাতি করার প্রথা সব সময়ে বাংলায় অত্যধিক-পরিমাণে বদ্ধমূল হয়। ভারতের সভ্য (অর্থাৎ ইংরেজ শাসিত) অংশ সকলে নিকটবর্ত্তী অসভ্য (অর্থাৎ দেশী রাজাদের অধীন) অঞ্চলসকল অপেক্ষা ডাকাতির প্রাদুর্ভাব বেশী। যে সব অঞ্চল অধিকতম কাল আমাদের শাসনাধীনে আছে, সেইগুলাই ডাকাতি প্রভৃতি হইতে সর্ব্বাপেক্ষা কম রক্ষিত, ইহা আপাতদৃষ্টিতে আমাদের পক্ষে বড়ই লজ্জাকর ও বেদনাদায়ক।

তখন বারাকপুরের ত্রিশ মাইল দূরে ডাকাতি হইত; আজকাল কলিকাতা শহরে দিনে-দুপুরে ডাকাতি হয়। সুতরাং উন্নতি হইয়াছে বলিতে হইবে।

তাৎকালিক ব্রিটিশ ভারতে ডাকাতি প্রভৃতির আধিক্যের যে-সব কারণ লর্ড মিণ্টো দেখাইয়াছেন, তাহার একটি এই, যে, ব্রিটিশ শাসিত ভূখণ্ডের লোকেরা সুশাসনের গুণে দেশী রাজ্যের লোকদের চেয়ে বেশী ধনী

হইয়া উঠিয়াছিল, সুতরাং ডাকাতদের লুব্ধ দৃষ্টি ব্রিটিশ প্রজাদের উপর বেশী পড়িয়াছিল। ব্রিটিশ প্রজাদের বেশী ধনী হইয়া উঠার কোন প্রমাণ কিন্তু তিনি দেন নাই। দ্বিতীয় কারণ তিনি নিম্নলিখিতরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

"Second, the long security which the country has enjoyed from foreign enemies, and the consequent loss of martial habits and character, have made the people of Bengal so timid and enervated that no resistance is to be apprehended in the act, nor punishments afterwards.

তাৎপর্য্য "বাংলা দেশ দীর্ঘকাল বিদেশীয় শত্রুর আক্রমণ হইতে অব্যাহতি ভোগ করায় এবং তজ্জন্য তাহাদের যুদ্ধ করিবার অভ্যাস ও যোদ্ধৃসুলভ চরিত্র লুপ্ত হওয়ায়, তাহারা এরূপ ভীরু ও বলবীর্য্যপৌরুষহীন হইয়া পড়িয়াছে, যে, ডাকাতদের ডাকাতিতে বাধা পাইবার এবং ধৃত হইয়া দণ্ডিত হইবার কোন আশঙ্কা নাই।"

ইহা হইতে প্রমাণ হয়, যে, ইংরেজ-রাজত্বের পূর্ব্বে বাংলার অধিবাসীদের যুদ্ধ করিবার অভ্যাস ছিল এবং যোদ্ধৃসুলভ গুণও ছিল; কেন না, যাহা কোন কালে ছিল না, তাহার "লস্" অর্থাৎ ক্ষয় বা লোপ হইতে পারে না। ইহা হইতে ইহাও প্রমাণ হয়, যে, ইংরেজের শাসন-নীতি ও "ব্রিটিশ" শান্তির প্রভাবে বাঙ্গালীরা ভীরু ও বলবীর্য্যপৌরুষহীন হইয়া পড়িয়াছিল। অতএব "ব্রিটিশ" শান্তির পূর্ণ-অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইলেও, বলিতে হইবে, যে, উহা অবিমিশ্র কল্যাণের কারণ হয় নাই।

বর্ত্তমান সময়ে যে ডাকাতির আধিক্য দেখা যায়, তাহার একটি কারণ যে (লর্ড মিণ্টো-বর্ণিত) ব্রিটিশ-শান্তি-জাত ভীরুতা ও যুদ্ধে অনভ্যস্ততা, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। কোন দেশের মানুষ সাহস-হীন, বলবীর্য্যহীন যাহাতে না হয়, সেই দেশের গবর্ণ-মেণ্টের তাহার ব্যবস্থা করা একান্ত কর্ত্তব্য। যদি ইহা স্বীকার করাও যায়, যে, গবর্ণমেণ্টের ওরূপ কোন কর্ত্তব্য নাই, তাহা হইলে অন্ততঃ ইহা ত মানিতেই হইবে, যে, দেশের লোকদের ধনপ্রাণ ইজ্জৎ রক্ষা করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। কিন্তু দেখা যাইতেছে, বর্ত্তমান সময়ে দুষ্ট দমনের এবং শিষ্টের রক্ষা ও পালনের যথেষ্ট সরকারী বন্দোবস্ত নাই, অথচ অন্য দিকে প্রজাদের সাহসিকতা ও শক্তি সংরক্ষণ ও বর্দ্ধনের ব্যবস্থাও নাই; বরং সেই উদ্দেশ্যে কোন বেসরকারী চেষ্টা হইলে তাহার উপর কর্ত্তৃপক্ষের সন্দিগ্ধ বিষদৃষ্টি পড়ে। অথচ কর্ত্তারা নিজেদের শাসনের সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ, এবং কিছুকাল হইতে ভাড়াটিয়া আমেরিকান্ লেখকদের দ্বারাও এই সুখ্যাতি রটাইতেছেন।

কলিকাতায় বিধবা-বিবাহ

বঙ্গীয় সমাজ সংস্কার সমিতির উদ্যোগে সম্প্রতি কলিকাতায় একটি নমঃশূদ্রজাতীয়া বিধবার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার নাম শ্রীমতী দেবযানী। তিনি ফরিদপুর জেলার সাতপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত গয়ালীচরণ বিশ্বাসের কন্যা। তিনি বেশ ভাল বাংলা লেখাপড়া জানেন। বর শ্রীযুক্ত রসিকলাল বিশ্বাস মহাশয়ের বাড়ী যশোর জেলার নারায়ণপুর গ্রামে। তিনি এবার বি-এ পরীক্ষা দিয়াছেন। তিনিও নমঃশূদ্র। বিবাহ হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে হইয়াছিল। সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ সুব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পৌরো-হিত্য করিয়াছিলেন। পণ্ডিত মহোদয়ের সহৃদয়তা, সত্যনিষ্ঠা ও সৎসাহস অতীব প্রশংসনীয়। শুনিতে পাই, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যখন সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যালের কাজ করিতেন, তৎকালে মেদিনীপুরে সমাজসংস্কার-বিষয়ক একটি বক্তৃতায় সুস্পষ্টভাষায় সত্য কথা বলিয়া সংস্কারের আবশ্যকতা প্রদর্শন করেন। এই অপরাধে, সরকারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত, গোব্রাহ্মণপালক, সর্ব্ববিধ শাস্ত্রীয় আচার দেশাচার ও লোকাচারে পরম নিষ্ঠাবান্, পরম হিন্দু বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ তাঁহাকে সংস্কৃত কলেজের কাজ ছাড়িয়া অবসর লইতে বাধ্য করেন। ইহা কি সত্য?

এই বিবাহে বর ও কন্যা উভয়েই প্রভূত সৎসাহস প্রদর্শনপূর্ব্বক সমাজের কল্যাণ করিয়াছেন। বিবাহসভায় হিন্দুসমাজের অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন এবং জলযোগ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের যে দুই চারিজন মহিলা ও ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন, তাহা বিশেষ

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অংশে স্যার্ হেন্‌রী ষ্ট্রেচী নামক ভারতের একজন ইংরেজ জজ লিখিয়াছেন :—

"The crime of dacoity has, I believe, increased greatly, since the British administration of justice."

"আমি বিশ্বাস করি, ব্রিটিশ বিচারপ্রণালীর প্রবর্ত্তন কাল হইতে ডাকাতী অপরাধ অতিশয় বাড়িয়াছে।"

১৮০৮ খৃষ্টাব্দে রাজশাহী বিভাগের সার্কিট্ জজ লিখিয়াছেন :—

"That dacoity is very prevalent in Rajeshahye has been often stated. But if its vast extent were known: if the scenes of horror, the murders, the burnings, the excessive cruelties, which are continually perpetrated here, were properly represented to Government, I am confident that some measures would be adopted to remedy the evil. Yet the situation of the people is not sufficiently attended to. It cannot be denied, that, in point of fact, there is no protection for persons or property."

তাৎপর্য্য "রাজশাহীতে যেডাকাতির প্রাদুর্ভাব বেশী, তাহাঅনেকবার বলা হইয়াছে। কিন্তু যদি ইহার বিশাল পরিমাণ লোকের জানা থাকিত; যদি ইহার আনুষঙ্গিক ভয়াবহ দৃশ্য, খুন, গৃহদাহ ও মনুষ্যদাহ এবং নানা আত্যন্তিক নিষ্ঠুরতার বিবরণ গবর্ণমেণ্টকে বিহিতভাবে জানান হইত; তাহা হইলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ইহার প্রতিকারকল্পে কোনও উপায় অবলম্বিত হইত। তথাপি, লোকদের অবস্থার প্রতি যথেষ্ট মন দেওয়া হয় না। ইহা অস্বীকার করা যায় না, যে, বাস্তবিক মানুষের প্রাণ বা সম্পত্তি রক্ষার কোন বন্দোবস্ত নাই।"

ডাকাতদের কার্য্যকলাপ ও প্রতাপ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক জেম্‌স্ মিল্ লিখিয়াছেন :—

"Such is the military strength of the British Government in Bengal, that it could exterminate all the inhabitants with the utmost ease; such at the same time is its *civil* weakness, that it is unable to save the community from running into that extreme disorder where the villain is more powerful to intimidate than the Government to protect."

(V. p: 410).

তাৎপর্য্য "বঙ্গে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সামরিক শক্তি তখন এরূপ ছিল, যে, উহা দেশের সমুদয় অধিবাসীকে অবলীলাক্রমে হত্যা করিতে পারিত; কিন্তু সেই সময়েই উহার সিবিল বা অসামরিক দুর্ব্বলতা এত ছিল, যে, উহা জনসমাজকে সেইরূপ আত্যন্তিক বিশৃঙ্খল অবস্থা হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই, যে-অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের রক্ষা করিবার শক্তি অপেক্ষা দুর্বৃত্তদের ভীতি উৎপাদনের ক্ষমতা অধিক হইয়াছিল।"

বর্ত্তমান বৎসরে ও গত কয়েক বৎসরে আমরা দেখিয়াছি, যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট্ রাজনৈতিক অশান্তি ও আন্দোলন দমন করিবার নিমিত্ত সৈন্যদলের সাহায্য লইয়াছেন, এবং সামরিক আইন জারি করিয়াছেন শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে কোম্পানীর গবর্ণমেণ্টের সামরিক শক্তি এত বেশী থাকা সত্ত্বেও তাহা কেন ডাকাতি দমনে প্রযুক্ত হয় নাই, তাহা আমরা বলিতে অসমর্থ। সমুদয় বঙ্গবাসীকে অনায়াসে মারিয়া ফেলিবার ক্ষমতা যাঁহাদের ছিল তাঁহারা তদপেক্ষা ন্যূনসংখ্যক ডাকাতদিগকে কেন জব্দ করেন নাই বা মারিয়া ফেলেন নাই?

১৮০৯ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী মিঃ ডাউড্‌স্‌ওয়েল্ রিপোর্ট করিয়াছিলেন :—

"To the people of India there is no protection, either of persons or of property."

"ভারতবর্ষের লোকদের দেহ কিম্বা সম্পত্তি কিছুই রক্ষিত হয় না।"

লর্ড মিণ্টো নিজে তাঁহার একটি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন :—

"They (the dacoits) have of late come within thirty miles of Barrackpore. The crime of gang robbery has at all times, though in different degrees, obtained a footing in Bengal. The prevalence of the offence, occasioned by its success and impunity, has been much greater in this civilised and flourishing part of India, than in the wilder territories adjoining, which have not enjoyed so long the advantages of a regular and legal government; and it appears at first sight mortifying to the English administration of these provinces that our oldest possessions should be the worst protected against the evils of lawless violence."

তাৎপর্য্য। ডাকাতরা বারাকপুরের ৩০ মাইলের মধ্যে আজকাল আসিয়া পৌঁছিয়াছে। দলবাঁধিয়া ডাকাতি করার প্রথা সব সময়ে বাংলায় অত্যধিক-পরিমাণে বদ্ধমূল হয়। ভারতের সভ্য (অর্থাৎ ইংরেজ শাসিত) অংশ সকলে নিকটবর্ত্তী অসভ্য (অর্থাৎ দেশী রাজাদের অধীন) অঞ্চলসকল অপেক্ষা ডাকাতির প্রাদুর্ভাব বেশী। যে সব অঞ্চল অধিকতম কাল আমাদের শাসনাধীনে আছে, সেইগুলাই ডাকাতি প্রভৃতি হইতে সর্ব্বাপেক্ষা কম রক্ষিত, ইহা আপাতদৃষ্টিতে আমাদের পক্ষে বড়ই লজ্জাকর ও বেদনাদায়ক।

তখন বারাকপুরের ত্রিশ মাইল দূরে ডাকাতি হইত; আজকাল কলিকাতা শহরে দিনে-দুপুরে ডাকাতি হয়। সুতরাং উন্নতি হইয়াছে বলিতে হইবে।

তাৎকালিক ব্রিটিশ ভারতে ডাকাতি প্রভৃতির আধিক্যের যে-সব কারণ লর্ড মিণ্টো দেখাইয়াছেন, তাহার একটি এই, যে, ব্রিটিশ শাসিত ভূখণ্ডের লোকেরা সুশাসনের গুণে দেশী রাজ্যের লোকদের চেয়ে বেশী ধনী

হইয়া উঠিয়াছিল, সুতরাং ডাকাতদের লুব্ধ দৃষ্টি ব্রিটিশ প্রজাদের উপর বেশী পড়িয়াছিল। ব্রিটিশ প্রজাদের বেশী ধনী হইয়া উঠার কোন প্রমাণ কিন্তু তিনি দেন নাই। দ্বিতীয় কারণ তিনি নিম্নলিখিতরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

"Second, the long security which the country has enjoyed from foreign enemies, and the consequent loss of martial habits and character, have made the people of Bengal so timid and enervated that no resistance is to be apprehended in the act, nor punishments afterwards.

তাৎপর্য্য "বাংলা দেশ দীর্ঘকাল বিদেশীয় শত্রুর আক্রমণ হইতে অব্যাহতি ভোগ করায় এবং তজ্জন্য তাহাদের যুদ্ধ করিবার অভ্যাস ও যোদ্ধৃসুলভ চরিত্র লুপ্ত হওয়ায়, তাহারা এরূপ ভীরু ও বলবীর্য্যপৌরুষহীন হইয়া পড়িয়াছে, যে, ডাকাতদের ডাকাতিতে বাধা পাইবার এবং ধৃত হইয়া দণ্ডিত হইবার কোন আশঙ্কা নাই।"

ইহা হইতে প্রমাণ হয়, যে, ইংরেজ-রাজত্বের পূর্ব্বে বাংলার অধিবাসীদের যুদ্ধ করিবার অভ্যাস ছিল এবং যোদ্ধৃসুলভ গুণও ছিল; কেন না, যাহা কোন কালে ছিল না, তাহার "লস্" অর্থাৎ ক্ষয় বা লোপ হইতে পারে না। ইহা হইতে ইহাও প্রমাণ হয়, যে, ইংরেজের শাসন-নীতি ও "ব্রিটিশ" শান্তির প্রভাবে বাঙ্গালীরা ভীরু ও বলবীর্য্যপৌরুষহীন হইয়া পড়িয়াছিল। অতএব "ব্রিটিশ" শান্তির পূর্ণ-অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইলেও, বলিতে হইবে, যে, উহা অবিমিশ্র কল্যাণের কারণ হয় নাই।

বর্ত্তমান সময়ে যে ডাকাতির আধিক্য দেখা যায়, তাহার একটি কারণ যে (লর্ড মিণ্টো-বর্ণিত) ব্রিটিশ-শান্তি-জাত ভীরুতা ও যুদ্ধে অনভ্যস্ততা, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। কোন দেশের মানুষ সাহস-হীন, বলবীর্য্যহীন যাহাতে না হয়, সেই দেশের গবর্ণ্‌মেণ্টের তাহার ব্যবস্থা করা একান্ত কর্ত্তব্য। যদি ইহা স্বীকার করাও যায়, যে, গবর্ণ্‌মেণ্টের ওরূপ কোন কর্ত্তব্য নাই, তাহা হইলে অন্ততঃ ইহা ত মানিতেই হইবে, যে, দেশের লোকদের ধনপ্রাণ ইজ্জৎ রক্ষা করা গবর্ণ্‌মেণ্টের কর্ত্তব্য। কিন্তু দেখা যাইতেছে, বর্ত্তমান সময়ে দুষ্ট দমনের এবং শিষ্টের রক্ষা ও পালনের যথেষ্ট সরকারী বন্দোবস্ত নাই, অথচ অন্য দিকে প্রজাদের সাহসিকতা ও শক্তি সংরক্ষণ ও বর্দ্ধনের ব্যবস্থাও নাই; বরং সেই উদ্দেশ্যে কোন বেসরকারী চেষ্টা হইলে তাহার উপর কর্ত্তৃপক্ষের সন্দিগ্ধ বিষদৃষ্টি পড়ে। অথচ কর্ত্তারা নিজেদের শাসনের সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ, এবং কিছুকাল হইতে ভাড়াটিয়া আমেরিকান্ লেখকদের দ্বারাও এই সুখ্যাতি রটাইতেছেন।

কলিকাতায় বিধবা-বিবাহ

বঙ্গীয় সমাজ সংস্কার সমিতির উদ্যোগে সম্প্রতি কলিকাতায় একটি নমঃশূদ্রজাতীয়া বিধবার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার নাম শ্রীমতী দেবযানী। তিনি ফরিদপুর জেলার সাতপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত গয়ালীচরণ বিশ্বাসের কন্যা। তিনি বেশ ভাল বাংলা লেখাপড়া জানেন। বর শ্রীযুক্ত রসিকলাল বিশ্বাস মহাশয়ের বাড়ী যশোর জেলার নারায়ণপুর গ্রামে। তিনি এবার বি-এ পরীক্ষা দিয়াছেন। তিনিও নমঃশূদ্র। বিবাহ হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে হইয়াছিল। সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ সুব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পৌরো-হিত্য করিয়াছিলেন। পণ্ডিত মহোদয়ের সহৃদয়তা, সত্যনিষ্ঠা ও সৎসাহস অতীব প্রশংসনীয়। শুনিতে পাই, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যখন সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যালের কাজ করিতেন, তৎকালে মেদিনীপুরে সমাজসংস্কার-বিষয়ক একটি বক্তৃতায় সুস্পষ্টভাষায় সত্য কথা বলিয়া সংস্কারের আবশ্যকতা প্রদর্শন করেন। এই অপরাধে, সরকারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত, গোব্রাহ্মণপালক, সর্ব্ববিধ শাস্ত্রীয় আচার দেশাচার ও লোকাচারে পরম নিষ্ঠাবান্, পরম হিন্দু বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ তাঁহাকে সংস্কৃত কলেজের কাজ ছাড়িয়া অবসর লইতে বাধ্য করেন। ইহা কি সত্য?

এই বিবাহে বর ও কন্যা উভয়েই প্রভূত সৎসাহস প্রদর্শনপূর্ব্বক সমাজের কল্যাণ করিয়াছেন। বিবাহসভায় হিন্দুসমাজের অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন এবং জলযোগ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের যে দুই চারিজন মহিলা ও ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন, তাহা বিশেষ

উল্লেখযোগ্য নহে; কারণ, তাঁহারা ত সমাজসংস্কারক বলিয়া পরিচিতই আছেন। নমঃশূদ্র সমাজের কতিপয় মহিলা এবং বিস্তর প্রতিষ্ঠাবান্ পুরুষ সভাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া কার্য্যতঃ বিধবাবিবাহে তাঁহাদের সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

—

বালবিধবার বিবাহ

শৈশবে ও বাল্যকালে যাঁহারা বিধবা হন, তাঁহাদের পুনর্ব্বার বিবাহ হওয়া একান্ত আবশ্যক। তাঁহাদের বিবাহের বিরোধীরা যতপ্রকার যুক্তিতর্ক উত্থাপন করিয়াছেন, সমস্তই বার বার খণ্ডিত হইয়াছে। বাল-বিধবাদের প্রতি ন্যায্য ও সহৃদয় ব্যবহার করিতে হইলে তাঁহাদের বিবাহ দেওয়া উচিত; হিন্দুসমাজকে ক্ষয় হইতে, সংখ্যার হ্রাস হইতে, রক্ষা করিবার জন্য বাল-বিধবাদের বিবাহ দেওয়া উচিত; বিধবাদের মানইজ্জত রক্ষা করিবারও প্রকৃষ্টতম উপায় তাহাদের বিবাহ দেওয়া। সামাজিক অপবিত্রতা দূরীকরণ এবং পবিত্রতা সংরক্ষণের জন্যও বালবিধবাদের বিবাহ দেওয়া একান্ত আবশ্যক। তাহার একটি প্রমাণ দিতেছি।

মানুষের জ্ঞান ও প্রয়োজন যত বাড়িতেছে, সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক দার্শনিক, প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লেখক ততই নূতন নূতন কথা ভাষায় যোগ করিতেছেন। ইহার মধ্যে কতকগুলি কথা চলিত হইয়া যায়, কতকগুলি বা লোপ পায়। এগুলি ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্ট বলিয়া সব সময় সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে কোন সাক্ষ্য দিতে পারে না। কিন্তু যেসকল শব্দ গ্রাম্য ও কথিত ভাষায় বহুশতাব্দী ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, তাহা ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্ট নহে, এবং তাহা হইতে স্থলবিশেষে সামাজিক তথ্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রাম্য ভাষায় বিধবার যাহা প্রতিশব্দ, ইতর ভাষায় পতিতা নারী বুঝাইতেও সেই শব্দ ব্যবহৃত হয়। ইহা দ্বারা সমাজ নিজের অজ্ঞাতসারে বহুশতাব্দী ধরিয়া এই সাক্ষ্যই দিয়া আসিতেছেন, যে, সামাজিক অপবিত্রতার অন্যতম কারণ বালিকাদের চিরবৈধব্য। অতি পবিত্র-স্বভাবা হিন্দু বিধবার অস্তিত্ব কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। কিন্তু গ্রাম্য ভাষা হইতে যে প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা সমাজসংস্কারকদিগের মনগড়া নয়; তাহা আমাদের সকলের লজ্জা ও কলঙ্কের বিষয় হইলেও তাহা উড়াইয়া দিবার কোন উপায় নাই। এই প্রমাণ কালক্রমে লুপ্ত করিবার একমাত্র উপায় বালবিধবাদের পুনর্ব্বার বিবাহ দেওয়া। তাঁহাদের বিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য যে মহাত্মা বাংলাদেশে প্রথম সফল চেষ্টার সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তাঁহাকে ভক্তিসহকারে স্মরণ করিয়া, যেসকল মহানুভব ব্যক্তি তাঁহার পদাঙ্কের অনুসরণ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। তাঁহারা প্রাণের সহিত যাহা করিবেন, ভগবান্ তাহার সহায় হইবেন।

—

নারীরক্ষা-সমিতি

বঙ্গের নানাস্থান হইতে, বিশেষতঃ উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গ হইতে, নারীর উপর অত্যাচারের মর্ম্মন্তুদ সংবাদ ক্রমাগত প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। এ অবস্থায় একটি নারীরক্ষা-সমিতির একান্ত আবশ্যক ছিল। সুখের বিষয়, পাঠকগণ অন্য পৃষ্ঠায় দেখিবেন, তাহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার কাজও আরম্ভ হইয়াছে। অবশ্য কেবল কলিকাতায় স্থাপিত একটি এরূপ সমিতি দ্বারা সমুদয় বাংলাদেশের নারীকুলের রক্ষা হইতে পারে না। সকল সহর ও গ্রামে এইরূপ সমিতি বা তাহার শাখা চাই।

নারীর ধর্ম্ম ও সম্মান সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিতে হইলে সমাজে অনেক গভীর ও ব্যাপক পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। নারী যে পুরুষের অন্যতম ভোগ্য বস্তু মাত্র, এই নীচ ধারণা লুপ্ত হওয়া আবশ্যক। তাহার জন্য পুরুষদের সুশিক্ষার আবশ্যক। নারীদেরও শিক্ষা এরূপ হওয়া চাই, যাহাতে তাঁহারা নিজেদের ও পুরুষদের শ্রদ্ধার ও সম্ভ্রমের পাত্রী হইতে পারেন।

সমাজের মধ্যে এই ভাবটি বদ্ধমূল হওয়া দরকার, যে, যে পুরুষ নারীর রক্ষার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত নহে, তাহার বিবাহ করিয়া পরিবারী হইবার কোন অধিকার নাই। নারীরক্ষারূপ পবিত্র ও একান্ত আবশ্যক কার্য্যের

জন্য দেহের বল ও মনের বল দুইই চাই—বিশেষ করিয়া মনের বল। সাহস না থাকিলে গায়ের জোর এবং অস্ত্র-শস্ত্র কিছুই কাজে লাগে না। আবার গায়ের জোর এবং অস্ত্রচালনার অভ্যাস ও দক্ষতা না থাকিলে, শেষ পর্য্যন্ত শুধু সাহসেই কার্য্য উদ্ধার হয় না। অন্য অস্ত্র প্রকাশ্যভাবে সংগ্রহ করিবার ও রাখিবার সুযোগ যাঁহাদের নাই, তাঁহারা লাঠি ব্যবহার করিতে শিখুন। এ-বিষয়ে সাহায্য করিবার নিমিত্ত আমরা অনেক মাস ধরিয়া লাঠি-খেলায় দক্ষ শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাস মহাশয়ের লেখা লাঠিখেলা-বিষয়ক সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া আসিতেছি।

শুধু পুরুষদের গায়ের জোর ও মনের জোরে কাজ হইবে না; মহিলাদেরও দৈহিক বল ও সাহসের বিশেষ প্রয়োজন আছে। তাঁহারা অস্ত্র-ব্যবহার দ্বারা কখন কখন দুরাত্মাদের দুরভিসন্ধি বিফল করিয়াছেন, এরূপ সংবাদ মধ্যে মধ্যে খবরের কাগজে বাহির হইয়া থাকে। এইরূপ সমুদয় সংবাদ কেহ সংগ্রহ করিয়া দিলে আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা প্রকাশ করিব। যখন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার আনন্দমঠে শান্তিকে ঘোড়ায় চড়াইয়াছিলেন, যখন তিনি তাঁহার দেবী চৌধুরানীকে পুরুষের মত ব্যায়াম ও অস্ত্রচালনা শিখাইয়াছিলেন, তখন বাঙ্গালীর তাহা নূতন লাগিয়াছিল। কিন্তু বাস্তবিক মহিলাদের অশ্বারোহণ বা অস্ত্রচালনা নূতন নহে এবং অস্বাভাবিকও নহে; প্রত্যুত ইহা একান্ত আবশ্যক। আমরা জানি, কোনও অতি সম্ভ্রান্ত পরিবারের দুটি বালিকা উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট লাঠিখেলা শিখিতেছেন, এবং তাঁহাদের "দম্" ও দক্ষতার প্রশংসাও শুনিয়াছি।

আমরা আগে বালবিধবার বিবাহ প্রসঙ্গে বলিয়াছি, যে, যে-কোন দিক্ দিয়াই বিচার করা যাক্, বালবিধবাদের বিবাহ দেওয়া উচিত। নারীনির্য্যাতন বন্ধ করিতে হইলেও, বিধবাবিবাহের প্রচলন একান্ত আবশ্যক। কেহ যদি নারীনির্য্যাতনের সমুদয় ঘটনার বিবরণ পড়িয়া অত্যাচরিতাদিগের মধ্যে বিধবা কয় জন, তাহা গণনা করেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ দেখা যাইবে, যে, বিধবার সংখ্যাই বেশী। অনেক স্থলে বালবিধবারা প্রাপ্তবয়স্ক হইবার পর, রক্ষক স্বামীর অভাবে, সুরক্ষিতা হন না, অথচ নানা প্রয়োজনে তাঁহাদিগকে বাড়ীর বাহিরেও আসিতে হয়। তখন তাঁহারা দুর্বৃত্ত লোকদের লোভের বস্তু হইয়া পড়েন। অনেক স্থলে অত্যাচারীরা মুসলমান বটে; কিন্তু হিন্দুসমাজেও দুর্বৃত্তের অভাব নাই। বস্তুতঃ দুর্বৃত্তেরা নামে হিন্দু বা নামে মুসলমান হইলেও, তাহারা কোন ধর্ম্মাবলম্বীই নহে, এবং তাহারা সুযোগ পাইলেই সম্প্রদায়ের বিচার না করিয়া নারীর সর্ব্বনাশ চেষ্টা করে। এই জন্য দেখা যায়, যে, মুসলমান বদ্‌মায়েস্ মুসলমান নারীরও, হিন্দু বদ্‌মায়েস্ হিন্দু নারীরও সর্ব্বনাশ করিতেছে। যেখানে যেখানে সম্ভব হইবে, স্থানীয় নারীরক্ষা-সমিতিতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই সভ্য থাকিলে ভাল হয়।

মুসলমান সমাজে বিধবার বিবাহ প্রচলিত আছে। তথায় ধর্ষিতা নারীরও বিবাহ হয় এবং সমাজে স্থান হয়। ইহা ন্যায্য ব্যবস্থা। হিন্দু সমাজেও ইহার প্রচলন সর্ব্বতোভাবে বৈধ এবং বাঞ্ছনীয়। ইহা সম্পূর্ণ শাস্ত্রসম্মতও বটে। ধর্ষিতা হিন্দু নারীর ভদ্র হিন্দু সমাজে স্থান না হইলে তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল দ্বিবিধ হয়। নিগৃহীতা নারী হয় অনিচ্ছাসত্বেও পতিতাদের শ্রেণীভুক্ত হন, কিম্বা কোন মুসলমানের পত্নী হন। অনেক সময়, যদি তিনি কোন মুসলমান কর্ত্তৃক অত্যাচরিতা হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাকেই বিবাহ করিতে বাধ্য হন। এই দ্বিবিধ ফলের মধ্যে যাহাই ঘটুক, তাহা দ্বারা সমাজের অকল্যাণ হয়। হিন্দু সমাজের অকল্যাণ ত হয়ই; মুসলমান সমাজেরও হয়। কারণ, এরূপ ঘটনায় কার্য্যতঃ অসভ্য দেশের ও অসভ্য যুগের বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়া বিবাহ করিবার প্রথা (marriage by capture) অনুসৃত হয়। যে-সমাজে ঐ প্রথা অনুসৃত হয়, তাহা সভ্যতার ও সুনীতির নিম্নস্তরেই আবদ্ধ থাকে। আপেক্ষিকভাবে ইহাতে হিন্দু সমাজের আর একপ্রকার ক্ষতি হয়। যেসকল হিন্দু বিধবা এইপ্রকারে মুসলমানের পত্নী হন, তাঁহারা দৈহিক পূর্ণতা প্রাপ্তির পরই বিবাহিতা হন ও সন্তানের জননী হন। সুশ্রুতের মতে ষোল বৎসরের কম বয়সের নারীর মাতা হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। তদূর্দ্ধ বয়সের মাতার সন্তান অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ ও আয়ুষ্মান্ হয়। ইহাই সাধারণ

নিয়ম ; ২।৪টা ব্যতিক্রমস্থল দেখাইয়া ইহা অপ্রমাণ করা যায় না। হিন্দু বিধবাদের বিবাহ হিন্দুসমাজে চলিত নাই। চলিত থাকিলে তাঁহারা অনেকেই বলিষ্ঠ সন্তানের মাতা হইতে পারিতেন। পূর্ববঙ্গে যেসব হিন্দুবিধবা কোন না-কোনপ্রকারে মুসলমান-সমাজভুক্ত হন, তাঁহাদের সন্তান অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ হয়। সামান্য বিবেচিত হইলেও হিন্দুসমাজের আপেক্ষিক দুর্ব্বলতার ইহা একটি কারণ।

—

তারকেশ্বরের ব্যাপার

তারকেশ্বরে অনাচার-অত্যাচার নূতন নহে। বহু-বৎসর পূর্ব্বে নবীন-এলোকেশী ঘটিত মোকদ্দমায় বাংলা দেশে খুব আন্দোলন হইয়াছিল।

বর্ত্তমান মোহান্তের নামে খবরের কাগজে তৎকর্ত্তৃক অত্যাচরিত ও হৃতসর্ব্বস্ব পুরুষ ও নারীর নামধাম দিয়া দীর্ঘ অভিযোগ বাহির হইতেছে। অথচ মোহান্তের নামে কেহ আদালতে নালিশ করিতেছে না, মোহান্তও কোন খবরের কাগজের সম্পাদকের নামে মানহানির নালিশ করিতেছে না! অনাচার-অত্যাচার অসহ্য ও নিন্দনীয়; তাহা ধর্ম্মের নামে হইলে আরও নিন্দনীয়। হিন্দুসমাজ সংঘবদ্ধ হইয়া তারকেশ্বরের মানবদেহধারী সব আবর্জ্জনা ও পাপবিষ দূর করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবেন কি না, বলিতে পারি না—হওয়াই ত উচিত। কিন্তু তাহা না হইলেও যে-সব খবরের কাগজ তথাকার অত্যাচার ও কলঙ্কের বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহারা ধন্যবাদার্হ; কালক্রমে তাহার সুফল ফলিবেই। কোন ধর্ম্মের শাস্ত্রে, হিন্দু-ধর্ম্মের শাস্ত্রে, ইহা বলে না, যে, ভগবান্ কোন একটি জায়গায় বা তীর্থে থাকেন; তিনি সর্ব্বত্র বিরাজমান। সুতরাং তারকেশ্বরের প্রকৃত সংবাদ যতই লোকসমাজে জ্ঞাত হইবে, ততই হিন্দুরা সেখানে না গিয়া অন্যত্র ভগবানের অর্চ্চনা করিবেন।

কোন দুর্গন্ধ অশুচি স্থানের উপর অবিরত রোদ পড়িবার ও বাতাস খেলিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলে যেমন কিছু দিন পরে তাহার অস্বাস্থ্যকরতা দূর হইতে পারে, তেম্‌নি যে-সব অত্যাচার-অনাচার গোপনে হইতে থাকে, তাহা প্রকাশ করিয়া দিয়া তাহার উপর লোকমতের ঝড় বহাইয়া দিলে কিছু সুফল নিশ্চয়ই ফলে।

ভিন্নধর্ম্মী লোকদের উপর ক্রোধ ও বিদ্বেষ সহজেই জন্মিতে পারে। সেইজন্য যখন মুসলমান-নামধারী দুর্ব্বৃত্তেরা নারীনিগ্রহ অপরাধে অপরাধী হয়, তখন তাহার বৃত্তান্ত অগত্যা বাহির করিতে হইলেও, তাহা এরূপভাবে করা আমাদের কর্ত্তব্য যাহাতে সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর ক্রোধ ও বিদ্বেষ উৎপন্ন না হয়। ইংরেজীতে একটা কথা আছে, যে কাচের ঘরে বাস করে তাহার অন্যের উপর ঢিল ছোঁড়া উচিত নয়। ধর্ম্মের নামে আমাদের মধ্যে যাহারা দুর্ব্বৃত্ততা করিবার সুযোগ ভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহাদের নিত্যনৈমিত্তিক পাপাচার স্মরণ করিলে আমাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ অন্যের প্রতি অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইবে না।

মুসলমান কথাটির ব্যুৎপত্তিলব্ধ আসল মানে, যিনি ঈশ্বরের আজ্ঞাধীন, যিনি ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। এই কারণে আমরা মুসলমান-নামধারী কোন লোকের দুর্বৃত্ততার উল্লেখ করিতে হইলে তাহাকে তথাকথিত-মুসলমান বলিয়া থাকি। নামে হিন্দু হইলেই যেমন প্রকৃত হিন্দু হওয়া যায় না, তেম্‌নি নামে মুসলমান হইলেই প্রকৃত মুসলমান হওয়া যায় না।

—

নারী-নির্য্যাতন-প্রতিকারের জন্য আবেদন

"নারী-নির্য্যাতনের প্রতিকারকল্পে আমাদের সাহায্যের জন্য খুব শীঘ্র ৪০ জন উৎসাহী কর্ম্মী-যুবকের প্রয়োজন। মায়ের সেবায় আমরা সাদরে প্রত্যেক যুবককে ডাকিতেছি। নারী-নির্য্যাতন-প্রতিকারকল্পে সাধারণের নিকট সাহায্যের জন্য শিশুসহায় ও মাতৃমঙ্গল সমিতির সভ্যগণ ভিক্ষায় বাহির হইবেন। সাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়। শ্রী বিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক, শিশুসহায় ও মাতৃ-মঙ্গল-সমিতি, ১২নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।"

—

চীনে রবীন্দ্রনাথ

সংবাদপত্রপাঠকেরা চীনে রবীন্দ্রনাথের বিপুল অভ্যর্থনা ও সম্বর্দ্ধনার কথা অবগত আছেন। তাঁহার ও তাঁহার সঙ্গীদের আদরযত্ন খুব হইতেছে।

রবীন্দ্রনাথ নিজে ১লা বৈশাখ তারিখের একখানি চিঠিতে লিখিয়াছেন—

"বেশ মনে হচ্ছে, এদের সঙ্গে আমাদের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হবে। [বিধুশেখর] শাস্ত্রী মহাশয়কে এখানে পাঠান দর্কার আছে। আমাদের প্রস্তাব শুনে এরা ভারি খুসি হয়েছে। এরাও এখান থেকে অধ্যাপক পাঠাতে সম্মত আছে। তা হ'লে বিশ্বভারতীতে চীনীয় ভাষা শেখ্‌বার সুব্যবস্থা হবে। চীনীয় থেকে হারান সংস্কৃত বইয়ের তর্জ্জমারও সুবিধা হ'তে পার্‌বে।

"বোধ হয় মে মাসের শেষ পর্য্যন্ত আমাদের এখানকার পালা। তার পরে জাপানে জুনের মাঝামাঝি। তার পর জাভা, শ্যাম, ক্যাম্বোডিয়া প্রভৃতি শেষ কর্‌তে জুলাই আগষ্ট এবং সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি লাগ্‌তেও পারে। তার পরে দেশে ফির্‌ব, এই রকম আন্দাজ কর্‌ছি।"

বিশ্বভারতীর কৃষি ও গ্রামসংগঠন বিভাগের অধ্যক্ষ এল্‌ম্‌হার্ষ্ট্‌ সাহেবের একখানি চিঠিতে দেখিলাম, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে প্রত্যুদ্গমন করিবার নিমিত্ত পেকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের হ্‌সু, চু, এবং চাঙ্‌ নামক তিন জন সুপণ্ডিত ব্যক্তি শাংঘাই আসিয়াছিলেন। এল্‌ম্‌হার্ষ্ট্‌ মহোদয় লিখিয়াছেন—"গুরুদেব হ্‌সুকে পাইয়া ভারি খুসী। হ্‌সু বরাবর আমাদের সঙ্গে থাকিবেন এবং আশা করি ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত যাইবেন; যদি আমরা বন্দোবস্ত করিয়া উঠিতে পারি, তাহা হইলে চু মহাশয়ও আমাদের সঙ্গে ভারতবর্ষ যাইবেন।

—

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়ের পুরস্কার

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-গ্রন্থাবলী হইতে দুই শত শ্রেষ্ঠ কবিতা নির্ব্বাচন করিয়া দিবার জন্য বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয় পাঁচটি পুরস্কার দিবেন। তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপনের পাতায় ছাপা হইয়াছে। যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের সমুদয় কবিতা পড়িয়াছেন, এবং কবিতার উৎকর্ষ নির্ণয় করিবার ক্ষমতা যাঁহাদের আছে, তাঁহাদের নির্ব্বাচনই উৎকৃষ্ট হইবে। যাঁহারা সমস্ত কবিতা পড়েন নাই, তাঁহাদের পক্ষেও পড়িয়া নির্ব্বাচন করিবার যথেষ্ট সময় আছে। যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারাও আর একবার পড়িলে ঠিক্ নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন। নির্ব্বাচনের কাজ কঠিন বটে; কিন্তু আপাত-দৃষ্টিতে যত কঠিন মনে হইতে পারে, তত কঠিন নহে। কোনও পুস্তক বা কবিতাকে কেন ভাল মনে করি, তাহার ঠিক্ সমুদয় কারণ নির্দ্দেশ করা খুব কঠিন, কিন্তু কোন্ কোন্ পুস্তক বা কবিতা আমাদের ভাল লাগে, তাহা বলা কঠিন নয়। বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়ও রবীন্দ্রনাথের কবিতার রসগ্রাহীদিগকে বস্তুতঃ ইহাই বলিতে আহ্বান করিতেছেন, যে, কোন্ দুই শত কবিতা তাঁহাদের ভাল লাগে।

পুরস্কার-পাওয়া অপেক্ষা বেশী লাভ কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গ-লাভ। অধ্যয়ন-অভ্যাসের গুণই এই, যে, আমাদের সুবিধা মত অল্প বা অধিক সময়ের জন্য আমরা ঘরে বসিয়া যে-কোন মহৎ লোকের সঙ্গলাভ করিতে পারি। মহৎ লোকদিগকে চাক্ষুষ দেখা ও তাঁহাদের সঙ্গে কথা কহার আনন্দ লোভের জিনিষ সন্দেহ নাই। কিন্তু এক হিসাবে তাঁহাদের গ্রন্থপাঠ আরও আনন্দের ও লাভের বিষয়। কারণ, তাঁহাদের গ্রন্থে তাঁহাদের ব্যক্তিত্বের—ভাবচিন্তা আদর্শ রসিকতা আদির—শ্রেষ্ঠ অংশ আমরা নিবদ্ধ দেখিতে পাই, যাহার পরিচয় কোন-এক সময়ে তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া আমরা না পাইতেও পারি। এই জন্য মনে হইতেছিল, যে, রবীন্দ্রনাথের সহিত পরিচয়ের সৌভাগ্য থাকিলেও, যদি অবসর পাইতাম তাহা হইলে পুরস্কার-লিপ্সা-ব্যপদেশে তাঁহার সমুদয় কাব্য পড়িয়া ফেলিতাম; রবীন্দ্রনাথ এক নহেন, অনেক; তন্মধ্যে বরেণ্যতম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গ-লাভে আনন্দিত হইতাম, উন্নত হইতাম, অনুপ্রাণিত হইতাম, মনের মলা কাটিত, প্রাণে নূতন প্রেরণা নূতন শক্তি আসিত। কিন্তু কর্ম্মফল ও কর্ম্মবন্ধনবশতঃ কোনও মহদ্ব্যক্তির এইরূপ নিভৃত সঙ্গ-লাভ ইহজীবনে আর ঘটিবে কি না, সন্দেহের

বিষয় হইয়াছে। যাঁহারা অধিকতর সৌভাগ্যবান্, তাঁহারা হৃদয়মনের এই ভোজের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিবেন না।

—

লর্ড্ লিটন ও মন্ত্রীদ্বয়

লর্ড্ লিটন বহুকষ্টে মন্ত্রী-গিরি করিতে রাজী দুজন লোক পাইয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে তিনি স্বভাবতই নারাজ। কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে রাখিতে ব্যগ্র হইলে কি হয়, তাঁহারই দেশের লোকের তৈরী আইনে বলিতেছে, যে, দেশের প্রতিনিধিদের অধিকাংশ যদি কোন মন্ত্রীকে না চায়, তাহা হইলে তাঁহাকে মন্ত্রীত্ব ছাড়িতে হইবে। মন্ত্রীদের বেতন মঞ্জুর হয় নাই, তথাপি লর্ড্ লিটন নিজের ও অন্য-সব লোকের মনকে বুঝাইতে চান, যে, তাহা দ্বারা ইহা প্রমাণ হয় নাই, যে, মন্ত্রীদিগের উপর অধিকাংশ ব্যবস্থাপকের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস নাই। একটি বেশী ভোটে যাহা গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য হয় তাহাকে গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য মনে করাই সর্ব্বত্র সব ব্যবস্থাপক সভার নিয়ম। এই নিয়ম না মানিলেই বা বা চলিবে কেমন করিয়া?

আমাদের মনে হয়, ভয়-প্রদর্শন ও প্রলোভনাদি কৌশলে যদিই বা লর্ড্ লিটন মন্ত্রীদের বেতন আবার মঞ্জুর করাইয়া লইতে সমর্থ হন, তাহা হইলেও মন্ত্রীদের পক্ষে কাজ করা সহজ হইবে না; গবর্ণমেণ্টের বিরোধী দল পুনঃ পুনঃ তাঁহাদের কাজে বাধা দিতে চেষ্টা করিবে এবং তাঁহাদের চেষ্টা মধ্যে মধ্যে সফলও হইবে।

মন্ত্রীদেরও এমনি করিয়া জোঁকের মত পদটি আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকা অশোভন হইতেছে। তাঁরা ভাল লোক কি মন্দ লোক, যোগ্য লোক কি অযোগ্য লোক, কথাটা তা নয়। দেশের লোক তাঁহাদিগকে চায় কি না, কথাটা তাও নয়। দেশের অল্প-সংখ্যক লোককে গবর্ণমেণ্ট্ ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের ক্ষমতা দিয়াছেন এবং কিছু ব্যবস্থাপক সরকারের মনোনীত ও নিজের লোক আছেন। এইসমুদয়ের মধ্যে অধিকাংশ লোক মন্ত্রীদিগকে চান কিম্বা না চান, তাহাই আইন-অনুসারে বিবেচ্য।

—

নামঞ্জুরকে মঞ্জুর করা

যে আইন-অনুসারে বর্ত্তমান দেশের কাজ চলিতেছে, তাহাতে বলে, যে, প্রাদেশিক কতকগুলি বিভাগ গবর্ণমেণ্ট নিজের হাতে রাখিবেন; তাহাদের নাম রিজার্ভ্ড্। মন্ত্রীদিগকে যে বিভাগগুলির ভার দেওয়া হইবে, তাহাদের নাম ট্রান্স্ফার্ড্ বা হস্তান্তরিত। টাকা ভাগের বেলায় কার্য্যতঃ প্রাদেশিক রাজস্বের বেশীর ভাগ গবর্ণমেণ্ট্ নিজের হাতের বিভাগ-সমূহের জন্য লইয়া বাকী খুদ-কুঁড়াটা মন্ত্রীদের হাতের বিভাগসকলে দেন। এই ত গেল এক নম্বর অবিচার।

তার পর, রিজার্ভ্ড্ বিভাগগুলির কোন বরাদ্দ নামঞ্জুর হইলে তাহা মঞ্জুর করিয়া লইবার ক্ষমতা আইন গবর্ণরকে দিয়াছে; কিন্তু ঐ আইনের সরকারী ব্যাখ্যা এই, যে, হস্তান্তরিত বিভাগের কোন বরাদ্দ নামঞ্জুর হইলে তাহা মঞ্জুর করিয়া লইবার ক্ষমতা গবর্ণরের নাই। ইহা দু-নম্বর অবিচার। ইহার মানে কার্য্যতঃ এই দাঁড়ায়, যে, তোমাদের বিভাগের কাজ চলুক বা না চলুক, তাহার জন্য মাথা-ব্যথা গবর্ণমেণ্টের নাই, আইন-কর্ত্তা পার্লেমেণ্টের নাই, পার্লেমেণ্ট-নির্ব্বাচক ইংরেজ জাতির নাই।

—

সরকারী চিকিৎসক ও স্কুল-পরিদর্শক

শিক্ষা-বিভাগের স্কুল-পরিদর্শক কর্ম্মচারীদের বেতন এবং সরকারী চিকিৎসা-বিভাগের চিকিৎসকদের বেতন নামঞ্জুর হওয়াটা রাজনৈতিক চা'ল হিসাবে কিরূপ হইয়াছে, তাহার বিচার হইতে পারে, এবং স্কুল-পরিদর্শনের ও চিকিৎসার সরকারী বন্দোবস্তের প্রয়োজন আছে কি না, তাহারও বিচার হইতে পারে। নামঞ্জুরীটা স্বরাজ্য ও স্বাধীন দলের ইচ্ছাকৃত, না, অবস্থাচক্রে অনভিপ্রেত-ভাবে ঘটিয়াছে, তাহা না জানিলে রাজনৈতিক চা'ল হিসাবে উহার বিচার ঠিকমত করা যায় না। উহা যদি অনভিপ্রেত-ভাবে ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে উহাকে চা'ল বলা চলে না; মতভেদ-অনুসারে, উহাকে সুঘটনা বা দুর্ঘটনা বলা চলে।

সরকারী ও সরকারের সাহায্য-প্রাপ্ত বা জানিত শিক্ষালয়-সকলের যে-সব দোষ আছে, সেই-সব দোষ-বর্জ্জিত যথেষ্টসংখ্যক জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত ও পরিচালিত না হওয়ায় আমরা প্রথমোক্ত শ্রেণীর শিক্ষালয় সকলের বর্জ্জনের ও উচ্ছেদ সাধনের পক্ষে আগেও ছিলাম না, এবং এখনও নাই ; কারণ, আমাদের মতে ঐ-সব শিক্ষালয় দ্বারা অবিমিশ্র অকল্যাণ হয় নাই, কল্যাণও হইয়াছে ও হইতেছে। ঐ শিক্ষালয়গুলি যখন আছে, তখন উহার পরিদর্শনও চাই। স্কুলপরিদর্শনের ব্যবস্থা সব সভ্য দেশে আছে ; উহার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু ইহাও ঠিক্, যে, পরিদর্শকদের সংখ্যা খুব বেশী বাড়ান হইয়াছিল—তাহার অভিপ্রায় কতকটা রাজনৈতিক গোয়েন্দা-গিরি, কতকটা অন্যবিধ। কেবল শিক্ষার উৎকর্ষ-রক্ষা ও-বৃদ্ধির জন্য যত আবশ্যক, সেইরূপ-সংখ্যক সুশিক্ষিত ও বিচক্ষণ পরিদর্শক রাখিয়া বাকী লোকদিগকে বিদায় দিলে ভাল হইত।

চিকিৎসকদের সম্বন্ধে বক্তব্য এই, যে, সরকারী অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ডের ও মিউনিসিপ্যালিটির দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাঁসপাতাল-সমূহের কাজ করিবার জন্য সরকারী চিকিৎসকের প্রয়োজন আছে। তা ছাড়া, এমন কোন কোন স্থান আছে, যেখানে কেবল রোগীর বাড়ী গিয়া চিকিৎসা-দ্বারা প্রাপ্ত দর্শনীতে ভাল ডাক্তারের পোষায় না, অথচ সেখানে ভাল ডাক্তার থাকা আবশ্যক। সেই-সব জায়গায় সরকারী ডাক্তার চাই।

—

গবর্ণমেণ্টের শক্তি-ও প্রভাব-বৃদ্ধির উপায়

এইরূপ একটি মত প্রচলিত আছে, যে, গবর্ণমেণ্ট্ দেশ-হিতকর যাহা কিছু করেন বা করান, তাহার দ্বারা জনসাধারণের হৃদয়-মনের উপর নিজের প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তার করেন, এবং তাহার দ্বারা পরোক্ষভাবে নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখিয়া স্বার্থ-সিদ্ধি করেন। আমরা এই মতটিকে সম্পূর্ণ অলীক বা ভিত্তিহীন মনে করি না। গবর্ণমেণ্টের এই প্রভাব ও আধিপত্য-বিস্তার-চেষ্টায় বাধা দিতেও আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু আমরা বলি, যে, বিদেশীদের কর্ত্তৃত্বের পরিবর্ত্তে আমাদের জাতীয় কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিতে আমরা কেন চাই, তাহা দেশের লোক ভাল করিয়া না বুঝাতেই, গবর্ণমেণ্টের উক্তরূপ প্রভাব-বৃদ্ধি-চেষ্টাকে আমরা ভয় করি।

ইংরেজ-প্রভুত্ব নষ্ট করিয়া জাতীয় প্রভুত্ব স্থাপন করিবার কারণ ও প্রয়োজন সাক্ষাৎ-ও পরোক্ষভাবে দেশের লোককে বুঝাইয়া দিবার জন্য, খবরের কাগজে গবর্ণমেণ্টের দোষোদ্‌ঘাটন ও সমালোচনা হইয়া থাকে। দোষ যাহা আছে, তাহা দেখান অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের যদি কোন দোষ-ত্রুটি না থাকিত, তাহা হইলেও আমরা জাতীয় কর্ত্তৃত্ব চাইতাম। কারণ, এক-একজন মানুষের পক্ষে নিজের নিজের কাজ চালাইবার ক্ষমতা থাকা এবং কাজ চালান যেমন মনুষ্যত্বের চিহ্ন, এক একটি জাতিরও নিজের নিজের কাজ চালাইবার ক্ষমতা থাকা ও তাহা চালান, তেম্‌নি তাহাদের মনুষ্যত্বের প্রমাণ। যে জাতি নিজেদের কাজ চালাইতে পারে না, তাহারা মনুষ্যত্ব-হিসাবে হীন। এই জন্য, আমাদেরই দেওয়া ট্যাক্স হইতে যে-যে রাষ্ট্রীয় কাজ চালাইবার সরকারী বন্দোবস্ত বা আয়োজন আছে, আমরা সেইসব দ্বারা নিজেদের কাজ উদ্ধার করিবার পক্ষপাতী। দৃষ্টান্ত দিতেছি। সরকারী ডাক-বিভাগের বন্দোবস্ত আমাদের কাজে লাগাইয়া আমরা দেশময় আমাদের মত প্রচার করিতেছি। সরকারী রেল-রোডের সাহায্যে রাজনৈতিক নেতারা বক্তৃতাদি করিয়া বেড়াইয়া নিজেদের কার্য্য উদ্ধার করিতেছেন। কিন্তু একথা কেহই বলিতে পারেন না, যে, সংবাদপত্র-সম্পাদক সকলেই বা রাজনৈতিক আন্দোলক সকলেই সরকারের মন্ত্রমুগ্ধ গোলাম হইয়া পড়িয়াছেন। অবশ্য, যদি কোন সরকারী বন্দোবস্ত বা আয়োজন নিজেদের কাজে লাগাইতে হইলে জাতীয় হীনতা বা অপমান স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা করা উচিত নয়।

অসহযোগীদের মধ্যে একটা কথা চলিত আছে, যাহার মর্ম্ম এই, যে, তাঁহারা যাহা করিতেছেন, তাহা আমলাতন্ত্রের সহিত রক্তপাতহীন যুদ্ধ, পাশব বা জাতীয় বলের পরিবর্ত্তে তাঁহারা আত্মিক বলের দ্বারা আমলাতন্ত্রের

কিল্লা ফতে করিবেন। আমাদের সর্ব্ববিধ রাজনৈতিক প্রচেষ্টা যে একপ্রকার যুদ্ধ, তাহা স্বীকার্য্য। সেইজন্যই ত বলি, যে, যেমন যুদ্ধে উভয় পক্ষই পরস্পরের বন্দোবস্ত ও আয়োজন দখল করিয়া নিজের কাজে লাগাইবার চেষ্টা করে, আমাদিগেরও সেই নীতির অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। অসহযোগীরা মিউনিসিপ্যালিটি ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ড্‌গুলি ক্রমে ক্রমে দখল করিবার চেষ্টায় আছেন। যুদ্ধের কৌশল এক নয়, নানা। যদি অসহযোগ-নেতারা দেশের সেবার জন্য বেসরকারী সব-রকম প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে, সর্ব্ববিধ আয়োজন করিতে পারেন, তাহা হইলে সরকারী সব-কিছু বর্জ্জন করুন; নতুবা প্রয়োজন-মত সরকারী কোন কোন প্রতিষ্ঠান দখল করুন বা দেশের কাজের জন্য কাজে লাগান। কোন পন্থাই নিন্দনীয় নহে।

—

আচার্য্য বসু মহাশয়ের প্রত্যাবর্ত্তন

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী দীর্ঘকাল ইউরোপের নানা-দেশ ভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। আচার্য্য মহাশয়কে সর্ব্বত্রই তাঁহার নূতন আবিষ্ক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল। তাহা বুঝাইবার জন্য তাঁহার উদ্ভাবিত ও তাঁহার তত্ত্বাবধানে দেশী কারিগর দ্বারা নির্ম্মিত যন্ত্র-সকল ব্যবহৃত হইয়াছিল। এই যন্ত্রগুলির সূক্ষ্ম, নির্ভুল ও অদ্ভুত কার্য্যকারিতা দেখিয়া সর্ব্বত্র বৈজ্ঞানিকগণ বিস্মিত হইয়াছেন। তাঁহাকে অনেক পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। এই পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। ইহার দ্বারা নূতন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রচার হইয়াছে, এবং বিদেশে ভারতীয় প্রতিভার গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছে।

অন্য অনেক অসাধারণ লোকের সহধর্ম্মিণীর সম্বন্ধে যেমন বলা যায়, আচার্য্য বসু মহাশয়ের পত্নীর সম্বন্ধেও সেইরূপ বলা যায়, যে, তিনি সাংসারিক সমুদয় ঝঞ্ঝাট ও খুঁটি-নাটির সম্পূর্ণ ভার নিজে বহন না করিলে, বসু মহাশয়ের জ্ঞানতপস্যায় বহু বিঘ্ন ঘটিত। কিন্তু আচার্য্য-পত্নী মহোদয়ার নিজের লোকহিতকর কাজও আছে। তিনি ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের সম্পাদকের কাজ দীর্ঘকাল চালাইয়া আসিতেছেন। নারী-শিক্ষা-সমিতির দ্বারাও নানা উপায়ে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হইতেছে। বসু মহাশয় ও তাঁহার পত্নী স্বদেশে আপনাদের কার্য্যক্ষেত্রে ফিরিয়া আসায় আমরা আনন্দিত হইয়াছি। তাঁহাদের সহকর্ম্মীদের প্রাণে নূতন বলের সঞ্চার হউক, এবং নূতন প্রেরণা আসুক, এই প্রার্থনা করি।

—

নাভার হত্যাকাণ্ড

অকালীরা কাপুরুষ নহে, যে, অহিংসার ভাণ করিয়া তাহারা কোথাও হিংসা করিতে বা দৈহিক বা অস্ত্র বল প্রয়োগ করিতে যাইবে। হিংসা করিবার ইচ্ছা করিলে বীরেরা যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া বা অন্যপ্রকারে প্রকাশ্য যুদ্ধই করে। সেইজন্য যখন সরকারী বা আধা-সরকারী সংবাদে বলা হইয়াছিল, যে, নাভা-রাজ্যে তাহারা প্রথমে যে জথা বাঁধিয়া যাইতেছিল, সেই জথার লোকদের আগ্নেয় অস্ত্র ছিল, তাহাদের সঙ্গের জনতার লোকদেরও অনেকের অস্ত্র-সজ্জা ছিল, এবং প্রথমে বে-সরকারী তরফ হইতে বন্দুক আওয়াজ হওয়ার পর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত ইংরেজ অফিসার তাহাদের উপর গুলিবর্ষণ করিতে হুকুম দেন,—তখন এই-সব কথা বিশ্বাস করিবার কারণ হয় নাই। পরে শিরোমণি গুরু-দ্বারা প্রবন্ধক কমিটির পক্ষ হইতে এসব কথা মিথ্যা বলা হয়। তাহার পর আমেরিকার জর্ণ্যালিষ্ট্ অর্থাৎ সাংবাদিক মিষ্টার জিম্যাণ্ড্ মহাত্মা গান্ধীকে প্রকাশ্য চিঠি লিখিয়া জানান, যে, অকালী জথা কিম্বা তাহাদের অনুচর পার্শ্বচর জনতা সশস্ত্র ছিল না, তাহাদের কাহারও আগ্নেয় অস্ত্র ছিল না, সুতরাং তাহাদের তরফ হইতে প্রথমে বন্দুক আওয়াজ হয় নাই, এবং সরকারী তরফ হইতে দুইবার দস্তুরমত গুলি বর্ষণ হয়। কংগ্রেস্ কমিটির পক্ষ হইতে যে রিপোর্ট্ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও জথা ও জনতার নিরস্ত্র ও নিরুপদ্রব শান্তভাব এবং সরকার পক্ষ হইতেই গুলি-বর্ষণের সংবাদ সমর্থিত হইতেছে। অতএব নাভার এই হত্যাকাণ্ডটিও অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালা বাগের একটি মত ব্যাপার। এইরূপ নিষ্ঠুর কাপুরুষতার

প্রতিকার-ক্ষমতা এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই, কিন্তু স্বদেশে ও বিদেশে এইসব সত্য ঘটনার কথা প্রচারিত হওয়ার মূল্য আছে।

—

জেল সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর অভিজ্ঞতা

মহাত্মা গান্ধী জেল সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা-প্রসূত যে-সব প্রবন্ধ লিখিতেছেন, তাহা অতি মূল্যবান্। তাহার দ্বারা যদি দেশের লোকদের চোখ ফুটে এবং গবর্ণ্মেণ্টেরও চোখ ফুটে, এবং ফলে কারাগারের সংশোধন হয়, তাহা হইলে মহাত্মা গান্ধী এবিষয়েও দেশের মহদুপকার সাধন করিবেন। যদি "গবর্ণ্মেণ্টেরও চোখ ফুটে" লিখিয়াছি, তাহা ভুল। গবর্ণমেণ্টের সবই জানা আছে, কিন্তু সংস্কার করিবার কার্য্যকরী ইচ্ছা নাই। জেলগুলিতে কদর্য্য খাদ্য অপ্রচুর খাদ্য দেওয়া হয়, তথাকার বন্দোবস্ত অস্বাস্থ্যকর, কয়েদীদের প্রতি অনেক সময় নিষ্ঠুর ব্যবহার হয়, ইত্যাদি কথা আজকাল লেখাপড়া-জানা লোকমাত্রেই জানেন। কিন্তু অস্বাভাবিক পাপে বিস্তর কয়েদী কিরূপে পশুর অধম হয়, এবং অনেকের উপর কিরূপ অস্বাভাবিক অত্যাচার হয়, তাহা গবর্ণ্মেণ্টের জানা থাকিলেও সর্ব্বসাধারণের জানা নাই। অপরাধ-নিবারণ কারাদণ্ডের প্রকাশ্যভাবে ঘোষিত উদ্দেশ্য; কিন্তু জেলগুলিতে সর্ব্ববিধ অপরাধ ও পাপ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; মানুষ কারাগার হইতে অধমতর হইয়া বাহির হয়; কারণ, জেলগুলি মানুষের সৃষ্ট বাস্তব নরক, কল্পিত নরক নহে।

—

মধ্যপ্রদেশে বাঙালী

গত ৬ই বৈশাখ মধ্যপ্রদেশের রায়পুর সহরে মধ্যপ্রদেশ-বাসী বাঙালীদের সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশন হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত স্যার্ বিপিনকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের যে অভিভাষণ পঠিত হয়, তাহার একখণ্ড পাইয়াছি। উহা বিলম্বে পাওয়ায় এবং ইতিমধ্যে খবরের কাগজে প্রকাশিত হইয়া যাওয়ায়, আমরা ছাপিতে পারিলাম না। বসু মহাশয় এই অভিভাষণে যেসকল বাঙালীর পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহারা বাস্তবিকই বাঙালী জাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

বসু মহাশয় ৫২ বৎসর পূর্ব্বে মধ্যপ্রদেশে যান। এই দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা হইতে তিনি তাঁহার অভিভাষণে যে একটি বিষয়ে পুনঃ পুনঃ সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহা পড়িয়া সাতিশয় প্রীত হইয়াছি। তিনি গোড়ার দিকে বলিয়াছেন—

> "আমি জব্বলপুর আসিয়াই দেখি, বাঙালীদের সঙ্গে সেদেশের লোকদের সদ্ভাব। ইহাতে আমি বড়ই প্রীতিলাভ করি।"

অন্যত্র, নাগপুরের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বলিতেছেন—

> "তখনকার বাঙালীরা অল্পসংখ্যক হইলেও মহারাষ্ট্রীয় ভ্রাতাদের সঙ্গে সকল শুভকার্য্যে উৎসাহের সহিত যোগ দিতেন।"

পরে বলিতেছেন—

> "যে সদ্ভাবের অঙ্কুর ১৮৭৪ সালে আসিয়া রোপিত হইতে দেখি, তাহা এখন বৃহৎ বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়াছে। ইহা যে যার-পর-নাই সুখের বিষয়, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। আমি এত দিন এখানে কাটাইলাম, বাঙ্গালীদের সঙ্গেও এদেশবাসীদের সঙ্গে কখনও মনোমালিন্য হইতে দেখি নাই। বরং বাঙ্গালীর সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী ও বিপদে সহানুভূতির ভূরি ভূরি নিদর্শন পাইয়াছি। বাঙ্গালীরাও সর্ব্বতোভাবে এইভাব বজায় রাখিয়াছেন।"

—

ইস্পাত-পণ্যশিল্পের সংরক্ষণ

ট্যারিফ্ বোর্ডের অর্থাৎ শুল্কসম্বন্ধীয় বিচারসমিতির সুপারিস অনুসারে ভারতগবর্ণ্মেণ্ট, ভারতীয় ইস্পাত-শিল্পের সংরক্ষণ জন্য বিদেশ হইতে আমদানি ইস্পাত ও ইস্পাতের জিনিষের উপর শুল্ক বসাইবার নিমিত্ত আইন প্রণয়ন করিবেন। ইহা না করিলে দেশী ইস্পাতশিল্প টিকিত না। অতএব এই নির্দ্ধারণ ঠিক্ হইয়াছে।

—

বিদেশী-দেশী দিয়াশলাই

সুইডেনের দিয়াশলাই-নির্ম্মাতা "সুইডিশ ম্যাচ্ ম্যানুফ্যাকচ্যারিং কোম্পানী" তাহার মূলধন দ্বিগুণ করিয়া ১৯ কোটি ক্রাউনে পরিণত করিয়াছেন। এক সুইডিশ্ ক্রাউন প্রায় ৮/১০ র সমান। সুতরাং এই কোম্পানীর মূলধন এখন ষোল কোটি তিন লক্ষ সাড়ে বার হাজার টাকা হইল। কোম্পানী তাহার নূতন মূলধন বোম্বাই, কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও করাচীতে তাহার দিয়াশলাইয়ের কারখানাগুলির নির্ম্মাণসম্বন্ধা ও কার্য্য পরিচালন করিবার জন্য ব্যবহার করিবে। বিদেশ

হইতে আগত দিয়াশলাইয়ের উপর শুল্ক থাকায় বিদেশী দিয়াশলাই নির্ম্মাতাদের অসুবিধা হইতেছে, এবং দেশী দিয়াশলাই অল্প-স্বল্প প্রস্তুত ও বিক্রী হইতেছে। এই জন্ম বিদেশী দিয়াশলাই নির্ম্মাতারা ভারতেই কারখানা স্থাপন করিয়া নিজেদের মাল চালাইবে, এবং আমাদের বর্ত্তমান কারখানাগুলি নষ্ট করিবে ও ভবিষ্যতে আমাদের কারখানা স্থাপন অসম্ভব করিবার চেষ্টা করিবে। এই অনিষ্ট নিবারণের উপায় আছে, এবং তাহা স্বাধীন দেশে প্রয়োজনমত অবলম্বিতও হইয়া থাকে। তদনুসারে আমাদের দেশেও এইরূপ আইন হওয়া উচিত, যে, ভারতীয় ভিন্ন অপর কোন জাতির মূলধনী বা অন্য লোক যদি এদেশে কোন কারবার কারখানাআদি স্থাপন করিতে চায়, তাহা হইলে দেখাইতে হইবে, যে, ঐ কারবার বা কারখানার মূলধনের তিন-চতুর্থ অংশ ভারতীয় লোকদের এবং উহার ডিরেক্টর্ অর্থাৎ পরিচালকদেরও তিন-চতুর্থ অংশ ভারতীয় লোক। এইরূপ আইন না করিলে আমাদের দেশী লোকদের নূতন পণ্যশিল্পের কারখানা ত স্থাপিত হইবেই না, পুরাতনগুলিও লোপ পাইবে। কারণ, ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানের লোকদের যত মূলধন আছে, আমাদের তত মূলধন নাই।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচিত সভ্যেরা সত্বর এ বিষয়ে মনোযোগী হউন।

—

লাহোরে প্লেগ

প্রায় ত্রিশ বৎসর হইতে চলিল, ভারতবর্ষে প্লেগের আবির্ভাব হইয়াছে; এখনও তিরোভাব হইল না। হইবেই বা কেমন করিয়া? প্লেগ দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট দেশেরই অতিথি হয়। দেশের দারিদ্র্য না গেলে প্লেগ নির্মূল হইবে না।

পঞ্জাবে, বিশেষতঃ লাহোরে, খুব প্লেগ হইতেছে। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, যে, কলিকাতার রামকৃষ্ণ মিশনের লোকেরা গিয়া লাহোরে প্লেগ রোগীর সেবা করিতেছেন, এবং লাহোর ডিভিজনের কমিশনার ল্যাংলী সাহেব বিশেষ করিয়া তাঁহাদের কার্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন।

জাতিভেদবিশ্বাসী খৃষ্টিয়ান্‌দের মধ্যে দাঙ্গা

দক্ষিণ ভারতে খৃষ্টিয়ান্ সমাজে, বিশেষতঃ রোম্যান্ কাথলিক্ খৃষ্টিয়ান্ সমাজে, হিন্দুদের মত জাতিভেদ আছে। যাহারা বামুন বা অন্য "উঁচু" জা'ত থেকে খৃষ্টিয়ান্ হইয়াছেন, তাঁহারা "অস্পৃশ্য" সমাজ হইতে আগত খৃষ্টিয়ান্‌দিগকে নিজেদের সমান সামাজিক ও অন্যান্য অধিকার দেন না। ইহা লইয়া ত্রিচিনপল্লীতে ঝগড়া ও পরে দাঙ্গা মারামারি হইয়া গিয়াছে। কয়েকজন আহত ও দুই-একজন মারাত্মকরকম জখম হইয়াছে।

—

আলিপুরে ষড়যন্ত্রের মামলা

আলিপুরের ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমা দীর্ঘকাল ধরিয়া চলার পর সকল আসামীরই বেকসুর খালাস প্রাপ্তিতে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। জজ তাঁহার রায়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যপ্রণালীর নিন্দা করিয়াছেন—তিনি নিজের বাংলায় বসিয়াই, অভিযুক্তদিগকে না দেখিয়াই, হুকুম দিতেন। পুলিশ যেভাবে আসামীদের স্বীকারোক্তি আদায় ও লিপিবদ্ধ করিয়াছিল, তাহার সমালোচনাও জজ করেন।

ষড়যন্ত্রের অভিযোগ ত ফাঁসিয়া গেল, কিন্তু বিচার শেষ হইবার আগেই ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব মানিয়া লইয়া বিলাতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক প্রগতিতে বাধা দিবার অনেক সফল চেষ্টা হইয়া গিয়াছে।

আসামীরা খালাস পাইবা মাত্র পুলিশ চারিজনকে গ্রেপ্তার করে। ওয়ারেণ্ট্ দেখাইতে বলায় পুলিশ ওয়ারেণ্ট দেখাইতে পারে নাই। এবিষয়ে ধৃতব্যক্তিদের পক্ষ হইতে হাইকোর্টে দরখাস্ত হওয়ায় সরকার পক্ষ হইতে বলা হয়, যে, তাহাদিগকে ১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশ্যন্ অনুসারে ধরা হইয়াছে, এবং জেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্‌কে তাহাদিগকে জেলে আবদ্ধ রাখিবার জন্য ওয়ারেণ্ট্ দেওয়া হইয়াছিল। জজরাও তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন নাই। জেল্-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে যে ওয়ারেণ্ট্ ছিল, তাহা পুলিশ কর্ত্তৃক আনীত চারিজন ব্যক্তিকে তাঁহার হেফাজতে রাখিবার জন্য; কিন্তু পুলিশ তাহাদিগকে ধরিল কোন্ ওয়ারেণ্টের জোরে? পুলিশের কাজটা ঠিক্ আইনসঙ্গত

প্রণালী অনুযায়ী হয় নাই, হাইকোর্টের বিচারও মোড়লী রকমের এবং আম্‌লাতন্ত্র-ঘেঁষা হইয়াছে।

• জজের রায় বাহির হইবার আগেই গবর্ণ্‌মেণ্ট কেন চারিজন আসামীকে ৩নং রেগুলেশ্যন্ অনুসারে ধরিবার মতলব আঁটিয়া জেলের কর্ত্তৃপক্ষকে তাহাদিগকে তাঁহার হেফাজতে রাখিবার আজ্ঞা দিলেন? ইহাতে কি আদালতের উপর এবং আইনসঙ্গত বিচারের উপর অশ্রদ্ধা ও অসম্মান প্রদর্শিত হয় নাই? কর্ত্তারা মাকড় মারিলে ধোকড় হয়; অন্যেরা ঐরূপ কাজ করিলে আদালতের অবমাননা হয়, ও তাহার জন্য শাস্তি হয়।

মানুষগুলাকে বিনা ব্যয়ে ধরিয়া বন্ধ করিয়া রাখিবার উপায় থাকিতে সরকার বাহাদুর গরীব প্রজাদের হাজার হাজার টাকা কেন এই মোকদ্দমায় খরচ করিলেন, আদালতের সময় কেন নষ্ট করিলেন, এবং জুরর বেচারাদের কয়েকমাস সময় বিনা পারিশ্রমিকে কেনই বা লইলেন?

—

নমঃশূদ্র-সমস্যা

নমঃশূদ্র জাতির সামাজিক বিদ্রোহী ভাবের প্রতি হিন্দু সমাজের দৃষ্টি পড়িয়াছে। নমঃশূদ্রগণ সচেষ্ট থাকিলে সমাজ আর ঘুমাইতে পারিবে না। বামুনদের মধ্যে ২১১ জন এবিষয়ে অদ্ভুত যুক্তি দেখাইতেছেন। একজন পণ্ডিত বলিতেছেন, নমঃশূদ্রেরা তাহাদের পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতিবশতঃ নিম্ন জাতিতে জন্মিয়াছে; অতএব তাহারা তাহা মানিয়া লউক। তাহাদের ইহজন্মের সুকৃতি দ্বারা ইহার পরজন্মে "উচ্চ" জাতি হইবার আশা থাকিতে পারে, ইত্যাদি। এই চমৎকার যুক্তিটি যে শুধু সামাজিক বিষয়ে প্রয়োগ করা যায়, তা নয়; রাজনৈতিক, আর্থিক, জ্ঞানিক, সব বিষয়েই প্রযুক্ত হইতে পারে। পরাধীন জাতির স্বাধীন হইবার, দরিদ্র জাতির ধনী হইবার, অজ্ঞ জাতির জ্ঞানী হইবার চেষ্টা করা উচিত নয়; কারণ তাহাদের বর্ত্তমান দুরবস্থা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে ঘটিয়াছে। অতএব, সকলে স্বাধীন, ধনী, জ্ঞানী ইত্যাদি হইবার চেষ্টা না করিয়া কেবল "সুকৃতি" করিতে থাক; তাহার দ্বারা পরজন্মে স্বাধীন, ধনী, জ্ঞানী হইতে পারিবে। "সুকৃতি"র একটা মানে অবশ্য ব্রাহ্মণদিগকে বেশী বেশী দক্ষিণা ও ভোজ্য আদি দান।

আর-একজন পণ্ডিতপুঙ্গব "অস্পৃশ্য" ও "অনাচরণীয়" জাতিদিগকে মানবদেহের কোন কোন অস্পৃশ্য স্থানের সহিত উপমিত করিয়া অপূর্ব্ব যুক্তির অবতারণা করেন। তাহা পরীক্ষা করিয়া আমাদের সময় ও প্রবাসীর জায়গা নষ্ট করিতে চাই না। কিন্তু এই ব্রাহ্মণপুঙ্গব কি ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন, যে, এই তুলনা দ্বারা ঐসকল জাতির লোককে অপমান করা হইতেছে কি না?

নমঃশূদ্রদের ভবিষ্যৎ তাঁহাদের নিজের হাতে। তাঁহারাও তাহা বুঝিয়াছেন মনে হইতেছে। অল্পদিন হইল বঙ্গের যে সরকারী পঞ্চবার্ষিক শিক্ষা-রিপোর্ট বাহির হইয়াছে, তাহাতে দেখিলাম, বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষা-ডিরেক্টর হর্নেল্ সাহেব তাঁহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,

"their present position in education and their present social advancement bring them under a higher category."

"শিক্ষাবিষয়ে তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থা এবং তাহাদের বর্ত্তমান সামাজিক উন্নতি তাহাদিগকে উচ্চতর শ্রেণীতে আনিয়াছে।"

পঞ্চবার্ষিক রিপোর্টটিতে লেখা হইয়াছে,

"The community is raising its status rapidly, and, arguing mainly from its consistent educational advance, is constantly making out a case for being regarded as other than backward."

"নমঃশূদ্রসমাজ দ্রুত নিজের সামাজিক পদবী উন্নত করিতেছে, এবং, প্রধানতঃ শিক্ষাবিষয়ে ইহার যে অবিরাম ক্রমোন্নতি হইতেছে তাহা হইতে, এই সিদ্ধান্ত করা যায়, যে, পশ্চাৎপদ বা অনুন্নত জাতি বিবেচিত না হইবার প্রমাণ নমঃশূদ্রেরা সর্ব্বদা উপস্থিত করিতেছে।"

রিপোর্টের উপর সরকারী মন্তব্যেও লিখিত হইয়াছে,

"Of the backward classes the most advanced are the *Namasudras*: education has spread among them to such an extent that it is doubtful whether they should now be included among the backward classes."

"অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে নমঃশূদ্ররা সকলের চেয়ে অগ্রসর; তাহাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার এরূপ হইয়াছে, যে, তাহাদিগকে এখন পশ্চাৎপদ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত মনে করা উচিত কি না, সন্দেহ।"

—

দক্ষিণ ভারতে জাত্যভিমান

ত্রিবাঙ্কুড় রাজ্যের ভাইকম্ নামক স্থানের একটি দেবমন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তী রাস্তা দিয়া "নিম্ন" শ্রেণীর কতকগুলি

জাতিকে ব্রাহ্মণাদি "উচ্চ" বর্ণের লোকেরা যাইতে দেয় না; "নিম্ন" শ্রেণীর লোকেরা যাইবার অধিকার স্থাপন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ত্রিবাঙ্কুড় গবর্ণমেণ্ট মন্দিরটির ট্রষ্টী অর্থাৎ ন্যাসরক্ষক। ঐ গবর্ণমেণ্ট "নিম্ন" শ্রেণীর যাহারা ঐ রাস্তায় যাইতেছে, তাহাদিগকে ধরিয়া জেলে পাঠাইতেছেন। এইপ্রকার সত্যাগ্রহ চলিতেছে।

দক্ষিণ ভারতেরই তিন্নেভেল্লী সহরের একটি রাস্তার অধিবাসীরা "উচ্চ" বর্ণের। তাহারা বলিয়াছে, তাহারা মিউনিসিপ্যালিটিকে "নীচ" জাতির কুলি দ্বারা ঐ রাস্তাটি মেরামত করাইতে দিবে না; "উচ্চ" জাতির কুলি চাই! অপরের পরোক্ষ স্পর্শে তাঁহাদের পবিত্রদেহ অপবিত্র হইবার যখন এতই আশঙ্কা, তখন তাঁহারা রাস্তা মেরামত নর্দ্দমা সাফ, পায়খানা পরিষ্কার, প্রভৃতি সব কাজ নিজেরাই করুন না?

দক্ষিণে জাত্যভিমানের এইরূপ অতিবাড়। অতএব আমরা ভারতীয়েরা কোন্ মুখে বলিব, যে, দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতকায়েরা তথাকার ভারতীয়দিগকে বিশেষ বিশেষ স্থানে আবদ্ধ রাখিবার আইন করিয়া আমাদের অপমান, অনিষ্ট ও নির্য্যাতনের চেষ্টা করিতেছে? আমাদের নিজের দেশেও ত কোন কোন শ্রেণীর লোক অপর কোন কোন শ্রেণীর লোকের প্রতিও অবজ্ঞাসূচক অমানবিক ব্যবহার করিতেছে। ভারতের যে প্রদেশেই হউক, যেসব উচ্চবর্ণের লোক নিম্নবর্ণের প্রতি অবজ্ঞাসূচক ও অবমানকর দেশাচার কায়েম রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা দেশের ও মানবসমাজের শত্রুর কাজই করিতেছেন।

—

কলিকাতার ভাইস্-চ্যান্সেলার্

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার্ বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু বাংলার শাসনপরিষদের সভ্য হওয়ায়, অনুমান চলিতেছে, যে, তাঁহার জায়গায় ভাইস্-চ্যান্সেলার্ কে হইবেন।

নেপালের নৃপতির নাম মহারাজাধিরাজ ত্রিভুবন বীর বিক্রম জংবাহাদুর শাহ্ বাহাদুর শমশের জং। কিন্তু রাজসিংহাসনে তিনি অধিষ্ঠিত থাকিলেও তাঁহার কোন ক্ষমতা নাই। সমুদয় ক্ষমতা প্রধান মন্ত্রীর হস্তে।

সেইরূপ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার্ যিনিই হউন, সেনেটের বর্ত্তমান সভ্যসমষ্টি ও ভিত্তিগত নিয়মাবলী বিদ্যমান থাকিতে শ্রীযুক্ত স্যার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ই উহার আসল কর্ত্তা থাকিবেন। এ অবস্থায়, যে-কেহ রাজী হইবেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকেই ঐ পদ দিতে পারেন।

মুসলমান সমাজ ঐ পদে একজন মুসলমানকে বসাইতে চাহিতেছেন। বর্ত্তমানে ঐ পদের জন্য যোগ্যতম লোক বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে না থাকিলেও, যোগ্য লোক আছেন। অতএব তাঁহাদের অভিলাষপূরণে কোন অলঙ্ঘ্য বাধা নাই।

—

বড়োদার মহারাজার আবার বিদেশ যাত্রা

বড়োদার মহারাজা ও অন্যান্য কোন কোন মহারাজা যে পুনঃপুনঃ দীর্ঘকাল বিদেশে যাপন করেন, ইহা অন্যায়। বিদেশী অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের জন্য দু-একবার যাইতে পারেন, কিন্তু বার বার বিদেশে দীর্ঘকাল থাকিয়া প্রজাদের প্রদত্ত টাকা উড়ান অধর্ম্ম। বড়োদার মহারাজা রাজ্যের অনেক উন্নতি করিয়াছেন, সত্য; কিন্তু আরও অধিক সময় রাজ্যে থাকিলে আরো উপকার করিতে পারিতেন। তাহা পারুন বা না পারুন, প্রজাদের টাকা বিলাসে ও আমোদে উড়াইবার অধিকার ধর্ম্মতঃ কোন নৃপতির নাই।

—

খিলাফৎ সম্বন্ধে তুর্ক জনমত

তুরস্কের খবরের কাগজগুলি সাধারণতঃ তুরস্কসাধারণতন্ত্র কর্ত্তৃক খিলাফতের উচ্ছেদ-সাধনের সমর্থনই করিতেছে। তাহা হইলেও, রক্ষণশীলদলের কাগজগুলি এ-প্রকার বৈপ্লবিক সংস্কার সম্বন্ধে 'অর্থপূর্ণ' মৌন অবলম্বন করিয়া আছে। কিন্তু কন্‌স্তান্তিনোপ্‌লের অন্যতম উদারনৈতিক দৈনিক কাগজ "তানিন্" (Tanin) খিলাফতের উচ্ছেদ সাধনে উল্লাস প্রকাশ করিয়াছে। এই কাগজে লেখা হইয়াছে:—

"এপর্য্যন্ত আমাদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসকলে যে বিপ্লব ঘটান হইয়াছিল, তাহা কেবল বাহ্য রূপের পরিবর্ত্তন মাত্র। কিন্তু এখন কেবল তাহাদের নামের বা রূপের পরিবর্ত্তন নহে, আমাদের আদর্শ, আমাদের চিন্তার ধরণ, আমাদের কর্ম্মনীতি, সবই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। খিলাফতের উচ্ছেদসাধনের মানে তুরস্কের সম্পূর্ণ আধুনিকতাপাদন ও প্রতীচ্যীকরণ (the complete modernization and Westernization of Turkey)। কোন কিছু বাদ সাদ না দিয়া আধুনিক রাষ্ট্রের সব নীতি আমাদের রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি ও প্রণালীর মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন আর ইউরোপীয় যে-কোন রাষ্ট্র ও তুরস্কে কোন প্রভেদ নাই। ইহা সত্য, যে সভ্যতার দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে আমরা একটি পশ্চাৎপদ বা অনুন্নত জাতি, কিন্তু আমরা ইউরোপীয় জাতিসকলের সহিত একই লক্ষ্যের অনুসরণ একই রীতি অনুসারে করিতেছি, এবং আমাদের প্রগতির রেখা বা পথ তাহাদের সঙ্গে এক। আমরা শীঘ্রই প্রাচ্যের সম্পূর্ণ প্রতীচ্যীকরণ দেখিব।"

"বতন্" (Vatan) নামক কন্স্তান্তিনোপলের আর একটি উদারনৈতিক দৈনিক বলেন,

"এমন এক সময় ছিল যখন খিলাফৎকে শক্তির উৎস বলিয়া বিশ্বাস করা হইত, কিন্তু এখন বুঝিতে পারা গিয়াছে, যে, উহা দুর্ব্বলতারই কারণ। বহু শতাব্দী ধরিয়া খলিফাদের বলহীনতা এবং মুসলমানদিগকে বৈদেশিক উৎপীড়ন অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার অক্ষমতা প্রযুক্ত মোস্লেম জগতে খিলাফতের প্রতিপত্তি লোপ পাইয়াছিল। আমাদের খুবই অভাবের সময়ও আমরা মুসলমানদের উপর খলিফার বৈধ ক্ষমতা হইতে কোন লাভ পাই নাই। এমন কি, জগৎজোড়া গত যুদ্ধের সময় খলিফা কর্ত্তৃক জেহাদ্ অর্থাৎ ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণাও ভারতীয় মুসলমানদিগকে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। তা ছাড়া, আমরা ধর্ম্মশাস্ত্রাদিপ্রসূত সবরকম প্রভাব বাদ দিয়া একটি আধুনিক রাষ্ট্র স্থাপন করিতে চাই। খিলাফৎ থাকার জন্য আমাদের তুর্কজাতীয় ব্যাপারে অন্য মোস্লেম্ জাতিরা হস্তক্ষেপ করিবার কারণ পাইয়াছিল। যথা—ভারতীয় মুসলমানরা মনে করিয়াছিল, যে, তুরস্কের শাসনপ্রণালীর সমালোচনা করিবার অধিকার তাহাদের আছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী শক্তিপুঞ্জ এই অবস্থার সুযোগে মোস্লেম্ জাতিসকলকে তুরস্কের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারসমূহে হস্তক্ষেপ করিতে উত্তেজিত করিয়াছিল। আমরা এইসব সম্ভাবনা এবং আমাদের সাংসারিক বা পার্থিব প্রতিষ্ঠানসকলে ধর্ম্মবিশ্বাসপ্রণোদিত হস্তক্ষেপ কাটিয়া ছাঁটিয়া ফেলিতে চাই। অতএব, প্রতীচ্যের গণতন্ত্র রাষ্ট্র সকলের মার্গ অবলম্বী একটি আধুনিক রাষ্ট্র স্থাপনার্থ খিলাফতের উচ্ছেদ সাধন ঠিক্ সমীচীন ও দরকারী জিনিষ।"

কন্স্তান্তিনোপলের নূতন সান্ধ্য কাগজ "মুস্তকিল" (Mustekil) উপেক্ষা ও ঔদাসীন্যের সুরে বলিতেছেন,

"হেজাজের রাজা হুসেনের মত মুসলমান রাজারা ও অন্যেরা খলিফা উপাধি দ্বারা আপনাদিগকে ভূষিত করিতে চাহিবে। সেটা তাদের ভাবিবার বিষয়, তার সঙ্গে তুর্কিদের কোন সম্পর্ক নাই। তুর্করা চিরকালের জন্য এই সমস্যার সমাধান করিয়াছে; তাহারা রাষ্ট্রকে ধর্ম্মমণ্ডলী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া দিয়াছে।"

কন্স্তান্তিনোপলের "ইক্দম্" (Ikdam) বলেন,

"সিকি শতাব্দী পূর্ব্বে মোসলেম জগতের সমক্ষে তুরস্ককে সেই জগতে স্বাধীনতার একমাত্র দৃষ্টান্ত বলিয়া ধরা হইয়াছিল। যেসব কোটি কোটি মুসলমান শত্রুর উৎপীড়নে আর্ত্তনাদ করিতেছিল, তাহারা, যতই অত্যাচার বাড়িতেছিল, ততই কন্স্তান্তিনোপলের দিকে চোখ্ ফিরাইতেছিল। এইপ্রকারে তাহারা সান্ত্বনা লাভ করিতেছিল এবং তাহাদের বিশ্বাস দৃঢ় হইতেছিল। এই অনুভূতির মধ্যেই তুরস্কের প্রতি সমুদয় মুসলমানদের বন্ধুভাব নিবদ্ধ আছে। খিলাফৎ এই বন্ধুত্বের উৎস বা উপাদান নহে। এই বন্ধুভাব পূর্ব্ববর্ণিত ভাবসকলের উপর প্রতিষ্ঠিত।

"তুরস্কের ১৯০৮ সালের ১০ই জুলাইয়ের রাষ্ট্রবিপ্লবের পর, মুসলমানদের আমাদের প্রতি যে-সব ভাব ছিল, তাহার উপর একটি নূতন ভাব সংযোজিত হইল। তুরস্কের স্বাধীনতা অর্জ্জন মুসলমানদের হৃদয়ে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চার করিয়াছিল—তাহারাও আমাদের মত স্বাধীনতা ও প্রগতি চাহিত, কিন্তু তাহার পথে আমাদের যে বাধা ছিল তাহাদেরও তাহা ছিল। তাহারা তাহাদের সম্মুখে এমন একটি জাতি দেখিল, যাহারা স্বাধীনতা অর্জ্জনে সফলপ্রযত্ন হইয়াছে, সুতরাং তাহাদের আনন্দ দ্বিগুণিত হইল।

"আনাতোলিয়ার স্বাধীনতা-সংগ্রাম আরম্ভ হওয়া অবধি মোস্লেম জগতে এক নব উত্তেজনার তরঙ্গ উত্থিত হয়। তুরস্কের জয়লাভ মুসলমানদের চক্ষেই স্লামেরই জয়লাভ বলিয়া প্রতীত হইয়াছে। সমগ্র মোস্লেম্ জগৎ আনাতোলীয় সৈন্যকে ইস্লামের সৈন্য বলিয়া, এবং তুরস্ক পার্লামেণ্ট ও উহার মহৎ নেতাকে ধর্ম্মের পক্ষে অবলম্বনপূর্ব্বক জয়ী ও লোকসকলের পথপ্রদর্শক বলিয়া পরিগণনা করিয়াছে। স্বাধীনতা-সমরের সমুদয় কাল ব্যাপিয়া এবং আজ পর্য্যন্ত সমুদয় সময়, খিলাফৎ মোস্লেমদের ন্যায় বিস্মৃতিগহ্বরে মগ্ন ছিল। মোস্লেম জগৎ ইতিহাসপৃষ্ঠায় খিলাফতের চিরবিশ্রাম-লাভ বিনাবাক্যব্যয়ে গ্রহণ করিবে।'

—

মুসলমান দেশসকলে স্বাজাতিকতার উদয়

ইউরোপ ও আমেরিকার রাষ্ট্রগুলি, সমস্তই, কাজে যাহাই হউক, নামে খৃষ্টিয়ান্ লোকদের রাষ্ট্র। তাহারা সকলেই খৃষ্টিয়ান্ বলিয়া পরিচিত হইলেও, প্রত্যেকের স্বতন্ত্র জাতীয়তা ও স্বতন্ত্র আইনাদি আছে। মুসলমান দেশসকলের অবস্থা ঠিক্ এইরূপ ছিল না; কিন্তু ক্রমশঃ তাহা হইতেছে।

ইস্লামের রাষ্ট্র ধর্ম্মশাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার সমুদয় আইনকানুন্ কোরান্ শরিফের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু কোন কোন মুসলমান দেশে এইসব বিষয়ে পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইণ্টারন্যাশন্যাল্ রিভিউ অব্ মিশন্স্ নামক ত্রৈমাসিক কাগজে ডাক্তার সী আর্ ওয়াট্‌সন বলিতেছেন, এখন অধিকাংশ মোস্লেম দেশে অপরাধের দণ্ড ঠিক্ ইস্লামের বিধি অনুসারে হয় না। চোরদের হাত কাটিয়া ফেলা হয় না। ব্যভিচারে ধৃতা নারীকে পাথর ছুঁড়িয়া মারা হয় না। সরকারী

বিচার কার্য্য এখন আর ঠিক্ ইস্‌লামিক আদর্শ অনুযায়ী নহে। সেইরূপ, বাণিজ্যিক আইনের উপরও এরূপ আধুনিকতাপাদক প্রভাব পড়িয়াছে যাহা মোস্‌লেম রাষ্ট্র-বাদের বিরুদ্ধ। মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে বিবাদের মীমাংসার জন্য এমনসব আপীল আদালত স্থাপিত হইতেছে যাহাতে মোস্‌লেম্ রাষ্ট্রের সমুদয় আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ করা হইতেছে। যে গণ্ডীর মধ্যে কাজী ধর্ম্মবিধি প্রয়োগ করিতে পারেন, তাহা ক্রমেই সংকীর্ণতর করা হইতেছে। ইউরোপীয় ছাঁচে ঢালা নূতনরকম আইন রচিত ও গৃহীত হইতেছে; তাহারা অধিক-হইতে-অধিকতর রূপে কোরানিক বিধির প্রাধান্য রহিত করিতেছে।

তিনি মিশরের নূতন রাষ্ট্রীয় কন্‌ষ্টিটিউশনের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে, "মিশরের সমুদয় অধিবাসী আইনের চক্ষে সমান; সকলের রাষ্ট্রীয় ও অন্য অধিকার সমান, এবং সকলেই জাতি-ভাষা-ও ধর্ম্ম-নির্বিশেষে সার্ব্বজনিক দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য পালন করিতে বাধ্য।" ইহার মানে ঠিক্‌মত বুঝিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে, যে, মিশরে বিস্তর খৃষ্টিয়ানের বাস। তাহারা ঐ দেশেরই পুরুষানুক্রমিক অধিবাসী।

মরোক্কো, টুনিসিয়া, আল্‌জীরিয়া, মিশর, সীরিয়া, সর্ব্বত্রই রাষ্ট্রীয় জীবনকে শাস্ত্রীয় বিধি হইতে মুক্ত করিয়া পার্থিব ভিত্তির উপর স্থাপন করা হইতেছে। তুরস্কের ত কথাই নাই।

আগে মোস্‌লেম্ রাষ্ট্রের কোন ভৌগোলিক সীমা ছিল না। পৃথিবীর যেখানে যে-কোন মুসলমান আছেন, তিনিই মুসলমান রাষ্ট্রের সভ্য, এইরূপ মনে করা হইত। এখন এক-এক দেশের মুসলমানদের চিন্তা ও স্বার্থবোধ তাহদের দেশের সীমার মধ্যে আবদ্ধ ও কেন্দ্রীভূত হইতেছে।

লেখক ডাক্তার ওয়াট্‌সন্ নানা দৃষ্টান্ত দ্বারা এইসব কথা বুঝাইয়াছেন

—

বড়োদার মহারাজের দান

হিন্দু দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনা অধ্যয়ন ও আলোচনার নিমিত্ত বড়োদার মহারাজা বিশ্বভারতীকে বার্ষিক ছয় হাজার টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। তিনি ভারতীয় ইতিহাসের গবেষণা ও বড়োদাতে তদ্বিষয়ক বক্তৃতা প্রদান জন্য বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা বিশেষ কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য নহে। ইতিমধ্যে অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এই টাকা এবং অতিরিক্ত কিছু পাইয়াছেন। মহারাজার বিদ্যোৎসাহ প্রশংসীয়।

—

আপিঙের চাষ কমান চাই

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের শীঘ্রই এই প্রস্তাব ধার্য্য করা উচিত, যে, কেবল চিকিৎসা ও বৈজ্ঞানিক কাজের জন্য যাহা আবশ্যক, তার চেয়ে বেশী আফিং উৎপন্ন করা হইবে না। শীঘ্রই লীগ্ অব্ নেশ্যন্‌স্ আফিঙের বিষয় আলোচনা করিবেন। অতএব, আর বিলম্ব করা উচিত নয়। নেশার জন্য আফিঙ বিক্রী ও ব্যবহার একেবারে বন্ধ করা চাই

খিলাফতের অস্তিত্বলোপ

(১)

খিলাফতের "আফৎ" চুকিল। কমাল পাশা জবর চাল চালিয়াছেন। যুবক তুর্ক রোজই এক-একটা নয়া দিকে হাত দেখাইতেছে। এশিয়ায় শেষ পর্য্যন্ত তুর্কীরাই জাপানীদের চেয়েও বেশী ইজ্জত পাইবার যোগ্য হইয়া উঠিল। আঙ্গোরা যুগান্তরের পর যুগান্তর আনিয়া এশিয়া-বাসীকে বাঁচিবার পথ দেখাইয়া দিতেছে। ভারতের হিন্দু-মুসলমান যুবা তুর্কীর "ভবিষ্যবাদ" ও বিপ্লবতন্ত্রের মর্ম্ম পূরাপূরি বুঝিতে পারিলে হয়।

১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে যুবক তুর্ক সুলতান বাহাদুরকে দেশ হইতে খেদাইয়া দেয়। কিন্তু কাগজে-কলমে আইনতঃ তখনও রাজতন্ত্র তুলিয়া দেওয়া হয় নাই।

পুরাপুরি খোলাখুলি গণতন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে এক বৎসর পর ১৯২৩ সালের অক্টোবর মাসে।

তুর্কীর বাদ্‌শা একাধারে রাজা এবং পুরোহিত। অর্থাৎ ইহজগতের বাদ্‌শাগিরি এবং ধর্ম্মজগতে মোহন্ত-গিরি দুইয়েই সুলতানের সমান এক্তিয়ার। এইধরণের দেশ-শাসক এবং ধর্ম্মগুরু কোনো এক ব্যক্তি জগতের কুত্রাপি নাই। মধ্যযুগেও খৃষ্টিয়ান্‌রা মাঝে মাঝে এইরূপ সীজার-পোপ লইয়া তক্‌রার করিয়াছে।

(২)

যুবক তুর্ক বাদ্‌শাকে তাড়াইয়া সুল্‌তানের ঐহিক ক্ষমতাগুলা রাষ্ট্রীয় মহাসভার (পার্ল্যামেণ্টের) হাতে দিয়াছিল। কিন্তু সুল্‌তানের ধর্ম্মক্ষমতা লইয়া কি করিবে সে সম্বন্ধে এতদিন সলা পাকিয়া উঠে নাই। কোনো উপায়ে কাজ চালাইবার জন্য ইহারা বাদ্‌শার ভাইকে ডাকিয়া বলিল—"আবদুল মজিদ্‌ তুমিই আমাদের পর-লোকের ভাবনাটা ঘাড় পাতিয়া লও। আমরা তোমাকে খলিফা বাহাল করিলাম। কিন্তু সাবধান দেশ-শাসকের কাজে মাথা ঘামাইতে চেষ্টা করিও না।"

আব্‌দুল মজিদ্‌ বাদ্‌শাহী-হীন খলিফাগিরি করিতে থাকেন। আজকাল রোমান ক্যাথলিক্‌ খৃষ্টিয়ান্‌ মহলে রোমের পোপ যেরূপ আব্‌দুল মজিদ্‌ চোদ্দপনর মাস ধরিয়া সেইরূপ ইজ্জত ভোগ করিলেন। কন্‌ষ্টাণ্টি-নোপ্‌লেই ইহার গদি।

কিন্তু কমাল পাশার দক্ষিণ হস্ত ইস্‌মেত পাশা গণতন্ত্রকে তুর্কী সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মোতায়েন আছেন। ইনি দেখিলেন বাদ্‌শাহতন্ত্রের স্বপক্ষে তুর্কী মহলে এখনো বহু নরনারী আন্দোলন চালাইতেছে। অধিকন্তু যতদিন পুরানো বাদ্‌শার ভাই ধর্ম্মগুরুর পদে অধিষ্ঠিত ততদিন সেই বংশের স্বপক্ষে ঘোঁটমঙ্গল বন্ধকরা অসাধ্য। কাজেই আঙ্গোরার পার্ল্যামেণ্ট্‌ সাব্যস্ত করিল,—ওস্‌মান বংশকে নির্ব্বংশ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। আব্‌দুল মজিদ্‌কে খলিফাগিরি হইতে বরখাস্ত করা হইল মার্চ্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে (১৯২৪)।

(৩)

এক মাত্র আবদুল মজিদ্‌ নয়, ওস্‌মান বংশের নবাব-বেগম, শাহজাদা-শাহজাদী, কুমার-কুমারী যে যেখানে আছে সকলকে রাতারাতি কন্‌ষ্টাণ্টিনোপ্‌ল এবং তুর্কীর অন্যান্য নগর হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া পার্ল্যামেণ্ট্‌ নিশ্চিন্ত হইয়াছে। মোটের উপর বত্রিশ জন রাজপুত্র এবং উনচল্লিশ জন বেগম সাহেবাকে বিনা বাক্যব্যয়ে "পত্রপাঠ" গাঁটুরি-বোঁচ্‌কাসহ বিদায় করা হইল। সকলকেই কয়বেশী পেন্সন দেওয়া হইবে।

আবদুল মজিদকে নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই। তাঁহাকে বনবাসে পাঠাইবার জন্য সাধারণতন্ত্রের অটোমোবিল হাজির ছিল। সরকারী কর্ম্মচারী সেই অটোমোবিলে বসিয়াই কিছু "রাহাখরচ" দিয়া গিয়াছে। আবদুল মজিদ্‌ সশরীরে সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। জেনেভা হ্রদের কিনারায় তেরিতেৎ পল্লীতে স্বাস্থ্যভোগ চলিতেছে।

তুরস্ক হইতে ফরাসী সংবাদদাতারা প্যারিসের "তঁ" কাগজে সংবাদ পাঠাইয়াছেন। মোট কথা এই:—"যুবক তুর্ক দেশটাকে পুরোপুরি নবীন বা বর্ত্তমান যুগোপযোগী করিয়া ছাড়িবে। তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। ধর্ম্মকর্ম্ম বিষয়ক মন্ত্রীর পদ তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ধর্ম্মবিদ্যালয়-গুলা চাপা দেওয়া হইতেছে। মোল্লাদের এক্তিয়ার খর্ব্ব করা হইতেছে। ধর্ম্মজীবনে যা-কিছু সবই মামুলি মন্ত্রীর দপ্তরখানার একটা বিভাগে শাসিত হইতেছে।"

স্মীর্না নগরের এক প্রতিনিধি শুক্রী বে অতি পুরামাত্রায় "ভবিষ্যবাদী"। ইনি ইস্‌মেৎ কমাল ইত্যাদির চেয়েও আধুনিক। পুরানা আমলের যা-কিছু সবই বর্জ্জন যাহাতে সম্ভব হয় সেই দিকে ইনি দল পুরু করিতেছেন।

আঙ্গোরার জননায়কগণ পার্ল্যামেণ্টে খোলাখুলি বলিতেছেন—"খিলাফৎ তুরস্কের সর্ব্বনাশ করিতেছে। খিলাফতের হুজুগে মাতিয়া যুবক তুর্ক স্বদেশী আন্দোলন ঢিল দিয়াছিল। একটা তথাকথিত প্যান্‌-ইস্‌লাম্‌ বা বিশ্বমুসলানের হিড়িকে পড়িয়া আমরা দেশের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কোথায় মরক্কো, কোথায় মিশর, কোথায় ভারত, কোথায় জাবা। এইসকল দেশের মুসলমানদের সঙ্গে না আছে আমাদের ভাষার মিল, না আছে জাতির বা রক্তের মিল, না আছে কোনোপ্রকার সামাজিক বা ঐতিহাসিক ঐক্য। অথচ খলিফার মোহে এইসকল বিদেশী এবং বিজাতীয় লোকের সঙ্গে ভ্রাতৃভাব চালাইবার জন্য আমাদের শক্তির অপব্যয় হইয়াছিল। খিলাফৎ তুর্কীর চরম শত্রু। খিলাফৎ উঠাইয়া দিয়া আমরা এখন হইতে ষোল কলায় স্বদেশী হইতে সচেষ্ট হইব।"

(৫)

অতএব খিলাফৎ তুলিয়া দিয়া যুবক তুর্ক প্রথমতঃ গণতন্ত্রের শাসন রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ দেশের শাসন কার্য্যে ধর্ম্মের প্রভাব একদম লুপ্ত করা তাহাদের উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ ধর্ম্মকর্ম্মকে স্বদেশ-সেবার এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার ও জনগণের স্বরাজের তুলনায় অতি নীচু ঠাঁই দেওয়াই আঙ্গোরা সরকারের কৃতিত্ব।

তৃতীয়তঃ তুর্কীরা ধর্ম্মের ঐক্য নামক বস্তুকে রাষ্ট্র-নীতিতে কোনো দাম আর দিবে না।

মুসলমানেরা "বিদেশী"। তাহারা নিজ নিজ দেশের সেবা করুক আর তুর্কীরা স্বদেশের কাজে প্রাণ সমর্পণ করুক, এই নীতি খিলাফৎ-ধ্বংসের গোড়ার কথা। আধুনিকতা হিসাবে যুবক তুর্কের এই মতই চরমতম সন্দেহ নাই।

খৃষ্টিয়ান্ জগতের সর্ব্বত্র এই মত চলিতেছে। ফরাসীরাও খৃষ্টিয়ান্, ইংরেজও খৃষ্টিয়ান, রুশও খৃষ্টিয়ান্, জার্ম্মানও খৃষ্টিয়ান্। কিন্তু তাহা বলিয়া কেহই একটা তথাকথিত বিশ্বখৃষ্টিয়ান্ জগতের ধ্বজা উড়ায় না। ইহারা সকলেই নিজ নিজ জননী জন্মভূমির সেবা করে। আর স্বদেশের সেবা করিবার জন্যই এক দেশের খৃষ্টিয়ান্ অন্য দেশের খৃষ্টিয়ানের বিরুদ্ধে লড়ে। ইহাই আন্তর্জ্জাতিক লেনদেনের অ, আ, ক, খ। এই বিদ্যায় হাতে খড়ি দিবার জন্য দুনিয়ার মুসলমানকে আঙ্গোরার যুবক বীরদের সাগরেতি করিতে হইবে।

(৬)

বাদশাকে খেদাইয়া দিবার পর হইতে তুর্কীরা জগতের অনেক মুসলমানের অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। গ্রীসকে লড়াইয়ে হঠাইয়া যুবক তুর্ক গোটা প্রাচ্য জগতে—মুসলমান এবং অমুসলমান সর্ব্বত্র—যুগপ্রবর্ত্তকরূপে পূজা পাইতেছিল। কিন্তু গোঁড়া মুসলমানেরা নয়া তুর্কের গণতন্ত্র হজম করিতে বড় রাজি নয়।

তাহার উপর খলিফাকে খেদানো এবং খিলাফৎ প্রথাটাই তুলিয়া দেওয়া কমাল-ইস্মেৎ ইত্যাদির পক্ষে অতিবুদ্ধি বা যথেচ্ছাচারের চরম-কিছু সন্দেহ নাই। দুনিয়ার মোল্লারা তুর্কীর এই বাড়াবাড়ি বরদাস্ত করিতে প্রস্তুত আছে কি? কখনই নয়।

ভারতীয় মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষিত সমাজে বোধ হয় কমসে কম দশ আনা লোক তুর্কীর গণতন্ত্রে খুসীই আছে। অবশ্য একদল নিরক্ষর যাহারা তাহারা বাদশাতন্ত্র গণতন্ত্র ইত্যাদি বুঝেসুঝে কি না সন্দেহ। গ্রীকদিগকে হারাইয়া দেওয়া কমাল পাশার বীরত্ব। সেই বীরত্বের জের কোথায় গিয়া ঠেকিতেছে তাহার হিসাব রাখা জনসাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়।

কিন্তু খলিফাগিরি ভাঙিয়া গেলে ভারতীয় খিলাফৎওয়ালারা কি করিবেন? এই খিলাফৎওয়ালাদের ভিতর চরমশিক্ষিত গণতন্ত্রপন্থী ভবিষ্যবাদী লোকও আছেন অনেক যে। এইবার তাঁহাদের পরীক্ষা উপস্থিত। ভারতের খিলাফৎ-সেবক মুসলমানেরা প্যান্ইস্লামভক্ত কি স্বদেশভক্ত তাহার বাচাই করিতেছেন কমাল পাশা। তুর্কীরা ঘর-মুখো দেশনিষ্ঠ হইল। অন্যান্য দেশের মুসলমানদিগকেও তাহারা ঘর-মুখো দেশনিষ্ঠ হইতে উপদেশ দিতেছে। জাতীয়তা, এক-রাষ্ট্রীয়তা, স্বদেশপ্রিয়তা এশিয়ায় জয়-জয়াকার লাভ করিতে চলিল।

(৭)

সমস্যা উপস্থিত। যুবক তুর্ক বলিতেছে:—"ওস্মান বংশের হাতে যে খলিফাগিরি ছিল সেই খলিফাগিরি এখন হইতে আঙ্গোরার পার্ল্যামেন্টের হাতে থাকিবে। কাজেই তুর্কী এখনও খিলাফতের কেন্দ্র।"

কিন্তু মক্কার মোহন্তকে তাহার ছেলেপুলে এবং পেটোয়ারা খিলাফতের গদিতে বসাইয়া ফেলিয়াছে। ইনি বলিতেছেন—"আমি স্বয়ং পয়গম্বর মহম্মদের লাগালাগি পরিবারেরই এক বংশধর। আমার পূর্ব্ব পুরুষ ওস্মান বংশ কর্ত্তৃক খিলাফৎ চুরির পূর্ব্বে খলিফাগিরি করিয়াছে।"

কিন্তু ফরাসী কাগজে বলিতেছে:—"না। তাহা হইতে পারে না। মক্কার মোহন্ত আজকাল আরব দেশের তথাকথিত রাজা। ইহাঁকে রাজপদে বসাইতেছে কে? ইংরেজ। বৃটিশ সাম্রাজ্যের গোলামি করা ইহাঁর স্বধর্ম্ম। ইংরেজের নিকট হইতে ইনি লাখ লাখ টাকা পেন্‌শ্যন পাইতেছেন। আরব-রাজকে খলিফার পদে বসাইয়া ইংরেজ জাতি মুসলমান মুল্লুকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ক্ষমতা বাড়াইবার ফিকির ঢুঁড়িতেছে।" খিলাফতের মক্কাযাত্রায় রাষ্ট্র-নীতির কৌটিল্যেরা গোঁফে চাড়া মারিতেছেন।

(৮)

কোরান্ শরীফের বয়েৎ যাঁহারা বুঝেন অথবা এই-সবের টীকাটিপ্পনী লইয়া যাহারা পাণ্ডিত্য করেন তাঁহারা বলাবলি করিতেছেন:—"মুসলমানদের খলিফা হইবার উপযুক্ত একমাত্র লোক সে যে পূরাপুরি স্বাধীন দেশের মালিক। আরব-রাজ ভারতীয় জনসাধারণ অথবা ভারতীয় নবাব-আমীরদের মতনই পরাধীন। কাজেই ইহাঁর দাবি নামঞ্জুর।"

ইহাঁদের মতে তুর্কী, পারস্য এবং আফ্গানিস্থান আসল স্বাধীন মুসলমান রাষ্ট্র। কিন্তু পারস্য সুন্নিমতের বিরোধী। কাজেই হয় আফ্গান আমীর না হয় তুর্কীর বর্ত্তমান গবমেণ্ট অর্থাৎ গণতন্ত্রের পার্ল্যামেণ্টই খিলাফৎ ভোগ করিতে অধিকারী।

এদিকে ঈজিপ্টের লোকেরা স্বদেশের রাজাকে খিলাফতের পদে তুলিতেছে। মজার কথা কিন্তু এই যে ওস্মান বংশাবতংস আবদুল মজিদ্ সুইট্জার্ল্যাণ্ডের স্বাস্থ্যনিবাস হইতে ইস্লাম ধর্ম্মাদিগের নিকট ইস্তাহার ভেজিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই:—"ভাইসকল, তোমরা আমাকে ভুলিও না। আমি এখনো তোমাদের খলিফাই আছি। খিলাফৎ হইতে আমাকে আঙ্গোরা গবর্মেণ্ট জোরজবরদস্তি করিয়া তাড়াইয়াছে। আমি খিলাফৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করি নাই।"

যাহা হউক, মুসলমান মহলে অনৈক্য দেখা দিয়াছে। ইহাতে এশিয়ার কোনো ক্ষতি নাই।

[illegible]
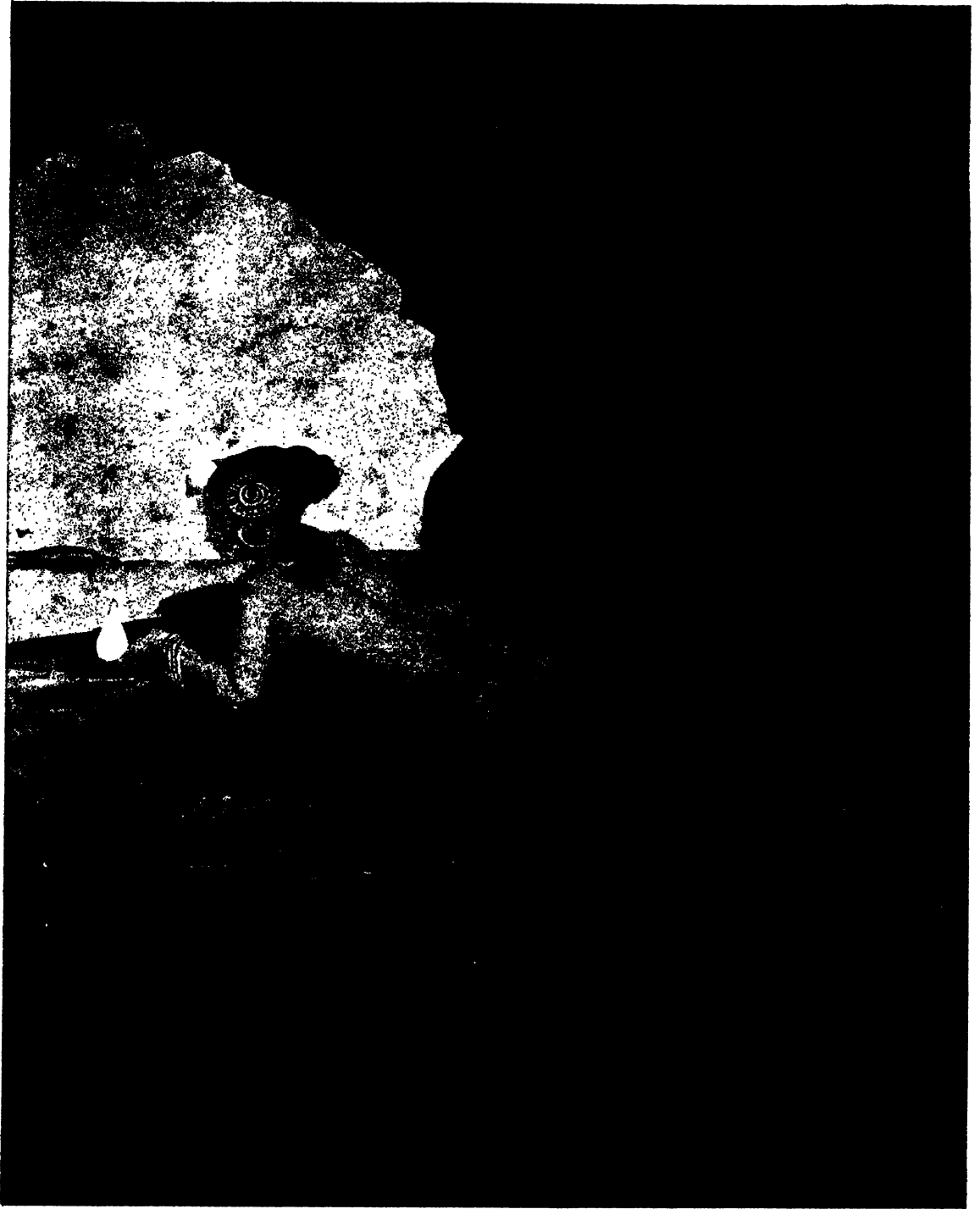
মৎস্যনারী

চিত্রকর—শ্রীবীরেশ্বর সেন

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৪শ ভাগ
১ম খণ্ড

আষাঢ়, ১৩৩১

৩য় সংখ্যা

বেঠিক পথের পথিক

[এই কবিতাটির অকারান্ত সমস্ত শব্দকে হসন্ত-রূপে গণ্য করিতে হইবে ও কবিতাটি দাদরা তালে পড়িতে হইবে।]

বেঠিক্ পথের্ পথিক্ আমার্
অচিন্ সে জন্ রে!
চকিত্ চলার্ ক্বচিৎ হাওয়ায়
মন্ কেমন্ করে।
নবীন্ চিকন্ অশথ্ পাতায়
আলোর্ চমক্ কানন্ মাতায়
যে রূপ্ জাগায় চোখের্ আগায়
কিসের্ স্বপন্ সে!
কি চাই, কি চাই, বচন্ না পাই
মনের্ মতন্ রে!

অচিন্ বেদন্ আমার্ ভাষায়
মিশায় যখন্ রে
আপন্ গানের্ গভীর্ নেশায়
মন্ কেমন্ করে!
তরল্ চোখের্ তিমির্ তারায়
যখন্ আমার্ পরাণ্ হারায়
বাজায় সেতার্ সেই অচেনার্
মায়ার্ স্বপন্ যে!
কি চাই কি চাই সুর্ যে না পাই
মনের্ মতন্ রে!

হেলায় খেলায় কোন্ অবেলায়
হঠাৎ মিলন্ রে।
সুখের্ দুখের্ দুয়ের্ মেলায়
মন্ কেমন্ করে।
বঁধুর্ বাহুর্ মধুর্ পরশ্
কায়ায় জাগায় মায়ার্ হরষ্,
তাহার্ মাঝার্ সেই অচেনার্
চপল্ স্বপন্ যে,
কি চাই, কি চাই, বাঁধন্ না পাই
মনের্ মতন্ রে!
প্রিয়ের্ হিয়ার্ ছায়ায় মিলায়
অচিন্ সে জন্ যে!
ছুঁই কি না ছুঁই বুঝি না কিছুই
মন্ কেমন্ করে।
চরণে তাহার্ পরাণ্ বুলাই
অরূপ দোলায় রূপেরে দুলাই;
আঁখির্ দেখায় আঁচল্ ঠেকায়
অধরা স্বপন্ যে!
চেনা-অচেনায় মিলন্ ঘটায়
মনের্ মতন্ রে।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কয়লার কেরামতি

"কয়লা ধুলে ময়লা যায় না"। অনেককাল ধরিয়া এই ঋষি-বাক্যটি কয়লার প্রতি অযথা অশ্রদ্ধা ও অবহেলা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে। কিন্তু পাশ্চাত্যের আধুনিক রাসায়নিক ঋষিরা এই কুৎসিত কালো কয়লার বহিরাবরণ মোচন করিয়া তার অন্তর হইতে যে বিচিত্র তথ্য-রসের ধারা আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাতে পূর্ব্বোক্ত প্রবাদবাক্যটি মিথ্যা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে।

এই কয়লার সঙ্গে বর্ত্তমান মানব-সভ্যতা ওতপ্রোত-ভাবে সংশ্লিষ্ট। কয়লা হইতে প্রভূত পরিমাণে আল্‌কাত্‌রা (coal tar) প্রস্তুত হয়। আর সেই আল্‌কাত্‌রা হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় একদিকে যেমন হাজাররকমের নয়ন-বিমোহন রঞ্জন-দ্রব্য-সম্ভার (dye-stuffs) যাহা শরতের নীলাকাশ, বসন্তের বিচিত্র প্রসূন-রাশি, নানাবিধ চিত্তরঞ্জন সুগন্ধি (scents and perfumes), ও মানবের কল্যাণকারী ভেষজাদি নিয়ত প্রস্তুত হইতেছে, অপরদিকে তেম্‌নি ধ্বংসের শেল-সম মারাত্মক বিস্ফোরক প্রভৃতি জিনিষও তৈরি হইতেছে। এই যে মরণাপন্ন রোগীর শিয়রে শিশি-ভরা ঔষধ, এই যে পুঞ্জীভূতমরণ-বটিকা ডিনামাইট্‌, এই যে পারিজাতগন্ধী পরিমল-রাশি, এমন কি এই যে নীরস-লেখনী-প্রক্ষিপ্ত মসীধারা, এর এক-একটি অণু-পরমাণু হয়ত লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে অদৃশ্য কার্ব্বনিক এ্যাসিড্‌ভাবে এই পৃথিবীর আকাশে বাতাসে বিরাজ করিত। তার পর উদ্ভিদ তাহাকে সূর্য্যকিরণের সাহায্যে আহার্য্য-রূপে গ্রহণ করিয়া নিজের দেহ পুষ্ট করে। তার পর একদিন প্রকৃতির ধ্বংসের লীলা সুরু হয়। বড় বড় অরণ্যানী এই আবর্ত্তনে পড়িয়া ভূগর্ভে চাপা পড়ে ও পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ তাপের প্রভাবে অঙ্গারে পরিণত হয়। আর সেই অঙ্গারই আমাদের কালো কয়লা!

এই'ত গেল কয়লার জন্মের ইতিহাস।

খনিজ কয়লা হইতে কোক্‌ কয়লা (coke) ও গ্যাস্‌ (coal gas) তৈরি হয়। বড় বড় লৌহ-নির্ম্মিত গ্যাস্‌-নিষ্কাশক-নল-যুক্ত পাত্রে কয়লা খুব উত্তপ্ত করা হয়; এরূপ করিবার সময় পাত্রের ভিতরে বায়ুর প্রবেশ রোধ করিয়া দেওয়া হয়। তাপের প্রভাবে উক্ত কাঁচা কয়লা নানাবিধ পদার্থে রূপান্তরিত হয়; তন্মধ্যে প্রধান কোক্‌ কয়লা, দ্রবীভূত ক্ষারিন্‌ বায়ু (liquid ammonia), আল্‌কাত্‌রা (coal tar) ও কোল্‌ গ্যাস্‌। অতঃপর নানাবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা এগুলিকে পৃথক্‌ ও শোধন করা হয়। কোক্‌ কয়লা ও গ্যাস্‌ জ্বালানীরূপে আলোক উৎপাদনের জন্য ও অন্যান্য বহু প্রয়োজনীয় কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। এমোনিয়াকে গন্ধক দ্রাবক (Sulphuric acid) দ্বারা এমোনিয়ম্‌ সালফেট্‌ নামক একপ্রকার লবণজাতীয় পদার্থে পরিণত করিয়া অতি উত্তম সার-(manure) রূপে ব্যবহার করা হয়। একটা কথা এখানে বলা আবশ্যক যে, কোক্‌ কয়লা ও গ্যাসের পরিমাণ প্রয়োজনানুরূপ বর্দ্ধিত করা কিংবা কমান যায়। কম তাপে কোকের পরিমাণ ও উচ্চ তাপে গ্যাসের পরিমাণ অধিক হয়।

আজ এই আল্‌কাত্‌রাকে অবলম্বন করিয়া পৃথিবীর নানা দেশে নানা বিরাট্‌ কার্‌খানা গড়িয়া উঠিয়াছে, কোটি কোটি টাকা, লক্ষ লক্ষ নর-নারী এই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইয়াছে। এক কথায় বর্ত্তমান মানব তাহার ঐহিক সুখের অনেকখানির জন্য কালো-আল্‌কাত্‌রার নিকট ঋণী। কিন্তু এমন একদিন ছিল যখন "কোক্‌ কয়লা" ও "কোল্‌ গ্যাসের" কার্‌খানার মালিকগণ এই আল্‌কাত্‌রাকে একটা বিরাট্‌ জঞ্জাল ও আপদ্‌ মনে করিত ও ইহাকে লইয়া কি করা যায় তাহা ভাবিয়া পাইত না। আর সেই আল্‌কাত্‌রা আজ রসায়নের যাদুমন্ত্র-বলে অভিনব রূপ গুণ রস গন্ধে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়া মানুষের ঐহিক সুখ-সুবিধা-সাধনে নিয়োজিত হইয়াছে।

কিন্তু কিরূপে এ অসম্ভব সম্ভবে পরিণত হইল সে-সম্বন্ধে গোড়াতেই দুই-একটি কথা বলিয়া রাখিতেছি।

ইহা পূর্ব্বেই জানা ছিল যে আল্‌কাত্‌রাকে বিশেষ আকার-বিশিষ্ট কোন পাত্রে রাখিয়া তাপের সাহায্যে পরিস্রুত (distill) করিলে "ন্যাপথা" (coal tar naptha) নামক মেটে তৈল-জাতীয় এক-প্রকার পদার্থ পাওয়া যায় ও ইহা জ্বালানীরূপে এবং আলো-উৎপাদনার্থে ব্যবহার করা যায়। বস্তুতঃ এই "ন্যাপথা" (coal tar naptha) হইতেই মনীষী ইংরেজ রাসায়নিক ফ্যারাডে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে বিশুদ্ধ বেন্‌জিন্ (Benzene) প্রস্তুত করেন। ইহা অতি তরল ও সহজ-দাহ্য। অতঃপর ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে জর্জ্জ্ ম্যানস্‌ফিল্ড্ নামক একজন ইংরেজ যুবক রাসায়নিককে এই ন্যাপ্‌থার রহস্য-ভেদের জন্য নিয়োজিত করা হয়। ম্যানস্‌ফিল্ড্ বহু গবেষণার পর আবিষ্কার করিলেন যে আল্‌কাত্‌রার পরিস্রবণ-কালে (during the process of distillation) তাপের ক্রমিক উচ্চতা-অনুসারে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি প্রথম পাত্র হইতে পরিস্রুত হইয়া পাত্রান্তরে জমা হয়, যথা—বেন্‌জিন্ টলুয়িন্ (Toluene), জাইলিন (Xylene), কার্ব্বলিক্ অ্যাসিড্, ন্যাপ্‌থালিন্, অ্যান্‌থ্রাসিন্, (anthracene) ও lubricating oils; আর প্রথম পাত্রে আল্‌কাত্‌রার স্থানে "পিচ্" নামক একপ্রকার কালো পদার্থ অবশিষ্ট থাকে এবং ইহা হইতে বার্ণিস ও জুতার কালি হয়, ও রাজপথ ধূলি-শূন্য করার কাজে ও কাষ্ঠ-সংরক্ষণের কাজে ইহা জ্বালানীরূপে ব্যবহৃত হয়।

ম্যান্স্‌ফিল্ড্ তখন দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলেন যে এই আল্‌কাত্‌রার পরিস্রবণ-কার্য্যের সহিত ভবিষ্যৎ মানব-জাতির ভাগ্য ও সুখ-স্বচ্ছন্দ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। অতঃপর তাঁহার চেষ্টায় উক্ত কার্য্যের জন্য একটি বিরাট্ কার্‌খানার প্রতিষ্ঠান হইল ও কাজকর্ম্ম উত্তমরূপেই চলিতে লাগিল। কিন্তু ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে একদিন অসাবধানতা-বশতঃ তৈলে আগুন লাগিয়া যায়। চোখের সাম্‌নে সাধের প্রতিষ্ঠানটি বিনষ্ট হইয়া যায় দেখিয়া অসীম সাহসে ম্যান্স্‌ফিল্ড্ আগুন নিবাইতে যাইয়া আর ফিরিতে পারেন নাই। এইরূপে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে একটি অমূল্য জীবনের অবসান হয়। আজ যে-শিল্পের জন্য কোটি কোটি মুদ্রা ও লক্ষ লক্ষ নর-নারী নিয়োজিত, তার সাফল্যের মূলে যে একটি ইংরেজ যুবকের জীবনাহুতি নিহিত আছে তাহা হয়ত অনেকেই জানেন না।

ঠাণ্ডা বেন্‌জিন্ নাইট্রিক্ ও সাল্‌ফিউরিক্ এ্যাসিডের মিক্‌শ্চার মিশাইলে নাইট্রো বেন্‌জিন্ (Nitro-benzene) নামক এক-প্রকার সুগন্ধ তৈল প্রস্তুত হয়। ইহা নানাবিধ সুগন্ধি-করণ-কার্য্যে ব্যবহৃত হয়, বিশেষতঃ সাবান প্রস্তুত করায়। ইহাই "মিরেবেন্ এসেন্স্" (Essence mirabane). আবার ইহাকে Vanilline নামক পদার্থের সহিত মিশাইয়া "White heliotrope" নামক অত্যুৎকৃষ্ট সুগন্ধি দ্রব্যটি প্রস্তুত হয়। কিন্তু অ্যানিলিন্ (Aniline) প্রস্তুত কার্য্যেই নাইট্রো বেন্‌জিন্ প্রধানতঃ আবশ্যক হয়। কুচি কুচি করিয়া কাটা-লৌহ ফলক ও হাইড্রোক্লোরিক্ এসিডের সহিত নাইট্রো বেন্‌জিন্ মিশাইয়া উত্তমরূপে নাড়িলে aniline তৈরি হয়। অতঃপর জলীয় বাষ্পদ্বারা ইহাকে শোধন করা যায়। নানাবিধ রঞ্জন দ্রব্য প্রস্তুত করার জন্য বৎসরে বৎসরে লক্ষ লক্ষ মণ Aniline আজ প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু মানুষের তৈরী সর্ব্বপ্রথম কৃত্রিম রংয়ের আবিষ্কারের একটু ইতিহাস এই প্রসঙ্গে বলা দর্‌কার মনে করি।

যে-সময়ের কথা বলিতেছি তখন কুইনিন্ অতি উচ্চ মূল্যে বিক্রী হইত। ঠিক এই সময়ে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ডাঃ উইলিয়ম্ পার্কিন নামক অষ্টাদশ-বর্ষ-বয়স্ক একটি বালক কুইনিন্ আবিষ্কার কার্য্যে নিযুক্ত হয়। একজন অপরাহ্ণে সারাদিনের পরিশ্রমে ব্যর্থ-মনোরথ ও নিরুৎসাহ হইয়া পার্কিন্ যে-সব ঔষধপত্র লইয়া কাজ করিতেছিলেন তাহার সকলগুলিই একটি পাত্রে মিশাইলেন ও তৎক্ষণাৎ অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সহিত দেখিতে পাইলেন যে অতি-মনোহর উজ্জ্বল রং বিশিষ্ট এক-প্রকার পদার্থ পাত্রের নীচে জমা হইয়াছে। ইহাই সুবিখ্যাত মভ্ (mauve) বা মেজেণ্টা (magonta) রং। এই আবিষ্কারের কথা তখন দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িল। অতঃপর রাসায়নিকদের অদম্য চেষ্টায় একটি একটি করিয়া হাজাররকমের রং আবিষ্কৃত হইয়াছে ও সে-সব প্রস্তুত করার জন্য বিরাট্

কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। একটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট হইবে —জার্ম্মেনীর এল্‌বারফিল্ডে বায়ার কোম্পানীর যে রংয়ের কারখানাটি আছে কেবলমাত্র তাহাতেই প্রায় ১৫ হাজার লোক নিযুক্ত আছে। পার্কিন মেজেণ্টা আবিষ্কার করিবার পরে স্বপ্নেও কি ভাবিয়াছিলেন যে একদিন তাঁর এই সামান্য আবিষ্কারকে অবলম্বন করিয়া একশ কোটি টাকা মূলধনের শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে ?

১৮১৯ খৃষ্টাব্দে গার্ডেন নামক একব্যক্তি আল্‌কাত্‌রা হইতে ন্যাপ্‌থালিন্ আবিষ্কার করেন। সেই ন্যাপ্‌থালিন্ আজ সারা দুনিয়ার ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছে। প্রত্যহ লাল নীল সবুজ গোলাপী কতরকমের মনোহর রং ও সাংঘাতিক সাংঘাতিক বিস্ফোরক যে এই সামান্য ন্যাপ্‌থালিন্ হইতে তৈরী হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ডুমা ও লঁরে নামক ফরাসী রাসায়নিকদ্বয় আল্‌কাত্‌রা হইতে এ্যান্‌থ্রাসিন্ (Anthracene) নামক এক-প্রকার পদার্থ আবিষ্কার করেন। আমরা যে-সময়ের কথা বলিতেছি তাহার বহু পূর্ব্ব হইতে ফ্রান্স রুশিয়া তুর্কী পারস্য ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে লক্ষ লক্ষ বিঘা ভূখণ্ড জুড়িয়া মঞ্জিষ্টার আবাদ হইত ও এই মঞ্জিষ্টার গাছের শিকড় হইতে কোটি কোটি টাকা মূল্যের Atizarin বা Turkey-red নামক এক-প্রকার লাল রং প্রস্তুত হইত। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে গ্রাবে ও লিবারম্যান্ (Grabe and Libermaun) নামক দুইজন জার্ম্মান্ রাসায়নিক আবিষ্কার করিলেন যে anthracene হইতে অতি সহজে ও সস্তায় Atizarin তৈরী করা যায়। এই যুগান্তরকারী আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী হইতে মঞ্জিষ্টার আবাদ তিরোহিত হইল। যে-শিল্পের দ্বারা বিভিন্ন দেশের লক্ষ লক্ষ নর-নারী জীবিকা অর্জ্জন করিত আজ তাহা একমাত্র জার্ম্মানীর হস্তগত হইল। "একটি আবিষ্কারে প্রভো, একটি আবিষ্কারে"—দিকে দিকে হাহাকার উঠিল। দুদিন পূর্ব্বে যে Anthraceneএর মূল্য ছিল মণ-প্রতি কয়েক পয়সা মাত্র, ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের পরে তাহার মূল্য প্রায় ২।৩ শত গুণ বাড়িয়া গেল।

আপনারা সকলেই রঞ্জনদ্রব্যের প্রপিতামহ "নীলের" (Indigo) কথা অবগত আছেন। হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে মিশরে ও ভারতবর্ষে নীলের চাষ ও ব্যবহার হইত। অতঃপর ইউরোপেও ইহার প্রবর্ত্তন হয়। মিশরের ও ভারতের বিশাল ভূখণ্ড ব্যাপিয়া এই নীলের আবাদ হইত। তার পর আধুনিক কালে এই নীলের চাষের সঙ্গে ভারতের যে লাঞ্ছনা, যে অপমান ও হৃদয়-বিদারক দুঃখের কাহিনী ও নির্দ্দয় নীলকর সাহেবদিগের যে নিষ্ঠুরতা ও কলঙ্কের ইতিহাস জড়িত আছে—তাহা স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের "নীল-দর্পণ" যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারা সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ব্যায়ার নামক একজন জার্ম্মান্ রাসায়নিক আবিষ্কার করিলেন যে আল্‌কাত্‌রা হইতে প্রাপ্ত পদার্থ-বিশেষ হইতে এই নীল তৈরি করা যায়। কিন্তু এইরূপে প্রস্তুত কৃত্রিম নীলের মূল্য প্রকৃতিজাত নীলের মূল্যের চেয়ে অনেক বেশী। অতঃপর জার্ম্মানীর Badeische aniline and soda fabrik নামক একটি কোম্পানী এ-বিষয়ে গবেষণার ভার গ্রহণ করেন। প্রায় ১৫ বৎসর ব্যাপিয়া অজস্র অর্থব্যয় ও অনেক উঁচুদরের রাসায়নিকদের অদম্য চেষ্টার পর সস্তায় অতি উৎকৃষ্ট নীল প্রস্তুতের উপায় আবিষ্কৃত হইল। এইরূপে অদ্যাবধি প্রায় ২০০০ হাজার রকমের রং আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রকৃতি-রাজ্যে এমন একটি রংও নাই, যাহার অনুকরণে রাসায়নিক অসমর্থ হইয়াছে।

বস্তুতঃ এই যে এত-সব অসম্ভব অলৌকিক ব্যাপার আজ সম্ভবপর হইয়াছে তাহার মূলে প্রধানতঃ জার্ম্মান-জাতির উদ্ভাবনী শক্তি, অলৌকিক প্রতিভা, অদম্য অধ্যবসায় ও উৎসাহ, মনীষা ও অমানুষিক কর্ম্মকুশলতা। আজ ইহাদের আবিষ্কারগুলিকে অবলম্বন করিয়া দেশে দেশে বিরাট্ শিল্পের প্রতিষ্ঠান হইয়াছে। বস্তুতঃ এক ইংলণ্ডেই বৎসরে এত রং তৈরি হয় যে যদি তাহা দ্বারা একফুট চওড়া কোন বস্ত্রখণ্ডকে রঞ্জিত করা যায় তবে তাহার দৈর্ঘ্য এত বেশী হইবে যে তাহা পৃথিবীকে ২০০০ বার বেষ্টন করিতে পারে বা পঁচিশবার পৃথিবী এবং চন্দ্রে যাতায়াত করিতে পারে।

কিন্তু শুধু কি রং! প্রতিবৎসর কোটি কোটি টাকা

মূল্যের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধাদি এই আল্‌কাত্‌রা হইতে প্রস্তুত হইতেছে। রাসায়নিকগণ প্রথমতঃ কুইনিন্ প্রস্তুত-মানসেই এই কার্য্যে ব্রতী হন কিন্তু এ-বিষয়ে যদিও আশানুরূপ সাফল্য লাভ হয় নাই তবুও আনুষঙ্গিক অনেক ঔষধ এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। Thallin ও Kairein নামক ঔষধ দুইটি এই আবিষ্কারের ফল। প্রথমোক্তটি এক-প্রকার সাংঘাতিক জ্বরের অতি উত্তম প্রতিষেধক, কিন্তু বিশেষ কোন কারণে আজকাল আর ইহা ব্যবহৃত হয় না। অতঃপর ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে Dr. Knorr Antipyrine নামক জ্বর-প্রতিষেধক ঔষধটি আবিষ্কার করেন। ইহা কুইনিনের চেয়েও উপকারী এবং সস্তা। কিন্তু অচিরেই acotanilide নামক আর একটি ঔষধ দৈবযোগে আবিষ্কৃত হইল যাহা Antipyrine হইতে কোন অংশে হীন নহে। ব্যাপারটি এই—জার্ম্মানীর Strassburg বিশ্ববিদ্যালয়ে Kann and Hopp নামক দুইজন চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহাদের এক বন্ধু কোন এক Antipyrineএর কার্‌খানায় রাসায়নিকের কার্য্য করিত। একদা চর্ম্মরোগে আক্রান্ত একটি রোগী উক্ত চিকিৎসক-দ্বয়ের নিকট উপস্থিত হয়। তখন তাঁহারা এই রোগে ন্যাপ্‌থলিন্‌এর আভ্যন্তরীণ প্রয়োগের (Internal application) কার্য্য পরীক্ষা করিতে মনস্থ করিয়া ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত কার্‌খানায় এক বোতল ন্যাপ্‌থলিন্ চাহিয়া পাঠান। কিন্তু ভুলক্রমে ন্যাপ্‌থলিনের পরিবর্ত্তে Acetanilide নামক পদার্থটি পাঠান হয়। চিকিৎ-সকদ্বয় বিনা দ্বিধায় এই ঔষধ প্রয়োগের পর দেখিতে পাইলেন যে ইহাতে যেরূপ আশা করিয়াছিলেন, ফল তাহার ঠিক বিপরীত ফলিয়াছে; রোগীর দেহের তাপের মাত্রা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কমিয়া গিয়াছে কিন্তু চর্ম্মরোগের কিছুই হয় নাই। ইহাতে তাঁহারা বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। অতঃপর এই ঔষধ ফুরাইয়া গেলে তাঁহারা পুনরায় আরও কিছু ঔষধ চাহিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু এবার যাহা আসিল তাহার কার্য্যকারিতা পূর্ব্বের ঔষধের কার্য্যকারিতা হইতে বিভিন্ন। তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন কোথাও কোন ভুল হইয়াছে। পরে অনুসন্ধানে জানা গেল, প্রথম বারে Acetanilide ও দ্বিতীয় বারে ন্যাপ্‌থালিন্ পাঠান হইয়াছিল। এইরূপে এক কার্‌খানার একটি বালক ভৃত্যের ভুলের জন্য মানবের মহাকল্যাণকর একটি ঔষধ আবিষ্কৃত হইল।

অতঃপর Phenacetine, Lacetophenin, Phenocoll-Veronal, Sulphonal প্রভৃতি ঔষধ একে একে আবিষ্কৃত হইল। Stovtaine Cocaine, Navo-Cocaine প্রভৃতি "স্থানীয় সংজ্ঞা লোপক" (Local anaesthetic) ঔষধগুলির কার্য্যকারিতা আরও আশ্চর্য্যজনক। কয়েক ফোঁটা ঔষধ দেহের অংশ-বিশেষে প্রবেশ করাইয়া দিলে (Inject) তাহা বিবেদন (Insensible to Pain) হইয়া যায়। এইরূপে বেদনাহীন শল্য-চিকিৎসা ও দন্ত-উৎপাটন প্রভৃতি অনেক কঠিন কার্য্য সহজ-সাধ্য হইয়াছে। মানুষ কিছুদিন পূর্ব্বে যাহা কল্পনাও করিতে পারিত না রাসায়নিক তাহাও কার্য্যে পরিণত করিয়াছে। সেটি হইতেছে "বিনা রক্তপাতে শল্য-চিকিৎসা" (bloodless surgery)। আজ যদি Shakespeare বাঁচিয়া থাকিতেন তবে তাঁহার Merchant of Venice নামক নাটক-খানার আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইত ও Shylockকেও এমন করিয়া আদালতে অপদস্থ ও অপ্রতিভ হইতে হইত না। বিনা রক্তপাতে সেদিন এক পাউণ্ড্ মাংস দেহ হইতে কাটিয়া লওয়া অসম্ভব ছিল কিন্তু আজ তাহা সম্ভবপর হইয়াছে। Adrenaline নামক যে ঔষধটি পরোক্ষে আল্‌কাত্‌রা থেকেই প্রস্তুত হয় তাহা দেহের অংশ-বিশেষে সামান্য পরিমাণে প্রবেশ করাইয়া দিলে সে-স্থানের সবটুক্ রক্ত স্থানান্তরে চলিয়া যায় ও বিনা রক্তপাতে সেখানে অস্ত্র-চালনা করা যায়। Mettylene blue নামক যে মনোহর রংটি আল্‌কাত্‌রা হইতে তৈরি হয় তাহা নালী ঘায়ের পক্ষে খুব উপকারী।

এইবারে আর-একটি অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কারের কথা বলিয়াই ঔষধের কাহিনী শেষ করিব। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জার্ম্মানীর John Hopkins বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক Ira Remsen Fahlberg নামক তাঁহার এক যুবক ছাত্রকে আল্‌কাত্‌রা সম্বন্ধে গবেষণা কার্য্যে নিযুক্ত করেন। একদা সারাদিন পরিশ্রমের পর গৃহে ফিরিয়া Fahlberg চা ও রুটি খাইতে গিয়া দেখিলেন

তাহা এত মিষ্ট যে মুখে দেওয়া যায় না। তিনি আবার চিনি খাইতে মোটেই পছন্দ করিতেন না। বিরক্ত হইয়া তাঁহার পরিচারিকাকে এত অধিক চিনি দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল সে চিনি দেয় নাই। তখন তাঁহার মনে হইল তবে কি আমার হাতেই মিষ্টি আছে নাকি! এই বলিয়া অঙ্গুলি লেহন করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে সত্যই তাঁহার হাতই মিষ্টি। তখনই Laboratoryতে ফিরিয়া যে-সব জিনিষ লইয়া সেদিন কাজ করিয়াছিলেন তাহার ভিতর হইতে এই অদ্ভুত মিষ্ট জিনিষটি আবিষ্কার করিলেন—ইহাই সুবিখ্যাত (Saccharine) স্যাকারিন্। ইহা চিনি হইতে প্রায় ৫৫০ গুণ বেশী মিষ্টি। অর্থাৎ এক সের Saccharine মিষ্টত্ব-হিসাবে প্রায় ১৪ মণ চিনির সমান। বহুমূত্র-রোগীর পক্ষে চিনি ব্যবহার বড় সাংঘাতিক, কিন্তু তাহারা নির্ভয়ে এই স্যাকারিন ব্যবহার করিয়া থাকে। দেহের ভিতর ইহার কোনও পরিবর্ত্তন হয় না ও অবিকৃত অবস্থায় মলের সঙ্গে দেহ হইতে নির্গত হয়। তা ছাড়া ইহার "পচন-নিবারক" (Antiseptic Power) ক্ষমতাও আছে। ফল, জ্যাম্, জেলী প্রভৃতি জিনিষ চিনি দ্বারা মিষ্ট করিলে অতি অল্পকালের ভিতরেই পচিয়া যায়, কিন্তু স্যাকারিনে অভিষিক্ত করিলে বহুদিন অবিকৃত থাকে।

অতঃপর বহুল পরিমাণে স্যাকারিন্ প্রস্তুতের জন্য বিরাট্ কারখানা প্রস্তুত হইল। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর যাবতীয় দেশের চিনির কারখানার মালিকগণ ব্যতিব্যস্ত ও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। দেশের গভর্ণমেণ্ট দেখিলেন যে, যদি এই চিনির কারখানাগুলি উঠিয়া যায় ও খুব সস্তা স্যাকারিন্ সে-স্থান দখল করে তবে আপাততঃ এই শান্তির দিনে বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না। কিন্তু কোনও দিন যদি জার্ম্মানীর সহিত যুদ্ধ বাধে ও জার্ম্মানী স্যাকারিন্ রপ্তানি বন্ধ করিয়া দেয় তবে সমস্ত জাতিটাকে না খাইয়া মরিতে হইবে। এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া গভর্ণমেণ্ট উক্ত স্যাকারিনের উপর অতি উচ্চ হারে শুল্ক বসাইলেন ও ঔষধ ছাড়া অন্য কোন গৃহস্থালীর কাজে ইহার ব্যবহার আইননিষিদ্ধ করিয়া দিলেন। এই বিধি-নিষেধের একটি কুফল হইল এই যে, বহু নর-নারী ভয়ানকরকমের জুয়াচুরি আরম্ভ করিল। পুরুষেরা কাপড়, জামা প্রভৃতি ও নারীরা নিজেদের গাউন, সেমিজ, রুমাল প্রভৃতি স্যাকারিনে ভিজাইয়া ও শুকাইয়া দেশান্তরে চালান দিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। কিছুদিন এইরূপভাবে চলিল। কিন্তু অবশেষে দেশের শুল্ক-বিভাগের (customs) সতর্ক দৃষ্টিতে সে জুয়াচুরি ধরা পড়ে।

অবশেষে আর-একটি জিনিষের কথা উল্লেখ না করিলে আল্‌কাত্‌রার প্রতি অবিচার করা হইবে;—সেটি হইতেছে সুগন্ধি দ্রব্য (Perfumes)। আজ এই রসায়নের যুগে সুগন্ধি দ্রব্যের জন্য মানুষকে প্রকৃতির দ্বারস্থ হইতে হয় না। আজ গোলাপী আতর হইতে আরম্ভ করিয়া হাজার-রকমের উপাদেয় এসেন্স্, আতর প্রভৃতি রাসায়নিকের কারখানায় কৃত্রিম উপায়ে বহুল পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে —এবং ইহার বেশীর ভাগই আবার দুর্গন্ধ আল্‌কাত্‌রা হইতে। মানুষ কি স্বপ্নেও একদিন ইহা ভাবিয়াছিল? মিরেবেন এসেন্সের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। Ionone নামক সুবাসটির গন্ধ এত তীব্র যে উহার ছোট এক শিশিতে ছোট খাট একটি সহরকে ভায়লেট্ ফুলের গন্ধে আমোদিত করিতে পারে। যদিও প্রকৃতি-জাত গোলাপী আতর প্রায় বিশরকমের বিভিন্ন সুবাসের সংমিশ্রণে গঠিত তবুও লাইপ্‌জিগের (Leipzig) মনীষী রাসায়নিকগণ তাহারও অবিকল নকল করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তীব্র অনুভূতি-সম্পন্ন ব্যক্তিও এতদুভয়ের পার্থক্য অনুধাবন করিতে অসমর্থ। Jasmine, Heliotrope, Vine-blossom, Lilac, Lily of the Valley প্রভৃতি হাজার-রকমের সুবাসের অনুকরণে পণ্ডিতগণ সমর্থ হইয়াছেন। এক জার্ম্মানীতেই বৎসরে ন্যূনকল্পে ৩ কোটি টাকা মূল্যের সুবাস-দ্রব্য কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হইতেছে।

সুগন্ধি পরিমল ও প্রাণঘাতক বিস্ফোরকে—জীবন-মরণ তফাৎ। কিন্তু তবু এই উভয় বস্তুই একই আল্‌কাত্‌রা হইতে প্রস্তুত হইতেছে। কার্ব্বনিক্ এ্যাসিড্ প্রভৃতি যে-সব জিনিষ আল্‌কাতরা হইতে পাওয়া যায় তাহা হইতে Dynamite, Cordite, Mellinite, Lyddite প্রভৃতি বজ্রতুল্য বিস্ফোরকাদি এমন কি ধূমহীন বারুদ

পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইতেছে। লিখিবার ও ছাপার কালি, আলোক-চিত্র পরিস্ফুট করিবার ঔষধাদি, বার্ণিশ, লাক্ষা (Shellac), অম্বর (amber), কৃত্রিম শিং, তাড়িতের বহিঃসঞ্চারণ-রোধক বস্তু (Electric insulator) প্রভৃতি হাজাররকমের দ্রব্যসম্ভার কয়লাজাত আল্‌কাত্‌রা হইতে প্রস্তুত হইতেছে ও মানবজাতির সুখ-সমৃদ্ধি দিন দিন পরিবর্দ্ধন করিতেছে।*

শ্রী যোগেন্দ্রমোহন সাহা

* Martin's "Modern Chemistry and Its Wonders" নামক গ্রন্থাবলম্বনে।

আমোদ

(১)

ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ডাকিয়া জমিদার হরকিঙ্কর রায় বলিলেন, "প্রসন্নকুমারকে আপনি ডেকে নিন, আর উচ্চ-শিক্ষার উচ্চ আশাটা ছেড়ে দিন"—একটি দীর্ঘ পত্র তাঁহার সম্মুখে প্রসারিত করিয়া তাহার খানিকটা অঙ্গুলি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিলেন "পড়ুন এইখান্‌টা" ও সঙ্গে-সঙ্গে হস্তপদাদি গুটাইয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিলেন।

প্রদর্শিত অংশটুকু পড়া শেষ হইলে চিঠিখানি মুড়িয়া এবং তদ্দ্বারা কপালে দুই-তিনবার আঘাত করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন "এই কপাল, কপাল; আমি চেষ্টা কর্‌লে কি হবে, হর? তা তুমি যখন এতদূর ঠেলে'-ঠুলে' আন্‌লে তখন পাশটা করিয়ে দাও, না হ'লে তোমারও পণ্ডশ্রম। তার পরে টেরী বাগিয়ে শিগ্‌রেট খেয়ে, যা খুসি তাই করে' মরুক্‌গে। বলে—'কপালে লিখিতং ধাতা—'"

রায় মহাশয় কথায় জোর দিবার নিমিত্ত জাজিমের উপর নখ দিয়া একটা অর্দ্ধচন্দ্র টানিয়া বলিলেন, "আর একটি পয়সা আমার হ'তে হবে না ঠাকুর মশায়, কড়ি দিয়ে উঞ্ছবৃত্তি বাড়ান রায়-বংশের কুষ্ঠিতে লেখেনি। আপনি ডেকে নিন্; এখনও জাত-ব্যবসায় লাগান। না হয়, পারেন—পড়ান, সে কথাও মন্দ নয়।"

'সে কথা' মন্দ না হইলেও হরকিঙ্করকে টেক্কা দিয়া "সে কথা" কার্য্যে পরিণত করার বিপদ্ ভট্টাচার্য্য মহাশয় চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তবে তাই হোক্, যাই একটা চিঠি লিখে'ও দিতে। নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মার্‌লে আর আমি কি কর্‌ব?"

(২)

তল্পী-তল্পা-সমেত বাড়ী আসিয়া প্রসন্নকুমার যখন পিতাকে প্রণাম করিল, তিনি আশীর্ব্বাদের বিনিময়ে তাহার মাথাটা ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলেন ও সেথায় হাল্‌ফ্যাশা'নর কোন পরিচয় না পাইলেও চৈতন্যের অন্তর্ধান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ফাষ্টো কেলাসে টিকি মানায় না, না বাবা?"*

প্রসন্ন কোনপ্রকার উত্তর করিতে সাহস করিল না। তারু নাপিত হাজির ছিলই, প্রসন্ন কাপড়-চোপড় ছাড়িলে সে, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আদেশমত গোক্ষুরপ্রমাণ একগোছা টিকি মাথার মাঝখানে ছাড়িয়া বাকিটা বেশ করিয়া কামাইয়া দিল। প্রসন্ন একবার মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল "ব্যাপার কিরে?"

তারু নাপিত বলিল, "বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে; তোমার মাথার টিকি কোথায় দাদা-ঠাকুর?"

প্রসন্ন গলাটা আরও নামাইয়া বলিল, "বাবাকে বলিস্‌নে; বিশু দুষ্টুমি করে' কেটে দিয়েছে। আমি ঘুমিয়ে ছিলুম আর—"

তারু বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের বিশ্বম্ভর রায় মহাশয়ের ছেলে?"

প্রসন্ন বলিল "আবার কে?"

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রসন্নের আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে,

তাহার পাঠ-জীবন শেষ হইয়া গিয়াছে। সকলের মূলে যে বিশ্বম্ভর তাহাও তাহার জানিতে ও বুঝিতে দেরী লাগিল না।

সন্ধ্যা হইতে ইতস্ততঃ করিতে করিতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আহারাদির পর প্রয়োজনমত সাহস সঞ্চয় করিয়া প্রসন্ন বলিল, "বাবা আমার ত কোন দোষ নেই; বিশু নিজে ফেল করে' ৩।৪ জন মিলে' আমার পেছনে লেগেছে।" পিতাকে নিরুত্তর দেখিয়া সে পুনরায় বলিল, "এ একটা বছর আমি ছেলে পড়িয়ে চালিয়ে নেব না হয়।"

পিতা তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "জমিদারের সঙ্গে টেক্কা দেয় কি, বাবা? বাপ্‌পিতেমো যা' করে' এসেছে তাই করো; আর দুঃখ করে' কি হবে?

অর্দ্ধেক রাত্রি-পর্য্যন্ত বই-গুলাকে বুকে চাপিয়া প্রসন্ন ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিল।

পরদিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে প্রসন্নকে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিতে হইল। প্রাতঃকৃত্যের বর্দ্ধিত-কলেবর ফর্দ্দটি সমাপন করিতে প্রায় ৭টা হইয়া গেল। তাহার পর দাওয়ার উপর এক কুশাসন পাতিয়া তাহাকে "পুরোহিত-দর্পণের" গোড়া'র বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করিতে হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় উঠিয়া গেলে, সে পা টিপিয়া টিপিয়া দুয়ার পর্য্যন্ত গমন করিল এবং তিনি অনেকটা দূর চলিয়া গেলে ঘরের মধ্যে গিয়া তাহার অতীতের পাঠ্য-পুস্তক-গুলিকে অনেকক্ষণ ধরিয়া অসীম বাৎসল্যের সহিত থাকে থাকে গুছাইয়া সিন্দুকে ভরিতে লাগিল। দু-একটা মলাটের উপর কয়েক বিন্দু অশ্রু যখন চেষ্টা-সত্ত্বেও ঝরিয়া পড়িল তখন আর সেখানে তিষ্ঠান তাহার দায় হইয়া উঠিল। বাবার আসিবার সময় হইয়া আসিয়াছিল। চক্ষের সমস্ত জল টিপিয়া বাহির করিয়া চক্ষু দুইটা ভাল করিয়া মুছিয়া সে আসনের উপর 'পুরোহিতদর্পণ' হইতে পড়িতে লাগিল "ওঁ গজেন্দ্রবদনম্ চারুচন্দ্রনিভাননম্—"

পঞ্চম দিবসের পড়া ধরিয়া উৎসাহভরে ভট্টাচার্য্য মহাশয় পত্নীকে বলিলেন, "গিন্নি, এই পূর্ণিমায় রায়-বাড়ীর সত্যনারায়ণ পূজো পরশা করবে; লোককে বল্‌তে হবে—'হ্যা নারাণ ভট্টাচার্য্যের পৌত্র বটে।'"

পূর্ণিমায় রায়বাড়ীর সত্যনারায়ণ পূজার পুরোহিত প্রসন্নই হইল। বিপুল উৎসাহ-ভরে ভট্টাচার্য্য মহাশয় পুত্রের বর্দ্ধিত শিখায় একটি সপুষ্প গ্রন্থি দিয়া তাহার উর্দ্ধাঙ্গ বিধিমত চন্দন-চর্চ্চিত করিয়া দিলেন।

(৩)

পূজার দালানের এক কোণে বিশ্বম্ভর ও তাহার বন্ধুদ্বয় কর্ত্তার অগোচরে থাকিয়া বেজায় চাপা হাসি সুরু করিয়া দিয়াছিল। হাসিতে হাসিতে বিশ্বম্ভরের গায়ে গড়াইয়া সত্যেন বলিল, "আমি ভাব ছি, কবেই বা ওর টিকি-গাছটা গজাল, কবেই বা বড় হ'ল, আর কবেই বা পত্রে পুষ্পে সুশোভিত হ'য়ে উঠ ল।"

হাসির মধ্যে তাহার পিঠে এক চাপড় কষিয়া বিশ্বম্ভর বলিল, "দূর পাষণ্ড, তবে আর ব্রহ্মতেজ বলি কাকে?"

ইহাতে হাসির মাত্রা এতটা বাড়িয়া গেল যে প্রসন্নের কানেও একটু আওয়াজ পৌছিল।

ব্রহ্মতেজের কথায় সত্যেন বলিল "ঐ-তেজেই ত হাতের কুশ-গাছটা শুকিয়ে গেছে। আবার আঙ্গুলের কায়দা দেখিয়ে হাত চালানো দেখ.।"

সত্যেন বিশ্বম্ভরের দেহ হইতে পীতাম্বরের দেহে লুঠাইয়া পড়িয়া বলিল, "তাই ত আমিও ভাব্‌ছি। এখন, ও কসরৎ দেখাচ্ছে কি ভেল্কি দেখাচ্ছে বল্ তোরা; আমার সংশয় দূর কর্।"

প্রসন্নের উপর দৃষ্টি সংবদ্ধ করিয়া বিশ্বম্ভর বলিল, "কেয়া মানিয়েছে দেখেছিস্, যেন বুড়ো ঠাকুরাদাদাটি—"

বাধা দিয়া সত্যেন বলিল, "কিছু না, ওকে পুরো বৃদ্ধ সাজাতে পারে শর্ম্মা; আমার মাথায় একটা খাঁও মতলব এসেছে।"

বিশ্বম্ভর ও পীতাম্বর সৌৎসুক্যে সত্যেনের মুখের নিকট মুখ আনিয়া বলিল, "কি সেটা বল্ শীগ গির, তোর প্রসন্ন ভট্টাচার্য্যের দিব্যি।"

সত্যেন আবার হাসিতে ভাঙিয়া পড়িয়া বলিল, "ওকে—ওকে গুরুমশায় কর্—সোনায় সোহাগা হবে; অমন বুড়ো সাজ্‌তে আর অন্য কেউ পারে না।"

এ-মতলবের পুরস্কার-স্বরূপ সত্যেন যে একটা প্রচণ্ড চড় বক্‌শিস্ পাইল, তাহাতে তাহার মুখটা ক্ষণিকের জন্য

বিকৃত হইয়া গেল। সত্যেন যে একটা জিনিয়াস্ এ-বিষয়ে বিশ্বম্ভর ও পীতাম্বরের মতভেদ রহিল না।

পরদিন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলে বিশ্বম্ভর তাঁহাকে বলিল যে তাহার বাবা প্রসন্নের প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ হইয়া পড়িয়াছিলেন। আর এটা তাহাদেরও স্বপ্নের অগোচর ছিল যে প্রসন্নটা এমন উৎরাইয়া যাইবে। কাল প্রসন্নের কথাই ভাবিতে ভাবিতে তাহার একটা কথা মনে পড়িয়া গেল—প্রসন্ন একটা পাঠশালা খুলিলে পারে না? এতে পয়সাও আছে, লেখা-পড়ার চর্চ্চাটাও থাকিয়া যাইবে, আর সবদিকেই ভাল। এই আমাদের বাড়ী হইতেই ত এক পাল ছাত্র পাইবে।

বাটী যাইতে যাইতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভাবিতে লাগিলেন—প্রসন্নটা সত্যই খুব বাঁচিয়া গিয়াছে; এমন শুভার্থী যে বিশ্বম্ভর সে কি মিথ্যা দোষারোপ করিয়া পিতাকে পত্র লিখিতে পারে?

বিশ্বম্ভর প্রভৃতির আগ্রহে ও উদ্যমে গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায়, বারোয়ারী পূজার আটচালার এক পার্শ্বে পাঠশালা বসিল; পিতৃভক্ত প্রসন্ন নবীন জীবনের উৎসাহের শিখাটি একেবারে নিভাইয়া গুরু-গিরি সুরু করিয়া দিল।

মাস-খানেক পরে সত্যেন একদিন পাঞ্জাবী, পম্‌সু পরিয়া একটা ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে প্রসন্নের পাঠশালায় হাজির হইল।

প্রসন্ন অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল।

একটু হাসিয়া সত্যেন বলিল "সবই ভুলে' গেলি, এই ত তুই। তা তুই না বল্‌লেও এই আমি বস্‌লুম।"

প্রসন্ন অপ্রস্তুত হইয়া বলিল "তুই আস্‌বি আমি স্বপ্নেও ভাবিনি; আজ চার মাস একটা খবর নিস্‌নে—

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সত্যেন বলিল বেশ, বল্; প্রসন্ন, আজ চার মাস বিশুর সঙ্গে মন-কষাকষি, আর আজ স্পষ্টাস্পষ্টি হ'য়ে গেল—শুধু তোকে নিয়ে।"

প্রসন্ন জিজ্ঞাসা করিল "কিরকম?"

"কিরকম আর কি?—বিশুকে তুইও চিন্‌লি, আমিও চিন্‌লাম। যাক্ সে-সব কথা। প্রসন্ন, তুই এই গুরুগিরি ছাড় আজই। আমি তোর খরচ দেব, আবার স্কুলে ফিরে' চল্, সবাই আপশোষ করে তোর জন্যে।"—শেষ-কালের কথাগুলি সত্যেন বলিল প্রসন্নের হাত ধরিয়া, নিতান্ত আগ্রহ-ভরে।

মলিন হাসি হাসিয়া প্রসন্ন বলিল "আর হয় না ভাই, অনেক এগিয়েছি।"

সত্যেন নিরাশভাবে হাতটা ছাড়িয়া দিল, বলিল "কি আর বল্‌ব তবে? এই-দিকেই উন্নতি কর্।" অতঃপর একটা বালকের দিকে চাহিয়া বলিল "যাও ত খোকা, গুরু-মশায়ের বাড়ী বলে' এস তাঁর একজন বন্ধু আজ খাবে।" প্রসন্নকে বলিল "আজ একেবারে চটাচটি, আমি স্পষ্ট বল্‌লুম একজনের জীবনটা নষ্ট করা তোর অন্যায়। ওর আর মুখ দেখ্‌ছিনে।"

প্রসন্ন চুপ করিয়া রহিল।

পাঠশালের চারিদিকে চাহিয়া সত্যেন বলিল "তোর পাঠশালের একটা ঘর থাকা দর্‌কার। কোন জিনিষ-টিনিষ রাখ্‌তে হ'লে, ঘাড়ে ক'রে বাড়ী না নিয়ে গিয়ে এই-খানেই রেখে দিলি। ঐ কোণটায় ঠিক হবে।"

প্রসন্ন বলিল, "কোন দর্‌কার হয় না ভাই।"

"একটা ঘর থাক্‌লে তার আর দর্‌কার হয় না? কি বলিস্। এই ধর্ ঝড়বৃষ্টির দিনেও ত ছেলে-গুলোকে পুর্‌তে পার্‌বি, বর্ষা আস্‌ছে। আরও কত কাজে লাগ্‌তে পারে। লাগিয়ে দে, জান্‌লি? আর খরচের ভারটা রইল আমার ওপর। এই ছোট-ছোট ছেলেদের একটু উপকার কর্‌তে পার্‌লে আমি যদি একটু সুখ পাই ত তুই আমায় বঞ্চিত কর্‌বি?"

প্রসন্ন লজ্জিত হইয়া বলিল "না, না, কি বলিস্ তুই।"

সেই দিনই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রসন্নের পাঠশালার এক কোণে দরমার বেড়া-দেওয়া একটা ছোট্ট ঘর খাড়া হইল।

হাসিতে হাসিতে বিশ্বম্ভরের সম্মুখীন হইয়া সত্যেন বলিল "নে বক্‌শিস্ কর্; মজাটা জমিয়ে এনেছি।"

আগ্রহের সহিত বিশ্বম্ভর প্রশ্ন করিল "কি করে' এলি শুনি?"

বিজয়োৎফুল্ল-ভাবে সত্যেন বলিল "পরশার তামাক খাবার ঘর খাড়া করে' দিয়ে এলাম,—যা ছাড়া গুরুমশায় মিছে।" "আরে ধ্যাৎ, তোর সেই জিন হয়েছে এখন ঘোড়া হ'লেই হয়। আগে হাতে হুঁকো তোলা।"

"হুঁকো ত ধরেছে বল্‌লেই হয়। আচ্ছা তুই বল্, যে-দিন তামাক টানাতে পার্‌বে, সে-দিন ওকে ডেকে সত্যনারায়ণের পূজো দেওয়াবি ?—কর্ মানসিক।"

সত্যেন খুব হাসিতে লাগিল।

বিশ্বম্ভর বলিল "এ আর শক্ত কথা কি? কিন্তু ওকে তামাক-ধরান সোজা নয় বলে, দিলাম।"

"আর সে-তেজ নেই চাঁদের; তবে আর গুরুমশায় বানালুম কেন?"

বিশ্বম্ভর তবুও সন্দিগ্ধভাবে মাথা নাড়িতে লাগিল।

সত্যেন বিরক্তির ভাণ করিয়া বলিল "একেই বলে অনধিকার চর্চ্চা; সে ভাবনা ত তোর নয় বাপু। কালে ওকে আমি বোতল ধরাব। তুই মহা-সমারোহে পূজোর আয়োজন কর্।"

পরদিন সত্যেন প্রসন্নের পাঠশালায় উপস্থিত হইল। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই রাত্রে বিশ্বম্ভরের বাড়ীতে থাকার জন্য জবাবদিহি দিল "আমি সন্ধ্যের সময় জামা কাপড় আন্‌তে যেতেই আমার হাত ধরে' বস্‌ল; কোন মতেই আস্‌তে দেবে না। বলে 'বল ক্ষমা কর্‌লি?' বড় মুস্কিলে পড়ে' গেলাম। শেষে বল্‌লুম আমি থাক্‌তে পারি, যদি নিজের কাজের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করিস্—"

প্রসন্ন হাসিয়া বলিল "কি আর এমন করেছে বিশু? তোর আবার—"

সত্যেন বলিল "না; তুই বুঝিস্‌নে, প্রসন্ন, আমি বড় বদ্‌লোক্। যাক্ যখন অমন করে' বল্‌লে তখন ওর ওখানে থাকা যাক্, কি বল্?" "নিশ্চয়।"

ছাত্রদের প্রতি নজর ফিরাইয়া সত্যেন বলিল "আমায় গোটা-কতক ছেলে দে, নিয়ে বসি। ভারি মহৎ কাজ তোর প্রসন্ন।

তিন-চারিটি ছেলেকে পড়াইয়া উঠিবার সময় সত্যেন বলিল "খাটুনি আছে তোর।"

তৃতীয় দিবস এইরূপভাবে পড়াইয়া কেরোসিনের বাক্সতে ঠেস্ দিয়া সত্যেন বলিল "বড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়্‌তে হয়। কিন্তু তবু ত ছাড়্‌তে পার্‌ছিনে, বেশ লাগ্‌ছে।" একটু চুপ করিয়া গলা নামাইয়া আবার বলিল "তুই যদি কিছু মনে না করিস্ ত, প্রসন্ন, একটা হুঁকো কিনে' এই ঘরটিতে রেখে দিই; একটা বদ্ অভ্যেস হ'য়ে গেছে জানিস্‌ই ত।

প্রসন্ন বেশি আপত্তি করিল না।

সন্ধ্যার সময় সত্যেন হুঁকা, তামাক, টিকা, দেশলাই প্রভৃতি ঘরের কোণে রাখিয়া আত্ম-গ্লানির স্বরে বলিল "পাপ, পাপ একটা, কখনও ধরিস্‌নে প্রসন্ন।"

এই উপদেশ-বাক্যে প্রসন্ন সন্তুষ্ট হইল।

তাহার পর সত্যেন ঘরে ঢুকিয়া বাহির হইয়া আসিয়া স্বস্তির "আঃ" উচ্চারণ করিলে প্রসন্নের মনটা কিরূপ হইতে লাগিল ও তাহার পর কর্ম্মের অন্তে ও ক্রমে মধ্যে প্রসন্নের শরীরটাও কিরূপ 'ম্যাজ ম্যাজ' করিতে লাগিল ও তামাকের গন্ধেই যেন কতকটা আরাম বোধ হইতে লাগিল এবং অবশেষে প্রায় সপ্তাহকাল মনের সহিত যুদ্ধের পর একদিন সমস্তদিন অঙ্ক কষাইয়া শরীরটা এলাইয়া পড়ায় সত্যেন তাহাকে দুইটি টান দিতে ও সে গ্রহণ করিতে কিরূপে বাধ্য হইয়াছিল এবং দুই টানের বেশি দিতে ও গ্রহণ করিতে উভয়েই কিরূপ দ্বিধা-বোধ করিয়াছিল সে-সব কথা বাঙ্গালী পাঠককে না বলিলেও চলে।

মোট কথা প্রসন্ন একদিন তামাক ধরিল। জমিদার বাড়ীতে একদিন সত্যনারায়ণ পূজাও হইল।

পূজার অন্তে প্রসন্ন-পুরোহিতের সামনে একটি সজ্জিত হুঁকো গম্ভীরভাবে ধরিয়া সত্যেন দুই বন্ধুকে একচোট খুব হাসাইল।

(৪)

গোপনের চেষ্টা-সত্ত্বেও এ-কথাটা আর' একজন বোধ হয় জানিল। সে ক্ষান্ত। শুধু ক্ষান্তের মনেই একটু আঘাত লাগিল।

সে প্রসন্নের পাঠশালার একটি ছাত্রী। নূতন নয়; প্রায় সুরু হইতে সেও পড়ে। তবে দৈনিক পোড়ো নয়। নিজের ও ভাইয়ের অসুখ মিলাইয়া তাহাকে গড়ে এক সপ্তাহ উপস্থিতির পর এক সপ্তাহ অনুপস্থিত থাকিতে হয়। ইহার উপর যে তাহার কোন হাত নাই, সংসারের অবস্থা-জ্ঞাপন-প্রসঙ্গে এ-কথা সে গুরুমহাশয়কে একাধিকবার বলিয়াছে।—একলা মা তাহার ওই ডাংপিটে

ভাইটিকে কি সাম্‌লাইতে পারে?—তাহাতে আবার যখন জরে পড়ে!

এ-সব কথা শুনিয়া প্রসন্ন মনে মনে ভাবিত—'তোমার মত গিন্নিবান্নি মেয়ে ত আমি দেখিনি।'—কখন কখন মুখ ফুটিয়াও বলিত।

তাহার প্রভাব অনুভব করিত সর্ব্বক্ষণ। যে-কটাদিন ক্ষান্ত পাঠশালায় উপস্থিত থাকিত, প্রসন্নের মাথার উপর যেন একটা মস্ত বোঝা চাপিয়া থাকিত। কিছুতে একটা খুঁৎ হইবার জো নাই। নিজের লেখাপড়ায় ষোল আনা ত্রুটি করিয়া সতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিকের ত্রুটি সাম্‌লাইয়া ফিরা—এই ছিল ক্ষান্তর কাজ। প্রসন্নকে সব শাসন নীরবে সহ্য করিয়া যাইতে হইত। এমন 'গিন্নিবান্নি' মেয়েকে পড়া জিজ্ঞাসা করা প্রসন্ন বেচারার সাহসে বড় একটা কুলাইত না। যে-দিন বা কুলাইয়া উঠিত, ক্ষান্ত বলিত, "আমি একটা মানুষ না হয় আপনার বাড়ী গিয়ে পড়া দিয়ে আস্‌তে পারি, ঐ দেখুন রেধো শেলেটে এক কলসী জল ঢেলে বসেছে, ওকে সাম্‌লান আগে" ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ-যেন এক অভিনব সংসার লইয়া তাহারা উভয়ে আসিবে। যে-দিন ক্ষান্ত আসিত না, প্রসন্ন প্রথমটা খুব উৎসাহের সহিত কাজ করিয়া যাইত; কিন্তু একটুর মধ্যেই দমিয়া যাইত। না আসিবার প্রকৃত কারণ আন্দাজে জানিতে পারিলেও কোন-একটা ছেলেকে পাঠাইয়া সঠিক বৃত্তান্ত জানিতে হইতই। যে-দিন ক্ষান্তর নিজের অসুখ না হইত, প্রসন্ন খবর পাইত: সে তাহার বাড়ীতে যাইয়া পড়িয়া আসিতে পারে।

সম্ভব হইলে কোন কোন দিন সে নিজে চলিয়াও আসিত, কাঠের বাক্সটাতে ঠেস্ দিয়া প্রসন্ন চাহিয়া থাকিত,—ক্ষান্ত আসিতেছে, প্রকাণ্ড শ্লেটের কাল গায়ে তাহার নিরলঙ্কার শুভ্র হাতখানি পড়িয়া আছে। ঘাড়ে অসংযত কেশরাশির একটা বিপুল বিশৃঙ্খল গ্রন্থি। পায়ে দু'গাছা মল। প্রসন্ন লক্ষ্য করিত যে-দিন মলের শব্দ সতেজ এবং ঘন, সে-দিন মুখটাও গম্ভীর। সে-দিন প্রসন্নকে শক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে হইত—কেন সে এক-জনের পড়ার ক্ষতি করিয়া তাহাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছে, পেরসাদে যে পাঁচদিন ধরিয়া কামাই করিতেছে, তাহার জন্য কটা লোক পাঠান হইয়াছে, ইত্যাদি।

এক-একদিন মনটা ভালও থাকিত। সেটাও প্রকাশ পাইত মলের বোলে এবং মুখের ভাবে। সে-দিন দূর হইতে ক্ষান্ত হাসিয়া ফেলিত এবং প্রসন্নের মুখেও সে হাসির প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হইত।

এইরূপভাবে হাসিতে হাসিতে একদিন পাঠশালের দাওয়ায় উঠিয়া সঘনে মাথা হেলাইয়া ক্ষান্ত বলিল, "না গুরু-মহাশয়, আমি আর আপনার বাড়ীতে পড়্‌তে যাব না, তাই এখন এলুম।"

প্রসন্ন হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'ল আবার?"

কৃত্রিম রাগের সহিত ক্ষান্ত বলিল, "যান্, সবাই কেন বল্‌বে আমাদের বড় ভাব?"

লজ্জায় আধমরা হইয়া প্রসন্ন প্রথমটা চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর গুরু-মহাশয়ের কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়া গম্ভীরতার চেষ্টা করিয়া বলিল, "কে বলেছে বল ত।"

আপনার ভাইয়ের দিকে অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ করিয়া ক্ষান্ত বলিল, "কেন, ঐ ড্যাক্‌রা। মা বল্‌বেন পিঠোপিঠি বলে' বলে; আপনিও কিছু বল্‌বেন না। বেশ, আমি ত আর যাচ্ছিনে।"

তাহার ভাই দিদির অবস্থা দেখিয়া শ্লেটের আড়ালে হাসতেছিল, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ক্ষান্ত বলিল, "হতচ্ছাড়া ছেলে, বোম্বেটে।"

(৫)

ছুটিতে বন্ধুর বাড়ী আসিয়াই সত্যেন পাঠশালায় হাজ্‌রি দিল। প্রসন্ন তখন উপুড় হইয়া শুইয়া ক্ষান্তর লেখা শোধ্‌রাইয়া দিতেছিল। বাম হস্তের উপর ভর দিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া ক্ষান্ত এক-মনে দেখিতেছিল।

সত্যেনকে দেখিয়া ছেলেরা চুপ করিয়া যাওয়ায় প্রসন্ন চাহিয়া দেখিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া সত্যেনকে বলিল, "আয়, দাঁড়িয়ে রইলি যে!"

ক্ষান্ত উঠিয়া পাঠশালের একপ্রান্তে গিয়া বসিল।

বাক্সর উপর বসিয়া মৃদু হাসিয়া সত্যেন কহিল, "বাঃ, বেড়ে আছিস্ কিন্তু।"

অতিমাত্র লজ্জিত হইয়া প্রসন্ন বলিল, "কিরকম?"

"'অমৃত বোসের কৃপণের ধন' দেখেছিস্ ত? আমার কুন্তলার কথা মনে পড়ে গেল।"

অধিকতর লজ্জিত প্রসন্ন চুপ করিয়া রহিল।

গলা নামাইয়া সত্যেন বলিল, "আমার কালাচাঁদ আছেন ত? তাঁরই টানে দৌড়ে' এসেছি।"

"আছেন"

"তা হ'লে"—ঘরের দরজায় কুলুপের দিকে চাহিয়া সত্যেন বলিল, "তা হ'লে চাবিটা দে।"

ঘর খুলিয়া জল-বিহীন হুঁকাতে তামাক খাইয়া সত্যেন বাহিরে আসিল। প্রসন্নের কাঁধে গোটা দুই-তিন থাব্ড়া মারিয়া বলিল, "চট্পট্, চট্পট্; পুড়ে' যাবে।"

সন্দিগ্ধ-নেত্রে কান্ত চাহিয়াছিল। প্রসন্ন একবার চকিতে তাহার পানে চাহিয়া বলিল, "আজ অসম্ভব ভাই।

বিস্তর পীড়াপীড়ি করিয়াও সত্যেন রাজি করিতে পারিল না।

বাসায় গিয়া সত্যেন দেখিল পীতাম্বরও আসিয়াছে। সে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই বিশ্বম্ভর থিয়েটারী স্বরে কহিল, "কি সংবাদ দূত?"

সত্যেন বলিল, "জবর সংবাদ; তুই কখন এলি, পীতু?

"আঃ! কি সংবাদ তোর বল্না আগে" বলিয়া বিশ্বম্ভর সত্যেনের মুখটা নিজের দিকে ফিরাইয়া লইল।

সত্যেন বলিল, "গুরুমশায় যে বেজায় প্রেম লাগিয়ে দিয়েছে ওদিকে!"

সাগ্রহে বিশ্বম্ভর বলিল, "কার সঙ্গে?"

সত্যেন একটু রসিকতা করিয়া বলিল, "বাবা, তোমাদের দেশের মেয়েদের আমি চিনি কোত্থেকে?"

পীতাম্বর বলিল, "তবেতো দেখ্তে যেতে হচ্চে।"

বিশ্বম্ভর কহিল, "কালই আমি চিনে' আস্ছি।"

সত্যেন চিন্তান্বিতভাবে বলিল, "সে ত হবে; এখন যে এক বিপদ্ উপস্থিত, তার কি উপায়?"

পীতাম্বর জিজ্ঞাসা করিল, "কি বিপদ্ আবার?"

"আমি ভাব্ছি ও যদি এইরকম প্রেম করতে থাকে; আর পরে বিয়েও হয় ত আমাদের সখের পাঠশালাটি যায় যে। এই যে গাধার খাটুনিটা খাট্লাম সে কি এরই জন্যে? তখন প্রসন্ন কি আর ছেলে ঠেঙাতে চাইবে? লক্কা পায়রাটি হ'য়ে দাঁড়াবে একেবারে।"

তখন, এ-যে এক ভীষণ বিপদ্, তাহাতে সকলেই সম্মত হইল। একটা উপায়-নির্দ্ধারণের জন্য সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পরামর্শ চলিল। অবশেষে একটা উপায়ও স্থির হইল।

(৬)

পরদিন উঠানে বসিয়া প্রসন্ন একটা নারিকেল কাটিতেছিল। সহর্ষমনে বাটীতে প্রবেশ করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "ছেলে ত বিশ্বম্ভর, বুঝ্লে গা? বেঁকে বসেছে 'আমি টাকা নিয়ে বে করব না। ঐ পাড়ার রাধুর মেয়েকে পছন্দ হয়েছে; ওই যে যে মেয়েটি কখনও কখনও আমাদের পর্শার কাছে পড়্তে আসে গো। বলে 'একটা গরীব বিধবার এতে উপকার হবে।'"

একটা কোপ নারিকেলে না পড়িয়া প্রসন্নের হাতের উপর আসিয়া পড়িল। বিশ্বম্ভরের প্রশংসা ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি প্রসন্নের হাতটা ধরিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "আঃ, আর এই এক ছেলে, তোর এখন সাত তাড়াতাড়ি নারকোল কাট্বার কি দর্কার ছিল, বাপু?—"

হাতটাকে পিতামাতার তত্ত্বাবধানে ছাড়িয়া দিয়া প্রসন্ন অসাড় হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার হৃদয়-তন্ত্রীতে একটা বিষাদের সুর ঘনাইয়া উঠিতেছিল। আজ হঠাৎ একটা কথার আঘাতে অভিনবরূপে, এক অভিনব ... কান্ত তাহার মানস-পটে স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল। বিষাদময় আতঙ্কে তাহার মনটা ভরিয়া উঠিতেছিল, একদিন—শীঘ্রই একদিন এক কথায় এই বন্ধন ছেদ করিয়া কান্ত তবে চলিল?

বিশ্বম্ভরদের যত অত্যাচার তাহার একে একে মনে হইতে লাগিল। তাহার জীবনটা দুই পায়ে মাড়াইয়া তাহাদের খেলা! অথচ তাহার অপরাধ?

প্রসন্ন পাঠশালে গেল না। কান্ত বসিয়া বসিয়া অবশেষে গুরুমহাশয়ের বাড়ী আসিল। মুখটা ভার, গুরুমহাশয়ের আজকাল প্রায়ই এইরকম। প্রায়ই ত আজকাল বাড়ী আসিয়াই পড়িয়া যাইতে হয়।

আসিয়া দেখিল গুরুমহাশয়ের হাতে পটি-বাঁধা। কপালে ভ্রূ উঠাইয়া শিহরিয়া ক্ষান্ত বলিল, "উঃ, কি হ'ল, গুরু-মহাশয়? হাতটা গেছে নিশ্চয়? হুঁ, আমি জানি গেছে, যা অসাবধান আপনি। এইজন্যে পাঠশালায় যাননি, না? তা কি করে' জান্‌ব? আপনি যে আজকাল প্রায়ই যান না; আমারই আস্‌তে হয়। খুব কষ্ট হচ্ছে, না? কি ওষুধ দেওয়া হ'ল?" ক্ষান্ত খুব সন্তর্পণে প্রসন্নের হাতটা তুলিয়া লইল। প্রশ্নগুলির উত্তরের অপেক্ষায় প্রসন্নের মুখের পানে একটু চাহিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "খুব জ্বালা কর্‌ছে নিশ্চয়?"

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রসন্ন বলিল, "না, তেমন লাগেনি।"

ঠোঁট ফুলাইয়া ক্ষান্ত বলিল, "হ্যাঁ, লাগেনি; নিজের কষ্ট লুকোতে আপনি অদ্বিতীয়।"

গুরু-মহাশয়ের কথা বিশ্বাস না হওয়ায় তাঁহার মাকে সে জিজ্ঞাসা করিল, "গুরু-মহাশয়ের খুব লেগেছে নাকি, জ্যাঠাইমা?"

স্নেহ-দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ মা, লেগেছে বই কি; যা অসাবধান ছেলে।"

তিরস্কারপূর্ণ অথচ সহাস্যনয়নে ক্ষান্ত বলিল, "হ্যাঁ, আমি ত বল্‌লুম—ঐরকম আপনার।"

আজই—এই একটু পূর্ব্বে যে দারুণ কথাটা প্রসন্ন শুনিল, তাহা তাহার নিতান্তই অসম্ভব বলিয়া বোধ হইয়াছিল। ক্ষান্তর হাতটা ধরিয়া গলা নামাইয়া বলিল, "আমার কষ্ট হ'লে তোমার কি ক্ষান্ত?"

"বাঃ রে কার না হয়? আমার হাত কেটে গেলে মার কষ্ট হবে না? —আপনার হ'ত না?—আপনিই বলুন না। তা আমারও কি হাতটা জ্বালা কর্‌বে? হাঃ হাঃ, তা নয়। তবে মনে কষ্ট হয়। মা বলেন মনের কষ্টই কষ্ট—"

ক্ষান্তর মুখের পানে চাহিয়া প্রসন্ন ভাবিতেছিল, "বিশু বলেছে বলে' কি সত্যই বে কর্‌তে পারে?—এরা এত গরীব, ওরা জমিদার—এ খালি আমায় একটু কষ্ট দেওয়া।"

প্রসন্নের হাত ক্রমে ক্রমে সারিয়া গেল। একদিন বাড়ীতে ঢুকিয়াই ভট্টাচার্য্য মহাশয় হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বলিতে লাগিলেন, "হাঃ হাঃ জমিদারী, খেয়াল আর কাকে বলে? ওগো, শুন্‌ছ, আমাদের বিশুর আব্দার? বলে 'না, আমার বে'তে প্রসন্ন পুরুত হবে; পুরোনো বন্ধু, ওর মনটা তবুও খুসী হবে।' আম'য় বলে 'ওকে এখন থেকে বড় বড় কাজে দিন্, ঠাকুর-মহাশয়; আমি বেশ টের পাচ্ছি কালে ও একজন মস্ত বড় পুরুত হবে।' —তা প্রসন্নকে বেগ পেতে হবে না; প্রায় সবই জানে।"

প্রসন্নের বুকটা যেন ধসিয়া গেল। তবুও মনকে সান্ত্বনা দিল—এ-সবই দুষ্টুমি—তাহাকে ভয় দেখান।

বিবাহের আর দিন নাই। জমিদার-বাড়ী উৎসবের আয়োজনে দিন দিন গুলজার হইয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে পাড়াটাও সরগরম হইয়া উঠিল। প্রসন্ন নৈরাশ্যাহত মনটাকে সাহস দিতে লাগিল—"ওরে বিশু, আমি সব বুঝি।"

ক্ষান্ত আর আসে না। প্রসন্নের পাঠশালাও আর ঠিক চলে না, এক-একদিন সে যায়। ক্ষান্তর বাড়ীর পানে যে রাস্তাটা চলিয়া গিয়াছে সেই দিকে স-আশ নয়নে চাহিয়া থাকে। ছেলেরাও ঢিলা পাইয়া অনেকেই গরহাজির থাকে। যে কয়জন আসে—সংখ্যার অল্পতা বশতঃ ছুটি পায়।

আর একদিন বাকি। বিকালে—সন্ধ্যার কাছাকাছি একটা "বসুমতী" হাতে করিয়া পীতাম্বর ও সত্যেন প্রসন্নের সহিত দেখা করিতে আসিল। লাল কালীতে দাগ দেওয়া একটা অংশ তাহার সামনে ধরিয়া সত্যেন বলিল, "বিশু একটা মস্ত কাজ কর্‌লে, প্রসন্ন,—'বসুমতী'তে আমরা ছাপিয়ে দিলুম। সে যাই হোক্; জমিদার-বাড়ীতে যে দাঁওটা মার্‌ছ তার অংশ দিচ্ছ কি না?"

প্রসন্নের মুখটা মলিন হইয়া গেল; তবে আর সত্যই-আশা নাই। সত্যেনের হাতটা চাপিয়া ধরিয়া প্রসন্ন রুদ্ধ-কণ্ঠে বলিল, "সতু, আমি তোদের কি করেছি ভাই? শুধু পাশ করে' গিয়েছিলুম বলে' এত অপরাধ?"

শ্রী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

পুতোয়া

(আনাতোল ফ্রাঁসের পুতোয়ার মর্ম্মানুবাদ)

মঁসিয়ে বেরজেরে বললেন "ছেলেবেলা ঘরের কোণের ছোট্ট বাগানটুকুই বিশাল বিশ্বের সমস্ত ভয়-বিস্ময় আমাদের জন্য জড়ো করে' রেখেছিল।" সূঁচের উপর থেকে চোক দু'টো না তুলে'ই জোএ একটু হেসে বললেন—"পুতোয়াকে কি তোমার মনে পড়ে ?"

"মনে পড়ে ?—বাঃ, ছেলেবেলাকার জানাশোনা সব লোকের মধ্যে পুতোয়ার কথাটাই এখনও খুব পরিষ্কার মনে আছে! তার মুখের গড়ন বা চরিত্রের ছিটে-ফোঁটাও আমি ভুলিনি। লম্বা মাথা—"

শ্রীমতী জোএ তখন বললেন—"নীচু কপাল।"

তার পর ভাই বোনে অনর্গল মুখস্থের মত একের পর আর কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বলে' যেতে লাগলেন—

"চোখ কোটরে।"

"চোরা চাহনি।"

"কপালে তিনটে রেখা।"

"লাল উঁচু চোয়াল।"

"খসখসে কান।"

"ভবঘুরে চেহারা।"

"হাত দুটো কেবলই নড়ত, আর এই করেই তার বুদ্ধি খুলত।"

"একটু নুয়ে চলা অভ্যাস, ছিপছিপে দুর্ব্বল চেহারা।"

"অথচ কি ভয়ঙ্কর জোরই ছিল তার গায়ে।"

"দু' আঙুলে টিপে টাকা পর্য্যন্ত ভেঙে ফেলত।"

"ভয়ঙ্কর টিপ।"

"চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলত।"

"মিহি সুর।"

হঠাৎ মঁসিয়ে বেরজেরে বলে' উঠলেন—"জোএ তার কটা চুল আর পাতলা দাড়ির কথাই যে আমরা ভুলে' গেলুম। রোস, ফের আরম্ভ করি।" পলিন বিস্ময়ে এ আবৃত্তি শুনে' যাচ্ছিল। সে তার বাবা ও পিসীমাকে জিজ্ঞেস করলে কেমন করে' তারা এ গল্পটুকু মুখস্থ করলেন আর কেনই বা মন্ত্রের মত এটা আওড়ালেন।

গম্ভীর হ'য়ে মঁসিয়ে বেরজেরে বললেন—"পলিন, এই যা তুমি শুনলে এই-ই বেরজেরে পরিবারের পুরাণ। তোমার শুনে' রাখা ভাল, যাতে আমার ও তোমার পিসীমার সঙ্গে সঙ্গেই এ লোপ না পায়।"

পলিন বললেন—"তোমাদের কথা ত কিছুই বুঝতে পারছিনে।"

"তার কারণ, তুমি পুতোয়াকে জানই না। শোন, ছেলেবেলা তোমার বাবা ও পিসীমার পুতোয়ার চেয়ে বেশী জানাশুনা লোক আর ছিল না।"

পলিন বলে' উঠল—"কিন্তু এই পুতোয়াটা কে ?"

পলিনের কথার উত্তর না দিয়েই তার বাবা ও পিসীমা এক সঙ্গে হেসে উঠলেন। পলিন আশ্চর্য্য হ'য়ে একবার এঁর আবার ওঁর মুখের পানে চেয়ে রইল। এ তার নিকট কেমন বিসদৃশ ঠেকছিল।

"বল না বাবা, এ পুতোয়াটা কে ? তুমি এক্ষুণি ত বললে আমার শুনে' রাখা দরকার।"

"পুতোয়া ছিল বাগানের মালী। রুসঁ্যা গাঁয়ের সরল চাষার ছেলে। ফুল বেচত। কিন্তু খদ্দেরকে খুসী রাখতে না পেরে ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে দিন-মজুরি আরম্ভ করলে। কিন্তু তাতেও তার বেশী দিন চলল না।"

একথা শুনে' শ্রীমতী জোএর হাসি বেড়ে উঠল। হাসতে হাসতে তিনি বললেন—"তোমার কি মনে পড়ে বেরজেরে যখনই বাবার দোয়াত, কলম বা কাঁচি হারাত তখনই তিনি বলতেন—"আমার সন্দেহ হয়, পুতোয়া এখানে এসেছিল'।"

মাথা নেড়ে মঁসিয়ে বেরজেরে বললেন—"হ্যাঁ, পুতোয়ার সুনাম বড় ছিল না।"

বিরক্ত হ'য়ে পলিন্ বললে—"এই মাত্র ?"

মঁসিয়ে বেরজেরে বললেন—"না মা, আরও বাকী আছে। পুতোয়ার ইতিহাসটা বেশ একটু জটিল। আমরা তাকে খুবই জানতুম, আমাদের খুবই ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিল সে, অথচ—"

তাঁর কথা শেষ না হ'তেই জোএ বলে' উঠলেন—"অথচ তার কোন অস্তিত্বই ছিল না।"

বেরজেরে জোএকে ধমক দিয়ে বললেন—"বল কি, জোএ? পুতোয়ার অস্তিত্ব ছিল না? একথা বলতে তোমার সাহস হয়? পুতোয়ার অস্তিত্ব নেই একথা বলবার আগে অস্তিত্ব ক'রকম তাকি ভেবে দেখেছ? না জোএ, পুতোয়া ছিল,—যদিও তার থাকাটা একটু বিশেষরকমের।"

নিরাশ হ'য়ে পলিন বললে—"তোমাদের কথাবার্ত্তা ক্রমেই আমার হেঁয়ালি বলে' মনে হচ্ছে।"

"না মা, সবটা শুনলে আর হেঁয়ালী ঠেকবে না। শোন, পুরো বয়স নিয়েই পুতোয়া জন্মে ছিল। আমি তখন ছিলুম ছোট্ট বালক আর তোমার পিসীমা ছিলেন ছোট্ট মেয়ে। সাঁ্যাতওমের-এর উপকণ্ঠে ছোট্ট একটি বাড়ী আমরা ভাড়া নিয়েছিলুম। মা ও বাবা তখন কাজে অবসর নিয়ে শান্তিতে দিন কাটাবার জন্যই বাড়ীটা ঠিক করেছিলেন। কিছুকাল পরই তাঁদের সঙ্গে শ্রীমতী কর্ন্নুইয়ের আলাপ হয়। ইনি ছিলেন বয়সে বুড়ো, আর পরিচয়ের পর তাঁর সঙ্গে আমাদের একটা সম্পর্কও বেরিয়ে পড়ল- দূর সম্পর্কে তিনি হন আমার মায়ের দিদিমা। সহর থেকে বারো মাইল দূরে মঁপ্লেসিতে তিনি বাস করতেন। সম্পর্ক বেরিয়ে পড়াতে কিন্তু মা ও বাবা মহা বিপদেই পড়লেন। ফি রবিবার বুড়ী মা ও বাবাকে খাবার নেমন্তন্ন করতেন। ফি রবিবার বারো মাইল গেয়ে নেমন্তন্ন রাখা কি অসহ্য ব্যাপার তা বুঝতে পার। বুড়ী কিন্তু কিছুতেই এ গোঁ ছাড়তেন না। তিনি বলতেন রবিবার আত্মীয়-স্বজন মিলে' একত্রে আহার করাই হচ্ছে সনাতন নিয়ম। ছোটলোকেরাই এ পুরোনো নিয়ম মানে না।" বাবার অবস্থা শোচনীয় হ'য়ে উঠল। কিন্তু শ্রীমতী তাতে ভ্রূক্ষেপও করতেন না। মা অনেকটা সহ্য করতেন। বাবার মত তাঁরও খুব কষ্ট হ'ত সত্যি—কিন্তু তবু মুখে হাসিই দেখাতেন।

জোএ বললেন "মেয়েরা কষ্ট সইতেই পৃথিবীতে আসে।"

বেরজেরে বললেন—"মানুষ মাত্রেই কষ্ট সইতে এখানে আসে।...যাক, এ ভয়ানক নেমন্তন্ন এড়াতে মা ও বাবা কত চেষ্টাই না করলেন। কিন্তু প্রত্যেক রবিবার বিকাল বেলাই শ্রীমতীর গাড়ী

এসে দুয়ারে হাজির হ'ত। এ তাঁরা কিছুতেই এড়াতে পারতেন না। এ বাঁধা নিয়ম সোজা বিদ্রোহ ছাড়া ভাঙ্বার উপায় ছিল না! শেষে বাবা বেঁকে দাঁড়ালেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, শ্রীমতীর এক নেমন্তন্নও তিনি আর রাখ্‌বেন না! কিন্তু নেমন্তন্ন করাবার অজুহাত বের করবার ভার মার উপর ফেলে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন; অথচ মা কিন্তু একাজের মোটেই উপযুক্ত ছিলেন না। কোনরকম ভাণ করা তাঁর পক্ষে একরকম অসম্ভবই ছিল। জোএ, তোমার বোধ হয় মনে আছে একদিন খেতে বসে' মা বললেন 'ভাগ্যিস্ জোএর ঘুস্‌ঘুসে কাশি হয়েছে, কিছু দিনের জন্য ত আর মঁপ্লেসিতে যেতে হবে না।' কিন্তু কিছুদিন পরেই তুমি সেরে উঠ্‌লে। তার পর একদিন শ্রীমতী এসে মাকে বললেন 'বাছা, আস্‌ছে রবিবার দিন মঁপ্লেসিতে তোমাদের নেমন্তন্ন রইল।' বাবা কিন্তু মাকে বলে' দিয়েছিলেন, যেমন করে'ই হোক একটা বেশ শক্ত অজুহাত বের করে' নেমন্তন্ন এড়াতেই হবে। মা তখন ফাঁপরে পড়ে' অসম্ভবরকমের এক ছুতো বের করে' বললেন—'বড় দুঃখের সহিত জানাতে হচ্ছে, এ রবিবার বাড়ী ছাড়া অসম্ভব। সেদিন মালী আস্‌বার কথা।' 'মার কথা শুনে' শ্রীমতী বৈঠকখানার কাঁচের জানালা দিয়ে বাগানের দিকে চোখ ফেরালেন। বাগানের গাছগুলোর উপর বহুকাল কাঁচি না লাগায় ছোট খাটো একটা জঙ্গল তৈরী হ'য়ে গিয়েছিল। হঠাৎ মায়ের চোখও বাগানের উপর পড়্‌ল। উঁচু উঁচু ঘাস আর বুনো চারা গাছে ভরা একটুকু জায়গা—যাকে তিনি 'বাগান' নাম দিয়েছেন তার দিকে চেয়েই তাঁর অজুহাতটা যে নিতান্ত অসার বলে' মনে হবে একথা ভেবেই তাঁর মুখ শুকিয়ে গেল।—'মালিটা সোম কি মঙ্গলবার আস্‌তে পারে না? রবিবার দিন কাজ করা ত ভারি অন্যায়! সপ্তাহে আর কোন দিন কি তার অবসর নেই?'

আমি চিরকাল দেখে' আস্‌ছি—সবচেয়ে অসম্ভব যা তা অনেক সময়ই কোন বাধা পায় না। অপরপক্ষে মুহূর্তে তার কাছে হার মানে। যতটা আশা করা গিয়েছিল, শ্রীমতী তেমন জেদ কিছুই করলেন না। চেয়ার ছেড়ে উঠে' তিনি বললেন 'তোমার মালীর নাম কি বাছা?', মা তাড়াতাড়ি বলে' উঠ্‌লেন—পুতোয়া। পুতোয়ার নাম করণ হ'ল,—কাজেই তার অস্তিত্বও হ'ল। শ্রীমতী গজ্‌গজ্ করে' বল্‌তে বল্‌তে চল্‌লেন—'পুতোয়া নামটা যেন কোথায় শুনেছি।—পুতোয়া,—পুতোয়া—বাঃ আমি ত তাকে খুবই জানি—কিন্তু তবু যেন সব মনে পড়ছে না। সে থাকে কোথায়? দিনের বেলা বুঝি কাজ করতে বেরোয়? দরকার হ'লে পুতোয়া যে বাড়ীতে কাজ করে' সেখানে তাকে খবর করতে হয়।—আঃ—যা ভেবেছি তাই! সে ত লক্ষ্মীছাড়া, ভবঘুরে, নিষ্কর্ম্মা!' শ্রীমতী তখন মুখ গম্ভীর করে' বল্‌লেন—'বাছা ওকে নিয়ে খুব সাবধানে থেকো।' "তার পর থেকে পুতোয়ার একটা চরিত্রও সৃষ্টি হ'ল।"

২

এমন সময় মসিয়ে গুর্ব্যা ও জ্যাঁ মার্ত্তো এসে উপস্থিত হলেন। মঁসিয়ে বেরজেরে আলোচনার বিষয়টা তাদের বললেন—

'একদিন মা যাকে তৈরী করে' স্যাঁৎ ওমেরএর মালীর কাজে নিযুক্ত করেছিলেন আমরা তার কথাই বল্‌ছি। মা তার একটা নাম দিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে তার কাজও সুরু হ'ল।

চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে মঁসিয়ে গুর্ব্যা বললেন "মাপ করুন মশায়! আপনি ফের ও-কথা বলতে চান?"

মঁসিয়ে বেরজেরে বলে' উঠ্‌লেন—"নিশ্চয়, এই নামে কোন মালীই ছিল না।

মা বল্‌লেন "মালী আস্‌বার কথা" অম্‌নি মালীর জন্ম হ'ল আর তার কাজও সুরু হ'ল"।

মঁসিয়ে গুর্ব্যা জিজ্ঞেস করলেন "তাঁর যদি অস্তিত্বই ছিল না, তবে সে কাজ করত কেমন করে'?"

"একরকম ধরলে, তার অস্তিত্ব ছিল।"

বিদ্রূপের সুরে মঁসিয়ে গুর্ব্যা বলে' উঠ্‌লেন—সে কি আপনার কল্পনায়?"

বেরজেরে উত্তরে বললেন—"কাল্পনিক অস্তিত্বের কি কোন মূল্য নেই? পুরাণ-সৃষ্ট চরিত্রগুলো কি মানুষের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেনি? ভেবে দেখুন তা হ'লেই বুঝতে পারবেন প্রকৃত নয়—কাল্পনিক চরিত্রই আমাদের মনের উপর স্থায়ী এবং সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করে। সব সময় সব দেশেই পুতোয়ার ন্যায় কাল্পনিক চরিত্রই জাতিকে স্নেহ ও ঘৃণা, আশা ও বিভীষিকায় অনুপ্রাণিত করেছে। এরাই পূজা পেয়েছে—আইন ও আচার গড়ে' তুলেছে। মঁসিয়ে গুর্ব্যা একবার ভিন্ন ভিন্ন পুরাণের কথা ভাবুন। পুতোয়াও পৌরাণিক চরিত্র। যদিও খুব অস্পষ্ট এবং খুবই সাধারণরকমের। হতভাগ্য পুতোয়াকে শিল্পী ও কবি ঘৃণা করতে পারেন, কারণ তাতে চোখ ঝল্‌সে যাবার মত জাঁকজমকের অভাব। খুবই সাধারণ লোকের খেয়ালে তার জন্ম। সামান্য লেখাপড়া-জানা মানুষের মতো গড়া জীব। যে রঙীন কল্পনায় উপন্যাস তৈরী হয় পুতোয়ার সৃষ্টি-কর্ত্তার সে কল্পনা-শক্তি ছিল না।...আপনাদের নিকট এখন বোধ করি পুতোয়ার চরিত্র অনেকটা স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে?"

জ্যাঁ মার্ত্তো বলে উঠ্‌লেন—"নিশ্চয়।"

মঁসিয়ে বেরজেরে বল্‌তে লাগ্‌লেন—"উনিশ শতাব্দীর শেষভাগে স্যাঁৎওমেতে পুতোয়া জন্মেছিল। কয়েক শতাব্দী আগে আর্ডেনের জঙ্গলে জন্মালে রূপকথায় তার স্থান হ'ত।"

আশ্চর্য্য হ'য়ে জ্যাঁমার্ত্তো বললেন—"পুতোয়া কি তবে একটা ভূত?"

মঁসিয়ে বেরজেরে বল্‌লেন—"কোন কোন বিষয়ে তার একটু শয়তানি ছিল।—কিন্তু সব কাজে নয়। আমার মনে হয় পুতোয়া সম্বন্ধে বড় অবিচার করা হয়েছে। শ্রীমতী কনুইয়ের মনে পুতোয়া সম্বন্ধে খারাপ ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছিল। শ্রীমতী ভাব্‌লেন যে আমার মা ত মোটেই ধনী নন, কাজেই পুতোয়াকে বেশী মজুরী দিতে পারেন না। নিজের মালীর বদলে শ্রীমতী যদি পুতোয়াকে কাজে লাগান তা হ'লে বেশ হয়। টাকার ত তার অভাব নেই; কিন্তু অভাব না থাক্‌লেই বা কি?—খরচও ত কম নয়! এদিকে চারাগুলো ছাঁটবারও সময় এল বলে'। শ্রীমতী ভাবতে লাগ্‌লেন বেরজেরের গিন্নী গরীব, কাজেই সে কম মজুরী দেয়, আমি ধনী, আমি আরও কম মজুরী দেব। কারণ এত নিয়মই রয়েছে যে গরীবের চাইতে ধনীরাই মজুরী কম দেয়।'—তার পর শ্রীমতী মানসনেত্রে দেখ্‌লেন তার চারাগাছগুলো ছাঁটা হ'য়ে নানা আকার ধরেছে অথচ খুবই সস্তায়। মনে মনে তিনি বললেন—'পুতোয়াকে আমার জোগাড় করতেই হবে। ভবঘুরের মতো চুরি করে' বেড়াতে আমি তাকে কিছুতেই দেব না। তাকে কাজে রাখ্‌লে আমার ক্ষতি ত নেই-ই বরং লাভই বেশী। সময় সময় ওস্তাদদের চাইতে দিন মজুররাই ভাল কাজ করে।' একদিন তিনি মাকে বললেন—'দেখ বাছা, পুতোয়াকে আমার ওখানে পাঠিয়ে দিও ত; মঁপ্লেসিতে আমি তাকে কাজ দেব।' মাও রাজি হলেন। পার্‌লে তিনি খুবই আগ্রহে পুতোয়াকে পাঠাতেন; কিন্তু সে যে অসম্ভব। শ্রীমতী কনুইয়ে পুতোয়ার আশাপথ চেয়ে রইলেন—কিন্তু সবই বৃথা। শ্রীমতীর গোঁ ছিল বড় ভয়ানক একবার যে গোঁ ধরতেন তার শেষ না দেখে' ছাড়তেন না। মার সঙ্গে আবার যখন

দেখা হ'ল তখন আবার পুতোয়ার কথা জিজ্ঞেস করলেন 'আমি যে পুতোয়ার অপেক্ষায় কাজ বন্ধ করিয়ে বসে' আছি একথা তাকে বলনি ?' মা বললেন 'বলেছিলুম, কিন্তু সে বড় আশ্চর্য্যরকমের খেয়ালী...' শ্রীমতী মাথা নেড়ে বললেন—'ওঃ! ওরকম লোকের স্বভাব আমার জানা আছে। তোমার পুতোয়াকে আমি ভালরকম চিনে' নিয়েছি। কিন্তু মঁপ্লেসিতে কাজ করতে চায় না এমন পাগলা মজুর ত আমি দেখিনি! সেখানকার সবাই ত আমার বাড়ী চেনে। পুতোয়াকে শীগগির আমার কাছে আসতে হবে বলে' রাখছি। সে কোথায় থাকে আমায় ব'লে' দাও ত বাছা,—আমি যেমন করে পারি তাকে খুঁজে' বের করব।'- মা বললেন পুতোয়া কোথায় থাকে তার সঠিক ঠিকানা বলতে পারব না। তার সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নি। বোধ হয় সে কোথাও লুকিয়ে আছে। এর চেয়ে সত্য কথা মা বলতে পারতেন না। কিন্তু শ্রীমতী তবু মার কথা বিশ্বেস করলেন না। তিনি ভাবলেন পাছে পুতোয়ার মজুরী চড়ে' যায় তাই মা তাঁর কাছে পুতোয়ার ঠিকানা গোপন করছেন। মনে মনে মাকে তিনি ভয়ানক স্বার্থপর ঠাওরালেন। কিছুকাল পরে শ্রীমতীর ভুল ভাঙল। তিনি দেখলেন বাস্তবিকই পুতোয়াকে পাওয়া গেল না। তবু তিনি ছাড়বার পাত্রী নন; তাকে খুঁজতে কসুর করতেন না। তাঁর যত পরিচিত আত্মীয়, বন্ধু, প্রতিবেশী, চাকর, দোকানদার ছিল সকলকেই তিনি পুতোয়ার কথা জিজ্ঞেস করলেন তার মধ্যে কেবল দু-তিনজন বললে যে তারা কখনো পুতোয়ার নাম শোনেনি। বাকী সবাই ভাবলে তারা পুতোয়াকে কোথাও না কোথাও দেখেছে। রাঁধুনী বললে 'আমি নাম শুনেছি কিন্তু তার মুখ মনে পড়ছে না।—কান চুলকোতে চুলকোতে রোড-মজুরী বললে 'পুতোয়া ? আমি তাকে বেশ চিনি, কিন্তু তাকে দেখিয়ে দিতে পারব না।' সবচেয়ে সঠিক খবর পাওয়া গেল রেজিষ্ট্রার মঁসিয়ে ব্লেজের নিকট। তিনি বললেন যে গেল বছর ১৯শে থেকে ২৩শে অক্টোবর পর্য্যন্ত তিনি পুতোয়াকে কাঠ কাটতে নিযুক্ত করেছিলেন।

একদিন ভোর বেলা শ্রীমতী হাঁপাতে হাঁপাতে বাবার লাইব্রেরীর ঘরে ঢুকে' বলতে লাগলেন—"আমি তোমার পুতোয়াকে এই দেখে' এলুম। ঠিক, ঠিক, এই এক্ষুনি দেখে' এসেছি। মঁসিয়ে তাঁ'র দেয়াল ঘেঁসে' ঘেঁসে' আবার রোডে গিয়ে পড়েছে। খুবই তাড়াতাড়ি যাচ্ছিল বলে' শেষে তাকে হারিয়ে ফেলেছি। সেই কি ? নিশ্চয় —এতে ভুল হ'তে পারে না। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, চিপ্‌চিপে চেহারা, একটু নু'য়ে চলা অভ্যাস, ভবঘুরের মত চাহনি, গায়ে ময়লা জামা।"—বাবা ধীরে ধীরে বললেন পুতোয়ার চেহারা অনেকটা ঐরকমই বটে।"—"আঃ, আমি ত বলেইছি! তার পর আমি হঠাৎ ডেকে উঠলুম—'পুতোয়া' সেও অমনি ফিরে' তাকালে। গোয়েন্দারাও লোকের পিছু নিয়ে, যে নামের লোক মনে করে' তারা পেছু নিয়েছে লোকটার বাস্তবিকই সেই নাম কি না ঠিক করবার জন্য এইভাবে হঠাৎ পিছন থেকে নাম ধরে' ডেকে ওঠে।—আমি তোমায় বলিনি, এ পুতোয়া না হ'য়ে আর যায় না। আমি ঠিক লোকেরই পিছু নিয়েছিলুম। কিন্তু যাই বল, তার চেহারা ভারি বদ। তোমরা তাকে কাজে রেখে ভাল করনি। আমি লোক দেখেই তার চরিত্র বুঝতে পারি। যদিও বেশীর ভাগ শুধু তার পেছনটাই দেখেছি—আমি শপথ করে' বলতে পারি ও-বেটা নিশ্চয় চোর—হয়ত বা খুনে! খসখসে কান—এ একেবারে অব্যর্থ চিহ্ন।"

"তার কান যে খসখসে, এও আপনি দেখেছেন ?"

"কিছুই আমার চোখ এড়ায় না, বাছা!—যদি ছেলে-মেয়ে সুদ্ধ খুন হ'তে না চাও, তবে পুতোয়াকে আর বাড়ী ঢুকতে দিও না। আর শোন, শীগগির বাড়ীর সব ক'টা তালা বদলে ফেলো।"

এর কিছুদিন পরে শ্রীমতীর রান্নাঘর থেকে তিনটা কাঁকুড় চুরি গেল। চোর যখন কিছুতেই ধরা গেল না, তখন শ্রীমতীর সন্দেহ পড়ল পুতোয়ার উপর। মঁপ্লেসীতে পুলিশ ডাকা হ'ল। তারা এসে যে প্রমাণ সংগ্রহ করলে তাতে পুতোয়ার উপর শ্রীমতীর সন্দেহ বদ্ধমূল হ'য়ে গেল। যদিও সে-সময় মঁপ্লেসির আশে পাশে অনেক চোরই আড্ডা গেড়েছিল, কিন্তু শ্রীমতীর বাড়ী চুরি হয়েছে একটি মাত্র লোকের দ্বারা—আর সে লোকটা চুরিতে একেবারে ওস্তাদ। —সে আর কোন জিনিষ ছোঁয়ও-নি—এমন কি ভেজা মাটির উপর পায়ের চিহ্নটি পর্য্যন্ত রেখে যায়নি। —পুতোয়া না হ'য়ে আর যায় না। সার্জেন্ট্ সাহেবেরও এই মত। তিনি পুতোয়ার সব খবরই জানেন। বহুকাল ধরে' ওৎ পেতে বসে' আছেন;—একবার ধরতে পারলে হয়।

পর দিন স্যাং ওমের সমাচার' নামক খবরের কাগজে 'শ্রীমতী কমু-ইয়ের তিন কাঁকুড়' নামক প্রবন্ধ বেরুল। সমাচারের বিশেষ রিপোর্টার সহর ঘুরে' ঘুরে' যে সংবাদ জোগাড় করেছিলেন তাতে পুতোয়ার চেহারার বর্ণনাও বেরিয়ে গেল। —"তাহার কপাল নিম্ন, চক্ষু কোটর-গত, কপালে কাক-পদ-চিহ্ন, গণ্ডদেশ রক্তবর্ণ, কর্ণ রুক্ষ। পুতোয়া কৃশাঙ্গ, ঈষৎ কুব্জ, আকৃতি দুর্ব্বল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে অসাধারণ শক্তিশালী। আঙুলে টিপে সে টাকা ভেঙে ফেলতে পারে।" অবশেষে সম্পাদক মন্তব্য লিখলেন—"আমাদের সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে অসাধারণ কৌশলের সহিত সহরে যেসব ডাকাতি হচ্ছে পুতোয়ার সহিত সেইসবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে।" সহরে লোকের মুখে মুখে এখন কেবল পুতোয়ারই কথা! একদিন খবর বেরুল যে পুতোয়া গ্রেপ্তার হয়েছে আর তাকে হাজতে রাখা হয়েছে। কিন্তু শীগগিরই প্রকাশ পেলে, পুতোয়া মনে করে' যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল সে পুতোয়া নয়—ফেরিওয়ালা রিগোবার্ট। তার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ না পেয়ে কিছুকাল হাজতে রেখে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পুতোয়ার কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। শ্রীমতী কমুইয়ের বাড়ী আবার একটা চুরি হ'ল—সেটা আগের বারের চাইতেও গুরুতর! তাঁর রান্নাঘর থেকে রূপোর তিন খানা চামচে চুরি গেল!

শ্রীমতী ঠিক করলেন—এ পুতোয়ারই কাজ। তিনি শোবার ঘরের সমস্ত দুয়ারে আচ্ছা করে' লোহার শেকল বেঁধে সমস্ত রাত জেগে কাটাতে আরম্ভ করলেন।

রাত্রি প্রায় ১০টার সময় পলিন শুতে চ'লে গেল ... শ্রীমতী জোএ তার ভাইকে বললেন—"শ্রীমতী কমুইয়ে রাঁধুনীকে পুতোয়া যে ফুসলে নিয়েছিল—সে কথাটা ত বললে না,"

মঁসিয়ে বেরজেরে বললেন—"তাই বলতে যাচ্ছিলুম, এ না বললে গল্পের আসল কথাটাই বাদ পড়বে।—পুলিশ পুতোয়াকে খুঁজতে খুঁজতে হয়রান; কিন্তু তাকে পাওয়া গেল না। প্রত্যেকেই পুতোয়াকে বের করতে উঠে' পড়ে' লেগে গেল। হিংসুটেদেরই এখন পোয়াবারো। স্যাংওমের কি তার উপকণ্ঠে এরকম লোকের সংখ্যা ত কম নয়। কাজেই অনেকে এখন থেকে পুতোয়াকে ঠিক একই সময় পথে, মাঠে, বনে, জঙ্গলে দেখতে লাগল। এতে তার চরিত্রের আরকটি গুণ প্রকাশ পেলে;—সে যে চোখের নিমেষে একজায়গা থেকে আরেক জায়গায় চ'লে যেতে পারে—লোকের মুখে মুখে তাই রটতে লাগল। যেখানে যাকে দেখবার কোন সম্ভাবনাই নেই সেখানে যদি সেই লোকটাকেই হঠাৎ চোখে পড়ে তবে তেমন লোকের নামে সকলেই শিউরে উঠে। পুতোয়াও স্যাংওমের বিভীষিকা হ'য়ে দাঁড়াল। শ্রীমতীর ত দৃঢ় ধারণা ছিল পুতোয়াই তাঁর কাঁকুড় তিনটা আর চামচে তিনখানা চুরি করেছে; কাজেই এখন

পুতোয়ার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য নিজের বাড়ীটাকে তিনি রীতিমত একটা দুর্গে পরিণত করে' ফেল্লেন। দুয়ার, খিল, তালা, শেকল কিছুরই উপর আর তার আস্থা রইল না। পুতোয়া যে ভয়ানক চালাক—তালা-দেওয়া দুয়ারের ভেতর দিয়েও সে ঘরে ঢুকতে পারে! ঠিক এম্নি সময় একটা ঘরোয়া ব্যাপারে তাঁর আতঙ্ক দ্বিগুণ বেড়ে গেল। কে একজন শ্রীমতীর রাঁধুনীকে ফুস্লে নিয়েছিল। শেষ পর্য্যন্ত রাঁধুনী তার পাপের বোঝা লুকোতে পারলে না। কিন্তু যে তার এমন সর্ব্বনাশ করেছে তার নামও কিছুতে বল্লে না।

শ্রীমতী জোএ বলে' উঠ্লেন—"রাঁধুনীটার নাম ছিল গুডুল।"

ম'সিয়ে বর্জ্জে বলে' যেতে লাগ্লেন—"হ্যাঁ, তার নাম গুডুলই। সকলেরই ধারণা ছিল যে চিবুকের নীচের দু'গাছি লম্বা দাড়িই গুডুলকে প্রেমের দৌরাত্ম্য থেকে বাঁচিয়ে চিরকাল তার কুমারী-ব্রত রক্ষা করবে। কিন্তু বিধাতার এই অমোঘ বর্ম্মও তাকে বাঁচাতে পারলে না। যে তার এমন সর্ব্বনাশ করে' শেষটায় তাকে ফেলে চলে' গেল তার নাম প্রকাশ করতে শ্রীমতী কনুইয়ে গুডুলকে চেপে ধরলেন। গুডুল কেবলই কাঁদতে লাগ্ল, কিন্তু মুখ ফুটে' একটি কথাও বল্লে না। কত ভয় দেখান—কত অনুনয়-বিনয়,—কিন্তু সবই বৃথা! অনেক কাল ধরে' শ্রীমতী পুঙ্খাপুঙ্খ অনুসন্ধান নিলেন। পাড়া-প্রতিবেশী, দোকানী, মালী, রোড-মজুরী, পুলিশ কাউকে জিজ্ঞেস করতে বাকী রাখ্লেন না। কিন্তু অপরাধীর কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। সব জায়গায় বিফল হ'য়ে আবার তিনি গুডুলকে চেপে ধরলেন। তবু কিন্তু গুডুল নীরব। হঠাৎ সব কথা শ্রীমতীর মনে জেগে উঠ্ল। তিনি শিউরে উঠে' বল্লেন—"এ পুতোয়ার কাজ—নিশ্চয় পুতোয়ার কাজ!'—রাঁধুনী কিন্তু কেবলই কাঁদতে লাগ্ল—কিছুই বল্লে না।—"নিশ্চয়, নিশ্চয় পুতোয়া! ওঃ, কি আহাম্মকই আমি; এ কথাটা আগে একবার মনেও জাগেনি। এ নিশ্চয়ই পুতোয়ার কাজ। —হতভাগা মেয়ে, কি দুর্ভাগ্যই না তোমার!"

এর পর সকলেরই বিশ্বাস জন্মাল যে পুতোয়াই রাঁধুনীর ছেলের জনক। স্যাং ওমেরের জজ থেকে মুটে-মজুর পর্য্যন্ত সকলের কাছেই গুডুল আর তার পাপের বোঝাটি পরিচিত হ'য়ে গেল। পুতোয়াই যে গুডুলকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল এখবরে সমস্ত সহর বিস্ময়, হাসি ও পুতোয়ার প্রসংশায় ভ'রে গেল। মেয়ে ভুলাতে পুতোয়া অদ্বিতীয়!—এগার হাজার মেয়ের সর্ব্বনাশ নাকি সেই করেছে!! পবিকের [illegible] জন্ম-খোঁড়া ছেলে—এও ত পুতোয়ারই। সহরের যত গল্পখোর মাথা নেড়ে বল্লে—'পুতোয়া নর-রাক্ষস'।

এখন যদিও সমস্ত সহর জুড়ে'ই পুতোয়ার নামডাক, কিন্তু আমাদের বাড়ীর সঙ্গে তার সম্বন্ধটা ছিল ঘনিষ্ঠ। সে আমাদের দুয়ারের পাশ দিয়ে চলে' যেত। লোকে বলত—আর আমাদের ভাইবোনেরও বিশ্বাস ছিল যে, পুতোয়া সময় সময় আমাদের বাড়ীর পাঁচিল ডিঙিয়ে ভিতরে ঢুকত। মুখোমুখি কখনও তাঁকে দেখিনি; কিন্তু তার ছায়া, গলার স্বর ও পায়ের দাগের সহিত আমরা খুবই পরিচিত ছিলুম। কতদিন সন্ধ্যায় আমরা ভেবেছি—ঐ যেন রাস্তার মোড়ে তার ছায়া দেখ্লুম! তার সম্বন্ধে আমরা ভাই-বোনে ধারণা দিন দিন বদ্লাতে লাগ্লাম। লোকে যদি তাকে দুষ্ট ও হিংসুটে ভাবত আমরা কিন্তু তাকে ছেলেদেরই মতন সরল ভাবতুম। দিন দিন সে কল্পনায় রঙীন হ'য়ে উঠ্তে লাগল। রাত্তিরে আস্তাবলে ঢুকে' ঘোড়ার লেজ বেঁধে রাখ্ত না সত্যি, কিন্তু তবু তার নানা-রকম দুষ্টুমি ছিল।—আমার বোনের মেয়ের পুতুলের মুখে কালি দিয়ে গোঁফ এঁকে দিয়ে যেত; শুতে যোবার আগে শুন্তুম সে যেন আমাদের মশারির ভিতর ঢুকে' চুপি চুপি কথা কইছে; ছাদে বিড়ালের সঙ্গে ঝগড়া করছে; কুকুরের সঙ্গে ঘেউ ঘেউ করছে;—রাস্তায় মাতালদের গানের অবিকল নকল করে' চলেছে।

বাবার চরিত্র ছিল একটু ভিন্নরকমের—অনেকটা দার্শনিকের মত মানুষ-জাতটাকেই তিনি বড় কৃপার চক্ষে দেখ্তেন। মানুষকে তিনি মোটেই বুদ্ধিমান্ মনে করতেন না। কিন্তু মানুষের ভুল বিশেষ সাংঘাতিক না হ'লে, তিনি এতে আমোদই পেতেন। পুতোয়া সম্বন্ধে সহরে লোকের ধারণা মানুষজাতির সকলরকমের ধারণারই যে একটা ছোট খাটো সংস্করণ এই ভেবে তিনি বেশ আনন্দ উপভোগ করতেন। বাবা শ্লেষ দিয়ে কথা বলতে ভাল বাসতেন; তাঁর কথা শুনে' মনে হ'ত যেন তিনি নিজেও পুতোয়ার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। মাঝে মাঝে তিনি পুতোয়ার চেহারার এমন সূক্ষ্ম বর্ণনা দিতেন যে শুনে' মা আশ্চর্য্য হ'য়ে গিয়ে বলতেন—"বল কি? তোমার কথা শুনলে লোকে ভাববে যে তুমি খাঁটি সত্য কথা বলছ। অথচ তুমি নিজেই জান—"। বাবা কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত উত্তর দিতেন,—"সমস্ত স্যাং ওমের পুতোয়ার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। এতকাল সহরে থেকে আমি কি তা অবিশ্বাস করতে পারি? এত লোকের একটা দৃঢ় ধারণা ভেঙে দেবার আগে ভাল করে ভেবে দেখা উচিত।" খুব পরিষ্কার মাথা যাদের তারাই এভাবে ভাবতে পারে। বাবা তার বিশ্বাস ও জনসাধারণের বিশ্বাসের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য করে' নিয়েছিলেন। স্যাংওমেরের লোকজনের সঙ্গে তিনি পুতোয়ার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন, কারণ একজন দার্শনিক বলেছেন—'আমি যে আছি এই-ই আমার অস্তিত্বের প্রমাণ।' কিন্তু কাঁকুড়-চুরি, রাঁধুনীর সর্ব্বনাশ বা অন্য সব ঘটনায় পুতোয়ার কোন হাত আছে বলে' তিনি স্বীকার করতেন না। কাজেই লোকে মনে করত বাবা খুব বুদ্ধিমান্ অথচ ভদ্র।

তার পর মার কথা। মা ভাব্তেন, পুতোয়ার জন্ম তিনিই দায়ী এবং তাঁর এধারণাও ভুল নয়। সেক্স্‌পীয়রের কল্পনায় যেমন ক্যালিবান জন্মেছিল, আমার মায়ের কল্পনা থেকে তেম্নি পুতোয়ার জন্ম হয়েছিল। এই কল্পনাটাকে 'মিথ্যা' ভেবে যদি পাপ বলে' ধরা যায় তবে সেক্স্‌পীয়রের চাইতে মা'র পাপের মাত্রা কম! কিন্তু তবু মা ভয় পেয়ে গেলেন। এই ছোট্ট একটুখানি 'মিথ্যা'তেই না ব্যাপারটা এত বড় হ'য়ে উঠেছে। একদিন তিনি একা বসে' বসে' ভাব্ছিলেন, কোন দিন বুঝি বা তার এই ছোটখাটো মিথ্যাটা সশরীরে তাঁর সামনে এসে হাজির হয়। সেইদিনই বাড়ীর একটা নূতন চাকর মাকে এসে বল্লে যে একটা লোক তাকে খুঁজ্ছে। লোকটা মার সঙ্গে কথা বলতে চায়। মা জিজ্ঞেস করলেন—'কিরকমের লোক? চাকর বল্লে মজুর বলে' মনে হয়।'

'তার কি নাম কিছু বলেছে?'

'হাঁ।'

'কি নাম?'

'পুতোয়া।'

'সে-ই বলেছে কি, তার নাম পুতোয়া?

'হাঁ, মা।'

'এখানে এসেছে?'

'হাঁ, রান্নাঘরের পাশে দাঁড়িয়ে আছে।'

'তুমি তাকে দেখেছ?'

'হাঁ, মা!'

'কি চায় তা কিছু বলেছে?'

'আমায় আর কিছু বল্লে না, শুধু বল্লে যে আপনার সঙ্গে। দেখা হ'লে সব বলবে।'

'আচ্ছা' তাকে এখানে আসতে বল।'

রান্নাঘরে ফিরে' গিয়ে চাকরটা আর পুতোয়াকে খুঁজে' পেলে না চাকরও পুতোয়ার এই সাক্ষাৎ আজও রহস্যে আবৃত। কিন্তু আমার মনে হয়, সে দিন থেকে মারও মনে বিশ্বাস জন্মাতে লাগ্ল যে হয়ত বা বাস্তবিকই পুতোয়ার অস্তিত্ব আছে;—সে কেবল তার নিজের কল্পনা-প্রসূত নাও হ'তে পারে।......

শ্রী ক্ষীরোদচন্দ্র দেব

দুলালী

দুলের মেয়ে দুলালী সাত বছর বয়স পর্য্যন্ত একরকম খেলে-ধুলে'ই মানুষ হয়েছিল। হঠাৎ একদিন তাকে খেলা-ঘরের পালা সাঙ্গ করে', ধুলা-কাদা ঝেড়ে ঘোম্‌টা টেনে দাঁড়াতেই হ'ল, কেননা দু ক্রোশ দূর হ'তে চারের পিঠে দুই বিয়াল্লিশ বছরের নন্দ ঘেসেড়া দু-দশ গণ্ডা টাকা দর দিয়ে তার সঙ্গে দস্তুরমত দাম্পত্য-প্রণয় উপভোগ কর্‌বার আশায় তাদেরই দাওয়ার নীচে এসে হাজির। দুলালীর বাপ বড় দুঃখী, তাই ভাব্‌লে এ একটা 'দাঁও'। সুতরাং আর দেরী না করে' একটা শুভ-দিন দেখে নন্দর হাতেই দুলালীকে দান করে' ফেল্‌লে। দুলালী দু-দশজনের কাছ থেকে 'পাকা মাথায় সিঁদুর পর্‌বার আশীর্ব্বাদের দাবী পেয়ে দিব্য দোলায় চড়ে' নন্দর সঙ্গে দুনিয়ার দোকান-দারি দেখ্‌তে দেখ্‌তে রওনা হ'ল।

সে হ'ল আজ দশ বছরের কথা। বিয়ের পর বছরে বছরে দলে দলে ফুটে' উঠ্‌তে উঠ্‌তে হঠাৎ যেদিন দুলালী পূর্ণ শতদলের মতন পরিস্ফুট হ'য়ে উঠল, সে দিন কিন্তু সে দেখ্‌লে সঙ্গীটি তার পথচলার অনেকখানিই শেষ করে' ফেলেছে।—আর তার ত সবে চলার সুরু। কেমন ক'রে সে তার নাগাল ধ'রে তার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক্‌ ঠিক্‌ পা ফেলে চল্‌তে পার্‌বে এভাবনাটা তার খুবই হয়েছিল।

তাই ব'লে দুলালী যে তার সাজান-অর্ঘ্য দেবতার পায়ে তুলে' দিতে কিছুমাত্র ইতস্তত করেছিল তা নয়। অনুষ্ঠানের তার ত্রুটি ছিল না—উপহারেরও তার কিছু কম ছিল না, কিন্তু তার সে পূজা গ্রহণ কর্‌বার ক্ষমতা দেবতার ছিল কি না সে-কথা সে একবার মনেও আন্‌ত না। আপনার কাছে সে আপনি পূর্ণ। নিজের দেওয়াটুকু পুরামাত্রাতেই নিঃশেষিত ক'রে আজ সে দেওয়ানা।

আর নন্দ? কপালটা তার নেহাতই মন্দ, তাই দুলের ঘরে দুলালীর মত অনিন্দ্যসুন্দরী স্ত্রী-রত্ন পেয়েও আজ সে আনন্দে নিরানন্দ। 'দুঃখ-ধান্দা' করে' দুটো শাকান্নের জোগাড় কর্‌তে কর্‌তেই জীবনে তার সন্ধ্যা এসে উপস্থিত। দুলালীর রূপের আলোর জলুষ যতই ফুটে' উঠে, তার চোখের উপর একটা ঝাপ্‌সা পর্‌দা ততই যেন ঢেকে বসে। ভাঙা কুঁড়েখান যতই উজল হ'য়ে উঠে, দুলালীর রূপের মাধুরীতে আঁধার যেন ততই ঘনিয়ে উঠে তার বুকের কুঠরিতে।

সে একদিন জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি। দু'তিন মাস বৃষ্টি নেই, সকাল থেকে সাঁঝ পর্য্যন্ত ধরার বুকের উপর দিয়ে যেন আগুনের হল্‌কা বয়ে' যাচ্ছে। মাঠে ঘাস নেই, জমিতে চাষ নেই, বিলে জল নেই, গাছে ফল নেই—পাতাগুলোও আম্‌রে উঠেছে। নন্দ ঘেসেড়া জমিদার বাড়ীর দুটো জোড়ার ঘাস যোগায়, আর তাদের ঘসামাজাই তার কাজ। একটি জলের ধার ছাড়া ২।৩ ক্রোশের মধ্যে আর ত কোথাও ঘাস খড় পাবার যো নেই। জলের ধারে জোলো ঘাস অল্প-স্বল্প কিছু যোগাড় হয়; তাই দুলালীকে ছেড়ে এই দূরের পথে নন্দকে আস্‌তেই হ'ত—দিনের আলো দুনিয়ার বুকের উপর আস্‌বার একটু আগেই।

সেই যে কাক-কোকিল ডাক্‌বার আগেই একখান খুর্‌পি আর খান দুই ছালা হাতে ক'রে তার বুকের কলজে জোর ক'রে কুঁড়েয় খসিয়ে রেখে নন্দ ঘর ছেড়ে বার হ'য়ে এসেছে—নাওয়া-খাওয়ার সময় গেল, দুপুর কাট্‌ল, বেলা পড়ে পড়ে; তবুও তার দেখা নেই। দুলালীর দুপুর-বেলার রান্না ভাত হাঁড়িতে ঠাণ্ডা জল হ'য়ে উঠেছে। সেই যে লোকটা ভোরে উঠে বাসিমুখে বার হয়েছে এখনও তার নাওয়া-খাওয়া হ'ল না এই কথাটাই কেবল দুলালীর মনের মধ্যে কাঁটার মত বিঁধ্‌ছিল। উন্মনাভাবে গালে হাত দিয়ে সে নিজের দাওয়ার উপরেই চুপ্‌টি ক'রে বসে' ছিল। সে যে স্ত্রী।

সাঁজের বাতি ঘরে ঘরে জলে' উঠেছে। এতক্ষণে

নন্দ, বাবুর বাড়ীর কাজ সেরে, ঘরে ফিরে এল। তার সারাদিনের-পরিশ্রমে-ভেঙে পড়া শরীরটা লুটিয়ে পড়্‌ল— দুলালীর পায়েরই কাছে দাওয়ার উপর। তাড়াতাড়ি একখান ভাঙা হাত-পাখা এনে দুই-এক বার বাতাস কর্‌তেই —"থাক্ থাক্, আর বাতাস কর্‌তে হবে নারে দুলু"— বলে'ই নন্দ উঠে' পড়ে' মুখ হাত ধুয়ে একটু ঠাণ্ডা হ'ল। তার পর একখান ভাঙা পাথরে ছ-সাত ঘণ্টার রান্না মোটা চালের ঠাণ্ডা ভাত খেতে তার যে কি তৃপ্তিই হচ্ছিল অন্য দশজনে না বুঝুক—যে তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল সেই দুলালী যে সেটা খুবই বুঝেছিল।

রাত তখন খুব বেশী না হ'লেও গ্রামটা যেন নিঝুম হ'য়ে প'ড়েছিল। শুধু রাতের হাওয়ায় বাঁশে ধাক্কা লেগে বেজে উঠ্‌ছিল এক-একটা হাততালি—আর ভাঙাকুঁড়ের মধ্যে জেগেছিল শুধু নন্দ আর সেবারতা দুলালী।

স্বামীর পা দুখানি কোলে তুলে' নিয়ে হৃদয়ের সব শক্তিটুকু এক করে' তার শ্রম-বিনোদনের চেষ্টাতে সত্যিই তার বেশ একটু তৃপ্তি হচ্ছিল। আনত-নয়না দুলালীর মুখপানে একদৃষ্টে চাইতে চাইতে দুফোঁটা চোখের জল অলসভাবেই নন্দর গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে গেল। দুলালীর আন্‌মনা চোখের পলক হঠাৎ স্বামীর মুখের উপর পড়্‌তেই—বাঁধভাঙা স্রোতের মতনই নন্দর সকল অশ্রু বাঁধনহারা হ'য়ে ছাপিয়ে পড়্‌ল এসে তার মুখের উপর। কি যেন অজানা বেদনায় দুলালীরও প্রাণটা আকুলি-বিকুলি করে' উঠ্‌ল; দুজনেই নির্ব্বাক্—নিষ্পলক। দূরে নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপটা কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছিল। যে মেঘে বৃষ্টি হয়নি তার বুকেই বোধ হয় বেশী আগুন লুকান থাকে। যে দুঃখটা নন্দর বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মতনই চেপে বসে' ছিল—চোখের জলে ধুয়ে ধুয়ে তা যেন একটু হাল্কা হ'য়ে গেল; কিন্তু অনির্দ্দিষ্ট দুঃখের অকরুণ বাষ্পে দুলালীর যেন শ্বাসরুদ্ধ হবার উপক্রম হ'য়ে উঠ্‌ল। দুবার ঢোক গিলে তাকে সরিয়ে দেবার বৃথা চেষ্টা করে' সে যেন হাঁফিয়ে উঠেছিল। মুখের লালিমা কোথায় লুকিয়ে পড়্‌ল, মুখ যেন শবেরই মত সাদা হ'য়ে উঠ্‌ল। ধরা-গলায় সে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"কি হয়েছে?"

নন্দ তার ময়লা কাপড়ের একটা খুঁট দিয়ে চোখ দুটো মুছে' ফেলে' উত্তর দিলে—"বিশেষ কিছুই হয়নি রে লালী—এর জন্য তুই অত ব্যস্ত হ'য়ে উঠিস্‌নে। কি জানিস্—যে মেঘটা দিনরাত্রি বুকের উপর জেঁকে বসে' আছে—আজ সে তোর সেবা-শুশ্রূষার ঠাণ্ডা হাওয়ায় দু ফোঁটা জল ছড়িয়ে দিলে আর কি।"

হেঁয়ালী বুঝ্‌বার ক্ষমতা দুলালীর আদৌ ছিল না; তাই অবুঝের মতনই সে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে' চেয়ে রইল—

নন্দ এবার স্পষ্ট করে'ই বল্‌লে—"শুন্‌বি তবে লালী? আচ্ছা তার আগে আমার এই কথাটার ঠিক উত্তর দে দিকি। এই যে বুড়োটা তোর জীবন একেবারে মাটি করে' দিলে তার জন্তে কি একটুও তোর দুঃখ হয় না?—কই একদিনও ত তোর মুখের উপর সে দুঃখের ছায়াপাত দেখ্‌লাম না?"

"আবার সেই কথা—ওটা কি আর ভুল্‌বে না তুমি" বলে'ই—দুলালী স্বামীর পায়ের মধ্যে মুখ লুকিয়ে নিজেকে যেন সঙ্কোচের মাঝখানে কতকটা সাম্‌লে নিলে।

নন্দের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে গেল—আবেগপূর্ণ-স্বরে সে আবার আরম্ভ কর্‌লে—"ভুল্‌তে যে পার্‌ছিনে লালী। ঐ একটা কথাই যে আমাকে চব্বিশ ঘণ্টা খোঁচা দিয়ে দিয়ে অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে। আমি কি একটা পাষণ্ড নিজের বয়সের কথা না ভেবে—তোর খেলাঘর থেকে সেই যে তোকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছি—সেটা কি সামান্য অপরাধ রে? তুইত বল্‌লি ভুলে' যাও। আগুনে ছাই ছাপা দিলে সে কি নেবে রে পাগ্‌লী? দুলালী যেন কেমন-একটা অস্বস্তির মধ্যেই পড়েছিল—নন্দর কথায় বাধা না দিলে সে আর তিষ্ঠিতে পার্‌ছিল না—তাই তার কথার মাঝখানেই বলে' উঠ্‌ল—"থাক থাক ও সব পুরোনো কথা পেড়ে আর দুঃখ কোরো না, যা হবার হ'য়ে গেছে। এখন ঘুমিয়ে পড়ো—সারাদিন আজ বড় খাটনি গেছে।"

একটু চুপ ক'রে থেকে, নন্দ দুলালীর হাত দুখানা চেপে ধরে' সে ব্যাকুলভাবে বলে' উঠ্‌ল—"লালী—লালী তোর

কাছে ক্ষমা চাইবারও আমার অধিকার নেই। কিন্তু তবুও তোকে আজ ক্ষমা কর্‌তেই হবে এই পারের যাত্রী বুড়োটাকে। পার্‌ছিনে আর সহ্য কর্‌তে—বল্ দুলু ক্ষমা কর্‌তে পার্‌বি কি ?"

ক্ষমার কথায় সে একেবারে লুটিয়ে পড়্‌ল নন্দর পায়ের তলায়—মুখ গুঁজ্‌ড়ে। আর্ত্তকণ্ঠে বলে' উঠ্‌ল "কি বল্‌ছ আজ তুমি! আমি যে তোমার স্ত্রী—দাসী। তুমি স্বামী—আমার দেবতা—আমার সর্ব্বস্ব। পায়ে পড়ি তোমার—আর আমাকে অপরাধিনী কোরো না।"

বিস্ময়ে নন্দর বাক্য-স্ফূর্ত্তি হচ্ছিল না, খুঁজে'ই পাচ্ছিল না যে কি কথাটা বল্‌লে, এর পর ঠিক্ মানানসই হয়। একান্ত ক্লান্তভাবে অতৃপ্তি নিয়েই—সে ঘুমিয়ে পড়্‌ল।

তার পর দুমাস কেটে গেছে। গ্রীষ্মের তাপদগ্ধ ধরণীবক্ষে শ্রাবণের ধারায় ধারায় নেমে এসেছিল কি এক স্বর্গের সুষমা, শ্যামশ্রীতে দিকে দিকে ফুটে' উঠেছিল একটা নবীন কান্তি জড়ের মাঝে জাগিয়ে দিচ্ছিল মধুর প্রেমের স্পন্দন। কিন্তু সে কয়দিন ?—সঙ্গে সঙ্গে বাংলার পাড়াগাঁয়ে ম্যালেরিয়া, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা এসে কৃষকের হৃদয় থেকে তার তৃপ্তিটুকু কেড়ে নিলে, তার সরল স্বাস্থ্য ভেঙ্গে দি'ল।

যে প্লাবনে সারা গ্রামটা তোল-পাড় হ'য়ে উঠেছিল তার একটা ধাক্কা দুলালীরও কুটীর-মাঝে এসে আছ্‌ড়ে পড়্‌ল, নন্দ বুড়া মানুষ তার বাধা দিতে গিয়ে তার ক্ষীণ শক্তি হার মেনেই এল। জ্বরের সঙ্গে জোর করে' সে দু'চার দিন যুঝ্‌লে বটে কিন্তু শত্রুসহযোগী শ্লেষ্মা এসে যখন তার বুকের উপরই চেপে বস্‌ল তখন না রইল তার উঠ্‌বার ক্ষমতা—না রইল কথা কইবার শক্তি। প্রথমটা দুলালী যেন একটু দমে গেল। কিন্তু সেই সাত বছর বয়স হ'তে সে অহরহ চাবুক মেরে মেরে মনটাকে খাড়া করে' রাখ্‌তে অভ্যাস করে' এসেছে, তাই কোন বিপৎ-পাতেই একেবারে মুস্‌ড়ে পড়্‌ত না।

নিজের মল-মাকড়ি যা দু'চারখান সোনা-রূপার গহনা ছিল সেকরার কাছে আধা দরে বেঁচে কিছু অর্থ সংগ্রহ করে' তা'তেই স্বামীর পথ্যের ব্যবস্থা কর্‌লে।

ঔষধের জন্য তার বড় বেগ পেতে হয়নি, কেননা জমিদারের ছেলে যামিনীবাবু বাড়ীতে বসে' বসে' হোমিওপ্যাথির খানকয়েক বই বেশ ভাল করে'ই পড়েছিলেন—চিকিৎসা-শাস্ত্রে জ্ঞানও হয়েছিল তাঁর গভীর। গাঁয়ের লোকের অসুখ-বিসুখে তাঁর 'জলপড়া' নেহাত মন্দ কাজ কর্‌ত না। যাই হোক তিনিই ছিলেন সারা গ্রামের একমাত্র ধন্বন্তরি ;—সুতরাং এ মহামারীর সময় তাঁর দ্বারে এসেই হত্যা দিয়ে পড়্‌ত দেশের যত গরীব দুঃখী। দুলালীও তাঁর করুণা হ'তে বঞ্চিত হয়নি, বরং তার উপর তাঁর অনুকম্পা যেন একটু বেশী মাত্রাতেই বর্ষিত হয়েছিল—তা সে তাঁর ঘেসেড়ার ঘরণী বলে'ই হোক আর যাই হোক। ঔষধের তার মূল্য দিতে হ'ত না, অধিকন্তু জমিদারের ছেলে পায়ে হেঁটে দিনে দু-তিন বার নন্দর ভাঙা ঘরে এসে তার ছিন্ন মলিন শয্যা-পার্শ্বে বসে' রোগের লক্ষণ নিরীক্ষণ কর্‌তেন। এতে তাঁর মহত্ত্ব, আশ্রিত-বাৎসল্যই প্রকাশ পেত সন্দেহ নেই। কিন্তু দুলালীর মনের মধ্যে কেমন একটা খট্‌কা লেগেছিল সেই প্রথম ঔষধ আনার দিন থেকেই। উপায়হীনা সে, তাই এ বিপদের দিনে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর দান তাকে হাত পেতে নিতেই হচ্ছিল ;—স্বামী যে আজ তার রোগ-শয্যায়!

দিনের পর দিন একভাবেই কেটে চল্‌ল। আহার নেই—নিদ্রা নেই—ক্লান্তি নেই—আলস্য নেই, দুলালী যেন তার ব্রত-উদ্‌যাপনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। সাবিত্রীর মতন সে স্বামীর জন্য কালের সঙ্গেও পাল্লা দিতে প্রস্তুত। নারীর শক্তি যে কোথায় তা সে ভাল করে'ই বুঝিয়ে দিলে স্বামীর সেই রোগ-শয্যায় তার জীবন-মরণের সঙ্কট-সময় মঙ্গল দিয়েই সে ঘিরে রেখেছিল পীড়িত স্বামীকে কল্যাণ-হস্তেই সে মুছিয়ে দিত তার যত অকল্যাণ। এমন একনিষ্ঠা সেবা-ভক্তি কি বিফল হ'তে পারে ?—দুলালীর প্রাণের আহ্বান প্রাণের দেবতার পায় পৌছুল, দিনে দিনে নন্দ রোগ-মুক্তির দিকেই অগ্রসর হ'তে লাগ্‌ল।

মাসখানেক পরে নন্দ যেদিন সেরে উঠে তার দাওয়ায় এসে বস্‌ল সেদিন সে ঠিক্ বুঝ্‌তে পার্‌লে কতখানি

আত্মত্যাগে দুলালী তাকে বাঁচিয়ে তুলেছে। দুলালীর পাণ্ডু মুখের দিকে চাইতেই নন্দর চোখ ছাপিয়ে জল এসে পড়ল। দুলালীর চোখেও আজ আনন্দাশ্রু—সে যে তার স্বামীকে বাঁচিয়ে তুলেছে! অশ্রুতে আজ অশ্রু চিনে নিলে. চোখের জলের মাঝখানে আজ তাদের সত্যিকারের শুভ দৃষ্টি হ'য়ে গেল।

দুলালী জানত—নন্দর শুধু সে বিনামূল্যেই পেয়ে এসেছে। কিন্তু যামিনী-বাবু যে তাঁর সহানুভূতির দান দুলালীর নামে খরচ-খাতায় জের টেনে টেনেই এসেছেন তা তার ধারণাই ছিল না। নন্দ তখন একটু-আধটু কাজ করবার শক্তি পেয়েছে। দুঃখী মানুষ—বাড়ী বসে' থাকলে ত আর চলবে না, তাই সকাল-সকাল খেয়েই সে কাজে বার হ'য়ে গেছে। হঠাৎ দুপুর বেলায় ডাক্তার-বাবুর ঔষধের মূল্যের দাবী এসে পড়ল দুলালীর কাছে। তা এমনই ঘৃণ্য যে দুলালীর অন্তরাত্মা তাতে সায় দেওয়া দূরে থাক তার মনের মধ্যে একটা দারুণ ধিক্কার জেগে উঠল। তাড়াতাড়ি নিজের কুঁড়ে-ঘরের দ্বাররুদ্ধ করে' সে একেবারে মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ল—আর্ত্তকণ্ঠে বলে' উঠল—"ভগবান্—এও শেষে শুনতে হ'ল!"

পূজোর বড় দেরী নেই। নন্দ দূরের হাটে দুলালীর জন্য একখানা পছন্দসই শাড়ী কিনতে গেছে। দুলালী বার বার বলে' দিয়েছে সন্ধ্যার আগেই যেন সে বাড়ী ফেরে। কিন্তু একে বুড়া মানুষ, তার উপর দারুণ রোগে তার সামর্থ্যও আর বড় বেশী ছিল না। সুতরাং ফিরতি বেলায় মাঝ-পথেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। অসুখের পর এতখানি পথ হাঁটায় সে শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছিল। যাই হোক দু-পা জোর জোর চলে এসে যখন সে দূর হ'তেই দেখলে কুটীর-মধ্যে মাটির প্রদীপটা তখনও মিটিমিটি জলছে—তখন আনন্দে সে শ্রান্তির কথা ভুলে'ই গেল। এত নিকটে সে তবুও যেন বোধ হচ্ছিল বড় দূর। ঐ! ঐ কুটীরে তার দুলালী তারই অপেক্ষায় প্রদীপ জেলে বসে' আছে। —আছে কি? হঠাৎ নন্দর দু-গণ্ড বয়ে' অশ্রুর উৎস ছুটে' গেল—কি এক অজানা আশঙ্কায় তাঁর প্রাণটা আঁৎকে উঠল দৌড়ে উঠানের মাঝ-খানে এসে ভীতি-বিজড়িতকণ্ঠে ডাক দিলে—"দুলালী।" তার ব্যথায় সহানুভূতি দেখিয়ে দিগন্ত হ'তেও প্রতিধ্বনি উঠল—'লালী'। নীরব অন্ধকার উঠানে দাঁড়িয়ে সে আর একবার ডাক দিলে—"দুলালী"। শূন্য আকাশ হ'তে সেই শব্দ উঠল—'লালী'। ঘরের স্তিমিত আলোকটা উজ্জল করে' দিয়ে আবার সে ব্যাকুল-ভাবে ডাক দিলে—"দুলু"। সাড়া নেই—শব্দ নেই—শুধু প্রাণহীন পিতল-কাঁসার বাসনগুলার মধ্য হ'তে বেজে উঠল তার ব্যথার সুরের ঝঙ্কার। বাইরে এসে আকাশ-বাতাস পূর্ণ করে' তার সব শক্তি এক করে'—বার বার ডাক দিলে—'দুলালী—দুলালী,' কোন উত্তর নেই। শুধু প্রতিধ্বনি তার কাতর আহ্বান দিক-দিগন্তে বয়ে' নিয়ে গিয়ে অনন্তের মাঝে ছড়িয়ে দিলে। বৃক্ষের উপর হ'তে একটা পেচক বার দুই বিকট চীৎকার করে' নন্দর মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল।

দুলালী নেই!—নন্দর হৃদয়ভেদী হাহাকার অর্দ্ধসুপ্ত গ্রামবাসীদের কাছে সংবাদ নিয়ে গেল—দুলালী নেই। দুলে পাড়ার আদর্শ ঘরণী—সদা-শান্তশীলা চির লাজময়ী —নন্দর জীবন-সঙ্গিনী—দুলালী নেই?—বিস্ময়কেও যে বিস্মিত ক'রে তুলে! নিদ্রা ভেঙে গেল। শয্যা ছেড়ে সব ছুটে' এল নন্দর উঠানের মাঝে। বনে-ঝোপে—বাগানে-বাগানে—বিলে পুকুরে—সকলের ঘরে ঘরে খোঁজ হ'ল—দুলালী কই? সকলের বিনিদ্র রজনী কেটে গেল শুধু তারই তল্লাসে। কোন খোঁজই তার মিলল না। ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের কারো আর জানতে বাকী রইল না—দুলালী নেই। দুলালী কই? নন্দর বুক ভেঙ্গে গেছে—থাকে থাকে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠে—দুলালী কই? তার ভাঙা ঘরের অধিষ্ঠাত্রী—শেষ জীবনের সম্বল—নয়নের আলো—সে দুলালী কই? রোগ-শয্যায় কল্যাণময়ী—দুঃখ-কষ্টে মমতাময়ী—জীবনে তার ব্যথার ব্যথী—সে দুলালী কই? নন্দ কেবল চোখের জল ফেলে আর খুজে' বেড়ায় তার লালীকে। আহার-

নিদ্রা ভুলে গেছে সে—বিরাম নেই—বিশ্রাম নেই—শুধু অতীতের স্মৃতিটুকু বুকে নিয়ে আজ সে ঘুরে বেড়ায় গ্রামের ঘাটে মাঠে—পথে-পথে।

আকাশে তখনও দু-একটা তারা মিটমিট করছে, দিকে দিকে অন্ধকার তখনও স্তরে স্তরে সাজান। রাত্রিশেষের স্নিগ্ধ হাওয়ায় নন্দর একটু তন্দ্রা এল। ঘন্টা-খানেক পরে পূজাবাড়ীর শানাইয়ের প্রভাতী রাগিণীতে তার তন্দ্রা ভেঙে গেল। চোখ চাইতেই ক্ষীণ দৃষ্টিতে দেখ্‌তে পেলে পায়ের উপর তার যেন একরাশ শিউলী ফুল। ভাল চাইতেই সে বুঝ্‌লে এত শেফালী নয় এ যে দুলালী!—তার খালি ঘরের রাণী! আনন্দে-বিস্ময়ে সে চীৎকার করে' উঠ্‌ল—"দুলালী—দুলালী—সত্যিই তুই এলি? আর পাগল করিস্‌নে রে দুলু, সত্যিই বল্‌ দেখি তুই-ই কি আমার দুলালী?" অশ্রুনিবদ্ধস্বরে সে উত্তর দিলে—"ওগো আমিই সেই—আমিই।"

"কিন্তু গেলিই বা কেমন করে' আর এলিই বা কেমন করে' দুলু?"

"কেমন করে' গেলাম?—সে একটা দুঃস্বপ্ন, সব মনে নেই শুধু জানি কে এসে আমার গলা টিপে' নিয়ে গেল। আর এলাম যে কি করে' তাও বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে। তবে তোমার পায়ের তলায়ই যখন এসে পড়েছি তখন জান্‌ছি সত্যিই এসেছি। কিন্তু আর নয় ওগো আর নয়। এ-কুটীরে থাকা আর আমাদের চল্‌বে না। নরকের হাওয়া একবার বয়ে গেছে এর উপর দিয়ে—এখন যেন শ্বাস-রুদ্ধ হ'য়ে আস্‌ছে। চল, আজ তোমার হাত ধরে' বার হ'য়ে পড়ি।"

"কিন্তু কোথায় যাবি লালী?"

দুলালী আবেগভরেই বলে' উঠ্‌ল, "যাব?—কেন দেবতার রাজ্যের পবিত্রতার মাঝখানে, যেখানে পুণ্যের হাওয়া বয়।"

"তবে চল্‌ দুলালী আমাদের সময় এসেছে।"

• • • •

গ্রামের পথ বেয়ে চলেছে আজ এক বৃদ্ধ আর তার যষ্টিধারিণী। বিস্ময়ে অবাক্‌ হ'য়ে লোকে চেয়ে দেখ্‌লে নন্দ আর দুলালী। জমিদারের নূতন পাইক এসে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"কে গো তোমরা"? নন্দ হেসে উত্তর দিলে, "গ্রামের ভিখারী"। কথাটা জমিদারের কানে পৌঁছল "গ্রামের স্ত্রী"। বাইরে এসে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "কোথায় যাবে তোমরা"? তেম্‌নি হেসেই নন্দ উত্তর দিলে, "পূজো দিতে"। উদ্বিগ্নভাবে জমিদার বল্‌লেন, "কেন—এখানে"। ঘোমটা খুলে'ই দুলালী উত্তর দিলে, "কাকে পূজো দেব? মাটির পুতুলের ত এ পূজো নেবার ক্ষমতা নেই"। জমিদার চেয়ে দেখ্‌লেন প্রতিমা আজ তাঁর সত্যিই মাটির পুতুল। উচ্চকণ্ঠে ডাক দিয়ে বল্‌লেন, "ফিরে আয় ফিরে আয় মা"।

দেবীর মতনই দীপ্তি ছড়িয়ে দুলালী হেসে বল্‌লে, "বাইরে থেকে যে আজ ডাক এসেছে, বাবা"।

শ্রী দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়

চোখের দেখা

চোখের চাওয়া ধন্য হ'ল তোমায় দেখে,
মনটি আমার পথের ধারে এলেম রেখে;
ধূলির পরে যেথায় তোমার চরণ-রেখা,
লুব্ধ মানস ব্যাকুল হ'য়ে ঘুর্‌ছে একা;
স্মরণ-পটে আভাসখানি রাখ্‌ছে এঁকে,
চোখের চাওয়া ধন্য হ'ল তোমায় দেখে'।

হয়ত দেখা হবে না আর তোমার সনে,
চল্‌তে পথে হঠাৎ তবু পড়্‌বে মনে;
একটু ব্যথা একটু প্রীতি নিরাশ-ভরা
জাগ্‌বে মনে একটি নিমেষ কাঁপন-ধরা;
বয়ে' যাবে তোমার স্মৃতির আবেশ মেখে,
চোখের চাওয়া ধন্য হ'ল তোমায় দেখে'।

শ্রী পরেশনাথ চৌধুরী

চর্‌কা ও দুর্ভিক্ষজনিত অন্নকষ্ট নিবারণ

কল্পনার চন্দ্রলোকে আরোহণ করিয়া যিনি বাস্তব জগতের সত্যকে তাঁহার লেখনী দ্বারা আঘাত করেন, তাঁহার লেখনী ধারণ যে সার্থক হয় নাই, ইহা আমরা অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিতে পারি। ভাব যখন সত্যকে অবলম্বন করিয়া বড় হইয়া উঠে, তখনই তাহা শ্রেষ্ঠ ও মহান্‌ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু সত্যকে ধ্বংস করিয়া যদি ভাবের প্রতিষ্ঠা করা হয়, তবে তাহা অচিরে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। সম্প্রতি ওয়েল্‌ফেয়ার্‌ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত এম্‌ এন রায় মহাশয় আচার্য্য রায়ের "খদ্দরের বাণীর" উপর কটাক্ষ করিয়া যে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ বাহির করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অকপট চিন্তাশীলতার পরিচায়ক হইতে পারে, কিন্তু কখনই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। তিনি তাঁহার প্রবন্ধের একস্থানে লিখিয়াছেন—

"ডাক্তার রায় এই কথা মানিয়া লইয়াছেন যে, গ্রাম্য অধিবাসীগণের অনেক অবসর সময় আছে এবং সেইজন্যই তিনি বিশ্বাস করেন যে, চর্‌কা একদিন সার্ব্বজনীন হইয়া উঠিবে। কিন্তু ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। তিনি যে অবসরের কথা বলিতেছেন, তাহা গ্রামবাসীগণের আদৌ নাই; সুতরাং চর্‌কা কখনও সার্ব্বজনীনভাবে গৃহীত হইতে পারে না।"

ওয়েল্‌ফেয়ার পত্রের সম্পাদকীয় মন্তব্যে মিষ্টার্‌ এম্‌ এন্‌ রায়ের প্রবন্ধের ভিতরকার কথাটি ধরিয়া একটি সুন্দর সমালোচনা বাহির হইয়াছে। মিষ্টার্‌ রায়ের প্রবন্ধটির মুখ্য উদ্দেশ্য এই বলা, যে, চাষীদের চর্‌কা কাটার সময় নাই। কিন্তু শ্রীযুক্ত এম্‌ এন্‌ রায় মহাশয় এই কথাটি ভুলিয়া গিয়াছেন যে চাষীদের যদি বা সময় না থাকে, তাহাদের স্ত্রীকন্যাগণের সময় থাকিতে পারে। মেয়েরাই বরাবর বেশী সূতা কাটিত—সর্ব্বতোভাবে স্ত্রী-কন্যারাই সূতা কাটিত, একথাও বলা যাইতে পারে। চাষীদের সময় আছে কি নাই, তাহা লইয়া এস্থলে আলোচনা করা তত প্রয়োজনীয় মনে করি না। যাহা হউক ওয়েল্‌ফেয়ারের সম্পাদক মহাশয় এই আলোচনায় যে সারগর্ভ কথা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—

"ডাক্তার স্যার্‌ পি সি রায় নিখিলভারত খদ্দর সভায় যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত এম্‌ এন্‌ রায় মহাশয় ওয়েল্‌ফেয়ারের বর্ত্তমান সংখ্যায় তাহার এক সমালোচনা বাহির করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, যে, এক-ফসল-জন্মা দেশে চাষীদিগকে বৎসরের মধ্যে আটমাস অবিশ্রান্তভাবে ১২ ঘণ্টা করিয়া পরিশ্রম করিতে হয়। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভুল কথা। তাহাদিগকে দিনের পর দিন যে পরিশ্রম করিতে হয়, তাহা ঠিক অবিশ্রান্ত নয়, ভিন্ন ভিন্ন সময়ের কৃষিকাজের মধ্যে বিশ্রামেরও সময় আসে। তার পর আর-এক কথা, দিনের আলো থাকিতেই তাহাদিগকে মাঠের কাজ সম্পন্ন করিতে হয়। যে কয়ঘণ্টা সূর্য্যের আলো থাকে তাহা অপেক্ষা তাহাদের পরিশ্রমের সময় বেশী হইতে পারে না। তার পর ইহাও সম্ভব হইতে পারে না, যে, এক-ফসল-জন্মা দেশে উপর্য্যুপরি ২৪০ দিন ১২ ঘণ্টাকাল সূর্য্যের আলো থাকিবে। বৎসরের যে-যে দিন ১২ ঘণ্টাকাল সূর্য্যের আলো থাকে, তখন চাষীরা মাঠেই তাহাদের দুই বেলার বা এক বেলার আহার সম্পন্ন করিয়া লয়; ইহাতেও তাহাদের কিছু সময় অতিবাহিত হইয়া যায়।"

"শ্রমঅপচয় ও দারিদ্র্য-সমস্যার চরম সমাধান করিতে হইলে, সমাজের শক্তি ও তাহার উপাদানগুলিকে সাধ্যমত কর্ম্মরত করিতে হইবে। একথা কেহই বলিতে পারেন না, যে, ভারতের জনসাধারণ কর্ম্মক্লান্ত এবং তাহাদের উপর আরও অতিরিক্ত কাজের বোঝা চাপাইলে তাহাদের সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কিঞ্চিৎ সুবিধা হওয়া সত্ত্বেও ইহা তাহাদের পক্ষে ঘোর অমঙ্গলকর হইবে। অধিক শ্রম বা অধিক ভোজন, এই দুইটি হইতেই ভারতের জনসাধারণ বঞ্চিত। তাহারা অর্দ্ধভুক্ত থাকে বলিয়াই তাহাদিগকে অধিক কর্ম্মশ্রান্ত বলিয়া মনে হয়। যদি তাহাদের সাংসারিক আয় কিছু বাড়িয়া যায়, তবে তাহাদের কর্ম্মশক্তি যে আরও বহুল পরিমাণে জাগিয়া উঠিবে, ইহা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি। অর্থনীতির দিক্‌ হইতে ডাক্তার রায়ের বক্তৃতার যে মূল্যই থাকুক না কেন, চর্‌কার দ্বারা আমাদের জাতীয় ধন সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সুন্দর-রূপে বিতরিত হউক বা না হউক, আমাদের স্থির বিশ্বাস আছে, যে, চর্‌কা (বা এই উদ্দেশ্যে অবলম্বিত অন্য কোন ছোট শিল্প) দ্বারা চাষীরা তাহাদের জমির সামান্য আয়ের উপর আরও ধনবৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইবে।"

শ্রীযুক্ত এম্‌ এন্‌ রায়ের প্রবন্ধের জবাব সম্পাদক মহাশয়ই দিয়াছেন, তবে বাস্তব ক্ষেত্রে হাতে-কলমে চর্‌কার কাজে যে সুফল পাওয়া যাইতেছে, তাহা উল্লেখ করিলে, এই বিষয়টি আরও স্পষ্ট হইবে, এই আশায়, চর্‌কার দুর্ভিক্ষ নিবারণ-শক্তির দৃষ্টান্ত দিতেছি। লেখক মহাশয়ের যদি সামান্য খাদি-কর্ম্মের সহিত পরিচয় থাকিত, তবে আজ তিনি এই সরল সত্যকে বুঝিবার জন্য গভীর গবেষণা করিয়া মস্তিষ্কের অপব্যবহার করিতেন না। চর্‌কায় যে কিরূপ সুফল ফলিয়াছে, তাহা একবার বগুড়া জেলার তালোড়া, চাঁপাপুর, দুর্গাপুর প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিলে সহজেই বোধগম্য হইবে। এই অঞ্চল প্রকৃত-পক্ষে এক-ফসলের দেশ; ঠিক দেড় বৎসর পূর্ব্বে আদমদিঘী প্রভৃতি স্থান আমরা পরিদর্শন করি। তখন বিগত ভীষণ বন্যায় এইসমস্ত স্থানের কি সর্ব্বনাশ হইয়াছিল, তাহা পাঠকবর্গের স্মরণ আছে। কার্ত্তিক মাসে দেখা গেল, যে-স্থানে এক মাস পূর্ব্বে ছয় ফুট সাত ফুট জল উঠিয়াছিল, উত্তরের হাওয়া বহিতেই সেই স্থানের মাটি শুকাইয়া ফাটল বাহির হইয়াছে এবং পাথরের ন্যায় শক্ত হইয়াছে। এইজন্য এই অঞ্চলে রবিখন্দ একবারে হয় না বলিলেই হয়। আমন ধান্যই এখানকার লোকের উপজীব্য। একবার বন্যায় ইহাদের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে, তাহার উপর আবার গত বৎসর উত্তরবঙ্গে অনাবৃষ্টিহেতু অনেক জমি একবারে চাষ করা হয় নাই। এই কারণে উল্লিখিত গ্রামসমূহে ভয়ানক অন্ন-কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। সুখের বিষয় বঙ্গীয় রিলিফ কমিটি আত্রাই, রঘুরামপুর, তালোড়া, চাঁপাপুর প্রভৃতি কেন্দ্রে আড়াইহাজার চর্‌কা বিতরণ করিয়াছেন এবং বরিশাল, মাদারীপুর, বিক্রমপুর প্রভৃতি অঞ্চলের অক্লান্তকর্ম্মী যুবকদের সহায়তায় এইসব অঞ্চলের মেয়েদের দ্বারা চর্‌কার সূতা কাটিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সম্প্রতি আচার্য্যদেব চাঁপাপুর কেন্দ্র পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে যাইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। সেখানে প্রতি সপ্তাহে চারিমণ করিয়া সূতা উঠিতেছে। আমি অনেক চাষীকে

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, চর্‌কার দ্বারা তাহাদের সুবিধা হইতেছে কি না। তাহারা বলিল—"বা আপনারা চর্‌কা দিয়াছেন বলিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি।" একজন চাষী বলিল, "আমার ঘরে পাঁচটা চর্‌কা লইয়াছি; অবসর মত পরিবারস্থ সকলেই সুতা কাটে এবং এই উপায়ে আমার সংসারে প্রতি সপ্তাহে সাড়ে চারি টাকা (৪।৹ টাকা) আয় হয়। একমাত্র চাঁপাপুর কেন্দ্র হইতে কাটুনীর মজুরী স্বরূপ প্রতি সপ্তাহে ২০০৲ টাকা বিতরিত হইতেছে।"

প্রবন্ধ-লেখক মিষ্টার্ এন্ এন্ রায় আর একস্থানে লিখিয়াছেন—

"যখন কৃষকেরা আবার তাহাদের দৈনন্দিন কৃষিকর্ম্ম আরম্ভ করে, তখন আর তাহাদের চর্‌কা কাটিবার অবসর থাকে না—চর্‌কার মধুর সঙ্গীত-ধ্বনি আর তাহাদিগকে আকৃষ্ট করিতে পারে না।"

ইহার উত্তরে যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি তাহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। সম্প্রতি মাঝে মাঝে বৃষ্টি হইতেছে, কাজেই মাটি নরম হইয়াছে। লিখিবার সময় চারিদিকে তাকাইয়া দেখিতেছি, কৃষকগণ উঠিয়া-পড়িয়া হলচালনা আরম্ভ করিয়াছে। ফল কথা, যদি সুবৃষ্টি হয়, তাহা হইলে আষাঢ় মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে ধান্য রোপণ শেষ হইবে। ১৫ই পৌষের পূর্ব্বে ধান্য কাটা সুরু হয় না। আমরা দেখিয়াছি ১৫ই আষাঢ় হইতে ১৫ই পৌষ পর্য্যন্ত ইহাদের ক্ষেতের জন্য কোনও মেহনত করিতে হয় না। কৃষকগণ হাতপা কোলে করিয়া বসিয়া কাটায় এবং সর্ব্বসাকল্যে বৎসরের মধ্যে ৮ মাস ইহাদের পূর্ণমাত্রায় অবকাশ। খুলনা জেলার সুন্দরবন-সন্নিকটস্থ প্রদেশগুলিও এক-ফসলের দেশ। সে-অঞ্চলেও চাষীদের বৎসরে তিন চারিমাসের অধিক ক্ষেতে কাজ করিতে হয় না।

আচার্য্যদেব অন্নসমস্যা প্রভৃতি বক্তৃতা ও প্রবন্ধে পুনঃ পুনঃ দেখাইয়াছেন—অলসতা ও শ্রমবিমুখতাই বাঙ্গালী জাতির সর্ব্বনাশের মূল। আত্রাই হইতে সুরু করিয়া একদিকে দিনাজপুর ও অপরদিকে বগুড়া পর্য্যন্ত মাড়োয়ারী ছাইয়া পড়িয়াছে এবং দেশের সার শোষণ করিয়া লইয়া সবল ও সতেজ হইতেছে। অথচ বাঙ্গালী, কি নিম্নশ্রেণীর কি উচ্চশ্রেণীর দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হইয়া কঙ্কালসার হইয়া পড়িতেছে। এই অঞ্চলের কৃষকগণ কিপ্রকার অলস ও শ্রমকাতর, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে। প্রসঙ্গক্রমে ডাক্তার রায় রেলের বিশ্রামাগারে সান্তাহারের কোনও রেলকর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে নিয়ত কত কুলী কাজ করে?" উক্ত রেলওয়ে কর্ম্মচারী বলিলেন—"দুই সহস্রেরও অধিক হইবে। ইহারা প্রত্যেকে প্রত্যহ আট দশ আনা করিয়া অর্থাৎ প্রতি মাসে ন্যূনকল্পে ১৫৲ টাকা রোজগার করে।" তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, অন্যূন ত্রিশ হাজার টাকা মাসে হিন্দুস্থানী ও উড়িয়া কুলীরা উপায় করিতেছে, অর্থাৎ বৎসরে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা লইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই সান্তাহার ষ্টেশনের চারিপার্শ্বে চাষীগণের গ্রাম। তাহারা ইচ্ছা করিলেই বাড়ীর ভাত খাইয়া রেলের মজুরের কাজ করিয়া উপার্জ্জন করিতে পারে। কিন্তু তাহা তাহারা কদাচ করিবে না। কুলীর কাজ করিলে তাহাদের ইজ্জৎ নষ্ট হইবে। অথচ তাহারা জমিদার ও মহাজনের নিকট বিক্রীত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যদি এই সাড়ে তিন লক্ষ টাকা প্রতিবৎসর সান্তাহার ষ্টেশনের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে ছড়াইয়া পড়িত, তাহা হইলে এই অঞ্চলের কি-প্রকার শ্রীবৃদ্ধি হইত তাহা পাঠকবর্গকে আর বলিয়া দিতে হইবে না।

মিষ্টার এম্ এন্ রায়ের কবি-কল্পনা-প্রসূত কয়েকটি উপাদেয় ছত্র উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি। তিনি বলিতেছেন—এক-ফসলের দেশে কৃষকগণ ১২ ঘণ্টা বা ততোধিক কাল পরিশ্রম করে। "যেভাবে কৃষকদিগকে কঠিন পরিশ্রম করিতে হয়, তাহাতে তাহাদের জীবনশক্তি এমনভাবে নষ্ট হইয়া যায়, যে, যদি তাহাদের এই কয় মাস অবসরের সময় না থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের জীবনের শেষ হইয়া যাইত। এক-ফসল-জন্মা দেশের চাষীদিগকে দেখিয়া মনে হয়, যে, তাহারা বৎসরের মধ্যে ৪ মাস অলসভাবে বসিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহারা ১২ মাসের কাজ আটমাসে সম্পন্ন করিয়া যে অবসর ভোগ করে, ইহা তাহাদের ন্যায্য ও অর্জ্জিত অবসর।"

আটমাস কঠোর পরিশ্রমের দরুন্ বাকী চার মাস শরীর ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কুম্ভকর্ণের মত নিদ্রাভিভূত থাকা দরকার, ইহাই তাঁহার যুক্তি। লেখক মহাশয়ের যদি স্বাস্থ্যতত্ত্বের নিয়মগুলির সহিত কিছুমাত্র পরিচয় থাকিত, তবে তিনি এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিতে কখনই সাহস করিতেন না। উপর্য্যুপরি ৮ দিন প্রচুর আহার করিয়া ৪ দিন উপবাস করা যেমন দেহের পক্ষে অনিষ্টকর, ১২ মাস কঠিন শারীরিক পরিশ্রম করিয়া ৪ মাস বিশ্রাম ভোগ করাও তেম্‌নি স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপদ্‌জনক। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে, এক-ফসলের দেশে কৃষককে ৩।৪ মাসের অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না। দৈবাৎ ২।৪ দিন মাত্র রোপণের সময় ১২ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে হয়। এবিষয়ে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন।

আর-একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। চর্‌কার প্রচলনে যে কেবল কাটুনীরা পয়সা রোজগার করে তাহা নয়, জোলা এবং তাঁতীগণও তাহাদের জীবিকা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হয়। এই তালোড়া কেন্দ্রের সন্নিকট গ্রামগুলিতে অনেক কারিকর জোলা আছে। তাহারা এই ভীষণ অন্নকষ্টের দিনে পৈতৃক ব্যবসায়ে অন্ন হয় না দেখিয়া নানা স্থানে পাগলের মত ছুটিয়া বেড়াইতেছিল। কিন্তু আজ ঘরের দুয়ারে চর্‌কার সুতা পাইয়া তাহাদের প্রাণে আনন্দ হইয়াছে। খাদি-কেন্দ্রগুলি যে তাঁতী, জোলা ও কাটুনীদের মধ্যে অন্ন বিতরণ করিতেছে, সেইজন্য আজ ঐগুলি আমাদের পুণ্যতীর্থ। মহাত্মা গান্ধী যে চর্‌কাকে অন্নপূর্ণা নাম দিয়াছেন, তাহা আজ সার্থক হইয়াছে। আমরা হিসাব করিয়া দেখিলাম যে, দুইসের সুতায় কাটুনীরা যে-স্থলে ২।৹ টাকা পায়, সে-স্থলে জোলা তাঁতীরা তিনটাকা রোজগার করে। দেশবাসীর নিকট আজ এই মাত্র বক্তব্য যে, দেশের গরীব তাঁতী ও গরীব কাটুনী তাহাদের প্রাণ দিয়া যে খদ্দরকে আমাদের নিকট নিবেদন করিয়াছে, তাহা কি আমরা সাদরে গ্রহণ করিব না?

পরিশেষে বক্তব্য এই, গত বন্যায় প্রপীড়িত লোকদিগকে সাহায্য করিবার পর বঙ্গীয় রিলিফ্ কমিটির হাতে কিছু টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। প্রথম বৎসরের কাজ শেষ হইতে-না-হইতে এঅঞ্চলে গত বৎসর অনাবৃষ্টির দরুন্ ফসল একরূপ হয় না। ভাবী দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় রিলিফ্ কমিটি ঐ উদ্বৃত্ত টাকা দিয়া চর্‌কার প্রচলন করেন। ঐ টাকার দ্বারাই এত বড় অনুষ্ঠান চলিতেছে। রিলিফ্ কমিটির এই টাকাও শেষ হইয়া আসিতেছে। আচার্য্যদেবের অধিনায়কত্বে খদ্দরের কাজ করিয়া রিলিফ কমিটি বাংলা তথা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের অনেক সহৃদয় ব্যক্তির যেরূপ সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহাতে আশা করা যায় অর্থাভাবে এরূপ মহৎ অনুষ্ঠান কখনও নষ্ট হইবে না।

শ্রী বিনয়কুমার সেন

ভারতীয় বালিকাদের ব্যায়াম-চর্চ্চা

দশ বৎসর পূর্ব্বে কুমারী নাজীর বাঈ সেখ বরোদা উচ্চ-ইংরেজী বালিকা-বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রী হইয়া আসেন। ইঁহার বাল্যকথা অতীব বিস্ময়কর। বোম্বাই উইলসন্ কলেজে অধ্যয়ন-কালে ইঁহাকে শারীরিক

কুমারী নাজীর বাঈ সেখ
বরোদার বিখ্যাত ব্যায়ামশিক্ষক প্রোফেসর মানেক রাওয়ের সহকারিতায় ইনি বালিকাদিগের ব্যায়াম শিক্ষায় মনোনিবেশ করিয়াছেন

অসুস্থতার জন্য পাঠ ত্যাগ করিতে হয়। জীবনের শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষাটিকে এই-ভাবে বিসর্জ্জন দিয়া তিনি অত্যন্ত উৎসাহহীনা হইয়া পড়েন। বরোদায় আসিবার পরে বিখ্যাত শরীর-তত্ত্ববিৎ প্রোফেসর মানেক রাওয়ের নাম শুনিয়া তাঁহার ব্যায়াম-চর্চ্চা করিবার ইচ্ছা হয়। প্রোফেসর মানেক রাও বরোদায় একটি আখড়া স্থাপন করিয়াছিলেন, সেখানে তিনি বালকদিগকে ব্যায়াম শিক্ষা দিতেন। তাঁহার নিকট গিয়া শিক্ষা

পরলোকগত কুমারী নজক্ বাঈ সেখ

লাভ করা সম্ভবপর না হওয়ায় কুমারী নাজীর বাঈ তাঁহার ভ্রাতাকে উক্ত আখড়ায় প্রেরণ করেন। তিনি ও তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নী কুমারী নাজীর বাঈ ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের ভ্রাতার নিকট গৃহে বসিয়া ব্যায়াম-চর্চ্চা করেন।
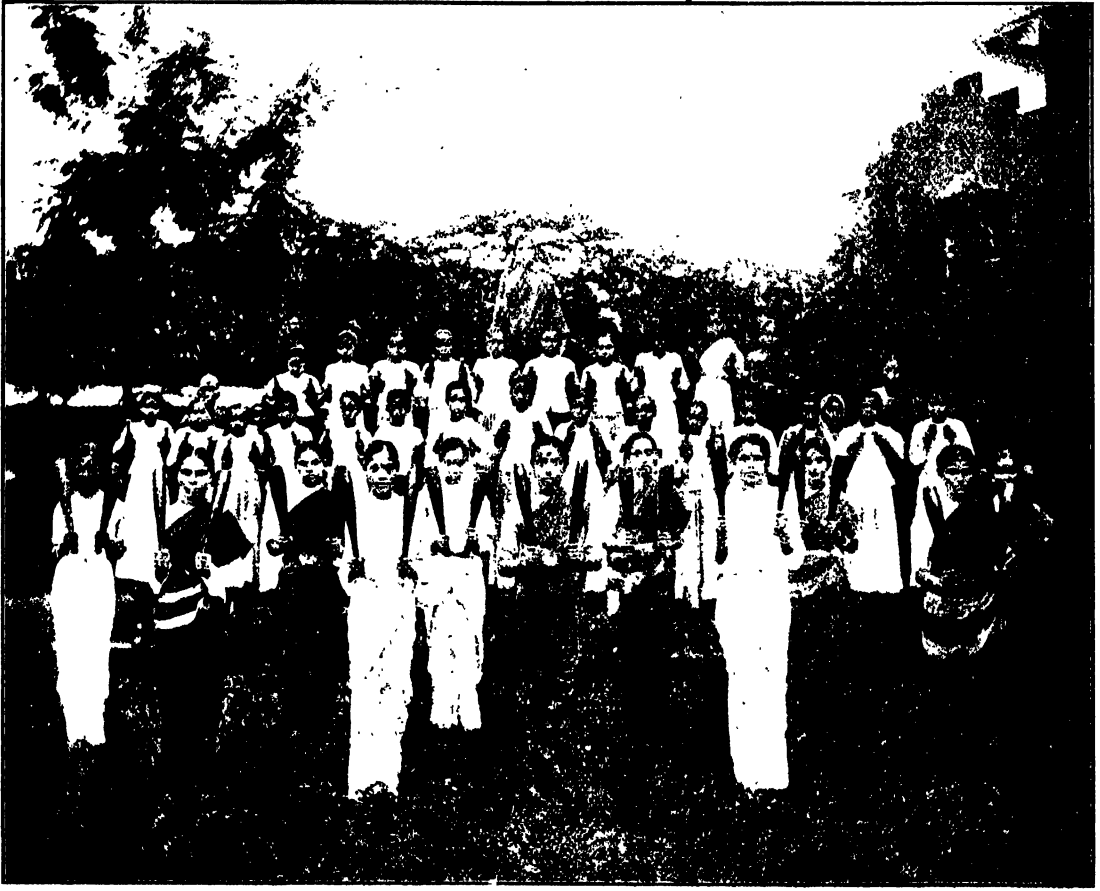
বরোদার বালিকারা মুগুর লইয়া ব্যায়াম করিতেছে। পশ্চাতে দণ্ডায়মানা কুমারী নাজীর বাঈ আদেশ দিতেছেন

কুমারী নাজক্ বাঈ অতি অল্পকাল-মধ্যেই শরীর বিজ্ঞান ও ব্যায়াম-প্রণালী এরূপভাবে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হন যে তাঁহার একটি ব্যায়াম-বিদ্যালয় খুলিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয়। শীঘ্রই তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর সাহায্যে তিনি একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

প্রথমে বিদ্যালয়ের ছাত্রী-সংখ্যা বেশী হয় নাই কারণ তৎকালে বরোদার সম্ভ্রান্ত বংশের অনেকেই রক্ষণশীল মতাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু অচিরেই বরোদার গাইকোয়াড়ের আত্মীয় ও বরোদা-সরকারের উচ্চ রাজকর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত কাশীরাও যাদবের দৃষ্টি এই অভিনব-ধরণের বিদ্যালয়টির প্রতি আকৃষ্ট হয়। তিনি প্রথমে নিজের কন্যাদিগকে এই বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া সৎসাহসের পরিচয় দেন। ক্রমে তাঁহার চেষ্টায় বিদ্যালয়টির প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। বরোদার গাইকোয়াড় ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে একটি পারিতোষিক-সভায় বালিকাদিগের ব্যায়াম দেখিয়া এতই সন্তুষ্ট হন, যে তিনি অচিরেই তাহার রাজ্যের বালিকা-বিদ্যালয়-সমূহে ব্যায়াম-শিক্ষা একটি অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয় বলিয়া ঘোষণা করেন।

এই সময়ে কুমারী নাজক্ বাঈয়ের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে এই অনুষ্ঠানটির বিশেষ ক্ষতি হয়। কিন্তু কুমারী নাজীর বাঈ ইহাতে হতাশ হন নাই। তিনি ও বিখ্যাত সমাজ-সংস্কারক পণ্ডিত আত্মারামের কন্যা শ্রীমতী সুশীলা বালিকাদিগের শরীর-চর্চ্চা-সম্বন্ধে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন।

এই বিদ্যালয়ে বালিকাদিগের জন্য অনেকপ্রকার ক্রীড়া শিক্ষা দেওয়া হয়। ক্রীড়ার আদেশগুলি মারাঠী

ভাগায় দেওয়া হয়। কখনও কখনও মুগুর, কখনও বা লাঠির সাহায্যে ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হয়। এই ক্রীড়াগুলির অনেক দেশী নাম আছে যথা (১) কপাদা, (২) ডবল কপাদা, (৩) ওয়াদাদ্ কপাদা। কপাদা খেলাতে বালিকাদিগকে এক পংক্তিতে বসিয়া মুরগীর মতো অগ্র-পশ্চাৎ লাফালাফি করিতে হয়। ডবল কপাদা অপেক্ষাকৃত কঠিন। জিমনা খেলা আরও আনন্দদায়ক।

এই বিদ্যালয়ে বালিকাদিগকে এবং বিশেষ করিয়া অপেক্ষাকৃত বর্ষীয়সী মহিলাগণকে আসন অথবা যৌগিক অঙ্গাভ্যাস শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রথমতঃ "তলাসন" করা হয়। হস্ততালুদ্বয় মাটিতে স্থাপন করিয়া দেহকে কখনও উচ্চে, কখনও বা নিম্নে সঞ্চালন করার নাম 'তলাসন'। পাদাসনে ছাত্রীকে এক পায়ের উপর দাঁড়াইয়া অন্য পা হাঁটুর উপরে রাখিতে হয় এবং হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ করিয়া সঞ্চালন করিতে হয়। "গফ্" নামক ব্যায়াম অতি প্রাচীন কাল হইতে এদেশে চলিয়া আসিতেছে। কথিত আছে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে গোপবালাগণের সহিত এই খেলা খেলিতেন। কোন অট্টালিকার ছাদ হইতে বা বৃক্ষ-শাখার সঙ্গে কতকগুলি রঙীন দড়ি ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। এক-একটি বালিকা এক এক গাছ দড়ি ধরিয়া ঝুলিতে থাকে, ক্রমাগত দোল দেওয়া হয় ও বালিকারা সমস্বরে গান করিতে থাকে। গিবগিব-মাসা-নামক ব্যায়ামে বালিকারা একটি আদেশ পাওয়া মাত্র সারি বাঁধিয়া বৃত্তাকারে দাঁড়ায় ও ক্রমাগত সুতা কাটিতে থাকে। ইহা ভিন্ন এখানে নানাপ্রকার নৃত্যাদির সাহায্যেও ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হয়।

এই ব্যায়াম-প্রণালীগুলি ভারতবর্ষের বালিকাদিগের পক্ষে বিশেষরূপে উপযোগী। ইউরোপীয় ব্যায়ামশিক্ষায় এদেশবাসী বালিকাদের অভিভাবকগণের আপত্তি থাকিতে পারে কিন্তু এই ব্যায়ামগুলি একাধারে শরীর রক্ষা করে ও আনন্দদান করে। বাড়ীতে মিলিয়া ভাই-ভগ্নীতে এইপ্রকার ব্যায়াম করা চলে। আমাদের মনে হয় কুমারী সেথ যদি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে তাঁহার এই অভিনবধরণের ব্যায়াম-শিক্ষা-প্রণালী প্রচলন করিবার চেষ্টা করেন, তবে দেশের ও নারী-সমাজের প্রভূত উপকার হইতে পারে। আমরা আশা করি দেশের ধনী সম্প্রদায় এবিষয়টির উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া কুমারী নাজীর বাইকে যথাশক্তি সাহায্য করিবেন।

শ্রী প্রভাত সান্যাল

অভিশপ্ত

আমার জীবনে সেই একটা অদ্ভুত ব্যাপার সেবার ঘটেছিল।

বছর তিনেক আগেকার কথা। আমাকে বরিশালের ওধারে যেতে হয়েছিল একটা কাজে।

ও অঞ্চলের একটা গঞ্জ থেকে বেলা প্রায় ১২টার সময় নৌকোয় উঠ্‌লুম। আমার সঙ্গে এক নৌকোয় বরিশালের এক ভদ্রলোক ছিলেন। গল্পে-গুজবে সময় কাটতে লাগ্‌ল।

সময়টা পূজার পরেই। দিনমানটা মেঘলা মেঘলা কেটে গেল। মাঝে মাঝে টিপ্ টিপ্ করে' বৃষ্টিও পড়্‌তে সুরু হ'ল। সন্ধ্যার কিছু আগে কিন্তু আকাশটা অল্প পরিষ্কার হ'য়ে গেল। ভাঙা-ভাঙা মেঘের মধ্যে দিয়ে চতুর্দ্দশীর চাঁদের আলো অল্প অল্প প্রকাশ হ'ল।

সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বড় নদী ছেড়ে একটা খালে পড়্‌লুম—শোনা গেল খালটা এখান থেকে আরম্ভ হ'য়ে নোয়াখালির উত্তর দিয়ে একেবারে মেঘনায় মিশেছে। পূর্ব্ববঙ্গে সেই আমার নতুন যাওয়া, চোখে কেমন সব একটু নতুন ঠেকতে লাগ্‌ল। অপরিসর খালের দু'ধারে

বৃষ্টিস্নাত কেয়ার জঙ্গলে মেঘে আধ-ঢাকা চতুর্দ্দশীর জ্যোৎস্না চিক্ চিক্ কর্‌ছিল। মাঝে মাঝে নদীর ধারে বড় বড় মাঠ। শঠি, বেত, ফার্ন্ গাছের বন জায়গায় জায়গায় খালের জলে ঝুঁকে পড়েছে। বাইরে একটু ঠাণ্ডা থাক্‌লেও আমি ছইএর বাইরে বসে' দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাচ্ছিলুম—বরিশালের সে-অংশটা সুন্দরবনের কাছাকাছি, ছোট ছোট খাল ও নদী চারিধারে, সমুদ্র খুব দূরে নয়, ১০।১৫ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমেই হাতিয়া ও বদ্বীপ। আর-একটু রাত হ'ল। খালের দুপাড়ের নির্জ্জন জঙ্গল অস্ফুট জ্যোৎস্নায় কেমন যেন অদ্ভুত দেখ্‌তে লাগ্‌ল। এ-অংশে লোকের বসতি একেবারে নেই; শুধু ঘন বন আর জলের ধারে বড় বড় হোগ্‌লা গাছ।

আমার সঙ্গী বল্‌লেন—"এত রাতে আর বাইরে থাক্‌বেন না, আসুন ছইএর মধ্যে। এসব জঙ্গলে—বুঝ্‌লেন না?"

তার পর তিনি সুন্দরবনের নানা গল্প কর্‌তে লাগ্‌লেন। তাঁর এক কাকা নাকি ফরেষ্ট ডিপার্ট্‌মেণ্টে কাজ কর্‌তেন, তাঁরই লক্ষ্যে করে' তিনি একবার সুন্দর-বনের নানা অংশে বেড়িয়েছিলেন—সেইসব গল্প।

রাত প্রায় বারোটার কাছাকাছি হ'ল।

মাঝি আমাদের নৌকোয় ছিল মোটে একটি। সে বলে' উঠ্‌ল—"বাবু একটু এগিয়ে গিয়ে বড় নদী পড়্‌বে। এত রাতে একা সে নদীতে পাড়ি জমাতে পার্‌ব না। এখানেই নৌকা রাখি।"

নৌকা সেখানেই বাঁধা হ'ল। এদিকে বড় বড় গাছের আড়ালে চাঁদ অস্ত গেল। দেখ্‌লুম অপ্রশস্ত খালের দুধারেই অন্ধকারে ঢাকা ঘন জঙ্গল। চারিদিকে কোন শব্দ নেই, পতঙ্গগুলো পর্য্যন্ত চুপ করেছে। সঙ্গীকে বল্‌লুম—"মশায় এই ত সরু খাল—পাড় থেকে বাঘ লাফিয়ে পড়্‌বে না ত নৌকার ওপর?"

সঙ্গী বল্‌লেন—"না পড়্‌লেই আশ্চর্য্য হব।"

শুনে' অত্যন্ত পুলকে ছইএর মধ্যে ঘেঁসে বস্‌লুম। খানিকটা বসে' থাক্‌বার পর সঙ্গী বল্‌লেন—"আসুন একটু শোয়া যাক্। ঘুম ত হবে না আর ঘুমোনো ঠিকও না, আসুন একটু চোখ বুজে' থাকি।"

খানিকটা চুপ করে' থাক্‌বার পর সঙ্গীকে ডাক্‌তে গিয়ে দেখি তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন, মাঝিও জেগে আছে বলে' মনে হ'ল না; ভাব্‌লুম তবে আমিই বা কেন মিথ্যে-মিথ্যে চোখ চেয়ে থাকি—মহাজনদের পথ ধর্‌বার উদ্যোগ কর্‌লুম।

তার পর যা ঘট্‌ল সে আমার জীবনের এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। শুতে যাচ্ছি হঠাৎ আমার কানে গেল অন্ধকার বন-ঝোপের ওপারে অনেক দূরে গভীর জঙ্গলের মধ্যে কে যেন কোথায় গ্রামোফোন বাজাচ্ছে। তাড়াতাড়ি উঠে' বস্‌লুম—গ্রামোফোন্? এ বনে এত রাতে গ্রামোফোন্ বাজাবে কে? কান পেতে শুন্‌লুম গ্রামোফোন্ না। অন্ধকারে হিজল হিন্তাল গাছগুলো যেখানে খুব ঘন হ'য়ে আছে, সেখান থেকে কারা যেন উচ্চ-কণ্ঠে আর্ত্তকরুণ সুরে কি বল্‌ছে। খানিকটা শুনে' মনে হ'ল সেটা একাধিক লোকের সমবেত কণ্ঠস্বর। প্রতিবেশীর তেতালার ছাদে গ্রামোফোন্ বাজ্‌লে যেমন খানিকটা স্পষ্ট খানিকটা অস্পষ্ট অথচ বেশ একটা একটানা সুরের ঢেউ এসে কানে পৌঁছয় এও অনেকটা সেইভাবের। মনে হ'ল যেন কতকগুলো অস্পষ্ট বাংলা ভাষার শব্দ কানেও গেল—কিন্তু ধর্‌তে পারা গেল না কথাগুলো কি। শব্দটা মাত্র মিনিটখানেক স্থায়ী হ'ল, তার পরই অন্ধকার বনভূমি যেমন নিস্তব্ধ ছিল, আবার তেম্‌নি নিস্তব্ধ হ'য়ে গেল। তাড়াতাড়ি ছইএর বাইরে এলুম। চারিপাশের অন্ধকার ঝিঙের বিচির মতন কালো। বনভূমি নীরব, শুধু নৌকার তলায় ভাঁটার জল কল্‌কল্ করে' বাধ্‌ছে, আর শেষ রাত্রের বাতাসে জলের ধারে কেয়াঝোপে একপ্রকার অস্পষ্ট শব্দ হচ্ছে। পাড় থেকে দূরে হিজল গাছের কালো কালো গুঁড়িগুলোর অন্ধকারে এক অদ্ভুত চেহারা হয়েছে।

ভাব্‌লুম সঙ্গীদের ডেকে তুলি। আবার ভাব্‌লুম বেচারীরা ঘুমুচ্ছে ডেকে কি হবে, তার চেয়ে বরং নিজে জেগে বসে' থাকি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট্

ধরালুম; তার পর আবার ছইএর মধ্যে ঢুক্‌তে যাব, এমন সময় সেই অন্ধকারে ঢাকা বিশাল বনভূমির কোন্ অংশ থেকে এক সুস্পষ্ট উচ্চ আর্ত্ত করুণ ঝিঁঝিঁ পোকার রবের মতন তীক্ষ্ণস্বর তীরের মতন জমাট অন্ধকারের বুক চিরে' আকাশে উঠ্‌ল—"ওগো নৌকা-যাত্রীরা, তোমরা কারা যাচ্ছ, আমরা শ্বাস বন্ধ হ'য়ে ম'লাম, আমাদের ওঠাও ওঠাও—আমাদের বাঁচাও।"

নৌকার মাঝিটা ধড়মড় করে' জেগে উঠ্‌ল. আমি সঙ্গীকে ডাক্‌লুম—"মশায়, ও মশায়, উঠুন উঠুন।"

মাঝি আমার কাছে ঘেঁসে এল, ভয়ে তার গলার স্বর কাঁপ্‌ছিল। বল্‌লে—"আল্লা! আল্লা! শুন্‌তে পেয়েছেন বাবু?"

সঙ্গী উঠে' জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"কি, কি মশায়! ডাক্‌লেন কেন? কোনো জানোয়ার-টানোয়ার নাকি?"

আমি ব্যাপার বল্‌লুম। তিনিও তাড়াতাড়ি ছইএর বাইরে এলেন। তিনজনে মিলে' কান খাড়া করে' রইলুম। চারিদিক্ আবার চুপ, ভাঁটার জল নৌকার তলায় বেধে আগের চেয়েও জোরে শব্দ হচ্ছিল।...

সঙ্গী মাঝিকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"এটা কি তবে?"

মাঝি বল্‌লে—"হ্যাঁ বাবু, বাঁয়েই কীর্ত্তিপাশার গড়।"

সঙ্গী বল্‌লেন—"তবে তুই এত রাত্রে এখানে নৌকো রাখ্‌লি কেন? বেকুব কোথাকার!—"

মাঝি বল্‌লে—"তিন জন আছি ব'লেই রেখেছিলাম বাবু। ভাঁটার টানে নৌকো পিছিয়ে নেবারও ত জো ছিল না।"

কথা-বার্ত্তার ধরণ শুনে' সঙ্গীকে বল্‌লুম—"কি মশায়, কি ব্যাপার? আপনারা কিছু জানেন নাকি?"

ভয়ে যত হোক্ না হোক্ বিস্ময়ে আমরা কেমন হ'য়ে গিয়েছিলুম। সঙ্গী বল্‌লেন—"ওরে তোর সেই কেরোসিনের ডিবেটা জাল্। আলো জেলে বসে' থাকা যাক্—রাত এখনও ঢের।"

মাঝিকে বল্‌লুম—"তুই শব্দটা শুন্‌তে পেয়েছিলি?"

সে বল্‌লে—"হ্যাঁ বাবু, আওয়াজ কানে গিয়েই ত আমার ঘুম ভেঙে গেল, আমি আরও দুবার নৌকো বেয়ে যেতে যেতে ও-ডাক শুনেছি।"

সঙ্গী বল্‌লেন—"এটা এঅঞ্চলের একটা অদ্ভুত ঘটনা। তবে এজায়গাটা সুন্দরবনের সীমানায় বলে' আর এ অঞ্চলে কোন লোকালয় নেই বলে', শুধু নৌকোর মাঝিদের কাছেই এটা সুপরিচিত। এর পেছনে একটা ইতিহাস আছে—সেটা অবশ্য নৌকোর মাঝিদের পরিচিত নয়—সেইটে আপনাকে বলি শুনুন্।"

তার পর ধূমায়িত কেরোসিনের ডিবার আলোয় অন্ধকার বনের বুকের মধ্যে বসে' সঙ্গীর মুখে কীর্ত্তিপাশার গড়ের ইতিহাসটা শুন্‌তে লাগ্‌লুম:—

৩০০ বছর আগেকার কথা। মুনিম খাঁ তখন গৌড়ের সুবাদার। এঅঞ্চলে তখন বারভূঁইয়ার দুই প্রতাপ-শালী ভূঁইয়া রাজা রামচন্দ্র রায় ও ঈশা খাঁ মসনদ-ই-আলির খুব প্রতাপ। মেঘনার মোহানার বাহির সমুদ্র যাকে এখন সন্দ্বীপ-চ্যানেল্ বলে, সেখানে তখন মগ আর পর্ত্তুগীজ্ জলদস্যুরা শিকারান্বেষণে শ্যেন পক্ষীর মত ওৎ পেতে বসে' থাকৃত।

সে-সময় এখানে এরকম জঙ্গল ছিল না। এসব জায়গা তখন কীর্ত্তি রায়ের অধিকারে ছিল। এইখানে তাঁর সুদৃঢ় দুর্গ ছিল—মগ জলদস্যুদের সঙ্গে তিনি অনেক বার লড়েছিলেন। তাঁর অধীনে সৈন্য সামন্ত কামান যুদ্ধের কোষা সবই ছিল। সন্দ্বীপ তখন ছিল পর্ত্তুগীজ্ জলদস্যুদের প্রধান আড্ডা। এদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা কর্‌বার জন্যে এঅঞ্চলের সকল জমিদারকেই সৈন্যবল দৃঢ় করে' গড়্‌তে হ'ত। ঐ বনের পশ্চিম ধার দিয়ে তখন আর-একটা খাল বড় নদীতে পড়্‌ত, বনের মধ্যে তার চিহ্ন এখনও আছে।

কীর্ত্তি রায় অত্যন্ত অত্যাচারী এবং দুর্দ্ধর্ষ জমিদার ছিলেন। তাঁর রাজ্যে এমন সুন্দরী মেয়ে কমই ছিল যে, তাঁর অন্তঃপুরে একবার না ঢুকেছে। তা ছাড়া তিনি নিজেও এক-প্রকার জলদস্যু ছিলেন। তাঁর নিজের অনেকগুলো বড় বড় ছিপ্ ছিল—আশপাশের জমিদারী এমন কি নিজের জমিদারীর মধ্যেও সম্পত্তিশালী গৃহস্থের ধনরত্ন স্ত্রী-কন্যা লুটপাট করা-রূপ মহৎ কার্য্যে সেগুলি ব্যবহৃত হ'ত।

কীর্ত্তি রায়ের পাশের জমিদারী ছিল কীর্ত্তি রায়ের এক

বন্ধুর। এঁরা ছিলেন চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র রায়েদের পত্তনিদার। অবশ্য সে-সময় অনেক পত্তনিদারের ক্ষমতা এখনকার স্বাধীন রাজাদের চেয়ে কম ছিল না। কীর্ত্তি রায়ের বন্ধু মারা গেলে তাঁর তরুণবয়স্ক পুত্র নরনারায়ণ রায় পিতার জমিদারীর ভার পান। নরনারায়ণ তখন সবে যৌবনে পদার্পণ করেছেন, অত্যন্ত সুপুরুষ, বীর ও শক্তিমান্। নরনারায়ণ কীর্ত্তি রায়ের পুত্র চঞ্চল রায়ের সমবয়সী ও বন্ধু।

সেবার কীর্ত্তি রায়ের নিমন্ত্রণে নরনারায়ণ রায় তাঁহার রাজ্যে দিন কতকের জন্যে বেড়াতে এলেন। চঞ্চল রায়ের তরুণী পত্নী লক্ষ্মী দেবী স্বামীর বন্ধু নরনারায়ণকে দেবরের মত স্নেহের চক্ষে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। দু-একদিনের মধ্যেই কিন্তু সে স্নেহের চোটে নরনারায়ণকে বিব্রত হ'য়ে উঠ্‌তে হ'ল। নরনারায়ণ রায় তরুণবয়স্ক হ'লেও একটু গম্ভীর-প্রকৃতি। বিদ্যুৎ-চঞ্চলা তরুণী বন্ধুপত্নীর ব্যঙ্গ-পরিহাসে গম্ভীর-প্রকৃতি নরনারায়ণের মান বাঁচিয়ে চলা দুষ্কর হ'য়ে পড়্‌ল। স্নান করে' উঠেছেন, মাথার তাজ খুঁজে' পাওয়া যায় না, নানা জায়গায় খুঁজে' হয়রান হ'য়ে তার আশা ছেড়ে দিয়ে বসে' আছেন, হঠাৎ কখন নিজের বালিশ তুল্‌তে গিয়ে দেখেন তার নীচেই তাজ চাপা আছে—যদিও এর আগেও তিনি বালিশের নীচে খুঁজেছেন। তাঁর প্রিয় তরবারিখানা দুপুর থেকে বিকেলের মধ্যে পাঁচ বার হারিয়ে গেল, আবার পাঁচ বারই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত স্থান থেকে খুঁজে' পাওয়া গেল। তাম্বুলে এমন সব দ্রব্যের সমাবেশ হ'তে লাগ্‌ল, যা কোনো কালেই তাম্বুলের উপকরণ নয়। তরল-মস্তিষ্কা বন্ধুপত্নীকে কিছুতেই এঁটে উঠ্‌তে না পেরে অত্যাচার-জর্জ্জরিত নরনারায়ণ রায় ঠিক্ করলেন তাঁর বন্ধুর স্ত্রীটি একটু ছিটগ্রস্ত। বন্ধুর দুর্দ্দশায় চঞ্চল রায় মনে মনে খুব খুসি হ'লেও বাইরে স্ত্রীকে বল্‌লেন—"দুদিনের জন্যে এসেছে বেচারী, ওকে তুমি যে-রকম বিব্রত করে' তুলেছ, ও আর কখনো এখানে আস্‌বে না।"

দিনকয়েক এরকমে কাট্‌বার পর কীর্ত্তি রায়ের আদেশে চঞ্চল রায়কে কি কাজে হঠাৎ গৌড়ে যাত্রা করতে হ'ল। নরনারায়ণ স্বয়ও বন্ধুপত্নী কখন কি করে' বসে, সে ভয়ে দিনকতক সশঙ্ক অবস্থায় কাল যাপন করবার পর নিজের বজ্‌রায় উঠে' হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌লেন। যাবার সময় লক্ষ্মী দেবী ব'লে দিলেন—"এবার আবার যখন আস্‌বে ভাই, এমন একটি বিশ্বাসী লোক সঙ্গে এনো যে রাতদিন তোমার জিনিষপত্র ঘরে বসে' চৌকী দেবে—বুঝ্‌লে ত?"

নরনারায়ণ রায়ের বজরা রায়মঙ্গলের মোহানা ছাড়িয়ে যাবার একটু পরেই জলদস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হ'ল। তখন মধ্যাহ্ন-কাল, প্রখর রৌদ্রে বজ্‌রার দক্ষিণ দিকের দিগ্বলয়-প্রসারী জলরাশি শানানো তলোয়ারের মত ঝক্‌ঝক্ করছিল, সমুদ্রের সে-অংশে এমন কোনো নৌকো ছিল না যারা সাহায্য করতে আস্‌তে পারে। সেটা রায়মঙ্গল আর কালাবদর নদীর মুখ, সাম্‌নেই বারসমুদ্র—সন্দীপ চ্যানেল্, জলদস্যুদের প্রধান ঘাঁটি। নরনারায়ণের বজ্‌রার রক্ষীরা কেউ হত হ'ল, কেউ সাংঘাতিক জখম হ'ল। নিজে নরনারায়ণ দস্যুদের আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে উরুদেশে কিসের খোঁচা খেয়ে সংজ্ঞাশূন্য হ'য়ে পড়্‌লেন।

জ্ঞান হ'লে তিনি দেখ্‌তে পেলেন তিনি এক অন্ধকার স্থানে শুয়ে আছেন, তার সাম্‌নে কি যেন একটা বড় নক্ষত্রের মতন জ্বল্‌ছে। খানিকক্ষণ জোরে চোখের পলক ফেল্‌বার পর তিনি বুঝ্‌লেন যাকে নক্ষত্র বলে' মনে হয়েছিল তা প্রকৃত পক্ষে একটি অতি ক্ষুদ্র গবাক্ষপথে আগত দিবালোক। নরনারায়ণ দেখ্‌লেন তিনি একটি অন্ধকার কক্ষের আর্দ্র মেজের ওপর শুয়ে আছেন, ঘরের দেওয়ালে স্থানে স্থানে সবুজ শেওলার দল গজিয়েছে।

কয়েক দিন কয়েক রাত কেটে গেল। কেউ তাঁর জন্যে কোন খাদ্য আন্‌লে না, তিনি বুঝ্‌লেন যারা তাঁকে এখানে এনেছে, তাঁকে না খেতে দিয়ে মেরে ফেলা তাদের উদ্দেশ্য। মৃত্যু!—সাম্‌নে নির্ম্মম মৃত্যু!

সে দিনমানও কেটে গেল। আঘাত-জনিত ব্যথায় এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অবসন্নদেহ নরনারায়ণের চোখের সাম্‌নে থেকে গবাক্ষ-পথের শেষ দিবালোক মিলিয়ে গেল। তিনি অন্ধকার ঘরের পাষাণ-শয্যায় ক্ষুধাকাতর দেহ প্রসারিত করে' অধীরভাবে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে

লাগ্‌লেন। প্রকৃতির একটা ক্লোরোফর্ম্‌ আছে, যন্ত্রণা পেয়ে মর্‌ছে এমন প্রাণীকে মৃত্যু-যন্ত্রণা থেকে বাঁচাবার জন্যে সেটা মুমূর্ষু প্রাণীকে অভিভূত করে। ধীরে ধীরে যেন সেই দয়াময়ী মৃত্যু-তন্দ্রা এসে তাঁকেও আশ্রয় করলে। অনেক ক্ষণ পরে, কতক্ষণ পরে তা তিনি বুঝ্‌তে পার্‌লেন না —হঠাৎ আলো চোখে লেগে তাঁর তন্দ্রাঘোর কেটে গেল। বিস্মিত নরনারায়ণ চোখ মেলে' দেখ্‌লেন, তাঁর সাম্‌নে প্রদীপ-হস্তে দাঁড়িয়ে তাঁর বন্ধুপত্নী লক্ষ্মী দেবী। কথা বল্‌তে গিয়ে লক্ষ্মী দেবীর ইঙ্গিতে নরনারায়ণ থেমে গেলেন। লক্ষ্মী দেবী হাতের প্রদীপটি আঁচল দিয়ে ঢেকে নরনারায়ণকে তাঁর অনুসরণ কর্‌তে ইঙ্গিত কর্‌লেন। একবার নরনারায়ণের সন্দেহ হ'ল—এসব স্বপ্ন নয় ত?···কিন্তু ঐ যে দীপশিখার উজ্জ্বল আলোয় আর্দ্র ভিত্তিগাত্রের সবুজ শেওলার দল স্পষ্ট দেখা যায়!

নরনারায়ণ শক্তিমান্‌ যুবক, ক্ষুধায় দুর্ব্বল হ'য়ে পড়্‌লেও নিশ্চিত মৃত্যুর গ্রাস থেকে বাঁচ্‌বার উৎসাহে তিনি দৃঢ়-পদে অগ্রবর্ত্তিনী ক্ষিপ্রগামিনী বন্ধুপত্নীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চল্‌লেন। একটা বক্রগতি পাথরের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে' একটা দীর্ঘ সুড়ঙ্গ পার হবার পর তিনি দেখ্‌লেন যে, তাঁরা কীর্ত্তি রায়ের প্রাসাদের সাম্‌নের খালধারে এসে পৌঁচেছেন। লক্ষ্মী দেবী একটা ছোট বেতে বোনা থলি বার করে' তাঁর হাতে দিয়ে বল্‌লেন—"এতে খাবার আছে, এখানে খেও না, তুমি সাঁতার জানো, খাল পার হ'য়ে ওপারে গিয়ে কিছু খেয়ে নাও, তার পর যত শীগ্‌গির পারো, পালিয়ে যাও।"

ব্যাপার কি নরনারায়ণ রায় একটু একটু বুঝ্‌লেন। তাঁর বিস্তৃত জমিদারী কীর্ত্তি রায়ের জমিদারীর পাশেই এবং তাঁর অবর্ত্তমানে কীর্ত্তি রায়ই দনুজমর্দ্দনদেবের বংশধরদের ভবিষ্যৎ পত্তনিদার। অতবড় বিস্তৃত ভূসম্পত্তি, সৈন্য-সামন্ত কীর্ত্তি রায়ের হাতে এলে তিনি কি আর কিছু গ্রাহ্য কর্‌বেন? কীর্ত্তি রায় যে মাথা নীচু করে' আছেন তার এই কি কারণ নয় যে, তাঁর এক পাশে বাক্‌লা, চন্দ্রদ্বীপ—অন্যপাশে ভুলুয়ার প্রতাপশালী ভূঁইয়া রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্য?

প্রদীপের আলোয় নরনারায়ণ দেখ্‌লেন, তাঁর বন্ধু-পত্নীর মুখের সে চটুল হাস্য-রেখার চিহ্নও নেই, তাঁর মুখখানি সহানুভূতিতে-ভরা মাতৃমুখের মতন স্নেহকোমল হ'য়ে এসেছে। তাদের চারি পাশে গাঢ় অন্ধকার, মাথার ওপর আকাশের বুক চিরে' দিগন্ত-বিস্তৃত উজ্জ্বল ছায়া-পথ, নিকটেই খালের জল জোর ভাটার টানে তীরের হোগ্‌লা গাছ দুলিয়ে কল্‌কল্‌ শব্দে বড় নদীর দিকে ছুটেছে। নরনারায়ণ আবেগপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"বৌ-ঠাক্‌রুন্‌! চঞ্চলও কি এর মধ্যে আছে?"

লক্ষ্মী দেবী বল্‌লেন—"না ভাই, তিনি কিছু জানেন না। এসব শ্বশুরঠাকুরের কীর্ত্তি। এইজন্যেই তাঁকে অন্য জায়গায় পাঠিয়েছেন, এখন আমার মনে হচ্ছে। গৌড়-টৌড় সব মিথ্যে।"

নরনারায়ণ দেখ্‌লেন, লজ্জায় দুঃখে তাঁর বন্ধুপত্নীর মুখ বিবর্ণ হ'য়ে উঠেছে। লক্ষ্মী দেবী আবার বল্‌লেন—'আমি আজ জান্‌তে পারি। খিড়কী-গড়ের পাইক সর্দ্দার আমায় মা বলে—তাকে দিয়ে দুপুর রাতের পাহারা সব সরিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। তাই—"

নরনারায়ণ বল্‌লেন—"বৌ-ঠাক্‌রুন্‌, আমার এক বোন্‌ ছেলেবেলায় মারা গিয়েছিল,—তুমি আমার সেই বোন্‌ আজ আবার ফিরে' এলে।"

লক্ষ্মী দেবীর পদ্মের মতন মুখখানি চোখের জলে ভেসে গেল। একটু ইতস্ততঃ করে' বল্‌লেন—"ভাই, বল্‌তে সাহস পাইনে, তবুও একটা কথা বল্‌ছি—বোন্‌ বলে' যদি রাখ···"

নরনারায়ণ জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"কি কথা বৌ-ঠাক্‌রুন্‌?"

লক্ষ্মী দেবী বল্‌লেন—"তুমি আমার কাছে বলে' যাও ভাই যে, শ্বশুরঠাকুরের কোন অনিষ্ট-চিন্তা তুমি কর্‌বে না?"

নরনারায়ণ রায় একটুখানি কি ভাব্‌লেন, তার পর বল্‌লেন—"তুমি আমার প্রাণ দিলে বৌ-ঠাক্‌রুন্‌, তোমার কাছে বলে' যাচ্ছি তুমি বেঁচে থাক্‌তে আমি তোমার শ্বশুরের কোন অনিষ্ট-চিন্তা কর্‌ব না।"

বিদায় নিতে গিয়ে নরনারায়ণ একবার জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"বৌ-ঠাক্‌রুন্‌ তুমি ফিরে' যেতে পার্‌বে ত?"

লক্ষ্মী দেবী বল্লেন—"আমি ঠিক যাব, তুমি কিন্তু যতদূর পারো সাঁতরে গিয়ে তার পর ডাঙায় উঠে' চলে' যেও।"

নরনারায়ণ রায় সেই ঘনকৃষ্ণ অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে খালের জলে পড়ে' মিলিয়ে গেলেন।

লক্ষ্মী দেবীর প্রদীপটা অনেকক্ষণ বাতাসে নিবে গিয়েছিল—তিনি অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে শ্বশুরের গড়ের দিকে ফিরলেন। একটু দূরে গিয়ে তিনি দেখ্লেন, পাশের ছোট খালটায় দুখানা ছিপ্ মশালের আলোয় সজ্জিত হচ্ছে—ভয়ে তাঁর বুকের রক্ত জমে' গেল—সর্ব্বনাশ! এরা কি তবে জান্‌তে পেরেছে? দ্রুতপদে অগ্রসর হ'য়ে গুপ্ত সুড়ঙ্গের মুখে এসে তিনি দেখ্‌তে পেলেন সুড়ঙ্গের পথ খোলাই আছে। তার পর তিনি তাড়াতাড়ি সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে' পড়লেন।

কীর্ত্তি রায় বুঝ্‌তেন নিজের হাতের আঙুলও যদি বিষাক্ত হ'য়ে ওঠে ত তাকে কেটে ফেলাতেই সমস্ত শরীরের পক্ষে মঙ্গল। পরদিন আবার দিনের আলো ফুটে উঠল, কিন্তু লক্ষ্মী দেবীকে আর কোন দিন কেউ দেখেনি। রাতের হিংস্র অন্ধকার তাঁকে গ্রাস করে' ফেলেছিল।

নরনারায়ণ রায় নিজের রাজধানীতে বসে' সব শুন্‌লেন—গুপ্ত সুড়ঙ্গের দুধারের মুখ বন্ধ করে' কীর্ত্তি রায় তাঁর পুত্রবধূর শ্বাসরোধ করে' তাঁকে হত্যা করেছেন। শুনে' তিনি চুপ করে' রইলেন। এর কিছুদিন পরে তাঁর কানে গেল—বাশুণ্ডার লক্ষ্মণ রায়ের মেয়ের সঙ্গে শীঘ্র চঞ্চলের বিয়ে।

সেদিন রাত্রে চাঁদ উঠলে নিজের প্রাসাদ-শিখরে বেড়াতে বেড়াতে চারিদিকের শুভ্র সুন্দর আলোর সাগরের দিকে দৃষ্টিপাত করে' দৃঢ়চিত্ত নরনারায়ণ রায়েরও চোখের পাতা যেন ভিজে উঠ্‌ল—তাঁর মনে হ'ল তাঁর অভাগিনী বৌঠাকুরাণীর হৃদয়-নিঃসারিত নিষ্পাপ অকলঙ্ক পবিত্র স্নেহের ঢেউয়ে সারা জগৎ ভেসে যাচ্ছে, মনে হ'ল তাঁরই অন্তরের শ্যামলতায় জ্যোৎস্না-ধৌত বনভূমির অঙ্গে অঙ্গে শ্যামসুন্দর শ্রী, নীরব আকাশের তলে তাঁর চোখের দুষ্ট হাসিটি তারায় তারায় নবমল্লিকার মতন ফুটে' উঠেছে। নরনারায়ণ রায়ের পূর্ব্বপুরুষেরা ছিলেন দুর্দ্ধর্ষ ভূম্যধিকারী দস্যু…হঠাৎ পূর্ব্বপুরুষের সেই বর্ব্বর রক্ত নরনারায়ণের ধমনীতে নেচে উঠ্‌ল, তিনি মনে মনে বল্‌লেন,—আমার অপমান আমি একরকম ভুলেছিলাম বৌ-ঠাক্‌রুন্, কিন্তু তোমার অপমান আমি সহ্য কখনো কর্‌ব না।

কিছুদিন কেটে গেল। তার পর একদিন এক শীতের ভোররাত্রির কুয়াসা কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, কীর্ত্তি রায়ের গড়ের খালের মুখ ছিপে, স্লুপে, জাহাজে ভরে' গিয়েছে। তোপের আওয়াজে কীর্ত্তি রায়ের প্রাসাদ-দুর্গের ভিত্তি ঘন ঘন কেঁপে উঠতে লাগ্‌ল। কীর্ত্তি রায় শুন্‌লেন আক্রমণকারী নরনারায়ণ রায়, সঙ্গে দুরন্ত পর্ত্তুগীজ জলদস্যু সিবাষ্টিও গঞ্জালেস্। উভয়ের সম্মিলিত বহরের চল্লিশখানা কোষা খালের মুখে চড়াও হয়েছে; পূরা বহরের বাকী অংশ বাহির নদীতে দাঁড়িয়ে।

এ আক্রমণের জন্য কীর্ত্তি রায় পূর্ব্ব থেকে প্রস্তুত ছিলেন—কেবল প্রস্তুত ছিলেন না নরনারায়ণের সঙ্গে গঞ্জালেসের যোগদানের জন্যে। রাজা রামচন্দ্র রায় এবং রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্যের সঙ্গে গঞ্জালেসের কয়েক বৎসর ধরে' শত্রুতা চলে' আস্‌ছে, এ অবস্থায় গঞ্জালেস্ যে, তাঁদের পত্তনিদার নরনারায়ণ রায়ের সঙ্গে যোগ দেবে—এ কীর্ত্তি রায়ের কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ঘটনা। তা হ'লেও কীর্ত্তি রায়ের গড় থেকেও তোপ চল্‌ল।

গঞ্জালেস্ সুদক্ষ নৌ-বীর। তার পরিচালনে দশখানা স্লুপ চড়া ঘুরে' গড়ের পাশের ছোট খালে ঢুক্‌তে গিয়ে কীর্ত্তি রায়ের নওয়ারায় এক অংশ দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হ'ল। গড়ের কামান সেদিকে এত প্রখর যে খালের মুখে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে বহর মারা পড়ে। গঞ্জালেস্ দুখানা ছোট কামান-বাহী স্লুপ ছোট খালের মুখে দাঁড় করিয়ে বাকীগুলো সেখান থেকে ঘুরিয়ে এনে চড়ার পিছনে দাঁড় করালে। গঞ্জালেসের অধীনস্থ অন্যতম জলদস্যু মাইকেল রোজারিও ডি ভেগা এই ছোট বহর খালের মধ্যে ঢুকিয়ে গড়ের পশ্চিম দিক্ আক্রমণ কর্‌বার জন্যে আদিষ্ট হ'ল।

অতর্কিত আক্রমণে কীর্ত্তি রায়ের নওয়ারা শত্রু-বহর

কর্ত্তৃক ছিপি-আঁটা বোতলের মতন খালের মধ্যে আট্‌কে গেল—বার নদীতে যেয়ে যুদ্ধ দেবার ক্ষমতা তাদের আদৌ রইল না। তবুও তাদের বিক্রমে রোজারিও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কিছু করে' উঠ্‌তে পার্‌লে না। কীর্ত্তি রায়ের নৌ-বহর দুর্ব্বল ছিল না, কীর্ত্তি রায়ের গড় থেকে পর্ত্তুগীজ্‌ জলদস্যুদের আড্ডা সন্দীপ খুব দূরে নয়, কাজেই কীর্ত্তি রায়কে নৌ-বহর সুদৃঢ় করে' গড়্‌তে হয়েছিল।

বড় নদীর বিশাল জলরাশি জুড়ে' অবসন্ন সূর্য্যরশ্মি যখন রক্ত-শয়ন পাত্‌লে, রোজারিওর কামানের মুখে গড়ের পশ্চিম দিক্‌টা তখন একেবারে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়েছে। নরনারায়ণ রায় দেখ্‌লেন প্রায় ত্রিশখানা কোষা জখম অবস্থায় খালের মুখে পড়ে', কীর্ত্তি রায়ের গড়ের কামানগুলো সব চুপ, নদীর দু'পাড় ঘিরে' সন্ধ্যা নেমে আস্‌ছে, উর্দ্ধে নিস্তব্ধ নীল আকাশে কেবলমাত্র এক ঝাঁক শকুনি কীর্ত্তি রায়ের গড়ের ওপর চক্রাকারে ঘুর্‌ছিল ……হঠাৎ বিজয়োন্মত্ত নরনারায়ণ রায়ের চোখের সম্মুখে বন্ধুপত্নীর বিদায়ের রাতের সন্ধ্যার পদ্মের মতন বিষাদ-ভরা ম্লান মুখখানি, কাতর মিনতিপূর্ণ সেই চোখ দুটি মনে পড়্‌ল—তীব্র অনুশোচনায় তাঁর মন তখনি ভরে' উঠ্‌ল।…তিনি করেছেন কি! এইরকম করে' কি তিনি তাঁর স্নেহময়ী প্রাণদাত্রীর শেষ অনুরোধ রাখ্‌তে এসেছেন?

নরনারায়ণ রায় হুকুম জারি কর্‌লেন কীর্ত্তি রায়ের পরিবারের এক প্রাণীরও যেন প্রাণহানি না হয়।

একটু পরেই সংবাদ এল, গড়ের মধ্যে কেউ নাই। নরনারায়ণ রায় বিস্মিত হলেন। তিনি তখনি নিজে গড়ের মধ্যে ঢুক্‌লেন। তিনি এবং গঞ্জালেস্‌ গড়ের সমস্ত অংশ তন্ন তন্ন করে' খুঁজ্‌লেন—দেখ্‌লেন সত্যই কেউ নেই। পর্ত্তুগীজ্‌ বহরের লোকেরা গড়ের মধ্যে লুটপাট কর্‌তে গিয়ে দেখ্‌লে মূল্যবান্‌ দ্রব্যাদি বড় কিছু নেই। পরদিন দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত লুটপাট চল্‌ল…কীর্ত্তি রায়ের পরিবারের এক প্রাণীরও সন্ধান পাওয়া গেল না। অপরাহ্ণে কেবলমাত্র দুখানা স্লুপ খালের মুখে পাহারা রেখে নরনারায়ণ রায় ফিরে' চলে' গেলেন।

এই ঘটনার দিন কয়েক পরে পর্ত্তুগীজ্‌ জলদস্যুর দল লুটপাট করে' চলে' গেলে কীর্ত্তি রায়ের গড়ের এক কর্ম্মচারী গড়ের মধ্যে প্রবেশ করে। আক্রমণের দিন সকালেই এ লোকটি গড় থেকে আরও অনেকের সঙ্গে পালিয়েছিল। একটা বড় থামের আড়ালে সে দেখ্‌তে পায় একজন আহত মুমূর্ষু লোক তাকে ডেকে কি বল্‌বার চেষ্টা করছে। কাছে গিয়ে সে লোকটাকে চিন্‌লে—লোকটি কীর্ত্তি রায়ের পরিবারের এক বিশ্বস্ত পুরোনো কর্ম্মচারী। তার মৃত্যুকালীন অস্পষ্ট বাক্যে আগন্তুক কর্ম্মচারিটি মোটামুটি যা বুঝ্‌লে, তাতেই তার কপাল ঘেমে উঠ্‌ল। সে বুঝ্‌লে কীর্ত্তি রায় তাঁর পরিবারবর্গ এবং ধনরত্ন নিয়ে মাটির নীচের এক গুপ্তগৃহে আশ্রয় নিয়েছেন এবং এই লোকটিই একমাত্র তার সন্ধান জানে। তখনকার আমলে এই গুপ্তগৃহগুলি প্রায় সকল বাড়ীতেই থাক্‌ত এবং এর ব্যবস্থা এমন ছিল যে বাইরে থেকে কেউ এগুলো না খুলে' দিলে তা থেকে বেরুবার উপায় ছিল না। কোথায় সে মাটির নীচের ঘর তা স্পষ্ট করে' বল্‌বার আগেই আহত লোকটা মারা গেল। বহু অনুসন্ধানেও গড়ের কোন্‌ অংশে সে গুপ্ত গৃহ ছিল তা কেউ সন্ধান কর্‌তে পার্‌লে না।

এইরকমে কীর্ত্তি রায় ও তাঁর পরিবারবর্গ অনাহারে তিলে তিলে শ্বাসরুদ্ধ হ'য়ে গড়ের যে কোন্‌ নিভৃত ভূগর্ভস্থ কক্ষে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন তার আর কোন সন্ধান হ'ল না—সেই বিরাট্‌ প্রাসাদ-দুর্গের পর্ব্বত-প্রমাণ মাটিপাথরের চাপে হতভাগ্যদের শাদা হাড়গুলো যে কোন্‌ বায়ুশূন্য অন্ধকার ভূকক্ষে তিলে তিলে গুঁড়ো হচ্ছে, কেউ তার সন্ধান পর্য্যন্ত জানে না।

ওই ছোট খালটা প্রকৃতপক্ষে সন্দীপ চ্যানেলের একটা খাড়ি। খাড়ির ধার থেকে একটুখানি গেলে গভীর অরণ্যের ভিতর কীর্ত্তি রায়ের গড়ের বিশাল ধ্বংসস্তূপ এখনও বর্ত্তমান আছে। খাল থেকে কিছু দূরে অরণ্যের মধ্যে দুই সার প্রাচীন বকুল গাছ দেখা যায়, এখন এ বকুল গাছের সারের মধ্যে দুর্ভেদ্য জঙ্গল আর শূলে কাঁটার বন, তখন এখানে রাজপথ ছিল। আর খানিকটা গেলে একটা বড় দীঘি চোখে পড়্‌বে। তারই দক্ষিণে কুঁচো ইটের জঙ্গলাবৃত স্তূপে অর্দ্ধ-প্রোথিত হাঙ্গর-মুখো

পাথরের কড়ি, ভাঙা থামের অংশ বারভুঁইয়াদের বাংলা থেকে, রাজা প্রতাপাদিত্য রায়ের বাংলা থেকে বর্ত্তমান যুগের আলোয় উঁকি মারছে। দীঘির যে ইষ্টক-সোপানে সকাল-সন্ধ্যায় তখন অতীতযুগের রাজবধূদের রাঙা পায়ের অলক্তক রাগ ফুটে' উঠ্‌ত এখন সেখানে দিনের বেলায় বড় বড় বাঘের পায়ের থাবার দাগ পড়ে, গোখুরা কেউটে সাপের দল ফণা তুলে' বেড়ায়।

এখানে কিন্তু বহুদিন থেকে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে' থাকে। দুপুর রাতে গভীর বনভূমি যখন নীরব হ'য়ে যায়, হিন্তাল হিজল গাছের কালো গুঁড়িগুলো অন্ধকারে যখন বনের মধ্যে প্রেতের মত দাঁড়িয়ে থাকে, সন্দীপ চ্যানেলের জোয়ারের ঢেউয়ের আলোকোৎক্ষেপী লোনা জল খাড়ির মুখে জোনাকীর মতন জ্বলতে থাকে, তখন খাল দিয়ে নৌকা বেয়ে যেতে যেতে মোমমধু-সংগ্রাহকেরা কতবার শুনেছে অন্ধকার বনের এক গভীর অংশ থেকে কারা যেন আর্ত্তস্বরে চীৎকার করছে,—ওগো পথযাত্রীরা, ওগো নৌকাযাত্রীরা, আমরা যে এখানে শ্বাসরুদ্ধ হ'য়ে মারা গেলাম, দয়া করে' আমাদের তোলো—ওগো আমাদের তোলো।

ভয়ে বেশী রাত্রে এপথে কেউ নৌকো বাইতে চায় না।

শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নবশিক্ষা

চিকিৎসা-তত্ত্বের ইতিহাস যাঁরা অধ্যয়ন করেছেন তাঁরা বলেন যে, এক-একটা বিশেষ চিকিৎসা-প্রণালীর আবির্ভাব ও প্রভাব কার্য্য-কারণ-পরম্পরায় কিছুদিনের জন্যে তিরোহিত হ'লেও অনেক সময়ে সামান্যমাত্র উন্নত ও পরিবর্ত্তিত আকারে নূতন ক'রে সভ্য-সমাজে গৃহীত হ'য়ে থাকে। সময় বিশেষে যুগ-ধর্ম্মই কোন প্রণালীর আদর বা অবহেলার অন্যতম কারণ বলে' নির্দ্দেশ করা যেতে পারে। শিক্ষার ইতিহাসেও এরূপ উদাহরণ দুর্লভ নয়।

সর্ব্ববিষয়ে উন্নতি সত্ত্বেও কোন-একটি বিশেষ ক্ষেত্রে একই প্রণালী বারবার ক'রে ফিরে' আসছে এ কথা মনে করবার পক্ষে বাধা থাক্‌লেও একথা সত্য যে তা ফিরে' আসে অবশ্য স্থান ও কালের বিশিষ্টতার প্রভাবকে স্বীকার ক'রে। য়ুরোপ ও মার্কিনে প্রচলিত বিভিন্ন শিক্ষা-পদ্ধতির আলোচনা করলে দেখা যায় যে, কোনটা-রই আবির্ভাব আকস্মিক নয় অথবা প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের কোন যোগ নেই এমন নয়, বরং বিভিন্ন প্রণালীর অন্তর্গত ঐক্যই বর্ত্তমান প্রচলিত প্রণালী-গুলির যুগোপযোগিতা ও সার্থকতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দেশ-বিদেশে প্রচলিত সমস্ত প্রণালীগুলির সম্যক্‌ অনুশীলনে ইহা স্পষ্টই দেখা যায় যে বিভিন্নতা সত্ত্বেও এসকলের মধ্যে বৈষম্য নেই—শিক্ষার উদ্দেশ্য ও গতি একই দিকে।

শিক্ষক, ছাত্র ও অধীত বিষয় এই তিনের সম্মিলনে শিক্ষা। এতদিন মানুষের বিশেষ নজর ছিল শিক্ষক ও বিষয়ের দিকে; এবং ছাত্র ও বিষয়ের জুড়ি হাঁকাতে গিয়ে শিক্ষক, বহুবার বিপথেই শিক্ষার রথ চালিয়েছেন, কারণ আগ্রহ-বিড়ম্বনায় ছাত্র পড়েছে পিছনে ও বিষয় এসেছে সাম্‌নে। কাজেই যেতেব সঙ্গে ছাত্রের পরিচয় হয়েছে যে-পরিমাণে ছাত্র ও বিষয়ের মধ্যে ব্যবধান বেড়েছে সেই-পরিমাণে, উভয়ের মধ্যে যোগ-সাধনের ধারাবাহিক সুসঙ্গত কোন চেষ্টাই হয়নি। বর্ত্তমানে এ-ধারা বদ্‌লেছে, এখন ছাত্র এসেছে সাম্‌নে—শিক্ষকের মুখ্য ও বিশেষ দৃষ্টি সে আকর্ষণ করেছে। কিন্তু বিষয়কে বাদ দিলে ত শিক্ষা হয় না, তাই বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির বিশেষত্ব এই যে ছাত্র ও বিষয়ের ভিতরকার সম্বন্ধটা বিশেষ ক'রেই স্বীকৃত হয়েছে এবং সে মিলন যাতে সুসঙ্গত ও সার্থক হয় সেই

চেষ্টাই চলেছে। রুশোর 'এমিল্' গ্রন্থে আমরা এলক্ষণ পেয়েছি, তাতে শিক্ষণীয় বিষয়ের চেয়ে ছাত্র বেশী যত্ন পেয়েছে। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দ থেকে আজ পর্য্যন্ত এই চিন্তা-ধারাই শিক্ষা-জগতের অন্তরে যে-সুর জাগিয়ে রেখেছে বর্ত্তমান শিক্ষার ঝোঁক তারই সঙ্গে তাল রেখে চলেছে, অথচ এতদিন পর্য্যন্ত শিক্ষা-ব্যবসায়ীর জাগ্রত দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়নি। সম্প্রতি এই ঝোঁকের একটা নামকরণ প্রয়োজন হয়েছে। মিঃ জি, ষ্ট্যান্‌লি হল এই পরিবর্ত্তিত প্রণালীর নাম দিয়াছেন paidocentric অর্থাৎ ছাত্র-কেন্দ্রিক।

ছাত্রকে কেন্দ্র ক'রে বর্ত্তমানে যে-সব প্রণালীর উদ্ভব হয়েছে ইতালীর মন্তেসরী প্রণালীই তন্মধ্যে সর্ব্বজন-বিদিত। ছাত্রকে ভাল ক'রে দেখা যাবে বলে' এই প্রণালী শিক্ষার সহায়ক যন্ত্রপাতি (apparatus) ছাড়া আর সব কিছুকে জঞ্জাল ব'লে বাদ দিলে। সে আশ্রমে সব কিছুর অস্তিত্ব ছাত্রের মুখাপেক্ষী—শিক্ষকও বাদ যাননি —পাছে শিক্ষক দৃষ্টির অন্তর্গত হ'য়ে মুখ্য হ'য়ে পড়েন ও ছাত্রকে আড়াল করেন তাই সযত্নে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্কুল-রঙ্গমঞ্চে ছাত্রই প্রধান অভিনেতা। তার প্রয়োজনের তাঁবেদারী কর্‌বার জন্যে সর্ব্বদা শিক্ষককে নেপথ্যে থাক্‌তে হবে। ড্যাল্টন প্রণালী শিক্ষককে এক পাশে ক'রে দাঁড়াতে অনুরোধ করেছে, যাতে ছেলে-মেয়ে নিজেদের দায়িত্ব বুঝে নিজেদের মনের মতন কাজ কর্‌বার স্ফূর্ত্তি পায়। Intelligence Tests (বুদ্ধি-পরীক্ষা) প্রভৃতিতে কেন্দ্র হচ্ছে ছাত্র। পরিদর্শনাত্মক শিক্ষাবিধির লক্ষ্য ও প্রণালী তাই, ছাত্রের প্রয়োজন-অনুযায়ী যন্ত্রকে গ'ড়ে তোলাই গ্যারীর প্রণালীর উদ্দেশ্য—ছাত্রের প্রয়োজন-সিদ্ধিই একমাত্র লক্ষ্য। The play way (খেলাচ্ছলে শিক্ষা) ছাত্রের স্বাভাবিক বিকাশ সাধনের জন্যই অস্তিত্ব লাভ করেছে; এবং project methodএ শিক্ষক ও বিষয় ছাত্রের খেয়ালখুসীর কাছে আত্ম-নিবেদন ক'রে পরস্পরের উদ্দেশ্যকে সার্থক কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে। উপরি-উক্ত পদ্ধতিগুলির বিশিষ্ট আলোচনায় এই paidocentricismএর যথেষ্ট প্রমাণ মিল্‌বে এবং এপথ যে ভুল পথ নয় তা স্পষ্টই প্রতিভাত হ'বে।

য়ুরোপ ও মার্কিনে শিশুর প্রতি এই কর্ত্তব্য-বুদ্ধির আবির্ভাব আকস্মিক না হ'লেও বর্ত্তমান শতাব্দীকে বিশেষ ক'রে "শিশুর শতাব্দী" বলা একটা কেতা হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু শুধু শিশু নয়, নারী ও আর্ত্তও এই কর্ত্তব্য-বুদ্ধির ভাগ পেয়েছে, এবং সেই-সমস্ত লোক যারা সমাজের উপর কোন দাবী খাটাতে পারে না—যত অযোগ্য অশক্ত নীচ ও ঘৃণ্য সবাই—আজ সাম্‌নে এসে গেছে, বর্ত্তমানের চিন্তাধারা ও নানা প্রতিষ্ঠানই তার প্রমাণ; মানুষের চিরন্তন একরোখা ঝোঁক অনুসারে চলার ফলে যোগ্যের দাবী যে বহু ক্ষেত্রে খর্ব্ব হয়েছে একথা বল্‌লেও অত্যুক্তি হবে না। সুস্থ সবল শিশুর চেয়ে দেহমনে অসুস্থ শিশুর জন্যে যে-সব সুচারু বন্দোবস্তের কথা আমরা শুন্‌তে পাই, উন্মাদ ও অপরাধীর জন্যে পণ্ডিতজনের যে ব্যস্ততা লক্ষ্য করি তার মধ্যে মাত্রাধিক্য থাক্‌লেও আমাদের এই কর্ত্তব্যবুদ্ধি যে সুফল প্রসব করেছে একথা অস্বীকার করা যায় না। মনস্তত্ত্ব ও শিশুতত্ত্ব প্রভৃতির অনুশীলনে, শিশু-রক্ষা ও শিশুশিক্ষার নানাবিধ চেষ্টায় একথা সপ্রমাণ হয় যে, এতদিনের অবজ্ঞাত শিশু আজ তার ন্যায্য অধিকার লাভ করেছে এবং তার ফলে দেশ ও সমাজ লাভবান্ হয়েছে।

সমালোচক মাত্রেই লক্ষ্য করেছেন যে, প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি একটা জোড়াতালির কার্‌বার। ছাত্রেরা এমন অনেক বিষয় শেখে যার মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধের যোগ-সূত্রের পরিচয় তারা কোনদিনই পায় না। সারাদিন স্কুলের কার্‌খানায় যে-সব বিষয়ের তারা চর্চ্চা করে তাদের পরস্পরের মধ্যে কোন যোগ থাক্‌তে পারে, শিক্ষক বা ছাত্র কারো মাথায় এ সম্ভাবনার কথা আজ পর্য্যন্ত প্রবেশ করেনি। অনেকে এই উদ্দেশ্যে শিক্ষণীয় বিষয়ের ভিতরকার ঐক্য পরিস্ফুট ক'রে curriculum (পাঠ্য-তালিকা) তৈরী করা প্রয়োজন বিবেচনা করেন, কিন্তু কেবলমাত্র পাঠ্য পরিবর্ত্তনে সুফলের আশা করা বিড়ম্বনা। প্রকৃত সমস্যা তা নয়—পরিবর্ত্তন প্রয়োজন সমস্ত শিক্ষাপদ্ধতিতেই—শিক্ষক ও বিষয়ের সঙ্গে ছাত্রের মানসিক গতি ও বুদ্ধিবৃত্তির সম্যক্ যোগসাধনের ঐক্যসূত্র আবিষ্কারই এ সমস্যা সমাধানের

একমাত্র উপায়। এ সমাধান জোড়া-তালিতে সম্ভবপর হবে না—আমূল পরিবর্ত্তনেই তা সার্থক হ'তে পারে, কারণ প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালীতে শিক্ষার অভাব যথেষ্ট, নবশিক্ষার উদ্যোগীগণের ইহাই মত।

নবশিক্ষার নানা প্রণালীর মধ্যে এই যোগসূত্রটি আবিষ্কারের চেষ্টা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষা যে কেবলমাত্র একটা বাইরের জিনিষ নয়, স্কুলের চার দেওয়ালের মধ্যেই যে তার অস্তিত্বের সীমানা নয়, বাস্তব জীবনের সঙ্গে শিক্ষণীয় বিষয়ের সাদৃশ্য ও সাযুজ্য দেখিয়ে, বাইরের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারের সঙ্গে স্কুলের জীবনের সঙ্গতি রেখে শিক্ষার অন্তরঙ্গতা প্রমাণের চেষ্টা চল্‌ছে। একদিকে যেমন বর্ত্তমান শিক্ষার খণ্ডতার উপরে অসন্তোষ জমা হ'য়ে উঠ্‌ছে অন্যদিকে তেম্‌নি বহুতর নতুন প্রণালীর সাহায্যে উন্নতির আশা দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়্‌ছে।

প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতিতে উন্নতির অন্তরায় প্রচুর। বাইরের পরীক্ষা আজও সঙ্কটের রুদ্র-মূর্ত্তিতে স্কুল-জগতের ভীতি উৎপাদন কর্‌ছে। পরীক্ষা নিয়ে আলোচনা হয়েছে অনেক এবং এটা যে নিছক মন্দ তা কেউই বলেন না; কিন্তু তার নিজের স্থানে তাকে রাখা দর্‌কার—শিক্ষার পরীক্ষা একদিনে কিছু করা যায় না, ছাত্রের ভবিষ্যৎ জীবনেই তার ফলাফল লক্ষিত হয়, এবং সে বিচারও যে খুব পক্ষপাত-শূন্যভাবে করা চলে এমন কোন কথা নেই—কাজেই পরীক্ষাকে দাবিয়ে শিক্ষণীয় বিষয়ের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

পরীক্ষাকে সঙ্কটের বদলে সহায় করে' তোল্‌বার জন্যে অনেকে পরিদর্শনের যুক্তিযুক্ততার আলোচনা করেছেন। শিক্ষিত ছাত্রকে বর্ত্তমানে প্রচলিত প্রণালী অনুসারে পরীক্ষা না ক'রে শিক্ষণীয় বিষয় ও শিক্ষাদান-প্রণালীর ভিতরকার বস্তুটি নির্ভুল কি না তারই পরীক্ষা প্রয়োজন। ছাত্রের উপরে সমাজের যে দাবী শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যে তা মেটাবার কোন যোগ্য আয়োজন আছে কি না এবং তা উপযুক্তভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে কি না, এবিষয়ে অপক্ষপাত পরিদর্শনই সুফল প্রসব কর্‌বে। পরীক্ষা যে একেবারে লোপ পাবে এ কথা সত্য নয়, কারণ নির্ব্বাচন-ক্ষেত্রে তার প্রয়োজনীয়তা কোন দিনই কম্‌বে না। কর্ম্মক্ষেত্রে বিভিন্ন বৃত্তি বা পেশার উপযোগী পরীক্ষা থাক্‌বে এবং অর্জ্জন-প্রয়াসীকে তা থেকে উত্তীর্ণ হ'তে হবে—স্কুলে সাধারণ শিক্ষা শেষ ক'রে কার্য্যক্ষেত্রে এরকম পরীক্ষার জন্যে সাহায্য কর্‌বার মতন বিদ্যালয়ও গ'ড়ে তোলা বিশেষ কষ্টকর হবে না।

প্রচলিত সংস্কারের উপরে শিক্ষকের টান নবশিক্ষার আর-এক অন্তরায়। নব-নব প্রণালীর আবির্ভাবের মধ্যে পুরাতনপন্থী শিক্ষকেরা ছাত্রের স্বাধীনতায় উচ্ছৃঙ্খলতার বীজ দেখ্‌তে পেয়েছেন, বিষয়ের চেয়ে শিক্ষকের চেয়ে ছাত্রের প্রাধান্য যে বিদ্রোহ-সূচক একথা বল্‌তে তাঁরা দ্বিধা বোধ করেননি, অর্থাৎ জীবনের প্রতিক্ষেত্রে উন্নতিশীল দলের প্রতিসংপ্রচেষ্টার বিরুদ্ধে পুরাতনপন্থী-দের সাধারণ ও সনাতন বিরোধের কোন অভাব হয়নি। তবে এবিরোধের মধ্যে উগ্রতা নেই—এতদিনের অচলা-য়তনের দেওয়াল একে একে যতই স্বাধীনতার মন্ত্র-সাধনের ফলে ভেঙে ভেঙে পড়্‌ছে ততই শিক্ষকের দল চকিত ও ভীত হ'য়ে উঠ্‌লেন। সবচেয়ে বড় আশার কথা এই যে, নব্যপন্থীরা প্রায় সবাই শিক্ষক, কাজেই প্রাচীন দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা না ক'রে তাঁরা সমব্যবসায়ীদের ভ্রম অপনোদনের ও নব্য প্রতিষ্ঠানে আস্থা উৎপাদনের চেষ্টা করেছেন। তাঁরা যে সফলকাম হয়েছেন ও নব্য প্রণালীকে বিশ্বাস স্থাপনের যোগ্য করে' তুলেছেন, তৎসম্বন্ধীয় তত্ত্ব ও তথ্য আলোচনায় তা স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে।

পুরাতন পদ্ধতির উচ্ছেদসাধন ক'রে নতুন প্রণালী কি গ'ড়ে তুলতে চায় কোন নব্য স্কুলের বিজ্ঞাপনীতে তার যথেষ্ট আভাস আছে—"যেহেতু সাধারণ স্কুলে আমাদের ছেলেমেয়ের স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা যথেষ্ট, আমাদের চেষ্টা হবে তাদের দেহকে সুস্থ-সবল ক'রে গড়ে' তুল্‌তে, যেহেতু বর্ত্তমান শিক্ষাযন্ত্র ছাত্রছাত্রীর দেহ-মন এমন কি আত্মাকে পর্য্যন্ত খর্ব্ব ও পঙ্গু ক'রে তুলে সর্ব্ব-বিষয়ে তার প্রসার-বৃদ্ধিই হবে আমাদের সাধনা; যেহেতু পুরাতন পদ্ধতি অনুসারে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ও বিদ্বেষ-বুদ্ধিতে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, প্রত্যেককে সকলের জন্যে পরিশ্রম কর্‌তে ও সহযোগিতার কার্য্য-

কারিতা ও সৌন্দর্য্যের বিকাশ সাধন হবে আমাদের একান্ত চেষ্টা, যেহেতু প্রচলিত প্রণালীতে কেবলমাত্র মস্তিষ্ক পরিচালনার ফলে দেহের জড়ত্ব বৃদ্ধি পায়, কায়িক ও মানসিক উভয়বিধ চর্চ্চার উপাদান সংগ্রহ হবে আমাদের একান্ত যত্ন···ইত্যাদি।”

অন্য অনেক আন্দোলনের মতন পাশ্চাত্য-শিক্ষা-জগতের এই বিদ্রোহদ্যোতক আন্দোলন আমাদের সুপ্তনীড়ের শান্তি ভঙ্গ করেছে। শান্তিনিকেতন, গুরুকুল প্রভৃতি শিক্ষা-আশ্রম, পদ্ধতি-প্রচলিত অকেজো শিক্ষা-পদ্ধতির বিরুদ্ধে এক-একটা শক্তিশালী প্রতিবাদ, কিন্তু সনাতনের মোহ কাটিয়ে শিক্ষক বা শিক্ষার ভার-প্রাপ্ত কর্ত্তৃপক্ষেরা যে অচিরে সাধারণভাবে কোন experiment (পরীক্ষা) করতে রাজি আছেন এমন কোন লক্ষণই ত দেখা যায় না। চলার বেগে পায়ের তলায় রাস্তা যে জাগে নব নব শিক্ষা-পদ্ধতির অনুষ্ঠাতাদের বিবরণ-গ্রন্থে তার গৌরবময় ইতিহাস আমাদেরও প্রাণে আশার সঞ্চার করে—আজও যদি অজানার ভয়ে আমরা পথ চলা বন্ধ বলে' বসে' থাকি তবে তার বাড়া লজ্জার কথা আর কিছুই থাকবে না।

প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়

দর্পণ

(Leo Lespes)

১পত্র

ভাই “আনাই”, তোমার ইচ্ছে, আমি তোমাকে পত্র লিখি—আমি গরীব বেচারী অন্ধ; যে অন্ধকারের মধ্যে হাৎড়িয়ে হাৎড়িয়ে চলে, তাকে কিনা তুমি লিখ্‌তে বল্‌ছ। আমার অন্ধকারে লেখা বিষাদময় পত্র পেতে তোমার কি ভয় হবে না? অষ্টপ্রহর অন্ধের মনে যে-সব বিষণ্ণ চিন্তা উদয় হয়, সেই সব চিন্তা কি তোমার ভাল লাগ্‌বে?

ভাই আনাই, তুমি সুখী; তুমি দেখ্‌তে পাও। দেখ্‌তে পাওয়া! হাঁ দেখ্‌তে পাওয়া—নীল আকাশ, সূর্য্য, আর সকলরকম রং দেখ্‌তে পাওয়া—সে কি আনন্দ! সত্য, এক সময় আমি এই অধিকার উপভোগ করেছিলাম; আমার যখন পুরো দশ বৎসরও বয়স হয়নি তখন আমি অন্ধ হই। ১৫ বৎসর থেকে এখন আমার চারিধারে সব জিনিসই রাত্রির মতো কালো দেখ্‌ছি। প্রকৃতির আশ্চর্য্য শোভা-সৌন্দর্য্য আমার মনে আন্‌তে কত চেষ্টা করি, কিন্তু কিছুতেই মনে আন্‌তে পারিনে। আমি তার সমস্ত রং ভুলে' গিয়েছি। আমি গোলাপের গন্ধ আঘ্রাণ করতে পারি, হাত দিয়ে ছুঁয়ে তার গঠনটা অনুমান করতে পারি; কিন্তু তার গর্ব্বের জিনিস রংটা—যার সঙ্গে প্রায়ই মেয়েদের রঙের তুলনা দেওয়া হয়—সেই রং আমি ভুলে' গিয়েছি—কিংবা আমি তার বর্ণনা করতে পারিনে। কখন-কখন এই স্থূল দেহ-আবরণের নীচে অদ্ভুত-রকমের কিরণ আনাগোনা করে। ডাক্তাররা বলেন এটা হচ্ছে রক্তের গতি; এর থেকে আরোগ্য-লাভের একটা আশ্বাস পাওয়া যেতে পারে। বৃথা আশা! যে আলোকচ্ছটায় পৃথিবী ভূষিত, তা যখন আমি ১৫ বৎসর থেকে হারিয়েছি, সে আর কখনো পাওয়া যাবে না—যদি কখনো পাওয়া যায়, সে স্বর্গে।

সেদিন আমার একটা অপূর্ব্ব অনুভূতি হচ্ছিল। আমার ঘরে হাৎড়াতে-হাৎড়াতে, আমার হাত পড়্‌ল একটা জিনিসের উপর—ওঃ! তুমি কিছুই আন্দাজ করতে পারবে না!—একটা দর্পণের উপর! আমি দর্পণটার সাম্‌নে বস্‌লাম, এবং একজন “ভাবুকের” মতো আমার চুলটা গুছিয়ে ঠিক্‌ঠাক্ কর্‌লাম। ওঃ! আমি যদি আপনাকে আপনি দেখ্‌তে পেতাম! আমি সুশ্রী ব'লে যদি মান্‌তে পার্‌তাম—আমার চামড়াটা যেমন নরম তেম্‌নি সাদা কি না—দীর্ঘ পক্ষ্মবিশিষ্ট আমার চোখ দুটি সুন্দর কি না, যদি জান্‌তে পার্‌তাম, তা হ'লে কত খুসীই হতাম!—ইস্কুলে এরা প্রায়ই আমাকে বল্‌ত, ছোট মেয়েরা অনেকক্ষণ ধরে' আয়নায় মুখ দেখ্‌লে সেই আয়নায় সয়তান আসে! আমি এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি, সয়তান আমার আয়নায় এলে খুব নাকাল হ'ত—কেননা, আমি ত তাকে দেখ্‌তে পেতাম না!

তোমার পত্রখানি এইমাত্র ওরা আমাকে পড়িয়ে শোনালে, তাতে তুমি জিজ্ঞাসা করেছ, একজন কুঠী-ওয়ালা দেউলে হওয়াতে আমার বাপ-মা সর্ব্বস্বান্ত হয়েছেন একথা সত্য কি না। আমি ত এ-কথা কিছুই শুনিনি। না, তাঁরা ধনী লোক। সমস্ত বিলাসের জিনিস তাঁরা আমাকে জুগিয়ে থাকেন। যেখানেই আমার হাত পড়ে, সেখানেই আমার হাত রেশম ও মখমল স্পর্শ করে, ফুল ও বহুমূল্য কাপড় স্পর্শ করে। আমাদের খাবার টেবিলে প্রচুর খাদ্য থাকে এবং প্রতিদিন আমার রসনার তৃপ্তির জন্য কত মুখরোচক জিনিস আনা হয়। তাই বল্‌ছি, আনাই, আমার পরমাত্মীয়েরা বেশ লক্ষীমন্ত।

২পত্র

আনাই, তোমার মাথায় আসবে না, আমি তোমাকে কি বল্‌তে যাচ্ছি। ওঃ! তা শুন্‌লে তুমি হেসে গড়িয়ে পড়্‌বে। তুমি মনে করবে, আমার দৃষ্টির সঙ্গে আমার বুদ্ধিও লোপ পেয়েছে। আমার এক প্রণয়ী জুটেছে।

হাঁ ভাই; আমি ত এই দৃষ্টিহীন অন্ধ বালিকা, আমার আবার

একজন প্রণয়-প্রার্থী! আমাকে কত আদর-যত্ন করে, কত সাধ্য-সাধনা করে—কি অদ্ভুত! এর পর আর কি বক্তব্য আছে? প্রেম যে-রকম অন্ধ এমন আর কেউ নয়। তাই বুঝি প্রেম আমাকে তার নিজের লোক ব'লে মনে করেছে।

সে ভদ্রলোকটি কি করে' আমাদের মধ্যে এসে পড়্‌ল আমি জানিনে; এখানে সে কি করতে চায় তাও জানিনে। এই পর্য্যন্ত আমি বল্‌তে পারি, সে-দিন সে ভদ্রলোকটি আমাদের খাবারের টেবিলে আমার বাঁ দিকে বসেছিল—আর আমার দিকে খুব মনোযোগ দিচ্ছিল—আমার প্রতি খুব যত্ন দেখাচ্ছিল। আমি বল্‌লাম;—"এই প্রথমবার আপনার সহিত সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য আমার ঘটেছে।"

তিনি উত্তর কর্‌লেন;—"সত্য, কিন্তু আমি আপনার মা-বাপকে জানি।" আমি উত্তর কর্‌লাম:—"আমি আপনাকে স্বাগত-অভিবাদন করি; কেননা, যিনি আমার পরম দেবতা আমার সেই বাপ-মার প্রতি কিরূপ শ্রদ্ধা করতে হয় তা আপনি জানেন।"

তিনি আস্তে আস্তে বল্‌লেন;—"শুধু তাঁদের উপরেই যে আমার মমতা আছে তা নয়।"

আমি না ভেবে-চিন্তে উত্তর কর্‌লাম;—"তবে আর কাকে আপনার ভাল লাগে?"

তিনি বল্‌লেন;— "তোমাকে।"

"আমাকে?" তার মানে কি?"

"মানে—আমি তোমাকে ভালবাসি।"

"আমাকে? আমাকে আপনি ভালবাসেন?"

"সত্যই ভালবাসি—উন্মত্তভাবে ভালবাসি।"

এই কথায় আমি লজ্জিত হ'য়ে পড়্‌লেম, আমার ওড়নাটা কাঁধের উপর একটু টেনে দিলেম।

"এই কথাটা আপনি হঠাৎ পেড়েছেন।"

"ওঃ! আমার দৃষ্টিতে, আমার ভাবভঙ্গীতে আমার সমস্ত কাজে এ-কথা প্রকাশ পাবে।"

"তা হ'তে পারে, কিন্তু আমি যে অন্ধ, কোন অন্ধ রমণীকে পাবার জন্য কেউ কি কখন সাধ্য-সাধনা করে?"

তিনি বেশ অকপট-ভাবে বল্‌লেন;—"আমি দৃষ্টির কোন তোয়াক্কা রাখিনে।" তুমি যদি আলো দেখ্‌তে না পাও, তাতে আমার কি এসে যায়? তোমার গঠনটি কি সুন্দর নয়? তোমার পা-দুখানি কি পরীর মত ছোট্ট নয়? তোমার পা-ফেলার ধরণটা কি চমৎকার নয়? তোমার কেশগুচ্ছ কি দীর্ঘ ও রেশ্‌মি কোমল নয়? তোমার গাত্র কি শ্বেত প্রস্তরের মতো নয়? তোমার মুখের রংটি কি দুধে আল্‌তার মতো নয়? তোমার হাত কি পদ্ম ফুলের রংএর মতো নয়?"

তাঁর কথা থেমে গেলেও, সেই কথাগুলি আমার কর্ণে ঝঙ্কৃত হ'তে লাগ্‌ল। আমার হ্যানো আছে, আমার ত্যানো আছে ব'লে আমার রূপের কতই বর্ণনা কর্‌লেন—তাঁর চোখে আমি সুন্দরী! অন্ধ বালিকার কাছে এরূপ প্রণয়ী শুধু প্রেমের একজন প্রার্থী মাত্র, কিন্তু আমার মতো অন্ধ বালিকার কাছে তিনি প্রণয়ীর চেয়েও বেশী, তিনি একটা দর্পণ। আমি আবার বল্‌লমে;—

"আপনি যে-রকম বল্‌ছেন আমি কি সত্যই সেইরকম সুন্দরী?"

আচ্ছা, এখন আমাকে কি কর্‌তে বলেন?"

"আমার ইচ্ছে তুমি আমার স্ত্রী হও।" এই কথায় আমি খুব উচ্চস্বরে হেসে উঠ্‌লেম। আমি বল্‌লেম;—"সত্যই কি আপনার এই ইচ্ছে? অন্ধের সহিত চক্ষুষ্মানের—রাত্রির সহিত দিনের বিবাহ? না! না! আমার মা-বাপ ধনী; আইবুড়ো হ'য়ে থাকতে আমার ভয় হয় না। আমি চিরজীবন আইবুড়োই থাক্‌ব—"

তিনি আর কোন কথা না বলেই চ'লে গেলেন, আমার কাছে সবই সমান। তবে এইটুকু তিনি আমাকে জানিয়ে দিয়ে গেলেন যে, আমি সুন্দরী! কিন্তু কে জানে কেন আমার দর্পণ মহাশয়ের উপর আমার একটু টান্ হয়েছে বুঝ্‌তে পার্‌ছি।

৩ পত্র

ভাই আনাই, তোমায় একটা মস্ত খবর দেবার আছে। এই জীবনে কত কি দুঃখের ঘটনা অপ্রকাশিতভাবে এসে পড়ে। কি ঘটেছে তোমাকে বল্‌তে যাচ্ছি, আর আমার অন্ধ চোখ দিয়ে ঝর্‌ঝর্ ক'রে জল পড়্‌ছে।

আমি যাকে আমার দর্পণ বলি, সেই অপরিচিত ভদ্রলোকটির সঙ্গে বাক্যালাপ হবার কয়েক দিন পরে, আমার মায়ের বাহুর উপর ভর দিয়ে বাগানে বেড়াচ্ছিলেম, এমন সময় হঠাৎ একজন তাঁকে চেঁচিয়ে ডাক্‌লে। আমার মনে হ'ল, আমাদের দাসী আমার মাকে তাড়াতাড়ি খোঁজ কর্‌তে এসে এই ব্যাকুল-কণ্ঠে চীৎকার কর্‌ছে।

আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লেম;—"ব্যাপারটা কি মা?"

"কিছুই না বাছা; বোধ হয় কোন লোক দেখা করতে এসেছে। আমাদের যেরকম অবস্থা তাতে আমাদের সামাজিক কর্ত্তব্য কিছুকিছু পালন না কর্‌লে চলে না।

মাকে চুম্বন করে' আমি বল্‌লেম:—"তা হ'লে মা, তোমাকে আর আট্‌কে রাখ্‌ব না—বৈঠকখানায় গিয়ে দর্শন-প্রার্থীদের অভ্যর্থনা কর-গে। যাও।"

মা তাঁর তুষার-শীতল ওষ্ঠাধর দিয়ে আমার ললাট স্পর্শ কর্‌লেন। তার পর তিনি চ'লে গেলেন—কাঁকর-বিছানো রাস্তা দিয়ে তাঁর পদশব্দ শুনতে পেলেম—ক্রমে সেই পদশব্দ দূরে মিলিয়ে গেল।

মা চ'লে যাবার পরেই, আমি যেন দুইজন শ্রমজীবীর কণ্ঠস্বর শুন্‌তে পেলেম; তারা একলা রয়েছে মনে ক'রে, মন খুলে' গল্পগুজব কর্‌ছিল। দেখ আনাই, যখন ভগবান্ এক ইন্দ্রিয় থেকে আমাদের বঞ্চিত করেন,—মনে হয় সান্ত্বনা দেবার জন্য, আমাদের অন্য ইন্দ্রিয়ের শক্তি বাড়িয়ে দেন। অন্ধের শ্রবণ-শক্তি, যারা দেখ্‌তে পায় তাদের চেয়ে এই কারণে বেশী তীব্র হ'য়ে থাকে। যদিও তারা আস্তে কথা কচ্ছিল, তাদের একটি কথাও আমার কান এড়ায়নি। তারা এই কথা বল্‌ছিল;——"আহা বেচারী! ওদের জন্য দুঃখ হয় আবার ঘটকরা এসেছে।"

—"আর বালিকাটির মনে একটু সন্দেহও হয়নি। সে আন্দাজ কর্‌তেও পারেনি যে তার অন্ধতার সুবিধা পেয়ে ওরা তাকে সুখী কর্‌বার চেষ্টা করে।

"বল কি তুমি?"

"না, এবিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই। সে কেবল আব্‌লুস্ কাঠ ও মখমলই হাত দিয়ে স্পর্শ কর্‌ছে। তবে কিনা, মখমলটা বিশ্রী ময়লা হ'য়ে গেছে, আবলুসের চেক্‌নাইটাও নষ্ট হয়েছে। আহারের সময় খাবার-টেবিলে বসে' মুখরোচক নানা-রকম খাদ্য-সামগ্রী সে উপভোগ করে; সে স্বপ্নেও ভাবে না, তার কাছ থেকে ঘরকন্নার দুঃখকষ্ট

লুকিয়ে রাখা হয়েছে ; আর ঐ খাবার-টেবিলে বসে'ই ওর বাপ-মারা শুকনো রুটি ছাড়া আর-কিছুই খায় না।"

—ওঃ ! আনাই, এই কথা শুনে' আমার কি কষ্ট হ'ল তা বুঝ্‌তেই পারছ। ওঁরা আমার সুখের জন্য কত লালায়িত। আমার এই অন্ধকারের মধ্যে ওঁরা আমাকে,—কেবল আমাকেই নানাপ্রকার বিলাস-সামগ্রী দিয়ে সুখে রাখ্‌তে চান। ওঃ! কি আশ্চর্য্য সেবা-যত্ন! এই ঋণ শত বৎসরেও আমি পরিশোধ করতে পারব না।

৪পত্র

বাড়ীর দুরবস্থার এই গুপ্ত কথাটা আমি যে আন্দাজে জেনেছি—তা আমি কারও কাছে প্রকাশ করিনি। দারিদ্র্যের কথাটা আমার কাছে লুকিয়ে রাখ্‌বার সব চেষ্টা যেন ব্যর্থ হয়েছে—এ কথা মা জান্‌তে পার্‌লে একেবারে অভিভূত হ'য়ে পড়্‌বেন। আমায় সর্ব্বদাই দেখাতে হবে, যেন আমাদের বাড়ীর ভাল অবস্থার সম্বন্ধে আমার খুবই বিশ্বাস আছে। কিন্তু আমার বাড়ীকে রক্ষা করব ব'লে আমি দৃঢ়সঙ্কল্প হয়েছি।

আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষীর নাম এড্‌মণ্ড"। তিনি আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছিলেন—ভগবান্ যেন আমাকে মার্জ্জনা করেন!—রঙ্গিণীর মতো হাব-ভাব দেখিয়ে তাঁর মন ভোলাবার একটু চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লেম।

আমি বল্‌লেম :—

"আমার উপর এখনো কি আপনার সমান ভালবাসা আছে?"

তিনি বল্‌লেন :—

"হাঁ, আমি তোমাকে ভালবাসি, কারণ তোমার যে রূপ-লাবণ্য, সে একটা উচ্চধরণের রূপ-লাবণ্য—অতি নির্ম্মল, বেশ লজ্জানম্র।

"আর আমার দেহের গঠন?"

—"দ্রাক্ষালতার মতো সুন্দর ও সুললিত"।

—আঃ—আর আমার ললাট?"

—"গজদন্তের মতো প্রশস্ত ও মসৃণ—ও-ললাটের কাছে গজদন্তও হার মানে।"

—"সত্যি?" এই কথা বলে' আমি হাস্‌তে লাগ্‌লেম।

"একথায় তোমার এত মজা লাগ্‌ল কেন?"

"আমার মনে হ'ল, যেন তুমি আমার দর্পণ। তোমার কথার ভিতর দিয়ে আমি নিজেকে দেখ্‌তে পাচ্ছি।"

"প্রিয়তমে, তুমি চিরদিন এইরকমই আমাকে ভেবো।"

"তুমি রাজি আছ? তা হ'লে—"

"আমি নির্ম্মল দর্পণের মতো, তোমার রূপ, তোমার গুণ তোমার কাছে প্রতিফলিত করতে আমি রাজি আছি। তুমি আমার স্ত্রী হবে বলে' সম্মতি দাও। আমার একটু সম্পত্তি আছে।...তোমার কিছুরই অভাব হবে না। আর আমি প্রাণপণে তোমাকে সুখী কর্‌তে চেষ্টা করব।

এই সময় আমার বাপ-মার কথা মনে এল। আমি ভাব্‌লেম, একে যদি আমি বিবাহ করি, তা হ'লে তাঁরা ঋণ-ভার হ'তে মুক্ত হ'তে পার্‌বেন। আমি উত্তর কর্‌লেম :—

"কিন্তু এই বিবাহে তোমার আত্ম-মর্য্যাদার হানি হবে। আমি তোমাকে দেখ্‌তে পাব না।"

তিনি বল্‌লেন :—"হায় হায়!—একটা কথা আমারও তোমাকে জানানো আবশ্যক।"

"—কথাটা কি?—শুনি।"

—"আমি প্রকৃতি-দেবীর একটি কুৎসিত সন্তান। আমার মুখেতেও কোন সৌন্দর্য্য নেই—আমার চলন-ভঙ্গীতেও কোন গাম্ভীর্য্য নেই। আমার চূড়ান্ত দুর্ভাগ্য হচ্চে—দারুণ বসন্ত রোগের ক্ষতচিহ্নে আমার মুখ আচ্ছন্ন। অতএব, আমি যে একজন অন্ধ বালিকাকে বিবাহ কর্‌ছি—তাতে আমার স্বার্থপরতাই প্রকাশ পাচ্ছে। এতে আমার নম্রতা প্রকাশ পাচ্ছে না।"

আমি তাঁর দিকে আমার হাত বাড়িয়ে দিলেম।

"আমি জানিনে নিজের উপর তুমি কতটা কঠোর হচ্ছ কিন্তু আর যাই হোক্ আমার বিশ্বাস তুমি খুব খাঁটি লোক। আমি যেমনটি আছি তুমি তবে আমাকে ঠিক্ সেইভাবে গ্রহণ করো। তোমার চিন্তা হ'তে কিছুই আমাকে বিচলিত কর্‌তে পারবে না। আমার এই আঁধার মরুভূমিতে তোমার প্রেমই আমার হরিৎকুঞ্জ হবে।"

আমি ঠিক্ কাজ কর্‌ছি, কি ভুল কর্‌ছি আমি জানিনে। কিন্তু এটা জানি, আমার বাপ-মাকে উদ্ধার কর্‌বার জন্যই আমি এই কাজে প্রবৃত্ত হচ্ছি। হয়ত, হাত্‌ড়াতে হাত্‌ড়াতে আমি ঠিক্ রাস্তাটা ধর্‌তে পেরেছি।

৫ পত্র

তোমার এবারকার পত্রে তুমি প্রিয় সখীর মতো আমার প্রতি কত স্নেহ-মমতা প্রকাশ করেছ—আমাকে প্রশংসা করেছ—আমাকে অভিনন্দন করেছ; এইসবেতেই পত্রখানি ভরা।

হাঁ ভাই, দুই মাস হ'ল আমি বিবাহ করেছি। নারীদের মধ্যে আমার মতো সুখী আর কেউ নেই। আমার কিছুই আকাঙ্ক্ষা কর্‌বার নেই। আমার স্বামীর আমি হৃদয়-পুত্তলী, আর আমার বাপ-মায়ের আমি আদরের বস্তু। তাঁরা আমাকে ত্যাগ করেননি। আমার অন্ধতার জন্য আর আমি দুঃখিত নই। "এড্‌মণ্ডের" দৃষ্টি আমাদের উভয়ের উপরেই আছে।

যে-দিন আমাদের বিবাহ হয়, আমার দর্পণ আমার জাঁকালো "ক'নে-সাজের" কথা আমার কাছে প্রকাশ করেছিলেন। আমার অবগুণ্ঠনটি অতি সুন্দর হয়েছিল—আর আমার নেবু-ফুলের মালা-গাছিতে আমাকে খুব মানিয়েছিল। কোন আসল দর্পণ এর চেয়ে আর কি বেশী কর্‌তে পার্‌ত?

সন্ধ্যার সময় আমরা দু-জনে বাগানে বেড়াই। সেখাকার ফুলের গন্ধে, পাখীর গানে, ফলের আস্বাদে ও কোমল স্পর্শে আমি মুগ্ধ। কখন কখন আমরা থিয়েটারে যাই এবং সেখানেও, আমার অন্ধ চোখ যা দেখ্‌তে না পায়, ওঁর বর্ণনার গুণে আমি সে-সমস্ত মানস-পটে দেখ্‌তে পাই। উনি বলেন, উনি দেখ্‌তে কুৎসিত, তাতে আমার কি এসে যায়? কোন্‌টা সুন্দর, কোন্‌টা কুৎসিত, আমি ত এখন বুঝ্‌তে পারিনে, আমি শুধু বুঝ্‌তে পারি স্নেহ-মমতা—ভালবাসা।

ভাই আনাই, আজ তবে এইখানেই বিদায় হই—আমার সুখে তুমি সুখী হও।

৬ পত্র

ভাই আনাই, আমি মা হয়েছি। একটি ছোট্ট মেয়ের মা। কিন্তু আমি তাকে দেখ্‌তে পাইনে। সবাই বলে, এমন মিষ্টি দেখ্‌তে হয়েছে, যে চোখ ফেরানো যায় না। তারা বলে, ওটি আমার জীবন্ত ক্ষুদে-নমুনা, কিন্তু সে-সম্বন্ধে আমি কিছুই বল্‌তে পারিনে। ওঃ! কি বলবতী মায়ের ভালবাসা! আমি যে নীল আকাশ দেখ্‌তে পাইনে, ফুলের শোভা দেখ্‌তে পাইনে, আমার স্বামীর মুখশ্রী, আমার বাপ-মায়ের মুখশ্রী দেখ্‌তে পাইনে—সমস্তই ত আমি অম্লানবদনে সহ্য করে' এসেছি—কখনো আক্ষেপ প্রকাশ করিনি। কিন্তু আমি যে আমার বাছাটিকে দেখ্‌তে পাব না—এ আমার পক্ষে অসহ্য। ওঃ! আমার চোখের

কালো পর্দ্দাটা যদি এক মিনিটের জন্য, শুধু এক সেকেণ্ডের জন্যও খসে' পড়ে, যদি বিদ্যুতের মতও তার মুখ একবার আমি দেখ্‌তে পাই, তাহ'লে আমি কত সুখী হই!—জীবনের অবশিষ্ট দিনের জন্য আমি তাহ'লে গর্ব্ব অনুভব করতে পারি।

এবার এড্‌মণ্ড্‌ আমার দর্পণ হ'তে পারবেন না। তিনি যতই বলুন না কেন, আমার বাছাটির চুল বেশ কোঁক্‌ড়া-কোঁক্‌ড়া, চোখ্‌ দুটি বেশ জ্বল্‌-জ্বলে, তার হাসিটি বড় মিষ্টি—তাতে আমার কি হবে? যখন বাছাটি আমার দিকে হাত বাড়ায় তখন ত আমি তাকে দেখ্‌তে পাইনে?

৭ পত্র

আমার স্বামী দেবতা। জানো, তিনি কি করেছেন? গত বৎসর আমার জন্য যে কত কি করেছেন তা আমি জান্‌তেও পারিনি। তিনি আমার চোখ ভাল করতে চান—আর তার ডাক্তার তিনি নিজেই! তাঁর ডাক্তারি কাজটা ভাল লাগে না, তবু শুধু আমার জন্যই ডাক্তারের ব্যবসাটা শিখেছেন। কাল আমাকে তিনি বল্‌লেন;—"প্রাণেশ্বরী! জান আমি কি আশা করছি?"

"এ-কি সম্ভব?"

"হাঁ, গাত্রচর্ম্ম সুন্দর করবার জন্য যে ঔষধের জল তোমার ব্যবহারের জন্য দিয়েছিলেম, সে একটা অছিলে মাত্র,—আসলে, এটা হচ্ছে আর একটা গুরুতর ব্যাপারের পূর্ব্বায়োজন।"

"সে ব্যাপারটা কি?"

"সেটা হচ্ছে চোখের ছানি সারানো।"

"তোমার হাত কি কাঁপ্‌বে না?"

"না; যখন আমার হৃদয় ঠিক্‌ আছে, তখন আমার হাতও ঠিক্‌ থাক্‌বে।"

আমি তাঁকে চুম্বন করে' বল্‌লেম;—তুমি মানুষ নও, তুমি দয়াময় দেবতা।"

তিনি বল্‌লেন;—"আঃ! আর একবার আমাকে চুম্বন করো প্রিয়তমে। আমাকে এই ক্ষণিকের বিভ্রম উপভোগ করতে দাও।"

"একথার অর্থ কি, এড্‌মণ্ড্‌?"

"অর্থাৎ ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে শীঘ্রই তোমার চোখ ভাল হবে"।

"তার পরে—?"

"তার পর, আমি যেমনটি ঠিক্‌ আমাকে সেইরকম দেখ্‌তে পাবে—বেঁটে, নগণ্য, ও কুৎসিত।"

এই কথাগুলিতে, আমার অন্ধকারের ভিতর দিয়ে যেন একটা আলোর ছটা বের হ'ল। আমার কল্পনা মশালের মতো জ্বল্‌তে লাগ্‌ল। আমি দাঁড়িয়ে উঠে' বল্‌লেম;—

"এডমণ্ড, প্রিয়তম, আমার প্রেমের উপর যদি তোমার বিশ্বাস না থাকে, যদি তুমি মনে কর, তোমাকে যেরকমই দেখ্‌তে হোক না কেন আমি তোমার স্বেচ্ছা-দাসী নই, তাহ'লে আমার অন্ধকারের মধ্যে, আমার চিররাত্রির মধ্যেই আমাকে রেখে দাও।" তিনি কোন উত্তর দিলেন না, কেবল আমার হাতটা একটু টিপে' ধর্‌লেন।

আমার মা বলেছিলেন ছানি-কাটার কাজটা একমাসের মধ্যে আরম্ভ হ'তে পারে।

আমার স্বামীর যে বর্ণনা শুনেছিলেম, সে-সব কথা আমার আবার মনে পড়্‌ল। মা বলেছিলেন, তার মুখে বসন্তের দাগ আছে; বাবা বলেছিলেন, তাঁর চুল খুব পাত্‌লা। আমাদের ঝী বলেছিলেন, তিনি বুড়ো।

মুখে বসন্তের দাগ হওয়া সে যে একটা দুর্ঘটনার কথা। লাভাটরের মতে টাক্‌ থাকা'ত একটা বুদ্ধির লক্ষণ। তবে বুড়ো হওয়া একটা দুঃখের বিষয় বটে। তার পর যদি দুর্ভাগ্যক্রমে আমার আগে তাঁর মৃত্যু হয়—তা হ'লে আমার ভালবাসার দিন সংক্ষেপ হবে।

ভাই আনাই, পরীকেতাবের গল্পটি তোমার মনে আছে? আমার সেই গল্পের "সুন্দরী ও পশু"র অবস্থা হয়েছে। এক্ষেত্রে কোন যাদুমন্ত্রের দ্বারা রূপান্তর হবারও উপায় নেই। আপাততঃ, ভাই আনাই, আমার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো। কে জানে, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে হয়ত আমি একদিন তোমার চিঠিগুলি পড়্‌তে পাব!

শেষপত্র

দেখ ভাই আনাই, আমার চিঠির গোড়ার দিক্‌টা না দেখে' শেষ দিক্‌টা দেখো না। যেমন যেমন পরে পরে হয়েছে সেই স্বাভাবিক ক্রম অনুসারে তুমি আমার দুঃখের আমার ঘটনা-বিপর্য্যয়ের, আমার আনন্দের ভাগ লও।

দু হপ্তা হ'ল, আমার ছানি কাটা হ'য়ে গেছে। আমি দু বার খুব চীৎকার করে' উঠেছিলুম। তার পর আমার মনে হ'ল যেন আমি দিন, আলো, রং, সূর্য্য দেখ্‌তে পাচ্ছি। তখনই আবার একটা পটি আমার চোখের উপর বসিয়ে দেওয়া হ'ল। আমি সেরে উঠ্‌লেম। কেবল একটু সহ্য করে থাকা, আর একটু সাহসের দরকার।

এডমণ্ড্‌ আমার জীবনকে আবার মধুময় করে' তুলেছেন।

কিন্তু একটা কথা কবুল করব কি? আমি একটা নির্বুদ্ধিতার কাজ করেছিলেম। আমি আমার ডাক্তারের কথার অবাধ্য হয়েছিলেম। তিনি তা জান্‌তে পারবেন না। তা ছাড়া, আমার এই গোঁয়ার্ত্তুমি থেকে এখন আর কোন বিপদের আশঙ্কা নেই। চুমো খাবার জন্য খুকীকে ঝী আমার কাছে এনেছিল। খুকী ঝীর কোলে ছিল।

পুঁটুমণি খুব নরমগলায় বল্‌লে—"মা"; তখন আমি আর থাক্‌তে পার্‌লেম না, পটিটা ছিঁড়ে' ফেল্‌লেম। আর বলে' উঠ্‌লেম;—

"আমার পুঁটুমণি! আহা কি সুন্দর! এই যে, আমার পুঁটুকে দেখ্‌তে পাচ্ছি—দেখ্‌তে পাচ্ছি।"

ঝী আবার আমার পটিটা চোখে বেঁধে' দিলে। কিন্তু এই অন্ধকারের মধ্যে আমি এখন আর একলা নই। পুঁটুর মুখখানি মনে পড়্‌তে লাগ্‌ল আজ সব যেন আলো হ'য়ে উঠ্‌ল।

কাল মা আমাকে কাপড় পরিয়ে দিতে এসেছিলেন। অনেকক্ষণ ধ'রে আমার সাজ-সজ্জা চল্‌ছিল। আমি একখানা রেশ্‌মী কাপড় পরেছিলেম একটা চিকনের কাজ-করা "কলার" পরেছিলেম, আর হাল ফ্যাশানের ধরণে চুল বেঁধেছিলাম। আমার সমস্ত সাজ্‌গোজ যখন শেষ হ'ল তখন মা আমাকে বল্‌লেন:—

"পটিটা খুলে' ফ্যাল্‌।"

আমি বাঁধাটা খুলে' ফেল্‌লেম। যদিও সেই সময় ঘরের ভিতর একটু গোধূলি আলো আসছিল, তবু আমার মনে হ'ল এমন সুন্দর আর কিছুই দেখিনি। আমার মাকে আমার বাবাকে, আমার পুঁটুকে বুকে চেপে ধর্‌লেম। বাবা বল্‌লেন:—

"নিজেকে ছাড়া তুই আর সকলকেই দেখ্‌তে পেয়েছিস্‌।"

আমি বলে' উঠ্‌লেম;—

"আর আমার স্বামী? কোথায় আমার স্বামী?"

আমার মা বল্‌লেন, "তিনি লুকিয়ে আছেন।"

তখন আমার মনে পড়্‌ল; তাঁর কুৎসিত চেহারার কথা, তাঁর পরিচ্ছদের কথা, তাঁর টাকের কথা, তাঁর বসন্তের দাগে-ভরা মুখের কথা।

আমি বল্‌লেম:—

"বেচারী এড্‌মণ্ড, তিনি আসুন না আমার কাছে, আমার চোখে তিনি কন্দর্পের চেয়েও সুন্দর।" মা উত্তর করলেন:—

"তোর স্বামীর জন্ম আমার অপেক্ষা করছি, তুই ততক্ষণ, তোর নিজের মুখখানি আয়নায় একবার দেখ্—তোর নিজের মুখ দেখে' নিজেই মুগ্ধ হবি এমন সুন্দর।"

আমার মায়ের কথা শুনে' আয়নার কাছে গেলেম, আমার নিজের একটু গর্ব্ব ছিল, একটু কৌতূহল ছিল। যদি আমি সত্যিই কুৎসিত হই?—যদি আমার কুৎসিত চেহারার কথা সবাই আমার কাছে ভাঁড়িয়ে থাকে?—তাই আমি আয়নার কাছে গেলেম ও আনন্দে চেঁচিয়ে উঠ্লেম। কেমন চিপ্ চিপে গড়ন, কেমন গোলাপের মতো রং, কেমন জ্বল্‌জ্বলে চোখ, সত্যই আমি রূপসী। কিন্তু বেশ আরামে আমার চেহারাটা দেখ্‌তে পারছিলেম, আয়নাটা ক্রমাগত কাঁপছিল, আয়নায় আমার প্রতিবিম্বটা যেন আনন্দে নৃত্য করছিল।

আমি আয়নার পিছন দিয়ে তাকিয়ে দেখ্‌লেম কেন আয়নাটা কাঁপছে।

একটি যুবা-পুরুষ বেরিয়ে এল, বেশ লম্বা চওড়া শরীর, বড় বড় কালো চোখ, একটা Legion of Honour-এর কৃত্রিম গোলাপ বুকে গোঁজা। একজন অপরিচিত লোকের কাছে রয়েছি বলে' আমি মরে' গেলেম। ঐ যুবকের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে'ই আমার মা বল্‌লেন:—

"দ্যাখ্ দিকি তুই কেমন সুন্দর—ঠিক যেন একটি সাদা গোলাপ।" আমি বলে' উঠ্‌লেম:

"মা!"

"দেখ্ দিকি এই সাদা হাত দুখানি", —এইকথা বলে' তিনি আমার হাতের আস্তিনটা কনুই পর্য্যন্ত উঠিয়ে দিলেন।

আমি বল্‌লেম:—

কিন্তু মা একজন অপরিচিত লোকের সাম্‌নে তুমি কি বল্‌ছ?

"অপরিচিত লোক?—এ যে একটা দর্পণ।"

"আমি আয়নার কথা বল্‌ছিনে, আয়নার পিছনে যে যুবা পুরুষটি ছিল আমি তার কথা বল্‌ছি।" বাবা বল্‌লেন:—

"আরে বোকা। তোর আর অত লজ্জা কর্‌তে হবে না। ওযে তোর স্বামী!" আমি বলে' উঠ্‌লেম: "এড্‌মণ্ড্!"—এই কথা বলে'ই তাকে চুম্বন করবার জন্য এগিয়ে গেলেম।

তার পর আবার কিছু পেলেম! আহা! উনি কি সুন্দর! আমি কি সুখী। যখন অন্ধ ছিলেম, তখন বিশ্বাস করে'ই ভাল-বেসেছিলেম। এখন নূতন প্রেমে আমার হৃদয় ভরপুর উঠেছে। ওঁর মহত্ত্বে আমি মুগ্ধ হয়েছি, আমার অন্ধতার জন্য আমাকে সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে উনি সকলকে বল্‌তে হুকুম দিয়েছিলেন যে উনি নিজে দেখ্‌তে কুৎসিত।

এড্‌মণ্ড্ আমার পায়ের নীচে নতজানু হ'য়ে বস্‌লেন। মা চোখের জল মুছতে মুছতে, আমাকে তাঁর কোলে বসিয়ে দিলেন। আনন্দের উচ্ছ্বাসে আমার স্বামী আমাকে বল্‌লেন:—

"তুমি কি সুন্দর!" আমি চোখ নীচু করে' উত্তর কর্‌লেম "—ওটা তোমার ভদ্রতার কথা।"

—"না, কেবল আমিই যখন তোমার একমাত্র দর্পণ ছিলেম আমি ত ঐ কথাই তোমাকে বরাবর বলে এসেছি। এখন দেখো! আমার এই যে সহযোগী সকর্ম্মী—মুখ দেখ্‌বার আয়না এরও গর্ এমকে মত এও বল্‌ছে আমি যা বলেছি তাই ঠিক।"

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

কার্ল্ মার্ক্স্ ও ফ্রিড্রিশ্ এঙ্গেল্স্

ভারতে যাঁহারা ধন-বিজ্ঞান-বিদ্যার আলোচনা করিয়া থাকেন তাঁহাদের নিকট জার্ম্মান্ লেখক ফ্রিড্রিশ্ (ফ্রেড্রিক্) এঙ্গেল্সের রচনাবলী অজানা জিনিষ নয়। এঙ্গেল্স্-প্রণীত "বিলাতী মজুর-শ্রেণীর সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা" নামক গ্রন্থ ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। জনগণের পারিবারিক আয়-ব্যয় এবং সমাজের অন্যান্য আর্থিক তথ্য ইত্যাদি বিষয়ে জগতের সর্ব্বত্র জ্ঞানলাভের যে প্রচেষ্টা দেখা যায়, তাহার জন্য এঙ্গেল্সের এই গ্রন্থ অনেক পরিমাণে দায়ী। নর-নারীর জীবনে সুখ-স্বচ্ছন্দতা মাপিবার বাস্তব যন্ত্র এঙ্গেল্সের প্রদর্শিত পথেই আজও সকল মহলে কায়েম করা হইতেছে।

জার্ম্মানির সমাজ-চিন্তায় এঙ্গেল্সের ঠাঁই খুব উঁচু। ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক দর্শনে দুইজন জার্ম্মান্ ইহুদি ইয়োরামেরিকায় নামজাদা হন। একজনের নাম কার্ল্ মার্ক্স (১৮১৮-১৮৮৩)। দার্শনিক হেগেলের আলোচনা-প্রণালীর বিরুদ্ধে কলম ধরিয়া ইনি ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণে এক নবযুগের সূত্রপাত করেন। অধিকন্তু খাঁটি ধনবিজ্ঞান এবং সমাজ তত্ত্বের প্রতিপাদ্য বহু বিষয়ে ইঁহার রচনাবলী জার্ম্মান্ পণ্ডিত-মহলের চোখ ফুটাইয়া দিয়াছে।

মজুর এবং দরিদ্র লোকেরা ক্রমশঃ কার্ল্ মার্ক্স্-কে যুগাবতার-জ্ঞানে পূজা করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। এই জ্ঞান আজকাল কেবলমাত্র জার্ম্মানিতেই আবদ্ধ নয়। ইয়োরোপ আমেরিকা এসিয়া আফ্রিকা অষ্ট্রেলিয়া নিউজীলণ্ড,—জগতের সকল দেশেই—"ওঁ কার্ল্ মার্ক্সায়

নমঃ” বলিয়া মজুরেরা মজুর-প্রতিনিধিরা এবং সমাজ-লেখকেরা কার্য্য আরম্ভ করিয়া থাকে।

কার্ল্ মার্ক্সের সময়কার অপর জার্ম্মান্-ইহুদী সমাজ-দার্শনিকের নাম ফার্ডিনাণ্ড্ লাসাল্ (১৮২৫-১৮৬৪)। ১৯১৮ সালে গণতন্ত্র স্থাপিত হইবার পর পাঁচ ছয় বৎসর ধরিয়া এবার্টের সভাপতিত্বে যে রাষ্ট্রীয় দল জার্ম্মানিতে রাজত্ব করিতেছে সেই দলের আদি পুরুষই লাসাল্। জার্ম্মান্ জাতি লাসালকে “সোৎসিয়াল-ডেমোক্রাটিশে পার্টাই”র (বা সমাজ সাম্যের দল) প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া জানে। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মানিতে সর্ব্বপ্রথম মজুর পরিষৎ স্থাপিত হয়।

মজুর-সমাজকে আর্থিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করা ছিল লাসালের জীবনের সাধনা। লাসাল্ প্রাচীন গ্রীক্-দর্শন এবং রোমান্ আইনকানুন বিষয়ক গবেষণা-মূলক গ্রন্থ রচনা করিয়া সুধী-মহলে যে যশ পাইয়াছিলেন সমসাময়িক খাজনা মজুরি এবং অন্যান্য আর্থিক তথ্যের বিশ্লেষণেও তাঁহার দক্ষতা সেইরূপ যশই পাইয়াছে।

(২)

মার্ক্সের সঙ্গে লাসালের কোনো কোনো ক্ষেত্রে একত্রে কাজকর্ম্মও চলিয়াছিল। লাসাল্ মার্ক্সকেই গুরুরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু গুরু শিষ্যরূপ বন্ধুত্বের সম্বন্ধ মার্ক্সে এবং এঙ্গেল্সেই বেশী মাত্রায় পাকিয়া উঠিয়াছিল। মার্ক্স্ এবং এঙ্গেল্স্ হরিহর-আত্মা ছিলেন, এইরূপ বলিলেই ইহাঁদের পরস্পর সম্বন্ধ ঠিক বুঝা যাইবে। এইখানে বলিয়া রাখা উচিত যে এঙ্গেল্স্ ছিলেন খৃষ্টান, অর্থাৎ ইহুদি নন।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে মার্ক্সের সঙ্গে এঙ্গেল্সের প্রথম দেখা হয়। মার্ক্সের বয়স তখন ছাব্বিশ বৎসর; এঙ্গেল্স্ তাহার দুই বৎসরের ছোট। ইহারা দুই জনে মিলিয়া ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে “দুনিয়ার নির্য্যাতিতদের নিকট” কমিউ-নিষ্টদের (ধনসাম্য-পন্থী) ইস্তাহার প্রকাশিত করেন। মার্ক্স্-প্রবর্ত্তিত একাধিক সংবাদপত্রে এঙ্গেল্স্ সর্ব্বদাই লেখকরূপে হাজির থাকিতেন। মার্ক্সের মৃত্যু পর্য্যন্ত পুরাপুরি চল্লিশ বৎসর ধরিয়া দুই জনের বন্ধুত্ব বজায় ছিল।

এই চল্লিশ বৎসরের ভিতর কার্ল্ মার্ক্সের নামে বহুসংখ্যক পুস্তিকা, বক্তৃতা, গ্রন্থ, সমালোচনা, তর্ক-বিতর্ক ইত্যাদি রচনা বাহির হইয়াছে। কিন্তু এই-গুলির কোন্ কোন্টায় কতখানি লেখা এঙ্গেল্সের এবং কতখানি মার্ক্সের নিজের তাহা বিশ্লেষণ করিতে হইলে গভীর গবেষণায় প্রবেশ করিতে হইবে। এই তথ্য হইতেই জার্ম্মানির উনবিংশ শতাব্দীতে এবং দুনিয়ার ধন-বিজ্ঞানে, সমাজ-তত্ত্বে এবং “দরিদ্র নারায়ণে”র পূজায় এঙ্গেল্সের কৃতিত্ব কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারা যায়।

কার্ল্ মার্ক্সের “ডাস্ কাপিটাল্” (বা পুঁজি) গ্রন্থে প্রচলিত ধন-বিজ্ঞান-বিদ্যার তীব্র সমালোচনা আছে। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড বাহির হয়। দ্বিতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি ছাপাখানায় যাইবার পূর্ব্বে মার্ক্সের মৃত্যু হইয়াছিল। সম্পাদনের ভার ছিল এঙ্গেল্সের হাতে। এঙ্গেল্সের তত্ত্বাবধানে দ্বিতীয় খণ্ড বাহির হয় ১৮৮৫ সালে এবং তৃতীয় খণ্ড ১৮৯৪ সালে। এই দুই খণ্ডে এঙ্গেল্সের স্বাধীন হাত প্রায় সর্ব্বত্রই লক্ষ্য করিতে হইবে। অর্থাৎ যে-গ্রন্থ মার্ক্স্-নীতির গীতাস্বরূপ তাহার অনেক স্থলেই এঙ্গেল্সের কলম কাজ করিয়াছে।

(৩)

যখনই আজকাল যেখানে মার্ক্সকে যুগাবতার বলা হইতেছে, সেখানে তখনই এঙ্গেল্সও পূজা পাইতেছেন। এই সূত্রে বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় এঙ্গেল্স্ যাহা বলিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে “ড্যর্ উর্স্প্রুং ড্যর ফামিলিয়ে ডেস্ প্রিফাট্-আইগেন্টুম্স্ উণ্ড্ ডেস্ ষ্টাটেস্” (পরিবার, নিজস্ব এবং রাষ্ট্রের উৎপত্তি) নামে। তাহার এক বৎসর পূর্ব্বে মার্ক্সের মৃত্যু হইয়াছে।

এঙ্গেল্স্ লিখিয়াছেন:—“এই গ্রন্থ রচনা করিয়া আমি প্রকারান্তরে একটা উইল-মাফিক কাজ করিতেছি।

মর্গ্যানের অনুসন্ধানগুলাকে ধনবিজ্ঞানের তরফ হইতে ব্যাখ্যা করিয়া প্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন একজন যে-সে লোক নন। তিনি স্বর্গগত মহাপুরুষ কার্ল মার্ক্‌স্‌। ইতিহাসের আর্থিক ব্যাখ্যা মার্ক্‌সের আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক আলোচনা-প্রণালী। এই ব্যাখ্যা-প্রণালী ফুটাইয়া তুলিতে আমিও অনেক কাল ধরিয়া তাঁহাকে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছি। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এই প্রণালী দার্শনিক সাহিত্যে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়।

"এক্ষণে মর্গ্যান্‌ আমেরিকার আদিমবাসীদিগের জীবন আলোচনা করিতে গিয়া সেই প্রণালীই পুনরায় আবিষ্কার করিয়াছেন। 'বার্ব্বার' সভ্যতার সঙ্গে উৎকর্ষের যুগের তুলনায় মর্গ্যান্‌ প্রায় মার্ক্‌সের সিদ্ধান্তেই আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। এই কারণেই মার্ক্‌স্‌ মর্গ্যানের তথ্যগুলা গ্রহণ করিয়া নিজ দর্শনকে পুষ্ট করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন।

"আমার বন্ধুবর নিজের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছানুরূপ কাজ করিয়া আমি একটা যথাসাধ্য ঠাঁই পূরণের ব্যবস্থা করিলাম। তবে মার্ক্‌স্‌ মর্গ্যানের কথা লইয়া যেখানে যেখানে টিপ্পনী বা টীকা করিয়া গিয়াছেন সেগুলা পুরাপূরি ব্যবহার করিতে ছাড়ি নাই।

"কাজেই বর্ত্তমান গ্রন্থও মার্ক্‌স্‌ এবং এঙ্গেল্‌স্‌ দুই জনেরই সন্তান এইরূপ ধরিয়া না লইলে গ্রন্থের জন্মকথা পরিষ্কার হইবে না।"

(৪)

এঙ্গেল্‌স্‌ তাঁহার রচনাকে "পরিবার, নিজস্ব বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং রাষ্ট্রের উৎপত্তি" নামে প্রচারিত করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই গ্রন্থে পৃথক্‌ বিবৃত হইয়াছে পরিবার বা বিবাহ-পদ্ধতি ও যৌন সম্বন্ধের ইতিহাস। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় গেন্‌স্‌ বা গোষ্ঠী-প্রথার সমাজ-শাসন। তাহার জন্য আমেরিকার ইণ্ডিয়ান্‌ (এবং বিশেষরূপে ইরোকোয়া) জাতির প্রতিষ্ঠানগুলা আলোচনায় ঠাঁই পাইয়াছে।

এঙ্গেল্‌সের তৃতীয় কথা গোষ্ঠীর ভাঙন বা রাষ্ট্রের জন্ম। ইণ্ডিয়ান সমাজের লোকেরা গোষ্ঠী-কেন্দ্র ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। তাহাদের সমাজে রাষ্ট্রের চিহ্ন পাওয়া যায় না। রাষ্ট্রের জন্ম-কথা ঢুঁড়িয়া বাহির করিবার জন্য প্রাচীন ইয়োরোপের গ্রীক্‌, রোমান্‌ কেণ্টিক্‌ এবং জার্ম্মান্‌ জাতির স্মৃতিশাস্ত্র ও সংহিতা-গুলা আলোচনা করা হইয়াছে।

আলোচ্য বিষয়গুলার তালিকা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, নিজস্ব বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি এই গ্রন্থের মুখ্য কথা নয়। মুখ্য কথা পরিবার, গোষ্ঠী এবং রাষ্ট্র এই তিন জীবনকেন্দ্রের ইতিহাস। এই কারণে বাংলা ভাষায় এঙ্গেল্‌সের রচনা "পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্রের জন্ম-কথা" নামে প্রচারিত হইল।

নিজস্ব বা ব্যক্তিগত সম্পত্তির উৎপত্তি গ্রন্থের মুখ্য কথা নয় বটে, কিন্তু এই বিষয়ই এঙ্গেল্‌সের "প্রাণের কথা"। সেই প্রাণের কথাটা গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের যেখানে সেখানে পাঠকের কাণ স্পর্শ করে। বস্তুতঃ ধনদৌলতের আকার-প্রকার মানব-জাতির শৈশব-কালে কখন্‌ কেন ও কিরূপ ভাবে বদ্‌লাইয়াছে তাহার আলোচনা করাই এঙ্গেল্‌সের উদ্দেশ্য ছিল। আর্থিক ইতিহাসের কোন্‌ স্তরে ব্যক্তিগত ধন-দৌলতের সৃষ্টি হইয়াছে, সে-কথা এই গ্রন্থে অতি উজ্জ্বল অক্ষরে বিবৃত হইয়াছে।

খাঁটি ধনবিজ্ঞান-বিদ্যা বলিলে যে সাহিত্য-নজরে আসে, এই গ্রন্থকে সেই সাহিত্যের অন্তর্গত করা চলিবে না। এই রচনা নৃতত্ত্ববিদ্যার মহলেই ঠাঁই পাইবার যোগ্য। নৃতত্ত্বের তথ্যগুলার উপরে আর্থিক ব্যাখ্যা চালাইলে যে-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার কথা এঙ্গেল্‌স্‌ এখানে সেই তত্ত্বের প্রচারক। সমাজ-দর্শন, সভ্যতার ইতিহাস ইত্যাদি বস্তু প্রাচীন মানবের জীবন-কথায় বা পুরাকাহিনীতে যতখানি পাওয়া যাইতে পারে, সেই দর্শন ও সেই ইতিহাসই বর্ত্তমান কেতাবের দান।

(৪)

নৃতত্ত্ব দুই শাখায় বিভক্ত :—শারীরিক ও সামাজিক। এক শাখায় পণ্ডিতেরা ভিন্ন ভিন্ন জাতির শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাপিয়া-জুকিয়া তুলনা করিয়া মানুষের

উৎপত্তি, শ্রেণী-বিভাগ ইত্যাদির আলোচনা করিয়া থাকেন। এই বিদ্যাকে কম্পারেটিভ্ অ্যানাটমির (বা তুলনা-মূলক অস্থি-বিদ্যার) এবং জীব-বিজ্ঞানের ক্ষেত্র বিবেচনা করা যাইতে পারে।

অপর বিভাগের পণ্ডিতেরা জগতের ভিন্ন ভিন্ন দেশের নরনারীর আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, লেন দেন, স্মৃতিশাস্ত্র, নীতি-শাস্ত্র, স্ত্র-কু ইত্যাদি জীবনের সকল খুঁটিনাটি আলোচনা করেন। সহজে এই বিভাগের নৃতত্ত্ববিদ্গণকে লোকাচারতত্ত্ববিৎ বলা চলে। ধর্ম্ম, শিল্প, ধন-দৌলত, রাষ্ট্র, সমাজ ইত্যাদি বিষয়ে তুলনা মূলক বিজ্ঞানগুলা সবই এই সামাজিক নৃতত্ত্ববিদ্যার সামিল।

এক কথায় বলা যাইতে পারে যে "ইতিহাস" নামে যা কিছু সাহিত্য রচিত হইয়া থাকে সবই নৃতত্ত্ব। কিন্তু পারিভাষিক হিসাবে এইখানে আর একটা প্রভেদ চলিয়া আসিতেছে। অতি সাবেক কাল, মান্ধাতার আমল, প্রাগৈতিহাসিক যুগ ইত্যাদি সময়কার মানব-কথা অর্থাৎ মানব-সভ্যতার গোড়াটা লইয়া যাহারা অনুসন্ধান চালাইতেছেন তাঁহাদিগকে নৃতত্ত্বের গবেষক বলা হয়।

অধিকন্তু বর্ত্তমান জগতের বিভিন্ন জনপদে যে সকল "আদিম", অনুন্নত, অসভ্য জাতি "সভ্যতার শৈশবাবস্থায়" জীবিত রহিয়াছে তাহাদের আচার-ব্যবহার এবং স্বধর্ম্মের সকল প্রকার অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান সকল অনুসন্ধানকারীর মনোযোগ আকর্ষণ করে। তাঁহারাও নৃতত্ত্ববিৎরূপে পরিচিত। এই হিসাবে পর্য্যটক, ভৌগোলিক আবিষ্কারক ইত্যাদি শ্রেণীর লোক নৃতত্ত্বের সংসারে নাম করিয়া থাকেন।

(৬)

মর্গ্যান্ লোকটা কে? চল্লিশ বৎসর ধরিয়া এই লেখক আমেরিকার ইণ্ডিয়ান্ সমাজে তথ্য অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। ইরোকোয়াদের কুটুম্ব সম্বন্ধে বা আত্মীয়তার প্রথা সম্বন্ধে ইনি ১৮৭১ সালে যে-সকল তথ্য প্রকাশ করেন তাহার ফলে গোটা লোকাচার-তত্ত্ব, বিবাহ-পদ্ধতি এবং সামাজিক নৃতত্ত্বে এক নবযুগ সুরু হয়। ইহার সর্ব্বপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম "এন্শ্যেন্ট্ সোসাইটি" (বা প্রাচীন সমিতি)। স্যাভেজ (বা সহজ) অবস্থা হইতে মানবজাতি কোন্ পথে "বার্ব্বার" সভ্যতা অতিক্রম করিয়া উৎকর্ষের স্তরে আসিয়া ঠেকিয়াছে সেই তথ্যগুলা নির্দ্দেশ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। গ্রন্থ ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল।

মর্গ্যানের প্রথম সিদ্ধান্ত এই যে, মানব-সমাজে এক কালে "দলগত" বিবাহ অর্থাৎ অবাধ যৌন-সংস্রব প্রচলিত ছিল। এই অবাধ সংস্রবে বিধি-নিষেধ কায়েম হইতে থাকে। ক্রমশঃ গেন্স্ বা গোষ্ঠী-প্রথা দেখা দেয়। গোষ্ঠী নীতি আবিষ্কার করা মর্গ্যানের দ্বিতীয় কীর্ত্তি। গোষ্ঠী সমরক্তজ জীবন-কেন্দ্র। এক গোষ্ঠীর ভিতর পরস্পর বিবাহ নিষিদ্ধ। গোষ্ঠী পরিচালিত হইত প্রথম প্রথম নারীর তরফ হইতে জননী-বিধির নিয়মে। সেই জননী-বিধির গোষ্ঠী আজও চলিতেছে ইরোকোয়া সমাজে, এই গেল মর্গ্যানের তৃতীয় সিদ্ধান্ত।

নারীর আমল গোষ্ঠীধর্ম্ম হইতে পরে উঠিয়া যায়। তাহার পরিবর্ত্তে দেখা দেয় পুরুষ-বিধি এবং পুরুষাধিপত্য। গ্রীক্ রোমান্ এবং জার্ম্মান্ সমাজগুলার প্রাচীনতম স্মৃতি শাস্ত্রে পুরুষ প্রাধান্যশীল গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠানই দেখিতে পাওয়া যায়। মর্গ্যানের এই আবিষ্কার প্রাচীন ইয়োরোপের ইতিহাসে রচনায় যুগান্তর আনিয়াছে।

এই চার সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াই মর্গ্যান্ আলোচনা খতম করেন নাই! উৎকর্ষের যুগ সম্বন্ধে অর্থাৎ যে যুগের ভরা জোয়ারে বর্ত্তমান জগতের "সভ্য" নরনারী বসবাস করিতেছে—সেই স্তরের জীবন-যাত্রাকে ইনি চরম ভাষায় তিরস্কার করিয়াছেন। লাভের লোভই এই যুগের ধনোৎপাদনের গোড়ার কথা,—ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া ধন-জীবীরা আর কিছু চিন্তা করে না,—ইহাই মর্গ্যানের মতে উৎকর্ষশীল মানবের মূল মন্ত্র। ফরাসী সোস্যালিষ্ট্ ফুরিয়ে যে-ভাবে বর্ত্তমান জগতের আর্থিক ব্যবস্থার নিন্দা করিয়াছেন, মর্গ্যান্ও সেইরূপই করিয়াছেন।

উৎকর্ষের যুগকে গালাগালি দেওয়াই মর্গ্যানের শেষ কথা নয়। একটা ভবিষ্য সমাজের স্বপ্নও তাঁহার মাথায়

ছিল। কোথায় একটা অনুন্নত আদিম অসভ্য জাতির আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে বৃত্তান্ত-প্রকাশ এবং কোথায় প্রাচীন ইয়োরোপের মান্ধাতার আমলের গ্রীক্ রোমান্ জার্ম্মান্‌দের জীবন কথার আলোচনা, আর কোথায় বর্ত্তমান মানবের জন্য সমাজসংস্কার, পরিবার-সংস্কার, আর রাষ্ট্র-সংস্কারের মোসাবিদা। সমাজ-সংস্কারক হিসাবে মর্গ্যান্ প্রায় মার্ক্‌সের বিপ্লব পন্থেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। কারণ মর্গ্যানের মতে ভবিষ্য মানব সেই মান্ধাতার আমলেরই যৌথসম্পত্তি-নির্দিষ্ট গোষ্ঠীদস্তের এক নবরূপ প্রকটিত করিবার দিকে অগ্রসর হইতেছে।

(৭)

এঙ্গেল্‌সের গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৮৫ সালে। ইহার ইংরেজি সংস্করণ বাহির হয় ১৯০২ সালে। অন্যান্য ভাষায় ইহার তর্জ্জমা পূর্ব্বেই হইয়াছিল। কিন্তু কি মর্গ্যানের আবিষ্কারগুলা, কি এঙ্গেল্‌স্ মার্ক্‌সের আর্থিক ব্যাখ্যা উনবিংশ শতাব্দীর ভিতর ভারতীয় সমাজে প্রবেশ লাভ করে নাই।

সেকালের কোনো ভারতীয় লেখক এইসকল তথ্য বা তত্ত্ব লইয়া মাথা ঘামাইয়াছেন কিনা সন্দেহ। অধিকন্তু প্রাচীন বা মধ্যযুগের ভারতবিষয়ক আর্থিক, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় তথ্যগুলা এই মর্গ্যান মার্ক্‌স্-প্রবর্ত্তিত সমাজ বিজ্ঞানের আওতায় আনিয়া পরখ করিতেও কোনো ভারতীয় গবেষক চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। বঙ্কিম, ভূদেব, চন্দ্রনাথ ইত্যাদির প্রবন্ধাবলীতে সে যুগের দৌড় জরীপ করা চলিতে পারে।

ভারতে যা-কিছু ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান সবই মাত্র ১৯০৫ সালের সম সম কালে এবং পরে দেখা দিয়াছে। বিগত বিশ বৎসর ধরিয়া যুবক ভারত ধন-বিজ্ঞান, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান এবং সমাজ-বিজ্ঞান ইত্যাদি নানা বিদ্যার জন্য সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ইয়োরামেরিকান্ গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত হইতেছে। কিন্তু ধন-বিজ্ঞানের তরফ হইতে ভারতীয় মান্ধাতার যুগকে যাচাই করিবার দিকে অথবা মানব-সভ্যতার ক্রম-বিকাশ বুঝিবার দিকে কোনো চেষ্টা আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গলাদেশের কুত্রাপি ত নাই-ই, ভারতের কোথাও দেখি না।

(৮)

একদম নাই বলিলে ভুল হইবে। কেননা এদানীং ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে ভারতীয় লেখকদের কয়েকখানা ইংরেজি কেতাব বাহির হইয়াছে। এই-সকল গ্রন্থে যে যে অংশ প্রাচীন তথ্যগুলার খাটি বিবরণ মাত্র সেইসকল অংশ প্রত্নতত্ত্ব-হিসাবে অনেক ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু যেখানেই বিদেশী—বিশেষতঃ ইয়োরামেরিকান্ তথ্যের সঙ্গে তুলনায় সমালোচনার চাঙ্গ মাত্র আছে সেইখানেই গোড়ায় গলদ ধরা পড়ে।

লেখকগণ প্রাচীন ভারতকে বিলকুল সৃষ্টি ছাড়া ভূতগুরুরূপে প্রচারিত করিবার জন্য বিজ্ঞান সাধনায় ব্রতী হইয়াছেন। অথবা বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলার সন-তারিখ "জাতিভেদ", ধন-বিজ্ঞান বা যুগধর্ম্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই ইহারা ভারতীয় "স্বদেশী সমাজে"র স্বধর্ম্ম, বিশেষত্ব, স্বাতন্ত্র্য ইত্যাদি আবিষ্কার করিয়া বসিয়াছেন। ফলতঃ যে-সকল অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান দুনিয়ার সকল জাতিরই "সামান্য ধর্ম্ম" মাত্র সেইগুলাকেও অতি মাত্রায় ভারতাত্মার প্রতিমূর্ত্তিরূপে প্রচারিত হইয়াছে। চিত্রকলা, স্থাপত্য, সাহিত্য, সঙ্গীত ইত্যাদি রসের সমালোচনায়ও এই বিসাক্ত "প্রাচ্যামি"র জয়-জয়-কার চলিতেছে।

(৯)

এইরূপ ভ্রমাত্মক আলোচনার পথ দেখাইয়াছেন ইয়োরামেরিকান প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ 'ওরিয়েণ্টালিষ্ট' পণ্ডিতগণ। তাঁহাদের জুড়িদারস্বরূপ পাশ্চাত্য, বিজেতা-জাতীয়, সাম্রাজ্য শাসক, "কলোনিয়ালিষ্ট" (উপনিবেশতন্ত্রী) রাষ্ট্রিকেরাও সমাজ-বিজ্ঞানের বর্ত্তমান দুরবস্থার জন্য দায়ী। এই দুই শ্রেণীর লোক প্রায় একশ' বৎসর ধরিয়া পূর্ব্বকে পশ্চিম হইতে ফারাক করিয়া রাখিয়াছেন। দুনিয়ার শ্বেতাঙ্গ-প্রাধান্যের যুগে অশ্বেতাঙ্গদিগকে "এক-ঘরে" করিয়া রাখা শ্বেতাঙ্গ-বিজ্ঞান-সেবীদের স্বার্থ এবং স্বধর্ম্ম।

তুলনামূলক সমাজ-বিদ্যার আলোচনায় ভুল কেন প্রবেশ করিয়াছে এবং এই বিজ্ঞানের সংস্কার কিরূপে সাধিত হইতে পারে, তাহার আলোচনা মৎপ্রণীত "ফিউচারিজ্‌ম্ অব্ ইয়ং এশিয়া" বা "যুবক এশিয়ার ভবিষ্যবাদ" (লাইপ্‌ৎসিগ্ ১৯২২) গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গেল গোটা সভ্যতা-বিজ্ঞান বা সমাজ-তত্ত্ব-সম্বন্ধে কথা।

সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে ভারতীয় রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠান ও সিদ্ধান্তগুলার কিয়ৎ বাহির করিবার জন্য "পলিটিকাল ইন্‌ষ্টিটিউ-শ্যান্‌স্ অ্যাণ্ড থেয়োরিজ অব্ দি হিন্দুজ্" অর্থাৎ "হিন্দু-জাতির শাসন-পদ্ধতি ও রাষ্ট্রনীতি" (লাইপ্‌ৎসিগ্ ১৯২২) নামক গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে। প্রাচীন কালের ভারতসন্তান ভালয় মন্দয় গ্রীক্, রোমান্ এবং জার্ম্মান্‌দেরই সমকক্ষ ছিল—এই কথা সেই গ্রন্থের প্রাণ। বর্ত্তমান ভারত অথবা ভবিষ্য ভারত সম্বন্ধে এই কেতাবে কোনো কথা বলি নাই।

(১০)

ভবিষ্য ভারত কোন্ পথে চলিবে? এই সম্বন্ধে যাঁহার যেরূপ খুসী তিনি সেইরূপ আদর্শ প্রচার করিতে অধিকারী। গোটা দুনিয়া কোন্ পথে চলিবে? এই সম্বন্ধে যেমন প্রত্যেক লেখক, সমাজ-সংস্কারক, বৈজ্ঞানিক বা প্রপাগাণ্ডিষ্ট্ নিজ নিজ মত জাহির করিতেছে, ভারত সম্বন্ধেও ভবিষ্যবাদীরা সেইরূপ করিবে ইহা স্বাভাবিক। স্বাধীন চিন্তায় বাধা দিবে কে? যাহার মাথায় কিছু কিছু মগজ আছে, সেই এক-একটা দল সুরু করিতে অধিকারী।

কিন্তু তাহা বলিয়া কোনো-একটা পথকে "পূরবী" এবং অপর কোনো পথকে "পশ্চিমা" দাগে চিহ্নিত করিতে বসিলে তর্ক-বিতর্কের আখ্‌ড়ায় আসিয়া পাঞ্জা কষিতে হইবে। এই আখ্‌ড়ায় আদর্শ, ভাবুকতা, মানবজাতির আশা, সমাজ-সংস্কারকের স্বপ্ন বা পীর-বরের বাণী খাটে না। এখানে খাটে কেবল তথ্য, বাস্তব তথ্য, যাহা ঘটিয়াছে এবং যাহা ঘটিতেছে তাহার নিরেট বিবরণ। অর্থাৎ দেশী-বিদেশী, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য, ভারতীয় এবং অভারতীয় সকল প্রকার জীবন-কেন্দ্রের সন-তারিখ-সমন্বিত এবং দফায় দফায় তুলনা-মূলক ইতিহাস বা নৃতত্ত্ব।

ধরা যাউক যেন চর্‌খার দ্বারাই ভবিষ্য ভারত স্বর্গে উঠিবে। অথবা যেন পল্লী-কেন্দ্রেই ভারতের ভবিষ্য-বিকাশ ঘটিতে বাধ্য, অথবা যেন কুটীরশিল্প ছাড়া অন্যান্য সকল প্রকার শিল্প-ব্যবস্থা ভারত হইতে বাহির করিয়া দেওয়া উচিত, অথবা যেন ভবিষ্য-ভারতে স্পষ্ট শাসন চলিবে পল্লীপঞ্চায়তেরই বিধানে। ভবিষ্যবাদীরা এই চার দফায় ভারতীয় জীবন গড়িয়া তুলুন—আপত্তি কি? কিন্তু এই চার দফার কোনোটাকেই ভারতীয় "আধ্যাত্মিকতার" বিশিষ্ট আবিষ্কার বলা যাইতে পারে কিসের জোরে? এই "চার মহা সত্য" জগতের অন্যান্য দেশে কোনো কোনো যুগে নরনারীর জীবনকেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত করে নাই কি?

এই "সত্য-চতুষ্টয়"ই যদি আধ্যাত্মিকতা এবং মানব-সভ্যতার চরম নিদর্শন হয় তাহা হইলে দুনিয়ার আদিম, অসভ্য, "বার্ব্বার," অনুন্নত জাতিগুলা চরম মাত্রায় আধ্যাত্মিক এবং সভ্যতাশীল নয় কি? তাহা হইলে প্রাচীন ইয়োরোপের গ্রীক্, রোমান্, জার্ম্মান্‌রা এবং মধ্য যুগের পর ফ্যাক্টরি যুগের কলচালিত শিল্প-ব্যবস্থার আমল পর্য্যন্ত ইয়োরোপীয় খৃষ্টানরা আধ্যাত্মিকতা এবং সভ্যতার দাবী হইতে বঞ্চিত হইবে কেন?

তাহা হইলে পাশ্চাত্য-সংসারের সোস্যালিষ্ট্ পন্থীরা এবং বিশেষতঃ কমিউনিষ্ট্ বা যৌথ-সম্পত্তি-পন্থী ধনসাম্য-ধর্ম্মীরা কি দোষ করিল? তাহা হইলে লেনিন্ ট্রট্‌স্‌কি প্রবর্ত্তিত বোল্‌শেভিক্ রুশিয়া কম-সে-কম আদর্শ-হিসাবে আধ্যাত্মিকতা এবং সভ্যতার মাপকাঠিতে চরমে গিয়া ঠেকে নাই কি? তাহা হইলে লেনিন্ ট্রট্‌স্‌কির "গুরুর গুরু" জার্ম্মান্ ইহুদির বাচ্চা কার্ল্ মার্ক্‌স্ তথাকথিত ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার এবং ভারত-ধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি নয় কি? পূর্ব্বই বা কোথায়? পশ্চিমই বা কোথায়?

(১১)

এঙ্গেল্‌সের গ্রন্থ ভারতীয় সমাজে প্রচারিত হইলে ভারতবাসী নিজ নিজ স্মৃতি নীতি ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ

শাস্ত্রগুলার দিকে এক নূতন চোখে দৃষ্টিপাত করিতে সুরু করিবে। ভারতের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সম্বন্ধে যুবক ভারত বহু বুজ্‌রুকি এবং কুসংস্কার বর্জ্জন করিতে শিখিবে। তুলনামূলক সমাজ-বিজ্ঞান-বিদ্যা কিছু কিছু করিয়া ভারত-সন্তানের পেটে পড়িতে থাকিবে।

মর্গ্যান্, মার্কস্, বা এঙ্গেল্স্ কাহারও মত বা বাণীই বেদবাক্য নয়। সকলের কথাই তথ্যের জোরে কষিয়া দেখা আবশ্যক। কিন্তু ইঁহাদের রচনায় উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্দ্ধের সমাজ-চিন্তা পুষ্ট হইয়াছে। এখনো এইগুলার দাম বিজ্ঞানের বাজারে ঢের। এই কারণে ভারত-সন্তানের পক্ষে এইগুলা জানিয়া রাখা দরকার। ১৯২৪ সালের পূর্ব্বে এঙ্গেল্সের গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হয় নাই, ইহা লজ্জার কথা। এই ধরণের আরও অনেক গ্রন্থ এতদিনে বাংলা ভাষায় পাওয়া উচিত ছিল।

বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীতে প্রাচীন সমাজ সম্বন্ধে বহু গবেষণা হইয়াছে। সম্প্রতি কয়েক বৎসর ধরিয়া নিউইয়র্কে এইসকল গবেষণার ফল নানা গ্রন্থে প্রচারিত হইতেছে। ১৯২০-২২ রবার্ট লোহ্বি, আর্থার গোল্ডেন্‌হাইজার্ এবং প্লিনি গডার্ড্ এই তিন জন লেখকের রচনাবলী পাঠ করিলে মর্গ্যানের পরবর্ত্তী কালের সকল সিদ্ধান্ত ইংরেজিতে পাওয়া যায়। সেইসকলের চুম্বক-প্রকাশ এই ভূমিকায় চলিতে পারে না।

(১২)

মানব-জাতির শৈশব সম্বন্ধে তুলনা-মূলক আলোচনা এঙ্গেল্সের গ্রন্থের প্রথম কথা। তুলনাসিদ্ধ ইতিহাস-হিসাবে এই রচনা এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন। আর-এক তরফ হইতে এই কেতাব সুধী-মহলের শ্রদ্ধা পাইয়া থাকে। সে ইতিহাসের আর্থিক ব্যাখ্যা বা সভ্যতার আর্থিক ব্যাখ্যার তরফ।

এই "আর্থিক ব্যাখ্যা" "ভৌতিক" ব্যাখ্যা ইত্যাদি ধরণের "ব্যাখ্যা"টা কি বীজ? এঙ্গেল্সের গ্রন্থ স্বয়ংই এই ব্যাখ্যা-প্রণালীর প্রয়োগ-ক্ষেত্র। কেতাবটা ঘাঁটিলেই ফলেন পরিচীয়তে। সেই ব্যাখ্যা-প্রণালী প্রচারের উদ্দেশ্যেই এই কেতাব বাংলায় দেখা দিল।

ভারতবাসীর পক্ষে "আর্থিক ব্যাখ্যা" হজম করা কিছু কঠিন। কেননা লেখায়, বক্তৃতায়, পাঠশালায়, বাক্‌বিতণ্ডায়, কবিতায়, ইতিহাসে, খবরের কাগজে, মায় রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের সভায় সভায় ও আমাদের পণ্ডিত এবং জননায়কগণ আমাদিগকে দুই পুরুষ ধরিয়া একটা মাত্র বুখ্‌নি শেখাইয়া আসিয়াছেন। সেই বুখ্‌নির মোটা কথা এই—"হিন্দু-মুসলমান আমলে নর-নারীরা ইহলোকের ধার ধারিত না। তাহারা পরলোক লইয়াই মস্‌গুল থাকিত। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ ছিলেন পুরামাত্রায় আত্মিক। ভৌতিক জগৎটা তাঁহাদের জ্ঞান ও কর্ম্মের বহির্ভূত ছিল। যদিও বা কিছু অন্তর্গত ছিল তাহাও ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়।"

(১৩)

প্রাচীন ভারতের লোকগুলা যে মানুষ ছিল, ইহাদেরও যে রক্ত-মাংসের শরীর ছিল, অতএব রক্ত-মাংসের স্বধর্ম্মও হিন্দু-মুসলমানদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিত—এই কথা বিশ্বাস করা আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর পণ্ডিতগণের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। তাঁহারা ছিলেন বোধ হয় প্রায় সকলেই ইতিহাসের "আত্মিক ব্যাখ্যার" ধুরন্ধর, অধ্যাত্মবিদ্যার পাড় বিশেষ। সভ্যতার এবং মানব-জীবনের একবগ্‌গা আত্মিক ব্যাখ্যা পাশ্চাত্য মুল্লুকেও বহুকাল চলিয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের বুখ্‌নিটাই ভারতীয় সমাজ-সংস্কারক এবং ইতিহাস-লেখক-মহলে প্রচলিত হইয়াছিল।

এই একবগ্‌গা আত্মিক ব্যাখ্যার উপর চাবুক লাগানো হইয়াছে ১৯১৪ সালে প্রকাশিত মৎপ্রণীত "পজিটিভ্ ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড্ অব্ হিন্দু সোসিয়োলজি" অর্থাৎ হিন্দু সমাজ-তত্ত্বের বাস্তব-ভিত্তি-নামক গ্রন্থে (পানিনি-কার্য্যালয়, এলাহাবাদ)। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম ভাগ বাহির হইয়াছে ১৯২১ সালে। ভারতীয় মানুষের ক্ষিধে পায়, ভারতীয় মানুষ পায়ে হাঁটিয়া চলে, ভারতীয় মানুষ জমি-জমা লইয়া মারামারি করে, ভারতীয় মানুষ লড়াই করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে চায়, ভারতীয়

মানুষ "একাতপত্রং জগতঃ প্রভুত্বং" কামনা করে, ভারতীয় মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সমাজ ও রাষ্ট্র শাসন করে, ভারতীয় মানুষ স্ত্রী-পুত্রের জন্য সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া ভবিষ্য সুখ-স্বচ্ছন্দতার বিধান করিতেছে অভ্যস্ত.—এই সকল অতি মামুলি বস্তু এই গ্রন্থের তথ্য।

"ট্রান্সেণ্ডেণ্টাল্" বা অতীন্দ্রিয় তরফটাকে ফুলাইয়া তুলিলে হিন্দুজীবন, হিন্দুধর্ম, প্রাচ্য ধর্ম, প্রাচ্যের সভ্যতা বুঝিতে পারা যাইবে না। ইতিহাস-রচনায় প্রচলিত অতীন্দ্রিয়ামি বা আধ্যাত্মিকামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সুরু করিবার জন্যই ভারতীয়দের বাস্তবনিষ্ঠা প্রকাশিত করা হইয়াছে। ফরাসী দার্শনিক কোঁৎ প্রবর্ত্তিত "পজিটিভ্" শব্দের দ্বারা গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া গিয়াছে। প্রত্যক্ষ, বাস্তবিক, "লৌকিক" ইহলৌকিক, ভৌতিক, "মেটিরিয়ালিষ্টিক্", "ইকনমিক্",—এসব শব্দ একই অর্থের এপাশ ওপাশ মাত্র। সম্প্রতি জার্ম্মান্ ভাষায় প্রকাশিত "ডিলেবেন্স্-আন্শাউং ডেস্ হিণ্ডুস" (ভারতীয় জীবন-সমালোচনা) গ্রন্থেও (লাইপৎসিগ্, ১৯২৩) বিজ্ঞানমহলে প্রচলিত কুসংস্কারগুলা খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

(১৪)

"পজিটিভ্ ব্যাক্গ্রাউণ্ড্" গ্রন্থে ভারতীয় ইতিহাসের বাস্তব বা ভৌতিক (এবং সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক) "ভিত্ত" মাত্রের সূচনা করা হইয়াছে। কিন্তু ইতিহাসের আর্থিক বা ভৌতিক "ব্যাখ্যা" বলিলে যাহা বুঝায় তাহা "ভিত্ত" মাত্রের সমান নয়! এই ভিত্তটাকে জীবনের, সভ্যতার এবং ক্রমবিকাশের "কারণ" রূপে প্রদর্শন না করা পর্য্যন্ত আর্থিক "ব্যাখ্যা" জারি করা হইয়াছে বলা হইবে না।

অর্থাৎ কৃষিশিল্প-বাণিজ্যের কতকগুলা তথ্য ইতিহাস-গ্রন্থের অধ্যায়ে অধ্যায়ে ছড়াইয়া দিলেই সভ্যতার আর্থিক "ব্যাখ্যা" করা হইল না। কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ-নির্ণয় এই ব্যাখ্যার আসল কথা। খাওয়া-পরার ব্যবস্থা দ্বারা, অন্নসংস্থানের উপায়ের দ্বারা, সোজা কথায় ভাত-কাপড়ের প্রভাবে জুনিয়ায় ধর্ম্ম, সুকুমার শিল্প, পারিবারিক রীতিনীতি, সৌজন্য, শিষ্টাচার এবং রাষ্ট্রশাসনের বিধি-নিষেধ সবই নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে,—এই কথা যে-সকল ঐতিহাসিক বলিয়া থাকেন একমাত্র তাঁহারাই সভ্যতার ভৌতিক "ব্যাখ্যা" প্রচার করিতেছেন, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

ইতালীয় ইতিহাস দার্শনিক ভিকো অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এই ভৌতিক ব্যাখ্যার ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু মার্কস্-এঙ্গেল্স প্রচারিত "ডাস্ কোম্মিউনিষ্টিশে মানিফেষ্ট" অর্থাৎ ধনসাম্যবাদীদের অনুশাসন বা ইস্তাহার (১৮৬৭) নামক পুস্তিকায় এই ব্যাখ্যা-প্রণালীর মূলসূত্রগুলা জগতে সর্ব্বপ্রথম প্রচারিত হইয়াছে। বিলাতে থোরোল্ড্ রোজার্স্ নামক প্রসিদ্ধ ধনবিজ্ঞানবিদের "ইকনমিক্ ইণ্টার্প্রেটেশন্ অব্ হিষ্টরি" এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই ব্যাখ্যা-প্রণালীর পূর্ব্বাপর ইতিহাস এবং সমালোচনা নিউইয়র্কের অধ্যাপক সেলিগ্ম্যানের গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। ফরাসী পণ্ডিত জিদ্ এবং রিষ্ট্ প্রণীত "হিস্তোয়ার্দে দোক্ত্রিন্ জেকোনোমিক্" গ্রন্থের শেষ অঙ্কে এইসকল চিন্তা-প্রণালীর পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থের ইংরেজ সংস্করণ সুপরিচিত।

প্রাচীন ইতিহাসের ব্যাখ্যায় মানব-সভ্যতায় ভাত-কাপড়ের প্রভাব বিশ্লেষণ করিয়া মার্ক্স্-এঙ্গেল্স্ বর্ত্তমান জগৎকে "আত্মিক ব্যাখ্যা," আধ্যাত্মিকামি এবং অতীন্দ্রিয়ামির কবল হইতে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন। বর্ত্তমান জগতের মাথাও অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে।

(১৫)

"সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়!"—এই গুঁতোর চরম গুঁতো হইতেছেন ভাতকাপড়ের টান, "অন্নচিন্তা চমৎকারা"। একথা আজকালকার দিনে কোনো ভারতবাসীকে এমন কি ফর্সা-কাপড়জামা-পরা পরীক্ষায় পাশকরা মস্তিষ্কজীবী "ভদ্রলোক"দিগকেও—চোখে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইবার দরকার নাই। ইয়োরামেরিকার কোনো নরনারীই এই বিষয়ে অন্ধ নয়। সভ্যতার "আর্থিক ব্যাখ্যা" বিংশ শতাব্দীর এক প্রথম স্বতঃসিদ্ধ। বলা বাহুল্য, দুনিয়ার "হাভাতে" "হাঘরে" দরিদ্র নির্য্যাতিত প্যারিয়াদের পক্ষে ইহাই একমাত্র বেদান্ত।

যাহারা চাষ-আবাদে জীবন ধারণ করে, তাহাদের "স্বধর্ম্ম" অর্থাৎ রীতিনীতি লেনদেন শাসন-শোষণ—এক-প্রকার। আবার যাহারা জানোয়ার চরাইয়া সভ্যতা গড়িয়া তুলে তাহাদের ধরণ-ধারণ "আত্মিক" জীবনও আর একপ্রকার!

সেইরূপ যাহারা রোজ আনে রোজ খায় তাহারা বিশ্ব-শক্তিকে এক চোখে দেখে। আবার যাহারা যে জিনিষ তৈয়ারী করে সেই জিনিষ খায় না, সেইগুলার বদলে বাজার হইতে আর-একপ্রকার জিনিষ "কিনিয়া" আনিয়া খায়, আবার কিছু-কিছু জমাইয়াও রাখে তাহাদের নিত্য-কর্ম্ম-পদ্ধতি, তাহাদের দর্শন, তাহাদের জীবন-সমালোচনা, তাহাদের বিশ্বদৃষ্টি (হ্বেল্টান্‌শাউঙ) অন্যবিধ।

আবার চাষ-আবাদের ফলে বা আওতায় যে বিবাহ-পদ্ধতি, যে শিল্পকলা, যে ভগবদ্ভক্তি দেখা দেয় অন্য কোনো-প্রকার ধনসৃষ্টির ফলে বা আওতায় ঠিক সেইরূপভাবে এইসব না গজাইতেও পারে। শিল্পকর্ম্ম হাতের জোরে চলিলে একধরণের পারিবারিক ও সামাজিক নীতিশাস্ত্র গড়িয়া উঠে। কিন্তু সেই শিল্পই যন্ত্রের দ্বারা চালিত হইলে দর্শন, সাহিত্য, সুকুমার শিল্প, ব্যক্তির সঙ্গে পরিবারের সম্বন্ধ, রাজার সঙ্গে প্রজার সম্বন্ধ, সবই নবরূপে দেখা দেয়। পল্লীস্বরাজ নামক সমাজ-শাসন বা রাষ্ট্র-শাসন যে-ধরণের কৃষিশিল্প বাণিজ্যের প্রতিমূর্ত্তি নগর-কেন্দ্র ঠিক সেইরূপ আর্থিক ব্যবস্থার সন্তান নয়; ইত্যাদি ইত্যাদি।

(১৬)

এইসকল বিভিন্নতা ও পার্থক্যের ভিতর জগতে উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব্ব-পশ্চিম কোন ভেদ নাই। সাদা চামড়া, লাল চামড়া, কাল চামড়া, হল্‌দে চামড়ার প্রভেদও নাই। ধনোৎপাদনের প্রণালী দুনিয়ার যত জায়গায় এবং যত যুগে একপ্রকার, ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদি মানব-সভ্যতার অভিব্যক্তিগুলা তত জায়গায় এবং তত যুগে একজাতীয় সমশ্রেণীভুক্ত প্রতিষ্ঠান।

বাষ্প-চালিত শিল্প-বাণিজ্যের যুগারম্ভ পর্য্যন্ত কি এশিয়া, কি ইয়োরামেরিকা সকল ভূখণ্ডের মানবজাতিই এক "আদর্শে" চলিয়াছে। ইয়োরামেরিকা বর্ত্তমান জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে হাতের জোরে এবং মাথার জোরে। এই সৃষ্টিকার্য্যে এশিয়া এক কাঁচ্চাও সাহায্য করিতে পারে নাই। এই যুগে এশিয়াবাসীর মগজ পচিয়া গিয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান জগৎ সৃষ্ট হইবামাত্র ইয়োরামেরিকা প্রায় ষোল আনাই বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। এই জন্যই এশিয়ার নরনারী ইয়োরামেরিকান্‌দিগকে কোনো মতেই চিনিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

তবে ইয়োরামেরিকার আবিষ্কৃত বর্ত্তমান জগৎটা এশিয়ায়ও আসিয়া হাজির হইয়াছে। চীন, জাপান, ভারত, পারস্য, মিশর, তুরস্ক ইত্যাদি দেশের যেখানে যতখানি এই বর্ত্তমান জগতের প্রভাব দেখা যায় সেইখানে ততখানি এশিয়ান্ নরনারী ইয়োরামেরিকান্‌দের "মাস্‌তুত ভাইয়ের" মতনই চলা-ফেরা করিয়া থাকে। ষ্টীম এঞ্জিন্ হইতে বোলশেভিজম্ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান জগতের সকল "সমস্তাই" আজ খাঁটি প্রাচ্য স্বদেশী মাল।

(১৭)

মার্কস্ এঙ্গেল্‌স্ প্রচারিত স্বতঃসিদ্ধগুলা অন্যান্য বিজ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধসমূহেরই অনুরূপ। প্রত্যেক স্বতঃ-সিদ্ধেরই সীমানা আছে। আজকালকার বিজ্ঞান-জগতে আইন্‌ষ্টাইনের "রেলেটিহ্বিটি" বা আপেক্ষিকতা দিগ্‌বিজয় লাভ করিয়াছে, আইন্‌ষ্টাইনের তত্ত্বটা যদিও বুঝি না তাঁহাব বোল্‌টা ব্যবহার করিতে ভয় পাইতেছি না। এই পারিভাষিক হিসাবে বলিতে চাই যে, আর্থিক ব্যাখ্যা-প্রণালীর স্বতঃসিদ্ধগুলা "রেলেটিহ্ব্" অর্থাৎ আপেক্ষিক।

মার্কস্-এঙ্গেল্‌সের কট্টর সেবকেরা অবশ্য এইসকল সূত্রের আপেক্ষিকতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন। ইঁহারা একবগ্‌গা লোক, অদ্বৈতবাদী মোনিষ্টিক্। কিন্তু বর্ত্তমান লেখক মানবজীবনকে কোনো এক খুঁটার খাড়াভাবে দেখিতে বুঝিতে বা ব্যাখ্যা করিতে অপারগ। এক সঙ্গে বহু শক্তি জীবনকে পুষ্ট করিতেছে। এই বহুত্বের ভিতর আর্থিক মেরুদণ্ড, শারীরিক কাঠাম, শরীরের শক্তিযোগ, রক্তমাংসের স্বধর্ম্ম, সংগ্রামধর্ম্মের স্বাস্থ্যভিত্তি, "দেহাত্মক-বুদ্ধির" বস্তুতন্ত্র ইত্যাদি সম্পর্কিত শক্তিগুলার ইজ্জদ্ খুব বড়। জগতের পণ্ডিতেরা ভৌতিক ধর্ম্মের ইজ্জদ্

সহজে দিতে রাজি নন। সেইসকল অধ্যাত্মনিষ্ঠ একবগ্‌গা পণ্ডিতের একদেশদর্শিতা ধ্বংস করিবার জন্য সভ্যতার আর্থিক ব্যাখ্যার এমন কি সময় সময় একবগ্‌গা আর্থিক ব্যাখ্যারও প্রয়োজন আছে। "যেমন কুকুর, তেমন মুগুর।"

এই প্রয়োজনটা ভারতে যতই বুঝা যাইতে থাকিবে ততই সুকুমার শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, রাষ্ট্র, পরিবার, সামাজিক ব্যবস্থা ইত্যাদি জীবনকেন্দ্রগুলা বুঝিবার পক্ষে যুবক ভারত দিন দিন উন্নতি লাভ করিবে। অধিকন্তু ভবিষ্য ভারতকে কোন্ পথে চালাইলে কত চালে কিস্তী-মাৎ হইবে তাহার অনেক সঙ্কেতই এই আর্থিক-ব্যাখ্যা-সমন্বিত ইতিহাস-বিজ্ঞানের আলোচনায় পরিষ্কার হইয়া আসিবে। এই ব্যাখ্যাই যুবক ভারতে যুগান্তরের দ্বিতীয় স্তর গঠন করিবে। ভারতীয় "যৌবন-পূজা"র আন্দোলনে অতীত-নিষ্ঠা এবং ভবিষ্য-বাদ দুইই নবরূপে দেখা দিবে।

এইসকল বিষয় "বর্ত্তমান জগৎ" গ্রন্থের নানাখণ্ডে ঠারে ঠোরে উত্থাপন করিয়াছি। সুবিস্তৃত গ্রন্থ লিখিবার সুযোগ ও সময় জুটে নাই। কিন্তু এঙ্গেল্‌সের গ্রন্থে বাঙ্গালী পাঠক নবীন ইতিহাস-বিজ্ঞানের রস এক খাঁটি ফোয়ারার স্রোতেই—বস্তুতঃ স্বয়ং ভগীরথের তত্ত্বাবধানেই—চাখিয়া দেখিবার সুযোগ পাইবেন। যাঁহারা ইংরেজি জানেন না বা কম জানেন তাঁহাদের কাজে আসিলেই এই অনুবাদ গ্রন্থ সার্থক হইবে। *

শ্রী বিনয়কুমার সরব

* "পরিবার গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র" নামক অনুবাদ-গ্রন্থের ভূমিকা।

বাদল-সাঁঝে

গুরু গুরু ডাকে মেঘ, আকুলিত হিয়া,
কোথা যেন যেতে চাই সব পাশরিয়া।
যারে আমি দেখি নাই তারে যেন পেতে চাই—
যুগে যুগে ছিল যেন সেই মোর প্রিয়া;
গুরু গুরু ডাকে মেঘ, আকুলিত হিয়া।

জল ঝরে ঝর ঝর আজ পড়ে মনে,
কত খেলা কত হাসি বসে' গৃহ-কোণে।
ক্ষণে ক্ষণে মেঘ-ডাকা, মার কোলে শুয়ে থাকা,
ছিল যেন ধূলি-ঢাকা সেই ব্যথা প্রাণে;
জল ঝরে ঝর ঝর আজ পড়ে মনে।

বারি-ধারা ধুয়ে দেয় ধরণীর ধূলি,
কোন্ বারি ধুয়ে দেবে মোর ব্যথাগুলি!
জানি দিন যাবে চলে' কত হাসি আঁখি-জলে,
স্মৃতি এর যায় না যে কেমনে তা' ভুলি;
কোন্ বারি ধুয়ে দেবে মোর ব্যথাগুলি।

এজগতে কেহ নাই, নাই নাই আশা,
প্রাণ-ভরা তৃষা আছে—নাই ভালবাসা।
বসে' আছি দিন যায় উদাসীন নিরাশায়,
বারি-ধারা বলে' যায় বুঝি তার ভাষা;
এ জগতে কেহ নাই, নাই নাই আশা।

কিছু আমি নাহি চাই—শুধু যাব দিয়া।
সঁপি' সব দিয়ে যাব প্রাণ পাশরিয়া।
যারে আমি দেখি নাই তারে শুধু পেতে চাই,
নানা ভাবে ডাকে মোরে সেই মোর প্রিয়া;
গুরু গুরু ডাকে মেঘ, আকুলিত হিয়া।

শ্রী প্রেমকুমার চক্রবর্ত্তী

ভবিষ্যৎ বাংলা ব্যাকরণের অঙ্গ পোষণার্থে পাথেয় সংগ্রহ

নেপথ্যে

শিরোনামটা প্রলয় ডাগর, দেখিলে লাগে ডর।
"গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল" হ'লে, মানায় মনোহর।

উপক্রমণিকা

ইংবং উভয় ভাষায় সুপটু যাঁর লেখনী,
হেন কোনো বিদ্যাভূষণ পণ্ডিত-চূড়ামণি,
সুন্দর ব্যাকরণ একটি রচিয়া নিভু‍র্ল,
দৃঢ় যদি করিতে চান, ভাষার ভিত্তিমূল,
নিম্নের নৈবেদ্য ডালি, লোচন গোচরে তাঁর
স'পিয়া দিয়া বিনয়ে নমি' হইনু বীতভার॥

(১)

নূতন আ এ ও

(ক) আই-আউ-আহে-আহা মরি, হয় যবে আকার,
(খ) আই-ইহা ইআ, এতিন মরিয়া, এ হয় যবে আর,
(গ) ঐ-ঔ অরি, উহা উআ মরি, ওকার হয় তথৈব,
যাঁদের শিখা লম্বা, হতভম্বা, হ'ন দেখে! কী দুদৈ‍র্ব!

(ক) এর নমুনা।

খা'ব=খাইব। যা'ন=যাউন। চা'ন=চাহেন বা চাউন। তা'কে=তাহাকে।

(খ) এ'র নমুনা।

এ'ল=আইল। এ'তে=ইহাতে। বোসে'=বসিআ। এসে'=আসিআ।

(গ) এর নমুনা।

হো'ল=হৈল। বো'স=বৈস। বো'এদের-বৌ'এদের। পো'ল আর মো'ল=পড়িল আর মরিল। ও'র=উহার। প'ড়ে=পড়্আ।

(২)

ক্রিয়াত্মক পদের

অঙ্গপূরণ।

অসমাপিকা ক্রিয়া কা'কে বলে, জানে তা' সরববাদী;
ক্রিয়া ভাঙা বিশেষ্য আর, করা, হওয়া, ইত্যাদি:—
ক্রিয়াত্মক বলিতে দুইই বুঝায়, ইহা বলা বাহুল্য।
নমুনা দেখিলে বেরো'বে ফুটি, এ মোর বচনের মূল্য॥

অতএব দেখ:—

(২/০)

অসমাপিকা ক্রিয়ার অঙ্গপূরণ।

অসমাপিকা ক্রিয়া	খণ্ডাঙ্গ	পূর্ণাঙ্গ
বলিয়া	দিল	বলিয়া দিল
চলিয়া	গেল	চলিয়া গেল
খাইয়া	ফ্যাল	খাইয়া ফ্যাল
হইয়া	গেল	হইয়া গেল
চাহিয়া	ত্যাখ	চাহিয়া দ্যাখ
খাটিয়া	মরিতেছে	খাটিয়া মরিতেছে
বসিয়া	খাইতেছে	বসিয়া খাইতেছে
গলিয়া	পড়িল	গলিয়া পড়িল
গড়িয়া	দাঁড় করাইল	গড়িয়া দাঁড় করাইল
ঘটিয়া	দাঁড়াইল	ঘটিয়া দাঁড়াইল
ঘটিয়া	উঠিল	ঘটিয়া উঠিল
যাচিয়া	মান	যাচিয়া মান
কাঁদিয়া	সোহাগ	কাঁদিয়া সোহাগ
করিতে	হইবে	করিতে হইবে
করিতে	লাগিল	করিতে লাগিল
করিতে	থাকিল	করিতে থাকিল
করিতে	নাই	করিতে নাই
হইতে	চলিল	হইতে চলিল

ইত্যাদি।

(২/০)

ক্রিয়া ভাঙা বিশেষ্যের

অঙ্গপূরণ

ক্রিয়াভাঙা	খণ্ডাঙ্গ	পূর্ণাঙ্গ
মারা	চা'ল	মারা চা'ল
মারা	গেল	মারা গেল
যাওয়া	যা'ক	যাওয়া যা'ক
ধরা	পড়িল	ধরা পড়িল
দ্যাখা	দিল	দ্যাখা দিল
বলা	সহজ	বলা সহজ
করা	কঠিন	করা কঠিন

ইত্যাদি

উপসংহার।

বাঙালী ভায়াদের, যদিও এতে, নাহি কোনো দরকার,
শিক্ষার্থী জনঋষভের দরশিবে উপকার॥
রামায়ণ মহাভারতে পষ্ট দেখিবারে পাই,—
নরপতি ছাড়া নরর্ষভের দ্বিতীয় অরথ নাই।
নরর্ষভ যেমন, নর-ঋষভ, সন্ধি ভাঙ্গিলে হয়,
জনর্ষভ তেম্নি, জন (John)-ঋষভ, নাহি তাহে সংশয়।
এদেশের যত নরর্ষভ, অর্থাৎ রাজারাজড়া,
আর্যভে তাঁদের, জনর্ষভেরা বিধিমতে স্থান বাগড়া॥

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(শান্তিনিকেতন পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১)

ময়ূরভঞ্জ

ময়ূরভঞ্জ উড়িষ্যার করদরাজ্যের মধ্যে একটা প্রধান রাজ্য। এটি উড়িষ্যার মধ্যে হ'লেও এখানে বাঙালীর প্রভাব কম নয়। কিছুদিন আগে এখানকার দেওয়ান ছিলেন শ্রী মোহিনীমোহন ধর, এবং এখানকার বার্ষিক রিপোর্টও বাংলায় লেখা হ'ত। এখনও বাঙালী-কর্ম্মচারীর সংখ্যা কম নয়। বর্ত্তমান রাজধানী বারিপাদাতে বড় জগন্নাথের মন্দির একটি দর্শনীয় জিনিষ। এটির বিশেষত্ব এই যে এটি পুরীর জগন্নাথের মন্দিরের অনুকরণে নির্ম্মিত ও এখানে বৈষ্ণব-মূর্ত্তি ছাড়া জৈন ও বৌদ্ধমূর্ত্তিও আছে। এখানকার নাট-মন্দিরের প্রাচীরের গায়ে উড়িয়া চিত্রকররা নানা-রকম ছবি এঁকে' রেখেছে। তার মধ্যে একটি ছবির বিষয়—দশ অবতার,—আর-সব অবতারের ছবি ঠিক আছে, কেবল নবম অবতার বুদ্ধদেবের স্থানে জগন্নাথ, বলরাম আর সুভদ্রা আঁকা রয়েছে। আমি এটা দেখে' একটু বিস্মিত হয়েছিলুম, জিজ্ঞাসা করলুম, এর মানে কি? সেখানকার পূজারী বল্লে—জগন্নাথই বুদ্ধদেব কিনা, তাই ওখানে জগন্নাথ আঁকা রয়েছে। পথে করনজিয়া বলে' একটি সহরে (রাজধানী থেকে ৭২ মাইল দূরে) আমরা একটি বৌদ্ধ-তারা মূর্ত্তি দেখেছিলাম। লোকে সেটাকে "বাগুলী" বলে' পূজা করে। এখান থেকে আর-একটি মঞ্জুশ্রী মূর্ত্তি রাজধানীতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেটি এখন বারিপাদা লাইব্রেরীতে আছে। সেখান থেকে আমরা খিচিং বলে' এক গ্রামে আসি। এটিই হ'ল আমাদের কার্য্যক্ষেত্র। রাজধানী থেকে এটি ১০০ মাইল দূরে, এর খুব কাছের রেলওয়ে ষ্টেশন ৫০ মাইল দূরে, পোষ্ট আফিসও ১০ মাইল দূরে। এমন জায়গায় আমাদের তাঁবু পড়েছিল। ময়ূরভঞ্জের মহারাজা শ্রীযুক্ত চন্দ মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করে' এনেছেন এখানকার প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ খনন কার্য্যের জন্য। এ-গ্রামের চারিদিক্ ঘুরে' আমরা বুঝ্‌লাম যে এককালে এটি একটি সমৃদ্ধ সহর ছিল। এইটিই ময়ূরভঞ্জের প্রাচীন ভঞ্জরাজগণের রাজধানী ছিল। তাম্রশাসনে এর নাম—খিজ্জিংকোট্ট। এর উত্তরে ভণ্ডণ নদী, দক্ষিণে কণ্টাখয়ের নদী, আর পশ্চিমে বৈতরণী। এর নানাদিকে নানামন্দির ও গড়ের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। আমরা সেখানে পৌঁছে' চারিদিক্ প্রদক্ষিণ করতে বেরলাম। এখানকার প্রধান মন্দির হচ্ছে—ঠাকুরাণীর মন্দির, যার ধ্বংসাবশেষ আমাদের খনন করতে হবে। এরই কিছু দক্ষিণে "চাউল কুণ্ডি"; সেটিকে লোকে ভীমের বাড়ী বলে। সেখানে খুব সুন্দর কারুকার্য্য-করা স্তম্ভ এখনও পড়ে' রয়েছে। সেখানে সম্ভবতঃ একটি মন্দির ছিল। তার কিছু পশ্চিমে কীচকরাজার গড় আছে। এখন সেটি জঙ্গলে পূর্ণ, তবে সেখানে যে ২।৩টি মন্দির ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সেখান থেকে প্রায় এক মাইল দূরে কণ্টাখয়ের নদীর তীরে "শখুয়া রাজার মন্দির" ছিল। যখন শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ময়ূরভঞ্জে প্রত্নতত্ত্বের অন্বেষণে যান, তখন ময়ূরভঞ্জের রাজকর্ম্মচারী শ্রী কামাখ্যাপ্রসাদ বসু এই স্থানটি খুঁড়েছিলেন। এখানে একটি পাথরের দুই পাশে দুইটি শঙ্খ খোদাই করা আছে। সেইজন্যই লোকেরা এটিকে "শখুয়া রাজার মন্দির" বলে। কামাখ্যা-বাবু আর-একটি যে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ নিতান্ত অবৈজ্ঞানিকভাবে খোঁড়েন, সেখান থেকে একটি বড় ও একটি ছোট হরগৌরীর মূর্ত্তি পান। এখানে যে বৌদ্ধ মন্দিরটি ছিল তার নাম হচ্ছে "ইটামুণ্ডি," কারণ এটি ইঁট দিয়ে তৈরী। সেখান থেকে একটি বড় বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়েছিল। সে মূর্ত্তিটি ৬৬ ইঞ্চি উঁচু। কামাখ্যা-বাবুর খননের দোষে এই বৌদ্ধ মন্দিরের যে ভিত্তিটুকুও অবশিষ্ট ছিল, তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আর-একটি উল্লেখযোগ্য ধ্বংসাবশেষ হচ্ছে—"করমরাজার দেউল," সেখান থেকেই নাকি অবলোকিতেশ্বরের একটি ভগ্নমূর্ত্তি পাওয়া যায়। এই থেকে বোধ হয় যে এটি রাজভঞ্জ রাজা দ্বারা স্থাপিত হয়েছিল। এ ছাড়া ছোট ছোট মন্দির অনেক আছে। এ থেকে মনে হয় এককালে এটি একটি খুব সমৃদ্ধিশালী সহর ছিল।

এখানকার প্রধান মন্দির হচ্ছে কীচকেশ্বরীর বা কীঙ্কেশ্বরীর মন্দির। সেই মন্দিরটি কালক্রমে ভেঙে গিয়ে একটি প্রকাণ্ড স্তূপ হ'য়ে পড়ে' ছিল। সেখানে আরও যে দু তিনটি মন্দির ছিল সে-গুলাও ক্রমশঃ ভগ্ন হ'য়ে পড়ে' যায়। আমাদের কাজ ছিল সেই যে প্রকাণ্ড ভগ্নস্তূপ রয়েছে সেইটি খনন করে' দেখা কোন মূর্ত্তি বা স্থাপত্যের নিদর্শন সেখানে মাটির নীচে রয়েছে কি না। প্রথমে গিয়ে দেখি যে সেখানে যে-জঙ্গল হয়েছে তা পরিষ্কার করা দরকার। আমরা প্রথমে জঙ্গল পরিষ্কার করে' কাজ সুরু করলাম। এবিষয়ে ময়ূরভঞ্জের মহারাজা লোকজনের সব আয়োজন করে' দিলেন। তবে এখানে বাধা-বিপত্তি অনেক ছিল, সে-সব আমাদের অতিক্রম করতে হয়েছে; যে-সব লোক কাজের জন্য এসেছিল তাদের চালান বড় শক্ত কথা। তারা সব কাছেরই গ্রামের লোক। তাদের মধ্যে কোল, সাঁওতাল, ভুইয়া, বাথুড়ী, গণ্ড, সাঁউতি, পুরাণ, পান, মহান্ত আর গৌর বেশী। এরা একদিকে খুব সরল আর আমুদে আবার অন্যদিকে বড়ই স্বাধীনতা-প্রিয়। তাদের সঙ্গে সেইজন্যে খুব সাবধানে কাজ করতে হ'ত। আরও সেই প্রকাণ্ড ভগ্নস্তূপের মধ্যে অনেক বড় বড় পাথর ছিল, সেইসব পাথরে কোনটায় নানারকম নক্সা, কোনটায় মূর্ত্তি খোদা ছিল। যে-সব কুলি এল তারা আবার এসব কাজে দক্ষ নয়। তারা খুব সহজে বড় বড় শাল গাছ, আমগাছ কাটতে পারে, কিন্তু মাটির ভেতর থেকে পাথর খুঁড়ে' ঠিকভাবে বের করান তাদের দ্বারা হয় না। সেইজন্যে প্রথমে তাদের শেখাতে হ'ল কিভাবে তারা কাজ করবে। তার পর, সেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর সরানও এক দায়। রত্নবেদীর প্রকাণ্ড পাথর বা মন্দিরের দেওয়ালের পাথর খুব সাবধানে টুলি করে' সরাতে হল। কয়দিন খোঁড়াবার পরই আমরা বুঝ্‌তে পার্‌লাম যে প্রাচীন মূল মন্দিরের কারুকার্য্য কিরকম উচ্চধরণের ছিল। এই খনন-কাজে আমরা অনেক মূর্ত্তি, কোনটি ভাঙা অবস্থায়, কোনটি বা ঠিক অবস্থায় পেলাম। সেইসব মূর্ত্তির বিস্তৃত বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। সেই বিস্তৃত বিবরণ দেবেন শ্রীযুক্ত চন্দ-মহাশয় তাঁর সরকারী রিপোর্টে। বর্ত্তমানে তিনি Monuments of Mayurbhanja বলে' একখানি বই রচনায় ব্যস্ত আছেন। সেই বইখানি প্রকাশিত হ'লে আমরা তাতে ভারতীয় শিল্পের এক নতুন অধ্যায়ের পরিচয় পাব। বর্ত্তমানে এইটুকু বল্‌লেই যথেষ্ট হবে যে এখানকার শিল্পের একটা যে বিশেষত্ব আছে তা ভারতের খুব কম জায়গাতেই দেখতে পাওয়া যায়। এখানকার শিল্পীদের বিশেষত্ব এই যে তারা সমস্ত জিনিষকে স্বাভাবিক করবার চেষ্টা করেছিল। ভারতের অন্য স্থানে যে-সব শিল্পের নিদর্শন পাওয়া গেছে তাতে গুপ্তযুগের শিল্প ছাড়া অন্যতে এতটা পরিমাণে স্বভাবকে অনুকরণ করা হয়নি। স্বভাবকে অনুকরণ করতে পেরেছিল বলে' এই-সব শিল্পীদের কার্য্য এত সুশোভন হয়েছে। আমরা মাটীর মধ্যে থেকে যে-সব মহিষমর্দ্দিনী-মূর্ত্তি, গণেশমূর্ত্তি, শিবমূর্ত্তি, নাগ ও নাগিনী মূর্ত্তি, scroll পেয়েছিলাম, তাতে ময়ূরভঞ্জের শিল্পের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

(শান্তিনিকেতন পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১) শ্রী ফণীন্দ্রনাথ বসু

—

সাহিত্য

আজকার এই সভায় আস্‌বার কিছু পূর্ব্বে—আজ অপরাহ্ণে আমাদের পাড়ার গলিতে একটা বোধ হয় কোন বিবাহ কিংবা কোন উৎসব উপলক্ষে বাঁশী বাজ্‌ছিল, সানাই বাজ্‌ছিল, আমি যখন শুন্‌ছিলাম

খাম্বাজের একটা টান দিয়ে বাঁশী বাজ্‌ছিল, তখন আমার মনে একথাটি উদয় হ'ল যে—আমি যেসব বিষয় নিয়ে তর্ক কর্‌ছি, বোঝাতে চেষ্টা কর্‌ছি, অনেক করে' চেষ্টা করে' নিজের সঙ্গে লড়াই করে' যেন এই যে বল্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি, সে-কথাটি সহজেই বল্‌ছে এই বাঁশী. যদি আমার সাধ্য থাক্‌ত তেমন করে' বল্‌বার, তা হ'লে আমার কথাটি সরল হ'ত।

এই যে উৎসব উপলক্ষে বাঁশী বাজ্‌ছে খাম্বাজ রাগিণীর ভিতরকার করুণ টানগুলি সমস্ত অপরাহ্ণ আকাশকে একটা বিষাদময় আনন্দে নিমগ্ন করেছে. সেটা কি, তার কাজ কি? কেন. উৎসবে এই বাঁশী এমন করে কি বল্‌ছে, আরো কি কথা বল্‌তে চাচ্ছে?

আমার যেটা মনে হ'ল এই যে ট্রাম যাতায়াত কর্‌ছে, কলিকাতা সহরে যে কেনা বেচা চল্‌ছে, চতুর্দ্দিকে প্রত্যহের যেসমস্ত ধূলিজাল উঠ্‌ছে, জীবনযাত্রার জন্য প্রত্যেকে যে আনাগোনা কর্‌ছে সমস্ত গলিতে রাস্তা দিয়ে বাঁশী এইসব চাপা দিতে চাচ্ছে, এই যে বাজনা বাজ্‌ছে, বাঁশী সমস্তটাকে আচ্ছন্ন করে' দিতে চায়। যেন ট্রাম চল্‌ছে না, যেন সমস্ত কেনাবেচা হচ্ছে না, যেন এর প্রয়োজন নেই, এসমস্ত ছায়া, একথা সুন্দরভাবে বল্‌ছে ঐ রাগিণী। আমি বল্‌ছি চাপা দিচ্ছে, তা না বলে' বলা উচিত ছিল কি? না এই যে পর্দ্দা, এই পর্দ্দা তুলে' দিচ্ছে, এই ট্রাম চলাচল এই প্রতিদিনের তুচ্ছতা এই যে অনিত্য চলাচল হচ্ছে এটা একটা পর্দ্দার মতো আচ্ছন্ন করেছে নিত্যকালের স্বরূপকে। এই রাগিণী সে পর্দ্দা তুলে' দিয়েছে এটা বল্‌বার জন্য যে-আজকার দিনে এই উৎসবের যারা প্রধান নায়ক-নায়িকা, বর-বধূ, তাদের সেই লোকে নিয়ে যেতে চায় যে লোক হচ্ছে রসের নিত্যলোক, প্রতিদিনের তুচ্ছতার ভিতর তারা অতি অকিঞ্চিৎকর, অখ্যাতনামা কিন্তু তাদের অন্তরে যদি সুখের বেদনা বেজে থাকে, কোন একটা পরম আশা প্রত্যাশায় তারা যদি পথ চেয়ে থাকে, এ যদি হয় তাদের ভিতর, তবে সে রসের উপলব্ধিতে তারা এমন একটা স্থানে অধিকার পায় যেখানে নিত্যকালের সমস্ত বরবধূরা মিলিত হচ্ছে, মিলিত হবার ইচ্ছা কর্‌ছে কোন্ অনাদিকাল হ'তে কে জানে, যেখানে এই প্রেমের বেদনা, যেখানে এই আনন্দের প্রকাশ নানা উপলক্ষ্য অবলম্বন করে' আন্দোলিত হিল্লোলিত হচ্ছে সে রসের নিত্য লোকে তারা সামান্য নয় অকিঞ্চিৎকর নয়।

তথ্যের সঙ্গে সত্যের প্রভেদ আছে, তথ্য হিসাবে তারা অতি সামান্য, তাদের মূল্য অল্প, আমি জানিনে তারা কে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে একথা বলা যেতে পারে তথ্য-হিসাবে এই বিবাহ প্রভৃতি উৎসবে যারা প্রধান নায়ক-নায়িকা তারা বড় কেহ নয়। ইতিহাসে তাদের কোন নাম থাক্‌বে না এবং আজকার দিনে তাদের আসন অত্যন্ত সংকীর্ণ। কিন্তু বাঁশী বল্‌ছে—ভুলে' যাও। এ মিথ্যা কথা ভুলে যাও—এ মায়া ভুলে যাও যে তুমি কেহ নও। বাইরের বিশ্বের যে বিপুল ব্যাপার এ বড় নয়, আজ আছে কাল না থাক্‌তে পারে, এসমস্ত মেঘের মতো ছায়ার মতো চলে' যেতে পারে, কিন্তু বেদনা-সরোবরে যে চিত্ত-কমল বিকশিত হয়েছে সে রসের অসীম সমুদ্র সেই অকাল সমুদ্র চিরন্তনের বাণীতে মুখরিত হচ্ছে, সেই সমুদ্রের মধ্যে যে-সব হৃৎপদ্ম ফুটছে তার পিছনে সত্যের সূর্য্যালোক আপনার আশীর্ব্বাদ বর্ষণ কর্‌ছে, এমন কেহ বরবধূ নেই পৃথিবীতে যার আসন অতীত কালের প্রেমিক-প্রেমিকার চেয়ে অল্প। জানি তথ্যের কারাগার থেকে, সংকীর্ণতা থেকে, মানুষ যেমন রসের অসীমতার ভিতর প্রবেশ করে, অম্‌নি তার মূল্যের কত বড় পরিবর্ত্তন হ'য়ে যায়, তা কি আমরা দেখিনে? কত নাটক রচনা হয়েছে, সাহিত্যে, কাব্যে তাদের নায়ক-নায়িকাদের যে মূল্য সে মূল্য কিসের? তারা কি ধনী বলে' মূল্যবান্? তারা কি মানী বলে' মূল্যবান্? তারা কি রাষ্ট্রীয়-সংগ্রামে অসাধ্য সাধন করেছে বলে' মূল্যবান্? রোমিও ও জুলিয়েটে এইসমস্ত নায়ক-নায়িকাদের ইতিহাস রচনা হয়েছে, এর ভিতরকার মূল্য কোন্‌খানে? তার তথ্যের কোন মূল্যই নেই। এ-কথা কোন পাঠক জিজ্ঞাসা করবেন না—তার হিসাবের খাতায় তার দেনা-পাওনা কিরকম, তার Bankএ কতদিনের জমা আছে, Credit আছে, তার অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি আছে কি নেই, একথা কেহ জিজ্ঞাসা করে না। একমুহূর্ত্তে তাকে রস-সমুদ্রের অনির্ব্বচনীয় মহিমায় দেখ্‌তে পাই। সমস্ত সাহিত্যের ভিতর, শিল্পকলার ভিতর, সমস্ত প্রকাশের ভিতর আমরা যা দেখ্‌তে পাচ্ছি তাকে কি দেখ্‌ছি? তাকে বন্ধন-মুক্ত করে' দেখ্‌ছি, তথ্যের বন্ধন থেকে তাকে মুক্ত করে' তার ভিতরকার যে অসীম মূল্য, রসের মূল্য এক মুহূর্ত্তে প্রকাশিত হচ্ছে সেটা দেখ্‌বার জন্য কবির ও অন্য গুণীদের প্রয়োজন, সেইজন্য কেবলমাত্র মানুষের দিক্ থেকে নয়, এই প্রকৃতির মধ্যে যে-সমস্ত জিনিষ নানা-রকমে প্রকাশিত হয় তাকে প্রাত্যহিক ব্যাপারের মধ্য দিয়ে নিজের প্রয়োজনের সংকীর্ণ সীমার মধ্য দিয়ে যখন দেখি, তখন তার এক মূল্য, যখন তাকে কাব্যের ভিতর দিয়ে চিত্তের ভিতর দিয়ে দেখি, সম্পূর্ণ অন্য মূল্য দেখ্‌তে পাই। কলিকাতাতে আমার এককাঠা জমির কত দাম জানি নে, কোথাও ৪।৫।১০ হাজার হ'তে পারে। সে দাম একেবারে তুচ্ছ, যেম্‌নি রসলোকে আমরা প্রবেশ করি, যেম্‌নি সেখানকার মূল্যের আদর্শ মনের ভিতর নিই; অম্‌নি অন্য যে মূল্য, বৈষয়িক মূল্য, তথ্যগত মূল্য তা দূর হ'য়ে যায়। এ কি বন্ধন-মুক্তি নয়? এ বন্ধনের মধ্যে মানুষ কি বদ্ধ হয় না? এই তথ্য-কারাগারের বিষম দৌরাত্ম্যের মধ্যে মানুষ কি পীড়িত হয় না? এই তথ্য-কারাগার থেকে মুক্তি দেবার জন্য মানুষ আপনাকে আপনি স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য মাঝে মাঝে গান গেয়েছে, চিত্র এঁকেছে, বলেছে—ঐ রসের লোক আনন্দের লোক, তুমিই সে আনন্দের প্রকাশ। এই উৎসবের বাঁশী বলেছে পৃথিবীতে গুণী মানী অনেক আছে। জগতের ভিতর যাদের জন্য বাঁশী বাজ্‌ছে রসমাধুর্য্যে আজকার দিনে তারা কারো চেয়ে কম নয়। আজকার দিনে এক হিসাবে বল্‌তে হবে যে তাদের চিত্ত-কমলে রসের আলোক যদি বিকশিত হ'য়ে থাকে তবে তারা অনেক অরসিক ধনী, মানী, গুণী জ্ঞানীর চেয়ে বড় সত্যকে পেয়েছে একথা তাদের বুঝিয়ে দেবার জন্যে সেই অসীম রসের মূল্য দেবার জন্য বাঁশী বাজ্‌ছে।

আমি কি বোঝাব আপনাদের? কাকে বলে সাহিত্য, কাকে বলে চিত্রকলা, এসকল বিশ্লেষণ করে' করে' কি বোঝাব? এক মুহূর্ত্তে বোঝা যায়, যেমন এক মুহূর্ত্তে আলো জ্বল্‌বামাত্র অন্ধকার সরে' যায় তেম্‌নি করে' বোঝা যায়। ক্রমাগত ধ্বনিত হচ্ছে এই বাণী। আকাশের নীলিমা থেকে, ধরণীর নীল শ্যামলিকা থেকে, মানুষের অন্তরে যে-রসের বেদনা আছে তার থেকে এই বাণী নিয়ত আমাদের আঘাত কর্‌ছে, বল্‌ছে—এই আনন্দধামের মাঝখানে তোমাদের প্রত্যেকের নিমন্ত্রণ আছে এস, বড় যজ্ঞের ভিতরে প্রত্যেকের নিমন্ত্রণ আছে এস। একথা বল্‌ছে চিরদিনের বিরহের মরমিয়া কবি। সকাল বেলা প্রভাত-কিরণের দূত এসে ধাক্কা দিলে—কি? না, নিমন্ত্রণ আছে; দুপুর বেলা সে দূত এসে ধাক্কা দিলে, নিমন্ত্রণ আছে; সন্ধ্যার রক্তিম ছটায় আশা ও উৎসাহ নিয়ে সে দূত আবার বল্‌লে—নিমন্ত্রণ আছে, কোথায় তোমার নিমন্ত্রণ-লিপি? আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত তারা উজ্জ্বল অক্ষরে জেগে উঠে' সে লিপি নিয়ে এল। যজ্ঞের অধীশ্বর সে দূতলিপি নিয়ে এসে বল্‌লে—তোমার নিমন্ত্রণ। এই দূত প্রতিদিনের সকাল-বেলার অরুণালোকের ভিতর সন্ধ্যাবেলার সূর্য্যাস্তের ছটায় এই বাণী প্রচার কর্‌ছে—অসীম তুমি, তোমাকে ডাক্‌ছি, এত সাজ-সজ্জা এই দূতের, তার তক্‌মা জ্বল্‌জ্বল্ কর্‌ছে, এত ফুলের মালা পরে' এসেছে, এত গৌরবের মুকুট তার মাথায়, কার জন্য? আমার জন্য, আমি রাজা নই, জ্ঞানী-গুণী নই, আমি কেহ নই, আমার জন্য সমস্ত আকাশের রং নীল করে' সমস্ত বসুধার অঞ্চল শ্যামল করে' সমস্ত নক্ষত্রের জ্যোতি স্নিগ্ধ করে' সে বাণী মুখরিত হচ্ছে। সে বাণীর সে নিমন্ত্রণের উত্তর লিখ্‌তে

হবে না? মানুষ তার উত্তর দিচ্ছে, সুন্দর করে' ব'ল্‌ছে,—আমার তার বাজ্‌ল, আমার হৃদয়ের বাণীতে তোমার নিমন্ত্রণ ধ্বনিত হ'ল, সুন্দররূপে হ'ল, আমার চিত্তে আমার প্রকৃতিতে আমার নানা কর্ম্মে, হে চিরসুন্দর, তোমার নিমন্ত্রণকে আমি স্বীকার করলাম, হে আমার পরম, তোমার নিমন্ত্রণ স্বীকার করলাম। আমিও তেমন সুন্দর করে' তোমায় চিঠি পাঠিয়েছি যেমন সুন্দর করে' তুমি পাঠালে। যেমন তুমি তোমার অনির্ব্বাণ তারকার প্রদীপ জেলে তোমার দূতের হাত দিয়ে নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছ; আমাকেও তেম্‌নি করে' আলো জ্বাল্‌তে হবে, যে আলো নিব্‌বে না, মালা গাঁথ্‌তে হবে যে মালা শুকোবে না। আমি মানুষ আমার ভিতর যদি অন্তরের শক্তি থাকে, আমার সে ঐশ্বর্য্য দিয়ে, এই সুন্দর জগতে যে আমন্ত্রণ পাঠিয়েছ সে আমন্ত্রণের প্রত্যুত্তর দেব। মানুষ একথা বল্‌ছে, এই বলার ভিতর সে আপনার গৌরবকে প্রকাশ করছে। সেইজন্য যেসমস্ত কবি, শিল্পী, গুণী, জ্ঞানী, হয়েছে তাদের ভিতর দিয়ে মানুষ আপনার নিমন্ত্রণকে স্বীকার করেছে। তাদের খ্যাতি পৃথিবীতে ছেয়ে গেছে। একথাটি যখন আমার মনে হ'ল, আজকার দিনের সানাইয়ের বাজ্‌না যখন শুন্‌লাম, আমি দেখ্‌লাম অনন্তকালের বরবধূরা মিলিত হচ্ছে। এ যখন দেখ্‌তে পেলাম, তখন আমার মনে এই প্রশ্ন উঠ্‌ল যে, কি করে' হ'ল? সুরগুলি এই রূপের যে জগৎ, তথ্যের যে জগৎ—যে জগৎকে বলি তুচ্ছ, এক একবার সরিয়ে দিয়ে বলি মায়া, দোদুল্যমান, কিছু নেই, অথচ কি দিয়ে সে বল্‌লে ধনী আছে, গুণী আছে, মানী আছে, এই একটি-একটি যে সুর সা, রে, গা, মা প্রভৃতি, সেগুলিকে সে বিশেষ আকার দিয়েছে, বিশেষ রূপ দিয়েছে।

এ নয় যে তার কোন রূপ নেই। অসীমকে প্রকাশ করেছে, অরূপকে রূপ দিচ্ছে যে রাগিণীতে, অসীমের আনন্দরস উচ্ছ্বলিত হচ্ছে যে রাগিণীতে, সে রাগিণীর রূপ আছে, আশ্চর্য্য কোন একটা রূপ গ্রহণ করেছে, সে খাম্বাজ কোনপ্রকার সুর কোন একটা গদ্ কোন একটা রমণীর সম্পূর্ণ রূপ গ্রহণ করেছে, যে রূপকে অসীম বল্‌তে পারিনে, রূপ কখনও অসীম হ'তে পারে না। রূপের সীমা আছে; কাব্যের সীমা আছে তা নয়, সে রূপকে যদি বড় করতে চান তা হ'লে তাকে খর্ব্ব করে। আজকে এই যে বাঁশী বাজ্‌ছে, খুব উঁচুদরের বাজ্‌ছে তা নয়, খেলোরকমের একটি সুর আজকালকার আধুনিকরকমের খাম্বাজে আলাপ করছিল, আলাপ নয় গদ্ বাজাচ্ছিল, বারংবার পুনরাবৃত্তি করছিল। হোলির সময় পশ্চিম দেশে দেখা যায় যারা সুরে উন্মত্ত হ'য়ে যায় একটা গদ্ নিয়ে বারংবার পুনরাবৃত্তি করে' তাল বাজিয়ে ঝন ঝন শব্দ করছে। তাতে কি করে? আয়তনে বড় করে, একটা সঙ্গীতের সপ্তক কেটে ২।৩ সপ্তক করে ১ ঘণ্টা ২ ঘণ্টা বিস্তৃত করে' দেয়, তার ভিতর সংযম নেই। সমস্ত কলা-বিদ্যার মধ্যে যে সংযম থাকে সে সংযম নেই, ক্রমাগত বাজিয়ে চল্‌ছে, টানের পর টান, আবৃত্তির পর আবৃত্তি —পুনরাবৃত্তি, তাতে কি করে? রসকে নষ্ট করে। তা হ'লে আয়তনে এই রসের প্রকাশ নয়, বড় করে অসীমকে আমরা প্রকাশ করতে পারিনে, কেবলমাত্র আয়তনের সীমাকে বড় করলে উল্টো হয়, আমরা তাকে নষ্ট করি। অর্থাৎ যখন রূপ নিতান্ত কেবল নিজেকে দেখে তখন অরূপকে আচ্ছন্ন করে, বারংবার যখন একই পদ ফিরে' ফিরে' আসে তখন আমাদের চিত্ত সেই রূপের মধ্যে অন্তর্নিহিত অরূপের বাণী শুন্‌তে পায় না, সে রূপ নিজেকে ঢেকে ঢেকে দিতে থাকে, সে ফিরে' ফিরে' বলে—আমাকে দেখো। আমরা কেন তোমাকে দেখ্‌ব? আমরা ছুটি নিতে এসেছি। যে বাণী সে অত্যাচার থেকে ছুটি দেবে, সে বাণী আমাকে বন্ধন করতে চায়, বাণীর বন্ধন এখানে আমাদিগকে ক্লেশ দেয়। সেইজন্য যখন আমরা সাহিত্যে, কাব্যে, চিত্রে এমন-কিছু দেখি যে আপনার যে technique—সীমা—তাকে একান্ত করে' ঢেকে দিতে চায়, তখন তাকে ক্ষমা করা অসম্ভব হয়। আপনার ক্ষেত্রে অধিক পাওয়া কেবল বাহুল্য, নয় বিপজ্জনক। পেটুক যখন খেতে বসে তার মনের সুখ শেষ হ'লেও খাওয়া শেষ হয় না। এতে অনিষ্ট হ'তে পারে, ডাক্তারের শরণাপন্ন হ'তে হয়, লোকে খুনী হয় সে-রকম মানুষকে খাইয়ে, মেয়েরা তাদের আরো খেতে বলে, শেষ কালে, খেয়ে খেয়ে একদিন আসে, যখন তাদের সেবা করবার ডাক পড়ে। এ খাওয়া বাহুল্য। যা বাহুল্য, অনেক সময় সংসার তা মাপ করে' থাকে; কিন্তু রসের ক্ষেত্রে, কাব্য এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেখানে আমরা দেখি রস ও রূপের বন্ধন থেকে যা আমাদের মুক্তি দেবে সেখানে রূপ যদি লাভ দেখ্‌তে আসে, যদি সে নিজকে বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বড় করে' দেখে তা হ'লে অত্যন্ত সে শাস্তির যোগ্য হয়। যে সরষে ভূত ছাড়াবে তাকে যদি ভূতে পায় তা হ'লে যেমন হয়, এও সে-রকম এ-কথা অনেক লেখক ভুলে' যান। অনেক পাঠক হিসাব করেন, যাত্রা আরম্ভ হ'ল সন্ধ্যা ৫টা থেকে পরের দিন বেলা ১টা পর্য্যন্ত চল্‌ল। তাকে দিয়েছি ৫০০ টাকা, তারা হিসাব করে, এই সময়ে তারা কত উপার্জ্জন করেন, রস-সামগ্রীর আয়তন দ্বারা বিচার হ'তে পারে না। অনেক অনভিজ্ঞ, আনাড়ী ১০ ফর্ম্মার জায়গায় ১৫ ফর্ম্মা পেলে ভারি খুসি হয়। তারা যে কত বোঝা ঘাড়ে করে' নেয় হিসাব করে না। তা হ'লে যারা কলাবিদ্যার রসকে প্রকাশ করছে তাদের একটা মস্ত সমস্যা মেটাতে হয়।

রূপ না হ'লে হয় না, রূপের ভিতর দিয়ে অরূপকে প্রকাশ করতে হয়, তা না হ'লে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হ'ত না, অসীম নিজকে সীমার মধ্যে প্রকাশ করছে, আমাদের ভিতর ভূমা রূপকে অবলম্বন করে' অরূপ রসকে প্রকাশ করে' থাকে, সে রূপকে মান্‌তেই হবে, আবার নাও মান্‌তে হবে, মান্‌তে হবে এই রূপ কিছু নয়, এটাকে সরিয়ে দিয়ে এমন করে' সেই রূপটিকে ধরতে হবে যাতে সে আপনাকে প্রকাশ না করে। আমাদের এই দেহকে দেখ্‌লে টের পাই। আমাদের এই যে হজম হওয়ার [illegible], রক্ত চালনা করে ভিতরে, চিন্তা করবার কল আছে মাথার মধ্যে, ভগবান্ সব কল ঢেকে দিয়েছেন, আমাদের এই যন্ত্রগুলি সমস্ত ঢেকে দিয়েছেন, ঢেকে দিয়ে কি রেখেছেন? এই যে মুখের ভিতর দিয়ে চিবিয়ে খাই এ-কথা মুখ বেশী করে' বলে কি? না, মুখের ভিতর রসের যে রঙ্গভূমি, হাসি-কান্নার যে খেলা ঘর, সে কি আমাদের মুখে নেই? বাহুতে, সত্য বটে, আমরা কাজ করি, কিন্তু যে কাজ করে সে যে ভিতরকার মাংসপেশী। সে মাংসপেশী ফুলিয়ে ফুলিয়ে যারা পালোয়ানি করে' বেড়ায়, তারা কি দেহের যে সঙ্গীত তাকে ঠিক প্রকাশ করছে? এই গানের ভিতর রসের প্রকাশ কতরকম করে' হ'য়ে এল, কত ছন্দে, কত নৃত্যে সেটা দেখ্‌লাম, ভিতরে আশ্চর্য্য কল রয়েছে, স্নায়ুপেশী, অস্থি প্রভৃতি একেবারে সব ঢেকে দিয়েছেন। পা চলে বটে, কিন্তু পা যে কল নিয়ে চলে সে কল ঢাকা পড়েছে; পায়ের চলার মধ্যে যে ছন্দ আছে, Rhyme আছে সেটা প্রকাশ পায়। ভিতরে আশ্চর্য্য সুনিপুণ কল আছে। সৃষ্টিকর্ত্তা বলেন আমি তোমার অস্ত্র প্রশংসা চাইনে। যারা Medical College এ কেটে কেটে দেখে তারা ওস্তাদ বটে, তিনি বলেন—ওস্তাদজীর প্রশংসা আমি চাইনে, আমি ভাল Engineer এটা নাই জান্‌লে বাপু। তবে কি জানবে? আমাকে জান। এই রঙ্গভূমিতে আমার রসলীলা, সে তোমার মুখে, চোখে, বাহুতে, নৃত্যে, কণ্ঠে। আমি সে প্রকাশকে দেখ্‌তে চাই, দেখাতে চাই। সেই আমার সকলের চেয়ে বড় প্রকাশ, আমাদের

সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রায় এখানে দেখ্‌বেন। সর্ব্বত্রই তাই। Geology বলে, একটা পদার্থ আছে, Geological স্তর। বড় বড় পাথরের শিলালিপিতে এর বৈজ্ঞানিক ইতিহাস লেখা আছে—সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত চাপা দিয়েছেন। উপরে যেখানে প্রাণের আনন্দ-নিকেতন, সেখানে শোভা দিয়ে, গান দিয়ে, বৈজ্ঞানিক ইতিহাস ঢাকা পড়েছে; এক সময় ঢাকা ছিল না; সে ভয়ঙ্কর লীলা তখন ছিল। সমস্ত শক্তিতে তখন বিশ্বকর্ম্মার হাতুড়ীর ঠোকাঠুকি চল্‌ছিল। ভয়ানক কার্‌খানার ভিতর বড় বড় চাকা ঘুর্‌ছিল। বড় বড় অগ্নিকুণ্ড জ্বল্‌ছিল, সে একদিন ছিল, বিধাতা তাতে গৌরব বোধ করেননি। সেটাকে চরম বলে' স্বীকার করেননি। চিম্‌নিতে ধোঁয়া পাড়িয়ে আগুন নিভিয়ে দিলেন, কার্‌খানা বন্ধ করে' দিলেন। কার্‌খানা-ঘরের পর্দ্দা পড়ে' গেল। সে-দিন তিনি রসের আকাশ থেকে রস পাঠিয়ে দিলেন, তার রুদ্র নৃত্যের খর দৃষ্টি পাঠালেন না, সেদিন চাঁদ হাস্‌লে, সূর্য্য হাস্‌লে, পৃথিবী হাস্‌লে।

এর থেকে আর-একটি কথা মনে পড়ে। পৃথিবীর যে সভ্যতা ক্রমাগত মাংশপেশীকে দেখাচ্ছে, factoryর চোঙাগুলি উপরে তুলে' ধরে' যা বিধাতার সৌন্দর্য্যকে লুকিয়ে রাখ্‌তে উদ্যত, চতুর্দ্দিকের এই কুৎসিত সৃষ্টি তিনি করেননি—যা প্রাণকে পীড়িত করছে, যা চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়্‌ল—কোথায় লণ্ডন্ থেকে টোকিও পর্য্যন্ত সব জায়গায় factory-দানব তার শৃঙ্গধ্বনি করছে, সে ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস কলুষিত হ'ল। সর্ব্বত্র শক্তি আপনার নগ্নতাকে উদ্‌ঘাটিত করে' তার রূপ দেখাচ্ছে। বিধাতা দেখাননি তিনি তাঁর শক্তি-রূপকে লুকিয়ে রেখেছেন, ঢেকে দিয়েছেন।

মানুষের সভ্যতার ক্রমাগত এই শক্তির অভিযানে অমৃতলোককে, আনন্দ-লোককে পীড়িত করলে। সব জায়গায় মানুষ আপনার শক্তি-রূপকে প্রকাশ করছে, আজকার দিনে আমাদের যে-কিছু দুঃখ সে এই দুঃখ। মানুষ নির্ম্মাণ করবে কেবল নয়, সৃষ্টিও করবে। সভ্যতা যদি তার সৃষ্টি হয় তবে সে ধন্য, কিন্তু এ যদি কেবল নিজের জন্য নির্ম্মাণ হয় তবে ধিক্! এ নির্ম্মাণের চেষ্টা শেষ কথা বল্‌তে পারে না। কোন্‌খানে শেষ কথা? মানুষের সঙ্গে মানুষের যে-সম্বন্ধ তথ্যকে অতিক্রম করে' সত্যের সম্বন্ধকে বিস্তার করে, যা প্রেমের সম্বন্ধ, যা সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধ, যা কল্যাণের সম্বন্ধ সেখানে মানুষের সৃষ্টি কেন? সেখানে প্রত্যেক মানুষ আপনার অসীম মূল্যকে লাভ করে। সেখানে প্রত্যেক মানুষের জন্য সমস্ত মানুষ তপস্যা করে, সেখানে মহাপুরুষেরা প্রাণ দিয়েছেন প্রত্যেক মানুষের জন্য, মহাজ্ঞানীরা জ্ঞান এনেছেন প্রত্যেক মানুষের জন্য; কিন্তু যেখানে একজন মহাজন ১০ জন দরিদ্রকে শোষণ করছে, বস্তা বস্তা কাপড়-চোপড় জিনিষপত্র উৎপন্ন করে' পৃথিবীকে ছেয়ে দিয়েছে, সেখানে সে পৃথিবীকে পীড়িত করছে, সেখানে মানুষ আপনার আনন্দরূপকে প্রকাশ করতে পার্‌লে না। আনন্দরূপে অসীম প্রকাশ পাচ্ছে, শক্তিরূপে না। সে আনন্দরূপ মানুষ এখনও প্রকাশ করেনি। তার machine-gun, তার factory, তার লাভ-লোকসান মানুষের চিত্তকে অভিভূত করছে, পীড়িত করছে; কিন্তু মানুষ বল্‌তে পারে—এ নয়—এ নয়। এসমস্ত বিশ্বের মূলতত্ত্বের বিরোধী। মানুষ পূর্ণতার সৃষ্টি করবে, নির্ম্মাণ করবে না। নির্ম্মাণ যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু করবে। সেটা সাম্‌নে এনে নির্ম্মাণের কার্‌খানা দ্বারা পৃথিবীর অঙ্গ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে' কদর্য্যতা বিস্তার করবে, বিধাতা এজন্য মানুষকে সৃষ্টি করেননি। জন্তু জীব ও জন্তুকেও করেননি, মানুষ তা করে। যখন সেদিন নৈহাটি থেকে এলুম—বরাহনগর পর্য্যন্ত, গঙ্গার ধারকে কি পীড়িত দেখ্‌লুম! কি কুশ্রী! Factoryর লজ্জা নেই, manufacture যাকে বলি তার লজ্জা নেই! সে নগ্ন। সেখানে মানুষের লজ্জা নেই। সেখানে মেয়ে-পুরুষে কাজ-কর্ম্ম করছে, তারা লজ্জা-সম্ভ্রম ত্যাগ করেছে, গহনা পরে' সেজে-গুজে বেড়ায়, লজ্জা নেই। কুশ্রী যে তার লজ্জা নেই। Factory নির্লজ্জতা নির্ম্মাণ করে। সে নির্লজ্জতা পৃথিবীকে পীড়িত করছে, সমস্তের সঙ্গে তার বিরোধ, অসামঞ্জস্য, এ-কথাটি বল্‌বার ভার তাদের উপর যারা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করছে। বারংবার তাদের বল্‌তে হবে তুমি রাজতক্তে বসেছ বলে' বড় নও, তুমি Governor হ'য়ে এসেছ বলে' বড় নও, তুমি পুলিশের কর্ত্তা বলে' বড় নও, এ-কথা আমি বল্‌তে পারি; গান গেয়ে বল্‌তে পারি, তোমার সমস্ত Police Regulation, আইন-আদালত রাজ্য-সাম্রাজ্য ছাপিয়ে যাবে। তুমি আকাঙ্ক্ষা বুকে করে' রেখেছ, সমস্ত জগতের সঙ্গে তোমার সুরের অসামঞ্জস্য আছে, বিধাতা যখন আপনাকে প্রকাশ করতে চান আনন্দরূপে, তখন তুমি তার সুরে সুর মিলালে না? পৃথিবীতে সুন্দরের বাণী এসেছে, তুমি তার সিংহাসনে দাগ কেট না। কোণ খসিয়ে দিও না, সে যে কোমল শতদল পদ্ম, মত্ত করীর মতো তাকে দলতে যেও না। একথা বল্‌বার অধিকার আমার আছে। কারণ আমি তোমার চেয়ে শক্তিতে খাট। বিধাতার আনন্দলোকে কুশ্রী বীভৎস এল না; আমি তার আনন্দকে মেনেছি একথা বার বার আমাদের বাঁশী কি বল্‌ছে না? এই বিবাহের দিনে বাঁশী বল্‌ছে তোমরা যে সত্য হবে, বরবধূ। ১০।২০ হাজার টাকা Bankএ বাড়্‌বে ব'লে সত্য হবে তা নয়। এখানে যে-সত্য সে-সত্যের কথা বিশ্বের ছন্দের ভিতর, Bankএর ভিতর নেই, টাকার ঝনঝনানিতে নেই, সে যে আনন্দলোকের সত্য, সৃষ্টির সত্য, পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের সম্বন্ধে সত্য, সে সত্য সুরে বাজে, সে সত্য ছবিতে রং মাখায়, সে সত্য কবি ছন্দে প্রকাশ করে, সে সত্য যদি গ্রহণ কর তুমি সত্য হবে, সংসার অমৃতময় হবে, সে-সংসার তোমার সৃষ্টি হবে। সেখানে উপকরণ-বস্তুর দ্বারা সৃষ্টি হয় না, তুমি Whiteaway Laidlawর দোকান থেকে জিনিষপত্র আন্‌লে তার দ্বারা সত্য হবে না। এসমস্ত তথ্য দ্বারা সত্য হবে না, কিন্তু তুমি অন্তরের মধ্যে যদি সে গানের সুর তুল্‌তে পার যে-গান সমস্ত জীবনের মধ্যে অনায়াসে বাজে, আকাশে বাতাসে যে-গান বাজে, তোমার জীবনে যদি সে গান বাজাও, তুমি ধন্য হবে। গরীবের ঘরে ঐশ্বর্য্য—সে ঐশ্বর্য্যের বাণী, সে ঐশ্বর্য্যের আমন্ত্রণ কোন্‌খানে আছে? রাজকোষে নেই, সেনানিবাসে নেই। সেখানে আছে যেখানে সে সুন্দরকে রূপ দিয়ে সৃষ্টি করছে। জীবনের ভিতর প্রাণের ভিতর পরস্পরের ভিতর, কল্যাণের সম্বন্ধের ভিতর যেখানে সে সৃষ্টি করছে সেখানে সে পরমকে পেয়েছে। সভ্যতাকে সেই পরমের আদর্শ দিয়ে বিচার করতে হবে। আবার বল্‌তে হবে—সেই এক কথা, আশা করি এখানে কেহ হাস্‌বেন না। এ বাণী বারবার বলেছি—আমি এইসকল পরম সত্য শিশুকাল থেকে পুনরাবৃত্তি করছি—হাজার বার বলেছি, আবার বল্‌ব—মৈত্রেয়ী বলেছে উপকরণ নিয়ে কি হবে—

"যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্, যদেব ভগবান্ বেদ
তদেব মে ব্রূহি।"

সমস্ত সভ্যতাকে একথা বল্‌তে হবে, তুমি অমৃত হওনি, মৃত্যুর উপকরণ জড় করেছ। অমৃত সেখানে যেখানে তোমার পূর্ণতা প্রকাশ পাচ্ছে। সে-পূর্ণতাকে গানে কার্য্যে শিল্পে পাওয়া যায়, প্রেমে স্নেহে আনন্দে নানা-রকম করে' প্রকাশ করে। নানা পথ আছে। যদি কোন সমাজে দেখি সে প্রকাশ আর-সমস্তকে ছাপিয়ে উঠে সে, সমাজে অন্ন বস্ত্রের কিছুঅবস্থা জানতে চাইনে, আমি বল্‌ব ধন্য হয়েছে সে সমাজ, সে সমাজ সভ্যতার চরম শিখরে উন্নীত হয়েছে—আজকার দিনে এই কথাটি মনে করিয়ে দিলে আমাদের ঐ গলির বাঁশী। আমি হয়ত আজকে বল্‌তে যেতুম ছন্দ বল্‌তে কি বুঝি, কোন্ ছন্দ কিরকম, সাহিত্যে ছন্দের স্থান কি, কি করলে সে ছন্দ আঘাত পায়, কি করলে

তার উৎকর্ষ প্রকাশ পায়, হয়ত সে-সমস্ত আলোচনা করতাম কিন্তু জোর করে, সাধনা হয় না। ইন্দ্রদেব সুন্দরকে পাঠিয়ে বলে' দিলেন, তপস্যা কোরো না। তাতে প্রাণ বড় শুষ্ক হ'য়ে যায়। মাঝে মাঝে সুন্দরের দূত পাঠিয়ে তিনি সে সাধনা বিক্ষিপ্ত করে' দেন। ইতিহাস একথার সাক্ষী দিয়েছে। বুদ্ধদেব যখন তপস্যা করেছেন তখন বলেছেন—পেলুম না। কখন পেলেন? সুজাতা হাতে করে' যখন অন্ন দিলেন। সে কি অন্ন, সে কি শেঠের অন্ন? তার ভিতর ভক্তি ছিল, প্রীতি ছিল, সেবা ছিল, সৌন্দর্য্য ছিল, সে পায়স-অন্নের ভিতর মাধুর্য্য ছিল। তাই যোগীকে দিলেন। ইন্দ্রদেব কি সুজাতাকে পাঠাননি? তিনি বলেছেন, তোমার শুষ্ক তপস্যা থেকে ব্রহ্ম পাবে না, ইড়া পিঙ্গলা নাড়ীটিকে পাবে না। তিনি দেখেন প্রেমের, আনন্দের উৎস, সেখান থেকে যখন পাত্র ভরে' এনে দেন তখন বুঝ্‌ব প্রেমের মূল্য কি, সৌন্দর্য্য কি, রস কি। সে-দিন তপস্বী তপস্যায় পাস্ হয়েছেন যে-দিন বলেছেন অপরিসীম প্রেমে বাঁধ্‌তে পারলে আপনার ভিতর ব্রহ্মকে পাবে। Christএর কাছে মার্থা ও মেরী দুটি স্ত্রীলোক এসেছিল। মার্থা কাজ-কর্ম্মে ব্যস্ত। তার সেবা প্রভৃতি ছিল, সে ধর্ম্মের জন্য ব্যস্ত ছিল। মেরী কিছু করে না, সে Christ এর পায়ে তার বহুমূল্য গন্ধ-তেলের পাত্রটি ভেঙে ফেলে' দিলে। সবাই বল্‌লে—আহা কি লোকসান করলে! এর চেয়ে ঢেলে দিলে ভাল ছিল। ওটা আর কোনরকম সৎকর্ম্মে লাগ্‌ত। Christ বল্‌লেন, না,—তা নয়, তার এই জিনিষের প্রয়োজন নেই। এই যে সাধনা এ অহেতুকী। যখন একজন নারী বিচার না করে' হিসাব না করে' প্রয়োজন চিন্তা না করে' ঢেলে ফেলে' দিলে। সে বলেছে—আমি জানিনে কি হ'ল, আমি সমস্ত পায়ে ঢেলে দিলাম—এতে কি প্রেমের রূপ দেখ্‌তে পেলাম না? এই ত তপস্যা পূর্ণ হ'ল।

একটা অবান্তর কথা এতক্ষণ বলেছি। আসল কথা যা বল্‌তে এসেছি—সে হচ্ছে স্কুল মাষ্টারের কথা। ভাব্‌ছিলুম ছন্দ প্রভৃতি রচনার কাঠাম (গঠন?) সম্বন্ধে কিছু বল্‌ব। ইন্দ্রদেব আমার গলিতে বাঁশী বাজিয়ে দিলেন। মনে পড়্‌ল আমি স্কুল মাষ্টার নই, সেজন্য আপনাদের কাছে একথা বল্‌তে এলুম। মানুষ তার সমস্ত সৌন্দর্য্য-রচনার ভিতর যখন আপনার ভিতরকার পূর্ণতার রসকে রূপ দিতে চেষ্টা করেছে, তখন সে কি না করেছে? সে ত নিমন্ত্রণের উত্তর দিয়েছে, না দিলে তার সঙ্গে আত্মীয়তা হবে কি করে'? তিনিই যদি সব দেন, তাঁকে যদি ফিরিয়ে দিতে না পারি, তবে গরীবের মতো নিয়ে আনন্দ কি? তিনি আনন্দধামের দূত পাঠিয়ে নিমন্ত্রণ করেছেন, আমাকেও নিমন্ত্রণ করতে হবে—আনন্দের নিমন্ত্রণ করতে হবে। এ রাসযাত্রার আতিথ্য আমাকে করতে হবে। তাঁতে আমাতে এক জায়গায় সমকক্ষতা প্রকাশ করতে হবে। স্বর্গলোক তিনি পাঠিয়ে দেবেন, আমরা ভোগ করব, তা হবে না, একরূপ স্বর্গলোক আমরাও তৈয়ার করব। জ্ঞানে প্রেমে সৌন্দর্য্যে কল্যাণে সেবায় আত্মত্যাগে আমরাও স্বর্গলোক সৃষ্টি করব। তিনি বৈকুণ্ঠ থেকে এসে সে আনন্দের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন। যাঁহারা গুহার ভিতর এতকাল ছিলেন তাঁহারা গুহার ভিতরকে চিত্র-বিচিত্র করেছেন, বলেছেন—তোমার সৃষ্টি আছে, আমার সৃষ্টি দেখে' যাও, ওস্তাদকে ডেকে বলেছেন—তোমার বীণা বাজাও, আমার হাতেও বীণা আছে, শুনে' যাও। যিনি আনন্দরূপকে জগতে বিস্তার করেছেন, অমৃতলোকের যিনি কর্ত্তা, তাঁকে গুহার ভিতর নিয়ে এসেছেন। অমরাবতীকে অবজ্ঞা মানুষ করে, মানুষ যখন ধনসম্পদের বড়াই করে তখন তিনি বলেন—অজির্ণে হতা লঙ্কা, সেখানে তাঁর মনে অবজ্ঞা নেই। যেখানে চিরদিনের সৃষ্টি রয়েছে, যুগযুগান্তের সকল বিপ্লব অতিক্রম করে' যা থাকবে সে অমরাবতীকে সৃষ্টি করবার কাজে যাঁরা লাগেন তাঁরা নানা-রকম বাঁশী বাজান। বাঁশীতে বাঁশীতে কোথায় চলে' যাই—একথা আমার নিজের অন্তরের আনন্দ ও বেদনা থেকে আমি আজকে জানালুম। আজ আমার আর কিছু বল্‌বার নেই।*

(পল্লীশ্রী, বৈশাখ ১৩৩১) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারে বাঙ্গালী

আজকাল বাঙ্গালা দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব বাহির করিতে হইলে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের গবেষণার প্রয়োজন হয়। কিন্তু এমন এক সময় ছিল যখন আমাদের এইদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গভূমিকে পবিত্র করিয়াছিলেন। সেইসকল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের পদতলে বসিয়া শত সহস্র ছাত্র শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিত। তাঁহাদের বিদ্যা ও জীবনের পবিত্রতার খ্যাতি দেশ হইতে দেশান্তরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত। সুদূর চীন, তিব্বত প্রভৃতি রাজ্য হইতে ধর্ম্ম ও জ্ঞান-পিপাসু ছাত্রগণ তাঁহাদের নিকট শিক্ষা লাভ করিবার জন্য আগমন করিত। তাহারা আবার কৃতবিদ্য হইয়া স্বদেশে যাইয়া এইসকল গুরুর যশ কীর্ত্তন করিত। তাহা শুনিয়া সেখানকার রাজারা ঐ বিশ্ববিশ্রুতকীর্ত্তি পণ্ডিতদিগকে নিজ নিজ রাজ্যে লইয়া গিয়া ধর্ম্ম সংস্কার ও প্রচার করাইবার জন্য, তাঁহাদের আহ্বান করিতে লোক প্রেরণ করিতেন। কোন পণ্ডিত বা যাইতেন, আর কেহ বা এত ব্যস্ত থাকিতেন যে বিদেশগমনের সময় পাইতেন না—তবে উপদেশাদি প্রেরণ করিতেন।

সাহেবই হউন আর বাঙ্গালীই হউন, আমাদের দেশের যাঁহারা ইতিহাস রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই এইসকল পণ্ডিতদের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করেন নাই। তাঁহাদের দৃষ্টি কেবলমাত্র রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রতিই নিবদ্ধ আছে। বাঙ্গালার cultural history বা সভ্যতার ইতিহাস জানিতে হইলে, শিক্ষা ধর্ম্ম ও পণ্ডিত-মণ্ডলীর বিবরণ সংগ্রহ করা যে কতদূর প্রয়োজন, তাহা তাঁহারা ভুলিয়া যান। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, রাজা শশাঙ্ক সম্বন্ধে যাঁহারা সম্পূর্ণ এক অধ্যায় লেখেন, তাঁহারা ঐ নৃপতিরই সমসাময়িক, বৌদ্ধ ভারতের তদানীন্তন গুরু বাঙ্গালী শীলভদ্র সম্বন্ধে দুই-চারি পংক্তি লেখাও স্থান ও সময়ের অপব্যয় মনে করেন। পাল-সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে তিন-চারখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছে; কিন্তু সেই সময়ের মহাপণ্ডিত শান্ত রক্ষিত ও অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সম্বন্ধে দুই তিনটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধও এপর্য্যন্ত রচিত হয় নাই। একমাত্র মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ব্যতীত অপর কাহারও দৃষ্টি এবিষয়ে এপর্য্যন্ত পতিত হয় নাই।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গালী যে কেবলমাত্র বৌদ্ধধর্ম্মের অনুসরণ করিত তাহা নহে, সে চীন, তিব্বত, নেপাল, সিংহল প্রভৃতি সুদূর দেশে পরোক্ষ বা অপরোক্ষ-ভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারে সহায়তা করিয়াছে।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ ধনধান্য, বিদ্যা, পাণ্ডিত্যে ভারতের মধ্যে এক শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিত। যে-যুগে কর্ণসুবর্ণের বীর নৃপতি শশাঙ্ক বঙ্গের বাহিরেও রাজ্য বিস্তারের প্রয়াস পাইয়াছিলেন, সেই যুগেই বাঙ্গালীর আদি-গৌরব শীলভদ্র জীবিত ছিলেন। শীলভদ্র সমতটের এক ব্রাহ্মণ রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম বয়সে তিনি দন্তভদ্র, দন্তদেব বা দন্তসেন নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি অল্পবয়সেই

---

* শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বিগত ৩রা মার্চ্চ তারিখে সেনেট হলে প্রদত্ত বক্তৃতা।

নানা বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া সুপণ্ডিত হইলেন। কিন্তু হেতু-বিদ্যা, শব্দ-বিদ্যা, চিকিৎসা-বিদ্যা, অথর্ব্ববেদ বা সাংখ্য দর্শন তাঁহার মনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে শান্ত করিতে পারে নাই। তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের জন্য নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি "শব্দ বিদ্যা সম্যুক্ত শাস্ত্র" প্রণেতা ধর্ম্মপালের নিকট ধর্ম্মোপদেশ লাভ করিয়া শান্তি লাভ করিলেন। পরে তিনি তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা-বলে বন্ধুগণকে মুগ্ধ করিয়া ও সদ্ধর্ম্মের শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়া নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদে উন্নীত হন।

চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন-সাং এই বাঙ্গালী গুরুর পদতলে বসিয়া ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় তাঁহার যাবতীয় সমস্যার সমাধান করিয়া লইয়াছিলেন। জ্ঞানের একনিষ্ঠ সাধক হুয়েন সাং বৌদ্ধধর্ম্মের বিষয়ে সকল কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিবেন বলিয়াই, কত দেশ, কত নদী, কত পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। পথে কাশ্মীরে পৌঁছিয়াই তিনি তাঁহার মনের সন্দেহ মিটাইবার জন্য যে পণ্ডিতদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই তাঁহার সমস্যার সমাধান করিয়া দিতে পারেন নাই। বাঙ্গালী আচার্য্য শীলভদ্র অতি সরলভাবে তাঁহাকে ঐসকল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিলেন। হুয়েন সাং ১০৩ বৎসর বয়স্ক ঐ জরা-জীর্ণ পণ্ডিতকুলচূড়ামণির নিকট ৫ বৎসর কাল শিক্ষালাভ করিলেন। যেমন গুরু, তেমনি শিষ্য। তাঁহাদের উভয়েরই মনের উদারতার কথা স্মরণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। সে-যুগের লোকেরা—বিশেষতঃ খৃষ্টীয় ধর্ম্মের নেতৃবৃন্দ, নিজের ধর্ম্মের শাস্ত্র ব্যতীত, অন্য ধর্ম্মের গ্রন্থাদি আলোচনা করাকে পাপ কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু শীলভদ্র নিজে মহাযান মতাবলম্বী হইয়াও, বৌদ্ধধর্ম্মের অন্যান্য শাখার শাস্ত্র বিদ্যায় সুনিপুণ ছিলেন, এবং হিন্দুধর্ম্মের সমগ্র বিদ্যাও তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এখন এই বিদেশী ছাত্রটির নিকট তাঁহার চিরজীবনের সাধনার ধন অর্পণ করিতে তিনি বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিলেন না। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের ছেলে—বৌদ্ধই হউন আর যাই হউন—তিনি যে চীনদেশের এক ব্যক্তিকে বেদ পড়াইলেন, ইহা তাঁহার মনের কম উদারতা ও তেজস্বিতার পরিচায়ক নহে। হুয়েন সাং আবার পাণিনির ব্যাকরণও শীলভদ্রের নিকট পাঠ করিয়াছিলেন। ফলতঃ তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল ভারতের সমগ্র cultureকে আয়ত্ত করিয়া চীনদেশে তাহার প্রচার করা। তিনি কেবলমাত্র বৌদ্ধ ধর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে নিজের মনকে আবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। তাঁহার নিজের লিখিত ভ্রমণ-বৃত্তান্তে ও তদীয় একজন ছাত্র-লিখিত জীবনচরিতে শীলভদ্রের গুণ ও বিদ্যাবত্তার কথা পড়িতে পড়িতে বাঙ্গালীর গৌরবের কথা স্মরণ করিয়া আমাদের মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়।

বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য শীলভদ্রের আগ্রহ ছিল। কামরূপাধি-পতি ভাস্কর বর্ম্মা স্বয়ং হিন্দু হইলেও অশেষ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হুয়েন সাংকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ রাজ্যে একবার লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন। হুয়েন সাং বিধর্ম্মীর রাজ্যে যাইতে বড় ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার গুরু-দেব শীলভদ্র তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, যেখানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই, বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচারকগণের সেইখানেই সর্ব্বাগ্রে গমন করা উচিত। হুয়েন সাং গুরুর আদেশে কামরূপ গিয়াছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য সেখানে বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

নালন্দার সকল পণ্ডিতই কিছু আর শীলভদ্রের মত উদার প্রকৃতির ছিলেন না। হুয়েন সাংয়ের পাণ্ডিত্য-প্রতিভাকে তাঁহাদের মধ্যে অনেকে মনে মনে ঈর্ষা করিতেন। তাই যখন সেই চীনদেশীয় পরিব্রাজক আবার চীনে ফিরিয়া যাইতে চাহিলেন, তখন সকলেই তাহাতে আপত্তি করিলেন। মিথিলা হইতে যেজন্য নব্য ন্যায়ের গ্রন্থ বাহিরে আনিতে দেওয়া হইত না, ঠিক সেইজন্যই হুয়েন সাংকে ভারতীয় বিদ্যা লইয়া বিদেশে যাইতে দিতে পণ্ডিতগণ আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালী শীলভদ্রের ইচ্ছা ছিল বৌদ্ধধর্ম্মকে দেশ-দেশান্তরে প্রচার করা। তাই তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন যে হুয়েন সাং যদি দেশে ফিরিয়া যান তবে চীনের ন্যায় সুবিস্তৃত দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের যথার্থ জ্ঞান অচিরকাল মধ্যেই ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। এই কথায় সকলেই সম্মত হইলেন। হুয়েন সাংও দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শীলভদ্রের আশা পূর্ণ করিলেন। চীনের বৌদ্ধগণের মধ্যে তিনি এমন এক নবজীবনের সঞ্চার করিলেন যে, তাহাতে তাঁহারা অনুপ্রাণিত হইয়া জাপান, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশে বুদ্ধদেবের পবিত্র ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য গমন করেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের এরূপ প্রচারের মূলে একজন বাঙ্গালীর কৃতিত্ব রহিয়াছে, এই কথা এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে।

ইহার পর, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে আবার আমার বাঙ্গালীর বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের বিবরণ অবগত হই। তিব্বতের রাজা খি-সং-ডেন-সাং দুইজন বাঙ্গালী পণ্ডিতকে তাঁহার রাজ্যে আহ্বান করিয়া লইয়া যান। তাঁহারাই সেখানে প্রথম বৌদ্ধধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মরূপে স্থাপন করেন। এই দুইজন বাঙ্গালীর মধ্যে একজন ছিলেন গৌড় নিবাসী মহাপণ্ডিত শান্ত রক্ষিত। শীলভদ্রের ন্যায় তিনিও নালন্দা মহাবিহারের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত ছিলেন। এতদ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ভারতবর্ষের সেই শ্রেষ্ঠতম বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের আসন বাঙ্গালী পণ্ডিতদের আয়ত্তে বহুবার আসিয়াছে। আর আজ যে, বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালী অধ্যাপকেরা আহূত হইয়া বিদ্যা দান করিতেছেন, তাহা বাঙ্গালার ইতিহাসে নূতন নহে। যাহা হউক, শান্ত রক্ষিতকে তিব্বতের অধিবাসিবৃন্দ মহাসম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া-ছিল। তাঁহাকে তাহারা আচার্য্য বোধিসত্ত্ব নামে সম্বোধন করিত। শান্ত রক্ষিত বৌদ্ধধর্ম্ম সম্প্রদায়ের নৈতিক চরিত্র সংশোধনের জন্য ও তাহাদের জীবনে সংযম শিক্ষা দিবার জন্য নিয়মাদি প্রণয়ন করেন।

রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস মহোদয় তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ সুলিখিত "Indian Pandits in the Land of Snow" নামক গ্রন্থে যেমন উল্লিখিত বিবরণটি প্রদান করিয়াছেন, তেমনি বাঙ্গালীর বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের আর-একটি সংবাদ দিয়াছেন—"In the 9th century many learned pandits from Bengal were invited to Tibet by King Ralpachan and employed by him in translating Sanskrit works into Tibetan." অর্থাৎ খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে তিব্বতের রাজা রাল্পাচান বঙ্গদেশ হইতে বহু পণ্ডিত আহ্বান করিয়া লইয়া যান এবং তাঁহাদিগকে সংস্কৃত ভাষা হইতে তিব্বতীয় ভাষায় গ্রন্থাদি অনুবাদকার্য্যে নিযুক্ত করেন।

তিব্বতে বাঙ্গালীরা যে কেবল বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে। যখন সে-দেশের বৌদ্ধধর্ম্ম বীভৎস কদাচারে পরিপূরিত হইয়া গিয়াছিল, তখনও একজন বাঙ্গালী যাইয়া তাহার সংস্কার সাধন করিয়া আসিয়াছিলেন। এই বাঙ্গালীর নাম অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। Pag-som-son-sang প্যাগ-সোম্-সন্-সাং নামক তিব্বতীয় বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বৌদ্ধধর্ম্মের নবসংস্কারে লা-চেন, লো চেন, রাজা যেশিহড্ ও অতীশ প্রধান ছিলেন। কিন্তু ইঁহাদের চারিজনের মধ্যে আবার বঙ্গদেশবাসী অতীশই খ্যাতি ও প্রতিপত্তিতে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিতেন। অতীশ ৯৮০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১০৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমণীপুর বা বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কল্যাণশ্রী, মাতার নাম প্রভাবতী। বাল্যকালে তাঁহারা অতীশকে

চন্দ্রগর্ভনাম প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম বয়সে জেতারি নামক পণ্ডিতের নিকট শিক্ষালাভ করেন। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হীনযান শ্রাবকের তিনটি পিটক, বৈশেষিক দর্শন, মহাযান মতের ত্রিপিটক, মাধ্যমিক মতবাদের দর্শনশাস্ত্র, যোগাচার্য্য মতবাদ ও চারি-প্রকার তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তৎকালে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাভব করিতে না পারিলে পাণ্ডিত্যের সম্যক্ প্রতিষ্ঠা হইত না। অতীশ একজন দিগ্বিজয়ীকেও পরাভূত করেন। কিন্তু ধর্ম্মের জন্য যাঁহাদের অন্তর ব্যাকুল হয়, তাঁহারা শুষ্ক বিদ্যার ভার বহন করিয়া বা প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজয় করিয়া শান্তি লাভ করিতে পারেন না। অতীশ ধর্ম্মলাভের আকাঙ্ক্ষায় কৃষ্ণগিরির রাহুল গুপ্তের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাহুল গুপ্ত তাঁহাকে ত্রিশিক্ষা প্রদান করিলেন। ১৯ বৎসর বয়সে তিনি ওদন্তপুরীর বিহারে ভিক্ষুধর্ম্ম গ্রহণ করেন। পরে ৩১ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে শ্রেষ্ঠ ভিক্ষুর আসনে উন্নীত হন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার অন্তরের ধর্ম্ম-পিপাসা মিটিল না। ভারতবর্ষের মধ্যে কেহই এই নবীন সাধকের সমস্যার সমাধান করিতে পারিলেন না; তাই তিনি সুবর্ণদ্বীপে গমন করিলেন। পণ্ডিতগণ বলেন, এই সুবর্ণদ্বীপ বর্ম্মাদেশেরই নামান্তর। সুবর্ণদ্বীপে তিনি অশেষ বিদ্যালাভ করিয়া যখন দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন পাল-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর স্বয়ং তাঁহাকে বিক্রমশিলা মহাবিহারের অধ্যক্ষ হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

অতীশ রাজানুরোধক্রমে সেই মহাসম্মানজনক পদ গ্রহণ করিলেন। দেশ-দেশান্তর হইতে বহু ছাত্র আসিয়া অতীশের নিকট শিক্ষালাভ করিতেন। এইরূপ একদল তিব্বতীয় ছাত্র অতীশের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া দেশে যাইয়া তাঁহার গুণ-কীর্ত্তন করিলেন। এদিকে তিব্বতের রাজা যোশী বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কার করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করা যায়, তাহার বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি ভারত-প্রত্যাগত ছাত্রগণের মুখে অতীশের কীর্ত্তিকাহিনী শুনিয়া, তাঁহাকে তিব্বতে আনয়ন করিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। প্রথম বারে যে চীনদেশীয় পরিব্রাজক-দল তাঁহাকে লইতে আসিল, তাহারা শুনিল যে, অতীশকে সাধারণতঃ দ্বিতীয় সর্ব্বজ্ঞ বলা হইয়া থাকে। তাঁহাকে লইয়া যাইবার প্রস্তাবকে লোকে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিবে—তিনি কি কখনও সঙ্ঘারাম ছাড়িয়া বিদেশে যান? এই কথা শুনিয়া তাঁহারা নিবৃত্ত হইয়া দেশে চলিয়া যান। দ্বিতীয় বারেও রাজা বহু অর্থ দিয়া Roya-tson-gru-sagre (রয়া-সং-গ্রু-সেজ) নেতৃত্বে একদল ধর্ম্ম-প্রচারক অতীশকে আনিবার জন্য প্রেরণ করেন। তাঁহারা আসিয়া অতীশকে বহু অর্থ উপঢৌকন দিয়া নিজেদের প্রস্তাব বিনীতভাবে জ্ঞাপন করিলেন। যিনি পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য্য ও বিলাসকে পদাঘাত করিয়া পবিত্র ধর্ম্মজীবন গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি কি আর সামান্য অর্থ-লোভে মুগ্ধ হন? অতীশ তাঁহাদিগকে সমস্ত অর্থ ফেরত দিলেন, কিছুই গ্রহণ করিলেন না; আর, দেশ ছাড়িয়া যাইতেও অস্বীকার করিলেন। ইহাতে তাঁহাদের নেতা কাঁদিয়া ফেলিলেন। তখন অতীশ তাঁহাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিলেন যে, তাঁহাদিগকে অপমান করিবার জন্য তিনি অর্থ গ্রহণে অস্বীকৃত হন নাই; তবে তিনি তিব্বতে যাইতে পারিবেন না।

ইঁহারা ব্যর্থমনোরথ হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করিলে পর, রাজা যোশীহড্ পুনরায় অতীশকে আনিবার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনের সঙ্কল্প অচল অটল—অধ্যবসায় অনন্য-সাধারণ। কিন্তু এবার যখন তিনি কোন সুবর্ণখনি হইতে স্বর্ণ আহরণ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার শত্রু এক রাজা আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যায়। শত্রুর কারাগারে রাজা যোশীহড্ প্রাণ ত্যাগ করিলেন, কিন্তু মৃত্যুর শেষ নিঃশ্বাসের সহিত তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে অনুরোধ করিয়া গেলেন যে, অতীশকে যেন পুনরায় তাঁহার নাম করিয়া আহ্বান করা হয়—যেমন করিয়া হউক, অতীশের দ্বারা যেন তিব্বতীয় ধর্ম্মের সংস্কার করান হয়।

এবারে Nag-tcho (নাগ-চো) নামে একজন তিব্বতীয় পণ্ডিত অতীশকে লইতে আসিলেন। ইনি একখানি গ্রন্থে অতীশের জীবন-চরিত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেখানিকেই উপজীব্য করিয়া উল্লিখিত ও নিম্নলিখিত বিবরণ প্রদত্ত হইল। নাগ-চো বিক্রমশীলা মহাবিহারে উপস্থিত হইয়া তিব্বতীয়গণের জন্য যে ভাগ নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহাতে গমন করিলেন। সেখানে তাঁহারা স্বদেশীয় এক পণ্ডিতের সহিত যুক্তি করিয়া স্থির করিলেন যে, বৃদ্ধ স্থবির আচার্য্য রত্নাকরের মনস্তুষ্টি যদি নাগ-চো সাধন করিতে পারেন, তবে তাঁহার দ্বারা অতীশকে তিব্বত গমনের জন্য আদেশ করা যাইতে পারে। নাগ-চো রত্নাকরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বহুদিন পরে তাঁহাকে মনের অভি-লাষ জ্ঞাপন করিলেন। রত্নাকর অতীশকে তিব্বত যাইতে আদেশ দিলেন। অতীশকে ঐ সময়ে পুনরায় নাগ-চো প্রচুর অর্থ উপ-ঢৌকন দিলেন—অতীশ পূর্ব্ববারের ন্যায় এবারও তাহার এক কপর্দ্দক গ্রহণ করিলেন না। তিনি গুরুর আদেশ ও তিব্বতবাসীদের একান্ত আগ্রহ অবহেলা করিতে না পারিয়া, এবার তথায় গমন করিতে স্বীকৃত হইলেন। তবে তখন তাঁহার হস্তে বহু বিহারের ভার ছিল বলিয়া, তৎক্ষণাৎই যাইতে পারিলেন না। কিছু বিলম্ব হইল।

অতীশকে যেরূপ সমারোহের সহিত তিব্বতবাসিগণ আহ্বান করিয়া লইয়াছিল, তাহারও উজ্জ্বল চিত্র নাগ-চো এবং—তাঁহার গ্রন্থের ভাব লইয়া লিখিত "Indian Pandits in the Land of Snow" নামক গ্রন্থে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন।

তিব্বতের রাজা অতীশকে জোভোজী বা প্রভু, স্বামী বলিয়া সম্বোধন করিতেন—সম্ভ্রমভরে কদাচ নাম গ্রহণ করিতেন না। অতীশ পঞ্চদশ বর্ষকাল তিব্বতে বাস করিয়া সেখানকার ধর্ম্মকে সুসংস্কৃত করিলেন। সেখানে আচারের নূতন সংস্করণ করিলেন ও লোকের নৈতিক চরিত্রের সংশোধনের চেষ্টা করিলেন। তিনি তিব্বতের যে-সকল বিহারে পদার্পণ করিয়াছিলেন, আজও তিব্বতবাসীরা, তাঁহার স্মৃতি সযত্নে সেইসকল স্থানে রক্ষা করিয়াছে। তিব্বতীয় লামাধর্ম্মের গুরু ব্রামটন তাঁহার শিষ্য ছিলেন। তিনি তিব্বতে বহু গ্রন্থ রচনা করেন—তন্মধ্যে "বোধি-পথ-প্রদীপের" আলোকে আজও তথাকার লোক ধর্ম্ম-পথ নিরূপণ করিতেছে। তাঁহার ধর্ম্মমতের প্রভাব সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে কিছু মতভেদ দেখা যায়। Sir Charles Eliot তাঁহার নব প্রকাশিত Hinduism and Buddhism গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"It may seem a jest to call the teaching of Atisa a reform, for he professed the Kalachakra, the latest and most corrupt form of Indian Buddhism; but it was doubtless superior in discipline and coherency to the native superstitions united with debased Tantrism which it replaced."

কিন্তু মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—"তিনি তিব্বতে মহাযান মতেরই প্রচার করেন। তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, তিব্বতীরা বিশুদ্ধ মহাযান ধর্ম্মের অধিকারী নয়; কেননা, তখনও তাহারা দৈত্যদানবের পূজা করিত; তাই তিনি অনেক বজ্রযান ও কালচক্রযানের গ্রন্থ তর্জ্জমা করিয়াছিলেন ও অনেক পূজাপদ্ধতি ও স্তোত্রাদি লিখিয়া-ছিলেন।"

নেপালেও বাঙ্গালীরা বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারে সহায়তা করিয়াছিলেন। কাহ্নপাদ, লুই, ভুসুক প্রভৃতি বৌদ্ধ লেখকগণের স্মৃতি আমাদের দেশে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, নেপালে কিন্তু তাঁহারা আজও পূজিত হন। মহা-মহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় তথা হইতে তাঁহাদের দোঁহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া বঙ্গসাহিত্যকে অপূর্ব্ব সম্পদে মণ্ডিত করিয়াছেন।

ইহা ব্যতীত কল্যাণী নগরের শিলালিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, পেগানেও তাম্রলিপ্তের বৌদ্ধ ভিক্ষুরা অর্ণবযানে গমন করিয়া তথায় বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কার করেন। আবার পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কাত্যায়ন গোত্রের একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, তাঁহার বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগের জন্য দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া সিংহলে বৌধাগম চক্রবর্ত্তীর পদলাভ করিয়াছিলেন। (শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু কৃত Modern Buddhismএর ভূমিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, বাঙ্গালীরা পরবর্ত্তী কালের বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রচারে তাহাদের শক্তি নিয়োগ করিয়া ধন্য হইয়াছিল।

শ্রী বিমানবিহারী মজুমদার

(মানসী ও মর্ম্মবাণী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১)

"কাশ্মীরী মেয়ের চাল কোটা"

শ্রী ললিতমোহন সেন কর্ত্তৃক কাঠ খোদাই

চন্দ্র-ভ্রমণ----

আমাদের এই পৃথিবী হইতে চন্দ্রলোকে যাওয়ার পরিকল্পনা অনেক কাল হইতে হইতেছে। এক একজন বৈজ্ঞানিক এক-এক প্রথায় চন্দ্রলোকে গমনের উপায় ঠাওরাইতেছেন, কিন্তু এপর্য্যন্ত কেহই এই কার্য্যে কল্পনার দৌড় দেখানোর বেশী সফলতা লাভ করেন নাই। পৃথিবীর বিশেষ কয়েক বর্গমাইল ছাড়া আর সকল স্থানেই মানুষ গিয়াছে এবং যেস্থানটুকু বাকি আছে তাহাও বোধ হয় অতি অল্পকাল-মধ্যে মানুষের গম্য হইবে। পৃথিবীর সমস্ত স্থান দেখা হইয়া গেলে পর, নূতনকে দেখিবার প্রেরণা মানুষকে কোথায় লইয়া যাইবে কে জানে, তবে তাহাকে পৃথিবীর বাহিরে যাইতে হইবে এবং পৃথিবীর বাহিরে অথচ পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটে চন্দ্রছাড়া আর কোন গ্রহ উপগ্রহ নাই, কাজেই স্বভাবতঃই মনে হয় মানব প্রথমেই চন্দ্রলোকে গমন করিবার চেষ্টা করিবে।

খুব জোরালো দূরবীক্ষণের সাহায্যে চন্দ্রকে যেন পৃথিবীর ৫০ মাইলের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া মনে হয়, যদিও পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্ব ইহা হইতে বহু সহস্র গুণ। যুক্তরাষ্ট্রের ক্লার্ক ইউনিভারসিটির অধ্যাপক আর্ এচ্ গডার্ড পৃথিবী হইতে চন্দ্রলোকে এক অসীম শক্তিপূর্ণ হাউই প্রেরণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহা সফল হইলে পৃথিবী এবং চন্দ্রের মাঝখানের ২৪০,০০০ মাইল স্থান সেতুবদ্ধ হইবে বলিয়া মনে হয়, অবশ্য সেই সেতু আমাদের চমৎকার হাবড়া পুলের মতন হইবে না।

বহু প্রাচীন কাল হইতেই মানুষ তাহার কল্পনার পুষ্পরথে চড়িয়া চন্দ্র-ভ্রমণ করিতেছে। মানুষের কল্পনার চোখে চন্দ্রের মতো রম্য স্থান ত্রি-সংসারে আর নাই। কিন্তু বাস্তবে ইহা কতদূর সত্য বা মিথ্যা তাহা জোর করিয়া বলা চলে না।

অধ্যাপক গডার্ড যে হাউই নির্ম্মাণ করিবেন, তাহার গতি সেকেণ্ডে

হাউই কিরকমভাবে চন্দ্রের দিকে ছুটিয়া চলিবে তাহার কল্পিত চিত্র কি
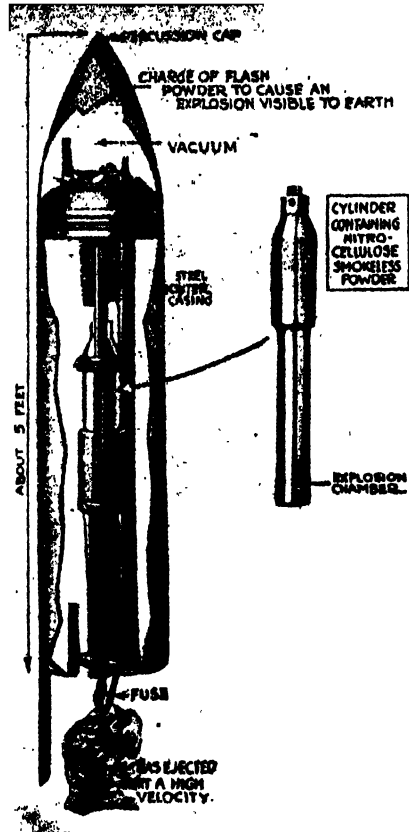
প্রোফেসর গডার্ডের হাউই নির্ম্মাণ প্রণালী

৬০৬ মাইল হইবার কথা। এই গতিতে কিছুক্ষণ চলিলেই হাউইটি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির সীমার বাহিরে গিয়া পড়িবে। হাউইটিকে ক্রমাগত গতিশীল রাখিবার জন্য একটি হাউইয়ের মধ্যে আর একটি, এইরূপ পর-পর অনেকগুলি হাউই থাকিবে, এবং এক-একটি হাউই বিদীর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই হাউইয়ের গতি বহুগুণ করিয়া বৃদ্ধি পাইবে। মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির বাহিরে গিয়া পড়িবামাত্র হাউই আপন বেগেই চন্দ্রের দিকে ভীষণ বেগে চলিতে থাকিবে এবং ক্রমশঃ চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি-সীমার মধ্যে গিয়া পড়িবে। তার পর যখন হাউই চন্দ্রে গিয়া পড়িবে, তখন ইহা মানুষের চক্ষের অন্তরালে রহিবে না। হাউই ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলি দূরবীক্ষণ চন্দ্রের বিশেষ স্থানে, যেখানে হাউই পড়িবার সম্ভাবনা আছে, সেইখানে লক্ষ্যস্থির করিয়া রাখা হইবে। ইহা সফল হইলে মানুষের মনে এক প্রশ্ন উঠিতে পারে, পৃথিবী ছাড়া অন্যান্য গ্রহে-উপগ্রহে প্রাণী আছে কি না এবং তাহাদের সহিত কোন রকম যোগ-স্থাপন করিয়া কথা-বার্ত্তা চালান যাইতে পারে কি না।

প্রোফেসর গডার্ড

চন্দ্রে প্রাণী আছে কি না ইহা লইয়া অনেকরকম বাদানুবাদ চলিতেছে। একদল বৈজ্ঞানিক বলেন যে চন্দ্রে বায়ুমণ্ডল নাই, অতএব সেখানে কোনপ্রকার প্রাণীও থাকিতে পারে না। চন্দ্রে যে সমস্ত ছায়াপাত হয় তাহা অতি পরিষ্কার এবং তীক্ষ্ণ, বায়ুমণ্ডল থাকিলে ছায়া ওরকম তীক্ষ্ণ এবং পরিষ্কার হইতে পারে না। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ অধ্যাপক পিকারিং বলেন যে চন্দ্রে খুব পাত্‌লা একটু বায়ুমণ্ডল আছে, এমন কি মাঝে মাঝে চন্দ্রে খুব সামান্য বরফও পড়ে। ইহাতে মনে হয় চন্দ্রলোকে অতি কষ্টে বিশেষ বিশেষ প্রাণী বাস করিতে পারে।

চন্দ্রলোকের টেম্পারেচার লইয়াও নানা-প্রকার বাদানুবাদ আছে। কোনপ্রকার বায়ুমণ্ডল না থাকিলে সূর্য্য-কিরণ সোজাসুজি অপ্রতিহত-ভাবে চন্দ্রে গিয়া পড়ে, তাহাতে চন্দ্রের টেম্পারেচার ফুটন্ত জল অপেক্ষাও বেশী হয়। অধ্যাপক পিকারিং বলেন যদি চন্দ্রে কোনপ্রকার প্রাণী থাকে তবে তাহা ছোট ছোট গাছ এবং লতা পাতা। তাঁহার মতে চন্দ্রের মতন স্থানে অন্য কোনপ্রকার প্রাণী থাকিতে পারে না।

কিন্তু এইচ্ জি ওয়েল্‌স্ একটি কথা বলেন। তিনি বলেন যে চন্দ্রের উপরে কোনপ্রকার লোক থাকিতে পারে না ইহা সত্য, কিন্তু চন্দ্রলোকে যে সমস্ত বৃহৎ বৃহৎ গহ্বর আছে, তাহার ভিতর যথেষ্ট পরিমাণে বায়ুমণ্ডল আছে, এবং তাহার তলায় মানুষ বা অন্য কোনপ্রকার প্রাণী সচ্ছন্দে থাকিতে পারে, কারণ বায়ুমণ্ডলের মধ্যে দিয়া সূর্য্যের কিরণ বিশেষ অসহ্য হইয়া কোন স্থানে পড়িতে পারে না।

কিন্তু চন্দ্রে কিরকমের লোক থাকা সম্ভব? চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর অপেক্ষা অনেক কম। সেই কারণে, আমরা চন্দ্রলোকে বিশ বাইশ মন ভারী জিনিষ অনায়াসে পিঠে লইয়া দৌড়াইতে পারি। লাফও যে বড় কম দিতে পারিব তাহা নয়, এক লাফে ৪০ ফুট চলিয়া যাইব উঁচু দিকেও মাটি হইতে বিশ-ত্রিশ ফুট উঠিতে পারিব। চন্দ্রের লোকেদের খুব পাৎলা বায়ুমণ্ডলএ বাস করিতে হয়, তাই তাহাদের শ্রবণ-শক্তি অতি তীক্ষ্ণ, কারণ পাৎলা হাওয়ার মধ্য দিয়া তাহাদের বড় বড় কানে শব্দ ধরিতে হয়। তাহাদের কথা-বার্ত্তা চালাইবার হয়ত এমন কোন উপায় আছে যাহাতে শব্দের কোন দরকার হয় না। হয়ত কোন বিশেষপ্রকারের সঙ্কেতে তাহারা কথা চালায়।

কিন্তু এই সমস্তই 'যদির' কথা। অধ্যাপক গডার্ডের হাউই যদি সফল হয়, তবে অনেক কিছুই জানিতে পারা যাইবে।

নূতন চাঁদের কথা—

অনেক পণ্ডিতের ধারণা হইয়াছে যে পৃথিবীর চারিদিকে আর একটি চাঁদ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই চাঁদটি নাকি জ্যোতিহীন। এই চাঁদে কোনপ্রকার বায়ুমণ্ডল নাই এবং ইহার আগাগোড়া সবই জমাট পাথর। ইহার আকার অতি ক্ষুদ্র, অবশ্য আমাদের পুরানো চাঁদের অনুপাতে। এই উপগ্রহটি নাকি পূর্ব্বে অন্য কোথাও মনের আনন্দে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত, তার পর কেমন করিয়া এক দিন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-গণ্ডীর ভিতর পড়িয়া যায়, এবং সেইদিন হইতে পৃথিবীর চারিদিকে তিন ঘণ্টায় একবার করিয়া ঘুরিয়া আসিতেছে, অর্থাৎ ইহার গতি প্রতি সেকেণ্ডে সাড়ে তিন মাইল করিয়া।

ইহা বোধ হয় পৃথিবী হইতে ২০০০ মাইল দূরে ঘুরিতেছে এবং ইহা বোধ হয় ৫০০ ফুট লম্বা। একটি তিন-ইঞ্চি টেলিস্‌কোপে ইহাকে দেখিতে পাওয়া যাইবার কথা। ইতিমধ্যে অনেকে নাকি ইহাকে একটি ক্ষুদ্র কালো বিন্দুরূপে দেখিতে পাইয়াছেন, তবে এখনও ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তেমন কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।
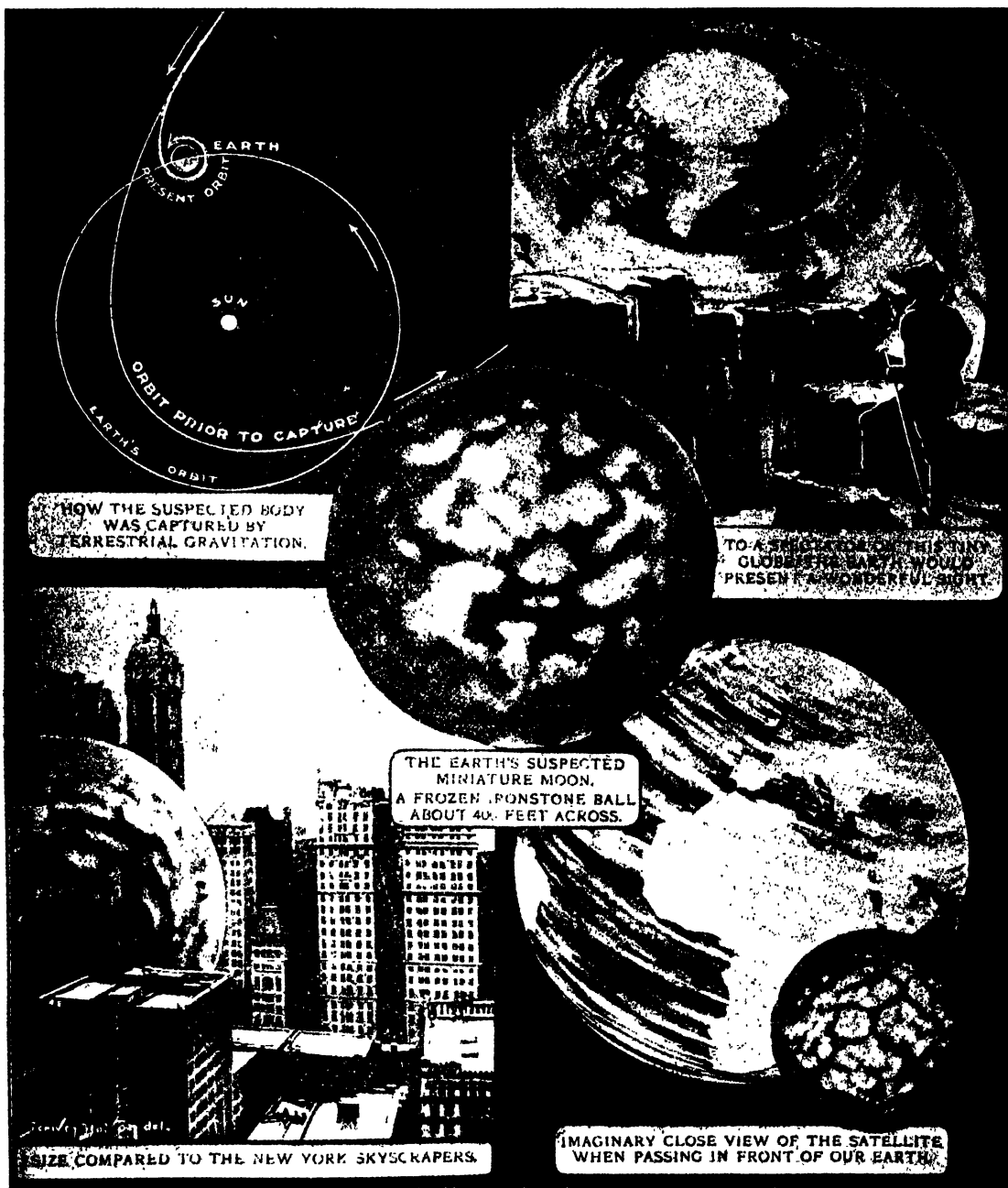
নূতন চাঁদের পরিচয়-চিত্র

নেকড়ে-শিকারীর পোষাক—

একজন আমেরিকান শিকারী নেকড়ের দলের সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই করিবার জন্য একটি অদ্ভুত বর্ম্ম নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বর্ম্মটি আগাগোড়া কাঁটা-যুক্ত। মাথার টুপীও এইধরণে তৈরী। মুখের উপর শক্ত তারের জালের মুখোস আছে। এই বর্ম্মটির মোট ওজন ২৭ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১৪ সের। শিকারীর হাতে দু-ধারী একটি কুড়াল থাকে। বুকের কাছে একটি ধারালো ছোরাও থাকে। বর্ম্মটি গরুর চামড়ার। এই

বর্ম্মাবৃত নেকড়ে শিকারী

দুইজন চড়িবার জার্ম্মান মিজেট্ গাড়ী

চালকের শয়নোপযোগী করিয়া এই মোটরকার তৈরী

পোষাক পরিয়া শিকারী আশা করেন যে তিনি একদল নেকড়ের মধ্যে একলা দাঁড়াইয়া তাহাদের নিকাশ করিতে পারিবেন। ইহাতে তিনি বেশ দু-পয়সা রোজগারের আশাও রাখেন।

নূতন গাড়ী—

(১) ছবিতে দেখুন। দুইজনে চাপিবার গাড়ী। ইহা জার্ম্মানীর তৈরী। খুব শক্ত, দামও বেশ সস্তা।

(২) আর-একখানি গাড়ী দেখুন, এই গাড়ীর চালক দরকার মতন যেখানে ইচ্ছা গাড়ীর মধ্যেই ঘুমাইতে পারে। গাড়ীখানি দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করিবার উপযুক্ত করিয়া নির্ম্মিত। এই গাড়ীতে করিয়া যে ভ্রমণ করিবে, তাহাকে কোন সহরে গিয়া রাত্রি কাটাইবার জন্য স্থান খুঁজিতে হইবে না, কোন দোকান হইতে কিছু খাদ্য কিনিয়া লইয়া গাড়ীতেই রাত্রিবাস করিতে পারিবে। গাড়ীটির গতিও অতি দ্রুত।

(৩) জার্ম্মানীতে আজকাল সব জিনিষেরই কম্‌তি হইয়াছে। একখানি মোটরে একজন চড়িবার মতন অবস্থা এখন আর জার্ম্মানীর লোকেদের নাই বলিলেও হয়। সেইজন্য এখন তাহারা এক-একখানি মোটর সাইকেলে তৃতীয় একটি চাকা যোগ করিয়া, মোটর সাইকেলকে
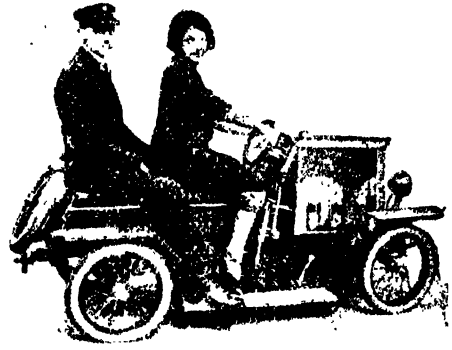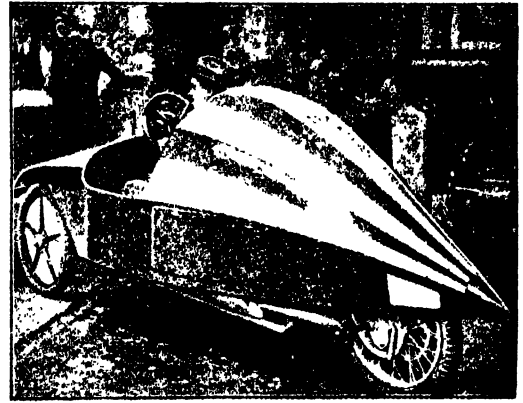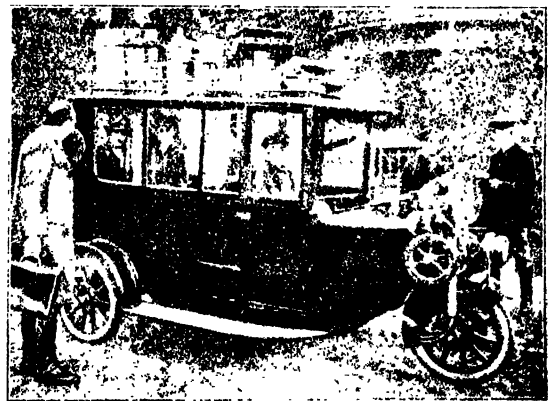
মোটর সাইকেল্‌কে মোটর গাড়ীরূপে ব্যবহার করা হইতেছে

বেশ বড় একটি মোটরকারে পরিণত করিতেছে। ছবি দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, এইরকম করিয়া তৈরী মটোরকার দেখিতে কেমনধারা হয়। সামনে মাত্র একটি চাকা, পিছনে দুটি চাকা। এইরকম মটোরকারে পাঁচ-ছয় জন লোক চড়িতে পারে, অথচ ইহার চালাইবার এবং নির্ম্মাণ

নতুনধরণের ট্যাণ্ডেম্ বাইসাইকেল

করিবার খরচা একটি সাধারণ মোটরকারের অর্দ্ধেকেরও কম। গাড়ীর উপরে মালপত্রও বহন করা যায়।

(৪) আমরা দুইজন চাপা বাইসাইকেল (Tandem) দেখিয়াছি। উহা চালাইতে বিশেষ কোনপ্রকার কষ্ট নাই, কারণ দুইজন পা দিয়া চালাইলে ও মাত্র একজনকে হাতল ধরিয়া ভার সমতা রাখিতে হয়। ছবিতে আর-একরকমের বাইসাইকেল দেখুন। এই বাইসাইকেল চালান কিছুই শক্ত নয়, ইহাতে চড়াই বড় শক্ত। কিন্তু একবার চড়িয়া বসিলে সাইকেল বেশ দৌড়াইবে। এই বাইসাইকেলে দুইজনে পাশাপাশি বসিয়া দুইজনকেই প্যাডেল করিয়া সাইকেল চালাইতে হয়।

(৫) এতকাল পর্য্যন্ত বরফের দেশে কুকুর-টানা গাড়ী ব্যবহার হইত। সম্প্রতি একপ্রকার মোটর-ঠেলা স্লেজ আবিষ্কার হইয়াছে। এরোপ্লেনও এইসমস্ত বরফের দেশে খুব বেশী ব্যবহার হইতেছে। কুকুর-টানা স্লেজে যে স্থান অতিক্রম করিতে ২০ দিন লাগিত, এরোপ্লেনে তাহা চার ঘণ্টায় হয়।

এই মোটর স্লেজের গতিও খুব বেশী। মোটরের সাহায্যে একটি চাকা ঘোরে, এবং ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে বরফের উপর স্লেজ ঠেলিয়া লইয়া যায়।

ছড়ি-গাড়ী—

(৬) চিত্রে দেখুন একজন ভদ্রলোক তাঁহার শিশু কন্যাকে কেমন করিয়া একটি ঠেলা গাড়ীতে বসাইয়া লইয়া যাইতেছেন। এই

বরফের দেশের মোটরসেজ

ছড়ি-গাড়ী

ঠেলা গাড়ীটির মজা হইতেছে এই যে, দরকার না থাকিলে ইহাকে ছড়ির গায়ে জুড়িয়া রাখা যায়। এমনভাবে জুড়িয়া রাখা যায় যে, তখন ছড়ি লইয়া বেড়াইবার কোনই কষ্ট হয় না, ছড়ির সঙ্গে যে গাড়ী আট্‌কান আছে, তাহা বোঝাই যায় না বলিলে হয়। ইহা এখনও বাজারে উঠে নাই।

—

উভচর মোটর গাড়ী—

(৭) দুই পাশে দুইটি pontoon-যুক্ত হাওয়ার মোটর-বাই-সাইকেলটি জলে এবং ডাঙায় উভয় স্থানেই চলিতে পারে। জলে চলিবার সময় আরোহী তাহার পা দুটিকে উঠাইয়া রাখিলে ভিজিবার কোন
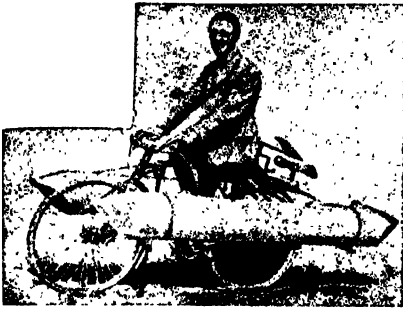
উভচর মোটর গাড়ী

ভয় নাই। জলে পেডালের সাহায্যে একটি প্রপেলার ঘোরে, তাহার জোরে গাড়ী অগ্রসর হইতে থাকে। হাতলের সঙ্গেই গাড়ীর পিছনে হালের যোগ আছে, তাহাতে গতি নিরূপণ করা যায়।

শিশু-রেলগাড়ী—

(৮) অ্যাট্‌লান্টা সহরের হ্যারিস্ নামে এক ভদ্রলোক একটি শিশু-রেলগাড়ী তৈয়ার করিয়াছেন। গাড়ীখানি মাত্র দু-তিন ফুট লম্বা, চাকাগুলিও ছয় ইঞ্চি মাত্র উঁচু। গাড়ীখানিকে ঠেলিতে হয় না, বাষ্পের
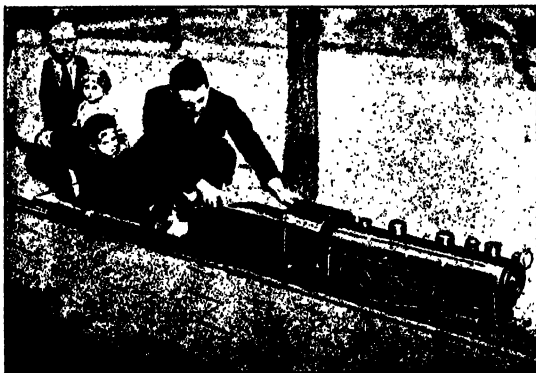
বাচ্চা রেলগাড়ী

সাহায্যে চলে। এই শিশু-রেলগাড়ীটিই নাকি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র লোক-টানা গাড়ী। ছবিতে দেখুন কেমন আরামে চারজন রেল গাড়ীতে চলিয়াছেন। কল-কব্জা এবং ধরণ-ধারণে বড় রেলগাড়ীর সহিত ইহার কোনপ্রকার বৈষম্য নাই, বেচারীর আকারই যা একটু ছোট, এই যা তফাৎ। ইনিও লাইন ছাড়া বে-পথে চলা-ফেরা করেন না।

—

নায়াগ্রার উপর তারের গাড়ী—

(৯) নায়াগ্রা নদীর উপর যাত্রীদের গমনাগমনের জন্য একপ্রকার তারের গাড়ীর বন্দোবস্ত আছে। শক্ত এবং মোটা তারের উপর গাড়ী খানি ঝুলিয়া চলে। বৈদ্যুতিক শক্তিতেই ইহা হয়। নদীর জলের দু-শ ফুট
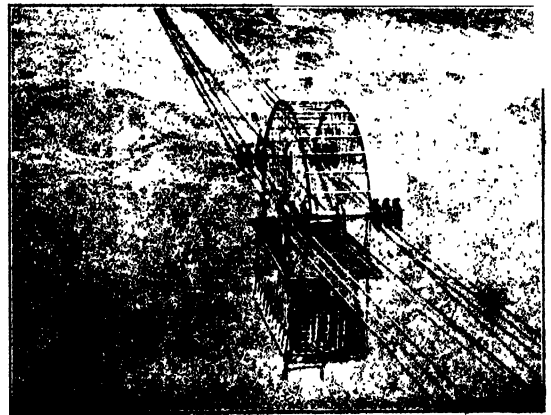
নায়াগ্রার উপর তারে ঝুলিতে ঝুলিতে গাড়ী চলিতেছে

উঁচু দিয়া এই গাড়ী চলে। গাড়ীর উপর বসিয়া নদীর ভীষণ বেগে প্রবাহিত জলকে দেখিয়া অনেকের মাথা ঘুরিয়া যায়, কারণ নীচে পড়িলে আর কোনরকমেই রক্ষা নাই!

—

২৫,০০০ বছরের শিল্প—

একজন ফরাসী মাটির নীচে এক গুহায় কতকগুলি পুরাকালের গুহাবাসী লোকদের নির্ম্মিত শিল্প আবিষ্কার করিয়াছেন। গুহাটি মাটির ১৩০০ ফুট নীচে অবস্থিত। এই গুহার মধ্য দিয়া একটি জলস্রোত আছে। মাঝে মাঝে গুহার ছাদের পাথর একেবারে জল ছুঁইয়া আছে। এই কারণেই এতদিন পর্য্যন্ত কেহ এই গুহার স্রোতে নামিতে সাহস করে নাই! কারণ পাথরের বেড়ার পরপারে মাটির তলায় কি আছে, তাহা কাহারো জানা ছিল না। প্রাণের মায়া ত্যাগ না করিয়া কেহ এইখানে নামিতে সাহস করে নাই।

এই ফরাসী যুবকের নাম নর্‌বু কাস্‌তিরে (Norbat Castiret)। ইনি একজন পাকা সাঁতারি। একটি রবারের বাক্সের মধ্যে দেশলাই এবং মোমবাতি ভরিয়া লইয়া, ইনি এই গুহার মধ্যে জলস্রোতে নামেন। গুহার উপরের পাথর যেখানে জল ছুঁইয়া আছে, সেই সেই স্থানে তিনি ডুব-সাতার দিয়া পার হন। এইরকমে প্রায় এক মাইল সাঁতরাইয়া

পাইরেনিস্ পাহাড়ের মধ্যের এক গুহাতে প্রাপ্ত একটি মূর্ত্তি

তিনি একটা ২৫০ ফুট লম্বা শুক্‌নো গুহায় আসিয়া পড়েন। এই গুহার দেওয়ালে নানা-প্রকার ছবি আঁকা আছে। পাথরের ধারালো টুকরা দিয়া এইসমস্ত ছবি পাথরের গায়ে খোদা হয়। বন্য মহিষ, আফ্রিকার জন্তু বন্য ঘোড়া, ইত্যাদি নানা-প্রকার পুরাকালের জন্তুর ছবি আছে। নানা-প্রকার জন্তুর মাটির তৈরী প্রতিমূর্ত্তি আছে। জলে এইসমস্ত মূর্ত্তিগুলির অনেক অংশ গলিয়া গিয়াছে।
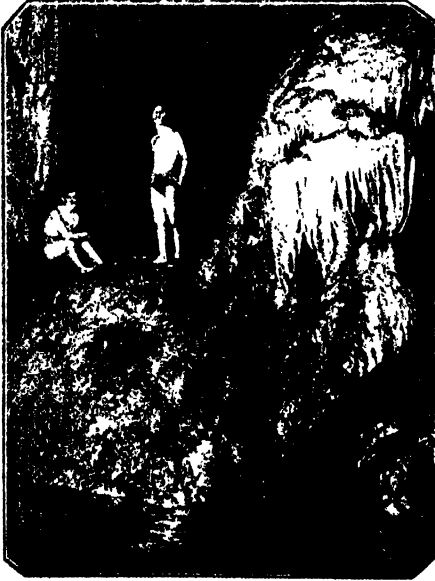
পাহাড়ের মধ্যের আর-একটি দৃশ্য--মাটির তলায় নদী পার হইয়া এই গুহায় পৌঁছাইতে হয়

একটি স্ত্রীলোকের অর্দ্ধমূর্ত্তি আছে। ইহার অতি নিকটে কতকগুলি বাঘের মূর্ত্তি আছে। সেই সময়কার লোকেদের নানা-প্রকার আঁক-জোকও এই গুহায় পাওয়া গিয়াছে। এইসমস্ত হইতে পুরাকালের লোকদের সম্বন্ধে হয়ত আরো অনেক নতুন অনেক কিছু জানা যাইতে পারে।

—

বুড়োর খেলা—

টম্ ওন্‌শের বয়স ৭০ বছর। কিন্তু এই বয়সেও সে অতিশয় বলবান্ এবং বালকের মতন চটপটে। বুড়ো তাহার যে কোন পাকে উঁচু করিয়া তাহার বুড়ো আঙুল কপালে ছোঁয়াইতে পারে! এই বুড়ো গত ৪০

৭০ বছরের বুড়োর কসরত্

বৎসর ধরিয়া আমেরিকার বহু সহস্র মাইল হাঁটিয়া ভ্রমণ করিয়াছে। বুড়ো এক সময় এক সার্কাসের দলের নাম জাদা খেলোয়াড় ছিল।

—

তারের পা--

যে কোন শিশুর কোমরে যদি একটি প্যাড্-দেওয়া পেটির সঙ্গে

পতন-রক্ষিণী তারের পা

তিনটি শক্ত তারের খোঁটা লাগাইয়া দেওয়া যায়, তবে শিশুর পড়িবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। এই তারের খোঁটা তিনটির মাটির দিকের প্রান্তে তিনটি কাঠের গোলক লাগান আছে, এইজন্য শিশু যে-দিকে ইচ্ছা হামাগুড়ি দিয়া যাইতে পারে, কিন্তু চেষ্টা করিলেও পড়িতে পারে না। ছবি দেখিলে ব্যাপারটি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবেন।

পা মানুষের বুদ্ধির মাপ্‌কাঠি—

মানুষের পা দেখিয়া তাহার বুদ্ধির সম্বন্ধে অনেক কথা বলা যায়, অবশ্য ইহা সাধারণভাবের কথা। প্রত্যেক মানুষ-সম্বন্ধেই যে ইহা সত্য হইবে, তাহার কোন মানে নাই।

হেন্‌রি ফোর্ড্
(বিখ্যাত মোটরকার-মালিক এবং পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা ধনী ব্যক্তি)

বৈজ্ঞানিক ওর্‌ভাইল্ রাইট্

পা-হাত লম্বা এবং শরীর ছোট হইলে সেই ব্যক্তি সাধারণতঃ অতি বুদ্ধিমান্ হয়। মাথার কাজই তাহার প্রধান কাজ এবং সেই কাজেই তাহার উন্নতির আশা আছে। মাথার কাজ মানে কেবল বই-পড়া, অঙ্ক-কষা বলিতেছি না, নতুন নতুন কলকব্জা আবিষ্কার ইত্যাদি সবই বলিতেছি। হেন্‌রি ফোর্ডের চেহারা দেখুন।

শরীর প্রকাণ্ড এবং হাত-পা ছোট হইলে, সেই ব্যক্তির পক্ষে গায়ের জোরের কাজই প্রশস্ত। হাতুড়ি পেটা-কল-চালান ইত্যাদি কাজ এই লোকেরা ভাল পারে। যেসব কাজে বিশেষ বুদ্ধির দরকার হয় না, কিন্তু ধীরভাবে করিতে হয়, সেইসব কাজ এই-সব লোকেদের দ্বারা খুব ভালরকম হয়।

টমাস্ এডিসন্
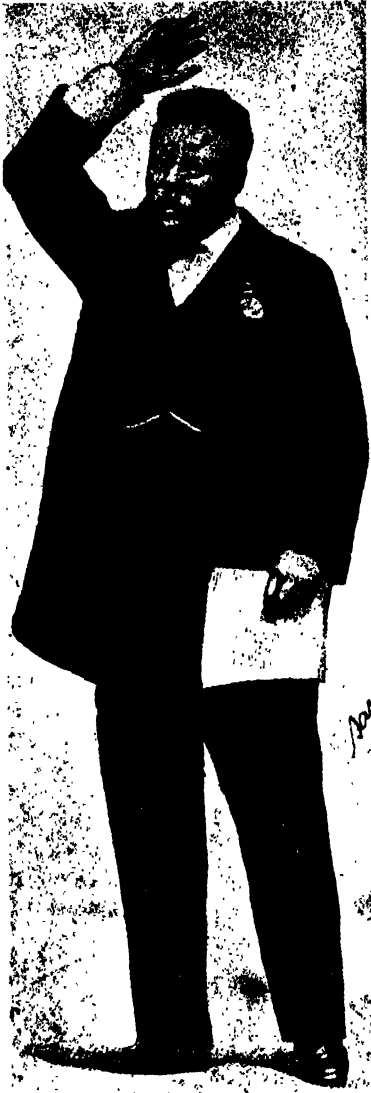
থিওডোর্ রুজ ভেল্ট্

যাহাদের শরীর বেশ সমান অর্থাৎ হাত-পা শরীরের তুলনায় ছোট-বড় নয়, তাহাদের সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলা চলে না। তাহারা বুদ্ধিমান্ এবং মস্তিষ্কের কাজে পটু হইতে পারে, আবার বিশেষ বুদ্ধিমান্ না হইয়া গায়ের জোরের কাজেও বেশ পটু হইতে পারে। টমাস্ এডিসনের চেহারা দেখুন।

ইহা পড়িয়া কেহ যেন মনে করিবেন না যে লম্বা হাত-পা হইলেই সে খুব বুদ্ধিমান্ হইবে এবং তাহা না হইলেই সে সাধারণ বুদ্ধির লোক হইবে। মজুর দলের মধ্যে এমন অনেককে দেখা যায় যে তাহাদের শরীরের অনুপাতে তাহাদের হাত-পা লম্বা। অথচ তাহারা সামান্য মজুরী করিয়াই দিন কাটাইতেছে, বিশেষ কোন বুদ্ধি খাটাইয়া নিজেদের কোন উন্নতি করিতে পারিতেছে না। তবে একদল লোককে সাধারণ-ভাবে পরীক্ষা করিয়া তাহাদের সম্বন্ধে এই কথা বলা যায়। কোলাম্বিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ৩০০ ছাত্রের শরীর পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছিল যে যে-সব ছাত্রের হাত-পা লম্বা, তাহাদের বুদ্ধিও সাধারণত হাত-পা-খাট ছাত্রদের অপেক্ষা বেশী। মজুরদলের মধ্যেও দেখা যায় যে যাহাদের হাত-পা লম্বা তাহাদের বুদ্ধিও অন্যান্য মজুরদের অপেক্ষা বেশী।

শতকরা হিসাবে বলিতে গেলে এইরূপ বলা চলে—লম্বা হাত-পা-ওয়ালা লোকেদের মধ্যে শতকরা ৭৬জন ভয়ানক বুদ্ধিমান্ হয়। সমান শরীরওয়ালা লোকদের মধ্যে অতি বড় বুদ্ধিমান্দের সংখ্যা শতকরা ৪০। এবং প্রকাণ্ড শরীর ছোট হাত-পা-ওয়ালা লোকদের মধ্যে শতকরা ১৫জন অতিরিক্ত বুদ্ধিমান্ লোক পাওয়া যায়।

লম্বা হাত পাওয়ালা লোকদের কয়েক জনের নাম দিলে বুঝিতে পারিবেন, এই কথার সত্যতা কতখানি। হেন্‌রি ফোর্ড, রক্‌ফেলার, জর্জ্জ্ ওয়াশিংটন্, লিন্‌কন্, উড্‌রো উইল্‌সন্, রামমোহন রায়, রবীন্দ্রনাথ, মার্ক্‌নি, টেস্‌লা। আরো অনেক নাম আছে, বাহুল্য-ভয়ে নাম করিলাম না। এডিসন্, রুজ্‌ভেল্ট্, নেপোলিয়ন্ ইত্যাদি সমান শরীরের লোক। ইঁহাদের শরীরের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আছে।

জ্যাক্ ডেম্প্‌সি এবং লুই ফির্‌নো বর্ত্তমান জগতে কাহারো অপেক্ষা কম বিখ্যাত নন, কিন্তু ইঁহারা ছোট হাত-পা এবং প্রকাণ্ড শরীর ওয়ালাদের দলের। বুদ্ধির জন্য ইঁহারা বিখ্যাত একেবারেই নন।

যেসমস্ত লোকের thyroid glandগুলি কার্য্যকারী হয়, সেই-সব লোকই সাধারণত ছোট শরীর এবং লম্বা হাত-পাওয়ালা হয়। এইসমস্ত লোক তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী, এবং প্রখর স্মৃতি-শক্তিমান্ হয়। উপরি-উক্ত glandগুলি যদি অতিরিক্ত কার্য্যকারী হয়, তবে এইসব লোক তাহাদের বুদ্ধিকে কেবল কল্পনায় এবং থিওরিতেই শেষ করে, সত্যিকার কাজ বিশেষ কিছুই হয় না।

প্রকাণ্ড শরীরওয়ালা লোকদের thyroid gland বিশেষ কার্য্যকারী হয় না। এইসমস্ত লোকেরা ছোটশরীরওয়ালা লোকদের অপেক্ষা ধীর, স্থির হয়। ইঁহাদের সহ্যগুণও খুব বেশী। এই-সব লোকের মানসিক শক্তি খুব ধীরে এবং আস্তে আস্তে কাজ করে, এই জন্যই এই সব লোকই পাকা ব্যবসায়ী হয়, ইঁহাদের সামান্য বুদ্ধি থিওরি এবং কল্পনা অপেক্ষা কাজেই বেশী চলে।

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়।

রুদ্ধ গৃহ

হরিহর কলেজ হইতে সবে পাশ করিয়া বাহির হইয়াছিল। কলিকাতার একটু বাহিরের দিক্ ঘেঁসিয়া অল্প ভাড়ায় দুইখানি ঘর লইয়া দেয়ালের গায়ে নূতন পিতলের সাইন বোর্ড আঁটিয়া সে ডাক্তার সাজিয়া বসিয়াছিল। বসিবার ঘরে চেয়ার ছিল, টেবিল ছিল, মেটিরিয়া মেডিকা ছিল, ঔষধের খালি ও ভর্ত্তি শিশি ছিল, যন্ত্রপাতিও কিছু কিছু ছিল, কিন্তু রোগীর দর্শন মিলিত না। তাই এই ঘরটার চাইতে চটের ঈজি চেয়ার-শোভিত দুই হাত চওড়া পথমুখী বারান্দাটির প্রতিই নবীন ডাক্তারের বেশী টান ছিল; যদিচ সেখানেও ঈজি চেয়ারের বুকে পড়িয়া নিজের শূন্য মন্দিরের ধ্যান করিতে তাহার বেশী ক্ষণ ভাল লাগিত না। তাই বেশীর ভাগ সময় তাহার দিন কাটিত বারান্দার রেলিং ধরিয়া ঝুঁকিয়া পথের পানে চাহিয়া চাহিয়া, নয় হাতের তেলোয় মুখ রাখিয়া আশে পাশের বাড়ীগুলির অন্দরের রহস্য উৎঘাটনে মন লাগাইয়া।

হরিহরের বাড়ীর একপাশে ছিল পোড়ো একটা মাঠের মধ্যে সাতকালের ভাঙা একটা মস্‌জিদ। তার গা বাহিয়া আকন্দ ফুলের মালা আপনি ফুটিয়া উঠিত, বুক চিরিয়া নিত্য নূতন অশ্বত্থ বৃক্ষের কচি পাতা দেখা দিত; প্রতি সন্ধ্যায় তার জীর্ণ দেহের অসংখ্য ফাটলের অন্ধকারকে নিবিড় করিয়া দেখাইবার জন্য পদতলে ছোট দুটি মাটির প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিত; কিন্তু ইহার মধ্যে হরিহর কোনো রহস্য খুঁজিয়া পাইত না, কোনো রোমান্সের ভিত্তির সন্ধানও করিত না।

বাড়ীর আর-এক পাশে ছিল, বাক্স-বিক্রেতা জয়কৃষ্ণ বাবুর দুই পক্ষের বিশাল পরিবার। আটটি মসী-নিন্দিতবর্ণা কন্যা ও পাঁচটি আবলুস-নিন্দিত পুত্রের উপর পৌত্র পৌত্রী বধূ জামাতায় মিলিয়া ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহখানির আনাচ-কানাচ এমন পরিপূর্ণ করিয়া রাখিত, যে, সত্যই সেখানে ছুঁচ ফেলিবার জায়গা পাওয়া যাইত না। ভোর না হইতে জল-তোলা, বাসন-মাজা, উনান-ধরানো, আপিসের ভাত বাড়ার কলরব সুরু হইত, সন্ধ্যা গড়াইয়া রাত্রির কোলে ঢলিয়া পড়িলেও চুল বাঁধা, গা ধোওয়া, ছেলে পিটোনো, ও বাবুর পায়ে তেল মালিশ প্রভৃতির সশব্দ পর্ব্ব সমাপন হইত না। বাড়ীর মধ্যে এমন কোনো মানুষ কি সময় কি স্থান ছিল না যাহার গায়ে রং ফলাইয়াও রহস্যময় করিয়া তোলা যায়। সে সংসারের স্থান কাল কি পাত্রের ধারার মধ্যে এমন কোনো ফাঁক পাওয়া যাইত না যেটুকুকে রসে রহস্যে গড়িয়া তুলিয়া কল্পনার খোরাক যোগান যায়।

হরিহরের বাড়ীর মুখোমুখি গলির ওপারের বাড়ীখানাই ছিল তার সব কল্পনার উৎস। দিনের পর দিন এই উচু পাচিলে ঘেরা বিশাল স্তব্ধ বাড়ীটার প্রচ্ছন্ন সংসারযাত্রার চক্রের শব্দহীন গতি সে অনুভব করিত, কিন্তু কোন্ পথে কোথায় কাহাকে অবলম্বন করিয়া যে সে সংসার চলিয়াছিল, হরিহর তাহা খুঁজিয়া পাইত না। তাহার কল্পনা আজ যাহা গড়িত, কাল তাহা ভাঙিয়া ফেলিত, রহস্য-জাল দিনকার দিন জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠিত।

রাস্তার ধারে লাল্‌চে রঙের প্রকাণ্ড দোতলা চক্‌-মিলানো বাড়ী। সারি সারি শার্শী খড়খড়ি অন্ধের চোখের মত দেয়ালের গায়ে সাজানো, দিনের আলো কবে কোন্ যুগে যে তাহার বন্ধন মোচন করিয়া অন্তঃপুরিকাদের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করিয়াছিল তাহা হয়ত ইতিহাস খুঁজিলে বলা যায়। তাহার পর আজ কতকাল ধরিয়া নিত্য প্রাতে তরুণ অরুণ তাহার আলোর অঞ্জলি আনিয়া বাতায়ন পথে নিবেদন করিতেছে, কিন্তু রুদ্ধ কবাট মুক্ত করিয়া সে অর্ঘ্য গ্রহণ কোনো কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীকে করিতে দেখা যায় না।

চিরকাল পরীক্ষার পড়া করিয়া, হরিহরের ভোর না হইতেই ঘুম ভাঙিয়া যাওয়ার রোগ দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া পলাতকা

নিদ্রাদেবীর সুখস্পর্শ ফিরিয়া পাইবার ব্যর্থ চেষ্টায় ক্লান্ত হইয়া রোদ না উঠিতেই তাহাকে উঠিয়া পড়িতে হইত। পাশের বাড়ীতে তখন কলের জল, উনানের ধোঁয়া, বাসনের ঝঙ্কার,—সবই গৃহস্থের বৃহৎ পরিবারের সঙ্গে সঙ্গে সজীব ও সজাগ হইয়া উঠিয়াছে। দেয়াল ও রেলিঙের গায়ে বিলম্বিত ভিজা কাপড়গুলি উড়িয়া উড়িয়া ইটেকাঠে গড়া পুরাতন বাড়ীখানাকেও যেন চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে।

হরিহর হাই তুলিয়া বারান্দায় বাহির হইয়া আসিয়া দেখিত সাম্‌নের লাল বাড়ীখানা নিত্যকার মত আজও তেম্‌নি নিঃশব্দ, তেম্‌নি নিঝুম। না জানি কোন্ সংসারবিমুখ তপস্বীর এ আবাস? ভৃত্য আসিয়া চায়ের পেয়ালা দিয়া যাইত; হরিহর চটের চেয়ারে বসিয়া দেখিত লাল বাড়ীর দরজায় বেসাতি লইয়া ভৃত্য কড়া নাড়া দিল; মুহূর্তে ভিতর হইতে কবাট খুলিয়া যাইত, আবার নিমিষেই বন্ধ হইয়া যাইত। ভিখারী দরজায় আসিয়া হাঁকিত, "জয় হোক মা, রাজরাণী হও", অম্‌নি অবগুণ্ঠিতা দাসী আসিয়া তাহার অঞ্চলে ভিক্ষা ঢালিয়া দিয়া রুদ্ধ দরজার অন্তরালে অন্তর্হিত হইত। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের তাপে কাতর কাক পাখী যখন ছাদের আলিসায় বসিয়া ধুঁকিত, তখন দেখা যাইত কবাটের আড়াল হইতে দাসী হাত বাড়াইয়া জানালায় ঝোলানো টিনের কৌটায় জল ঢালিয়া দিয়া যাইতেছে; পথের ধারের রকে ক্ষুধার্ত্ত কুকুর জিব্ মেলিয়া হাঁপাইত, দাসী ক্ষণিকের জন্য অর্গল খুলিয়া তাহাকেও মাথা ভাত ঢালিয়া দিয়া যাইতে ভুলিত না। তাহার পর দীর্ঘ দিন বহিয়া যাইত; জগৎসংসারের গতির সঙ্গে বন্ধ দরজার আড়াল তুলিয়া লাল বাড়ীখানা যেন আপনাকে আলগা করিয়া রাখিত। আশে পাশের বাড়ীর বাবুরা কেহ আপিষে যাইত, কেহ দোকান হইতে স্নান-আহারের আশায় বাড়ী ফিরিয়া আসিত, ছেলেরা ইস্কুলে ছুটিত, ছোট মেয়েরা সকালের খয়রাতী পাঠশালার বিদ্যাচর্চ্চা শেষ করিয়া কেহ ফুটপাথের কলে জল ভরিতে, কেহ বেণের দোকানে মশলা কিনিতে কেহ বা পড়শীর সঙ্গে পুতুল খেলিতে গলা ধরাধরি করিয়া অনবরত যাওয়া আসা করিত; পূজারী ব্রাহ্মণ গৃহদেবতার পূজা সারিয়া গামছায় নৈবেদ্য বাঁধিয়া বাড়ী ফিরিত; এম্‌নি শতেক যাওয়া শতেক আসার ফাঁকে দরজার হুড়কা কেবলি সশব্দে উঠিত পড়িত, ঘরের সঙ্গে বাহিরের যোগের কখন যে শেষ হইত বলা যায় না। অন্ধকার রাত্রেও কড়া-নাড়া, হুড়কা-পড়া আলো-দেখানোর বিরাম ছিল না; বাবুরা কেহ তাস খেলিয়া রাত বারোটায় বাড়ী ফিরিত, কেহ থিয়েটার দেখিয়া ফিরিয়া পাড়া জাগাইয়া স্ত্রীকন্যার ঘুম ভাঙাইত। কিন্তু লাল বাড়ীখানা যেমনকে তেম্‌নি আপনাকে লইয়া আপনি মশ্‌গুল হইয়া পড়িয়া থাকিত। বন্ধুগণের আনাগোনা সে বাড়ীতে হরিহরের চোখে কোনোদিন পড়ে নাই; হাসি-কান্নার কোনো ঝঙ্কারও সেখানে ধ্বনিত হইতে শোনা যায় নাই; শিশুর চঞ্চল চরণের চাপল্যও কোথাও দেখা যায় নাই। অথচ গৃহের অধিকারী যে ধ্যানমগ্ন তপস্বী ছিলেন এমন কথাও ত বেশী দিন বলা গেল না।

অনিবার্য্য কারণে যখন অবগুণ্ঠিতা দাসীকে চকিতের মত কবাট খুলিতে দেখা যাইত, তখন হঠাৎ একদিন চোখে পড়িল মর্ম্মরমণ্ডিত গৃহতলে মেহগনীর পালঙ্কে বকের পালকের মত শুভ্র সুন্দর শয্যা, দেয়ালের গা ঘেঁসিয়া চার হাত উঁচু আয়না, আলনার কোলে রংদার শাড়ীর চমক। কিন্তু তার বেশী আর দৃষ্টি যাইত না। শুধু গৃহরুদ্ধ বায়ু মুক্তির পথে একরাশ বকুলবেলার গন্ধ হরিহরের ঔষধের আলমারীর গায়ে দীর্ঘশ্বাসের মত ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইত। কোন্ সুন্দরীর এ অঙ্গসৌরভ, কাহার কেশবাসের এ অস্পষ্ট পরিচয়, হরিহর ভাবিয়া পাইত না। না জানি কোন্ সুদূর অন্তঃপুর হইতে কোন্ অপ্সরাকে হরণ করিয়া আনিয়া কে এই প্রাসাদকারাগারে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে? পলকের জন্য তাহার বিষাদমাখা মুখখানি দেখিয়া লইতে মন কত বার চঞ্চল হইয়া উঠিত। ইচ্ছা করিত ইউরোপীয় মধ্যযুগের বীরদের মত প্রাণ তুচ্ছ করিয়া এই বন্দিনীর বন্ধন মোচন করিয়া অমর প্রেম ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়া লয়

দুপুরের ঝাঁঝাঁ রৌদ্রে যখন পথ নির্জ্জন হইয়া আসিত, পথিকের পদ-শব্দ বিরল হইয়া আসিত, পাশের বাড়ীর

কল-কোলাহলও ক্ষণিকের জন্য শান্ত হইয়া পড়িত, তখন গ্রীষ্মাধিক্যে মেঝের উপর মাদুর বিছাইয়া হরিহর ঘুমাইবার চেষ্টা করিত। কিন্তু নিঃশব্দ মধ্যাহ্নের সুযোগ পাইয়া লালবাড়ীর বন্দী প্রাণ যেন ক্ষীণকণ্ঠে তাহার চোখের ঘুম তাড়াইয়া কি জানাইতে চাহিত। কে যেন অন্ধকার বন্ধ ঘরের এপ্রান্ত হইতে ওপ্রান্ত পর্য্যন্ত চঞ্চল-চরণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, রুদ্ধ জানালার কবাটে কবাটে কিসের যেন টানাটানি; বন্দিনী কি কবাট ভাঙিয়া এই পথে পলাইয়া যাইতে চায়? দীর্ঘ বন্দীদশায় তাহার শ্বাস কি রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে? মেঝেতে কাণ আরও চাপিয়া ধরিয়া সে শুনিত কে যেন বুকভাঙা কান্না টিপিয়া রাখিতে রাখিতে ফুঁপাইয়া উঠিতেছে। ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া সে দেখিত বহুকালের বন্ধ ক। খড়খড়ির গায়ে মাকড়সার জালে ও ধূলার পরতে পরতে দীর্ঘ বিগত দিনমালার সূত্র বাড়িয়া চলিয়াছে মাত্র; সেখানে চাঞ্চল্যের কোনো চিহ্ন নাই।

জ্যোৎস্নারাত্রে খোলা ছাদে শুইয়া নারিকেল-কুঞ্জের মাথায় চাঁদের আলোর ঝরণা ঝরিতে দেখিতে দেখিতে কতদিন হরিহরের মনে হইয়াছে এই জ্যোৎস্নার সুরের মত গভীর কার প্রেম-বিহ্বল কণ্ঠস্বর যেন পথপারের রুদ্ধ গৃহতল ভরিয়া তুলিতেছে। কোন্ সে প্রেমিক বাহিরের জ্যোৎস্নার রূপ উপেক্ষা করিয়া অন্ধকারের গোপন কোণে তাহার বন্দিনী প্রেয়সীর সন্ধানে লুকাইয়া আসিয়াছে কে জানে? মনে হইত অন্ধকারের এই আনন্দ-উৎস যেন জ্যোৎস্নার জোয়ারকেও ছাপাইয়া উঠিতেছে। পুষ্প-সৌরভে নিশীথবায়ু ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিত, আকাশভরা আলোর তলায় প্রকাণ্ড বাড়ীর জমাট অন্ধকারও যেন প্রাণরসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। হয়ত বা এ কোন্ পলাতক প্রণয়ীযুগলের গুপ্ত বাসস্থান যাহারা মানুষের সকল সম্পর্ক সভয়ে এড়াইয়া চলে।

এম্‌নি করিয়া কতদিন কাটিয়া গেল। ঋতুর পর ঋতু চঞ্চল গতিতে চলিয়া গেল; কিন্তু বন্দিনীর মুক্তির চেষ্টা আর করা হইয়া উঠিল না, গোপন-চারিণীর অন্তরের রহস্য চিরআবৃতই রহিয়া গেল। দুটি চারিটি করিয়া দিনের সঙ্গে পুরানো দিনের চিন্তার ধারা যখন ক্রমে আগাগোড়া বদল হইয়া আসিতেছে, এমন সময় এক শুক্লা দ্বাদশীর রাত্রে খুট্ করিয়া সাম্‌নের বাড়ীর দরজা খুলিয়া অবগুণ্ঠিতা দাসী আসিয়া হরিহরের দরজায় দাঁড়াইল। দাসী শুধু বলিল, "ডাক্তার বাবু একবার আসুন।" ডাক্তার কোনো প্রশ্ন না করিয়াই উঠিয়া পড়িল। ধীরে সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া সাম্‌নের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। যে দরজায় কোনো দিন কাহাকেও পা দিতে দেখে নাই, তাহার চৌকাঠ ডিঙাইতে পা উঠিতেছিল না। দাসী বলিল, "ভিতরে চলুন।"

দরজার ভিতর শ্বেতপাথরের মাজা-ঘসা মেঝে ঝক্‌ঝক্ করিতেছিল। ভিতরের বারান্দায় সারি-সারি চীনা মাটির টবে ফুলের গাছ। পাশে চীনা মাটির বড় চৌবাচ্চায় কাচের মত স্বচ্ছ নির্ম্মল জল কালো কাঠের খোলা দরজার ভিতর দিয়া দেখা যাইতেছে। ছোট জলচৌকিতে রূপার ঘটি তেলের বাটি সাবানদানি সাজানো। কোনো কিছুর গায়ে একটু ময়লার দাগ নাই। উপরে উঠিবার সিঁড়ির মুখোমুখি আবলুস্‌কাঠে বাঁধানো মস্ত বড় আয়না। হঠাৎ নিজের ছায়া দেখিয়া মনে হয় খোলা দরজা দিয়া কে যেন উল্টা দিক্ দিয়া আসিতেছে। মাথার উপর রূপার ঝাড় দুলিতেছে, কিন্তু তাহাতে বাতি নাই। দোতালার সাম্‌নের ঘরে লাল রেশমের পর্‌দা ঝুলিতেছে; পর্‌দা তুলিয়া দাসী ভিতরে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল; হাওয়ায় ওড়া পরদা ও অকস্মাৎখোলা দরজার ফাঁকে যে ঘরখানির একটু চিহ্ন এত দীর্ঘ দিনে দুই একবার মাত্র চোখে পড়িয়াছে, দেখিয়াই ডাক্তার তাহা চিনিল। সেই মেহগনীর জোড়া পালঙ্কের উপর শুভ্র চাদরে ঢাকা মখমলের গদি, সেই দেয়ালজোড়া আয়নার দুই পাশে রূপার বাতি। পাশে ছোট তিন পায়ার উপর রূপার থালায় ফুলের মালা সাজানো, আলনায় জরি ও রেশমের ছড়াছড়ি, রঙে রঙে ঘর উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, পায়ের কাছে রাঙা চটি ও জরির জুতা; চৌকা একটা টেবিলের উপর সোণার চিরুণী কাঁটা, রেশমী ফিতা, গন্ধ তেল, প্রসাধনের আরো কত কি সরঞ্জাম। কোণে পিঁড়ির উপর কালো পাথরের জলের কুঁজা। রোগীর ঘরের এ কেমন সজ্জা! কাহার বাসর-গৃহে সে ভুল করিয়া আসিয়া

পড়িয়াছে ভাবিয়া ডাক্তার বিব্রত হইয়া পড়িতেছিল। কিন্তু ঘরে ত মানুষ নাই! এই বেলা পলাইতে পারিলেই ভাল; নহিলে না জানি এখনি পরদা ঠেলিয়া কোন্ ইন্দ্রাণীর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি আসিয়া তাহার উপর পড়িবে! সুন্দরীর দেহ-যষ্টি যেন কোন্ তিরস্করিণী বিদ্যার জোরে দৃষ্টির বাহিরে রহিয়াছে মাত্র কিন্তু সমস্ত কক্ষতল তাহারি সত্তায় পরিপূর্ণ। আর-একটু আগাইয়া ঘরের ভিতরেরই আর-একটা পরদা তুলিয়া দাসী অন্য ঘরে চলিল। শূন্য-প্রায় ঘরের কোণে ছোট একটি খাটে কে যেন শুইয়া আছে; ঘরে আলো নাই, ভাল করিয়া দেখা যায় না। দাসী আলো জ্বালিতেই রোগীর দিকে দৃষ্টি পড়িল। জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালসার দেহখানি বিছানার সঙ্গে মিলাইয়া গিয়াছে। সে চোখ মেলিয়া আলোর দিকে সভয়ে চাহিয়া বলিল, "আলো, আলো কেন?" ভয়ে তাহার বিবর্ণ পাংশুমুখ শুকাইয়া উঠিল। দাসী ডাক্তারকে দেখাইয়া দিল। রোগী এইবার ফিরিয়া বলিল, "ডাক্তারবাবু, আমার কি হয়েছে বল্‌তে পারেন।"

হরিহর বলিল, "তাই দেখ্‌তেই ত এসেছি।"

রোগী বলিল, "তবে তাড়াতাড়ি দেখে নিন; বেশী দেরী কর্‌লে চল্‌বে না; তার আসার সময় হ'য়ে এল!"

বিস্মিত ডাক্তার বলিল, "কে আস্‌বে?"

শিরাবহুল রক্তহীন হাতখানা নাড়িয়া ডাক্তারকে কাছে ডাকিয়া গলা নামাইয়া অতি সন্তর্পণে রোগী বলিল, "যামিনী, যামিনী।"

হরিহরের পুরাতন কৌতূহল জাগিয়া উঠিল। সে ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "যামিনী কে?"

বিরক্তিতে রোগীর কুঞ্চিত ললাট রেখায় রেখায়-ভরিয়া উঠিল। সে বলিল "কে? সেই ত সব। দেখে' বুঝ্‌তে পার্‌ছ না! তার ঘর তার বাড়ীর মত লাগ্‌ছে না? এ কি এক দিনের কাজ? কত দিন কত বৎসর ধরে' তিল তিল করে' সঞ্চয় করেছি, শরীরের বিন্দু-বিন্দু রক্ত দিয়ে গড়েছি, তবে না আজ এর এত রূপ! বল না ডাক্তার, তার মনে ধর্‌বার মত কি হয়নি?"

হরিহর কিছু না বুঝিয়াই বলিল, "হয়েছে।" রোগীর মুখে ম্লান হাসির ক্ষীণ একটি রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, "তবে, তবে আর দেরী কেন? আর কি এখনো এ-রঙ্গ, এ-খেলা ভাল দেখায়? ভুল করেছিলাম বটে, আমিই প্রথমে; তাই বলে' কি চিরকালই এমনি লুকোচুরি খেলে' আমায় যন্ত্রণা দিতে হবে? কে জানে, মেয়েমানুষের মন এতে কি আনন্দ পায়? কিছুতেই বেঁধে রাখ্‌তে পার্‌লাম না! রাজার মেয়ে সে, দরিদ্রের ঘরে দুঃখ পাবে এই ভয়েই না তখন আন্‌তে চাইনি। রাজরাণীর মত ঘর সাজাতে একটু সময় লাগে বৈকি! তাতেই কি অমনি অভিমান কর্‌তে হবে? আর আজ যে এত সাধনা কর্‌ছি, এর কি কোনোই মূল্য নেই? মুখের কথায় যখন কিছুতেই তাকে ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পার্‌লাম না, তখন ভেবেছিলাম খাঁচার পাখীর মত বন্দী করে' তাকে ধরে' রাখ্‌ব। বাড়ীর চারিধারে পাঁচিল দিলাম, পাঁচ হাত উঁচু করে'। ডাকাতে পারে না এ পাঁচিল পার হ'তে, কিন্তু সে তাও এড়িয়ে গেল। তার পর যত ঘরে যত দরজা যত জানালা ছিল, সব পেরেক ঠুকে' একেবারে বন্ধ করে' দিয়েছি। দেখ্‌তেই পাচ্ছ কেবল আসা যাওয়ার পথটুকু রেখেছি মাত্র। কিন্তু সে বিদ্যুতের আলো বাঁধতে পার্‌লাম না। সারাদিন বাড়ীময় ঘুরে' ঘুরে' দেখি কোথায় ফাঁক আছে কি না, দোর জানালা টেনে টেনে দেখি কোথাও আল্‌গা হ'য়ে গেছে কি না, কিছুই ত বুঝ্‌তে পারি না।"

হরিহর বলিল, "যদি তাকে রাখ্‌তেই পারেননি, তবে আর বৃথা কষ্ট করেন কেন?"

রোগী হাসিয়া বলিল, "সে কি কম মায়াবিনী? আমাকে পাগল কর্‌তে সে প্রতিরাত্রে আসে। অন্ধকার ঘরে আসে, দূর থেকে কথা কয়, আবার আলো না হ'তেই কোথায় চলে যায়, হাওয়ার সঙ্গে যেন মিলিয়ে যায়। একবার চোখের দেখাও দেয় না। তার পর তন্ন তন্ন পাতি পাতি করে' খুঁজেছি, কোথাও তাকে পাইনি। কোন্ পথে সে আসে তাও জানি না, কোন্ পথে যায় তাও বল্‌তে পারি না। অন্ধকারে যখন সমস্ত বাড়ী ছেয়ে যায় তখন ঢুক্‌বার জন্যে খিড়কীর বাগানের দরজা একটিবার খুলে' রাখি বটে, কিন্তু সে আন্‌বার পর কতদিন বেরিয়ে গিয়ে দেখেছি দুয়ারে ভিতর থেকে তালা বন্ধ।"

হরিহর বলিল, "হঠাৎ আলো জ্বেলে একদিন দেখেন-নি কেন ?"

রোগী বলিল, "দু-দিন দেখ্তে গিয়েছিলাম, ঝড়ের মত ছুট্কে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, তার পর ঝি চাকর আমি তিন জনে মিলে' সারা-বাড়ী ওলোট-পালোট করে' কোথাও তাকে পেলাম না ...টা রাত আমার ওইটুকু সুখও নষ্ট হ'ল। সে বলেছে আর কখনও যদি রাত্রে আমি তাকে অমন করে' দেখ্তে চেষ্টা করি তবে হয় আমি তার মরা মুখ দেখ্ব, নয় চিরদিনের জন্য সে দূরে চলে' যাবে। সেই ভয়ে আর আমিও চেষ্টা করিনি। সে আমার ঘরের লক্ষ্মী পাছে ছল করে চলে' যায়, তাই কাক পক্ষী, কুকুর, বিড়াল, ভিখারী, কাউকে কখনও বিমুখ করি না। লক্ষ্মীকে তবু ঘরে ধরে' রাখ্তে পার্ছি না।"

কথা বলিতে বলিতে শ্রান্ত হইয়া রোগী হাঁপাইতে লাগিল। হরিহরের অন্তরের ডাক্তার হঠাৎ সচেতন হইয়া নিজ কাজে লাগিয়া গেল। অনেক কষ্টে রোগীকে ঘুম পাড়াইয়া ডাক্তার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। বাহিরে আসিয়া দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে ভাল করে' ত বুঝ্লাম না! রাত্রে কি ঘুম হয় না ?"

দাসী বলিল, "কোনো রাত্রেই ত চোখে ঘুম দেখি না। সারা রাত যামিনীর সঙ্গে কথা কয়, হাসে কাঁদে।"

ডাক্তার বলিল, "যামিনী কোথায় ?"

দাসী বলিল, "এই বাড়ীতেই আছে।"

হরিহর বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বলিল, "তাকে দেখা যায় না কেন তবে ?"

দাসী বলিল, "যায় বৈকি, ও পাগল, চিন্তে পারে না।"

ডাক্তার বলিল, "কি আশ্চর্য্য! এত যাকে ভাল-বাসে তাকেও আবার মানুষ চিন্তে পারে না ?"

দাসী হাসিয়া বলিল, "আশ্চর্য্যি আর কি ডাক্তার বাবু ? চিন্তে পারাই বরং আশ্চর্য্যি; চল্লিশ বচ্ছর পরে কেউ কখনও কাউকে চিন্তে পারে ?"

হরিহরের বিস্ময় বাড়িয়াই চলিতেছিল। সে বলিল, "তার মানে ?"

দাসী বলিল, "মানে ? রামনগরের বাবুদের মেয়েকে অভিলাষ যখন বিয়ে কর্তে চেয়েছিল তখন মেয়েটির বয়স ছিল পনের আর অভিলাষের বয়স ছিল কুড়ি। বাবুদের বাড়ীতেই ভাত খেয়ে সে মানুষ, এক পয়সাও তার মুরোদ ছিল না। ভিখিরী রাজার মেয়েকে বিয়ে কর্তে চায় শুনে' বাবুরা ত হেসেই অস্থির! বল্লেন 'অভিলাষের অভিলাষ ত খুব বড় দেখ্ছি, কিন্তু ওইখানেই কি সব পৌরুষ শেষ হ'য়ে গেছে ?' অভিলাষের বড় অভিমান হ'ল। সে বল্লে 'আচ্ছা, চাইবার মত মুরোদ যেদিন হ'বে, সেদিন আস্ব। সেদিন আমায় কে ফিরোয় দেখ্ব।' টাকার সন্ধানে সে বিদেশে চলে' গেল। বাবুরা মেয়ের বিয়ের অন্যত্র চেষ্টা কর্তে লাগ্লেন। মেয়ে কিন্তু বেঁকে বস্ল, কিছুতেই বিয়ে কর্বে না। চার বছর পরে অভিলাষ যখন ফিরে' এল, তখন তার চাক্রী হয়েছে আশী টাকা মাইনে, কিন্তু বাবুদের মেয়ের বিয়ে হয়নি। বাবুরা তবু দেমাক্ ছাড়্তে না পেরে বল্লেন, "হ্যাঁ, পান-মশলার ব্যবস্থাটা হয়েছে বটে, কিন্তু আমাদের মেয়ের ভাত-কাপড়ও লাগে।" অভিলাষ মেয়ের সঙ্গে দেখা কর্তে চাইলে বাবুরা শক্ত গালাগালি দিয়ে বিদায় করে' দিলেন। সে আবার চলে' গেল; এবার একেবারে কোন্ তেপান্তরের পারে তা কেউ জানে না। এদিকে মেয়ের বয়স বাড়তে লাগ্ল কিন্তু কিছুতেই তার বিয়ে দেওয়া যায় না। শেষে এত বয়স হ'য়ে উঠ্ল যে বাবুদের বাইরে মুখ দেখান ভার হ'য়ে দাঁড়াল। তাঁরা অভিলাষের সন্ধানে লোক পাঠালেন যে এবার এলেই বিয়ে দেবেন।

এবার সে-ই বাবুদের বিমুখ কর্লে, এল না; বল্লে, বাড়ী হয়নি। আবার কিছু দিন বাদে লোক গেল; সেও ফিরে' এসে বল্লে, গহনা হয়নি। এক বছর বাদে আবার লোক গেল; ফিরে' এসে বল্লে, আসবাব বাকি আছে। শেষে সবাই বুঝ্লে মানুষটার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে তার পর কতকাল গেল; বাবুদের বাড়ী যা কখনও হয়নি তাই হ'ল। তিনকেলে আইবুড়ো মেয়ে রেখে বাপ ভাই সব একে একে মরে গেল। বাড়ীতে সেই মেয়েই তখন সবার মাথার ওপর।

এমন সময় একদিন শোনা গেল অভিলাষ এসেছে যামিনীকে নিয়ে যেতে। শুনে' যামিনী পড়ে' পড়ে'

কতক্ষণ কাঁদল। তার পর কি জানি কেন উঠে' পাকা চুলের উপর ঘোমটা দিয়ে চল্‌ল দেখা কর্‌তে। ভুলে' গিয়েছিল বোধ হয় যে সব চুল সাদা হ'য়ে গেছে, দাঁত কটার অর্দ্ধেক পড়ে' গেছে, রাঙা মুখ মেছেতায় কালী হ'য়ে গেছে, ননীর মত নরম গড়ন প্যাঁকাটির মত পাকিয়ে গেছে। এসব মনে থাকলে হয়ত যেত না। অভিলাষের সাম্‌নে গিয়ে হেসে দাঁড়াতেই সে আগুনের মত জ্বলে' উঠে' বল্‌লে, "এত দিনেও হয়নি? তুমি আবার কি বল্‌তে এসেছ রাক্ষুসী? যামিনীকে এখুনি পাঠিয়ে দাও।" ঘুরে' পড়তে পড়তে যামিনী সাম্‌লে নিলে! তার পর ছুটে' ঘরে চলে' গেল। অনেক কেঁদে কেটে চিঠি লিখে' পাঠিয়ে দিলে—

"আমার দাসীকে কাল তোমার ওখানে পাঠাবো। ঠিকানা রেখে যাও। তার পর সময় মত আমি এক দিন যাব; সেখানে গিয়েই যা কর্‌বার করা যাবে। আমাকে সম্প্রদান কর্‌বারও কেউ নেই, আমি নিজেই নিজের ব্যবস্থা করব। তোমাকে ত অনেক ডেকেও পাইনি, এক বার ডাকতেই আমি যাব ভাব্‌ছ কি করে? দাসী আপাতত ঘর সংসার গুছিয়ে রাখুক গিয়ে।" এবারেও অভিলাষকে ফিরে' যেতে হ'ল। তার পর দিন লুকিয়ে যামিনী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়্‌ল। দাসী হ'য়ে এসে সেই ঘর-সংসার গোছালে, সেবা যত্নও কর্‌লে, কিন্তু পাগ্‌লা অভিলাষ এততেও তাকে চিন্‌তে পার্‌লে না। শেষে অন্ধকার এক রাত্রে সাজসজ্জা করে' সে গেল নিজের পরিচয় নিজেই দিতে। তার কথার স্বর শুনে'ই অভিলাষ চম্‌কে উঠ্‌ল। যামিনী বুঝ্‌ল শুধু ওইটুকুই তার চিন্‌বার মত আছে। দুঃখে তার চোখ ফেটে কান্না বেরিয়ে এল। ঠিক্ কর্‌লে এমুখের পরিচয় আর দেবে না। তার পর অন্ধকারে দেখার কড়ারে আজ কত দিন ধরে' রোজ রাত্রে তাদের কথাবার্ত্তা হয়। পাগল বোঝে না যে, সে যামিনী মরে' গেছে; তাকেই সে রোজ ফিরে' চায়; কিন্তু কে এনে দেবে তাকে? সেই অপ্সরার রূপ-বন্দনা কানে শুনে' কার প্রাণ ওঠে ওই মড়া-মূর্ত্তিকে সে বলে' পরিচয় দিতে? প্রতিরাত্রে যারা এসব কথা শোনে আর শোনায় তারা কেউ ত কাউকে দেখে না, তাই মনে হয় পৃথিবীতে এমনি যে দিন আর ফেরানো যায় না; অন্ধকারের ঢাকা দিয়ে শরীরটাকে ভুলে যেন তাকে ফিরে' পাওয়া সম্ভব। কিন্তু দিনের আলোয় একথা ভেবে সান্ত্বনা পাওয়া বড় শক্ত, তাই যামিনী এখনও যখন-তখন কান্না চাপ্‌তে হাঁপিয়ে ওঠে। চেঁচিয়ে কাঁদ্‌বারও তার জো নেই, কারণ গলার স্বরেই তাকে চেনা যায়।"

হরিহর বলিল, "কোথায় সে যামিনী, আমায় একবার দেখাও না।" দাসী ম্লান হাসি হাসিয়া বলীরেখাঙ্কিত মুখ তুলিয়া বলিল, "এই যে।"

সারারাত মুমূর্ষু রোগীর সঙ্গে যুঝিয়া সকালে হরিহর চটের ঈজি চেয়ারখানার উপর পড়িয়া ঝিমাইতে ঝিমাইতে ভাবিতেছিল, রাত্রে সে স্বপ্ন দেখিয়াছিল, না সত্যই এসব কথা শুনিয়াছে।

শ্রী শান্তা দেবী

সমাজসংস্কার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

[উত্তর-ভারতীয় সামাজিক মন্ত্রণা-সভার সভানেত্রী শ্রীযুক্তা পূর্ণিমা দেবীর অভিভাষণের মর্ম্মানুবাদ]

সভানেত্রীর আসন গ্রহণ বিষয়ে নম্রতা প্রকাশ করিয়া ভারতবর্ষীয় স্ত্রীজাতির প্রতিনিধিরূপে সভানেত্রী মহাশয়া সংক্ষেপে তাঁহার বক্তব্য জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন যে, সামাজিক সমস্যাগুলি সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে,—প্রথমতঃ যেগুলি কেবল পুরুষ-জীবন-সম্বন্ধীয়, দ্বিতীয়তঃ যেগুলি স্ত্রীজীবনের উপরই

আধিপত্য বিস্তার করে। অবশ্য স্ত্রী-পুরুষের জীবন এক-সূত্রেই গাঁথা। কবি গাহিয়া গিয়াছেন যে, যাহা স্ত্রী-লোকের ভাবিবার বিষয় তাহা পুরুষেরও ভাবিবার বিষয়; স্ত্রী-পুরুষের উত্থান ও পতন একসঙ্গেই সম্ভব। কবির এই কল্পনা সত্য হইলেও স্ত্রী-পুরুষের সামাজিক সমস্যাগুলি স্বতন্ত্র-ভাবে আলোচনা করাতে অনেক সুবিধা আছে। মহিলা সভাপতিরূপে তিনি তাঁহার স্বশ্রেণী স্ত্রীজাতির সামাজিক সমস্যাগুলির আলোচনা করিতেই সকলের অনুমতি প্রার্থনা করেন; যেহেতু পুরুষজীবনের সামাজিক সমস্যার আলোচনা করিবার তেমন যোগ্যতা তাঁহার আছে বলিয়া তিনি মনে করেন না।

তিনি বলেন, ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকের উন্নতি দ্বিবিধ পর্দ্দা দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। এক বাহ্য পর্দ্দা, আর-এক মানসিক পর্দ্দা। বাহ্য পর্দ্দার ফলে স্ত্রীলোক গৃহ-কোণে আবদ্ধ হইয়া থাকে। মানসিক পর্দ্দা দ্বারা স্ত্রীলোকের মন জ্ঞানের আলোক হইতে বঞ্চিত এবং অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়। বস্তুতঃ মানসিক পর্দ্দা বাহ্য পর্দ্দা অপেক্ষা অনেক বেশী অনিষ্টকর; যদিও উভয়ের মধ্যে একটা অবিচ্ছিন্ন সংস্রব রহিয়াছে। মুসলমান রাজাদের আধিপত্য- ও অনুকরণ-বশতঃ উত্তর ভারতেই পর্দ্দা অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের উন্নতির পথে অধিকতর বাধা দিয়াছে। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই-সংখ্যক ইণ্ডিয়ান্ লেডিস্ ম্যাগাজিন্ হইতে বাক্যাংশ উদ্ধৃত করিয়া তিনি বলেন—পর্দ্দা দ্বারা স্ত্রীলোক গৃহ-কোণে আবদ্ধ হইয়া থাকে এবং তাহাতে তাহারা ঈশ্বরের আলোক-বাতাস হইতে বঞ্চিত হয়। সেজন্য তাহাদের দেহ সুস্থ ও সবল হইতে পারে না। ফলে স্ত্রীলোকের এক দুর্ব্বল ও রুগ্নকায় জীব-বিশেষ হইয়া পড়ার আশঙ্কা আছে। পর্দ্দা দ্বারা স্ত্রীলোকের নূতন তথ্য জানিবার কৌতূহল নষ্ট হইয়া যায় এবং পরিদর্শন করিবার ক্ষমতাও বিলুপ্ত হয়। পর্দ্দার ফলে বালিকারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই স্কুল ছাড়িয়া গৃহ-কোণে প্রবেশ করে। সেজন্য স্ত্রীলোকের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা বিস্তার-লাভ করিতে পারে না। তাহাতে স্ত্রীলোকের কুসংস্কার ও অজ্ঞতা দৃঢ় ও চিরস্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। মাতার উৎকর্ষের উপর যখন সন্তানের শিক্ষাদীক্ষা নির্ভর করে তখন এই কথাও বলা যাইতে পারে যে, পর্দ্দা দ্বারা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারেরও বাধা ঘটিয়া থাকে। ইহাতে সামাজিক ক্ষতিও আছে। স্ত্রীলোক সাধারণতঃ পুরুষ-মনের সুকুমার বৃত্তিগুলি পরি-স্ফুট করিয়া দেয়। পর্দ্দার ফলে স্ত্রীলোকের আত্মশক্তির পরিস্ফুটন হয় না বলিয়া স্ত্রীলোকের দ্বারা পুরুষের মনো-বৃত্তি-বিকাশ সম্ভব হয় না। পর্দ্দার ফলে সমাজের মধ্যে অমিতাচার প্রভৃতি দোষগুলিও প্রবেশ করে। পর্দ্দার ফলে স্ত্রীলোক পদে-পদে প্রবঞ্চিত হয় এবং কপটাচারী লোক এরূপ নিরুপায় স্ত্রীলোকের যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া থাকে। পর্দ্দার ফলে দেশে এমন আইন হইয়াছে যাহাতে স্ত্রীলোক নিজে কোন বৈষয়িক কর্ম্ম করিতে অক্ষম; যাহারা স্ত্রীলোকের সহিত কোনরূপ বৈষয়িক কর্ম্ম করে তাহারাও এরূপ আইনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে।

এই পর্দ্দা কখনো সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হইতে পারে কি না স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু যতদিন এই নিয়ম সমাজে আছে ততদিন পর্দ্দার ভিতরে থাকিয়াই স্ত্রীলোকের আত্মোৎকর্ষ এবং পরিবারে ও সমাজে আত্মশক্তি বিস্তার করিতে হইবে। রীতিমত জেনানা-শিক্ষা দ্বারা স্ত্রীলোকের কুসংস্কার ও অজ্ঞতা দূর করিতে হইবে। স্ত্রীলোকের প্রতি স্ত্রীলোকের যে কর্ত্তব্য রহিয়াছে সেই দায়িত্ব হইতে স্ত্রীলোক নিজেকে নিষ্কৃতি দিতে পারে না। অন্ধতমসাচ্ছন্ন গ্রাম্য স্ত্রীলোকের সম্মুখে শিক্ষিতা স্ত্রীলোকেরাই জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়া দিতে পারে এবং তদ্দ্বারা তাহাদের ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইতে পারে। গ্রাম্য স্ত্রীলোকের চলিবার বা ভাবিবার শক্তির অভাব নাই; কিন্তু তাহারা হস্ত-পদাদি এমন কি মস্তিষ্কেরও ব্যবহার করিতে জানে না। স্ত্রীলোকেরা যেন অজ্ঞতার প্রতিযোগিতা করিয়া চলিতেছে; কে কত কম শিক্ষায় জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে তাহা দেখানোই যেন স্ত্রীলোকের গৌরবের বিষয়।

উত্তর-ভারতে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের অনেকগুলি কুসংস্কার-মূলক অন্তরায় বিশেষভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। সাধারণতঃ বালিকাদিগকে স্কুলে পাঠান হয় না; কেন না তাহাতে অনেক খরচ করিতে হয়। এই খরচটা

লোকে মোটেই লাভজনক মনে করে না, যেহেতু বিবাহের পর কন্যা পরিবারান্তরে চলিয়া যায় এবং সে-জন্য তাহার শিক্ষার্থ একান্নবর্ত্তী পরিবারের ধন হইতে যাহা ব্যয় হয়, তাহাতে সেই পরিবারের মোটেই লাভ হয় না। পক্ষান্তরে একান্নবর্ত্তী পরিবারের ধন-ভাণ্ডার হইতে ছেলের শিক্ষায় যাহা ব্যয় হয় ছেলের উপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা তাহা পূর্ণ হইতে পারে। আরও একটি কথা। কন্যার বিবাহে অনেক ব্যয় করিতে হয়; ছেলের বিবাহে যৌতুকাদি দ্বারা একান্নবর্ত্তী পরিবারে ধনাগম ঘটে। এই-সকল কারণে হিন্দুপরিবারে পুত্রসন্তান যেরূপ আনন্দের বিষয় বলিয়া পরিগণিত হয়, কন্যা সেইরূপ একটা দুর্ভাগ্য ও নিরানন্দের ছায়া বিস্তার করে। ইংলণ্ডের ন্যায় স্বাধীন দেশে কিন্তু ইহার ঠিক্ বিপরীত ভাব সমাজে দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরেজ পিতামাতা মনে করিয়া থাকে :—

"পুত্র মম রহে পুত্র যতদিন বিবাহ না হয়।
ভক্তিমতী কন্যা কিন্তু চিরদিন কন্যারত্ন রয়॥"

শিক্ষা-বিস্তার দ্বারা কঠোর সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে। আমাদের জাতীয় জীবনে এখন এমন এক সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে যখন স্ত্রীলোকের মধ্যে প্রচুর-পরিমাণ সুশিক্ষা-বিস্তারের ব্যবস্থা অবিলম্বে করা আবশ্যক। ভারতের স্ত্রীপুরুষ প্রত্যেকের মধ্যে একটা জাগরণের ভাব আবির্ভূত হইয়াছে। প্রাচীন পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া স্ত্রীলোক আর গৃহ-কোণে আবদ্ধ হইয়া সন্তুষ্ট থাকিতেছে না। তাহারাও জাতীয় জীবন-সংগঠন-ব্যাপারে স্বামী ভ্রাতা বা পুত্রের সহায়তা করিতে ব্যগ্র ও উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ অবস্থায় স্ত্রীলোকদিগকে গৃহকোণে আবদ্ধ করিয়া রাখার অর্থ জাতির অর্দ্ধেক অংশকে মৃতকল্প করিয়া রাখা।

প্রত্যেক বালিকা যাহাতে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষে এক্ষণে অবশ্যকর্ত্তব্য। এই ব্যবস্থা করিবার জন্য আমাদের শিক্ষা-সচিবদিগকে সদা-সর্ব্বদা তাঁহাদের এই অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্মটি স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে।

বর-পণ বা যৌতুক-প্রথাও ভারতীয় স্ত্রীলোকের শিক্ষা বিস্তারের এক অন্তরায়। এই প্রথা সমাজে প্রচলিত আছে বলিয়া একদিকে যেমন ছেলেদের শিক্ষা-বিস্তারের সাহায্য করিয়াছে অন্যদিকে সেইরূপ মেয়েদের শিক্ষাপ্রসারের বাধা ঘটাইয়াছে। কন্যার বিবাহের খরচের জন্য অধিকাংশ পিতামাতাকে কন্যার জন্ম হইতেই এত উদ্বিগ্ন থাকিতে হয় যে, তাহাদের শিক্ষার জন্য পিতামাতা বস্তুতঃ প্রচুর পরিমাণে সঞ্চয় বা ব্যয় করিবার কথা মনে স্থান দিতে পারে না। বিবাহের বাজারে আম্‌দানি ও কাট্‌তির নিয়মানুসারে বর-পণ পরিচালিত হইতেছে। হিন্দুসমাজে জাতিনির্ব্বিশেষে বিবাহের প্রথা আইনসঙ্গত নহে বলিয়া কন্যার পক্ষে উপযুক্ত বর-লাভের সুযোগ খর্ব্ব হইয়া আছে। সুতরাং প্রাপ্তবয়স্কা কন্যার পিতাদের মধ্যে যে যত বেশী দাম দিতে পারে, সে-ই বররূপ পণ্যদ্রব্য নীলামে তত সহজে ক্রয় করিতে পারে। এই রোগের একমাত্র ঔষধ অসবর্ণ বিবাহের প্রথা প্রচলিত করা এবং তদ্দ্বারা বর-কন্যা নির্ব্বাচনের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা। এই যৌতুক-প্রথা উত্তরাধিকারিত্বের একদেশদর্শী আইন-বশতঃ এরূপ চিরস্থায়ী হইয়া পড়িয়াছে। পুত্র জীবিত থাকিলে বিবাহিতা বা অনূঢ়া কন্যার পৈতৃক সম্পত্তিতে কোন অধিকার থাকে না। এইজন্যই মনে হয় বিবাহ-উপলক্ষে বর-পণ দ্বারা পৈতৃক সম্পত্তি হইতে কন্যার ন্যায্য অংশ আদায় করিয়া লওয়ার ব্যবস্থা সমাজে স্থান পাইয়াছে। পৈতৃক সম্পত্তিতে যে-পর্য্যন্ত কন্যাকে ন্যায্য অধিকার দেওয়ার আইন না করা হয়, সে-পর্য্যন্ত সমাজ হইতে বর-পণ-প্রথা উঠিয়া যাইতে পারে না; যদিও স্নেহলতার ন্যায় মেয়েরা বরপণ-জনিত দুঃখে জর্জ্জরিত পিতার দুর্দ্দশা দেখিয়া আত্মহত্যা করিয়া আসিতেছে।

আমাদের হিন্দুদের মধ্যে বাল্য-বিবাহ আর-একটা সামাজিক কুপ্রথা। ইহার ফলেই আমরা শর্করাবাহী জন্তু-বিশেষের মত হইয়া পড়িয়াছি। ইংরেজ-রাজ যদি ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনে চলিয়া যায়, তাহা হইলেও আমরা অপর কোন ক্ষমতাশালী জাতির দাস-স্বরূপ হইয়াই থাকিব, কেননা আমরা বাল্য-বিবাহের

ফলে অপরিপুষ্টা বালিকার সন্তান বলিয়া হীন-বীর্য্য ক্ষীণ-তেজ ও শীর্ণদেহ দুর্ব্বল জাতি হইয়া পড়িয়াছি। বস্তুতঃ ইহাই আমাদের শারীরিক দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ। যত শীঘ্র এই কুপ্রথা সমাজ হইতে দূরীভূত হয় ততই আমাদের জাতীয় জীবনের পক্ষে মঙ্গল। ইহার কুফল সর্ব্বসাধারণের বিদিত থাকা সত্ত্বেও এই প্রথা দুইটি কারণ-বশতঃ সমাজে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। এক কারণ—শাস্ত্রিক ব্যবস্থা, অর্থাৎ কন্যার কোন-এক নির্দ্দিষ্ট বয়সের পূর্ব্বেই বিবাহ দেওয়া প্রত্যেক হিন্দুর পক্ষে কর্ত্তব্য। আর-এক কারণ—জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা। ধনীরা প্রাচীন প্রথা অনুসরণ করিয়া এবং স্থল-বিশেষে সখ করিয়া অপ্রাপ্ত-বয়স্ক পুত্র-কন্যার বিবাহ দিয়া থাকেন। দরিদ্রেরা কন্যার ভরণপোষণের দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি-লাভের জন্য যত শীঘ্র সম্ভব কন্যাকে পাত্রস্থ করে। এই শ্রেণীর কোটি কোটি লোকের আর্থিক অবস্থা যত দিন উন্নত না হয়, তত দিন সমাজ হইতে বাল্য-বিবাহের প্রথা কিছুতেই উঠিয়া যাইতে পারিবে না।

বাল্য-বিবাহ হইতেই বাল-বৈধব্যের সৃষ্টি। বাল্য-বিবাহ সমাজ হইতে উঠিয়া গেলে সমাজে বাল-বিধবা দেখা যাইতে পারে না এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে পতিতা স্ত্রীলোকের সংখ্যাও কমিয়া যাইতে পারে। কিন্তু ভ্রষ্টা ও অনুতপ্তা স্ত্রীলোক সমাজে যখন রহিয়াছে, তাহাদের উদ্ধার ও সংশোধনের উপায় সমাজকে করিতে হইবে। বাল্য-বিবাহের ফলে বা অন্য কারণে সমাজে যে-সকল নিরাশ্রয় বিধবা রহিয়াছে, সদ্‌ভাবে তাহাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য স্থানে স্থানে কর্ম্ম-ক্ষেত্র প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। নিরাশ্রয় স্ত্রীলোকের শোচনীয় অবস্থার উন্নতি-সাধন, স্ত্রীলোকের সচ্চরিত্রতার উপর জাতীয় গৌরব-বোধ এবং আইন-পরিবর্ত্তন দ্বারাই সমাজ হইতে স্ত্রীলোকের দেহ-বিক্রয়রূপ ব্যবসায় বন্ধ করা যাইতে পারে।

জীবিত বা মৃত স্বামীর প্রতি কায়মনোবাক্যে এক-নিষ্ঠতা সম্ভ্রান্ত হিন্দু-স্ত্রীলোকের অস্তিত্বের নিদর্শন-স্বরূপ। সেইজন্যই হিন্দু সমাজে বিধবা-বিবাহ একটা ঘৃণার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। যে আইনের সহায়তায় বিধবা-বিবাহ হইতে পারে, তাহার দ্বারাই বিধবা-বিবাহের প্রলোভন অনেকটা কমিয়া গিয়াছে, কেননা পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে গেলেই মৃত স্বামীর উত্তরাধিকার ও সম্পত্তি হইতে বিধবাকে বঞ্চিত হইতে হয়। সুতরাং বিধবার পক্ষে পুনর্ব্বার বিবাহ করা একটা শাস্তি-বিশেষ। এই বিষয়ে আইন-কারকদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতে পারে।

যে-সকল স্ত্রীলোক কলকারখানায় বা খনিতে কাজ করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করে তাহাদের দুরবস্থার উল্লেখ মাত্র এখানে করা যাইতেছে। অস্বাস্থ্যকর পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও অনুচিত পরিশ্রম ও আহারাদি যে কেবল এই-সকল স্ত্রীলোকদের পক্ষেই অনিষ্টকর তাহা নহে, তাহাতে তাহাদের সন্তানসন্ততিরও অনিষ্ট ঘটিতেছে। ইহার প্রতিকার আইনকারকদের হাতে, সমাজ-সংস্কার দ্বারা ইহার কোন ব্যবস্থা হইতে পারে না।

সভানেত্রী মহাশয়া বলেন যে, তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতার অভাববশতঃই মদ্যপান প্রভৃতি বিশেষভাবে পুরুষ সম্বন্ধীয় সমস্যার আলোচনা করা হয় নাই। কিন্তু একটি কথার উল্লেখ না করিয়া তিনি তাঁহার অভিভাষণ শেষ করিতে পারেন নাই। অন্ত্যজ লোক ব্রাহ্মণাদি উচ্চশ্রেণীর লোকদের অস্পৃশ্য এই কথা সকলেই জানেন। আপাততঃ ত্রিবাঙ্কুরে অস্পৃশ্যতামূলক যে-সকল ঘটনা ঘটিতেছে তাহা সকলে সংবাদ-পত্র হইতে অবগত আছেন। দেবমন্দির, রাজপথ, সর্ব্ব-সাধারণের জন্য নির্ম্মিত জলাশয় প্রভৃতিতেও অন্ত্যজ লোকেরা প্রবেশ করিতে পারে না। বড়ই লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয় এই যে, একই রক্তমাংসে গঠিত মানুষ মানুষের এতটা ঘৃণার পাত্র হইতে পারে।

সিড্‌নি লো তাঁহার 'ভিশন্ অব্ ইণ্ডিয়া' নামক পুস্তকে কোন্ অন্ত্যজ লোক কতদূর হইতে দক্ষিণ ভারতের কোন্ কোন্ অঞ্চলে ব্রাহ্মণাদি উচ্চতর শ্রেণীর লোক-দিগকে স্পর্শ-দোষে কলুষিত করিতে পারে, তাহার একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। সেই তালিকা অনুসারে কর্ম্মকার চর্ম্মকার সূত্রধর ও রাজমিস্ত্রী ১৬ হাত (২৪ ফুট) দূরে থাকিয়া, তাড়ি-প্রস্তুতকারক ২৪ হাত (৩৬ ফুট) দূরে থাকিয়া, কৃষক ৩২ হাত (৪৮ ফুট) দূরে থাকিয়া এবং

গোমাংস-ভক্ষক আদি জাতীয় হিন্দু ৪২৷৷০ হাত (২১ গজ ১২ ইঞ্চি) দূরে থাকিয়াও ব্রাহ্মণাদি লোকদিগকে অপবিত্র করিতে পারে।

আমাদের স্বদেশেই যখন আমরা আমাদের নিজের লোকদিগকে এতটা অস্পৃশ্য মনে করি তখন ইংরেজের উপনিবেশ বিশেষে আমাদিগকে নিম্নতর লোক বলিয়া কোণঠেসা হইয়া অবমানিত হইতে হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি!

এই অস্পৃশ্যতামূলক সামাজিক সমস্যার মীমাংসার একমাত্র পথ—মিউনিসিপ্যালিটি, জেলাবোর্ড ও স্কুল প্রভৃতি যে-সকল প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের অর্থদ্বারা পরিচালিত তাহাতে সকল শ্রেণীর লোকের অবাধ প্রবেশাধিকার দেওয়া। এরূপে লোক পরস্পরের সহিত মিশিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িলে অন্ত্যজ ও উচ্চতর শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে এরূপ সংস্পর্শজ দোষের বিভীষিকা অনেকটা কমিয়া যাইতে পারে।

সভানেত্রী মহাশয়া উপসংহারে বলেন যে, সমস্যাটি অংশতঃ রাজনৈতিক বলিয়া হিন্দু মুসলমানের একতা-সাধনের প্রকৃষ্ট উপায়ের আলোচনা তিনি করেন নাই। কিন্তু তাঁহার মনে হয় 'কলিকাতা ক্লাবের' মত মিশ্রিত ক্লাব ও ক্রীড়া-ভূমি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান দ্বারা এবং যেখানে যেখানে হিন্দু-মুসলমান বাস করে সে-সকল স্থানে পরস্পরের মিলন ও হিতকল্পে সম্মিলনী প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পরস্পরের প্রতি যে বিদ্বেষভাব আছে তাহা ক্রমশঃ দূর করা যাইতে পারে।

সভানেত্রী মহাশয়ার শেষ কথা এই:—সভা-সমিতিতে প্রস্তাবনা করিয়াই সমাজসংস্কারদের সন্তুষ্ট থাকিবার উপায় নাই। মূর্চ্ছিতা ললনার ন্যায় সভায় স্বীকৃত প্রস্তাবসমূহকে সঙ্গে-সঙ্গে আপন গৃহে লইয়া যাইতে হইবে; এবং তৎ-সমূহকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। জাতীয় মহাসভা বা কংগ্রেসের সভ্যদিগের ন্যায় সমাজ-সংস্কারকদের জন্য কোন বিশেষ ধর্ম্ম বা অনুশাসন নাই একথা সত্য। কিন্তু ধর্ম্ম বা অনুশাসনবিশেষ অপেক্ষা কার্য্যসিদ্ধির পক্ষে প্রকৃত ইচ্ছা ও একনিষ্ঠ আগ্রহকেই তিনি শ্রেয়ঃ মনে করেন। বস্তুতঃ সমাজ-সংস্কারকদের কোনরূপ অনু-শাসনের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই বলিয়া আনুষ্ঠানিক হিন্দুরা তাহাতে অবাধে যোগ দিতে পারে। অনুশাসন-বিশেষের কোন প্রয়োজনও নাই। একমাত্র প্রয়োজন স্থানে স্থানে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি সৃষ্টি করা, যাহার দ্বারা অনুমোদিত প্রস্তাবসমূহ কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে।

[সভানেত্রী শ্রীযুক্তা পূর্ণিমা দেবীর অভিভাষণের সমালোচনা পূর্ব্বেই সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রাচীন হিন্দুদের আদর্শস্থানীয়া মহিলার ন্যায় তিনি সাধারণ পাঠকপাঠিকার নিকট সম্পূর্ণ পরিচিতা নহেন। তাঁহার স্বামী স্বর্গীয় জ্বালাপ্রসাদ শঙ্খধর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ এবং শাহ্‌জাহানপুর জেলার একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ জমিদার ছিলেন। শ্রীযুক্তা পূর্ণিমা দেবী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী। উত্তরভারতীয় সামাজিক মন্ত্রণা-সভার গত অধিবেশনে তাঁহার সম্বন্ধে আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী এবং লীডারের সম্পাদক শ্রীযুক্ত চিন্তরাভরী যজ্ঞেশ্বর চিন্তামণি যাহা বলেন নীচে তাহার তাৎপর্য্য দেওয়া গেল।—

"১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে এদেশে সামাজিক মন্ত্রণাসভার অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার পর হইতে এই প্রথম একজন হিন্দু মহিলা উহার পরিচালক হইয়াছেন। ১২বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার প্রথিতনামা স্বামী বারাণসীতে এইরূপ সভার সভাপতি হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্তা জ্বালাপ্রসাদ শঙ্খধর-জায়ার পরিচয় প্রদান অনাবশ্যক। তিনি শিক্ষাবিস্তার-কল্পে অনেক কাজ করিয়াছেন; তিনি লোকহিতসাধনকল্পে অনেক কাজ করিয়া-ছেন; এবং ইহা উল্লেখ করা খুব দরকার, যে, শাহজাহানপুর জেলায় তিনি বৈষয়িক কার্য্যপরিচালনে সুদক্ষ বলিয়া পরিজ্ঞাত। আমি যখন মন্ত্রী ছিলাম তখন আমাকে শাহজাহানপুর জেলার একজন ম্যাজিষ্ট্রেট্ বলিয়াছিলেন, যে, শ্রীযুক্তা পূর্ণিমা দেবীর মত জমিদার তিনি আর কখনও দেখেন নাই; তাঁহা অপেক্ষা প্রজাদের প্রীতি ও বিশ্বাস-ভাজন জমিদার আর কেহ নাই। তাঁহার বিদ্যাবত্তা, অন্যান্য নানা গুণ, উচ্চ চরিত্র, এবং বিনা আড়ম্বরে ও নিঃস্বার্থভাবে সাধিত নানাবিধ সর্ব্বজন-সেবার কার্য্যের বিষয় চিন্তা করিলে বলা যায়, যে, তিনি সেই ভবিষ্যৎ কালের অগ্রদূতস্বরূপ, যখন হিন্দু মহিলারা জাতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রে মুক্তি ও স্বাধীনতা লাভের সহায় হইবেন।"]

শ্রী শক্তি দেবী

[২৬]

শীতটা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল; কিন্তু কয়েক-দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ও বায়ুর ফলে একটা তীব্র কন্-কনানিতে শুধু মানুষের দেহ নয়, মন পর্য্যন্ত আর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বায়ু আর্দ্র এবং বেগ-বান্, রাজপথ কর্দ্দমাক্ত; ঠাণ্ডা হইতে রক্ষা পাইবার অনাবশ্যক আগ্রহে প্রমদাচরণ তাঁহার বসিবার ঘরের দ্বার ও জানালাগুলা বিবিধ কৌশলে মুক্ত, অর্দ্ধ-বিমুক্ত ও অবরুদ্ধ রাখিয়া এবং দেহ বহুবিধ উপায়ে আবৃত ও আচ্ছাদিত করিয়া সদ্য-লব্ধ সংবাদপত্র পাঠ করিতে-ছিলেন।

দেখিতে-দেখিতে সহসা একটা সংবাদের উপর দৃষ্টি পড়ায় প্রমদাচরণ বিশেষরূপে উৎসুক হইয়া উঠিলেন। আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত গভীর আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া তিনি পেন্সিল দিয়া সংবাদটি চিহ্নিত করিলেন, তৎপরে হঠাৎ কি মনে করিয়া পাশের দেরাজ হইতে লাল-নীল পেন্সিল বাহির করিয়া লাল পেন্সিল দিয়া সমগ্র সংবাদটি রেখাবৃত করিয়া দিলেন।

দেরাজে তখনও লাল-নীল পেন্সিল পুনঃস্থাপিত হয় নাই, দ্বার ঠেলিয়া সুমিত্রা ঘরে প্রবেশ করিল এবং প্রমদাচরণের চেয়ারের বাম পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বাবা, আজ বড় বেশী ঠাণ্ডা পড়েছে, আজ তোমার জন্যে এক পেয়ালা চা তৈরী করে' নিয়ে আসি।"

বহুকাল হইতে প্রমদাচরণের নিয়মিত চা-পানের অভ্যাস ছিল এবং ক্রমশঃ সেই অভ্যাস সুদৃঢ় আসক্তিতে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু সুমিত্রা চা ছাড়িবার পর হইতে তিনিও ক্রমশঃ চা-পান বন্ধ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই আসক্তি-বর্জ্জনের সহিত অপত্য-স্নেহেরই একমাত্র যোগ ছিল।

মুখে কিন্তু প্রমদাচরণ সে-কথা স্বীকার করেন না; বলেন বয়স বেশী হইলে চা-পান অনিষ্ট করে; স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য বাড়ায়।

জয়ন্তী ক্রুদ্ধ-কণ্ঠে বলেন, "স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের কথ জানিনে, তবে মানসিক দুর্ব্বলতা তোমার খুব বাড়্ছে, তা দেখ্তেই পাচ্ছি।"

তদুত্তরে প্রমদাচরণ স্মিতমুখে বলেন, "স্নায়ুর সঙ্গে মনের এমন ঘনিষ্ঠ যোগ আছে যে, একটার দুর্ব্বলতা বাড়লেই অপরটার দুর্ব্বলতাও বাড়ে।"

কথা শুনিয়া জয়ন্তীর পিত্ত জ্বলিয়া উঠে! বলেন, "কিন্তু তোমার ধিঙ্গী মেয়ে যত প্রবল হ'য়ে উঠ্ছে, তুমি কেন তত দুর্ব্বল হ'য়ে পড়্ছ তা আমাকে বুঝিয়ে দিতে পার? এটা তোমাদের কিরকম যোগ?"

একথার উত্তরে প্রমদাচরণের মুখ দিয়া কোনও কথা বাহির হয় না, মনে-মনে বলেন, 'দুর্য্যোগ! তবে মেয়ের সঙ্গে নয়; উপস্থিত মেয়ের গর্ভধারিণীর সঙ্গে!'

সুমিত্রার সহিতও মাঝে মাঝে এপ্রসঙ্গ হয়, কিন্তু তাহা একেবারে বিভিন্ন ধারায়। বৃদ্ধ-বয়সে পিতা এত-দিনের চায়ের নেশা পরিত্যাগ করায় সুমিত্রা মনে-মনে আনন্দিত ত ছিলই না বরং কিছু দুঃখিত ছিল। তাই সে তাহার পিতাকে চা-পানে প্রবৃত্ত করিতে মাঝে মাঝে চেষ্টা করিত।

ঠাণ্ডা বেশী পড়িলে প্রমদাচরণের দুই-তিন পেয়ালা চা বাড়িয়া যাইত, সে-কথা সুমিত্রার জানা ছিল। তাই প্রত্যুষে উঠিয়া বৃষ্টি বায়ু ও শীতের প্রকোপ দেখিয়াই তাহার মনে হইয়াছিল যে, আজ এক পেয়ালা তপ্ত চা তাহার পিতাকে পান করাইতে হইবে।

প্রমদাচরণ কিন্তু মাথা নাড়িয়া স্মিতমুখে বলিলেন, "না, মা, যে নেশাটা একরকম কাটিয়ে উঠেছি আর ইচ্ছে করে' তার অধীন হচ্ছিনে!"

সুমিত্রা প্রমদাচরণের স্কন্ধে ধীরে-ধীরে হস্তার্পণ করিয়া বলিল, "চায়ের আবার নেশা কি বাবা? তা ছাড়া, আজ বড্ড ঠাণ্ডা। আজ এক পেয়ালা চা খেলে তোমার শরীর ভাল থাক্‌বে।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া প্রমদাচরণ বলিলেন,

"তোমার ঠাকুর্দ্দাদা থেকে আরম্ভ করে' ঊর্দ্ধতন আর কেউ কখনও চা স্পর্শ পর্য্যন্ত করেননি, অথচ ঠাণ্ডাও যে আমার চেয়ে তাঁদের কম ভোগ কর্‌তে হয়েছিল তা নয়! দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অভিযোগ, এ-সব আমারা নিজেই তৈরী করেছি। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা যে জিনিসের নাম পর্য্যন্ত জান্‌তেন না, আমাদের সেই জিনিসের নেশা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তোমার ব্রজ-কাকা যে বলেন, সকালে উঠে' কাকেরা কা কা করে' ডাকে আর চা-খোরেরা চা চা করে' চেঁচায়, সে কথা ঠিক।" বলিয়া প্রমদাচরণ হাসিতে লাগিলেন।

সম্মুখের একটা চেয়ারে ধীরে-ধীরে বসিয়া পড়িয়া সুমিত্রা বলিল, "কিন্তু বাবা, পূর্ব্বপুরুষদের সময়ে জীবন-ধারা অনেক সহজ ছিল, তাই অনেক জিনিসের দর্‌কারই তাঁদের হ'ত না। তখন দেশ-বিদেশের সঙ্গে এমন অবাধ কার্‌বার ছিল না, তাই আম্‌দানিও ছিল না, রপ্তানিও ছিল না, দেশের জিনিস-পত্রেই দেশের অভাব মেটাতে হ'ত। এখন পৃথিবীর সমস্ত দেশের সভ্যতার সঙ্গে আমাদের কার্‌বার চলেছে, তাই আমাদের নতুন জীবন-ধারার পক্ষে হয়ত আগেকার অনেক জিনিস অনুপযোগী আর এখনকার অনেক জিনিস উপযোগী হয়ে পড়েছে।"

গলা হইতে পশ্‌মী গলাবন্ধটা তাড়াতাড়ি খুলিয়া ফেলিয়া চেয়ারের উপর সোজা হইয়া বসিয়া প্রমদা-চরণ বলিলেন, "তা হয়ত হয়েছে, কিন্তু যতটা না বাস্তবিক হয়েছে তার শত গুণ হয়েছে মনে করে' আমরা আমাদের উৎপীড়িত করে' তুলেছি। যে-দেশে ঘরে ঘরে নেবুর গাছ আর দই-চিনি মজুত, সে-দেশে বিলাতী লাইম্‌জুস্ কর্ডিয়ালেরই বা কি দর্‌কার, আর যে-দেশে গাছে গাছে ভগবান্ সর্‌বতের ভাঁড় ফলিয়ে রেখেছেন সে-দেশে সোডা-লেমনেডেই বা কি হবে? তুমি অন্য দেশের সভ্যতার কথা বল্‌ছিলে, কিন্তু আমার মনে হয় সুমিত্রা, বিদেশী সভ্যতাকে একেবারে এড়িয়ে যাওয়াও বরং ভাল, কিন্তু তার মধ্যে একেবারে তলিয়ে যাওয়া ভাল নয়। আধুনিক সভ্যতার আদর্শ-ক্ষেত্র হচ্ছে আমেরিকা, কিন্তু সেখানকার লোকের অবস্থা জান? তারা অতি-সভ্যতার চাপে এমন অস্থির হ'য়ে উঠেছে যে, প্রতিবৎসরই তাদের মধ্যে খুন আর আত্মহত্যার সংখ্যা ভয়ানকরকম বেড়ে উঠ্‌ছে। সে-সভ্যতা যদি আজ ষোল-আনা আমাদের দেশে এসে হাজির হয়, তা হ'লে যারা আজ মোটর-গাড়ী চড়ে' গড়ের মাঠে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছে, তাদের অধিকাংশকেই মোটর-গাড়ী তৈরী কর্‌বার জন্যে কার্‌খানায় ঢুক্‌তে হবে। আর তা না হ'য়ে যদি আরও অনেক বেশী লোক মোটর-গাড়ী চড়্‌তে আরম্ভ করে, তা হ'লেই যে দেশের মোট সুখ বেড়ে যাবে তা মনে কোরো না। কলকার্‌খানা-বাড়ার সঙ্গে যে জিনিসটা বাড়ে সেইটেই সভ্যতা নয়। যন্ত্রের সঙ্গে যন্ত্রণাও বাড়্‌তে থাকে।"

বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সুমিত্রা প্রমদাচরণের কথা শুনিতেছিল। প্রমদাচরণের মধ্যে প্রকৃতিগত বিদেশ-প্রিয়তা কখনও ছিল না; কিন্তু ষ্টীমলঞ্চ যেমন নিজের পথে গাধা-বোটকে টানিয়া লইয়া যায় ঠিক সেই-রূপে শক্তি-শালিনী জয়ন্তী নির্ব্বিরোধী প্রমদাচরণকে সারা-জীবন নিজের অভিমতে টানিয়া আসিয়াছেন, তাই বাধ্য হইয়া প্রমদাচরণকে খানাও খাইতে হইয়াছে, ড্রেসিং গাউনও পরিতে হইয়াছে এবং গ্রীষ্মকালের রাত্রেও স্লীপিং সুটের মধ্যে নিদ্রা যাইতে হইয়াছে। জয়ন্তীর অজ্ঞতা এবং অক্ষমতাই যদি না রক্ষা করিত তাহা হইলে সম্ভবতঃ তাঁহাকে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সহিত ইংরেজীতে কথাবার্ত্তা কহিতে হইত।

প্রমদাচরণের এই বিদেশী আবরণ ও আচরণের সহিত তাঁহার নিজের অন্তরের বিশেষ কোনও যোগ ছিল না, সে-কথা জানা থাকিলেও ঠিক এমনভাবে প্রমদাচরণকে আত্মপ্রকাশ করিতে সুমিত্রা কখনও দেখে নাই। তাই সে তাহার পিতার এই নূতন-ধরণের কথার উত্তরে কি বলিবে মনে-মনে ভাবিতেছিল. এমন সময়ে প্রমদাচরণের সম্মুখস্থ সংবাদপত্রে লাল-রেখাবৃত অংশে সহসা তাহার দৃষ্টি পড়িয়া গেল।

ঈষৎ ঝুঁকিয়া, উপরের বড় অক্ষরের ছত্রটি পড়িবার চেষ্টা করিয়া সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করিল, "লাল পেন্সিল দিয়ে ঘেরা ওটা কি বাবা?"

আলোচনার উত্তেজনায় প্রমদাচরণ একথাটা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সুমিত্রার আকস্মিক প্রশ্নের উত্তরে কিভাবে কথাটা বলিবেন সহসা ভাবিয়া না পাইয়া দুই হস্তে সংবাদপত্রখানা তুলিয়া লইলেন, সংবাদটার উপর একবার দুই তাড়াতাড়ি দৃষ্টি বুলাইয়া সংবাদপত্রখানা পুনরায় টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া সুমিত্রার প্রতি মুখ তুলিয়া বলিলেন, "এটা সুরেশ্বরের খবর, স্বদেশী আন্দোলনের ব্যাপারে তার এক বৎসর জেল হয়েছে।"

খবরটা শুনিবার পর সুমিত্রা আর কিছু আগ্রহ প্রকাশ করিল না; শুধু একটা ক্ষুদ্র 'ও' বলিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

সুমিত্রার এই অনাগ্রহে মনে-মনে ঈষৎ চিন্তিত হইয়া প্রমদাচরণ বলিলেন, "কিন্তু এখবরটা আমি আমাদের পক্ষে সুসংবাদ বলেই মনে করি সুমিত্রা; তাই লাল-পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়েছি। তোমার মা যে সেই চিঠিখানা পেয়েছিলেন সেটা যে সর্ব্বৈব মিথ্যা, সে-বিষয়ে আমরা একেবারে নিঃসন্দেহ হলাম।

এই 'আমরা'র মধ্যে প্রমদাচরণের যে কোন দিনই স্থান ছিল না তাহা সুমিত্রা ভালরূপেই জানিত এবং তাহাকে উদ্ঘাটিত না-করিবার ভদ্রতায় এই 'আমরা' কথার ব্যবহার তাহা বুঝিতেও তাহার বাকী ছিল না। তথাপি সে মৃদু হাসিয়া বলিল, "কিন্তু তোমার ত কোন দিনই সে-বিষয়ে সন্দেহ ছিল না বাবা?"

প্রমদাচরণ বলিলেন, "না থাকুক, তবুও এতে ভালই হ'ল! বিশ্বাস সন্দেহের এত কাছাকাছি বাস করে যে, প্রমাণের উপর তাকে দাঁড় করাতে পারলেই তা' কায়েমী হয়। প্রমাণের অভাবে বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কত অবিচার যে করতে হয়েছে তা আর কি বলব!"

সুমিত্রা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আমার কিন্তু মনে হয় বাবা, বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অবিচার তুমি কখন করনি।"

প্রমদাচরণ উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "করিনি কেন মা? এই ত সে দিনও করেছি! একটা জঘন্য অপবাদ দিয়ে সুরেশ্বরকে অপমান করে, বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর অপবাদটা সম্পূর্ণ মিথ্যা জেনেও ত আমি তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে আসতে পারিনি।

সুরেশ্বরের ঘটনা লইয়া প্রমদাচরণের মনে যে ব্যথাটুকু ছিল তাহার পরিমাণ সুমিত্রার অবিদিত ছিল না। তাই সে পিতার মনস্তাপে ব্যথিত হইয়া স্নিগ্ধ-কণ্ঠে কহিল, "তা পারনি, কিন্তু কেন পারনি তাও ত আমরা জানি, বাবা!"

জয়ন্তীর রোষ উদ্রিক্ত করিয়া গৃহে অনর্থক অশান্তি বৃদ্ধি করিবার আশঙ্কায় প্রমদাচরণ সুরেশ্বরের ব্যাপারে কোন প্রতিকার করেন নাই তাহাই সুমিত্রা ইঙ্গিত করিতেছিল। কিন্তু প্রমদাচরণ সুমিত্রার কথায় উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। সুরেশ্বরের জেলের কথা অবগত হইয়াই হউক বা অন্য যে-কোনও কারণেই হউক, প্রমদাচরণের নির্ব্বিরোধ শান্ত-চিত্তে আজ দেখা দিয়া একটা অভূতপূর্ব্ব উত্তেজনা প্রবেশ করিয়াছিল।

উদ্দীপ্তকণ্ঠে প্রমদাচরণ বলিলেন, "কেন পারিনি তা তুমি ঠিক জান না সুমিত্রা! আমি অতিশয় দুর্ব্বল তাই পারিনি, একটা অপরাধ অন্য অপরাধের সাফাই হ'তে পারে না। যে-অপরাধ তোমার মা করেছিলেন তার প্রতিকার না করে' আমি সে অপরাধকে প্রশ্রয় দিয়েছিলাম।"

এমন সময়ে বাহিরে বারান্দায় জয়ন্তীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল। সুমিত্রা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "মা আসছেন, বাবা!"

প্রমদাচরণ তেমনি উদ্দীপ্তকণ্ঠে বলিলেন, "তা আসুন! এম্‌নি করে' চিরকাল ওঁকে অনর্থক ভয় করে' করেই—"

ভয় করিয়া-করিয়া কি অনিষ্ট হয়েছে তাহা বলিবার পূর্ব্বেই জয়ন্তী কক্ষে প্রবেশ করিলেন; এবং প্রজ্জলিত ল্যাম্পের বাতির চাকা সহসা ঘুরাইয়া দিলে রশ্মি যেরূপ একেবারে স্তিমিত হইয়া যায়, জয়ন্তীর মূর্ত্তি সম্মুখে দেখিয়া প্রমদাচরণ ঠিক সেইরূপে নিঃশব্দ হইয়া গেলেন।

প্রমদাচরণের কথার একটা বাক্য শুনিতে না পাইয়াও জয়ন্তী অনুভব করিলেন যে, এই যত্নকৃত মৌনতার অব্যবহিত পূর্ব্বেই একটা কোনও আলোচনায় কক্ষটি মুখর ছিল। একবার স্বামীর মুখের প্রতি এবং একবার কন্যার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি শুধু বলিলেন, "কি হয়েছে ?"

চেয়ারের উপর আরও খানিকটা উঁচু হইয়া উঠিয়া বসিয়া প্রমদাচরণ বলিলেন, "না, কিছু হয়নি; স্বদেশী ব্যাপারে সুরেশ্বরের এক বছর জেল হয়েছে, সেই কথা হচ্ছিল।"

"জেল হয়েছে ? কেমন করে' জান্‌লে ?" সমস্ত মুখের উপর হর্ষের একটা আরক্ত দীপ্তি জয়ন্তী কিছুতেই নিবারিত করিতে পারিলেন না।

খবরের কাগজখানা সম্মুখে উন্মুক্ত অবস্থাতেই পড়িয়াছিল, প্রমদাচরণ নিমিষের জন্য একবার লাল রেখার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "খবরের কাগজে বেরিয়েছে।"

প্রমদাচরণের দৃষ্টি-পথ অনুসরণ করিয়া দেখিয়া জয়ন্তী বলিলেন, "তা অমন করে' লাল-পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়েছ কেন ? খবরটা খুব সুসংবাদ নাকি ?"

প্রমদাচরণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ক্ষণকাল নিঃশব্দে সংবাদ-পত্রের রেখান্বিত অংশে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, "একদিক্ থেকে সুসংবাদই বটে।"

জয়ন্তী মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তোমার পক্ষে কোন দিক্ থেকে সুসংবাদও নয়, দুঃসংবাদও নয়।"

জয়ন্তীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ দ্বিধাজড়িতভাবে প্রমদাচরণ বলিলেন, "একটা কথা ভুলে' যাচ্ছ, জয়ন্তী; তুমি যে সেই রেজেষ্ট্রী চিঠিটা পেয়েছিলে, সে কথা ভুলে' যাচ্ছ। সুরেশ্বরের জেল হওয়ায় এখন আর কোনও সন্দেহ রইল না যে সে চিঠির কথাটা মিথ্যা।"

এই পত্রের উল্লেখে ক্রোধে জয়ন্তীর ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল; আরক্তমুখে কহিলেন, "সেইজন্যেই সংবাদটা সুসংবাদ বুঝি ? সুরেশ্বর একজন নন্-কো-অপরেটার, গবর্ণমেন্টের শত্রু, এইটে প্রমাণ হওয়াতেই তুমি খুব খুসী হয়েছ ?"

খুসী হইয়াছেন সে কথা বলিতে প্রমদাচরণের সাহস হইল না, কিন্তু নিরুত্তরে বসিয়া থাকিয়া কতকটা সেইরূপ ভাবই প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

নিঃশব্দে ক্ষণকাল প্রমদাচরণের উপর অগ্নি-দৃষ্টি বর্ষণ করিয়া তীব্র-কণ্ঠে জয়ন্তী বলিলেন, "দেখ এখনও গবর্ণমেন্টের টাকাতেই এই পরিবারটির অন্ন-বস্ত্র চল্‌ছে। চিরদিনই চলেছে সে কথা না হয় এখন ভুলে'ই গেছ! এতটা নিমক্‌হারামি ভাল নয়! মাসের ২রা তারিখে পেন্‌সনের টাকাটি আনিয়ে নিয়ে তার পর সমস্ত মাস ধরে' বাপে-ঝিয়ে মিলে' নন্-কো-অপারেশনের চর্চ্চা করায়, আর একজন নন্-কো-অপারেটারের জেল হ'লে তার জেলের খবর লাল-পেন্সিল দিয়ে ঘিরে' দেওয়ায় একটুও পৌরুষ নেই!"

কথাটা হয়ত ঠিক্ এতটা কঠিন করিয়া বলিবার জয়ন্তীর ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু সুমিত্রার সম্মুখে রেজেষ্ট্রী চিঠির উল্লেখ করিয়া সুরেশ্বরের সমর্থন করায় জয়ন্তী সমস্ত সংযম হারাইয়া নিষ্ঠুরভাবে স্বামীকে আক্রমণ করিলেন।

প্রমদাচরণ এবারও নিরুত্তর বসিয়া রহিলেন, কিন্তু এতখানি পিতৃ-লাঞ্ছনা সুমিত্রার সহ্য হইল না।

অপাঙ্গে পিতার দুঃখ-পাণ্ডু মুখ নিমেষের জন্য একবার দেখিয়া লইয়া সে প্রমদাচরণকেই সম্বোধন করিয়া বলিল, "বাবা, চাক্‌রী করা মানে কি তা হ'লে এইরকম করে' আজীবন গবর্ণ্‌মেণ্টের দাসত্ব করা ? গবর্ণ্‌মেণ্টের অপছন্দ কোনো বিষয় নিয়ে কখন ভাব্‌তেও পার্‌বে না, আলোচনাও কর্‌তে পার্‌বে না ?"

প্রমদাচরণ শান্তস্বরে বলিলেন, "কি জানি মা, তোমার মা ত' সেইরকমই বল্‌ছেন।" তাহার পর সহসা তাঁহার বেদনাহত নেত্র জয়ন্তীর প্রতি উত্থিত করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা জয়ন্তী, তুমি কি এই বল্‌তে চাও যে আমি যদি নন্-কো-অপারেশনের চর্চ্চা করি, কিম্বা কোনো নন্ কো-অপারেটারের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন না করি, তা হ'লে আমার গবর্ণ্‌মেণ্টের কাছ থেকে পেন্‌শন্ নেওয়া উচিত নয় ?"

জয়ন্তী একমুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমি তোমার অত সব গোলমেলে কথা জানিনে, আমি

বল্‌ছি যে সারাজীবন গবর্ণ্‌মেণ্টের পয়সা খেয়ে এসে এখন গবর্ণ্‌মেণ্টের বিপক্ষ-দলের সঙ্গে যোগ দেওয়া তোমার উচিত হচ্ছে না !"

প্রমদাচরণ সুরেশ্বরের জেল-সংবাদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "না, না, এর মধ্যে গোলমেলে কথা কিছু নেই ত। তুমি যা বল্‌ছ তা যদি ঠিক্ হয়, তা হ'লে তবে বিপরীতটাও ঠিক্। একথাটা আমি এরকম করে' একদিনও ভেবে দেখিনি ; এখন মনে হচ্ছে ভেবে দেখা উচিত !" বলিয়া প্রমদাচরণ একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

"বাবা ?"

"কি, মা ?"

"এক পেয়ালা চা তা হ'লে করে' নিয়ে আসি ?"

সুমিত্রার প্রতি দৃষ্টি উত্থিত করিয়া প্রমদাচরণ শান্ত-কণ্ঠে কহিলেন, "আজ থাক্, মা। কাল্ না হয় সকাল-সকাল এক পেয়ালা করে' দিয়ো।"

"কিন্তু আজ যে বড় ঠাণ্ডা, বাবা ?"

"তা হোক্—আজকের দিনটা—আজকের দিনটা থাক্।"

প্রমদাচরণের কথা শুনিয়া জয়ন্তীর চক্ষু অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত জ্বলিয়া উঠিল এবং সুমিত্রার চক্ষু সজল হইয়া আসিল ! কিন্তু কেহও কোন কথা কহিল না।

[২৭]

ক্ষণকাল পরে সুমিত্রাকে একান্তে পাইয়া জয়ন্তী তীব্র স্বরে কহিলেন, "বেশী বাড়াবাড়ি করিস্‌নে সুমিত্রা ! বেশী বাড়াবাড়ি কর্‌লে ওসব চর্‌কা-টর্‌কা আমি বাড়ী থেকে ঝেঁটিয়ে বার করে' দেবো !"

সুমিত্রা মাতার দিকে চাহিয়া ছলছল-নেত্রে বলিল, "তার চেয়ে তোমার এই আপদ্-বালাই মেয়েটাকে ঝেঁটিয়ে বাড়ী থেকে বার করে' দাও না মা ; তা হ'লে সব হাঙ্গামা চুকে' যাবে !"

অপলকনেত্রে ক্ষণকাল সুমিত্রার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া জয়ন্তী ঈষৎ শান্তস্বরে কহিলেন, "আমার কথা শোন্ সুমিত্রা, এই বুড়ো-বয়সে তোর বাপকে পাগল করে' তুলিস্‌নে ! লেখাপড়ার সময় থেকে এতটা বয়স পর্য্যন্ত আমি যাকে চালিয়ে এসেছি, তাকে আজ আমার হাত থেকে বার করে' নিস্‌নে ! তাতে মঙ্গল হবে না।"

সুমিত্রা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া কাতরতার সহিত বলিতে লাগিল, "এ-সব তুমি কি কথা বল্‌ছ, মা ? তোমার হাত থেকে আমি বাবাকে বার করে' নেব কেন ?"

সহসা জয়ন্তীর চক্ষু হইতে ঝর্‌ঝর্ করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল ; তিনি বাষ্প বিকৃতকণ্ঠে বলিলেন, "কিন্তু আমি যে দেখ্‌তে পাচ্ছি বার করে' নিচ্ছিস্ ; ও ক্ষেপাকে আমি চিনি, উনি যদি একবার ক্ষেপে ওঠেন, তখন আর শত চেষ্টাতেও ফেরাতে পার্‌বিনে ! আমার সব সাধ-আহ্লাদ, সব কাজ-কর্ম্ম বাকী রয়েছে। তোদের দুই বোনের বিয়ে আছে, আর দু-তিন মাস পরে তোর দাদা বিলেত থেকে ফিরে' আস্‌ছে। এখন অনেক কাজ বাকী সুমিত্রা—আমার এত সাধের সংসারে আগুন ধরিয়ে দিস্‌নে ! আমি তোর হাতে ধর্‌ছি, আমার কথা রাখ্ ! আমিও তোর মা !" বলিয়া জয়ন্তী ব্যাকুলভাবে সুমিত্রার দুই হস্ত চাপিয়া ধরিলেন।

জননীর মুষ্টি হইতে নিজের হস্ত মুক্ত করিয়া লইবার কোন চেষ্টা না করিয়া সুমিত্রা নীরবে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর রুদ্র বৈশাখের তপ্ত মেঘ হইতে সময়ে সময়ে যেমন বড় বড় ফোঁটা ঝরিয়া পড়ে, তেম্‌নি সুমিত্রার চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

"বল্, আমার কথা রাখ্‌বি ?"

সুমিত্রা তাহার আনত আর্দ্র নেত্র উত্থিত করিয়া বলিল, "কি কথা রাখ্‌তে হবে মা, বলো ?"

"তুই আগেকার মতন আবার হ' ! আমার সংসার যেমন চল্‌ছিল তেম্‌নি চলুক !"

ভয়ে সুমিত্রার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। "আগেকার মত আবার কি মা ? সেই সাজ-সজ্জা, লেস্‌ফ্রিল্, সেই বিলাতী কাপড়, সেইসব আবার ?"

জয়ন্তী ব্যগ্রভাবে কহিলেন, "আমি অত কথা জানিনে, তুই আগে যেমন ছিলি তেম্‌নি হ'। তোর এ যোগিনী-সাজ আমার যে কত বড় সাজা হয়েছে তা আমি কি করে' তোকে বোঝাব !"

সুমিত্রা তাহার বিহ্বল বিমূঢ় দৃষ্টি জয়ন্তীর মুখের উপর

স্থাপিত করিয়া বলিল, "তাতেই কি তোমার সংসারের মঙ্গল হবে, মা?"

আগ্রহ-ভরে জয়ন্তী বলিলেন, "হবে! আমি বল্‌ছি হবে! আমি তোর মা, আমার কথা শোন্!"

আবার সুমিত্রার চক্ষু হইতে দুই-চারি বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

"আচ্ছা মা, তাই হবে, এবার থেকে তোমার মতেই চল্‌ব; কিন্তু একটা কথা—"

জয়ন্তী সুমিত্রাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন, "না আমি আর কোনো কথা শুন্‌তে চাইনে; এর মধ্যে আর কিন্তু-টিন্তু কিছু নেই!"

সুমিত্রার দুঃখ-মলিন ওষ্ঠাধরে, বর্ষা-প্রভাতের স্তিমিত বিদ্যুৎ-স্ফুরণের মত ম্লান হাস্য-রেখা দেখা দিল।

"আর-কোন্ কথাই শুন্‌বে না, মা?"

জয়ন্তী ব্যগ্রস্বরে বলিলেন, "না, না, আর আমি কোন কথা শুন্‌বো না। যার সম্মান এখন একটা রাখ্‌লি সুমিত্রা, তখন আর কোনো গোলযোগ তুলিসনে!"

"আচ্ছা, তবে থাক্! কিন্তু শুন্‌লে বোধ হয় ভাল করতে!" বলিয়া সুমিত্রা ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

সুরেশ্বরের এক বৎসর জেল হওয়ার সহিত সুমিত্রার এই অচিন্তিত মতি-পরিবর্ত্তন মণি-কাঞ্চনের যোগের মত জয়ন্তীর মনে হইল। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, যে আর কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া মনের অভিপ্রায়গুলিকে এমন কায়েমী করিয়া ফেলিবেন যাহাতে তদ্বিষয়ে এক বৎসর পরে কাহারও দ্বারা কোনপ্রকার ক্ষতি হওয়ার কোনও সম্ভাবনা না থাকে।

কিন্তু সন্ধ্যার পর সজ্জিত হইয়া সুমিত্রা যখন ড্রয়িং-রুমে প্রবেশ করিল, তখন তাহার সজ্জা-পরিবর্ত্তন দেখিয়া জয়ন্তী সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন, বিমানবিহারী প্রহেলিকা দেখিতে লাগিল এবং প্রমদাচরণ প্রমাদ গণিলেন।

ভয়ার্ত্ত-কণ্ঠে প্রমদাচরণ বলিলেন, "এ বেশ কেন মা সুমিত্রা?"

সুমিত্রা কম্পিত-কণ্ঠে বলিল, "কেন বাবা? এ ত' বেশ ভাল!"

যে সুমিত্রা কিছুকাল হইতে খদ্দর ভিন্ন অপর বস্ত্র স্পর্শ পর্যন্ত করিত না, সে আজ নটিনের বাড়ীর প্রস্তুত মভ্-ক্রেপের সেটে সজ্জিত হইয়া আসিয়াছে! মনে হইতেছিল—পুষ্প যেন কীটরাশির দ্বারা পরিবৃত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রেমের দৃষ্টি

দিনের শেষে ফির্‌ল পাখী, ভর্‌ল আকাশখানি,
ছড়িয়ে গেল চার দিকে সেই পুলকভরা বাণী।
উঠ্‌ল শশী, ছাইল আকাশ হাজার তারার ফুলে।
হাজার দিনের বেদন-ধরা রইল যে আজ ভুলে।

এম্‌নি সময় এলে তুমি ব্যথায় ভরা চোখে;
তোমার মাঝে ব্যথা যেন জাগ্‌ল সকল লোকে।
হাজার জনের কাঁদন এল তোমার সাথে ফিরে;
হাজার দিনের ক্লান্তি এল তোমার ঘিরে ঘিরে।

মনে হ'ল যে-সব পাখী ফিরল আজি নীড়ে,
মলিন শশী, ভর্‌ল আকাশ যতেক তারার ভিড়ে,
সবার মাঝে কাঁদন যেন উঠ্‌ছে ফুলে ফুলে।
চিরন্তনী ব্যথার সাগর উঠ্‌ছে দুলে দুলে॥

শ্রী রেখা দেবী

[এই বিভাগে চিকিৎসা ও আইন-সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে যাঁহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বোত্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। যাঁহাদের নামপ্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাঁহারা লিখিয়া জানাইবেন। অনামা প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না। একটি প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের এক পিঠে কালিতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিয়া পাঠাইলে তাহা প্রকাশ করা হইবে না। জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ করা সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত। যাহাতে সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্‌দর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত, যাহার মীমাংসায় বহু লোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতূহল বা সুবিধার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংসা পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দাজী না হইয়া যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রশ্ন এবং মীমাংসা দুয়ের যাথার্থ্য সম্বন্ধে আমরা কোনরূপ অঙ্গীকার করিতে পারি না। কোন বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোন জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছাধীন—তাহার সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনরূপ কৈফিয়ৎ আমরা দিতে পারিব না। নূতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন করিয়া সংখ্যাগণনা আরম্ভ হয়। সুতরাং যাঁহারা মীমাংসা পাঠাইবেন তাঁহারা কোন্ বৎসরের কত-সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন।]

জিজ্ঞাসা

(১)

দিল্লী

ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে ১৩ খৃষ্টাব্দে তোমর-বংশীয় অনঙ্গপাল দিল্লী নগরী পত্তন করেন। বর্ত্তমান নগরের দিল্লী এবং তোমর নৃপতিদিগের দিল্লী নগরী কি একই? যদি না হয়, উহা বর্ত্তমানে কোথায় অবস্থিত?

শ্রী দেবেন্দ্রমোহন ঘটক

(২)

আনারকুলী বাজার

"আনারকুলী বাজার" নামে লাহোরে একটি বাজার আছে। এই "আনারকলী" নামকরণ কোথা হইতে আসিল? অনেক অনুসন্ধান করিয়া এক স্থানে অবগত হই যে, ঐ নামে আকবর বাদশাহের একটি প্রিয়পাত্রী (দাসী) ছিল। পরে উহার নাম নাদিরা বেগম হয়। সম্রাট্‌পুত্র জাহাঙ্গীর এক সময়ে এই আনারকুলীর সহিত হাস্য-তামাসা করেন। সম্রাট্ উহাতে সন্দেহ করিয়া এই স্থানে তাহাকে জীবন্ত প্রোথিত করেন। "আনারকুলী বাজার" সেই স্মৃতির নিদর্শন মাত্র।

এ ঘটনাটি কতদূর ইতিহাস-সঙ্গত, তাহা তথ্য নির্দ্ধারণার্থ শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়কে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; তদুত্তরে তিনি লেখেন যে, "আনারকুলী" নামে কোন স্ত্রীলোকের বিবরণ তিনি আজও কোন ইতিহাসে পান নাই। এমন কি তৎকালে যে-সকল ইউরোপীয়গণ এদেশে আসিয়া তাঁহাদের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতেও উপরোক্ত ঘটনার উল্লেখ নাই।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে কথাটা কোথা হইতে আসিল?

শ্রী সতীশচন্দ্র বসু

(৩)

জিজিয়া কর

জিজিয়া কর উদ্ভাবন করেন কে? এসম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ লক্ষিত হয়। কেহ বলেন মহম্মদ বিন্ কাশিম, কেহ বলেন আলাউদ্দিন খিলিজি, কেহ বা বলেন ফিরোজ তোগলক। কে কখন্ এই কর প্রবর্ত্তিত করেন এবং কে রদ্ করেন?

শ্রী সত্যশরণ গুপ্ত

(৪)

"আমের মধ্যে পোকা"

অনেকগুলি আমের উপরিভাগ দেখিতে খুব ভাল, এবং কোনরূপ খারাপ চিহ্ন দেখা যায় না। কিন্তু কাটিলেই আমটির মধ্য হইতে পোকা বাহির হয়। এই পোকা কিপ্রকারে উহার জন্মায়?

শ্রী সুকুমার সেন

(৫)

গোপীনাথজীর মন্দির

নদীয়া শিলাইদহের গোপীনাথজীর মন্দির কোন্ সময় কাহা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত?

মোহাম্মদ মনসুর উদ্দিন শাহজাদপু

(৬)

রোল্ড গোল্ড

Rolled Gold (রোল্ড গোল্ড) কি কি উপাদানে প্রস্তুত কোন্ কোন্ উপাদানের ন্যূনাধিক্যবশতঃ উহার প্রকারভেদ হয়? Rolled Gold এর জিনিস ময়লা হইয়া গেলে পরিষ্কার করিবার কোন উপায় আছে কি না। Rolled Gold এর জিনিস ভাঙ্গিয়া গেলে জোড়া দিবার উপায় কি? কোন্ দেশে ইহা প্রথম প্রস্তুত হয়? ভারতবর্ষের কোন্ স্থানে Rolled Gold প্রস্তুত হয়?

এম্ ইসমাইল ওয়ায

(৭)

আসল মুক্তার রং পরিবর্ত্তন

আমাদের দেশে প্রধানতঃ দুইপ্রকার আসল মুক্তা পাওয়া

বস্‌রাই ও চুণাখালি। বস্‌রাই মুক্তা সাদা হয়, কিন্তু চুণাখালির মুক্তা ঈষৎ লাল বর্ণের হয়। চুণাখালি মুক্তার ঔজ্জ্বল্য বজায় রাখিয়া উহা কি প্রকারে বস্‌রাই মুক্তার মত সাদা করা যায়?

শ্রী

(৮)

জয়দেবের জাতি নির্ণয়

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়, এম্-এ মহাশয় তদীয় "জাতিবিরোধ" শীর্ষক প্রবন্ধে বলিয়াছেন "আমি স্বয়ং ব্রাহ্মণ সন্তান, বঙ্গ-সাহিত্য লইয়া নাড়াচাড়া করা আমার অনেক দিনের অভ্যাস! * * * গীত গোবিন্দের কবি জয়দেব ইত্যাদি ইঁহারা সকলেই বৈদ্যকুল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।" পক্ষান্তরে আমরা শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় সম্পাদিত "গীত গোবিন্দ" পুস্তকে দেখিতেছি যে তিনি কবিরাজ জয়দেব গোস্বামীকে "চক্রবর্ত্তী" উপাধিধারী ব্রাহ্মণ শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। উভয় লেখকই ক্ষমতাশালী ও প্রতিভাবান্। এই মতদ্বৈধের কারণ কি? সতীশ-বাবু কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া "জয়দেব গোস্বামীকে" বাঙ্গালার বৈদ্য-শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন? যদি সতীশ-বাবু বা অন্য কেহ প্রবাসীতে ইহার উত্তর দেন তাহা হইলে বাধিত হই।

শ্রী ললিতমোহন রায়, বিদ্যাবিনোদ

(৯)

ম্যাডাম্ প্যাভ্‌লোভা

ম্যাডাম্ প্যাভ্‌লোভার বর্ত্তমান ঠিকানা কি? তিনি কোথায় থাকেন এবং তাঁহার দলে ভারতীয় পুরুষ কিংবা নারী রাখেন কি না?

কুমারী সুপ্রভা ব্যানার্জ্জী

—

মীমাংসা

(১০১)

৩। Scope of Economics—অর্থনীতিশাস্ত্রের কার্য্য ও অনুসন্ধান-ক্ষেত্র।

৮। Corporation—আইন দ্বারা গঠিত এবং ব্যক্তিস্বরূপ কার্য্য করিবার অধিকারপ্রাপ্ত সভা বা সমাজ। (কিন্তু municipal corporation—নগর বা সহরের নাগরিক শাসকবর্গ।)

৯। Monopolies—একচেটিয়া করা জিনিষসকল।

Trusts—(আইনে) অন্য ব্যক্তির উপকারার্থে নিয়োগ বা ব্যবহার করিবে এই বিশ্বাসে যে, কোন ব্যক্তির নিকট কোন কোন সম্পত্তি যে-সকল বন্দোবস্ত দ্বারা ন্যস্ত বা স্থানান্তরিত (বাণিজ্যে) কোন সুবিধার জন্য (নিজেদের) বিশেষ বস্তুর উৎপাদন নিয়মন বা কোন বিশেষ ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনের নিমিত্ত ব্যবসায়ীগণের সম্মিলনসমূহ।

Kartels—ব্যবসায়ীগণের ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য সম্মিলন।

১২। Discount—বাট্টা; বাট্টা।

Cheque—টাকার বরাত-চিঠি।

Balance of trade—রপ্তানি মাল ও বিদেশ হইতে আনীত পণ্যদ্রব্যের পার্থক্য।

১৩। Bill of Exchange—হুণ্ডী।

১৪। Dividend—লভ্যাংশ।

১৫। Nationalisation of industry—ব্যবসায় · ব্যক্তিবিশেষের অধিকারচ্যুত করিয়া জাতীয় সম্পত্তিরূপে পরিগণিত করা।

২১। Consumer's surplus—কোন জিনিষের ক্রেতা ঐ জিনিষের ক্রয়মূল্য অপেক্ষা জিনিষের আরও যাহা বেশী মূল্য দিতে রাজি—সেই উদ্বৃত্ত মূল্য।

২৩। Socialism—সমাজ-প্রাধান্য বাদ।

Collectivism—সংহতি-বাদ।

Communism—অধিকারসাম্যবাদ।

শ্রী চুনীলাল আইচ

(১১১)

ভীষ্মের মৃত্যু-তিথি

আমার ভীষ্মের মৃত্যুতিথি সম্বন্ধে ১১১ নং জিজ্ঞাসার মীমাংসার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ১৯৩ পৃঃ পাইলাম। মীমাংসাকার লিখিয়াছেন ভীষ্মের মৃত্যুর দিন উত্তরায়ণ প্রবৃত্ত হয়য়াছিল, মাঘ মাস, মাসের তিন ভাগ অবশিষ্ট ছিল। "**সেদিন দিবা-রাত্রি সমান** ও শুক্ল পক্ষ ছিল। এইমাত্র মহাভারতে পাওয়া যায়।"

আজকাল উত্তরায়ণ ২২ ডিসেম্বরে প্রবৃত্ত হয়, ২২ জুনে শেষ হয়, ১লা মাঘকে উত্তরায়ণ সংক্রান্তি বলে। কিন্তু উপরের উক্তি হইতে বোধ হয় মহাভারতের সময়ে ১লা মাঘ দিবা-রাত্রি সমান হইত (Spring Equinox) ও যে সময়ে সূর্য্য ভূমধ্য রেখার উত্তরে থাকিত (তাহার গতি যেদিকেই হউক না কেন) সেই সময়কে উত্তরায়ণ বলিত। অর্থাৎ Spring Equinox ২২ মার্চ্চ হইতে Vernal Equinox ২২ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত উত্তরায়ণ। তাহাই যদি হইত তবে তাহার প্রমাণ কি? এইটি নিশ্চয় করিয়া...জানিতে পারিলে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

মীমাংসাকার লিখিয়াছেন পতনের দশম দিন শুক্লানবমী হইলে ৫৮ রাত্রির পর শুক্লাষ্টমী হয় না শুক্লা সপ্তমী হয়।

আমি অষ্টমী লিখিয়াছিলাম, কিন্তু অষ্টমী না হইয়া সপ্তমী কেন হইবে বুঝিলাম না। তিথি ও দিন এক পদার্থ নহে। ২৯ দিন ১২ ঘণ্টাতে এক চান্দ্রমাস [৩০ তিথি] অতএব ৫৯ দিনে দুই চান্দ্র মাস বা ৬০ তিথি হয়। তবে ৫৮ দিনে একটি তিথি না কমিয়া দুইটি কমিবে কেন?

শ্রী অমৃতলাল শীল

(১১২)

আলো

"দীপ নিব্‌লে আলো কোথায় যায়" এ জান্‌তে হ'লে আগে বুঝা দরকার আলো বা দীপ-শিখা জিনিসটা কি। শিখা সেই space বা স্থানটিকেই বলে যেখানে দীপের তেল বাষ্পীভূত (gasified) হ'য়ে চারি পাশের বাতাসের সহিত মিলিত হওয়ার দরুন্ রাসায়নিক ক্রিয়া বা পরিবর্ত্তন ঘটে, আর তার ফলে তাপ ও আলো দেখা দ্যায়। এখন দীপের তেলের বাষ্পীয় অবস্থায় পরিণত হ'তে হ'লে, উত্তাপের প্রয়োজন; তার পর আবার ঐ বাষ্পীভূত তেল যথেষ্ট উত্তপ্ত থাকা দরকার যাতে বাতাসের সংযোগে রাসায়নিক ক্রিয়া সম্ভব হ'তে পারে। সল্‌তে বা পল্‌তের কাজ হচ্ছে দীপের বুক থেকে শিখায় অনবরত তেল পৌঁছে দেওয়া; শিখায় যে পরিমাণে তেল বাষ্পীভূত হচ্ছে, দীপের বুক থেকেও সেই পরিমাণে তেল, কৈশিক আকর্ষণের গুণে, সল্‌তে বেয়ে শিখায় যাচ্ছে।

ফুঁ'য়ে বা বাতাসের ঝটকায় দীপ নিব্‌বার কারণ হচ্ছে যে বাতাসের ঝটকা শিখা থেকে এত বেশী তাপ এত তাড়াতাড়ি দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় যে তেলের বাষ্পীভূত হবার উপযোগী উত্তাপের অভাব ঘটে; তাই রাসায়নিক ক্রিয়া থেমে যায়; আর সঙ্গে সঙ্গে আলো ও উত্তাপ আমরা হারাই। তা হ'লে দেখা গেল দীপ নিব্‌লে আলো কোথাও যায় না;

ব্যাপারটা এই হয় যে রাসায়নিক ক্রিয়ার অভাবে আলো আর হয় না।

অমিয় বসু

প্রশ্নকর্তা জিজ্ঞাসা করেছেন "প্রদীপ নির্ব্বাপিত করিলে আলো কোথায় যায়?" যতদূর সম্ভব বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মতত্ত্ব এড়িয়ে এর উত্তর দিচ্ছি। প্রথম কথা হচ্ছে যে "আলো" বস্তু (matter) নয়। সুতরাং আলো-সম্বন্ধে কোথা থেকে আসা বা কোথায় যাওয়া এরূপ বস্তুধর্ম্ম আরোপ করা চলে না। আলো সম্বন্ধে আলোচনা করতে হ'লে পদার্থসকলকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করতে হয়—স্বভাবতঃ উজ্জ্বল (luminous) ও অনুজ্জ্বল (non-luminous)। সূর্য্য, প্রদীপের শিখা প্রভৃতি উজ্জ্বল পদার্থের দৃষ্টান্ত; এবং দরজা, টেবিল, গেলাস, ধূলি প্রভৃতি অনুজ্জ্বল পদার্থ। উজ্জ্বল পদার্থ স্বভাবতঃই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় আর অনুজ্জ্বল পদার্থ সেরূপ হয় না। অন্ধকার ঘরের কোন জিনিষ আমরা চোখে দেখিনে; ঘরে একটি আলো জ্বাললে প্রথমতঃ প্রদীপশিখা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় কারণ উহা উজ্জ্বল পদার্থ। আলোকরশ্মিসকল (rays of light) দীপশিখা থেকে বেরিয়ে চোখের ভেতরের একটা পর্দায় (retina) উহার প্রতিবিম্ব (image) উৎপন্ন করে। তাই আমাদের মস্তিষ্কে দীপশিখাটির অনুভূতি জন্মে। তার পর আলোকরশ্মির সাধারণ গুণ সরল পথে অনুভূতি প্রদান করে; সে কারণ রশ্মিগুলি উজ্জ্বল পদার্থ থেকে বেরিয়ে অন্যান্য অনুজ্জ্বল পদার্থের ওপর পড়ে' প্রতিহত হ'য়ে ফিরে' এসে আমাদের চোখে লাগে (অবশ্য যদি আমরা তাকিয়ে থাকি), তাই চোখের ভেতরের সেই পর্দায় ঐ ঐ পদার্থের প্রতিচ্ছায়া অঙ্কিত হয় এবং আমাদের মস্তিষ্কে ঐ পদার্থগুলির ধারণা জন্মে অর্থাৎ আমরা ঐ জিনিষগুলি দেখ্‌তে পাই। প্রদীপটি নিভিয়ে দিলে ঘরের ভেতর কোন উজ্জ্বল পদার্থ (সুতরাং আলোকরশ্মির উৎপত্তিস্থান) রইল না, কাজেই কোন অনুজ্জ্বল পদার্থের প্রতিবিম্ব চোখে উৎপন্ন হবারও সুযোগ রইল না। সেজন্য তখন কোন অনুজ্জ্বল পদার্থ দেখা যায় না। প্রশ্নকর্তা একেই বলেছেন "আলোর কোথাও চলে' যাওয়া"। সুতরাং দেখা গেল, "আলো থাকা" কোন উজ্জ্বল পদার্থের অস্তিত্বের একটি গুণ (quality) মাত্র, এবং "আলো যাওয়া" ঐ উজ্জ্বল পদার্থটির অভাব-নির্দ্দেশক।

শ্রী নগেন্দ্রনাথ সেন

(১৯৩)

বিমানপোত পৃথিবীর আহ্নিকগতি পায় কেন?

পৃথিবী থেকে প্রায় ৪৫ ক্রোশ উর্দ্ধপর্য্যন্ত বায়ুমণ্ডল (atmosphere) আছে। পৃথিবী যেমন ২৪ ঘণ্টায় নিজের কক্ষের (axis) ওপর একপাক ঘুরে' আসে, পৃথিবীর চতুষ্পার্শ্বস্থ এই বায়ুমণ্ডল তার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে, সেজন্য এই বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত বিমানপোত, পাখী প্রভৃতি পৃথিবীর সঙ্গে ঠিক সমানভাবে ঘুরতে থাকে। সমুদ্র নদী জলাশয় প্রভৃতি যেমন মাছ, কুমীর, নৌকা প্রভৃতি জলগর্ভস্থ সমুদয় পদার্থ নিয়ে পৃথিবীর সঙ্গে বেড়ায়, বায়ুমণ্ডলও তেমনি তৎগর্ভস্থ বিমানপোত ইত্যাদি নিয়ে বেড়ায়। সুতরাং একখানা বিমানপোত যদি কলকাতার ঠিক ওপরে উঠে' নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে থাকে অর্থাৎ তার নিজের কোন গতি (motion) না থাকে, তবে সে বরাবর কলকাতার ওপরেই থেকে যাবে। অবশ্য যদি বিমানপোতখানি বায়ুমণ্ডলের বাইরে যেতে পারত এবং অন্য কোন আকর্ষণের বশীভূত হ'ত তবে ১২ ঘণ্টার পর অবতরণ করলে পৃথিবীর অপরাংশে কলকাতার ঠিক বিপরীত (antipodes) পড়্‌ত।

এর সঙ্গে মাধ্যাকর্ষণের কোন সম্বন্ধ নেই।

শ্রী নগেন্দ্রনাথ সেন

পৃথিবী আহ্নিক গতি অনুসারে প্রায় ২৪ ঘণ্টায় (প্রকৃত সময় ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেণ্ড) আপন মেরুদণ্ডের উপর একবার ঘুরিয়া আসে। এখানে যে কেবলমাত্র পৃথিবীর মৃত্তিকাময় অংশটুকু ঘুরিতেছে তাহা নয়; পৃথিবীর উপরিস্থ বায়ুমণ্ডলও একই কৌণিক গতিতে (angular velocity) ঐসঙ্গে ঘুরিতেছে। যদি তাহা না হইয়া কেবলমাত্র মৃত্তিকার অংশটুকু আবর্ত্তন করিত তাহা হইলে পৃথিবী-পৃষ্ঠে সর্ব্বদাই ভীষণ ঝড় বহিত; কারণ বায়ুমণ্ডল স্থির থাকি[য়া] কেবলমাত্র মৃত্তিকাময় অংশটুকু ঘুরিলে পৃথিবী ও তৎপৃষ্ঠে অবস্থিত আমরা আমাদিগকে নিশ্চল দেখিতে পাইতাম। আরও দেখিতাম বায়ু ভীষণ বেগে পূর্ব্ব দিক্ হইতে পশ্চিম দিকে সর্ব্বদাই প্রবাহিত হইতেছে। ইহাতে এই হইত—আমি শূন্যে উঠিলেই দেখিতে পাইতাম পৃথি[বী] আমাকে পশ্চাতে রাখিয়া পূর্ব্বদিকে বেগে ধাবিত হইতেছে, এবং [১২] ঘণ্টার মধ্যে আমি পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠে উপস্থিত হইয়াছি এ[বং] ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া যে-স্থান হইতে উঠিয়াছিল[াম] পুনরায় সেখানে আসিয়া পৌঁছিতাম। পৃথিবীর লোক দেখিত [বায়ু] আমাকে ভীষণ বেগে পশ্চিমে ঠেলিয়া লইয়া চলিল। যাহা [২৪] ঘণ্টায় পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবে তাহার বেগ কত ভীষণ বোধ হইবে?

এক্ষণে পৃথিবী তাহার উপরিস্থ বায়ুমণ্ডল লইয়া ঘুরিতেছে ধ[রিয়া] লইলে কি হয় দেখা যাউক:—

যখন সকল স্থানই একই সময়ে একবার ঘুরিয়া আসিতেছে ত[খন] সকল স্থানেরই কৌণিক গতি (angular velocity) একই, কি[ন্তু] রৈখিক গতি (linear velocity) বিভিন্ন, কারণ যে-স্থান পৃথি[বীর] কেন্দ্র হইতে যত দূরবর্ত্তী সে তত বৃহত্তর পরিধি সৃষ্টি করিতেছে। কি[ন্তু] কৌণিক গতি (angular velocity) সকলেরই সমান বলিয়া যে [যত] বড় পরিধি সৃষ্টি করে তাহার রৈখিক গতি (linear velocity) [তত] বেশী। সেইজন্য যে-স্থান যত উচ্চে অবস্থিত তাহার রৈখিক গতি [তত] অধিক। সুতরাং উপরিস্থ বায়ুর রৈখিক গতি ভূপৃষ্ঠের গতি অপে[ক্ষা] অধিক।

জড় পদার্থের একটি ধর্ম্ম এই যে তাহাকে একটি গতি দিয়া ছা[ড়িয়া] দিলে যদি কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত না হয় তবে সে সেই গতিতে অনবরত অগ্রসর হইতে থাকিবে। উপরিস্থ বায়ুর গতি ভূপৃষ্ঠের [গতি] অপেক্ষা অধিক হওয়ায় বেলুন যখন উপরে উঠিল তখন এই হ[ওয়া] উচিত ছিল। বায়ু বেলুনকে পশ্চাতে রাখিয়া যায়, কারণ ভূপৃষ্ঠের গ[তি] যাহা বেলুনের রৈখিক গতিও তাহাই। কিন্তু জলের উপর ভাস[মান] দ্রব্যাদি যেমন স্রোতের বেগে গমনাগমন করে সেইরূপ বেলুনটিও বায়ুস্তরে ভাসিতেছে সেই স্তরের রৈখিক গতি প্রাপ্ত হয়। এত[দ্ব্যতীত] পৃথিবী-পৃষ্ঠ হইতে প্রাপ্ত নিজ গতিও আছে। সেই একই [কারণে] বায়ু বেলুনকে পশ্চাতে না রাখিয়া বরং বেলুনই বায়ুকে পশ্চাতে রা[খিয়া] যাইবারই কথা। কিন্তু বেলুনের গতি বায়ুর গতি অপেক্ষা অ[ধিক] থাকায় বেলুনের সহিত বায়ুর ঘর্ষণ উপস্থিত হয় এবং বেলুন হা[ল্কা] বলিয়া বেলুনের এই বেশী গতিটুকু ক্রমেই হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং কি[ছু] পরে একেবারেই অন্তর্হিত হয়। তখন সে কেবল মাত্র সেই [বায়ুর] বেগেই অগ্রসর হয়, কিন্তু এই বায়ুর কৌণিক গতিও যাহা তাহার [কিংবা] ভূপৃষ্ঠের কৌণিক গতিও তাহাই। সেইজন্য বেলুনটি যে-স্থান হ[ইতে]

উঠিয়াছিল প্রায় সেই স্থানের উপরেই ভাসিতে থাকে, বরঞ্চ একটু পূর্ব্বে সরিয়া যাইবারই সম্ভাবনা।

শ্রী হাজারিলাল বিশ্বাস

আহ্নিক গতি যে পৃথিবীর কেবল জলাংশ ও স্থলাংশের আছে তা নয়, পৃথিবীকে ঘিরে' যে বায়ুমণ্ডল রয়েছে তারও আছে। বিমান-পোত আকাশে উঠ্‌লে বায়ু-মণ্ডলের বাহিরে যায় না, সুতরাং সেও আহ্নিক-গতিকে এড়িয়ে যেতে পারে না। উড়ো জাহাজ কল্‌কাতার আকাশে উঠ্‌লেও, আহ্নিক গতির দরুন্, কল্‌কাতার সঙ্গে-সঙ্গেই চল্‌তে থাকে; তাই পূর্ণ বারো ঘণ্টা পরে নাম্‌লেও সে কল্‌কাতাতেই নাম্‌বে, "কলিকাতার ঠিক বিপরীতে, পৃথিবীর অপরার্দ্ধাংশে যে স্থান আছে" সেখানে নয়। পৃথিবী বায়ুমণ্ডলকে আঁকড়ে ধরে' থাকে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জোরে; তাই বায়ুমণ্ডল আমাদের ছেড়ে অনন্ত-শূন্যে ভেসে যায় না।

অমিয় বসু

পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে একটি বায়ুমণ্ডলের আবরণ আছে, তাহার গভীরতা প্রায় ৫০ পঞ্চাশ মাইল। মাধ্যাকর্ষণের বলে এই বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে আহ্নিক-গতি অনুসারে ঘুরিয়া থাকে। এইজন্যই বিমান-পোতটি বার ঘণ্টাকাল কলিকাতার উপরে অবস্থান করিয়াও একই স্থানে অবতরণ করিয়া থাকে। মাধ্যাকর্ষণই ইহার কারণ বটে।

শ্রী রণবীরকিশোর দেববর্ম্মা

(১৯৫)

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর বাল্যজীবনী বিস্তৃতভাবে কোনও এক পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে বলিয়া জানা যায় না। "চৈতন্য-ভাগবত," "চৈতন্যমঙ্গল" "চৈতন্যচরিতামৃত", "ভক্তি-রত্নাকর", "অদ্বৈতপ্রকাশ" প্রভৃতি গ্রন্থে বিক্ষিপ্তভাবে এতৎসম্বন্ধে বর্ণনা আছে। আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব গোলোকগত মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর ঐ বিক্ষিপ্তাংশ সঙ্কলিত করিয়া, শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর একখানা জীবনী প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহারই উদ্যোগে এবং উৎসাহে ত্রিপুর-রাজ-বংশাবলী "রাজমালা"র বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক "শ্রীমন্নিত্যানন্দ-চরিত" নামে একখানা সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ সংগৃহীত এবং আগরতলা রাজমালা যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া তত্রত্য "বীরচন্দ্র লাইব্রেরী" হইতে ১৩১৮ ত্রিপুরাব্দে প্রকাশিত হয়। উহার একখণ্ড আমার নিকট আছে।

শ্রী রণবীরকিশোর দেববর্ম্মা

(১৯৭)

কাল-বৈশাখী

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রখর রৌদ্র-তাপে মাটি অত্যন্ত তেতে ওঠে; সেই তাতে বায়ুমণ্ডলের নিম্নতম স্তরগুলিও খুব গরম হ'য়ে ফেঁপে ওঠে; অথচ কিছু উপরের দিকের বায়ুস্তরগুলি অপেক্ষাকৃত বেশ ঠাণ্ডা থাকে। গরম ফাঁপা বাতাস উপরের দিকে ঠেল্‌তে থাকে; আর উপরের দিকের ঠাণ্ডা বাতাস অপেক্ষাকৃত ভারী বলে' নীচের দিকে পড়্‌তে থাকে; এই দুয়ের সংঘর্ষণে ঝড়ের উৎপত্তি। বৃষ্টির কারণ সমস্ত দুপুরে অত্যন্ত গরমে সাগর, নদী ও পুকুরের জল দ্রুত শুকিয়ে মেঘে পরিণত হয়, এই মেঘ ঝড়ে জড়ো হ'য়ে মাঝে মাঝে বিকালে বর্ষণ করে।

এখানে "কাল" শব্দের অর্থ "যম" বা "মৃত্যু", কারণ জলপথে কাল-বৈশাখীর নজরে একবার পড়লে প্রাণ নিয়ে তীরে ফেরা অনেকেরই হ'য়ে ওঠে না; এই সময় প্রতি বছরেই বাংলাদেশে অনেক নৌকা ডোবে, তাই নাবিকেরা কালবৈশাখীকে যমের মতই ভয় করে' চলে।

অমিয় বসু

(২০১)

রামচন্দ্রের প্রপিতামহের নাম রঘু। তিনি যখন রাজ্যলাভ করিয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন তখন তাঁহার সহিত বঙ্গদেশের রাজগণের যুদ্ধ হয়। রঘুবংশের ৪র্থ সর্গের ৩৬।৩৭ শ্লোকে ইহার উল্লেখ আছে। নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল—"বঙ্গীয় নরপতিগণ রণতরীতে আরোহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রঘুরাজ তাঁহাদিগকে বলপূর্ব্বক পরাজয় করিয়া গঙ্গাপ্রবাহ-মধ্যস্থিত দ্বীপপুঞ্জে জয়স্তম্ভ প্রোথিত করিলেন। তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিয়া পুনরায় স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠিত করিলে পর তাঁহারা শালিধান্যের ন্যায় রঘুর পাদপদ্মে প্রণত হইয়া বিপুল ধন দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন।"

শ্রী বিদ্যাপতি ভট্টাচার্য্য

গান

শাখায় জাগে নবীন পাতা,
লতায় দোলে ফুল;
আজ, দখিন্ হাওয়া চম্‌কে এসে
ভাঙ্‌ল মনের ভুল!
ঝরা-পাতার বুকের 'পরে
জীবন-শিশু নৃত্য করে,
ও সে, উড়িয়ে দিয়ে সকল জরা
আনন্দে আকুল।

আজ নিখিল-ভরা শতেক স্বরে
কোথায় পাতি কান?—
কারেই করি অবহেলা,
শুনি বা কার গান!
ভেবে আমি না পাই মনে
চলি কাহার নিমন্ত্রণে;
আমায় আজি লুট করেছে
বসন্ত ব্যাকুল!

"প্রতিধ্বনি"

স্পর্শমণি

রসায়ন-শাস্ত্রের পরিচয় আজকাল কাহারো কাছে অবিদিত নহে। পথে-ঘাটে ঔষধালয়, সাময়িক পত্রাদিতে বিজ্ঞাপন এবং চিকিৎসক-দত্ত তিক্ত ঔষধ রসায়ন-শাস্ত্রের মহিমা সর্ব্বক্ষণই প্রচার করিতেছে। কিন্তু ইহার উৎপত্তি কোথা হইতে, তাহা সর্ব্বজনবিদিত নহে।

রসায়নের আদি শাস্ত্রকার প্রাচীন চিকিৎসকবর্গ। এদেশে চরক, সুশ্রুত, নাগার্জ্জুন, গ্রীসে এস্কিউলেপিয়স্, গ্যালেন্, হিপ্পক্রেটিস্, মধ্যযুগের ইয়োরোপে পারাসেল্সস্, গেবর্ ইত্যাদি বৈদ্য ও চিকিৎসকগণ এই শাস্ত্রের সূচনা করিয়া গিয়াছেন। এই প্রাচীন মনীষিগণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মানবদেহের রোগ-সকলের প্রতিকার। রোগের নিমিত্ত ঔষধের অন্বেষণ এবং ঔষধের উপাদান-সকলের সংগ্রহ ও পরীক্ষাই ইহাদের জীবনের প্রধান কার্য্য ছিল। যে-কোন পদার্থ কিছুমাত্র অসাধারণ-গুণযুক্ত বলিয়া মনে হইত, তাহা হইতেই তাঁহারা উপাদান-সংগ্রহের চেষ্টা করিতেন। কখনও বা পদার্থটি স্বাভাবিক অবস্থায় ব্যবহৃত হইত, কখনও বা তাহার সার বস্তু পৃথক্ করিয়া বা তাহার সহিত অন্য কোন পদার্থ যোগ করিয়া ব্যবহার করা হইত। এইরূপে ঔষধ-প্রস্তুত-করণেচ্ছা হইতেই, পুটপাক, তির্য্যক্-পাতন, উর্দ্ধপাতন, মারণ, জারণ ইত্যাদি রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া জন্মলাভ করিয়াছে; এবং এইরূপ অন্বেষণ, গবেষণা ও তত্ত্বানুসন্ধান হইতেই যুগে যুগে রসায়ন-শাস্ত্রের বহু নূতন তথ্য ও বহু নূতন পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

সাধারণ মনুষ্যমাত্রেরই জীবনের প্রধান লক্ষ্য—সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য। ইহার জন্য মানুষ যে কত পরিশ্রম, কত কষ্ট স্বীকার করে, তাহার ইয়ত্তা নাই। অনন্ত সুখ ও অনন্ত কাল ধরিয়া তাহার ভোগ, এই ইচ্ছা প্রত্যেকেরই জীবনে কোনও না কোনও সময় প্রবল থাকে। জ্ঞানলাভের সহিত এই ইচ্ছায় সফলকাম হওয়া সম্বন্ধে নিরাশাও আসে। সেইজন্যই এত দিন পরে, বিদ্বান্ ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ইহাকে দুরাশা বলিয়া ত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু এমন সময় ছিল, যখন বিজ্ঞতম পণ্ডিতে[illegible] বিশ্বাস করিতেন, যে, অনন্ত যৌবন এবং অনন্ত সুখ দুষ্প্রাপ্য হইলেও পাওয়া অসম্ভব নহে। এমন কি তাঁহা[illegible]দের মধ্যে অনেকে এরূপ বলিয়া গিয়াছেন, যে, ইহা[illegible] উপায় তাঁহাদের নিকট জ্ঞাত।

অনন্ত যৌবন বা জীবন লাভের উপায় অমৃত। অন[illegible] সুখের উপায় অসীম ঐশ্বর্য্য। ঐশ্বর্য্য যে সুখের আক[illegible] সে-সম্বন্ধে বহুদর্শী ঋষি ও দার্শনিক ভিন্ন আর কাহার সন্দেহ ছিল না এবং এখনও নাই। তবে প্রশ্ন এই, [illegible] অসীম ঐশ্বর্য্যলাভের সহজ উপায় কি?

বহু পুরাকাল হইতে স্বর্ণই ঐশ্বর্য্যের প্রধান নিদর্শ[illegible] রূপে গৃহীত হইয়া আসিতেছে। ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্র[illegible] বিক্রয় সকলই সুবর্ণ-খণ্ডের পরিমাপে চালিত হ[illegible] সুতরাং ঐশ্বর্য্য বলিতে সুবর্ণ বলিলে তাহাতে বিশে[illegible] কিছু ভুল হয় না।

অতএব যদি কেহ সাধারণের অজ্ঞাত কোনও স[illegible] উপায়ে অপর্য্যাপ্তপরিমাণে সুবর্ণ লাভ করিতে পা[illegible] তাহা হইলে তাহার ঐশ্বর্য্য অসীম ও অনন্ত বলিয়া [illegible] যায়। এই উপায়ের আবিষ্ক্রিয়ার জন্য বহুকাল যা[illegible] অনেক জ্ঞানী ও বিদ্বান্ রাসায়নিক আজীবন কাল পরি[illegible] ও চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের চেষ্টা ও গবেষণার ফ[illegible] রসায়ন-শাস্ত্রের অনেক অমূল্য নূতন তথ্য এবং অ[illegible] নূতন পদার্থ মানবের জ্ঞানগোচর হইয়াছে।

ইয়োরোপীয় এবং ঈজিপ্টের প্রাচীন পণ্ডিতদের ম[illegible] স্বর্ণই একমাত্র শুদ্ধ ধাতু। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, যে-কোন ধাতুকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শোধন ক[illegible] স্বর্ণে পরিণত করা যায়। এই শোধন-ক্রিয়ায় অ[illegible] উপাদান আবশ্যক। তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান একটি বি[illegible] গুণযুক্ত ও অতীব দুষ্প্রাপ্য পদার্থ। তাহার নাম স্পর্শম[illegible] এই স্পর্শমণি যে কিপ্রকার বস্তু, সে-সম্বন্ধে নান[illegible] মত প্রচলিত ছিল।

কাহারো মতে ইহার অলৌকিক ধাতুশোধনশ[illegible]

ছিল, কাহারো মতে ইহার স্পর্শগুণ কেবল ধাতুতেই আবদ্ধ ছিল না, পরন্তু রোগের উপশম এবং মনুষ্য-জীবনের যাবতীয় দুঃখকষ্টের লাঘব করার ক্ষমতাও ইহার ছিল।

এই স্পর্শমণির বা পরশপাথরের খোঁজে নানাদেশে নানা সময়ে কত যে চেষ্টা হইয়াছে, তাহার বিষয়ে লিখিয়া শেষ করা যায় না। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, পরমাণুবাদের প্রচলনের পর মৌলিক পদার্থের পরিবর্ত্তন অসম্ভব বলিয়া ধারণা বিদ্বজ্জনের মধ্যে দৃঢ় হয়। তবে তাহা সত্ত্বেও এবিষয়ে চেষ্টা এখনও চলিতেছে এবং বোধ হয় চিরকাল চলিবে।

প্রথম কোথায় কে এবিষয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ করেন, তাহা বলা অসম্ভব। পাশ্চাত্য ইতিহাসের প্রথম ভাগে দেখা যায় যে, রসায়ন-শাস্ত্র ধর্ম্মের অঙ্গবিশেষ বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিল এবং সেইজন্য কেবলমাত্র পুরোহিত শ্রেণীর লোকের এই বিষয়ে অধিকার ছিল।

রসায়ন শাস্ত্রের পাশ্চাত্য নাম কেমি বা কেমিষ্ট্রি। এই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। গ্রীক্ ভাষায় এই নামের মূল "ক্কেমিয়া"। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক প্লুটার্ক্ বলেন যে, ঈজিপ্ট্ দেশের নাম সেই দেশের পবিত্র দেবভাষায় "খেম্" বা "খ্মী" (অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ) ছিল। সুতরাং কেমিয়া শব্দের উৎপত্তি ঐ শব্দ হইতে হইয়াছে বলা যায়। অন্যেরা বলেন, যে, হীব্রু ভাষার "চামান্" বা হামান্ শব্দ—যাহার অর্থ "গুহ্য" বা "অলৌকিক"—ইহার মূল। জ্ঞানী বোকার্ট্ বলেন যে, আরবী "চেমা" বা "কেমা" ধাতু—অর্থ লুকান—ইহার মূল।

মূল যাহাই হউক, এই শব্দের আন্তর্থ যে গুহ্য শাস্ত্র বা সাধারণে অপ্রকাশ্য শাস্ত্র, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। আমাদের দেশের এই শাস্ত্রের নাম "রসায়ন" পারদের অন্য নাম "রস" হইতে উৎপন্ন। পারদ শব্দের অর্থ যাহা পার-প্রদ বা সর্ব্ববিঘ্ন উত্তীর্ণ করায়, অর্থাৎ যাহা সর্ব্বরোগের মহৌষধ। রসায়নের অর্থ পারদ-পথ।

বিদেশে রসায়ন-শাস্ত্রের জন্মস্থান ঈজিপ্ট বা মিশরদেশ। ঈজিপ্সীয়ান্ দেবতা "থথ্" এই শাস্ত্রের উদ্বোধন করেন, এইরূপ সেই দেশে কিংবদন্তী ছিল। কাহারো মতে "থথ"

মিশরের দেবতা থথ্

দেবতা পরে ইয়োরোপে হার্মীজ্ নাম প্রাপ্ত হয়েন। এই হার্মীজ্ দেবতার নাম হইতেই "হার্মেটিক্যালি সীল্ড্" কথার উৎপত্তি। ইহার কারণ প্রাচীন রাসায়নিকগণ তাঁহাদের পাত্রসকল হার্মীজ্ দেবতার চিহ্ন-যুক্ত ঢাক্‌নি দ্বারা আবদ্ধ করিতেন। পানোপলিস্ সম্ভূত জোজিমস্ নামক খৃঃ ৫ম শতাব্দীর প্রাচীন লেখক বলেন, যে, পুরাকালে এই শাস্ত্রের বিশেষ সুখ্যাতি ছিল না। তিনি বলেন:—ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে, যে, কতিপয় দেবতা, মনুষ্য-কন্যা-দর্শনে মিলনকামী হইয়া তাহাদিগের নিকট প্রকৃতির রহস্যসকল প্রকাশ করিয়া দেন। এই দোষের শাস্তিস্বরূপে তাঁহারা স্বর্গ হইতে নির্ব্বাসিত হন। রোমকদিগের মধ্যেও এইরূপ প্রবাদ ছিল, যে, সিবিল্লা নামক নারী সূর্য্যদেব ফীবসের নিকট হইতে বাসনাতৃপ্তির মূল্যস্বরূপে দীর্ঘজীবন ও এই শাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করে।

এইরূপ প্রবাদ পারস্যদেশ, ফিনিশিয়া, গ্রীস ইত্যাদি নানাদেশে নানাজাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। ইহা বাইবেলে বিবৃত আদম ও হবার নন্দন-কানন হইতে বিতাড়নের উপাখ্যানের বিভিন্ন রূপান্তর মাত্র।

অল্‌নাদিম লিখিত আরবী কিতাব্ অল্ ফিহ্‌রিস্ত্ নামক পুস্তকে আছে, যে, জ্ঞানী হার্মীজ এই শাস্ত্রের সূচনা করেন। তিনি বাবিলন্‌দেশীয় ছিলেন, কিন্তু বাবেল্ নগরের অধিবাসিগণ ছড়াইয়া পড়িলে তিনি ঈজিপ্টে বসবাস করেন। ডাইওডরাস্ সিক্যুলাস্ ঈজিপ্টে প্রবাদ শুনিয়াছিলেন, যে, প্রথম ধাতুনিষ্কাশন টিউব্যাল্‌কেন্ করেন। এই টিউব্যাল্‌কেন্‌ই রোমক দেবতা ভল্‌কান্।

ভারতবর্ষে রসায়নের ইতিহাস অতি পুরাতন। ঋগ্বেদে ইহার প্রথম সূত্রপাত দেখা যায়। অথর্ব্ববেদে ইন্দ্রজাল, মন্ত্র, ইত্যাদির সহিত মিশ্রিতভাবে ইহার

ক্রমবিকাশ, ও পরে আয়ুর্ব্বেদ এবং তন্ত্রে পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়।

এদেশের অতি পুরাতন যুগে রসায়ন-শাস্ত্র চিকিৎসা-শাস্ত্রের বা আয়ুর্ব্বেদের অঙ্গমাত্র ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভৈষজ্যানির এবং আয়ুস্থানির (দীর্ঘজীবন লাভের ঔষধ) অন্বেষণ এবং তন্নিমিত্ত নানাদ্রব্যের পদার্থগুণ পরীক্ষা, ইহা হইতেই রসায়নের বিকাশ। সুশ্রুতের মতে স্বয়ং ব্রহ্মা এই আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গরূপে প্রকাশ করেন। তন্ত্রে হরগৌরী-সংবাদে বোঝা যায়, যে, স্বয়ং মহাদেব এই শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন। চরকের মতে অন্য দেবতাগণ ইহার প্রকাশ করেন। রসেশ্বর সিদ্ধান্তে বহু দেবতা, দৈত্য, মুনি ও মানবের নাম পাওয়া যায়, যাঁহারা "রস" দ্বারা জীবন্মুক্ত হইয়া যান। মহেশ, দৈত্য-গুরু শুক্রাচার্য্য, বালখিল্য মুনিগণ, নৃপতি সোমেশ্বর, গোবিন্দ ভাগবত, কপিল, ব্যালি ইত্যাদি অনেক নামই ইহার মধ্যে আছে।

এই ত গেল পুরাণ আদির রসায়নের উৎপত্তির বিবরণ। ঐতিহাসিক সময়ের মধ্যে এবিষয়ে যাহা জানা যায়, তাহাও অতি বিচিত্র। এই প্রবন্ধের মধ্যে তাহার সম্পূর্ণ বর্ণন অসম্ভব।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলে তখনকার সময়ে প্রচলিত রাসায়নিক গ্রন্থাবলী সংগৃহীত হয়। এই সংগ্রহ এখন ভেনিস্ নগরের সেণ্ট্ মার্ক্ যাদুঘরে রক্ষিত আছে। ইহার মধ্যে অধিকাংশই খৃষ্টীয় ৩য় বা ৪র্থ শতাব্দীতে লিখিত। এই পুঁথিগুলি কতক সুপরিচিত লেখকদিগের লিখিত, কতক কাল্পনিক লেখকের নামে প্রচলিত ছিল। সেই সময়কার রসায়ন-শাস্ত্র এবং তাহার বিষয়ে প্রচুর গবেষণার পরিচয় এই পুঁথিসংগ্রহে লিপিবদ্ধ আছে। লিডেন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে এইরকম আর-একটি পুঁথি আছে। ইহা প্যাপিরস্ নামক উদ্ভিজ্জ পত্রে লিখিত, এবং থীব্‌স্ নগরের এক সমাধিমণ্ডপে ইহা পাওয়া যায়। নানাপ্রকার নিম্নশ্রেণীর ধাতুর মিশ্রণে কিপ্রকারে স্বর্ণের অনুকরণ করা যায়, সেই বিষয়ের অনেক সূত্র এবং সংকেত ইহাতে লিখিত আছে। এইসকল পুঁথি হইতে বোঝা যায়, যে, অন্ততঃ খৃঃ ৭ম শতাব্দী পর্য্যন্ত রসায়ন অতিশয় গুপ্ত শাস্ত্র ছিল। তাহার পর ক্রমে ক্রমে, কৃত্রিম উপায়ে স্বর্ণ প্রস্তুত-করণ এবং সর্ব্বব্যাধি ও জরানাশক মহৌষধির আবিষ্কার এই দুই উদ্দেশ্যে রসায়ন-শাস্ত্রের চর্চ্চা সার্ব্বজনীন হইয়া পড়ে।

অতি প্রাচীন কালের দার্শনিক মতবাদের মধ্যেও পদার্থ ও শক্তি এই দুইয়ের উৎপত্তি, প্রকৃতি এবং পরস্পরের সম্বন্ধ বিষয়ে নানাপ্রকার বিচার ও গবেষণা দেখা যায়। এইপ্রকার মতবাদ সর্ব্বস্থলেই যে রীতিমত পরীক্ষা এবং চাক্ষুষ দর্শনের উপর স্থাপিত ছিল, তাহা নহে; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, যে, সাধারণ অভিজ্ঞতায় যতটা সম্ভব, ততদূর পর্য্যন্ত বিচারের ভিত্তি ন্যায়সঙ্গত ও যথাযথ করিবার চেষ্টা সর্ব্বকালেই ছিল।

গ্রীক্ দর্শনে দেখা যায়, যে, প্রথমে জলই সর্ব্ব পদার্থের মূল বলিয়া জ্ঞাত ছিল। খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর এক গ্রীক্ দার্শনিক, মাইলীটস্ নিবাসী থেল্‌স্, এই মতের জন্মদাতা বলিয়া পরিচিত। ইনি কিছু কাল ঈজিপ্টে যাপন করিয়াছিলেন এবং তথাকার থীব্‌স্ ও মেম্ফিস্ নগরের পুরোহিতগণের নিকট বিজ্ঞান শিক্ষা করেন। সুতরাং তাঁহার মতামতে ঈজিপ্টের প্রভাব থাকা খুবই সম্ভব। পদার্থ ও ভৌতিক ঘটনাদি সম্বন্ধে যে-সকল দার্শনিক অনুসন্ধান ও বিচার করেন, তাঁহাদের মধ্যে ইনিই প্রথম বলিয়া ইয়োরোপে পরিচিত। ইঁহার মতামতের প্রভাব প্রায় আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া পাশ্চাত্য জগতে অক্ষুণ্ণ ছিল। গুরুবাদ ও শাস্ত্রের উপর মানুষের যে কিপরিমাণ ভক্তি আছে, তাহার পরিচয় ইহা হইতেই পাওয়া যায়।

সকল বস্তুর মূল উপাদান একই মৌলিক পদার্থ-বিশেষ, এই মত প্রায় সকল প্রাচীন দার্শনিকই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেই মৌলিক পদার্থ কি এবং তাহার স্বভাব কিরূপ, সে-সম্বন্ধে যথেষ্টই মতভেদ ছিল। থেলস্ বলেন, তাহা জল এবং জলের গুণাবলী-যুক্ত; এনাক্সিমিনিস্ (খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতাব্দী) বলেন, তাহা বায়ু এবং বায়বীয় স্বভাবের; হেরাক্লীটস্ বলেন, তাহা অগ্নি; এবং ফেরিকাইডিস্ বলেন, যে, তাহা মৃত্তিকা।

একই মৌলিক পদার্থ (ভূত) হইতে বিভিন্নরূপ প্রকৃতির পদার্থ-সকলের উৎপত্তি হইয়াছে, এই মত প্রমাণ করা বিশেষ দুরূহ হইয়া পড়ে। এক মৌলিক উপাদান হইতে তাহার প্রকৃতির বিরুদ্ধগুণযুক্ত পদার্থের সৃষ্টি কি-প্রকারে হইতে পারে, এই সমস্যার সমাধান না হওয়ায় ক্রমে দার্শনিকগণ একমৌলক মত ত্যাগ করিয়া বহু-মৌলিক মত গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। বৈজ্ঞানিক হিসাবে, এই দার্শনিকদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ এবং মহত্তম, আরিষ্টটল্ নামে এক গ্রীক্ মহাপুরুষ।

ইঁহার মতে জগতের যাবতীয় পদার্থের জন্মদাতা চারিটি মৌলিক পদার্থ, যথা:—অগ্নি, বায়ু, জল এবং মৃত্তিকা। এই মত তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকেরাও কেহ

আরিষ্টটল্

কেহ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, বিশেষে এম্পিডোক্লিস্ নামে একজন গ্রীক্ পণ্ডিত সম্বন্ধে এই খ্যাতি আছে। আরিষ্টটলের মতের বিশেষত্ব এই, যে, তিনি বলিয়াছেন, যে, এই চারি মৌলিক পদার্থ পরস্পরের প্রভাবে এক হইতে অন্যের রূপে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। প্রত্যেক মৌলিক পদার্থের দুইটি বিশেষ গুণ আছে, এই বিশ্বাস তাঁহার ছিল, যথা:—অগ্নি, উত্তপ্ত এবং শুষ্ক; বায়ু, উত্তপ্ত এবং সিক্ত; জল, শীতল এবং সিক্ত; মৃত্তিকা (বা ক্ষিতি) শীতল এবং শুষ্ক। এক মৌলিক পদার্থ অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিলে, যে তৃতীয় পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহার প্রমাণ-স্বরূপ এই দার্শনিক নানা উদাহরণ দিয়া গিয়াছেন। যেমন—অগ্নির উত্তাপ জলের সিক্ততা দ্বারা পরাজিত হইলে ফলে বায়ু উৎপন্ন হয়; বায়ুর উত্তাপ ক্ষিতির শীতলতা দ্বারা পরাজিত হইলে জল উৎপন্ন হয়, ইত্যাদি।

উপরোক্ত মত অবশ্য নির্ভুল নহে; কিন্তু এই প্রখরবুদ্ধি মহাপুরুষই প্রারম্ভকালে বিজ্ঞানকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। পদার্থ-বিজ্ঞান এবং ভৌতিক দর্শনের সত্যাসত্যের নিরূপণ কিপ্রকারে হইতে পারে, তাহার পথ নির্দ্দেশ ইনিই করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যক্ষ-প্রমাণ ভিন্ন কোনও যুক্তির অবতারণা নিষেধ করিয়া তিনি বিজ্ঞানের পথ পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।

আরিষ্টটলের মতবাদ বাইজান্টাইন্ লেখকগণের দ্বারা ঈজিপ্টে প্রচারিত হয়। খ্রীঃ ৭ম শতাব্দীতে আরব জাতি এই দেশ জয় করিয়া তাহা গ্রহণ করেন। পরে যে দেশে আরবগণ গিয়াছেন, সেইখানেই এই বিদ্যার প্রচার তাঁহাদিগের দ্বারাই হইয়াছে।

আমাদের দেশে রসায়নের বিকাশ অতি প্রাচীন কালেই হয়। দুঃখের বিষয়, প্রামাণিক গ্রন্থাবলী বা পুঁথি এ-বিষয়ে এতই কম পাওয়া যায় এবং যাহা পাওয়া যায়, তাহা এতই ছিন্নভিন্ন অবস্থায় আছে, যে, যাহার কোনও অংশ কল্পিত বা আনুমানিক নহে, এরূপ কোনও ধারাবাহিক ইতিহাস লেখা অসম্ভব। তিব্বতীয় এবং চীনদেশীয় পুস্তকাগারে প্রাপ্ত তর্জ্জমা হইতে এইসকল প্রাচীন ভারতীয় রাসায়নিক পুস্তকাদির পুনরুদ্ধারের চেষ্টা হইতেছে; কিন্তু বিশেষ কিছু পাওয়া যাইবে কি না, তাহা এখনও নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

পদার্থের উৎপত্তি সম্বন্ধে সাঙ্খ্যদর্শনের সিদ্ধান্তই বোধ হয় আধুনিক পরমাণুবাদের সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ব্যাখ্যা। এই সিদ্ধান্ত কপিল মুনির বলিয়া প্রথিত। তাঁহার মতে পদার্থের উৎপত্তি পঞ্চভূত—যথা ক্ষিতি, অপ (জল), তেজ (আলোক, অগ্নি, বিদ্যুৎ), মরুৎ (বায়ু), এবং ব্যোম (আধুনিক ঈথার —এবং পঞ্চভূতের উৎপত্তি পঞ্চ তন্মাত্র হইতে। তন্মাত্র বা পরমাণুকে তিনি সূক্ষ্মতম গতিশীল অণু বলিয়াছেন। ইহা স্থূলদেহ জীবের চক্ষুর অগোচর।

সাঙ্খ্যদর্শনের পরেই কণাদ ঋষির বৈশেষিক সিদ্ধান্তের বিষয় জানা যায়। ইনিও পদার্থের উৎপত্তির সোপানাবলি সাঙ্খ্যদর্শনের ন্যায় দেখাইয়া গিয়াছেন। ইঁহার মতের বিশেষত্ব, ইঁহার অণুর সংজ্ঞায় পাওয়া যায়।

ইঁহার মতে অণুর বিশ্লেষণ অসম্ভব, অর্থাৎ অণুকে বিভক্ত করা যায় না। এই পরমাণুবাদ দুই সহস্র বৎসর পরে ইয়োরোপে ডাল্টন্ নামক ইংরেজ রাসায়নিক দ্বারা পুনর্ব্বার বিবৃত হয়, এবং তাহা দ্বারা আধুনিক রসায়নের নবজীবন-লাভ হয়। কণাদ ঋষি অণু কেমন করিয়া অন্য অণুর সহিত মিলিত হইয়া স্থূল হইতে স্থূলতর আকার ধারণ করে, তাহারও বর্ণনা করিয়াছেন। এইরূপে যুক্ত অণু ত্রি-অণুক-সমষ্টি (অর্থাৎ পরস্পর সংলগ্ন তিনটি যুগল অণু) রূপ ধারণ করিলে পরে মনুষ্যচক্ষুর গোচর হয়।

চরকের রসায়ন কেবলমাত্র দ্রব্যগুণ ও ঔষধি-সংক্রান্ত ছিল। চরক অনুসারে, "যাহা কিছু দীর্ঘ জীবন-স্মৃতি-শক্তি, স্বাস্থ্য, বল ইত্যাদি বর্দ্ধন করে, তাহাই রসায়ন।" সুশৃঙ্খলভাবে বৈজ্ঞানিক তথ্য পর্য্যবেক্ষণের কোনও বিশেষ লক্ষণ চরকে পাওয়া যায় না। ইহা অসংলগ্ন ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ এবং ঔষধ প্রস্তুত-করণের ব্যবস্থা-পত্রের সংগ্রহ-বিশেষ।

চরক স্বয়ং বাস্তবিক কোন ব্যক্তি-বিশেষ ছিলেন বা কাল্পনিক (বা পৌরাণিক) নাম মাত্র, সে-বিষয়ে কোনও-প্রকার ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে বাস্তব বা কাল্পনিক, যাহাই হউক, ঐ-নামে পরিচিত গ্রন্থ যে ঐতিহাসিক বস্তু, সে-সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। বুদ্ধ-দেবের সহস্র বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী কালে ইহা লিখিত হয়।

চরকের পর হিন্দু-রসায়নে সুশ্রুতের আগমন হয়। সুশ্রুত, চরক অপেক্ষা অনেক অধিক সুশৃঙ্খল এবং বৈজ্ঞানিকভাবে লিখিত।

রাসায়নিক বস্তু-আদির পরিচয়, প্রস্তুত-করণ, দ্রব্যগুণ-বিবরণ ইত্যাদি সুশ্রুতে যথেষ্টই পাওয়া যায়, এবং অধিকাংশ স্থলে এইসকল ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সমসাময়িক পাশ্চাত্য (গ্রীক্ এবং ঈজিপ্টীয়) রাসায়নিকদিগের প্রথা অপেক্ষা অনেক অংশে শুদ্ধ।

সুশ্রুতের যে ভাষ্য এখন প্রচলিত, তাহা অনেকের মতে বিখ্যাত বৌদ্ধ রাসায়নিক নাগার্জ্জুন-লিখিত। এই মহাজ্ঞানী রাসায়নিকের প্রথা এবং মতাদি এদেশে এখনও প্রচলিত আছে। দক্ষিণ দেশে অষ্টাঙ্গহৃদয়-লেখক বাগ্‌ভটের মতই শুদ্ধ বলিয়া গৃহীত হয়। ঐ সময়ে হারীত, ভেল, পরাশর ও অন্যান্য রাসায়নিক এবং চিকিৎসা-শাস্ত্রকারের নাম বাগ্‌ভটের লেখায় পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে এই জ্ঞানীগণের নাম ভিন্ন অন্য কোনরূপ চিহ্ন এখন বর্ত্তমান নাই।

সুশ্রুতে পারদ বা রসের প্রয়োগ-সম্বন্ধে বিশেষ কিছু নাই।

অতি প্রাচীন কাল হইতে খৃঃ ৯ম শতাব্দী পর্য্যন্ত রসায়নের বিস্তারের পরিচয় এইসকল রসায়ন ও আয়ুর্ব্বেদ-মিশ্রিত গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায়। এই সময়ের সকল পুস্তকাবলীই প্রায় সম্পূর্ণভাবে চরক, সুশ্রুত এবং নাগার্জ্জুনের মতে পরিপূর্ণ। খৃঃ দশম শতাব্দী হইতে ১১শ শতাব্দীর মধ্যে দুইজন মাত্র রাসায়নিকের নাম পাওয়া যায়। ইঁহাদের সময়ে চিকিৎসা-শাস্ত্রে অল্পে-অল্পে নূতন মত আসিয়া উপস্থিত হয়। এই দুইজন সিদ্ধযোগ-লেখক বৃন্দ এবং চক্রপাণি। তৎপরে এদেশে তন্ত্রের যুগ উপস্থিত হয়। সে-সময়ের অনেক পুস্তকাদির নানা সংস্করণ এখনও বর্ত্তমান। এবং সেইসকল পুস্তক হইতে অনেক প্রাচীন হিন্দু-রাসায়নিক তথ্যাদি পাওয়া যায়। যাঁহারা এ-বিষয়ে বিশদভাবে কিছু জানিতে চাহেন, তাঁহা-দের আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়-লিখিত "হিন্দু-কেমিষ্ট্রী"-নামক ইংরেজী পুস্তক পাঠ করা উচিত।

তন্ত্রের যুগ রসায়নে পারদের যুগ বলিলেও চলে। পারদ সর্ব্বরোগবিনাশকারী, পারদ হীনধাতুশোধনকারী; এক কথায়, পারদ রাসায়নিকের ব্রহ্মাস্ত্ররূপে তন্ত্রে এবং তান্ত্রিক যুগের পুস্তকাদিতে পরিচিত।

তন্ত্র-যুগের পরে রসায়নের বিশেষ চর্চ্চা ছিল, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। রসায়ন, একদিকে আয়ুর্ব্বেদিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া এবং অন্য দিকে মন্ত্র-তন্ত্র, ইন্দ্রজাল ইত্যাদিতে দ্বিভক্ত হইয়া ক্রমেই অধোগামী হইয়া পড়ে। বৈদিক যুগের মতবাদ এবং বৌদ্ধ যুগের ব্যবহারিক রীতি, ইহারই চর্ব্বিতচর্ব্বণ রসায়ন-

শাস্ত্রের নামে চলিতে থাকে। ১০১৭ খৃঃ হইতে ১০৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এ দেশে আল্‌বেরুনী-নামক একজন বিদ্বান্ মুসলমান আসেন। তিনি সে-সময়ে এদেশে প্রচলিত বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক-কিছুই লিখিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতে অনুমান হয়, যে, রসায়ন তখনই ঘোর কুসংস্কার-তিমিরে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

মুসলমান-বিজেতার হস্তে হিন্দুর অন্য অনেক কীর্ত্তির সঙ্গে প্রাচীন রসায়ন-শাস্ত্রের প্রামাণিক গ্রন্থাবলী প্রায় সম্পূর্ণ বিনাশ-প্রাপ্ত হয়। আমাদের দেশে এখন পরবর্ত্তী লেখকগণের সঙ্কলিত গ্রন্থাবলী আছে। তাহাতে সঠিক বিবরণ পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে অনুমান এই হয়, যে, এদেশে বৌদ্ধ এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিক-যুগের কয়েকজন রাসায়নিক ভিন্ন প্রায় অন্য সকলেই সিদ্ধান্তমূলক বা অনুমানাত্মক রাসায়নিক যুক্তির অবতারণাই বিশেষভাবে করিয়া গিয়াছেন, ব্যবহারিক বা ফলিত রসায়নের চর্চ্চার

ভৈষজ্যগুরু বুদ্ধ

গুরুত্ব বা সার্থকতা বিশেষ উপলব্ধি করেন নাই কিম্বা করিলেও তাহা ঘোষণা করেন নাই। ভৌতিক বা প্রাকৃতিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ বৌদ্ধ রাসায়নিকগণ যতটা করিয়া গিয়াছেন, তৎপরবর্ত্তী রাসায়নিকগণ সেইরূপ না করাই এদেশে রসায়ন-শাস্ত্রের অবনতির প্রধান কারণ বলিয়া অনুমান হয়। বোধ হয়, বৌদ্ধ ধর্ম্মের এক অঙ্গ জীবের দুঃখ-কষ্ট-নিবারণ, এই কারণে বৌদ্ধ-যুগে চিকিৎসা-শাস্ত্রের এবং ঔষধ-বিজ্ঞানের বিশেষ উন্নতির দিকে দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণের লক্ষ্য ছিল; এবং যাহাতে উভয় শাস্ত্রের বিকাশ সহজ হয়, সেইজন্য রাজকীয় সাহায্যে প্রত্যেক মঠ ও বিহারে দাতব্য চিকিৎসালয় এবং হাঁসপাতাল পরিচালিত হইত। নাগার্জ্জুন, মাণ্ডব্য, রত্নঘোষ, ব্যাদি, যশোধর, নন্দী, সিদ্ধ লক্ষ্মীশ্বর, ব্রহ্মজ্যোতি, গহনানন্দনাথ, ভাগ্যদত্তদেব, বৃন্দ, দম্বন, গয়াদাস, মাধব, সাঙ্গধর, চক্রপাণি, ইত্যাদি হিন্দু রসায়নে প্রসিদ্ধ নামাবলীর অধিকাংশই বৌদ্ধ পুরোহিত ও শ্রমণদিগের নাম।

যেসকল প্রাচীন ভৌতিক দর্শন ও রসায়ন-তত্ত্ববিদ্‌গণের নাম এখনও আমরা শুনিতে পাই, তাহার মধ্যে এক অতি মহা জ্ঞানী দার্শনিক সিদ্ধ-পুরুষের নাম, সমতল ভূমিখণ্ডে পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে। সুদূর অতীতের ধূম ও ধূলি-জাল ভেদ করিয়া ইঁহার গৌরবের রশ্মি বর্ত্তমানে আসিয়া পড়িতেছে। এই মহাপুরুষের নাম নাগার্জ্জুন। সুশ্রুতের বর্ত্তমান বেশ ইঁহারই কৃত; অনেক রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া, যথা তির্য্যক্-পাতন, পুটপাক, ঊর্দ্ধপাতন ইত্যাদি ইঁহারই আবিষ্কার; এবং পরবর্ত্তী হিন্দু-রসায়নের গতি ইঁহারই নির্দ্দিষ্ট পথে হয়। কুশানবংশীয় নৃপতি কনিষ্কের রাজত্বকালে ইনি বৌদ্ধ ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান পুরোহিতের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রবাদ এই, যে, তিনি বিদর্ভ-দেশে এক ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, সন্তান-লাভের আশায় তাঁহার পিতার শত ব্রাহ্মণ ভোজন এবং দক্ষিণা দানের ফলস্বরূপে ইঁহার জন্ম হয়। জন্মের পর দৈবজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন, ইঁহার আয়ু সপ্তাহকাল মাত্র। আয়ু-বৃদ্ধির নিমিত্ত শত ভিক্ষু-সেবা করায় ইঁহার আয়ু সপ্ত-বৎসর-কালে পরিণত হয়। সপ্ত বৎসর উত্তীর্ণ হইবার সময় ইঁহার পিতা-

মাতা, সন্তানের মৃত্যু-দর্শন-যন্ত্রণার ভয়ে, ইঁহাকে কয়েক জন পরিচারকের সঙ্গে কোনও নির্জ্জন স্থানে প্রেরণ করেন। সেখানে মহাবোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর খসরপান ইঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া, মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার অব্যর্থ উপায় মগধে নালন্দা বিহারে গমন, এই উপদেশ দেন। সেই অনুসারে নাগার্জ্জুন নালন্দায় গমন করেন।

পরে নালন্দার প্রধান আচার্য্য সারহভদ্র ইঁহাকে ভিক্ষু-পদে অধিষ্ঠিত করেন। কিছুকাল পরে দেশে

সিদ্ধ নাগার্জ্জুন

দারুণ দুর্ভিক্ষ হওয়ায় বিহারের অধিবাসীগণ অত্যন্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়েন। বিহারের জন্য অর্থসংগ্রহের নিমিত্ত নাগার্জ্জুন মহাসাগর মধ্যে এক ঋষির নিকট গমন করেন। ঋষি তাঁহাকে রসায়ন ও স্বর্ণ-প্রস্তুত-করণ শিক্ষা দেন। এই বিদ্যার সাহায্যে নাগার্জ্জুন, প্রত্যাবর্ত্তনের পর, বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া বিহারের দুঃখমোচন করেন।

এদেশীয় রাসায়নিকদিগের বিষয় অনেক বলা গেল। এবার বিদেশীয়দিগের বিষয় আলোচনা করা যাক্। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আরব জাতি ঈজিপ্ট্ জয় করিয়া গ্রীক্ এবং আলেকজান্দ্রীয় রসায়ন-বিদ্যা লাভ করে। ইহার পর রসায়ন-শাস্ত্রের বিকাশ পাশ্চাত্য দেশে আরব-জাতির —বিশেষে সারাসেন-জাতীয় আরবের—শাস্ত্র ও বিজ্ঞান চর্চ্চায় হয়। ইঁহাদের রসায়ন-শাস্ত্রে ও চিকিৎসা-শাস্ত্রে জ্ঞান-লাভ কতটা গ্রীক্‌দের নিকট হইতে ও কতটা হিন্দুদিগের নিকট হইতে হইয়াছিল তাহার নিরূপণ অতীব দুরূহ। কেন না, একদিকে যেমন য়ুনানী (গ্রীক্) বৈজ্ঞানিক জলনুস (গ্যালেন্) ও বুখরাট (হিপ্পক্রেটিস্) তাঁহাদের শাস্ত্রে স্থান পাইয়াছেন, অন্যদিকে শারক (চরক), "সুশ্রুদ" বা "সানাশ্রাদও" (সুশ্রুতও) যথেষ্টই স্থান পাইয়াছেন। প্রসিদ্ধ আরবী পুস্তক-তালিকা কিতাব অল্ ফিহরিস্তে (লেখক, অল্ নাদিম্) এই কথা পাওয়া যায়, যে, খলিফা হারুন্ ও খলিফা মন্‌সুর্ কয়েকটি প্রসিদ্ধ হিন্দু আয়ুর্ব্বেদ ও ঔষধ-বিজ্ঞানের পুস্তক আরবী ভাষায় তর্জ্জমা করান। উক্ত ফিহরিস্তে ইহাও লিখিত আছে, যে, প্রসিদ্ধ হিন্দু চিকিৎসক "মাংখ", যিনি হারুন্ অল্ রসীদকে কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্য করেন, স্বয়ং সুশ্রুত আরবী ভাষায় তর্জ্জমা করেন। অন্য এক আরবী পুস্তকে পাওয়া যায়, যে, 'সনক' নামক হিন্দু চিকিৎসক নিদান এবং অসঙ্কর (বাগভট্ট লিখিত অষ্টাঙ্গহৃদয়) আরবীতে তর্জ্জমা করিয়াছিলেন। অল্‌বেরুনি তাঁহার ভারতবর্ষ-ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়া গিয়াছেন, যে, তাঁহার নিজস্ব পুস্তকাগারে আলি ইব্‌ন্ জৈনের কৃত চরকের সংস্করণ ছিল। এইরূপ আরবী বিজ্ঞানের উপর হিন্দু আয়ুর্ব্বেদ ও রসায়নের প্রভাব-বিস্তারের আরও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। এখনো এই দেশীয় হাকিম সাহেবদিগের অনেক ঔষধের নাম যে সংস্কৃত নামের অপভ্রংশ মাত্র তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন হকিমী নাম "অত্তরফল" সংস্কৃত ত্রিফলা শব্দের অপভ্রংশ মাত্র।

প্রাথমিক শিক্ষা যেখান হইতেই হউক, সারাসেন আরবগণ যে ফলিত ও ব্যাবহারিক রসায়নের উন্নতির বিশেষ সহায়তা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। রোমের ইতিহাস-লেখক গিবন্ বলেন, যে, আরবগণের দ্বারাই ইয়োরোপে রসায়ন আনীত হয় এবং রসায়নের উন্নতি প্রথম দিকে কেবল মাত্র সারাসেন (আরব) রাসায়নিকদিগের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে হয়।

আধুনিক ব্যবহারিক এবং ফলিত রসায়নের অধিকাংশ

আবিষ্কার যে রাসায়নিক সম্প্রদায়ের কর্তৃক হয় এবং সেই সম্প্রদায় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ-কাল পর্য্যন্ত যে পদ্ধতি-অনুসারে রসায়ন চর্চ্চা করিতেছিলেন, এই উভয়েরই জন্ম এবং যথেষ্টপরিমাণে পরিপোষণ আরব দার্শনিক-সম্প্রদায়ের কীর্ত্তিরূপে গণ্য হইতে পারে। উক্ত প্রাচীন আরব দার্শনিকগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ এক ইরাক্ (মেসোপোটামিয়া)-নিবাসী জ্ঞানী পুরুষ, যাঁহার নাম আসলে আবুমুসা জবীর্ অল্ সুফী, কিন্তু ইয়োরোপে গেবর নামে চলিত ছিল। ইহাঁর জীবনকাল ৭০২ খৃঃ হইতে ৭৬৫ খৃঃ। ইহাঁর মতে যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ মাত্রই পারদ এবং গন্ধকের যোগে জনিত। পদার্থ-সমুদয় মধ্যে পার্থক্য এই দুই মৌলিক বস্তুর বিভিন্ন পরিমাণ এবং শুদ্ধতার কারণে হয়।

জবীর অল্ সুফীর পর আবু বকর মোহাম্মদ ইব্‌ন্ জাকারিয়া এল্‌রাজি—ইয়োরোপে রাহজেস্ নামে পরিচিত—নামক পারস্তদেশীয় এক চিকিৎসকের নাম পাওয়া যায়। ইনি ৯২৫ খৃঃ বোগ্‌দাদ্ নগরে চিকিৎসক ছিলেন। গ্যালেন্ এবং হিপ্পক্রেটীসের গ্রীক্ মত অনুসারে ইনি চলিতেন। অন্য একজন প্রসিদ্ধ মুসলমান রাসায়নিক ইয়োরোপে আভি-সেন্না নামে পরিচিত। ইহাঁর আসল নাম আবু আসিএল্ হুসেন ইব্‌ন্ আবদাল্লাহ ইব্‌ন্ সীনা। বোখারা দেশীয় এই চিকিৎসকের ঔষধ-সম্বন্ধীয় পুস্তকাবলী তখনকার রসায়ন-শাস্ত্রে অনেক নূতন মত আনয়ন করে। তাঁহার প্রসিদ্ধ প্রাচ্য-দর্শন-সম্বন্ধীয় পুস্তকের নাম অনেক প্রাচীন ইয়োরোপীয় দার্শনিক উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন কিন্তু তাহার কোনও চিহ্ন আধুনিক সময় পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছায় নাই।

মধ্যযুগে রসায়নের প্রচার আরবদের দ্বারাই হয়। ইয়োরোপে মুসলমান-বিজেতাই রসায়নের প্রচার করেন। স্পেন্‌দেশের উদারচিত্ত মুসলমান খলিফাদ্বয়, য়ুসুফ এবং য়াকুব, এবিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিতেন এবং ইহাঁদের রাজত্বের কারণেই বিজ্ঞান ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা পায়। স্পেন্‌দেশে কর্দ্দোভা, সেভিল্, গ্রেনাদা ও টলেডো এই চারি নগরে প্রধান প্রধান বিদ্যা-পীঠ ছিল। রজার বেকন্ এবং অন্য প্রসিদ্ধ খ্রীষ্টিয়ান্ রাসায়নিক ও পদার্থবৈজ্ঞানিক-গণের শিক্ষা এইসকল বিদ্যা-পীঠেই হয়। তাঁহাদের রসায়ন ও পদার্থ-বিজ্ঞান-সম্বন্ধে জ্ঞান-লাভ প্রধানতঃ "সর্ব্ব-গুণালঙ্কৃত এবং মহান্ গরীয়ান্ বৈজ্ঞানিক" ইব্‌ন্ রোশদ নামক এক মহানুভব মুসলমান আচার্য্যের মত ও শিক্ষার অনুসরণ দ্বারা হয়। ইয়োরোপ ইহার নিকট হইতে আরিষ্টটলের মতসম্বন্ধে এবং গেবর ও আভিসেন্নার সাহায্যে প্রাচ্য দেশীয় বিজ্ঞান ও দর্শন-শাস্ত্রাদি সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করেন। ইব্‌ন্ রোশ্‌দ ১১২৬ খৃঃ হইতে ১১৯৮ খৃঃ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

প্রথম ইয়োরোপীয় রাসায়নিকদিগের মধ্যে তিনজনের নাম প্রসিদ্ধ। ইঁহারা সমসাময়িক এবং পরস্পরের বন্ধু
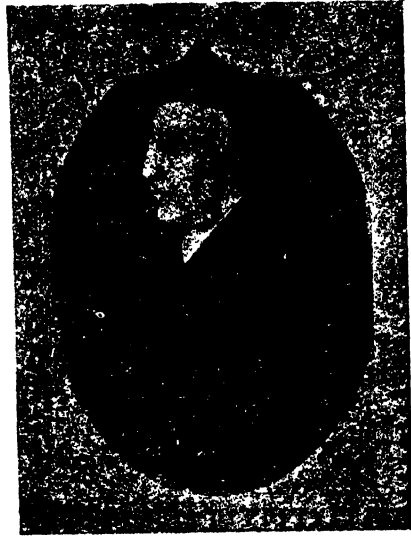
রজার্ বেকন্

ছিলেন। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত রজার্ বেকন্ নামক একজন ইংরেজ খ্রীষ্টিয়ান্ সন্ন্যাসী। ইনি ১২১৪ খৃঃ ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। দর্শন, বিজ্ঞান, রসায়ন ইত্যাদি নানা বিষয়ে পুস্তকাদি লিখিয়া ও অনেক গবেষণা করিয়া ইনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১২৮৫ খৃঃ ইঁহার মৃত্যু হয়। পাশ্চাত্য দেশে বারুদ আবিষ্কার ইনিই করেন, এইরূপ প্রবাদ আছে।

অন্য দুই জনের নাম এলবার্টস্ মাগ্নাস্ ও রেমণ্ড্ ললী। প্রথম ব্যক্তি সমসাময়িক রসায়ন-বিজ্ঞান-সম্বন্ধে অতি

পরিষ্কার ভাষায় বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয় জন নানা নূতন আবিষ্কার, নূতন রাসায়নিক প্রক্রিয়া উদ্ভাবন ইত্যাদির জন্য প্রসিদ্ধ।

কথিত আছে, যে, রেমণ্ড লুলী ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় এড্ওয়ার্ডকে কৃত্রিম উপায়ে স্বর্ণ প্রস্তুত করিয়া দেখান এবং পরে রাজাকে ষাট লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ক্রুসেড্ যুদ্ধের খরচ-হিসাবে দান করিতে চাহেন।

ইঁহাদের পর অনেক রাসায়নিক ইয়োরোপে রসায়ন চর্চ্চা করেন। খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে বেসীল্ ভ্যালেণ্টাইন নামক এক বেনেডিক্টিন সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টিয়ান্ সন্ন্যাসী তাঁহাদের মধ্যে এক বিখ্যাত রাসায়নিক। যে-সকল পুস্তক ইঁহার নামে প্রচলিত তাহাতে অনেক তথ্য পাওয়া যায়, যাহা ইঁহার সময়ের পূর্ব্বে অজ্ঞাত ছিল। আণ্টিমনি (অঞ্জন) ধাতুর অনেক যৌগিক পদার্থ, শব্দীয়া, দস্তা, বিস্মথ ধাতু, ম্যাঙ্গানিজ ধাতু, পারদের বহু যৌগিক পদার্থ ইত্যাদি ইনিই প্রথমে বিশদভাবে বর্ণনা করেন। ইঁহার ব্যক্তিগত ইতিহাস কিছুই জানা যায় নাই।

জর্জ্জ রিপ্লি নামক ইংরেজ খ্রীষ্টিয়ান্ পুরোহিত খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর আর-একজন প্রসিদ্ধ রাসায়নিক। কথিত আছে, যে, ইনি কৃত্রিম উপায়ে স্বর্ণ প্রস্তুত-করণে এতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, যে, জেরুজালেমের সেণ্ট জনের নামে অভিহিত খ্রীষ্টিয়ান্ যোদ্ধৃ-সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় ইঁহার প্রদত্ত বিস্তর সুবর্ণ-রাশিদ্বারা তুর্ক্‌দের বিরুদ্ধে রোড্‌স দ্বীপের যুদ্ধের খরচ চালাইয়াছিলেন।

এতদিন পর্য্যন্ত পশ্চিম দেশীয় রাসায়নিকগণের সকল গবেষণা, প্রয়াস এবং অনুসন্ধানের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দুইটি। প্রথম—হীন ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করা (অ্যাল্‌-কেমি বা অল-কিমিয়া) এবং দ্বিতীয়—সর্ব্বরোগ ও জরা নাশকারী ঔষধ (এলিক্সির বা অল্-ইক্স্‌র্) আবিষ্কার। অন্য সকল রাসায়নিক আবিষ্কার বা ক্রিয়া-উদ্ভাবন এই প্রয়াসেরই শাপালব্ধ ধন মাত্র।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রী কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
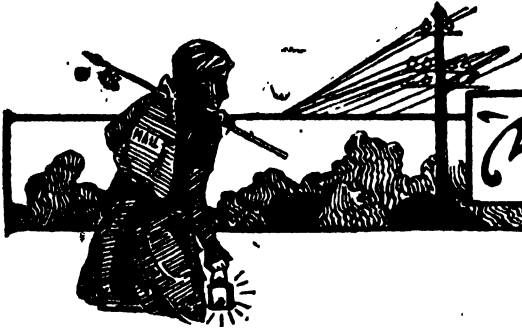
ভারতবর্ষ

নিখিল-ভারত মোস্লেম লীগ—

গত ২৪শে মে তারিখে লাহোরে মোস্লেম লীগের পঞ্চদশ বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বোম্বাইয়ের বিখ্যাত মুসলমান নেতা মিঃ মহম্মদ আলী জিন্না সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উক্ত অধিবেশনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অনেক কংগ্রেস ও খিলাফৎ নেতা উপস্থিত ছিলেন। লীগের কার্য্যের সাফল্য কামনা করিয়া মহাত্মা গান্ধী জানান্, "লীগের সর্ব্বপ্রকার সাফল্য কামনা করিতেছি। আশা করি ইহার আলোচনায় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সৌহার্দ্দ্যের বন্ধন দৃঢ়তর হইবে।"

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত আগা মহম্মদ সাফ্দার তাঁহার উর্দ্দ অভিভাষণে বলেন যে, সকল ধর্ম্মই আত্মসংযম ও পর-মত-সহিষ্ণুতা শিক্ষা দেয় এবং কোনও ধর্ম্মই নির্ব্বিচারে মনুষ্য হত্যার বিধি দেয় না। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় এই তথ্যটা অনুধাবন করিতে পারিলেই পরস্পরের মধ্যে আর কোনও বিরোধ বর্ত্তমান থাকিবে না। খিলাফৎ সম্বন্ধে তিনি বলেন, হেজাজ, মিশর ও মরক্কোর সুলতান অথবা আফ্-গানিস্থানের আমীর ইঁহাদের কাহাকেও সুলতান আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে না। কারণ, এইসকল দুর্ব্বল মুসলমান-রাষ্ট্রের উপর বিদেশীরা ইচ্ছামত প্রভাব বিস্তার করিতে পারে।

মিঃ জিন্না তাঁহার অভিভাষণে বলেন, দেশের সাধারণ লোকের মনে দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে, যে, ভারতবর্ষের শাসনভার আর বিদেশীর উপর থাকা উচিত নহে। কিন্তু স্বরাজলাভ করিতে হইলে, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে রাজনৈতিক একতা স্থাপন করা অপরিহার্য্য—কেননা এই উভয় সম্প্রদায়ের বিরোধের ফলেই এদেশে বিদেশীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যাহাতে ভারতীয়গণ ঔপনিবেশিক শাসনাধিকার লাভ করিয়া জগতের জাতিসঙ্ঘে স্বীয় আসন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, উহার জন্য চেষ্টা করাই মোস্লেম লীগের প্রধান কর্ত্তব্য।

সভায় নির্দ্ধারিত কতকগুলি প্রস্তাবের তাৎপর্য্য দিতেছি।

(ক) ভারতের বিভিন্ন প্রদেশগুলির ভৌগোলিক সীমা পরিবর্ত্তিত করিলেও বাংলা, পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ এই তিনটি মুসলমান-প্রধান প্রদেশের কোন পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে না।

(খ) ব্যবস্থাপক সভাসমূহে জনসংখ্যার অনুপাতে সভ্য নির্ব্বাচিত হইবে; কিন্তু যেস্থানে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা কম, সেই-স্থানে তাহার অনুপাতের অধিক সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিবে।

(গ) মতামতের ও ধর্ম্মের স্বাধীনতা মানিয়া চলিতে হইবে।

(ঘ) বর্ত্তমানের পৃথক্ নির্ব্বাচকমণ্ডলী হইতে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন-প্রথা বজায় রাখিতে হইবে। তবে কোন সম্প্রদায় ইচ্ছা করিলে, পৃথকের পরিবর্ত্তে সাধারণ নির্ব্বাচক-মণ্ডলীদ্বারা প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে পারিবে।

ইহা ভিন্ন সভায় খিলাফৎ-সমস্যা, হিন্দু-মুসলমান একতা প্রভৃতি সম্বন্ধীয় কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ভারতে বিদেশী সুরা—

পার্লামেণ্ট্ মহাসভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে প্রকাশ যে ১৯২২-২৩ সালে বিদেশ হইতে ভারতে ১১ লক্ষ ২০ হাজার গ্যালন্ সুরা আমদানি হইয়াছে। ইহার আনুমানিক মূল্য ২০ কোটি টাকা। ইহাতে ট্যাক্স্ বাদে আয় হইয়াছে ২২ কোটি ১৫ লক্ষ ২ হাজার ৮০ টাকা। এই মদ্যের ৭ লক্ষ গ্যালন্ গ্রেট্‌ব্রিটেন্ হইতে আসিয়াছে।

স্বতন্ত্রীকরণ আইন ও খৃষ্টীয়ান্ সম্প্রদায়—

ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলের ন্যাশন্যাল্ খৃষ্টীয়ান্ কাউন্সিলের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি দক্ষিণ আফ্রিকার স্বতন্ত্রীকরণ আইনের (Class Areas Bill) বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। এই আইনের উদ্দেশ্য, দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয়গণের জন্য অন্ত্যজ জাতিদের ন্যায় সহরের এক প্রান্তে একটা স্বতন্ত্র বস্তি নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া। ন্যাশন্যাল্ খৃষ্টীয়ান্ কাউন্সিল দক্ষিণ-আফ্রিকার মিশনারী সমাজকে জানাইয়াছেন যে, এই প্রস্তাবিত আইনটি ঘোরতর অন্যায় ও বৈষম্যমূলক, কারণ :—

(১) ইহাতে গান্ধী-স্মাট্‌স্ চুক্তিপত্র ভঙ্গ হইবে।

(২) ইহার ফলে ভারতবাসীদিগকে সভ্যসমাজ হইতে দূরে একটা স্বতন্ত্র স্থানে আবদ্ধ রাখিয়া তাহাদের অবস্থা আরও শোচনীয় করিয়া তোলা হইবে।

(৩) ইহা খৃষ্টীয় নীতি ও ধর্ম্মের বিরোধী। এই অন্যায় আইন বিধিবদ্ধ হইলে কেবল মাত্র শ্বেত-সভ্যতা নয়, খৃষ্টীয়ান্ ধর্ম্মের প্রতিও এশিয়াবাসীর একটা বিজাতীয় ঘৃণার সৃষ্টি হইবে।

ন্যাশন্যাল্ খৃষ্টীয়ান্ কাউন্সিল্ অতি সুপরামর্শ দিয়াছেন সন্দেহ নাই কিন্তু তাঁহাদের দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসী স্বজাতীয় এবং স্বধর্ম্মীরা তাঁহাদের কথায় কান দিবে কি ?

বিশনগর ও ফরিদপুর—

বিশনগর ভারতের পশ্চিম প্রান্তে গুজরাটে ; ফরিদপুর ভারতবর্ষের পূর্ব্ব প্রান্তে বাংলায়। দুই স্থানেই হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষ ও বিরোধ অতি কুৎসিতভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

ফরিদপুরে হিন্দুদের একটি প্রাচীন কালীবাড়ী আছে। বহুকাল যাবৎ হিন্দুরা বিনা বাধায় কালীবাড়ীর সম্মুখস্থ রাস্তা দিয়া সংকীর্ত্তন ও মিছিল বাহির করিয়া আসিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে হিন্দুদের আনুকূল্যে জনৈক মুসলমান ঐ কালীবাড়ীর অদূরে একটি মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করে। ইহার পরও হিন্দুরা বিনা বাধায় উক্ত রাস্তা দিয়া সংকীর্ত্তন করিয়া গিয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি সেখানে এই ব্যাপার লইয়া উভয় সম্প্রদায়ের ভিতর মনোমালিন্য

অতিশয় খারাপ আকার ধারণ করিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে কে বা কাহারা ঐ কালীবাড়ীতে একখানি গরুর পা ঝুলাইয়া রাখিয়া যায়। ফলে ফরিদপুরে হিন্দু ও মুসলমান জন-সাধারণের মধ্যে একটা প্রবল বিদ্বেষের অগ্নি প্রধূমিত হইয়া উঠিতেছে এবং ব্যাপার আদালত পর্য্যন্ত গড়াইয়াছে।

বিশনগরেও দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল গোলমাল বাধিয়াছে। গত রামনবমীর দিন বিশনগরের কতকগুলি হিন্দু চিরপ্রচলিত প্রথানুযায়ী ভজন গান করিতে করিতে মসজিদের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল। মুসলমানেরা উন্মুক্ত তরবারি হস্তে তাহাদের মিছিলে বাধা দেয়। ফলে উভয় সম্প্রদায়ে ঘোরতর বিরোধ বাধে। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও মিটমাট হয় নাই।

মহাত্মা গান্ধী বিশনগরের এই ঘটনায় মর্ম্মাহত হইয়া "নব জীবন" পত্রিকায় যে-সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই ভারতের প্রত্যেক হিন্দু-মুসলমানের পক্ষে ভাবিয়া দেখা অবশ্যকর্ত্তব্য। তিনি বলিয়াছেন যে, "এক দিন আমরা আমলাতন্ত্রের সহিত অসহযোগ ঘোষণা করিয়াছিলাম, আর আজ আত্ম-কলহের ফলে শান্তিরক্ষার্থ তাহাদেরই শরণাপন্ন হইতেছি! এর চেয়ে আর কি লজ্জা ও ঘৃণার কথা হইতে পারে?" মুসলমানদিগকে লক্ষ্য করিয়া মহাত্মা বলিয়াছেন, "প্রত্যেক মুসলমানেরই নমাজ পড়া একান্ত কর্ত্তব্য; কিন্তু নমাজের ব্যাঘাত হয় বলিয়া পশুবলে অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর কীর্ত্তন বা ভজনে বাধা দেওয়া কি তাহাদের পক্ষে শাস্ত্রসঙ্গত? এই তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া সমগ্র হিন্দু-সমাজের সঙ্গে বিবাদ করা মুসলমানদের ধর্ম্মরক্ষার পক্ষে কি একান্ত প্রয়োজনীয়? মুসলমানদের জানা উচিত, যে, তরবারি দ্বারা কখনই ধর্ম্মরক্ষা বা প্রচার হয় না, এক মাত্র প্রেমের বলেই তাহা সম্ভব।" হিন্দুদিগকে লক্ষ্য করিয়া মহাত্মাজী বলিয়াছেন, "তাহাদের কীর্ত্তন ও ভজন গাহিবার অধিকার আছে, কাহারও ভয়ে তাহা বন্ধ করাও অন্যায় এবং অধর্ম্ম। কিন্তু মুসলমান ভ্রাতাদের প্রতি ঔদার্য্যবশতঃ তাহারা কি মসজিদের সম্মুখে কীর্ত্তন বা ভজন কিয়ৎক্ষণের জন্য বন্ধ করিতে পারেন? মুসলমানেরা না হয় হিন্দুদিগকে কাফের্ বা বিধর্ম্মী মনে করিতে পারে, কিন্তু উদার হিন্দুধর্ম্মে ত কোন ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষের স্থান নাই।"

কাণপুরের "বর্ত্তমান" নামক হিন্দী পত্রের প্রতিনিধির নিকট মৌলানা সৌকৎ আলিও ঐরূপ কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন, রাস্তার ট্রাম্‌গাড়ী প্রভৃতির শব্দে বা লোকজনের গোলমালে মুসলমানদের নমাজের ব্যাঘাত হয় না, আর হিন্দুদের কীর্ত্তন ও ভজন গানেই যত বিপত্তি ঘটে! এরূপ কলহপ্রিয় জাতিকে ভগবান্ কখনই ভালবাসেন না।

ফরিদপুরের ও বিশনগরের হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজের মুখে কলঙ্ক লেপন করিয়াছে। উভয়েরই পরস্পরের প্রতি ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া এই লজ্জাকর গৃহ-বিবাদ মিটাইয়া ফেলা উচিত।

স্বামী ওঙ্কারানন্দের কারাদণ্ড—

বাঙ্গালী-সন্ন্যাসী ওঙ্কারানন্দ অমৃতসরে গিয়া অকালী আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি সেখানে গিয়া "অনওয়ার্ড" পত্র সম্পাদন করিতেছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য এবং আকালী আন্দোলন সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিবার জন্য ১২৪ (ক) ধারামতে অভিযোগ আনয়ন করা হয়। বিচারে তাঁহার দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। এই বাঙ্গালী-সন্ন্যাসী অকালীদের সহিত একত্রে তাঁহাদের দুঃখ ভাগ করিয়া ভোগ করিবার জন্য কারাগারে গিয়া বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়োছেন।

অধঃপতিত হিন্দুজাতি ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ—

সম্প্রতি বোম্বাইয়ে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ "হিন্দু-সংগঠন ও শুদ্ধি" সম্ব একটি বক্তৃতা করিয়াছেন। স্বামীজী বলেন যে, যেরূপভাবে হিন্ দিগের জনসংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাইতেছে তাহাতে আর ৪২০ বৎস মধ্যে হিন্দু জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এই প্রসঙ্গে হিন্দুদিগের অধঃপতনের কয়েকটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কি কারণে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে স্বামীজি তাহা বলিয়াছেন। মুসলমানগণ অনেককেই ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করাইয়া তাহাদে সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে এবং তাহাদের সামাজিক রীতিনীতি হিন্দুদে অপেক্ষা সুবিধাজনক। মুসলমানদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহের বহুল প্রচল নাই, অধিকন্তু তাহাদের বিধবাগণের পুনরায় পতিগ্রহণের অধিক আছে। বাল্য-বিবাহই হিন্দুদিগের অধঃপতনের প্রধান কারণ। বাল বিবাহের ফলে জাতির জীবনী-শক্তি হ্রাস পাইতেছে, শারীরিক শ কম হইয়া আসিতেছে এবং জাতি হীনবীর্য্য হইয়া দিনের পর দি ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইতেছে। বিধবা-বিবাহের প্রচলন না থাকাতে হিন্দুদিগের পক্ষে ক্ষতির কারণ হইতেছে।—ইহাও স্বামীজী বি ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

শিখ উৎসব—

উৎপীড়িত শিখদিগের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার জন্য গত ১৮ই ভারতের সকল প্রদেশের শিখগণ উপবাস ও প্রার্থনা করিয়াছে সুখের বিষয় এই, যে, সারা ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ের লোকেই উৎসবে যোগদান করিয়া নিগৃহীত শিখদের প্রতি সম্মান দেখাইয়াছেন।

সুরমা উপত্যকা ছাত্র-সম্মিলন—

সুরমা উপত্যকা ছাত্র-সম্মিলনের বর্ত্তমান বার্ষিক সভায় স্থির হইয়া যে, সম্মিলনের কর্ম্মীগণ গ্রামের নিরক্ষর লোকদের শিক্ষাবিষয়ক অর্থনৈতিক উন্নতির বিষয়ে মনোযোগী হইবেন। স্বাস্থ্য, কৃষি, সমব সম্মিলন প্রভৃতি বিষয়েও তাঁহারা পল্লীবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করাইবে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সুরমা উপত্যকার কর্ম্মীদের কাজের সাফ কামনা করিতেছি।

ভারতে শাসন-সংস্কার—

সংস্কার আইন সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য সিমলাতে যে কমি বসিয়াছে, তৎসম্বন্ধে ভারত-সরকার একটি ইস্তাহার জারি কর জানাইয়াছেন যে, কমিটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আলো করিয়াছেন—(১) সংস্কার আইনের কোন্ কোন্ স্থানে গলদ আ (২) উক্ত আইনের গঠন-প্রণালী, নীতি এবং উদ্দেশ্য বজায় রা উপরোক্ত গলদগুলির (ক) বর্ত্তমান আইনের আশ্রয়ে এবং (খ) বর্ত্ত আইনের কোন্ কোন্ ধারা সংশোধন করিয়া কিভাবে প্রতিকার যায়। বর্ত্তমান আইনের নীতি এবং সার্থকতা সম্বন্ধে বিচার না কর কিভাবে বর্ত্তমান আইনের সহায়তা লইয়া শাসন-সংস্কার হইতে প তৎসম্বন্ধে আলোচনা করার জন্যই কমিটিকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছি কমিটি তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানে ভা সরকার এই রিপোর্ট সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। এই কমি সভ্য ছিলেন স্যার্ আলেক্‌জাণ্ডার মুডিম্যান্ (সভাপতি) স্যার্ মহম্মদ সফি, স্যার্ নরসিংহ শর্ম্মা, স্যার্ হেন্‌রী মনক্রিফ্, মিঃ জেমস্ ক্রেরার এবং মিঃ এ. সি. ম্যাক্‌ওয়াটার্স্।

ভীল সেবা-মণ্ডল—

গুজরাটের বিখ্যাত কর্ম্মী শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ঠাক্কারের অধিনায় একদল কর্ম্মী ভীলজাতির মধ্যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

ভারতে ১৮লক্ষ ভীল আছে। দীর্ঘকায়, সুগঠিতদেহ ভীলজাতি সরল আনন্দে বনে-বনে বিহার করিত, স্বল্পাহারী স্বল্পসন্তুষ্ট ভীলদের কোন অভাব-অভিযোগ ছিল না। কিন্তু সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভীলেরা আজ অতিরিক্ত পানদোষের ফলে সর্ব্বস্বান্ত। শ্রীযুক্ত ঠাকারের নেতৃত্বে কয়েকজন নিঃস্বার্থ সেবাব্রতী কর্ম্মী এই অধঃপতিত জাতির কল্যাণ-কামনায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন।

বর্ত্তমানে মণ্ডলের অধীনে দুইটি স্কুলে ভীল-বালকগণ আশ্রমে বাস করিয়া অধ্যয়ন করিতেছে। ছয়টি সাধারণ স্কুল এবং দুইটি চিকিৎসালয়ও সুন্দররূপে চলিতেছে। এই অবৈতনিক প্রতিষ্ঠানগুলি ভীলদিগের নৈতিক ও সাংসারিক জীবনের উন্নতি সাধনে অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইয়েছে। সম্প্রতি ভীলদিগের একটি বাৎসরিক কন্‌ফারেন্স্ হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত এণ্ড্রুজ্ এই সভার সভাপতি ছিলেন। তিনি এই সেবা- মণ্ডলের কার্য্যের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

ভীল-সেবা মণ্ডলের কার্য্য-পদ্ধতির প্রতি আমরা বাঙ্গালার কর্ম্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। যেভাবে ভীল-সেবা-মণ্ডল কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, ঠিক্ সেইভাবে বাংলাদেশে ও অন্যান্য স্থানে এক-একটি সমিতি গড়িয়া কার্য্য আরম্ভ করিলে, বর্ত্তমান সামাজিক ব্যাধিগুলির প্রতিকার হইতে পারে। বঙ্গের সাঁওতাল, বাউরী, প্রভৃতিদের জন্য এইরূপ কাজ হওয়া উচিত।

মাহাত্মা গান্ধী ও স্বরাজ্য দল—

জুহুতে মহাত্মাজীর সহিত শ্রীযুক্ত দাশ ও পণ্ডিত মতিলালজীর আলোচনার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। মহাত্মাজী একটি বর্ণনা-পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

মহাত্মাজীর কথা

মহাত্মাজী তাঁহার বর্ণনা-পত্রে জানাইয়াছেন যে, তিনি স্বরাজ্যদলের কাউন্সিল প্রবেশের কোন সার্থকতা বুঝিতে পারিলেন না। অসহযোগ অর্থে তিনি যাহা বুঝেন তাহাতে অসহযোগী থাকিয়া কাউন্সিল্ প্রবেশ করা যায় না। মহাত্মাজী শ্রীযুক্ত দাশ প্রমুখ নেতৃবর্গের কাউন্সিল্ প্রবেশের কোন খারাপ উদ্দেশ্য দেখেন না। তিনি আশা করেন যে, এইসকল নেতা ও কর্ম্মী যখন বুঝিতে পারিবেন যে, কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়া কোন কাজ হয় না তখন তাঁহারা এপথ পরিত্যাগ করিয়া আসিবেন। মহাত্মাজী একথাও বলিয়াছেন যে, যদি স্বরাজ্যদলের কাউন্সিল্ প্রবেশে দেশের প্রকৃত কার্য্য হয় তাহা হইলে তিনিও তাঁহাদের মতাবলম্বন করিবেন।

পরিবর্ত্তনবিরোধীদিগকে মহাত্মাজী উপদেশ দিয়াছেন যে, তাঁহারা স্বরাজ্যদলের কার্য্যে কোনরূপ বাধা না দিয়া গঠনকার্য্যে আত্মনিয়োগ করুন। খদ্দর, জাতীয়শিক্ষা, হিন্দু-মুসলমানের একতা, অস্পৃশ্যতামোচন এইসকল কার্য্যে বর্ত্তমানে সকল কর্ম্মীদিগের আত্ম-নিয়োগ করিতে হইবে। মহাত্মাজী কাউন্সিলের মধ্যে কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন, যে, তিনি নিজে কাউন্সিলে প্রবেশ করিলে কাউন্সিলের সাহায্যে দেশের গঠনকার্য্যের উন্নতি বিধান করিতেন। গবর্ণমেন্ট্ ইহাতে বাধা দিলে তিনি অবশেষে আইন অমান্য করিতেন। মহাত্মাজী আরো বলিয়াছেন, যে, স্বরাজ্যদল যদি সেই অবস্থায় উপস্থিত হন তাহা হইলে তিনি স্বয়ং তাঁহাদের সঙ্গে ও অধীনে কার্য্য করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। অবশেষে তিনি বলিয়াছেন, যে, একমাত্র গঠন-কার্য্যই বিভিন্নদলের মিলনের ক্ষেত্র।

শ্রীযুত দাশ ও পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু তাঁহাদের যুক্ত বর্ণনায় বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের মতে অসহযোগী থাকিয়াও কাউন্সিলে প্রবেশ করা যায়। তবে দেশের কার্য্যের জন্য কাউন্সিলে প্রবেশ করা যখন আবশ্যক তখন উহা যদি অসহযোগের বিরোধীও হয় তাহা হইলে তাঁহারা বরঞ্চ অসহযোগকে পরিত্যাগ করিতে রাজি আছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় বৈঠক—

সম্প্রতি সিমলাতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় বৈঠক বসিয়াছিল। ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৫০ জন প্রতিনিধি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত কয়েকজন বিশিষ্ট দর্শক এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। লর্ড্ রেডিং তাঁহার অভিভাষণে বলেন, একটি বিশ্ব-বিদ্যালয় সাফল্য-মণ্ডিত হইলে দেশের তেমন উপকার হয় না—সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সাফল্যেই দেশের উপকার। তিনি বলেন, যে, স্বাস্থ্যবান্ জাতি তৈয়ার করাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য এবং ভারতবর্ষে বিবেচক ও চিন্তাশীল ব্যক্তি তৈয়ার করাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। সভায় লর্ড্ রেডিং স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার সম্বন্ধেও স্বীয় মত প্রকাশ করেন।

সভায় স্থির হইয়াছে যে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অধ্যাপক পরিবর্ত্তন করা হইবে। শিক্ষা-বিভাগের জন্য একটি কেন্দ্রীয় সমিতি গঠন করা স্থির হইয়াছে।

আসাম ও মহাত্মা গান্ধী—

শ্রীযুত এণ্ড্রুজ্ সম্প্রতি আসামে গিয়াছিলেন। সেখানে একটি সভায় তিনি বলেন, যে মহাত্মাজী আসামের জন্য তাঁহার নিকট এক বাণী প্রেরণ করিয়াছেন। মহাত্মাজী প্রথমবার আসাম ভ্রমণ করিয়া অত্যন্ত সুখী হন। তিনি বলিয়াছেন যে, আসামকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জন্য যে তিনি পছন্দ করেন তাহা নহে, আসামে যে আজও চরকার প্রচলন ও হাতে বোনার কাজ চলিতেছে সেইজন্যই তিনি আসামকে ভালবাসেন। মহাত্মাজী আর একবার আসাম ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। সেই সময় ঘরে-ঘরে চর্‌কার প্রচলন হইয়া সকলকেই খদ্দর পরিধান করিতে দেখিবেন—ইহাই মহাত্মা আশা করেন। মহাত্মা সকলকে আফিং সেবনে নিষেধ করিয়াছেন-কেবল ঔষধার্থে দর্‌কার হইলে উহা ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন।

শ্রীযুত এণ্ড্রুজ্ বলেন যে, নভেম্বর মাসে জেনেভাতে আন্তর্জ্জাতিক অহিফেন-সভায় তিনি যোগদান করিবেন এবং সেই সময় আসাম হইতেও একজন প্রতিনিধি তাঁহার সঙ্গে যাইবেন এরূপ তিনি আশা করেন। সভায় উক্ত মর্ম্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

চাকুরী কমিশন—

গত নভেম্বর মাসে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস ও অন্যান্য সর্ব্ব-ভারতীয় চাকুরী সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য একটি রয়েল কমিশন বসিয়াছিল। কমিশনের সভাপতি ছিলেন লর্ড্ লী এবং সদস্য ছিলেন স্যার্ রেজিন্যাল্ড্ ক্র্যাডক্, মিঃ পেট্রিক্, স্যার্ সি'রল জ্যাক্‌সন্, অধ্যাপক কুপল্যাণ্ড্, স্যার্ মহম্মদ হবিবুল্যা, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত এন্, এম্, সমার্থ ও শ্রীযুক্ত হরিকিষণ কউল্। কমিটির সভ্যগণ সমগ্র ভারতবর্ষ ঘুরিয়া গত মার্চ্চ মাসে তাঁহাদের মত ভারত-সর্‌কারের নিকট পেশ করেন। ছোট-খাট ব্যাপার ছাড়া কমিশনের সদস্যগণ একই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহারা সিভিলিয়ানদের বেতন-বৃদ্ধি ও উচ্চপদে ভারতীয়ের নিয়োগ প্রভৃতি সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, এইরূপ তাঁহাদের ধারণা। ১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দ হইতে তাঁহাদের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা হইবে। ঐ প্রস্তাবানুযায়ী কাজ করিলে প্রথম বৎসরে ২৬—২৮ লক্ষ টাকা ব্যয় বাড়িয়া যাইবে। ক্রমে উহা বাড়িয়া দেড় কোটি টাকায় দাঁড়াইবে। পরে উচ্চপদে অধিক-

সংখ্যক লোক ভারতীয় নিযুক্ত হইলে খরচ কমিতে আরম্ভ করিবে। কমিশনের মতে অনতিবিলম্বে তাঁহাদের প্রস্তাবানুযায়ী কাজ করা দরকার।

বোম্বাইয়ের ভয়েস্-অব্-ইণ্ডিয়া সংবাদ-পত্র প্রকাশ করিয়াছে যে, এই কমিশনের প্রত্যেক সদস্যের জন্য প্রত্যহ ৩৬০ টাকা খরচ হইয়াছে। কমিশনের রিপোর্ট্ দাখিলের পর ইহার দুই জন ভারতীয় সদস্য সরকারী চাকুরী পাইয়াছেন—যথা শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু বাংলার এক্জিকিউটিভ কাউন্সিলর হইয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত সমার্থ ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্য হইয়াছেন। কমিশনের অপর একজন ভারতীয় সদস্য স্যার্ হবিবুল্যা ভারত-সম্রাটের জন্মদিনে (গত ৩রা জুন) কে, সি, আই, ই হইয়াছেন। কমিশনের চতুর্থ ভারতীয় সভ্যও সরকারী কর্ম্মচারী।

ভারতীয় কারাগারসমূহে রাজবন্দী—

কোন্ দেশের গবর্ণমেণ্ট্ কতদূর উন্নত, তাহা তাঁহাদের রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি ব্যবহারের নমুনা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। ভারতের কত উন্নতমনা, আদর্শ-চরিত্র, দেশসেবক যুবক যে কারাগারের অন্ধকার কক্ষে জীবন কাটাইতেছেন, নির্য্যাতনের দরুন্ তাঁহাদের স্বাস্থ্য ও মনুষ্যত্ব চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। মান্দ্রাজের বিখ্যাত দেশ-সেবক ডাঃ বরদারাজুলু নাইডু সম্প্রতি কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়াছেন। তিনি "তামিল নাডু" পত্রিকায় এইরূপ দুইজন নিয্যাতিত রাজবন্দীর হৃদয়-বিদারক কাহিনী প্রদান করিয়াছেন। ইঁহাদের একজন পাঞ্জাবী অপরজন বাঙ্গালী। ইঁহারা উভয়েই মান্দ্রাজের ত্রিচি জেলে বন্দী আছেন।

পাঞ্জাবী যুবকটির নাম শ্রীযুক্ত বগলা সিং। ইনি ১৯১৫ সালে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হইয়া বিশ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রাপ্ত হন। সেই অবধি এই পাঞ্জাবী যুবক নিদারুণ কারা-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন।

বাঙ্গালী রাজবন্দীর নাম শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। ১৯১১ সালে রাজনৈতিক অপরাধে ইনি ২৫ বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। আজ ১৩বৎসর ধরিয়া ইনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নানা জেলে পচিতেছেন। সাধারণ চোরডাকাতের ন্যায় ইঁহাকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়। তাঁহাকে সাধারণ কয়েদীর মতো কদর্য্য খাদ্য খাইতে দেওয়া হয়। মান্দ্রাজের জেল কর্ত্তৃপক্ষগণ বাংলাভাষা বোঝেন না কাজেই ইঁহাকে বাংলাভাষায় পত্রাদি লিখিতে বা পড়িতে দেওয়া হয় না। ইহার ফলে তাঁহাকে একপ্রকার জীবন্ত সমাধি দেওয়া হইয়াছে।

ইঁহার সম্বন্ধে ডাঃ নাইডু লিখিয়াছেন যে,—"আমার কারাবাস কাল পূর্ণ হইয়া আসিলে, সেনগুপ্ত পাগলের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। আমি যে তাঁহাকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব, তাহা ভাষায় খুঁজিয়া পাই নাই। জেলে বাস করিতে হইবে বলিয়া তিনি কাঁদেন নাই; তিনি কাঁদিয়াছিলেন যে, তিনি আর আমার সঙ্গলাভ করিতে পারিবেন না। সেনগুপ্ত মনে করেন যে, তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে আবার তাঁহার প্রিয় জন্মভূমি বাঙ্গলা দেশ দেখিতে পাইবেন। মহাত্মার আন্দোলনের উপর তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। আমি শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তকে জীবন্মুক্ত আখ্যা দিয়াছি। তাহার স্বদেশপ্রেম কারাবাসে কমে নাই বরং বাড়িয়াছে।"

এই প্রসঙ্গে যুক্তপ্রদেশের মহিলা কংগ্রেস-কর্ম্মী শ্রীযুক্তা পার্ব্বতী দেবীর নামও আমাদের মনে আসে। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ১৯ শে জানুয়ারী তারিখে ইনি কারাবরণ করেন। আজ একবৎসর চার মাস ইনি কারাগারে আছেন। বর্ত্তমানে তিনি ফতেগড় জেলে আছেন। প্রকাশ যে জেলে তাঁহাকে খারাপ খাদ্য দেওয়া হয়। তাঁহাকে দড়ি পাকাইতে দেওয়া হয় ও নির্জ্জন কুঠুরিতে বন্ধ করিয়া রাখা হয়। এমন অবস্থায় তাঁহার স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। কিন্তু ইহা সত্বেও তাহার মনের বল একটুও কমে নাই। সম্প্রতি জেল হইতে একখানি পত্রে তিনি লিখিয়াছেন:—"গরমের জন্য আমার রাত্রে একেবারেই নিদ্রা হয় না। আমি দেড় বৎসর কারা ভোগ করিয়াছি, কিন্তু এই পর্য্যন্ত জেল-কর্ত্তৃপক্ষের কাছে কোন অভাব জানাই নাই। ভগবান্ ভিন্ন এই শির অন্য কাহারও কাছে নমিত হইবে না। আমি এখন চরকা কাটিয়া এবং পুস্তক পাঠ করিয়া সময় কাটাইতেছি।"

ভারত-মহিলাদিগের ভোটাধিকার—

শ্রীযুক্ত বি, দাস ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় নিম্নলিখিত মত একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন।

"ভারতীয় স্ত্রীলোকদিগকেও পুরুষের ন্যায় সমান ভোটাধিকার দেওয়া হউক এবং এই উদ্দেশ্যে ভারত-সংস্কার আইনের প্রয়োজনমত পরিবর্ত্তন করা হউক ও ব্যবস্থা-পরিষদে কোন মনোনীত সদস্যপদ খালি হইলে, ঐস্থলে একজন মহিলাকে মনোনীত করা হউক।"

ভারতের কয়েকটি প্রদেশে মহিলাদিগের ভোটাধিকার আছে। কিন্তু সে-সব প্রদেশে তাঁহাদের ব্যবস্থা-পরিষদে সদস্য হইবার ক্ষমতা নাই। বাংলাতে এ-দুটির একটি ক্ষমতাও নাই। এই প্রস্তাবটি বিধিবদ্ধ হওয়া যে একান্ত-প্রয়োজনীয় তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

দিল্লীতে মহিলা-কলেজ—

দিল্লীর কুইন্ মেরী স্কুলটি বর্ত্তমান বর্ষ হইতে কলেজে পরিণত করা হইয়াছে। কলেজটি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

বাঙ্গালী মহিলার কৃতিত্ব—

কাশীর 'আজ' পত্রে প্রকাশ যে কুমারী আশা অধিকারী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত এম্-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন।

ব্রহ্ম মহিলাদিগের সংকল্প—

ব্রহ্মদেশের পাংদে-নামক স্থানে ব্রহ্মদেশীয় মহিলাদের একটি কনফারেন্স্ হইয়া গিয়াছে। কনফারেন্সে ২০০ বিভিন্ন নারী-সঙ্ঘের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। বিদেশী-বস্ত্র-বর্জ্জন, স্বায়ত্ত-শাসন-লাভের চেষ্টায় ভালরূপ প্রচারকার্য্য-করা প্রভৃতি বিষয়ে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। আর-একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া কন্ফারেন্স্ স্থির করেন যে, যে-সকল যুবক ইংরেজী ফ্যাশানে চুল কাটিবে, তাহাদিগকে কোন স্ত্রীলোক বিবাহ করিবে না। এবং যাহারা দ্বৈত-শাসনের পক্ষপাতী তাহাদের সহিতও কোন স্ত্রীলোক পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইবে না।

ভাইকোম সত্যাগ্রহ—

ভাইকোম সত্যাগ্রহ আন্দোলন পূর্ণ বেগে চলিতেছে। এই আন্দোলনে পাঁচজন নারী স্বেচ্ছা-সেবিকা যোগদান করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী হিন্দুদিগকে এই আন্দোলনে অন্যের সাহায্য লইতে বারণ করিয়াছেন। তিনি ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রে লিখিয়াছেন—"আমি আশা করি শিখগণের অন্নসত্র বন্ধ করা হইবে; এই আন্দোলন কেবল হিন্দুরাই চালাইবেন।......মুসলমানদিগের নিজেদের কোন ধর্ম্ম ও সমাজ-সম্পর্কিত সমস্যা মীমাংসায় যদি হিন্দু বা অন্য কোন অ-মুসলমান হস্তক্ষেপ করেন, তাহা হইলে তাহা অনধিকার চর্চ্চা হইবে এবং মুসলমানেরা তাহা ঔদ্ধত্য মনে করিলে ঠিক কাজই করিবেন। সেইরূপ হিন্দু সংস্কারে অ-হিন্দুরা হস্তক্ষেপ করিলে গোঁড়া হিন্দুরাও অসন্তুষ্ট ও

ক্রুদ্ধ হইবেন।" শিখদিগের অন্নসত্রটি বর্ত্তমান মাস হইতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ত্রিবাঙ্কুর ব্যবস্থা-পরিষদের আগামী অধিবেশনে একটা প্রস্তাব উত্থাপিত করা হইবে যে, ভাইকমের মন্দিরের চারিপাশের রাস্তার মতো, অন্য সমস্ত নিষিদ্ধ রাস্তা দিয়া অস্পৃশ্যদিগকে চলিতে দেওয়ায় যেন কোনপ্রকার বাধা না দেওয়া হয়। দেখা যাক্ এপ্রস্তাবের কি ফল হয়। স্বামী শ্রদ্ধানন্দও সম্প্রতি ভাইকমে গিয়াছিলেন ও তিনি পণ্ডিত মালবীয়কে এ-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

ফিরিঙ্গীদের অসহযোগ—

কিছুদিন পূর্ব্বে দুইটি পশু-প্রকৃতির ফিরিঙ্গী-যুবকের টুণ্ডালায় একটি গরীব মাল্লা-মেয়ের সতীত্ব নাশ করার অপরাধে প্রত্যেকের নয় মাস করিয়া জেল ও বিশটা করিয়া বেত্রদণ্ডের হুকুম হইয়াছিল। ফিরিঙ্গী-সমাজ ইহাতে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। কোন ভারতীয় যে ফিরিঙ্গী অপরাধীগণকে বেত্রাঘাত করিবে ইহা তাহাদের অসহ্য। সেইজন্য এই সমাজের সভাপতি কর্ণেল গিড্নী বড়লাট, প্রধান সেনাপতি ইত্যাদি বড় কর্ম্মচারীদের নিকট আবেদন করেন যে যদি বেত মারিতেই হয় তবে কোন ফিরিঙ্গীকে দিয়া ঐ কাজটা করান হউক। ফিরিঙ্গী-সমাজ ভয় দেখায় যে যদি তাহাদের আবেদন অগ্রাহ্য হয় তবে তাহারা অসহযোগ করিয়া অক্সিলারি সৈন্যদল হইতে কাজ ছাড়িয়া দিবে।

আশ্চর্য্যের বিষয়, গবর্ণমেণ্ট ফিরিঙ্গী-সমাজের হুমকীতে ভীত হইয়া তাহাদের আবেদন গ্রাহ্য করিয়াছেন। অপরাধীর আবার শাদা-কালোর তফাৎ কি? যদি কোন ভারতবাসী এরূপ আবেদন করিত তাহা হইলে কি এইরূপ বিচার হইত?

আসামের বজেট—

আসাম সরকারের ইস্তাহারে বর্ত্তমান বর্ষের বজেটে ব্যবস্থাপক সভা যেসমস্ত ব্যয় না-মঞ্জুর করিয়াছিলেন তাহার সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ প্রকাশিত হইয়াছে।

মন্ত্রীর বেতন-সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থাপক-সভার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। সেট্‌লমেণ্ট খরচা কাউন্সিল ১৯১৭৫০ টাকার স্থলে ৯৪০০০ টাকা করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন। আবগারী বিভাগের পাঁওনাও কাউন্সিল ১৮৪৩৪৫ টাকার স্থানে ৬৫০০০ টাকা করিয়াছিলেন। এ-প্রস্তাবও সরকার গ্রহণ করেন নাই। রেল-পুলিশ, সাধারণ পুলিশ ইত্যাদি বিভাগের সমস্ত খরচাও সার্টিফিকেটের বলে বহাল করা হইয়াছে।

রাজপুত কন্‌ফারেন্স ও মহাত্মা গান্ধী—

কাথিয়াবার রাজপুত কন্‌ফারেন্সের উদ্যোক্তাদিগকে মহাত্মা নিম্নলিখিত বাণী প্রেরণ করিয়াছেন, "কাথিয়াবার শূর-বীরের আবাস-ভূমি ছিল। রাজপুতদের তেজ-বীর্য্য জগৎ-প্রসিদ্ধ কিন্তু প্রাচীন যুগের তেজ-বীর্য্যের কথা বলিলেই আজ রাজপুতদের চলিবে না। আজ হিন্দুদের কে উদ্ধার করিবে? হিন্দু যদি রক্ষা না পায় তবে মুসলমানও রক্ষা পাইবে না। ২২ কোটি হিন্দু যদি পতিত থাকে তবে সাত কোটি মুসলমান কিছুতেই ঠিক থাকিতে পারিবে না। এই পতিত হিন্দুস্থানের উদ্ধার করিতে কে সমর্থ হইবে? কে ভয়-ভীতকে নির্ভয় করিবে? উহা ক্ষত্রিয়েরই কাজ। অতএব রাজপুত-পরিষৎকে নিজের ধর্ম্মরক্ষার বিধান করিতে হইবে।

"নিজেদের ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য তরোয়ালের কোন প্রয়োজন নাই। তলোয়ারের যুগ চলিয়া গিয়াছে বা যাইতেছে। তলোয়ারের মজা জগৎ বেশ অনুভব করিয়া লইয়াছে এবং এখন সংসার উহাতে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশসমূহেরও এখন এই অবস্থা। যিনি মারিয়া দেশ রক্ষা করেন তাঁহাকে ক্ষত্রিয় বলিতে পারি না কিন্তু যিনি মরিয়া রক্ষা করেন তাহাঁকে ক্ষত্রিয় বলিব। যিনি অস্ত্রকে তাড়াইয়া খাড়া রহেন, তাহাঁকে ক্ষত্রিয় বলি না কিন্তু যিনি বুক ফুলাইয়া খাড়া রহেন এবং নিজে প্রহার না করিয়া প্রহার সহ্য করেন তাহাঁকেই প্রকৃত ক্ষত্রিয় বলি। অতএব রাজপুত-পরিষদের প্রথম কর্ত্তব্য আত্মোন্নতি-বিধান —রাজপুতকে সর্ব্বপ্রথমে ধর্ম্মের সাধনা করিতে হইবে।"

তাঞ্জোরে মিরাশদার্ সম্মিলন—

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট মিরাশদারদিগকে যৎসামান্য ট্যাক্স মাপ দিয়াছেন প্রকাশ যে মিরাশদারগণ এই সর্ত্ত গ্রহণ করিবেন না এবং কংগ্রেসের যোগে তাঁহাদের আন্দোলন চালাইবেন।

শ্রী প্রভাত সান্যাল

—

বাংলার কথা

হিন্দু-মুসলমানের চুক্তি—

(মহাত্মা গান্ধী)

ইহা সুস্পষ্ট যে, যেরূপ অবস্থায় একটা চুক্তি-পত্র সম্ভবপর, সেরূপ অবস্থায় আমরা এখনও উপনীত হই নাই। গো-হত্যা ও মসজিদের সম্মুখে বাদ্য-সম্বন্ধে কোনও চুক্তির কথা উঠিতে পারে না। উভয় পক্ষ হইতেই ইহা স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং ইহাকে কোন একটি চুক্তির ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিতে পারা যায় না।

গবর্ণমেণ্টের আপিসের চাকরী-সম্বন্ধে এই কথা বলিতে পারা যায় যে তাহার মধ্যেও সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশ করাইলে সুশাসনের পক্ষে সর্ব্বনাশ স্বরূপ হইবে। শাসন-কার্য্য প্রকৃষ্টরূপে ও দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করিতে হইলে উহা যোগ্যতম ব্যক্তির হাতেই অর্পণ করা দরকার। ইহাতে কোনপ্রকার আশ্রিত-বাৎসল্যের পরিচয় দিলে চলিবে না। আমাদের যদি পাঁচজন ইঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে আমরা এক সম্প্রদায় হইতে ৫ জনকে না লইয়া যোগ্যতম পাঁচজনকেই বাছিয়া লইব তাঁহারা সকলে মুসলমানই হউন বা পার্শীই হউন। নিম্নতম পদগুলির জন্য প্রয়োজন হইলে সর্ব্ব সম্প্রদায়ের দ্বারা গঠিত একটি নিরপেক্ষ কমিটির দ্বারা পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যেসব সম্প্রদায় শিক্ষায় পশ্চাৎপদ, জাতীয় গবর্ণমেণ্ট তাহাদের শিক্ষার বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করিবেন। ইহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের অধীনে দায়িত্বপূর্ণ পদলাভের প্রয়াসী, তাঁহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট যোগ্যতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে।

—ইয়ং ইণ্ডিয়া

রমেশচন্দ্র কলা-ভবন

স্বনামধন্য রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রায় ১২।১৩ বৎসর হইল পরলোক গমন করিয়াছেন। আমরা তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার জন্য এপর্য্যন্ত বিশেষ কিছুই করি নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ হইতে রমেশচন্দ্রের স্মৃতি-রক্ষার্থ রমেশ-কলাভবন-নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইয়াছিল এবং ঐ উদ্দেশ্যে প্রায় ২০।২৫ হাজার টাকাও সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় রমেশ-

কলা-ভবন এই ১০।১২ বৎসরেও সম্পূর্ণ হয় নাই; উহার কাজ কিছুদূর অগ্রসর হইয়া অর্দ্ধপথেই থামিয়া রহিয়াছে। বাঙ্গালী জাতির তথা পরিষদের স্মৃতিরক্ষা-সমিতির পক্ষে ইহা ঘোরতর লজ্জা ও কলঙ্কের কথা। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছি, রমেশস্মৃতি ফণ্ডের তহবিলের কোষ-রক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন,—মিঃ জে, সি, মুখার্জ্জি; ইনি রমেশ চন্দ্রের এক দৌহিত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মিঃ মুখার্জ্জি পূর্ব্বে কলিকাতার করপোরেশনের সেক্রেটারী, পরে ভাইস্-চেয়ারম্যান্ ছিলেন এবং সম্প্রতি অন্যতম ডেপুটী এক্‌জিকিউটিভ্ অফিসার-পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু রমেশচন্দ্রের এরূপ একজন আত্মীয় ও পদস্থ লোকের নিকট রমেশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষা-সম্বন্ধে যেরূপ উৎসাহ ও সহানুভূতি আমরা আশা করিয়াছিলাম, তাহার কোন লক্ষণই দেখিতে পাইতেছি না। মিঃ মুখার্জ্জি নাকি এপর্য্যন্ত স্মৃতিরক্ষা-তহবিলের কোন সম্পূর্ণ হিসাবই দাখিল করেন নাই। মোট কত টাকা আদায় হইয়াছে এবং কত টাকা তাঁহার নিকট গচ্ছিত আছে, স্মৃতিরক্ষা-সমিতি পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেও তিনি তাহা জানান নাই। তার পর তাঁহার নিকট গচ্ছিত টাকা তিনি কোন ব্যাঙ্কে রাখেন নাই, সুতরাং এই কয় বৎসরে ঐ টাকার যে সুদ হইত, তাহাও পাওয়া যায় নাই, এখন এরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, অর্থাভাবে রমেশ-কলা-ভবনের কাজ বন্ধ হইবার উপক্রম। বাঙ্গালা দেশে সাধারণের নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থ লইয়া প্রায়ই ছিনিমিনি খেলা হয়। কিন্তু রমেশ-স্মৃতিরক্ষা-তহবিলের টাকা লইয়াও যে ঐরূপ কাণ্ড ঘটিবে, ইহা একেবারে অসহ্য। পরিষদের স্মৃতিরক্ষা-কমিটিতে বহু শিক্ষিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তি আছেন। তাঁহারা এব্যাপারে এতটা ঔদাসীন্য দেখাইয়া কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করিতেছেন কেন? মিঃ জে, সি, মুখার্জ্জি যাহাতে সংগৃহীত অর্থের হিসাব অবিলম্বে দাখিল করেন এবং রমেশ-কলা-ভবন যাহাতে সত্বর সম্পূর্ণ হয়, তাহার ব্যবস্থা না করিলে একটা লোক-দেখানো কমিটি থাকিবার প্রয়োজন কি? এ কয় বৎসরে মিঃ মুখার্জ্জির হাতে টাকাটা পড়িয়া থাকিয়া যে সুদ লোকসান হইয়াছে, তাহাও তাঁহার নিকট হইতে আদায় করা কর্ত্তব্য।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

বাঙ্গালী যুবকের বীরত্ব:—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ, মমিনপুর নবিনগর হইতে পত্রে জানাইতেছেন—"২৪শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার বেলা ৪॥০ টার সময় আমার কন্যা প্রমীলা—বয়স ১৬ বৎসর, পুকুরে পা ধুইতে যাইতেছিল, এমন সময়ে একটি ব্যাঘ্র (৫।৬ হাত লম্বা) তাহাকে আক্রমণ করে। সে প্রাণপণে চীৎকার করিলে অনেক লোক জমা হয়। আমি আমার কন্যার প্রাণরক্ষার জন্য সকলের কাছে প্রার্থনা করি। এমন সময় কলিকাতা-নিবাসী একটি যুবক, শ্রীমান্ পান্নালাল, বয়স আন্দাজ ২১ বৎসর, প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া আমার হাত হইতে একখানি কাটারী লইয়া এমনভাবে ব্যাঘ্রটিকে আক্রমণ করেন যে, সেই আক্রমণের ফলেই ব্যাঘ্রটি নিহত হয়।

জুয়া খেলা বন্ধ:—দোর জাতীয় বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত কুমার চন্দ্র জানা মহাশয়ের চেষ্টায় ও যত্নে সুতাহাটা থানার বাহাদুরী হাটে জুয়া-খেলা বন্ধ হইয়াছে। স্থানীয় জনসাধারণ এই মহৎ কার্য্যে বিশেষ উপকৃত হইয়াছে।

—সত্যবাদী

জলকষ্ট নিবারণ।—বাঁকুড়া জেলার জামজুড়ী-গ্রামে আড়াই শত ঘর লোকের বসতি। দুটি শুষ্ক-প্রায় পাতকুয়া হইতে এতগুলি লোকের জন্য পানীয় জল সংগ্রহ করিতে হয়। সমস্ত দিন-রাত্রি ঘটি ঘটি করিয়া জল তুলিতে হয়। এই গ্রামে একটি নূতন কূপ খনন করিবার জন্য শ্রীযুক্ত অনুকূল চন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় দেড়শত টাকা দিয়াছেন, পরে তিনি আরও দেড়শত টাকা দিবেন। খনন কার্য্য চলিতেছে। অনুকূল-বাবু ধনী লোক নহেন। তাঁহার সহৃদয়তা সাতিশয় প্রশংসনীয়।

বঙ্গে বিধবার সংখ্যা—

বাংলার অধিবাসী মোট ৪,৬৬,৯৫,৫৩৬ জনের মধ্যে ২,০২,০৩,৫২৭ জন হিন্দু এবং ২,৫২,১০,৮০২ জন মুসলমান। হিন্দুর মধ্যে ১,০৫,৩৬, ১১৯ জন পুরুষ এবং ৯৬,৬৭,৪০৮ জন স্ত্রীলোক। তন্মধ্যে ৫২,৩৪,৪৬৮ জন পুরুষ অবিবাহিত এবং ২৮,৬৭,৪৯৯ জন স্ত্রীলোক অবিবাহিতা। পুরুষের মধ্যে ৫,৩৪,৮৮২ পুরুষের স্ত্রী মৃতা। স্ত্রীলোকের মধ্যে ২৪,৬৫,৩৮৩ জন বিধবা।

মোটামুটি দেখা যায় শতকরা ২৫ জন বিধবা। তন্মধ্যে ১ হইতে ৫ বৎসরের বিধবা ১,৪০৪ জন, ৫ হইতে ১০ বৎসরের বিধবা ৮,৪৭০ জন, ১০ হইতে ১৫ বৎসরের বিধবা ৩৫,৩২৪ জন, ১৫ হইতে ২০ বৎসরের বিধবা ৯৩,৭১৩ জন, ২০ হইতে ২৫ বৎসরের বিধবা ১,৪৬,৬০০ জন, ২৫ হইতে ৩০ বৎসরের বিধবা ২,২৩,৪৬৫ জন।

—তাম্বুলি পত্রিকা

বাঙ্গালী মহিলার কৃতিত্ব—

কুমারী জ্যোতির্ম্ময়ী চৌধুরী রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাঙালী মহিলাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম বি, এ, পরীক্ষায় পাশ করিয়াছেন।

বিহারে বাঙ্গালী পণ্ডিতের কৃতিত্ব—

গত ১৪ই বৈশাখ রবিবার বেলা ৯টার সময় হাজারীবাগ সহরের ভিতর খাদাক্কিতালাও নামক পুষ্করিণীতে কাহার জাতীয় ১০।১১বৎসর-বয়স্ক একটি বালক জলমগ্ন হয়, তথায় প্রায় তিন শতাধিক লোক সমাগত হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে গণ্ডগোল করিতেছিল, জনমণ্ডলীর মধ্যে বহু বলবান্ শক্তিসম্পন্ন লোকেরও অভাব ছিল না, দুঃখের বিষয় কেহই হতভাগ্য জলমগ্ন বালককে উদ্ধারে অগ্রসর না হইয়া ভীরুতার পরিচয় দিয়া শুধু গাত্রবল যে বৃথা তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ইতিমধ্যে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিপদ শাস্ত্রী মহাশয় গণ্ডগোল শুনিয়া জিজ্ঞাসা করেন, পুকুর-পাড়ে কোলাহল হইবার কারণ কি? তদুত্তরে জলমগ্ন হইয়াছে এই কথা শুনিবামাত্রই তিনি দৌড়াইয়া পুষ্করিণী-তীরে উপস্থিত হন এবং জাল আনিতে বলিয়া জলে নামিয়া সন্তরণ ও ডুব দ্বারা বহু অনুসন্ধান করেন এবং আরো লোককে নামিবার জন্যও বলেন। যাহারাও বা জলে নামিলেন, তাহারা সন্তরণে অপটু, শাস্ত্রী মহাশয়ই বহুকষ্টে জলমগ্ন বালককে উত্তোলন করেন ও তাহাকে বাঁচাইবার জন্যও বহু চেষ্টা করা হয়। তন্মুহূর্ত্তে তাহাকে সরকারী হাঁসপাতালে মোটর করিয়া পাঠান হইয়াছিল কিন্তু তাহার আর সংজ্ঞা হইল না। শাস্ত্রী মহাশয়ের শরীর কৃশ ও দুর্ব্বল।

—এডুকেশন গেজেট

সরোজিনীর পত্র—

যশোহর হইতে শ্রীমতী সরোজিনী এবং আরও দুই-একটি মহিলা 'বসুমতী'তে এক পত্র লিখিয়াছেন। উহাতে অন্যান্য কথার মধ্যে বলা হইয়াছে—নারী-রক্ষার জন্য দেশে বিলক্ষণ আন্দোলন, আলোচনা চলিতেছে—কিন্তু হিন্দু-সমাজের মধ্যে এমন কয়জন যুবক আছেন, যাহারা লাঞ্ছিতা নারীকে জীবন-সঙ্গিনী করিবার জন্য অগ্রসর হইতে পারেন? আমরা বলি, একজনও নাই। আমরা পূর্ব্বে ঠিক এই কথাই বলিয়াছি—মুখে নারীর মান-ইজ্জৎ অল্পই রক্ষা

হইবে, কার্য্যে তাহাকে সহানুভূতি দেখাইবার মত একটা লোকও নাই। স্নেহলতা' যখন মরে, তখন একটা কলেজের যুবক-ছাত্রদল বিনাপণে বিবাহ করিবার জন্য সভা-সমিতি করিয়া এবং কবি গোবিন্দ দাসের—"থাকুক আমার বিয়ে" নামক করুণরসাত্মক কবিতাটি বিতরণ করিয়া বেড়াইতেছিল।' এই দলেরই একটি হিন্দু যুবক বিবাহকালে শ্বশুরের টাকা গ্রহণ করিতে লজ্জা বোধ করে নাই।

—ছোলতান

বিবাহে ত্যাগ—

হুগলী জিলার পোঃ মোগুলাই, গ্রাম ইলুছোবা-নিবাসী শ্রীযুক্ত রাখালদাস পালধি তাঁহাদের গ্রামের ৺ অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বাদশবর্ষীয়া অনাথা কন্যার আশ্রয় ও বিবাহেচ্ছু পাত্র আবশ্যক বলিয়া একটি আবেদন 'আনন্দবাজার পত্রিকাতে' প্রকাশ করেন। এই আবেদনটি চৈত্র-সংখ্যা-প্রবাসীতে স্থান পায়। খুলনা জেলার নকীপুর গ্রামস্থ প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের মত লইয়া ঐ অনাথা বালিকাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইলেন। ইলুছোবা গ্রামের প্রসিদ্ধ জমিদার ৺ জগত ঘোষ মহাশয়ের পৌত্র, কলিকাতা মেডিকেল কলেজের বর্ত্তমান হেডক্লার্ক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ঘোষ মহাশয় বিবাহের সমস্ত ব্যয়-ভার নিজে গ্রহণ করেন এবং গ্রামস্থ নিজেদের বাড়ীতেই বিবাহ-দানের সুব্যবস্থা করেন। গত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার শ্রীমতী কালিদাসী দেবীর সহিত শ্রীমান্ প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়ের শুভ বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিবাহে প্রায় ৪০০চারিশত টাকা ব্যয় হয়। এই কার্য্য অতীব প্রশংসনীয় এবং দরিদ্র-বহুল বাঙ্গালার ধনাঢ্য যুবকদের অনুকরণীয়।

খুলনায় পল্লী-সংগঠন।

খুলনা জেলার নানাস্থানে অল্পবিস্তর পল্লীগঠন-মূলক কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এইকার্য্যে সাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ ও সাহায্য লাভ করার উদ্দেশ্যে নিম্নে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

খুলনা সেবাশ্রম

খুলনার পল্লী-সংগঠন-মূলক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে খুলনা সেবাশ্রমই প্রথম ও প্রধান। ১৯২০সালে এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২১ সালে খুলনার দক্ষিণাঞ্চলে যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তাহাতে সেবা ও সাহায্য-দানের একরূপ সমস্ত দায়িত্ব ক্রমে ক্রমে এই আশ্রমের সেবকদিগকেই গ্রহণ করিতে হয় এবং তাহাতেই ইহার কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে। দুর্ভিক্ষ প্রশমনান্তে আশ্রম, দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত অঞ্চলের বিভিন্নস্থানে চারিটি শাখা প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্থায়ীভাবে সেবাকার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। এই শাখাগুলির প্রধান কেন্দ্র আশাশুনিতে অবস্থিত।

অল্পবয়স্ক কৃষক-সন্তানদের জন্য স্থাপিত ৬টি অবৈতনিক বিদ্যালয়ে দুইশতের উপর ছাত্র ও জনসাধারণের জন্য স্থাপিত ৩টি নৈশ বিদ্যালয়ে ৩০জনের উপর ছাত্র শিক্ষা লাভ করিতেছে। এইসমস্ত বিদ্যালয়ে সামান্য-সামান্য গৃহ-শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থাও আছে।

দারিদ্র্য-পীড়িত জনগণের দুর্দ্দশা মোচন-কল্পে গ্রামে গ্রামে চরকার প্রচার-জন্য চরকা ও গৃহে গৃহে তুলা উৎপাদন করিবার জন্য তুলার বীজ বিতরিত হইয়াছে ও হইতেছে। এযাবৎ পাঁচ শতের উপর চরকা বিতরিত হইয়াছে এবং সাত শত লোক সূতাকাটা একরূপ শিখিয়াছে। আশ্রমে তাঁত-শালা ও বেতের কারখানা স্থাপন করিয়া জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে দরিদ্র বালক ও যুবকগণকে এই দুই শিল্প শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। আশ্রমকর্ত্তৃক পরিচালিত প্রফুল্লচন্দ্র-বয়ন-বিদ্যালয়ে প্রথমে প্রায় ১৭।১৮ খানি তাঁতে কার্য্য হইত। বর্ত্তমানে ছাত্রাভাবে ও অন্যান্য কারণে মাত্র ৬ খানিতে কার্য্য হইতেছে। অনেকে এখান হইতে বয়ন শিক্ষা করিয়া স্ব স্ব গৃহে যাইয়া এই ব্যবসায় চালাইতেছেন। আশ্রমের প্রস্তুত খদ্দর ও বেতের ব্যাগ প্রভৃতি বেশ জনাদর লাভ করিয়াছে।

খুলনার এই অঞ্চল অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। এইজন্য প্রতিকেন্দ্রে দাতব্য চিকিৎসালয় ও ঔষধ-বিতরণ-বিভাগ খুলিয়া দরিদ্র রোগীদিগকে ঔষধ ও পথ্যাদি দেওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে এবং সভা-সমিতি করিয়া পল্লীর স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য নানাবিধ উপদেশাদি প্রদান করা হইতেছে। চারিটি কেন্দ্রে প্রতিদিন প্রায় ৬০।৭০টি রোগী সমাগত হয়। আশ্রমের সেবকগণ কলেরার প্রকোপের সময় রোগীর সেবা ও শুশ্রূষার জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছেন। অর্থাভাবে জলাভাব দূর করিতে পারিতেছেন না।

দৌলতপুর সত্যাশ্রম

দৌলতপুর সত্যাশ্রম আর-একটি প্রতিষ্ঠান যাহা অতি সুন্দর কার্য্য করিতেছিল। ছাত্রগণের মধ্যে নৈতিক, মানসিক ও দৈহিক সুশিক্ষা-বিস্তার ও দরিদ্র জনগণের মধ্যে ঔষধ-বিতরণ ও বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা দ্বারা এই আশ্রমটি দিন-দিন বিশেষভাবে সাধারণের দৃষ্টিতে পড়িতেছিল। সম্প্রতি ইহার প্রতিষ্ঠাতা ও অক্লান্ত কর্ম্মী শ্রীযুক্ত কিরণ-চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তিন আইনে গ্রেপ্তার হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছে।

খালিষপুর আশ্রম

এই নূতন-প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের অধিবাসী ছাত্রগণ সকলেই সকল কাজ নিজ হস্তে করেন। এখানে ছাত্রগণ-পরিচালিত তাঁতে সুন্দর খদ্দর প্রস্তুত হইতেছে এবং প্রধানতঃ স্থানীয় লোকদিগের মধ্যেই বিক্রীত হইতেছে। আশ্রমের ক্ষেত্রে ছাত্রগণ প্রচুর কার্পাস ও অন্যান্য ফসল উৎপাদন করিয়াছেন।

কলিকাতার ডাক্তার—

কলিকাতা সহরে এমন ৫।৬ শত ডাক্তার আছেন, যাঁহারা মাসে ৫০৲ পঞ্চাশটি টাকাও উপার্জ্জন করিতে পারেন না। এই সমস্ত ডাক্তারেরা মাসিক ৫০৲ টাকা বেতন পাইলে সকালে-বিকালে এতদুভয়ের যে কোন সময়ে দাতব্য-ঔষধালয়ে কাজ করিতে পারেন। আচ্ছা, যদি কলিকাতার প্রত্যেক পাড়ায়-পাড়ায় কোন ধনী গৃহস্থের বৈঠকখানায় অথবা ঠাকুর-দালানে এক একটি দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপন করা যায়, তবে বদান্যবর ধনী গৃহস্থ নিশ্চয়ই সাধারণের হিতার্থে কোনপ্রকার ভাড়া গ্রহণ করেন না। তার পর মাসিক ২০৲ টাকা বেতনে একজন কম্পাউণ্ডার নিযুক্ত করিয়া মাসিক ৭০।৮০ টাকার ঔষধাদি ব্যয় করিলেই ত ছোটখাট একটি দাতব্য-ঔষধালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে প্রতিদিন অন্ততঃ একশত রোগী, ঔষধ লইতে পারে এইরূপ একটি দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন করিতে মাসিক ১৫০৲ শত টাকা মাত্র খরচ হয়।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু তিন হাজার স্থলে মাসিক দেড় হাজার টাকা বেতন লইবেন স্থির করিয়াছেন। তাঁহার বেতন হইতে মাসিক যে দেড় হাজার টাকা বাঁচিবে সেই দেড় হাজার টাকায় অনায়াসে দশটা দাতব্য-ঔষধালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। কলিকাতা সহরে ১১ লক্ষ লোকের বাস, বড় জেলার অধিবাসীর সহিত কলিকাতার লোক-সংখ্যার তুলনা করিলে অত্যুক্তি হয় না। তফাৎ এই যে, জেলার অধিবাসীরা পৃথক্‌ভাবে বাস করে, আর সহরের অধিবাসীরা একত্র ঘন-সন্নিবিষ্টভাবে বাস করে। এরূপ প্রভূত লোকের সংখ্যার অনুপাতে কলিকাতায় যে দাতব্য ঔষধালয়

মন্দির (তারকেশ্বর)

আছে তাহা অতি সামান্ত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অন্ততঃ এক-শতটা দাতব্য ঔষধালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে বোধ হয় কলিকাতার দরিদ্র অধিবাসীদের অভাব কতটা দূর হয়। কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করিলে এক-বৎসরে একাজ হইতে পারে।

কর্পোরেশনের দুইজন ডেপুটী একজিকিউটিভ অফিসার হইবেন, তন্মধ্যে একজনের বেতন পনর-শতের স্থলে হাজার, এবং আর-একজনের বেতন তের শতের স্থলে ৭॥ শত হইয়াছে। ইহাঁদের বেতনের উদ্বৃত্ত টাকা হইতেও যে ২।৩টি দাতব্য ঔষধালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, এমন নহে। আমরা আশা করি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্র অবিলম্বে এই দিকে দৃষ্টি প্রদান করিবেন।

—হিন্দুস্থান

খাস-মহালে ফিরিঙ্গির আদর—

সহযোগী নোয়াখালী সম্মিলনী বলিতেছেন :—"নোয়াখালী খাস-মহালের অবস্থা সমস্তই আজব। ইহার জমি-বন্দোবস্তের কায়দা-কানুন, প্রভৃতি এতই জড়িত যে, সময়ে সময়ে ইহার রহস্যোদ্ঘাটন কর' কঠিন হইয়া পড়ে। খাস-মহালের প্রজাদের অনেকের অবস্থা এইরূপ যে, তাহারা বহু দ্রোণের অধিকারী। অথচ নদীর প্রকোপে তাহাদের মাথা লুকাইবার স্থান নাই। তাহারা খাস-মহালে অনেক চেষ্টা করিয়াও এক কড়া জমি বন্দোবস্ত পাইতেছে না। অনেক প্রজার নাম লিষ্টভুক্ত করা সত্বেও অনেক গরীব প্রজাকে নানা অজুহাতে জমি দেওয়া হয় নাই। কিন্তু দেশীয় ফিরিঙ্গিদিগকে চর-কচ্ছবিয়া হইতে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া

হইতেছে। দেশীয় ফিরিঙ্গিদের অনেকের কোন জমি-জমা এই পর্য্যন্ত কোন নদী-সিকস্তি হয় নাই। অথচ দেশীয় হিন্দু-মুসলমানের ন্যায্য দাবি অগ্রাহ্য করিয়া এই ফিরিঙ্গিদিগকে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইতেছে। খাস-মহালে দেশীয় লোকদের নিকট হইতে জমার পাঁচগুণ সেলামী গ্রহণ করা হইয়া থাকে, কিন্তু এই দেশীয় খ্রীষ্টানদিগের নিকট হইতে জমার দ্বিগুণ মাত্র লওয়া হইতেছে। কেবল কি তাই? দেশীয় লোকদের নিকট সেলামী নগদ আদায় করা হয়। অথচ ফিরিঙ্গির নিকট হইতে সেলামী তিন বৎসরে আদায় করা হইবে। এইসমস্ত পার্থক্যের কারণ আমরা বহু অনুসন্ধানেও জানিতে পারি নাই!

—ঢাকা-প্রকাশ

নারী-নিগ্রহ—

কোন কোন কাগজওয়ালা মোহলমান সমাজকে মহিলা-নির্য্যাতনের জন্য দোষী সাব্যস্ত করিতেছেন। আসল কথা তাহা নহে। প্রত্যেক সমাজেই দুর্ব্বৃত্ত ও সয়তান শ্রেণীর লোক আছে। অসাবধান ও অমনোযোগী হইলে চোরে যে সর্ব্বস্ব চুরি করিয়া লইয়া যাইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? চোর জেল খাটিল সত্য, কিন্তু আমি যে বিড়ম্বনা ও ক্ষতি স্বীকার করিলাম, তাহার সংশোধন ত তাহাতে হইল না। দুর্ব্বৃত্তদিগের শাস্তির ব্যবস্থা হয় কিন্তু যে অপমান ও নিগ্রহ নারী ভোগ করিল তাহার প্রতিকার কোথায়? সতী-সাধ্বী

একদল সত্যাগ্রহী মোহান্তের প্রাসাদের দিকে চলিয়াছেন

সত্যাগ্রহীদের আগমন-প্রতীক্ষায়

নারীর কেশ-স্পর্শ কেহ করিতে পারে, ইহা আমরা মনে করি না। নারী যখন বাহির হইবে, তখন যেন তাহারা কখনও উপযুক্ত পরিচ্ছদ পরিতে কুণ্ঠাবোধ না করে। লজ্জাহীন পোষাকে তরলচিত্ত যুবকদের মনে কু-ভাব জাগে এবং তাহারি ফলে সমাজে নানা অনর্থ ঘটে। নারীর গায়ে ত যথেষ্ট বল আছে—ইচ্ছা করিলে, অভিভাবকেরা মনোযোগী হইলে নারী পুরুষের মতই আত্মরক্ষার সমস্ত কৌশলই শিখিতে পারে। নিতান্ত ননীর পুতুল করিয়া দেশের মানুষ নারীর যে কি সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহা বলা যায় না। অপ্রিয় সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়—নারীর জন্ত হিন্দুসমাজ যতই সহানুভূতি ও বেদনায় চীৎকার করুন না কেন, নারীকে সর্ব্বপ্রকারে তাঁহারা যেমন ছোট করিয়াছেন এমন আর কেহ করে নাই। হিন্দু-মোছলমান পাশাপাশি দুই ভাই—হিন্দু বালিকার অপমান দেখিলে আমাদের মন আহ্লাদে আটখানা হয়, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। দেশের যাহারা নিতান্তই অবোধ ও হতভাগা তাহারাই বাঙ্গালা দেশের দুঃখিনী নারীর জাতি হরণ করে।

—ছোলতান

কৃষি-বিভাগে শোষণ-নীতি—

চুঁচুড়াতে গবর্ণমেণ্টের একটা Experimental Farm বা পরীক্ষা-মূলক কৃষিক্ষেত্র আছে। চুঁচুড়া কৃষিক্ষেত্রের এলাকায় প্রায় ৬।৭ শত বিঘা জমি আছে। জমিগুলি একটু নীচু। এই নীচু জমিকে উঁচু করিবার জন্য কৃষিবিভাগ হইতে চেষ্টা করা হইয়াছিল। প্রথমতঃ খানিকটা জমি উঁচু করিবার জন্য প্রায় ৫।৬ হাজার টাকা ব্যয় হয়। ঐ জমিতে "ফার্ম্" হইতে ফসল প্রভৃতি উৎপন্ন করা হইবে এবং তাহার ফলাফল দেখিয়া ফার্ম্মের অন্য জমি-সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা হইবে, এইরূপ স্থির হয়। সম্প্রতি এই উঁচু জমির মধ্য হইতে ১৫ বিঘা জমি Satem & Sons (সাটেম এণ্ড্ সন্স্) নামক একটি বিদেশী বীজের ব্যবসায়ী কোম্পানীকে সম্পূর্ণ বিনাসর্ত্তে পাঁচ বৎসরের জন্য ইজারা দেওয়া হইয়াছে। ঐ ১৫ বিঘা জমি ফার্ম্মের সর্ব্বোৎকৃষ্ট জমি বলিলেই হয়। সাটেম এণ্ড্ সন্স্ এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট জমিটুকু কৃষি-বিভাগ হইতে খয়রাতীসূত্রে পাইয়া, তাহাতে বিদেশী বীজ লাগাইবেন এবং পরে ঐ বীজ, বিলাতী লেবেল আঁটিয়া, ভারতের হাটে বেশ চড়া দরে বিক্রয় করিবেন। কেমন, চমৎকার ব্যবস্থা! শাসন ও শোষণ যে এদেশে কিরূপ অঙ্গাঙ্গী-সম্বন্ধে আবদ্ধ, এ-সব তাহারই দৃষ্টান্ত নয় কি ?

এই জমি খরিদ করিতে সরকারী কৃষি-বিভাগ হইতে অর্থ দেওয়া হইয়াছে, উহা ইংরেজ, স্কচ্ বা আমেরিকান্‌দের অর্থ নয়।

চারজন সত্যাগ্রহীকে ফটকের ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র গ্রেপ্তার করা হইল

বাঙ্গালী-প্রজার শোণিত-তুল্য অর্থ হইতেই উহা আসিয়াছে। এই জমির উৎকর্ষসাধনের জন্য যে কয়েক হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে, তাহাও এদেশের লোকেরই অর্থ। অথচ কৃষি-বিভাগের মোড়লেরা জমিটুকু অনায়াসে একটি বিলাতী কোম্পানীকে ব্যবসা করিবার জন্য খয়রাত করিয়া দিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চুঁচুড়ার ফার্ম্মে মোট জমি ৬।৭ শত বিঘা। ইহার মধ্যে ১৯২২ সালে ৪ শত বিঘাতে ফসলাদি করা হইয়াছিল। বাকী জমি পতিত ছিল। ১৯২৩ সালে পূর্ব্বের চেয়ে আরও বেশী জমি পতিত ছিল। ১৯২২ সালে এই ফার্ম্মের বাবদ খরচ হইয়াছে ২০৫৮৬।১০, আর আমদানি দেখানো হইয়াছে ১৪১১৭।০ টাকা মাত্র। এই আমদানি টাকার মধ্যে ১৯১৭৬৷৵৫ টাকা ১৯২২ সালের ৩১ শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত আদায় হয় নাই এবং ৩১৬৪৷৵০ টাকা মূল্যের জিনিষ ঐ তারিখ পর্য্যন্ত বিক্রয়ার্থ মজুত ছিল। অর্থাৎ ১৯২২ সাল ৩১ শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত মোট নগদ আদায় ৮৭৫৫৷৵ এবং মোট খরচ ২০৫৮৬৲। সহজ এবং সরল ভাষায়—ফার্ম্মের বাবদ দেনা বা বাকী ১১৮৩১৲ টাকা।

১৯২২ সালে ঐ ফার্ম্মে ফসল জন্মাইবার জন্য বীজ, সার ও যন্ত্রাদি খরিদ বাবদ মোট ব্যয় হইয়াছিল মাত্র ৬৫৭৷৵০ টাকা এবং প্রকৃতপক্ষে তাহার দ্বারাই ফসলাদি উৎপন্ন হইয়াছিল। অথচ ফার্ম্মের খাতায় মোট খরচ দেখানো হইয়াছে ২০৫৮৬৲ টাকা; তাহা হইলে বাকী টাকাটা আর কিসের জন্য ব্যয় হইল? ভূতের বাপের শ্রাদ্ধের জন্য? যে ফার্ম্মের মোট নগদ আমদানি ৮ হাজার টাকা, তাহার ব্যয়ের ফর্দ্দ ২০ হাজার টাকা! কি শোচনীয় অবস্থা! আর এইরূপ একটা দেউলিয়া ফার্ম্মের কাজ চালাইবার জন্য সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও কয়েকজন কর্ম্মচারী আছেন,—তাঁহাদের মাহিনা বাবদও বোধ হয় বৎসরে পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় হয়। এদেশ ছাড়া এমন অদ্ভুত ব্যাপার আর কোথাও সম্ভব হইত কি? আমরা প্রস্তাব করি, অতঃপর চুঁচুড়ার সমস্ত ফার্ম্মটিই সাটেম এণ্ড সন্স্‌কে বিনাসর্ত্তে ইজারা দেওয়া হউক এবং উক্ত কোম্পানী মনের আনন্দে সেখানে বীজের ব্যবসায় চালাইয়া লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করিতে থাকুন। আর বাঙ্গলার কৃষক ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া দেখুক।

—আনন্দ বাজার পত্রিকা

পল্লী-সংস্কার—

(ক) গ্রামের মধ্যবর্ত্তী জলনিকাশের পথ বা নালাগুলি পরিষ্কার এবং কার্য্যকারী করিয়া রাখা।

(খ) ছোট ছোট ডোবা, যাহা গ্রীষ্মকালে জলশূন্য হইয়া থাকে, অথচ বর্ষাকালে জল আবদ্ধ করিয়া রাখে, সেইগুলি বোজাইয়া ফেলা।

(গ) গ্রামের মধ্যবর্ত্তী বড় বড় পুকুরে কই, মৌরলা, পুঁটি, ছুয়া মশককীড়াভুক্ মাছের চাষ করা এবং পানা প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদ হইতে উহাদিগকে পরিষ্কার রাখা।

(ঘ) ছোট ছোট বনজঙ্গল, যাহাতে আজকাল গ্রামগুলির মধ্যবর্ত্তী পরিত্যক্ত বাস্তুভিটাগুলি ভরিয়া উঠিতেছে, তাহা কাটিয়া পরিষ্কার করা।

(ঙ) পরিত্যক্ত ভাঙ্গা হাঁড়িকুড়িতে, বড় বড় গাছের কোটরে, এবং আনারস প্রভৃতি কয়েক জাতীয় গাছের মাথায় যাহাতে বর্ষার জল জমিয়া না থাকে তাহার চেষ্টা করা।

(চ) কুয়াকে ঢাকা রাখার ব্যবস্থা করা এবং যতদিন না খানাডোবাগুলি বোজান হয় ততদিন উহাদের মধ্যে সঞ্চিত আবদ্ধ জলে মাঝে মাঝে কেরোসিন দেওয়া।

(ছ) বড় বড় পুষ্করিণীর মধ্যে মধ্যে পঙ্কোদ্ধার করিয়া পানীয় জলের সুব্যবস্থা করা।

আমরা উল্লিখিত উপায়গুলি গ্রহণ করিতে প্রত্যেক পল্লবাসীকে উপদেশ দিই। ইহা দ্বারা খানা ডোবা ভরাট করিয়া গ্রামের মধ্যেই কৃষিযোগ্য জমি বাড়ান চলিবে, মাছের চাষ বাড়াইয়া বর্ত্তমান মৎস্যাভাব অনেকটা বিদূরিত হইবে, এবং তদ্দ্বারা অনেকের একটা নূতন আয়ের পথ খোলা হইবে, আর ছোট ছোট বন জঙ্গল পরিষ্কার করিয়াও কৃষিযোগ্য জমির বৃদ্ধি এবং কাঠের অভাবও অনেকটা দূর হইবে। গাছের কোটরে ও আনারসগাছের মাথায় জল জমিয়া থাকা নিবারণের দ্বারা গাছগুলির অবস্থাও ভাল হইবে। সর্ব্বোপরি স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সকলেরই চেষ্টা করা উচিত।

'স্বাস্থ্য-সমিতি' গঠন খুব প্রয়োজনীয়, এবং আমরা পল্লীবাসীগণকে উহা করিতে উপদেশ দিই। ঐপ্রকার সমিতি গঠন করিয়া 'কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমবায় সমিতি'তে সংবাদ দিলে তাঁহারা প্রত্যেক 'পল্লী-সমিতি'কে সাধ্যমত সাহায্য ও উপদেশ দানে উহাদের উন্নতির সহায়ক হইবেন। কলিকাতা, ১০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে উক্ত কেন্দ্রীয় সমিতির কার্য্যালয়।

আপনারা হয়ত জানেন না যে এই বঙ্গদেশে এক বৎসরের মৃত্যু সংখ্যা ও মোট জনসংখ্যার হার এবং প্রত্যেক রোগে মৃত্যুর হার হিসাব করিলে দেখা যায় প্রত্যহ—প্রতি ১॥ মিনিট অন্তর একজন করিয়া অধিবাসী ম্যালেরিয়ায় ৩ জন নিউমোনিয়ায়, ৪ জন ওলাউঠায়, ৪ জন আমাশয়ে, ৫ জন ক্ষয়রোগে, ৮ জন সূতিকায়, ১৫ জন ধনুষ্টঙ্কারে, ৩০ জন কালাজ্বরে, মরিতেছে। এবং প্রত্যহ একজন করিয়া টাইফয়েড্ জ্বরে মৃত্যু-মুখে পতিত হইতেছে।

দেশের এ অবস্থার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে শরীর আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে; সুতরাং স্বাস্থ্য সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা অধিক করিয়া বলিবার দরকার হয়।

—কৃষক

বাঁশের নলকূপ—

বিপদবারণ বাবু বাঁশের নলকূপের মোটামুটি ব্যয়ের যে ফর্দ্দ দিয়াছেন তাহা নিম্নে দেওয়া গেল—

একটি বাঁশের নল—	॥০ আনা
বসাইবার খরচ—	২৲ টাকা
পিতলের জাল ও তার—	২৲ "
একটি লোহার নল চামড়া প্রভৃতি	॥০ আনা
মোট	৫৲ টাকা

লোহার ব্যারেল ব্যবহার করিলে ইহার উপর আরও দুই টাকা খরচ হইবে। প্রতি নলকূপ হইতে অন্যূন ৬০০ গ্যালন জল পাওয়া যাইতে পারে। এরূপ অল্প ব্যয়সাধ্য নলকূপে যদি ঐপ্রকার জল পাওয়া যায় তাহা হইলে এই গরীব দেশের জলের অভাব অনেকটা দূর হইতে পারে। বঙ্গের ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটিতে এই নলকূপের কার্য্যকারিতা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ভাল হয় না?

—টাঙ্গাইল হিতৈষী

তারকেশ্বরের কথা—

তারকেশ্বর সাধারণ গ্রামের মত নহে। এখানে শুধু তারকনাথ এবং তারকনাথের সেবাইত মোহান্ত আছেন এবং যাত্রীগণের আবশ্যক দ্রব্যাদি সরবরাহ করিবার জন্য বাজার আছে। ক্রমে এখানে "আনন্দ বাজার" বলিয়া একটি পল্লী গড়িয়া উঠিয়াছে—এই পল্লীতে সাড়ে চারি শত বেশ্যা বাস করে। এখানে এত বেশ্যা রাখিবার কারণ শুনিলাম এই যে, ইহাতে যাত্রী সংখ্যা খুব বেশী হয়! এত বেশ্যা কোথা হইতে

এখানে আসিল তাহার অনুসন্ধান করিলে যেসকল তথ্য বাহির হইয়া পড়ে তাহা অতি করুণ ও হৃদয়বিদারক। বহু ভদ্রগৃহস্থের কন্যা ও কুলবধূ এই তীর্থস্থানে আসিয়া আর ফিরিতে পারে নাই। দুর্বৃত্তদের ছলে-বলে-কৌশলে এখানে জাতি-কুল-মান হারাইয়া শেষে দুই মুঠা উদরান্ন ও একটু আশ্রয়ের জন্য এখানে চিরজীবন বেশ্যা হইয়াই রহিয়াছে। শুনিয়াছি, যেসকল গৃহস্থ কার্য্যোপলক্ষে তারকেশ্বরে বাস করে তাহারা কেহ সেখানে মেয়ে-ছেলে লইয়া বাস করিতে সাহস পায় না।

যাত্রীদের পয়সা কড়ি যে এখানে লুট হয় তাহা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কত গরীব বুকের রক্ত ঢালা পয়সা আনিয়া মোহান্তের গদিতে ফেলিয়' দেয় এবং সেই পয়সায় মোহন্ত মহারাজের বিলাস-লালসার উপকরণ সংগৃহীত হয়। শুনিয়াছি, মোহান্ত মহারাজের আয় বাৎসরিক কয়েক লক্ষ টাকা। কিন্তু তারকেশ্বরের যাত্রীদের থাকিবার ও থাইবার যেরূপ দুরবস্থা দেখিয়াছি তাহাতে মনে হয় না যে ঐ লক্ষ লক্ষ টাকার একটি পয়সাও কখনও লোকহিতে ব্যয় করা হয়! তারকেশ্বরে সহস্র সহস্র যাত্রীর সমাগম হয়—কিন্তু, সেখানে পানীয় জলের কোন ব্যবস্থাই নাই। এই দারুণ গ্রীষ্মে যাত্রীদের যে কি কষ্ট, কত লোক যে কর্দ্দমাক্ত বিষাক্ত জল পান করিয়া ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছে এতদিন শুধু ভগবান্‌ই তাহার হিসাব রাখিয়াছেন।

—সারথি

বৌদ্ধজয়ন্তী-উৎসবে মহাত্মা গান্ধী [ইণ্ডিয়ান্ ডেলী মেল হইতে

বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর মত—

বিগত ১৮ই মে তারিখেজুহুতে বৌদ্ধজয়ন্তী-উৎসবের সভাপতিরূপে মহাত্মা গান্ধী বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে বেশ একটি সারবান্ বক্তৃতা দিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন বুদ্ধদেব জগৎকে সত্য ও প্রেমের পথ প্রদর্শন করিয়া অমর হইয়া রহিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মেরই একটি অঙ্গ। গৌতমবুদ্ধ হিন্দুদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন—প্রাণগ্রহণ করা অপেক্ষা প্রাণদান করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। গৌতমবুদ্ধের উপদেশ পালন না করিয়াই হিন্দুরা অধঃপাতে যাইতেছে।

বাখরগঞ্জ জেলা সম্মিলনীর কয়েকটি প্রস্তাব—

১। এই সম্মিলন পল্লীগঠন ও সংস্কারের কার্য্য দেশের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন এবং এই জিলার রাষ্ট্রীয় সমিতিসমূহকে উক্ত কার্য্য বিশেষভাবে মনোযোগী হইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন।

২। এই সম্মিলনী মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসমিতি পরিগৃহীত অহিংস অসহযোগনীতি যে স্বরাজলাভের একমাত্র উপায় তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতেছেন এবং এই জিলার সর্ব্বসাধারণকে তাহা পালন করিয়া চলিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন।

৩। জাতীয় শিক্ষা ব্যতীত দেশে জাতীয়তা উদ্বুদ্ধ করা অসম্ভব; সুতরাং যাহাতে দেশে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বহুল পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত হয় তৎপ্রতি দেশের সর্ব্বশ্রেণীর লোকের সচেষ্ট হওয়া একান্ত আবশ্যক। এই জিলায় বর্ত্তমানে যেসকল জাতীয় বিদ্যালয় বিদ্যমান আছে সেগুলি যাহাতে উপযুক্তরূপে পরিচালিত ও রক্ষিত হয় এবং গ্রামে গ্রামে যাহাতে প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয় তৎপ্রতি জিলাবাসী সকলকে বিশেষভাবে মনোযোগী হইতে এবং সর্ব্বপ্রকারে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে এই সম্মিলনী সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন।

৪। সকল হিন্দু-দেবমন্দির ও তীর্থস্থান পরিশুদ্ধ, সংস্কৃত ও হিন্দু জনসাধারণের আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে এই সম্মিলনী দেশবাসীগণকে আহ্বান করিতেছেন।

৫। এই জিলার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভা গৃহীত ত্রিবিধ বর্জ্জননীতি মান্য করিয়া তাহার সার্থকতা ও সফলতার উদ্দেশ্যে এই সম্মিলনী নিম্নলিখিত জনহিতকর কার্য্যে দেশবাসীদিগকে আত্মনিয়োগ করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছেন।

৬। এই সম্মিলনী বিশ্বাস করেন যে হিন্দুসমাজে বর্ত্তমানে প্রচলিত অস্পৃশ্যতা-দোষ দেশের ও সমাজের পক্ষে ঘোর অসম্মানজনক এবং উহা দেশের জাতীয়তা ও পরস্পর ভ্রাতৃভাব সংস্থাপনের বিরোধী, সুতরাং এই সম্মিলনী নিম্নলিখিত কার্য্য করিতে জিলাবাসীকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন।

৭। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্মাবলম্বী এ-জেলার অধিবাসীর মধ্যে পরস্পর প্রীতি ও সহযোগিতা ব্যতীত দেশের উন্নতি সাধন অসম্ভব; সুতরাং এই সম্মিলনী সর্ব্ব সম্প্রদায়ের জনগণকে প্রীতি-বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া দেশ-হিতকর কার্য্যে মনোনিবেশপূর্ব্বক স্বরাজলাভের জন্য বদ্ধপরিকর হইতে অনুরোধ করিতেছেন।

৮। এই সম্মিলনী বিশ্বাস করেন যে বর্ত্তমানে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপালিটির যাঁহারা সভ্য আছেন তাঁহাদের সকলেই দেশের

হিতাকাঙ্ক্ষী প্রতিনিধি নহেন। দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করিতে হইলে এসমস্ত প্রতিষ্ঠানে দেশের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী প্রতিনিধিগণকে প্রেরণ করা আবশ্যক; সুতরাং এই সম্মিলনী এ-জেলার সর্ব্বশ্রেণীর অধিবাসীগণকে এই অনুরোধ করিতেছেন যে তাঁহারা ভবিষ্যতে এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে যাহাতে প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী, সর্ব্বত্যাগী রাষ্ট্রীয় সমিতির মনোনীত প্রতিনিধি প্রেরণ করেন, তৎপ্রতি সর্ব্বথা চেষ্টা করিবেন।

৯। গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসন বিষয়ক আইন (Village Self-Govt. Act) দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে; সুতরাং এই সম্মিলনী যাহাতে জেলার কোথায় কোন ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারে এ-জন্য এজিলার প্রত্যেক গ্রামবাসীকে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

১০। স্বরাজ-আন্দোলনের অপরিহার্য্য নারীশক্তিকে জাতীয়ভাবে সংবদ্ধ করিবার জন্য এই সম্মিলনী দেশবাসীকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন।

১১। যাহাতে দেশবাসীর সর্ব্বপ্রকার আবশ্যক দ্রব্য দেশে (বরিশালে) প্রস্তুত হয় এবং দেশবাসী ক্ষতি স্বীকার করিয়াও কেবল মাত্র স্বদেশজাত দ্রব্য ব্যবহার করেন, তদ্বিষয়ে এই সম্মিলনী দেশবাসীকে সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন।

১২। এই সম্মিলনী দেশবাসীকে যথাসম্ভব ব্রিটিশ্ সাম্রাজ্য জাত দ্রব্য পরিহার করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন।

—বরিশাল

শ্রী ৬

কৌতুক-অভিনেতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কৌতুক ও অশ্লীলতার মধ্যে যে একটা বিশেষ তফাৎ আছে তা আজকালকার অনেক অভিনেতাই মনে রাখে

না। ফলে আমাদের বালকবালিকা প্রভৃতির পক্ষে কৌতুক-অভিনয় দর্শন বিশেষ বিপদ্‌জনক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। অশ্লীলতাহীন কৌতুক-অভিনয় বাংলা দেশে দুর্লভ।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ওরফে এস্, সি, মুখার্জ্জি বা "ফানিম্যান্" শিক্ষিত ভদ্রলোক। ইনি ইংরেজী সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন ও মার্জ্জিত রুচির জন্য প্রসিদ্ধ। ইনি শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে ও ইংরেজ মহলে খুবই সমাদর লাভ করেছেন। ইহাঁর অভিনয় চমৎকার ও কৌতুকরসে ভরপুর: কিন্তু ইনি অপরের ক্ষতি করে' অথবা শ্লীলতার সর্ব্বনাশ করে' রসিকতার চেষ্টা করেন না। শ্রীযুক্ত এস্, সি, মুখার্জ্জি সম্প্রতি নূতন উৎসাহে কৌতুক-অভিনয় ক্ষেত্রে নেমেছেন। এবিষয়ে ইনি কৃতী ও বিশেষ ক্ষমতাশালী।
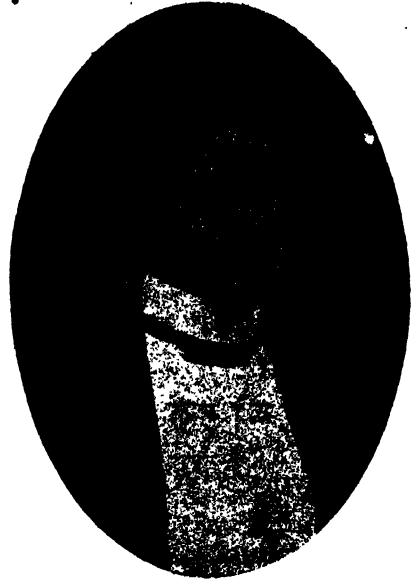
অ

কৌতুক-অভিনেতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

চৈতন্যদেব ও ঈশ্বরপুরী-সম্বন্ধীয় চিত্র

বৈশাখের প্রবাসীতে প্রকাশিত এই চিত্র-সম্বন্ধে জ্যৈষ্ঠের কাগজে শ্রী অমৃতলাল শীল যাহা লিখিয়াছিলেন, মূলতঃ তাহাই শ্রী বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রী জ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত, শ্রী নন্দনন্দন ব্রহ্মচারী ও শ্রী সলিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন। এইজন্য তাহার প্রকাশ অনাবশ্যক। প্রবাসীর সম্পাদক।

চৈতন্যদেবের মূর্চ্ছা সম্বন্ধীয় ছবি

পূর্ব্বকালে পৃথিবীতে যত ধর্ম্মস্থাপক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের পার্ষদেরা প্রায়ই নিরক্ষর ছিলেন, কিন্তু চৈতন্যদেবের পার্ষদেরা সকলেই উচ্চদরের বিদ্বান্ ছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে অনেকে তাঁহার জীবনের ঘটনাগুলি সবিস্তারে লিখিয়া গিয়াছেন। অতএব তাঁহার সম্বন্ধে চিত্র আঁকিতে কল্পনার সাহায্য লওয়া চলে না। এই মূর্চ্ছার চিত্র-খানিতে চৈতন্যদেবের মস্তক মুণ্ডিত, এ অবস্থা সন্ন্যাসের পরের। পশ্চাতে বিষ্ণুপাদ-পদ্মের চিত্রটি গয়া-দর্শন-কালের, অর্থাৎ সন্ন্যাসের পূর্ব্বের। নিমাই পণ্ডিত সন্ন্যাস লইবার বহু পূর্ব্বে একবার মাত্র গয়ায় গিয়াছিলেন, তখন তিনি চঞ্চল যুবক অধ্যাপক, তাঁহার নটবর বেশ, মাথায় চাঁচর কেশ। বিষ্ণুপাদ পদ্মের প্রভাব শুনিয়া তাঁহার ভক্তি উদিত হইয়াছিল, তিনি ভক্তিতে বিহ্বল হইয়াছিলেন মাত্র, মূর্চ্ছিত হয়েন নাই।

> চরণপ্রভাব শুনি বিপ্রগণ মুখে।
> আবিষ্ট হইলা প্রভু প্রেমানন্দ সুখে॥
> অশ্রুধারা বহে দুই শ্রীপদ্ম নয়নে।
> লোমহর্ষ কম্প হইল চরণ দর্শনে॥
> সর্ব্ব জগতের ভাগ্যে প্রভু গৌরচন্দ্র।
> প্রেম-ভক্তি-প্রকাশের করিলা আরম্ভ॥

সেই স্থানে পরম ভক্ত বৈষ্ণব সন্ন্যাসী, গৈরিক-বসনধারী শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল ও পুরী গোসাঞি নিমাইকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। চিত্রের বৃদ্ধটি শ্বেতশ্মশ্রু ধুতি-চাদর-পরা, অতএব পুরী গোসাঞি হইতে পারেন না, ও গয়ার দৃশ্য নহে। নিমাই পণ্ডিত সন্ন্যাস লইয়া মস্তক মুণ্ডিত করিয়াছিলেন, ও মাতার অনুমতি লইয়া শ্রীক্ষেত্রে গিয়াছিলেন। ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে আপনার সঙ্গীদের ছাড়িয়া একা বিহ্বল অবস্থায় মন্দিরে প্রবেশ করিলেন ও জগন্নাথকে ধরিতে গিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সে সময়ে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সেখানে ছিলেন, তিনি নবীন সন্ন্যাসীর মহাভাব দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন, ও আপনার কয়েকটি পড়িছা শিষ্য দ্বারা তাঁহার মূর্চ্ছিত দেহ বহাইয়া আপন বাটীতে আনিয়া, পবিত্র স্থানে রাখিলেন। সেখানে তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত তিনি মূর্চ্ছিত ছিলেন ও ভট্টাচার্য্য স্বয়ং তাঁহার কাছে

> বসি ভট্টাচার্য্য মনে করেন বিচার।
> এই কৃষ্ণ মহাপ্রেমের সাত্ত্বিক বিকার।

ছবিটি বোধ হয় সেই সময়কার, নিকটের বৃদ্ধটি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য। কিন্তু স্থানটি সার্ব্বভৌমের বাটী, তিনি বেদান্তী নৈয়ায়িক, সেখানে বিষ্ণুপাদ-পদ্ম-চিহ্ন বা চিত্র কিছুই ছিল না, বিষ্ণুপাদ-পদ্ম-সম্বন্ধে সে সময়ে কেহ চিন্তাও করিতেছিলেন না। অতএব ঐ চিহ্নের এখানে কোনও অর্থ হয় না। পুস্তকে এসময়ে তাঁহার মূর্চ্ছার কথাই আছে, বিবসন হইবার কথা নাই, কিন্তু কবি-কল্পনায় বিবসন হওয়া অসম্ভব নহে। সেসময়কার দৃশ্যটিও ঐতিহাসিক সত্যরূপে চিত্রিত নহে। শিল্পী গয়ার ও ভট্টাচার্য্যের গৃহের দুইটি দৃশ্য কল্পনা-বলে একসূত্রে গ্রথিত করিয়া আঁকিয়াছেন, কিন্তু সত্য ঘটনাম্বয়কে এরূপে ইচ্ছামত বিকৃত করিবার অধিকার বোধ হয় চিত্র-শিল্পীরও নাই, কেন না এরূপ করায় উভয় সত্য ঘটনাই দূষিত হইয়াছে।

শ্রী অমৃতলাল শীল

সম্পাদকীয় মন্তব্য। ঐতিহাসিক উপন্যাস বা অন্যবিধ কাব্যে ঐতিহাসিক তথ্যের কতদূর অনুসরণ করা উচিত, এবং কিরূপ ব্যতিক্রম করা উচিত নয়, তাহার আলোচনা ও মীমাংসার বহু চেষ্টা হইয়াছে; কিন্তু সর্ব্ববাদীসম্মত মীমাংসা হইয়াছে বলিয়া অবগত নহি। কিন্তু ইহা বোধ হয়, অনেকেই স্বীকার করিবেন, যে, ঐতিহাসিক ব্যক্তির চরিত্রের লাঘব না করিয়া কোন ব্যতিক্রম করিলে তাহা সাংঘাতিক নহে। কাব্য-সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, চিত্র-সম্বন্ধেও তাহা বলা চলে; কারণ, উভয়েরই উদ্দেশ্য রস-সৃষ্টি; অতএব, যেমন কাব্যে, তেমনি চিত্রে, লক্ষ্য করিবার প্রধান বিষয় এই যে, কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি-সম্বন্ধে কাব্যকার বা শিল্পী আমাদের মনে এমন কোন ভাবের উদ্রেক করিতে চাহিয়াছেন কি না, যাহা তাঁহার সম্বন্ধে অনুচিত। অর্থাৎ, দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কোন কবি, ঔপন্যাসিক, বা চিত্রকর চৈতন্যদেবকে হিংস্র বা কঠোর, শিবাজীকে কাপুরুষ বলিয়া আমাদের মনে তাঁহাদের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মাইতে চেষ্টা করিলে তাহা অনুচিত। চরিত্রগৌরব রক্ষা করিয়া ইতিহাসের খুঁটি-নাটি হইতে ব্যতিক্রম চলিতে পারে বলিয়া আমাদের ধারণা। চিত্র-পরিচয়ে যখন যখন ভুল হয়, তাহা লেখকদের ভুল, চিত্রকরের নহে।

যাহারা চিত্রে ও সর্ব্ববিধ গদ্য ও পদ্য-কাব্যে সকল বিষয়ে ইতিহাসের ও তথ্যের অনুসরণ চান, আমরা তাঁহাদের সহিত একমত নহি।

শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

বৈশাখের প্রবাসীতে প্রকাশিত 'ঐতিহাসিক নাটক' শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একস্থানে লিখিয়াছেন :—
"প্রথমে আমাদের দেশে পৌরাণিক আখ্যায়িকা লইয়া নাটক রচিত হইত। পরে ঐতিহাসিক রচনা হইয়াছিল। আচার্য্য বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত উপন্যাসগুলি নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া অভিনীত হইবার পরে নূতন ঐতিহাসিক নাটক রচনা হইয়াছিল।"

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত ও অভিনীত হই-বার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ঐতিহাসিক নাটকগুলি রচিত ও অভিনীত হয় নাই কি? ঐতিহাসিক নাটক-রচনায় জ্যোতি-রিন্দ্রনাথ লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও বাঙ্গালা সাহিত্যে এবিষয়ে তিনি একরকম

'পথ-প্রদর্শক বলিলেই হয়। তাঁহার লিখিত অশ্রুমতী, পুরু-বিক্রম ও সরোজিনী (ঐতিহাসিক) নাটক তিনখানি একসময়ে বহুবার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছে। রাখাল-বাবুর উল্লিখিত তিনজন নাট্যকারের নামের সহিত ঐতিহাসিক নাট্যকার-হিসাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নামোল্লেখ নাই কেন?

শ্রী সলিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

"ভারতের রত্নআদি খনিজ"

জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'তে 'ভারতের রত্নআদি খনিজ' প্রবন্ধে ২৫৪ পাতায় লেখক 'ডাইকে'র সংজ্ঞায় লিখেছেন,—কোন-একপ্রকার পদার্থের স্তরের ফাটলে বাঁধের বা প্রাচীরের আকৃতি-বিশিষ্ট অন্তর্বিধ পদার্থরাশিকে ডাইক্ বলে।

কিন্তু ভূ-বিজ্ঞানের দিক্ দিয়ে দেখ্‌তে গেলে 'অন্তর্বিধ' না লিখে' 'আগ্নেয়' (igneous) লেখা উচিত; কারণ উক্ত প্রাচীরের আকৃতি-বিশিষ্ট পদার্থরাশি যদি আগ্নেয় না হয় তা হ'লে তাকে 'ডাইক্' বলে না।

অমিয় বসু

সম্পাদকীয় মন্তব্য। পত্র-লেখক যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক্। কিন্তু ডাইকের সংজ্ঞা প্রবন্ধ-লেখকের নহে; উহা সম্পাদককর্তৃক বন্ধনীর মধ্যে সংযোজিত হইয়াছিল। খনিজ পদার্থ পলিমাটির দেশে বা জলজ স্তরে পাওয়া যায় না, প্রবন্ধে বলা হইয়াছে। অতএব ডাইক্ যে কিপ্রকার জিনিষ, স্পষ্ট করিয়া বলিয়া না দিলেও সেবিষয়ে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা কম। প্রবাসীর সম্পাদক

বাল-বিধবার বিবাহ

জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে বালবিধবাদের বিবাহ-প্রসঙ্গে—"তাঁহাদের বিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য যে মহাত্মা বাংলা দেশে প্রথম সফল-চেষ্টার সূত্রপাত করিয়াছিলেন—"ইত্যাদি কথায় খুব সম্ভব আপনি স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়াছেন। এখানে বোধ হয় বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে বিদ্যাসাগর মহাশয়েরও প্রায় একশত বৎসর আগে বাংলা দেশে অন্ততঃ আরও দুইজন হিন্দু শাস্ত্রমতে বিধবাদের বিবাহ দেওয়ার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই উদ্যম তাঁহাদের জীবনকালে সফল না হইলেও আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এর মূল্য আছে, কারণ কোনও সত্য-প্রচারের প্রয়াস ব্যর্থ হইলেও তার একটা সার্থকতা থাকে। বাবু কালীনাথ চৌধুরী-প্রণীত রাজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে (১৭৯ পৃষ্ঠায়) রাণী ভবানী ও রাজা রাজবল্লভের বিধবা-বিবাহ প্রচলন-চেষ্টার উল্লেখ আছে।

"রাণী ভবানীর কন্যা তারা ঠাকুরাণি অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিলেন। তাঁহার বৈধব্য-যন্ত্রণায় রাণী ভবানী সর্ব্বদা দুঃখিত থাকিতেন। ঢাকার রাজবল্লভ ঐরূপ স্বীয় কন্যার বৈধব্য-যন্ত্রণায় প্রপীড়িত ছিলেন। রাণী ভবানী ও রাজবল্লভ তাঁহাদের বিধবা কন্যার বিবাহের প্রস্তাব পণ্ডিত-মণ্ডলীতে উত্থাপন করিলেন। সেসময় বিক্রমপুর ও নদীয়ার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সমাজের শিরোমণি ছিলেন। নদীয়ার পণ্ডিতগণ নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অধীন, বিক্রমপুর ও নদীয়ার পণ্ডিতগণের বিচারে বিধবা-বিবাহ ব্যবস্থাসূচক বলিয়া স্বীকৃত হয় কিন্তু রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কৌশলে কার্য্যে পরিণত হইল না।" রাজবল্লভ ও রাণী ভবানীর সহিত কৃষ্ণচন্দ্রের বিশেষ ভাব ছিল না, তাই হয়ত তিনি এই সংস্কার-চেষ্টার বিরোধী হইয়া থাকিবেন। যাহা হউক, প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত রাজা রাজবল্লভ এবং দূরদর্শিনী রাণী ভবানীর নামও একসঙ্গে আমাদের ভক্তি-সহকারে স্মরণীয়।

শ্রী অবিনাশচন্দ্র দত্ত

সম্পাদকীয় মন্তব্য। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্ব্বেও বাংলা দেশে বিধবাদের বিবাহ দিবার চেষ্টা হইয়াছিল, ইহা আমাদের জানা ছিল। কিন্তু আমরা "সফল" চেষ্টার কথাই বলিয়াছি। সুতরাং আগেকার বিফল-চেষ্টার অনুল্লেখে কোন দোষ হয় নাই। প্রবাসীর সম্পাদক।

কবিতা ও বনিতা

কবিতা বনিতা সমান (ই) ভণিতা
সংসারে তাদের সমান দর।
কবিতা যেমন বনিতা তেমন
করিলে আপন, নহিলে পর।

শ্রী বৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ

আর্য্য প্রতিভা—শ্রী সূর্য্যকুমার দে, বি-এ, অধ্যাপক হোলি ক্রস ইনষ্টিটিউশন, আকিয়াব (Holy Cross Institution, Akyab, Burma) পৃঃ ৭১; মূল্য ।/০

গ্রন্থকারের বক্তব্য—বর্ত্তমানযুগে যেসমুদায় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব শিল্প আবিষ্কৃত হইয়াছে, বৈদিক ঋষিগণ সেসমুদায়ই অবগত ছিলেন। বৈদ্যুতিক শকটাদি বৈদিক যুগে ব্যবহৃত হইত!

মহেশচন্দ্র ঘোষ

গীতমালা—দেবদেবী বিষয়ক গানের স্বরলিপি—শ্রী গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, প্রকাশক ডোয়ার্কিন এণ্ড্ সন্, কলিকাতা মূল্য ২॥০ টাকা।

সঙ্গীত-জগতে শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নূতন করিয়া পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। সুকণ্ঠে ও সঙ্গীত শাস্ত্র জ্ঞানে ইঁহার সমকক্ষ লোক ভারতে অল্পই আছেন। গীতমালার ছাপা ও স্বরলিপিগুলি খুবই উৎকৃষ্টতরের হইয়াছে। আশা করা যায় যে সঙ্গীত-জগতে ইহার উপযুক্ত আদর হইবে। পুস্তকের মলাটখানিও সুন্দর হইয়াছে।

অ

বরেন্দ্র রন্ধন—কিরণ লেখা রায় সঙ্কলিত। দাম দুইটাকা ১৩২৮।

জলখাবার—কিরণ-লেখা রায় সঙ্কলিত। দাম দুটাকা। ১৩৩১।

দুইখানি পুস্তকেই নানা-প্রকার ব্যঞ্জন এবং জলখাবার মিষ্টান্ন ইত্যাদি তৈয়ার করিবার সহজ প্রণালী আছে। এইপুস্তক দুখানি পড়িয়া একজন আনাড়ী পুরুষ মানুষও অনেকপ্রকার ব্যঞ্জন এবং মিষ্টান্ন তৈয়ার করিতে পারে। প্রত্যেক বাঙ্গালী পরিবারে এইরকম পুস্তকের আদর হওয়া উচিত। ছেলেমেয়েদের পক্ষে একখানি অভিধান যেমন প্রয়োজন—বাড়ীর মেয়েদের পক্ষে এই "বরেন্দ্র রন্ধন" এবং "জল খাবার" পুস্তকের প্রয়োজন তেম্নি। বইদুখানির ছাপা, বাঁধাই এবং কাগজ সবই ভাল, তবে এইরকম বইয়ের দাম আরো অনেক কম করা উচিত। চারটাকা দিয়া দুখানি বই ক্রয় করা আমাদের দেশের অনেকের অবস্থায় কুলায় না।

হাসি (উপন্যাস)—শ্রী শৈলজা মুখোপাধ্যায়। কল্লোল পাব্লিশিং, ১০।২ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা। দাম পাঁচ সিকা।

লক্ষ্মী (উপন্যাস)—শ্রী শৈলজা মুখোপাধ্যায়। কল্লোল পাবলিশিং। দাম বারো আনা।

দুখানি উপন্যাসই মন্দ নয়। ছাপা বাঁধাই ইত্যাদি বেশ ঝরঝরে।

কারাজীবনী—শ্রী উল্লাসকর দত্ত। আর্য্য পাব্লিশিং হাউস, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট্, কলিকাতা। দাম একটাকা। দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৩০।

বই দুখানির প্রথম সংস্করণ শেষ হইয়া গিয়াছে, ইহাতেই ইহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, কারণ বাংলাদেশে বটতলা এবং বিশেষপ্রকার বিজ্ঞান-কেতাব ছাড়া আর কোনপ্রকার বইএর বিশেষ কাট্তি হইতে দেখা যায় না। এই কারাজীবনী পাঠে লেখকের জীবনের অনেক কিছুই জানিতে পারা যায়। ভুল পথে হউক, ঠিক পথে হউক, দেশের সেবা করিতে গিয়া এবং দেশকে স্বাধীন করিতে গিয়া লেখককে যে কতপ্রকার অত্যাচার এবং দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই। তবে বইয়ের মধ্যে দু-একটি প্রায়-ভৌতিক ব্যাপারের কথা উল্লেখ আছে। এইসব ভৌতিক কাণ্ড সত্য হ'লেও বিশ্বাস করা মুস্কিল, তবে পড়িতে বেশ লাগে। বইখানির আগাগোড়াই বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। ছাপা, বাঁধাইও বেশ ভাল।

রূপোপজীবিনী—(ছোট গল্পের বই) শ্রী শিবশঙ্কর রায় চৌধুরী। প্রাপ্তিস্থান, দি বুক কোম্পানি, কলেজ স্কোয়ার, এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স, ৯০।২এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বইখানি সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলিবার নাই। কয়েকটি গল্প বিদেশী গল্পের অনুবাদ, লেখক তাহা স্বীকার করিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। তবে কোন গল্পটি অনুবাদ এবং কোনটি মৌলিক তাহা বুঝিবার কোনই উপায় নাই। পড়িতে একরকম লাগে।

চিত্ররেখা—শ্রী সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাণীমন্দির, ঢাকা হইতে প্রকাশিত। দাম আট আনা। ১৩৩১।

সুধীবাবুর গল্প-সম্বন্ধে নতুন কিছুই বলিবার নাই। ছোট গল্পগুলি সুখপাঠ্য। গল্প পড়া শেষ হইয়া গেলেও যেন তাহার ঝঙ্কার শেষ হয় না।

বইখানির বাঁধাই, ছাপা অতি মনোহর। মলাটের পরিকল্পনাটিও সুন্দর। বইখানি দেখিলেই একবার হাতে করিতে ইচ্ছা করে।

মাছ ব্যাঙ সাপ—শ্রী জগদানন্দ রায়। ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ। দেড় টাকা। ১৩২৯।

বৈজ্ঞানিক ব্যাপার জগদানন্দ-বাবুর হাতে পড়িলে উপন্যাসের মত সরস এবং মনোমুগ্ধকর হইয়া পড়ে। বাঙ্গলা দেশে কঠিন বিজ্ঞানকে এমন শিশু-বৃদ্ধ-যুবাজনপ্রিয় আর কেহ করিয়াছেন কি না, জানি না। এই বইখানি কেবল শিশুদের নহে, সকলেরই পড়িতে ভাল লাগিবে এবং নতুন অনেক কিছু শিখাইবে। মাছ ব্যাঙ সাপ ছাড়াও ইহাতে আরো অনেক কিছুর কথা আছে। চিত্রবহুল হওয়ায় পুস্তকখানি বিশেষ সুখপাঠ্য হইয়াছে। আমাদের দেশে প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণ শিশুদের শিখান হয় না বলিলেই হয়। প্রায় সকল বিদ্যালয়ে ইহাকে সময় নষ্ট এবং অপ্রয়োজনীয় জ্ঞানে সাদরে বর্জ্জন করা হয়। এই পুস্তক-পাঠে আমাদের এবং আমাদের দেশের শিক্ষকদের সে ভ্রম দূর হইতে পারে। বিশেষ বিশেষ প্রাণীর শরীর গঠন এবং পরিচয় যে কিপ্রকার অদ্ভুত, তাহা জগদানন্দ বাবু অতি পরিষ্কার এবং উপকথার মত সরস করিয়া শিশুজগতের সাম্নে ধরিয়াছেন। শিশুজগৎ যদি এই পুস্তকপাঠে আনন্দ এবং জ্ঞান লাভ না করিতে পারে তবে তাহাদের মন্দভাগ্য বলিতে হইবে।

বইখানির ছাপা, কাগজ, বাঁধাই ইত্যাদি সবই সুন্দর। এককথায়, বইখানি সকলরকমেই মনোমুগ্ধকর হইয়াছে।

গ্রন্থকীট
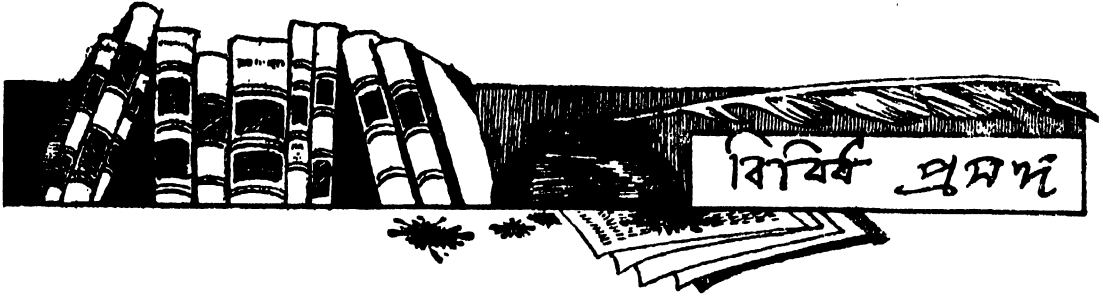
নিরপেক্ষতা অতি দুর্লভ

স্যার্ শঙ্করন্ নায়ারের বিরুদ্ধে পঞ্জাবের ভূতপূর্ব্ব লেফ্‌টেন্যান্ট্ গবর্ণর্ স্যার্ মাইকেল ও'ডোআইয়ার মানহানির ও তজ্জন্য ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমা করিয়াছিলেন। তাহাতে বিলাতী জজ্ স্যার্ শঙ্করনের বিরুদ্ধে রায় দিয়াছেন। রায়ের মধ্যে জজ বলিয়াছেন, জেনারেল্ ডায়ার যে অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগে গুলি চালাইয়াছিলেন, তাহা তিনি ঠিক্ই করিয়াছিলেন, যদিও তাঁহার বিবেচনার ভুল (এরার্ অব্ জজ্‌মেণ্ট্) হইয়া থাকিতে পারে, ইত্যাদি। এবিষয়ে আমাদের বক্তব্য পরে লিখিব। সম্প্রতি বলিতে চাই, এইরূপ রায়ে ইংরেজেরা সাধারণতঃ খুসি হইয়াছেন (দু-একজন হন নাই, তাহাও সত্য), এবং ভারতীয়েরা এবং তন্মধ্যে বাঙালীরা অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হইয়াছেন।

সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনে আর্নেষ্ট্ ডে নামক ইংরেজের হত্যাকারী গোপীনাথ সাহার স্বদেশ-হিতৈষিতা-মূলক উদ্দেশ্যের প্রশংসা করিয়া (এবং অহিংসা-নীতির সমর্থন করিয়া!) এক প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছে। এ-বিষয়েও পরে আমাদের বক্তব্য বলিব। আপাততঃ বলিতে চাই, যে, এইরূপ প্রস্তাব ধার্য্য হওয়ায় ইংরেজরা অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, এবং বাঙালীদের মধ্যে অন্ততঃ যাঁহারা এই প্রস্তাবের পক্ষে হাত তুলিয়াছিলেন, তাঁহারা সন্তুষ্ট ও উল্লসিত হইয়াছেন।

ইংরেজদের মধ্যে অনেকের মতে জেনার‍্যাল্ ডায়ারের উদ্দেশ্যও ভাল ছিল, এবং অতগুলা মানুষকে যে মারিয়া ফেলা হইয়াছিল, সেই কাজটাও ভাল হইয়াছিল। কিন্তু যে-সব ইংরেজ, যেমন লয়েড্ জর্জ্ প্রমুখ তাৎকালিক ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা, ডায়ারের কাজটার পুরা সমর্থন করেন নাই, তাহারাও তাহার অনেষ্টী অব্ পার্পাস্ অর্থাৎ সৎঅভিপ্রায়ের প্রশংসা করিয়াছিলেন। নায়ার-ও'ডোআইয়ার্ মোকদ্দমাতেও জজ মাক্‌কার্ডি ডায়ারের মহৎ উদ্দেশ্যের তারিফ করিয়াছেন। যে-সব ইংরেজ গোপীনাথ সাহার প্রশংসায় ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে সিরাজগঞ্জের অহিংসা-নীতির সমর্থক ও গোপীনাথ সাহার পূজকগণ বলিতে পারেন, "তোমাদের অনেক প্রধান লোক যেমন বলিয়াছেন, যে, ডায়ারের বিচারভ্রম হইয়া থাকিলেও তাহার অভিপ্রায় ভাল ছিল, আমরাও ত তেম্‌নি মিস্টার ডের হত্যার প্রশংসা করি নাই, গোপীনাথের উদ্দেশ্যেরই প্রশংসা করিয়াছি। অতএব তোমরা চট কেন?"

পক্ষান্তরে ইংরেজরা বলিতে পারেন, "তোমরা যেমন গোপীনাথ সাহার ভ্রম সত্ত্বেও তাহার সৎ উদ্দেশ্যের প্রশংসা করিতেছ, আমরাও তেম্‌নি, ডায়ারের বিবেচনার ভুল স্বীকার করিতে হইলেও, তাহার মহৎ অভিপ্রায়ের প্রশংসা করিতেছি। সুতরাং তোমরাই বা চট কেন?"

ডায়ার-পূজকদের মতে, ডায়ারের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা করা এবং তাহা মহৎ। সাহা-পূজকদের মতে, সাহার উদ্দেশ্য ছিল ভারতকে স্বাধীন করা এবং তাহা মহৎ। ডায়ার সভায় সমবেত লোক-দিগকে বিদ্রোহী সৈন্যদল মনে করিয়াছিল; তাহা ভ্রম। সাহা মিঃ ডেকে মিঃ টেগার্ট্ মনে করিয়াছিল, তাহা ভ্রম। উভয় পক্ষ নিজ নিজ পক্ষ সমর্থনার্থ ঐরূপ কথা বলিতে পারেন।

কিন্তু উভয় পক্ষই যে ভ্রান্ত, উভয় পক্ষই যে হত্যা-

কারীর কাজটার গর্হিতত্ব পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না, তাহা কোন পক্ষই ভাবিয়া দেখিতেছেন না ও বুঝিতে পারিতেছেন না। বিজাতিবিদ্বেষ এবং স্বজাতিবাৎসল্য উভয় পক্ষেরই মানস চক্ষুকে অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। এরূপ কথা বলায় কোন পক্ষই আমাদের উপর সন্তুষ্ট হইবেন না, জানি; কিন্তু মানুষকে যে-কোন-প্রকারে খুসি রাখাই সম্পাদকদের মুখ্য বা একমাত্র কর্ত্তব্য নহে। সুতরাং হক্‌কথা বাধ্য হইয়া বলিতে হয়।

—

মধ্যপ্রদেশে বাঙ্গালী

গত ৬ই বৈশাখ রায়পুরে মধ্যপ্রদেশবাসী বাঙালীদের সম্মিলনীতে শ্রীযুক্ত স্যার্ বিপিনকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের যে অভিভাষণ পঠিত হয়, তাহাতে তিনি তথাকার অনেক বাঙালীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছিলেন। বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর কথা প্রবাসীতেই প্রথম বিশেষভাবে লিখিত হইতে আরম্ভ হয়, এবং বাঙালী জাতির সম্যক্ বৃত্তান্ত জানিতে হইলে বঙ্গের বাহিরে তাহারা কি করিয়াছেন, তাহা জানা আবশ্যক। তাহা সর্ব্বসাধারণকে জানান প্রবাসীর অন্যতম উদ্দেশ্য। এই জন্য বসু মহাশয়ের অভিভাষণের কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। বসু মহাশয় বলেন :—

"আজ প্রায় ৫২ বৎসর হইল আমি এদেশে আসিয়াছি। আমি যখন এখানে আসি, তখন আমার নিতান্ত তরুণ বয়স। পৃথিবীর কর্ম্মক্ষেত্রে সেই আমার প্রথম পদার্পণ। আমি জব্বলপুরে প্রথম আসি। তখন সেখানে অনেকগুলি বাঙ্গালী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার এদেশে একরকম চিরস্থায়ী-রূপে বাস করিতেছিলেন। অনেক বাঙ্গালী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে সামাজিক বা রাজনৈতিক চর্চ্চা বলিয়া কোনরূপ কাজই ছিল না। ব্রাহ্ম সমাজের শাখার মতন একটি সভা ছিল। সেখানে প্রতি রবিবার কতকগুলি বাঙ্গালী মিলিয়া উপাসনা করিতেন। মনে হয় সে-দেশের ২।৪টি লোকও যোগ দিতেন; বহুদিন হইতে জব্বলপুর-বাসী সিংহপরিবারস্থ দ্বারকানাথ সিংহ মহাশয়ের যত্নে এই সভাটি স্থাপিত হয় ও প্রধানত তিনিই উপাসনা করিতেন।"

জব্বলপুর সম্বন্ধে তিনি আরও বলেন :—

"সেই সময়ে জব্বলপুরে একটি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় ছিল। জানিলাম সেটি একজন বাঙ্গালীর চেষ্টা ও উদ্যোগে স্থাপিত ও তিনিই তাহার সম্পাদক ও সর্ব্বরকমে পৃষ্ঠপোষক। তিনি সেদেশের লোকদের মত বেশ-ভূষা করিতেন ও সেদেশের লোকদের ভাষাতেই প্রধানত কথাবার্ত্তা করিতেন। সকলেই তাঁহাকে মান্য করিতেন ও ভালবাসিতেন। সুখের বিষয় তিনি এখনও জীবিত আছেন। সেদিন পর্য্যন্ত স্বহস্তস্থাপিত বিদ্যালয়টির সম্পাদকের কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন। এখন বোধ হয় বয়সাধিক্য- জনিত দুর্ব্বলতার জন্য অবসর লইয়াছেন। তাঁহার নাম শ্রী অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। জব্বলপুরে আসিয়া আমি তাঁহারই অতিথি হই। এদেশের লোকেদের সঙ্গে কিরূপে একপ্রাণ হইয়া কার্য্য করিতে হয়, তাঁহার নিকট প্রথম শিক্ষা পাই।

"সাগরে তখন অনেকগুলি বাঙ্গালী ছিলেন। এমন কি তাঁহাদের যত্নে আমাদের সকলকে একত্রীভূত করিবার ও দেশীয় ধর্ম্মভাব বজায় রাখিবার সুন্দর উপায় ৺দুর্গোৎসব মহাসমারোহে সম্পাদিত হইত। ইহাতে সেদেশের লোকেরা সকলে আসিয়া যোগ দিতেন।"

নাগপুরের সেকালের বাঙালীদের সম্বন্ধে বসু মহাশয় বলেন :—

"নাগপুরে যখন আসি, তখন এখানে বাঙ্গালীর সংখ্যা খুব অল্প। যতদূর স্মরণ হয় ৫টি বা ৬টি পরিবার মাত্র ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে তিনজন ডাক্তার। সেই সময় এখানে একটি মেডিক্যাল-স্কুল ছিল—অল্পদিন পরে উহা উঠিয়া যায় ও আবার কয়েক বৎসর হইল পুনরায় গঠিত হইয়াছে। সেই মেডিক্যাল-স্কুলে তাঁহারা শিক্ষক ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজনের নাম করিতেছি ৺ যাদবকৃষ্ণ ঘোষ। তিনি সে-সময় এই সহরের প্রথম চিকিৎসক ছিলেন। বড় বড় সর্‌কারী কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত নিজেদের জন্য এমন কি নিজেদের পরিবারের জন্যও সিবিল-সার্জ্জনকে ছাড়িয়া তাঁহারই চিকিৎসা পছন্দ করিতেন। তাঁহাকে এ-দেশবাসী লোকেরাও বিশেষ মান্য করিতেন।"

অতঃপর বসু মহাশয় আরও কয়েকজন বাঙালীর বিষয়ে কিছু বলেন :—

"নবীনচন্দ্র বসু একজন এক্স্‌ট্রা আসিষ্ট্যাণ্ট্ কমিশনার ছিলেন—রায়পুরে তিনি কয়েক বৎসর কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি পুরাকালের হিন্দু-কলেজের লব্ধপ্রতিষ্ঠ জনৈক ছাত্র। স্যার্ রিচার্ড্ টেম্পল্ তাঁহাকে এই দেশে আনেন। তিনি খুব দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য করেন। তাঁহার প্রতিভার একটি গল্প বলি। তিনি একটি জটিল খুনি-মকদ্দমা করিতেছিলেন। একজন বড় দাম্ভিক সিবিলসার্জ্জন সাক্ষ্য দিতে আসেন। তিনি বড় বড় লম্বা লম্বা বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্দ দিয়া সাক্ষ্য দিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ধারণা নবীনবাবু তাহার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝিবেন না ও তাঁহাকে যেদিকে ইচ্ছা লইয়া যাইবেন। নবীনবাবু নীরবে তাঁহার এজাহার লইতে লাগিলেন। সিবিল সার্জ্জন মহাশয় সাক্ষ্য দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে নবীনবাবু তাঁহাকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিলেন। দুই-একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, এই বলিয়া জেরা আরম্ভ করিলেন। ১০।১৫ মিনিট পরেই সাহেব বুঝিলেন, যে, তিনি একজন অস্ত্রচিকিৎসা শাস্ত্রে বিশেষ বিশারদ লোকের হাতে পড়িয়াছেন। পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলেন অধিকাংশ ভুল স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন ও ক্ষুণ্ণমনে ঘরে ফিরিলেন। লোকেরা দেখিয়া অবাক্। নবীনবাবু তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সময়ে সময়ে সংঘর্ষণ হইত—কিছুদিন পরে অবসর গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

"তারাদাস ও ভূতনাথের নাম আপনারা অনেকেই জানিয়া থাকিবেন। তাঁহারা এদেশের লোকদের উন্নতি-সাধনকল্পে অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন। তারাদাস বাবু ডিষ্ট্রিক্ট্ কৌন্সিলের সভাপতি ছিলেন ও ভূতনাথ বাবু মিউনিসিপ্যালিটির সম্পাদক ছিলেন। উভয়েই দক্ষতার সহিত নিজ নিজ কার্য্য অনেক দিন করেন। উভয়ের মৃত্যু রায়পুরেই হয়। তারাদাস বাবুর নাম এখনও গ্রামে গ্রামে সজীব হইয়া আছে।"

বঙ্গের বাহিরে বাঙালীরা সাধারণতঃ ওকালতী, ডাক্তারী, ও সরকারী চাকরীতে নাম করেন। কিন্তু মধ্যপ্রদেশে অন্যক্ষেত্রেও বাঙালীর কিছু কৃতিত্ব আছে।

"আজ যে রাজনন্দগাঁও সহরে বিশাল মিল্ দেখিতে পান, তাহার ভিত্তি রায়পুরের একজন বাঙ্গালী স্থাপন করেন—নাম কেদারনাথ বাগচী।"

অতঃপর বসু মহাশয় শিক্ষাকার্য্যে প্রসিদ্ধ দুই ব্যক্তির উল্লেখ করেন।

"জব্বলপুরের কথা পূর্ব্বে কিছু বলিয়াছি। আর একজনের কথা বলিব। কৈলাসচন্দ্র দত্ত সেখানকার কলেজের (এখন যাহা রবার্টসন্ কলেজ নামে খ্যাত) সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি যখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন আমি সেই সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িতাম। আমাদের দুই জনের জানাশুনা ছিল। তাহার পর যখন তিনি এদেশে আসিলেন তখন পূর্ব্ব পরিচয় বর্দ্ধিত হইল। তিনি যেরূপ সুযোগ্য অধ্যাপক, তেম্নি কোমলস্বভাব, অমায়িক, ও সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন। ছাত্রেরা তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভালবাসিত ও ভক্তি করিত। তাঁহার অনেক ছাত্র এখন সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত। নাগপুরের বিখ্যাত স্বদেশপ্রেমিক প্রতিভাপূর্ণকর্ম্মী আমার হৃদয়ের বন্ধু ও সকল লোকহিতকার্য্যে সহযোগী পরলোকগত বাপুরাও-দাদা তাঁহার জনৈক ছাত্র ছিলেন। তিনি কৈলাসবাবুর সম্বন্ধে একটি হাস্যজনক কথা আমাকে বলিয়াছিলেন। আমরা বাঙ্গালী সংস্কৃত ভাষা যথাবিধি উচ্চারণ করিতে বড় একটা জানি না। কৈলাসবাবু যখন প্রথম আসেন, তখন তাঁহার বাঙ্গালী-সুলভ সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণ তাঁহার ছাত্রেরা বড় একটা বুঝিতে পারিত না। সকলে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত। ইহার রহস্য বুঝিতে তাঁহার কিছু দিন লাগিয়াছিল। তিনি পেন্‌শন্ লইয়া জব্বলপুরে স্থায়ী হইয়াছিলেন। যখন ১৮৯৮ সালে সেই সময়ের দুর্ভিক্ষ কমিশনের সঙ্গে জব্বলপুরে যাই তখন তাঁহার সহিত দেখা হয়। তখনও তিনি জব্বলপুরের সকল লোক-হিতকর কার্য্যে যোগ দিতেন। এখন তিনি স্বর্গে।"

কৈলাসচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের রঘুবংশের সটীক সংস্করণ আমরা ছাত্রাবস্থায় দেখিয়াছিলাম। উহা ছেলে পাস্ করাইবার নোট্-বুকরূপী পয়সাধরা ফাঁদ ছিল না। উহাতে তাঁহার পাণ্ডিত্য এবং সংস্কৃত রীতিতে সংস্কৃত রচনার ক্ষমতার পরিচয় ছিল।

"১৮৮৫ সালে এখানে এদেশের লোকদের উদ্যোগে একটি সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ স্থাপিত হয়। মধ্যপ্রদেশে সেই প্রথম কলেজ। তাহা এখন সরকারী মরিস্ কলেজ নামে খ্যাত। তখন এপ্রদেশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিপত্যের অন্তর্গত ও প্রধানতঃ সেইজন্যই নবগঠিত কলেজের জন্য তিনটি বাঙ্গালী প্রোফেসর আনা হয়। তাঁহাদের মধ্যে এক জনের নাম আপনাদের নিকট উল্লেখ করিব। তিনি আজ জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত—ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। তখন তাঁহার অল্প বয়স, সেই কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি খ্যাতনামা খৃষ্টীয় মিশনারি হেষ্টী সাহেবের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। হেষ্টী সাহেব তাঁহাকে একখানি সার্টিফিকেট্ দেন। তাহাতে বলিয়াছিলেন, যে, একদিন ব্রজেন্দ্র শীলের পাণ্ডিত্যের যশে ভারত কেন ইউরোপ পর্য্যন্ত ভরিয়া যাইবে। তাহাই হইয়াছে। ব্রজেন্দ্র শীল মরিস্ কলেজে বেশী দিন ছিলেন না। কিন্তু সেই অল্প কালের মধ্যে নাগপুরের ছাত্রজগতে এরূপ প্রিয় হইয়াছিলেন, যে, বোধ হয় আজ পর্য্যন্ত কোন অধ্যাপক সেরূপ হইতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। বিদ্যাতে বল, বিনয়ে বল, কোমল স্বভাব বল, তিনি তাঁহার ছাত্রদিগকে মায়াজালে বাঁধিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বোধ হয় আপনারা জানেন, যে, তিনি এখন উন্নতিশীল দেশীয় করদ রাজ্য মহিশূরের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার। ইহা বাঙ্গালীর সামান্য গৌরবের বিষয় নয়।"

অতঃপর যাঁহার নাম উল্লিখিত হয়,

"তিনি 'আলালের ঘরের দুলাল' নামক সেই সময়ের বাঙ্গালা সাহিত্য-জগতের একটি রত্ন-স্বরূপ পুস্তকের লেখক প্যারিচাঁদ মিত্র মহাশয়ের পৌত্র জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র। তিনি বিদর্ভ (বেরার) হইতে নাগপুরে আসেন। নিজের প্রতিভা-প্রভাবে তিনি শীঘ্রই এখানকার বারে শীর্ষস্থান অধিকার করেন। পরে এখানকার হাই-কোর্টের জনৈক জজ্ হন। তিনি কয়েক বৎসর মাত্র একাজ করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি যেরূপ ন্যায়পরায়ণ ও আইনজ্ঞ বিচারপতি বলিয়া যশ রাখিয়া গিয়াছেন, এরূপ ইদানীং অন্য কোন জজ্ করিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। অল্প দিনের জন্য প্রধান জজের কাজ করিয়াছিলেন। আমি বিশ্বস্ত সূত্রে জানিয়াছি, আজ তিনি থাকিলে স্থায়ী প্রধান জজ্ হইতেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে সকল সম্প্রদায়ের লোক শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন।"

জ্যোতিষচন্দ্র কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে আমাদের সহপাঠী ছিলেন।

মধ্যপ্রদেশে সরকারী হিসাব-বিভাগেও বাঙ্গালীর কৃতিত্ব আছে।

"যখন বেরার এদেশের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন এখানকার একাউণ্ট্যান্ট্ জেনারাল ছিলেন একজন বাঙ্গালী। তিনি পূজ্যপাদ আচার্য্য ও সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিত মহেশ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহার নাম মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য। দুইটি ভিন্ন রাজ্য—তাহার মধ্যে একটি আবার দেশীয় রাজ্যভুক্ত বলিয়া সকল বিষয়ে অনুন্নত—সম্মিলিত হওয়াতে হিসাবের কাজ জটিল হইয়া পড়ে। তাহার সুচারু ব্যবস্থা করিবার ভার একাউণ্ট্যান্ট্ জেনারেলের হস্তে ন্যস্ত হয়। আমি বড় বড় ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদের মুখে শুনিয়াছি যে, ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই গুরুতর কার্য্যটি অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন করেন। সকলেই তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হন।

"একাউণ্ট্যান্ট-জেনারালের কাজটা বড়ই অপ্রীতিকর। অফিসরদের বিল পরীক্ষা করা ও কাটাকুটি করা তাঁহার দৈনিক কর্ম্মের মধ্যে একটা বিশেষ কাজ। মন্মথ বাবু কাহাকেও রেয়াৎ করিতেন না। অথচ এরূপভাবে কাজটি করিতেন যে কাহারও তিনি বিরাগভাজন হন নাই। বিনয়গুণে সকলকে বশীভূত করিয়াছিলেন। ইহাও আমি বড় বড় অফিসরদের মুখে শুনিয়াছি। তিনি এখান হইতে লাহোর যান ও সেইখানে হঠাৎ তাঁহার কাল হয়। তিনি চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কৃত হিসাব-কার্য্য-বিধি এখনও চলিতেছে।"

সর্ব্বশেষে যাঁহার বিষয়ে কিছু বলা হয়;

"তিনি ছিলেন ইঞ্জিনীয়ার। ১৮৯৯-১৯০০ সালে এখানে অভূতপূর্ব্ব বর্ষব্যাপী নিদারুণ দুর্ভিক্ষ হয়। বৃষ্টির নামও ছিল না। শস্য মোটেই হয় নাই। যাহা কিছু কোন কোন স্থানে হইয়াছিল, প্রচণ্ড সূর্য্যের তাপে জ্বলিয়া নষ্ট হইয়া যায়। চারিদিকে একেবারে হাহাকার পড়িয়া

যায়। সেই সময় স্যার্ এণ্ড্ ফ্রেজার চীফ্ কমিশনার ছিলেন, ও তাঁহার পূর্ত্তবিভাগের আণ্ডার্-সেক্রেটারী রাজেশ্বর মিত্র ছিলেন। ফ্রেজার সাহেব অসাধারণ উদারতার সহিত দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদের রক্ষার জন্ম বিপুল আয়োজন করেন। সেই বন্দোবস্তের সুফল শীঘ্রই দেখা দিয়াছিল। মৃত্যুসংখ্যা সাধারণ সময় অপেক্ষা অতি সামান্তই বাড়িয়াছিল। আমি তখন সেণ্ট্রাল চ্যারিটেব্‌ল্ রিলীফ্ কমিটির মেম্বর ছিলাম; রেভিনিউ মেম্বরও একজন মেম্বর ছিলেন। তিনি আমাকে ও ফ্রেজার সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া একদিন বলিয়াছিলেন, যে, এরূপ বাহুল্যের সহিত সাহায্যদান কার্য্য বিস্তার করিলে রাজভাণ্ডার শীঘ্রই শূন্য হইবে। আমি তাহার উত্তর দিয়াছিলাম, যে, কাবুল যুদ্ধে লোক-বিনাশ জন্ম ভারতের কোটি কোটি টাকা অকাতরে খরচ হইয়াছে! তাহাতে রাজকোষ শূন্য হয় নাই। আর যাহাদের টাকাতে রাজকোষ পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহাদের আসন্ন বিপদে প্রাণ রক্ষার জন্য যদি একটু বদান্যতা দেখান হয়, তাহা হইলে কি বড় দোষের বিষয় হইল? আজিকার প্রসঙ্গের সহিত এই কথাবার্ত্তার কোন বিশেষ সংশ্রব নাই। তবে ফ্রেজার সাহেবের বন্দোবস্ত কিরূপ উদারভাবে করা হইয়াছিল, তাহা ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে। আর এই বন্দোবস্তে মিত্র মহাশয় ফ্রেজার সাহেবের একজন দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি, দিন নাই, রাত্রি নাই, কিরূপ অবিশ্রান্তভাবে পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহার অনেকটা আভাস আমি পাইয়াছিলাম। কারণ, দুর্ভিক্ষ-নিবারণ-কল্পে খয়রাতী সাহায্যের সঙ্গে আমার কিছু সংশ্রব ছিল। আমার সঙ্গে ফ্রেজার সাহেবের ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি তাঁহার আণ্ডার্-সেক্রেটারী কিরূপ দক্ষতার সহিত একান্তমনে অকাতরে দুর্ভিক্ষ নিবারণ ব্যবস্থাতে তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট কয়েকবার প্রকাশ করিয়াছিলেন।"

বসু মহাশয় মধ্যপ্রদেশবাসী বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে সাধারণভাবে যে নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহাতে বাঙ্গালীমাত্রেই তৃপ্ত হইবেন।

"এমন জেলা অতি বিরল যেখানে দুই চারি জন বাঙ্গালী নাই। আর যাঁহারা আছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেককে এদেশের লোকদের সঙ্গে একপ্রাণ হইয়া দেশের মঙ্গল কার্য্যে যোগ দিতে দেখা যায়। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহারা এখনও জীবিত আছেন, সেজন্য তাঁহাদের নাম দেওয়া বিধেয় মনে করি না। আপনারা অনেকেই তাঁহাদের জানেন ও কেহ কেহ এই সভায় উপস্থিত আছেন। ও তাঁহারা কি কি কাজ করিয়াছেন, তাহাও আপনাদের অবিদিত নাই। সে জন্য বলিবারও প্রয়োজন নাই। তবে এতটুকু বলা অন্যায় মনে করি না, যে, যিনি যেখানেই আছেন, নিজ নিজ শক্তি ও সুবিধা অনুযায়ী লোক-কল্যাণকর কার্য্যে যোগ দিয়া বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিতেছেন ও বাঙ্গালী যে কেবল নিজ জাতির ও নিজ দেশের মঙ্গলের জন্য ব্যস্ত, এরূপ বলিবার পথ রাখিতেছেন না। জন্ম বটে তাঁহাদের বাঙ্গালায় কিন্তু নিখিল ভারত তাঁহাদের দেশ ও সাধারণ ভারতের মঙ্গল তাঁহাদের মূল মন্ত্র।"

—

বাঁকুড়ায় অগ্নিকাণ্ড

গত ২০শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে বাঁকুড়া সহরের "নূতন চটী" নামক পল্লীতে আগুন লাগিয়া ৭৯ (উনআশি) খানা বাড়ী পুড়িয়া গিয়াছে। জলের অভাবে এবং অতি ভয়ানক রোদের তাতে কেহ কিছু করিতে পারে নাই। জিনিষ-পত্রসহ সমুদয় ঘরবাড়ী ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। ঐ পল্লীর এরূপ সর্ব্বনাশ আর কখনও হয় নাই। নিরাশ্রয় বিপন্ন লোকদের এখন রৌদ্রে, অন্নাভাবে, ও অন্য নানা অভাবে কষ্টের অবধি নাই। সম্মুখে বর্ষা। তখন আবার বারিপাতে অন্যবিধ দুঃখ তাহাদিগকে ভোগ করিতে হইবে। অতএব শীঘ্র বিপন্ন লোকগুলির, বিশেষতঃ শিশু ও স্ত্রীলোকগুলির, মাথা রাখিবার জায়গা করিয়া দেওয়া ও কিছু দিনের জন্য তাহাদের অন্নবস্ত্রের বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া একান্ত আবশ্যক। এইজন্য আমরা সর্ব্বসাধারণের দ্বারস্থ হইতেছি। যিনি যাহা দিবেন, বাবু সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত, স্কুলডাঙা, বাঁকুড়া, এই ঠিকানায় পাঠাইলে, তাহার নিশ্চিত সদ্ব্যয় হইবে জানিবেন।

—

স্যার্ শঙ্করন্ নায়ারের শাস্তি

স্যার্ শঙ্করন্ নায়ার্ ইংরেজীতে "গান্ধি ও অরাজকতা" নামক একখানা বহি লেখেন। তাহাতে মহাত্মা গান্ধীর খুব কড়া সমালোচনা ও নিন্দা ছিল। গবর্ণমেণ্ট ঐ পুস্তক লিখিবার কিছু উপকরণ জোগাইয়াছিলেন, এবং প্রথম সংস্করণের বহিও অনেকখণ্ড কিনিয়াছিলেন। এই হিসাবে তাঁহাকে সর্‌কারের খয়েরখাঁ এবং বহি-খানাকে আধাসর্‌কারী বলা চলে। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, উহাতে স্যার্ মাইকেল্ ওডোআইয়ারের আমলে পঞ্জাবে ভীষণ অত্যাচারের ও বিভীষিকার বর্ণনা ও নিন্দা ছিল। তাহার জন্য স্যার্ মাইকেল বিলাতে তাঁহার নামে মানহানির নালিশ ও ক্ষতিপূরণের দাবী করেন। ম্যাক্‌কার্ডি নামক এক জজের নিকট বিচার হয়।

বিচারের বৃত্তান্ত রয়টারের তারের খবরে সংক্ষেপে জানা যাইতেছিল। যখন জজের রায় বাহির হয় নাই, কেবল সাক্ষ্য-গ্রহণ এবং উভয় পক্ষের কৌঁসুলীর বাদানুবাদ চলিতেছিল, তখনই অনুমান করিতে পারা গিয়াছিল, যে, স্যার্ মাইকেলের জিত হইবে। কারণ, জজ্ বরাবরই বাদী-পক্ষের দিকে ঝোঁক্ দিয়া এমন সব প্রশ্ন ও মন্তব্য করিতেছিলেন, যে, যদি জজ ও উভয় পক্ষের কৌঁসুলীর;

নাম বাদ দিয়া তাহার জায়গায় "ক", "খ", "গ" লিখিয়া দিয়া, কাহাকেও জিজ্ঞাসা করা যাইত, "বল ত, কোন্ কথাগুলি জজের এবং কোন্ কথাগুলি স্যার্ মাইকেলের ব্যারিষ্টারের," তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি জজ্ ম্যাক্‌কার্ডির কোন কোন কথাকে বাদী-পক্ষের ব্যারিষ্টারের কথা মনে করিতেন। বস্তুতঃ এই বিচারে বরাবরই জজ্ বাদীর পক্ষে এরূপ টান দেখাইয়াছেন, যে, ভারতীয়দের স্বার্থবিরোধী এংলো-ইণ্ডিয়ান্ ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্ ও পাইয়োনীয়ার কাগজ দুখানাও একথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে, এবং বলিয়াছে, যে, এই কারণে দেশী লোকমতের উপর জজের রায়ের যথোচিত প্রভাব অনুভূত হইবে না।

জজ্ রায় দিয়াছেন, যে, স্যার্ শঙ্করন্ নায়ারকে ৫০০ পাউণ্ড্ (৭৫০০ টাকা) খেশারৎ দিতে হইবে, এবং স্যার্ মাইকেলের মোকদ্দমার খরচ প্রায় ২০,০০০ পাউণ্ড (৩ লক্ষ টাকা)ও তাঁহাকে দিতে হইবে। তা ছাড়া তাঁহার নিজের খরচও বিস্তর হইয়াছে। সম্ভবতঃ তাহা তিন লক্ষ টাকা অপেক্ষা অধিক হইয়াছে। কারণ, সাক্ষ্যসংগ্রহের জন্য ও'ডোআইয়ারের পক্ষে সরকারী লোক খাটিয়াছিল, স্যার্ শঙ্করন্ সেরূপ কোন সাহায্য পান নাই। অতএব, বলিতে গেলে স্যার্ শঙ্করনের প্রায় সাতলক্ষ টাকা গর্দণ্ড হইল; তা ছাড়া সময় ও শক্তি নাশ এবং উদ্বেগ-ভোগ আছে।

কি ভারতে, কি বিলাতে, ভারতীয় ও ইংরেজে এইরূপ মোকদ্দমা হইলে ভারতীয়ের জয়লাভ হওয়া দুর্ঘট; অসম্ভব বলিলেও চলে। টিলক জিতিতে পারেন নাই। মিসেস্ বেসান্ট ভারতীয় না হইলেও ভারতীয় পক্ষে লড়িয়াছিলেন বলিয়া একখানা স্কচ কাগজ তাঁহার কুৎসা করে। কিন্তু তিনিও উহার নামে মোকদ্দমা করিয়া হারিয়া যান। এই জন্য ইহা অনুমিত হইয়াছিল, যে, স্যার্ শঙ্করন্‌ও হারিবেন। কিন্তু তিনি মোকদ্দমা করেন নাই, অন্যে তাঁহার নামে নালিশ করায় তাঁহাকে অগত্যা আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহাকে বেকুব বলা যায় না।

জজ্ ম্যাক্‌কার্ডির যুক্তিগুলি চমৎকার। একটা দৃষ্টান্ত দিই। জজ বলেন, "পঞ্জাবের দুইশত খবরের কাগজের কোনটাতেই সৈন্যসংগ্রহার্থ অত্যাচার জনিত বিভীষিকা সম্বন্ধে একটি কথাও লেখা হয় নাই।...... ইহার ব্যাখ্যা কি ইহাই নহে, যে, বিরল দু-একটা অন্যায় কাজ ছাড়া, কোন অত্যাচারই হয় নাই?" পঞ্জাবের কোন খবরের কাগজে, ভয় প্রদর্শনদ্বারা সিপাহীসংগ্রহ সম্বন্ধে কোন কথাই বাহির হয় নাই, ইহা সত্য কি না জানি না। কিন্তু যদি সত্য হয়, তাহা হইলে জজ্ যাহা মনে করেন, তাহার বিপরীত কথাই তাহার দ্বারা প্রমাণিত হয়। ইহাই প্রমাণিত হয়, যে, অত্যাচারের ও তজ্জনিত আতঙ্কের মাত্রা এত বেশী হইয়াছিল, যে, কেহ প্রকাশ্যভাবে কিছু লিখিতে সাহস করে নাই। অত্যাচারের কথা বিলাত পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল, ট্রুথ কাগজে তাহা বাহির হইয়াছিল। হাণ্টার্ কমিশনের নিকট সাক্ষ্যেও তাহা বাহির হইয়াছিল।

জজ্ জেনার্যাল্ ডায়ারের জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহাকে নির্দোষ বলিয়াছেন। বিলাতের টাইম্‌স্ কাগজ পর্য্যন্ত জজের এই মন্তব্যপ্রকাশ অপ্রাসঙ্গিক বলিয়াছেন। বাস্তবিকও ডায়ার দোষী কি নির্দোষ, তাহা মোটেই প্রধান বা অন্যতম বিচার্য্য বিষয় ছিল না। সুতরাং তাৎকালিক ভারতসচিব ডায়ারকে অন্যায়রূপে দণ্ড দিয়াছিলেন, জজের পক্ষে এই কথা বলা, নিভান্ত ভারতসচিবের বিরুদ্ধে পায়ের ঝাল ঝাড়ার মতই দেখাইতেছে। হাণ্টার্ কমিশন্, আর্মী কৌন্সিল ও ব্রিটিশ গবর্ণ্‌মেণ্ট্ কর্ত্তৃক বহু অনুসন্ধান ও সাক্ষ্য গ্রহণের পর, তাঁহাদের স্বজাতীয় লোক জেনার্যাল্ ডায়ারকে ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষ অল্পপরিমাণে দোষী সাব্যস্ত করেন। এতদিন পরে, অন্য লোকের মোকদ্দমা উপলক্ষ্যে কিছু সাক্ষ্য লইয়া, জজ নিজের দেশের গবর্ণমেণ্টের উপর বিচারক সাজিয়া ডায়ারকে নির্দোষ এবং গবর্ণ্‌মেণ্ট্‌কে দোষী স্থির করিলেন, এই দৃষ্টান্তে নিশ্চয়ই গবর্ণ্‌মেণ্টের প্রতিপত্তি খুবই বাড়িবে!

আর্মী কৌন্সিলের নিকট ডায়ারের সাক্ষ্য হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া জজ্ বলেন, ডায়ার্ জালিয়ানওয়ালা-বাগে মনে করিয়াছিলেন, যে, তাঁহার সাম্‌নে একটা

বিদ্রোহী সৈন্যদল রহিয়াছে, এবং যদি ঐ সৈনদলকে সে পিষিয়া না ফেলিত, তাহা হইলে একটা দুর্দম্য উচ্ছৃঙ্খল জনতার হাঙ্গামার ফলে ইউরোপীয় অধিবাসীরা নিহত এবং গবর্ণ্মেণ্ট অবজ্ঞাত হইত। বৈশাখী মেলা উপলক্ষে সেদিন অমৃতসরে বাহিরের গ্রাম্য অনেক লোকেরও সমাগম হইয়াছিল। ইহাদের অনেকেও জালিয়ানওয়ালাবাগের সভার ভীড় বাড়াইয়াছিল। সকলেই জানেন, জালিয়ানওয়ালাবাগে বিদ্রোহী সৈন্য দল ছিল না। যে-ব্যক্তি অস্ত্রহীন কতকগুলা স্ত্রীলোক ও পুরুষের, শিশু যুবা প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের, জনতাকে সত্য-সত্যই বিদ্রোহী সৈন্যদল মনে করিতে পারে, সে হয় পাগল, নয় গাধা। এরূপ পাগল বা গাধাকে ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ কেন সেনাপতি করিয়াছিলেন, তাহারই কৈফিয়ৎ প্রয়োজন। কিন্তু ডায়ার হাণ্টার্ কমিশনের সম্মুখে যাহা বলিয়াছিল, তাহা হইতে স্যার্ মাইকেলের মতেও তাহার কাজের সমর্থন করা যায় না। জজ ম্যাক্‌কর্ডি বলেন, আর্মী কৌন্সিলের সম্মুখে সাক্ষ্য দিবার সময় ডায়ার এমন অনেক অবস্থার বিষয় বলে, যাহা হাণ্টার্ কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্য দিবার সময় তাহার মনে ছিল না। ইহা খুব ঠিক্ কথা! আর্মী কৌন্সিলের সমক্ষে সাক্ষ্য দিবার সময় ডায়ার যে-সব কথা বানাইয়া বলিয়াছিল, হাণ্টার্ কমিশনের কাছে তাহা বলে নাই! পূর্ব্বাপর তাহার সব কথা পড়িলেই বুঝা যায়, যে, প্রথমে সে কতকগুলা কালা আদমীকে গুলি করিয়া ভয় পায় নাই, সুতরাং সত্য কথা বলিয়াছিল। তাহার পর যখন ভয়ের উদ্রেক হয়, তখন সে মিথ্যা কথা বলে। লোকটা গোঁয়ার ও নিষ্ঠুর, এবং মিথ্যাবাদীও বটে। ইহাকেই জজ ম্যাক্‌কার্ডি ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রক্ষাকর্ত্তার মত খাড়া করিয়া বলিতেছেন, "যদি জেনার‍্যাল্ ডায়ারের অধীনস্থ সিপাহীদলকে বিদ্রোহীরা নির্ম্মূল করিয়া ফেলিত, তাহা হইলে তাহার ফল ভীষণ হইত।...... গুরুতর বিপদের আশঙ্কা হইলে প্রতিকারও গুরুতররকমের হওয়া চাই। ......অসাধারণরকম গুরুতর অবস্থায় জেনার‍্যাল্ ডায়ার ঠিক্ কাজ করিয়াছিলেন, এবং ভারতসচিব তাঁহাকে বেঠিক্‌রকমে দণ্ড দিয়াছিলেন।"

জজ্ ম্যাক্‌কার্ডির মত পক্ষপাতী লোক বিচারাসনের উপযুক্ত নহেন।

সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের অধিবেশনের পূর্ব্বে যদি তাঁহার রায় বাহির হইত, তাহা হইলে অনেকেরই মনে হইত, যে, ঐ রায় পড়িয়া উত্তেজনায় মতিভ্রান্ত হইয়া কোন কোন প্রতিনিধি গোপীনাথ সাহার প্রশংসাসূচক প্রস্তাব সম্মিলনের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছিলেন এবং অন্য অনেকে ঐরূপ প্রভাবেরই বশবর্ত্তী হইয়া তাহাতে সায় দিয়াছিলেন। উত্তেজনার সময় এইরূপ বিপথচালক ভাব মনের মধ্যে আসা বিচিত্র নহে, যে, "যদি তোমাদের একজন বৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ সেনাপতি কতকগুলি নিরপরাধ ও নিরস্ত্র ভারতীয় লোককে অপ্রমত্তভাবে বিমৃশ্যকারিতা সহকারে গুলি করিয়া মারিলে প্রশংসার্হ হয়, তাহা হইলে একজন তরলমতি বিপথগামী ভারতীয় বালক একজন নিরপরাধ ইউরোপীয়কে খুন করিলে তাহারও প্রশংসা হইতে পারে।" কিন্তু সিরাজগঞ্জের গর্হিত ও শোচনীয় প্রস্তাবটি জজ ম্যাক্‌কার্ডির রায় বাহির হইবার কয়েকদিন পূর্ব্বে সম্মিলনের সমক্ষে উপস্থাপিত ও অধিকাংশের মতে তৎকর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল।

—

গোপীনাথ সাহার সম্বর্দ্ধনা

সিরাজগঞ্জে গোপীনাথ সাহার সম্বর্দ্ধনা ঠাণ্ডা মেজাজেই করা হইয়াছিল। তদ্বিষয়ক প্রস্তাবের অব্যবহিত বা কিছু পূর্ব্বে শঙ্করন্ নায়ারের মোকদ্দমা প্রসঙ্গে পূর্ব্বে উল্লিখিত জাতিবিদ্বেষজনক কোনপ্রকার উত্তেজনার কারণ ঘটে নাই। কি কারণে এই প্রস্তাবটি সভায় উপস্থাপিত হয়, তাহা বলিতে পারি না। গোপীনাথ সাহা কর্ত্তৃক আর্নেষ্টডের হত্যার পর ইউরোপীয় সভার যে অধিবেশন হয়, তাহাতে কোন বাঙালী নেতার নাম করিয়া বলা হয়, "অমুক ব্যক্তি এই হত্যার জন্য কোন দুঃখ প্রকাশ করেন নাই।" হইতে পারে, যে, এই প্রস্তাব পরোক্ষভাবে তাহারই স্পর্দ্ধিত জবাব। অথবা ইহাও হইতে পারে, যে, মহাত্মা গান্ধী বঙ্গের হিন্দুমুসলমান চুক্তির সমর্থন না

করিয়া তাহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পন্থার বর্জ্জনকারী ব্যতিরেকে অন্য কাহারও কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিগুলির সভ্য থাকা উচিত নহে, এইরূপ মত ঘোষণা করিয়াছেন, বলিয়া, তাঁহার অহিংসা নীতিকে ভ্যাংচাইবার জন্য এই প্রস্তাব উপস্থাপিত ও গৃহীত হইয়াছিল কিন্তু ঠিক্ কারণ যে কি, তাহা বলিতে আমরা অক্ষম।

এক্ষণে প্রস্তাবটি সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু তাহা বলিতে গেলেই প্রথম বিঘ্ন এই উপস্থিত হয়, যে, প্রস্তাবটি যে কি, তাহাই নির্ণয় করা কঠিন। স্বরাজ্য-দলের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় কর্ত্তৃক পরিচালিত "সারথি" কাগজের ২২শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের সংখ্যায় ছাপা হইয়াছে :—

"শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাব করেন, যে, কংগ্রেসের অহিংস নীতিতে বিশ্বাস রাখিয়া এই সম্মিলনী গোপীনাথের মহৎ উদ্দেশ্যকে সম্বর্দ্ধিত করিতেছে।"

কিন্তু স্বরাজ্যদলের ইংরেজী দৈনিক ফর্‌ওয়ার্ডের ৭ই জুনের সংখ্যায় মিস্টার সি আর্ দাশ লিখিতেছেন :—

I would translate the resolution in question in the following way :

"This Conference while denouncing (or dissociating itself from) violence (every kind of *himsa*) and adhering to the principle of non-violence, appreciates Gopinath Saha's ideal of self-sacrifice, misguided though that is in respect of the best interests of the country, and expresses its respect for his self-sacrifice."

কিন্তু তিনি যে বাংলা প্রস্তাবটির অনুবাদ দিয়াছেন, তাহার মূল বাংলা পাঠটি তিনি দেন নাই। বাংলাটি কি এবং তাহা কোথায় কবে কোন্ বাংলা কাগজে বাহির হইয়াছিল? মূল বাংলাটি না পাইলে আমরা কেমন করিয়া তাঁহার অনুবাদের বিচার করিব? বাংলাদেশে কংগ্রেসের প্রাদেশিক সেক্রেটারী এবং স্বরাজ্যদলের অন্যতম নেতা অনিলবরণ-বাবুর কাগজে প্রস্তাবটি যে ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার অনুবাদ করিলে তাহা মিস্টার সি আর্ দাশের অনুবাদের সঙ্গে মোটেই মিলে না। অনিলবরণ-বাবু গোপীনাথ সাহার প্রশংসাসূচক প্রস্তাব গৃহীত হইবার সময় সম্মিলনী-মণ্ডপে উপস্থিত ছিলেন শুনিয়াছি; তিনি প্রস্তাবটির ভুল পাঠ লিখিয়াছেন, ইহা সম্ভব বোধ হইতেছে না। অধিকন্তু, সমালোচিত হইবার পর কেহ কিছু বলিলে অথচ তাহার সন্তোষজনক কোন প্রমাণ না দিলে, লোকের সে কথায় আস্থা না হইতে পারে। এই জন্য মিঃ দাশ মূল বাংলা প্রস্তাবটির পাঠ ছাপিলে ও তাহা কোন্ কাগজে কোন্ তারিখে ঠিক্ ঐরূপ ভাষায় মুদ্রিত হইয়াছিল, লিখিলে আলোচনার সুবিধা হইত। ২ রা জুন প্রস্তাবটি গৃহীত ও ৩রা জুন ইংরেজী দৈনিকগুলিতে উহার অনুবাদ মুদ্রিত হয়। তাহা এই :—

"While adhering to the policy of non-violence, this conference pays its homage to the patriotism of Gopi Nath Saha, who suffered capital punishment in connection with the murder of Mr. Day."

ইহা বিশেষ কোন সম্পাদকের মনগড়া অনুবাদ নহে; সংবাদপত্র সকলের প্রতিনিধিরা সম্মিলনীর কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে ইহা পাইয়াছিলেন। ফর্‌ওয়ার্ডে এই প্রস্তাবটি সম্বন্ধে লেখা হইয়াছিল :—

TRIBUTE TO GOPI NATH

"NOT TO HIS ACT, BUT TO HIS OBJECT"

Sj. Srish Chandra Chatterjee, who moved the first resolution, while reiterating his faith in non-violent non-co-operation and condemning murder as murder for whatever purpose it was committed whether by an erring patriot or by Government in the name of law and order, said while he condemned the murder committed by Gopinath Saha he thought it was their duty to pay homage to his intense patriotism and heroic self-sacrifice for cause of freedom.

Dr. Protap Chandra Guha Roy, seconding, praised Gopi Nath's fearlessness, his ardent love of the country and the sacrifice he made.

A DISSENTER.

Babu Nepal Chunder Roy, of Jessore, opposing the motion said he agreed with Srish Babu that in no circumstances could murder be supported. They must all admit that Gopi Nath's action was unpardonable. (cries of shame.) They should not take into account his motive. Every crime was committed with a motive and every motive could be said to be noble. (Loud cries of shame.) The speaker had been under the impression that even

murder was pardonable on political grounds, but after coming into contact with Mahatma Gandhi he had changed his mind. It was a delusion to imagine that a murder could make the country independent. (Loud cries of shame.)

Babu Sasadhar Chakravarty supporting the motion said he could not distinguish violence from non-violence. Non-violence was an abstract term and it would not help them. For the sake of the country they must invoke force.

Replying, Babu Srish Chandra Chatterjee said, the Congress supported the act of Kemal Pasha and he asked if the Congress did that where was non-violent non-co-operation? The resolution was carried by a huge majority by a show of hands.

কলিকাতার ইংরেজী দৈনিক-সকল যদিই বা কোন কারণে ভুল ছাপিয়া থাকে, তাহা হইলে অন্যান্য প্রদেশের কাগজে প্রস্তাবটি কি আকারে পৌঁছিয়াছে ও মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করা উচিত। একটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট হইবে। মান্দ্রাজের "হিন্দু"তে উহা এইরূপ ছাপা হইয়াছে :—

"At the Provincial Conference, Mr. C. R. Das and his party, who were in a majority, supporting a resolution praising the conduct of Gopinath Saha who was hanged for murdering Earnest Day was passed by the Subjects Committee who also adopted the Hindu-Mahomedan pact by 161 votes to 22."

সব্‌জেক্টস্ কমিটিতে প্রস্তাবটি যে আকারে ধার্য্য হইয়াছিল, সম্মিলনীর অধিবেশনে তাহার কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছিল বলিয়া কোন রিপোর্ট্ বাহির হয় নাই।

প্রস্তাবটির বাংলা ও ইংরেজী যে-যেরূপ আমরা উদ্ধৃত করিলাম, মিঃ দাসের অনুবাদের সহিত তাহার কোনটিই মিলে না। সুতরাং তাঁহার কথা ঠিক বলিয়া মানিয়া লওয়া যাইতে পারে না। অন্য সবাই মনগড়া কিছু-একটা লিখিয়াছে, কেবল তিনিই খাঁটি জিনিষটি অনেক বিলম্বে বাহির করিয়াছেন, ইহা কেন ধরিয়া লওয়া হইবে?

প্রস্তাবটি-সম্বন্ধে যে তর্কবিতর্ক ফর্‌ওয়ার্ডে ছাপা হইয়াছে, তাহা হইতেও বুঝা যায়, সমবেত শ্রোতৃবর্গের সমক্ষে উহা কি আকারে উপস্থাপিত হইয়াছিল, তাঁহারা কি শুনিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের মনের ভাব কিরূপ ছিল। বাবু নেপালচন্দ্র রায় যখন বলেন, গোপীনাথের কাজটি অমার্জ্জনীয়, তখন সভায় তাঁহাকে ধিক্কার দেওয়া হইল। সকল অপরাধেরই মহৎ উদ্দেশ্য আবিষ্কার করা যায় বলাতে, আবার তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে ধিক্কার দেওয়া হইল। যখন তিনি বলিলেন, একটা হত্যা দ্বারা দেশকে স্বাধীন করা যায় মনে করা ভ্রম, তখনও আবার উচ্চ শেম্, শেম্ (ধিক্, ধিক্) ধ্বনি উত্থিত হইল। ইহাতে কি মনে হয়, যে, সভার লোকেরা কেবল গোপীনাথের উদ্দেশ্যটিতে মোহিত হইয়াছিল, এবং অহিংসানীতির অনুসরণ করিয়া হত্যার কাজটির বিরোধী ছিল?

বাবু শশধর চক্রবর্ত্তী হিংসা ও অহিংসার মধ্যে কোন পার্থক্যই আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। তাঁহার মতে অহিংসা একটা অবচ্ছিন্ন গুণবাচক বা ভাববাচক শব্দ মাত্র, উহা আমাদের কোন সাহায্য করিতে পারে না; দেশের জন্য আমাদিগকে শক্তির, বলপ্রয়োগের আবাহন করিতে হইবে। তর্কবিতর্কের উত্তর দিতে উঠিয়া প্রস্তাবক বাবু শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন, কংগ্রেস্ কমাল পাশার কাজটির অর্থাৎ যুদ্ধের সমর্থন করিয়াছিলেন, এবং তিনি জিজ্ঞাসা করেন, যখন কংগ্রেস তাহা করিয়াছিলেন, তখন অহিংস অসহযোগ কোথায় ছিল? ইহাতে পরিষ্কার বুঝা যায়, যে, বক্তা অহিংস অসহযোগকে ব্যঙ্গের বিষয়ই মনে করিয়াছিলেন; সুতরাং তিনি যেপ্রস্তাবের গোড়ায় অহিংস অসহযোগে বিশ্বাসের পুনরুল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহা অকপট বলিয়া মনে হয় না; মনে হয় উহা রক্ষাকবচরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

যাহা হউক, প্রস্তাবটির রূপ ও ভাষা যে কি ছিল, সে-বিষয়ে মতের ঐক্য দেখা যাইতেছে না। কিন্তু একটা বিষয়ে কতকটা ঐক্য দেখা যাইতেছে। তাহা এই, যে, গোপীনাথ সাহার আত্মোৎসর্গের ও তাহার দেশভক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া তাহাকে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। এখানে "সারথি" হইতে আর-একটি প্রস্তাব উদ্ধৃত করিতেছি, এবং তাহার নীচে, উহা ইংরেজী দৈনিকসমূহে যে আকারে বাহির হইয়াছে, তাহাও দিতেছি।

"দ্বিতীয় দিবস মৌলানা আক্রাম খাঁ সভাপতির আসন হইতে শ্রদ্ধেয় অশ্বিনীকুমার দত্ত, নলিনীকান্ত রায় (যশোহর), রাজবন্দী চারুচন্দ্র ঘোষ (দৌলতপুর সত্যাশ্রম), স্যর আশুতোষ চৌধুরী, ও স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি দেশমাতৃকার সুসন্তানদিগের মৃত্যুতে শোক প্রকাশের প্রস্তাব উত্থাপন করেন; এবং প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।"

"This Conference expresses its heartfelt condolence for the passing away of Babus Aswini Kumar Datta, Nalininath Ray, Panch Couri Bandyopadhyay, Charu Chandra Ghosh, Sir Ashutosh Chowdhury, and Sir Asutosh Mookerjee, all noble sons of Bengal, and further expresses its sympathy for the bereaved families."

পাঠকেরা লক্ষ্য করিবেন, গোপীনাথ সাহার আদর্শের প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার যে সম্বর্দ্ধনা হইয়াছে, অশ্বিনীকুমার দত্ত বা আর-কাহারও তাহা হয় নাই। অতএব ইহা মনে করা অন্যায় হইবে না, যে, সিরাজগঞ্জের সম্মিলনীর অধিকাংশ প্রতিনিধির মতে গত এক বৎসরে বঙ্গের যত "সুসন্তান" পরলোকযাত্রা করিয়াছেন, গোপীনাথ সাহার স্থান তাঁহাদের সকলের অনেক উপরে।

বাবু শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কমাল পাশাকে অভিনন্দিত করার কথা বলিয়াছেন। এবিষয়ে আমাদের বক্তব্য বলিতেছি। কংগ্রেসের সভ্যদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী অহিংসাকে সর্ব্বদা, সকল ক্ষেত্রে ও সকল অবস্থায় অনুসরণীয় আধ্যাত্মিক নিয়ম বলিয়া মনে করেন। সম্ভবতঃ আরো কাহারো কাহারো মত এইরূপ। মৌলানা মহম্মদ আলী বার বার বলিয়াছেন, যে, তাঁহার ধর্ম্মে বল-প্রয়োগ ও হিংসা স্থলবিশেষে ও অবস্থা-বিশেষে বৈধ। কিন্তু তিনি মনে করেন, যে, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় অহিংসাই অবলম্বনীয় এবং তাহার দ্বারাই স্বাধীনতা লব্ধ হইবে। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে যুদ্ধ করায় তাঁহার কোন আপত্তি নাই। তাঁহার মত অনেকেই অহিংসাকে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় অনুসরণীয় নীতি বা পলিসি মনে করেন, উহা সকল অবস্থায় ও সকল দেশের অনুসরণীয় আধ্যাত্মিক বিধি মনে করেন না। অতএব, আমাদের মতে, যাঁহাদের মত ঠিক্ মহাত্মা গান্ধীর অনুরূপ, তাঁহারা কমাল-পাশার সমর্থন বা তাঁহাকে অভিনন্দন করিতে পারেন না; কিন্তু যাঁহাদের মত মৌলানা মহম্মদ আলীর অনুরূপ (এবং তাঁহাদের সংখ্যাই খুব বেশী বলিয়া মনে হয়), তাঁহারা নিশ্চয়ই কমাল পাশাকে অভিনন্দন করিতে পারেন। কারণ, ভারতবর্ষের কংগ্রেসের মূল বিশ্বাস ও নীতিসূত্রগুলি ভারতের জন্য এবং বর্ত্তমান ভারতের জন্য; উহা অন্য কোন দেশের জন্য লিখিত হয় নাই, এবং উহার কোথাও এরূপ লেখা নাই, যে, অন্য কোন দেশের লোক স্বাধীনতা লাভ ও রক্ষা বা দেশ, বা ধর্ম্ম, বা স্বার্থ রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিলে তাহা নিন্দনীয় বা সমর্থনের অযোগ্য হইবে। এই-জন্য আমাদের বিবেচনায় শ্রীশবাবুর ব্যঙ্গ কেবল তাঁহাদের প্রতিই প্রযোজ্য যাঁহারা ঠিক্ মহাত্মা গান্ধীর মতাবলম্বী হইয়াও কমাল পাশাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন (এরূপ কেহ তাহা করিয়াছিলেন কি না জানি না); সংখ্যাভূয়িষ্ঠ অন্য কংগ্রেস-সভ্যদের প্রতি উহা প্রযোজ্য নহে, এবং উহা তাঁহাদের গায়েও লাগিবে না।

তা ছাড়া, রাজনৈতিক খুন (পোলিটিক্যাল্ য়্যাসাসিনেশ্যন্) এবং যুদ্ধে একটা প্রভেদ আছে, তাহাও এখানে দেখান দরকার। সকল দেশের লোকমত অনুসারে অতর্কিতভাবে কাহাকেও আঘাত বা বধ করা নিন্দনীয়, সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান করিয়া আঘাত বা বধ করা তদপেক্ষা ভাল। রাজনৈতিক খুন অতর্কিতভাবেই করা হইয়া থাকে। শত্রুকেও কেহ ব্যক্তিগত কারণে অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করিলে তাহা নিন্দনীয় বিবেচিত হয়, অতএব রাজনৈতিক কারণে অতর্কিত আক্রমণ প্রশংসার যোগ্য, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ দেখিতেছি না।

দুই দেশের মধ্যে যখন যুদ্ধ হয়, তখন তাহার পূর্ব্বে যুদ্ধ ঘোষিত হয়, এবং উভয় পক্ষই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকে। কখন কখন যুদ্ধ ঘোষণা করিবার পূর্ব্বেও আক্রমণ হয় বটে, কিন্তু তাহা আন্তর্জাতিক রীতির বিরুদ্ধ বিবেচিত হয়, এবং একবার আক্রমণ হইয়া গেলেই তাহা ঘোষণার সমান বিবেচিত হয়, এবং পরে উভয় পক্ষ প্রস্তুত থাকে। তখন গুপ্ত আক্রমণ দোষের বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয় না। ইহার সহিত রাজনৈতিক খুনের তুলনা করা যাক্। মিঃ আর্ণেষ্ট্ ডে-কে ভ্রম-ক্রমে খুন করা হয়, সুতরাং তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কথা উঠিতে পারে না। মিঃ টেগার্টকে খুন করাই উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধেও

যুদ্ধঘোষণা করা হয় নাই। তবে গোপীনাথ সাহা এই আশা প্রকাশ করিয়া গিয়াছে বটে, যে, তাহার অসমাপ্ত কাজ যেন আর কেহ সমাপ্ত করে। ইহা একপ্রকার যুদ্ধ-ঘোষণা বটে। জিজ্ঞাস্য এই, যে, সিরাজগঞ্জ সম্মিলনী গোপীনাথ সাহার উক্ত উদ্দেশ্য, আশা ও পরোক্ষ যুদ্ধ-ঘোষণার সমর্থন করেন কি না।

প্রস্তাবটিতে গোপীনাথ সাহার কার্য্যের ও আদর্শের, কার্য্যের ও উদ্দেশ্যের, এবং কার্য্যের ও আত্মবলিদানের চুলচেরা পার্থক্য নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এবং কাজটির সমর্থন না করিয়া আদর্শের, উদ্দেশ্যের ও আত্মবলিদানের প্রশংসা করা হইয়াছে। অতএব শেষোক্ত জিনিষগুলির বিচার আবশ্যক।

উদ্দেশ্য ছিল মিঃ টেগার্টকে বধ করিয়া দেশ স্বাধীন করা। জাতীয় আত্মকর্তৃত্বলাভ-রূপ উদ্দেশ্য বা আদর্শকে যদি উপায়নির্ব্বিশেষে সম্বর্দ্ধনা করা সম্মিলনীর অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে অন্ততঃ অশ্বিনীকুমার দত্তের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও আত্মোৎসর্গের সম্বর্দ্ধনা সম্মিলনীতে হইত। কিন্তু তাহা হয় নাই। সুতরাং ইহা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে, যে, যে উদ্দেশ্য, আদর্শ ও আত্মোৎসর্গ সম্মিলনীর দ্বারা সম্বর্দ্ধনার যোগ্য বিবেচিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে খুন থাকা চাই, সরকারী ইউরোপীয় কর্ম্মচারীর খুন থাকা চাই, এবং তাহার জন্য ফাঁসী যাওয়া চাই। অশ্বিনীকুমার দত্ত বা চারুচন্দ্র ঘোষ দেশে জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, সে উদ্দেশ্য ও আদর্শ তাঁহাদের ছিল; তাঁহারাও আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন; গবর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িতও হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা যে সম্বর্দ্ধনা পান নাই, গোপীনাথ তাহা পাইয়াছে। তাহার কারণ অন্বেষণ করিলে দেখা যায়, যে, গোপীনাথ একজন সরকারী কর্ম্মচারীকে খুন করিয়া দেশকে স্বাধীন করিতে চাহিয়াছিল, এবং পরে ধৃত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল; অশ্বিনীকুমার বা চারুচন্দ্র কাহাকেও খুন করেন নাই বা করিতে চান নাই, সুতরাং তজ্জন্য তাঁহাদের ফাঁসীও হয় নাই। সেই জন্য বলিতেছি, সিরাজগঞ্জ সম্মিলনী উপায়নির্ব্বিশেষ শুধু দেশ-উদ্ধারের উদ্দেশ্য, আদর্শ, বা আত্মোৎসর্গের সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন, ইহা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়; সম্মিলনী বাস্তবিক দেশসেবার একটি বিশেষ উপায়, পন্থা বা আদর্শকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়া তাহার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন, এবং সেই পথটি হিংসার পথ। প্রস্তাবটির গোড়ায় যে বলা হইয়াছে, যে, কংগ্রেসের অহিংস অসহযোগ নীতিতে বিশ্বাস পুনরুক্ত হইতেছে, তাহা আত্মরক্ষার জন্য অভিপ্রেত কথার ফাঁকি মাত্র। অহিংসার উপরই যদি সম্মিলনীর অধিকাংশ প্রতিনিধির বিশ্বাস থাকিবে, তাহা হইলে যাঁহাদের জীবনে দেশ-উদ্ধার, জাতীয় আত্মকর্তৃত্বলাভচেষ্টা ও আত্মোৎসর্গের আদর্শ অহিংস আচরণের ভিতর দিয়া বিকাশ ও প্রকাশ পাইয়াছিল, তাঁহাদিগের অপেক্ষা গোপীনাথের সম্বর্দ্ধনা কেন অধিক হইল, যাহার উদ্দেশ্য, আদর্শ ও আত্মবলিদান হিংসার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল? ইহাও এখানে বক্তব্য, যে, গোপীনাথের ফাঁসীকে ঠিক্ সেল্ফ্ স্যাক্রিফাইস্ বা আত্মবলিদান বলা যায় না; কেন না, সে নিজেকে নিজে বলি দ্যায় নাই, তাহার পলায়নচেষ্টা বিফল করিয়া অন্যে তাহাকে বলি দিয়াছে। মৃত বিপথগামী এই বালকের সমালোচনা করা সাতিশয় অপ্রীতিকর কাজ; কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাহা করিতে হইতেছে।

যদি কেহ এরূপ বলেন, যে, অশ্বিনীবাবু প্রভৃতি সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহা দ্বারাই তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সম্মান দেখান হইয়াছে, তাহা হইলে আমরা জিজ্ঞাসা করি, ঐ প্রস্তাবে গোপীনাথ সাহার নামও গুঁজিয়া না-দেওয়ার একটা কারণ কি এই নয়, যে, তাহাকে স্বতন্ত্র-ও বিশেষ-রকম এবং উচ্চতর সম্মান দিবার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল? আর কাহারও আত্মবলিদানের উল্লেখ ও সম্বর্দ্ধনা হয় নাই। আর কোন মৃতব্যক্তি কি আত্মোৎসর্গ করেন নাই?

গোপীনাথ সাহার চরিত্রে প্রশংসনীয় কিছু ছিল কি না, তাহার বিচার আমরা করিতেছি না। তাহা অবশ্যই ছিল, এবং আমরা বিশ্বাস করি, তাহার বলে সে ভ্রম বুঝিতে পারিয়া ক্ষমা পাইবে এবং তাহার কল্যাণ ও উন্নতি হইবে। মানুষের শক্তি সৎপথে চালিত ও সৎকার্য্যে নিয়োজিত হইলে তাহাই প্রশংসা ও অনুকরণের

যোগ্য হয়। সেই প্রশংসা ও অনুকরণই সমাজের মঙ্গলজনক।

প্রস্তাবের সমর্থকেরা যদি মনে মনে মিঃ টেগার্টের হত্যা ভাল কাজ মনে করেন, তাহা হইলে সেরূপ মনে করিবার কারণ কি, তাহা তাঁহারা অবশ্য প্রকাশ্যভাবে বলিতে পারিবেন না—যদিও অন্যের আত্মবলিদানের প্রশংসা তাঁহারা করিয়াছেন। তথাপি তাঁহাদের ও দেশস্থ অন্য-সকলের এবিষয়ে চিন্তা করা দরকার। কথিত আছে, কোন বাড়ীর প্রহারপটু গুরুমহাশয়ের মৃত্যুতে এক বালক উল্লাস প্রকাশ করায় আর-একজন বলিয়াছিল, "গুরুমশায় মর্‌লে কি হয়, বাবা যে বেঁচে আছে?" অর্থাৎ বাবা যতদিন বাঁচিয়া আছে, ততদিন গুরুমহাশয়ের অভাব হইবে না; নূতন নূতন গুরুমহাশয় নিযুক্ত হইবে। সেইরূপ, যদি মিঃ টেগার্টকে খুব অত্যাচারী দুষ্ট লোক এবং ভারতের আত্ম-কর্ত্তৃত্ববিরোধী বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট্ থাকিতে তাঁহাকে বা তাঁহার ন্যায় অন্য ইংরেজদিগকে মারিয়া ফেলিলেও তাঁহার পদে অন্য লোক অধিষ্ঠিত হইবে, লোকের অভাব হইবে না, গুপ্ত হত্যাদ্বারা ইংরেজকুল নির্ম্মূল করিতে কেহ পারিবে না, এবং ভয়ে কোন ইংরেজ এই কাজ লইবে না, এরূপও হইবে না। পরাধীনতা বিনষ্ট করিবার পথ ইহা নহে।

পরাধীনতা আমাদের আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতা ও ভীরুতার একটা বাহ্য চিহ্ন ও উপসর্গ মাত্র। আমাদের ভীরুতা ও দুর্ব্বলতা যত দিন আছে, তত-দিন ইংরেজ গেলেও আমরা স্বাধীন হইতে পারিব না, অন্য কেহ বিদেশী বা স্বদেশী আমাদের প্রভু হইবে। রোগ নষ্ট করিতে হইলে রোগের জড় মারিতে হয়। পরাধীনতা রোগের জড় আমাদের দুর্ব্বলতা, ভীরুতা অনৈক্য, পরস্পরকে অবিশ্বাস। তাহা বিনষ্ট করিতে হইবে।

—

মৌলানা আক্রাম খাঁর অভিভাষণ।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের সিরাজগঞ্জ অধিবেশনে সভাপতি মৌলানা আক্রাম খাঁ তাঁহার অভিভাষণে বেশ পক্ষপাতশূন্যভাবে তাঁহার মত প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্বরাজ সম্বন্ধে মুসলমান-দের আশঙ্কার বিষয়ে তিনি বলেন :—

"স্বরাজ হইলে তাহা প্রকৃতপক্ষে হিন্দু স্বরাজে পরিণত হইবে, এবং হিন্দুর চাপে মুছলমান একেবারে মরিয়া যাইবে—একথাগুলির অর্থ কি তাহাই আমার প্রথম জিজ্ঞাস্য। এদেশে হিন্দুর সংখ্যা অধিক একথা কেহই অস্বীকার করে না এবং ইহার প্রতীকারের কোনও উপায়ও আমাদের হাতে নাই শিক্ষা ও সম্পদে হিন্দু মুছলমান অপেক্ষা বহুগুণে উন্নত—ইহাই সত্য। তবে ইচ্ছা করিলে মুছলমান-সমাজ নিজেদের অবস্থার উন্নতিসাধন করিয়া ইহার কতকটা প্রতীকার করিতে পারেন। সে যাহা হউক, ইহাতে মুছলমানের মারা পড়ার যে কি কারণ আছে, আমি তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

"এই অন্যায়, অপ্রস্তুত ও কল্পিত আশঙ্কার মূল এই, যে, হিন্দুজাতি জাতির হিসাবে সুযোগ পাইলেই মুছলমানদের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারে। বাঙ্গালার মুছলমান সমাজ বোধ হয় স্বীকার করিবেন যে, মুছলমানদের ন্যায্য স্বার্থরক্ষার সময় আমি কখনই হিন্দুদিগের মুখ চাহিয়া কথা কহি নাই। বাঙ্গালায় বোধ হয় এখন এমন একজন মুছলমানও বিদ্যমান নাই, যিনি এইসকল বিষয় লইয়া হিন্দুদিগের সহিত কার্য্য-ক্ষেত্রে আমা অপেক্ষা অধিক সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়াছেন এবং সেজন্য আমা অপেক্ষা অধিক বিপন্ন হইয়াছেন। এই হিসাবে আমি এই পণ্ডিত বন্ধুবর্গকে দৃঢ়কণ্ঠে বলিব যে, সমস্ত দুনিয়াটাকে নিজের মনোভাবের মধ্য দিয়া দর্শন করা উচিত নহে। আমি গত বিশ বৎসর হইতে নানাবিধ কলহ ও মিলনের মধ্য দিয়া হিন্দুনেতা ও সহকর্ম্মীবর্গকে দেখিয়া আসিতেছি, এবং এই অভিজ্ঞতার ফলে আজ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি, যে, এই শ্রেণীর আশঙ্কা একেবারেই অলীক ও ভিত্তিহীন। স্বীকার করি হিন্দুরা অনেক সময় ভুল করিতে পারেন—করিয়াও থাকেন। কিন্তু ভুল এক কথা, আর ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রবঞ্চনা অন্য কথা।

"হিন্দুর আশঙ্কাও পূর্ব্ববৎ অলীক ও অন্যায়। এসম্বন্ধে এই শ্রেণীর হিন্দু বন্ধুদিগের নিকট আমার বিনীত নিবেদন—তাঁহারাও যেন নিজেদের মন দ্বারা মুছলমান জাতির মনোভাবের অনুমান না করেন। বিগত দেড়শত বৎসর চেষ্টা চরিত্রের ফলে, আজ মুছলমানের মধ্যেও তাঁহাদের একদল জুড়িদারের উদ্ভব হইয়াছে—সত্য; কিন্তু মুছলমান জাতির সহিত তাহাদিগের কোন সংশ্রব নাই। অবস্থাগতিকে মুছলমান আজ দরিদ্র, অশিক্ষিত এবং সর্ব্বস্বহীন। তাহাকে মূর্খ বল, গোঁড়ামির বশবর্ত্তী বল, আর এইপ্রকার ন্যায্যঅন্যায্য যতপ্রকার বিশেষণ তোমার অভিধানে থাকে, সেসমস্তের প্রয়োগ কর, নীরবে মানিয়া লইব, সহিয়া লইব। কিন্তু, তাহাকে যেন খল বলিও না, শঠ বলিও না, কপট বলিও না, প্রবঞ্চক বলিও না।" ("সারথির" চুম্বক হইতে।)

—

"ছ" ও "স"।

ফোনেটিক্স্ বা ধ্বনিবিজ্ঞানের মতে তাহাই আদর্শ বর্ণমালা যাহাতে প্রত্যেক স্বতন্ত্র ধ্বনির চিহ্নস্বরূপ স্বতন্ত্র একটি অক্ষর আছে, এবং যাহাতে একই অক্ষর দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনি কিবা একাধিক অক্ষর দ্বারা

একই ধ্বনি সূচিত হয় না। এই আদর্শ অনুসারে বিচার করিলে বাংলা বা নাগরী বর্ণমালা নিখুঁত না হইলেও, ইংরেজী বর্ণমালা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই আদর্শের অনুসরণ করিয়া আমরা "স" ও "ছ" এর প্রয়োগ সম্বন্ধে কিছু বলিব।

বাংলায় ও সংস্কৃত ইংরেজী "এস্" এর উচ্চারণ বুঝাইবার নিমিত্ত "স" অক্ষর আছে। সুতরাং ঐ ধ্বনিটি বুঝাইবার জন্যই আবার "ছ" অক্ষরটি ব্যবহার করা অনাবশ্যক ও অনুচিত। মুসলমান, মোস্লেম্, ইস্লাম্ ইত্যাদি ঠিক্ ধ্বনি বা উচ্চারণ অনুযায়ী বানান। ইহার জায়গায় মুছলমান, মোছ্লেম, ইছ্লাম, ইত্যাদি লিখিলে ভুল হয়। অবশ্য বঙ্গের নানা জায়গায় অনেকে "ছ" কে "স" উচ্চারণ করে বটে। কিন্তু অনেক জায়গায় "পড়া"কে বলে "পরা" ও "তাড়াতাড়ি"কে বলে "তারাতারি"; এবং "রাস্তা"কে বলে "আস্তা" ও "আম"কে বলে "রাম"। কিন্তু এইসব প্রাদেশিক অশুদ্ধ উচ্চারণ কেতাবে কাগজে আমদানী করা উচিত নয়। ইংলণ্ডে ইংরেজী কথার অনেক প্রাদেশিক উচ্চারণ আছে। কিন্তু সেগুলা কেবল নাটকে গল্পে উপন্যাসে কখন কখন (সব স্থলে নয়) কথোপকথন উপলক্ষে ব্যবহৃত হয়। এবিষয়ে কাহারও কোন জেদ থাকা উচিত নয়। নতুবা কালক্রমে ছাল ও সাল, ছায়া ও সায়া, ছই ও সই, ছাড়া ও সাড়া, ছাত ও সাত, ছাপ ও সাপ, ছার ও সার, ছোলা ও সোলা প্রভৃতির মধ্যে অকারণ গোলযোগ উপস্থিত হইবে।

—

ভাড়াটিয়া প্রতিনিধি

খবরের কাগজে এই কথা লিখিত হইয়াছে, যে, সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনে প্রতিনিধির সংখ্যা যত হইয়াছিল, তাহার খুব বেশী অংশ মৈমনসিং হইতে ভাড়া করিয়া আমদানী করা হইয়াছিল, এবং তাহার দ্বারা স্বরাজ্যদলের মতের পরিপোষক প্রস্তাব-সকল পাস্ করা হইয়াছিল। ইহার সত্যতা অনুসন্ধান করিতে আমরা অসমর্থ। কিন্তু আমরা বলিতে চাই, যে, এরূপ অসদাচরণের অভিযোগ সত্য বা মিথ্যা যাহাই হউক, ইহার প্রতিকারের চেষ্টা করা উচিত। একটি উপায়, মোট প্রতিনিধির সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া, এবং লোক-সংখ্যা অনুসারে কোন্ জেলা ও শহরের কত প্রতিনিধি পাঠাইবার অধিকার আছে, তাহা স্থির করিয়া দেওয়া। অবশ্য এরূপ ব্যবস্থা করিলেও সর্ব্বত্র কোন একটা দলের লোক নানা উপায়ে কেবল নিজেদের দলের প্রতিনিধিই পাঠাইবার চেষ্টা করিতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও, প্রধানতঃ অধিবেশন-স্থানের বা তন্নিকটবর্ত্তী কোন শহরের লোকদের মতই বাংলা দেশের মত বলিয়া প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা কিছু কম হয়।

—

শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী

শ্রীযুক্ত স্যার্ আশুতোষ চৌধুরী রাজসাহী জেলার এক প্রাচীন জমিদার-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন এবং উভয়ত্র খ্যাতি অর্জ্জন করেন। কেম্ব্রিজে শিক্ষালাভ করা ভিন্ন তিনি বিলাতে ব্যারিষ্টারীর জন্যও অধ্যয়নাদি করেন, এবং ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যবহারাজীবের কার্য্য আরম্ভ করেন। আইন-ব্যবসায়ে কালক্রমে তাঁহার খুব পসার হইয়াছিল। তিনি যখন হাইকোর্টের জজিয়তী গ্রহণ করেন, তখন তাঁহাকে মাসিক অনেক হাজার টাকা কম আয়ে তাহা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। হাইকোর্টের অরিজিন্যাল্ বিভাগে ভারতীয় জজ্‌দের মধ্যে তিনিই প্রথমে বিচারপতিত্ব করেন। ১৯২১ সালে তিনি জজিয়তী হইতে অবসর গ্রহণ করেন, এবং আবার ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন। কিন্তু জজিয়তী করিবার সময়েই তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। কিছু কাল পূর্ব্বে তাঁহার পত্নী শ্রীমতী প্রতিভা দেবী মহাশয়ার মৃত্যুতে তাঁহার স্বাস্থ্য আরও খারাপ হয়। তিনি আর সারিয়া উঠিতে পারেন নাই। গত ৯ই জ্যৈষ্ঠ তাঁহার কলিকাতাস্থ ভবনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ব্যারিষ্টারীতে যখন তাঁহার খুব পসার ও প্রতিপত্তি তখনও তিনি কার্য্য-বাহুল্যের মধ্যেও নানা লোকহিতকর সার্ব্বজনিক কাজে যোগ দিতেন। দেশের কল্যাণ সাধনের ইচ্ছা তাঁহার ছিল।

১৯০৪ সালে তিনি বর্দ্ধমানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের সভাপতি হন। সেই সময়ে তাঁহার অভিভাষণে তিনি প্রথম বলেন, যে, "পরাধীন জাতির কোন রাষ্ট্রনীতি নাই"("এ সব্জেক্ট্ নেশন্ হ্যাজ নো পলিটিক্স্")। তৎকালে এই উক্তি লইয়া খুব আলোচনা হইয়াছিল, এবং বঙ্গের রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টার উপর উহার প্রভাব অনুভূত হইয়াছিল।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে চৌধুরী মহাশয় দিনাজপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি বাংলার ভূস্বামী-সভার সংস্থাপক ও প্রথম অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। তিনি জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ্ এবং কলিকাতা ন্যাশন্যাল্ কলেজের অন্যতম সংস্থাপক ছিলেন। এই ন্যাশন্যাল্ কলেজের যে বিভাগে ব্যাবহাবিক বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা বরাবর স্বপরিচালিত হইয়া আসিতেছে। ইহা হইতে উত্তীর্ণ অনেক ছাত্র যোগ্যতার সহিত কার্খানা আদিতে কাজ করিতেছেন। ইহা সম্প্রতি শিয়ালদহ ষ্টেশন্ হইতে ৬ মাইল দূরবর্ত্তী যাদবপুর নামক স্থানে নিজের বাড়ীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। চৌধুরী মহাশয় যেমন বে-সর্কারী জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের সহিত প্রথম হইতে যুক্ত ছিলেন, তেম্নি গবর্ণমেণ্ট্ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট এবং সিণ্ডিকেটেরও সভ্য ছিলেন। বস্তুতঃ আমাদের দেশে শিক্ষার বিস্তৃতি ও উন্নতি এত কম হইয়াছে, ইহাতে বৈচিত্র্য এত কম, এবং ইহা এরূপ কম রকম-ওয়ারি, যে, শুধু সর্কারী বা শুধু বে-সর্কারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিদ্বারা দেশের শৈক্ষিক প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে না। সকলপ্রকার বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠানেরই দোষ-ত্রুটি আছে, সংশোধন ও সংস্কারের প্রয়োজন আছে; কিন্তু জাতীয় ক্ষতি না করিয়া কোনপ্রকার প্রতিষ্ঠানকেই বিলুপ্ত করা চলে না। সম্ভবতঃ চৌধুরী মহাশয়ের ধারণাও এইরূপ ছিল বলিয়া তিনি উভয়বিধ প্রতিষ্ঠানেরই সহিত যোগ রক্ষা করিতেন।

যেসকল সার্ব্বজনীন প্রচেষ্টায় খুব হুজুক আছে, কোলাহল আছে, উত্তেজনা-উন্মাদনা ও বিদেশ হইতে আমদানি হাত-তালি পাইবার সম্ভাবনা আছে, তাহার সহিত যুক্ত থাকিলে খুব নামজাদা হওয়া যায়। কিন্তু এমন অনেক ভাল কাজ আছে, যাহাতে এসব কিছু নাই। তাহা করিলে সমাজের উন্নতি হয়, লোকের বিমল আনন্দ বিধান করা যায়, আত্মপ্রসাদ লাভ হয়, কিন্তু হাততালি পাওয়া যায় না, নামজাদা হওয়া যায় না। চৌধুরী মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী প্রতিভা দেবী, তাঁহার স্বামীর সম্পূর্ণ অনুমোদন ও সহযোগিতায়, "সঙ্গীতসংঘ" নামক সঙ্গীত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান আমরণ চালাইয়া ছিলেন। তাহার জন্য তিনি সময়, শক্তি, অর্থ, হৃদয়ের ঐশ্বর্য্য নিয়োগ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন! জাতির হৃদয়মনের উৎকর্ষ সাধনার্থ সঙ্গীত ও অন্যান্য ললিতকলার অনুশীলন আবশ্যক। এদেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোক এখনও এবিষয়ে উদাসীন। চৌধুরী মহাশয় সর্ব্বতোমুখী শিক্ষার এবং সকল দিকে প্রবুদ্ধমনা হইবার মর্য্যাদা বুঝিতেন। এইজন্য তিনি পত্নীর মৃত্যুর পরেও সঙ্গীত-সংঘ বজায় রাখিয়াছিলেন। তিনি ভারতীয় চিত্রকলারও রসজ্ঞ ছিলেন। ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যখন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কোন কোন সভ্য প্রাচ্য কলার অনুশীলনার্থ স্থাপিত ইণ্ডিয়ান্ সোসাইটী অব্ ওরিয়েণ্ট্যাল আর্ট নামক ভারতীয় সমিতির সামান্য সর্কারী সাহায্য বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন তিনি তাহাতে বাধা দিয়াছিলেন।

চৌধুরী মহাশয় সদালাপী, মিষ্টভাষী, বিনয়নম্র ও অমায়িক লোক ছিলেন। যেমন কাজের লোক ভিন্ন সংসার চলে না, তেম্নি কেবল কাজের লোকই পৃথিবীতে থাকিলে লোকালয়ের আনন্দ ও শ্রী-সৌন্দর্য্য থাকে না। তজ্জন্য সামাজিকতারও প্রয়োজন আছে। চৌধুরী মহাশয় যে কাজের লোক ছিলেন না, তাহা নহে; কিন্তু তিনি সামাজিকতার জন্যও লোকপ্রিয় ছিলেন।
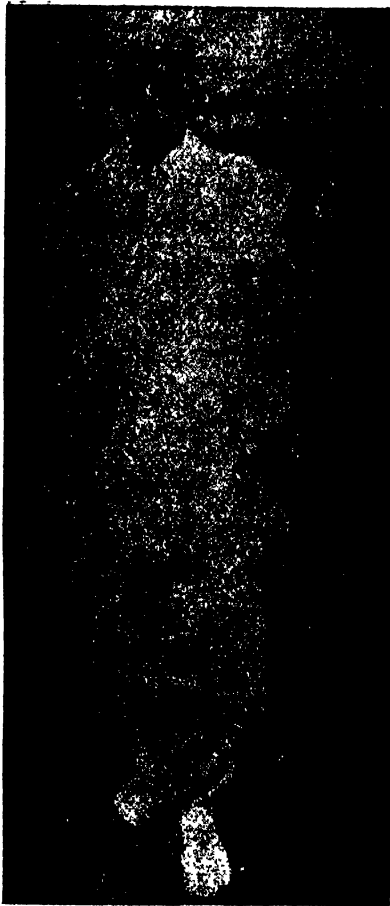
শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী

সেই-জন্য তাঁহার অভাবে কলিকাতার বাঙালী সমাজের এক অংশ অন্যতম ভূষণ হারাইয়াছে।

—

শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

কোন প্রসিদ্ধ লোকের মৃত্যু হইলে খবরের কাগজে এইরূপ লিখিবার একটা প্রথা দাঁড়াইয়া গিয়াছে, যে, তাঁহার স্থান অধিকার করিবার লোক আর নাই। কিন্তু আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্বন্ধে এই কথা বলিলে তাহা প্রথা-রক্ষা হিসাবে বলা হয় না, অক্ষরে অক্ষরে সত্য কথাই বলা হয়। কেন না, তিনি একা যতরকম কাজ নিয়মিতরূপে ও দক্ষতার সহিত করিতেন, দেশে সত্য সত্যই আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই, যিনি তাহা করিতে সমর্থ। তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিদের মধ্যে নাই, বয়ঃকনিষ্ঠদের মধ্যেও কেহ আছেন বলিয়া অবগত নহি। তাঁহার অসাধারণ কর্ম্মিষ্ঠতা ও শ্রমশক্তি ছিল, বুদ্ধিও খেলিত বহু বিষয়ে। পৃথিবীতে সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা কাহারও ছিল বা আছে, বলিলে সত্য কথা বলা হয় না। সুতরাং আশু-বাবুর সম্বন্ধেও তাহা বলা যায় না। তদ্রূপ কেহ আধুনিক জগতে বাস্তবিক সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ আছেন বা ছিলেন, বলিলেও সত্যের অপলাপ হয়। কিন্তু আশু-বাবুর পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে একটি কথা সত্যের অপলাপ না করিয়া বলা যায়। ভারতবর্ষে এক-একটি বিষয়ে বা একাধিক বিষয়ে তাঁহা অপেক্ষা পণ্ডিত লোক আছেন, নিজের নিজের বিদ্যায় অতিশয় কৃতী ও প্রসিদ্ধ লোক আছেন; কিন্তু আশু-বাবুর মত অনেকগুলি বিষয়ে পাণ্ডিত্যের সহিত নানাপ্রকার কাজ চালাইবার ক্ষমতা আর কোন ব্যক্তিতে এদেশে দৃষ্ট হয় নাই। আর একটি ক্ষমতা তাঁহার অধিক মাত্রায় ছিল। তাঁহাকে কার্য্য গতিকে নানাবিদ্যার নানা উচ্চ অঙ্গের বিষয়ে লিখিতে ও বলিতে হইত। তাহার মধ্যে তিনি কোনটায় পারদর্শী না থাকিলেও তৎতদ্বিষয়ে পণ্ডিত সহকর্ম্মীদের নিকট হইতে জ্ঞাতব্য কথা জানিয়া লইয়া অতি শীঘ্র তিনি গুছাইয়া লিখিতে ও বলিতে পারিতেন।

ভিন্ন ভিন্ন জাতির, ধর্ম্মের, রুচির, ব্যবসায়ের ও মতের নানা লোককে একত্র কাজ করাইবার অসাধারণ ক্ষমতা তাঁহার ছিল। প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার অসামান্য ক্ষমতাও তাঁহার ছিল।

বাল্যকালেই আশুতোষের ভবিষ্যৎ কৃতিত্বের পূর্ব্ব লক্ষণ লক্ষিত হইয়াছিল। স্কুল ও কলেজে তিনি ছাত্র-রূপে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন। আমরা যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে আসিয়া ভর্ত্তি হই, তখন তিনি উচ্চ শ্রেণীতে পড়িতেন। তাঁহার একমাত্র ভ্রাতা ও কনিষ্ঠ যৌবনেই পরলোকগত হেমন্তকুমার আমাদের সহপাঠী ছিলেন। সেই কারণে আশু-বাবুর সহিত বিশেষ পরিচয়ও হইয়াছিল। আমরা যখন নীচের ক্লাসে পড়ি,

কেন খুব কৃতী হইতে পারিতেন, তাহারই কারণ দেখাইতেছি। এখন কোনরূপ সমালোচনা অসাময়িক বলিয়া তাহা আমাদের অভিপ্রেত নহে।

রাজনীতি-ক্ষেত্রে আর-একটি শক্তি কাজে লাগে। তাহা, গুপ্ত সংবাদ জানিবার উপায় অবলম্বন এবং তাহা জানিয়া আগে হইতে সাবধান ও প্রস্তুত থাকা ও বিপক্ষকে বিফলপ্রযত্ন করা। এই ক্ষমতা আশু বাবুর ছিল, এবং এইজন্য তিনি এ-বিষয়ে পাশ্চাত্য রাজনৈতিকদের সমশ্রেণীস্থ ছিলেন।

আমাদের দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে সাফল্যলাভের জন্য দেশভক্তি ও স্বাজাতিকতা থাকা দরকার। এই জন্য কথা উঠিতে পারে, যে, আশু-বাবুর তাহা ছিল কি না। আমরা যাহা জানি, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস তাঁহার দেশভক্তি ও স্বাজাতিকতা ছিল। তাহার কিছু কিছু প্রমাণের উল্লেখ পরে করিব। আপত্তি এই হইতে পারে, যে, তাঁহার প্রধান হইবার ইচ্ছা ও প্রভুত্ব-প্রিয়তা ছিল। কিন্তু জীবিত ও মৃত ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের এক-একজনের কথা ভাবিলে, অধিকাংশেরই প্রকৃতিতে ঐ ঝোঁক্ লক্ষিত হইবে। প্রভেদ এই, যে, আশু-বাবু যে-পরিমাণে সফলকাম হইয়াছিলেন, অন্য অনেকেই তাহা হন নাই। সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ বা স্বার্থ-ত্যাগ আশু-বাবু করিতে পারেন নাই, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু যিনি বা যাঁহারা পারিয়াছেন বা পারিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম করা বড় সহজ হইবে না।

যাহাই হউক, আশু-বাবু যখন রাজনীতিকে নিজের কার্য্যক্ষেত্র করেন নাই, তখন সে বিষয়ে অধিক লেখা অনাবশ্যক। শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতি, সর্ব্ববিধ জ্ঞান-অর্জ্জন, গবেষণা দ্বারা মানবের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করা,—সকল সভ্য দেশে যেমন এইসকল দিকে চেষ্টা হইতেছে, আমাদের দেশেও যাহাতে সেইরূপ হয়, আশু-বাবুর ইহা হৃদ্গত ইচ্ছা ছিল। এই ইচ্ছাকে ফলবতী করিবার জন্য তিনি যৌবন কাল হইতে প্রভূত, অবিরাম, এবং এতদ্দর্থে ভারতবর্ষে অনতিক্রান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার জীবনের কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য যে-সকল রীতি ও উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার সব-গুলির উপযোগিতা, ফলোপধায়কতা এবং অনবদ্যতা সম্বন্ধে অবশ্য মতভেদ আছে। কিন্তু তিনি নিজের সম্বন্ধে একদা যে নিম্নলিখিত মর্ম্মের কথা বলিয়াছিলেন, তাহা সত্য :-

"আমি আমার বিবেকের অনুমোদন-সহকারে বলিতে পারি, যে আমি পরিশ্রম হিসাবে যেমন অনেক সময় অন্যকে রেয়াৎ করি নাই তেমনি আমি কখনও নিজেকেও বাঁচাইয়া চলি নাই। আমার অ[illegible]বিধ অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য—তন্মধ্যে আমার বিচারপতি-পদের কর্ত্ত[illegible] সর্ব্বপ্রধান—সম্পন্ন করিয়া, যতটুকু সময় করিতে পারিতাম, তাহ[illegible] প্রত্যেক ঘণ্টা প্রত্যেক মিনিট বহু বৎসর ধরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে[র] কাজে নিয়োজিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি[র] জন্য নানা উপায় ও পদ্ধতির চিন্তা আমার দিবাস্বপ্নের বিষয়; রা[ত্রি]কালে বিশ্রামের সময়েও সেইসব চিন্তা হইতে আমি নিষ্কৃতি প[াই] নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের জন্য আমি অধ্যয়ন ও গবেষণার সমু[দয়] সম্ভাবনা বলি দিয়াছি, সম্ভবতঃ কিয়ৎপরিমাণে পরিবারবর্গ ও বন্ধুদে[র] স্বার্থ বলি দিয়াছি, এবং দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, আমার স্বাস্থ্য[] জীবনীশক্তির অনেক অংশ নিশ্চয়ই বলি দিয়াছি।"

তাঁহার মত মানসিকশক্তিশালী লোক যে তাঁহা[র] বুদ্ধির উপযুক্ত কোন মৌলিক গ্রন্থ-আদি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, ইহাতে তিনি নিজের প্রতি অবিচা[র] করিয়াছেন, এবং তাঁহার জাতিও সম্ভাবিত লাভ হইতে হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

আমাদের জাতিকে নানা বিষয়ে প্রবুদ্ধমনা করিবা[র] জন্য দেশে যত প্রতিষ্ঠান আছে, তাহার অনেকগুলি[র] সহিত তিনি যুক্ত থাকিয়া কাজ করিয়া গিয়াছেন[।] বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটীর তিনি সভ্য ছিলেন, এ[বং] পুনঃ পুনঃ সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তি[নি] ১৯০৯ সালে ভারতীয় মিউজিয়মের ট্রষ্টীদিগের সভাপ[তি] নির্ব্বাচিত হন। প্রায় সেই সময়ে বঙ্গে সংস্কৃত উপা[ধি] পরীক্ষার পরিচালক-সমিতির সভাপতি হন। তি[নি] বৌদ্ধ মহাবোধি সভারও সভাপতি ছিলেন। যখ[ন] কলিকাতার ধর্ম্মরাজিক চৈত্যবিহারে গবর্ণমেন্ট্ বুদ্ধদেবে[র] দেহাবশেষের কিয়দংশ দান করেন, তখন গবর্ণমেণ্ট প্রাস[াদ] হইতে শোভাযাত্রা করিয়া উহা আনয়ন করিবার স[ময়] মুখোপাধ্যায় মহাশয় নগ্নপদ ও পট্টবস্ত্র পরিহি[ত] হইয়া উহা গ্রহণপূর্ব্বক আনয়ন করেন। ভারতে[র] অতীত গৌরবস্বপ্নে পূর্ণ তাঁহার হৃদয়ে সেদি[ন] ভারতের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থা সম্বন্ধে কি চিন্তা উদয় হইয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই, কেব[ল]
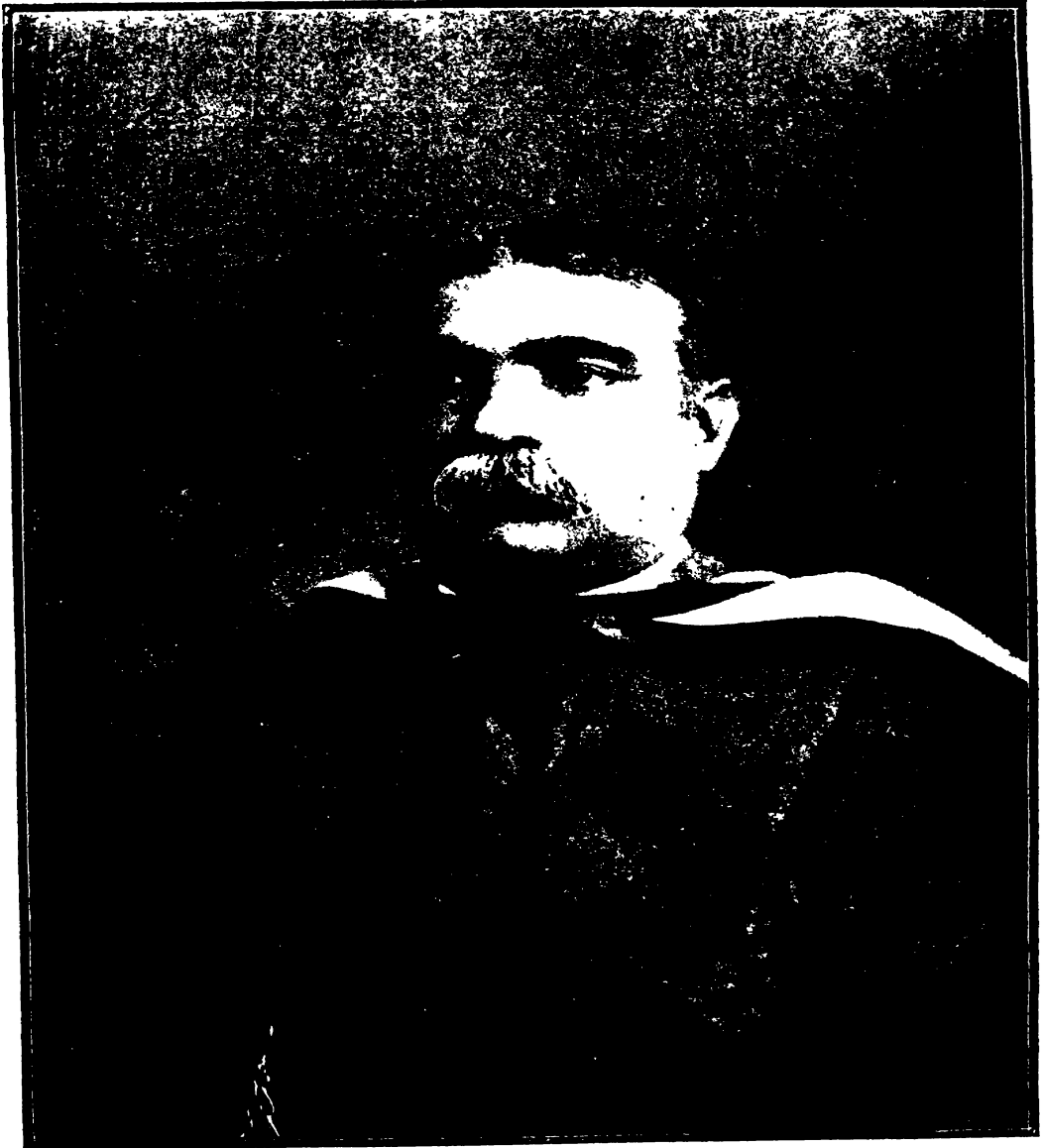
স্যার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

Prabasi Press.

পাটনা হইতে আনীত শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শবদেহ দর্শনার্থ হাওড়ায় সমবেত জনতা

কল্পনা করা যাইতে পারে। তিনি বঙ্গের গণিত-সভার সংস্থাপক ও সভাপতি ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের সহিতও তাঁহার যোগ ছিল। তিনি একবার বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া আমাদের ভাষার ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহার আশা ও স্বপ্ন বঙ্গভাষী জনগণকে জ্ঞাপন করেন।

বর্ত্তমান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি প্রধান স্থপতি। তিনি ইহাকে যতটা গড়িয়াছেন, আর কেহ ততটা নহে। ইহার ভালর জন্য প্রশংসা ও মন্দের জন্য দায়িত্ব তাঁহার যত বেশী, অন্য কাহারও তত নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠন-কার্য্যে তাঁহার সহকর্ম্মী ও সহায়ক অনেকে ছিলেন, সকল বড় প্রতিষ্ঠানেই তাহা থাকে; কিন্তু চালক ছিলেন তিনি। তা ছাড়া, নিজেও স্বহস্তে যত কাজ করিতেন, তাহার পরিমাণও খুব বেশী। পূর্ব্বে আধুনিক ভারতবর্ষের সব বিশ্ববিদ্যালয় কেবল পরীক্ষা করিয়া উপাধি ও সার্টিফিকেট দিত। এখন সর্ব্বত্র বিশ্ববিদ্যালয়গুলি উচ্চতম শিক্ষারও নিকেতন হইতেছে। এ-বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কাল হিসাবে সর্ব্বপ্রথম এবং কাজ হিসাবে সর্ব্বপ্রধান। এখানে যত ছাত্র যত ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যার শিক্ষা পায়, ভারতবর্ষের অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে তত ছাত্র তত বিষয়ে শিক্ষা পায় না। এখানে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও নানা বিজ্ঞানে খাঁটি গবেষণা যতটুকু হইয়াছে, ভারতের অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহা হয় নাই। ইহার জন্য প্রধান গৌরব তাঁহার প্রাপ্য যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য কোন ছাত্র ও সদস্য অপেক্ষা দীর্ঘতর কাল অধিকতর অনুরাগ, শ্রমশীলতা ও একাগ্রতা-সহকারে সেনেটর, সীণ্ডিক্ ও ভাইস্‌চ্যান্সেলার-রূপে তাহার সেবা করিয়াছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ

বিভাগ, সমিতি ও কমিটির সভাপতি ছিলেন; কিন্তু গরহাজিরী রোগ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে নাই। তিনি সর্ব্বত্রই নামে ও কাজে নেতৃত্ব করিতেন। খুঁটি-নাটি সব বিষয়েই এতটা করিবার প্রয়োজন ছিল না; এবং তাহার ফলে তাঁহার যে সময় ও শক্তি উচ্চতর কার্য্যে ব্যয়িত হইলে জাতি ও জগৎ লাভবান্ হইতে পারিত, তাহা সম্ভব হয় নাই; অধিকন্তু অন্যদের নেতৃত্বশক্তি বিকশিত হইবার যথেষ্ট সুযোগও ঘটে নাই। তাঁহার স্থানাভিষিক্ত হইবার লোকের অভাবের ইহা অন্যতম কারণ। কিন্তু আশু-বাবুর স্বভাবনেতৃত্ব, আত্মনির্ভর, আত্মবিশ্বাস ও কর্ম্মিষ্ঠতা অসামান্য ছিল বলিয়া, তিনি সময় ও শক্তি সম্বন্ধে মিতব্যয়ী ও সকল দিকে বিবেচক হইতে পারেন নাই।

অনুমান হয়, আশু-বাবুর এই উচ্চাভিলাষ ছিল, যে, কালক্রমে তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয় যেন, শুধু ভারতে নয়, পৃথিবীতেও প্রথমশ্রেণীস্থ বলিয়া পরিগণিত হয়, এবং শেষে সর্ব্বপ্রধান হয়; যদিও এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ অবলম্বিত নীতি ও উপায়সমূহ সকলস্থলে তদুপযোগী বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। আশু-বাবুর আশার ভিত্তি ছিল তাঁহার নিজের মানসিক শক্তিতে বিশ্বাস এবং তাঁহার স্বদেশ-বাসীর মানসিক শক্তিতে বিশ্বাস। এইজন্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় প্রধান প্রধান বিদ্যা ও বিজ্ঞানের, প্রত্যেকটিতে, সমুদয় না হউক, কতকগুলি অধ্যাপক ভারতীয়। অবশ্য শিক্ষাক্ষেত্রে বিদেশী জ্ঞান বা বিদেশী অধ্যাপক কিছুই বর্জ্জন করিবার পাগলামি তাঁহার ছিল না। কিন্তু তা বলিয়া, তাঁহার স্বদেশ-বাসীর মানসিক শক্তি ও জ্ঞান অবহেলিত, অবমানিত, ও অবসাদিত হইয়া ভারতীয় প্রতিভা ভগ্নোৎসাহ হইবে, ইহাও তাঁহার অসহ্য ছিল। তাহা যাহাতে না হয়, তাহার উপায়ও তিনি করিয়াছিলেন। ভারতীয় মানসিক শক্তির কার্য্যক্ষেত্র তিনি ক্রমেই বিস্তৃত করিতেছিলেন। দেশীয় প্রতিভার প্রতি তাঁহার এই আস্থা যে ভিত্তিহীন নহে, তাহাও তিনি দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি গুণজ্ঞ, গুণগ্রাহী ও গুণের উৎসাহদাতা ছিলেন,—যদিও শক্তি-শালী লোকদের শাবকবাৎসল্যের দোষ তাঁহাকেও স্পর্শ করিয়াছিল। বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপকতা ও গবেষণা-বৃত্তি আদি যে সমস্তই খাঁটি ভারতীয়দিগের জন্য বলিয়া বন্দোবস্ত আছে, তাহা অবশ্য রাসবিহারী ঘোষ ও তারকনাথ পালিত মহাশয়দ্বয়ের দানের দলিলেরই অন্তর্গত। কিন্তু এরূপ অনুমান করিবার কারণ আছে, যে, ইহাতে আশু-বাবুরও পরামর্শ ও হাত ছিল। এই উভয় দাতার প্রভূত দানও অনেকটা আশু-বাবুর চেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পাইয়াছিলেন, তাহাও সর্ব্বজনবিদিত।

খয়রা রাজার দান, এবং অন্যান্য ক্ষুদ্রতর অনেক দান আশু-বাবুরই চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয় পাইয়াছেন।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের স্বাজাতিকতা রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রকাশ পাইবার সুযোগ ঘটে নাই, তিনি আরও কিছু কাল বাঁচিয়া থাকিলে তাহা ঘটিতে পারিত। কিন্তু তাঁহার স্বাজাতিকতা সম্বন্ধে তাঁহার বন্ধুগণ নিশ্চয়ই নিঃসন্দেহ ছিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁহার স্বাজাতিকতার পরোক্ষ প্রমাণ বিস্তর আছে। কিছুর উল্লেখ উপরে করিয়াছি। আরও কিছু বলিতে পারা যায়।

ভারতবর্ষের লোকেরা প্রাচীন কালে কতটা সভ্য বা অসভ্য ছিল, স্বাধীনভাবে অপরের সাহায্যে কোন্ বিদ্যা, জ্ঞান, শিল্প প্রভৃতিতে কতটা উন্নতি করিয়াছিল, ভারতীয় সভ্যতার ও উন্নতির কোন্ স্তরের প্রাচীনত্ব কিরূপ, এই-সকল বিষয়ের আলোচনা অবশ্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাই প্রথমে করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের নিকট হইতেই আমরা প্রথমে এইসব বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিয়াছি। তজ্জন্য তাঁহারা আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। কিন্তু সকল বিষয়ে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত অবিচারিতভাবে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। আমাদের অতীতের জ্ঞানের জন্য চির-কাল পরমুখাপেক্ষী থাকা নিষ্প্রয়োজন ও অবমানজনক, এবং এমন অনেক বিষয় ও তথ্য আছে, যাহা আমরা সহজে আবিষ্কার ও উপলব্ধি করিতে সমর্থ, বিদেশী পণ্ডিতেরা নহেন। আমাদের অতীত সম্বন্ধে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি যদি কখন হয়, তাহা অনেকটা আমাদেরই দ্বারা হইতে পারে ও হওয়া উচিত। ভারতীয় অন্য মনীষীদের মত আশুতোষ এইসব কথা জানিতেন বুঝিতেন। সেই

জন্য তিনি ভারতের অতীত ইতিহাস এবং ইহার প্রাচীন সভ্যতা ও নানাবিষয়ক কৃতিত্বের অনুশীলনে ও তদ্বিষয়ক গবেষণায় খুব উৎসাহ দিতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিভাগে কেহ কেহ প্রকৃত গবেষণা করিয়াছেন। পালি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা এবং তিব্বতীয় ও চৈন ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনের সুযোগ দিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পরোক্ষভাবে পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায় হইয়াছেন। প্রাচীন সভ্যতাবিশিষ্ট কোন জাতির পুনরুজ্জীবন ও পুনর্যৌবনলাভ, অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণে, তাহার অতীত সভ্যতার জ্ঞানসাপেক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয় এবিষয়ে এপর্য্যন্ত যাহা করিয়াছেন, ভবিষ্যতে তদপেক্ষা অধিক করিলে তাহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করা হইবে।

পাশ্চাত্য শিক্ষার অনিষ্টকারিতার প্রচার খুবই হইয়াছে। তাহার মধ্যে উপভোগ্য এই, যে, প্রচারকরা নিজেই পাশ্চাত্য শিক্ষার সাহায্যে মান্যগণ্য হইয়াছেন, এবং পাশ্চাত্য ভাষারই সাহায্যে উক্ত অনিষ্টকারিতা প্রচার করিয়াছেন। যাহা হউক, এবিষয়ে আলোচনা এখন প্রাসঙ্গিক নয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার দু-একটা ভাল ফল যাহা হইয়াছে, তাহাই উপলক্ষ করিয়া একটা কথা বলিতে চাই। ভবিষ্যতে ভারতের সাধারণ ভাষা যাহাই হউক, বর্ত্তমানে শিক্ষিতদের মধ্যে ইংরেজী সাধারণ ভাষা। তদ্দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা ত হইয়াছেই, সকল বিষয়ে মানসিক আদানপ্রদান, পরস্পরকে জানিবার উপায়, রাষ্ট্রীয় ও অন্যবিধ সাধারণ প্রচেষ্টার সুসাধ্যতা, এবং ঐক্যসাধনের উপায়, প্রভৃতি হইয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বারাই আমরা আমাদের অতীতকে জানিয়া গৌরব বোধ করিতে শিখিয়াছি। তা ছাড়া, ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে কূপমণ্ডূকতা হইতে মুক্ত হইয়া জগতের চিন্তাস্রোত, প্রভাবস্রোত, কার্য্যস্রোত ও ঘটনা-স্রোতের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। এসব লাভ বড় কম লাভ নয়। দেশে শিক্ষা যত বাড়িবে, এইসব লাভ তত বেশী হইবার সম্ভাবনা বাড়িবে। লর্ড্ কার্জ্জনের বিশ্ববিদ্যালয় আইনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল উচ্চশিক্ষার বিস্তৃতি ও উন্নতিতে বাধা দেওয়া। বাংলা দেশে আশু-বাবু এই আইনটিকেই কিন্তু উচ্চশিক্ষার বিস্তৃতি ও উন্নতির উপায়ে পরিণত করিয়াছিলেন। অবশ্য ইহা সত্য, যে, বিস্তৃতির দিকে বেশী ঝোঁক্ দেওয়ায় উৎকর্ষের দিকে দৃষ্টি কম হইয়াছে; কিন্তু উৎকর্ষ যে কোন দিকেই সাধিত হয় নাই, তাহাও সত্য নয়। তা ছাড়া, ইহা স্বতঃসিদ্ধ, যে, সব জিনিষেরই উন্নতি তাহার অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি বঙ্গে রক্ষিত ও সংখ্যায় বর্দ্ধিত হইয়াছে। তাহাদের উন্নতি বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে করা যাইতে পারিবে।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য, প্রাচীন মন্দির, মুদ্রা, মূর্ত্তি, অনুশাসন প্রভৃতি জানিলেই ভারতবর্ষকে জানা হইবে না। ভারতীয় জীবনের এবং ভারতের ব্যক্তিত্বের চরম ও চূড়ান্ত অভিব্যক্তি প্রাচীন কালেই হইয়া যায় নাই। অতীত যাহা কিছু, তাহা জানা অবশ্য চাইই এবং তাহার ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয় যাহা করিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখও করিয়াছি। কিন্তু অভিব্যক্তি প্রাচীন কাল হইতে মধ্যযুগে এবং মধ্যযুগ হইতে এখন পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। ইহার পরিচয় ও প্রমাণ বাংলা সাহিত্যে এবং ভারতীয় অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যে আছে। বাংলা সাহিত্যের এবং তৎপরে অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ও তৎসংসৃষ্ট গবেষণার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় আমাদিগকে ভারতীয় জীবন ও সভ্যতার যে সর্ব্বাঙ্গীণ ধারণা লাভ করিবার সুযোগ দিয়াছেন, অন্যত্র কোথাও তাহা নাই। অবশ্য কার্য্যটির প্রারম্ভ মাত্র হইয়াছে, এবং অর্থলিপ্সুদের দ্বারা ইহার অপব্যবহারও হইয়াছে। কিন্তু সংশোধন অসাধ্য নহে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাবহারিক বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও কৃষি এবং নানা বৃত্তি শিখাইবার সূচনা হইয়া আছে। ইহার বিকাশ, বিস্তৃতি ও উন্নতি ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। ছাত্রদের স্বাস্থ্যের উন্নতি ও তদ্দ্বারা শারীরিক উৎকর্ষ-সাধনের চেষ্টার সূত্রপাতও হইয়া আছে। এই সকল বিষয়েই উপক্রম, উদ্যোগ ও সূত্রপাত আশু-বাবু করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার সম্মতি ও সহযোগিতা ব্যতীত কিছু হইতে পারিত না ও হয় নাই।

যাহা অবস্থাবিশেষে কেজো এবং অবস্থাবিশেষে

যাহা দ্বারা অর্থাগম হয়, সেইরূপ শিক্ষার বন্দোবস্তই প্রথমে ও বেশীপরিমাণে স্বভাবতই হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও সেইরূপই হইয়া আসিতেছে। ললিতকলার চর্চ্চা এদেশে এখনও বিস্তৃতভাবে খুব একটা রোজগারের উপায় হয় নাই। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবিষয়ে বক্তৃতা দিবার জন্য অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। কি অবস্থায়, কি কি কারণে ও কি কি উদ্দেশ্যে এই নিয়োগ হইয়াছে, তাহার আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। আমরা এখানে কেবল ইহার লাভের দিক্‌টাই মুখ্যতঃ দেখিব। কোন জাতিকে সর্ব্ববিষয়িণী শিক্ষা না দিলে ঐ জাতির লোকেরা সকল দিকে প্রবুদ্ধমনা ও উদ্‌বুদ্ধহৃদয় হইতে পারে না, সুতরাং প্রকৃত সভ্যপদ-বাচ্যও হয় না। তজ্জন্য ললিতকলার শিক্ষা ও অনুশীলন আবশ্যক। এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য এই, যে, যখন সাধারণভাবে ললিতকলা বিষয়ে অনুশীলন বিশ্ববিদ্যালয়ে আরম্ভ হইয়াছে, তখন সঙ্গীত, চিত্র, তক্ষণ, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য আদির শিক্ষার ব্যবস্থাও হইবে আশা করা যায়।

বিদেশী কাহারো সহিত তর্কযুদ্ধে বা পত্রব্যবহারে আশু-বাবুকে কখনও পরাজয় স্বীকার করিতে হয় নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধেও তিনি যত জানিতেন, অন্য কোন বাঙালীর ততটা জানা ছিল বলিয়া আমরা অবগত নহি। বস্তুতঃ, বিদেশী শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞদিগের সহিত তুলনা করিলে তাঁহাকে নিকৃষ্ট মনে করিবার কারণ ছিল না। এইজন্য মনে হয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দোষত্রুটিগুলি সম্ভবতঃ তাঁহার জ্ঞানাভাব হইতে উদ্ভূত নহে, অন্য কারণে ঘটিয়াছিল। তিনি যে শিক্ষণ-বিষয়ে এবং পাণ্ডিত্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি, তাহা বঙ্গের বাহিরে অন্যান্য প্রদেশেও কার্য্যতঃ স্বীকৃত হইয়াছিল।

তিনি খুব দৃঢ়চিত্ত শক্ত মানুষ ছিলেন। অনেক ঝড় তাঁহার মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে; কিন্তু তিনি তাহাতে ভগ্ন বা নত হন নাই।

আশু-বাবু বলিয়া তাঁহার পরিচয়েই বুঝা যায়, যে, তিনি বাঙালী বাবু হইয়া জন্মিয়াছিলেন, এবং শেষ পর্য্যন্ত বাঙালী বাবুই ছিলেন। সেই পরিচয়ে তিনি কখন লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। ইহা সৌভাগ্যের বিষয়, যে, তাঁহার মত মানুষ "বাবু" বলিয়া পরিচিত ছিলেন; কেন না, তাহাতে "বাবু" কথাটার অর্থের লাঘব না হইয়া গৌরবই হইয়াছে। তাঁহার অশন বসন চাল চলন সাবেকধরণের ছিল। নিজের আফিস-আদালতের কাজ ছাড়া অন্য সব কাজে ও অবস্থায় তাঁহাকে ধুতিপরিহিত দেখা যাইত। বিশ্ব-বিদ্যালয় কমিশনের বৈঠকেও তিনি ধুতি পরিয়া উপস্থিত হইতেন। তিনি অবিলাসী সাদাসিধেভাবে জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার দেশী চালচলনে অনুরাগ তাঁহার স্বাদেশিকতার অঙ্গ ছিল বলিয়া প্রতীত হয়।

এক দিকে তিনি প্রভুত্বে ও নেতৃত্বে অভ্যস্ত শক্ত লোক ছিলেন বটে, কিন্তু অন্য দিকে সাবেককালের ভদ্র বাঙালীর একটি গুণ তাঁহার ছিল যাহা আজকালকার দিনে খুব সুলভ নহে। তিনি সকল অবস্থার সকলরকমের লোকের সহজে অধিগম্য ছিলেন। কোন কোন বড় লোকের, এমন কি খুব পরিচিত বড় লোকেরও, বাড়ীতে গিয়া দেখিয়াছি, বাড়ীর কর্ত্তার সঙ্গে দেখা করিতে গেলে বাড়ীর দারোয়ান বা অন্য চাকর এমনভাবে তাকায় ও কথা বলে, যেন একটা ভিখারী বা হ্যাংলা উমেদার আসিয়াছে। আশু-বাবুর বাড়ীতে কোন-না কোনপ্রকারের সাহায্যপ্রার্থী ও উমেদার খুব বেশী যাইত, কিন্তু তিনি বাড়ী থাকিলে সকলে অনায়াসে অবিলম্বেই দেখা পাইত। তিনি সকলের কথাই মন দিয়া শুনিতেন, এবং উপায় ও সাধ্য থাকিলে সাহায্য বা উপকার করিতে বিমুখ হইতেন না। হাল্ ফ্যাশনের "চেষ্টা করিব" বলিয়া ফাঁকি দিবার ও পরমুহূর্ত্তেই ভুলিয়া যাইবার অভ্যাস তাঁহার ছিল না। এই কারণে, বোধ হয়, বাংলা দেশে শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী লোকদের মধ্যে তাঁহার নিকট হইতে কোন-না কোনপ্রকারের সহায়তা ও উপকার যত লোক পাইয়াছেন, অন্য কোন লোকের নিকট হইতে তত নহে। মৎলবী ও তোষামোদকারী লোকেরা তাঁহার সহৃদয়তার অপব্যবহার করিয়াছে, তাহা স্বীকার্য্য; কিন্তু তাঁহার গুণটির অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না।

নিজের পরিবারের মধ্যে তিনি খুব স্নেহশীল ছিলেন। লক্ষ্মীস্বরূপা তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা বিধবা হইবার পর তিনি আবার তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহাকে অতি নীচ ও অভদ্ররকমের নানা আক্রমণ সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাহাতে তিনি অটল ছিলেন। দুঃখের বিষয় এই কন্যাটি আবার বিধবা হন এবং পিতার মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বে গতাসু হন। তাঁহার শোকে মুখোপাধ্যায় মহাশয় কাতর হইয়াছিলেন।

তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু অবগত নহি। তিনি অন্য অনেক শিক্ষিত হিন্দুর মত প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার অকপটতায় সন্দেহ করিবার মত আমরা কিছু অবগত নহি। কিন্তু ইহা বলিলেও বোধ হয় তাঁহার প্রতি কোন অবিচার করা হইবে না, যে, তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস সম্ভবতঃ তাঁহার স্বাজাত্যিকতারও অঙ্গ ছিল।

সত্যের অপলাপ না করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে সময়োচিত যাহা বলা যায়, আমরা তাহাই আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। তাঁহার জীবন, কার্য্য ও চরিত্রের সমালোচনা ভবিষ্যতে নিরপেক্ষ জীবনচরিতলেখক ও ঐতিহাসিক করিবেন।

—

লী কমিশনের রিপোর্ট্

ভারতবর্ষে ইংরেজরা যেসব বড় চাকরী করে, তাহার বেতন জাপান ও পাশ্চাত্য ধনী দেশ-সকলে ঐসব শ্রেণীর চাকরীর বেতন অপেক্ষা যুদ্ধের আগেও বেশী ছিল। তাহার পর যুদ্ধের সময়ে ও ভারতশাসন-সংস্কার-আইন জারী হইবার পর এই-সব কর্ম্মচারীদের পাওনা বেশ বাড়ে। কিন্তু তাহারা তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া আবার আন্দোলন করিতে থাকে। তজ্জন্য একটি কমিশন বসে। লর্ড্ লী তাহার সভাপতি ছিলেন বলিয়া উহা লী কমিশন বলিয়া পরিচিত। কমিশন ঐ চাকুরেদের পাওনা, পেন্শন্-আদি আবার বাড়াইয়া দিতে বলিয়াছেন। আন্দোলনকারী ভারতীয়দের মুখ বন্ধ করিবার নিমিত্ত কমিশন বলিয়াছেন, যে, সিভিল্ সার্বিস্ প্রভৃতি বড় চাকরীতে ভারতীয়ের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া ১৫ বৎসর পরে শতকরা ৫০ জন হইবে। কিন্তু তাহার পর ভারতীয়ের সংখ্যা ও অনুপাত কেন যে বাড়িবে না ও কালক্রমে কেন যে সব সরকারী চাকরীই ভারতীয়েরা নিজের দেশে পাইবে না, এবং অর্দ্ধেক পাইতেই বা কেন ১৫ বৎসর লাগিবে, তাহার কোন কারণ কমিশন দেখান নাই।

কমিশন আরো বলেন, হস্তান্তরিত বিভাগগুলিতে যে-সব অফিসার চাকরী করে, তাহাদের নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রীরা করিবেন, কিন্তু রিজার্ভ্‌ড্ অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের হস্তে রক্ষিত বিভাগগুলিতে অফিসারদের নিয়োগ-নিয়ন্ত্রণাদি ভারত সচিবের হাতে থাকিবে। কিন্তু ভারতের সকলদলের রাজনৈতিকেরা একবাক্যে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টে সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব চাহিতেছে। তাহা না হইলে কেহ সন্তুষ্ট হইতে পারে না; কিন্তু তাহা হইলে সব বিভাগই হস্তান্তরিত হইবে। তখন ত প্রদেশসকলের কার্য্যে ব্যাপৃত সমুদয় অফিসারেরই নিয়োগনিয়ন্ত্রণাদি মন্ত্রীদের হাতে যাওয়া চাই।

যাহা হউক, সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় কমিশনের রিপোর্টের আলোচনা হইবার আগে কিছু করা হইবে না, ইহা হইতে যদি কেহ কিছু সান্ত্বনা লাভ করিতে পারেন, ত করুন।

—

আমদানী লৌহ ও ইস্পাতের উপর শুল্ক

ভারতবর্ষে না প্রস্তুত হইতে পারে, এরূপ দ্রব্য সভ্য জগতে খুব অল্পই ব্যবহৃত হয়। শুধু সুযোগের অভাবেই এদেশের স্বাভাবিক সম্পদ্ অব্যবহৃত বা পরহস্তগত হইয়া পড়িয়া আছে। এবং আমাদের দেশবাসীরাও পরের কথায় ভুলিয়া ভুল বিশ্বাসের বশবর্ত্তী ও নিষ্কর্ম্মা হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা ভাবিতেছেন, যে, এদেশে শুধু চাষবাস করাই সম্ভব, কলকারখানা এদেশে সাজে না ও সম্ভব নহে। বস্তুতঃ এই-ভুল ধারণার মূলে আছে শুধু অপরদেশীয় ব্যবসাদারের মিথ্যা প্রচার,—আমাদের চিন্তাশক্তিবিহীন জড় ভাব, ও শিক্ষার অভাব। এই দেশে না উৎপন্ন হইতে পারে এরূপ খুব অল্প জিনিসই এই দেশে আমদানি হয়, এবং সুবিধা পাইলে ভারতের মত বিবিধ সম্পদ্‌শালী অল্প দেশই হইতে পারে। আমাদের এই যে বর্ত্তমান দারিদ্র্য ইহার প্রধান কারণ স্বাভাবিক সম্পদের অভাব নহে। প্রকৃতি আমাদের অনেক দিয়াছেন, কিন্তু আমরাই অজ্ঞতা ও জড়তার দাস হইয়া সকল ঐশ্বর্য্য অব্যবহৃত রাখিয়া দারিদ্র্যে ডুবিয়া রহিয়াছি।

একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে, যে,মানুষ যত-প্রকার দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহার মধ্যে অধিকাংশই শুধু প্রকৃতির দান নহে। উর্ব্বরা জমি থাকিলেই ফসল পাওয়া যায় না। বৃক্ষ কর্ত্তন করিয়া তাহা হইতে আসবাব প্রস্তুত করিয়া না লইলে, বৃক্ষসম্ভব ঐশ্বর্য্য অরণ্যে রোদনই করিবে, মানুষের কাজে লাগিবে না। গভীর খনিতে ধাতু অথবা হাওয়াতে নাইট্রোজেন্ কিছুই মানুষের সম্পদ্ বলিয়া গণ্য হইবে না, যতক্ষণ না মানুষ নিজ পরিশ্রমে তাহাকে সম্পদের রূপ দান করিবে। এইরূপে দেখা যাইবে, যে, মনুষ্য-সমাজে যাহা-কিছু ঐশ্বর্য্য বলিয়া গণ্য হয়, সকলেরই মূল

প্রকৃতিতে, কিন্তু প্রায় কোনটিই মানুষের শ্রম ব্যতীত বাস্তবিক ঐশ্বর্য্য বলিয়া গণ্য হয় না।

আমরা ভারতবর্ষে কতপ্রকার দ্রব্য নিত্য ব্যবহার করি, তাহা একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। কাঁচি, ছুরি, আলো, বাতি, ঔষধ, সূচ, সূতা, কাগজ, পেরেক, স্ক্রু, তার, কড়ি, বর্গা, জুতা, বোতাম, কাঁচ, চিনামাটি ও এনামেলের দ্রব্য, দেশালাই, ছাতা, ছড়ি ইত্যাদি নানানপ্রকার দ্রব্য ত সর্ব্বদা সর্ব্বঘটে ব্যবহৃত হইতেছে। তাহা ব্যতীত সকললোকই রেল-গাড়ী, ষ্টিমার, ট্রাম, ট্যাক্সী, প্রভৃতির সাহায্যে স্থান হইতে স্থানান্তরে গমনাগমন করিতেছেন। সর্ব্বত্রই লৌহের যন্ত্রপাতি সাক্ষাৎ- বা পরোক্ষভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। এবং দেশকে উন্নত ও সম্পদশালী করিতে হইলে আরও অধিকপরিমাণে সকলপ্রকার দ্রব্য উৎপাদন করিতে হইবে। আধুনিক জীবনযাত্রার দোষ-গুণ যাহাই থাকুক না কেন, ইহা মানুষকে নানান্‌-রূপে উন্নত করিয়াছে; অবনতও করিয়াছে। কিন্তু তাহা বিশেষ করিয়া আধুনিক জীবনযাত্রারই ফল, ইহা কেবল একশ্রেণীর "দার্শনিকদের" বিশ্বাস, প্রমাণিত সত্য নহে।

আধুনিক জীবনযাত্রার জন্য যতপ্রকার দ্রব্য প্রয়োজন হয়, তাহার মধ্যে খাদ্য ও বস্ত্র অন্যতম; কিন্তু সমস্ত নহে। খাদ্য ও বস্ত্র যদি আধুনিক জীবনে একফুট উচ্চ স্থান লাভ করে তাহা হইলে অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমুদয় মিলিয়া প্রায় দশ ফুট উচ্চ স্থান অধিকার করিবে। সভ্যতার চিহ্ন শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ। এই সর্ব্বাঙ্গীণ উৎকর্ষের জন্য যেপরিমাণ ও যতপ্রকার দ্রব্যের প্রয়োজন তাহার মধ্যে খাদ্য ও বস্ত্র অতি ক্ষুদ্র স্থানই পাইবে। খাদ্য ও বস্ত্রও উপযুক্তপরিমাণে ও -প্রকারে পাইতে হইলে নানা-প্রকার যন্ত্রপাতি ও কলকব্জার ব্যবহার প্রয়োজন।

এবিষয়ে অধিক কথা না বলিয়া বর্ত্তমানে কেবল ইহাই বলা দরকার যে, বর্ত্তমান জীবনের বৈচিত্র্য ও বৈভবের মূলে রহিয়াছে মানুষের সমুদয় প্রাকৃতিক শক্তি কাজে লাগাইবার সামর্থ্য। মানুষ ক্রমে ক্রমে এমন-একটি যুগ আনয়ন করিতে চায় ও তজ্জন্য চেষ্টা করিতেছে, যখন সকল মানুষ অল্পায়াসে বৈভব ও বৈচিত্র্যময় জীবন যাপনে সক্ষম হইবে এবং মানুষের অবসর যতই বৃদ্ধি পাইবে ততই সে শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ বিষয়ে মনোযোগী হইতে সক্ষম হইবে। ফলে যে অতিমানবের যুগ আমরা কল্পনা করিয়া আনন্দ পাই, সেই অতিমানব পৃথিবীতে আসিবে ও মানবীয় সভ্যতা আর-এক পদ শ্রেষ্ঠত্বের দিকে অগ্রসর হইবে।

এই কল্পনা বা স্বপ্নের রাজপথ প্রকৃতি-"জয়" এবং নবনব যন্ত্রের উদ্ভাবন। আমরা চাই উত্তম জীবন-ধারণের পক্ষে যথেষ্ট বাস্তব ঐশ্বর্য্য। ইহা "শ্রেষ্ঠত্বের" দিকে অগ্রসর হইবার উপায় মাত্র, ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য নহে। এই দারিদ্র্য, দুঃখ, অকাল-বার্দ্ধক্য, অজ্ঞতা, জড়তা, দাসত্ব, কুসংস্কার, উদ্দেশ্য-ও আদর্শ-হীনতা প্রভৃতি বহুল দোষের লীলাভূমি ভারতবর্ষের এখনও এমন দিন আসে নাই, যে, আমরা "বাস্তব ঐশ্বর্য্য আর চাই না" বলিতে পারি। বাস্তব ঐশ্বর্য্য লাভের সঙ্গে-সঙ্গে যদি আমরা আমাদের উচ্চতর আদর্শগুলি সম্মুখে রাখি, তাহা হইলে যথেষ্ট ঐশ্বর্য্য পাইবার পর আমাদের মুখ ফুটিয়া বলিতে হইবে না, "আর চাই না"। আমরা "কার্য্যেই" আর চাহিব না। অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের ঐশ্বর্য্য-উৎপাদন-চেষ্টা কমিয়া আসিবে ও উৎকর্ষের দিকে উৎসাহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে।

মানুষের এই যে প্রকৃতি-"জয়"-চেষ্টা, ইহার প্রধান অস্ত্র বর্ত্তমানে লোহ ও ইস্পাত। অনেকে বর্ত্তমান সভ্যতাকে যান্ত্রিক সভ্যতা ও বর্ত্তমান সময়কে ইস্পাতের যুগ বলিয়া থাকেন। কারণ, ইস্পাতের উপরই আমাদের সকল ঐশ্বর্য্য-উৎপাদন ও সকল ক্ষমতা বিশেষরূপে নির্ভর করে। সকল-প্রকার যন্ত্রই মূলত ইস্পাত-নির্ম্মিত। এই কারণে আমাদের দেশে ইস্পাতের কারবার যাহাতে ভাল করিয়া গড়িয়া উঠিতে পারে, তাহার বিশেষ চেষ্টা বহুকাল হইতে হইয়া আসিতেছে। বড় বড় কারখানা কয়েকটি স্থাপিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে তাতার লৌহ ও ইস্পাতের কারখানাই সর্ব্বপ্রধান।

কিছুদিন পূর্ব্বে এদেশে একটি "কমিশন্" বসিয়াছিল। তাহার উদ্দেশ্য ছিল, কিভাবে ভারতীয় কারখানা ও কারবারগুলিকে উন্নত করিয়া তোলা যায়, তাহা স্থির করা। দেশীয় কারখানা ও কারবারগুলিকে উন্নত করিবার একটি উপায় তাহাদিগকে বাহিরের কারখানাদারের প্রতিযোগিতার হস্ত হইতে সাময়িক ভাবে রক্ষা করা। অর্থাৎ প্রথম প্রথম দেশীয় কারখানাগুলিকে একটু জিয়াইয়া রাখিলে তাহারা একটু জোর পাইলে পরে নিজ হইতেই আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়া উঠিবে। আমাদের দেশে এই সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করা হইবে কি না বিচার করিয়া উপরোক্ত কমিশন স্থির করেন, যে, যদি কোন কারবার এই দেশের পক্ষে বিশেষরূপ উপযুক্ত হয় ও প্রথমে সংরক্ষিত হইলে পরে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইবে বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে সেই কারবারকে বাহিরের প্রতিযোগিতা হইতে সাময়িকভাবে রক্ষা করিবার জন্য সেই কারবারজাত দ্রব্য বাহির হইতে আমদানি যাহাতে সহজে না হয় এবং হইলেও যাহাতে আমদানীকৃত দ্রব্যের মূল্য অল্প না থাকিতে পারে, তজ্জন্য তাহার উপর শুল্ক বসাইতে হইবে। ইহা ব্যতীত

সাক্ষাৎভাবে এদেশে উক্ত দ্রব্য উৎপাদককে অর্থ সাহায্যও করা যাইতে পারে।

এই বিচারের পরে একটি "বোর্ড্" নিযুক্ত করা হইল কোন্ কোন্ কার্‌বার সাহায্য লাভের যোগ্য, তাহা স্থির করিবার জন্য। বোর্ডের নিকট লৌহ ও ইস্পাতের কার্‌বারগুলি এইরূপ সাহায্য দাবী করে। দাবীদারদিগের মধ্যে প্রধান ছিল তাতার লৌহ ও ইস্পাতের কার্‌খানা। ইহাদের বিরুদ্ধে আবার অযথা বিদেশী লোককে অধিক বেতন দিয়া নিয়োগ করা প্রভৃতি নানা-প্রকার অভিযোগ ছিল। সে যাহা হউক, এই কথা বোর্ডের নিকট উঠিবা মাত্র এংলো-ইণ্ডিয়ান্ ধনিক-মহলে ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। "গেল বুঝি আমাদের সস্তা দামে মস্ত গাধা কেন্‌বার পথ বন্ধ হ'য়ে" ভাবিয়া এংলো-ইণ্ডিয়ান্ ধনিকের মস্তকে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। পাটকল ও চা-বাগানের প্রভুদের বিশেষ ভয় হইল, তাহাদের যন্ত্রপাতির দাম বাড়িয়া বুঝি বা "ডিভিডেণ্ডে" ঘা লাগিল। অপর কার্‌বারকে সাহায্য করিবার জন্য সমৃদ্ধিশালী কার্‌বারকে বোঝাগ্রস্ত করার অর্থনৈতিক নির্ব্বুদ্ধিতা সম্বন্ধে বড় বড় প্রবন্ধ বাহির হইতে লাগিল; যদিও সামাজিক অর্থনীতির দিক্ দিয়া দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির খাতিরে ঐশ্বর্য্যশালী কার্‌বারের নিকট সাহায্য আদায় কিছুমাত্র নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক নহে। প্রত্যহ সর্ব্বদেশে এইরূপই হয়। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও দেখা যায়, যে, দেশের গভর্ণমেণ্ট্ চালাইবার জন্য ধনীই দরিদ্র অপেক্ষা অধিক কর দিয়া থাকে।

কিন্তু এংলো-ইণ্ডিয়ানের এই আন্দোলনের ফল ফলিয়াছে। দেখা যাইতেছে, যে, যে-রূপ ভাবে লৌহ ও ইস্পাতের কার্‌বারগুলিকে সাহায্য দেওয়া যাইবে স্থির হইয়াছে, তাহাতে পাটকল ও চা-বাগানের প্রভুদের বিশেষ কিছু অতিলাভের ব্যাঘাত হইবে না। ভারটা পড়িবে প্রধানত "রেলওয়ে"গুলির উপর। অর্থাৎ রেলযাত্রী ও রেলে যাহারা মাল পাঠায় তাহাদের উপর। তাহারা প্রধানতঃ কাহারা তাহা লিখিয়া বলিতে হইবে না।

ইস্পাতের উপর নূতন সংরক্ষণ নিয়োগের ফলে "বীম" "এঙ্গ্‌ল্" ও "চ্যানেল্"এর উপর শতকরা ২০, "প্লেটের" এর উপর শতকরা ৩০ এবং "করুগেটেড" ও গ্যালভ্যানাইজ্‌ড্"-এর উপর শতকরা ১৫ শুল্ক বসিল। ইহা ব্যতীত "রেল" ও "ফিশপ্লেট্" প্রস্তুত-কারক টন প্রতি ৩২৲ টাকা (১৯২৪—২৫ খৃঃ অঃ-তে) হইতে নামিয়া টন প্রতি ২০৲ টাকা (১৯২৬—২৭-এ) অবধি সাক্ষাৎ সাহায্য লাভ করিবেন। যে-ভাবেই হউক টাকাটা দিবে হয় উক্ত দ্রব্যসকলের ক্রেতা, অথবা "গবর্ণ্‌মেণ্ট্" অর্থাৎ জনসাধারণ। পাটকল ও চা-বাগান আরামে অর্থোপার্জ্জন করিতে থাকিবে এবং তাহাদের মালিকরাও শেষ জীবনে বহু অর্থ সঙ্গে করিয়া "হোমে" গমন করিতে থাকিবে। অ

সমুদ্রের চিঠি

আজ ৭ দিন থেকে আমরা সমুদ্রে ভাস্‌ছি। এমন চমৎকার আরামে সমুদ্রযাত্রা আর কোনো দিন করিনি। হুপ্-হুপ্ করে' জলের আওয়াজ্ হচ্ছে আর তার তালে তালে নৌকাখানা নাচ্‌তে নাচ্‌তে চলেছে। সামুদ্রিক হাঁসেরা আগে পিছে চারিদিকে আমাদের বারংবার প্রদক্ষিণ করে' গান গেয়ে বেড়াচ্ছে, কখনও ক্লান্ত হ'য়ে সমুদ্রের ঢেউয়ের উপর গিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসছে এবং একটা বড় ঢেউ এলে উড়ে' সেটা পার হ'য়ে আর একটা ঢেউয়ের খাঁজের মধ্যে গিয়ে বস্‌ছে। ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ুক্কু মাছ জাহাজের জলের তাড়নায় জাহাজের নিকট থেকে দূরে উড়ে' উড়ে' চলে' যাচ্ছে, তাদের ডানাগুলো বেশ সুন্দর সাদায় কালোয় মেশানো চমৎকার দেখাচ্ছে। মাঝে মাঝে দল বেঁধে' শুশুকেরাও ডুব খাচ্ছে। কোনও কোনও জায়গায় বা রাশীকৃত স্পঞ্জ্ ভেসে ভেসে আসছে—এটা এই লোহিত সাগরেরই বিশেষত্ব চারিদিক্ জলে জলময়—গাঢ় নীল জল। এই গাঢ় নীল জলের উপর রোজই চন্দ্র-সূর্য্যের উদয়-অস্তের খেলা চল্‌ছে, গ্রহ-তারকার খেলা চল্‌ছে। উপরে অনন্ত আকাশে অন্তহীন জ্যোতিষ্কদের আনন্দ-বিহার চল্‌ছে, আর নীচে দিগন্তপ্রসারিত সমুদ্রের বক্ষে আলোকের ঝলকে ঝলকে শুভ্রফেন-মালা নাচ্‌তে নাচ্‌তে চলেছে।

সমুদ্রের কথা ভাব্‌লে মানুষের মন অবশ ও নিস্পন্দ হ'য়ে আসে; এইরকম নিস্পন্দ হ'য়ে আস্‌বার সময় মনে যে ভাব হয় তাকে ইংরেজীতে বলে sublimity; একথাটার কেন যে ভাল বাঙ্গলা নেই তা বল্‌তে পারিনে, কারণ ভাব্‌টা আমাদের মনে যথেষ্টই আসে। একে ঠিক সুন্দর বলা যায় না; একে বলা যায় মহান্, উদার, বৃহৎ-অনন্ত; অথচ এ কথাগুলির কোনওটিতেই ভাবটি প্রকাশ হয় না। সৌন্দর্য্য বলি তখনই যখন আমাদের মন মুগ্ধ হয় কিন্তু অভিভূত হয় না, চিত্ত-বৃত্তি উত্তেজিত হয় কিন্তু অবশ অসাড় হয় না। কিন্তু যাকে sublimity বলা যায় সেটা হচ্ছে একটা "মনকারা"

যাওয়ার ভাব। আমাদের দেশে এই ডুবে' যাওয়ার ভাবটার প্রতি চিরকালই একটা গভীর শ্রদ্ধা দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তাই সমুদ্রের সঙ্গে ব্রহ্মের উপমা আমাদের দেশের ধর্ম্ম ও দর্শন গ্রন্থে প্রায়ই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। জ্ঞানের উন্মেষের দিক্ দিয়েই হোক্, কি প্রবল ইচ্ছাশক্তির আত্ম-সংযমের দিক্ দিয়েই হোক্, মানুষ যে তাকে ভুলে' যেতে পারে এইটিই চিরকাল ধরে' আমাদের দেশে একটি চরম সত্য বলে' গৃহীত হ'য়ে এসেছে। উপনিষদ্ যে আত্মাকে পাওয়ার জন্য ব্যগ্র হয়েছেন, সে ত আমাদের প্রাত্যহিক ক্ষুৎপিপাসার চঞ্চল আত্মা নয়, সে যে আত্মা তার সঙ্গে সাধারণভাবে আমাদের একেবারে পরিচয়ই যেন নেই বল্‌তে হবে। উপনিষদের আত্মার কোনোও ইন্দ্রিয়ের লেশ নেই "অশব্দমস্পর্শম্ অরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধমর্চ্চয়ৎ," শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ কিছুই নেই সেখানে। সে হচ্ছে অনাদি এবং অনন্ত। এই ব্রহ্মকে নাকি কথায় পাওয়া যায় না চক্ষুতে দেখা যায় না, মনে পাওয়া যায় না। এর সম্বন্ধে খালি বলা যায় 'আছে' আর কিছুই বলা যায় না। "নৈব বাচান মনসা প্রাপ্তুং শক্যেন চক্ষুষা 'ইত্যাদি উপনিষদের কথাগুলো নিয়ে নানা-রকম ব্যাখ্যা হ'য়ে কত বিভিন্ন পন্থার বেদান্ত দর্শনের মত উঠেছে, কত কথা কাটা-কাটি চলেছে।

আর-এক পন্থায় দেখ যোগদর্শন উঠেছে। যোগী বল্‌ছেন যে চরম পন্থা হচ্ছে এই যে মনের নড়া-চড়া একেবারে বন্ধ করে' এক জায়গায় তাকে বন্ধ করে' রাখ্‌তে হবে। জায়গাটার পরিমাণ ক্রমশঃ সইয়ে সইয়ে কমিয়ে আন্‌তে হবে, তাই স্থূল থেকে সূক্ষ্মতর বস্তুতে মনকে সইয়ে সইয়ে আবদ্ধ করে' রাখ্‌তে হয় যাতে এমন অবস্থা আস্‌তে পারে যে তার চিরকালের দৌড়-ঝাঁপের প্রবৃত্তিটা একেবারে বন্ধ হ'য়ে যায়; এইরকম অবস্থাটা পাকা হ'য়ে এলে তাকে একেবারে তার সূক্ষ্মতম জায়গাটি থেকেও সরিয়ে এনে শূন্যে ছেড়ে দিয়ে নিরালম্ব করে' রাখ্‌তে হবে। তা হ'লে মনের দফা একেবারে রফা হবে, মন একেবারে ধ্বংস পাবে, আর সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি যে তার সঙ্গে ধ্বংস পাবে সেত পাবেই, তার আর কথা কি, থাকবে খালি চিন্ময় আত্মা। সে যে কি থাকা, আর সে যে কি চৈতন্য তা "দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।"

ভক্তি-সম্প্রদায়ের যাঁরা তাঁরা চান ভক্তিতে ভাবেতে একেবারে আত্মহারা হ'য়ে একেবারে কৃষ্ণানন্দে ডুবে' যাওয়া। আমরা জানি শ্রীচৈতন্য এম্‌নি ভাবাবেশে সমুদ্রের জলে হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলে' ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। যতরকম আত্মহারা ভাব আছে তার মধ্যে "আনন্দে আত্মহারা" জিনিষটা শুনতে ভাল শোনায়। কিন্তু তথাপি সেই আপনাকে হারাতে হবে এই সেই পুরানো কথাই গিয়ে শেষে দাঁড়াল।

আমরা যখনই আমাদেরকে সমুদ্রের সাম্‌নে ছেড়ে দিই, আর থই পাইনে, ডাঙায় বসে' কেবলই অতল জলে ডুব্‌তে থাকি। এর একটা প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে আমাদের মনের চল্‌বার একটা প্রধান উপায়ই হচ্ছে তার বিষয়ের বৈচিত্র্য। চিন্তার স্রোতের পদ্ধতিই হচ্ছে এই যে সে কতকগুলির সহিত অপর কতকগুলির সাদৃশ্যে কি বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করে এবং কতকগুলি সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যের উপর ভর করে' অপর কতকগুলি নূতন বিষয়ে গিয়ে পৌঁছায়। রাতদিনই তার ভাঙাগড়ার, আর ঘরকন্নার ঠোকা-ঠুকি চল্‌ছে। মনের কোনো বিশ্রাম নেই, তার কাজই হচ্ছে সর্ব্বদা এই গোছ-গাছের কাজে লেগে থাকা। এই গোছগাছের পক্ষে সব চেয়ে বড় কথা হ'ল এই যে নানা জিনিষ পাওয়া চাই, কারণ এই গোছানর প্রধান মন্ত্রই হচ্ছে মিল-গরমিলের সূত্রধরা। তাই অনন্ত আকাশ কি সীমাহারা সাগরকে যখন মন আঁকড়ে ধর্‌তে চায় তখনই সে পায় এক ঘেয়ে নীল জল, নয় এক ঘেয়ে নীল রঙ, বৈচিত্র্যের অভাবে তার গোছানর কাজ বন্ধ হ'য়ে আসে; ইন্দ্রিয়েরা অবশ হ'য়ে পড়ে, তারা তার সাম্‌নে নূতন নূতন বিষয়ের ভোগ এনে ধর্‌তে পারে না, তাই মনের কাজ বৈচিত্র্যের অভাবে বন্ধ হ'য়ে আস্‌তে চায়, ইন্দ্রিয়গুলি নিস্পন্দ হ'য়ে আস্‌তে থাকে আপনা-আপনি মনের কাজ যখন বন্ধ হ'য়ে আস্‌তে থাকে। ইন্দ্রিয় যখন নিস্পন্দ হ'য়ে আসে তখনই তার ফলে একটা অবশ আত্মহারা ভাব আসে, সে উপলব্ধির মধ্যে একটা মহত্ত্ব বৃহত্ত্ব, একটা উদার গম্ভীর ভাব আছে, সেই ভাবটিকেই ইংরেজীতে বলে Sublimity. যোগ সাধন ধ্যান প্রভৃতি বিবিধ সাধন পদ্ধতিতে বলপূর্ব্বক মনকে একস্থানে স্থির কর্‌বার চেষ্টা থাকে; বাহির হ'তে এই স্থিরতাটি মনের মধ্যে আবিষ্ট হ'তে পারে না, তাই সেখানে এই Sublimityর ভাবটি তেমন থাকে না, খালি একটি তলহীন নিরালম্ব ভাব ভেসে ওঠে;

সমুদ্রকে যখন আমরা এম্‌নি করে' সাম্‌নে নিয়ে বসি, যেন মনে হয় সফেন গভীর কালো জলে ঝাঁপিয়ে পড়ি। যেন কি এক অজ্ঞাত আকর্ষণ ঐ ফেনমণ্ডিত গভীর নীল পয়োধিনীরের দিকে আমাকে টান্‌তে থাকে। আপনাকে ভুলে' যাই, নিজের সত্তা ভুলে' যাই। যেন কি-এক অনন্তের টান এসে আমাকে টেনে নিয়ে যেতে চায়। কোথায় যাচ্ছি, কি কাজ, দেশকাল সব ভুলে' যাই। এটা যেন অনেকটা সংজ্ঞাহীন ভাব, যেন একটা মূক ভাষাহীন অবোধ আকর্ষণ। পতঙ্গ যখন বহ্নিমুখে ধাবিত হয় সেও যেন একটা এই-রকমের উন্মাদ আকর্ষণে।

ঐ যে বড় বড় ঢেউগুলি সাদা টুপি পরে' নাচ্‌তে নাচ তে আস্‌ছে, কত সময় এই রেলিংএর উপর মাথা

দিয়ে ভেবেছি যেন ঐ ঢেউয়ের সঙ্গে মিশে' গেছি, যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত চিন্তা-প্রবাহ রুদ্ধ হ'য়ে এসেছে। বুকের কপাটে ধক্ ধক্ করে' রক্ত-স্রোতের আঘাত অনুভব করেছি, আতঙ্কে সরে' এসেছি, মুগ্ধ মন জেগে উঠেছে, সমুদ্রের ভয়ে দূরে পালিয়ে গেছি।

মন যখন গোছগাছ নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকে তখন ভাবা যায় তাই ত এমন ব্যস্ত গৃহিণীকে একলা পাওয়া গেলে তবেই একে পেতে পারতুম—একে একলা নিরালা স্থির হ'য়ে কখন পাই। স্থির হ'য়ে যখন পাবার অবসর ঘটে তখন দেখি যে কর্ম্মপরায়ণাকে অন্বেষণ কর্‌ছিলুম নৈষ্কর্ম্ম্যের দ্বার দিয়ে তিনি কোথায় সরে' পড়েছেন, বদলে যাকে রেখে গেছেন তাঁর সঙ্গে সঙ্গ কর্‌বার জো নেই। তাঁকে পেতে হ'লে আপনাকে খুইয়ে অসঙ্গ হ'তে হবে।

কতকগুলি ভক্তসম্প্রদায় বাদ দিলে আর বাকী প্রায় সমস্ত হিন্দুসাধনা আমাদের এই অরূপের রূপ-সাগরে ডুব দিতে বল্‌ছেন। এই অরূপকে পাওয়া আত্মনাশ কি আত্মপ্রাপ্তি বোঝা শক্ত। উপনিষদ্ বল্‌ছেন এর নাম আত্মপ্রাপ্তি, কিন্তু বৌদ্ধ বল্‌ছেন এর নাম নির্ব্বাণ। কিন্তু নির্ব্বাণই বলুন আর নাশই বলুন বৌদ্ধও বল্‌ছেন যে এই অবস্থাটিই আমাদের চরম উপেয়; এইখানেই সমস্ত জীবন-প্রবাহের লয় ও চরম সার্থকতা। এই মনোহরণপুর থেকে যে আমরা নানা সময় ডাক পাচ্ছি, আহ্বান পাচ্ছি, সাড়া পাচ্ছি একথা যারা ভাবুক, তারা কখনও অস্বীকার কর্‌তে পারে না। এর সত্তা এবং ডাক আমি চোখে দেখেছি এবং কাণে শুনেছি; অথচ এর স্বরূপ কি তা আমি জানিনে। মন এখানে হারিয়ে যায় তাই একে আমি "মনোহরণপুর" বল্‌ছি, এবং মন হারিয়ে যায় বলে'ই এর সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না।

যতক্ষণ মনের রাজ্য, ততক্ষণই চাঞ্চল্য। যাকে আমরা চলিত কথায় বলি মন স্থির করা, সে আর কিছুই নয় একজাতীয় বস্তুপরম্পরার সঙ্গে ব্যবহার কর', মনকে নানা বিষয়ের টানে লক্ষ্যহীনভাবে ছেড়ে না দেওয়া। কিন্তু মনের নড়া-চড়া বন্ধ করে' দিলে, মন হারিয়ে যায়, ফলে হয় সুষুপ্তি নয় সমাধি। এই অবস্থার কথা মনে জাগ্রত অবস্থার কথা দিয়ে বোঝান যায় না, কারণ সে অবস্থায় মন ঘুমিয়েছে এবং মনের লয় হয়েছে। "মনোহরণপুরে" মন নেই, তাই সেখানকার কথা মন বল্‌তে পারে না। মনের কাজ আমাদের কাছে তখনই চলে যতক্ষণ আমাদের জাগ্রত জ্ঞান তার সাম্য-বৈষম্য নিয়ে হাঁ-না নিয়ে কাজ চালাতে থাকে। এই "মনোহরণপুরের" সঙ্গে মনের যে একটা সম্বন্ধ আছে তাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সে সম্বন্ধ যে কিজাতীয় তা বলা কঠিন। শাস্ত্র বল্‌ছেন যে সেই মনোহরণপুরের যে তত্ত্ব সেইটিই হচ্ছে মূলপরমার্থ আর মনোরাজ্যের যত খেলা সব মায়া। আমাদের চরম উপেয় হচ্ছে সেই মনোহরণপুরের তত্ত্ব; সেইটিই যথার্থ সত্য। এইখানে আমার মন বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে। যাতে আমরা সর্ব্বদা আছি তাতে আমাদের মন সন্তুষ্ট থাক্‌তে চায় না। তাই আমরা দেখ্‌তে চাই যে এই চাঞ্চল্য থেকে কোথাও বিশ্রাম পাওয়া যায় কি না; মনোহরণপুরের অতল বিশ্রাম আমাদের চিত্তকে আকর্ষণ করে, তাই এই তত্ত্বটি আমাদের মনীষীদের কাছে এত সমাদর পেয়েছে, যে তাঁরা খালি এইটিকেই সত্য বলে' মনে করেছেন।

কিন্তু আমার মন আমায় বলে' যে কেন আমরা এই তত্ত্বকে চরম উপেয় ও সত্য বলে' মান্‌ব। ডুবে' যাওয়া লয় পাওয়া, আত্মার নির্ব্বিকার স্বস্বরূপে অবস্থান করা, এটা কেন আমার পরম ও চরম উপেয় বলে' মান্‌ব? আমি একথা মানি যে মনোহরণপুরের ঘাটে যখন আমরা ডুব দিয়ে উঠি তখন যেন একটা সদ্যঃ-স্নাত পবিত্রতায় আমাদের মন ভরপুর হ'য়ে ওঠে, এবং মনোরাজ্যের বিষয়গুলিকে যেন আমরা তাতে আরও গভীরভাবে ভোগ কর্‌তে পারি; কিন্তু তাই বলে' মনোরাজ্যের বিষয়ের চেয়ে মনোলয়ের বিষয় বেশী সত্য কেন হবে তা আমি বুঝ্‌তে পারিনে। এইখানে সমস্ত ভারতীয় সাধনার বিরুদ্ধে আমার মন যুদ্ধ কর্‌তে চায়। য়ুরোপীয় সাধনা সাধারণতঃ মনোরাজ্যকে সত্য ও পরমার্থ বল্‌তে চায়, এবং মনোলয়ের রাজ্যকে খেয়াল বলে' উড়িয়ে দিতে চায়। ভারতবর্ষ তেমনই মনোলয়ের রাজ্যকেই পরম বলে' মনো-রাজ্যকে খেয়ালের খেলা বলে' উড়িয়ে দিতে চায়। এই দুয়েরই বিরুদ্ধে আমার মন বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে। আমার মনে হয় পাখী যেমন তার দুটি ডানায় ভর করে' সীমাহীন অনন্ত আকাশে বিচরণ করে তেম্‌নি আমরা মন ও মনোলয় এই উভয় পক্ষকে আশ্রয় করে' অনন্তে ভেসে চলেছি। এদের উভয়ের কাউকে ছাড়া আমাদের চলে না। এদের যে-কোনটির অভাবে আমাদের জীবন তার সার্থকতার গতি-রেখা থেকে দূরে সরে' পড়ে। ত্যাগ ও ভোগ, মুক্তি ও বন্ধ। মন ও মনোলয় এই উভয়ের কাউকে ছাড়্‌লে আমাদের চলে না। যারা শুধু মনের এই দৈনন্দিন ভাঙা-গড়া ছাড়া আর-কিছুরই সন্ধান রাখ্‌তে চায় না, তাদের উপরেও ঐ গহন মনোলয়ের আকর্ষণ অল্প পরিমাণে হ'লেও প্রভাব বিস্তার কর্‌তে চায় এবং প্রেয়ের পথে শ্রেয়ের নিশান উড়িয়ে দিয়ে পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কেন প্রেয়ের পথে আমরা শ্রেয়ের দাবী মান্‌তে যাব এপ্রশ্নের উত্তর য়ুরোপীয় চিন্তা আজ পর্য্যন্ত

ভাল করে' দিয়ে উঠ্‌তে পারেনি। কেউ কেউ বলেছেন যে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে আমরা আমাদের ক্রমশঃ পূর্ণতরভাবে বিকাশ করব, কিন্তু সে প্রশ্ন রয়েই যাচ্ছে কেন আমাদের পূর্ণতরভাবে বিকাশ করা আমাদের উদ্দেশ্য হবে? শুধু প্রেয়ই কেন আমাদের চরম উপেয় হবে না? আমার জবাব হচ্ছে এই যে, শ্রেয় ও প্রেয় এই দুই নিয়েই আমাদের জীবন, এই দুয়েরই কেহই কম সত্য নয়। এই দুইকেই ভর করে' আমাদের চল্‌তে হবে। এই দুইয়ের মধ্যে কিন্তু এমন একটা অচিন্ত্য সম্বন্ধ আছে যে, একের মধ্যে অপরের আমরা সাক্ষাৎ পেতে পারি। যে মনীষীরা আমাদের দেশে শুধু শ্রেয়ের অন্বেষণে সমস্ত জীবন পণ করে' দৃঢ়ব্রত হ'য়ে নিষ্ঠাপর হ'য়ে ছুটেছিলেন, তাঁদের কাছে শ্রেয়ই প্রেয় হয়ে উঠেছিল। শ্রেয় শুধু তাঁদের শ্রেয়রূপে আকর্ষণ করেনি। শ্রেয়টা তাঁদের কাছে যথার্থই প্রেয় হ'য়ে উঠেছিল। নইলে তার আকর্ষণে এত জোর হবে কেমন করে'। আবার যারা প্রেয়ের পথে চলেছে, সে পথেও "জীবহিত" "বিশ্বহিত" "দেশের কল্যাণ" ইত্যাদি নানা মূর্ত্তিতে শ্রেয় তাদের সাম্‌নে আবির্ভূত হয়েছেন। শ্রেয়কে ছেড়েও প্রেয় নেই, প্রেয়কে ছেড়েও শ্রেয় নেই। উপনিষদ্ যে শ্রেয় ও প্রেয়ের বিরোধের কথা বলেছেন, সেটা আমার কাছে ক্ষণিক বিরোধ ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। মানুষ কিছুক্ষণ শুধু প্রেয়েরই বশ হ'য়ে কাজ কর্‌তে পারে এবং তাতে শ্রেয়ের আহ্বান কানে না তুল্‌তে পারে, আবার তেম্‌নি আপাততঃ মনে হ'তে পারে কেউ বা যেন শ্রেয়ের বা কর্ত্তব্য একটা আদর্শের গভীর আকর্ষণে পথ চল্‌তে পারে, কিন্তু আমার মতে এমন ব্যাপরটা বেশী কাল চল্‌তে পারে না; প্রেমের পথে যে চলেছে কিছুদূর চল্‌তে না চল্‌তেই শ্রেয়ের দাবীতে তার মন ভারী হ'য়ে আস্‌বে এবং প্রেয়ের আসনে শ্রেয়কে প্রতিষ্ঠিত না করে' সে কখনো প্রেমের মধ্যে তার প্রিয়কে যথার্থভাবে পাবে না। এবিষয়ে শ্রেয়ের একটা বিশেষত্ব এই যে শ্রেয়ের পথে চল্‌তে গেলে প্রেয়কে পাবেই পাবে, কারণ যার আকর্ষণে সে চলেছে সেটা তার কাছে প্রিয় না হ'য়ে পারে না। কাজেই শ্রেয়ের মধ্যে প্রেয় রয়েছেই। শুধু প্রেয়ের পথে শ্রেয়ের বিচ্যুতি ঘট্‌তে পারে, কিন্তু সেই বা কতক্ষণ, প্রেয়ের পথে শ্রেয়কে না এনে আমরা পারিনে। যার যা দাবী তাকে তা না দিলে আমাদের জীবন চল্‌তেই পারে না। একটা কথা এখনও রয়ে গেল, সেটা হচ্ছে এই যে এমন মনে হ'তে পারে যে আমি কোন্ কথা বল্‌তে কোন কথা বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লুম।

আমি আরম্ভ করেছিলুম সমুদ্রের কথা দিয়ে; বলেছিলুম সাগরের নীল জলের দিকে চেয়ে আত্মহারা মনোহারা হ'য়ে কোথায় যেন তলিয়ে যাই তার ঠিকানা থাকে না, তার সঙ্গে শ্রেয় ও প্রেয়ের দ্বন্দ্ব কোন্‌খানে? পূর্ব্বে যে কথা বল্‌ছিলুম্ সেটা হচ্ছে মনস্তত্ত্বের কথা (psychological) আর অপরটি হচ্ছে কর্ম্মপথের আদর্শের কথা (ethical)। একটার থেকে আর-একটায় আমি কেমন করে' ঝাঁপিয়ে এলুম?

এর জবাবে আমার এই কথা মনে হয় যে, এ দুইয়েরই আসল কথা আমার কাছে একই বলে' মনে হয়।

প্রেয়ের রাজ্যে হচ্ছে সেইখানে যেখানে আমরা লাভ-লোকসানের জমাখরচ রীতিমত খতিয়ে উশুল দিয়ে আমাদের নিজ নিজ তহবীল রীতিমত মিলিয়ে নিতে পারি। এই তহবিল-মিলানর কাজ যুক্তি-বিচারের কাজ। এতে দেনা-পাওনা আছে, হিসাবনিকাশ আছে, বোঝা-পড়া আছে; এটা হচ্ছে মনের নিজের রাজ্য, তার ঘর-করণার ব্যাপার। কিন্তু আদর্শের দিক্‌টা মনের বাইরে। সেটা যেন মনোহরণপুরের কথা—গহনং গভীরং। আমার সুখ ছেড়ে দেশের সুখ কেন দেখ্‌ব এপ্রশ্নের জবাব খতিয়ে তোলা যায় না। যুক্তি এখানে মূক। এটা হচ্ছে একটা গহন গভীর পুরীর ডাক, যেখানে মন থই পায় না, তার বিচার সেখানে নাগাল পায় না। মনে পাইনে বলে'ই এর দাবী নেই বলা চলে না। কারণ মনই আমাদের সর্ব্বস্ব নয়। আমরা মনেও আছি, মনোলয়েও আছি। মন দিয়ে মনোলয়কে মাপা যায় না, আবার মনোলয় দিয়ে মনকে মাপা যায় না। এই যে উভয়ের মিলন ও দ্বন্দ্ব এইখানেই জীবনের হেঁয়ালী। চিন্তার লয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা যে মনোহরণের আবেশে আপনহারা হ'য়ে অরূপের সাক্ষাৎ পাই তারই রূপ আমরা আমাদের কর্ম্মযাত্রার আদর্শের মধ্যে সাক্ষাৎ করি। আদর্শের রূপ এই গহন গভীরেরই রূপ। মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়ে যেটা মনোহরণের উপলব্ধি, কর্ম্মযোগের পথে সেইটিই হচ্ছে আদর্শের উপলব্ধি। Psychological এবং ethical এই দুই দিকের মধ্যে যে, একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, তা আমাদের দেশের মনীষীরা বহুদিন থেকেই ধরেছিলেন। সেইজন্য যোগ-শাস্ত্রে চিত্তকে ত্যাগমুখী কর্‌বার একটা প্রধান উপায়ই হচ্ছে তাকে কোনো এক জায়গায় বেঁধে তাকে হারিয়ে ফেল্‌বার চেষ্টা করা, চিত্তবৃত্তি নিরোধ করা। চিত্তবৃত্তি নিরোধ কর্‌বার অভ্যাস কর্‌লে খালি যখন চিত্ত নিরুদ্ধ থাকে তখনই-চিত্তের একটা সার্থকতা হ'ল তা নয়। নিরোধের পর চিত্ত যখন জেগে ওঠে তখনও তার ফল পাওয়া যায়। নিরোধের অভ্যাসের ফলে, সজাগ অবস্থাতেও মন পাত্‌লা হয়, মনের কলুষতা দূরে যায়, মনের শক্তি বাড়ে এবং বিষয়-ভোগের মধ্যেই মন তাকে একেবারে নিঃশেষ করে' ফেল্‌তে চায় না, সে মনে করে যে ভোগই তার পরমার্থ নয়, ভোগে আসক্তিই তার চরম উপেয় নয়.

নিজের স্বার্থ অনুসন্ধান করাই তার পরম স্বার্থ নয়। এক দিকে যেমন এই ফল হয় অপরদিকে তেম্‌নি মনের জাগ্রত বৃত্তিগুলি এই ডুব দেওয়ার ফলে শিথিল হ'য়ে আসে, এবং চিন্তার চেয়ে চিন্তাহীনতার বিরামের মধ্যে মন ডুব দিতে চায়। সেইজন্যই বল্‌ছিলুম যে, যখন হয় একটি সুন্দর গান শুনে' কি উদার সমুদ্রের কি অনন্ত আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে আমাদের মন সেই গোপন গহন গভীর মনোহরণ-পুরে নিজেকে হারিয়ে ফেলে, অতল গভীরে ডুবে' যায়, তখন সেটা শুধু একটা মনের জিম্‌নাষ্টিক্‌ হয় যে তা নয়, তার ফলে ভোগাতীতের পথের ত্যাগের পথের মুখ পরিষ্কার হ'য়ে যায় এবং ভোগ থেকে ভোগাতীতে ও ভোগাতীত থেকে ভোগে আস্‌বার দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। যতক্ষণ আমরা শুধু ভোগে থাকি এবং শুধু চিত্তের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াবশতঃ মধ্যে মধ্যে ভোগের মধ্যে ভোগাতীতের ছায়া পাই মাত্র, ততক্ষণ আমরা বুঝ্‌তে পারিনে যে ভোগের অবস্থার মতন ভোগাতীতের অবস্থার মধ্যেও আমাদেরই একটি যথার্থ স্বরূপ নিভৃতে নিহিত রয়েছে। আমাদের স্বভাব এই নয় যে ভোগের-মধ্যে চিন্তার মধ্যেই আমাদের সম্পূর্ণ সমাপ্ত করে' দিয়ে খালি হ'য়ে যাই। ভোগও যেমন আমাদের একটা স্বভাব ভোগাতীতও তেম্‌নি আমাদের আর-একটি স্বভাব নিভৃতে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। ভোগাতীতের দিকে মুখ ফিরিয়ে যদি শুধু ভোগ নিয়ে থাকি, সমাধি ছেড়ে যদি যুক্তি-বিচার নিয়ে থাকি, তবে সেই দূর গহনের ছায়া মাত্র আদর্শের রূপ ধরে' বা কোনো গুহানিহিতের অনির্দ্দিষ্ট আকর্ষণের রূপ নিয়ে আমাদের সাম্‌নে উপস্থিত হ'য়ে আমাদের মুগ্ধ করে' দেয়। তার কারণ আমরা বুঝ্‌তে পারিনে, অথচ তার ডাকে আমাদের প্রাণ সাড়া দেয়। এই সাড়ায় যারা ব্যাকুল হয় লোকে তাদের বলে—Mystic ক্ষ্যাপা পাগল। মানুষ যখন এই গহন গভীরকে জীবন থেকে বাদ দিতে চায়, তখনই সে তার চলার বেতালায় পাক খেতে থাকে। তাই এ গহনকে জীবন থেকে বাদ দেওয়া যায় না, চলন্ত জীবনের সঙ্গে এই কূটস্থকে মেলাতে পার্‌লেই জীবনকে যথার্থভাবে পাওয়া যায়, কারণ এ কূটস্থ নিরালম্ব দিক্‌টা জীবনেরই দিক্‌, বাহিরে এর স্থান নেই।

এইখানেই ঘুরে' ফিরে' আবার সেই প্রশ্ন আস্‌বে যে, যদি কূটস্থকে আমি এত গভীরভাবে স্বীকারই কর্‌ব তবে ভারতীয় সাধনার সঙ্গে আমার বিদ্রোহটা উঠ্‌ল কোথা থেকে। এর জবাবে আমার এই কথাই মনে আস্‌ছে যে ভারতবর্ষ এই গহনগভীর অবাঙ্‌-মনসঃ গোচরের স্বাদ পেয়ে একেই চরম সত্য বলে' মেনে, এরই মধ্যে তার শেষ পাওয়া শেষ সমাপ্তিকে দেখ্‌তে চেয়েছে; ভারতবর্ষ বলেছে জীবনের উদ্দেশ্য মুক্তি। সমস্ত গতি ভারতবর্ষের কাছে এক চিরকালের জন্য এক কলহীন সমাপ্তির মধ্যে থেমে গেছে। আমার চোখে আমি দেখ্‌ছি যে গতি আছে বলে' থামা, প্রাপ্তি আছে বলে'ই সমাপ্তি, যেখানে প্রাপ্তি ফুরিয়ে গেছে, সেখানে সমাপ্তিও ফুরিয়ে গেছে। যাকে থামা বলে' মনে হয় সে শুধু চলার একটা যতি, একটা তাল। সমাপ্তিকে চরম বলে' আমি মানিনে, এখানে য়ুরোপের সঙ্গে আমার মন সায় দেয়। কিন্তু তেম্‌নি আবার য়ুরোপ যেমন এই গহন গভীরকে, এই সমাপ্তিকে একেবারে জীবনের বাহিরে সরিয়ে দিতে চায়, সেখানে সমস্ত য়ুরোপকে আমার ঠেলে' ফেলে' দিতে ইচ্ছা হয়। চলার দিক্‌টা যেমন সত্য, বিরামের দিক্‌টা ঠিক তেম্‌নিভাবেই সত্য, গহনগভীরের সঙ্গে প্রতিদিনের দৃষ্টি-প্রত্যক্ষের সঙ্গে ভোগাতীতের সঙ্গে বিচিত্র ভোগের সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য কর্‌বার চেষ্টাতেই আমাদের জীবন। জীবনটা সেইজন্য পাওয়া জিনিষ নয়, গড়্‌বার জিনিষ। পাখী যেমন তার দুই ডানায় ভর করে' অনন্ত আকাশে উড়ে' চলে, মানুষ তেম্‌নি মনের উদয় ও লয়কে নিয়ে অনন্ত জীবনের পথে চলেছে। সাধারণতঃ য়ুরোপ লয়ের দিক্‌টা স্বীকার কর্‌তে চায়নি, এবং ভারতবর্ষ উদয়ের দিক্‌টা স্বীকার কর্‌তে চায়নি। মানুষ গভীরের টানে গভীরে চলে' যায়, এবং গভীর থেকে যখন ফিরে' আসে তখন হয়ত মনে করে—এইটিই বোধ হয় আমার যথার্থ আশ্রয়। আবার যখন মানুষ চঞ্চল জীবন-প্রবাহের মধ্যে নাচ্‌তে নাচ্‌তে চলে, হাসির তুফানে আপনাকে আচ্ছন্ন ক'রে তোলে, তখন সে মনে করে জীবনে চলার দিকটাই বুঝি সত্য। কিন্তু এর যে-কোনটার অভাবেই মানুষের চলে না। উভয়কে নিয়ে, এ-উভয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে' উভয়ের মধ্যে নিরন্তর আদান-প্রদান করে' তবেই মানুষ তার যথার্থ স্বরূপকে পায়।

আমরা এখন লোহিত সাগরের মধ্য দিয়ে চলেছি। জাহাজ ভর্ত্তি লোক। সবই প্রায় ইংরেজ; আমি ছাড়া ভারতবর্ষের লোক মাত্র আর একজন আছে,—দক্ষিণ ভারতের ব্যাঙ্গালোরের একজন ভারতীয় খৃষ্টান। এখন বেলা ৩টা, ডেক্‌চেয়ারে পড়ে' পড়ে' সকলে ঘুমুচ্ছে, কেউ কেউ বা পচা নভেল পড়্‌ছে, কেউ বা সেলাই কর্‌ছে। আশ্চর্য্য হ'য়ে যেতে হয় এই য়ুরোপীয়দের আশ্চর্য্য শৃঙ্খলা দেখে'। আমাদের যাত্রীদের সংখ্যা প্রায় ২০০ হবে। এতগুলি লোকের ঠিক একই নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্নান আহার চল্‌ছে. বল্‌তে গেলে একমিনিটও অতিক্রম করে না, এর মধ্যে কোনোও ফ্যাসাদ নেই,—গণ্ডগোল নেই,কলহ নেই, মনোমালিন্য নেই, এ একরকম আশ্চর্য্য শিক্ষা। ভোর ৫॥টা থেকে সব স্নান ও প্রাতঃক্রিয়া আরম্ভ হ'য়ে যায়। ঠিক ৮টার সময় শিশুদের খাওয়া। ইতিপূর্ব্বে চা ফল ও রুটি ঘরে ঘরে বিলি করে' যায়। ৮॥টার সময় [illegible]

খাওয়ার ভেঁপু বাজে। আবার দ্বিপ্রহরে ১২টার সময় শিশুদের খাওয়া। আমাদের খাওয়া ১টার সময় আবার সেই ভেঁপু। বৈকালে ৪টার সময় চা, আবার সন্ধ্যা ৭টার সময় সান্ধ্য-ভোজনের ভেঁপু। এর কি একতিল ব্যতিক্রম হয়! তা ছাড়া এত বড় জাহাজখানা রোজ মাজা-ঘসা চল্‌ছেই, চল্‌ছেই। এর কোনোখানে কোনও বিশৃঙ্খলা নেই, গোলমাল নেই।

সমবেতভাবে কাজ কর্‌বার শক্তি এরা অদ্ভুতরকমে সঞ্চয় করেছে। শৃঙ্খলা জিনিষটা যেন আমাদের ধাতেই নেই। খাটুতে আমাদের কসুর নেই, কিন্তু শৃঙ্খলা করে' নিয়মিত সময়মত সব কথা স্মরণ রেখে সব দিক্ বজায় রেখে কিছু কর্‌তে গেলেই আমরা হাঁপিয়ে পড়ি। আমি কিছুতেই ভাব্‌তে পারিনে যে মানসিক অসংযম ও আলস্য ছাড়া এর আর কি কারণ হ'তে পারে। শৃঙ্খলা ও সংযম জিনিষটা যদি আমাদের একেবারে স্বাভাবিক ধাতুগত না হ'য়ে যায়, যদি শৃঙ্খলা ও আনন্দের মধ্যেই আমরা আনন্দ না পাই, যদি শৃঙ্খলা ও সংযমকে উৎসব-দিনের বেশের মতন একদিন বের করে' এনে জাঁক করে' ব্যবহার কর্‌তে হয়, তবে সে শৃঙ্খলা ও সংযমে কোনোও লাভ নেই। তাকে অবলম্বন করে' মানুষ বল সঞ্চয় কর্‌তে পারে না।

ভারতবর্ষকে যদি যথার্থ একজাতি করে' গড়ে' তুল্‌তে হয় তবে সমবেতভাবে কাজ কর্‌বার সাধনা, শিক্ষা ও আনন্দ তাকে আয়ত্ত করে' তুল্‌তে হবে। শুধু সভায়-সমিতিতে নয়, শুধু পোষাকীরকমে নয়। কিন্তু প্রাত্যহিক খুঁটিনাটি জীবনে পরকে আঘাত না দিয়ে সংযতভাবে সকলকে বাঁচিয়ে সকলের যাতে সুবিধা হয়, এম্‌নি করে' শৃঙ্খলা ও সংযমের সহিত যদি কাজ কর্‌তে না শিখি তবে কিছুতেই আমাদের মঙ্গলের আশা নেই।

বাদ্‌লা হাওয়ার মতন এক-একটা স্বাদেশিকতার ঝাঁকুনি বা কাঁপুনি এসে আমাদের মধ্যে মধ্যে সজাগ করে' দিচ্ছে সন্দেহ নেই। এর যা সুফল আছে তা এর রইল। কিন্তু এতে জীবনকে গড়্‌তে পারে না। এতে আকস্মিকভাবে খানিকটা শক্তিকে সংহত করা যায় মাত্র, তার বেশী আর যে বড় কিছু হয় এ আমার বিশ্বাস নয়। একটা জাত যা গড়ে সে তার প্রাত্যহিক জীবনের নিভৃত সঞ্চয়ে। তাতে কোনও শব্দ নেই, আড়ম্বর নেই, জাঁকজাঁক নেই, আছে খালি কাজ আর সাধনা, সংযম আর সংযমের আনন্দ, বলের আহরণ ও বলের পরিপাক।

এই জাহাজখানা কলম্বো বন্দর ছেড়ে সীমাহীন সমুদ্র পাড়ি দিতে সুরু করেছে, দিন নেই, রাত নেই, নিজের লক্ষ্যকে সাম্‌নে রেখে বরাবর ছুটে' চলেছে। এর খবর কেউ রাখে না শুধু আশে-পাশের ২।৪খানা জাহাজ ছাড়া। যখন ঘাটে গিয়ে পৌঁছবে তখনই লোকে একে জান্‌বে দেখ্‌বে। এই যে উদ্দেশ্যকে সাম্‌নে রেখে নিভৃতে নিরন্তর চলা, এইখানেই শক্তির পরীক্ষা, এইখানেই মানুষের জিত। ব্যক্তিগত হিসাবে মানুষই হোক্ কি কোনো জাতিই হোক, বল সঞ্চয় কর্‌তে হ'লে, জয়ী হ'তে হ'লে এই নিভৃত সাধনার পথই পথ; আস্ফালনের পথে লাভের চেয়ে লোক্‌সান বেশী, সঞ্চয়ের চেয়ে ক্ষয় বেশী। শক্তি যত কম, আস্ফালন তত বেশী প্রয়োজন, কারণ শক্তির অভাবটা আস্ফালন দিয়ে পূরণ না কর্‌তে পার্‌লে স্বস্তি বোধ করা যায় না।

য়ুরোপীয়দের দোষ ও অপরাধের মাত্রা যে কম তা খালি বল্‌ছিনে। কিন্তু সে দোষগুলি তাদের সমবেত শক্তির গঠনের প্রতিকূলে তেমন দাঁড়ায় না। একটা স্বাভাবিক শৃঙ্খলা তাদের জীবনের মধ্যে কেমন সহজ হ'য়ে গেছে। পার্থক্য আছে, কিন্তু তেমন কলহ নেই। নিজেকে সকলের সঙ্গে মিলিয়ে কেমন ক'রে চালাতে হয়, সেটা কেমন এদের মজ্জাগত হ'য়ে গেছে। আমরা যাকে এদের formality, reservedness, outward politeness প্রভৃতি নানা আখ্যায় তাচ্ছিল্য করে' উড়িয়ে দিতে চাই, আমার মনে হয় তার নীচে একটা গভীর সংযমশক্তির নিভৃত বিধারণ ক্রিয়া চল্‌ছে। সংযমের দ্বারা আত্ম-বিধারণ করতে না পার্‌লে আত্মাকে বাঁচাবার আর দ্বিতীয় উপায় নেই। আমরা যেমন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস করি তেম্‌নি স্বাভাবিক শক্তিতে য়ুরোপীয়েরা সমবেতভাবে আত্ম-বিধারণ করে' চলেছে, তা হয়ত এদের অনেকে ভেবেই দেখে না, ভাব্‌বার ত প্রয়োজন নেই। কাজ চল্‌লেই হ'ল। এশক্তিটা কখনই জড়-শক্তি নয়—Materialism নয়, এটা যথার্থই আত্মার শক্তি। আত্মার শক্তি ছাড়া বলসঞ্চয়ের আর দ্বিতীয় উপায় নেই, এসম্বন্ধে আমি একেবারে নিঃসংশয়—"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

শ্রী সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

৯১ নং আপার সার্কুলার রোড, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রী অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৪শ ভাগ
১ম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩৩১

৪র্থ সংখ্যা

গোস্বামী তুলসীদাস

অধ্যাপক শ্রী অমৃতলাল শীল, এম্-এ

দেবনাগরী শিখিয়াছে কিন্তু ভক্ত-প্রবর তুলসীদাসের নাম শুনে নাই, এমন লোক বোধ হয় খুঁজিলেও পাওয়া যায় না। বঙ্গীয় পাঠকের মধ্যেও বোধ হয় শতকরা ৯৯ জন তুলসীদাসের নাম শুনিয়াছেন। এ-হেন সর্ব্বজন-বিদিত কবি ও ভক্তের জীবন সম্বন্ধে নানা সম্ভব ও অসম্ভব কাল্পনিক গল্প ছাড়া বিশ্বাসযোগ্য কথা অতি-অল্পই অদ্যাবধি জানিতে পারা গিয়াছে। এমন কি, তাঁহার জন্মস্থান ও জন্ম-সন সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। তাঁহার জীবনী-লেখকেরা বলেন, ১৫৮৩ হইতে ১৫৮৯ সম্বতের মধ্যে কোন সময়ে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। তবে, ভারতের লেখকেরা মহাপুরুষের কর্ম্মই দেখিয়া থাকেন, তাহারই আলোচনা করেন, ভাল-মন্দ ও ফলাফল বিচার করেন। তাঁহারা জন্ম-তারিখ, সন, বা জন্মস্থান (গ্রাম বা জেলা) লইয়া মাথা ঘামাইতে চাহেন না; জীবনের মূল ঘটনাগুলিও ধারাবাহিকরূপে না লিখিয়া একটি ফর্দ্দ মাত্র লিখিয়া দেন। তাঁহাদের মতে এসকল খুঁটিনাটিতে কিছুই যায় আসে না। কিন্তু ইউরোপীয় মত সম্পূর্ণ ভিন্ন। একজন ইউরোপীয় কবি বা মহাপুরুষ কোন্ তারিখে, কোন্ সময়ে, কোথায়—নগরের কোন্ অংশে, কোন্ গৃহের কোন্ প্রকোষ্ঠে—জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, জীবনী-লেখকেরা সন্ধান করিয়া জানিয়াছেন। গ্রিয়র্সন্ সাহেব হিন্দী-সাহিত্যের অনেক আলোচনা করিয়াছেন, ও ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদিগের মত তুলসীদাসের ঠিক জন্ম-সন ও জন্মস্থান খুঁজিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ১৫৮৯ সম্বৎ (১৫৩২ খৃঃ)-ই তাঁহার জন্ম-সন। তাঁহার জন্মভূমি সম্বন্ধেও ঐরূপ মতান্তর আছে। কেহ বলে তিনি প্রাচীন হস্তিনাপুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কেহ বলে চিত্রকূটের কাছে সাজীপুরে, আবার

কাহারও মতে তিনি আধুনিক বান্দা জেলার রাজাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই রাজাপুরে এখনও তুলসী দাসের ভিটা বলিয়া একটি স্থান পরিচিত; সেইজন্য অনেকের বিশ্বাস রাজাপুরই তাঁহার জন্মভূমি। কিন্তু তিনি রাজাপুর-বাসকালে অতি দরিদ্র ছিলেন। বড়-বড় রাজ-প্রাসাদের চিহ্নই যখন থাকে না, তখন বুঝিতে পারা যায় না যে এক দরিদ্রের কুটীরের চিহ্ন কিরূপে থাকা সম্ভব। আমার বিবেচনায় ঐ ভিটা কাল্পনিক। নিঃসন্দেহে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার যৌবনে সস্ত্রীক বাসস্থান কোন বড় নদী (গঙ্গা বা যমুনা)-তীরে কোনও গ্রামে ছিল।

তুলসীদাস যে ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহ; কিন্তু কোন্ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন নিঃসন্দেহে বলা যায় না। একস্থানে তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন যে, তিনি পরাশর-গোত্রীয় দ্বিবেদী। ইহা ছাড়া আর কিছুই নিঃসন্দেহে বলা যায় না। তবে রাজাপুরে বা ঐ অঞ্চলে সরযূপারী ব্রাহ্মণদের বাস দেখিতে পাওয়া যায়, সেইজন্য অনেকে অনুমান করেন যে তিনিও সরযূপারী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার বাস যদি রাজাপুরে না হইয়া অন্য কোন স্থানে হয়, তবে এ অনুমানও ঠিক নহে।

জীবনী-লেখকেরা তাঁহার পিতা-মাতার নামও লিখিয়াছেন। পিতার নাম আত্মারাম, মাতার নাম হুলসী। কিন্তু এ নামগুলি কোনও প্রামাণিক গ্রন্থে পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ কল্পিত। কল্পিত বিবেচনা করিবারও যথেষ্ট কারণ আছে। অকবর বাদশার বাল্যাবস্থার অভিভাবক বেরাম খাঁর পুত্র নবাব অবদুল-রহিম খান্‌খানাঁ তুলসীদাসের ভক্ত ও বন্ধু ছিলেন। তিনি স্বয়ং কবি ছিলেন ও কবির আদর করিতে জানিতেন। তাঁহার অসাধারণ দান-সম্বন্ধেও অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যায় (১)। তিনি তুলসীদাসকে কখনও কিছু দিতে পারেন নাই বলিয়া দুঃখ করিতেন। ত্যাগী মহাপুরুষ বলিতেন—আমি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, এক পোয়া অন্ন হইলেই আমার যথেষ্ট; আমি তোমার দান গ্রহণ করিয়া কি করিব, কোথায় রাখিব, কেবল চোরের উপদ্রব বাড়িবে বই ত নহে। একবার এক দরিদ্র কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ তুলসীদাসের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করিল। তিনি স্বয়ং কপর্দ্দকহীন; তিনি এক-খানি কাগজে একপদ কবিতা লিখিয়া ব্রাহ্মণকে দিলেন, বলিলেন, নবাব খান-খানাঁর কাছে লইয়া যাও; যদি তোমার অদৃষ্টে থাকে, কিছু পাইবে। নবাব ঐ কাগজ দেখিয়া ব্রাহ্মণকে এত ধন দিলেন যে, কন্যাদায় হইতে মুক্ত হইয়া সে চিরজীবন সুখে কাটাইতে পারে ও কবিতার পাদ পূরণ করিয়া তুলসীদাসের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। তুলসীদাস লিখিয়াছিলেন "সুরতিয়, নরতিয়, নাগতিয়, সব চাহত্ অস্ হোয়।" নবাব পদ পূরণ করিলেন "গোদ লিয়ে হুলসী ফিরে, তুলসী সো সুত হোয়।" অর্থাৎ "কি দেবতা, কি নর, কি নাগ-স্ত্রীরা সকলেই ইচ্ছা করে এমন হউক।" নবাবের উক্তি:— "হুলসী কোলে করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় (ও ইচ্ছা করে) তুলসীর মত পুত্র হউক।" এই পদ হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে তুলসীর মাতার নাম হুলসী ছিল। কিন্তু ঐ পদের আর-এক সহজ অর্থ সম্ভব। অর্থাৎ "কোলে করিয়া উল্লাসিত হইয়া বেড়ায় (ও ইচ্ছা করে) তুলসীর মত পুত্র হউক।" "হুলসী" শব্দ এখনও যুক্তপ্রদেশে প্রচলিত, ও "উল্লাসিত"র অপভ্রংশ। আমার বিবেচনায় এখানে এই অর্থই সমীচীন। "হুলসী" তুলসীর মাতার নাম ধরিতে গেলে কষ্ট-কল্পনা করিতে

(১) পার্সী ভাষায় কবিতা লিখিয়া কবিরা তাঁহার কাছে যাহা পারিতোষিক পাইত, তাহার পরিমাণ বেশী হইত। হিন্দী ভাষার কবিরাও বড় কম লাভ করিতেন না। একবার, এক ব্রাহ্মণ এক কবিতা পাঠ করিলেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে এক চকা চকিকে বলিতেছে—"এইবার দিগ্বিজয়ী নবাব সুমেরু পর্ব্বত জয় করিতে যাইতেছেন, তিনি নিশ্চয় জয়ী হইবেন। পর্ব্বতটা সুবর্ণময় কিন্তু নবাব এমন দাতা যে একদিনেই তাহা দান করিয়া ফেলিবেন, তাহা হইলে সূর্য্য আর অস্ত যাইতে স্থান পাইবে না। অতএব রাত্রি হইবে না, আমাদের আর বিরহ-কষ্ট সহ্য করিতে হইবে না।" এই কবিতার নূতন কবিকল্পনা শুনিয়া নবাব কবির বয়স জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, ৩৫ বৎসর। তিনি কোষাধ্যক্ষকে আজ্ঞা করিলেন, পণ্ডিতকে আজীবন পাঁচ টাকা প্রাত্যহিক দাও। যুক্তপ্রদেশে পূর্ণায়ু ১২০ (বিংশোত্তরী দশা মতে) বৎসর ধরা হয়। সেই হিসাবে জন্ম-পত্রিকা দেখিয়া ১২০ বৎসর পূর্ণ হইতে যত দিন বাকী আছে তাহার ৫৲ প্রাত্যহিক হিসাবে টাকা দিলেন। পাঠক একবার হিসাব করিয়া দেখিবেন একটা কবিতার মূল্য কত হইল।

হয়, তথাপি কবিতার অর্থ সরল হয় না। এইরূপে "আত্মারাম"ও বোধ হয় তাঁহার পিতার নাম নহে! তিনি যে ভক্ত ছিলেন, আত্মারাম ছিলেন, এইরূপ কোনও উক্তি হইতে তাঁহার নাম "আত্মারাম" হইয়া গিয়াছে।

তুলসীদাসের বাল্যাবস্থা সম্বন্ধেও নানা লেখকের নানা মত। কেহ বলেন তিনি শৈশবেই পিতৃহীন হইয়াছিলেন, বিধবা মাতা ভিক্ষা করিয়া তাঁহাকে প্রতিপালন ও লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। কেহ বলে তিনি গণ্ড-যোগে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া পিতামাতা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা বিশ্বাস হয় না। এখনও ত রিষ্টিতে ছেলে হয়, কিন্তু কে আপন সন্তান ত্যাগ করে? এরূপ রিষ্টি খণ্ডন করিবার উপায়ও সহজ। মাতা এরূপ সন্তানকে মাটিতে শোয়াইয়া দেন, অর্থাৎ ত্যাগ করেন, ধাত্রী বা কোন আত্মীয়া তুলিয়া লয়। পরে মাতা ধাত্রীকে বা আত্মীয়াকে যথাসাধ্য কাঞ্চন-মূল্য দিয়া পুত্র কিনিয়া লন, রিষ্টি-দোষ কাটিয়া যায়। বিনয়-পত্রিকা নামক পুস্তকে কবি একস্থানে আপনার বাল্যদুঃখের কথা লিখিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় তাঁহার বাল্যাবস্থা দারিদ্র্যে কাটিয়াছে। বাল্যাবস্থাতেই দ্বারে দ্বারে রাম নাম করিয়া ভিক্ষা করিতে হইয়াছে। লোকে বিদ্রূপ করিয়া তাঁহাকে রাম-বোলা (২) বলিয়া ডাকিত। পিতা-মাতার কাছে সন্তান যতটা আদর-যত্ন ও ভালবাসা আশা করিয়া থাকে, তুলসী আপন দারিদ্র্য-পীড়িত পিতা-মাতার কাছে ততটা কেন, বোধ হয় কিছুই পান নাই। এক-স্থানে লিখিয়াছেন তাঁহার যখন জন্ম হইল, তাঁহার দরিদ্র মাতা-পিতা আহার্য্য জোগাইতে হইবে বলিয়া দুঃখিত হইলেন। যাহা হউক, তিনি এই অবস্থাতেই নরহরিদাস-নামক কোন দয়ালু ভক্ত ব্রাহ্মণের কাছে বিদ্যাশিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন, ও পরে এই শিক্ষাগুরু "কৃপাসিন্ধু নর-রূপ-হরি"র কাছেই দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ভক্তিমার্গের সাধনার পথে অগ্রসর হইতে থাকেন।

দারিদ্র্য-বশতঃ শৈশবে ও বাল্যাবস্থায় আধপেটাও খাইতে পান নাই। পিতা-মাতার কাছে দুটা আদর-সোহাগের কথা শুনিতে পান নাই, দ্বারে দ্বারে রাম নাম করিয়া ভিক্ষা করিয়া তবে গুরুর কাছে পাঠ গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তথাপি পুণ্যভূমি ভারতে বিবাহরূপ সৌভাগ্যের অভাব হয় নাই। আমাদের দেশে বলে—জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ, এতিনটি বিধাতা পুরুষ স্থির করিয়া থাকেন বোধ হয়; ইহার অর্থ যে জন্ম হইলে যেমন মৃত্যু অনিবার্য্য, সেইরূপ বিবাহও অনিবার্য্য। অনেকে অল্প বয়সে মরিয়া বিধাতাকে ফাঁকি দিতে চাহে কিন্তু পারে না, তাহার প্রমাণ সেন্‌সস্ রিপোর্টে পাঁচ বৎসর অপেক্ষা কম বয়সের বিধবার সংখ্যাও চার বা পাঁচ অঙ্কে লেখা হয়। তুলসী-দাসের অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, গৃহ নাই, শান্তি নাই, কিন্তু গৃহিণী জুটিয়া গেল। দীনবন্ধু পাঠকের কন্যা তাঁহার অন্নহীন গৃহে গৃহলক্ষ্মী-রূপে অধিষ্ঠিত হইলেন। যথা সময়ে গৃহিণী এক পুত্র উপহার দিলেন, তাহার নাম রাখা হইল তারক, কিন্তু শিশু এ দারিদ্র্য-পীড়িত মর-জগতে বেশী দিন থাকে নাই, অল্প কালেই নিত্য ধামে চলিয়া গেল।

তুলসী দাস যৌবনে স্ত্রীর বড় অনুরক্ত ছিলেন। স্ত্রীকে ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্তও থাকিতে কষ্ট বোধ করিতেন। তাঁহার বন্ধু-বান্ধবেরা তাঁহাকে মহাস্ত্রৈণ বলিয়া উপহাস করিত কিন্তু তিনি সে কথা শুনিয়াও শুনিতেন না। তাঁহার স্ত্রী এই অনুরক্তিতে বড় ব্যথিত হইতেন। তাঁহার সমবয়স্কাদের উপহাস অসহ্য হওয়াতে কাহারও সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতেন না। একদিন তুলসীদাস নিকটের হাটে গিয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহার পত্নীর পিত্রালয় হইতে সংবাদ আসিল, তাঁহার পিতা অত্যন্ত পীড়িত, তিনি একবার শেষ দেখা দেখিবার জন্য কন্যাকে ডাকিয়াছেন। এমন আহ্বান পাইয়া কোন্ কন্যা গৃহে বসিয়া থাকিতে পারে? তিনি প্রতিবাসীদের বলিয়া স্বামীর অনুপস্থিত-অবস্থায় যমুনার পর-পারে তিন-চার ক্রোশ দূরে পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন। তুলসীদাস সন্ধ্যার সময়ে বাড়ী ফিরিলেন। সমস্ত দিবসের অদর্শ-নের পর, যখন বড় আশা করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন শূন্যগৃহ দেখিয়া, তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। প্রতি-

(২) রামকো গোলাম, নাম রাম বোলা রাম রাখো। ইত্যাদি বিনয়-পত্রিকা।

বাসীর কাছে সংবাদ পাইয়া যমুনাতীরে পার হইবার নৌকা খুঁজিতে লাগিলেন। যে দুই-একখানি নৌকা ছিল, তাহার নাবিকেরা দেখাইয়া দিল আকাশ ঘোর ঘনঘটায় আচ্ছন্ন, ঝড় আগত-প্রায়; বর্ষার নদী দুইকূল ছাপাইয়া চলিয়াছে, এসময়ে তাহারা কোনমতে নৌকা লইয়া যাইতে পারিবে না। অগত্যা তুলসীদাস সাঁতার দিয়া নদী পার হইলেন। পার হইতে এক প্রহর রাত্রি অতীত হইল। এসময়ে যমুনা বা গঙ্গার পাট ২।৩ মাইল অপেক্ষা কম ছিল না। (৩) তিন-চার ক্রোশ পথ হাঁটিয়া যখন শ্বশুরালয়ের গ্রামে প্রবেশ করিলেন, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে। গ্রামে সকলেই গভীর নিদ্রায় অচেতন। তাঁহার শ্বশুর মৃত্যু-শয্যায়, অতএব বাটীর লোক জাগ্রত ছিল। ঘটনাক্রমে তাঁহার স্ত্রী সেই সময়ে কোনো প্রয়োজনে বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। তিনি স্বামীকে এই অবস্থায় দেখিয়া লজ্জিতা ও উৎকণ্ঠিতা হইলেন। পিত্রালয়ের লোকও তাঁহার স্বামীর স্ত্রৈণভাবের কথা জানিত। এই দুর্য্যোগে এইরূপে আসাতে পর-দিবস সখীরা কি বলিবে ভাবিয়া তিনি চিন্তায় আকুল হইয়া স্বামীকে বলিলেনঃ—

লাজ্ ন লাগত্ আপকো দৌড়ে আয়ে হো সাথ্। ধিক্, ধিক্, এ্যাসে প্রেময়কা কহা কহুঁ হে নাথ্॥ অস্থি-চর্ম্ম-ময় দেহ মম্ তা মেঁ প্রীত্। ত্যাসী যো শ্রীরাম মেঁ হোত, হোত ন ভবভীত্॥

অর্থাৎ—হায় নাথ! তোমার কি একটুও লজ্জা নাই যে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইয়া আসিয়াছ? তোমার এ প্রেমে ধিক্ আমার এই অস্থি-চর্ম্মময় দেহের প্রতি যে প্রীতি করিতেছ, সেইরূপ যদি শ্রীরামের প্রতি করিতে তবে ভবভীতি থাকিত না।

এই শুভ মুহূর্ত্তে এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়া গেল। যে-মন বন্ধু-বান্ধবদের সহস্র বিদ্রূপ সহস্র উপহাস উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে সেই মনে এই গভীর নিস্তব্ধ নিশীথে পত্নীর বাক্যে এমন ক্ষত উৎপাদিত হইল যে, তুলসীদাস মুহূর্ত্ত মধ্যে আপন কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলেন। তিনি পত্নীকে জানাইলেন তিনি পত্নীর উপদেশই (৪) গুরু-উপদেশের মত শিরোধার্য্য করিলেন, ও এইবার ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের সহিত প্রীতি করিতে গৃহ ত্যাগ করিবেন। তুলসী নদীতে সাঁতার দিয়া পার হইয়াছিলেন। তখনও পরিধানে সিক্ত বস্ত্র ছিল। তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে শুষ্ক বস্ত্র আনিয়া দিয়া বলিলেন, "এত রাত্রে সকলকে সংবাদ দিয়া বিব্রত করিবার প্রয়োজন নাই, তুমি কাপড় ছাড়, খাবার আনিতেছি খাও, পরে বিবেচনা করিয়া যাহা ভাল হয় করিও।" তুলসী সমস্ত দিন অভুক্ত ছিলেন, সেই অবস্থায় বর্ষার ভরা যমুনা সাঁতার দিয়া পার হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মনে এসময়ে বৈরাগ্য-অনল এত প্রখর হইয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে যে, আর বস্ত্র-পরিবর্ত্তন বা ভোজনের জন্য অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। সেই গভীর নিস্তব্ধ নিশীথে পত্নীর কাছে বিদায় লইয়া কাশী-ধামে চলিলেন। যে-পত্নীকে গৃহে না দেখিতে পাইয়া এই দুর্য্যোগে সাঁতার দিয়া ভরা বর্ষার নদী পার হইয়া-ছিলেন, তাহাকে তিনি চিরকালের মত ত্যাগ করিতে একটুও দ্বিধা বোধ করিলেন না।

তুলসীদাস বহুকাল নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া একবার এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণবাটীতে আতিথ্য স্বীকার করিলেন। এই ব্রাহ্মণটি তাঁহারই শ্যালক, পিতৃ-বিয়োগের পর অবস্থা-পরিবর্ত্তন হওয়াতে গ্রামান্তরে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার ভগ্নী—তুলসীদাসের পত্নীও—তাঁহার সঙ্গে থাকি-তেন। তিনি এখন প্রৌঢ়া। বাটীতে অতিথি আসিলে বাটীর বধূরা অতিথির সম্মুখে বাহির হইত না, প্রৌঢ়া কন্যা অতিথি-সেবার ভার লইতেন। তিনি অতিথিকে দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু তুলসীদাস চিনিতে পারেন নাই। তিনি অতিথির পাকের জন্য "চৌকা" প্রস্তুত করিয়া পূজার স্থান করিয়া দিলেন। তুলসীদাসের সহিত বিগ্রহ ছিল, পূজা করিবার সময়ে আরতি করিবার জন্য কর্পূরের প্রয়োজন হওয়াতে তাঁহার পত্নী বলিলেন, "একটু অপেক্ষা করুন, আমি কর্পূর আনিতেছি।" তুলসীদাস বলিলেন, "না আনিতে হইবে না, আমার

(৩) মেগাস্থিনিসের সময়ে উৎপত্তি-স্থানে গঙ্গার পাট ৩০ ষ্টাডিয়া বা ৩.৪৪ মাইল ছিল।

(৪) কটে এক রঘুনাথ সঙ্গ, বাঁধ জটা সির কেশ। হম তো চাখা প্রেম রস্, পত্নীকে উপদেশ॥

ঝোলাতে আছে, বাহির করিয়া দাও।" তাঁহার পত্নী তাহাই করিলেন। পরে তিলক-সেবা করিবার জন্য খড়ি-মাটির প্রয়োজন হওয়াতে তাঁহার পত্নী খড়ি আনিতে যাইতেছিলেন, তুলসীদাস বলিলেন, "আমার ঝোলাতে আছে, বাহির করিয়া দাও।" তদ্রূপ করা হইল। পূজার পর রন্ধন করিতে বসিয়া তুলসী দেখিলেন ভ্রম-ক্রমে ডা'লে দিবার মশলা আনা হয় নাই। তাঁহার পত্নী তাড়াতাড়ি মশলা আনিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু অতিথি বলিলেন, "যাইবার প্রয়োজন নাই, আমার ঝোলাতে আছে, বাহির করিয়া দাও।" তাঁহার পত্নী আর আত্ম-প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন, "বৈরাগী মহাশয়ের বৈরাগ্য ত বেশ দেখিতেছি, ঝোলার মধ্যে কর্পূর লইয়াছ, খড়ি লইয়াছ, এমন কি ডা'লের মশলা লইয়াছ, তবে ঐ ঝোলার মধ্যে রাঁধিয়া দিবার জন্য স্ত্রীকে লইতে পার নাই? তাহাকে ত্যাগ করিয়াছ কেন?" তুলসীদাস এতক্ষণ কুল-কামিনীকে লক্ষ্য করিয়া দেখেন নাই, এই ব্যঙ্গোক্তি শুনিয়া বক্তাকে লক্ষ্য করিলেন। বহুকাল পূর্ব্বেকার একখানি মুখ মনে পড়িয়া গেল। এতকালে কতটা পরিবর্ত্তন সম্ভব তাহাও ভাবিয়া লইলেন। তখন নিঃসন্দেহে চিনিতে পারিলেন। তাঁহার পত্নী, ভ্রাতার অবস্থার পরিবর্ত্তন, ভিন্নগ্রামে বাস, ক্রমে অবস্থার উন্নতির সকল কথা বলিলেন। পরে বলিলেন, "আর তোমাকে ছাড়িতেছি না, আমাকে তোমার ঝোলাতে পুরিয়া লও। তোমার বৈরাগ্য ত দেখিতেছি ভণ্ডামির রূপান্তর মাত্র। তোমারও সেবিকার প্রয়োজন দেখিতেছি, আমারও এখানে আর মন টিকিতেছে না। আমি তোমার সহিত তীর্থ-ভ্রমণ করিব।" কিন্তু তুলসীদাস স্বীকৃত হইলেন না। তিনি দু-এক দিবস গ্রামে বাস করিয়া আবার তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হইলেন।

প্রথম যখন তুলসীদাস গৃহত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গ করিবার জন্য তীর্থ-ভ্রমণ করিতে বাহির হন, তখন তাঁহার কোনো নির্দ্দিষ্ট গতি-বিধি ছিল না। যখন যেমন সুবিধা বা সঙ্গী জুটিত সেইরকমেই যাইতেন। কোনো গ্রামে বা মন্দিরে দশ-পাঁচ দিন থাকিতেন, রাম-নাম করিতেন, গ্রামবাসীকে উপদেশ দিতেন। একবার গঙ্গাতীরের কোনো গ্রামে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যহ প্রাতে নদী-তীরে শৌচক্রিয়া করিয়া ফিরিবার সময়ে এক গাছে ঘটির বাকী জলটুকু ঢালিয়া দিতেন। সেই গাছে এক প্রেত থাকিত। সে একদিন তাঁহাকে দেখা দিয়া বলিল, "আমি তোমার নিত্য-সেবায় তুষ্ট হইয়াছি, তুমি আমার কাছে কিছু চাহিয়া লও।" তুলসী বলিলেন, "আমি তোমার কাছে কিছুই চাই না, তবে যদি আমার ঠাকুর ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে একবার দেখাইতে পার, তবে দেখাও।" প্রেত বলিল, "সে ক্ষমতা আমার নাই। তবে যে তোমাকে শ্রীরামচন্দ্রকে দেখাইতে পারে, তাহাকে দেখাইয়া দিতে পারি।" তুলসী বলিলেন, "তবে তাহাই দেখাইয়া দাও।" প্রেত তখন এক শ্রীরাম-মন্দিরের নাম করিয়া বলিল, "ঐ মন্দিরে প্রত্যহ রাম-কথা পাঠ হইয়া থাকে, শুনিতে অনেক লোক আসে। একটি অতি বৃদ্ধ কুষ্ঠ-রোগী শ্রোতা দেখিতে পাইবে। সে সকলের পূর্ব্বে আসে ও পশ্চাতে কথা শেষ হইলে যায়। সেইটি ভক্ত-প্রবর মহাবীর হনুমান। তিনি হীনরূপ ধারণ করিয়া রামায়ণ শুনিতে আসেন। তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাকে ঠাকুর দর্শন করাইতে পারেন। তুমি তাঁহার উপাসনা কর।" তুলসী তৎক্ষণাৎ সে-গ্রাম ত্যাগ করিয়া নির্দ্দিষ্ট মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। হনুমানকে সহজেই চিনিতে পারিলেন। পাঠ শেষ হইলে মন্দির-প্রাঙ্গণেই বৃদ্ধের পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "আপনি যে মহাপুরুষই হউন, আমায় ঠাকুর দেখাইতেই হবে।" তুলসীর কাতর প্রার্থনায় তিনি বলিলেন, "তুমি চিত্রকূটে গিয়া বাস কর, প্রত্যহ বিগ্রহ দর্শন ও রাম নাম করিবে, সেখানেই তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে।"

তুলসী এইবার চিত্র-কূটের পাহাড় ও বনের মধ্যে এক কুটীর বাঁধিয়া বাস করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ স্থানীয় রাম-মন্দির দর্শন করেন ও দিবারাত্রি ভজন বা নাম করেন। উৎসবের সময়ে অনেক যাত্রী আসে, প্রত্যহ দশ-পাঁচ জন আসে। কেহ না কেহ তাঁহার আহার যোগায়। একদিন তিনি বিগ্রহ দর্শন করিয়া নিজ কুটীরে ফিরিতেছেন, পশ্চাতে অশ্বপদশব্দ পাইয়া সঙ্কীর্ণ পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন একটি

মৃগকে তাড়া করিয়া দুইটি রাজকুমার চলিয়া গেল। প্রথমটি শ্যামবর্ণ ও পরেরটি গৌর। তিনি ভাবিতে লাগিলেন ইহাঁরা কাহারা? নিকটে কোনো রাজপুত্রের কথা শুনেন নাই। এমন সময়ে রাম-মন্দিরের বৃদ্ধকে দেখিতে পাইলেন। হনুমান জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন? দেখিয়াছ ত?" তখন তুলসীদাস বুঝিতে পারিলেন, রাজপুত্র দুটি রাম ও লক্ষ্মণ। যতটা স্মরণ হয়, হৃদয়ে চিত্র আঁকিয়া লইলেন। কিন্তু বৃদ্ধকে বলিলেন "ওরূপ চকিতের মত দেখায় সাধ মেটে নাই। ভাল করিয়া দেখাইতে হইবে। আর যখন সীতাদেবীকে দেখি নাই তখন এ-দেখা দেখাই নহে।" হনুমান আর-একবার দেখাইতে স্বীকৃত হইয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন।

তুলসীদাস আপন কুটীরে বাস করেন। দিবারাত্রি রাম ভজন করেন। কবে কোথায় ভগবান্ দর্শন হইবে সেই চিন্তায় থাকেন। একদিন নিকটের এক গ্রামে অন্ন সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলেন। ফিরিবার সময়ে দেখিলেন, পথের ধারে এক মাঠে অনেক লোক জড় হইয়াছে, দূর হইতে গোলমাল শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন সেখানে রাম-লীলা হইতেছে। তিনি ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া রাম-লীলা দেখিতে লাগিলেন। রাম-লীলাতে ধনুর্যজ্ঞ, চার ভাইয়ের বিবাহ, পরশুরামের সহিত কলহ, রামাভিষেক উৎসব ও বনবাস দেখিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইলে রামলীলা ভাঙিয়া গেল। তিনিও লীলার কথা ভাবিতে ভাবিতে কুটীরের পথে চলিলেন। কুটীরের কাছে এক প্রতিবাসী সাধুর সহিত দেখা হইল। সাধু তাঁহার সমস্ত দিন অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি রামলীলার কথা বলিলেন। সাধু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "তুমি কি বলিতেছ? এই বনের মধ্যে এত লোক কোথায়, যে মেলা বসিবে? রামলীলা ত শরৎকালে নবরাত্রির সময় হয়, আজকাল রামলীলা কোথায়? আর তুমি যেখানে রামলীলা দেখিয়াছ বলিতেছ, সেখানে ত ১০।২০ জন লোকের দাঁড়াইবার মতই স্থান নাই, এত লোক কোথায় দাঁড়াইয়া ছিল?" তুলসীদাস চিন্তিত হইলেন, পরে ঊর্দ্ধশ্বাসে রামলীলার স্থানে আসিয়া দেখিলেন যেখানে তিনি অপরাহ্নে সহস্র দর্শকের সহিত দাঁড়াইয়া রামলীলা দেখিয়াছেন সে-স্থান বন ও পাহাড়ে পূর্ণ, ২০।২৫ জন লোকের একত্র দাঁড়াইবার স্থান নাই।

তিনি ভাবিতে ভাবিতে আবার কুটীরে ফিরিলেন। দেখিলেন, বৃদ্ধরূপী হনুমান তাঁহার কুটীরদ্বারে বসিয়া আছেন। হনুমান জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন? এবার সাধ মিটাইয়া দেখিয়াছ ত?" তুলসী উত্তর করিলেন, "না ঠাকুর, সাধ মেটে নাই। দেখিবার সময় আমার জ্ঞান হরণ করিলেন কেন?" হনুমান বলিলেন, "ঐটি সাধারণ নিয়ম, ভগবৎ-মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া জীবে ভগবৎ-দর্শন পাইয়াও বুঝিতে পারে না; যাহা হউক, যাহা পাইয়াছ তাহাতেই তুষ্ট হও, আর বেশী আকাঙ্ক্ষা করিও না। তুমি ভাগ্যবান্, তাই দুইবার দর্শন পাইলে, অনেকে আজীবন তপস্যা করিয়া একবারও দর্শন পায় না। এইবার লোকালয়ে যাও, জীবকে ভক্তি উপদেশ কর, ও শ্রীভগবানের নরলীলা কাহিনী শুনাও।" তুলসী বলিলেন, "আমার ত বিদ্যা নাই, বড় বড় বিদ্বান্‌দের ছাড়িয়া আমার কথা কে শুনিবে?" হনুমান হাসিয়া বলিলেন, "যে দুইবার ভগবান্ দর্শন করিয়াছে তাহার শক্তির অভাব হয় না। তুমি আপনার কর্ম্ম কর, সফলতার ভার শ্রীভগবানকে দাও।"

তুলসীদাস কাশীতে আসিয়া কার্য্যারম্ভ করিলেন। ঘাটে ঘাটে ভক্তিমার্গের উপদেশ দেন, অবসর-মত রাম-চরিতের কথা শুনান, ও নিভৃতে বসিয়া রামায়ণ রচনা করেন। তিনি বহু কাল একস্থানে থাকিতেন না, তবে বেশীর ভাগ কাশীতে ও অযোধ্যাতে থাকিতেন। অন্য সময়ে ভারতের সকল তীর্থেই ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের ঘটনাগুলির মধ্যে কোন্‌টি আগে কোন্‌টি পরে হইয়াছিল জানিবার উপায় নাই। একবার তিনি শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, অন্য অনেক ভক্তের সহিত এক মন্দির দর্শন করিতে প্রবেশ করিয়া তাঁহার মনে পড়িল তিনি ত আপনার মাথা শ্রীরামচন্দ্রকে দিয়া রাখিয়াছেন, এখন অন্য বিগ্রহের সম্মুখে তাহা নত করেন কেমন করিয়া। যদিও শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণে প্রভেদ নাই তথাপি চিরকালের বিশ্বাস কোথায় যাইবে? তিনি বিগ্রহের সম্মুখে জোড়

হস্তে দাঁড়াইয়া বলিলেন :—"কা বরনউ ছবি আজ কি, ভলে বিরাজউ নাথ ? । তুলসী মস্তক তব নমেঁ, ধনুষ-বান লেও হাত ॥"—"আজকার ছবির দৃশ্য কি বর্ণনা করিব ? কি সুন্দর তুমি অধিষ্ঠিত! তুলসী তখনই মস্তক অবনত করিবেন যখন হাতে ধনুর্ব্বাণ লইবে॥" তুলসীর মুখে এই পদ উচ্চারিত হইতেই সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিল সিংহাসনে রাধাকৃষ্ণ নাই। তাহার পরিবর্ত্তে বীরাসনে ধনুর্ব্বাণধারী শ্রীরামচন্দ্র, বামে লক্ষ্মীরূপা জানকী, পশ্চাতে লক্ষ্মণ, ও সম্মুখে ভক্ত হনুমানের মূর্ত্তি রহিয়াছে। সকলেই প্রণাম করিল, কিন্তু মাথা তুলিয়া আর সে-মূর্ত্তি কেহ দেখিতে পাইল না। তুলসীর, প্রথমেই ভক্ত বলিয়া শ্রীবৃন্দাবন-সমাজে সম্মান ছিল ; এই ঘটনার পর তাহা সহস্রগুণে বাড়িয়া গেল।

কাশীতে একদিন তুলসীদাস গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছিলেন, দেখিলেন একটি যুবক উচ্চকণ্ঠে বলিতেছে, "আমি ব্রাহ্মণ-কুমার হইয়া গো-হত্যা করিয়াছি। এই কাশী-পুরীতে এমন কোনো মহাপুরুষ আছেন কি যিনি আমাকে ভগবানের নামে হত্যা হইতে উদ্ধার করিয়া দেন ?" কাশীর মত স্থানেও কেহ তাহার সাহায্য করিতেছে না দেখিয়া তুলসী ব্যথিত হইলেন। তিনি তাহাকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গাতীরে গেলেন, তাহাকে রাম-নাম জপ করিতে বলিয়া গঙ্গা-স্নান করাইলেন, পরে আপন আশ্রমে আনিয়া আপনার সহিত বসাইয়া মহাপ্রসাদ খাওয়াইলেন, পরে তাহাকে নীতি ও ধর্ম্ম উপদেশ দিয়া ছাড়িয়া দিলেন। কাশীর ব্রাহ্মণ-সমাজ তুলসীদাসের এই কর্ম্মে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল। সকলেই বলিল, "তুমি যখন গোহত্যাকারীর সহিত ভোজন করিয়াছ, তখন তুমি পতিত হইয়াছ, তোমাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে পারিব না।" তুলসীদাস বলিলেন, "তোমরা কেবল টিয়াপাখীর মত শাস্ত্র পড়িয়াছ মাত্র, অর্থ বুঝিতে পার নাই। শাস্ত্রে বিশ্বাসও কর না।" শুনিয়া পণ্ডিতের দল চটিয়া উঠিলেন। তুলসীদাস বলিলেন "যখন শাস্ত্র বলিতেছে একবার রাম নাম করিলে সকল পাপ ক্ষয় হয়, তখন যে-ব্যক্তি অনেকক্ষণ বসিয়া রামনাম জপ করিয়াছে তাহার পাপ কোথায় ? হয়, সে নিষ্পাপ হইয়াছে, নতুবা শাস্ত্র মিথ্যা। তোমরা এ-দু'য়ের মধ্যে কোন্‌টা স্বীকার করিতে চাও ?" পণ্ডিতের দল নিরুত্তর হইলেন। বলিলেন, "আপনি ত মহাপুরুষ, আমাদের কোনও চিহ্ন দ্বারা বিশ্বাস করাইয়া দিন যে লোকটা নিষ্পাপ হইয়াছে", তুলসী জিজ্ঞাসা করিলেন "কিরূপ প্রমাণ চাও ?" তাহারা তুলসীকে জব্দ করিবার জন্য একটা অসম্ভব প্রমাণ চাহিল। বলিল, "বিশ্বনাথের মন্দিরে যে পাথরের ষণ্ড আছে সে যদি ঐ ব্রাহ্মণ-কুমারের হাতে তৃণ খায়, তবে আমরা উহাকে নিষ্পাপ বিবেচনা করিব।" তুলসী উত্তর করিতে পারিতেন, "ঐ পাথরের ষাঁড় তোমাদের হাতে তৃণ খায় কি ?" কিন্তু তাহা না বলিয়া বলিলেন, "তাহাই হইবে"। তিনি সকলকে লইয়া বিশ্বনাথের মন্দিরে গেলেন, প্রথমে পূজা করিলেন, পরে ধ্যানে বসিলেন। কতক্ষণ পরে সেই যুবককে বলিলেন, "পাথরের ষাঁড়ের মুখে তৃণ দাও।" মন্দিরে যত দর্শক উপস্থিত ছিল, সকলেই স্পষ্ট দেখিল পাথরের ষাঁড় যুবকের হাত হইতে তৃণ তুলিয়া লইল। সকলে তুলসীর এই অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া চমৎকৃত হইল ও তাঁহার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল।

যখন তুলসীদাস কাশীতে থাকিতেন, তখন নিম্নলিখিত চারিটি স্থানের কোনো এক স্থানে বাস করিতেন।

১। কাশীর দক্ষিণে অসির অপর পারে আপনার আশ্রমে। এখন ঐ আশ্রমে সীতা-রামের মন্দির আছে।

২। গোপাল-মন্দিরের পাশে এক ছোট কুঠারীতে। এই গোপাল-মন্দির বল্লভ সম্প্রদায়ীদের। এখন প্রতি-বৎসর শ্রাবণ শুক্ল-সপ্তমীর দিন এই ঘরখানি খোলা হয়।

৩। সঙ্কট-মোচন ঘাটের কাছে তুলসী স্থাপিত মহাবীর মন্দিরের কাছে।

৪। প্রহ্লাদ ঘাটে পণ্ডিত গঙ্গারাম যোশীর বাটীতে।

একবার কাশী-বাসকালে প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতে যাইবার সময়ে দেখিতেন, এক যুবতী কুলবধূ তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ লইয়া যাইত। মধ্যে চার-পাচ দিন তাহাকে দেখেন নাই, পরে যখন গঙ্গাস্নানে চলিয়াছেন, দেখিলেন সেই বধূটি নানা অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া আসিতেছে। সে গোস্বামীকে প্রণাম করিল। তুলসীদাস তাহাকে "সৌভাগ্যবতী ভব" বলিয়া আশীর্ব্বাদ

করিতে একজন দর্শক বলিল, "এ কি আশীর্ব্বাদ করিলেন? ঐ দেখুন উহার স্বামীর শব আসিতেছে। ও ত সহমরণে চলিয়াছে, আপনার আশীর্ব্বাদ আর কেমন করিয়া সফল হইবে?" তুলসীদাস এই কথা শুনিয়া চিন্তিত হইলেন। শবের সহিত শ্মশানে গিয়া সকলকে বলিলেন, "তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি না আসিলে উহার ঊর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া করিও না।"

এই বলিয়া তিনি স্নান করিতে গেলেন। স্নানের পর ধ্যানে বসিলেন। তাঁহার ধ্যান আর ভাঙে না। এদিকে যাহারা শবদাহ করিতে আসিয়াছিল তাহারা চিতা সাজাইয়া বসিয়া বিরক্ত হইতে লাগিল। কিন্তু মহাপুরুষের কথাও ঠেলিতে পারিল না। এক প্রহর পরে দেখিল, কাপড়-ঢাকা শব নড়িতেছে। কাপড় তুলিয়া দেখিল নিশ্বাস পড়িতেছে। এমন সময়ে গোস্বামী আসিয়া বধূকে বলিলেন, "মা, ভগবান্ আমার কথা রাখিয়াছেন, তোর স্বামীকে বাড়ী লইয়া যা।" ক্রমে একথা নগরময় প্রচারিত হইলে গোস্বামীর কাছে এত লোক আসিতে লাগিল, যে, তিনি বাধ্য হইয়া কিছুকালের জন্য কাশী ত্যাগ করিলেন।

তুলসীর জীবনী-লেখকেরা বলেন, মুসলমান বাদ্শা এই সংবাদ পাইয়া তুলসীদাসকে ডাকিয়া অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দিতে বলেন। তিনি বলিলেন, "আমার কোনো ক্ষমতা নাই। আমি রাম নাম ভিন্ন আর কিছুই জানি না।" বাদ্শা তুলসীকে কারাগারে পাঠাইলেন। রাত্রে মহাবীর বানরসৈন্য আনিয়া রাজধানী তোলপাড় করিলেন। পরদিন বাদ্শা ক্ষমা চাহিয়া ছাড়িয়া দিলেন।

এঘটনা প্রায় সকল মহাপুরুষ ও তাঁহার ইষ্টদেবতা-সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে; যথা—ভারতচন্দ্র ভবানন্দ মজুমদারকে কারাগারে রাখিয়া কালীদেবীর সৈন্যদ্বারা দিল্লী তোলপাড় করিয়াছেন।

শ্রীবৃন্দাবন-বাসী প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ভক্তমালের গ্রন্থকার নাভাজী তুলসীদাসের বন্ধু ও ভক্ত ছিলেন। ভক্তমালে তাঁহার স্তুতি করিয়াছেন মাত্র। তাহাতে ঐতিহাসিক কিছুই নাই।

তুলসীদাসের আরও কতকগুলি অলৌকিক ক্ষমতার গল্প আছে। কিন্তু গল্পগুলি সত্য বলিয়া বোধ হয় না। একবার, তাঁহার কোন ধনবান্ ভক্ত পূজার বাসন সোনা-রূপার করিয়া দেন। অসিঘাটের আশ্রমে সেগুলি ছিল। এক চোর কয়েকদিন সেগুলি চুরি করিতে আসিয়া দুইটি ধনুর্ব্বাণধারী বালককে রক্ষকরূপে দ্বারে দেখিয়া ফিরিয়া যায়। পরে গোসাঞি জানিতে পারিয়া, ঠাকুরের রক্ষা করিতে কষ্ট হইতেছে বলিয়া, বাসনগুলি দান করিয়া দেন। এরূপ গল্প অন্য মহাপুরুষ সম্বন্ধেও আছে।

প্রহ্লাদ ঘাটে গোস্বামীর বন্ধু পণ্ডিত গঙ্গারাম যোশী মুঙ্গাপুরের কাছে কোন গহরবার ক্ষত্রিয় রাজার জ্যোতিষী ছিলেন। একবার রাজকুমার মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। সেবকেরা আসিয়া বলিল, রাজকুমারকে বাঘে খাইয়া ফেলিয়াছে। রাজা গঙ্গারামকে ডাকিয়া বলিলেন, "কাল সকালে গণনা করিয়া জানাইবে কুমারের কি হইয়াছে। ঠিক বলিতে পারিলে পুরস্কৃত হইবে, মিথ্যা বলিলে শূলে উঠিতে হইবে।" শূলের নাম শুনিয়া যোশীজি জ্যোতিষ ভুলিয়া গেলেন। তিনি বাড়ী আসিয়া তুলসীদাসকে সব কথা বলিলেন। তুলসীদাস কাগজ-কলম চাহিলেন। কালি না থাকায় খদির দিয়া রামশলাকা চক্র আঁকিয়া প্রশ্ন বিচার করিয়া বলিলেন, "তোমার রাজাকে বলিয়া আইস রাজকুমার জীবিত আছেন. আগামী কল্য আসিবেন।" যোশী তাহাই করিলেন। পরদিবস কুমার বাড়ী ফিরিলেন। তিনি একটি অনুচরসহ কয়েকটি বাঘের মুখে পড়িয়াছিলেন। উভয়ের ঘোড়া ও অনুচরকে বাঘে খাইয়া ফেলে। দূর হইতে অন্য অনুচরেরা দেখিয়া ভ্রম-বশতঃ রাজকুমারের মৃত্যু-সংবাদ দিয়াছিল। রাজা যোশীকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দিলেন। যোশী এই টাকা তুলসী-দাসকে লইতে অনুরোধ করেন, কিন্তু তিনি স্বীকার করিলেন না। অনেক অনুরোধে দুই আনা অর্থাৎ ১২৫০০ টাকা লইতে স্বীকার করিলেন। এই অর্থ দিয়া তিনি বারটি মহাবীর-মন্দির স্থাপন করিলেন। এগুলি এখনও আছে। গঙ্গারামের উত্তরাধিকারীর কাছে ঐ খদিরে লেখা কাগজখানি এখনও আছে।

তুলসীদাস কমবেশী ৯১ বৎসর বয়সে ১৬৮০ সম্বতে শ্রাবণ শুক্ল-সপ্তমীর দিন (২৩ জুলাই, ১৬২৩ :) স্বদেহ

রামচন্দ্রের বানর-সৈন্য—চিত্রকর শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ। শ্রীযুক্ত এন্ সি মেহতা মহাশয়ের সৌজন্যে

রক্ষা করিয়াছিলেন। কোন কবি তাঁহার তিরোধানের তিথি এইরূপে বলিয়াছেন।—সম্বৎ সোলা সো অসী, অসী-গঙ্গকে তীর। শ্রাবণ শুক্লা সপ্তমী, তুলসী তজ্যো শরীর॥

সে-কালে পণ্ডিতেরা দেব-ভাষায় রচনা করিতেন। প্রাকৃতে সাধারণ পত্রলেখাও অপমান-জনক বিবেচনা করিতেন। সেইজন্য সে-কালের প্রাকৃত ভাষার রচনা অতি অল্পই দেখা যায়। তুলসীদাস সে নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়া সাধারণ প্রাকৃতেই রচনা করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার রচনাতে পার্সী আরবী শব্দ যথেষ্ট পাওয়া যায়। একবার তিনি কাশীর কোন ঘাটে বসিয়াছিলেন, একজন পণ্ডিত আসিয়া তাঁহার কাছে বসিলেন। বলিলেন, "আপনি পণ্ডিত হইয়া চাষাদের ভাষাতে কবিতা লেখেন কেন?" গোসাঞি সবিনয়ে বলিলেন, "আপনার শুনিতে ভুল হইয়াছে, আমি বিদ্বান্ নই, আপনার মত পণ্ডিতদের জন্য দেবভাষায় রচনা করিবার ক্ষমতা আমার নাই। আমি যেমন মূর্খ, সেইরূপ মূর্খ চাষাদের মনোরঞ্জনের জন্য যাহা রচনা করি, তাহা চাষাদের ভাষাতেই করি।"

গ্রন্থাবলী

তুলসীদাসের রচিত বলিয়া যে-সকল পুস্তক ও পুস্তিকা প্রচলিত, তাহার সংখ্যা ৩১। কিন্তু বিশেষজ্ঞেরা কেবল ১৩খানি পুস্তক নিঃসন্দেহে তুলসীদাসের বলিয়া স্বীকার করেন। একখানি সম্বন্ধে মতভেদ আছে ও বাকি ১৭খানি সত্য বা কাল্পনিক তুলসী-নামধারী অন্য কবির রচনা। যেগুলি নিঃসন্দেহে গোস্বামীর রচনা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, সেগুলি এই:—

১। রাম-চরিত-মানস বা রামায়ণ:—তুলসীদাস ঠিক বাল্মীকির অনুসরণ করেন নাই। কৃত্তিবাসের মত আপনার কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন।

২। রাম-নহছু:—যুক্তপ্রদেশে, অযোধ্যা ও মিথিলা-প্রদেশে বিবাহের পূর্ব্বে যখন বর বিবাহ করিতে যাত্রা করে, তখন বরের মাতা পুত্রকে স্নান করাইয়া কোলে লইয়া বসেন। নাপিতানী বরের নখ কাটিয়া আলতা পরাইয়া দেয়। এই প্রসাধনকে স্থানীয় ভাষায় নহছু (নহ = নখ, ছু = ছোঁয়া) বলে। এই পুস্তকে শ্রীরামচন্দ্র বিবাহ করিতে যাইবার পূর্ব্বে কৌশল্যা দেবীর কোলে বসিয়াছেন, নাপিতানী প্রসাধনে ব্যস্ত,—এই দৃশ্যই বর্ণিত হইয়াছে। বাল্মীকিতে, অবশ্য, এ-দৃশ্য নাই। সেখানে রাম বাটী হইতে বর সাজিয়া যাত্রাই করেন নাই। এই কবিতার ছন্দের নাম "সোহর"। এখনও বিবাহের সময়ে ঐ অঞ্চলে এই সোহর গীত হইয়া থাকে।

৩। বৈরাগ্য-সন্দীপনী:—বৈরাগ্য-মার্গের পথ-প্রদর্শক—৬২টি কবিতা।

৪। বিরওয়া-রামায়ণ:—অতি সহজ নূতন ছন্দে রামায়ণের কথা। এই নাম-করণের একটি গল্প আছে। নবাব আব্‌দুল রহিম খানখানার মুন্সীর স্ত্রী কবি ছিলেন। তিনি এক কবিতা লেখেন, তাহার প্রথম পদ:—"প্রেম প্রীতিকে বিরওয়া চলে হুঁ লগায়। সীচন কী সুধ লীজো, মুর্ঝি ন জায়।"—প্রেম ও প্রীতির চারাগাছ রোপণ করিয়া চলিলাম, তাহাতে জল সেচন করিতে ভুলিও না, যেন শুকাইয়া না যায়। এই কবিতা ও ছন্দ নবাব পছন্দ করিয়া ছন্দের নাম "বিরওয়া" রাখিলেন ও আপন বন্ধুদের ঐ ছন্দে কবিতা লিখিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারই অনুরোধে তুলসীদাস রামায়ণ-বিষয়ে নানা কবিতা লিখিয়াছেন।

৫। পার্ব্বতী-মঙ্গল:—হর-পার্ব্বতীর বিবাহ-বিষয়ে কবিতা।

৬। জানকী-মঙ্গল:—জানকীর বিবাহ-কথা, কিন্তু বাল্মীকির মত নহে, রাম-চরিত মানসের কথাও নহে।

৭। রামাজ্ঞা:—ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে গ্রন্থ। সাত অধ্যায়, প্রতি-অধ্যায়ে ৪৮টি দোহা।

৮। দোহাবলী:—নানা বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচিত ৫৭৩টি দোহার সংগ্রহ।

৯। কবিত্ত-রামায়ণ বা কবিতাবলী:—ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচিত কবিতা সংগ্রহ।

১০। গীতাবলী:—রামায়ণ কথকতার মধ্যে গেয় গীত-সংগ্রহ।

১১। কৃষ্ণ-গীতাবলী:—কৃষ্ণ-বিষয়ক গীতাবলী (সম্ভব বৃন্দাবন-বাস-কালে রচিত)।

১২। শত পঞ্চ চৌপাঈ :—১০৫ টি চৌপাঈ সংগ্রহ। ভক্তিমার্গের গীত।

১৩। বিনয় পত্রিকা :—গীত বা প্রার্থনা সংগ্রহ। ইহাতে নানা বিষয়ক ২৭৯টি পদ্য আছে। ইহাতে কবির জীবনের কথা, সে-সময়ের সমাজের ও দেশের কথা, কাশীর মন্দির বর্ণনা ইত্যাদি নানা কথা আছে।

১৪। রাম সতসঈ :—সাত শত অপেক্ষা বেশী দোহাবলী সংগ্রহ। এই পুস্তক-সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের মতভেদ আছে। কেহ বলেন অধিকাংশ তুলসীদাসের লেখা, দুই-চারিটি প্রক্ষিপ্ত, আবার কাহারও মতে প্রায় সকল-গুলিই তুলসী নাম-ধারী অন্য কোন কবির লেখা। পুস্তকে আছে যে, ১৬৪২ সম্বৎ বৈশাখ শুক্ল-নবমী গুরুবার শেষ হইয়াছে।

১৬৫৫ সম্বৎ (১৫৯৮ খৃঃ) জাহাঙ্গীর একজন জয়পুরী চিত্রকর পাঠাইয়া গোস্বামী তুলসীদাসের এক চিত্র প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। বোধ হয়, তুলসীদাসের ইহাই একমাত্র চিত্র। শুনিয়াছি আদৎ চিত্রখানি কাশীর গঙ্গারাম যোশীর উত্তরাধিকারীর কাছে আছে। উপস্থিত উত্তরাধি-কারীর সহিত আমার ১৯১৫ খৃঃ আলাপ হয়, তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে, প্রহ্লাদ ঘাটে যে-ঘরে তুলসীদাস থাকিতেন, তাহাতে ঐ চিত্র দেখিয়া তিনি একটি শ্বেত প্রস্তরের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবেন। কিন্তু তিনি সফল হইয়াছেন কি না সংবাদ পাই নাই।

বেজায় খরচ

শ্রী নিশিকান্ত সেন, বি-এ

(টলষ্টয় অবলম্বনে)

মনাকো ক্ষুদ্র রাজ্য, ফ্রান্স ও ইটালির সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত। রাজ্যটি খুবই ছোট। অনেক ছোট সহরেও এর চেয়ে বেশী লোকের বাস। রাজ্যে লোকসংখ্যা মোট সাত হাজার। আর রাজ্যটা যদি এই সাত হাজার অধিবাসীর মধ্যে ভাগ করা যায়, তবে মাথা পিছু এক একর জমিও পড়ে না।

যেমনি ছোট রাজ্য, তেমনি তার একজন ছোট রাজা। তাঁর প্রাসাদ সভাসদ মন্ত্রিবর্গ সেনাপতি সৈন্যদল সবই আছে ; তবে ছোট রাজার ছোটধরণের সব। সৈন্যদলে মোট ষাট জন সৈন্য ; তবু সৈন্যদল ত বটে। রাজার অভিষেক, উৎসব, আইন-আদালত, মন্ত্রিসভা, আলোচনা, বিচার, শাস্তি, পুরস্কার সবই আছে ; ছোট রাজার যেমন থাক্‌তে হয়।

রাজ্যের আয় ছিল রাজকর এবং মদ্য, তামাক প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের উপর শুল্ক। সে আয় সামান্যই ; কারণ বেশী লোকে মাদক দ্রব্য ব্যবহার কর্‌ত না। রাজার মন্ত্রিগণ, সভাসদ ও অন্যান্য কর্ম্মচারীদের বেতনেই সে আয় ফুরিয়ে যেত।

রাজার আর-একটা নতুন আয় হ'ল, জুয়ার আড্ডার খাজনা। যারা জুয়া খেল্‌ত তাদের হারজিত যা হোক না আড্ডাধারীকে কতক টাকা দিতেই হ'ত। আড্ডাধারী তার লাভ থেকে একটা মোটা-রকমের টাকা রাজসরকারে দিত। ইউরোপে অন্যান্য রাজ্যে জুয়া-খেলার প্রচলন বন্ধ হওয়ায় আড্ডাধারী এই আড্ডাটা অনেক টাকা খাজনা দিয়ে রেখেছিল। যারা জুয়া খেল্‌ত তারা মনাকো রাজ্য ছাড়া আর খেল্‌বার জায়গা পেত না। কাজেই জুয়াড়ীর দল সব এখানে খেল্‌তে আস্‌বেই। হার হোক্, জিত হোক্‌, রাজার লাভের বাধা নেই।

রাজা বুঝেন, জুয়া খেলাটা ভাল নয়, তবু কি করেন ব্যয় কুলাইবার জন্য আয় ত চাই। তাই এই জুয়ার আড্ডা রাখা।

একবার রাজ্যে একটা খুন হ'ল। সে-রাজ্যের অধিবাসীরা সব শান্তিপ্রিয় ; এমন ঘটনা রাজ্যে কখনো আর হয়নি। আদালতে মামলা হ'ল। জজ, উকিল, ব্যারিষ্টার, জুরি সবই আছে। তাঁরা নানা যুক্তি-তর্কের অবতারণা কর্‌লেন। নিয়মমত বিচার হ'ল। বিচারে আসামী দোষী সাব্যস্ত হ'ল। হুকুম হ'ল, তার মাথা কেটে ফেলা হবে। জজের রায় রীতিমতন রাজ-দরবারে দাখিল হ'ল ; রাজা মঞ্জুর কর্‌লেন।

কিন্তু মুস্কিল হ'ল এই—রাজ্যে ঘাতকও নেই, মাথা কেটে ফেল্‌বার উপযুক্ত অস্ত্রও নেই। মন্ত্রীরা অনেক পরামর্শ করে' স্থির কর্‌লেন, ফরাসী গবর্ণ্‌মেণ্টের নিকট অস্ত্র ও ঘাতক প্রার্থনা করা হবে।

সেখানে সংবাদ গেল। ফরাসী গবর্ণ্‌মেণ্ট্ উত্তর দিলেন—তাঁরা অস্ত্র ও ঘাতক দিতে পারেন, ব্যয় পড়্‌বে ষোল হাজার টাকা।

রাজার কাছে খবর গেল, রাজা বল্‌লেন, "উহুঁ, এ-যে বেজায় খরচ ! ষোল হাজার টাকা ! রাজ্যের প্রজার উপর মাথা পিছু দু টাকারও বেশী ! না, এ হ'তে পারে না। ও খুনেটার জন্য এত খরচ করা যায় না। এতে রাজ্যে বিদ্রোহ হ'তে পারে। দেখ, কম খরচে হয় কি না।"

আবার মন্ত্রীরা পরামর্শে বস্‌লেন। স্থির হ'ল, ইটালি রাজ্যে খোঁজ নেওয়া হোক। ফ্রান্স্ সাধারণ-তন্ত্র দেশ, রাজার সম্মান তারা বোঝে না। ইটালীর রাজারা রাজার সম্মান রাখ্‌বেন।

ইটালী রাজ্যে খবর গেল। সেখান থেকে উত্তর এল, তাঁরাও দিতে পারেন, তবে খরচ বার হাজার টাকা।

কিছু সস্তা বটে, তবু এও বেজায় খরচ। রাজা বল্‌লেন, "উহুঁ, আরো সস্তায় দেখ, এও অতিরিক্ত!"

আবার মন্ত্রীসভার অধিবেশন। কি করে' কম খরচে হয় তার আলোচনা হ'ল। তাঁরা বল্‌লেন, "আচ্ছা কোন সৈন্ত দিয়ে হয় না? তারা ত মানুষ মারার জন্তই আছে; যুদ্ধে কত মানুষ মারে।"

সেনাপতি সৈন্তদের জিজ্ঞাসা করলেন, সৈন্তেরা বল্‌লে, 'না, আমরা পারব না; এমন করে' মানুষ মারা আমরা শিখিনি।"

কি করা যায়? মহা মুস্কিল। মন্ত্রীরা আবার পরামর্শে বস্‌লেন। আলোচনা, সমালোচনা, পুনরালোচনা, অনেক হ'য়ে গেল। কমিটি, সব্‌-কমিটি গঠিত হ'ল; শেষটা ঠিক হ'ল লোকটার মৃত্যু-দণ্ড বদ্‌লে দিয়ে, আজীবন কয়েদ করে' রাখা হোক্‌। এতে রাজারও দয়া দেখান হবে, খরচও অনেক বেঁচে যাবে। রাজার কাছে খবর গেল; রাজাও মঞ্জুর করলেন।

আবার আর এক মুস্কিল। আজীবন একটা লোককে কয়েদ করে' রাখা যায় এমন কারাগার সে রাজ্যে নেই। সাময়িকভাবে কয়েদ রাখার যোগ্য একটা আছে বটে, কিন্তু তাতে একটা লোককে আজীবন রাখা চলে না।

শেষটা একটা স্থান ঠিক হ'ল সেখানে খুনেটাকে আটক রাখা হবে। একটা পাহারাওয়ালা নিযুক্ত হ'ল, সে লোকটাকে চৌকি দেবে, আর রাজ বাড়ী থেকে কয়েদীর আহার্য্য এনে দেবে।

এরূপ মাসের পর মাস যায়, ক্রমে এক বছর গেল। রাজা তাঁর রাজ্যের হিসাব-নিকাশ দেখ্‌তে বস্‌লেন। তিনি দেখ্‌লেন, রাজ্যে একটা নতুন খরচ বেড়ে গেছে। সেটা ঐ পাহারাওয়ালা রাখার খরচ। তবে বেতন ও কয়েদীর আহারেতে বছরে ছয় শত টাকা খরচ হ'য়ে গেছে। আরও মুস্কিল এই যে, লোকটা বেশ সবল ও সুস্থ আছে; শীঘ্র মরবার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। এমনভাবে আরও পঞ্চাশ বছর বাঁচতে পারে। পঞ্চাশ বছর ধরে' এমনিতর খরচ—সে যে আরও বেজায় খরচ!

রাজা আবার মন্ত্রীদের ডাক্‌লেন। তাদের বল্‌লেন, "আপনারা একটা সোজা উপায় ঠিক করুন। এতটা খরচ চল্‌বে না।"

তাঁরা অনেক চিন্তা করলেন, অনেক আলোচনা করলেন। একজন বল্‌লেন, "আচ্ছা, পাহারাওয়ালাকে উঠিয়ে দেওয়া হোক।" আপত্তি হ'ল, তাহ'লে লোকটা পালিয়ে যাবে যে। "যায় যাক্‌; খরচ ত হবে না তাতে।"

আবার রাজার কাছে খবর গেল। রাজা তাদের সিদ্ধান্ত মঞ্জুর করলেন। পাহারাওয়ালা বরখাস্ত হ'ল।

কয়েদী দেখ্‌লে ঠিক সময়ে তার খাবার এ'ল না। বেরিয়ে এসে দেখ্‌লে পাহারাওয়ালা নেই। কি করা যায়? না খেয়ে ত আর বাঁচা যায় না। নিজেই সে থালা নিয়ে রাজবাড়ী চল্‌ল খাবার আন্‌তে। খাবার এনে খেয়ে দোর বন্ধ করে' রইল।

এমনি করে' রোজ চল্‌ল। কয়েদী নির্দ্দিষ্ট সময় রাজবাড়ী থেকে খাবার আনে আর ঐখানে থাকে। তার পালাবার কোন চিহ্নই দেখা গেল না।

কি করা যায়? মন্ত্রীরা আবার পরামর্শে বস্‌লেন। ঠিক হ'ল, কয়েদীকে খুলে' বলা হোক যে তাকে আটকে রাখা তাদের ইচ্ছা নয়। সে যথা ইচ্ছা যেতে পারে।

প্রধান মন্ত্রী তাকে ডেকে বল্‌লেন, "তুমি চলে' যাচ্ছ না যে, এখন ত পাহারা দেবার কেউ নেই, তুমি গেলে কোন অপরাধ হবে না।"

সে লোকটা উত্তর করলে, "অপরাধ ত হবে না, কিন্তু আমি যাব কোথায়? আমার কোনো স্থান নেই। কি করি? আপনারা বিচারে আমার সর্ব্বনাশ করেছেন। লোকে আমায় দেখে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে। তার পর, এতদিন আটক থাকায় আমার কাজ করার অভ্যাস নষ্ট হ'য়ে গেছে। আপনারা আমার উপর অবিচার করেছেন। যখন আমার মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল, তখন আমাকে মেরে ফেলা উচিত ছিল। তা করেননি। এই নম্বর এক। তার পর আমার আজীবন কয়েদ করলেন এবং আমার খাবার এনে দেওয়ার জন্য পাহারাওয়ালা নিযুক্ত করলেন। এখন তাকে তুলে' দিয়েছেন, আমাকে নিজেই খাবার আন্‌তে হচ্ছে। এই নম্বর দুই। এতেও আমি কিছু বলিনি। এখন দেখ্‌ছি, আপনারা সত্যসত্যই আমাকে তাড়াতে চান। আপনারা যা ইচ্ছা করুন, কিন্তু আমি কিছুতেই যাব না।"

এখন কি করা যায়? আবার মন্ত্রী-সভার অধিবেশন। কি হবে? লোকটা কিছুতেই যাবে না। তাঁরা অনেক ভেবে আলোচনা করে' ঠিক করলেন যে, একটা উপায় আছে। লোকটার জন্যে একটা পেন্‌শ্যনের ব্যবস্থা করা হোক। তাঁরা রাজাকে বল্‌লেন, এ ছাড়া আর উপায় নেই। লোকটাকে ছাড়াতেই হবে।

বার্ষিক ছয় শত টাকা পেন্‌সন ঠিক্‌ হ'ল, কয়েদীকে একথা জানান গেল।

লোকটা বল্‌লে, "আচ্ছা, আমি যদি এটা নিয়মিত পাই তবে যেতে রাজি আছি।"

যাক্‌, এতদিনে একটা মীমাংসা হ'ল। কয়েদী তার পেন্‌শ্যনের তিন ভাগের একভাগ টাকা অগ্রিম পেয়ে রাজার রাজ্য ছেড়ে গেল। রাজ্যের সীমান্ত ছেড়ে সেখানে কতকটা জমি কিনে' বাস করতে লাগ্‌ল।

এখন বেশ সুখেই তার দিন কাটে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে সে রাজ-সরকারে হাজির হয়, তার পেন্‌শ্যনের টাকা নিয়ে ফিরে' আসার পথে জুয়ার আড্ডায় গিয়ে দু-এক বাজি খেলে; হার-জিত যা হোক্‌, বাড়ী এসে স্বচ্ছন্দে খায় দায় থাকে।

লোকটার সৌভাগ্য যে, সে এমন দেশে খুন করেনি যেখানে গবর্ণমেণ্ট্‌ মানুষের মাথা কেটে ফেলার জন্যে অথবা তাকে আজীবন আটক রাখার জন্যে খরচ করতে ইতস্ততঃ করে না!

মাসিক গল্প-সাহিত্য

শ্রী মঙ্গলচন্দ্র শর্ম্মা

বাংলা দেশে মাসিক পত্রের সংখ্যা প্রতিবৎসরই বেশ দ্রুতবেগে বেড়ে চলেছে; সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, দ্বৈ-মাসিক, ত্রৈমাসিক ইত্যাদি পত্রও দেখা দিচ্ছে। এগুলি সংবাদ-পত্র নয়; এদের অধিকাংশেরই উদ্দেশ্য চল্‌তি সাহিত্য ও সহজ বোধ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার। কিন্তু সাহিত্যিক রচনা বল্‌তে প্রধানতঃ যা বোঝায়, সেই কাব্য, গল্প ও অন্যান্য রস-রচনার উপরই প্রকাশকদের ঝোঁক বেশী।

টাট্‌কা গল্প, কবিতা, উপন্যাস, ভ্রমণ-কথা ও অন্যান্য রস-নিবন্ধ প্রচার কর্‌বার জন্য যখন আমাদের দেশে নিত্য এত নূতন নূতন সাময়িক পত্রের আবির্ভাব হচ্ছে, তখন মানুষের মনে স্বতঃই এই কথা উদয় হয়, যে, বাংলাদেশে বুঝি রস-সাহিত্য ছড়াছড়ি যাচ্ছে; এই সৃষ্টির ভার পাছে অপচয় হয় তাই বুঝি রস-গ্রাহীর দ্বারে দ্বারে নিত্য নব নব ডালি এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু এইসমস্ত সাহিত্যিক পসরায় কি আমরা সত্যই নব নব সম্পদের দেখা পাই, আধুনিক দশ-বারো কি পনের খানা কাগজ খুলে' দেখুন। সবার আগেই চোখে পড়্‌বে তাদের এক ছাঁচের চেহারা। পনের-কুড়ি বৎসরেরও আগে যে-সব পত্র জন্মগ্রহণ করেছিল, তাদের আকার-প্রকার, সাজ-সজ্জা, বিষয়-বিভাগ সব-কিছুর হুবহু অনুকরণ করে' নূতনগুলিও আবির্ভূত হচ্ছে। কোথাও নূতনত্বের কি বিশেষত্বের চিহ্ন বেশীক্ষণ দেখা যায় না। যদি নামজাদা একখানা কাগজে নূতন কোনো একটা বৈচিত্র্য একবার দেখা দিলে, পরের মাসে দেখা যাবে আর পাঁচখানা কাগজেও আলিবাবার মজ্জিয়ানার মত কে ঠিক সেই চিহ্ন এঁকে দিয়ে গিয়েছে। এতে মনে হয় অধিকাংশ সাময়িক পত্রের নিজস্ব কোন একটা আদর্শ নেই। অন্য-গুলির মতই তারাও যে হ'তে পারে, বড়জোর এই প্রতি-দ্বন্দ্বিতার আদর্শটুকু আছে।

মানুষের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি ও সকলপ্রকার আনন্দের দিকে দৃষ্টি রাখতে গেলে আজকার দিনে শ্রম বিভাগের কথা মনে রাখা দর্‌কার। বাংলা মাসিক পত্র কিন্তু সে কথা মনে রাখেন না। যে-যুগে মাসিক পত্রের বিশেষ বাহুল্য ছিল না, সে-যুগের মাসিক পত্রকে একলাই জুতা সেলাই হ'তে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত সমস্ত কাজ কর্‌তে হয়েছে। কিন্তু যেহেতু তারা এই আদর্শ নিয়ে দাঁড়িয়েছে, অতএব সকলকেই সেই আদর্শে চল্‌তে হবে এখন এযুক্তি বোধ হয় আর মানায় না। ছোট কোন সহরে যখন প্রথম একটা দোকান বসে, তখন এক দোকানীকেই সব সওদা জোগাতে হয়। দোকান দাঁড়িয়ে গেলে তারা সুনাম রাখ্‌বার ইচ্ছায় কি অভ্যাসের বশে কি নিজ পুরাতন ধারা বজায় রাখার জন্য দোকানের ছাঁচ না বদ্‌লাতে পারে; কিন্তু তা বলে' সহর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরবর্ত্তী সমস্ত দোকানগুলিতেই কি চাল-চিঁড়া থেকে সোনা-দানা সব বিকোবে, না ময়রা-সেক্‌রার ভিন্ন ব্যবসায় হবে?

বাংলা মাসিক পত্রের ইতিহাসে এখনও শ্রম বিভাগের আদর্শ কেন দাঁড়াল না বুঝ্‌তে পারিনে। মাসিক পত্র জাতিগত, সম্প্রদায়গত, ব্যবসায়গত যাই হোক না কেন সকলকারই একরূপ। দর্শন, ইতিহাস, ভ্রমণ-কথা, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমালোচনা, আবিষ্কার, উপন্যাস, গল্প, কবিতা, স্বরলিপি ইত্যাদি সব বিষয় ত সকল কাগজে বাহির হবেই; তা সে কৃষক, বণিক, ঘটক কি শিক্ষক যারই মার্কা-মারা কাগজ হোক না কেন; তার উপর আবার সবগুলিতে একই লেখকের লেখা বাহির করতে পারলে আরোই সুন্দর হ'ল মনে করা হবে। বাংলা দেশের এক মোড় থেকে আর-এক মোড় পর্য্যন্ত সকল প্রকাশক যদি রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস (একই উপন্যাস পেলেও আপত্তি নেই) ও জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ

প্রকাশ কর্‌তে পার্‌তেন তা হ'লে তাঁরা খুবই আনন্দিত হ'তেন সন্দেহ নেই, কিন্তু মাসিক পত্রগুলির বিভিন্ন নামের সার্থকতা কোথায় থাকৃত জানি না। প্রত্যেক নূতন পত্রের পিছনে নূতন লেখক নূতন রকম মস্তিষ্কের পরিচয় নিয়ে যদি না দাঁড়াতে পারেন তবে তাদের আয়োজনের সার্থকতাটা কোথায়? একই জিনিষ দশ হাজারের জায়গায় বিশ হাজার প্রচার করতে পার্‌লে কোন লাভ নেই কেউ বল্‌বে না, কিন্তু নূতনত্ব তার মধ্যে যে নিশ্চয়ই নেই তা' বলাই বাহুল্য। সকল জিনিষকে সমগ্রভাবে দেখার সঙ্গে খণ্ডভাবে দেখার প্রয়োজন আছে। সুতরাং সকলেই একই সর্ব্বাঙ্গীণ আদর্শে অনুপ্রাণিত না হ'য়ে যদি ভিন্ন ভিন্ন অংশের ও ভিন্ন ভিন্ন আদর্শের চেহারা দেশকে দেখাতে চাইতেন তা হ'লে দেশ অধিকতর লাভবান্ হ'ত। এক ছাচের দশখানা পত্রের চেয়ে দশ ছাঁচের দশখানা পেলে দেশের লাভ যে বেশী হ'ত তা ত বলাই বাহুল্য, কারণ সৃষ্টির রূপ ত বৈচিত্র্যেই খোলে। অভাবপক্ষে এক ছাচের দশখানায় যদি একছাঁচেরই দশগুণ খাঁটি জিনিষ মিল্‌ত তা হ'লেও নিতান্ত কম আনন্দের কথা হ'ত না। কিন্তু সাময়িক দশ-বারো খানা কাগজ খুলে' দেখুন, এখানেও কলিকাতার মাড়োয়ারী বণিক্ ও গোয়ালার ব্যবসায় সুরু হয়েছে। সহরে ঘিও নেই, দুগ্ধও নেই, কিন্তু ব্যবসায় করে' বড়লোক হ'তে সবাই ব্যস্ত; অতএব সেই একমণ ঘি চর্ব্বি-যোগে পাঁচমণ এবং একমণ দুগ্ধ জলযোগে দশমণ হ'য়ে ঘরে ঘরে ফিরি হ'তে লাগ্‌ল। আমাদের দশাও হয়েছে তাই; লেখকের সম্বল হয়ত চার খানা আমেরিকান্ বৈজ্ঞানিক কাগজ, গোটা দুই গল্পের প্লট, গোটা চার গাইড বুক, পিক্‌চার পোষ্টকাড, আর ছটাক-খানিক কল্পনা; কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনেক; খরিদ্দারও কম নয়, অতএব সেই স্বল্প সম্বলে জল মিশিয়ে দিনকার দিন জোলো হ'তে জোলোতর রচনা কাগজে প্রকাশ করা চলেছে। এর ফলে মাসিক সাহিত্যের কি অবস্থা হয়েছে ভাল করে' দশ-বারো খানা আধুনিক কাগজ খুলে' দেখ্‌লেই বোঝা যায়।

বাংলা মাসিক পত্রের ছোট গল্প না হ'লে' চলে না। সুতরাং এবারকার মত ছোট গল্পের আলোচনা করে'ই দেখা যাক। একেবারে আধুনিক অর্থাৎ ১৩২৯ সালের শীতকালের খানকয়েক কাগজ সাম্‌নেই পড়ে' আছে, মনের মধ্যেও তার দু চার মাস আগের মাসিক সাহিত্যের কিছু কিছু ছাপ এখনও আছে। এইটুকুর উপর নির্ভর করে'ই সমালোচনা কর্‌ছি; বলে' রাখা ভাল, যে, বাংলা দেশের সমস্ত মাসিক পত্রের সমস্ত রচনা অথবা সমস্ত গল্প পড়ে' সমালোচনার সুত্রপাত হয়নি। মোটামুটি যা চোখে পড়েছে এটা তারই একটা মানসিক ছবি। ইম্প্রেশ্যানিষ্ট্ সম্প্রদায়ের ছবির সঙ্গেই এর সাদৃশ্য হবে বেশী। এখানে এনাটমী, পার্স্পেক্টিভ্ কিছুই যথাযথ মিল্‌বে না। যেটুকুর ছায়া মনে যেমন পড়েছে এবং তার ফলে মনে যে কথা জেগেছে কেবল সেইটুকুই দেখা যাবে।

বাংলাদেশে যে-সব কাগজের নাম সবার আগে শোনা যায় সেইরকম সব কাগজের সমসাময়িক দশ-বারো-খানা সংখ্যার অন্তত ত্রিশটা গল্প অল্প দিনের মধ্যেই পড়েছি, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, কাগজগুলি একটু দূরে সরিয়ে রেখে তাদের কথা ভাব্‌তে গেলে দুটো একটার বেশী মনেই আসে না। সূচীপত্র সাম্‌নে ধর্‌লে আট দশটা গল্প মনে পড়ে কিন্তু তাও ছায়া-ছায়া। কাগজের পাতা-কটা একবার উল্টে গেলে দেখা যায় প্রথম শ্রেণীর গল্প বল্‌তে যা বোঝায় তেমন গল্প একটাও নেই। মাসে যে-সব মানুষ খুব কম হলেও দশ-বারোটা কাগজ পড়ে তাদের চোখে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রগুলির মধ্যে দু-তিন মাসে একটিও প্রথম শ্রেণীর গল্প ধরা দিলে না এটা আশ্চর্য্য নয় কি? মাসিক পত্রে প্রকাশিত গল্পের শ্রেষ্ঠতম থেকে নিকৃষ্টতম বিভাগকে যদি পাঁচটা স্তরে ভাগ করা যায় তবে এইসব শ্রেষ্ঠ কাগজের ত্রিশটা গল্পের দশটা হয় তৃতীয় শ্রেণীর, পাঁচটা দ্বিতীয় শ্রেণীর, বাকী চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর। পঞ্চম শ্রেণীর গল্প প্রকাশ করার কার্য্যে যারা সুপ্রসিদ্ধ তাঁদের কাগজ না পড়ে'ই তালিকাটা এইরকম দাঁড়িয়েছে।

যে-সব লেখকের লেখনী থেকে এইসব গল্প প্রসূত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ কিন্তু একাধিকবার প্রথম

শ্রেণীর গল্প বাংলাদেশকে উপহার দিয়েছিলেন। এখনও তাঁদের লেখার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর উপাদান অনেক মিল্‌ছে, কিন্তু সকল দিক্ দিয়ে বিচার কর্‌লে দেখি তাঁদের পুরাতন খ্যাতির কাছে আর তাঁরা পৌছতে পার্‌ছেন না; এবং ওই দুটো-চারটে খুঁতের জন্য গল্পগুলি দ্বিতীয় কখন বা তৃতীয় শ্রেণীতে গিয়ে পৌছচ্ছে।

প্রবীণ ও নবীন লেখকদের মধ্যে যাঁরা ছোট গল্প লেখার জন্য খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন মাসিক পত্রের সম্পাদকদের মধ্যে অনেকে তাঁদের লেখা পেলে নির্ব্বিচারে ছাপিয়ে দেন অনেকে নিজেরাই অনুরোধ করে' লেখকদের কাছ থেকে ফরমাসী গল্প আদায় করেন। ফরমাসী গল্পের মধ্যে যেগুলো লেখকের মস্তিষ্কে ইতিপূর্ব্বেই অঙ্কুরিত হচ্ছিল, কেবল আলস্যের জন্য বিকশিত হ'য়ে প্রকাশ্যে দেখা দিতে পারেনি, সেগুলি এই বাহিরের উত্তেজনার আঘাতে বাহিরে প্রকাশ পেয়ে মানুষকে আনন্দ দেয়। কিন্তু ফরমাসী গল্পের মধ্যে এইজাতীয় গল্প কমই থাকে। লেখকের শূন্য মস্তিষ্কে সম্পাদকের অনুরোধ ও পাঠকদের বাহবা একজাতীয় উত্তেজনার সঞ্চার করে। অধিকাংশ ফরমাসী গল্প তারই পরিণতি। প্রায়ই দেখা যায় লেখক যে গল্প লিখে' একবার বাহবা পেয়েছেন এইসব ফরমাসী গল্পে তাকেই নূতন পোষাক পরিয়ে এনে দাঁড় করা'ন। যাকে ভাল বলা হয়েছে, লেখকের সেই মানস-সন্তানের প্রতি তাঁর এমন একটা মোহ এসে পড়ে, যে, তিনি পার্থিব বাস্তব পিতামাতার মতই বাৎসল্যে অন্ধ হ'য়ে পড়েন। জীবনের বিশেষ একটা সুর কি অনুভূতি লেখকের কাছে খুব বড় হ'তে পারে, কিন্তু তাই বলে' পাঠক সাধারণের কাছে সেই একই সুরের একই কথা দিনের পর দিন সমান মূল্যবান্ বলে' ঠেক্‌বে, এরকম ভ্রান্ত ধারণা বাঙালী লেখকদের কেন হয় বুঝি না। একটি মাত্র সম্পদ্ যার দেবার আছে সে যদি শুধু সেইটি দিয়েই দানের লোভ সম্বরণ করে, তবে তার সে দানটি সাহিত্য জগতে সম্পদ্‌রূপে চিরস্থায়ী হ'য়ে থাকে। কিন্তু মানুষ বর্ত্তমানকে সব থেকে বড় করে' দেখে বলে' খ্যাতিটা অতীত কি ভবিষ্যতের গহ্বরে ফেলে, রাখা তার পক্ষে দুরূহ হয়। তাই সে সাহিত্য-রসিককে নিত্য নূতন ডালি দিয়ে খ্যাতিটাকে চির বর্ত্তমানে রাখ্‌তে ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে। ফলে নিত্যটা হয় বটে কিন্তু নূতনটা কম মানুষের হাত দিয়েই বেরোয়। প্রথম দর্শনে রচনার যে-রূপটা রসজ্ঞের কাছে মনোহর লেগেছিল, লেখক ফিরে' ফিরে' সকল রচনায় সেই রূপটিই দেখাতে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েন। যে দান একবার দেওয়া হ'য়ে গিয়েছে, তা যে আর ফিরে' দেওয়া যায় না, এই কথাটা যে লেখক ঠিক ভুলে' যান, তা নয়; অন্তরে-বাইরে ওই রূপটির বন্দনা করে' ও শুনে' শুনে' মন এম্‌নি মোহাবিষ্ট হ'য়ে থাকে, যে, নূতন উপহার মনে করে'ও ওই পুরাতনকেই এনে আবার হাজির করেন। কি নবীন কি প্রবীণ সকল লেখকেরই এবিষয়ে একটু সজাগ থাকা দর্‌কার। "আমায় হয়ত করতে হবে আমার লেখাই সমালোচন," এটা সর্ব্বত্রই দুভাগ্যের কথা নয়। নিজের সমালোচনা কর্‌তে শিখ্‌লে অনেক সময় অনেক দুভাগ্যের হাত এড়িয়ে যাওয়া যায়।

সাহিত্য-জগতে হাস্য-রসের চেয়ে করুণ রসের স্থান অনেক উপরে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই করুণরসাত্মক সাহিত্যের পথ বড় পিচ্ছিল। হাস্য-রস সৃষ্টি কর্‌বার জন্যই মানুষ যেখানে হাস্যরসের সৃষ্টি কর্‌তে পারে, সেখানে সে বাস্তবিক আর্টের পরিচয় দেয়; যেখানে হাস্য-রস-সৃষ্টির চেষ্টাটাই হাস্যকর হয়ে ওঠে, সেখানে লেখক বিফল হ'লেও এই বিফলতা হাসির খোরাকই জোগায়; সুতরাং তাঁর ভাগ্য অতি মন্দ বলা যায় না। কিন্তু করুণ রসের উদ্রেক কর্‌তে গিয়ে যদি লেখক হাস্য-রসের সৃষ্টি করেন তবে তাঁর ভাগ্য অতি মন্দই বল্‌তে হবে। আমাদের বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের অনেককেই সেই রোগে ধরেছে। ট্রাজেডির অবতারণা করে' মানুষের মনের তন্ত্রীতে বেদনার সুর জাগিয়ে তোলায় খুব নিপুণতার দর্‌কার আছে। মাথায় লোহার ডাণ্ডা মেরে নায়ক-নায়িকাকে নির্দ্দয় খুন্যের মত হত্যা করে' দিলেই যে পাঠক সব সময় তাদের সমবেদনায় মূর্চ্ছা যান, এমন বলা চলে না; হ'তে পারে, যে, এই বীভৎস রক্তারক্তির ফলে তাঁর সৌন্দর্য্যপ্রিয় মনে যে বিরক্তি ও বিতৃষ্ণার উদয় হবে, তার ফলে তিনি চিরকালের মত ঐ লেখকের

লেখা এড়িয়েই চল্‌বেন। জগতে শত শত মানুষ পলে পলে যথাসর্ব্বস্ব হারাচ্ছে, ব্যাপারটা জগতে কিছু মাত্রই নূতন নয়। সুতরাং নায়ক-নায়িকাকে যে-কোনপ্রকারে সর্ব্বহারা করে' দিলেও পাঠকের মন আকর্ষণ করা যায় না। বাস্তব জগতে যেমন এই সর্ব্বহারা মানুষটার সঙ্গে মানুষের মনের যোগটা আগে হওয়া চাই তবে তার দুঃখে বেদনার সঞ্চার মনে হবে, সাহিত্যেও সেইটে আগে দেখ্‌তে হবে; তা ছাড়া দেখ্‌তে হবে ট্রাজেডিটা ঠিক্ পথে ঠিক্ সময়ে ঠিক্ ওজন নিয়ে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হচ্ছে কি না। এই পথ সময় ও ওজনের দিকে যাঁর দৃষ্টি নেই, তিনি কখনও করুণ রসের সৃষ্টি কর্‌তে পারেন না। এইখানে একচুল এদিক্ ওদিক্ হলেই করুণ রস হয় হাস্য নয় বীভৎস রসে (অথবা বিরক্তি রসে) পরিণত হ'য়ে লেখকের সমস্ত চেষ্টা পণ্ড করে' দেয়। বড় নামজাদা লেখকের লেখাতেও অনেক সময় দেখা যায়, করুণ রসের অবতারণা কর্‌তে গিয়ে তার ভিতরের গাম্ভীর্য্য ও সংযমের কথা লেখক একেবারে ভুলে' গিয়েছেন; নায়িকা-কে হয়ত প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা পর্য্যন্ত ক্রমাগত ঝাঁটা মেরেই পিঠের ছাল তুলে' দিচ্ছেন; পাঠকের মন এতে করুণায় ভরে' উঠ্‌বে কি, চোখই যে ঝাঁটার কাঁটায় টাটিয়ে উঠছে। হয়ত কেউ হতাশ প্রেমিক নায়কের চোখ দিয়ে এমন অশ্রুবন্যা বওয়ালেন যে তার ধাক্কায় পাঠক একেবারে ছিট্‌কে বাইরে বেরিয়ে গেলেন; এমন একটা খুঁটিও সেখানে মাথা জাগিয়ে থাকে না, যা ধরে' দাঁড়িয়ে অন্য মানুষ দু-ফোঁটা চোখের জল ফেল্‌তে পারে। দুঃখ জিনিষটা যেখানে যত গভীর, যত করুণ, সেখানে তত সংযত ও তত শান্ত হয়ে দেখা দিলেই তার প্রকৃত সৌন্দর্য্য ও বিষাদকে দেখা যায়। চিলে ছোঁ মেরে রসগোল্লাটা ছিনিয়ে নিয়ে গেলে ছোট ছেলে যদি হাঁউ মাঁউ করে' তার পিছনে দৌড়তে থাকে, তবে তার এ ছোট দুঃখটার মাপসই ব্যবহারই সে করেছে বল্‌তে হবে। কিন্তু মৃত্যু কি বিরহ-ব্যথা যেখানে প্রিয়ের সমস্ত অন্তর মথিত করে' তোলে, সেখানে বাহিরের চাঞ্চল্যে তার প্রকৃত মূর্ত্তি দেখা যায় না। মড়া কান্নায় মানুষের মনে যে ধাক্কাটা লাগে, সেটাকে ঠিক ব্যথার রূপ বলা যায় না; বর্শার খোঁচার মত কাঁচা কঠোর ও ভীষণ সেটা, খানিকটা বীভৎসও বটে। আর্টে তার স্থান অনেক সময় একটিমাত্র দীর্ঘশ্বাসেরও নীচে। ব্যথার যে মূর্ত্তি সাহিত্য প্রকাশ কর্‌তে চায়, তার মধ্যে একটা শ্রী একটা শান্তি ও একটা শাশ্বত গাম্ভীর্য্যের ভাব ক্ষণিক উত্তেজনার চেয়ে অনেক উপরে। প্রিয়-বিচ্ছেদে মানুষ বুকভাঙা কান্না এক দিনই কাঁদে কিন্তু সেইখানেই তার ব্যথার শেষ হ'য়ে যায় না, বরং অনুভূতির প্রকৃত সূচনা সুরু হয়। সাহিত্য প্রকাশ করবে এই অনুভূতি-টাকে, ক্ষণিক আকস্মিক আঘাতের প্রতিক্রিয়াটাকে নয়।

আজকাল সাহিত্যে বাস্তবের আদর বেড়েছে বলে অনেকে বাস্তব মাত্রকেই সাহিত্যের মালরূপে চালাতে চেষ্টা কর্‌ছেন। ছোট গল্প ও কাব্য-জগতে এটা একটা মস্ত ভুল। আঁস্তাকুড়ের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে মেথরকে দিয়ে তার সমস্ত ঘৃণাকারজনক সম্পত্তি গণনা করিয়ে খাতা পেন্সিল নিয়ে খুব পরিষ্কার নির্ভুল একটা তালিকা করে' দেওয়া কিছু এমন একটা শক্ত কাজ নয়, কিন্তু তাই বলে' সেটা কি সাহিত্যের খোরাক হবে? ছোট গল্প কি কবিতা যে বিষয়েরই হোক না কেন ছবির আর্টের মত তার আর্টেরও একটা প্রধান লক্ষণ হচ্ছে সৌন্দর্য্য। রুদ্ররস, করুণ-রস, হাস্যরস, প্রভৃতির সকলেরই একটা নিজস্ব সৌন্দর্য্য আছে, যেটাকে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে আর্টের একটা বড় কাজ। সেটা ভুলে' গিয়ে যদি কেহ মেডিকেল কলেজের শবব্যবচ্ছেদ কক্ষের নির্ভুল রিপোর্ট, কি ময়লার টিন ও ড্রেনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেন, তবে তিনি ডাক্তার কি স্যানিটারী ইন্‌স্পেক্টর হ'তে পারেন, সাহিত্যিক হবেন না। তা ছাড়া চোখে বাস্তবকে যেমন দেখা যায়, কাগজের পাতায় ঠিক্ তেম্‌নি তুলে' দেওয়াটাও একটা ভুল। লেখকের মনের রঙে যদি তাকে রঙীন না করা যায়, তবে লেখকের স্থান কোথায়? মানুষের কল্পনা, মানুষের আদর্শ, মানুষের কামনা, মানুষের নৈপুণ্য ইত্যাদি নানা মশলায় বাস্তবকে যে নূতন রূপ দেওয়া হয় সেই ত সাহিত্য-সৃষ্টি। এতে বস্তু-লোকের ফাঁকে ফাঁকে কল্প-লোক এসে পড়ে' তার বহু কদর্য্যতাকে ঢেকে দেয়, বহু অবাস্তরকে সরিয়ে দেয় এবং

বাস্তবে যা নেই এমন বহু সত্য ও সুন্দরকে যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করে। না হলে যুদ্ধের রিপোর্ট কি মহামারীর রিপোর্ট পড়লেই ত রুদ্র ও করুণ-রসের চর্চ্চা করা যেতে পারত।

গান শিখতে গিয়ে অনেক নবীন গায়ক যেমন সবার আগে ওস্তাদের মুদ্রা দোষটা নকল করে' বসে; নবীন সাহিত্যিকরাও অনেক সময় তেম্‌নি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের মুদ্রা-দোষটুকুই আয়ত্ত করে' ফেলেন, প্রকৃত আর্ট যেটা, তার পরিপূর্ণতা, তাকে আনাড়ির চোখে গোপন করে' রাখে; সেটা এমন সহজ স্বচ্ছ অনাবিল জল-স্রোতের মত বয়ে চলে বলে' মানুষের তাতে তাক্‌ লাগে না। তাই যেটা বিকট, যেটা বিস্ময়কর, যেটা অস্বাভাবিক যেটা হেঁয়ালি, সেইটাকেই আপাত-দৃষ্টিতে আদৃত জিনিষ বলে ভ্রম হয়। এইজন্য অনেক লেখক সেইটাকেই প্রাণপণে বড় করতে চেষ্টা করেন। যেহেতু কোনো একজন নামজাদা সাহিত্যিকের নায়িকারা অধিকাংশই কোপন-স্বভাবা, তাই আজকাল কাগজ খুল্‌লেই দেখা যায়, শতকরা ত্রিশজন নায়িকা নায়কের গায়ে ভাঙা বোতল ছুঁড়ে' কিম্বা মাথায় ইট মেরে প্রেম প্রকাশ করছেন। কেন যে তাঁরা এমন করছেন এটা যে বুঝা যায় না. এইখানেই নাকি নারী-চরিত্রের রহস্য। অনেকে ঘরে বসে' শাক-চচ্চড়ি ভাত খেতে খেতে হঠাৎ ঘর ছেড়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে' দূর দিগন্তের পারে মিলিয়ে যাচ্ছেন, কি জানি কিসের ডাকে, যা বোঝানো যায় না। যেহেতু কোনো প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক গল্পের খানিকটা আব্‌ছায়া রাখেন, অতএব বেশী সুন্দর করবার উৎসাহে এর আগাগোড়াই রহস্যাবৃত থেকে গেল।

গল্পের কার্য্য-কারণ না বোঝা যাওয়া আজকালকার গল্পের আর একটা বিশেষত্ব। মানুষের বাহিরের ব্যবহার ও ভিতরের চিন্তার মধ্যে অনেক প্রভেদ থাকে সত্য কিন্তু সেটা হচ্ছে চর্ম্মচক্ষের দৃষ্টিতে দেখা। সাহিত্যিকের একটা দিব্য দৃষ্টি আছে ধরে' নিতে হবে; না হ'লে আগাগোড়া সুসামঞ্জস্যের সৃষ্টি তিনি কি করে' করবেন? মানুষ অতি দুঃখেও হাসে, অতি প্রিয়কেও ছেড়ে চলে' যায়, অতি অস্পৃশ্য চণ্ডালকেও ঘরে তুলে আনে, দেবতাকেও দূরে রাখে বটে; কিন্তু কেন করে, যার অন্তর্দৃষ্টি আছে সে বুঝে নেয় এবং অপরকে বুঝে নেবার চাবিটি দেখিয়ে দেয়। সাহিত্যিকের সেই অন্তর্দৃষ্টি থাকা চাই এবং থাকার প্রকাশটা অপরকেও একটু জানতে দেওয়া চাই। জগৎটা যে ঠিক্‌ কলের মত চলে না, ন্যায় সূত্রের নিয়ম ও যে সে পদে-পদেই ভাঙে এবং ভাল-মন্দর বিচারও যে সেখানে নিক্তির ওজনে হয় না, একথা খুবই ঠিক্‌। কিন্তু তাই বলে' সাহিত্যিক যদি দেখান যে নায়ক নায়িকাকে ভালোবেসেছিল এবং পর মুহূর্ত্তে ঘর থেকে বার করে' দিল, তা হ'লে মনে হবে যেন ভালবাসার এইটাই প্রকাশ। সাহিত্যিক হয়ত জগতের নাট্যলীলার এই প্রকাশ দেখিয়ে মনে মনে খুব খুসী হবেন, কিন্তু পাঠকেরা তাঁর এ লীলায় মোটেই খুসী হ'তে পারবেন না, যদি না তিনি নায়ক-নায়িকার অন্তরে প্রবেশ করবার একটুখানি পথও খোলা রাখেন। বল্‌ছি না যে উত্তর-রাম-চরিতের লক্ষ্মণের মত সব কথার পরেই একটা ব্যাখ্যা দিতে হবে, কিন্তু মনগড়া ব্যাখ্যা তৈরী করে' নেবার মতও একটু সূত্র অন্ততঃ দেওয়া দরকার।

মানুষকে চম্‌কে দেওয়া গল্পের প্লটের একটা লক্ষ্য থাকে বটে অনেক সময়ই। কিন্তু সে চমক্‌টা হঠাৎ বিনা-মেঘে বজ্রাঘাতের মত হ'লে সুরসিক পাঠক তাতে মোটেই পুলকিত হন না। মেঘটা আগাগোড়া থাকা সত্ত্বেও পাঠকের দৃষ্টি বজ্রাঘাতের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তার দিকে তাকাবার অবসর না পেলে অথবা দরকার বোধ না করলে এবং পরিশেষে সেইটাকে বজ্রাঘাতের অবশ্যম্ভাবী কারণ বলে' বুঝতে পারলে তবে চমক্‌টার মধ্যে কিছুমাত্র বাহাদুরী থাকে।

বিস্ময়ে পাঠকের চোখ ঠিক্‌রে দেওয়াই ছোট গল্পের সব চেয়ে বড় আদর্শ নয়। সমস্ত গল্পটির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য ও সুষমার প্রকাশ থাকা চাই, পরিপূর্ণতার তৃপ্তি মনে জাগিয়ে তোলা চাই। তার চরিত্র, তার বর্ণনা. তার বাঁধুনী কোনোটা যেন কাউকে টেক্কা দিতে চেষ্টা না করে। কোনো একটা দিক্‌ ভারী হ'য়ে পড়লেই অন্য সকল সৌন্দর্য্যও তার ভারে চাপা পড়ে' যায়। বৃন্তস্থিত ফুল যেমন রং, রেখা, ভঙ্গী, সৌরভ সমস্ত নিয়ে ভবিষ্যতের

ফলের আশাটি মধুময় করে' তুলেছে তেম্নি করে' তুল্তে হবে প্রকৃত রস-রচনাকে। ফুলের মত এর বাঁধন সুন্দর হওয়া চাই, ফুলেরই মত নিজের বৃন্তের উপর নিরালম্ব ভঙ্গীতে হাল্কা হ'য়ে নিতান্ত সহজ স্বাভাবিকভাবে ফুটে' থাকা চাই, ফুলের মত অন্তরে মধু থাকা চাই ও কেন্দ্রকে ঘিরে সমগ্র দলগুলির একগতি হওয়া চাই। কোনো কদর্য্যতা উপরে উঠে' এলে, কোনো রেখার বন্ধন টুটে' গেলে, কোনো দল উন্টা মুখে ফুট্‌লে কিম্বা ওজনে বৃন্ত ছিঁড়ে' ফেল্‌লে, অথবা সমগ্রটি শূন্যগর্ভ অর্থহীন হ'লে, তার আর কোনো মাধুর্য্য থাকে না।

এসকল দিকে লেখকদের দৃষ্টি বড় দেখা যায় না; নিজেদের সকল দৈন্য তাঁরা পাঠকের কাছে খুলে' ধর্‌ছেন অতিরিক্ত দানের উৎসাহে, এবং এই দৈন্য-জনিত বিকৃতিটাকেই সাহিত্যের আর্ট্‌ ভেবে মনকে খুসী কর্‌তে চাইছেন।

কবি-মানস

শ্রী পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

পূর্ণিমার চাঁদ তার স্নিগ্ধ আলো দিয়ে পৃথিবীকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেচে। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা ধ্যানে নিমগ্ন, অনেকক্ষণ পরে স্তিমিতনেত্রে বলে' উঠ্‌লেন:

এতদিন আমার ধারণা ছিল, আমার সৃষ্টির মধ্যে মানুষই সব চাইতে সুন্দর কিন্তু দেখ্‌চি তা ভুল; ওই যে সরোবরের পদ্মটি ফুটে' রয়েচে, সামান্য বায়ুভরে হেল্‌চে দুল্‌চে—ওর মত সুন্দর ত আর কিছুই দেখ্‌চিনে। সৌন্দর্য্যের নদীতে যে এমন করে' বান ডাকাতে পারে, মানুষের মধ্যে তার সন্ধান ত মেলে না।

ধ্যান-মগ্নের মত কিছুক্ষণ চুপ করে' থেকে ব্রহ্মা আবার বলে' উঠ্‌লেন:

ফুলের মধ্যে যেমন পদ্ম, মানুষের মধ্যে তেম্নি একজনকে সৃষ্টি কর্‌লে হয় না? আচ্ছা, আমি এমন একজনকে সৃষ্টি কর্‌ব যাকে নিয়ে সকলে তৃপ্তি পাবে আর ধরণীর বুক গর্ব্বে ভরে' উঠ্‌বে। কমল, তুমি বালিকার মূর্ত্তি ধরে' আমার সুমুখে এসে দাঁড়াও!

একথা বল্‌বামাত্র সরোবরের জল দুলে' ফুলে' নেচে উঠ্‌ল—যেন শ্বেত রাজহংসের ডানা-দুটি কেঁপে উঠ্‌ল।

ক্রমে নিশীথিনী উজ্জ্বলতর, জ্যোৎস্না স্নিগ্ধতর হ'ল, শাখায় শাখায় পিক-বধূ সুরের পিচকারী ছুড়ে' মার্‌লে।

আবার সব স্তব্ধ, নিথর। সব যেন অভিনব মন্ত্র-শক্তিতে একদম বদলে গেল। ব্রহ্মার সুমুখে কমল নারী-মূর্ত্তিতে এসে দাঁড়াল। আপন সৃষ্টি দেখে' স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা অবাক্‌ হ'য়ে চেয়ে রইলেন!

পরে বালিকা-কমলকে শুধোলেন,

তুমি ছিলে সরোবরের কমল, আজ থেকে হ'লে ব্রহ্মার মানস-কমল।

বসন্তের দখিন্‌ হাওয়া যখন ফুলের পাঁপড়ি চুম্বন করে' তার কানে কানে যৌবনের কথা কয়, ঠিক তেম নি করে' বালিকা জবাব দিলে—

প্রভু, আপনি আমায় মানবী ক'রে সৃষ্টি করেছেন, এখন আমার বাসস্থান নির্দ্দেশ করে' দিন্‌। আমি যখন ফুল হ'য়ে সরোবরে ফুটে-ছিলুম, তখন ঈষৎ তরঙ্গ-হিল্লোলে আমি ভয়ে কেঁপে উঠ্‌তুম। ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রবিদ্যুৎ চম্‌কালে আমার ভয়ের সীমা থাক্‌ত না। আপনার আদেশে নারীরূপ ধারণ কর্‌লেও আমার অন্তরটি এখনো ফুলের মতই রয়ে গেছে। আজ যখন ধরিত্রীর বুকে এসে দাঁড়ালুম, তখন আমার প্রাণ-মন-দেহ অজ্ঞাত শঙ্কায় কেঁপে কেঁপে উঠ্‌চে। আমায় অভয় দিন্‌ প্রভু, আর থাক্‌বার স্থান নির্দ্দেশ করে' দিন্‌।

ভগবান্‌ তাঁর সর্ব্বদর্শী দৃষ্টি নিয়ে শুভ্র নীলাকাশের বুকের অগণিত তারকার দিকে চেয়ে রইলেন, তাঁর ললাটে চিন্তার রেখা ঘনিয়ে এল। হঠাৎ তিনি জেগে উঠে' কমলের দিকে চেয়ে শুধোলেন, শৈল-শিখরে বাস কর্‌তে চাও?

প্রভু, সেখানে অত্যন্ত শীত, বরফও আছে, আমার এ তনু দেহ সে-শীতের শিহরণ সহ্য কর্‌তে পার্‌বে না।

তা হ'লে সরোবরের জলে তোমার বাসের জন্যে একটি স্ফটিক প্রাসাদ তৈরী করে' দেব?

জলকে আমি জানি প্রভু, সেখানে অনেক বিকট জীবজন্তুর ও অভাব নেই—আমার এই কিশলয়ের মত কোমল দেহ ত তাদের ভিতর বাস কর্‌বার উপযোগী নয়।

তা হ'লে ওই বিস্তৃত প্রান্তরের ভিতর তোমার বাসগৃহ তৈরী করে' দিই?

না, সেখানে ঝড়ঝঞ্ঝার ভয় বড় বেশী।

তা হ'লে দেখ্‌চি ভারি মুশ্‌কিল। আচ্ছা, হয়েচে! জগতের সকল কর্ম্মকোলাহল থেকে দূরে—অতিদূরে গিরিগহ্বরে মুনিঋষিরা যুগযুগান্তর ধরে' ধ্যানধারণা কর্‌চেন, সেখানে সেই মৌনা প্রকৃতির কোলে থাক্‌তে, আশা করি, তোমার কিছুমাত্র আশঙ্কা হবে না।

প্রভু, সেখানে ভীষণ নিস্তব্ধতা ও গাঢ় অন্ধকার—না প্রভু, আমার ভারি ভয় হয়।

বালিকার জবাব শুনে' ব্রহ্মা ভারি বিষণ্ণ হ'য়ে মাথা গুঁজে' ভাব্‌তে লাগ্‌লেন। বালিকা ভয়ে থর থর করে' কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল। ক্রমে [illegible]

ঝিক্ করে' উঠ্‌ল, গাছের ফাঁকে ফাঁকে আলোর কাঁপন সুরু হ'য়ে গেল। জলে হাঁস, বক, পানকৌড়ীর আনাগোনা আরম্ভ হ'ল। দূরে বনে ময়ূর-ময়ূরী ডেকে উঠ্‌ল, দূর—অতিদূর থেকে বীণা-যন্ত্রের সুর শোনা গেল।

ব্রহ্মা বীণার তান শুনে' চম্‌কে উঠে' বলে' উঠ্‌লেন, কবি বাল্মীকি উষার আবাহন কর্‌ছেন।

অল্পক্ষণ পরেই বাল্মীকি সরোবরের পাশে এসে উপস্থিত হলেন। সৃষ্টিকর্ত্তার এ নবসৃষ্টি দেখে'ই তাঁর হাত থেকে বীণা খসে' পড়্‌ল, সুর একেবারে থেমে গেল, তিনি নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে হাঁ করে' চেয়ে রইলেন। নবসৃষ্টির আনন্দ-শান্তিতে ব্রহ্মার মন ভরে' গেল। আত্মহারা ব্রহ্মা কমল-বালার নারী-মূর্ত্তির দিকে চেয়ে চেয়ে একসময় বলে' উঠ্‌লেন,—

জাগো, বাল্মীকি—কথা কও।

বাল্মীকি বল্‌লেন :—কি সুন্দর!

কেবল এই একটিমাত্র শব্দ ছাড়া তাঁর মুখে আর কোন কথাই জোগাল না।

সহসা ব্রহ্মার মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল।

তিনি বল্‌লেন, অবশেষে তোমার বাসের স্থান খুঁজে' পেয়েচি কমল! অতঃপর তুমি কবির মানস-লোকে বাস করবে।

বাল্মীকি বল্‌লেন, কি সুন্দর, কি মহান্!

ব্রহ্মার ইচ্ছামাত্রেই কবির মানস-লোক বালিকার চোখের সুমুখে স্বচ্ছ কাচের মত স্পষ্ট ভেসে উঠ্‌ল। বাসন্তী পূর্ণিমা-রাত্রির মত উজ্জ্বল, সুরধুনীর জোয়ারের মত বিহ্বল, তার সেই নির্দ্দিষ্ট মন্দিরে বালিকা ধীরে ধীরে প্রবেশ করতে লাগ্‌ল। কিন্তু যখন বাল্মীকির মানস-লোকের সবখানি তার চোখের সামনে ফুটে' উঠ্‌ল, তখন বালিকা একেবারে বিবর্ণ হ'য়ে গেল, দেহ তার স্রোতাহত বেতসলতার মতন থর-থর করে' কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল।

ব্রহ্মা বিস্ময়-বিস্ফারিতা-নেত্রে তার দিকে চেয়ে বল্‌লেন, তুমি কি কবির মানস-লোকেও বাস করতে শঙ্কিত হচ্চ?

বালিকা জবাব দিলে, প্রভু, কি করে' এ-স্থানটা আমার বাসের জন্যে নির্দ্দেশ করচেন? বরফে ঢাকা শৈল-শিখর, ভীষণদর্শন প্রাণীতে ঘেরা জল, প্রান্তরের ঝড়ঝঞ্ঝা, গিরি-গহ্বরের বিকট অন্ধকার—সমস্তই যে কবির ওই অন্তরের মাঝখানে আসর জমিয়ে বসে' রয়েচে। না, প্রভু, আমার ভারি ভয় করচে।

ব্রহ্মা তখন বালিকাকে বল্‌লেন, ভয় নেই কন্যা, ভয় নেই! কবির মানস-লোকে যে বরফের বিপুল স্তূপ দেখ্‌তে পাচ্চ তাকে তোমার অন্তরের বসন্তের দখিন্ হাওয়া দিয়ে বিগলিত করো, আর সেখানে জলের যে গভীর আবর্ত্ত জেগে রয়েচে তাতে তুমি মুক্তারূপে বিরাজ করো, উদার উন্মুক্ত প্রান্তরের যে নির্জ্জনতা তাঁর বুকে বাসা বেঁধেচে তাতে তুমি আনন্দের ফুল হ'য়ে ফুটে' ওঠো, তাঁর হৃদয়ের বিরাট্ অন্ধকার গহ্বরকে তুমি প্রেমের সূর্য্যালোকে পুলকিত ক'রে তোলো।

বিহ্বল বাল্মীকি বিধাতার দিকে ফিরে' চেয়ে বল্‌লেন—

হে দেবতা, তুমিই ধন্য! *

* নরওয়ের বিখ্যাত লেখক Sienkiewiczএর অনুসরণে লিখিত।

চিকিৎসা-শাস্ত্রে বিজ্ঞানের দান

শ্রী সুবোধকুমার মজুমদার, এম-এস্‌সি

মানুষের নিবদ্ধ নিয়ম ভঙ্গ করিয়া অপরাধী শাস্তির হাত এড়াইয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিয়া গিয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত সংসারে নিতান্ত বিরল নহে, কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গকারী কোনো মানব আজ পর্য্যন্ত প্রকৃতিদত্ত শাস্তি হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। কারণ এবং কার্য্যের মধ্যে কাল-ব্যবধান যখন বিশেষ থাকে না তখন দুয়ের সম্বন্ধ অবধারণ করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। শিশুকাল হইতেই মানুষ শিখিয়াছে যে আগুনে হাত দিলে পরিণাম বিশেষ সুখদায়ক হয় না; সুতরাং যে বালকের হাত একবার পুড়িয়াছে সে সহসা অগ্নিতে হাত দিতে সঙ্কুচিত হয়।

বৈজ্ঞানিক বলিতে চাহেন যে ব্যাধিমাত্রেই কোন বিশেষ কারণ হইতে সঞ্জাত, তবে সর্ব্বত্রই যে এই কারণকে প্রতিষেধক দ্বারা প্রতিরুদ্ধ করা যায় অথবা কার্য্য কারণকে দ্রুত অনুসরণ করে, তাহা নহে। মানুষের বিচার-গৃহে আইনের অজ্ঞতার অজুহাতে অপরাধী মুক্তি প্রার্থনা করিতে পারে কিন্তু প্রকৃতির মন্দিরে এরূপ আত্ম-সমর্থন একেবারেই চলে না। নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল যে শুধু অপরাধীকেই একা ভোগ করিতে হয়, তাহা নহে; অনেক ক্ষেত্রে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে প্রকৃতির অভিশাপ ফলিতে থাকে।

প্রকৃতির এই কঠোরতা মানুষের চক্ষে ভয়াবহ হইলেও নিতান্ত সত্য। প্রকৃতির আদেশ যখন নত-

কৃষক

চিত্রকর শ্রী নন্দলাল বসু

প্রবাসী প্রেস কলিকাতা।
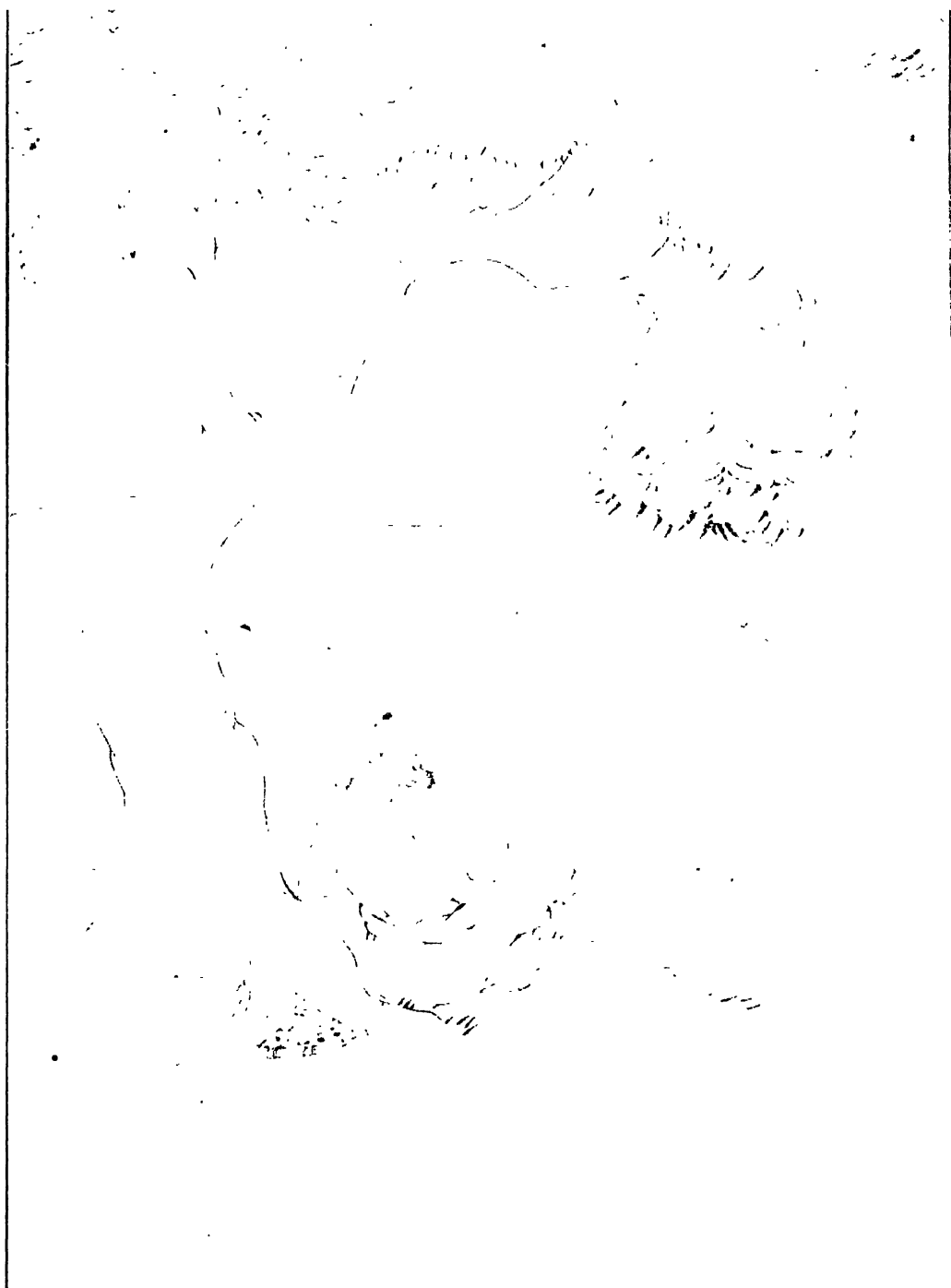
মস্তকে মানিতেই হইবে তখন যাহাতে নৈসর্গিক ব্যাপারে মানুষের জ্ঞান উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয় তাহার চেষ্টা করা কি মানুষের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নহে? অবশ্য যাঁহারা অদৃষ্ট ও প্রাক্তনের স্কন্ধে সংসারের সকল দুঃখ-কষ্ট আরোপ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চান তাঁহাদের পক্ষে একথা খাটে না। অজ্ঞতা ও বিশ্বাস যে দুঃখের প্রাখর্য্য লাঘব করে, ইহা ত অবিসংবাদিত সত্য।

ইউরোপ যে মধ্যযুগে মহামারী প্লেগে বিধ্বস্ত হইয়াছিল তাহা যে শুধু অজ্ঞতার ফলে নহে, এ-কথা কে অস্বীকার করিবে? দেবতার অভিশাপে মহামারীর আগমন এবং দৈবরোষ-শান্তির জন্য প্রার্থনা ও স্বস্ত্যয়ন আবশ্যক, এবিশ্বাস প্রাচ্যজাতিসমূহে মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে—ইহাকে একেবারে উড়াইয়া দিবার আবশ্যকতা আছে কি না, প্রতীচীর আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াও প্রাচীকে এপ্রশ্নের উত্তরদানে বিরত হইতে হইবে। বৈজ্ঞানিক বলেন প্লেগের জীবাণু মাছির সাহায্যে মূষিকে এবং মূষিক হইতে মানুষে সংক্রামিত হয়—দৈবরোষের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতে বৈজ্ঞানিক প্রস্তুত নহেন। অজ্ঞতার ফলে মানুষ বিল অথবা জলময় ক্ষেত্র হইতে উত্থিত বাষ্পকেই ম্যালেরিয়ার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন—বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করিলেন যে, এক-শ্রেণীর মশকের সাহায্যেই ম্যালেরিয়া-জীবাণু মনুষ্য-দেহে সঞ্চারিত হয়; আর এই তথ্যের সাহায্যেই ইটালীর কয়েকটি প্রদেশ যাহা পূর্ব্বে ম্যালেরিয়ার প্রভাবে মনুষ্যবাসের অযোগ্য ছিল, এখন তাহা স্বাস্থ্যনিবাসে পরিণত হইয়াছে।

ব্যাধির প্রকৃত স্বরূপ যত দিন আমরা নির্দ্ধারিত করিতে না পারি, ততদিন পর্য্যন্ত ইহার সম্মুখে মানুষ নিতান্তই অসহায়। কিন্তু যখনই বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাহায্যে শত্রুব্যূহের সন্ধান পাওয়া যায় তখনই চিকিৎসা-শাস্ত্র তাহার সকল অস্ত্র ইহার বিপক্ষে প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করে। প্লেগের বিপক্ষে যুঝিতে হইলে মূষিক-সঙ্কুল স্থানের সমস্ত মূষিককে মারিয়া ফেলিতে হইবে এবং ম্যালেরিয়া সমূলে বিনাশ করিতে হইলে ম্যালেরিয়া-গ্রস্ত স্থানের চতুষ্পার্শ্বের ক্ষুদ্র জলাশয়গুলি পরিষ্কৃত রাখিতে হইবে। এইসকল নিয়ম প্রতিপালনের ফলে অস্বাস্থ্যকর স্থান যে রোগশূন্য হইতে পারে তাহার সাক্ষ্য দিতেছে হাভানা, পানামা প্রভৃতি আমেরিকার কয়েকটি প্রদেশ।

রোগের প্রকৃতির সহিত পরিচয় লাভ করিতে হইলে রোগীর পরিচর্য্যা করা আবশ্যক কিন্তু ইহাতে রোগের কারণ-নির্ণয়ে যে বিশেষ সহায়তা হয় তাহা মনে হয় না, কারণ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া চিকিৎসক রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া রোগের নিদান লিপিবদ্ধ করিয়া আসিতেছেন কিন্তু পাস্তর, লিষ্টার্ প্রভৃতি অচিকিৎসক অনুসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিকের গবেষণার ফলে রোগের প্রকৃতি এবং কারণ সম্বন্ধে যত তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে চিকিৎসকের নিদান হইতে তত হয় নাই ইহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং ব্যাধির বিপক্ষে অবিশ্রান্তভাবে যুদ্ধ চালাইতে হইলে, সমূলে ব্যাধির বিনাশের উপায় নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইতে গেলে এবং ব্যাধির প্রসার রুদ্ধ করিতে হইলে, সাধারণ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইলে চলিবে না। রাসায়নিক ও জীবাণু-তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতই এযুদ্ধের প্রধান উদ্যোক্তা এবং বৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষণাগারই ইহার রণস্থলী। সাধারণ চিকিৎসক কতকটা ইঞ্জিনিয়রের মত,—তিনি বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি কার্য্যক্ষেত্রে আরোপ করিতে সুদক্ষ পরন্তু তাঁহার কার্য্য প্রণালী কতকগুলি নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ। ব্যাধিসংক্রান্ত কোন নূতন তথ্য আবিষ্কার করিবার আগ্রহ বা সুযোগ তাঁহার নাই। অবশ্য সাধারণ নিয়মের "সম্মানিত ব্যতিক্রম সর্ব্বত্রই সম্ভব, কিন্তু ইহা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না যে, লব্ধ-প্রতিষ্ঠ গবেষক চিকিৎসকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প।

প্রতিবৎসর দুই-চারিটি দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধির প্রতিষেধকের আবিষ্ক্রিয়া চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন হিসাবে সংবাদপত্রস্তম্ভে প্রকাশিত হয় কিন্তু পরীক্ষা-শালার ভিতর স্বাস্থ্য, উদ্যম ও অর্থ ক্ষয় করিয়া কত বৈজ্ঞানিক যে বিফলতার তিক্ত স্বাদ অনুভব করিয়া নীরবে কষ্ট সহ্য করে তাহার হিসাব বাহিরের কয়জন লোকে রাখে? "সভ্যতা বিস্তারের" ফলে সকল সভ্য দেশেই বর্ত্তমানে ফৈরিঙ্গ

অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে—এই রোগের অব্যর্থ প্রতিষেধকও* একজন জার্মান্ রাসায়নিক কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিলাতী ভেষজশাস্ত্রে এই ঔষধের নাম হ্বার্লিকের ছয় শত ছয়। (Ehrlick's 606) এই অদ্ভুত নাম ইহাই বলিতে চাহে যে ঐ রাসায়নিক ঔষধ প্রস্তুত করিবার সময় ছয় শত পাঁচ বার বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন। এই ঔষধের এইরূপভাবে নামকরণ না হইলে পরবর্ত্তী যুগের লোক জানিতে পারিত না যে কি বিশাল শক্তি ও অধ্যবসায়ের ফলে এই আবিক্রিয়া সম্ভবপর হইয়াছিল। যুদ্ধাভিযানের সৈনিকের পক্ষে শত্রুর গোলা অপেক্ষা ব্যাধি যে অধিক ভীতিপ্রদ ইহা সাধারণের কাছে উপহাসাস্পদ মনে হইলেও বাস্তবিক পক্ষে নিতান্তই সত্য। দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধের সময় ইংরেজ-বাহিনীর যত সৈন্য শত্রুর অস্ত্রাঘাতে প্রাণ দিয়াছিল, তাহার দ্বিগুণ ব্যাধির প্রকোপে ইহলীলা সাঙ্গ করিয়াছিল। আমেরিকা স্পেনের সঙ্গে যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় তাহাতে সমুদয় সৈন্যের এক ষষ্ঠ অংশ শুধু টাইফয়েড্ জ্বরে শয্যাগত হয়। আবার রুষজাপান সমরের অব্যবহিত পূর্ব্বে জাপানী নৌ-সৈন্যের মধ্যে বেরীবেরীর প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল, জাপানী বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ ইহাতে শঙ্কান্বিত হইয়া এই ব্যাধির কারণ-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হন। তাঁহাদের সমবেত চেষ্টার ফলে সাত বৎসর যুদ্ধের মধ্যে একটিও জাপানী নৌ-সৈনিক বেরীবেরীতে আক্রান্ত হয় নাই। গত মহাযুদ্ধেও সামরিক কর্ত্তৃপক্ষগণ সৈনিকদিগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না; তাই ইংরেজ-বাহিনী ব্যাধির প্রকোপ বিশেষ অনুভব করে নাই। রাইট্ সাহেবের প্রবর্ত্তিত সান্নিপাতিক জ্বরের প্রতিষেধক টীকা লইতে সৈনিকগণকে বাধ্য করা হইয়াছিল এবং তাহার ফলে এই রোগ সৈনিকগণের মধ্যে বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করে নাই।

দেড়শত বৎসর পূর্ব্বেও ইউরোপে লোকে ধারণা করিতে পারিত না যে, কোনো উপায়ে বসন্ত-রোগের কবল হইতে উদ্ধার পাওয়া যাইতে পারে। এমন কি, অষ্টাদশ শতাব্দীতেও জার্ম্মানীতে একটি প্রবচন প্রচলিত ছিল যে "অল্প লোকেই প্রেম ও বসন্তের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে।" যে মহাত্মা এই প্রবাদের আংশিক অসারতা প্রমাণ করিয়াছেন তাঁহার নাম এডোয়ার্ড জেনার্ (Edward Jenner)। উত্তর কালে ফরাসী পণ্ডিত পাস্তর্ (Pasteur) এবং ইংরেজ-বৈজ্ঞানিক লর্ড লিষ্টার্ (Lord Lister) জেনারের প্রবর্ত্তিত নীতির সমর্থন করিয়াই মনুষ্য-সমাজে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। জেনার্ যখন অজাতশ্মশ্রু বালক-মাত্র,—সবেমাত্র চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়াছেন, তখন একদিন একটি বালিকা তাঁহার নিকট বলে যে, গ্রাম্য গোপ-বালিকারা গো-বসন্তের বীজ শরীরে প্রবিষ্ট করাইয়া দেখিয়াছে যে তাহারা জীবনে কখনও বসন্তে আক্রান্ত হয় না। বালকের মনে সেদিন যে ধারণা প্রবিষ্ট হইল প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরিয়া সে কেবল তাহাই চিন্তা করিয়াছিল। অভূতপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক আবিক্রিয়া দ্বারা সহসা জগতকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়া বাহাদুরি লইবার ইচ্ছা এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে এক দিনের জন্যও জেনারের মনে উদিত হয় নাই। জেনারের বয়স যখন সাতচল্লিশ বৎসর তখন তিনি প্রথম গো-বসন্তের বীজ একটি বালকের অঙ্গে প্রবেশ করান। এই পরীক্ষা আশাতীত সাফল্যে মণ্ডিত হইল। অল্প দিনের মধ্যেই অভিজাত বংশীয় দুইটি বালক জেনারের নিকট হইতে প্রতিষেধক টীকা লয়। অতঃপর জেনারের নাম বিশ্ব-বিখ্যাত হইয়া পড়ে এবং তৎপ্রবর্ত্তিত টীকা দেশবিদেশে সাগ্রহে গৃহীত হইতে থাকে।

ইচ্ছা করিলে জেনার্ তাঁহার এই বহুমূল্য আবিক্রিয়াটি পণ্যদ্রব্য-রূপে বিক্রয় করিয়া প্রচুর ধনের অধিকারী হইতে পারিতেন। প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের মনে কিন্তু কখনও অর্থ-লালসা প্রবেশ করে না। আমরাও গৌরব করিতে পারি যে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র তাঁহার বহুমূল্য আবিষ্কৃত তথ্যগুলি জাতির সম্পত্তিরূপে দেশকে অর্পণ করিয়াছেন—তাহাদের সাহায্যে অর্থোপার্জ্জন করিবার বাসনা আচার্য্যের মনে কখনও উদিত হয় নাই। সুখের বিষয়, ইংলণ্ডের তৎকালীন মন্ত্রী-সমাজ জেনারের প্রতিভা সত্বরই বুঝিতে

* এইপ্রকারের আবিক্রিয়া জগতে পাপের অবাধ গতির সহায়তা করিতেছে কি না এপ্রশ্ন বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিবেচ্য নহে। নৈতিক পণ্ডিতেরা ইহার মীমাংসা করিবেন।

পারিয়াছিলেন এবং যথেষ্ট পরিমাণে আর্থিক বৃত্তিও প্রদান করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বেই জেনার্ দেশবিদেশের বুধমণ্ডলীর ভক্তি-শ্রদ্ধার উপহার পাইয়াছিলেন। মহাবীর নেপোলিয়ান্ জেনারের মহত্ত্বে একান্ত মুগ্ধ ছিলেন—শুধু তাঁহারই কথায় যুদ্ধের সময় দুইজন ইংরেজ-বন্দীকে স্বাধীনতা প্রদান করিতে নেপোলিয়ন্ কুণ্ঠিত হন নাই।

রোগের বিশিষ্ট জীবাণুদ্বারা মনুষ্যদেহে ব্যাধি সংক্রামিত হয় জেনার্ এই যে অপূর্ব্ব তথ্য প্রথম লোক-সমাজে প্রকাশ করিয়া গেলেন তাহারই সাহায্যে মানব-জাতিকে অপূর্ব্ব সম্পদের অধিকারী করিয়া দিয়া গিয়াছেন পাস্তর্ এবং লিষ্টার্। পাস্তর্ দেখিলেন যে প্রতিবৎসর সহস্র সহস্র গো-মহিষ মহামারীতে ধ্বংস হইতেছে অথচ ইহার প্রতিকারের কোনোই উপায় নাই। এই বিষয়ে গবেষণার সহকর্ম্মীরূপে পাস্তর্ পাইয়াছিলেন রবার্ট কক্ (Robert Coch) নামক পণ্ডিতকে। শীঘ্রই পাস্তর্ বুঝিতে পারিলেন যে মনুষ্য-দেহের ন্যায় পশু-দেহও রোগের জীবাণুর সমক্ষে অসহায়, ব্যাধির জীবাণুর কবল হইতে পশুকে রক্ষা করিতে গেলে, পশু-দেহেও ঐ রোগের বিষ সামান্য-পরিমাণে প্রবেশ করান আবশ্যক। পাস্তরের এই আবিষ্ক্রিয়া প্রথমে সকলে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিল, অবশেষে পশু-চিকিৎসক সমিতি এই অভিনব মতবাদের সত্যতা পরীক্ষা করিবেন বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে পঞ্চাশটি মেষ প্রদান করা হইল। পাস্তর্ প্রথম পঁচিশটি মেষের দেহে সামান্য পরিমাণে রোগের বিষ প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন এবং কয়েকদিন পরে সমস্ত মেষগুলিকে একত্র করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের শরীরে উগ্র বিষ যথেষ্ট পরিমাণে ঢুকাইয়া দিলেন। স্থির হইল ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ২রা জুন, সাধারণের সমক্ষে এই পরীক্ষার ফলাফল বিবেচনা করা হইবে। পাস্তরের জীবনে সে এক স্মরণীয় দিন—প্রথম হইতেই তিনি দৃঢ়ভাবে বলিয়া আসিতেছিলেন যে, শেষের পঁচিশটি মেষ নিশ্চয়ই মরিবে। দ্বিপ্রহরে যখন তিনি পশুশালায় প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার মনোভাব যে কিরূপ হইয়াছিল তাহার ধারণা আমরা এখনও কিছু-কিছু করিতে পারি। পাস্তর্ ভাবিয়াছিলেন যে, প্রকৃতির গুপ্ত রহস্য যদি তিনি উদ্‌ঘাটিত করিয়া থাকেন, জীবদেহে জীবাণু-দ্বারা রোগ পরিচালিত হয় ইহা যদি প্রাকৃতিক সত্য হয়, তবে জয় তাঁহার সুনিশ্চিত। সহকর্ম্মী ও শিষ্যবৃন্দে পরিবৃত হইয়া যখন তিনি পরীক্ষাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন তখন দেখিলেন যে, চব্বিশটি মেষের প্রাণহীন দেহ চারি-দিকে পড়িয়া আছে, এবং অবশিষ্ট মেষটিও মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরোক্তি করিতেছে। এই আশাতীত সাফল্যে পাস্তর্ বুঝিলেন যে, বহুমূল্য তথ্য তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার ফল শুধু পশু-দেহে আবদ্ধ করিলে চলিবে না, মানুষকেও এই লাভের অংশ দিতে হইবে।

পাস্তর্ এইবার ক্ষিপ্ত জন্তু-দংশনের প্রতিষেধক ঔষধ আবিষ্কারে তাঁহার সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করিলেন। তৎকালীন লোকের বিশ্বাস ছিল যে, ক্ষিপ্ত কুক্কুরের লালার সঙ্গে বিষ মিশ্রিত থাকে। পাস্তর্ দেখিলেন যে এই প্রচলিত মত নিতান্তই ভ্রমাত্মক, কারণ শশকের দেহে এই লালা সামান্য-পরিমাণে প্রবিষ্ট করাইলেও শশক ক্ষিপ্ত জন্তুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে না।

কুক্কুর ক্ষিপ্ত হইলে তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হয় এইরূপ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া পাস্তর্ ক্ষিপ্ত জন্তুর মস্তিষ্ক ও অন্য স্নায়বিক অংশ হইতে রোগের জীবাণু গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং ইহাতে ফলও আশানুরূপ হইতে লাগিল। কিন্তু পরীক্ষা চলিতে লাগিল পশুর দেহে, পরীক্ষালব্ধ তথ্যের সত্যতা মানব-দেহে প্রমাণিত করিবার কোনোই সুবিধা এপর্য্যন্ত পাস্তর্ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। হঠাৎ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে সে সুযোগও উপস্থিত হইল, এই সময়ে ক্ষিপ্ত কুক্কুরদষ্ট একটি বালক কুক্কুর-দংশনের দুই দিন পরে পাস্তরের পরীক্ষাগারে আনীত হইল। পাস্তরের প্রবর্ত্তিত অধুনা সুবিখ্যাত রীতি-অনুসারে এই বালকই প্রথম চিকিৎসিত হয়—দ্বাদশবার দেহে বিষ প্রয়োগ করিবার পর এই বালক রোগের কবল হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি লাভ করে। পাস্তরের এই মহৎ আবিষ্ক্রিয়ার বিরুদ্ধে অনেকেই প্রকাশ্যে নিন্দাবাদ আরম্ভ করিল; ইংলণ্ডের এক শ্রেণীর লোক এই বিপক্ষদলের নেতা হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে যখন দেখা গেল যে, পাস্তরের প্রবর্ত্তিত চিকিৎসা-

প্রণালী জীবদেহে কোনোই কুফল উৎপাদন করিতেছে না, বরং শত শত রোগীকে মরণের পথ হইতে ফিরাইয়া আনিতেছে, তখন বিপক্ষদলকে বাধ্য হইয়া পাস্তরের মহত্ত্ব স্বীকার করিতে হইল। পাস্তরের নাম এখন সভ্য-সমাজে সর্ব্বত্র সুপরিচিত, যত দিন বর্ত্তমান সভ্যতার অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন লোকে কৃতজ্ঞতা-সহকারে এই মনস্বী ফরাসী পণ্ডিতকে স্মরণ করিবে। ফরাসী-জাতি এইজাতীয় মহাপুরুষকে সম্মান দিতে কার্পণ্য করে নাই, মৃত্যুর পর তাঁহার দেহাবশেষ মহাসমারোহে সমাহিত হইয়াছিল। পাস্তরের সমাধি-মন্দির ও পরীক্ষা-শালা দেশবিদেশের ভক্তবৃন্দের নিকট পরম পবিত্র তীর্থ-ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। পাস্তর্ যে আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ ফরাসী একথা ফরাসীরা প্রায়ই গৌরব-সহকারে স্বীকার করিয়া থাকে।

ডিপ্থিরিয়া (Diptheria) রোগের জীবাণু প্রথম আবিষ্কার করেন লিফ্লার্ ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে। শিশুগণ সহজেই এই সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হয়। লিফ-লারের আবিষ্ক্রিয়ার পূর্ব্বে চিকিৎসক অস্ত্রোপচার ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে রোগীর যন্ত্রণার লাঘব করিতে পারিতেন না। এই রোগের তীব্র বীজাণু মাংসের ক্বাথের মধ্যে পরিবর্দ্ধিত করিলে যে জলীয় অংশ পাওয়া যায় তাহা ডিপ্থিরিয়া রোগের প্রতিষেধক-রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। এই তরল বিষ দুই-তিন মাস ধরিয়া ক্রমান্বয়ে কয়েকবার অশ্বের ধমনীতে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলে, রক্তের মধ্যে একপ্রকার তীব্রতর প্রতিষেধক বিষের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অশ্ব-দেহে সঞ্জাত এই বিষই ডিপ্থিরিয়া রোগে মহৌষধিরূপে ব্যবহৃত হয়। এই অব্যর্থ প্রতিষেধকের আবিষ্ক্রিয়ার জন্য বেরিং (Behring) এবং রু (Roux) নামক দুইজন বৈজ্ঞানিক প্রধানতঃ দায়ী। পূর্ব্বে ডিপ্থিরিয়া রোগগ্রস্ত শিশুদের প্রায় এক তৃতীয়াংশের এই রোগে মৃত্যু হইত আর এখন এক দশমাংশও মরে কি না সন্দেহ। রোগের প্রথম অবস্থায় ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিলে প্রায় সকল রোগীই রক্ষা পায়। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসু প্রবৃত্তির সম্মুখে এই রোগের পরাজয় নব্য বিজ্ঞানের পক্ষে গর্ব্ব করিবার বিষয়।

জীবাণুর কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে বিস্তৃত গবেষণা আরম্ভ করেন পাস্তর্ই সর্ব্বপ্রথম। পাস্তর্ই প্রথম লক্ষ্য করেন শ্বেতসার যে পচনের ফলে অম্ল ও সুরাসারে পরিবর্ত্তিত হয়, সে-পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় বিশেষপ্রকার জীবাণুর সাহায্যেই। পচনশীল বস্তু-মাত্রকেই যদি সম্পূর্ণরূপে জীবাণু সংস্পর্শ রহিত করা যায় তবে বহুকাল পর্য্যন্ত ইহা অবিকৃত থাকিবে ইহাও পাস্তর্ই প্রথম আবিষ্কার করেন। বায়ুশূন্য টিনে রক্ষিত খাদ্যসম্ভারে এখন দেশ ছাইয়া গিয়াছে, বিলাতের লোকের পক্ষে ত এইপ্রকার খাদ্যই প্রধান সম্বল। কিন্তু অল্পলোকেই জানেন যে, সংরক্ষণের এই উপায় বাস্তবিক পক্ষে নির্দ্দেশ করেন সর্ব্বপ্রথম পাস্তর্ ও লিষ্টার্। অঙ্গারজ বস্তু যেমন জীবাণুর সংস্পর্শে পচিয়া যায়, লিষ্টার্ দেখিয়াছিলেন যে, জৈবিক মাংসপেশীসমূহও সেইরূপ জীবাণুর অত্যাচারে বিকৃত হয়। প্রাণী-দেহের ক্ষত প্রকৃতি চাহেন শীঘ্র নিরাময় করিয়া দিতে আর প্রাকৃতিক এই চিকিৎসার বাধা দিতে থাকে এই দুষ্ট জীবাণুগুলা।—জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে ইহাদের বাস; একবার সুবিধা পাইলেই ইহারা ক্ষতমধ্যে প্রবেশ করে। রোগীর জীবনীশক্তি বিশেষ প্রবল থাকিলে ইহারা প্রায় হটিয়া যায়, প্রকৃতি স্বাভিপ্রেত কাজ করিয়া যান কিন্তু রোগীর দেহ জীবাণুর আক্রমণের বিপক্ষে আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইলে ক্ষত পচিতে আরম্ভ করে।

লিষ্টার্ই সর্ব্বপ্রথম বুঝিতে পারিলেন যে, অস্ত্রোপচারে সফলকাম হইতে গেলে চিকিৎসকের লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যাহাতে ক্ষতমধ্যে জীবাণু প্রবেশ না করে। লিষ্টারের প্রবর্ত্তিত জীবাণু-বিনাশ-প্রণালী এবং জীবাণু-সম্পর্কবিহীন তুলা ও আচ্ছাদনী এখন বিশ্ববিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছে। লিষ্টারের আবিষ্কৃত এই সকল মূল্যবান্ তথ্যের ফলেই আধুনিক অস্ত্র চিকিৎসার এত সাফল্য সম্ভবপর হইয়াছে। অস্ত্রোপচারের পূর্ব্বে চিকিৎসক সর্ব্ব-প্রথম নিজের হস্ত ও যন্ত্রপাতি যাহাদের সহিত ক্ষতের সংস্পর্শ অবশ্যম্ভাবী—জীবাণুশূন্য করিয়া লন। জীবাণুর বিশেষত্বই এই যে, অধিক উত্তাপে ইহাদের জীবনীশক্তি সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়, সুতরাং অস্ত্রোপচারের অব্যবহিত

পূর্ব্বে জলে কিছুক্ষণ ধরিয়া যন্ত্রগুলি ফুটাইয়া লইলে জীবাণুর হাত হইতে আংশিক অব্যাহতি লাভ করা যায়, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। বিভিন্নপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যেও জীবাণুর বিনাশ করা যাইতে পারে, কিন্তু লক্ষ্য রাখা আবশ্যক যে, এইসকল পদার্থ জীব-দেহের মাংসপেশীর কোন অপকার সাধন না করে। বর্ত্তমান সময়ে অস্ত্রোপচারের ফলে রোগীর রক্তদুষ্টি শুধু চিকিৎসকের অনবধানতার ফলেই সম্ভব।

১৯১২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে লিষ্টার্ নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন। জীবিতাবস্থায় তিনি অশ্রুতপূর্ব্ব সম্মানের অধিকারী হইয়াছিলেন; মৃত্যুর পর জনসাধারণ, ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ মনীষীবর্গের বিশ্রাম স্থান, ওয়েষ্ট্-মিন্‌ষ্টার ভজনালয়ে, তাঁহার দেহ সমাহিত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে, কিন্তু লিষ্টারের অন্তিম ইচ্ছানুসারে তাঁহার দেহ স্বীয় পত্নীর সমাধির পার্শ্বে হাম্প্‌ষ্টেডে অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন সমাধি-ক্ষেত্রে সমাহিত হয়। লিষ্টার্ পাস্তরের মন্ত্রশিষ্য হইলেও তাঁহার উদ্ভাবনী-শক্তি মানবজাতিকে যে ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করিয়া দিয়াছে তাহা ঔজ্জ্বল্যে পাস্তরের দান অপেক্ষা হীন নহে। লিষ্টার্ তাঁহার আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা রোগীর জীবনের আশঙ্কা দূরীভূত করিয়া দিলেন সত্য, কিন্তু অস্ত্র-প্রয়োগের ফলে রোগী যে বিষম যন্ত্রণা ভোগ করে তাহার লাঘব করিবার কোন উপায়ই নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই।

ইথর, ক্লোরোফর্ম্ম্ প্রভৃতি সম্মোহকের (anaesthetic) গুণ আবিষ্কার করেন একজন ইংরেজ চিকিৎসক, সার জেমস্ সিম্প্‌সন্ (Sir James Simpson)।

সিম্প্‌সন্ যখন চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলেন তখন অস্ত্রের সময় একজন স্ত্রীলোকের কাতরোক্তিতে এতদূর বিচলিত হইয়াছিলেন যে, চিকিৎসক হইবার বাসনা পরিত্যাগ করিবেন মনঃস্থ করিলেন। বিশেষ বিবেচনার পর তিনি ঠিক্ করিলেন যে অতঃপর যাহাতে রোগীর দুঃখ-যন্ত্রণা লাঘব হয়, তাহার চেষ্টাতেই তিনি তাঁহার নিজের জীবন উৎসৃষ্ট করিবেন।

ক্লোরোফর্ম্মের সম্মোহক গুণ আবিষ্কৃত হইবার অনেক পূর্ব্বেই নাইট্রাস্ অক্সাইড (nitrous oxide) নামক গ্যাস্ ও ইথর নামক তরল পদার্থে এই গুণ অল্পাধিক-পরিমাণে লক্ষিত হইয়াছিল এবং দন্ত-চিকিৎসায় এগুলি ব্যবহৃতও হইয়াছিল; কিন্তু ফল আশানুরূপ হয় নাই। প্রত্যহ রাত্রিতে আহারের পর দুইজন সহকর্ম্মী চিকিৎসকের সহিত সিম্প্‌সন্ বিভিন্ন সম্মোহকের ক্রিয়া নিজ নিজ দেহের উপর পরীক্ষা করিতেন। প্রথম হইতেই ক্লোরো-ফর্ম্মের উপর তাঁহার মন কেমন বিরূপ হইয়াছিল, তাই অবজ্ঞা-ভরে তিনি ক্লোরোফর্ম্মের শিশিটি রাশীকৃত পুরাতন কাগজের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছিলেন। একদিন নৈশ আহারের পর হঠাৎ তাঁহার শিশিটির কথা মনে পড়িল। কিছুক্ষণ ধরিয়া ঘ্রাণ লইবার পর, সকলেরই মনে অস্বা-ভাবিক স্ফূর্ত্তি জাগিয়া উঠিল, অধ্যাপকোচিত গাম্ভীর্য্য পরিহার করিয়া তিন জনেই উচ্চকণ্ঠে বাদানুবাদ আরম্ভ করিলেন। হঠাৎ তাঁহাদের মনে হইল, নিকটে কোথাও ঘন ঘন বন্দুকের শব্দ হইতেছে। শীঘ্রই চক্ষু বুজিয়া আসিল এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের কোন চৈতন্য ছিল না। জ্ঞান হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সিম্প্‌সন্ বলিয়া উঠিলেন, "এই ঔষধের সম্মোহক ক্রিয়া বাস্তবিকই অতিশয় তীব্র"; পরমুহূর্ত্তেই বুঝিতে পারিলেন যে, সহকর্ম্মীদ্বয় পরিবৃত হইয়া তিনি এতক্ষণ ভূমিশয্যা গ্রহণ করিয়া অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়াছিলেন। সেই রাত্রিতেই তাঁহারা বারংবার ক্লোরোফর্ম্ম্ আঘ্রাণ করিয়া ইহার শক্তি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন এবং দশ দিন পরে সিম্প্‌সন্ এই নূতন ঔষধের গুণ লোক-সমাজে প্রচার করিলেন।

বলা বাহুল্য চারিদিক্ হইতে বিপক্ষ দল এই ঔষধের নিন্দা আরম্ভ করিল। ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেল্ হইতে খ্রীষ্টধর্ম্ম-নীতি উদ্ধার করিয়া জনসাধারণকে বুঝান হইল যে, এইরূপ ঔষধের ব্যবহার খৃষ্টীয়-ধর্ম্মবিরুদ্ধ। গর্ভিণী স্ত্রী-লোকগণের প্রসবকালে এই ঔষধের ব্যবহারের বিপক্ষে ধর্ম্মযাজকগণ তীব্র মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আদিম জননী ইভের প্রতি ভগবানের অভিশাপই এই ছিল যে, জ্ঞান-বৃক্ষের ফলভক্ষণকৃত অপরাধের জন্য তিনি এবং তাঁহার সন্ততিবর্গ সন্তানপ্রসবের যন্ত্রণা ভোগ করিবেন—ঔষধের সাহায্যে এযন্ত্রণা লাঘব করার চেষ্টা ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া ভিন্ন আর কি হইতে পারে।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া যখন যাজকের এই ভ্রূকুটি অবহেলা করিতে সাহসী হইলেন তখন হইতেই ক্লোরোফর্মের বিপক্ষবাদীরা নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন।

প্লেগের জীবাণু যে মূষিক ও মশক-সাহায্যে চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হয় তাহা প্রথম আবিষ্কার করেন দুইজন জাপানী চিকিৎসক। প্লেগরোগগ্রস্ত মূষিককে দংশন করিয়া মশক এই রোগের বীজ মনুষ্য-দেহে সংক্রামিত করে। মশক এবং অন্যান্য কীটের দংশনই যে অনেক সংক্রামক মারাত্মক ব্যাধির প্রকোপের প্রধান কারণ তাহা সম্ভবতঃ অনেকেই জ্ঞাত নহেন। ম্যালেরিয়া, পীতজ্বর (yellow fever), ঘুমান-রোগ (Sleeping sickness), প্লেগ, সান্নিপাতিক জ্বর, কালাজ্বর প্রভৃতি সাংঘাতিক ব্যাধি মশক ও কীট দ্বারাই পরিব্যাপ্ত হয়। অণুবীক্ষণের সাহায্যে রোগীর রক্ত পরীক্ষা করিলে, শোণিতে বিভিন্নপ্রকার জীবাণুর অস্তিত্ব সহজেই ধরা পড়ে। এইসকল ব্যাধির কারণ-নির্ণয়ের পক্ষে যে জীবাণু-সংক্রান্ত গবেষণা বিশেষ আবশ্যক তাহা বলাই বাহুল্য। এ-দেশেও এরূপ গবেষণার মূল্য চিকিৎসকগণ যে না বুঝিতে পারিয়াছেন তাহা নহে। লিওনার্ড রজার্স্-স্থাপিত প্রাচ্য-ব্যাধির চিকিৎসালয়ে এইসকল ব্যাধি-সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ হইয়াছে।

আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিশেষ বিস্তৃত না হইয়া থাকিলেও ব্যাধি-সংক্রান্ত কয়েকটি মূল্যবান্ তথ্য যে আবিষ্কৃত হইয়াছে ইহা বাস্তবিকই গর্ব্ব করিবার বিষয়। কালাজ্বরে ডাঃ ব্রহ্মচারীর অ্যান্টীমনি ও কুষ্ঠ ব্যাধিতে গোপাল-বাবুর চালমুগ্‌রা তেলের চিকিৎসা বিশেষভাবে সফল হইয়াছে বলিয়া দেশবিদেশে স্বীকৃত হইতেছে।

ব্যাধির স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া বৈজ্ঞানিক যে শুধু অর্থ, উদ্যম ও স্বাস্থ্য ক্ষয় করিয়াই ক্ষান্ত হন তাহা নহে. অনেকস্থলে নিজের জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জনে কুণ্ঠিত হন না। বীরত্বে ইঁহারা যুদ্ধের সৈনিক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মানবের কল্যাণে যাঁহারা প্রাণ দিতে বিমুখ হন না তাঁহাদের নাম বিজ্ঞানের ইতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে চিরকাল মুদ্রিত হইয়া থাকিবে।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে কিউবা (Cuba) দ্বীপে পীতজ্বরের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া ডাক্তার লাজিয়ের্ (Dr. Lazear) স্বেচ্ছায় মশক-দংশন সহ্য করেন। তাঁহার সঙ্গী চিকিৎসকগণ তাঁহাকে লইয়া তাঁহাদের গবেষণা আরম্ভ করেন, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই লাজিয়ের্ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে লীভারপুল্ হইতে দুইজন চিকিৎসক, ডাব্‌হাম্ এবং মায়ার্স্, পীতজ্বরের কারণ অনুসন্ধানে পেরা দ্বীপে গমন করেন। উভয়েই এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হন, ডাব্‌হাম কোনপ্রকারে রক্ষা পাইয়া গেলেন, মায়ার্স্‌কে আর দেশে ফিরিতে হয় নাই।

রেডিয়ম্ ও এক্স-রে সংক্রান্ত চিকিৎসায় দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সার্ আরোগ্য হয় কি না ইহা পরীক্ষা করিতে গিয়া একাধিক বৈজ্ঞানিকের অঙ্গে অস্ত্রোপচার আবশ্যক হইয়াছে, কাহারো কাহারো জীবন পর্য্যন্ত গিয়াছে। তথাপি এই শ্রেণীর গবেষণার বিরাম নাই।

এইসকল বৈজ্ঞানিক যাঁহারা মানবের হিতের জন্য অম্লানবদনে নিজেদের জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তাঁহারা বাস্তবিকই মানবের নমস্য—সাধারণ লোকে ইঁহাদের স্মৃতির উদ্দেশে কিভাবে পূজা করিতেছে তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

অনাদ্যন্ত

শ্রী সুধীরকুমার চৌধুরী

কা'রা যেন দিল আনি'
আজিকে অন্তর-তলে জন্মান্তর স্মরণের বাণী—
পরিচিত সুর,
বিস্মৃতির অতলতা তারি স্পর্শে স্পন্দিত বিধুর
কল্লোলিত সিন্ধুসম। মনে পড়ে, বহু লক্ষ শত
লক্ষ্যহীন বর্ষ ধরি' নিত্যকার মতো
বেলা যায় হাসিমুখে; সন্ধ্যা আসে ছায়া বুলাইয়া
কাননে কান্তারে তীরে, শীতল পরশে ভুলাইয়া
দিবসের বিবশ গ্লানিরে; তার সর্ব্ব কর্ম্ম করি' সমাপন
গগন-অঙ্গন ভরি' যতনে আঁকে সে আলিম্পন
তারকা-বিন্দুর,
ভালে লয়ে' সুমঙ্গল গোধূলির প্রদীপ্ত সিন্দুর,
দেহটিরে ঘিরে' লয়ে' শুচিস্নিগ্ধ পাণ্ডুর গৈরিকে, স্তব্ধপদে,
আপনার অন্তরের সুগোপন শান্তির সম্পদে,
স্পন্দিত হৃদয়ে। ক্লান্ত অবসর রাতি;—
তারার দীপালি সনে কারো গৃহে উৎসবের বাতি
ধন-জন সমারোহে; কারো গৃহে রুদ্ধ বাতায়নে
আঁধারে দীপালি জ্বলে পথ-চাওয়া আকুল-নয়নে
দৃষ্টির আলোতে।—শুধু আমি একপাশে,
দিনের দেউটিখানি জানি না কখন্ নিবে' আসে;
কাজ কিছু নাহি ছিল সাঙ্গ করি অবসর যাচি;
চলার ছিল না তাড়া, সমুখে পিছনে কাছাকাছি
পথ যার গৃহ তার কাছে; হিসাবের ছিল না বালাই,
যে দিকে যাহারে রাখি,—লাভ-ক্ষতি—ভেদ কিছু নাই,
আয়ে ব্যয়ে মহাশূন্য প্রতিদিন সমান দাঁড়ায়,
যত করি ছড়াছড়ি কণাটুকু কভু না হারায়।
শুধু সেই শূন্য ভরি' থরথরি কাঁপিত কি জানি
সবার অগীত গান, সবাকার অকথিত বাণী!
স্বপনে ছিল না ভুল, স্বরগে ছিল না তার বাড়া,
এজীবনে জাগরণে কোথাও ছিল না তার সাড়া;

কেবল কাঁপনে তারি বুকে মোর কাঁপিত কি তার,—
কভু মনে হ'ত হাসি, কভু মনে হ'ত হাহাকার;
মরু-কান্তারের পাশে, ধূলিহীন নদীটির ধারে
সবাকার অগোচরে লুকায়ে লইয়া আপনারে,
লোকালয় পাছে রাখি', পায়ে-চলা পথ হ'তে দূরে,
তিমির মগন করি' ভাষাহীন বাঁশরীর সুরে
তোমারে সাধিয়াছিনু।

তার পর বহু জন্ম ধরি'
কার মুখ পানে চেয়ে কেটেছে বিনিদ্র বিভাবরী,
কেউ তাহা জানিত না। জানিতাম কিছু তার আমি।
অস্তিত্বের মর্ম্মমূলে জীবনে মরণে দিবাযামী
জাগিত যে আপনার অনুভব, ছিল তার মাঝে
বুকের পরশ কার যেন। মোর প্রতি পদে প্রতি কাজে
তারে আমি বহিতাম, সুখে দুঃখে মাখিতাম সুর,
লোক হ'তে লোকান্তরে লইতাম বিরহ-বিধুর
সুদূরের অভিসারে। সে চলিত আগে,
আমি চলিতাম তার চরণের ধ্বনি অনুরাগে
পায়ে পায়ে অনুসরি'। কানে কানে কহিতাম কথা,
শান্তি লভিতাম তারে অন্তরের সর্ব্ব ব্যাকুলতা
নিবেদন করি' দিয়া। হাতে ধরি' বসাইয়া কাছে
দিতাম অঞ্চল ভরি' নিঃশেষিয়া যা দেবার আছে,
তার পরে দেখিতাম, মোর যত দান-করা ধন
আমারই পায়ের কাছে পড়ে' আছে অর্ঘ্যের মতন,
অনাদিকালের মোর পাথেয়ের গোপন সঞ্চয়।
দিনে দিনে আপনাতে আপনার নব পরিচয়
নূতন প্রেমের মতো জাগে;—কবে সে কেমনে নাহি জানি
স্বপনে নিজের মনে কার সনে হ'ল কানাকানি,
কহিলাম, ভালবাসি। সে কহিল সেই কথাটিরে
চকিতে ফিরিয়া যেন প্রতিধ্বনি।—সেইদিন কি রে
আপনারে দ্বিধা করি' জেগেছিনু প্রথম প্রণয়ে

আপনার মাঝে আমি আধ চেতনায় ?···যারে বহেছি হৃদয়ে,
সহসা বাহিরে তারে হেরি;—তারে নাহি হেরি। সচকিত ছায়া
হেরি কার প্রভাত গগনে। ঘন মেঘস্তরে কার স্বর্ণকায়া
শিহরি' ডুবিয়া যায়। দূরে শ্যামায়িত বনরেখা 'পরে
আঁখির পল্লব কার ঘনস্নিগ্ধ আলসের ভরে
হুইয়া নামিয়া আসে। দিগন্তের অনন্ত বিস্তারে
আকুল আগ্রহ-ভরে ডেকে ডেকে খুজে' ফিরি তারে,
তবু যেন তারই মাঝে রহি। ধীরে কেটে যায় দিন,
আনন্দে ব্যথায় ভরা আপনার হৃদয়-নিলীন
অজানা সে আভাসের টানে
দূর হ'তে দূরে চলি, অন্তরের অন্তস্তল পানে,
তোমারেই কাছে শুধু আনি।

তার পর কতবার,
হৃদয়-গহন-কোণে আষাঢ়ের বিজলি-বিভার
আলোকে তোমারে হেরি শুধু এক পলকের মতো।
বুকের গোপন-কক্ষে নিরাশায় শান্ত অনাহত
স্তিমিত যে দীপখানি জ্বলে, তার ধ্যান-দৃষ্টি দিয়া
তোমারে চকিতে লভি, তার পর হাসিয়া কাঁদিয়া
পুনরায় বসি ধ্যানে। কত জন্মযুগ যায় বহি',
কাঁদে এ-বক্ষের মাঝে এ-বিশ্বের অনাদি বিরহী
অজানা প্রিয়ার লাগি' তার। কভু সোহাগের তুলি
বুলাইয়া আঁকি তোমা' ;—শোণিতে জীবন্ত রঙ্গুলি
হাসে তব কেশে-বেশে, কপোলে, অধরে, বক্ষে, পায়ে,
শুধু মোর দীর্ঘশ্বাস বহে স্তব্ধ পটেরে কাঁপায়ে,
নিরাশায় আঁখি মোর ঝরে। কভু অনিন্দিত ঐ রূপখানি
কঠিন পাষাণে গড়ি' করি তোমা' কঠিন পাষাণী,
চরণে মরণ-লেখা এঁকে লই ললাট-ফলকে
মিনতি-নতির পুরস্কার। কভু চাহি অপলকে
যেথায় চলে না দৃষ্টি, সৃষ্টির বাহির দূর-পানে,
যা-কিছু অচেনা সবে তোমার মতন করি' টানে,
ডাকে ঘোর শঙ্খের নির্ঘোষে। পথে পথে
বাহিরাই বীর-বেশে স্বর্ণচূড় তূর্ণগতি রথে
চক্রের ঘর্ঘর তুলি', শঙ্খের নিনাদ, ভেরীরব ;—
রণ-অবসানে হেরি পুঞ্জ পুঞ্জ ব্যর্থতার শব
তোমার পথেরে করে দুস্তর দুর্গম। কভু চুপে
তোমারে ধরিতে চাহি এ-বিশ্বের দেবতার রূপে ;
ধূপের অলস ধোঁয়া বাতাসের গায়
মূরছিয়া রহে পড়ি' কাঁপন জাগায়
স্পন্দমান সন্ধ্যাতারা অন্ধ নিশীথের
চির প্রতীক্ষার বুকে, হিমভারে অবশ শীতের
জমাট বিষাদ-সম মর্ম্মরের দেব-আয়তনে
স্তব্ধতার করি পূজা, আঁধারেরে বসায়ে যতনে
আলোক-পিপাসু মর্ম্মশতদলে, পদতলে দিই দীপ জ্বেলে,
তারপর আঁখি মুদি' ভাবি তুমি এলে, তুমি এলে, তুমি এলে!

কত যুগ ধরি'
তোমারে গড়েছি আমি আমার মনের মতো করি'
কামনার নানা বর্ণে রূপে। কত রুদ্র তপস্যায়
পাষাণে এনেছি প্রাণ তিলে-তিলে, জড় মৃত্তিকায়
হৃদয়ের স্পন্দনের সুর। গড়িয়াছি আঁখিদুটি
আমার এ আঁখিজল দিয়া। অধরে যে হাসি ফুটি'
মিলায় উষার আলো সম, আমি আঁকিয়াছি তারে
আমার-অধর পিপাসায়। কপোলের একধারে
একটি তিলের ফোঁটা বাসনার বেধলক্ষ্য সম,—
যুগব্যাপী সাধনার সাদর বুকের স্পর্শে মম
আছিল সে নিভৃত লালনে। পুঞ্জ পুঞ্জ কেশভার,
তব পথ-চাওয়া মম সুনিবিড় ঘন তমসার
স্মৃতি সে যে বহু দিবসের। আজি চাহি কুতুহলে
তোমার ও-মুখপানে, ভাবিতেছি কোন্ মন্ত্রবলে
তোমারে আনিনু আমি আশাধন হৃদয়-গহন-তল হ'তে
এবিশ্বের উদার আলোতে।
অন্তরের অনির্ব্বাণ আশা,
আমার অস্তিত্বমূলে অনাদি কালের ভালবাসা,
সে আজি লভেছে রূপ কি মায়াতে, ওগো মায়াবিনী
ঐ বাহুলতিকায়, পদাম্বুজে, কণ্ঠগীতে, কঙ্কণ-কিঙ্কিণী-
নূপুর-বলয়-রবে, কটিতটে, গ্রীবা বক্ষ নাসিকা ললাটে,
কোমল কপোলতলে, ভুরুযুগে, কেশপাশে, ম্লান সিঁথিপাটে,
ললিত গতির ছন্দে, আবেশে-আগ্রহে,
হাসি অশ্রু মানে অভিমানে, ধ্যানে, মোহে,

উৎকণ্ঠা উৎসুক ব্যগ্র প্রেমে! তুমি এবিশ্বের যতখানি
ততখানি তুমি এ-চিত্তের। তুমি মম সৃষ্টি-রাণী
মুগ্ধ অন্তরের। তুমি মোর বাসনার পরিমাণ।
নিভৃত সাধনা মোর যুগে যুগে নিশি-দিনমান
তোমারে দিয়েছে কায়া। অন্তর-বৃন্তের পুষ্প তুমি,
তোমারে চেনে এ মম জীবনের শ্যাম-তটভূমি
আপনার রসের আভাসে। বিশ্ব অণু অণু করি'
দিল তার বর্ণ-গন্ধ-গীতি, তারে অনুরাগে গড়ি
আপন মনের মতো আমি,—লয়ে' পুষ্পিত বনের ভালবাসা
শ্যাম-প্রান্তরের ঘন তৃণাঙ্কিত রোমাঞ্চের ভাষা,
উষার তরল মেঘ-জ্যোতিঃ, দূর নীলিমার রহস্য-বিস্ময়,
গোধূলির স্তব্ধ শান্তি, বহু নরনারীর প্রণয়,
কত স্নেহ-বিগলিত পূত প্লুত মাতৃহিয়া-সুধা,
কত যুগ-যুগান্তের বুকভরা সৌন্দর্য্যের ক্ষুধা।

আর কেহ
গড়িতে পারিত কভু মনোরম ঐ প্রিয় দেহ,
কমনীয় ঐ মন, এমন একান্ত করি' মোর
আপন আশার ছাঁদে? হে সুন্দর চোর,
কে তোমারে দিল বলি' এহিয়ার গোপন সন্ধান,
এর অন্ধিসন্ধি যত? তুচ্ছতম তোমার যা' দান,
তোমার প্রতিটি বাণী, অধরকুঞ্চন, বিশিষ্টতা,
মুঞ্জরে সবারে লয়ে' অনাদি কালের কল্পলতা,
মোর চিরতপস্যার নির্ব্বাক্ সাধনা। কিছু নাহি কোথা তব
যারে আমি চাহি নাই, যাহারে করি না অনুভব
চির পরিচিত সম, সুকঠোর তপলব্ধ ধন,
যার মাঝে নাহি মম যুগান্তের অশ্রান্ত ক্রন্দন!
আমি গড়িয়াছি তোমা,'—আপনার হাতে তিলে তিলে;
আমি জানিয়াছি তব কোথায় কি রঙ্‌খানি দিলে
সুন্দর মানায়। মম মোহালস তুলিকার টানে
আঁকা ঐ ভুরুরেখা, মম চিত্ত জানে
কি আবেশে গড়েছিনু ঢলঢল আঁখির পল্লব!

আজিকে ভুলিব সব।
আজিকে ক্ষণেক তরে চাহিব দিগন্ত-সীমানায়,
স্পন্দিত আঁধার যেথা অসীমের বেদনা জানায়
নিয়ত আহ্বানে। জানি, জানি আমি রবে না এ বাধা,
এই মম সৃষ্টির বন্ধন, এই আধা
পরিচয় আশা-সাধ-কামনার মোহে;
তোমারে লভিতে হবে তিলে তিলে নিবিড় বিরহে
আশার অতীত করি'। জানি আমি দিনে দিনে তোমা'
হারাব বিশ্বের মাঝে জ্যোতিঃস্রোতে, ওগো প্রিয়তমা!
হিয়ার বাহিরে যারে এনেছিনু হৃদয়ের ধন,
তারে বাঁধিবে না মোর এই ব্যগ্র হিয়ার বন্ধন;
শতেক বন্ধনে বেঁধে হেসে কেঁদে শতবার করি'
হাসায়ে কাঁদায়ে তোমা' নেবে ধরা আমা হ'তে হরি,'
নেবে তার সমুদায় পথ 'পরে, যেই পথ চলে
তোমার আপন আশা পানে। জানি আমি আঁখিজলে
পথ তব রুধিবে না। জানি মম হৃদয়-শোণিতে
আঁকা তাহে হবে আলিপনা। জানি জানি হবে দিতে
এবক্ষ চিরিয়া তব পথ করি'। ভালোবাসাটিরে
পথের পাথেয় করি' ক্ষণকাল লবে কিম্বা নাহি লবে ফিরে'
তার পর চাহিবে না। যদি কভু চলি সাথে সাথে,
নীরবে ঘেঁসিয়া কাছে হাতখানি রাখি তব হাতে,
শিহরি' চাহিয়া মম মুখপানে একদিন মোরে
তুমি আর চিনিবে না।—তোমারেও চিনিব না।...
　　সেইদিন স্বপনের ঘোরে
সহসা লাগিবে রুদ্র চেতনার আলো;
　　তোমারে বাসিব ভালো
　　সেদিন নূতন করি'। হৃদয়ের ধনে
　　হৃদয় অতীত করি'। অশান্ত ক্রন্দনে
যারে লভেছিনু নিজ বাসনার পরিমাণ-মাঝে,
তাহারে সহসা হেরি মহীয়সী রাজরাণী সাজে
আমার বাসনা হ'তে বহুগুণ বড়।
অজানার বিচিত্রতা তোমারে করিবে প্রিয়তর।
সেদিন লভিব আমি হৃদয়ের সমাধির পরে
যত আশা যত সাধ এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে না ধরে,
　　আছে যারা এবিশ্বের অন্তরে অন্তরে।
হৃদয়ের সীমা হ'তে যতদূরে যাবে তুমি প্রিয়া,
পায়ে পায়ে র'বে জাগি' মোর কোটি স্পন্দমান হিয়া,
তোমারে লভিব তব সর্ব্বমাঝে। পরিচয়ে যারে
লভেছিনু, এতদিন পরিচয়-পারে
তাহারে লভিব পুনঃ সর্ব্বব্যাপী করি'।

দিব্য-শর্ব্বরী

অনাদির অশ্রু দিয়ে লভি' যারে এজীবনে হায়,
অনন্তের অশ্রুপাতে তাহারে লভিব পুনরায়।

বার্লিনের অবরোধ

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

ডাক্তার "ভি"-র সঙ্গে "শাঁজ্-এলিজে" দিয়ে যেতে যেতে, গোলা-বিদ্ধ দেয়াল থেকে, ছর্‌রা-গুলি-সমাকীর্ণ পথের বাঁধানো রাস্তা থেকে, আমরা অবরুদ্ধ প্যারির ইতিহাস সংগ্রহ করছিলেম। "প্লাস্ দ্য লেতোয়াল"এ পৌঁছিবার ঠিক্ আগে ডাক্তার থাম্‌লেন,—থেমে, আর্ক্ দ্য ত্রিয়ঁফ্-এর চারিধারে, কোণের যে-বাড়ীগুলো জাঁকালো-ভাবে পুঞ্জীকৃত রয়েছে তার একটা বাড়ী আঙুল দিয়ে আমাকে দেখালেন। তিনি বল্‌লেন :—

"দেখ্‌তে পাচ্ছ কি, ঐ উপরের বারাণ্ডায় ৪টা বন্ধ জান্‌লা? আগষ্ট মাসের আরম্ভে, সেই বিপৎসঙ্কুল ১৮৭০ অব্দের আগষ্ট মাসে, মৃগীরোগগ্রস্ত এক রোগীকে দেখ্‌বার জন্য আমাকে ডাকা হয়েছিল। সে রোগী—কর্নেল জুভ, "প্রথম-সাম্রাজ্যের" আমলের একজন বর্ম্মধারী অশ্বারোহী সৈনিক,—যশোলাভের জন্য, মাতৃভূমির জন্য একেবারে উন্মত্ত। যুদ্ধের আরম্ভে, "শাঁজ্-এলিজের" ভিতর, যে একটা বাড়ীর গবাক্ষ-ওয়ালা একপ্রস্থ কামরা ভাড়া করে' রেখেছিল;—কি জন্যে জান?—আমাদের সৈন্যদের বিজয়-প্রবেশ সেখান থেকে দেখ্‌বে বলে'। বৃদ্ধ বেচারী! আহারান্তে টেবিল থেকে উঠছে এমন সময় (Wissembourg) ৱইসেম্বুর্গের সংবাদটা এসে পৌঁছিল। সংবাদ-পত্রের পাদদেশে লুই-নেপোলিয়ানের নাম-স্বাক্ষরিত পরাজয় সংবাদটা পাঠ করে'ই সৈনিক মূৰ্চ্ছিত হ'য়ে পড়্‌ল।

"আমি গিয়ে দেখ্‌লেম, বৃদ্ধ অশ্বারোহী, ঘরের মেজের উপর সটান পড়ে' আছে, মুখ দিয়ে রক্ত পড়্‌ছে, আর একেবারে স্পন্দহীন; লাঠির আঘাতে যেরকম হয় ঠিক সেইরকম। দাঁড়ালে খুব লম্বা বলে' মনে হ'ত—কিন্তু এখন শুয়ে আছে, তবু শরীরটা প্রকাণ্ড বলে' মনে হচ্ছে। সুন্দর মুখাবয়ব, সুন্দর দন্ত-পাঁতি, কোঁক্‌ড়া কোঁকড়া সাদা চুল। বয়স ৮০ বৎসর, কিন্তু দেখ্‌লে মনে হয় ৬০এর বেশী না। তার পাশে, তার পৌত্রী নতজানু হ'য়ে আছে—চোখ দুটি জলে-ভরা। পিতামহের সঙ্গে তার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। তফাতের মধ্যে, একজনের মুখশ্রী জরা-জীর্ণ,; আর-একজনের মুখশ্রীতে বেশ একটা নবীনতা আছে, একটা উজ্জ্বলতা আছে।

মেয়েটিকে দেখে' আমার বড় কষ্ট হ'ল। সৈনিকের কন্যা ও সৈনিকের পৌত্রী। কেন না, তার পিতা মাক্-মাহনের পার্স-পার্শ্বচর-দের মধ্যে একজন ছিল। বৃদ্ধ মেয়েটির সম্মুখে প্রসারিত; মেয়েটির মনে আর-একটি ভয় জেগে উঠেছে। আমি তাকে আশ্বস্ত করবার জন্য অনেক চেষ্টা করলেম,—আসলে যদিও আমারও কোন আশা ছিল না। ফুস্‌ফুসের রক্তস্রাব আট্‌কাবার জন্য আমরা চেষ্টা করছিলেম—৮০ বৎসর বয়সে এ-রকম রক্তস্রাব হ'লে বাঁচ্‌বার কোন আশা থাকে না।

তিন দিন ধরে' রোগী সেই একই অবস্থায় ছিল—নিস্পন্দ, নিশ্চল। ইতি মধ্যে রাইখ্‌শোফেনের সংবাদটা এল—মনে আছে ত, সে কি অদ্ভুত সংবাদ! সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমাদেরই একটা বড়রকম জয় হয়েছে বলে' আমরা বিশ্বাস করেছিলেম।—২০,০০০ প্রুশীয় নিহত, আর প্রুশিয়ার যুবরাজ বন্দী।

"বেচারী রোগী—যে এপর্য্যন্ত বাহিরের ঘটনার প্রতি বধির ছিল—কি চুম্বক শক্তির প্রভাবে এই জাতীয় আনন্দের প্রতিধ্বনি তার কাণে এসে পৌঁছিল, তা আমি বল্‌তে পারিনে। কিন্তু সেই রাত্রে তার শয্যার পাশে এসে দেখি, সে যেন আর-এক মানুষ। তার চোখ প্রায় সাফ্ হ'য়ে গেছে, কথা কইতে আর তত্টা কষ্ট হচ্ছে না; মুখে একটু হাসির রেখা দেখা দিয়েছে—আর তোৎলার মতন কথা কচ্ছে :—

"জয়, জয়"।

"হাঁ কর্নেল, একটা বড়রকমের জয়। তার পর যখন মাক্-মাহনের বিজয় কীর্ত্তির খুঁটিনাটি বর্ণনা করতে লাগ্‌লেম তখন তার মুখশ্রী শিথিল হ'য়ে এল, তার মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল।"

"আমি যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এলেম, রোগীর নাত্নী আমার জন্য অপেক্ষা করছিল—তার মুখ ফ্যাকাশে হ'য়ে গেছে, আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌ছে।" আমি তার হাত-দুটি ধরে' বল্‌লেম :—

"কর্নেল রক্ষা পেয়েছে।"

আমার কথার উত্তর দিতে মেয়েটির সাহস হ'ল না। একটু আগে যুদ্ধের আসল খবরটা পাওয়া গেছে। মাক্-মাহন পলাতক, সমস্ত ফরাসী বাহিনী নিষ্পেষিত। একটা আতঙ্কের ভাবে আমরা পরস্পরের মুখের পানে তাকাতে লাগ্‌লেম। মেয়েটি দাদামশায়ের জন্য উৎকণ্ঠিত, আর থরথর্ করে' কাঁপ্‌ছে। নিশ্চয়ই, এই নূতন ধাক্কাটা তিনি আর সাম্‌লাতে পারবেন না। এখন তবে উপায় কি? যে-সংবাদ তাঁকে পুনর্জীবিত করে' তুলেছে—সেই সংবাদের বিভ্রমটাই তিনি এখন উপভোগ করুন। তবে কি না, তাঁকে আমাদের প্রতারণা করতে হবে। সাহসী মেয়েটি বল্‌লে :—

"আচ্ছা তবে আমিই তাঁকে প্রতারণা করব।" এই কথা বলে' তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে' ফেলে', হাস্য-বদনে তার পিতামহের ঘরে প্রবেশ কর্‌লে

মেয়েটি নিজেই এই শক্ত কাজের ভারটা নিয়েছে। প্রথম কয়েক দিন, এ-কাজটা অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল, কেননা বৃদ্ধের মস্তিষ্ক তখন দুর্ব্বল ছিল—ছোট ছেলের মতো সে যা-তা বিশ্বাস করত। কিন্তু স্বাস্থ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তার মাথাটা পরিষ্কার হ'য়ে এল। রোজকার সংবাদ তাকে শোনানো আবশ্যক হ'ত, বানিয়ে বানিয়ে নূতন খবর বল্‌তে হ'ত। সুন্দরী মেয়েটি রাত-দিন একটা জার্মানির ম্যাপের উপর ঝুঁকে' রয়েছে—দেখ্‌লে কষ্ট হয়। ছোট ছোট নিশেন দিয়ে ম্যাপটা সে চিহ্নিত করত—বিজয়-যাত্রার পথে বাজেন বার্লিনের দিকে অগ্রসর হয়েছে, ফ্রসার্ড ব্যাভেরিয়ায় আছে, মাক্-মাহন বাল্টিক সমুদ্রের উপর ইত্যাদি। এইসব বিষয়ে সে আমার পরামর্শ নিত; আমার সাধ্যমত আমি তাকে সাহায্য করতেম। কিন্তু এই কাল্পনিক যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যাপারে ওর পিতামহের কাছ থেকেই আমরা বেশী সাহায্য পেতেম। প্রথম সাম্রাজ্যের আমলে ফরাসীরা কতবার জার্ম্মানী জয় করেছে—তাই বৃদ্ধ আগু-থাক্‌তেই যুদ্ধের সব চাল জানত। 'এখন ওদের ঐখানে যাওয়া উচিত। এইবার ওরা এইরকম করবে'। তাঁর ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হচ্ছে দেখে' তার মনে মনে বেশ একটা গর্ব্ব হ'ত। দুর্ভাগ্যক্রমে, আমরা যতই নগর দখল করি বা কেন যুদ্ধে জয়লাভ করি না কেন—তাতে তার মন উঠ্‌ত না। তাঁকে আমরা নাগাল পেতাম না। তিনি আরও এগিয়ে যেতেন। তাঁর কিছুতেই মনস্তুষ্টি হ'ত না। প্রতিদিন মেয়েটি নূতন নূতন কাল্পনিক

জয়ের সংবাদ দিয়ে আমাকে অভিবাদন করত। একটা হৃদয়-বিদারক হাসির ভাব মুখে এনে, আমার সঙ্গে মিলিত হ'ত। আর, দরজার ভিতর থেকে আমি শুনতে পেতেম একজন হর্ষোৎফুল্ল-কণ্ঠে বল্‌ছে; "আমরা বেশ এগোচ্ছি, বেশ এগোচ্ছি। আর এক হপ্তার মধ্যে আমরা বার্লিনে প্রবেশ করব।"

"সেই সময় প্রুশীয়েরা আর বেশী দূরে নেই, এক হপ্তার মধ্যেই প্যারিতে এসে পড়্‌বে। প্রথমে আমরা মনে করলেম, এখান থেকে পল্লী-প্রদেশে চলে' যাওয়াই ভাল; কিন্তু এখান থেকে একবার বের হ'লেই, পল্লী-প্রদেশের অবস্থা দেখ্‌লেই আসল কথাটা প্রকাশ হ'য়ে পড়্‌বে। কিন্তু বৃদ্ধ এখনও এত দুর্ব্বল, যে আসল কথা জান্‌লে আর সহ্য করতে পারবে না। তাই, ঠিক্‌ হ'ল, এইখানেই থাকা হবে।

"অবরোধের প্রথম দিনে, আমার রোগীকে আমি দেখ্‌তে গেলাম।—আমার বেশ মনে পড়ে, আমি তখন চিন্তাকুল। প্যারির কটক বন্ধ হয়েছে, আমাদের প্রাকারের নীচেই যুদ্ধ চল্‌ছে, আমাদের সহরতলীগুলোই আমাদের প্রান্তসীমায় পরিণত হয়েছে—এই কথা জেনে আমার মন তখন অত্যন্ত ব্যথিত, তখন সকলেই এই ব্যথা তীব্ররূপে অনুভব করছিল।

"গিয়ে দেখি, বৃদ্ধ বেশ হর্ষোৎফুল্ল, গর্ব্বিত।" সে বল্‌লে :—

"অবরোধ ত আরম্ভ হয়েছে"

আমি হতবুদ্ধি হ'য়ে তার দিকে তাকালেম।

"তুমি কি করে' জান্‌লে, কর্নেল? তার পত্নী আমার দিকে ফিরে' বল্‌লে,—'হাঁ ডাক্তার, এটা একটা মস্ত খবর। বার্লিনের অবরোধ আরম্ভ হয়েছে'। তার ছুঁচটা টেনে নিয়ে, সে বেশ শান্ত-ভাবে এই কথা বল্‌লে। বৃদ্ধের মনে সন্দেহ কি করে' আসবে? বৃদ্ধ কামানের গর্জ্জনও শুনতে পায়নি, প্যারির এই রোষ-গম্ভীর ভাব ও বিশৃঙ্খল অবস্থাও দেখ্‌তে পায়নি। যা কিছু তার শয্যায় শুয়ে সে দেখতে পাচ্ছিল, তাতে তার বিভ্রমটা সমানই থেকে যাচ্ছিল। বাহিরে "বিজয়-তোরণ"; আর ঘরের ভিতর, "প্রথম-সাম্রাজ্যের" স্মৃত-সামগ্রীর বেশ একটা সংগ্রহ ছিল। ফরাসী-প্রধান সেনাপতিদের তসবির, যুদ্ধের খোদাই চিত্র, খোকার পোষাক-পরা রোম-নৃপতির ছবি; সম্রাটের স্মৃতিচিহ্ন, তাম্রমূর্ত্তি, কাচের কানসে ঢাকা "সেণ্ট্‌-হেলেনার" একটা পাথর—এইসব সামগ্রী। সরল প্রকৃতি কর্নেল! আমরা যাই বলি না কেন, প্রথম নেপোলিয়ানের এইসব বিজয় কীর্ত্তির মধ্যে থেকে, সরলভাবে সে বিশ্বাস করেছিল যে, বার্লিন অবরুদ্ধ হয়েছে।"

"সেইদিন থেকে, আমাদের সামরিক ব্যাপারগুলো অপেক্ষাকৃত অনেকটা সহজ হ'ল। এখন বার্লিন দখল করা কেবল ধৈর্য্য-সাপেক্ষ। যখন বৃদ্ধ অপেক্ষা করে'-করে' ক্লান্ত হ'য়ে পড়্‌ত, তখন মধ্যে-মধ্যে তার পুত্রের পত্র তাকে পড়ে' শোনানো হ'ত;—অবশ্য এ-সব পত্র কাল্পনিক; কেননা, তখন প্যারিসের ভিতর কিছুই প্রবেশ করতে পার্‌ত না। এবং "সেডান্‌"-এর পর, বৃদ্ধের পুত্র ম্যাক্‌-মেহনের পার্শ্বচর সেনাধ্যক্ষকে একটা জার্ম্মান-দুর্গে পাঠানো হয়েছে। মেয়েটির মনে তখন কি-রকম নৈরাশ্যের ভাব জাগ্‌ছিল তা বেশ কল্পনা করতে পার। বাপের কোন খবর পাচ্ছে না; বাপ বন্দী,—আরাম ও সুখের সামগ্রী হ'তে বঞ্চিত; হয়ত পীড়িত। তবু তাঁর মুখ দিয়ে, ক্ষুদ্র পত্রের আকারে, মিথ্যে করে' বলাতে হচ্ছে যে, তিনি বিজিত দেশে, ক্রমশঃই জয়ের পথে অগ্রসর হচ্ছেন। কখন কখন, যখন রোগী একটু বেশী দুর্ব্বল হ'য়ে পড়্‌ত তখন নূতন খবর আস্‌তে কত সপ্তাহ অতীত হ'য়ে যেত। কিন্তু যখন খুব উৎকণ্ঠিত হ'য়ে পড়্‌ত—নিদ্রা হ'ত না, তখন হঠাৎ জার্ম্মানী থেকে যেন একটা পত্র আস্‌ত; মেয়েটি সেই পত্র বৃদ্ধের শয্যার পাশে বসে' জোর করে' কান্না চেপে রেখে হর্ষোৎফুল্লভাবে পড়ে' শোনাতো। কর্নেল ভক্তিভাবে মনোযোগ দিয়ে শুন্‌ত; মুখে একটা গর্ব্বের হাসি,—কোন জায়গায় অনুমোদন করছে, কোন জায়গায় দোষ ধরছে, কোন জায়গায় ব্যাখ্যা করছে। তার সব চেয়ে গুণপনা দেখা যেত, পুত্রকে যখন সে উত্তর দিত। বৃদ্ধ লিখ্‌ত :—'তুমি যে একজন ফরাসী, একথা কখনো ভুল্‌বে না'; 'ঐসব হতভাগা লোকদের প্রতি উদার হবে'। এই আক্রমণটা তাদের পক্ষে যেন বেশী কঠোর না হয়। পরামর্শের আর অন্ত ছিল না; সম্পত্তির প্রতি সম্মান দেখানো-সম্বন্ধে, মহিলাদের প্রতি শিষ্টাচার-সম্বন্ধে কতই উপদেশ—এক কথায় বৃদ্ধ যেন বিজয়ীদের ব্যবহারের জন্য একটা সামরিক ধর্ম্ম-সংহিতা রচনা করছিল। এইসবের মধ্যে আবার পলিটিক্‌সের কথাও থাক্‌ত—বিজিতের উপর সন্ধির সর্ত্ত কিরকম চাপাতে হবে, সে কথাও থাক্‌ত। একথা স্বীকার করতেই হবে, বৃদ্ধ বিজিতদের কাছে থেকে বেশী কিছু দাবী করেনি।"

"যুদ্ধের ক্ষতি-পূরণের অর্থদণ্ড, তা ছাড়া আর কিছু নয়; দেশ দখল করায় কোন লাভ নেই। তুমি কি জার্ম্মানীকে কখনো ফ্রান্সে পরিণত করতে পার?"

"বৃদ্ধ এই উত্তর লেখাবার সময় এরূপ দৃঢ়স্বরে, এরূপ দেশভক্তি-ব্যঞ্জক বিশ্বাসের সহিত কথাগুলো বলে' যেত যে, কাহারো পক্ষে অবিচলিত-চিত্তে তা শোনা অসম্ভব।

"ইতিমধ্যে অবরোধের কাজ চল্‌তে লাগল—অবশ্য বার্লিনের অবরোধ নয়। হায়! এইসময় শীত, গোলাবর্ষণ, মারী, দুর্ভিক্ষ চরমে উঠেছিল। অবস্থা যতদূর খারাপ হবার তা হয়েছিল। কিন্তু আমাদের যত্নের গুণে এবং গৃহ-পরিজনের অশ্রান্ত সেবার গুণে, বৃদ্ধের শান্তি একমুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত হয়নি। শেষ পর্য্যন্ত আমি তার জন্য—একমাত্র তারই জন্য সাদা রুটি, ও টাট্‌কা মাংস যুগিয়েছিলেম। বৃদ্ধের প্রাতর্ভোজনটা যারপরনাই মর্ম্মস্পর্শী। পিতামহ নিরীহ গর্ব্বে গর্ব্বিত; মুখে তাজা ভাব, ও হাস্যবদন। শয্যার উপর উঠে বসেছে, থুঁতির নীচে 'ন্যাপ্‌কিন্‌' বাঁধা; শয্যার পাশে, তার নাত্নী অভাব ও অনশনে পাণ্ডুবর্ণ,—বৃদ্ধের হাতটা ধরে' মুখের দিকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, এবং সকলরকম রুচিকর নিষিদ্ধ জিনিসের আহারে সাহায্য করছে। বৃদ্ধ খেয়ে দেয়ে একটু চাঙ্গা হ'য়ে উঠে' নিজের গরম ঘরটিতে বেশ একটু আরাম উপভোগ করছে। ঘরের ভিতর শীতের বাতাস প্রবেশ করতে পারছে না—কেবল জানালার কাছে তুষারের ঘূর্ণিপাক চলেছে। এই সময়ে কবচ-ধারী অশ্বারোহী বৃদ্ধ উত্তর য়ুরোপের যুদ্ধ-কাহিনী বল্‌তে ভালবাস্‌ত। রুশিয়ার যুদ্ধে সেই সর্ব্বনেশে পশ্চাদ্‌গমনের বর্ণনা করত—যাত্রা-পথে বরফে-জমা বিস্কুট ও ঘোড়ার মাংস ছাড়া আর খাদ্য-দ্রব্য কিছুই পাওয়া যেত না।'

'বুঝিছিস বুড়ি, আমরা ঘোড়া খেতেম'!

"মেয়েটি খুবই বুঝতে পেরেছিল। কেননা, এই দুই মাস কাল সে ঘোড়ার মাংস ছাড়া আর কিছুই খায়নি। বৃদ্ধ যেমন একটু সেরে উঠতে লাগ্‌ল—আমাদের কাজটাও প্রতিদিন কঠিন হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। তখন কর্নেলের ইন্দ্রিয় ও অঙ্গাদির অসাড়তা—যারদরুন্‌ আমাদের একটু সুবিধা হয়েছিল—ক্রমশঃ অন্তর্হিত হ'তে আরম্ভ করেছে। এরই মধ্যে, দুই-একবার পোর্ত্ মেলোর কামানের ভীষণ গর্জ্জনে বৃদ্ধ চমকে উঠেছিল এবং যুদ্ধের ঘোড়ার মতো কান খাড়া করেছিল। কাজেই বাধ্য হ'য়ে একটা কথা আমাদের বানিয়ে বল্‌তে হ'ল—আমরা তাকে বল্লেম, বার্লিনের সম্মুখে যুদ্ধে আমাদের জয় হওয়ায় তারই সম্মানার্থ "অ্যাঁভালিড্‌" হ'তে তোপ-ধ্বনি হচ্ছে। আর-এক দিন তার শয্যাটা

জানালার কাছে সরিয়ে আনা হয়েছিল—সেই সময় ন্যাশনাল গার্ড্-এর একদল সৈন্য, "বড়-বাহিনী-বীথির" পথে একত্র জড়ো হয়েছিল। দেখা গেল, বৃদ্ধ ঐ সৈন্য দেখে' খুঁৎ-খুঁৎ করছে। —জিজ্ঞাসা কর্‌লে :—'

"ঐ ওরা কোন্ সৈন্য?—ওদের অঙ্গচালনার শিক্ষা মোটেই ভাল হয়নি—কুশিক্ষা, কুশিক্ষা—"

"এর খারাপ ফল কিছুই হ'ল না। কিন্তু আমরা বুঝ্‌তে পারলেম এখন থেকে আরো একটু সাবধান হওয়া আবশ্যক। কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে আমরা যথেষ্ট সাবধান হ'তে পারিনি।"

"একদিন রাত্রে দেখ্‌লেম, মেয়েটির খুব ভাবনা হয়েছে।" সে বল্‌লে :—

"কাল ওরা প্রবেশ কর্‌বে"।

পিতামহের ঘরের দরজাটা কি খোলা ছিল? এখন আমার মনে হচ্ছে, সমস্ত রাত্রি তাঁর মুখে একটা অদ্ভুত ভাব লক্ষ্য করেছিলেম। বোধ হয়, আমাদের কথাগুলো তাঁর কাণে গিয়েছিল। আমরা প্রুশীয়দের কথা বল্‌ছিলেম, কিন্তু তিনি মনে করেছিলেন আমরা ফরাসীদের কথা বল্‌ছি; এত দিন তিনি যে আশা কর্‌ছিলেন,—মার্শাল মাক্-মাহন পুষ্প-বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে, তুরী-নাদের ভিতর দিয়ে, নগর প্রবেশ কর্‌ছেন—আর মার্শালের পার্শ্বচর তাঁর পুত্র, মার্শালের পাশে পাশে অশ্বপৃষ্ঠে আস্‌ছে। তাই আজ দেখ্‌তে পাবেন বলে' তিনি তাঁর উর্দ্দি পোষাক পরে', বারুদ-কালিমায় মলিন নিশান ও ঈগল-পতাকাকে অভিবাদন কর্‌বার জন্য জান্‌লার বারাণ্ডায় বস্‌বেন মনে করেছেন।

বেচারা কর্নেল জুভ! বৃদ্ধ নিশ্চয়ই মনে করেছিল, মনের আবেগ পাছে তার অসহ্য হয়, এইজন্য আমরা তাকে বাধা দেব। তাই তার মনোগত অভিপ্রায় আমাদের কাছে প্রকাশ করেনি। কিন্তু তার পরদিন পোর্ত্ মেলোত্ থেকে তুইলরি পর্য্যন্ত যে লম্বা রাস্তা গেছে সেই রাস্তা দিয়ে প্রুশীয় সৈন্য যখন অতি সাবধানে যাত্রা করছিল, ঠিক সেই সময় দেখা গেল, জান্‌লাটি আস্তে আস্তে খুলে' গেল—মাথায় শিরস্ত্রাণ পরে', কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে' বৃদ্ধ বারাণ্ডায় এসে দাঁড়াল।

অনেক সময় আমি মনে মনে ভেবেছি, এইরকম সামরিক সাজ-সজ্জায় ভূষিত হ'য়ে খাড়া হ'য়ে উঠ্‌তে তার না জানি কতটা ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করতে হয়েছিল, তার এই ক্ষীণ অবস্থায়, কি প্রচণ্ড আকস্মিক আবেগ না জানি তাকে পরিচালিত করেছিল। এই পর্য্যন্ত আমরা জানি, বৃদ্ধ গরাদে ধরে' চুপ করে' দাঁড়িয়ে আছে—কেবল তার আশ্চর্য্য মনে হচ্ছে—কেন রাস্তাটা এত নিস্তব্ধ, কেন সব গবাক্ষ বন্ধ; প্যারি যেন একটা কুষ্ঠরোগীর আশ্রম; সর্ব্বত্রই পতাকা—কিন্তু অপরিচিত বিদেশী পতাকা; লাল 'ক্রস'-অঙ্কিত সাদা রঙের পতাকা। আমাদের সৈনিকদের দেখ্‌বার জন্য কেউ আসেনি।

"মুহূর্ত্তের জন্য তার মনে হয়েছিল, হয়ত তার ভুল হয়েছে।"

"কিন্তু না! ঐখানে, "বিজয়-তোরণের" পিছনে একটা তুমুল শব্দ, দিবালোকের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটা কৃষ্ণ রেখা—তার পর ক্রমশঃ শিরস্ত্রাণের শলাকাগুলো ঝিক্‌মিক্ করে' উঠ্‌ল, তলোয়ারগুলো ঝন্‌ঝন্ করে' উঠ্‌ল, তার পর শুবেয়ার-রচিত গগনভেদী বিজয়-সঙ্গীত বেজে উঠ্‌ল।"

রাজপথের সেই মৃতবৎ নিস্তব্ধতার মধ্যে একটা চীৎকার—একটা ভীষণ চীৎকার শোনা গেল :—

"সবাই অস্ত্র ধর—অস্ত্র ধর—প্রুশীয়েরা এসেছে"। অগ্রগামী সৈন্য-দলের ৪জন অশ্বারোহী বোধ হয় দেখে' থাকবে—ঐ উপরের বারাণ্ডা থেকে একজন দীর্ঘকায় বৃদ্ধ টল্‌তে-টল্‌তে, হাত দোলাতে-দোলাতে নীচে পড়ে' গেল। এইবার কর্নেল জুভ গতপ্রাণ।"

—আল্‌ফঁস্ দোদের ফরাসী হইতে

স্পর্শমণি

শ্রী কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি-এস্‌সি (লণ্ডন), এ-আর্-সি-এস্ (লণ্ডন)

এপর্য্যন্ত যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে ধাতুসকলের সংস্থান বা আভ্যন্তরীণ গঠন সম্বন্ধে প্রাচীনগণের কি-কি মত বা বিশ্বাস ছিল, তাহা, আশা করি, অনেক-খানি প্রকাশ পাইয়াছে।

প্রাচীনগণ, কি এই দেশে, কি বিদেশে, সর্ব্বত্রই এবিষয়ে একমত ছিলেন, যে, ধাতুসকল বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ নহে। বরঞ্চ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই মত প্রবল ছিল, যে, ধাতুসকল, অন্যান্য সৃষ্ট পদার্থের ন্যায়, কতিপয় মৌলিক পদার্থের বিবিধ বিন্যাসের দ্বারা গঠিত হয়। বিশেষ বিশেষ ধাতুর স্বভাব ও গুণ ভিন্ন-ভিন্ন হইবার কারণ, ধাতুমধ্যে এই মৌলিক পদার্থগুলির পরিমাণভেদ এবং শুদ্ধতার তারতম্য।

যাহা যৌগিক পদার্থ, তাহার উপাদানসকল পাইলে, তাহা কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করা যায়। কেবলমাত্র বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণ স্থির করাই প্রয়োজন। সুতরাং যদি স্বর্ণ যৌগিক পদার্থ হয় এবং তাহার

উপাদান কি কি মৌলিক পদার্থ ও সেই সকল মৌলিক উপাদান কি কি পরিমাণে যোগ করিলে স্বর্ণ গঠিত হইতে পারে তাহাও জ্ঞাত হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞ রাসায়নিকের পক্ষে স্বর্ণ প্রস্তুত-করণ কিছুই আশ্চর্য্য নহে। একমাত্র সমস্যা উপাদান-সংগ্রহ।

উপাদান সম্বন্ধে "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।" নানা দার্শনিক নানা মতপ্রকাশ করিয়াছেন। কেহ বা স্বর্ণকে স্বল্পক্ষিতি-মিশ্রিত জ্যোতিরাশি বলিয়াছেন (কণাদ), কেহ বা ইহাকে পারদ ও গন্ধকের সার পদার্থ-দ্বয়ের যৌগিক পদার্থ বলিয়াছেন (গেবর), এবং অন্য অনেকে বিভিন্ন মতবাদ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু এক বিষয়ে প্রায় সকল প্রাচীন দার্শনিক একমত। "সকল ধাতুর উপাদান একইপ্রকার, কেবল অনুপাত ও উপাদানের শুদ্ধতার প্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন ধাতু হয়; সুতরাং যে-কোন ধাতুর মধ্যেই স্বর্ণের সকল উপাদান বিদ্যমান আছে।" এই মত প্রায় খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সর্ব্বদেশে বর্ত্তমান ছিল।

উপরোক্ত মতাবলম্বীগণ স্বর্ণ প্রস্তুত করণের উপায় এইরূপ সাব্যস্ত করেন। যথা—প্রথমে যে হীন ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করা হইবে, তাহার শোধন প্রয়োজন। কেনন', উপাদান সকল অশুদ্ধ বা দুষ্ট হইলে তাহা দ্বারা স্বর্ণের ন্যায় শুদ্ধ পদার্থ প্রস্তুত হওয়া অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, শোধিত ধাতুর সহিত অন্য পদার্থাদি যোগ করা প্রয়োজন। কেননা, হীন ধাতুর মধ্যে মৌলিক উপাদান-সকল যে অনুপাতে থাকে, স্বর্ণ-মধ্যে সে-সকলের অনুপাত ভিন্ন। সুতরাং যে মৌলিক উপাদানের পরিমাণ-বর্দ্ধন প্রয়োজন, সেই উপাদান যদি শুদ্ধ মৌলিক অবস্থায় না পাওয়া যায়, তাহা হইলে এরূপ কোন বস্তু আবশ্যক যাহাতে ঐ উপাদান শুদ্ধাবস্থায় প্রচুর-পরিমাণে আছে।

এই শোধন-প্রণালী নানা দেশে ও নানা দার্শনিকের মতে ভিন্ন-ভিন্নপ্রকার ছিল। পাশ্চাত্য দেশে শোধক পদার্থাদি "ঔষধ" নামে অভিহিত ছিল এবং প্রধান ঔষধ "দার্শনিকের প্রস্তর" বা স্পর্শমণি নামে পরিচিত ছিল।

স্পর্শমণি সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ প্রাচীন হিন্দু রাসায়নিক পুস্তকে পাওয়া যায় না। হিন্দু রাসায়নিকদিগের বিশ্বাস-মতে নানাপ্রকার বিভিন্ন পদার্থের দ্বারা হীন ধাতু শোধন এবং স্বর্ণ প্রস্তুত-করণ সম্ভব। "কোটিবেধ-মহারসঃ", নাগার্জ্জুন উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহা কি, সে-বিষয়ে কিছুই বলেন নাই। বরঞ্চ স্বর্ণ প্রস্তুত-করণের নানাপ্রকার বিভিন্ন উপায় বলিয়া গিয়াছেন।

যথা :—

> কিমত্র চিত্রং যদি রাজবর্ত্তকং
> শিরীষপুষ্পাগ্ররসেন ভাবিতম্
> সিতং সুবর্ণং তরুণার্কসন্নিভং
> করোতি গুঞ্জাশতমেকগুঞ্জয়া।
>
> (রসরত্নাকর—নাগার্জ্জুন)

"রাজাবর্ত্ত শিরীষপুষ্পাগ্ররসে সিদ্ধ হইলে উহা একগুঞ্জ-পরিমাণ রৌপ্যকে শতগুঞ্জ-পরিমাণ তরুণঅরুণসন্নিভ স্বর্ণে পরিণত করিবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি?"

> কিমত্র চিত্রং যদি পীতগন্ধকঃ
> পলাশনির্য্যাসরসেন শোধিতঃ
> আরণ্যকৈরুৎপলকৈস্তু পাচিতঃ
> করোতি তারং ত্রিপুটেন কাঞ্চনম্।
>
> (রসরত্নাকর—নাগার্জ্জুন)

"পীত গন্ধক পলাশনির্য্যাস দ্বারা শোধিত হইলে এবং আরণ্যক উৎপল সহিত পাচিত হইলে তিনবার পুটপাকে রৌপ্যকে সুবর্ণে পরিণত করিবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি?"

তান্ত্রিক পারদ-রাসায়নিকেরা পারদের মারণ এবং শোধন দ্বারা স্বর্ণ প্রস্তুত-করণের ঔষধ প্রস্তুত করিতেন। যথা—

> বজ্রদণ্ডঃ সুদণ্ডশ্চ লোহদণ্ডস্তথৈবচ।
> ত্রয়ো বিনা ওষধয়ে রসস্য মারণে হিতা।
> তান্নিবোধ সমাসেন যথা জানংতি সাধকাঃ
> বজ্রদণ্ডস্তু বজ্রী স্যাৎ লোহদণ্ডং পুটং বিড়ঃ।
> সুদণ্ডং ব্রহ্মদণ্ডং চ সমাসাৎ কীর্ত্তিতং তব।
> গ্রাহয়েত্তং সমাসেন সাধকো হৃষ্টমানসঃ॥

তদ্রসং রসসংযুক্তং একীকৃতং তু মর্দয়েৎ ॥
অন্ধমূষাগতং ধ্মাতং রসং ম্রিয়েত তৎক্ষণাৎ
সহস্রবেধী কর্ত্তা চ জায়তে স মহারসঃ।
মূষাং সংলেপয়েৎ তেন পুবাগৃহ্য মহৌষধীঃ ॥
(কাকচণ্ডেশ্বরীমত তন্ত্র)

"বজ্রদণ্ড, সুদণ্ড, লৌহদণ্ড, ব্রহ্মদণ্ড, পুট দ্বারা বিড় করিবে। উহার রসের সহিত পারদ সংযোগ করিয়া মর্দ্দন করিবে। তৎপরে বদ্ধমূষাযন্ত্রে (মুচি) স্থাপন করিয়া পাক করিলে পারদের মারণ ক্ষণমধ্যেই হয়। এই পারদ এক্ষণে মহারস সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। ইহা সহস্রবেধী অর্থাৎ সহস্রগুণ হীন ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করিতে পারে।"

অন্যান্য হিন্দু রসায়ন-সংক্রান্ত পুস্তকে পারদের ঐ গুণ সম্বন্ধে যথেষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় যথা—

চতুঃ যষ্ঠং শতো বীজপ্রক্ষেপো মুখমুচ্যতে।
এবঙ্কতে রসো গ্রাসলোলুপো মুখবান্ ভবেৎ ॥
মুখস্থিতরসেনাল্পলোহস্য দমনাৎ খলু।
স্বর্ণরূপ্যত্ব জননং শব্দবেধঃ স কীর্ত্তিতঃ ॥ (রসরত্নসমুচ্চয়)

"চতুঃষষ্ঠাংশ বীজ প্রক্ষেপকে মুখ বলে। এরূপ করিলে পারদ গ্রাসলোলুপ মুখযুক্ত হয়। এইরূপ মুখযুক্ত পারদের সাহায্যে অল্পপরিমাণ ধাতুকে রৌপ্যে বা স্বর্ণে পরিণত করাকে শব্দবেধ বলে।"

একবিষয়ে সর্ব্ব-দেশেই একমত ছিল। তাহা পারদের অলৌকিক গুণ সম্বন্ধে। এদেশে বহু রাসায়নিক পারদের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্য প্রাচীন রাসায়নিক-গণও পারদের গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন। নাগার্জ্জুন তাঁহার রস-রত্নাকরে বলিয়া গিয়াছেন—

রসং হেমসমং মর্দ্দ্যং পীঠিকা গিরিগন্ধকম্।
দ্বিপদীরজনীরস্তাং মর্দয়েৎ টঙ্কণান্বিতাম্ ॥
নষ্টপিষ্টক মুক্তক অন্ধমূষ্যাং নিধাপয়েৎ।
তুষাল্পলঘুপুটং দত্বা যাবৎ ভস্মত্বমাগতঃ ॥
ভক্ষণাৎসাধকেন্দ্রস্তু দিব্যদেহমবাপ্নুয়াৎ ॥

"সমপরিমাণ স্বর্ণ পারদের সহিত মর্দ্দন করিবে। পরে গিরিগন্ধক, সোহাগা ইত্যাদির সহিত মর্দ্দন করিবে। এইরূপে নষ্ট পিষ্ট পারদকে মূষাযন্ত্রে (মুচিতে) আবদ্ধ করিয়া তুষানলে লঘু পুটপাক করিবে, যতক্ষণে ইহা ভস্মে পরিণত হয় তৎপর্য্যন্ত। এই ঔষধ ভক্ষণ করিলে দিব্যদেহ (জরা মৃত্যুর অতীত) প্রাপ্তি হয়।"

অন্যদিকে গন্ধক সম্বন্ধেও এইরূপ বিশ্বাস অনেকস্থলে পাওয়া যায়। প্রাচীন পাশ্চাত্য রাসায়নিকদিগের বিশ্বাস ছিল, যে, পারদের আত্মার সহিত গন্ধকের আত্মার যোগে সর্ব্বধাতু উৎপন্ন হয়। এই গন্ধকের আত্মাকেই প্রাচীন পাশ্চাত্য রাসায়নিকগণ দার্শনিকের প্রস্তর বা স্পর্শমণি নামে অভিহিত করিতেন।

স্পর্শমণির অলৌকিক গুণ সম্বন্ধে বিশ্বাসের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। স্বর্ণ প্রস্তুত-করণ ভিন্ন ইহার অন্য ব্যবহার ছিল জীবদেহ জরাব্যাধি হইতে মুক্ত করায়। খৃঃ চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে অনেক চিকিৎসক স্বাস্থ্যরক্ষা ও দীর্ঘজীবন লাভের ঔষধ হিসাবে স্পর্শমণি প্রয়োগের ব্যবস্থা দিতেন! "রৌপ্যপাত্রে উত্তম শ্বেতবর্ণ সুরা অনুপানে এক-গ্রেণ-পরিমাণ স্পর্শমণি দ্রবীভূত করিবে এবং দ্বিপ্রহর রাত্রিতে তাহা পান করিবে।" এইরূপ ব্যবস্থা এক প্রাচীন চিকিৎসা-শাস্ত্র গ্রন্থে পাওয়া যায়।

স্পর্শমণির ব্যবহার সকলেই জ্ঞাত ছিলেন। কিন্তু কি উপায়ে ইহা লাভ করা যায়, সে-সম্বন্ধে মতভেদ যথেষ্টই ছিল। কাহারও মতে ইহা দৈব উপায় ভিন্ন পাওয়া অসম্ভব; আবার কেহ কেহ ইহা প্রস্তুত-করণের উপায় জানেন, একথাও বলিয়া গিয়াছেন। তবে প্রস্তুত-করণের উপায় অতি অদ্ভুত কূট সাঙ্কেতিকভাবেই লিখিত হইত। যেমন একজন নিম্নলিখিত ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

"পারদ বন্ধনের প্রথা—কতিপয় দ্রব্যমধ্যে, এইসকল গ্রহণ কর। যথা ২, ৩ এবং ৩, ১; ১ এর প্রতি ৩, ৪ হয়; ৩, ২ এবং ১। ৪ এবং ৩ মধ্যে আছে ১; ৩ হইতে ৪ হয় ১; তৎপরে ১ এবং ১, ৩ এবং ৪; ১ হইতে ৩ হয় ২। ২ এবং ৩ মধ্যে আছে ১, ৩ এবং ২ মধ্যে ১। ১, ১, ১, এবং ১, ২, ২, এবং ১, ১ এবং ১এর প্রতি ২। তৎপরে ১ হয় ১। তোমাকে সমস্তই বলিলাম।"

ফলাফল যাহাই হউক, এই স্পর্শমণির অন্বেষণ ও অমরত্বের ঔষধের অন্বেষণের গণ্ডীর মধ্যে রসায়ন শাস্ত্র বহুকাল আবদ্ধ ছিল। ইয়োরোপে ১৪৯৩ খৃঃ প্যারা-

সেল্‌সস্‌ নামে এক মহাপণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই প্রথমে রসায়ন-চর্চ্চার গতি অন্যদিকে প্রবাহিত করেন। ইঁহার মতে রসায়নের উদ্দেশ্য জীবনরহস্য উদ্‌ঘাটন এবং জীবনক্রিয়া-সংক্রান্ত ঘটনাবলীর পর্য্যবেক্ষণ। ইঁহার পর হইতে রাসায়নিকগণ স্বর্ণ ও অমরত্ব লাভের চেষ্টা ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্যেও রসায়ন-চর্চ্চা করেন।

কিন্তু স্পর্শমণির অন্বেষণ ও স্বর্ণ প্রস্তুত-করণের চেষ্টা এইখানেই ক্ষান্ত হয় নাই। প্যারাসেল্‌সসের বহুকাল পরেও এই চেষ্টা প্রকাশ্যভাবে চলে। ১৭৮২ খৃঃ ইংলণ্ডে ডাক্তার জেমস্‌ প্রাইস্‌ নামে রয়েল সোসাইটির এক সভ্য (F.R.S.) শ্বেত ও রক্তবর্ণ দুই পদার্থ তাঁহার আবিষ্কার বলিয়া প্রচার করেন এবং এইরূপ বলেন যে, ঐ পদার্থ-দ্বয়ের দ্বারা তিনি পঞ্চাশ বা ষাট গুণ পারদকে স্বর্ণ ও রৌপ্যে পরিণত করিতে পারেন। শোনা যায় যে, তাঁহার প্রস্তুত স্বর্ণ রাসায়নিক পরীক্ষায় বিশুদ্ধ স্বর্ণ বলিয়াই প্রমাণিত হয়। কিন্তু পরবর্ত্তী সালে তাঁহাকে পুনরায় এইরূপ স্বর্ণ প্রস্তুত করিতে বলা হয়। তিনি অকৃতকার্য্য হইয়া আত্মহত্যা করেন। আমাদের দেশে অতি অল্পদিন পূর্ব্বে হায়দরাবাদে বিজ্ঞানাচার্য্য অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় একজন পণ্ডিত রাসায়নিক ছিলেন। তিনি এইরূপে স্বর্ণ প্রস্তুত-করণ সম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং কিম্বদন্তী এই, যে, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেই এই চেষ্টায় সফলকাম হইয়াছিলেন। কিন্তু এই কিংবদন্তীর সত্যাসত্য সম্বন্ধে কোনওরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

কৃত্রিম উপায়ে ধাতু সংগঠন, পদার্থ বিজ্ঞান, পরমাণু-বাদ ইত্যাদিতে নানা মতভেদ খৃঃ ১৮শ শতাব্দী পর্য্যন্ত চলে। আরিষ্টটল্‌ও প্রাচীন আরবদিগের মতই নানা রূপে ও বেশে এইসকল মতবাদের প্রাণ দিলেন। খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে এক ফরাসী বৈজ্ঞানিক এইসকল মতবাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান "ফ্লজিষ্টন্‌ মত"কে ভ্রমাত্মক বলিয়া অকাট্যভাবে প্রমাণ করিয়া আধুনিক রসায়নের জন্মদান করেন। এই মহাপুরুষের নাম আঁতোয়ান্‌ ল্যর‍্যা লাভোয়াজিয়ে। ফ্রান্সের পারি নগরে ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কোনও নূতন পদার্থের আবিষ্কার করেন নাই। কিন্তু অনেক রাসায়নিক পদার্থ- ও ক্রিয়া-সম্বন্ধে নির্ভুল ব্যাখ্যা ইঁহা দ্বারাই হয়। বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন বায়ুর প্রকৃতি ইনিই প্রথম নির্ভুলভাবে বিচার করেন। দাহ্য বস্তুসকলে দাহক্রিয়া কিপ্রকারে সম্পন্ন হয়, তাহারও ইনিই প্রথমে সঠিক ব্যাখ্যা করেন। ইঁহার আবিষ্কৃত তথ্য লইয়া ইনি, ব্যর্‌তোলে (Berthollet). ফ্যর্‌ক্রয় ও আরও কয়েকজন নব্য রাসায়নিক রসায়ন শাস্ত্রের পুনর্গঠন-সম্পাদনে প্রবৃত্ত হন। ইঁহাদের ও ইঁহাদের পরবর্ত্তী রাসায়নিকগণের কার্য্যের ফলে পদার্থের

পারিনগরের সোর্‌বন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে
লাভোয়াজিয়ে এবং ব্যর্‌তোলে

সংস্থান সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জগতের মত পরিবর্ত্তন হয় এবং ধাতুসকল মৌলিক পদার্থ বলিয়া জ্ঞাত হয়। এই নূতন মতবাদ, বিশেষে পরমাণুবাদ, জন ডাল্টন নামক এক ইংরেজ বৈজ্ঞানিকের নামের সহিত বিশেষভাবে বিজড়িত। ইনি ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন। এইসকল মতের প্রবর্ত্তনের ফলে স্পর্শমণির অন্বেষণ বিজ্ঞান-রাজ্য হইতে লোপ পায়।

লাভোয়াজিয়ে ফরাসী বিপ্লবে প্রাণ হারান। তিনি রাজকর বিভাগে ইজারাদার ছিলেন। এই দোষে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়। কফিন্‌হল্‌ নামক বিপ্লববাদী

মূর্খ বিচারক ইহাকে দণ্ড দিবার সময় বলে "রাষ্ট্রের জ্ঞানী লোকের প্রয়োজন নাই।" এইরূপে আধুনিক রসায়নের জন্মদাতার অমূল্য জীবন ৫১ বৎসর বয়সেই নষ্ট হয়।

কৃত্রিম উপায়ে স্বর্ণ প্রস্তুত-করণ সম্ভব কি না, এইপ্রশ্ন শতাধিক বৎসর পরে পুনরুত্থাপিত হইয়াছে। তাহার কারণ, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে (১৯০৯ খ্রীঃ) রদার্‌ফোর্ড নামক ইংরেজ বৈজ্ঞানিকের অতি সূক্ষ্ম পরীক্ষায় ইহা প্রমাণিত হয়, যে, রেডিয়ম্ ধাতু হইতে হিলিয়ম্ নামক মৌলিক বায়ু উৎপন্ন হয়। ইহা সকল বৈজ্ঞানিকের জ্ঞাত, যে, রেডিয়ম্ ও হিলিয়ম্ উভয়ই মৌলিক পদার্থ। সুতরাং এক মৌলিক পদার্থ হইতে অন্য মৌলিক পদার্থ উৎপাদন সম্ভব বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। তাহা যদি সম্ভব হয়, তবে অন্য ধাতু হইতে স্বর্ণ উৎপাদন কেন অসম্ভব হইবে? রেডিয়ম্ হইতে আরও অনেক পদার্থ উৎপন্ন হয়। এই পদার্থগুলি রেডিয়মের সহিত অন্য কোন পদার্থের যোগে উৎপন্ন হয় না। অর্থাৎ সাধারণতঃ যেরূপে ধাতু হইতে অন্য মৌলিক পদার্থ সহযোগে যৌগিক পদার্থ সংগঠিত হয়, ইহা সেপ্রকার প্রক্রিয়া নহে। রেডিয়ম্ ধাতুর পরমাণু হইতে তেজ নিষ্ক্রমণ ক্রমাগত হইতে থাকে এবং তৎসঙ্গে পরমাণুর ভগ্নাংশও নিষ্ক্রান্ত হয়। এতৎসংক্রান্ত ভৌতিক ঘটনা অতীব আশ্চর্য্য এবং বিজ্ঞানের অনেক ধারণার মূলে ইহা দ্বারা আঘাত প্রদত্ত হইয়াছে।

ধাতু হইতে তেজনিষ্ক্রমণ-সংক্রান্ত ব্যাপার অনেক দিন হইতেই বৈজ্ঞানিকদিগের চক্ষুগোচর হয়। যেসব ঘটনায় এবিষয়ে বৈজ্ঞানিকদিগের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়, সংক্ষেপে তাহা বলিতেছি।

বায়ুমধ্যে বিদ্যুতের চলাচল অতি কঠিন, কেননা বায়ু অতি নিকৃষ্ট চালক (conductor)। কিন্তু যদি কোন সম্পূর্ণভাবে বদ্ধ কাচ-পাত্রের দুইদিকে দুইটি এলুমিনিয়ম্ নির্ম্মিত বিদ্যুৎমার্গ যোজনা করা হয়, এবং তাহা হইতে বায়ু নিষ্কাশন করা হয়, তাহা হইলে বিদ্যুতের গতি ক্রমেই সহজ হইয়া আসে, ইহা দেখা যায়। প্রথমে ৩০০০০ ভোল্ট্ বৈদ্যুতিক চাপ প্রয়োজন হয় এবং তাহার সাহায্যে অতি ক্ষীণ বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ এক বিদ্যুৎমার্গ (electrode) হইতে অন্যে গমন করে। বায়ুচাপ নিষ্কাশন দ্বারা কমাইলেই ক্রমে স্ফুলিঙ্গসকল পুষ্ট এবং বিদ্যুৎচলাচল স্থিরভাবে হয়। অবশেষে পাত্র প্রায় বায়ুশূন্য হইলে পাত্র অন্ধকার হইয়া আসে, কিন্তু পাত্রের বহির্গাত্র জ্যোতি-ঝলকে পূর্ণ হইয়া আসে। এই অবস্থায় কাচ-পাত্রের অভ্যন্তরে "ক্যাথোড্ রশ্মি" নামক জ্যোতি-রশ্মি উৎপন্ন হয়। ইহার বহু গুণাবলী-সম্বন্ধে এই প্রবন্ধ মধ্যে সম্যক্ বর্ণনা অসম্ভব। তবে ইহার একটি বিশেষ গুণ দৃষ্ট হয়। অন্য সকল ক্ষেত্রেই তেজ বা জ্যোতির রশ্মি অশরীরী বলিয়া জ্ঞাত, অর্থাৎ তেজ-রশ্মির গুরুত্ব ইত্যাদি পদার্থগুণ নাই, কিন্তু "ক্যাথোড্" রশ্মির তাহা আছে। কেননা ইহা চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় এবং ইহার পথে কোনও বস্তু থাকিলে তাহার উপর আঘাত পড়ে। কাচ-পাত্রের বহির্গাত্র জ্যোতি-ঝলসিত হইলে এই গাত্র হইতে একপ্রকার অদৃশ্য রশ্মি পাত্রের বহির্মুখে ধাবিত হয়। ইহাই প্রসিদ্ধ "রণ্ট্‌গেন রশ্মি" বা 'এক্স-রে' (X Ray)। ১৮৯৫ খৃঃ রণ্ট্‌গেন 'এক্স-রে' আবিষ্কার করেন। ১৮৯৬ খৃঃ বেক্‌রেল নামক ফরাসী বৈজ্ঞানিক ইহা প্রমাণ করেন, যে, কতকগুলি স্বাভাবিক পদার্থ, যাহা হইতে স্বভাবতঃই জ্যোতিঝলক নিষ্ক্রান্ত হয়, এইপ্রকার অদৃশ্য রশ্মি (রণ্ট্‌গেন রশ্মির ন্যায়) প্রদান করে। এই গুণ-সম্পন্ন পদার্থসকলকে তেজ-বিকিরক পদার্থ (Radioactive) বলে। তেজবিকিরক পদার্থ হইতে বিদ্যুৎপূর্ণ তেজোময়-পরমাণু অপেক্ষা সূক্ষ্ম তন্মাত্র সর্ব্বদা নির্গত হয়; এবং এইরূপ প্রত্যেক পদার্থ, নির্দ্দিষ্ট-পরিমাণ তেজ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দান করে।

পূর্ব্বে ইউরেনিয়ম্ এবং থোরিয়ম্ এই দুই ধাতুতে ও তাহাদের যৌগিক পদার্থে এইসকল গুণ লক্ষিত হয়; এবং এই দুই পদার্থের তেজ বিকিরণের পরিমাপ অতি সূক্ষ্মভাবে গ্রহণ করা হয়।

১৮৯৭ খৃঃ ম্যাদাম কুরি নামক ফ্রান্সবাসিনী পোল-জাতীয়া এক মহিলা-বৈজ্ঞানিক ইহা লক্ষ্য করেন,

ম্যাদাম্ কুরি

"ইমানেশন্"-নিষ্কাশন যন্ত্র

যে, খনিতে-প্রাপ্ত কয়েকপ্রকার অসংস্কৃত ইউরেনিয়ম্ বিশুদ্ধ ইউরেনিয়ম্ অপেক্ষা বহু অধিক পরিমাণে তেজ বিকিরণ করে। ইহাতে তাঁহার সন্দেহ হয়, যে, ঐ-প্রকার খনিজ (পিচ্-ব্লেণ্ড নামক খনিজ)-মধ্যে ইউরেনিয়ম্ অপেক্ষা বহুগুণ শক্তিশালী কোনও তেজবিকিরক পদার্থ আছে। এই ধারণায় তিনি ও তাঁহার স্বামী ঐ খনিজের অতি সূক্ষ্ম পরীক্ষা করেন। তাঁহাদের অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ১৮৯৮ খৃঃ রেডিয়ম্ ধাতু আবিষ্কৃত হয়।

রেডিয়ম্ হইতে "ইমানেশন্" নিষ্কাশন। ম্যাদাম্ কুরি পরিচালিত বিজ্ঞানাগারের এক অংশ

সেইসময় হইতে এখন পর্য্যন্ত এই আশ্চর্য্য ধাতুর গুণাবলী পরীক্ষা ইত্যাদি ক্রমাগত চলিয়াছে এবং অনেক আশ্চর্য্য তথ্যের আবিষ্কার হইতেছে।

রেডিয়ম্ অনেকপ্রকার খনিজ মধ্যে থাকে। তবে সর্ব্বত্রই অতি অল্পপরিমাণে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে কার্ণোইট নামক খনিজে এবং চেকোস্লোভাকিয়ায় জোয়াকিমস্থাল্ নামক স্থানের পিচ-ব্লেণ্ড্ খনিজে ইহা অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।

আমাদের দেশে তেজবিকিরক পদার্থ-মধ্যে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের মোনাজাইট্ (Monazite) বালি সর্ব্বপ্রধান। ইহাতে ইউরেনিয়ম্ এবং থোরিয়ম্ এই দুই তেজবিকারের পদার্থ প্রভূত-পরিমাণে থাকে। এবং সিরিয়ম্ ইট্রিয়ম্ ইত্যাদি অন্য অনেক মূল্যবান্ দুষ্প্রাপ্য ধাতুও থাকে। এই খনি সম্পূর্ণভাবে বিদেশীর করলে। গ্যাসের আলোর ম্যান্টল্ এইসকল পদার্থ বিনা হয় না। ইংলণ্ডের গ্যাস ম্যান্টলের কারখানা সম্পূর্ণভাবে এদেশের মোনাজাইটের উপর নির্ভর করে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এদেশে এক রতি প্রমাণও মোনাজাইটের ব্যবহার নাই।

হাজারিবাগ ও গয়া জেলার কয়েকটি অভ্রের খনিতে পিচ্-ব্লেণ্ড-জাতীয় পদার্থ পাওয়া গিয়াছে। এইসকল পদার্থে প্রধানতঃ ইউরেনিয়ম ধাতু ও ফস্ফোরস থাকে। ঈষৎ পীত বর্ণের নুড়ির আকারে এইসকল পদার্থ পাওয়া যায়। যেগুলি পাওয়া গিয়াছে, সেসকলই প্রায় দুই-আড়াই ইঞ্চি ব্যাসের বস্তু। নুড়ি ভাঙ্গিলে তন্মধ্যে কৃষ্ণবর্ণের আঁটির মতন এক পদার্থ পাওয়া যায় এবং তাহাই অবিকৃত পিচ-ব্লেণ্ড। গয়ার সিঙ্গার নামক জমিদারির অন্তর্গত পিছলি নামক স্থানে এই পদার্থ অনেক পাওয়া গিয়াছিল।

রেডিয়ম্ হইতে অন্য মৌলিক পদার্থ উৎপন্ন হয়, ইহা নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার প্রভাবে এক ধাতু অন্যে পরিণত হয় কি না, সে-সম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই ; যদিও র‍্যাম্সে, কুরি ও অন্যান্য অনেক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের মতে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে।

র‍্যাম্‌সে, অষ্ট্‌ভাল্ড্‌, ইত্যাদি মনীষিগণের মতে, যদি কখনও এক ধাতু অন্যে পরিণত করা যায়, তাহা হইলে ঐ প্রক্রিয়ায় প্রভূতপরিমাণ তেজোরাশি অতি গাঢ়ীভূত-ভাবে আবশ্যক হইবে। ইহা সত্য বলিয়াই মনে হয়। কেননা, যেসকল নক্ষত্রে অতি অল্প মৌলিক পদার্থ আছে (অর্থাৎ অন্যগুলি তেজোরাশির প্রভাবে উচ্চতর মৌলিক পদার্থে পরিণত হইয়া আছে), সেসকল নক্ষত্রের উত্তাপের পরিমাণ ২৫০০০ ডিগ্রী (সেন্টিগ্রেড) বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। মনুষ্যের উদ্ভাবিত যন্ত্র-মধ্যে বৈদ্যুতিক চুল্লী সর্ব্বাপেক্ষা প্রচণ্ড উত্তাপ দান করে। তাহার উত্তাপ মাত্র ৩০০০ ডিগ্রী। সুতরাং স্বর্ণ প্রস্তুত-করণে কিপ্রমাণ তেজ প্রয়োজন, তাহা সহজে বোধগম্য হয় না। কবি বলিয়াছেন, যে, এক "ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশ পাথর", পরে ক্লান্ত ও অন্যমনস্কভাবে "কখন ফেলেছে ছুঁড়ে পরশ পাথর"; কেননা তাহার কটিদেশস্থ লৌহশৃঙ্খল স্বর্ণে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। যদি স্বর্ণ প্রস্তুত-করণ সম্বন্ধে উপরোক্ত বৈজ্ঞানিক মতই ঠিক হয়, তাহা হইলে "ক্ষ্যাপার" পক্ষে অন্যমনস্ক হইয়া "পরশ পাথর" ছুঁড়িয়া .... সম্ভব হইত না। কেননা যে মুহূর্ত্তেই স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহ স্বর্ণে পরিণত হইত, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার প্রচণ্ড তেজে হতভাগ্য "ক্ষ্যাপার" অস্থি মাংস গলিত বা ভস্মীভূত হইয়া তাহার মৃত্যু হইত।

বিজ্ঞান-রাজ্যে কি সম্ভব কি অসম্ভব, তাহা নিশ্চিত-ভাবে বলা যায় না। সুতরাং স্বর্ণ প্রস্তুত-করণ অসম্ভব, একথা বলাও অসম্ভব।

পরিশেষে রেডিয়ম্‌ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। তাহা রেডিয়মের ঔষধ-গুণ সম্বন্ধে।

মনুষ্য-প্রকৃতি অতি বিচিত্র। যখনই কোন আশ্চর্য্য-গুণসম্পন্ন বস্তুর আবিষ্কার হয়, তখনই মনুষ্যের চিত্ত জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠে, যে, ঐ বস্তু দ্বারা তাহার আদিম ইচ্ছা-সকল পরিপূর্ণ হইতে পারে কি না—উহা দ্বারা ঐশ্বর্য্যলাভের ও অমরত্ব লাভের সহজ পন্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় কি না। এইরূপে কত নূতন পদার্থের কত অলৌকিক গুণ যুগযুগান্তর ধরিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

রেডিয়ম্‌ আবিষ্কারের পর ইহার অণুজীব-সংহারের ক্ষমতাও আবিষ্কৃত হয়। সঙ্গে সঙ্গে অনেকে বলিলেন, সর্ব্বরোগহর অমোঘ ঔষধ এত দিনে পৃথিবীতে আসিল। অনেক অর্থলোলুপ চিকিৎসক রেডিয়ম্‌ সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও ইহার ব্যবহার আরম্ভ করিলেন।
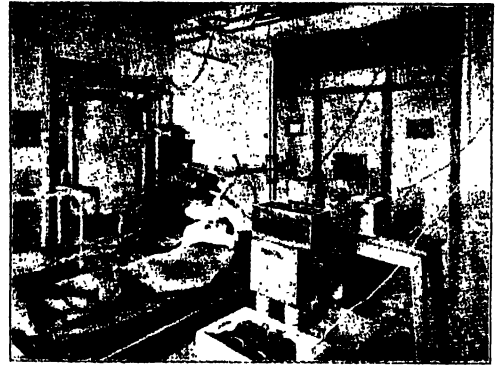
পাভিলন্‌ পাস্তরে ক্যান্‌সার্‌ রোগীর রণ্ট্‌গেন্‌ রশ্মি চিকিৎসা। রোগীর গণ্ডদেশে ক্যান্‌সার্‌ হইয়াছে। 'এক্স্‌-রে' যন্ত্র তাহার মস্তক হইতে ৮ ইঞ্চি ব্যবধানে (উপরিভাগে) স্থাপিত। ক্যান্‌সার্‌ গ্রস্ত অংশ ভিন্ন মুখের অন্য স্থলে যাহাতে রশ্মি না পড়ে সেইজন্য 'এক্স্‌-রে' যন্ত্রের নীচে ঢাল (shield) দেওয়া আছে। ঢালমধ্যস্থিত ছিদ্রপথে রশ্মি ক্যান্‌সার্‌-গ্রস্ত স্থানে পড়িতেছে। চিকিৎসক কাষ্ঠ ও সীসক নির্ম্মিত পর্দ্দার আড়ালে থাকিয়া একটি ক্ষুদ্র বিশেষ কাচ নির্ম্মিত জানালা দিয়া চিকিৎসা-ক্রিয়া দেখিতেছেন।

ফলে বহুসংখ্যক হতভাগ্য রোগীর ইহলীলা সাঙ্গ হয়। কেননা রেডিয়ম্‌, 'এক্স্‌-রে' ইত্যাদি সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের হস্তে যেমন মহৌষধ, তেমনই অনভিজ্ঞের হস্তে কালান্তক যমদণ্ড বিশেষ। কিরূপ যত্নের সহিত ও সন্তর্পণে এই-সকল প্রয়োগ করা উচিত, তাহা প্রবন্ধমধ্যস্থ পাস্তর গার্ডিলনের রণ্ট্‌গেন্‌-রশ্মি প্রয়োগাগারের চিত্র হইতে বোঝা যায়।

ফ্রান্সে ইহার অনেক ব্যবহার এবং অনেক দুর্ঘটনা ঘটিবার পর, এ-সম্বন্ধে চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিকগণ বিশেষ সতর্ক হইয়াছেন। ১৯২০ সালে পারি নগরের ম্যুনিসিপাল কাউন্সিল্‌ প্রায় ৭॥ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দুই গ্রাম (এক তোলার এক ষষ্ঠ ভাগ) রেডিয়ম্‌ ক্রয় করিয়া

ম্যাদাম কুরির হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। ইহা ল্যাঁস্তিত্যুত্‌ দ্যু রাডিয়ম্‌ নামক পারি নগরের এক বিজ্ঞানমন্দিরে আছে। সেখানে অতি যত্নের সহিত রেডিয়মের গুণাবলী পরীক্ষা হইতেছে; এবং কি উপায়ে জীবনহানি হইবার আশঙ্কা ব্যতিরেকে রেডিয়ম্‌ দ্বারা রোগের প্রতিকার হইতে পারে, সে-সম্বন্ধেও চেষ্টা চলিতেছে। ইহার ঔষধরূপে প্রয়োগ "পাভিলন পাস্তর" নামক চিকিৎসাগারে হয়।

ল্যাঁস্তিত্যুত দ্যু রাডিয়ম্‌

এখনও রেডিয়মের পরীক্ষা চলিয়াছে। ইহা হইতে অনেকে অনেক-কিছু প্রত্যাশা করিয়াছিলেন এবং এখনও করেন। আশা সফল হইবে কি না, সে-বিষয়ে কোনদিকেই অধিক লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। হয়ত ইহাই কিংবা এতৎসংক্রান্ত কোনও পদার্থই স্পর্শমণি, আবার হয়ত বা ইহা অন্য অনেক আবিষ্কারের ন্যায় রসায়ন-শাস্ত্রের গন্তব্য পথের একটি যোজনস্তম্ভ মাত্র।

গোয়ালিয়র-প্রান্তে প্রাচীন নগর

(পদ্মাবতী)

শ্রী ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গোয়ালিয়র প্রান্তে যে-সব প্রাচীন নগর আছে, তাহা একদিন ভূতলের স্বর্গ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছিল। আজও সেই গৌরবের কথা পুরাণাদিতে লিখিত আছে। একদিন উজ্জয়িনীর (অবন্তীনগর) কীর্ত্তি সূর্য্যের দীপ্তির ন্যায় সমস্ত ভারতে প্রভাসিত ছিল। মহাভারতের চেদী-রাজের চান্দেরীর প্রশংসায় সর্ব্বত্রই মুখরিত ছিল। প্রসিদ্ধ রাজা নলের 'নরবর দুর্গ' গোয়ালিয়র রাজ্যের বুকে এখনও নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। বিদিশা নগরী গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত। পূর্ব্বের ন্যায় ইহারা আর উন্নতির শিখরে নাই, কিন্তু ইহাদের বৈভবের কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরস্মরণীয় থাকিবে।

কালের পেষণে দলিত নগরের মধ্যে পদ্মাবতীও একটি। আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচনার বিষয় এই পদ্মাবতী নগর। ইহা আর এখন নগর নাম ধারণ করিবার উপযুক্ত নয়। সে শুধু অতীতের পুরাতন স্মৃতি নিজের বক্ষে ধারণ করিয়া কালের বিচিত্র লীলা সন্দর্শন করিতেছে।

নাগরাজদিগের সময় পদ্মাবতী একটি প্রভাবশালী

পদ্মাবতীতে প্রাপ্ত মণিভদ্র-মূর্ত্তি (সম্মুখভাগ)

মণিভদ্র-মূর্ত্তি (পশ্চাৎভাগ)

মহানগরী ছিল, তাঁহাদের রাজত্ব-কালে ইহার গৌরব ও গরিমার দিন ছিল,—তাহা আমরা বিষ্ণুপুরাণ হইতে জানিতে পারি। ভারতের গৌরব কবি ভবভূতির "মালতী-মাধব" গ্রন্থে আমরা ইহার যেরূপ বর্ণনা পাই তাহা সত্যই সুন্দর। তাহার নাটক হইতে অনুমান করা যায় যে. দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে পদ্মাবতী একটি বৈভবযুক্ত বিশাল নগরী ছিল। প্রাচীন ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ আবিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন, পদ্মাবতী গোয়ালিয়র রাজ্যেরই অন্তর্গত।

আবিষ্কার-কর্ত্তাদিগের মতের ঐক্য নাই। যে যেরূপ পারিয়াছেন আবিষ্কার করিয়া নিজের মত প্রকাশ করিয়াছেন। উইল্‌সন (Mr. Wilson) সাহেব প্রথমে আবিষ্কার করিয়া উজ্জয়িনীকেই পদ্মাবতী বলিয়া স্থির করেন; কিছুদিন পরে তিনি ঠিক করিলেন—বর্ত্তমান ঔরঙ্গাবাদ অথবা বরারের নিকটই কোথাও, পদ্মাবতী হওয়া সম্ভব। বরারের নিকট পদ্মাবতী বলিবার কারণ উইল্‌সন্ বলেন, মালতী-মাধবের রচয়িতা ভবভূতি পদ্মপুর-নিবাসী ছিলেন এবং এই নগরটি বিদর্ভ অর্থাৎ বরার অঞ্চলেই অবস্থিত।

পদ্মপুর ও পদ্মাবতী যে একই স্থান—ইহাদের নামে সামঞ্জস্য আছে বলিয়াই তিনি এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। আবার তিনি গঙ্গার ধারে অবস্থিত ভাগলপুরকে পদ্মাবতী বলিয়া ধার্য্য করিলেন।

তাঁহার পর আসিলেন কানিংহাম্ সাহেব। পদ্মাবতীর মত কান্তীপুর ও মথুরা নাগ-রাজার অধীনে ছিল বলিয়া তাঁহার ধারণা মথুরার নিকটই কোথাও পদ্মাবতী থাকা সম্ভব। সেই কারণে তিনি মথুরার দক্ষিণ দিকে ১৫০ মাইল অদূরবর্ত্তী নরবর দুর্গকে পদ্মাবতী বলিয়া আবিষ্কার করিলেন। সেই কারণে নিজের গ্রন্থে নরবর দুর্গের বর্ণনার সহিত পদ্মাবতীর তুলনা করিয়াছেন। তিনি ভবভূতির বর্ণনার নজির তুলিয়া দেখাইয়াছেন। যদিও তাঁহার অনুমান অনেকটা সত্য, তবুও যেসব বর্ণনা ভবভূতি দিয়াছেন—সেসব নরবর দুর্গ হইতে বহুদূরে।

সিন্ধুনদীর তীরে ভুবনেশ্বর মন্দির, ভবভূতি-বর্ণিত সুবর্ণ বিন্দু—পদ্মাবতী

এখন কবি যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, সেই স্থলটি কোথায়? কবি বর্ণনা করিয়াছেন—পদ্মাবতীর চারটি নদী বহিয়া চলিয়াছে—সিন্ধু, পারা, লবণ এবং মধুমতী। পূর্ব্বের পদ্মাবতী নিজের কীর্ত্তির সহিত নিজের নামের অক্ষরও হারাইয়া ফেলিয়াছে। প্রাচীন—বড় বড় গৃহ-শোভিত পদ্মাবতী এখন ক্ষুদ্র পবায়া গ্রাম। এখন ইহার চতুর্দ্দিকে যে চারটি নদী আছে তাহাও পূর্ব্ব চারটি নদীর অপভ্রংশ। পূর্ব্বেকার সিন্ধু, পারা, লবণ ও মধুমতীর জায়গায় বর্ত্তমান সিন্ধ, পার্ব্বতী, নোন ও মহুয়র নামের অনেক সামঞ্জস্য আছে। সিন্ধু ও সিন্ধ, পারা ও পার্ব্বতীতে কোন তফাৎ নাই; লবণ ও নোন একই জিনিষ; মধুমতীর নামটা বিগড়াইয়া মহুয়র নাম ধারণ করিয়াছে। এই নব-আবিষ্কৃত জায়গাটি দতিয়া ও গোয়ালিয়রের মধ্যস্থলে করডা মানব ষ্টেশন হইতে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত। গোয়ালিয়র রাজ্যের প্রত্নতত্ত্ববিৎ গার্দ্দে সাহেব অতি কষ্টে আবিষ্কার করিয়াছেন—নরবর হইতে উত্তরপূর্ব্বে ২৫ মাইল অদূরবর্ত্তী এই নগরটি অবস্থিত।

সিন্ধুনদীর জলপ্রপাত—পদ্মাবতী

বর্ত্তমান পবায়া পল্লী সিন্ধ ও পার্ব্বতীর সঙ্গমের উপর অবস্থিত। পল্লীর দক্ষিণ-পশ্চিমে দুই মাইল

দূরে সিন্ধু নদীর জল-প্রপাত দৃষ্টিগোচর হয়। এই জল প্রপাতের বিষয় কবি ভবভূতি নিজের নাটকে বর্ণনা করিয়াছেন।

পবায়ার কিছু নিম্নে দুই মাইল দূরে মহুয়র (মধুমতী) সিন্ধের সহিত আবদ্ধ হইয়াছে। ইহারা যে-স্থানে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ হইয়াছে ঠিক সেই সঙ্গমের উপর একটি শিবলিঙ্গ আছে যাহার উল্লেখ কবি স্বর্ণ-বিন্দু নামে নিজের নাটকে করিয়াছেন।

সিন্ধু ও পার্ব্বতী নদীসঙ্গম—পদ্মাবতী

মালতী-মাধবের বর্ণনার সহিত দেখিতে গেলে পবায়াকে পদ্মাবতীর অপভ্রংশ বলিতে পারা যায়। ভবভূতির বর্ণনা ও বর্ত্তমান পবায়ার প্রাকৃতিক দৃশ্য এই দুইয়ের শোভায় এতদূর সামঞ্জস্য আছে যে নিঃসন্দেহে আমরা পবায়াকে পূর্ব্বকালের মহানগরী পদ্মাবতী বলিতে পারি। উইল্‌সন্ ও কানিংহাম্ সাহেব যে-সব স্থানের বর্ণনা দিয়াছেন ও যেসব জায়গা তাঁহারা পদ্মাবতী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—সেসব স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য-সম্পদে ও পবায়া-পল্লীতে ঢের তফাৎ।

পবায়া গ্রামের গ্রামবাসীদিগের মুখে শুনিতে পাই, তাহারা বংশপরম্পরা হইতে শুনিয়া আসিতেছেন, অতি প্রাচীনকালে তাঁহাদের এই ক্ষুদ্র গ্রাম একটি বিশাল মহানগরী ছিল। রাজাদিগের নামের মধ্যে ধুধুঁপাল ও পুণ্যপালের নাম পল্লীবাসীদিগের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। তাহারা বলে ইহারাই এ-স্থানের প্রতাপশালী চক্রবর্ত্তী রাজা ছিলেন। বহুদিন অবধি ইহা নাগবংশীয় রাজাদিগের লীলাক্ষেত্র ছিল, কিন্তু শেষে কিছু দিনের জন্য পরমার-বংশ তাঁহাদিগের কীর্ত্তি লোপ করিয়াছিলেন। এই পরমার-বংশীয় রাজাদিগের মধ্যে উপরে লিখিত দুইজনের নাম পাওয়া যায়। গোয়ালিয়র দুর্গও বহুদিন অবধি এই পরমার-বংশীয় রাজাদিগের অধীনে ছিল। রাজা পুণ্যপাল এইস্থানে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করান ও নদী-সঙ্গমের উপর সুদৃশ্য ঘাট বাঁধাইয়া দেন। ইহা এখনও বর্ত্তমান।

পবায়া পল্লীতে যাইলে দেখিতে পাওয়া যায়—উন্মুক্ত নীলাম্বরতলে, শ্যামদূর্ব্বাদলে আচ্ছাদিত কত শত উচ্চ অট্টালিকার স্তূপীকৃত আবর্জ্জনা পড়িয়া পুরাতন গৌর-বের পরিচয় দেওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। পূর্ব্বে চতুর্দ্দিক্ হইতে নদী আসিয়া নিজের স্নেহালিঙ্গনে প্রাচীন পদ্মাবতীকে বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছিল—নিজেদের স্নিগ্ধ-ধারায় নগরের সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি করিয়াছিল।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ গার্দ্দে সাহেব যখন পবায়া আবিষ্কার করেন, তখন সেই স্থানের ভগ্ন বিশাল ভবন-সমূহ হইতে তিনি অনুমান করিয়াছিলেন—কোন সময়ে ইহা একটি বড় নগর ছিল। তিনি খনন করিয়া ও গ্রামবাসীদিগের নিকট হইতে যতগুলি প্রাচীন মুদ্রা পাইয়াছেন, সবগুলিই নাগ-বংশীয় রাজাদিগের। প্রাচীন মূর্ত্তি যতগুলি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্ট জানিতে পারা যায় ঐ স্থানটিই পদ্মাবতী। অতএব ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, এইখানে কখন না কখন প্রবলপ্রতাপশালী এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল; কিন্তু তাহা অল্পকালের মধ্যেই ধ্বংসদশায় নিপতিত হইয়াছে।

রায়গড়

শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায়

যে-সব ঘটনা-বৈচিত্র্যের ভেতর দিয়ে মহারাষ্ট্র-ইতিহাস গড়' উঠেছিল তার অনেকগুলোরই কেন্দ্রস্থান রায়গড় দুর্গ। এইজন্যই এই গড়টি মহারাষ্ট্র-ইতিহাসে বিশেষভাবেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। শেষ জীবনে শিবাজী এই স্থানটাকেই তাঁর কর্ম্ম-কেন্দ্ররূপে বেছে নিয়েছিলেন। ১৬৭৪ সাল থেকে ১৬৮০ সাল পর্য্যন্ত রায়গড়ই মহারাষ্ট্র-সূর্য্য শিবাজীর রাজধানী ছিল। আর এই স্থানেই ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন।

রায়গড় দুর্গটির ভৌগোলিক অবস্থান রাজনৈতিক হিসাবে এত চমৎকার যে, অতি প্রাচীন কালেও তার খ্যাতি দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেকালের ইউরোপীয়ানরা এটিকে এইজন্য পূর্ব্ব-জিব্রাল্টার আখ্যা প্রদান করেছিলেন। মহারাষ্ট্র-ইতিহাসের পরবর্ত্তী যুগে এই স্থানটিকেই কেন্দ্র করে' অসংখ্য ঝগড়া-বিবাদের উৎপত্তি হয়েছিল। যাঁরাই মহারাষ্ট্র-প্রাধান্য স্থাপন করতে চেষ্টা করেছেন তাঁরাই সকলের আগে এই দুর্গটিকে স্বাধিকারভুক্ত করে নেবার চেষ্টা করেছেন। দুর্গটির ভৌগোলিক অবস্থানই যে এর কারণ তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এ দুর্গটি এত দৃঢ়রূপে সুরক্ষিত এবং দুর্ভেদ্য ছিল যে ঔরঙ্গজেব দুর্গটিকে জয় করবার প্রচুর চেষ্টা করে'ও কৃতকার্য্য হননি। অস্ত্রের পরীক্ষায় ব্যর্থ হ'য়ে অবশেষে জয়ের জন্য তাঁকে বিশ্বাসঘাতকের শরণাপন্ন হ'তে হয়। আর ১৬৯০ সালে এই বিশ্বাসঘাতকের কারসাজিতেই রায়গড় দুর্গ তিনি হস্তগত করেন। এর পরে রায়গড়ের ১২৫ বৎসরের ইতিহাস কেবল হস্ত-পরিবর্ত্তনের ইতিহাস। এই অল্প দিনের ভেতর অন্যূন ছয় জন রাজা একে জয় করেছেন এবং হারিয়েছেন। ১৮১৮ সালে দুর্গটি ইংরেজের অধিকারে এসেছে এবং সেই হ'তে দুর্গটি তাঁদের হাতেই রয়ে' গেছে। ইংরেজের কামান এর উপরে ধ্বংসের যে বিচিত্র চিহ্ন এঁকে দিয়ে গিয়েছে আজ পর্য্যন্তও তা লোপ পায়নি। শিবাজীর প্রাসাদটি পর্য্যন্ত কামানের কলঙ্ক-লেখা বুকে নিয়ে সেই ধ্বংসস্তূপের ভেতর স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে।
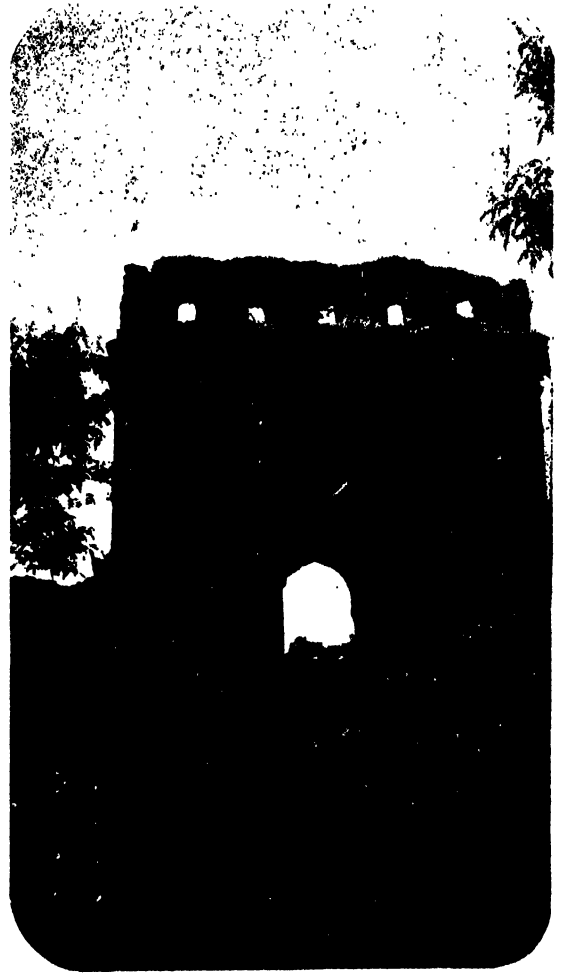
শিবাজীর প্রাসাদের তোরণ-দ্বার— রায়গড়

রায়গড় পুণা থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় ৮০ মাইল দূরে। মাহাদ থেকে রায়গড়ের দূরত্ব প্রায় ষোল মাইল।
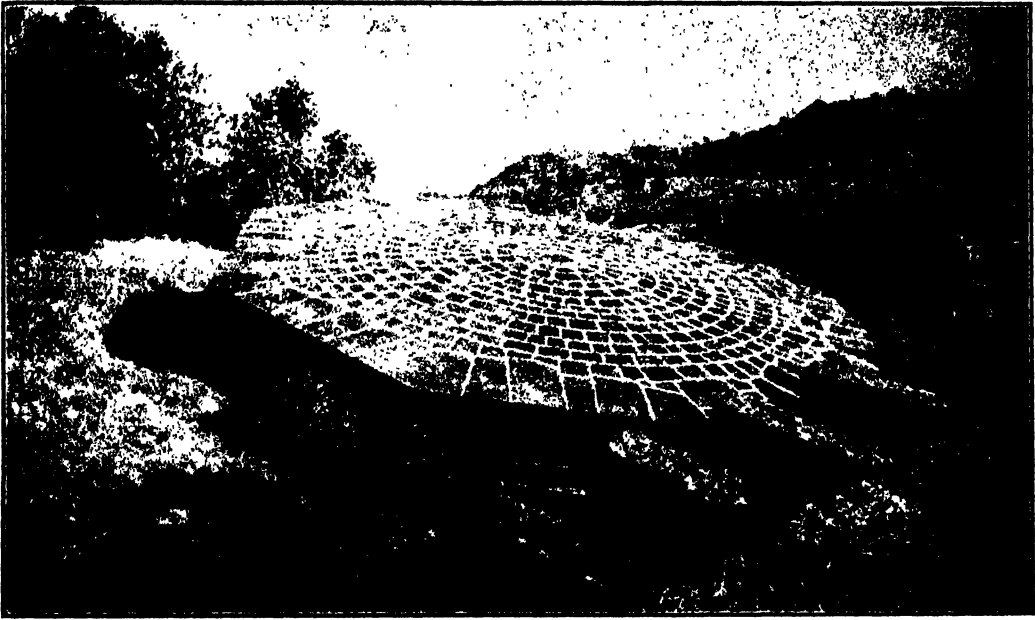
শিবাজীর সমাধি—রায়গড়

রায়গড় যেতে হ'লে এই মাহাদের পথই একমাত্র জানা পথ। বোম্বাই থেকে ষ্টিমারে প্রায় ১২ ঘণ্টা চলে' তার পর মোটরকারে মাহাদে যেতে হয়। মাহাদ হ'তে হয় পা-যান না হয় গো-যান—এই দুটো যান ছাড়া আর কোন-রকমের যান নেই। সমুদ্র-উপকূল থেকে রায়গড়ের উচ্চতা প্রায় ২৮৫১ ফুট। পরিষ্কার দিনে এই গড় থেকে ৪৫ মাইল দূরের সমুদ্র-বেলাও বেশ স্পষ্ট দেখ্‌তে পাওয়া যায়। একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ের উপর রায়গড় প্রতিষ্ঠিত। এই পাহাড়টি সহ্যাদ্রি গিরি মালা থেকে দূরে ছট্‌কে পড়েছে। চারিদিকের পাহাড়গুলোর চেয়ে এর উচ্চতা কম বলে' রায়গড়কে অনেক দূর থেকে নজরে পড়ে না

গড়ের উপরে চড়্‌বার একটি মাত্র পথ আছে। আর সে-পথ খুবই দুরারোহ, কারণ পথটি সটান সোজা উঠে' যায়নি, এঁকে বেঁকে উঠে' নেমে ঘুরে' ফিরে' সে-পথ চূড়োয় গিয়ে পৌঁছেচে। পাহাড়টির উচ্চতা ভৌগোলিক হিসাবে মাত্র ৩০০০ ফুট, কিন্তু এই উচ্চতাটাকে পাড়ি দিতে যে পথটা অতিক্রম কর্‌তে হয়, তার দূরত্ব ৮ মাইলের কম হবে না।

কিন্তু এই দুর্গম পথের প্রাকৃতিক শোভা যা তা অপূর্ব্ব। প্রকৃতি তাঁর সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার এর চারিদিকে এমন করে' সাজিয়ে রেখে দিয়েছেন যে, তার দিকে চোখ পড়্‌লে চোখ জুড়িয়ে যায়। এখানে ঝরণার জল পাহাড়ের গা বেয়ে ঝর্‌ঝর্‌ করে' নেমে চলেছে। ওখানে গিরির মৃদু কল্লোল বীণার ধ্বনির মত বাতাসের বুকে সুর-তরঙ্গ সৃষ্টি কর্‌ছে।

পথের ধারে কোথাও পাহাড়ের গায়ে গুহা খোদাই করা, কোথাও বা জলাশয়, স্থানে স্থানে পাহারওয়ালাদের আস্তানার ভগ্নাবশেষ। ধ্বংসপ্রাপ্ত পুরোনো দোকানের দুই-চারিটি দেওয়ালও মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। তিনশটি ধাপ পেরিয়ে তবে গড়ের প্রধান দরজার সাম্‌নে পৌঁছান যায়। এই দরজাটি এখনও একেবারে ভেঙে পড়েনি—দৃঢ় এবং সবল হ'য়েই মাটির উপর দাঁড়িয়ে আছে। সমস্ত কাজের শুভাশুভ এই দরজার উপরেই বিশেষভাবে নির্ভর করে বলে'ই একে যে অতিমাত্রায় মজবুৎ করে'ই গড়ে' তোলা হয়েছিল—এই ভাবে টিকে থেকে এ তারি প্রমাণ নিঃসংশয়ে প্রদান কর্‌ছে। দরজার দুপাশে গোটা বারো ঘর আছে। প্রত্যেকটি দুটো করে

প্রাচীর দ্বারা রক্ষিত। প্রাচীরগুলোর গাঁথনিও খুব শক্ত ও দৃঢ়। রায়গড়কে দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করবার চেষ্টা যে বেশ ভালরকমেই হয়েছিল তার পরিচয় এর যেখানে সেখানে ছড়িয়ে পড়ে' আছে।

সদর দরজাটার একটু দূরেই গঙ্গা-সাগর। এই হ্রদটি দৈর্ঘ্যে ১২০ গজ, প্রস্থে ১০০ গজ। এর জল কাঁচের মতন স্বচ্ছ, বরফের মতন ঠাণ্ডা। এর সুনীল জলে পাড়ের উপরকার ভগ্ন প্রাসাদটির প্রতিবিম্ব পড়ে' কাঁপ্‌তে থাকে—এর জলের উপর দিয়ে বাতাস হু হু শব্দে নিশ্বাস ফেলে যায়। সে-নিশ্বাস শৃঙ্খলিতা মহারাষ্ট্র-রাজ্য-লক্ষ্মীর কান্নার মতন পথিকদের কানে এসে বাজে।

প্রাসাদের দরজা থেকে মোট ৩৭টি ধাপ অতিক্রম করলেই "নাকাড়া খানা"। এইটিই দুর্গের ভেতর সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতম স্থান। এখানে দাঁড়িয়ে দুর্গের প্রায় সমস্ত অংশটাই নজরে পড়ে, এবং দুর্গের বাইরেও অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। দুর্গের চারিপাশের স্থান, বিসর্পিত নদীরেখা, নদীতীরে গ্রামসমূহ, রাজগড়, তোরণ, প্রতাপগড়, এ-সমস্তই চোখের সম্মুখে বায়োস্কোপের ছবির মত ফুটে ওঠে।

দরবারখানা হ'তে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে একটির পর একটি দরবারে প্রবেশ করতে হয়—এর কোনটির নাম 'ন্যায়সভা', কোনটির নাম 'বিবেকসভা',

জগদীশ্বর মন্দির—রায়গড়

পাল্কী-দরজাকে অতিক্রম করলেই শিবাজীর প্রাসাদের সাম্‌নে এসে পৌছান যায়। পথে হ্রদের উত্তর-পূর্ব্ব ধারে ভবানীর মন্দির। প্রাসাদে প্রবেশ করবার প্রধান দরজা পেরলেই শিবাজীর দরবারখানা চোখে পড়ে। এই দরবারখানাটি দৈর্ঘ্যে ৪৫০ ফুট এবং প্রস্থে ২৫০ ফুট। একটি দামী পাথরের মঞ্চ এখনও এখানে দাঁড়িয়ে আছে—শিবাজীর সিংহাসনের এইটিই একমাত্র অবশেষ। এই স্থানটি মহারাষ্ট্রদের কাছে এখনও তীর্থস্থানের মত পবিত্র। তারা জুতো পায়ে দিয়ে এর ভেতর প্রবেশ করে না। যারা নিম্নশ্রেণীর তারা দূর থেকেই প্রণাম করে' চলে' যায়।

কোনটির নাম 'মকরসভা', কোনটির বা আর-কিছু। সিংহাসনের ঠিক পেছনের দিকটায় 'প্রবৃত্তি, মন্দির'-'বিশ্রাম-মন্দির' 'ভাণ্ডাগার' অন্তঃপুর ইত্যাদি অবস্থিত। ভাণ্ডাগারটি অগ্নির অনুগ্রহে একেবার ভস্মাবশেষে পরিণত হয়েছে—এখনও এর মাটির ভেতর প্রচুর পোড়া চালের নিশানা পাওয়া যায়।

শিবাজীর সমাধি-মন্দির—রায়গড়

প্রাসাদের উত্তর-পূর্ব্ব ধারে ৪০ফুট প্রশস্ত একটা রাস্তা সটান সোজা চলে' গিয়েছে। রাস্তাটির দুইধারে প্রায় ৭০০ফুট লম্বা জায়গা পাথর দিয়ে উঁচু করে' বাঁধানো। এখানে এখনও ৪টি দোকান-ঘরের ভগ্নাবশেষ পড়ে' রয়েছে। এইখানেই তখনকার দিনে বাজার বসত এবং জনসাধারণ ঘোড়ার পিঠ থেকে সওদাগরদের কেনা-বেচা করত। এখান থেকে একটা রাস্তা 'তকমকে' এসে শেষ হয়েছে। খাঁড়া সোজা পাহাড়—একবার পা পিছ্‌লে গেলে হাজার ফুট নীচে কোন্ গুহার অন্তরালে যে গড়িয়ে পড়্‌তে হ'বে তার ঠিক্ ঠিকানা নেই। যাদের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হ'ত—এই 'তকমক' থেকেই তাদের ঠেলে' ফেলে' দেওয়া হ'ত। এখানে দাঁড়িয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে মাথা ঘুরে' যায়।

অস্ত্র-তৈরীর কারখানাটা এখান থেকে বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। কারখানাটি এখন ভগ্ন, চূর্ণ পাথরের স্তূপে পরিণত হয়েছে। কারখানাটি দৈর্ঘ্যে ছিল ৯৯ ফুট এবং এর দেওয়ালগুলো ছিল ৩॥ ফুট চওড়া। কারখানার কাছে ১২টি জলাশয় পাহাড় খুঁড়ে' তৈরী করা হয়েছিল। এদের যে-কোন একটিতে ঢিল ছুঁড়্‌লে সবগুলোর জলে ঢেউয়ের দোলানি জেগে ওঠে। কারণ নীচের 'ছদ্র-পথ দিয়ে এদের প্রত্যেকটিকে প্রত্যেকটির সঙ্গে যুক্ত করে' রাখা হয়েছে।

এই কারখানা থেকে প্রায় মাইলখানেক দূরে জগদীশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। চারিদিকে দেওয়াল দিয়ে ঘেরা মন্দিরটি এখনও অভগ্ন অটুট অবস্থায় আছে। মন্দিরের মহাদ্বার-তলে শিবাজীকে সমাহিত করা হয়েছে। শিবাজীর সমাধি-স্তম্ভটি অতি সাধারণ—সমস্তরকমের বাহুল্যবর্জ্জিত কালো রংএর পাথরে তৈরী। শিবাজীর সমাধির পাশে তাঁর প্রিয় কুকুরটিকেও গোর দিয়ে তার উপরেও একটি ছোটখাট স্তম্ভ গড়ে' তোলা হয়েছে।

রায়গড়ের পশ্চিম দিকের খাড়া চূড়াটার নাম হিরকণী। এই নামের ইতিহাসটি ভারি চমৎকার। হিরকণী একজন আভীরা রমণীর নাম। সে রোজ রাজপ্রাসাদে দুধ জোগাত। এক সন্ধ্যায় তার বেরিয়ে যেতে দেরী হওয়ায় তাকে ভেতরে রেখেই সদর দরজা বন্ধ করা হয়। গৃহে সে শিশু-পুত্রকে রেখে এসেছিল, সুতরাং রাত্রিতে বাড়ী ছেড়ে থাকাও তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। অবশেষে আর-কোন উপায় না দেখে' প্রাণের মায়া ত্যাগ করে' সে খাড়া পাহাড় বেয়ে নেমে বাড়ী পৌঁছেছিল, ছেলেকে বুকে তুলে নেবার জন্যে। পরের দিন ঘটনাটা শিবাজীর

কানে পৌছয়; মাতৃ-স্নেহের এই অপূর্ব্ব দৃষ্টান্তটাকে অক্ষয় করে' রাখবার জন্যে তিনি এই চূড়াটার নাম হিরকণী রেখেছিলেন।

আজ রায়গড়ের সে পূর্ব্ব গৌরব নেই। ধ্বংস-স্তূপের ভেতর তার সৌন্দর্য্য হারিয়ে গেছে। তার প্রাসাদ, তোরণ, দরবার ধসে ভেঙে প্রস্তর-স্তূপে পরিণত হয়েছে। মানুষের হাত যাকে সুন্দর করে' গড়ে' তুলেছিল কালের হাত তার উপর কদর্য্যতার আবরণ টেনে দিয়েছে। কিন্তু সে-সত্ত্বেও এর ঐতিহাসিক গৌরব নষ্ট হয়নি। শিবাজীর এই মৃত্যু-ভূমিটা এখনও লক্ষ লক্ষ দেশ ভক্তের পুণ্য তীর্থ।

এখনও এখানে প্রতিবৎসর ১৩ বৈশাখে শিবাজীর রাজ্যাভিষেকের তিথিতে বাৎসরিক উৎসব হ'য়ে থাকে। সে সময়টাতে নানা স্থানের লোক এ-জায়গাটাতে জমায়েৎ হ'য়ে মহারাষ্ট্র-গৌরব-রবির স্মৃতির তর্পণ ক'রে যায়।

বাংলার বিভক্তি ও কারক

শ্রী যতীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

বাংলা ভাষায় লিখিত এবং বাংলা ব্যাকরণ বলিয়া পরিচিত যে-কোন একখানি বই খুলিলেই দেখা যায় যে, লেখকের মতে বাংলা নাম-শব্দের সাতটি বিভক্তি ও ছয়টি কারক। এই বিভক্তি সাতটি আবার একবচন- ও বহুবচন ভেদে চৌদ্দটি। তাঁহারা নিম্নলিখিত প্রকার চৌদ্দটি রূপ দেন। যেমন 'নর' শব্দ—

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	নর	নরেরা
দ্বিতীয়া	নরকে	নরদিগকে
তৃতীয়া	নর দ্বারা	নরদিগ দ্বারা
	বা	বা
	নরের দ্বারা	নরদিগের দ্বারা
চতুর্থী	নরকে	নরদিগকে
পঞ্চমী	নর হইতে	নরদিগ হইতে
ষষ্ঠী	নরের	নরদিগের
সপ্তমী	নরে, নরেতে	নরসকলে বা
		সকল নরে

সম্বোধন　হে নর

এই শব্দরূপের ভিতর একটু মজা আছে। লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, দ্বিতীয়া ও চতুর্থী বিভক্তির রূপে কোনই প্রভেদ নাই এবং পঞ্চমী বিভক্তির 'নরদিগ হইতে' অন্য যে-কোন ভাষাই হউক বাংলা নহে।

এখন মনে হইতে পারে দ্বিতীয়া ও চতুর্থী বিভক্তির রূপে কোনই প্রভেদ নাই। বিভক্তিযুক্ত পদটি পাইলে তাহা কোন্ বিভক্তি চিনিব কি করিয়া? ইহার স্পষ্ট উত্তর বাংলা ব্যাকরণকারদের ব্যাকরণ খুঁজিলে পাওয়া যাইবে না। তাঁহাদের মনের ভাব বোধ হয় শুধু অর্থ দেখিয়াই বিভক্তি নির্ণয় করিতে হইবে। এই মনোভাবের বশবর্ত্তী হইয়া কোন-কোন ব্যাকরণকার প্রথমা বিভক্তির এক-বচনের চিহ্ন "এ, য়, তে" বলিয়া নির্দ্দেশ করেন অর্থাৎ "লোক" শব্দের প্রথমার একবচনে 'লোক, লোকে, লোকেতে" তিনই। বাস্তবিকই ইহা বাংলা ব্যাকরণ-কারদের প্রতিভার সম্পূর্ণ উপযোগী। বিভক্তির অর্থ-বিচারই সব দেশের সকল ব্যাকরণকারদের উর্ব্বর মস্তিষ্ক ছাড়া অন্য কোথাও গজাইত কি না সন্দেহ।

তার পর তৃতীয়া ও পঞ্চমী বিভক্তি "নর দ্বারা" ও "নর হইতে"। বিভক্তি জিনিষটা শব্দের অঙ্গীভূত কিন্তু 'দ্বারা' ও 'হইতে' এক-একটি স্বতন্ত্র শব্দ। এস্থলে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে যদি 'নরের দ্বারা' ও 'নর হইতে' এক-একটি বিভক্তি হয়, তাহা হইলে নর অপেক্ষা, নর ছাড়া

নর বিনা, নর ব্যতীত, নরের প্রতি, নরের পশ্চাৎ প্রভৃতি এক-একটি বিভক্তি নহে কেন? ইহারও কোন উত্তর বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য বাংলা ব্যাকরণে নাই।

এইরূপ সপ্তমী বিভক্তির বহুবচনে 'সকল নরে' বা 'নর-সকলে' কি-করিয়া যে বিভক্তি হইতে পারে এবং 'সকল' শব্দ যদি বিভক্তির সমস্ত নিয়ম উল্‌টাইয়া দিয়া হঠাৎ "নরে"র আগে বসিয়া পড়িয়া সপ্তমী বিভক্তি নির্দ্দেশ করে, তাহা হইলে "দুইজন নরে" "দশজন নরে" "অনেক নরে" প্রভৃতি এক-একটি বিভক্তি নহে কেন, এসকল সন্দেহ মিটিবার আশা বাংলার ব্যাকরণকারদের নিকট করা অন্যায়।

তার পর একবচন ও বহুবচন ভেদ। ব্যাকরণকারেরা দু-একটি শব্দ দেখাইয়া তাহার একবচন ও বহুবচন বিভক্তি দেখাইয়াছেন। কিন্তু এইসব বাংলা ব্যাকরণ পড়িয়া কেউ যদি লেখে "অনেক ইটেরা পড়িয়া রহিয়াছে" তাহা হইলে তাহা কেন অশুদ্ধ হইল সেনিয়ম কোন ব্যাকরণ হইতে বাহির হইবে না।

আসল কথা বাংলা-ব্যাকরণকারেরা বিভক্তি পদার্থটি বুঝেন নাই। সংস্কৃত-ব্যাকরণকারেরা বহু পরিশ্রমে সমস্ত শব্দ তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, প্রাতিপদিক বা শব্দের যতপ্রকার রূপভেদ হয় তাহা দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; এক, যে রূপভেদ-গুলি অন্য শব্দের এবং ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ জ্ঞাপন করে, কিন্তু শব্দের অর্থের কোন বিকৃতি হয় না; অপর, যে রূপভেদগুলিতে শব্দের অর্থের বিকৃতি হয় এবং যে রূপভেদগুলির দ্বারা অন্য শব্দের সহিত সম্বন্ধ বুঝান যায় না। ইহার মধ্যে সম্বন্ধ-জ্ঞাপক রূপভেদগুলিকে তাঁহারা বিভক্তি ও অন্যগুলিকে প্রত্যয় বলিলেন। এই বিভক্তি-গুলি ভাগ করিয়া তাঁহারা সাত শ্রেণী ও তিন বচনে স্থাপন করিলেন। এবং তাহার পর বিভক্তিগুলির কোন্‌টি কি অর্থ প্রকাশ করিতেছে তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন ও তাহাদের প্রয়োগ নির্ণয় করিলেন। কিন্তু ইহা গাধা-খাটুনির কাজ এবং বাংলা ব্যাকরণকারদের উর্ব্বর মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। তাঁহাদের যুক্তি অন্য-রূপ। সংস্কৃত ভাষা দেবভাষা—প্রত্যক্ষভাবে হউক, পরোক্ষভাবে হউক, সংস্কৃত হইতে বাংলার উৎপত্তি—অতএব সংস্কৃতে যখন সাতটা বিভক্তি আছে, তখন বাংলাতেও তাহা অবশ্যই থাকিবে। বাংলায় দ্বিবচন খুঁজিয়া পাওয়া গেল না এই একটা বড় দুঃখ, সেটা দিতে পারিলেই চমৎকার হইত। কিন্তু একবচন ও বহুবচন বিভক্তি দেওয়া গেল। তাহা হইলেই বাংলা শব্দরূপ সম্পূর্ণ! এখন যদি তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করা যায়"—দশজন লোক আসিয়াছে" এখানে "লোকেরা" হইল না কেন? তাঁহারা বলিবেন, সংখ্যাবাচক শব্দ পূর্ব্বে থাকিলে বহুবচন চিহ্নের লোপ হয়। আপদ্‌ চুকিয়া গেল, তাঁহারাও খালাস, আমরাও নিশ্চিন্ত।

আসল কথা, বাংলা ব্যাকরণকারেরা যদি একটু লক্ষ্য করিতেন তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন যে, বাংলা ব্যাকরণে যদিও একবচন ও বহুবচন প্রভেদ করিবার প্রয়োজন আছে, কিন্তু নাম শব্দের একবচন বিভক্তি ও বহুবচন বিভক্তি নাই। বিভক্তি আছে 'সাধারণ' বিভক্তি ও 'কেবল বহুবচন' বিভক্তি ও সাধারণ বিভক্তি অর্থাৎ যাহা একবচন ও বহুবচন উভয় স্থলেই প্রযুক্ত হইতে পারে। 'দুই' 'তিন' প্রভৃতি শব্দ লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, তাহারা "দুইয়ে" "দুইয়ের" 'তিনে" "তিনের" প্রভৃতি রূপ গ্রহণ করে "দুইয়েদের" বা "তিনেদের" নয়। 'দুই' 'তিন' যে বহুবচন তাহাতে সন্দেহ নাই, অতএব 'এ' 'এর' যেমন একবচনের বিভক্তি তেম্‌নি বহুবচনের বিভক্তি। সাধারণ বিভক্তিগুলি সমস্ত শব্দেই প্রযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু কেবল 'বহুবচন' বিভক্তি সব শব্দে যুক্ত হয় না। যে শব্দগুলি পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ বা উভয়লিঙ্গ কেবল তাহারাই 'বহুবচন' বিভক্তি গ্রহণ করে; এই হিসাবে নাম শব্দগুলিকে সলিঙ্গ ও অলিঙ্গ এই দুই ভাগে ভাগ করা উচিত। সংস্কৃতের পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ এ বিভাগ চলে না।

এই ত গেল বচনের কথা, তার পর বিভক্তি। বাংলা শব্দগুলির রূপভেদ পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাহাদের সাধারণ বিভক্তি চারিটি ও কেবল বহুবচন বিভক্তি তিনটি মাত্র আছে। 'নর' শব্দ ধরা যাক্‌—'সাধারণ' বিভক্তি (১) নর, (২) নরের, (৩) নরকে, (৪)

নরে বা নরেতে ; 'কেবল বহুবচন' বিভক্তি (১) নরেরা, (২) নরদের বা নরদিগের, (৩) নরদের বা নরদিগকে। ইহার মধ্যে 'নরেরা' 'নর'-এর 'কেবল বহুবচন'রূপ এবং 'নরদের বা নরদিগের' ও 'নরদের বা নরদিগকে' যথাক্রমে 'নরের' ও 'নরকে'এর কেবল বহুবচন রূপ। অতএব বাংলা ভাষার প্রকৃতি-অনুসারে "নর" শব্দের নিম্নলিখিতপ্রকার রূপ হওয়া উচিত।

	সাধারণ	কেবল বহুবচন
১ম বিভক্তি	নর	নরেরা
২য় "	নরের	নরদের (নরদিগের)
৩য় "	নরকে	নরদের (নরদিগকে)
৪র্থ "	নরে (নরেতে)	—

৪র্থ বিভক্তির 'কেবল বহুবচন' রূপ নাই।

তার পর কারক। সংস্কৃতে ছয়টি কারক আছে, সুতরাং বাংলাতেও ছয়টি কারক থাকিতেই হইবে, ইহাই হইতেছে আমাদের ব্যাকরণকারদের যুক্তি। এখন দেখা যাক্ কারক পদার্থটা কি। 'ক্রিয়ান্বয়ি কারকম্' 'ক্রিয়া-নিমিত্তত্বং কারকম্' অর্থাৎ যাহা ক্রিয়ার নিমিত্ত অথবা যে পদের সহিত ক্রিয়ার অন্বয় হয় তাহাই কারক। ইহাই হইতেছে সংস্কৃত কারকের সংজ্ঞা। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে বিশেষণ বা অব্যয়ের সহিতও ত ক্রিয়ার অন্বয় হয়, তাহাদিগকে কারক বলিব না কেন? ইহার উত্তরে সংস্কৃত ব্যাকরণকারেরা বলেন যে, যে নাম শব্দগুলি বিভক্তিযোগে সাক্ষাৎভাবে ক্রিয়ার সঙ্গে অন্বিত হয়, তাহাদিগকেই কারক বলা যায়। তাহা হইলে বুঝা গেল যে, কোন শব্দ ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হইলেই কারক হইবে না, কারক হইতে হইলে শব্দটি (১) নাম বা সর্ব্বনাম শব্দ হওয়া চাই, (২) বিভক্তি-যুক্ত হওয়া চাই, ও (৩) সাক্ষাৎভাবে ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হওয়া চাই, অর্থাৎ অন্য কোন শব্দের সাহায্যে ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ প্রকাশ করিলে চলিবে না। এইরূপে কারকের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহারা দেখিতে লাগিলেন ক্রিয়ার সহিত শব্দের কি কি অর্থে অন্বয় হইতে পারে। ক্রিয়া আপনা-আপনি হয় না, তাহার একজন কর্ত্তা থাকে, ক্রিয়ার ফল কর্ত্তা ছাড়াও অপরকে আশ্রয় করে, ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার জন্য কর্ত্তাকে অপরের সাহায্য লইতে হয়, ক্রিয়াটি বিশেষ কোন দেশে বা কালে হইতে পারে—অথবা এক দেশ হইতে অন্যত্র অথবা কোন দেশের অভিমুখে হইতে পারে ইত্যাদি দেখিয়া বিভক্তি ও অর্থ-অনুসারে কারককে কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণে বিভক্ত করিলেন। যদি এমন হইত যে এক-এক অর্থে এক-একটি মাত্র বিভক্তি হইত এবং সেই বিভক্তি হইলে সেই কারকই বুঝাইত তাহা হইলে আর-কোন গোল-যোগ থাকিত না। কিন্তু ব্যাকরণকারের অনেক আগে লোকের মুখে মুখে ও কলমে কলমে ভাষা নানারূপ বিচিত্র ভঙ্গী পাইয়া আসিয়াছে সুতরাং এক বিভক্তিতে দুই-তিন কারক এবং এক কারকে দুই তিন বিভক্তি কল্পনা করিতে হইল। আবার অনেক শব্দ নানা অব্যয়-যোগে ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হইয়া কারকের অর্থ প্রকাশ করিতেছে অথচ তাহাদিগকে কারক বলা চলে না, অকর্ম্মক ধাতুর অধিকরণ কর্ম্মের বিভক্তি গ্রহণ করিতেছে তাহাকে অধিকরণও বলা চলে না, প্রভৃতি অনেক সমস্যার সমাধান তাঁহাদিগকে করিতে হইল। সে-স্থলে অকর্ম্মক ধাতুকে সকর্ম্মক বলিয়া এবং ভিন্ন ভিন্ন অব্যয়-যোগে ভিন্ন-ভিন্ন বিভক্তি নির্দ্দেশ করিয়া অথচ অন্য পদের সহিত তাহাদের কি সম্বন্ধ সে-বিষয়ে নীরব থাকিয়া সেগুলি একরকম করিয়া সারিয়া দিলেন। তাঁহারা লক্ষ্য করিলেন যে, যদি স্বত্বত্যাগপূর্ব্বক দান করা যায় তাহা হইলে দানার্থক ধাতুর যাহাকে গৌণ কর্ম্ম বলা যাইত তাহার উত্তর চতুর্থী বিভক্তি হয়। সেখানে তাঁহারা "গৌণকর্ম্মে চতুর্থী বিভক্তি হয়" একথা না বলিয়া চতুর্থী বিভক্তিযুক্ত পদটিকে সম্প্রদান কারক বলিয়া অভিহিত করিলেন।

আমরা উপরে দেখিয়াছি যে, শব্দের বিভক্তি ও বিভক্তির অর্থ মিশিয়া কারক হইয়াছে, কেবল বিভক্তি বা কেবল অর্থের দ্বারা কারক হইতে পারে না। তাহা যদি হইত তাহা হইলে অনেক ক্রিয়াবিশেষণকে বা অব্যয়কেও কারক বলা যাইতে পারিত। সেইজন্যই "ব্রাহ্মণায় ধনং দদাতি"তে "ব্রাহ্মণায়" সম্প্রদান এবং "রজকং বস্ত্রং দদাতি"তে রজকং কর্ম্ম। সেইজন্য "ভৃত্যায় ক্রুধ্যতি"তে "ভৃত্যায়

সম্প্রদান এবং "ভৃত্যং অভিক্রুধ্যতি"তে "ভৃত্যং" কর্ম্ম, যদিচ বিভক্তির অর্থ এখানে একই। সেইজন্য "গাং দুগ্ধং দোগ্ধি"তে "গাং"কে কর্ম্ম বলিতে হইয়াছে, অর্থ ধরিলে তাহাকে অপাদান বলিতে হইত।

বাংলা ব্যাকরণকারেরা কিন্তু শুধু অর্থ ধরিয়াই কারক বিচার করিতে চান। তাঁহারা বলেন যে, যখন সংস্কৃতে ছয়টি কারক রহিয়াছে এবং তাহার সমান অর্থ বাংলাতে পাওয়া যাইতেছে তখন বাংলাতেও নিশ্চয় ছয়টি কারক আছেই। তাঁহারা একথা বুঝেন নাই বা বুঝিতে চাহেন নাই যে, ঐ ছয়টি কারকেই নামের সহিত ক্রিয়ার যাবতীয় সম্বন্ধ নিঃশেষিত হইয়া যায় নাই এবং সেই জন্যই সংস্কৃত ব্যাকরণে বিভক্তি-নির্ণয়ে নানাবিধ কষ্ট-কল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারা একথা বোঝেন না যে, শুধু অর্থ ধরিয়া ব্যাকরণে শ্রেণী-বিভাগ চলে না, প্রত্যেক শ্রেণী-বিভাগের বৈয়াকরণিক উপযোগিতা থাকা চাই। মজার কথা এই যে, বাংলার বৈয়াকরণেরা সম্প্রদান কারকের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিলেন "যাহাকে স্বত্বত্যাগ করিয়া দান করা যায়, তাহাকে সম্প্রদান বলে"। সংস্কৃতে ইহার বৈয়াকরণিক উপযোগিতা আছে—যেমন "রজকায় বস্ত্রং দদাতি" এবং "রজকং বস্ত্রং দদাতি" ইহাদের প্রথমটিতে আমরা বুঝিব কাপড়টি দান করা হইতেছে, দ্বিতীয়টিতে বুঝিব কাপড়টি কাচিতে দেওয়া হইতেছে। কাচিতে দেওয়ার স্থলে "রজকায়" এবং দানের স্থলে "রজকং" বলিলে ভুল সংস্কৃত হইবে! কিন্তু বাংলাতে "ধোপা-বৌকে কাপড়খানা দাও" বলিলে এমন কেউ আছেন কি না জানি না যিনি বলিতে পারিবেন ইহা স্বত্বত্যাগ পূর্ব্বক দান করা হইল কি স্বত্ব রাখিয়া দান করা হইল। তাহা হইলে ত আমরা ইহাও বলিতে পারি যে, চিবাইয়া খাইলে কর্ম্ম এবং গিলিয়া খাইলে সম্ভোগ কারক হইবে এবং তাহাতে অষ্টমী বিভক্তি হইবে, যাহার রূপ দ্বিতীয়া বিভক্তি হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন।

যাক্ এখন দেখিতে হইবে ব্যাকরণে কারকের বাস্তবিক উপযোগিতা কি আছে। অর্থ ধরিলে ক্রিয়াবিশেষণে ও কারকে বিশেষ প্রভেদ নাই। কারকগুলিও ক্রিয়া-বিশেষণের মত ক্রিয়াকে বিশেষ করে। দুইটি উদাহরণ দিতেছি। "রাম খাইতেছে" "রাম ভাত খাইতেছে" "রাম তাড়াতাড়ি খাইতেছে"—শুধু "খাইতেছে" বলিলে আমরা ভাত খাওয়া 'রুটি খাওয়া' 'খাবার খাওয়া' প্রভৃতি সব খাওয়াকেই বুঝিতে পারি এবং তাড়াতাড়ি খাওয়া ধীরে ধীরে খাওয়া প্রভৃতি সবরকমের খাওয়াই মনে হইতে পারে। কিন্তু ভাত খাইতেছে বা তাড়াতাড়ি খাইতেছে বলিলে একটা বিশেষ খাওয়া বুঝি। এইরূপ "যদু গাড়ীতে যাইতেছে" "যদু হাটিয়া যাইতেছে" বা "যদু হন্ হন্ করিয়া যাইতেছে"—সবগুলিতেই আমরা যাওয়ার প্রকার-ভেদ বুঝি। এখন কারককে তাহা হইলে ক্রিয়া-বিশেষণ না বলিয়া কারক বলিব কেন? দেখা যাক্।

প্রথমতঃ কর্ত্তা-কারক। কর্ত্তা-কারককে ক্রিয়া-বিশেষণ এইজন্য বলিতে পারি না যে, তাহা ক্রিয়ার সহিত নিত্য সম্বন্ধ এবং ক্রিয়ার আকার কর্ত্তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু ক্রিয়াবিশেষণ না থাকিলেও ক্রিয়ার কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। কর্ম্মকারকও এইরূপ ক্রিয়ার সহিত নিত্য সম্বন্ধ, তাহাকে ছাড়িয়া সকর্ম্মক ক্রিয়া দাঁড়াইতে পারে না।

কিন্তু অন্য কারকগুলি সম্বন্ধে সেকথা খাটে না। বাস্তবিক সেগুলিতে ক্রিয়াবিশেষণের সমস্ত লক্ষণই বর্ত্তমান। এমন কি সময়ে সময়ে কোন্‌টি বা কারক কোন্‌টি ক্রিয়াবিশেষণ সে-সম্বন্ধেও সন্দেহ আসে; কেবল প্রভেদ এই যে কারকগুলি নাম-শব্দ ও বিভক্তি-যুক্ত। ইহার মধ্যে কতকগুলি বিভক্তিযুক্ত হইয়া প্রত্যক্ষভাবে ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হয়, অপর কতকগুলি সম্বন্ধ-প্রকাশক, অন্য কোন শব্দের সাহায্যে ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ প্রকাশ করে। অনেক স্থলে বিভক্তি দ্বারা যে-সম্বন্ধ প্রকাশিত হয় অন্য সম্বন্ধ-প্রকাশক শব্দের দ্বারাও সেই একই সম্বন্ধ বুঝায়। আবার সংস্কৃত কারকগুলি যে যে অর্থ প্রকাশ করে বাংলায় অন্যশব্দ-যোগে ক্রিয়ার সঙ্গে অন্বিত শব্দগুলি তাহা হইতে অন্য-রকমের অনেক অর্থ ও সম্বন্ধ প্রকাশ করে। সুতরাং বাংলা ভাষায় কর্ত্তা ও কর্ম্ম ব্যতীত ক্রিয়ার সহিত অন্য সম্বন্ধগুলিকে কারক না বলিয়া অন্যভাবে এবং অন্য দিক্ হইতে তাহাদের দেখিতে হইবে।

উপরে দেখিয়াছি যে, বাংলায় কর্ত্তা ও কর্ম্মকারকের

যে বৈয়াকরণিক উপযোগিতা আছে অন্যান্য কারকের তাহা নাই। বিশেষতঃ যখন অনেক স্থলে একটা পদ কোন্ বিশেষ কারক সে-সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিয়া যায় তখন তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করিবার প্রয়োজন কি? "সে **মনে** জানে", "সে **রাস্তায়** বেড়াইতেছে", "সে **রাস্তা দিয়া** চলিয়াছে", "সে **মন দিয়া** শুনিতেছে", "সে খালি **পায়ে** বেড়াইতেছে", "সে **হাতে হাতে** ফল পাইল", "সে **সন্ত সন্ত** ফল পাইল", "সে **মনে মনে** পড়িতেছে", "সে আপনার **মনে** পড়িতেছে", "সে **নীরবে** পড়িতেছে", "সে **একমনে** পড়িতেছে" প্রভৃতি স্থলে অর্থ বিচার করিয়া কোন্‌টি কারক, কোন্‌টি ক্রিয়াবিশেষণ অথবা কোন্‌টি করণ কোন্‌টি অধিকরণ তাহা বহু বাগ্‌বিতণ্ডার পরও নির্ণীত হইতে পারে কি না সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। নির্ণীত হইলেও ব্যাকরণের হিসাবে আমাদের কি লাভ হইবে বুঝিতে পারি না। তাহার অপেক্ষা আমি যদি বলি "মনে" "মন" শব্দের ৭মী বিভক্তি এবং "জানে" ক্রিয়ার সহিত অন্বিত—"রাস্তা" "দিয়া" যোগে ২য় বিভক্তি এবং "চলিয়াছে"র সহিত "দিয়া"র সাহায্যে অন্বিত। এবং বাক্য-বিশ্লেষণ স্থলে যদি বলি "মনে" শব্দটি "জানে" বিধেয়ের সম্প্রসারণ এবং "রাস্তা দিয়া" বাক্যাংশটি "চলিয়াছে" বিধেয়ের সম্প্রসারণ—তাহা হইলে কি দোষ হইতে পারে? খুব জোর বলিতে পারি "অমুক অর্থে অমুক বিভক্তি" বা "অমুক অর্থে দ্বিরুক্তি", কিন্তু সেটা অধিকরণ কি করণ, সম্প্রদান কি অপাদান বাংলায় তাহা বিচার করিয়া কি উদ্দেশ্য সাধিত হইবে বলিতে পারি না। সংস্কৃতে যে-ভিত্তির উপর এ শ্রেণী-বিভাগ করা হইয়াছে বাংলায় সে-ভিত্তি অর্থাৎ ছয়টি ভিন্ন-ভিন্ন বিভক্তিই নাই। তাহা ছাড়া আমি যে কারক নির্দ্দেশ না করিয়া কেবল বিভক্তি মাত্র নির্দ্দেশ করিতে চাহিতেছি তাহার অন্য কারণও আছে। বিভক্তিযুক্ত পদগুলি প্রত্যক্ষভাবে বা অন্বয়বোধক পদের সাহায্যে যদি কেবল ক্রিয়ার সহিতই অন্বিত হইত তাহা হইলে কোন কথা ছিল না, কিন্তু তাহারা যেমন ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হয়, তেমনই নাম, সর্ব্বনাম, বিশেষণ প্রভৃতির সহিতও অন্বিত হইতে পারে। "**জাতিতে** ব্রাহ্মণ", "**বিদ্যায়** বৃহস্পতি", "**কার্য্যে** দক্ষ", "**রামের চেয়ে** ভাল", "**শ্যামের মত**, শান্ত", "**গরীবের উপর** দয়া", "**টাকার দিকে** লক্ষ্য", প্রভৃতি তাহার উদাহরণ। এখানেও "অমুক অর্থে অমুক বিভক্তি" "অমুক যোগে অমুক বিভক্তি" এবং "অমুক নাম বা বিশেষণকে বিশেষ করিতেছে" অনায়াসেই বলা চলে এবং কোনরূপ কষ্ট-কল্পনার আশ্রয় লইতে হয় না।

তার পর এই যে অর্থ ধরিয়া কারক বিচার করিব সে অর্থ কার? নাম পদটির, না, অন্বয়-বোধক শব্দটির? "হাতে করিয়া তুলিয়া ফেল" এখানে সম্বন্ধ বুঝাইতেছে কে? 'হাতে' না "করিয়া"? নিশ্চয়ই "করিয়া"। সুতরাং "করিয়া" কি সম্বন্ধ জ্ঞাপন করিতেছে সেটা বিবেচনা করিব যখন "করিয়া" পদের অর্থ বিচার করিব। যদি কেহ বলেন "হাতে করিয়া" একটি বিভক্তি, তাহার উত্তর "হাতে" নিজেই "করিয়া" যোগে ৭মী বিভক্তি। বিভক্তির উপর বিভক্তি হয় না।

তাহা ছাড়া কতকগুলি বিশেষ বিশেষ অর্থকে বিশেষ বিশেষ কারক বলিব কেন? সংস্কৃত ব্যাকরণকারগণ বলিয়াছেন বলিয়া? "ঘরে জল পড়িতেছে"—"ঘরে" অধিকরণ এবং "ঘর হইতে বাহির হইতেছে"—"ঘর হইতে" অপাদান, এ-প্রভেদ কেন করিব? এবং কোন্ উপযোগিতা বা কি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর এ শ্রেণী-বিভাগ স্থাপিত করিব? "সে দেবতাকে পুষ্পাঞ্জলি দেয়" এবং "সে দেবতাকে ভয় করে" এখানে প্রথম "দেবতাকে" সম্প্রদান এবং দ্বিতীয় "দেবতাকে" অপাদান বলা কি হাস্যকর ব্যাপার নয়? "সে তাস খেলিতেছে" এখানে "তাস" কে করণ বলা কতদূর সঙ্গত? যেহেতু সংস্কৃতে "ক্রীড়্" এবং "ভী" অকর্ম্মক, অতএব বাংলাতেও তাহাই হইবে? এবং সেই অর্থ-অনুসারে বাংলার কারক নির্ণীত হইবে?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ক্রিয়ার কর্ত্তা, ফলভোগী, কারণ উপায়, উদ্দেশ্য, দেশ, কাল ইহা লইয়াই কারক। এখন এক-একটি অর্থের সহিত যদি শব্দের রূপভেদ প্রভৃতি বৈয়াকরণিক ব্যাপার যুক্ত থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগকে ভিন্ন-ভিন্ন কারক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে বাধা হয় না এবং উপরোক্ত উপায়, উদ্দেশ্য প্রভৃতি ছাড়া অন্য যে-সকল অর্থ আছে, তাহাদিগকে ঐ রূপভেদ ধরিয়া ভিন্ন-ভিন্ন

কারকের ভিতর ফেলিতে পারা যায়। কিন্তু যদি রূপভেদই না থাকে তাহা হইলে কেবল অর্থ ধরিয়া কারক নির্ণয় করা আর যারই কাজ হোক্ ব্যাকরণকারের নহে।

আর্টের আদর্শ

আর্ট ও আর্টিষ্টের ব্যক্তিত্ব

শ্রী সরোজেন্দ্রনাথ রায়, এম্-এ

আজকাল বাঙ্গলাদেশে আর্ট্ লইয়া বেশ আলোচনা চলিতেছে। দেশ ও বিদেশের আর্ট-সমালোচকগণ নানা মত প্রকাশ করিতেছেন। এইসব মতগুলি এত বিভিন্ন-প্রকারের যে, যাঁহারা সত্য-সত্যই আর্টের স্বরূপ জানিতে চাহেন তাঁহারা এই মতের গোলক-ধাঁধার মধ্যে পথ হারাইয়া ফেলিবেন। আর আজকালকার দুনিয়াটিও এত জোরে ছুটিয়াছে যে, একটু চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিবার অবকাশ নাই। রোলাঁর ভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয়, আমরা কোন্ এক অচেনা অদেখা কুহেলিকারূপিণী "লিলুলি"র (Liluli) পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া ক্ষত-বিক্ষত, ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছি। সত্যের প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিবার আমাদের অবসর নাই—ধৈর্য্য ও ইচ্ছাও নাই।

আর্ট্ কি? ইহার সঙ্গে মানব-জীবনের কি সম্পর্ক—সমাজে ইহার স্থান কি? মানবের গভীরতম জীবনের সঙ্গে ইহার যোগ-সূত্র কোথায়? সুন্দর কি? মঙ্গলের সঙ্গে সুন্দরের মিলন কি সম্ভব? নীতি কি? নীতির সহিত আর্টের মিলন কোন্ ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত? এ-সব প্রশ্নের মীমাংসার চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় না। সকলেই বাঁধা বুলি লইয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে।

ম্যাক্স্‌মুলার আর্টের প্রতিশব্দ মায়া করিয়াছেন ও আর্টিষ্ট্‌কে মায়ী বলিয়াছেন। মায়ী—মায়াতে নিজকে সর্ব্বদা প্রকাশ করিতেছেন তাহাতেই তাঁহার আনন্দ। আর্টিষ্ট নিজ জীবনের গোপনভাব ও অভিজ্ঞতাগুলি সকলের কাছে প্রকাশ করিয়া আনন্দ পান। অপ্রকাশের একটা নিগূঢ় ব্যথা আছে—যাহা অসহনীয়। সুতরাং বাঁচিতে হইলে মানুষকে প্রকাশ করিতেই হইবে। পরলোকগত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার "কাব্য ও কবিত্ব" নামক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধে এই বাধ্যতার ভাবকে আবেশ বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

> "ইহাকে আবেশ বলিবার অভিপ্রায় এই, ইহা যেন সর্ব্বেন্দ্রিয়কে গ্রাস করে, চিন্তাকে পথভ্রান্ত করে, হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে, ভাবরাশিকে আন্দোলিত করে। এইপ্রকার নেশা বা আবেশে যাহাকে না ধরে, তাহার হাত দিয়া প্রকৃত কবিতা বাহির হয় না। ইহা যেন কাঁচপোকার তেলাপোকা ধরার ন্যায়। আবেশে ঘাড়ে ধরিয়া লেখায়, না লিখিয়া নিস্তার নাই। এই আবেশ যেন ভিয়ানের পাক। ইহার ভিতর দিয়া যে শব্দটা আসে সেটা মিষ্ট, যে অলঙ্কারটা আসে সেটা মিষ্ট, যে ছন্দটি ফুটিয়া উঠে তাহা মধুর। আর এই আবেশ না ধরিলে কবিতা লেখা বিড়ম্বনা মাত্র।"

কিন্তু আজকাল এই ছাপাখানার যুগে আমরা দেখি কত লোক কত কি লিখিতেছেন। কিন্তু স্থির হইয়া বসিলে দেখিতে পাই এ-সমস্তের অনেকের মধ্যে অর্থের আবেশ ছাড়া অন্য কোন উচ্চাঙ্গের আবেশের গন্ধও নাই। পশ্চিম হইতে সমাগত রক্ত-মাংসের আকুল আহ্বানে পীড়িত আর্ট্ আমাদের ভারতীয় চিত্তের শেষ আধ-ভাঙ্গা খুঁটিটিও ভাঙ্গিয়া দিতেছে। রক্ত-মাংসের ডাক সনাতন ডাক—অস্বীকার করিবার জো নাই—আমরা তাহাতে যথেষ্টই কাতর আছি। ডষ্টয়েভ্‌স্কির "ব্রাদার্স্ কারামাঝভ" বা ক্নুট্ হামজানের "প্যানের" মধ্যে আদিম মানবের যে-ক্ষুধা চিত্তকে মথিত করিতেছে দেখিতে পাই সে-ক্ষুধা দিনের পর দিন আমাদের সাহিত্যেও পরম আধিপত্য

বিস্তার করিতেছে। কিন্তু হৃদয়ের নিভৃততম গুহায় গভীর যে গভীরতরের সন্ধানে নিরন্তর ডাকিয়া ডাকিয়া ফিরিতেছে তাহা কি আরও সত্যতর আহ্বান নয়? এই দেহের ক্ষুধা-তৃষ্ণা যাহা আমাদিগকে কাতর করিয়া দিতেছে ইহা ব্যতীত মানব-মনে অন্য ক্ষুধাও আছে। দিগন্ত-বিস্তৃত নীলাকাশের গুরু গম্ভীর সত্তা আমাদিগকে উদ্বেলিত করে এবং আমরা দেহের ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলিয়া তাহাতে মগ্ন হই। হিমালয়ের তুষার-শুভ্র মূর্ত্তি আমাদিগকে কি এক অদৃশ্য বিরাট্ অস্তিত্বের আভাস দান করে! ইতিহাসের বিচিত্র বিধানের মধ্যে আমরা কোন্-এক অপূর্ব্ব অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ দেখিয়া অবাক্ হই! প্রেমের জন্য এই দেহ—এই রক্ত-মাংসকেও মানুষ বর্জ্জন করিতে দ্বিধা বোধ করে না! মহত্ত্বের নিকট সকলে অবনত-মস্তক হয়। এই যে সকলের মধ্যে অতীন্দ্রিয় সত্তা ইহার স্পর্শ যে প্রাণ পায় সে সকল ভোগ-সুখ বিসর্জ্জন দিয়া তাহাকে হৃদয়ে উপলব্ধি করিবার জন্য ব্যাকুল হয়।

আজকাল দেখিতে পাই জীবনের সঙ্গে আর্টের যে নিগূঢ় যোগ থাকা উচিত ছিল তাহা শিথিল হইয়া যাইতেছে। সত্য আর্ট্ও সেইজন্য বিরল হইয়াছে। আর্ট্ জীবনের সঙ্গে গভীর যোগ হারাইয়া দিন-দিন নীরস, শুষ্ক, অর্থহীন হইয়া পড়িতেছে। রং ফলান'র বাড়াবাড়ি আর্ট নয়। আপাত-মধুর সৃষ্টি আর্ট নয়। সত্য আর্ট চিরকালের বস্তু। আর্ট্ কথাটি আজকাল বাঙ্গালায় বহুল প্রচলিত হইলেও ইহার যে বিলাতী গন্ধ—ইহার চারিপাশে যে বহু শতাব্দীর দ্বন্দ্ব জমিয়া উঠিয়াছিল—ইহার যে জন্ম-কথা—তাহা ইহা এখনও ছাড়িতে পারে নাই। তাই প্রথমেই আমাদের আর্টের সঙ্গে প্রকৃতির যে বিরোধ তাহাই মনে পড়ে। আর্ট্ প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন। যাহা আর্ট তাহা প্রাকৃতিক নহে। ফুলটি বনে ফুটিয়া আছে—ইহা আর্ট্ নহে। কিন্তু চিত্রকর যখন সেই ফুলটি নানা বর্ণের সমাবেশে তাঁহার পটের উপর ফুটাইয়া তোলেন তখন তাহা আর্ট্ হয়। শিশুর সরল হাস্য আর্ট নহে—মা যে সন্তানকে স্তন্য দান করেন তাহা আর্ট নহে। কিন্তু চিত্রকর যখন শিশুর সেই সরল হাসিটুকু তাঁহার তুলির দ্বারা চিরস্থায়ী করিয়া দেন তখন তাহা আর্ট—তখন সেই হাসিটুকু কতকালের সম্পত্তি হইয়া থাকে। তাই ম্যাডোনার মূর্ত্তি আর্ট্। এই কারণেই চরিত্রগত মধুরতা, স্বাভাবিক বাগ্মিতা, ব্যবহারিক জীবনে মিষ্টতা—আর্ট্ নহে, যদিও এইগুলি দ্বারা জীবনের সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয়।

প্রশ্ন হইতে পারে তবে আর্ট্ কি? আর্টকে সংজ্ঞায় আবদ্ধ করিতে কেহ কেহ ঘোর আপত্তি করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—জীবনকে কি সংজ্ঞার দ্বারা বোঝান যায়? তাঁহাদের আপত্তির কারণ বোধ হয় আর্টকে সুকুমার কলার (Fine Arts) সঙ্গে সমার্থক করার দরুন্। কিন্তু শুধু আর্টকে Fine Arts-এর সমান করিয়া লইলে চলিবে না। যদিচ অনেক সময়ে এই অর্থেই শুধু এই পদ ব্যবহৃত হয়। যাহা সুকুমার কলা হইবার উপযুক্ত নহে এমন অনেক কার্য্যও আর্ট্—যেমন কৃষি, ব্যবসায়।

কোন-একটি জ্ঞাত উদ্দেশ্য লইয়া মানুষ যখন সৃষ্টি করে তখন সে আর্টের জন্ম দেয়। সে তাহার পথ সম্বন্ধে সচেতন, তাহার ফলাফলও সে বোঝে। উদ্দেশ্য-বিহীন কার্য্য আর্ট্ হইতে পারে না। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক জন্ ষ্টুয়াট্ মিল্ বলিয়াছেন—"The art proposes to itself an end to be attained" অর্থাৎ আর্টের একটি উদ্দেশ্য আছে।

আর্ট্ উদ্দেশ্য-যুক্ত কি উদ্দেশ্য-বিহীন এই লইয়া বহু মত দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা বলেন যে ইহা উদ্দেশ্য-বিহীন, তাঁহারা সকলেই শুধু ললিত কলার কথা ভাবেন। আর যাঁহারা আর্টকে উদ্দেশ্য-যুক্ত বলেন তাঁহারা সকলপ্রকার আর্টের কথা ভাবেন। কৃষি বাণিজ্য, গৃহনির্ম্মাণ প্রভৃতি ব্যবহারিক জীবনের আর্টগুলির কথা তাঁহাদের মনে স্পষ্টভাবে বর্ত্তমান থাকে ললিত কলা ও সর্ব্বপ্রকারের শিল্পকে পাশাপাশি রাখিয় দেখিলে অত বিরোধের সম্ভাবনা হইত না। কিন্তু তা বলিয়া বলা হইতেছে না যে ললিত কলা উদ্দেশ্যহীন ললিত কলার সম্বন্ধেও টলষ্টয় বলিয়াছেন যে, আর্ট মানুষে এক-প্রকার কার্য্য। মানুষ যখন পূর্ণ জাগ্রতভা কতকগুলি বাহ্য চিহ্নের দ্বারা তাহার হৃদয়ের ভ অন্যের কাছে প্রকাশ করে তখন তাহার উদ্দেশ্য থাকে ৫

অন্যেও ইহার দ্বারা সংক্রামিত হউক এবং তাহার হৃদয়ের ভাবগুলি সে যেমন করিয়া উপলব্ধি করিয়াছিল অন্যেও তাহাই করুক, সে যেমন অভিভূত হইয়াছিল অন্যেও সেইরূপ হউক।

সাধারণ আর্টে উদ্দেশ্য অতি স্পষ্ট থাকে। ললিত কলায় বিশেষতঃ গানে অনেক সময় উদ্দেশ্য এমন অস্পষ্ট থাকে যে অনেকে মনে করেন যে ইহা উদ্দেশ্য-বিহীন। মানুষ কোন কার্য্যই বিনা উদ্দেশ্যে করে না। তাহা যতই স্পষ্ট হউক বা অস্পষ্ট হউক। মানুষের শক্তি কতক তাহার শরীর-রক্ষায় ব্যয়িত হয়, কতক তাহার মনের ক্ষুধা-নিবৃত্তিতে ও চিন্তা-প্রকাশে,—অবশিষ্ট যাহা থাকে, তাহাতে তাহার হৃদয়ের ভাব প্রকাশ হয়। হৃদয়ের ভাবোদয় ও তাহার অনুভূতি ও প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সে এক বিমল আনন্দ উপভোগ করে। যেখানে সে শরীরের অভাবের ঊর্দ্ধে, সেখানে সে স্বার্থবিহীন, সেখানে সে চায় যে, সে যাহা পাইল অন্যেও তাহাই পাউক। তাই সে তাহার ভাবরাশির প্রকাশের জন্য ব্যাকুল হয়। এইখানেই মানুষের সাহিত্য, কলা, সভ্যতা জন্ম লাভ করে। এইখানে সে শারীরিক অভাব ও স্বার্থের তাড়নার ঊর্দ্ধে—এখানে সে সমগ্র। এই ভাব-প্রকাশ দ্বারা অন্যের সঙ্গে সে জীবনের সম্পর্ক স্থাপন করে। তাই যে-দিন হইতে মানুষ মৌনব্রত অবলম্বন করে, সেদিন হইতে সে বনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হয়।

কিন্তু তাই বলিয়া আর্ট "খুসী"র বা খেয়ালের বস্তু নয়। আর্টের সঙ্গে জীবনের গূঢ় সম্পর্ক আছে। বাঁচিতে হইলে মানুষ তাহার ভাব প্রকাশ করিবে—তাহার অনুভূতি অন্যকে উপভোগ করাইবে। এইখানেই চেষ্টা আসে—এইখানেই উদ্দেশ্য আসে। সেইজন্যই টলষ্টয়ের মতে it is one of the conditions of human life—মানব-জীবনের বাঁচিবার জন্য আবশ্যক। এই যে বাঁচিবার জন্য আর্টের জন্ম দেওয়া ইহাকে এমার্সন্ tragic necessity বা মারাত্মক আবশ্যকতা আখ্যা দিয়াছেন। আর্ট সত্য কি মিথ্যা ইহার পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি এই necessityকে কষ্টিপাথর করিয়াছেন। কাব্যের বা অন্য-কোন কলার, সত্যতা পরীক্ষার সময়ে তিনি দেখিয়াছেন যে কুয়াসার মত ভাবগুলি রূপধারণের জন্য কবির মনকে পীড়িত করিতেছিল! প্রসবের ব্যথা আছে—তাহার মধ্যে আনন্দ ও বেদনা যুগপৎ মিশ্রিত। কবি বা শিল্পী কি সেই ব্যথা অনুভব করিয়াছিলেন?

এই ক্ষেত্রে বলা দরকার যে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা কেবল ললিত কলাকেই আর্ট নামে অভিহিত করিব। মানুষের হৃদয় যখন বর্ণে, রেখায়, স্বরে ও ভঙ্গীতে নিজেকে প্রকাশ করে—তখন সে সুকুমার আর্টের জন্ম দেয়। ললিত কলার সহিত অপরাপর শিল্প-কলার প্রভেদ তাহাদের জন্মে। আনন্দ হইতে ললিত কলার জন্ম কিন্তু অভাব হইতে কৃষি, ব্যবসায়, বাণিজ্য প্রভৃতি শিল্প-কলার জন্ম। ললিত কলার জন্ম সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে গেলে অনেক শিল্পী বলিয়া থাকেন যে, মানবের ইচ্ছা তাহার জন্মের জন্য দায়ী নহে। অনেক সময়ে এই কৈফিয়ৎএর আড়ালে থাকিয়া শিল্পীরা বেশ আত্ম-রক্ষা করেন। তাহারা বলেন যে, আর্ট সহজ (spontaneous)—ইহা চেষ্টা-প্রসূত নহে—মানুষের ইচ্ছা-শক্তির এখানে কোন হাত নাই। শিল্পীর মনে গোপন অন্ধকারে ইহা জন্মলাভ করিয়া আত্ম-প্রকাশের জন্য ব্যাকুল হয়। মানুষ না জানিবার পূর্ব্বেই সর্ব্বালঙ্কারা সকলায়ুধা আথেনীর মত ইহা নিজের শক্তিতে নিজে জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং আমাদের উচিত ইহাকে জেরার হাত হইতে মুক্তি দিয়া ইহার চির-নিভৃত গুহায় ইহাকে বাড়িতে দেওয়া। যদি আর্টের দোহাই দিয়া অনেকরকমের আবর্জ্জনা আমাদের উপর দৌরাত্ম্য না করিত, তবে আর্টের উপরও আমরা দৌরাত্ম্য করিতাম না।

মানুষের আয়াস যে আর্টের জন্য দায়ী তাহা বুঝাইবার জন্য টলষ্টয় একটি গল্পের অবতারণা করিয়াছেন। এক বালক একদিন একটা নেকড়ে বাঘ দেখিয়া ভয় পাইল। পরে একদিন বন্ধুদের কাছে তাহার বাঘ দেখিয়া মনোভাব কিরূপ হইয়াছিল তাহা বুঝাইবার জন্য সে ঘটনাটি আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিল। বর্ণনা করিবার সময় তাহার ঘটনার পূর্ব্বের অবস্থা, সেই গহন বন, তাহার চারি পাশের আবেষ্টন, তাহার ছেলে-মানুষী, তাহার

ছুটাছুটি, সেই বাঘের চেহারা, এইরূপ অনেক ঘটনা সে বলিল। বলিবার সময় তাহার সেই ভয় আবার নূতন করিয়া সে অনুভব করিল ও তাহার বন্ধুদের মনে তাহা সংক্রামিত হইল। ইহা আর্ট। ইহাতে যথেষ্ট আয়াসের স্থান আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "সৌন্দর্য্য-বোধ" নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন—"সত্যকে যখন শুধু আমরা চোখে দেখি, বুদ্ধিতে পাই তখন নয়, কিন্তু যখন তাহাকে হৃদয় দিয়া পাই তখন তাহাকে সাহিত্যে প্রকাশ করিতে পারি। তবে কি সাহিত্য-কলা কৌশলের সৃষ্টি নহে—তাহা কেবলি হৃদয়ের আবিষ্কার? ইহার মধ্যে সৃষ্টিরও একটা ভাগ আছে।"

কিন্তু তথাপি এক-শ্রেণীর লেখক বলিয়া আসিতেছেন যে, আর্ট স্বপ্রকাশ। তাহার জন্মের জন্য সে-ই একা দায়ী। এই শ্রেণীর লেখকেরা সকলেই বোধ হয় গানের কবি (lyric poet)। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার What is Art? নামক আমেরিকায় পঠিত ইংরেজী প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"Such discussions (i.e. regarding what is art) introduce elements of conscious purpose into the region where both our faculties of creation and enjoyment have been spontaneous and half-conscious"। অর্থাৎ—আর্ট কি? এই-প্রকারের আলোচনা সৃষ্টি ও উপভোগ-রূপ মনের যে অর্দ্ধচেতন ও সহজ বৃত্তি আছে তাহাতে স্বেচ্ছাপ্রসূত উদ্দেশ্য জাগাইয়া তোলে। শেলীর সেই এয়োলিয়ান বীণার (Aeolian harp) সহিত কবি-হৃদয়ের তুলনা বোধ হয় সকলেই জানেন। বীণা সুরে সাধা আছে—পৃথিবীর চারি কোণ হইতে বাতাস আসিয়া তাহার তন্ত্রীতে ঝঙ্কার দিতেছে। ইহাই হইতেছে কবির হৃদয়। মানুষের সুখ, দুঃখ, হাসি কান্না, বিরহ, মিলন, বিচ্ছেদ ও প্রেম, ভক্তি ও ত্যাগ, শরতের তরল মেঘ, বৈশাখের দারুণ অগ্নি, বর্ষার জলভরা শ্যামল কান্তি, বসন্তের সুষমা, আবার পথের ধারের ক্ষুদ্র ডেজি ফুল ও বাগানের বেড়ার উপেক্ষিত কন্টিকারি—সকলেই কবির চিত্তকে জাগ্রত করিতেছে। তাহার ভিতর দিয়া সমগ্র মানবত্ব নব নব জন্ম পাইতেছে—এইখানেই সে তাহার খণ্ডহীন সমস্তকে পূর্ণভাবে পাইতেছে; আবার যেখানেই এচিত্ত জাগ্রত হয় সেইখানেই সে বাহিরে আসিবার জন্য ব্যস্ত হয়। এবং সেইখানেই সে বৃহৎ মানব-সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য প্রয়াসী হয়। এইখানেই গানের সৃষ্টি। গানের কবিদের অন্তরে ভাবগুলি এমন এক কাঁপন ধরায় যে, কবিরা আর স্থির থাকিতে পারেন না। এই অবস্থার মধ্যে যে সাহিত্য জন্মগ্রহণ করে তাহা হইতে ইচ্ছা, প্রয়াস ও উদ্দেশ্যকে মানুষ দূরে রাখিতে চায়—কেননা সে-সমস্ত এখানে অবচ্ছায়ার মত বর্ত্তমান। তাহারা কবির ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এক হইয়া যায়। আনন্দ হইতে এই বিশ্ব জন্মগ্রহণ করিয়াছে—এবং যদি কোন সাহিত্য এই আনন্দে জন্মিয়া থাকে তবে তাহা এই গীতি-কাব্য (lyric poetry)। এখানে আয়াস বর্ত্তমান কিন্তু ক্ষীণ। চেতনাও অর্দ্ধ-জাগ্রত। গানের সুর স্বতঃস্ফূর্ত্ত, কিন্তু তাহার ভাষা তাহার চেষ্টার সাক্ষ্য বহন করে। নিজের মনে যে আনন্দ বা ব্যথা প্রকাশের জন্য আঁকুপাঁকু করে তাহা যতই সরল ও নিরলঙ্কার হউক বিশ্ব-জনের সম্মুখে বাহির করিতে হইলে তাহার জরির পোষাক চাই। আমার মনে হয় আমার যাহা সুখ-দুঃখ তাহা পরেরও হউক। তাই আমি কত করিয়া পরকে আমার কথাটি বুঝাই, ভয় হয় পাছে সে না বোঝে—পাছে আমার ভাবটি তাহার প্রাণে সাড়া না দেয়। তাই কত দশগুণ বড় করিয়া তাহাকে ধরি—যাহাতে সকলে দেখিতে পায়। তবে চেষ্টা কাহারও কম করিতে হয়, কাহারও বেশী করিতে হয়। যিনি প্রতিভাবান্, ভগবান্ তাঁহার কণ্ঠে এমন সুর, জিহ্বায় এমন ভাষা দিয়াছেন যে, নিমেষের চেষ্টাতেই তিনি প্রাণের গভীরতম রহস্য লোক-চক্ষুর সম্মুখে আনিতে পারেন। তাঁহার হৃদয় ও মনোবৃত্তিগুলি এত সজাগ, এমন অদ্ভুত যে, অভ্যাস ও নিয়মের তিনি বহু উর্দ্ধে। এখানে তাঁহার রচনাকে বিচার করিতে হইলে তিনি কিরূপ তাহার জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কেননা কবি গানের মধ্যে তাঁহার সমগ্র হৃদয় ও শিক্ষা-দীক্ষা, রুচি, কুরুচি—অর্থাৎ তাঁহার সম্পূর্ণ মানবত্বকে, নিঃশঙ্ককে ঢালিয়া দেন।

অনেক সময়ে কবি বলেন যে, আমার মনের অন্ধকার গুহায় যে আনন্দ-ধ্বনি বাজে তাহাই আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রকাশিত হয়, তাহা আমার আনন্দের জন্য, আমার খুসীর জন্য, তাহা লইয়া বিশ্বের লোক অত মারামারি করে কেন? যদি ঐ কবি কবি-শ্রেষ্ঠ কীট্‌সএর মত বলিতেন যে, নিশার গভীর অন্ধকারে যাহা লিখিব তাহা যদি সূর্য্যালোকের সঙ্গে সঙ্গে পোড়াইয়া ফেলিতে হয় তবুও আমি লিখিব, তাহা হইলে বলিবার কিছু থাকিত না। কেননা কবিতা কীট্‌সের জীবন ছিল। কিন্তু সকলের ত তা নয়। সকলে ত শুধু নিজের আনন্দের জন্য আর্ট্ সৃষ্টি করেন না। বরঞ্চ সকলে পড়িয়া যাহাতে বেশ আনন্দ লাভ করে ও বিশ্বে তাঁহাদের যশ হয় তাহার জন্য পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন—কিছু অর্থোপার্জ্জনও তাহার লক্ষ্য থাকে। তাঁহাদের যুগে বা তাঁহাদের জন্মভূমিতে যশ না হইলে বিপুলা পৃথ্বী ও নিরবধি কালের দিকে আশাপূর্ণ অন্তরে চাহিয়া থাকেন। আসল কথা—রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "সাহিত্যের বিচারক" নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন—"আমাদের অধিকাংশ হৃদয়-ভাবেরই এই দুইটা দিক্ই আছে,একটা নিজের জন্য, একটা পরের জন্য। আমার হৃদয়-ভাবকে সাধারণের হৃদয়ভাব করিতে পারিলে তাহার একটা সান্ত্বনা—একটা গৌরব আছে। আমি যাহাতে বিচলিত, তুমি তাহাতে উদাসীন—ইহা আমাদের কাছে ভাল লাগে না।" তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, শোকাতুরা মাতা শুদ্ধমাত্র প্রাণের বেদনা বিশ্বের কাছে ঘোষণা করেন না—কিন্তু বিশ্বের সমস্ত অবজ্ঞার বিরুদ্ধে তাহার সন্তানের সহস্র সহস্র খুঁটিনাটি গুণাবলি, ক্রিয়া-কলাপ হাসি-কান্না, কত ভুলে-যাওয়া ছোট ছোট কাজ পড়শীদের স্মরণ-পথে আনিয়া দেন—যাহাতে তাহারাও তাঁহার গভীর বেদনার সমভোগী হয়। পড়শীরাও হয়ত ব্যথায় ব্যথিত হয়, কিন্তু স্নেহান্ধ মাতার সব কথা তাহারা বিশ্বাস করে না বা সমান আদর করে না। তাহারা তাহার সমালোচনা করিয়াই থাকে। কবিতার বেলাও এই কথাই প্রযোজ্য।

এই হইল গানের কথা। গান ব্যতীত অন্যান্য-প্রকারের সাহিত্যে প্রয়াসের স্থান বেশ আছে। উদ্দেশ্যও বেশ পরিস্ফুট হয় যদি সাহিত্যিকের কিছু দিবার থাকে। নাটক, উপন্যাস, মহাকাব্য এইসকলের মধ্য দিয়াই সাহিত্যিক বড় সাবধানতার সঙ্গে পথ চলেন—তিনি প্রত্যেকটি স্থান ও পাত্র কোন-এক বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া অবতারণা করেন। তিনি তখন খুব সচেতন।

এপর্য্যন্ত আমরা আর্ট ও প্রকৃতিতে বিরোধ, আর্ট্ ও ফাইন্ আর্টস্এ কি প্রভেদ, আর্টে চেষ্টা ও উদ্দেশ্যের স্থান কতটুকু তাহাই বিচার করিয়াছি। এইবার আমরা দেখিব—আর্টের লক্ষ্য কি, কোন্ বস্তু ইহাকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হয়—মানব-জীবনে ইহার স্থান ও প্রভাব কি ও সামাজিক জীবনে ইহার কি দায়িত্ব।

আর্টের লক্ষ্য কি বা আর্টের সাহায্যে কোন্ বস্তু প্রকাশিত হয় এই কথা বিচার করিতে গেলে দেখিতে পাই কত বিভিন্নপ্রকারের আশ্চর্য্য মত মানব-মনের উপর প্রভুত্ব করিয়া গিয়াছে। এখনকার দিনে আমাদের কাছে তাহারা অকিঞ্চিৎকর মনে হইতে পারে, কিন্তু এক সময় তাহারা মানব-মনের চিন্তা ও ইচ্ছাকে নিয়মিত করিত। সেই সোক্রাতিসের আমল হইতে আজ পর্য্যন্ত কত মতই না প্রচারিত হইয়াছে। ইহা হইতেই বোঝা যায় বস্তুটি ধারণার কত অগম্য। এই মতের বিভিন্নতার মধ্যে সামঞ্জস্য আনয়ন করাও কত কঠিন!

আমাদের দেশে প্রাচীন কালে সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব, আর্ট ও আর্টের বিষয় লইয়া বোধ হয় খুব বেশী বিরোধ হয় নাই, আজকালকার বৈজ্ঞানিক প্রণালীতেও ওবিষয়ের বিচার হয় নাই। কতকগুলি মত সকলেই এক-রকম মানিয়া লইয়াছিলেন। তাই সংস্কৃত সাহিত্যে আমরা দেখিতে পাই রস-সৃষ্টিই কাব্যের প্রাণ—এই কথা সকলে মানিয়া লইয়াছেন। সাহিত্য-দর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ "কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং" ও কাব্য-প্রকাশ-প্রণেতা মম্মট ভট্ট "কাব্যং রসাদিমৎ বাক্যং" বলিয়া একই ভাবের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। কিন্তু রস কি? বিশ্বনাথ কবিরাজ বলিয়াছেন, চিত্ত-দ্রবকারী অলৌকিক চমৎকারিত্বময় আনন্দ বিশেষের নামই রস। ইহা কথার দ্বারা বুঝান যায় না। আনন্দ যেমন কাহাকেও বলিয়া বুঝান যায় না

সকলেই বোঝে তেমনি রসও কি বস্তু তাহা সকলে বোঝে—বাক্য দ্বারা বুঝান যায় না। রসের ধারণা কঠিন বলিয়াই হউক অথবা রসের সম্বন্ধে সংস্কৃত সাহিত্যে উচ্চ ধারণা ছিল বলিয়াই হউক রসাস্বাদের সঙ্গে ব্রহ্মাস্বাদের তুলনা করা হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শ খুব উচ্চ ছিল। উৎকৃষ্ট সংস্কৃত সাহিত্য পাঠ করিলে মন একটা উচ্চভাবে পূর্ণ হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে এমন অনেক জিনিষ আছে যাহা এখন আমরা পড়িতে লজ্জা পাই কিন্তু মোটের উপর যে ভাবটি মনে শেষ পর্য্যন্ত থাকিয়া যায় তাহা মনকে সতেজ করে, পবিত্র করে, সুন্দর করে। কাব্যের বস্তু-সম্বন্ধে তখনকার লোকদের কি আদর্শ ছিল তাহা আমরা মম্মট ভট্টের "কাব্য-প্রকাশে" কাব্যের ফল-নির্দ্দেশ-ব্যপদেশে দেখিতে পাই। তিনি লিখিয়াছেন—

"কাব্যং যশসেঽর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে
সদ্যঃ পরনিবৃতয়ে কান্তাসংম্মিততয়োপদেশযুজে।"

অর্থাৎ কাব্যে যশ ও অর্থ হয়, লোক-ব্যবহার জানা যায়, অমঙ্গল নাশ হয়, বাধাহীন আনন্দ পাওয়া যায় এবং তাহা স্ত্রীর উপদেশের মত মধুর উপদেশ-বাক্যে পূর্ণ থাকে। সুতরাং শুধু বাক্যের বিন্যাস কাব্য নয়। ইহাতে আনন্দ, শিক্ষা ও জ্ঞানের স্থান আছে। কাব্য-পাঠ করিয়া লোক-ব্যবহার জানা যায়—জাতীয় ও ব্যক্তিগত অমঙ্গল নাশ হয়—দেশের বা জাতির চরিত্র গঠন হয়। নিকৃষ্ট সাহিত্য যেমন জাতিকে পাপের পথে লইয়া যায়—তেমনি সৎসাহিত্য মঙ্গলের পথে লইয়া যায়।

মোটের উপর আর্ট-সম্বন্ধে সংস্কৃত সাহিত্যে আমরা এই দেখি যে, নয়প্রকার রস ও ভাবের সৃষ্টিই কাব্য। ভারতীয় কাব্য, চিত্র ও ভাস্কর্য্য সকলের মধ্যেই এই রসসৃষ্টি করা হইয়াছে। কিন্তু এইসব রসসৃষ্টিরও বহু নিম্নে ভারতীয় কলার অন্তরের মধ্যে লুক্কায়িত দেখিতে পাই একটি অতীন্দ্রিয় সত্তার প্রভাব। এই অসীমের প্রভাব—এই খণ্ডের সহিত অখণ্ডের অন্তর্নিগূঢ় যোগ—ইহাই ভারতীয় কলার বিশেষত্ব। একখানি ভারতীয় কাব্য বা চিত্র যদি শুধু কাব্য বা চিত্র হিসাবে বিবেচিত হয় তবে দেখিব তাহা আধখানা। তাহার আসল ভাগটি ছাটিয়া ফেলা হইয়াছে। প্রত্যেক চিত্র একটি বৃহত্তের খণ্ড মাত্র। অজন্তা গিরি গুহার প্রত্যেকটি লতা অনাদি ও অনন্ত। সে কোন্ নির্দ্দেশ-বিহীন রাজ্য হইতে আরম্ভ করিয়া আবার কোন্ অসীমের মধ্যে পথ হারাইয়াছে। আমরা যেটুকু দেখি সেটুকু তাহার খণ্ডরূপ মাত্র। প্রত্যেক রেখা অনাদি অনন্ত। গণনাতীত বাহুল্য তাহার সৃষ্টির মধ্যে। স্রষ্টা যেন সৃষ্টি-সিন্ধু মন্থনে ক্ষেপিয়া গিয়াছেন। এক-একটি চিত্রের মধ্যে কত লোক—কত ফুল—কত পাতা—সকলই সীমাহীন! মন্দিরের উচ্চ চূড়াও অন্তহীনতার মধ্যে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে যেমন রস-সৃষ্টি ছিল, তেমনি য়ুরোপীয় সাহিত্যকার ও দার্শনিকদের মতে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিই ছিল সাহিত্যের কার্য্য। য়ুরোপে ইহা লইয়া বেশ একটা আলোচনাও হইয়া গিয়াছে। গ্রীক্ সভ্যতার প্রাণ ছিল সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি; এবং গ্রীক্ সভ্যতার গুরু সোক্রাতিস্, প্লেটো ও আরিষ্টটলের লেখার মধ্যে এসম্বন্ধে বেশ একটা স্পষ্ট ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা পৃথিবীর সেই প্রাচীন কালেই সৌন্দর্য্যকে বেশ বিচারের চক্ষে দেখিয়াছিলেন। সোক্রাতিসের সৌন্দর্য্য মঙ্গলের সঙ্গে ও ব্যবহারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ। প্লেটোর সৌন্দর্য্য জড় জগতের বস্তু নহে—অধ্যাত্ম-লোকের অদৃশ্য বস্তু—ইহার ছাপ যেখানে পড়ে সেখানেই মানুষ সৌন্দর্য্য পায়। আরিষ্টটল্ সৌন্দর্য্যকে ব্যবহার ও মঙ্গল হইতে পৃথক্ করিয়াছেন। তিনি মনে করিতেন সৌন্দর্য্যের মুখ্য উদ্দেশ্য আনন্দ-দান। গ্রীসে ও ইটালীতে সৌন্দর্য্যতত্ত্ব খুব আলোচিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু খৃষ্ট-ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের অব্যবহিত পূর্ব্বে ও সমসাময়িক কালে আর্টের নামে এত ব্যভিচার ও কুরুচির প্রশ্রয় পাইয়াছিল যে খৃষ্টধর্ম্মের প্রচারের সঙ্গে-সঙ্গে ঐ আর্ট্ বন্ধ করা খৃষ্টানের পক্ষে ধর্ম্মের অঙ্গ হইয়াছিল। খৃষ্টধর্ম্ম মঙ্গলের বার্ত্তা লইয়া জগতে সমুদিত হইয়াছিল। সুতরাং আর্টের সু-উচ্চ দেওয়াল যাহা মানুষ হইতে মানুষকে পৃথক্ করিয়াছিল এবং যাহা নৈতিক শিথিলতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিলাসের প্রশ্রয় দিয়াছিল ও জাতীয় জীবনের অবনতি সাধন করিয়া মানব-সমাজকে পশুর সহধর্ম্মী করিয়াছিল তাহাকে

ধূলিসাৎ করা তখনকার দিনের ধর্ম্মের প্রধান কার্য্য হইয়াছিল। ইহাতে জগতের বিশেষ ক্ষতিও হয় নাই। তখনকার আর্ট মানব-জীবনের খোরাক দিতে অসমর্থ ছিল —এবং খৃষ্টধর্ম্ম তাহার জীবনের নবীন অনুভূতি ও অর্থ দ্বারা বিশ্বের সে ক্ষুধা পূর্ণ করিয়াছিল। পরে যখন পুনরায় খৃষ্টধর্ম্ম চার্চ্চের ধর্ম্মরূপে প্রচারিত হইল তখন পুনরায় এক নূতনপ্রকারের আর্টের সৃষ্টি হইল। খৃষ্ট ও মেরীর অলৌকিক কাহিনী, দ্বাদশ শিষ্যগণের অদ্ভুত ক্রিয়া-কলাপ, খৃষ্ট ভক্তগণের দেবভাব, আশ্চর্য্য ভক্তি ও প্রেম ও পরে মধ্যযুগে লৌহবর্ম্মাবৃত খৃষ্টীয় নাইটগণের নানা গুণাবলী কীর্ত্তন করাই তখনকার আর্টের একমাত্র কার্য্য ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর পর হইতে উচ্চস্তরের খৃষ্টানদিগের মধ্যে প্রচলিত খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি অবিশ্বাস আসিল ও পরে রেনেসাঁস্ (Renaissance) বা নব-জীবনের সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত ধর্ম্মে সম্পূর্ণ অনাস্থা ও আর্টে যুগ-পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। ইহার ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আনন্দই আর্টের লক্ষ্য হইয়া পড়িল। খৃষ্টধর্ম্মের মঙ্গলভাব কাব্য ও কলা হইতে নির্ব্বাসিত হইল। পরে আনন্দ আবার আমোদের সমার্থ হইয়া পড়িয়াছিল। এই যুগের সাহিত্যের মধ্যে অনেক উৎকৃষ্ট জিনিষ আছে, কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে কিরূপ রুচির বিকার হইয়াছিল তাহার সাক্ষ্য এই যুগের সাহিত্য চিরকাল বহন করিবে। এই যুগের শ্রেষ্ঠ কবি শেক্স্পীয়র পর্য্যন্ত এই দোষ হইতে মুক্ত নন। আর্টকে বিচারের ও বিশ্লেষণের চক্ষে দেখা প্রথমে অষ্টাদশ শতাব্দীর জার্ম্মানীতেই আরম্ভ হইয়াছিল। Baumgarten (বাউম্গার্টেন) একালের আর্টের আদি সমালোচক। তিনি বলিয়াছেন সৌন্দর্য্য আর্টের লক্ষীভূত। মানুষ বুদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়া চরম সত্যে উপনীত হয়—আর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সৌন্দর্য্যকে উপলব্ধি করে। এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, ইন্দ্রিয়-রথে সৌন্দর্য্যের আলোকপুরীর দিকে রম্য প্রয়াণ করিতে যাইয়া যে-আর্টের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে আর্টের মর্য্যাদা সব সময় রক্ষিত হয় নাই। Baumgarten (বাউম্গার্টেন) যে মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহাতে অনেক বিপদের সম্ভাবনা আছে। তাঁহার মতে আর্ট্ সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করে এবং এই সৌন্দর্য্য আমাদের মধ্যে কামনার (desire) সৃষ্টি করে। যাহা সুন্দর তাহাকে আমরা পাইতে চাই। কাণ্ট্ সৌন্দর্য্যকে আর্টের জনক বলিয়াছেন কিন্তু ইহা হইতে কামনাকে বাদ দিয়া ইহাকে মুক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, মানুষের চিন্তা ও ইচ্ছা বাদে আর-একটি শক্তি আছে তাহা বিচার করে— তাহা যুক্তি-তর্ক ব্যতীত বিচার করে এবং কামনা-বিহীন আনন্দের সৃষ্টি করে। ইহার উপরই মানুষের সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার মতে সৌন্দর্য্য তাহাই যাহা মানুষের লাভ-ক্ষতির দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া সকলকে শুধু আনন্দ দান করে এবং চিরকাল করিবে। ব্যক্তিগত ব্যবহারের লেশমাত্র গন্ধ ইহাতে নাই। শিলারও (Schiller) এই মতাবলম্বী ছিলেন। ফিক্‌টে (Fichte) সৌন্দর্য্যকে দ্রষ্টার চক্ষের বিষয়ীভূত করেন এবং মানবাত্মার রম্যপুরীতে তাঁহার স্থান নির্দ্দেশ করেন। এই যে সুন্দর আত্মা ইহার বাহিরের প্রকাশই আর্টের বিষয়ীভূত এবং ইহার কার্য্য মানুষকে শিক্ষা দান করা—শুধু মন নয়—শুধু হৃদয় নয়, কিন্তু সমগ্র মানবকে ইহা সম্পদে পরিপূর্ণ করে। আর্ট্ তাহার নিকট বাহিরের জিনিষ নহে—ইহা শিল্পীর সুন্দর হৃদয়ের প্রকাশ। এইখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমরা একটা সুন্দর মিল পাই। তিনি তাঁহার What is Art? নামক প্রবন্ধে এই কথাটিই স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়াছেন। তিনি সমস্ত প্রবন্ধের মধ্যে এই কথাটি বারবার বলিয়াছেন— "The principal object of Art is the expression of personality" অর্থাৎ আর্টের মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। কিন্তু এই যে personality বা ব্যক্তিত্ব ইহা সংযমের দ্বারা সুন্দর, স্থির ও গম্ভীর হওয়া চাই, নতুবা আর্ট সুন্দর হইবে না—এই কথা তাঁহার সৌন্দর্য্যতত্ত্বে বলিয়াছেন। ভারতীয় চিন্তার অনুসরণ করিয়া হেগেল্ বলিয়াছেন যে, বিশ্ব-প্রকৃতিতে ও আর্টে ভগবানের সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয়। তিনি প্রকৃতিতে ও মানবাত্মায় স্ফূর্ত্ত হইয়াছেন। আত্মা ও যাহা আত্মিক তাহাই শুধু সুন্দর। বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য পরমাত্মার সৌন্দর্য্যের প্রতিচ্ছবি মাত্র। এই জগতের পশ্চাতে যে এক বিরাট্ ভাব (idea) আছে তাহা ইন্দ্রিয়-

গ্রাহ্য মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হয়। আর্ট্ ধর্ম্ম ও দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে কলা ও সাহিত্যের মধ্যে এই ভাবকে মূর্ত্ত করিয়া তোলে এবং মানব-জীবনের গভীরতম সমস্যা ও পরমাত্মার সম্বন্ধে মহোচ্চ সত্য লইয়া কার্‌বার করে। তিনিও Keatsএর মতন বলেন, সত্য ও সুন্দর এক। ডারউইন্, স্পেনসার্ প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, পশুদিগের মধ্যেও আর্ট বর্ত্তমান। স্ত্রীপুরুষের মিলনেচ্ছা ও ক্রীড়ার মধ্যে আর্টের জন্ম—ইহাতে স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে একরকম সুখপ্রদ চঞ্চলতা আসে। টলষ্টয়ের মতে তাহাই আর্ট্ যাহা মানব-হৃদয়ের ভাবনিচয় প্রকাশ করিয়া অপরের মধ্যে সংক্রামিত হয় এবং হৃদয়ে হৃদয়ে যোগ-সাধন করে। তিনি আর্ট্‌কে বিষয়-ভেদে উচ্চ-নীচ সঙ্কীর্ণ ও বিশ্বজনীন বলিয়াছেন। যে আর্ট্ কোন যুগের মানব-জীবনের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ ও অনুভূতি (যাহাকে সেই যুগের ধর্ম্ম বলা হয়) সাহিত্যে বা কলায় প্রকাশ করে তাহাই প্রকৃত আর্ট্ বলিয়া পরিচিত হয়। প্রকৃত আর্টের ভাষা সরল ও তাহা বিশ্বের উপভোগের সামগ্রী। তাহা ধনীর প্রাসাদ হইতে দরিদ্র কৃষকের কুটীর পর্য্যন্ত সমাদৃত হয়। রবীন্দ্রনাথ আর্টের কোন সংজ্ঞা দিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। তিনি আর্ট্‌কে মানব-হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রকাশ বলিয়াছেন। তাঁহার মতে মানবের ব্যক্তিত্ব আর্টে প্রকাশিত হয়। সেইজন্য তিনি আর্টের কি সামগ্রী, কোন্ আর্ট উচ্চ বা নীচ তাহা বলিবার কোনো চেষ্টা না করিয়া সেই আর্ট যাহার হৃদয়-ভাবের প্রকাশ সেই ব্যক্তির মধ্যে কি সম্পদ্ আমরা আশা করিব তাহার সম্বন্ধেই বলিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত এক-শ্রেণীর কলাবিদেরা—তাঁহাদের অধিকাংশই ইংলণ্ডবাসী—আর্ট্ কি বুঝাইতে যাইয়া, আর্টের সামগ্রীর নাম করিয়াছেন। যথা—বিশ্বপ্রেম বা বিশ্বজনীনতা, শৃঙ্খলা, পৌর্ব্বাপৌর্য্য, সমপ্রাণতা, বৃহতের জন্য ক্ষুদ্রের স্বার্থনাশ, সমগ্রের সঙ্গে খণ্ডের ঐক্য, শাশ্বত বস্তু, ইত্যাদি।

আমরা এখানে শুধু প্রধান মতগুলিরই বিচার করিব। বাউমগার্টেনের (Baumgarten) সুন্দর শুধু আনন্দদানই করে না তাহা কামনার সৃষ্টি করে। ইহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু। তাঁহার এই সিদ্ধান্ত ইম্প্রেশনিষ্ট (impressionist) আর্টের সৃষ্টির সহায়তা করিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন যে, বিশ্বপ্রকৃতিতে আমরা সর্ব্বোচ্চ সৌন্দর্য্য দেখি—সুতরাং প্রকৃতিকে কপি করাই আর্টের চরম উদ্দেশ্য। ইহার ফলেই আমরা (impressionist) ইম্প্রেশনিষ্ট্ আর্টের মধ্যে খুব রংঙের ছোপ দেখিতে পাই। নীতির অভাব ও রঙের প্রাচূর্য্যবশতঃ পারীর সালঁতে এই দলের একজন প্রধান শিল্পী, ম্যানেটের "অলিম্পিয়া" নামক চিত্রখানি আনন্দ দান দূরে থাকুক, ঘৃণার সঞ্চার করিয়াছিল। তা ছাড়া সৌন্দর্য্যকে কামনার বস্তু বলায় বিপদের সম্ভাবনা আছে। যেখানে সৌন্দর্য্য উচ্চ অঙ্গের—যেখানে তাহা অতীন্দ্রিয় সেখানে নয়, কিন্তু যেখানে তাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সেখানে। কাণ্টের অনুসরণ করিয়াই সালি (Sully) আর্ট্‌কে শুধু শিল্পী, শ্রোতা বা দ্রষ্টার যুগপৎ আনন্দ দানে নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা যে অর্থে এই কথাগুলি ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাদের পরে লোকে ভুলিয়া গিয়াছে। এখন আনন্দ আমোদে পরিণত হইয়াছে। জীবন্ত প্রাণের সঙ্গে যোগ হারাইয়া আনন্দ অনেক সময় হাতীর নাচ অপেক্ষাও বীভৎস হয়।

হেগেলের মতে যাহা পারমাত্মিক বা যাহা পরমাত্মার প্রকাশ তাহাই আর্টের বিষয়ীভূত, কেননা তাহাই সুন্দর এবং তাঁহাদের মতে সুন্দরের প্রকাশই আর্ট্। এখানে ধর্ম্মের সহিত সাহিত্যের এক যোগসূত্র বাঁধা হইয়াছে। এই মতকে টলষ্টয় ভিত্তিহীন 'ধোঁয়াটে' প্রভৃতি বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, এই মতের দ্বারা সৌন্দর্য্য, যাহার স্বরূপ একেই বোঝা কঠিন, তাহাকে অধিকতর অবোধ্য করিয়া তোলা হইয়াছে। রসাস্বাদকে ব্রহ্মাস্বাদের সঙ্গে তুলনা করিয়া বুঝাইতে গেলে যেমন কোনটাই পরিষ্কার হয় না সেইরূপ সুন্দরকে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত করায় সাধারণ লোকের বুঝিবার ক্ষমতার কিছু সহায়তা হয় নাই। এই মতের দ্বারা আর্টের কার্য্য অনিশ্চিত করা হয়। যাহাতে আর্ট্ কি তাহা সকলের সুবোধ্য হয় সেইহেতু টলষ্টয় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে আর্টের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, সকল প্রকার হৃদয়ভাবের সচেতন প্রকাশই আর্ট। বাক্যদ্বারা আমরা চিন্তা প্রকাশ করি,

কিন্তু হৃদয়ের আবেগময় ভাবগুলিকে আর্টের সাহায্যে বিশ্বের নিকটে ধরি। ইহাতে আর্ট্‌কে খুব উদার ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। ইহা প্রকাশের একটা বিশেষ উপায় মাত্র। কিন্তু টলষ্টয় এইখানেই ক্ষান্ত থাকিতে পারেন নাই। আর্ট্‌ যখন মানুষের একপ্রকার কাজ তখন তাহা অন্যান্য কাজের মত বিচারিত হইবে। দেখিতে হইবে ইহার প্রচার জগতের কল্যাণকর কি না— ইহা মানুষকে তাহার জীবনের লক্ষ্যের দিকে লইয়া যায় কি না। মনে অনেক কথার উদয় হইতে পারে, কিন্তু সমাজে সকল কথা বলা চলে না—ভদ্র হইতে হইলে মনের উপর একটা শাসন চাই—সেইরূপ আর্টের সাহায্যে যে-কোন হৃদয়-ভাবকে আমরা প্রচারিত করিতে পারি না। শুধু যাহা ভদ্র ও শুভ আর্ট্‌ তাহাই সমাজ স্বীকার করিয়া লয়, অপরগুলি নিন্দনীয় হয়। কিন্তু কোন্ আর্ট ভদ্র আর কোন্‌টি অভদ্র তাহা অনেকে বোঝে না। সেই জন্য টলষ্টয় শ্রেষ্ঠ আর্ট্‌ কি তাহা বোঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, আর্টের শুধু সংক্রামণী শক্তি বা আর্টিষ্টের তন্ময়তা থাকিলেই চলিবে না। দেখিতে হইবে যুগ-বিশেষের আর্টে সেই যুগের সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মানুভূতি বা আদর্শ গৌরবান্বিত হইয়াছে কি না। আর্টের এই জাতিভেদের দরুন্ আর্ট্‌কে সঙ্কীর্ণ করা হইয়াছে। ইহার ফলে সামান্য কয়েকখানি গ্রন্থই তাঁহার নিকট সমাদৃত হইয়াছে। আর্টকে তিনি প্রথমে উদারতার উপর স্থাপিত করিয়া পরে সঙ্কীর্ণতার দিকে লইয়া গিয়াছেন। কোন্ যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মানুভূতি কি তাহার উত্তর বড় সহজ হইবে না। ধর্ম্মের আদর্শ ও অনুভূতি একই যুগে বিভিন্ন হইতে পারে। তার পর এই মতের প্রতিষ্ঠা-ভূমিই কি হেগেলের মতের অপেক্ষা সহজতর হইল? ইহাও ত শেষে সেই অপরিষ্কার—ধোঁয়াটে—ভিত্তিহীন হইল। টলষ্টয় বলিয়াছেন যে, আর্টিষ্ট্‌ যে অনুভূতি ও আদর্শকে প্রাণবান্ করেন তাহা যদি সর্ব্বদেশের, সর্ব্বকালের, সর্ব্বজনের উপভোগ্য হয় তবে তাহাই প্রকৃত আর্ট্‌। প্রকৃত আর্ট্‌ চিনিবার ইহা একটা উপায় বটে, কিন্তু সেই আর্টিষ্টের সমসাময়িক লোকদের ইহাতে কোন সুবিধা হয় না। যখন কোন আর্ট্‌ দেশকে নীচের দিকে লইয়া যায়, তখন তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিবার অধিকার কাহারও থাকে না। টলষ্টয় শুধু বুদ্ধের বাণী, বাইবেল প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের ধর্ম্মগ্রন্থকেই প্রকৃত আর্ট্‌ বলিয়াছেন ইহাতে দেখা যায় তাঁহার মত বড় উদার ছিল না—কেননা সত্য-সত্যই এইসবগুলি ব্যতীতও আরও উচ্চাঙ্গের আর্ট আছে। টলষ্টয় শ্রেষ্ঠ আর্ট সম্বন্ধে এই বলিয়াছেন যে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারে। বুঝাইয়া দিলে এক মানুষের হৃদয়ভাব অপরেও বুঝিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সকলে সকলের হৃদয়ভাব অনায়াসে বুঝিবে ইহা ঠিক মনে হয় না। একজন যদি অধিক চিন্তাশীল হয় আর-একজন যদি চিন্তাশীল না হয় তা' হইলে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির চিন্তার ধারা অপরে কি করিয়া বুঝিবে? ধ্যানযোগে ঋষিরা চিন্ময়-স্বরূপ ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করিয়া যেসকল অমৃতময় শ্রুতি রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা কি সাধারণ লোকে সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে? রবীন্দ্রনাথের গীতি-কবিতাগুলি অনেকেরই নিকট সহজবোধ্য নয়, কিন্তু যাঁহারা ভাবুক, প্রেমিক—যাঁহারা হৃদয়ের মধ্যে অসীমের স্পন্দন পান তাঁহারা সহজেই বোঝেন। রবীন্দ্র-নাথের ভাষা সম্বন্ধেও কাহারও কিছু বলিবার নাই, কেন না তাঁহার ভাষা সরল। তবুও যাঁহারা বোঝেন না তাঁহারা নিশ্চয় রবীন্দ্রনাথের চিন্তার অনুসরণ করিতে পারেন না। হয়ত চিন্তা-রাজ্যে রবীন্দ্রনাথ যে-স্থানে পৌঁছিয়াছেন সেখানে তাঁহাদের ক্ষণিকের জন্যও প্রবেশাধিকার হয় নাই।

আমরা ফিক্‌টে ও রবীন্দ্রনাথের প্রক্ষিপ্ত আলোকে যদি হেগেলের মতটির বিচার করিতে প্রবৃত্ত হই তবে দেখিতে পাইব টলষ্টয়ের মত অপেক্ষা ইহা কোন-কোন বিষয়ে বেশ প্রশংসনীয়। আসল জায়গায় টলষ্টয় ও হেগেলের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। অর্থাৎ সুন্দর হইতে সত্য ও মঙ্গলকে পৃথক্ করেন নাই। তার পর সত্যই কি হেগেলের মতটি "founded on nothing"—ভিত্তিহীন? যদি ফিক্‌টের মতন আমরা বলি আত্মাতেই সৌন্দর্য্যের বাস ও সুন্দর আত্মার প্রকাশই আর্ট্‌ তাহা হইলেও কি ইহা ধোঁয়ার মতন থাকিবে? রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, যেখানে আর্ট প্রকৃত আর্ট্‌ সেখানে তাহা

আলাদীন্

চিত্রকর শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৌজন্যে

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

কবির শ্রেষ্ঠতম জীবনেরই প্রকাশ। মানুষ যখন নিজের মধ্যে অমৃতের সন্ধান পায় তখনই তাহার জীবন-নদী কূল ছাপাইয়া যায়—তখনই সে সাগর-সঙ্গমের জন্য ব্যাকুল হয়, তখনই তাহার সেই চঞ্চলতা স্বর, বর্ণ ও রেখার বিচিত্র বন্ধনের মধ্যে আত্ম-প্রকাশ করে। তিনি বলিয়াছেন,

"যথার্থ উপলব্ধি-মাত্রই আনন্দ—তাহাই চরম সৌন্দর্য্য।" "সত্যের এই আনন্দরূপ, অমৃতরূপ দেখিয়া সেই আনন্দকে ব্যক্ত করাই কাব্য-সাহিত্যের লক্ষ্য।" সত্য যখন হৃদয়ের দ্বারা উপলব্ধ হয় তখন তাহা মানবের নিজস্ব হয় তখন তাহা তাহার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এক হইয়া যায়। মানবের হৃদয়-বৃন্দাবন ভূমার লীলাক্ষেত্র। মানবহৃদয় অপেক্ষা আর্টের আর নিশ্চিন্ততর ভূমি কি হইতে পারে? আর এই মত গ্রহণ করিলে কাব্যের সামগ্রী ও বিষয় কি অসীম অন্তহীন হইয়া পড়ে! কেননা ইহলোক, পরলোক এক হইয়া যায়। সংস্কৃত সাহিত্যের রস ও ভাবের কল্পিত সীমা-রেখা অদৃশ্য হইয়া যায়! আমাদের প্রত্যেক হৃদয়-ভাবের মধ্যে আমরা ভূমার স্পর্শ লাভ করি ও প্রত্যেক ভাবই উচ্চাঙ্গের আর্টের বস্তু হয়। আর মানবাত্মার সঙ্গে ব্রহ্মের যোগ যেমন বাড়ে, তেমনই বিশ্বের অণুপরমাণুর সঙ্গে তাহার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই যে ব্রহ্মানুভূতি ইহা অনন্ত, সেই হিসাবে আর্টের বিষয়ও অনন্ত হয়। অপরদিকে ইহলোকের সঙ্গে অধ্যাত্মলোকের সম্বন্ধ যাহারা ছিন্ন করে তাহারা কি দরিদ্র হইয়া পড়ে! ইহার যদি প্রমাণ কেহ চায়, তাহাকে আমরা ইংলণ্ডের অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্য (রোমান্টীক রিভাইভ্যালের আগে পর্য্যন্ত) পাঠ করিতে অনুরোধ করি। আমাদের দেশেও বৈষ্ণব-ধর্ম্মের পতনের পর হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুত্থানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই দশা ছিল।

আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, টলষ্টয়ের মতটি উদারতা হইতে আরম্ভ করিয়া সঙ্কীর্ণতার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু হেগেলের মতটি সঙ্কীর্ণ ভূমি হইতে নামিয়া বিশাল সাগরে পড়িয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ভারতীয় প্রতিভা এই দুইকে এক সমন্বয়ের ভূমিতে আনিয়াছে। তিনি যে ভূমিতে উপস্থিত হইয়াছেন, সেখানে দণ্ডায়মান হইয়া আমরা দেখি যে, যে-ভাবগুলি আপনার বেগে আপনি বাহির হইবার জন্য চিত্তকে ব্যাকুল করে তাহারা সত্য, সুন্দর ও মঙ্গল। তাই তাহারা পবিত্র। তাহারা মানব-জীবনের যাহা সর্ব্বোচ্চ অনুভূতি তাহাই প্রকাশ করে। যাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইবার জন্য হৃদয়কে ব্যাকুল করে নাই, তাহা বেগহীন, তাহার সৃষ্টির সময় মানব হৃদয় অমৃতের সন্ধান পায় নাই—বিশ্বের মধ্যে সে আপনাকে দেখে নাই—সত্যকে সে আনন্দের শঙ্খ বাজাইয়া বরণ করিয়া লইতে পারে নাই। সেখানে সে ব্রহ্মানুভূতি পায় নাই। সে হয়ত তাহার অসার, অসনাতন কয়টি কথা নানাছন্দে সাজাইয়া দেউলিয়া-হৃদয়ের দৈন্য ঢাকে। পশ্চিমের টলষ্টয় বৈজ্ঞানিক ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, কিন্তু ভারতের রবীন্দ্রনাথ ঋষিদের মতই সত্য ভূমিতে স্থান লইয়াছেন। টলষ্টয়ের মধ্যে বৈজ্ঞানিক প্রতিভা দেখিতে পাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্যের, তাঁহার মধ্যে অতীন্দ্রিয় সহজানুভূতি (mystic intuition) এত প্রবল তাঁহার মধ্যে কুয়াসার ভাব নাই—তিনি এমন এক সত্যে আসিয়াছেন যে, তাহা হইতে বিচ্যুত হইবার সম্ভাবনা নাই—তাহা [illegible]নের মূলে বাস করিয়া আছে। যাহা অভেদ টলষ্টয় তাহাকে বিভিন্ন করিয়া দেখিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ ভেদের মধ্যে অভেদকে দেখিয়াছেন। সেইজন্যই তাঁহার সকল কথা সত্য—প্রাণে নাড়া দেয়—সকল কথাই এক অপূর্ব্ব সৌরভে ভরপূর। কিন্তু আসল কথায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে টলষ্টয়ের কোন প্রভেদ নাই। তবে বৈজ্ঞানিক প্রতিভার এক সুবি[illegible] আছে, সে আপনার ভূমি বেশ করিয়া চেনে, কিন্তু যি[illegible] অদৃশ্য লোকের জ্যোতির দিকে মুখ ফিরাইয়া তাহ[illegible] প্রকাশের অপেক্ষায় আছেন, তাঁহার কাছে বিদ্যুৎস্ফু[illegible] স্থিরালোক বলিয়া ভুল হইবার বিপদ্ আছে। এইজন্যই ত অনিমেষ স্থির-দৃষ্টি চাই যাহা গ্রহতারকা চন্দ্রতপনকে ভেদ করিয়া প্রকৃতির দূর গোপন-গুহায় অবিরাম নৃত্য চলিতেছে তাহা দেখিতে পায়।

আসামে আহোম-রাজত্ব

শ্রী সূর্য্যকুমার ভূঞা

গত দশ বৎসর যাবৎ বঙ্গের সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিদ্বজ্জনের আলোচনায় আসাম এবং অসমীয়া স্থান পাইতেছে। যথার্থতঃ বলিতে গেলে বঙ্গদেশে "আসামের আবিষ্ক্রিয়া" আরব্ধ হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে বঙ্গদেশের অনেক স্থানে আসাম এবং অসমীয়া-সম্বন্ধে একটা কিম্ভূতকিমাকার ধারণা ছিল। এমন কি, বিজ্ঞানের এই চরম উন্নতির সময়ে, এই বিংশতি শতাব্দীর প্রারম্ভে অনেক বঙ্গদেশীয় শিক্ষিত ভদ্রলোক দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন যে, আসামীরা যাদু জানে, তন্ত্র-মন্ত্র পড়িয়া মানুষকে ভেড়া বানাইয়া স্বগৃহে বন্দী করিয়া রাখিতে পারে। আসামের গৌরব-সমৃদ্ধি তাঁহাদের দৃষ্টিপথে সম্যক্ পতিত হয় নাই। তাঁহারা তখন মনে করিতে পারিতেন না যে, বর্ত্তমান আসাম অর্থাৎ পৌরাণিক যুগের সুপ্রসিদ্ধ কামরূপ বা প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে রীতিমত অনাদিকাল হইতে আর্য্য-সভ্যতার এক বিপুল প্রবাহ বহিতেছে। যাঁহারা আসামে তীর্থযাত্রী হইয়া এখানে আসিতেন, বা যাহারা এখানে বহুকাল বসতি করিতেন তাঁহারাও আসাম-সম্বন্ধীয় বহুবিধ অলীক কথা বঙ্গদেশে প্রচার করিতেন। সেই সময়কার আসাম-প্রবাসীর লিখিত গ্রন্থাবলীর কাছে আরব্য উপন্যাসের একাধিক সহস্র রজনীকেও হার মানিতে হইত। দুঃখের বিষয় এই যে, যে বাঙ্গালী মনস্বীগণ ব্যাবিলন, আসিরিয়া, নিনেভা-আদি পৃথিবীর প্রাচীন ইতিবৃত্ত উদ্ঘাটনে নিযুক্ত থাকিতেন, তাঁহারাও পার্শ্ববর্ত্তী আর্য্য-সভ্যতার গৌরব-ভূমি প্রকৃতির কুঞ্জকানন এই আসামের প্রতি দৃক্‌পাতও করিতেন না। তাঁহারা কখনও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আসামের ইতিবৃত্ত এবং সামাজিক প্রথাদির আলোচনা করিতেন না। তাই এই দুই জাতির মধ্যে একটু রেষা-রেষি ও বিদ্বেষভাব প্রজ্জলিত ছিল। উপন্যাস-লেখকেরাও কোন প্রতিকূল নায়কের কপটতা বা শঠতা হইতে তাঁহাদের প্রধান নায়ক বা নায়িকাকে উদ্ধার করিবার জন্য তাহাকে আসামে আনিয়া ম্যালেরিয়া বা কালাজ্বরে ভোগাইয়া মারিতেন। আবার যদি লেখকের এমন কোনও উপনায়ক তৈয়ার করিবার প্রয়োজন ঘটিত যাহার দ্বারা প্রধান নায়ককে বিপৎ-সঙ্কুল অবস্থা হইতে উদ্ধার করা যাইতে পারে তাহা হইলে উহাকে আগে ভোজ-বিদ্যার অ্যাপ্রেণ্টিসগিরির জন্য তাঁহারা আসামে পাঠাইতেন। বঙ্গীয় জন সমাজ আসামকে মন্ত্র-পীঠ বা যোগ-ভূমি বলিয়াই জানিতেন।

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে এইরূপ ভাবের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন দেখিতেছি। খৃষ্টাব্দ ১৯০৯ সনে বঙ্গভাষাভাষী কয়েকজন সহৃদয় মহানুভব ব্যক্তি স্থির করিলেন যে, বঙ্গীয় সমাজকে আসাম সম্বন্ধে অন্ধকারে রাখা আর বিধেয় নহে। বঙ্গ-সমাজের সম্মুখে আসামের ইতিবৃত্ত ও প্রাচীন গৌরব-রাশি তুলিয়া ধরিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য-অনুশীলন-সভা গৌহাটিতে স্থাপিত হয়। তাঁহাদের যত্নে আসাম-সম্পর্কীয় অনেক বিষয় এই সভাতে আলোচিত হয় এবং সেই প্রবন্ধাবলী বঙ্গের সাময়িক এবং মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এখানে বলা আবশ্যক যে, এই শুভ অনুষ্ঠানের পুরোহিত উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনীর গৌরীপুরের অধিবেশনের সভাপতি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ। আসাম-সম্বন্ধীয় অনেক প্রবন্ধ ইংরেজী এবং বাংলা ভাষায় তিনি নিজে রচনা করিয়া সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তাঁহার চেষ্টায় পুণ্যতীর্থ পরশুরামকুণ্ডে আজ হাজার হাজার যাত্রী প্রত্যহ যাইতে পারিতেছে। উক্ত সাহিত্য-অনুশীলনী সভার সমবেত উদ্যমে বঙ্গীয় সমাজে আসামের আবিষ্কার ঘটিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে পারি— সতী জয়মতীর কাহিনী। আজ ইহা বঙ্গীয় সমাজে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতির পুণ্য-কাহিনীর ন্যায় সমাদৃত হইয়াছে। বঙ্গীয় পণ্ডিতমণ্ডলী তখন হইতে আসামের সম্বন্ধে তথ্য জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে কামরূপের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান কামাখ্যা-ভূমিতে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনীর পঞ্চম অধিবেশন হয়। সেই অবধি বঙ্গীয় ভাষাতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব-সম্পর্কীয় গবেষণাতে আসাম প্রধান উপকরণাবলী জোগাইতেছে। সাহিত্যের এই সমুত্থান-যুগে বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজে "আসামের আবিষ্কার" ব্যাপারটা ইতিহাসতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ উল্লাসের সহিত আলোচনা করিবেন।

কিন্তু এখনও বহু বিষয়ে বঙ্গীয় সমাজ আসাম-সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহেন, বলিতে হইবে। আসামে বৃটিশ-আধিপত্য স্থাপিত হওয়ার পূর্ব্বে এখানে কাহারা রাজত্ব করিতেন, তাঁহাদের শাসন-প্রণালী কি-রকম ছিল এবং তদানীন্তন অসমীয়া সমাজই বা কিপ্রকার ছিল, সে-বিষয়ে অনেকের সুস্পষ্ট ধারণা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।* বর্ত্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমরা সে-বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্যামদেশীয় টাই-জাতি আসামে আসিয়া বিজয়-পতাকা রোপণ করেন। তাঁহারা অনার্য্যজাতীয় ছিলেন। শান্ত বেদাধ্যায়ী কামরূপনিবাসী তাঁহাদের সঙ্গে কোনমতেই আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাঁহাদের দুর্দ্দান্ত অনার্য্য-শক্তির নিকটে শান্তিপ্রিয় আর্য্যশক্তির পরাজয় হইল। আর্য্যেরা এই নূতন আক্রমণকারীদিগের শৌর্য্য-বীর্য্য অতুলনীয় মনে করিয়া তাহাদিগকে "অসম" বলিতে লাগিলেন। সেই শব্দ অনার্য্য টাই-জাতির সন্তানের মুখে পড়িয়া 'অহম' রূপে পরিণত হইল। ইহা হইতেই আসাম নামের উৎপত্তি এবং ইহার প্রচার মুসলমান-সংঘর্ষণের সময় হইতেই আরব্ধ হয়।†

এই আহোম-বংশীয় প্রথম নৃপতি সুকাফা ১২২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার পর ৩৯ জন ভূপতি রাজত্ব করেন। শেষ রাজা যোগেশ্বর সিংহের সময়ে আসাম প্রদেশ ব্রহ্ম-দেশীয় সৈন্য কর্ত্তৃক উপদ্রুত হওয়ার কালে ব্রহ্মরাজার সঙ্গে ইয়াণ্ডাব সন্ধিসূত্রে আসাম-রাজ্য বৃটিশের হস্তগত হয়।

প্রায় ছয় শত বৎসর কাল রাজা সুকাফার বংশধরে বিপুল বিক্রমের সহিত আসামে রাজত্ব করেন। খৃষ্ট চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে আসাম-অধিকারের জন্য মুসলমা বাদশাহগণের প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয়। চতুর্দ্দশব মুসলমানেরা আসাম আক্রমণ করেন, কিন্তু একবার মুসলমান সেনা-নায়কগণ আসাম অধিকার করিতে পা নাই। আওরঙ্গজেবের সময় সম্রাটের প্রিয় পাত্র মীরজু নামে সেনাপতি বিস্তর সৈন্য লইয়া আসাম জয় করিব জন্য এই দেশ আক্রমণ করিতে উদ্যত হন। কিন্তু তাঁহ শিক্ষিত সৈন্যেরাও অসমীয়া সেনার যুদ্ধ-কৌশলের সম্মু বেশীক্ষণ দাঁড়াইতে সমর্থ হয় নাই। আসামের উন্ন বংশের মহিলারাও বিপুল-বিক্রমে যুদ্ধক্ষেত্রে অবত হইতেন। তাঁহাদের পরাক্রম-কাহিনী শুধু কল্পনা-সু অতিরঞ্জিত ইতিবৃত্ত নহে। হস্তলিখিত আসাম-ইতিঃ বা বুরঞ্জীর পাতায় পাতায় তাহার নিদর্শন পাওয়া যা আসামী সৈন্যেরা যুদ্ধেও অতিশয় দক্ষতা প্রদ করিয়াছেন। বর্ত্তমান গৌহাটীর নিকটে ব্রহ্মপুত্রতটি পাণ্ডু ষ্টেশনের সমীপস্থ শরাইঘাট নামক স্থানে নৌযুদ্ধ হয়, তাহাতে মুসলমান সৈন্যেরা পৃষ্ঠ-ভঙ্গ দি বাধ্য হয়।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে আহোম-রা অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হয়। চুলিকফা নামে এক অদূরা যুবক সিংহাসনারূঢ় হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বী রাজপুরুষদের ক্ষত বা নিহত করিতে লাগিলেন, তন্মধ্যে গদাপাণি না জনৈক পরাক্রমশালী রাজকুমারের উপর তাঁহার বিদ্বে দৃষ্টি বিশেষভাবে পতিত হয়। গদাপাণি তাঁহার গুণবতী ভার্য্যা জয়মতী এবং দেবকুমারসদৃশ কুমারদ্ব ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ হইলেন। রাজার দূতেরা গদাপা সম্বন্ধে সংবাদ না পাইয়া তাঁহার পত্নীকে বন্দী করিয়া র

* বর্ত্তমান প্রবন্ধকারের অসমীয়া ভাষায় রচিত "আহোমর দিন" নামক গ্রন্থে এবিষয়ে সম্যক্ আলোচনা হইয়াছে।

† ইহাই সর্ব্ব-সাধারণের ধারণা। কিন্তু আমার বিশ্বাস, "অ-সোম" শব্দ হইতে এই অসম বা আহোম শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। বিজয়ী টাইজাতীয় বীরগণ কামরূপের যে অংশে আধিপত্য স্থাপন করেন, তাহাকে সৌমারপীঠ বলা হইত, এবং সেই খণ্ডে সোম নামক এক জাতি বাস করার প্রমাণ পাওয়া যায়, সুতরাং এই নূতন টাই-জাতীয় সন্তানগণ অ সোম (অর্থাৎ সোম জাতির গণ্ডীভূত নহেন) বলিয়া বলিয়া পরিচিত হন।

সমীপে লইয়া গেল। তাঁহাকে পতির সংবাদ জিজ্ঞাসা করায় জয়মতী কোনমতে তাহা বলিতে স্বীকৃতা হইলেন না। রাজার আদেশ অনুসারে অনুচরেরা জয়মতীকে নানা শাস্তি দিতে লাগিল, তবুও সাধ্বী সতীর মুখ হইতে পতি-সম্বন্ধে কোনও কথা বাহির হইল না। এইরূপে একপক্ষ যাবৎ বহুবিধ নির্য্যাতন সহ্য করিয়া সতী জয়মতী প্রাণত্যাগ করিলেন। আজ সাধ্বী জয়মতী হিন্দু-ললনামাত্রেরই আদর্শ-স্থানীয়া হইয়াছেন।

আহোম-রাজত্বের শেষ সময়ে রাজ্যের মধ্যে ভীষণ আত্ম-কলহ উপস্থিত হয়। গৌহাটীর রাজ-প্রতিনিধি, রাজা এবং তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর উপর ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিহিংসা-সাধনের নিমিত্ত ব্রহ্মদেশীয় বিপুল-পরাক্রান্ত সৈন্য নিমন্ত্রণ করিয়া দেশে লইয়া আসিলেন। ব্রহ্মদেশীয় সৈন্যের অত্যাচারে দেশের চতুর্দ্দিকে হাহাকার-ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। এখানে আসিয়া আসামের ঐশ্বর্য্য-সমৃদ্ধির কথা জানিতে পারিয়া বারংবার বিনা নিমন্ত্রণে অসংখ্য ব্রহ্মসৈন্য আসাম-দেশে প্রবেশ করিতে লাগিল। এক সময়ে ছয় বৎসর যাবৎ ব্রহ্মসৈন্য আসামের সিংহাসন হস্তগত করিয়াছিল। অবশেষে ব্রহ্মদেশের সহিত ইংরেজেরা ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে সন্ধি হওয়াতে ব্রহ্মরাজ ইংরেজের হস্তে আসাম সমর্পণ করেন।

আহোম-রাজ্যের অধিনায়ক-রাজার উপাধি ছিল 'স্বর্গদেব'।* রাজার প্রধানতঃ তিনজন মন্ত্রী ছিলেন—বুড়াগোঁহাই, বড়-গোঁহাই এবং বড়পাত্র গোঁহাই। তাঁহারা রাজাকে শুধু পরামর্শ দিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন না। রাজকীয় সকল কার্য্যে তাঁহারা অপরিসীম ক্ষমতা দেখাইতেন। এমন কি ইঁহারা তিনজনে সমবেত হইয়া রাজাকে সিংহাসনচ্যুতও করিতে পারিতেন। যুদ্ধ বিগ্রহাদি আন্তর্জাতিক সকল কার্য্যে রাজা ইঁহাদিগের পরামর্শ লইতেন। আজকাল অসমীয়া ভদ্রলোক মাত্রই "ডাঙ্গরীয়া" উপাধিতে সম্বোধিত হন, কিন্তু সেই সময় রাজ্যের মধ্যে ইঁহারা তিনজন মাত্র এই "ডাঙ্গরীয়া" পদযুক্ত ছিলেন। এই মন্ত্রি-সমাজ রাজার ক্যাবিনেটের মতন ছিল।

রাজকীয় সকল বিভাগে এক এক-জন কর্ত্তা রাজধানীতে থাকিতেন। রাজ-সভায় রাজ-কর্ম্মচারী বড়ুয়া, ফুকন ইত্যাদিরা নিত্যই উপস্থিত হইয়া স্বকীয় কার্য্য সম্পাদন করিতেন এবং রাজ্য-সম্বন্ধীয় কোনও বিষয় রাজার জ্ঞাতব্য থাকিলে তাঁহারা রাজাকে শুনাইতেন।

বিচার-সম্বন্ধে আহোম আইন-কানুন বড় কঠিন ছিল। রাজ্যের নিয়ম-প্রথার অনুসারে বিচার ব্যবস্থিত হইত, কিন্তু আহোম নৃপতিগণ হিন্দুধর্ম্মের প্রভাবাধীন হওয়া অবধি হিন্দুশাস্ত্র-অনুসারে বিচার-কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। "আপীল" প্রথা তখনও প্রবর্ত্তিত ছিল। পরস্ত্রী-হরণের শাস্তি মৃত্যু ছিল। রাজ-বিদ্রোহীগণ সবংশে নিহত হইত। গ্রামের অধিবাসীরা "মেল" বা পঞ্চায়েত ডাকিয়া অভিযোগ মীমাংসা করিত। রাজার রাজধানীতে বড় বড়ুয়া নামক জনৈক কর্ম্মচারী থাকিতেন। তিনি রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান বিচারক এবং সমস্ত বিভাগের তত্ত্বাবধারক ছিলেন। গৌহাটীতে বড়ফুকন নামক এক রাজ-প্রতিনিধি বাস করিতেন। রাজার রাজধানী ছিল শিবসাগর, কিন্তু বড়ফুকন থাকিতেন দূরস্থ গৌহাটীতে। বিষয়-মর্য্যাদায় বড়বড়ুয়া এবং বড়ফুকন সমান হইলেও ক্ষমতায় বড়ফুকন বেশী ছিলেন। তাঁহাকে গৌহাটীর রাজা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ষোড়শবর্ষ বয়স হইতে পঞ্চাশৎ বৎসর পর্য্যন্ত সমস্ত লোক 'পাইক' বলিয়া ধার্য্য হইত, এবং চারটি পাইককে একত্রে "গোট" বলা হইত। এক গোটের মধ্যে একজনকে রাজার জন্য কাজ করিয়া দিতে হইত; ইতরজাতীয় পাইককে ফাঁড়ী পাইক এবং উন্নত জাতীয় পাইককে চমুয়া পাইক বলা হইত। কুড়িজন পাইকের উপর এক "বড়া" উপাধিধারী কর্ম্মচারী থাকিতেন। একশত পাইকের উপর এক "শইকীয়া", হাজার পাইকের উপর এক "হাজারিকা", তিন সহস্র পাইকের এক "রাজখোয়া" এবং ছয় হাজার পাইকের উপর "ফুকন" কর্ম্মচারী। আজ পাইক-প্রথা উঠিয়া যাইবার বহুকাল পরেও এইসকল উপাধি অসমীয়া-সমাজে প্রচলিত আছে। আসাম-

* আহোমদিগের ধারণা ছিল আহোম-রাজ্যের পূর্ব্বপুরুষেরা স্বর্গ হইতে স্বর্ণ-শৃঙ্খল দিয়া মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হন।

দেশীয় পাইকদের এই একটা সুবিধা ছিল যে, তাহারা সমবেত হইয়া তাহাদের কর্ম্মচারীদিগকে নির্ব্বাসিত বা বিতাড়িত করিতে পারিত। রাজকর্ম্মচারীরা মুদ্রা হিসাবে কোনও বেতন পাইতেন না, তাঁহাদের যাবতীয় কার্য্য করিবার জন্য রাজ-প্রাসাদ হইতে তাঁহারা নির্দ্দিষ্টসংখ্যক পাইক পাইতেন। ক্ষেত-চাষ সমাপ্ত করিয়া অবসর-কালে এই পাইকেরা রাস্তা ও পুকুর, দুর্গ-প্রাচীর নির্ম্মাণে নিযুক্ত থাকিত; তাই রাজ্যের আভ্যন্তরিক কার্য্য অতি সুলভে সম্পাদিত হইত।

প্রত্যেক রাজ-কর্ম্মচারী বন্দী বা ক্রীতদাস পাইতেন। বন্দীদিগের উপর রাজার কোনরূপ আধিপত্য থাকিত না। তাহাদের প্রভু তাহাদিগের যথেচ্ছা বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে পারিত। এই পাইক এবং বন্দীদিগের পরিশ্রমের দ্বারাই উচ্চবংশীয় অসমীয়া প্রজার ভরণ-পোষণ চলিত। সুতরাং বৃটিশ-সাম্রাজ্যে যখন ক্রীতদাস প্রথা একেবারে উঠিয়া যায়, তখন সেই সম্রান্ত বংশগণের ভরণ-পোষণ এবং মর্য্যাদা-অনুসারে সমাজে চলাফেরা বড় মুস্কিল হইয়া পড়িল। অসমীয়া সম্রান্ত বংশীয়দের বর্ত্তমান দৈন্যের কারণের মধ্যে ইহাও অন্যতম।

প্রজার উপকারার্থে রাজারা অনেক কাজ করিতেন। যেখানে জলের অভাব সেখানে পুষ্করিণী খনন করিয়া সে-অভাব মোচন করা হইত। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে আহোম নৃপতি এবং প্রজাগণ শাক্তদীক্ষা গ্রহণ করেন; সেই অবধি তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের অধিকতর পৃষ্ঠ-পোষক হইয়া পড়েন। সতী জয়মতীর পুত্র রাজা রুদ্রসিংহের সময় হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং তাহার মোহন্ত গোঁসাইগণ রাজার সভায় এবং রাজ্যে বিস্তর প্রতিপত্তি লাভ করেন। রাজাও নৈষ্ঠিক শাক্ত হিন্দু হইয়া পড়েন। তাঁহারা দেশের নানা স্থানে দেবালয় এবং মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তাঁহারা উজ্জয়িনী, কনৌজ, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান হইতে উচ্চকুলের সদ্‌ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ আনিয়া এখানে বাস করান। আহোম রাজত্বের সময় নির্ম্মিত অট্টালিকা এখনও আহোম রাজধানী শিবসাগর সমীপস্থ রংপুর নামক স্থানে বিরাজ করিতেছে। ভাস্কর-বিদ্যায় অসমীয়া শিল্পীরা অতি সুনিপুণ ছিল। আসামের সর্ব্বত্র প্রাসাদ-মন্দিরাদিতে খোদিত প্রস্তরমূর্ত্তিগুলি দেখিলে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ছয় শত বৎসর ধরিয়া আহোমেরা আসামে রাজত্ব করেন। তাঁহাদের রাজত্বের চিহ্ন এখনও আসামের সর্ব্বত্র বিদ্যমান। অসমীয়ার নামের শেষে প্রায়ই আহোমরাজ-প্রদত্ত উপাধি ব্যবহৃত হয়। বর্ত্তমানকালেও প্রজার শ্রেণী-বিভাগ, গ্রামের আভ্যন্তরিক কার্য্যকলাপ, রাজস্ব আদায়ের নিয়ম-প্রণালী আহোম প্রণালীর উপর প্রতিষ্ঠিত।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতেও সমস্ত আহোমপ্রজা হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই। তাহাদের মধ্যে অনেক লোক স্বকীয় ধর্ম্ম পালন করিত। তাহাদের দেওধাই, বাইলু, মোহন নামক নিজের পুরোহিতবৃন্দ ছিল। এই পুরোহিতেরা প্রাচীন আহোম ধর্ম্ম-গ্রন্থ পাঠ করিতেন, শাস্ত্রমতে ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতেন, এবং আহোম ভাষায় দেশের ইতিহাস বা বুরঞ্জী লিখিতেন। আহোম জাতি বুরঞ্জী-রচনা-বিদ্যায় অতীব পারদর্শী ছিল। ইহাতে রাজ্যের সমস্ত কার্য্যকলাপের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইত। সেইজন্য রাজসভায় নির্দ্দিষ্ট বুরঞ্জী-লেখক কর্ম্মচারী থাকিতেন। পরে আসামী ভাষায় বুরঞ্জী লেখার প্রথা প্রচলন হয়। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কীর্ত্তি-চন্দ্র বড়বড়ুয়া নামক জনৈক কর্ম্মচারী স্বীয় বংশগত নীচতার প্রকাশ পাইবার ভয়ে রাজ্যের সমস্ত বুরঞ্জী দগ্ধ করিবার আদেশ প্রচার করেন, কিন্তু অনেক অসমীয়া "থাফি-খা" তাঁহার হস্ত হইতে বুরঞ্জী গোপনে রক্ষা করেন, এবং যদিও ব্রহ্মদেশীয়দের অত্যাচারের সময় অনেক বুরঞ্জী নষ্ট হয়, তথাপি এখনও আসামে বিস্তর বুরঞ্জী পাওয়া যায়।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, বঙ্গীয় সুধী-সমাজ যেন আসামের পুরাতত্ত্ব-আলোচনায় অধিকতর নিবিষ্ট হন। আসামের প্রাচীন সভ্যতা ও গৌরব-সমৃদ্ধির কাহিনী যাহাতে আরো অধিকতরভাবে বঙ্গবাসী বা ভারতবাসীর গোচরীভূত হইতে পারে, আমার বিনীত প্রার্থনা যেন তাঁহারা তজ্জন্য সচেষ্ট থাকেন।

পঞ্চশস্য

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

বুকের জোর—

পোল্যাণ্ড দেশে সিস্‌মণ্ড ব্রেইট্‌বার্ট নামে একজন বিষম শক্তিশালী লোক আছেন। তিনি একটি খেলা লোককে দেখাইতে অতিরিক্ত ভালবাসেন। বুকের ওপর মোটরবাইক্ দৌড়িবার মতন করিয়া তৈরী একটি কাঠের গোল ফ্রেম্ রাখেন। সারকাসে এইপ্রকার ফ্রেমে
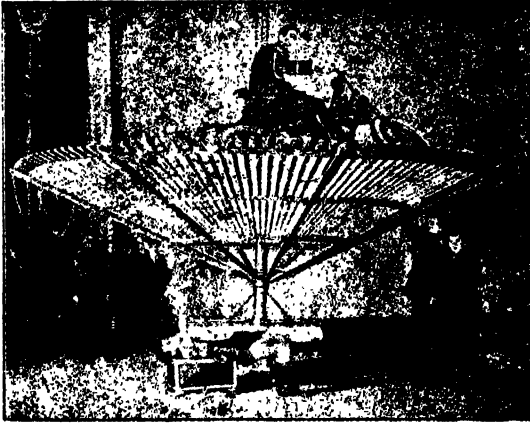
বুকের উপর মোটরবাইক্ দৌড়

আমরা সাইকেল দৌড়াইতে দেখিয়াছি। এই ফ্রেমের ওপর দুইজন মোটর সাইকেলওয়ালা সাইকেলসমেত দৌড় দেয়, অর্থাৎ ঘুরপাক খায়। এইসমস্তর ওজন হয় ১৫০০ পাউণ্ড, অর্থাৎ প্রায় ৪৮মণ। ব্যাপারটি আমরা যতটা সহজ ভাবিতেছি ততটা সহজ বোধ হয় নয়।

হাঁস-শিকারীর কায়দা—

একজন হাঁস-শিকারী একটি বড় মজার ভেলা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই ভেলার মধ্যে তিনি অনায়াসে বসিয়া থাকিবেন। ভেলার চারি পাশে দড়ি দিয়া নকল বা আসল হাঁস বাঁধা থাকিবে। দূর হইতে অন্য বন্য হাঁসেরা ইহা দেখিয়া নির্ভয়ে থাকিবে তার পর শিকারী ক্রমে ক্রমে বন্য হাঁসের দলের মধ্য দিয়া গুলি করিয়া তাহাদের মারিতে পারিবেন। এই ভেলাটি এমন করিয়া তৈরী যে, ইহা কোনরকমেই ডুবিবে না।

হাঁস-শিকারীর ভেলা

বিমানচারীদের কথা—

বিদেশী বিমানচারীরা আজকাল এরোপ্লেনে করিয়া প্রায়ই সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া পৃথিবী ভ্রমণ করিতেছে। এসিয়া, আফ্রিকা,
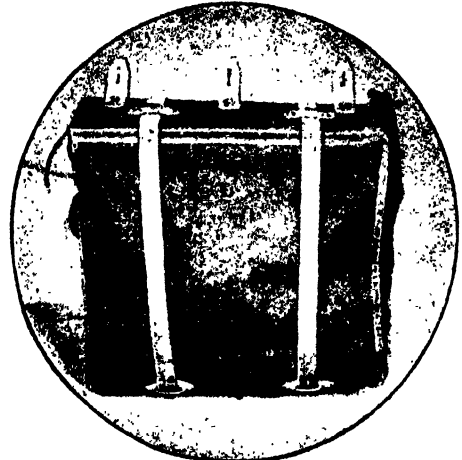
এরোপ্লেনের যন্ত্রপাতির থলি

ইউরোপ, আমেরিকা কোন দেশই আর বাদ পড়িতেছে না। জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া কেবল দেশের উপকার করিবার এবং নতুনকে দেখিবার প্রেরণাই এই বীরদিগকে এই কার্য্যে প্রেরণ করিতেছে।

আকাশে উঠিবার পূর্ব্বে বিমানচারীকে সবরকমের যন্ত্রপাতি এবং হাতিয়ার সঙ্গে লইতে হয়, কারণ এরোপ্লেনের কল পথে যেখানে-সেখানে বিগড়াইয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই যন্ত্রপাতিগুলি খুব সামান্য একটুক্‌রা কাপড়ে জড়াইয়া লওয়া যায়। যে ব্যাগে এই যন্ত্রগুলি জড়ান যায়, তাহার মাপ সাড়ে ১৭×১৬×৬ ইঞ্চি মাত্র। আমেরিকা হইতে অ্যাট্‌ল্যান্‌টিক্ এবং প্রশান্ত মহাসাগর পার হইবার চেষ্টা বহুকাল হইতেই চলিতেছে। এ পর্য্যন্ত নানা প্রকার দুর্ঘটনাও ইহাতে হইয়াছে, কিন্তু তবু চেষ্টার ক্রটি নাই! কিছুদিন পূর্ব্বে একদল আমেরিকান্—তাঁহাদের দলে নারীও আছেন—এরোপ্লেনে করিয়া প্রশান্ত মহাসাগর পার হইয়াছেন। এক পক্ষকাল পূর্ব্বে তাঁহারা কলিকাতাতেও আসিয়াছিলেন।

এরোপ্লেন পরিচয় চিত্র

১৯২২ সালে মেজর ব্লেক্ এক্স্‌পিডিশনের দল এরোপ্লেনে করিয়া পৃথিবী ভ্রমণ করিবার সময় বঙ্গ উপসাগরে কল খারাপ হইয়া পড়িয়া যায়। এই পতনের পূর্ব্বে তাহাদের আরো তিনবার পতন হয়, কিন্তু তিনবারই তাহারা কল মেরামত করিয়া এরোপ্লেনকে আকাশে উঠাইতে সক্ষম হয়। চারবারের বার আর তাহা হইল না। এরোপ্লেন জলে পড়িয়া ডুবিতে লাগিল। এরোপ্লেন চারদিন ধরিয়া আস্তে আস্তে ডুবিতে লাগিল। আকাশে ঝড় এবং বৃষ্টি। আকাশচারীরা পন্‌টুনের সাহায্যে কোন রকমে ভাসিতে লাগিল। শেষ মুহূর্ত্তে একখানা জাহাজে তাহাদের উঠাইয়া লইল। আর-এক ঘণ্টা দেরী হইলে সকলে ডুবিয়া মরিত।

এত বিপদ্ মাথায় লইয়া যে একদল লোক ক্রমাগত আকাশে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, তাহার একমাত্র কারণ সমস্ত পৃথিবীতে একটি আকাশ-পথ আবিষ্কার করা। এই আকাশ-পথ আবিষ্কার হইলে ১৫ দিনের পথ ১৫ ঘণ্টায় বা তাহা অপেক্ষাও কম সময়ে যাওয়া চলিবে। এইসমস্ত আকাশ ভ্রমণে নানাপ্রকার যন্ত্রপাতির ব্যবহারে অবশেষে কতকগুলি অত্যাবশ্যক যন্ত্রপাতিরও আবিষ্কার হইতে পারে, যাহাতে যন্ত্রপাতির সংখ্যাও কম হইবে এবং কাজেরও সুবিধা হইবে।

আমাদের-দেশের পরমেশ্বর নির্ব্বাচিত এবং পরম দয়ালু গবর্ণমেণ্ট্ এইসমস্ত অনাবশ্যক কাজে আমাদের উৎসাহ দেয় না—তাহাতে ভালই হয়, প্রাণটা পথে-ঘাটে না গিয়া ঘরেই পচিয়া মরিতে পারে।
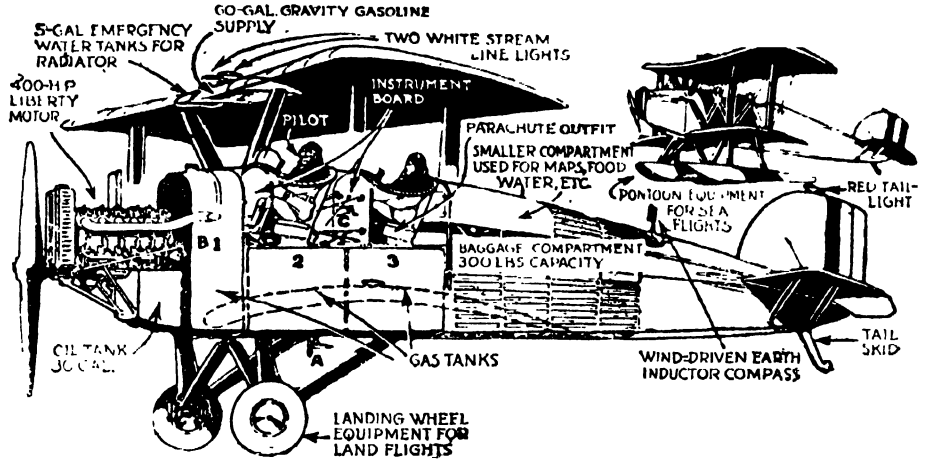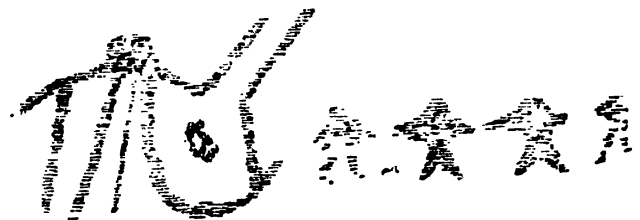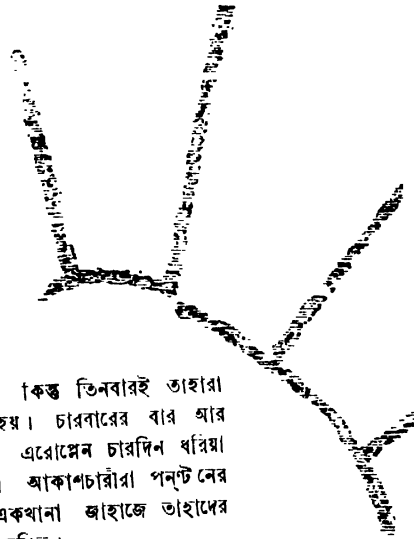
১নং ছবি—অপূর্ণ, নীচের ছবি—লোমওয়ালা দু-পেয়ে জন্তুর চিত্র

পুরাকালের কথা—

বহুকাল পূর্ব্বে, লেখা-ইতিহাস আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে,

ভারতবর্ষে এমন একদল লোক ছিল—যাহাদিগকে আর্য্যেরা অসুর বলিতেন—যাহারা পাথরের তৈরী অস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে ধাতুর তৈরী অস্ত্রাদিও ব্যবহার করিত।। তাহাদের দেহে বল ছিল এবং সেই বলের নিকট আর্য্য-শক্তি পরাভব স্বীকার করিত, সেই-জন্যই আর্য্যেরা বিজেতাদিগকে ঘৃণার সহিত অসুর বলিতেন। আমাদের দেশের হো, মুণ্ডা এবং ছোটনাগপুরের অন্যান্য আদিম অধিবাসীদিগকে এই অসুরদের বংশধর বলা যায়। পুরাকালের এই জাতিদের নানা-রকম অস্ত্রপাতি, সোণা ধুইবার পাথরের পাত্র ইত্যাদি অনেক কিছুই মানভুম, সিংভুম, গাংপুর, রেওয়া হইতে সুরু করিয়া জব্বলপুর এবং নাগপুরের চারিদিকে ছড়ান আছে। সমস্ত চিহ্নই যে ভাল অবস্থায় আছে তাহা নয়, অনেক ভাঙ্গিয়া-চুরিয়াও গিয়াছে। নাগপুরে এমন সমস্ত স্থান আছে যেখানে ৫০ বছর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সভ্যতার কোন-প্রকার আলোক প্রবেশ করে নাই, কিন্তু ঐসমস্ত প্রদেশে কত হাজার বছর পূর্ব্ব হইতে যে লোক বাস করিতেছে তাহার কোন হিসাব নাই।

২নং ছবি—লোমওয়ালা দু-পেয়ে জন্তুর চিত্র

বহুশতাব্দী পূর্ব্বে মাটিতে পোঁতা হাড় বিশেষ পাত্রে পাওয়া যায়, এই পাত্রের কাছাকাছি বা অনেক সময় পাত্র মধ্যেও একরকম মাটির চাক্তি পাওয়া যায়, এই চাক্তিগুলি বোধ হয় পরপারের যাত্রীর পাথেয় অর্থরূপে ব্যবহৃত হইত।

কিন্তু এইসমস্ত দ্রব্য হইতে এমন কোন কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না যে, যাহাতে প্রমাণ হয় যে, সেই সময়কার লোকেরা কোনপ্রকার চিত্র আঁকিতে বা আঁকজোক করিতে পারিত। কিন্তু ১৯১০ সালে নাহারপালির কাছের পাহাড়ের উপর, বি-এন্-রেলওয়ে লাইন্ যেখানে মাণ্ড নদী পার হইয়াছে, তাহার কয়েক মাইল পূর্ব্বে গভীর জঙ্গলের মধ্যে কতকগুলি গুহায় সেই অতি-পুরাকাল-বাসীদের চিত্র-বিদ্যার বহু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ঐস্থানে যে দুইটি গুহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সেখানে বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় নাই,

৩নং ছবি—শিকারের দৃশ্য
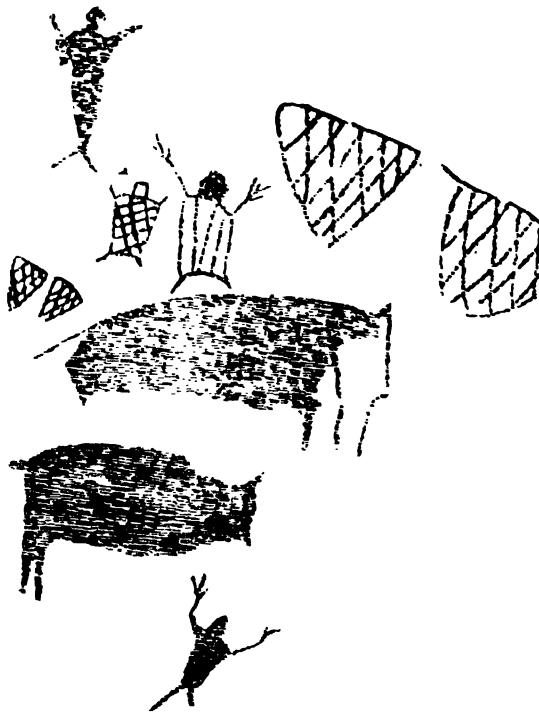
৪নং ছবি—হাতী ধরিবার চিত্র

৫নং ছবি—গিরগিটি
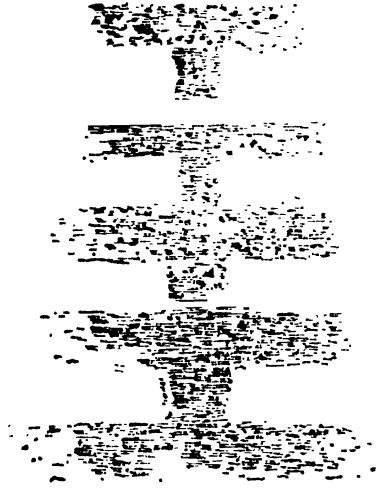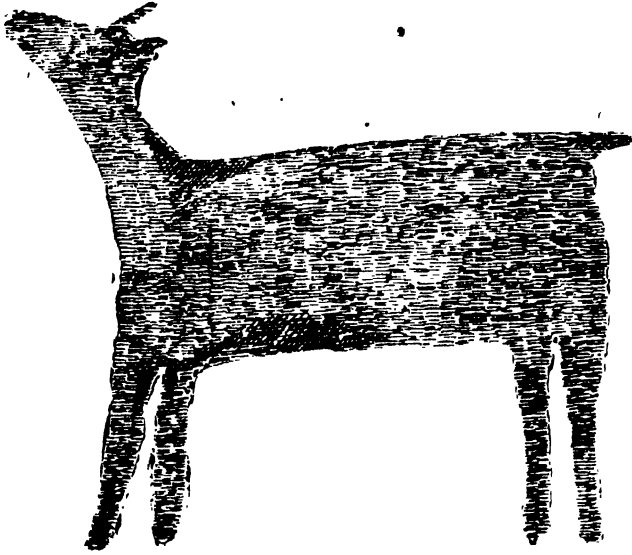
নাই. কিন্তু ছোট কয়েকটি গুহাতে অনেক কিছুই পাওয়া গিয়াছে। কতকগুলি ছবির নমুনা দিলাম।

১নং ছবি অপূর্ণ। তাহা বোধ হয় পাথর খসিয়া যাওয়ার জন্যই হইয়াছে। অন্য ছবি বোধ হয়, কতকগুলি লোমওয়ালা দু পেয়ে জন্তুর পরিচায়ক।

২ এবং ৩নং ছবি পূর্ণ। নীচে একটি মৃত ব্যক্তি। কতকগুলি সাহসী লোক মুগুর বা ধনুক লইয়া আনন্দে শিকারে চলিতেছে। বন্য মহিষ এবং বন্য বরাহের সহিত যুদ্ধেরও বেশ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। যে পাথরের উপর এই চিত্র রহিয়াছে, তাহার পঞ্চাশ ফুট উপরে আরো কতকগুলি শিকারের ছবি আছে।

৪নং চিত্র, হাতি ধরিবার চিত্র বলিয়া মনে হয়। এইসময়ের লোকেরা সম্বর (Sambhur) হরিণ (৬নং চিত্র), গিরগিটি (৫নং চিত্র), এবং নেকড়ে বা কুকুরের অস্তিত্ব জানিত বলিয়া প্রমাণ হয় (৭নং চিত্র)। এই ছবিগুলি খুব পরিষ্কার না হইলেও সহজ-বোধ্য, চিত্র-পরিচয় না দিলেও বোঝা যায়।

৭নং ছবি—কুকুর অথবা নেকড়ে বাঘ

৭ক—৭নং ছবির ডান কোণের ত্রিশূলাকার চিত্র

৮নং ছবি—পশু-চামড়ার ছবি

১০নং ছবি জ্যামিতি-জ্ঞানের পরিচায়ক
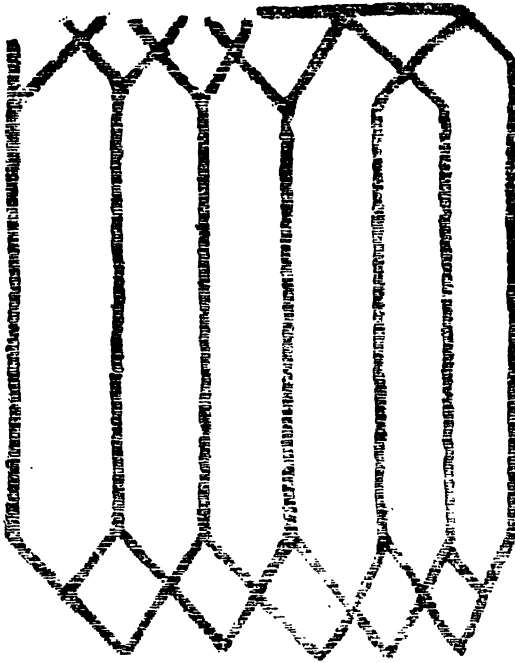
৮নং ছবি দেখিয়া মনে হয় যেন কেহ কতকগুলি পশু চামড়ার ছবি আঁকিয়াছে। সেই সময়কার লোকে বন্যপশু হত্যা করিয়া তাহার চামড়া রোদে বা আগুনে শুকাইয়া লইয়া বস্ত্র বা শয্যারূপে ব্যবহার করিত।

৭ক এবং ৯নং চিত্রের মত অঙ্কন পৃথিবীর অনেক দেশেই পাওয়া যায়। এইগুলি অক্ষর আবিষ্কার হইবার পূর্ব্বাভাস এবং এই দুইটি চিত্রের বিশেষ অর্থ আছে বলিয়া মনে হয়।

আরো দু-একটি ছবির কোনপ্রকার নাম দেওয়া যায় না। ১০নং চিত্রের মধ্যে বেশ একটি নিয়ম এবং চিন্তা আছে। ইহাকে জ্যামিতি জ্ঞানের পরিচায়ক বলা চলে।

এইসমস্ত চিত্রগুলি হাজার হাজার বছর পূর্ব্বের আঁকা হইলেও, বর্ত্তমান সময়ের কিউবিষ্ট্ এবং ফিউচারিষ্ট্দের আঁকা ছবির মতই সু-বোধ্য অন্ততঃ তাহাদের অপেক্ষা দুর্ব্বোধ্য নয়।

শীতকালে এই গুহা যে-কেহ দেখিতে যাইতে পারেন, এবং এই স্থানে বনভোজন করাও চলিতে পারে, তবে তাহার পূর্ব্বে ঐসমস্ত স্থানের মৌমাছিদের অনুমতি লইতে হয়, তাহা না হইলে বিপদের আশা আছে। গুহাগুলি দেখিবার সময় কোনরকম গোলমাল করা, লাঠি ঘোরান বা ধূমপান করা নিরাপদ নহে, তাহাতে মৌমাছিদের অনাবশ্যক উত্তাক্ত করা হইবে।

প্যালেষ্টাইনের পুনরুদ্ধার—

'পবিত্র নগর' জেরুসালেমের জাটকা নামক স্থানে তাড়িৎ-উৎপাদনী একটি কল প্রস্তুত হইতেছে। এই কলটির নির্ম্মাণ শেষ হইয়া গেলে পর, ইহার পূর্ব্বে নির্ম্মিত আরো দুইটি কলের সহিত ইহার যোগ করিয়া দেওয়া হইবে এবং ইহাতে যেপরিমাণ তাড়িত শক্তির উদ্ভব হইবে, তাহাতে ঐসমস্ত প্রদেশের মিউনিসিপ্যাল, চাষবাস এবং গৃহকর্ম্মাদি সমস্তই সম্পূর্ন হইবে এবং খরচও অনেক কম হইবে। ভূমধ্য সাগরের তীরে যাফা-নামক স্থানে আর-একটি তৈল-চালিত "প্ল্যান্ট্" নির্ম্মাণ শেষ হইয়া গিয়াছে। এই প্রচণ্ড তাড়িত-শক্তিতে আর-একটি কাজ হইবে—যাফা হইতে জেরুসালেম্ পর্য্যন্ত একটি রেল চলিবে।

১১নং ছবি—কোন পরিচয় নাই

কিন্তু এই তাড়িত-উৎপাদনী কলগুলি চিরস্থায়ীভাবে তৈরী করা হইতেছে না। যোড়্ডান নদীর জলকে বাঁধিয়া তাহার সাহায্যে তাড়িত উৎপাদন করিবার প্রকাণ্ড ব্যাপারটি শেষ হইলেই এই তুলনায় ছোট কলগুলি নিষ্কর্ম্মা হইবে, তবে একেবারে চুপ চাপ বসিয়া থাকিবে না, দরকারমত "শক্তি" সরবরাহ করিবে। যোড়্ডান নদীর উপর এই ব্যাপারটি শেষ হইতে প্রায় চার বৎসর কাল সময় লাগিবে এবং খরচও হইবে প্রায় ২০,০০০,০০০ টাকা। এই টাকা প্রথম দিক্কার খরচ, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যখন কলটিকে আরো বাড়ান হইবে তখন ঐ টাকার প্রায় ২০গুণ টাকা খরচ হইবে।

তাড়িত-শক্তি ব্যবহার প্যালেষ্টাইনে একটি নবযুগ আনয়ন করিবে। প্যালেষ্টাইনের অধিবাসীরা বিজ্ঞানকে তাহাদের বিশেষ কোন কাজে লাগায় নাই, তাহাদের

পবিত্র নদী যোর্ড্ডানের পবিত্র জলে মহাত্মা যীশুর দীক্ষা হইতেছে
(গুষ্টাভ ডোরের খোদাই চিত্র হইতে)

সভ্যতাও প্রায় সেই বাইবেলের সময়ের মতনই আছে। অন্যান্য দেশের সভ্যতার উপর দিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যেসমস্ত প্রচণ্ড ঝড় বহিয়া গিয়াছে, প্যালেষ্টাইনের সভ্যতাকে তাহা বিশেষ আঘাত করিতে পারে নাই, তাহা এই প্রদেশের লোকদের জীবনযাত্রার প্রথা দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়। এই প্রদেশে কলের লাঙ্গলের পরিবর্ত্তে এখনও বলদে-টানা-লাঙ্গলই ব্যবহার হয়, বিদেশ-ভ্রমণ লোকে গাধার পিঠে চড়িয়াই করে। চামড়ার ভিস্তিতে করিয়া কুয়া বা নদী হইতে লোকে পানীয় জল বহন করিয়া লইয়া আসে। ঘরে ঘরে বিদ্যুতের আলো নাই, তেলের আলো বা বাতিই জ্বলে। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে এই দেশের বনজঙ্গল লোপ পাইয়াছে এবং উচ্চভূমি হইতে উর্ব্বরা মাটি নীচে ধুইয়া আসিয়াছে, কিন্তু লোকে আলস্যবশতঃ উর্ব্বরা উপত্যকাগুলিতে কোন-

উট এবং মানুষের সাহায্যে পাথর আনিয়া
যোর্ড্ডানে বাঁধ দেওয়া হইতেছে

প্রকার চাষবাস করে নাই, তাহার ফলে উপত্যকাগুলি প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড জলাভূমি এবং ম্যালেরিয়ার আড্ডা হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু মনে হয় যে বিদ্যুৎ-শক্তির প্রচলনে এক রাত্রির মধ্যে সমস্ত দেশের ভোল বদ্‌লাইয়া যাইবে। জলাভূমির জল বাহির করিয়া ফেলা হইবে এবং উপত্যকাতে পরিষ্কার জল সরবরাহের বন্দোবস্তও করাও হইবে। যোর্ড্ডান নদীর বিদ্যুতের কলে এত অধিকপরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে, যে, মনে হয়, ইউরোপ এবং আমেরিকার লোকেদের অপেক্ষা প্যালেষ্টাইনের লোকেরা তাড়িত-শক্তিকে অধিকপ্রকার কাজে লাগাইবে এবং ইহা অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়েও হইবে। বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে আমেরিকার এবং ইউরোপের ধনী ব্যক্তিরাই রান্না এবং ঘর গরম করার কাজে তাড়িৎ ব্যবহার করিতে পারে ত কিন্তু প্যালেষ্টাইনে তাড়িত-উৎপাদনের খরচ এত ভয়ানক কম হইবে যে, অতি দরিদ্র লোকেও রান্নাবান্না হইতে আরম্ভ করিয়া ঘরের সবরকম কাজই তাড়িতের সাহায্যে করিতে পারিবে, এবং এই দেশের লোকেদের ব্যবহার দেখিয়া মনে হয় যে ইহারা নতুন কোন সুবিধার জিনিষ পাইলে তাহা সাদরে গ্রহণ করিবে।

উপরে—যোর্ড্ডানের যারমুক জলপ্রপাত, এই শক্তিকে বাঁধিয়া মানুষের কাজে লাগানো হইবে। নীচে ডান দিকে—যাফার তাড়িত-উৎপাদনের কল-ঘর

এই প্রচণ্ড তাড়িত শক্তি উৎপাদনের জন্য যোড়্ডান নদীর জলকে বাঁধিতে হইবে। বাঁধ হইয়া গেলে ১০,০০০,০০০,০০০ বর্গ ফুট জল কল চালাইবার এবং ক্ষেত্রে সরবরাহ করিবার জন্য সঞ্চিত থাকিবে। ৬৫০,০০০ একর জমি এইপ্রকারে একই সময়ে জলসিঞ্চিত হইবে। নদীর জল বিদ্যুতের কল চালাইয়া আবার তাহার স্রোতে ফিরিয়া যাইবে। টাইবেরিয়াস্ হ্রদে কল চালাইবার জল অনেক-পরিমাণে জমা থাকিবে এবং এই হ্রদ না থাকিলে বাঁধের খরচা আরো অনেক বেশী পড়িত বলিয়া মনে হয়।

এই তাড়িত-উৎপাদক কলটি শেষ হইয়া গেলে পর ইহার দ্বারা যে কতরকমের কাজ হইবে, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। প্যালেষ্টাইনের কাছাকাছি এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে কোন লোক বাস করে না, এবং এমন অনেক স্থান আছে যেখানে লোকের আবাস গিজ্‌গিজ্ হইয়া উঠিয়াছে। এইসমস্ত স্থান হইতে লোক সরাইতে হইলে পতিত জমি সংস্কার করিতে হইবে। বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে সকলই সম্ভবপর হইবে বলিয়া মনে হয়। যাতায়াতের সুবিধা, জল সরবরাহ, রেল চালান, আলো-পাখার বন্দোবস্ত, জলাভূমি হইতে পাম্পের সাহায্যে জল নিষ্কাশন ইত্যাদি সবই বিদ্যুতের সাহায্যে হইবে।

ইংরেজ-গবর্ণমেন্টের অনুমতিতে এই কাজ চলিতেছে, কারণ ইংরেজরাই এখন প্যালেষ্টাইনের পরমেশ্বর-নির্ব্বাচিত অভিভাবক। পিনহাস্ রুটেনবার্গ-নামক একজন ইঞ্জিনিয়ার 'পবিত্র ভূমির' আগাগোড়া দেখিয়া বিদ্যুৎ-উৎপাদক কলের প্ল্যান তৈরী করিয়াছেন।

মোটর্-কারের সাহায্যে কল-চালানো—

কিছুদিন পূর্ব্বে প্রবাসীতে লিখিয়াছিলাম একজন ভদ্রলোক কেমন-ভাবে তাঁহার ফোর্ড্-কারের সাহায্যে একটি ছোট কারখানা এবং করাত-কল চালান। সম্প্রতি আর একজন ভদ্রলোক তাঁহার ওভারল্যাণ্ড্-গাড়ীর সাহায্যে কেমন করিয়া নানা প্রকার কল চালাইতেছেন, দেখুন। এই-প্রকারে, মাটিখোঁড়া, লাঙ্গল টানা ইত্যাদি অনেক কাজই হইতে পারে। গাড়ীর পিছনে চাকার সঙ্গে বেল্ট লাগাইয়া কলের চাকাতে যুক্ত করিয়া কল চালানো যায়। বেল্ট ঢিলা হইয়া গেলে, গাড়ীকে একটু সামনে আগাইয়া দিলেই বেল্ট আবার টান হইয়া যায়। মোটর ইঞ্জিন্-সম্বন্ধে যাঁহাদের কিছু জ্ঞান আছে, তাঁহারা এই ব্যাপারটি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবেন এবং তাঁহাদের বাড়ীর গাড়ী থাকিলে ব্যাপারটিকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। গাড়ী অনেক সময় বাড়ীতে বসিয়া থাকে, সেই-সময় তাহার সাহায্যে কল চালাইলে বেশ দু-পয়সা আয় করা যাইতে পারে। ছুরি-কাঁচি শান দিবার কল হইতে আরম্ভ করিয়া ময়দা-পেষা, খড়কাটা, সুরকী-করা ইত্যাদি নানারকম কল চলিতে পারে। ইহাতে খরচও যে খুব বেশী পড়িবে তাহা মনে হয় না। মোটরওয়ালারা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে পারেন।

মোটর্-কারের চাকার সাহায্যে কল চলিতেছে
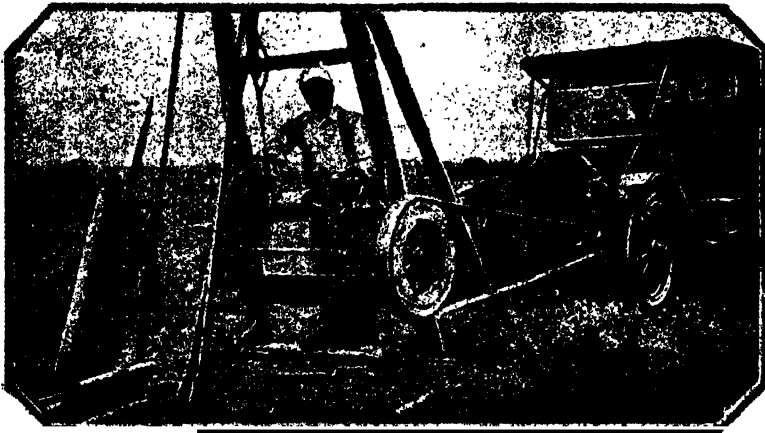
মোটর্ গাড়ীর সাহায্যে আর একটি কল চলিতেছে

বিপদ্-বারণ বেড়া—

উঁচু রাস্তা বা পুলের ধারে প্রায়ই নানা-রকমের মোটর-দুর্ঘটনা হয়। পুলের উপর হইতে হয়ত মোটর-গাড়ী জোরে দৌড়াইয়া নামিতেছে, হঠাৎ গাড়ী নালার মধ্যে গিয়া পড়িল। এইসব জায়গাতে মোটর দুর্ঘটনার শতকরা ৪০টি হয়। পাহাড়ে রাস্তার ধারেও এইরকম খারাপ জায়গা থাকে। এই সমস্ত বিপদ্ হইতে গাড়ী রক্ষা করিবার জন্য একপ্রকার স্প্রিংওয়ালা তারের বেড়ার আবিষ্কার হইয়াছে, এই বেড়াতে গাড়ী বেশ জোরে আসিয়া পড়িলেও, গাড়ী কোন আঘাত না পাইয়া থামিয়া যাইবে। গাড়ী যদি অতিরিক্ত জোরে আসিয়া
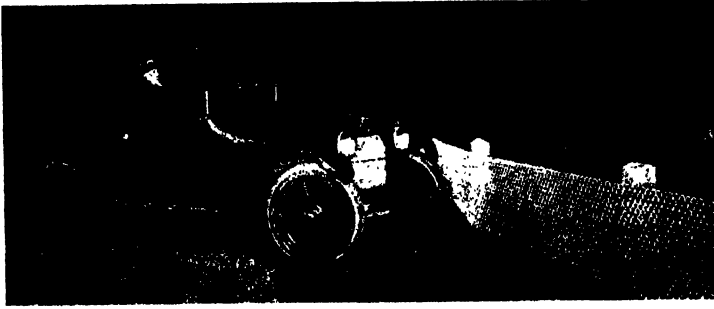
বিপদ্‌-বারণ বেড়া

এই তারের বেড়ায় লাগে, তবে বেড়া প্রথমে খানিকটা সাম্‌নের দিকে গিয়াই তৎক্ষণাৎ গাড়িকে পিছনের দিকে ঠেলিয়া দিবে।

ছাদের উপর মোটর্‌-দৌড়ের স্থান—

ইটালির টিউরিন্‌ সহরে এক মোটর-কার্‌খানার ছাদের উপর একটা মোটর দৌড় করাইবার রাস্তা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। রাস্তাটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১ মাইল। ৭০ ফুট চওড়া, ঘুম্‌তিগুলিতে খুব উঁচু দেওয়াল দেওয়া আছে। এই রাস্তায় গাড়িখানির "বডি" বাদ দিয়া কেবল মাত্র ইঞ্জিন্‌ এবং কাঠামোখানি পূর্ণ বেগে দৌড় করান হয়। এই রাস্তাটিকে পরীক্ষা-রাস্তা বলা যায়। এই রাস্তার উপর মোটরকারগুলি এত ভয়ানক বেগে দৌড়ায় যে, কল্পনা করা যায় না। সড়কের দুই পাশে দেওয়াল ঘুমতিগুলিতে রাস্তাটাও একটু কাত হইয়া আছে।
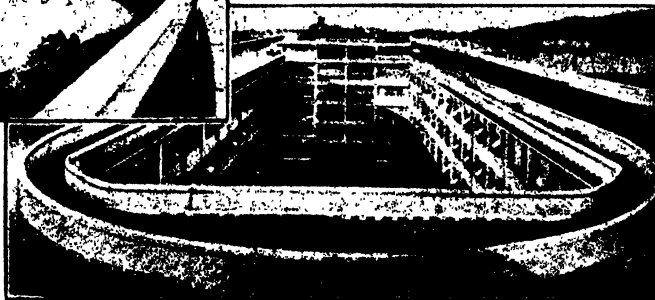
বাড়ীর ছাতে মোটর্‌-দৌড়ের সড়ক

—

হাল্‌কা নৌকা—

ছবিতে দেখুন, একটি বালক কেমন একটি ছোট নৌকা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। এই নৌকাগুলি নাকি খুব হাল্‌কা এবং কোনরকমেই জলের তলায় যাইবে না। নৌকার দুই প্রান্তে দুইটি ওয়াটারটাইট্‌ কক্ষ আছে, সেই কারণেই নৌকা ডুবিতে পারে না। যে-কেহ এই নৌকা লইয়া নদী বা খালে বেড়াইতে পারে। দুই জন লোকের ভার এই নৌকা বহিতে পারে। আর একজন লোক রসদ-পত্র লইয়াও ইহাতে বেশ যাইতে পারে।

—

একজনে বহন করিবার মত হাল্‌কা-নৌকা

গেছো মাছ—

সিরাম্‌ (Ceram) মলয়-দ্বীপপুঞ্জের একটি দ্বীপ। এই দ্বীপে এক প্রকার গাছে-চড়া মাছ পাওয়া যায়। এই মাছ পৃথিবীর অন্য কোথাও পাওয়া যায় না।

এই মাছ ৯ ইঞ্চি লম্বা। এই মাছ নাকি বেশীর ভাগ সময়ই ডাঙ্গায় পোকামাকড় খাইয়াই বিচরণ করে। দুটি পাখ্‌নার সাহায্যে ইহারা গাছে চড়ে, তবে ডাঙ্গাতে ইহারা লাফাইয়া চলে।

ইহারা ৬ ইঞ্চির বেশী লাফাইতে পারে না। তাহাদের ফুস্‌ফুসের ছোট ছোট ফাঁকে জলীয় পদার্থ থাকে ও ইহাদেরই সাহায্যেই এই মাছেরা জলের বাহিরে থাকিয়াও বাঁচিয়া থাকে।

—

গাছে-চড়া মাছ—একটি ডাঙ্গায় এবং একটি গাছে শিকড় বাহিয়া চড়িতেছে দেখুন

ভ্রমণ-শীল রেডিওওয়ালা—

জার্ম্মানির লাইপ্‌জিগ্‌ শহরে এক মজার কাণ্ড হয়। একজন লোক একটি সম্পূর্ণ রেডিও রিসিভিং সেট, লাউড্‌ স্পিকার এবং এরিয়েল

ভ্রমণশীল রেডিওয়ালা। রাস্তার লোকদিগকে গান শুনাইতেছে

সমেত কাঁধে করিয়া লইয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং বহুদূরের গান-বাজনা, ঐক্যতান বাদন, বক্তৃতা ইত্যাদি পথের লোকজনদের শোনায়।

শাখা-পত্র-হীন বৃক্ষ—

মেক্সিকোর সোনারা-নামক স্থানে একপ্রকার অদ্ভুত বৃক্ষ পাওয়া গিয়াছে, এই বৃক্ষের কোনপ্রকার ডালপালা নাই। কার্নেগি ইন্‌ষ্টিটিউশনের সভ্য ডাঃ ডি টি ম্যাক্‌ডুগ্যাল্‌ এই বৃক্ষ প্রথমে আবিষ্কার

মেক্সিকোর ডালপালাহীন বৃক্ষ

করেন। এই বৃক্ষের গায়ে ছোট অঙ্কুর হয় বটে, কিন্তু তাহা অঙ্কুরই থাকিয়া যায়। গাছটি খুব লম্বা হয়, কিন্তু বিশেষ শক্ত হয় না।

ঘণ্টায়-৯০মাইল মোটর-কার—

একটি মোটর্‌ কারের সাম্‌নে একটি এরোপ্লেনের প্রপেলার্‌ লাগাইয়া লওয়া হইয়াছে। ফলে এই হইয়াছে যে গাড়ীখানি ঘণ্টায় ৯০ মাইল

প্রপেলার-যুক্ত মোটর্‌-কার

বেগে সব সময় দৌড়াইতে পারে। এই মোটরের ইঞ্জিনটি ৮০ হর্স পাওয়ার এবং মোটরকারখানি এরোপ্লেন তৈয়ারী করিবার মালমস্‌লায় তৈয়ারী হইয়াছে।

অকেজো বাঙ্গালীর সংখ্যা

অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলার লোক-সংখ্যা অধিক। বাংলার পরিধি ৭৬৮৪৩ বর্গ-মাইল, লোক-সংখ্যা ৪৬৬৯৫৩৬ জন। বাঙ্গালী না খাইয়া মরে; রোগে মরে; আবার বিকলাঙ্গের সংখ্যা দিন-দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। বাংলার উন্মাদের সংখ্যা সকল দেশের অপেক্ষা অধিক। বাঙ্গালীকে সতর্ক হইতে হইবে।

বাঙ্গলায় উন্মাদের সংখ্যা ১৮৮৯৩ জন, পুরুষ ১১১০২, স্ত্রী ৭৭৯১; ৩১২৬৪ জন কালা, পুরুষ ১৮৯৩৯, ১২৩২৫ স্ত্রীলোক; অন্ধ-পুরুষের সংখ্যা ১৮৭০২, অন্ধ-স্ত্রীলোক ১৪৭৬৬; কুষ্ঠগ্রস্ত পুরুষ ১১৪৮, স্ত্রী ৪০০৩। প্রায় এক লক্ষ লোক সমাজের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া জীবন ধারণ করে। ইহার উপর বেকার লোকের আব্দার আছে। বাংলার ধন-সম্পত্তি অবাঙ্গালীর হাতে গিয়া পড়িতেছে, বাঙ্গালী শ্রমকাতর, আত্মঘাতী; উৎসন্নের পথ রোধ করিতে হইলে একদল অধ্যবসায়ী দেশকর্ম্মীর অভ্যুত্থান দরকার হইয়াছে, যাহারা সেবা বলিতে এইসকল বিকলাঙ্গ নরনারীর সেবার ব্যবস্থা করিবে, সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কৃষিজাত দ্রব্য, শিল্প শ্রমজাত সামগ্রী উৎপন্ন করিয়া জাতিকে সমৃদ্ধ করিবে। অর্থবল অপেক্ষা ঐক্যবলকে জাগ্রত করিবে, শ্রমকে শৃঙ্খলিত করিয়া তুলিবে। দেশে নিস্বার্থ কর্ম্মীর বান ডাকিলে, অনেক অন্ধ-খঞ্জের মনেও উৎসাহের সঞ্চার হইবে, অলস কল্পনাপ্রিয় জাতির কর্ম্ম-প্রবৃত্তি প্রবল হইলে, উন্মাদের সংখ্যা হ্রাস পাইবে।

(প্রবর্ত্তক, বৈশাখ, ১৩৩১।)

—

মেদিনীপুর—ময়নাগড়

মেদিনীপুর জেলায় তমলুক মহকুমার অন্তর্গত সুবিখ্যাত ময়নাগড় অবস্থিত; ইহা কংসাবতীর শাখা রাইখালী নদীর তীরবর্ত্তী। রাইখালী নদী মহিষাদলের শেষ মাহিষ্য-রাজ উদয়নারায়ণ রায়ের পুত্র প্রাতঃ-স্মরণীয় রাজা কল্যাণ রায় কর্ত্তৃক খোদিত।

১১৩২ খৃঃ অব্দে গজপতিবংশীয় চুড়ঙ্গদেব উৎকল জয় করিয়া তথায় সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। রাজা কালন্দীরাম তাঁহার একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন, তিনি ময়নার সুপ্রাচীন খ্যাতনামা রাজা ছিলেন। ময়নার রাজবংশাবলী হইতে অবগত হওয়া যায় যে, কালন্দীরাম চুড়ঙ্গদেবের আত্মীয় ছিলেন। ময়না রাজবংশের আদি রাজা তাহার বহুপূর্ব্বে রাজ্য আরম্ভ করেন। যতদূর মনে হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ঐ বংশে রাজা গোবর্দ্ধনানন্দ বাহুবলীন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। সম্রাট্ আকবরের রাজত্বের প্রাক্কালে (আকবরের রাজত্বকাল ১৫৬০-১৬০৫) মেদনীপুরসহ উড়িষ্যা-প্রদেশ মোগলের আয়ত্তাধীন হয়; তৎপূর্ব্বে এই প্রদেশ উড়িষ্যার সম্রাট্গণের অধীনে ছিল। মেদিনীপুর জেলার প্রাচীন বালিসীতা ও তিলদাগড় ময়না-রাজাগণকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। রাজা গোবর্দ্ধনানন্দ বাহুবলীন্দ্র যখন বালিসীতা-গড়ে রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময়ে উৎকল-সম্রাট্ দেবরাজ তাম্রলিপ্ত-রাজের ক্ষমতা হ্রাস দেখিয়া গোবর্দ্ধনানন্দের নিকট কর চাহিয়া পাঠান। কিন্তু কর দিতে অস্বীকার করায় উৎকল-সম্রাটের সৈন্যগণকর্ত্তৃক গড় আক্রান্ত হয় এবং ইনি ধৃত হইয়া রাজ-সমীপে নীত হন। উৎকল-সম্রাট্ ইঁহার অসামান্য রণ-কৌশল ও সঙ্গীত-বিদ্যা দেখিয়া ইঁহাকে উপবীত, বাণ, নিশান ও ডঙ্কা উপঢৌকন-সমেত "বাহুবলীন্দ্র" উপাধি প্রদান করেন। বাহুবলীন্দ্র রাজারা ময়নাগড়ে বসবাস করিতেন। পূর্ব্বের স্বাধীন নৃপতিগণ গড়জাত রাজা বলিয়া কথিত হইতেন; ময়নাগড়ের রাজবংশ "গড়জাত" রাজা নামে পরিচিত। তৎকালে শ্রীধর হুই নামে এক ব্যক্তি কর্ণসেনের গড়ে ছিলেন। পূর্ব্বে লাউসেনের গড়কে গড়ময়না বলা হইত, ইহা গৌড়েশ্বরের শাসনাধীন ছিল। গৌড়েশ্বরের স্থালিকাপতি রাজা কর্ণসেন তৎকর্ত্তৃক এই গড়ের রক্ষক নিযুক্ত হন; পরে তৎপুত্র রাজা লাউসেন ইহার অধিকার প্রাপ্ত হইলে 'গড়ময়না' নামকরণ হয়। লাউসেনের মাতুল মহোম্মদ নামক একব্যক্তি (কোথাও কোথাও মহীমদ পাত্র দেখা যায়) গৌড়েশ্বরের মন্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হন। ইনি কোন কারণে উক্ত গড় আক্রমণ করেন। লাউসেনের অনুপস্থিতিতে তদীয় রাণীদ্বয় শত্রু-সৈন্যসহ তুমুল যুদ্ধ করিয়া অপূর্ব্ব শৌর্য্য-বীর্য্যের পরিচয় প্রদান করেন; এই যুদ্ধে এক রাণী হত হন ও অপর রাণী জয়লাভ করেন। পরে গৌড়রাজের অবসানে 'গড়ময়না' শ্রীধর হুইর হস্তগত হয় ও পরে ময়নাগড় নামে অভিহিত হয়। যাহা হউক শ্রীধর হুই কর্ত্তৃক এই নামটি প্রদত্ত হইয়াছে বেশ বুঝা যায়। এই রাজবংশের প্রথম রাজা গোবর্দ্ধনানন্দ বাহুবলীন্দ্র নূতন করিয়া রাজ-বাটী, গড়-আদি নির্ম্মাণ করেন। তৎকালে ময়নাগড় হইতে বীরভূম পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ রাজা লাউসেনের অধিকারভুক্ত ছিল। গোবর্দ্ধনানন্দ গৌড় রাজ্য ধ্বংসের অব্যবহিত পূর্ব্বে শ্রীধর হুইকে পরাজিত করিয়া ময়নাগড় অধিকার করেন।

এই ত গেল ময়নার সংক্ষিপ্ত প্রক্ষিপ্ত ইতিহাস। এক্ষণে গড়ের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক। ময়নাগড়ের পরিমাণফল ৩০ শত বিঘারও অধিক। ইহার চতুর্দ্দিকে কালিদহ পরিখা, বিস্তার ১৭৫ ফুট, দৈর্ঘ্যে প্রত্যেক দিকের পরিমাণ ৭৫০ ফুট। ইহার চতুর্দ্দিকে উচ্চ ভূখণ্ড, পরিসর ২০০ শত ফুট, দৈর্ঘ্যে প্রত্যেক দিকের পরিমাণ ১০০০ হাজার ফুট; বাহিরে মাকরদহ, বিস্তার ১৭৫ ফুট প্রত্যেক দিকের দৈর্ঘ্য ১৪০০ শত ফুট, গভীরতা ৮ হইতে ১৫ ফুট। উক্ত পরিখাদ্বয়ে কুম্ভীর ও মৎস্যাদি আছে, উভয় পরিখার মধ্যবর্ত্তী স্থান উচ্চ ভূখণ্ড ঘনাবৃত দুর্ভেদ্য পার্ব্বত্য বাঁশের ঝাড় ও বহুবিধ বৃক্ষাদিতে পরিপূর্ণ। এই ভূখণ্ড হরিণ, ব্যাঘ্র, ময়ূর ও বিবিধ পক্ষী ও সরীসৃপ প্রভৃতির বাস-স্থান। সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ ময়নাগড়-সম্বন্ধে অনেক বিষয় অনুসন্ধান করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তদ্ব্যতীত বহু বাঙ্গালা ইতিহাসে এই স্থানের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

১১৯৭ সালের পূর্ব্বেই সমগ্র সবঙ্গ ময়না-রাজাগণের হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ময়না-রাজবংশের সপ্তম রাজা ব্রজানন্দ বাহুবলীন্দ্রের

রাজত্ব-কালে সবঙ্গ পরগণা খণ্ড-খণ্ডরূপে নীলাম হওয়ায় কতকগুলি তালুকের সৃষ্টি হয়। ইনি ১৮২২ খৃঃ পরলোক গমন করেন। তৎ-পরবর্ত্তী রাজা আনন্দনারায়ণ বাহুবলীন্দ্র ইংরেজাধিকার-কালেই পরলোক গমন করেন, তদীয় পিতা রাজা জগদানন্দের শেষ জীবনে এই প্রদেশ কোম্পানীর হস্তগত হয়।

ময়নাগড়ের বিবরণ কবি দ্বিজরাম, ঘনরাম চক্রবর্ত্তী, নৃসিংহ বসু, মাণিক গাঙ্গুলি রচিত পৃথক্ পৃথক্ চারিখানি ধর্ম্মায়ণ ও ধর্ম্ম-সঙ্গীত-নামক পদ্য-পুস্তকে (প্রাচীন পুঁথিতে) আছে। কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর এই ময়নাগড়কে কর্ণগড় বা কর্ণসেনের গড় বলিয়া মানসিংহের বর্ণনা করিয়াছেন। কবি ঘনরাম চক্রবর্ত্তী মেদিনীপুরের এই ময়নাগড়ে জন্মগ্রহণ করেন। তৎপ্রণীত শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের ন্যায় বঙ্গের ভাষা ভাণ্ডারে এমন মহাকাব্য আর কি আছে? ইহা বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। আমার নিকট একখানি ঐ কালের জীর্ণাবস্থা-প্রাপ্ত ধর্ম্মায়ন আছে; তন্মধ্যে কতকগুলি সম্পূর্ণ নূতন জিনিস পাওয়া গিয়াছে। এই জেলার অনেকে অদ্যাবধি ময়নাগড়ের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানেন না—ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়।

ময়নাগড়ের লোকেশ্বর ও শ্যামসুন্দর এই দুইটি মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ময়নাগড়ের রাজগণ দেশের কৃষিবাণিজ্য-বিস্তার-কল্পে এবং দেবসেবার্থে ব্রাহ্মণকে অনেক ভূসম্পত্তি দান করিয়াছেন।

(মাধবী, বৈশাখ ১৩৩১)   শ্রী বিভূতিভূষণ জানা

—

কাশীপুরের বিরূপাক্ষ

বরিশাল হইতে দুই-তিন মাইল পশ্চিমে কাশীপুর গ্রাম। সেখানে একখানা অতি সুন্দর শিবমূর্ত্তি বিরূপাক্ষ নামে পূজা প্রাপ্ত হইতেছে। মূর্ত্তিখানি কতদিন হইল পাওয়া গিয়াছে, কে পাইয়াছিল, কাহার বাড়ীতে বর্ত্তমানে পূজা হইতেছে, এইসকল খবর আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ যদি এইসকল খবর সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন, তবে বড়ই ভাল হয়।

মূর্ত্তিখানি কৃষ্ণ প্রস্তর-নির্ম্মিত। আমার নিকট মূর্ত্তিখানির যে ফোটোগ্রাফ আছে তাহা দেখিয়া মনে হয়, মূর্ত্তিখানি চারি ফুট, সাড়ে চারিফুট উচ্চ হইবে। মূর্ত্তিখানি চতুর্ভুজ, দক্ষিণোর্দ্ধহস্তে ত্রিশূল, দক্ষিণাধঃ হস্তে বরমুদ্রায় ধৃত জপবটী। বামোর্দ্ধহস্তে খট্বাঙ্গ, বামাধঃ হস্তে নরকপাল। মাথায় জটামুকুট, মাথার পশ্চাতে প্রভা-মণ্ডল। সকলের উপরে একটি তিন-থাক-ওয়ালা ছাতি। প্রভা-মণ্ডলের দক্ষিণে মূষিক-বাহন গণেশ ললিতাসনে উপবিষ্ট, বামে কার্ত্তিকেয় ময়ূর-বাহনে ধাবমান। শিবের গলায় হার, বাহুতে বাজু, প্রকোষ্ঠে বলয়, কর্ণ-ভূষণের ভারে কর্ণ ছিঁড়িয়া নামিয়াছে। কটিতে কটিসূত্র ও অজস্র অলঙ্কার, পরনের কাপড় কিন্তু হাটুর নীচে নামে নাই। সুস্পষ্ট উদ্ধলিঙ্গও লক্ষ্যের যোগ্য।

শিবের দক্ষিণে অভয় ও উৎপল-ধারিণী মকর-বাহিনী গঙ্গা, বামে অভয়োৎপল-ধারিণী সিংহ-বাহিনী গৌরী। শিব কমলাসনে দণ্ডায়মান, আসনের নিম্নে বলীবর্দ্দ হাত পা গুটাইয়া মাথাটি ঈষৎ উপরের দিকে উঠাইয়া যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-ধরের বহন-গৌরব অনুভব করিতেছে।

মূর্ত্তিখানি বিরূপাক্ষ নামে পূজা হয়, কিন্তু বিরূপাক্ষের কোন ধ্যানের সহিতই মূর্ত্তির মিল পাইলাম না। কেহ উদ্যোগী হইয়া যে ধ্যানে বর্ত্তমানে মূর্ত্তিখানির পূজা হয়, তাহা সংগ্রহ করিলে বড় ভাল হয়। আমার মতে এই মূর্ত্তি নীলকণ্ঠ বলিয়া পরিচিত হওয়া উচিত, কারণ নীলকণ্ঠের ধ্যানের সহিত মূর্ত্তিখানির মিল আছে।

সারদা-তিলোকক্ত নীলকণ্ঠের ধ্যান এইরূপ :—

বালার্কাযুততেজসং ধৃতজটাজুটেন্দুখণ্ডোজ্জ্বলং
নাগেন্দ্রৈঃ কৃতভূষণৈর্জপবটীং শূলং কপালং করৈঃ।
খট্বাঙ্গং দধতং ত্রিনেত্রবিলসৎপঞ্চাননং সুন্দরং
ব্যাঘ্রত্বক্‌পরিধানমব্জনিলয়ং শ্রীনীলকণ্ঠং ভজে॥

নবোদিত অযুত সূর্য্যের মত তেজশালী, খণ্ডইন্দুদ্বারা উজ্জ্বল, জটাজুটধারী, মহাকায় সর্পগণ দ্বারা ভূষিত, চারিবাহুতে জপবটী, শূল, খট্বাঙ্গ এবং নরকপালধারী, ত্রিনেত্রযুক্ত পঞ্চাননশালী, ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিহিত, পদ্মের উপর অধিষ্ঠানকারী, সুন্দর শ্রীনীলকণ্ঠকে ভজনা করি।

এই ধ্যানের সহিত মূর্ত্তিটির এক পঞ্চানন ভিন্ন আর সম্পূর্ণ মিল আছে। মূর্ত্তি লইয়া যাঁহারা আলোচনা করেন, তাঁহারা জানেন যে শিব সর্ব্বদাই পঞ্চাননরূপে বর্ণিত হইলেও পাথরের মূর্ত্তিতে সাধারণতঃ একটি মাত্র মুখই দেখান হয়।

মূর্ত্তিখানি খুব সাদা-সিধা। কিন্তু শিব ও গঙ্গা-গৌরীর মুখশ্রী শিল্পী অতি নিপুণ হস্তে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ভোলা মহেশ্বরের মুখে যে স্বর্গীয় হাসিটি লাগিয়া আছে, তাহা প্রণিধান করিয়া দেখিতে দেখিতে সৌন্দর্য্যের উপলব্ধিতে আত্মহারা হইয়া যাইতে হয়।

মূর্ত্তির উপরের ছত্রটি লক্ষ্যের যোগ্য। ছত্র-চিহ্ন আর কৃত্তিমুখ-চিহ্ন, পূর্ব্ববঙ্গের পাথরের মূর্ত্তিগুলির উপর এই দুই চিহ্নই সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়। কৃত্তিমুখযুক্ত মূর্ত্তিগুলিতে কারুকার্য্য খুব বেশী থাকে। ছত্র-চিহ্নের মূর্ত্তিগুলি সাধারণতঃ সাদা-সিধা হয়। আমার মনে হয়, ছত্রচিহ্নযুক্ত মূর্ত্তিগুলি পূর্ব্ববঙ্গের ভাস্করগণের তৈয়ারি। প্রমাণ-প্রয়োগের কথা তুলিলেই পাঠকগণ পলায়নপর হইবেন—কাজেই রসভঙ্গ করিবার দরকার নাই।

পূর্ব্ববঙ্গে এমন প্রাচীন পল্লী প্রায় নাই যেখানে দুই-একখানা পাথরের মূর্ত্তি না আছে। পাঠকবর্গ যদি নিজ নিজ গ্রামের পাথরের মূর্ত্তিগুলির বর্ণনা লিখিয়া পাঠান, তবে পূর্ব্ববঙ্গের ভাস্কর্য্যের ইতিহাস সঙ্কলন করা সহজ-সাধ্য হইয়া উঠে।

(তরুণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১)   শ্রী নলিনীকান্ত ভট্টশালী
(কিউরেটর, ঢাকা মিউজিয়ম্)

—

ভারতের বাহিরে আয়ুর্ব্বেদের প্রভাব

অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের সবিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। বৌদ্ধগণ জীবের দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত এই শাস্ত্রের সম্যক্ অনুশীলন ও প্রচার করিতেন। মহারাজা অশোক মনুষ্য ও পশু এ উভয়ের নিমিত্ত পৃথক্ চিকিৎসালয় করাইয়াছিলেন। তিনি যে কেবল তাঁহার নিজের রাজ্যেই এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা নহে, শিলা-লিপিতে উক্ত হইয়াছে যে, সিংহলে ভারতবর্ষের পশ্চিমে যে-সমুদয় যবন-রাজ্য ছিল, তাহার সর্ব্বত্রই তিনি এইরূপ মনুষ্য ও পশুর চিকিৎসার বিধান করিয়াছিলেন। ফল-মূল ও অন্যান্য ভেষজ-দ্রব্য যেখানে যাহা কিছুর অভাব হইত, তিনি ভারতবর্ষ হইতে তৎসমুদয় সরবরাহ করিতেন। এমন কি আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধে ব্যবহৃত অনেক গাছ-গাছড়াও তিনি ঐ-সমুদয় দেশে রোপণ করাইয়াছিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদের জ্ঞান সমগ্র এশিয়ায় প্রচারিত হইয়া জীবের মহা কল্যাণ সাধিত করিয়াছিল।

জীবের অশেষ কল্যাণকর আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র সমগ্র এশিয়ায় কিরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল, তাহার কিছু-কিছু প্রমাণ এখনও বিদ্যমান আছে। মধ্য এশিয়াখণ্ডের চীন-দেশের অন্তর্গত কাশগড়ের একটি

বৌদ্ধস্তূপ হইতে অনেকগুলি হস্ত-লিখিত পুঁথি আবিষ্কার করা হইয়াছে। আবিষ্কর্তার নামানুসারে এগুলিকে বাওয়ার পুঁথি বলে। ভূর্জ্জপত্রে লিখিত এই পুঁথিখানি গুপ্ত-যুগের প্রচলিত অক্ষরে লিখিত, সুতরাং ইহা খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী। এই পুঁথিখানির মধ্যে সাতখানি ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে চারিখানি আয়ুর্ব্বেদ-গ্রন্থ। এই গ্রন্থগুলির ভাষা চরক-সুশ্রুতের ভাষা অপেক্ষাও প্রাচীন। বাওয়ার পুঁথি অপেক্ষাও প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদের পুঁথি মধ্য-এশিয়ায় পাওয়া গিয়াছে। ম্যাকার্টুনি যে পুঁথি আবিষ্কার করেন, তাহা খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছিল।

মহারাজা অশোকের সময় হইতেই সিংহলে আয়ুর্ব্বেদের প্রচার হইয়াছিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে সিংহলের রাজা বুদ্ধ দাস স্বীয় রাজ্যে চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপন করিয়া আয়ুর্ব্বেদের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। 'সারথসংগ্রহ' নামে তিনি একখানি আয়ুর্ব্বেদের গ্রন্থও রচনা করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যোগার্ণব নামে আর-একখানি গ্রন্থ লিখিত হয়। পরে ভারতীয় সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ অবলম্বনে বহু গ্রন্থ সিংহলীয় ভাষায় রচিত হয়।

তিব্বতেও আয়ুর্ব্বেদের বহুল প্রচার হইয়াছিল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে চারিখানি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হয়। (এই মূল সংস্কৃত গ্রন্থগুলি এখন পর্য্যন্তও পাওয়া যায় নাই।) ইহার পরে আরও বহুসংখ্যক সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। তিব্বতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞান প্রায় সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিব্বত হইতে আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র মঙ্গোলিয়ান্ জাতিদিগের মধ্যে ও হিমালয় পর্ব্বতবাসী লেপ্চা প্রভৃতি জাতির মধ্যে প্রচলিত হয়। তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত কতকগুলি আয়ুর্ব্বেদ-গ্রন্থ বিভিন্ন মঙ্গোলীয় ভাষায় অনূদিত হওয়ায় অনেক ভিন্ন ভিন্ন মঙ্গোলীয় জাতির মধ্যে ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র প্রতিষ্ঠালাভ করে।

আরব ও পারস্যদেশের আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের বহুল প্রচার ছিল। শাসানিয়ান্ ও আব্বাসাইডদিগের রাজত্ব-কালেই সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদ-গ্রন্থের পারস্য ভাষায় অনুবাদ আরম্ভ হয়। তৎপরে আরবী ভাষায় বহু আয়ুর্ব্বেদ-গ্রন্থের অনুবাদ হয়। চরক ও সুশ্রুত ব্যতীত এমন অনেক ভারতীয় গ্রন্থকারের রচনা উক্ত ভাষায় অনূদিত হইয়াছে, যাহার মূল সংস্কৃত এখন আর পাওয়া যায় না। এইসব গ্রন্থকারের নামও উক্ত অনুবাদগুলিতে দেওয়া আছে। কিন্তু পারসী ও আরবী ভাষায় তাহা এরূপ রূপান্তরিত হইয়াছে যে, তাহার ভারতীয় মূল এখন উদ্ধার করা অসম্ভব। আবু মনসুর মুয়াফ্ফক নামক পারস্য-দেশীয় এক গ্রন্থকার আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার জন্য ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তাহার গ্রন্থে অধুনা-অজ্ঞাত বহু সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদ-গ্রন্থের ও গ্রন্থকারের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। যথা:—মনসুর 'বীকরগবদৎ' নামক গ্রন্থকারের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা যে 'শ্রীভার্গবদত্তের' পারসী সংস্করণ সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

আরব ও পারস্যের মধ্য দিয়া ইউরোপেও আয়ুর্ব্বেদের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। গ্রীক্-দেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্র যে কোন কোন বিষয়ে ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের নিকট ঋণী, এ-কথা পণ্ডিত মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। তবে এই ঋণের পরিমাণ কাহারও মতে খুব বেশী আবার কাহারও মতে অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু মোটের উপর আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র যে গ্রীসে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। তার পর খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত আরব-দেশীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রভাব ইউরোপে খুব বেশী ছিল, সুতরাং প্রকারান্তরে আয়ুর্ব্বেদের প্রভাবও স্বীকার করিতেই হইবে। আরব-দেশীয় ইবন সিনা, আল্-রাজি প্রভৃতি গ্রন্থের লাটিন্ অনুবাদেও চরক-সংহিতার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষের বাহিরে যেখানে যেখানে ভারতবাসীরা উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই-সেইখানে আয়ুর্ব্বেদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এইরূপে ব্রহ্মদেশ, মালয়, শ্যাম, কাম্বোডিয়া, আসাম, সুমাত্রা, যাভা প্রভৃতি দেশে আয়ুর্ব্বেদের প্রচার হইয়াছিল। এইসকল দেশে আয়ুর্ব্বেদের প্রভাব কিরূপ ছিল, তাহার কিছু পরিচয় শিলালিপি হইতে পাওয়া যায়। কাম্বোজরাজ যশোবর্ম্মণের শিলালিপিতে তাঁহার গুণবর্ণনাছলে উক্ত হইয়াছে—

সুশ্রুতোদিতয়া বাচা সমুদাচারসারয়া
একো বৈদ্যঃ পরত্রাপি প্রজাব্যাধীন্ জহার যঃ।

অর্থাৎ বৈদ্য সুশ্রুতের মতানুসারে ব্যবস্থা করিয়া ইহকালে প্রজা-ব্যাধি হরণ করে। কিন্তু রাজা শাস্ত্র-সম্মত ও সারবান্ বাক্যের দ্বারা প্রজাগণকে ইহকাল ও পরকালের ব্যাধি হইতে রক্ষা করেন। সুশ্রুতের সহিত তুলনায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, তৎকালে (খৃঃ নবম শতাব্দীতে) কাম্বোজ-দেশে (বর্ত্তমান কাম্বোডিয়ায়) সুশ্রুত-সংহিতা অতিশয় সুপরিচিত ছিল।

তার পর অষ্টম জয়বর্ম্মণের রাজত্ব-কালে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে আয়ুর্ব্বেদ-মতে বহু দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান শ্যাম ও কাম্বোডিয়ার বিভিন্ন স্থানে আটখানি শিলালিপিতে এইরূপ আটটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

একখানি শিলালিপির কতক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইহা দ্বারা জয়বর্ম্মণের কল্পনা ও কার্য্যের কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে। রাজার গুণবর্ণনাচ্ছলে উক্ত হইয়াছে:—

আয়ুর্ব্বেদাস্ত্রবেদেষু বৈদ্যবীরৈর্বিশারদৈঃ
যোঽঘাতয়দ্ রাষ্ট্ররুজো রুজারীন্ ভেষজায়ুধৈঃ।

[আয়ুর্ব্বেদরূপ অস্ত্রবেদে বিচক্ষণ বৈদ্য-বীরগণের দ্বারা ঔষধরূপ অস্ত্রের সাহায্যে তিনি রাজ্যের পীড়া সংহার করিয়াছিলেন।]

কারণ:—"দেহিনাং দেহরোগোঽস্মন্মনোরোগরুজত্তরাং
রাষ্ট্রদুঃখং হি ভর্ত্তৄণাং দুঃখং দুঃখং তু নাত্মনঃ।

[রাজ্যের দুঃখেই রাজার দুঃখ, রাজার নিজের দুঃখ নহে। আবার দেহ-রোগ হইতেই মনের রোগ উপস্থিত হয় সুতরাং দেহ-রোগেই রাজ্যের দুঃখ।]

অতএব:—

"স ব্যধাদিদমারোগ্যশালং স সুগতালয়ং
ভৈষজ্যসুগতঞ্চেহ দেহাম্বরহৃদিন্দুনা।

[তিনি একটি বৌদ্ধ মন্দির ও আরোগ্য-শালা প্রতিষ্ঠা করিলেন।]

এখনকার ব্যবস্থা:—

"চিকিৎস্যা অত্র চত্বারো বর্ণা দ্বৌ ভিষজৌ তয়োঃ
পুমানেকঃ স্ত্রিয়ৌ চ দ্বে একশঃ স্থিতিদায়িনঃ।"

[এখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—সকলেরই চিকিৎসা হইবে। দুইজন ভিষক্ থাকিবেন প্রতি ঘরে পুরুষ হইলে একজন ও স্ত্রীলোক হইলে দুইজন রোগী (স্থিতিদায়িন?) থাকিবে।]

অন্যান্য কর্ম্মচারীর ব্যবস্থা:—

"নিধিপালৌ পুমাংসৌ দ্বৌ ভেষজানাং বিভাজকৌ।
গ্রাহকৌ ব্রীহিকাষ্ঠানাং তদ্দায়িভ্যঃ প্রতিষ্ঠিতৌ।
পাচকৌ তৌ পুমাংসৌ দ্বৌ পাকৈধোদকদায়িনৌ
পুষ্পদর্ভহরৌ দেব বসতেশ্চ বিশোধকৌ"
"দ্বৌ যজ্ঞহারিণৌ পত্রকারৌ পত্রশালাকয়োঃ
দাতারাবথ ভৈষজ্যপাকেন্ধনহরাবুভৌ

"নারাশ্চতুর্দ্দশারোগ্যশালা-সংরক্ষিণঃ পুনঃ
দাতারো ভেষজানাং ... স্থিতে
"দ্বে তু ব্রীহ্যবঘাতিন্যৌ তা অষ্টৌ পিণ্ডিতা স্ত্রিয়ঃ
তাসাং তু স্থিতিদায়িন্যঃ প্রত্যেকং যোষিতাবুভে
"পুনঃ পিণ্ডীকৃতাস্তে তু দ্বাত্রিংশৎ পরিচারিকাঃ
ভূয়োষ্টানবতিস্সর্ব্বে পিণ্ডিতাস্ স্থিতিদৈস্ সহ

[কর্ম্মচারীর তালিকা :—

ঔষধের বিভাগের নিমিত্ত নিধিপাল	—২
পাচক (ঔষধ ও পথ্য প্রস্তুতের নিমিত্ত)	—২
ঔষধের ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত যজ্ঞহারী	—২
আরোগ্য-শালার ঔষধ-ব্যবস্থা-নিমিত্ত	—১৪
দাসী (তণ্ডুলচূর্ণ ও অন্যান্য কার্য্যের নিমিত্ত)	—৮
ব্রীহিকাষ্ঠ-গ্রাহক —	—২
গাছ-গাছড়া-সংগ্রহকারী	—২
মোট পরিচারক-সংখ্যা	—৩২
স্থিতিদায়ী (রোগী ?)	—৬৬
মোট	৯৮

তার পর প্রতিবৎসর তিনটি নির্দ্দিষ্ট তারিখে, প্রত্যেক রোগীর জন্য নিম্নলিখিত জিনিষগুলি ভাণ্ডার হইতে দেওয়া হইবে—

"প্রতিবর্ষং ত্রিদং গ্রাহ্যং ত্রিস্কন্ধৌ ভূপতের্নিধেঃ
প্রত্যেকং চৈত্রপূর্ণিম্যাং শ্রাদ্ধে চাপি উত্তরায়ণে"
জিনিষের তালিকা :—
"রক্তান্তজালবসনৈকং ধৌতাম্বরাণি ষট্।
দ্বেগোভিক্ষে পঞ্চপলং তক্রং কৃষ্ণা চ তাবতী
"একঃ পঞ্চপলঃ সিকথদীপঃ একপলঃ পুনঃ।
চত্বারো মধুনঃ প্রস্থাস্ত্রয়ঃ প্রস্থাস্তিলস্য চ ॥
"ঘৃতং প্রস্থোথ ভৈষজ্যং পিপ্পলী রেণুদীপাকম্।
পুন্নাগশ্চৈকশঃ পাদদ্বয়ঞ্জাতীফলত্রয়ম্ ॥
হিঙ্গুক্ষারং কোথজীর্ণমেকৈকশ্চৈক পাদকম্।
পঞ্চবিশ্বংতু কর্পূরং শর্করায়াঃ পলদ্বয়ম্ ॥
"দংদংসাখ্যা জলচরাঃ পঞ্চাখ্যাতা অথৈকশঃ।
শ্রীবাসশ্চন্দনং ধান্যং শতপুষ্পং পলং স্মৃতং ॥
"এলা নাগরককোলং মরীচং তু পলদ্বয়ং।
প্রত্যেকং একশঃ প্রস্থৌ দ্বৌ প্রচীবল সর্ষপৌ ॥
ত্বকসাধ মুষ্টি পথ্যাস্তু চত্বারিংশৎ প্রকল্পিতাঃ।
দার্বী ভিদা দ্বয়ঞ্চাথ সার্দ্ধৈক পলমেকশঃ ॥
"অথৈকশো মধু পুদ্দৌ কুডুব ত্রয় মানিতৌ।
একং প্রস্থস্তু সৌবীর নিরসস্য পরিকল্পিতঃ ॥

এইরূপ আরোগ্য-শালার প্রতিষ্ঠান করিয়া রাজা ব্যবস্থা করিলেন যে, রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী নিজে ইহার তত্ত্বাবধান করিবেন। অন্য কোন অধস্তন রাজকর্ম্মচারী কর আদায় বা অন্য কোন ছলে এই আরোগ্য-শালার প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

গুরুতর অপরাধ করিলেও যতক্ষণ অপরাধী এই আরোগ্য-শালায় থাকিবে ততক্ষণ তাহার কোন দণ্ড হইতে পারিবে না, কিন্তু এই আরোগ্য-শালাস্থিত কাহারও প্রতি যে কোনরূপ অত্যাচার করিবে তাহার কঠোর দণ্ড হইবে।

এশিয়ার সুদূরতম প্রদেশে আয়ুর্ব্বেদের কিরূপ প্রভাব ছিল, আলোচ্য শিলালিপিখানিই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। কেবলমাত্র একজন রাজার রাজত্বেই ন্যূনপক্ষে এইরূপ ৮টি আরোগ্য-শালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীন গৌরবের ইহা অপেক্ষা আর কি উৎকৃষ্ট নিদর্শন হইতে পারে? প্রাচীন কালে—অধুনা অরণ্য-সমাকীর্ণ কত সুদূর দেশে আয়ুর্ব্বেদের প্রভাবে কত লক্ষ লক্ষ লোকের আধিব্যাধি দূর হইয়াছিল, তাহা ভাবিতেও হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হয়। প্রাচীন ভারত-সভ্যতার এই গৌরব কখনও লুপ্ত হইবার নহে।

(প্রাচী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১) শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার

—

সভ্যতার একটি মাপকাঠি

অনেক বৎসর পূর্ব্বে, প্রাতে গোলদিঘী-পরিক্রমণ আমার দৈনিক কাজের মধ্যে ছিল। তখন যাঁহাদের সঙ্গে বেড়াইতাম, তাঁহারা অনেকে এখনও সেখানে বেড়ান, আমার যাওয়া প্রায় ঘটিয়া উঠে না।

সেই আগেকার দিনে যখন একদিন বেড়াইতেছিলাম, তখন দেখিলাম, একটি ছেলে বার-বার গোলদিঘী পরিক্রমণ করিতেছে। তাহাকে তাহার আগেও ঐখানে অনেক বার দেখিয়াছিলাম। ছেলেটির পরিধানে ছিল চুড়িদার পায়জামা ও কোট, এবং মাথায় একটি দেশী টুপি। তাহার নীচে হইতে ঈষৎ লম্বা চুল ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

বেড়াইতে বেড়াইতে আমাদের ভ্রমণের সঙ্গী একজন থামিয়া কিছুক্ষণ তাহার সহিত তাহার পিতার ও তাহার কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ইত্যাদি নানা-কথা ইংরেজীতে কহিলেন। তাহাতে বুঝিলাম, ছেলেটি বাঙ্গালী নয়;—অবশ্য তাহার পোষাকেও আগেই তাহা অনুমান করিয়াছিলাম।

তাহার পর ছেলেটির ও আমাদের বেড়ান আবার আরম্ভ হইল। তখন যিনি তাহার সহিত কথা কহিয়াছিলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলুন ত, ঐ ছেলেটি ছেলে না মেয়ে?" এরূপ প্রশ্নে স্বভাবতই বিস্মিত হইলাম, এবং কৌতূহলেরও উদ্রেক হইল। প্রশ্নকর্ত্তা নিজেই উত্তর দিলেন, "ওটি মেয়ে। উহার পিতা দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক অবস্থা ও মত প্রভৃতি তিনি সাক্ষাৎভাবে অবগত হইতে চান।" একথাও সম্ভবতঃ আমাদের ভ্রমণ-সহচর বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা আমার এখন ঠিক্ মনে নাই, যে, মেয়েটির মাতা জীবিত নাই। যাহাই হউক, তাঁহার নিকট অবগত হইলাম, যে, মেয়েটির পিতা তাহাকে সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া স্বয়ং তাহার শিক্ষকের কাজ করেন। আমি তাঁহাকে ঐ মেয়েটিকে ও তাহার বড় ভাইকে গোলদিঘীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণের ঘাসের উপর বসিয়া শিক্ষা দিতে দেখিয়াছিলাম। তাঁহার নাম যাহা শুনিয়াছিলাম তাহা এখনও মনে আছে, কিন্তু তাহা লিখিবার প্রয়োজন নাই। তিনি একবার আমার সহিত সাক্ষাৎও করিয়াছিলেন।

মেয়েটি বড় হইয়াছিল, কিন্তু তখনও বিবাহিতা হয় নাই। তাহাকে সঙ্গে রাখাও দরকার। প্রাপ্তবয়স্কা অনূঢ়া কন্যাকে লইয়া নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ান ও তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করা কঠিন কাজ; বিশেষতঃ সাধারণ গৃহস্থ-লোকদের পক্ষে। সেইজন্য কন্যাটির পিতা এবিষয়ে নিরুদ্বেগ হইবার নিমিত্ত তাহাকে ছেলে সাজাইয়া সঙ্গে রাখিতেন। ছেলের মত নিঃশঙ্ক চলাফিরায় অভ্যস্ত হওয়ায় মেয়েটিকে মেয়ে বলিয়া বুঝা যাইত না। যখন জানিতে পারিলাম, যে, সেটি মেয়ে, তখনও তাহাকে বালকই মনে হইতে লাগিল।

সম্ভবতঃ অনেকে এই কন্যার পিতাকে ছিটগ্রস্ত বা খেয়ালী লোক মনে করিবেন। তাহা করুন; সে-বিষয়ের আলোচনা করা

আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি কেবল সকলকে মনে-মনে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া নিজেই মনে-মনে তাহার উত্তর দিতে অনুরোধ করিতেছি, যে, বাংলাদেশে নির্ধন পিতার পক্ষে দেশভ্রমণকালে প্রাপ্তবয়স্কা অনূঢ়া কন্যাকে ছেলে সাজাইয়া সঙ্গে রাখিবার প্রয়োজন কেন হইল? পাশ্চাত্য দেশসকলের কথা তুলিতে চাই না, কারণ আমাদের দেশে এখনও এই মতই প্রবল যে, পাশ্চাত্য সমাজ বড় খারাপ এবং আমাদের সমাজ বড় ভাল। কিন্তু ভারতবর্ষেরই কোন কোন প্রদেশের কথা ভাবিতে বলি যেখানে বাংলা বিহার আগ্রা অযোধ্যা অপেক্ষা নারীদের বেশী স্বাধীনতা আছে। মহারাষ্ট্রে কোন নির্ধন পিতার কন্যাকে ছেলে সাজাইবার প্রয়োজন নিশ্চয়ই হইত না, কারণ সেখানে অবগুণ্ঠনমুক্ত কোন তরুণী, প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধাকে বাড়ীর বাহিরে দেখিলে তাঁহার সম্ভ্রান্ততা- বা ভদ্রতা-সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন মনে আসে না; তথায় অতি সম্ভ্রান্ত মহিলারাও পুরুষ-সঙ্গী ব্যতিরেকেও রাস্তা-ঘাটে বেড়াইয়া থাকেন। বাড়ীর বাহিরে আসিলে বাংলাদেশের মত পুরুষদের কাপুরুষোচিত বিষদিগ্ধ দৃষ্টি মহারাষ্ট্র মহিলাকে সহ্য করিতে হয় না।

বস্তুতঃ, কোন্ দেশ কতটা সভ্য, তথাকার নারীর অবস্থা দ্বারা তাহা মাপা যাইতে পারে। সে-দেশে নারীরা জ্ঞানে কত উন্নত, তাঁহাদের পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার, দায়াধিকার, কিরূপ—এ-সকল বিষয়ে তথ্যনির্ণয় করা আবশ্যক বটে; কিন্তু আমি এখন সে-সব কথা তুলিতেছি না। আমি এখন কেবল ইহাই বলিতেছি, যে, যে-দেশে নারী যেরূপ নিরাপদ্, নিরুদ্বেগ, নিঃশঙ্ক জীবন যাপন করিতে পারেন সেই দেশ সভ্যতায় তত অগ্রসর।

অবশ্য পূর্ণ সভ্য এখনও কোনও দেশ হয় নাই। ইউরোপের জাতিরা আপনাদিগকে সভ্যতম বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন; কিন্তু সেই মহাদেশেও যখনই জাতিতে জাতিতে বিরোধ হইয়া যুদ্ধ হইয়াছে, তখনই আক্রান্ত বা পরাজিত দেশের নিরপরাধ রমণীদের উপর পৈশাচিক অত্যাচার হইয়াছে। গত মহাযুদ্ধে, পোল্যাণ্ড্ প্রভৃতি দেশে লক্ষ লক্ষ নারী এইপ্রকারে অত্যাচারিত হইয়াছিলেন। এই কলঙ্ক হইতে কোন দেশ কোন জাতি সম্পূর্ণ মুক্ত নহে। মহারাষ্ট্রের ইহা একটি গৌরবের বিষয়, যে, শিবাজীর এবিষয়ে কঠোর আজ্ঞা ছিল এবং এবিষয়ে তাঁহার নিজের আচরণ আদর্শস্থানীয় ছিল। অধ্যাপক যদুনাথ সরকার তৎকৃত শিবাজী-চরিতে লিখিয়াছেন, "His chivalry to women and strict enforcement of morality in his camp was a wonder in that age and has extorted the admiration of hostile critics like Khafi Khan."

আধুনিক কালে ভারতবর্ষের মধ্যে বহু বৎসর যুদ্ধ হয় নাই। মোপ্‌লা বিদ্রোহকে শেষ যুদ্ধ বলা যাইতে পারে। ইহাতেও স্ত্রীলোকদের উপর অত্যাচার হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধ না হইলেও দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও ডাকাইতি এ-দেশে এখনও হইয়া থাকে, এবং তাহাতে স্ত্রীলোকদিগকে অত্যাচার ও লাঞ্ছনা খুবই সহ্য করিতে হয়। অত্যাচার হইতে রক্ষা করা পুলিশের কাজ, কিন্তু কখন কখন তাহারাই অত্যাচারী হইয়া থাকে।

বাংলাদেশের সর্ব্বাপেক্ষা লজ্জা ও দুঃখের কথা এই যে, এখানে গৃহস্থের বাড়ীর মধ্য হইতে, রাত্রে, সন্ধ্যায় এমন কি দিনে-দুপুরে, কখন কখন স্বামী পিতা ভ্রাতার সম্মুখ হইতে নারী অপহৃতা হন।

নারীদের এইরূপ দুর্গতি যে-দেশে ও যেখানে হয়, তথাকার কতক-গুলা লোক দুর্ব্বৃত্ত ও পশুপ্রকৃতি এবং অন্য কতকগুলা লোক দুর্ব্বল ও কাপুরুষ।

বস্তুতঃ নারীদিগকে প্রায় সব সময় বা বেশীর ভাগ সময় অন্তঃপুরে রাখিবার সপক্ষে যে যুক্তি দেখান হয়, যে, নতুবা তাহাদের মান ইজ্জৎ সম্ভ্রম থাকিবে না, সেই যুক্তির মধ্যেই ইহা উহ্য রহিয়াছে, যে, দেশের বহুসংখ্যক লোক এরূপ জঘন্য প্রকৃতির যে তাহারা সুযোগ পাইলেই স্ত্রীলোকদিগের অনিষ্ট করিবে, এবং যাহারা অনিষ্ট করিবে না তাহারা এরূপ বলহীন ভীরু ও কাপুরুষ, যে, তাহাদের দ্বারা নারীর রক্ষার আশা নাই। সুতরাং অবরোধ-প্রথা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে।

সমুদয় পৃথিবীতে নরমাংস ভোজনের বিরুদ্ধে যেমন একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সংস্কার ও লোকমত জন্মিয়াছে, নারীর উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধেও তেমনি একটি প্রবল সংস্কার ও লোকমত বদ্ধমূল হইলে বুঝিব, যে, পৃথিবীর লোক সভ্য হইয়াছে।

বাংলাদেশের দুর্গতি দূর করিতে হইলে, প্রত্যেক সমর্থ পুরুষকে নারীর মানসম্ভ্রম রক্ষার জন্য প্রাণপণ করিতে হইবে; এবং যাঁহারা অবিবাহিত, এইরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইবার মত সাহস ও বল তাঁহাদের না থাকিলে তাঁহাদিগকে আমরণ অবিবাহিত থাকিতে হইবে।

(নব্যভারত, বৈশাখ, ১৩৩১) শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

—

রামায়ণী কথার প্রচার

প্রাচীন গ্রন্থাদির মধ্যে রামায়ণ-কথার উল্লেখ বা প্রচার প্রথম মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতের বন-পর্ব্বে ২৭৩ হইতে ২৯০ অধ্যায় পর্যন্ত—এই চৌদ্দটি অধ্যায়ে রামায়ণের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে।

মহাভারতে রামায়ণী কথাকে পুরাণ-ইতিহাস বলিয়াই স্বীকার করা হইয়াছে। যথা—

"শৃণু রাজন্ যথাবৃত্তমিতিহাসং পুরাতনম্"। ৩।২৭৩।৬

মহাভারতকার এই প্রাচীন গীত যে প্রাচীন কবি বাল্মীকির রচিত তাহারও উল্লেখ দ্রোণ-পর্ব্বে করিয়াছেন।

"অপিচায়ং পুরা গীতঃ শ্লোকো বাল্মীকিনা ভুবি।"

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে বশিষ্ঠ ঋষি রামকে আত্মজ্ঞান-বিষয়ক তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন। ইহা বৈরাগ্য প্রকরণ, মুমুক্ষু-ব্যবহার প্রকরণ, নির্ব্বাণ প্রকরণ—প্রভৃতি ছয়টি প্রকরণে বিভক্ত। ধর্ম্ম-উপদেশ-ছলে বহু উপাখ্যানও এই পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে; এই সঙ্গে ইক্ষ্বাকু-মনু সংবাদও প্রদত্ত হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে এই গ্রন্থখানা রামায়ণ নহে; রাম-সম্পর্কিত ধর্ম্ম-দর্শন গ্রন্থ। ইহার রচনা-কালও মূল রামায়ণের অনেক পরবর্ত্তী।

বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অনেক গ্রন্থে রামায়ণ-কথার আভাস আছে; তন্মধ্যে "লঙ্কাবতার সূত্র," "দশরথ জাতক," "মহাবিভাসা" প্রভৃতি উল্লেখ-যোগ্য। লঙ্কাবতার সূত্রে রামের কোন কথা নাই। না থাকিলেও রামের সমসাময়িক বীর লঙ্কাধিপতি রাবণের কথা আছে।

'লঙ্কাবতার সূত্রে' রাবণকে বুদ্ধদেবের সমসাময়িক বলিয়া লিখিত হইয়াছে এবং তিনি যে বুদ্ধদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ লিখিত হইয়াছে। স্বর্গীয় রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের একটি প্রবন্ধ হইতে লঙ্কাবতার সূত্রের বিবরণ গৃহীত হইল।

একসময়ে ভগবান্ বুদ্ধ লঙ্কানগরীর সমুদ্রতীরবর্ত্তী মলয়-শিখরে বিহার করিতেছিলেন; লঙ্কাধিপ রাবণ ভগবানের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত তাঁহাকে লঙ্কার অভ্যন্তরে লইয়া যাইতে আসিলেন।

রাবণ শুক ও সারণ-নামক অমাত্যদ্বয় ও নিজ পরিবার সহ পুষ্পক-রথে বুদ্ধের নিকট আসিয়া তাঁহাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া লঙ্কায় লইয়া যাইতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

রাবণ বলিলেন—"এই লঙ্কাপুরী দিবারত্নে ভূষিত; ইন্দ্রনীলমণি দ্বারা উদ্ভাসিত। আমরা যক্ষ-রক্ষগণ এখানে বাস করিতেছি। কুম্ভকর্ণপ্রমুখ রাক্ষসগণ মহাযান-ধর্ম্ম শ্রবণ করিবার জন্য উৎসুক রহিয়াছেন। অতএব, হে মুনে, আমাদিগের প্রতি অনুকম্পা করিয়া নিজ পুত্রগণের সহিত গমন করুন। আমি বুদ্ধগণের ও নিজ পুত্রগণের আজ্ঞাকারী..."

বুদ্ধদেব রাবণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া জিনপুত্রগণ সহ লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় ভগবান্ জিনপুত্রগণ সহ পূজা গ্রহণ করিয়া "প্রত্যাত্মগতিগোচর ধর্ম্ম" ব্যাখ্যা করিলেন।

দশানন (দশমুণ্ড নহে) বুদ্ধের সুমধুর ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া তাঁহার শরণাগত হইলেন এবং বুদ্ধধর্ম্ম এবং সংঘের আশ্রয় লইলেন।

রাবণ বুদ্ধের নিকট ১০৮টি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। বুদ্ধ সেই প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়াছিলেন। প্রশ্নগুলির মধ্যে দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি সকল বিষয়ই ছিল।

বৌদ্ধগণ এই গ্রন্থকে পরম ভক্তির চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, ভগবান্ বুদ্ধ রাবণকে যেসকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা লইয়াই 'লঙ্কাবতার সূত্র' বিরচিত হইয়াছিল।

এই গ্রন্থ খ্রীষ্টীয় ৪৪৩, ৫১৩ ও ৭০৪ অব্দে চীন ভাষায় পুনঃ পুনঃ অনূদিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের মত শঙ্করাচার্য্য তাঁহার বেদান্ত ভাষ্যে উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডিত করিয়াছেন। মাধবাচার্য্য তাঁহার সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে উল্লেখ করিয়াছেন।

এই লঙ্কাবতার সূত্রের আলোচনায় এমন ধারণাও যদি পাঠকের মনে জন্মিয়া থাকে, যে বৌদ্ধযুগের ভারতীয় জনগণ ও ভারত মহাসাগরের বক্ষঃস্থিত লঙ্কাদ্বীপে রাবণ নামে যে একজন নরপতি ছিল, তাহার কথা জানিত, বা শুনিয়াছিল, তবেই এস্থলে এই পুস্তকের বিবরণ সঙ্কলনের চেষ্টা সার্থক হইল, মনে করিব।

"দশরথ-জাতক" রামায়ণ-সম্পর্কিত দ্বিতীয় বৌদ্ধগ্রন্থ। জাতকগুলি বুদ্ধের মুখে প্রকাশিত—তাঁহার পূর্ব্ব-জন্মের কাহিনী বলিয়া প্রচারিত। বুদ্ধ যে পূর্ব্ব-জন্মে দশরথের পুত্র রাম-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, দশরথ-জাতকের গল্পটি দ্বারা তাহা তিনি বিবৃত করিয়াছেন। রামায়ণের গল্পের সহিত এই জাতকের গল্পের অনেক স্থলেই ঐক্য নাই। গল্পটি নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

বারাণসীর রাজা দশরথের ষোল হাজার পত্নী ছিল। তাঁহাদের মধ্যে যিনি রাজমহিষী ছিলেন, তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল,—দুইটি পুত্র একটি কন্যা। তাহাদের নাম ছিল যথাক্রমে—রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা। জ্যেষ্ঠ রাম সুপণ্ডিত ছিলেন, সেইজন্য লোকে তাঁহাকে রাম-পণ্ডিত বলিত।

হঠাৎ একদিন রাজার জ্যেষ্ঠ মহিষী পুত্রকন্যাদিগকে মাতৃহীন করিয়া চলিয়া গেলেন; রাজা দুঃখিত অন্তরে তাঁহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়াদি সমাপন করিয়া অন্য এক রাণীকে মহিষী মনোনীত করিলেন।

নূতন মহিষী রাজাকে খুব বাধ্য করিলেন। রাজা তাঁহার আচরণে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বর দিতে ইচ্ছা করিলে, রাণী বলিলেন—"যদি আমাকে ভালই বাস, বেশ; আমার বর আমার প্রয়োজন-মত চাহিয়া লইব। তখন অস্বীকার করিবে না ত?"

রাজা বলিলেন—"সে কি হয়? নিশ্চয় দিব।"

কিছুদিন পরে এই মহিষীর পুত্র ভরত একটু বড় হইলে রাণী রাজার নিকট তাঁহার অঙ্গীকৃত বরটি চাহিলেন।

রাণী বলিলেন—"তুমি যদি আমাকে ভালই বাস, আমার ছেলে ভরতকে রাজা করিয়া দাও।"

রাজা দশরথ ইহা শুনিয়া ভয়ানক রাগ করিলেন। কিছুতেই এরূপ বর দেওয়া যাইতে পারে না। আমার উপযুক্ত পুত্র রাম-পণ্ডিত বর্ত্তমান থাকিতে আমি অন্য কাহাকেও রাজা করিতে পারিব না। রাজার মনের অবস্থা বুঝিয়া রাণী সে-যাত্রা নীরব হইয়া রহিলেন। কিছুদিন এইরূপে চলিল।

আর-একদিন যখন রাজা রাণীর সহিত ভালবাসা দেখাইতে আরম্ভ করিলেন, অবস্থা বুঝিয়া রাণী তাঁহার বরটি পুনরায় প্রার্থনা করিল। রাজা এবার কিছুই বলিলেন না; কিন্তু মনে-মনে চিন্তা করিলেন—"বিমাতার সংসার, উপায় কি?"

রাজা দৈবজ্ঞ ডাকিয়া দেখিলেন, তাঁহার পরমায়ু আর মাত্র বার বৎসর। তিনি বিমাতার চক্রান্ত হইতে ছেলে-দুটিকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগকে স্থানান্তরে যাইয়া আত্মগোপন করিয়া থাকিতে এবং এই বার বৎসর পরে আসিয়া পিতৃ-সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিতে উপদেশ দিলেন।

পিতৃ-উপদেশে রাম লক্ষ্মণ বনে চলিলেন। ভ্রাতাদিগকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া ভগ্নী সীতাও কাঁদিয়া অস্থির হইলেন। অবশেষে তিনি ভ্রাতৃদ্বয়ের অনুগমন করিলেন।

এদিকে রাজা দশরথ পুত্রশোকে কিছু অগ্রেই মরিয়া গেলেন।

উপযুক্ত সময় বুঝিয়া রাণী বলিলেন—"এখন আমার পুত্রই রাজা।"

পাত্রমিত্রগণ বলিলেন—"তাহা কেমন করিয়া হয়; জ্যেষ্ঠাধিকারী বর্ত্তমান থাকিতে কনিষ্ঠের সিংহাসনে অধিকার হইতে পারে না।"

ভরত বুদ্ধিমান্ ছিলেন, তিনি বলিলেন—"তাহাই হইবে, দাদাকেই খুঁজিয়া আনিতে হইবে।"

ভরত পৌরজন লইয়া জ্যেষ্ঠ রাম-পণ্ডিতকে আনয়ন করিতে বনে গেলেন। রাম আসিলেন না; তিনি বলিলেন,—পিতৃ-আদেশ—"দ্বাদশবর্ষ পরে রাজধানীতে যাইতে; এখনও যে তাহার তিন বৎসর বাকী। তুমি লক্ষ্মণ ও সীতাকে লইয়া যাও; আমি পিতৃ-আদেশ কখনও লঙ্ঘন করিব না।"

ভরত বলিলেন—"আমরা তবে কাহার মস্তকে রাজছত্র ধারণ করিব?"

রাম বলিলেন—"কেন? তোমার।"

ভরত স্বীকৃত হইলেন না। তখন রাম স্বীয় পাদুকাযুগল দেখাইয়া বলিলেন—"লইয়া যাও আমার এই পাদুকাদ্বয়।"

ভরত, লক্ষ্মণ, সীতা ও পাদুকাদ্বয় সহ রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া রাজসিংহাসনে রামের পাদুকা স্থাপন করিয়া সেই পাদুকার ইঙ্গিতে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিন বৎসর পরে রাম কাশীতে ফিরিয়া আসিয়া সহোদর ভগ্নী সীতাকে বিবাহ করিলেন এবং উভয়ে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন।

এইরূপে রাম ষোল হাজার বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

বুদ্ধদেব গল্পটি শেষ করিয়া বলিলেন—"এই রামই আমি, দশরথ আমার পিতা শুদ্ধোধন, সীতা আমার পত্নী গোপা, আর ভরত আমার শিষ্য আনন্দ।"

বুদ্ধদেবের সমসাময়িক যুগে রামায়ণ কথা কিরূপভাবে প্রচলিত ছিল, তাহা দশরথজাতক পাঠ করিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না। জাতকগুলি বুদ্ধদেবের তিরোভাবের পরে রচিত হইয়াছিল। মোটামুটি সিদ্ধান্ত এই করা যাইতে পারে যে—যে-আকারেই হউক—বৌদ্ধযুগে ঐসময়ের লোক রামায়ণের ঘটনা জানিতেন।

এই জাতকটি দ্বারা আর-একটি ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাওয়া যাইতেছে এই

যে, শাক্যদিগের মধ্যে সহোদরা বিবাহ অভিনব ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য হইত না।

'মহাবংশ' লঙ্কা বা সিংহলের প্রসিদ্ধ ইতিহাস। এই গ্রন্থেও বাঙ্গালার রাজা সিংহবাহু যে তাঁহার সহোদরা ভগিনী সিবলীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ আছে। এই ভ্রাতার ঔরসে ও ভগ্নীর গর্ভে বিজয়সিংহের জন্ম। বিজয়ের কনিষ্ঠ সুমিত্র। মহাবংশ ভ্রাতা-ভগ্নীর এই যৌন সম্বন্ধকে অভিনবত্বে বিবেচিত করে নাই। মহাবংশে লঙ্কা, সিংহল ও তাম্রপর্ণী (তম্বপন্নি—পালি) এক দ্বীপ বলা হইয়াছে।

সীতা-হরণের কথা এই জাতকে নাই; থাকিলে বোধ হয় "লঙ্কাবতার সূত্রের" বিবরণ পণ্ড হইয়া যায়।

অযোধ্যার নাম এই জাতকে নাই; তখন বারাণসী শ্রেষ্ঠ স্থান বলিয়া পরিচিত; অযোধ্যা এই যুগ হইতে সাকেত নামে পরিচিত।

ইহা বুদ্ধদেবের বাণী বলিয়া কথিত হইলেও তাঁহার বহু পরবর্ত্তী শিষ্যগণের রচনা।

বৌদ্ধগ্রন্থ মহাবিভাষায় রামায়ণের কথা আছে।

পুরাণগুলির মধ্যে পদ্ম-পুরাণ, বিষ্ণু-পুরাণ, ভাগবত-পুরাণ, মার্কণ্ডেয়-পুরাণ, গরুড়-পুরাণ, ব্রহ্ম-পুরাণ, স্কন্দ-পুরাণ, অগ্নি-পুরাণ, বায়ু-পুরাণ, মৎস্য-পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ, শিবপুরাণ, দেবীভাগবত ও বৃহৎ-ধর্ম্মপুরাণে অল্প-বিস্তর রামায়ণ-সম্পর্কিত কথা আছে।

পদ্ম-পুরাণ পাতাল-খণ্ডের বিভিন্ন অধ্যায়ে রামায়ণ-কথা আছে। মূল রামায়ণের পশ্চাতে যে উত্তরাকাণ্ড যোজিত আছে, তাহাতে রামের সহিত কুশীলবের যুদ্ধ নাই। এই পুস্তকে বিস্তৃতভাবে তাহা আছে। কৃত্তিবাস পাতাল খণ্ডের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই লবকুশের যুদ্ধ লিখিয়াছিলেন। পাতাল খণ্ডে রাম-সম্পর্কিত এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা বাল্মীকির রামায়ণে ত নাই-ই, উত্তরকাণ্ডেও নাই; কৃত্তিবাস পণ্ডিতও তাহা গ্রহণ করেন নাই।

বিষ্ণুপুরাণ ১ম ভাগের, ৪র্থ অংশের ৪র্থ অধ্যায়ে সূর্য্য-বংশের বিবরণ সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে।

ভাগবত পুরাণের বা শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের দশম, একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে রামায়ণ-কথা আছে। এই পুরাণেও কুশ-লবের কথা আছে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে রামোপাখ্যান ও কুশবংশবিবরণ আছে।

গরুড়পুরাণের ১৪৭ অধ্যায়ে রামায়ণ-কথা বিবৃত হইয়াছে।

ব্রহ্মপুরাণের ১৫৪-১৫৭ অধ্যায়ে রাম-কথা আছে।

স্কন্দপুরাণের তৃতীয় খণ্ডে রাম-চরিত বিবৃত হইয়াছে।

অগ্নিপুরাণের ২৭ অধ্যায়ে সূর্য্যবংশ-কথা ও ২৩৮ হইতে ২৪২ অধ্যায়ে রামোক্ত নীতি কথিত হইয়াছে।

বায়ুপুরাণের ৮৮ অধ্যায়ে ইক্ষ্বাকু বংশের বিবরণ আছে।

মৎস্যপুরাণে ১২শ অধ্যায়ে সূর্য্যবংশের কথার সহিত রামায়ণ-রচয়িতা বাল্মীকির নাম আছে। রামের দুর্গা-পূজার কথাও এই পুরাণে আছে। এই পুরাণের নির্দ্দেশ-অনুসারে কোন-কোন স্থানে দুর্গাপূজাও হয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের ১৪শ অধ্যায়ে ও শিবপুরাণের ধর্ম্মসংহিতা খণ্ডের ৬০-৬২ অধ্যায়ে সূর্য্যবংশের কথা আছে।

দেবী ভাগবতের ৩য় স্কন্ধের ২৮ হইতে ৩০শ এবং ৭ম স্কন্ধের ১ম অধ্যায়ে সূর্য্যবংশ-কথা বিবৃত হইয়াছে।

বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণের পূর্ব্ব-খণ্ডে ১৮শ অধ্যায় হইতে বিস্তৃতভাবে রামায়ণ-কথার আলোচনা হইয়াছে। রামের দুর্গাপূজার বিবরণ এই পুরাণে আছে এবং এই পুরাণ-অনুসারেও বাঙ্গালার কোন কোন অঞ্চলে শারদীয় পূজা সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই পুরাণের ৩০শ অধ্যায়ে (পূর্ব্বখণ্ড) "বাল্মীকি কর্ত্তৃক ব্যাসের প্রতি মহাভারত রচনার উপদেশও" আছে।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, মৎস্যপুরাণ প্রভৃতি ব্যতীত দেবীপুরাণ, বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণ প্রভৃতির বিধান-অনুসারেও বাঙ্গালার স্থানে-স্থানে শারদীয়া পূজা হইয়া থাকে।

ব্যাসদেবের নামে একখানা রামায়ণও প্রচারিত আছে, তাহার নাম অধ্যাত্ম-রামায়ণ। এই অধ্যাত্ম-রামায়ণে বাল্মীকি-রামায়ণের পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে। কিন্তু অনেক স্থলেই আর্য্য রামায়ণের মত রক্ষিত হয় নাই।

অগ্নিবেশ্য-রামায়ণ, বৌধায়ন-রামায়ণ, আনন্দ-রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ প্রভৃতি রামায়ণগুলির নামও এস্থলে উল্লেখযোগ্য। এই সকলগুলিতেই রামায়ণ-কথা বিবৃত হইয়াছে।

এগুলির মধ্যে অদ্ভুত রামায়ণে একটু বিশেষত্ব আছে। এই বিশেষত্বের উল্লেখ এস্থলে করা হইল—এইজন্য যে এই ক্ষুদ্র রামায়ণখানাও বাল্মীকির রচনা বলিয়াই প্রচারিত। ইহার বর্ণিত ঘটনাবলীও উত্তরকাণ্ডের ন্যায়। কবি নাকি উত্তরকাণ্ড লিখিয়াও সীতার মহিমা শেষ করিতে পারেন নাই, তাই পরিশিষ্টস্বরূপ অদ্ভুত উত্তরকাণ্ড নামক এই অদ্ভুত রামায়ণ রচনা করিয়া সীতার অদ্ভুত বীরত্বের কাহিনী প্রচার করিয়াছেন।

অদ্ভুত রামায়ণ সপ্তবিংশতি সর্গেও—১৩৪১ শ্লোকে রচিত; নিম্নে সংক্ষেপে ইহার পরিচয় প্রদত্ত হইল।

বিষ্ণুভক্ত অম্বরীষের শ্রীমতী নামে পরমা সুন্দরী এক কন্যা ছিল। নারদ ও পর্ব্বত উভয়েই তাহার পাণিপ্রার্থী হন। বিষ্ণুর চক্রে অবশেষে ইঁহারা নিরাশ হন। ইঁহাদের ক্রোধে বিষ্ণুর অধোগতি হয়। বিষ্ণু আসিয়া অযোধ্যার দশরথের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। সীতা জন্ম গ্রহণ করিলেন মন্দোদরীর গর্ভে। মন্দোদরী সীতাকে কুরুক্ষেত্রে পরিত্যাগ করিলে কুরুক্ষেত্র-তীর্থক্ষেত্র-কর্ষণ-যজ্ঞ-কালে রাজা জনক তাহাকে প্রাপ্ত হন। অতঃপর রাম-সীতার বিবাহ হয়।

ইহার পরের ঘটনা অতি সংক্ষেপে রাম-সীতার বনগমন, সীতা-হরণ ও রাবণ বধ। এই পুস্তকের আর-একটি বিশেষত্ব এই—সীতা হারাইয়া রাম হনুমানের সহিত সাক্ষাৎকালে তাহার নিকট আত্মতত্ত্ব, সাংখ্যযোগ, উপনিষদ্-ধর্ম্ম (যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের গীতা ব্যাখ্যার ন্যায়) ইত্যাদি অনেক ধর্ম্মকথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতঃপর অদ্ভুত ঘটনা—দশস্কন্ধ রাবণের ভ্রাতা সহস্রস্কন্ধ রাবণ-বধের বিবরণ। রাম-সীতা বনবাস হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলে একদিন সীতা সকলের সমক্ষে সহস্রস্কন্ধ রাবণের বিবরণ বলেন। তখন রাম সসৈন্যে সেই সহস্রস্কন্ধ রাবণকে বধার্থ পুষ্কর যাত্রা করেন। রাম এই যুদ্ধে পরাজিত হইলে, সীতা কালিকা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সহস্রস্কন্ধ রাবণকে বধ করেন ও রামকে মুক্ত করিয়া আনয়ন করেন।

(সৌরভ, আষাঢ় ১৩৩১) শ্রী কেদারনাথ মজুমদার

হারানিধি

শ্রী শান্তা দেবী

পাশাপাশি আট-দশটা গ্রামের মত ধান-চা'ল কলে ভানা ছাঁটা হ'য়ে এই পথেই বিদেশে রপ্তানি হ'ত। তা ছাড়া রেল-পথে যাওয়া-আসা কর্‌বার মত মানুষও এতগুলো গ্রামে নিতান্ত কম ছিল না। আজ একুশ বৎসর হ'ল ষ্টেশনটি খুলেছে, কিন্তু একুশ বৎসর আগে সেই যে রেল-কোম্পানী এককথা বলেছিলেন, এখানে গাড়ী দেড় মিনিট থাম্‌বে, সে-কথার আর নড়চড় হয়নি। সংসারের মানুষের কথার কিন্তু নিত্যই বদল হ'য়ে যাচ্ছে। একটা চালের কলের জায়গায় তারা চারটা কল বসিয়ে ফেলেছে, ঘরের কাছে রেল পেয়েছে বলে'ই অমনি হপ্তায় একবার সহর থেকে বাড়ী ছুটোছুটি সুরু করে' দিয়েছে, এতকাল পরে গাঁয়ের পাঠশালা ছেড়ে সদরে ছেলে পড়াবার সখ পর্য্যন্ত জেগে উঠেছে। অথচ এ-সব কথা কিছু গোড়ায় হয়নি। কাজেই নিজের দোষে মানুষগুলো নিজেরাই কষ্ট পায়। পয়সা দিয়ে গাড়ীতে উঠে বলে'ই ত সকলের সব আব্‌দার শোনা চলে না। আজ বল্‌বে পাঁচ মিনিট গাড়ী থামাও, কাল বল্‌বে ওয়েটিংরুম করে' দাও, এ ত বড় জ্বালা! আর-একটা আব্‌দার রাখ্‌লেই কি আর রক্ষা আছে? গাল দেওয়া যাদের স্বভাব তারা সব তাতেই গাল দেবে, যতই কেন মন রাখ্‌তে চেষ্টা কর না। খুঁৎ ধর্‌বার জিনিষের তাদের কখনও অভাব হয় না। সময় বেশী দিলে বল্‌বে গাড়ীতে জায়গা নেই; একটা গাড়ী বেশী দিলে বল্‌বে এখন, পাণি-পাঁড়ে জল দেয় না; তাও যদি করে' দেওয়া হয় ত বল্‌বে, মেথর গাড়ী পরিষ্কার করে না; এম্‌নি কত যে বাজে ছুতো ধরে' পিছনে লাগ্‌বে, তার ঠিক্ নেই। কাজেই বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে, কোন কথায় কান না দিয়ে যেমন কাজ চল্‌ছিল তেম্‌নি সোজাসুজি কাজ চালানো। কাজের বদল কর্‌লেই হরেক-রকম বিশৃঙ্খলা আসে, অকারণ অত হাঙ্গাম করে' কি লাভ?

বেশীর ভাগ গাড়ীগুলো সে-ষ্টেশনে রাত্রে থামে, কিন্তু গ্রামের রাস্তায় ত আর গ্যাস্ কি ইলেকট্রিক্ লাইট্ নেই যে, যথা সময়ে পথে বেরোলেই হ'ল। কাজেই যাত্রীদের দিন থাক্‌তে পাল্কী ও গরুর গাড়ীর ব্যবস্থা করে' ছেলেপিলে, মোটঘাট সব একসঙ্গে বোঝাই করে' ধান-ক্ষেতের আলের উপর দিয়ে ঝড়াং ঝড়াং কর্‌তে কর্‌তে ষ্টেশনের দিকে দৌড় দিতে হয়।

তখন অন্ধকার হ'য়ে গিয়েছে। ষ্টেশনের লোহার রেলিঙের বাইরে সারি সারি গরুর গাড়ী তলার দিকে ছোট ছোট কেরোসিনের লণ্ঠন ঝুলিয়ে বটগাছতলার জমাট অন্ধকারে মাঝে মাঝে ফাট ধরাবার চেষ্টা কর্‌ছে। উপরের গাড়ী ও সাম্‌নের জোড়া বলদের আড়াল ভেদ করে' আলোকরশ্মি বেশী দূর অগ্রসর হ'তে মোটেই পার্‌ছে না। গাড়োয়ানরা বড় বড় চালের বস্তা পিঠে করে' আলোকের অভাবটা কণ্ঠস্বরে যথাসাধ্য মোচন করে' যথাস্থানে মাল পৌঁছে দিতে ব্যস্ত। পথ-ও সময়-সংক্ষেপ করার উৎসাহে অনেকে বোঝাসমেত সচ্ছন্দে লাইনের মধ্যেই নেমে পড়্‌ছে। নূতন যাত্রীরা পথের অন্বেষণে হাতড়ে হাতড়ে রেলিং ও দেওয়ালে মাথা ঠুকে' বেড়াচ্ছে। ছেলে, পুঁটুলি ও ঘোমটার ভারে বিব্রত মহিলাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। পাশের যাত্রীর উদ্যত তোরঙ্গের ধাক্কা থেকে ছেলের মাথা বাঁচানো ও ঘোম্‌টার ভিতর থেকে পথ চিনে' স্বামীর পদানুসরণ বা কণ্ঠানুসরণ করা দুইটিই এ-ক্ষেত্রে দুরূহ কাজ। বুদ্ধিমান্ যাত্রীদের ও পূর্ব্বাগত চালের বস্তার ভিড়ে প্লাট্‌ফর্ম্মের পথ ইতিমধ্যেই সঙ্কীর্ণ হ'য়ে উঠেছে। নির্জ্জীব বাধাগুলির গায়ে হোঁচট্ খেলে একপক্ষের মাত্র বিপদ্, সজীব বাধাগুলি তাই তারস্বরে নিজ অস্তিত্ব-সম্বন্ধে অপরকে সচেতন করে' দুই পক্ষের বিপদ্ এড়াবার চেষ্টা কর্‌ছেন।

ক্রমে রাত্রি বাড়তে লাগ্‌ল। বস্তাসঙ্কুল পথে পড়ে'

মর্‌বার ভয়ে যাত্রীদের চলাচল অনেক সংযত হ'য়ে এসেছে। কেবল মাঝে মাঝে ষ্টেশনচর দুই-একটা মানুষ এদিক্-ওদিক্ ঘুর্‌ছে-ফির্‌ছে। প্লাটফর্ম্মের কেরোসিনের খরচ যথাসম্ভব বাঁচিয়ে আলোগুলি নিভানোই আছে, গাড়ী আসার অল্পক্ষণ আগে জ্বালা হবে। লাল কাঁকর-বিছানো খোলা প্লাট্‌ফর্ম্মে নিজ-নিজ বাক্স, বিছানা ও পুঁটুলির উপর বসে' যাত্রীরা গাড়ীর অপেক্ষা কর্‌ছে। ঘুমিয়ে পড়্‌লে গাড়ী ধর্‌তে বিপদ্ হ'তে পারে, অথচ চোখের খোরাকের উপর অন্ধকারের এমন কালো পর্দ্দা টানা যে, চোখ মেলে' থাকা দায়। তাই "অমুক আছ হে——" বলে' একটা দীর্ঘ টান দিয়ে বন্ধুর খোঁজে যাত্রীরা থেকে থেকে রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ কর্‌ছে। অমুক কাছে থাক্‌লে গল্পটা আস্তেই চল্‌ছে, দূর থেকে সাড়া এলে পার্শ্বে শয়ান রেলের কুলির নিদ্রা-সুখকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে' উচ্চকণ্ঠে দুই প্রান্ত থেকে দুইজনে পরস্পরের দুঃখ ও প্রতিবাসীর সুখের আলোচনায় সময় কাটাচ্ছে।

চিরঞ্জীব-বাবু এক বিরাট্ বাহিনী সঙ্গে করে' এই পথে কলিকাতা ফির্‌ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর গৃহিণী, দুটি কন্যা, তিনটি দৌহিত্র, দুটি দৌহিত্রী, বিধবা ভ্রাতৃ-জায়া, সকন্যা একটি ভ্রাতুষ্পুত্রী, সসন্তান ভাগিনেয়-বধূ, কন্যার জা, শ্যালক-পত্নী, কন্যার দেবর, দেবরের বন্ধু, তিনটি ঝি ও একটি চাকর। ইহা ছাড়া মোটঘাট ছিল তেইশটি। বাড়ী থেকে রওনা হবার সময় সঙ্গে একটা কেরোসিনের লণ্ঠন আনা হয়েছিল, পথে কাজে লাগ্‌বে বলে'। কিন্তু গরুর গাড়ীর ঝাঁকুরানির কল্যাণে একটা টিনের প্যাট্‌রা চাপা পড়ে' তার চিম্‌নীটি ভেঙে যায় এবং কাগজের ছিপিটি খুলে' সমস্ত তেলটা রসগোল্লার হাঁড়িটি সুবাসিত করে' তোলে। অন্ধকার যত ঘনিয়ে উঠ্‌ছিল, শিশুপালের প্রাণ আতঙ্কে ততই পূর্ণ হ'য়ে আস্‌ছিল। মাতৃক্রোলের অধিকার থেকে যারা এখনও বঞ্চিত হয়নি, তারা কচি হাতে মার গলা জড়িয়ে মার বুকে মুখ লুকিয়ে কোনপ্রকারে আকাশ-জোড়া কালো দৈত্যটার আক্র-মণের হাত থেকে নিজেদের সুরক্ষিত মনে কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিল। যাদের মাতৃকোল নবাগত প্রতিদ্বন্দ্বী বেদখল করে' নিয়েছিল, তারা কেউ মার আঁচলটুকু ছোট মুঠির সমস্ত-শক্তি দিয়ে চেপে ধরে' কেউবা মুদ্রিত চোখ-দুটি নিজ হাতের আবরণে দ্বিগুণ করে' আড়াল করে' কম্পিত-বক্ষে এই ভীষণ দুর্দ্দিনের অবসান কামনা কর্‌ছিল। ভীত শিশুকণ্ঠে কেউ ডাক্‌ছিল, "মা গো, আলো দাও," কেউ শ্রান্ত-জড়িত-কণ্ঠে প্রার্থনা কর্‌ছিল, "মা, বাড়ী যাব," কেউ বা ক্ষীণ সুরে জানাচ্ছিল, "মা, ভয়।" দুই একটি বেপরোয়া শিশু ভয় ভুলে' কঠিন টিনের বাক্সের উপরেই ঘুমিয়ে পড়েছিল।

সকাল বেলা অনেক বুদ্ধি খরচ করে' চাকরের হাতে একডালা ফল ও এক হাঁড়ি সন্দেশ দিয়ে চিরঞ্জীব-বাবু ষ্টেশন মাষ্টরকে নিজ যাত্রার কথা জানাতে পাঠিয়ে-ছিলেন। সঙ্গে অনেক মেয়েছেলে, কচিকাঁচা ও লাটবহর আছে, যেন গাড়ীতে ওঠার একটা ব্যবস্থা করা হয়। উত্তরে অভয় পেয়ে তিনি এখন কুম্‌ড়োর বস্তা ঠেস দিয়ে নিশ্চিন্ত-মনে ধূম্রপান কর্‌ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ সিগ্‌নাল ও ঘণ্টার সঙ্কেতে সকলে সচকিত হ'য়ে উঠে' বস্‌ল। চারি ধারে "ওঠ্, ওঠ, জাগ, জাগ্‌রে" সাড়া পড়ে' গেল। চিরঞ্জীব-বাবু এরকম আচম্‌কা সাড়া পেয়ে "ম্যাষ্টর ও ম্যাষ্টর" বলে' চীৎকার সুরু করে' দিলেন। দূর হ'তে কে সাড়া দিলে, "এই যে মশায়, আস্‌ছি।" কিন্তু তাকে দেখা গেল না। যাত্রীদের ঠেলা দিয়ে নীলকুর্ত্তা-পরা কুলি তিন্‌টা কেরোসিনের আলো জ্বেলে দিয়ে সকলকে লাইন থেকে দূরে সরে' দাঁড়াবার উপদেশ দিয়ে চলে' গেল। ইঞ্জিনের আলো দেখা যাবার আগেই হুঁকো, ছাতা, পুঁটুলি, বস্তা কাঁধে যাত্রীরা সকলে সাম্‌নের দিকে দৌড়তে আরম্ভ কর্‌লে। তবু ম্যাষ্টরের টিকি দেখা গেল না।

গাড়ী এসে পড়্‌ল। আধ-অন্ধকারে গাড়ীর নম্বর পড়া যায় না; রাত্রির হাওয়ার ভয়ে গাড়ীর জানালা-গুলিও ভাল করে' বন্ধ করা, ভিতরে কতগুলি মানুষ আছে বাহির থেকে তাও বোঝা শক্ত। চিরঞ্জীব বাবু সাহায্যের আশা ছেড়ে মেয়ে-গাড়ীর সন্ধানে সদলে গাড়ীর এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত পর্য্যন্ত দৌড় শেষ করে' সবে হতাশ হ'য়ে হাঁপাতে যাবেন, তখন লণ্ঠন-হাতে ষ্টেশন মাষ্টার এসে "এই যে মশায়, এই গাড়ীতে উঠে' পড়ুন, মেয়েগাড়ী পাবেন না" বলে' একটানে একটা দরজা

খুলে' ধর্‌লেন। চিরঞ্জীব-বাবু সবে মুক্তির নিশ্বাস ফেল্‌তে যাবেন এমন সময় গাড়ীর ভিতর হ'তে "আহা, বাঁচালে বাবা, কিছুতে দোর খুল্‌তে পারছিলুম না," বলে' এক অশীতিপর বৃদ্ধা এসে দরজা জুড়ে' দাঁড়াল। তার পর সিঁড়ির ধাপে ধাপে বসে' অতি কষ্টে সে প্লাটফর্মে নেমে পড়্‌ল। প্রথমেই বাধা পেয়ে ক্রুদ্ধ চিরঞ্জীব-বাবু চীৎকার করে' উঠ্‌লেন, "মর্‌ বুড়ী, আর নাম্‌বার জায়গা পেলি না।" তার পর আর কোনোদিকে ভ্রুক্ষেপও না করে' সলম্ফে তিনি সকলের আগেই গাড়ীতে উঠে' পড়্‌লেন। গৃহিণী নিদ্রালু ও করুণ স্বরে নীচ থেকে বল্‌লেন, "ওগো ধর না হাতখানা, উঠ্‌তে পার্‌ছি না।" কর্ত্তার হাত ধরে' ও ঝির ধাক্কা খেয়ে ক্ষীণবৃন্তের পুষ্টফলের মত পানের ডিবা সমেত গৃহিণী কোন প্রকারে উঠ্‌লেন। দুইটা প্রকাণ্ড ঝুড়ি মাথায় কুলি আবার পথ রোধ করলে।- নীচ হ'তে নারীসঙ্ঘ তারস্বরে চীৎকার করে' উঠ্‌তেই ঝুড়িতে ঠেলা দিয়ে ভিতরে সরিয়ে দিয়ে কুলিরা সরে' দাঁড়াল। ক্রমে ফেলি, ননী, হাবি, টেবি সকলে একে একে সিঁড়ি আঁকড়ে উপরে উঠ্‌তে সুরু করলে। গাড়ী ছাড়বার সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল। ষ্টেশনমাষ্টার চেঁচামেচি লাগালেন, "মশায়, তাড়াতাড়ি করুন, গাড়ী আর পাঁচ সেকেণ্ড দাঁড়াবে।" চিরঞ্জীব-বাবুর ইচ্ছা কর্‌ছিল নেমে অকৃতজ্ঞ লোকটাকে দুই-চার ঘা দিতে, কিন্তু তখন আর সময় ছিল না; ইতিমধ্যে তিনটি ঝি হাঁউ মাঁউ করে' বাড়ীর মেয়েদের ঠেলে'-ঠুলে' তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠে' পড়্‌ল। ভৃত্য ও সঙ্গী যুবকটি পাশের একটা গাড়ীর দিকে দৌড় দিলে। নিরভিভাবক মেয়েরা অগত্যা নিজেরাই নিজেদের পথ দেখ্‌তে বাধ্য হলেন।

গাড়ী ছাড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই গাড়ীর ভিতরে একটা তুমুল কলরব পড়ে' গেল। ঠিক যেমন হওয়া উচিত ছিল তেমনটি না হওয়ার বিরক্তিতে চিরঞ্জীব-বাবুর গা রি রি কর্‌ছিল। তিনি গায়ের ঝাল ঝেড়ে মেঝেতে উপবিষ্টা পরী-ঝিকে লাঠির একটা খোঁচা দিয়ে বল্‌লেন, "ঠাঁই জুড়ে' বস্‌লি যে? জিনিষপত্র কি কি উঠেছে না উঠেছে দেখ্‌তে হবে না?" পরী তার কাল মুখখানা নাড়া দিয়ে বল্‌লে, "কি কি ছেল আমি কি জানি যে দেখ্‌ব?" চিরঞ্জীব বল্‌লেন, "তুই জানিস্‌ না ত কি ওপাড়ার ভেমো গয়লা জানে? চটে-মোড়া বিছানাটা উঠেছে কিনা দেখ্‌ দিকি।" ঝি এদিক্‌-ওদিক্‌ চেয়ে বল্‌লে, "দেখ্‌ছি না ত তেনাকে।" প্রথম কথার উত্তরেই এমন কানজুড়ানো খবর পেয়ে চিরঞ্জীব জ্যামুক্ত ধনুকের মত বেঞ্চি হ'তে ছিট্‌কে সোজা উঠে' দাঁড়িয়ে বল্‌লেন, "দেখ্‌ছিস্‌ না কিরকম? চোখের মাথা খেয়েছিস্‌ না ফেলে' এসেছিস্‌ ইষ্টিশানে? দাঁড়াও, বার করছি ম্যাষ্টরের আম সন্দেশ খাওয়া। গিন্নি, জিনিষ কি কি ছিল বল ত, মিলিয়ে দেখি।"

সারাদিনের পরিশ্রমে ও গরুর গাড়ীর ঝাঁকানিতে গৃহিণীর স্থূল দেহ তখন অতি ক্লান্ত। তিনি ঘুমভরা চোখ-দুটি কোনপ্রকারে খুলে' হাই তুলে' চিবিয়ে চিবিয়ে বল্‌লেন, "জিনিষ? জিনিষ ত অনেকগুলি ছিল। আমার বড় পুঁটুলি, ছোট পুঁটুলি, হাবির তোরঙ্গ, বড়দিদির তর্‌কারির ঝোড়া"...। গৃহিণীর চোখ ঢুলে' এল।

কর্ত্তা বল্‌লেন, "থাম, দেখি আগে এইগুলোই আছে কি না। পরী, বড় পুঁটুলিটা আন্‌ দেখি।" পরী দুটো হাত একসঙ্গে নেড়ে বল্‌লে, "সে উঠে নাই, কর্ত্তা। হাঁদু ছোঁড়া অন্ধকারে আমার পায়ের উপর ছোট মামীমার গয়নার বাস্‌কোটা ফেলে' দিলে। দরজে মরি মা—পুঁটুলি উঠাব কি?"

কর্ত্তা পা ঠুকে দাঁত খিঁচিয়ে বল্‌লেন, "পায়ে বাক্স পড়েছিল ত পুঁটুলি উঠাস নি কেন পোড়ারমুখী; হাত দুখানাও কি খসে' গিয়েছিল?"

পরী সচ্ছন্দে হেসে বল্‌লে, "ই কি মেয়্যামানুষের কাজ কর্ত্তা! কোথা ভুঁই আর কোথা রেল। স্বগ্‌গে পা দিয়ে দিয়ে তবে রেলে চাপ্‌তে হয়, পুঁটুলি নিয়ে নাগাল পাব কি করে'?"

কর্ত্তা উত্তর দিবার আগেই গৃহিণী জড়িত-স্বরে বল্‌লেন, "বড় পুঁটুলিতে যে ননী, হাবি, টেবির সব ধোবো কাপড়গুলি ছিল মা। ফেলির বেগমডুরে শাড়ী, নেবুর ইষ্টকিং মোজা, টুসীর ভেলিভেটের জামা, সব একত্তরে বেঁধেছিলাম। হ্যাঁ পরি, সত্যি উঠাস্‌ নাই পুঁটুলি? কি হবে মা! হ্যাগা ডাক্‌লে রেল থাম্‌বে না?"

অক্ষমতার লজ্জা ও বিরক্তিতে কর্ত্তার আকণ্ঠ পূর্ণ হ'য়ে উঠেছিল। তিনি বল্লেন, "হ্যাঁ থাম্‌বে বৈ কি! আমার শ্বশুরবাড়ীর বড় কুটুম রেলকোম্পানী, ডাক্‌বারই শুধু অপেক্ষা। ছোট পুঁটুলিটা তুলেছিলি ত রে পরী, না সেটাও দেখে' শুনে' ফেলে' এসেছিস?"

পরী বল্লে, "এ বাবা! আমি কি সব পুঁটুলির হিসাব রাখি নাকি বাবু! সে পুঁটুলি ত ক্ষেন্তির ঠেঁয়ে জিম্মা করা ছিল। তাকে শুধাও না।"

ক্ষেন্তি তৎপরভাবে এগিয়ে এসে বল্লে, "সেই যে ইস্তক বাড়ী থেকে বেরিয়েছি, আর যে ইস্তক গাড়ী এসেছে, তার মধ্যে একটি বারও পুঁটুলিটি ছাড়ি নাই। তার পর গাড়ীটি চাপবার লেগে হাঁদুর হাতে একবারটি এক লহমার তরে পুঁটুলিটি দিয়েছিলাম। ইমন লবাবের গাড়ী দেখি নাই মা, দাঁড়িয়ে হাতটি বাড়াব কি রেলটি ছেড়ে দিলেক্। হাঁদু জানালাটি পেরিয়ে ভিতর দিকে পুঁটুলিটি ছেড়ে দিলেই নিশ্চিন্দি হতাম; তা সে মড়া দিলেক্ কৈ?"

অনুপস্থিত হাঁদু তার নামে মহিলাবৃন্দের অভিযোগের কোন উত্তরই দেবার সময় পেলে না। কর্ত্তা বল্লেন, "যাক্ বাঁচিয়েছে হাঁদু! আমার কপাল ঝরঝরে হয়েছে; ছোট পুঁটুলিটাও গেছে, আপদ্ গেছে, আমার আর কোন ভাবনা রইল না।"

গৃহিণী বেঞ্চির কোণায় ঠেস্ দিয়ে পানের ডিবা কোলে করে' ঝিমাচ্ছিলেন, ছোট পুঁটুলির নাম-উল্লেখেই অর্দ্ধসজাগ হ'য়ে উঠে' বসে' বল্লেন, "ছোট পুঁটুলি! ছোট পুঁটুলিটি নাই! তাতে যে খোকার ভাতের ভারী রূপোর বাটিটি ছিল, রূপোর ঝিনুক ছিল। ওমা, সে যে বারো ভরির বাটি, সখ করে' গড়িয়েছিলাম।"

এখবরটা কর্ত্তার জানা ছিল না। তিনি বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হ'যে বল্লেন, "কে আন্‌তে বলেছিল রূপোর বাটি-ঝিনুক বাড়ী থেকে?"

গৃহিণী নিরুপায়ভাবে বড়জায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বল্লেন, "বল্‌বে আবার কে দিদি? কুটুম-বাড়ীর কাজে নিমন্তন্নে যাচ্ছি, ভাব্‌লাম ছেলেকে দুধ খাওয়াব, রূপোর বাটিটা নিয়ে যাই। বাক্সে তুলেছিলাম শেষকালে, তা ঐটে খোকার মাপের বাটি তাই আবার পথের জন্যে ছোট পুঁটুলিতে বার করে' বাঁধ্‌লাম।"

দিদি এব্যবহারে মোটেই সায় দিলেন না। বল্লেন, "ভাল করনি বউ। পাঁচজনার ঘরে আমি কখনও রূপোর বাসন নিয়ে যাইনে। কে জানে, কার মনে কি আছে? কাঁসা পেতলই আমার ভাল।"

গৃহিণী উচ্ছ্বসিত শোক চেপে শুধু বল্লেন, "আমার অমন ভারী রূপোর বাটিটা!"

কর্ত্তা বল্লেন, "আর নাকে কাঁদ্‌তে হবে না। এখন আর কি কি গেছে তাই দেখ।"

পরী স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে বল্লে, "ছোট মামীমার গয়নার বাকসটা হ্যাণ্ডিল্ ছিঁড়ে পড়েছিল কি না, তাই মু'টাও খুলে' গেছ্‌ল। আঁধারে গয়না কুড়াতে কুড়াতে গাড়ী সিটি দিয়ে দিলেক্; সেটা আসে নাই।" কর্ত্তা কপালে করাঘাত করে' বল্লেন, "তবে এসেছে কি সেইটে বল্ না এক কথায়, নবাবের বিটিরা।" পরী ও ক্ষেন্তি ধরাধরি করে' দুটি বিরাট্ ঝুড়ি টেনে এনে দেখালে ঝুড়ি-বোঝাই লাউ-ডগা, কুম্‌ড়ো ও শশা উঠেছে। চিরঞ্জীব-বাবুর ভ্রাতৃজায়া খুসী হ'য়ে বল্লেন, "আমার ফোটনের গয়নার বাক্সও উঠেছে। আমি এই আঁচলে বেঁধে গাড়ীতে উঠেছিলাম। ভাই, আমি মানুষ ফেলে উঠ্‌লেও গয়না ফেলে' উঠি না। মানুষের হাত-পা আছে, গয়নার ত আর তা নাই।"

ভ্রাতৃজায়ার সৌভাগ্যে নিজের দুর্ভাগ্যটা চিরঞ্জীব-বাবুর কাছে আরও কঠোররূপে দেখা দিলে। আর কি উঠেছে তার খোঁজ না নিয়েই তিনি মহা আক্রোশে আস্ফালন করে' বল্লেন, "আমি বলেছিলাম, তখনি বলেছিলাম যে ওসব ঘাড়ছাঁটা চুলকাটা একেলে বাবুদের বিশ্বাস নাই; ওদের মুখেই বোল, কোন কাজ ওদের দ্বারা হবে না। মানুষ চিনে' চিনে' আমার হাড় পেকে গেল, হুঁ হুঁ আমি কি মানুষ চিনি না! নাড়ী দেখে' কার কত মুরোদ বলে' দিতে পারি। চুলছাঁটা বাবুরা এসেছিলেন আমায় বোঝাতে! গাড়ী থামিয়ে রাখ্‌বেন, মাল তুলিয়ে দেবেন! রেল-কোম্পানী ওদের কেনা কালের গোলাম কি না! ছি, ছি, ছি, মেয়ে

মানুষের কথা শুনে', ভদ্রলোকে কাজ করে ? তোমাদের কথা শুনে' ওই চুলছাঁটা বাবুটাকে এতগুলা পয়সা নষ্ট করে' আম সন্দেশ পাঠালাম ; তার এই ফল। ও ত জানাই ছিল, জানাই ছিল ; না হ'লে তিন ঘণ্টা আগে এসে চিরঞ্জীব ঘোষ ইষ্টিশানে কিসের জন্যে বসেছিল ? কথা ত কেউ কারোর শোনে না ; শুনতে আমার কথা, ত একটা জিনিষ আজ বরবাদ্ যেত ? জুতিয়ে জিনিষ তুলিয়ে দিতাম। এখন খাওয়াও ছেলেকে রূপোর বাটিতে দুধ, পরাও গয়না ! নবাবের নাতি কিনা।" গৃহিণী কাঁদ-কাঁদ স্বরে বল্‌লেন, "তুমি ত মানা করনি। না হ'লে—"

তাঁহার কথা শেষ হবার আগেই চিরঞ্জীব মেঝেয় লাঠি ঠুকে' বল্‌লেন, "মানা করবার আমি কে ? লোকসান দেওয়া আমার কাজ। তার পর তোমরা আছ মালিক। মেয়েমানুষকে ভগবান্ বুদ্ধি দিন বা না দিন জাঁক ত কম দেন্‌নি।" গৃহিণী ভেবে পেলেন না তাঁর কোন্ অপরাধে সমস্ত জিনিষ ষ্টেশনে' পড়ে' রইল। পার্শ্বে উপবিষ্টা এক সহযাত্রিণীর কাছে সহানুভূতি পাবার আশায় তার দিকে চেয়ে তিনি বল্‌লেন, "হ্যাগা, ঘরে চাকরে ভেঙে ফেল্‌বে, বাইরে লোকে চুরি করে' নেবে, তবে রূপোর বাটি গড়ানো কেন ছেলের নাম করে' ? জিনিষ যদি তুল্‌তে না পার্‌বে ত এনেছিল কেন সঙ্গে ? আমি কি ওর দেউড়ির চৌকিদার, যে, মন্দ সেজে মালের খপরদারী করে' বেড়াব ? হ্যাঁ ভাই বল দেখি, এই তুমি যদি একটা অন্যায় কাজই কর ত ভদ্রলোকের ছেলে কি তোমায় যা মুখে আস্‌বে তাই বল্‌বে ?"

সহযাত্রিণী হেসে বল্‌লেন, "কোনো ভদ্রলোকের ছেলের ঘর আগ্‌লাতে ত যাইনি, কাজেই পঁটুলিও হারায়না, তার কৈফিয়ৎ তলবও কেউ করে না।" গৃহিণী বিস্মিত স্বরে বল্‌লেন, "বিয়ে করনি ?" তার পরেই স্বস্তির সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বল্‌লেন, "আঃ বেঁচেছ ভাই, এমন জান্‌লে কে বিয়ে করত !"

পঁটুলি হারানোর দুঃখে ও স্বামীর শ্লেষবাক্যের অপমানে বিবাহটাকেও মারাত্মক ভুল মনে করে' গৃহিণী বাঙালীর মেয়ের পিতৃকুলকে গালি দিতে দিতে বল্‌লেন, "হায় মা, আমাদের বাঙ্গালীর ঘরে কি তা' হবার জো আছে ? মেয়ে নয় ত গলার কাঁটা। দশ বছর পার হ'তে না হ'তে বাপ-মায়ের আর চিন্তা নেই, কেমন করে' মেয়েটাকে দূর করে' দেবে এই এক ভাবনা।" তার পর ক্ষোভের নিশ্বাস ফেলে' "আহা, অমন ভারী রূপোর বাটিটা !" বলে' গৃহিণী সান্ত্বনার্থ মুখে এক টিপ দোক্তা পুরে আবার ঝিমতে সুরু কর্‌লেন।

কর্ত্তা আপন মনে বসে' জানালার বাহিরে তাকিয়ে কি গজগজ্ করে' বলে' যাচ্ছিলেন। তাঁর রোষদীপ্ত-দৃষ্টি ও মাঝে মাঝে উচ্চরবে উচ্চারিত "ঘাড়ছাটা বাবু"দের প্রতি প্রীতিসম্ভাষণ ছাড়া গাড়ীর শব্দে আর-কিছু শোনা যাচ্ছিল না। আর সকলে ক্লিষ্টমুখে যে-যার কোণে বসে' সবে-নষ্ট সম্পদের শোকটা ভাল করে' অনুভব কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিল। গাড়ীর ভিতরের উত্তেজনাটা তখন অনেক কমে' এসেছিল। চিরঞ্জীব-বাবুর ছোট ছেলের শিশু-হৃদয়ে এই শোকাচ্ছন্ন জনসমষ্টির অটল গাম্ভীর্য্য অত্যন্ত পীড়া দিচ্ছিল। সে সকলকার কাছে ঘুরে' ঘুরে' হতাশ হ'য়ে অবশেষে এক অবগুণ্ঠিতা বধূর ঘোমটার মধ্যে মুখটা ঢুকিয়ে বল্‌লে, "বউ মা, কথা কও, চোখ চাও, সবাই রাগ করেছ কেন ?" বউ খোকাকে চেপে ধরে' কেঁদে উঠল।

একে আঁধার-মুখের সারি দেখেই খোকা হাঁপিয়ে উঠেছিল, তার উপর কান্না দেখে' সে ত ভয়েই অস্থির। বধূর ঘোমটার ভিতর থেকে মুখ বার করে' নিয়ে ছুটে' এসে কচি হাতে মাকে ঠেলা দিয়ে তুলে সে বল্‌লে, "মা, ওমা, বউমা কাঁদ্‌ছে কেন ?" মা ধড়মড়িয়ে উঠে' বসে' বল্‌লেন, "কি গা, কি হয়েছে বউমা, প্যাঁট্‌রাটা উঠে নাই বুঝি ! তা কেঁদে আর কি হবে মা, এই আমার কি রূপোর বাটী ঝিনুক যায় নাই, তাই বলে' কি আর মাথা মুড় খুঁড়ছি ?" বউমা এতক্ষণ শ্বশুর-ভাসুরের ভয়ে কান্নাটাকে টিপে' রেখেছিল ; তা ছাড়া, এতক্ষণ তার দিকে কেউ তাকায়ওনি, এইবার মামী-শাশুড়ীর কথার স্পর্শে তার কান্না শতধারে ঝরে' পড়্‌ল। একেবারে বেঞ্চের উপর লুটিয়ে পড়ে' সে কান্না জুড়ে' দিলে। কিন্তু তবু

বধূত্বের লজ্জায় কথার উত্তর দিতে সে পারছিল না। তিনু-ঝি বৌকে তুলে' ধরে' বল্‌লে, "কেঁদ না বৌরাণী, আমার যে পরনের কাপড়খানা ছাড়া সব কিছু গিন্নির পুঁটুলির সাথে গেছে, তা কি করব বল? কাপড় ত আর না পরে' থাক্‌ব না, আবার হবেই।" বৌ, ঝির কাঁধে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে বল্‌লে, "তিনু, আমার মেয়ে, আমার খুকুমা কই?"

তিনু সরব ক্রন্দনে সকলকে সচকিত করে' মেয়ে হারানোর খবর জানিয়ে দিলে। মুহ্যমান যাত্রীদের মধ্যে আবার একটা ভীতি ও উত্তেজনার ঢেউ খেলে গেল। গাড়ীর একমাত্র যুবকযাত্রী ছুটে' এসে শিকলটা টান্‌তে যেতেই চিরঞ্জীব-বাবু তার হাত চেপে ধরে' বল্‌লেন, "না দাদা, আমার আর উব্‌গারে দরকার নেই। মেয়েটাত গেছেই, আবার তোমাদের পাল্লায় পড়ে রেল-কোম্পানীকে পাঁচশ' টাকা দিতে পারব না।" যুবক হতভম্ব হ'য়ে বসে' পড়্‌ল। চিরঞ্জীব-দুহিতা সান্ত্বনার সুরে বল্‌লেন, "কে জানে হয় ত পাশের গাড়ীতে নবর সঙ্গে উঠেছে। গাড়ীটা থাম্‌লেই বাবা খোঁজ নিও। বৌ, কেঁদনা ভাই, এত দু'মিনিটের মাম্‌লা, এখুনি গাড়ী থাম্‌লেই খবর পাবে। কোলের ছেলেটার দিকে ততক্ষণ একটু তাকাও।"

(২)

চটেমোড়া বিছানার উপর উপুড় হ'য়ে খুকী ঘুমিয়ে পড়েছিল। গাড়ী আসার গোলমালে তার ভারপ্রাপ্ত যুবক নব তার কথা একেবারেই ভুলে' গিয়েছিল। বিছানাটাও তুল্‌বার কথা কারুর মনে আসেনি। সুতরাং খুকীর গভীর নিদ্রায় কোনো ব্যাঘাত না ঘটিয়েই যাত্রীরা গাড়ীতে উঠে' পড়েছিল। সারা বিকেলটা গরুর গাড়ীর ভিতর বাক্স, বিছানা ও মানুষের ঠাসাঠাসির গরমে তার বড় অসোয়াস্তির মধ্যে কেটেছিল। তাই খোলা-আকাশের তলায় রাত্রের ঠাণ্ডা হাওয়ায় তার শিশু-সুলভ গাঢ় নিদ্রাটি সুখস্বপ্নে মধুর হ'য়ে তাকে একেবারে আচ্ছন্ন করে' রেখেছিল।

অনেক রাত্রে বটগাছের মাথায় দোলা দিয়ে, খেজুর ঝোপের মধ্যে শুক্‌নো পাতার কর্কশ ক্রন্দন তুলে', পথের রাঙা কাঁকরের ছর্‌রা ছুটিয়ে কালবৈশাখীর ঝড় নেমে এল। ষ্টেশনের আশে-পাশে যে দুটো-চারটে কুলিমজুর পড়ে' পড়ে' ঘুমোচ্ছিল সকলেই ঝড়ের রুদ্র মূর্ত্তি দেখে' টিনের চালার তলায় আশ্রয়ের সন্ধানে দৌড় দিলে। খুকী ঘুমের ঘোরে দু-চারবার উস্‌খুস করে বিছানাটাকে শক্ত করে' আঁকড়ে ধরে' আবার ঘুমিয়ে পড়্‌ল।

ঝড়ের সহচরী বৃষ্টি যখন মাটির বুকে নেমে এসেছে, তখন সেই অতবড় খোলা চাতালটার মধ্যে ছোট্ট খুকীটি ছাড়া আর দ্বিতীয় মানুষ নেই। খুকীর হাসিমাখা ঘুমন্ত মুখের উপর বৃষ্টির তীক্ষ্ণ ঝাপ্‌টা এসে পড়্‌তেই সে চম্‌কে উঠে' বস্‌ল। তারার আলো নেই; ঘন মেঘের ঘটায় আকাশের গায়ের স্বচ্ছতার আলো-টুকুও ঢাকা পড়ে' গেছে; বৃষ্টির জলে ভাল করে' চোখ চাওয়া যায় না। খুকীর বুক ভয়ে দুলে' উঠ্‌ল; "মা, মা" বলে' ডেকে সে দুইহাতে শূন্যতাকে জড়িয়ে ধর্‌তে গেল। ছোট হাত দুখানি কঠিন মাটির গায়ে এসে ঠেক্‌ল, মায়ের কোমল উষ্ণ বাহুর বন্ধন তাকে জড়িয়ে তুলে নিলে না। মনে হ'ল কালো আকাশের বুক চিরে সহস্র কালনাগিনী নেমে আস্‌ছে তার দিকে, তাদের তুষারশীতল দেহের নিবিড় আবর্ত্তনে তার কোমল দেহটুকু পিষে' ফেল্‌তে। সমস্ত শরীরের রক্ত যেন তার কে হিম করে' তুল্‌ছিল। পায়ের তলায় বৃষ্টির জল ঝড়ের দাপটে সরে' সরে' দুলে' দুলে' উঠ্‌ছিল, সর্ব্বাঙ্গে বাতাসের দাপাদাপি পা-দুখানা এক জায়গায় স্থির করে'ও রাখ্‌তে দিচ্ছিল না। মনে হ'ল, পায়ের তলায় কঠিন পৃথিবীও বুঝি এই সরে' যায়। অতলস্পর্শ হিম-সমুদ্রের অনন্ত কালিমায় এখনি সে ডুবে' মিশিয়ে যাবে। কালো, কালো, কালো; উপর নীচ চারিধার একি বিষম কালো, কি ভীষণ নিবিড় নিষ্ঠুর শূন্যতা! কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। তার ভয়-কাতর বুকে কান্নাও থম্‌কে থেমে গিয়েছিল। একি অন্ধ-তমসার তীরে সৃষ্টি হতে সমূলে উপ্‌ড়ে এনে তার নিষ্ঠুর মা তাকে ফেলে' গিয়েছে? মা নেই, কাকে সে ডাক্‌বে? সৃষ্টির শেষ আলোকণাটুকুও মুছে' নিয়ে শূন্য অন্ধকারের গহ্বরে

মাতৃহারা তাকে কণ্ঠরোধ করে কে কেন রেখে গেল, বিমূঢ় ভয়ক্লিষ্ট শিশু ভেবে পেলে না।

মাথার উপর হঠাৎ সমস্ত আকাশখানাকে দুই টুক্‌রো করে' বিদ্যুতের আলো ঝল্‌কে উঠ্‌ল; খুকীর মুদিতপ্রায় চোখে আলোর চমক্‌ এসে লাগ্‌ল। সে ভয়ে মূর্চ্ছা গেল না। তার বুকের স্পন্দন যেন ফিরে এল। এই যে আলো, এই যে সৃষ্টি! ওই যে বটগাছের ঝুরি, ইষ্টিশনের থাম, টিনের চালা, সিগনালের লম্বা হাত দুটো। সৃষ্টি তবে ধ্বংস হয়ে যায়নি। খুকীর গলার স্বর কেঁপে উঠল, কিন্তু তবু কথা ফুটল। "মা, মাগো, আবার আলো দিয়েছ! ভাইয়াকে রেখে আমায় কোলে নিয়ে যাও মা, বড় ভয় কর্‌ছে।" কিন্তু আলো আবার নিবে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধ দানবের হুঙ্কারের মত বাজ গর্জ্জন করে' উঠ্‌ল। মাটিও যেন গর্জ্জনের তাড়সে কেঁপে কেঁপে উঠল।

সত্যি সত্যিই মাটি কাঁপছিল। গুম্‌ গুম্‌ গুম্‌ করে' কি-একটা শব্দ ক্রমেই এগিয়ে আস্‌ছিল। একি আকাশের দানবটা আলো জেলে পৃথিবীটা একবার দেখে' নিয়ে ভারী পায়ের শব্দে মাঠ কাঁপিয়ে এই দিকে এগিয়ে আস্‌ছে! খুকীর বুকে হঠাৎ যেন কিসের সাহস জেগে উঠ্‌ল। দেখে' নেবে সে ওই দুষ্টু রাক্ষসটাকে, কি কর্‌তে পারে সে তার? সে জোর করে' চোখ মেলে' তাকালে। ঐ যে দূরে তিন্‌টে আগুনের ভাঁটার মত চোখ জল্‌জল্‌ কর্‌ছে। ঐ যে আস্‌ছে দৈত্যটা এই দিকেই। খুকী উঠে দাঁড়াল। এবার তার পা টলে' গেল না।

মাঠ পার হ'য়ে রক্তচক্ষু দৈত্যটা এগিয়ে আস্‌ছিল। খুকী ছুটে' সেই দিকে গেল। ওমা! তার পিছনে যে সারি সারি আলো! এক নিমিষে খুকীর সাম্‌নে সব আলোগুলো লম্বা একছড়া হীরার মালার মত এসে পড়্‌ল। আনন্দে খুকীর প্রাণ নেচে উঠল। এ ত রাক্ষস নয়, এ যে রেলের গাড়ী। এই রেলের গাড়ী চড়বে বলে'ই ত মা তাকে আজ ডুরে শাড়ী পরিয়ে সঙ্গে করে গরুর গাড়ী চড়েছিল। মা কি দুষ্টু! গাড়ী করে' কোথায় বেড়িয়ে এল, তাকে এই বিশ্রী গলাচাপা অন্ধকারে ফেলে' রেখে' দিয়ে। এতক্ষণে বুঝি মার মনে পড়ল খুকুর কথা। ভাইয়াই তার সব হয়েছে! অভিমানে ঠোঁট ফুলে' উঠ্‌ল।

কাদা-জলে ডুরে শাড়ীর আঁচল লুটিয়ে খুকী যখন ট্রেনের দিকে দৌড়চ্ছিল, তখন ষ্টেশনে আবার একটু মানুষের কোলাহল সুরু হয়েছিল। সেদিকে কিন্তু তার কোনোই নজর ছিল না। সে দু-হাতে ট্রেনের সিঁড়ি আঁক্‌ড়ে কোনপ্রকারে একটা গাড়ীতে উঠে' পড়্‌ল। মাকে গিয়ে গ্রেপ্তার কর্‌তেই হবে। ভিতরে অনেকগুলি মানুষ ঘুমচ্ছিল। তাদের সে দেখ্‌লে না। শাল মুড়ি দিয়ে একটি মেয়ে কোলের কাছে একটি ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। এই নিশ্চয় তার মা। খুকী তার পায়ের কাছে দৌড়ে গিয়ে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ল। তার পর পায়ের উপর দুইহাতে ছোট ছোট কিল দিয়ে সে বল্‌লে, "মা দুষ্টু, মা দুষ্টু, মা দুষ্টু।" বেশীক্ষণ আর তার রাগ দুঃখকে জয় করে' রাখ্‌তে পার্‌লে না তাই চোখের জলে ফেটে সে সেইখানে লুটিয়ে পড়্‌ল। নিদ্রিত মেয়েটির পা চোখের জলে ভিজে উঠ্‌তেই "ওমা কে রে কার বাছা তুই?" বলে' বিস্মিত তরুণী উঠে' খুকীকে তুলে' ধর্‌লে। কাদায়ফেলা শুক্‌নো মলিন গোলাপ ফুলের মত সিক্ত কেশে-বাসে ঘেরা কচি এতটুকু মেয়েটি ঝড়ের বুক থেকে ছিট্‌কে তার পায়ে কেমন করে' এসে পড়ল?

ট্রেন্‌ তখন ছেড়ে দিয়েছে। দূরে শোনা যাচ্ছিল ব্যাকুলকণ্ঠে কারা যেন ডাকাডাকি কর্‌ছে, "খুকী রে খুকী!" খুকীর কানে সে ডাক গেল না; সে তখন তার অপরিচিতা মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌ছিল। খুকীর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে ব্যথিত বিস্মিত তরুণী অন্ধকারে জানালার বাইরে মুখ বাড়িয়ে ষ্টেশনের নাম দেখ্‌বার চেষ্টা কর্‌লে। কিন্তু এই দুর্য্যোগে মিট্‌মিটে ঝাপ্‌সা আলোগুলোও চোখে পড়ে না, কিছুই বোঝা গেল না। মেয়েটি পাশের বেঞ্চির মহিলাকে ডেকে বল্‌লে, "হ্যাঁগা দিদি, এটা কি ইষ্টিশান গা? কার কচি মেয়েটা জলে ভিজে এ-গাড়িতে এসে উঠ্‌ল। মা-মাগীর হুঁস্‌ নেই, কোথায় উঠল, কোথায় নাম্‌বে কে জানে? দুধের ছেলে কেমন ছেড়ে দিয়েছে! আমি একি গেরোয় পড়লাম দেখ ত। একে নিয়ে এখন কি করব?"

গাড়ীতে একটা সোরগোল পড়ে' গেল। কেউ বল্‌লে পরের ইষ্টিশানে খোঁজ নিও, কেউ বল্‌লে ইসটিস্‌ম্যান কাগজে বিজ্ঞাপন দিও, কেউ বল্‌লে শিকলি ধরে' টান; কেউ বা মেয়ের কাছেই খোঁজ করতে সুরু করলে। খুকীর উত্তরে মা-বাবার যে নাম পাওয়া গেল, বাংলা দেশে কোন বাঙালীর ঘরেই বোধ হয় সে নামের অভাব নেই; কাজেই তাতে কোন ফল হ'ল না। অগত্যা শিকল ধরে'ই টানা হ'ল। ঝড়ের রাত্রে মাঠের মাঝখানে গাড়ী হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। সারি সারি গাড়ীর ভিতর হ'তে মানুষের মুখ ভয়ে ও ঔৎসুক্যে উৎগ্রীব হ'য়ে বেরিয়ে পড়্‌ল। ঝড়ে না জানি পথে কি সর্ব্বনাশ হ'য়ে আছে!

(৩)

যাত্রার ঘণ্টা-পাঁচেক পরেই আবার সেই ষ্টেশনে সদলে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে চিরঞ্জীব-বাবুকে ফিরতে হয়েছিল। খুকীকে না পেয়ে ষ্টেশনমাষ্টারের সঙ্গে তাঁর সত্যই মারামারি লেগে গিয়েছিল। বয়সে অনেক নবীন হ'লেও শোকে উন্মত্তপ্রায় এই বৃদ্ধের গালাগালিতে সে কোনোই উত্তর দেয়নি। চিরঞ্জীব-বাবু যখন আস্ফালন করছিলেন "ব্যাটা, ঘাড়ছাঁটা চুলকাটা পাজি; ম্যাষ্টর হয়েছেন! বের কর বল্‌ছি মেয়ে, নইলে দেখে' নেব তোকে আর তোর কোম্পানীর চোদ্দ পুরুষকে," তখন ট্রলির শব্দের দিকে উৎকর্ণ ষ্টেশনমাষ্টারের কানে কোন কুবাক্যই প্রবেশ করছিল না। কুক্ষণে সে আমসন্দেশ খেয়েছিল। কিন্তু তার চেয়ে বড় কুক্ষণ আজ যে সেই পথহারা শিশুর। সত্যই তাকে না ফিরে' পেলে কেমন করে' সে মানুষের কাছে মুখ দেখাবে, কেমন করে'ই বা কোম্পানীর মান রাখবে?

ভগবান্ তার উপর সদয় হলেন, তাই সেইরাত্রেই কোম্পানীর সাহায্যেই সে নিজের নাম ও কোম্পানীর নাম রাখ্‌তে পার্‌লে এবং খুকীকে দিয়ে চিরঞ্জীব-বাবুর আমসন্দেশের ঋণও শোধ কর্‌লে।

সার্ম্মাদ

শ্রী কুমুদরঞ্জন মল্লিক

[ইনি একজন ভক্ত ফকির ছিলেন, উলঙ্গ থাকিতেন, এবং 'লা ইলাহা' বলিতেন বলিয়া আরঙ্গজেব তাঁহার শিরচ্ছেদের হুকুম দেন। দিল্লীতে জুম্মা মসজিদের পাশেই তাঁহার কবর।]

ন্যাংটা ফকির কৃপাণের তলে
ওই পেতে দেয় শির,
ঘুচাবে নিখিল অশ্লীলতায়
বাদ্‌শা আলমগীর।
সার্ম্মাদ নাম ভক্ত কোবিদ
পবিত্র হৃদি তার,
চির-শুচি আর চির-শিশু সে যে
ধারে না রুচির ধার।
প্রেম-সিন্ধুর ঠিকানা সে পেলে
সিন্ধু দেশেতে এসে,
অজানা প্রেমের আস্বাদ পেলে
হিন্দুরে ভালবেসে।
কিশোর যুবার আঁখি দিল তারে
স্বরগের বাণী কয়ে',
যীশুর প্রেমের দরদ বুঝিল
ক্রুসের বেদনা সয়ে'।
পাগল ফকির জীবন ধরিয়া
করে' গেল পাগলামি,
খেপামি তাহার সারা দুনিয়ার
চতুরতা চেয়ে দামী।
সে যে বলিয়াছে ভগবান্ নাই
এ যে অপরাধ মহা,
বাহুবলে তাহা প্রমাণ করিবে
প্রবল শাহান-শাহা।
সে যে দয়ালের তোরণের পাশে
'নাই তুমি' বলে' কাঁদে,
'আজানের' দেশে ফেরে মন তার
জান্ পড়ে তার ফাঁদে!

রুষ্ট নবাবে তুষ্ট করিতে
মোল্লারা দিল সায়,
'কোতল' করার হুকুম হইল—
ফকিরের প্রাণ যায়।
কাজির হস্ত বাঁধা রাখিয়াছে
রাজ-করুণার রাখী,
বিবেক তাহার ইজারা লয়েছে
রাজার নজর নাকি ?
রাজ-তলোয়ার যখনি চেয়েছে
শুনী সহিদের শির,
কালীর গণ্ডী ফতোয়া দিয়েছে
কলম মৌলবীর।
উলেমার আঁখি কুর্শী হইতে
কতটুকু দেখে' বল্,
দরবার আর দপ্তরখানা
নিদেন্ রঙ্‌মহল।
সার্ম্মাদ হায় দাঁড়ায়েছে সেই
উচ্চ মিনার-চূড়ে,
মুফ্‌তি উলেমা পায় না নাগাল,
চেয়ে মাথা যায় ঘুরে ;
সেখানে হইতে দেখা যায় 'কাবা'
আল্লার প্রিয় ঘর,
মন্দির আর গির্জ্জার সারি
এক সমতল 'পর।

আজিকে ধরায় লুটায়ে পড়িবে
দীন ফকিরের শির,
গোটা রাজধানী ভাঙিয়া পড়েছে—
সবার নয়নে নীর।
ঝক্‌মক্ অসি ঘুরায়ে ঘাতক
আসিল যখন কাছে,
সাধু কহিলেন— 'যে রূপেই আস
হিয়া মোর চিনিয়াছে ;
দয়াল এসেছ রুদ্র সাজিয়া
এস সাধনের ধন,
ফেটে যাক্ বুক দাও দাও তবু
নিবিড় আলিঙ্গন।
তোমার প্রেমের সোরগোল হেথা
খুনের তামাসা, প্রিয়,
পর্‌দা সরায়ে অন্তত তুমি
একবার দেখে' নিয়ো।
সার্ম্মাদ ছিল বঁদ হ'য়ে সুখে,
হে বঁধু তোমার পাশে,
জাগিয়া বারেক মেলেছিল আঁখি,
আবার তন্দ্রা আসে।
দেখিল এখনো ধর্ম্মের নামে
বিকাইছে পাপরাশি,
জপের মালার সূত্রে ত গড়ে
ভক্তের লাগি' ফাঁসি,

সত্যকে হীন মুখোস পরায়ে
দানব সাজায় ছলে ;
ঈদের চাঁদকে জ্যোতিষী দেখায়ে
নষ্ট চন্দ্র বলে।
প্রেমের মদিরা পান করে' যাই
রক্ত-সাগরে নেয়ে,
মাতালের এই তীর্থে আসিবে
জগতের ছেলেমেয়ে।'
আল্লা না মানি, আল্লার লাগি'
সার্ম্মাদ দিল প্রাণ ;—
রক্তে রাঙালে মানব-মনের
এ-মানচিত্রখান।
ঈরানী রক্ত- গোলাপের মাঝে
জনম হইল তার,
তরল গুলের গুল্‌জার-বাগে
দেহ হ'ল একাকার।

অভ্র

শ্রী কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি-এস্‌সি (লণ্ডন), এ-আর্‌-সি-এস্‌ (লণ্ডন)

অন্য নাম :—অভ্রক, খেচর, মেঘলাল (চলিত ভাষা), মাইকা।

রাসায়নিক পরিচয় :—কতকগুলি বালুসারের মিশ্র যৌগিক পদার্থ। এলুমিনিয়ম্‌ এবং পটাসিয়ম ধাতু-দ্বয় সকলপ্রকার অভ্রেই থাকে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ম্যাগ্নেসিয়ম্‌ও বিদ্যমান থাকে। লিথিয়ম্‌, সোডিয়ম্‌ এবং ফ্লুয়োরিন্‌, এই তিন মৌলিক পদার্থ কখন কখন থাকে। সকল-প্রকার অভ্রই জলযুক্ত হয়।

বর্ণ :—শ্বেত, হরিতাভ, লোহিত এবং মিশ্রবর্ণ।

কাঠিন্য :—২ হইতে ২·৫।

আপেক্ষিক গুরুত্ব :—২·৮৫।

আকর :—পেগ্‌মাটাইট্‌-নামক আগ্নেয়প্রস্তরের স্তর সর্ব্বপ্রধান আকর। অন্য অনেকপ্রকার স্তরেও পাওয়া যায়, কিন্তু আহরণীয় পরিমাণে এবং অবস্থায় নহে।

অভ্র অতি প্রাচীন কাল হইতেই মনুষ্যের পরিচিত খনিজ পদার্থ। আমাদের প্রাচীন বৈজ্ঞানিক পুস্তকাবলীর মধ্যে ইহার উল্লেখ যথেষ্টই পাওয়া যায়। যথা, মাধবাচার্য্য-লিখিত সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ নামক পুস্তকে পাওয়া যায়, যে ভৈরব (মহাদেব) গৌরীকে বলিতেছেন, "হে দেবি, অভ্র তোমার বীজ এবং পারদ আমার বীজ। এই উভয়ের সংযোগে রোগ এবং দারিদ্র্য নষ্ট হয়।"

শিষ্ট্‌ প্রস্তরে পেগ্‌মাটাইট্‌ প্রস্তরশিরা

সংস্থান :—মনক্লিনিক্‌ শ্রেণীর স্ফাটিক পদার্থ। সাধারণতঃ ছয়মাত্রিক ভাবে পাওয়া যায়।

জাতি :—অনেকপ্রকার। প্রধানতঃ মস্কোভাইট্‌ এবং ফ্লগোপাইট্‌। অন্য জাতির অভ্র বৈজ্ঞানিকের পরিচিত খনিজ-মাত্র, কোনপ্রকার বাণিজ্য-সামগ্রী নহে।

উপরোক্ত উদাহরণ হইতে সহজেই বোঝা যায়, যে, প্রাচীনগণ অভ্রকে কি-প্রকার ঔষধিগুণ-সম্পন্ন বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

"রসরত্নসমুচ্চয়" নামক পুস্তকে অভ্র-সম্বন্ধে তখনকার জ্ঞান কি ছিল, তাহার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। এই পুস্তক খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে লিখিত হয় বলিয়া অনুমান হয়। লেখক কে, জানা যায় না, যদিও তিনি নিজেকে "অষ্টাঙ্গ-হৃদয়" প্রণেতা বাগ ভট বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ইনি বলেন :—

রসহৃদয়-লেখক ভিক্ষু গোবিন্দ খেচর (অভ্র) একটি "উপরস" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। রুদ্রযামল-তন্ত্রে ইহাকে "রস" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (রসকল্প)। ধাতুমঞ্জরীতে আছে (রুদ্রযামল তন্ত্র) :—

"অভ্রকং চৈব ব্যোমং চ গগনং গ্রাহকং পরম্"

অভ্রের গুণ-বর্ণনা ও ক্রিয়া-বর্ণনা আরও অনেক জায়গায় পাওয়া যায়। সুতরাং এই দেশে অভ্র বহুকাল হইতে সুপরিচিত, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

অভ্রের উৎপত্তি-সম্বন্ধে বোধ হয় পূর্ব্বকালে এইরূপ
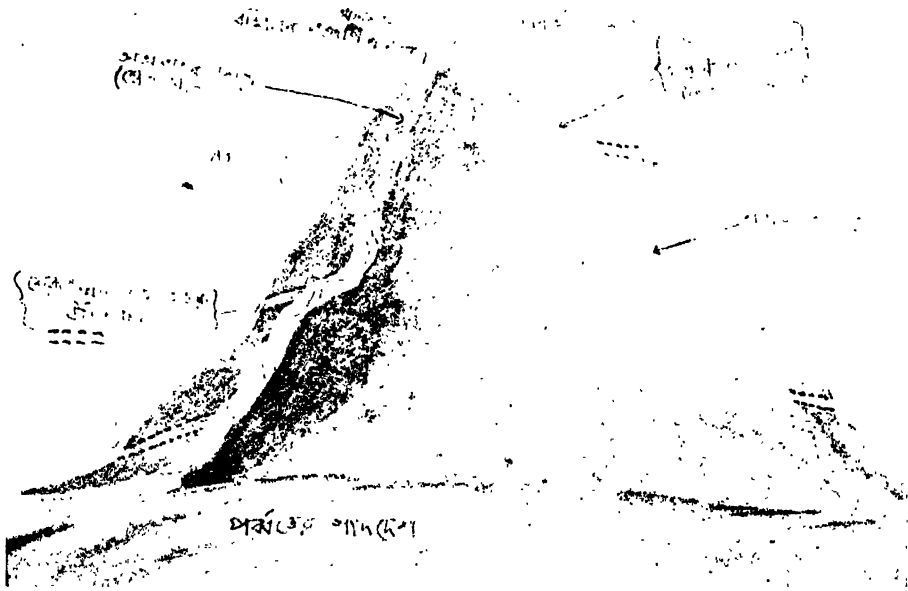
কোডার্ম্মায় পর্ব্বতে স্থিত অভ্রখনি [লেখককর্ত্তৃক অঙ্কিত কল্পিত চিত্র।]

পিনাকং নাগমণ্ডূকং বজ্রমিত্যভ্রকং মতম্"
শ্বেতাদি বর্ণভেদেন প্রত্যেকং তচ্চতুর্ব্বিধম্ ॥

"অভ্র তিনপ্রকার ; যথা, পিনাক, নাগমণ্ডূক ও বজ্র। বর্ণভেদে পুনরায় ইহাদের প্রত্যেকটি চতুর্ব্বিধ হয়।"

চারি-প্রকার বর্ণ-সম্বন্ধে ইনি বলেন :—

"শ্বেতং রক্তঞ্চ পীতঞ্চ কৃষ্ণমেব চতুর্ব্বিধম।"

"শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ এই চারিপ্রকার।"

অভ্র মধ্যে যাহার স্তরবিচ্ছেদ সহজ, সেইটিই উৎকৃষ্ট, এই তথ্যও লেখকের জানা ছিল। যথা :—

"স্বর্থনির্মোচাপত্রঞ্চ তদভ্রং শস্তমীরিতম্"।

বিশ্বাস ছিল, যে, উহা ব্যোম কিংবা মেঘজনিত পদার্থ। "অভ্র" এবং "খেচর" এই দুই প্রাচীন নামের অর্থ হইতে এইরূপ সংজ্ঞা পাওয়া যায়।

বাঁকুড়া জেলায় অভ্রের প্রচলিত নাম "মেঘলাল" ; এবং তথায় এইরূপ গল্প শোনা যায়, যে, মেঘেরা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া শুশুনিয়া প্রভৃতি পাহাড়ের শাল ও অন্যান্য বৃক্ষের তরুণ শ্যামল পত্র খাইতে আসে। সেই মেঘের মুখনিঃসৃত লালা পরে অভ্রে পরিণত হয়।

অভ্র স্ফাটিক পদার্থ ; পৃথিবীর আগ্নেয় প্রস্তরস্তর-

সমূহে ইহা অতি সুপ্রাপ্য পদার্থ। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরূপ ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া থাকে, যে, উহার কোনওরূপ কার্য্যকর ব্যবহার অসম্ভব। আগ্নেয় প্রস্তর-মধ্যে পেগ্‌মাটাইট্‌ প্রস্তরেই অভ্র স্থূলভাবে পাওয়া যায়।

ভূগর্ভস্থ প্রচণ্ড উত্তাপে দ্রবীভূত প্রস্তররাশি কোন-প্রকারে পৃথিবীর উপরিভাগে আসিলে, ক্রমশঃ শীতল হইয়া কঠিন আগ্নেয় প্রস্তরস্তররূপ ধারণ করে। গলিত প্রস্তর অসংখ্যপ্রকার পদার্থের মিশ্রিত সমষ্টি-মাত্র। উহা যখন ক্রমশঃ শীতল হইতে থাকে, তখন ক্রমে ক্রমে মিশ্রিত পদার্থগুলি দ্রবের মধ্য হইতে পৃথক্‌ হইতে থাকে। যেমন উত্তপ্ত জলে প্রচুর পরিমাণে সোরা বা ফট্‌কিরি দ্রবীভূত করিয়া জল শীতল করিলে, স্ফাটিকাকার সোরা

পেগ্‌মাটাইট্‌ প্রস্তর এইরূপ অতি মন্দ গতিতে কঠিন প্রস্তরে পরিণত হয়। সুতরাং পরীক্ষা করিয়া দেখিলে উহা যে বিভিন্ন স্ফাটিক পদার্থ সকলের সমষ্টিমাত্র, তাহা স্পষ্টই প্রকাশ পায়। এই সমষ্টির প্রধান উপাদান কার্টজ্‌ (quartz) ও ফেল্‌ড্‌স্পার (feldspar) এবং আনুষঙ্গিক কয়েকটি অন্য পদার্থের সহিত অভ্র।

অভ্রের সহিত প্রধানতঃ ফেল্‌ড্‌স্পার, চীনামাটি, কার্টজ্‌ তাম্‌ড়া, আপাটাইট, তুর্ম্মলী এবং বেরিল্‌ থাকে। কখনও কখনও অন্য অনেক দুষ্প্রাপ্য খনিজ,—যথা—রেডিয়ম্‌ ধাতুর আকরিক আধার পিচ্‌ব্লেণ্ড,—ইত্যাদিও থাকে।
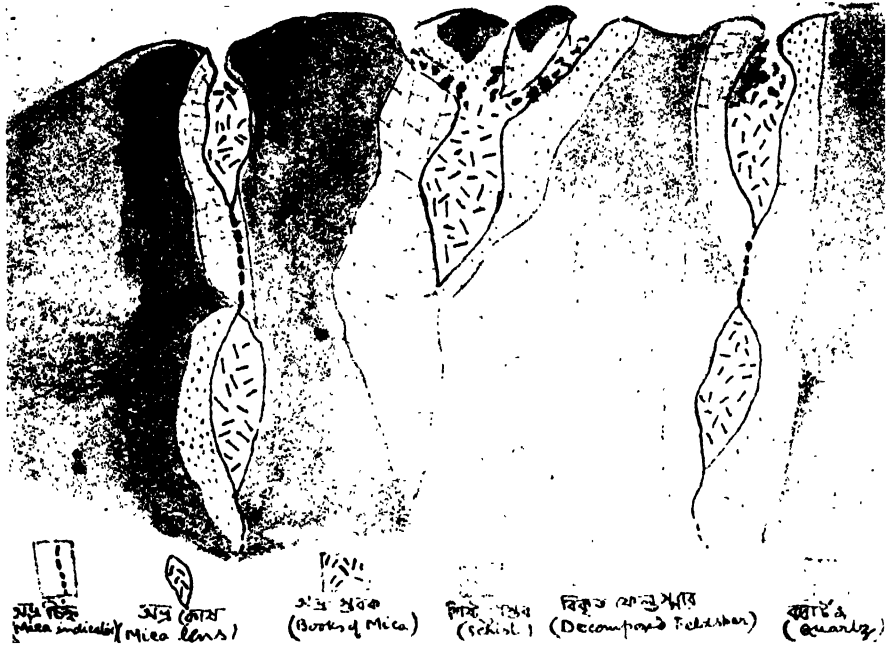
বিহার অঞ্চলের অভ্রখনির লম্বভাবে ছেদের নক্সা [লেখককর্ত্তৃক অঙ্কিত কল্পিত চিত্র ।]

বা ফট্‌কিরি পৃথক্‌ হইতে থাকে, গলিত প্রস্তর-মধ্যে দ্রবীভূত এইসকল পদার্থও সেইরূপে পৃথক্‌ হইতে থাকে।

উত্তপ্ত প্রস্তরদ্রব সহসা শীতল হইয়া গেলে এইসকল স্ফাটিক বস্তু অতি সূক্ষ্মভাব ধারণ করে। প্রস্তরদ্রব যতই ধীরে ধীরে শীতল হয়, তন্মধ্যস্থ স্ফাটিক বস্তুসকল ততই স্থূল এবং বৃহৎ আকার ধারণ করিয়া পৃথক্‌ হয়।

যেসকল স্থানে পেগ্‌মাটাইট্‌ স্তর গ্নীস্‌ (gneiss) বা মাইকা শিষ্ট্‌ (mica schist) ভেদ করিয়া গিয়াছে, সেই স্থলেই অভ্রের লাভজনক খনি থাকা সম্ভব।

আমাদের দেশ অভ্রের জন্য প্রসিদ্ধ। পৃথিবীতে যত উৎকৃষ্ট অভ্র ব্যবহৃত হয়, তাহার তিন চতুর্থাংশ ভারত-বর্ষের প্রদত্ত।

এদেশীয় অভ্র প্রায় সমস্তই মস্কোভাইট্ শ্রেণীর। ত্রিবাঙ্কুরে অল্প-পরিমাণ ফ্লগোপাইট্ও পাওয়া যায়। মস্কোভাইট্ অভ্রে এলুমিনিয়ম্ এবং পটাসিয়ম্ ধাতুদ্বয় হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এবং বালুসারের (সিলিকার) সহিত রাসায়নিকভাবে সংযুক্ত থাকে। এদেশীয় অভ্র স্বচ্ছ, বর্ণযুক্ত, কাচবৎ মসৃণ, সহজে স্তরনির্মোচা, বিদ্যুৎ ও উত্তাপ চালন-রোধক বা অচালক এবং অন্য-দেশীয় অভ্রের তুলনায় কঠিন। অধিকাংশ অম্ল বা দ্রাবকের ইহার উপর কোনও ক্রিয়া নাই।

অভ্রের উৎপাদন-কেন্দ্র বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে স্থিত। মুঙ্গের, হাজারিবাগ ও গয়া, এই তিন জিলার (হাজারিবাগে বেন্দি হইতে মুঙ্গেরে ঝাঝাঁ পর্য্যন্ত) মধ্যে ৬০ মাইল লম্বা এবং ১২ মাইল চওড়া ভূমিখণ্ডের মধ্যে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভ্রের আকর অবস্থিত।

মান্দ্রাজে নেলোর অঞ্চলে গুডুর, রাপুর, আত্মাকুর, ও কাবালি এই চারি স্থানে অভ্রের খনি আছে। মালাবার অঞ্চলেও সম্প্রতি ভাল অভ্রের খনি পাওয়া গিয়াছে, এইরূপ শোনা যায়। কোইম্বাটুর, কুর্গ এবং গঞ্জাম, এই তিন অঞ্চলেও অভ্র-সম্বন্ধে কিছু-কিছু খবর পাওয়া গিয়াছে।

রাজপুতানায় আজমের-মেরওয়ারা, জয়পুর, কিষনগড়, সিরোহি এবং টঙ্ক, এই কয়টি রাজ্যে সম্প্রতি উৎকৃষ্ট অভ্রের আকর আবিষ্কৃত হইয়াছে, শোনা যায়।

বিহার অঞ্চলের (হাজারিবাগ) কোডার্মা জঙ্গলের একটি অভ্র-খনির মুখ

অন্য অনেক প্রদেশে এইরূপ অনেক সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তবে বাণিজ্যের সাময়িক অবসাদ হেতু সে-সম্বন্ধে আর বিশেষ কোনও চেষ্টা হয় নাই।

অভ্র-উৎপাদন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক-পরিমাণে গিরিডি ও হাজারিবাগের নিকটবর্ত্তী খনিসমূহ হইতে হইয়া থাকে। অন্য প্রদেশের অভ্র অপেক্ষা এই দুই স্থানের সামগ্রী অধিক আদৃত।

অভ্র খনন ও আহরণ-প্রথা যেরূপ আদিম ও অবৈজ্ঞানিক-রূপে এদেশে হয়, তাহা যে কোনও সভ্য

দেশের পক্ষে অতীব লজ্জাকর ব্যাপার। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভ্র খনন কোনওরূপ নিয়মবদ্ধ প্রণালীতে হয় না। এক "টিক্‌রি" * হইতে অন্য "টিক্‌রি" পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গ-পথ খুঁজিয়া অভ্র বাহির করা হয়। উপরে অভ্রের চিহ্ন পাইলে তার পর বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে কাটিয়া খনি প্রস্তুত-করণের প্রথা ইদানীং কয়েকটি ইয়োরোপীয় কোম্পানী অনুসরণ করিতেছেন। দেশী ব্যবসায়ী এখানে খরচ বাঁচাইবার চেষ্টায় অনেক সময় খনন বিশেষ ব্যয়-সাধ্য করিয়া তোলেন, এবং অনেক সময় সেরূপ অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ না লওয়াতে মূল্যবান্ খনি কার্য্যোপযোগী নহে ভাবিয়া পরিত্যাগ করেন।

দেশী প্রথায় প্রস্তুত খনি মধ্যে বায়ু চলাচল, জল এবং ভগ্ন প্রস্তরাদি নিষ্কাশন ইত্যাদির কোনওরূপ সুচারু বন্দোবস্ত থাকে না। অভ্র-খননকারীদিগের কার্য্যের সাহায্যার্থে কোনওরূপ চেষ্টা হয় না। ফলে অভ্র উত্তোলন ব্যয়সাধ্য হয় এবং ব্যবহারযোগ্য অভ্রের অপচয় অত্যন্ত অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে।

এইরূপ একটি খনির (আলুকদিয়া) প্রথম অবস্থায় খরচ এবং বিজ্ঞান-সম্মত উপায়াদি অবলম্বনের পর খরচের বৃত্তান্ত বিবৃত হইতেছে।

এই খনিতে প্রত্যহ ১২৫ জন মজুরানী সকাল হইতে বেলা দুইটা পর্য্যন্ত খাটিয়া জল এবং আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিত। খনির ভিতর অত্যন্ত গরম হওয়ায় কার্য্যে বাধা পড়িত। ফলে অভ্রখনকেরা দিনে মাত্র চারি ঘণ্টা সময় খনন করিত। পরে বায়ু-চলাচলের জন্য একটি কূপ খনন করিয়া খনির সুড়ঙ্গপথের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। তাহাতে খনকদিগের কার্য্যের সময় বৃদ্ধি না হইলেও খনির অভ্যন্তর শীতল হওয়ায় কার্য্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু খনি পরিষ্কার করিবার উপায় পূর্ব্বের ন্যায় ছিল এবং তাহাতে খরচ মাসে ছয়শত টাকা এবং দৈনিক কার্য্যের সময় চারি ঘণ্টা কাল ছিল। ইহার পর খনির ইংরাজ অধ্যক্ষেরা পাশ্চাত্য খননপ্রথা অনুযায়ী ইঁদারা * খুঁড়িয়া, পাম্প্ বসাইয়া এবং যন্ত্র-চালিত প্রস্তর-বেধক (Rock-drill) চালনা করিয়া কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। খনিত বস্তু উত্তোলনের জন্য ট্রলি লাইন এবং কপিকল বসাইয়াও পাম্পের সাহায্যে জল নিষ্কাশন করাইয়া, তাঁহাদের মাসিক খরচ ৫৮৬৲ টাকা হইতে ৭৫৲ টাকায় দাঁড়ায়, এবং এই বন্দোবস্তের পর বেলা ১১টার মধ্যে খনি-পথসকল পরিষ্কার হইয়া যাওয়াতে দিনে ৭ ঘণ্টা কাজের সময় পাওয়া যায়। ফলে অভ্রের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, যে, দেশী খননপ্রথা অনুযায়ী সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গ কাটার জন্য খনকদিগের কার্য্য স্থল বিশেষ অন্ধকার এবং অস্ত্রক্ষেপস্থানাভাবযুক্ত হয়। ইহার দরুন্ দুইপ্রকারে খনি-অধিকারীদিগের ক্ষতি হয়। প্রথম, অন্ধকার এবং সঙ্কীর্ণতার দরুন্ অনেক সময় খনক
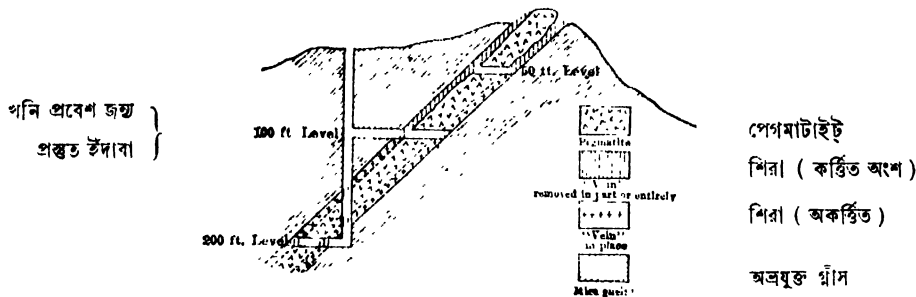
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একটি অভ্র খনির ছেদ নক্সা

* টিক্‌রি—ইংরাজিতে বুক্-অব্-মাইকা, "অভ্রপুস্তক," অভ্রসমষ্টি, অভ্রস্তবক বা অভ্রের চাপ।

* ইঁদারা বা ইন্দ্রা—ইংরাজী মাইন্-শাফ্‌ট্, বৃহৎ কূপের ন্যায় খনির মুখপথ। এই পথে খনির ভিতর যাতায়াত, খনি হইতে খোদিত বস্তু উত্তোলন ইত্যাদি হইয়া থাকে।

দেখিতে না পাইয়া, কিংবা অস্ত্রের গতি এবং বেগ ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত না করিতে পারায়, মূল্যবান্ অভ্রের স্তবক কাটিয়া বা অন্যপ্রকারে নষ্ট করিয়া ফেলে। সার্ টমাস্ হল্যাণ্ড্ ও অন্য অনেক ভূতত্ত্ব ও খনিতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, যে, এদেশে এইরূপে নষ্ট অভ্রের পরিমাণ শতকরা ৭৫ হইতে ৮০। অর্থাৎ খননের যথাযথ বিধান হইলে যেস্থলে অন্ততঃপক্ষে ৮০মণ উত্তোলিত হইত, সেস্থলে এইরূপ কার্য্য-প্রণালীতে ২৫ মণ মাত্র অভ্র পাওয়া যায়।

খনির অধিকারীর দ্বিতীয়প্রকার ক্ষতির কারণও ঐরূপ অন্ধকার এবং সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গ। খনকের কার্য্যস্থল অন্ধকার এবং আবর্জ্জনাপূর্ণ হওয়ায় অনেক সময় সে খনিজপূর্ণ প্রস্তরশিরা হারাইয়া ফেলে এবং পরে বৃথা চারিদিকে খনন করিয়া বেড়ায়। খনির অধিকারী বা তাঁহার কোনও কর্ম্মচারী প্রায়ই বিশেষ শিক্ষিত না হওয়ায় শিরা পুনরাবিষ্কৃত হয় না এবং খনি অভ্রশূন্য এইরূপ বিবেচিত হইয়া পরিত্যক্ত হয়।

খনিজবাহক প্রস্তরশিরার অভিমুখ (strike) এবং ডুবকোণ (angle of dip) নিরূপণ শিক্ষিত এবং অভিজ্ঞ ভূতত্ত্ববিদের প্রথম কার্য্য। এই দুইটি নিরূপণ না করায় অনেক স্থলে বৃথা পরিশ্রম করিয়া খনির কর্ত্তৃপক্ষ অনর্থক বহু অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন।

কোডার্মাতে এক খনির এইরূপ বৃত্তান্ত স্যার্ টমাস্ হল্যাণ্ড্ লিখিয়া গিয়াছেন। এই খনিটি একটি পাহাড়ের উপর স্থিত। প্রথমে অভ্রের নিদর্শন পাওয়া যায় প্রায় শিখর-দেশের নিকটে। সেখানে অভ্রবাহক শিরার বহিঃপ্রকাশ (out-crop) ছিল। খনির কর্ত্তৃপক্ষ সেইখানেই খনিমুখ করিয়া শিরা অনুসরণ করিয়া সুড়ঙ্গ কাটিয়া চলেন। সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গে ধাপ কাটিয়া, মজুর ও মজুরানী (প্রায় ১০০ জন) দ্বারা "মাল" (অভ্র-স্তবকাদি), আবর্জ্জনা, এবং ঘড়া পূর্ণ করিয়া জল খনিমুখে তুলিয়া পরে নীচে আনিতে হয়। ক্রমে সুড়ঙ্গ যতই গভীর হইতে থাকে, ততই অভ্র খনন এবং উত্তোলনের খরচ বৃদ্ধি পায়। শেষে বায়ু-চলাচলের অভাব, খনি পরিষ্কার রাখার খরচ বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে খনির কার্য্য প্রায় বন্ধ হইয়া আসে।

অথচ কর্ত্তৃপক্ষ কোনও বিশেষজ্ঞ ভূতত্ত্ববিদ্ নিয়োগ করিলে অনেক বাধা-বিঘ্ন হইতে পরিত্রাণ পাইতেন। এইক্ষেত্রে অভ্রবাহক শিরা পর্ব্বতশিখরের দুইপার্শ্বেই পর্ব্বতগাত্রের সমান্তরাল হইয়া নীচে চলিয়া গিয়াছে, এবং অধিকাংশ স্থলেই পর্ব্বতগাত্র হইতে শিরা অল্প দূরেই স্থিত। সুতরাং অভিমুখ এবং ডুবকোণ নিরূপণ করিয়া শিরা পরীক্ষা করিলে কর্ত্তৃপক্ষ সহজেই বুঝিতেন, পর্ব্বতগাত্র সুবিধামত স্থলে স্থলে ভেদ করিয়া ঢালু পথ করিয়া দিলে খনকেরা সহজেই কার্য্যস্থলে যাইতে পারিত। বায়ু-চলাচল সহজ, ঠেলা গাড়িতে জল নিষ্কাশন আবর্জ্জনা বহিষ্কার এবং আনয়ন এইসকলপ্রকার সুবিধা হইত। খনকেরা পিচ্ছিল সঙ্কীর্ণ অন্ধকার জায়গায় খনন করার অসুবিধা হইতে উদ্ধার পাইয়া অভ্র খনন অধিক যত্নের সহিত করিতে পারিত। বিশেষে শিরা নীচে হইতে উপরদিকে কাটিয়া যাইলে অস্ত্রের ক্ষেপণ ঊর্দ্ধমুখ হইত। তাহাতে অস্ত্রাঘাত ইচ্ছামত মৃদু বা প্রবল করিতে পারায়, এবং ভগ্ন প্রস্তরাদি আবর্জ্জনা খননস্থল আচ্ছাদন করিয়া না থাকায়, অভ্রস্তবক অস্ত্রাঘাতে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা অনেক কম হইত।

অভ্রখনন-সম্বন্ধে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞই এইরূপ ঊর্দ্ধমুখ আঘাতের অনুকূল মত দেন। নিম্নমুখ আঘাতের দোষ এই, যে, আঘাতে ভগ্ন প্রস্তর-খণ্ড ও-চূর্ণ খনন স্থলেই পড়িয়া থাকে। প্রত্যেক কোপের পরে আবর্জ্জনা পরিষ্কার করা সম্ভব নহে, অথচ আবর্জ্জনায় আচ্ছাদিত অনেক অভ্রস্তবক আঘাত লাগিয়া নষ্ট হইয়া যায়। ঊর্দ্ধমুখ আঘাতে ভগ্ন আবর্জ্জনা নীচে পড়িয়া যাওয়ায় খননস্থল সর্ব্বদাই পরিষ্কার থাকে।

অবশ্য সকল খনিই যে কূপ খনন, যন্ত্রাদি স্থাপন, এইসকলের উপযুক্ত, তাহা নহে। কোন কোন ক্ষেত্রে খনিতে অভ্রের পরিমাণ অল্প থাকে। সেখানে যত অল্প খরচে কার্য্যোদ্ধার হয়, ততই ভাল। তবে বিশেষজ্ঞ ভিন্ন অন্য কেহ তাহা স্থির করিতে পারেন না।

খনিজশিরা মধ্যে অভ্র সর্ব্বত্রব্যাপী হইয়া থাকে না। অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়, যে, শিরামধ্যে অভ্রস্তবক-সকল পৃথক্ পৃথক্ কোষ (lens) মধ্যে আবদ্ধ থাকে।

অল্প অংশ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তও থাকে। সাধারণতঃ এক কোষ হইতে অন্য কোষে সংযুক্ত অভ্ররেখার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, এবং একটি কোষ শূন্য হইয়া যাইলে খনিজ-শিরামধ্যে অন্য কোষ আছে কি না, তাহার প্রধান নিদর্শন ঐ অভ্ররেখা।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

জানালায়

শ্রী প্রিয়ম্বদা দেবী

রোগী আমি, কখনো বিছানা
কখনো বা জানালার ধারে,—
এই মোর রাজ্যের সীমানা!
কাচের জানালাখানি স্বচ্ছ আপনারে
দিয়াছে ছাড়িয়া, খুলি কিম্বা বন্ধ করি
মানা নাই, তুই চক্ষু ভরি'
যতদূর ইচ্ছা যায় পাবি দেখে' নিতে,
আকাশে কি আছে, কিবা আছে ধরণীতে!

একেবারে জানালা ঘেঁষিয়া
দাঁড়াইয়া ঝাউ গুটিকত,
তপস্যায় শরীর শুষিয়া,—
ডাল-পালা উর্দ্ধবাহু সন্ন্যাসীর মত।
মাথায় পাতার বোঝা—যেন জটাভার—
বাতাসে করে না তোলপাড়;
ঈষৎ তুলিয়া উঠে' থেমে যায় ধীরে;
নির্ব্বিকার উদাসীন অন্তরে বাহিরে!

অচেনা গাছেরা তার নীচে,—
অযুত পাতার মহামেলা,
দিনরাত কলরব কি যে,
দিনরাত নৃত্য গীত হাসি আর খেলা!
পাখী গায়, দোলে শাখা, পাতা শুধু বকে,
ফোটে ফুল স্তবকে স্তবকে!
তত্ত্বকথা, দীর্ঘশ্বাস, মৌন আর ধ্যান
কোথা থাকে, সে-কথার নাই কারো জ্ঞান!

ঝরণার পালা তার পরে,
ঢেউ তুলে' নৃত্য করে' চলে,
পাহাড় দু-ধারে ঝুঁকে' পড়ে,
কেবা জানে সারাদিন কি যে তারে বলে!

আঁচল টানিয়া বলে শেওলা কেবলি,—
মাথা খাও যেও না'ক চলি',
সাথে ভেসে চলে, ফুল সকালের খেলা
সাঙ্গ হ'ল, কেবা চায় খেলিতে একেলা!

তার নীচে চলে না'ক চোখ,
তবু কিন্তু আছে কিছু আরো,
জলে দেখি সন্ধ্যা-দীপালোক,—
গানের আভাস ভেসে আসে কারো কারো!
সবুজ পাহাড় জাগে সারি সারি দূরে,
ঢেউ যেন নীলাকাশ জুড়ে'
থেমে আছে, শিরে মেঘ ফেনার মতন,
কখনো ঘুমায়, কভু চঞ্চল চেতন।

কোলে বুকে কটিতে মাথায়,
সবুজ ধূসর ঘন বন,
গাছে গাছে পাতায় পাতায়
ডালে ডালে জড়ানো এমন,
বিচিত্র বিভিন্ন তারা বিবিধ অনেক
বোঝা ভার, মনে হয় এক,
শুধু ঘন রংএর প্রলেপ যেন তারা,
কেহ বুড়া, যুবা নয়, কেউ কচি চারা!

তোলপাড় করিলে বাতাস
আরো কাছে জড়ো হ'য়ে আসে,
একেবারে এক রাশ বাস,
আলো পেলে জেগে উঠে' হাসে,
কোথাও ধূসর নীল, ঘোর ফিকে আর
সবুজের কত না বাহার!
তার পর সব শুধু নীল আর নীল—
আবছায়া, নিরুদ্দেশ, আকাশ অনিল!

রাজপথ

শ্রী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

[২৮]

সকালে জয়ন্তীর সহিত কথোপকথনের পর সুমিত্রা নিজ কক্ষে প্রবেশ করিয়া একবার চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিল। কয়েক দিন হইল প্রমদাচরণ তাহাকে দুই-খানা উৎকৃষ্ট খদ্দর আনাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা দিয়া সে মনের মত করিয়া ঘরটির সংস্কার করিয়া লইয়াছিল। যেখানে যাহা কিছু অপরিচ্ছন্নতা ছিল, সে খদ্দর দিয়া সমস্ত ধুইয়া মুছিয়া বিদূরিত করিয়াছিল। দ্বারে মূল্যবান্ ক্রেটনের পর্দ্দার স্থলে খদ্দরের পর্দ্দা, গবাক্ষে বর্ডার ও কুঁচি দেওয়া সূক্ষ্ম বিলাতী স্ক্রীনের পরিবর্ত্তে খদ্দরের স্ক্রীন্, শয্যায় বিলাতী শীটিংএর পরিবর্ত্তে খদ্দরের চাদর, টেবিলে খদ্দরের টেবিল-ক্লথ্; আল্নায় খদ্দরের শাড়ী, সেমিজ ও জামা; সংক্ষেপে, কক্ষের এমন কোনও স্থল দৃষ্টি-গোচর ছিল না যেখানে বিদেশী বস্ত্র খদ্দরের দ্বারা অপসারিত হয় নাই।

কক্ষের মধ্যস্থলে দাড়াইয়া মেঘ-মেদুর প্রভাতের স্তিমিত আলোকে স্নিগ্ধ এই শুভ্র শুচিতার দিকে চাহিয়া চাহিয়া সুমিত্রার চক্ষে জল আসিল। বোট্যানিকাল গার্ডেনের ঘটনার পর হইতে বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনাবলী পরম্পরাক্রমে তাহার মনে একটা স্বপ্নের মত উদিত হইতে লাগিল, যাহা আজ ভাঙ্গিবার উপক্রম করিয়াছে। কয়েক মাস ধরিয়া নানাবিধ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া যে অলৌকিক অবস্থান্তরে সে উপনীত হইয়াছে এই বিরুদ্ধ-বিমুখ গৃহে মরুদ্বীপের মত তাহার নিষ্ঠা-পূত কক্ষ-তপোবনে আজ সহসা সেই রূপান্তরিত অবস্থার স্বরূপ দর্শন করিয়া এক দিকে যেমন একটা অনির্ব্বচনীয় সুখে তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল, তেম্‌নি অপর দিকে মাতৃঋণরূপে যে উৎপীড়ন আজ হইতে এই সদ্য-রচিত তপোবন বিধ্বস্ত করিতে উদ্যত হইল তাহার কথা স্মরণ করিয়া তাহার সমস্ত মন বিতম্বিত হইয়া গেল।

কক্ষের এক কোণে আব্‌লুস কাষ্ঠের একটা ত্রিপদের উপর সুরেশ্বরের দেওয়া চর্‌কাটা ছিল। সুমিত্রা ধীরে ধীরে তথায় উপস্থিত হইল এবং ক্ষণকাল প্রগাঢ় নতনেত্রে তৎপ্রতি চাহিয়া থাকিয়া হাতলটা ধরিয়া একবার ঘুরাইল। তৈল-নিষিক্ত স্নিগ্ধ যন্ত্র ভ্রমর-গুঞ্জনের মত মৃদু-গম্ভীর ধ্বনি করিয়া উঠিল, কিন্তু সুমিত্রার কর্ণে তাহা করুণ ক্রন্দন-ধ্বনির মত শুনাইল! মনে হইল, চর্‌কার মধ্যে কাহার কণ্ঠস্বর প্রবেশ করিয়া যেন বিলাপ করিতেছে। বলিতেছে—"বন্ধ কর, বন্ধ কর। যাহা চলিবে না তাহাকে চালাইয়া লাঞ্ছিত করিয়ো না!" সুমিত্রা তাড়াতাড়ি চর্‌কার হাতলটা ছাড়িয়া দিল। তাহার পর চর্‌কার দক্ষিণ কোণে খোদিত 'সু' অক্ষরের প্রতি দৃষ্টি পড়ায় নির্নিমেষ-নেত্রে তৎপ্রতি চাহিয়া ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুদিন পূর্ব্বে এই অক্ষরটি লইয়া মাধবীর সহিত তাহার যে রহস্যালাপ হইয়াছিল তাহা মনে পড়িল, এবং তৎপরে এই অক্ষরটিকে বীজ মন্ত্রের মত গ্রহণ করিয়া বাধাবিঘ্নের বিরুদ্ধে কিপ্রকারে সে তাহার জীবন-গতিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া তাহার দুঃখদীর্ণ-নেত্র হইতে টপ টপ্ করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া নত হইয়া চর্‌কায় মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিতে গিয়া সুমিত্রা মুদিত নেত্রে বারম্বার যাহাকে প্রণাম করিল সে তখন আলিপুরের জেলখানায় একান্তমনে বন্দী জীবনের কঠোর কর্ত্তব্য পালন করিতেছিল।

দ্বীপান্তরের আসামী যেমন জাহাজে উঠিয়া সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া শেষবারের মত স্বদেশের আকাশ, বাতাস, গাছপালাকে আঁকড়িয়া ধরে, তেম্‌নি করিয়া সুমিত্রা নিজের প্রিয়বস্তু ও বিষয়গুলিকে বাহিরিন্দ্রিয় ও অন্ত-রিন্দ্রিয় দিয়া অধিকার করিয়া সমস্ত দিন অতিবাহিত করিল। কিন্তু জাহাজ সাগর-বক্ষে উপস্থিত হইলে দিগন্ত-বিস্তৃত জলরাশির মধ্যে জন্মভূমির আকর্ষণ ও প্রবাস-ভূমির বিপ্রকর্ষণ উভয়ই যেমন লুপ্ত হইয়া যায়,

তেমনি সন্ধ্যার নিঃশব্দ তিমির-সঞ্চারের মধ্যে চিন্তা করিতে করিতে সমস্ত দিনের ভোগ করা সুখ এবং দুঃখ সুমিত্রার নিকট বস্তুহীন মায়ার মত ঠেকিল। মনে হইল স্বদেশ এবং বিদেশের বিচার একেবারে অর্থহীন, দেশী খদ্দর এবং বিলাতী বস্ত্র সর্ব্বতোভাবে প্রভেদরহিত।

এমন কি বিমানবিহারীর ডেপুটিত্ব এবং সুরেশ্বরের স্বদেশপ্রেম একই মাত্রায় অবাস্তব! অনবচ্ছিন্ন মহাকালের গর্ভে ক্ষণস্থায়ী মানবজীবন অস্তিত্ববিহীন বলিয়া মনে হইল, এবং তদন্তর্গত সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বেদনা, আশা-নৈরাশ্যের কোনও স্বাতন্ত্র্য অথবা মূল্য আছে বলিয়া একবারও তাহার মনে হইল না।

এইরূপে বৈরাগ্যের মহাশূন্যতার মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে সুমিত্রার নিকট জীবনটা বস্তুহীন বুদ্বুদের মত হইয়া উঠিয়াছে এমন সময়ে কক্ষে বিমলা প্রবেশ করিয়া বলিল, "মেজদি, তোমাকে মা বৈঠকখানায় ডাক্‌ছেন।" তাহার পর সুইচ্ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া দিয়া বলিল, "অন্ধকারে শুয়ে রয়েছ যে, মেজদি? মাথা ধরেনি ত?"

সে-কথার কোনও উত্তর না দিয়া সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করিল, "বৈঠকখানায় কে কে আছেন, বিমলা?"

"বাবা, মা আর বিমান-দাদা।" বলিয়া বিমলা প্রস্থান করিল।

দুশ্ছেদ্য বৈরাগ্যজাল এক মুহূর্ত্তেই ছিন্ন হইয়া ঔদাস্য-শিথিল মন সাধারণ জীবনের আসক্তি-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে প্রবলভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। একটা তীব্র আঘাতে আহত হইয়া সুমিত্রা ক্ষণকাল নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল।

উপর্য্যুপরি কয়েকদিন না-আসার পর যে-দিন সুরেশ্বরের কারাদণ্ডের সংবাদ প্রকাশিত হইল, সে-দিন বিমানবিহারীর আসা, এবং তৎপরে পূর্ব্বের মত ড্রয়িংরুমে তাহাকে জয়ন্তীর আহ্বান, পরস্পর-সম্পর্কিত ব্যাপার মনে করিয়া অপরিমেয় ঘৃণায় ও বিরক্তিতে সুমিত্রার মন কণ্টকিত হইয়া উঠিল। মনে হইল, সুরেশ্বরের কারাবাসের সুযোগ পাইয়া স্বার্থোদ্ধারের জন্য এই দুইজনের লোভাতুরতা একদিনও অপেক্ষা করিতে পারিতেছে না। সবিদ্বেষ অবজ্ঞার সহিত বিমানবিহারীর কথা সুমিত্রা মন হইতে বাহির করিয়া দিল, কিন্তু জয়ন্তীর প্রতি একটা দুর্নিবার ও দুর্জ্জয় অভিমান জাগ্রত হইয়া তাহার সমস্ত মনটা ভরিয়া রহিল!

সকালে জয়ন্তী যে-সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা সুমিত্রার একে একে মনে পড়িতে লাগিল। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার এত সাধের সংসারে আগুন ধরিয়ে দিস্‌নে! আমি তোর হাতে ধর্‌ছি, আমার কথা রাখ্! আমিও তোর মা!" দুঃখে সুমিত্রার চক্ষে জল ভরিয়া আসিল। সে মনে-মনে বলিতে লাগিল, 'সংসারটা কি শুধু তোমার একলারই, মা? আর কারো নয়? তোমার ইচ্ছাতেই আর-সকলের ইচ্ছা বিসর্জ্জন দিতে হবে? তুমি আমার মা তা' জানি; কিন্তু তাই বলে'ই কি আমার উপর তোমার জুলুমের সীমা থাক্‌তে নেই?' নির্দ্দোষ খদ্দরের সজ্জা জয়ন্তীর পক্ষে সাজা হইল, অথচ অস্পৃশ্য বিলাতী বস্ত্র সুমিত্রার পক্ষে শাস্তি হইতে পারিল না! আত্ম-প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় সমগ্র দেহ যখন জীবন পণ করিয়াছে, তখন প্রমদাচরণের সহিত স্বদেশ-চর্চ্চা হইল, প্রমদাচরণকে জয়ন্তীর হস্ত হইতে বাহির করিয়া লওয়া! মাতৃত্বের উৎপীড়নে সুমিত্রার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল।

জননী এবং জন্মভূমি উভয়েই গরীয়সী; কিন্তু সুমিত্রার দুর্ভাগ্যবশতঃ জন্মভূমির সহিত জননীর বিরোধ বাধিয়াছে। এই কঠিন অবস্থাসঙ্কটে কর্ত্তব্য-নিরূপণ করিতে সুমিত্রা ক্ষণকালের জন্য বুদ্ধিভ্রষ্ট হইল। একবার চর্‌কার প্রতি সাগ্রহ দৃষ্টিপাত করিল, একবার সুরেশ্বরের মূর্ত্তি স্মরণ করিল, তৎপরে জননীর ব্যাকুল আবেদনের কথা মনে পড়িল। তখন সুমিত্রা একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিল। আত্মহত্যা করিবার কল্পনায় মানুষে যেমন করিয়া চিন্তা করে, ঠিক সেইরূপ উদ্ভ্রান্ত নিবিড় চিন্তা! আত্মবিনাশের উৎকট উন্মাদনা তাহার আকৃতিতে প্রকট হইয়া উঠিল।

যে-ঘরে তাহার পূর্ব্বের বস্ত্রাদি ছিল, তথায় উপস্থিত হইয়া সুমিত্রা এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিল, তৎপরে একটা ওয়ার্ড্রোব খুলিয়া নটনের বাড়ীর মভ্ ক্রেপের সুট্‌টা বাহির করিয়া পরিল। একদিন এই সজ্জাটি পরিধান করিবার জন্য জয়ন্তী তাহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সেদিন সুমিত্রা জয়ন্তীর অনুরোধ রক্ষা করে নাই; সেই

কথা স্মরণ করিয়াই আজ সে ইহা পরিধান করিয়া ড্রয়িংরুমে উপস্থিত হইল।

প্রবল অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া সুমিত্রা এত বড় আত্ম-নিপীড়ন করিয়া বসিল! ক্রুদ্ধা সর্পিণী কখন কখন যেমন আপনার দেহে আপনি দংশন করে, ঠিক সেইরূপ সে নিজকে নিজে দংশন করিল। মনস্তত্ত্বের হিসাবে ইহা পুরাদস্তর আত্মহত্যা, শুধু দেহের পরিবর্ত্তে মনের! সে যখন দেশী বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বিলাতী বস্ত্র পরিধান করিতেছিল তখন অভিমানের উন্মাদনায় তাহার বুদ্ধি-বিবেচনা ভালমন্দর বিচার-শক্তি সমস্তই ঠিক সেইরূপে অপহৃত হইয়াছিল আত্মহত্যার পূর্ব্বে যেরূপে হয়।

তাই যখন মুখে গভীর দুঃখের ছাপ লইয়া সুমিত্রা ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিল, তখন তাহাকে নবসজ্জায় সজ্জিত দেখিয়াও জয়ন্তী হৃষ্ট হওয়ার পরিবর্ত্তে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। পুষ্প-চন্দনে ভূষিত হইয়া মৃতব্যক্তির মুখের নিষ্প্রভতা যেরূপ অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া উঠে, সুদৃশ্য বিলাতী বস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সুমিত্রার আকৃতির অবস্থাও তদ্রূপ হইয়াছিল।

খদ্দরের সজ্জা পরিত্যাগ করিয়া সহসা সুমিত্রার বিলাতী বস্ত্র পরিধান করার মূলে একটা বিশেষ কোনও গোলযোগ আছে অনুমান করিয়া প্রমদাচরণ শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। ভয়ার্ত্ত-কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "এ বেশ কেন, মা সুমিত্রা?"

সুমিত্রা কম্পিত-কণ্ঠে বলিল, "কেন বাবা, এ'ত বেশ ভালই!"

প্রমদাচরণ স্তব্ধ হইয়া ক্ষণকাল সুমিত্রার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন, "না, না সুমিত্রা, আমার কাছে কোন কথা লুকিয়ো না! একাজ তুমি যে সহজে করনি তা' আমি বুঝ্‌তে পারছি। আমাকে বল, কি হয়েছে?"

সহসা কি বলিবে বিশেষতঃ একজন বাহিরের লোক বিমানবিহারীর সমক্ষে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া সুমিত্রা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

জয়ন্তী উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। প্রমদাচরণের প্রশ্নের উত্তরে সুমিত্রা কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিবে, এই আশঙ্কায় তিনি মৃদু হাস্যের সহিত বলিলেন, "হবে আবার কি? কিছু দিন একটা সখের মত যে কাজ করলে তাই নিয়েই কি চিরকাল থাক্‌বে? মাঝে মাঝে সাধ করে' খদ্দর পর্‌তে ত মানা নেই; কিন্তু তাই বলে' এসব কাপড় ত্যাগ কর্‌বে কেন?"

সুমিত্রা এ-কথার কোনও মৌখিক প্রতিবাদ না করিয়া যেমন দাঁড়াইয়া ছিল তেম্‌নি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

জয়ন্তীর প্রতি কোনওপ্রকার মনোযোগ না দিয়া সুমিত্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রমদাচরণ বলিলেন, "এ যদি তুমি সম্পূর্ণ নিজের বিবেচনায় করে' থাক মা, তা' হ'লে আমার বল্‌বার কিছুই নেই; কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে যে, এ তা' নয়, এর মধ্যে কোন দিক্ থেকে জুলুম-জবরদস্তি নিশ্চয়ই আছে।"

এবারও সুমিত্রা কোনও কথা কহিবার পূর্ব্বে জয়ন্তীই কথা কহিলেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন, যে, তাঁহার নিকট হইতে উত্তর পাইবার পর প্রমদাচরণ এপ্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন। তাহা না করিয়া কথাটাকে এরূপ মন্তব্যের দ্বারা গুরুতর অবস্থায় লইয়া যাওয়ায় জয়ন্তী মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু বিমানবিহারীর সম্মুখে কথাটা লইয়া বেশী বাড়াবাড়ি করা অনুচিত হইবে তজ্জন্য, এবং সুমিত্রার পরিবর্ত্তনের তরুণ অবস্থায় কথাটা লইয়া অনর্থক আলোচনা করিলে আসল বিষয়ে ক্ষতি হইতে পারে, এই আশঙ্কায়, তিনি তাঁহার মানসিক অবস্থা কিছুমাত্র জানিতে না দিয়া স্বাভাবিক কণ্ঠে কহিলেন, "জুলুম-জবরদস্তি কোন দিক্ থেকেই নেই, যদি কিছু থাকে ত' তার বিপরীতেই আছে।"

এবার প্রমদাচরণ প্রত্যক্ষভাবে জয়ন্তীর কথার উত্তর দিলেন, বলিলেন, "জুলুম-জবরদস্তির বিপরীতটা আবার সময়ে সময়ে জুলুম-জবরদস্তিকেও ছাড়িয়ে যায়। এমন অনেক ব্যাপার আছে, যা' জোর করে' করান যায় না, কিন্তু অন্যরকম করে' করান যায়।"

ক্রোধে জয়ন্তীর চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল; এবার আর নিজেকে সংযত রাখিতে না পারিয়া বলিলেন, "কি-রকম করে' করা যায় বলই না? হাতে পায়ে ধরে'?

'ই বল্‌তে চাচ্ছ ত? কিন্তু তুমি ভুলে' যেয়ো না যে, ামি সুমিত্রার মা! আমার আদেশেও সে অনেক নিষ করতে পারে!"

একমুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া প্রমদাচরণ তাঁহার য়ার হইতে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তাহার র বিমানবিহারীর দিকে ফিরিয়া শান্তকণ্ঠে বলিলেন, াজ আমাদের আর ও-আলোচনাটা শেষ হ'ল না মান; থাক্, অন্য দিন হবে। বাইরে যেমন দুর্যোগ লছে, তেম্‌নি আজ সকাল থেকে আমাদের ভেতরেও ালযোগ চলেছে! তুমি যেয়ো না; বসো, গল্প-টল্প র।" তাহার পর সুমিত্রার নিকট উপস্থিত হইয়া াহার মস্তকের উপর দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিয়া স্নিগ্ধ-ঠে কহিলেন, "মাতৃ-আদেশ লঙ্ঘন করতে তোমাকে ামি উপদেশ দিচ্ছিনে মা, তবে তোমার মঙ্গলের ন্যে যদি একান্তই আবশ্যক হয়, তা' হ'লে পিতৃ-াদেশেরও তোমার অভাব হবে না, এ-কথা তোমাকে ামি শুনিয়ে রাখ্‌লাম।" বলিয়া প্রমদাচরণ ধীরে ধীরে ক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

সে-সময়ে সুমিত্রার চক্ষু হইতে টপ্‌টপ্‌ করিয়া অশ্রু রিয়া পড়িতেছিল, তাহা আর কেহও লক্ষ্য করিল া, শুধু প্রমদাচরণই যাইবার সময়ে দেখিয়া গেলেন।

[২৯]

প্রমদাচরণ যে ব্যাপারটা করিয়া গেলেন, তাহা বিবাদ হে, কলহ নহে, তর্কও নহে; তাহার মধ্যে কটূক্তি ছিল া, ক্রোধ ছিল না, এমন কি উত্তেজনাও ছিল না; তথাপি প্রমদাচরণ প্রস্থান করিবার পর ক্ষণকালের জন্য জয়ন্তী ভীর বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া রহিলেন। সুমিত্রার প্রতি ৎপীড়ন হইয়াছে কল্পনা করিয়া তাহার প্রতিবাদ, এবং প্রয়োজন হইলে তাহার প্রতিকার করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন, প্রমদাচরণ যে এমন করিয়া করিতে পারেন তাহার সম্ভাবনা প্রমদাচরণের একটানা অবিসংবাদী জীবন ও প্রকৃতির ধ্যে কোথায় যে ছিল তাহা জয়ন্তী ভাবিয়া পাইলেন া। যে-জিনিষ কখনও বিচলিত হয় নাই, তাহা চলিতে আরম্ভ করিলে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে তাহার কোন আন্দাজ করিতে না পারিয়া জয়ন্তী মনে-মনে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। কিন্তু উপস্থিত-ক্ষেত্রে ব্যাপার-টাকে হাল্‌কা করিয়া দেওয়াই সমীচীন মনে করিয়া মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "নিজে চিরকাল জোর খাটিয়ে এসে এখন এমন হয়েছে যে, কোন বিষয়ে জোর-জবরদস্তি করা হচ্ছে বলে' সন্দেহ হ'লেই ব্যস্ত হ'য়ে ওঠেন। কিন্তু এটা বোঝেন না যে, তাঁর এ মেয়েটির ওপর-আর-সব খাটান যায়, শুধু জোর খাটানই যায় না।"

তাহার পর সুমিত্রার দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "না বাপু সুমিত্রা, তুমি ওঁকে অমন করে' ভয় পাইয়ে দিও না; তুমি দেশী বিলিতী মিলিয়ে কাপড় পোরো। আর আমি নিজেও তাই ভালবাসি। যেখানকার যে-জিনিষটি ভাল হবে সেখানকার সে-জিনিষ-টির আদর করব। পাঞ্জাব যদি বাঙ্গালাদের পক্ষে আপনার হ'তে পারে তা' হ'লে আফগানিস্থানই বা কেন হবে না, আর পৃথিবীর অন্য যে-কোন স্থানই বা কেন হবে না? পাঞ্জাব আর বাংলাকে এক করেছে একমাত্র ইংরেজের রাজ্য-শাসনই ত? তুমি কি বল, বিমান?"

ইহার বিরুদ্ধে বিমানবিহারীর কিছুই বলিবার ছিল না, কারণ ইহা তাহারই যুক্তি যাহা তাহারই মুখে জয়ন্তী একদিন শুনিয়াছিলেন। তথাপি সে আজ সম্পূর্ণভাবে সে-কথা সমর্থন না করিয়া বলিল, "তা এক হিসাবে সত্যি বটে মা, তবে এক সুখের অথবা এক দুঃখের অধীন হওয়াও একত্র হওয়ার একটা মস্ত কারণ। একই শাসন-প্রণালীর অন্তর্গত হ'য়ে পাঞ্জাব আর বাংলা যখন একই-রকম সুবিধা-অসুবিধা ভোগ করছে তখন সে-দিক্‌ দিয়ে তারা যে এক সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। তেমনি সকল জাতের মানুষকে যখন একই পৃথিবীতে বাস করতে হচ্ছে, তখন একটা খুব বড় দিক্‌ দিয়ে তারা সকলে যে এক তাও মান্‌তেই হবে। সে-হিসাবে আপনি যা বল্‌ছেন তা ঠিক্। আমার মনে হয়, যে, শিল্প, সাহিত্য, বাণিজ্য, এসব ব্যাপার নিয়ে গণ্ডী তৈরী করে' দল বেঁধে ঝগড়া করা, এক সংসারে ঘরে-ঘরে ঝগড়া করার মতই, অন্যায়। সুদূর ভবিষ্যতে কোনো-এক সময়ে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একধর্ম্ম একজাত হ'য়ে যাবে

এই যদি আদর্শ হয়, তা হ'লে দেশী বিলাতী প্রভেদ করে' জাতির সঙ্গে জাতির বিবাদ করা সেই মহৎ আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।"

বিমানবিহারীর কথায় বিশেষভাবে প্রসন্ন হইয়া জয়ন্তী কহিলেন, "সেইজন্যেই ত, আমি বলি যে, বিলাতী জিনিষ ঘৃণা করার মধ্যে মহত্ত্ব কিছুই নেই, বরং তাতে নিজের মনকে ছোট করা হয়।"

বিমানবিহারী কহিল, "না, বিলাতী-বর্জ্জন প্রতিজ্ঞার মূলে ঠিক্ ঘৃণার কথা নেই। এটা হচ্ছে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির একটা উপায়। কিন্তু আমার মনে হয়, সাধু উদ্দেশ্য সিদ্ধ কর্‌বার জন্যে অসাধু উপায়ের সাহায্য নেওয়া উচিত নয়। দরিদ্র ভোজন করাবার জন্যে চুরি কর্‌লে, পুণ্য বেশী হয়, কি পাপ বেশী হয় বলা কঠিন।"

সুমিত্রা একটা চেয়ারে বসিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া জয়ন্তী ও বিমানবিহারীর কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল; কিন্তু তাহাদের আলোচনায় প্রবেশ করিয়া উত্তর-প্রত্যুত্তর অথবা তর্ক-বিতর্ক করিবার কিছু মাত্র প্রবৃত্তি তাহার ছিল না। ক্ষণকাল পরে বিমানবিহারীর নিকট তাহাকে ও বিমলাকে রাখিয়া জয়ন্তী যখন স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন, তখন অগত্যা তাহাকে বিমানবিহারীর কথার উত্তরে কথা কহিতেই হইল।

দুই চারিটা অন্যান্য কথার পর বিমানবিহারী বলিল, "হঠাৎ তোমার এ বেশ-পরিবর্ত্তন দেখে' আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে গিয়েছিলেম! আর সত্যি কথা বল্‌তে কি আমারও তেমন ভালও লাগেনি। এখন ত' এতক্ষণ হ'য়ে গিয়েছে, এখনও কেমন যেন বেমানান লাগ্‌ছে।"

বিমানবিহারীর একথায় বিস্মিত হইয়া সুমিত্রা মুখ তুলিয়া চাহিয়া সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, বেমানান লাগ্‌ছে কেন? এই বেশেই ত' আমাকে চিরকাল আপনারা দেখে' এসেছেন?"

বিমানবিহারী মৃদু হাসিয়া বলিল, "কেন বেমানান লাগ্‌ছে তা বল্‌তে পারিনে, কিন্তু লাগ্‌ছে। মনে হচ্ছে এ যেন তোমার বেশ নয়, ছদ্মবেশ!"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সুমিত্রা বলিল, "কিন্তু খদ্দরও ত' আপনারা পছন্দ করেন না?"

একথায় মনে-মনে ঈষৎ আহত হইয়া বিমানবিহারী মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমি হয়ত আমার বিষয়ে পছন্দ করিনে; কিন্তু তা বলে', তোমার বিষয়ে অপছন্দ কর্‌বার ত' কোনো কারণ নেই! ডাকাতের ছেলে ডাকাত হবে এ হয়ত অনেক ডাকাতই পছন্দ করে না।"

উপমাটা বিমানবিহারী হয়ত সহজভাবেই দিয়াছিল, কিন্তু তাহার মধ্যে একটা নিগূঢ় অর্থ ও ইঙ্গিত উপলব্ধি করিয়া সুমিত্রার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। সে কোনও কথা না বলিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

কিন্তু বিমলা উত্তর দিতে গিয়া কথাটাকে একেবারে অনাবৃত করিয়া দিল। সে সহসা বলিয়া বসিল, "ডাকাতে হয়ত পছন্দ করে না, কিন্তু ডেপুটিরা পছন্দ করে!"

সবিস্ময়ে বিমানবিহারী জিজ্ঞাসা করিল, "কি পছন্দ করে?"

"পছন্দ করে যে তারা যেমন সাহেব তেম্‌নি তাদের স্ত্রীদেরও মেমসাহেব হওয়া উচিত।" বলিয়া বিমলা সুমিত্রার দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল।

এরূপ পরিহাস বিমলা কখনও করে না, এক্ষেত্রেও সে পরিহাস করিবার জন্যই কথাটা বলে নাই, কিন্তু যেমন করিয়াই হউক, কথাটায় বিমান লজ্জিত এবং সুমিত্রা বিরক্ত হইয়া উঠিল।

ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া বিমানবিহারী মৃদু হাসিয়া বলিল, "যে ডেপুটির স্ত্রী নেই, সে একথার উত্তর কেমন করে' দেবে? যাদের আছে, তাদের জিজ্ঞাসা করে' দেখো, তারা হয়ত বল্‌তে পার্‌বে।" তাহার পর সুমিত্রার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "কিন্তু আমার মনে হয় সুমিত্রা, ডেপুটিদের ওপর বিমলা একটু বেশীরকম অবিচার কর্‌ছে। সব ডেপুটিই যে ডাকাতদের চেয়ে নিকৃষ্ট তা না হ'তেও পারে! তোমার কি মনে হয়?"

বিমানবিহারীর কথায় বিমলা হাসিতে লাগিল, এবং সুমিত্রা অধিকতর আরক্ত হইয়া উঠিল।

সুমিত্রার মতের জন্য অপেক্ষা না করিয়া বিমান-বিহারী নিজের মতই ব্যক্ত করিল, বলিল, "আমার মনে হয় আমরা আমাদের জীবনে এতরকম অসঙ্গতি বহন করে' বেড়াই, যে একজন ডেপুটির পক্ষে স্বদেশী স্ত্রী

একেবারে অসঙ্গত না হ'তেও পারে। বাইরে মুরগীর ঝোল আর অন্দরে সত্যনারায়ণের সিন্নীর মত অনেক ব্যাপার আমাদের মধ্যে অনেক দিন ধরে' নির্ব্বিরোধে চল্‌ছে।"

একথায় বিমলা পুনরায় হাসিতে লাগিল।

ইহার পর আরও কিছুকাল কথাবার্ত্তা চলিল বটে, কিন্তু নিতান্তই কোনওপ্রকারে; দুই চারিটা প্রশ্নোত্তরের পর এক একটা প্রসঙ্গ থামিয়া যাইতে লাগিল।

অগত্যা বিমানবিহারী উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "আচ্ছা আজ তা হ'লে চল্‌লাম।"

সুমিত্রা উঠিয়া বিমানবিহারীর সহিত দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া বলিল, "আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল।"

বিমানবিহারী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কি কথা?"

"সুরেশ্বর বাবুর এক বৎসর জেল হয়েছে সে-কথা আপনি জানেন?"

অপ্রতিভ হইয়া বিমানবিহারী বলিল, "হ্যাঁ, জানি। আজ সকালে কাগজে দেখ্‌ছিলাম।" তাহার পর সে-কথার কোনও উল্লেখ না করিয়াই চলিয়া যাইতেছিল, তাহার কৈফিয়ৎ-স্বরূপ বলিল, "কিন্তু কথাটা একেবারে ভুলে' গিয়েছিলাম।"

কৈফিয়ৎটা মোটেই কৈফিয়তের মত শুনাইল না, সুমিত্রার কর্ণে ত নহেই, বিমানবিহারীর নিজের কর্ণেও নয়। কৈফিয়তে অপরাধের মূর্ত্তি অনেক সময়ে পরিস্ফুট হইয়া উঠে; এক্ষেত্রেও তাহাই হইল।

সুমিত্রা কিন্তু তদ্বিষয়ে কোনও অনুযোগ না করিয়া বলিল, "তাঁদের ত' আর কেউ পুরুষ অভিভাবক নেই, কে তাঁদের দেখবে? আপনি তাঁদের একটু খোঁজ-খবর নেবেন?"

বিমানবিহারী একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "তা নিতে পারি; নেওয়াও উচিত। কিন্তু ভাব্‌ছি, অনধিকার-চর্চ্চা হবে কি না।"

সুমিত্রা শান্তভাবে বলিল, "তা যদি মনে হয় ত থাক, কাজ নেই। আচ্ছা, আমি আর বাবা যদি তাঁদের খোঁজ-খবর নিই তা হ'লেও কি অনধিকার-চর্চ্চা হবে বলে আপনার মনে হয়?"

বিমানবিহারী মৃদু হাসিয়া ক্ষুণ্ণকণ্ঠে কহিল, "অন্ততঃ এবিষয়ে কোন কথা বলা আমার পক্ষে নিশ্চয়ই অনধিকার-চর্চ্চা হবে, একথা তুমি আর তোমার বাবা দুজনে স্থির কোরো। তুমি আমার ওপর রাগ করছ সুমিত্রা, কিন্তু সম্প্রতি সুরেশ্বর আর মাধবীর সঙ্গে আমার যেসব ঘটনা হ'য়ে গিয়েছে, তা যদি তুমি জান্‌তে তা'হ'লে আমার অনধিকার চর্চ্চার কথায় তুমি এমন করে' কখনই রাগ কর্‌তে না।"

বিমানবিহারীর কথা শুনিয়া অপ্রতিভ হইয়া সুমিত্রা বলিল, "আমি না জেনে যে কথা বলেছি তার জন্যে আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন। তেমন কোনও ঘটনা যদি ঘটে' থাকে তা হ'লে আমি কখনই আপনাকে সেখানে যেতে বল্‌তে পারিনে।"

বিমানবিহারী বলিল, "আর-কিছু তোমার বল্‌বার আছে?"

"আর-একটা কথা। সুরেশ্বর বাবু কোন্ জেলে আছেন তা আপনি জানেন?"

"জানি, আলিপুর জেলে।"

"সেটা ত এই দিকে?" বলিয়া সুমিত্রা কর-প্রসারিত করিয়া দিক্ নির্দ্দেশ করিল।

"হ্যাঁ; কিন্তু একথা তুমি কেন জিজ্ঞাসা করছ?"

"এম্‌নি; বিশেষ কোন কারণে নয়।"

স্তিমিত আলোকেও সুমিত্রার মুখে রক্তোচ্ছ্বাস বিমান-বিহারীর দৃষ্টি অতিক্রম করিল না।

"আর কোনও কথা আছে কি?"

সুমিত্রা মৃদু-কণ্ঠে বলিল, "না, আর-কিছু নেই।"

তখন বিমানবিহারী প্রস্থান করিল, কিন্তু অতিশয় অপ্রসন্নচিত্তে।

(ক্রমশঃ)
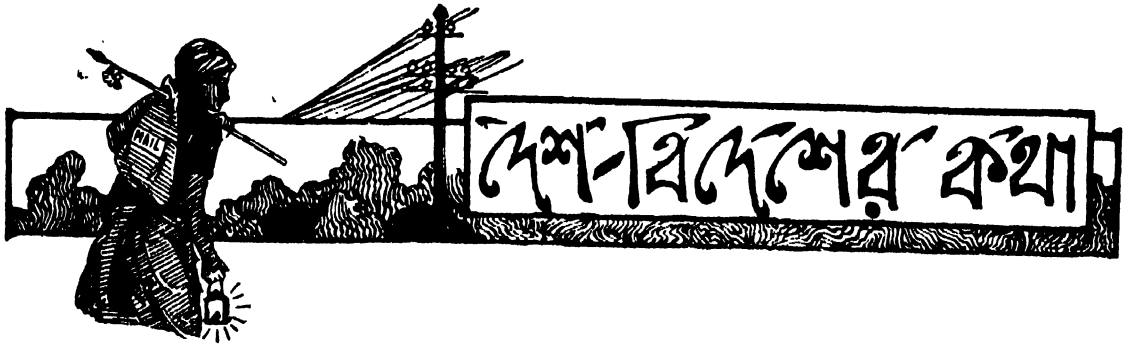
ভারতবর্ষ

নিখিল-ভারত কংগ্রেস-কমিটি

সম্প্রতি আহ্‌মেদাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস-কমিটির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। নানাদিক্ দিয়াই কংগ্রেস-কমিটির এই অধিবেশনটি স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। মহাত্মার কারাদণ্ডের পর স্বরাজ্য দলের লোকেরাই কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাত্মার আদর্শের সঙ্গে স্বরাজ্য দলের আদর্শের ঢের প্রভেদ। দেশের উপর মহাত্মার প্রভাব তাঁহার এই সুদীর্ঘ অনুপস্থিতির পরেও কতটা অক্ষুণ্ণ আছে তাহারই একটা হিসাবনিকাশ লইবার জন্য মহাত্মা কতকগুলি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। এইসব প্রস্তাব সম্পর্কে মহাত্মার সহিত স্বরাজ্য দলের নেতাদের মতভেদ বিশেষ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। স্বরাজ্য দল মহাত্মার প্রস্তাব কংগ্রেসের বিধি-বহির্ভূত বলিয়া সভা পরিত্যাগ করিয়া সদলবলে চলিয়াও আসিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে মহাত্মা গান্ধী তাঁহার প্রস্তাবের কোনো কোনো অংশ পরিত্যাগ করিতে রাজি হওয়ায় উভয় দলের একটা আপোষ হইয়া গিয়াছে, যদিও এ আপোষ অত্যন্ত সাময়িক বলিয়া আমাদের মনে হয়। মহাত্মা তাঁহার প্রস্তাবগুলি কংগ্রেস-কমিটির অধিবেশনের পূর্ব্বে ছাপাইয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং উভয় দলের ভিতর যে বেশ একটা বোঝা-পড়া এবার হইবে তাহার আভাস গোড়াতেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। বস্তুতঃ এবার কংগ্রেস নেতারা মিলিয়াছিলেন মিলনের আকাঙ্ক্ষা লইয়া নহে—তাঁহাদের ভাব ছিল লড়াই এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার।

নিখিল-ভারত কংগ্রেস-কমিটির এই অধিবেশনে মৌলানা মহম্মদ আলি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুমতি-ক্রমে মহাত্মা তাঁহার প্রস্তাব সভায় পেশ করেন। সে প্রস্তাব হইতেছে এই—

চরকা এবং চরকার সাহায্যে হাতে কাটা সূতা দ্বারা প্রস্তুত খদ্দর স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার পক্ষে অপরিহার্য্য বলিয়া গণ্য হওয়া সত্ত্বেও এবং চরকা ও খদ্দর গ্রহণ আইন-অমান্যের প্রাথমিক প্রয়োজনীয় বিষয় বলিয়া কংগ্রেস কর্ত্তৃক বিবেচিত হইলেও দেশের সর্ব্বত্র কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ এপর্য্যন্ত চরকার সাহায্যে হাতে সূতা কাটিবার ব্যাপারে অবহিত হন নাই। সুতরাং নিখিল-ভারত কংগ্রেস-কমিটি স্থির করিতেছেন যে, প্রতিনিধি মূলক কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান-সমূহের সকল সদস্যকেই প্রত্যহ যথানিয়মে কম পক্ষে আধঘণ্টা-কাল চরকায় সূতা কাটিতে হইবে এবং অন্ততঃ দশ নম্বর সূতার দশ তোলা সূতা প্রত্যেক সদস্যকে মাসে ১৫ই তারিখের পূর্ব্বে নিখিল-ভারতীয় খাদি-প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারীর নিকট পাঠাইতে হইবে। অবশ্য শারীরিক অসুস্থতায় অক্ষম হইয়া পড়িলে অথবা ক্রমাগত পর্য্যটনের জন্য অশক্ত হইলে এই নিয়ম আর তখন কার্য্যকরী হইবে না। অন্যথা নির্দ্দিষ্টপরিমাণ সূতা, নির্দ্দিষ্ট তারিখের ভিতর যিনি পাঠাইতে অসমর্থ হইবেন, তিনি সদস্যের পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং যথারীতি সেই শূন্য স্থান অন্য সদস্য নির্ব্বাচনের দ্বারা পূর্ণ করা হইবে।

পণ্ডিত মতিলাল নেহ্‌রু, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতি স্বরাজ্যদলের নেতারা এই প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, উহা কংগ্রেসের বিধি-বহির্ভূত। প্রস্তাবটি অবশেষে ভোটে তোলা হয়। ভোটে মহাত্মা জয়ী হইলে স্বরাজ্য দল সদলবলে সভা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। তাহার পর সভাতে সেই প্রস্তাব লইয়াই আলোচনা চলিতে থাকে এবং মহাত্মার প্রস্তাবের শাস্তিমূলক অংশটি, অর্থাৎ যাহারা ১০ তোলা করিয়া সূতা কাটিতে পারিবে না তাহাদিগকে কংগ্রেসের কর্ম্মচারীর পদ ছাড়িতে হইবে, এই ধারাটি তুলিয়া দিবার জন্য একটি সংশোধক প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। অনেক তর্কবিতর্কের পর এ প্রস্তাবেও মহাত্মাই জয় লাভ করেন। মহাত্মা অবশেষে নিজেই শাস্তিমূলক ধারাটি প্রত্যাহার করিয়াছেন—তাহার পর শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটিতে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং স্বরাজ্য দলও কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করিয়াছেন।

১। ইহা ছাড়া নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলিও সভায় গৃহীত হইয়াছে। নিখিল-ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি জানিতে পারিয়াছেন যে, সময়ে সময়ে, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্য্য-পরিচালকগণ তাহাদের উপরিতন প্রতিষ্ঠান ও কর্ম্মচারীর অনুশাসন পালন করেন নাই। এই সভা স্থির করিতেছেন যে, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্য্যকরী সমিতি শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য আবশ্যক উপায় অবলম্বন করিতে পারিবেন, এমন কি তাঁহারা কর্ত্তব্যভ্রষ্ট কর্ম্মচারীকে কার্য্য হইতে সরাইয়াও দিতে পারিবেন। যেখানে প্রাদেশিক কর্ত্তৃপক্ষ স্বয়ং অভিযুক্ত হইবেন, সেখানে নিখিল-ভারত কংগ্রেস-কমিটি ও ওয়ার্কিং কমিটি আবশ্যক উপায় অবলম্বন করিতে পারিবেন।

২। নিখিল-ভারত কংগ্রেস-কমিটি নির্ব্বাচনমণ্ডলীকে এই মর্ম্মে অনুরোধ করিতেছেন, যাঁহারা কাকিনাড়া কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবাবলীর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কংগ্রেসের পঞ্চবিধ বর্জ্জনে আস্থাবান্ নহেন, নির্ব্বাচক মণ্ডলী যেন তাঁহাদিগকে কংগ্রেস কমিটিতে নির্ব্বাচিত না করেন। কমিটির যে সকল সদস্য বয়কটমূলক প্রস্তাব-সম্পর্কে কাকিনাড়া কংগ্রেসের নির্দ্দেশের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ব্যক্তিগতভাবে উক্ত পঞ্চবিধ বর্জ্জনের নিয়ম পালন না করিবেন নিখিল-ভারত কংগ্রেসকমিটি তাঁহাদিগকেও কংগ্রেস কমিটির পদ পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

৩। উপনিবেশসমূহে ভারতবাসীর অবস্থা-সম্পর্কে পণ্ডিত জহরলালের প্রস্তাব অনুসারে নিখিল ভারত কংগ্রেস-কমিটি ওয়ার্কিং কমিটিকে এই ক্ষমতা দিতেছেন যে কমিটি ঐসম্বন্ধে যথাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন ও প্রয়োজন বুঝিলে দক্ষিণ আফ্রিকায় ডেপুটেশন্ পাঠাইতে পারিবেন।

৪। কংগ্রেসের কার্য্যে ইংরেজী ছাড়া উর্দ্দু ও দেবনাগরী ভাষা ব্যবহৃত হইবে

৫। এই সভা গোপীনাথ সাহা কর্ত্তৃক মিঃ ডের হত্যায় দুঃখ প্রকাশ করিতেছে এবং তাঁহার পরিবারবর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে। বিপথে পরিচালিত হইলেও গোপীনাথের স্বদেশ-প্রেমের কথা এই কমিটি বিশেষভাবে জ্ঞাত আছেন। তথাপি এই হত্যা এবং এবম্প্রকার সকল হত্যাই নিন্দনীয়। কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্য—অহিংস অসহযোগের সহিত এইসকল হত্যাকার্য্যের কোনো মিল নাই। ইহাতে দেশের আইন-অমান্যের জন্য প্রস্তুত হওয়ার পথে বাধার সৃষ্টি করা হয়। আইন-অমান্যেই পবিত্রতম আত্মত্যাগ সম্ভবপর আর নিরুপদ্রব অবস্থা-ব্যতীত আইন-অমান্যের প্রবর্ত্তন কিছুতেই সম্ভবপর নহে।

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ সিরাজগঞ্জ কন্‌ফারেন্সের প্রস্তাব-অনুযায়ী ঐ প্রস্তাবের একটি সংশোধন-মূলক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন—এই প্রস্তাব-সম্পর্কে "আমার উপর অকারণে দোষ দেওয়া হইতেছে এবং ১৮১৮ সালের তিন আইনের হুমকি দেখানো হইতেছে। অন্ততঃ সেই হুম্‌কির জবাব-স্বরূপেও এই সংশোধন প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত।" ভোটে মূল প্রস্তাবই পরিগৃহীত হইয়াছে।

৬। শিখগণ তাঁহাদের ধর্ম্ম-সংক্রান্ত-ব্যাপারে অহিংসার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া যে-ভাবে আত্মত্যাগের পরিচয় প্রদান করিতেছেন, তাহা বিশেষভাবেই প্রশংসার্হ।

ভাইকোম সত্যাগ্রহ—

ভাইকোম সত্যাগ্রহ যথারীতি চলিতেছে। অবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্ত্তন হয় নাই। সত্যাগ্রহ ক্যাম্পে বর্ত্তমানে ১৫০ জন স্বেচ্ছাসেবক রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী তামিল নাড়ু এবং অন্ধ্রদেশের অধিবাসীদিগকে এই আন্দোলনে সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ছয় মাসের উপযুক্ত অর্থ এবং স্বেচ্ছাসেবক প্রস্তুত রাখিতে হইবে।

শ্রী নারায়ণ গুরু তাঁহার আশ্রম সত্যাগ্রহীদিগকে দান করিয়াছেন। সত্যাগ্রহীগণ সেইখানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা যখন নিষিদ্ধ রাস্তায় কার্য্য করিতে না যান, তখন আশ্রমে বসিয়া চরকা কাটা, তূলা পেঁজা প্রভৃতি কাজ করিয়া থাকেন। তাঁহারা নিজেরাই আশ্রম পরিষ্কার করেন, রন্ধন-কার্য্য করেন। বর্ত্তমানে সত্যাগ্রহ ক্যাম্পে প্রত্যহ ১২০ টাকা করিয়া ব্যয় হইতেছে।

বিগত ১৩ই জুন তারিখেও ভাইকোমে যথারীতি সত্যাগ্রহ চলিয়াছিল। শ্রীমতী রামস্বামী নায়কার ও অন্য দুইজন উচ্চবর্ণের মহিলা স্থানীয় মন্দিরে পূজা দিতে গিয়াছিলেন; কিন্তু রাস্তায় অস্পৃশ্য জাতির সত্যাগ্রহীগণ দাঁড়াইয়াছিল, তাঁহারা ঐ রাস্তা দিয়া আসিয়া অপবিত্র হইয়া গিয়াছেন এই অজুহাতে তাঁহাদিগকে মন্দিরে ঢুকিতে দেওয়া হয় নাই, মহিলাগণ বাধ্য হইয়া মন্দিরের বাহিরেই পূজা-অর্চনা করিয়াছেন।

অস্পৃশ্যদিগকে নিষিদ্ধ রাস্তা দিয়া গমন করিবার অধিকার দেওয়া সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের মনোভাব কি তাহা জানিবার জন্য ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছিল, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট্ সে-প্রশ্নের কোনোরূপ উত্তর দেন নাই। এজন্য মহাত্মাজী পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়কে ত্রিবাঙ্কুরে গিয়া যদি কোনো মিটমাটের সম্ভাবনা থাকে সে-সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

গত ২৩শে জুন হইতে ভাইকম সত্যাগ্রহের নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ সত্যাগ্রহের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, গবর্ণমেণ্ট্ সত্যাগ্রহ নিবারণের ব্যবস্থা করিলেন না সুতরাং সাম্প্রদায়িক পবিত্রতা ও অধিকার রক্ষার ভার তাঁহারা নিজেরাই গ্রহণ করিবেন। সত্যাগ্রহের বিস্মৃতিতে তাঁহাদের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

স্বেচ্ছাসেবকগণ চরকা লইয়া সূতা কাটিতে কাটিতে সত্যাগ্রহ করিতে যায়। ত্রিবাঙ্কুরে পুলিশ তাহাদের নিকট হইতে চরকা প্রভৃতি কাড়িয়া লইয়া তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে সুরু করিয়াছে। স্বেচ্ছাসেবকদের উপরে মার-ধরও বেশ ভালমাত্রাতেই চলিতেছে। ইতিমধ্যেই অনেকে কারাদণ্ডেও দণ্ডিত হইয়াছেন।

অ্যাসোসিয়েটেড্ প্রেসের কোনো বিশেষ প্রতিনিধির নিকট মহাত্মা গান্ধী ভাইকম সত্যাগ্রহ-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন :—"সাধারণতঃ আমার মত এই যে, এইসব আন্দোলনের সাফল্য বাহিরের কোনো সহায়তার উপর নির্ভর করে না। কিন্তু বর্ত্তমানে অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে নিখিল-ভারত কংগ্রেস-কমিটির পক্ষে একটা সুস্পষ্ট ঘোষণা করা দরকার। সংবাদ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষ সত্যাগ্রহী-দিগকে সংস্কারবিরোধী গোঁড়া সম্প্রদায় কর্ত্তৃক নিযুক্ত গুণ্ডাদের হাতে সমর্পণ করিয়াছেন। গুণ্ডারা যদি সত্যাগ্রহীদের প্রহার করে এবং তাহাদের খদ্দরের জামা ছিঁড়িয়া পোড়াইয়া ফেলে তাহা হইলে ব্যাপারটা গুরুতরই বলিতে হইবে। কর্ত্তৃপক্ষ কেন স্বেচ্ছাসেবকদের নিকট হইতে যে চর্‌কা কাড়িয়া লইতেছেন তাহা কিছুতেই আমার বোধগম্য হইতেছে না। আমি আশা করি ত্রিবাঙ্কুর দরবার পূর্ব্বের ন্যায় সংস্কারক ও গোঁড়ার দলের ভিতর শান্তি-রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবেন।"

মহাত্মা গান্ধী ভাইকোম সত্যাগ্রহীদের নিকট মিঃ কৃষ্ণস্বামী আয়ারের মারফৎ নিম্নলিখিত বাণী প্রেরণ করিয়াছেন—"সত্যাগ্রহে জয় লাভ করিতে হইলে দুইটি জিনিষ চাই—ধৈর্য্য এবং অপরাজেয় সাহস, ধৈর্য্যের অর্থ অহিংস-ভাব। গোঁড়ার দল যতই অত্যাচার করুন না কেন, সত্যাগ্রহীদের সব নীরবে সহ্য করিতে হইবে। সাহস বলিতে সহ্য করিবার শক্তি বুঝায়। আমার অভিজ্ঞতা হইতে আমি এই বুঝিয়াছি যে, ন্যায়ের পক্ষে ভগবানের নাম লইয়া যাঁহারা সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তাঁহাদের সহ্য করিবার ক্ষমতা বিশেষভাবেই থাকে।"

মহাত্মা গান্ধীর ইচ্ছানুসারে কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি ভাইকোম সত্যাগ্রহ-সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গ্রহণ করিয়াছেন :—শোনা যাইতেছে গোঁড়া হিন্দুরা সত্যাগ্রহীদের উপর অত্যাচার করিবার জন্য গুণ্ডা ভাড়া করিয়া আনিয়াছেন। এই গুণ্ডারা সত্যাগ্রহীদের উপর নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচার করিতেছে। কর্ত্তৃপক্ষের উচিত এ-ক্ষেত্রে সত্যাগ্রহীদিগকে রক্ষা করা কিন্তু তাঁহারা সে কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন না। কার্য্যকরী সমিতির বিশ্বাস এ-সংবাদ সত্য নহে। কিন্তু যদি সত্য হয়, তবে সমিতি ত্রিবাঙ্কুর দরবারের নিকট এই অনুরোধ করিতেছেন যে, তাঁহারা যেন গুণ্ডাদের অত্যাচার হইতে সত্যাগ্রহীদের রক্ষা করেন।

সংবাদ-পত্রের ইতরামি—

একখানি সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ যে, পাঞ্জাবের দুইখানি সংবাদ-পত্রের বিরুদ্ধে পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট্ ফৌজদারী মামলা আনিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সংবাদ-পত্র দুইখানি হিন্দু এবং মুসলমান দুই পৃথক্ সম্প্রদায়ের মুখপত্র। তাঁহারা অনেক দিন হইতেই পরস্পরের ধর্ম্ম

এবং সমাজকে অন্যায়ভাবে আক্রমণ ও অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করিয়া আসিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট যে এতদিন এ-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন নাই তাহার কারণ তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে, উভয় সম্প্রদায়ের সম্ভ্রান্ত লোকেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজেরাই পত্রিকাদ্বয়ের বিরুদ্ধতা করিবেন এবং তাহাতেই এই কুৎসিত ব্যবহার বন্ধ হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহাদের আশা সফল হয় নাই। কাজেই এ অবস্থায় তাঁহারা মামলা আনিতেই কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট আশা করেন যে, উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ব্যক্তিরা সাম্প্রদায়িক বিরোধ এবং অসন্তোষ যাহাতে বৃদ্ধি না পায় তাহার জন্য চেষ্টা করিবেন।

বলা বাহুল্য সংবাদ-পত্রের মারফৎ এই কুৎসিত গালাগালির আদান-প্রদান এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিষ ছড়ানো বন্ধ করিতে না পারা কোন স্থানেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের গৌরবের জিনিষ নহে।

দিল্লীতে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ—

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই হিন্দু-মুসলমানের ভিতর বিরোধের ভাব সম্প্রতি অত্যন্ত সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছে। দিল্লীতে এই মনোভাব এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে তাহার পরিণাম স্মরণ করিয়া অনেকেই শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন, উভয় সম্প্রদায়ের দুষ্ট লোকেরা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবৃদ্ধির দ্বারা ধর্ম্মোন্মাদনার সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া বালক-বালিকা অপহরণ এবং স্ত্রীলোকদের উপর অত্যাচারের কাল্পনিক বিবরণসমূহ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে। বিরোধ যাহাতে আর বেশী দূর না গড়ায় নেতারা তাহার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন। এই সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য ইতিমধ্যে সেখানে কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে ডাঃ আন্‌সারির সভাপতিত্বে হিন্দু-মুসলমানের প্রতিনিধিদের এক সভা হইয়া গিয়াছে। সভায় স্থির হইয়াছে যে, একটি কেন্দ্রীয় মীমাংসা-সমিতি গঠিত হইবে। এই সমিতিতে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে তিনজন হিন্দু এবং তিনজন মুসলমান সভ্য থাকিবেন। ইহা ছাড়া স্থানীয় প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে নির্ব্বাচিত ছয়জন করিয়া সভ্য থাকিবেন। হাকিম আজমল খাঁ এই নব গঠিত সমিতির সভাপতির কাজ করিবেন। এই সভায় ইহাও স্থির হইয়াছে যে, উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় দেড়শত লোকের স্বাক্ষরযুক্ত বিজ্ঞাপন সহরময় টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইবে। এইসকল বিজ্ঞাপনে জনসাধারণকে অনুরোধ করা হইবে যে, তাঁহারা অতিরঞ্জিত নারী-নিগ্রহ ও নারী-হরণের সংবাদে না মাতিয়া সমস্ত বিষয় যেন কেন্দ্রীয় সমিতির গোচরীভূত করেন। স্থানীয় ও বিভিন্নদেশীয় সংবাদ-পত্রসমূহের সম্পাদকগণকে এবং তাঁহাদের সংবাদ-দাতাদিগকে, যেসকল বিষয়ে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হইতে পারে, সেসব বিষয়ের সংবাদ প্রকাশ-সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিবার জন্য অনুরোধ করা হইবে, নিগৃহীত রমণী ও বালক-বালিকাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও সাহায্য করাও এইরূপ মীমাংসা-সমিতির অন্যতম কর্ত্তব্যের ভিতর পরিগণিত হইবে, ঐসকল নিগৃহীত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে বিরোধের বিষয়ও অবিলম্বে এই সমিতিকে জ্ঞাপন করানো হইবে এবং সমিতি যথারীতি অনুসন্ধান করিয়া যে মীমাংসা করিবেন, তাহাই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

এইসব বন্দোবস্তের দ্বারা সত্যই কোনো সুফল ফলিবার সম্ভাবনা আছে কি না, ডাঃ আন্‌সারিকে সেসম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইয়াছিল। তিনি ইহার ব্যবস্থার সুফল সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ করেন না। বস্তুতঃ আন্তরিক ইচ্ছা লইয়া উভয় সম্প্রদায়ের নেতারা যদি বিরোধ-প্রতিকারের চেষ্টা করেন, তবে ফল ভাল না হইবার কোনোই কারণ নাই। বিরোধের মূলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের পরস্পরের ভুল ধারণা কাজ করিতেছে। এই ধারণাগুলি যদি ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায়, তবে হিন্দু-মুসলমানের মিলন যে দৃঢ় ভিত্তির প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার ত কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

আসামের আমলাতন্ত্রী শাসন—

সম্প্রতি আসামের লক্ষ্মীপুর জেলায় গরুমারা চাপারিতে এক অমানুষিক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আসাম ভ্যালি বিভাগের কমিশনার গরুমারা চাপারি গ্রামটিকে গোচারণের মাঠে পরিণত করিতে আদেশ দেন। উক্ত গ্রামের অধিবাসীগণ এই আদেশের বিরুদ্ধে লাটের নিকট আবেদন করে। কিন্তু লাটের নিকট হইতে তাহাদের আবেদনের উত্তর আসিবার সময় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ডেপুটি কমিশনার ফিলিপ্‌সনের আদেশে ডিব্রুগড় আদালতের নাজির জনৈক দারোগা ও কয়েক জন সশস্ত্র পুলিশের সহিত সেই গ্রামে উপস্থিত হইয়া গ্রামবাসীদের সকাতর অনুরোধ সত্ত্বেও গৃহগুলি জ্বালাইয়া দিয়াছেন। ফলে সমস্ত গ্রামখানি ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়াছে।

এই গৃহহীন লোকগুলির কষ্ট যে কিরূপ নিদারুণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহা আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। বিগত ৭ই জুলাই তারিখে আসাম সরকার এক ইস্তাহার জারি করিয়া এব্যাপার ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছেন। নিজেদের হৃদয়-হীনতা দ্বারাই আমলা-তন্ত্র দেশের লোকের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইতেছেন—এজন্যে আর কাহাকেও দোষ দেওয়া চলে না।

বিনায়ক দামোদর সভারকার—

বোম্বাইএর ১লা জুলাইএর খবরে প্রকাশ, বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশনে এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে যে, শ্রীযুক্ত বিনায়ক দামোদর সভারকারের উপর এখনও যে-সমস্ত কঠোর বিধি-নিষেধ আছে, তাহা প্রত্যাহার করিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হউক।

গয়া সেবা-সমিতি—

গয়ায় যে-সব বাঙ্গালী তীর্থযাত্রার উদ্দেশে গমন করেন, তাঁহাদিগকে অত্যাচার উৎপীড়নের হাত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য গয়ার বাঙ্গালী অধিবাসীদের সমিতি সম্প্রতি একটি সভা করিয়া ফরিদপুরের ব্রহ্মচারী বিনোদ অথবা রামকৃষ্ণ মিশনকে গয়ায় একটি সেবা-সমিতি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছেন।

গয়ায় সম্প্রতি একটি বাঙ্গালী মহিলা নৃশংসভাবে খুন হইয়াছেন।—গয়া-প্রবাসী বাঙ্গালীদের ভিতর সেই খুনটি বিশেষভাবেই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে। উপরোক্ত প্রস্তাবটি সম্ভবতঃ তাহারই ফল।

জাইটো হত্যাকাণ্ড—

গত ১লা জুলাই রায়সাহেব অমরনাথ জাইটো গুলি-মারা মামলার রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ২২ জন আসামীই ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১০৭ এবং ১৪৯ ধারা-অনুসারে দণ্ডিত হইয়াছে। সুচা সিং নামে যে ব্যক্তি মুক্ত তরবারী হস্তে ঘোড়ায় চড়িয়া জনতাকে পরিচালিত করিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ, তাহার প্রতি ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের এবং ১০০০ অর্থদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। জরিমানার টাকা আদায় না হইলে তাহাকে আরো দুই বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। কুষাণ কৌর নাম্নী যে রমণী সাধারণকে উত্তেজিত করিয়াছিল, তাহার প্রতি চারি বৎসর বিনাশ্রমের কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। ১৭ জন আসামীর প্রত্যেকে সাত বৎসর করিয়া কারাদণ্ড এবং হাজার টাকা হিসাবে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। টাকা দিতে না পারিলে আরো দেড় বৎসর ইহাদিগকে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। তিনজন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক আসামীকে ৫ বৎসর কারাদণ্ড ও ১০০০ টাকা

দণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। টাকা আদায় না হইলে তাহাদের ...বাসের সময় আরো এক বৎসর বাড়িয়া যাইবে।

এইখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে জাইটো হত্যা-উৎসব-সম্পর্কে ...কারী এবং বে-সরকারী ইস্তাহারে ঢের প্রভেদ পরিলক্ষিত হইয়াছে। ...বাহুল্য এরূপ প্রভেদ একেবারেই অস্বাভাবিক নহে।

...স্কার-আইন-তদন্ত কমিটি—

স্যার আলেকজাণ্ডার মুডিম্যানের সভাপতিত্বে শাসন-সংস্কার-সম্বন্ধে ...ষ্ট করিবার জন্য যে কমিটি বসিয়াছে উহার কার্য্য-তালিকা প্রকাশিত ...য়াছে। কমিটির আলোচ্য-বিষয় :—

(১) সংস্কার-আইন-অনুযায়ী কাজ করিতে গিয়া কেন্দ্রীয় এবং ...দেশিক গবর্মেণ্টের কার্য্যে যে-সব অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছে এবং উক্ত ...নের মধ্যে যেসব গলদ বিদ্যমান আছে সেগুলি পরীক্ষা করা।

(২) উক্ত অসুবিধা ও গলদ দূর করিবার অভিপ্রায়ে উক্ত আইন-...যায়ী অথবা উহার সংশোধন দ্বারা প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন করা। ...টির সদস্যগণের নাম :—

সভাপতি—স্যার্ আলেকজাণ্ডার মুডিম্যান্। সদস্যগণ—স্যার ...দ সফি, স্যার্ হেন্‌রী মনক্রিফ্ স্মিথ্, স্যার্ তেজ বাহাদুর সপ্রু, স্যার্ ...স্বামী আয়ার, বর্দ্ধমানের মহারাজা, স্যার্ আর্থার ফ্রুম, মিঃ জিন্না, ... ডাঃ পরাঞ্জপে। মিঃ টম্‌কিন্‌সন্ এই কমিটির সম্পাদকরূপে ... করিবেন। এই কমিটির নয় জন সদস্যের ভিতর ছয়জন বে-...কারী।

স্যার মুডিম্যান্ কমিটির রিপোর্টের ভিত্তির উপর একটি মেমো-...াম্ প্রস্তুত করিয়াছেন। এই মেমোরেণ্ডাম্ ইতিপূর্ব্বেই প্রাদেশিক ...মেন্ট-সমূহের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মতামত প্রদানের ... এই মেমোরেণ্ডাম্ জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান, এবং সভা-সমিতি ...তির নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। কমিটির বৈঠক যাহাতে ...ষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহের ভিতর বসিতে পারে এবং উক্ত সময়ের ...র যাহাতে কমিটি কার্য্য আরম্ভ করিতে পারে সেজন্য মেমোরেণ্ডামের ... উত্তর ও আবেদনসমূহ ১লা আগষ্টের পূর্ব্বে কমিটির নিকট ...ছান দরকার।

...ক্ষকদের রাজনীতি-চর্চ্চা—

রাও বাহাদুর এ, কে, পাই বোম্বাই কর্পোরেশনে স্কুলের শিক্ষকদের ...নীতি চর্চ্চায় যোগদানের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত প্রস্তাব উত্থাপন ...য়াছিলেন। স্কুল কমিটির কোনো সদস্য স্কুলের কার্য্য-নির্ব্বাহের ...র রাজনীতি ঢুকাইতে পারিবেন না, এবং স্কুলের শিক্ষকেরা কোনো-...মের রাজনীতিতে যোগদান করিতে পারিবেন না। যোগদান করিলে ...দের কঠোর সাজা হইবে।

জাতীয় দলের সদস্যগণ এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। ... প্রস্তাবের পক্ষে ৩২ এবং বিপক্ষে ২৭টি ভোট হওয়ায় প্রস্তাবটি ...ত হইয়াছে।

...ই ফেরুতে সত্যাগ্রহ—

ভাই ফেরুতে গুরু লাঙ্গরের জন্য গুরুর জমি হইতে কাঠ ও ফলমূল-...হ-সম্পর্কে অকালী সত্যাগ্রহ এখনও সমানভাবে চলিতেছে। ...রা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হইতেছেন—নির্য্যাতিত হইতেছেন। ...রে অনেক অকালী দীর্ঘ সময়ের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইতেছেন। ... গ্রীষ্মের ভিতর লোহার হাজতে অকালীদের স্থান নির্দ্দিষ্ট ...ছে, ফলে তাঁহাদের অনেকেই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। এপর্য্যন্ত ... সত্যাগ্রহে ৩ হাজার ১ শত ৬৬জন অকালীকে গ্রেপ্তার করা ...াছে।

ভারতীয় নারী-বিশ্ব-বিদ্যালয়—

সম্প্রতি পুনায় ভারতীয় নারী-বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেশন্ হইয়া গিয়াছে। বোম্বাইএর দেওয়ান বাহাদুর জি-এম্-রাও সভাপতির আসন অধিকার করিয়াছিলেন। মিঃ রাও তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন—এই বিশ্ববিদ্যালয় এখন পরীক্ষার যুগ কাটাইয়া উঠিয়াছে। এখন ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে এই বিশ্ববিদ্যালয় সুপ্রতিষ্ঠ। স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে ভারতীয় নেতাদের জাপানের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা উচিত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মেয়েদের জন্য একটি স্বতন্ত্র মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া সঙ্গত।

শ্রীমতী পার্ব্বতী দেবীর মুক্তি—

গত ১৫ই জুন ফতেগড় জেল হইতে শ্রীমতী পার্ব্বতী দেবীকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রাজদ্রোহ-সূচক বক্তৃতা দেওয়ার অভিযোগে তিনি অভিযুক্ত হন। বিচারে তাঁহার প্রতি দুই বৎসরের জন্য সশ্রম কারাবাসের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। এক বৎসর কারাভোগের পর তাঁহার স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া পড়ে। তাঁহাকে মুক্তি দিবার জন্য পর পর ব্যবস্থাপক সভায় দুইটি প্রস্তাব গৃহীতও হইয়াছিল।

অসহযোগ আন্দোলনে এই পার্ব্বতী দেবী অদ্ভুত কর্ম্ম-শক্তি এবং তেজস্বিতা দেখাইয়া জন-সাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছেন।

সুরাট মিউনিসিপ্যালিটির অপরাধ—

সুরাট মিউনিসিপ্যালিটি তাহার এলাকার মধ্যে জাতীয় শিক্ষা-বিস্তারের জন্য মিউনিসিপ্যালিটির তহবিল হইতে টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন। এই অপরাধে গবর্মেন্ট সুরাটের মিউনিসিপ্যাল বোর্ড্‌কে বাতিল করিয়া দিয়াছেন, ইহা ছাড়া ২২জন কমিশনারের বিরুদ্ধে তাঁহারা মামলাও দায়ের করিয়াছিলেন। জেলা জজ বিচার শেষ করিয়া এই ২২ জন কমিশনারের বিরুদ্ধে ৪০ হাজার টাকা ডিক্রি দিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী এই সম্পর্কে সুরাটের অসহযোগী অধিবাসীদিগকে উপদেশ দিয়াছেন—গবমেণ্ট যদি এই টাকা আদায় করিতে চেষ্টা করেন, তবে স্থানীয় লোকদের কর্ত্তব্য হইবে মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স্ বন্ধ করা। তিনি স্বরাজ্যপন্থীদিগকেও বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সদস্যের পদ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

পুনায় মদ বন্ধের ব্যবস্থা—

পুনাতে আবগারী পরামর্শদাতা সমিতির একটি বৈঠকে মদের প্রচলন হ্রাস-সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে।

(১) প্রত্যেক রবিবারে, হিন্দু-মুসলমানের পর্ব্বদিনে, মহরম, গণপতি এবং শিমাগো উৎসবের পরের পাঁচ দিন এবং মকরসংক্রান্তির পরের দিন মদের দোকানগুলি বন্ধ রাখা হইবে।

(২) দোকানগুলি যাহাতে অপরাহ্ণ ৩টা হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত মাত্র খোলা থাকে তজ্জন্য পরিদর্শক নিযুক্ত করা হইবে।

(৩) সহরের ৬টি দোকানের মধ্যে ৩টি একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

এই সমিতিতে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, সেট্‌লমেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্‌গণ ও জন-সাধারণের পক্ষ হইতে ৬ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। আবগারী বিভাগের ভার-প্রাপ্ত মন্ত্রীর অনুমোদন পাইলেই প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করা হইবে।

নিজামের খলিফা-ভক্তি—

হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর ভূতপূর্ব্ব খলিফা আব্দুল মজিদ খাঁর জন্য প্রতিমাসে ৪৫ হাজার টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি যতদিন বাঁচিয়া থাকিবেন ততদিন তাঁহাকে এই বৃত্তি দেওয়া হইবে। জুলাই মাস হইতে নিয়মিতভাবে নিজাম-রাজ্য হইতে এই বৃত্তি পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বিদ্যালয়ে চর্‌কা ও তাঁত—

কাকিনাড়া মিউনিসিপ্যালিটি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, মিউনিসিপ্যালিটির স্কুলসমূহে যাঁহারা চর্‌কা ও তাঁতের কাজ জানেন, তাঁহাদিগকেই বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইবে। দশহরা ছুটির সময় মিউনিসিপ্যাল স্কুল-সমূহে শিক্ষকদের ভিতর সূতা-কাটায় প্রতিযোগিতার দিন ধার্য্য হইয়াছে।

চামারদের সংস্কার—

তেজ পত্রিকায় প্রকাশ, মিরাট জেলার সুখবেড়া-গ্রামের চামারেরা নিজেদের সামাজিক সংস্কারের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছে। তাহাদের পঞ্চায়েতে স্থির হইয়াছে যে, তাহারা মদ্য ও গোমাংস ভক্ষণ ত্যাগ করিবে। এবং স্ত্রীলোকেরা সৎভাবে জীবন যাপন করিবে। কিন্তু স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমানেরা তাহাদের এই সামাজিক সংস্কারকে বিশেষ সুনজরে দেখিতেছেন না। তাঁহাদের ধারণা এই সমাজ-সংস্কারের মূলে রহিয়াছে চামারদের হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষ। সুতরাং তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া চামারদিগকে জব্দ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। দোকানদারেরা পর্য্যন্ত চামারদের নিকট কেনা-বেচা বন্ধ করিয়াছে।

নিজেদের প্রতি অবিশ্বাস আমাদের অনেক দুর্দ্দশার কারণ। অন্ত্যজ জাতিদের প্রতি আমাদের ব্যবহার-ধারা পরিবর্ত্তনের জন্য আন্দোলনও প্রচুর হইয়াছে। তথাপি যে আমাদের চোখ ফুটিতেছে না—ইহা জাতির পক্ষে চরমতম দুর্ভাগ্যের কথা।

মাদ্রাজে সত্যাগ্রহ—

মাদ্রাজের 'শ্রী ভারত নামন্' এর ম্যানেজার লিখিতেছেন—আমাদের আশ্রমের সভ্য শ্রীমান্ চিদম্বর ভারতী মুর বাজারের নিকট দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেছিলেন, কিন্তু তাহাতে লোক-চলাচলের ব্যাঘাত হয় বলিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইহাতে আমাদের আশ্রমের সভ্যগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত এই সংগ্রাম চালাইবেন। আমাদের আশ্রমের অন্যতম সভ্য শ্রীমান্ সারঙ্গপাণি সেই মুর বাজারের নিকটেই বক্তৃতা করিবেন। জন-সাধারণকে অনুরোধ করা হইতেছে, যেন তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে অহিংস থাকেন এবং এই সত্যাগ্রহ সংগ্রামকে সফল করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। যাঁহারা এই সত্যাগ্রহ-সংগ্রামে যোগ দিতে ইচ্ছুক তাঁহারা ভারত আশ্রমে উপস্থিত হইবেন।

মাদ্রাজে কি হয় জানি না, কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, খৃষ্টান পাদ্রিরা হাট-বাজারে, বড় বড় রাস্তার চৌমাথায় দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দেন। তাহাতে যদি লোক-চলাচলের অসুবিধা না হয় তবে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলি বক্তৃতা দিলেই যে কেন দোষ হইবে তাহার কারণ বোঝা যায় না। যেখানে কর্ত্তৃপক্ষের নজর সম্প্রদায়-ভেদে বিভিন্ন, সেখানে বিরুদ্ধাচরণ করা ছাড়া আর অন্য উপায়ই বা কি আছে?

সাইকেলে পৃথিবী-ভ্রমণ—

দেওয়ার নাথ নামে একজন ভারতবাসী সাইকেলে পৃথিবী-ভ্রমণ মনস্থ করিয়া বোম্বাই হইতে রওনা হইয়াছেন। তাঁহার পারস্যের তেহারন্ সহরে পৌঁছিবার খবর পাওয়া গিয়াছে। রাস্তায় তিনি প্রায় সমস্ত স্থানেই সাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছেন।

যে-দেশে কোনোরকমের সাহসিকতার কাজ নাই, সে-দেশের পক্ষে এই সাহসিকতার পরিচয়গুলি একেবারে নিরর্থক নহে।

পুনায় ট্যাক্স্ বন্ধ—

পুনা জেলার রাজুরী-নামক স্থানে এবং তাহার চারি পাশের তালুকে গত চারি বৎসর কাল ধরিয়া অজন্মা হওয়ায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। এই দুর্ভিক্ষের জন্য গত ১৯২০ সালের জমির খাজনা বাকী পড়িয়াছে। বর্ত্তমান কলেক্টরগণ জনসাধারণের দুই দুর্দ্দশা সত্ত্বেও বাকী খাজনা আদায় আরম্ভ করিয়াছেন এবং জনসাধারণ ইহার প্রতিবাদ-স্বরূপ ট্যাক্স্ দিতে অস্বীকৃত হইয়াছে। ফলে অনেকেরই অস্থাবর সম্পত্তি নীলামে চড়িতেছে। শ্রীযুক্ত দত্তপহ ঘানেকার, চুনীলাল স্বরূপচাঁদ, তুকারাম এবং হাদভাতে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

কমিউনিষ্ট-রক্ষা সমিতি—

বোম্বাইয়ে একটি 'ভারতীয় কমিউনিষ্ট-রক্ষা সমিতি' গঠিত হইয়াছে। এই কমিটি কানপুর বোল্‌শেভিক ষড়যন্ত্র মামলার আপীলে আসামীদের পক্ষ সমর্থনের জন্য জনসাধারণের নিকট অর্থ প্রার্থনা করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে কমিউনিষ্ট্ দল গঠন করা বে-আইনী কি না এই মামলার আপীলের বিচারেই তাহার মীমাংসা হইয়া যাইবে।

ভারতের বাহিরে ভারতবাসী—

ভারতের বাহিরে উপনিবেশগুলিতে কত ভারতবাসী আছে, তাহার একটা হিসাব কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে আলোচিত হইয়াছিল। হিসাবটি এখানে আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

দেশের নাম	ভারতবাসীর সংখ্যা
কানাডা	১২০০
অষ্ট্রেলিয়া	২০০০
নিউজিলাণ্ড্	৬০৬
দক্ষিণ আফ্রিকা	১,৬১,৩৩৯
ষ্ট্রেট্ সেট্‌ল্‌মেণ্ট্	১,০৪,৬২৮
ফরাসী মালয় ষ্টেট্‌স	৩,০৫,২১৯
ব্রিটিশ মালয়	৬১৮১৯
সিংহল	৭,৫০,০০০
মরিশাস	২,৮৪,৫২৭
কেনিয়া	২২,৮২২
ত্রিনিদাদ	১,২১,৪২০
ব্রিটিশ গায়ানা	১,২৪,২৩৮
ফিজি	৬০,৬৩৪
জ্যামেকা	১৮,৪০১
আমেরিকায়	৩,১৭৫
	২০,০২,৭২৮

দাতিয়ার ব্যবস্থা-পরিষদ্—

সম্প্রতি দাতিয়ার মহারাজের জন্ম-দিনের উৎসব হইয়া গিয়াছে। এই উৎসবে সমবেত প্রজাবৃন্দের সম্মুখে দাতিয়ার প্রধান মন্ত্রী দাতিয়ায় ব্যবস্থাপক সভা-প্রতিষ্ঠার সংবাদ ঘোষণা করিয়াছেন। এই সভায় সর্ব্বসুদ্ধ

৩৫ জন সদস্য থাকিবেন। এই ৩৫ জনের ভিতর ২০ জন হইবেন নির্ব্বাচিত সদস্য। পরিষদ্ রাজ্যের শাসন-সম্পর্কীয় ব্যাপারে মহারাজকে সাহায্য করিবেন। তাহার আইন এবং নিয়মাবলী প্রণয়নেব পূর্ণ ক্ষমতা ব্যবস্থাপক সভাকে দেওয়া হইয়াছে।

ভূপালের হিন্দুর দুর্দ্দশা—

ভূপাল-রাজ্যে হিন্দুদের দুর্দ্দশা-সম্বন্ধে অনেকগুলি অপ্রীতিকর ঘটনা প্রকাশিত হইয়াছে। হিন্দু প্রজাদের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় অবস্থা নাকি সেখানে বিশেষ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। রাজ্যের সরকারী চাকুরীতে শতকরা ৯৯ জন মুসলমান এবং স্থানীয় কাউন্সিলে হিন্দু প্রজার প্রতিনিধি একজনও নাই। হিন্দুদের বিবাহ প্রভৃতি উৎসবের সংবাদ পূর্ব্বাহ্ণে কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইতে হয়, মুসলমানদের জন্য ব্যবস্থা অবশ্য অন্যরূপ। মুসলমান বস্তিতে হিন্দু মহিলার ইজ্জৎ সংরক্ষিত নহে। বক্‌রিদের সময় হিন্দু শ্রমিকদিগকে মুসলমানদের বক্‌রিদের গোমাংসও বহন করিতে জোর করিয়া বাধ্য করা হয়। মুসলমানদের গোরস্থানের মত হিন্দুদের শ্মশান-ঘাটের বিশেষ ব্যবস্থা নাই।

অভিযোগগুলি যে গুরুতর তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের জন্য যেমন দেশের ভিতর বিরাট্ আন্দোলন চলিতেছে, এবং হিন্দু-মুসলমানের মিলন ভিন্ন দেশের কল্যাণ অসম্ভব একথা যখন চোখের উপর দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে তখন ভারতের কোনো স্থানেই এইসব বৈষম্য থাকা কোনোপ্রকারেই সঙ্গত নহে।

মধ্যপ্রদেশের স্বরাজ্য দলের কার্য্য-পদ্ধতি—

মধ্যপ্রদেশের স্বরাজ্যদলের সহিত গবর্ণমেণ্টের বিরোধ ক্রমেই জটিল হইয়া উঠিতেছে। সরকার পক্ষ নাকি কাউন্সিল ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্ব্বাচনের চেষ্টা করিতে মনস্থ করিয়াছেন। স্বরাজ্য দলের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা কি হইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা কঠিন; তবে মোটামুটিভাবে তাঁহারা নাকি এই কাজগুলিতে হস্তক্ষেপ করিবেন।—

(১) বজেট্ প্রত্যাখ্যান করা।

(২) যে-সকল প্রস্তাবের দ্বারা সরকার নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে পারেন সে-সমস্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা।

(৩) জাতীয় জীবনের উন্নতির পক্ষে প্রয়োজনীয় বিবিধ প্রস্তাব বা বিল্ উপস্থিত করা।

(৪) বিদেশীদের দ্বারা ভারতের অর্থ শোষণের স্রোত বন্ধ করা।

ভবিষ্যতে কাউন্সিলারদের নিকট উন্মুক্ত সমস্ত পদ লাভ করিতে এবং প্রত্যেক কমিটিতে প্রবেশ করিতে তাঁহারা চেষ্টা করিবেন। মধ্যপ্রদেশের স্বরাজ্য দলের নেতা মিঃ রাও নাকি এক সভায় বলিয়াছেন, স্বয়ং গভর্ণরকে শাসন কার্য্যের প্রধান স্থান হইতে বিচ্যুত করা স্বরাজ্য দলের প্রধান কাজ হইবে। সুতরাং হস্তান্তরিত বিভাগগুলিতে গবর্ণরের ক্ষমতা যতদূর সম্ভব নষ্ট করিয়া দেওয়ার জন্য তাঁহারা নানা প্রস্তাব উপাপন করিবেন। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, মিউনিসিপ্যালিটি এবং আবগারী বিভাগ প্রভৃতিতেই স্বরাজ্যদল প্রথমতঃ আত্মশক্তি নিয়োগ করিবেন।

খাল্‌সা কলেজে ধর্ম্মঘট—

কিছুদিন হইতে অমৃতসরের খাল্‌সা কলেজে যে গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা ক্রমেই গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে। ছাত্রেরা গত ১৬ই জুন একযোগে ধর্ম্মঘট ঘোষণা করিয়াছে। তাহারা অধ্যাপকদিগকে ক্লাশে প্রবেশ করিতে দিতেছে না। কতকগুলি ছাত্র কলেজের প্রবেশ-পথে এবং আফিসের সম্মুখে ধন্না দিতে আরম্ভ করিয়াছে। কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ কয়েকজন ছাত্রকে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার হুকুম দিয়াছিলেন। ছাত্রদের ধর্ম্মঘট করিবার তাহাই প্রধান কারণ। কলেজের কার্য্য-পরিচালক-বিভাগ অধ্যাপক বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায়কে বরখাস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে গিয়া আরো কয়েকজন শিখ অধ্যাপক কাজে ইস্তাফা দেন। এই ব্যাপার হইতেই ছাত্রদের ভিতর যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়, তাহাই বর্ত্তমানে ধর্ম্মঘটের আকার ধারণ করিয়াছে।

গৌরীশঙ্কর অভিযান—

গৌরীশঙ্কর অভিযানের শেষ চেষ্টা দারুণ দুর্ঘটনায় পরিসমাপ্ত হইয়াছে। অভিযাত্রীদলের লেফ্‌টেন্যাণ্ট্ মোলারী এবং আর্‌ভিন্—ইঁহারা দুইজনে চূড়ায় উঠিবার শেষ চেষ্টা করিতে গিয়া মারা গিয়াছেন। রয়াল জিয়োগ্রাফিক্যাল্ সোসাইটির ভূতপূর্ব্ব সভাপতি স্যার্ ফ্রান্সিস্ ইয়ং হাজ্‌ব্যাণ্ড সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন, "অভিযাত্রী-দল প্রায় চূড়ায় উঠিয়াছেন এমন সময় এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। তাঁহারা যত দূর উঁচুতে উঠিয়াছিলেন, ততখানি উঁচুতে পূর্ব্বের কোন অভিযাত্রীই উঠিতে পারেন নাই। এখন যে অভিযান পরিত্যক্ত হইবে তাহা ঠিক— অন্ততঃ এবৎসরের মত।"

মহীশূরের ব্যবস্থা-পরিষদ্—

মহীশূর ব্যবস্থা-পরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে সংবাদপত্র আইনের বিল্ উপাপন করা হইয়াছিল। শেষোক্ত আইনটি যে-ভাবে গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে কোন সংবাদপত্রের সম্পাদন, মুদ্রণ বা প্রকাশে গবর্ণমেণ্টের অনুমতির আবশ্যক হইবে না বটে তবে কোন সম্পাদক যদি রাজদ্রোহ কিম্বা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচারের ফলে দণ্ডিত হন, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে তাঁহার পত্রিকার প্রচার বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন।

গো-হত্যা নিবারণের আইন—

পণ্ডিত শ্যামলাল নেহরু ভারতে গো-হত্যা-নিবারণ-কল্পে এক বিল্ প্রস্তুত করিয়াছেন। এসেম্ব্লীরও আগামী অধিবেশনে সম্ভবতঃ এই বিল্ লইয়া আলোচনা হইবে। গোমাংস বিদেশে রপ্তানির ব্যবসার জন্য সম্পূর্ণরূপে গো হত্যা বন্ধ করাই এই বিলের উদ্দেশ্য। ধর্ম্মার্থে গো-হত্যা বন্ধ করার কথা ঐ বিলে থাকিবে না।

ভারতবর্ষে ব্যবসার খাতিরে বৎসরে ৪২ লক্ষ গরু হত্যা করা হয়। সুতরাং এই গো-হত্যা বন্ধ করিতে পারিলে দেশের একটা বড়রকমের অর্থ-নৈতিক সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

রায়

বাংলার কথা

বাংলায় তুলার চাষ—

কার্ত্তিকের বীজ

নদীয়ার কতক স্থানে, বীরভূম, বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমানে কার্ত্তিক মাসেই সাধারণতঃ বীজ বপন করা হইয়া থাকে। এ-বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। বাঁকুড়ায় গত কার্ত্তিকে যে-চাষ হইয়াছে, তাহা এখন ক্ষেতে আছে। আমরা যতদূর জানিয়াছি, এই স্থানে বীজ নিকৃষ্ট হইয়াছে। আগামী কার্ত্তিকে চেষ্টা করিলে বাঁকুড়া ও বীরভূমে ভাল

জাতের বীজ হইতে ভাল কাপাস পাওয়ার আশা করা যায়। সময় থাকিতে ঐ বীজ খাদি প্রতিষ্ঠানে রাখা হইবে।

বাংলায় ক্ষেত কাপাসের গাছ

ক্ষেত কাপাসের গাছ যাহা বৎসর বৎসর ফল দেওয়ার পর উপ্‌ড়াইয়া ফেলা হয় অথবা ক্ষেতেই পোড়াইয়া দেওয়া হয়, তাহাই বাংলায় গাছ কাপাস হইয়া যায়। একবার আশ্বিন মাসে ফুল দিয়া ও পৌষে ফসল দিয়া চৈত্রে পুনরায় ফুল দিতে থাকে।

কাপাসের জন্মই ভারতবর্ষে

আমেরিকা এখন তুলার চাষে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে, কিন্তু কাপাসের জন্ম হইয়াছিল প্রথমে এই ভারতবর্ষে। আমেরিকার তুলার আঁশ যতই লম্বা এবং সূক্ষ্ম হউক না কেন, ভারতবর্ষের মাটির সঙ্গে কাপাসের যে একটি জন্মগত সম্বন্ধ আছে, এই কথা মেড্‌লিকট্‌ সাহেব বেশ স্পষ্ট ভাষায় তাঁহার "কটন্ গ্রাও্‌ বুক" নামক পুস্তকের ৬১ পৃষ্ঠায় লিখিয়া গিয়াছেন—

"আমেরিকার মাটিতে কাপাস জন্মে বটে, কিন্তু সেই মাটি যে কাপাসের নিজের মাটি নয়, ইহা ত কাপাসের জীবনীশক্তি দেখিলেই স্পষ্টই বোঝা যায়। কিন্তু ভারতবর্ষের মাটিতে যখন সেই কাপাসের জন্ম হয়, তখন তাহার আয়ু বাড়িয়া যায়, কারণ ভারতবর্ষের মাটিই কাপাসের প্রথম জন্মভূমি। আমেরিকার যে কাপাসগুলি এক বৎসর ফল দিয়াই শুকাইয়া যায়, ভারতবর্ষের মাটিতে সেইসকল কাপাস কখনও দুই বৎসর তিন বৎসর আবার কখনও বা ৪।৫ বৎসর পর্য্যন্ত ফল দিয়া থাকে; প্রথম বৎসর অপেক্ষা দ্বিতীয় বৎসরেই আরও বেশী এবং ভাল ফসল দিয়া থাকে। তবে বর্ষার প্রারম্ভে প্রতি বৎসর একবার করিয়া গাছগুলিকে ছাঁটিয়া দিতে হয়। গাছের গোড়া হইতে সমস্ত আগাছা তুলিয়া ফেলা এবং গ্রীষ্মকালে মধ্যে মধ্যে জলসেচন করা আবশ্যক।"

শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত,
কর্ম্মী, খাদি প্রতিষ্ঠান,
৪১, চড়কডাঙ্গা রোড,
বেলেঘাটা, কলিকাতা।
—নীহার

কুষ্ঠরোগীর চিকিৎসার্থ দান ভিক্ষা—

বাঁকুড়া জেলায় এই ভীষণ রোগের প্রাদুর্ভাব যে অত্যন্ত অধিক তাহা কাহাকেও বলিতে হইবে না। লেপার্ মিশন্ ট্রাষ্ট্‌ এসোসিয়েসনের দ্বারা এখানে একটি কুষ্ঠাশ্রম স্থাপিত হয়। সেই আশ্রমে রোগগ্রস্ত বহু লোকের স্থান আছে; কিন্তু সকল রোগীই সেখানে যায় না। অনেকেই লোকালয়ে বাস করিয়া জলবায়ু দূষিত করে, কাজেই এই ভীষণ পীড়া এ-জেলা হইতে দূর করা বা কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা হ্রাস করা দুরূহ ব্যাপার।

এই রোগ নিবারণ করিতে হইলে, ক্ষতযুক্ত রোগীগণকে কুষ্ঠাশ্রমে আট্‌কাইয়া রাখা এবং এই রোগ যাহাদিগকে সবেমাত্র স্পর্শ করিয়াছে তাহাদিগকে ইন্‌জেকসন্ দ্বারা আরোগ্য করা ভিন্ন জনসমাজের প্রকৃত হিতসাধন হইতে পারে না। ক্রমেই ইহা দেশময় বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে।

বাঁকুড়া কুষ্ঠাশ্রমের রোগীদের দৈনিক আহারের ব্যয়ভার গবর্ণমেণ্ট্‌ বহন করেন। এই কুষ্ঠাশ্রমের কার্য্য পরিচালনের ভার এক কমিটীর উপর অর্পিত আছে। এই কমিটীর দ্বারাই ঐ আশ্রমের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে। বাঁকুড়ার রেভারেণ্ড জে, ডব্লিউ, সার্জ্জেণ্ট্‌ এই কমিটীর সম্পাদক। সমিতির সভ্যগণ গত অধিবেশনে স্থির করিয়াছেন, যে কুষ্ঠাশ্রমের বাহিরে রাস্তার ধারে কুষ্ঠরোগীদের জন্য একটি আউট্‌ডোর ডিস্পেন্‌সারী বা চিকিৎসালয় নির্ম্মাণার্থ অর্থ সংগ্রহ করা হউক। ঐ গৃহটি নির্ম্মাণের জন্য ১৫০০্‌ পনর শত টাকা মাত্র ব্যয় হইবে। যাহাদের গায়ে সবে ঐ রোগের চিহ্নাদি প্রকাশ পাইতেছে তাহারা কিছুতেই কুষ্ঠাশ্রমে যাইতে প্রস্তুত নহে। তাই লোক-সমাজে এই রোগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। কুষ্ঠাশ্রমের সন্নিকটে একটি ডিস্পেন্‌সারী খোলা হইয়াছে। সেখানে বাহির হইতে অনেকগুলি রোগী গিয়া ইন্‌জেকসন্ লইয়া আসিতেছেন। কিন্তু সেই গৃহটি নিতান্ত ক্ষুদ্র, তাহাতে সকল রোগীর স্থান হইতেছে না। সেইজন্য ১৫০০্‌ টাকা ব্যয়ে ঐ নূতন গৃহ নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইয়াছে। এরূপ মহৎ কার্য্য সম্পাদনার্থে সহৃদয় বাঁকুড়া-জেলাবাসী ভদ্রমহোদয়গণ স্বতঃই অগ্রসর হইবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। তাই আমরা এই দেশ-হিতকর কার্য্যে তাঁহাদের দান ভিক্ষা করিতেছি। যিনি যাহা দিবেন, তাহা তিনি কুষ্ঠাশ্রমের সেক্রেটারী রেভারেণ্ড্‌ জে, ডব্লিউ, সার্জ্জেণ্ট্‌ মহোদয়ের নিকট পাঠাইবেন।

—বাঁকুড়া-দর্পণ

বঙ্গীয় পল্লী শ্রীসঙ্ঘ—

বঙ্গীয় পল্লী শ্রীসঙ্ঘ কলেরা, ম্যালেরিয়া, বসন্ত, কালাজ্বর, শিশুমঙ্গল ও পল্লী সংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে গ্রামে গ্রামে আলোক-চিত্রের সাহায্যে শিক্ষা ও আনন্দপ্রদ বক্তৃতা প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সঙ্ঘ বাঙ্গালার প্রতি পল্লী হইতে আমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করিবেন। যাঁহারা আহ্বান করিবেন, তাঁহাদের নিকট উক্ত সঙ্ঘ একজন কর্ম্মীর কেবলমাত্র যাতায়াত ও তথায় থাকিবার ব্যবস্থার প্রত্যাশা করেন। ইচ্ছা করিলে তাঁহারা উক্ত প্রতিনিধিকে এক সময়ে এক সপ্তাহের জন্য জন-সাধারণের সেবায় নিয়োজিত রাখিতে পারিবেন। নিকটবর্ত্তী কয়েকটি গ্রামের অধিবাসিগণ সমবেত হইয়া অনায়াসে ইহার ব্যবস্থা করিতে পারেন। যাঁহারা শ্রীসঙ্ঘের কর্ম্মীগণের সহায়তা কামনা করেন, তাঁহারা ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে, পল্লী শ্রীসঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীযুত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী অথবা শ্রীযুত রাজেন্দ্রচরণ ঘোষ মহাশয়কে জানাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

—২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ

এই অনুষ্ঠানটি প্রসার লাভ করিলে দেশের প্রকৃত হিতসাধন হইবে। বাংলা দেশ বলিতে বাংলার পল্লীসমূহকেই বোঝায়। সেই পল্লীর উন্নতি সাধিত হইলেই সমগ্র দেশের উন্নতি ঘটিবে। দারিদ্র্যে ও অস্বাস্থ্যে আজ বাংলার পল্লী ধ্বংসের মুখে। এই দারিদ্র্য ও অস্বাস্থ্য দূর করিতে হইলে, পল্লীবাসীকে শিক্ষিত করার প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে। সেই শিক্ষার ভার যাঁহারা হাতে লইয়াছেন তাঁহাদিগকে সাহায্য করা এবং তাঁহাদিগের সাহায্য লওয়া দেশহিতেচ্ছু সকলেরই কর্ত্তব্য।

পল্লী-সংস্কার—

আষাঢ় (১৩৩১) সংখ্যায় ৪০৫ পৃষ্ঠায় "কৃষক" হইতে যে-অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহাতে কয়েকটি ভুল আছে।

প্রথমতঃ, কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমবায় সমিতির ঠিকানা ১০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট না হইয়া ১।২এ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন রোগে মৃত্যুর যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে, উহা ঐরূপ না হইয়া নিম্নলিখিত রূপ হইবে।—"প্রতি ১॥ মিনিট অন্তর...... ম্যালেরিয়ায়, ৩ মিনিট অন্তর ১ জন নিউমোনিয়ায়, ৪ মিনিট অন্তর ১ জন ওলাউঠায় ও ১ জন আমাশয়ে, ৫ মিনিট অন্তর ১ জন ক্ষয়রোগে, ৬ মিনিট অন্তর ১ জন টাইফয়েডে, ৮ মিনিট অন্তর ১ জন সুতিকায় (১২ মিনিট অন্তর ১ জন পেটের অসুখে), ১৫ মিনিট অন্তর ১ জন ধনুষ্টঙ্কারে এবং ৩০ মিনিট অন্তর ১ জন কালাজ্বরে মরিতেছে।" ইহার সঙ্গে যোগ দিতে পারেন "মোটের উপর প্রতি ঘণ্টায় ১৬২ জন অর্থাৎ

২২ সেকেণ্ড অন্তর ১ জন বাঙ্গালী মরিতেছে। ভাবিয়া দেখুন, সবগুলি যদি চোখের সামনে দেখা যায় ত কি অবস্থা হয়!"

শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাংলায় নারী-নির্য্যাতন—

সম্প্রতি বাংলা দেশে স্ত্রীলোকের প্রতি পাশবিক অত্যাচার অত্যধিক মাত্রায় বাড়িয়া চলিয়াছে। মফঃস্বলের ও সহরের এমন সংবাদপত্র অল্পই আছে, যাহাতে দুই-একটি নারী-নির্য্যাতনের সংবাদ না থাকে। গত ২০ জ্যৈষ্ঠ হইতে আজ ২০ আষাঢ় পর্য্যন্ত আমরা কোন্ কোন্ সংবাদপত্রে কতগুলি নারী-নির্য্যাতনের সংবাদ পাইয়াছি তাহা নিম্নে দেখাইলাম -

বৈকালী ৩টি; বন্দেমাতরম—৩টি; বঙ্গরত্ন—২টি; ২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ—২টি; বরিশাল-হিতৈষী—১টি; ঢাকা-প্রকাশ—২টি; আলোক—১টি; আনন্দবাজার পত্রিকা—৫টি; নীহার—১টি এবং বসুমতী—১টি। সঞ্জীবনীতেও এবিষয়ে অনেক সংবাদ বাহির হইয়াছে।

বাংলার সমস্ত সংবাদপত্র পাইলে হয়ত আরো বেশী সংবাদ পাওয়া যাইত। যাহা হউক, একমাসের মধ্যে একুশটি নির্য্যাতনের সংবাদ আমরা দিলাম। ইহাও কম ভয়াবহ ও শোচনীয় ব্যাপার নয়। নারীর মানসম্ভ্রম রক্ষা করা বাংলা দেশে ক্রমেই দুষ্কর হইয়া পড়িতেছে। দুর্ব্বৃত্ত লোকের প্রতাপ যেন ক্রমেই বাড়িতেছে। এইসব লোককে দমন করিবার জন্য নানারূপ বিধিব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। আবার স্ত্রীলোককে শিক্ষা না দিয়া সকল দিক্ হইতে দুর্ব্বল করিয়া রাখিলে আত্মরক্ষায় তাঁহারা যে কতটা অসমর্থ হইয়া পড়েন তাহাও অনেক স্থলে দেখা যায়। পুরুষের শিক্ষা-বিস্তার আমাদের দেশে এখনও ঘটে নাই; কিন্তু পুরুষের শিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েদের শিক্ষাও সমভাবে আমাদিগকে বিস্তার করিতে হইবে। আর দেশের শিক্ষিত ও সৎসাহসী লোকদিগকে নারীরক্ষা কল্পে নানাবিধ সমিতি ও অনুষ্ঠান গঠন করিতে হইবে, যাহাতে দুর্ব্বৃত্তগণের হস্ত হইতে মেয়েদের রক্ষা করিবার মত লোক গ্রামে গ্রামে কাজ করিতে পারেন। গত জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীতে বিবিধ প্রসঙ্গে (২৮২ পৃষ্ঠা) এবিষয়ে বিশদ আলোচনা আছে। এবিষয়ে একটি সুসংবাদ আছে—

নারীরক্ষা-সমিতি—

টাঙ্গাইলে একটি নারী-রক্ষা-সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই সমিতির কমিটিতে হিন্দু এবং মসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরাই আছেন।

—ঢাকা-প্রকাশ

বিধবা-বিবাহ প্রসার—

যে দেশে নারী-নির্য্যাতন এত বেশী এবং সে-দেশে নারীর প্রতি সমাজের অবিচারের অন্ত নাই, সে-দেশে নারীর প্রতি সুবিচারের দুই-একটি সংবাদও খুবই আনন্দের কারণ। বাল-বিধবার বিবাহ দেওয়া যে মহাপাতকের কাজ নয়, এই ভাব যে দেশে বিস্তৃত হইয়া কার্য্যে পরিণত হইতেছে তাহা সুখের বিষয়।

শিলচর বিধবা বিবাহ সমিতি

গত ১৩৩০ সালে এই সমিতির উদ্যোগে বেঙ্গল ও আসামে মোট ৮১টি বিধবা-বিবাহ হইয়াছে। তন্মধ্যে বৈদ্য একটি, ব্রাহ্মণ ৪টি, কায়স্থ ৭টি এবং ৬৯টি দাস।

মেদিনীপুরে বিধবা বিবাহ

মেদিনীপুরে গত ২৭।৫।২৪ তারিখে দুইটি বাল-বিধবার বিবাহ হইয়াছে। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

(১) মেদিনীপুর জেলার গাঙ্গারডিহি গ্রামে শ্রীযুক্ত ভূপতিচরণ ঘোষ একটি বাল-বিধবার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। কন্যার নাম শ্রীমতী পদ্মমণি দাসী, বয়স ১২ বৎসর, ৭বৎসর বয়সে বিধবা হয়। বরকন্যা উভয়ে সদ্‌গোপ-জাতীয়।

(২) ঐ জেলায় খাকুরদা গ্রামে শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ দত্ত একটি বাল-বিধবার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। কন্যার নাম শ্রীমতী সরোজিনী দাসী। বয়স ১৩ বৎসর, ৭ বৎসর বয়সে বিধবা হয়। বরকন্যা উভয়ে কায়স্থ জাতীয়।

(৩) গত ২৯।৫।২৪ তারিখে মেদিনীপুর জেলার আমলাকুচি গ্রামে আর একটি বাল বিধবার বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। বরের নাম শ্রীযুক্ত মিহিরচন্দ্র রাণা। কন্যার নাম শ্রীমতী কিরণবালা দাসী। বয়স ১২ বৎসর, ৮ বৎসর বয়সে বিধবা হয়। বরকন্যা উভয়েই কম্মকার-জাতীয়।

তিনটি বিবাহই হিন্দুমতে হইয়াছে। বিবাহস্থলে মেদিনীপুর বিধবা বিবাহ সমিতির সভ্য ও বহু ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। বর ও কন্যা-পক্ষের আত্মীয় কুটুম্বগণ আহারাদি করিয়া সামাজিকতা রক্ষা করিয়াছিলেন।

১৯২৩ সালের এপ্রিল মাসে মেদিনীপুরে বিধবা বিবাহ সমিতি স্থাপিত হয়। সমিতির উদ্যোগে ইতিমধ্যে ১৫টি বিধবার বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইল।

শ্রীভাগবৎচন্দ্র দাশ,
সম্পাদক—বিধবা-বিবাহ-সমিতি, মেদিনীপুর।

—বঙ্গরত্ন

কুমিল্লায় বিধবা বিবাহ

"ত্রিপুরা হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতির" উদযোগে গত ৮ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহানুভূতি ও ঐকান্তিক উৎসাহে তাঁহারই নিজ ভবনে ত্রিপুরা বিষ্ণুপুর নিবাসী শ্রীমান্ মহিমচন্দ্র দের সহিত কালীকচ্ছ-নিবাসী ৺বিপিনচন্দ্র দের বিধবা কন্যা শ্রীমতী গিরিবালা দের শুভ বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। এই বিবাহে কুমিল্লার প্রায় ১৮ শত গণ্যমান্য ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। প্রায় দুই শতাধিক ভদ্রমহিলা উপস্থিত হইয়া স্ত্রীআচার প্রভৃতি মাঙ্গলিক কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। এই বিবাহে শ্রীকাইল নিবাসী কুমিল্লার স্বনামখ্যাত উকিল শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের দয়াশীলা পত্নী ৫ টাকা দান করিয়াছেন। স্বদেশ-হিতৈষী বিখ্যাত উকিল শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র দাশ মহাশয় এবং জনৈক ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক বিধবা বিবাহের সারবত্তা সকলকে বুঝাইয়া দেন।

প্রত্যেক নূতন সংস্কার বা নূতন কিছু প্রবর্ত্তিত হইতে গেলে এক-প্রকারে না এক-প্রকারে বাধা উপস্থিত হইবেই; এবং ইহাই পরিশেষে সংস্কারের সত্যতা এবং আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়া থাকে।

ব্রহ্মচর্য্য বিধবা-জীবনের আদর্শ, এই কথা কেহ অস্বীকার করে না। কিন্তু জোর করিয়া অসহায় অবলাদিগের উপর ব্রহ্মচর্য্য চাপাইয়া দেওয়া নিষ্ঠুরতারই নামান্তর মাত্র। বালবিধবার ব্রহ্মচর্য্যের বেলায় যাঁহারা কথায় কথায় শাস্ত্রের দোহাই দিয়া থাকেন, তাঁহারাই আবার ষাট বৎসরের বিপত্নীক বৃদ্ধের নিমিত্ত ষোড়শী ভার্য্যার ব্যবস্থায় মুক্তকণ্ঠ হইয়া থাকেন। এসকল ব্যাপারে তাঁহাদের যুক্তির বহর দেখিলে অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়। তথাকথিত সমাজপতিদের এইরূপ বিবেচনার ফলে ব্যভিচার, জাতিধর্ম্ম পরিত্যাগ ভ্রূণহত্যা, প্রভৃতি পাপ অবাধে সমাজে প্রশ্রয় পাইতেছে। চক্ষের উপর এইসকল পাপের অভিনয় হইয়া সমাজকে কলুষিত ও পাতিত করিতেছে। আর যখনই উহার প্রতীকারের চেষ্টা হইতে থাকে তখনই তথাকথিত সমাজপতিগণ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া গগন-পবন মুখরিত করিয়া তুলেন।

—ত্রিপুরা হিতৈষী

বিধবা বিবাহ :—শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র ঘোষ নামক একজন ভদ্রলোক চন্দ্রকোণা দলমদলের অষ্টাদশবর্ষীয়া এক বিধবার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। স্থানীয় বহু ব্রাহ্মণ এই শুভকার্য্যে সাহায্য করিয়াছিলেন। সত্বর আরও ২।১টি বিধবা বিবাহ হইবার সম্ভাবনা আছে।

—সত্যবাদী

কচুরী, পাটের সার—

কয়েক বৎসর গত হইল (১৯১৫ সালে) যখন কচুরী প্রথমতঃ নজরে আইসে তখন ইহার সারের গুণাগুণ বাহির করিবার জন্য ঢাকা ফারমে অনেক পরীক্ষা করা হয়। রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে যে পচা কচুরীতে যবক্ষারজান ও সোরাজানের ভাগ অধিক ইহার গাছ পোড়াইয়া ক্ষার করিলে উহার মধ্যে সোরাজানের ভাগ অধিক পাওয়া যায়।

এইসকল পরীক্ষা দ্বারা বেশ জানা গিয়াছে যে কচুরী লাল মাটির পাটের উত্তম সার। পচা কচুরী ও গোবর সমান ভাগে জমিতে দিলে কচুরীই অধিক ফল দেয়।

কেবল লাল মাটি নহে, পলি মাটিতেও এইরূপ। ঢাকা জেলার বুড়ি-গঙ্গার পাড়ে চর দোলেশ্বরের মাটি পলিময়, ইহাতে একইরকম চারিখণ্ড জমিতে পরীক্ষা করা হয়; উহার দুইখণ্ডে গোবর ও অপর দুইখণ্ডে সমান ভাগ কচুরীর সার দেওয়া হয়। গত বৎসরের পরীক্ষার ফল নিম্নে দেওয়া গেল :—

প্রতি একরে গড়ে ফলন গোবর সারে—২৭।৫ সের
ঐ পচা কচুরীর সারে—৩০।৫ সের

পচা কচুরীর সার দিয়া গোবর অপেক্ষা প্রতি একরে ৩/০ মণ অর্থাৎ প্রতি বিঘায় ১/০ মণ অধিক পাট পাওয়া গিয়াছে। ইহা দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে পচা কচুরীর সার গোবর অপেক্ষা ভাল। পূর্ব্ববঙ্গে অনেক স্থানে কৃষকেরা ইহা বুঝিয়াছে। তাহারা পাট ও ধানের সারের জন্য পচা কচুরী ও উহার ছাই অধিক-পরিমাণে ব্যবহার করিতেছে।

পশ্চিম বঙ্গে বাখিন্দ ভূমিতে ধানের জমিতে কৃষকেরা কচুরীর সার দেয়; এই নিমিত্ত বর্ষার পূর্ব্বে তাহারা গাড়ী বোঝাই করিয়া দূর হইতে ধান ক্ষেত্রে কচুরী লইয়া যায় এবং বৃষ্টি হইলে জমি কাদা করিয়া উহাতে মিশাইয়া দেয়; ফলে তাহাদের ফসল অধিক জন্মে।

বোনা ধানের জমিতে ও শুকনা কচুরীর ছাইয়ের সার দেওয়া হয় এজন্য কৃষকেরা ধান রোপণের জন্য জমি কাদা করিবার সময় চাষ দিয়া মাটির সহিত ইহা মিশাইয়া দেয়, ইহাতে ফলন পড়ে।

কচুরী পচাইয়া ভাল ফল পাইতে হইলে উহার গাছ উঠাইয়া প্রথমত দুইদিন রৌদ্রে শুকাইবে; পরে উহা এক জায়গায় গাদি দিবে; ইহাতে সহজেই উহা পচিয়া যাইবে। গোবরের ন্যায় কচুরী ও ভালমত পচিলে সার ভাল হয়। এইরূপ পচা কচুরীর সার দেখিতে পচা গোবরের গুঁড়ার মত।

কচুরীর ছাই তৈয়ার করিবার জন্য গাছগুলি ভালমত রৌদ্রে শুকাইবে; পরে একটি গর্ত্তের মধ্যে পোড়াইবে; ইহাতে ছাইয়ের কোনও লোকসান হইবে না।

আখ কিম্বা খেজুরের রস জ্বাল দিবার সময় অন্য জ্বালানি কাষ্ঠের অভাবে শুকনা কচুরী জ্বালাইবে। ইহাতে গুড় জ্বাল দেওয়া ও ছাই করা উভয় কাজই হইবে।

রবার্ট এস ফিন্‌লো,
বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের অধ্যক্ষ
—ঢাকা গেজেট।

দান ও সদনুষ্ঠান—

লক্ষটাকা দান—শিলচরের বিখ্যাত ধনী বি, সি, গুপ্ত কোং শ্রীহট্ট কাছাড়ের জলকষ্ট নিবারণের জন্য একলক্ষ টাকা দান করিবেন প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

—মেদিনীপুর-হিতৈষী

সদনুষ্ঠান—তমলুক মহকুমার সুতাহাটার একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সুতাহাটার জমিদার শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার পণ্ডা মহাশয় মেদিনীপুর জেলাবোর্ডের হস্তে ৫০ বিঘা জমি প্রদান করিয়াছেন।

—নীহার

স্যার্ কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্তের দান—আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, স্যার্ কে জি গুপ্ত তাঁহার ঢাকা জেলার অন্তর্গত ভাটপাড়া গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনার্থ ঢাকা জেলা-বোর্ডের হস্তে ১৮০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

—ঢাকা-গেজেট,

দান।—বালিয়াকান্দী দরিদ্র-নারায়ণ সেবা-সমিতির জনৈক সেবক তাঁহার নিজের সমস্ত সম্পত্তি অন্য কোন নিকটাত্মীয় না থাকায় এই সেবা সমিতিতে উইল করিয়া দিয়া দিয়াছেন। এই সেবকটি বালিয়াকান্দী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে এবৎসর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়াছিলেন। গত কয়েকমাস যাবৎ তিনি রোগশয্যাশায়ী ছিলেন এবং এই সেবা-সমিতিই তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছিল। সেবকটির নাম ৺সূর্য্যকুমার দত্ত।

—সম্মিলনী

দান :—পাসপুর থানার কেলেগোছা-নিবাসী শ্রীযুত রাধানাথ মাইতি মহাশয় স্বীয় পত্নীর ইচ্ছানুসারে সোরাখালি গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন জন্য জেলাবোর্ডের হস্তে ৫০০০৲ টাকা প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত তিনি চিকিৎসালয়ের জন্য ভূমি ক্রয় ও গৃহনির্ম্মাণের ব্যয় ও বহন করিতে সম্মত আছেন।

—সত্যবাদী

স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা :—স্থানীয় স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য জেলা বো তমলুক লোকাল বোর্ডকে ৫০০০৲টাকা দান করিয়াছেন। এই অর্থে জঙ্গল কাটা নালা পুষ্করিণী প্রভৃতি পরিষ্কার, মেলায় জল সরবরাহ ইত্যাদি কার্য্য করা হইবে এবং ম্যাজিক লন্ঠন-যোগে সাধারণকে স্বাস্থ্যতত্ব শিক্ষা দেওয়া হইবে।

— সত্যবাদী

শ্রীযুক্ত সরযূপ্রসাদ বেহানী মহাশয় তাঁহার তৃতীয় পুত্রের বিবাহোপলক্ষে গত ৮ই জ্যৈষ্ঠ নিম্নলিখিত স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নতিকল্পে এককালীন দান করিয়াছেন। ভগবান্ নবদম্পতীকে দীর্ঘায়ুযুক্ত করিয়া সুখে রাখুন, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

৺রামকৃষ্ণ সেবা-সমিতি ১০০৲, ঐ মিশন ১২৫৲, ৺রঘুনাথ জীউর ঠাকুরবাড়ী ১০০৲, আচারী মহারাজের বাটী ২৫৲, ধর্ম্মশালা ১১০৲, কুতুবপুর দুর্গাবাড়ী ৫০৲, হাঁসপাতাল ৫০৲, বি দে থিয়েটার হল ২৫৲, পুরাতন মালদহের মিউনিসিপ্যালিটির অধীন পাঠশালা কয়টির জন্য ২৫৲, দুর্গাদেবী পাঠশালা, কুতুবপুর পাঠশালা, মকদুমপুর মিরের চক, পুড়াটুলী পাঠশালা, নৈশ-বিদ্যালয়, ফুলবাড়ী মক্তব, বাঁশবাড়ী মক্তব, মহাকালী পাঠশালা, জালালিয়া বালিকা বিদ্যালয় প্রত্যেকে ১৫৲ হিসাবে, বাচামারী পাঠশালা ১০৲, খুটু ক্ষ্যাপা বাবাজী ১৫৲, নবাবগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির অধীন পাঠশালা কয়টির জন্য ২৫৲, হিন্দী পাঠশালা ৫১৲, অভয়া চতুষ্পাঠী ১৫৲, মোট ৮৭৬৲ টাকা।

—মালদহ সমাচার

হাওড়ায় মেডিক্যাল কলেজ—হাওড়ার জনৈক ভদ্রলোক তথায় একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের জন্য ৪ লক্ষ টাকা মূল্যের

২২ সেকেণ্ডে অন্তর ১ জন বাঙ্গালী মরিতেছে। ভাবিয়া দেখুন, সবগুলি যদি চোখের সামনে দেখা যায় ত কি অবস্থা হয়!"

শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাংলায় নারী নির্য্যাতন—

সম্প্রতি বাংলা দেশে স্ত্রীলোকের প্রতি পাশবিক অত্যাচার অত্যধিক মাত্রায় বাড়িয়া চলিয়াছে। মফঃস্বলের ও সহরের এমন সংবাদপত্র অল্পই আছে, যাহাতে দুই-একটি নারী-নির্য্যাতনের সংবাদ না থাকে। গত ২০ জ্যৈষ্ঠ হইতে আজ ২০ আষাঢ় পর্য্যন্ত আমরা কোন্ কোন্ সংবাদপত্রে কতগুলি নারী-নির্য্যাতনের সংবাদ পাইয়াছি তাহা নিম্নে দেখাইলাম—

বৈকালী ৩টি; বন্দেমাতরম—৩টি; বঙ্গরত্ন—২টি; ২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ—২টি; বরিশাল-হিতৈষী—১টি; ঢাকা-প্রকাশ—১টি, আলোক—১টি; আনন্দবাজার পত্রিকা—৫টি; নীহার—১টি এবং বসুমতী—১টি। সঞ্জীবনীতেও এবিষয়ে অনেক সংবাদ বাহির হইয়াছে।

বাংলার সমস্ত সংবাদপত্র পাইলে হয়ত আরো বেশী সংবাদ পাওয়া যাইত। যাহা হউক, একমাসের মধ্যে একুশটি নির্য্যাতনের সংবাদ আমরা দিলাম। ইহাও কম ভয়াবহ ও শোচনীয় ব্যাপার নয়। নারীর মানসম্ভ্রম রক্ষা করা বাংলা দেশে ক্রমেই দুষ্কর হইয়া পড়িতেছে। দুর্ব্বৃত্ত লোকের প্রতাপ যেন ক্রমেই বাড়িতেছে। এইসব লোককে দমন করিবার জন্য নানারূপ বিধিব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। আবার স্ত্রীলোককে শিক্ষা না দিয়া সকল দিক্ হইতে দুর্ব্বল করিয়া রাখিলে আত্মরক্ষায় তাঁহারা যে কতটা অসমর্থ হইয়া পড়েন তাহাও অনেক স্থলে দেখা যায়। পুরুষের শিক্ষা-বিস্তার আমাদের দেশে এখনও ঘটে নাই; কিন্তু পুরুষের শিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েদের শিক্ষাও সমভাবে আমাদিগকে বিস্তার করিতে হইবে। আর দেশের শিক্ষিত ও সৎসাহসী লোকদিগকে নারীরক্ষা কল্পে নানাবিধ সমিতি ও অনুষ্ঠান গঠন করিতে হইবে, যাহাতে দুর্ব্বৃত্তগণের হস্ত হইতে মেয়েদের রক্ষা করিবার মত লোক গ্রামে গ্রামে কাজ করিতে পারেন। গত জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীতে বিবিধ প্রসঙ্গে (২৮২ পৃষ্ঠা) এবিষয়ে বিশদ আলোচনা আছে। এবিষয়ে একটি সুসংবাদ আছে—

নারীরক্ষা-সমিতি—

টাঙ্গাইলে একটি নারী-রক্ষা-সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই সমিতির কমিটিতে হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরাই আছেন।

—ঢাকা-প্রকাশ

বিধবা-বিবাহ প্রসার—

যে দেশে নারী-নির্য্যাতন এত বেশী এবং সে-দেশে নারীর প্রতি সমাজের অবিচারের অন্ত নাই, সে-দেশে নারীর প্রতি সুবিচারের দুই-একটি সংবাদও খুবই আনন্দের কারণ। বাল-বিধবার বিবাহ দেওয়া যে মহাপাতকের কাজ নয়, এই ভাব যে দেশে বিস্তৃত হইয়া কার্য্যে পরিণত হইতেছে তাহা সুখের বিষয়।

শিলচর বিধবা বিবাহ সমিতি

গত ১৩৩০ সালে এই সমিতির উদ্যোগে বেঙ্গল ও আসামে মোট ৮১টি বিধবা-বিবাহ হইয়াছে। তন্মধ্যে বৈদ্য একটি, ব্রাহ্মণ ৪টি, কায়স্থ ৭টি এবং ৬৯টি দাস।

মেদিনীপুরে বিধবা বিবাহ

মেদিনীপুরে গত ২৭।৫।২৪ তারিখে দুইটি বাল-বিধবার বিবাহ হইয়াছে। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

(১) মেদিনীপুর জেলার গাঙ্গারডিহি গ্রামে শ্রীযুক্ত ভূপতিচরণ ঘোষ একটি বাল-বিধবার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। কন্যার নাম শ্রীমতী পঙ্কমী দাসী, বয়স ১২ বৎসর, ৭বৎসর বয়সে বিধবা হয়। বরকন্যা উভয়ে সদ্‌গোপ-জাতীয়।

(২) ঐ জেলায় থাকুরদা গ্রামে শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ দত্ত একটি বাল-বিধবার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। কন্যার নাম শ্রীমতী সরোজিনী দাসী। বয়স ১৩ বৎসর, ৭ বৎসর বয়সে বিধবা হয়। বরকন্যা উভয়ে কায়স্থ জাতীয়।

(৩) গত ২৯।৫।২৪ তারিখে মেদিনীপুর জেলার আমলাকুচি গ্রামে আর একটি বাল-বিধবার বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। বরের নাম শ্রীযুক্ত মিহিরচন্দ্র রাণা। কন্যার নাম শ্রীমতী কিরণবালা দাসী। বয়স ১২ বৎসর, ৮ বৎসর বয়সে বিধবা হয়। বরকন্যা উভয়েই কর্ম্মকার-জাতীয়।

তিনটি বিবাহই হিন্দুমতে হইয়াছে। বিবাহস্থলে মেদিনীপুর বিধবা বিবাহ সমিতির সভ্য ও বহু ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। বর ও কন্যা-পক্ষের আত্মীয় কুটুম্বগণ আহারাদি করিয়া সামাজিকতা রক্ষা করিয়াছিলেন।

১৯২৩ সালের এপ্রিল মাসে মেদিনীপুরে বিধবা বিবাহ সমিতি স্থাপিত হয়। সমিতির উদ্যোগে ইতিমধ্যে ১৫টি বিধবার বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইল।

শ্রীভাগবৎচন্দ্র দাস,

সম্পাদক—বিধবা-বিবাহ-সমিতি, মেদিনীপুর।

—বঙ্গরত্ন

কুমিল্লায় বিধবা বিবাহ

"ত্রিপুরা হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতির" উদযোগে গত ৮ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহানুভূতি ও ঐকান্তিক উৎসাহে তাঁহারই নিজ ভবনে ত্রিপুরা বিষ্ণুপুর নিবাসী শ্রীমান্ মহিমচন্দ্র দের সহিত কালীকচ্ছ-নিবাসী ৺বিপিনচন্দ্র দের বিধবা কন্যা শ্রীমতী গিরিবালা দেবী শুভ বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। এই বিবাহে কুমিল্লার প্রায় ১৮ শত গণ্যমান্য ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। প্রায় দুই শতাধিক ভদ্রমহিলা উপস্থিত হইয়া স্ত্রীআচার প্রভৃতি মাঙ্গলিক কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। এই বিবাহে শ্রীকাইল নিবাসী কুমিল্লার স্বনামখ্যাত উকিল শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের দয়াশীলা পত্নী ৫ টাকা দান করিয়াছেন। স্বদেশ-হিতৈষী বিখ্যাত উকিল শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র দাস মহাশয় এবং অনেক ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক বিধবা বিবাহের সারবত্তা সকলকে বুঝাইয়া দেন।

প্রত্যেক নূতন সংস্কার বা নূতন কিছু প্রবর্ত্তিত হইতে গেলে এক-প্রকারে না এক-প্রকারে বাধা উপস্থিত হইবেই; এবং ইহাই পরিশেষে সংস্কারের সত্যতা এবং আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়া থাকে।

ব্রহ্মচর্য্য বৈধব্য-জীবনের আদর্শ, এই কথা কেহ অস্বীকার করে না। কিন্তু জোর করিয়া অসহায়া অবলাদিগের উপর ব্রহ্মচর্য্য চাপাইয়া দেওয়া নিষ্ঠুরতারই নামান্তর মাত্র। বালবিধবার ব্রহ্মচর্য্যের বেলায় যাঁহারা কথায় কথায় শাস্ত্রের দোহাই দিয়া থাকেন, তাঁহারাই আবার ষাট বৎসরের বিপত্নীক বৃদ্ধের নিমিত্ত যোড়শী ভার্য্যার ব্যবস্থায় মুক্তকণ্ঠ হইয়া থাকেন। এসকল ব্যাপারে তাঁহাদের যুক্তির বহর দেখিলে অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়। তথাকথিত সমাজপতিদের এইরূপ বিবেচনার ফলে ব্যভিচার, জাতিধর্ম্ম পরিত্যাগ ভ্রূণহত্যা, প্রভৃতি পাপ অবাধে সমাজে প্রশ্রয় পাইতেছে। চক্ষের উপর এইসকল পাপের অভিনয় হইয়া সমাজকে কলুষিত ও পাতিত করিতেছে। আর যখনই উহার প্রতীকারের চেষ্টা হইতে থাকে তখনই তথাকথিত সমাজপতিগণ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া গগন-পবন মুখরিত করিয়া তুলেন।

—ত্রিপুরা হিতৈষী

বিধবা বিবাহ :—শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র ঘোষ নামক একজন ভদ্রলোক চন্দ্রকোণা দলমদলের অষ্টাদশবর্ষীয়া এক বিধবার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। স্থানীয় বহু ব্রাহ্মণ এই শুভকার্য্যে সাহার্য্য করিয়াছিলেন। সত্বর আরও ২।১টি বিধবা বিবাহ হইবার সম্ভাবনা আছে।

—সত্যবাদী

কচুরী, পাটের সার—

কয়েক বৎসর গত হইল (১৯১৫ সালে) যখন কচুরী প্রথমতঃ নজরে আইসে তখন ইহার সারের গুণাগুণ বাহির করিবার জন্য ঢাকা ফার্মে অনেক পরীক্ষা করা হয়। রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে যে পচা কচুরীতে যবক্ষারজান ও সোরাজানের ভাগ অধিক ইহার গাছ পোড়াইয়া ক্ষার করিলে উহার মধ্যে সোরাজানের ভাগ অধিক পাওয়া যায়।

এইসকল পরীক্ষা দ্বারা বেশ জানা গিয়াছে যে কচুরী লাল মাটির পাটের উত্তম সার। পচা কচুরী ও গোবর সমান ভাগে জমিতে দিলে কচুরীই অধিক ফল দেয়।

কেবল লাল মাটি নহে, পলি মাটিতেও এইরূপ। ঢাকা জেলার বুড়ি-গঙ্গার পাড়ে চর দোলেশ্বরের মাটি পলিময় ইহাতে একইরকম চারিখণ্ড জমিতে পরীক্ষা করা হয়; উহার দুইখণ্ডে গোবর ও অপর দুইখণ্ডে সমান ভাগ কচুরীর সার দেওয়া হয়। গত বৎসরের পরীক্ষার ফল নিম্নে দেওয়া গেল :—

প্রতি একরে গড়ে ফলন গোবর সারে—২৭।৫ সের
ঐ পচা কচুরীর সারে—৩০।৫ সের

পচা কচুরীর সার দিয়া গোবর অপেক্ষা প্রতি একরে ৩/০ মণ অর্থাৎ প্রতি বিঘায় ১/০ মণ অধিক পাট পাওয়া গিয়াছে। ইহা দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে পচা কচুরীর সার গোবর অপেক্ষা ভাল। পূর্ব্ববঙ্গে অনেক স্থানে কৃষকেরা ইহা বুঝিয়াছে। তাহারা পাট ও ধানের সারের জন্য পচা কচুরী ও উহার ছাই অধিক-পরিমাণে ব্যবহার করিতেছে।

পশ্চিম বঙ্গে বারিন্দ ভূমিতে ধানের জমিতে কৃষকেরা কচুরীর সার দেয়; এই নিমিত্ত বর্ষার পূর্ব্বে তাহারা গাড়ী বোঝাই করিয়া দূর হইতে ধান খেত্রে কচুরী লইয়া যায় এবং বৃষ্টি হইলে জমি কাদা করিয়া উহাতে মিশাইয়া দেয়; ফলে তাহাদের ফসল অধিক জন্মে।

বোনা ধানের জমিতে ও শুক্না কচুরীর ছাইয়ের সার দেওয়া হয় এজন্য কৃষকেরা ধান রোপণের জন্য জমি কাদা করিবার সময় চাস দিয়া মাটির সহিত ইহা মিশাইয়া দেয়, ইহাতে ফলন পড়ে।

কচুরী পচাইয়া ভাল ফল পাইতে হইলে উহার গাছ উঠাইয়া প্রথমত দুইদিন রৌদ্রে শুকাইবে; পরে উহা এক জায়গায় গাদি দিবে; ইহাতে সহজেই উহা পচিয়া যাইবে। গোবরের ন্যায় কচুরী ও ভালমত পচিলে সার ভাল হয়। এইরূপ পচা কচুরীর সার দেখিতে পচা গোবরের গুঁড়ার মত।

কচুরীর ছাই তৈয়ার করিবার জন্য গাছগুলি ভালমত রৌদ্রে শুকাইবে; পরে একটি গর্ত্তের মধ্যে পোড়াইবে; ইহাতে ছাইয়ের কোনও লোক্সান হইবে না।

আখ কিম্বা খেজুরের রস জ্বাল দিবার সময় অন্য জ্বালানি কাঠের অভাবে শুক্না কচুরী জ্বালাইবে। ইহাতে গুড় জ্বাল দেওয়া ও ছাই করা উভয় কাজই হইবে।

রবার্ট এস ফিন্লো,
বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের অধ্যক্ষ
—ঢাকা গেজেট।

দান ও সদনুষ্ঠান—

লক্ষটাকা দান—শিলচরের বিখ্যাত ধনী বি, সি, গুপ্ত কো' শ্রীহট্ট কাছাড়ের জলকষ্ট নিবারণের জন্য একলক্ষ টাকা দান করিবেন প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

—মেদিনীপুর-হিতৈষী

সদনুষ্ঠান—তমলুক মহকুমার সুতাহাটার একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সুতাহাটার জমিদার শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার পণ্ডা মহাশয় মেদিনীপুর জেলাবোর্ডের হস্তে ৫০ বিঘা জমি প্রদান করিয়াছেন।

—নীহার

স্যার্ কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্তের দান—আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, স্যার্ কে জি গুপ্ত তাঁহার ঢাকা জেলার অন্তর্গত ভাটপাড়া গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনার্থ ঢাকা জেলা-বোর্ডের হস্তে ১৮০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। —ঢাকা-গেজেট,

দান।—বালিয়াকান্দী দরিদ্র-নারায়ণ সেবা-সমিতির জনৈক সেবক তাঁহার নিজের সমস্ত সম্পত্তি অন্য কোন নিকটাত্মীয় না থাকায় এই সেবা-সমিতিতে উইল করিয়া দিয়া দিয়াছেন। এই সেবকটি বালিয়াকান্দী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে এবৎসর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়াছিলেন। গত কয়েকমাস যাবৎ তিনি রোগশয্যাশায়ী ছিলেন এবং এই সেবা-সমিতিই তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছিল। সেবকটির নাম ৺সূর্য্যকুমার দত্ত। —সম্মিলনী

দান :—দাসপুর থানার কেলেগোছা-নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধানাথ মাইতি মহাশয় স্বীয় পত্নীর ইচ্ছানুসারে সোনাখালি গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন জন্য জেলাবোর্ডের হস্তে ৫০০০৲ টাকা প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত তিনি চিকিৎসালয়ের জন্য ভূমি ক্রয় ও গৃহনির্ম্মাণের ব্যয় ও বহন করিতে সম্মত আছেন।

—সত্যবাদী

স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা :—স্থানীয় স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য জেলা বোর্ড তমলুক লোকাল বোর্ডকে ৫০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এই অর্থে জঙ্গল কাটা নালা পুষ্করিণী প্রভৃতি পরিষ্কার, মেলায় জল সরবরাহ ইত্যাদি কার্য্য করা হইবে এবং ম্যাজিক লন্ঠন-যোগে সাধারণকে স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হইবে। —সত্যবাদী

শ্রীযুক্ত সরযূপ্রসাদ বেতানী মহাশয় তাঁহার তৃতীয় পুত্রের বিবাহোপলক্ষে গত ৮ই জ্যৈষ্ঠ নিম্নলিখিত স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নতিকল্পে এককালীন দান করিয়াছেন। ভগবান্ নবদম্পতীকে দীর্ঘায়ুযুক্ত করিয়া সুখে রাখুন, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

৺রামকৃষ্ণ সেবা-সমিতি ১০০৲, ঐ মিশন ১২৫৲, ৺রঘুনাথ জীউর ঠাকুরবাড়ী ১০০৲, আচারী মহারাজের বাটী ২৫৲, ধর্ম্মশালা ১১০৲, কুতুবপুর দুর্গাবাড়ী ৫০৲, হাঁসপাতাল ৫০৲, বি দে থিয়েটার হল ২৫৲, পুরাতন মালদহের মিউনিসিপ্যালিটীর অধীন পাঠশালা কয়টির জন্য ২৫৲, দুর্গাদেবী পাঠশালা, কুতুবপুর পাঠশালা, মকদুমপুর মিরের চক, পুড়াটুলী পাঠশালা, নৈশ-বিদ্যালয়, ফুলবাড়ী মক্তব, বাঁশবাড়ী মক্তব, মহাকালী পাঠশালা, জালালিয়া বালিকা বিদ্যালয় প্রত্যেকে ১৫৲ হিসাবে, বাচামারী পাঠশালা ১০৲, মুটু ক্ষ্যাপা বাবাজী ১৫৲, নবাবগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটীর অধীন পাঠশালা কয়টির জন্য ২৫৲, হিন্দী পাঠশালা ৫১৲, অভয়া চতুষ্পাঠী ১৫৲, মোট ৮৭৬৲ টাকা। —মালদহ সমাচার

হাওড়ায় মেডিক্যাল কলেজ—হাওড়ার জনৈক ভদ্রলোক তথায় একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের জন্য ৪ লক্ষ টাকা মূল্যের

সম্পত্তি দান করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধীন এম্-বি পর্য্যন্ত তথায় পড়াইবার ব্যবস্থা করা হইবে।

—হিন্দুরঞ্জিকা

চীনে রবীন্দ্রনাথ—

১২ই এপ্রিল তারিখে হংকংএ কবি সদলে পৌঁছলে অন্যান্য স্থানের মধ্যে সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করবার জন্য আমন্ত্রিত হন। আমাদের পূর্ব্বপরিচিত হর্নেল সাহেব এখন ওখানকার ভাইস্-চ্যান্সেলার। ২৩এ এপ্রিল তাঁরা পিকিংএ পৌছন। সিনানে তাঁকে প্রথমেই তাঁর বাণী শোনাতে হ'য়েচে ছাত্রমহলে—চার হাজার ছাত্র তা শোন্‌বার জন্যে হাজির হয়েছিল। চীনে সমারোহের সঙ্গে তাঁর জন্মোৎসব পালিত হ'য়েচে। ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্ তাঁকে পরিচ্ছদ উপহার দিয়েচেন আর চীনে তাঁর নূতন নামকরণ হ'য়েচে "চু-চান-তান"—যার মানে বজ্রগম্ভীর ভারত-প্রভাত।

সমস্ত স্থানেই কবীন্দ্র অভিনন্দনের উত্তর দিয়েছিলেন। কি চীন, কি বর্ম্মা সকল স্থানে সকল সম্প্রদায়ই বার বার করে' তাঁকে নিবেদন করেচে, তাবৎ এসিয়ার মহামানব তিনি—সকলরকমে এত বড় বিরাট্ ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ তারা আর পায়নি। চীনসম্প্রদায় বলেছে যে, তারা বিশ্বাস করে, তাদের দেশের অশান্ত অবস্থা তাঁর উপস্থিতিতে দূর হ'য়ে যাবে; সত্য সুন্দর ও সৎ আর কারুর ভিতর এমন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেনি।

—বিজলী

ইক্ষু চাষ ও গুড়—

বাঙ্গলার ১৯২৩-২৪ সালের ইক্ষুচাষের অবস্থা প্রথমে কতকটা ভাল থাকিলেও মধ্যে অনাবৃষ্টির জন্য খারাপ হইয়া যাওয়ায় শেষ ফল খুব আশাপ্রদ নহে। পূর্ব্ববঙ্গের ফসল সন্তোষজনক হইলেও উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গের ফসল আশানুরূপ হয় নাই। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এ-বৎসর ৭৩০০ একর বেশী জমিতে চাষ হইলেও উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ সাধারণ উৎপাদনের মাত্রার শতকরা ৮০ ভাগ মাত্র; এই হার গত বৎসরে ৭৯ ভাগ ছিল। অনুমান—এই বৎসরে উৎপন্ন গুড়ের পরিমাণ ২২৩০০০ টন হইবে, পূর্ব্ব বৎসরে ২১২৫০০ টন ছিল। এ-বৎসর খেজুরগুড় পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা ১২৬০০ টন কম।

—সম্মিলনী

শ্রীরামপুরে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন—

শ্রীযুক্ত বিভূতি মুখোপাধ্যায়-নামক জনৈক ভদ্রলোক শ্রীরামপুরে এক কালীপূজা করেন। এই পূজা উপলক্ষে তিনি চামার, মেথর প্রভৃতি অস্পৃশ্য জাতিদিগকে নিমন্ত্রণ করেন এবং উচ্চবংশীয় হিন্দু-দিগের অনুরূপ অধিকার তাহাদিগকে দেওয়া হয়।

—হিন্দুরঞ্জিকা

গৌড় রজক-সম্মিলনী—

বাঁকুড়া জেলায় ছাতারডি গ্রামে মল্লভূম, ধলভূম, সিংভূম, সাতভূম, সামন্তভূম, সুরভূম, সিকরভূম প্রভৃতি স্থানের রজকগণ গৌড় রজক-সম্মিলনী নামে একটি সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। সুরাপান নিবারণ, বিলাতী বস্ত্র বর্জ্জন, বিবাহে পণপ্রথার উচ্ছেদ প্রভৃতির পরিচালন-দ্বারা নিজেদের উন্নতিসাধন করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। (সারথি)

—আনন্দবাজার-পত্রিকা

বিদ্যাসাগর বাণী-ভবন—

নারী-শিক্ষা-সমিতি দ্বারা পরিচালিত হিন্দু বিধবাদিগের জন্য বিদ্যাসাগর বাণীভবনে এখনও কয়েকটি বৃত্তি খালি আছে। এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য কোন বেতন লওয়া হয় না। বৃত্তি হইতে থাকা এবং খাওয়ার খরচ নির্ব্বাহ হইয়া যায়। ১০৫নং আপার সারকুলার রোডে নারী-শিক্ষা-সমিতির সম্পাদিকার নিকট আবেদন-পত্র পাঠাইতে হইবে।

—সম্মিলনী

কলিকাতায় মাদক দ্রব্যের দোকান—

কলিকাতা সহরে বিলাতী মদের দোকান আছে ৯৬টি। দেশী মদের দোকান ৪৮, আফিমের দোকান ৬০, গাঁজা ৩৪, সিদ্ধি ১৩, চরশ ৩, তাড়ি ২৭। সর্ব্বশুদ্ধ ২৮১টি স্থানে সর্ব্বদা মাদক দ্রব্য বিক্রয় হইতেছে।

—সম্মিলনী

বাঙালীর সৎসাহস—

'অমৃতবাজার পত্রিকায়' একজন ভদ্রলোক লিখিতেছেন, গত ২৩শে জুন তিনি ঢাকা হইতে রওনা হইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌছেন। শিশুপুত্রটি তাঁহার কোলে ছিল, স্ত্রী পশ্চাতে আসিতে-ছিলেন। এমন সময় গোলমাল শুনিয়া পিছনে চাহিয়া দেখেন, একজন বাঙ্গালী-যুবক একটি ইউরোপীয়ানকে ধরিয়া বে-পরোয়া জুতা মারিতেছেন। ঘটনা কি জানিবার জন্য কৌতূহলী ভদ্রলোককে, তাঁহার স্ত্রী বলিলেন, সাহেবটা তাঁহার আঁচল ধরিয়া টানিয়াছিল। বাঙ্গালী-যুবকটির কবল হইতে পরিত্রাণ পাইয়া সাহেব উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল। স্বীয় স্ত্রীর মর্য্যাদারক্ষক যুবককে ভদ্রলোক ধন্যবাদ দিতে গিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। যুবক পরিচয় দিলেন না, কিন্তু তিনি অন্য লোকের নিকট জানিলেন, যুবকের নাম শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রভূষণ দত্ত, ইনি চট্টগ্রামে ডাক্তারি করেন।

—আনন্দবাজার-পত্রিকা

বাঙালীর কৃতিত্ব—

বোম্বাই সহরে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব

বোলপুর শান্তিনিকেতনের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র শ্রীমান্ ক্ষিতীশচন্দ্র রায়, বোম্বাই সহরের "সার জে জে স্কুল-অব্-আর্ট" হইতে ভাস্কর্য্য-বিদ্যার পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। স্কুলের অধ্যক্ষ গ্লাডষ্টোন্ সলোমন সাহেব শ্রীমান্ ক্ষিতীশচন্দ্রের খুব প্রশংসা করিয়াছেন।

—বন্দেমাতরম্

গুপ্ত

—

বিদেশ

ঋণ করিয়া কোনওপ্রকারে সমরের ব্যয়-সঙ্কুলান করাতে ফ্রান্সের জাতীয় ঋণের পরিমাণ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। ইংরেজ কিন্তু যুদ্ধের খরচ যোগাইবার জন্য প্রথম হইতেই অন্য উপায় স্মরণ লইয়াছিলেন। প্রজা-সাধারণ অসন্তুষ্ট হইলে মন্ত্রী-সভার ক্ষমতা কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে; সেজন্য কর-ভার বাড়াইয়া রাজস্বের আয় বাড়াইতে ফরাসী সরকার সাহস পান নাই। ইংরেজ-মন্ত্রীসভা কিন্তু প্রথম হইতেই শুল্ক ও করের পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়া রাজস্বের আয় প্রভূতপরিমাণে বাড়াইয়া লইয়াছিলেন। সেজন্য ফরাসী সাম্রাজ্যের ন্যায় ইংরেজ রাজস্বের জাতীয় ঋণ অত বাড়িয়া উঠে নাই। সুদের টাকা দিতে রাজস্বের অনেকটাই খরচ হইয়া যায়, তাই ফ্রান্স্ আপনার ঋণ শোধের জন্য জার্ম্মানীর নিকট হইতে যথাশীঘ্র সম্ভব ক্ষতি-পূরণ আদায়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জার্ম্মানীর ক্ষতি-পূরণের সামর্থ্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়াই অন্যায় জোর-

জবর-দস্তি আরম্ভ করিলেন। রুর্ দখল, জার্ম্মান্ ব্যবসায়ীর উপর অত্যাচার, জার্ম্মান্-শ্রমিকদিগের প্রতি নানারূপ জোর-জুলুম চলিতে লাগিল। ফ্রান্সের অসম্ভব, অসঙ্গত ও অত্যধিক দাবী—এত অত্যাচারেও জার্ম্মানী ক্ষতি-পূরণ করিতে পারিলেন না। ফ্রান্সের সকল চেষ্টাই নিরর্থক হইল। এদিকে ঋণদাতা বৈদেশিক শক্তিবর্গ ঋণশোধের জন্য ফ্রান্সকে তাগিদ দিতে আরম্ভ করিলেন। ফ্রান্সের শূন্য-প্রায় অর্থ-কোষে সুদ দিবার অর্থই জোগাড় ছিল না, সেক্ষেত্রে মূল ঋণের টাকা আসে কোথা হইতে? কাজেকাজেই বিশ্বের হাটে ফ্রান্সের অপযশ রটিল, ফ্রান্সের মুদ্রার মূল্য কমিতে লাগিল। আর্থিক বিপদে বিপর্য্যস্ত হইয়া ফ্রান্সের বিপন্ন জনসাধারণ এই বিপর্য্যয়ের জন্য ফ্রান্সের মন্ত্রীসভাকেই দায়ী মনে করিয়া তাঁহাদের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিলেন। তথাপি প্রধান মন্ত্রী পঁয়াকারে রুরনীতি পরিহার করিতে অসম্মত হইয়া আপনার পথেই চলিতে লাগিলেন। মন্ত্রীসভার যেসকল সভ্য পঁয়কারের কার্য্যের পূর্ণ সমর্থন করিতেন না, তাহাদিগকে সরাইয়া দিয়া পঁয়াকারে এক নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করিলেন। রুরনীতিকে যাঁহারা সমর্থন করেন, এমন সমস্ত লোককেই বাছিয়া বাছিয়া মন্ত্রীসভায় গ্রহণ করা হইল। Loucher হইলেন বাণিজ্য-সচিব, ক্ষতি-পূরণ কমিশনের ভূতপূর্ব্ব সভ্য, বার্ত্তাশাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিত Morsal হইলেন রাজস্ব-সচিব এবং Matin পত্রিকার সহকারী সম্পাদক Dr. Jouvenal হইলেন শিক্ষা-সচিব। জাতিসমূহের সংঘে Jouvenal রুরনীতির সমর্থন করিয়া ইতিপূর্ব্বেই যশস্বী হইয়াছিলেন। এইরূপে মন্ত্রীসভাকে পুনর্গঠিত করিয়া পঁয়াকারে ভাবিয়াছিলেন, যে, ফরাসীরাষ্ট্র-তন্ত্রের উপর আপনার প্রভাব আরও সুদৃঢ় করিলেন। কিন্তু এতগুলি বিচক্ষণ লোকের সহায়তা লাভ করিয়াও পঁয়াকারে আপনার প্রভাব অব্যাহত রাখিতে পারিলেন না, ক্রমেই তাঁহার শক্তি কমিয়া আসিতে লাগিল। পঁয়াকারের প্রভাব কমিয়া আসিতে দেখিয়া, সাম্যবাদীদল ফ্রান্সের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ-ভার তাঁহাদের হস্তে লইবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনৈতিক নির্ব্বাচনে শ্রমিকদল জয়যুক্ত হওয়াতে ফ্রান্সের শ্রমিক ও সাম্যবাদীদলের সাহস ও শক্তি বাড়িয়া গেল। পঁয়াকারে আপনার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী দেখিয়া, সাম্যবাদীদলের নেতা M. Herriotএর সহিত একটা রফা সম্ভবপর কি না তাহার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। Herriot কিন্তু সমস্ত ক্ষমতা সাম্যবাদীদিগের হস্তেই রাখিতে চাহেন। পঁয়াকারের এমনই দুর্ভাগ্য যে এই আসন্ন বিপদের মুখেই আবার বিশ্বের হাটে ফ্রান্সের প্রচলিত মুদ্রা ফ্রাঙ্কের দাম আরও পড়িয়া গেল। এদিকে ১লা জুন তারিখে সাম্যবাদী-দিগের বার্ষিক বৈঠক হইয়া গেল। সাম্যবাদীদলের সকল সম্প্রদায়ই Herriotএর নেতৃত্ব স্বীকার করাতে Herriotএর প্রভাব অসম্ভব-রূপে বাড়িয়া উঠিল। পঁয়াকারে-মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করিলেন। নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করিবার জন্য Herriotএর ডাক পড়িল। ফরাসীরাষ্ট্র তন্ত্রের সভাপতি মিলের্ঁা পদত্যাগ না করিলে Herriot প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। মিলের্ঁার রাষ্ট্রনৈতিক মতের সহিত যখন Herriotএর মতের মিল নাই, তখন মিলের্ঁার রাষ্ট্র-নায়কত্ব স্বীকার করা Herriot উচিত মনে করেন না। মন্ত্রীসভার পতনের সহিত রাষ্ট্রপতির পুনর্নির্ব্বাচন ব্যবস্থা কিন্তু ফ্রান্সের সংস্থিতির মধ্যে নাই। রাষ্ট্রপতির কার্য্যকাল ফুরাইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে পদত্যাগের যে দাবী Herriot জানাইয়াছেন, তাহা বিধি-বহির্ভূত বলিয়া মিলের্ঁা প্রথমে পদত্যাগ করিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু Herriot তাঁহাকে রাষ্ট্রপতি রাখিয়া মন্ত্রীসভা-গঠনে অস্বীকার করাতে মিলের্ঁা পঁয়াকারে মন্ত্রীসভার রাজস্ব-সচিব François Morsalকে মন্ত্রীসভা গঠনের ভার দিলেন। সাম্যবাদীদল ইহাতে আপত্তি তুলিয়া বলিলেন, যে, সভ্য-সংখ্যায় যে দল বলবান্ সেই দলের উপরই মন্ত্রীসভা গঠনের ভার দেওয়া ফ্রান্সের চিরাচরিত রীতি। Morsalএর নিয়োগ এই চিরন্তন বিধিকে লঙ্ঘন করিয়া হইতেছে; সাম্যবাদীদল প্রজার এই অধিকারকে নষ্ট হইতে দিতে পারেন না। জাতীয় সভার বৈঠকে সাম্যবাদীদল সেজন্য প্রস্তাব করিলেন, যে, প্রজার রাষ্ট্রীয় স্বত্বে হস্তক্ষেপ করিয়া Morsal মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়াতে এই মন্ত্রীসভাকে রাষ্ট্রীয় মহাসভা স্বীকার করেন না। চেম্বারের অধিবেশনে ১২৯ জন সভ্য প্রস্তাবের স্বপক্ষে ও ২১ জন বিপক্ষে ভোট দেওয়াতে Morsal মন্ত্রীসভার পতন হইল এবং মিলের্ঁা পদত্যাগ করিলেন। নূতন নির্ব্বাচনে রাষ্ট্রপতি হইবার জন্য প্রার্থী ছিলেন M. Painleve ও M. Doumergue. M. Doumergue নির্ব্বাচনে জয় লাভ করিয়া ফরাসী সাধারণতন্ত্রের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। Herriot জার্ম্মানীর সহিত বিরোধ মিটাইয়া ফেলিবার পক্ষপাতী; তাই তিনি ঘোষণা করিয়াছেন, যে ডয়েস সিদ্ধান্ত অনুসারে কার্য্য আরম্ভ হইলেই ফরাসী রুর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিবেন। ইংরেজদিগের সহিত যে মনোমালিন্যের সূত্রপাত পঁয়াকারে মন্ত্রীসভা করিয়া গিয়াছিলেন তাহা দূর করিয়া পুনরায় মিত্রতা বন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য Herriot ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য লণ্ডনে আগমন করেন। প্রকাশ যে ইঁহাদের আলোচনা-ফলে সমস্ত মনোমালিন্য দূর হইয়াছে। এই আলোচনা সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ এখনও জানা যাই। কাজে কাজেই এখনও রুরনীতি-সম্বন্ধে কোনও শেষ সিদ্ধান্তের খবর দেওয়া সম্ভবপর নহে।

ফ্রান্সের নূতন প্রধান মন্ত্রী M. Edouard Herriotএর নিবাস Lyons শহরে। ইহার বয়স এখন পঞ্চাশ বৎসর; Lyons শহরের Mayorরূপে ইনি পূর্ব্বে যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। Lyons প্রদর্শনীর ব্যবস্থার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া বৃহৎ অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন, সংগঠন ও পরিচালনে যে ইঁহার যথেষ্ট দক্ষতা আছে, তাহা প্রতিপন্ন করেন। ইঁহার কর্ম্মদক্ষতায় আকৃষ্ট হইয়া ভূতপূর্ব্ব প্রধান-মন্ত্রী M. Briand ইঁহাকে খাদ্য-সরবরাহ-সচিব নিযুক্ত করেন। Herriot অত্যন্ত শান্তিপ্রয়াসী এবং যুদ্ধবিগ্রহের প্রতি ইঁহার বিতৃষ্ণা আছে। ইঁহার মতে যুদ্ধে মিত্র-শক্তিবর্গের মধ্যে ইংলণ্ডের ক্ষতি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছে। যুদ্ধের ফলে ইংরেজের বাণিজ্য-প্রাধান্য লুপ্ত হইয়া পণ্যের হাটে মার্কিনের প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধে রাজ্যলাভও ইংরেজের ভাগ্যে বেশী ঘটে নাই। ফরাসীর বর্ত্তমান ঋণভার যদিও ইংরেজ অপেক্ষা অনেক বেশী, কিন্তু খনিজ-সম্পদে পূর্ণ রাজ্য লাভ করাতে ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ ইংরেজের অপেক্ষা অনেক উজ্জ্বল। বৈদেশিক শক্তিবর্গ ফ্রান্সকে যেঋণ প্রদান করিয়াছেন ফ্রান্সের সেই ঋণ পরিশোধ করিবার ক্ষমতার প্রতি আস্থা বাড়িলেই ব্যবসায় ক্ষেত্রে তাহার যে প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়িয়া উঠিবে, তাহাতে ফ্রান্সের সমস্ত ক্ষতি পুরিয়া যাইবে।

শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

স্বর্গীয় সরোজকান্ত মিত্র ঢাকা জেলায় বিক্রমপুরে শ্যামসিদ্ধি-গ্রামে জমিদার মিত্রবাবুদের বংশে বাঙ্গালা ১২৯৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম বাম্রীকান্ত মিত্র।

স্বর্গীয় সরোজকান্ত মিত্র

সরোজকান্ত ১৯১২ খৃঃ অব্দে ঢাকা কলেজ হইতে ইতিহাস অনার্স সহ বি-এ পাশ করিয়া কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে এম্-এ, এবং ইউনিভার্সিটিতে 'ল' পড়িতে থাকেন এম্-এ, ডিগ্রী লইবার পূর্ব্বেই প্রিলিমিনারী 'ল' পাশ করিয়া ১৯১৩ সালে তিনি বিলাত গমন করেন। সেখানে কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটির অন্তর্গত ইমানুয়েল্ কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া তিন বৎসরে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত ইতিহাস, ইক্নমিক্স্ ও আইন বিষয়ে তিনটি ট্রাইপস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিন বৎসরে এই তিনটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া অতীব পরিশ্রম সাধ্য। তৎপরে লণ্ডনে গ্রেজ ইন্ হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া ১৯১৭ সালে ভারতে প্রত্যাগমন করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টার হন। এবং সঙ্গে সঙ্গে সিটি-কলেজে ইক্নমিক্স্-এর অধ্যাপক এবং ইউনিভার্সিটি 'ল' কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯১০ খৃঃ অব্দে পুনঃপুনঃ দুরারোগ্য বাত-ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া ডাক্তার ইউনানের পরামর্শ-মতে ইনি কলিকাতা ছাড়িতে বাধ্য হন এবং যুক্ত-প্রদেশে বেরিলি কলেজে অস্থায়ী প্রিন্সিপালের পদ প্রাপ্ত হইয়া তথায় গমন করেন; বিলাত হইতে কিছুকাল পরে ইংরেজ প্রিন্সিপাল্ আসিলে ইনি সেখানে সহকারী প্রিন্সিপ্যাল্ এবং ইকনমিক্স্এর অধ্যাপক হইয়া কার্য্য করিতে থাকেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি আরও একবার ৬ মাসের জন্য প্রিন্সিপ্যাল হইয়াছিলেন। এই কয় বৎসরে যুক্তপ্রদেশের সুধী-সমাজে অনেক স্থানেই তিনি পরিচিত, হন। ইনি এলাহাবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের এসোসিয়েটেড্ কলেজ বোর্ডের এবং পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন-কমিটির সভ্য ছিলেন। ছাত্রেরা তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি-শ্রদ্ধা করিত। যুক্ত-প্রদেশের গভর্ণর স্যার্ হার্কোর্ট্ বাট্লার জন-সভায় ইঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

ইক্নমিক্স্ এবং আইন বিষয়ে ইঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। পারিবারিক জীবনে ইনি আদর্শ পুত্র, আদর্শ স্বামী, এবং আদর্শ পিতা, আদর্শ ভ্রাতা ছিলেন। পুনরায় কলিকাতায় আসিয়া ব্যারিষ্টারি করিবেন, ইহাই তাঁহার একান্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু ভগবান্ তাঁহার আশা পূর্ণ করিলেন না। গত ৬ই জুন মাত্র ৩৩ বৎসর বয়সে বৃদ্ধ জনক-জননী, স্ত্রী, দুইটি শিশু পুত্র, ভ্রাতা-ভগ্নী, আত্মীয়-পরিজন সকলকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া টাইফয়েড রোগে ইনি মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

শ্রী :—

[এই বিভাগে চিকিৎসা ও আইন-সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে যাঁহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বোত্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। যাঁহাদের নামপ্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাঁহারা লিখিয়া জানাইবেন। অনামা প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না। একটি প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের এক-পিঠে কালিতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিয়া পাঠাইলে তাহা প্রকাশ করা হইবে না। জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ করা সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত। যাহাতে সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্‌দর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত, যাহার মীমাংসায় বহু লোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতূহল বা সুবিধার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংসা পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দাজী না হইয়া যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রশ্ন এবং মীমাংসা দুয়েরই যাথার্থ্য সম্বন্ধে আমরা কোনরূপ অঙ্গীকার করিতে পারি না। কোন বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোন জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছাধীন—তাহার সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনরূপ কৈফিয়ৎ আমরা দিতে পারিব না। নূতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন করিয়া সংখ্যাগণনা আরম্ভ হয়। সুতরাং যাঁহারা মীমাংসা পাঠাইবেন, তাঁহারা কোন্ বৎসরের কত-সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন।]

জিজ্ঞাসা

(১০)

সৈনিকের পোষাক

হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বকালে সৈনিকের পোষাক কিরূপ ছিল? কোন-প্রকার uniform ছিল কি না?

গোলাম গফুর

(১১)

ধানের পোকা

কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে আকাশে মেঘ হইলে ধানের ছড়ার একপ্রকার পোকা জন্মে। ঐ পোকাগুলি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ধান কাটিয়া ফেলে। ফলে অনেক কৃষকের সর্ব্বনাশ হয়। যদি কেহ এই-প্রকার পোকা নিবারণের কোন সহজসাধ্য উপায় বলিয়া দিতে পারেন, তবে বাধিত হইব।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

(১২)

ষড়যন্ত্র শব্দের উৎপত্তি

ষড়যন্ত্র শব্দের অর্থ কি? সাধারণতঃ ষড়যন্ত্র শব্দে পরামর্শ বুঝায়। শব্দটির অর্থ ছয়টি যন্ত্র হওয়া উচিৎ। এই শব্দটি সংস্কৃত ভাষায় আছে কি না? কেহ ইহার বুৎপত্তিগত প্রকৃত অর্থ বলিয়া দিলে বাধিত হইব।

শ্রীরমেশচন্দ্র রায়

(১৩)

মহাব্বত খাঁ

মোগল সেনাপতি মহাব্বত খাঁকে একখানা বিশিষ্ট নাট্য-গ্রন্থে রাজপুত সগরসিংহের ধর্ম্মভ্রষ্ট পুত্ররূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। ইহার ঐতিহাসিক ভিত্তি কতটুকু?

এম্ আর চৌধুরী

(১৪)

ললাটেশ্বরী-মন্দির-সম্পর্কীয় ইতিবৃত্ত

বীরভূম জেলার অন্তর্গত নলহাটী একটি পীঠস্থান। নলহাটি ষ্টেশনের এক মাইল পশ্চিমে ললাটেশ্বরী-মন্দির-সংলগ্ন যে পাহাড় আছে, তাহার উপরিভাগে পশ্চিম প্রান্তে একটি অনুমান ৬ কাঠা পরিমিত সমকোণী সমতল ক্ষেত্র আছে; পাহাড়ের অন্য কোথাও এরূপ দেখা যায় না। এসম্বন্ধে নানাপ্রকার কিংবদন্তী আছে; কেহ বলেন—জগন্নাথদেবের মন্দির নির্ম্মাণার্থ এস্থানটি সমতল করা হইয়াছিল, কিন্তু কোন কারণবশতঃ মন্দির নির্ম্মাণ হয় নাই। আবার কেহ বলেন—বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে দুরন্ত বর্গীরা এস্থানে শিবির স্থাপন করিয়াছিল। জিজ্ঞাস্য এই যে, ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি সত্য, এবং এসম্বন্ধে কোনরূপ ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক তথ্য আছে কি?

শ্রীবিজয়েন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী
শ্রীনারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

—

মীমাংসা

(১০৭)

সৈয়র-উল্-মুতক্ষরীণের অনুবাদ

কলিকাতায় হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীটস্থিত R. Cambray & Co. সৈয়র-উল্-মুতক্ষরীনের ৪ খণ্ড ইংরেজি অনুবাদ অনেক দিন আগে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার মূল্য ৬৪৲ টাকা।

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী

(১৯৪)

শাহ সুজা

সুজা শাহ্‌জাহানের দ্বিতীয় ছেলে। তিনি সুখী লোক ছিলেন। তিনি যুদ্ধ-বিগ্রহ ভালবাসিতেন না—আমোদ-প্রমোদ করিয়া দিন কাটান; সাদা কথায় দুনিয়ার স্ফূর্ত্তি লুটিবার আগ্রহটা তাঁর খুবই ছিল; এবং ১৭ বৎসর কাল তিনি বাংলাদেশের জল-বায়ুর মধ্যে অবস্থান করিয়া নিতান্ত আলস্যপ্রিয়, দুর্ব্বল, এবং কর্ত্তব্য-কর্ম্মে বিমুখ হইয়া উঠেন।

তিনি শাসনকার্য্যে দক্ষ ছিলেন না, উপরওয়ালার এরূপ অপদার্থতার দরুন্ সুজার সৈন্যদলও একেবারে নিস্তেজ ও "বিলাসী বাবু" হইয়া উঠে। কাজেই, রাজপুত্র সুজা ৪১ বৎসর বয়সেই বার্দ্ধক্য লাভ করেন। শাহ্‌জাহানের যখন অসুখ, তখন সুজা সে-সময়কার বাংলার রাজধানী রাজমহলে ছিলেন। শাহ্‌জাহানের অসুখ—এই সংবাদ পাওয়া মাত্রই তিনি নিজকে 'ভারত-সম্রাট্' বলিয়া ঘোষণা করেন এবং নিজ নামের পিছনে কতকগুলি বিশেষণ লাগাইয়া, মুদ্রা ছাপাইতে থাকেন। ১৬৫৭ খৃঃ সুজা এই নাম ধারণ করেন—"আবুল ফায়াজ্ নাসিরুদ্দিন মহম্মদ, ৩য় তৈমুর, ২য় আলেক্‌জাণ্ডার, শাহ্ সুজা বাহাদুর গাজী।" দিল্লী দখল করিবার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ হইতে "নাওওড়া" নামক বিখ্যাত নৌ-বাহিনী সংগ্রহ করিয়া যুবরাজ সুজা ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের শেষে কাশীতে পৌছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা সুজার দিল্লী-অভিযানের খবর পাইয়া স্বীয় পুত্র সুলেমান্ শেখ্ এবং রাজা জয়সিংহকে বিপুল বাহিনীসহ কনিষ্ঠ ভাইয়ের বিরুদ্ধে পাঠাইয়া দিলেন। কাশীর ৫ মাইল উত্তর-পূর্ব্বদিকে বাহাদুরপুর নামক স্থানে সুজা যুদ্ধে হারিয়া যান (১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৬৫৮ খৃঃ)। এই যুদ্ধ উপলক্ষে সুজার ২ কোটি টাকা লোক্‌সান হয়। সুজা প্রথমতঃ পাট্‌না, তার পর মুঙ্গেরে পলায়ন করেন—সুলেমান্ শেখ এখানেও তাঁহাকে অনুসরণ করেন,—সুজা সুলেমানের সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হন (মে মাসের প্রথম ভাগ ১৬৫৮ খৃঃ)। অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের আওরঙ্গজীব নাম বিখ্যাত ইংরেজী গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে সুজার বিস্তৃত ইতিহাস আছে। কাজেই এস্থানে আলোচ্য বিষয় খুবই সংক্ষেপে লিখিয়া গেলাম।

১৬৫৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী সুজা আওরঙ্গজীব কর্ত্তৃক "খাজওয়াতে" সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হন। তিনি বাংলাদেশে ফিরিতে বাধ্য হন এবং নিজেকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ২ বৎসর আওরঙ্গজীবের বিরুদ্ধে চেষ্টা করেন। ভাগ্যলক্ষ্মী কিছুতেই প্রসন্না হইলেন না। হতভাগ্য সুজা ১৬৬০ খৃঃ ১২ই মে সপরিবারে আরাকানে পলায়ন করেন।

আরাকানবাসী 'মঘেরা' যে কিরূপ লোক—তাহা আর তখনকার দিনে অবিদিত ছিল না। পূর্ব্ব-বাংলা তাহাদের হস্তগত ছিল বলিলেই হয়। দস্যুতা, নরহত্যা, নিষ্ঠুরতা এবং নানাবিধ পৈশাচিক লীলায় 'মঘেরা' ছিল সকলের সেরা। সুজার তখনকার অবস্থা, "জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ" ইহার মধ্যস্থিত লোকের মত। একদিকে আওরঙ্গজীবের হাতে নিষ্ঠুরভাবে মৃত্যু অপেক্ষা করিতেছে অপর দিকে 'মঘদের' আশ্রয় লওয়া আর সাক্ষাৎ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা একই কথা। আওরঙ্গজীবের হাতে ধরা দেওয়ার চেয়ে তিনি 'মঘদিগের' আশ্রয় লওয়াটা ভাল মনে করিলেন। ৪১ বৎসর পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানে সুখে লালিত-পালিত হইয়া—ভাগ্যলক্ষ্মীর নিষ্ঠুর পরিবর্ত্তনে ভারত-সম্রাটের আদরের পুত্র, মাত্র ৪০ জন বিশ্বস্ত অনুচরসহ সপরিবারে জন্মভূমি এবং কর্ম্মভূমির নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। আরাকানে যাইয়া সুজা কি করিলেন এবিষয়ে ঐতিহাসিক কামু ও কাফি খাঁ নীরব। অনেকদিন পর এক সংবাদ আসে যে সুজা পারস্যদেশে চলিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার ছেলে বুলেন্দ আখ্‌তার ভারতবর্ষে উপস্থিত। এই সন্দেহে ১৬৬৯ খৃঃ একজনকে এলাহাবাদের নিকট গ্রেপ্তার করা হয়। ১৬৯৯ খৃঃ এবং ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে দুইজন লোক সুজা বলিয়া নিজকে জাহির করিতে থাকে। এসব নানা কারণে খুঁৎ-খুঁতে আওরঙ্গজীব বিষম মুস্কিলে পড়েন। তিনি মিরজুমলা এবং সায়েস্তা খাঁকে সুজার সংবাদ সংগ্রহ করিতে বলেন। কিন্তু তাঁহারা সুজার কোন খবরই পান নাই। য়ুরোপীয় ঐতিহাসিক বলেন, সুজা আরাকানে যাইয়া অনেক অনুচর প্রাপ্ত হন এবং অনুচরবৃন্দের সাহায্যে আরাকান-রাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করেন। একথা আরাকান-রাজ টের পান। সুজা পলায়ন করেন। কিন্তু 'মঘেরা' তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া হত্যা করে।

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী

(১৮৬)

অশোক

অশোকের আক্রমণ-কালে কলিঙ্গের রাজা কে ছিলেন, তাহা ঐতিহাসিকেরা উল্লেখ করেন না।

তখন ভারতে বৌদ্ধ-বিহার ছিল। রাধাকৃষ্ণ-নামক মন্ত্রীর সাহায্যে অশোক রাজা হইয়াছিলেন।

অশোকের দিগ্বিজয়ী সেনাপতির নাম পাওয়া যায় না। অশোকের তিন জন মহিষীর খবর মিলে—কারুবকি, অসন্ধিমিত্রা ও তিষ্যরক্ষিতা। অসন্ধিমিত্রা ও তিষ্যরক্ষিতার ঐতিহাসিক মূল্য নাই। ইতিহাস আলোচনাকারীরা কুণালের অস্তিত্বও স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা তিষ্যরক্ষিতা ও কুণাল-সম্বন্ধীয় ঘটনাকে গল্পের কোঠায় ফেলিয়া রাখিয়াছেন।

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী

(১৯৮)

প্রাচীন ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়

লাহোর হইতে পেশোয়ার যাইবার পথে সরাইকলা জংশন বলিয়া একটি রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। সরাইকলা রাওলপিণ্ডি হইতে ২০ মাইল উত্তরপশ্চিমে। এই সরাইকলা ঠিক পূর্ব্ব-উত্তর কোণেই প্রাচীন তক্ষশিলা নগরের লুপ্তোদ্ধার হইয়াছে। (See A Guide to Taxila Marshall, p. 1 19. ভারতবর্ষ, কার্ত্তিক—১৩২৬, ৬০৫ পৃঃ —৬১২ পৃঃ)

তক্ষশিলার উৎপত্তি ও নামকরণ-সম্বন্ধে রামায়ণে এখবরটুকুও পাওয়া যায়। শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার রাজত্বের শেষ দিক্ দিয়া শ্রীমান্ ভরতকে সিন্ধু-তীরবর্ত্তী পরম শোভন গন্ধর্ব্বদেশ জয় করিবার জন্য কিছু সৈন্যসহ প্রেরণ করিলেন। ভরতের মাতুল কেকয় রাজ যুধাজিৎ সসৈন্য ভরতের সঙ্গে, গন্ধর্ব্বদেশের নিকটবর্ত্তী এক স্থানে আসিয়া যোগদান করেন। তক্ষ ও পুষ্কল নামে ভরতের দুই পুত্র; তাঁহারাও এই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। গন্ধর্ব্বদের সৈন্য-সংখ্যা ছিল তিন কোটি। সাত রাত ধরিয়া তুমুল যুদ্ধ চলে। গন্ধর্ব্বেরা যুদ্ধে হারেন। ভরত গন্ধর্ব্ব-রাজ্যে দুই পুত্রের নামে দুইটি নগর স্থাপন করিলেন। তক্ষের নাম হইতে তক্ষশিলা এবং পুষ্কলের নাম হইতে নগরের নাম হইল পুষ্কলাবত।

(রামায়ণ উত্তরকাণ্ড; ১০০ সর্গ, ১০ ও ১১ শ্লোক
" " —১০১ সর্গ, ১০—১৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।)

মহাভারতে রাজা জনমেজয়ের সর্প-যজ্ঞ-সম্পর্কে তক্ষশিলার উল্লেখ আছে। বুদ্ধ জাতকগুলি হইতে জানা যায় যে, খৃঃ পূঃ ৪র্থ এবং ৫ম শতাব্দী হইতেই তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয় রসায়ন-শাস্ত্র, চিকিৎসা-শাস্ত্র,

সাহিত্য এবং বিজ্ঞান অনুশীলনের জন্য বিখ্যাত ছিল। তার পর আলেকজান্দারের ভারত অভিযান হইতে আরম্ভ করিয়া, তক্ষশিলার খাঁটি ইতিহাস আছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি কে স্থাপিত করেন, স্থির হয় নাই।

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী

(১৯৯)

"ঢোল সহরত"

শোহরাত্ অর্থ, ঘোষণা। কেশোয়ারী নামক বিখ্যাত অভিধানে ইহা আরবী শব্দ বলিয়া উল্লেখ আছে। সহরত এই শোহরাত্ শব্দেরই অপভ্রংশ। মোছলমান বাদ্শাহগণের সময়ে সহরত বা সহরত্ শব্দের ন্যায় দলিল, নকিব প্রভৃতি অনেক আরবী এবং পার্শী শব্দ বাংলাভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

মোহাম্মদ সেকেন্দর আলি

(২০০)

খদ্দরের পাড়ের রং

ফরিদপুর জেলায় মাদারীপুর-সহরে খদ্দরের পাড়ের রং করিবার কার্খানা আছে। আমি নিজে তথা হইতে পাড়ের রং করিয়া আনিয়াছি। প্রতি ১০ হাতী কাপড়ের এক পার্শ্বে ছাপ দিতে ৵০ আনা করিয়া লাগে। পাড়ের দুই পার্শ্বে ছাপ দিতে হইলে, ৶০ আনা করিয়া দিতে হয়।

খদ্দরের পাড়ের রং কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয়, নিম্নে উহার প্রক্রিয়া প্রদত্ত হইল।

জলের সহিত হরীতকী-চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া উহা সিদ্ধ করত: ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। উহার সহিত লোহার জল (গুড়-জলের সহিত গুলিয়া মাটির পাত্রে রাখিয়া তাহাতে লোহার চাদর বা পেরেক দিয়া ২।৩ সপ্তাহ রাখিলেই লোহার জল ব্যবহারের উপযোগী হইবে) মিশাইতে হইবে। এই প্রণালীতে হরিতকীর ক্বাথের সহিত লোহার জল ৫।৭ বার মিশ্রিত করিলেই পাকা কাল রং প্রস্তুত হইবে। এই পাকা কালী দ্বারা পাড় অনায়াসে ছোপান হইতে পারে।

নগেন্দ্রনাথ সেন-প্রণীত "বৃহৎ কেশরঞ্জন পঞ্জিকাতে" বিবিধ কালী প্রস্তুত করিবার প্রণালী লিখিত আছে। প্রশ্নকর্ত্তা উক্ত বহিখানি একবার দেখিয়া লইতে পারেন।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
শ্রীমতী কমলকামিনী দেবী

(২০৩)

পাটের পোকা

পাট-গাছে পোকা ধরিলে, কেরোসিনমিশ্রিত জল, চূনের জল, তামাক-ভিজান জল, হুঁকার বাসী জল, ফট্‌কিরী বা কর্পূরজল অথবা ভুঁতে-ভিজান জল—উহাদের যে-কোনটি জমিতে বা গাছের উপর ছিটাইয়া দিলে পোকা নির্ব্বংশ হইয়া যায়। এক সঙ্গে ২।৩-রকমের জল ছিটাইলে অধিক ফল দর্শে। ইহা পরীক্ষিত।

পাট-পাতায় তামাকের গুল-ভিজান জলের সহিত একটু কর্পূর ও সাবানের জল মিশ্রিত করিয়া লাগাইলে পোকার আর কোন ভয় থাকে না।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

(১)

দিল্লী

ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই, দিল্লীর প্রাচীন নাম—ইন্দ্রপ্রস্থ। খৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে "দিল্লী"—এই নাম সর্ব্ব-প্রথম ইতিহাসে দৃষ্ট হয়। দিল্লী নামের উৎপত্তি হইতে জানা যায় যে, মৌর্য্যবংশীয় শেষ নরপতি 'দিলু' স্বীয় নামানুসারেই এই নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে প্রথম অনঙ্গপাল ৭৩৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন অধিকার করিয়া নগর-সংস্কার পূর্ব্বক ঐ দিল্লীতেই রাজধানী স্থাপিত করেন। তৎপূর্ব্বে এখানে রাজা ধ্রুব রাজত্ব করেন। দিল্লীর লৌহস্তম্ভগাত্রে যে লিপি খোদিত রহিয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টই জানা যায় যে, ধ্রুবরাজাই উহা প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, অনঙ্গপাল দিল্লী-নগরীর প্রথম স্থাপনকর্ত্তা নহেন। তৎপূর্ব্বেই দিল্লী নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি দিল্লী নগরীর সংস্কার করিয়াছেন মাত্র। বর্ত্তমান দিল্লীর চতুর্দ্দিকে পুরাতন রাজধানী-সকলের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

মোগল-সম্রাট্ সাজাহানই বর্ত্তমান দিল্লীর প্রতিষ্ঠাতা; ইংরেজ-প্রতিষ্ঠিত নূতন রাজধানী সাজাহান-নির্ম্মিত দিল্লী-সহরের ৩।৪ ক্রোশ উত্তরে স্থাপিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, বর্ত্তমান দিল্লী ও অনঙ্গপালের দিল্লী এক নহে।

(৺রমেশচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ইতিহাস হইতে এই প্রশ্নের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি।)

শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

(২)

"আনারকুলী বাজার"

লাহোরে 'আনারকুলী' বাজার ও সেই নামে যে কবর আছে তাহার মূলে ঐতিহাসিক সত্য আছে। কথাটা 'আনারকুলী' নয়; আনার-কলি অর্থাৎ ডালিমের কলি। ইহা কোনও তন্বী রূপসীর রূপব্যঞ্জক সংজ্ঞা মাত্র। আকবর বাদসাহের জনৈক ইরানী বাঁদী তাঁহার প্রিয়পাত্রী ছিল, তাহার নাম শরীফউন্নীসা, পরে নাদীরা বেগম হয়। জনশ্রুতি যে যুবরাজ সেলিম তাহার সহিত হাসি-তামাসা করেন, সম্রাট্ তাহা জানিতে পারিয়া তাহাকে জীবন্তে সমাহিত করেন। সেলিম জাহাঙ্গীর বাদসাহ হইয়া ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে উক্ত কবরের উপরে একটি মর্ম্মর-প্রস্তরের সমাধি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহা আজও বিদ্যমান আছে। ইংরেজ-আমলে ইহা গির্জ্জাঘর-রূপে ব্যবহৃত হইত। এখন রাজদপ্তরখানা মহাফেজখানা হইয়াছে। এই সমাধির মধ্যস্থলে একখণ্ড শিলালিপিতে পারস্য ভাষায় একটি কবিতা উৎকীর্ণ ছিল; তাহার ইংরেজি অনুবাদ—

Ah! could I behold the face of my beloved once more I would give thanks unto my God unto the day of resurrection. (Punjab Gazetteer—Lahore District by G. C. Walker, I.C.S., P. 305.)

বিগত ১৯১৯ সালেও এই শিলালিপি স্থানান্তরিত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী এক গৃহ-কোণে রক্ষিত ছিল দেখিয়াছিলাম। লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি সাহাদাৎ হোসেন গত ১৩২৬ সালে শ্রাবণ মাসের পল্লী-বাণী মাসিক পত্রিকার "মরুর কুসুম" শীর্ষক এক কবিতায় এই ব্যর্থ প্রেমের করুণ কাহিনী কবি-কল্পনায় একটু পরিবর্ত্তিত আকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন যে কোনও ইতিহাসে বা ইউরোপীয়ের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে তিনি একথার নিদর্শন পান নাই। ভারতবর্ষে যখন যাহা ঘটিয়াছে, তাহার সব কথা ইউরোপীয়ের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে নাই; আবার তখন ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিবারও নিয়ম ছিল না; বিশেষ তাহা রংমহল-সম্বন্ধীয় কোনও ব্যাপার হইলে সম্রাটের খাস দরবারের লিপিকরের লিখিয়া না রাখাই

সম্ভবপর। কিন্তু স্থানীয় কিংবদন্তী একেবারে অবিশ্বাস করা চলে না। এক্ষেত্রে মৃতার কবর আজও বিদ্যমান রহিয়াছে।

মুর্শিদাবাদ নবাবের দরবারেও ফৈজি (Faizunnissa) নামে একটি সুন্দরী নর্ত্তকী নবাবের প্রিয়পাত্রী হয়। পরে ঐরূপ সন্দেহহেতু তাহাকেও জীবন্ত সমাহিত করা হয়। একথা কিন্তু কোনও ইতিহাসে বা ইউরোপীয়ের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে পাওয়া যায় না। সম্মানভাজন ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় মহাশয় তাঁহার পুস্তকে এই ঘটনার কথা উল্লেখ মাত্র করিয়াছেন। স্থানীয় লোক একথা জানে ও বিশ্বাস করে। এইসকল বিষয় বিশ্বাস করিবার জন্য সমুদ্রপারের প্রমাণ আবশ্যক করে না। সমুদ্রপারেও ভারত ইতিহাসের সব মাল-মসলা নাই, তাহা এদেশেই চারিদিকে প্রক্ষিপ্ত রহিয়াছে। আমরা যে ইতিহাস দেখিতে পাই তাহা ভারত ইতিহাসের কবন্ধ মাত্র।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী

জিজিয়া কর

জিজিয়া কর প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে নানামত দৃষ্ট হয়। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন,— "মহম্মদ তোগলকই জিজিয়া-কর প্রথম স্থাপন করেন।" তাঁহার মত সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। কারণ মহম্মদ তোগলকের অব্যবস্থিততায় রাজ্যের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসপাঠকমাত্রেই অবগত আছেন।

শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

কাজরী

শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ রায়

"জল-ছল্-ছল্ শাঙন-মেঘের আঁখির কোণ,
বল্ বল্ সই কিসের ব্যথায় ভরল মন!
ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ বর্ষাধারার মুখর গান
খুন্ ওলো খুন্ কর্‌লে আজিকে কর্‌লে প্রাণ!"
—"বর্ষাধারার বর্ষণে,—
অকারণেই উতল হ'লি, বল্‌বে কি লো সব জনে?"

"থাক্ থাক্ থাক্ কাজের কথা থাক্‌না সই;
শোন্ ওলো শোন্ মর্ম্ম-ব্যথা শোন্ না কই।
ঝর্ ঝর্ ঝর শাওন-ধারার ঝর্‌ছে জল;—
বল্ বল্ সই পরাণ কেন হয় উতল?"
—"শাঙন-মেঘের বর্ষণে,—
হঠাৎ যে তুই এমন হ'লি, বল্‌বে কি লো সব জনে?"

"দোল্ দোল্ দোল্ দোলায় পরাণ সমীরণ;
ভোল্ ভোল্ ভোল্ ঘরের কথা ভোল্ এখন।
শোন্ শোন্ ওই বিনয় করে' যায় সেধে—
সই ওলো সই সোহাগ-কাঁদন ওই কেঁদে'!"
—"মেঘলা হাওয়ার কম্পনে—
তুই যেন এ কেমন হ'লি, বল্‌বে কি লো সব জনে?"

"শন্ শন্ শন্ গাছের শাখায় হাওয়ার ভিড়;
শোন্ শোন্ সই পরাণ কেন রয় না থির।
ওই ওই সই ছিঁড়্‌ছে পাতা ফুলের সাজ,—
এই থাক্ থাক্ থাকল পড়ে' ঘরের কাজ।"
—"বাদল-বায়ুর নর্ত্তনে—
ঘর ছেড়ে তুই কোথায় যাবি, বল্‌বে কি লো সব জনে?"

"কড় কড় কড় গর্জ্জে' উঠে দেয়ার ডাক,—
মুহুর্মুহু কে দেয় প্রাণে কে দেয় হাঁক!
ঝম্ ঝম্ ঝম্ মেঘের নূপুর বাজ্‌ছে ওই;
যাই যাই যাই ঘর করা এই রইল সই।"
—"দেয়ার অধীর গর্জ্জনে—
ঘরের বধূ বাউরী হবি, বল্‌বে কি লো সব জনে?"

"রুন্ ঝুন্ রুন্ নূপুর-ধ্বনি বাজুক্ সই;
মেঘলা-সাঁঝে পরাণ-পিতম এল যে ওই!
ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ বর্ষণে আজ হই বিভোর;—
রিন্ ঝিন্ রিন্ শিউরে উঠুক্ অঙ্গ মোর!"
—"ভর্ সাঁঝে তুই ক্রন্দনে—
বুকের কাপড় ভিজিয়ে দিলি, লাজ তোর কি নেই মনে?" *

* পূর্ব্বে প্রকাশিত একটি কবিতার ভাব-অনুসরণে কাজরী নৃত্যের ছন্দে রচিত।
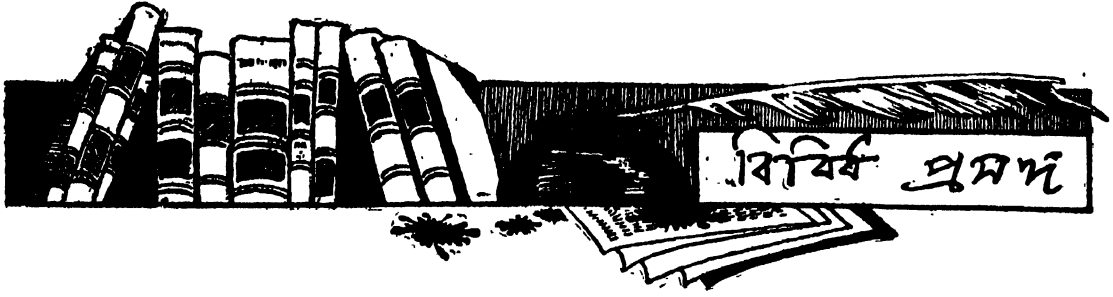
ভারতবর্ষ বৃহৎ কারাগার

"আমি জেলেই থাকি বা জেলের বাহিরেই থাকি, তাহাতে কিছু আসে যায় না—জেলে যাইতে আমি ভয় করি না; কারণ, আমাদের দেশ ভারতবর্ষ বৃহত্তর কারাগার মাত্র।" এইরূপ কথা অসহযোগ আন্দোলনের আরম্ভ হইতে অনেকের মুখে অনেক বার শুনা গিয়াছে।

ইহার মানে এই, যে, যে-দেশে জাতীয় স্বাধীনতা ও আত্মকর্ত্তৃত্ব নাই, যে দেশে গবর্ণমেণ্ট যখন ইচ্ছা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারেন, তাহা বৃহত্তর কারাগার মাত্র।

এরূপ কথাকে শুধু স্বাধীনতালিপ্সুর ভাবুকতা-প্রসূত আক্ষেপ বলা যায় না। ইহা শুধু আলঙ্কারিক কথাও নহে। সোজা কথার সোজা মানে করিলেও, এইরূপ উক্তি যে সত্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

জেলের কয়েদীরা কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে জেলের প্রাচীরের বাহিরে যাইতে পারে না। ভারতীয়েরাও ছাড়পত্র ব্যতিরেকে স্থলপথে বা জলপথে ভারতসাম্রাজ্যের সীমা ছাড়াইয়া যাইতে পারে না।

খিলাফৎ সম্বন্ধে ভারতীয় মুসলমানদের মত ও অভিলাষ তুরস্কের কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইবার জন্য একটি প্রতিনিধির দল গঠিত হইয়াছিল। এইরূপ একদল প্রতিনিধি আঙ্গোরা যায়, সম্ভবতঃ ইহা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট্ পছন্দ করেন না;—অন্ততঃ কোন কোন ব্যক্তির যাওয়া সম্বন্ধে যে তাঁহাদের আপত্তি আছে, ইহা নিশ্চিত। এইজন্য মৌলানা শৌকৎ আলী ভারত গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন, যে, কয়েক জন প্রতিনিধির পরিবর্ত্তে অন্য কয়েকজনকে লওয়া হইয়াছে, এবং এখন তিনি আশা করেন, যে, অতঃপর ভারত গবর্ণমেণ্টের আপত্তি হইবে না।

এই যে অনুমতি লইয়া তবে ভারতবর্ষের বাহিরে যাইতে পাওয়া, এই অবস্থাটি কয়েদীদের অবস্থার সমতুল্য। এইরূপ নিয়ম সমুদয় সভ্য স্বাধীন দেশে আছে কি না, জানি না। যদি না থাকে, তাহা হইলে কয়েদীর অবস্থাটা বিশেষ করিয়া ভারতীয়দেরই দুরবস্থা বলিতে হইবে। যদি থাকে, তাহা হইলে যে-যে দেশে আছে, তথাকার লোকেরা এই একটি বিষয়ে ভারতীয়দের মত বন্দীদশাপন্ন, সুতরাং ঠিক স্বাধীন নহে।

অবশ্য কোন দেশের গবর্ণমেণ্ট্ যদি নিশ্চিত জানেন, যে, তদ্দেশীয় কোন ব্যক্তি বিদ্রোহ বা বিপ্লবের ষড়যন্ত্র করিতে বিদেশে যাইতেছে, কিংবা ফৌজদারী আইন অনুসারে দণ্ডনীয় কোন গর্হিত কাজ করিতে তথায় যাইতেছে, তাহা হইলে তাহাকে যাইতে বাধা দেওয়ার অধিকার ঐ গবর্ণমেণ্টের থাকা উচিত মনে হয়। কিন্তু সাধারণভাবে এই নিয়মটি বিবৃত করিলেও, এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে অসীম ও অনির্দ্দিষ্ট অধিকার দেওয়া যাইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে সামান্য কোন-কিছু সন্দেহ হইলেই রাজপুরুষেরা মানুষের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবে, ইহা নিশ্চিত।

সম্প্রতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, এবং কাশীর বাবু শিবপ্রসাদ গুপ্ত ও তাঁহার পত্নী ইউরোপে যাইবার জন্য যথাক্রমে বাঙ্গলা গবর্ণ্মেণ্ট ও আগ্রা-অযোধ্যা গবর্ণ্মেণ্টের নিকট ছাড়পত্রের জন্য দরখাস্ত করেন। উক্ত মৌলানা সাহেব ও বাবু সাহেব স্বাস্থ্যলাভের জন্য বিদেশ যাইতেছেন বলিয়া প্রকাশ করেন। উভয় প্রাদেশিক

গবর্ণমেণ্ট্ দরখাস্ত নামঞ্জুর করিয়াছেন। আবেদকগণ অতঃপর এবিষয়ে বিলাতী পার্লেমেণ্টে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করান। উত্তরে অধ্যাপক রিচার্ডস্ হাউস্ অব্ কমন্সে জানাইয়াছেন, যে, ভারতসচিব লর্ড্ অলিভিয়ার উক্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টদ্বয়ের নির্দ্ধারণের উপর হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তুত নহেন। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট্ দুটি তাঁহাদের আদেশের কোন কারণ দেখান নাই, লর্ড অলিভিয়ারও দেখান নাই। যদি বাংলার ও আগ্রা-অযোধ্যার ব্যবস্থাপক সভা দুটিতে এবিষয়ে প্রশ্ন করা যায়, তাহা হইলেও, খুব সম্ভব, কারণটা জানিতে পারা যাইবে না। কিন্তু চেষ্টা করায় দোষ নাই।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ মুসলমান সমাজের, খিলাফৎ-কন্‌ফারেন্সের এবং কংগ্রেসের একজন মান্যগণ্য সভ্য। বাবু শিবপ্রসাদ গুপ্ত বারাণসীর হিন্দুস্তানী বৈশ্য সমাজের একজন অতি মানী ও ধনশালী ব্যক্তি। তিনি নিজ মাতৃভাষা হিন্দীর পরম অনুরাগী এবং পূর্ণমাত্রায় স্বাজাতিক অর্থাৎ ন্যাশন্যালিষ্ট। "আজ" নামক হিন্দী দৈনিক কাগজ তাঁহারই ব্যয়ে চলে। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ভারতে বিদ্রোহ বা বিপ্লব ঘটাইবার জন্য বিদেশে যাইতেছেন, এরূপ সন্দেহ করা যায় না। বাবু শিবপ্রসাদ গুপ্ত সস্ত্রীক, বিদ্রোহ ও বিপ্লব ঘটাইবার জন্য, বিদেশে যাইতেছেন, ইহাও সম্ভবপর নহে। ইহা সম্ভব, যে, ভারতের অনেক স্বাজাতিক মনে করেন, যে, যুদ্ধ না করিলে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা যাইবে না। কিন্তু ভারতবর্ষের নিজের একা, কিম্বা কোন শক্তিশালী জাতির সহযোগে, এখন যুদ্ধ করিবার সুযোগ আছে বা অদূর ভবিষ্যতে ঘটিতে পারে, ইহা কোন প্রাপ্তবয়স্ক, পৃথিবীর রাজনৈতিক-অবস্থাভিজ্ঞ এবং বুদ্ধিমান্ ভারতীয় বিশ্বাস করেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। আবেদকদ্বয় ইউরোপ যাইবার ছাড়পত্র চাহিয়াছিলেন। সে মহাদেশে এখন দুটি জাতি পরস্পরের সমকক্ষ—ফরাসী ও ইংরেজ। ফরাসীরা ইংরেজের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ। ইহা ঠিক্ বটে, যে, যখনই কোন জাতির স্বার্থে আঘাত পড়ে, তখনই তাহারা সন্ধি অগ্রাহ্য করে। এবং ইংরেজ ও ফরাসীর বন্ধুতা অপেক্ষা শত্রুতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাই অধিকতর ইতিহাসপ্রসিদ্ধ, ইহাও ঠিক্। কিন্তু আমাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া ফরাসীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়িবে, এ আশা বাতুল ভিন্ন কেহ বিশ্বাস করিতে পারে না। যদি লড়িবার ইচ্ছা করে, তাহা হইলেও তাহারা আমাদের কোন সাহায্য করিতে পারিবে না। কারণ, স্থলে ইংরেজ অপেক্ষা ফরাসী প্রবল বা অন্ততঃ ইংরেজদের সমকক্ষ হইলেও জলে ইংরেজ প্রবল। কিন্তু সমুদ্র অতিক্রম করিয়া না আসিলে ইউরোপীয় কোন জাতি আমাদের সাহায্য করিতে পারিবে না। ইউরোপের অন্য কোন জাতির, যদিই বা ইচ্ছা হয়, তাহা হইলেও একা একা ইংরেজের সঙ্গে লড়িবার সাধ্য নাই। অনেকগুলা জাতি একজোট হইয়া আমাদের পক্ষ অবলম্বন-পূর্ব্বক ইংরেজদিগকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দিবে, এবং তাহার পর আমাদিগকে নিজেদের পদানত না করিয়া স্বাধীন করিয়া দিয়া চলিয়া যাইবে, এরূপ "সাত্ত্বিক" ও নিষ্কাম স্বভাব কোন জাতির নাই।

আর-একটা কথা এখানে বিবেচ্য। পৃথিবীর যে-যে জাতি অন্য কোন জাতির সাহায্যে স্বাধীন হইয়াছে বা স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছে, স্বাধীনতা-সমরে তাহাদিগকে নিজেই প্রধান কর্ম্মী হইতে হইয়াছে, অন্যেরা কেবল সহায় হইয়াছে মাত্র। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রসমূহ স্বাধীনতার জন্য ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল, ফরাসীরা তাহাদের সাহায্য করিয়াছিল; গত শতাব্দীতে গ্রীকরা তুর্কদের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিবার জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে লড়িয়াছিল, ইংরেজরা তাহাদের সাহায্য করিয়াছিল; বর্ত্তমান সময়ে তুর্করা স্বাধীনতা ও স্বদেশ-রক্ষার জন্য লড়িয়াছে, ফরাসীরা তাহাতে তাহাদের সহায় ছিল। আমরা যদি অন্য কোন জাতির সাহায্যে যুদ্ধ করিয়া ইংরেজদিগকে তাড়াইয়া দিতে চাই, তাহা হইলে যুদ্ধটা প্রধানতঃ আমাদিগকেই করিতে হইবে। তাহার মত নেতা, সৈন্যদল, ঐক্য, জলস্থলআকাশের রণ-শিক্ষা, অস্ত্র-শস্ত্র, সরঞ্জাম, প্রভৃতি আমাদের কোথায়?

অতএব ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, যে, কোন বুদ্ধিমান্ ও প্রাপ্তবয়স্ক ভারতীয় স্বাজাতিক ষড়যন্ত্র করিবার জন্য বিদেশে যাইবেন না। ইউরোপে কেন

যাইবেন না, তাহা আমরা দেখাইয়াছি। আমেরিকা যাইবেন না কেন, তাহাও সহজবোধ্য। আমেরিকা আমাদের এমন বন্ধু, যে, যে-সব ভারতীয় আমেরিকার পৌর অধিকার পাইয়াছিলেন তাঁহাদের সে-অধিকার আমেরিকার লোকেরা নাকচ করিয়া দিতেছেন, এবং ভারতীয়েরা যাহাতে আমেরিকা যাইতেই না পারে, তাহার উপায় অবলম্বন করিয়াছেন—কেবল অনেক বাঁধাবাঁধির মধ্যে গুটিকতক ছাত্র যাইতে পারিবে মাত্র। জাপানীরা ত নিজেদের বিপদ্ এবং আভ্যন্তরিক ও বৈদেশিক সমস্যাসকল লইয়া বিব্রত। সেখানেও ভারতীয়েরা ষড়যন্ত্র করিবার উদ্দেশ্যে যাইতে পারেন না।

ফৌজদারী আইনে দণ্ডনীয় গর্হিত কাজ করিবার জন্য বিস্তর টাকা খরচ করিয়া সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া মানুষ—বিশেষতঃ প্রৌঢ় শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মানুষ —একা বা সস্ত্রীক যায় না।

অতএব, যে-সব ভারতীয় বিচারাধীন বা জামিনে খালাস নাই বা যাহাদের বিরুদ্ধে প্রকাশযোগ্য স্পষ্ট প্রমাণ নাই, চাহিবা মাত্রই তাহাদিগকে ছাড়পত্র দেওয়া উচিত।

ইহা ঠিক, যে, ভারতীয়েরা বিদেশে গেলেই এদেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা এবং ইংরেজদের কার্য্যকলাপ তাহাদের লেখায় ও বক্তৃতায়, এবং, তাহারা লেখক ও বক্তা না হইলে, তাহাদের সাধারণ কথাবার্ত্তায় প্রকাশ হইয়া পড়ে। তাহাতে বিদেশীরা জানিতে পারে, যে, ইংরেজরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নিজেদের যেরূপ ছবি আঁকে তাহারা তত ভাল নহে, ভারতের সুখসৌভাগ্যের যে ছবি আঁকে ভারতের লোকেরা তত সুখী সমৃদ্ধ নহে, এবং আমাদিগকে যত অসভ্য ও কুচরিত্র বলিয়া বর্ণনা করে, আমরা তত নিকৃষ্ট নহি। তাহাদের সম্বন্ধে এবং ভারতবর্ষের সম্বন্ধে সত্য কথা জানা পড়িবার ভয় ইংরেজদের আছে।

কিন্তু কয়েকজন ভারতীয়ের বিদেশযাত্রা বন্ধ করিতে পারিলেই কি সত্যকথাটা চাপা থাকিবে? থাকিবে না। ছাড়পত্র দেওয়া-সম্বন্ধে কড়া নিয়ম এবং ভারতীয় সংবাদ-পত্রসকলের উপর কঠোর রাজদ্রোহী ও ইংরেজবিদ্বেষ বিষয়ক আইনের প্রয়োগ সত্ত্বেও অনেক সত্য কথা নানা দেশে প্রকাশ পাইয়াছে, ক্রমাগত প্রকাশ পাইতেছে, এবং ভবিষ্যতে আরও প্রকাশ পাইবে। সত্য চাপা দিয়া রাখিবার শক্তি ইংরেজের নাই, কোন জাতির নাই, কোন জাতিসংঘের নাই।

বিদেশগামী এরূপ বিস্তর ভারতীয় আছেন, যাঁহারা ভারতে কোন রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত যুক্ত নহেন অথচ মতে বা অভিলাষে চরমপন্থী। ইংরেজের বিশ্বাস-ভাজন লোকদের মধ্যে, সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে, এরূপ লোক আছেন।

গবর্ণমেণ্ট যে উদ্দেশ্যে ছাড়পত্র সম্বন্ধে কড়া নিয়ম ও অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা সিদ্ধ হয় নাই, হইতে পারে না; লাভের মধ্যে কেবল এই খ্যাতি রটিতেছে, যে, ভারতবর্ষ কারাগার, এবং কারাধ্যক্ষ ইংরেজের অনুমতি ভিন্ন বন্দী ভারতীয়দের কোথাও যাইবার জো নাই। কারাগারের এই প্রাচীর ভাঙিবার চেষ্টা করা, ভাঙিয়া ফেলা সম্পূর্ণ বৈধ, না-ভাঙাটাই অধর্ম্ম এবং মানুষের অনুচিত।

—

আকাশপথে ভ্রমণ

ভারতবর্ষে ইংরেজ, মার্কিন্, পোর্ত্তুগীজ ও ফরাসী বিমান-নাবিকদের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আগমনের সংবাদ খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে। অন্যান্য দেশেও আকাশপথে ভ্রমণের নানা-প্রকার প্রতিযোগিতা চলিতেছে। ভারতীয় কোন ব্যক্তির কিন্তু এরূপ সখ্ দেখা যাইতেছে না। ইহা অবশ্য গরীবের সাধ্যের অতীত সখ্। কিন্তু ভারতের অনেক ধনী ত ঘোড়দৌড়ের অনেক ঘোড়া রাখেন; তাহাতে বিস্তর খরচ হয়, এবং তাঁহারা নিজে সে-সব ঘোড়ায় চড়িয়া বাজী জিতিবার চেষ্টা করেন না। বেতনভোগী সওয়ারেরা সে-কাজ করে। তেমনি, তাঁহাদের কেহ কেহ আকাশভ্রমণে ভারতীয় সাহসী ও বলবান্ যুবকদিগকে উৎসাহ দিবার সখ পোষণ করুন না? ঘোড়দৌড়ের জুয়াখেলায় যে নৈতিক অবনতি হয়, এবং তাহাতে বাজী রাখিয়া যে অনেক গরীব লোকেরাও

সর্ব্বস্বান্ত হয়, এই সখের সেরূপ কোন অনিষ্টকারিতা নাই। অথচ ইহাতে পৌরুষ-বৃদ্ধির খুবই সম্ভাবনা আছে।

বহুসংখ্যক ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া, আস্তাবল, সহিস্, সওয়ার রাখিবার খরচ অপেক্ষা ইহার খরচ বেশী হইবে না। দুঃখের বিষয় ভারতীয় ধনীদের সখ অনেক সময়ে এ-প্রকারের যে যাহাতে দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক অবনতিই হয়। ভারতীয় যুবকেরা যে একাজে অসমর্থ, তাহা নহে। ব্যারিষ্টার মিঃ প্যারীলাল রায়ের পুত্র শ্রীমান্ ইন্দ্রলাল রায় গত মহাযুদ্ধে আকাশযোদ্ধৃদলে ছিলেন, এবং অনেক জার্ম্যান্ আকাশযানকে তিনি ভূপাতিত করেন। যুদ্ধে তাঁহার প্রাণ যায়।

—

গৌরীশঙ্কর জয়ের চেষ্টা

হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ চূড়া গৌরীশঙ্করকে ইংরেজরা এভারেষ্ট্ নাম দিয়াছেন। উহা সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ২৯০০০ ফুটেরও অধিক উচ্চ। পৃথিবীর মধ্যেও ইহা অপেক্ষা উচ্চ পর্ব্বতশিখর নাই। ইহা আরোহণ করিবার চেষ্টা বর্ত্তমান বৎসরেও হইয়াছিল। কিন্তু এবারেও মানুষের পরাজয় ও গৌরীশঙ্করের জয় হইয়াছে। এবার ম্যালোরী এবং আর্ভিন্-নামক দুইজন ইংরেজ ২৮০০০ ফুট উঠিয়াছিলেন, তাহার পর আর তাঁহাদের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তাঁহাদের একজন সঙ্গী কিছু নীচে থাকিয়া যন্ত্রের সাহায্যে তাঁহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিলেন। তাঁহার মত এই যে, তাঁহারা সর্ব্বোচ্চ স্থানে উঠিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পর আর দিনের আলো না-থাকায়, নামিতে পারেন নাই। তখন হয় তাঁহারা ঝড়ে কোথাও পড়িয়া যান এবং তুষার-চাপা পড়িয়া প্রাণ হারান, কিংবা মানসিক ও শারীরিক অবসাদে এবং প্রচণ্ড শীতজনিত আড়ষ্টতা ও জড়তার আবেশে নিদ্রিত হইয়া পড়েন, ও সেই অবস্থাতেই তাঁহাদের মৃত্যু হয়।

এই দুইজন বীর ইংরেজের মধ্যে আর্ভিনের বয়স মোটে ২১ বৎসর ছিল।

সহজেই মনে হইতে পারে, এরূপ করিয়া প্রাণ দিয়া লাভ কি? কিন্তু মানুষের মধ্যে একটা প্রবৃত্তি, একটা প্রেরণা আছে, যাহা তাহাকে সর্ব্বপ্রকার বাধা-বিঘ্নের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত করে। যাহা কেহ এখনও জানিতে পারে নাই তাহা জানিব, যে-দেশ এখনও অজ্ঞাত তাহা আবিষ্কার করিব, যে তথ্য ও নিয়ম এখনও অজ্ঞাত তাহা আবিষ্কার করিব, এপর্য্যন্ত যাহা অসাধ্য বা দুঃসাধ্য বিবেচিত হইয়া আসিতেছে, তাহা সাধন করিব,—মানুষের পৌরুষ তাহাকে এই প্রবৃত্তি দিতে থাকে। ইহার প্রভাবে লাভালাভের কথা তাহার মনে থাকে না। অসাধ্যসাধন বা দুঃসাধ্যসাধন হইয়া গেলে, ভবিষ্যতে হয়ত তাহা হইতে মানুষের লাভ হয়, কিন্তু যাহারা প্রথমে কৃতিত্ব প্রদর্শন করে, তাহারা লাভের আশায় করে না। এখন আমরা শুনিতেছি বটে, যে, উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুতে ভূগর্ভে অনেক মূল্যবান্ খনিজ আছে, এবং ভবিষ্যতে হয়ত ঐসকল ভূখণ্ডে মানুষ বাস করিবে। কিন্তু যাঁহারা সুমেরু ও কুমেরুতে পৌঁছিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং শেষে যাঁহাদের চেষ্টা সফল হইয়াছিল, তাঁহারা ধনরত্নের লোভে তথায় যান নাই। তাঁহারা অজ্ঞাতের মুখোস্ খুলিবার দুর্দ্দমনীয় কৌতূহল নিবৃত্ত করিবার জন্য, জ্ঞান-পিপাসা মিটাইবার জন্য গিয়াছিলেন। পৌরুষের তাড়নায় তাঁহারা অজেয়কে, দুর্জ্জয়কে জয় করিতে বাহির হইয়াছিলেন। আকাশে উড়িবার চেষ্টাও এই-প্রকারে আরব্ধ হয়। কিন্তু সেইসকল চেষ্টা এখন কাজে লাগিতেছে।

অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কারে এই-জাতীয় সাহস ও পৌরুষের প্রয়োজন হয় না; কিন্তু ক্ষতিলাভের গণনা না করিয়া অজ্ঞাতকে জানিবার, অন্ধকারের রাজ্যে আলোকের পতাকা গাড়িবার, সত্যের সন্ধানে প্রাণপণ করিবার প্রবৃত্তি এরূপ কার্য্যের মূলে বিদ্যমান থাকে।

লাভালাভের কথা না ভাবিয়া শুধু সাহসের জন্যই সাহসের, পৌরুষের জন্যই পৌরুষের কাজ করা যৌবনের ধর্ম্ম। ব্যক্তির পক্ষে যাহা সত্য, জাতির পক্ষেও তাহা সত্য। বার্দ্ধক্যগ্রস্ত জাতি সাহসের কাজ করে না; যৌবনধর্ম্মী জাতি তাহা করে। পাশ্চাত্য জাতিসকলের প্রবৃত্তি ও তাহাদের সভ্যতার প্রকৃতি তাহাদিগকে

মারামারি কাটাকাটির মধ্যে লইয়া গিয়াছে বটে; কিন্তু তাহারা জরাগ্রস্ত নহে। তাহারা শক্তিতে ভরপুর। তাহাদের সভ্যতার ও প্রবৃত্তির মুখ প্রকৃত সাত্ত্বিকতার দিকে যখন ফিরিবে, তখন তাহারা জরা ও অবসাদগ্রস্ত ভারতীয় জাতিকে সাত্ত্বিকতাতে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইবে। জড়ভাব, অপৌরুষ, নির্জ্জীবতা সাত্ত্বিকতা নহে; উহা তামসিকতারই রূপান্তর।

ব্যক্তিতে ও জাতিতে প্রভেদ এই, যে, ব্যক্তির যৌবন একবার অতীত হইলে আর ফিরিয়া আসে না; কিন্তু যে জাতিকে আজ জরাগ্রস্ত ও মুমূর্ষু মনে হইতেছে, তাহা আবার নবযৌবন ও নবজীবন লাভ করিতে পারে। এই নবযৌবন ও নবজীবন লাভ মানুষের সাধ্যায়ত্ত। ইহা পাইবার চেষ্টা আমাদিগকে বিধিমত করিতে হইবে।

গৌরীশঙ্করের চূড়ায় উঠিতে গিয়া বার-বার অকৃতকার্য্য হইয়াও ইংরেজ জেদ ছাড়িতেছেন না। এবারেও তাঁহারা ভগ্নোৎসাহ হন নাই। তাঁহাদের রাজকীয় ভৌগোলিক সমিতির (রয়্যাল্ জিওগ্রাফিক্যাল্ সোসাইটীর) সভাপতি স্যার্ ফ্রান্সিস্ ইয়াংহাজ্‌ব্যাণ্ড্ এ-বিষয়ে টাইম্‌সে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "এভারেষ্ট্ (গৌরীশঙ্কর) খুব দৃঢ়তার সহিত নানা ভীষণ অস্ত্র-সহকারে যুদ্ধ করে। অলঙ্ঘ্য পাষাণরাশিতে তাহাকে ঘিরিয়া আছে। সে তুষারের পাহাড়। ঝড় ও হিমানী তাহার সাহায্য করে। কিন্তু সে অন্ধের মত যুদ্ধ করে। অভিজ্ঞতা দ্বারা শিক্ষালাভ তাহার হয় না, এবং তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর চেষ্টা, আয়োজন, সাহস, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যেমন বাড়িতে থাকে, তাহার আয়োজন, অস্ত্র, দৃঢ়তা অমনি সেই সঙ্গে-সঙ্গে বাড়িতে থাকে না। অন্য দিকে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী মানুষের চেষ্টা, আয়োজন, সাহস, প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা বাড়িয়া চলিতেছে। নূতন নূতন বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিবার মত প্রতিজ্ঞার বল, বুদ্ধি ও কর্ম্মিষ্ঠতা মানুষের আছে। পর্ব্বতে ও মানুষে এই মল্লযুদ্ধে মানুষকে পাহাড় যতবার আছাড় দিতেছে, মানুষ, ভয় না পাইয়া, না দমিয়া, ততবার নূতন উদ্যমে ও তেজস্বিতা-সহকারে তাল ঠুকিয়া দাঁড়াইতেছে। সুতরাং গৌরীশঙ্করের অদৃষ্টে পরাজয় নিশ্চিত। মানুষ নির্ম্মমভাবে তাহার দিকে অভিযান করিয়া চলিয়াছে। ৪০ বৎসর আগে মানুষ খুব বিনয়নম্র ছিল, ২১০০০ ফুটের বেশী উঁচুতে উঠিবার কল্পনার আস্পর্দ্ধা তাহার হয় নাই। ২০ বৎসর আগে সে ২৩০০০ ফুট উঠিয়াছিল। ১৫ বৎসর আগে প্রায় ২৫০০০ ফুট পর্য্যন্ত চড়ে। দুই বৎসর পূর্ব্বে ২৭০০০ ফুট আরোহণ করে এবং গত মাসে ২৮০০০ এর কম নহে। পাটীগণিতই দেখাইতেছে, যে, ২৯০০০ ফুট আরোহণ অতঃপর আসিতেছে এবং গৌরীশঙ্কর পরাজিত হইবে।"

ভারতীয় লোকদের মধ্যে সাত জন ভারবাহী লোক গতবারের চেষ্টায় তখনকার সর্ব্বোচ্চ স্থানে গিয়া তুষার-স্তূপ পতনে মারা যায়। এবারেও মান বাহাদুর নামক একজন সর্দ্দার ভারবাহী প্রায় ২৮০০০ ফুটের নিকটে মারা পড়িয়াছে। সুতরাং গৌরীশঙ্করের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় উঠিবার মত শক্ত-সমর্থ মানুষ ভারতীয়দের মধ্যে আছে, সাহসও আছে। কিন্তু মনের দৌড় নাই, যৌবনসুলভ অসমসাহসের কাজ করিবার প্রবৃত্তি নাই, সুশৃঙ্খল আয়োজন নাই, বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামের জ্ঞান নাই, এবং এরূপ বিষয়ে ইংরেজ বা অন্য কোন ইউরোপীয় যে-যেপ্রকারের সাহায্য গবর্ণমেণ্টের নিকট পাইয়াছে, তাহা ভারতীয় কেহ সহজে পাইবে না। মোটেই পাইবে কি না, তাহা চেষ্টা না করিলে বলা যায় না। চেষ্টা কেহ ত করেন নাই।

—

ওলিম্পিক্ ক্রীড়ায় ভারতবর্ষ

ওলিম্পিক্ ক্রীড়ায় দৌড়ে প্রতিযোগিতা করিবার জন্য ভারতবর্ষ হইতে একজন এংলোইণ্ডিয়ান্ এবং একজন মান্দ্রাজী গিয়াছিলেন। তাঁহারা কিন্তু প্রারম্ভিক দৌড়েই হটিয়া গিয়াছেন; আসল প্রতিযোগিতায় যাইতে পারিবেন না।

ওলিম্পিক্ ক্রীড়ায় পৃথিবীর সেরা খেলোয়াড়রা যায়। দৌড় আদি প্রত্যেক বিষয়েই বিশেষ শিক্ষা, অভ্যাস, প্রভৃতি দরকার। তা ছাড়া খুব সুস্থ ও বলিষ্ঠ শরীর

ত চাই-ই। এ-সকল বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি না থাকিলে শুধু শুধু সেখানে গিয়া ভারতবর্ষের নাম খারাপ করিবার প্রয়োজন নাই।

গত ওলিম্পিক্ ক্রীড়ায় ভারতীয়দের থাকিবার জায়গা খুব খারাপ ছিল। খাইবার বন্দোবস্তও ভাল ছিল না। এবারেও সেইরূপ হইয়া থাকিলে এখানকার প্রতিযোগীরা সেই কারণেও গোড়াতেই বিফল-প্রযত্ন হইয়া থাকিতে পারেন।

—

কাশীতে বালকদের সন্তরণ

কাশী হইতে আমাদিগকে শ্রীযুক্ত সুনীলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নিম্নলিখিত সংবাদ পাঠাইয়াছেন।—

"গত ১লা জুলাই মঙ্গলবার কাশীর সেন্ট্রাল হেল্থ্ ইউনিয়নের তত্ত্বাবধানে ১৪ বৎসরের ও তন্নিম্নবয়স্ক স্থানীয় বালকদিগের একটি সন্তরণ-প্রতিযোগিতা হইয়াছিল। রামনগর হইতে অহল্যাবাঈ ঘাট পর্য্যন্ত সন্তরণ হইয়াছিল। এই দুই স্থানের দূরত্ব চারি মাইল। এই সময়ে গঙ্গায় স্রোত খুব কম ছিল, এবং অনেক স্থলে প্রতিযোগীদিগকে বিপরীত স্রোতে সাঁতার কাটিতে হইয়াছিল। ১৮ জন বালকের মধ্যে একজন ব্যতীত সকলেই নির্দ্দিষ্ট ঘাটে পৌঁছিয়াছিল। একটি বালকের বয়স ছিল ৪॥০ বৎসর এবং আর-একটির বয়স ৬ বৎসর ৭ মাস। ইহারা দুই ভাই। ছোট ছেলেটির নাম শ্রী বলাইলাল দাস সরকার, সে ঠিক ২ ঘণ্টায় ঘাটে পৌঁছে; অপর ছেলেটির নাম শ্রী কানাইলাল দাস সরকার, সে ১ ঘণ্টা, ৪১ মিনিট, ১০ সেকেণ্ডে পৌঁছে। প্রথম পাঁচটি প্রতিযোগীর নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"প্রথম—শ্রী হৃদয়চন্দ্র দাস, (সেন্ট্রাল্ হেল্থ্ ইউনিয়নের মেম্বর), বয়স ১৩ বৎসর, সময় ১ ঘণ্টা।

"দ্বিতীয়—শ্রী বিকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বয়স ১৪ বৎসর, সময় ৬২ মিনিট।

"তৃতীয়—শ্রী বিশ্বনাথ গাঙ্গুলী, (সেন্ট্রাল হেল্থ্ ইউনিয়নের মেম্বর) বয়স ১১ বৎসর, সময় ৬২॥০ মিনিট।

"চতুর্থ—শ্রী শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য, (হেল্থ ইম্‌প্রুভিং এসোসিয়েশনের মেম্বর), বয়স ১৩ বৎসর, সময় ৬৪ মিনিট।

"পঞ্চম—শ্রী বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (হেল্থ্ ইম্‌প্রুভিং এসোসিয়েশনের মেম্বর), বয়স ১৪ বৎসর, সময় ৬৬ মিনিট।

"অনারেবল্ রাজা মোতীচাঁদ সি-আই-ই, মহোদয় উপস্থিত থাকিয়া পুরস্কার বিতরণ করিয়াছিলেন। রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী, ডিষ্ট্রিক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট্, গোঁসাই রামপুরী জী, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ দে প্রভৃতি মহোদয়গণ এবং আরও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অহল্যাবাঈ ঘাট ও নিকটবর্ত্তী ঘাট-সমূহে অসংখ্য লোক সমবেত হইয়াছিল। তীরবর্ত্তী অনেক বাড়ীর জানালা, বারান্দা ও ছাদ নরনারীতে পূর্ণ হইয়াছিল। কেদারঘাট স্ত্রীলোকে ভরিয়া গিয়াছিল। ৪॥০ বৎসরের শিশুটি কেদার-ঘাটের নিকটে আসিলে স্ত্রীলোকেরা উলুধ্বনি দেন।

"১৫খানি নৌকায় জীবন-রক্ষক প্রতিযোগীদের সঙ্গে আসিয়াছিল; ইহা ব্যতীত ডাক্তারের নৌকা এবং দর্শকদিগের আরো অনেক নৌকা সঙ্গে ছিল। দুইজন ডাক্তার কম্পাউণ্ডার-সহ প্রতিযোগীদের সঙ্গে ছিলেন, এবং দুধ, ঔষধ ও কম্বল প্রভৃতির বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল। কুমীরের ভয় না থাকিলেও দুইজন ভদ্রলোক বন্দুক লইয়া সতর্ক ছিলেন, এবং প্রতিযোগীদিগকে একটি ঘরে লইয়া গিয়া শুশ্রূষা করিবার বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল।

"পাঁচটি পুরস্কারের ব্যবস্থা হইয়াছিল, কিন্তু পরে অন্য সকল প্রতিযোগীদিগকেই পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

"এরূপ অল্পবয়স্ক বালকদিগের সন্তরণ-প্রতিযোগিতা এদেশে এই প্রথম। সেন্ট্রাল হেল্থ ইউনিয়নের এই কাজে এবার কাশীর জনসাধারণের মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব উৎসাহ ও আনন্দের সৃষ্টি হইয়াছিল।"

—

খাদি প্রতিষ্ঠান

খাদি প্রতিষ্ঠানে কেবলমাত্র চরকায় কাটা সূতার বিশুদ্ধ খদ্দর প্রস্তুত ও বিক্রী করা হয়। উহা আগে কলিকাতার সহরতলীতে অবস্থিত ছিল। এইজন্য সহরের

ক্রেতাদের সুবিধা হইত না। এখন সহরের কেন্দ্রস্থলে ১৫নং কলেজ স্কোয়ারে উহা উঠিয়া আসায় সকলেই সহজে খাঁটি খদ্দর ক্রয় করিতে পারিবেন।

—

তারকেশ্বরের সমস্যা

ইণ্ডিয়ান্ জর্ণ্যালিষ্টস্ এসোসিয়েশ্যান্- অর্থাৎ ভারতীয় সাংবাদিকগণের সভা সম্প্রতি তথ্যনির্ণয়ের জন্য তাঁহাদের সভাপতি ও কয়েকজন সভ্যকে প্রতিনিধিস্বরূপ তারকেশ্বরে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহাদের রিপোর্ট্ আমরা এখনও পাই নাই। তাহা হস্তগত হইলে তারকেশ্বর-সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহাদের মত জানা যাইতে পারিবে। তারকেশ্বর শিব-মন্দিরের বন্দোবস্ত, উহার সম্পত্তির ও আয়-ব্যয়ের বন্দোবস্ত ব্যক্তিবিশেষের হাতে না থাকিয়া, হিন্দুসমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় একটি কমিটির হাতে থাকা বাঞ্ছনীয়। কোনও অসচ্চরিত্র লোক উহার পুরোহিত বা সেবাইত থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। এবিষয়ে, বোধ হয়, কোন মতদ্বৈধ নাই।

তারকেশ্বরের লক্ষ্মীনারায়ণের বিগ্রহ ও মন্দির ব্যক্তিগতভাবে মোহান্তের, না সর্ব্ব-সাধারণের অবাধে তথায় গিয়া দর্শন ও পূজা করিবার অধিকার আছে, সে-বিষয়ে ঠিক খবর জানি না। সত্যাগ্রহী পক্ষের কথা, এই, যে উহা সর্ব্বসাধারণের; উহা এখন যেরূপ মোহান্তের প্রাসাদের প্রাচীরের বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত, বরাবর সে-প্রকার ছিল না; এরূপ বন্দোবস্ত আধুনিক। ইহা ঠিক খবর হইলে সর্ব্ব-সাধারণের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

বর্ত্তমান-প্রকারের সত্যাগ্রহই তাহা করিবার প্রকৃষ্টতম উপায় কি না, সে-বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। অবশ্য ইহা ঠিক্, যে, মোকদ্দমা করিলে তাহার ফল কিরূপ হইবে, বলা কঠিন। অনেক সময় যাহার টাকার জোর বেশী, তাহারই জিৎ হয়। কিন্তু আদালতের মীমাংসা ভিন্ন অন্য-কোন মীমাংসা তাহার মত বলবৎ হইবে না। সালিসী মীমাংসা অবশ্য হইতে পারে। কিন্তু কোন্ কোন্ পক্ষের মধ্যে হইবে, তাহা বলা কঠিন। মোহান্তকে ত সত্যাগ্রহীরা আমল দিতে চান না।

বর্ত্তমানে স্বরাজ্যদলের সত্যাগ্রহীদের পক্ষ হইতে তারকেশ্বরের মন্দিরের যে-বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহাও স্থায়ী হইবে কি না, বলা যায় না। কারণ, তাঁহারা আদালত কর্ত্তৃক নিযুক্ত রিসীভারকে আমল দিতেছেন না। বর্ত্তমানে মন্দিরের আয়ব্যয়ের হিসাব কে রাখিতেছেন, কে রসীদ দিতেছেন ও রাখিতেছেন, এবিষয়ে বৈধ অধিকার কাহার, মোটেই হিসাব রাখা হইতেছে কি না, সে-সব কিছুই অবগত নহি।

স্বরাজ্যদলের লোকেরা আদালত মানেন না, বলিবার জো নাই। কারণ, তাঁহারা হাইকোর্টে দরখাস্ত করিয়া মন্ত্রীদের বেতন মঞ্জুর সম্বন্ধীয় প্রস্তাব ব্যবস্থাপক সভায় পুনর্ব্বার পেশ করা আপাততঃ বন্ধ করাইয়াছেন। সুতরাং যেখানে তাঁহাদের দরকার ও সুবিধা হইবে, সেখানে তাঁহারা আদালতের সাহায্য লইবেন ও তাহার আদেশের সুবিধা ভোগ করিবেন, কিন্তু যেখানে আদালতের আদেশ তাঁহাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির বাধা জন্মাইবে, সেখানে তাঁহারা "অসহযোগী" সাজিবেন,—যেমন রিসীভারকে বেদখল রাখিবার বেলা সাজিয়াছেন,—ইহা একটা কৌশল বটে, কিন্তু সরল ও সুসঙ্গত আচরণ নহে।

ধর্ম্মার্থে লোক যে টাকা দেয়, তাহার ব্যয় সমাজের হিতার্থেই হওয়া উচিত, কাহারও সুখভোগের জন্য হওয়া উচিত নহে; জঘন্য পাপবাসনা তৃপ্তির জন্য, নারীর সর্ব্বনাশের জন্য, তাহা যে ব্যবহৃত হওয়া উচিত নয়, তাহা ত বলাই বাহুল্য। কিন্তু কেমন করিয়া এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, তাহাই বিবেচ্য। সত্যাগ্রহ চিরকাল চলিতে পারে না, এবং সত্যাগ্রহীরা যে-অধিকার স্থাপন ও বন্দোবস্ত করিয়াছেন বা করিবেন, সত্যাগ্রহ বন্ধ হইলেও তাহা নির্ব্বিবাদে চলিতে থাকিবে, এরূপ আশা করা যায় না।

সাংবাদিক সভার প্রতিনিধিদের রিপোর্টে সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব আছে কি না, দেখিবার কৌতূহল আছে।

তারকেশ্বরে যাহাতে নারীর অসম্মান ও সতীত্বনাশ না হয়, এবং যাহাতে সামাজিক পবিত্রতা রক্ষিত হয়, এইরূপ ব্যবস্থা করা ও অবস্থা সংরক্ষণ করা সত্যাগ্রহীদের

অভিপ্রেত বলিয়া প্রকাশ। অতএব দেখা উচিত, যে, যে-সব পুরুষ ও নারী এই সত্যাগ্রহে যোগ দিয়াছেন বা ইহার নেতৃত্ব করিতেছেন, তাঁহাদের এরূপ উচ্চ কার্য্যের মত চারিত্রিক ও অন্যবিধ যোগ্যতা আছে কি না। এবিষয়ে নজর থাকা উচিত।

তারকেশ্বরের মত ক্ষুদ্র জায়গার পক্ষে পতিতা নারীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। খবরের কাগজে পড়িয়াছি, যে, বর্ত্তমান ও ভূতপূর্ব্ব মোহান্তদের চরিত্রের ফলে অনেক নারীর চরিত্রভ্রংশ ঘটায়, অংশতঃ, এই অবস্থা হইয়াছে; দ্বিতীয়তঃ, অধিকসংখ্যক যাত্রী ও দর্শক আকর্ষণ করিবার জন্যও, শুনিয়াছি, মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ব্বে এইরূপ অবস্থা ঘটাইয়াছে।

সত্যাগ্রহীরা ইহার কি প্রতিকার করিয়াছেন বা করিতেছেন, তাহা জানিতে ইচ্ছা হয়। স্থানটি তীর্থস্থান। ইহার নৈতিক হাওয়া সাত্ত্বিক ও পবিত্র হওয়া চাই। পতিতা নারীরা যাহাতে সদুপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা সত্যাগ্রহীরা করুন।

খবরের কাগজে পড়িয়াছি, যে, তারকেশ্বরে যে-সকল নারী সত্যাগ্রহ করিতেছেন, পতিতা নারীরাও তাঁহাদের দলভুক্ত এবং তাহারা অবাধে সকলের সঙ্গে মিশিতেছে। ইহা সত্য কি না, জানি না। সত্য হইলে, ইহা বাঞ্ছনীয় নহে; কারণ ইহাতে সামাজিক পবিত্রতা সংরক্ষিত ও বর্দ্ধিত না হইয়া নষ্ট হইবার সম্ভাবনাই বেশী।

যদি অন্য উপায়ে তারকেশ্বরের সমস্যার সমাধান সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে একটা দেশব্যাপী চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা জাগাইয়া রাখা, এবং যুবকদের যে সময় স্বার্থ-ত্যাগপ্রবৃত্তি, শক্তি ও হিতৈষণার অধিকতর সুফলদায়ক ব্যবহার হইতে পারে, হুজুগে তাহার অপচয় হইতে দেওয়া অনুচিত। এত গোলমাল ও উত্তেজনায় একান্ত আবশ্যক নানা হিতকর কার্য্য অবহেলিত হয়।

—

তারকেশ্বরে ও জেলে গুণ্ডামি

লর্ড লিটন্ সম্প্রতি একটা বক্তৃতায় বলিয়াছেন, যে, তারকেশ্বরের ব্যাপারটা একটা বিরাট্ ছলনা মাত্র। একথায় সায় দেওয়া যায় না। মোহান্তের বিরুদ্ধে ও তাহার মন্দির ও জমিদারীর বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে যে একটা সত্য এবং সত্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত দেশব্যাপী ক্রোধ ও উত্তেজনা জন্মিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার জো নাই। শত শত ব্যক্তি যে সরল বিশ্বাসে তারকেশ্বরের অবস্থার উন্নতির জন্য অনেক স্বার্থত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, ইহার জন্য যে অনেকের প্রাণসংশয় পর্য্যন্ত হইয়াছে, তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। নেতারা সত্যাগ্রহ প্রবর্ত্তন কি উদ্দেশ্যে করিয়াছেন, সে-বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে। কিন্তু ইহা নিশ্চয়ই কেবলমাত্র তাঁহাদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উপায়স্বরূপ অবলম্বিত হইয়াছে, সদভিপ্রায় কিছুই নাই এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিবার মত যথেষ্ট তথ্যজ্ঞান আমাদের নাই। ইহা হয়ত অংশত রাজনৈতিক চা'ল। কিন্তু তারকেশ্বরের সংস্কার যে খুবই আবশ্যক হইয়াছিল, তাহা বাঙালী কেহ মানেন না বলিয়া অবগত নহি। উপায়-সম্বন্ধে মতভেদ আছে ও হইতে পারে।

লর্ড লিটন্ সত্যাগ্রহটাকে ত একটা বিরাট্ ঠকামি বলিয়াছেন; কিন্তু তারকেশ্বরে এত সশস্ত্র গুণ্ডার আবির্ভাব ও অত্যাচার কেন অবাধে হইয়াছিল, তাহার কোন খবর ও কৈফিয়ৎ তিনি লইয়াছিলেন কি? অস্ত্রা-আইন কি ইহাদের জন্য অভিপ্রেত নহে? গুণ্ডামির বিরুদ্ধে কর্ত্তব্য গবর্ণমেণ্ট-পক্ষ হইতে কিছুই করা হয় নাই, বলিতেছি না; কিন্তু যথেষ্ট নিশ্চয়ই করা হয় নাই।

তাহার পর সত্যাগ্রহী নারীদের উপরও পুলিশের লাঠি চালান, তাহাদিগকে টানাহেঁচড়া, তাহাদের বিবস্ত্রী-ভবন, এবং সেই অবস্থায় তাহাদিগকে হাজতে রাখিয়া দেওয়া, ইহা কি অনিবার্য্য ছিল? নারী পতিতা হইলেও তাহাদের প্রতি দুর্ব্যবহার অমার্জ্জনীয়। অবশ্য লাঞ্ছিত নারীরা সকলেই পতিতা শ্রেণীর নহেন।

এখানে কিন্তু ইহাও বলা দরকার, যে, এরূপ টানা-হেঁচড়া ও ধস্তাধস্তির মধ্যে নারীদের যাওয়া উচিত নয়। এরূপ কাজের পক্ষে পুরুষের শক্তিই উপযোগী ও যথেষ্ট।

বাঁকুড়া ও আর কয়েকটি জেলে সত্যাগ্রহী কয়েদী-দিগকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করা হইয়াছে। অন্য দুর্ব্যবহারও হইয়াছে। যাহারা প্রহার করিয়াছে এবং

যাহাদের হুকুমে করিয়াছে, তাহাদের কোন সাজা হইয়াছে বলিয়া কাগজে পড়ি নাই। জেলের বাহিরে একজন বেসরকারী লোক অন্য একজন বেসরকারী লোককে আঘাত করিলে যেরূপ শাস্তি হয়, জেলের ভিতরেও কয়েদীদের উপর সেইরূপ অত্যাচারের দণ্ড ঠিক সেইরূপ হওয়া ত চাই-ই, বরং কিছু বেশী হওয়া উচিত। কেহ জেলের নিয়মভঙ্গ করিলে জেলের অধ্যক্ষের বিচার ও আদেশ অনুসারে কোন কয়েদীর শাস্তি হইলে সে-বিষয়ে আলোচনা অবশ্য অন্যরকমে করিতে হইবে,—যদিও অধ্যক্ষের হুকুম-অনুসারে হইয়াছে বলিয়াই যে-কোন-রকম শাস্তি সঙ্গত ও বৈধ মনে করা যাইতে পারে না।

কোন কোন জেলে সত্যাগ্রহীদিগকে কাঁকর-ও পোকা-মিশ্রিত চালের ভাত এবং সিদ্ধ ঘাসের মত স্বাদবিহীন তরকারী দেওয়া হয়। তাহাতে তাঁহারা প্রায়োপবেশন করিবেন, কিম্বা পীড়িত হইবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

কয়েদীদের প্রতি এইরূপ ব্যবহারকরায় গবর্ণমেণ্টের কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, কেবল বর্ব্বরতার অখ্যাতি রটে। গবর্ণমেণ্ট তাহাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করিবার হুকুম দিয়াছেন বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু দুর্ব্যবহার বন্ধ করিবার জন্য যথেষ্ট উপায়ও ত অবলম্বিত হয় নাই।

জেলে কঠোর নিষ্ঠুর ব্যবহার দ্বারা কোন-প্রকার "অপরাধ" কোন দেশে কমে নাই,—রাজনৈতিক "অপরাধ" ত কমেই নাই। শত বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে লঘুগুরু প্রায় দু'শ' রকম অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ড হইত; কিন্তু তাহাতে অপরাধপ্রবণতা কমে নাই;—কমিয়াছে শিক্ষা-বিস্তার ও অন্যান্য সুসভ্য উপায় দ্বারা। সভ্য ও স্বাধীন দেশসকলে রাজনৈতিক অপরাধ কমিয়াছে, জন-সাধারণের শিক্ষা, অধিকার ও দায়িত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে; জুলুম, জবরদস্তি, কঠোর আইন ও অমানুষিক শাস্তির দ্বারা নহে।

তারকেশ্বরের সত্যাগ্রহের বিষয় লিখিতে গিয়া একটি সাধারণ কথা আমাদের মনে উদিত হইয়াছে, তাহা বলা আবশ্যক। জাতীয় জীবনে এমন সময় কখন কখন আসে, যখন রাষ্ট্রীয় শক্তির অবাধ্য হইয়া বিদ্রোহী হওয়া আবশ্যক এবং উচিত বিবেচিত হইয়া থাকে। অবাধ্য ও বিদ্রোহী না হওয়াটাই তখন অধর্ম্ম। কিন্তু সাধারণতঃ রাষ্ট্রীয় বিধি ও নিয়ম এবং কর্তৃপক্ষের আদেশ মানিয়া চলাই কর্ত্তব্য, কেননা, যেমন বিধির আনুগত্য ব্যতিরেকে জড়জগৎ চলে না, তেমনি সভ্যসমাজও চলে না। বিধি-সঙ্গত উপায়ে কোন অনিষ্টকর অবস্থার প্রতিকার না হইলে অগত্যা বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু প্রথমে বিধিসঙ্গত উপায়ই অবলম্বনীয়। তারকেশ্বরে তাহা হইয়াছে কি না, নেতারা ধীর-শান্তভাবে ভাবিয়া দেখিবেন।

—

সিরাজগঞ্জে গোপীনাথ-সম্বর্দ্ধনা

এই বিষয়ে আষাঢ় সংখ্যায় আমাদের মন্তব্য মুদ্রিত হইয়া যাইবার পর "সারথি" কাগজে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ইংরেজী অনুবাদ অনুযায়ী বাঙ্গলা প্রস্তাবটি আমরা দেখিতে পাই। সেইটি ও তাহার আগের প্রস্তাবটি ঐ কাগজ হইতে নীচে উদ্ধৃত করিতেছি।

১। এই সম্মিলন বঙ্গের সুসন্তান অশ্বিনীকুমার দত্ত, নলিনীনাথ রায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র ঘোষ, আশুতোষ চৌধুরী এবং আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের পরলোক গমনে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতেছে, এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে।

২। এই সম্মিলন সর্ব্বপ্রকার হিংসভাব বর্জ্জন ও অহিংসভাবকে মূলনীতিস্বরূপ গ্রহণ করিয়াও মৃত গোপীনাথ সাহার আত্মত্যাগের উচ্চ আদর্শ হৃদয়ঙ্গম করিয়া মাতৃভূমির স্বার্থ সংরক্ষণ বিষয়ে ভ্রান্ত হইয়াও যে মহান্ স্বার্থত্যাগ করিয়াছে তন্নিমিত্ত তাহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছে।

প্রস্তাবটি প্রথমে যে-ভাষায় কাগজে ওরূপে বাহির হইয়াছিল, সিরাজগঞ্জের অধিবেশনে উহা মোটামুটি সেই আকারেই উপস্থাপিত ও গৃহীত হইয়াছিল বলিয়া আমরা মনে করি, এবং তাহা মনে করিবার কারণও আমরা গত সংখ্যায় লিখিয়াছিলাম। কিন্তু আমরা ঐ অধিবেশনে স্বয়ং উপস্থিত ছিলাম না। সুতরাং আমাদের ভ্রম হইবার সম্ভাবনা আছে মনে করিয়া আমরা তর্কের খাতিরে উপরে মুদ্রিত রূপ ও ভাষাই উপস্থাপিত ও গৃহীত প্রস্তাবের ভাষা ও রূপ বলিয়া ধরিয়া লইতেছি। কিন্তু তাহাতে আমাদের গত মাসে প্রকাশিত মন্তব্যের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক বোধ হইতেছে না।

নিতান্ত আবশ্যক না হইলে, প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ও মৃত ব্যক্তির সমালোচনা করা অনুচিত। আগে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহাই যথেষ্ট।

উপরে মুদ্রিত প্রস্তাব-দুটি হইতে বুঝা যাইবে, যে, সিরাজগঞ্জ রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের মতে গোপীনাথ সাহা ছাড়া গত বৎসর এমন কোন বাঙালী মরেন নাই, যাঁহার আত্মত্যাগের আদর্শ উচ্চ ছিল, যিনি মহান স্বার্থত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং যাঁহাকে তাহার জন্য শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা চলে।

গোপীনাথ সাহার "আত্মত্যাগের উচ্চ আদর্শ" ও "মহান স্বার্থত্যাগ" সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ অনেক লিখিয়াছেন ও বলিয়াছেন। কিন্তু সিরাজগঞ্জের সভার আগে তিনি তাঁহার কাগজ ফরোয়ার্ডে তাহা লেখেন নাই; গোপীনাথের কার্য্যের নিন্দা করিয়াছিলেন, এবং তাহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। দেশ তাহার সেবা হইতে বঞ্চিত হইল এই আক্ষেপ করিয়াছিলেন। ইহাই যেন রক্তকলঙ্কিত শেষ বলিদান হয়, এই আশাও প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহা কোন্ হৃদয়বান্ ব্যক্তি না করিবে? ফরোয়ার্ডের আগেকার লেখায় গোপীনাথের সম্বন্ধে বাঙালী জাতির "আনন্দে ও গর্ব্বে বুক ফুলিয়া উঠা"র কিম্বা "অনুভূতি সত্য প্রকাশ" (?) করিবার ঐকান্তিক চেষ্টা ও ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

—

আহ্‌মেদাবাদে গোপীনাথ সাহা

আহ্‌মেদাবাদে নিখিল-ভারতীয় কংগ্রেস্-কমিটির অধিবেশনে গোপীনাথ সাহার কার্য্যের নিন্দা করা হয় এবং তৎকর্ত্তৃক নিহত মিঃ ডের পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করা হয়। এরূপ কাজ দ্বারা দেশের কি ক্ষতি হয়, তাহা বলা হয় এবং ইহার সহিত কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্য ও অহিংস অসহযোগের কোন মিল নাই, তাহা বলা হয়।

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ ও তাঁহার দলের লোকেরা মনে করেন, মহাত্মা গান্ধীর এই প্রস্তাব, ইহার সংশোধক চিত্তরঞ্জন-বাবুর প্রস্তাব, এবং সিরাজগঞ্জের প্রস্তাব মূলতঃ এবং সারতঃ এক। ইহা ভ্রম। মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবের উদ্দেশ্য কাজটির নিন্দা করা এবং তাহার অনিষ্টকারিতা ও কংগ্রেসের নীতির সহিত তাহার অসামঞ্জস্য প্রদর্শন। গোপীনাথ সাহা দেশকে ভালবাসিলেও এই প্রস্তাবে কাজটির নিন্দা ও দোষ প্রদর্শন করা হইয়াছে। কিন্তু স্বরাজ্য দলের প্রস্তাব-দুটির অভিপ্রায়, গোপীনাথের কাজটির সহিত অহিংসার, কংগ্রেসের নীতি ও উদ্দেশ্যের এবং দেশের প্রকৃত হিতের বিরোধ থাকিলেও, গোপীনাথকে শ্রদ্ধা-প্রদর্শন। এই কারণে উভয়বিধ প্রস্তাবকে এক মনে করা মহাত্মা গান্ধীর মতে আত্মপ্রতারণা।

কোন মানুষ কোন অপকর্ম্ম করিলে তাহার চুলচেরা বিচার করিয়া ঠিক্ তাহার উদ্দেশ্যে কতটুক্ মহত্ত্ব ছিল তাহা স্থির করা, এবং মন্দ কাজটির জন্যই বা তাহার ঠিক কতটা নিন্দা প্রাপ্য তাহা স্থির করা, মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে। এরূপ চুলচেরা বিচারের ভার ভগবানের হাতে থাকাই ভাল। কেহ অপকর্ম্ম করিলে অপকর্ম্মের সঙ্গে বা মূলে অল্প কিছু ভাল উদ্দেশ্য বা প্রেরণা থাকিলে, খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহারই প্রশংসা করিলে, অপকর্ম্মের নিন্দনীয়তা ও অনিষ্টকারিতার লাঘব করা হয়। এই হেতু এরূপ প্রশংসা সমাজের অহিতকর। বিশেষতঃ যদি দেখা যায়, যে, সৎকর্ম্মের সঙ্গে বা মূলে ঠিক্ ঐরূপ ভাল উদ্দেশ্য, প্রেরণা ও আদর্শ থাকিলেও বিশেষ করিয়া তাহার প্রশংসা হইতেছে না, কিন্তু অপকর্ম্মের বেলায় হইতেছে, তাহা হইলে লোকের এই ধারণা হইতে পারে, যে, অপকর্ম্মের সহিত জড়িত যাহা অল্পকিছু ভাল তাহাই প্রশংসনীয়, সৎকর্ম্মের মূলীভূত তদ্রূপ যাহা ভাল, তাহা প্রশংসনীয় নহে।

সুতরাং অপকর্ম্মীর প্রশংসা করিতে হইলে অনেক বিবেচনা করিয়া করিতে হয়। নতুবা অবিবেচনা, চিন্তাহীনতা বা হঠকারিতার ফলে, অপকর্ম্মের অপকর্ম্মত্বটা লোকে ভুলিয়া যাইতে পারে।

—

আহ্‌মেদাবাদে দুই দল

আহ্‌মেদাবাদে নিখিল-ভারতীয় কংগ্রেস্-কমিটির অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী অকপটভাবে নিজের উদ্দেশ্য ও

আদর্শ অনুসারে বক্তৃতা ও কাজ করিয়াছিলেন। স্বরাজ্য দলের কার্য্যে ও বক্তৃতায় রাজনৈতিক কৌশল ছিল, এবং কখন কখন দর্পও প্রকাশ পাইয়াছিল।

কংগ্রেস্‌সম্পর্কীয় কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটিগুলির সভ্যদিগকে মাসে ২০০০ গজ সূতা কাটিতে হইবে, যাঁহারা তাহা না করিবেন, তাঁহারা ঐ কারণে স্বতঃই সভ্যপদ হারাইবেন, মহাত্মা গান্ধীর একটি প্রস্তাব প্রথমতঃ এইরূপ ছিল। ইহা কংগেসের ভিত্তিভূত নিয়মাবলীর অনুযায়ী কিম্বা তাহার বিরোধী হইয়াছিল, তাহার আলোচনা করিব না। দুই দিকেই অনেক বলিবার আছে। আমরা কেবল উক্ত কমিটিগুলির সভ্যত্বের এই যোগ্যতা সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। কংগ্রেস্ কতকগুলি কাজকে জাতিগঠন-মূলক ও অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন; সেই কার্য্যপদ্ধতি অনুসৃত হইলে প্রয়োজনমত নিরুপদ্রব আইন অমান্য নীতির অনুসরণ করিতে পারা যাইবে, কংগ্রেসের ইহাও মত। চর্‌কায় সূতা কাটা ঐ কাজগুলির মধ্যে একটি। কিন্তু বরাবর দেখা যাইতেছে, যে, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা, মহাত্মা গান্ধী ও অন্য অল্পসংখ্যক লোক বাদে, অপরকে সূতা কাটিবার উপদেশ দেন, কিন্তু নিজেরা কাটেন না। কথায় ও কাজে এরূপ অসঙ্গতি দীর্ঘ কাল একটা উপহাসের বিষয় হইয়া আছে। সুতরাং এই দিক্ দিয়া মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাব খুবই ন্যায্য ও সুসঙ্গত হইয়াছিল। কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্য্যপদ্ধতির পরিবর্ত্তন না হইলে ও সূতা কাটা তাহার মধ্য হইতে বাদ না যাইলে কিম্বা তাহা ইচ্ছাধীন করা না হইলে, আমাদের বিবেচনায় কমিটির সভ্যদের হয় সূতা কাটা উচিত, নতুবা সভ্যত্ব ত্যাগ করা উচিত। স্বরাজ্য দলের নেতারা মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবের প্রতিবাদ নিখিলভারতীয় কংগ্রেস্ কমিটিতে করিয়াছিলেন; তাহা তথায় না করিয়া তাঁহাদের উচিত ছিল, কংগ্রেসের কোন অধিবেশনে সূতা কাটাকে কার্য্যপদ্ধতি হইতে বাদ দিবার বা অবশ্যকর্ত্তব্যের পরিবর্ত্তে ইচ্ছাধীন করিবার চেষ্টা করা।

সূতা কাটা কংগ্রেসের কার্য্যপদ্ধতির অঙ্গীভূত বলিয়া যাহা বলা উচিত, তাহা বলিলাম। উক্ত কার্য্যপদ্ধতিতে উহা না থাকিলে অবশ্য বিবেচনা করা চলিত, যে, সূতা না কাটিলেও ভারতবর্ষের রাজনীতি-ক্ষেত্রে কর্ম্মিষ্ঠ হওয়া যায় কি না, এবং প্রধান কর্ম্মীদের শ্রেণীভুক্ত থাকা যায় কি না।

এইপ্রকারে সাধারণভাবে বিষয়টির আলোচনা করিলে দেখা যায়, যে, চর্‌কায় সূতা না কাটিলেও দেশহিতকর রাজনৈতিক ও অন্যবিধ অনেক কাজ করা যায়। কিন্তু কংগ্রেসের বর্ত্তমান জাতিগঠনমূলক কার্য্যপদ্ধতি অপরিবর্ত্তিতভাবে কায়েম থাকিতে, যিনি সূতা কাটেন না এমন কেহ কংগ্রেসের প্রধান কর্ম্মীদের শ্রেণীভুক্ত থাকিতে পারেন না।

মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবটি কংগ্রেসের মূলনিয়মাবলীর বিরোধী বলিয়া তর্ক করিয়া স্বরাজ্যদল কমিটি-গৃহ হইতে চলিয়া আসেন। তাহার পর আলোচনানন্তর প্রস্তাবটি অধিকাংশের মতে গৃহীত হয়। মহাত্মা গান্ধী কিন্তু বলেন, যে, স্বারাজ্যিকেরা উপস্থিত থাকিলে মূল-প্রস্তাবটি অবিকল গৃহীত হইত না। সেইজন্য তিনি, সূতা না কাটিলেই কমিটির সভ্যত্ব স্বতঃ লোপ পাইবে, প্রস্তাবের এই শাস্তির অংশটি নূতন একটি প্রস্তাব পেশ্ করিয়া বাদ দেন। ইহা তাঁহার যোগ্য কাজ হইয়াছে।

সূতা কাটার সহিত স্বরাজ-লাভের সম্পর্ক অনেকে বুঝিতে পারেন না; সাক্ষাৎ সম্পর্ক ত পারেনই না। এই বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা এখানে করিবার স্থান ও সময় নাই। কেবল এইমাত্র বলিতে পারি, যে, স্বরাজ একটি বিদেশীর দেয় জিনিষ নহে; বিদেশীরা কতকগুলি আইন ও নিয়ম করিয়া আমাদিগকে কতকগুলি অধিকার ও ক্ষমতা দিবে এবং তাহা হইলেই আমাদের স্বরাজ লাভ হইবে, আমরা এরূপ মনে করি না। স্বরাজের ভিত্তি জাতীয় ঐক্য, স্বাবলম্বন, শ্রমশীলতা প্রভৃতি। ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, যুবা-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ, সকলেই যদি কিছু কষ্ট ও শ্রম স্বীকার করিয়া কিছু সময় দিয়া, একই এমন কোন কাজ করেন যাহা জাতির পক্ষে আবশ্যক, তাহা হইলে তাহা ঐক্যবিধায়ক অন্যতম উপায় হইতে পারে। চর্‌কায় সূতা কাটা এইরূপ একটি কাজ। ধনী ও "শিক্ষিত"দের মনে সহজেই ইহার

প্রতি অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের ভাব আসিতে পারে। কিন্তু দেশের অধিকাংশ লোক দরিদ্র; স্ত্রীলোকেরা অধিকাংশ "অশিক্ষিত"। দেশের লজ্জারক্ষার এই উপায়টির প্রতি তাঁহাদের অবজ্ঞা না হইতে পারে। সত্য বটে, হাতে সূতা কাটিলে প্রভূত পরিশ্রমে রোজগার অল্পই হয়। কিন্তু অধিকতর লাভজনক কাজ হইতে দেশের অধিকাংশ লোককে টানিয়া আনিয়া এই কাজে লাগান হইতেছে না। বৎসরের অনেক সময় দেশের অধিকাংশ পুরুষ ও নারীর কোন রোজগারের উপায় থাকে না। তখন সামান্য রোজগারও যাহা হয়, তাহাই লাভ। নিজের গ্রামে নিজের বাড়ীতে থাকিয়া সামান্য মূলধন খাটাইয়া রোজগার কিসে হয়, তাহার উপায় আমাদিগকে খুঁজিতে হইবে। আমরা ত চর্‌কায় সূতা কাটা অপেক্ষা সহজে অবলম্বনীয় এরূপ কোন কাজের বিষয় অবগত নহি। হাতে সূতা কাটা ও হাতের তাঁতে কাপড় বোনার আর-একটি সুবিধা এই, যে, খাদ্যের পরেই মানুষের বস্ত্রের প্রয়োজন বেশী; সুতরাং কাপড়ের কাট্‌তি বেশী। এরূপ কাপড় মিলের কাপড়ের সঙ্গে দামে টক্কর দিতে পারে না, জানি। কিন্তু যাহারা নিজে সূতা কাটিয়া কাপড় বুনিবে বা বুনাইবে, তাহাদের নগদ খরচ মিলের কাপড়ের দাম অপেক্ষাও কম পড়িবে—বিশেষতঃ যাহারা নিজের বাড়ীতে উৎপন্ন কাপাস হইতে সূতা কাটিবে। সেইজন্য ঘরে ঘরে কাপাসের চাষের বিস্তারও খুব দর্‌কার। যাহাদিগকে কাপড় কিনিয়া পরিতে হয়, তাহাদের মধ্যে ধনী ও সচ্ছল অবস্থার লোকদের খদ্দর ক্রয় ও পরিধান অবশ্যকর্ত্তব্য। ইহার দ্বারা গ্রামবাসী ও দরিদ্র লোকদের সহিত সহানুভূতির বন্ধন দৃঢ় হয়। খদ্দর মাত্রেই মোটা ও ভারী নয়। মিহি অথচ খাঁটি খদ্দরও দেখিয়াছি।

আমরা এরূপ বলিতেছি না, যে, চর্‌কায় সূতা কাটা ভিন্ন জাতীয় ঐক্য-বিধানের অন্য উপায় নাই, বা যাঁহারা সূতা কাটেন না, তাঁহাদের স্বজাতিপ্রেম নাই; আমরা সহজসাধ্য একটি উপায়ের কথাই বলিতেছি। আমরা নিজে সূতা কাটিতে পারি না; আমাদের কংগ্রেসের সভ্য না হইবার এবং সভ্যরূপে অপরকে সূতা কাটিবার উপদেশ না দিবার ইহা একটি কারণ। তথাপি, এবিষয়ের আলোচনা এইজন্য করিতেছি, যে, আরও বিস্তর এমন অনেক ভাল কাজের আলোচনা করি, যাহা আমরা নিজে করি না, করিবার সাধ্য, সুযোগ ও অবসর নাই।

অবসর সময়ে চর্‌কা চালানর আর-একটি গুণ এই, যে, ইহার দ্বারা মানুষ নিয়মিত শ্রমে অভ্যস্ত হয় এবং আলস্য ও তাহার নানা কুফল নিবারিত হয়। ইহা পরম লাভ। অলস জাতির দ্বারা স্বরাজ লাভ ও রক্ষা হইতে পারে না। সমুদয় জাতিকে শ্রমশীল করিবার ইহা অপেক্ষা সোজা উপায় যদি কেহ জানেন, ত তাহা নিশ্চয়ই বিবেচ্য।

স্বরাজটা কেবল রাজনৈতিক ব্যাপার নহে। নিজেদের সর্ব্ববিধ প্রয়োজন নিজেদের চেষ্টায় সিদ্ধ করিবার ক্ষমতার নাম স্বরাজ। কাপাসের জন্ম ভারতে। অথচ ভারতীয়েরা লজ্জা রক্ষার জন্য অপরের উপর নির্ভর করিবে, ইহা স্বরাজ নহে। ভারত নিজের সন্তানদের খাদ্য নিজে উৎপাদন করেন। বস্ত্রও এখানে উৎপন্ন করা চাই। চর্‌কা ও হাতের তাঁত দ্বারা এই উদ্দেশ্য যত অল্প টাকায় ও বিদেশীর বিনা সাহায্যে সিদ্ধ হইতে পারে, অন্য কোন উপায়ে তাহা হইবে না। মিল স্থাপনের ব্যয় অধিক, তাহাতে বিস্তর মজুর ও মজুরানীকে গ্রাম ছাড়িয়া নৈতিক ও দৈহিক অস্বাস্থ্যজনক অবস্থায় থাকিতে হয়, এবং তাহারা কার্য্যতঃ অনেকটা মূলধনীদের দাস হইয়া পড়ে। পারিবারিক জীবনের ও গ্রাম্য জীবনের গুণ ও সুবিধা এবং শ্রমসম্বন্ধীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া বস্ত্রসমস্যার সমাধান একমাত্র চর্‌কা ও হাতের তাঁতের দ্বারা হইতে পারে। রোমান্ ক্যাথলিক্ পাদ্রীরা তাঁহাদের অনেক গ্রাম্য ও অন্য বিদ্যালয়ে চর্‌কা ও তাঁত প্রবর্ত্তন করিয়া সুফল পাইয়াছেন।

মানুষ একদিকে স্বাবলম্বী এবং নিজের অভাব নিজেই মোচনে ও নিজের কাজ নিজেই সম্পাদনে সমর্থ হইলে, অন্য দিকেও তাহা সহজে হইতে পারিবে।

এবম্বিধ নানা কারণে চর্‌কার সমর্থন করিতেছি। কিন্তু সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া ইহা অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর কোন উপায় নির্দ্দেশিত হইলে চর্‌কা আঁক্‌ড়াইয়া থাকা কুসংস্কার ও গোঁড়ামি হইবে।

সুতা না কাটিলে কমিটির সভ্যত্ব স্বতঃই লোপ পাইবে, মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাব হইতে এই শাস্তিমূলক অংশ বাদ পড়িলেও, সুতা কাটা যে চাই-ই, এই কর্ত্তব্যনির্দ্দেশ বজায় আছে। উত্তম লোকেরা কর্ত্তব্যবোধে, ভাল কাজ ভাল বলিয়াই, পদোচিত কাজ করেন; মধ্যম লোকেরা দণ্ডের ভয়ে করে; অধম লোকেরা কর্ত্তব্যবোধ কিম্বা দণ্ডের ভয় কিছুতেই না করিতে পারে। বর্ত্তমানক্ষেত্রে এই সাধারণ নিয়ম প্রয়োজ্য কি না, কংগ্রেসের সভ্যগণ বিবেচনা করিবেন।

ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়া পরিশ্রম- ও সুবিবেচনা-সহকারে কাজ করিলে দেশের কিছু উপকার করা যায় এবং কিছু অনিষ্ট নিবারণ করা যায়, ইহা আমরা প্রথম হইতেই স্বীকার করিয়া আসিতেছি। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সকল কাজে বাধা দেওয়ার নীতির দোষও আমরা দেখাইয়াছিলাম। স্বারাজ্যিকরা সে-নীতি ত্যাগ করিয়া বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন—যদিও তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভা আদি ভাঙিয়া দবার যে-আশা লোককে দিয়া ভোট পাইয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ করিতে না পারিয়া তাঁহারা অঙ্গীকারভঙ্গ ও অসঙ্গতি-দোষে দুষ্ট হইয়াছেন।

বিলাতের লোকেরা তাহাদের পার্লেমেণ্টে ঢুকিয়া যে-পরিমাণে দেশের ভাগ্যনিয়ন্তা হইতে পারে, আমরা যদি তাহা হইতে পারিতাম, তাহা হইলে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবার পরিশ্রম, উদ্বেগ ও অর্থ-ব্যয় কতকটা পোষাইত। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের প্রতিনিধিরা যতটুকু কাজ করিতে পারেন, তাহাতে এত পরিশ্রম, উদ্বেগ, রেষারেষি, দলাদলি ও অর্থব্যয় নিতান্তই অপব্যয়, তাহাতে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। তথাপি কেহ যদি এতরকমে এতটা অপব্যয়ী হইয়াও ব্যবস্থাপক সভায় ঢুকিতে ও প্রতিনিধির কাজ করিতে চান, তাহাতে আমরা বাধা দিতে অনিচ্ছুক।

কিন্তু ইহা পুনঃ পুনঃ বলিলে ক্ষতি নাই, যে, কংগ্রেসের গঠনমূলক কাজগুলির মূল্য কৌন্সিলের কাজ অপেক্ষা অনেক বেশী। অবশ্য কেহ যদি কৌন্সিলে ঢুকিয়া গঠনমূলক কার্য্যের সহায়তা করিতে পারেন, কিম্বা কৌন্সিলের কাজ ছাড়া গঠনমূলক কাজও করিতে পারেন, তাহা ভাল; কিন্তু এপর্য্যন্ত তাহা করা হইয়াছে কি? সমস্ত জাতি স্বাবলম্বী ও নিয়মিতপরিশ্রমী (সুতরাং সংযত) হইলে, খাদ্যবস্ত্রের অভাব নিজেরাই পূরণ করিতে পারিলে, অস্পৃশ্যতা দূরীভূত হইলে, হিন্দু-মুসলমানাদির বিরোধ নিবারিত ও ঐক্য স্থাপিত হইলে, পান-দোষ ও অন্যবিধ নেশার অভ্যাস বিনষ্ট হইলে, শুধু যে, স্বরাজলাভ অধিকতর সহজসাধ্য হইবে তাহা নহে, স্বরাজ অনেকটা লব্ধ হইয়াছেই বুঝিতে হইবে।

পঞ্চবিধ বর্জ্জনের মধ্যে সরকারী ও সরকারের অনুমোদিত শিক্ষালয় পরিহারের সমর্থন আমরা কখন করিতে পারি নাই এইসব শিক্ষালয়ের শিক্ষণীয় বিষয়, শিক্ষাপ্রণালী শিক্ষার পুস্তক, প্রভৃতির অনেক দোষ আছে জানি; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও উহার দ্বারা একটা অভাব দূর হইতেছে যাহা "জাতীয় বিদ্যালয়" দ্বারা দূর হইতেছে না। বিকৃত ভারতেতিহাস শিক্ষা দেওয়া সরকারী শিক্ষাপ্রণালীর একটা মহা দোষ। কিন্তু সেই দোষের প্রতিকার-স্বরূপ মেজর বামনদাস বসু মহাশয়ের লেখা ভারতেতিহাস বিষয়ক বহিগুলির মত বহিও ত সাবেক ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরা লিখিতেছেন।

সরকারী আদালতের সাহায্য না-লওয়া ও তাহাতে ব্যবহারাজীবের কাজ না-করা পঞ্চবিধ বর্জ্জনের অন্তর্গত। অনেক লোককে বাধ্য হইয়া মোকদ্দমায় বাদী বা প্রতিবাদী-রূপে লিপ্ত হইতে হয়। নতুবা তাহাদের খুব ক্ষতি, অনিষ্ট, বা অসুবিধা হয়। এই কারণে আহমেদাবাদের একটি প্রস্তাব দ্বারা ঐপ্রকারের লোকদিগকে পঞ্চবিধ বর্জ্জনের মধ্যে আদালতের সাহায্য-গ্রহণ পরিহার হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হইয়াছে। তদুপলক্ষ্যে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ-সম্পাদিত ফরওয়ার্ডের সম্পাদকীয় স্তম্ভে লেখা হইয়াছে, যে, ব্যবহারাজীবদিগের রোজগারের উপায় পরিত্যাগেও ত তাহাদের খুব ক্ষতি হয়। অর্থাৎ প্রকারান্তরে বোধ হয় ইহাই বলা হইয়াছে, যে, কংগ্রেস মোকদ্দমার পক্ষদিগকে যেমন নিষ্কৃতি দিয়াছেন, উকীলব্যারিষ্টারদিগকেও তেমনি বর্জ্জনের এই দফা হইতে নিষ্কৃতি দিলে ভাল হয়। কিন্তু তাহাতে বেশী কিছু আসে যায়

না; অল্পসংখ্যক লোক ছাড়া, আগে যাঁহারা আইনব্যবসা ছাড়িয়াছিলেন তাঁহারা আবার তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অবশিষ্ট লোকদের ইচ্ছা হইলে তাঁহারাও চক্ষুলজ্জা পরিত্যাগ করিয়া ভিতরবাহিরের দ্বন্দ্ব লোপ করিতে পারেন।

আহ্‌মেদাবাদে গোপীনাথ সাহা-সম্পর্কীয় প্রস্তাবটির উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি। মহাত্মা গান্ধী এবিষয়ে কোন বক্তৃতা করেন নাই, এবং কোন পক্ষে ভোটও দেন নাই; তিনি, অন্য কেহ কোন্ পক্ষে ভোট দিবেন, তৎসম্বন্ধে কোন প্রভাবপ্রয়োগে যথাসম্ভব বিরত ছিলেন। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাত্মার প্রস্তাবের সংশোধক-স্বরূপ সিরাজগঞ্জের প্রস্তাবটা উপস্থিত করেন, এবং বক্তৃতাও করেন। মানুষের মনের ভাবকে গবর্ণ্‌মেণ্টের ও এংলোইণ্ডিয়ান্‌দের বিরুদ্ধে চালিত করিয়া স্বকার্য্য-সাধন একটা সাধারণ কৌশল। চিত্তরঞ্জন-বাবু এই কৌশল প্রয়োগ করেন; বলেন, এই উপলক্ষ্যে ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশ্যান্ প্রয়োগের ভয় দেখান হইয়াছে, অতএব সেই কারণেই, সেই ধমকের জবাবস্বরূপ, সভ্যদের সিরাজ-গঞ্জের প্রস্তাবটির পক্ষে ভোট দেওয়া উচিত। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিরুদ্ধ ভাবের সুযোগ গ্রহণ ছাড়া, পরোক্ষভাবে নিজে কমিটির সভ্যদের সমর্থন লাভ করিয়া নিঃশঙ্ক হইবার ইচ্ছা ও চেষ্টাও হয়ত ছিল। ইহাকে দয়ারস উদ্রেকের চেষ্টা বলা যায় কি না, ভাবিবার বিষয়।

তাহার পর চিত্তরঞ্জন-বাবু বলেন, যে, এবিষয়ে অনিষ্টকর আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হওয়ায় বঙ্গের হৃদয় বিক্ষুব্ধ হইয়াছে; অতএব, সভ্যগণের বঙ্গের মনোভাবের সহিত যদি কোন সহানুভূতি থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদের সকলের একমত হইয়া সংশোধক প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেওয়া উচিত। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের এরূপভাবে কথা বলিবার একটা অভ্যাস আছে, যেন তাঁহারা দেশের সমস্ত বা অধিকাংশ লোকের হৃদয়ের ও বিবেকের রক্ষী। আমরা বঙ্গের যে-সব কাগজ দেখিয়াছি, তাহার অধিকাংশ সিরাজগঞ্জ প্রস্তাবের প্রতিকূল সমালোচনা করিয়াছে। হইতে পারে, যে, তাহারা বাংলাদেশের মনের ভাব জানে না, বা জানিয়াও তাহা প্রকাশ করিবার সাহস তাহাদের নাই; কেবল স্বারাজ্যিকদেরই সেই জ্ঞান ও সাহস আছে; কিন্তু আমরা অন্য কাহারও প্রতিনিধিত্বের দাবী না করিলেও নিজের মন জানিবার অধিকার রাখি। সুতরাং বলিতেছি, অন্ততঃ একজন বাঙালী চায় নাই, যে, কেহ বাংলার মুখ চাহিয়া সিরাজগঞ্জ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়।

যাহা হউক, চিত্তরঞ্জন-বাবু পূর্ব্বোক্তরূপ ওকালতি করিবার পর ৭৮ জন মূল প্রস্তাবের ও ৭০ জন সংশোধনের পক্ষে ভোট দেয়। ইহা হইতে বুঝা যায়, যে, কংগ্রেসের অনেক মাতব্বর ব্যক্তির অহিংসায় বিশ্বাস গুল্ফ-গভীর।

একজন মহারাষ্ট্রীয় সভ্য ত মহাত্মাজীকে বিদ্রূপ করিয়া বলেন, যে, অহিংসাবিষয়ে মহাত্মার চরমপন্থিতা দেশের লোক গ্রহণ করিতে অসমর্থ, তিনি তাঁহার অসম্ভব সাত্বিকতা জোর করিয়া দেশের লোককে গিলাইতে চেষ্টা করিতেছেন।

মহাত্মা তাঁহার ইয়ং ইণ্ডিয়াতে আহ্‌মেদাবাদের অধিবেশন সম্বন্ধে যে-প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, যে, সিরাজগঞ্জ প্রস্তাবের পক্ষে ৭০জন মত দেওয়ার পর সভাস্থলে শোচনীয় লঘুচিত্ততার প্রাদুর্ভাব হয়, এবং তাহাতে তাঁহার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হয়। বস্তুতঃ যিনি একটি আদর্শের জন্য প্রাণপণ ও সর্ব্বস্বপণ করিয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়াছেন এবং কঠোর তপস্যা করিতেছেন, সেই আদর্শটি সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে তাঁহার তথাকথিত দলের লোকদের পরিহাস-উপহাসের বিষয় হইলে তাঁহার মর্ম্ম-বেদনা কল্পনা করিবার সামর্থ্যও সাধনাসাপেক্ষ।

বস্তুতঃ, যাঁহারা অহিংসায় বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদের সিরাজগঞ্জের মত এমন কোন প্রস্তাবে মত দেওয়া উচিত নয়, হিংসা-পরিহার ও অহিংস নীতির অনুসরণ জ্ঞাপন যাহার অংশ। পুরাপুরি হিংসা, বাহুবল ও অস্ত্রবলের সমর্থক কোন প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া তাহার পক্ষে ভোট দেওয়া, কিম্বা চুপ করিয়া থাকা তাঁহাদের উচিত। নতুবা কপটতা হয়, ভিতরে বাহিরে মিল থাকে না।

—

তেজ-বিকিরক পদার্থ

বর্ত্তমান সংখ্যায় "স্পর্শমণি" প্রবন্ধে ৪৬৯ পৃষ্ঠায় ভারতবর্ষে প্রাপ্তব্য যে-সব তেজ-বিকিরক পদার্থ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার ছবি এখানে দেওয়া হইল।

রিফ্‌ ও স্পেনীয়দিগের যুদ্ধ

সম্প্রতি রয়টারের তারের খবরে জানা গিয়াছে, যে, মরোক্কোতে স্পেনের সঙ্গে রিফ্‌দিগের যুদ্ধ হইতেছে। প্রথমে স্প্যানিয়ার্ডদের পরাজয় হইয়াছিল; তাহার পর

গয়া জেলায় প্রাপ্ত তেজ-বিকিরক খনিজ-খণ্ডসকল
(১) মোনাজাইট্, (২) মোনাজাইট্, (৩) মোনাজাইট্, (৪) মোনাজাইট্, (৫) পিচ ব্লেণ্ডে প্রাপ্ত পিচ্‌ব্লেণ্ড খনিজের স্পর্শচিত্র (contact photograph.)

নাকি তাহারা জিতিয়াছে। কিন্তু এখনও জয়-পরাজয় সম্বন্ধে নিশ্চয়, কিছু বলা যায় না। যুদ্ধ মধ্যে মধ্যে ৩।৪ বৎসর ধরিয়া হইতেছে।

রিফ্‌রা মরোক্কোর একটি জাতি। তাহারা গাজী আব্দল করিম্ নামক একজন শক্তিশালী ব্যক্তির নেতৃত্বে সাধারণ-তন্ত্র স্থাপন করিয়াছে। আব্দল্ করিমের এরূপ প্রতাপ, যে,

গাজী আব্‌দল করিম্
রিফিয়া সাধারণতন্ত্রের সভাপতি

রিফ্‌দের অধ্যুষিত ভূখণ্ডে চুরি-ডাকাতী-আদি নিবারিত হইয়াছে। তিনি সভ্যদেশসকলের শিক্ষিত ব্যক্তিদের ন্যায় জগতের নানা-বিষয়ক জ্ঞানে ওয়াকিব্ হাল্, এবং চলিত সব বিষয়ে জ্ঞানবত্তা ও বিচক্ষণতার সহিত কথোপকথন করিতে সমর্থ।

—

জমিদার ও রায়ৎ

সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের অধিবেশনে বাংলার রায়ৎদের স্বত্বসম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি ধার্য্য হয়।

১৫। যেহেতু বাঙ্গলার প্রজাগণ ন্যায়তঃ জমির মালিক হওয়া সত্ত্বেও প্রায় যাবতীয় স্বত্বাধিকার হইতে বঞ্চিত, সেই জন্য যতদিন পর্য্যন্ত জমির উপর যাবতীয় স্বত্বাধিকার সহ প্রজাগণকে গাছকাটা, দালান ইমারতাদি তৈয়ার করা, পুকুর, ইন্দারা খনন করা প্রভৃতির অবাধ অধিকার না দেওয়া হয়, ততদিন পর্য্যন্ত প্রজার মনে স্বরাজ লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকায়, এই সম্মিলন আশা করেন যে, বঙ্গদেশের সর্ব্ব শ্রেণীর প্রজাগণকে পুকুর ইন্দারা খনন, গাছ কাটা এবং দালান ইত্যাদি তৈয়ার করিবার ক্ষমতাসহ প্রকৃত মালিক বলিয়া স্বীকার করা হউক, এবং কোন স্থলেই খারিজ দাখিলের নজর পণের উপর শতকরা ২৲ টাকার বেশী না হয় তাহার ব্যবস্থা করা হউক।

রায়তদের ন্যায্য অধিকার সংরক্ষিত ও স্থাপিত হয় এবং অব্যাহত থাকে, ইহা আমরা খুবই বাঞ্ছনীয় মনে করি। সেই জন্য উপরের প্রস্তাবটিতে যে-যে দিকে প্রজার অধিকার স্থাপন বা বর্দ্ধনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সাধারণভাবে আমরা তাহার সমর্থন করি। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় জিনিষটিকে স্বরাজলাভের আকাঙ্ক্ষা জাগরণের সহিত না জড়াইলে ভাল হইত। দেশ যদি স্বাধীন থাকিত বা হইত, তাহা হইলেও প্রজাদের উক্ত অধিকারগুলি থাকা দর্‌কার হইত; পরাধীন অবস্থাতেও দর্‌কার আছে।

স্বরাজলাভের সঙ্গে প্রস্তাবটিকে জড়ানর ফলে জমিদার-সম্প্রদায়কে স্বরাজের বিরুদ্ধে চেষ্টা করিতে উত্তেজিত করা হইয়াছে—অবশ্য ইচ্ছা করিয়া নহে। কুমার শিবশেখরেশ্বর রায়ের চিঠি হইতে তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে।

প্রবাসী-সম্পাদকের জমিদারি ত নাই-ই, কোনপ্রকার রায়তী স্বত্বেও কোথাও একটুকু জমি নাই। সুতরাং এ-বিষয়ে কতকটা অপক্ষপাত বিচার করিতে পারা যাইবে!

অল্পসংখ্যক জমিদার ছাড়া, জমিদারশ্রেণী অপরের শ্রমের ফল শোষণ করিয়া আলস্যে, বিলাসে, অনেক স্থলে পাপাচরণে, কালযাপন করে, অত্যাচারও তাহাদের দ্বারা অনেক হয়। ইত্যাকার অনেক কথা আমরা অনেক বার বলিয়াছি। এখনও তাহার সমর্থন করি। কিন্তু রুশীয় বলশেভিক্ মত অনুসারে ভূম্যধিকারী শ্রেণীর লোপও আমরা বর্ত্তমান অবস্থায় চাহিতে ... স্বরাজ্যিকেরা চান, এরূপ ইঙ্গিতও আমরা করিতেছি না। সাধারণভাবে বিষয়টির আলোচনা করিতেছি। প্রবলতা-বশতঃ যাহারা অত্যাচার করে, মানব-

হিতৈষণা তাহাদের মধ্যে জাগিলে রক্ষার কাজও তাহারা ভাল করিতে পারে। জমিদারদের মধ্যে নারীনির্য্যাতক আছে জানি, কিন্তু নারীনির্য্যাতনের প্রতিকার করিবার ক্ষমতাও জমিদারশ্রেণীর আছে। হিন্দুমুসলমান উভয়বিধ কোন কোন জমিদার নারীনির্য্যাতন দমন চেষ্টায় যোগ দিয়াছেন। এক-এক জনের হাতে প্রভূত ধন সঞ্চিত হইলে তাহার অপব্যবহার হয় জানি, কিন্তু সুব্যবহার দ্বারা বৈজ্ঞানিক কৃষির প্রবর্ত্তন, স্বাস্থ্যের উন্নতি, শিক্ষার বিস্তার প্রভৃতি নানা কাজও তাহাদের দ্বারা হইতে পারে। দেশের কোন শ্রেণীর লোকেরই সুমতি হওয়া সম্বন্ধে নিরাশ হইলে চলিবে না। সুবুদ্ধি জাগাইবার চেষ্টা ক্রমাগত করিতে হইবে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের প্রস্তাবটিতে প্রজাদের যে-সব অধিকার সমর্থিত হইয়াছে, কিছু কাল পূর্ব্বে ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয় মফঃস্বল-ভ্রমণ করিয়া সঞ্জীবনীতে রায়তদের ঐসকল অধিকার আবশ্যক বলিয়াছিলেন। আমরা তখন তাহা ঠিক্ মনে করিয়াছিলাম।

—

সিদ্ধ নাগার্জ্জুনের ছবি

"স্পর্শমণি" প্রবন্ধের জন্য তাহার লেখক সিদ্ধ নাগার্জ্জুনের যে ছবি আঁকাইয়াছেন, বলা বাহুল্য, তাহা কল্পিত। তাহা চিত্রকলা-নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য অঙ্কিত হয় নাই। তির্য্যক্‌পাতন নামক রাসায়নিক প্রক্রিয়া সিদ্ধ নাগার্জ্জুন আবিষ্কার করিয়াছিলেন ও তাহার যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তাহা নাগার্জ্জুনের পশ্চাতে দক্ষিণ দিকে প্রদর্শিত হইয়াছে। বামদিকে, খনিতে প্রাপ্ত অশোধিত তাম্র গলাইয়া খাঁটি তামা বাহির করিবার প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাও নাগার্জ্জুনের উদ্ভাবন হওয়া অসম্ভব নহে। তিনি শিষ্যকে উপদেশ দিতেছেন, চিত্রে এইরূপ আঁকা হইয়াছে।

—

তারকেশ্বর-সম্বন্ধে তথ্য

"সঞ্জীবনী"র সম্পাদক সাংবাদিক সভার সভাপতি এবং সম্প্রতি উক্ত সভার পক্ষ হইতে তারকেশ্বর গিয়াছিলেন। তাঁহার কাগজে তারকেশ্বর-সমস্যা-সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা উক্ত বিষয়ে আমাদের মন্তব্য লেখা হইয়া যাইবার পর আমাদের চোখে পড়িয়াছে। তাহা হইতে আমরা অধিকাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

পাপের শাস্তি।

পাপের ভরা পূর্ণ হইয়াছে। নতুবা পিপীলিকার দংশনে মাতঙ্গ কখনও প্রাণভয়ে পলাইত না। যে-মোহন্তের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে প্রজাকুল সন্ত্রস্ত, নারীকুল ভীত, আজ সে দেশান্তরিত।......

মোহন্তকে দূর কর।

তারকেশ্বরের যাত্রীদের উপর কেবল মোহন্ত নয়, পাণ্ডা, দোকানদার, পূজারি সকলেই অত্যাচার করিয়াছে। মোহন্ত পলাতক, দোকানদার ও পূজারিদের বিষদন্ত ভগ্ন। এমন কি তাহারাও আজ শতমুখে মোহন্তের নিন্দা করিতেছে। তাহারাও বলিতেছে, মোহন্তকে দূর করিয়া দেও।

মোহন্তের অত্যাচারে প্রপীড়িত প্রজাগণের আর্ত্তনাদে আকাশ প্রকম্পিত হইতেছিল। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারে, অল্প লোকেরই তেমন সাহস ছিল। আজ কিন্তু ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সমস্ত প্রজা প্রকাশ্যভাবে বলিতেছে, মোহন্তকে সরাও।

নারীদের কথা কি বলিব? তাহারা লোকলজ্জা বিসর্জ্জন করিয়া অকুতোভয়ে মোহন্তের পাপলীলার রহস্য ব্যক্ত করিয়া বলিতেছে, উহাকে সবংশে সরাইয়া দেও। মোহন্তকে দূরীকরণ সম্বন্ধে দ্বিমত নাই, সুতরাং মোহন্তকে তারকেশ্বর পরিত্যাগ করিতেই হইবে।

ভলাণ্টিয়ার দল।

মোহন্তকে মঠচ্যুত ও জমিদারিচ্যুত করিবার জন্য তারকেশ্বর মঠের প্রতিষ্ঠাতার কতিপয় বংশধর ও হুগলী জেলার অপর কতিপয় ব্যক্তি হুগলীর জজ আদালতে এক মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের অর্থসম্পদ্ নাই, তাই বাদীদের মধ্যে শ্রীযুত জটাধারী সিংহ রায় কলিকাতা আসিয়া তারকেশ্বর-সম্বন্ধে সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণের নিমিত্ত কয়েকটি সভা করেন। সেই সভার কথা শুনিয়া স্বামী বিশ্বানন্দ তারকেশ্বর মঠ হইতে মোহন্তের অত্যাচার দমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হন ও মহাবীর দল গঠন করেন।

মহাবীর দল যে নিষ্পাপ হইয়া কার্য্য করিয়াছিল, তাহা বলা যায় না। কিন্তু তাহারা যে তারকেশ্বরের লোকদের ভয় ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মহাবীর দলে অনেক বেশ্যা ও দুরন্ত পুরুষ ভলাণ্টিয়ার হইয়াছিল। তাহাদের কার্য্যে তারকেশ্বরের অনেক লোক অসন্তুষ্ট হওয়াতে কংগ্রেস তারকেশ্বর আন্দোলনের ভার গ্রহণ করেন।

এখন তারকেশ্বরে পাঁচ দল ভলাণ্টিয়ার আছেন।

১। মহাবীর দল। ইহাঁদের সংখ্যা বেশী নয়। কিন্তু ইহাঁরাই মোহন্তের গদীতে বসিয়া যাত্রীদের নিকট অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকেন। ইহাঁরা যাহা সংগ্রহ করেন, তাহা কংগ্রেস আফিসে জমা দেন। কিন্তু

কত টাকা জমা দেন, তাহার রসিদ রাখেন না। হিসাব-সম্বন্ধে নিয়ম পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

২। মন্দির-রক্ষক ভলাণ্টিয়ার। ইঁহাদের অধিকাংশই ময়মনসিংহ ও মাদারীপুরের ভলাণ্টিয়ার। ইঁহাদের সবুজ রংএর সৈনিক পোষাক। হাফ্ প্যাণ্ট, কোট ও টুপি সবই সৈনিকধরণের।

পাছে হুগলী জজ আদালতের রিসীভার মন্দির দখল করেন, তাই এই ভলাণ্টিয়ারগণ মন্দিরের দ্বারে দিনরাত পালা করিয়া পাহারা দিয়া থাকেন।

৩। চাঁপদানি সেবা-সমিতি। সত্যাগ্রহীদিগকে লইয়া মোহন্তের বাড়ী দখল করিতে যাওয়া, ধৃত সত্যাগ্রহীর সহিত থানায় যাওয়া এবং থানা হইতে বন্দীদিগকে লইয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে গমন করা ও সহর পরিষ্কার রাখা ইহাদের কার্য্য। এই ভলাণ্টিয়ারদের অনেকেই অল্পবয়স্ক। তাহাদের অনেকেই বাঙ্গালা স্কুল বা ইংরেজী স্কুলের নিম্ন শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়া পাঠ সাঙ্গ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে একটি মুসলমান বালক আছে। সে পিতা-মাতার অনুমতি না লইয়া ভলাণ্টিয়ার হইয়াছে।

৪। সত্যাগ্রহী। মোহন্তের বাড়ী দখল করিতে যাইয়া জেলে গমন করাই ইহাদের কার্য্য। ইহাদের মধ্যে ভাল লোকের একান্ত অভাব। ইহাদের অধিকাংশ বালক ও অল্পবয়স্ক যুবক। ইহাদের অনেকের গাত্রেই খদ্দর দেখা যায় না। সত্যাগ্রহী অথচ খদ্দরধারী নহে।

৫। স্ত্রীলোক ভলাণ্টিয়ার। সংবাদপত্রে লেখা হয় মহিলা ভলাণ্টিয়ার। প্রকৃতপক্ষে কতকগুলি বেশ্যা, ও বাগ্দী ডোম প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকদ্বারা এই দল গঠিত। মন্দিরের দ্বারে দিনরাত বসিয়া থাকা ইহাদের কার্য্য। পাছে রিসীভার আসিয়া মন্দিরে প্রবেশ এবং মন্দির দখল করেন, তাই ইহারা দ্বারদেশে বসিয়া থাকে। স্ত্রীলোকদিগের গায়ের উপর দিয়া যাইতে রিসীভার সাহসী হইবেন না, তাই ইঁহারা দল বাঁধিয়া সারি সারি দ্বারে বসিয়া থাকে। এই স্ত্রীলোকদের সম্মুখে প্রথম দলের কতিপয় ভলাণ্টিয়ার দাঁড়াইয়া থাকে।

বেশ্যা ও অপর শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের ভলাণ্টিয়ার করা ভাল হয় নাই।

সৎকাজ।

আগে মন্দিরসংলগ্ন দুধ-পুকুরে স্ত্রী-পুরুষ যাত্রীরা একই ঘাটে, একত্র স্নান করিত। ভলাণ্টিয়ারগণ লম্বা বাঁশ দিয়া ঘাট দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। স্ত্রীলোকেরা উত্তরাংশে ও পুরুষেরা দক্ষিণাংশে স্নান করেন, কিন্তু পরস্পরকে বেশ দেখিতে পান। চেটাইএর বেড়া দ্বারা ঘাট দুই ভাগে এমন করিয়া পৃথক্ করা উচিত, যে, স্ত্রী পুরুষ পরস্পরকে যাহাতে স্নানের সময় দেখিতে না পান।

মোহন্তকে দূর করিবার উপায় কি ?

মোহন্তকে মন্দির হইতে দূর করিয়া তীর্থযাত্রীদের লাঞ্ছনা অপসারণ ও তীর্থক্ষেত্রের পবিত্রতা রক্ষা করার জন্য প্রথমতঃ চেষ্টা করা হয়; তার পর মোহন্তের বাড়ী দখল করার চেষ্টা হইতেছে।

শ্রীযুক্ত জটাধারী সিংহ রায় প্রভৃতি মোহন্তকে জমিদারি দেবোত্তর সম্পত্তি ও মন্দির হইতে চ্যুত করিবার জন্য হুগলী জজ আদালতে নালিশ করিয়াছেন। নালিশের চূড়ান্ত মীমাংসা অন্যূন ৭।৮ বৎসরের কমে হইবে না। তাই মোহন্তকে মন্দির ও বাজার হইতে সরাইবার জন্য রিসীভার নিযুক্ত করিতে বাদীগণ দরখাস্ত করেন। জজ সেই দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়া একজন পেন্সনপ্রাপ্ত প্রাচীন ব্রাহ্মণ সবজজকে রিসীবার নিযুক্ত করেন। কিন্তু মহাবীর দলের নায়ক স্বামী বিশ্বানন্দ ঘোষণা করিলেন, যে, রিসীবার একজন খৃষ্টান। এই অমূলক কথাতে তারকেশ্বরবাসীরা উত্তেজিত হইল। লোকে মনে করিল, রিসীভার মোহন্তেরই সহায়তা করিবে। স্বামী বিশ্বানন্দ মন্দির দখল করিয়া রাখিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া রিসীভারকে স্ত্রীলোক ভলাণ্টিয়ারের সহায়তায় বেদখল দিলেন।

এখন মন্দির কংগ্রেসের দখলে আছে।

রিসীভার একটা গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন। তিনি মোহন্তের একজন কর্ম্মচারীকে নিজের অধীনে কর্ম্ম দিয়াছেন। সুতরাং লোকে মনে করিতেছে, মোহন্তকে সহায়তা করাই রিসীভারের কার্য্য। এই ভ্রম শীঘ্র দূর করা উচিত।

আদালত রিসীভারকে মন্দির ও বাজার দখল করিতে আদেশ দিয়াছেন; রিসীভার এপর্য্যন্ত তাহা দখল করিতে পারেন নাই। বাদী পক্ষ ইহাতে বিস্মিত হইয়া বলিতেছেন, আদালত কি তাঁহাদের সহিত রহস্য করিতেছেন ?

মোহন্তকে সরাইবার জন্য নানা লোক নানা পরামর্শ করিতেছেন।

(ক) মোকদ্দমা করিয়া সরাইতে বহু বৎসর লাগিবে। কিন্তু যদি জমিদারি, দেবোত্তর সম্পত্তি, মন্দির প্রভৃতির কার্য্য পরিচালনার কোন একজন সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিকে রিসীবর নিযুক্ত করা হয়, তবে অবিলম্বে মোহন্তকে সম্পত্তিচ্যুত করা যাইতে পারে।

(খ) কেহ কেহ বলিতেছেন, সত্যাগ্রহ দীর্ঘকাল রাখিতে পারিলে মোহন্ত দূরে সরিয়া যাইবে। অনেকেই ইহা সম্ভব মনে করে না। সত্যাগ্রহ দীর্ঘকাল তিষ্ঠিতে পারিবে না। দ্বিতীয়তঃ, গবর্ণমেণ্ট তারকেশ্বরে পুলিশ ও স্পেশেল মাজিষ্ট্রেট রাখিয়াছেন; সেই ভয়ে মোহন্ত সত্যাগ্রহীদিগকে তাড়াইয়া দিতে পারিতেছে না। যদি গবর্ণমেণ্ট স্পেশেল পুলিশ ও মাজিষ্ট্রেটকে সরাইয়া নেন, তবে মোহন্তের দল ও সত্যাগ্রহী দলের মধ্যে রক্তারক্তি হইবে। তাহাতে বহু লোক মরিবে বটে, কিন্তু মোহন্তকে দূর করা যাইবে না।

(গ) তৃতীয় উপায়, একখানি আইন করিয়া নিষ্ঠাবান্ হিন্দু কমিটি দ্বারা মন্দির ও জমিদারি পরিচালন করা। ৩।৪ মাসের মধ্যে ব্যবস্থাপক সভায় এইরূপ এক আইন প্রণয়ন করা সম্ভব। গবর্ণমেণ্টও ইহা সমর্থন করিবেন।

মন্দির ও জমিদারির উপর একজন ন্যায়বান্ হিন্দুকে অবিলম্বে রিসীভার নিয়োগ করা ও ৩।৪ মাসের মধ্যে আইন প্রণয়ন করিয়া মন্দির ও জমিদারি পরিচালনের জন্য কমিটি গঠন করা, মোহন্তকে সরাইবার ইহাই শ্রেষ্ঠ উপায়।

—

সরকারী ও বে-সরকারী লোকদের কন্ফারেন্স

গত ৪ঠা ও ৫ই জুলাই কলিকাতায় সরকারী কৃষি, শিল্প, সমবায় এবং পশুচিকিৎসা বিভাগের সম্মিলিত কন্ফারেন্স্ বা আলোচনা- ও মন্ত্রণা-সভা হইয়াছিল। ইহাতে সরকারী কর্ম্মচারী ছাড়া বে-সরকারী ভদ্রলোকও কয়েকজন যোগ দিয়াছিলেন। ইহাতে অনেকগুলি প্রস্তাব

কার্য্য হয়। তদনুসারে কাজ হইলে দেশের উপকার হইবে, স্বীকার্য্য। কিন্তু আমাদের বে-সর্‌কারী অনেক সভা-সমিতির প্রস্তাবের মত, সর্‌কারী কন্‌ফারেন্সের প্রস্তাব-সকলও অনেক সময় ফলদায়ক হয় না। প্রস্তাব করিতে কিছু বাক্য, সময় ও কাগজ-কালী ব্যয় হয়; তাহা খরচ করা কঠিন নয়। কিন্তু কাজ করিতে হইলে অনেক টাকার দর্‌কার হয়। টাকার কথা উঠিলেই গবর্ণ্‌মেণ্ট বলেন, রাজকোষ শূন্য, তোমরা নূতন ট্যাক্স্ বা চাঁদা দ্বারা টাকা তুলিয়া কাজ চালাও। সাম্রাজ্য-বৃদ্ধি বা অন্য কোন মৎলবে যুদ্ধ করিতে হইলে টাকার অভাব হয় না; পুলিশের জন্যও টাকার অকুলান হয় না!

কন্‌ফারেন্সের দুটি প্রস্তাবের আমরা কিছু আলোচনা করিব।

একটি এই—

"এই কন্‌ফারেন্সের মতে, বিশেষরকমের সমবায়-সমিতি সকলের বিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য সর্‌কারী ঋণদান সম্বন্ধে উদার ও মুক্তহস্ত নীতি অবলম্বন, একান্ত আবশ্যক।"

আর-একটি এই—

"কৃষির উন্নতির জন্য জলসেচনের আবশ্যকতা, বিশেষতঃ পশ্চিম বঙ্গে, এই কন্‌ফারেন্স নির্ব্বন্ধ-সহকারে গবর্ণ্‌মেণ্টের গোচর করিতেছেন; এবং পশ্চিম বঙ্গে জলসেচনার্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের বিকাশ হওয়ায়, সমবায়-কর্ম্মচারীর সংখ্যাবৃদ্ধির, এবং যে-সব জেলায় এইরূপ বিকাশ হইতেছে বা হওয়া সম্ভবপর তথায় যোগ্য জলসেচন-এঞ্জিনীয়ার-নিয়োগের সমীচীনতাও এই কন্‌ফারেন্স্ গবর্ণ্‌মেণ্ট্‌কে বিশেষভাবে জানাইতেছেন।"

প্রথম প্রস্তাবটিতে যে-সকল বিশেষ রকমের সমবায়-সমিতির কথা বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে চাষের জমিতে জলসেচনের জন্য এবং স্নানপানাদির নিমিত্ত জল সর্‌বরাহের জন্য পশ্চিম বঙ্গে (যেমন বাঁকুড়ায়) পুরাতন পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করিবার ও ছোট নদীতে বাঁধ দিবার উদ্দেশ্যে যেসকল জলসেচন সমবায় সমিতি গঠিত হইয়াছে ও হইতেছে, তৎসমুদয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এইরূপ কোন কাজ করিতে হইলে কতকগুলি লোক অল্প অল্প চাঁদা দিয়া একটি সমিতি গঠন করেন ও তাহা রেজিষ্টারী-করেন। তাহার পর তাঁহারা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা ধার পান। এইপ্রকারে পুকুরের পঙ্কোদ্ধার এবং নদীতে বাঁধ দেওয়া হয়। গত বৈশাখের প্রবাসীতে আমরা চিত্রসহ জল সর্‌বরাহের এই সকল চেষ্টার কিছু বৃত্তান্ত দিয়াছি, এবং তাহাদের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা প্রদর্শন করিয়াছি। গত চৈত্রের প্রবাসীতে আমরা দেখাইয়াছি, যে, পশ্চিম বঙ্গের বাঁকুড়া, নদীয়া, মেদিনীপুর, প্রভৃতি কয়েকটি জেলায় বৃষ্টি খুব কম হয়, ও ফসলও সেইজন্য কম হয়। এইজন্য জলসেচনের বন্দোবস্তের খুব দর্‌কার আছে।

বৈশাখের প্রবাসীতে "বাঁকুড়ার উন্নতি"-নামক প্রবন্ধে আমরা লিখিয়াছিলাম:—

গবর্ণ্‌মেণ্ট্ একজন সুযোগ্য কৃষি ও জলসেচন এঞ্জিনীয়ার এবং তাঁহার অধীনে একজন সার্ভেয়ার নিযুক্ত করিয়াছেন বটে। কিন্তু আরও অনেক কর্ম্মচারী ও টাকা চাই। গ্রামে গ্রামে গিয়া সমিতি গঠন করিতে লোকদিগের প্রবৃত্তি উৎপাদন ও তাহাদের দ্বারা সমিতি গঠন করাও দর্‌কার। তাহার জন্য অনেক লোক চাই। যতগুলি ছোট নদীতে সম্বৎসর জল বহে, তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান জরিপ করিয়া বাঁধের নক্‌সা-আদি প্রস্তুত করিবার জন্য আরো সার্ভেয়ার্ চাই। তা ছাড়া কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলি যাহাতে সমবায়সমিতিগুলিকে ঋণ দিবার জন্য যথেষ্ট টাকা পায়, তাহার বন্দোবস্তও চাই।........"

ইহা হইতে দৃষ্ট হইবে, যে, কন্‌ফারেন্সে যে-দুটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহার প্রয়োজনীয়তা আমরা আগেই দেখাইয়াছিলাম। বাঁকুড়ার লোকেরা যে স্বাবলম্বন দ্বারা কিছু করিয়াছে, তাহা লর্ড লিটন্‌ও স্বীকার করিয়াছেন। আমরা বৈশাখের প্রবাসীতে লিখিয়াছিলাম:—

"গত জানুয়ারী মাসে লাট্ লিটন্ বাঁকুড়া দেখিবার পর তথাকার ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত ব্রজদুর্ল্লভ হাজরা মহাশয়কে চিঠি লিখিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, যে, জল সর্‌বরাহ-সমবায়-সমিতির কাজগুলি উৎসাহজনক। এই সকল সমিতির সভ্যেরা দেখাইয়াছেন, যে, দরিদ্র জনসমষ্টিদ্বারাও কিপ্রকারে ধন উৎপন্ন হইতে পারে, এবং আমি আশা করি, যে, তাহাদের দৃষ্টান্ত ব্যাপকভাবে অনুসৃত হইবে। আমি পূর্ব্বে কোন কোন উপলক্ষ্যে বলিয়াছি, যে, স্থানীয় লোকেরা যে-পরিমাণ চেষ্টা করে, গবর্ণ্‌মেণ্টের সাহায্য সেই অনুপাতে হওয়া উচিত; এই নীতি-অনুসারে বাঁকুড়ার লোকেরা গবর্ণ্‌মেণ্ট্ সাহায্যের উপর বলবৎ দাবী স্থাপন করিয়াছেন। আমি এই প্রশংসনীয় চেষ্টা ভুলিব না, এবং দেখিব, যে, ইহা যথাযোগ্য উৎসাহ লাভ করে।"

ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে লিখিত লর্ড লিটনের চিঠির এই আংশিক অনুবাদ ছাপিয়া আমরা বৈশাখে লিখিয়াছিলাম, "লর্ড লিটন্ তাঁহার অঙ্গীকার-অনুসারে বাঁকুড়াকে সর্‌কারী

সাহায্য দিতে বাধ্য।" এখন আবার সেই কথা বলিতেছি। গবর্ণমেণ্টকে ভিক্ষা দিতে বলিতেছি না; কন্‌ফারেন্সে গৃহীত প্রস্তাব-অনুসারে সরকারী ঋণ যথেষ্টপরিমাণে দিতে বলিতেছি। সেই ঋণ লোকেরা সুদসহ শোধ করিবে; এ পর্য্যন্ত করিয়াছেও। দুর্ভিক্ষ হইবার পর ভিক্ষায় ও ঋণদানে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করা অপেক্ষা আগে হইতে দুর্ভিক্ষ-নিবারণের জন্য জলসেচনার্থ অর্থব্যয় যে শ্রেয়ঃ, তাহাও আমরা বৈশাখের কাগজে দেখাইয়াছি। যথা—

"গত দশ বৎসরে বাঁকুড়ায় দুইবার দুর্ভিক্ষে সরকারকে সাড়ে তের লক্ষ টাকা খরচ করিতে হইয়াছে। ইহা কেবল অন্নদান-আদির ব্যয়। এ-টাকা আর সরকারী তহবিলে ফিরিয়া আসিবে না। তা ছাড়া দু বারে ষোল লক্ষ টাকা কৃষি-ঋণ দিতে হইয়াছে। ঋণের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা কেবল দানের টাকাটার বিষয়েই বলিতেছি। কয়েক বৎসর অন্তর দুর্ভিক্ষ বাঁকুড়ায় প্রায়ই হয়। তাহা নিবারণের জন্য দুইবারে সরকারী তহবিল হইতে যে সাড়ে তের লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছে, তাহার একটি পয়সাও ফিরিয়া আসিবে না। কিন্তু যদি, ঐ সাড়ে তের লক্ষ বা দশ লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কে মজুদ রাখিলে তাহার যত সুদ হইত, বৎসর বৎসর সেইপরিমাণ টাকা জল-সরবরাহ-সমিতি স্থাপন ও তাহাদের সাহায্যার্থ গবর্ণমেণ্ট ব্যয় করেন, তাহা হইলে মূলধনটাও বজায় থাকে, এবং বাঁকুড়া জেলায় দুর্ভিক্ষও আর হয় না। লর্ড লিটন্ তাঁহার অঙ্গীকার অনুসারে বাঁকুড়াকে সরকারী সাহায্য দিতে বাধ্য। সাহায্য করিবার যে উপায় আমরা নির্দ্দিষ্ট করিলাম, তাহা তিনি বিবেচনা করিয়া দেখুন।"

জলসেচন-সমিতি-গঠন-সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের সহিত যতটুকু সম্বন্ধ রাখা দরকার, তাহা যে অসহযোগীদেরও রাখা উচিত, এবং তাঁহারা নিজ-নিজ অন্য প্রয়োজনবশতঃ সেরূপ সম্বন্ধ যে রাখেন, তাহাও আমরা বৈশাখের প্রবাসীতে দেখাইয়াছিলাম। দুঃখের বিষয়, জলসেচন সম্পর্কে, আমরা যত দূর জানি, কংগ্রেস্-নেতারা বাঁকুড়ার লোকদিগকে উপদেশ দান, প্রবৃত্তি জন্মান, কিম্বা তদপেক্ষা বেশী কোন সাহায্য করেন নাই। আমাদের বৈশাখের লেখার কোন প্রতিবাদও হয় নাই। তাহার পর ত স্বরাজ্যদল দস্তুরমত গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতা করিয়াছেন। সম্প্রতি দেখিলাম, বাঁকুড়ার স্বরাজ্য-নেতা শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় মহাশয় ১৯শে আষাঢ়ের "সারথি"তে লিখিয়াছেন :—

"নিজে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া অন্ততঃ বাঁকুড়া জিলা সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা হইয়াছে, যে, দেশের অধিকাংশ লোককে খদ্দর পরাইতে হইলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন। (১) চাষের জন্য সুচারুরূপে জলসেচনের ব্যবস্থা করিতে হইবে, (২) উন্নত প্রণালীতে কার্পাস-চাষ শিক্ষা দিতে হইবে, (৩) বিলাতী ও মিলের বস্ত্রের উপর অতিরিক্ত টেক্স বসাইতে হইবে।"

যদি অনিলবরণ-বাবুর এই অভিজ্ঞতা আগে হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি ও তাঁর সহকর্ম্মীরা লোকদিগকে জলসেচন-সমিতি গঠন করিতে কেন উপদেশ দেন নাই, তাহা ভাবিয়া দেখিবেন। আর যদি অভিজ্ঞতা সম্প্রতি জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে আশা করি এখন তাঁহারা হয় সম্পূর্ণ বেসরকারী জলসেচনের ব্যবস্থা করিবেন, কিম্বা গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থার সুযোগ ও সুবিধা লইয়া জলসেচন-সমিতি গঠন করিতে "গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া" লোকদিগকে উপদেশ দিবেন।

—

নারীনির্য্যাতন

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনে নারীনির্য্যাতন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছে :—

যেহেতু দেশের বিভিন্ন স্থানে দুর্ব্বৃত্তগণ-কর্তৃক নারীজাতি অবমানিতা ও নির্য্যাতিতা হইতেছেন, সেই হেতু এই সম্মিলন বিভিন্ন জিলা সমিতি ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিকে অনতিবিলম্বে এরূপ উপায় অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিতেছে, যাহাতে নারীজাতির উপর ভবিষ্যতে অত্যাচার ও অনাচার অনুষ্ঠিত না হইতে পারে।

এখন যে-দল বাংলার কংগ্রেস্-প্রতিষ্ঠানগুলি দখল করিয়া আছেন, তাঁহারা এই প্রস্তাব অনুসারে কি কাজ করিয়াছেন, অবগত নহি। কাজটিতে হুজুক, হাততালি বাহবা ইত্যাদি নাই, এবং ইহার দ্বারা দলের ভাণ্ডারে অর্থাগমেরও সম্ভাবনা নাই। সুতরাং ইহা অবহেলিত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

অবশ্য ইহা ঠিক্, যে, কোন একটি প্রতিষ্ঠান দ্বারা নারীর উপর অত্যাচারের সম্পূর্ণ প্রতিকার হইবে না কিন্তু অনেকটা হইতে পারে।

নারীকে পুরুষ যে-চোখে সাধারণতঃ দেখে, তাহার পরিবর্ত্তন আবশ্যক। নারীদেরও এরূপ শিক্ষা ও সাহসবৃদ্ধি চাই, যাহাতে তাঁহারা পুরুষদের শ্রদ্ধা আদায় করিতে এবং আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হন। পুরুষদের মধ্যে অনেকে নিজে ত নারীনির্য্যাতন করিতে চানই না, বরং অত্যাচার দমন করিতেই ইচ্ছুক। কিন্তু তাঁহাদের এবিষয়ে যথেষ্ট মনো-

যোগ নাই, অনেকের সাহস নাই, এবং এই একান্ত-আবশ্যক সৎকাজটির জন্য সুশৃঙ্খল দলবদ্ধতা নাই। দু-চার জন দুর্ব্বৃত্তের ভয়ে শতশত লোক শঙ্কিত থাকে, কারণ দুর্ব্বৃত্তেরা মন্দ কাজের জন্য কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় 'মরিয়া', কিন্তু ভালমানুষেরা সৎকাজের জন্য 'মরিয়া' নহেন।

খবরের কাগজে নারীনির্য্যাতনের যত খবর বাহির হয়, তাহার অধিকাংশে অত্যাচারী পুরুষরা মুসলমান, নির্য্যাতিতারা হিন্দু। কিন্তু হিন্দুরমণীর উপর হিন্দুর অত্যাচার এবং মুসলমান রমণীর উপর মুসলমান পুরুষের অত্যাচারের বৃত্তান্তও মধ্যে-মধ্যে দেখা যায়। বেশীর ভাগ খবরে অত্যাচারীরা মুসলমান, এবং অধিকাংশ খবরের কাগজ হিন্দুদের; ইহা হইতে মনে হইতে পারে, যে, ব্যাপারটি হিন্দু বনাম মুসলমান। কিন্তু তা নয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মুসলমান স্ত্রীলোকের উপরও অত্যাচার হয়। তবে, অত্যাচারীদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা বেশী বটে; কোথাও কোথাও তাহারা দল বাঁধিয়া প্রকাশ্যভাবে দিনে-দুপরে হিন্দু নারী হরণ করে; এবং ইহাও দেখা যায়, যে, যখনই হিন্দু-মুসলমানে মনকষাকষি হয়, যেমন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ও স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইয়াছিল এবং বর্ত্তমানে "প্যাক্টের" চাকরী ভাগ লইয়া হইয়াছে, তখনই নারীনির্য্যাতন বাড়ে। ইহার কারণ কি, তাহা দেশহিতৈষী ও মোস্‌লেমসম্প্রদায়-হিতৈষী মুসলমান-নেতারা অনুসন্ধানপূর্ব্বক স্থির করিলে ভাল হয়। আমাদের মনে হয়, এইরূপ কুকাজের বিরুদ্ধে মুসলমান-সমাজে লোকমত প্রবল নহে, এবং যথেষ্ট সামাজিক শাসন নাই। এবিষয়ে উন্নতি বাঞ্ছনীয়। কারণ, অত্যাচার দমন না হইলে হিন্দুসমাজের ক্ষতি, মুসলমান-সমাজের ক্ষতি, সমুদয় জাতির ক্ষতি।

কোন কোন মুসলমান কাগজে এইধরণের লেখা দেখা যায়,যে,যেহেতু হিন্দু সমাজে অনেক যুবতী বিধবা আছেন, এবং তাঁহারা অসূর্য্যম্পশ্যা নহেন, সেই কারণে কোন কোন শ্রেণীর মুসলমানদের দুষ্প্রবৃত্তি উত্তেজিত হওয়ায় তাহারা এইরকম কাজ করে। বালিকা ও তরুণীদের চির-বৈধব্যের বিরুদ্ধে আমরা অনেক লিখিয়াছি, ভবিষ্যতেও লিখিব। কিন্তু বিধবার অস্তিত্ব দ্বারা বদ্‌মাইস্‌দের কাজ সমর্থিত কিম্বা তাহার গর্হিততার লাঘব হইতে পারে না। তাহা হইলে বলিতে হয়, যেহেতু অলঙ্কারের দোকানে মূল্যবান্ জিনিষ থাকে, সেই জন্যই লোভের বশবর্ত্তী হইয়া গুণ্ডারা তাহা লুট করে। এপ্রকার যুক্তিতে দোষটা দুর্বৃত্ত লোকদের স্কন্ধ হইতে সম্পূর্ণ বা অনেকটা অন্যের স্কন্ধে ফেলা হয়।

তা ছাড়া, ইহা সত্যও নহে, যে, কেবল বিধবাদের উপরই অত্যাচার হয়। সধবারাও তাহাদের বাড়ী হইতে স্বামী ও অন্যান্য আত্মীয়ের নিকট হইতে হৃত হন। আত্মীয়দের নারীরক্ষায় অক্ষমতা লজ্জার বিষয় সন্দেহ নাই; কিন্তু গুণ্ডাদেরও ইহা গৌরবের বিষয় নহে।

আমাদের মনে হয়, মুসলমান সমাজে সুশিক্ষার বিস্তার হইলে কিছু প্রতিকার হইবে; তাঁহাদের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হইলে আরো অধিক প্রতিকার হইবে। বহুবিবাহ যে-কোন সমাজে প্রচলিত থাকে, তথায় নারীদের সম্বন্ধে ধারণা হীন হয়। শিক্ষিতা নারীরা ইহা সহ্য করেন না। এইজন্য স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হইলে বহুবিবাহও কমে ও পরে লোপ পায়। তুরস্কের লোকেরা মুসলমান, মুসলমান শাস্ত্র-অনুসারে বহুবিবাহ করা চলে; কিন্তু তথাপি স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি- ও বিস্তার-বশতঃ তুরস্কে বহুবিবাহ প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। স্ত্রীশিক্ষা হইতে নানা সুফল উৎপন্ন হইবে বলিয়া আমরা সরকারী শিক্ষারিপোর্টে দেখিয়া সুখী হইয়াছি, যে, মুসলমান সমাজে স্ত্রীশিক্ষার দ্রুত বিস্তৃতি হইতেছে।

হিন্দুধর্ম্ম-অনুসারে ও হিন্দুসমাজে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু নানা কারণে উহা অপ্রচলিত হইয়া আসিতেছে। মুসলমান-সমাজেও তাহা হইবে।

নারীনির্য্যাতন-সমস্যাকে হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়ার নূতন একটা কারণ করিলে, হিন্দু বা মুসলমান কাহারও লাভ নাই, অধিকন্তু তাহাতে স্ত্রীলোকদের বিপদ্ বাড়িবে। জেদ্-বশতঃ দুর্বৃত্তেরা সর্ব্বদা অত্যাচারের সুযোগ অন্বেষণ করিবে। লাভের মধ্যে ইংরেজ আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা ও সুবিধা বাড়িবে।

হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়া ব্যাপকভাবে দেশময় বিস্তৃত হইলে হিন্দুরাই নিশ্চিত হারিবে, এমন বলা যায় না। ভারতবর্ষে হিন্দুদের সংখ্যা বেশী, এবং তাহাদের সাহসও

যে জন্মিতে পারে, ইংরেজ রাজত্বের পূর্ব্বে হিন্দুপ্রাধান্য তাহার প্রমাণ।

কিন্তু এই সমস্যাটির সমাধান বলের ন্যূনাধিক্যতার উপর দাঁড় করাইতে চাই না। নারী-সম্বন্ধে সামাজিক আদর্শ যে-যে উপায়ে উন্নত হইতে পারে, সেইসব উপায় অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ মনে করি। নারীর রক্ষার জন্য পুরুষেরা প্রাণপণ করেন, ইহাই প্রার্থনীয়। সর্ব্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় নারীদের আত্মরক্ষার ক্ষমতা-বৃদ্ধি।

মুসলমানদের শাস্ত্র- ও সাহিত্য-সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি সামান্য। কিন্তু শিক্ষিত মুসলমানেরা, বিশেষতঃ শিক্ষিতা মুসলমান মহিলারা, নিশ্চয়ই তাহা হইতে নারীর প্রতি শ্রদ্ধাসূচক উক্তি ও ঘটনা সংগ্রহ করিতে পারিবেন। দুর্বৃত্তদের কাজের সাফাই অন্বেষণ না করিয়া এইসকল উক্তি ও ঘটনার বহুলপ্রচার দ্বারা সামাজিক ও নৈতিক উন্নতি বিধানের চেষ্টা করিলে মুসলমান সাংবাদিকেরা স্বসম্প্রদায়ের ও স্বদেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিতে পারিবেন।

ভূপালের বেগম্ সাহিবার একখানি উর্দ্দু বহির ইংরেজী অনুবাদে প্রথম পড়িয়াছিলাম, যে, হজরৎ মোহাম্মদের মতে স্বর্গ জননীর পদতলে। তাহার পর এই উক্তি "মিশ্‌কাৎ-উল্-মসাবীহ্" নামক গ্রন্থের কোন কোন অংশের পাদ্রী গোল্ডস্যাক্ কর্ত্তৃক ইংরেজী অনুবাদে দেখিয়াছি। কিছুদিন পূর্ব্বে পূর্ব্ব-আফ্রিকায় আরবদিগের দ্বারা এক সভায় অভিনন্দিতা হইয়া শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এই উক্তির উল্লেখ করিয়া নিজের মাতৃত্বের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেন। যাঁহাদের শাস্ত্রে মাতার এত সম্মান, মাতৃজাতির লাঞ্ছনা তাঁহাদের কাহারও দ্বারা হওয়া উচিত নয়।

"মিশ্‌কাৎ-উল্-মসাবীহ্"-পুস্তকের কয়েকটি উক্তির ইংরেজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি।

It is related from Jábir that, 'the prophet said, "Do not visit those women whose husbands are absent; for verily Satan circulates in every one of you like the circulation of blood." We replied, "And in thee also, O Apostle of God?" He said, "And in me also, but God has aided me against him so that I am secure."—*At Tirmidhi.*

It is related from Abú Hurairah that, 'The Apostle of God' said, "A widow shall not be married until she be consulted; and a virgin shall not be married until her consent be asked."—*Muslim, At Bukhari.*

—

আশুতোষের স্মৃতি-রক্ষা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে-সব কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার স্মৃতি রক্ষিত হইবে বটে। কিন্তু একথা ত প্রত্যেক বিখ্যাত লোকের পক্ষে সত্য। তথাপি অনেকের স্মৃতিরক্ষার নিমিত্ত নানা উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। আশুতোষের জন্যও তাহা করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে কলিকাতার সর্ব্বসাধারণের সভায় বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজকে সভাপতি করিয়া এক কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। কলিকাতার এই সভায় সভাপতিরূপে লর্ড লিটন্ বলেন, যে, যে-সকল প্রতিষ্ঠান আশুতোষের স্মৃতিরক্ষা করিতে চান, তাঁহারা তাহা পৃথক্ পৃথক্ না করিয়া একযোগে করিলে তাঁহার উপযোগী স্মারক কিছু করা যাইবে, নতুবা না যাইতেও পারে। ইহা ঠিক্ কথা। উচ্চ শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের যে পোষ্ট-গ্রাজুয়েট্ বিভাগ আছে, তাহারই সম্পর্কে কিছু করিয়া, জ্ঞানবিস্তার ও গবেষণার সুবিধা করিয়া দিতে পারিলে তাহাই আশুতোষের যোগ্যতম স্মারক হইবে।

—

বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারী সাহায্যদান

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত উপাধিদান সভায় লর্ড লিটন্ বলিয়াছেন, যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বজেটে যত টাকা ঘাটতি পড়িয়াছে, তাহা গবর্ণমেণ্ট্ দিবেন; কেবল বিস্তারিত হিসাবের অপেক্ষা।

গবর্ণমেণ্ট্ এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারিলে এবং অপব্যয়-নিবারণের বন্দোবস্ত বিশ্ববিদ্যালয় করিতে পারিলে, ইহাতে দেশের কল্যাণ হইবে।

গবর্ণমেণ্ট্ এখনও এই টাকাটি মঞ্জুরীর জন্য সপ্লিমেণ্টারী ডিম্যাণ্ড্ বা প্রপূরক দাবীর অন্তর্ভূত করেন নাই। ভবিষ্যতে যখন করিবেন, তখন অসহযোগী নামে পরিচিত ব্যবস্থাপক সভার সভ্যেরা কি করেন, দ্রষ্টব্য। তাঁহারা

গোলামখানা ভাঙ্গিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, শিক্ষাপরিদর্শকদের বেতন বাবতে দাবী মঞ্জুর করেন নাই; বিশ্ববিদ্যালয়কে এখন তাঁহারা কি নজরে দেখিবেন, আগে হইতে বলা যায় না। যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে কিছু বলিলে-করিলে তাঁহাদের দলের জনবল ও ধনবল বাড়িবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য দিতে তাঁহারা নিশ্চয়ই রাজি হইবেন।

—

আম্‌দানী কাগজের উপর সংরক্ষণ-শুল্ক

পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের জন্য যখন কোন দেশে প্রথম-প্রথম কারখানা স্থাপিত হয়, তখন তাহা, যে-সব দেশে ঐরূপ কারখানা প্রভৃতি মূলধন ও বিশেষজ্ঞদিগের সাহায্যে অনেক দিন হইতে চলিতেছে, তাহার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। সেইজন্য বিদেশ হইতে আম্‌দানী পণ্যের উপর ট্যাক্স্ বসাইয়া উহার দাম এত বাড়াইয়া দেওয়া হয়, যে, দেশী জিনিষ তখন উহার সহিত টক্কর দিতে সমর্থ হয়। ফলে, ঐ পণ্যদ্রব্য বিদেশ হইতে যত সস্তায় আগে পাওয়া যাইত, শুল্ক বসাইবার পর তার চেয়ে বেশী দামে ঐ জিনিষ, দেশী ও বিদেশী দুই-ই, কিনিতে হয়। তথাপি, এই বেশী দাম দেওয়া সার্থক এইজন্য মনে করা হয়, যে, দেশে একটি নূতন পণ্যশিল্প তদ্দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাতে অনেক দেশী মূলধন খাটে, অনেক দেশী লোক বড় ও ছোট কাজ পায়, অনেক শ্রমজীবীর অন্ন হয়, এবং মোটের উপর পূর্ব্বাপেক্ষা দেশে অধিক ধন উৎপন্ন হওয়ায়, তাহা অল্লাধিক পরিমাণে সকলের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে।

কিন্তু এইসব সুফল লাভ করিতে হইলে দেখিতে হইবে, যে, আম্‌দানী দ্রব্যের উপর পণ্যশুল্ক স্থাপন করিয়া যে পণ্যশিল্প ও কারখানাকে দাঁড় করাইবার চেষ্টা হইতেছে, তাহা বাস্তবিক দেশী নামের যোগ্য কিনা। কোন কারখানা ভারতবর্ষে অবস্থিত হইলেই তাহা ভারতীয় বা দেশী, হয় না। দেখিতে হইবে, যে, ঐ কারখানার মালিক কাহারা, মূলধন কাহাদের, পরিচালক ও উচ্চপদস্থ বিশেষজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মচারী কোন্ দেশের লোক, এবং আপাততঃ উহাতে, দেশী বিশেষজ্ঞের অভাবে, বিদেশী লোক রাখিতে হইলেও, দেশী লোকদিগকে সবরকম কাজ শিখাইবার জন্য শিক্ষানবীস্ লওয়া হয় কি না। এইসকল বিষয়ে কারখানাটি পূর্ণমাত্রায় দেশী হইলে, সংরক্ষণ-শুল্ক স্থাপনের সমর্থন করা যায়; অন্ততঃ রকম বার আনা হইলেও করা যায়। কিন্তু বেশীর ভাগ মূলধন ও পরিচালক এবং বিশেষজ্ঞ বিদেশের হইলে, সংরক্ষণ-শুল্কের সমর্থন কোন মতেই করা যায় না।

বিদেশ হইতে আগত দিয়াশলাইয়ের উপর কর আছে। সেই সুযোগে সুইড ও ইংরেজেরা বিস্তর মূলধন সংগ্রহ করিয়া ভারতবর্ষে চারিটা বড় কারখানা করিতেছে। তাহাতে লাভ এই হইবে, যে, দেশী দিয়াশলাইয়ের কারখানাগুলি নষ্ট হইবে, নূতন দেশী দিয়াশলাই কারখানা স্থাপিত হইবে না, অথচ আমাদিগকে বেশী দামে দিয়াশলাই কিনিতে হইবে। কিন্তু যদি আইন এইরূপ হইত, যে, দিয়াশলাইয়ের ও অন্য সব রকম জিনিষের কারখানার মূলধন শতকরা ৭৫৲ টাকা দেশী লোকের হওয়া চাই, পরিচালকদের তিন-চতুর্থাংশ দেশী হওয়া চাই, সবরকম কাজ চালাইবার জন্য যথাসম্ভব দেশীলোক রাখা চাই, সবরকম কাজ শিখাইবার জন্য দেশী শিক্ষানবীস্ রাখা চাই, এবং দিয়াশলাইকাঠের গুঁড়ি প্রভৃতি বিদেশ হইতে আসিলে তাহার উপরও ট্যাক্স্ দিতে হইবে, তাহা হইলে দেশে ভারতীয়দের দিয়াশলাইয়ের কারখানা স্থাপিত হইতে ও টিকিতে পারিত।

ভারতে স্থাপিত কাগজের কারখানাগুলি যে সংরক্ষণ চাহিয়াছে, তাহার ঔচিত্য বিচার করিতে হইলে এইসব কথা মনে রাখিতে হইবে। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। রাণীগঞ্জে কাগজ তৈয়ার করিবার জন্য বেঙ্গল পেপার মিল্‌স্ আছে। উহার মূলধনের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র দেশী। পরিচালক চারিজনের মধ্যে মাত্র একজন দেশী। সবরকম কাজ শিখাইবার জন্য দেশী শিক্ষানবীস্ নাই। এই কারখানার পক্ষে যে ইংরেজ ট্যারিফ্ বোর্ডের (সংরক্ষণ-শুল্ক-সমিতির) সমক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাঁহার মতে দেশী যুবকেরা, ভাল করিয়া কাজ শিখিবার জন্য যতদিন শিক্ষা করা দরকার, ততদিন শিক্ষা করে না, কিম্বা কাগজের কাজটাই শিখিতে চায় না, কিম্বা তাহা শিখিবার যোগ্যতাই তাহাদের নাই। অথচ জেরায় তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হন, যে, একটি দেশী যুবক ১৮মাস শিখিবার পর আসাম গবর্ণমেণ্ট্ কর্ত্তৃক তাঁহাদের বিশেষজ্ঞের পদ পাইয়া রাণীগঞ্জ হইতে গিয়াছেন! মোটকথা, রাণীগঞ্জের কাগজের কারখানায় শিক্ষানবীস্ নাই। মূলধনের অংশ ও পরিচালকদের সংখ্যা বিবেচনা করিয়াও ইহাকে দেশী বলা যায় না। সুতরাং এরূপ কারখানার সুবিধার জন্য আমরা দেশী ও বিদেশী কাগজের বেশী দাম দিতে প্রস্তুত নহি।

কাগজের দাম বাড়িলে পুস্তক, মাসিক ত্রৈমাসিক পত্র, ও খবরের কাগজের ব্যয় ও মূল্য বাড়িবে; যদি দাম না বাড়াইয়া বর্ত্তমান মূল্যেই বেচিতে হয়, তাহা হইলে নিকৃষ্ট কাগজ ব্যবহার করিতে হইবে। তাহাতে

ছাপা ভাল হইবে না, এবং চক্ষুর ক্ষতিও হইবে। অধিকন্তু কাগজ নিকৃষ্ট হওয়ায় পুস্তক সাময়িক পত্রসকল বাঁধাইয়া রাখিলেও কয়েক বৎসরের মধ্যে নষ্ট হইয়া যাইবে। মোট-কথা, কাগজের মূল্য-বৃদ্ধি জ্ঞানবিস্তার ও শিক্ষা-বিস্তারের সাহায্য না করিয়া উহাতে বাধা জন্মাইবে।

চিঠির ও পুস্তকের পুলিন্দার ডাকমাশুল দ্বিগুণ হইয়াছে, অল্প টাকার ভ্যালুপেয়েব্‌ল্ পুলিন্দার কমিশন দ্বিগুণ হইয়াছে, সমুদয় ভ্যালুপেয়েবল্ পুলিন্দা রেজিষ্টারি করিতে হয়। ইহাতে জ্ঞানবিস্তার ও শিক্ষাবিস্তারের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে, এবং প্রকাশকদের ব্যবসার ক্ষতি হইয়াছে। ইহার উপর কাগজের দাম বাড়িলে আরও বাধা জন্মিবে।

যদি কাগজের কলগুলি লক্ষ্ণৌয়ের কলের মত দেশী হইত, তাহা হইলেও বা আমরা কিছু দিনের জন্য বেশী দামে কাগজ কিনিতে রাজী হইতাম। কিন্তু ভারতে প্রতিষ্ঠিত বিদেশী বণিক্‌দিগকে ভারতের অর্থ-শোষণে সাহায্য করিবার জন্য আমরা আম্‌দানী কাগজের উপর পণ্যশুল্ক বসাইবার প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারি না।

—

আলাদিনের ছবি

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত আলাদিনের যে ছবির প্রতিলিপি আমরা এবার দিলাম, তাহা আলাদিনের গল্পের কোন ঘটনার নহে। আলাদিন্ পর্ব্বতগুহায় এক রহস্যময় আলোকের মধ্যে রহিয়াছে, ইহাই তিনি আঁকিয়াছেন।

—

মন্ত্রীদের বেতনের প্রস্তাব স্থগিত

বাংলার মন্ত্রীদের বেতন মঞ্জুরীর প্রস্তাব গবর্ণমেণ্ট্ আবার কৌন্সিলে পেশ করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীযুক্ত কুমুদশঙ্কর ও কিরণশঙ্কর রায় এবিষয়ে হাইকোর্টে মোকদ্দমা করায় বিচারপতি চারুচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের আদেশে প্রস্তাব উপস্থিত করা স্থগিত আছে। গবর্ণ্মেণ্ট্ পক্ষ হইতে ইহার বিরুদ্ধে আপীল হইয়াছে।

প্রস্তাবটি স্থগিত রাখিবার আদেশ হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট কৌন্সিলের অধিবেশনই স্থগিত রাখিয়াছেন। তাহা করা ঠিক্ হয় নাই। কারণ এই প্রস্তাবটি ছাড়া কৌন্সিলের আরও বিস্তর কাজ ছিল। তাহাতে অকারণ বিলম্ব ঘটান অনুচিত হইয়াছে। চটিয়া হঠাৎ কোন কাজ করা বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞতার পরিচায়ক নহে।

—

পতিতাদের কবল হইতে বালিকাদের উদ্ধার

পতিতাদের গৃহে কলিকাতায় প্রায় ২০০০ বালিকা আছে, যাহাদিগকে, বড় হইলে, তাহারা পাপ ব্যবসায়ে লিপ্ত করিবে। ইহাদের উদ্ধার সাধনের ক্ষমতা পুলিস্‌কে নূতন আইন দ্বারা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহাদিগকে কোথায় রাখা হইবে, তাহা স্থির না হওয়ায় পুলিশ তাহাদিগকে পাপ-নিকেতন হইতে সরাইতে পারিতেছে না। খৃষ্টীয় মিশনারীরা তাহাদের ভার লইতে পারেন; কিন্তু তাহা হইলে কথা উঠিতে পারে, যে, গবর্ণ্মেণ্ট্ প্রকারান্তরে খৃষ্টিয়ানের সংখ্যা বাড়াইতেছেন। এইজন্য একটি অখৃষ্টিয়ান্ আশ্রমের জন্য কলিকাতা ভিজিল্যান্স্ এসোসিয়েশ্যন্ সম্প্রতি সভা করিয়া এক লক্ষ টাকা তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। ২৫ নং চৌরঙ্গীতে এই সভার অবৈতনিক সম্পাদকের নামে টাকা পাঠাইতে হইবে।

যে-কোন ধর্ম্মের আশ্রয়েই হউক, বালিকারা সৎ-জীবন-যাপনের জন্য শিক্ষিত ও পালিত হইলে আমরা তাহাতে কোন আপত্তির কারণ দেখি না—বিশেষতঃ যদি হিন্দুসমাজ এবিষয়ে নিজের কর্ত্তব্য না করেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিয়া ভালই করিয়াছেন। আশ্রম-স্থাপনে সাহায্য সকলেরই করা কর্ত্তব্য।

ভ্রম-সংশোধন

এই মাসের প্রবাসীতে ৪৭২ পৃষ্ঠার পরে ৪৬৫ হইতে ৪৭২ পৃষ্ঠা ভুলক্রমে পুনরায় দেওয়া হইয়াছে। অতএব ৪৭২ পৃষ্ঠার পর হইতে পাঠকগণ অনুগ্রহ করিয়া পরবর্ত্তী ৮ পৃষ্ঠা ৪৬৫ (ক), ৪৬৬ (খ) এইরূপ ধরিয়া লইবেন।

এই মাসের ৪৬৭ পৃষ্ঠায়—

	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২য় কলম ৩য় লাইন	ধূলিহীন	ধূলিলীন
৪৬৮ পৃষ্ঠায়—		
১ম কলম ১৬শ লাইন	নিরাশায়	নিরালায়
ঐ ২৫শ লাইন	নিরাশায়	নিরালায়

	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
৪৬৯ পৃষ্ঠায়—		
১ম কলম ২৫শ লাইন	তপলব্ধ	তপোলব্ধ
২য় কলম ১ম লাইন	বাধা	বাঁধা
২য় কলম ৩৬শ লাইন	এতদিন	একদিন

গত জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে ২১৯ পৃষ্ঠায় ২য় কলমের নীচের দিকে "ঘণ্টায়-মাইল নৌকা" প্রসঙ্গটিতে "ঘণ্টায়-মাইল" না হইয়া "মিনিটে-মাইল" হইবে, এবং প্রসঙ্গটির ভিতরেও সেইরূপ পরিবর্ত্তন ধরিতে হইবে।
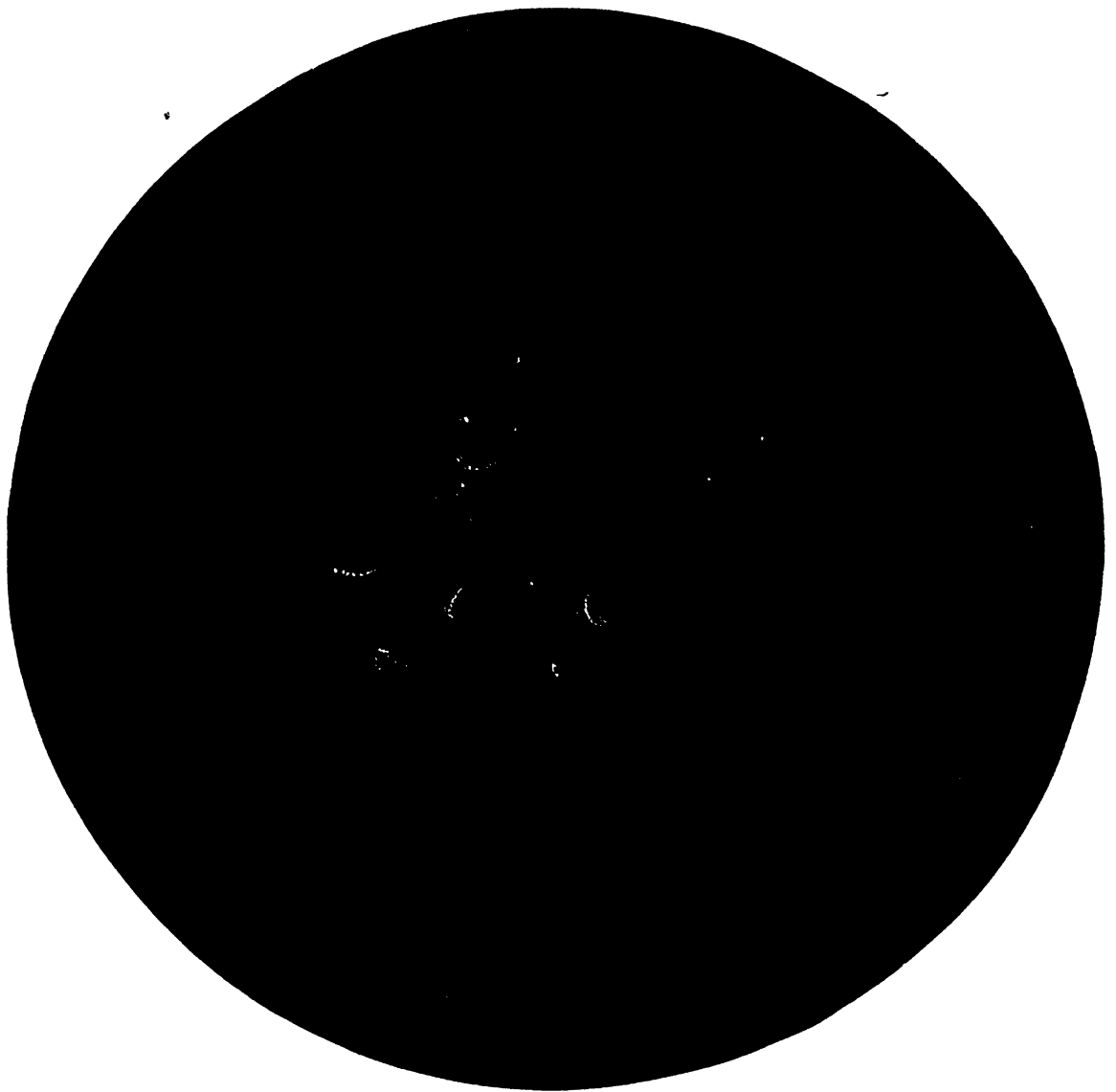
রাগিণী মেঘ-মল্লার

চিত্রকর শ্রী পূর্ণচন্দ্র সিংহ

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা।

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৪শ ভাগ
১ম খণ্ড

ভাদ্র, ১৩৩১

৫ম সংখ্যা

বধূমঙ্গল*

ওগো বধূ সুন্দরী,
নব মধু-মঞ্জরী,
সাত ভাই চম্পার লহ অভিনন্দন ;—
পর্ণের পাত্রে
ফাল্গুন-রাত্রে
স্বর্ণের বর্ণের ছন্দের বন্ধন।
এনেছি বসন্তের
অঞ্জলি গন্ধের,
পলাশের কুঙ্কুম, চাঁদিনীর চন্দন।

পারুলের হিল্লোল,
শিরীষের হিন্দোল,
মঞ্জুল বল্লীর বঙ্কিম কঙ্কণ।
উল্লাস-উতরোল
বেণুবন-কল্লোল,
কম্পিত কিশলয়ে মলয়ের চুম্বন।
তব আঁখি-পল্লবে
দিনু আঁখি-বল্লভ
গগনের নবনীল স্বপনের অঞ্জন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

* শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত "সাত ভাই চম্পা" নামক চিত্র-সহযোগে পরিণয়-উপহাররূপে রচিত।

গান

নাই যদি বা এলে তুমি
এড়িয়ে যাবে তাই বলে'?
অন্তরেতে নাই কি তুমি
সাম্‌নে আমার নাই বলে'?

মন যে আছে তোমায় মিশে',
আমায় তবে ছাড়বে কিসে?
প্রেম কি আমার হারায় দিশে
অভিমানে যাই বলে'?

বিরহ মোর হোক না আকুল;
সেই বিরহের সরোবরে
মিলন-কমল ঐ ত দোদুল
অশ্রুজলের ঢেউয়ের 'পরে।

তবু তৃষায় মরে আঁখি,
তোমার লাগি' চেয়ে থাকি,
বুকের 'পরে পাব না কি
চোখের 'পরে নাই বলে'?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গোতমের সাধনা ও সিদ্ধি

মহেশচন্দ্র ঘোষ

গোতম ধন-ঐশ্বর্য্যের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ভোগবিলাস তাঁহাকে বিপথগামী করিতে পারে নাই। বাল্যকাল হইতেই তিনি ধর্ম্মপিপাসু ছিলেন। যখন তিনি গৃহস্থ্য অবস্থাতে ছিলেন, তখনও তিনি অনেক সময়ে ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া থাকিতেন (মজ্‌ঝিম, মহাসচ্চক)। সংসারে থাকিয়াই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন—এই সংসার অনিত্য, এবং দুঃখ ও পাপে পূর্ণ। তিনি ইহাও বুঝিয়াছিলেন, যে, পাপ-তাপের অতীত এক নিরাপদ অচ্যুত পরম অবস্থা আছে। তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, এই অনিত্য ও দুঃখময় জগতের অতীত হইতে হইবে এবং সেই নিত্য পরমাবস্থা লাভ করিতে হইবে। কিন্তু এই পরমপদ লাভ করিবার উপায় কি? ভোগ-বিলাসে ইহা লাভ করা যায় না, ইহা তিনি নিজ জীবনেই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। গৃহত্যাগ করিলে হয়ত এই অবস্থা লাভ হইতে পারে, এই ভাবিয়া তিনি গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিলেন।

আলাড় কালাম

গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া তিনি আলাড় কালাম-নামক একজন সাধকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। আলাড় কালাম একজন পরম যোগী ছিলেন। তিনি ধ্যানে এমন গভীরভাবে মগ্ন হইয়া থাকিতে পারিতেন, যে, সে-সময়ে তিনি বাহ্যজগৎকে অতিক্রম করিতেন। মহা-পরিনিব্বান সুত্তে লিখিত আছে যে, এক সময়ে ৫০০ শকট তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, তবুও তিনি যোগ-বিচ্যুত হন নাই। তিনি ইহা বুঝিতেই পারেন নাই, যে, শকট তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। গোতম এইপ্রকার সাধকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া যোগাভ্যাস করিতে লাগিলেন। যোগ-সাধনে কালাম যতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, গোতমও ততদূর অগ্রসর হইলেন।

এই সময়ে তাঁহার মনে হইল, এখানে এই যে ধর্ম্ম-সাধন করিলাম, ইহা দ্বারা নির্ব্বেদ, বৈরাগ্য, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা ও নির্ব্বাণ লাভ করা যায় না; ইহা কেবল আকিঞ্চন্ত-আয়তনের অবস্থা।

যে-অবস্থাতে কোন বস্তুর অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না, সেই অবস্থার নাম 'আকিঞ্চন্য-আয়তন'। এই অবস্থা শূন্যময়। পরে আমরা দেখিব যে, গোতম অনুভব করিয়াছিলেন যে, ইহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর অবস্থা আছে।

আলাড় কালামের সাধন-প্রণালীতে গোতম সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই।

রাম-পুত্র উদ্দক

ইহার পরে তিনি রাম-পুত্র উদ্দক-নামক একজন গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। উদ্দকের যাহা-কিছু শিখাইবার ছিল, তাহা সমুদায়ই তিনি শিখিলেন। কিন্তু ইহাতেও গোতম পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না। তাঁহার মনে এইপ্রকার চিন্তা হইল :—

আমি যে-ধর্ম্ম লাভ করিলাম, ইহা দ্বারা নির্ব্বেদ, বৈরাগ্য, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধ এবং নির্ব্বাণ লাভ করা যায় না। এই অবস্থা কেবল সংজ্ঞা ও অসংজ্ঞা—এতদুভয়ের অতীত অবস্থা।

উরুবেলা

এইজন্য তিনি উদ্দকের আশ্রম পরিত্যাগ করিলেন। ইহার পরে তিনি মগধ দেশে উরুবেলা-নামক গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মনে হইল—এই স্থান কি রমণীয়। অদূরে শুভ্রসলিলা স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইতেছে; এস্থলে চিত্ত স্বভাবতঃই প্রসাদগুণসম্পন্ন হইয়া থাকে। গ্রামও সন্নিকটে, ভিক্ষারও বিঘ্ন হইবে না। এই স্থানই কুলপুত্রগণের সাধনের উপযুক্ত।

এই স্থানেই তিনি কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কি-প্রকার কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহা "গোতমের তপস্যা"-নামক প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। যখন তিনি দেখিলেন এপ্রকার তপস্যায় সিদ্ধিলাভের কোন সম্ভাবনা নাই, তখন তিনি কৃচ্ছ্র-সাধন পরিত্যাগ করিলেন। ইহার অন্য প্রণালী অবলম্বন করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

নির্জ্জন-সাধন

কৃচ্ছ্র-সাধন পরিত্যাগ করিবার পরও গোতম নির্জ্জনে সাধন করিতেন। কিন্তু নির্জ্জন-সাধন সহজ ব্যাপার নহে। এক সময়ে জানুস্সোণি-নামক একজন লোক গোতম বুদ্ধকে এইরূপ বলিয়াছিলেন :—

"হে গোতম! অরণ্যে বাস, প্রান্তরে অবস্থান অত্যন্ত কষ্টকর; নির্জ্জনে কালাতিপাত অতি দুষ্কর; একাকিত্ব দুঃখময়। যে-সমুদায় ভিক্ষুর মন সমাধিতে মগ্ন হয় না, বনে তাহাদিগের প্রাণ উৎক্ষিপ্ত হয়।"

গোতম বলিলেন :—

"হে ব্রাহ্মণ! ঠিক বলিয়াছ।........যখন আমি বুদ্ধত্ব লাভ করি নাই, যখন কেবল বোধিসত্ত্ব ছিলাম, তখন আমারও মনে এইপ্রকার ভাব হইয়াছিল। যে-সমুদায় শ্রমণ ও ব্রাহ্মণের কায়িক, বাচনিক ও মানসিক কার্য্য পরিশুদ্ধ হয় নাই, যাহাদের জীবিকা অপরিশুদ্ধ, যাহারা লোভপরায়ণ, কাম্য বস্তুতে যাহাদিগের তীব্র অনুরাগ, যাহারা হিংসাপরায়ণ ও যাহাদিগের সঙ্কল্প প্রদূষিত, যাহারা আলস্যপরায়ণ ও নিশ্চেষ্ট, যাহারা উদ্ধত ও অশান্তচিত্ত, যাহাদের প্রাণ অনিশ্চিত ও সন্দেহপূর্ণ, যাহারা আপনাকে গৌরবান্বিত ও অপরকে হীন করে, যাহারা ভীত ও স্তম্ভিত, যাহারা লাভ সৎকার ও প্রশংসা কামনা করে, যাহারা কুসীদ ও হীনবীর্য্য, যাহাদিগের স্মৃতি বিভ্রান্ত ও যাহারা অসম্প্রজ্ঞ, যাহারা অসমাহিত ও বিভ্রান্তচিত্ত, যাহারা দুষ্প্রজ্ঞ ও মূর্খ, সেই-সমুদায় শ্রমণ ও ব্রাহ্মণের পক্ষে অরণ্যে অবস্থান ও প্রান্তরে বাস ভয়ভৈরবপূর্ণ—যেহেতু তাহাদিগের জীবন অপরিশুদ্ধ। কিন্তু আমার সমুদায় কার্য্য পরিশুদ্ধ ছিল, কাম লোভ অহঙ্কারাদি বিদূরিত হইয়াছিল, মৈত্রীভাব-দ্বারা আমার প্রাণ পূর্ণ হইয়াছিল। ইহা আমি সম্যক্ অনুভব করিয়া অরণ্যে বিহার করিতাম এবং ইহাতে আমার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইত।" (ভয়ভেরব সুত্ত)।

ভয়-ভৈরব-পরাভব

ইহার পরে গোতম বলিয়াছিলেন, "একদিন আমার মনে হইল রাত্রিতে অষ্টমী, বা চতুর্দ্দশী বা পঞ্চদশী তিথিতে কোন আরামের বনভূমিতে বা বৃক্ষসমীপবর্ত্তী কোন চৈত্যে গমন করিয়া সমুদায় রাত্রি বাস করিব। যদি লোমহর্ষণকারী ভয়ঙ্কর স্থানে বাস করি, তাহা হইলে

ভয় ও ভৈরব কি তাহা অনুভব করিতে পারিব। এই-রূপ চিন্তা করিয়া আমি এইরূপ স্থানে গমন করিতাম। যদি মৃগ বিচরণ করিত, পক্ষী যদি বৃক্ষশাখায় উপবেশন করিত এবং তজ্জন্য বৃক্ষ হইতে কাষ্ঠ নিপতিত হইত, কিংবা যদি বায়ুপ্রবাহে শুষ্কপত্র সঞ্চালিত হইত,—এই-সমুদায় শব্দ শ্রবণ করিয়া আমার মনে হইত, এই ভয়-ভৈরব আসিতেছে। তখন মনে করিতাম—আমি কেন ভয়ের আক্রমণ প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব? যে-ভাবে ইহা আগমন করিবে, আমি সেইভাবেই ইহাকে পরাভব করিব; আমার যে-অবস্থাতে এই ভয়-ভৈরব উপস্থিত হইবে, আমি সেই অবস্থাতে থাকিয়াই ইহাকে জয় করিব। যখন বিচরণ করিতাম, সেই সময়ে যদি ভয়-ভৈরব আগমন করিত, তখন আমি দণ্ডায়মান হইতাম না, বা উপবেশন করিতাম না, বা শয়ন করিতাম না, বিচরণ করিতে করিতেই সেই ভয়-ভৈরবকে পরাভূত করিতাম। যখন দণ্ডায়মান থাকিতাম, তখন যদি ভয়-ভৈরব আসিয়া উপস্থিত হইত, তখন সেই অবস্থাতেই থাকিতাম, বিচরণ উপবেশন বা শয়ন করিতাম না; বিচরণ করিতে করিতেই ভয়-ভৈরবকে পরাভূত করিতাম।

এইরূপ যখন উপবিষ্ট থাকিতাম বা শয়ন করিয়া থাকিতাম, তখন যদি ভয়-ভৈরব উপস্থিত হইত, আমি সেই-সেই অবস্থাতে থাকিয়াই ভয়-ভৈরবকে পরাভূত করিতাম” (মজ্ঝিমনিকায়, ভয়-ভেরব সুত্ত)।

ভয়কে অতিক্রম করিবার জন্য অল্পলোকই সাধনা করিয়া থাকেন। ইহা যে আবশ্যক, ইহার যে উপকারিতা আছে, এপ্রকার চিন্তা অল্পলোকের প্রাণেই উদিত হয়। এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা স্বভাবতঃই সাহসী। কিন্তু ইঁহারাও সম্পূর্ণরূপে ভয়কে অতিক্রম করিতে পারেন না। মনে কর, একজন সাহসী ব্যক্তি বনভূমিতে রাত্রিকালে অন্ধকারে অবস্থিতি করিতেছেন। হঠাৎ এক বিকট, ভীষণ, অশ্রুতপূর্ব্ব ও অস্বাভাবিক শব্দ শ্রবণ করিলেন। তখন কি তাঁহার দেহমন অচঞ্চল ও নির্ব্বিকার থাকিবে? মনস্তত্ত্ববিৎ ও প্রাণতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, পূর্ব্বোক্ত ঘটনাতে সেই সাহসী ব্যক্তির প্রাণও অজ্ঞাতসারে ভয়ার্ত্ত হইবে, তাহার দেহমন কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইবে। ইহাই সাধারণ নিয়ম।

এপ্রকার হয় কেন? ইহার কারণ এই যে, মানব কেবল মানব নহে, মানব একাধারে পশু ও মানব। পশু চায় আত্মরক্ষা করিতে, ভয় সেই আত্মরক্ষার এক প্রধান উপায়। ভয় না থাকিলে পশুগণ জীবনরক্ষার জন্য সংগ্রামও করিত না কিংবা পলায়নও করিত না। মানুষ যে অনেক সময়ে রোমাঞ্চিত ও কম্পিত হয়—তাহার মূলে প্রাণ-ভয়। ভয় একটি পাশব সংস্কার; চিন্তা আসিবার পূর্ব্বেই মানুষ এই সংস্কার-দ্বারা চালিত হইয়া প্রাণ-রক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়। মানুষ এস্থলে পশু, সংস্কারের অধীন। এই মানুষের স্বাধীনতা কোথায়, কোথায় তাহার স্বতন্ত্রতা?

মহাত্মা গোতম এই পশু-প্রকৃতিকে অতিক্রম করিবার জন্য সাধন করিয়াছিলেন এবং সেই সাধনায় সিদ্ধও হইয়াছিলেন। তিনি ভয়-ভৈরবকে পরাজয় করিয়াছিলেন এবং দেহ-মনকে সম্পূর্ণরূপে আত্মবশে রাখিয়াছিলেন। এ-বিষয়ে তাঁহার উক্তি এই:—“আমি আরব্ধ-বীর্য্য ছিলাম; আমি কখন ভয়ে ভীত হইতাম না; আমার স্মৃতি সর্ব্বদা সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিত; কখনও অপ্রতিষ্ঠ হইত না। দেহ প্রস্তব্ধ থাকিত, কখনও চঞ্চল হইত না। চিত্ত সমাহিত ও একাগ্র থাকিত। (মজ্‌ঝিম, ভয়-ভেরব সুত্ত)।

দ্বেধা-বিতর্ক

বুদ্ধত্ব লাভ করিবার পূর্ব্বে গোতম পাপ তাপ দূর করিবার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা তিনি নিজেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বর্ণনা করিয়াছেন।

কাম, ব্যাপাদ, হিংসা

দ্বেধা-বিতক্ক-সুত্তে লিখিত আছে, যে, গোতম এক সময়ে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া এই-প্রকার বলিয়াছিলেন:—

“হে ভিক্ষুগণ! যখন আমি বুদ্ধত্ব লাভ করি নাই, যখন আমি কেবল বোধিসত্ত্ব ছিলাম, তখন আমার মনে এই-প্রকার ভাব হইয়াছিল—যখন আমার প্রাণে নানা-

প্রকার ভাব আসিয়া উপস্থিত হয় তখন সেই সমুদায় ভাবকে দুই ভাগে বিভাগ করি না কেন? দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভাগকে বিচার করিয়া দেখি না কেন? এইপ্রকার স্থির করিয়া কাম, ব্যাপাদ (=অপরের অশুভ-কামনা, বিদ্বেষ-বুদ্ধি) ও হিংসা এই কয়েকটিকে একদিকে রাখিতাম এবং নৈষ্কাম্য অ-ব্যাপাদ ও অহিংসা এই কয়েকটিকে অপর দিকে রাখিতাম। তাহার পরে আমি অপ্রমত্ত, সাধন-পরায়ণ ও সমাহিত হইয়া এইভাবে বিচার ও বিতর্ক করিতাম—এই কাম-বাসনা উৎপন্ন হইয়াছে,—ইহা নিজের অকল্যাণকর, ইহা অপরের অকল্যাণকর এবং ইহা উভয়ের অকল্যাণকর। ইহা প্রজ্ঞাকে নিরোধ করে, বিনাশ আনয়ন করে এবং নির্ব্বাণলাভে বাধা প্রদান করে। এইপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে কাম-বাসনা প্রাণ হইতে বিদূরিত হইত।

এইরূপ ব্যাপাদ ও হিংসা-বিষয়ে চিন্তা করিয়া বুঝিতাম, যে, এই সমুদায় নিজের অকল্যাণ সাধন করে; অপরের অকল্যাণ সাধন করে এবং সকলের অকল্যাণ সাধন করে; এই সমুদায় প্রজ্ঞাকে নিরোধ করে, বিনাশ আনয়ন করে এবং নির্ব্বাণলাভে বাধা প্রদান করে। এইপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে এ-সমুদায়ও প্রাণ হইতে বিদূরিত হইত।

অপর দিকে যখন নৈষ্কাম্য ভাব উপস্থিত হইত, তখন আমি ভাবিতাম—এই নৈষ্কাম্য ভাব উপস্থিত হইয়াছে, ইহা নিজের পক্ষে কল্যাণকর, অপরের পক্ষে কল্যাণকর এবং উভয়ের পক্ষে কল্যাণকর। ইহা প্রজ্ঞা বর্দ্ধিত করে, বিনাশ নিবারণ করে এবং নির্ব্বাণ-লাভে সাহায্য করে। আমি রাত্রিতে এইপ্রকার চিন্তা করিতাম, দিবাভাগে এইপ্রকার চিন্তা করিতাম এবং দিবারাত্রি এইপ্রকার চিন্তা করিতাম। এইরূপ অব্যাপাদ ও অহিংসার বিষয়ে বিতর্ক-বিচার করিয়া বুঝিতাম, এসমুদায় নিজের কল্যাণ সাধন করে, অপরের কল্যাণ সাধন করে এবং উভয়ের কল্যাণ সাধন করে; এসমুদায় প্রজ্ঞা বর্দ্ধিত করে, বিনাশ নিবারণ করে, নির্ব্বাণলাভে সাহায্য করে। রাত্রিতে, দিবাভাগে এবং দিবারাত্রি এইপ্রকার চিন্তা করিতাম।

যে-যে বিষয়ে বহুক্ষণ চিন্তা করা যায়, সেই-সেই বিষয়ের দিকেই চিত্তের গতি হয়। নৈষ্কাম্যাদির বিষয় অনুক্ষণ চিন্তা করাতে কামাদি-বাসনা তিরোহিত হইয়াছিল এবং নৈষ্কাম্যাদি ভাব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং এই সমুদায় ভাবের দিকেই আমার মনের গতি হইয়াছিল"। (মজ্‌ঝিমনিকায়, দ্বেধা-বিতক্ক সুত্ত)।

পঞ্চ-নিমিত্ত

ছন্দ (=রাগ, কাম্যবস্তু, ভোগে অনুরাগ), দ্বেষ ও মোহ নিবারণ করিবার জন্য গোতম পাঁচটি উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই পাঁচটি "নিমিত্ত" মজ্‌ঝিমনিকায় গ্রন্থের বিতক্ক-সন্থান সুত্তে বিস্তৃতভাবে বিবৃত হইয়াছে।

প্রথম উপায়

যদি প্রাণে ছন্দ-দ্বেষ-মোহ-মূলক পাপচিন্তা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে প্রাণে কুশল-চিন্তা আনয়ন করিতে হইবে। ঐ কুশলভাব চিন্তা করিতে করিতেই পাপচিন্তা বিদূরিত হইবে। যেমন মিস্ত্রী ক্ষুদ্র কীলক (খিল) দ্বারা বৃহৎ কীলককে বাহির করে, তেমনি কুশল-চিন্তা দ্বারা পাপচিন্তাকে অপসারিত করা যায়।

দ্বিতীয় উপায়

ইহাতেও যদি পাপচিন্তা বিদূরিত না হয়, তাহা হইলে ঐ পাপচিন্তার ঘৃণিত ও বিষময় ফলের বিষয় ভাবিতে হইবে; এইপ্রকার করিলে পাপচিন্তা বিদূরিত হইবে।

যদি কোন পুরুষ বা রমণীর কণ্ঠে সর্প বা কুকুর বা মনুষ্যের মৃত-দেহ সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের প্রাণে ঘৃণা ও ন্যক্কার উপস্থিত হয়। তেমনি পাপের বীভৎসরূপের বিষয় চিন্তা করিলেও প্রাণে ঘৃণা ও ন্যক্কারের সঞ্চার হইবে।

তৃতীয় উপায়

ইহাতেও যদি পাপভাব বিদূরিত না হয়, তাহা হইলে মনকে পাপচিন্তা হইতে আকর্ষণ করিয়া বিষয়ান্তরে লইতে হইবে।

যদি কেহ কোন বস্তু দর্শন করিতে ইচ্ছা না করে, তাহা হইলে সে চক্ষু নিমীলিত করে বা অপরদিকে দৃষ্টি-পাত করে। তেমনি পাপচিন্তা উপস্থিত হইলে মনশ্চক্ষু

নিমীলিত করিতে হইবে কিংবা অপর দিকে মনকে চালিত করিতে হইবে।

চতুর্থ উপায়

ইহাতেও যদি পাপচিন্তা বিদূরিত না হয়, তাহা হইলে অভ্যাস-দ্বারা ক্রমশঃ মনকে পাপচিন্তা হইতে নিবৃত্ত করিতে হইবে। এবিষয়ে গোতম এই উপমা দিয়াছেন। মনে কর, একব্যক্তি দ্রুত গমন করিতেছে ; সে মনে করিতে পারে—কেন আমি এত দ্রুত গমন করিতেছি, আমি ত শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে পারি। তাহার পরে সে যখন মৃদু গতিতে অগ্রসর হইবে, তখন সে মনে করিতে পারে—কেন আমি এইভাবে অগ্রসর হইতেছি, আমি ত দণ্ডায়মান থাকিতে পারি। সে দণ্ডায়মান অবস্থায় ভাবিতে পারে—আমি কেন দণ্ডায়মান রহিয়াছি, আমি ত উপবেশন করিতে পারি। সে উপবেশন করিয়া ভাবিতে পারে—আমি কেন উপবেশন করিয়া রাহিয়াছি, আমি ত শয়ন করিতে পারি। এই ব্যক্তি যে-ভাবে ধাবমান অবস্থা হইতে শয়নাবস্থাতে উপস্থিত হইল, আমরাও তেম্নি পাপচিন্তা-বিষয়ে ভোগের অবস্থা হইতে নিরাহারের অবস্থায় আগমন করিতে পারি।

পঞ্চম উপায়

ইহাতেও যদি রাগ-দ্বেষ-মোহ-মূলক চিন্তা বিদূরিত না হয় তাহা হইলে দৃঢ়ভাবে দন্তে দন্ত সংলগ্ন করিয়া, তালুতে জিহ্বাকে সংশ্লিষ্ট করিয়া বলদ্বারা চিত্তকে নিগ্রহ করিতে হইবে। এইপ্রকার করিলে পাপচিন্তা প্রাণ হইতে তিরোহিত হইবে, এবং চিত্ত শান্ত ও সমাহিত হইবে। (মজ্‌ঝিম, ২০)।

গোতমও এক-সময়ে এই পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি এক-সময়ে বলিয়াছিলেন, "দন্তে দন্ত সংলগ্ন করিয়া, তালুতে জিহ্বা সংশ্লিষ্ট করিয়া এমনভাবে বলের সহিত চিত্তকে নিগ্রহ করিতাম যে, আমার কক্ষ (বগল) হইতে ঘর্ম্ম বিগলিত হইত।" (মজ্‌ঝিম, মহাসচ্চকসুত্ত)।

গোতমের ধ্যান

(ক)

গৃহ ত্যাগ করিবার পর গোতম এইপ্রকার নানা উপায়ে পাপবাসনা দূর করিয়া চিত্তকে শান্ত ও সমাহিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এইপ্রকার প্রশান্ত চিত্ত লইয়া তিনি ধ্যানে মগ্ন হইতেন। আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া তিনি বহুদিন এই অবস্থায় নিমগ্ন থাকিতে পারিতেন। এবিষয়ে তিনি এইরূপ বলিয়াছেন :—

"আমি দেহকে স্থির করিয়া বাক্য উচ্চারণ না করিয়া, এক দিবারাত্রি, দুই দিবারাত্রি, তিন দিবারাত্রি, চারি দিবারাত্রি, পাঁচ দিবারাত্রি, ছয় দিবারাত্রি এবং সাত দিবারাত্রি…বাস করিতে পারি।" (মজ্‌ঝিম, ১৫)।

(খ)

তিনি কি-প্রকার গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া থাকিতে পারিতেন, তাহা মহা-পরিনিব্বান সুত্তে বর্ণিত আছে। এক-সময়ে তিনি আতুমা নগরে ভুষাগারে ধ্যানে মগ্ন হইয়াছিলেন। ধ্যানভঙ্গের পর বাহিরে আসিয়া দেখেন, সে-স্থলে মহা জনতা। তখন যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা তিনি এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

সেই সময়ে একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এখানে এত জনতা কেন ?"

সে বলিল—"কিছুক্ষণ পূর্ব্বে প্রবলবেগে গল্‌গল্‌ করিয়া বৃষ্টি বর্ষিত হইতেছিল, বিদ্যুৎ চমকিতেছিল, অশনি নিপতিত হইতেছিল, ইহাতে এই তুষাগারে দুই কৃষক-ভ্রাতা ও চারিটি বলীবর্দ্দ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহা-দিগকে দেখিবার জন্য আতুমা নগর হইতে বহু লোক সমাগত হইয়াছে। এইজন্যই এই মহা জনতা।"

তখন সেই ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"হে ভদন্ত! আপনি কোথায় ছিলেন ?"

আমি বলিলাম—"হে আয়ুষ্মান্‌! আমি এই স্থলেই ছিলাম।"

"আপনি কি এই সমুদায় দর্শন করেন নাই ?"

"হে আয়ুষ্মান্‌! আমি এসমুদায় দর্শন করি নাই।"

"হে ভদন্ত! আপনি কি সুপ্ত ছিলেন ?"

"হে আয়ুষ্মান্‌! আমি সুপ্ত ছিলাম না।"

"হে ভদন্ত! আপনার কি সংজ্ঞা ছিল ?"

"হে আয়ুষ্মান্‌! আমার সংজ্ঞা ছিল।"

"তাহা হইলে হে ভদন্ত! আপনি সংজ্ঞাবান্‌ ও জাগ্রৎ ছিলেন, আর তখন প্রবলবেগে গল্‌গল করিয়া

বৃষ্টি নিপতিত হইতেছিল, বিদ্যুৎ চমকিতেছিল, অশনি নিপতিত হইতেছিল, দুই কৃষক-ভ্রাতা ও চারিটি বলীবর্দ্ধ বিনষ্ট হইয়াছিল—আপনি এসমুদায় দেখেনও নাই, শুনেনও নাই!"

"হে আয়ুষ্মান্! ঠিক তাহাই।" (মহানিঃ, ৪।৩০-৩২)

এই ঘটনা হইতে বুঝা যাইতেছে, গোতম কি-ভাবে ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া থাকিতে পারিতেন।

(গ)

মনের উপর গোতমের এতই ক্ষমতা ছিল যে, তিনি ইচ্ছামাত্রই ধ্যানে মগ্ন হইতে পারিতেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন :—

"আমার যখনই ইচ্ছা হইত তখনই আমি···প্রথম ধ্যানে ···দ্বিতীয় ধ্যানে···তৃতীয় ধ্যানে···চতুর্থ ধ্যানে মগ্ন হইয়া বিহার করিতাম" (সংযুত্তনিকায়, কস্সপসংযুত্ত, ৯)।

আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ

ক। আবিষ্কার

সর্ব্বপ্রকার আশ্রব (সব্বাসব) বিনাশ করিয়া, চিত্তকে শান্ত ও সমাহিত করিয়া, গোতম ধ্যানে নিমগ্ন হইতেন। এই অবস্থায় তাঁহার নিকট সত্য প্রকাশিত হইয়াছিল, সমুদায় সন্দেহ বিদূরিত হইয়াছিল এবং নির্ব্বাণলাভের পথ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। পথ আবিষ্কারের বিষয়ে তিনি বলিয়াছেন :—

আমি চক্ষুলাভ করিয়াছি, আমি জ্ঞানলাভ করিয়াছি, প্রজ্ঞালাভ করিয়াছি, বিদ্যালাভ এবং আলোকলাভ করিয়াছি। (সংযুত্তনিকায়, ১২।৬৫।১০,১৪)।

তিনি যে-জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন তাহা অপরোক্ষ, প্রত্যক্ষ ও সাক্ষাৎ জ্ঞান। তিনি ইহাকে প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক নাম দিয়াছেন। এসমুদায়ের অর্থ এই যে, তিনি যুক্তি-তর্ক দ্বারা এই পথ উদ্ভাবন করেন নাই, এ-পথ স্বকপোল-কল্পিত পথ নহে। ইহাতে কেহ-কেহ মনে করিতে পারেন, তবে বুঝি গোতমের ধর্ম্ম কেবল বিশ্বাসের ধর্ম্ম, এ-ধর্ম্মে বুঝি যুক্তি-তর্কের স্থান নাই। কিন্তু এ-প্রকার বিশ্বাস ভিত্তিবিহীন। গোতম শিষ্যগণকে উপদেশ দিবার সময় ভূয়োভূয়ঃ যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিতেন; যুক্তি-তর্ক দ্বারা বুঝাইতেন, যে, তাঁহার প্রদর্শিত ধর্ম্ম উপকারী, উপযোগী, যুক্তিযুক্ত ও উপাদেয়; এবং শিষ্যগণকে এই পন্থা অবলম্বন করিবার জন্ত উপদেশ দিতেন (ব্রহ্মজাল সুত্ত, ১)। কিন্তু এমন অনেক তত্ত্ব আছে, যাহা তর্কগম্য নহে (অতক্কাবচার, দীঘ, ১।২৮; মজ, ৭২; সংযুত্ত ৬।১; বিনয়, ১।৫।৩)। এসমুদায় সাক্ষাৎ ও অপরোক্ষভাবে অনুভব করিবার বিষয়। নির্ব্বাণ-ধর্ম্মের অনেক তত্ত্বই এইপ্রকার; বুদ্ধ দিব্য আলোকে, দিব্য চক্ষু দ্বারা এইসমুদায় সত্য দর্শন করিয়াছিলেন; বুদ্ধ অনেক স্থলে এইরূপ বলিয়াছেন।

খ। প্রাচীন পথ

বুদ্ধ যে-পথ দেখাইয়াছেন তাহা জগতের পক্ষে নূতন। কিন্তু গোতম বলিয়াছেন যে, ইহা পুরাতন পথ; প্রাচীন কালের বুদ্ধগণ এই পথই অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং তিনি সেই প্রাচীন পথই নূতন আবিষ্কার করিয়াছেন। এবিষয়ে তিনি এই উপমা দিয়াছেন :—

"মনে কর, একব্যক্তি অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে এক পুরাতন মার্গ, প্রাচীন পথ দেখিতে পাইল। প্রাচীন কালে এই পথে মনুষ্যগণ যাতায়াত করিত। তখনই সেই ব্যক্তি সেই পথ অবলম্বন করিয়া গমন করিতে লাগিল। যাইতে যাইতে দেখিতে পাইল যে, এক পুরাতন নগর, এক পুরাতন রাজধানী রহিয়াছে; প্রাচীনকালে বহু মানব এই স্থলে বাস করিত। এই নগর আরাম, উপবন ও পুষ্করিণী-সংযুক্ত এবং প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। তখন সেই ব্যক্তি রাজা বা রাজমন্ত্রীর নিকট উপস্থিত হইয়া সমুদায় ঘটনা বর্ণনা করিল। তখন রাজা এবং রাজমন্ত্রী সেই নগরকে উদ্ধার করিলেন এবং কালে সেই নগর বহু-জনাকীর্ণ, সমৃদ্ধিযুক্ত, বর্দ্ধিষ্ণু ও বিপুলতাপ্রাপ্ত হইল।" এই দৃষ্টান্ত দিয়া গোতম বলিলেন—

"আমিও এইপ্রকার এক পুরাতন পথ, পুরাতন মার্গ আবিষ্কার করিয়াছি। প্রাচীনকালের সম্যক্ সম্বুদ্ধগণ এই পথে বিচরণ করিতেন" (সংযুত্তনিকায়, ১২।৬৫।১৯-২১)।

ইহার পরে তিনি বলিয়াছেন :—

"আমিও এই পথ অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়াছি" (১২।৬৫।২২)।

গোতম এই পথকে প্রাচীন পথ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই পথ নূতন। গোতম বিশ্বাস করিতেন, তাঁহার পূর্ব্বেও অনেক বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা নিশ্চয়ই এই পথ অনুসরণ করিয়া বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

গ। কোন্ পথ?

বুদ্ধত্ব লাভ করিবার পরই গোতম পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণকে এই পথের বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন। সে উপদেশ এই:—

"হে ভিক্ষুগণ! পরিব্রাজকগণ দুই অন্ত পরিত্যাগ করিবে। সেই দুই অন্ত কি? প্রথম হীন গ্রাম্য ইতর-জনভোগ্য অনার্য্য, অনর্থ-সংযুক্ত কাম্য বস্তুর উপভোগ। দ্বিতীয় দুঃখময় অনার্য্য, অনর্থ-সংযুক্ত দেহ-নির্যাতন। এই দুই অন্ত অতিক্রম করিয়া তথাগত মধ্যম পথ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই পথে দৃষ্টিলাভ হয়, জ্ঞানলাভ হয়, প্রাণ প্রশান্ত হয়, অভিজ্ঞা সম্বোধ ও নির্ব্বাণ লাভ করা যায়। হে ভিক্ষুগণ! তথাগত যে মধ্যম পথ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা কোন্ পথ? ইহা এই আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ—(১) সম্যক্ দৃষ্টি, (২) সম্যক্ সঙ্কল্প, (৩) সম্যক্ বাক্, (৪) সম্যক্ কর্ম্মান্ত, (৫) সম্যক্ আজীব, (৬) সম্যক্ ব্যায়াম, (৭) সম্যক্ স্মৃতি এবং (৮) সম্যক্ সমাধি।

হে ভিক্ষুগণ! তথাগত এই মধ্যম পথ আবিষ্কার করিয়াছেন; এই পথে দৃষ্টিলাভ হয়, জ্ঞানলাভ হয়, প্রাণ প্রশান্ত হয়, অভিজ্ঞা সম্বোধ ও নির্ব্বাণ লাভ করা যায়।" (সংযুক্ত, ৫৬।১১।১-৪; বিনয়, মহাবগ্‌গ, ১।৬।১৭,১৮)

গোতমের ব্যাখ্যা

দীঘনিকায়ের অন্তর্গত মহাসতিপট্‌ঠান সুত্তন্তে এবং মজ্‌ঝিমনিকায়ের অন্তর্গত সতিপট্‌ঠান সুত্তে মজ্‌ঝিম-নিকায়ের সচ্চবিভঙ্গ সুত্তে গোতম এই অষ্টাঙ্গ মার্গের ব্যাখ্যা দিয়াছেন। নিম্নে এই ব্যাখ্যা উদ্ধৃত হইল।

১। সম্যক্ দৃষ্টি

দুঃখ কি, দুঃখের উৎপত্তি কি-প্রকারে হয়, দুঃখের নিরোধ কি, এবং কি-প্রকারে দুঃখের নিরোধ হয়—এই সমুদায় জ্ঞানের নাম সম্যক্ দৃষ্টি।

২। সম্যক্ সঙ্কল্প

নৈষ্কাম্য, অবিদ্বেষ এবং অহিংসা এইসমুদায় বিষয়ে সঙ্কল্পের নাম সম্যক্ সঙ্কল্প।

৩। সম্যক্ বাক্

অসত্য বাক্য, পিশুন বাক্য, পরুষবাক্য, অসার প্রলাপ-বাক্য এই সমুদায় হইতে বিরত হওয়ার নাম সম্যক্ বাক্।

৪। সম্যক্ কর্ম্মান্ত

প্রাণ বিনাশ না-করা, অদত্ত-বস্তু গ্রহণ না-করা, কাম-ভোগ হইতে বিরত থাকা—এইসমুদায় সম্যক্ কর্ম্মান্ত।

৫। সম্যক্ আজীব

অন্যায় উপায়ে জীবিকা উপার্জ্জন না করিয়া ন্যায়সঙ্গত উপায়ে জীবিকা উপার্জ্জনের নাম—সম্যক্ আজীব।

৬। সম্যক্ ব্যায়াম

"ব্যায়াম" অর্থে 'চেষ্টা' বা 'শ্রম'।—(১) যাহাতে প্রাণে পাপ ও অকুশল ভাবের উদয় না হইতে পারে; (২) প্রাণে যে-সমুদায় পাপ ও অকুশল ভাবের উদয় হইয়াছে, যাহাতে সেইসমুদায় বিদূরিত হইতে পারে; (৩) যে সমুদায় কুশল-ধর্ম্ম প্রাণে উদিত হয় নাই, যাহাতে সেই সমুদায় উদিত হইতে পারে; (৪) যে-সমুদায় কুশল ধর্ম্ম প্রাণে উদিত হইয়াছে, যাহাতে সেই সমুদায় স্থায়ী হইতে পারে, বৈপুল্য ও পূর্ণতা লাভ করিতে পারে—এই সমুদায় বিষয়ে চেষ্টার নাম সম্যক্ ব্যায়াম।

৭। সম্যক্ স্মৃতি

সর্ব্ববিষয়ে স্মৃতিকে জাগ্রৎ রাখার নামই সম্যক্ স্মৃতি। কোন্ কোন্ বিষয়ে স্মৃতি জাগ্রৎ রাখিতে হইবে, গোতম তাহা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যে-যে বিষয়ে তিনি স্মৃতিমান্ হইতে বলিয়াছেন তাহা এই:—

(ক) দেহমূলক সমুদায় ঘটনা—যেমন ভ্রমণ, উপবেশন, শয়ন, অশন, বাক্-উচ্চারণ ইত্যাদি।

(খ) সুখদুঃখ-মূলক সমুদায় অবস্থা।

(গ) চিত্ত-বিষয়ক সমুদায় অবস্থা—যেমন রাগ, দ্বেষ, মোহ।

(ঘ) (১) পঞ্চ নীবরণ (কাম, ব্যাপাদস্ত্যানমিদ্ধ অর্থাৎ দেহমনের জাড্যদোষ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য অর্থাৎ উদ্ধতভাব ও কুকর্ম্ম-পরায়ণতা, এবং বিচিকিৎসা); (২) রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পঞ্চ স্কন্ধ; (৩) চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন এই ছয়টি আয়তন; (৪) স্মৃতি, ধর্ম্মানুসন্ধান, বীর্য্য, প্রীতি, প্রশান্তভাব, সমাধি, উপেক্ষা এই সপ্ত বোধ্যঙ্গ এবং (৫) দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের নিরোধ এবং দুঃখ-নিরোধের উপায়।

এইসমুদায় বিষয়ে সর্ব্বদা স্মৃতিমান্ থাকাই সম্যক্ স্মৃতি।

৮। সম্যক্ সমাধি

চারিটি ধ্যানকে সম্যক্ সমাধি বলা হইয়াছে। গোতম যে-ভাবে ধ্যানে মগ্ন হইতেন, তাহা তিনি নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন।

ক। প্রথম ধ্যান

গোতম বলিয়াছেন—

আমি কাম-ত্যাগ করিয়া অকুশল-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বিতর্কপূর্ণ, বিচারপূর্ণ, বিবেকজ (=নির্জ্জনতা-মূলক; অসঙ্গ-জনিত) এবং প্রীতিসুখপূর্ণ প্রথম ধ্যানে নিমগ্ন হইতাম।

খ। দ্বিতীয় ধ্যান

তাহার পরে বিতর্ক ও বিচার অতিক্রম করিয়া, অধ্যাত্ম সম্প্রসাদ লাভ করিয়া, চিত্তের একাগ্রতা সংসাধন করিয়া, বিতর্কবিহীন, বিচারবিহীন সমাধিজ, প্রীতিসুখ-পূর্ণ দ্বিতীয় ধ্যানে বিহার করিতাম।

গ। তৃতীয় ধ্যান

তাহার পরে প্রীতির অতীত হইয়া, উপেক্ষা-ভাব লাভ করিয়া স্মৃতিমান্ ও সম্প্রজ্ঞ হইয়া তৃতীয় ধ্যানে বিহার করিতাম। আর্য্যগণ এই অবস্থার বিষয়ে বলিয়া থাকেন—"যাহারা স্মৃতিমান্ ও সম্প্রজ্ঞ—তাঁহারা সুখ-বিহারী।"

ঘ। চতুর্থ ধ্যান

ইহার পরে সুখের অতীত হইয়া দুঃখের অতীত হইয়া (সৌমনস্য ও দৌর্ম্মনস্য) অতিক্রম করিয়া, দুঃখ-রহিত, সুখরহিত, এবং উপেক্ষা ও স্মৃতিদ্বারা পরিশুদ্ধ চতুর্থ ধ্যানে বিহার করিতাম।" (মজ্‌ঝিম, ভয়ভেরবসুত্ত, দ্বেধা-বিতক্কসুত্ত; অঙ্গুত্তরনিকায়, মহাবগ্‌গ, ৩।৬৩।৫ ইত্যাদি)

এই চারিটি ধ্যানের নাম সম্যক্ সমাধি।

অনুকূল উপায়

সমাধি অষ্টাঙ্গিক মার্গের শেষ সোপান। এই সোপানে অধিরোহণ করিতে হইলে, প্রথম সাতটি সোপান অতিক্রম করিতে হয়। এই সাতটি উপায় সমাধির সহায়; অর্থ বুঝাইবার জন্য এসমুদায়কে 'সপ্ত-সমাধি-পরিক্খার' (সপ্ত-সমাধি-পরিষ্কার) বলা হইয়াছে (দীঘ, ১৮।১২৭; মজ্‌ঝিম, ১১৭)।

বহুস্থলে বলা হইয়াছে, যে, ধ্যানে মগ্ন হইতে হইলে 'পঞ্চনীবরণ' বিদূরিত করিতে হয় (দীঘ, ২।৭৪, ২৫।১৭; মজ্‌ঝিম ৫১, ৬০, ৭৬ ইত্যাদি)। পঞ্চনীবরণাদি ক্ষীণ না হইলে ধ্যান সম্ভব হয় না; আবার ধ্যান সাধন না করিলেও এসমুদায় নির্ম্মূল হয় না। প্রথমে হিংসা বিদ্বেষাদি ক্ষীণ করিয়া ধ্যানে প্রবৃত্ত হইতে হয়, তাহার পরে ধ্যান-সাধনের সঙ্গে সঙ্গে এসমুদায় ক্ষীণতর হইবে এবং সর্ব্বশেষে সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।

পথ ও লক্ষ্য

কেহ-কেহ মনে করেন ধ্যানই যেন উদ্দেশ্য; কিন্তু তাহা নহে, ধ্যান লক্ষ্য নহে; ধ্যান একটি পথ। ইহার লক্ষ্য "একান্ত নির্ব্বেদ, বৈরাগ্য, নিরোধ, শান্তি, অভিজ্ঞা, সম্বোধ, এবং নির্ব্বাণ" (দীঘ, ২৯।২৪)। এইসমুদায় লাভই ধ্যানের উদ্দেশ্য।

ধ্যান ও উদ্যমশীলতা

অনেকে মনে করেন ধ্যানের সময়ে অন্তরে কোন-প্রকার উদ্যম থাকে না। কিন্তু এ-বিশ্বাস ভ্রমপূর্ণ। বুদ্ধ স্বয়ং বলিয়াছেন, যে, চতুর্থ ধ্যানে চিত্ত সমাহিত হয়, পরিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ হয়, নির্দ্দোষ ও নিষ্পাপ হয়, মৃদুতা (অর্থাৎ কোমলতা) প্রাপ্ত হয়, কর্ম্মণ্য (কর্ম্মনীয়) হয়,

স্থির ও অবিচলিত অবস্থা প্রাপ্ত হয় (দীঘ, ২।৮৩; মজ্ঝিম, ৪; অঙ্গুত্তর, ৫।১৭৫।১২, ৫।১৭৬।১২ ইত্যাদি)।

চিত্ত এসময়ে নিশ্চেষ্ট থাকে না, কর্ম্মণ্যই থাকে। চতুর্থ ধ্যানের পরও চিত্ত আরও উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিবার জন্য চেষ্টা করে।

অরূপ ধ্যান

বৌদ্ধ-গ্রন্থে সচরাচর চারিটি ধ্যানের কথা বলা হয়; কিন্তু ইহা অপেক্ষাও পাঁচটি উচ্চতর অবস্থা আছে; এ-সমুদায়কেও কোন-কোন স্থলে ধ্যান বলা হইয়াছে।

পঞ্চম ধ্যান

প্রথম চারিটি ধ্যান রূপ-মূলক; কিন্তু শেষ চারিটি ধ্যান অরূপ ধ্যান।

পঞ্চম ধ্যানে সাধক রূপ-মূলক সমুদায় জ্ঞান, ইন্দ্রিয়ের সমুদায় বিষয়, এবং নানাত্ব বোধ—এসমুদায়ই অতিক্রম করেন। কেবল এই জ্ঞান প্রকাশিত হয় যে 'আকাশ অনন্ত' এবং তখন সাধক আকাশের দিকে অনন্ত আয়তনে বিহার করেন।

ষষ্ঠ ধ্যান

এই ধ্যানে সাধক 'আকাশের অনন্ত আয়তন' এজ্ঞানও অতিক্রম করেন। কেবল এই জ্ঞান প্রকাশিত হয় যে 'বিজ্ঞান অনন্ত' এবং তখন তিনি বিজ্ঞানের অনন্ত আয়তনে বিহার করেন।

সপ্তম ধ্যান

এই অবস্থায় সাধক 'বিজ্ঞানের অনন্ত আয়তন' এ-জ্ঞানও অতিক্রম করেন। কেবল এই জ্ঞান প্রকাশিত হয় যে, "কিছুই নাই" এবং তখন তিনি আকিঞ্চন্যের (অর্থাৎ 'কিছুই নাই' ইহার) অনন্ত আয়তনে বিহার করেন।

অষ্টম ধ্যান

এই অবস্থায় সাধক "আকিঞ্চন্যের অনন্ত আয়তন" এ-জ্ঞানও অতিক্রম করেন। তখন কেবল এই জ্ঞান প্রকাশিত হয়, যে, সংজ্ঞা (perception) এবং অসংজ্ঞা কিছুই নাই এবং তখন তিনি 'সংজ্ঞা বা অসংজ্ঞা কিছুই নাই' ইহার অনন্ত আয়তনে বিহার করেন।

নবম ধ্যান

অষ্টম ধ্যানে যে আয়তনের কথা বলা হইল—তাহার বিষয়ে এই বলা যায় যে, "ইহা সংজ্ঞাও নয়—অসংজ্ঞাও নয়।" নবম ধ্যানে সাধক এজ্ঞানও অতিক্রম করেন। তখন তিনি এমন অবস্থাতে বিহার করেন যে অবস্থাতে বেদনা (sensation) বা সংজ্ঞা (perception) কিছুই থাকে না। প্রজ্ঞা-দৃষ্টিতে তাহার সমুদায় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। এই সাধকের বিষয়ে গোতম আরও বলিয়াছেন—

"তিনি নিশ্চিন্তভাবে গমন করেন, নিশ্চিন্তভাবে দণ্ডায়মান হন, নিশ্চিন্তভাবে উপবেশন করেন এবং নিশ্চিন্তভাবে শয়ন করেন।"

গোতম আলাড় কালামের নিকট সপ্তম ধ্যান এবং রামপুত্র উদ্দকের নিকট অষ্টম ধ্যান শিক্ষা করিয়াছিলেন। নবম ধ্যান কাহারও নিকট শিক্ষা করেন নাই, নিজেই সাধনবলে এই অবস্থায় প্রবেশ করিতেন। (মজ্ঝিম-নিকায়, অরিয়-পরিয়েসন-সুত্ত)।

মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা

মিত্রের প্রতি যে ভাব, সেই ভাবের নাম মৈত্রী; বর্ত্তমান যুগে আমরা প্রেম, ভালবাসা (love), ইত্যাদি শব্দ দ্বারা ইহার ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। প্রাণের যে অবস্থায় অপরের দুঃখে দুঃখ উপস্থিত হয়, অপরের দুঃখ ও অহিত দূর করিবার বাসনা হয়, সেই অবস্থার নাম করুণা। প্রাণের যে অবস্থায় অপরের সুখে সুখ উপস্থিত হয়, সেই অবস্থার নাম মুদিতা। এই তিন অবস্থা অতিক্রম করিয়া যখন মানুষ দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা এবং সুখে বিগতস্পৃহ হয় এবং নিত্যই শান্তভাবে অবস্থিতি করে, সেই অবস্থাকে উপেক্ষা বলা হয়।

মৈত্রী-ভাবনা, করুণা-ভাবনা, মুদিতা-ভাবনা ও উপেক্ষা-ভাবনা, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের এক বিশেষ সাধনা। বৌদ্ধ-শাস্ত্রের বহুস্থলে এই বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

গোতম নিজেও এইপ্রকার সাধন করিতেন। এক স্থলে এইপ্রকার বলিয়াছেন :—

"আমি তৃণপত্রাদি সংগ্রহ করিয়া তাহার উপরে

যোগাসনে উপবেশন করিতাম এবং দেহকে ঋজুভাবে স্থাপন করিয়া মনকে স্থির করিতাম।

তাহার পরে মৈত্রী-পরিপূর্ণ চিত্ত দ্বারা জগতের একদিক্ ব্যাপ্ত করিয়া বিহার করিতাম; এইরূপ দ্বিতীয় দিক্, তৃতীয় দিক্ ও চতুর্থ দিক্ ব্যাপ্ত করিয়া বিহার করিতাম। উর্দ্ধ, অধঃ, তির্য্যক্ এবং সর্ব্বত্র, সর্ব্বস্থানে, সর্ব্বলোকে আমি বিপুল, মহত্ত্বপ্রাপ্ত, অপরিমেয়, অবৈর ও হিংসাবিহীন এবং মৈত্রীপরিপূর্ণ চিত্ত দ্বারা ব্যাপ্ত করিয়া বিহার করিতাম। (অঙ্গুত্তরনিকায়, মহাবগ্‌গ, ৩।৬৩।৬)।

ইহার পরে ঠিক এই ভাষাতেই বলিয়াছেন, যে, তিনি পূর্ব্বোক্তপ্রকারে করুণা, মুদিতা ও মৈত্রী দ্বারা সর্ব্বজগৎ ব্যাপ্ত করিয়া বিহার করিতেন।

এ-বিষয়ে তিনি 'রাহুল'কে এইপ্রকার উপদেশ দিযাছিলেন।—

"হে রাহুল! মৈত্রী-ভাবনা সাধন করিবে, মৈত্রী-ভাবনায় বিদ্বেষ-বুদ্ধি ('ব্যাপাদ') বিদূরিত হইবে। হে রাহুল! করুণা-ভাবনা সাধন করিবে; করুণা-ভাবনা দ্বারা হিংসা-বুদ্ধি বিদূরিত হইবে। হে রাহুল! মুদিতা-ভাবনা সাধন করিবে, মুদিতা-ভাবনা দ্বারা 'অ-রতি'-ভাব বিদূরিত হইবে। হে রাহুল! উপেক্ষা-ভাবনা সাধন করিবে, উপেক্ষা-ভাবনা দ্বারা 'রাগ' (অর্থাৎ আসক্তি, কাম) বিনষ্ট হইবে। (মজ্‌ঝিম, ৬২, মহারাহুলো-বাদ সুত্ত)।

মৈত্র্যাদি-ভাবনা দ্বারা যে বিদ্বেষাদি ভাব অপগত হয় তাহা অন্যান্য স্থলেও বর্ণিত হইয়াছে। (দীঘনিকায়, সঙ্গীতি সুত্তন্ত, ২।২।১৭)।

সম্যক্ সমাধি ও ব্রহ্মবিহার

সম্যক্ সমাধি ও ব্রহ্ম-বিহার উভয়ই সাধনের পথ। কিন্তু প্রণালীতে পার্থক্য আছে। মজ্‌ঝিমনিকায়ের অন্তর্গত মহা-বেদল্ল সুত্তে এই বিষয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সম্যক্ সমাধিতে চিত্তের যে বিমুক্তি হয়, তাহার নাম অনিমিত্ত চিত্ত-বিমুক্তি, আকিঞ্চন্য চিত্ত-বিমুক্তি এবং শূন্যতা চিত্তবিমুক্তি। সমাধির উচ্চ অবস্থায় কোন বাহ্য বস্তু চিন্তার বিষয় হয় না, এইজন্য ইহা অনিমিত্ত (নিমিত্তবিহীন)। তখন অন্তরে এই চিন্তা উপস্থিত হয় 'কিছু নাই' 'কিছু নাই'; এইজন্য ইহার নাম আকি-ঞ্চন্য (কিছু নাই—এই ভাব)। তখন আমিত্ব-জ্ঞান ও মমত্ব-বোধ বিদূরিত হয় এইজন্য ইহার নাম শূন্যতা। কিন্তু ব্রহ্ম-বিহারে চিত্তের যে বিমুক্তি, তাহাতে চিত্তের প্রসারতা বর্দ্ধিত হয়, তাহা অসীম, ও অপ্রমাণ অর্থাৎ প্রমাণ বা পরিমাণরহিত। এইজন্য ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে অপ্রমাণ চিত্ত-বিমুক্তি।

প্রণালীতে পার্থক্য থাকিলেও এতদুভয়েরই লক্ষ্য ও ফল একই। সম্যক্ সমাধি ও ব্রহ্ম-বিহার উভয় সাধনেই রাগ, দ্বেষ, মোহ বিদূরিত হয়; উভয়ই অর্হত্ত্বপ্রাপ্তির ও নির্ব্বাণ-লাভের উপায়। (মজ্‌ঝিম, ৪৩, মহাবেদল্ল সুত্ত)।

উভয় পথই ধ্যানের পথ, উভয়ই গোতমের অনু-মোদিত এবং উভয় পথেই গোতম সাধনা করিয়াছিলেন। এই সাধনার ফল বুদ্ধত্ব-লাভ।

আর্টে ধর্ম্ম ও নীতির স্থান

শ্রী সরোজেন্দ্রনাথ রায়, এম্-এ

ভূমানন্দের প্রকাশ বলিয়া রবীন্দ্রনাথের—তথা ভারতীয় সাহিত্য ও কলার—মধ্যে এক গম্ভীর সত্তা চিত্তকে পুলকিত করে। এক অজ্ঞাত পদক্ষেপ-ধ্বনি শুনিতে পাই—মনে হয় কার যেন রঙীন আঁচলখানি চোখের উপর হইতে সরিয়া যাইতেছে—লুকাইবার ব্যর্থ প্রয়াসে। এইজন্য বিদেশীয়েরা ভারতের সাহিত্যকে ধর্ম্ম-সাহিত্য বলে। ভারতীয় সাহিত্য ধর্ম্ম-সাহিত্য হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? ভারতীয়েরা যে ধর্ম্মাধিপতিকে সকলের মধ্যে দেখিতে পায়! প্রাণের দুয়ারে সে যে চির-অতিথি—শরতের শিউলি ফুল—বসন্তের রঙীন আকাশ—

বর্ষার কূলভরা গম্ভীর জলরাশি যে তাহাকে প্রাণের কত কাছে পাইয়া ধন্য হয়। সে যে অগ্রহায়ণে নবান্নের অতিথি, সে যে পৌষ-পার্ব্বণে পিঠেপুলির আনন্দোৎসবের প্রধান নিমন্ত্রিত—সে যে বৈশাখের পাকা আমটির নিবেদন আগে পায়। হিন্দুর প্রত্যেক গার্হস্থ্য-অনুষ্ঠানে আল্‌পনার ধবল চিহ্নে যে তাহারই অদৃশ্য পদ-চিহ্ন দেখিতে পাই—সে যে নবজাত শিশুর মধ্যে বারে বারে জন্মগ্রহণ করে—আবার যখন দুঃখের দিনে চক্ষের জলের মধ্যে পরিবারের প্রিয়তম অংশীটি চির-বিদায় লইয়া কূলহারা সাগরের পথে যাত্রা করে তখনও সে ধন্য হয়।

সকলপ্রকার দৈনন্দিন কার্য্যের মধ্যে ভূমাকে দেখিয়াছিল বলিয়া ভারতীয় সাহিত্য ধর্ম্ম-সাহিত্য। ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া ভারতীয় সাহিত্য, স্থপতি, চিত্র, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি জন্মলাভ করিয়াছিল। ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিয়া দেখিলে ভারতীয় কলার কিছুই থাকে না। সুদূর বিন্ধ্যাচলের গিরি-গুহার গোপন-চিত্রমালাই হউক আর উদার প্রান্তরের রহস্যময় প্রস্তর-স্তম্ভই হউক সকলেই সে-অনন্তের অন্তহীন লীলার পরিচয় দিতেছে। সংস্কৃত সাহিত্য রস ও ভাবের মধ্যে এক কৃত্রিম ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছিল। রস ইহজগতের বস্তু লইয়া সাধারণ বিষয়ী মানুষের জন্য। ভাব ভূমাকে লইয়া—ভক্তের জন্য—অবিষয়াসক্তের জন্য। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে কি এই বিভাগ রহিয়াছিল?—সুন্দর ও মঙ্গল, রস ও ভাব কি ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত নহে? কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ আদিরসাশ্রিত কাব্য হইলেও তদানীন্তন কালের যা ধর্ম্মানুভূতি তাহার ছাপ ইহাতে আছে। ভবভূতির উত্তররাম-চরিতের ত কথাই নাই। প্রসাদ ও ওজঃগুণের কি আশ্চর্য্য সমাবেশ! কিন্তু তাই বলিয়া ইহাতে যে মানুষের রক্ত-মাংসের আকাঙ্ক্ষা ও পিপাসার আহ্বান নাই তাহা নহে। এইসব কারণে সংস্কৃত-নাটক বা কাব্য পড়িলে মনে ভক্তি, আনন্দ ও বিস্ময়ের যুগপৎ উদয় হয়। সুন্দর ও মঙ্গলকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করাই ভারতীয় আর্টের কৃতিত্ব। ভারতের প্রকৃত আর্ট কোন দিন জাতীয় জীবনের অমঙ্গল ও ব্যক্তিগত জীবনের দুর্নীতির প্রশ্রয় দেয় নাই। সৌন্দর্য্য-প্রীতি ও শোভনতা মানুষকে অনেক পাপের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে। এই কথা শুধু ভারতের পক্ষে প্রযোজ্য নহে—ইহা সমস্ত পৃথিবীর সভ্যতার কথা। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "অসংযমকে অমঙ্গল বলিয়া পরিত্যাগ করিতে যাহার মনে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, সে তাহাকে অসুন্দর বলিয়া ইচ্ছা করিয়া ত্যাগ করিতে চাহিতেছে। সৌন্দর্য্য যেমন আমাদিগকে ক্রমে-ক্রমে শোভনতার দিকে, সংযমের দিকে আকর্ষণ করিয়া আনিতেছে, সংযমও তেম্‌নি আমাদের সৌন্দর্য্য-ভোগের গভীরতা বাড়াইয়া দিতেছে।" এই কথাই শ্রীঅরবিন্দ Shama'a নামক পত্রিকায় লিখিয়াছেন—"Our sense of virtue is a sense of the beautiful in conduct and our sense of sin a sense of ugliness and deformity in conduct." অর্থাৎ আমাদের ধর্ম্মভাবের ধারণা আমাদের ব্যবহারিক জীবনে যা সুন্দর তার সঙ্গে জড়িত, আর আমাদের পাপের ধারণা আমাদের আচরণে যা কুৎসিত তার সঙ্গে সম্পৃক্ত। আমাদের ক্ষমা, প্রেম, ভক্তি ও অহিংসা এই সৌন্দর্য্যের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। উচ্চাঙ্গের আর্ট—যাহা সুন্দর—তাহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে যদি সে আমাদের প্রাণে উচ্চভাব ও পবিত্রতা আনিয়া না দেয়। অন্য কথায় বলিতে গেলে, ইহাই বলা যায়, যে সে-আর্ট্ আর্ট্ই নয় যাহার সৌন্দর্য্যের মধ্যে মঙ্গলের বীজ নিহিত নাই।

ধর্ম্ম সাধনার বস্তু। সাধনার সঙ্গে-সঙ্গে একটা কৃচ্ছ্রের ভাব লাগিয়া রহিয়াছে। অপর দিকে সৌন্দর্য্য আনন্দের বস্তু—ইহাতে শুষ্কতা বা কঠোরতার লেশমাত্র নাই। সেইজন্য ধর্ম্ম ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে কোন-কোন সময় বিশেষতঃ ইউরোপের Puritan যুগে একটা বিরোধ ঘটিয়াছিল। আমাদের দেশেও ইহা হইয়াছিল। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম এককালে মঙ্গল ও সংযমের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া সৌন্দর্য্যকে বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইয়াছিল। তখন আমাদের দেশে ললিতকলা পাপ ও ব্যভিচারের আশ্রয়স্থল ছিল। রবীন্দ্রনাথের মতে সংযম ব্যতীত সৌন্দর্য্য ভোগ করা অসম্ভব। তিনি বলিয়াছেন—"যথার্থ সৌন্দর্য্য সমাহিত

সাধকের কাছেই প্রত্যক্ষ। লোলুপ ভোগীর কাছে নয়।" "আমাদের সৌন্দর্য্য-প্রিয়তার মধ্যেও যদি সেই সতীত্বের সংযম না থাকে তবে কি হয়? সে কেবলই সৌন্দর্য্যের বাহিরে-বাহিরে চঞ্চল হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়; মত্ততাকেই আনন্দ বলিয়া ভুল করে।" তখনকার দিনেও আমাদের দেশে তাহাই ঘটিয়াছিল। তাই তখনকার দিনে যাঁহারা নীতি ও চরিত্র সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের তদানীন্তন ললিত-কলার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। পরে তাঁহা-দিগের বুঝিতে হইয়াছে যে, সৌন্দর্য্য ও মঙ্গল দুইএর কাহাকেও ছাড়িলে একদিনও চলে না। তাহাতে সমাজ এক পাও অগ্রসর হয় না। অরবিন্দ বলিয়াছেন—আমাদের মঙ্গল সৌন্দর্য্যের দাস হইবে না সত্য, কিন্তু সুন্দর ও আনন্দপূর্ণ হইবে। এইখানে সে শুধু মঙ্গল থাকিবে না। আমরা ধর্ম্মাচরণের জন্য জীবনধারণ করি না, কিন্তু ধর্ম্মের জন্য করি, আনন্দের জন্য করি। মানবের উন্নতি সৌন্দর্য্য ও আনন্দকে ত্যাগ করিয়া নয় কিন্তু হীন হইতে উচ্চ ও খণ্ড হইতে অখণ্ড আনন্দ ও সৌন্দর্য্যের দিকে অগ্রসর হওয়ায়। (Shama'a—"National Value of Art")। আর্টের উচ্চ-নীচ স্তর-ভেদকালে আমাদের এই কথা স্মরণ রাখা দরকার। অনেক সময় দেখা যায় যে, সৌন্দর্য্য আনন্দ দেয় বলায় যাহা কিছু আনন্দদায়ক তাহাকেই সৌন্দর্য্য বলা হয়। পরে আনন্দ এই কথাটির সঙ্গে যে একটা পবিত্রতার আঁচ লাগিয়া আছে তাহাও চলিয়া যায়। প্রাচীন কালের এপিকিউরাসের উচ্চ আনন্দবাদ যেমন এখন পান-ভোজনে নামিয়াছে তেমনি কালে আমোদ ও আনন্দ এক হইয়া দাঁড়ায় এবং যে-আর্ট্ আমোদ দেয় তাহাকেই প্রকৃত আর্ট্ বলা হয়। ইহার ফলে যে-সমস্ত লোক ধর্ম্মকে চায় তাহারা সৌন্দর্য্যকে ত্যাগ করে। কিন্তু এই মিথ্যার বিরুদ্ধে আমাদের সাবধান থাকিতে হইবে। আর্ট্ ধর্ম্মকে সহজ করিয়া দেয়—তাহার শুষ্কতা অপনোদিত করে। সে মিষ্ট হয়।

আমরা বারান্তরে বলিয়াছি গান ব্যতীত সকলপ্রকারের সাহিত্য বিশেষ উদ্দেশ্য ও চেষ্টার ফল। কেবল গানেই বোধ হয় কবির নিজের চেষ্টা খুব কম—নাই বলিলেই চলে। দেহহীন সুরকে আকার দিতে যতটুকু চেষ্টা লাগে তাহাই প্রকৃত গানে আবশ্যক। তবে গানে মানুষের প্রাণ, তাহার ব্যক্তিত্ব—তাহার সমগ্রতা জাগ্রত হয় বলিয়া ইহাতে দেব-ভাবই প্রকাশ পায়—মন্দের ছাপ ইহাতে বড় একটা লাগিতে দেখা যায় না। প্রকৃত গান হৃদয়ের বস্তু বলিয়া ইহা পবিত্র। যে গান নীচ-ভাবকে জাগ্রত করে তাহা কোন দিন রচয়িতায় হৃদয়ে আবেগের সৃষ্টি করে নাই—রচয়িতা হৃদয়ের গোপন কোণে তাহার সন্ধান পাইয়া আশ্চর্য্যে ও আনন্দে অধীর হইয়া অপরকে দিবার জন্য ব্যাকুল হন নাই। প্রকৃত গান বা সত্য সাহিত্য হইতে কোন দিন কাহারও অপকার হয় নাই। নাটক ও উপন্যাসে রচয়িতার কৌশল পরিস্ফুট হয়। সেখানে বিচিত্র ঘটনা, স্থান, কাল ও ব্যক্তির সমাবেশে একটা জিনিষ ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা হয়। অনেক সময়ে গ্রন্থকার একটা ছোট প্লটের আশ্রয়ে তাঁহার বিচিত্র বহুদর্শিতা, অভিজ্ঞতা নানাবিধ রসের মধ্য দিয়া প্রকাশ করেন। উদ্দেশ্য প্রকাশ করিয়া অপরকে আনন্দ দেওয়া—সকলকে বলিয়া নিজের সুখ বা দুঃখের ভার ভাগ করিয়া হাল্কা করিয়া লওয়া। রোলাঁর জাঁ ক্রিস্তেপ্-এ নানা ঘটনার সমাবেশে মানবজীবনের কতকগুলি দিক্ ব্যক্ত করা হইয়াছে। এখানে দেখিতে হইবে গ্রন্থকার কিরূপ—তাঁহার চিন্তার গভীরতা কতটুকু—তাঁহার হৃদয় কিরূপ—সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে তাঁহার আদর্শ কি—মানবকে লইয়া তিনি কি বলিতে চাহেন—তাঁহার মুখ কোন্ দিকে ফিরিয়া আছে—তাঁহার সৃষ্টির সঙ্গে তাঁহার প্রাণের কিরূপ যোগ—তাঁহার মতের জন্য তিনি কি লাঞ্ছনা সহ্য করিতেও প্রস্তুত?

এক শ্রেণীর লোক আছেন তাঁহাদের এ-সব প্রশ্নে ঘোরতর আপত্তি। তাঁহারা বলেন, আর্টের খাতিরে আর্ট্কে দেখিতে হইবে—L'art pour l'art। চিত্রে আর্টের technique অর্থাৎ রীতি ঠিক হইয়াছে কি না—কাব্যে সে ভাবগুলি উত্তমরূপে প্রকাশিত করিয়া মানব-মনে প্রকাশ-জনিত আনন্দ দিতেছে কি না—ইহাই দেখিবার বিষয়। উদ্দেশ্যের সহিত তাহার কোন যোগ নাই—ফলাফলের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই।

ফরাসী দেশের অন্তর্গত সুবিখ্যাত সর্‌বন (Sorbonne) বিদ্যা-পীঠে ভিক্তর্ কুজাঁ (Victor Cousin) ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে বক্তৃতা-কালে আর্ট্‌কে অন্য বিষয় হইতে পৃথক্ করিয়া বিচার করিবার কথা বলিয়াছিলেন। তিনিই উপযুক্ত বিখ্যাত বাক্যটির স্রষ্টা। (Rudolf Eucken's Main Currents of Modern Thought pp. 405)। পরবর্ত্তী কালে দার্শনিক-প্রবর কঁৎ (Comte) আর্ট্‌কে ধর্ম্ম, নীতি, রাজনীতি প্রভৃতি পরিপার্শ্ব হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিতে বলিয়াছেন। যে-কোন কারণেই হউক এই বাক্যটি প্রায় শতাব্দী-কাল ধরিয়া আর্ট্-চর্চ্চা-ক্ষেত্রে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিতেছে। আর্ট্-অর্থে যদি আমরা শুধু রচনা-পদ্ধতি বুঝিতাম, তাহা হইলে ইহা সম্ভব হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু আর্ট্-অর্থে আমরা একটা সমগ্রকে বুঝি। ইহা হইতে কবির মন, দেশ, কাল, পাঠকের মঙ্গলা-মঙ্গল, ধর্ম্ম-নীতি ইত্যাদি বাদ দেওয়া চলে না। ইহা এখন আমাদের কাছে শুধু রচনা-প্রণালী নয়। আশ্চর্য্য কৌশলের সঙ্গে যদি নানা-রূপ রঙের সমাবেশ করি বা সরল রেখার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া যদি খুব নিপুণতার সহিত অঙ্কিত বৃত্তাংশের সাহায্যে আমার চিত্র অঙ্কিত করি তাহা হইলেই তাহা সুন্দর চিত্র হইবে না। যদি এমন হয় যে লতান হাত-পা বা চীনাদের মত চক্ষু অঙ্কিত করা খুব কঠিন কাজ এবং চিত্রবিশেষের ধারা, তাহা অঙ্কিত করিতে পারিলে কোন মণ্ডলীর লোকদের কাছে বাহবা খুব পাওয়া যায়, তবুও তাহা সত্য-সত্য চিত্রিত বস্তুকে সুন্দর করে কি না দেখিতে হইবে। যৌবন-স্ফীতা শকুন্তলার অনিন্দ্যসুন্দর মূর্ত্তি যাহা বল্কল-বন্ধনের মধ্যে থাকিতে পারিতেছে না—তাহা রোগা পিট্‌পিটে একটি গারো রমণীর মত করিয়া অঙ্কিত করা হইয়াছে দেখিয়াছি। চক্ষু চৈনিক হইয়াছে, উপরের ঠোঁট বেশ পুরু হইয়াছে। তাহাতে হয়ত চিত্রের বিশেষ-কোন-পন্থী লোকেরা তৃপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু তাহা সত্য-সত্য সুন্দর হইয়াছে কি? আনন্দ-বিধান করিয়াছে কি? অপর দিকে নিখুঁত সুন্দর মূর্ত্তি যদি হৃদয়ের উচ্চ-ভাব প্রকাশ করিতে অসমর্থ হয় তাহা হইলে সুন্দর আর্ট্ হইবে না। সেইরূপ কাব্যের রচনা-প্রণালী যদি কৌশলপূর্ণ হয় তাহা হইলেই আমরা সন্তুষ্ট হইব না। নাটকীয় আর্ট্-হিসাবে হয়ত সেক্স্‌পীয়র্ তাঁহার পরবর্ত্তী কালের আর্টিষ্ট্‌দের সমকক্ষ ছিলেন না—অনেক বাহুল্য কথা, অনাবশ্যক দৃশ্য, ভূতপ্রেত, নেপথ্য-বাণী, স্বগত চিন্তার সাহায্যে নাটকীয় ঘটনাবলীর উদ্ঘাটন প্রভৃতি যাহা বাস্তব জীবনে দৃষ্ট হয় না, এইরূপ অনেক দোষ তাঁহার নাট্য-শিল্পের আছে। ইব্‌সেন্ প্রভৃতির নাটক এ-সব দোষে দুষ্ট নহে। কিন্তু তবুও সেক্স্‌পীয়র্-এর মধ্যে যাহা আছে তাহা অপরের মধ্যে নাই—তাঁহার চরিত্রাঙ্কন তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। অনেক অসুবিধা-সত্ত্বেও সেক্স্‌পীয়রের্ পাঠকের অভাব হইবে না। সুতরাং দেখা গেল, এক্ষেত্রে আর্ট্ অর্থে আমরা শুধু রচনা-প্রণালী বুঝি না—গল্প, চরিত্রচিত্রন, নানা-ভাবের ক্রীড়া ও প্রভাব প্রভৃতি আরও অনেক বুঝি। সুতরাং ঐ অর্থে আর্টের খাতিরে আর্ট্ এই বাক্যের প্রয়োগ হওয়া সঙ্গত মনে হয় না। আর্টের অর্থে যদি আর্টের বস্তুও বুঝায় তবে বস্তুটি কেমন সেই প্রশ্ন ওঠে। যাহা সুন্দর তাহার ফলও সুন্দর। তাহার উৎপত্তি স্থানও সুন্দর। সুন্দর বস্তুর লক্ষণ কি? তাহার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে। যাহা অপরকে তাহার সৌন্দর্য্য দ্বারা প্রভাবান্বিত করে। তাহা মানব-জীবনকে সুন্দর করে—এইখানে নীতির সহিত ইহার সম্বন্ধের কথা আসে। নীতির কথাতে আর্টিষ্ট্‌দের অনেকের ঘোর আপত্তি উঠিতে দেখা যায়। ইহার অর্থ এই যে, আর্ট্ মানবমনের স্বাধীনতা আনে, আর নীতি তাহাকে নাগপাশের বন্ধনে বাঁধে। আর্টের সাহায্যে মানবের ব্যক্তিত্ব, তাহার ভাব, চিন্তা, ইচ্ছা অনিচ্ছা, রুচি-অরুচি প্রকাশ হয়। প্রকাশের সঙ্গে একটা আরাম একটা মুক্তির ভাব আছে। কিন্তু নীতি অনেক জিনিষকে 'নেতি' বলে—অনেক-কিছুকে ত্যাগ করিতে বাধ্য করায়—'না' করিবার একটা দুঃখ, একটা ব্যথা আছে। সেইজন্য নীতির নামে লোকে ভয় পায়। কিন্তু তাই বলিয়া নীতি কতক-গুলি শুষ্ক প্রাণহীন নিয়ম নহে। মানব আত্মার অনন্ত বিকাশের দিক্ আছে—যাহা অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইলে সে ভূমার সহিত যুক্ত হইতে পারে। আত্মার এই পূর্ণ বিকাশের যে প্রয়াস তাহাতেই নীতির জন্ম। নীতি জীবনের গভীরতম দেশের বস্তু। ইহা মানুষকে বাহির

হইতে হৃদয়ের অন্তঃপুরে লইয়া যায়। পূর্ণ বিকাশ কখনও অসুন্দর হইতে পারে না। নীতিবিহীন আর্ট্ কখনও সুন্দর হইতে পারে না। আর্ট্ নীতিকে সরস করে ও ভূমার সহিত যুক্ত হইতে সাহায্য করে। মানব-হৃদয়ের মধ্যে যে সৌন্দর্য্যের খনি রহিয়াছে, তাহাকে উপেক্ষা করিয়া উপবাসে রাখিলে সমস্ত জীবন দুঃখ পাইবে—সমগ্র মানবত্বের কখনও বিকাশ সম্ভবপর হইবে না। জীবনে মঙ্গল ত চাইই, কিন্তু সৌন্দর্য্যকে ত্যাগ করিতে পারি না। সেই জীবনই ধন্য যাহা সত্যকে চিনিয়া লইয়াছে এবং সেই পরিপূর্ণ সত্যের অখণ্ড-মূর্ত্তির মধ্যে সুন্দর ও মঙ্গলকে সখ্য-বন্ধনে নিত্য আবদ্ধ দেখিয়াছে।

ধর্ম্মে ও সাহিত্যে আমরা স্বীকার করিয়া লইয়াছি যে, মানবাত্মা স্বাধীন। প্রত্যেক মানব নিজ নিজ আলোকের অনুসরণ করিয়া বিকাশের দিকে অগ্রসর হইবেন। ইহা সত্য। ইহার ফলে আমরা কতকগুলি ভাব প্রচারিত হইতে দেখিতেছি। যেমন প্রত্যেক মানুষের রুচি, ইচ্ছা ও সংকল্প তাহার নিকট সত্য—উহা সমষ্টির অনুকূল হউক বা প্রতিকূল হউক। প্রত্যেক জাতির মঙ্গল তাহার নিকট সত্য—ইহাতে অপরাপর জাতির যতই অনিষ্ট হউক। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যাহা সত্য ইচ্ছা, সত্য সংকল্প ও সত্য মঙ্গল তাহা ব্যক্তি বা জাতিকে ভূমার দিকে লইয়া যায়—যাহা ভূমার উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাই সত্য। স্বজাতি-প্রেম শ্রেষ্ঠ, কি বিশ্বমানবতা শ্রেষ্ঠ—হিংসা ও স্বার্থপরতা শ্রেষ্ঠ, কি বিশ্বের কল্যাণের জন্য বিন্দু বিন্দু করিয়া আত্মবলিদান শ্রেষ্ঠ—ক্ষুদ্রতা শ্রেষ্ঠ কি উদারতা শ্রেষ্ঠ—প্রবৃত্তির তুষ্টি সত্য কি তার বিসর্জ্জন শ্রেষ্ঠ—অণুর আহ্বান সত্য কি আদর্শের স্বপ্ন সত্য, এই ভূমার সহিত যোগে বুঝিতে পারি। আর্ট্ একটি ক্ষুদ্র সম্পর্কবিহীন বিষয় নহে। জীবনের সঙ্গে ইহা গভীর যোগে যুক্ত। আমরা যেমন জীবনকে লইয়া ধূলা-খেলা করিতে পারি না, আর্টকে লইয়াও সেরূপ পারি না।

নিষ্কণ্টক

জুড়নজীবন মুখোপাধ্যায়

রামজীবন খদ্দরের চাদরখানা গায়ে ফেলিয়া প্রত্যুষেই নিস্তার-মাসীর বাড়ীর দরজায় উপস্থিত হইল। তার পর নিঃশব্দে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া উদ্বেগ-উৎকর্ণ কানদু'টি গৃহদ্বারে স্থাপিত করিয়া ধীরে ধীরে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। বাহিরে আসিয়া গোশালা হইতে গরুটিকে বাহির করিয়া ও চারিদিক্ একবার নিরীক্ষণ করিয়া ত্বরিতপদে বাহির হইয়া গেল।

কার্ত্তিকমাস হইতেও বেশ একটু ঠাণ্ডা পড়িয়াছে। শরতের শেষটায় ম্যালেরিয়া তাঁহার বিজয়বাদ্য বাজাইয়া একটু নিরস্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছেন দেখিয়া নিউমোনিয়া, টাইফয়েড, এই সুযোগে ভূভার হরণার্থ বঙ্গপল্লীতে দেখা দিয়াছেন. দরিদ্র বিধবা নিস্তারিণীর বালক পুত্র নিউমোনিয়ার অনুগ্রহে সুজলা-সুফলা বঙ্গ ছাড়িয়া একেবারে চিরমলয় সেবিত স্বর্গধামেই আশ্রয় পাইতে বসিয়াছিল; কিন্তু অর্ব্বাচীন রামজীবনটার জন্য সে-সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইল। গ্রামের প্রবীণ জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলিলেন যে, পরমায়ু থাকিতে কেহ মরে না, মানুষের চেষ্টা অনর্থক, একমুঠা নেহাৎ কপালে ছিল বলিয়াই নাকি রক্ষা পাইয়া গিয়াছে, কেননা মানুষের চেষ্টায় যদি প্রাণরক্ষা হইত তাহা হইলে সপ্তম এডওয়ার্ড মরিতেন না। এই অকাট্য যুক্তির প্রয়োগের সময় বক্তার সগর্ব্ব হাস্য দশ-বিশ জন অনুমোদকের হাস্যের সহিত মিশিয়া

মানুষের সমস্ত শক্তিকে এম্‌নিভাবেই অস্বীকার করিল, যে, শ্রোতামাত্রেই উপলব্ধি করিলেন, উদ্যোগ ও পৌরুষ যেন শুধুই নির্ব্বুদ্ধিতা-প্রসূত।

বৃদ্ধ লুটবিহারী চাটুয্যে হুঁকাটা টানিতে টানিতে ফণী চৌধুরীদের বাটীর দিকে আসিতেছিলেন, কালো মোজার উপর সাদা-মোজা-আবৃত পা দু'টি যে 'চটি-জোড়াটির' মধ্যে ভ্রমণ করিতেছিল, তাহার প্রকৃত বর্ণ বিশেষ পর্য্যবেক্ষণের পর জানিতে পারা যাইত। গাত্রে তূলার একটি কুর্ত্তি ও তদুপরি মস্তক আবৃত করিয়া বালাপোষ। রামজীবনকে হন্‌ হন্‌ করিয়া আসিতে দেখিয়া চট্টোপাধ্যায় প্রশ্ন করিলেন, "এত সকাল সকাল এদিকে কোথায় চলেছ হে?"

"আজ্ঞে, গয়লাবাড়ী যাব একবার।"

"চায়ের নেশা করেছ বুঝি? এই ত বাপু, স্বদেশী স্বদেশী করে' বেড়াও, কেন ও বিলিতী নেশা বলদিকি! খদ্দর পর্‌লেই স্বদেশী হয় না। আমরা ওসব দেখে' শুনে' চুপ্‌ হ'য়ে আছি।"

"আজ্ঞে না, চা ত আমি খাই নে। গয়লাবাড়ী যাচ্ছি, সাতু গয়লাকে ডেকে গরুটা দুইয়ে নেবো।"

"এত সকালে দুধ কে খাবে? তোমার বুড়ো পিসী, না তুমি? বাড়ীতে ত দু'জন লোক মোটে।" বলিয়া রামজীবনের মিথ্যা জবাবদিহিটা তিনি যে নিতান্তই ধরিয়া ফেলিয়াছেন ও এই প্রশ্নে তাহার মত এম্‌-এ-পাশ ছোক্‌রাকে যে একেবারে বোকা বানাইয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন এইভাবে একটু হাসিয়া তিনি হুঁকাটায় একটা টান দিলেন ও চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন।

রামজীবন মৃদুস্বরে কহিল, "আমি কি মিথ্যা কথা বল্‌লাম? কি আশ্চর্য্য!" বলিয়া সেও অগ্রসর হইতে উপক্রম করিল।

কথাটায় তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ ধারণার প্রতিবাদ করার ধৃষ্টতা প্রকাশ পাইল অনুভব করিয়া চট্টোপাধ্যায় ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রুক্ষকণ্ঠে কহিলেন, "দেখ, ছোটমুখে বড়কথা ভাল নয়। লেখাপড়া শিখে' একটা হস্তিমূর্খ হয়েছ কিনা! তোমার বাপের থেকে বয়সে বড় আমি,তা জান?"

হতভম্ব হইয়া রামজীবন কহিল, "কেন, আমি ত আপনাকে কিছু বলিনি"!

"আবার কি বল্‌বে? ধরে' জুতো মার্‌বে? আমি আশ্চর্য্য লোক হ'য়ে গেলাম?"

রামজীবন কহিল, "জ্যেঠামশায় আপনি শুন্‌তে ভুল করেছেন; তা হ'লেও আপনি রাগ ক'র্‌বেন না, ক্ষমা করুন।"

অপেক্ষাকৃত নরম হইয়া চট্টোপাধ্যায় কহিলেন, "আহা, ক্ষমা তোমায় কেন করব না! কথাটা হচ্ছে একটু বিনয়ী হবে, যতই লেখা পড়া শেখ আমাদের যে অভিজ্ঞতা, এ পেতে হ'লে এই বয়স হওয়া চাই, বুঝ্‌লে—তবে বুঝে' সমঝে' কথা কইতে শিখ্‌বে। তোমাকে মিথ্যুক কি আমি বলিছি বলদিকি? হ্যাঁ, তা এত সকালে দুধ কি হবে?"

"আজ্ঞে, নিস্তার-মাসীদের বাড়ীর জন্যে। জানেন ত ছেলেটা এযাত্রা বোধ হয় রক্ষা পেলে, কিন্তু মেয়েটাকে আবার ধরেছে। ডাক্তার দুধটা খেতে বলেছে বেশী করে'। তা ভগবানের কৃপায় ওদের গরুটা দুধ পর্য্যাপ্তই দেয়। সকালবেলা রোগীদুটির পথ্যের জন্যই দুধ দর্‌কার।"

"মেয়েটা, সেই বিধবা মেয়েটা বুঝি।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তার পথ্য দুধ! তা ভাল। কি রোগটা তার?"

"স্ত্রীরোগ-গোছের।"

"বিধবা-মানুষের আবার স্ত্রীরোগ! তার মানে?"

"আজ্ঞে, বিধবা হ'লেও স্ত্রীলোক ত বটে। ম্যালেরিয়ায় ভুগে' ভুগে' কাহিল শরীরের উপর ভায়ের অসুখের সময় অত্যাচার হয়েছে, ঠাণ্ডা লেগেছে। তার থেকে হেমারেজ হ'য়ে রক্তহীন হ'য়ে পড়েছে।"

"দেখ রামজীবন, বিধবা মানুষের ঠাণ্ডা-লাগা-টাগা কিছু নয়। অসুখ হয়েছে বলে' অত বিবির মত যত্ন করা, ডাক্তার-দেখানো, দুধ-খাওয়ানো, তার উপকার করা নয়, মহা অপকার করা। ব্রহ্মচারিণী বিধবা, রোদে আগুনে জলে ভাজা-ভাজা হবে, সে ত বিবি নয়। ওসব কাজ ঠিক নয়। আগুনের ফুল্‌কির মত মেয়ে, ও কোনও-রকমে মরে' গেলেই ওর মায়ের জঞ্জাল যায়, তা জান?

ওর পক্ষে ও সুখের। বিধবার বেঁচে ত সুখ নেই। ম'লেই মঙ্গল। আর তুমিই বা অতটা যত্ন ওদের কেন নিচ্ছ বলদিকি? একটা কুৎসা রটে' গেলে ওদেরই বিপদ্ বেশী, সেটা তোমার বোঝা উচিত।"

"আজ্ঞে, আমার প্রতিবেশী, নিঃসহায় দরিদ্র, বিপদে দেখ্‌ব না?"

"মানুষের সহায়ের কোনও মূল্য নেই—হাঁ। বেশী ওদের দেখাশোনা কর্‌তে যেও না। এই বৃদ্ধের বচনটি মেনে নিও।"

রামজীবন চলিয়া যাইতে যাইতে আপনমনে বলিল, "নীচ লোকের শত্রুতারও কোনো মূল্য নেই। সে শুধুই উপেক্ষার।"

দুধ দেওয়া শেষ হইলে রামজীবন ডাকিল, "ও মাসী, এইবার ওঠ গো। বেলা হ'য়ে গেছে।" মাসী উঠিয়া বাহিরে আসিলেই জিজ্ঞাসা করিল, "রাত্রে বেশ সুনিদ্রা হয়েছে ত ওদের? আর ভয় নেই মাসী। আমি একেবারে তিনদিনের ওষুধ এনে দিয়ে আজ কল্‌কাতায় চলে' যাব। খুব সাবধানে রেখো ক'দিন—বুঝ্‌লে?"

মাসী চক্ষু মুছিতে মুছিতে কহিলেন, "কল্‌কাতায় কেন যাবি, বাবা?"

"দরকার আছে একটু। এই যে আমাদের জনার্দ্দন ঠাকুরদা' ছিলেন তাঁর ছেলে হরিশ কাকাকে তোমরা দেখেছ ত?"

"তা আর দেখিনি! সে যে বিলাত থেকে জজ ব্যারিষ্টারি পাশ করে' কল্‌কাতায় মস্তলোক হ'য়ে বসেছে।"

"হ্যাঁ, সেই তাঁরই কাছে আমি যাব। বিলাত ফেরৎ হ'লে কি হয়, অতি সুন্দর লোক। খুব স্বদেশী, আমাদের গ্রামের উপরও কত টান যে আছে কি বল্‌ব! আমার কাছে সকলের খবর পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করেন। তিনি একদিন এখানে আস্‌বেন সেইসব বন্দোবস্ত কর্‌তে যাচ্ছি। এখানে একটা মেয়ে ইস্কুল কর্‌বার টাকা দেবেন। ছোট-ছেলেরা বিনা-মাইনেতে পড়্‌তে পারে এমন একটা ইস্কুল করা হবে। আরও সব অনেক মতলব আছে, মাসী। যখন হবে দেখ্‌তে পাবে।" বলিয়া তাহার পল্লীমাতার ভবিষ্যৎ রাজ্জীশ্বের নিশ্চিত সম্ভাবনায় পুলকিত হইয়া সে হাসিতে লাগিল।

(২)

বৃদ্ধ চট্টোপাধ্যায় ধীরে ধীরে গ্রামের মস্তকসদৃশ ফণীন্দ্র চৌধুরীর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। বাহিরের রোয়াকের উপর হইতে হাঁকিলেন, "ওরে জগা! ব্যাটা ডেমো-গয়লা বজ্জাতের ধাড়ী; রোয়াকটাতেও এখনও ঝাঁটার বাড়ী দিতে পারেনি!"

বৃদ্ধ চৌধুরী বাহিরে আসিলেন। "নটদার যে একেবারে শীতের ঝাঁক দেখে' বাঁচিনে। করেছ কি দাদা, এত শীত এখনও পড়েনি।"

"আরে না ভাই, বুড়ো হাড় যত্ন না কর্‌লে কি টিঁকিয়ে রাখা যায়? ঠাণ্ডা লাগ্‌লে আর রক্ষে নেই। দেখ্‌ছ না নিউমোনিয়ার ধূমটা। তোমার গিয়ে এখনও বয়েস আছে। হাজার হোক্ আমার থেকে পাঁচ-ছবছরের ছোট তুমি।"

"হ্যাঁ—বয়েস নেই আবার! বোধ হয় একটা বিয়ে আবার করা চলে, না দাদা?"

ভৃত্য জগা রোয়াকের উপর সতরঞ্চিটা বিছাইয়া দিতে আসিতেই চট্টোপাধ্যায় কহিলেন, "এই এদিকে এই রোদ্‌টায়। ব্যাটাকে তিন্‌শো তিরিশ দিনই বল্‌তে হবে। হ্যাঁঃ! আমার কি জ্ঞান, এই সারা শীতকালটা তোমাদের বাড়ীর এই রোয়াকটায় সকাল-বিকেলটা কাটান চাই। ব্রহ্মাণ্ডে রোদ্দুর আস্‌বার আগে এই রকটাতে আস্‌বেই। আবার ওবেলা, মজাটা দেখ, চারদিক্ অন্ধকার হ'য়ে গেল, এখানটায় রোদ্দুরটা আছেই। সেকালের সব লোকের মাথা ছিল, বলিহারি! বিশেষ আমার নবীন-জ্যাঠার। কোন ব্যাটা ইঞ্জিনিয়ারের মাথায় আসুক দিকি আজকাল এইসব ফন্দি। কল্‌কাতায় সব বড়-বড় বাড়ী, বুঝ্‌লে ভায়া, না আছে রোদ্দুর না আছে হাওয়া। তোর ইঞ্জিনিয়ারের কাঁথায় আগুন!"

ক্রমে আরও দুইচারিজন বৃদ্ধ ও তদ্দলভুক্ত লোক আসিয়া সেখানে সমবেত হইলেন। বৃদ্ধ চট্টোপাধ্যায় আরম্ভ করিলেন, "বুঝ্‌লে ফণী-ভায়া, আজ যখন তোমার এখানে আস্‌ছি, দেখি তারিণীর বেটা রামজেবনা, এম্-এ পাশ-

করা বাঁদর, হন্ হন্ করে' চলেছে। জিজ্ঞাসা কর্‌লাম কোথায় চলেছ এত সকালে হে? বলে গয়লাবাড়ী। আমি বল্‌লাম যে কাক-পক্ষী ওঠেনি, এখনই এত সকালে গয়লাবাড়ী কেন? না, গরুদোয়াতে দোয়াল ডাক্‌তে যাচ্ছি। তখন আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম যে, এত সকালে দুধ কি হবে, চা খাবে বুঝি! ব্যস্ একেবারে চটে' আগুন! বলে আপনি ত আশ্চর্য্য লোক দেখ্‌ছি। চা খাই আর না খাই আপনার তাতে কি? বোঝ একবার আস্পদ্দা!"

একজন প্রবীণ ব্যক্তি বলিয়া উঠিলেন, "আপনার পায়ের জুতোটা ছিল কোথায়? দু'চার ঘা দিয়ে দিতে হয়। তার পর আমরা দেখে' নিতাম কি করে। অকাল কুষ্মাণ্ড! আমি বলি তারিণীর ছেলেটা বুঝি মানুষ হয়েছে।"

কলিকাতে ফুঁ দিতে দিতে জগা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া কহিল, "পায়ের জুতো আবার কম্‌নে থাক্‌বে কত্তা, ছিরিচরণেই ছেল।"

চট্টোপাধ্যায় ধমক দিয়া কহিলেন, "থাম্ ব্যাটা। হ্যাঁ, মানুষ আবার হয়নি, খুব হয়েছে। ব্যাপার শোন, ঐ যে নীলকণ্ঠর বিধবা বউ নিস্তার; একটা ছেলে আর বিধবা মেয়ে। সেই মেয়েটার নাকি অসুখ, ডাক্তার দুধ খেতে বলেছে, তাই উনি সকাল-বেলা দোয়াল ডাক্‌তে বেরিয়েছেন।"

প্রাতঃকালেই এইরূপ মুখরোচক আন্দোলনের গন্ধ পাইয়া সকলেই উল্লসিত হইয়া উঠিলেন এবং বোধ হয় কাহার মুখ দেখিয়া আজ শয্যাত্যাগ করিয়াছিলেন সেই সুলক্ষণ ব্যক্তিবিশেষকে স্মরণ করিবার চেষ্টায় সকলেই একবার আত্মনিয়োগ করিলেন।

জনৈক মহাপ্রভু বলিয়া উঠিলেন, "দেখ ওর ছেলেটার ব্যামোর সময় যখনই ছোঁড়া গিয়ে খুব দেখা-শোনা কর্‌ছে তখনি ভেবেছি এর মধ্যে গুড় আছে বাবা, তা না হ'লে অম্‌নি শুধু-শুধুই যায়।"

দলের মধ্যে বৃদ্ধ প্রিয়নাথ ছিলেন দরিদ্র ও অত্যন্ত সৎস্বভাব। তিনি কহিলেন, "দেখ হারান-দা, যাই বল, গাঁয়ের মধ্যে এত লোক, একবার কেউ চোখ দিয়েও দেখেনি। পাছে কিছু সাহায্য কর্‌তে হয়। যা হোক্ ও-ই তদ্বির করে' ছেলেটাকে বাঁচিয়েছে। নইলে বিধবার সম্বল—"

চট্টোপাধ্যায় কর্কশকণ্ঠে ডাক ছাড়িলেন, "দেখ প্রিয়, তুমি একটি বদ্ধ বোকা। আর-জন্মে বোধ হয় গাধা ছিলে। সবার আগে গিয়ে গায়-পড়া হ'য়ে ও-ই যখন দেখ্‌তে আরম্ভ কর্‌লে তখন আবার গাসুদ্ধ গিয়ে অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট কর্‌তে যাব কি-জন্যে? আর ও একটা স্বার্থের মত্‌লবে দেখ্‌ছে বলে' আমরা সব চুপচাপ ছিলাম। কেননা ও প্রাণপণে দেখ্‌বেই, ওর স্বার্থ আছে। আমরা ভেবে ঠিক কর্‌লাম যে, এই করে' নীলকণ্ঠর ছেলেটা সেরে উঠুক না, তার পর ওকে দুই ঝাঁটায় সিধে করে' ওপথ বন্ধ করে' দেব। ব'ড়ের চাল্‌টা একবার বোঝ! ভাত না খেয়ে ঘাস খেতে পার না!"

সকলের মুখপাত্র হইয়া একজন বলিয়া উঠিলেন, "তা বৈ কি। নটুদার এ মত্‌লব আমরা সবাই মনে-মনে টের পেয়ে ওৎ পেতে বসে' ছিলাম।"

এইরূপে এবিষয়ের আন্দোলন গড়াইয়া চলিল। আসল কথা দরিদ্র তারিণীর পুত্র রামজীবন দারিদ্র্যের সহিত যুঝিয়া ৫।৭ খানা গ্রামের ভিতর এম্-এ পাশ করার সম্মানটা তাঁহাদের ছেলেপুলের মধ্যে সে একাই অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে—ইহা তাঁহাদের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

ইহার উপর সে যদি একটা গবর্ণমেণ্টের ভাল চাকুরী পাইয়া যাইত তাহা হইলে দুই চারিজন যে হিংসার উত্তাপে মারা পড়িত ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। কেননা যেদিন তাহার এম-এ পাশ হওয়ার সংবাদটা গ্রামে আসিল সেইদিন পাশ করার যে কোনও মূল্য নাই, পরীক্ষা যে আজকাল কত সহজ, এমনকি সাবেক ছাত্র-বৃত্তির সহিতও যে ইদানীংকালের এম্-এর তুলনা করা চলে না এবং কলিকাতায় যে কত বি-এ, এম্-এ পাশ ট্রামওয়ে কণ্ডাক্‌টার ও রাঁধুনীবামুন ছড়াছড়ি যাইতেছে—এইসব আলোচনার পর যখন প্রিয়নাথ বলিয়া বসিল যে, এরাই ত আবার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ইত্যাদিও হইতেছে তখন সকলেই কিরূপ নিরানন্দমুখে চিন্তাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহা দেখিলেই অনুমান করা যাইত।

তখন একজন নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিলেন, "তা ছোঁড়ার যে-রকম বরাত-জোর, আশ্চর্য্য নয়, একটা কিছু বাগিয়েও ফেল্‌তে পারে।" তার পর যখন রামজীবন নন্‌-কো-অপারেশন্‌ করিয়া চাকুরির চেষ্টা ছাড়িয়া দিল এবং স্বীয় গ্রামে আসিয়া তাহার উন্নতি-সাধন-কল্পে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া গেল ও সামান্য পৈত্রিক সম্পত্তির আয় হইতে খালি-পা ও মোটা-কাপড়ের জীবনটাই বাছিয়া লইল তখন সকলে মনে মনে আনন্দিত হইলেন বটে, কিন্তু তবুও ইচ্ছা হইত যে উহার এম্‌-এ ডিগ্রীটা নামের পশ্চাতে যদি না থাকিত।

কোথায় এইরূপ একটি শিক্ষিত যুবক গ্রামে আসিয়া থাকিলে তাহাকে একটা ভরসাস্থল বিবেচনা করিয়া আনন্দিত হওয়া উচিত, তৎপরিবর্ত্তে তাহার উপর তাঁহারা বিরূপ হইয়া উঠিলেন, তাহার কারণ, সে যাহা ন্যায্য তাহাই প্রচার করিতে চায়। গ্রামের সকলকে মানুষ হইতে বলে, দেশী কাপড় ব্যবহার করিতে অনুরোধ করে, অতবড় শক্তিশালী দিব্যকান্তি ইংরেজের পদাশ্রয় ছাড়িয়া স্বাধীন হইবার স্পর্দ্ধা রাখে এবং সর্ব্বোপরি মোকদ্দমা না করিবার জন্য সকলের পায়ে ধরিয়া অনুরোধ করে। এরূপ লোকের সঙ্গে বসতি করা যে বিপদকে ডাকিয়া আনা! শুধু কি তাই, একটা চাষার পাঠশালা খুলিয়া দিয়াছে ও তাহাদের নানারূপ উপদেশ দেয়। বোধ হয় রোড্‌সেস্‌টা কম দিবার পরামর্শও দিয়া দিতেছে। তাঁহারা একটাকা খাজনা হইলে যে চারি আনা রোড্‌সেস্‌ বলিয়া আদায় করেন এবং তাহাদের বুঝাইয়াছেন, যে "বাপু, কোম্পানীর পয়সা, কম দিলেই একটি কলম লিখে' দেব; ব্যাস্‌ বল্‌বে না, কইবে না, সটান ধরে' নিয়ে গিয়ে জেলে পূরে দেবে আর বাড়ী-ঘর, গরু-বাছুর বেচে দশগুণ আদায় করে' নেবে।" রোড্‌সেস্‌ বাড়িতেছে কেন জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিতেন যে, কোম্পানী যুদ্ধ করিতে করিতে যে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যাইতেছে, কিরূপ পয়সার দর্‌কার সে খেয়াল কি তাহাদের নাই? দেশ উড়াইয়া দেয় যে তোপ, শুধু তারই একটার খরচ দশলাখ টাকা, ইত্যাদি।

এইসব কারণে রামজীবনের উপর তাঁহাদের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না, তবে আর-একটি শ্রেণীর লোক ছিল, যাহারা রামজীবনকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত অথবা পুত্রাধিক স্নেহ করিত। তাহারা দরিদ্র গৃহস্থ।

(৩).

ব্যারিষ্টার হরিশ্চন্দ্রের ভাবী আগমন-বার্ত্তা দেশময় রাষ্ট্র হইয়া গেল। রেলওয়ে-ষ্টেশনে বিপুল জনতা। ব্যারিষ্টার একটা কি-প্রকার জীব ইহা দেখিবার জন্য ৫।৭ ক্রোশ দূর হইতেও বিস্তর অশিক্ষিত লোক আসিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধের দল পুরোবর্ত্তী হইয়া হরিশ-বাবুর অভ্যর্থনার্থ দণ্ডায়মান আছেন। ট্রেন আসিল। খদ্দর-পরিহিত হরিশ্চন্দ্র ও রামজীবন গাড়ী হইতে অবতরণ করিল. বৃদ্ধেরা পরস্পর পরস্পরের দিকে বিস্মিতহাস্যের সহিত তাকাইয়া অগ্রসর হইলেন, হরিশ্চন্দ্র আসিয়া যথাযথ অভিবাদনাদি করিলেন। নটবর চট্টোপাধ্যায় আরম্ভ করিলেন, "দেখ বাবা, সম্পর্কে আমি তোমার কাকা হই। ইনি এই ফণীন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ইনিও তাই। তোমার মত এত বড় একটা আত্মীয় থাক্‌তে দেশের অবস্থা দেখ। আমি রামজীবনকে বলি—"তুই ত বাবা জানিস্‌ হরিশের ঠিকানা। আমরা ত কল্‌কাতার কিছু চিনি-নে। তাকে একবার দেশে-ঘরে নিয়ে আয়। সে কি আমাদের পর? সে আমাদের হাজার ফেলুক, আমরা তাকে ফেলতে পারিনে।"

"আজ্ঞে না, আমি কি ফেল্‌তে পারি—"

"আহা না তা কি পার! ধর যদিচ ফেল, ফেল্‌বে ত নাইই, তা হ'লে আমরা কি তোমায় আন্‌তে পারি? তুমি একটা এতবড় বিদ্বান্‌, যশস্বী, তুমি কি আর একটা যা নয় তা কর্‌তে পার?"

"না, তবে যদি বলেন আমি এতদিন আসিনি কেন, তার কারণ পাড়াগাঁয়ের সামাজিক সব নানা গোলমাল, দলাদলি, ওটা আমি বড় ভয় করি।"

"কিসের গোলমাল? কার বাবার সাধ্যি গোলমাল করে। নটু-চাটুয্যে আর ফণী-চক্কবৃতি থাক্‌তে? সে আর কিছু ভাব্‌তে হবে না বাবা, তুমি চল, গাড়ীর কষ্টটা বিশ্রামে লাঘব করবে চল।"

কতবড় একটা ভোজের আশু সম্ভাবনা উপস্থিত

অপরাহ্নের মজ্‌লিসে এই আলোচনা হইতে সাবেককালে ক্রিয়াকর্ম্মোপলক্ষে ভোজের ভূরি-আয়োজনের যে গল্প-গুলি আসিয়া পড়িল তাহাতে সকলেরই জিহ্বা রসাল হইয়া উঠিল। কেহ বলিলেন, "এই নন্দপুরের রায় চৌধুরীদের বাড়ী, মিষ্টিই কর্‌ত ধর ২০।৩০রকম। আর যত খাও, যত বেঁধে নিয়ে যাও।" এইসমস্ত গল্পের দ্বারা তাঁহাদের পছন্দসই আদর্শ-ভোজের যেমন একটা চিত্র অঙ্কিত হইল তেম্‌নি তাঁহাদের লালসাবৃত্তিও বোধ হয় ইহাতে কিঞ্চিৎ তৃপ্ত হইল।

যাহা হউক নটু চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি গ্রামের ফন্দিবাজ বৃদ্ধের দলের একটা যে আশা হইয়াছিল যে তাঁহাদের নিষ্কর্ম্মা সুযোগ্য পুত্রগুলির এক-একটা চাকুরী এইবার বুঝি হরিশের সাহায্যে হইয়া যায়, তাহা অচিরেই ভস্মীভূত হইল। দুই-একদিন পরে এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব হইবামাত্র হরিশ উত্তর দিল, "দেখুন, চাকুরি করা যদি ভাল বোধ কর্‌তাম বা যদি কারও চাক্‌রি করে' দিতাম ত সে রামজীবন। কেননা, সে উচ্চশিক্ষিত, অতি অল্প চেষ্টাতেই তার চাক্‌রি করে' দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হ'ত, কিন্তু দেখুন সে-ই গ্রামে এসে চাষা হ'য়ে বসেছে, আমাদের যে দিন-কাল পড়েছে, তাতে আর ওবৃত্তি চল্‌বে না। আপনারা দেশে আছেন, দেশে থেকে পল্লী-গ্রামের উন্নতি করুন। সকলেই যাতে বাংলা লেখাপড়াটা শেখে সে-ব্যবস্থা করা হোক্‌। গ্রামের মধ্যে চর্‌কা, তাঁত সব চলুক। সুখে-স্বচ্ছন্দে আমাদের ঠাকুমার আমলে যেমন সব ছিলেন, আবার তেম্‌নি হোক্‌।"

চট্টোপাধ্যায় উত্তর করিলেন, "তা বাবা, তুমি ব্যারি-ষ্টারিটা কি ছেড়ে দিয়েছ ?"

"না-ই-বা যদি দিয়ে থাকি তাই বলে' কি আপনারা সব ব্যারিষ্টারি বা চাক্‌রি কর্‌তে সুরু কর্‌বেন ? একটি হীন লোক যদি একটা সত্য বা নীতি-কথা বলে তা' হ'লে কি সেটা সত্য নয় না নীতিকথা নয় ? আমার কথা ছেড়ে দিন। অবশ্য আমি ছেড়েও দিয়েছি। আমি এখন অন্য ব্যবসা কর্‌ছি। এই রামজীবন এখানে রইল। ও-ই সব কর্‌বে কর্ম্মাবে। ওর সঙ্গে পরামর্শ করে' গ্রামের যা'তে মঙ্গল হয় আপনারা সকলে একযোগে তাই করুন। উপস্থিত একটা ছেলেপুলের ইস্কুল শীঘ্রই করা হবে। আমাদেরই বাড়ীর বাইরের ঘরটা মেরামত আরম্ভ করে' দিয়েছি, ওইখানে ইস্কুল বস্‌বে, যাতে সকলেই স্বল্প খরচে চিকিৎসা পান তার ব্যবস্থাও কর্‌ব। আমি সামান্য আর্থিক সাহায্য কর্‌ব মাত্র। বাকী সবই আপনাদের কর্‌তে হবে, অবশ্য নিজেদেরই মঙ্গলের জন্য।"

রামজীবনের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করা অপেক্ষা পদব্রজে যমালয়ে গমন যে শ্রেয়স্কর তাহা এক-বাক্যে সকলেই স্বীকার করিলেন ; হরিশটা যে একান্ত অপদার্থ এবং নেহাতই এক টাকা ফি-এর ব্যারিষ্টার ছিল তাহাও মীমাংসিত হইল।

গ্রামে স্কুল স্থাপিত হইবার পূর্ব্বেই ক্ষমতাশালী এই বৃদ্ধেরা বাড়ী বাড়ী গিয়া বলিয়া আসিয়াছিলেন যে, যে-কেহ তাঁহার বাটীর ছেলেপুলেদের স্লেচ্ছ হরিশের স্কুলে পাঠাইবেন, তিনি সমাজচ্যুত হইবেন। একটা সামান্য ইস্কুল খুলিয়া নাম কিনিবার আর স্থান বোধ হয় মিলে নাই, তাই হরিশ সস্তায় স্বপল্লীতে নাম কিনিতে আসি-য়াছে, ওসব এক পয়সার ব্যারিষ্টারী চাল তাঁহারাও বোঝেন।

স্কুল-খোলার দিন রামজীবন প্রিয়নাথের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া কহিল, "প্রিয় কাকা, দেশে-ঘরে এসে কি-রকম চেপে ক্রমে ক্রমে বস্‌ছি দেখুন।"

একগাল হাসিয়া প্রিয়নাথ কহিলেন, "তা বস্‌বে বৈ কি, বাবা। দেশ-ঘর কি সোজা কথা !—মাতৃভূমি, যার মানে বাপের ভিটে। উজ্জ্বল কর বাবা, রাজা হও।"

মাতৃভূমির অর্থশ্রবণে রামজীবন হাসিয়া কহিল, "স্কুল আজ খুল্‌লাম, ছেলেপুলে সব পাঠিয়ে দেবেন।"

"হ্যাঁ বাবা, দেখি। আমার নাতি আর ছোট খোকা বড়ই ছোট। ওই ওদের ছেলেরা যদি ডেকে নিয়ে যায় তবেই যেতে পার্‌বে।"

স্কুলে ছেলে হইল না। রামজীবনদের প্রত্যেক অনুষ্ঠানে বৃদ্ধের দল বাধা দিতে লাগিল। শুধু তাই নয়, তাহার সহিত জড়িত হইয়া নিস্তার মাসীরাও বিনাদোষে একঘ'রে হইলেন। তবে সমাজপতিরা বলিলেন যে, বিশেষ অকাট্য প্রমাণের অভাবহেতু তাঁহারা এইটুকু করিতে

পারেন যে, রামজীবন অচিরাৎ গ্রাম ত্যাগ করিলে তাঁহারা সমাজে পুনরায় প্রবেশাধিকার পাইবেন। তাঁহারা জানিতেন যে, ইহা রামজীবন শুনিলেই গ্রাম ত্যাগ করিয়া যাইবে। তাহার মত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ লোক কখনই নিজের জন্য অপর একজনের শাস্তিভোগ সহ্য করিবে না। ঘটিলও তাহাই। রামজীবন মাতৃভূমিকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইল।

* * * *

মজলিসের মধ্যে দন্ত-পংক্তি পুনরায় বিকশিত হইল, এবং নটু চাটুয্যে কহিলেন, "কি ফন্দি ক'রেই তাড়ান গেল। যাক্, গ্রাম আজ নিষ্কণ্টক হ'ল!"*

* সুহৃৎ-লাইব্রেরী হইতে স্বর্ণমণি প্রতিযোগিতা-পদকপ্রাপ্ত।

দৃষ্টিহীনের আহ্বান ও অনুরোধ

শ্রী নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বি-এ

আমি যে-বিষয়ে দেশের জনসাধারণকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি সে-বিষয়ে আমরা সাধারণতঃ বিশেষভাবে কোন আলোচনা দেখিতে পাই না। তাই আমি দৃষ্টি হারাইয়া যে সামান্য অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি তাহাই বলিতে ইচ্ছা করি।

ভারতে অন্ধের সংখ্যা জগতের মধ্যে প্রায় সমস্ত দেশ অপেক্ষা অনুপাতে অধিক। কিন্তু ইয়োরোপের প্রায় সমস্ত দেশ আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি স্থানে অন্ধদের কি-প্রকার অবস্থা আমরা ভারতে তাহা অনুভব করিতেও অক্ষম। সে-সব দেশে অন্ধদের দিন কেমন সহজে চলিয়া যায় তাহা আমরা ধারণা করিতে পারি না। অনেক দেশেই অন্ধদের ভিক্ষা করা একটা দোষের মধ্যে পরিগণিত হয়। আমেরিকা, জার্ম্মানি, ইংলণ্ড এবং অন্যান্য অনেক স্থানে অন্ধদের ভিক্ষা করা একটা অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হয়। সেই-সব স্থানে বহুসংখ্যক দৃষ্টিহীন ব্যক্তি স্বকীয় চেষ্টায় যথেষ্ট বিদ্যালাভ করিয়া ও ধনবান্ হইয়া স্বচ্ছলভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে। ঐসব স্থানে অন্ধদিগের মধ্যে অনেক বড় বড় ব্যবসায়ী আছেন, গায়ক আছেন ও অন্যান্য অনেকে বিবিধ উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিয়া মনের আনন্দে দিন কাটান। আর ইহা কি নিতান্ত দুঃখের বিষয় নয় যে, আমরা ভারতে অন্ধদিগের মনুষ্যত্ব ও অস্তিত্বে পদাঘাত করিয়া, তাহাদিগকে সমাজে কোন স্থান না দিয়া, দয়া করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি শিখাইয়া, পদদলিত করিয়া রাখিয়াছি, তাহাদের অলস-জীবন ভারযুক্ত করিয়া তুলিতেছি? অন্ধদিগের মধ্যে এমন অনেক আছেন যাঁহারা উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে সমাজে যে-কোন স্থানে গণ্যমান্য ও প্রতিষ্ঠাবান্ হইতে পারেন। কিন্তু হায়! আমাদের দেশে 'অন্ধ' এই কথা মনে পড়িলেই শিশুশিক্ষার সেই "অন্ধজনে দয়া কর" এই কথাটি মনে পড়ে। অন্ধকে দয়া করিতে হইবে, সাহায্য করিতে হইবে, ইহা সত্য; কিন্তু সে দয়ার ধারা পূর্ব্বকথিত পথে না চলিলেই ভাল হয়। কারণ তাহাতে তাহাদের অলসতার প্রশ্রয় দেওয়া হয় এবং ফলতঃ তাহাদের উপকার অপেক্ষা অপকারই অধিক সম্পাদিত হয়। অনেকে তাঁহাদের দৃষ্টিহীন সন্তান-সন্ততি ও ভাই-ভগ্নীদিগকে কিছু করিতে না দিয়া নিতান্ত অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখেন, আর তাহার ফলে তাহাদের সমস্ত জীবন অত্যন্ত ভারযুক্ত ও দুঃখময় করিয়া তোলেন। যখন তাহাদের জ্ঞান হয়, তখন তাহারা জগতে আপনাদের কোন স্থান নাই দেখিয়া নিরর্থক দীর্ঘনিশ্বাসে আপনাদের জীবন কাটাইয়া দেয়। যাহারা এ-সব বিষয়ে চিন্তা করেন তাঁহারা বলিয়াছেন—"The greatest burden on the blind is not blindness but idleness." অর্থাৎ—অন্ধদের

প্রধানতম কষ্ট দৃষ্টিহীনতা নয়, অকর্ম্মণ্যতা—বাস্তবিক ইহা নিতান্ত সত্য। অন্ধদিগকে কাজ দিতে হইবে ও শিখাইতে হইবে।

ভারতে ১৪টি অন্ধবিদ্যালয় আছে। আজকাল দুই-চারিটি বাড়িয়াও থাকিতে পারে। কিন্তু এতবড় একটা দেশে এই কয়টি স্কুল আদৌ যথেষ্ট নহে। এই বঙ্গদেশে একটিমাত্র অন্ধ-বিদ্যালয় আছে, ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। বাংলায় বহুসহস্র অন্ধ বালক-বালিকা আছে; এখানে একটি বিদ্যালয় কি করিতে পারে? সম্প্রতি অন্ততঃ প্রত্যেক বিভাগে এক-একটি অন্ধ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করা নিতান্ত দরকার হইয়া পড়িয়াছে এবং এইসব কাজের জন্য উৎসাহী সহৃদয় শিক্ষকের আবশ্যক। আজকাল কলিকাতার স্কুলে লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া নিয়মিতই হইতেছে। আর গান বাজনা ও বেতের কাজও শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু ইহা যথেষ্ট নহে। অন্যান্য যে-সব বিবিধ শিল্পকার্য্য অন্যান্য দেশে অন্ধদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহারও অনুষ্ঠান করা দরকার এবং এইসব কার্য্য যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় সে-বিষয়ে অন্ধ-বিদ্যালয় সমিতি যদি কিছু মনোযোগ দেন তাহা হইলে খুব ভাল হয়। শুনিতেছি, যে সম্প্রতি ঢাকায় একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে। এই চেষ্টা যাহাতে বিফল না হয় তাহাই আমাদের একান্ত ইচ্ছা। প্রথমে যে-ভাবেই আরম্ভ হউক, উৎসাহী ও উদ্যোগী লোক থাকিলে ইহা ভবিষ্যতে বেশ ভাল হইবে আশা করা যায়। কিন্তু কেবল ঢাকায় একটি অন্ধ-বিদ্যালয় হইলেই হইবে না। এইরূপ স্থানে-স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করা দরকার। দেশের যাঁহারা কর্ম্মী, উদ্যোগী ও অগ্রণী তাঁহারা যদি কেহ এবিষয়টিতে মনোযোগ দেন তাহা হইলে আমরা নিশ্চি হইতে পারি। আর যাঁহারা অন্ধদের জনক-জননী, তাঁহারা যেন সন্তানের অন্ধ-মায়ায় বশীভূত না হইয়া যাহাতে তাহাদের উপকার হয় সে-বিষয়ে চেষ্টা করেন। প্রথম কথা এই যে, ছেলে-মেয়ে অন্ধ হইলেও তাহাদিগকে আত্মনির্ভর হইতে শিখাইতে হইবে। যাহাতে তাহারা খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতি দৈনিক কার্য্য নিজে সম্পন্ন করিতে পারে সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। তাই আজ কি প্রকারে তাহাদের অবস্থা আমেরিকা প্রভৃতি স্থানের মত করিতে পারা যায় সেই দিকে দেশের কর্ম্মীদিগকে কিছু যত্নবান্ হইতে অনুরোধ করিতেছি। সহসা কোন উন্নতি না হইলেও ভবিষ্যতে বিশেষ উন্নতি হওয়া নিতান্ত সম্ভব।

আর-একটি কথা এই যে, অনেকেই মূক-বধির-বিদ্যালয় ও অন্ধ বিদ্যালয় এই দুইটিকে এক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু বাস্তবিক এ-দুইটির পরস্পর কোন সম্পর্ক নাই।

মানুষের ইন্দ্রিয়ই কি তাহার সর্ব্বস্ব? যাহার চক্ষু নাই সে হতভাগ্য, জগতে তাহার কিছুই নাই, এইরূপ মর্ম্মস্পর্শী সহানুভূতি দেখাইয়া তাহার প্রাণ লইয়া খেলা করিবার মানুষের কি অধিকার আছে? যাহার চক্ষু আছে সে দৃষ্টিহীনের কোথায় দুঃখ কেমন করিয়া বুঝিবে? যখন দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত করুণ সম্ভাষণে চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি সহানুভূতি দেখাইয়া এজগতে দৃষ্টিহীনের স্থান নাই বুঝাইয়া দেন তখন তাহার হৃদয়ের অন্তস্তম স্থল হইতে যে একটা বেদনা আসিয়া তাহার প্রাণটাকে নাড়িয়া চাড়িয়া ভাঙিয়া ফেলিতে চায় কেহ কি সেই দুঃখ বুঝিতে পারেন। মানুষের কোন একটি অঙ্গবিকৃতি হইলেই কি তাহার জীবন ব্যর্থ ও সুখশূন্য হইয়া যায়? কে বলে? প্রাণের ভিতর চাহিয়া দেখিলে কেহই একথা বলিতে পারেন না। অনেক অন্ধ কত আনন্দে দিন যাপন করে দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি। আবার অন্যদিকে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিকারী হইয়াও কোন কোন ব্যক্তি নিতান্ত দুঃসহ, ভারময়, জীবন বহন করিয়া থাকেন; আর তাঁহারাই দৃষ্টি-হীনের সামান্য দৃষ্টির অভাব দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন! বাহ্য ইন্দ্রিয়াদির পশ্চাতে যে একটা বাস্তব অতি মূল্যবান্ পদার্থ আছে তাহা আমরা ভুলিয়া যাইব কেন?

যখন বঙ্কিম-বাবুর "রজনী" পুস্তকখানি পাঠ করি তখন দেখিয়া বড় আনন্দ পাই যে, তিনি চক্ষুষ্মান্ হইয়াও অন্ধের প্রাণে প্রাণ মিলাইয়া তাহার প্রাণের আলোড়ন-বিলোড়ন লক্ষ্য করিয়াছেন। অন্ধের প্রাণেও কবিত্ব আছে, ভাব আছে, ভাষা আছে; সেও প্রকৃতির

সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারে। আমেরিকাবাসী মিস্ হেলেন্ কেলার্ অতি বাল্যাবস্থায় দৃষ্টি হারান এবং সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহার বাক্‌শক্তি ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের শক্তিও বিকৃত হয়। তিনি এই অবস্থায় যে নিজের কতদূর উন্নতি করিয়াছেন তাহা ভাবাও অসম্ভব। তিনি এখন বিদুষীদের একজন অগ্রণী। তিনি বলিয়াছেন—"Every atom of my body is a vibroscope." বাস্তবিক চক্ষু না থাকিলেও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মানুষ জগতের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারে। সে কোন নিস্তব্ধ জনশূন্য প্রান্তরে যখন মৃদুল বায়ুর স্পর্শ অনুভব করে অথবা যদি নদীর ধারে বসিয়া শীতল বায়ু সেবন করিতে করিতে নদীবক্ষবাহিনী-তরণীস্থ দাঁড়ের উত্থান-পতনের শব্দ শ্রবণ করে অথবা উদ্যানস্থিত পুষ্পের সুঘ্রাণ আঘ্রাণ করে অথবা যদি গভীর নিশীথে সেই গম্ভীর প্রকৃতির অব্যক্ত সঙ্গীতধ্বনি উপলব্ধি করে তবে সেও সেই অসীম প্রকৃতির মধুর আহ্বানে আপনাকে হারাইয়া বসে। শিক্ষা না পাইলে অন্ধ কেমন করিয়া বুঝিবে তাহার জীবনের সেই নিতান্ত অকর্ম্মণ্য অবস্থার মধ্যে কিরূপে সে প্রাণকে জাগাইবে? যাহাতে এদেশের সহস্র সহস্র অন্ধ জীবন্মৃত না হয় এবিষয়ে দেশবাসী দেখিবেন কি?

আমি দেশবাসীকে পুনঃপুনঃ অনুরোধ ও আহ্বান করিতেছি যে, একবার নূতনভাবে এই হতভাগ্যদিগকে উন্নত করুন এখন ত কর্ম্মের দিন। চারিদিকেই "কাজ কর", "কাজ কর" বলিয়া সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। তাই এই নূতন যুগে সাহস করিয়া সকলকে এই অন্ধদের দুঃখ-মোচন করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি।

রোমান্স্

শ্রী সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

মাসিক পত্রিকাখানির নাম হচ্ছে "উৎসব ও উপাসনা"। এই পত্রিকাটিকে আমি প্রতিমাসে একটি করে' প্রবন্ধ লিখ্‌তুম আর প্রতিমাসে ঠিক আমারই প্রবন্ধের পরে তাতে একটি করে' কবিতা ছাপা হ'ত. আর সে কবিতার নীচে নাম থাক্‌ত কুমারী মুকুলিকা দেবী। শুদ্ধ মাত্র এই ঘটনাটিকে ধরে' আমার মনে আমার অজ্ঞাতসারে যে একটা রোমান্স গড়ে' উঠ্‌ছিল তা আমি প্রথমে টের পাইনি। যখন টের পেলুম তখন দেখ্‌লুম যে. রোমান্স্ আমার অলক্ষ্যে অনেকটা অগ্রসর হ'য়ে গেছে আমার অনুমতির কিছুমাত্র অপেক্ষা রাখেনি—আর মুকুলিকা দেবীর কবিতার অনেক লাইন আমার মুখস্থ হ'য়ে গিয়েছে।

সেই প্রথম আমি উপলব্ধি কর্‌লুম যে. মানুষ একটি আশ্চর্য্য সৃষ্টি। প্রতিদিনের নেহাৎ সহজ আটপৌরে কাজকর্ম্মের মধ্যে কোন্-একটু সূত্রকে ধরে' যে সে দৈনন্দিন ব্যস্ততাকে ছাড়িয়ে ওঠে—আছে-কি-নেই এমন একটি ছায়াকে ধরে' তারই উপরে আপনার অন্তরের রং চড়িয়ে যে সে প্রতিমুহূর্ত্তের স্পষ্টতার বন্ধন থেকে কেমন করে' মুক্তির আয়োজন করে' নেয় তা ভাব্‌লে আশ্চর্য্য হ'য়ে যেতে হয়। কোথায় একখানি শাড়ীর প্রান্ত একটু বিশেষভাবে দুলে' উঠ্‌ল কি না, চুড়ির ঠিনিঠিনিটা একটু বেশী মুখর হ'য়ে গেল কি না, আঁখি-পল্লব-ছায়ে চোখের তারা-দুটি একটু অতিরিক্ত সলজ্জ হ'ল কি না তার ঠিক নেই. কিন্তু ঐ নিশ্চিত-অনিশ্চিত ব্যাপারগুলো যে একটা স্বপ্ন-লোকের দরজা ধীরে-ধীরে খুলে' দেয় তাতে কিছুমাত্র অনিশ্চয়তা নেই। কোন যুক্তিতর্ক বিবেচনাই আর সে দরজাকে বন্ধ করে' রাখ্‌তে পারে না।

কিন্তু একটা মানবচিত্তের দোষই বা কি? এই

সৃষ্টি রহস্যটাকে যদি এক শ' ভাগে ভাগ করা যায়, তবে তার নিরানব্বই ভাগের ব্যাপারগুলো সমস্ত বাজে বা সময় কাটাবার কতকগুলো ফন্দিমাত্র, আর ঐ বাকি এক ভাগই হচ্ছে আসল, প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব-প্রকৃতির যা মতলব; আর এই মতলব হচ্ছে দুটি চিত্তের মিলন—দুইটি তেমন চিত্তের মিলন থাকে আশ্রয় করে' আবার একটি নবীন চিত্ত গড়ে' উঠ্‌তে পারে। বিশ্বপ্রকৃতির এই যে মতলব এইটেই তার কেন্দ্রগত মতলব—আর এই মতলবের কাছেই যুগ-যুগান্তর হ'তে পুরুষনারী আনন্দের সঙ্গে আপনাদের আহুতি দিচ্ছে। মানব-জীবনে এই-ই হচ্ছে একমাত্র যজ্ঞ। মানুষের জন্ম থেকে যৌবন পর্য্যন্ত যা-কিছু সে-সবই হচ্ছে এই যজ্ঞেরই স্বস্তিবাচন, আর যৌবন থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত যা-কিছু তা হচ্ছে এই যজ্ঞেরই বিসর্জ্জন-মন্ত্র। পাণ্ডবেরা খুবই বড় বটে, কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা চল্‌ছে পাঞ্চালীকে ঘিরে'।

কিন্তু সে যা হোক্ উপরে যে, একটু গভীর দার্শনিক বা জীবতত্ত্বের বা সৃষ্টিতত্ত্বের গবেষণা করা গেল তা সত্যই হোক্ বা মিথ্যাই হোক্ এ-কথা খাঁটি সত্য যে আমার অন্তরে রং ধরেছিল। সারা বছরের তৃণলেশ-শূন্য ক্ষেত্রে প্রথম বর্ষাবারি-স্পর্শে যেমন করে' নয়নাভিরাম রং ধরে, কদলীবৃক্ষে পূর্ণাঙ্গ ও সুপুষ্ট কদলী-গাত্রে রৌদ্ররশ্মিতাপে যেমন করে' জিহ্বা-জল-সঞ্চারক রং ধরে তেম্‌নি করে' ধীরে ধীরে আমার অন্তরে রং ধরেছিল। তবে এ-রং হরিতও নয়, হরিদ্রাও নয়—এ-রং ছিল গোলাপী। সেই সঙ্গে-সঙ্গে টের পেয়েছিলুম যে, এই গোলাপী রঙের একটা মাদকতা আছে, যা আর-যে-কোন মাদকতার চাইতে বেশী মোহন, বেশী মধুর-মত্ততা আনে।

আসলে জীবন ভরে' মানুষের একটা কোন নেশা চাই-ই চাই—তা এ নেশা কোন সুরারই হোক্ বা কোন সুরেরই হোক্—আধিভৌতিকই হোক্ বা আধ্যাত্মিকই হোক্। কেউ বা বাইরের সুরার নেশায় অন্তর রঙিয়ে তুল্‌ছে, আর কেউ বা অন্তরের সুরের নেশায় বাহির রঙিয়ে তুল্‌ছে। জ্ঞানের নেশা, কর্ম্মের নেশা, ধর্ম্মের নেশা, দেশোদ্ধারের নেশা, পরহিতের নেশা, যে-কোন একটা নেশাকে ধরে' মানুষ তার ধমনীতে ধমনীতে শোণিত প্রবাহকে চাঙ্গা করে' রাখ্‌বার প্রয়াস পাচ্ছে। আর এইসব নেশার মধ্যে সবার চাইতে নিবিড় নেশা, সবার চাইতে বিশ্ববিজয়ী নেশা হচ্ছে প্রেমের নেশা। হঠাৎ কেন যে, একদিন প্রথম শরৎপ্রভাতের মিষ্টি আমেজটুকু একটা নবীন অতৃপ্তির বেশ দিয়ে ছেয়ে যায়, হঠাৎ কেন যে, এক দিন বসন্ত-সন্ধ্যার সুখের আভাসটুকু একটা নতুন আগ্রহের অপেক্ষা দিয়ে ভরে' ওঠে, হেমন্ত-গোধূলির করুণ সুরে সুরে কেন যে, ধরা-যায়-না, ছোঁয়া-যায়-না এমন একটা আশার ঝঙ্কারের রেশ বাজ্‌তে থাকে, তার কোন কারণ খুঁজে' পাওয়া যায় না—কিন্তু তার অর্থ বুঝ্‌তে বিশেষ দেরী হয় না। এর অর্থ হচ্ছে এই, যে, যৌবনের শঙ্খ বেজেছে, প্রেমের দেবতা ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন কর্‌ছেন। এখন ওরে আত্মভোলা পথ কর্, পথ কর্। এখন আর কিছু চল্‌বে না। কর্ম্মের কঠোরতা, রাজনীতির কচকচি, পরহিতের সেবাব্রত, দেনাপাওনার হিসাবনিকাশ, চিত্তদুয়ার থেকে সমস্তকে সরিয়ে ফেল্। এখন শুধুই ফুলের মেলা সুরের খেলা। আজ যে অলক্ষ্যে আর একটা চিত্ত তোমার দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'য়ে আস্‌ছে। সে-চিত্তকে অভিলষিত কর্‌বার জন্য অবহিত হও। তারই আভাস যে শরৎপ্রভাতের মিষ্টতায় হেমন্ত-গোধূলির কারুণ্যে বসন্ত-সন্ধ্যার সুখ-হিল্লোলে তোমার কাছে ধরা পড়েছে। এখন ওরে আত্মভোলা পথ কর্, পথ কর্। সম্রাট্ তার সাম্রাজ্যে অদ্বিতীয়রূপে সিংহাসন গ্রহণ করবেন।

মানুষের জীবনে এইটে সবার চাইতে বড় কথা কি না জানিনে, কিন্তু এটা সবার চাইতে নিবিড় কথা, সবার চাইতে মধুর কথা, সে-সম্বন্ধে কোনই ভুল নেই। হাজার কর্ম্ম-কোলাহলের মাঝে এ-যেন একমাত্র সঙ্গীত যা আমাদের কানে লাগে, হাজার স্পষ্টতার মাঝে এ-যেন একমাত্র স্বপ্নলোক যা আমাদের চোখে

ফুটে' উঠে, আমাদের হাজার প্রচেষ্টার মাঝে এইটে একমাত্র সহজ যা আমাদের আটপৌরে মুহূর্ত্তগুলিকে পোষাকী করে' তোলে, জীবন-যাত্রার প্রয়াসগুলিকে কাব্যসম্পদ্-পূর্ণ করে' তোলে, গদ্যময় কণ্ঠবাণী একটা বিশেষ অভিব্যঞ্জনায় ভরে' দেয়, চিত্তের বিক্ষিপ্ত ও বেসুরো সুরগুলিকে সংহত করে' একটা অর্থপূর্ণ সঙ্গীত রচনা করে—যা আমাদের বিচ্ছিন্ন ও লক্ষীছাড়া জীবনধারাকে শ্রীমন্ত করে' তোলে। অথচ ব্যাপারটি মোটেও অ-পূর্ব্ব নয়—এটি আবহমান কাল থেকে চলে' আস্ছে—আর এটি হচ্ছে পুরুষ ও নারীর পরস্পরের মিলনের জন্যে আকুলতা

সে যা হোক্ মাসের পর মাস "উৎসব ও উপাসনা"য় ঐ যে আমার একটি করে' প্রবন্ধ আর তারই ঠিক পরে-পরে মুকুলিকা দেবীর একটি করে' কবিতা এ-যেন আমার মানস-জগতের পাশে পাশে একখানি করে' গান। মাসের পর মাস সে কবিতাগুলির কত বিভিন্ন ছন্দ, বিভিন্ন সুর, বিভিন্ন লয়—কত বিভিন্ন রং, বিভিন্ন গন্ধ, বিভিন্ন রূপ, কিন্তু তার মূল অর্থ এক। সেই অর্থ যেন তার বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন সুর, বিভিন্ন ছন্দের ভিতর দিয়ে এই এককথা প্রকাশ করছে—হে পথিক, আমি তোমারি কাছে-কাছে তোমারি পাশে-পাশে অবিরাম জাগ্রত আছি। হে বহুদূরের যাত্রী, তোমার পুরুষের মস্তিষ্কের পাশে-পাশে একখানি নারী-হৃদয় সদা জাগ্রত। হে রণ-পিপাসী, তোমার পুরুষ-চিত্তের দুরাশার পাশে যশ মান গৌরব, আকাঙ্ক্ষার পাশে নারী-চিত্তের একখানি স্নেহনীড় সদা উন্মুক্ত—তোমার বিজয়-মাল্যই তার শ্রেষ্ঠ কণ্ঠাভরণ।

যে-মানুষটিকে দেখিনি এবং যার সঙ্গে দেখা হবার হয়ত কোন দিন সম্ভাবনাও নেই অথচ মনের কাছে যার অস্তিত্ব সত্য হ'য়ে উঠেছে, প্রাণের নানা সুর ও চিত্ত-লোকের বিভিন্ন আলেখ্যের ভিতর দিয়ে তার অন্তর-লোকের আভাস ধরা পড়েছে সে মানুষটি যে কেমন সে-সম্বন্ধে কল্পনা কোনদিনই নিশ্চেষ্ট থাকে না। "কিমাসীত ব্রজেত কিম্" বা "কেমন যে তার বাণী, কেমন হাসিখানি" এ-সব প্রশ্নকে কল্পনা প্রশ্নরূপেই থাকতে দেয় না। এর প্রতিপ্রশ্নের উত্তরে একখানি করে' ছবি তার অন্তরে আপনা-আপনিই স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। বলা বাহুল্য, কল্পনার এইসব ছবির মধ্যে সত্য যতটা না থাক্ তার চাইতে বেশী থাকে আপন মনের সন্তোষ।

ধীরে ধীরে মুকুলিকা দেবীর অস্তিত্ব আমার কাছে সত্য হ'য়ে উঠেছিল এবং এ-মানুষটি যে কেমন এ-প্রশ্নও আমার মনের কাছে অনিবার্য্য হ'য়ে উঠেছিল। আমি মনে কর্তে চেষ্টা কর্তুম—আচ্ছা, যার অন্তরে এই মনো-ভাব ফুটেছে—

বনেতে আজি শিহরি' গেল বনের বনলতা,
উতলা কাঁপি' বিটপী কাছে কহিল মনোব্যথা,
উঠিয়া ধীরে জড়ায় সুখে তাহার গ্রীবাখানি,
শাখার 'পরে মরমে মরি' বিছাল তনুখানি;
　　আজিকে এই প্রথম মধু-বসন্তে
　　রহুক সখি দুইটি হিয়া একান্তে—

তার বয়েস কত? কিম্বা

　　জীবন-তরণীখানি
　　　　যাও যাও বাহি গো।
কত শত গোধূলির　　গৃহে-ফেরা বাঁশরীর
গানে হিয়া চঞ্চল　　চোখ দুটি ছল ছল,
　　কত সুখে আকুলিত
　　　　কত রূপ চাহি গো,
　　জীবন-তরণী তাই
　　　　যাও যাও বাহি গো।

এই আকাঙ্ক্ষা যার চিত্তে সঙ্গীত হ'য়ে ফুটে' উঠেছে, তার অন্তরলোক কেমন? এইসব প্রশ্নের উত্তরে আমার কল্পনা উধাও হ'য়ে ছুটেছে। নানা বস্তু থেকে নানা রং নানা সুর নানা গন্ধ কুড়িয়ে তাই দিয়ে একটা মানসীমূর্ত্তি গড়িয়ে তার নাম দিয়েছে মুকুলিকা দেবী। জ্যোৎস্না থেকে রং কুড়িয়ে, মেঘ থেকে নিবিড়তা কুড়িয়ে, পদ্ম থেকে 'লাবনি' কুড়িয়ে, গোলাপ থেকে লালিমা কুড়িয়ে, চম্পক থেকে কোমলতা কুড়িয়ে, সাগর-বুকের মৃদু তরঙ্গ-হিল্লোলের ক্রীড়া-চঞ্চলতা কুড়িয়ে, যে-একটি কিশোরীর পরিচ্ছন্ন মূর্ত্তি আমার মনে গড়ে' উঠেছিল তাতে কোথাও এতটুকু খুঁত থাক্বার সম্ভাবনা ছিল

না। মানস-লোকের সৌন্দর্য্যের দাবীর আমরা একচুলও ছাড়িনে, কল্পনা-দেবীও আমাদের সে-দাবীর ষোল-কলা পূর্ণ করে' দিতে কোন কার্পণ্যই করেন না।

এম্‌নি করে' প্রায় আড়াই বছর কেটে গেল। "উৎসব ও উপাসনা"র পৃষ্ঠায় প্রতিমাসে আমার প্রবন্ধ ও মুকুলিকা দেবীর কবিতার সঙ্গে-সঙ্গে আমার মনের উৎসব ও উপাসনার ভিতর দিয়ে আমার অন্তরে একটা কল্পলোক গড়ে' উঠেছিল। এই কল্পলোক-সম্বন্ধে আমার সবার চাইতে আরামের ব্যাপার ছিল, এইটে যে, বাস্তবজগতের স্পষ্টতার স্পর্শ একে কোন দিনই ক্ষুণ্ণ বা খিন্ন কর্‌তে পার্‌বে না।

কিন্তু মানুষের মনস্তত্ত্ব বোধ হয় একটা জটিল ব্যাপার। সহসা একদিন সম্পাদককে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—"মুকুলিকা দেবীটি কে জানেন ?"

সম্পাদক উত্তর কর্‌লেন—"তা কি করে' জান্‌ব বলুন।"

"ইনি এই বিশাল মহীর কোন্ অংশ অলঙ্কৃত করে' বিরাজ কর্‌ছেন তাও জানেন না ?"

"না, সেটা আমার অজ্ঞাত নয়।"

সম্পাদক তাঁর দেরাজ খুলে' একখানি ছোট্ট চিঠি বের কর্‌লেন। সেই চিঠিখানি খুলে' তাঁর চোখের সাম্‌নে রেখে বল্‌লেন—"এঁর হাল সাকিম হচ্ছে বেল-তলা রোড়, 'অশ্রু-নিবাস' ভবানীপুর, কলিকাতা।"

আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—"আচ্ছা, বলুন ত গত দু'-বছর আড়াই-বছর ধরে' প্রতিমাসে ঠিক আমারই প্রবন্ধের পরে মুকুলিকা দেবীর কবিতার স্থান দান করেন কেন ?

সম্পাদক আশ্চর্য্য হলেন—বল্‌লেন—"তাই নাকি ?"

তাঁর টেবিলের উপর কয়েক মাসের পত্রিকা পড়ে' ছিল। আমি প্রতিসংখ্যা খুলে' তাঁকে দেখিয়ে দিলুম—প্রতিমাসে আমার প্রবন্ধ প্রথমেই থাক্ বা শেষেই থাক্ বা মাঝেই থাক্, মুকুলিকা দেবীর কবিতা ঠিক তার পরে-পরে ছাপা।

সম্পাদক বল্‌লেন—"বাঃ! এটা ত আমি কোন দিন খেয়াল করিনি।" তাঁর চোখ-দুটোতে একটা কৌতুকের হাসি ফুটে' উঠ্‌ল—বল্‌লেন—"বোধ হয় কোন অদৃশ্য-লোকের সূক্ষ্মজীব আমাকে দিয়ে এটা করিয়ে নিয়েছে।"

"সে-সব বিশ্বাস করেন নাকি ?"

"কি-সব ?"

"এই যে অদৃশ্যলোকের জীবরা মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করে।"

সম্পাদক আমার মুখের দিকে একটু বিশেষ করে' তাকিয়ে দেখ্‌লেন—তার পর মৃদু হেসে বল্‌লেন—"আপনি প্রশ্নটা যখন এমন গম্ভীর করে' জিজ্ঞেস্ কর্‌ছেন তখন ঠিক বল্‌তে পারিনে যে বিশ্বাস করি বা বিশ্বাস করিনে।"

সম্পাদকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়্‌লুম।

কিন্তু সেদিন থেকে এটা টের পেতে বেশী দেরী লাগ্‌ল না, যে আমার অন্তর-লোকের স্বরগ্রামে একটা বেসুরো সুর জেগে উঠেছে। একটা নিশ্চিত অনির্দ্দেশ্যকে ঘিরে' যাদুকর আপন খেয়াল, আপন রুচি-অনুসারে একটা নিখুঁত সঙ্গীত রচনা করেছিল, একটা কল্পনালোকের আলেখ্য রচনা করেছিল, সেইটে যেন অনিশ্চিত একটা স্পষ্টতার স্পর্শে কিরকম-একরকম গুলিয়ে দিয়ে গেল। এতদিন আমি মনে কর্‌তুম, যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মুকুলিকা দেবী বলে' একজন কেউ আছেন তা সে রাওয়ালপিণ্ডি-তেই হোক্ বা রেঙ্গুনেই হোক্, গন্ধর্ব্বলোকেই হোক্ বা মঙ্গল গ্রহেই হোক্—এই অনির্দ্দেশ্যতাই মুকুলিকা দেবীকে আমার চিন্তার অতিরিক্ত করে' রেখেছিল, তাই প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে-একটি কবি-চিত্ত আছে যে-একটি আর্টিষ্টের আত্মা আছে, আমার মধ্যেকার সেই কবি-চিত্তটি সেই আর্টিষ্টের আত্মা, তাঁর একটা সহজ নাগাল পেয়েছিল। কিন্তু যখন শুন্‌লুম যে মুকুলিকা-দেবীর আবাস-স্থল এই কলিকাতার ভবানীপুরে বেল-তলা রোডে, তখন কল্পলোকের হাজার সুর দিয়েও আর তাঁকে ছোঁয়া গেল না—বাস্তবতার কঠিন স্বর্গে সমস্ত সুর যেন ছিন্নবিছিন্ন হ'য়ে কঠোর কর্ম্মকোলাহলের মাঝে ঝরে' পড়্‌তে লাগ্‌ল।

সেই দিন আমি এই একটা জিনিস লক্ষ্য কর্‌লুম

যে, মানুষের অন্তর-জগতে যতক্ষণ তৃপ্তি থাকে, তার কল্প-লোকের সুরের জালে যতক্ষণ বিষয়াতিরিক্ত সত্তার একটা স্পর্শ থাকে, ততক্ষণ বাইরের দিকের কোন দাবীরই সত্য হ'য়ে উঠ্‌বার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যখন এই সুরের জাল কোনক্রমে গুলিয়ে যায়, কল্পলোকের আর কোন আনন্দের স্পর্শ পাওয়া যায় না, তখন বাইরের দিক্ থেকে এই আনন্দের তল্লাস পড়ে' যায়। কল্পলোকের দারিদ্র্য আমরা বাস্তব-জগতের সম্পদ্ দিয়ে ভরে' রাখ্‌তে চাই।

সে যা হোক মুকুলিকা দেবীকে যখন আমার কল্প-লোকের সুর দিয়ে ছোঁয়া গেল না, তখন তাঁর চাক্ষুষ পরিচয়ের একটা আকাঙ্ক্ষা ধীরে ধীরে আমার অন্তরে মাথা তুল্‌তে লাগ্‌ল। মুকুলিকা দেবীর পরিচয় স্পষ্ট হ'য়ে মনের কাছে তা এম্‌নি আব্‌ছা হ'য়ে উঠ্‌ল, নিকটে এসে তা এম্‌নি একটা দূরত্ব রচনা কর্‌লে যে আমার অন্তর-লোকের একটা পরিপূর্ণ সন্তোষের কোঠা একেবারে শূন্য হ'য়ে গেল। এখন এই শূন্যতা পূর্ণ করা যায় কি করে'? যে-সঙ্গীত থেমেছে অথচ যার রেশটুকু এখনও শরৎ-প্রভাতের স্নিগ্ধ স্পর্শের মতো স্মৃতি জাগাচ্ছে, সে-সঙ্গীতের ছিন্নবিচ্ছিন্ন সুরগুলিকে আবার গেঁথে তোলা যায় কি' করে'? এম্‌নি কতগুলো অস্পষ্ট প্রশ্নের উত্তরে আমার মধ্যে মুকুলিকা দেবীর পরিচয়লাভের আকাঙ্ক্ষা ধীরে ধীরে মাথা তুল্‌লে। আসলে তখন মনস্তত্ত্বের এমন বিশ্লেষণ করার অবসর ছিল কি না সন্দেহ, কিন্তু এইটে অত্যন্তই সত্য ছিল, যে, আমি যেন দু'-বছর আড়াই-বছর ধরে' নিজের জন্যে একটা দায়িত্ব গড়ে' তুলেছি আর সেটা হচ্ছে ঐ মুকুলিকা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ।

অথচ ব্যাপারটি সহজ মোটেও নয়। আমাদের বাঙালীর সমাজে কোন অপরিচিত পুরুষের পক্ষে সম্পর্কলেশহীন পরিবারের কোন অনাত্মীয় মহিলার পরিচয় লাভ কর্‌বার কোন সুযোগই নেই। আমাদের দুজনের লেখা একই মাসিক পত্রিকাতে বেরোয় শুদ্ধ এই ঘটনাটাই আর কিছু সামাজিক রীতিনীতিকে নাকচ করে' দেবার দাবী নিয়ে দাঁড়াতে পারে না। সমাজের হাতে এমন কোন যন্ত্র নেই যা দিয়ে অন্তরের আত্মীয়তার সঠিক পরিমাপ কর্‌তে পারে এবং সেই-অনুসারে সামাজিক রীতিনীতিকে প্রয়োজন-মত ডাইনে-বাঁয়ে সরিয়ে দিতে পারে। সামাজিক রীতি-নীতির উদ্ধত প্রাচীর এম্‌নি একটা নির্জীব ব্যাপার যে কোন সুরের স্পর্শই তাকে বিন্দুমাত্রও চঞ্চল করে' তোলে না।

কিন্তু অপর পক্ষে মুকুলিকা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা ব্যাপারটা আমার কাছে যত কঠিন বলে' মনে হ'তে লাগ্‌ল এই সাক্ষাৎ করার বাসনাও তত প্রবল হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। আর সেই-সঙ্গেসঙ্গে ভবানীপুর বেলতলা রোডের "অশ্রু-নিবাস" আমার কাছে একটা পরম রহস্যের আবাস হ'য়ে উঠ্‌ল। "অশ্রু-নিবাস"!—কত সৌখীন লোকের কত বাড়ীর নাম শুনেছি। কতরকমের আবাস নিবাস নিকেতন ভিলা—কিন্তু এ-পর্য্যন্ত "অশ্রু-নিবাস" বলে' কোন নাম কোথাও শুনিনি। অশ্রু—এ কার অশ্রু?—কিসের অশ্রু?—এ কি কোন ব্যক্তি-বিশেষের জীবন-ব্যাপী দর-বিগলিত অশ্রু, না এই পৃথিবীর থম্‌কে-থাকা অব্যক্ত অশ্রু? কে এমন মানুষটি যে এমন দুঃখের সংজ্ঞা দিয়ে আপন আবাসস্থানকে ঘিরে' রেখেছে? কি এমন তার অন্তর-বেদনা যা এই পৃথিবীর সহস্র চাঞ্চল্য ভুলিয়ে দিতে পারেনি, জীবন-সংগ্রামের শত সহস্র আশা-আকাঙ্ক্ষা হাল্‌কা করে' তুল্‌তে পারেনি? কে সে এমন মানুষটি যার অন্তরে দুঃখের দেবতা এম্‌নি স্থায়ী আসন পেতে বসেছেন, যে, এই পৃথিবীর সকলপ্রকার সুখের সুরই সেখান থেকে প্রতিহত হ'য়ে ফিরে' আসে; যে, সেখানে শরৎ-উষার মুগ্ধ প্রকৃতি, জ্যোৎস্না-যামিনীর সুদূরের আমন্ত্রণ, বসন্ত-সন্ধ্যার একটা চির-অব্যক্ত আকুলতা কোন নব চাঞ্চল্যই আর সত্য করে' তুল্‌তে পারে না? ঐ যে রৌদ্র করে নারিকেল-শাখাগ্র ঝিল্ মিল্ কর্‌ছে, বহুদূর থেকে একটা চিলের ডাক বাতাসে ভর করে' ভেসে আস্‌ছে, গৃহ-পালিত পারাবতের বক্-বকম্-কুম্ ক্ষণে-ক্ষণে শোনা যাচ্ছে, ঐ যে একটা মোটর-গাড়ী 'হর্ন্' বাজিয়ে তার কোন সুদূর গন্তব্য স্থানে ছুটে' গেল—এসব কি তার অন্তরে কোন নব সুখ নবীন আকাঙ্ক্ষা দিয়েই ভরে' দেয় না? কোন্ কঠোর সমাপ্তির কঠিন রেখা তার জীবন-কাহিনীতে দাঁড়ি টেনেছে?

এম্‌নি করে'ই দিন কাট্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু মুকুলিকা দেবীর সঙ্গে পরিচিত হবার কোন পন্থাই আবিষ্কার কর্‌তে পার্‌লুম না।

পরের মাসের "উৎসব ও উপাসনা" এলে দেখ্‌লুম যে আমার প্রবন্ধ থেকে মুকুলিকা দেবীর কবিতা বিচ্ছিন্ন হয়েছে। বুঝ্‌লুম সম্পাদকের সঙ্গে আমার কথোপকথনের ফল। কিন্তু এই ছোট্ট ব্যাপারটা আমার অন্তরকে একটা মস্ত দোলা দিয়ে গেল।

মনে হ'ল যেন কতদিনকার একটি অত্যন্ত পরিচিত বান্ধব, যিনি আমার অন্তরের পাশে-পাশে চির-জাগ্রত ছিলেন তিনি হঠাৎ আমার বেদনা-সূত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে কোথায় সুদূরে ছিট্‌কে' পড়্‌লেন। যাঁর অস্তিত্বের স্পর্শ আমার মনোমন্দিরে আশা-আকাঙ্ক্ষা দিয়ে ভরে' রাখ্‌ত সে-অস্তিত্ব যেন দূরে সরে' গিয়ে আমার মনোমন্দির একেবারে শূন্য করে' দিয়ে গেল। মানুষের জীবন পূর্ণ হ'য়ে থাকে সুখ-দুঃখ দিয়ে। এই সুখ-দুঃখের উপাদান কোথায় চলে' গিয়ে যেন আমার জীবনকে মুহূর্ত্তে ভারাক্রান্ত করে' তুল্‌লে। আর এ কি কেবল আমার একলার জীবনকেই শূন্য করে' তুল্‌লে? মুকুলিকা দেবীর কি এতে কিছুই হয়নি? একদিক্‌কার দুঃখের ঢেউ কি অন্যদিকে কোনই অনুরূপ তরঙ্গের দোলা দিয়ে যায় না? তবে মুকুলিকা দেবীর কবিতায় আজ এসুর ফুটল কেন?

সহে না বঁধু সহে না কি?
তৃষিত আঁখির আকুল চাওয়া,
বকুল বনের ব্যাকুল হাওয়া,
আজি এ ঘন বসন্তেতে
দহে না প্রাণ দহে না কি?
সহে না বঁধু সহে না কি?

সহে না বঁধু সহে না আর।
আজি যে গত সরম-ভার।
স্বগত আজি বিলাপ শুধু
ঘিরিয়া আছে জীবন ছার।

আমার মনে হ'ল—যে আমার মর্ম্ম-দুয়ারের হতাশার দীর্ঘনিশ্বাস মুকুলিকা দেবীর হৃদয়-বীণায় ঝঙ্কারিত হ'য়ে উঠেছে, যেন তাঁর চোখের দু'-ফোঁটা গড়িয়ে-পড়া নীরব অশ্রুর সঙ্গে। একখানি কাব্য লিখিত হ'তে হ'তে অর্দ্ধ পথে যেন লেখনী থেমে গেল, এ-যেন তারি বেদনা—একটা গান গীত হ'তে হ'তে যেন অন্তরায় এসে স্তব্ধ হ'য়ে গেল, এ যেন তারি আক্ষেপ-চিত্রের রেখাই টানা হ'য়ে থাক্‌ল তাতে যেন বর্ণ-সংযোজনার আর সময় হ'য়ে উঠ্‌ল না, এ-যেন তারি একটা নিবিড় ক্রন্দন। তাই বুঝি মুকুলিকা দেবীর এই কবিতাটিতে তারই আভাস ছত্রে-ছত্রে জেগে উঠেছে।

বহে না বঁধু বহে না কি?
নীরব দুটি আঁখির 'পরে
যে নীরটুকু গুমরি' মরে'
সে নীরটুকু উথলি' দুখ
মুছিয়া নিতে চাহে না কি?
বহে না বঁধু বহে না কি?

বহে না বঁধু বহে না আর।
নয়নে নাহি নয়নাসার
স্বগত আজি বিপুল স্মৃতি
আনিছে শুধু দুখের ভার।

মুকুলিকা দেবীর এই কবিতার সঙ্গে আমার তখনকার মানসিক অবস্থার এমন একটা মিল ছিল যে, তা সামাজিক বিধি-বন্ধন একেবারে মিথ্যা করে' তুল্‌লে। সেদিন মনে হ'ল যে মানুষ বৎসরের তিন শ' চৌষট্টি দিন সমাজের বিধি-ব্যবস্থা মেনে চলুক, কিন্তু বাকী একটা দিন যদি সে আপনার মনের স্বাধীনতা ঘোষণা না করে তবে সমাজের প্রাণরক্ষাই দুরূহ হ'য়ে উঠবে—মনে হ'ল যে সমাজের হাজার-করা ন' শ' নিরেনব্বুই জন সামাজিক আইন-কানুনকে পূজা করে' চলুক কিন্তু বাকী একজন যদি আপনার অন্তরের সত্যকে পূজা কর্‌বার সাহস না করে তবে সমাজ সেই বস্তু থেকেই বঞ্চিত থাক্‌বে যে-বস্তু বন কেটে নগর বসিয়েছে, ঊষর ক্ষেত্রে ফসল ফলিয়েছে, প্রাচীর ভেঙে আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করেছে—এই বস্তুই না মূককে মুখর করেছে, পঙ্গুকে উল্লঙ্ঘনের শক্তি দিয়েছে, কাপুরুষকে দুঃসাহসিক করে' তুলেছে। একজনের এই অন্তর-পূজাই সমাজকে নব-নব পথে নব-নব আশীর্ব্বাদ লাভের জন্য সচেতন ক'রে তুলেছে। সে যা

হোক্ আমি সেদিন তাই একটা দুঃসাহসিকের কাজ ক'রে ফেল্‌লুম, মুকুলিকা দেবীকে একখানি চিঠি লিখে' ডাকে ফেলে' দিলুম।

ছোট্ট একটু চিঠি। চিঠিখানিতে বিশেষ কিছু ছিল না। শুধু ছিল এই যে, মুকুলিকা দেবীর কবিতা আমার বড় ভাল লাগে। এমন ভাল লাগে যে আমি এই কবিতা-গুলির লেখিকার সাক্ষাৎ-পরিচয়ে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কর্‌বার জন্যে উৎসুক, এবং আশা করি, আমার এ বেয়াদবি মার্জ্জনা লাভ কর্‌বে।

তিন দিনের দিন আমার চিঠির উত্তর পেলুম। ছোট্ট একটু চিঠি, কিন্তু তার ওজন আমার কাছে মনে হ'ল মহাকাব্যের চাইতেও বেশী। চিঠিখানি এই—

"অশ্রুনিবাস"
বেলতলা রোড্
ভবানীপুর।

সবিনয় নিবেদন—

আপনার ক্ষুদ্র চিঠিখানি পেয়ে যে কতদূর আনন্দিত হয়েছি তা বল্‌তে পারিনে। আপনার লেখা আমি সাগ্রহে পড়ে' থাকি। আপনার লেখার মধ্যে এমন একটা মিষ্ট ও সরস ভঙ্গী আছে যে, একবার পড়্‌লে তা ভোলা যায় না। আপনার সাক্ষাৎ-পরিচয় লাভের জন্যে আমিও উৎসুক। আগামী শনিবার বিকেল পাঁচটা ও ছয়টার মধ্যে যদি আপনার দর্শন পাই, তবে কৃতার্থ হ'ব। ইতি

শ্রী মুকুলিকা দেবী।

চিঠি পেয়ে আমার অন্তর এতখানি হৃষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ল যে, বুঝ্‌লুম যে আমার লেখা চিঠির উত্তর পাবার আশার চাইতে না-পাবার আশঙ্কাই আমার মনে বেশী ছিল।

* * * *

রসা রোডের ট্রাম্ থেকে যখন নাম্‌লুম তখন পাঁচটা বেজে তের মিনিট। বেলতলা রোডে "অশ্রু-নিবাস" খুঁজে' বের কর্‌তে আমার বিশেষ বেগ পেতে হ'ল না। একখানি মাঝারি-রকমের একতলা লাল রঙের বাড়ী রাস্তা থেকে প্রায় একশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে। রাস্তার উপরেই ফটক। ফটক খুলে' ভিতরে ঢুকে' দেখি, একটি পরিপাটী ফুলের বাগান। সেই বাগানের মাঝ দিয়ে একটা সরু লাল কাঁকর-বিছান রাস্তা সোজা দালান পর্য্যন্ত গিয়েছে। রাস্তার দু'-কিনারে চন্দ্রমল্লিকার ঝাড়, তাতে পাতা নেই বলে'ই হঠাৎ অনুমান হয় এম্‌নি তাতে ফুল ফুটেছে।

দালানের সাম্‌নের দিকে একটি বারান্দা। আমি সব রাস্তাটি বেয়ে সরাসর বারান্দায় গিয়ে উঠ্‌লুম। সেখানে গিয়ে দেখি একটি গোল টেবিলের উপর একটি টিয়ে-পাখী আর সেই টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে একটি মহিলা টিয়ে-পাখীটাকে এক-একটি করে' বাদাম তুলে' দিচ্ছেন আর পাখীটি মহা আনন্দে তাই গলাধঃকরণ কর্‌ছে।

আমি কোনরূপ ভনিতা টনিতা না করে'ই একেবারেই জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—"মুকুলিকা দেবী এখানে থাকেন?"

মহিলাটি উত্তর কর্‌লেন—"আমারই নাম মুকুলিকা দেবী।"

এই উত্তরের সঙ্গে-সঙ্গে আমার মনে হ'ল যেন হঠাৎ কোন্ অদৃশ্য শক্তি আমাকে উদ্ভিদে পরিণত করে' ফেল্‌লে, আর এক নিমেষে আমার দু'পা থেকে সহস্র শিকড় গজিয়ে সিমেণ্ট, ভেদ করে' তাই পৃথিবীর বুকে চালিয়ে দিয়ে আমাকে সেখানে বজ্রমুষ্টিতে ধরে' রাখ্‌লে।

দেখ্‌লুম আমার সাম্‌নে মুকুলিকা দেবী। যেমন লম্বা তেম্‌নি মোটা। গায়ের রং আব্‌লুস কাঠের মতো, নাসা-রন্ধ্রের নীচ দিয়ে একটি সূক্ষ্ম গোঁফের রেখা, বয়েস চল্লিশও হ'তে পারে পঞ্চাশও হ'তে পারে।

প্রায় আধ মিনিটের মধ্যে আমার উদ্ভিদ্ অবস্থা কেটে গেল। সেই সঙ্গে আমার শিরায় শোণিতপ্রবাহ আবার গতিশীল হ'য়ে উঠ্‌ল আর তারই সাথে সাথে আমার সর্ব্বা[ঙ্গ] বেয়ে সহস্র ধারা হ'য়ে ঘাম ঝর্‌তে লাগ্‌ল। এম্‌নি একট[া] অসোয়াস্তিতে আমার সারা অন্তর ভরে' উঠ্‌ল যে তা[র] তুলনা মেলে না। মুকুলিকা দেবীর সঙ্গে কথোপকথনে[র] একটা ধারা কল্পনায় হাজার বার গড়ে' তুলেছি তার খেই যে কোথায় হারিয়ে গেল, কেবল তাই নয়, সে-সময় আমার চোখ দুটির দৃষ্টি যে কোথায় স্থাপন কর্‌ব, [এ] তাই একটা বিষম সমস্যা হ'য়ে উঠ্‌ল। মনে হ'ল [যে] মুকুলিকা দেবীর দিকে তাকিয়ে দেখাই তাঁর প্রতি এক বিশ্বাসঘাতকতা করা। সেখানে আর এক-মুহূর্ত্ত থা

আমার পক্ষে সাংঘাতিক ব্যাপার কিন্তু আবার তৎক্ষণাৎ বিদায় নেওয়া তার চাইতেও হাস্যজনক। মনে হ'ল, যেন আমি একটা জালবদ্ধ শিকার অথচ সহানুভূতির আশা কোন দিক্ থেকেই করা চল্‌বে না।

এম্‌নি যখন আমার একটা সাংঘাতিক ন-যযৌ-ন-তস্থৌ অবস্থা তখন বিদ্যুৎঝলকের মতো একটা ফন্দি মনে খেলে গেল। আমি বল্লুম—"আমার নাম গঙ্গারাম। উৎপল আমার বন্ধু। উৎপলের আজ আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে আস্‌বার কথা ছিল। কিন্তু আজ বেলা তিনটের সময় সে তার বাড়ী থেকে এক টেলিগ্রাম পায় যে নন্‌-কো-অপারেশনের সম্পর্কে তার বাবা ও দাদা দু' জনেই গ্রেপ্তার হয়েছেন, সেইজন্যে তাকে আজ দার্জ্জিলিং মেলে বাড়ী চলে' যেতে হয়েছে। যাবার সময় আমাকে বলে' যায় আপনাকে খবরটা দিতে যেন আপনি তার জন্যে অপেক্ষা করে' না থাকেন।"

মুকুলিকা দেবী একটু আম্‌তা আম্‌তা করে' বল্লেন "তা—গঙ্গারাম-বাবু—বসুন্ না।"

আমি বল্লুম—"না—আমায় মাফ করবেন, আমার একটু জরুরী কাজ আছে।"

তার পর একটা নমস্কার জানিয়ে মুকুলিকা দেবীকে আর কোন কথা বল্‌বার অবসর না দিয়েই আমি বেরিয়ে পড়লুম।

যখন মেসে পৌঁছলুম তখন সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে। রাস্তায়-রাস্তায় গ্যাসের বাতি জ্বলে' উঠেছে। লোক-প্রবাহের কোলাহল, ট্রামের ঘর্ঘর, ফেরিওয়ালাদের ডাক-হাঁক সব এক-সঙ্গে মিলে' একটা বিরাট্ ব্যস্ততা সৃষ্টি করেছে। জামা চাদর ছেড়ে একটা চুরুট ধরিয়ে যখন বিশ্রাম কর্‌তে বস্‌লুম তখন মনে হ'ল যে মানুষের জীবন ট্র্যাজেডি ও কমেডির একটা অপূর্ব্ব মিশ্রণ।

তখন স্বপ্নেও ভাবিনি যে কি কড়া চাবুক আমার জন্যে তৈরী হচ্ছে।

* * * *

তিন দিন পরে এই চিঠিখানা পেলুম।

বেলতলা রোড
ভবানীপুর।

উৎপল-বাবু—

আমি আপনাকে পূর্ব্বে দু'বার দেখেছি। কোথায় সে-কথা এখন বলে' কোন লাভ নেই। আমার চেহারার জন্যে আপনার কাছে ত্রুটি স্বীকার করা উচিত ছিল, কিন্তু সেদিন সে-সুযোগ আমাকে দেননি। আশা করি আপনার বাড়ীর খবর ভাল। ইতি—

শ্রী মুকুলিকা দেবী।

চিঠিখানা পড়ে' আমার এম্‌নি অবস্থা হ'ল যে কেউ তখন আমাকে দেখ্‌লে মনে করত যে আমার নির্ব্বিকল্প-সমাধি-অবস্থা।

তার পর থেকে "উৎসব ও উপাসনা"র লেখা ছেড়ে দিয়েছি—সে মেসও পরিবর্ত্তন করে' আর-এক মেসে উঠে' গেলুম, আর সেই থেকে নব্য ফ্যাশানে দাড়ি-গোঁফ কামাই।
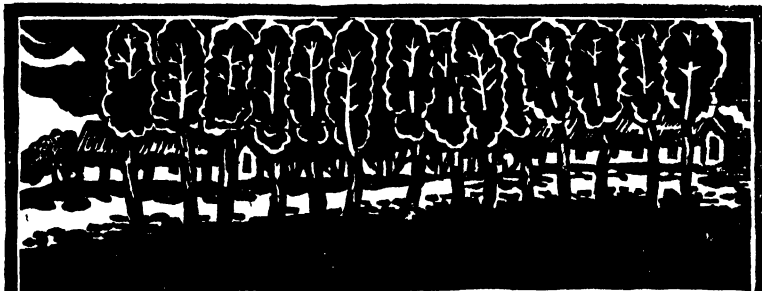
শাল-বীথি
রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক কাঠ-খোদাই

শাওনের ধারা

শ্রী রামেন্দু দত্ত

আজি, শাওনের ধারা ঝর্ ঝর্ ঝর্
ঝরিছে বিপুল নিঝ রে ;
ত্রিলোক-পালিনী জননীর কোটি
স্তনমুখ হ'তে ক্ষীর ঝরে !
চলিছে ছুটিয়া কল কল কল
করতালি দিয়ে হেসে খলখল
কালো জল-ধারা পাগলের পারা
জাগাইয়া যত জীব-জড়ে !

হৈমবরণ ঐ কে চরণ
বাড়াইল বাঁকা বিদ্যুতে !
বজ্র-নূপুরে নাচন জুড়িয়া
তাড়াইয়া ফিরে নিদ্-দূতে !

মল্লারে তান ধরেছে বাদল,
বাজে মৃদু মধু মৃদঙ্-মাদল,
গগনে শ্যামল নবমেঘদল
সে গান শুনিতে ভীড় করে।

আঁধার মেঘের কাঁচলিতে কার
সুধার উৎস রয় ঢাকা !
কার ছলছল নয়নে সজল
সুদূর দিগ্বলয় আঁকা !
ঝল্‌সে বিজলী উতল উজল,
তরাসে তিমির তোলে অঞ্চল !
ত্রস্ত ধরার বস্ত্র তিতিয়া
ভীতি-ভরে বুঝি স্বেদ ঝরে !

কারাগারে

শ্রী ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

এক

রাত্রি দ্বিপ্রহর। কারাগারের মধ্যে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল। মাঝে মাঝে দুই একজন পাহারাওয়ালার পদ-শব্দ শোনা যাইতেছিল। বন্দী-গৃহের শিখরদেশের ছিদ্রগুলি নিকটবর্ত্তী অন্যান্য স্থানের তুলনায় অধিক অন্ধকারময়, মৃত্যুর চক্ষুর মতই ভয়ঙ্কর।

জেলের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের ঘরে একটা আলো জ্বলিতেছিল। একটি টেবিলের পার্শ্বে দুটি লোক মুখোমুখি হইয়া বসিয়াছিল। একজন সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট, অপরটি তাহার সাহায্যকারী। তাহারা একটি পেন্সিল্ দিয়া সেইসব কয়েদীদের নামের পার্শ্বে দাগ দিতেছিলেন যাহারা কাল প্রাতে বিচারের জন্য প্রেরিত হইবে।

ঝন্-ঝনন্! ঝন্-ঝনন্!—

"আবার সেই!" পেন্সিল ফেলিয়া দিয়া সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট্ চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

সঙ্গীটি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি ?"

"একটি নূতন কয়েদী, শিকলের শব্দে দিনরাত আমাকে এম্‌নি করে' জ্বালাতন করে।"

"কেন এমন শব্দ করে ?"

"কেন তা কি করে' জান্‌ব ? অনবরত ঐ কুকুরটা হাঁটাহাঁটি করে—একদণ্ডও আমাকে বিশ্রাম করতে দেয় না। যত বছর আমি এখানে আছি তার মাঝে এমনটি আর দেখিনি। কি অদ্ভুত শব্দ।"

ঝনন্! ঝন্-ঝনন্—

এবার শব্দটি আরও বিকট।

"অসহ্য!" সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট্ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। আর সহ্য করা যায় না। কাল রাত্রে এর জন্য আমি এক মিনিটের জন্য চোখ বুজ্‌তে পারিনি।"

সাহায্যকারীটি হাসিয়া উঠিলেন।

"কি, হাসছেন যে ?"

"কেন হাস্‌ছি, বাঘ মেষের ভয়ে কাতর একথা শুন্‌লে সিদ্ধ মুরগীটি পর্য্যন্ত হেসে উঠে। আপনার রাগ বা অসন্তোষের কারণ কি ? ওকে চুপ করিয়ে দিন্ না।"

"চুপ করিয়ে দেব ? বলা খুবই সোজা।"

"ওকে ঘুমুতে বলুন।"

"যদি ও না ঘুমোয় তা হ'লে ?"

"ঘুমোতে বাধ্য করুন। তার জন্য ভাল ওষুধ নেই কি ?" বলিয়া তিনি দেওয়ালের গায়ে ঝুলান চাবুকের সারির দিকে ইঙ্গিত করিলেন। তাঁহার ছোট-ছোট চোখ-দুটি নিষ্ঠুরতার আগুনে জ্বল্ জ্বল্ করিয়া উঠিল।

ঝনন্! ঝন-ঝনন্!—আবার সেই জীর্ণ লৌহের ভয়ঙ্কর শব্দ। সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট্ চিন্তান্বিত হইলেন ও দাঁতে ওষ্ঠ চাপিয়া ক্রোধভরে ঘর হইতে বাহির হইলেন। তিনি যে সেল হইতে শব্দ আসিতেছিল সেই সেলের দিকে অগ্রসর হইলেন, গোলাকার জানালাটি খুলিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন,—

"চুপ্ কর্ কুকুর, চুপ করে' থাক্ !"

"আমিত কিছুই করছি না।"—ভিতর হইতে উত্তর আসিল।

"সব সময় এমন করে' শব্দ কেন করিস্ ?"

"কেন ? শিকলগুলোর গায়ে গায়ে ঘা লেগে শব্দ হয়।"

"চলা-ফেরা কেন কর ?"

"তবে কি করব আমি ?"

"ঘুমোবে, ঘুমোবে। যদি না ঘুমোও তা হ'লে",—সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট্ কথাটা শেষ করিলেন না।

"ঘুমোব,—হাঁ বলা খুব সোজা বটে", বন্দী মনে মনে বলিল।

"মানুষের স্বাধীনতার রক্ষক যে সে কি পারে ঘুমোতে ?—যদি তাকে রাখা হয় জীয়ন্ত গোর দিয়ে, আর না থাকে তার বিন্দুমাত্র আশা ?"

হিদাকের মন ছিল আগ্নেয়গিরির মত। সেলটি অত্যন্ত অপরিসর ও শৃঙ্খলটি ভয়ঙ্কর ভারী। শৃঙ্খলের শব্দ, যথেচ্ছাচারীর ভীতিময় সঙ্গীত—যে-সঙ্গীত সৃষ্টির আদি হইতে কারাগারের প্রাচীরে প্রাচীরে প্রতিধ্বনিত।

সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট্ চলিয়া গেলেন। বন্দী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, কথাগুলি চিন্তা করিতে লাগিল। তার পর আবার বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। সে দেওয়ালের নিকট দিয়া একপা-একপা করিয়া অতি সতর্কতার সহিত হাঁটিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া শৃঙ্খল বাজিয়া উঠিল।

সাহায্যকারীটি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত দিন ধ'রে ঐ অপদার্থটি এখানে আছে ?"

"তিন দিন হ'ল Toprag-Gale-এ তাকে ধরা হয়। অত্যন্ত দুর্ভাগা ওর, এমন কি ঘুমোতে পর্য্যন্ত পারে না। কেউ বল্‌তে পারে না কে ও, বা কোথা থেকে এসেছে।"

"ঝুল্‌বে কি ?"

"কিসে ? ও ! আপনি বল্‌ছেন ফাঁসির কথা ? নিশ্চয়ই !—যদি আদেশ হয়।"

তার পর তাঁহারা নিস্তব্ধ হইলেন। বিষয়টি আলোচনার পক্ষে মোটেই অনুকূল ছিল না। তাই সেটি তাদের মনে-মনে বহুক্ষণ আন্দোলিত হইতে লাগিল। কেহই একটি কথা বলিলেন না। হঠাৎ শিকলের একটি কর্কশ শব্দে সে নিস্তব্ধতা বাধা প্রাপ্ত হইল।

"কাল সকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর্ কুকুর !" সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট্ অস্পষ্ট-স্বরে বলিয়া উঠিলেন।

সাহায্যকারী উঠিলেন ও বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন।

পরদিন প্রভাত হইল ও বন্দীদিগের প্রাতর্ভোজনের সময় আসিল।

"এখন তুমি চিরকালের জন্য শান্ত হবে কাফের।"

সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট্ একখানি খাবারের থালা হাতে করিয়া সেলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

তিনি দরজা খুলিয়া খাবারের থালাটি মেঝের উপর রাখিলেন, বন্দী তখন ঘুমাইতেছিল। সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট্ আস্তে আস্তে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন কিন্তু চলিয়া গেলেন না। কিসে যেন তাঁহাকে সেখানে ধরিয়া রাখিল। তিনি দরজার ছিদ্র দিয়া ভিতরে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। বন্দীটি দেখিতে সুন্দর। চেহারার মধ্যে বংশ-গৌরবের লক্ষণ বিদ্যমান। তাহার প্রশস্ত ও উজ্জ্বল ললাট উচ্চ ও মহৎ চিন্তার অভিব্যক্তি। মুখমণ্ডলে চরিত্রের দৃঢ়তা সূচিত হইতেছিল। নিদ্রিত বন্দীর চেহারার মধ্যে এমন কিছু ছিল যাহাতে সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট্ বিশেষভাবে বিচলিত হইলেন। মনে ভয় হইল। তিনি তাঁহার মনের ভাব দমন করিতে চেষ্টা করিলেন।—কেন আমি এখানে দাঁড়াইয়া উহাকে লক্ষ্য করিতেছি ? চলিয়া যাইতেছি না কেন ? তিনি কিছুই বুঝিলেন না। চিন্তা করিতে ইচ্ছা হইল না। তিনি নিজেকে কেবলই প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

তিনি দেখিলেন বন্দী উঠিয়া খাবারের নিকট আসিল। তাঁহার পা কাঁপিতে লাগিল, অতি কষ্টে দরজার সহিত আড় হইয়া রহিলেন। তিনি চলিয়া যাইতে চাহিলেন, কিন্তু পারিলেন না। তাঁহার তালু শুকাইয়া আসিল। এমন সুন্দর ললাট ও জ্যোতিঃপূর্ণ চক্ষু ! এ-যুবককে কিছুতেই নষ্ট হইতে দিব না।

তিনি দরজা খুলিয়া বলিয়া উঠিলেন,—

"থাম ! থাম !"

বন্দী বিস্ময়ে তাঁহার দিকে চাহিল।

"থাম, আমি এ পারব না। শিকলের শব্দ তোমার যত খুসী করতে পার।"

তিনি থালাটি উঠাইয়া লইলেন ও দ্রুত ঘর হইতে বাহির হইয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। বন্দী সমস্ত বুঝিল। শুধু একটু মৃদু হাসি তাহার ছোট ঠোঁট দু-খানির উপর দিয়া খেলিয়া গেল অস্ত-গামী সূর্য্যের অস্পষ্ট লালিমার মত। সে উৎফুল্ল হইল। বদ্ধ কারার ক্ষুদ্র কক্ষে থাকিয়াও সে আজ জয়ী।

দুই

কয়েক সপ্তাহ কাটিল।

ঝনন্। ঝনন্—এবার "এ—" পল্লীর ভিতর দিয়া সঙ্গিন্‌ধারী পাহারায় বেষ্টিত হইয়া বন্দীর দল চলিয়াছে। তাহাদিগকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাওয়া হইতেছিল। দিনের বেলাও এই শিকলের শব্দ ভয়ঙ্কর শুনাইতেছিল। দরজা, জানালা সমস্তই বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। এই শব্দে গ্রামবাসীর মনে ভয়ের সঞ্চার করিল, এমন কি সাহসী হৃদয়ও কাঁপিয়া উঠিল। স্কোয়ারের বাহিরে বিরাট্ জনতার সৃষ্টি হইল, যেখানে ছিল কেবল বিচারক, উকিল ও অন্যান্য কর্ম্মচারী, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্ ও তাঁহার সহকারীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

"আমার দোষ নয়।" সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্ মনে মনে বলিতে লাগিলেন। বিচারক বন্দীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

"তুমি এ-পল্লীর 'এ— ?'

"না আমার বাড়ী 'এ' পল্লীতে নয়।"

" 'ক—' তোমার বন্ধু ?"

"আমি তাকে চিনি না।"

"তুমি "জি—"-কে হত্যা করিয়াছিলে ?"

"হাঁ ! সে আমার শত্রু।"

"তুমি অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া শ—এর নিকট গিয়াছিলে ?"

"না ; আমি অস্ত্র সংগ্রহ করি নাই।"

সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের সাহায্যকারীটি এ-পর্য্যন্ত অন্যমনস্ক-ভাবে শুনিতেছিলেন, সে এখন বিচারকের কানে চুপে-চুপে কি বলিল। বিচারকের ইঙ্গিতে সে বন্দীর সম্মুখে খুব নিকটে গিয়া দাঁড়াইল।

সকলেই নিস্তব্ধ হইল। একটা নূতন-কিছুর আশঙ্কায় সকলেই উৎকণ্ঠিত হইল। তাহাদের চোখ ঐদুটি লোকের উপর নিবদ্ধ রহিল। শুধু দুটি লোক মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছিল না,—ছিল চারিটি চক্ষু, চারিটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ; দর্শকবৃন্দ ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। কিছু যেন ঘটিবে, অসাধারণ কিছু। তথাপি তাহারা পরস্পরের দিকে তাকাইয়া রহিল। চোখে পলক নাই। ওষ্ঠ নড়িল না, ভ্রূ কুঞ্চিত হইল না। এমন কি একটি কথা পর্য্যন্ত কহিল না। তাহারা চাহিয়াই রহিল ; একজন শৃঙ্খলাবদ্ধ কিন্তু তেজোদীপ্ত—অন্যজন তুর্ক কর্ম্মচারীর পোষাক-পরিহিত তবুও ভীত-কম্পিত।

বন্দী কয়েক পদ পিছনে সরিয়া গেল।

শৃঙ্খল বাজিয়া উঠিল। সে ঘৃণায় তাহার মুখ সরাইয়া লইল। দর্শকগণ ক্ষণকালের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিল।

"আমি তোমাকে চিনি। তুমি 'এ—' "

অপরটি উত্তর করিল, "হাঁ তুমি আমার বন্ধু ছিলে।"

বন্ধু! এ কি কথা!

কথাটি বিরাট্‌কায় একটা দৈত্যের মূর্ত্তি ধরিয়া যেন তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। নিজেকে সে হীনতায় মণ্ডিত দেখিতে পাইল। নিজের মূর্ত্তিতে সে নিজেই শিহরিয়া উঠিল। আঃ! কত মনুষ্য-রক্তের বিনিময়ে এই উজ্জ্বল বোতাম-বিশিষ্ট সরকারী পরিচ্ছদ সে লাভ করিয়াছে। নিজের অজ্ঞাতসারে সে একটি বোতামের উপর হাত দিল। উঃ! বরফের মত শীতল! সে তাহার হাত সরাইয়া লইল। হায়, কত বছর ধরিয়া যে এই স্বাধীনতার উপাসক বীরের বন্ধুর ভাণ করিয়াছে। কৌশল বিস্তার করিয়া তাহার ধ্বংসের আয়োজন করিয়াছে! সে তাহার তরবারি স্পর্শ করিয়া হাত পশ্চাতে সরাইয়া লইল। সে একবার তাহার বন্ধু, স্বাধীনতার সমরে পূর্ব্বসঙ্গীর কঠিন লৌহ-শৃঙ্খলের দিকে তাকাইল। কোন্‌টি গৌরবের? তুর্ক্ কর্ম্মচারীর তরবারি? না স্বাধীনতার হদীশের কদাকার লৌহ-নিগড়? এ প্রশ্ন যে সে বহু পূর্ব্বে মীমাংসা করিয়াছে। ইহাই আবার নূতন আকারে তাহার নিকট দেখা দিল।

তিন

অন্ধকারময় রাত্রি—অন্ধকারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কাহার তপ্ত দীর্ঘশ্বাস গুমরিয়া গুমরিয়া ফিরিতেছে। অশান্ত বাতাস কালো আকাশের তলে উদাস হইয়া ছুটিয়াছে! সহকারী কর্ম্মচারীটি কারাগৃহের দিকে চলিল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। তাঁহার মনে অনবরত কতকগুলি চিন্তা প্রবেশ-লাভ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, তাহাদিগকে সে কিছুতেই দূর করিতে পারিল না। সেদিন সকালে যখন "এ" ফাঁসিকাষ্ঠে আরোহণ করে তখন সে শত চেষ্টায়ও নিজকে লুকাইতে পারে নাই। বন্দীর চক্ষু দুইটি তখন যেন তাহাকেই খুঁজিয়া ফিরিতেছিল। সে তাহার দিকে তেম্‌নি করিয়া চাহিল যেমন করিয়া সে বিচারের দিনে চাহিয়াছিল। সেই দুইটি চক্ষু—জ্বলন্ত দুইটি চক্ষু সে সেই অন্ধকারের মধ্যে স্পষ্ট দেখিতে পাইল। সে আর অগ্রসর হইতে পারিল না, পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া পড়িল। চক্ষুদুইটি তাহার বন্ধুরই চক্ষু ঠিক্—তেম্‌নি, তেম্‌নি বড়। সে আর অগ্রসর হইবে কি না বুঝিতে পারিল না, ভয়ে চক্ষু নিমীলিত করিল; চোখ খুলিতেই আবার সেই দুইটি চক্ষু। সে পলাইতে চেষ্টা করিল। চক্ষু দুইটি অদৃশ্য হইল। একটি বিড়াল লাফাইয়া পড়িয়া পলায়ন করিল। সে নিজের ভয়ে হাসিয়া উঠিল, কিন্তু অন্য দিনের চেয়ে দ্রুত হাঁটিয়া চলিল।

জেলের প্রাঙ্গণে আসিয়া সে সভয়ে বধ্যভূমির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। সে ভাবিল নিশ্চয় তাহাকে এতক্ষণ গোর দেওয়া হইয়াছে তার সব শেষ হইয়াছে। কিন্তু সেই গভীর অন্ধকারের ভিতর দিয়াও সে তাহার মৃতদেহ স্পষ্ট দেখিতে পাইল। থাকিয়া থাকিয়া বাতাস যখন ফাঁসিকাষ্ঠে আঘাত করিতেছিল তখন বোধ হইতেছিল যেন উহা করুণস্বরে আর্ত্তনাদ করিতেছে। কোন দিকে না চাহিয়া সাহায্যকারীটি অগ্রসর হইল; ফাঁসিকাষ্ঠের নিকট আসিতেই তাহার গতি লঘু হইয়া আসিল। সমস্ত শরীরে একটা শিহরণ অনুভব করিল। কাঁপিতে কাঁপিতে সে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ঘরে প্রবেশ করিল। ঘরে একটি আলো জ্বলিতেছিল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ তাহাকে লক্ষ্য করিলেন না; তিনি কি যেন চিন্তা করিতেছিলেন। দুইজনেই নির্ব্বাক্।

"এখন ত আপনি ঘুমোতে পারেন" সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সাহায্যকারীটি বলিয়া উঠিল। "এখন আর শৃঙ্খলের শব্দ শোনা যাইবে না।" "সেকি! আপনি শুনতে পাচ্ছেন না?" বাহির হইতে বাতাসের সঙ্গে ফাঁসী-কাষ্ঠের সংঘর্ষের একটি অস্পষ্ট শব্দ ভাসিয়া আসিতেছিল; অত্যন্ত করুণ, বিশেষত্বহীন ও মৃত বীরের দেহের উপর ঘুম-পাড়ানি গানের মতই একঘেয়ে।

"কেন? তাকে গোর দেওয়া হয়নি?"

"সেইজন্যই ত আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি। কাল সকালে আপনি তাকে নিয়ে গোর দেবার ব্যবস্থা করবেন,—কারণ আপনি ছিলেন তার বন্ধু।"

সাহায্যকারীটি নিস্তব্ধ রহিলেন। রসিকতার কি তীব্র পরিহাস! তাহার মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ তাঁহার মস্তক নত করিলেন, তাঁহার চক্ষু বাষ্পপূর্ণ হইয়া আসিতেছিল। সাহায্যকারী ধীরে ধীরে উঠিল, আলোটি লইয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কম্পিত মুখের উপর ধরিতেই তিনি ক্রোধে মুখ সরাইয়া লইলেন। তিনি আলোটি তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া মেঝের উপর ফেলিয়া দিলেন। আলোটা চূর্ণ হইয়া গেল!

"ভীরু বিশ্বাসঘাতক, সে যে তোমার বন্ধু!"

ঘরটি অন্ধকারময় হইল। ঘরের প্রতি-কোণে অসংখ্য জ্বলন্ত চক্ষু উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল! সে দৃশ্য বাস্তবিকই ভীতিপ্রদ। সে পলায়ন করিতে চাহিল কিন্তু কোন দরজা খুঁজিয়া পাইল না; বৃথা ঘরময় ঘুরিতে লাগিল। অবশেষে সে অতিকষ্টে একটা দরজা পাইয়া খুলিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল। বাহিরের দৃশ্যও কম ভয়ঙ্কর ছিল না,—ভীষণ অন্ধকার, প্রবল বাতাস ও ফাঁসিকাষ্ঠের অদ্ভুত শব্দ। ওঃ! কি ভীষণ শব্দ!—যেন তাহার হাড়ের ভিতর গিয়া বিঁধিতেছে। সে কোথায় যাইবে! সে যথাশক্তি দৌড়াইতে চেষ্টা করিল। তাহার সম্মুখে গাঢ় অন্ধকার—তাহার মধ্যে জ্বলন্ত রক্তমাখা দুইটি চক্ষু! তাহার পা ভাঙিয়া আসিতেছিল। কাঁপিতে কাঁপিতে সে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের দরজার নিকট আসিল।

"ভীরু, বিশ্বাসঘাতক" সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ বলিয়া উঠিলেন। সাহায্যকারীটি আবার ফিরিল, কিন্তু এবার প্রবল বাতাসে তাহার পথ রুদ্ধ করিল, শেষে সে দেখিল যে সে ফাঁসিকাষ্ঠের নিকট দাঁড়াইয়া আছে। এবার মৃত লোকটিকে মোটেই ক্রুদ্ধ দেখাইল না, বরং বোধ হইল শান্ত সহানুভূতির দৃষ্টিতে সে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। ওষ্ঠ দুইটি ঈষৎ নাড়িয়া যেন সে বলিতেছে—"বন্ধু, বন্ধু!"

সে হামাগুড়ি দিয়া নিকটে গেল। মইটিকে উপযুক্ত স্থানে রাখিয়া তাহার উপর আরোহণ করিল। দড়ি খুলিয়া দিতেই মৃতদেহ নীচে পড়িয়া গেল। অতি শীঘ্র সে চামড়ার দড়িটি নিজের গলায় পরিয়া শূন্যে ঝুলিয়া পড়িল। ক্রুদ্ধ বাতাসের গর্জ্জনের সহিত মনুষ্য-কণ্ঠের একটা অস্পষ্ট শেষ আকুতি মিশিয়া গেল—তার পর আর সে শব্দ শোনা গেল না। শুধু দুইটি মৃতদেহ পরস্পরের দিকে তাকাইয়া রহিল,—একটি মাটির উপর, আর-একটি শূন্যের অন্ধকারে প্রবল বাতাসের কোলে।*

* Awetis Aharonean.

ফাঁকি

শ্রী মণীন্দ্রলাল বসু

দাদামশাই!

এখনও ঘুমোস্‌নি সুধা, কি কষ্ট হচ্ছে মা?

না, দাদামশাই কোন কষ্ট নয়, তুমি এবার ঘুমোতে যাও, কোন দরকার হ'লে ডাক্‌বো'খন।

সে ঘুমের ওষুধটা—

না, দাদামশাই, ওষুধ খেলেও আমার ঘুম হবে না, তার চেয়ে তুমি একটু গল্প করো, আমি গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি।

মাতৃহারা ক্ষুদ্র বালিকা সুধাকে কত রাত, কত গল্প বলিয়া দাদামশাই ঘুম পাড়াইয়াছেন, কিন্তু আজ এ মৃত্যুপথযাত্রিণী যক্ষ্মারোগাক্রান্তা নারীকে তিনি কি গল্প বলিয়া ভুলাইয়া ঘুম পাড়াইবেন! তাঁহার হৃদয় কত সুখ-দুঃখের স্মৃতিতে ভারী হইয়া চোখ দুইটি জলে ভরিয়া আসিল, ভাঙা গলায় তিনি বলিলেন, দেখ সুধার—তার পর আর-কিছু বলিতে পারিলেন না, শুধু দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া বেদনায় স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। অদূরে সমুদ্রের একটানা করুণ কল্লোল-ধ্বনি তাঁহার ভগ্ন জীবনের দীর্ঘ হতাশ্বাসের মত কানে আসিয়া বাজিতে লাগিল, বাহিরে মৃদু জ্যোৎস্না থম্ থম্ করিতে লাগিল।

এঘরের অন্ধকারময় স্তব্ধতা পাষাণ-ভারের মত দাদামশায়ের বুকে যেন চাপিয়া ধরিল, তিনি ধীরে ধীরে পাশের ঘরে গিয়া বলিলেন, সুধা, এখন একটু বেদানার রস খাবে?

আচ্ছা দাও দাদু,—কটা বেজেছে এখন?—

এখন প্রায় দশটা।

মোটে দশটা? আমার মনে হচ্ছে যেন কত রাত হয়েছে, যেন এরাতের আদি নেই—শেসও হবে না—হ্যাঁ, দাদামশাই, আলোটা এঘরে নিয়ে এস, ওই কোণে রাখ,—

চোখে লাগ্‌বে যে—

না, লাগ্‌বে না, বাইরে বড় জ্যোৎস্না, চোখ দু'টো যেন জ্বালা করছে, ঘরে আলো থাক্‌লে বাইরেটা তবু অন্ধকার হবে—

দাদামশাই আলোটা মাথার দিকে জান্‌লার পাশে রাখিলেন। তারা-ভরা আলোছায়াময়ী রাত্রি এতক্ষণ মৃত্যুর মত স্তব্ধ রহস্যময় নিঃশব্দ-চরণে শিয়রে দাঁড়াইয়াছিল, ঘরে আলো আসাতে ঘর হইতে একটু সরিয়া দাঁড়াইল।

বেদানার রস খাইয়া সুধা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দেওয়ালে ঘরের নানা জিনিষের অদ্ভুত ছায়াগুলি দেখিতে লাগিল। দাদামশাই ভাবিলেন, সুধার এবার ঘুম আসিতেছে।

সহসা সে বলিয়া উঠিল—আচ্ছা দাদামশাই তুমি কি দুপুরে ওঁর চিঠিটা পড়ে' শুনিয়েছিলে?—আমার ঠিক মনে পড়্‌ছে না—

চিঠির কথা হইতেই দাদামশাইয়ের বুকের পাঁজর যেন অসহনীয় বেদনায় কাঁপিয়া উঠিল, আপনাকে দমন করিয়া তিনি বলিলেন—হাঁ, তোমাকে ত বল্‌লুম—

হাঁ, ঠিকই ত তুমি বল্‌লে, উনি এক জরুরী মকদ্দমায় ব্যস্ত, শেষ হ'লেই আস্‌বেন দেখ আমার সব এলোমেলো হ'য়ে যায়, আমি বল্‌ছিলুম কি, ওঁর যদি বিশেষ কাজ থাকে উনি এখন নাই বা এলেন, আমি ত একটু সেরে উঠেছি—

না, আমি লিখে' দিয়েছি শীগ্‌গির আস্‌তে, এ বুড়ো কি তোর সেবা কর্‌তে পার্‌বে, নাত্‌জামাইয়ের সেবায় দু'দিনেই সেরে উঠ্‌বি—শেষের কথাগুলি পরিহাসের সুরে বলিলেন বটে, কিন্তু কথাগুলি ব্যঙ্গের মত শোনাইল, শ্লেষবাক্যগুলিতে নিজেই মর্ম্মাহত হইয়া স্তব্ধ হইলেন।

কিন্তু কথাগুলি সুধার বুকে বিশেষ আঘাত করিল না, তাহার হৃদয় যেন অসাড় হইয়া গিয়াছে, বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া সে ধীরে বলিল—আমি বল্‌ছিলুম কি দাদু, খোকাকে শুধু যদি পাঠিয়ে দিতে

পারে, একদিনের জন্য, কত দিন আমি তাকে দেখিনি, মনে হচ্ছে যেন কত বছর, কতদিন হবে?

প্রায় একমাস হবে—

একমাস—আচ্ছা ঠাকুর-পো'র এখন ছুটি, ওরা যদি খোকাকে একবার পাঠায়, দু'দিনের বেশী আমি তাকে রাখ্‌ব না—আমি শুধু একবার দেখ্‌ব—আচ্ছা দাদামশাই, খোকা এখানে এলে তার কি কোন ভয় আছে, তা যদি থাকে—

না, মা, সে আমি ঠিক ব্যবস্থা কর্‌ব—

আচ্ছা, আমি কোলে নিতে পার্‌ব ত তাকে?—

কোন ভয় নেই, তোমার খোকা তোমার কাছে এলে তার কোন রোগ হবে না—

তুমি কাল ডাক্তার-বাবুকে একবার জিজ্ঞেস কোরো—ওরা কবে আস্‌বে লিখ্‌ছে,—কাল?

দু'-একদিন দেরী হবে, মকদ্দমাটা শেষ না হ'লে—

হাঁ, ঠিক, মকদ্দামার কথাটা আমি ভুলে গেছ্‌লুম—আচ্ছা, ডাক্তার-বাবুকে জিজ্ঞেস কোরো আমি এখন একটু বেড়াতে পারি কি না, তা হ'লে কাল সকালে কতকগুলো ঝিনুক কুড়িয়ে নিয়ে আসি—

সে আমি নিয়ে আস্‌ব'খন।

না, তোমার কষ্ট হবে, খোকা ঝিনুক পেলে নিশ্চয় খুব খুসি হবে, আর সেই মুচিটাকে একবার আস্‌তে বোলো ত—হরিণের চামড়ার কি সুন্দর জুতো নিয়ে এসেছিল, খোকার পায়ে বেশ মানাবে, নয় দাদামশাই?—

হাঁ, বেশ মানাবে।

আচ্ছা, চিঠিটা কি তোমার কাছে আছে?

আর এখন চিঠি শোনে না মা, তা হ'লে রাতে একেবারে ঘুম হবে না—

এ ক'-রাত আমার একটুও ঘুম হয়নি, জান, একটু চুল আসে হঠাৎ চমকে উঠি, মনে হয় যেন খোকার পায়ের মিষ্টি শব্দ—কিন্তু চোখ চাইলেই কোথায় মিলিয়ে যায়—আচ্ছা ও ত সমুদ্রের ডাক—

না, বাতাসে ঝাউগাছগুলোর শব্দ হচ্ছে।

ও, মাঝে মাঝে মনে হয় যেন গাড়ীর শব্দ শুন্‌ছি, যেন গাড়ী করে' আমার খোকা আস্‌ছে; সব এমন গুলিয়ে যায়।—দাদামশাই!

কি মা!

সেই চিঠিটা একবার, না, তোমায় পড়্‌তে হবে না, আমায় শুধু দাও আমি হাতে করে'—

সেটা কোথায় যেন রাখ্‌লুম মনে পড়্‌ছে না ত, দেখি বোধ হয় ওঘরে—

দাদামশাই আলো লইয়া পাশের ঘরে গেলেন, এবং আলোটি সে ঘরে রাখিয়া দিয়া যেন কোন অজানা অন্ধকার পথে একা দিশাহারা হইয়া অসাড়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সুধার সকরুণ জীবনের মত চিঠিটাও একটা মস্ত ফাঁকি। প্রায় একমাস হইল দাদামশাই সুধাকে তাহার মাতাল স্বামীর ঘর হইতে জোর করিয়া লইয়া আসিয়াছেন, এই এক মাসের মধ্যে সুধার স্বামীর কোন চিঠিই আসে নাই। দাদামশাই যখন সুধাকে লইয়া আসেন তখন স্বামী কিছু আপত্তি করিলেও শাশুড়ী বিশেষ কিছু আপত্তি করিলেন না। সুধা যখন সুস্থ, সবল ছিল তখন তাহাকে দিয়া সংসারের সমস্ত কাজ করাইয়া লওয়া চলিত, কিন্তু এখন এ রুগ্না, অকর্ম্মণ্যার জন্য শুধু ঝির খরচ নয়, ডাক্তারের খরচও বাড়িয়াছে, একটা যন্ত্র ভাঙিয়া গেলে যেমন সেটাকে দূর করিয়া লোকে নূতন যন্ত্রের অর্ডার দেয়, সুধার শাশুড়ী তেম্‌নি সুধাকে ঘর হইতে বিদায় দিয়া তাঁহার এক নূতন কর্ম্মপরায়ণা বধূর দর্‌কার একথা ঘটকী-মহলে জানাইয়া দিলেন। তবে দাদামশাইয়ের আদিক্ষেতা বা দরদটা যে তিনি পছন্দ করিলেন না তাহা লোক-সমাজে জানাইবার জন্য তিনি সুধার চার-বছরের খোকাকে নিজের কাছে আট্‌কাইয়া রাখিলেন, বলিলেন—তোমাদের মেয়ে তোমরা নিয়ে যেতে পার, আমার নাতিকে আমি দেবো না। অপ্রেম-অনাদর-নির্য্যাতনের মধ্যে স্বামীর ঘরে সুধা এই খোকাকে বুকে করিয়া সকল দুঃখ সহজে বহিয়াছে, খোকাকে আবার দেখিতে পাইবে এই ভাবিয়া তাহার মন দুলিতেছিল।

দাদামশাই সুধার স্বামীকে আসিবার জন্য কয়েকখানা চিঠি লিখিয়াছিলেন, কিন্তু কোন উত্তরই পান নাই, শুধু

মাঝে স্বামী কিছু টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিল, আর মনিঅর্ডার-কুপনে দু'লাইন লেখা ছিল, এখন আদালতে বড় বেশী কাজ, মক্কেলরা কিছুতেই ছাড়ে না, যাবার সময় নেই—বার-বার চিঠি লিখে' বিরক্ত করবেন না।

দাদামশাই ! খুঁজে পাচ্ছ না বুঝি, আচ্ছা থাক—

এই যে মা—

আচ্ছা কাল দিও, আমি কি ভাবছিলুম জান ?

কি রে ?—

কি আশ্চয্যি আমার এতদিন কখনও মনেও হয়নি—

কি মা ?

আচ্ছা দাদু, মার মুখ তোমার মনে আছে ত ?

তোর মা !

মার সত্যিকার মুখ আমার খুব অস্পষ্ট মনে আছে, তবে সেই যে ফোটোটা আছে—দেখ দাদু খোকার মুখ ঠিক্ মায়ের মুখের মত হয়েছে, চোখ দু'টো ত ঠিক্ সেইরকম টানা টানা—আমি কি করে' বুঝলুম জান, আমার মনে হ'ল, মা যেন ওই জানালার কোণ থেকে আমার দিকে চেয়ে আছেন, ঠিক তাঁর মত একখানা মুখ—হঠাৎ সে মুখ মিলিয়ে গেল, আবার ভেসে উঠল, দেখি, সে ত মার মুখ নয়, খোকার, কিন্তু ঠিক মায়ের মুখের মত—কৈ চিঠিটা ?

দাদামশাই তাঁহার পকেট হইতে একখানা আফিসের চিঠি বাহির করিয়া কম্পিত-হস্তে সুধাকে দিলেন। সুধা ইংরেজী জানে না এই ভরসা।

বাহিরের মেঘে চাঁদ ঢাকা পড়িয়াছে, বাতাস উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে, সাগরের ডাক ডমরুধ্বনির মত বাজিতেছে। কাশিয়া কাশিয়া বুকের যে পাঁজরগুলিতে ব্যথা হইয়াছে তাহাদের উপর রোগশীর্ণ হাতে চিঠিটা ধরিয়া সুধা শান্ত হইয়া শুইল। অন্ধকার রাত্রির তারাগুলি মাতার করুণ ব্যাকুল অনিমেষ চাউনির মত তাহার রোগ-শয্যার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। দাদামশাই ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া সম্মুখে বালির উপর বসিয়া অন্ধকারময় অনন্ত সমুদ্রের দিকে শূন্যনয়নে চাহিয়া রহিলেন। কিছু ভাবিবার, কাঁদিবারও তাঁহার যেন শক্তি নাই।

২

দুপুরবেলা ইজি-চেয়ারে শুইয়া খোকার জন্য রেশমের মোজা বুনিতে-বুনিতে শ্রান্ত হইয়া সুধা একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। দাদামশাই ধীরে তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন, ধীরে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন, চুল কত উঠিয়া গিয়াছে, মাথাটা যেন শুকাইয়া ছোট হইয়া গিয়াছে। কয়েকটা মাছি মুখে উড়িয়া বসিতেছে দেখিয়া তিনি ধীরে ধীরে পাখার মৃদু বাতাস করিতে লাগিলেন, শীর্ণ মুখখানি রোগের আভা-মণ্ডিত হইয়া কি করুণ !

সুধা একটু উস্‌খুস করিয়া জাগিয়া উঠিল ; দাদামশাই পাখার বাতাস করিতেছেন দেখিয়া মিটিমিটি চাহিয়া করুণ-মধুর হাসিল ; তার পর দাদামশাইয়ের হাত হইতে পাখাটি লইয়া বলিল—দাও না দাদামশাই, তোমায় একটু হাওয়া করি—

আমি এই জানালাটা খুলে' দিচ্ছি, তা হ'লে খুব হাওয়া আসবে—

আচ্ছা দাও, আজ কত তারিখ দাদামশাই ?

আজ বোধ হয় ১২ই—

ও ! তা হ'লে তিন দিন আছে, জান ষোলই হচ্ছে খোকার জন্মদিন, ও এখনও মোজাটা কত বাকি, কিছু বোনা হয়নি, খালি ঘুমিয়ে পড়ি—

এখন তোমার যে পরিপূর্ণ বিশ্রাম দরকার।

না, এ আমায় বারণ করতে পারবে না, এ-তিনদিনে এটা আমায় শেষ করতেই হবে, আচ্ছা, ষোলইএর মধ্যে খোকা নিশ্চয়ই এসে পড়বে—জানো আমি কি স্বপ্ন দেখছিলুম ?—আমি দেখছিলুম, খোকা এসেছে, আমি তাকে এই মোজাটা পরিয়ে দিলুম, তার পর হরিণ-চামড়ার সুন্দর জুতো— কি সুন্দর দেখাচ্ছিল—আমার গলা জড়িয়ে চুমো খেয়ে বললে,—ভারি দুষ্টু, মা, আমায় ফেলে' এসেছিলে, আমার মন কেমন করে যে—দাদু, আচ্ছা আলনাটায় ত তোমার কাপড় আর পাঞ্জাবী রয়েছে ত ?—হাঁ, ঠিক মনে হচ্ছিল খোকার সেই লাল জরিপাড় ধুতিটা আর সিল্কের পাঞ্জাবীটা ঝুলছে—খোকা,—খ্যা !—

সহসা সুধার এক কাশির বেগ আসিল, কাশিতে

চাঁদবিবি (প্রাচীন চিত্র)
শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠের সৌজন্যে প্রাপ্ত

কাশিতে খানিকটা রক্ত মুখ দিয়া উঠিল, কিছুক্ষণ বসিয়া মৃদু আর্ত্তনাদ করিয়া শ্রান্ত হইয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার হাতে-বোনা রেশমের মোজা-পরা খোকার কচি পা-দু'টি মুদিত নয়নের অন্ধকার-পটে বারবার ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। সেই জুতোমোজা পরিয়া খোকা যেন দস্যিপনা করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহার দুরন্ত পায়ের শব্দের মত সাগরের তরঙ্গধ্বনি তাহার কাণে আসিয়া বাজিতে লাগিল।

৩

গভীর রাতে সুধা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে ভাবিয়া দাদামশাই নিঃশব্দ চরণে তাহার ঘরে ঢুকিয়া তাহার শয্যার পাশে বসিলেন। সুধা কিন্তু জাগিয়াছিল, সে ধীরে বলিয়া উঠিল কে, দাদামশাই? তোমায় আজ সারাদিন দেখিনি কেন?

দাদামশাই শিহরিয়া উঠিলেন, তাঁহার চোখ দিয়া যে টস্‌টস্ করিয়া জল পড়িতেছে তাহা সুধা অন্ধকারে বুঝিতে পারিল না।

আচ্ছা, দাদু কাল ত সকালে ওরা আস্‌বে, দেখ, আমি ভোরে প্রায়ই ঘুমিয়ে পড়ি, আমায় কিন্তু কাল ভোরে জাগিয়ে দিও, ভোরবেলাইত ট্রেন্ আসে—

দাদামশাই গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—মা গো!

তাহার স্বামী ও পুত্র কাল সকালে আসিবে এই স্বপ্নমাধুরীতে সুধা নিমগ্ন ছিল, স্নেহসুধায় তাহার হৃদয় কানায়-কানায় ভরা। ধীরে সে বলিল—আচ্ছা, আজ কোন চিঠি আসেনি?

চিঠি সত্যই সেদিন একখানা আসিয়াছিল। সেটা সুধার স্বামী লেখে নাই, তাহার দেবর দাদামশাইকে লিখিয়াছে। সে লিখিয়াছে, খোকার কয়েকদিন হইতে খুব জ্বর, বৌদির জন্য ভয়ঙ্কর কাঁদে। দাদা খোকার কান্নার জন্য বিরক্ত হইয়া আর রাতে বাড়ীই আসেন না, তিনি আগে মাঝ-রাতে বাড়ী ফিরিতেন, এখন সমস্ত রাতই বাহিরে থাকেন। বৌদিকে দেখিবার জন্য তাহার ভয়ঙ্কর ইচ্ছা করে, কিন্তু তাহার মা শাসাইয়াছেন, যে, সে যদি দেখিতে আসে তবে তাহাকে আর বাড়ী ঢুকিতে দিবেন না। এদিকে খোকার চিকিৎসার কিছুই হইতেছে না, সে যে কি করিবে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। বৌদি কেমন আছেন তা যেন তাহাকে নিশ্চয় জানানো হয়। তরুণমনের অনেক ব্যথার কথাই সে লিখিয়াছে। তাহার চিঠিখানি পাইয়া দাদামশাই আজ দিশাহারা হইয়া গিয়াছেন।

সুধা বলিল, মোজাটা কিন্তু একটু বোনা বাকী আছে, তা তার জন্যে খোকা রাগ করবে না, কালই আমি শেষ করে' দেবো—কিন্তু তুমি এলে, আর মনটা কেমন হু হু করছে—এতক্ষণ আমি আকাশের দিকে চেয়ে যেন খোকার মুখ দেখ্‌ছিলুম—তারাগুলো যেন তার সুন্দর চাউনি—না, আমার কেমন ভাল লাগ্‌ছে না···মনে হচ্ছে, খোকার যেন ভয়ঙ্কর অসুখ করেছে, সে মা, মা, বলে' কাঁদছে—অন্ধকারে হাৎড়ে বেড়াচ্ছে, আমাকে খুঁজে' পাচ্ছে না—দাদামশাই!

দাদামশাই আর আপনাকে দমন করিয়া রাখিতে পারিলেন না, এ মিথ্যার মায়া-জালে ভারাক্রান্ত হইয়া ছট্‌ফট্ করার চেয়ে সত্যে মুক্তি ভাল,—সে মুক্তি যতই নির্ম্মম ক্রূর বেদনাময় হোক!

তিনি ভাঙা-গলায় বলিয়া উঠিলেন—ওরে সব ফাঁকি, তোকে সব মিথ্যা—

সহসা তিনি থামিয়া গেলেন। সুধার কাশির বেগ আসিয়াছে। কাশিতে কাশিতে সে উঠিয়া বসিল, ঝড়ে দোলা লতার মত কাঁপিতে লাগিল, বিছানা রক্তে ভাসিয়া গেল।

কাশি থামিয়া গেলে, সুধা যখন একটু শান্ত হইল, দাদামশাই আর তাহাকে কিছু বলিতে পারিলেন না। অশ্রুসিক্তকণ্ঠে ডাকিলেন, মা!

না, দাদু, কষ্ট না, কিছু কষ্ট না, আমি এখন একটু ঘুমোতে চেষ্টা করি, আমায় কিন্তু ভোরে জাগিয়ে দিও।

৪

পরদিন বিকেল-বেলায় সমুদ্রতীরের সম্মুখে বারান্দায় বসিয়া সুধা তাহার খোকার ফোটোটি দেখিতেছিল। এ-ফোটোটি তাহার দেবরের এক বন্ধু তুলিয়া দিয়াছিল। খুব ভালো ওঠে নাই, তবু এই অস্পষ্ট ছবিখানি সে খোকার রূপমাধুরী দিয়া ভরিয়া দুই চোখ দিয়া পান করিতেছিল।

ঘরের ভিতর দাদামশাইয়ের পায়ের শব্দ শুনিয়া সে ধীরে ডাকিল—দাদামশাই!

অপরাধীর মত দাদামশাই তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

তোমায় এম্নি ডাকলুম দাদামশাই, বোসো না চেয়ারটায়।

দাদামশাই, তোমার পাকাচুলগুলো তুলি এস ত—

ওরে আমার সব চুলই যে পাকা!

দেখ ত কানে কি ময়লা—বলিয়া সুধা আঁচল দিয়া কান পরিষ্কার করিয়া দিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু একটা কান পরিষ্কার করিয়াই পরিষ্কার করিবার উৎসাহ চলিয়া গেল। দাদামশাই তাহার মাথায় ধীরে হাত বুলাইয়া বলিলেন—কেমন আছিস, সুধা?

মন্দ কি, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে কি জান, আমি যেন নেই, আমি থাকা না-থাকার বাইরে গেছি—তুমি অমন করে' চেও না—হাঁ, আমার এখন কিরকম মনে হচ্ছে জান?—আমরা সব ছায়া, সব ফাঁকি, বাস্তব কিছু নেই—এই সাম্নে বালির পাড়, ওই যে সমুদ্দুর ঠিক যেন ছবির মত আমার চোখে লাগ্ছে, এই যে তুমি বসে' আছ, ওই যে লোকজন চলেছে, সব যেন ছবির মত ভেসে চলেছে—ওই যে খোকার ফোটোটা আর এই যে বাইরের ঘর-বাড়ী জিনিষ পত্তর লোকজন আমি কোন তফাৎ বুঝ্তে পারিনে—সব ছায়াবাজীর মত মনে হয়—মাঝে-মাঝে আমি নিজের গায়ে চিম্‌টি কেটে দেখি সত্যি আমি আছি কি না—ফাঁকা সব ফাঁকা, এই ঘর, এই মন, এই আকাশ, সব ফাঁকা, তার মধ্যে সবাই ছায়ার মত ঘুরছি—তোমার কি এরকম মনে হয়—

সত্যিইরে ফাঁকি সব ফাঁকি, আমি মিথ্যা দিয়ে একটু সুখস্বর্গ তোর জন্যে রচনা কর্‌ছিলুম—কিন্তু ফাঁকি দিয়ে—ওরে—

তুমি কেঁদো না দাদামশাই, আমি জানি, আমি ঠাকুরপোর চিঠি পড়েছি!

দাদামশাইয়ের সমস্ত দেহ ঝিম্‌ঝিম করিয়া উঠিল, তিনি চারিদিকে অন্ধকার দেখিলেন। দুই চোখ দিয়া টস্‌টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

তুমি কাঁদছ, কিন্তু আমার চোখে ত জল আসে না দাদামশাই, আমার কাছে সব মায়া, মিথ্যা মনে হচ্ছে, কে এল কে না এল, কাকে দেখ্‌লুম, কাকে দেখ্‌লুম না, সব মিথ্যা—এ-হাসি মিথ্যা, এ-কান্না মিথ্যা, এ-সুখ মিথ্যা, এ-বেদনা মিথ্যা, সমস্ত সংসার যে ফাঁকি—তুমি কেঁদো না দাদু—ওঃ!—উঃ!—

সুধার চোখে অশ্রু উৎসারিত হইয়া উঠিল না বটে, কিন্তু কাশির বেগ আসিল এবং বুক হইতে চাপ-চাপ রক্ত উঠিতে লাগিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে, আকাশে কয়েকটি তারা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুধা বারান্দা হইতে উঠিয়া ঘরে চুপ করিয়া বিছানায় শুইয়াছিল।

সহসা সে বলিয়া উঠিল, দাদামশাই, তুমি ভেবো না, তারা আস্‌বে, খোকার আসার সময় কাছে আস্‌ছে আমি বুঝতে পার্‌ছি, আস্‌ছে তারা—

দাদামশাই দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

আচ্ছা, সবই যদি মিথ্যা হয় ত ঠাকুরপোর ও-চিঠিও ত মিথ্যা, তবে খোকা আস্‌বে না কেন? মাঝে-মাঝে অন্ধকার দেওয়ালের গায়ে আমি কি দেখতে পাই জান?—খোকার কাপড়, জামা, খেলনা, বাসন—তার ইঞ্জিন-গাড়ীটা একনিমিষের জন্য দেওয়ালের গা দিয়ে চলে' কোথায় অন্ধকারে পাড়ি দিলে—ওই তার পদ্মকাটা রেকাবখানা, দেওয়াল দিয়ে গড়িয়ে পড়্‌ল—তার দুধের বাটি তার সন্ধানে ঘুরে' বেড়াচ্ছে—ওরে বাছা—

সুধা, চুপ কর!

চুপ করব কি, আমি যে শুন্‌তে পাচ্ছি, সে আস্‌ছে—উনিও আস্‌ছেন—আস্‌বেন তিনি—তখন হয়ত আমার জ্ঞান থাক্‌বে না, তখন হয়ত আমি তাঁকে চিন্‌তে পারব না, কিন্তু তাঁর পায়ের ধূলো একটু আমার মাথায় দিও।

রাত্রি আরও গভীর হইয়াছে, আকাশ তারায়-তারায় ভরিয়া গিয়াছে; মৃদু চাপা আর্ত্তনাদের মত সমুদ্রের ডাক বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে।

না দাদামশাই, আমার কোন দুঃখ নেই, কারুর

ওপর আমার রাগ নেই, তোমার কাছে আজীবন যে স্নেহ পেয়েছি, তা' ত ফাঁকি নয়; আমার যাবার সময় আস্‌ছে, কিন্তু তোমাকে আমি ছাড়্‌ব না—আর-জন্মে তুমি নিশ্চয় আমার ছেলে হয়ে জন্মাবে—তুমি আর ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারবে না—

না, মা তোকে আমি ফাঁকি দেবো না—

হাঁ, দাদামশাই, এজন্মে তুমি আমার যা করেছ তার কিছু আমি শোধ দেবো, ছেলেবেলায় কবে যে বাপ-মা হারিয়েছি কিন্তু তাঁদের অভাব কোনদিন আমায় বুঝ্‌তে দাওনি—এবার তোমাকে আমি বুকে করে' মানুষ করব!

হাঁ, মা, আমাকে তুই ছাড়িস্‌নে—তুইও যদি যাস্‌ ত আমাকে নিয়ে চল্‌।

কিন্তু তুমি ভাব্‌ছ দাদামশাই, আমি মিথ্যে বল্‌ছি—না, খোকা আস্‌ছে, আমি যে দেখ্‌তে পাচ্ছি, সেই ছোট ঘরের কোণে ম্লান প্রদীপের আলো, ময়লা বিছানায় সে এতক্ষণ ছট্‌ফট্‌ করছিল, ঠাকুর-পো তাকে কোলে করে' বসেছিল—সে কাঁদ্‌ছিল, আমার জন্যে গুমরে মর্‌ছিল—তার কান্না থাম্‌ল, হৃদয়ের বেদনা শেষ হ'ল, এবার সে যাত্রা করেছে—

সুধা!

হাঁ, এবার আমাকে তৈরী হ'তে হবে তার জন্যে, তার মোজাটা আমার হাতে দাও ত, কিন্তু ঝিনুক, তুমি কিছু ঝিনুক কুড়িয়ে নিয়ে এস—ঝিনুক নিয়ে আমার সঙ্গে খেলা করবে—

মা!

কার সঙ্গে সে আস্‌ছে জান, সে মিথ্যা নয়, সে ফাঁকি নয়, সে মৃত্যু, সে স্বয়ং যম।

বৌদি!

দেখ সুধা কে এসেছে।

কে? মা, যাই মা, একটু দাঁড়াও, এখনও যে খোকা—

বৌদি! বৌদি কেমন আছেন দাদামশাই?

ও ত আজ সন্ধ্যে থেকে ভুল বক্‌ছে, জ্ঞান নেই। খোকা কৈ?

খোকা ত নেই দাদামশাই, তাঁকে বাঁচাতে পার্‌লুম না, তাই ছুটে' এলুম বৌদিকে যদি বাঁচাতে পারি।

তোমার মা আস্‌তে দিলেন?

মাকে বলে' এসেছি, মা, তোমাদের আমায় তাড়াতে হবে না, আমি তোমাদের ছেড়ে চল্‌লুম।

ওগো, কি মদের গন্ধ তোমার গায়ে, কত মদ খাও তুমি—উঃ, কেমন জ্বর-জ্বর লাগ্‌ছে, কত বাসন মাজ্‌ব—

ভুল বক্‌ছে—

ভুল, ভুল সব ভুল—ওগো, চল্‌লে, কটা রাত হবে—শরীরে যে কিছু নেই তোমার—আজ নাই বা গেলে—

বৌদি, আমি এসেছি—

এসেছিস, আয়, আয় বাছা, কোলে আয়—তোর মা তোর জন্যে মরতে পার্‌ছে না—উঃ—উঃ—ওঃ—

প্রবল কাশির বেগ আসিল। রক্তবমন করিয়া সুধা বিছানায় লুটাইয়া পড়িয়া দীর্ঘশ্বাস টানিতে লাগিল।

অকূল অন্ধকারে সাগর হইতে ঝোড়ো বাতাসে ঘরের আলোর শিখা কাঁপিতে লাগিল, দাদামশাইয়ের চোখে সমস্ত সংসার অন্ধকার ফাঁকি মনে হইল, তিমিরাবগুণ্ঠিতা রহস্যময়ী স্তব্ধ স্নিগ্ধ রাত্রির মত মৃত্যু নিঃশব্দচরণে ঘরে প্রবেশ করিল।

কর্ণ

শ্রী প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

[কর্ণের জীবন আগাগোড়া ব্যর্থতায় ভরা। অর্জ্জুনের শরে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে কর্ণ নিপতিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে জানান যে, কর্ণ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ইহাতে শোক-বিহ্বল হইয়া অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ কর্ণের মাথা আপনার কোলে তুলিয়া লইয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে থাকেন। অর্জ্জুনের কোলে কর্ণ বিলাপ করিতেছেন।]

কর্ণ

কে রে? কার স্পর্শ পাই?—দুর্য্যোধন? দুর্য্যোধন বুঝি!
এস ভাই, কর্ণ হত প্রাণপণে তব তরে যুঝি'!
এস সখা! এস মিত্র! লহ শেষ বিদায় আমার!

অর্জ্জুন

দুর্য্যোধন নহি ভাই, আমি পার্থ অনুজ তোমার।

কর্ণ

এঁ্যা! এঁ্যা! পার্থ!—দেখি দেখি—বটে ত অর্জ্জুন!
কি সংবাদ চিরদ্বন্দ্বী? শত্রু তব রিক্ত-ধনু-তূণ
মৃতপ্রায়! আর কেন?

অর্জ্জুন

ক্ষমা কর মোরে, সহোদর;
জ্যেষ্ঠ মোর, ভ্রাতা মোর, অপরাধ করেছি বিস্তর।

কর্ণ

সহোদর! জ্যেষ্ঠ তব! শত্রুজনে এ কি সম্ভাষণ!
তুমি অরি, আমি অরি,—এই ভাই মোদের বন্ধন।
জ্যেষ্ঠ আমি? জ্যেষ্ঠ বটে! আজ প্রাতে শুনিনু তাহাই;
তুমি আমি সহোদর—সিংহে ব্যাঘ্রে,—শুনিনু বৃথাই।
আজ প্রাতে, আগে নয়, শুনিয়াছি তোমারই জননী
আমার জননী সে, জ্যেষ্ঠ আমি; ধন্য মনে গণি।
চিরদ্বেষী, চিরদ্বন্দ্বী, চিরঅরি সর্প ও নকুল
এক গর্ভ হ'তে এল,—ভুল ভাই, বিধাতার ভুল!
কর্ণ অধিরথ সুত অবজ্ঞাত,—সেই ছিল বেশ;
অরি-হাতে হ'নু হত সেই ভেবে মুছে যেত ক্লেশ।
বড় ব্যথা, বড় ক্লেশ! পদ্মাবতী! বৃষকেতু নাই?

অর্জ্জুন

ভাই, ভাই, কেঁদো নাকো, ধৈর্য্য ধর, শান্ত হও ভাই!

কর্ণ

শান্ত হব, ভেবো নাকো; ঐ হোথা ডুবে দিন-স্বামী
তপন জনক মোর চিরারাধ্য!—যাই পিতা আমি!
শান্ত হব, যাব ভাই, মহীতলে তুমি রবে বীর
দ্বন্দ্বীহীন দম্ভী দৃপ্ত!—মৃত্যু মোর নহে যে সুস্থির!
না, না, ভাই, ক্রোধ নাই, দ্বেষ নাই, হিংসা নাই আর,
আমি তব জ্যেষ্ঠ ভাই, তব শুভ ইচ্ছি বার বার।
মৃত্যু আসে, শান্তি আসে, জানি ভাই মুদিব নয়ন,
দু'টি কথা বলে' যাই দু'টি কথা—হৃদয়-বেদন!

অর্জ্জুন

ব্যথিও না আপনারে, ছাড় খেদ, ছাড় সহোদর!

কর্ণ

খেদ ভাই, খেদ বটে, বড় খেদ, কহি পর-পর,—
বড় ব্যথা, বড় দুখ জমে' আছে, ঢেকে আছে বুক;
পার্থ ধীর, ভ্রাতা মোর, তব পাশে নামাই সে দুখ।—
যে ব্যথা বলিনি কারে সে ব্যথা আজিকে ব'লে যাই,
ধরণী দিল যে ব্যথা, ধরণীতে রেখে যেতে চাই।
পার্থ ভাই, ভেবে দেখ—অবহেলা, ঘৃণা, অপমান
শৈশব হইতে পেনু নিতি আমি মানবের দান,—
ব্যর্থতা বিপুল শুধু পদে-পদে নিঠুর ব্যর্থতা;
কীর্ত্তি-শৈলে উঠি—পড়ি, ঠেলে পদ গুপ্ত পিচ্ছিলতা।
শৈশবে ত্যজিলা মাতা লজ্জায় গোপনে অবজ্ঞায়।
কৈশোরে যখন প্রাণ মুঞ্জরিল বীরত্ব-ব্যথায়
অস্ত্র-গুরু দ্রোণ-পাশে মাগিলাম অস্ত্রের শিক্ষণ,
দিলা গুরু প্রত্যাখ্যান, রাধা-সুতে ফিরাল বদন।
গেনু জামদগ্ন্য-পাশে—অস্ত্রশিক্ষা লভিনু অপার;
ক্ষত্র নহি জানি' গুরু দিলা শাপ, দিলা তিরস্কার,
শাপ দিলা—দ্বন্দ্বীমুখে ব্যর্থ হবে তোর বাণ-বল।
দুর্জ্জয় এ চিত্তে তবু কোন ব্যথা করেনি দুর্ব্বল।
দুর্ব্বার এ বীর্য্য-তেজ আপনাতে সম্বরিতে নারি
ছুটে' গেছি দম্ভী দৃপ্ত—যে-দিন নিপুণ অস্ত্রধারী

জিনিলে সবারে তুমি পরীক্ষায় করি' সবে ম্লান,
আমি প্রতিদ্বন্দ্বী তব গেনু সেথা, বীর্য্য-অভিমান
ফোলে বক্ষে ; অধিরথ-সুত জেনে দিলা সবে গ্লানি,
দুর্য্যোধন নিজগুণে হীন কর্ণে করি' দিলা মানী ;
অগ্রসরি' গেনু আমি দেখাইতে অস্ত্রের কৌশল,
বার্ত্তা এল—কুন্তী-পীড়া, সঙ্গে ভঙ্গ হ'ল সভাস্থল !
ব্যর্থ শিক্ষা অভিলাষ, ব্যর্থ আশা, পেনু বড় ক্ষোভ !
বড় ব্যথা, আজো বাজে সমাজের অবিচার-কোপ !

অর্জ্জুন

থামো ভাই, থামো, থামো, গত দুঃখ গত হ'য়ে যাক ।

কর্ণ

গত দুঃখ গত হবে । ব্যথা তার থাক ভাই থাক,
করুণার তরে নয়,—কেবল কর্ণের পরিচয়—
ভাগ্য-সনে দ্বন্দ্ব তার, ব্যর্থতারে দিতে পরাজয় ।
আরো আছে—আরো ব্যথা, শোনো পার্থ, অন্তর-যাতনা,
দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে হাসি পেল হেরি' বীরপনা
বীর্য্যহীন ক্ষত্রিয়ের, লক্ষ্যভেদে হনু অগ্রসর,
দ্রৌপদী লাঞ্ছিল মোরে, অধিরথ-সুতে নাহি বর
বরিবে সে কভু,—ব্যর্থকাম, ব্যর্থশক্তি ব্যর্থ-আশ,
অপমানে অবজ্ঞায় পুড়ে' ম'ল উচ্চ অভিলাষ!—
পিঞ্জরে আবদ্ধ ব্যাঘ্র নিষ্ফল আক্রোশে যথা মরে
সম্মুখে হেরিয়া তার মুক্তিনাশী অতিক্ষুদ্র নরে !

অর্জ্জুন

সে দুঃখের ভাবে, ভাই, বাড়ায়ো না আজিকার ভার ;
মানুষ ভাগ্যের শিশু, ক্রীড়নক দুঃখ-যাতনার ।

কর্ণ

আজি প্রাতে, শোনো ভাই, তপনে বন্দিয়া প্রাণ ভরি'
প্রতিজ্ঞা করিনু দৃঢ়—দৃঢ় বলে আজ মারি' অরি
দর্পী পার্থে, নিষ্কণ্টক করি পথ ; কর্ণ-জয়-গান
ধ্বনিয়া রণিয়া আজ দিকে-দিকে বাজাই বিষাণ !
সহসা কুন্তীরে হেরি' নতমুখী, মুখে মাখা ব্যথা,
স্নেহশীলা ধীরে ধীরে জানাইলা সে বজ্র-বারতা
আমি কর্ণ পুত্র তাঁর !—নিমেষে টুটিল অন্ধকার !
চিত্তে মোর একসাথে বেজে গেল হর্ষ, হাহাকার !
দুর্জ্জয় জয়ের বহ্নি ম্লান হ'ল, নিবে নিবে যায়,
এ নব বিচিত্র সুখে, জননীর স্নেহের বাত্যায় ;
দুর্দ্দম বাসনা মোর অরিন্দম প্রতিজ্ঞা দুর্ব্বার
মন্ত্রবদ্ধ সর্প-সম ব্যর্থ রোষে ফোলে অনিবার ।
চলে' আসি রণাঙ্গনে ;—ভিক্ষা-আশে আসিল ব্রাহ্মণ,
মাগিল কঠোর ভিক্ষা, মাগিল সে জীবনের ধন—
শেষের সহায় মোর আত্মরক্ষী কবচ-কুণ্ডল,
দিনু তাহা ; আশা শেষ, দিনু ভাই জীবন-সম্বল !
তবু হেরিয়াছ, ভাই, এ কর্ণের অক্লান্ত প্রতাপ,
প্রচণ্ড প্রবল শক্তি ;—হায়, হায়, মৃত্তিকার চাপ
গ্রাসিল রথের চক্রে, আনায়ে পড়িল সিংহ বাঁধা !
সনাতন সেই দুঃখ, সনাতন ব্যর্থতার বাধা
পদে পদে এল কাছে, পদে পদে পরা'ল শৃঙ্খল ;
আমি বিধাতার শাপ, কীর্ত্তিহীন, জীবন নিষ্ফল !
জননী ভাসায়ে দিল অবজ্ঞায়,—ভেসে ভেসে আসি
অবজ্ঞা-উপলে পিষ্ট, স্নেহহীন, ব্যর্থ উচ্চ-আশী ।
পুত্র হ'য়ে মাতৃত্যক্ত, বীর হ'য়ে সুনির্ম্মল খ্যাতি
লভিনিক, চিত্ত-আশা চিত্তে লয়, গর্ব্ব আত্মঘাতী ।
আমি এক ধূমকেতু প্রয়োজনহীন আলো লয়ে'
আকাশের ব্যর্থ সৃষ্টি তপনে চন্দ্রেতে যবে বহে
অজস্র আলোর স্রোত তারায় তারায় । তুমি ভাই,
বীর বটে বংশগর্ব্বী, শুভ্র-খ্যাতি, কোনো গ্লানি নাই ।
জয়ী তুমি, তৃপ্ত তুমি, বীরত্বের দেখালে ব্যঞ্জনা,
আমি পেনু অনাদর, অভিশাপ, ব্যর্থতা, গঞ্জনা !
হীনতা, দীনতা, লজ্জা উচ্চ শির করিয়াছে নত ;
জ্যেষ্ঠ বটে শ্রেষ্ঠ নই, কীর্ত্তি নাই বলিবার মত !
কর্ণ নাম মুছে যাক্, খেদ নাই ;—শুধু অনুরোধ,
তুমি মনে রেখো মোর এ লাঞ্ছনা, অপমান-বোধ ।
শত্রু নয়, দ্বন্দ্বী নয়, ভ্রাতা বলে' মনে দিও ঠাঁই ;
ধরণীতে যা হ'ল না স্বর্গে হবে,—রব ভাই ভাই ।
আর নয়, বড় ব্যথা, যাই ভাই, ভেঙে যায় বুক !
পার্থ ভাই, আশীর্ব্বাদ করি তুমি লভ চিরসুখ ।

সুইস্ নর-নারীর ধরণ-ধারণ

শ্রী বিনয়কুমার সরকার, এম্-এ

ভারতে আমরা শুনিয়াছি যে, সুইস্ নর-নারীরা প্রত্যেকে তিন-তিনটা ভাষায় ওস্তাদ। জুরিখের একজন বাস্তুশিল্পী-এঞ্জিনিয়ারের পত্নী বলিতেছেন:—"কথাটা কাগজে-কলমে ঠিক। ইস্কুলে আমরা ফরাসী, জার্ম্মান্,

লুগানো হ্রদের আবেষ্টন

এবং ইতালিয়ান্ এই তিনটাই শিখিতে বাধ্য। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু নিজ মাতৃ-ভাষা ছাড়া অপর দুইটা আমাদের দখলে আসে না।" ইনি নিজে জার্ম্মান্-ভাষী পিতামাতার কন্যা। ফরাসী জানেন কিছু-কিছু,—ইতালিয়ান্ একদম না।

ফরাসী-সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের এক নগরের নাম ফ্রাইবুর। এই-খানে একটা বিশ্ববিদ্যালয় আছে। ক্যাথলিক পাদ্রীদের প্রভাব এই পাঠশালায়

হোটেল হেলহ্বেট্‌সিয়া—কাট্টাক্রোলা

প্যারাদিলো

অত্যধিক। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের পত্নী শীত কাটাইতে আসিয়াছেন ইতালিয়ান্ সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে। ইনি বলিতেছেন :— "জার্ম্মান্ শিখিবার জন্য পাঠশালায় ত ব্যবস্থা ছিলই। অধিকন্তু পরে রিয়েনা সহরের নিকটবর্ত্তী এক অতি প্রসিদ্ধ অষ্ট্রিয়ান্ বালিকা-বিদ্যালয়ে গিয়া জার্ম্মান্ শিখিয়া আসিয়াছি।" তথাপি ইঁহার সঙ্গে জার্ম্মানে কথা বলিয়া জবাব পাইতেছি ফরাসীতে!

(২)

"হোটেল হেল্‌ভেট্‌সিয়ার" আশে-পাশে যে দু-চারঘর সুইস্ বাসিন্দা দেখিতেছি—তাহারা সকলেই ইতালিয়ান্। কাষ্টাঞোলা, কাসারাতে, কুভিস্‌লিয়ানা ইত্যাদি সকল পল্লীই ইতালিয়ান্। এখানে রাস্তায়-ঘাটে যে-সব গাড়োয়ান্, মজুর, চাষী, কুলী ইত্যাদির সঙ্গে দেখা হয় তাহারা ফরাসীও বুঝে না জার্ম্মান্‌ও বুঝে না।

পাঠশালার ছাত্রছাত্রীর পাল প্রায়ই চোখে পড়ে। ইহারা দেখা হইলেই "বোন্ জোর্নো", 'বেনো সেরা" ইত্যাদি বলিয়া সম্ভাষণ করে।

লুৎসান্‌-তালের য়ে.ডল-গায়ক পরিবার

টেসিনের গির্জ্জা—মোকোতে পল্লীতে

ফরাসী দুই-ই জানে। ইতালিয়ান্-জানা সুইস্ গুন্‌তিতে খুবই কম।

(৩)

এইসব দেখিয়া-শুনিয়া মনে হইতেছে যে, উচ্চ-শিক্ষিত সুইস্‌রা উচ্চশিক্ষিত ভারতবাসীদের চেয়ে ভাষা হিসাবে উন্নত নয়। আমরা নিজ মাতৃ-ভাষার উপরে একটা দ্বিতীয় ভাষা (বর্ত্তমানে ইংরেজি) ইস্তামাল করিতে অভ্যস্ত। এইধরণেই ফরাসী-সুইস্‌রাও জার্ম্মান্ শিখে দ্বিতীয়-ভাষা-স্বরূপ। জার্ম্মান্ সুইস্‌দের পক্ষে ফরাসী দ্বিতীয় ভাষা। ইতালীয়-সুইস্‌রা হয় ফরাসী না হয় জার্ম্মান্ শিখে। কিন্তু একটা তৃতীয় ভাষা উচ্চশিক্ষিত সুইস্‌দেরও দখল নাই। নিম্ন- শিক্ষিতদের পক্ষে এমন কি একটা দ্বিতীয় ভাষাও অনেক সময়ে বিরল।

একটা তৃতীয় ভাষায় ওস্তাদ হওয়া সোজা কথা নয়। সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের মতন একটা ছোট দেশেও আইনের জোরে তিনটা ভাষাকে প্রত্যেক নরনারীর সমান দখলে রাখিবার ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয় নাই।

ইতালিয়ান্ ভাষায় দিনের বেলায় ও সন্ধ্যা-বেলায় এইরূপই সম্ভাষণ-রীতি।

বাজেল শহরের "শোআইট্‌সার ব্যাঙ্ক্-ফারাইন্" নামক প্রসিদ্ধ সুইস্ ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীর সঙ্গে আলাপ হইল। ইনি ইতালিয়ান্ জানেন না। উচ্চশিক্ষিত শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, ব্যবসাদার, চিকিৎসক ইত্যাদি শ্রেণীর লোকেরা অনেকেই জার্ম্মান্ এবং

কাষ্টাঞোলা

প্রত্যেক দেশেই দু'-চার-দশ জন লোক বিদেশী ব্যবসার জন্য, পররাষ্ট্রনীতির কার্‌বার সামলাইবার জন্য, উচ্চতম জ্ঞান-বিজ্ঞানে গবেষণা চালাইবার জন্য তিনচারটা ভাষা আয়ত্ত করিয়া থাকে। কিন্তু তাহারাও অধিকাংশ স্থলেই মাতৃভাষা এবং একটা দ্বিতীয় ভাষাই আটপৌরে কাজ চালাইবার জন্য ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত।

সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের হোটেল-ওয়ালারা প্রত্যেকেই চার-পাঁচটা ভাষায় কথা বলিতে পারে। স্বদেশী ভাষা তিনটা ছাড়া ইংরেজিতে দখল না থাকিলে ইহাদের কাজ চলে না। সুইস্-সমাজে হোটেল চালানো এক অতি বড় ব্যবসা। এই ব্যবসায় পাকা হইয়া উঠিবার জন্য যুবারা হোটেল-বিদ্যালয়ে তিন-চার বৎসর কাটাইয়া থাকে। এই পাঠশালায় অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ভাষার দিকে নজর দেওয়া হয় খুব বেশী।

(৪)

সুইস্ আল্পস্ স্বাস্থ্যের খনিবিশেষ। সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের প্রত্যেক পল্লীই স্বাস্থ্য-নিকেতন। কি হ্রদের কিনারায়, কি পাহাড়ের কোলে, কি বনের ফাঁকে-ফাঁকে, কি পর্ব্বতচূড়ায় সর্ব্বত্রই দেশীবিদেশী লোকের ভিড়। ইহারা হয় রোগ-চিকিৎসার জন্য না হয় ব্যারাম সারিবার পর জলবায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য সুইস্-উপত্যকায় অতিথি হয়।

কাজেই "সানাটেরিয়ুম" আরোগ্যশালা, হাসপাতাল, পান্থনিবাস, "গাষ্ট হোফ্" (অতিথি-শালা,) "পাসিয়ঁ" হোটেল ইত্যাদির সংখ্যা হাজার-হাজার। যার যেমন পয়সার জোর সে তেমন বসবাসের আড্ডা ঢুঁড়িয়া থাকে।

সাঙ্ক্‌ট মোরিস্, ডাভোস, আরোজা ইত্যাদি পল্লী বা শহর উঁচু পাহাড়ের ডগায় বা "তালে" (অর্থাৎ উপত্যকায়) অবস্থিত। শীতকালের বাঘা শীতের সময় এখানকার বায়ু খট্‌খটে শুক্‌না। চারিদিক্ বরফে সাদা। আবার জুন জুলাই আগষ্ট মাসের প্রচণ্ড গরমের সময় এইসকল জনপদই আরামদায়ক ঠাণ্ডা। এই কারণে এই দুই ঋতুতে সাঙ্ক্‌ট মোরিস্ ইত্যাদি নগর স্বাস্থ্যান্বেষীদের মক্কায় পরিণত হয়।

লুইনির আঁকা "মা মরী"—লুগানোর

গ্রীষ্মের পূর্ব্বে বসন্ত এবং কড়া শীতের পূর্ব্বে শরৎ বা হেমন্ত ইয়োরামেরিকার ঋতু-বিধান। এই দুই ঋতুতে আরাম-ভোগ করিতে হইলে লোকেরা আসে লুসানো, লোকার্নো মন্ত্রো ইত্যাদি শহরের "কুরর্ট্" বা স্বাস্থ্য-নিকেতনে। এইসকল শহর ইতালীয় ও ফরাসী-সুইট্সার্ল্যাণ্ডের হোটেল-কেন্দ্র।

(৫)

"কুরর্ট্" বা স্বাস্থ্যজনপদগুলা সুইট্সার্ল্যাণ্ডের হোটেল পাঁসিয়ঁ-কেন্দ্র সন্দেহ নাই। সঙ্গে-সঙ্গে চিকিৎসালয়, হাঁসপাতাল, আরোগ্যশালা ইত্যাদির কেন্দ্র-হিসাবেও এইসব পল্লী-নগর সুইস্ নরনারীর ব্যবসাস্থল। সুতরাং রেল কোম্পানীও এইসকল কেন্দ্রে পয়সা রোজগারের পথ ঢুঁড়িয়া পায়।

নেহাৎ যাহারা মরণাপন্ন রোগী তাহারা "সানাটোরিয়ুমে" শয্যাগত থাকে। কিন্তু আর-সকল লোক চব্বিশ ঘণ্টা নানাপ্রকার খেলা-

টেসিনের শিকারী

টেসিন-ক্যাণ্টনের "জাতীয়" পোষাক

ধূলা এবং আমোদপ্রমোদের সুযোগ পায়। শীত-কালে বরফের উপর নাচাকুদা দৌড়লাফ করার জন্য গণ্ডা-গণ্ডা খেলা আবিষ্কৃত হইয়াছে। "স্কি" চালানো এক-প্রকার মারাত্মক আমোদজনক খেলা। এই খেলা বহু দূরদেশ হইতে নরনারীদিগকে ডাহ্বোস্ ইত্যাদি কেন্দ্রে টানিয়া আনে।

অন্যান্য ঋতুর জন্য ও সময়োপযোগী সকলপ্রকার স্বাস্থ্যকর খেলার আয়োজন সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের সর্ব্বত্রই আছে। টেনিস্ গল্‌ফ্ ফুটবল ইত্যাদির ত কথাই নাই। তাহার উপর হ্রদে নৌকা বাওয়া, আর পাহাড়ে, বনে, জঙ্গলে শিকার করা ত আছেই। ঘরে বসিয়া থাকিবার জন্য কেহই "কুরর্টে" আসে না।

(৬)

খেলা-ধূলায় যোগ দেওয়া পয়সা-সাপেক্ষ, অধিকন্তু প্রত্যেক খেলার অনুরূপ পোষাক দরকার। তাহার জন্যও অনেক খরচ করিতে হয়। কাজেই একমাত্র পয়সাওয়ালা লোকেরাই স্বাস্থ্যান্বেষণের জন্য সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের হোটেলে পাসিয়নে অতিথি হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান যুগে শক্তি ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য নানা-প্রকার অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান উদ্ভাবিত হইয়াছে। কিন্তু ট্যাঁকে টাকা না থাকিলে রোগীর পক্ষে চিকিৎসা চালানো সম্ভব নয়, অথবা সুস্থ সবল হইবার জন্য খোলা মাঠে নানা-প্রকার দৌড়-ধাপের ব্যবস্থায় ভিড়িয়া যাওয়াও সাজে না।

আজকালকার বাজার-দর দুনিয়ার সর্ব্বত্রই চড়া। সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে ত বটেই। সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা হোটেলে কিম্বা পাঁসিয়নে বসবাস করিতে হইলে কোনো সুইস্ "কুরর্টে" ভারতীয় নয় টাকার কমে রোজ চলে না। ঘর-ভাড়া, এবং তিন-বেলা খাওয়ার খরচ ধরা হইল। মামুলি কাপড়-চোপড় ধোলাইও ইহার সামিল। খেলিতে যাওয়া, বেড়াইতে যাওয়া, গান শুনিতে যাওয়া অথবা নৌকায়, ষ্টীমারে, অটোমবিলে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে যাওয়া ইত্যাদি সবই আলাদা খরচের অন্তর্গত। তাহার উপর, যদি ডাক্তার ডাকিয়া ওষুধ-পথ্য করিতে হয় সেকথা স্বতন্ত্র। তবে কোনো শহরে পৌছিয়া এইধরণের একটা সস্তা হোটেল ঢুঁড়িয়া বাহির করিতেও গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয়। গরীবের জন্য ব্যবস্থা দুনিয়ার কুত্রাপি নাই।

প্রত্যেক "কুরর্টে"ই ছেলে-পুলেদের জন্য ইস্কুল আছে। "অতিথিরা" স্বাস্থ্যান্বেষী হইয়া আসিলে এই-সকল বিদ্যাপীঠে সন্তান-সন্ততিদিগকে পাঠাইয়া নিশ্চিত থাকিতে পারে।

(৭)

সুইস্ নর-নারী সকল তরফ হইতেই তাহাদের পাহাড়, বন, হ্রদ, উপত্যকাগুলাকে মানব-জীবনের শক্তি, স্বাস্থ্য, আনন্দ ও সৌন্দর্য্যের সেবায় লাগাইতে পারিয়াছে। ভারতে পাহাড়ের অভাব আছে কি? স্বাস্থ্যকর বন,

টেসিনের কিষাণদম্পতী

আজকাল একটু-আধটু করিয়া যাওয়া-আসা করিতেছে।

অধিকন্তু রেল-কোম্পানীর প্রভাবে ভারতের বহু অপরিচিত অথচ সৌন্দর্য্যময় জনপদে কুলী-মজুর ও কেরানীদের আড্ডা-হিসাবে অনেক পল্লী গড়িয়া উঠিয়াছে। এইসকল পল্লীর দিকেও স্বাস্থ্যান্বেষীরা ক্রমে-ক্রমে ঝুঁকিতেছে।

(৮)

কিন্তু ভারতীয় নর-নারী বর্ত্তমান যুগে কোন স্বাস্থ্য-কর নগরনির্ম্মাণ বা উপনিবেশস্থাপনের দিকে দৃষ্টি দিতে অগ্রসর হয় নাই। আজকাল যুবক ভারত স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিতেছে। খোলা হাওয়ায় খেলা-ধূলা, দরিয়ায়-সাগরে সাঁতার কাটা, অটোমবিলে, সাইকেলে অথবা পদব্রজে হাঁটিয়া শত শত মাইল যাওয়া ইত্যাদি সখ আমাদের জীবনে দেখা দিয়াছে।

ভারতীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনের সহচর করিবার দিকে এবং স্বাস্থ্য শক্তিকর সুযোগগুলাকে আটপৌরে খাওয়া-পরার আব-হাওয়ায় আনিয়া ফেলিবার দিকে আমাদের উপবন, সাগর, দরিয়ার অভাব আছে কি? কিন্তু আমরা কোথায়ও এখন পর্য্যন্ত খাঁটি "কুরর্ট" নামক শক্তি-স্বাস্থ্যের জনপদ গড়িয়া তুলিতে পারি নাই।

ইংরেজরা ভারতীয় পাহাড়গুলাকে নিজ দরকার-মত নিজ স্বাস্থ্য, বিলাস ও আমোদ-প্রমোদের কেন্দ্র তৈয়ারী করিয়া লইয়াছে। সেই-সকল কেন্দ্রে পয়সা-ওয়ালা ভারত-সন্তানেরা

টেসিনের গির্জ্জা—কাষ্টাগ্রোলায়
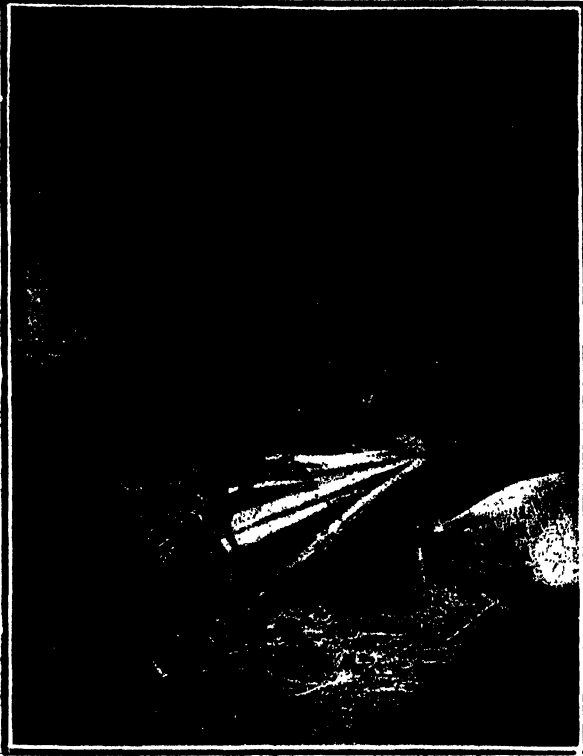
টেসিনের এক কুটীর-শিল্প

উৎসাহ ও অধ্যবসায় অল্পকালের ভিতরই প্রযুক্ত হইতে থাকিবে আশা করি। পল্লীসেবাই বলি আর প্রকৃতি-পূজাই বলি অথবা যৌবন-আন্দোলনই বলি সকলের সঙ্গেই শারীরিক শক্তির পীঠস্থানস্বরূপ "কুরর্ট"-গুলার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে।

মান্ধাতার আমলের তীর্থক্ষেত্রগুলায় ভারত-সন্তান স্বাস্থ্য-ভোগও করিয়া থাকে। যুবক ভারতকে এখন স্বাস্থ্যতীর্থের জন্যই কতকগুলা বিশিষ্ট কেন্দ্র গড়িয়া তুলিতে হইবে। বাপ-দাদারা যাহা করিয়া গিয়াছে একমাত্র তাহা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিলেই চলিবে না। ভারতীয় নর-নারীকে বর্ত্তমান যুগের স্বধর্ম্ম-মাফিক্ই জীবনের সাড়া প্রকটিত করিতে অভ্যস্ত হইতে হইবে। তাহা হইলেই দুনিয়া বুঝিবে যে ভারতেও জীবন-স্রোত চলিতেছে।

(৯)

ভারতের ভিন্ন-ভিন্ন জনপদ-সম্বন্ধে সচিত্র ভ্রমণ-বৃত্তান্ত আজকাল ভারতীয় পত্রিকার একটা বিশেষ অঙ্গ। ছুটির সময়, কংগ্রেসের সময়, সাহিত্য-সম্মিলনের সময় উচ্চশিক্ষিত ভারতসন্তান বিপুল মহাদেশের নানা নগর-পল্লীর প্রাকৃতিক ও সামাজিক ধরণ-ধারণগুলা দখলে আনিতেছেন।

আল্‌স্-পাহাড়ে গোসেবা
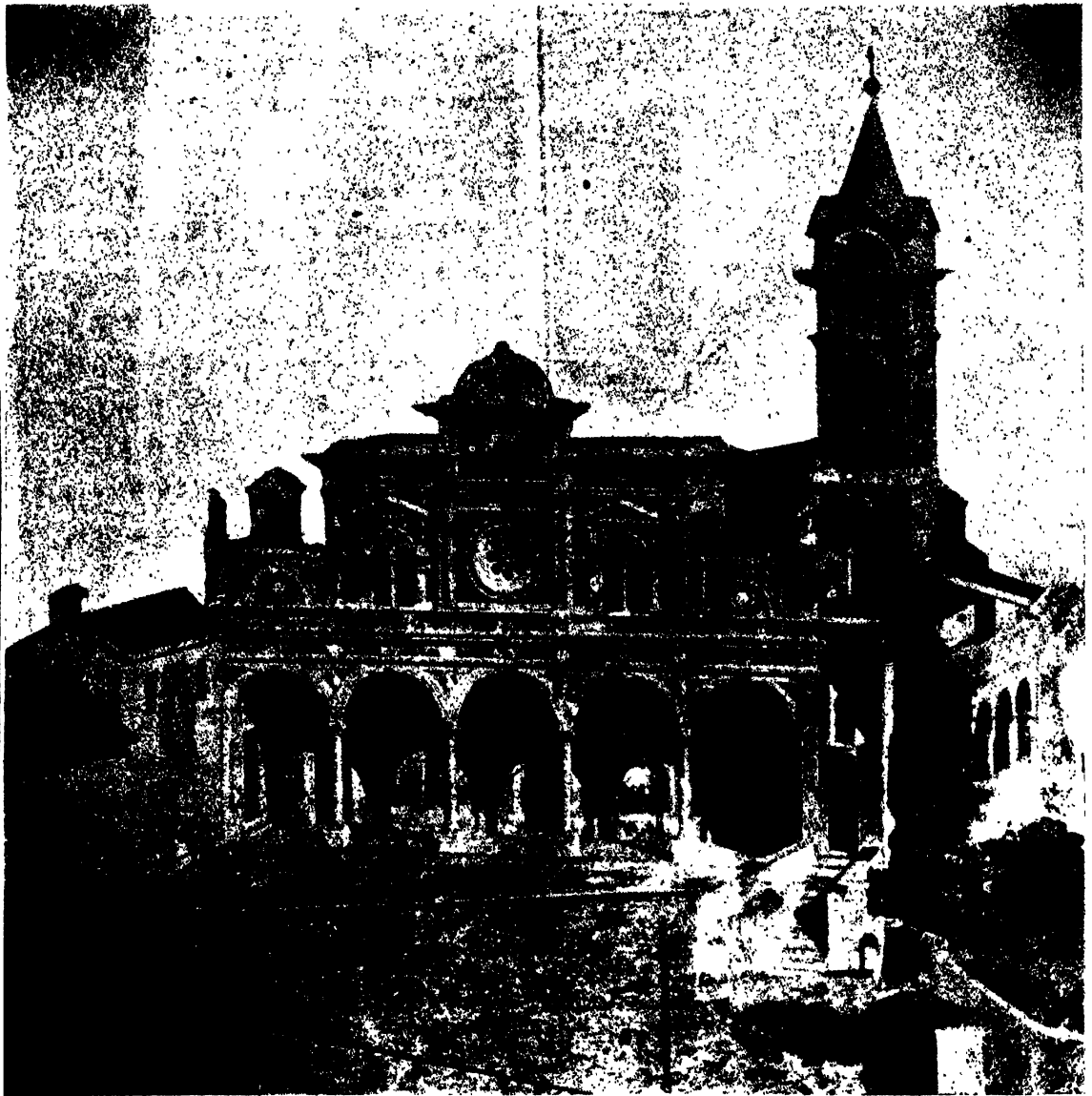
মাদোনা দেল সাসো—লোকানো।

এই হিসাবে বলিব, যুবক ভারতে প্রকৃতি-পূজার সূত্রপাত হইয়াছে। এই-সঙ্গে একটা অভাব মনে পড়িতেছে। ভারতীয় চিত্র-শিল্পীরা এখনো কোনো ভারতীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে নরনারীর চোখের সম্মুখে আনিয়া ধরিতে পারেন নাই। সুকুমার শিল্পের ওস্তাদ-গণের নিকট ভারতবাসী স্বদেশের সম্পদ্-বৈচিত্র্য-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার আশা রাখে। প্রাকৃতিক রসে ভরপূর কোনো উল্লেখ-যোগ্য ছবি ভারতীয় চিত্রকরের কার্য্যাবলীর ভিতর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

ভারতের উপত্যকা, বন-মাঠ, পাহাড়, দরিয়া, হ্রদ, ঝরণা আর সাগরকিনারাগুলাকে সাধারণ গৃহস্থের নিকট চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিবার আর-এক উপায় হইতেছে কবি ও ঔপন্যাসিকদের দৃশ্য-বর্ণনা। খাঁটি সৌন্দর্য্যময় আবেষ্টনের ভিতর বসিয়া তাহার খুঁটিনাটি
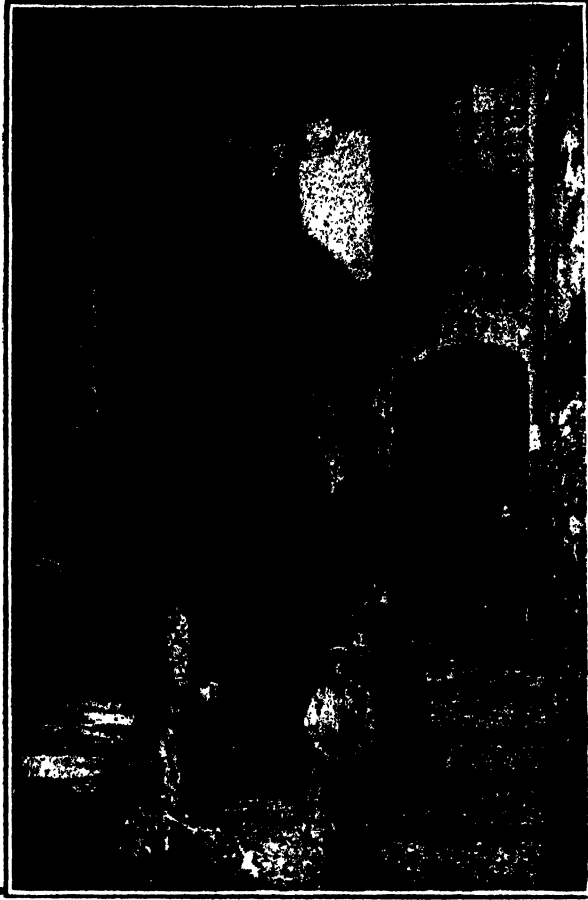
টেসিনের ইতালীয় পরিবার

সরসভাবে বিবৃত করিয়া যাইবার দায়িত্ব গদ্য ও পদ্য-সাহিত্যের নানা রচয়িতাদের ঘাড়ে রহিয়াছে।

তাঁহারা যদি নিজ নিজ কথাবস্তুগুলাকে প্রকৃতির রসে ভিজাইতে সমর্থ হন, তাহা হইলেই "প্রকৃতি-পূজা," নামক জিনিষটা সাধারণ্যে দাঁড়াইয়া যায়। এইদিকে নবীন ভারতের সাহিত্য-রসিকেরা যাহা কিছু করিয়াছেন তাহার দাম বেশী নয়। ভারতের অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য বাংলা বা হিন্দী সাহিত্যে প্রায় একরূপ অজানা রহিয়াছে। ভারতীয় সাহিত্য-স্রষ্টারা ভারতের কোন্ কোন্ জেলা, নগর, পাহাড়, দরিয়া বা পল্লীকে জনগণের নিকট প্রিয় করিয়া তুলিয়াছেন এই সূত্রে তাহার আলোচনা সুরু করিলে সাহিত্য-সমালোচকেরা একটা নূতন চিন্তাক্ষেত্র পাইবেন।

(১০)

জাপানে দেখিয়াছি পুরুষ নাপিতেরা কামায় স্ত্রীলোককে। ইতালিয়ান্-স্থইস্ মুল্লুকে পুরুষকে কামাইতেছে নাপিতানী। কাঠের জুতা পায়ে দিয়া স্ত্রীপুরুষেরা চলা-ফেরা করিতেছে। শীতকালে আঙ্গুরের ক্ষেতে কাজ নাই। তবে ঘরের ভিতর বেতের চুপ্ড়ী তৈয়ারী হইতেছে। পাহাড়ের আঁকা-বাঁকা পথে মাল-ঘাড়ে টেসিন্ নারীদের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়। হিমালয়ের ভুটিয়া-দৃশ্য মনে পড়ে।

টেসিনের পল্লীগুলা বড়ই বিচিত্র। একটা ঘরের ঘাড়ে আর-একটা ঘর উঠিয়াছে। লোকার্নোর নিকটবর্ত্তী ব্রিয়োনে গ্রামের অকথ্য দুর্গন্ধ স্থইট্সার্ল্যাণ্ডের কলঙ্ক। একজন শিক্ষয়িত্রী বলিতেছেন —"জার্ম্মান্ স্থইট্সার্ল্যাণ্ডের পল্লীতে এরূপ নোংরা দৃশ্য দেখিতে পাইবেন না।"

লুগানো হ্রদের এক অঞ্চলে একদম জলের উপর হইতে গান্দ্রিয়া গ্রাম উঠিয়াছে। এক-একটা বাড়ীর ঘাড়ে আর-একটা বাড়ী অবস্থিত। এই পল্লীটা চিত্র-শিল্পী ফোটোগ্রাফারদের চোখে বড়ই সুন্দর। বাহ্য রূপের তরফ হইতে বাস্তবিক ঘরসমাবেশটা মনোরম বটে, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখি, এখানে বসবাস অসম্ভব।

মোন্টে ব্রে পাহাড় আর সাঁ সাল্ভাতোরে পাহাড়, এই দুইটাই লুগানোর দুই অঞ্চলে জমকালো। দুইয়েই উঠিবার জন্য "ফুনিকোলেথার" আছে। অর্থাৎ রেলপথ উঠিয়াছে প্রায় সোজা খাড়া। হাঁটিয়া উঠিতে লাগে তিন-চার ঘণ্টা। পায়দলেই মোন্টে ব্রে দেখিয়া আসা গেল। পথে পড়িল রাখাল বালক। ইহারা ধেনু চরাইতেছে না, চরাইতেছে ছাগলের পাল।

(১১)

টেসিনের পল্লীগির্জ্জাগুলা গড়নে বিশেষত্ব-পূর্ণ লোকার্নোর "মাদোনা দেল্ সাস্সো" স্থইস্-সমাজে অতি প্রসিদ্ধ। ইয়োরোপের বাস্তু-রসিক এবং চিত্রশিল্পীরা এই মন্দিরের তারিফ করিয়া থাকেন।

গির্জ্জাহীন পল্লী একপ্রকার নাই বলিলেই চলে। গির্জ্জার মোহন্ত,পল্লীর কিষাণ, রাজমিস্ত্রী, মুচি, গোয়ালাদের উপর একছত্র শাসন-ভোগ করে। ক্যাথলিক নরনারীর চিন্তায় পুরুত্ ঠাকুর সাক্ষাৎ দেবতা বিশেষ। বার মাসে তের পার্ব্বণের ব্যবস্থা ইহাদের আধ্যাত্মিকতার মামুলিকতা।

লুগানো হ্রদের এক কিনারায় মোর্কোতে শহর বা পল্লী। কাষ্টাঞ্জোলা হইতে ষ্টীমারে চড়িয়া পল্লীটা দেখিয়া আসা টুরিষ্ট মাত্রের সখ। মন্দিরটা উল্লেখযোগ্য। লুগানো সহরের ভিতর নানা-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গির্জ্জা ত আছেই। অধিকন্তু টেসিনের খাঁটি স্বদেশী অর্থাৎ ইতালীয় গির্জ্জাও চোখে পড়ে।

মন্দিরগুলার ভিতরে ইতালীয় চিত্রকরদের আঁকা ছবি আছে, বলাই বাহুল্য। লুইনির আঁকা "মা মেরী" শিল্পীদের মহলে সুপরিচিত। হোটেল হেল্‌ভেট্‌সিয়াতে ঘরে বসিয়াই কাষ্টাঞ্জোলার গির্জ্জাটা চৌপর দিন-রাত দেখিতেছি। রবিবার সকালে আর দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর ঘণ্টা-ধ্বনি কানে প্রবেশ করে। আর রাস্তায় দেখি মন্দিরযাত্রী পল্লীবাসীদের সারি। ধর্ম্মের আওতা ক্যাথলিক-মহলে বেশী কি হিন্দু-মহলে বেশী ভাবিয়া-চিন্তিয়া বিচার করিবার বিষয়।

(১২)

"ফিও (ফুল), "ফিও" বলিয়া এক পাঁচছয় বৎসরের ইতালীয় বালিকা প্রায়ই আসে, হোটেলে বেগুনী ফুল বেচিতে। ইহার ভাই যায় স্কুলে, আর বাপ কাজ করে সড়কে রাজমিস্ত্রীর। হোটেলের অনতিদূরেই পাহাড়ের গায়ে উহাদের বাড়ী।

একদিন ইহার মার সঙ্গে সুখদুঃখের কথা হইল। শুনিলাম, "হোটেলওয়ালা আমাদিগকে বিপদে-আপদে সাহায্য করে। ইহার ছেলে-মেয়ের জামা-কাপড় পুরানো হইয়া গেলে আমার শিশুরা সেইসব পায়। দেখিতেছি, পাড়াপড়্‌শীদিগকে মনে রাখা ভারতীয় পল্লী-পঞ্চায়তেরই একচেটিয়া সদ্‌গুণ নয়।
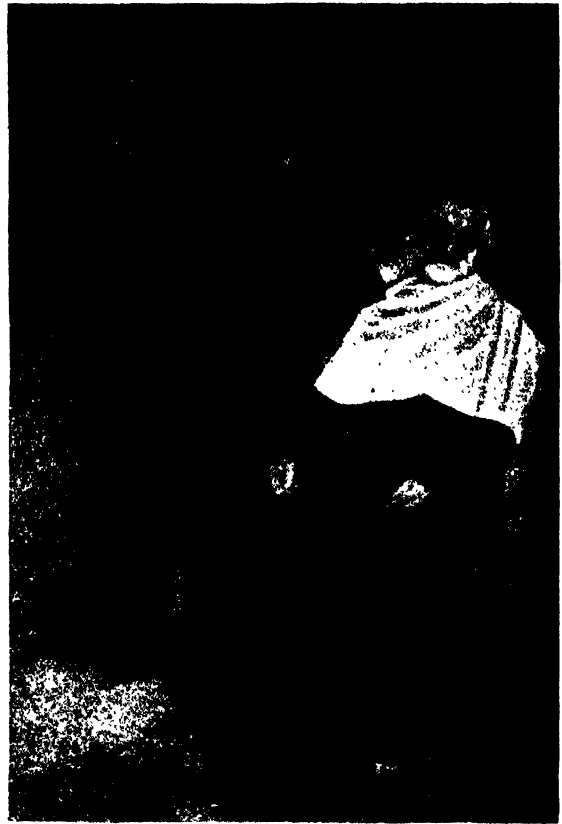
সুইস্ ইতালীয় নাপিতানী

এক ব্যবসায়ী তাহার স্ত্রীকে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য হোটেলে রাখিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া গেল। স্ত্রী, স্বামী ছাড়িয়া একলা থাকিতে রাজি নয়। কান্নাকাটি চলিতেছে দিনরাত। লুগানো হইতে বাজেল পর্য্যন্ত টেলিফোনে কথাবার্ত্তা হয় প্রতিদিন। ছেলেপুলেদেরকে ফেলিয়া দূরদেশে নিজ স্বাস্থ্যসুখ ভোগ করা এই সুইস্-নারীর চিন্তায় বিলাস ও পাপবিশেষ। ভারতীয় নারীদের ভিতর যাঁহারা অতি সতী তাঁহারা এই সুইস্-ব্যবসাদারের পত্নীকে হারাইতে পারিবেন কি ?

আমাদের দেশে যেমন সীতা, সাবিত্রী ইত্যাদি পতি-ব্রতার কাহিনী আছে, সেইধরণের কাহিনী ইয়োরোপের সাহিত্যে গণ্ডা-গণ্ডা শুনিতেছি। জার্ম্মান্ নরনারীরা সেই-সকল আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই জীবন গড়িয়া তুলিতে শিখে।

আঙুর-ক্ষেতে কিষাণ-নারী

(১৩)

শীতকালে সূর্য্যের রোদ খাওয়া ইয়োরোপীয় নগর-জীবনে একপ্রকার অসম্ভব। যে-সকল ঘরে রোদ আসে তাহার ভাড়া অত্যধিক। জার্মানিতে যতদিন ছিলাম ততদিন কোনো ঘরে রোদ দেখি নাই। কাজেই কান্টাঞোলার "হেল্‌ভেৎসিয়ায়" ডিসেম্বর-জানুয়ারিতেও সাত-আট ঘণ্টা রোদে পোড়া হইয়া ভাবিতেছি, মানুষের জীবনে সূর্য্যেরও দাম আছে।

এক মুচি এই হোটেলে অতিথি। উনি বলিতেছেন :—"আমি যখন ব্যবসা সুরু করি, তখন হাতে একটা আধ্‌লাও ছিল না। এখন আমি বাড়ী করিয়াছি, গাড়ী করিয়াছি, বাগান করিয়াছি, নিজ কর্ম্মশালায় কয়েকজন চাকরও বাহাল করিয়াছি। বৎসরে একবার করিয়া ছুটি ভোগ করিবার জন্য দূর দেশেও গিয়া থাকি। স্ত্রীকে সঙ্গে আনিতে পারি নাই। দুইজনেই একসঙ্গে বাহিরে থাকিলে সংসার ও ব্যবসা চালানো অসম্ভব। কিন্তু আমি ফিরিয়া গিয়াই স্ত্রীকেও কোনো কুরর্টে পাঠাইব।"

সপরিবারে ছুটি ভোগ করিতে আসিয়াছেন এক রুটিওয়ালা। ইঁহাদের ছেলেমেয়েরা দেশ-বিদেশের ডাক-টিকেট সংগ্রহে মাতিয়াছে। ডাক-টিকেট সংগ্রহ করা ইয়োরোপের সর্ব্বত্রই একটা বাতিক, খেলা এবং ব্যবসা।

(১৪)

জুরিখের নিকটবর্ত্তী ওবালিকন পল্লীর এক বড় অটোমবিল ফ্যাক্টারিতে প্রায় এক হাজার মজুর খাটে। ফ্যাক্টারির পরিচালক-এঞ্জিনিয়ার বলিতেছেন :—"সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে জিনিষ-পত্রের দর বাড়িয়াছে। কাজেই মজুরেরা বেশী বেতন চায়। ফ্যাক্টারির মালিকেরা বেতন বাড়াইতে অরাজি ছিল। অধিকন্তু তাহারা মজুরদিগকে পুরানো বেতনেই রোজ আট ঘণ্টার ঠাঁইয়ে নয় ঘণ্টা কাজ করাইতে সচেষ্ট ছিল। আমি মজুরদের সপক্ষে মনিবদের বিপক্ষে রায় দিয়াছি।"

এঞ্জিনিয়ারের স্ত্রী পূর্ব্বে স্কুল-মাষ্টার ছিলেন। যৌবনে শিক্ষয়িত্রী, সম্প্রতি গিন্নী, এইধরণের নারী অনেককে দেখিতেছি। একজন জজসাহেবের স্ত্রী বলিতেছেন :—"আমি এখনো মাষ্টারি করিতেছি। আমার স্বামীর যদিও টাকার অভাব নাই, তবুও আমি ভাবিতেছি যে, আর দু-এক বৎসর কাজ করিলেই পূরাহারে সরকারী পেন্‌শন্‌ পাইব। কিন্তু কাজে ইস্তফা দিলে পেন্‌শন্‌টা সবই মাঠে মারা যাইবে।"

ধর্ম্মশিক্ষা লইয়া সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের পাঠশালায় লড়াই চলিতেছে। ক্যাথলিক পরিবারেরা তাহাদের সন্তান-সন্ততিকে সরকারী স্কুলের "নীতি"-শিক্ষার ক্লাস হইতে বাঁচাইতে যায়। এক ক্যাথলিক স্কুলমাষ্টার বলিলেন :—"নীতিশিক্ষার ওজর করিয়া প্রটেষ্টান্ট্‌ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা আমাদের ছেলে-মেয়েকে অধর্ম্ম শিখাইতেছে।" এক প্রটেষ্টান্ট্‌ নারী বলিলেন :—"ক্যাথলিকরা এমনই গোঁড়া

টেসিনের মিস্ত্রি

ও পরমত-বিদ্বেষী যে, তাঁহাদের চিন্তাধারা হইতে সামান্য মাত্র প্রভেদ ঘটিলেই সব কিছুই অধর্ম্ম বা দুর্নীতি !”

(১৫)

আশী বছরের এক বুড়ী পাহাড়ের গৌরব প্রচার করিতেছেন। সঙ্গে আছে এক পুত্র ও এক কন্যা। প্রত্যেকেই কয়েক ছেলের জনক-জননী। উঁহারা আপেন্‌ৎসেল ক্যাণ্টনের লোক। বুড়ী পূর্ব্বে কখনো টেসিন্ ক্যাণ্টন দেখেন নাই।

বৃদ্ধা আপেন্‌ৎসেলের উপভাষায় গান শুনাইয়া বলিতেছেন :—“এইধরণের সুন্দর ভাষা সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের অন্য কোনও ক্যাণ্টনে শুনিতে পাইবেন না।” ইঁহার মুখে অন্যান্য ক্যাণ্টনের জার্ম্মান্ ভাষা ও উচ্চারণের ঠাট্টা শুনা গেল অনেকপ্রকার।

“হেল্‌ভ্বেটসিয়া” সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড দেশেরই অন্যতম নাম। এই নামের হোটেলে সুইস্-মুল্লুকের সকল ক্যাণ্টন্ হইতে অতিথি আসে। বর্ত্তমানে আপেন্‌ৎসেলের আত্ম-ম্ভরিত্ব শুনিবামাত্র বুড়ীর চারিদিকে লোক জমিয়া গেল। ক্যাণ্টনে ক্যাণ্টনে লড়াই দেখিলাম খানিকক্ষণ ধরিয়া। বুড়ী নাছোড়বান্দা।

উৎস্বগ শহরের এক কিণ্ডার-গার্টেন স্কুলের শিক্ষয়িত্রী বলিতেছেন :—“এতদিন আমরা ছেলে-পুলেদিগকে আজগুবি গল্প শিখাইতাম। রাক্ষস-খোক্কসের কাহিনী, ভূত-পেত্নীর কাহিনী, অদ্ভুত জানোয়ারের মিথ্যায় ভরা গল্প, এইসবই ছি[ল] ছেলে-ভুলানো ছড়া। এইসকলের বিরুদ্ধে আমর[া] আজকাল উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি। শিশুদে[র] চিত্তে ভয় প্রবেশ করানো কোনো মতে[ই] মঙ্গলজনক নয়। অধিকন্তু যতদূর সম্ভব প্রত্যে[ক] গল্পেই বৈজ্ঞানিক এবং ঐতিহাসিক সত্য প্রচা[র] করার দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।”

(১৬)

বসন্তের সঙ্গে সঙ্গে লুগানো, কাষ্টাঞোল প্যারাদিসো ইত্যাদি সকল কেন্দ্রই লোকে লোক রণ্য। বহুসংখ্যক জার্ম্মান্-নর-নারী সুইট সার্ল্যাণ্ডে সকল কুরটেই অতিথি। সুইস্‌রা বলিতেছে :- সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের বড় বড় প্রাসাদ-তুল্য হোটে[লে] আসিয়া বিলাস ভোগ করিবার ক্ষমতা দেখিতে[ছি] হাজার হাজার জার্ম্মানের। অথচ ইহারা স্বদেশে[র] দুঃস্থ নরনারীদের জন্য সুইস্-মুল্লুক হইতে ভি[ক্ষা] সংগ্রহ করিতে লজ্জা বোধ করে না!” এই মর্ম্মে লে[খা] পড়িতেছি ও “বুণ্ড” (ব্যর্ণ), “নাট্‌সিওনাল ৎসাইটু[ঙ্] (বাজেল), “জুর্নাল্ দ' জেনেহ্ব” এবং “নয়েৎস্যিরৎ ৎসাইটুঙ” কাগজে। জার্ম্মানির পররাষ্ট্রসচিব ষ্ট্রেজেমা[ন] লুগানোতে স্বাস্থ্যান্বেষী।

লোকার্নোয় “কামেলিয়েন্” ফুলের মেলা হই[তে] এইরূপেই টেসিনে বসন্তোৎসব সুরু হয়। মার্চ্চ-এপ্রি[ল] মাস অবশ্য জার্ম্মানিতে এক উত্তর সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডেও [এ] শীতকালই বটে। কিন্তু দক্ষিণ সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড, ইতা[লি] দক্ষিণ ফ্রান্স, দক্ষিণ টিরোল ইত্যাদি জনপদে এখন সবু[জ]

এবং রংবেরঙের ফুলের আওতা। ঘরে বসিয়াই ফুলের গন্ধ শুঁকিতেছি। তাহা ছাড়া চাঁদের আলো, রোদের ঝাঁজ আর নীল হ্রদের হাওয়া ত আছেই।

(১৭)

নৈশ ভোজনের সময় সপ্তাহে দুইতিনবার করিয়া ভিন্ন-ভিন্ন গায়কের দল আসিয়া গান গাহিয়া পয়সা রোজ্‌গার করিতেছে। ইতালীয়ান্‌, রুশ, জার্ম্মান্‌, ফরাসী, সকলপ্রকার ওস্তাদের গানই শুনা যাইতেছে। কাণ্টাগ্রোলার এক অন্ধ যুবা হ্যাদি, রাখ্‌মানিনফ্‌, গোদার্‌ ইত্যাদির তৈয়ারী গং পিয়ানোয় বাজাইলেন।

"য়োড্‌ল্‌"-নামক সুর বা রাগিণী আল্পস্‌পাহাড়ের খাস আবিষ্কার। টিরোলে, বাহ্বেরিয়ায়, সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের সর্ব্বত্র পাহাড়ের "তাল" বা উপত্যকাগুলা এই সঙ্গীত-ধ্বনিতে মুখরিত হয়। ভিন্ন-ভিন্ন তালের পোষাকও বিভিন্ন। উপভাষা এবং উচ্চারণ, বিভিন্ন বটেই।

এই সঙ্গীতের প্রধান যন্ত্র হইতেছে "গিথার"। ত্রিশ-চল্লিশটা তারে এই যন্ত্র তৈয়ারী। যন্ত্রটা কাঠের পাতবিশেষ। টেবিলে শোয়াইয়া অথবা কোলে রাখিয়া দুই হাতের আঙুলে বাজাইতে হয়।

(১৮)

ব্যন্‌ অঞ্চলের এক চাষী সপত্নীক য়োড্‌ল্‌ গাহিয়া গেল। লুৎসার্ন্‌ তালের য়োড্‌ল্‌ও শুনিলাম। বসন্তের গান, হ্রদের গান, বরফের গান, গরুবাছুরের গান, ছাগলের গান, গোয়ালা-গোয়ালিনীর গান,—এইসবই য়োড্‌লের "মুদ্দা"।

প্রকৃতি এইসকল গানের কথাবস্তু মাত্র নয়। সঙ্গীতের সুরগুলা সবই প্রকৃতির বিভিন্ন ধ্বনি বিশেষ। এক গানে বুঝিলাম,—সন্ধ্যার সময়ে রাখালেরা মাঠ হইতে গরুর পাল বা ছাগলের পাল ঘরে ফিরাইতেছে। কিন্তু যে ব্যক্তি ভাষা বুঝিবে না, সেও আওয়াজের লহরেই বুঝিবে যে, গরুগুলা হাঁটিতেছে, গোয়ালা-গোয়ালিনীরা গরুগুলাকে ডাকিতেছে, ইত্যাদি। গোধূলির আব্‌-হাওয়ায়

টেসিনের কিষাণ-নারী

যা-কিছু কল্পনা করা সম্ভব সবই য়োড্‌লের সুরে পাইতেছি। ইহাও প্রকৃতি-পূজা সন্দেহ নাই।

য়োড্‌লের রাগিনীতে প্রতিধ্বনির ঠাঁই অনেক। পাহাড়ীরা খোলা মাঠে আকাশ ফাটাইয়া গাহিতে অভ্যস্ত। কাজেই হ্রদের, পর্ব্বতের, বনের এক তাল হইতে অপর তালে ধ্বনিগুলা লাফালাফি করিয়া থাকে। সেই লাফালাফিটা সুরের রূপে ধরিতে পারা যায়।

(১৯)

পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সুররচয়িতারা নিজ-নিজ সৃষ্টির ভিতর প্রকৃতির বহু ধ্বনি ধরিয়া রাখিয়াছেন। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি ঝোরা, কি দরিয়া, কি নিশীথ, কি মধ্যাহ্ন, কি কীট-পতঙ্গ, কি বিহঙ্গকুল, দুনিয়ার আব-হাওয়ায় যাহা কিছু দেখা যায়, শুনা যায়, সবই পাশ্চাত্য

টেসিনের পল্লীভবন

তাহা হইলে তাঁহারা বলিবেন:—"দেখিতেছি খৃষ্টান্ চাষী গোয়ালা নরনারীরাও প্রকৃতিনিষ্ঠ এবং আধ্যাত্মিকও বটে।"

তাহার পর ইয়োরামরিকার শহুরে ওস্তাদদের "সিম্ফনি," "ওভ্বার্‌টিয়োর্" "সোনাটা," "গাভ্বট্" "রোন্দো" ইত্যাদি রাগরাগিণীতে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা যেদিন হইবে সেদিন ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার পাঁড় প্রচারকেরা বলিতে সুরু করিবেন:—"ভারতীয় শিল্পীদের সৃষ্টি, ভারতবাসীর প্রকৃতি-নিষ্ঠা সবই নেহাৎ ছেলেখেলা।" কথাটা শুনিবামাত্রই হয়ত আমাদের অনেকের বুক ফাটিয়া যাইবে। কিন্তু কি করা যায়? জগৎ বাড়িয়াছে। ভরত আর তানসেনই তুনিয়ার শেষ বীর নন।

(২০)

এবার ইষ্টারের ছুটিতে সুইস্ রেলে তুর্ঘটন ঘটিল। লুগানোর নিকটেই টেসিনের বড় শহর বেলিনাৎসোনা। এইখানে তুই ডাকগাড়ীতে রাত্রিকালে সংঘর্ষের ফলে বহু লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

কম্পোজারদের অপূর্ব্ব রাগ-রাগিণীর ভিতর পাকড়াও করিতে পারি।

ভৈরবী সকাল বেলার গান, আর পূরবী সন্ধ্যার গান, এইধরণের প্রভেদ করিতে ভারত-সন্তান অভ্যস্ত। এই-সকল প্রভেদের জোরেই ভারতবাসী লম্বাগলা করিয়া প্রচার করিতেছেন,—"ভারতীয় সঙ্গীতশিল্পে প্রকৃতির সঙ্গে মানবের এক আধ্যাত্মিক সংযোগ আছে। বিশ্বের নারীর সঙ্গে মানবাত্মার এই যে যোগাযোগ তাহা ভারতেরই একচেটিয়া বস্তু।"

ভারতবাসীরা আল্প্‌স্ পাহাড়ের য়োডল্ শুনুন।

মারা পড়িবার মধ্যে জার্ম্মান্ টুরিষ্ট্‌দের সংখ্যাই বেশী। "ডায়েচ্‌নাটসিওনাল" দলের প্রধান কর্ত্তা হেল্‌ফেরিখ তাঁহাদের অন্যতম। হেলফেরিখের মৃত্যু জার্ম্মান্ সমাজের তুর্ভাগ্য। ইনি ছিলেন ফ্রান্সের যম এবং ইংলণ্ডের মুগুর। যুবক জার্ম্মানি হেল্‌ফেরিখ্‌কে হিণ্ডেনবুর্গ এবং লুডেন্‌ডোর্ফের মতনই পূজা করিত। মন্ত্রী কুনো আমলে রুর্ লইয়া জার্ম্মানিতে যে সত্যাগ্রহের লড়াই চলিতেছিল তাহার আধ্যাত্মিক সেনাপতিই হেল্‌ফেরিখ। জার্ম্মানেরা সুইস্ রেলকোম্পানীকে যারপরনাই গালাগালি করিতেছে।

কবি-প্রশস্তি

শ্রী কালিদাস নাগ

[চীনদেশে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিনে পঠিত]

লোইয়াঙ্ কল্যাণতীর্থ চীন-ভারতের ইতিহাসে—
কত না মৈত্রীর ধারা মিলেছে হেথায়
কতই অমর শিল্প সত্য সাধনায়
এসিয়ার প্রাণক্ষেত্র পুণ্য করি' পূর্ণ করি' আসে।
চিত্ত মোর চাহিছে লুন্ঠিতে
পূত পথধূলি পরে' করিতে প্রণতি।
দু-ধারে যবের ক্ষেত্র—শ্যাম সিন্ধু পারা
রহে তরঙ্গিতে;
চাষ করে চাষী হোথা শ্রম-শান্তি-ধৈর্য্যের মূরতি।

সহসা বিক্ষুব্ধ করি' সে প্রশান্তিধারা,
বিকট কর্কশ শব্দে ধূলিপুঞ্জে দিগ্বিদিক্ ভরি'
এল সৈনিকের পাল,
ঝলসিল কৃপাণ করাল,
কিরীচে বন্দুকে যেন প্রাতঃসূর্য্যে বিদ্ধ খণ্ড করি'।
ক্রমশঃ মিলাল তারা
লুপ্ত হ'ল অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা;
অশান্তির ঘূর্ণি যেন শান্তির অতলে হ'ল হারা,
দে[illegible]লে শিশু, খাটে চাষী- কি অনন্যমনা!

প্রকৃতির পটভূমিকায়
পরসিকের অমর তুলিকা
ফুটাইল ধ্যানমূর্ত্তিশিখা
সংযম সৌন্দর্য্যে দীপ্ত অমর্ত্ত্য রেখায়।
প্রভাতের পটে এই ক্ষণিকের ছবি,
এ নীরব নাট্যলীলা, একটি কোণের
সহসা ভরিয়া দিল আমার মনের
সকল মহলা;
সুষমায় গলা
স্নিগ্ধ প্রভাতের নব রবি

নব রূপকের রঙে ভরে' যেন দিল পটখানি—
দেখিনু বিস্ময় মানি',
চিরন্তন ইতিহাস শান্তির তরঙ্গ-ভঙ্গে নেচে নেচে চলে;-
দেশে দেশে মানুষে মানুষে কোলাকুলি
রূপে রূপে রসে রসে মিলনের তলে
শাশ্বত সৃষ্টির উৎস ক্ষণে ক্ষণে যায় দেখি খুলি;—
হিংসা দ্বেষ ধ্বংসের ঝটিকা
ক্ষণতরে শান্তিধারা বিক্ষুব্ধ পঙ্কিল করি' তোলে,
রক্তের কল্লোলে
ডুবে যায় শ্যাম পৃথ্বী—ঢাকে বিশ্ব মৃত্যু-কুজ্ঝটিকা!
কিছুকাল হত্যাযুদ্ধ জয়দর্পে মুখর করিয়া
মানবের ভীরু ইতিহাস,
মিলায় নিষ্ঠুর মায়া;
তরুলতা আবার বিতরে স্নিগ্ধ ছায়া
আবার প্রাণের নিত্য রেখাটি ধরিয়া
ধরিত্রী ভরায়ে' তোলে ফুল-ফল—স্বর্গ্য পরিহাস!
ক্ষমা- শান্তি- মৈত্রী- মন্দাকিনী
চিরদিন বহিতেছে বাজাইয়ে সৃষ্টির কিঙ্কিণী।
সেই সুরনির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ যবে
হ'ল ভারতের এক কোণে,
কে জানিত তবে
তাহার অমৃতধারা ভেদিয়া [illegible]মসঘন বনে
উল্লঙ্ঘি' বঙ্গের সীমা প্লাবিয়া সমগ্র হিন্দুস্থান
ডুবাইয়া একে একে সর্ব্ব ব্যবধান
মানব-মানবমাঝে
প্রেমের প্রাণের স্রোতে আলিঙ্গিবে নিখিল ধরায়?
মৈত্রী-কল্যাণের কাজে
যুগে যুগে বিশ্বজনে ডাকিয়াছে শাশ্বত ভারত,
বুদ্ধকণ্ঠে জাগায়েছে সীমাহীন পূর্ণ করুণায়.

সেই ডাকে বন গিরি উত্তুঙ্গ পর্ব্বত
মাথা করিয়াছে নত,
আত্ম-ভোলা কারুণ্যরসিক শত শত
ছুটিয়াছে বিশ্বের কল্যাণে ;—
বিরাট্ সাম্রাজ্য ছাড়ি' ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের লাগি'
মহান্ আকৃতি তাই ধর্ম্মাশোক-প্রাণে
সিংহাসন ছাড়ি' তাই আজ রহে জাগি'
গুণবর্ম্মণের গুণ সিংহলে জাভায়
চীনের মন্দিরে মঠে—রূপ-তূলিকায়
বোধিধর্ম্ম তাই
ভাষা-হারা কল্যাণের অখণ্ড বাঁধনে
বেঁধেছেন জনে জনে,
চীন ভক্তগণ তাই তাঁর নাম জপিছে সদাই।

হে শাশ্বত ভারতের মন্ত্রদ্রষ্টা কবি !
তব কণ্ঠে জাগিয়াছে ভারতের সনাতন গান,
তব কাব্যে তাই দেখি অপূর্ব্ব মহান্
বিশ্বমানবের রূপচ্ছবি,
বাণী তব বিশ্বের ভারতী,
ছন্দ তব নাচিতেছে বিশ্বতালে রেখে' রেখে' তাল,
প্রাণ তব বিশ্বদেবে করিছে আরতি
বেদনায় বেদনায় জ্বালি দীপ উদার বিশাল !
তাই ত তোমার ডাক সবার মাঝারে
পশ্চিম-সাগর হ'তে পূর্ব্ব-সাগরের পরপারে ;
নরনারী আনে বহি' সমস্যার ভার
লভিবারে নির্দ্দেশ তোমার ;
যুবা আসে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির ক্ষুধা নিয়ে,
তব চির যৌবনের ধ্যানমন্ত্র দিয়ে
কর তারে আশীর্ব্বাদ ;
ছোট ছেলে মেয়ে আসে নিয়ে ছোট সাধ
বলে "গান কর কবি ! মোরা ভালবাসি
তুমি গাও, তারা নাচে—মুখে স্বর্গ্য হাসি !
বিরাটের সাথে
সহজেরে মিলায়েছ—বিশ্বমানবের বেদনাতে
পশেছ সহজ প্রেমে,
কাব্য হ'তে কল্যাণের পথে তাই আসিয়াছ নেমে,
ধন্য তুমি, কবি নাম সার্থক তোমার,
ভারতগৌরবরবি ! তোমারে করি হে নমস্কার !

হে বিশ্বপ্রেমিক কবিগুরু !
করাল হিংসার মেঘে ছেয়েছে মানব-ইতিহাস,
ধ্বংসের বিদ্যুৎফণা লেহি লেহি খণ্ডিছে আকাশ,
বজ্রে বাজে প্রলয়-ডম্বরু !
তার মাঝে অকম্পিতবুকে,
বহিয়া চলেছ উর্দ্ধে প্রেম শান্তি মৈত্রীর কেতন
স্বর্গের মহিমা-ভরা-মুখে
গাহিয়া চলেছ তুমি সৃষ্টির সঙ্গীত চিরন্তন !
তুচ্ছ তৃণ তুষারপর্ব্বতে করে' জয়
বনময়
ফুলে ফুলে ভরি' উঠে, শীতের মরণ ছদ্মবেশ,
জাগে চিরবসন্তের মৃত্যুঞ্জয়ী চুম্বন-আবেশ,
আলোকের অগ্রদূত গাহে পাখী "রাত্রি হ'ল দূর !"
মহামানবের নিত্য-মিলনের সুর
ঝঙ্কছে গম্ভীর মন্দ্রে প্রাণভরা তব ব্রহ্মবীণ ;
সত্যলোকে চিরজীবী, প্রেমলোকে শাশ্বত নবীন
হে মোদের কবি বন্ধু সাধনার ধন !
আত্মার প্রণতি আজি তোমারে করি হে নিবেদন ॥

শিপির মেলা

শ্রী প্রভাত সান্যাল

আমাদের দেশের নর-নারী গ্রাম্য মেলা বা ঐ শ্রেণীর অন্য প্রতিষ্ঠানে বিশেষ আনন্দ-সহকারে যোগদান করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশেই এরূপ বাৎসরিক মেলা বসে ও জনসাধারণে উৎসব করে।
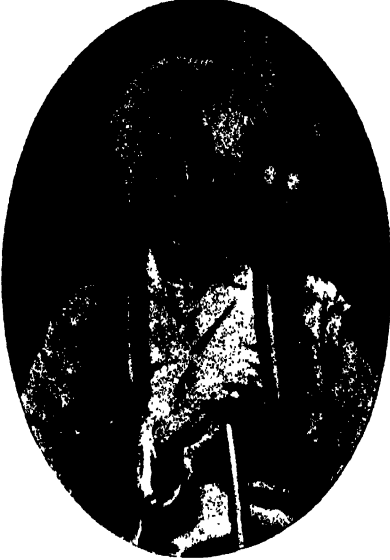
রাণা রঘুবীর সিংহ, কোটি-রাজ্যের রাজা

সিমলা শহর হইতে ৭ মাইল দূরে মাশোবারা পাহাড়ের পাদদেশে শিপি নামক একখানি ছোট গ্রাম আছে।

শিপিমেলাতে সমাগত পাহাড়িয়া রমণী

গ্রামখানির প্রাকৃতিক দৃশ্য অত্যন্ত চমৎকার। চারিদিকে পাহাড়ের গায়ে এই দেবদারু বৃক্ষ সুশোভিত গ্রামখানি ঠিক একখানি ছবির মত দেখায়। এখানে প্রতিবৎসর জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে একটি মেলা বসে। নিকটবর্ত্তী সমস্ত পার্ব্বত্য গ্রাম হইতে সকল সম্প্রদায়ের লোক এই মেলাতে যোগদান করিয়া আমোদ-আহ্লাদ করে। ভারতের নানা প্রদেশের লোক এখানে আসিয়া এই উৎসবে যোগদান করে। এই মেলাতে অনেক বিদেশী লোকেরও সমাগম হয়। কতদিন হইতে শিপির মেলার উৎপত্তি হইয়াছে একথা কেহই সঠিক বলিতে পারে না। অনেকে বলেন, যে, গুর্খা রাজত্বের সময় হইতে এই মেলার উৎপত্তি।
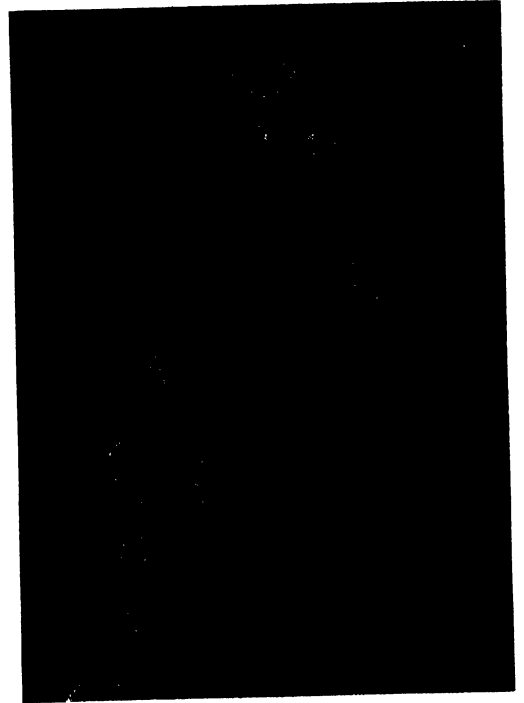
একটি পাহাড়িয়া সুন্দরী

শিপি কোটি-রাজ্যের পাহাড়ীদের দেবতার নাম। উহা হইতেই এই সুন্দর স্থানটির নামকরণ হইয়াছে। পাহাড়ীরা ভক্তিভরে এই দেবতার উদ্দেশ্যে পূজা, বলি ও মানসিক দেয়।

মেলাতে বালকবালিকাদিগের নৃত্য
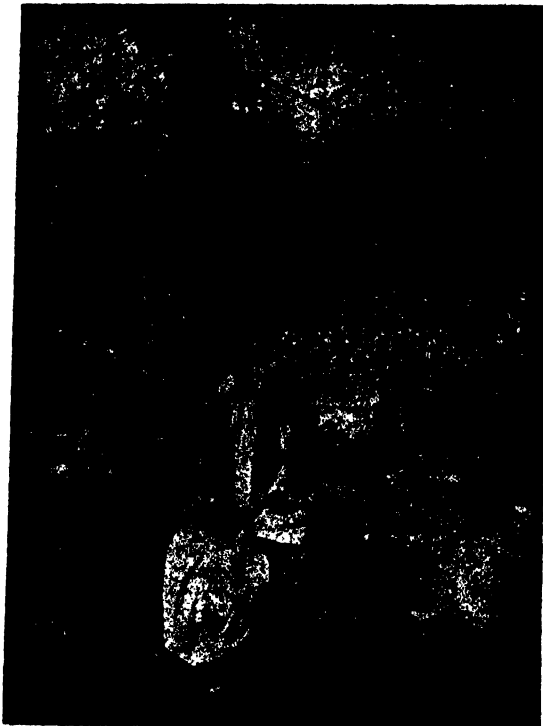
শিপি মেলার ঝোলনা

একটি ছোট মন্দিরের ভিতর শিপি বিগ্রহ অধিষ্ঠিত। বিগ্রহটি পিত্তল-নির্ম্মিত—দক্ষিণ হস্তে একটি ত্রিশূল ও বাম হস্তে একটি পদ্মফুল। পাহাড়ীরা ভক্তিসহকারে এই দেবতাকে অর্ঘ্য প্রদান করে ও মেলায় আসিয়া প্রথমেই এই মন্দিরটি দর্শন করে। এই মন্দিরের পূজারীকে এদেশের রাজা-প্রজা সকলেই সম্মান ও ভক্তি করে।

প্রতিবৎসর মেলার সময় রাজা, রাণী ও রাজ-পরিবারের অন্যান্য লোক এই মন্দিরে পূজা দিতে আসেন। মন্দিরে এই উপলক্ষে অনেক ছাগ বলি হয়। পূজা শেষ হইলে পূজারী রাজাকে আশীর্ব্বাদ করেন ও তৎপরে তিনি মন্দির-প্রাঙ্গণস্থ একটি সামিয়ানার নীচে আসন গ্রহণ করেন। সেখানে সমবেত নর-নারী তাঁহাকে অভিনন্দিত করে।

বালিকারা ও মহিলারা নানা অলঙ্কারে ও বেশে ভূষিত হইয়া একটি পৃথক্ স্থানে বসে। তাহাদের নানা রংএর বেশভূষা দূর হইতে রামধনুর মত দেখায়। পূর্ব্বে এই মেলা-উপলক্ষে সমবেত নরনারীর মধ্যে বিবাহাদির

প্রস্তাব হইত! কিন্তু ক্রমে ক্রমে লোকে এখানে বালিকা বিক্রয় আরম্ভ করে। এই কারণে বিবাহাদি প্রথা এখন উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

হিমালয় বিদ্যা-প্রবর্দ্ধিনী সমিতির প্রচেষ্টায় এই স্থানের অন্যান্য কুপ্রথাগুলি (জুয়াখেলা মদ্যপান ইত্যাদি) ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে।

এই মেলার সময় এখানে নানাপ্রকার উৎসব হইয়া থাকে। তন্মধ্যে পাহাড়ী বালকদের সঙ্গীত ও নৃত্যই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা-ভিন্ন এখানে অন্য-প্রকারের নৃত্যগীতাদিও হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া মেলার সময় অনেক সাপুড়ে, বাজিকর ইত্যাদিরও সমাগম হয়। পাহাড়ী বালিকারা ঝুলন ক্রীড়াতেই বিশেষ আনন্দ-সহকারে যোগদান করে। এই মেলার আর-একটি দ্রষ্টব্য বিষয় ভিখারী-সম্প্রদায়। নানা দেশ হইতে নানা শ্রেণীর ভিখারীরা এখানে সমবেত হয়। এমন কি দাক্ষিণাত্য হইতেও অনেক ভিখারী মেলার সময় এখানে আসে।

যদিও শিপির মেলা অল্প কয়েকদিন ধরিয়া বসে, তথাপি সিমলা ও তন্নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য গ্রামগুলির মধ্যে এই মেলাটিতেই বেশী লোক সমাগম হয়।
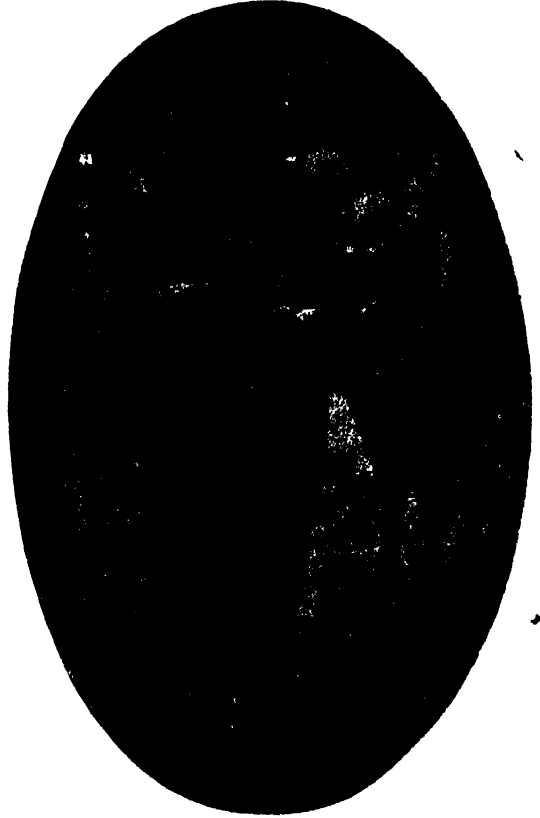
একজন বৃদ্ধা মন্দ্রাজী ভিখারিনী

মা

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

সেদিন প্রাতে আমাদের চিত্রকর বন্ধু বি—র সঙ্গে দেখা করতে "মৌণ্ট-ভ্যালেরিয়াঁয়" গিয়েছিলেম। বি— একজন সেন্-পণ্টনের-লেফ্‌টেন্যাণ্ট। চমৎকার লোক। সেই সময় সে পাহারা দিচ্ছিল। জায়গা ছেড়ে তার কোথাও যাবার জো নেই। কাজেই ওখানে আমাদের দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ল। আমরা জাহাজের প্রহরী নাবিকদের মত পায়চারি করতে লাগ্‌লেম। প্যারিসের কথা, যুদ্ধের কথা, অনুপস্থিত প্রিয়জনদের কথা আমরা বলাবলি করতে লাগ্‌লেম। আমাদের লেফ্‌টেনেণ্ট্ ভায়া, তখনও পূর্ব্বের মত কলার উন্মত্ত ভক্ত, হঠাৎ আমার কথায় বাধা দিয়ে একটা ভঙ্গী করে' আমার হাতটা ধরে' নিম্নস্বরে আমাকে বল্লে :—"দেখ দেখ! কেমন দুটি মাণিক-যোড়!"

তার ছোট ছোট চোখের কোণটা, শিকারী কুকুরের চোখের মত জ্বলে' উঠ্‌ল; সে আঙুল বাড়িয়ে দুইটি বুড়ো-বুড়ীকে দেখিয়ে দিলে। এই বুড়ো-বুড়ী ঠিক সেই সময়, মৌণ্ট-ভ্যালেরিয়াঁর মাল-ভূমিতে এসে উপস্থিত হয়েছিল। বৃদ্ধটির গায়ে চেষ্টনট্‌রংএর কোর্ত্তা; বেটে, পাত্‌লা, লালমুখ, নীচু কপাল, গোল চোখ, প্যাঁচার ঠোঁটের মত নাক। বলি-রেখা-বিশিষ্ট পাখীর মত মুখ, গম্ভীর ও নির্ব্বোদ্ধ। ছবিটা সম্পূর্ণ হয়, যদি বলি—একটা ফুলকাটা কার্পেটের ব্যাগ্ থেকে একটা বোতলের গলা বেরিয়ে আছে, আর বগলের নীচে এক বাক্স মোরব্বা।—ভবিষ্যতে প্যারিসের কোন লোক যদি এই টিনের বাক্স আবার দেখে ত পাঁচ-মাসব্যাপী অবরোধের কথা না ভেবে থাক্‌তে পারবে না। আর বৃদ্ধার প্রথমে আর কিছুই দেখ্‌তে পেলেম না—কেবল মাথায় একটা প্রকাণ্ড টুপী, আর গলা থেকে পা পর্য্যন্ত সমস্ত শরীরে একটা শাল এঁটে জড়ানো। মধ্যে মধ্যে, সেই টুপীর ভিতর থেকে তার ছুঁচোলো নাকের ডগা ও দু'চারটি পাকা চুলের গোছা বেরিয়ে পড়ছিল।

মালভূমিতে পৌঁছে, দম নেবার জন্য সেইখানে থেকে বৃদ্ধ কপাল পুঁছতে লাগ্‌ল। অক্টোবর মাস। তেমন গরম হবার কথা নয়। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি চলে' আসায় হাঁপিয়ে পড়েছিল।

বৃদ্ধা না থেমে একেবারে খিড়্‌কী-ফটকের কাছে এল। সে ইতস্ততোভাবে আমাদের দিকে একবার তাকালে—যেন আমাদের কিছু বল্‌তে চায়; কিন্তু অফিসরের সাজ-সজ্জা দেখে' একটু ভয়-শুম্ভিত হ'য়ে পড়েছিল—তাই আমাদের কিছু জিজ্ঞাসা না করে' শান্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করাই শ্রেয় মনে করুলে। সে ভয়ে-ভয়ে তার ছেলেকে দেখ্‌বার জন্য তার কাছে অনুমতি চাইলে। সে বল্‌লে:—তার ছেলে "৬ নম্বর প্যারিস-পল্টনের একজন পদাতিক"

শান্ত্রী উত্তর করুলে:—

"এইখানে একটু অপেক্ষা করো, আমি তাকে বলে' পাঠাচ্ছি।" বুড়ির আনন্দ আর ধরে না—সে একটা আরামের হাঁপ ছেড়ে, ছুটে' স্বামীর কাছে এল। তার পর, দু'জনে একটা ঢালু জমির ধারে এসে' বস্‌ল।

অনেকক্ষণ ধ'রে, ওরা অপেক্ষা করতে লাগ্‌ল। মৌণ্ট্-ভ্যালেরিয়া নগর-দুর্গটা এত প্রশস্ত; ওর ভিতরে এত অঙ্গন, এত ঢালু পাড়, এত বুরুজ, এত ব্যারিক, এত গুপ্ত খিলান-ঘর রয়েছে, মনে হয় যেন, একটা গোলক-ধাঁধা। এই জটিলতার মধ্য-থেকে ৬নং পদাতিককে বের করা বড়ই কঠিন। তাতে আবার সেই সময় কেল্লার ভিতর তুরী-ভেরী বাজ্‌ছিল, সৈনিকেরা ছুটোছুটি করছিল, টিনের সুরাপাত্র হ'তে ঠন্‌-ঠন্‌ শব্দ হচ্ছিল। যারা বদলি হচ্ছিল, তাদের এক-একজনকে বিশেষ বিশেষ কাজের ভার দেওয়া হচ্ছিল, রসদ বণ্টন করা হচ্ছিল। সৈনিকেরা একজন রক্তমাখা শত্রুর গোয়েন্দাকে বন্দুকের গুঁতো দিতে দিতে নিয়ে আসছে; চাষারা সৈনিকদের অত্যাচারের জন্য নালিশ করতে সেনাপতির কাছে এসেছে; একজন আর্দালি ঘোড়া ছুটিয়ে এসে পড়েছে—নিজেও ক্লান্ত, ঘোড়াও ঘেমে উঠেছে। দূরের আড্ডা থেকে খচ্চরদের পিঠে ঝোলানো আহতদের ডুলী দুল্‌তে দুল্‌তে আসছে। আহতেরা মৃদুস্বরে আর্তনাদ করছে। "মারো ঠ্যালা হেই হো" বলে' তূরীনাদের সঙ্গে একটা নূতন কামান উপরে ওঠানো হচ্ছে। কেল্লার মেষদের নিয়ে লাল পাজামা-পরা কঞ্চি হাতে, মেষ-পালকেরা উঠানে যাতায়াত করছে, আবার ফটক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

মা বেচারী এইসব দেখ্‌ছে আর ভাব্‌ছে, "আমার ছেলেকে বল্‌তে ভুল্‌বে না ত?" প্রত্যেক পাঁচমিনিটের পর সে উঠে দাঁড়াচ্ছে, আস্তে আস্তে ফটকের কাছে যাচ্ছে, প্রাচীরের পিছন থেকে যে বহিরঙ্গণ একটু দেখা যাচ্ছে সেই দিকে সে তৃষিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে; কোন কথা কাউকে জিজ্ঞাসা করতে আর তার সাহস হচ্ছে না, পাছে তার ছেলে হাস্যাস্পদ হয়। বৃদ্ধ ওর চেয়েও আরও ভয়-তরাসে, সে তার কোণটি ছেড়ে একপাও নড়্‌ছিল না। তার স্ত্রী বিষণ্ণ-মনে, হতাশভাবে যখন প্রত্যেকবার নিজের জায়গায় ফিরে এসে বস্‌ছিল; বেশ দেখা গেল, তার স্বামী, অধৈর্য্যের জন্য স্ত্রীকে ধমকাচ্ছে এবং যুদ্ধের চাকরীতে কি কি দরকার সেই-সব বোঝাচ্ছে—অতি নির্ব্বোধ হ'য়েও বিজ্ঞতার ভাণ করছে।

ব্যক্তিগত জীবনের এইসব নীরব দৃশ্য আমার দেখ্‌তে বড় ভাল লাগে। যতটা দেখা যায় তার চেয়ে আন্দাজে অনেকটা বোঝা যায়। যখন রাস্তায় ভিড় ঠেলে বেড়িয়ে বেড়াই, কত মুখ-নাড়া-নাড়ি, কত-রকম অঙ্গ-ভঙ্গী দেখা যায়—এইরকম এক-একটা অঙ্গ-ভঙ্গিতেই লোকের জীবন-ধারা ব্যক্ত হ'য়ে পড়ে।

এইদিন উজ্জ্বল প্রভাতে আমি কল্পনা করলেম, একজনের মা যেন এইরকম মনে-মনে ভাব্‌ছে:—

"জেনেরাল ত্রোশুর হুকুমের জ্বালায় অস্থির হ'তে হয়েছে। আর পারা যায় না। তিন মাস হ'ল আমার ছেলেকে আমি দেখিনি। আমি ঠিক করেছি, আমি ছেলেকে একবার দেখে' আস্‌ব।"

ছেলের বাপ ভীতু ও সাংসারিক কাজকর্ম্মে নিতান্ত আনাড়ি; তার ভয় হ'ল, একটা অনুমতি-পত্র সংগ্রহ করতে অনেক বেগ পেতে হবে—তাই প্রথমে সে তার স্ত্রীর সঙ্গে তর্ক জুড়ে' দিলে।

"না, মাই ডিয়ার, একথা মনেও এল না! মৌণ্ট্-ভ্যালেরিয়া, সে কি এখানে? সে অনেক দূরে। একটা গাড়ী না হ'লে সেখানে কি করে' যাবে? তা ছাড়া এটা একটা নগর-দুর্গ। মেয়েরা তার ভিতর যেতে পারে না।

—স্ত্রী বল্‌লে:—"আমি ভিতরে যাব"। তার যা ইচ্ছে হয়, সে না-করে ছাড়ে না। কাজেই তার স্বামীর যেতে হ'ল। সে "সেক্টরের" আফিসে "মেয়ারের" আফিসে গেল, "ষ্টাফের" সদর-আড্ডায় গেল, "কমিসারি"তে গেল। যাবার সময় ভয়ে গা' দিয়ে ঘাম ছুটছে, শীতে শরীর জমে যাচ্ছে, ভুলে' এ-দরজায়, ও-দরজায় ঢুকে' পড়্‌ছে—একটা আফিসে গিয়ে দু-ঘণ্টা ধরে' বসে' আছে—শেষে টের পেলে সে ভুল আফিসে এসেছে। অবশেষে রাত্রে গভর্ণরের কাছ থেকে একটা অনুমতি-পত্র নিয়ে বাড়ী ফির্‌ল। পরদিন খুব সকালে জেগে উঠ্‌ল—খুব ঠাণ্ডা, তখনো প্রদীপ জ্বলছে। ছেলের বাপ আপনাকে গরম কর্‌বার জন্য কিছু খেয়ে নিলে, কিন্তু ছেলের মার তখন ক্ষিদে ছিল না। মা মনে করুলে, সেখানে গিয়ে ছেলের সঙ্গে একত্র আহার করবে। মনে করুলে ছেলে-বেচারী সেখানে ত ভাল খেতে পায় না—তাকে একটা ভালরকমের ভোজ দিতে হবে। তাই সে অবরোধ-কালের যে-সব বাতিল খাদ্য-দ্রব্য পড়েছিল, সেগুলো তাড়াতাড়ি একটা ঝুড়ীর মধ্যে ভরে' নিলে:—চকোলেট, মোরব্বা, সিল্‌-মোহর-করা সুরা—সমস্ত। এমন কি, একটা বাক্সও সঙ্গে নিলে। এই বাক্সটা ৪ টাকা দিয়ে এরা কিনেছিল—দুর্দ্দিনের জন্য এটাকে খুব সযত্নে সঞ্চিত করে' রেখেছিল। যখন এরা দুর্গ-বুরুজের কাছে এসে পৌঁছ্‌ল, তখন দুর্গের ফটক সবেমাত্র খোলা হয়েছে। এখন অনুমতি-পত্রটা দেখাতে হবে। এইবার মা-ই ভয় পেলে। কিন্তু দেখা গেল সবই ঠিক আছে। সৈনিকদের অ্যাড্‌জুটেণ্ট্‌ বল্‌লে:—

"ওদের যেতে দেওয়া হোক্‌!"

এই কথা শুনে' মা হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌ল।

"লোকটি বড় ভদ্র।"

মা তাড়াতাড়ি ছুটে' চল্‌ল। বাপ তাকে ধরে' উঠ্‌তে পার্‌ছিল না।

"মাই ডিয়ার, অত দৌড়ে চোলো না!"

কিন্তু মা তার কথায় কর্ণপাত করুলে না। ঐ ওখানে দিগন্তের কুয়াসার ভিতর থেকে, মৌণ্ট-ভ্যালেরিয়া হাত-ছানি দিয়ে যেন তাকে ডাকছে:—"শীঘ্র এস, সে এখানে আছে।"

এখানে পৌঁছে আবার তাদের একটা নূতন কষ্ট আরম্ভ হ'ল। যদি তাকে দেখ্‌তে না পেয়ে থাকে! যদি সে না আসে!

হঠাৎ সে চমকে উঠ্‌ল, বুড়োর হাত ছুঁয়ে সে একেবারে লাফিয়ে উঠ্‌ল। কতকটা দূরে, খিলেন-ওয়ালা খিড়্‌কি ফটকের নীচে, তার ছেলের পায়ের শব্দ সে চিন্‌তে পারলে।

এ সেই! যখন সে এসে উপস্থিত হ'ল, তখন দুর্গের সম্মুখটায় আলো জ্বালানো হয়েছিল।

লোকটা বেশ লম্বা-চওড়া। সোজা খাড়া হ'য়ে আছে। পিঠে জিনিষের ঝোলাটা ঝুল্‌ছে, আর কাঁধের উপর তার বন্দুক রয়েছে। সে আস্তে আস্তে তাদের দিকে এগিয়ে এল। সমস্ত মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠেছে। সে পুরুষোচিত উৎফুল্ল-স্বরে বল্‌লে;—

"প্রণাম মা।"

তখনই মা প্রকাণ্ড টুপীটার ভিতর,—তার ছেলের ঝোলা, কোর্ত্তা, শিরস্ত্রাণ সমস্তই পুরে ফেল্‌লে। বাপ জিজ্ঞাসা কর্‌লে ;—

"কেমন আছ? গরম কাপড় পরেছ ত? সাদা সুতোর কাপড় যথেষ্ট আছে ত?"

চুম্বন, অশ্রু ও হাসি-বর্ষণের মধ্যে—মায়ের সুদীর্ঘ স্নেহ-দৃষ্টি তার আপাদমস্তক আচ্ছন্ন করে' আছে। মাতৃস্নেহের তিন মাসের বাকি-বকেয়া যেন একেবারেই পরিশোধ করা হ'ল। বাপের মনও খুব বিচলিত হচ্ছিল, কিন্তু বাহিরে প্রকাশ কর্‌বে না বলে' স্থিরসঙ্কল্প হয়েছিল। আমরা তার দিকে তাকিয়ে আছি জান্‌তে পেরে, আমাদের দিকে একটু চোখ্ টিপে যেন এই কথা বল্‌লে ;—

"তোমরা কিছু মনে কোরো না,—ও মেয়ে মানুষ।"

এইরকম আনন্দ-উল্লাস চল্‌ছে—এমন সময় একটা বিউগ্‌ল বেজে উঠ্‌ল– আনন্দের উচ্ছ্বাস নিবে' গেল। ছেলে বলে' উঠ্‌ল ;—

"ঐ যাবার ডাক পড়েছে—এখনি আমাকে যেতে হবে।"

"কি? তুমি আমাদের সঙ্গে প্রাতর্ভোজন কর্‌বে না?"

"না, আমি ত তা পার্‌ব না। ঐ দুর্গের মাথায় ২৪ ঘণ্টা আমায় পাহারা দিতে হবে।"

মা-বেচারী শুধু বল্‌লে ঃ

"ওঃ!" আর কিছুই বল্‌তে পার্‌লে না।

তিনজনই একটা ভয়ের ভাবে, পরস্পরের মুখের দিকে মুহূর্ত্তের জন্য চেয়ে' রইল। তার পর বাপ হৃদয়বিদারক স্বরে বল্‌লে ঃ—

"নিদেন এই বাক্সটা তুই নে"। কিন্তু যাত্রার গোলমালে ও ব্যস্ততায়, সে বাক্সটা খুঁজে' পেলে না। কম্পিতহাতে ওরা খুঁজ্‌তে লাগ্‌ল, হাৎড়াতে লাগ্‌ল। চোখ দিয়ে জল পড়্‌ছে, গলা ভেঙ্গে গেছে—সে যদি দেখ্‌তে। কেবলি বল্‌ছে—বাক্সটা কোথায়?—বাক্সটা কোথায়? তার পর যখন বাক্সটা পাওয়া গেল,—ওদের মধ্যে বিদায়-আলিঙ্গন বিনিময় হ'ল। ছেলে আবার ছুটে' দুর্গের ভিতর ঢুকে' পড়্‌ল।

এটা যেন মনে থাকে, এই প্রাতর্ভোজনের জন্য ওরা অত দূর থেকে এসেছিল, ওরা এটা একটা উৎসবের ব্যাপার মনে করেছিল। এমন কি, আগের রাত্রে মা ঘুমোয়নি। বল দেখি, এই বিফল যাত্রা- স্বর্গ হাতে পেতে-পেতে ফস্‌কে যাওয়া—এর চেয়ে হৃদয়-বিদারক ব্যাপার কখনো কি কল্পনাও কর্‌তে পার? সেইখানে ওরা খানিকক্ষণ চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইল। যেখান দিয়ে তাদের ছেলে চলে' গিয়েছিল, সেই খিড়্‌কী-ফটকের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল। অবশেষে বাপ আপনাকে একটু ঝাঁকা দিয়ে একটু ঘুরে' দাঁড়াল ; মুখে সাহসের ভাব এনে দুই-তিনবার কাশ্‌লে। তার পর চেঁচিয়ে বলে' উঠ্‌ল ঃ—

"চল গাদোর মা, এইবার আমরা যাই।"*

—* আল্‌ফঁস্ দোদে হইতে

অহিফেন-ব্যবসায়ে ব্রিটিশ-রাজ *

শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়

মদ, গাঁজা, আফিম, কোকেন, মরফিয়া প্রভৃতি মাদক দ্রব্যগুলি মানুষকে এত শীঘ্র অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে যে, ইহাদের প্রচার বন্ধ করিবার জন্য পৃথিবীর সকল দেশেই তীব্র আন্দোলন জাগিয়া উঠিয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র যে এ-বিষয়ে সকলের অগ্রণী তাহা বলা বাহুল্য। আইন করিয়া সেখানে মদ্য-বিক্রয় বন্ধ করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে অহিফেন, মর্‌ফিয়া, হিরোইন, কোডিন, কোকেন প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন সেখানে জাগিয়া উঠিয়াছে। আফিম ও তজ্জাত মর্‌ফিয়া প্রভৃতি এত শীঘ্র পুরুষত্ব নষ্ট করিয়া ফেলে যে, ইহাদের প্রচারে 'জাতিকে জাতি' অতি অল্প সময়ের মধ্যে নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়ে। ইহাদের নেশা অতি তীব্র—একবার ব্যবহার করিলে ছাড়া দুষ্কর। অনেক জায়গায় ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েরা পর্য্যন্ত আফিম ও কোকেনের নেশা করিতে সুরু করিয়াছে। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই আফিম ও কোকেন-বিক্রয় ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন্ না হইলে হয় না। আইনই সর্ব্বত্র ইহা সম্ভব করিয়াছে। কিন্তু নেশা-খোরদের নেশার যোগান দেওয়া অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসায় বলিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আফিম ইত্যাদির লুক্কায়িত অবৈধ বিক্রয়কারীর সংখ্যা অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। রাজশক্তির চক্ষে ধূলা দিয়া ইহারা স্বচ্ছন্দে নিজেদের এই পাপ-ব্যবসায় চালাইয়া যাইতেছে। প্রায়

* এই প্রবন্ধ লিখিতে আমি Miss Ellen N. Lamotte কৃত The Ethics of Opium নামক সদ্যপ্রকাশিত গ্রন্থ হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি। এতদ্ব্যতীত আমেরিকার House of Representatives-এর Limiting the Production of Habit-forming Narcotic Drugs and the Raw Materials from which they are made সম্বন্ধে সভার কমিটী-রিপোর্ট্‌দ্বয় ও The Truth about Indian Opium" (India Office, 1923) হইতে সাহায্য লইয়াছি।—লেখক।

প্রত্যহই কেহ না কেহ আফিম প্রভৃতি বে-আইনীভাবে চোরা গোপ্তা আম্‌দানি বা বিক্রী করায় ধরা পড়িতেছে—কিন্তু একদল ধরা পড়িলে সেস্থলে দশটা দল দাঁড়ায়—তাই পুলিশে আর কত ধরিবে! সাধারণতঃ এই-সব পাপ ব্যবসায়ীরা ছোট-ছোট ছেলেদের এই নেশায় আসক্ত করিয়া পরে কোথা হইতে কি-কি চালাকি করিয়া এই-সব মাদক দ্রব্য পাওয়া যাইবে, তাহা শিখায়; একবার ইহাতে অভ্যস্ত করিতে পারিলেই তাহাদের কার্য্য-সমাধা হইল। কারণ এই-সব নেশা এমন প্রকৃতির যে, শত চেষ্টাতেও ইহা ছাড়া যায় না। এই সব মাদক-দ্রব্য-ব্যবসায়ীরা এ-কথা জানে; তাই তাহারা যা-তা দামে ইহা বিক্রয় করে।

যুক্ত-রাষ্ট্রে দেখা গিয়াছে যে, এই-সব নেশা-খোরেরা প্রায় প্রথম যৌবনেই নেশা করিতে শেখে। ১৯১৯এর ১৫ই এপ্রিল তারিখে যুক্ত-রাষ্ট্রের মাদক-দ্রব্য-তদন্ত-সমিতি এইসম্বন্ধীয় রিপোর্টে লেখেন—

"The Committee is of opinion that the total number of addict in this country probably exceeds 1,000,000 at the present time.* * * The range of ages of all addicts was reported as from 12 to 75 years. The large majority of addict of all ages was reported as using morphine or opium or its preparations * *. Most of the heroin addicts are comparatively young, a portion of them being boys and girls under the age of 20. This is also true of cocaine addicts.

কমিটীর মতে তখন যুক্তরাষ্ট্রে নেশা-খোরদের সংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ।…নেশা-খোরদের বয়স ১২ হইতে ৭৫এর মধ্যে। ইহাদের অধিকাংশই মর্‌ফিয়া, আফিম, অথবা তজ্জাত কোন নেশাসক্ত। হিরোইন- (আফিম হইতে প্রস্তুত একরকম নেশা) সেবীরা প্রায়ই অল্প-বয়স্ক, অনেক ছেলে-মেয়ের বয়স ২০এর নীচে। কোকেন-খোরদের বেলাতেও এই কথাই খাটে।

১৯১৯এর পরে ইহাদের সংখ্যা যে ঢের বাড়িয়াছে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। অল্প-বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের রক্ষা করিতে আজ যুক্তরাষ্ট্র চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি যদি নিজেদের স্বার্থ রাখিতে সচেষ্ট না হয়, তাহা হইলে একা যুক্তরাষ্ট্র কিছুই করিতে পারিবে না। আফিম হইতেই অধিকাংশ নেশার জিনিষ প্রস্তুত হয়। আফিম ও কোকেন এই দুইটি জিনিষ প্রস্তুত করা বন্ধ করা বর্ত্তমানে অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কারণ ইহারা মানুষের মনুষ্যত্ব-নাশের পক্ষে চমৎকার নেশা।

পৃথিবীতে আফিম সব চেয়ে বেশী প্রস্তুত হয় আমাদের দেশে; তার পর তুরস্ক, পারস্য ও চীনে। ইংরেজ আসিবার পূর্ব্বে এদেশে আফিমের চাষ ছিল সত্য; কিন্তু তাহা আমাদের 'ক্রিশ্চিয়ান' কর্ত্তারা যেভাবে বৃদ্ধি করিয়াছেন, সেভাবে কখনই ছিল না। সামান্যপরিমাণে আফিম উৎপন্ন হইত; এবং তাহা দেশেই ব্যয়িত হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে ইংরেজ-সর্‌কার অহিফেন বেচিয়া পৃথিবীর লোককে আফিমের নেশায় আসক্ত করিতে যে বিরাট্ কার্‌বার ফাঁদিয়া বসিয়াছেন—তাহাতে তাঁহারা আফিম বিক্রী করাটাকে পাপ বা অন্যায় বলিয়া যে জ্ঞান করেন, তাহা মনে হয় না। আফিম-চাষ হইতে শুরু করিয়া আফিম খুচ্‌রা বিক্রী করা পর্য্যন্ত সর্‌কারের একচেটিয়া ব্যবসায়। পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভারতবর্ষের আফিম প্রচলিত। একদিকে আমাদের ও অপরদিকে সারা পৃথিবীকে নেশা-খোর করিবার "মহান্ কর্ত্তব্য" ভারতের ইংরেজ-সর্‌কারের হাতে!

ঔষধের জন্য আফিম ও কোকেনের খানিকটা দর্‌কার। বিশেষজ্ঞদের মতে গড়পড়্‌তা বার্ষিক ১০০ টন (১ টন = ২৮ মণ) আফিম হইলে পৃথিবীর ঔষধ-ব্যবসায়ী ও বৈজ্ঞানিকদের কাজ চলিয়া যায়। কিন্তু বৎসরে প্রায় ১৫০০ টন আফিম পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়। তাহার অর্থ ১৩০০। ১৪০০ টন আফিম পৃথিবীতে প্রতিবৎসর নেশা-খোরদের সেবায় লাগিতেছে। মানুষকে এই ভীষণ নেশার কবল হইতে উদ্ধার করিতে হইলে এখনই এই উদ্বৃত্ত অহিফেন-চাষ বন্ধ করা প্রয়োজন। কিন্তু কে বন্ধ করে?

ইওরোপের খৃষ্টীয় জাতিরা যে জিনিষটা সবচেয়ে বেশী চেনে তাহা হইতেছে—আর্থিক লাভ। তাহারা বোঝে টাকা। তাহারা দেখিয়াছে যে, এশিয়ার চতুর্দ্দিকে

যে টাকার খনি পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা পকেটে পূরিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজন—সস্তায় শ্রমিক। সস্তায় শ্রমিকও এশিয়াতে মেলে, কিন্তু তাহারা ঔপনিবেশিক দ্বীপগুলির অস্বাস্থ্যকর আব্‌হাওয়ায় তেমন খাটিতে রাজি নয়। তাই খৃষ্টের এই পরম ভক্তেরা সস্তায় আফিম জোগাইয়া ইহাদের নেশা-খোর করিয়া তুলিল। পরে এই-সব দ্বীপগুলিতে সহজে আফিম যাহাতে পাওয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া নেশাসক্ত হতভাগ্যদের ক্রীতদাসরূপে খাটাইয়া নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধি করিয়া চলিল। সিঙ্গাপুর হইতে সুরু করিয়া ফেডারেটেড্ ষ্টেটে, জোহোর, কেডা, ব্রিটিশ উত্তর বোর্ণিয়ো, সারাওয়াক্, ব্রুনে, হংকং, ওলন্দাজ উপনিবেশগুলিতে, পর্ত্তুগীজ্ উপনিবেশগুলিতে, ফরাসী ইণ্ডো-চীনে, শ্যামদেশে, চীনে—সর্ব্বত্র ইওরোপীয় খৃষ্ট-চেলাদের এই অপূর্ব্ব অহিফেন-কীর্ত্তির মাহাত্ম্য ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ভারতের ইংরেজ-সর্‌কার এই পাপ-ব্যবসায়-প্রচারে অগ্রণী। পাশ্চাত্যের তথা-কথিত অপূর্ব্ব সভ্যতার হাতে চীন দেশের যে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, তাহা পৃথিবীতে পাশ্চাত্য জাতিগুলির ইতিহাস মসীসিক্ত করিয়া রাখিবে। চীনে যদিও অহিফেনের প্রচলন বহুদিন ধরিয়া আছে, তথাপি উহা অতি সামান্য পরিমাণেই তথায় ব্যবহৃত হইত। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ওলন্দাজেরা চীনদেশে তামাকের সঙ্গে আফিমের ধূমপান-প্রথার প্রবর্ত্তন করে। গোয়া হইতে পর্ত্তুগীজেরাই প্রথম অহিফেন চীনে চালান দেয়। চীন-সম্রাট্ ইয়ুং চিং অহিফেন-প্রচারের অপকারিতা বুঝিয়া ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে অহিফেন-বিক্রয় ও অহিফেন-ধূম-পানের বিরুদ্ধে আইন জারী করেন। কিন্তু পাশ্চাত্য জাতিগুলি চীনের দুর্ব্বলতা বুঝিয়া ক্রমাগতই চীনের সম্রাটের আজ্ঞা তুচ্ছ করিয়া অহিফেন চালান দিতে থাকে। ১৭২৯ সালে ২০০ বাক্স অহিফেন আসিয়াছিল, আর ১৭৯০ সালে আসিল ৪০০০ বাক্স। ১৭৯৬ সনে সম্রাট্ আবার অহিফেন প্রচার নিষিদ্ধ করিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও পাশ্চাত্যের অর্থ-পিশাচ জাতিগুলির চেষ্টায় চীনে ক্রমাগতই অহিফেন প্রচার বাড়িতে থাকে। নিম্নের তালিকা হইতে এই বৃদ্ধির পরিমাণ অনেকটা বুঝা যাইবে :—

১৭২৯—২০০ বাক্স
১৭৯০—৪,০০০ „
১৮২০—৫,০০০ „
১৮৩০—১৬,০০০ „
১৮৩৮—২০,০০০ „
১৮৫৮—৭০,০০০ „

বলা বাহুল্য ইহার সমস্তই ভারতীয় অহিফেন। রাজকীয় সকল প্রচেষ্টাকে তুচ্ছ করিয়া অহিফেনের এই প্রচার-বৃদ্ধির প্রথম কারণ ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা, দ্বিতীয় কারণ ভারতের ইংরেজ-সর্‌কার। ইংরেজ দেখিয়াছিল যে, ভারতে অপর্য্যাপ্ত অহিফেন উৎপন্ন হইতে পারে এবং সামান্য চেষ্টা করিলে চীনে তাহা চালান যাইতে পারে। পর্ত্তুগীজ্ ও ওলন্দাজদের চেষ্টায় চীনারা অহিফেনের আস্বাদ প্রথমেই পাইয়াছিল; এবার ইংরেজ তাহার অপ্রমেয় সৈনিক শক্তির সাহায্যে চীনে অহিফেন চালাইতে নামিল।

চীন-সর্‌কার অহিফেনের প্রসারে ভীত হইয়া বার-বার ব্রিটিশ গবর্ণ্‌মেণ্ট্‌কে অনুনয় করিতে লাগিল—তোমরা এই বে-আইনী সর্ব্বনাশকর আফিমের ব্যবসা বন্ধ কর; চীনেদের সর্ব্বনাশ এমন করিয়া করিও না। কিন্তু কে কার কথা শোনে? ইংরেজ দেখিল চীন-সর্‌কারের শক্তি নাই যে তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে, তাই তাহার কথায় কর্ণপাত করার কোন প্রয়োজনই সে মনে করিল না। চীন-সর্‌কার যখন দেখিল যে, ইংরেজের ধর্ম্ম-বুদ্ধির ও নীতি-জ্ঞানের উপর দোহাই দিয়া কোন ফল নাই, তখন তাহারা নিজেরা উহার প্রতিকারে নামিল। অহিফেনের বাক্স ধরা পড়িলেই তাহারা তাহা চুন ও লবণ মিশ্রিত করিয়া নষ্ট করিতে লাগিল। ইংরেজ দেখিল বিপদ্—তাহার পাপ-ব্যবসায় ত বুঝি বন্ধ হয়! ফলে যুদ্ধ লাগিল। ইহাই প্রথম অহিফেন-সংগ্রাম নামে ইতিহাসে পরিচিত। হৃতশক্তি চীন হারিয়া হারিয়া ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে সন্ধি করিল। হংকং ইংরেজের হইল; ইংরেজ ২১০ লক্ষ ডলার খেসারৎও পাইল। ইহা ছাড়া ক্যাণ্টন্‌

আময়, ফু চৌ, নিং-পো ও সাংহাই এই কয়টা বন্দরে ভারতীয় অহিফেন আসিবার অনুমতি চীনকে দিতে হইল। ইহার পরে ১৫ বৎসর ধরিয়া ইংরেজ এই কয়টা বন্দরের মধ্য দিয়া চীনে অহিফেন চালাইতে লাগিল। চীন-সরকারের শত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া ইংরেজ-ব্যবসায়ীর সহায়তায় চীনে অহিফেন বিক্রী চলিতে লাগিল। আবার যুদ্ধ বাধিল। ইংরেজ আবার জিতিল। এবারও ৩০ লক্ষ ডলার খেসারৎ ও কতিপয় বন্দরে অহিফেন-আমদানির অনুমতি ইংরেজ পাইল। পরে ১৮৫৮ সালে সন্ধি-সর্ত্তে চীনে ভারতীয় অহিফেন আমদানি আইনানুমোদিত হইল। এমন করিয়াই খৃষ্টীয় ইংরেজ-সরকার চীনকে পাশ্চাত্য সভ্যতার অমৃত ফল খাওয়াইতেছে!

তাহার পর চীন বাধ্য হইয়া নিজেই অহিফেন উৎপন্ন করিতেছে—বৃথা কেন বিদেশীকে টাকা তাহারা দেয়। চীনের ভারতীয় অহিফেন এখন কমিয়া যাওয়া সত্ত্বেও ভারতে যে-পরিমাণ অহিফেন উৎপন্ন হয়, তাহা পৃথিবীর পক্ষে অনিষ্টকর। ভারতবর্ষে যে অহিফেন উৎপন্ন হয় তাহা সাধারণতঃ চতুর্ব্বিধ উপায়ে ব্যয়িত হয়:—

১। ভারতের বাহিরে চালান দিবার জন্য—কলিকাতায় নিলাম করা হয়;

২। ষ্ট্রেট্‌ সেট্‌লমেণ্ট্‌স্‌, হংকং, নেদারল্যাণ্ড্‌স্‌ ইণ্ডীজ্‌, শ্যাম, ব্রিটিশ নর্থ্‌ বোর্নিয়ো ও সিংহলে পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট চুক্তি-অনুসারে ভারত-সরকার বিক্রয় করেন;

৩। ভারতের ঔষধালয়গুলিতে ঔষধ-প্রস্তুতের জন্য বিক্রীত হয়;

৪। আব্‌গারী-বিভাগকে খুচ্‌রা বিক্রয়ের জন্য দেওয়া হয়।

উল্লিখিত তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে, ভারত-জাত অহিফেনকে দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। এক, বহির্ভারতে রপ্তানির জন্য, আর-এক, ভারতে ব্যবহারের জন্য।

অহিফেন হইতে মর্‌ফিয়া তৈয়ারী হয়; মর্‌ফিয়া অহিফেন হইতে অধিকতর উত্তেজক ও দামী। ভারত-সরকার বলেন যে, ভারতের অহিফেন হইতে ভারতে মর্‌ফিয়া তৈয়ারী হয় না। ভারতের অহিফেন হইতে শতকরা ৮ ভাগের বেশী মর্‌ফিয়া নিষ্কাশিত হয় না। সেজন্য ভারতের অহিফেন হয় আস্ত খাওয়া হয়, নয় তাহার ধূম পান করা হয়। এইরূপভাবে অহিফেন ব্যবহার করা যে অত্যন্ত মারাত্মক তাহা সাধারণ বুদ্ধিতেই সহজেই বোঝা যায়। চীনে নূতন করিয়া অহিফেন উৎপন্ন হইতেছে দেখিয়া, লণ্ডনের "টাইম্‌স্‌" পত্রে ৭ই এপ্রিল ১৯২৩ তারিখে অত্যন্ত দুঃখপ্রকাশ করিয়া লেখা হয়।—

In all countries with European civilisations, there are no two opinions as to the physical and moral ruin wrought by the consumption of these so-called "drugs of addiction."

—এই-সব মাদক দ্রব্য ব্যবহারে শারীরিক ও নৈতিক যে অবনতি ঘটে, সে-সম্বন্ধে ইয়োরোপীয় সভ্যতা-বিশিষ্ট কোন দেশেই ভিন্ন-মত নাই।

"টাইম্‌স্‌" পত্রের এই মত খাঁটী সত্য হইলেও ইহা যে নিঃস্বার্থতা-প্রণোদিত নহে, তাহা পাঠক-পাঠিকা নিঃসন্দেহে বুঝিয়াছেন। চীনে আফিম উৎপাদিত হইলে ইংরেজের মস্ত বড় একটা বাজার খসিয়া যায়, তাই এই মাছের শোকে বকের ক্রন্দন! ভারতের অহিফেনই যে সর্ব্বত্র ইংরেজ বিক্রয় করিয়া ভারতবাসীর তথা পৃথিবীবাসীর "শারীরিক ও নৈতিক ধ্বংস" (physical and moral ruin) সাধন করিতেছে—তাহা কি টাইম্‌স্‌ জানে না?

ভারতবর্ষ হইতে কোন্‌ বৎসরে কত অহিফেন রপ্তানি হইয়াছে তাহা নিম্নের তালিকা হইতে বোঝা যাইবে:—

১৯১৭-১৮—১৪,৪৯৯ বাক্স
১৯১৮-১৯—১২,৫০০ ,,
১৯১৯-২০— ৭,৪০০ ,,
১৯২০-২১— ৫,৮০০ ,,
১৯২১-২২— ৭,৫০০ ,,
১৯২২-২৩— ৯,০০০ ,, (এষ্টিমেট)

এক-এক বাক্সে ১৪০ পাউণ্ড প্রায় ১৷৹ মণ আফিম থাকে। ১৯১৯ হইতে ১৯২১ পর্য্যন্ত যে হ্রাস তাহার কারণ পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যবসায়ে মন্দা পড়িয়াছিল

বলিয়াই। পরে ১৯২১-২২ হইতে আবার বৃদ্ধি বেশ আরম্ভ হইয়াছে। ভারত-সরকারের ১৯২৩-২৪এর বজেট্ রিপোর্টেই উল্লেখ আছে—

"The Budget estimate for 1922-23 provided for the sale of about 6590 chests of opium for consumption outside India…owing to a better demand for opium in the Far East than was anticipated in the Budget…it is now estimated that 8836 chests will be disposed of in the current year. (G. of. I. Budget for 1923-24, p. 94).

রপ্তানির জন্য যে অহিফেন তৈয়ারী হয়, তাহার সমস্তই প্রতিবৎসরে রপ্তানি হয় না; কিছু-কিছু জমা করিয়া প্রতি বৎসরই রাখা হয়।

যে-সব দেশে, যে-পরিমাণ ভারতীয় অহিফেন রপ্তানি হয়, তাহার হিসাব নিম্নের তালিকায় পাওয়া যাইবে—

(বাক্সের সংখ্যা)

	১৯১৭-১৮	১৯১৮-১৯	১৯১৯-২০
ইংল্যাণ্ড্	৩০৫১	২৪০০	৯০০
সিংহল—			
সরকার	০	০	৬০
সাধারণ ব্যবসায়ী	৬০	৭০	০
ষ্ট্রেট্স্ সেটেল্মেণ্ট্—			
সরকার	৪৭৮৯	৩৯৬১	৩৭৫০
সাধারণ ব্যবসায়ী	৬৮৫	১৪২	২৭৫
হংকং—			
সরকার	৪০৫	৪৫০	৪৫০
সাধারণ ব্যবসায়ী	০	৫১	৩৬৯
ম্যাকাও—			
সাধারণ ব্যবসায়ী	৪৫০	৫০০	০
জাপান—			
সাধারণ ব্যবসায়ী	৯৭১	১,৯৩০	৯৮০
ইণ্ডোচীন—			
সাধারণ ব্যবসায়ী	৩০৫০	৩,৪৯০	৯৯৫
জাভা সরকার	১,৮০০	২,৪০০	২,০০০
শ্যাম—			
সরকার	৮৫০	১,৭৫০	১,৪০০
সাধারণ ব্যবসায়ী	৮০০	০	০
বৃটিশ উঃ বোর্ণিও—			
সরকার	২০	১৪০	১৪৪
মরিশাস—			
সরকার	০	০	১২
সাধারণ ব্যবসায়ী	১৫	৪২	২৩
বৃটিশ ওয়েষ্ট ইণ্ডীজ্—			
সাধারণ ব্যবসায়ী	১	০	০
নিউ সাউথ ওয়েলস্—			
সাধারণ ব্যবসায়ী	৫	০	০
ফিজি—			
সাধারণ ব্যবসায়ী	১	০	১
ব্রাজিল—			
সাধারণ ব্যবসায়ী	০	২	০

মোট বাক্স রপ্তানি হইয়াছে—

	৯১১৭-১৮	১৯১৮-১৯	১৯১৯ ২০
সাধারণ ব্যবসায়ী	৫,৭৩৮	৬,২২৭	২,৬৪৩
ঔপনিবেশিক ও অন্যান্য			
গবর্ণমেণ্ট্	৭,৮৬৫	৮,৭০১	৭,৮১৬
গ্রেট বৃটেন	৩,০৫১	২,৪০০	৯০০
একুন	১৬,৬৫৩	১৭,৩২৮	১১,৩৫৯

"সাধারণ ব্যবসায়ীদের" যে মাল দেওয়া হয় তাহাই যে পৃথিবীর সর্ব্বদেশে অবৈধ অহিফেন বিক্রয়ে ব্যয়িত হয়, ইহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। তাই মনে হয় ইংরেজ সরকার পৃথিবীতে অহিফেন সেবন-রূপ পাপ-প্রচারে একটুও দ্বিধা বোধ করে না।

রপ্তানি ব্যতীত ভারতে ব্যবহারের জন্য নিম্নপরিমাণে অহিফেন প্রস্তুত হইয়াছিল :—

১৯১৬-১৭—৮,৭৩২ বাক্স
১৯১৭-১৮ ৮,৫৬৭ "
১৯১৮-১৯ ৮,৫১২ "
১৯১৯-২০ ৭,২৮৯ "
১৯২০-২১— ৭,০৭৪ "
১৯২১-২২— ৫,৬২৮ "

ভারতে ব্যবহার্য্য অহিফেনের এক বাক্সে ১২৩ পাউণ্ড অহিফেন থাকে। এই অহিফেন ব্যতীত করদ রাজ্যগুলি হইতেও অহিফেন আসে। করদ রাজ্যগুলির মধ্যে মালব-রাজ্য হইতেই সবচেয়ে বেশী অহিফেন আসে। এই-সব অহিফেন বাহিরে রপ্তানি হয় না; ভারতেই ইহা ব্যবহৃত হয়। চীন যখন ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া পর্য্যন্ত দেখিল যে, পাশ্চাত্য অর্থগৃধ্নু সভ্যতার নিকট, ন্যায় ধর্ম্ম সত্য বলিয়া কোন বাচ-বিচার নাই, তখন বিদেশী অহিফেন কিনিয়া বিদেশে অর্থ-প্রেরণ অপেক্ষা নিজেই সেই অর্থ রাখিতে স্বদেশে অহিফেন-চাষ ভাল মনে করিল। ফলে ভারতীয় অহিফেন সেখানে রপ্তানি হওয়া বন্ধ হয়। মালব-রাজ্যে তাহার ফলে ৬০,০০০ বাক্স অহিফেন উদ্বৃত্ত থাকিয়া যায়। সদয় ইংরেজ রাজ মালবের এই দুরবস্থা ঘুচাইতে বৎসরে-বৎসরে কিছু-কিছু করিয়া ঐ অহিফেন নিজেরা কিনিয়া আমাদিগকে অহিফেন-খোর করিবার সুব্যবস্থা করিয়াছেন। ১৯১৬-১৭ হইতে ১৯২১-২২ পর্য্যন্ত কত বাক্স মালব-জাত অহিফেন ভারত-সরকার তাহাদের নিজের প্রজাকে অহিফেন-সেবী করিতে ঘরের টাকা খরচ করিয়া কিনিয়াছে, তাহা নিম্নে দৃষ্ট হইবে। (১২৩ পাউণ্ডে এক বাক্স)

১৯১৬-১৭—৫,২৫৭	বাক্স
১৯১৭-১৮—৪,৯১৬	"
১৯১৮-১৯—৫,৩১৪	"
১৯১৯-২০— ৫৯	"
১৯২০-২১— ৭৫৮	"
১৯২১-২২—২,২৯৭	"

মোট ১৮,৬০১ বাক্স।

অতএব, দেখা যাইতেছে ৬০,০০০ উদ্বৃত্ত বাক্সের মধ্যে এখনও ৪১,৩৯৯ বাক্স ভারত সরকার আমাদের জন্য কিনিয়াছেন। সাধু!

এতদ্ব্যতীত যুক্ত-প্রদেশের অহিফেন-চাষের ঘাটতি কমাইবার জন্য বিশেষ-বিশেষ নির্দ্দিষ্ট স্থানে অহিফেন-চাষ হয় (ইণ্ডিয়া হাউস্ হইতে প্রকাশিত "The Truth about Indian Opium, p. 7 দ্রষ্টব্য)। ভারত-সরকার সে অহিফেনও ভারতবাসীদের জন্য কেনেন। তাহার পরিমাণ নিম্নে দৃষ্ট হইবে:—

১৯১৬-১৭—২,২২৬	বাক্স
১৯১৭-১৮—২,৩১৫	"
১৯১৮-১৯—১,২০০	"
১৯১৯-২০—১,৮০৩	"
১৯২০-২১—৬,৫০৭	"
১৯২১-২২—৮,৭২০	"

মোট ২২,৭৬৮ বাক্স

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, এক ভারতবাসীকে অহিফেন-সেবনরূপ সৎকার্য্যে যোগান দিতে ভারতের সদয়-হৃদয় ইংরেজ ভাগ্য-বিধাতারা গত ছয় বৎসরে নিজেদের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত ৪৫,৮০২ বাক্স, মালব ও অন্যান্য করদ রাজ্য হইতে প্রাপ্ত ৪১,৩৬৯ বাক্স, একুনে ৮৭,১৭১ বাক্স, অর্থাৎ ৪,৭৮৬ টন (১ টন প্রায় ২৭ মণ ৯ সের) অহিফেন ভারতবাসীকে খাওয়াইবার পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছেন!

সমগ্র পৃথিবী জুড়িয়া অহিফেন প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হইতেছে, বৃটিশ-রাজের উপর তাহার সফলতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। কারণ পৃথিবীর মধ্যে ইংরেজাধিকৃত ভারতবর্ষেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক-পরিমাণে অহিফেন জন্মে। এই অহিফেন-চাষ বন্ধ না করিলে, রাজশক্তি কোন আইন পাশ করিয়া অহিফেন-প্রচার বন্ধ করিতে পারে না।

অহিফেনের বিরুদ্ধে প্রথম সংগ্রাম সুরু করিবার বিপুল গৌরব যুক্ত-রাষ্ট্রের। প্রেসিডেণ্ট ট্যাফ্ট্ ১৯০৯ সনে সাংহাই সহরে আন্তর্জাতিক অহিফেন-সংসদ্ আহ্বান করেন। পরে সে-বৎসরে সেপ্টেম্বর-মাসে হেগ্ সহরে উহার আর-এক অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে অহিফেন-সম্বন্ধে প্রথমে কতকগুলি বিধি-নিষেধ লিপিবদ্ধ হয়; উহাই The Hague Opium Convention নামে বিখ্যাত। ১৯১২ সনে ২৩শে জানুয়ারি গ্রেটবৃটেন, জার্ম্মেনী, ফ্রান্স, ইতালী, হল্যাণ্ড, পর্ত্তুগাল, রুশ, চীন, জাপান, শ্যাম, পারস্য ও যুক্তরাষ্ট্র উহাতে সম্মত হইয়া

সহি করেন। ১৯১৩ ও ১৯১৪ সনে ইহার আরও দুই অধিবেশন হয়।

যে-সব রাষ্ট্র অহিফেন-ব্যবসায়ী তাহারা নিজেদের স্বার্থ যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা হেগে করে। গ্রেটবৃটেন একদিকে যেমন সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান্ রাষ্ট্র, অপর দিকে পৃথিবীতে সেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকপরিমাণে অহিফেন উৎপন্ন করে। ফলে তাহার চেষ্টায় অহিফেন-সম্বন্ধে যে নির্দ্ধারণ হয় তাহা দ্বারা জগতে অহিফেন-নিবারণের যে কোন সহায়তাই হইবে না, ইহা স্বতঃই বোঝা যায়। এই নির্দ্ধারণের দ্বিতীয় অধ্যায় ৬ষ্ঠ সর্ত্তে আছে—"The high contracting parties shall take measures for the gradual and effective suppression of the manufacture of, internal trade in, and use of prepared opium, with due regard to the varying circumstances of each country concerned. unless regulations on tho subject are already in force." (Chap. II. Art. 6).

—বৃহত্তম শক্তিগুলি ধীরে ধীরে এবং নিশ্চিন্তভাবে অহিফেন-প্রস্তুত, উহাতে ব্যবসায় এবং অহিফেন-জাত অন্যান্য দ্রব্য নিজ নিজ দেশের অবস্থা বুঝিয়া বন্ধ করিবার জন্য—যদি কোন আইন না থাকে তবে—আইন প্রণয়ন করিবেন।

এই সর্ত্ত অর্থহীন। "Gradual" 'ক্রমে ক্রমে,' 'ধীরে ধীরে' শব্দটা ভুয়া কথা ব্যতীত আর কিছুই নয়। একটা নির্দ্দিষ্ট সময় উল্লিখিত না হওয়াতে এই সর্ত্তের সকল উপযোগিতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। স্বার্থ বড় বিষম 'চীজ্'। এই স্বার্থের লোভেই ইংরেজ-রাজ আমাদের Responsible Government বা স্বায়ত্ত শাসন "Gradual"-ভাবে—ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে দিতেছেন; অহিফেন-প্রচার বন্ধও ঠিক সেইরূপ ধীরে ধীরে করিতেছেন। এক পাউণ্ড, অর্দ্ধসের করিয়া বৎসরে অহিফেন-চাষ কমাইলেও ত ঐই সর্ত্তের অঙ্গীকার বজায় থাকে। ১৯২১-২২ সালে ভারতে ব্যবহৃত হইয়াছে ২০,৩৫০,৩৫ পাউণ্ড অহিফেন। এক পাউণ্ড করিয়া যদি সদয়-প্রাণ ভারতের ভাগ্য-বিধাতারা এই অহিফেন-চাষ কমান, তবে মাত্র ২০ লক্ষ বৎসর এই অহিফেন-ব্যবসা একেবারে বন্ধ হইতে লাগিবে, কিন্তু অঙ্গীকার ত ঠিক রাখা হইবে!

এইরূপ আর একটি সর্ত্ত-নির্দ্ধারণের ২য় অধ্যায়ের ৭ম সর্ত্ত :—

"The contracting powers shall prohibit the importation and exportation of prepared opium; however. those nations which are not yet ready to prohibit the exportation of prepared opium at once. shall prohibit such exportation as soon as possible.

—সর্ত্তে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগণ স্ব-স্ব রাষ্ট্রে অহিফেন হইতে প্রস্তুত দ্রব্যাদির আমদানি ও রপ্তানি বন্ধ করিবেন। তবে যে-সব রাষ্ট্র উহা বর্ত্তমানে বন্ধ করিতে রাজি নহেন, তাঁহারা যত শীঘ্র হয় তাহা করিবেন।

এই সর্ত্তটিও যে 'আইনের ফাঁকি' ব্যতীত অন্য কিছু নহে, তাহা একটু বিচার করিলেই দেখা যায়। অহিফেন হইতে প্রস্তুত কোন দ্রব্যই (অর্থাৎ মর্ফিয়া প্রভৃতি) বর্ত্তমানে আর কেহ রপ্তানি করে না। কাঁচা অহিফেনই বর্ত্তমানে রপ্তানি করা হয়, এবং যে-সব রাষ্ট্রে উহা বিক্রীত হয়, তাহারাই উহাকে মর্ফিয়া ইত্যাদিতে পরিণত করিয়া লয়। হংকং, সিঙ্গাপুর, সেইগন, ম্যাকাও প্রভৃতি সুদূর প্রাচ্যের (Far East) সর্ব্বত্রই অহিফেনকে মর্ফিয়া প্রভৃতিতে পরিণত করার কারখানা আছে। তাই তাহারা কেহই অহিফেন-জাত দ্রব্যাদি আমদানি করে না। এইরূপেই হেগ-নির্দ্ধারণের ৭ম সর্ত্তকে বজায় রাখা হইয়াছে। স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রদের যদি সত্যসত্যই অহিফেন-পাপ নিবারণের জন্য আন্তরিক ইচ্ছা থাকিত, তাহা হইলে তাহারা কাঁচা অহিফেন রপ্তানি ও আমদানির বিরুদ্ধেই সর্ত্ত করিত।

গোঁজা-মিল দেওয়ার একটা গুপ্ত ইচ্ছা এইরূপ কতক-গুলি সর্ত্তের মধ্য দিয়াই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ইংরেজই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় অহিফেন-ব্যবসায়ী; ইংরেজই স্বাক্ষরকারী শক্তিগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান্। তাই ন্যায় ও ধর্ম্ম বাঁচাইতে যে

সর্ত্ত হইয়াছে, তাহা ইংরেজের তথা প্রাচ্য উপনিবেশে প্রাচ্য-"কুলি"-নিয়োগ-কর্ত্তা পাশ্চাত্য জাতিগুলির স্বার্থকে সর্ব্বভাবে সংরক্ষিত করিয়াই প্রণীত হইয়াছে।

গত মহাযুদ্ধের পরে (League of Nations) আন্তর্জাতিক বৈঠক অহিফেন সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক বিষয়ও নিজের আলোচ্য বিষয়গুলির অন্তর্ভুক্ত করিয়া সে-সম্পর্কে এক পরামর্শ-সমিতি গঠন করে (Advisory Committee on the Traffic in Opium)। এই সমিতি একটি স্থায়ী সঙ্ঘ। ইহার অধিবেশন নির্দ্দিষ্ট সময়ে হয় এবং অহিফেন-সম্পর্কিত বিষয়ে ইহা যে-সব তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন করিয়াছে তাহা মূল্যবান্। জেনেভা-সহরে আগামী নভেম্বর মাসে ইহার এক অধিবেশন হইবে। এই সমিতির কায্য কেবল লীগ্-অব্-নেশনের কাউন্সিলকে অহিফেন-ঘটিত বিষয়ে পরামর্শ-দান ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। বস্তুতঃ লীগ্-অব্-নেশনের সাধারণ সভার (Assembly) সভ্যদের সর্ব্বসম্মতি ব্যতীত এই তদন্ত-সমিতির নির্দ্ধারণগুলি ফলবান্ হওয়ার কোন আশাই নাই। তবু পৃথিবীর লোকেরা এই সমিতি হইতে অহিফেনের অপকারিতা-বিষয়ে বহু জ্ঞান লাভ করিতে পারে বলিয়া ভবিষ্যতে ইহা হইতে সুফল পাওয়ার আশা আছে।

যে-সকল রাষ্ট্রগুলির স্বার্থ অহিফেনের বিস্তৃতিতে, তাহারা স্বভাবতই এই তদন্ত সমিতির কার্য্যাবলীকে বাধা দিতেই চেষ্টা করিবে। তবে নেহাৎ চক্ষু-লজ্জার সঙ্কোচেই এই বাধা অতি সুকৌশলে দিতে হয়। নহিলে সভ্যতার মুখোস্ থাকে না। ১৯২১ সালে বৈঠকের সাধারণ অধিবেশনে চীন-প্রতিনিধি মিঃ ওয়েলিংটন প্রস্তাব আনেন—

"That in view of the world-wide interest in the attitude of the League toward the opium question, and of the general desire to reduce and restrict the cultivation and production of opium to strictly medicinal and scientific purposes, the advisory committee on traffic in opium be requested to consider and report, at its next meeting, on the possibility of instituting an enquiry to determine approximately the average requirements of raw and prepared opium specified in chapters I and II of the convention for medicinal and scientific purposes in different countries (Excerpts from League of Nations, Annex. 228 to the minutes of the 13th Session of the Council held at Geneva from Friday June 17, to Tuesday, June 28, 1921)

—অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বৈঠকের অহিফেন-সমস্যা-সম্বন্ধে মনোযোগ থাকা-হেতু এবং "কেবল চিকিৎসা ও বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনের জন্য" অহিফেন বাদ দিয়া উদ্বৃত্ত অহিফেন-চাষ ও প্রস্তুত বন্ধ করার জন্য চতুর্দ্দিকে আন্দোলন-হেতু অহিফেন-ব্যবসায়-সম্পর্কিত সমিতিকে অনুরোধ করা হউক যে, তাহার আগামী অধিবেশনে পৃথিবীতে সকল দেশে কাঁচা অহিফেন ও তজ্জাত দ্রব্যাদি কেবল চিকিৎসা-কার্য্য ও বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনের জন্য কি-পরিমাণ আবশ্যক ইহা নির্দ্ধারণ করিতে এক কমিশন বসাইবার প্রয়োজন স্থির করা হউক।

এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অহিফেন-স্বার্থ-বিশিষ্ট সকল জাতিই প্রথমে দণ্ডায়মান হওয়াতে ইহা গোড়াতেই মারা যাইতে বসিয়াছিল। ভারতের ইংরেজ-সরকারের প্রতিনিধি, ভারতের প্রতিনিধি-পরিচয়ে, মিঃ শ্রীনিবাস শাস্ত্রী এই সুন্দর প্রস্তাবটির কয়েকটি শব্দের অদল বদল করিয়া ইহার প্রয়োজনীয়তা একরূপ বিনষ্ট করিলে পর তবে ইহা য্যাসেম্বলীতে গৃহীত হয়। তিনি "strictly" (কেবল) কথাটি উঠাইয়া দেন এবং "medicinal and scientific" (চিকিৎসা ও বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনের) স্থলে "legitimate" (আইনানুমোদিত) এই কথাটি বসান। শেষে এই সংশোধিত প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়। 'চিকিৎসা ও বৈজ্ঞানিক প্রয়োজন' শব্দগুলির পরিবর্ত্তে আইনানুমোদিত কথা বসানোতে মিঃ কু'র প্রস্তাবটির সকল উপকারিতাই নষ্ট হইয়া যায়। কারণ

ভারতবর্ষ ও হংকং প্রভৃতি প্রাচ্যের পাশ্চাত্যরাষ্ট্রগুলির অধীন দেশে অহিফেন মফিয়ার ধূমপান ও কাঁচা গিলিয়া খাওয়া আইন-সঙ্গত। অথচ এই "আইন-সঙ্গত" ব্যবহার দেশের ও জাতির পক্ষে সর্ব্বনাশকর। যদি "কেবল চিকিৎসা ও বৈজ্ঞানিক প্রয়োজন ভিন্ন" অহিফেন ও তজ্জাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত হওয়া "বৈঠক" হইতে নিষিদ্ধ হইত, তবে সর্ব্বত্র অহিফেন-চাষ কমিয়া যাইত। কিন্তু বর্ত্তমান প্রস্তাব অনুসারে তাহা আর হইবে না।

একজন "দেশহিত-ব্রতী" শিক্ষিত ভারতবাসী কর্ত্তৃক যে এরূপ প্রস্তাব উত্থাপিত হইতে পারে, তাহা পৃথিবীর সমক্ষে ভারতবাসীর আত্ম-মর্য্যাদা-জ্ঞান-হীনতা প্রচার করিয়াছে। মিঃ শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ইংরেজ-সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া যে নিজ স্বাধীনচিত্ততাকে জলাঞ্জলি দিতে একটুও ইতস্ততঃ করেন নাই—ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা ব্যথার ও দুঃখের কথা! "Servant of India Society"র সভাপতির পক্ষে ইহা অপেক্ষা কলঙ্ককর ব্যবহার যে আর কি হইতে পারে তাহা জানি না! অহিফেন আমাদের দেশের যে কি ভীষণ সর্ব্বনাশ করিতেছে তাহা সম্যক্ জানিয়াও মিঃ শাস্ত্রী এই প্রস্তাব আনয়ন করিয়া দেশের অতিবড় শত্রুর কর্ম্মই করিয়াছেন।

মিঃ শাস্ত্রীর এই কীর্ত্তির পর অ্যামেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্র দেখিলেন যে, তাঁহারা সাংহাইতে যে মানব-কল্যাণের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা স্বার্থান্ধ ব্রিটিশ-সরকারের কূট-নীতিতে ধ্বংস হইতে বসিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র ইওরোপের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের সহিত সংলিপ্ত থাকিতে ইচ্ছুক নহেন বলিয়া তাঁহারা আন্তর্জাতিক বৈঠকে যোগদান করেন নাই। কিন্তু অহিফেন-সমস্যা সুষ্ঠুরূপে সমাধান না হইলে তদ্দ্বারা মানব-সমাজের প্রভূত অকল্যাণ সাধিত হইবে বলিয়া তাঁহারা সাংহাই কন্‌ভেন্‌শনের আহ্বায়ক বলিয়া লীগ্ অব্ নেশনের অহিফেন-শাখাতে যোগ দিবার দাবি করিলেন। লীগ্ তাহাতে স্বীকৃত হইলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ অহিফেন-বৈঠকে যোগ দিয়াছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থা-পরিষদের সভ্য (House of Representatives) মিঃ পোর্টারের নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ গত বৎসর মে মাসে জেনেভায় উক্ত বৈঠকে যোগ দেন। তাঁহারা খুব খোলাখুলিভাবে তাঁহাদের মতামত উক্ত বৈঠকে প্রকাশ করেন।

তাঁহারা বলেন যে, হেগ্-বৈঠকের নির্দ্ধারণকে যদি সরল-ভাবে কার্য্যে পরিণত করার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে কেবল চিকিৎসা-কার্য্য ও বৈজ্ঞানিক প্রয়োজন ব্যতীত অন্য-কোন-ভাবে অহিফেন ও তজ্জাত দ্রব্যাদির ব্যবহারকে আইন-সঙ্গত বলা অত্যন্ত অন্যায়। দ্বিতীয়তঃ এই-সব দ্রব্যাদি যাহাতে অন্যায়ভাবে ব্যবহৃত না হয় সেজন্য চিকিৎসা ও বৈজ্ঞানিক কার্য্যাদিতে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুর বেশী অহিফেন যাহাতে পৃথিবীতে উৎপন্ন না হয়, তাহা দেখিতে হইবে। মিঃ পোর্টারের এই স্পষ্ট কথায় স্বার্থপর রাষ্ট্রগুলি যে নানা বাধা উত্থাপিত করিয়াছিল, তাহা সহজেই বোঝা যায়। প্রথমে এক চীন ছাড়া সকল রাষ্ট্রই আমেরিকার প্রস্তাবগুলির বিপক্ষে দাঁড়ায়। পরে আস্তে আস্তে সকল রাষ্ট্রই মিঃ পোর্টারকে সমর্থন করে। কেবল এক ভারতের ইংরেজ-সরকারই ইহার বিপক্ষে শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া আছেন। ভারতের পরম হিতৈষী কর্ত্তাদের অভিমত এই যে, অহিফেন-খাওয়া ভারতবাসীর পক্ষে মোটেই অনিষ্টকর নহে। বরং চিকিৎসকের অভাব-হেতু সাধারণ লোকে অহিফেনকে ঔষধ-রূপে ব্যবহার করে এবং তাহাতে তাহারা উপকৃতই হয়।

কোন সভ্য শিক্ষিত জাতি যে এরূপ কথা প্রকাশ্য সভায় পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিতে পারে—ইহা আমাদের ধারণাতেই আসে না। পৃথিবীর সর্ব্বত্র চিকিৎসকদের অভিমত এই যে, সাধারণতঃ লোকে যে-সব বিভিন্ন উপায়ে অহিফেন ব্যবহার করে তাহার মধ্যে অহিফেন গুলি পাকাইয়া খাওয়াটাই শরীর ও মনের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকর। আর ভারতবর্ষে এইভাবেই অহিফেন ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীর সকল দেশের লোকের শরীরের পক্ষে যাহা অনিষ্টকর, এই রুগ্ন শীর্ণ দীন ক্ষুধা-পীড়িত জাতির তাহাতে কোন অনিষ্ট হয় না—ইহা অপেক্ষা বিস্ময়কর বাণী কোন দেশে কখনও উচ্চারিত হইয়াছে বলিয়া জানি না।

ভারতের ইংরেজ "ট্রাষ্টী"রা ভারতবাসীর শারীরিক স্বাস্থ্য-রক্ষার্থে অহিফেন-ব্যবহার-সম্পর্কে না হয় অত্যন্ত

মনোযোগী ; কিন্তু তাঁহারা ভারতের বাহিরে বৎসর বৎসর এত অধিকপরিমাণে অহিফেন কেন রপ্তানি করেন? স্বার্থ-প্রণোদিত না হইলে এই রপ্তানী-বাণিজ্য নিশ্চয়ই তাঁহারা বন্ধ করিতেন।

আগামী নভেম্বর মাসে জেনেভাতে লীগ্ অব্ নেশনের অহিফেন-শাখা-সমিতির অধিবেশন হইবে। এই অধিবেশনে ইংরেজ-সরকারের মনোনীত প্রতিনিধি যে ভারতবাসীর মনোনীত প্রতিনিধি নহে, ইংরেজ-সরকারের অহিফেন-নীতি যে দেশের সকল স্বার্থের ও কল্যাণের পরিপন্থী,—ইহা বুঝাইবার জন্ম আমাদের এক বা ততোধিক প্রকৃত প্রতিনিধি পাঠান অত্যন্ত প্রয়োজন। পৃথিবীর সকল জাতির নিকট ইংরেজ-সরকারের এই স্বার্থ-প্রণোদিত জাতির-পক্ষে-অমঙ্গলকর নীতির কথা প্রকাশ করিবার জন্ম আমাদের প্রতিনিধি পাঠান অত্যন্ত প্রয়োজন। অহিফেন ইত্যাদিতে দিন-দিন যে-ভাবে জাতির জীবনী-শক্তি হ্রাস পাইতেছে, তাহাতে শীঘ্রই অহিফেন-চাষ কমান ব্যতীত উপায় নাই। পৃথিবীর অন্য সকল রাষ্ট্রের চাপে ইংরেজের এই স্বার্থ-লিপ্সা ধ্বংস করিতেই হইবে—এই পাপ-ব্যবসায় হইতে ইংরেজকে তথা সমগ্র ভারতবাসী ও পৃথিবীবাসীকে রক্ষা পাইতে হইবে।

বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত য্যাণ্ড্রুজ পৃথিবীতে মানব-হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া পরিচিত ; তাঁহাকে আগামী জেনেভা-অধিবেশনে পাঠান একান্ত প্রয়োজন। যুক্তরাষ্ট্র-অধিবাসী অধ্যাপক তারকনাথ দাসও এ-সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়াছেন এবং বিশ্ব-রাজনীতি-ক্ষেত্রে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁহাকেও শ্রীযুক্ত য্যাণ্ড্রুজের সহকারীরূপে পাঠান আবশ্যক। হয়ত অধিবেশনে তাঁহাদের ঠাঁই মিলিবে না, কিন্তু যে-সব রাষ্ট্র অহিফেনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে তাহারা ইংরেজ-সরকারের ভারত-প্রতিনিধিদের কথার অসারতা প্রতিপাদন করিতে ইঁহাদের সাহায্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গ্রহণ করিবে। কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির প্রধান কর্ত্তব্য যে তাঁহারা ইঁহাদের বা অন্য কাহাকেও প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিয়া জেনেভায় পাঠান। জাতীয় মহাসভার প্রতিনিধি বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সমকক্ষ বলিয়া আইনতঃ না হইলেও ন্যায়তঃ গৃহীত হইবেনই।

আমাদের কার্য্যকরী শিক্ষা

আজকাল আমাদের শিক্ষিত যুবকদের অনেকেই নানা কারণে উচ্চদরের যন্ত্র ও শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে ব্যগ্র। ইহা যে দেশের পক্ষে আশার কথা, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতের মোট শিক্ষিতের সংখ্যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অপর চারিটা রাজ্যের শ্বেতকায় শিক্ষিত অধিবাসীর সমষ্টির চেয়ে আজকাল বেশী হইলেও, এই বিজ্ঞান-শিল্প-চর্চ্চায় শিক্ষিত ভারতবাসী এত পিছনে পড়িয়া আছে যে, ভাবিলে হতাশ হইতে হয়। ইহার অন্যতম কারণ, দেশের বেশীর ভাগ ভালো ছেলে কেবল কাব্য-দর্শনের সুধাপান করিতে এখন ব্যাকুল। আর যে-সব ছেলে হয়ত এইসব বৈজ্ঞানিক কাজেই উন্নতি করিবার আশা করিয়াছিল তাহারা অনেকে নানা ক্ষমতা থাকিতেও মাট্রিক্ স্কুলে বিদেশী ভাষাতে ব্যুৎপত্তির অভাবে একেবারে অকর্ম্মণ্য উপাধি পাইয়া ছাত্র-জীবন হইতে অবসর লইতে বাধ্য হয়। কার্য্যকরী বিজ্ঞান-শিক্ষা দেশের শক্তি ও সম্পদের প্রধান সহায়। জার্ম্মানীর বর্ত্তমান বিশৃঙ্খলা ও দুর্দ্দশা সত্ত্বেও সে-দেশে এখনও Flame Throwerএর বলে ফুলের গাছেও পোকা লাগিতে পারে না। আর আমাদের বাংলায় প্রত্যহ এক ম্যালেরিয়া রাক্ষসীই একহাজার লোক গ্রাস করিতেছে। আমাদের উদ্যমশীল ছাত্রদের সাহস শক্তি কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা বিকাশের ক্ষেত্র চাই। বিজ্ঞানকে

দশের কাজে, দেশের কাজে কেমন করিয়া লাগাইতে হয়, তা তাহাদের শিখিতে হইবে, তবেই সেই সঙ্গে তাহারা কেরানী-গিরি, ম্যালেরিয়া ও অজীর্ণ-অম্লের হাত হইতেও রক্ষা পাইবে। আপাততঃ পানের বাটা, ফুলের মালা, তব্‌লা বাঁয়া ও বিশেষ করিয়া আলস্যকে দূরে রাখিতে শিখিতে হইবে। একাজে যতই বিলম্ব হইবে, ততই ছাত্রদের শক্তি ও উদ্যম অনেকস্থলে স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক উপায়ে নষ্ট হইতে থাকিবে।

উচ্চদরের বিশুদ্ধ বিজ্ঞানপাঠের চেয়ে আপাততঃ শ্রমশিল্প-সংক্রান্ত অন্যান্য ফলিত বিজ্ঞানের যথার্থ শিক্ষা বেশী আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। জাতির উত্থানের সঙ্গে শুধু এই একটা অঙ্গের বিকাশ আংশিকভাবে সম্ভব হইবে কি? আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, মহারাজা মণীন্দ্র নন্দী ও আরও দু'চারজন বাংলার সুসন্তান এদিকে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। কিন্তু যাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় অগ্রণী ছিলেন, তাঁহাদের বেশীর ভাগ এদিকে তেমন নজর দেন নাই। দেশের হাওয়া এখন এদিকে সামান্যরূপ অনুকূল। তাই গুটিকতক পুরানো বাজে কথা বলিতে সাহসী হইতেছি।

(১) কার্য্যকরী বিজ্ঞান- ও যন্ত্র-নির্ম্মাণ-বিদ্যা- শিক্ষার ক্ষেত্র ও প্রাথমিক শিক্ষাদানের প্রণালী অতি সঙ্কীর্ণ ও অনুপযোগী। যেসব ছাত্র যন্ত্র-শিল্পাদির কাজে যাইবেন, তাঁহাদের সে-বিষয়ে শিক্ষার আরম্ভ অন্ততঃ চৌদ্দ বছর বয়স হইতে সুরু হওয়া চাই। অভিনব সরল যন্ত্রাদির সঙ্গে তখন হইতেই ঘনিষ্ঠ পরিচয় চাই। যন্ত্র-অঙ্কন, যন্ত্রবিজ্ঞান, পদার্থ-বিদ্যা ও রসায়নের প্রথম ভাগ মাট্রিক্‌ পরীক্ষার ছাত্রদের ইচ্ছামত পড়িবার অধিকার থাকিলে মন্দ হয় না। অবশ্য বাংলা ভাষাতে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিতে হইবে! তবে যেসব শব্দ বাংলাতে নাই, সেই-সব বৈজ্ঞানিক শব্দ সব প্রদেশের পণ্ডিতরা মিলিয়া "হিন্দী"তে অনুবাদ করিয়া ভারতের সর্ব্বত্র চালাইতে পারিলে চমৎকার হয়। এখন মাদ্রাজী, মারাঠী বা পাঞ্জাবীর সঙ্গে কথা কহিতে হইলে আমাদিগকে বিদেশী ভাষার আশ্রয় লইতে হয়। এ কি লজ্জার কথা! আশা করি, অতি শীঘ্র ভারতের সব প্রদেশে হিন্দী অবশ্য পাঠ্যরূপে শিখান হইবে।

যদি শিল্প-বিজ্ঞানের পৃথক্‌ বিদ্যালয় ও কলেজ হয়, তবে সেগুলি প্রথমে শিক্ষিত ও উচ্চসমাজে বেশ আদৃত হওয়া চাই।

বি-এস্‌সি, এম-এস্‌সি পাশ করিবার পর আমাদের অনেকে আশা করেন যে দু'-এক বৎসর বিদেশে বা দেশে খাটিয়া একটা যেমন-তেমন ইঞ্জিনিয়ার না হইয়া নিরস্ত হইব না। কিন্তু এই শিক্ষাতে সচরাচর তাঁহারা আসল কার্য্য-ক্ষেত্রে সনাতন কলম-পেষা ছাড়া বড় কিছু করিতে প্রায় পারেন না। যখন বিশ, বাইশ বা চব্বিশ বছরের সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিঞ্জরা-পোল ছাড়িয়া বাহির হই, তখন আমরা ড্রয়িং বোর্ড বা ষ্টীম্‌ টরবাইন্‌ (বাষ্প প্রবাহ-চালিত শয়ানচক্র) কিরূপ দেখিতে, তাহাই অনেক বৈজ্ঞানিক জানে না। বোধ হয় ভাল করিয়া পেন্সিল কাটিতে হইলেও মাথা ধরে,—কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার হইবার তীব্র বাসনাটা থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পরীক্ষা পাশ করিবার পর আবার সাত বৎসর অন্ততঃ পাঁচ বৎসর কারখানাতে শিক্ষানবীশের জীবনে যে কষ্ট-সহিষ্ণুতা, উদ্যম ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার দরকার, তাহা অনেকেরই থাকে না। অর্থ-উপার্জ্জনেরও অনেকেরই প্রয়োজন হয়। ইংলণ্ডে বার তের বৎসরের ছেলে-মেয়ে স্কুলে যন্ত্র-পাতি আঁকিতে শেখে,—আর রসায়ন, পদার্থ-বিদ্যা ও যন্ত্র-বিজ্ঞানের প্রথম-ভাগ সুরু করে। ছেলেরা বাড়ীতে ছোট ছোট, ল্যাবোরেটারী খুলে। অনুবীক্ষণ ফোটো ক্যামেরা, রাসায়নিক আগার ও ছবি আঁকিবার যন্ত্র-পাতি বাড়ীতে অনেক ছেলেরই আছে।

(২) এই জাতীয় স্কুল ও কলেজের বিজ্ঞানাগার ও কারখানার যন্ত্র-পাতি ও সাজ-সরঞ্জামের সাধারণ স্কুল-কলেজের চেয়ে অনেক বেশী অর্থ ও সময় আবশ্যক। অন্ততঃ দু'টি-একটির প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ এখন দেশের লোক দিতে রাজি হইবে, আশা করা যায়।

কলিকাতার অতি সন্নিকটে গোটাদুই বড় শিল্প-বিজ্ঞানের কলেজ ও কারখানা অবিলম্বে সুরু হওয়া চাই। তাহাতে জাহাজ, এরোপ্লেন, রেলের ইঞ্জিন, তড়িতাগার'

ও সাধারণ কলকব্জার (Machinery) নিৰ্ম্মাণ, পরিচালন ও সংস্কার-শিক্ষা দেওয়া হইবে। জলীয় বাষ্পের পুরানো ইঞ্জিন, রেলগাড়ী চালান ও কারখানাতে ছোট দু'চারটি মোটামুটি কাজের জন্যই শুধু ব্যবহার হয়। বড় জাহাজে জলীয় বাষ্পের ব্যবহার হয় ষ্টীম্ "টারবিনে"—তাহার কার্য্য-প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কিন্তু মোটর-বোট, টর্পেডো, ল্যাঞ্চ, সাব্‌মেরীন্ বোট ইত্যাদিতে তেল ও গ্যাসই সব শক্তি সরবরাহ করে। আমেরিকা ত দু'-একটা বড় যুদ্ধজাহাজ শুদ্ধ তড়িতের শক্তিতেই চালাইতেছে। এরোপ্লেনের চারিশত অশ্ব-শক্তি অতি সাধারণ,—ঘণ্টাতে ৭৫ মাইল বেগ। তাহা এত হাল্কা যে প্রতি অশ্ব-শক্তি পিছুমাত্র এক-সের দেড়-সের ওজন। শুধু ইঞ্জিনটিতে ১১০০।১২০০ বিভিন্ন অঙ্গ আছে। এ-সব শিক্ষা কত সময়- ও সাধনা-সাপেক্ষ তাহা সহজেই অনুমেয়।

কারখানাতে অন্ততঃ পাঁচ বৎসর হাতে কাজ না করিলে কেউ কোথাও বিশ্বাস-যোগ্য কাজ দেয় না। গরীব দেশের মাত্র কয়েকজন যোগ্য ছাত্র য়ুরোপ-আমেরিকাতে শিক্ষার্থে যাইবার সুযোগ পায়। আর বিদেশী হাওয়ার মাঝে শিক্ষার তুলনাতে অসুবিধাও নিতান্ত কম নয়। সুতরাং দেশেই এখন য়ুরোপ, আমেরিকা হইতে দু'চার জন অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক কারিগর আনিয়া বেশী অর্থ খরচ করিয়া এইরূপ কলেজ-পত্তন, প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষাদানের জন্য কয়েক বৎসর রাখিতে হইবে। কাজ এখন সুরু হইলে প্রথম কারিগরদল কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করিবে বছর আট-দশ পরে। কাজেই বিলম্ব করা সঙ্গত হইবে না বোধ হয়।

দুঃখিনী বাংলা মায়ের কোলে জন্মিয়া আমরা আত্মরক্ষায় অস্ত্র-ধারণের অযোগ্য বলিয়া আরো কতকাল মানুষের সবচেয়ে বড় অপমান সহ্য করিব তা অন্তর্য্যামীই জানেন। কিন্তু আমাদের যে শুধু চোগা-চাপ্‌গান পরিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে কেরানীগিরি করিতে হইবে, অভাব, ব্যাধি, দুশ্চিন্তা, ও কাপুরুষতাতে পচিয়া-পচিয়া রুগ্ন হীন ক্রীতদাসের মত মরিতে হইবে, তাও বোধ হয় আর বিশ্বনাথের অভিপ্রেত নয়।

—প্রবাসী ছাত্র

ছুরী- ও বাঁক-খেলা

শ্রী পুলিনবিহারী দাস

বিভিন্ন অসৎ অভিসন্ধি-হেতুই দুর্বৃত্তগণ ছুরী ও বাঁকের প্রয়োগ করিয়া থাকে ; কিংবা নিশীথে অথবা নির্জ্জন স্থানে ভয় প্রদর্শন করাইয়াও, হীনচেতা চোরগণ নিঃসহায় পথিকগণ হইতে ধন-সম্পত্তি কাড়িয়া লয়। তাই ছুরী ও বাঁক খেলায় সুদক্ষ হইতে পারিলেই ঐসমস্ত দুর্বৃত্তগণের দুষ্ট চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া সম্পূর্ণরূপে আত্মরক্ষা সম্ভব হইতে পারে। বিশেষতঃ রমণীগণ ছুরী খেলায় সুদক্ষ হইলে, এবং ছুরী কিংবা ভোজালী আদি তাহাদের সঙ্গে থাকিলে পাষণ্ডগণ আর কদাচ তাহাদের প্রতি পৈশাচিক অত্যাচার করিতে সাহস করিবে না। এইরূপ কল্পনা করিয়াই ছুরী ও বাঁক খেলার পদ্ধতি কথঞ্চিৎ বর্ণনা করিতে অগ্রসর হইলাম। এ-বিষয়ে কোনরূপ ভ্রম-ভ্রান্তি ও ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলে, সুধীগণ তাহা এবং তৎসহ অন্য কোনও নূতন রহস্য জানাইয়া দিলে চির-কৃতজ্ঞ থাকিব।

প্রথমতঃ অসির অগ্রভাগের অনুরূপে একপ্রকার ক্ষুদ্র অস্ত্র প্রস্তুত হইত, তাহার উভয় পার্শ্বেই ধার থাকিত, এবং সাধারণতঃ আততায়ীর অতি সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া যে-কোনও মর্ম্মস্থলে ইহাকে সম্পূর্ণরূপে প্রবিষ্ট করাইবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত, কখনও কখনও বা দূর হইতেও কৌশলে আততায়ীর প্রতি নিক্ষিপ্ত অর্থাৎ ছোড়া হইত বলিয়াই উহার নাম ছুড়ী ও ছোড়া হইয়াছে, এবং ছেদন অর্থে "ছুর" ধাতু হইতে ইহার নাম "ছুরি" (ছুরী) হইয়াছে ;

আবার কতিপয়প্রকারের আকৃতি বক্র অর্থাৎ বঙ্ক হইত বলিয়াই "বক্র" ও "বঙ্ক" শব্দ হইতে অপভ্রংশে "বাঁক" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

সময়, স্থান, শিক্ষার্থী, শিক্ষাগুরু প্রভৃতি সম্পর্কে "লাঠি-খেলা ও অসি-শিক্ষা" মধ্যে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে ছুরী ও বাঁক খেলা সম্পর্কেও তাহা সম্পূর্ণরূপেই প্রযোজ্য।

ছুরী ও বাঁকের বর্ণনা :—সাধারণতঃ ছুরী ও বাঁক মুষ্টি-সহ ষোড়শ অঙ্গুলী দীর্ঘ হইয়া থাকে; তন্মধ্যে মুষ্টির দৈর্ঘ্য প্রায় ছয় অঙ্গুলী হয়। নিম্নে কতিপয়প্রকারের ছুরী ও বাঁকের আকৃতি চিত্র দ্বারা প্রদর্শিত হইল :—

প্রয়োগের অনুরূপ এবং "প্রতিকার" সম্পূর্ণরূপেই অসি সম্পর্কিত "বিনোদেব" অনুরূপ।

বাঁকের উভয় পার্শ্বেই ধার থাকে, তাহাতে বাঁক সহজেই শরীর-মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে।

২য়প্রকারের বাঁকের মধ্যদেশে উভয় পৃষ্ঠেই দৈর্ঘ্যের পরিমাপে একটি শিরা বা উচ্চ অংশ থাকে। এই উচ্চ অংশের উভয় পার্শ্বে দুইটি খাত থাকে, এবং অগ্রবিন্দুর দুই অঙ্গুলী ঊর্দ্ধপর্য্যন্ত অংশ ঈষৎভাবে অপেক্ষাকৃত ক্রমিক স্থূল হইয়া থাকে। এইরূপ আকৃতিতে বাঁক প্রস্তুত হইলেই শরীরে প্রবিষ্ট হওয়াকালে সংঘর্ষণ বাধা (frictional

১ম　　২য়　　৩য়　　৪র্থ　　৫ম

resistance) সামান্যমাত্রই উৎপন্ন হয়, কাজেই গুড়দিশের (গরদেশের) গতিতে চালিত হইয়া আসিলে অতি সহজেই বাঁক শরীর-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যায়।

আবার মধ্যদেশে শিরা ও তাহার উভয় পার্শ্বে খাত থাকাতে, বাঁক শরীর-মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ার সময় ক্ষত মুখের চতুষ্পার্শস্থ মাংস ও পেশীগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক বিস্তৃত হয় বলিয়া, ক্ষত-অভ্যন্তরে বহির্বায়ুর সংস্পর্শও অপেক্ষাকৃত অধিক ঘটিয়া থাকে; তাহাতে বহির্বায়ুস্থ
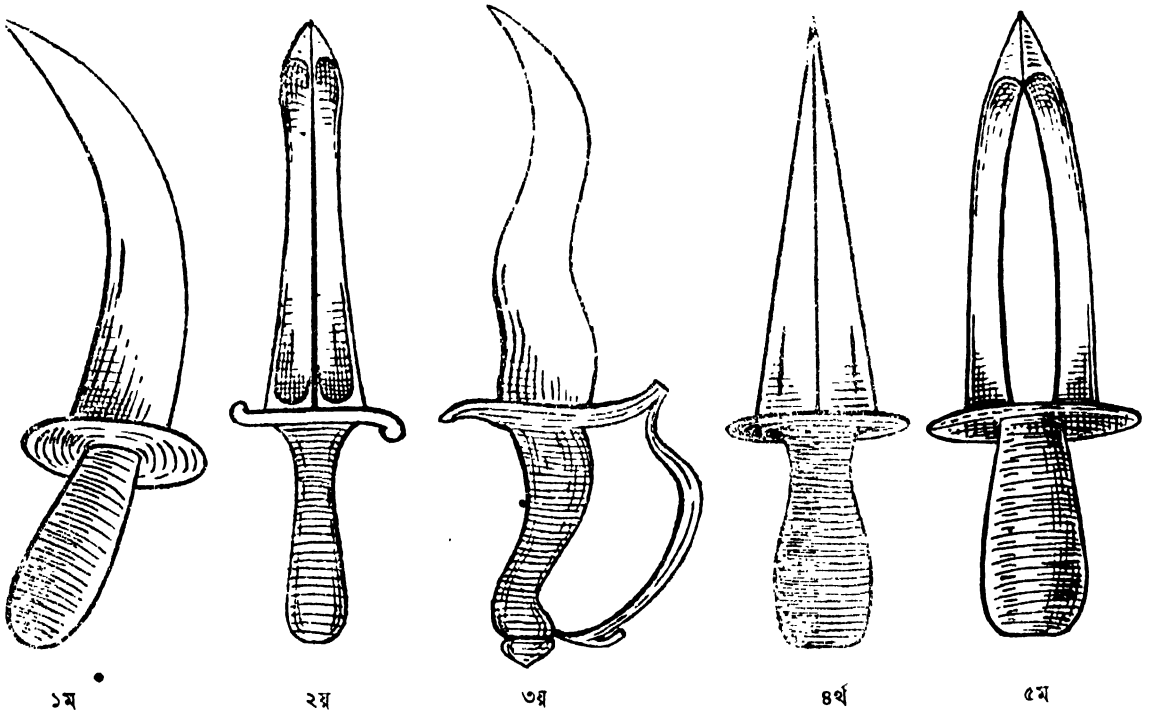
ইহা ব্যতিরেকে আরও বিভিন্ন কতিপয়প্রকারের আকৃতি-বিশিষ্ট ছুরী কিংবা বাঁক দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহাদের সকলগুলির ব্যবহারে বিশেষ সুফল পাওয়া যায় না। শরীর-মধ্যে প্রবিষ্ট করাইতে হইলে ২য় চিত্রের অনুরূপ বাঁকই শ্রেষ্ঠ, কোনও অঙ্গচ্ছেদ করিতে হইলে ১ম চিত্রের অনুরূপ বাঁকই শ্রেষ্ঠ।
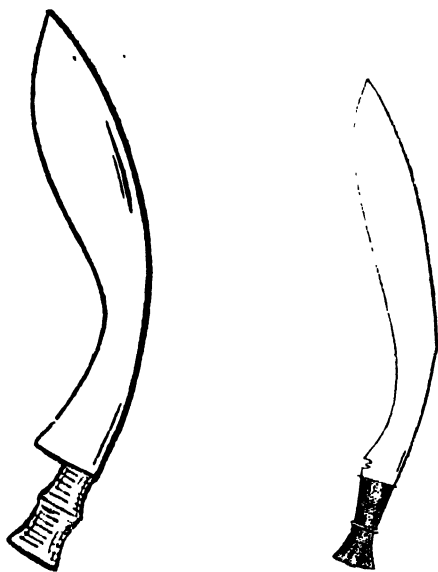
অনেকে নেপালী-ভোজালীও ছুরীর পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার "প্রয়োগ" সম্পূর্ণরূপেই অসি-

সূক্ষ্ম কণিকাদি কিংবা কোনওপ্রকারের বিষাক্ত অণু-পরমাণু-আদিরও অপেক্ষাকৃত অধিকপরিমাণে ক্ষত-মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সুতরাং ক্ষতও দুশ্চিকিৎস্য এবং দুরারোগ্য হওয়ারই সম্ভাবনা অধিক হইয়া থাকে।

এতদুদ্দেশ্যেই অন্যান্য আকৃতির ছুরী কিংবা বাঁকেরও মধ্যদেশে এবং দৈর্ঘ্যপথে একটি কিংবা দুইটি খাত থাকে। আবার কোন ছুরীর মধ্যদেশ একেবারে বা শূন্যগর্ভও থাকে; কোনও ছুরীর মধ্যদেশস্থ শূন্যগর্ভের উভয় পার্শ্বে দুইটি করিয়া খাতও থাকে। খাত থাকার জন্য ছুরী অপেক্ষাকৃত লঘুও হইয়া থাকে।

ছুরী ও বাঁক খেলার সম্পর্কে যেসমস্ত সাঙ্কেতিক নাম ব্যবহৃত হইবে, তাহা প্রায় সমস্তই "লাঠি-খেলা ও অসি-শিক্ষা" মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। কাজেই এস্থলে ঐসমস্তের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মাত্র।

স্থিতি (ঠাট্‌):—শিক্ষাভ্যাসকালে উভয়ে পরস্পর জানুতে-জানুতে সংলগ্ন করিয়া সাধারণভাবে ও সহজ পদ্ধতিতে আসন করিয়া উপবেশন করিবে; অথবা উভয়ের অগ্রপদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া "লাঠি-খেলা ও অসি-শিক্ষায়" বর্ণিত একাঙ্গের স্থিতির অনুরূপে অগ্রপদের জানু ভঙ্গ করিয়া দাঁড়াইবে।

মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ছুরী ধারণ করিলে, ছুরীর অগ্রবিন্দু কনিষ্ঠাঙ্গুলীর দিকে থাকিবে, এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ "ছু মস্তকোপরি থাকিবে, যথা নিম্ন চিত্রে:—
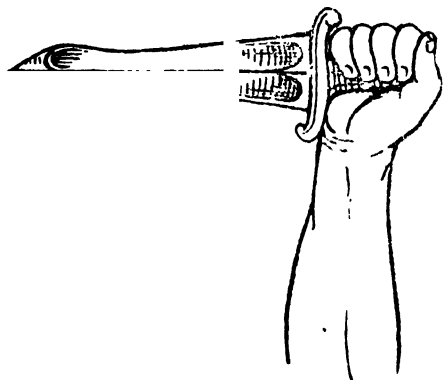
উপবেশন করিয়া ক্রীড়ার প্রারম্ভে উভয়েরই নিজ-নিজ হস্তদ্বয় নিজ-নিজ জানূপরি ঊর্দ্ধ-পৃষ্ঠভাবে থাকিবে। দাঁড়াইয়া ক্রীড়ার প্রারম্ভে "ছুরী" সহ হস্ত নিজ-নিজ নাভি-সম্মুখে ঊর্দ্ধ-পৃষ্ঠভাবে থাকিবে, অপর হস্ত পার্শ্বদেশে স্বাভাবিকভাবেই থাকিবে।

অভিবাদন:—প্রথমতঃ ছুরীসহ হস্ত উত্তোলন করিয়া "গুড়দিশে" (গরদেশে) ঘুরাইয়া উভয়েই প্রতিপক্ষের বাম-কর্ণমধ্যে (তামেচায়) আঘাত-প্রয়োগের উপক্রম করিয়াই, আঘাত সংহরণ করিয়া আনিয়া উভয়ের বক্ষদেশের মধ্য পথে নিজ-নিজ ছুরী প্রতিপক্ষের ছুরী ও হস্তপ্রকোষ্ঠের মধ্যে চালিত করিয়া প্রতিপক্ষের ছুরীকে প্রতিরোধ করিয়া রাখিয়া, অপর হস্তদ্বারা ছুরীমুষ্টি ধারণ করিবে; পরে উভয়ে পূর্ব্ব-হস্তে পূর্ব্ব-হস্তে মিলিত করিয়া নিজ নিজ মস্তক ও ললাট স্পর্শ করিয়া অভিবাদন করিবে, পরে পূর্ব্ব হস্তদ্বারা পুনরায় যথারীতি ছুরী ধারণ করিয়া ক্রীড়া আরম্ভ করিবে।

ক্রীড়া আরম্ভকালে ও ক্রীড়া শেষ করিয়া সর্ব্বদাই অভিবাদন করিতে হইবে। অভিবাদন প্রয়োজন "লাঠি-খেলা ও অসি-শিক্ষা" সম্পর্কেই সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে।

আঘাত-প্রয়োগ-প্রণালী:—প্রত্যেক আঘাত-প্রয়োগ-কালেই মণিবন্ধ "গুড়্‌দিশে" (গরদেশে) ঘুরাইয়া আরম্ভ করিতে হইবে, পরে প্রয়োজন-মতে, কিংবা আঘাত বিশেষে হস্তচালনায়, কখনও বা "জড়বিশের' (জার্ব্বের) কখনও বা "ত্রাসের" প্রাধান্য হইয়া থাকে। "হুল"

"আণী", "অংসহুল", "উদর", "বস্তি," "হনুর" প্রভৃতি কতিপয় মাত্র আঘাতের প্রয়োগেই "জড়বিশের" (জার্কের) প্রাধান্য হইয়া থাকে। "মন" ও "দে" র প্রয়োগ-কালে যথাক্রমে দক্ষিণ ও বাম "বেতসী" অবলম্বন করিতে হইবে; "জনার্দ্দন" "উর্দ্ধবৃক্ষ" প্রভৃতি যেসমস্ত আঘাত নিম্ন হইতে উর্দ্ধদিক্ অভিমুখে প্রয়োগ করিতে হয়, তাহাদের প্রয়োগ-প্রারম্ভে "জানু-বিজানু" গতিতে ঈষৎ "অবনমন" অবলম্বন করিতে হয়।

প্রত্যেকটি আঘাতেরই প্রয়োগকালে, হস্তগতির সঙ্গে-সঙ্গেই শরীরের উর্দ্ধাংশের সামান্য অগ্রগতি করাইতে হয়।

প্রতিরোধ-প্রণালী :—দক্ষিণ হস্তে ছুরী ধারণ করিয়া ক্রীড়াকালে প্রতিপক্ষের আঘাতের প্রতিরোধকল্পে বাম হস্তের সমস্ত পাঁচটি অঙ্গুলী একত্র রাখিয়া, বাম করতল-মধ্য-দ্বারা প্রতিপক্ষের দক্ষিণ প্রকোষ্ঠে (পুরোবাহুতে) "ব্যাঘ্র থাবাবৎ" সজোরে আঘাত করিয়া প্রতিপক্ষের বাহু দূর করিয়া দিতে হইবে। আঘাতকারীর প্রকোষ্ঠ-মধ্যে মণিবন্ধের যত সন্নিকটে প্রতিরোধকারীর বামকরতলের আঘাত পতিত হইবে, প্রতিরোধও তত অধিক তীব্র ও সন্তোষজনক হইবে।

তবে, যেসমস্ত আঘাতের প্রয়োগ-প্রারম্ভ ছুরীধৃত হস্তের বিপরীত পার্শ্ব হইতে করিতে হয়, তাহাদের প্রতিরোধকল্পে প্রতিরোধকারীর করতলের আঘাত কোন-কোন অবস্থায় আঘাতকারীর কফোণির (কনুইএর) ঠিক উর্দ্ধে প্রগণ্ডোপরিও হইতে পারে।

আঘাত যেদিক্-অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকিবে, প্রতিরোধহেতু করতলের আঘাতও সাধারণতঃ ঠিক তদ্বিপরীত দিকেই প্রয়োগ করিয়া সঙ্গে-সঙ্গেই আঘাতকারীর হস্ত অবস্থা-বিশেষে দক্ষিণে কিংবা বামে অপসারিত করিয়া দিতে হইবে।

করতলের আঘাত প্রয়োগ কালে ও হস্তচালনায় "গুড়দিশের" (গরদেশের) প্রাধান্য হইলেই সহজে সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রতিরোধ-কল্পে বাম করপল্লবের কোন অংশ কদাচ যেন আঘাতকারীর মণিবন্ধ অতিক্রম করিয়া তাহার করপল্লবোপরি পতিত না হয়। নতুবা সহজেই প্রতিরোধকারী হস্তে ছুরীর আঘাত পাইতে পারে। যেসমস্ত আঘাতের প্রয়োগ নিম্ন হইতে উর্দ্ধদিক্ অভিমুখে হইয়া থাকে, তাহাদের প্রতিকারকল্পে প্রথমতঃ করতলের আঘাত উর্দ্ধ হইতে নিম্ন দিকে প্রয়োগ করিয়াই অপ্রতিহতগতিতে হস্তচালনায় প্রয়োগকারীর হস্তকে অবস্থা-বিশেষে বামে কিংবা দক্ষিণে দূর করিয়া দিতে হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গেই "জানু বিজানু" গতিতে "অবনমন" ও অবলম্বন করিতে হইবে।

আঘাতকারীর দক্ষিণ মণিবন্ধে একটি বিন্দু, এবং প্রতিরোধকারীর শরীরের যে অংশ লক্ষ্য করিয়া আঘাত প্রযুক্ত হইবে তথায় অপর-একটি বিন্দু কল্পনা করিয়া লইলে, প্রতিরোধকারীর বামকরতল, সর্ব্ব আঘাত-সম্পর্কেই প্রতিরোধকালে ঐ উভয় বিন্দুর মধ্যে প্রতিপক্ষের প্রকোষ্ঠোপরি পাতিত করিতে হইবে। নতুবা আঘাত প্রয়োগকারীর হস্তগতি সম্পূর্ণ প্রতিহত হইবে না, এবং সহজেই সে হস্ত ঘুরাইয়া অন্য কোনও লক্ষ্যে আঘাত করিতে পারিবে; সে-অবস্থায় অধিকাংশস্থলেই প্রতিরোধকারী পুনঃ প্রতিরোধে অসমর্থ হইয়া পড়িবে।

[শিক্ষাভ্যাস-কালে সর্ব্বদাই এ-বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হইবে; অভ্যাস আয়ত্ত হইয়া গেলে আর বাহ্যিক সতর্কতার প্রয়োজন হয় না।]

এ-বিষয়ে সতর্ক থাকিলেই বিভিন্ন আঘাত-সম্পর্কে, প্রতিরোধকারীর করতল কখনও বা আঘাতকারীর মণিবন্ধের সম্মুখে, কখনও বা মণিবন্ধের পৃষ্ঠে, কখনও বা মণিবন্ধের পার্শ্বে পতিত হইবে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ নিম্নে তিনটি চিত্র প্রদর্শিত হইল।
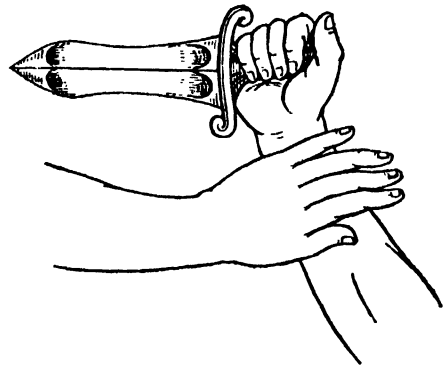
তামেচা
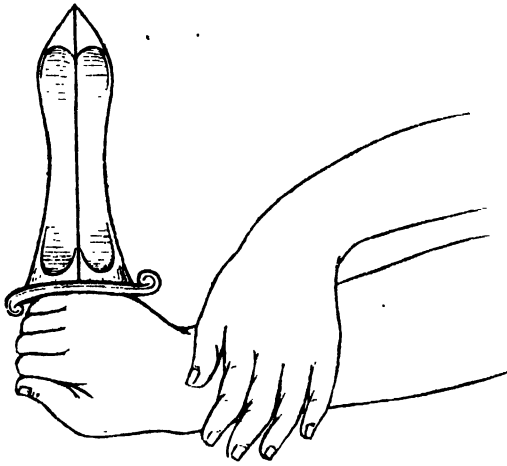
কটী

প্রতিরোধ-হেতু হস্তের পাচটি অঙ্গুলী একত্র করিয়া রাখিলেই সংহতি-হেতু আঘাতের তীব্রতা অধিক হইয়া থাকে; আবার বৃদ্ধাঙ্গুলীটি বিচ্ছিন্নভাবে থাকিলে, অধিকাংশ-স্থলেই আঘাত-কারীর প্রকোষ্ঠের প্রতিঘাতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূল সন্ধি বিকল হইয়া পড়িবার ও মচ্‌কাইয়া যাইবার সম্ভাবনাও অধিক থাকে।

প্রতিরোধ-কল্পে করতলের আঘাতে আঘাত-কারীর হস্ত দূর করিয়া তন্মুহূর্ত্তেই হস্ত-চালনা-দ্বারা ভবিষ্যৎ ক্রিয়া-হেতু প্রস্তুত হইতে হয়। যুযুৎসুর কৌশল-প্রয়োগের অভিপ্রায়-ব্যতিরেকে কদাচ আঘাত-কারীর হস্তাদি ধরিয়া ফেলিতে নাই।

যেমন গুটিকা ক্রীড়া-কালে দণ্ড ও গুটিকার সংস্পর্শ নিমেষ-কালমাত্র হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রতিপক্ষদ্বয়ের হস্ত-প্রকোষ্ঠ এবং হস্ততলের সংস্পর্শও নিমেষ-কালমাত্র হইবে। নতুবা আঘাত-কারী মণিবন্ধের চালনা-দ্বারা প্রতিরোধ-কারীর অঙ্গুলী-আদি আহত করিতে সমর্থ হইতে পারে।

বামহস্তে ছুরী ধারণ করিয়া ক্রীড়া-কালে প্রতিরোধ-কল্পে, পূর্ব্ব বর্ণনা-মধ্যে "দক্ষিণ"-স্থলে "বাম" ও "বাম"-স্থলে "দক্ষিণ" ধরিয়া লইলেই হইবে।

পাঠাভ্যাস-কালে, প্রত্যেকটি পাঠ ক্রম-সম্পর্কেই পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যেকটি আঘাতেরই প্রয়োগ ও প্রতিকার করিতে করিতে ক্রীড়ায় রত থাকিতে হইবে।
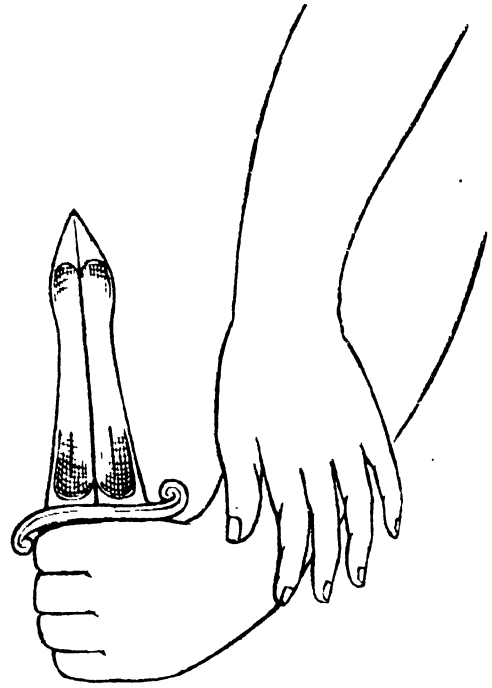
জনার্দ্দিন

প্রথম পাঠগুলি ধীরে-ধীরেই অভ্যাস করিতে হইবে; দ্রুত চালনা ক্রমে আরম্ভ করিতে হইবে; এবং প্রতি-বারেই প্রথমতঃ মন্দবেগে হস্ত-চালনা আরম্ভ করিয়া হস্ত-গতির বেগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতে হইবে। ক্রীড়া-কালে কোনরূপ ভ্রম-ভ্রান্তি হইয়া পড়িলে, পুনরায় মন্দবেগে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ দ্রুত চালনায় রত হইতে হইবে।

প্রত্যেকটি পাঠই অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি প্রথমে আরম্ভ করিবে, পরে অপর ব্যক্তি প্রথমে আরম্ভ করিয়া সমভাবে সেই পাঠটিরই অভ্যাস করিবে।

প্রত্যেকটি পাঠ-সম্পর্কেই প্রথমতঃ দক্ষিণ হস্তে ক্রীড়া করিয়া পুনরায় সমভাবে ও সমপরিমাণে বামহস্তে ক্রীড়া করিতে হইবে।

পাঠ-ক্রম

একঘাত (একের চোট্)।

১। তামেচা।

দ্বিঘাত (দুইয়ের চোট্)।

২। তামেচা, বাহেরা।

ত্রিঘাত (তিনের চোট্)।

৩। শির, তামেচা; বাহেরা।

চতুর্ঘাত (চারের চোট্)।

৪। তামেচা; বাহেরা, কটী, ভাণ্ডার।

পঞ্চঘাত (পাঁচের চোট্)।

৫। বাহেরা, তামেচা, ভাণ্ডার, কটী, শির।

ষড়্ঘাত (ছয়ের চোট্)।

৬। শির, তামেচা, বাহেরা, কটী, ভাণ্ডার, ঊর্দ্ধ বুক।

ঊর্দ্ধবুক=বক্ষাস্থির নিম্ন পার্শ্বের মধ্যবিন্দু যেস্থলে উদরের ঊর্দ্ধ অংশে মিলিত হইয়াছে তথা হইতে ছুরী বক্ষের মধ্য-প্রদেশে প্রবেশ করাইবার নিমিত্ত ঊর্দ্ধমুখে আঘাত। ইহার অপর নাম "উল্টাসিকন্"॥

সপ্তঘাত (সাতের চোট্)।

৭। শির, বাহেরা, তামেচা, কটী, অংসতুল উত্তর, ভাণ্ডার, ঊর্দ্ধ্ববুক।

অংসতুল উত্তর=বাম-পার্শ্বের সম্মুখস্থ স্কন্ধাস্থির এক অঙ্গুলী ঊর্দ্ধে বিদ্ধ করিয়া ছুরী বাম বক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করাইবার নিমিত্ত আঘাত। ইহার অপর-একনাম "হঁয়কমা"।

অষ্টঘাত (আটের চোট্)।

৮। উদর, কটী, ভাণ্ডার, অংসতুল দক্ষিণ, দে, ঘাটিকা উত্তর, তুল, গলবিন্দু।

কটী "লাঠি-খেলা ও অসি শিক্ষায়" বর্ণিত "কোমর" ই "কটী"।

অংসতুল দক্ষিণ=দক্ষিণ পার্শ্বের সম্মুখস্থ স্কন্ধাস্থির এক অঙ্গুলী ঊর্দ্ধে বিদ্ধ করিয়া ছুরী দক্ষিণ বক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করাইবার নিমিত্ত আঘাত। ইহার অন্যান্য নাম "উল্টা ঊয়কমা" ও "ঊয়কমা রাস্ত"।

ঘাটিকা উত্তর=গলপৃষ্ঠের বাম পার্শ্বে আঘাত। ইহার অপর-এক নাম "উল্টা হালকুম্"।

গলবিন্দু=গলদেশ ও বক্ষস্থল যথায় মিলিত হইয়াছে, তাহার সম্মুখস্থ বিন্দু হইতে ছুরী বক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করাইবার নিমিত্ত আঘাত। "পহেলু" এবং "জক্রে মধ্য" ইহার অপর দুই নাম।

নবঘাত (নয়ের চোট্)।

৯ (ক)। শির, বাহেরা, তামেচা, কটী, অংসতুল উত্তর, ভাণ্ডার; ঘাটিকা দক্ষিণ, বুক দক্ষিণ, ঊর্দ্ধ্ববুক।

ঘাটিকা দক্ষিণ=গল পৃষ্ঠের দক্ষিণ পার্শ্বে আঘাত। ইহার অপর নাম "হালকুম্"।

বুক-মধ্য—বক্ষাস্থির নিম্নপার্শ্বের মধ্যবিন্দু যেস্থলে উদরের ঊর্দ্ধ্ব অংশে মিলিত হইয়াছে, তথায় বক্ষ-ক্ষেত্রোপরি সমকোণে শরীর-মধ্যে ছুরী প্রবেশ করাইবার নিমিত্ত আঘাত। ইহার অপর নাম "মাঝানি"।

নবঘাত (প্রকারান্তর)।

৯ (খ)। ঊর্দ্ধ্ববুক, ভাণ্ডার, কটী, অংসতুল উত্তর, মন্, ঘাটিকাদক্ষিণ, বুক-মধ্য, ঊর্দ্ধ্ববুক, শির।

দশঘাত (দশের চোট্)।

১০। শির, বাহেরা তামেচা, অংসতুল উত্তর, ভাণ্ডার, ঘাটিকা দক্ষিণ, বুক-মধ্য, ভাণ্ডার-ঘাত, ঊর্দ্ধ্ববুক।

ভাণ্ডার-ঘাত=বাম কটী-পার্শ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া পায়ুমূল-অভিমুখে আঘাত।

একাদশ ঘাত (এগারর চোট্)।

১১। তামেচা, দে, বাহেরা, তুল, গ্রীবান্, আনী, বস্তি-উত্তর, উদর, বস্তি-দক্ষিণ, দক্ষি আনী, জনার্দ্দন।

বস্তি উত্তর=মূত্রনালীর ঊর্দ্ধস্থ ত্রিকোণাকৃতি স্থানের নাম বস্তি। বস্তির উত্তর পার্শ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া পায়ুমূল-অভিমুখে আঘাতই "বস্তির-উত্তর"।

বস্তি দক্ষিণ=বস্তির দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া পায়ুমূল-অভিমুখে আঘাত।

জনার্দ্দন=চিবুকের এক অঙ্গুলী পশ্চাতে হনুতলে ঊর্দ্ধমুখে ছুরী বিদ্ধ করিবার নিমিত্ত আঘাত। "জনক-দান" ও "হনু-তল" ইহার অপর দুই নাম।

দ্বাদশ ঘাত (বারর চোট্)।

১২। বাহেরা, মন্, তামেচা, হিমাএল, দক্ষিণ আনী, বস্তি-দক্ষিণ, বস্তি-উত্তর, উত্তর আনী, নেত্রস্থল-উত্তর, গলবিন্দু, উদর, বস্তি-মধ্য।

নেত্রস্থল উত্তর=বাম চক্ষু-মধ্যে ছুরী প্রবেশ করাইবার নিমিত্ত আঘাত।

বস্তি মধ্য—বস্তি প্রদেশের মধ্য-দেশে ছুরী বিদ্ধ করাইবার নিমিত্ত আঘাত।

ত্রয়োদশ ঘাত (তেরর চোট্)।

১৩। শির, বাহেরা, তামেচা, কটী, ঊর্দ্ধবুক, ভাণ্ডার, ঘাটিকা-দক্ষিণ, বুক-মধ্য, তুল, কটী-ঘাত, দে, মন্, জনার্দ্দন।

কটী-ঘাত=দক্ষিণ কটী-পার্শ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া পায়ুমূল-অভিমুখে আঘাত।

চতুর্দ্দশ ঘাত (চোদ্দর চোট্)।

১৪। হিমাএল, মন্, উগ্রা-দক্ষিণ, কল্প-উত্তর, ঘবেগা দক্ষিণ, জনার্দ্দন, দে, আনী, নেত্রস্থল দক্ষিণ, অংসতুল-উত্তর, বস্তি-মধ্য, উদর, নেত্রস্থল-উত্তর, মণিবন্ধ-পৃষ্ঠ।

উগ্রা-দক্ষিণ=দক্ষিণ স্তন-চুচুকের দুই অঙ্গুলী ঊর্দ্ধ ও দক্ষিণ হইতে বক্রভাবে ছুরী প্রবেশ করাইয়া দক্ষিণ ফুস্ফুস বিদ্ধ করিবার নিমিত্ত আঘাত। ইহার অপর নাম "যিগর" (জিগর)।

কল্প-উত্তর বাম স্তন-চুচুকের দুই অঙ্গুলী বাম ও নিম্ন হইতে ঈষৎ ঊর্দ্ধমুখে বক্রভাবে ছুরী প্রবেশ করাইয়া হৃদয় ও পিত্ত-কোষ বিদ্ধ করিবার নিমিত্ত আঘাত। ইহার অপর নাম "কলপ্"।

ঘবেগা দক্ষিণ গলদেশের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া গলদেশ ও স্কন্ধ দেশের সন্ধি পর্য্যন্ত অংশ-মধ্যে স্কন্ধের সমান্তরালভাবে আঘাত।

নেত্রস্থল-দক্ষিণ=দক্ষিণ চক্ষু-মধ্যে ছুরী প্রবেশ করাইবার নিমিত্ত আঘাত।

মণিবন্ধ-পৃষ্ঠ—কর-পৃষ্ঠের দিকে মণিবন্ধে আঘাত। ইহার অপর নাম হাতকাটি পোঙ্গ।

পঞ্চদশ ঘাত (পনরর চোট্)।

১৫। গ্রীবান, দে, উগ্রা-উত্তর, কল্পদক্ষিণ, ঘবেগা-উত্তর, মন, শঙ্খ-দক্ষিণ, শঙ্খ-উত্তর, উত্তর-আনী, দক্ষিণ-আনী, নেত্রস্থল-উত্তর, নেত্রস্থল-দক্ষিণ, বস্তি-মধ্য, ঊর্দ্ধবুক, জনার্দ্দন।

উগ্রা-উত্তর—বাম স্তন-চুচুকের দুই অঙ্গুলী বাম ও ঊর্দ্ধ হইতে বক্রভাবে ছুরী প্রবেশ করাইয়া হৃদয় বিদ্ধ করিবার নিমিত্ত আঘাত।

কল্প-দক্ষিণ—দক্ষিণ স্তন-চুচুকের দুই অঙ্গুলী দক্ষিণ ও নিম্ন হইতে ঈষৎ ঊর্দ্ধমুখে বক্রভাবে ছুরী প্রবেশ করাইয়া দক্ষিণ ফুস্‌ফুস্ বিদ্ধ করিবার নিমিত্ত আঘাত।

যবেগা-উত্তর—গলদেশের বামপার্শ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া গলদেশ ও স্কন্ধ-দেশের সন্ধি-পর্য্যন্ত অংশ-মধ্যে স্কন্ধের সমান্তরালভাবে আঘাত।

শঙ্খ-দক্ষিণ—ললাটের দক্ষিণ পার্শ্বদেশে, কর্ণ ও ললাটের মধ্যে ভ্রূ-পুচ্ছের প্রান্তের উপরিভাগে ছুরী ঈষৎ নিম্নমুখে বক্রভাবে বিদ্ধ করিয়া মস্তক-মধ্যে প্রবেশ করাইবার নিমিত্ত আঘাত।

শঙ্খ-উত্তর—পূর্ব্ব বর্ণনানুরূপ ললাটের বাম-পার্শ্বে আঘাত।

ষোড়শ ঘাত (ষোলর চোট্)।

১৬। শির, তামেচা, (কটী, তামেচা, কটী), অংসফলক-দক্ষিণ, ভাণ্ডার, ঘাটিকা-দক্ষিণ, বুক-মধ্য, ভাণ্ডার,কটী, দে, ভাণ্ডার, (ঊর্দ্ধবুক, শির, ঊর্দ্ধবুক)।

বর্ণনা :—ষোড়শ ঘাতের ক্রীড়া-কালে বন্ধনী-মধ্যস্থিত তিন-তিনটি আঘাতই এক-সঙ্গে প্রয়োগ করিতে হইবে। ষোড়শ ঘাত-মধ্যে, একত্রে তিনটি আঘাত-প্রয়োগের নির্দ্দেশ রহিয়াছে বলিয়া "ত্রি-ধারা" ইহার একটি বিশেষণ।

(ক্রমশঃ)

মেরুর ডাক

শ্রী প্রমথনাথ বিশী

আবার মোরে ডাক দিয়েছে তুষার-মেরু উত্তরে,
সে রব শুনে বিপদ্ গুনে কেমন করে' রই ঘরে !
ছাদের বাধা আল্‌গা হ'ল, ডাক্‌ছে তাবু ইঙ্গিতে
মেরুর পানে মরার টানে ; রবই পড়ে' কোন্ ডরে।

হিমের বায়ে মরণ-শাদা দিইছি আমার পাল তুলে'
জাহাজগুলো ডাক্‌ছে আমায় রিক্ত শাখার মাস্তুলে,
জলের ঝাপট্ লাগ্‌ছে আমার নিদাঘ-দাগা পঞ্জরে,
তাই ত কাঁদে পরাণ আমার—ঘাটের বাঁধন দেয় খুলে'।

তীক্ষ্ণ হ্রেষায় মৃত্যু-নেশায় পবন হাঁকে ভীম রবে ;
উড়্‌ছে কানাৎ, টুট্‌ছে তাবু, ঝঞ্ঝা বিপুল বয় যবে ,
ফুরিয়ে এল খাবার পুঁজি, ছিন্ন আমার বস্ত্র গো ;—
মৃত্যু বুঝি মুচ্‌কে হাসে—না হয় মরণ তাই হবে !

তাই বলে' কি রইব পড়ে' বিষুব-রেখার অন্দরে—
রুদ্র নিদাঘ জ্বালায় যেথা তপের আগুন মন্তরে ?
ব্যর্থ হবে মেরুর সে গান, ব্যর্থ হবে জয়-গাথা—
মৃত্যু যেথা হাজার রূপে জমাট্-জলে সন্তরে !

সবুজ-আভা বরফ-রাশি রয় গো সেথা দিক্ জুড়ে,
সিন্ধু-ঘোটক বিশাল দাঁতে তুষার-মাটি খায় খুঁড়ে ;
পেঙ্গুইনের পঙ্গুদলে বিজ্ঞভাবে রয় চেয়ে—
ঝাপ্‌টে ফেলে' ডানার বরফ কচিৎ পাখী যায় উড়ে।

দিগন্তেরি ধারটুকুতে নিতেজ রবি যায় দেখা,
হাজার তারার দ্বিগুণ আলো তুষার পরে হয় লেখা,
স্থির চপলা মেরুপ্রভা জ্বালায় রঙের ফুলঝুরী—
কার যেন এ শব-সাধনা চল্‌ছে দিবা-রাত একা !

আবার ডাকে শোন্ গো তোরা,শোন্ গো তোরা কান পেতে
আমায় ঘিরে' রাখিস্ মিছে, মেরুর মুখে দিস্ যেতে ;
তরীর কাছি তীরের কাছে চাচ্ছে এবার মুক্তি গো—
প্রলয়-শ্বাসে পাল ফোলে রে—উঠ্‌ছে তরীর হাল মেতে !

সিন্ধু-শকুন পাখার বাতাস বুলিয়ে গেল মোর গায়ে,
বিজন দ্বীপে চিত্ত ঘোরে নারিকেলের সেই ছায়ে ;
আলোক-ছায়ার মাল্য গাঁথা চপল ঢেউয়ের উচ্ছ্বাসে,
আমার স্মৃতি বাজ্‌ছে আজি উপল-নূপুর যার পায়ে !

এবার আমায় ডাক দিয়েছে তুষার-মেরু উত্তরে—
চক্ষে যে দেশ হয়নি দেখা—কাঁদ্‌ছে পরাণ তার তরে।
শ্যামল ধরার কোমল বাহু লাগ্‌ছে না আর মোর ভালো,
মেরুর পানে ভাস্‌ব এবার মরণ-শাদা পাল-ভরে।

রাজপথ

শ্রী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

[৩০]

পরদিন প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ হইতেই পূর্ব্বদিনের কথা স্মরণ করিয়া বিমানবিহারীর মন তিক্ত হইয়া উঠিল। দূরাপসৃত হইয়াও সুরেশ্বর, দুরপনেয় শক্তির মত, সুমিত্রার উপর এমন প্রবলভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে দেখিয়া সে তাহার বিরক্তি-বিরূপ চিত্তে আর কোনও সান্ত্বনা অথবা আশা খুঁজিয়া পাইল না। মনে হইল, যে যাদু-বিদ্যা সুরেশ্বর সুমিত্রার উপর প্রয়োগ করিয়া গিয়াছে, তাহা হইতে সুমিত্রাকে উদ্ধার করিবার মত কোনও বিদ্যাই তাহার জানা নাই- এবং যতই সে-কথা মনে হইতে লাগিল, ততই একটা নিষ্ফল আক্রোশে তাহার প্রণয়-প্রসারিত হৃদয় সঙ্কুচিত হইয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু পরক্ষণেই যখন মনে পড়িল যে, সুরেশ্বরের গৃহের সংবাদ সে না রাখিলে সে-গৃহের সহিত সুমিত্রার ঘনিষ্ঠতা বর্দ্ধিত হইবার আশঙ্কা আছে, তখন কোন্ সম্ভাবিত বিপদ্ নিবারণের উদ্দেশ্যে সুরেশ্বরের গৃহে যাইবার জন্য সে সহসা প্রস্তুত হইল, তাহা মনস্তত্ত্বের একটি জটিল সমস্যা!

বিমানবিহারী যখন সুরেশ্বরের গৃহে উপস্থিত হইল, তখন তারাসুন্দরী তাঁহার পূজার ঘরে বসিয়া ইষ্ট-মন্ত্র জপ করিতেছিলেন এবং মাধবী তাহার চর্‌কা-ঘরে চর্‌কা কাটিতেছিল। বাহিরের দ্বার উন্মুক্ত ছিল এবং গৃহাঙ্গণে বাসন-মাজা ও জল-পড়ার শব্দ শোনা যাইতেছিল। ভিতরের দ্বারের নিকট ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া 'বেয়ারা' 'বেয়ারা' করিয়া বিমান ডাকিতে লাগিল, ভৃত্যের নাম মনে পড়িল না।

কানাই বাহিরে আসিয়া বিমানকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরের ঘর খুলিয়া দিল; সে বিমানকে চিনিত। বিমান উপবেশন করিলে সে বিষণ্নমুখে বলিল, "দাদাবাবু ত বাড়ী নেই বাবু, তাঁর এক বছরের জন্যে—আপনি জানেন না বাবু? খবরের কাগজে পড়েননি?" জেল হইয়াছে—সেকথা কানাইয়ের মুখ দিয়া নির্গত হইল না।

বিমানবিহারী বলিল, "হ্যাঁ, সে কথা আমি জানি। মা কি বড় বেশী কাতর হয়েছেন?"

কানাইয়ের চক্ষু সজল হইয়া আসিল; আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "তা আর হবেন না বাবু? কত আদরের ছেলে! তবে মুখ দেখে' কিছুই বোঝ্‌বার জো নেই, মুখে সদা-সর্ব্বদা সেইরকম হাসি লেগে রয়েছে। কিন্তু সেই জন্যেই ভয় হয় বাবু, আগুন বেশীক্ষণ চেপে রাখা ভাল নয়!"

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বিমান বলিল, "আর তোমার দিদিমণি? তিনি কেমন আছেন?"

"কে? মাধু-দিদি? তাঁর কথা আর বল্‌বেন না বাবু! যেমন ভাই, তেমনি বোন্! দাদাবাবুর আটক হ'য়ে পর্য্যন্ত মাধু-দিদি নিজের ভাগ সুতো কেটে দাদাবাবুর ভাগ পর্য্যন্ত কাট্‌ছেন! আমি একদিন বল্‌তে গেছ্‌লাম যে, মাধুদিদি তুমি একলা অত পরিশ্রম কোরো না, আমিও না হয় দাদাবাবুর ভাগ খানিকটা করে' কেটে দেবো, তাতে হাস্‌তে হাস্‌তে তিনি বল্‌লেন যে, যা যা কানাই, তুই নিজের চর্‌কায় তেল দিগে যা!" বলিয়া কানাই হাসিতে লাগিল।

কৌতূহলী হইয়া বিমান-বিহারী জিজ্ঞাসা করিল, তুমিও চর্‌কা কাট নাকি?"

কানাই স্মিতমুখে বলিল, "কাটি বই কি বাবু, না কাট্‌লে কাপড় পাব কি করে'? এ-বাড়ীতে সকলকেই সুতো কেটে' কাপড় পর্‌তে হয়। মা-ঠাকরুণ পর্য্যন্ত নিজের সুতো নিজে কাটেন; খদ্দর-ভিন্ন এ বাড়ীতে অন্য কাপড় চলে না।" বলিয়া কানাইলাল বিমান-বিহারীর বস্ত্র ঘন-ঘন পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল, কিন্তু তদ্বিষয়ে কোনও প্রশ্ন করিল না।

প্রশ্ন না করিলেও তাহার মনের ভাব যথাযথরূপ উপলব্ধি করিয়া বিমানবিহারী মনে-মনে ঈষৎ অপ্রতিভ হইল এবং তদ্বিষয়ে আর কোনও প্রশ্ন না করিয়া বলিল, "মাকে গিয়ে বলো যে, বিমানবিহারী দেখা করতে এসেছে।"

অবিলম্বে আহূত হইয়া বিমান-বিহারী অন্তঃপুরে উপস্থিত হইল। তারাসুন্দরী তাহার অপেক্ষায় সহাস্যমুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন, বিমানবিহারী তাড়াতাড়ি নিকটে গিয়া নত হইয়া প্রণাম করিল।

আশীর্ব্বাদ করিয়া তারাসুন্দরী বলিলেন, "আমি মনে করেছিলাম যে, আমার এ-ছেলেটি একেবারে আমার গঙ্গা-যাত্রার দিন গামছা কাঁধে ক'রে এসে' দাঁড়াবে; তার আগে যে তুমি আসবে সে আশা ক্রমশঃ ছেড়ে দিয়েছিলাম।" বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

বিমানবিহারী অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "আমি কিন্তু মা, তার পর অনেকবার এ-বাড়ীতে এসেছি; তবে আপনার সঙ্গে দেখা করা হয়নি।"

তারাসুন্দরী স্মিতমুখে বলিলেন, "তা আমি জানি। সুরেশের কাছে তোমার খবর আমি সর্ব্বদাই পেতাম।"

তাহার পর বিমানবিহারীকে বসাইয়া তারাসুন্দরী একে-একে তাহার গৃহের সংবাদ লইতে লাগিলেন।

সুরেশ্বরের জেলের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিবার জন্য বিমানবিহারী ব্যগ্র হইয়া ছিল, কিন্তু কি-ভাবে কথাটা আরম্ভ করিবে, তাহা ঠিক করিতে পারিতেছিল না। সংক্ষেপে তারাসুন্দরীর প্রশ্নসমূহের উত্তর দিয়া সে সে-কথা তুলিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "কাল খবরের কাগজে সুরেশ্বরের খবর পেয়ে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি।" কথাটা একটু বেখাপ্পা মত শুনাইল, উপস্থিত আর-কিছু না বলিয়া বিমানবিহারী থামিয়া গেল।

একটু চিন্তা করিয়া তারাসুন্দরী বলিলেন, "আসলে কিন্তু এতে দুঃখিত হবার বিশেষ কিছু নেই। যে যে-বিষয়ের কারবার করবে তার বোঝা তাকে বহন করতেই হবে। তা' ছাড়া, জেলের কষ্টর চেয়ে জেলের বাইরের কষ্ট যে কম মনে করে না তার তুমি কি করবে বলো? আমি বেশ করে' ভেবে দেখেছি বিমান, দুঃখিত হবার কারণ কোনো দিক্ থেকেই কিছু নেই। আমার ছেলে জেলে না গিয়ে শ্বশুরবাড়ী গেলে আমার পক্ষে খুবই ভাল হয়। কিন্তু সেইরকমে সকলেরই ছেলে যদি শ্বশুরবাড়ী যায়, তা হ'লে দেশ কোথায় যায় বলো? দেশের ত আর শ্বশুরবাড়ী নেই!" বলিয়া তারা-সুন্দরী হাসিয়া উঠিলেন।

তারাসুন্দরীর কথা শুনিয়া বিস্ময়ে ও পুলকে বিমান-বিহারী ক্ষণকাল নির্ব্বাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। বঙ্গদেশের একজন পুরাতন যুগের স্ত্রীলোক, যাঁহার একমাত্র পুত্র কারাগারে অবরুদ্ধ, এমন করিয়া যে ভাবিতে এবং বলিতে পারেন, তাহা এপর্যান্ত তাহার অভিজ্ঞতার বহির্ভূত ছিল। সে হর্ষোৎফুল্ল-নেত্রে বলিল, "আপনি যা' বল্ছেন তা হাজার বার সত্য, কিন্তু ক'জন মা আপনার মতন ভাবতে পারেন?"

শিরশ্চালনা করিয়া তারাসুন্দরী বলিলেন, "না, না, তা বোলো না বাবা! আমি আর কি এমন ভাব্ছি? আমি ত ভাবছি, যে, এক বৎসর পরে আমার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে' আস্বে। কিন্তু কিছুকাল আগে আমাদের দেশে যারা নিজের হাতে স্বামী পুত্রকে যুদ্ধের সাজে সাজিয়ে দিত, তারা কতখানি ভাবত ভেবে দেখ দেখি! সেই দেশেই আমরা বাস কর্ছি, কিন্তু সে-সব যেন মনে হয় কোন্ আরব্য উপন্যাসের কথা!"

বিমুগ্ধচিত্তে বিমানবিহারী বলিল, "সত্যি!"

অদূরে মাধবীকে দেখা গেল। তারাসুন্দরী ডাক দিয়া বলিলেন, "মাধবী, বিমান এসেছেন।"

মাধবী নিকটে আসিয়া বিমানবিহারীকে নমস্কার করিল।

প্রতি-নমস্কার করিয়া বিমান সহাস্যমুখে বলিল, "মা'র মুখ থেকে দেশ-সেবার মন্ত্র শুন্ছি। দেখুন, আবার দ্বিতীয় রত্নাকর দ্বিতীয় বাল্মীকি না হ'য়ে ওঠে!"

মাধবী স্মিতমুখে বলিল, "উঃ! সে যে ষাট হাজার বৎসর লাগ্বে! তার চেয়ে এমন কোনো উদাহরণ নেই যাতে এক দণ্ডে কার্য্যোদ্ধার হয়?" বলিয়া মাধবী হাসিতে লাগিল।

বিমানবিহারী হাসিতে হাসিতে বলিল, সে একমাত্র যাদু-দণ্ডের স্পর্শেই হ'তে পারে। যদি তেমন কোনো যাদু দণ্ড জানা থাকে ত স্পর্শ করিয়ে দিন, আমার কোনো আপত্তি নেই!"

তারাসুন্দরীও রহস্যে যোগ দিয়া স্মিতমুখে বলিল, "আমি আশীর্ব্বাদ করছি বিমান, সে যাদু-দণ্ডের স্পর্শ তুমি তোমার শ্বশুরবাড়ীতেই পাবে। আমি সুরেশের মুখে যতটুকু শুনেছি তাতে বুঝ্‌তে পেরেছি যে, তুমি শ্বশুরবাড়ী গেলে দেশের ক্ষতি হবে না, লাভই হবে।" বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

তারাসুন্দরীর কথা শুনিয়া মাধবীও মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল, কিন্তু মেঘের মধ্যে বজ্রের মত, সে হাস্যের মধ্যে একটা বেদনাও দপ্ দপ্ করিতে লাগিল। পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হওয়ার পর গৃহত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্ব্বে সুরেশ্বর মাধবীকে প্রতিশ্রুত করাইয়া লইয়াছিল যে এমন কোন কার্য্য সে করিবে না যাহা বিমানের সহিত সুমিত্রার মিলনের পক্ষে বিঘ্নকর হইতে পারে। সেই প্রতিশ্রুতি-হেতু নিজের অক্ষমতা স্মরণ করিয়া মাধবীর মনে বিমান-বিহারীর প্রতি একটা সূক্ষ্ম বিদ্বেষের মত ভাব জাগিয়া উঠিল।

কথায় কথায় সুরেশ্বরের দণ্ডের কথা উঠিল। বিমান বলিল, "অপরাধের তুলনায় শাস্তিটা অত্যন্ত বেশী হয়েছে!"

একটু নীরব থাকিয়া তারাসুন্দরী বলিলেন, "আমি কিন্তু তা মনে করিনে বাবা। যে-কাজ সুরেশ করছিল তা' যদি অপরাধ বলে' মনে কর, তা হ'লে শাস্তি একটুও বেশী হয়নি, বরং কম হয়েছে। যে তোমার শাসন আর বিধি-ব্যবস্থা ওলট্‌পালট করে' দেবার চেষ্টা করছে তাকে যদি তুমি এক বৎসর জেলে আট্‌কে রাখ্‌বার ব্যবস্থা কর তা হ'লে আর তোমাকে এমন কি দোষ দেওয়া যায়? আবার বিনা অপরাধে সুরেশ্বরের শাস্তি হয়েছে বলে'ই যদি মনে কর, তা হ'লেও কিছু বল্‌বার নেই। যারা অবিচার করছে বলে' তোমাদের ধারণা তাদের কাছে সুবিচার প্রত্যাশা কর কেমন করে'? গালে যে চড় মারছে—পিঠে সে হাত বুলিয়ে দেবে সে আশা করা বৃথা!"

তারাসুন্দরীর কথার উত্তরে বলিবার মত কোনও কথা খুঁজিয়া না পাইয়া বিমানবিহারী চুপ করিয়া রহিল।

মাধবী মৃদু হাসিয়া বলিল, "মা যে কোন্ পক্ষের হ'য়ে কথা বলছ, তা বোঝা শক্ত। কোনো পক্ষই তোমার কথা শুন্‌লে সন্তুষ্টও হবে না, অসন্তুষ্টও হবে না।"

সেকথার উত্তর বিমানবিহারী দিল; বলিল, "উচিত কথার একটা বিশেষত্বই হচ্ছে এই যে, তার দ্বারা কোনো পক্ষকে বেশী রকম সন্তুষ্টও করা যায় না, অসন্তুষ্টও করা যায় না। মানুষকে বেশী রকম সন্তুষ্ট অথবা অসন্তুষ্ট করবার একটা প্রধান উপায় হচ্ছে তার বিষয়ে অযথা কথা বলা।"

মাধবী স্মিতমুখে বলিল, "কিন্তু কাণাকে কাণা বল্‌লে ত সে চটে' যায়?"

বিমান কহিল, "তা যায়, কিন্তু তাকে পদ্মপলাশ-লোচন বল্‌লে বোধ হয় আরও বেশী চটে' যায়।"

মাধবী হাসিতে হাসিতে বলিল, "হ্যাঁ, তা' যায় বটে।"

বিমানবিহারী বলিতে লাগিল, "মানুষকে খুসী করতে হ'লে তার ত্রুটিগুলোকে একটু কৌশল করে' গুণে পরিবর্ত্তিত করতে হয়; মিথ্যাবাদীকে চতুর বল্‌তে হয়, গুণ্ডাকে বীর বল্‌তে হয়, আর ডেপুটিকে বোধ হয় ধর্ম্মাবতার বল্‌তে হয়।"

বিমানের কথা শুনিয়া মাধবী ও তারাসুন্দরী উভয়েই হাসিতে লাগিলেন।

সুরেশ্বরের এক বৎসর কারাদণ্ডের সংবাদ পাইয়া অবধি মাধবী ও তারাসুন্দরীর অন্তরে যে অনুচ্চারিত বিষণ্ণতা গুরুভারের মত চাপিয়া ছিল, বিমানবিহারীর আগমনে ও তাহার সহিত কথাবার্ত্তায় তাহা অনেকটা লঘু হইয়া গেল। মেঘ কাটিয়া আকাশ নির্ম্মল হইয়া গিয়াছিল এবং প্রথম বসন্তের নাতিশীতল প্রভাতবায়ুতে এবং অম্লান সূর্য্য-কিরণে একটা প্রশান্ত প্রসন্নতা বিরাজ করিতেছিল। তাহার উপশমক ক্রিয়ার প্রভাবে বিবিধ-বেদনায় বিদ্ধ তিনটি প্রাণীর এই সম্মিলন চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিল।

বিমান বলিল, "গল্প করে' করে' আপনাদের সকাল-বেলার কাজ-কর্ম্মের ব্যাঘাত করছি।"

তারাসুন্দরী বলিলেন, "সকাল-বেলার কাজ কর্ম্ম মানে ত' তিনটি প্রাণীর আহারের ব্যবস্থা? তাতে কতই বা সময় লাগে, আর দুই-এক ঘণ্টা দেরী হ'লেই বা কি আসে যায়? তোমারই বরং কাছারীর কাজের ক্ষতি হচ্ছে।"

তারাসুন্দরীর কথা শুনিয়া আরক্তমুখে বিমানবিহারী বলিল, "একদিকে ক্ষতি-স্বীকার না করলে অন্যদিকে লাভ করা যায় না!"

মাধবী হাসিতে-হাসিতে বলিল, "কিন্তু বেশী ক্ষতি করে' অল্প লাভ করা আবার ভাল নয়।"

"লাভ-লোক্‌সানের হিসাব স্কুলে যে-রকম করেছিলাম, জীবনে যদি সে-রকম করতাম তা' হ'লে জীবনটা এ-রকম বে-হিসেবী হ'ত না।" বলিয়া বিমানবিহারী হাসিতে লাগিল।

তারাসুন্দরী সহাস্যমুখে বলিলেন, "হিসেবটা জমা-খরচের খাতাতেই ভাল, জীবনে বেশীরকম হিসেবী হ'লে জীবনের পথে এগোনোই যায় না; পদে-পদে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়। তাই বলে' যেন মনে কোরো না যে, আমি তোমাদের বিবেচনাহীন হ'য়ে চল্‌তে বল্‌ছি!" বলিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

বিমানবিহারীও হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "তা হ'লে মা, বিবেচনাহীন হ'য়ে আর আপনাদের সময় নষ্ট করব না; এখন আমি চল্‌লাম। আমি আজ আপনাকে বল্‌তে এসেছিলাম যে, সুরেশ্বর যত দিন না ফিরে' আসছে, ততদিন তার কর্ত্তব্যের কতকটা অংশ আমাকে বহন করতে দেবেন। মাঝে-মাঝে আমি এসে খবর নিয়ে ত যাবই; তা ছাড়া যখন দরকার হবে, দিনে হোক, রাতে হোক, সকালে হোক, সন্ধ্যায় হোক, আমাকে খবর দিলেই আমি এসে হাজির হব।"

বিমানবিহারীর কথা শুনিয়া তারাসুন্দরীর চক্ষে অশ্রু ভরিয়া আসিল। তিনি বলিলেন, "তুমি যে আমাদের পর নও তা বুঝ্‌তে পেরেছি। দরকার হ'লে কোনো কথাই তোমাকে বল্‌তে আমি দ্বিধা করব না। যখনই তোমার সময় আর সুবিধা হবে আমাদের খবর নিয়ে যেয়ো।" তাহার পর মাধবীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "মাধবী, কানাইকে দিয়ে বিমানের জন্যে কিছু মিষ্টি আনাও।"

বিমানবিহারী কিন্তু কিছুতেই তাহা করিতে দিল না; বলিল, "মা আর ছেলের মধ্যে আমি কোনো-রকম সামাজিকতার স্থান রাখ্‌তে দেবো না। যে-দিন ক্ষিদে পাবে, নিজে চেয়ে খেয়ে যাব।"

মাধবী তারাসুন্দরীর দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "মা, দাদা জেলে কি খাচ্ছেন, বিমান-বাবু বোধ হয় সে-খবর আনিয়ে দিতে পারেন।"

তারাসুন্দরীর অনুরোধের জন্য অপেক্ষা না করিয়া বিমান কহিল, "আমি নিশ্চয়ই সে খবর আনিয়ে দেবো; আর খুব সম্ভবতঃ তার খাওয়ার বিষয়ে একটু সু-ব্যবস্থাও করিয়ে দিতে পারব।"

তারাসুন্দরী কহিলেন, "আমি জানি তা' তুমি পারবে, কিন্তু তার দরকার নেই বাবা। এ-রকম আব্দার-অনুরোধ করলে নিজেকে একটু খাট করতেই হয়। তা' ছাড়া ব্যবস্থা করে'ই বা তুমি কি করবে? আমি ত' সুরেশকে জানি, জেলের যা মামুলী বরাদ্দ তার বেশী একটি কণাও সে স্পর্শ করবে না। স্পর্শ করা উচিতও নয়। নিজের অবস্থার অতিরিক্ত ব্যবস্থায় কখনই কারো মঙ্গল হয় না।"

এরূপ স্বাধীন ও সবল যুক্তির দ্বারা স্বীয় প্রস্তাব খণ্ডিত হওয়ায় মনে-মনে অপ্রতিভ হইয়া বিমানবিহারী বলিল, "তবে সুরেশ্বর জেলে কি খাচ্ছে জেনে কি হবে মা?"

মাধবীর দিকে একবার চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া তারাসুন্দরী স্মিতমুখে কহিলেন, "মাধবীর মতলব, যে-রকম খাওয়া সুরেশ জেলে খাচ্ছে, যতটা সম্ভব সেই-রকম খাওয়া আমাদের বাড়ীতেও জারি করে। দেশের আর ঘরের সু-সন্তান যে খাওয়া খেয়ে জীবন ধারণ করছে, বাড়ীর অন্য লোকের তার চেয়ে ভাল খাওয়া উচিত নয় এই তার কল্পনা।" তাহার পর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তাই কি সে অপেক্ষা করে' আছে? আন্দাজি যতটা পারে এরি মধ্যে জেলের খাওয়া জারি করে' দিয়েছে!" বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

বিস্মিত বিমুগ্ধনেত্রে মাধবীর দিকে চাহিয়া বিমান-বিহারী দেখিল, নির্ব্বিকল্পমুখে মাধবী মৃদু-মৃদু হাস্য করিতেছে। তাহার মুখে লজ্জা অথবা সঙ্কোচের এমন একটি রেখা পর্য্যন্ত ছিল না যদ্দ্বারা ব্যক্ত হয় যে, এই আহার-সংক্রান্ত ব্যাপারে সে যাহ বিয়াছে অথবা করিয়াছে তাহার মধ্যে অসাধারণ কিছু ছিল বলিয়া সে একবারও বিবেচনা করে! নিঃশব্দ প্রশংসায় বিমান মাধবীর নির্ব্বিকার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

"জেলখানার কয়েদীদের কি বিছানা দেয় জান বিমান?"

এ-বিষয়ে বিমানবিহারীর সম্যক্ জ্ঞান ছিল না; বলিল, "না, ঠিক জানিনে।"

তারাসুন্দরী কহিলেন, "আমিও ঠিক জানিনে; কিন্তু একখানা কম্বল আর একটা ইঁট দিয়ে মাধবী যে নিজের বিছানা করেছে, জেলখানায় তার চেয়ে ভাল বিছানা দেয় বলে' আমার মনে হয়।"

মাধবী বলিল, "আমার ত তবু একটা ইঁট আছে, তোমার যে তাও নেই মা!"

তারাসুন্দরীর শান্ত-শুভ্র মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল; বলিলেন, "সে ত আর আজকের কথা নয়, সে এখন বুঝ্‌তেও পারিনে। এ ত অভ্যাস হ'য়ে গেছে। কিন্তু ইঁটে মাথা দিয়ে শোওয়ার চেয়ে শুধু-মাথায় শোওয়া ভাল।"

বৈধব্যের পর তারাসুন্দরী বহুবিধ দ্রব্যের সহিত উপাধানও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সে কথা বুঝিতে পারিয়া বিমানের মনে তারাসুন্দরীর প্রতি শ্রদ্ধার সঞ্চার হইলেও উপস্থিত তজ্জন্য বিশেষ কিছু কষ্টবোধ হইল না। কিন্তু মাধবীর কঠিন শয্যার কথা শুনিয়া সে বাস্তবিকই ব্যথিত হইল; দুঃখিতস্বরে বলিল, "এ কষ্টটা না করলেই হ'ত! এ যে কঠোর তপস্যার মত কঠিন!"

বিমানের কথা শুনিয়া মাধবী হাসিয়া ফেলিল; বলিল, "তপস্যাকে অত ছোট করে' দেবেন না! ইঁট যত শক্ত, ইঁটে মাথা দিয়ে শোওয়া তত শক্ত নয়, বিশেষতঃ কম্বল দিয়ে ঢেকে নিলে।

বিমান স্মিতমুখে বলিল, "কম্বল দিয়ে ঢেকে নিলে, কি কথা দিয়ে ঢেকে নিলে তা' ত ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে!"

বিমানের পরিহাসে তারাসুন্দরী এবং মাধবী উভয়েই হাসিয়া উঠিলেন।

প্রস্থানোদ্যত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মাধবীর দিকে চাহিয়া বিমান আরক্তমুখে বলিল, "সেদিনকার সেই স্থতো-পোড়ানোর অপরাধের জন্যে আজ সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা চাচ্ছি। আজ ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছি যে, সেদিন দেবালয়ে পশুহত্যা করে' গিয়েছিলাম!"

ব্যস্ত হইয়া কুণ্ঠিতস্বরে মাধবী বলিল, "না, না, ও-সব কথা আবার কেন বল্‌ছেন? ও-সব কথা ত সেই দিনই শেষ হ'য়ে গিয়েছে!"

তারাসুন্দরী কিছু বুঝিতে না পারিয়া সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কথা?"

মৃদু হাসিয়া বিমান বলিল, "সে একটা অত্যন্ত অন্যায় কথা মা! সে বল্‌তে গেলে অনেক সময় লাগ্‌বে।" মাধবীর প্রতি চাহিয়া বলিল, "অপনি সময়-মত মাকে কথাটা শুনিয়ে দেবেন।" তাহার পর এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া মুখ তুলিয়া স্মিতমুখে বলিল, "আপনারা ত প্রায়শ্চিত্ত করেইছিলেন, আমিও করেছিলাম; ইচ্ছায় নয়, বাধ্য হ'য়ে পরদিন যখন মনে পড়্‌ল যে আমার অপরাধের জন্য আপনি আর স্থরেশ্বর প্রায়শ্চিত্ত করছেন, তখন আমার গলাটা একেবারে যেন চেপে গেল! সমস্ত দিন আর জল পর্য্যন্ত খাবার শক্তি ছিল না।"

কাতরমুখে মাধবী বলিল, "দেখুন দেখি কি অন্যায়!"

"কার অন্যায় তা মা'র দ্বারা বিচার করিয়ে নেবেন।" বলিয়া হাসিতে-হাসিতে বিমান প্রস্থান করিল।

পথে বাহির হইয়া তাহার মনে হইল যেন কোনও দেবালয় হইতে সে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে। লঘু পদক্ষেপে এবং লঘুতর চিত্তে সে গৃহাভিমুখে চলিতে লাগিল। আসিবার সময়ে সে মনে করিয়া আসিয়াছিল, সে প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ে স্থমিত্রাকে জানাইয়া যাইবে যে, স্থরেশ্বরের গৃহে গিয়া সে মাধবীদের সংবাদ লইয়াছে। কিন্তু এখন আর তাহার কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হইল না। মনে হইল, সেকথা স্থমিত্রা জানিলেই বা কি আর না জানিলেই বা কি? মাধবীদের গৃহে আসিয়া ঘনিষ্ঠ হইলেই বা কি আর না হইলেই বা কি?

কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ দিয়া বাড়ী যাইতে যাইতে বিমান দেখিল, একটা দোকানে বড়-বড় অক্ষরে খদ্দরের বিজ্ঞাপন রহিয়াছে। হঠাৎ কি খেয়াল হইল, সে দোকানে ঢুকিয়া পড়িল এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট একটি শাড়ী ও ব্লাউস্ ক্রয় করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

গৃহে পৌঁছিয়া সুরমার নিকট উপস্থিত হইয়া বাণ্ডিলটা তাহার হস্তে দিয়া বিমান বলিল, "বউদি, তোমার জন্যে একটা নতুন জিনিষ এনেছি, মাঝে মাঝে ব্যবহার কোরো।"

ঔৎসুক্যের সহিত বাণ্ডিলটা খুলিয়া দেখিয়া সুরমা সাশ্চর্য্যে বলিল, "এ যে দেখ্‌ছি খদ্দর!"

"কেন, তোমার পছন্দ হচ্ছে না?"

"পছন্দ হবে না কেন? খুব পছন্দ হচ্ছে। তুমি ডেপুটি মানুষ হ'য়ে খদ্দর কি করে' কিন্‌লে তাই ভেবে আশ্চর্য্য হচ্ছি!"

"কেন বউদি, ডেপুটি মানুষ কি এতই অমানুষ যে, একখানা খদ্দর কিন্‌তে পারে না?"

সুরমা হাসিতে হাসিতে বলিল, "তোমাকে ত আর সেকথা বলা চলে না ঠাকুর-পো! বিশেষতঃ যে ডেপুটির স্ত্রী অথবা ভাবী স্ত্রী শুধু খদ্দর পরে না, চর্‌কাও কাটে, তার অমানুষ হবার উপায় কোথায়?"

সুরমার কথার কোনও উত্তর না দিয়া বিমান মৃদু-মৃদু হাসিতে লাগিল।

বৈকালে কোর্ট্ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিমান দেখিল সুরমা খদ্দরের শাড়ী ও ব্লাউস্ পরিয়া কাজ করিয়া বেড়াইতেছে।

নিকটে আসিয়া সে হাসিমুখে কহিল, "বড় চমৎকার দেখাচ্ছে বউদি! মনে হচ্ছে, আজ যেন আমাদের বাড়ীতে একটা নতুন আলো এসে পড়েছে!"

স্মিষ্ট হাস্য হাসিয়া সুরমা বলিল, "তা মনে হোক। এখন তাড়াতাড়ি জল খেয়ে নিয়ে আমাকে ও-বাড়ী নিয়ে চলো। মা বলে' পাঠিয়েছেন, বড় জরুরী কি কথা আছে। রাত্রে তুমি ওখানেই খাবে।"

সবিস্ময়ে বিমান বলিল, "এই বেশে সেখানে যাবে?"

"কেন, তুমি ভয় পাচ্ছ নাকি?"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বিমান বলিল, "আমি ভয় পাই আর না পাই, তুমি পাচ্ছ না?"

সুরমা হাসিতে হাসিতে বলিল, "কার জন্যে ভয় পাব? মার জন্যে? মা যখন একটি মেয়েকে সহ্য কর্‌ছেন, তখন আর-একটি মেয়েকেও সহ্য কর্‌বেন!"

মৃদু হাস্যের সহিত বিমান বলিল, "সে মেয়েটিকে এখন আবার ভিন্ন মূর্ত্তিতে সহ্য কর্‌তে হচ্ছে।"

বিস্মিত হইয়া সুরমা বলিল, "কি-রকম?"

"গেলেই দেখ্‌তে পাবে। খদ্দর ছেড়ে সুমিত্রা এখন আবার ষোল-আনা বিলিতী কাপড় ধরেছে। অসাধুকে সাধুর বেশে দেখ্‌লে লোকে যেমন সন্ত্রস্ত হ'য়ে ওঠে, সুমিত্রাকে বিলাতী কাপড়ে দেখে' মা তেম্‌নি ত্রস্ত হ'য়ে উঠেছেন—লক্ষণটা ভাল না মন্দ সেটা ঠিক বুঝে' উঠ্‌তে পার্‌ছেন না! বোধ হয় সেই বিষয়ে পরামর্শের জন্যই তোমার তলব পড়েছে।" বলিয়া হাসিতে হাসিতে বিমানবিহারী নিজ কক্ষে প্রবেশ করিল।

ক্রমশঃ

কান্তনামা

সমালোচনা

(দেওয়ান মামুল্লা মণ্ডল কৃত। শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী, এম্-এ, সম্পাদিত। ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাবলী নং ৮। ১০৭ পৃষ্ঠা। মূল্য ৷৹ আনা।)

কাশিমবাজারের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম কান্তবাবু। তাঁহার নামানুসারে এই গ্রন্থের নাম, কান্তনামা; অর্থাৎ কান্তবাবুর ইতিহাস। কান্তবাবুর পরে লোকনাথ, তদনন্তর হরিনাথ, তদনন্তর কৃষ্ণনাথ রাজা হইয়াছিলেন। এই চারি রাজার কীর্ত্তি এই গ্রন্থে পদ্যে বর্ণিত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে রাজধর্ম্মও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই হেতু এই গ্রন্থের অপর নাম, রাজধর্ম্ম।

কান্তনামায় লিখিত আছে, ১১৭২ সালে কান্তবাবু রাজা হইয়াছিলেন। সম্পাদক লিখিয়াছেন পুথীর শেষ পৃষ্ঠায় ১২৫০ সাল লিখিত আছে। ১২৫২ সালে মহারাজ কৃষ্ণনাথ পরলোক গমন করেন। কাজেই গ্রন্থকার কৃষ্ণনাথের সময়ে ছিলেন। ১২৫০ সালে গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। সে আজ ৮১ বৎসর পূর্বে।

পুথীখানি তত পুরাণ নহে এবং পদ্যমাত্রে কাব্যও নহে। কিন্তু পুথীমাত্রেই ইতিহাস। কারণ, কবি যেমনই হউন, তিনি কাল-প্রবাহের বাহিরে যাইতে পারেন না। তিনি কালের নগণ্য বিন্দু হইলেও তাহাকে অতিক্রম করা তাঁহার সাধ্য নয়। এই হিসাবে কান্তনামার মূল্য আছে। সম্পাদকমহাশয় পুথীখানি উদ্ধার করিয়া ভাল করিয়াছেন।

কবির নিবাস ছিল, দিনাজপুরে, মহারাজা কৃষ্ণনাথের জমিদারীর মধ্যে। সেখানে তাঁহার বহুকালের বাস। তাঁহার উপাধি 'দেওয়ান' হইতে বুঝি, তিনি সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মিয়াছিলেন। 'মণ্ডল' পদ্ধতি হইতেও বুঝি, গ্রামের মধ্যে তিনি মান্য গণ্য ছিলেন। তাঁহার ঊর্দ্ধতন পঞ্চম পুরুষে ও পদ্ধতি 'মণ্ডল' ছিল।

কবির বংশধরগণের বাড়ীতে পুথী পাওয়া গিয়াছিল। ইঁহারা কবিকে 'লেখনদার' বলিয়া এখনও স্মরণ করেন। কবিও পুথীর মধ্যে আপনাকে 'লেখনদার' বলিয়াছেন। তাঁহার ভাষা দেখিয়া বোধ হইতেছে, তিনি তৎকালের প্রচলিত বাঙ্গালা জানিতেন, কিন্তু বাঙ্গালা শেখেন নাই। ভাষায় অনেক আরবী ফারসী শব্দ আছে, কিন্তু সে সবও এমন অশুদ্ধ, যে, সম্পাদক অর্থ দিতে পারেন নাই। গ্রন্থের ভাষা ও ভাব দেখিলে তাঁহাকে গ্রাম্য কবি বলিতে হয়। তিনি লেখনদার ছিলেন অর্থাৎ বাক্য-রচনা করিতে পারিতেন। প্রসাদ গুণ গ্রাম্য কবির প্রধান গুণ। অধিকাংশ প্রাচীন কবির ভাষায় এই গুণ বর্তমান ছিল। এই গুণেই পাঠকের চিত্ত আকৃষ্ট হইত, তাহারাও কবির যোগ্য আদর পাইতেন।

বৃদ্ধ বয়সে যখন কবির দেহ জরায় জীর্ণ রোগে ক্লিষ্ট, তখন তিনি কান্তনামা লিখিয়াছিলেন। তাঁহার শোক তাপেরও অবধি ছিল না। ছয় ভাই, সাত পুত্র দুই ভাই পো, ভাই-বউ করিয়া একে একে পরিবারের কুড়িজন গত। ইতমধ্যে গৃহ-দাহও হইয়া গিয়াছে; পুরী শ্মশানে পরিণত। তাঁহার এই দুঃখের কাহিনী পড়িলে করুণায় মন ভরিয়া আসে।

খেদে আমার মন রাগে ধরি খাএ বনের বাঘে
তবে আমার জুড়াইত হিয়া।
নাহি পাই পথের দিশ খায়া মরি জহর বিষ
নহে মরি জলে ঝাম্প দিয়া॥
নহে ত অগ্নিতে পড়ি কখন কিবা মনে করি
কোথা গেলে বাছার পাব দেখা।
এ ভব-সংসার মাঝে বৃথা রইলাম কিবা কাজে
এহি ছিল কপালের লেখা॥ *

কিন্তু কবি ঈশ্বর বিশ্বাসী, ঈশ্বরের কৃপায় নির্ভরশীল মুসলমান। "এহি রূপে নিরঞ্জন বুঝেন আমার মন।" একদিন কবি স্বপ্নে নিরঞ্জনের বাণী শুনিলেন,

লিখহ রাজার কীর্ত্তি রাজা সে বাসিবে প্রীতি
এহি বাক্য নিরঞ্জন কএ।
কিন্তু এ যে কঠিন আদেশ।
কিরূপে লিখিব আমার শেষ অজ্ঞান।
রোগে শোকে কোন মতে নাহি লাগে জ্ঞান॥
তা ছাড়া,
আর ত রাজার কীর্ত্তি লিখিতে লাগে ভয়।
না জানি বাসিবে মন্দ রাজা মহাশয়॥
এমন সময় শূন্য বাণী হইল,
লিখিলা রাজার কীর্ত্তি আমার বাচনি॥
কীর্ত্তি শুনিয়া যদি রাজা নাহি মানে।
পিতা উদ্ধারণ তার হইবে কেমনে॥

রাজা কৃষ্ণনাথের পিতা রাজধর্ম পালন করেন নাই। এই হেতু তাঁহাকে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছিল। সে-কথা কৃষ্ণনাথ শুনিলে পুণ্যকর্ম দ্বারা নিশ্চয়ই পিতার স্বর্গ প্রাপ্তির উপায় করিবেন। এই উপকারের জন্যও, রাজার প্রীতি হউক না হউক, কবিকে কীর্ত্তি লিখিতে ও রাজাকে শুনাইতে হইবে। কবি সাধ করিয়া কান্তনামা লেখেন নাই, কেহ লেখাইয়াছিলেন।

গুপ্তভাবে কহে বাক্য অন্তরে আমার।
পুস্তকে লিখিএ আমি করিয়া প্রচার॥
আপন প্রতিষ্ঠা কিছু না লিখি আপনি।
নাচার হইয়া লিখি ঈশ্বর বাচনি॥

প্রকৃত কবি প্রেরণার বশে কাব্য লিখিয়া থাকেন।

বোধ করি, প্রকৃত ঈশ্বরভক্তও ঈশ্বরের নাম বিচার করেন না। তাঁহার নিকট সব নামই মধুর, সব নামেই সেই এক। মানুষ নাম না করিয়া ধ্যান করিতে পারে না, সে নাম যাহাই হউক। মানুল্লা মণ্ডল দেখিতেছি, মুসলমান হইয়াও "শ্রীশ্রীহরি সহায়" লিখিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। হরি হর নারায়ণ এই তিনও সেই এক।

হরিহর নারায়ণ ত্রিজগতের পতি।
ইহ নাম বিনে লোকের অন্য নাহি গতি॥
হরি ব্রহ্ম হরি ব্রহ্ম সর্ব্বশাস্ত্রে কএ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে জানো হরি সর্ব্বময়॥

তাঁহার অনন্তরূপ অনন্ত নাম, অথচ তিনি নিরাকার, নিরঞ্জন।

সকলের সঙ্গে ফিরে কেহ এ দেখিতে নারে
তিল অর্দ্ধে না ছাড়ে কাহার।
পুরুষ প্রকৃতি নএ কে কহিতে পারে তাএ
কিছু আকার নাহিক তাহার।

প্রাচীন অনেক মুসলমান কবির মনে হিন্দুর উপাস্য দেব-দেবীর সহিত মুসলমানের একেশ্বর-বাদের সমন্বয় হইয়াছিল। কান্তনামায় হরি বলিতেছেন,

আমি ব্রহ্মা আমি বিষ্ণু আমি মহেশ্বর।
আর কেউ বলিতে নাহি আমার উপর॥
আমি রাম আমি রহিম আমি হরিধ্বনি।
বলির কাছে ত্রিপদ ভূমি
দান লৈলাম আমি।

এই কারণে হিন্দুও সত্যনারায়ণ-পূজা-পদ্ধতি করিয়াছিলেন।

রাজা কৃষ্ণনাথকে রাজধর্ম শিক্ষা দেওয়া কবির অভিপ্রায়। এবিষয়ে এক প্রাচীন আখ্যান আছে। শ্রীচন্দ্র নামে এক ধনুর্দ্ধর বলবান্ রাজা

---

* যাবতীয় উদ্ধৃত পদের শব্দের বানান পাঠকের সুবিধার নিমিত্ত শুদ্ধ করিয়া লেখা গেল।

ছিলেন। কতদিন তাঁর ভালয় ভালয় গেল। পরে এক পুত্র জন্মিল। তাহার অন্ন-প্রাশনের পর বিবাহ হইবে। রাজা এই এই বাবদে প্রজার নিকট সেলামি চাহিলেন। ইতিমধ্যে রাজার পিতাও স্বর্গারোহণ করিলেন। কাজেই হাড়-পোড়ানি আর এক বাবদ আসিয়া জুটিল। এক সঙ্গে তিন বাবদে, অল্প নয়, টাকায় ছয় আনা, আদায় হইল। প্রজার দুঃখ হইল, রাজার প্রতি ঈশ্বর নারাজ হইলেন, মৃত্যুর পর রাজা নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন।

ফল কথা,

রাজা হৈলে পিতা হয় প্রজা হয় বেটা।
প্রজা-পুত্র বলি কদর আর বুঝে কেটা॥

ইহার সাক্ষাৎ প্রমাণ, রাজা হরিনাথ। তাঁহার সময়ে ইজারাদার প্রজার নিকট অন্যায় করিয়া এ-বাবদ সে-বাবদ করিয়া অতিরিক্ত কর লইতে লাগিল। প্রজা রাজার গোচরে দুঃখের কথা জানাইল। কিন্তু রাজা জবাব দিলেন না। পরদিন আবার প্রজা রাজার নিকট খাড়া হইতে গেল, কিন্তু সে দিন রাজা পাটে বসিলেন না, দরবার হইল না। এই রূপে তের দিন গত হইল, রাজার সঙ্গে পুনশ্চ আর দেখা হইল না। এদিকে খরচ ফুরাইয়া গেল, প্রজা নাচার হইল।

প্রজা বলে পুনরপি যাব দরবারে।
হএ না হএ আজিকা ফিরি না যাব ঘরে॥
এতেক ভাবিয়া প্রজা চলিল তখন।
রাজার দখলে যায়্যা দিল দরশন॥
দেখে রাজা বসি আছে পাটের উপর।
দরানি যাইতে না দেএ রাজার গোচর॥
যাইতে না পায়্যা দিল দোহাই রাজার।
দেখিয়া জবাব রাজা না দিল তাহার॥

দ্বারের দরান কোন মতে যাইতে দিল না, রাজাও শুনিলেন না। প্রজাকে চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে ফিরিতে হইল। ছয় দিনের পথ আসিয়াছিল, সম্বল আর কিছু মাত্র নাই। ক্ষুধায় আকুল হইয়া প্রজা উপবাসী রহিল। ভিক্ষা করিয়া খাইয়া কতদিনে ঘরে ফিরিল, নিরঞ্জন পুণ্যমন্ত রাজার পাপ টুকিয়া রাখিলেন।

কতদিন পরে রাজার মৃত্যু হইল। দান-ধর্ম, পুণ্য কর্ম হেতু বৈকুণ্ঠে স্থান হইল। তিনি সিংহাসনে বসেন, নানা উপচারে সুবর্ণের থালে অন্ন ভোজন করেন। সবই সুখ, এক জ্বালাতে তিনি ছটফট করিতে লাগিলেন। প্রজাকে উপবাসী করাইয়াছিলেন, তাঁহার অঙ্গে হাওয়া লাগে না, সদা গ্রীষ্মজ্বালা ভোগ করিতে লাগিলেন। ত্রিলোকের নাথের দয়া হইল, তিনি দ্বিজরূপে দেখা দিয়া ছয় আনা জ্বালা নিবারণ করিলেন। তাঁহারই অংশে পুত্র কৃষ্ণনাথ জন্মগ্রহণ করিয়া দানধর্ম-পুণ্যকর্ম দ্বারা পিতাকে উদ্ধার করিলেন।

মহা ধার্ম্মিক রাজা হৈল কি কহিব তার।
যাহার সম পুণ্যমন্ত রাজা নাহি আর॥
দিগ-জোড়া নাম হৈল ভাটি আর উজানি।
রহিবেক নাম যশ যাবৎ মেদিনী॥

মহারাজ কৃষ্ণনাথের নাম, তাঁহার পত্নী প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ীর নামে ঢাকা পড়িয়াছে। কান্তনামার সম্পাদক ঠিক লিখিয়াছেন, "পৌরাণিক এবং জনশ্রুতি-মূলক চরিতাখ্যান লইয়া কাব্য-রচনা বাঙ্গালা-সাহিত্যে বহুলভাবে প্রচলিত থাকিলেও ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক ব্যক্তি-বর্গের কথা কাব্যাকারে লিপিবদ্ধ করার উদাহরণ অভিনব।" বেশী দিনের কথা নয়, মাত্র এক শত বৎসর পূর্বে রাজা-প্রজার কি সম্বন্ধ ছিল, কবি আমাদিগকে দেখাইয়া গিয়াছেন। সে পিতাপুত্রের সম্বন্ধ এখন দুর্লভ হইয়াছে।

পিতা রাজা পালন করে নানান যতনে।
পরে মারে অবিচারে দয়া নাহি জানে॥

অবশ্য তখনও দুর্দান্ত প্রজা ছিল, রাজাকে মানিত না, রাজকর দিত না। কান্তবাবুর এক নূতন জমিদারীর নাম ছিল বাহিরবন্দ।

বড় খল রাজ্য সেহি খল তার প্রজা।
খাজনা না দেএ কাকেও নাহি মানে রাজা॥
এক এক রায়তের জমা দুই চারি হাজার।
কুঞ্জর আছয়ে বান্ধা ফিলখানার মাঝার॥
কাহার পুষ্করণীর জল কেহ নাহি খাএ।
কাহার জাঙ্গাল দিয়া কেহ নাহি যাএ॥

এত ধনবান্ ও খল প্রজা শাসন করিতে কান্তবাবুকে কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। পরে কিন্তু

দয়ার শরীর রাজার দয়া হৈল মনে।
ইনসাফ করিল বাবত না দিঅ কখনে॥

এইরূপ কিন্তু নানা কথার মাঝে মাঝে মানুল্লা মণ্ডলের শোকধ্বনি উত্থিত হইয়াছে। তিনি কেন কীর্তিকথা লিখিতে বসিলেন? ইহার উত্তর নানাস্থানে দিয়াছেন। কিন্তু বোধ হয় আসল উত্তর, তিনি মহারাজা কৃষ্ণনাথের পুণ্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। যে-সে তাঁহার পুণ্য-কীর্তি লিখিতে পারিবে না। ত্রিলোকনাথ ভাবিলেন,

পুত্র-ভ্রাতা লৈঞা আগে মন ভোলাইব।
তবে ত রাজার কীর্ত্তি পশ্চাতে লেখাব॥
দুঃখ পায়্যা আমার নাম না ভুলে যে জন।
সেহি সে লিখিবে কীর্ত্তি পিতা-উদ্ধারণ॥

এই হেতু তিনি

পুত্র ভ্রাতা মারে আমার লেখাএ আমার হাতে।
পুত্র-শোকের শেল আমার রৈল কলেজাতে।
সে সব কহিতে আমার প্রাণ জারে জার।
ঈশ্বর বাচনি লিখি হইয়া নাচার॥
হায়রে দারুণ বিধি কঠিন তোর হিয়া।
কীর্ত্তি লেখাইলে আমার বুকে শেল দিয়া॥

এই যে স্বাভাবিকতা, ইহার জন্যও বাঙ্গালী পাঠক মানুল্লা মিঞার কীর্তি স্মরণ করিবে।

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়

মহিলা-প্রগতি

শ্রীমতী দেবী

ভারতবর্ষে কোচিন রাজ্যই সর্ব্বপ্রথম নারীদের ভোট দিবার অধিকার এবং নির্ব্বাচনে দাঁড়াইবার অধিকার দান করেন। সেখানেই নারী এবং পুরুষদের মধ্যে সকল-রকমের প্রভেদ একেবারে দূর করিয়া দেওয়া হয়। সম্প্রতি একটি তালিকায় দেখা গিয়াছে, যে, ১৮০০০ ভোটদাতার মধ্যে মাত্র ১২০০ জন মহিলা। এই কম-সংখ্যক নারী ভোটদাত্রীর সাহায্যে কোন মহিলারই নির্ব্বাচিত হইবার আশা নাই। এইজন্য এইখানে নারীদের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাউন্সিলে ১৫ জন বিশেষ নির্ব্বাচনের মধ্যে অন্ততঃ চারটি পদ নারীদের জন্য রাখিয়া দেওয়া উচিত। কোচিন প্রদেশের মত ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশের নারীরা এত শিক্ষিত নহেন। শিক্ষিত নারীর সংখ্যাও কোচিনে অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বেশী। কোচি-নের মহারাণীও খুব শিক্ষিতা এবং প্রজাদের উন্নতির জন্য সতত ব্যস্ত রহিয়াছেন। তাঁহার সাহায্যে নারীদের এই অধিকার লাভ করিতে বিশেষ দেরী না হইতেও পারে।

বঙ্গের একজন বণিক্ দাতার অর্থে বেনারস হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীদের জন্য একটি বিশেষ হোষ্টেল নির্ম্মিত হইয়াছে। এই ছাত্রী-আবাসটি একটি দেখিবার মত জিনিষ এবং দাতার দান সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই বিশেষ কার্য্যে দাতার দানকে প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না, কারণ দাতা স্পষ্টই বুঝিয়াছেন, যে, নারী এবং পুরুষ একসঙ্গে না চলিতে পারিলে দেশের কোন আশা নাই। এই কথাটি অতি পুরাতন, কিন্তু বার বার বলিয়াও দেশের লোকদের চেতনা হইতেছে না। কিন্তু এই হোষ্টেল খোলার সঙ্গে-সঙ্গে আর-একটি প্রশ্ন উঠিয়াছে। এতদিন পর্য্যন্ত মাত্র ছয়টি ছাত্রী এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়াছে। তাহাদের পড়াশুনা ইত্যাদি সবই পুরুষ ছাত্রদের সঙ্গে একই ঘরে হইয়াছে। এই নূতন ছাত্রী-আবাসে ১০০ জন ছাত্রী থাকিবার মত স্থান হইয়াছে। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বড়কর্ত্তারা স্বতন্ত্র নারী-বিভাগ করিতে চাহিতেছেন, তাঁহারা এত বেশী-সংখ্যক ছাত্র এবং ছাত্রী একসঙ্গে একই ক্লাসে পড়াইতে সাহস করেন না। তাঁহাদের নানাপ্রকার আশঙ্কা হইয়াছে। কিন্তু যাঁহাদের লইয়া এত কথা তাঁহারা কোনপ্রকার আলাদা বন্দোবস্ত চাহেন না, তাঁহারা পুরুষ ছাত্রদের সঙ্গে সকল বিষয়ে সমান সুবিধা এবং অধিকার চাহেন। তাঁহারা বলেন, যে, তাঁহাদের নিজেদের চরিত্রের উপর বিশ্বাস আছে, অনাবশ্যক ভয় করিবার কিছু নাই।

পুরুষ-ছাত্রেরা অনেক সময় নানাপ্রকার বেয়াদবী করে। তাহাদের ব্যবহার দেখিয়া মধ্যে-মধ্যে মনে হয়, যে, তাহারা কোন কালে নারী দেখে নাই, এবং তাহারা ভদ্রতা ভব্যতা শিষ্টতার ধারও ধারে না। এই-সমস্ত বদ্‌রোগের ঔষধ মেয়েদের হাতেই আছে। তাঁহারা রাস্তায় যদি চাবুক লইয়া বেড়ান এবং দর্‌কার-মত তাহার ব্যবহার করিতে পারেন, তবে দেশের অনেক উপকার হইবে। বেনারস্ হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের বড়কর্ত্তারা মেয়েদের জন্য আলাদা বন্দোবস্ত না করিয়া পুরুষ ছাত্রদের জন্য একটি বিশেষ ক্লাস খুলিলে পারেন, এই ক্লাসটির নাম হইবে—"মহিলাদের প্রতি ভদ্রব্যবহার শিক্ষার ক্লাস"। অবশ্য সকল ছাত্রকেই যে এই ক্লাসে পড়িতে হইবে তাহার কোন মানে নাই, যাহাদের একান্ত প্রয়োজন কেবলমাত্র তাহারাই বিনাবেতনে পড়িতে পাইবে।

মান্দ্রাজের আদায়ার বিদ্যালয়ের মেয়েদের একজন ডাচ মহিলা বাইসাইকেল চড়া শিখাইতেছেন। তিনি

তাঁহার নিজের বাইসাইকেল এই কার্য্যে দান করিয়াছেন। গত দুই মাসে ১৫ জন মহিলা বেশ ভাল বাইসাইকেল চড়িতে শিখিয়াছেন। ইহাতে তাঁহাদের কার্য্যের অনেক সুবিধা হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে খোলা হাওয়ায় ব্যায়ামের জন্য শরীরও ভাল হইতেছে। ভারতবর্ষের অন্য কোথাও এইরূপ ব্যবস্থা আছে কি না, জানি না। কলিকাতার মেয়ে-বিদ্যালয়গুলিতে এই ব্যবস্থা অনায়াসেই করা যাইতে পারে। বাইসাইকেল চড়িতে শিখিলে মেয়েদের অনেক সময় স্বাধীনভাবে চলা-ফেরা করিবার সুবিধা হয়, এবং এপাড়া হইতে ওপাড়া যাইতে হইলে থার্ড্ ক্লাস গাড়ী ডাকিয়া ছয় আনা পয়সা ভাড়া দিতে হয় না।

আফ্‌গানিস্থানের বর্ত্তমান আমীর আমান-উল্লা দেশের নানাপ্রকার উন্নতি করিবার সময় নারীদের ভুলিয়া যান নাই। দুই বৎসর পূর্ব্বে মহারাণীর নিজ কর্ত্তৃত্বাধীনে একটি মেয়েদের বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে এই দেশে আর কখনও নারী-বিদ্যালয় খোলা হয় নাই। বিদ্যালয়টি পর্দ্দা-বিদ্যালয় হইলেও ইহাতে দেশের অনেক উপকার হইতেছে। বিদ্যালয়ের চারিদিকে কড়া পাহারার বন্দোবস্ত হইয়াছে। বিদ্যালয়টিতে ৩৫০ জন ছাত্রী আছে। সকলেই দেখিতে সুন্দরী এবং বুদ্ধিমতী। বিদ্যালয়ে পাঁচ বৎসর পড়িতে হয়। ছোট মেয়েদের সাত বছর বয়স হইতে লেখা-পড়া সুরু করিতে হয়। বিদ্যালয়ে, পড়া লেখা অঙ্ক ভূগোল ইতিহাস চিত্রাঙ্কন সেলাই-শিল্প ইত্যাদি সহজভাবে শিখান হয়। শিক্ষকেরা ভারতবর্ষ হইতে শিক্ষিত হইয়া গিয়াছেন। এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে মেয়েদের শিক্ষার বন্দোবস্ত মেয়েদের পিতারা দয়া করিয়া করিলে কিছু হইত। তাহাও কোরান্-পাঠেই শেষ হইত।

সুদূর চীনদেশের উচাও সহরের নারীরা একটি দৈনিক কাগজ বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছেন। চীনদেশের পুরুষ পরিচালিত খবরের কাগজগুলিতে মহিলারা বিশেষ আমল পান না, তাই তাঁহাদের এই উদ্যোগ। এই কাগজে নারীদের সংক্রান্ত ব্যাপার এবং সংবাদাদি ছাড়া অন্য কিছুই থাকিবে না।

জাপানে নারী-শ্রমিকদের একটি সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইহার সভ্য সংখ্যা ১০০। এই সংখ্যার মধ্যে সকলরকমের নারীই আছেন। এই সঙ্ঘ ক্রমশঃ তাঁহাদের দল বাড়াইতেছেন এবং ক্রমে তাঁহারা জাপানের সমস্ত নারী-শ্রমিকদের কেন্দ্র-সঙ্ঘ হইবেন বলিয়া মনে হয়। সঙ্ঘ নারী শ্রমিকদের সকলপ্রকার উন্নতির দিকে দৃষ্টি রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ-গুলিতে এইপ্রকার নারী-শ্রমিক-সঙ্ঘের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

নূতন ছন্দ

শ্রী গোলাম মোস্তফা

এই কোলাহল-মুখরিত জগতে ছন্দ ও সুরের অবধি নাই। মেঘ-মন্দ্রে, গিরি-রন্ধ্রে, বিহগ-সঙ্গীতে, তরঙ্গ-ভঙ্গীতে, সর্ব্বত্রই ছন্দ বিরাজমান। বিশ্বের দৈনন্দিন কর্ম্ম-কোলাহলের মধ্যেও ছন্দ ও সুর ধ্বনিত হইতেছে। যাহার কান আছে, সেই তাহা শুনিতে ও বুঝিতে পারে।

নিম্নের ছন্দগুলি এইরূপভাবেই আমি প্রকৃতি হইতে ধরিয়া লইয়াছি। ইচ্ছা করিলে যে এইরূপ ছন্দ আরও আবিষ্কার করা যায়, তাহা বলাই বাহুল্য।

১। ছন্দ-সূত্র :—

"মহাত্মা গান্ধী-কি জ—য়!"

লোকে যে-ভাবে মহাত্মার নামে জয়ধ্বনি করিয়া থাকে, সেই সুর ও তাল সর্ব্বত্র বজায় রাখিতে হইবে।

মহাত্মা গান্ধী-কি জ—য় !
স্বরাজ্য মিল্‌বেই নিশ্চ—য় !
অসংখ্য বন্ধন দৈন্তে—র,
হুহুঙ্কার মিথ্যার সৈন্তে—র,
টুট্‌বেই রে, টুট্‌বেই একবা—র—
আস্‌বেই দিন—সেইদিন দেখ্‌বা—র !
অদম্য মুক্তির ক্রন্দ—ন,
সংক্ষুব্ধ অন্তর-স্পন্দ—ন,
উদ্বুদ্ধ দাস্তের এই জ্ঞা—ন,
আন্‌বেই শেষ স্বর্গের কল্যা—ণ !
ভক্তের এই রক্তের অর্প—ণ
নিঃসন্দ মুক্তির দর্প—ণ !

২। ছন্দ-সূত্র :—

"আল্লা নবী ,
—হেঁই···ও !
আদম ছবি
—হেঁই···ও !"—ইত্যাদি।

কোন ভারী বস্তু স্থানান্তরিত করিতে হইলে, লোকে যেরূপ বোল ব্যবহার করে।

ওগো সাধের
ময়না !
কানন-রাণীর
গয়না !
মধুর তুমি—
সুন্দর ;
সুবাস-মাখা
কুন্দ'র ;
কোমল তব
অন্তর,
চরণ-ধ্বনি
মন্থর,
এস হৃদয়-
কুঞ্জে—
কোমল কুসুম-
পুঞ্জে !

৩। ছন্দ-সূত্র :—উড়ে বেহারাদের পাল্‌কী-গানের বোল :—

"হেঁক্কু যাব রে !
হালায় যাব রে !
ধাইকিড়্‌ নাকড়্।" ইত্যাদি।

শেষোক্ত শব্দগুলি (যথা :—"যাব রে", "চলে রে" ইত্যাদি) অপেক্ষাকৃত দ্রুত বলিতে হইবে, নতুবা ছন্দের গতিভঙ্গি অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইবে।

পাল্‌কি চলে রে !
পাল্‌কি চলে রে !
ঘোম্‌টা ঘেরা কে
বউ-ঝি টলে রে !
ঘোট্টা বেহারা
ছোট্টা চেহারা !
কোন্ গাঁ হ'তে গো।
আস্‌ছে ইহারা !

(এই ছন্দের সম্পূর্ণ কবিতাটি পূর্ব্বেই "প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে।)

৪। ছন্দসূত্র :—

"কুতুর্ কুতুর্ ময়না
আজও বিয়ে হয় না"—ইত্যাদি।

ছেলে-মেয়েদের ছড়ার ছন্দ অনুসরণ করিতে হইবে :—

তোজম্মল ছোক্‌রা
দাঁত-পড়া বোক্‌রা !
হাড়ে হাড়ে দুষ্ট,
সবাই অসন্তুষ্ট !
করে কেবল ঝগড়া,
কাঁপায় ঘাড়ের মগরা !
ভাই-বোনে দুইটি—
যেন কাঁথা-সুঁইটি !
এক খানে হয় না,
ভাল কথা কয় না,
মুখ করে ভেক্‌চি—
কানা-ভাঙা ডেক্‌চি !

৫। ছন্দসূত্র :—

"আগাডুম বাগাডুম ঘোড়াডুম-সাজে !"

এই ছড়ার ছন্দে শেষ শব্দের উপান্ত স্বরে টান দিয়া পড়িতে হইবে :—

মধুময় ফাগুনের কুঞ্জের-মাঝে
আজি কা'র রাঙা পা'র মঞ্জীর-বাজে !
এলো চুল দুল্ দুল্ ঢুল্ ঢুল্-আঁখি,
পুষ্পের হার আর পুষ্পের-রাখী,
বৃক্ষের ছায় যায় মন্থর-পায়ে,
বক্ষের অঞ্চল চঞ্চল-বায়ে ! *

৬। ছন্দসূত্র :—

পাখীর গান—"বউ কথা-কও !"

বউ কথা কও !
বউ কথা কও !
মোর পরাণ যায়
তুই কোথায় হায় !
কোন্ সুদূর দেশ,
দূর আঁখির শেষ,
কোন্ বনের ছায়,
নীল গগন গায়,—
খোঁজ কোথায় তোর ?
বল্ হৃদয়-চোর !

---

* অবশ্য ইহার অনুরূপ ছন্দ স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার "চর্‌কার গানে" ধরিয়া রাখিয়াছেন।

৬। ছন্দ-সূত্র—

"ঢং ঢং ঢং
ঢং ঢং ঢং।"

ষ্টেশনে গাড়ীর ঘণ্টার শব্দ—

ঢং ঢং ঢং!
ঢং ঢং ঢং!
ট্রেন ওই যায়,
আয় আয় আয়।
ঝট্‌পট্‌ ওঠ,
তোল সব মোট,
বস্‌বার ঠাঁই
একদম্‌ নাই।
গায়-গায়গা
সব জায়গা!

৭। ছন্দ-সূত্র :—

"ঘচা-ঘচ্‌
ঘচা-ঘচ্‌"

ট্রেন চলার শব্দ—

ঢাকা মেল
দিল 'বেল',
দেরী নাই,
ব'সে যাই!
বারোমাস
পরবাস,
মনে ভাই
ব্যথা পাই!
বাড়ী যাই!
বাড়ী যাই!

৮। ছন্দ-সূত্র :—স্থানের নাম—

(ক) "ভারতবর্ষ"

ভারতবর্ষ!
ভারতবর্ষ!
আমার পুণ্য
আমার হর্ষ!
নিখিল বিশ্ব
হউক শিষ্য
ধরার অঙ্গে
চরণ পর্শ'!

আরবী-"ম ফাঈলুন" ছন্দ-সূত্রের অনুরূপ।

(খ) "59, Mirzapur"

59, Mirzapur
আজ থেকে ভাই স্বর্গ-পুর!
ঘুচ্‌ল এবার সব্‌ অভাব
আমজাদ্‌আলীর দাও জবাব!
সব ভাল, সব জমকাল'
বিজ্‌লি বাতী চম্‌কালো!
'লাও বাবুর্চ্চি, লাও খানা!'
'আইয়ে হুজুর মাওলানা!
বা-কারাগাৎ বইঠিয়ে,
স্বর্গে যাবার মইটি এ!'

আরবী "মফ্‌তাআলুন ফাএলুন" ছন্দের অনুরূপ।

৯। ছন্দসূত্র :—মানুষের নাম—

(ক) গাজী মোস্তফা কামাল পাশা

গাজী মোস্তফা কামাল পাশা।
অসাড় স্পন্দহীন জাতির আশা!
চালাও বজ্রভীম তোমার অসি,
সকল দৈন্য-ভয় পড়ুক খসি!
আবার ইস্‌লামের আগুন জ্বালো,
নিখিল বিশ্ব হোক্‌ উজল-আলো!

(খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—
ধারাল মেধা চাকুর!
মুকুট সকল কবির,
বাণীর সাগর গভীর!
সকাল-সাঁঝের স্মরণ
বরণ করি চরণ!

(গ) চণ্ডীচরণ মিত্র

চণ্ডীচরণ মিত্র
আঁকতে পারেন চিত্র,
মুগ্ধ তাঁহার দৃষ্টি
স্নিগ্ধ পুলক-বৃষ্টি!

(ঘ) কাজী নজরুল্‌ ইস্‌লাম

কাজী নজরুল ইস্‌লাম!
বাসায় একদিন গিছ্‌লাম;
ভায়া গান গায় দিনরাত,
হেসে লাফ দেয় তিন হাত!
প্রাণে হর্ষের ঢেউ বয়,
ধরায় পর তার কেউ নয়!

(ঙ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত,
ছন্দের গানে মন মত্ত।
বঙ্গের কবিদের গর্ব্ব,
বিশ্বের বীণা-তান-সর্ব্ব।
অন্তর ভরা তার ছন্দে,
এই দীন কবি আজ বন্দে!

এইরূপভাবে যে-কোন নাম লইয়া এক-একটি নূতন ছন্দ রচনা করা যাইতে পারে। আমি বাঙ্গালার কবিদিগের দৃষ্টি এই বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করিতেছি।
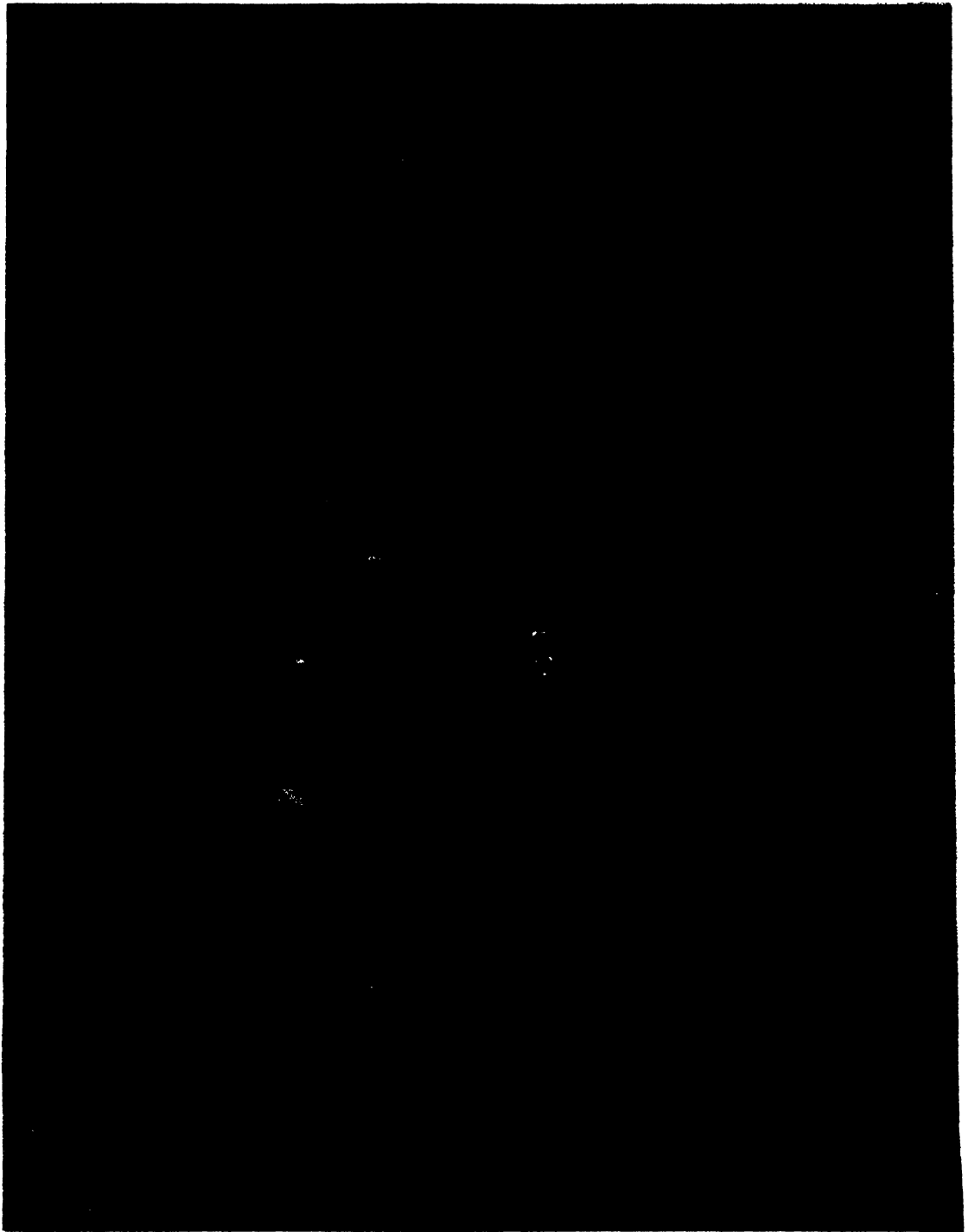
"নিশীথ রাতের বাদল-ধারা"

চিত্রকর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বিশী

বৌদ্ধ-সাহিত্যে প্রেততত্ত্ব—ডাক্তার শ্রী বিমলাচরণ লাহা, এম্‌-এ, বি-এল্‌, পি এইচ্‌-ডি প্রণীত। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড্‌ সন্স্‌, ২০৩।১।১ কর্ণ্‌ওয়ালিস ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা। দাম আট আনা। বৈশাখ, ১৩৩১।

বৌদ্ধ-ধর্ম্মকে বুঝিতে হইলে প্রেত-সম্বন্ধে বৌদ্ধদের ধারণা কিরূপ ছিল তাহা জানা দরকার। মৃত্যুই মানুষের শেষ নহে, মৃত্যুর পরেও একটা জীবন আছে এবং সে জীবনে তাহাকে ইহলোকের কর্ম্মানুসারেই ফলভোগ করিতে হয়—এই বিশ্বাসের উপরেই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং প্রেতের অস্তিত্ব বাধ্য হইয়াই বৌদ্ধদিগকে স্বীকার করিতে হইয়াছে। প্রেত-সম্বন্ধে বৌদ্ধ-সাহিত্যে যে-গ্রন্থখানিতে বিশেষ আলোচনা আছে তাহার নাম 'পেতবথু'। ধর্ম্ম-পাল এই বইখানির ভাষ্য লিখিয়া গিয়াছেন। বিমলাচরণ-বাবু ধর্ম্মপালের সেই ভাষ্য হইতে সঙ্কলন করিয়া কতকগুলি প্রেতের কাহিনী এই গ্রন্থখানিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

এইসব প্রেতের কাহিনীর ভিতর দিয়া সে-যুগের রীতি-নীতি, সামাজিক আচার-ব্যবহার, ধর্ম্মের উদারতা ও গোঁড়ামি—ইত্যাদি অনেক জিনিষের সন্ধান পাওয়া যায়। এক কথায় এই প্রেতের আখ্যানগুলি বৌদ্ধ-যুগের ইতিহাসের একটা খুব বড় উপাদান। যে-যুগে রূপকের ভিতর দিয়া ইতিহাসকে লুকাইয়া রাখিবার রেওয়াজ ছিল, এগুলি সেই যুগের কাহিনী; সুতরাং এই উপাখ্যানগুলিও রূপকের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া আছে। ইহাদের অঙ্গ হইতে সেই রূপকের আবরণটা খুলিয়া ফেলিতে পারিলেই বৌদ্ধযুগের ইতিহাসের চেহারাটা ধরা পড়ে।

ডাঃ শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ইতিহাসের দিকে এই গ্রন্থের দ্বারা আমাদের অনুসন্ধিৎসা আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন—এজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। বইখানির ভিতরে কেবলমাত্র তাঁহার অনুসন্ধিৎসা নহে, জ্ঞানেরও পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার বলিবার ভঙ্গীও বেশ সহজ এবং সরল। এই বলিবার ভঙ্গীতে সেকালের এই পুরাণো গল্পগুলি একালের গল্পের মতই সজীব হইয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থের ছাপা কাগজ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট। সে-হিসাবে দাম খুবই কম বলিতে হইবে।

মুক্তির ডাক—শ্রী মন্মথ রায়, বি-এ প্রণীত, প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড্‌ সন্স্‌, ২০৩।১।১ কর্ণ্‌ওয়ালিস ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা, দাম ।৵০

এখানি একখানি একাঙ্ক নাটক। রবীন্দ্রনাথের দুই-একখানি রূপক নাটক ছাড়া বাংলায় একাঙ্ক নাটক খুব কম। ইউরোপীয় সাহিত্যে অবশ্য একাঙ্ক নাটকের অভাব নাই। কোনো একটা জটিল সমস্যাকে জমাট করিয়া তুলিয়া ইউরোপীয় সাহিত্য-রথীদের অনেকেই অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই নাটকখানিতে সেরূপ কোনো অসাধারণত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না বটে, তবে গ্রন্থখানির ভিতরে লেখকের বৈশিষ্ট্যের ছাপ অনেক জায়গায় আছে। মোটের উপর বইখানি পড়িয়া আমরা সুখী হইয়াছি।

রায়

চন্দ্রলোকে যাত্রা—শ্রী রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য, বি-এ প্রণীত। শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক ৫৭।১ কলেজ ষ্ট্রীট্‌ হইতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা। পৃঃ ৭৪ (১৩৩১)।

বইখানি সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী উপন্যাস-লেখক জুল ভ্যার্ণের গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ "From the Earth to the Moon" নামক গ্রন্থাবলম্বনে লিখিত। রাজেন্দ্র-বাবু ইতিপূর্ব্বে জুল ভ্যার্ণের অন্যান্য গ্রন্থাবলম্বনে 'আশীদিনে ভূপ্রদক্ষিণ', 'বেলুনে পাঁচ সপ্তাহ' ও 'পাতাল' এই তিনখানি বই লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। এই বইখানিও বেশ সুখপাঠ্য হইয়াছে। পুস্তকখানি বালক-বৃদ্ধ সকলেরই চিত্তাকর্ষণ করিবে সন্দেহ নাই। বইখানির ছাপা ও বাঁধাই মনোরম হইয়াছে।

প্র

ত্রিবেণী—শ্রী অবিনাশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম্‌-এ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান অল্‌ ইণ্ডিয়া পাব্‌লিশিং কোম্পানী; লিমিটেড্‌, ৩০ কর্ণ্‌ওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা। দাম বারো আনা।

কবিতার বই। কবিতাগুলির তিনটি বিভাগ করা হইয়াছে—স্বপ্ন ও জাগরণ, বিরহ ও মিলন, এবং হাসি ও অশ্রু। কিন্তু বিভাগগুলির সহিত কবিতাগুলি সুসঙ্গত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। গোড়ার দিকে দুই-একটি কবিতা মন্দ হয় নাই, যেমন টেনিসনের এনক্‌ আর্ডেনের উপাখ্যানের অনুরূপ কবিতাটি। অধিকাংশ কবিতায় ছন্দের ত্রুটি আছে। হাসি ও অশ্রু বিভাগে লেখকের হাসাইবার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। তবে লেখকের কবিত্ব কিছু আছে।

বইখানির ছাপা ও কাগজ চলনসই।

গুপ্ত

দণ্ড-রহিত-শিক্ষা-প্রণালী—প্রকাশক অধ্যাপক আর কে কুলকর্ণী, এম্‌ এ, এল্‌ এল্‌-বি, ভিক্টোরিয়া কলেজ গোয়ালিয়র। দাম দুই আনা।

দণ্ড না দিয়া শাসন না করিয়া কেবল যত্ন ও ভালবাসায় ছোট-ছোট ছেলেদের কেমন করিয়া শিক্ষা দেওয়া যায় ও পাশ্চাত্য দেশে কেমন করিয়া সেই কাজ হইতেছে তাহা সংক্ষেপে এই পুস্তিকায় বিবৃত হইয়াছে। এসম্বন্ধে কয়েকটি চিন্তা-পূর্ণ মতামতও উদ্ধৃত হইয়াছে। এরূপ আলোচনা যত হয় ততই দেশের মঙ্গল। প্রকাশকের উদ্যম প্রশংসনীয়।

মায়ের দান—শ্রীমতী গিরিবালা দেবী। প্রকাশক শ্রীরণজিৎ কাঞ্জিলাল, ৯৩।১।এ বহুবাজার ষ্ট্রীট্‌ কলিকাতা। দাম বারো আনা।

কবিতার বই। একটি দীর্ঘ কবিতাতেই বইটি সম্পূর্ণ। দস্যু রত্নাকর নারদের উপদেশে রাম নাম জপ করিতে করিতে কিরূপে সাধুত্ব পাইয়াছিল তাহারই বিবরণ, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর ভগবৎ-তত্ত্ব! ভগবৎতত্ত্বের গুরুভারে কবিত্ব চাপা পড়িয়াছে। সুতরাং ইহাকে রত্নাকরের কাহিনী বলার চেয়ে ভগবৎতত্ত্ব-ব্যাখ্যা বলাই সঙ্গত। একটি জিনিষ কিন্তু বিশেষ প্রশংসার আছে। লেখিকা আন্দামান-

নির্ব্বাসিত শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ কাঞ্জিলালের পত্নী। স্বামীর নির্ব্বাসনের পর, দিনের পর দিন দুঃখ ও যাতনার আগুনে পুড়িয়া পুড়িয়া তিনি কিরূপে অসহায়ের অবলম্বন ভগবানকে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন এবং ধর্ম্মগ্রন্থাদি অধ্যয়নের দ্বারা কিরূপে তাঁহার স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে পারিয়াছিলেন তাহার পরিচয় বা লেখিকার ধর্ম্মভাবের ক্রমোন্নতি বইটিতে বেশ স্পষ্ট পাওয়া যায়। দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও আনন্দ লাভ করিয়া লেখিকা যেরূপে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। বইটি সাধারণ পাঠকের নিকট গুরু হইবে, তত্ত্বজ্ঞের নিকট আদর পাইবে! বইটির শেষে দুইটি অন্য কবিতা আছে। দুইটিই ভালো। স্বাধীনতার যজ্ঞে জীবন আহুতি দিয়াছেন যাঁহার স্বামী, বাঙ্গালীর ঘরের এমন এক পীড়িতা মেয়ে স্বাধীনতা ও বিপ্লবের যেরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন তাহা সুন্দর। স্বাধীনতা ও বিপ্লবকে উদ্দেশ করিয়া তিনি বলিতেছেন—

স্বাধীনতে, হে অমৃতে, তব মহিমায়
উদ্ভাসিত, আনন্দিত নিখিল ভুবন!
প্রকৃত স্বরূপ তুমি নিখিল জীবের,
আনন্দের অমৃতের তুমি প্রস্রবণ।
তুমি উৎস শিল্প-বিদ্যা-জ্ঞান-বিজ্ঞানের;
স্বাধীনতে, জগতের তুমিই জীবন!

* * *

স্বাতন্ত্র্যের ক্রোধবহ্নি তুমি হে বিপ্লব,
অন্যায়ের দারুণ দণ্ড, হে চির-বিজয়ী,
মনোহর শত্রুভয়কারী রূপ তব
নিরখি পুলকে মম প্রাণ উঠে ভরি!

শিখ-পরিচয়—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র, বি এ। বি, প্র, ভাণ্ডার, বসন্তকুটীর, গোন্দলপাড়া, চন্দননগর,। দাম চার আনা।

বইটিতে শিখ জাতির দশটি গুরুর জীবন-কথা, তাঁহাদের উপদেশ ও শিখ জাতির ইতিহাস খুব সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। অল্পের মধ্যে যাঁহারা শিখদিগের পরিচয় জানিতে চান, বইটি তাঁহাদের কাজে লাগিবে।

শান্তি—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আদি ব্রাহ্ম-সমাজ যন্ত্রালয়, ৫৫ আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। দাম বারো আনা।

গান ও কবিতার বই।

লতাপাতা—শ্রীঅমূল্যরতন বিশ্বাস, বি-এ। প্রকাশক শ্রীঅমৃতলাল দত্ত, পাসিয়াল, যশোহর। দাম এক টাকা।

পদ্যের বই। না আছে ছন্দ, না আছে ভাব। এমন বই প্রকাশ না করাই উচিত ছিল।

রামকৃষ্ণ মনঃশিক্ষা—অন্নদা ঠাকুর দ্বারা প্রাপ্ত। প্রকাশক শ্রীনলিনচন্দ্র পাল বি, এ, ১০ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম এক টাকা।

রামকৃষ্ণপরমহংসর উপদেশ পদ্যে গ্রথিত।

কল্যাণী—শ্রীনিত্যনিরঞ্জন সান্যাল। প্রকাশক শ্রীবিষ্ণুরঞ্জন সান্যাল, সলপ। দাম আট আনা।

কবিতার বই। কয়েকটি কবিতা মন্দ নয়। মাঝে-মাঝে ছন্দের দোষ আছে; ছাপার ভুলও অত্যন্ত বেশী।

গুপ্ত

সরল গঠন-তত্ত্ব—শ্রী শৈলেশ্বর সান্যাল বি-ই। প্রকাশক দি বুক্ কোম্পানি, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা। দাম এক টাকা মাত্র। ১৩৩১।

এই বিষয়ের বই বাংলা ভাষাতে বেশী নাই। এই বইখানি প্রণয়ন করিতে গ্রন্থকারের বিশেষ চেষ্টা এবং অধ্যবসায়ের পরিচয় প্রত্যেক পাতায় পাওয়া যায়। বইখানিতে কতকগুলি পরিভাষা প্রণয়ন কষ্ট-কল্পনা করিয়া করা হইয়াছে এবং তাহা অনেকের পক্ষে সহজে বোধগম্য হইবে বলিয়াও মনে হয় না। আমাদের দেশের ঠিকাদারেরা এবং অনেক ইঞ্জিনিয়ার পূর্ত্তবিভাগের কার্য্যক্ষেত্রে নামেন বিশেষ ব্যাবহারিক জ্ঞান না লইয়াই; তাঁহাদের পক্ষে এই বইখানি বিশেষ উপকারী হইবে, এবং আশা করা যায় এই বইখানিকে তাঁহারা কাজে লাগাইবেন। বইখানিতে পূর্ত্তবিদ্যার কেবল মাত্র নিয়মাদি এবং নির্ম্মাণ-কৌশলই আলোচিত হয় নাই, ইহাতে পূর্ত্তবিদ্যা-ব্যবসায়ীদের অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়গুলি, যেমন ব্যয়-নির্ণয়, পরিমাণ-নির্ণয়, বিভিন্ন দ্রব্যের ওজন ইত্যাদি অন্যান্য অনেক বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে। চিত্র-সম্বলিত হওয়ায় বইখানি সহজ-বোধ্য হইয়াছে। মাঝে মাঝে ফুটনোট দেওয়ায় ভাল হইয়াছে, কারণ এই-সমস্ত বিষয়ে এখনও এমন অনেক কিছু আছে, যাহা বাংলা অপেক্ষা ইংরেজিতেই আমরা ভাল বুঝি—কথাটা দুঃখের হইলেও সত্য। মোটের উপর বইখানি প্রণয়ন করিয়া লেখক সকলেরই ধন্যবাদার্হ এবং বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী পূর্ত্তবিদ্যা-ব্যবসায়ীদের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। বইখানির বাঁধাই, ছাপা, কাগজ সবই ভাল। ইংরেজি টেক্‌নিক্যাল্ বইএর তুলনায় দামও কম।

পাখী—শ্রীজগদানন্দ রায় প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান প্রেস্ লিমিটেড, এলাহাবাদ। প্রাপ্তিস্থান, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ১৲। ১৩৩১।

বাংলা-সাহিত্যে জগদানন্দ-বাবুর নূতন পরিচয় অনাবশ্যক। বর্ত্তমানে বাংলায় বৈজ্ঞানিক বিষয় এমন শিশু-যুবা-বৃদ্ধ-জন-মনোহরণ করিয়া আর কে লিখিতে পারেন জানি না। আলোচ্য বইখানি শিশুদের জন্য লেখা। বইখানিতে পাখীদের সম্বন্ধে যাহা জানা দরকার সবই আছে। তাহাদের জন্ম এবং মৃত্যুর মধ্যে কিছুই বাদ নাই। আমাদের দেশের পাখীদের সম্বন্ধে বিশেষ-ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। বইখানি যাহাদের জন্য লেখা তাহারা ইহা একবার আরম্ভ করিলে, শেষ না করিয়া উঠিবে না—এবং ইহার আনন্দ হইতে বুড়ারাও বাদ যাইবেন না। বইএর ছবিগুলিও ভাল হইয়াছে। শিশুকাল হইতেই যদি বালকদের মনে এই-সমস্ত পুস্তক পাঠ করাইয়া বিজ্ঞান-বিষয়ে তাহাদের একটা স্বাদ জন্মান যায়, তবে বড় হইয়া তাহারা পৃথিবীর অন্যান্য বৈজ্ঞানিক বিষয়ের অনেক কিছু মনোযোগ দিয়া পাঠ করিবে আশা আছে, এবং তাহাতে উপকার ছাড়া অপকার নাই। আমাদের দেশে বিদ্যালয়ে যে-সমস্ত বৈজ্ঞানিক পুস্তক পাঠ করান হয়, তাহাতে শিশুর কচি মন বিজ্ঞানের প্রতি বিরূপ হইয়া যায়—ঐ-সমস্ত বই ইংরেজি বৈজ্ঞানিক বইএর "মথি-লিখিত সুসমাচারের" মত অনুবাদ। অনুবাদকের কোনপ্রকার বিদ্যা আছে বলিয়া মনে হয় না। জগদানন্দ-বাবু নিজে বৈজ্ঞানিক এবং তার উপর পাকা শিক্ষক, "স্কুল-মাষ্টার" নন, কাজেই শিশুদের মন আকৃষ্ট করিবার মত করিয়া বৈজ্ঞানিক বিষয় লিখিবার তাঁহার যথেষ্ট ক্ষমতা এবং জ্ঞান আছে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয় জগদানন্দ-বাবুর এই-সমস্ত বই স্কুলপাঠ্য হইবে না। বইখানির ছাপা কাগজ বাঁধাই ইত্যাদি সবই ভাল, তবে একটা বিষয়ের ত্রুটি আছে মনে হয়—

বইখানি উপরের পরি-কল্পনা আর-একটু রংচঙে করা এবং ভিতরেও কয়েকখানি ত্রিবর্ণ এবং দ্বিবর্ণ চিত্র দেওয়া উচিত ছিল। তাহাতে সামান্ত খরচ বেশী হইলেও বইএর উপকারিতা বাড়িয়া যায়।

গলগ্রহ—(উপন্যাস)—শ্রী প্রিয়নাথ বসু। এক টাকা। জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১।

বইখানি পড়িতে একরকম ভালই লাগে। শেষের দিক্ আর-একটু ভাল হইবে আশা করিয়াছিলাম। মামুলী প্লট, তবে লেখার গুণে সরস হইয়াছে। বইখানির মাঝে মাঝে বিলাতী গল্পের ছায়া দেখা যায়।

ঝাড়ের আলো—(উপন্যাস)—শ্রী প্রফুল্লকুমার মণ্ডল। ১৷৽। জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১।

চলন সই।

শুভযোগ—(উপন্যাস)—শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল, দি বুক্ কোম্পানি ৪।৪এ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

ফণীবাবুর এই বইখানি বেশ ভাল লাগিল। আগাগোড়া প্লটের বাঁধুনি আছে। বইখানি বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী হইয়াছে। আশা করি, বাংলার উপন্যাস-পাঠক এবং পাঠিকার দল এই বইখানি পড়িয়া আনন্দিত হইবেন। বইখানির দাম, ছাপা, কাগজ এবং বাঁধাই সবই ভাল। বইখানির প্রায় গোড়াতেই "উপহার-পৃষ্ঠা"খানি বাদ দিলে ভাল হয় না? ঐ কুশ্রী নোংরা জিনিষটি আজকাল বাংলার প্রায় সব বই-এর ঘাড়ে ভূতের মত চাপিয়াছে। আলোচ্য বইখানির 'উপহার"-পৃষ্ঠা তবু ভাল। কতকগুলি এমন বই আছে, যাহাদের যাত্রাদলের যুধিষ্ঠিরের মত "উপহার"-পৃষ্ঠার ভড়ং দেখিলে বমি আসে। আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকদেরও সময়ে সময়ে রুচি জিনিষটার অভাব চোখে বড় বেশী লাগে।

গ্রন্থকীট

মুক্তি-সাধনা—স্বামী সত্যানন্দ প্রণীত পৃঃ ১০×৯৩ মূল্য ৸৽ গ্রন্থকার কর্ত্তৃক ডি এম্ লাইব্রেরী ৬৪।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

এই পুস্তকে উদারভাবে হিন্দুধর্ম্মের অনেক তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। আলোচ্য বিষয় ঈশ্বর ও সৃষ্টি, ধর্ম্ম, ধর্ম্ম ও জাতীয়তা, তপস্যা, আশ্রম ও সঙ্ঘ, সন্ন্যাসী, সঙ্ঘ ও সাধনা, সাধনা। গ্রন্থ কথোপকথনচ্ছলে লিখিত।

সত্যযুগ—শ্রী জগচ্চন্দ্র দাস বি-এ প্রণীত। গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পৃ ৭৪। মূল্য ॥৽।

জীবতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতির স্থূল স্থূল বিষয়ও লেখক অবগত নহেন।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

আপনার জন, প্রথম খণ্ড, শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ প্রণীত। প্রকাশক শ্রী মনোরঞ্জন চৌধুরী ও শ্রী ভুবনমোহন ভট্টাচার্য্য ২৩, গুরু-প্রসাদ চৌধুরীর লেন কলিকাতা। পৃঃ ৪১। মূল্য ।৵৽।

১১ খানা চিঠি, স্বাক্ষর
"আপনার জন"। সুন্দর।

আশুতোষের ছাত্রজীবন—শ্রী অতুলচন্দ্র ঘটক এম্-এ প্রণীত ও রায় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর ডি-লিট্ লিখিত ভূমিকা সম্বলিত, কলিকাতা ইউনিভার্সিটি প্রেস। এক টাকা। ১৯২৪।

বাংলার পুরুষ-ব্যাঘ্র স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্মাবধি ছাত্রাবস্থার ভিতর দিয়া কর্ম্মজীবনে প্রবেশ পর্য্যন্ত জীবনকথা ও তাঁহার পিতৃমাতৃপরিচয় এই পুস্তকে ছাত্রদিগের উপযুক্ত করিয়া সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। যে শক্তিমান্ পুরুষের প্রভাবে সমস্ত বঙ্গ-দেশ শ্রদ্ধাসম্নত হইয়া ছিল, যাঁহার অকস্মাৎ তিরোধানে সমস্ত ভারতবর্ষ শোকার্ত্ত হইয়া হাহাকার করিয়াছে, তাঁহার পাঠানুরাগ ও বিদ্যানুরাগ, অসাধারণ মেধা ও কুশাগ্রবুদ্ধি, বক্তৃতার শক্তি অনুশীলন, গণিতের মৌলিক গবেষণায় কৃতিত্ব, ছাত্রজীবনে ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিবার শক্তি ও সাহস, এবং স্বাবলম্বন, তাঁহার শুভানুধ্যায়ী বন্ধুদিগের তাঁহার সহিত সস্নেহ ব্যবহার, বিদ্যালয়ে কৃতিত্বের জন্য পিতার নিকট উৎসাহ ও পুরস্কার লাভ এবং পাঠানুরাগের জন্য পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট হইতেও পুরস্কার প্রাপ্তি, পুস্তকসংগ্রহের অদম্য আগ্রহ, এবং তাঁহার কর্ম্মপটুতার অনুরূপ ভোজনপটুতা প্রভৃতি বহু কৌতূহলোদ্দীপক ও কৌতুককর কাহিনী এই গ্রন্থে স্বয়ং স্যর্ আশুতোষের মুখ হইতে শুনিয়া ও নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই মহাপুরুষের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে এই জীবনী প্রকাশ করায় গ্রন্থকারের উদ্যম ও তৎপরতা এবং যাঁহার জীবনকথা তাঁহার উপর তাঁহার অসাধারণ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে। বইখানি পর-পর বিবৃত ঘটনা-সমষ্টি হইলেও বিষয়-বস্তুর গুণে ও সমাবেশ-শৃঙ্খলার গুণে সুখপাঠ্য হইয়াছে। ভাষা প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ—ছাপায় স্থানে-স্থানে বর্ণাশুদ্ধি আছে, তাহার জন্য দায়ী সত্বর পুস্তক প্রকাশের ব্যগ্র আগ্রহ। এই পুস্তক পাঠ করিলে ছাত্রগণ একজন পরবর্ত্তিকালে প্রখ্যাতনামা বিশিষ্ট ছাত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বিশেষ লাভবান্ হইবেন, এবং এই বিরাট্ প্রতিভাবান্ পুরুষের অনুসরণ করিয়া যদি তাঁহারা ছাত্রজীবনে সাফল্য লাভ করিয়া কর্ম্ম-জীবনে তাঁহাদের আদর্শ-পুরুষের শক্তিমত্তার শতাংশ মাত্রও পরিচয় দিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহারা ধন্য হইবেন, তাঁহাদের জাতি ও দেশ ধন্য হইবে। এইজন্য এই পুস্তকের বহুল প্রচার আমরা কামনা করি।

এই পুস্তকে অনেকগুলি ছবি আছে, তাহার একখানি রঙীন। বইখানি কাপড়ে বাঁধা, সোনায় নাম লেখা।

কোর্‌আন শরিফ, আম্-পারা—শ্রীমোহাম্মদ আক্রম্ খাঁ প্রণীত। মোহম্মদী বুক এজেন্সী, ২৯ আপার সারকুলার রোড কলিকাতা। রেশমী কাপড়ে সুন্দর বাঁধা, সোনার জলে নাম-লেখা। দাম ২৷৽।

কোর্‌আন্-শরিফ জগতের মধ্যে একটি প্রধান ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-গ্রন্থ। কোর্‌আন ত্রিশ খণ্ডে বিভক্ত, ইহার এক-একটি খণ্ডকে যুজ বা পারা বলে। ত্রিশ বা শেষ খণ্ড আম্‌পারা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পুস্তকখানিতে আম্‌পারার মূল অনুবাদ টীকা ও ভাবার্থ দেওয়া হইয়াছে। মূল ও অনুবাদ পাশাপাশি দুই স্তম্ভে সজ্জিত হওয়াতে ইহার উপকারিতা আরও বৃদ্ধি হইয়াছে; যাঁহাদের আরবী অক্ষর ও ভাষার সহিত সামান্য পরিচয়ও আছে তাঁহারা মূল ও অনুবাদ পাশাপাশি মিলাইয়া পড়িবার দুর্লভ সুযোগ পাইবেন; এই অনুবাদের নীচে ভাবার্থ এবং বিশেষ-বিশেষ শব্দ ও উক্তি-সম্বন্ধে টীকা দেওয়া হইয়াছে। কোর্‌আনের সুরাগুলি মক্কি ও মাদানি এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে; হজরৎ মহম্মদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে মক্কায় প্রচলিত ও পরে সংগৃহীত সুরাগুলিকে মক্কি বলে, এবং মদিনায় মহম্মদের প্রচারিত ধর্ম্মতত্ত্বগুলিকে মাদানি বলে; মক্কি সুরাগুলিতে সাধারণত ইস্‌লামের মূল নীতিসমূহ বিধিবদ্ধ হইয়াছে, এবং মাদানি সুরাগুলিতে সাধারণতঃ নানা দিক্ দিয়া সেগুলির বিশ্লেষণ, কার্য্যক্ষেত্রে সেই নীতি পালনের

পদ্ধতি নির্দ্ধারণ এবং কর্ম্ম দ্বারা মানবজীবনে সেই জ্ঞান নীতি ভাব ও ভক্তিকে বদ্ধমূল করিবার উপায় নিরূপণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আম্‌পারার প্রায় সমস্ত সুরাই মক্কি এবং ইস্‌লামের প্রাথমিক যুগের। মুসলমানেরা প্রত্যহ পাঁচবার নমাজের সময় বহুবার এই সুরাগুলি আবৃত্তি করিয়া থাকেন, কিন্তু অধিকাংশ লোকই তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন না; ইহার ফলে সাধারণ মুসলমানগণ ইস্‌লামের প্রকৃত শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। লেখক মহাশয় বাঙালী মুসলমানদিগের মাতৃভাষায় আম্‌পারার অনুবাদ করিয়া বাঙালী মাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। শাশ্বত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মতত্ত্ব কোনো সম্প্রদায়-বিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি নয়, তাহা বিশ্বমানবের সম্পত্তি। সত্য-ধর্ম্ম যে-কালে ও যে-দেশে যাঁহার দ্বারাই প্রচারিত হোক না কেন তাহাতে জগতের সকল নরনারীর সমান অধিকার; এই সুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত হওয়াতে সত্যধর্ম্মের সন্ধানী ধর্ম্মপিপাসু সকল সম্প্রদায়ের নরনারীই বিশেষ উপকৃত হইবেন; স্বধর্ম্মের তত্ত্ব যেমন অনুশীলন ও হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক, পরধর্ম্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ; বিবিধ দেশ-কালের ধর্ম্মতত্ত্ব তুলনায় সমালোচনা না করিলে শাশ্বত সত্যধর্ম্মের সাক্ষাৎ লাভ ঘটে না। সুতরাং এই বইখানি হিন্দু মুসলমান ও অপরাপর ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকের নিকট তুল্যভাবে সমাদৃত হইবার বিশেষ দাবী রাখে। পুস্তক অত্যন্ত উপাদেয় ও সুরচিত হইয়াছে।

পারস্য-প্রতিভা—পারস্য কবিদের জীবন ও কাব্যালোচনা, প্রথম খণ্ড। শ্রী মোহম্মদ বরকতুল্লাহ এম্‌-এ বি-এল্‌ প্রণীত। রায় এণ্ড্‌ রায়চৌধুরী, ২৪ দোতলা কলেজ-ষ্ট্রীট্‌-মার্কেট্‌, কলিকাতা। ১৮১ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধা, সোনালিতে নাম-লেখা। পাঁচ সিকা। ১৩৩০।

এই পুস্তকে পারস্য-সাহিত্যের একটি মোটামুটি পরিচয় এবং ফির্দৌসী হাফিজ ওমরখাইয়াম সাদী ও জালালউদ্দীন-রুমীর জীবনী ও কাব্যালোচনা প্রদত্ত হইয়াছে; গ্রন্থকার নিজের জ্ঞান ও বিচারের সহিত বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিতের গবেষণার সংমিশ্রণে এই উপাদেয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ধর্ম্মে ও সাহিত্যে জাতিভেদ নাই; স্থান ও কালের বিভিন্নতায় ধর্ম্মে-ধর্ম্মে ও সাহিত্যে-সাহিত্যে যে পার্থক্য ঘটে তাহাতে অসীমরসপিপাসু মানবমন বিচিত্রতার রসাস্বাদ করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিবার অবসর পায়। গ্রন্থকার এই অসাধারণ আনন্দ বঙ্গের নরনারীকে পরিবেশণ করিয়া সকলের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। কবির জীবনের সহিত তাঁহার কাব্যের সম্পর্ক প্রদর্শন ও তাঁহার কাব্যের বিশেষত্ব বিশ্লেষণ বিশেষ নিপুণতার সহিত করা হইয়াছে। কেবল একটি অভাব আমাকে দুঃখ দিতেছে, তাহা এই—লেখক বলিয়াছেন "পার্সী-ভাষানভিজ্ঞ বাঙ্গালী পাঠককে কবির রচনা-ভঙ্গি বুঝাইবার উপায় নাই। বঙ্গভাষায় সে সৌন্দর্য্য বুঝাইবার চেষ্টা বিড়ম্বনা।" এইজন্য লেখক রচনার নমুনা মূল পার্সী উদ্ধৃত না করিয়া কেবল মাত্র তাহার ইংরেজী বা বাংলা অনুবাদ দিয়াছেন; কিন্তু ইহাতে তৃপ্তি বোধ হয় না। মূল বুঝিতে না পারিলেও তাহার শব্দঝঙ্কার শুনিবার জন্য চিত্ত উতলা হইয়া উঠে। গ্রন্থকার মূল কবিতাগুলিও বাংলা অক্ষরে লিখিয়া দিলে এই গ্রন্থের মূল্য বর্দ্ধিত হইত। স্থানে স্থানে গ্রন্থকার পার্সী শ্লোক বাংলা অক্ষরে লিখিয়াছেন; কিন্তু অক্ষরান্তরকরীকরণ সর্ব্বত্র বিশুদ্ধ হয় নাই। গ্রন্থকারের পদ্যানুবাদও সর্ব্বত্র ছন্দ ও ভাব রক্ষা করিয়া চলিতে পারে নাই। এই ত্রুটি সত্ত্বেও বইখানি সাহিত্যরসিক ব্যক্তি মাত্রেরই নিকট সমাদৃত হইবে; এবং সেরূপ হওয়ার যোগ্যতাও ইহার নিজের আছে।

পোলাও—শ্রীবেনোয়ারিলাল গোস্বামী, গাইবাঁধা রংপুর। ১৭৭ পৃষ্ঠা। পাঁচ সিকা। ১৩৩০।

এই কবি বহুকাল পূর্ব্বে খিচুড়ি পরিবেশণ করিয়া বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত হইয়াছিলেন। আজ তিনি আবার পোলাও লইয়া আনন্দভোজ দিবার আয়োজন করিয়াছেন,—তাঁহার ভাণ্ডারে 'একাদশ হাঁড়ী' পোলাও আছে। এই পুস্তকে পদ্যে বঙ্গদেশের বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তির এবং বিবিধ ঘটনার সরস সমালোচনা ও ব্যঙ্গ আছে; সেই-জন্য এই ধরণের পুস্তক বিশেষ মনোরম এবং কৌতূহলোদ্দীপক হইয়া থাকে, এখানিও হইয়াছে। কিন্তু এই পুস্তকের রচনা বেশ সুশৃঙ্খল নহে এবং ছন্দের পঙ্গুতা পদে-পদে পাঠে ব্যাঘাত ঘটায়। বিষয়বিন্যাস এলোমেলো হওয়াতে কবির বক্তব্য সর্ব্বত্র সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবার অবসর পায় নাই; তাহাতে তাঁহার উদ্দেশ্যও পণ্ড হইয়াছে।

রসাঙ্কুর—শ্রীফণীন্দ্রনাথ ঘোষ, চুঁচুড়া। ১১০ পৃষ্ঠা। বারো আনা। ১৩৩০।

কবিতার বই। ইহার কবিতাগুলিতে কবিত্ব ও ছন্দবৈচিত্র্য দেখিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি।

চয়ন—সঙ্কলয়িতা শ্রী বিজয়কুমার ভৌমিক বি-এ, নৈহাটি-সিরামপুর খুলনা। ২৪৯ পৃষ্ঠা। কাগজের শক্ত বাঁধা। পাঁচ সিকা। ১৯২৩।

বিদ্যালয়পাঠ্য সংগ্রহপুস্তক। বহু প্রসিদ্ধ লেখক-লেখিকার গদ্য পদ্য ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে; নির্ব্বাচন উত্তম হইয়াছে। বিদ্যালয় পাঠ্য হইবার উপযুক্ত।

মুদ্রারাক্ষস

বাঙ্গলা সাহিত্য-প্রসঙ্গ

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়

(প্রণেতা ও প্রকাশক—মোহাম্মদ আহবাব চোধুরী, বিদ্যাবিনোদ, বি, এ। শ্রীহট্ট। ১৩৩০ সাল। ৭৫ পৃষ্ঠা। দাম ।√০ আনা।)

গ্রন্থকার বইখানি আমায় উপহার দিয়াছেন। ইহাতে আমার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার পরিচয় পাইতেছি। আমার অভিমতও চাহিয়াছেন। ইহাতেও শ্রদ্ধা প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রদ্ধার বিনিময়ে শ্রদ্ধা আপনা হইতে জন্মে। কিন্তু সকলে তাহা প্রকাশ করিতে জানে না, গ্রন্থকার অবশ্য দেখিয়াছেন। 'তিনি পুরাতন ও নূতন বাঙ্গালা বই অনেক পড়িয়াছেন, বর্ত্তমান সংবাদপত্র ও বহু সাহিত্যপত্র পড়িয়া থাকেন। ইদানী মুসলমানের মধ্যে অনেক ক্ষমতাশালী বাঙ্গালা-লেখকের উদয় হইয়াছে। কিন্তু আমার পড়া-শুনা অল্প; বাঙ্গালা সাহিত্যজ্ঞান আমার নাই বলিলেই হয়। গ্রন্থকার যে প্রসঙ্গ করিয়াছেন, তাহার আলোচনা আমার দ্বারা ঠিক হইবে কি না, সন্দেহ।

বইখানির ভাষা সরল, স্পষ্ট, কোথাও পেঁচ নাই, ধুঁআ নাই। বিশেষ গুণ, কেনা নাই। কিন্তু জায়গায় জায়গায় হঠাৎ আর্বী বা ফার্সী শব্দ থাকাতে আমার বুঝা মুস্কিল হইয়াছে। এক এক শাস্ত্রের, এক এক বিদ্যার এক এক পরিভাষা আছে। সাবধান লেখক সে সে শাস্ত্র ও বিদ্যা ব্যাখ্যা করিবার সময় পরিভাষাও সাধারণের বোধ্য ভাষায় বুঝাইয়া দিয়া থাকেন। আমার বোধ হয় না, এই পুস্তকে ব্যবহৃত আর্বী ফার্সী শব্দ সেইরূপ পরিভাষা।

কিন্তু মোট-কথা বুঝিতে কষ্ট নাই। বর্তমান বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য দ্বারা বাঙ্গালা দেশের মুসলমানের কি ক্ষতি-বৃদ্ধি হইতেছে, বইখানিতে তাহা দেখানা হইয়াছে; কিন্তু গোড়া হইতে আগা পর্য্যন্ত এক অসন্তোষের সুর বরাবর বাজিতেছে। গ্রন্থকার বাঙ্গালা ভাষা চান, কারণ, বাঙ্গালা ভাষা তাঁহার মাতৃ-ভাষা। কিন্তু সে ভাষায় তাঁহার জানা ও অভ্যস্ত শব্দ সব নাই। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্য চান, কারণ "জাতীয় জীবনের সহিত সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।" কিন্তু বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য হিন্দু-ভাবে ভরা। আমি তাঁহার অসন্তোষের নিন্দা করিতেছি না; তাহার তুল্য আরও অনেক মুসলমানের সে অসন্তোষ থাকাও স্বাভাবিক।

তাঁহার নিবেদনে কথাটা আরও স্পষ্ট আছে। তিনি লিখিয়াছেন—"সত্য বলিবে, প্রিয় বলিবে, কিন্তু অপ্রিয় সত্য বলিবে না। এই কথাটি ব্যক্তিগতভাবে খাটিতে পারে। কিন্তু সমাজ ও দেশ হিসাবে খাটিবে না। আমার কোন কোন্ লেখা কাহারও নিকট সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা Communal patriotism বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু আমি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি, তাহা অপ্রিয় হইলেও প্রকাশ করিতে দ্বিধা বোধ করি নাই। মেলেরিয়ায় ধরিলে কুইনাইন তিক্ত হইলেও সেবন করিতে হয়।"

ইহার পরেই লিখিয়াছেন,

"সভা-সমিতির মিষ্ট কথার লেপনে, মৌখিক ভ্রাতৃত্ব ও গরজের বন্ধুত্বে হিন্দু-মুসলমানের মিলন স্থায়ী হইবে না। আমাদের সাহিত্য হইতে হিংসা-বিদ্বেষের গলিত অংশ চিবাইয়া [?] বাহির করিয়া উভয়ের মধ্যে প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে।"

অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ স্বীকার করিয়া মিলনের পথ খুজিতেছেন।

এই ভাব লইয়া বইখানি সমাপ্ত করিয়াছেন। "আজ আমাদের সকলেরই এক আসন। আজ হিন্দু-মুসলমানের গৌরব-গাথা অতীতের বিস্মৃতি-সাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে। তবে কেন আমরা অবোধ শিশুর ন্যায় পরের কথায় পরস্পরের মধ্যে বে-ফায়দা ঝগড়া করিয়া নিজের অনিষ্ট সাধন করিতেছি। অতএব আসুন, আমরা মনের কালিমা দূর করিয়া পরস্পর পরস্পরকে প্রেমালিঙ্গন করি।"

কিন্তু নিবেদনে তিনিই বলিয়াছেন মৌখিক ভ্রাতৃত্ব ও পরস্পর বন্ধুত্ব স্থায়ী হয় না। যে-হেতু আজ ধরাতলে আমাদের সকলের আসন এক, অতএব এস আমরা ভাই হইয়া যাই। এ-কথা তিনি অস্বীকার করিয়াছেন। অথচ ইহা ব্যতীত তাঁহার অন্য উপদেশ নাই।

অতএব সাহিত্য-প্রসঙ্গের মধ্য দিয়া এমন প্রসঙ্গ উঠিয়াছে, যাহা আজ কাল খুব বড় প্রসঙ্গ হইয়াছে। মহাত্মা গন্ধী আদি শত শত হিতকামী দেশচিন্তক এই কথা ভাবিতেছেন। তাঁহারা যে কলহের নিবারণ-চিন্তা করিতেছেন, দুই দশটা সরকারী চাকরী, দুই-দশটা পদ, কিংবা মস্‌জিদের কাছে বাজনা, অথবা হিন্দু পাড়ার মধ্যে গো-হত্যা—এইরূপ বিষয়ের নিষ্পত্তি হইয়া গেলেই সে কলহ চুকিয়া যাইবে না। এক এক রোগের নানা উপসর্গ থাকে; আমাদের দেশকে যে রোগে ধরিয়াছে, সে রোগের এ-সব মাত্র কয়েকটা উপসর্গ। আসল রোগ, ভিতরে; মনের অসন্তোষে। এই অসন্তোষের বীজ ধরিতে না পারিলে নিত্য নূতন উপসর্গের শান্তি খুজিতে হইবে। আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত না হইলে অসন্তোষ জন্মে। এক বিরোধী আকাঙ্ক্ষা জুটিয়া প্রথমটাকে তৃপ্ত হইতে দেয় না। মনের এইরূপ দুই বিপরীত ইচ্ছার অস্তিত্ব আমরা সব সময় বুঝিতে পারি না। কিন্তু বুঝি মন যেন বেসুরা বাজিতেছে,—একটা তার যে সুরে, অন্যটা সে সুরে নয়। এই লয়ের অভাবে মনে করি, বুঝি এইটা পাইলে অসন্তোষ চলিয়া যাইবে। আমার মনে হয়, গ্রন্থকার চৌধুরী সাহেব দো-টানা মনের দ্বন্দ্বে পড়িয়াছেন। আমি যে, সে দ্বন্দ্ব দেখাইতে পারিব, কিম্বা তাঁহাকে মানাইতে পারিব, সে আশা করি না। কারণ আমার কাছে যেটা সত্য, তাঁহার কাছে সেটা সত্য নয়। আরও বাধা, আমি যে হিন্দু, একথা তিনি কদাপি ভুলিতে পারিবেন না।

সম্প্রতি তাঁহার মনের অ-সুখ অন্বেষণ না করিয়া তাঁহার সত্যের বিশ্লেষণ করি। প্রথমেই দেখিতেছি, ভাষা ও সাহিত্য যে দুই পৃথক্ বস্তু, তাহা তিনি বহু স্থলে ভুলিয়া গিয়াছেন। আমি সাহিত্য-শব্দে বুঝি, মানব-মনোজগতের বাহ্য প্রকাশ-বিশেষ। চিত্রে এই প্রকাশ দেখি, সেটা চক্ষুর গ্রাহ্য। কানে যখন শুনি, তখন সেটা ধ্বনিময়। যখন সে ধ্বনির উৎপত্তি চিন্তা করি, তখন বলি বাক্‌ময়। যখন সে বাকের মূর্তি কল্পনা করি, তখন তাহা অক্ষরময়। এই বিশ্লেষণ হইতে বুঝি, মানব-মনের প্রথম প্রকাশ চিত্রে ও গানে হইয়াছিল। পরে সাহিত্যে সম্পূর্ণ বাক্‌ময় হইয়াছে। ভাষা সেই বাক-সাহিত্যের আশ্রয় ও বাহন। আরও পরে ভাষার ধ্বনি বিশ্লেষণ করিয়া, কৈমিতিকের মূল পদার্থের মত, ভাষার বর্ণ আবিষ্কার করিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে এক এক বর্ণের এক এক রূপ কল্পনা করিয়া অক্ষররূপ চিত্র দ্বারা ভাষার ধ্বনিকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছি। এখন চিত্র দেখিবামাত্র কানে ধ্বনি শুনি, আর মনে সে ধ্বনি বা শব্দের অর্থ উদয় হয়। কিন্তু এই যে বাক্, তাহা সমাজ-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন। জীবন-ধারণে ও সুখ-ভোগে সুবিধা হয় দেখিয়া আমরা দল বাঁধিয়া সমাজ গড়িয়াছি, তেমনই বহু বিষয়ে নিজের পায়ে বেড়ীও পরিয়াছি। কেহ সে বেড়ী ভাঙ্গিলে তাহার কৈফিয়ৎ চাই, তাহাকে এক-ঘরো করি, সমাজ হইতে তাড়াইয়া দিই। কারণ সে সমাজের শৃঙ্খলকে বিশৃঙ্খল করে। অবশ্য সমাজের শৃঙ্খলের পরিবর্তন হয়, সকলে পরিবর্তন গ্রহণ করে, মানে। কিন্তু পরিবর্তন দ্বারা আমাদের দুঃখের মাত্রা হ্রাস, সুখের মাত্রা বৃদ্ধি দেখিতে না পাইলে মানে না। ভাষার শব্দের বানান (মূলধ্বনি) সকলের কানে সমান নয়, মুখেও সমান নয়। কিন্তু শব্দের চিত্র, যে সঙ্কেত শিখিয়াছে, সে দেখিবামাত্র অর্থ গ্রহণ করে। এখানে আমার নিজের কথা বলিতে হইতেছে। কেহ কেহ মনে করেন, আমি বানান বদ্‌লাইতেছি। কথাটা কিন্তু ঠিক নহে; আমি বানান ঠিক রাখিতেছি, অনেক অসাবধান ও অলস লেখক ঠিক বানান লেখেন না দেখিয়া দুঃখিত হই। আমি কোন-কোনও বর্ণের চিত্র বা দ্যোতক পরিবর্তনের পক্ষপাতী। এই দুয়ের মধ্যে আস্‌মান্ জমিন্ ফরক। কোন কোন মুসলমান লেখক, বাঙ্গালা ভাষায় উত্তম জ্ঞান থাকিতেও, বানান বদ্‌লাইতেছেন। তাঁহারা বাঙ্গালা অক্ষরের ধ্বনি জানেন না, বলিতে পারি না। আমি আর্বী ফার্সী জানি না। কিন্তু মৌলবীর মুখে আর্বী 'সিন' আমার কানে 'স' ধ্বনি বোধ হইয়াছে। উহা যে 'ছ' ধ্বনির তুল্য নহে, তাহা আমি কেন পূর্ববঙ্গের দুই-এক স্থান ছাড়া অপর সকল বাঙ্গালীর কানে ধরা পড়িবে। একথা লেখাও বাহুল্য হইবে না যে, পশ্চিম বঙ্গের এমন কি খাস্ কলিকাতার বহু বহু বাঙ্গালীর মুখে 'স' ভিন্ন অন্য ধ্বনি বাহির হয় না? দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালা বর্ণমালা শেখানা

হয় না; লেখানা হয় অক্ষর, সে অক্ষরের ধ্বনি যাহাই হউক। শুধু পাঠশালায় ও বিদ্যালয়ে নয়; সংস্কৃত বিদ্যালয়ে ও টোলে বর্ণের উচ্চারণ কণ্ঠে ও কর্ণে না থাকিয়া ব্যাকরণেই থাকে। ফলে বাঙ্গালী পণ্ডিতের সংস্কৃত উচ্চারণ ভারত জুড়িয়া অখ্যাতির বিষয় হইয়াছে। আমি জানি আমরা যেমন লিখি তেমন পড়ি না, যেমন বলি তেমন লিখি না। কিন্তু শিক্ষা- ও সংসর্গ-ভেদে ইহার তারতম্য আছে। কিন্তু কালীর আঁখরে তারতম্য করিলে চলে না, লিখনের প্রয়োজন ব্যর্থ হয়। অতএব যখন কোন মুসলমান লেখককে নোয়াব, জোয়াব, মস্কিল, ছাহেব, মোছলমান লিখিতে দেখি, তখন বুঝি—হয় তিনি বাঙ্গালা ভাষা জানেন না, কিংবা পৃথক্ উচ্চারণ চালাইয়া বাঙ্গালী হিন্দু হইতে পৃথক্ থাকিতে চান। এইরূপ, যখন দেখি অনাবশ্যক আর্বী-ফার্সী শব্দ বসাইতেছেন, তখন বুঝি,—তিনি তাঁহার ও তাঁহার সমশ্রেণীর জানা-শোনা শব্দের কদর করিতেছেন, সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের প্রতি নির্দয় হইতেছেন। আমি মোটরে চড়ি, কি গোরুর গাড়ীতে চড়ি, নৌকায় যাই, কি হাঁটিয়া যাই, আমি যে, সেই থাকি। কিন্তু হাঁটিয়া যে পথ যাইতে পারি, কিংবা সস্তার যানে যাইতে পারি, সে পথ যাইতে যদি মোটরে চড়ি, তাহা হইলে অন্যে বুঝিবে, যাওয়া একটা উপলক্ষ, মোটর দেখানা, ধন দেখানা আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু সে কথা আমি মানিব কি? সেইরূপ, আমি যখন সাহেবী পোষাক পরিয়া বাহির হই, তখনও আমার ওজুহাতের অভাব হয় না। কিন্তু যাঁহার চোখ আছে, তিনি বুঝিতে পারেন, আমি মনের সঙ্গে লুকাচুরি খেলিতেছি। চৌধুরী সাহেবের অনেক যুক্তিতে মনের এইরূপ দ্বন্দ্ব আছে। তিনি বলেন, আল্লা শব্দের পরিবর্তে ঈশ্বর বা ভগবান্, নমাজের পরিবর্তে উপাসনা, রোজার পরিবর্তে উপবাস, ইত্যাদি হইতে পারে না। "এক জাতির ভাষা ও শব্দ অন্য ভাষায় অনুবাদ করিলে সেই শব্দের তেজ অনেকটা নষ্ট হইয়া যায় এবং অর্থ বিকৃত হইয়া যায়।" তিনি লিখিয়াছেন, "আমরা হিন্দু-মুসলমান-মিলনের প্রত্যাশী, কিন্তু মাথার টুপী ফেলিয়া কপালে সিন্দুর পরিয়া হিন্দু-বেশে তাঁহাদের সহিত মিলিতে পারি না। আমরা চাই মিলিতে নিজে মুসলমান থাকিয়া, নিজে ইস্লামিক্ ভাব ও মুসলমানিত্ব বজায় রাখিয়া।"

তিনি বাঙ্গালা সাহিত্য-সম্বন্ধে এক স্থানে লিখিয়াছেন, "মুসলমানগণ বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্মদাতা না হইলেও তাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু মুসলমানগণ স্বীয় মূঢ়তা-বশতঃ অনেক পিছনে পড়িয়া রহিলেন। তাঁহারা রাজ্য হারাইয়া জেদ করিয়া ইংরেজী ও বাঙ্গলা শিক্ষায় অবহেলা প্রদর্শন করিলেন, আর তাঁহাদের প্রতিবেশী হিন্দু-ভ্রাতাগণ ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় মাতৃ-ভাষার শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে যত্ন প্রকাশ করিলেন এবং আধুনিক সাহিত্যকে মুসলমানের হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া নিজে পুরাদস্তর দখল করিয়া ফেলিলেন।" পরে লিখিয়াছেন, "তাঁহাদের (মুসলমান-দিগের) এই মোহ-নিদ্রার সুযোগে ছোট বড় হিন্দু সাহিত্যিকগণ তাঁহাদের প্রাণে আঘাত দিতে বা তাঁহাদের চরিত্র কলঙ্ক-কালিমায় লেপন করিয়া কালি-কলমের অপব্যবহার করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহারা উঠিয়া দেখিলেন, হিন্দুরা বহু আগে পৌঁছিয়া কেল্লা দখল করিয়া ফেলিয়াছেন। মুসলমানেরা সেখানে গিয়া দেখিলেন, তাঁহাদের প্রতি দ্বার রুদ্ধ। সমালোচক পাহারাওয়ালারা কড়া সুরে প্রবেশ নিষেধ করিতেছে।" ইত্যাদি।

সত্য হউক, মিথ্যা হউক, এখানে অসন্তোষের একটা কারণ পাওয়া গেল। আমার বোধ হয়, এখানেও তিনি ভাষাকে সাহিত্য মনে করিয়া গোলে পড়িয়াছেন। সে যাহা হউক, তিনি কি মনে করেন, কোনও ভাষা কাহারও বলা বা লেখা কেহ বন্ধ করিতে পারে? সমালোচক কোনও রচনা ভাল বা মন্দ বলিতে পারেন। বাঙ্গালা ভাষায় যাঁহার অধিকার আছে, তিনি বলিতে পারেন, কোন্ রচনা তাঁহার মাপে প্রমাণ দাঁড়াইয়াছে, কোন্ রচনা দাঁড়ায় নাই। ভাষার আদালৎ যদি বা ছোট, সাহিত্যের আদালৎ পৃথিবী-জোড়া। রবীন্দ্রনাথ যে নোবেল-প্রাইজ পাইয়াছেন, তাহা সাহিত্যের আদালৎ হইতে পাইয়াছেন, যে আদালতে তাঁহার ভাষা কেহ বোঝেন না। অবশ্য দেশ-কাল-পাত্র অতিক্রম করিয়া সাহিত্য-নির্মাণ সকলের সাধ্য নয়। অধিকাংশ সাহিত্যে এই তিন প্রায়ই থাকে। হিন্দুর সাহিত্যে হিন্দুয়ানি, মুসলমানের সাহিত্যে মুসলমানি থাকা আশ্চর্য্য নয়, এবং হিন্দুর লেখায় সংস্কৃত, মুসলমানের লেখায় আর্বী-ফার্সী শব্দ অধিক থাকাও স্বাভাবিক। কিন্তু যদি কোন হিন্দু তাঁহার রচনা মুসলমানের পাঠ্য করিতে চান, তাঁহাকে পাঠক বিবেচনা করিয়া লিখিতে হইবে। সেইরূপ মুসলমানের রচনা হিন্দুকে পড়িতে বলিলে হিন্দুর প্রমাণে লিখিতে হইবে। মুসলমানের সহিত মিশিতে গেলে মুসলমানের আদব-কায়দা শিখিয়া ও মানিয়া হিন্দুকে চলিতে হইবে; হিন্দুর সহিত মিশিতে গেলে হিন্দুর আচার-ব্যবহার শিখিয়া মানিয়া মুসলমানকে চলিতে হইবে। ইহা সামান্য শিষ্টাচার। নইলে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। অথচ এই জ্ঞানের অভাবে সংসারে যে কত অনর্থ ঘটিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

চৌধুরী সাহেব যে বলিয়াছেন, হিন্দুরা অনুগ্রহ করিয়া কতকগুলি আর্বী-ফার্সী শব্দ লইয়াছেন, তাহা ঠিক নয়। অনুগ্রহ করিয়া নয়, গরজে পড়িয়া। এখনকার বাঙ্গালী নয়, পূর্বকালের বাঙ্গালী। মুসলমান রাজত্বের সময় এই-সকল শব্দ আমদানি হইয়াছিল, বাঙ্গালা ভাষায় অনেক রহিয়া গিয়াছে, কিছু বাদও পড়িয়াছে। কালের ধর্মই এই। এখন আমরা অনেক ইংরেজী শব্দ লইতেছি, তাহাও দায়ে ঠেকিয়া। বাঙ্গালী জ্ঞাতসারে ইচ্ছা করিয়া, মিটিং বসাইয়া, রিজোলিউশান্ পাস করিয়া এ-সকল শব্দ গ্রহণ করে নাই। ইংরেজীর ধমকেও নগরবাসী সংবাদপত্রের জ্ঞানের অভাবে কত পুরাতন বহুপ্রচলিত বাঙ্গালা শব্দ ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িয়া দূর গ্রামের নিরালা কোণে লুকাইয়াছে। কলিকাতা শহরে হিন্দুস্থানী লোকের সংসর্গে কত হিন্দী কথা কলিকাতায় বাঙ্গালীর অন্দরে পর্য্যন্ত ঢুকিয়া পড়িয়াছে। কোথাও অনুগ্রহ-নিগ্রহ নাই।

বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালীর হইলেও যার ইচ্ছা সেই ইহাকে নিজের করিয়া যেমন ইচ্ছা তেমন সাজাইয়া ব্যবহার করিতে পারে। ইংরেজী ভাষা ইংরেজের। কোথাকার কে আমরা স্বচ্ছন্দে এই ভাষা পড়িতেছি, লিখিতেছি, বলিতেছি। কিন্তু যদি ইংরেজী লিখিয়া ইংরেজ পণ্ডিতের কাছে যাই, তিনি বলেন, এই শব্দটা তাঁহারা এমন বসান না, এই বাক্যটা তাঁহাদের মতন হয় নাই, এইরূপ প্রয়োগ এখন তাঁহাদের মধ্যে চলে না, ইত্যাদি। কেহ বলিলেন, আমাদের ইংরেজী Baboo English। আমরা হাজার সেক্স্পীয়রের দোহাই দিই, তিনি ঘাড় নাড়েন। আমা-দিগের কাছে এই সমালোচনা অপ্রিয় বটে, কিন্তু নাচার। ইংরেজী ভাষায় ইংরেজই প্রমাণ। অবশ্য যে-সে ইংরেজ নয়। যিনি নিজের ভাষা উত্তম-রূপ জানেন, তিনিই প্রমাণ। যদি আমরা ইংরেজী ভাষা পরখ করাইতে না যাই, কোন বালাই থাকে না, আমি যাহা লিখি তাহাতে আমার মন তুষ্ট হইলেই হইল।

চৌধুরী সাহেব একখানা বহির সমালোচনা উপলক্ষে লিখিয়াছেন, "যাহারা বাঙ্গালা দেশে বাস করে—হিন্দুই হউক আর মুসলমানই হউক,

তাহারা বাঙ্গালী। কিন্তু প্রবাসীর অভিধানে বাঙ্গালী অর্থ এখানে কেবল হিন্দুকেই বুঝাইয়াছে। মুসলমান বাঙ্গালী নহে, সে ত মুসলমান। কেবল প্রবাসীরই দোষ দেই কেন? আজকাল দৈনিক সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায়, গল্প ও উপন্যাসেও সাধারণ কথাবার্ত্তায় বাঙ্গালী বলিতে কেবল হিন্দুকেই বুঝায়।" ইত্যাদি। বাঙ্গালী বলিলে কেন কেবল হিন্দু বুঝায়, এরহস্য বহুকাল আমারও জানা ছিল না। আমি যখন কটক যাই, সেখানেও ওড়িয়া বলিতে কেবল হিন্দু বুঝাইতে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। কারণ ওড়িষ্যায় অনেক মুসলমানের ও অনেক বাঙ্গালীর বাস আছে। সেখানে মুসলমান ও বাঙ্গালী, ওড়িয়া নহে। ওড়িষ্যাবাসী বাঙ্গালী বলিলে, বাঙ্গালার মুসলমান নহে, হিন্দু বুঝিতে হইবে। প্রথম প্রথম আমি এইরূপ ভাগ দেখিয়া, চৌধুরী সাহেবের মতন আশ্চর্য্য হইতাম। এক দিন এক ঘটনায় আমার চোখ ফোটে। আমার এক মুসলমান ছাত্র ছিল। সে লেখাপড়ায় যেমন ভাল, ব্যবহারেও তেমন ভাল, কিন্তু তার সাংসারিক অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। এ-কথা আমি জানিতাম, আরও জানিতাম তাহার নিবাস ওড়িষ্যায়। শুনিলাম ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হইবে। একটা বৃত্তি সে নিশ্চয় পাইবে, এই ধারণায় এক দিন তাহাকে আশ্বাস দিই। কিন্তু আমার কথায় তাহার মুখের ভাবান্তর দেখিয়া জিজ্ঞাসা করি, কেন তুমি নিরাশ হইতেছ? "আমি ত ওড়িয়া নই, এই বৃত্তি ওড়িয়ার প্রাপ্য।" "তুমি তবে কি?" "আমি মুসলমান"—এই বলিয়া আমার অজ্ঞতা দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল। তখন বুঝিলাম, মুসলমানেরা ওড়িষ্যাবাসী ছিলেন না, তাঁহারা বিদেশী। ওড়িষ্যা তাঁহাদের আদি দেশ নহে। অতএব ভাগটা এইরূপ,—

ওড়িষ্যাবাসী। { চিরকালের বাস…ওড়িয়া
অচিরকালের বাস। (১) মুসলমান
(২) হিন্দু (বাঙ্গালী……

ওড়িয়ামাত্রেই হিন্দু ওড়িষ্যার আদিনিবাসী। ওড়িষ্যাতে অনেক বাঙ্গালীরও (হিন্দু) বাস বহুকালের। ইঁহাদের কথাবার্ত্তা ওড়িয়া কিংবা ভাঙ্গা ওড়িয়া। কিন্তু ইঁহারাও আপনাদিকে বাঙ্গালী বলেন, ওড়িয়া বলেন না। অতএব উপরের ভাগ ঠিক নয়। (এখানে একটা নূতন শব্দ চাই। ইংরেজী race, বাঙ্গালায় 'রয়' করিলাম।) ভাগটা রয় ধরিয়া। ওড়িয়া রয়, মুসলমান রয়, বাঙ্গালী রয়। ওড়িষ্যায় মুসলমানদিগের এক সাধারণ নাম পাঠান আছে। সুতরাং রয়িক ভাগে দোষ হয় নাই।

শুধু ওড়িয়া নাম কেন? মরাঠী, পঞ্জাবী, বিহারী প্রভৃতি নামে এক এক প্রদেশবাসী হিন্দু বুঝায়। বাঙ্গালী নামেও তাই। বহু পূর্ব্বকাল হইতে একখণ্ড দেশের নাম বঙ্গ আছে। তদ্দেশবাসী এই অর্থে আল প্রত্যয় করিয়া বঙ্গ+আল—বঙ্গাল, এই নাম হইয়াছিল। বঙ্গালের ভাষা,—বঙ্গালী। এই নাম শুদ্ধ অর্থাৎ ব্যাকরণসম্মত। একটা ভুলে দেশের নাম বঙ্গাল হইয়াছিল। তাহা হইতে বঙ্গাল-দেশবাসী—বঙ্গালী। বঙ্গাল দেশের ভাষাও—বাঙ্গালী। বর্ত্তমান বাঙ্গালী সেই পুরাতন বঙ্গালীর বংশধর বলিয়া গণ্য।

ওড়িয়া বাঙ্গালী বিহারী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রয় না হইতে পারে। কিন্তু উৎপত্তি ব্যতীত অন্য লক্ষণ রয়-তুল্য হইলেও বাস্তবিক রয় না বলিয়া জাতি বলা ভাল। জাতি অর্থে class। যখন বলি আম একরকম ফল, তখন বুঝি ফলের এক জাতি। এইরূপ, হিন্দু জাতি বলিলে বুঝি ইহাদের আচার-ব্যবহার অন্যের মতন নয়। হিন্দুধর্ম বলিলে বুঝি হিন্দুজাতির আচার-ব্যবহার। বাস্তবিক এই দুই নাম বেশী দিনের নয়। ভারতে মুসলমান আসিবার পূর্ব্বে হিন্দু নাম ছিল না। কেহ বলিল দেশের নাম সিন্ধু, বিদেশী শ্রোতার ভাষার নিয়মে সিন্ধু হইল হিন্দু। দেশের নামে দেশবাসীও বুঝায়। হিন্দু এক দেশের নাম এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই দেশবাসীরও নাম। ক্রমে সে দেশবাসীর আচার-ব্যবহার ভারতখণ্ডের বিহার, বঙ্গ, ওড়িষ্যা প্রভৃতি অন্য দেশবাসীর মধ্যে দেখা গিয়াছিল। ইহারাও হিন্দু নামে পরিচিত হইল। এই কারণে ভারতবর্ষের নাম India, হিন্দুস্থান বা হিন্দুস্তান।

ভারতের ত্রি-সীমার বাহিরে হিন্দুদের মাথা গুঁজিবার ঠাঁইও নাই। সে বৎসর কত মুসলমান অভিমান-ভরে হিন্দুস্থান ছাড়িয়া সপরিবারে পশ্চিমদেশে চলিয়া গেলেন। কিন্তু শতপদ-দলিত হইলেও হিন্দুকে এই দেশেই পড়িয়া মরিতে হইবে। হিন্দুর যা-কিছু গৌরব ও কীর্ত্তি, সাধনা, ও কৃষ্টি,—সব এই দেশের মাটিতে জড়িত। মুসলমানের পক্ষে সে মাটি ভারতের বাহিরে। মুসলমানও যদি এ দেশের মাটিকে হিন্দুর চোখে দেখিতে পারিতেন, মা ভাবিয়া কদর করিতে পারিতেন, দরদে দরদী হইতে পারিতেন, তাহা হইলে স্বরাজ্যলাভ কেহ আটকাইতে পারিত কি?

চৌধুরী সাহেব অনেক পড়িয়া শুনিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহার বইখানি লিখিয়াছেন। আমিও আদরপূর্ব্বক তাঁহার 'সত্য' আলোচনা করিতে বসিয়াছিলাম। দুঃখ হইতেছে, সম্পূর্ণ করিতে পারিলাম না। প্রবাসীপত্রে আর স্থান পাইলাম না।
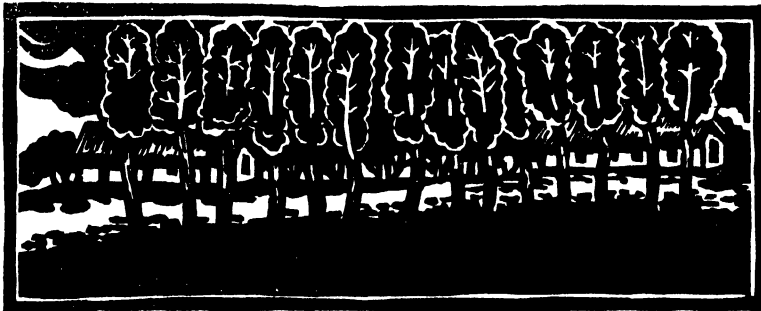
শাল-বীথিকা
শ্রী মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত কর্ত্তৃক কাঠ খোদাই

বিদেশ

অষ্ট্রীয়াতে ভারত-সভা—

"সুদূর অষ্ট্রীয়াতে শিক্ষার্থী ভারতীয় ছাত্রেরা "ভারত-সভা" (Indien Sava) নামক একটি সমিতি গঠন করিয়াছেন। সভার প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে বক্তৃতা এবং পুস্তিকা প্রচার দ্বারা ঐ দেশবাসীকে ভারতের নৈতিক, দার্শনিক ও ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করা।

সম্প্রতি একদল ভারতীয় যুবক অষ্ট্রীয়ার ভিয়েনা-বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষার্থ গিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা-শাস্ত্র, সাহিত্য, দর্শন, রসায়ন ও যন্ত্রবিজ্ঞান ইউরোপের অন্যান্য স্থান হইতে ভালভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। এখানে আর একটি সুবিধা এই যে, এখানকার সাধারণ লোক ও অধ্যাপকেরা এই সভার সাহায্যে ভারতীয় সভ্যতার ও ভারতবাসীদের জ্ঞানের ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া ভারতীয় ছাত্রদিগকে বিশেষ আদর করিতেছেন। অষ্ট্রীয়ার অনেক লোক এখন ভারতের স্বরূপ জানিতে পারিয়াছে এবং সকলেই ভারতীয় ছাত্রদিগের কার্য্য-কলাপের সহিত সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছে।

সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিশোরীকুমার মাথুর আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, কর্ম্মী ও অর্থের অভাবে সমিতির এই অবশ্যপ্রয়োজনীয় কার্য্যের আশানুরূপ প্রসার হইতেছে না।

আমরা আশা করি ভারতের সর্ব্ব সম্প্রদায়ের লোক অর্থ সাহায্য করিয়া এবং পুরাতন পুস্তিকা ও সংবাদপত্রাদি দান করিয়া প্রবাসী ছাত্রদের এই শুভ অনুষ্ঠানটি বাঁচাইয়া রাখিবেন। প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রগণও বক্তৃতা ও অর্থাদি সাহায্য করিয়া কর্ম্মীদিগকে উৎসাহিত করিতে পারেন। সমিতির ঠিকানা Indien-Sava

Universitat
Wien 1
Austria

আমরা এই অনুষ্ঠানটির সাফল্য কামনা করি।

শ্রী প্রভাত সান্যাল

আইরিশ সমস্যা—

যে-প্রকারেই হউক আয়ারল্যাণ্ডে শান্তি স্থাপন করা নিতান্ত প্রয়োজন বোধ, হওয়াতে লয়েড জর্জ্জের মন্ত্রীসভা আলষ্টার সমস্যার মূল গণ্ডগোলের কোনও সুমীমাংসার ব্যবস্থা না করিয়া নানারকম গোঁজামিল দিয়া সাময়িক-ভাবে আয়ারল্যাণ্ডে শান্তিস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সন্ধিসর্ত্তের মধ্যে কতকগুলি এমন মস্ত ফাঁক রহিয়া গিয়াছিল, যাহার জন্য এখন আবার গোল দেখা দিয়াছে। আলষ্টারের অরেঞ্জ্ দলকে শান্ত করিবার জন্য ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ-সরকার আলষ্টার দলের সহিত যে রফা-নিষ্পত্তিতে উপস্থিত হন, তাহাতে আলষ্টার প্রদেশের স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হয় এবং উত্তর প্রদেশে স্বায়ত্ত-শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করা হয়। আলষ্টারের জননায়ক সার জেম্‌স্ ক্রেইগ উক্ত প্রদেশের শাসন-পরিষদ্ ও ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক প্রধান মন্ত্রীর পদে নির্ব্বাচিত হন। কিন্তু আলষ্টারকে আয়ারল্যাণ্ড্ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন একটি রাষ্ট্ররূপে স্বীকার করিতে আইরিশ জাতি ভয়ঙ্কর নারাজ ছিলেন। যদিও বা আইরিশ ফ্রিষ্টেটের অধীনে আলষ্টারে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তিত করিতে আইরিশ জননায়কগণ স্বীকৃত হইতে পারিতেন, তথাপি আলষ্টারের যে-সব অংশে রোম্যান ক্যাথলিক সম্প্রদায় ভুক্ত জাতীয় দলের লোকই অধিবাসীদিগের মধ্যে সংখ্যানুপাতে অধিক সেই-সমস্ত অঞ্চলও ইংরেজদিগের সহিত আলষ্টারের সন্ধিসূত্রে আলষ্টার প্রদেশের সহিত জুড়িয়া দেওয়াতে আয়ারল্যাণ্ডে মহা অসন্তোষের সঞ্চার হইয়াছিল। ইংরেজ সরকার যখন ১৯২১ খৃষ্টাব্দে আইরিশ জননায়কদিগের সহিত সন্ধিসূত্রের আলোচনা করিবার উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ করিয়াছিলেন তখন আইরিশ জননায়কগণ বলিলেন যে আলষ্টারের গোলযোগের মীমাংসার একটি পন্থা আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত ইংরেজদের রাষ্ট্রীয় প্রাধান্য আয়ারল্যাণ্ড্ স্বীকার করিতে পারে না। কারণ আলষ্টার-সমস্যার সহিত আয়ারল্যাণ্ডের জাতীয় সম্মান এমন ভাবে জড়িত যে, তাহাকে কোনওপ্রকারে ক্ষুণ্ণ হইতে দিলে আয়ারল্যাণ্ডের মর্য্যাদার হানি হইবে। আইরিশ জননায়কদিগের দৃঢ়তা দেখিয়া ইংরেজ-সরকার বাধ্য হইয়া একটা পন্থা আবিষ্কারের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। কিন্তু সে পথের কণ্টক হইয়া দাঁড়াইলেন আলষ্টার-নেতা স্যার জেম্‌স্ ক্রেইগ। তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইতে লাগিল যে, ইংরেজ-সরকারের আবিষ্কৃত পন্থা কার্য্যতঃ গৃহীত হইলে আলষ্টার বিদ্রোহ-ঘোষণা করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না। ইংরেজ-সরকার বাধ্য হইয়া গোঁজামিল দিয়া কাজ চালাইয়া লইবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন এবং লর্ড বার্কেন্‌হেড ও লয়েড্ জর্জ্জ্ সেই গোঁজামিলের পন্থাও আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের শেষাশেষি লণ্ডন শহরে আইরিশ নেতৃবর্গ সমবেত হইয়া ইংরেজ-সরকারের সহিত যে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন, তাহাতে নানা জটিল সমস্যার মীমাংসা হইয়া গেল; কেবল আলষ্টার-সমস্যার সুমীমাংসা হয় নাই। এই সুযোগে একটা মস্ত গোঁজামিল দিয়া তখনকার মত কার্য্যসিদ্ধি করাইয়া ইংরেজ-সরকার একটা মস্ত রাষ্ট্রনৈতিক চাল চালিয়াছিলেন। এই সন্ধিসূত্রের বারো নম্বর সর্ত্তে স্থির হয় যে, আলষ্টার প্রদেশ আইরিশ স্বাধীন রাজ্যের বশ্যতা স্বীকার করিবে কি না তাহার সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য আলষ্টার প্রদেশকে আরও একমাস সময় দেওয়া হইবে। তাহার পর যদি আলষ্টার আপন স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিতে চাহে—তবে উক্ত প্রদেশের সীমানা পুনরায় স্থির করিবার জন্য একটি সালিসী বসিবে। ফারমাগ্‌নাগ, টাইরোল্ প্রভৃতি যে-সব অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসী জাতীয় দলভুক্ত সেগুলির অংশ-বিশেষ, প্রজার অভিপ্রায় অবগত হইয়া সেই-অনুসারে এই সালিসী সভা আয়ার-

ল্যাণ্ডের সহিত পুর্নযুক্ত করিবেন। এই সালিসী সভায় ইংরেজ, আইরিশ্ ও আল্‌ষ্টার মন্ত্রীসভা একজন করিয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবেন।

আইরিশ জাতীয় দল এই প্রস্তাবে সম্মত হওয়াতে এবং সন্ধিসর্ত্তের অন্যান্য সর্ত্তগুলিও উভয় জাতি স্বীকার করিয়া লওয়াতে আইরিশ সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। ইংরেজপক্ষে লয়েড্ জর্জ্জ্, লর্ড বার্কেনহেড্, অষ্টেন্ চেম্বারলেন্, উইনষ্টন চার্চ্চহিল, স্যার এল্ ওয়ার্দিংটন ইভান্স্; স্যার হ্যামার গ্রিন্‌উড ও স্যার গর্ডনহিউয়ার্ট্ এবং আইরিশ পক্ষে গ্রিফিথ, বার্টন, কলিন্স্, ডুগাল ও গাভান ডাফি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন। সন্ধিপত্রে আল্‌ষ্টার পক্ষের কাহারও স্বাক্ষর নাই। যে অংশে আল্‌ষ্টার সংক্রান্ত একটি সর্ত্ত রহিয়াছে অন্ততঃ সেই অংশটুকুতে আল্‌ষ্টার-নেতৃবর্গের সম্মতি ও স্বাক্ষর লওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাহা না লওয়াতে এখন নুতন গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে।

ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী র‍্যাম্‌জে ম্যাক্‌ডোনাল্ড্ আইরিশ জাতির নিকট ইংরেজ-সরকারের পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবার উদ্দেশ্য আল্‌ষ্টারের সীমা পুনরায় নির্দ্দেশ করিবার জন্য সালিসী নিয়োগের ব্যবস্থা করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু আল্‌ষ্টার-সরকার সালিসীসভায় প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। আল্‌ষ্টার-সরকার বলেন যে, আইরিশ সন্ধিসূত্রের সহিত আল্‌ষ্টারের যখন কোনও সম্পর্ক নাই, তখন সন্ধিসর্ত্তের বারো নম্বর ধারা মানিয়া লইতে আল্‌ষ্টার বাধ্য নয়।

আল্‌ষ্টার যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত, তখন ইংরেজ-মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত আল্‌ষ্টার ব্যবস্থাপক-সভা না মানিয়া লইলে আল্‌ষ্টারের শাসন-কর্ত্তাকে সিদ্ধান্ত-অনুসারে সালিসী-সভায় প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে বাধ্য করা যায় কি না তাহা স্থির করিবার জন্য ম্যাক্‌ডোনাল্ড্ প্রিভি-কাউন্সিলের নিকট এক আবেদন করেন। প্রিভি-কাউন্সিলের জুডিশিয়াল্ কমিটির বিচারকগণ রায় দিয়াছেন যে, যখন সন্ধি-সর্ত্তে আল্‌ষ্টারের সম্মতি গ্রহণ করা হয় নাই, এবং ১৯২০ খৃষ্টাব্দে আল্‌ষ্টারের সহিত ইংরেজের যে রফা হয়, তাহা যখন বাহাল আছে, তখন তাহাকে উপেক্ষা করিয়া ১৯২১ খৃষ্টাব্দের আইরিশ সন্ধি-সর্ত্ত বলবত্তর করা চলে না। এই সন্ধি-সর্ত্ত মানিয়া লইতে হইলে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট-সভা আল্‌ষ্টারে স্বায়ত্ত-শাসন-প্রবর্ত্তনের জন্য যে আইন পাশ করিয়াছিলেন, তাহার পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া নুতন আইন পাশ না করিলে উপায়ান্তর নাই। এদিকে আইরিশ সাধারণ-তন্ত্রের সভাপতি কাস্‌গ্রিভ আল্‌ষ্টার সমস্যার সত্বর একটি মীমাংসায় উপনীত হইবার জন্য ইংরেজ-সরকারকে তাগিদ দিতেছেন। আইন পাশ করাইয়া লইতে হইলে শুধু শ্রমিকদলের মত লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া ম্যাক্‌ডোনাল্ড্ সমীচীন বোধ করেন নাই। তাই আইরিশ সন্ধি-সর্ত্তের ইংরেজ-স্বাক্ষরকারীদিগকে ও রক্ষণশীল এবং উদারনৈতিক জননায়কদিগকেও তিনি একটি বৈঠকে উপস্থিত হইয়া এ-সম্বন্ধে একটা চরম সিদ্ধান্তে আসিতে অনুরোধ করিয়াছেন। অন্য দিকে সহজে কোনও একটা মীমাংসা সম্ভবপর কি না তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে তিনি স্যার জেম্‌স্‌ক্রেগ্ ও কস্‌গ্রিভকে লণ্ডন-সহরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমন্ত্রণ-লিপি প্রেরণ করিয়াছেন। ১লা আগষ্ট্ পার্লামেণ্ট্ মহাসভায় ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ বল্ড্‌উইনের প্রশ্নের উত্তরে পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ টমাস্ বলিয়াছেন যে, প্রিভি-কাউন্সিলের বিচারকগণের রায় বাহির হওয়ার পর ইংলণ্ডের সম্মুখে এক মহা সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। আয়ার্ল্যাণ্ডের সহিত যে সন্ধিসর্ত্ত স্বাক্ষরিত হইয়াছে, তাহার সর্ত্ত পালন করিতে ইংরেজ-জাতি ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ বাধ্য। সরকার-পক্ষ আশা করেন যে, আল্‌ষ্টার-দলের সুবুদ্ধির উদয় হইবে এবং তাঁহারা প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবেন। প্রধান মন্ত্রী আল্‌ষ্টার-জননায়কদিগকে এজন্য বিশেষ অনুরোধ করিবেন। ব্রিটিশ জাতির মঙ্গলের জন্য নিশ্চয়ই তাঁহারা এ-অনুরোধ পালন করিবেন। তবে যদি শুনিতে একান্তই রাজি না হন তখন ইংরেজ-সরকারকে বাধ্য হইয়া আইন পাশ করিয়া লইতে হইবে। ইহাতে হয়ত আল্‌ষ্টারে অশান্তির আগুন জ্বলিবে। আপনার প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য এই বিপদের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এই কার্য্যের জন্যই ইংরেজ-সরকার বদ্ধপরিকর। লয়েড্ জর্জ্জ্ এই প্রস্তাব সমর্থন করিতে গিয়া বলেন যে, তিনি ও তাঁহার সহচরবর্গ এই কার্য্যে শ্রমিকদলের সম্পূর্ণ সহায়তা করিবেন। রক্ষণশীল সম্প্রদায় কিন্তু এই প্রস্তাবের বিরোধী। তাঁহারা আল্‌ষ্টার-দলকেই সমর্থন করিবেন। আল্‌ষ্টারে কিন্তু ইতিমধ্যেই মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। কস্‌গ্রিভ লণ্ডনে উপস্থিত হইয়াছেন; আল্‌ষ্টার-নেতা স্যার্ জেম্‌স্ ক্রেগ অসুস্থ, সেজন্য তিনি বৈঠকে উপস্থিত হইতে পারিবেন না। তাঁহার পরিবর্ত্তে আল্‌ষ্টার অরেঞ্জদলের পক্ষে মার্কুইস অফ্ লণ্ডনডেরি লণ্ডনে উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু অরেঞ্জদলের যেরূপ অভিপ্রায় দেখা যাইতেছে, তাহাতে বৈঠক নিষ্ফল হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। তখন নুতন আইন সৃজনের ব্যাপার লইয়া মহা আন্দোলন হইবে। এমন কি নব নির্ব্বাচনেরও সম্ভাবনা আছে; পূর্ব্বের গোঁজামিল দূর করিয়া শেষ সিদ্ধান্তে আসিতে ইংরেজ-সরকারকে কত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে কে বলিবে?

শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

—

ভারতবর্ষ

দক্ষিণ-ভারতে বন্যা—

জল-প্লাবন ভারতবর্ষের বার্ষিক ব্যাপারের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গত বৎসর বোম্বাই মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে পর্জ্জন্য-দেবের অনুগ্রহ বেশ পূরা-মাত্রাতেই বর্ষিত হইয়াছিল। এবারেও মাদ্রাজ বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। ত্রিবাঙ্কুর কোচিন, কানাড়া, মহীশূর প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতিদিন নানারকমের শোচনীয় সংবাদ খবরের কাগজে প্রকাশিত হইতেছে। এই-সব সংবাদের ভিতর নিরাশ্রয় গৃহহীন নিঃসম্বল লোকদের সংবাদ ত আছেই; মৃত্যুর সংবাদও বড় অল্প নহে। বহু মৃতদেহ বন্যার জলে ভাসিয়া যাইতে দেখা যাইতেছে। কত গৃহ যে ভূমিসাৎ হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। এই বন্যার সঙ্গে ভূমিকম্পও ছিল। কোচিনের অন্তর্গত সোরানুরের একটি স্কুলের গৃহ চাপা পড়িয়া ৬৫টি ছাত্র এবং একজন শিক্ষক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। রেল-লাইন অনেক স্থলেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

দেশের সমস্ত কেন্দ্র হইতে বিপন্নদের সাহায্যের জন্য অর্থ-সংগ্রহের চেষ্টা হওয়া উচিত। বন্যাপীড়িত অঞ্চলকে সাহায্য করিবার জন্য ত্রিবাঙ্কুরের রাজসরকার পঞ্চাশ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। লেজিস্‌লেটিভ এসেম্‌ব্লিতে শ্রীযুক্ত রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার বন্যাপীড়িত অঞ্চলকে এক কোটি টাকা দিয়া সাহায্য করিবার জন্য সপারিষদ্ গবর্ণর জেনারেলের নিকট অনুরোধ করিয়া এক প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন বলিয়া নোটিশ দিয়াছেন।

বন্যায় তাঞ্জোর ত্রিচিনপল্লী কৈয়াম্বাটুর মালাবার দক্ষিণ-কানাড়া, মহীশূর ত্রিবাঙ্কুর কোচিন প্রভৃতি স্থানই বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ ঠিক করা এখনও সম্ভবপর নহে।

দিল্লীর দাঙ্গা—

সম্প্রতি দিল্লীতে হিন্দু-মুসলমানে ভয়ানক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। একটি সংবাদে প্রকাশ, ১১ জন হিন্দু হত ও ১৮ জন আহত এবং ১ জন

মুসলমান হত ও ৫০ জন আহত হইয়াছে। হতাহতের সংখ্যা যে এই সংখ্যাকে ঢের ছাড়াইয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ব্যাপারে শান্তিরক্ষা করিতে গিয়া পুলিশকেও গুলি চালাইতে হইয়াছিল। তাহাদের ৪ জনের আঘাত নাকি একটু গুরুতর-রকমের। হিন্দু-স্ত্রীলোক এবং শিশুদের প্রতি যে অত্যাচার হইয়াছে, তাহা অমানুষিক পাশবিকতায় ভরা।

হিন্দুদের মন্দিরগুলি অপবিত্র করা হইয়াছে। হাকিম আজমল খাঁ বলিয়াছেন—এরূপ বর্ব্বরোচিত কার্য্যের পুনরভিনয় যাহাতে না হয়, সেজন্য জামায়েৎ-উল্-উলেমা এবং খেলাফৎ কমিটির বিশেষভাবে চেষ্টা করা উচিত।

মৌলানা মহম্মদ আলী বলিয়াছেন—"আমার বড়ই লজ্জা বোধ হইতেছে যে, আমার সমধর্ম্মীদের কেহ কেহ স্ত্রীলোক ও শিশুদের উপর আক্রমণ করিয়াছে এবং একটি দেব-মন্দির অপবিত্র করিয়াছে। আমি এমন কোনো উত্তেজনার কারণ কল্পনা করিতে পারি না, যাহাতে এই ধরণের অত্যাচার সমর্থন করা যাইতে পারে। উচ্চ কণ্ঠে এই-সমস্ত কার্য্যের নিন্দা করিতে হইবে। হিন্দু গুণ্ডাদের ভার আমি হিন্দু ভ্রাতাদের হাতেই ছাড়িয়া দিতেছি, হিন্দু-সমাজেও গুণ্ডার অভাব নাই।"

সূতা-কাটার সিদ্ধান্ত—

গুজরাট জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহারা প্রতিমাসে অন্ততঃ তিনশত গজ সূতা কাটিবেন এবং অতিরিক্ত দুই হাজার গজ সূতা সংগ্রহ করিবেন।

বারদোলী তালুকের শিক্ষকেরা স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহারা গুজরাট প্রাদেশিক-কংগ্রেস-কমিটিতে প্রতিমাসে তিন হাজার গজ এবং যদি সম্ভব হয় তবে পাঁচ হাজার গজ সূতা প্রদান করিবেন।

বারদোলী তালুক কংগ্রেস-কমিটি স্থির করিয়াছেন যে মহাত্মা গান্ধী যখন বারদোলী গমন করিবেন তখন বারদোলী তালুকের প্রত্যেক নর-নারী যাহাতে তাঁহাকে আন্দাজ আড়াই পোয়া করিয়া সূতা উপঢৌকন দিতে পারেন সেজন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করা হইবে।

মিউনিসিপ্যালিটির কর্ম্মপন্থা—

তামিল কংগ্রেস-কমিটি, অন্ধ্র কংগ্রেস-কমিটি, খিলাফৎ কমিটি, তামিল-অন্ধ্র স্বরাজ্যদল ও মহাজন-সভা একত্র মিলিত হইয়া মিউনিসি-প্যালিটি-সম্বন্ধে তাহাদের কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন এবং কংগ্রেস হইতে যে-সব সদস্য মিউনিসিপ্যালিটিতে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহারাও সেই কর্ম্ম-পদ্ধতি মানিয়া চলিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এই কর্ম্ম-পদ্ধতি অনুসারে—

(১) মিউনিসিপ্যালিটির সদস্যদিগকে খদ্দর পরিয়া কর্পোরেশনের সভাসমূহে এবং অন্যান্য সভাসমিতিতে উপস্থিত হইতে হইবে।

(২) গবর্মেন্টের কোনো কর্ম্মচারীর সম্মানের কোনো অনুষ্ঠান হইলে তাঁহারা সেগুলিতে যোগদান করিতে পারিবেন না।

(৩) বড়লাট, প্রাদেশিক গবর্ন্‌র, শাসন-পরিষদের সদস্য বা মন্ত্রীদিগকে তাঁহারা অভিনন্দিত করার পক্ষে ভোট দিবেন না।

(৪) কর্পোরেশনের ভিতর দিয়া ইঁহারা কংগ্রেসের গঠন-মূলক কার্য্য করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

এই দল নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য লইয়া কাজ করিবেন :—কর্পোরেশনের স্কুলসমূহে তাঁহারা জাতীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিবেন, স্কুলসমূহে চর্কা প্রচলিত করিয়া এবং শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার করিয়া জাতীয় ভাবের যাহাতে পরিপুষ্টি হয় তাহার ব্যবস্থা করিবেন, সহরের বালক-বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করিবেন, মদ বন্ধের চেষ্টা করিবেন, খদ্দর প্রচারের জন্য সকল-রকমে চেষ্টা করিবেন, গরীবদিগের জন্য বিনা পয়সায় রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবেন। যেখানে সম্ভব বিদেশী জিনিষের ব্যবহার বন্ধ করাইবেন। বিদেশী লোকের নামে যে-সব ইমারত রাস্তা প্রভৃতি আছে তাহাদের নাম বদলাইয়া ভারতবাসীর নামে সেগুলির নামকরণ করিবেন, মিউনিসিপ্যালিটির কাজে বিদেশী লোক রাখিবেন না।

ভারতীয় হিন্দু শুদ্ধিসভা—

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত নিম্নলিখিতরূপে মালকানাদিগকে হিন্দু করা হইয়াছে—

জানুয়ারী— ১৫০ জন,
ফেব্রুয়ারী— ৩৫০ জন,
মার্চ্চ— ৮০০ জন,
এপ্রিল— ৪৫০ জন,
মে— ৩০০ জন,
জুন— ২০০ জন।

নাগপুর-বিশ্ববিদ্যালয়—

নাগপুর-বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সভায় ভাইস্-চ্যান্‌সেলার স্যার্ বিপিনকৃষ্ণ বসু মহাশয় ঘোষণা করিয়াছেন যে, স্যার মেকেঞ্জি দাদাভাইয়ের আইন-পুস্তকের লাইব্রেরী, রাজপুতনা কিষণগড় রাজ্যের দেওয়ান বাহাদুর পোনাস্করের প্রদত্ত শতকরা সাড়ে তিন টাকা সুদের সত্তর হাজার টাকা ও অমরাবতীর মিঃ মোটের প্রদত্ত চারি হাজার টাকা দানস্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। মিঃ পোনাস্করের প্রদত্ত টাকায় দাতার স্ত্রীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে স্থানীয় স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি বিধান করা হইবে এবং মিঃ মোটের টাকা বেরারের শিক্ষার্থীগণের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার উৎসাহ প্রদানার্থ ব্যয়িত হইবে।

নাগপুরের মিল দুর্ঘটনা—

গত ২৯শে জুলাই গুজরাটের একটি তুলার কল ভূমিসাৎ হইয়াছে। বহু কারিকর তখন কলের ভিতর কাজ করিতেছিল। সুতরাং বহুলোক চাপা পড়ে। গত ১লা আগষ্ট রাত্রি ১০টার সময় ধ্বংসস্তূপ সরানোর কাজ শেষ হইয়াছে। মোটের উপর ২৪ জনের মৃতদেহ ধ্বংসস্তূপের ভিতর পাওয়া গিয়াছে। দুইজন আহত ব্যক্তি হাঁসপাতালে মারা গিয়াছে। ৩৪ জন জখমীর মধ্যে ১৪ জন হাঁসপাতালে শয্যাশায়ী হইয়া আছে। মিল-কর্তৃপক্ষ আহতদের পরিবারবর্গকে একমণ হিসাবে খাদ্যদ্রব্য এবং মৃতের সৎকারের জন্য ১০৲ টাকা করিয়া দান করিয়াছেন।

কাশ্মীরে মজুর ও সেনাদলে সংঘর্ষ—

কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের সিল্কের কারখানার মজুরেরা কারখানার নূতন ব্যবস্থায় আপত্তি করিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠে। অবস্থা সঙ্গীন দেখিয়া সৈন্যদল তলব করা হয়। কাশ্মীর রাজ্যের অশ্বারোহী সেনাদের সহিত উত্তেজিত জনসংঘের সংঘর্ষ ঘটে। ফলে গুলি চলিয়াছিল। গুলির আঘাতে ৭ জন দাঙ্গাকারী মারা গিয়াছে এবং ৪০ জন জখম হইয়াছে। ইংরাজ-গভমেণ্টের দৃষ্টান্তের চমৎকার অনুকরণ।

কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট—

২০টি প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটির মধ্যে গুজরাট আগামী কংগ্রেসের জন্য কাহারও পক্ষে মত প্রকাশ করে নাই। আজমীর-মাড়োয়ারের

মত এখনও জানা যায় নাই। অবশিষ্ট কংগ্রেস-কমিটিগুলির মধ্যে কর্ণাটক, যুক্তপ্রদেশ, অন্ধ্র, তামিল নাড়ু, এবং বিহার মহাত্মা গান্ধীকে মনোনীত করিয়াছেন। মোটের উপর ১৬টি কমিটি মহাত্মা গান্ধীর পক্ষে ভোট দিয়াছেন, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুকে দিয়াছেন ৮টি এবং ৮টি ভোট দিয়াছেন মিঃ রাজাগোপাল আচারীকে। তার পর লালা লাজপত রায়, কোণ্ডাবেঙ্কটপুর, ডাক্তার মুঞ্জি, সার্ পি, সি রায়, শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, হসরত মোহানী, মিঃ সি, এফ্ এণ্ড্রুজ,পণ্ডিত সুন্দরলাল ও পণ্ডিত জহরলাল, ডাক্তার কিচ্‌লু, মিঃ বল্লভভাই পটেল, মৌলনা সৌকত আলী, ডাঃ আন্‌সারী, মিঃ প্রকাশম; শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, দেশবন্ধু দাশ, আব্বাস তায়বজী—ইঁহাদের নামও উঠিয়াছে।

আবার গৌরীশঙ্করে—

"ডেলিমেল" পত্র বলেন, যদি আবশ্যক অর্থসাহায্য পাওয়া যায়, তাহা হইলে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই গৌরীশঙ্কর-শৃঙ্গে পুনরায় আরোহণের চেষ্টা হইবে। এবার সুইজারল্যাণ্ড্ দেশীয় পর্ব্বতারোহণ-পটু ব্যক্তিগণই এই কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন।

এই কার্য্যে প্রধান উৎসাহী যিনি তিনি একজন সুইস্, এবং আল্‌প্‌স্ পর্ব্বত-শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া তিনি সর্ব্বসাধারণের সুপরিচিত। তাঁহার হিমালয়-আরোহণ সম্বন্ধেও অভিজ্ঞতা আছে। বাছা-বাছা লোককে পথ-প্রদর্শক গ্রহণ করা হইবে; তাহাদিগের বয়স ৩৫ বৎসরের অনধিক হওয়া চাই, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা হইবে।

নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সুবিধার কারণ এবার অম্লজান সরবরাহের জন্য কোনো ভারী সরঞ্জাম সঙ্গে লওয়া হইবে না। পর্ব্বতারোহীগণ স্থির করিয়াছেন, তাঁহারা ছোট ছোট নলে ঘনীকৃত অম্লজান পুরিয়া লইবেন। যখন নিশ্বাসপ্রশ্বাস কষ্টকর হইবে, তখন উহা পিচ্‌কারী দ্বারা দেহের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করানো হইবে।

একেই বলে জীবিত জাতির অদম্য উৎসাহ। হিমালয়-পৌঁছিয়া কোনো বৈষয়িক লাভ নাই; কিন্তু দুর্গম পথ উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রকৃতির সহিত যুদ্ধে জয়ী হইয়া সঙ্কল্পিত লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার সফলতাই পরম লাভ ও পুরুষকারের চরম পুরস্কার!

দশলক্ষ টাকা দান—

বোম্বাই প্রেসিডেন্সির মুসলমান ছাত্রেরা যাহাতে বিদেশে গিয়া চিকিৎসা দর্শন প্রাচীন ইতিহাস আরব সাহিত্য ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে পারে এজন্য বৃত্তিদান করিবার উদ্দেশ্যে স্যার ফজলভাই করিমভাই, স্যার করিমভাই এবং ভাই কানুভাই নুরমহম্মদ জিরাজভাই পীরভাই শিক্ষা সম্বন্ধীয় ট্রাষ্টের পক্ষ হইতে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে দশলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

লোকমান্যের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা—

পুণা-সহরে পরলোকগত লোকমান্য তিলকের একটি প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের সম্মুখে এই প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করাইয়াছেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু উঁহার আবরণ উন্মোচন করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট হইতে এই মর্ম্মে এক নিষেধাজ্ঞা জারি করা হইয়াছিল যে এই উদ্দেশ্যে মিউনিসিপ্যালিটির এক কপর্দ্দকও কেহ ব্যয় করিতে পারিবে না। তার পর শিল্পীকে এইজন্য অগ্রিম যে ছয় হাজার টাকা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা আদায় করিবার জন্যও আদালতে এক মামলা রুজু করা হইয়াছিল। এই-সকল প্রতিবন্ধক থাকা সত্ত্বেও মিউনিসিপ্যালিটি যে এই মর্ম্মরমূর্ত্তিটী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের সৎসাহসের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

দশসহস্রাধিক লোক সমবেত হইয়া লোকমান্যের স্মৃতি পূজা করিয়াছে। ইহার পর পণ্ডিতজী তিলক-মেমোরিয়াল হলের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে দান—

এম্প্রেস্ স্বদেশী মিল্‌স্ এবং আহ্‌মদাবাদ অ্যাড্‌ভান্স মিল্‌সের পক্ষে মেসার্স টাটা এণ্ড্ সন্‌স্ নাগপুর-বিশ্ববিদ্যালয়-ভবন নির্ম্মাণের জন্য ১ লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন। কার্য্যকারী কাউন্সিল দাতার এই দান সাগ্রহে গ্রহণ করিয়া ভবনটির নামকরণ জমশেদ নসরওয়ানজী টাটার নামে করিবেন বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সামরিক শিক্ষা—

ডাক্তার পরাঞ্জপে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে বিশ্ববিদ্যালয়ে সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবার জন্য একটি প্রস্তাব তুলিবেন; ঐ প্রস্তাবের একটি সংশোধন প্রস্তাবও উপস্থিত করা হইবে। তাহার মর্ম্ম এই—বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যে-সকল আর্ট কলেজ আছে, সেগুলির ফার্ষ্ট ইয়ারের ছাত্রদের পক্ষে শরীরচর্চ্চা বাধ্যতা-মূলক করা হউক।

লক্ষ টাকা দান—

ময়ূরভঞ্জ ষ্টেটের সামন্তরাজ লেফ্‌টেনাণ্ট পূর্ণচন্দ্র ভঞ্জ দেও কটকের র‍্যাভেন্সা কলেজের ল্যাবরেটারীর উন্নতির জন্যে বেহার ও উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্টের শিক্ষামন্ত্রীর হাতে ১,০০,০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। ল্যাবরেটারীর নাম 'ময়ূরভঞ্জ ল্যাবরেটারী" রাখিতে হইবে।

রায়

বাংলার কথা

কলিকাতার সাময়িক পত্রিকা—

কলিকাতা ও উপনগরে ৩১ খানা দৈনিক, ৩ খানি অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক, ৭০ খানা সাপ্তাহিক, ১৫ খানা পাক্ষিক, ১৭৭ মাসিক, ২৭ খানা ত্রৈমাসিক, ১ খানা অর্দ্ধ-বাৎসরিক ৩ খানা বাৎসরিক পত্রিকা গত বছর ছাপা হয়েছে। গোটা কলকাতায় ছাপাখানা আছে ৬০০।

—বেকালী

নূতন আইন—

উকিলেরা হাইকোর্টে অরিজিনেল সাইডে মোকর্দ্দমা দায়ের করতে পারবেন কি না, এসম্বন্ধে বিবেচনা করবার জন্য বার-কমিটি নামক একটি কমিটি নিযুক্ত করা হয়েছিল। এতদিন এ অধিকার ব্যারিষ্টারদের একচেটে ছিল।

বার-কমিটির রিপোর্ট্ বিবেচনা করে' হাইকোর্ট্ থেকে নিম্নলিখিত আইন করা হবে স্থির হয়েছে—

ভকিল কিম্বা এটর্ণি, যারা অন্ততঃ ১০ বৎসর যাবত কাজ করে, আসছেন, তাঁরা এই অধিকার পাবেন।

হাইকোর্টের উকিল যাঁদের কাজ ১০ বৎসর পূর্ণ হয়নি, তাঁরা বিশেষ একটা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'লে এই অধিকার পাবেন।

হাইকোর্টের এটর্ণিদের ১০ বৎসর কাজ পূর্ণ হ'য়ে থাকলে পরীক্ষা-বোর্ডের সেক্রেটারীর নিকট হ'তে এই মর্ম্মে সার্টিফিকেট আনতে হবে যে, তাঁদের ব্যবসা-আইন-সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান আছে।

কোন লোক বি-এ কিম্বা বি-এস্‌সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'লে এবং হাইকোর্টের এড্‌ভোকেটের নিকট এক বছর শিক্ষা লাভ করলে এবং কোন বিশেষ বিষয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'লেও হাইকোর্ট তাদের এই অধিকার দিতে পারেন।

—বৈকালী

পুলিশের জয়গান—

লর্ড লিটন যে "জবরদস্ত" গবর্ন্‌র, তাহার পরিচয় তিনি ক্রমেই দিতেছেন। সেদিন হুগলীতে যাইয়া সমস্ত তারকেশ্বরের সত্যাগ্রহ ব্যাপারটাকেই তিনি Hoax বা দমবাজি বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। এবার ঢাকা সহরে অবতীর্ণ হইয়া, তিনি প্রাণ ভরিয়া পুলিশের গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন। পুলিশ হাজার অত্যাচার-অনাচার করুক না কেন, আমলাতন্ত্র গবর্ন্‌মেণ্ট তাহাকে সমর্থন করিতে বাধ্য; কিন্তু কথাটা মনে-মনে বুঝিলেও, একজন গবর্ন্‌রের মুখে পুলিশের এমন নির্লজ্জ প্রশংসা, নিতান্তই বিসদৃশ বোধ হয়!

লর্ড্‌ লিটন পুলিশের যে আদর্শ-চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা আদর্শ হিসাবে ঠিকই বটে; হয়ত বা অন্যান্য সভ্য দেশের পুলিশ কতকটা ঐরূপই। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে আদর্শ-পুলিশের সঙ্গে বাস্তব-পুলিশের এতটা আকাশ-পাতাল তফাৎ যে, লর্ড্‌ লিটনের কথাগুলি বিদ্রূপ বলিয়াই মনে হয়! লর্ড লিটন বলিয়াছেন,—

"পুলিশ লোকসমাজের ভৃত্য—কেবলমাত্র গবর্ন্‌মেণ্টের ভৃত্য নয়। পুলিশ দরিদ্র, অসহায় ও নির্দ্দোষ ব্যক্তিদের রক্ষকস্বরূপ। যাহারা শান্তিভঙ্গ করে বা সামাজিক বিধি অমান্য করে, তাহারা ব্যতীত আর কেহ যেন পুলিশকে দেখিয়া ভয় না পায়। পুলিশ অজ্ঞতার প্রতি ধৈর্য্যশীল হইবে এবং উত্তেজনার মধ্যেও শান্ত থাকিবে তাহাদের সাহস, সাধুতা ও শিষ্টতার উপরেই সমগ্র সঙ্ঘবদ্ধ সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। যদি তাহারা এইরূপ আচরণ না করে, তবে যে কেবল গবর্ন্‌মেণ্টের প্রতিই তাহারা কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করে, তাহা নয়, লোকসমাজের প্রতিও তাহারা তদ্দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতা করে।"

বক্তৃতা-হিসাবে লর্ড্‌ লিটনের বাক্যগুলি চমৎকার হইয়াছে। বাঙ্গালার বাহিরে জালিয়ানওয়ালাবাগ, গুরু-কা-বাগ, নাগপুর প্রভৃতি স্থানের পুলিশের কথা ছাড়িয়া দিই; এই বাঙ্গালাদেশেই চাঁদপুর, মির্জ্জাকলু, সলঙ্গাহাট, হাওড়া, বরিশাল, কানাইঘাট, মাইজভাগ প্রভৃতির কথা কি লোকে ইতিমধ্যেই ভুলিয়া গিয়াছে? শান্তি ও শৃঙ্খলা-রক্ষার নামে বাঙ্গালার পুলিশ ঐসব স্থানে যে কীর্ত্তিকলাপ করিয়াছিল, তাহা চিরদিন জ্বলন্ত অক্ষরে এদেশবাসীর হৃদয়ে লেখা থাকিবে। লর্ড লিটন বক্তৃতা করিবার সময় ঐ সব স্থানের কাহিনী কি ভুলিয়া গিয়াছিলেন?

একেবারে যে ভুলেন নাই, তাহার প্রমাণ তিনি পরক্ষণেই দিয়াছেন। তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, লণ্ডনের পুলিশ তাঁহার আদর্শ চিত্রের কতকটা অনুরূপ। এদেশের পুলিশ ঠিক তেমন নয়। কিন্তু সে দোষ কাহার? লোকে বলিবে যে, উহা এদেশের পুলিশের শিক্ষাদীক্ষা ও আব্‌হাওয়ার দোষ, যে আমলাতন্ত্র শাসন-প্রণালীর তাহারা বাহন, তাহার দোষ,—যাঁহাদের ইঙ্গিতে এদেশে পুলিশ চালিত হয়, তাঁহাদের দোষ! কিন্তু পাঠকবর্গ শুনিয়া চমকিত হইবেন যে, লর্ড্‌ লিটন মৌলিক গবেষণা করিয়া সম্পূর্ণ নুতন কারণতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, এদেশের পুলিশ যে লণ্ডন পুলিশের মত আদর্শ পুলিশ হয় নাই, তাহার জন্য দায়ী এদেশের জনসাধারণ!! তাহারা পুলিশের কার্য্যে সহায়তা করে না, পুলিশকে ভীতির চক্ষে দেখে ও তাহাকে এড়াইয়া চলে, পুলিশকে তাহারা আপনাদের রক্ষাকর্ত্তা মনে করে না, বরং উল্টা তাহাদিগকে নানারূপ তীব্র সমালোচনা ও গালিগালাজ করে। আর এইসব কারণেই এদেশের পুলিশ আদর্শ-পুলিশ হইতে পারে নাই। কেহ গালাগালি দিলে, পাল্‌টা জবাবে গালাগালি দিয়া প্রতিপক্ষকে জব্দ করিবার প্রথা—কলহপ্রিয় বালকদের মধ্যে প্রচলিত আছে বটে; কিন্তু বাঙ্গালার গবর্ন্‌রও যদি বালক-মহলের সেই সনাতন প্রথা অবলম্বন করেন, তবে তাহা নিতান্তই হাস্যরসাত্মক হইয়া পড়ে।

সাধারণ লোকদের সঙ্গে পুলিশের কোন সহানুভূতি নাই, শান্তি ও শৃঙ্খলা-রক্ষার অজুহাতে তাহারা বিনা কারণে বা সামান্য কারণে লোকদের উপর অত্যাচার করে। কোনপ্রকারে একবার পুলিশের সংস্পর্শে আসিলে, লোককে নাস্তানাবুদ হইতে হয়, সর্ব্বোপরি এদেশের পুলিশ নিজেদেরকে জনসাধারণের ভৃত্য মনে করে না, "সর্ব্বময় প্রভু"ই মনে করে,—এই সবই পুলিশের প্রধান দোষ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এমন কি, বিহার-উড়িষ্যার পুলিশের বড় কর্ত্তা, মহীশূর পুলিশের বড় কর্ত্তা প্রভৃতির মত বড় বড় অভিজ্ঞ পুলিশ কর্ম্মচারীরাও এইরূপই বলিয়াছেন। আর আজ লর্ড্‌ লিটন তরজাওয়ালাদের মত উল্টাপাল্টা গাহিয়া সেইসব কথা উড়াইয়া দিতে চাহেন।

লর্ড্‌ লিটন এমন একটা কথা বলিয়াছেন, যাহা সমগ্র ভারতবাসীর পক্ষে ঘোর অপমান-স্বরূপ।

"ভারতবর্ষে যে জিনিষটি আমাকে বেশী পীড়া দিয়াছে, তাহা এই:—কর্তৃপক্ষের প্রতি ঘৃণাবশতঃ ভারতবাসী পুরুষেরা ভারতীয় রমণীদিগকে মিথ্যা করিয়া নিজেদের সম্মান ও মর্য্যাদার বিরুদ্ধে অপরাধ সৃষ্টি করিতে প্রবৃদ্ধ করে এবং কেবলমাত্র পুলিশের বদ্‌নাম করিবার জন্যই ঐরূপ করা হয়।"

এপর্য্যন্ত ভারতের কোন দাম্ভিক বড়লাট বা ছোটলাট, ভারতবাসীর প্রতি এমন নীচ মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করিতে সাহস পান নাই। পুলিশের বদ্‌নাম করিবার জন্য এদেশের পুরুষেরা মেয়েদিগকে মিথ্যা কথা বলিতে শিখায়—আর মেয়েরা মিথ্যা করিয়া কেবলমাত্র পুলিশকে জব্দ করিবার জন্য অম্লান-বদনে নিজেদের ধর্ম্ম ও সতীত্বনাশের কথা লোক-সমক্ষে প্রচার করে। মোকদ্দমা আপীল আদালতে বিচারাধীন বলিয়া লর্ড্‌ লিটন নাম না করিলেও তিনি যে চরমনাইরের ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছেন, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। গবর্ন্‌রের এই মন্তব্য আপীল আদালতের উপর কিরূপে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, বোধ হয়, তিনি তাহা ভাবিয়া দেখেন নাই। লর্ড্‌ লিটনের দৃষ্টান্ত আমরা অনুসরণ করিতে চাই না। তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, তিনি কি সত্যই এদেশের মেয়েদের সম্বন্ধে এই নীচ ধারণা পোষণ করেন? তাঁহার মতে চরমনাইর গ্রামের সাজুবিবি, অষ্টমা দাসী প্রভৃতি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে নিজেদের সতীত্বনাশের যে কাহিনী ব্যক্ত করিয়াছিল, তাহা কি সব মিথ্যা?

উপসংহারে পুলিশকে অভয় দিয়া লর্ড্‌ লিটন তাঁহার মূল্যবান্‌ বক্তৃতা বা উপদেশ শেষ করিয়াছেন। দেশের লোকে পুলিশের যতই তীব্র সমালোচনা ও নিন্দা করুক না কেন গবর্ন্‌মেণ্ট যে তাহাদিগকে পক্ষপুটে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিবেন, তাহাদের সর্ব্বপ্রকার দুঃখকষ্ট দূর করিতে সতত যত্নবান্‌ থাকিবেন, একথা গবর্ন্‌র দৃঢ়স্বরে বলিয়াছেন। আমরা বলি তথাস্তু। কিন্তু গবর্ন্‌র যদি মনে করিয়া থাকেন, যে, তাঁহার এই রক্তচক্ষু দেখিয়া দেশবাসী ভীত হইবে, পুলিশের সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার ও অনাচার তাহারা নীরবে সহ্য করিবে তবে তিনি নিশ্চয়ই হতাশ হইবেন।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

লোকমান্য টিলক মহাশয়ের প্রতিমূর্ত্তি
পুনায় প্রতিষ্ঠিত
শ্রীযুক্ত ন ব বীরকর কর্ত্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ্ হইতে মুদ্রিত

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র গুহ রায়ের কারাবরণ—

চরমনাইয়ের মোকদ্দমায় শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র গুহ রায় মহাশয় এক বৎসরের জন্য বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। দেশে 'শান্তি ও শৃঙ্খলার' রক্ষাকর্ত্তা সরকারের পেয়ারা পুলিস চরমনাইয়ে স্ত্রীলোকদিগের উপর যে পাশবিক বর্ব্বরোচিত ব্যবহার করিয়াছিল তাহা প্রতাপ-বাবুই প্রথম প্রকাশ করিয়া তৎপ্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইহাই প্রতাপ-বাবুর অপরাধ। ফরিদপুরের জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের রিপোর্টে বিষয়টাকে যেপ্রকার ধামাচাপা দিবার চেষ্টা হইয়াছিল, প্রতাপ-বাবুর প্রতিবন্ধকতায় তাহা বিফল হইয়াছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটীর সভায় প্রতাপ-বাবু মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় পুলিশের অত্যাচার-কাহিনী যেভাবে বর্ণনা করেন, তাহার ফলে কংগ্রেসের তদন্ত কমিটি গঠিত হয়, এবং কমিটির রিপোর্ট্ অনুসারে প্রতাপ-বাবুর আরোপিত অভিযোগের সত্যতাই প্রমাণিত হয়। ন্যায় ও সত্যের অনুরোধে পুলিশের অত্যাচারের হুঙ্কার-জনক স্বরূপ লোক-সমক্ষে প্রকাশের কর্ত্তব্য সম্পাদনের পরই আজ প্রতাপ-বাবু রাজদণ্ডে দণ্ডিত। দেশবাসী কিন্তু শ্রদ্ধাপ্লুত হৃদয়ে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে। চরমনাইয়ে নিগৃহীত অধিকাংশ স্ত্রীলোকই মুসলমান। এই উৎপীড়িতা রমণীগণের পক্ষাবলম্বন করিতে গিয়াই প্রতাপ-বাবু দণ্ডিত হইয়াছেন। মুসলমান সমাজ সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে ইহা চিরদিন স্মরণ রাখিবে।

—মোহাম্মদী

কলিকাতার রেষ্টরেণ্ট—

কলিকাতার প্রায় রাস্তায় আজকাল বিলাতী কায়দায় (?) রেষ্টুরেণ্ট্ খোলা হইতেছে। চা, চপ, কাট্‌লেট্, ডিম, কারি কত কি সেখানে বিক্রয় হয়। প্রায় সবগুলি দোকানই অতিশয় নোংরা।—এমন কি খুব "নামকরা" এই ধরণের হোটেলগুলিও মৃত্যুর আড়কাটি। এই-সমস্ত হোটেলের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা পরীক্ষা করিবার জন্য কর্পোরেশন হইতে লোক নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা কিভাবে পরীক্ষা করেন জানি না; তবে কলিকাতার পৌনে ষোল আনারও বেশী রেষ্টরেণ্ট্-এর খাদ্য ও বসিবার স্থান এবং প্লেট্, গ্লাস্ ইত্যাদি অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা। নানা কারণে আজকাল ইহা লোকে গ্রহণ করে। কিন্তু খাদ্যদ্রব্য-পরীক্ষকদের এদিকে উপেক্ষা করার কোন কারণই গ্রহণযোগ্য নহে।

—স্বরাজ

বঙ্গে ডাকাতি—

গত জুন মাসে সমগ্র বঙ্গদেশে ৯১টা ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ইহাই কি শৃঙ্খলা ও শান্তি রক্ষার আদর্শ। এত ডাকাতি বৃদ্ধি হইলে ইহাকে মোগল আমল মনে হইতে পারে না কি?

—বরিশাল-হিতৈষী

শ্রমজীবী সঙ্ঘ—

আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলিয়া গিয়াছেন, "সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা"। দেশ, সমাজ ও জাতি রক্ষার জন্য দেশবাসী সকলেরই যে সংহতিবদ্ধ হইয়া থাকা প্রয়োজন, তাহা তাঁহারা বুঝিতেন। এখন এক একটা সম্প্রদায় অপর সকল হইতে স্বতন্ত্র হইয়া নিজেদের মধ্যে দলগঠনকরতঃ আত্মপ্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে। ইদানীং শ্রমজীবীসঙ্ঘ সর্ব্বত্র প্রবল হইয়া উঠিতেছে। রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ্, ডাক, ষ্টীমার, কয়লার খনি, লৌহের কারখানা, পাটের কারখানা, কাপড়ের কল—সর্ব্বত্র সাধারণ কর্ম্মচারীরা ও শ্রমজীবীরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া আত্মশক্তি স্থাপন করিতেছে। বিলাতের কুলিরা ত দৈনিক ৩৷৪ টাকা রোজগার করে, এখানেও চারি পাঁচ আনার স্থলে বার আনা হইতে দেড় টাকা দু'টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। ছয় সাত টাকার পিয়ন ২০৷২৫ টাকা পাইতেছে। এই শ্রমজীবী সঙ্ঘ কোথায় কিরূপ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরা তাহার খবর রাখে না। বিলাতের শ্রমজীবীরা এইক্ষণ সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। মার্কিনের শাসনকর্ত্তারাও তথাকার শ্রমজীবীদের করধৃত পুতুলের মত। অল্পদিন মধ্যে ভারতেও সেই ভাব আসিয়া পড়িয়াছে। শিল্প বাণিজ্যের প্রাবল্য যত বৃদ্ধি পাইতেছে রাজ্য-শাসন যতই শিল্পী ও বণিকদের অনুগত হইতেছে, ততই শাসনকর্তৃত্ব শ্রমজীবীদের হাতে গিয়া পড়িতেছে। বোম্বাই নগরেই শ্রমজীবীরা বিশেষ অগ্রসর হইয়াছে। সেখানেই "অল্ ইণ্ডিয়া ট্রেড্ ইউনিয়ান্ কংগ্রেস" স্থাপিত হইয়াছে। বোম্বাই নগরে ১০টি ইউনিয়নে ২৭,৮৮৮ জন মেম্বর, আহমদাবাদ নগরে ৭টি ইউনিয়নে ১৫৮৫০ জন, এবং অন্যান্য জেলায় ৬টি ইউনিয়নে ৮৩৯১ জন, মোটের উপর বোম্বাই প্রদেশে ২৩টি ইউনিয়ান ৫২,১২৯ জন মেম্বর। তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক রেলওয়েতে, ষ্টীমারঘাটে, কয়লার খনিতে, পাটের

কলে, ট্রামওয়েতে, সরকারী প্রত্যেক বিভাগে সাধারণ কর্ম্মচারীরা ও শ্রমজীবীরা সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছে। সম্প্রতি "অল ইণ্ডিয়া ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের" জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ জিনুওয়ালা ভারতের সমস্ত ইউনিয়নকে লইয়া এক "লেবার ফেডারেশন" গঠনের আয়োজন করিতেছেন। ইহার ভাবী ফল কি দাঁড়াইবে, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ভাবিতে থাকুন। আমরা বারান্তরে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিব।

—জ্যোতি

গাছ পাথরে পরিণত—

প্রায় মাসাবধি হইল আসানসোলের অনতিদূরে রেলওয়ে লাইনের জন্য মাটি কাটিবার সময়, ১০ফুট নীচে একটি গাছ পাথরে পরিণত হইয়াছে, দেখা যায়। এই সংবাদ পাইবামাত্র গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ভূতত্ত্বদিগের একজন সাহেব এবং একজন বাঙ্গালী বাবু আসিয়াছেন। তাঁহারা এ গাছটি কলিকাতা লইয়া যাইবার জন্য বন্দোবস্ত করিতেছেন। লোক পরম্পরায় শুনা যাইতেছে যে, কিভাবে ঐ গাছ পাথরে পরিণত হইয়াছে তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য ইংলণ্ডে পাঠান হইবে। গাছটি দেখিবার জন্য প্রত্যহ বহু লোকের সমাগম হইতেছে।

—আনন্দবাজার-পত্রিকা

দুরপনেয় কলঙ্ক—

দেশের দরিদ্র লোকদের মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করার অমোঘ উপায় খদ্দর প্রচারের জন্য শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র রায় বৃদ্ধ বয়সে একরূপ আহার নিদ্রা ত্যাগ করতঃ ক্ষীণ দেহখানি লইয়া, সারাদেশ ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, নিজের সঞ্চিত পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহাতে দিয়াছেন। তাঁহার প্রেরণায় বহু উদ্যমশীল যুবক লোকের ঘরে ঘরে গিয়া চরকায় সুতাকাটা শিখাইয়াছে, কাপড় বুনন শিখাইয়াছে। উত্তরবঙ্গের জলপ্লাবিত স্থানের শত শত লোক চরকায় সুতা কাটিয়া মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে, আর আজ কি না শুনিতেছি, তাঁহার খদ্দর-প্রতিষ্ঠানে কাপড় মজুত হইয়া যাইতেছে, দেশের লোক তাহা কিনিতেছে না। খদ্দর ফেলিয়া যাহারা বিলাতী ও দেশী মিলের সরু কাপড় পরে ও বাবুগিরি দেখায়, তাহারা একবার ভাবিবে কি তাহাদের এ কলঙ্ক ঢাকিবার স্থান জগতে আছে কি না ?

—জ্যোতি

খুলনায় ভীষণ গো-মড়ক—

সংবাদপত্র-পাঠক মাত্রেই এই ভীষণ গো-মড়কের কথা অবগত আছেন। খুলনা সেবাশ্রমের আশাশুনি কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী যোগানন্দ যাহা জানাইয়াছেন, তাহাতে কৃষকের অবস্থা চিন্তা করিয়া হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আশ্রমের শক্তি সীমাবদ্ধ। মাত্র ১৩।১৪টি জনবিরল ক্ষুদ্র গ্রামের সেবা করিতেই তাঁহাদের শক্তি নিঃশেষিত হইতেছে। এই সামান্য কয়টি গ্রামেই ইতিমধ্যে ৫ শতের উপর গরু মরিয়াছে এবং এখনও বহুতর গরু মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছে। নদী দিয়া অবিরত মৃত গরুর দেহ ভাসিয়া যাইতেছে; গ্রামগুলি পূতিগন্ধে ভরিয়া উঠিয়াছে। ভীষণ দুর্ভিক্ষের কবল হইতে কোনওরূপে উদ্ধার পাইয়া, এখন কৃষকগণ এই আর-এক ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে। গত বৎসরও এই সময়ে এইরূপ মড়ক উপস্থিত হইয়াছিল। কৃষকগণ কোথাও ধনী নহে,—এ অঞ্চলে ত তাহারা দুর্ভিক্ষকে নিত্যসহচররূপে পাইয়াছে, ম্যালেরিয়া-রাক্ষসীকে দলে দলে প্রাণ বলি দিতেছে। গরু তাহাদের একমাত্র ধন। এই ধনও যদি প্রতিবৎসর এইরূপে বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাহা হইলে, তাহাদের ভবিষ্যৎ কিরূপ ভয়াবহ হইবে, তাহা চিন্তা করিতেও কষ্ট হয়। এ-বৎসর বহু আন্দোলনের পর দুইজন পশু-চিকিৎসক এই অঞ্চলে প্রেরিত হইয়াছেন। কিন্তু রোগ যেখানে এরূপ বিস্তৃত, সেখানে দুজন মাত্র লোকে কি করিবেন ? ফলে তাঁহাদের দ্বারা যে কিছু সাহায্য পাওয়া যাইতেছে তাহা কৃষকগণ অনুভব করিতেই পারিতেছে না। মড়ক যখন প্রতিবৎসর যথাসময়ে উপস্থিত হইতেছে, তখন ইহার কারণ নির্ণয় করা এবং তৎসঙ্গে কি করিলে কৃষকগণ পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইতে পারে, সে বিষয়ে উপদেশ দানের ব্যবস্থা করা গবর্ণমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য। মড়কের কারণ নির্ণীত হইলে এবং প্রতিষেধকের ব্যবস্থা হইলে সেবাশ্রমের সেবকগণই কৃষকগণকে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারিবেন,—পশু-চিকিৎসক প্রেরণের বিশেষ প্রয়োজন হইবে না। আশা করি, গবর্ণমেণ্ট সত্বর এবিষয়ে যথাযোগ্য অনুসন্ধান করিবেন।

—সেক্রেটারী,
খুলনা রিলিফ কমিটি

চরকা-কাটা—

বাঙ্গলার নো-চেঞ্জারগণ সেদিন কলেজ স্কোয়ারের সভায় চরকা কাটিয়া সভায় উপস্থিত লোকদের দেখাইয়াছেন। শত বক্তৃতা হইতে ইহা কার্য্যকরী। জাতিগঠনমূলক কার্য্যকে নো-চেঞ্জারগণ যদি সফল করিতে চাহেন, তবে আদর্শকে কায়মনোবাক্যে আঁকড়াইয়া ধরিতে হইবে। আদর্শে নিষ্ঠাহীন আমাদের আহ্বানে জাতি যদি যথেষ্ট সাড়া না দেয়, দোষ কাহার ? কথায় কার্য্যে সঙ্গতিই হইল সত্যনিষ্ঠার গোড়ার কথা। আর সত্যে যদি জাতির নিষ্ঠা আশ্রয় করে, তবে জাতির মানুষ হইতে কতদিন লাগিবে ? জাতি যদি মানুষ হয় তবে চরকা চলুক না চলুক স্বরাজ কেহ আট্‌কাইতে পারিবে না। আমরা আশা করি, পাকে যাঁহারা চরকা কাটিয়া "চরকা-প্রদর্শনীকে" সফল করিয়াছেন, প্রদর্শনীর বাহিরে ঘরেও তাঁহাদের চরকা নিয়ত ঘুরিবে। চরকা কাটা স্বভাবটি আয়ত্ত করিতে হইলে হুজুগে-হুজুকে হইবে না, ঘরের নীরব কর্ম্মনিষ্ঠায়ই তাহা সম্ভব হইবে। জাতিকে যাঁহারা নির্ম্মাণ করিতে চাহেন, সত্যনিষ্ঠাকে তাঁহাদের আশ্রয় করিতেই হইবে।

—স্বরাজ

নূতন দল—

শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দরের নেতৃত্বে বেঙ্গল নন-কো-অপারেশন লীগ নামে একটি দল সম্প্রতি গঠিত হইয়াছে। ইহারা গভর্ণমেণ্ট ও স্বরাজ্যদলের সহিত অসহযোগিতা করিবেন, এবং কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট না থাকিয়া দেশের কাজ করিবেন। পরে দেশের শ্রদ্ধাকর্ষণ করিতে পারিলে অনায়াসেই কংগ্রেস দখল করিয়া লইবেন। ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, বরিশালের শ্রীযুত শরৎকুমার ঘোষ, শ্রীযুত হরদয়াল নাগ প্রমুখ ৮০ জন ব্যক্তি এই দলে ভর্ত্তি হইয়াছেন।

—খুলনাবাসী

ছাত্রদের উপর নোটিস্—

বিগত ১২ই জুলাই তারিখে আসামের শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টার মিঃ জে. আর, কানিংহাম সি, আই, ই এই মর্ম্মে বিভিন্ন সরকারী বিদ্যালয়ে নোটিস জারি করিয়াছেন যে, ছাত্রগণ কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিতে পারিবে না এবং রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে যাইতে পারিবে না।

—জনশক্তি

ঢাকুরিয়া কৃষি-ক্ষেত্র—

২৪ পরগণা ঢাকুরিয়া কৃষিক্ষেত্রে শ্রীযুত অধরচন্দ্র লস্কর মহাশয়ের প্রস্তুত নূতনপ্রকৃতির লাঙ্গলের সাহায্যে চাষ-আবাদ

কাবেরী নদীতে বন্যাপ্লাবনে দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও দীর্ঘ পুলের চিহ্ন লোপ
শ্রীরঙ্গমবাসী শ্রীযুক্ত র বেঙ্কোবরাও কর্ত্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে মুদ্রিত

হইতেছে। যে কেহ তথায় যাইলে নূতন লাঙ্গলের চাষের সহিত পুরাতন লাঙ্গলের চাষের তুলনা করিয়া দেখিয়া আসিতে পারিবেন।

—স্বরাজ

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নাম এ-দেশের কাহারও অপরিজ্ঞাত নহে। ইনি আদি ব্রাহ্মসমাজের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, বয়সে প্রবীণ। ইহাঁর বয়স এক্ষণে ৮৬ বৎসর। এই বৃদ্ধ বয়সে ইনি বুঝিয়াছেন, চরকাই মুক্তিলাভের উপায়। তাই নিজে চরকায় সূতা কাটা আরম্ভ করিয়াছেন।

—কাশীপুর-নিবাসী

ন্যাশনাল ফণ্ডের হিসাব—

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে যে ন্যাশনাল ফাণ্ড হইয়াছিল, তাহার সম্পাদক শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীযুত সত্যানন্দ বসু মহাশয় ফণ্ডের ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন। গত বৎসরের শেষে ফণ্ডে ৭৭০৮৯।/৫ পাই ছিল, আলোচ্যবর্ষে ১০৯৫৯৶৫ পাই খরচ হইয়াছে ও হাতে মজুদ ৬৬১৩০৶০ ছিল। হিসাবপরীক্ষক মিঃ জে সি দাস হিসাব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তাহা ঠিক আছে। ফণ্ড হইতে নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে আলোচ্যবর্ষে ২৪৮০ টাকা প্রদান করা হইয়াছে। ক্যালকাটা পোর্টট্রাষ্ট ডিবেঞ্চারের দর কমিয়া যাওয়ায় ফণ্ডের ১১৪৩০।১৫ ক্ষতি হইয়াছিল ও ওয়ার-ফণ্ডের দর বাড়ায় ১২০৬৪ পাই লাভ হইয়াছে।

—স্বরাজ

চাকরী ও মেম্বরী—

কলিকাতা কর্পোরেশনের নূতন কর্ম্মকর্ত্তৃগণ সম্প্রতি ৩৫ খানি চাকরীর ২৫ খানি মুসলমানদিগকে এবং ১০ খানি হিন্দুদিগকে দিয়াছেন। ইহা লইয়া কলিকাতার কোন কোন সংবাদপত্র হিন্দুদের প্রতি অবিচার হইল বলিয়া সমালোচনা করিতেছেন। এদিকে চট্টগ্রাম ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডে ২০ জন মেম্বরের মধ্যে ১৮ জন মুসলমান এবং ২ জন হিন্দু বা হিন্দু বৌদ্ধ প্রভৃতি অমুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে মেম্বর নিযুক্ত হইয়াছেন দেখিয়াও স্থানীয় অমুসলমানেরা যেন মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। কেহ কেহ যখন বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতেছেন তখন অন্যেরা নীরব থাকিলে মুসলমান-সম্প্রদায় মনে করিতে পারেন যে হিন্দু-মাত্রেই এজন্য মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিতেছেন। আমরা বলিব, জনকতক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট লোক ছাড়া মুসলমান-সমাজের প্রতি হিন্দুসমাজের বিদ্বেষভাব কেন, বিরক্তির ভাবও নাই। কোথায় সমাজ,

আর কোথায় চাকরী আর মেম্বরী। এই দুইটা পদার্থ ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে পর্য্যন্ত এদেশের জনসাধারণের অজ্ঞাত ছিল। ইংরেজ গবর্ণমেন্ট্ ইহাদের সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং হিন্দুরা তাহার পসার বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন—বাবুগিরি ও বাহাদুরীর দ্বারা তাহাকে জনসাধারণের লোভনীয় করিয়াছেন। হিন্দুসমাজের আভ্যন্তরীণ শোচনীয় অবস্থা যাঁহারা চিন্তা করেন উাঁহারা মুক্তকণ্ঠে বলেন এই মোহাবর্ত্তে পড়িয়াই হিন্দুরা মনুষ্যত্ব হারাইতে বসিয়াছে, জাতিকে ধ্বংস এবং পূর্ব্বপুরুষের পুণ্য ও ঐশ্বর্য্য-পূর্ণ বসতিস্থানকে শ্মশানে পরিণত করিয়াছে। সুতরাং যাহারা চাকরীর মজা বুঝে নাই তাহারা কিছুদিন বুঝুক, হিন্দুসমাজের তাহাতে ক্ষুব্ধ হইবার কোন কারণ নাই। যে-সমাজের দুইসহস্রাধিক গ্রাজুয়েট প্রতি-বৎসর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া অন্নসংস্থানের পথ খুঁজিয়া পায় না, সেই সমাজ ২৫।৩০টি চাকরীর জন্য কেন ব্যাকুল হইবে? মুসলমান-সমাজকে বলিব,—বাপু হে, তোমরাও সাবধান থাক, চাকরীর মোহে দিশাহারা হইও না।

—জ্যোতি

সহবাস-সম্মতি আইন—

গত মঙ্গলবার কলেজ স্কোয়ারস্থ বৌদ্ধবিহারে ডাঃ গৌড়ের প্রস্তাবিত সহবাস-সম্মতি বিলের প্রতিবাদ করার জন্য একটি সভা হইয়া গিয়াছে। সভায় অনেকেই এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, প্রস্তাবিত বিল হিন্দুধর্ম্মের পরিপন্থী। বিলটির তীব্র প্রতিবাদ করিয়া সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

—আনন্দবাজার-পত্রিকা

উদ্ধারাশ্রম—

কলিকাতার পতিতা রমণী ও বালিকাদের জন্য "উদ্ধারাশ্রমের" যে কত গুরুতর প্রয়োজন, সে-কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। রাঁচি হইতে শ্রীমতী সুপ্রভা সরকার ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার এ-সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে, প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ বিদ্যাসাগরের বসতবাটী এখনও ঋণমুক্ত হয় নাই; হিন্দুস্থান ইনশিওরেন্স কোম্পানী ৭০ হাজার টাকায় উহা কিনিয়া রাখিয়াছেন। যদি বাঙ্গালী জাতির পক্ষ হইতে অবিলম্বে ৭০ হাজার টাকা তুলিয়া আমরা ঐ বাড়ী ঋণমুক্ত করিতে পারি এবং সেখানে বিধবা-ভবন ও ও উদ্ধারাশ্রম স্থাপন করি, তবেই বিদ্যাসাগরের উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষা করা হইবে। বাঙ্গালী জাতি কি এই প্রস্তাবে কর্ণপাত করিবে না? আমরা কেবলই কথা বলি ও বক্তৃতা করি, কিন্তু কোন একটি ভাল কাজই আমাদের দ্বারা হয় না। শুনিতে পাই, বাঙ্গলা দেশে বহু বিদ্যাসাগর-ভক্ত আছেন, কিন্তু কার্য্যে তাহার ত কোন লক্ষণ দেখিতেছি না।

—আনন্দবাজার-পত্রিকা

নারী-নির্য্যাতনের বিরুদ্ধে নমঃশূদ্র—

সহযোগী স্বরাজ জানাইতেছেন, কিছুদিন পূর্ব্বে বিক্রমপুরের মধু-মণ্ডলের কন্যাকে কতগুলি দুর্ব্বৃত্ত মুসলমান জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া যায়। ইহার কিছুদিন পরে গ্রামের লোকসমূহ অনেক খোঁজের পর মেয়েটিকে উদ্ধার করে। মুন্সীগঞ্জ আদালতে ইহা লইয়া মোকদ্দমা চলিতেছে। কিন্তু ইতিমধ্যে গত ৩রা আষাঢ় রাত্রি প্রায় সাড়ে বারোটার সময় ৪০।৫০ জন মুসলমান জোট করিয়া মধু মণ্ডলের কন্যাকে জোর করিয়া লইতে আসে। কিন্তু মাত্র সাত জন নমঃশূদ্র সেই ৪০।৫০ জন মুসলমানকে হটাইয়া দেয়। এবং এতগুলি দুর্ব্বৃত্তের সঙ্গে লড়াই করিয়া একজন মুসলমানকে বাঁধিয়া রাখে। এই ব্যাপারটি লইয়াও মামলা চলিতেছে। পশুবলের বিরুদ্ধে নমঃশূদ্রগণের এই সৎসাহস বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। এই নমঃশূদ্র-সমাজই এখনও হিন্দু-সমাজের প্রকৃত বাহুবল। তাহাদের শৌর্য্য বীর্য্য এখনও বিলাস-ব্যসনে জরাগ্রস্ত হয় নাই। অথচ আত্মাভিমানী অকর্ম্মণ্য হিন্দু-সমাজের নিকট এখনও ইহারা পতিত। সমাজে ইহাদের ন্যায্য প্রাপ্য স্থান দিবার মতো উদারতা সঞ্চয় করিতে আমাদের সমাজপতিরা এখনো কুণ্ঠা বোধ করেন। এই ব্যাপারেও কি তাঁহাদের চক্ষু খুলিবে না?

—বরিশাল-হিতৈষী

তুলার কলে উৎপন্ন জিনিস—

গত এপ্রিল মাসে ভারতে মোট ৫৫০০০০০০ পাউণ্ড্ সুতা ও ৩৫০০০০০০ পাউণ্ড্ ওজনের কাপড় তৈয়ার হইয়াছে। গত বৎসর এই মাসে যথাক্রমে ৬১০০০০০০ পাউণ্ড্ ও ৩৯০০০০০০ পাউণ্ড্ হইয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান বৎসর সুতার কমতি শতকরা ১০০৬ ও কাপড়ের কমতি শতকরা ১১ হইয়াছে।

গত ১৯২৩ সনের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯২৪ সনের জানুয়ারী পর্য্যন্ত ৫ মাসে ২৮৫০০০০০০ পাউণ্ড্ সুতা ও ১৯৮০০০০০০ পাউণ্ড্ কাপড় তৈয়ার হইয়াছে। এবং তাহার পূর্ব্ব মরসুমের ঐ ৫ মাসে ৩০০০০০০০০ পাউণ্ড্ সুতা ও ১৭২০০০০০০ পাউণ্ড্ ওজনের কাপড় হইয়াছে। ১৯২৩ সনের এপ্রিল হইতে ১৯২৪ সনের জানুয়ারি পর্য্যন্ত ১০ মাসে ৫৭৪০০০০০০ পাউণ্ড্ সুতা ও ৩৫১০০০০০০ পাউণ্ড্ ওজনের কাপড় উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ ১০ মাসে ভারত হইতে সমুদ্র-পথে বিদেশে প্রায় ৩৫০০০০০০ পাউণ্ড্ এবং তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী দুই মরসুমে যথাক্রমে ৫০০০০০০০ ও ৭১০০০০০০ পাউণ্ড্ ওজনের সুতা বিদেশে গিয়াছে।

বিধবা-বিবাহ—

ত্রিপুরা জিলার কুমিল্লা অঞ্চলে পোঃ জফরগঞ্জ, ফুলতলী বিধবা-বিবাহ-সমিতির উদ্যোগে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিধবা-বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যেক বিবাহেই ব্রাহ্মণ ও ভদ্রমণ্ডলী উপস্থিত থাকিয়া যোগদান ও আশাতীত উৎসাহিত করিয়াছিলেন। সকল বিবাহেই বিধিমত ক্রিয়া-কলাপ সম্পন্ন হইয়াছে। বিধবা-বিবাহের জোর প্রচলন-হেতু আমরা সমিতির পক্ষ হইতে সুরমা-উপত্যকাবাসী প্রত্যেক হিন্দু নরনারীর সাহায্য ও যাহাতে শ্রীহট্টেও একটি সমিতি স্থাপিত হইতে পারে, তজ্জন্য বিখ্যাত 'জনশক্তি-পত্রিকার সাহায্যে উৎসাহ আকর্ষণ করিতেছি।

গত ১৪ই ফাল্গুন তারিখে কায়স্থ মধ্যে তিনটি; ২৯শে ফাল্গুন একটি ও ৮ই জ্যৈষ্ঠ একটি। ২৯শে ফাল্গুন তারিখে শীল মধ্যে একটি; ২৩শে জ্যৈষ্ঠ একটি, ও ১৫ই আষাঢ় একটি, ২৩শে জ্যৈষ্ঠ নাথের মধ্যে তিনটি। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের মধ্যে একটি। মোট ১২টি বিধবা-বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

শ্রীকামিনীমোহন চক্রবর্ত্তী
ফুলতলী বিধবা-বিবাহ-সমিতি, ত্রিপুরা।

—জনশক্তি

সুতার কলে উৎপন্ন জিনিস—

গত ফেব্রুয়ারীমাসে ভারতের কলগুলিতে মোট ২৯০০০০০০ পাউণ্ড্ ওজনের সুতা ও ২৪০০০০০০ পাউণ্ড্ ওজনের কাপড় তৈয়ার হইয়াছে। তৎপূর্ব্ব বৎসরের ঐসময়ে যথাক্রমে ৫৪০০০০০০ ও ৩২০০০০০০ পাউণ্ড্ হইয়াছে। অর্থাৎ উৎপন্ন সুতা শতকরা ৪৬ ও কাপড় শতকরা ২৪ কম হইয়াছে। ১৯২৩ সনের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯২৪ সনের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ৬ মাসে মোট ৩১৪০০০০০০ পাউণ্ড্ সুতা ও ২২২০০০০০০ পাউণ্ড্ কাপড় প্রস্তুত হইয়াছে। তৎপূর্ব্ব বৎসরে ঐসময়ে যথাক্রমে ৩৫৪০০০০০০
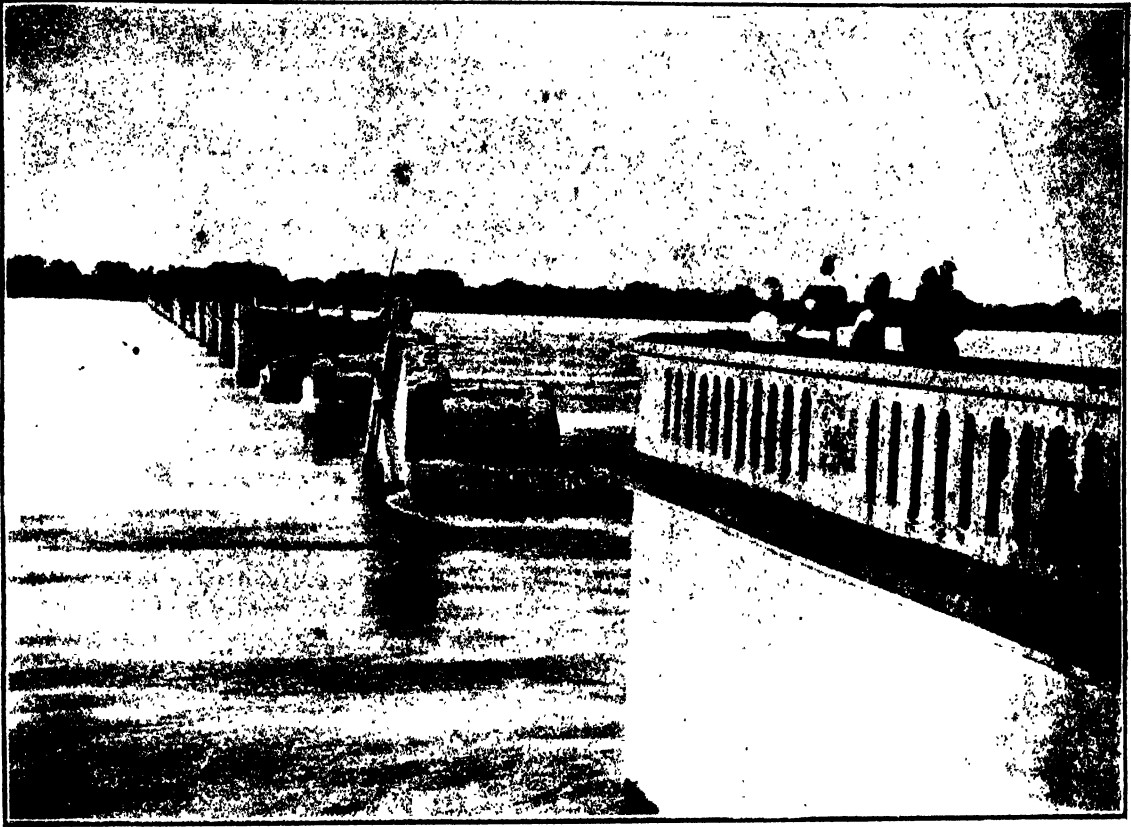
লোকমান্য টিলক মহোদয়ের মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠার উৎসব (পুনা)
শ্রীযুক্ত ন র বীরকর কর্ত্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ্ হইতে মুদ্রিত

পাউণ্ড্ ও ২০৪ পাউণ্ড্ হইয়াছে। ১৯২৩ সনের এপ্রিল হইতে ১৯২৪ সনের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ১১ মাসে ৫৭৭০০০০০০ পাউণ্ড সূতা ও ৩৭৫০০০০০০ পাউণ্ড কাপড় তৈয়ারী হইয়াছে।

—বাণিজ্যবার্ত্তা

নবদ্বীপে একাদশীর উপবাস বন্ধ—

নবদ্বীপ হইতে কোন সংবাদ-দাতা লিখিয়াছেন "নবদ্বীপের বিধবাগণ কমিটি করিয়া একাদশীতে উপবাস করিবেন না স্থির করিয়াছেন। গত একাদশীতে কমিটির সিদ্ধান্ত-অনুসারে কার্য্যও হইয়া গিয়াছে।

—বরিশাল-হিতৈষী

পতিতার সংখ্যা—

১৯২১ সালের আদম-সুমারীতে খাস কলিকাতায় পতিতা নারীর সংখ্যা ৮৮৭৭ জন লিখিত হইয়াছে। এছাড়া হাওড়াতে ১২৯৬ জন এবং সহরতলীতে কয়েক শত পতিতা নারী গণনা করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, যাহারা বারাঙ্গনা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাদের প্রকৃত সংখ্যা এর চেয়ে অনেক বেশী, বোধ হয় বিশ হাজারের কম হইবে না। বৈষ্ণবী, আধা-গেরস্ত, পানওয়ালী, ঝি, অভিনেত্রী, যাত্রী প্রভৃতি নামের অন্তরালেও বহু বারাঙ্গনা আত্মগোপন করিয়া থাকে। এইসমস্ত হিসাব ধরিলে অনুমান হয়, কলিকাতা সহরে ১৫ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্কা স্ত্রীলোকদের মধ্যে প্রতি ১৮ জনের মধ্যে একজন বারাঙ্গনা-বৃত্তি করে। এই সহরের বেশ্যার সংখ্যা দেখিয়াও মহাত্মা শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন—আমাদের সমাজ-সেবক-সঙ্ঘ একবার শিশুমঙ্গল করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিলেন—ইহাদিগকে সহরের বাহিরে কোথাও স্থান করিয়া দিয়া এবং ইহাদের মধ্যেও যাহারা ভাল আছে, তাহাদিগকে সুপথে আনিবার একটা চেষ্টা করিলে হয় না ?

—বরিশালহিতৈষী

নিখিল-ভারত অনাথ-আশ্রম—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

—বিবেকানন্দ

পিতৃমাতৃহীন, পরিত্যক্ত ও নিরাশ্রয় অনাথ শিশুদের আশ্রয়-প্রদান ও লালন-পালন সমাজের অন্যতম কর্ত্তব্য। প্রতিদিন নর-নারায়ণ-রূপী কত অনাথ শিশু অন্নবস্ত্র ও আশ্রয়ের অভাবে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভবানীপুরে "নিখিল ভারত অনাথাশ্রম" নামে এক অনাথ-নিকেতন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত আশ্রমের

অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে নানা কুৎসিত অত্যাচারের অভিযোগ বিচারালয়ে উপস্থিত হওয়ায় সম্প্রতি উহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। উক্ত আশ্রমের নির্য্যাতিত কতিপয় অনাথশিশু আমাদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করায় আমরা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের নিমিত্ত বিগত ১১ই মার্চ্চ তারিখে মিত্র ইনষ্টিটিউশন-গৃহে এক জনসভার আহ্বান করি। উক্ত সভার নির্দ্দেশ-অনুসারে উক্ত শিশুগণকে লইয়া "দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রম" নামে এই নূতন অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠা করি। উক্ত আশ্রমকে সুগঠিত ও সুপরিচালিত করিতে হইলে যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন।

সহৃদয় জনসাধারণের নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁহারা যথাসাধ্য অর্থানুকুল্যে এই মহৎ অনুষ্ঠানটিকে সফল করিয়া তুলিতে অগ্রসর হউন। যথোচিত আর্থিক সাহায্য পাইলে এই আশ্রমেই বালকগণ প্রতিপালিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া কালে সমাজ-সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিতে পারিবে। তাহাদের মধ্যে হয়ত এমন প্রতিভাশালী ও মহাপ্রাণ কর্ম্মীর সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে, যাহারা ভবিষ্যতে স্বীয় কর্ম্ম ও চরিত্রগুণে দেশের ও সমাজের মুখোজ্জ্বল করিতে সক্ষম হইবে।

এস্থলে আমরা জনসাধারণকে নিঃসন্দেহে জানাইতে পারি যে, বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠানটি যে ত্যাগ ও সেবাপ্রবণ চিত্তের ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছে এবং সাধারণের বিশ্বাসভাজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ-কর্ত্তৃক গঠিত কার্য্যনির্ব্বাহ-সমিতি দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, তাহাতে অর্থ বা অন্য কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে ত্রুটি-বিচ্যুতির কোন সম্ভাবনা নাই।

আশ্রমকে জনসাধারণ কি কি উপায়ে সাহায্য করিতে পারেন:—

(১) মাসিক, বার্ষিক বা এককালীন অর্থ-সাহায্য দ্বারা;
(২) চাউল, ডাউল, লবণ, তেল প্রভৃতি আহার্য্য-বস্তু দ্বারা;
(৩) কাপড়, জামা, বিছানা প্রভৃতি সাহায্য দ্বারা;
(৪) থালা, ঘটী, বাটী প্রভৃতি ধাতুময় দ্রব্যাদি দ্বারা;
(৫) পুস্তক, পত্রিকা, কাগজ, কালি, প্রভৃতি শিক্ষার সরঞ্জাম দ্বারা;
(৬) দৈনিক মুষ্টিভিক্ষা প্রদান ও সংগ্রহের দ্বারা;
(৭) ক্রীড়া ও ব্যায়ামের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ইত্যাদি দ্বারা।

যিনি যাহাই দান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা আশ্রমের কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র, সভাপতি, সম্পাদক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মীর হস্তে প্রদান করিতে পারেন।

আশা করি শ্রীঅনাথ-নারায়ণ পূজার এই মহা আয়োজন সকলের সাহায্য ও সহানুভূতি-লাভে বঞ্চিত হইবে না। বিনীত—

সভাপতি—শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ।
সম্পাদক—শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু।

ভারতের রেশম-শিল্প—

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে রেশম ভারতের উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে একটি প্রধান পণ্য ছিল, এখন উহা অপেক্ষাকৃত হীন দশায় নীত হইয়াছে। এখন দক্ষিণ মহীশূরে, উত্তর-পশ্চিম বঙ্গে, কাশ্মীর ও জম্মুতে এবং উত্তর পশ্চিম পঞ্জাবে ইহা উৎপন্ন হইয়া থাকে। অধিকাংশ রেশমই কুটীর-শিল্পে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ১৯২২।২৩ খৃষ্টাব্দে ভারত হইতে বিদেশে ১২ লক্ষ পাউণ্ড ওজনের কাঁচা রেশমের সুতা বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী তিন বৎসরের হিসাব করিয়া গড়ে প্রতি বৎসর যত রেশমী সুতা বিদেশে নীত হইয়াছিল, আলোচ্য বর্ষে তাহা অপেক্ষা উহার রপ্তানি কিছু বাড়িয়াছিল। ইহার মূল্য হয় ৩৮ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা। আর রেশমের বস্ত্রাদি রপ্তানি হয় ২ লক্ষ ৪২ হাজার টাকার। পক্ষান্তরে বিদেশ হইতে ভারতে ৩ কোটি ১৫ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকার রেশমী কাপড় আমদানি হইয়াছে—ইহার প্রায় অর্দ্ধেক আসিয়াছে জাপান হইতে। ভারত এখন বিদেশ হইতে রেশম গ্রহণ করিতেছে,—কিন্তু উহা বিশেষভাবে উৎপন্ন করিতেছে না।

—২৪-পরগণা-বার্ত্তাবহ।

স্বেচ্ছায় গদী-ত্যাগ—

শ্রীযুক্ত পাঠিকের মামলা যদি না উঠ্‌ত, তা হ'লে দেশের লোক এক শুভ প্রভাতে খবর পেত যে, মেবারের রাণা সন্ন্যাস-গ্রহণ-মানসে পুত্রের হাতে রাজ্যশাসন-ভার অর্পণ করেছেন। এই ত্যাগীর দেশে সবাই সে কথা বিশ্বাস করত, অনিত্য বিষয়-ভোগ-স্পৃহা ত্যাগ করেছেন বলে' আধ্যাত্মিক এই জাতি মেবারের রাণার জয়-গান করত। দেশের কেউ জান্‌ত না স্বেচ্ছায় এই গদী-ত্যাগ করবার সত্যিকার কারণ কি!

পাঠিকের মামলায় আসল ব্যাপারটি বেরিয়ে পড়েছে। মেবারের রাণা গদী-ত্যাগ করতে অসম্মত, কিন্তু তাঁকে তা করতেই হবে, কেননা ভারতবাসীর দেশীয় রাজাদের ভাগ্য-বিধাতার তাই ইচ্ছা।

অবশ্য জিজ্ঞাসা করতে পারেন, মেবারের এই রাণা কি অপরাধ করেছেন? তাঁর প্রথম অপরাধ এই যে, তিনি রাজ্য-শাসনের সকল বিভাগগুলিই নিজের আয়ত্তে নেবার চেষ্টা করেছেন। মনে রাখ্‌বেন, দেশীয় রাজাদের পক্ষে এ একটা গুরুতর অপরাধ। সব কাজ যদি তাঁরাই করবেন, তা হ'লে পলিটিক্যাল এজেন্ট্‌রা আছেন কেন? মেবারের রাণা এজেন্টের হাতে রাজ্য-শাসনের সকল ভার ন্যস্ত করে' বসে' থাকেন নি, এ কি অপরাধ নয়?

মেবারের রাণার দ্বিতীয় অপরাধ এই যে, তিনি রাজ্যশাসন-পদ্ধতির সংস্কার করেননি যদিও বার বার সে সংস্কারের দাবী উপস্থিত করা হয়েছিল। কিন্তু সে দাবী কে করেছিল। ব্রিটিশ ব্যুরোক্রেশী, না প্রজার দল? ব্রিটিশ ব্যুরোক্রেশী যদি সে দাবী উপস্থিত করে' থাকেন, তা হ'লে তা অগ্রাহ্য করে' মেবারের রাণা নিশ্চিতই কোন অপরাধ করেন-নি, আর প্রজার দাবি যদি তিনি অগ্রাহ্য করে' থাকেন, তা হ'লে অবশ্য তিনি অপরাধী। কিন্তু সে অপরাধের জন্য ব্রিটিশ ব্যুরোক্রেশীর আদেশে তাঁকে গদী ত্যাগ করতে হবে কেন? তা যদি করতে হয়, তা হ'লে সে আদেশ দেবার আগে ব্যুরোক্রেশীর নিজেরই ত বহুদিন আগে শাসন-ভার ত্যাগ করা উচিত ছিল। ব্যুরোক্রেশীর প্রজাও ত বহুদিন থেকেই সংস্কারের দাবী করেছে। সে দাবীও ত ব্যুরোক্রেশী কখনও পূর্ণ করেননি। তাঁদের নিজেরই রায় অনুসারে তাঁদের ত রাজ্যশাসন-ভার ছেড়ে দিতে হয়।

আর মেবারের রাণাকে যদি গদীচ্যুত করতেই হবে, তা দেশের লোকের কাছে প্রকাশ করাই কি ভালো না?

মেবারের রাণাকে বলা হয়েছে যে, তিনি যদি কোনরূপ গোল না করে' রাজ্যশাসন-ভার পুত্রের উপর অর্পণ করে' আজ সরে' দাঁড়ান, তা হ'লে লোকের মনে কোনরূপ সন্দেহ জাগবে না; সবাই মনে করবে বার্দ্ধক্য-বশতঃ তিনি স্বেচ্ছায় পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে' বানপ্রস্থ অবলম্বন করছেন। এ ছলনার প্রয়োজন কি ছিল? যদি সঙ্গত কারণেই তোমরা তাঁকে গদী-চ্যুত কর, তা হ'লে জান্‌বার ভয় কর কেন? ভিতরে যে গলদ আছে, তা ত এমন করে' ব্যাপারটাকে চাপা দেবার প্রয়াসেই প্রকাশিত হয়।

—বৈকালী

[এই বিভাগে চিকিৎসা ও আইন-সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে যাঁহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্কোত্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। যাঁহাদের নামপ্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাঁহারা লিখিয়া জানাইবেন। অনামা প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না। একটি প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের এক-পিঠে কালিতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিয়া পাঠাইলে তাহা প্রকাশ করা হইবে না। জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ করা সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত। যাহাতে সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্‌দর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত, যাহার মীমাংসায় বহু লোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতূহল বা সুবিধার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংসা পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দাজী না হইয়া যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রশ্ন এবং মীমাংসা দুয়েরই যাথার্থ্য সম্বন্ধে আমরা কোনরূপ অঙ্গীকার করিতে পারি না। কোন বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোন জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছাধীন—তাহার সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনরূপ কৈফিয়ৎ আমরা দিতে পারিব না। নূতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন করিয়া সংখ্যাগণনা আরম্ভ হয়। সুতরাং যাঁহারা মীমাংসা পাঠাইবেন, তাঁহারা কোন্ বৎসরের কত-সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন।]

জিজ্ঞাসা

(১৫)

মুঘল পাঠান

হিন্দুস্থানের মুস্‌লিম্ বাদশাহগণ পাঠান ও মুঘল নামে পরিচিত। আসলে ইহারা পাঠানও নয়—মুঘলও নয়। এই শব্দ দুটি কোথা হ'তে কিভাবে ইতিহাসে স্থান পেলে? হিন্দুস্থানের ইতিহাসের মুঘল-পাঠান বংশ-সম্পর্কে এই শব্দ দুটির ঐতিহাসিক ভিত্তি কতটুকু?

নার্গিস্ আসার খানম

(১৬)

ভরতের সিংহাসনারোহণ

বাল্মীকি-রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টম সর্গে মন্থরা-কেকেয়ী-সংবাদের মধ্যে লিখিত আছে :—

'ভরতশ্চাপি রামস্য ধ্রুবং বর্ষশতাৎ পরম্
পিতৃপৈতামহং রাজ্যমবাপ্স্যতি নরর্ষভঃ।'

পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত রামায়ণ ১৫৪ পৃঃ

তখনকার দিনে এমন কি প্রথা থাকিতে পারে যদ্দ্বারা ভরত অগ্রজ বর্ত্তমানে পিতৃপিতামহের রাজ্য একশত বৎসর পরে নির্ব্বিবাদে পাইতে পারেন? এরূপ কোনও নিয়ম প্রচলিত না থাকিলে উক্ত শ্লোকের সার্থকতা কি থাকিতে পারে?

শ্রী ফণীন্দ্র মুখোপাধ্যায়

(১৭)

দেশলাইয়ের কারখানা

বাঙ্গলাদেশে ছোট ছোট অনেক দেশলাইয়ের কারখানা আছে। তাদের সকলের নাম ও ঠিকানা কিরূপে এবং কোথায় পাওয়া যায়? কলিকাতায় কমার্শিয়াল মিউজিয়মে খোঁজ করিয়াও কোন খবর পাই নাই।

শ্রী প্রশান্তকুমার ঘোষ

(১৮)

শিলং এর জলপ্রপাত

আমাদের রাজধানী শিলংএ বিডন্ ফল্‌স্, বিশপ্ ফল্‌স্ এবং এলিফ্যান্ট ফল্‌স্ নামে তিনটি বিখ্যাত জল-প্রপাত আছে। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা—সকল ঋতুতেই এইসকল প্রপাতের যোগে প্রভূতপরিমাণে জল নির্গমন হইতেছে। কোন তুষারক্ষেত্র বা হিমধারার (Glacier) সহিত এই-সকল প্রপাতের কোন সংস্পর্শ আছে বলিয়া মনে হয় না; এত জল কোথা হইতে আসে এবং প্রতি সেকেণ্ডে কত জলই বা এইরূপে নির্গমন হইতেছে কেহ বলিতে পারেন কি?

শ্রী সত্যভূষণ সেন

(১৯)

সুমেরু পর্ব্বত

পুরাতন কাব্য সাহিত্যে প্রচুরপরিমাণে "সুমেরু" পর্ব্বতের উল্লেখ দেখা যায়। এই পর্ব্বতের কোন নৈসর্গিক অস্তিত্ব ছিল কি? বর্ত্তমানে ইহার ভৌগোলিক অবস্থান-সম্বন্ধে তথ্য কোথায় পাওয়া যায়?

শ্রীমতী পঙ্কজবাসিনী সেন

—

মীমাংসা

(২)

আনারকলি

আষাঢ় সংখ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু 'আনারকলি' সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করেন, শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত 'মীমাংসায়' তাহার সদুত্তর পাওয়া যায় নাই। সমসাময়িক ফার্সী ইতিহাসে আনারকলির কথা না থাকিলেও, ইউরোপের যাঁহারা সে সময় ভারতে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কাহারও কাহারও গ্রন্থে আছে।

উইলিয়াম্ ফিন্‌চ্ (Wm. Finch) জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের

প্রারম্ভেই এদেশে আসেন। ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে লাহোর দেখিয়া তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহার একস্থলে আছে :—

"Passing the Sugar Gonge is a faire Meskite (masjid) built by Sheeke Fereed; beyond it (without the Towne, in the way to the Gardens) is a faire monument for Don Sha his mother, one of the Acabar his wives, with whom it is said Sha Selim (afterwards Jahangir) had to do [her name was Immacque Kelle (Anarkali), or Pomgranate kernell] upon notice of which the King caused her to be inclosed quicke within a wall in his Moholl where shee dyed; and the King in token of his love commands a sumptuous Tombe to be built of stone in the midst of a foure-square Garden richly walled with a gate, and divers roomes over it: the convexity of the Tombe he hath willed to be wrought in workes of gold, with a large faire Jounter with roomes over-head."---Wm. Finch in *Purchas His Pilgrimes*, iv. 57. Mac Lehose.

ইংলণ্ডের রাজদূত স্যার টমাস্ রো-র পুরোহিত রেঃ টেরী এদেশে দুইবছরেরও বেশী (১৬১৫-১৮) অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থেও সংক্ষেপে লেখা আছে—

"Achabar ...... upon high and just displeasure taken against his son for climbing up unto the bed of Anarkelee, his father's most beloved wife . . ." *A Voyage to East-India*, Edward Terry, p.408 (1777).

ফিন্‌চ্ বা টেরীর লেখা পড়িয়া মনে হয়, তাঁহারা যখন এদেশে গেলেন, তখনও আনারকলির স্মৃতি লোকের মন হইতে মুছিয়া যায় নাই।

আনারকলি সম্বন্ধে আলোচনা এই বইগুলিতে আছে :—

1. Notes and Queries—R. C. Temple, *Indian Antiquary*, 1915, pp. 111-12,
2. Beale-Keene's *Oriental Biographical Dictionary*, p. 74,
3. *Gazetteer of the Lahore District*, 1883-84, p. 187,

শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১১)

ধানের পোকা

একবার আমাদের গ্রামে পোকা উঠিয়া ধানগাছের ছড়া কাটিয়া সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিল। সে-বার আমরা নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া (আমার পরামর্শ-মত) আশাতীত ফল পাইয়াছিলাম। সেই পরীক্ষিত উপায়টি প্রশ্নকর্ত্তার গোচরার্থে নিম্নে প্রদত্ত হইল। যথা :—

তামাকের গুল (তামাক খাওয়ার পর কল্কিতে যে পোড়া জিনিষ পড়িয়া থাকে) জলে ভিজাইয়া সেই জলের সহিত সামান্য কর্পূর ও সাবানের জল মিশ্রিত করিয়া লউন। এক্ষণে এই মিশ্রিত পদার্থটি পিচ্‌কারীর সাহায্যে ধান-গাছে ছিটাইয়া দিলে, নিশ্চিতই পোকার উৎপাত কমিয়া ধানের আর কোনরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

(১৩)

মহাব্বত খাঁ

শব্দটি মহাবত্ খাঁ। টড তাঁহার রাজস্থানে লিখিয়াছেন :—The great Mohabet Khan, the most intrepid of Jehangir's generals was an apostate Sagarawat (Vol. i, Ch. xi, note 2. p. 264-265)—রাণা প্রতাপের এক ভ্রাতা সগরজী ভাইকে ছাড়িয়া অক্‌বরের চাকরী স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু টড এখানে ভুল করিয়াছেন। মাআসর-উল-উম্রা ও জহাঙ্গীর লিখিত তুজকে মহাবতকে খাঁটি অফ্‌গান বলা হইয়াছে। এই সামন্তদের কতকগুলি নিজের সৈনিক থাকিত, মহাবতের নিজের ছয় সহস্র (৬০০০) সৈনিক ছিল, এগুলি সব রাজপুত, সেইজন্য বোধ হয় ভুল হইয়া থাকিবে। মহাবৎ চিরকাল রাজপুত-পক্ষপাতী ছিল, অতএব তাহাকে রাজপুত সন্দেহ করা হইয়াছিল। মহাবতের আত্মীয়-কুটুম্বরাও অধিকাংশ অফ্‌গান ছিল।

শ্রী অমৃতলাল শীল

কর্ণেল টড (Tod) তাঁহার *Rajasthan* গ্রন্থে লিখিয়াছেন উদয়-সিংহের পুত্র সাগরসিংহের (সাগরজী) ছেলেই মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মহাবৎ খাঁ নাম গ্রহণ করেন। টডের এই উক্তি অবলম্বন করিয়া অনেক ঐতিহাসিক ও নাট্যকার তাঁহাদের গ্রন্থে মহাবৎকে 'রাজপুত' চরিত্ররূপেই খাড়া করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মহাবৎ জাতিতে রাজপুত ছিলেন না। তাহার প্রমাণ বাদশাহ জহাঙ্গীরের আত্মকথা—'তুজুক্-ই-জহাঙ্গীরী'। জহাঙ্গীর লিখিতেছেন :—

"I raised Zamana Beg, son of Ghayur Beg of Kabul, who has served me personally from his childhood, and who, when I was prince, rose from the grade of an *ahadi* to that of 500, giving him the title of MAHABAT KHAN and the rank of 1,500. He was confirmed as *bakshi* of my private establishment (*Shagird-pisha*)." -*Tuzuk-i-Jahangiri*, Rogers and Beveridge, i. 24.

মহাবৎ শৈশব হইতেই জহাঙ্গীরের পরিচিত এবং বাদ্‌শাহের শেষ জীবনের ইতিহাসের সহিত তাঁহার নাম বিশেষভাবে বিজড়িত, এ-অবস্থায় মহাবতের বংশ-পরিচয়ে জহাঙ্গীরের ভুল হওয়া সম্ভব নয়।

শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রী বিদ্যাপতি ভট্টাচার্য্য
শ্রী গঙ্গাগোবিন্দ রায়
শ্রীমতী নার্গিস আসার খানম্

(২০০)

খদ্দরের পাড় ও রং

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের "দেশী রঙ" পুস্তকের বাংলা, হিন্দী ও ইংরেজী ত্রিবিধ সংস্করণই আছে। উহাতে কাল এবং অন্যান্য রঙ প্রস্তুতের প্রণালী পাওয়া যায়। হাতে-কলমে শিখিবার জন্য খাদিপ্রতিষ্ঠানে গেলে দেখিতে পারা যায়। বেনারসে "চৌক"এ খোলা ফুটপাথের উপর কাঠের ছাপ কিনিতে পাওয়া যায়। পরিকল্পনা আঁকিয়া দিলে দেশীয় সূতোর মিস্ত্রীরা সব রকমের ছাপ তৈয়ার করিতে পারে। চন্দননগর খদ্দর-প্রচার-সমিতিও কাঠের ছাপ ও কালি প্রস্তুত করেন।

গুহ ঠাকুর ও
শ্রী বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন

বারাণসীর প্রাচীন পরিচয়

শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়

আমাদের জাতীয় জীবনের প্রথম উন্মেষ সপ্তসিন্ধুপ্রদেশে, তৎপরে ব্রহ্মর্ষি দেশে, মধ্যদেশে ও আর্য্যাবর্ত্তে; কিন্তু উহার পূর্ণ প্রকাশ হইল কুরু-পঞ্চাল প্রদেশে, কোশলে, কাশীক্ষেত্রে এবং বিদেহ রাজ্যে।

বারাণসীর আমরা প্রথম পরিচয় পাই অথর্ব্ববেদে (৮-৭-১) সেইখানে বরণাবতী নদীর নাম উল্লেখ আছে। সেই নদী আজও বহতা। তাহার উপকূলে আজও বারাণসী নগরী বিদ্যমান। তৎপরে ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের যুগে, আনুমানিক খৃঃ পূঃ ১০০০ অব্দে, কাশী ভারতের মধ্যে একটি প্রধান সভ্যতার কেন্দ্র হইয়া উঠে। তখন কাশীধামের ক্ষত্রিয় রাজগণ অবধি সর্ব্বোচ্চ পরাবিদ্যার, ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী হইয়াছিলেন।

আমরা শতপথ-ব্রাহ্মণে (৫।৩।৭), বৃহদারণ্যক (২।১।১) ও কৌষীতকি উপনিষদে (৪।১) কাশীরাজ অজাতশত্রুর বিদ্যাবত্তার বিশেষ পরিচয় পাই।

ভারতের ইতিহাসের প্রারম্ভ বৈদিক যুগ হইতেই কাশীক্ষেত্র আর্য্যধর্ম্ম ও বিদ্যার এক প্রধান কেন্দ্রস্থান হইয়াছিল। বেদপ্রসূত বারাণসীর ইতিহাস আবহমানকাল গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় চলিয়া আসিতেছে এবং যুগে যুগে নানা স্তরে এ ইতিহাস গঠিত হইয়া রহিয়াছে। এই ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন স্তরগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাব ও ধর্ম্মের আন্দোলনের পরিচায়ক। বাস্তবিক ভাবরাজ্যে ভারতে যতগুলি প্রধান প্রধান আন্দোলনের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিই এই পুণ্যক্ষেত্রকে স্পর্শ করিয়া তাহার নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে। সেই-সকল নিদর্শন কখনও গ্রন্থে ও সাহিত্যে নিবদ্ধ, কখনও বা প্রাকৃতিক জগতে, প্রস্তরে, মন্দিরগাত্রে, শিলাস্তম্ভে, বিহারের ভগ্নাবশেষে প্রকটিত।

এই বারাণসী অঞ্চলে ভারতের কেন, জগতের সাহিত্য-সম্মিলন প্রথম অধিষ্ঠিত হয়। পর্য্যটক বিদ্যার্থিগণকে শাস্ত্রে চারক নামে অভিহিত করা হইয়াছে। বিদ্যালোচনায় ইঁহারা দেশের নানা জায়গায় পরস্পর মিলিত হইতেন এবং সেই মিলন-স্থানগুলি দেশের উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিয়াছিল।

দেশের নানা স্থানে এবং বিশেষতঃ রাজসভায় দার্শনিক ও ধর্ম্ম-তত্ত্বের আলোচনার জন্য তখনকার বিদ্বন্মণ্ডলী প্রায়ই এইরূপ সাহিত্য-সম্মিলনে সমবেত হইতেন। বাস্তবিক আমাদের জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পৎ ও গৌরবের বস্তু যে উপনিষদ্ ইহা একপ্রকার এই প্রাচীন সাহিত্য-সম্মিলনের আলোচনা অবলম্বন করিয়াই গঠিত হইয়াছে।

বিদেহরাজ জনক অশ্বমেধযজ্ঞের আয়োজন করিয়া সমগ্র কুরু-পঞ্চালদেশের বিদ্বৎসমাজকে নিমন্ত্রণের দ্বারা এক মহাসম্মিলনের আহ্বান করেন। তথায় জটিল দার্শনিক তত্ত্ব লইয়া যে বহুবিধ আলোচনা হয়, তাহাতে আট জন প্রধান ঋষির পরিচয় পাওয়া যায়। যাঁহারা বিদ্যা ও তর্কে সভায় অগ্রণী হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে একজন ব্রহ্মবাদিনী স্ত্রীলোকও ছিলেন, তাঁহার নাম গার্গীবাচক্নবী। এই সভায় সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের বিদ্যা ও ব্রহ্মজ্ঞানের প্রাধান্য স্বীকৃত হয় এবং সেই প্রাধান্যের নিদর্শনস্বরূপ রাজা জনক তাঁহাকে স্বর্ণশৃঙ্গশোভিত সহস্র সবৎসা গাভী উপহার প্রদান করেন।

বিদ্বৎসভার আলোচনা দ্বারা শিক্ষাবিস্তারের এই চিরন্তন প্রণালী যে আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে, তাহার প্রমাণ এই বারাণসী-ক্ষেত্রে অদ্যাপি প্রত্যক্ষ রহিয়াছে।

সুবিখ্যাত গ্রীক লেখক ষ্ট্রাবো পর্য্যন্ত ভারতের এই প্রাচীন সাহিত্য-সম্মিলন ও দার্শনিক আলোচনার কথা বলিয়া গিয়াছেন। গ্রীক্ রাজদূত মেগাস্থিনিস মৌর্য্য রাজসভায় কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিয়া ভারতের আচার ব্যবহার প্রভৃতি লইয়া যে বিবরণী সংকলন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা হইতে ষ্ট্রাবো দেখাইয়াছেন যে, ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর রাজা এক বিরাট্ সুধী-সম্মিলন প্রচলিত প্রথানুসারে আহ্বান করিতেন। সেই সম্মিলনের উদ্দেশ্য তর্কের দ্বারা বৎসরের মধ্যে আবিষ্কৃত তত্ত্বসমূহের মীমাংসা করা। সেই-সমস্ত তথ্য শুধু যে ধর্ম্ম ও দর্শনবিষয়ক তাহা নহে। ইহা কৃষি কিংবা পাশুপাল্য বিষয় লইয়াও উপস্থাপিত হইত। রাজার কর্ত্তব্য ছিল, ঐ-সকল বৈজ্ঞানিক তথ্যের যাথার্থ্য বৈজ্ঞানিকগণের পরীক্ষা দ্বারা নিরূপণ করা। যিনি এই মহাসভায় নিজের মত প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন, তিনি রাজার নিকট যথেষ্ট পুরস্কার পাইতেন। ষ্ট্রাবোর মতে এইরূপ জয়ী বিদ্বান্‌কে রাষ্ট্রীয় সকলপ্রকারের দাবি হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইত। রাজাকে কোনওরূপ কর দিতে তাঁহাকে হইত না। কিন্তু যাহার মত ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইত, তাহাকে শঠতাচরণের অভিযোগে দণ্ডিত করা হইত। মিথ্যা-প্রচারককে চিরকাল মৌনব্রত গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হইত। ষ্ট্রাবোর এই প্রমাণ হইতে দেখা যায় যে, পঞ্জাব প্রদেশে প্রাচীনকালে খৃঃ পূঃ ৩০০ শতাব্দী পর্য্যন্ত উপনিষদ্-যুগে প্রবর্ত্তিত শিক্ষাবিস্তার-প্রণালীগুলি বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। আর সেই প্রণালীর আবির্ভাবের স্থান এই ভারতের পূর্ব্বভাগ বারাণসী অঞ্চল। বারাণসীর বিদ্যা ভারতের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবকালে আমরা দেখিতে পাই যে, বারাণসীই তখন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রধান ক্ষেত্র। কারণ বুদ্ধদেব গয়ায় সিদ্ধি লাভ করিয়া নিজের ধর্ম্ম ও মত প্রচার করিবার জন্য প্রথমেই বারাণসী অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহার অভিপ্রায় তখন এই ছিল যে, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের যেখানে সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিপত্তি ও প্রসার, সেইখানে সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার নূতন মতের প্রতিষ্ঠা না করিতে পারিলে সমগ্র দেশে উহা কখনই গ্রাহ্য ও প্রচারিত হইতে পারিবে না। পুরাতন সমরনীতিতে আছে, কোনও দেশ জয় করিতে হইলে, যে স্থানে তাহার সমস্ত বল ও শক্তি রক্ষিত থাকে, সেই দুর্গের জয় অগ্রে কর্ত্তব্য। বুদ্ধদেবের সময়ে বৈদিক ধর্ম্মেরও প্রধান আশ্রয় ও রক্ষার স্থান ছিল বারাণসী। বারাণসী নগরীর অনতিদূরে ঋষিপত্তন বোধ হয় একটি প্রসিদ্ধ ঋষিকুল ছিল। তাই সেইখানেই বুদ্ধদেব সর্ব্বাগ্রে তাঁহার ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন

করিলেন। পালিগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, সেখানে বুদ্ধদেব প্রথমে পঞ্চ ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীকে উপদেশের দ্বারা নিজ মত গ্রহণ করান। তাঁহাদিগের নাম কৌণ্ডিণ্য, ভদ্রিক, মহানাম, অশ্বজিৎ ও বাষ্প। বৌদ্ধ সঙ্ঘ গঠিত হয় কাশীর এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ লইয়া। কাশীর পুণ্য ক্ষেত্রেই বাস্তবিক বৌদ্ধধর্ম্মের জন্ম। বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধদেব বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু সেখানে তিনি তাঁহার তপস্যালব্ধ সত্য নিজের মধ্যেই রাখিয়াছিলেন, জগতের কাছে প্রকাশ করেন নাই। যখন ঋষিপত্তনের প্রধান পাঁচ জন ঋষি নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন, তখন সমগ্র বারাণসী-সমাজে একটি বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হইল। ভাবপ্রবণ যুবকবৃন্দ দলে দলে বুদ্ধদেবের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল। সেই-সমস্ত যুবক শ্রেণীর ভাগই সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। তাহাদের নেতা ছিলেন যশ: তিনি কাশীর একজন ধনী শ্রেষ্ঠীর পুত্র।

কাশীতেই ৬০ জন ভিক্ষু লইয়া বুদ্ধদেব সঙ্ঘ সৃষ্টি করিলেন এবং প্রত্যেক ভিক্ষুকে ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

ইহার পর কাশীর বিদ্যাচর্চ্চার পরিচয় জাতক-গ্রন্থে কিছু কিছু পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে জাতকের যুগ খৃঃ পূঃ আন্দাজ৬০০—২৫০ পর্য্যন্ত। জাতক গ্রন্থ হইতে দেখা যায়, এই সময়েও বিদ্যালোচনায় বারাণসীর প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু তৎকালে ভারতবর্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষার কেন্দ্র ছিল উত্তর-ভারতের তক্ষশিলা নগরী। তাই প্রায়ই দেখা যায়, বারাণসীর অনেক বিদ্যার্থী উচ্চতর নানাবিধ বিদ্যার আলোচনার্থে তক্ষশিলাভিমুখে গমন করিতেন। এই সম্বন্ধে জাতক-সমূহে অনেক প্রমাণ আছে।

তক্ষশিলায় শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বারাণসীর যুবকগণ স্বদেশে শিক্ষা-বিস্তার কার্য্যে ব্যাপৃত হইত। যে-সমস্ত উচ্চ অঙ্গের বিদ্যা তক্ষশিলার বিদ্যালয়ের নিজস্ব সম্পত্তি ছিল, সেইগুলি এই স্বদেশপ্রেমিক যুবকগণ বারাণসীতে প্রত্যাগত হইয়া প্রচার করিতেন। এইরূপভাবে চিকিৎসা-শাস্ত্র ও অথর্ব্ববেদের আলোচনার জন্য তক্ষশিলায় যেরূপ শ্রেণীর বিদ্যালয় ছিল, বারাণসীতেও তত্তৎ বিষয় অবলম্বন করিয়া অনেক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহাতে বারাণসীর শিক্ষিত সমাজে যে নব-জীবন সঞ্চারিত হইয়াছিল, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

তক্ষশিলার ন্যায় বারাণসীরও অনেক শাস্ত্র নিজস্ব শিক্ষার বিষয় হইয়াছিল। বারাণসীবাসিগণের মধ্যেও অনেক বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই পণ্ডিতগণের প্রত্যেকেরই ৫০০ শত শিষ্য ছিল, এইরূপ অনেক জাতকে বর্ণিত হইয়াছে। যে সমস্ত কলাবিদ্যা ও শাস্ত্র বারাণসীর নিজস্ব সম্পত্তি ছিল, তাহার মধ্যে সঙ্গীতবিদ্যা একটি প্রধান। গুত্তিল জাতকে বারাণসীর একজন সঙ্গীতবিশারদের উল্লেখ আছে, যাহার সমকক্ষ সমগ্র ভারতবর্ষে কেহই ছিল না। সঙ্গীতবিদ্যা প্রচারের জন্য তিনি বারাণসীতে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন।

বারাণসী হইতে শিক্ষার জন্য তক্ষশিলায় প্রেরিত বিদ্যার্থিগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বদেশ ও সমাজের সেবার জন্য প্রত্যাগত না হইয়া ধর্ম্মের জন্য সংসার ত্যাগ করিতেন।

জাতকের যুগের পরবর্ত্তীকালে বারাণসী মগধ-সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়াতে তাহার ইতিহাস সমগ্র সাম্রাজ্যের ইতিহাসের সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া তাহার নিজের স্বাতন্ত্র্য, ভাবরাজ্যে তাহার বৈশিষ্ট্য ও প্রাধান্য লুপ্ত হয় নাই। যুগে যুগে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন ও বিপ্লবের মধ্যেও বারাণসী আত্মরক্ষা করিয়া আসিতেছে। ভাবরাজ্যে, ও ধর্ম্ম ও বিদ্যানুশীলন সম্বন্ধে তাহার স্বায়ত্তশাসন, তাহার সামাজিক স্বারাজ্য দৃঢ়ভাবে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। সংসারের পরিবর্ত্তন ও বিবর্ত্তন বারাণসীকে স্পর্শ করিতে পারে নাই; কারণ, বারাণসী সংসার বিমুখ, অন্তর্মুখী, আত্মস্থ, ও বিশ্বনাথের ন্যায় আপনারই ধ্যানে নিমগ্ন। আজও বারাণসীর শাস্ত্রজ্ঞ সুধীসমাজ বিদেশীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের কোনরূপ বশ্যতা স্বীকার না করিয়া ভাবরাজ্যে আত্মবশের সুখ উপভোগ করিতেছেন।

জয়ে পরাজয়ে

শ্রী কান্তিচন্দ্র ঘোষ

আমি ত জানিনে আজো—এসেছিলে কবে
আমার নিরালা কুঞ্জে; আবাহন-বাণী
কর্ণে পশেছিল কার? অতৃপ্ত পরাণী
স্বপ্নে জাগরণে মোর মগ্ন ছিল যবে?

আসিলে গোপন-পায়ে, বেণুবীণা-রবে
ঝঙ্কারিয়া উঠে নাই নিকুঞ্জ বনানী;
পুষ্পে নাহি গন্ধ ছিল—শুষ্ক মালাখানি
কণ্ঠে দিয়েছিলে মোর একান্ত নীরবে!

কখন ফুরায়ে গেল অভিসার-রাতি,
যত্নে রচা' বাসরের মিলন হরষ
একটি নিঃশ্বাসে কার নিভে গেল বাতি!

আজিকে বিদায়-ভোরে—আলোক-পরশ
লাগিতেছে দেহে মনে—মোর জয়ভাতি
এ যে উজলিবে মোর দীরঘ দিবস!

আজিও জানিনে আমি—মোর কতখানি
রেখেছিলে ঢেকে ওই বক্ষপুটে তব,
কণ্ঠে বেজেছিল সে কি সুর অভিনব
দিঠির পরশে মুছি নিরাশার গ্লানি!

ক্ষুদ্র অভিমান কত—সুকঠোর বাণী,
নম্রনত শির—ক্ষুব্ধ বেদনা-নীরব,
কত তুচ্ছ মনে হয় আজিকে সেসব—
পরাণ আজিকে তৃপ্ত পরাজয় মানি!

তবু কেন গর্ব্ব-ক্ষুণ্ণ মিলনের গীতি?
ছিন্নমালা চেয়ে আছে অতীতের পানে—
শুধু আছে গন্ধটুকু—বাসরের স্মৃতি!

আজি কেন মনে পড়ে—সজল নয়ানে
সেই কবে চেয়ে দেখা? কী অজানা ভীতি
মিলন-স্বপনে মোর জাগিছে পরাণে!

শ্রী হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

কাঠ-খোদাইএর বাহাদুরি—

সামান্য একটা ছুরীর সাহায্যে খেলনা-রেলগাড়ী অতি সুন্দর-ভাবে কাঠ হইতে খোদাই করা হইয়াছে। এই ছোট্ট কাঠের রেলগাড়ীতে কলকব্জা সবই আছে। ইঞ্জিনখানি অবিকল আসল ইঞ্জিনের মতন,

কাঠের খোদাই রেলগাড়ীর মডেল

কোথাও সামান্য খুঁতও নাই। প্রদর্শনীতে বহুলোকে এই ইঞ্জিনটিকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া যায়। এই বাহাদুর মিস্ত্রির নাম আরনেষ্ট ওয়ারথার, ইনি ওহিওর ডোভার নামক স্থানের বাসিন্দা।

সবচেয়ে ছোট এবং সবচেয়ে পুরানো বই—

হাতের আঙ্গুলে যে বইটি দেখিতেছেন, উহা ব্যাবিলোনিয়ার উর-বংশের রাজত্বের সময়কার কতকগুলি ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত চিহ্নে

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র কেতাব

অঙ্কিত একটুকরা পাথর। পাথরটি ১ ১.৪বর্গ ইঞ্চি এবং ৫০০০ বৎসরেরও বেশী পুরানো।

তালুতে যে বইখানি দেখিতেছেন, উহা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একজন লোক তৈরী করেন। বইখানিতে কয়েকশত পাতা আছে এবং ইহা অতি ক্ষুদ্র, হাতের তালুতেই ইহাকে রাখা যায়।

বাছুর-বওয়া মোটরবাইক্—

ওয়েল্‌সের লোকেরা সহর হইতে অতি দূরে বাস করে। তাহাদের অবস্থা মোটরলরী কিনিবার মত নয়। তাই তাহারা মোটরবাইকে
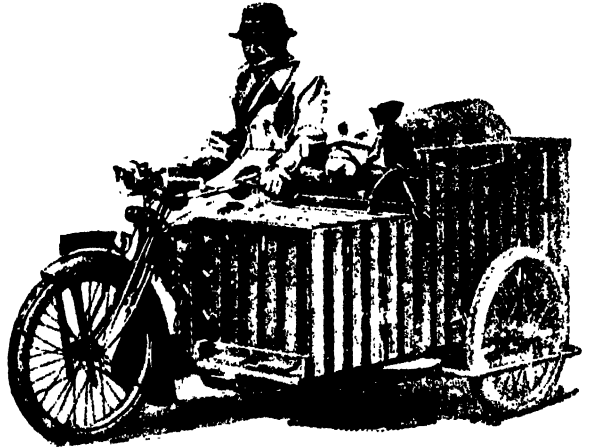
বাছুর বওয়া মোটরবাইক

করিয়া জিনিষপত্র হাট-বাজারে লইয়া যায়। এমন কি দরকার মত একটা বেশ বড় বাছুরকেও তাহারা মোটরবাইকে করিয়া লইয়া যাইতে পারে।

গাছের উপর বাড়ী—

৮২ বছরের বুড়োর কাণ্ড! রসিক বুড়া সুবিধা-মত গাছ পাইয়া কেমন একটি সুন্দর ছোটখাট বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছে! বাড়ীতে বর্ত্তমান সভ্য-জগতের সকল রকম সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আছে। বাড়ীর দুখানি ঘর বিশেষ বিশেষ অতিথিদের জন্য বিশেষ ভাবে সজ্জিত। বাড়ী মাটি হইতে ত্রিশ ফুট উচ্চে অবস্থিত।

বৃক্ষাবাস

হীলারি লং—বিখ্যাত সার্কাস্ অভিনেতা
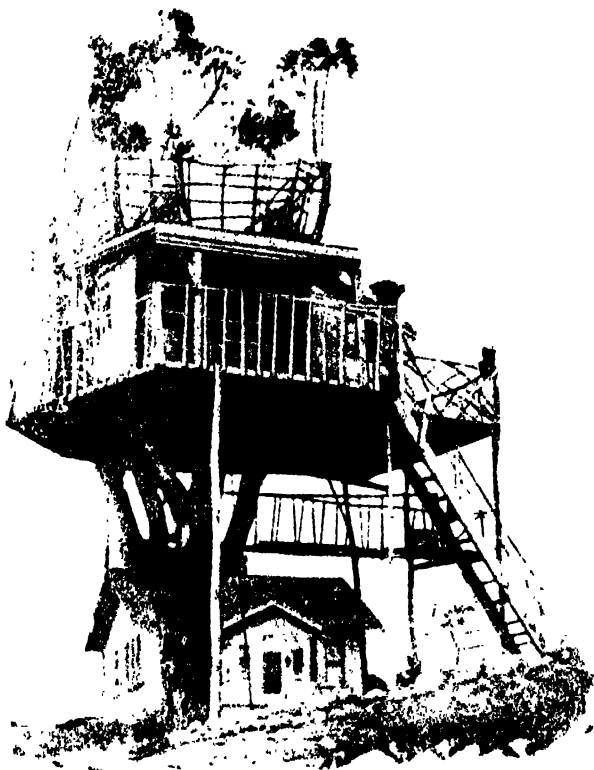
ডান্‌পিটের কাণ্ড—

হিলারি লং একজন প্রসিদ্ধ সার্কাসওয়ালা। সার্কাসে কত-রকম অদ্ভুত প্রাণ-যায়-যায়-গোছের খেলা যে লোককে তিনি দেখাইয়াছেন তাহা বলা যায় না। উঁচু স্থান হইতে লাফ দিয়া পড়া, মোটর লইয়া শূন্যে লাফাইয়া উঠা, ইত্যাদি কাজ তাঁহার কাছে ছেলে-মানুষের খেলা বলিলে বাড়াইয়া বলা হয় না। এই-সমস্ত কাজ তিনি কেবল মাত্র তাঁহার অসীম সাহস এবং মনের বলের দ্বারা করিতে সক্ষম হন নাই; বিজ্ঞান এবং অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্য তিনি পদে-পদে গ্রহণ করিয়াছেন। এক-কথায় বলিতে গেলে তিনি পদার্থবিজ্ঞানে প্রায় সকল নিয়মকে তাঁহার কাজে লাগাইয়াছেন। মাধ্যাকর্ষ ভার-সমতা, গতির ক্রমবৃদ্ধি, বেগ, কেন্দ্রাতিগ বিপ্রকর্ষণ ইত্যা সবরকম নিয়ম তিনি ব্যবহার করিয়াছেন। এই লোকটি তাঁহা সাত বছর বয়সের সময় হইতে সার্কাসের নানারকম খেলা নি

বাঁ দিকের অঞ্চল হইতে নীচের সমতলে পতন—পড়িবার সময় শূন্যে একটি ডিগবাজিও খাওয়া হয় এবং পড়িবার সময় সোজা দাঁড়াইয়া পড়া হয়

মোটর লাফ—B মার্কা মোটরকার পরে যাত্রারম্ভ করিয়া আগে আগে লাফ শেষ করে, তাহার কারণ A মার্কা গাড়ীকে বেশী উঁচুতে উঠিতে হয় যদিও Bএর পূর্ব্বে সে যাত্রারম্ভ করে

বাড়ীতে অভ্যাস করিতেন। এই অল্প বয়সে পদার্থ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার কোনপ্রকার জ্ঞান ছিল না, কিন্তু অ-জানা অবস্থাতেই তি সহজবুদ্ধিবলেই পদার্থ-বিজ্ঞানের সাহায্য লইতেন। এখন তাঁহা কতকগুলি কাণ্ডের ছবি দেখিলে তাঁহার বিদ্যার কিছু পরিচয় পাওয় যাইবে।

—
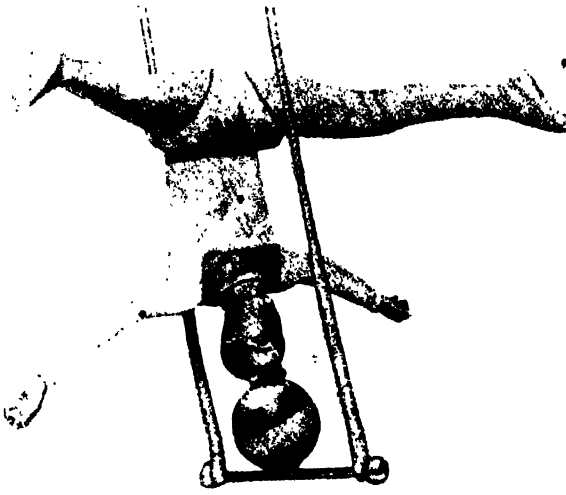
শূন্যের উপর একটি দোলায়মান ডাণ্ডার উপর একটি বল রাখিয়া তাহার উপর মাথা রাখিয়া উল্টামুখী হইয়া থাকা—ভার সমতার বিশেষ জ্ঞান না থাকিলে এই কার্য্য সম্ভবপর নয়

আগুন-লাগা বাড়ী হইতে নামিবার উপায়—

পিটার পি ভেসকভি নামক একজন ভদ্রলোক আগুন-লাগা বাড়ী হইতে অবতরণ করিবার এক চমৎকার উপায় ঠাওরাইয়াছেন। পকেটের মধ্যে ছোট একটি কুণ্ডলী-পাকানো ৭৫ ফুট লম্বা ইস্পাতের ফিতা থাকে। এই ফিতা অতি পাতলা হইলেও ৭৫০ পাউণ্ড ওজন ঝুলাইয়া রাখিতে পারে। এই ফিতার কৌটাকে শরীরের সঙ্গে বেশ ভাল করিয়া বাঁধিয়া লইয়া খুব উঁচু স্থান হইতেও নির্ভয়ে অবতরণ করা যায়। ভদ্রলোকটি নিজে একটা আধতলা বাড়ীর জানালাতে এই ফিতা লাগাইয়া দিয়া তাহার সাহায্যে নীচে অবতরণ করিয়াছেন।

আগুনলাগা বাড়ী হইতে পালাইবার অভিনব উপায়—একটি পাতলা তারের দড়ি

যুক্ত টেলিস্‌কোপ্‌ এবং মাইক্রোস্‌কোপ্‌—

ভদ্রলোকটির চোখে যে যন্ত্রটি লাগান রহিয়াছে, তাহা ইচ্ছা এবং প্রয়োজন-মত দূরবীক্ষণ কিম্বা অনুবীক্ষণ উভয়প্রকার কাজেই লাগান যাইতে পারে। টেলিস্কোপটির মধ্যে আর একটি ছোট নলের মত যন্ত্র লাগাইয়া এই পরিবর্ত্তন সাধন করা যায়।

টেলিসকোপ এবং মাইক্রোসকোপ একত্রীভূত

ঘূর্ণীবাতাসের ছবি—

ঘূর্ণীবায়ু সোজা লম্বা উপরে উঠিয়া বিস্ময়জনকারী মেঘে গিয়া ঠেকে। সাইক্লোন ইত্যাদি ঝড় বহুস্থান ব্যাপিয়া হয়, এবং ইহা সামনের দিকে তীরের মত বেগে ছুটিয়া চলে, ইহার পথে যাহা পড়ে সব একেবারে চুরমার হইয়া উড়িয়া যায়। ঘূর্ণীবাতাস এইপ্রকারের নয়। ঘূর্ণীবায়ু এবং মেঘের নীচের পরিধি বড়জোর ১,০০০ ফুট হয়। ঘূর্ণীবায়ু হইবার বিশেষ স্থান এবং সময় এতরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে। সাইক্লোনের সঙ্গে সঙ্গেও

জলস্তম্ভ—পাঁচ মাইল দূর হইতে ছবি তোলা। নেব্রাস্কায় এইটি দেখা যায়

ইহার আগমন দেখা যায়। মার্চ্চ, এপ্রিল এবং মেমাসেই ঘূর্ণীবায়ু বেশী দেখা যায়। অনেক পুস্তকে লেখা দেখা যায় যে, ভরা গরমে ঘূর্ণীবায়ুর উৎপত্তি হয়, কিন্তু এধারণা ভুল। এই লেখার সঙ্গে যে কয়েকটি ঘূর্ণীবায়ুর ছবি দেওয়া হইল সব ক'টিই এপ্রিল অথবা মে মাসে হয়। ঘূর্ণীবায়ুর তালিকা-পুস্তক হইতেও দেখা যায় যে শতকরা ৮০টি ঘূর্ণীবায়ু বসন্ত কালেরই অব্যবহিত পরে হয়।

পুঞ্জীভূত বর্ষণোন্মুখ মেঘে ভরিয়া যায়। বৃষ্টি হয়, এবং তার পর শিল পড়িতে আরম্ভ হয়। তার পর দেখা যায় কৃষ্ণ-নীল মেঘ পাক খাইয়া লম্বা হইতে হইতে হাতীর শুঁড়ের মত মাটিতে আসিয়া লাগে। এবং তাহার পর তাহার ধ্বংসের লীলা আরম্ভ হয়।

শেষাবস্থা—নীচে স্তম্ভের শেষে ধূলার ঝড় দেখুন

ঘূর্ণীবায়ু খুব সকালে কিম্বা সন্ধ্যার দিকেই বেশীর ভাগ হয়। চীন ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেই ইহার কথা বেশীর ভাগ শোনা যায় এবং মিসিসিপি উপত্যকাই ইহার প্রধান আড্ডা বলিলেও চলে। মিসিসিপি উপত্যকায় ঘূর্ণীবায়ু হইবার পূর্ব্বের কয়েকদিন বেশ গরম পড়ে। মাঝে মাঝে ভয়ানক ঝড় এবং বজ্রনির্ঘোষ হয়। বৃষ্টিও মাঝে মাঝে হয়। এই কয়েকটিই ঘূর্ণীবায়ু উঠিবার পূর্ব্বলক্ষণ। সমস্ত আকাশ

পোকাদের স্থাপত্য-বিদ্যা—

আমরা মানুষ যেমন করিয়া নানারকম ঘরবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিয়া থাকি, পোকামাকড়েরাও তেমনিভাবে তাহাদের সুবিধা এবং মনোমত ঘর বাড়ী তৈয়ার করিয়া লয়। এ-বিষয়ে তাহারা মানুষের নিকট হইতে কিছু ধার করে নাই।

বোলতার বাসা

বর্ম্মাবৃত পোকার বাসা

একটি রঙীন বোল্‌তার বাসা দেখুন। ইংরেজীতে ইহার নাম Painted nest was—রঙীন বোল্‌তার বাসাও নানারকম রঙে রঞ্জিত। আর কোন পোকা বোধ হয় এমন সুন্দর করিয়া বাসা তৈয়ার করিতে পারে না। বাসায় প্রবেশ করিবার জন্য একটি দুয়ারও আছে। দূর হইতে বাসাটিকে দেখিলে একটি লালচে-বুনন রঙের বল

ইউমেনিড নামক বোলতার বাসা
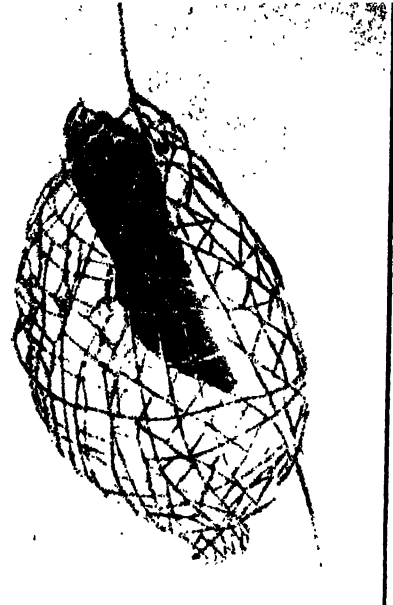
এক প্রকার প্রজাপতির গুটির বাসা

বলিয়া মনে হয়। এই বাসাটির মাঝে মাঝে শাদা, লাল, সবুজ ইত্যাদি রং ফলানো আছে।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশের একপ্রকার পোকার গুটি কেমনভাবে সুরক্ষিত দেখুন। গুটিটি রেশমের একটি ফানেলের মত দেখিতে। গায়ের কাঁটা-গুলিও খুব পাত্‌লা এবং শক্ত রেশমের তৈরী।° একটি ১০ ইঞ্চি লম্বা
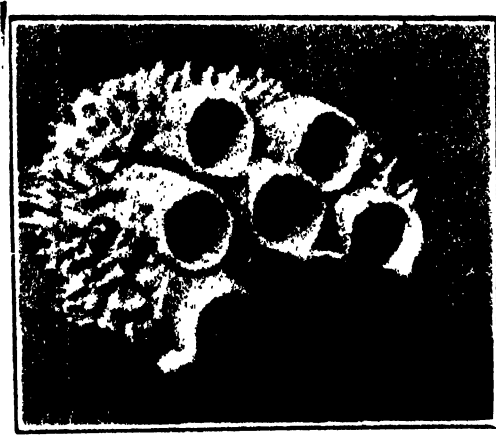
টাইনস্কলিঅন বোলতার বাসা

রেশমী সুতার সাহায্যে ইহাকে গাছের ডালে সুবিধামত জায়গায় ঝুলাইয়া দেয়। এই গুটির উপর ইহার শত্রু পোকামাকড়েরা বসিবার বা দাঁড়াইবার কোন-প্রকার সুবিধা পায় না, কাজেই গুটির মধ্যে পোকা নিশ্চিন্তে বাড়িতে থাকে।

কলম্বিয়া প্রদেশে প্রাপ্ত বোলতার বাসা

কাদার তৈরী ভিমরুলের বাসা দেখুন। এই বাসার মধ্যে নানা রঙে রঞ্জিত বহুত খোপ আছে। এই-সমস্ত খোপে ভিমরুলের ডিম রক্ষিত হয়। এই কাদার বাসা দেখিলে ভিমরুলের আশ্চর্য্য বুদ্ধি এবং ধৈর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

আর-একটি বোলতার বাসা। এই বোলতার ইংরেজী Tryposeylon wasp. পোকাদের তৈরী বাসা এক বিচিত্র কারখা বাসাটির গড়ন দেখিলেই বুঝা যায়, ইহা দেখিতে কি চমৎকার সুন্দর। এই বাসাও কাদার তৈরী। যে-সমস্ত খোপগুলি বোলতাদের বাচ্চা থাকে তাহার দেওয়ালগুলি কাদার তৈরী হই খুব পাৎলা কাগজ অপেক্ষাও পাৎলা। ছবিতে বাসাটিকে প্রায় চা বাড়ানো হইয়াছে।

একরকম প্রজাপতির গুটি দেখুন। নানাপ্রকার শত্রু পে মাকড় হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য প্রজাপতি গুটিটিকে এ পাতা হইতে ঝুলাইয়া দেয় এবং আত্মরক্ষার জন্য গুটির চারিদিকে এ জালের বেড়া বুনিয়া দেয়। ছবিতে গুটিকে বড় করিয়া দেখা হইয়াছে।

বোলতার সারবন্দি আবাস-গৃহ। কলম্বিয়া প্রদেশের এক জঙ্গলে বাসাটিকে গাছের ডাল হইতে গুলি করিয়া ছিন্ন করিয়া মাটিতে যে হয়। এই বাসাটির রং শাদা এবং 'পাপিয়ে মাশে'র মত শক্ত। বাস তিন ফুট লম্বা। বাসাটির গায়ে অজস্র কাগজের প্রকোষ্ঠ আছে প্রকোষ্ঠগুলি সারি সারি করিয়া সুন্দরভাবে সাজানো আছে। এ রকম বাসা কলম্বিয়া প্রদেশের জঙ্গলের গাছের মাথায় পাওয়া যা একটি বাসাতে লক্ষ লক্ষ বোলতার বাস।

পাঁচ লক্ষ বৎসর আগেকার ফড়িং—

বরফের তলায় বেচারীরা চাপা পড়িয়া আছে, প্রায় পঞ্চাশ ল বছর ধরিয়া। এই ফড়িংগুলিকে মাউন্ট্ ওয়াইজের উত্তর দি বরফের তলায় পাওয়া গিয়াছে। ফড়িংগুলি প্রায়ই স্তরে স্তরে জমি আছে। ফড়িংগুলিকে দেখিতে বর্ত্তমান কালের ফড়িংদের মতই- একটু আধটু অমিল আছে। ইহারা হয়ত সেই বহু যুগ পূর্ব্বে এ পাহাড়ের নিকট দিয়া অন্য কোন দেশে উড়িয়া যাইতেছিল, তার প কোনপ্রকারে বিষম ঝড়ের মুখে পড়িয়া এই বরফের পাহাড়ের উপ পড়িয়া যায় এবং বরফের চাপে পড়িয়া সেই সময় হইতে জমি আছে। মিস্ মার্গারেট্ লিণ্ড্সলে নামে একজন জঙ্গল-রক্ষ নারী এই ফড়িংদের অনেকগুলি নমুনা জোগাড় করিয়াছেন। ব কষ্ট সহ্য করিয়া এবং একটি বিপজ্জনক জমাট-হ্রদ পার হইয়া এ পাহাড়ের ধারে যাওয়া যায়।

অপরাজিত পক্ষী—

মানুষ এরোপ্লেনে করিয়া পৃথিবীর চারিদিক্ ভ্রমণ করিতেছে কয়েকজন বিমানবীর আশ্চর্য্য-রকম দ্রুত বেগে সারা পৃথিবী বিমানে করিয়া টহল দিতেছেন। কিন্তু এত করিয়াও মানুষ পক্ষীকে গতিবেগে হার মানাইতে পারে নাই। উত্তর মেরুর কাছাকাছি দেশসমূহে একপ্রকার পক্ষী বাস করে। তাহারা প্রতিবৎসর তাহাদের ডিম পাড়িবার স্থান হইতে ২২,০০০ মাইল দূরের খাদ্যসংগ্রহের স্থানে যায় এবং আবার ফিরিয়া আসে।

অভ্র

শ্রী কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

(২)

খনি হইতে আনীত অভ্রস্তবক প্রথমে অল্প স্থূল তক্তিতে বিভক্ত করা হয়। তক্তিগুলি পরে কাটিয়া ছাঁটিয়া পরিষ্কার করা হয়, যাহাতে তক্তির মধ্যে কোন অংশ ভগ্ন বা দোষযুক্ত না থাকে। এইরূপ কর্ত্তন কয়েকপ্রকার প্রথায় হইয়া থাকে।

"কাঁচি-ছাঁটা" (shear-trimmed) বা মান্দ্রাজী-ছাঁটা (Madras-trimmed) প্রথায় অভ্রস্তর কাঁচি দ্বারা কাটা হয়। এই প্রথায় তক্তিগুলি মোটামুটি চতুরস্র বা চৌকা আকারে কাটা হয়। মান্দ্রাজে এই প্রথা প্রচলিত।

"কাস্তে-ছাঁটা" (Sickle-trimmed or Indian-trimmed) প্রথায় দেশী কাস্তের সাহায্যে অভ্রের তক্তি

অভ্র-স্তবক কর্ত্তন (মান্দ্রাজে প্রচলিত প্রথা)

ছাঁটা হয়। এই প্রথায় অভ্রের দোষযুক্ত অংশ অতি সূক্ষ্ম-ভাবে ছাঁটা হয়; ফলে ছাঁটা তক্তি অনেক কোণ এবং আকারযুক্ত হয়। এই প্রথা বিহার অঞ্চলে প্রচলিত।

"আঙ্গুল-ছাঁটা" (thumb-trimmed) প্রথায় তক্তিগুলি হাতে ধরিয়া আঙ্গুলের চাপে মোটামুটি ছাঁটা হয়। এই প্রথা আমেরিকায় যুক্তরাজ্যে এবং কানাডাদেশে প্রচলিত।

"ছুরি-ছাঁটা" (knife-trimmed) প্রথায় তক্তির দোষযুক্ত অংশ ছুরির সাহায্যে কাটিয়া ফেলা হয়।

কর্ত্তিত অভ্র পরে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদিত বিভাগ এই কয়টি, যথা :—

Clear (Government Standard)—পরিষ্কার

Partly Stained (Government Standard)—আংশিক দাগযুক্ত।

Second quality clear—২য় শ্রেণীর পরিষ্কার।

Second quality clear, partly stained—২য় শ্রেণীর পরিষ্কার, অংশদাগী।

Fair stained—পরিষ্কার দাগী।

Ordinary—সাধারণ।

Stained—দাগী।

Densely stained—ঘন দাগযুক্ত।

Black spotted—কাল-দাগী।

ব্যবসায়ে চলিত নাম কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকারের, যথা :—

Clear—পরিষ্কার।

Slightly stained—কিঞ্চিৎ দাগী।

Fair stained—পরিষ্কার দাগী।

Stained—দাগী।

Heavily stained—খুব দাগী।

Black spotted—কাল-দাগী।

শ্রেণীবিভাগের পর পরিমাপ অনুযায়ী বিভাগ করা হয়। কারণ, যদিও অভ্র ওজন অনুসারে বিক্রয় হয়, কিন্তু বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র আকারের সামগ্রীর মূল্যের যথেষ্ট তারতম্য হয়। অর্থাৎ একমণ ওজনের ছয় বর্গ-ইঞ্চি প্রমাণ অভ্রখণ্ড-সমষ্টির মূল্য একমণ ওজনের বার বর্গ-ইঞ্চি প্রমাণ অভ্রখণ্ড-সমষ্টির মূল্যের অর্দ্ধেক আন্দাজ হয়।

এদেশে প্রচলিত বিভাগনির্দ্দেশ এইরূপ। যথা :—

পরিমাপ-বিভাগ	অভ্রখণ্ডের মাপ (বর্গ-ইঞ্চি)		
"এক্স্ট্রা স্পেসিয়াল্" (extra special)	৬০	হইতে	৭০
"স্পেসিয়াল্" (special)	৪৮	"	৫৯ ৩/৪
"এ ওয়ান্" (A1,	৩৬	"	৪৭ ৩/৪
"নম্বর এক"	২৪	"	৩৫ ৩/৪
"নম্বর দুই"	১৪	"	২৩ ৩/৪
"নম্বর তিন"	১০	"	১৩ ৩/৪
"নম্বর চার	৬	"	৯ ৩/৪
"নম্বর পাঁচ"	৩	"	৫ ৩/৪
"নম্বর ছয়"	১	"	২ ৩/৪

বিভিন্ন দেশে অভ্রের শ্রেণী-বিভাগ বিভিন্ন পদ্ধতি-অনুসারে হয়, ইহা বলা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন।

ক্ষুদ্র আকারের অভ্রতক্তি সাধারণতঃ চিরিয়া ফেলা হয়। অতি সূক্ষ্ম অভ্রপত্র (সচরাচর এক ইঞ্চির সহস্রাংশ স্থূল) এইরূপে তীক্ষ্ণধার ছুরির সাহায্যে প্রস্তুত করা হয়। বাণিজ্যের ভাষায় এইরূপ বস্তুর নাম "স্পিটিংস্" (Mica splittings)। বিদেশে ইহা দ্বারা মাইকানাইট্ নামক পদার্থ প্রস্তুত হয়।

প্রথমে চাপ দ্বারা এই-সকল পত্র একত্রিত করিয়া একটি ইচ্ছামত লম্বা এবং চওড়া পাত তৈয়ারি করা হয়। পরে পাতটির উপর সমানভাবে সুরাসারে দ্রবীভূত লাক্ষা মাখান হয়। তাহার উপর আর-এক স্তর অভ্রপত্র, পরে পুনর্ব্বার লাক্ষাদ্রব, তাহার পর অভ্রপত্র, এই রূপে ক্রমে ক্রমে উত্তাপ এবং চাপের সাহায্যে ইচ্ছামত স্থূল অভ্রের তক্তা তৈয়ারি হয়। প্রস্তুত হইবার পর এইরূপ অভ্রের তক্তায় শতকরা তিন-চারিভাগের বেশী যোজক পদার্থ (লাক্ষাদ্রব ইত্যাদি) থাকা উচিত নহে। এই বস্তুটি মাইকানাইট্ (Micanite) নামে পরিচিত।

মাইকানাইট্ যে-কোন আকার বা স্থূলতা-বিশিষ্ট ইহাকে হয় কাটিয়া গড়িয়া বা চাপ দিয়া যে-কোন আকৃতিযুক্ত করা যায়। বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ ইত্যাদি নানা কাজে ইহার অজস্র ব্যবহার হয়।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, যে, রসরত্নসমুচ্চয়ে আছে "সুখ-নির্ম্মোচ্য পত্রঞ্চ তদভ্রং কান্তমীরিতম্"। এই সহজে পত্র নির্ম্মোচন অর্থাৎ স্তর-বিচ্ছেদ গুণই অভ্রের গুণাবলীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়।

শ্রেষ্ঠ অভ্র অতি সূক্ষ্ম স্তর-বিচ্ছেদেও ফাটিবে না, বা অসমান ভাবে বিচ্ছিন্ন হইবে না। অভ্র-মধ্যে অন্য পদার্থ সন্নিবিষ্ট থাকিলে বা অভ্রখণ্ডের স্ফাটিক গুণ বিকৃত হইলে স্তর-বিচ্ছেদ উত্তমরূপে সম্পন্ন হয় না।

সাধারণতঃ এদেশে দেখা যায়, যে, খনি হইতে উত্তোলিত অভ্রের শতকরা দশভাগ মাত্র কার্য্যোপযোগী অভ্র পত্রে পরিণত হয়। বাকী অংশ সম্পূর্ণভাবে আবর্জ্জন বলিয়া গণ্য হয়।

কাঠিন্য-গুণ কোন কোন কার্য্যে আবশ্যক এবং অন

স্থলে দোষ বলিয়া গণ্য। যথা, বৈদ্যুতিক মোটরের কমিউটেটার নির্ম্মাণে কোমল অভ্র ব্যবহৃত হয়, কেন না অভ্র, যন্ত্রের তাম্র-অংশ অপেক্ষা কঠিন হইলে, তাম্র ক্ষয়-প্রাপ্ত হওয়ায় মোটর বিকল হইবার সম্ভাবনা থাকে।

অভ্রের ব্যবহার প্রধানতঃ বৈদ্যুতিক কারবার-সকলে হয়। বিদ্যুৎ ইত্যাদির চালন-রোধক (insulating medium) পদার্থ হিসাবে ইহার আবশ্যক। চালন-রোধন শক্তি, সহজ-নির্মোচন গুণ, তাপসহন শক্তি, ইত্যাদি গুণাবলীর কারণে অভ্র বিদ্যুৎসংক্রান্ত যন্ত্রাদিতে অপরিহার্য্য বস্তু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে অভ্রের ব্যবহার কি কি কাজে হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক বৎসর একটা তালিকা প্রকাশিত হয়। তাহাতে পাওয়া যায়, যে, অভ্রের ব্যবহার এইরূপে হইয়াছে। যথা :—

বিদ্যুৎচালন-রোধন কার্য্যে—	শতকরা	৮৬ অংশ
চুল্লী প্রস্তুত করণ ...	,,	১০ ,,
ফোনোগ্রাফ যন্ত্রে ...	,,	২ ,,
অন্য সকল কাজে ...	,,	২ ,,

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রেণীর অভ্র ফোনোগ্রাফ বা গ্রামোফোন যন্ত্রের "শব্দ-উৎপাদক" অংশে ব্যবহৃত হয়। তারহীন টেলিগ্রাফ, ইত্যাদির অংশবিশেষেও সম্পূর্ণ দোষহীন অভ্রের প্রয়োজন হয়।

বৈদ্যুতিক কনডেন্‌সার নির্ম্মাণে ও ম্যাগ্নেটো নির্ম্মাণে অভ্র অনেক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এই দুই কাজেই ভারতীয় রুবি-অভ্র ভিন্ন অন্য কিছু চলে না।

এত বিভিন্নরূপ ও প্রকারের কার্য্যে অভ্র ব্যবহৃত হয়, যে, ইহা খনির অধিকারী স্বয়ং ব্যবহারককে সরবরাহ করিতে পারেন না। সুতরাং দালাল ও চালানদারের সাহায্য ছাড়া কোনও কাজ হওয়া অসম্ভব।

ভারতবর্ষের অভ্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু অভ্রের ব্যবসা এদেশের একচেটিয়া নহে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ও কানাডায়, এবং আফ্রিকায় পূর্ব্ব-আফ্রিকা এবং দক্ষিণ-আফ্রিকায় যথেষ্ট অভ্র পাওয়া যায়।

এদেশের অভ্র এত ভাল হওয়া সত্ত্বেও এবং অভ্র-খনির অনেকাংশ (বোধ হয় অধিকাংশ) এদেশীয় লোকের হাতে থাকা সত্ত্বেও ইহা এখন বিশেষ লাভকর ব্যবসা নহে, অন্ততঃ এদেশী ব্যবসায়ীদিগের পক্ষে। তাহার প্রধান কারণ, অনেক হাত ফেরায় অভ্রের দাম অতি বিষম এবং অস্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে তাহা স্পষ্টই দেখা যায়—

লণ্ডনে রুবি-ক্রিয়ার অভ্রের দাম

(দাম প্রতি পাউণ্ড ওজনে শিলিংএ দেওয়া আছে)

শ্রেণী	১৯০১	১৯০৮	১৯১১	১৯১২	১৯১৪	১৯১৯
৬ নং	...	...	১/২ শিলিং	১/২	১/২	১ ১/২
৫ নং	...	...	১	২	২ ৩/৪	৪ ১/৪
৪ নং	১/২	৩ ১/৪	৩	৪ ১/২	৪ ১/২	৮ ১/৪
৩ নং	১ ১/৪	৪ ১/২	৪ ১/২	৫ ৩/৪	৭ ৩/৪	১২
২ নং	৩ ১/৪	৬	৫ ১/২	৭ ২/৩	৮ ১/৪	১৫
১ নং	৫	৭	৬ ৩/৪	৮ ১/৩	৯	২৯ ১/২

তাহার উপর এদেশী অভ্রব্যবসায়ী সম্বন্ধে বিদেশে এইরূপ ধারণা হইয়াছে, যে, তাহারা স্বভাবতঃই শঠ ও প্রবঞ্চক। কেন না, দেশী চালানে কখনই নমুনা-অনুযায়ী জিনিস থাকে না, কিছু খারাপ বা কম-দামী জিনিষ মেশান থাকে। এরূপ ধারণা যে ভিত্তিহীন, তাহা বলা চলে না। কেন না, বিদেশী ব্যবসায়ীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনেক বেশী দাম দিয়া লণ্ডনে অভ্র খরিদ করে।

উপসংহারে কয়েকটি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীতে "রত্ন-আদি খনিজ" প্রবন্ধে আমি বলিয়াছিলাম, যে, আমাদের দারিদ্র্যের কারণ ও হেতু সম্পূর্ণভাবে বিদেশী শাসনকর্ত্তা ও বিদেশী শিক্ষা নহে। অনেক অংশে (বোধ হয় অধিকাংশে) উহা আমাদেরই দোষ। অভ্রের ক্ষেত্রে দোষ প্রায় সম্পূর্ণভাবেই আমাদের।

অভ্রের খনি বোধ হয় এদেশীয় অধিকারীদিগের হস্তেই অধিক পরিমাণে আছে। বিদেশে অভ্রের চালান পাঠান, পাট কিম্বা চায়ের মত বিদেশী সমবায়ের একচেটিয়া অধিকার নহে। অভ্রের চাহিদা কিরূপ, তাহা উপরোক্ত মূল্য-বৃদ্ধির উদাহরণ হইতে সম্যক্ বোঝা যায়। অথচ এদেশীয়-দিগের মধ্যে অভ্রের ব্যবসায়ে সেরূপ ধনীর নাম দু-এক

জন ছাড়া পাওয়া যায় না। এবং যাহাদের নাম পাওয়া যায়, তাহারা প্রায় সকলেই যুদ্ধের দরুন ধনী হইয়া এখন ক্রমেই সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে।

ইহার কারণ কি? এই প্রশ্নের সহজে উত্তর দেওয়া যায় না; কিন্তু বোধ হয় প্রধান কারণ অজ্ঞতা ও শঠতা বলিলে বিশেষ ভুল হয় না।

অজ্ঞতা-নিবন্ধন খনন ব্যয়সাধ্য হইতেছে। অজ্ঞতা-নিবন্ধন খননকালে বিস্তর (শতকরা ৬০ ভাগ) অভ্র নষ্ট হইতেছে। অজ্ঞতা-নিবন্ধন কাটা ছাঁটা খরিদ্দারের মনঃপূত না হওয়ায় মাল বহুকাল পড়িয়া থাকিতেছে। পরিত্যক্ত অভ্র চূর্ণ করিলে বেশ বিক্রয় হয়, কিন্তু এদেশে তাহা আবর্জ্জনা হিসাবে পড়িয়া থাকে। মাইকানাইট্ ইত্যাদি অভ্র হইতে প্রস্তুত পদার্থ এখানে জন্মায় না। ইহা অজ্ঞতা ভিন্ন আর কি?

শঠতা-নিবন্ধন খরিদ্দারের বিশ্বাস হারাইয়া ফেলায় বিদেশী অভ্রের দালালের দ্বারস্থ হওয়াতে বিক্রয়ের কোনও স্থিরতা নাই। মূল্যেরও কোন স্থিরতা নাই।

এরূপ অবস্থায় অভ্র-ব্যবসায় যে এদেশীর পক্ষে লাভ-জনক নহে, তাহা আর বিচিত্র কি এবং সেজন্য দায়িত্ব কাহার?

গুপ্ত আশ্রম
শ্রী মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত কর্ত্তৃক কাঠ-খোদাই

পূজা
শ্রী রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক কাঠ-খোদাই

ভারতের পুরুষ ও নারীদের চরিত্র

ভারতবর্ষের পুরুষ ও নারীদের কাহারও কোনই দোষ নাই, তাহারা তাহা মনে করে না। কিন্তু যে দোষ আমাদের জাতিগত নহে, তাহা আমাদের চরিত্রে আরোপ করা উচিত নয়। লর্ড লিটন সম্প্রতি তাহা করিয়াছেন। ঢাকায় পুলিস্ কর্ম্মচারীদের সমক্ষে তিনি বলিয়াছেন :—

"The thing that has distressed me more than anything else since I came to India is to find that mere hatred of authority can drive Indian men to induce Indian women to invent offences against their own honour merely to bring discredit upon Indian policemen."

তাৎপর্য্য। "ভারতীয় পুরুষেরা ভারতীয় নারীদিগকে তাহাদের সতীত্বের বিরুদ্ধে মিথ্যা করিয়া অপরাধ উদ্ভাবন করিতে প্রবৃত্ত করে। কেবলমাত্র কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ভারতীয় পুলিস্ কর্ম্মচারীদিগকে অপযশভাজন করিবার নিমিত্ত ভারতীয় পুরুষদিগকে এরূপ ব্যবহারে প্রবৃত্ত করে। আমার ভারত আগমনের পর ইহাই আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখ দিয়াছে।"

লর্ড লিটনের ভাষা হইতেই বুঝা যাইতেছে, যে, তিনি পতিতা নারীদের কথা বলেন নাই, গৃহস্থ-বাড়ীর মেয়েদের সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন। সুতরাং অসঙ্কোচে, কোনও দ্বিধা অনুভব না করিয়া, বলা যাইতে পারে, যে, এইরূপ কথা বলায় লর্ড লিটনের আচরণ নিন্দনীয় হইয়াছে।

নারীর চরিত্রে অসতীত্ব আরোপ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের লোকদের সংক্ষোভ্যতা এত বেশী, যে, তাহার আতিশয্য একটা দোষে পরিণত হইয়াছে। এরূপ ঘটনা বিস্তর ঘটে, যে, নারী ধর্ষিতা ও অপমানিতা হইয়াও লোক-লজ্জা বশতঃ তাহা প্রকাশ করেন না; কখন কখন লাঞ্ছিতা নারীগণের পুরুষ-আত্মীয়েরাও ঘটনা জানিয়াও তাহা লোক-নিন্দার ভয়ে চাপা দিয়া থাকেন, এবং এইজন্য দুর্বৃত্ত লোকদিগকে দণ্ডিত করিবার কোন চেষ্টা পর্য্যন্ত হইতে পারে না। দুর্বৃত্ত লোকে ভয়-প্রদর্শন ও বল-প্রয়োগ দ্বারা কোনও নারীর ধর্ম্মনাশ করিলে অনেক সময় তাহাকে তাহার আত্মীয়-স্বজন ও সমাজস্থ লোকেরা গৃহে স্থান দেয় না। তাহাতে কখন কখন তাহারা মুসলমান-সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করে, কখন বা পাপ ব্যবসায় অবলম্বন করে। এই কারণে লাঞ্ছিতা নারীদিগকে সমাজে স্থান দেওয়ার অনুকূলে সভা-সমিতিতে প্রস্তাব উপস্থাপিত ও গৃহীত হইয়াছে। দুরাত্মাদের দ্বারা নারীর লাঞ্ছনা হইলে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া অনেক সময় কঠিন হয়। চরমনাইরে এইরূপ অত্যাচারের অভিযোগ হওয়ায় তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত যে বেসরকারী কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহার রিপোর্টে যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহের এই বাধার উল্লেখ আছে।

ইহা হইতে ভারতীয় পুরুষ ও নারীদের এ বিষয়ে মনের ভাব এবং এবিষয়ে লোকমত সহজেই অনুমিত হইবে। লর্ড লিটনের সম্ভবতঃ এ বিষয়ে কোনই জ্ঞান নাই। সম্ভবতঃ সেই কারণেই তিনি এরূপ গর্হিত ও গুরুতর অবিবেচনার কাজ করিয়াছেন। কিন্তু যাহার যে বিষয়ে জ্ঞান নাই, সে বিষয়ে তাহার চুপ করিয়া থাকাই ভাল। এই হেতু যদি অজ্ঞতাই লর্ড লিটনের অপরাধের কারণ হয়, তাহা হইলেও তাহা মার্জ্জনীয় নহে।

সকল দেশেই ভদ্র-সমাজে পুরুষদের পক্ষে কোনও স্ত্রীলোকের মিথ্যা নিন্দা রটান কাপুরুষের কাজ বলিয়া বিবেচিত হয়; কারণ নিন্দুককে স্বয়ং সমুচিত শাস্তি দেওয়া নানা কারণে স্ত্রীজাতির পক্ষে ঘটিয়া উঠে না। আমাদের দেশে ত তাহা অসম্ভব। অধিকন্তু লজ্জার বিষয় এই, যে, আমাদের দাসত্ব-বশতঃ আমরাও লর্ড লিটনের মত রাষ্ট্র-ভৃত্যকে পদচ্যুত করিতে অসমর্থ।

ইংলণ্ডে স্বামী ও স্ত্রীর বিবাহ-বন্ধন আইন অনুসারে

ছিন্ন করিবার জন্য কখন কখন এরূপ ঘটে, যে, উভয় পক্ষ পরস্পরের সম্মতিক্রমে ব্যভিচারের মিথ্যা প্রমাণ আদালতে উপস্থিত করে। কখন কখন তাহা ধরা পড়ে, কখন কখন ধরা না পড়ায় দম্পতির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, এবং তাহারা পুনর্ব্বার অপর স্ত্রীলোক ও পুরুষকে বিবাহ করে। পুরুষবিশেষের নিকট হইতে টাকা আদায় করিবার জন্য বা আক্রোশ ও বিদ্বেষ-বশতঃ তাহাকে জব্দ করিবার জন্য কোন কোন স্ত্রীলোক নিজের উপর আক্রমণের মোকদ্দমা কখন কখন বিলাতে রুজু করে বা করিবার ভয় দেখায়। এবম্বিধ নানা মোকদ্দমা ও ঘটনা বিলাতে বিরল না হইলেও, আমরা কখন এরূপ মনে করি নাই এবং বলি নাই, যে, ইংলণ্ডের পুরুষ ও নারীদের চরিত্রে এইরূপ দোষ এত বেশী, যে, তাহা সাধারণ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

আমাদের দেশের পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের নামে লর্ড্ লিটন যে ভাষায় দোষ আরোপ করিয়াছেন, তাহার মানে অবশ্য ইহা নহে, যে, ভারতীয় পুরুষ ও নারীদের সকলে বা অধিকাংশ এই দোষে দোষী। কিন্তু যদি ইহা ধরিয়াও লওয়া যায়, যে, দুই-এক স্থলে লর্ড্ লিটন-কর্ত্তৃক উল্লিখিত দোষে ২।১ জন ভারতীয় পুরুষ ও স্ত্রীলোক দোষী হইয়াছে, তাহা হইলেও, তাঁহার উক্তির মত সাধারণভাবে প্রযুজ্য উক্তি ন্যায়সঙ্গত হয় না; এবম্বিধ বহুসংখ্যক ঘটনার সত্য প্রমাণ থাকিলে তবে এমন কথা বলা চলে। অবশ্য এরূপ ২।১ টা ঘটনার বিষয়ও আমরা অবগত নহি। কোন দেশে যদি ক্বচিৎ কখন ২।১ জন মাতৃহত্যা করে, তাহা হইতে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা চলে না, যে, "বড়ই দুঃখের বিষয় যে এ দেশের লোকেরা মাতৃহন্তা।"

লর্ড্ লিটন নিজে সাক্ষাৎভাবে নিশ্চয়ই তাঁহার উক্তির অনুযায়ী একটি ঘটনার বিষয়ও অবগত নহেন। তিনি কোন কোন হাকিম ও পুলিস্ কর্ম্মচারীর কথায় বিশ্বাস করিয়া এরূপ বলিয়া থাকিবেন। তাঁহার নিজের দেশে বিবাহ-বিচ্ছেদ ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে যেরূপ জঘন্য অভিযোগ অনেকস্থলে পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়েই করে, তাহা তিনি জানেন বলিয়াই, আমাদের দেশের পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে তাঁহার নীচ ধারণা সহজে হইয়াছে, এবং সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি অনুচিত কথা বলিয়াছেন। ইংরেজরা ছলে, বলে, কৌশলে ভারতবর্ষের মালিক হইয়াছেন বলিয়া তাঁহারা অনেকে মনে করেন, যে, তাঁহারা সকল বিষয়েই ভারত-বর্ষের লোকদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ; কোন কোন বিষয়ে যে আমরা শ্রেষ্ঠ হইতে পারি, সে কল্পনা সাধারণতঃ তাঁহাদের মনে স্থান পায় না। এইজন্য তাঁহাদের পক্ষে ইহা মনে করা স্বাভাবিক, যে, যে-দোষ তাঁহাদের সমাজে আছে, তাহার মত বা তাহা অপেক্ষাও জঘন্য দোষ আমাদের মধ্যে আছে।

ইহা অনুমিত হইয়াছে, যে, লর্ড্ লিটন চরমনাইরের ঘটনা স্মরণ করিয়া ভারতীয়দের নিন্দা করিয়াছেন। এই অনুমান অমূলক মনে হয় না। চরমনাইরে পুলিস্ স্ত্রীলোকদের উপর অত্যাচার করিয়াছে, ইত্যাদি নানা কথা রটনা করায় ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র গুহ রায়ের উপর দণ্ডের আদেশ হইয়াছে। তিনি তাহার বিরুদ্ধে আপীল করিয়াছেন। সুতরাং মোকদ্দমা বিচারাধীন। এই অবস্থায় গবর্ণরের আলোচ্য এই উক্তি ন্যায়বিচারের অন্তরায় হইবার বিশেষ সম্ভাবনা, এবং তাহা পরোক্ষভাবে আদালতের অবমাননাও বটে। কিন্তু তিনি লাট সাহেব, সুতরাং মানুষের আদালতে তাঁহার বিচার হইবে না, যদিও বিশ্বপতির ন্যায়দণ্ড কাহাকেও অব্যাহতি দেয় না।

—

বাংলার মন্ত্রীদের বেতন

স্বরাজ্য দলের লোকেরা হাইকোর্টে মোকদ্দমা করিয়া বাংলার মন্ত্রীদের বেতনের বরাদ্দ পুনর্ব্বার ব্যবস্থাপক সভার নিকট উপস্থাপন স্থগিত করিয়াছিলেন এবং গবর্ণমেণ্ট্ তাহার বিরুদ্ধে আপীলও করিয়াছিলেন। কিন্তু আপীল নিষ্পত্তি হইবার আগেই বড়লাট নিয়ম জারী করিয়াছেন, যে, ব্যবস্থাপক সভা কোন বরাদ্দ নামঞ্জুর করিলে বা কমাইয়া দিলে উহা পুনর্ব্বার ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা চলিবে। সুতরাং সরকার-পক্ষ হইতে আপীল প্রত্যাহার করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে ভারত-গবর্ণ্-মেণ্ট্ কলিকাতা হাইকোর্টের সম্মান রক্ষা না করিয়া

প্রকারান্তরে অপমান করিয়াছেন। কিন্তু আইনে ইহার কোন সাজা নাই। এরূপ করিবার কারণ নানাবিধ হইতে পারে। আপীল নিষ্পত্তি হইতে হয়ত বিলম্ব হইত; বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন ও তাহাতে মন্ত্রীদের বেতনের বরাদ্দ উপস্থাপন তত দিন স্থগিত রাখা হয়ত সুবিধাজনক মনে হয় নাই। মন্ত্রীদের বেতনটা মঞ্জুর করান চাই-ই; অথচ আপীলে জজদের রায় কি হইবে, তাহার স্থিরতা নাই; এইজন্য একটা উপায় শীঘ্র অবলম্বন আবশ্যক বোধ হইয়া থাকিবে। তৃতীয়তঃ, আপীলে যদি জজেরা এই রায় দিতেন, যে, একবার যাহা ব্যবস্থাপক সভায় নামঞ্জুর হইয়াছে, তাহা আবার সেই ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা আইন-বিরুদ্ধ, তাহা হইলে সেই রায় নাকচ করিয়া নিয়ম জারী করিলে হাইকোর্টের অধিকতর অপমান হইত; এবং তাহা বড়লাট করিতে পারিতেন কি না, অন্ততঃ সদ্য সদ্য করিতে পারিতেন কি না, সন্দেহ।

এখন আবার মান্দ্রাজের কোন কোন ভারতীয় আইনজ্ঞ বলিতেছেন, যে, বড়লাটের এরূপ নিয়ম করিবার অধিকার নাই। শেষ পর্য্যন্ত কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়, দেখা যাক।

—

ব্যারিষ্টারের অপমান

হাইকোর্টের জজ পেজ্ ব্যারিষ্টার শরচ্চন্দ্র বসুকে তাঁহার আদালত হইতে বাহির হইয়া যাইতে হুকুম করেন। এরূপ অপমান করিবার কোন কারণ ছিল না, এবং জজের তাহা করিবার অধিকারও ছিল না।

এই অপমানের কথা অবগত হইয়া ব্যারিষ্টারদের নেতা এড্‌ভোকেট্ জেনের‍্যাল্ শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাস মহাশয় জজ পেজের আদালতে গিয়া দৃঢ় ও ভদ্র ভাষায় তাঁহার আচরণের প্রতিবাদ করেন। জজ তাহাতে অনুতপ্ত হওয়া দূরে থাক, অধিকন্তু দাস মহাশয়কেও দু-কথা শুনাইবার চেষ্টা করেন, এবং বলেন, যে, ব্যারিষ্টার্ বসুকে তিনি গুরুতর শাস্তি দিতে পারিতেন কিন্তু লঘু ব্যবস্থাই করিয়াছেন; এবং যদি মিঃ বসু ক্ষমা চান, তাহা হইলে তাহা বিবেচিত হইবে। বাংলা গ্রাম্য প্রবাদে প্রথিতকীর্ত্তি যে-সকল লোক পথ অপরিষ্কার করে এবং চোখও রাঙায়, এই জজ্‌টি সেই শ্রেণীর লোক।

এড্‌ভোকেট্ জেনারাল্ দাস মহাশয় জজ্ পেজের আদালতে বিফলপ্রযত্ন হইয়া চীফ্ জষ্টিসের নিকট যান। তিনি বলেন, যে, এই ব্যাপারের শুনানি প্রকাশ্য আদালতে হইতে পারে না; এইজন্য মিঃ দাস প্রচলিত রীতি অবলম্বন করিতে উপদিষ্ট হন। তদনুসারে চীফ্‌জষ্টিসের নিকট এক আবেদন পেশ্ করা হইয়াছে। তাহার ফল অবগত নহি।

প্রকাশ্য আদালতে একজন মানুষ অকারণে আর-একজন মানুষের অপমান করিলে প্রকাশ্য আদালতে কেন তাহার আলোচনা পর্য্যন্ত হইতে পারে না, তাহা বুঝি না।

খুব চট্‌পট্ কলিকাতার টাউন-হলে জজ্ পেজের আচরণের প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত এক সভা হয়। তাহাতে উকীল ব্যারিষ্টারুরা যোগ দেন নাই বলিলেও চলে; কেন, তাহা জানি না। হইতে পারে, যে, তাঁহারা চীফ্‌জষ্টিসের সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করিতেছিলেন, কিম্বা হয় ত কোন দলাদলিঘটিত কারণ ছিল; ভয়ও থাকিতে পারে। যাহা হউক সভাটি যেমন হওয়া উচিত ছিল, তেমন হয় নাই। একটি বক্তৃতা কপোত বা বুল্‌বুলের মত গর্জ্জনকারী তন্তুবায় বটম্‌কে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। এলাহাবাদের "পণ্ডিত" শ্যামলাল নেহরু এলাহাবাদের উকীল ব্যারিষ্টারদের বীরত্বের সহিত তুলনা করিয়া কলিকাতার সেই সেই শ্রেণীর লোকদিগকে লজ্জা দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যাঁহারা এলাহাবাদের খবর রাখেন, তাঁহাদের পক্ষে এই অভিনয় উপভোগ্য।

যাহা হউক, টাউন-হলে কলিকাতার সর্ব্বসাধারণের সভা করিতে হইলে সকল শ্রেণীর যথেষ্টসংখ্যক লোকের সমাগম যাহাতে হয়, তাহার চেষ্টা না করিয়া সভা করা উচিত নয়। চেষ্টা করিতে হইলে কিছু সময়েরও দরকার হয়; বেশী তাড়াতাড়ি ভাল নয়।

শুনিয়াছি, হাইকোর্টের উকীল-ব্যারিষ্টারদের একজোট হইয়া কোন জজের আদালত বর্জ্জন করা হাইকোর্টের

নিয়মবিরুদ্ধ। তাহা হইতে পারে; কিন্তু আত্ম-সম্মান-বিশিষ্ট প্রত্যেক ব্যবহারাজীব যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জজ পেজের আদালতে না যান, তাহা হইলে ত নিয়ম-ভঙ্গ হইবে না।

কিন্তু এদিকে জজ্ ছুটি লইয়া ঘর-মুখো হইয়াছেন। শীতকালের আগে ফিরিবেন না। ততদিনে সব ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে। জজটির বুদ্ধি ও ভবিষ্যদ্দর্শিতা আছে, স্বীকার করিতে হইবে।

মফঃস্বলে হাকিম-কর্ত্তৃক উকীল মোক্তারের পেয়াদা দ্বারা কান ধরিয়া বহিষ্করণ ও তাঁহাদের আদালত-কক্ষের কোণে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকিতে বাধ্য হওন, ইত্যাদি ঘটনা সংবাদপত্রে ক্বচিৎ কখন বাহির হইয়া থাকে। তখন কোন প্রকাশ্য প্রতিবাদ-সভা কেন হয় না, তাহা সকলে ভাবিয়া দেখিবেন।

—

বি-এ পরীক্ষার ফল

এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা প্রভৃতি পরীক্ষার ফল বাহির হইতে দেরী হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিলম্ব হইয়াছে, বি-এ পরীক্ষার ফল বাহির হইতে। পরীক্ষার ফল বাহির হইতে বিলম্ব হইলে তাহাতে নানা কুফল ফলে। যাহারা পরীক্ষা দেয়, তাহাদিগকে দীর্ঘকাল অনিশ্চয়ের মধ্যে থাকিতে হয়। ইহা ক্লেশকর ও অনিষ্টজনক। এই দীর্ঘসময় ছাত্রেরা প্রায় আলস্যে কাটায়। পাস্ হইলে তবু অন্য কিছু একটা করিতে পারে, ফেল্ হইলে আবার পড়িতে পারে, কিন্তু কোন খবর বাহির না হইলে কোন কাজে মন বসে না।

বিলম্বের কারণ প্রকাশিত হয় নাই। যদি আশু-বাবুর মৃত্যুতে বিশৃঙ্খলা ঘটায় এরূপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা একনায়কত্বের সুপরিচিত পরিণামের অন্যতম দৃষ্টান্ত মাত্র।

—

ব্রাহ্মণ-সভা এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য আচরণ

সিরাজগঞ্জে হিন্দুসভায় "অস্পৃশ্য" ও "অনাচরণীয়" জাতিদের অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তা দূর করিবার জন্য যে প্রস্তাব ধার্য্য হয়, খবরের কাগজে দেখিয়াছিলাম ব্রাহ্মণ-সভা তাহা দূষণীয় বলিয়াছেন। আরও দেখিলাম, শ্রীযুক্ত শশধর রায় নামক একজন ভদ্রলোক "অনাচরণীয়ে"র জলগ্রহণ করায় ব্রাহ্মণ-সভা তাঁহার পুরোহিতকে তাঁহার পৌরোহিত্য না করিতে অনুরোধ করেন। অনুরোধ রক্ষিত হয় নাই। পুরোহিত ঠিক কাজ করিয়াছেন।

আমরা জা'ত মানি না; আমাদের কথা না হয় নাই ধরিলেন। কিন্তু অনেক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণও যে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে মত দিতেছেন, এবং কেহ কেহ অস্পৃশ্যতার ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করিতেছেন, ব্রাহ্মণ-সভা তাহার কি প্রতিকার করিবেন?

ব্রাহ্মণ-সভার সভ্যদের অনেকে কলিকাতায় বাস করেন। এখানে চা ও আমিষ-আহার্য্যের দোকানে যাহারা ঐ-সব জিনিষ তৈরী ও পরিবেষণ করে, তাহাদের জা'ত কেহ জিজ্ঞাসা করে না, কোন্ জানোয়ারের মাংস এবং কোন্ বিহঙ্গমের অণ্ড তাহাও কেহ জিজ্ঞাসা করে না। এই-সব দোকানে ভোজনকারী ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ, হিন্দু, অহিন্দু সকলে এক টেবিলে ভোজন করে। ব্রাহ্মণ-সভা ইহা অনবগত নহেন; শশধর রায় বা জনর্দ্দন ভট্টাচার্য্যের নামটা ছাপা হইয়া গেলেই কি যত দোষ হয়?

লাট-বেলাটের সঙ্গে কে কখন্ খানা খাইল, তাহাদের তালিকা কাগজে ছাপা হয়। তালিকায় হিন্দু-সমাজের লোকদের নামও থাকে। ব্রাহ্মণ-সভা তাহাদের কি দণ্ড বিধান করেন বা করিতে পারেন?

ব্রাহ্মণ-সভা পণ্ডশ্রম করিতেছেন; জা'ত টিকিবে না, টেঁকা উচিত নহে।

—

লর্ড রোনাল্ড্‌শের জাতিভেদের গুণ-গান

সম্প্রতি বিলাতের এক সভায় লর্ড্ রোনাল্ড্‌শে হিন্দু সমাজে জাতিভেদের তারিফ্ করিয়াছেন। থিওসফিক্যাল সোসাইটীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাত্রী ম্যাডাম ব্লাভাট্‌স্কী একবার বলিয়াছিলেন, যে, যতদিন জাতিভেদ আছে, ততদিন ভারতবর্ষে ইংরেজদের প্রভুত্ব লোপের কোন ভয় নাই। সুতরাং লর্ড্ রোনাল্ড্‌শের বক্তৃতা যে খাঁটি স্বজাতি-প্রেম-প্রসূত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অপর দিকে স্বজাতি-বৎসল মহাত্মা গান্ধী সনাতনপন্থী হিন্দু বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াও অস্পৃশ্যতার উচ্ছেদ-সাধনে বদ্ধপরিকর। অথচ তিনি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মীও বটে। কিন্তু তিনি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের ব্যাখ্যা প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী করেন না, নিজের জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে করেন।

অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তা জাতিভেদের চরম কুফল। অন্ততঃ এই দুটির উচ্ছেদ হইলেও তবু কিছু মঙ্গল হয়। শ্রেণীভেদ সকল দেশেই আছে ও থাকিবে; কিন্তু অন্য প্রত্যেক শ্রেণীতেই নিত্য নূতন লোক প্রবেশ করিতেছে। বিলাতের লর্ড্ বা অভিজাত সম্প্রদায়ে প্রতি বৎসরই নূতন লোক স্থান পাইতেছে। আবার লর্ড্‌দের জ্যেষ্ঠ সন্তান ছাড়া অন্য সন্তানেরা লর্ড্ থাকিতেছে না। বিলাতের যে-কোন শ্রেণীর লোক রেভারেণ্ড্ উপাধি-বিশিষ্ট খৃষ্টীয় পুরোহিত ও ধর্ম্মযাজক হইতে পারে ও হইয়া থাকে। আবার ধর্ম্মযাজকদের একটি ছেলেও ধর্ম্মযাজক না হইয়া আর-কোন-না-কোন কাজে নিযুক্ত হইতে পারে।

আমাদের দেশেও বহুকাল হইতে এরূপ ঘটিতেছে। বামুনের ছেলে অথচ যজন-যাজন অধ্যাপন করে না, এরূপ লোক ত অগুন্তি আছে। বামুনের ছেলে মদ, মাংস, চাম্‌ড়া, জুতা এবং অন্য নানা জিনিষ বিক্রী করে, এরূপ লোকেরও অভাব নাই। কিন্তু ইহাদের কাহারও ব্রাহ্মণত্ব লোপ পায় না। সর্ব্ববাদীসম্মত খুব গর্হিত কাজ করিয়া কেহ জেলে গেলেও তাহার জা'ত যায় না। অবশ্য ইহারও একটা ব্যাখ্যা আছে। যথা—পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফলে যে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহার ব্রাহ্মণত্ব ইহজন্মে লোপ করে কাহার সাধ্য? তাহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু পূর্ব্বজন্মে কে কি করিয়াছে তাহার প্রমাণও কাহারও নিকট নাই। তা'ছাড়া, কোন্ সুকৃতির ফলে বামুনের ছেলে ইহ-জন্মে শুঁড়ির কাজ করিতেছে ও শুঁড়ির মুরুব্বি হইতেছে, তাহা বলা খুব সহজ নয়।

—

নারীনির্য্যাতন

রাত্রে ও দিনে-দুপুরে নারী হরণের, আত্মীয়-স্বজনের চক্ষের সম্মুখে হরণের, ও পরে তাহাদের উপর পৈশাচিক অত্যাচারের সংবাদ এখনও কাগজে বাহির হইতেছে। অধিকাংশ স্থলে অত্যাচারীরা মুসলমান-নামধারী, এবং অত্যাচরিতারা হিন্দু-সমাজের স্ত্রীলোক। মুসলমান স্ত্রীলোকের উপর মুসলমান-নামধারী দুর্ব্বৃত্তের অত্যাচারের সংবাদও মধ্যে মধ্যে বাহির হয়। মুসলমান-নামধারী দুর্ব্বৃত্তেরা তাহাদের সমাজের, ও নারীরক্ষায় অসমর্থ হিন্দু-সমাজের লোকেরা তাহাদের সমাজের কলঙ্ক, এবং উভয়েই সমগ্র দেশবাসীর লজ্জার কারণ।

শুভ লক্ষণ দু'টি আছে। কোথাও কোথাও হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক নারী-হরণ নিবারণের ও দুর্ব্বৃত্তদের শাস্তি দিবার সম্মিলিত চেষ্টা করিতেছেন এবং সেই চেষ্টা কিয়ৎপরিমাণে সফল হইয়াছে; দুই-এক স্থলে নারীর সাহসিকতায় দুর্ব্বৃত্তেরা বিফলকাম হইয়াছে।

—

রাষ্ট্রনীতির চর্চ্চা

এইরূপ একটা ধারণা চলিত আছে, যে, যে-কেহ শিক্ষকের কাজ করিতে পারে। এইজন্য দেখা যায়, যে, অন্য কোন কাজ না জুটিলে অনেকে শিক্ষক হইবার চেষ্টা করেন। সেইরূপ খবরের কাগজের সম্পাদক বা লেখক হইয়া রাষ্ট্রনীতি-বিষয়ে কলম চালানও সকলেরই সাধ্যায়ত্ত, এই ধারণাও অনেকের আছে। কিন্তু এই উভয় ধারণাই ভ্রান্ত। শিক্ষাদান যে অন্যান্য বিদ্যার মত একটি বিদ্যা এবং ইহা যে শিক্ষাবিজ্ঞানের ভিত্তির উপর স্থাপিত, তাহা বহুবৎসর হইতে উপলব্ধ হইয়াছে, এবং সেইজন্য যে-সব দেশে অন্যান্য বিজ্ঞান ও বিদ্যার চর্চ্চা হয়, শিক্ষা-বিজ্ঞান ও বিদ্যার চর্চ্চাও তথায় হইয়া থাকে। সেইরূপ সাংবাদিকের (জার্ন্যালিষ্টের) কাজের জন্যও যে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন ইহা কয়েক বৎসর হইতে অনুভূত হইয়াছে। তজ্জন্য আমেরিকার অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বিলাতের লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহা শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত আছে।

অবশ্য ইহা ঠিক, যে, শিক্ষা-বিজ্ঞান ও শিক্ষাবিদ্যা না শিখিয়াও অনেকে উৎকৃষ্ট শিক্ষক হইয়াছেন। সেইরূপ সাংবাদিক বিদ্যায় রীতিমত শিক্ষা না পাইয়াও অনেকে বিখ্যাত ও বিচক্ষণ সম্পাদক হইয়াছেন। কিন্তু, কোন

মেডিক্যাল কলেজে না পড়িয়াও অনেকে কোন কোন রোগের চিকিৎসায় ও অস্ত্রপ্রয়োগে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন; এবং বাণিজ্য-কলেজে না পড়িয়াও অনেকে বড় সওদাগর হইয়াছেন। তাহাতে যেমন মেডিক্যাল কলেজে ও বাণিজ্য-কলেজে শিক্ষার অনাবশ্যকতা প্রমাণ হয় না, তেমনি পূর্ব্বোক্ত শিক্ষক ও সম্পাদকদিগের কৃতিত্বে তাঁহাদের বৃত্তিশিক্ষার অনাবশ্যকতা প্রমাণ হয় না।

শিক্ষাদান যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ, পরীক্ষা করিয়া সার্টিফিকেট দেওয়া প্রধান কাজ নহে, ভারতবর্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই এই সত্যটি প্রথমে উপলব্ধি করিয়া তদনুসারে কাজ করিতে প্রথমে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অতএব আরো কোন কোন বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে হইবে। ইহাতে রাষ্ট্রনীতিবিজ্ঞানের শিক্ষা দিবার বর্ত্তমানে যে ব্যবস্থা আছে, তাহার উৎকর্ষ-সাধন ও সম্প্রসারণ আবশ্যক। আমেরিকার কোলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টান্ত-অনুসারে বিশ্বরাষ্ট্রনীতি-বিষয়ে একটি অধ্যাপকের পদ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সৃষ্ট হওয়া উচিত। তাহার জন্য লোকের অভাব হইবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যে, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার বিদ্যাবত্তা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নানা দেশের অভিজ্ঞতা, এবং ভূয়োদর্শনে এই পদের উপযুক্ত।

ইহার সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিকের বিদ্যা ও কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্যও বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা উচিত। বেকার-সমস্যার সমাধানের নিমিত্ত বৃত্তিশিক্ষা-বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কন্‌ফারেন্স্‌ ডাকিয়াছিলেন। তাহাতে অনেক প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছিল, এবং তদনুসারে শিক্ষা পদ্ধতি এবং শিক্ষণীয় বিষয়ের তালিকার খসড়াও প্রস্তুত হইয়াছিল। শুনিতে পাই, গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন না পাওয়ায় এখনও কোন কাজ হয় নাই। ঠিক খবর জানি না। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় কৃপণের ধনের মত সংবাদগুলি সঞ্চয় করিয়া রাখেন। নিজের দরকার হইলে গোপনীয় সংবাদও কোন কোন সম্পাদককে দেন, নতুবা সাধারণতঃ ফেলো ব্যতীত কাহাকেও কিছু না জানানটাই রীতি। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি ও সাহায্য চান! এই অবান্তর কথা রাখিয়া দিয়া, আমরা যাহা বলিতেছিলাম, এখন তাহাই বলি।

আমাদের দেশে খবরের কাগজের এবং মাসিক পত্রের সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। উহার পরিচালন ও উহাতে প্রবন্ধাদি লিখন বহুদেশে যেরূপ একটি বৃত্তি, আমাদের দেশেও সেইরূপ বৃত্তি হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু ইহা শিখিবার ও শিখাইবার বন্দোবস্ত নাই। অনেক বৎসর হইতে আমাদের নিকট অনেক যুবক মধ্যে মধ্যে আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন, সংবাদপত্র পরিচালন করিতে হইলে কি শিক্ষা করা উচিত; অনেকে আমাদের কার্য্যালয়ে শিক্ষানবীসও থাকিতে চান। অনেক দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাগজের সম্পাদকের নিকট নিশ্চয়ই আরও অনেক বেশী লোক যান। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, যে, এই বৃত্তিটি শিখিবার লোক ও তাহাদের আগ্রহ আছে। এইজন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইহা শিখাইবার বন্দোবস্ত করা উচিত।

ইহা পাটীগণিত বা ভূগোলের মত কোন একটি বিদ্যা নহে। অনেকগুলি বিষয় শিখিলে তবে ভাল করিয়া সংবাদপত্র চালাইতে পারা যায়। তাহার তালিকা এখানে দেওয়া অনাবশ্যক। কেবল যে বিষয়টির উল্লেখ আগে করিয়াছি, সেই বিশ্বরাষ্ট্রনীতি বা অন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতি ভাল করিয়া জানা যে ভারতীয় সম্পাদকদের খুব দরকার, তাহাই পুনর্ব্বার বলিতে চাই।

আমরা সকলে মুখে বলি বা নাই বলি, সবাই স্বাধীনতা চাই। কিন্তু ভারতীয় স্বাধীনতার সহিত বিশ্বরাষ্ট্রনীতির কি সম্পর্ক, ভারতবর্ষের স্বাধীন হইতে হইলে অন্য অনেক দেশে কিরূপ রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন আবশ্যক, তাহা আমরা সব সময় ভাবি না, অনেক সময় জানিতে বা বুঝিতেও পারি না। কিন্তু আসল কথা এই, যে, অন্য কতকগুলি দেশ স্বাধীন না হইলে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইতে পারে না, এবং ভারতবর্ষ স্বাধীন না হইলে অন্য কতকগুলি দেশ স্বাধীন হইতে পারে না। এখানে এ বিষয়ে স্থূল স্থূল দু-একটা কথা বলিতে পারা যায়।

কয়েকটা রাজনৈতিক চা'ল

পাঠকেরা কিছু দিন আগে খবরের কাগজে দেখিয়া থাকিবেন, যে, মিশর-দেশের নেতা জঘ্লুল্ পাশা চান, যে, সুদান দেশ আগেকার মত মিশরের সহিত যুক্ত থাকে। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ র‍্যাম্‌জে ম্যাক্‌ডোনাল্ড্ তাহাতে রাজী নন, ইংরেজরা সুদানকে নিজেদের হাতেই রাখিতে চান। অথচ তাঁহারা বলিতেছেন, যে, মিশরকে তাঁহারা স্বাধীনতা দিয়াছেন। কতকটা ক্ষমতা যে দিয়াছেন, তাহাও ঠিক। পূর্ব্ব হইতে মিশরের অন্তর্ভূক্ত সুদানকে কেন এখন মিশরের সহিত যুক্ত হইতে দিতেছেন না, সেইজন্য তাহার কারণ বুঝা আবশ্যক।

সুদানে কার্পাস ও অন্যান্য অনেক ফসল হইতে পারে। এইসব কৃষিকার্য্যের সুবিধার জন্য ইংরেজরা সুদানে নীল-নদকে বাঁধিয়া বৃহৎ কৃত্রিম হ্রদ প্রস্তুত করিয়া ও খাল কাটিয়া জল-সেচনের বিশাল বন্দোবস্ত করিয়াছেন। কিন্তু কৃষিকার্য্যের দ্বারা ধনবান্ হওয়া ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। মিশর-দেশের নির্ভর কার্পাস-আদি চাষের উপর। নীল-নদের জলে প্রতিবৎসর মিশর-দেশ প্লাবিত হওয়ায় সেই চাষ সম্ভব হয়; প্লাবন বন্ধ হইলে চাষও বন্ধ হইবে। নীল-নদ আসে সুদান-দেশের ভিতর দিয়া। ইংরেজরা সেই সুদানে এরূপ বাঁধ, কৃত্রিম হ্রদ, ও খাল নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যে, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে যে-কোন বৎসর নীলের জল তাহাতে রাখিয়া ও চালাইয়া মিশরে উহার প্লাবন বন্ধ করিতে পারেন। তাহা হইলে মিশরকে খুব বিপন্ন হইতে হইবে। সুতরাং যদি সুদান ইংরেজের হাতে থাকে, তাহা হইলে মিশর নামে স্বাধীন হইলেও কাজে ইংরেজের মুঠার মধ্যেই থাকিবে। কারণ, যখনই মিশর কোন বিষয়ে ইংরেজের স্বার্থ ও সুবিধা-অনুসারে না চলিয়া স্বতন্ত্র পথে চলিতে চাহিবে, তখনই ইংরেজ তাহাকে জব্দ করিয়া তাহার চেতনা সম্পাদন করিতে পারিবে।

তা' ছাড়া, সুয়েজ খালটি ও তাহার সন্নিকটবর্ত্তী স্থান ও তৎসমুদয়ের রক্ষণাবেক্ষণের ভারও ইংরেজ নিজের হাতে রাখিয়াছেন, এবং তাহার জন্য তথায় সৈন্য রাখিবার অধিকারও রাখিয়াছেন;—যদিও সুয়েজ ও তৎসন্নিহিত স্থানসকল মিশর-দেশের অন্তর্গত। সুদানের মত সুয়েজও ইংরেজের হাতে থাকায়, এবং উভয়ত্র ইংরেজের সৈন্য রাখিবার ক্ষমতা থাকায় মিশর স্বাধীন হইয়াও পরাধীন থাকিবে। মিশরকে এইরূপে পরাধীন রাখিবার উদ্দেশ্য কি? অন্য নানা উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। কিন্তু একটা প্রধান উদ্দেশ্য ভারতবর্ষকে ব্রিটেনের অধীন রাখা।

ব্রিটেনের সমুদয় ঐশ্বর্য্যের ও শক্তির মূল ভারতবর্ষ-অধিকার। ভারতবর্ষ ইংরেজের হাত হইতে গেলে ব্রিটেনের ঘরে-ঘরে হা-হুতাশ পড়িবে, ও উহার আন্তর্জাতিক শক্তির খুব হ্রাস হইবে। এইজন্য ভারতবর্ষকে স্বাধীন হইতে দেওয়া ত দূরে থাক, উহাকে সামান্য প্রকৃত ক্ষমতা দিতেও ইংরেজরা এত নারাজ। ভারতবর্ষকে হাতে রাখিতে হইলে সহজে ভারতবর্ষে যাতায়াত, এবং তথায় যুদ্ধজাহাজ, সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ করা আবশ্যক। সুয়েজ খাল ও তৎসন্নিহিত স্থানসকল অন্য কোন স্বাধীন জাতির হাতে গেলে ভারতবর্ষে যাতায়াতের পথে বিঘ্ন পড়িবে। এইজন্য ইংরেজ সুয়েজ খালকে হাতে রাখিয়াছে, এবং মিশরকে নামে স্বাধীনতা দিয়াও, সুদান এবং সুয়েজ স্বহস্তে রাখিয়া, উহাকে নিজ আজ্ঞানুবর্ত্তী রাখিতে সচেষ্ট।

অবশ্য অদূর ভবিষ্যতে সমুদ্রপথে সৈন্য ও অস্ত্র-শস্ত্রাদি না পাঠাইয়া, আকাশমার্গে তাহা প্রেরণ সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু আকাশতরীকেও ত কতকগুলি দেশের উপর দিয়া উড়িয়া আসিতে হয়, এবং মধ্যে মধ্যে কোন আড্ডায় নামিয়া তেল লইতে ও আবশ্যকমত মেরামত আদি করিতে হয়। সেই-সব দেশ ইংরেজের হাতে থাকিলে, অন্ততঃ তাহারা মিত্রভাবাপন্ন থাকিতে বাধ্য হইলে, ইংরেজের সুবিধা। সংবাদপত্র পাঠকেরা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, যে, অনেক আকাশ-জাহাজ মিশরের রাজধানী কায়রোতে নামে, এবং কোন-কোনটা বাগ্‌দাদে নামে। এইজন্য যখন আকাশ-তরীর দিন আসিবে, তখনও মিশর এবং মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি দেশ ইংলণ্ডের

আজ্ঞাধীন বা অন্ততঃ প্রভাবাধীন থাকিলে ইংলণ্ডের খুব সুবিধা; না থাকিলে অত্যন্ত অসুবিধা।

আরব দেশও ভারতবর্ষে আসিবার পথে পড়ে। এই জন্য আরব দেশকেও ইংরেজ নিজের প্রভাবের অধীন রাখিতে চায়। নতুবা মরুভূমি-প্রধান আরব দেশ লোভের জিনিষ হইত না। তা' ছাড়া, অবশ্য আর-একটা কারণ আছে। আরব ও প্যালেষ্টাইনে মুসলমানদের প্রধান তীর্থস্থানগুলি অবস্থিত। এই উভয় দেশ ইংরেজের প্রভাবের অধীন থাকিলে ভারতীয় মুসলমানের উপর পরোক্ষভাবে ইংরেজদের কতকটা প্রভাব থাকিবে।—মনে রাখিতে হইবে, যে, ভারতে যত মুসলমানের বাস, কোন স্বাধীন মুসলমান দেশেরও লোক-সংখ্যা তত নহে।

ইংরেজ যে আজ ভারতবর্ষের রাজা, তাহার কারণ শুধু সাহস বা বাহুবল নহে; দূরদর্শিতা এবং সুদূর ভবিষ্যতে কি আবশ্যক হইবে অনেক আগে হইতে তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখা, তাহার অন্যতম কারণ। পাশ্চাত্য দেশের লোকদের বর্ত্তমান প্রাধান্যের একটি কারণ এই, যে, আগে লোকে যে-সব কাজ শুধু দৈহিক বলে করিত, এখন তাহা বৈজ্ঞানিক যন্ত্র দ্বারা বেশী-পরিমাণে ও অল্প সময়ে সম্পন্ন হয়। এই-সব যন্ত্র প্রধানতঃ ষ্টীম্ বা বাষ্পীয় শক্তিতে চলে। কয়লা পুড়াইয়া বাষ্প উৎপন্ন করিতে হয়। কয়লা ক্রমশঃ দুর্ল্ভ হইয়া আসিতেছে। পরে আরও দুর্ল্ভ হইবে। এখনই কেরোসীন ও তৎসদৃশ খনিজ তৈল পুড়াইয়া এরূপ বিস্তর যন্ত্র চালিত হইতেছে, যাহা পূর্ব্বে কেবল কয়লা পুড়াইয়া চালান হইত। পরে তৈলের অবশ্যপ্রয়োজনীয়তা আরো বাড়িবে। এইজন্য দূরদর্শী জাতিরা খনিজ তৈলের ক্ষেত্রগুলি এখন হইতে দখল করিতেছেন ও করিতে চেষ্টা করিতেছেন। পারস্য-দেশের তৈলক্ষেত্র ইংরেজদের এংলো-পার্সিয়ান্ অয়েল্ কোম্পানীর হাতে আছে। মোসল ও এশিয়ামাইনরের অন্য কোন কোন তৈলক্ষেত্রে ইংরেজ নিজ বর্ত্তমান অধিকারকে স্থায়ী করিবার চেষ্টায় আছেন।

মোট কথা, ভারতবর্ষকে হাতে রাখিবার জন্য ইংরেজ অন্য কতকগুলি দেশকে হাতে রাখিয়াছেন ও রাখিতে চান। সেইগুলি হাতছাড়া হইলে ভারতবর্ষ তাঁহার হাতছাড়া ও স্বাধীন হইতে পারে। আবার ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে ঐ-সকল দেশকে অধীন রাখার কোনও প্রয়োজন নাই। অতএব ভারতের ভাগ্য যে অন্য নানা দেশের ভাগ্যের সহিত জড়িত, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এশিয়ার রাষ্ট্রনীতির মত অন্যান্য মহাদেশের রাষ্ট্রনীতিরও ভারতের ভাগ্যের সহিত সম্পর্ক আছে।

—

শ্রীযুক্ত তারকনাথ দাস

শ্রীযুক্ত তারকনাথ দাসের নাম সংবাদপত্র-পাঠকদের নিকট পরিচিত। তিনি অনেক খবরের কাগজে লিখিয়া থাকেন। তাঁহার লিখিত "ইণ্ডিয়া ইন্ ওয়ার্ল্ড্ পলিটিক্স্" "বিশ্বরাজনীতিতে ভারতবর্ষ"-নামক একখানি উৎকৃষ্ট ইংরেজী পুস্তক আছে। তিনি সম্প্রতি আমেরিকার জর্জ টাউন্ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতি ও আন্তর্জাতিক আইনে পি-এইচ্ ডি উপাধি লাভ করিয়াছেন। এই বিষয়ে আমেরিকায় এই উপাধি হিন্দুদের মধ্যে বোধ হয় তিনিই প্রথমে লাভ করিলেন। ইহা বলিবার উদ্দেশ্য ইহা নহে, যে, এই বিষয়ে উপাধি লাভ করা অন্য সমুদয় বিষয়ে উপাধি লাভ অপেক্ষা কঠিন; উদ্দেশ্য এই, যে, এই বিষয়টির সম্যক্ জ্ঞানলাভ করা ভারতীয়দের পক্ষে খুব আবশ্যক; তজ্জন্য শ্রীযুক্ত তারকনাথ দাস, এ-বিষয়ে পথ-প্রদর্শক হইয়া ভারতীয় বিদ্যার্থীদের উপকার করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন তিনি বহুদিন হইতে যে দেশ সেবার কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, এখন তাহা আরও ভাল করিয়া করিতে পারিবেন।

তিনি ১৯০৬ সালে কলিকাতা হইতে জাপান যাত্রা করেন। তিনি আর্য্য-মিশন বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তথাকার ছাত্ররূপে তিনি "বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী ও তাহার কার্য্যকারিতা"-বিষয়ে বাংলা প্রবন্ধ লিখিয়া বীরেশ্বর সেন পদক প্রাপ্ত হন। প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হইয়া ফ্রীচার্চ্ ইন্ষ্টিটিউশ্যানে ভর্ত্তি হন, এবং তথা হইতে প্রবন্ধ রচনা করিয়া সরস্বতী ইন্ষ্টিটিউটের পদক প্রাপ্ত হন। প্রবন্ধের বিষয় ছিল, "ভারতের বর্ত্তমান ও অতীত কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য ও তাহার উন্নতির উপায়।"

জাপানে কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়া তিনি আমেরিকা যান এবং ১৯১০ সালে ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ উপাধি এবং অর্থনীতি ও রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞানে ফেলোশিপ লাভ করেন। পর বৎসর তিনি মাষ্টার অব্ আর্ট্‌স্ হন। তদ্ভিন্ন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিবার সার্টিফিকেট পান।

অতঃপর তিনি ক্যালিফর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। তাহার পর জাপানে শিক্ষকের কাজ করেন, এবং তুরস্কে ও এশিয়া-মাইনরে তথাকার রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেন। চীনদেশে থাকিতে তিনি "ইজ্ জাপান এ মেনেস্ টু এসিয়া?" "জাপান কি এসিয়ার ভয়ের কারণ?" নামক নিবন্ধ রচনা ও প্রকাশ করেন। তিনি "ফ্রী হিন্দুস্থান" নামক কাগজের সম্পাদক ছিলেন। এই কাগজেই প্রথমে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র-মণ্ডলের ন্যায় স্বাধীন ভারতের যুক্তরাষ্ট্র মণ্ডল-স্থাপনের প্রস্তাব প্রথম উত্থাপিত হয়। দাস মহাশয় আরো অনেক পুস্তিকা ও প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত তারকনাথ দাস

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমরা বিদেশে, বিশেষতঃ আমেরিকায় ও জাপানে, কৃতী ভারতীয় ছাত্রদের পরিচয় নিয়মিতরূপে প্রকাশ করিতাম। তাহার পর, আর উহার আবশ্যক নাই বুঝিয়া উহা আমরা বন্ধ করিয়াছি। শ্রীযুক্ত তারকনাথ দাস ভারতবর্ষীয় রাষ্ট্রনীতি ও তাহার সহিত অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রনীতির সম্পর্ক-বিষয়ে অধ্যয়ন ও নানা দেশে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া লিখিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে কিছু লেখা উচিত মনে হইল।

—

লোকমান্য টিলক

গত মাসে লোকমান্য টিলক মহোদয়ের মৃত্যু হয়। তদুপলক্ষ্যে ভারতবর্ষের নানা স্থানে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পিত হইয়াছে।

তিনি যৌবনে যে দেশহিতব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়াছিলেন। দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম, রাজপুরুষদের রোষ, কারাদণ্ড, দৈহিক ব্যাধি, কিছুতেই তাঁহাকে প্রতিজ্ঞাচ্যুত করিতে পারে নাই।

ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে যে-সকল ভারত-সন্তান কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে টিলক মহাশয়ের বিশেষত্ব এই, যে, ইংরেজের প্রকৃতি এবং ইংরেজের গবর্ণমেণ্টের প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহার কোন ভ্রম কখন জন্মে নাই। ইংরেজকে ও তাহার গবর্ণমেণ্টকে খুসি করিয়া বা তাহাকে ভুলাইয়া আমরা রাজনৈতিক অধিকার ও ক্ষমতা লাভ করিতে পারি, এ বিশ্বাস তাঁহার কোন কালে ছিল না। এইজন্য তিনি গবর্ণমেণ্টের মন জোগাইতে কখন চেষ্টা করেন নাই। গবর্ণমেণ্টও সেইজন্য তাঁহাকে নত করিতে বা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে বরাবর চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার

মেরুদণ্ড কিছুতেই নত হয় নাই, সেলাম করার অভ্যাস তাঁহার জন্মে নাই; তিনি ভগ্নও হন নাই।

তাঁহার মনের জোর কিরূপ ছিল, তাহা তাঁহার কারাগারে রচিত পুস্তক হইতে প্রমাণিত হয়। তাহা তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রমাণও বটে। যেরূপ পুস্তক কেহ স্বচ্ছন্দচিত্তে স্বগৃহে প্রয়োজনীয় পুস্তকরাজিপরিবৃত হইয়া রচনা করিলে প্রশংসাভাজন হন, তিনি তাহা কারাগারের নানা কষ্ট, অসুবিধা ও মানসিক অশান্তির কারণ সত্ত্বেও রচনা করিয়া দেশবিদেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন।

তাঁহার গীতাভাষ্য তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞতা ও ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচায়ক।

শিক্ষার অভাব এবং দারিদ্র্য বশতঃ ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকের দেশহিতকর প্রচেষ্টা সকলের সহিত এখনও যথেষ্ট যোগ নাই। টিলক যখন কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তখন এ বিষয়ে দেশের অবস্থা আরও খারাপ ছিল। তিনি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের যোগ স্থাপন, এবং দেশহিতকর প্রচেষ্টাসকলে সর্ব্বসাধারণের আগ্রহ উৎপাদন করিবার জন্য দেশী রীতি অবলম্বন করেন। গণপতি-মেলা ও শিবাজী-উৎসব তাঁহার দ্বারাই মহারাষ্ট্রে প্রবর্ত্তিত হয়। এই উৎসব দুটিকে গবর্ণমেণ্ট্ দু' চক্ষে দেখিতে পারিতেন না, এবং উহাদের উচ্ছেদ সাধনার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।

শিক্ষা বিস্তারের, ও তন্মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা টিলক মহাশয় সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি যৌবনে কয়েকজন বন্ধুর সহিত মিলিয়া দাক্ষিণাত্য-শিক্ষাসমিতি ও তাহার তত্ত্বাবধানে এক উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ইহা পরে ফার্গুসন্ কলেজ নামে পরিচিত হয়। এই সমিতির সভ্যেরা সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় মাত্র লইয়া শিক্ষকতা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। টিলকও অনেক বৎসর এই সর্ত্তে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার সঙ্গীদের সহিত কোন কোন বিষয়ে মতভেদ হওয়ায় তিনি সমিতি ও কলেজের সংস্রব ত্যাগ করেন।

ওকালতী করিয়া প্রভূত অর্থ-উপার্জ্জন করিবার মত শিক্ষা উপাধি ও যোগ্যতা টিলকের ছিল। তিনি নিজের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মোকদ্দমায় যেরূপ দক্ষতা এবং মানসিক স্থৈর্য্য ও দৃঢ়তার সহিত আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহা অসামান্য। তাহা হইতেই বুঝা যায়, যে, আইন ব্যবসার দ্বারা লভনীয় কোন ঐশ্বর্য্য সম্মান ও পদ তাঁহার সাধ্যাতীত ছিল না। কিন্তু তিনি তাঁহার শক্তি দেশের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। নিরাশ হইয়া তিনি তাহা করেন নাই, ইংরেজের উপর রাগ করিয়া করেন নাই, দলপতি হইবার জন্য করেন নাই, শিক্ষা সমাপনের পর লোকহিতব্রত গ্রহণ করিয়া তাহা করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার গৌরবময় স্মৃতি তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল।

তিনি নিজে লোকহিতের, ভারতবর্ষের উন্নতি-সাধনের, যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা কখনও পরিত্যাগ করেন নাই। কিন্তু তিনি ভাল করিয়া জানিতেন, যে, পথ এক নহে, বহু। সেইজন্য তিনি ভিন্নপন্থাবলম্বী মহাজনকে শ্রদ্ধা করিতে পারিতেন। তিনি নিজে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট আচার ও দেশাচার মানিয়া চলিতেন, রবীন্দ্রনাথ সকলস্থলে তাহা করেন না। তাহা সত্ত্বেও তিনি রবীন্দ্রনাথকে ইউরোপে ভারতবর্ষের কাজ করিতে অনুরোধ করিয়া পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রেরণ করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে জানান, যে, তিনি তাঁহার 'প্রণালী' অনুসারে কাজ করিতে অসমর্থ। টিলক বলেন, যে, তাহা তিনি জানেন, এবং ইহাও বলেন, যে, রবীন্দ্রনাথ নিজের পন্থা ত্যাগ করিয়া অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করেন, ইহা তিনি চান না; বরং তিনি তাহা করিলে দুঃখিতই হইবেন;—রবীন্দ্রনাথ নিজের প্রণালী ও মত অনুসারে ভারতবর্ষের বাণী পাশ্চাত্য দেশসকলে প্রচার করেন, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। রবীন্দ্রনাথ এই টাকা গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু ঘটনাটি হইতে টিলকের স্বদেশ-প্রেমের, সূক্ষ্মদর্শিতার ও ঔদার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। পথ, প্রণালী, ও পদ্ধতির ঝগড়ায় যাঁহারা লক্ষ্যের ও উদ্দেশ্যের একত্ব ভুলিয়া যান, টিলকের দৃষ্টান্ত হইতে তাঁহারা শিক্ষা লাভ করিলে দেশের কল্যাণ হয়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, টিলক শাস্ত্রীয় আচার ও লোকাচার মানিয়া চলিতেন। ইহা কতটা ধর্ম্মবিশ্বাসজাত, কতটাই বা রাজনৈতিক কারণ হইতে প্রসূত, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে যাহা জানি, তাহাতে তাঁহাকে গোপনে নিষিদ্ধমাংসভোজী ও প্রকাশ্যে মালা-তিলকধারী গোঁড়া হিন্দু মনে করিবার কোন কারণ নাই। "অস্পৃশ্যতা" বিধির অযৌক্তিকতা তিনি বুঝিতেন। ভিন্ন ভিন্ন জাতির উদ্ভবের পৌরাণিক কাহিনীর উল্লেখ করিয়া তিনি এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, যে, মানব দেহের প্রত্যেক অংশ যেমন অন্য সব অংশের সহিত যুক্ত, কোন অংশই অনাবশ্যক, হেয় ও অস্পৃশ্য নহে, তেমনি ব্রহ্মার শরীরের যে অঙ্গ হইতেই যাহার জন্ম হইয়া থাকুক না, কেহই হেয়, বর্জ্জনীয় ও অস্পৃশ্য নহে।

প্রত্যেক মানুষকেই ঈশ্বর স্বতন্ত্র আত্মা ও হৃদয় মন দিয়াছেন। তাহার উদ্দেশ্য এই, যে, কেহ কাহারও ঠিক নকল হইবে না। এইজন্য মহাজনগণের প্রত্যেক মত ও কার্য্যপ্রণালী অপর-সাধারণকে গ্রহণ করিতে হইবে, এমন নয়; কিন্তু তাঁহাদের জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য এবং তাহার জন্য সাধনা ও তপস্যা সকলেরই পক্ষে দৃষ্টান্তস্থল।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার মনুষ্যত্ব ও দয়ার জন্য চিরকাল পূজিত হইবেন। তাঁহার বিধবাবিবাহ চালাইবার চেষ্টার যাঁহারা সম্পূর্ণ বিরোধী তাঁহারাও তাঁহার জীবনের অন্য কোন কোন কাজের উল্লেখ করিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি জানাইতে বাধ্য হন। কারণ, তাঁহার গুণের আদর করিতে না পারিলে, তাহা যিনি না পারেন, তাঁহারই সেটা ত্রুটি বলিয়া গণিত হয়।

অথচ, বিধবাবিবাহবিরোধীরাও যদি ভাবিয়া দেখেন, তাহা হইলে তাঁহারাও বুঝিতে পারিবেন, যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় যে নারীজাতির দুঃখ মোচনার্থ ও কল্যাণ সাধনার্থ সমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আজীবন চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই অনন্যসাধারণ কীর্ত্তির রশ্মি-পাতেই তাঁহার জীবনের অন্য চেষ্টাগুলিকে মহিমান্বিত করিয়াছে।

তিনি অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে দেশীয় অধ্যাপকদের দ্বারা উচ্চশিক্ষাদানের প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। এইরূপ চেষ্টা অন্যেরাও করিয়াছেন, কিন্তু তাহার জন্য তাঁহার মত শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি অনেক বাংলা উৎকৃষ্ট বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, এবং অন্য পুস্তক রচনা দ্বারাও বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। এরূপ কাজ তাঁহার আগে ও পরে অন্য অনেকে করিয়াছেন। কেহ কেহ এবিষয়ে কোন কোন দিকে তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তথাপি তাঁহারা কেহ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত প্রাতঃস্মরণীয় হইতে পারেন নাই। দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট ও ব্যাধিগ্রস্ত লোকদের সেবা তাঁহা অপেক্ষা বেশী অনেকে করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা তাঁহার মত ভক্তিভাজন হইতে পারেন নাই। এইরূপ আরও অনেক বিষয়ে তাঁহার সহিত অন্য অনেকের তুলনা করা যাইতে পারে। কিন্তু সকল স্থলেই দেখা যাইবে, যে, এক এক বিষয়ে কেহ কেহ তাঁহার সমকক্ষ বা তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও, বাংলার মনুষ্যত্বের ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের যে স্থান, তাঁহাদের স্থান সেরূপ নহে।

বিধবাবিবাহের সফল চেষ্টার প্রবর্ত্তন করিলেন বাঙালী বিদ্যাসাগর বাংলায়, কিন্তু তাহা বাংলাদেশ অপেক্ষা এখন ভারতবর্ষের অন্য কোন কোন প্রদেশেই বেশী চলিতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী চেষ্টা হইতেছে পঞ্জাবে। যাহা হউক কিঞ্চিৎ সুখের বিষয় এই, যে, কিছু দিন হইতে বাংলা দেশেও বিধবাবিবাহের চেষ্টা আগেকার চেয়ে অধিক হইতেছে—বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর যে জেলায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই মেদিনীপুর জেলায়।

—

বিধবাবিবাহের প্রয়োজনীয়তা

হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহের প্রচলন যে কিরূপ আবশ্যক, তাহা হিন্দুবিধবাদের সংখ্যা হইতেই বুঝা যায়। ১৯২১ সালের সেন্সস্ অনুসারে হিন্দু বিপত্নীক ও বিধবা-

দের সংখ্যা বয়স অনুসারে নীচের তালিকায় দেওয়া হইল।

বয়স	বিপত্নীক	বিধবা
০-১	৯	৪৫
১-২	৩৪	২৫
২-৩	১৫	১২৪
৩-৪	৫৩	৩২৫
৪-৫	১৩৯	৯২০
৫-১০	৮৯৫	৮৭৫১
১০-১৫	২৩৭৫	৩৬৩২৩
১৫-২০	৬৫৬৯	৯৬৪৭০
২০-২৫	১৭১০৪	১৫১০৮৬
২৫-৩০	৩৮১০৭	২৩০৭৯৩
৩০-৩৫	৪৯৭২৬	২৬৫৪৮২
৩৫-৪০	৫৭৩৩১	২৬৪৮৬৯
৪০-৪৫	৬৯৮৭০	৩২০৯৩২
৪৫-৫০	৫৯৮৯২	২৩৪২৭৭
৫০-৫৫	৭০৪৪৮	২৯৮৭২৭
৫৫-৬০	৪৪০১০	১৫৫৯০৫
৬০-৬৫	৬০২৮৫	২২৮৩৫৬
৬৫-৭০	২৩৭৫৪	৭৫৬৭৯
৭০ ও তদূর্দ্ধ	৫৫৭৬৫	১৫৯৭২২
মোট সংখ্যা	**৫৫৬৩৬১**	**২৫২৮৮০৩**

নিঃসন্তানা বা সসন্তানা যে-কোন বয়সের সব বিধবার বিবাহ হওয়া উচিত, ইহা আমাদের মত নহে। যাঁহারা বালিকা বয়সে বিধবা হইয়াছেন, যাঁহাদের সন্তান হয় নাই, এবং যাঁহারা বৃদ্ধা বা প্রৌঢ়া নহেন, এইরূপ নিঃসন্তানা বিবাহযোগ্য বয়সের বালবিধবাদের বিবাহ তাঁহাদের মত লইয়া নিশ্চয়ই দেওয়া কর্ত্তব্য, ইহাই আমাদের মত।

এইরূপ মতপ্রকাশ সত্ত্বেও আমরা প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা বিধবাদেরও সংখ্যা কেন দিলাম, তাহার অনেক কারণ আছে। এখন যাঁহারা প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে বালবিধবা। তাঁহারা যখন বালিকা ও তরুণী ছিলেন, তখন যদি আবার তাঁহাদের বিবাহ হইত, তাহা হইলে দেশে মোট বিধবার সংখ্যা এবং প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা বিধবার সংখ্যা কম হইত। ভিন্ন ভিন্ন বয়সে বিপত্নীকদের ও বিধবাদের সংখ্যার পার্থক্য কিরূপ বেশী, তাহা দেখানও আমাদের উদ্দেশ্য। বিস্তারিত ভাবে তাহা বলা অনাবশ্যক। পাঠকেরা নিজেই তালিকা হইতে তুলনা করিতে পারিবেন, এবং বুঝিবেন, যে, কচি বয়সের ছেলে ও মেয়ের জন্য সামাজিক ব্যবস্থার পার্থক্য কিরূপ।

বাল্যকালে ও যৌবনেই যে বিপত্নীক ও বিধবাদের সংখ্যার এই পার্থক্য লক্ষিত হয়, তাহা নহে, প্রৌঢ় বয়সের সংখ্যাতেও ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। সর্ব্বাপেক্ষা শোকের কারণ অনুভূত হয়, বৃদ্ধ বিপত্নীক ও বৃদ্ধা বিধবাদের সংখ্যার তারতম্য দেখিয়া। ইহাতে বীভৎস রসেরও উদ্রেক হয়। প্রবীণা বিধবারা যে আবার বিবাহ করিবেন না, ইহা স্বাভাবিক ও আদর্শানুযায়ী। কিন্তু বৃদ্ধ বিপত্নীকদের সংখ্যা যে ঐ বয়সের বিধবাদের সংখ্যা অপেক্ষা অনেক কম, তাহাতে বুঝা যায়, যে, পুরুষেরা একনিষ্ঠতার আদর্শ পালনে মনোযোগী নহে।

বালবিধবাদের বিবাহ না হওয়ায় তাহাদের প্রতি অবিচার ও নিষ্ঠুরতা হয়। যে সমাজে এরূপ বিবাহ প্রচলিত নাই তাহার লোকসংখ্যা প্রয়োজনানুরূপ বৃদ্ধি পায় না, কোন কোন প্রকার পাপের প্রাদুর্ভাব হয় এবং তাহাতে সংশ্লিষ্টা বিধবাদের দৈহিক মানসিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অকল্যাণ হয়, এবং সামাজিক অপবিত্রতা বৃদ্ধি পায়। বিধবা ও পতিতা রমণী বুঝাইতে একই গ্রাম্য কথার প্রয়োগ যে বহু শতাব্দী ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, বালবিধবাদের চিরবৈধব্যের সহিত সামাজিক অপবিত্রতার সম্বন্ধের তাহা অন্যতম অখণ্ডনীয় প্রমাণ।

নিঃসন্তান বালবিধবাদের বিবাহ যে হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে বৈধ, তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার সহিত তর্ক করিয়া কেহই তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারেন নাই। এইজন্য অন্য নানা যুক্তিও উত্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু সবগুলাই অসার। কেহ কেহ আগে, সেন্সস্ রিপোর্ট না দেখিয়াই, বলিতেন, যে, আমাদের দেশে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদের সংখ্যা বেশী; অতএব বিধবাবিবাহ চালাইলে অনেক কুমারী অবি-

বাহিতা থাকিয়া যাইবার সম্ভাবনা। একথা তাঁহারা এখন বলেন কি না, জানি না। কিন্তু প্রকৃত কথা এই, যে, ভারতবর্ষ এবং তাহার অন্তর্গত বাংলা দেশে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম। শুধু মোটের উপর কম নহে। ভিন্ন ভিন্ন এক একটি হিন্দু জা'তের মধ্যেও কম। ১৯২১ সালের সেন্সস্‌ রিপোর্ট্‌ হইতে বঙ্গের কতকগুলি হিন্দু জাতির প্রতি হাজার পুরুষে কত স্ত্রীলোক আছে, তাহার তালিকা দিতেছি।

বৈষ্ণব	১১৬৭	আগুরী	৯৩৬
ভূমিজ	১০০৬	শুঁড়ী	৯৩১
বাউরী	১০০১	লোহার	৯২৮
বাগ্‌দী	৯৯৭	নাপিত	৯২৬
কৈবর্ত্ত	৯৮৫	বারুই	৯২৫
তাম্বুলী	৯৮০	রাজবংশী	৯২৫
ডোম	৯৭৫	কামার	৯২৪
সদ্‌গোপ	৯৭৩	সূত্রধর	৯২৩
কপালী	৯৭২	ধোবা	৯১৪
নমঃশূদ্র	৯৬৯	কায়স্থ	৯১১
হাড়ী	৯৬৮	কলু	৯০১
যুগী বা যোগী	৯৬৬	গন্ধবণিক	৮৯০
বৈদ্য	৯৬৫	ময়রা	৮৮৪
ক্যাওরা	৯৬৩	তাঁতি	৮৮১
পোদ	৯৬১	মুচী	৮৪৮
ভুইমালী	৯৬১	ব্রাহ্মণ	৮৪৫
শাহা	৯৫৩	গোয়ালা	৮০৭
সোনার বেনিয়া	৯৫৩	ভুইয়া	৮০১
পাটনী	৯৪৬	সোনার	৭৯৫
কোচ	৯৪১	রাজপুত (ছত্রী)	৫৫৮
কুম্‌হার	৯৩৮	দোসাধ	৪১৭

নিম্ন শ্রেণীর কয়েকটি জা'ত ছাড়া আর সব জা'তেই পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম।

বাঙালী হিন্দু পুরুষদের যে-রকম বয়সে বিবাহ হয়, এবং বাঙালী হিন্দু মেয়েদের যে-রকম বয়সে বিবাহ হয়, সেই সেই বয়সের পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা যদি সেন্সস্‌ রিপোর্টে দেখা যায়, তাহা হইলেও স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা বেশী দৃষ্ট হইবে।

অতএব যাঁহারা পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা বেশী এই ভ্রান্ত ধারণা বশতঃ বিধবা-বিবাহের বিরোধিতা করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই বিরোধিতা ত্যাগ করা ত উচিতই; অধিকন্তু তাঁহাদের এই তর্ক করা উচিত, যে, বিপত্নীকদের আর বিবাহ হওয়া উচিত নহে, কারণ তাহা হইলে অনেক পুরুষ চির-কুমার থাকিতে বাধ্য হইবে! বাস্তবিকও এখন পাত্রীর অভাবে বঙ্গে অনেক জা'তের পুরুষদের বিবাহ হওয়া কঠিন হইয়াছে, এবং অনেকের বিবাহ না হওয়ায় বংশ-লোপ হইতেছে। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইলে এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

সমুদয় ভারতবর্ষে গড়ে প্রতি হাজার পুরুষে ৯৪৫ জন স্ত্রীলোক আছে। বাংলা দেশে গড়ে প্রতি হাজার পুরুষে ৯৩২ জন স্ত্রীলোক আছে। বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে প্রতি হাজার পুরুষে ৯৪৫ জন স্ত্রীলোক আছে। বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে প্রতি হাজার পুরুষে ৯১৬ জন স্ত্রীলোক আছে। বাঙালী মুসলমানদের মধ্যেও পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম বটে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত থাকায় এবং হিন্দু-সমাজের মত তাহাদের মধ্যে জাতিভেদ না থাকায় পাত্রীর অভাবে বিবাহ না হওয়া মুসলমান-সমাজে দৃষ্ট হয় না। তা' ছাড়া, তাহারা অন্য যে-কোন ধর্ম্মাবলম্বী স্ত্রীলোককেও বিবাহ করিতে পারে।

ইংলণ্ডে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা প্রায় আঠার লক্ষ বেশী; কিন্তু তাহার জন্য কেহ সেখানে বিধবা-বিবাহ বন্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছে না।

অনেকের এইরূপ অদ্ভুত ধারণা আছে, যে, বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইলে সকল বিধবাই বিবাহ করিতে চাহিবে। স্ত্রীজাতি যে স্বভাবতঃ পুরুষ অপেক্ষা একনিষ্ঠ, এ-কথা তাহারা ভুলিয়া যায়। হয়ত এ-কথা তাহারা বিশ্বাস করিবে না। সেইজন্য একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। ইংলণ্ডে বিপত্নীকের বিবাহে এবং বিধবার বিবাহে কোন সামাজিক বাধা আগেও ছিল না, এখনও নাই। তাহা সত্ত্বেও দেখা যায়, যে, তথায় বিপত্নীক অপেক্ষা বিধবার সংখ্যা বেশী। অর্থাৎ বাধা না থাকিলেও সে-দেশে পত্নীর মৃত্যু হইলে যত পুরুষ পুনর্ব্বার বিবাহ করে, পতির মৃত্যু হইলে তত স্ত্রীলোক পুনরায় বিবাহ করে না। ঠিক সংখ্যাগুলি দিতেছি। ১৯১১ সালের সেন্সস্‌-অনুসারে ইংলণ্ড্‌ ও ওয়েল্‌সের পুরুষদের মধ্যে হাজারে ৩৮ জন বিপত্নীক, কিন্তু স্ত্রীলোকদের মধ্যে হাজারে ৭১ জন বিধবা।

—

লর্ড্‌দের মাথা-ব্যথা

বিলাতের পার্লেমেণ্টে লর্ড্‌দের অর্থাৎ অভিজাত ব্যক্তিদের সভায় কয়েক দিন আগে ভারত-হিতৈষণার ঝড় বহিয়াছিল। এই যে ভারত, ইহার মানে এ-দেশের আজীবন অল্পাশন-পীড়িত, বুভুক্ষিত, রোগ-ক্লিষ্ট, নগ্ন ও অর্দ্ধনগ্ন, গৃহহীন বা অস্বাস্থ্যকরগৃহবাসী, অশিক্ষিত ও অজ্ঞ কোটি কোটি লোক নহে; ইহার মানে মোটা বেতন-ভোগী প্রায় দেড় হাজার ইংরেজ সিবিলিয়ান্‌। তাহাদের

এবং তাহাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের ঘোর দুঃখে লর্ড্‌রা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। যদি সিবিলিয়ান্‌দের বেতন আরও বাড়াইয়া দেওয়া হয়, যদি তাহাদিগকে আরও শীঘ্র শীঘ্র ছুটি লইয়া মধ্যে মধ্যে ভারতীয় প্রজাদের প্রদত্ত জাহাজ-ভাড়ায় বাড়ী যাইতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে এই দুঃখের অবসান হইবে। নতুবা নহে।

ইংরেজদের মুখে বরাবর যেমন নিজেদের প্রশংসা শুনা যায়, লর্ড-সভায় এবারও তেমনি শুনা গিয়াছে। অধিকন্তু ইংরেজরা যেমন বরাবর বলেন, যে, তাঁহারা কেবল ভারতবর্ষের কোটি কোটি লোকদের কল্যাণার্থ, বিশেষতঃ নিম্ন-শ্রেণীর লোকদের কল্যাণার্থ, এদেশে বহু কষ্ট সহ্য করিয়া কাজ করেন, এবারও তাহা নানা মুখে ব্যক্ত হইয়াছে। এইজন্য আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে হইতেছে, যে, যদি তোমরা মানব-হিতৈষণা-বশতঃই এদেশে আসিয়া বাস কর, তাহা হইলে ক্রমাগত "টাকা, টাকা, টাকা, চাই টাকা" এই রব কেন উত্থিত হয়? তোমাদের দেশের লোকদেরই দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। যে-সব ইংরেজ খৃষ্টীয় মিশনারী এদেশে কাজ করেন, তাঁহারা সিবিলিয়ান্‌দের চেয়ে কম বেতন বরাবরই পাইয়া আসিতেছেন, এবং তাঁহারা অনেকে সিবিলিয়ান্‌দের চেয়েও দুর্গম অখ্যাত ও সঙ্গী-বিহীন জায়গায় কালযাপন করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, যে, তাঁহারাও ভারত হিতৈষী; সিবিলিয়ান্ ও তাঁহাদের গুণ-গায়করা বলেন, যে, সিবিলিয়ান্‌রাও ভারত-হিতৈষী। আমরা প্রত্যেকের কথাই সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতেছি। তাহা ধরিয়া লইয়া দেখিতেছি, যে, একদল ভারত-হিতৈষী কম বেতনে ভারতবর্ষে সুস্থ শরীরে কাজ করেন, এবং তাঁহাদের মধ্যেও খুব বিদ্বান্ ও কার্য্যক্ষম লোক আছেন; আর একদল লোক বরাবর খুব বেশী টাকা পাইয়া আসিতেছেন, অথচ তাঁহারা ক্রমাগত আরও বেশী টাকা ও সুবিধার জন্য চেঁচাইতেছেন। পাদ্‌রীদের মধ্যে অল্প লোক ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে বেতন পান; বাকী সকলের টাকা তাঁহাদের নিজের নিজের দেশ হইতে আসে—অবশ্য তাহাও হয় ত অনেকাংশে পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষ হইতে আহৃত। সিবিলিয়ান্‌দের টাকা সমস্তই ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে প্রাপ্ত। সেইজন্য আমাদের বোধ হয়, যে, আমাদের টাকায় যাহারা আমাদের কল্যাণ-সাধন করিতে চায়, তাহাদের হিতৈষণা ও কার্য্যকারিতার মাপকাঠি ক্রমশঃ অধিকতর টাকার জন্য চীৎকার। ইহাও হইতে পারে, যে, যেহেতু ভারতীয় শাস্ত্রে লেখা আছে, "অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্" "অর্থকে নিত্য অনর্থ বলিয়া ভাবিবে", সেইজন্য আমাদের পরম হিতৈষী সিবিলিয়ানেরা ও তাহাদের বন্ধুরা অর্থরূপ অনর্থের বোঝা আমাদের স্কন্ধ হইতে নামাইয়া নিজেদের স্কন্ধে লইতে সর্ব্বদাই ব্যগ্র। কারণ, এই অনর্থ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া আমরা যত দরিদ্র হইব, ততই আমাদের মঙ্গল হইবে।

লর্ড উইণ্টার্টন্ এশিয়াটিক্ রিভিউ কাগজে সিবিলিয়ান্‌দের কার্য্যকারিতার প্রশংসা শতমুখে করিয়াছেন; বলিয়াছেন, যে, ব্রিটিশ কর্ম্মচারীদের মত কর্ম্মদক্ষ ও কর্ম্মিষ্ঠ কর্ম্মচারী অন্য কোন দেশে নাই; তাহারা একেবারে "আনিম্পীচেব্‌ল্" অর্থাৎ অনিন্দনীয় এবং "ইম্পেকেব্‌ল্" অর্থাৎ নিষ্পাপ নিখুঁত। এ-বিষয়ে পরে কিছু বলিব। লর্ড-সভায় অনেক বক্তাও তাঁহাদের জা'তভাই সিবিলিয়ান্‌দের "এফিসিয়েন্সীর" খুব প্রশংসা করেন। "এফিসিয়েন্সীর" মানে ফলোৎপাদকতা, এবং "এফিসিয়েণ্ট্"এর মানে কার্য্যকারী, কার্য্য-তৎপর, কর্ম্মিষ্ঠ ইত্যাদি। ইংরেজরা বলেন, ভারতীয়েরা এফিসিয়েণ্ট নহে, তাঁহারা নিজে খুব এফিসিয়েণ্ট, এবং তাঁহাদের এফিসিয়েন্সী অতুলনীয়। এফিসিয়েন্সীর মানে যখন ফলোৎপাদকতা, তখন উহার পরিমাণ নির্ণয় করিতে হইবে উৎপন্ন ফলের দ্বারা।

এই ফল ইংরেজরা চান এক রকম, আমরা চাই আর এক রকম। সুতরাং সিবিলিয়ান্‌রা নিজেদের ও তাঁহাদের স্বদেশবাসীদের বিবেচনায় খুব এফিসিয়েণ্ট্ হইলেও আমাদের বিবেচনায় তাঁহারা এফিসিয়েণ্ট্ নহেন।

ইংরেজরা এদেশে আসিয়াছিলেন, টাকার জন্য, এবং এখনও আছেন প্রধানতঃ টাকার জন্য। তাঁহারা যে ক্ষমতা ও প্রভুত্ব চান, তাহার মাদকতা লোভনীয় হইলেও বস্তুতঃ তাহাও তাঁহারা চান টাকার জন্য। ভারতবর্ষের উপর রাজনৈতিক প্রভুত্ব থাকাতে তাঁহারা কেবল যে বড় বড় এবং অনেক মাঝারি ও ছোট চাকরীর বেতনগুলি পান, তাহা নহে; ভারতবর্ষের শিল্প-বাণিজ্যও খুব বেশী পরিমাণে তাঁহাদের হাতে থাকায় তাঁহারা প্রভূত ধনশালী হন। রাজশক্তি হাতে থাকিলে যে বাণিজ্যের সুবিধা কত বেশী হয়, তাহার বিস্তর দৃষ্টান্তের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। চীন ভারতবর্ষ অপেক্ষা বড় দেশ এবং উহার লোক-সংখ্যাও ভারতবর্ষ অপেক্ষা বেশী। কিন্তু চীন ইংরেজের অধীন নহে, ভারতবর্ষ ইংরেজের অধীন। ইহা মনে রাখিয়া উভয় দেশে বিলাত হইতে কত টাকা মূল্যের জিনিষ আমদানী হইয়া থাকে, তাহা দেখুন। এই অঙ্কগুলি ১৯২৩ সালের ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্‌স্ ইয়ার্ বুক্ হইতে গৃহীত। ১৯২০-২১ সালে (অর্থাৎ ১৯২০এর ১লা এপ্রিল হইতে ১৯২১এর ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরে) বিলাত হইতে ভারতবর্ষে দুইশত চারি কোটি উনষাট লক্ষ উননব্বই হাজার ছয় শত ষাট টাকার জিনিষ আসিয়াছিল; ১৯২১ সালে বিলাত হইতে চীনে চুয়াল্লিশ কোটি আটানব্বই লক্ষ ছয় হাজার

আট শত পঁয়তাল্লিশ টাকার জিনিষ আসিয়াছিল। অর্থাৎ চীন ভারতবর্ষ অপেক্ষা বৃহৎ ও জনাকীর্ণ দেশ হওয়া সত্ত্বেও উহাতে বিলাত হইতে ভারতের বিলাতী আম্‌দানির মোটামুটি এক পঞ্চমাংশ জিনিষ আসিয়াছিল। ভারতবর্ষের উপর ইংরেজের প্রভুত্ব থাকায় কেবল যে বিলাতের ইংরেজরা এদেশে বিস্তর জিনিষ পাঠাইয়া লাভবান্ হয়, তাহা নহে; ভারতের বড় বড় কার্‌খানা, খনি, যৌথ কারবার ও সওদাগরী হৌসের অধিকাংশ ইংরেজদের। ভারতে যত বিদেশী মাল সমুদ্র-পথে আসে, তাহার অধিকাংশ ইংরেজের জাহাজে আসায় কোটি কোটি টাকা ইংরেজের সিন্ধুকে যায়।

এই সব কথা বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে, যে, ইংরেজ এফিসিয়েন্সীর বিচার করিবে, স্বদেশের ও স্বজাতির উদ্দেশ্য-সাধনের দিক্ দিয়া। অর্থাৎ তাহারা দেখিবে, যে, সর্‌কারী কর্ম্মচারীরা দেশের শাসন-কার্য্য এরূপ ভাবে চালাইতে পারিতেছে কি না, যাহার দ্বারা দেশের উপর ইংরেজের প্রভুত্ব থাকে, ইংরেজের শিল্প-বাণিজ্যের সুবিধা হয়, চাকরী দ্বারা টাকা রোজ্‌গারটা মোটের উপর না কমিয়া বরং বাড়ে, ট্যাক্স্ বেশী আদায় হয়, সৈনিক বিভাগ ইংরেজের হাতে থাকে, দেশী লোকেরা ইংরেজকে প্রভু বলিয়া স্বীকার করিয়া তাহার অধীনতা-পাশে ঠাণ্ডা থাকে, ইত্যাদি। অবশ্য, এই-সব মূল উদ্দেশ্যের দিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়া এখন কাজও করিতে হইবে, এবং ভারতীয়-দিগকে এমন পদ ও "অধিকার"ও দিতে হইবে, যাহাতে তাহারা ও জগতের লোকেরা মনে করিতে পারে, যে, ইংরেজ-শাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য লোকহিত-সাধন।

এই মাপকাঠি অনুসারে বিচার করিলে বলিতে হইবে, যে, সিবিলিয়ান্ ও অন্য ইংরেজ কর্ম্মচারীরা খুব এফিসিয়েন্ট্, কারণ ইংরেজ-জাতি যে ফল চায়, তাহারা তাহা উৎপন্ন করিয়া আসিতেছে।

কিন্তু আমরা চাই অন্য রকম ফল। ইংরেজ ছাড়া জগতের অন্য সভ্য জাতিরাও চায় অন্য রকম ফল দেখিতে। আমরা কি চাই?

আমরা চাই, যে, দেশের সমুদয় নর-নারীর যথেষ্ট অন্ন-বস্ত্র ও স্বাস্থ্যকর বাসগৃহ থাকে। আমরা চাই, যে, দেশে একেবারে দুর্ভিক্ষ না হয়। ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হয়, তাহা ত চাইই না, ইউরোপ-আমেরিকার সভ্যদেশ-সকলে যেমন বর্ত্তমান যুগে মোটেই দুর্ভিক্ষ হয় না, ভারতের সেই অবস্থা চাই। ভারতবর্ষের লোকদের মধ্যে নানা পীড়ার প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী, মৃত্যুর সংখ্যা খুব বেশী, নগর ও গ্রামসকল, বিশেষতঃ গ্রামসমূহ, সাতিশয় অস্বাস্থ্যকর। এখানে ইনফ্লুয়েঞ্জার মত কোন মারী আসিলে, ইউরোপ অপেক্ষা মৃত্যুর হার বেশী হয়। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যে প্লেগ আসিয়াছে, তাহা এখনও চলিতেছে। এই-সব বিষয়ে আমরা ভারতবর্ষকে সভ্য স্বাধীন দেশ-সকলের সমান দেখিতে চাই। সভ্য স্বাধীন দেশ সকল অপেক্ষা শিক্ষায় ও জ্ঞানের বিস্তারে ভারতবর্ষ অত্যন্ত অধিক অনগ্রসর। আমরা চাই অন্ততঃ সকলের সমান হইতে। কৃষি শিল্প বাণিজ্যে, নিজের প্রয়োজনীয় নানা দ্রব্য উৎপাদনে, আমরা সমুদয় সভ্য দেশের সমকক্ষ হইতে চাই। আমাদের দেশ অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু হইতে রক্ষা করিবার ভার আমরা নিজে লইতে চাই এবং তদুপযুক্ত স্বাস্থ্য বল সাহস শিক্ষা ও সর্ব্ববিধ আয়োজন যাহাতে হয়, তাহার ব্যবস্থা আমরা করিতে চাই; অর্থাৎ সকল বিষয়ে স্বাধীনতা চাই। মানুষের মত খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে চাই। এই-সকল বিষয়ে আমাদের বেতন-ভোগী সিবিলিয়ানরা যদি আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায় হইয়া আমাদিগকে গন্তব্যপথে যাইতে সমর্থ করিতেন, অন্ততঃ সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে তাহাতে বাধা না দিতেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদের এফিসিয়েন্সীর প্রশংসা করিতে পারিতাম। ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল সভ্যজাতির গবর্ণ্‌মেণ্টের অধীনে আছে। কিন্তু ইহা সভ্যজাতির গবর্ণ্‌মেণ্ট্-শাসিত অন্য প্রত্যেক দেশ অপেক্ষা দরিদ্রতা, রোগ, অজ্ঞতা ও ভীরুতার জন্য অধিক অখ্যাতিভাজন। সুতরাং আমরা ইহার প্রধান সর্‌কারী কর্ম্মী সিবিলিয়ান্‌দিগকে কার্য্যদক্ষ না বলিয়া অত্যন্ত অকেজো বলিতে বাধ্য।

লর্ড্ ইঞ্চকেপ্ এবং অন্য অনেকে বলিয়াছেন, যে, ইহাদের খরচ খুব বাড়িয়াছে। তাহা সত্য। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সত্য, যে, ভারতবর্ষের সকল অধিবাসীরই খরচ বাড়িয়াছে, অথচ আয় তদনুরূপ বাড়ে নাই। সুতরাং সাংসারিক ব্যয়বৃদ্ধির ওজুহাতে ভারতবর্ষের মোটা মাহিনার চাকরদেরই পুনঃপুনঃ বেতন-বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। ভারতবর্ষের লোকদের গড় আয় সম্বন্ধে সর্‌কারী ও বেসর্‌কারী ইংরেজরা নানারূপ অনুমান করিয়া থাকেন। তাঁহারা দেখাইতে চান যে আয় খুব বাড়িতেছে। অথচ ইংরেজ-সর্‌কার এবিষয়ে দস্তুরমত সর্‌কারী ও বেসর্‌কারী বিশেষজ্ঞদিগের দ্বারা অনুসন্ধান করিতে নারাজ।

গড়ে প্রত্যেক ভারতবাসীর টাকায়, পরিমিত আয় যদিই বা বাড়িয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও শুধু তাহা হইতেই ভারতীয়দের আয় বাড়িয়াছে বলা চলে না। দেখিতে হইবে, যে, আগে যাহার যত টাকা আয় ছিল, তাহাতে সে যত খাদ্য বস্ত্র প্রভৃতি ক্রয় করিতে পারিত, এখনকার আয়ে তাহা অপেক্ষা কম, বেশী, না তাহার সমান খাদ্যবস্ত্রাদি কিনিতে পারিতেছে। আমরা নিজে যতটা বুঝিতে পারি, এইরূপ বিচার করিলে

দেখা যাইবে, যে, মোটের উপর ভারতবর্ষের লোকেরা ক্রমশঃ দরিদ্রতর হইতেছে।

সার্ শঙ্করন্ নায়ার ভারত-গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ সদস্য ছিলেন। ভারত-গবর্ণমেণ্টের খয়েরখা হইয়া "গান্ধী ও অরাজকতা" নামক পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তাহার প্রণয়ন জন্য তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে অনেক উপকরণ পাইয়াছিলেন, এবং গবর্ণমেণ্ট্ উহার অনেক খণ্ড ক্রয় করিয়াছিলেন। এহেন শঙ্করন্ নায়ার বিলাতের একখানি কাগজে লিখিয়াছেন, যে, ভারতবর্ষ ক্রমশঃ দরিদ্রতর হইতেছে।

—

ইংরেজের কার্য্যকারিতা

লর্ড্ উইণ্টার্টন্ তাঁহার এসিয়াটিক্ রিভিউয়ের প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, যে, এসিয়াবাসীরা কখনও ইংরেজের মত এফিসিয়েণ্ট্ হইতে পারিবে না। তাহার কোন প্রমাণ তিনি দেন নাই। আমরা কিন্তু একটা প্রশ্ন করিতেছি। পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে জাপানীরা মধ্যযুগের অবস্থা হইতে কল-কারখানা বাণিজ্যজাহাজ যুদ্ধজাহাজ শিল্প বাণিজ্য কৃষি প্রভৃতি বিষয়ে এবং রাষ্ট্রীয় বিষয়ে পৃথিবীর চারিটি কি পাঁচটি শক্তিশালী জাতির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। ইউরোপের বা পৃথিবীর অন্য কোন জাতি এত অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ কার্য্যকারিতা কখনও দেখাইতে পারিয়াছে কি?

ইংরেজ খুব এফিসিয়েণ্ট, আমরা নহি; এই কারণে উইণ্টার্টন্ চিরকাল ইংরেজের ভারতের প্রভু থাকিবার দাবী করেন। অনেক বিষয়ে জার্ম্যান্‌রা, আমেরিকান্‌রা, ফরাসীরা ইংরেজদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং ন্যায়তঃ উহাদেরও ইংলণ্ডের প্রভু হওয়া উচিত।

উইণ্টার্টন্ দয়া করিয়া বলিয়াছেন, যে, যদিও ভারতীয়েরা এফিসিয়েণ্ট নহে, তথাপি ইহাও স্বীকার্য্য যে ইউরোপের কোন কোন জাতিও তাহাদের মত কম এফিসিয়েণ্ট্। তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই, যে, এই-সব "অকেজো" অথচ স্বাধীন ইউরোপীয় জাতিদের উপর "কেজো" ইংরেজ প্রভুত্বের দাবী কেন করে না? তাহারা "অকেজো" হইয়াও যদি স্বাধীন থাকিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদেরই সমান কম-এফিসিয়েণ্ট আমরা চিরদাসত্ব ব্যতীত আর কিছুর যোগ্য বলিয়া কেজো ইংরেজদের দ্বারা স্বীকৃত হইল না কেন? উইণ্টার্টন্ বলেন, যে পপলারে যে ভাবে স্থানিক স্বায়ত্ত শাসন চলে, তাহার সঙ্গে ভারতবর্ষের বিশৃঙ্খলতম মিউনিসিপালিটিরও তুলনা করিলে তাহা নিকৃষ্ট মনে হইবে না। এই পপ্‌লার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী লণ্ডনের একটা অংশ। ইংরেজরাই তথাকার কাজ চালায়। অথচ উইণ্টার্টন্ একই মুখে ইংরেজকে কেজোতম এবং এসিয়াবাসীদিগকে অকেজো বলিয়াছেন।

—

উইণ্টার্টনের অসাবধানতা

উইণ্টার্টন্ দু একটা সত্যি কথা হঠাৎ বলিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই, যে, শুধু বেতন কম বলিয়াই যে ইংরেজরা ভারতে কাজ করিতে অনিচ্ছুক, তাহা নহে। তাহারা ভারতীয়দের অধীনে কাজ করিতে চায় না। তবে যদি তাহাদের পাওনাটা কিছু বাড়াইয়া দাও, তাহা হইলে, জানই ত, পেটে খেলে পিঠে সয়!

আরও দুটা সত্যি কথা তাঁহার প্রবন্ধে পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন :—

"That hard work, difficult conditions, and indifferent pay do not of themselves act as a deterrent to Civil Service overseas is proved by the case of Africa."

তাৎপর্য্য। শক্ত কাজ ও খাটুনি, পারিপার্শ্বিক অবস্থার কঠোরতা এবং বেতনের অপ্রচুরতা সত্ত্বেও ইংরেজরা যে সাগরপারে সিবিলিয়ানী করিতে পরাঙ্মুখ হয় না, আফ্রিকায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

অতঃপর তিনি দেখাইয়াছেন, যে, উগাণ্ডা, কেন্যা, সুদান্, ও উত্তর রোডেসিয়াতে চাকরী করিবার নিমিত্ত ইংরেজের অভাব হয় না। তাঁহার নিজের কথা এই :—

"I can scarcely conceive a harder life than that led, say by a British member of the Soudan Civil Service in the Equatorial Provinces. . . ."

"বিষুব-রেখার সন্নিহিত গ্রীষ্মপ্রধান প্রদেশ-সকলে সুদান সিবিল সার্বিসের ব্রিটিশ জাতীয় কোন চাকরোর অপেক্ষা ক্লেশকর জীবনের কথা আমি ধারণা করিতে পারি না বলিলেও চলে।"

অথচ সেখানেও লোক জুটে। কিন্তু ক্রমাগত অধিক হইতে অধিকতর বেতন না দিলে কেবল ভারতবর্ষেই লোক জুটে না!

ইংরেজদের নিজের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী যুবকদেরও যে আজকাল জীবিকা উপার্জ্জনের পথ খুব সংকীর্ণ এবং কম টাকাতেও অনেকে ভারতে আসিতে পারে, উইণ্টার্টন্ তাহা লিখিয়াছেন; অথচ বলিয়াছেন, আর কিছু জুটে না বলিয়া নাচার হইয়া এই-সব কৃতী যুবক ভারতীয় সিবিল্ সার্বিসে প্রবেশ করে, তাহা তিনি চান না! এর মানে ইহা ভিন্ন আর কি, যে, আর কোথাও জোর করিয়া বেশী বেতনের বন্দোবস্ত করিবার জো নাই, ভারতবর্ষে আছে, অতএব; যত বেশী পার ভারতবর্ষের নিকট হইতে আদায় কর। উইণ্টার্টনের একেবারে বুদ্ধি নাই, বলা যায় না; কারণ তিনি স্বদেশবাসীদিগকে ঠারে ঠোরে বলিয়াছেন, 'ভারতবর্ষের উপর বেশী চাপ দিও না; জানই ত বিলাতে সব বৃত্তি ও

ব্যবসাতেই জীবন অধিকতর আরামদায়ক না হইয়া কঠোরতর হইয়াছে। তাঁহার কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়া এই মন্তব্য শেষ করি।

"It must be remembered how small are the entrances to a livelihood open to the successful University man in the present time of world-wide trade depression, and though no one wishes to see men go into the Indian Civil Services because there is nothing else for them to do, it is legitimate to emphasise the fact that the war has made life in every professsion harder than easier."

—

জম্‌শেদ্‌পুরে আরও ইউরোপীয় আম্‌দানী।

জম্‌শেদ্‌পুরে তাতা কোম্পানী যে বৃহৎ লোহা ও ইস্পাতের কার্‌খানা স্থাপন করিয়াছেন, তাহা হইতে দেশের খুব উপকার হইতে পারে। কিন্তু এই কার্‌খানার কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বরাবর এই অভিযোগ শুনা যাইতেছে, যে, তাঁহারা ভারতীয়দিগকে সব রকম কাজ শিখাইবার বন্দোবস্ত করেন নাই, ভারতীয়দিগকে যথেষ্ট উৎসাহ দেন না, এবং অত্যন্ত বেশী বেশী বেতনে ইউরোপীয় ও আমেরিকান্ কর্ম্মচারী রাখেন। যুদ্ধের সময় জার্ম্যান্‌দিগকে বিদায় দিতে হইয়াছিল। তখন হইতে তাহাদের অনেক কাজ সাঁওতালরা করিতে সমর্থ হইয়াছে; সুতরাং অন্য সব কাজও যে ভারতীয়েরা শিখিতে পাইলে করিতে পারিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার যথেষ্ট বন্দোবস্ত কোথায়?

ক্যাথলিক্ হেরাল্ড্ অব্ ইণ্ডিয়া সংবাদ দিতেছেন, যে, ইংলণ্ড হইতে আশীজন ফোর্‌ম্যান্ বা সদার্‌মিস্ত্রী জম্‌শেদ্‌পুরে কাজ করিতে আসিতেছে।

—

হিন্দু-মুসলমানের মিলন

সকলেই উচ্চকণ্ঠে বলিতেছেন, যে, হিন্দু-মুসলমানের মিল্ না হইলে স্বরাজ লাভ করিতে পারা যাইবে না;—যেন তাহাতেই হিন্দু-মুসলমানের মিলন হইয়া যাইবে। স্বরাজ বা অন্য কোন বস্তু অপেক্ষা হিন্দুর চোখের সাম্‌নে গোরু জবাই করিবার উচ্চ অধিকার যতদিন বিস্তর মুসলমান শ্রেষ্ঠ মনে করিবে, এবং স্বরাজ বা অন্য কোন বস্তু অপেক্ষা মুসলমানদের পর্ব্বে প্রকাশ্য-গোবধ নিবারণ করা অনেক হিন্দু বেশী আবশ্যক মনে করিবে, ততদিন পূর্ব্বোক্ত উচ্চ চীৎকারে কোন ফল হইবে না। এক দল লোক বরং নরহত্যা করিবে তাও সই, তবু তাহারা নিজেদের বাঞ্ছিত প্রকারে গোবধ করিবেই, এই তাহাদের প্রতিজ্ঞা। আর এক দল মানুষ বরং নরহত্যা করিবে, তবু পূর্ব্বোক্ত দলের পূর্ব্বোক্ত প্রকারে গোবধ বন্ধ করা তাহাদের চাই-ই। এমন সুবুদ্ধি লোক যে-দেশে আছে, সে-দেশের বর্ত্তমান মনিবরা লর্ড-সভায় এবং আরো কত জায়গায় ত বলিবেই, যে, "আমরা ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া আসিবামাত্র ভারতীয়েরা পরস্পরের টুঁটি চাপিয়া ধরিবে।"

স্বরাজ পাওয়া যাক্ বা না যাক্, সব সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব চাই; নতুবা কোন সম্প্রদায়েরই ধর্ম্ম, উন্নতি বা ঐশ্বর্য্যলাভ হইবে না;—ঐশ্বর্য্যলাভ হইবে, সকল গোলামদলের মনিব ইংরেজদের। ধর্ম্মের কথা এখানে না তুলাই ভাল। কারণ ঝগড়ার মধ্যে সাত্ত্বিকতার লেশমাত্র নাই। কেহ ঈশ্বরের নামে গোরু মারিয়া সুখে তাহার মাংস ভোজন করিলে কিছুমাত্রও ধর্ম্ম হয় না, অপর কেহ ঈশ্বরের নামে ছাগল বলি দিয়া সুখে তাহার মাংস খাইলে তাহাতেও ধর্ম্ম হয় না। নিজের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি-সমূহকে বলি দিয়া বা বশে রাখিয়া জীবন যাপন করিলে তবে ধর্ম্ম হয়। ঈশ্বর কোন জন্তুর মাংস বা কোন নিরামিষ নৈবেদ্য ভোজন করেন না। তাঁহার সৃষ্ট কোন জীবকে মারিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা অপেক্ষা ভ্রম আর নাই।

প্রাচীন ইহুদীদের ধর্ম্মেও প্রাণী বলি দিবার ব্যবস্থা আছে। ঐতিহাসিক জোসেফাস্ লিখিয়াছেন, যে, এক বৎসর জেরুজালেমের মন্দিরে আড়াই লাখ মেষ বলি দেওয়ায় রক্তের স্রোত বহিয়াছিল। ইহা অত্যুক্তি হইতে পারে। কিন্তু বলিদান খুব বেশী হইত। ইহুদীরা এখনও বলি দেয় কি না জানি না। কিন্তু তাহাদের ধর্ম্ম হইতে উদ্ভূত খৃষ্টীয় ধর্ম্ম হইতে ঈশ্বরের নামে প্রাণী বলি দেওয়া উঠিয়া গিয়াছে। জ্ঞানবিস্তার ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে উচ্চতর আদর্শের উপলব্ধি সহকারে অন্যান্য ধর্ম্ম হইতেও জীব হত্যা দ্বারা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করিবার ইচ্ছা উঠিয়া যাইবে।

আমরা কাহারও ক্রিয়াকলাপে বাধা দিতে চাই না। মুসলমানরা যত ইচ্ছা গো-বধ করুন; যখন ইহার অনিষ্টকারিতা বুঝিবেন, তখন ছাড়িয়া দিবেন। আমরা তাঁহাদের মস্‌জিদের সম্মুখে কোন বাদ্য বাজাইতে, গান গাহিতে বা টুঁ শব্দও করিতে চাই না। কিন্তু তাঁহারাই ভাবিয়া দেখুন, যে, মোটরের ভেঁপু, ট্রামের ঘর্ঘর শব্দ, মহরমের ঢাক ইত্যাদিতে যদি মস্‌জিদের কোন ক্ষতি না হয়, তাহা হইলে অন্য রকম গোলমালের জন্যই বা উত্তেজিত হইয়া সাংঘাতিক মারপিট করা অনিবার্য্য কি না।

হিন্দুদের মধ্যে একদল লোক আছেন, যাঁহারা স্বরাজ মানে এখনও হিন্দুস্বরাজ বুঝেন। আবার মুসলমানদের মধ্যেও বিস্তর লোকের আচরণে এই মনের ভাবই প্রকাশ পায়, যেন স্বরাজ পাওয়া ও ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা বিশেষভাবে হিন্দুদেরই পিতৃমাতৃদায়। ইহার কোনটাই

সত্য নয়। ভারতবর্ষের প্রত্যেক ছোট বড় সম্প্রদায়ের লোক মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া দেশের কাজ চালাইতে সমর্থ হইলে তাহার নাম হইবে স্বরাজ। ধর্ম্মসম্প্রদায় অনুসারে কোন ভাগাভাগি তাহাতে থাকিতে পারে না। কোন সময়ে এক সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে খুব যোগ্য লোক বেশী থাকিতে পারে, অন্য সময়ে অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগ্য লোক বেশী থাকিতে পারে।

মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেক লোক যদি মনে করেন, যে তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে খুসী না করিলে তাঁহারা স্বরাজ হওয়ায় মত দিবেন না, এবং তাহা হইলে স্বরাজও হইবে না, অতএব হিন্দুরা তাঁহাদের সব দাবীতে সম্মত হইতে বাধ্য, তাহা হইলে ইহা তাঁহাদের ভ্রম। ধর্ম্মসম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে ভারতীয় অনেক লোকের মধ্যে স্বাধীনতাস্পৃহা ও শক্তি যখন জাগিবে, তখন কেহ তাহাদের চেষ্টায় বাধা দিতে পারিবে না। সামান্য দুএকটা দৃষ্টান্ত লউন। লর্ড মিণ্টোর আমলে যে ভারতশাসনসংস্কার হইয়াছিল, তাহা স্বরাজ নহে, কিন্তু সামান্য প্রগতি বটে। তাহা ঘটিয়াছিল প্রধানতঃ হিন্দুদের চেষ্টায় ও আন্দোলনে। মুসলমানেরা তখন হিন্দুদের আন্দোলনে কচিৎ যোগ দিতেন। যখন মিণ্টো দেখিলেন, হিন্দুদিগকে কিছু একটা না দিলে চলে না, তখন তিনিই গোপন আহ্বানে মুসলমানদের প্রতিনিধিদিগকে নিজের নিকটে হাজির করাইয়া সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বরূপ অনর্থ ঘটাইলেন। ইহা মর্লীর জীবন-স্মৃতিতে আছে, এবং মৌলানা মহম্মদ আলী তাঁহার অভিভাষণে স্বীকার করিয়াছেন। আবার যখন মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড্ সংস্কার হইল, তাহাও প্রধানতঃ হিন্দুদের আন্দোলনে ও অন্য নানাবিধ কারণে যাহার মূলে প্রধানতঃ হিন্দুরা ছিল। কিন্তু ভাগ মুসলমানেরাও পাইলেন। সেইরূপ ভবিষ্যতে প্রকৃত রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রধানতঃ কোন এক সম্প্রদায়ের চেষ্টাতেই ভারতীয়েরা পাইতে পারে, যদিও তাহার লাভটা সকল সম্প্রদায়ের লোকেরাই পাইবেন।

ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসে মুসলমানদের বাধা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের কোন কোন অংশ আত্মকর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছিল। অতীতে যাহা যুদ্ধের দ্বারা ঘটিয়াছিল, এবং ভারতবর্ষের কোন কোন অংশে ঘটিয়াছিল, বর্ত্তমানে তাহা সমগ্র ভারতে বিনা যুদ্ধে, এবং তৃতীয় পক্ষ ইংরেজের বাধা সত্ত্বেও, ঘটাইতে হইবে। এইজন্য এই কঠিন কার্য্যে সকল সম্প্রদায়ের লোকের আন্তরিক যোগ ও সমবেত চেষ্টা চাই। কিন্তু যদি কোন সম্প্রদায় সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি-বশতঃ মনে করেন, যে, তাঁহাদের বিশেষ সুবিধা না হইলে বরং তাঁহারা ইংরেজের গোলাম থাকিবেন, তথাপি অন্য সব ভারতীয়ের স্বাধীনতা-প্রচেষ্টায় যোগ দিবেন না, তাহা হইলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলিতে হইবে, যে, তাহা তাঁহাদের ভ্রম। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবেই, ইহা কেহ আট্‌কাইয়া রাখিতে পারিবে না। অবশ্য সকলে যোগ দিলে যত সহজে হইত, তত সহজে হইবে না, এই প্রভেদ আছে। তাহা সত্ত্বেও লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর হইতে হইবে। যিনি ইহাতে যোগ দিবেন না, তিনি নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন, পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবেন।

—

বিপ্লবের ভুলমন্ত্র

আজকাল দেখা যাইতেছে, যে, সকল বিষয়েই ভারতবর্ষ খুব দ্রুতগতিতে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও তাহার শাখা-প্রশাখার মধ্যে জড়িত হইয়া পড়িতেছে। যদিও সর্ব্বক্ষেত্রে ভারতীয় স্বীকার করিতে চায় না, যে, সে পাশ্চাত্যের অনুকরণ করিতেছে, তবুও তার স্বাদেশিকতার পাত্‌লা ওড়্‌নার ভিতর দিয়া অতি অল্প আয়াসেই, সে যে হ্যাট্‌কোটপরিহিত, এটা ধরা পড়িয়া যায়। পাশ্চাত্য দর্শনের মাথায় পাগ্‌ড়ি বাঁধিয়া তাহাকে বেদান্ত বলিয়া চালান যায় বটে; তবে কতক্ষণ এবং কাহার নিকট, তাহা না বলাই ভাল। প্রশ্ন উঠিতে পারে, "পাশ্চাত্য সত্যও সত্য এবং ভারতীয় সত্যও সত্য; তবে কি করিয়া বলি, যে, ভারতীয় পাশ্চাত্যকে অনুকরণ করিয়াই সে সত্যে উপনীত হইয়াছে? সে অনায়াসেই আপনা হইতেই ত তাহা আবিষ্কার করিতে পারে?"

উত্তম কথা; কিন্তু যদি দেখা যায়, যে, আবিষ্কারটা একটা মারাত্মক রকম অসত্য অর্থাৎ ভুল এবং ভুলটা একই প্রকার কোন একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য একই ভাবে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে ব্যবহৃত হইতেছে ও পাশ্চাত্যে সেই ভুলটা প্রথম যখন করা হইয়াছিল তখনকার কাল হইতে আজ অবধি নিত্য নব আবিষ্কৃত সত্যকে অবহেলা করিয়াও তাহাকে দাঁড় করাইয়া রাখা হইয়াছে—উদ্দেশ্য-সিদ্ধির খাতিরে; তাহা হইলে বলিতে ইচ্ছা করে, যে, ভুলটা উভয় ক্ষেত্রে একই হওয়ার কারণ ঘটনাচক্র নয়, তাহা অনুকরণ করা এবং তাহার মূলে উদ্দেশ্য সিদ্ধি।

আজ বহুকাল ধরিয়া পাশ্চাত্যে ধনিক ও শ্রমিকে লড়াই বাধিয়াছে। প্রথমে ধনিক যথার্থই শ্রমিকের উপর অত্যাচার করিত, তাহার ক্ষুধার অন্ন কাড়িয়া ও তাহার শীতবস্ত্রের উপর হস্তক্ষেপ করিয়া অশ্বারোহণে শৃগাল তাড়াইয়া কৃষকের ফসলের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া বেড়াইত। কিন্তু আজ আর সে দিন নাই। ক্রমাগত সংঘবদ্ধ হইয়া বিবাদ করিয়া শ্রমিক তার নিজস্ব প্রায় সবটাই পাইয়াছে এবং শীঘ্রই সবটাই পাইবে, এরূপ আশা করা যায়। এই ঝগড়া-বিবাদের জের এখনও চলিতেছে

এবং ফলে পুরাতন সব ধনিকের অত্যাচার-কাহিনী এখনও পাশ্চাত্য শ্রমিকরা উপকথার মতই শিশুকাল হইতে শুনিতে শুনিতে বাড়িয়া উঠে। ঝগড়ার ধাক্কায় পাশ্চাত্য অর্থনীতি বিজ্ঞাপনী-সাহিত্যের নীতি অনুসরণ করিতেছে। ধনিকের বন্ধু বলিতেছে, শ্রমিক আরামে বসিয়া, কুঁড়েমী করিয়া সমাজের সর্ব্বনাশ করিতে চায়; শ্রমিকের বন্ধু বলিতেছে, ধনিক বসিয়া সকলের রক্ত শুষিয়া অকারণ উৎপীড়নের কেন্দ্ররূপে জোঁকের মত ফুলিয়া উঠিতেছে।

আসলে উভয়েই করিয়াছে ভুল। সামাজিক অর্থনীতির দিক্ দিয়া ধনিক ও শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবী দুইএরই প্রয়োজন আছে। প্রথম দ্বিতীয়কে বঞ্চিত করিলেও তাহা দোষ এবং দ্বিতীয় প্রথমকে বঞ্চিত করিলেও তাহা দোষ। কিন্তু ঝগড়ার খাতিরে শ্রমিকবন্ধু অর্থনৈতিক বিপ্লববাদী ক্রমাগত চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "ধনিক আমাদের ও সমাজের শত্রু—তাহাকে দূর করিয়া দাও।"

ইহার মূলে অবশ্য রহিয়াছে ধনিকের অত্যাচার, কিন্তু রোগীকে হত্যা করা রোগের প্রতিকার নয়। যদি ধনিকগণ দুষ্টই হয়, তাহা হইলে তাহাদের দোষ নষ্ট করাই প্রয়োজন, তাহাদের সমাজ হইতে নিঃশেষে দূর করিলে লাভ ত নাইই, বরং সমাজ চলা দুষ্কর হইয়া উঠিবে। পাশ্চাত্যের অনেক দেশেই এখনও ধনিকবংশ-নির্বংশবাদ একটা ধর্ম্মের মতই প্রায় শ্রমিক-জগতে জাগ্রত হইয়া রহিয়াছে—কিন্তু অল্পে অল্পে সকলেই ইহার নির্ব্বুদ্ধিতা বুঝিতে পারিয়া শান্ত হইয়া আসিতেছে। রুশিয়া নিজের ভুল বুঝিয়া ক্রমশঃ তাহা সংশোধন করিতেছে। বর্ত্তমানকালে পাশ্চাত্যের কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই ভাবেন না, যে, সমাজের সকল ব্যক্তিকে ধরিয়া জোর করিয়া ইট বহান অথবা হাতুড়ি পিটানর কাজ করাইয়া লইলেই সমাজের অনন্ত উন্নতি হইবে। ইহাও কেহ ভাবেন না, যে, সামাজিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির উপায় সকল ব্যক্তিকে এক ছাঁচে ঢালিয়া তথাকথিত সাম্যনীতির প্রতিষ্ঠা অথবা সকল পাকস্থলীর অথবা স্নায়ুর অবস্থা-নির্বিশেষে সর্ব্বজনের একই খাদ্য, বস্ত্র, ও জীবনযাত্রা-প্রণালী নির্দ্ধারণ করা।

আজকাল আমাদের দেশে পাশ্চাত্যের ঢেউ আসিয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাহার মাথায় পাগ্ড়ি থাকিলেও আমরা তাহার পাশ্চাত্য রূপ ধরিয়া ফেলিয়াছি। ধনিক-শ্রমিক-সংঘাতের ক্ষেত্রেও দেখিতেছি, ভারতবর্ষে পাশ্চাত্যের পুরাতন কথাগুলি নূতন উচ্ছ্বাস ও উৎসাহের সাজ পরিয়া আসিয়াছে।

ভারতে শ্রমিক বড়ই উৎপীড়িত—কে নয়? শ্রমিকের উন্নতি হয়, আমরা সকলেই চাই। কিন্তু তাই বলিয়া অর্থনীতি ও সমাজনীতির শ্রাদ্ধ আমাদের চোখের সম্মুখে সম্পন্ন হয়, ইহা ত চাই না। শ্রমিককে উন্নত করিতে হইবে বলিয়া সকল মিথ্যা ও অর্দ্ধ-সত্যকে মানিয়া লইতে হইবে, তাহা নয়। ভারতবর্ষে পাশ্চাত্যের অনুকরণে অর্থনীতি ও সমাজনীতি-জ্ঞানহীন একদল লোক নানাপ্রকার আজগুবি কথা বলিতে সুরু করিয়াছে। তাহাদের মতে, ১। ইতিহাস শুধু অর্থনৈতিক কারণেরই ফল, ২। সকল দুঃখের শেষ হইবে যদি সমাজে অর্থনৈতিক সাম্যবাদ আনয়ন করা যায়, ও ৩। সকল অর্থ ও ঐশ্বর্য্যের মূলে আছে শুধু শ্রমিকের শ্রম।

আমাদের সম্মুখে একখানা এক পয়সা মূল্যের সাপ্তাহিক রহিয়াছে। তাহাতে দেখিতেছি, ইয়োরোপীয় ঐ চির-পুরাতন তিনটি ভুল ভাল করিয়া প্রচার করিবার চেষ্টা হইয়াছে। দেখিতেছি, "এই যে দেশব্যাপী বিরাট অসন্তোষ, এই যে দারিদ্র্যের মর্ম্মন্তুদ জ্বালা", ইহার মূলে না কি "ধনী সম্প্রদায়ের বাড়ী, গাড়ী, বিলাস, ব্যসন," ইত্যাদি।

আমাদের ত মনে হয়, দেশব্যাপী অসন্তোষের মূলে রহিয়াছে, নানা লোকের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অত্যাচার, অপমান, ভয়, হিংসা, ধর্ম্ম, আত্মশ্লাঘা ও আরও অনেক কিছু। গাড়ী, বাড়ী, বিলাস, ব্যসন লইয়া এই যে ধনীরা রহিয়াছে, ইহারা কি সকলেই পরম সন্তোষে দিন কাটাইতেছে? ইতিহাসের ঘটনাচক্র শুধু অর্থনীতির ধাক্কাতেই নড়ে, এ ভুলটা ভারতবর্ষ প্রথম করে নাই; তার আগে করিয়াছিলেন কার্ল্ মার্ক্স্; তাহারই ধাক্কা আজ এদেশে পৌঁছিয়াছে।

ঘরে আছে শুধু চার মুঠা চাল, খাবার লোক চার জন। সকলের মধ্যে চালটুকু সমবিভাগ করিলেই কি তাহা পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে? আমাদের সম্মুখের এক পয়সার সাপ্তাহিকখানার মতে সাম্যনীতি প্রতিষ্ঠিত হইলেই কোন অর্থনৈতিক জাদুর সাহায্যে সামাজিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হঠাৎ খুব বাড়িয়া যাইবে। ধরা যাক্ ভারতবর্ষের লোকের আয় লোক-প্রতি বৎসরিক ৩০৲। ইহার অর্থ এই, যে, কাহারও কাহারও আয় ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী, কাহারও অনেক কম। কিন্তু সকলের আয় একত্র করিয়া সমবিভাগ করিলে প্রত্যেকে মাত্র বাৎসরিক ৩০৲ পাইবে। আশার কথা সন্দেহ নাই! তাহাতে সকলে পরম সুখে কাল কাটাইবে! সাম্য হইতে স্বাচ্ছন্দ্য পাইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে যাহা বণ্টন করিয়া সাম্যনীতি প্রতিষ্ঠা করা হইবে, তাহার পরিমাণ বর্দ্ধন প্রয়োজন। শুধু সাম্য হইলেই স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হইবে না। **বরং অকালে সাম্য আসিলে সামাজিক সঞ্চয়ে বাধা পড়িয়া সমাজের ভবিষ্যৎ উৎপাদনী শক্তি**

কমিয়া গিয়া ঐ বাৎসরিক ৩০৲ টাকাতেও খা লাগিবার সম্ভাবনা। এই দ্বিতীয় ভুলটাও কার্ল্‌ মার্ক্‌স্‌ করিয়াছিলেন। সাম্যনীতিকামী এক পয়সার সাপ্তাহিকখানি বড়ই বর্ণনাপ্রিয়। ইহাতে দেখিতেছি, "এত বড় বৃটিশ সাম্রাজ্য—সেই সাম্রাজ্যের কেন্দ্র ইংলণ্ডের অবস্থাই বা আজ কি? সেখানেও আজ এইরূপ (ভারতের মত) দারিদ্র্য, এইরূপ বেকার-সমস্যা বিপ্লবের বীজ বপন করিতেছে। সেখানেও আজ লক্ষ লক্ষ গৃহহীন, অন্নহীন, দরিদ্র লণ্ডন-ব্রিজের নিম্নে পুরুষানুক্রমিক ভাবে বাস করে কেন?"

প্রশ্নটি বড়ই বিপদ্‌জনক। আমাদের দেশের মধ্যবিত্তের সমান অর্থ যে দেশের লোকেরা বেকার অবস্থায় সরকার হইতে সাহায্যরূপেই পায়, যে দেশের লোকেরা একটি কাম্‌রায় দুইজন থাকিতে হইলেই তাহাকে গৃহহীনতা নাম দেয়, চারবার উত্তমরূপে আহার না করিতে পাইলেই তাহাকে অনাহার বলে, সে দেশের সহিত আমাদের দেশের তুলনাই বাতুলতা। আর "লণ্ডন-ব্রিজ" নামধেয় কোন ব্রিজের নিম্নে কেহ থাকে বলিয়া কখন শুনি নাই—পুরুষানুক্রমিক ভাবে যদি কেহ সত্যই ঐরূপ নামের কোন ব্রিজের নিম্নে থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে, তাহা তাহাদের বংশগত বদ-অভ্যাস অথবা সামাজিক রীতি। ধর্ম্মসংক্রান্ত কিছুও হইতে পারে।

প্রকৃতি আমাদের যাহা অকাতরে দিতেছেন, তাহা কি আমাদের শ্রমলব্ধ? সাগরকূলে বেড়াইতে বেড়াইতে একটি মুক্তা অথবা একটি মৎস্য কুড়াইয়া পাইলে কি তাহা শ্রমলব্ধ বলিতে হইবে, না বলিতে হইবে, তাহার মূল্য নাই, তাহা ঐশ্বর্য্য নহে? মানুষ যত কিছুকে ঐশ্বর্য্য বলে তাহা প্রথমত প্রকৃতির দান, দ্বিতীয়ত অতীত সমাজের সঞ্চয়ের ফল, ও তৃতীয়ত বর্ত্তমানের মানুষের শ্রমলব্ধ। কাজেই সকল ঐশ্বর্য্য, অর্থ বা মূল্যবান্‌ দ্রব্য শুধু শ্রমিকের শ্রমপ্রসূত, ইহা সত্য কথা নহে। বুদ্ধিজীবীর বুদ্ধির ফলে কত যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক কত সাধনার ফলে আজ মানবসমাজকে এই অবস্থায় আনিতে পারিয়াছেন। নূতন উপায়ে মানব-সমাজের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিবার জন্য কত ধনবান্‌ সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়াছেন। সকল ভুলিয়া, পাশ্চাত্য বিপ্লববাদের নিশান উড়াইবার উন্মাদনায় আমরা কি বলিব যে, শুধু শ্রমিক, 'এই-সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে'র অধিকারী শ্রমিকরাই সামাজিক ঐশ্বর্য্যের একমাত্র স্রষ্টা?

এ ভুলটাও কার্ল্‌ মার্ক্‌স্‌ করিয়াছিলেন। কোন কোন ধনী অর্থবলে ও রাজশক্তির সহায়তায় কোন কোন শ্রমিকের উপর অত্যাচার করিতেছে, একথা স্বীকার্য্য। কিন্তু সকল ধনীই অত্যাচারী, একথা মিথ্যা। কোন কোন শ্রমিক বা ধরা যাক সকল শ্রমিকই তাহাদের ন্যায্য পাওনা পায় না, কিন্তু ন্যায্য পাওনা লাভের উপায় একটা আরও বড় অন্যায়ের সৃষ্টি নয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসের আরম্ভ হইতে অনেক ধনীকে দরিদ্রের সহায় ও ন্যায়ের সেবক দেখা যাইতেছে। গৌতম, অশোক, আকবর প্রমুখ মহাধনীরাই এর উদাহরণ—সহস্র সহস্র মন্দির, জলাশয়, অন্নছত্র ইত্যাদি এর সাক্ষী। আজ ভারতের ইতিহাস ও আদর্শ ভুলিয়া, অর্থনৈতিক সত্য অবহেলা করিয়া আমরা কি পাশ্চাত্যের মোহে ভুলিয়া মিথ্যাকে অবলম্বন করিব? কার্ল্‌ মার্কসের ছাত্ররা সুযোগ বুঝিয়া আজ ভারতে সমাগত—অল্পবুদ্ধি শ্রমিক তাহাদের পাল্লায় পড়িয়া ও তাহাদের "অকাট্য" যুক্তির প্রভাবে আজ সমাজনীতিবিরুদ্ধ বিশ্বাসে হৃদয় বোঝাই করিতেছে। আমাদের এখন প্রয়োজন, অর্থ-নৈতিক শিক্ষার প্রচার ও তদনুসারে সর্ব্বত্র কার্য্যারম্ভ করা।

অ

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৪শ ভাগ
১ম খণ্ড

আশ্বিন, ১৩৩১

৬ষ্ঠ সংখ্যা

অশ্বপতির ব্রহ্মবাদ

মহেশচন্দ্র ঘোষ

কথিত আছে অশ্বপতি-নামক একজন ক্ষত্রিয় কেকয়-দেশে রাজত্ব করিতেন। তিনি এক সময়ে ছয় জন ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মবিদ্যা-বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন। শতপথ-ব্রাহ্মণ (১০।৬।১) ও ছান্দোগ্য-উপনিষদে এই বিষয় বর্ণিত আছে। আমরা উভয় গ্রন্থের সাহায্যেই এই ব্রহ্মবাদের বিষয় আলোচনা করিব। যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মবাদ এক শ্রেণীর; অশ্বপতির ব্রহ্মবাদ অন্যপ্রকার। দার্শনিক জগতে উভয়েরই স্থান অতি উচ্চ। যাজ্ঞবল্ক্যের মতামত অল্পাধিক-পরিমাণে অনেকেই জানেন; কিন্তু অশ্বপতির ব্রহ্মবাদ অনেকেরই সুপরিচিত নহে। এই-জন্য ইহা কিছু বিস্তৃতভাবেই আলোচনা করা আবশ্যক।

যাজ্ঞবল্ক্য যে-ভাষায় ও যে-ভাবে ব্রহ্ম-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বকালের উপযোগী। কিন্তু অশ্বপতি যে-ভাষায় ও যে-ভাবে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা কেবল তাঁহার সময়েরই উপযোগী। বিশেষ ধৈর্য্য ও মনোযোগের সহিত পাঠ না করিলে তাঁহার মতামত বোধগম্য হইবে না। এই-জন্য ধৈর্য্যের সহিত এবিষয়ে আলোচনা করিতে হইবে।

পঞ্চ ব্রাহ্মণ

এক সময়ে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ একস্থলে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদিগের নাম এই (১) উপমন্যুর পুত্র প্রাচীনশাল, (২) পুলুষ-পুত্র সত্যযজ্ঞ, (৩) ভাল্লবি-পুত্র ইন্দ্রদ্যুম্ন, (৪) শর্করাক্ষ-পুত্র জন, এবং (৫) অশ্বতরাশ্ব-পুত্র বুড়িল। ঋষি ইঁহাদিগকে 'মহাশাল' (=মহা গৃহস্থ) ও মহা-শ্রোত্রিয় বলিয়াছেন। ইঁহারা সম্মিলিত হইয়া এই বিচার করিয়াছিলেন—"কে আমাদিগের আত্মা? ব্রহ্ম কি?" তাঁহারা এ-বিষয়ে কোন মীমাংসায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না। এই-জন্য তাঁহারা স্থির করিলেন—"সম্প্রতি উদ্দালক আরুণি এই বৈশ্বানর আত্মাকে

অবগত আছেন। তাঁহার নিকট গমন করা যাউক।” তৎপরে তাঁহারা উদ্দালকের নিকট উপস্থিত হইলেন (ছাঃ ৫।১১)।

এস্থলে ‘বৈশ্বানর’ শব্দের ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। বিশ্ব এবং নর এই দুইটি শব্দ হইতে বৈশ্বানরের উৎপত্তি। বিশ্ব=সমুদায়, নর=মানব। ‘নর’ নৃধাতু হইতেও হইতে পারে। তাহা হইলে নর=নেতা। বৈশ্বানরের অনেক অর্থ করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে কয়েকটি এই—(১) যিনি সমুদয় নরের মধ্যে বর্ত্তমান; (২) যিনি সকলের নেতা; (৩) যিনি সমুদায় নরের হিতকর; (৪) সমুদয় মানব যাঁহার।

উদ্দালক

এই বৈশ্বানর-আত্মার বিষয় জানিবার জন্য সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণ উদ্দালক-সমীপে উপস্থিত হইয়া জ্ঞাতব্য বিষয় উত্থাপন করিলেন। উদ্দালক তখন চিন্তা করিতে লাগিলেন—“এই-সমুদায় মহাগৃহস্থ ও মহা-শ্রোত্রিয় আমাকে প্রশ্ন করিবেন। সম্ভবতঃ আমি সমুদয় প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিব না। সুতরাং ইঁহাদিগকে অন্য উপদেষ্টার কথা বলিয়া দিই।” এই স্থির করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন—“হে ভগবদ্‌গণ, সম্প্রতি অশ্বপতি কৈকেয় এই বৈশ্বানর-আত্মাকে অবগত আছেন। তাঁহার নিকট গমন করা যাউক।”

অশ্বপতি-সমীপে

অনন্তর ছয়জনই অশ্বপতির সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। রাজা যথাবিধি তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিলেন। তখন তাঁহারা রাজাকে বলিলেন কেন তাঁহারা সমাগত হইয়াছেন। স্থিরীকৃত হইল, পরদিন পূর্ব্বাহ্নে রাজা তাঁহাদিগের প্রশ্নের উত্তর দিবেন। তাঁহারা ছয়জন যথা-সময়ে সমিৎপাণি হইয়া পুনরায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু রাজা তাঁহাদিগকে ‘উপনীত’ না করিয়াই উপদেশ প্রদান করিলেন।

প্রাচীন শাল ঔপমন্যব

অশ্বপতি প্রাচীন শালকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“হে ঔপমন্যব! তুমি কাহাকে আত্ম-রূপে উপাসনা কর?”।

ঔপমন্যব বলিলেন—“হে ভগবন্! রাজন্! আমি দ্যৌকেই আত্মা বলিয়া উপাসনা করি।”

অশ্বপতি বলিলেন—“তুমি যাঁহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা কর, ইনি নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ তেজঃসম্পন্ন বৈশ্বানর-আত্মা। এইজন্য তোমার কুলে সুত, প্রসুত ও আসুত (নামক সোমরস) দৃষ্ট হয়। ... যিনি এইরূপ বৈশ্বানর-আত্মাকে উপাসনা করেন, তিনি অন্ন ভোজন করেন, তিনি প্রিয়জন দর্শন করেন এবং তাঁহার কুলে ব্রহ্মবর্চ্চস বর্ত্তমান থাকে।

কিন্তু এই দ্যৌ আত্মার মূর্দ্ধা মাত্র। (৫।১২)।

সত্যযজ্ঞ পৌলুষি

ইহার পরে অশ্বপতি সত্যযজ্ঞকে ‘আত্মা’-বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নই করিয়াছিলেন। সত্যযজ্ঞ বলিলেন—“হে ভগবন্! হে রাজন্! আদিত্যকেই আত্মরূপে উপাসনা করি।”

রাজা বলিলেন “তুমি যাঁহার উপাসনা কর, তিনি বিশ্বরূপ নামক বৈশ্বানর-আত্মা। সেই-জন্য তোমার কুলে ‘বিশ্বরূপ ধন, দৃষ্ট হয়।...কিন্তু এই আদিত্য আত্মার চক্ষু মাত্র।” (৫।১৩)

ইন্দ্রদ্যুম্ন ভাল্লবেয়

রাজার সেই প্রশ্নের উত্তরে ইন্দ্রদ্যুম্ন বলিলেন “হে ভগবন্! হে রাজন্! বায়ুকেই আমি আত্মরূপে উপাসনা করি।”

অশ্বপতি বলিলেন—“তুমি যাঁহার উপাসনা কর, তিনি পৃথক্ বর্ত্মা-নামক বৈশ্বানর আত্মা। সেই-জন্য পৃথক্ পৃথক্ বলি তোমার নিকট উপস্থিত হয় এবং পৃথক পৃথক্ রথশ্রেণী তোমার অনুগমন করে।... কিন্তু এই বায়ু আত্মার প্রাণ মাত্র।” (৫।১৪)

জন শার্করাক্ষ

রাজার প্রশ্নের উত্তরে ‘জন’ বলিলেন—“হে ভগবন্! হে রাজন্! আকাশকেই আমি আত্মা বলিয়া উপাসনা করি।”

রাজা বলিলেন—“তুমি যাঁহাকে বৈশ্বানর-আত্মা বলিয়া উপাসনা কর, তিনি ‘বহুল’-নামক বৈশ্বানর-

আত্মা; সেই-জন্য তুমি সন্ততি ও ধনে 'বহুল' হইয়াছ। ....কিন্তু এই আকাশ আত্মার মধ্য-দেহ।" (৫।১৫)

বুড়িল আশ্বতরাশ্বি

রাজার সেই প্রশ্নের উত্তরে বুড়িল বলিলেন—"হে ভগবন্! হে রাজন্! জলকেই আমি আত্মারূপে উপাসনা করি।"

রাজা বলিলেন -"তুমি যাঁহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা কর, তিনি রয়ি (=ধন) নামক বৈশ্বানর-আত্মা সেই-জন্য তুমি রয়িমান্ ও পুষ্টিমান্।......... কিন্তু এই জল আত্মার বস্তি-দেশ।" (৫।১৬)

উদ্দালক আরুণি

অনন্তর অশ্বপতি উদ্দালক আরুণিকে জিজ্ঞাসা করিলেন- "হে গোতম! তুমি কাহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা কর?"

উদ্দালক বলিলেন, "হে ভগবন্! হে রাজন্! পৃথিবীকেই আমি আত্মা বলিয়া উপাসনা করি।"

রাজা বলিলেন --"তুমি যাঁহাকে আত্মরূপে উপাসনা কর, তিনি প্রতিষ্ঠা-নামক বৈশ্বানর-আত্মা। সেই-জন্য তুমি সন্ততি ও পশু লাভ করিয়া প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছ।......... কিন্তু এই পৃথিবী আত্মার পাদদ্বয় মাত্র। (৫।১৭)

অশ্বপতির মীমাংসা

ক

ইহার পরে অশ্বপতি ঐ ছয়জনকেই সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"(এই বৈশ্বানর-আত্মা পৃথক্ পৃথক্ নহেন কিন্তু) তোমরা ইঁহাকে পৃথক্ পৃথক্ কল্পনা করিয়া অন্নভোজন করিতেছ। যিনি এইরূপে এই বৈশ্বানর আত্মাকে 'প্রাদেশ মাত্র' ও 'অভিবিমান'-রূপে উপাসনা করেন, তিনি সর্ব্বলোকে, সর্ব্বভূতে, ও সর্ব্ব-আত্মাতে অন্নভোজন করেন।" (৫।১৮।১)

শেষ অংশের অর্থ এই "তিনি সকলের সহিত একত্ব অনুভব করেন। সুতরাং তাঁহার ভোগে সকলের ভোগ ও সকলের ভোগে তাঁহার ভোগ হইয়া থাকে।"

ইহার পরে অশ্বপতি আরও বলিলেন—'সুতেজা' এই বৈশ্বানর-আত্মার মূর্দ্ধা; বিশ্বরূপ ইঁহার চক্ষু; পৃথগ্‌বর্ত্মাত্মা ইঁহার প্রাণ; 'বহুল' ইঁহার শরীরের মধ্যভাগ; রয়ি ইঁহার বস্তি এবং পৃথিবী ইঁহার পাদদ্বয় (ছান্দোগ্য। ৫।১৮।২)

খ

প্রাচীন শালা-প্রমুখ ছয়জন ব্রাহ্মণ যথাক্রমে দ্যৌ, আদিত্য, বায়ু, আকাশ, জল, পৃথিবী এই ছয়টিকে বৈশ্বানর বলিয়া জানিতেন। অশ্বপতি বলিলেন, এ-সমুদয়ই আংশিকভাবে সত্য; কিন্তু এই ছয়টির কোন-টিই পূর্ণ বৈশ্বানর-আত্মা নহে; এসমুদয় বৈশ্বানর আত্মার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মাত্র। ইহাই আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য তিনি বলিলেন দ্যৌ ইঁহার মস্তক, আদিত্য ইঁহার চক্ষু, বায়ু ইঁহার প্রাণ, আকাশ ইঁহার মধ্য-দেহ, জল ইঁহার বস্তি এবং পৃথিবী ইঁহার পাদ।

পরমাত্মাকে এক বিরাট পুরুষরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যাহা-কিছু আছে, সমুদয়ই এই আত্মার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। আত্মা জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ নহেন, আবার পৃথক্ পৃথক্ বস্তুও আত্মা নহে। যাঁহাতে এই সমুদয় সম্মিলিত হইয়াছে, তিনিই আত্মা, তিনিই পরমাত্মা, তিনিই ব্রহ্ম। ইঁহাকে 'প্রাদেশ মাত্র' ও 'অভিবিমান' বলা হইয়াছে। এই দুইটি কথা দুর্ব্বোধ্য, সেই-জন্য কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

প্রাদেশ মাত্রম্

'প্রাদেশ মাত্র'-শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, সে বিষয়ে অতি প্রাচীন কাল হইতেই মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। আমরা নিম্নে কয়েকজন আচার্য্যের মত উদ্ধৃত করিতেছি।

আশ্মরথ্যের মত

বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনী বিস্তৃত করিলে একের অগ্রভাগ হইতে অপরের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত যে পরিমাণ, সেই পরিমাণের নাম "প্রাদেশ"। আশ্মরথ্য-মুনি বলেন --হৃদয়, প্রাদেশ-পরিমিত। পরমাত্মা এই হৃদয়ে বাস করেন, এই-জন্য তাঁহাকে 'প্রাদেশ মাত্র' বলা হইয়াছে (বেদান্ত সূত্র, ১।২।২৯, শঙ্কর-ভাষ্য)।

বাদরির মত

অনুস্মৃতেঃ বাদরিঃ (বেদান্তসূত্র,১।২।৩০)। শঙ্কর এই সূত্রের দুইটি অর্থ করিয়াছেন।

(১) মন প্রাদেশ মাত্র হৃদয়ে অবস্থিত। এই মন পরমাত্মার ধ্যান করিয়া থাকে। এই-জন্য পরমাত্মাকে 'প্রাদেশ মাত্র' বলা হইয়াছে।

(২) প্রকৃত-পক্ষে পরমাত্মা প্রাদেশ মাত্র নহেন, কিন্তু তিনি প্রাদেশ মাত্র রূপে অনুস্মৃত অর্থাৎ চিন্তনীয়। এই-জন্য তাঁহাকে প্রাদেশ মাত্র বলা হইয়াছে।

জৈমিনির মত

শতপথ-ব্রাহ্মণে (১০।৬।১।১০,১১) লিখিত আছে যে, অশ্বপতি এক সময়ে আরুণি সত্যযজ্ঞ প্রভৃতিকে এইরূপ বলিয়াছিলেন—'দেবগণ বৈশ্বানরকে প্রাদেশ-মাত্ররূপে জানিয়া তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে এমনভাবে বর্ণনা করিব যেন প্রাদেশ মাত্র বস্তু তাঁহার উপমান হইতে পারে।' ইহার পর অশ্বপতি অঙ্গুলি দ্বারা নিজের মস্তক দেখাইয়া বলিলেন—ইহাই 'অতিষ্ঠা' নামক বৈশ্বানর। চক্ষুদ্বয়কে দেখাইয়া বলিলেন—ইহাই 'সুতেজা'-নামক বৈশ্বানর। নাসিকা দেখাইয়া বলিলেন ইহাই 'পৃথগ্ বর্ত্মা'-নামক বৈশ্বানর। মুখের অভ্যন্তরস্থ আকাশকে দেখাইয়া বলিলেন—ইহাই 'বহুল'-নামক বৈশ্বানর। মুখের লালা দেখাইয়া বলিলেন—ইহাই 'রয়ি'-নামক বৈশ্বানর। চিবুক দেখাইয়া বলিলেন—ইহাই 'প্রতিষ্ঠা'-নামক বৈশ্বানর।

এইরূপে মস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া চিবুক পর্য্যন্ত সমুদয় অংশকে বৈশ্বানর-রূপে কল্পনা করা হইল। এই অংশের পরিমাণ এক 'প্রাদেশ' অর্থাৎ এক বিঘৎ; এই-জন্য বৈশ্বানর-আত্মাকেও 'প্রাদেশ মাত্র' বলা হইয়াছে।" ইহাই জৈমিনির মত (বেদান্ত-সূত্র, ১।২।৩১)।

এস্থলে একটি গুরুতর আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। শতপথ-ব্রাহ্মণে মস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া চিবুক পর্য্যন্ত অংশকে বৈশ্বানর-রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। এই অংশের পরিমাণ 'প্রাদেশ মাত্র'; সুতরাং এই আত্মাকে 'প্রাদেশ মাত্র'-রূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে। কিন্তু ছান্দোগ্য-উপনিষদে মস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া পাদদ্বয় পর্য্যন্ত সমুদায় দেহকে বৈশ্বানর-রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। এ অংশের পরিমাণ প্রাদেশ মাত্র নহে; সুতরাং এস্থলে শতপথ-ব্রাহ্মণের অর্থে বৈশ্বানর-আত্মাকে 'প্রাদেশ মাত্র' বলা যাইতে পারে না।

জাবাল শাখাধ্যায়ীদিগের মত

চিবুক হইতে মূর্দ্ধা পর্য্যন্ত অংশ প্রাদেশ-পরিমিত। ভ্রূ ও নাসিকা ইহারই অন্তর্গত।। এই ভ্রূ ও নাসিকার সন্ধিস্থলে পরমাত্মা অবস্থিত। এই-জন্য পরমাত্মাকে 'প্রাদেশ মাত্র' বলা হইয়াছে (বেঃ সূঃ ১।২।৩২; শাঙ্কর ভাষ্য)।

শঙ্করাচার্য্যের মত

শঙ্করাচার্য্য ইহার চারিটি অর্থ করিয়াছেন :

(১) দ্যুলোক হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত প্রদেশ দ্বারা তিনি পরিমিত হন (মীয়তে, মা ধাতু) অর্থাৎ জ্ঞাত হন, এই-জন্য তিনি 'প্রাদেশ মাত্র'।

(২) তিনি মুখ প্রভৃতি প্রদেশে ভোক্তৃরূপে পরিজ্ঞাত হন, এই-জন্য তিনি 'প্রাদেশ মাত্র'।

(৩) দ্যুলোক হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত সমুদয় প্রদেশ তাঁহার পরিমাণ, এই-জন্য তিনি 'প্রাদেশ মাত্র'।

(৪) দ্যুলোকাদি বিষয়ে শাস্ত্রে প্রকৃষ্টরূপে উপদেশ দেওয়া হয়, এই-জন্য এই সমুদয়ের নাম প্রাদেশ (=প্র+আদেশ)। এই প্রাদেশই তাঁহার পরিমাণ, এই-জন্য তাঁহাকে 'প্রাদেশ মাত্র' বলা হইয়াছে। (ছাঃ ভাঃ ৫।১৮)

অভিবিমান

'অভিবিমান' শব্দের অর্থ লইয়াও অনেক মত-ভেদ।

শঙ্করের মত

শঙ্করাচার্য্য ইহার চারিটি অর্থ দিয়াছেন

(১) তিনি প্রত্যগাত্মরূপে অভিবিমিত হন অর্থাৎ 'অহম্' (=আমি) বলিয়া জ্ঞাত হন; এই-জন্য তিনি 'অভিবিমান' (ছাঃ ভাঃ ৫।১৮; বেঃ ভাঃ ১।২।৩২)

(২) প্রত্যগাত্মা বলিয়া তিনি সকলের নিকটস্থ (অভিগত); এই-জন্য তিনি অভিবিমান(বেঃ ভাঃ ১।২।৩২)।

(৩) তাঁহার পরিমাণ করা যায় না, এইজন্য তিনি অভিবিমান (বেঃ ভাঃ ১।২।৩২)।

(৪) জগতের কারণ বলিয়া তিনি সমুদয় পরিমাপ করেন (অভিবিমিমীতে) অর্থাৎ সমুদয় অবগত আছেন, এইজন্য তিনি অভিবিমান (বেঃ ভাঃ ১।২।৩২)।

রামানুজের মত

রামানুজ ইহার এইরূপ অর্থ দিয়াছেন—তিনি অভিব্যাপ্তবান্ (অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী) এবং বিগতমান (অর্থাৎ অপরিমেয়); এই-জন্য তাঁহার নাম 'অভিবিমান' (বেঃ ভাঃ ১।২।৩০)।

সিদ্ধান্ত

দেখা যাইতেছে এই দুইটি শব্দের অর্থ লইয়া অত্যন্ত মত-ভেদ। আমাদিগের মনে হয়, যে অর্থ গ্রহণ করিলে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য থাকে, সেই অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। দেখা যাউক এই অংশের পূর্ব্বে এ-বিষয়ে কি বলা হইয়াছে।

ছান্দোগ্য-উপনিষদে ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী ছয়খণ্ডে বৈশ্বানর-আত্মা-বিষয়ে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা এই :—

যিনি দৌ অর্থাৎ সুতেজা-নামক বৈশ্বানর-আত্মাকে উপাসনা করেন, তাঁহার কুলে সুত প্রসুত ও আসুত দৃষ্ট হয় (৫।১২।১)। সুতেজা শব্দেও 'সুত', এবং সুত, প্রসুত, ও আসুত শব্দেও 'সুত'; এই-জন্যই বোধ হয় সুতেজার সহিত সুত-প্রসুতাদির সম্বন্ধ দেখান হইয়াছে। শতপথ-ব্রাহ্মণে অনুরূপ-স্থলে সুতেজা-স্থলে 'সুত-তেজা' ব্যবহৃত হইয়াছে (১০।৬।১)।

ইহার পরে বলা হইয়াছে 'যিনি আদিত্য অর্থাৎ বিশ্বরূপ বৈশ্বানর-আত্মার উপাসনা করেন, তাঁহার কুলে "বহু বিশ্বরূপ" বস্তু দৃষ্ট হয় (৫।১৩।১)।

যিনি বায়ু অর্থাৎ 'পৃথগ বর্ত্মাত্মা' বৈশ্বানরের উপাসনা করেন, তাঁহার কুলে 'পৃথক্' বলি আগমন করে (৫।১৪।১)।

যিনি আকাশ অর্থাৎ 'বহুল'-নামক বৈশ্বানরের উপাসনা করেন, তিনি প্রজা ও ধনে 'বহুল' হন (৫।১৫।১)।

যিনি আপ অর্থাৎ রয়ি-নামক বৈশ্বানরের উপাসনা করেন, তিনি 'রয়িমান্' হয়েন (৫।১৬।১)।

যিনি পৃথিবী অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা-নামক বৈশ্বানরের উপাসনা করেন, তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন (৫।১৭।১)।

এই কয়েকটি স্থল পাঠ করিয়া বুঝা যাইতেছে যে, প্রতিষ্ঠার উপাসনার ফল প্রতিষ্ঠা, রয়ির উপাসনার ফল রয়ি, বহুলের উপাসনার ফল বহুল ইত্যাদি। উপাস্য বস্তু যেপ্রকার, উপাসনার ফলও তদনুরূপ।

পূর্ব্বোক্ত ছয়-প্রকার বৈশ্বানরের উপাসনার কথা বলিয়া অশ্বপতি বলিতেছেন যে, প্রকৃত বৈশ্বানর প্রাদেশ মাত্র এবং অভিবিমান; তাঁহার উপাসনার ফল সর্ব্বলোকে, সর্ব্বভূতে ও সর্ব্বআত্মায় অন্নভোজন। উপাস্য যাহা, উপাসনার ফলও যখন তাহাই, তখন ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, সর্ব্বলোক, সর্ব্বভূত ও সর্ব্বআত্মা যাহা, প্রাদেশ মাত্র এবং অভিবিমানও তাহাই। এখানে প্রথমে বলা হইতেছে তিনটি বস্তুর কথা—সর্ব্বলোক, সর্ব্বভূত ও সর্ব্বআত্মা। এই তিনটিকে বলা হইল প্রাদেশ মাত্র এবং অভিবিমান। এস্থলে তিনটি বস্তুকে দুইটি বিশেষণ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইহার দুই অর্থ হইতে পারে।

প্রথম অর্থ

সর্ব্বলোক ও সর্ব্বভূত—এই দুইটির বিশেষণ প্রাদেশ-মাত্র এবং সর্ব্ব-আত্মার বিশেষণ অভিবিমান।

সর্ব্বলোক ও সর্ব্বভূত অর্থাৎ দ্যুলোক হইতে ভূলোক পর্য্যন্ত সমুদয় প্রদেশ এবং এই প্রদেশস্থ সর্ব্ববস্তু ইহার মাত্রা; এইজন্য ইহার নাম প্রাদেশ মাত্র (শঙ্করের ১ম, ৩য় অর্থ দ্রষ্টব্য)।

সর্ব্ব আত্মারূপে ইনি অভিবিমিত হন অর্থাৎ সর্ব্ব আত্মারূপে ইহাকে জানা যায়, এইজন্য ইহার নাম অভিবিমান (শঙ্করের ১ম ও ২য় অর্থ দ্রষ্টব্য)।

'প্রাদেশ মাত্র' নাম দ্বারা সমুদায় অনাত্মবস্তুকে বৈশ্বানরের অন্তর্ভূত করা হইল এবং 'অভিবিমান' শব্দ ব্যবহার করিয়া বলা হইল এই বৈশ্বানর আত্ম-বস্তু অর্থাৎ ইনি আত্মা।

দ্বিতীয় অর্থ

(ক)

দ্বিতীয় অর্থ এই :—প্রাদেশমাত্র বলিলে সর্ব্বলোক,

সর্ব্বভূত ও সর্ব্ব-আত্মা—এই তিনটিকেই বুঝিতে হইবে। সর্ব্ব আত্মা প্রদেশের বাহিরে, এ-প্রকার আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই। এস্থলে 'আত্মা' অর্থ অবশ্যই 'অশরীর আত্মা' নহে। যখন অন্ন ভোজনের কথা আছে, তখন বুঝিতে হইবে এ আত্মা 'সশরীর আত্মা'। সুতরাং 'প্রাদেশ মাত্র' দ্বারা সর্ব্বলোক, সর্ব্বভূত ও সর্ব্ব-আত্মা এই তিনটিকেই বুঝাইতে পারে।

(খ)

অভিবিমান = অভি + বি + মা + অনট্; মা ধাতুর অর্থ 'পরিমাণ করা'। যাহার পরিমাণ নাই, তাহার নাম 'অভিবিমান' (শঙ্করের তৃতীয় অর্থ দ্রষ্টব্য)। রামানুজ 'অভিব্যাপ্ত' অর্থে 'অভি' এবং 'অপরিমেয়' অর্থে 'বিমান' গ্রহণ করিয়াছেন। রামানুজের অর্থ ও শঙ্করের তৃতীয় অর্থ একই শ্রেণীর।

(ক) এবং (খ)

প্রাদেশমাত্র বলিলে বৈশ্বানরকে দেশকাল-পরিচ্ছিন্ন করা হয়; এই-জন্য 'প্রাদেশমাত্র' বলিয়াই সেই সঙ্গে সঙ্গে বলা হইল ইনি অভিবিমান অর্থাৎ অপরিমেয় (কিংবা সর্ব্বব্যাপী ও অপরিমেয়)।

'প্রাদেশ মাত্র' দ্বারা বলা হইল বৈশ্বানর-আত্মা জগৎ-রূপে প্রকাশিত; 'অভিবিমান' দ্বারা বলা হইল 'জগৎ দ্বারা তাঁহার পরিমাণ করা যায় না, তিনি জগতের অতীত।'

সামঞ্জস্য

সর্ব্বলোক, সর্ব্বভূত ও সর্ব্ব-আত্মা এই তিনটির সঙ্গে কিভাবে 'প্রাদেশ মাত্র' এবং 'অভিবিমান' এই দুইটির সংযোগ করিতে হইবে; সে বিষয়ে মত-ভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু একটা স্থলে মত-ভেদ নাই। তাহা এই:- পরমাত্মা 'প্রাদেশ মাত্র' ও "অভিবিমান"। সর্ব্বলোক, সর্ব্বভূত ও সর্ব্ব-আত্মা তাঁহার অঙ্গীভূত; তিনি জগৎরূপে প্রকাশিত কিন্তু জগৎ দ্বারা তাঁহাকে সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করা বা পরিমাণ করা যায় না। তিনি অপরিমেয়, তিনি অভিবিমান।

যাজ্ঞবল্ক্য ও অশ্বপতি

যাজ্ঞবল্ক্যও অদ্বৈতবাদী এবং অশ্বপতিও অদ্বৈতবাদী। কিন্তু উভয়ের অদ্বৈতবাদ এক শ্রেণীর অদ্বৈতবাদ নহে। যাজ্ঞবল্ক্যের অদ্বৈতবাদে জগতের স্থান নাই; তাঁহার ব্রহ্ম অন্তর্বাহ্যরহিত; ইঁহার অভ্যন্তরেও কিছু নাই, বাহিরেও কিছু নাই। কিন্তু অশ্বপতির অদ্বৈতবাদে জগতের একটি বিশেষ স্থান আছে। যাহা কিছু আছে, সমুদয়ই ব্রহ্মের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ; ব্রহ্ম জগৎ-বিশিষ্ট। জগৎ ব্রহ্মের বিশেষণ।

বর্ত্তমান যুগে অনেকেই এইপ্রকার মতের আদর করিবেন।

ফ্যাসিষ্ট্ আন্দোলন-সম্বন্ধে দু'-একটা কথা

শ্রী ফণীন্দ্রকুমার সান্যাল

আজ জগতের লোক দুটো পরস্পরবিরোধী আন্দোলনের দিকে চেয়ে আছে দেখ্‌বার জন্যে যে শেষ পর্য্যন্ত তাদের মধ্যে কোন্‌টা সত্যই জয়ী হয়। মানুষের চিরপুরাতন সামাজিক বিধিব্যবস্থার চাপে মানুষ এত অস্থির হ'য়ে উঠেছিল যে সে তার সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে চাচ্ছিল একটা বিরাট্ পরিবর্ত্তন। যা' কিছু পুরাতন সেসমস্ত ভেঙে দিয়ে সে চাচ্ছিল্ নতুন করে' সত্যিকার প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর্‌তে। এর ফলে জেগে উঠ্‌ল রুশিয়ার ভীষণ বিপ্লব। যে ঘনান্ধকার রুশিয়ার ভাগ্যাকাশ ধীরে ধীরে ছেয়ে ফেল্‌ছিল সে অন্ধকার দূর কর্‌বার জন্যে বদ্ধপরিকর হ'য়ে কর্ম্মবীর লেনিন তাকে যে নতুন আলোক দান করেছিলেন সে আলোকের ঔজ্জ্বল্যে সমস্ত জগৎ চমকিত হ'য়ে গিয়েছিল আর তার উত্তাপ সকলের পক্ষেই ভয়ানক অসহ্য হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু প্রথমটা অসহনীয় হ'লেও রুশিয়া তার শ্রেষ্ঠ

সন্তানের দান আজ আদর করে' গ্রহণ করেছে। অদ্ভুত-কর্ম্মা লেনিন আজ আর নেই। তিনি যে যজ্ঞ আরম্ভ করেছিলেন তাতে তাঁর নিজের জীবনকে আহুতি দিয়ে রুশিয়ায় নবজীবনের সঞ্চার করে' গেছেন। জগতের লোক তাই চেয়ে আছে দেখ্বার জন্যে যে রুশিয়া কি-ভাবে তার নতুন জীবন যাপন করে।

আর একদিকে আর-এক কর্ম্মবীরের অভ্যুত্থান হয়েছে। তিনি মুসোলিনি; বর্ত্তমান ইতালীর মন্ত্রগুরু। যে-মন্ত্রের সাধনা কর্‌তে ইতালীকে তিনি আহ্বান করেছেন জগতের চিন্তারাজ্যে তা সম্পূর্ণ নতুন না হ'লেও বর্ত্তমান চিন্তাস্রোতের বিরুদ্ধগামী সে-মন্ত্র। এ-মন্ত্র সাধনা ইতালীকে সিদ্ধির পথে কতখানি এগিয়ে দেয় তা বিশেষভাবে লক্ষ্য কর্‌বার।

বিগত যুদ্ধের বহুপূর্ব্ব থেকেই ইতালীতে সোশ্যালিষ্ট্ দল গড়ে' উঠ্‌ছিল। কিন্তু তখনকার শাসনপদ্ধতির সঙ্গে তাদের অন্তরের যোগ না থাক্‌লেও সে-পদ্ধতির সমূল উচ্ছেদ কর্‌তে তারা চাইত না। তারা চাইত যাতে ধীরে ধীরে কতকগুলো ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি সাধারণের সম্পত্তি বলে' পরিগণিত হয় এবং রাষ্ট্রশক্তি ধীরে ধীরে ব্যক্তিবিশেষের হাত থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য কেড়ে নিয়ে জনসাধারণের জন্যে সেগুলো চালায়। কিন্তু যখন সমস্ত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে' বলশেভিক্‌বাদ রুশিয়ায় জয়ী হ'য়ে দাঁড়াল, তখন জগতের সমস্ত সোশ্যালিষ্ট্ দলের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য এসে উপস্থিত হ'ল। বলশেভিক্‌দের আদর্শ ছিল সমস্ত জগতে একটা বিরাট্ বিপ্লব সৃষ্টি কর্‌বে, সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে বলশেভিক্ নেতারা সমস্ত জায়গায় তাঁদের দূত পাঠিয়েছিলেন। ইতালীতেও এ-আন্দোলন প্রবল-ভাবে চালাবার চেষ্টা তাঁরা করেছিলেন। যুদ্ধের ফলে যেসমস্ত দেশ ধ্বংস যেতে বসেছিল, জীবনধারণ মাত্রও যেসব দেশে একটা মহা সমস্যার বিষয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল, বলশেভিক্‌বাদ সেখানে সহজেই জনসাধারণের প্রাণে আশার সঞ্চার করে। সেজন্যে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইতালীতে প্রচারের কাজ জোর চলে। ফলে সেখানে প্রবলভাবে ধর্ম্মঘট আরম্ভ হয় এবং সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য একরকম বন্ধ হ'য়ে যায়। তার পর অরাজকতা প্রভৃতি থেকে যে অবস্থা দাঁড়ায় তাতে তখনকার মন্ত্রী সিনিয়র নিটি মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দিয়ে তাঁর মন্ত্রীত্ব ত্যাগ কর্‌তে বাধ্য হন। রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল গাওলিটিকে ডেকে নতুন মন্ত্রী সভা গড়্‌তে বলেন। কিন্তু এ মন্ত্রীসভাও বেশী কিছু করে' উঠ্‌তে পারেননি।

এমন সময় মুসোলিনির আবির্ভাব হ'ল। তিনি পূর্ব্বে সোশ্যালিষ্ট্ দলভুক্ত ছিলেন; কিন্তু রুশিয়ার অবস্থা দেখে' তিনি তাঁর আদর্শ পরিবর্ত্তন করেন। তিনি তখন ফ্যাসিষ্ট্ (Fascist) নাম দিয়ে একটা দল গঠন কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন এঁদের প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল বলশেভিক্‌বাদকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া এবং ইতালীর পুরাতন নষ্ট-গৌরব আবার ফিরিয়ে আনা। এঁরা সোশ্যালিজম্ থেকে দু'একটা ভাল আদর্শ নিলেন বটে; কিন্তু রীতিমত অস্ত্রশস্ত্র সাহায্যে যুদ্ধ করে' সোশ্যালিজম্‌কে দূর করে' দিতে এঁরা বদ্ধপরিকর হলেন। এইভাবে যে দল গড়ে' উঠ্‌ল তাদের নাম হ'ল ফ্যাসিষ্ট্ সেনাবাহিনী বা Fascist fighting corps। ফ্যাসিষ্ট্ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থে বোঝায় ব্যাণ্ডেজ বা বন্ধনী। ক্ষত বা আহত স্থান নীরোগ কর্‌বার জন্যেই এ বন্ধনীর প্রয়োজন। বলশেভিক্‌বাদ প্রচারের ফলে ইতালীর বুকে ভীষণ ক্ষত দেখা গেল এবং তা সারাবার জন্যে এই দল গঠিত হয়েছিল বলেই সেই দলকে ফ্যাসিষ্ট্ নামে অভিহিত করা হয়। মুসোলিনির দলগঠনের অদ্ভুতশক্তি ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বের জোরে তিনি ক্রমশই তাঁর দল বাড়িয়ে তুল্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন। প্রতিদিন দলে দলে লোক এসে তাঁর দলে যোগদান করতে লাগ্‌ল। তার পর সোশ্যালিষ্ট্ দলের সঙ্গে তাঁদের প্রবল সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। সমস্ত ইতালী অন্তর্যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে উঠে। অবশেষে ফ্যাসিষ্ট্ দল যুদ্ধে সোশ্যালিষ্ট্‌দের সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে। বিধ্বস্ত সোশ্যালিষ্টরা দলে দলে এসে ফ্যাসিষ্ট্ দলে যোগদান কর্‌তে আরম্ভ করে। কেবল মাত্র পশুশক্তির সাহায্যেই ফ্যাসিষ্ট্ দলের জয় হয়। এই জন্যে Henry Tompkins নামে একজন লেখক মুসোলিনিকে বলেছেন "a renegade socialist who achieved power by means of what, in essence was an army of Condottiori" ("Humanity", April, 1924)

তার পর ১৯২১ সালে অক্টোবর মাসে ফ্যাসিষ্ট্ কংগ্রেসের অধিবেশন মুসোলিনি সিনিয়র গাওলিটির মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন এবং এ মন্ত্রীসভা ভেঙে দেবার প্রস্তাব করেন। অবস্থার গুরুত্ব-বোধে গাওলিটি মন্ত্রীসভা ভেঙে দিতে বাধ্য হন এবং রাজা ইমান্থয়েল মুসোলিনিকে ডেকে মন্ত্রীসভা গঠন করতে অনুরোধ করেন।

এইভাবে ফ্যাসিষ্ট্ দল গঠন করে' মুসোলিনি আজ সমস্ত ইতালীর ভাগ্যনিয়ন্তা হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন। মুসোলিনির মত সোশ্যালিষ্ট্ মতবাদের একরকম সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। তিনি ধনী ও শ্রমজীবীর মধ্যে পার্থক্য সম্পূর্ণ দূর করে' দিতে চান না, তবে তাদের পরস্পরের সম্বন্ধ যাতে মধুর হয় তার ব্যবস্থা তিনি করতে প্রস্তুত। ব্যবসা বাণিজ্য ব্যক্তিবিশেষের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে সমস্ত জনসাধারণের জন্যে রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা চালিত করা তাঁর মত নয়। পরন্তু বর্ত্তমানে ইতালীতে যেসমস্ত বিষয় এইভাবে জনসাধারণের সম্পত্তি হিসাবে রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা পরিচালিত হয় তিনি সে-সমস্ত ধীরে ধীরে পুনরায় ব্যক্তিবিশেষের হাতে সমর্পণ করবেন বলে' মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। সোশ্যালিষ্ট্দের ন্যায় ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নষ্ট ক'রে তাকে সাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত করা তাঁর মত নয়। জনগণের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ তিনি দূর করে' দিতে চান না। দেশের আভিজাত্যকে নষ্ট করে' দিতে বা নাগরিক ও গ্রাম্য সম্প্রদায়ের প্রভেদকে দূর করে' দিতে তিনি প্রস্তুত নন। এককথায় সামাজিক বৈষম্যকে দূর করে' একীকরণ তাঁর মত নয়। এমন কি যারা এই একীকরণপ্রয়াসী তাদের দমন করতে পশুশক্তি ব্যবহার করতে তিনি সর্ব্বদাই প্রস্তুত। বৈষম্যকে বজায় রেখে বৈষম্যের কঠোরতা ও অত্যাচার দূর করা হচ্ছে তাঁর মত। এইজন্যে পূর্ণগণতন্ত্রের তিনি পক্ষপাতী নন। রাষ্ট্রশক্তি জনসাধারণের হাতে নিহিত করা তিনি অন্যায় মনে করেন এবং প্রতিনিধিমূলক রাষ্ট্রশক্তির উপরই তাঁর আস্থা দেখা যায়, কিন্তু এই প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ক্ষমতা তিনি সমগ্র জনসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করতে রাজি আছেন। দেশের culture (কাল্চার) যাতে বৃদ্ধি পায় তার আয়োজন করতে তিনি প্রস্তুত। দেশে সুকুমার শিল্প, কলা, সাহিত্য প্রভৃতির উন্নতির তিনি বিশেষ পক্ষপাতী এবং তাঁর বিশ্বাস বৈষম্য না থাকলে culture বাড়বে না আর culture-বিহীন একীকরণ কঠোর ও অন্যায় বৈষম্যেরই রূপান্তরমাত্র। যুদ্ধের প্রয়োজন তিনি স্বীকার করেন এবং যুদ্ধের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকাও বিশেষ প্রয়োজন মনে করেন।

এই হচ্ছে ফ্যাসিষ্ট্দলের মতবাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ-মতবাদ জগতে চলবে কি না। তাই সমস্ত জগৎ চেয়ে আছে এর পরিণাম দেখ্বার জন্যে। একথা অবশ্যই অস্বীকার করা যায় না যে অনেক বড় কথা মুসোলিনির মতের মধ্যে নিহিত রয়েচে। কিন্তু আবার অনেক গলদও এর মধ্যে দেখ্তে পাওয়া যায়। অবশ্য যতরকম মতবাদেরই সৃষ্টি হোক না কেন সবগুলোর ভিতরই যে পূর্ণ সত্য নিহিত আছে একথা কেউ বল্বে না। কিন্তু প্রত্যেক মতবাদের মূলে থাকে একটা আদর্শ উপলব্ধি কর্বার চেষ্টা এবং সেই আদর্শ উপলব্ধি করতে যেপরিমাণে সে-মতবাদ সহায়তা করে সেই পরিমাণেই সে-মতবাদকে সত্য বলে' মানুষ মেনে নেবে। ফ্যাসিষ্ট্-মতবাদ কতখানি সত্য তা প্রমাণ হবে তা দিয়ে ইতালীর বর্ত্তমান আদর্শ কতখানি উপলব্ধ হ'ল তাই দেখে'। কিন্তু যেভাবে এআন্দোলন এখন চল্ছে তাতে অনেকের মনে অনেকরকম সন্দেহ হ'তে আরম্ভ করেছে। এসম্বন্ধে Henry Tompkins যা লিখেছেন তা বিশেষ ভাব্বার। তাঁর লেখা থেকে কিছু অংশ নীচে উদ্ধৃত করে'ই এপ্রবন্ধ শেষ করব। তিনি লিখেছেন :

তাঁহার এই আন্দোলনের মূলে যে দেশাত্মবোধক-কর্ত্তব্যবুদ্ধির কতকগুলি সুন্দর আদর্শ আছে, একথা স্বীকার করা যেতে পারে ; তিনি দৃঢ়চরিত্র এবং সামরিক শৃঙ্খলা রক্ষার দিকে লক্ষ্য রাখেন একথাও মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু মানুষ যে গণতন্ত্রের ভারে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে এই কথাটা তিনি প্রমাণ করতে চান, ফ্যাসিষ্ট সৈন্যদলকে যতদিন খাড়া রাখা যায়, ততদিন মানুষকে এবিষয়ে তার মতামত প্রকাশ করতে বাধা দিয়ে। অভিজাত-সম্প্রদায়

ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে জুয়া খেলে ধ্বংস পাওয়ার হাত থেকে তিনি রক্ষা করেন বটে কিন্তু সেই সঙ্গে তাহাদের সোশ্যালিজম্ ও সোভিয়েটিজমের হাত থেকে সুরক্ষিত 'করে' রাখবার দাবীও করেন। যাহারা সামাজিক ও আর্থিক স্বাধীনতা স্পষ্টরূপে কামনা করে, তাহাদের বিরুদ্ধে তাঁহার একমাত্র অস্ত্র পাশব-শক্তি ন্যায় কি আইনের ধার তখন তিনি ধারেন না। ইতালিয়ান্ মহাজনরা যতদিন তাঁহাকে আশ্রয়স্থল বলে' জান্‌বে ততদিন পার্লামেণ্ট ও নিয়মতন্ত্রের প্রতি তাঁহার প্রতিকূলতাকে তাহারা বিনা আপত্তিতে চলে' যেতে দেবে।

দক্ষিণ ইউরোপীয় প্রকৃতির এমন কতকগুলি বিশেষত্ব আছে যাহাতে এই কপট শিভ্যাল্‌রি ও মহাজনী সম্ভব হয়েছে; কিন্তু সকলরকম বেদখলী ব্যাপারের মত ইহার শক্তিও নিরবচ্ছিন্ন নাটকীয় সাফল্যের উপর নির্ভর করে। এই শক্তির শেষ সীমা যে অতিক্রান্ত হয়েছে তাহার চিহ্ন ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে। ভিতরের দলাদলি ও বাহিরের অবিশ্বাস মুসোলিনির শক্তির মূলক্ষয় সুরু করেছে।

বিস্ফোরক

শ্রী যোগেন্দ্রমোহন সাহা

মানুষ দিন-দিন দৈহিক হিসাবে যতই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে ততই তাহাকে সেই শক্তি-হীনতার ক্ষতি-পূরণের জন্য কৃত্রিম শক্তি-উৎসের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইতেছে। সেই সন্ধানের সফলতার মধ্যে বিস্ফোরক-আদির উদ্ভাবন প্রধান। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সাধনার ফল মানুষের কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণেই বেশী নিয়োজিত হইয়াছে। সেকালে রসায়ন-শাস্ত্র যখন শিশু-দোলায় দোল খাইতেছে, তখন নেপোলিয়ান্ ১৫ বৎসরের যুদ্ধে মোটে দশ লক্ষ লোকের প্রাণ-নাশ করিয়াছিলেন। আর একালে রসায়ন উদ্দাম যৌবনে ১৫ মাসের চেয়েও কম সময়ের ভিতর প্রায় বিশ লক্ষ নর নারীকে নিহত করিয়াছে। আর এই দুইয়ের পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছে রাসায়নিকের সাধনা এবং তাঁহার বিস্ফোরক-আদি।

বর্ত্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ—বিশেষতঃ রসায়নের। এই যে সেদিন পশ্চিমে এত বড় যুদ্ধটা হইয়া গেল, তার মূলে কি মানুষের দৈহিক শক্তি ছিল, না সেনাবল ছিল? সে শক্তি-উৎস হইতেছে রাসায়নিকের ল্যাবোরেটরি বা তাঁর টেষ্ট টিউব।

"The pen is mightier than the sword" —তরোয়ালের চেয়ে কলম জোরাল—সে কথাটি এযুগে আর খাটে না। মার্টিন সত্যই বলিয়াছেন—the balance and test tube of the chemist is mightier than the other.- রাসায়নিকের নিক্তি আর পরখ-নল সবার চেয়ে শক্তিমান্!

বিস্ফোরক মানে কি? যে-কোনও বস্তু সহসা অত্যধিক-পরিমাণে সম্প্রসারিত হয় ও তাহার ফলে প্রচণ্ড শক্তির সৃষ্টি করে, তাহাকেই বিস্ফোরক (explosive) বলা যায়। আপনারা হয়ত শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, জলের ন্যায় এমন অনপকারক বস্তুও অবস্থা-বিশেষে সাংঘাতিক বিস্ফোরকের ন্যায় আচরণ করে। পৃথিবীর বুকের ভিতর অহর্নিশি আগুন জ্বলিতেছে। যখন উপরকার জল মাটির স্তর ভেদ করিয়া কোনওক্রমে সেই মধ্যেকার প্রজ্বলিত ধাতু গন্ধক প্রভৃতি দ্রব্যের সংস্পর্শে আসে তখনই উহা বাষ্পে পরিণত হয় ও উহার পরিমাণ হাজার-হাজার গুণ বাড়িয়া যায়। এই সম্প্রসারণের ফলে যে দুঃসহ চাপের সৃষ্টি হয়, তাহা চারিদিক্‌কার

গলিত পদার্থ-সমূহকে মাটির স্তর ভেদ করিয়া পৃথিবীর বুক চিরিয়া আকাশে বহু ঊর্দ্ধে প্রক্ষিপ্ত করে, আর এই মুক্তির স্পন্দনে সমস্ত পৃথিবী কাঁপিয়া উঠে। সাহিত্যের ভাষায় ইহাকেই ভূমিকম্প কহে। লোক-লোচনের সীমার ভিতর যুগযুগ ধরিয়া পৃথিবীর যে ভাঙ্গা-গড়া চলিতেছে, তাহার অনেকখানিই এই ভূমিকম্পের দরুন্। এই যে সেদিন জাপানে এত বড় ভূমিকম্পটা হইয়া গেল, তাহাতে কত হাজার-হাজার লোক মরিল, কত কোটি কোটি টাকার ধন-সম্পত্তি নষ্ট হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই। অনেকেই অনুমান করেন, বহু যুগ পূর্ব্বে জাপান এসিয়া-মহাদেশের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। তারপর হঠাৎ ভূমিকম্পের ফলে বর্ত্তমান জাপান ও এসিয়ার মধ্যেকার সমস্ত ভূখণ্ড ধসিয়া গেল এবং তাহার স্থান সমুদ্র-জলে পূর্ণ হইয়া জাপানকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। আর ছোট-খাটরকমের ভূমিকম্প ত জাপানে বারমাসে তের পার্ব্বণের মত লাগিয়াই আছে। কত বড় একটা নগরী, তাহার সমস্ত সমৃদ্ধি, সমস্ত সভ্যতা-সমেত চিরদিনের মত মুহূর্ত্তে লুপ্ত হইয়া গেল।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ক্রাকাতোয়াতে যে ছোট-খাটরকমের ভূমিকম্পটি হয়, তাহার ফলে এক বর্গমাইল-পরিমিত গোটা একটি পর্ব্বত ধূলি-মুষ্টির ন্যায় শূন্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল; প্রায় দুই হাজার মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতে এই কম্পনের ধ্বনি শ্রুত হইয়াছিল ও দেড়শত মাইল দূরের দরজা-জানালার কাচ ইহার প্রবাহের ধাক্কায় চুরমার হইয়া গিয়াছিল। দক্ষিণ-আফ্রিকায় জোহান্সেসবার্গ নগরের রেল-ষ্টেশনে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রায় ৫৫টন (এক টন প্রায় ২৭ মণের সমান) বিদারক জেলাটিন নামক একপ্রকার বিস্ফোরক দৈবাৎ সংঘর্ষণের ফলে বিদীর্ণ হইয়া যায়। বজ্রনিনাদে ও প্রচণ্ডকম্পনে সহরবাসীগণ শিহরিয়া উঠিয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া শুধু নিবিড় মেঘের ন্যায় পুঞ্জীভূত ধূমরাশির ভিতর হইতে উত্থিত একটি প্রজ্জলিত অগ্নিশিখা দেখিতে পাইল। কিন্তু এত বড় সাংঘাতিক বিস্ফুরণের ফলে অকুস্থানে মোটে ৩০০ শত ফুট দীর্ঘ, ৬৫ ফুট প্রশস্ত ও ৩০ ফুট গভীর একটি খাতের সৃষ্টি হইল ও চতুর্দ্দিকে প্রায় ১০০০ গজ পরিমিত স্থানের বাড়ীঘর চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। মানুষের এই কৃত্রিম বিস্ফোরকাদি প্রকৃতির বজ্রশক্তির তুলনায় কত ক্ষীণ!

এইবারে একটি-একটি করিয়া বিস্ফোরকগুলির উপাদান, প্রস্তুত-প্রণালী ও তাহাদের ধর্ম্ম (property) সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিব।

বারুদ

ইহার উপাদান—

৭৫ ভাগ সুরা (potassium nitrate)

১৫ ভাগ কয়লা (charcoal)

১০ ভাগ গন্ধক (sulphur)

উপরোক্ত পদার্থগুলি উত্তমরূপে গুঁড়া করিয়া উক্ত-পরিমাণে মিশ্রিত করিতে হয়। কামান-গড়ার উপযোগী তামা-দস্তা-মিশ্র ধাতুকে অথবা তাম্রে নির্ম্মিত ভিতরে ফলা লাগানো বৃহৎ ঢোলে এই মিশ্রণ-কার্য্য সম্পাদিত হয়। অতঃপর চালুনী দিয়া ছাঁকিয়া হাইড্রলিক প্রেস বা জল-পীড়ন-যন্ত্র দ্বারা চাপ দিয়া উহাকে একটি বৃহৎ তালে পরিণত করা যায় ও পরে উহা হইতে আবশ্যক-অনুযায়ী আকারবিশিষ্ট খণ্ড বারুদ প্রস্তুত হয়। মোটামুটিভাবে এই হইল ইহার প্রস্তুত-প্রণালী। কামান বন্দুক প্রভৃতি হইতে গুলি ছুড়িবার জন্যই সাধারণতঃ এই বারুদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নলের ভিতরে প্রথমে খানিকটা বারুদ পূরিয়া গুলি ঠাসিয়া দিতে হয়। অতঃপর যেই পশ্চাৎদিক্ হইতে বারুদে আগুন দেওয়া হয়, অমনি তৎক্ষণাৎ উহা জ্বলিয়া গ্যাসে পরিণত হয় ও রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে সে-সময় যে ভীষণ তাপ উৎপাদিত হয়, তাহা উক্ত গ্যাসকে বহু-গুণে বর্দ্ধিত করে ও এই সম্প্রসারণের ফলে ভয়ানক চাপের সৃষ্টি হয়। সম্মুখে খোলা পাইয়া গ্যাস গুলিটিকে সেই দিকে ঠেলিয়া দেয় ও উহা বিষম-বেগে সম্মুখে বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হয়।

কিন্তু বিস্ফোরক-বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই বারুদের ব্যবহার অনেক কমিয়া গিয়াছে ও ধূমহীন বারুদ উহার স্থান অধিকার করিয়াছে। প্রথমতঃ এই বারুদ পোড়ানয় যে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়, তাহা চারিদিক্কার বায়ুকে দূষিত করে ও গুলি-নিক্ষেপ-কারীকে বেষ্টন

করিয়া ধোঁয়ার সৃষ্টি করে ও ফলে উহাকে দূরস্থিত শত্রুর গোচরীভূত করে। তখন তাহার আত্মরক্ষা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।

লিব্যার্ত্তে নামক যুদ্ধ-জাহাজ
১৯১১ সালে বারুদে আগুন লাগিয়া যাইবার পরের অবস্থা

ডিনামাইট্ বা নাইট্রোগ্লিসেরিন্

ডিনামাইট প্রস্তুতের মূল পদার্থ হইতেছে গ্লিসেরিন্। অনেকেই এই স্বচ্ছ মিষ্ট তৈল-জাতীয় পদার্থটি দেখিয়াছেন। অসৎ ব্যবসায়ীরা অনেক সময় মধুতে গ্লিসেরিন্ ভেজাল দিয়া থাকে। সাবান্ ও চর্ব্বি-বাতি প্রস্তুতের প্রক্রিয়া-কালে গৌণ পদার্থ-রূপে ইহা পাওয়া যায়। ডিনামাইট প্রস্তুতের জন্য যে গ্লিসেরিন্ ব্যবহৃত হয়, তাহা অতি উত্তমরূপে বিশুদ্ধ করা একান্ত আবশ্যক।

সীসক-নির্ম্মিত চৌবাচ্চায় নাইট্রিক্ এসিড্ ও সাল্-ফিউরিক্ এসিডের ঠাণ্ডা মিক্শ্চার রাখিয়া তাহাতে সূক্ষ্ম ঝরণা-ধারায় গ্লিসারিন বৃষ্টি করিতে হয়। চৌবাচ্চার চারিদিক্ বরফ-জলের বেষ্টনীর দ্বারা সর্ব্বদা ঠাণ্ডা রাখা হয়। উহার তলদেশে অসংখ্য ছিদ্রপথে বায়ু-বুদ্বুদ চালিত করিয়া অ্যাসিড্ ও গ্লিসেরিন্‌কে উত্তমরূপে মিশান হয়। এই মিশ্রণের ফলে নাইট্রিক্ এসিড্ ও গ্লিসারিনের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া হয় ও নাইট্রো-গ্লিসেরিন্ প্রস্তুত হয়। অতঃপর উহাকে উত্তমরূপে জলদ্বারা বার-বার ধৌত করা হয় ও অবশেষে ক্ষার-জলে (অ্যাল্‌কলি-জলে) ও পুনরায় বিশুদ্ধ জলে ধৌত করা হয়। তার পর যে ভারী তৈল-পদার্থ পাওয়া যায়, উহাকে বিশুদ্ধ লবণের ভিতর দিয়া ফিল্‌টার করা হয় অর্থাৎ ছাঁকা হয়। কথায় বলিতে ইহা খুব সহজ, কিন্তু কার্য্যে এই প্রস্তুত-ব্যাপার যে কত শক্ত ও বিপজ্জনক তাহা বলিতেছি।

নাইট্রো-গ্লিসেরিন্ প্রস্তুতের নিমিত্ত সাধারণতঃ তিনটি ঘরের প্রয়োজন। ঘরগুলি পরস্পর হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে অবস্থিত ও ভূগর্ভে প্রোথিত হওয়া আবশ্যক। একটি ঘরে তিনজনের বেশী লোক কাজ করে না ও প্রত্যেককেই সাধারণ পাদুকার পরিবর্ত্তে বনাতে নির্ম্মিত পাদুকা ব্যবহার করিতে ও নিঃশব্দে অতি ধীরে সাবধানে চলা-ফেরা করিতে হয়, যেন কোথাও কোনরূপ সংঘর্ষের সৃষ্টি না হয়। প্রথম গৃহে অ্যাসিডের সহিত গ্লিসেরিন্ মিশান হয়। প্রতিমুহূর্ত্তেই চৌবাচ্চায় থার্ম্মোমিটার নিমজ্জিত করিয়া তাপ পরীক্ষা করিতে হয়, যেন কোন-ক্রমে উহা ২৫ ডিগ্রির বেশী না হয়। যদি কোন কারণে হঠাৎ তাপের মাত্রা বেশী হইয়া যায়, তবে তৎক্ষণাৎ গ্লিসেরিন্ বৃষ্টি বন্ধ করা হয় ও চৌবাচ্চায় ভাসমান তৈলকে বরফজলে পূর্ণ অন্য এক চৌবাচ্চায় লইয়া গিয়া তাপ কমান হয়। ইহার কোনোখানে যদি তিলমাত্র ব্যতিক্রম হয়, অমনি রুদ্রনাদে গগন-ভেদী বিস্ফোরণ শব্দ হইবে। এইসব বিপদ্-নিবারণের জন্যই ঘরগুলিকে ভূগর্ভে প্রোথিত, যথাসম্ভব কমসংখ্যক লোক নিযুক্ত ও বনাতের পাদুকার বন্দোবস্ত করিতে হয়। যাহাতে বিস্ফোরণ সংক্রামক না হইতে পারে, তাহারও বিশেষ বন্দোবস্ত করিতে হয়। মৃত্তিকা-প্রোথিত সীসার নলের ভিতর দিয়া গৃহ হইতে গৃহান্তরে তৈল সরবরাহ করা হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় গৃহে ধৌত করা ও ছাঁকার

কাজ সম্পাদিত হয় ও এতদুভয়েই পূর্ব্বোক্তরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। প্রথম গৃহকে নাইট্রেটিং হাউস্ বা নাইট্রেট্ করার ঘর দ্বিতীয়কে ওয়াশিং হাউস্ বা ধৌত করার ঘর, তৃতীয় গৃহকে শুষ্ক করার ঘর বলে। নাইট্রো-গ্লিসেরিনে লেশমাত্র অ্যাসিডও লাগিয়া থাকিলে উহা অকালে স্বতঃস্ফূরিত হইয়া জীবন নাশের কারণ হইয়া দাঁড়ায় ও এইজন্য ধৌত-কার্য্য খুব উত্তমরূপ হওয়া আবশ্যক।

সামান্য-মাত্র অসাবধানতায় কিরূপ সাংঘাতিক শাস্তি পাইতে হয়, একটি দৃষ্টান্তেই তাহা অনুমেয়। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী বেলা ১০টা ৫৫ মিনিটের সময় হেল্ নগরের নাইট্রোগ্লিসেরিনের কারখানায় একটি কারিগরের একটু অসাবধানতায় বিস্ফোরণ হয়। দূরে দূরে অবস্থিত থাকা সত্ত্বেও মুহূর্ত্ত-মাত্র সময়ের মধ্যে তিনটি ঘরই ধূলি-কণায় পরিণত হয়। প্রায় ৯০ মাইল দূর হইতে বজ্রধ্বনির মত এ বিদারণ-শব্দ শোনা গিয়াছিল এবং ৪ মাইলের ভিতর প্রায় সমস্ত ঘর-বাড়ীর দরজা-জানালার কাচ চুর-মার হইয়া গিয়াছিল।

নাইট্রোগ্লিসেরিনের স্বাদ বেশ মিষ্ট কিন্তু ইহা অতি বিষাক্ত। বেশী-পরিমাণে খাইলে ইহা কুচিলা-বিষের (ষ্ট্রিক্নিন্) ন্যায় কার্য্য করে ও অচিরেই মৃত্যু ঘটায়। কিন্তু অল্প মাত্রায় সেবনে হৃদ্-যন্ত্রের ক্রিয়া বেশ দ্রুত চলে। ইহা প্রায় সকল জিনিসের ভিতরেই অতি অদ্ভুতভাবে প্রবেশ (soak) করে। দেহের যে-কোন অংশে রাখিলে ইহা ত্বকের ভিতর প্রবেশ করিয়া রক্তের সহিত মিশে এবং তাহাতে মাথা ঘুরে ও হৃদ্-যন্ত্র বিকল হয়।

বারুদের তুলনায় ইহা দশগুণ ক্ষমতাশালী; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় নাইট্রোগ্লিসেরিন্ অত সহজে বিদীর্ণ হয় না। এমন কি একটি প্রজ্বলিত দীপশলাকা উহার ভিতরে নিমজ্জিত করিয়া নির্ব্বাপিত করা যায়। কিন্তু অকস্মাৎ তাপ বা আঘাত পাইলেই উহা বিদীর্ণ হয়।

নাইট্রোগ্লিসেরিনের একটি ধর্ম্ম হইতেছে ঠাণ্ডাতে ইহা জমিয়া বরফের ন্যায় শক্ত হইয়া যায় ও ইহার পরিমাণ বর্দ্ধিত হয়। এরূপ হওয়া অতি বিপজ্জনক, কারণ শক্ত নাইট্রোগ্লিসেরিন্ অতি সহজেই বিদীর্ণ হয়। বস্তুতঃ হির্‌শ্‌ব্যার্গের একজন খনিজ-পূর্ত্তবিদ্যা-বিশারদ মাইনিং এঞ্জিনিয়ার জমাট নাইট্রোগ্লিসেরিন্ টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ভাঙ্গিতে গিয়া প্রাণ হারায়। আর-এক বার এক বাক্স নাইট্রোগ্লিসেরিন্ স্থানান্তরে প্রেরণের পথে এক রেল-ষ্টেশনের গুদাম-ঘরে পড়িয়া ছিল। রাত্রিতে ঠাণ্ডা লাগিয়া উহা জমিয়া বরফ হইয়া যায় ও উহার পরিমাণ বর্দ্ধিত হওয়ার দরুন্ বাক্সের ডালা উদ্ভিন্ন করিয়া বাহির হইয়া আসে। পরদিন সেই গুদামের একটি কর্ম্মতৎপর বালক উহা দেখিতে পাইয়া যন্ত্রপাতি সহ বাক্সটিকে ভাল করিয়া প্যাক্ করিতে লাগিয়া যায়। ফলে অচিরাৎ উহা বিদীর্ণ হইয়া সমস্ত ষ্টেশন-গৃহটিকে ভগ্নস্তূপে পরিণত করে ও প্রায় ৩০টি প্রাণীর ইহলীলা সাঙ্গ হয়। ফলতঃ এই ঘটনার পর হইতে রেল ও ষ্টিমার-কোম্পানীর মালিকগণ নাইট্রোগ্লিসেরিন্ লাগেজ্ গ্রহণ বারণ করিয়া নিষেধাজ্ঞা প্রচার করেন। এই-সকল কারণে তদানীন্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাইট্রোগ্লিসেরিন্ প্রস্তুত-কারক সুইডেন্-দেশ-বাসী এম্ নোবেল (M. Nobel —সুবিখ্যাত নোবেল-প্রাইজের প্রতিষ্ঠাতা) এই ব্যবসা ছাড়িয়া দিবেন কি না ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, এমন সময় দৈব-ক্রমে একটি উপায় আবিষ্কৃত হয়। বালি স্বীয় ওজনের প্রায় তিনগুণ-পরিমাণ নাইট্রোগ্লিসেরিন্ অনায়াসে শোষণ করিতে পারে। এই বালি-মিশ্রিত নাইট্রোগ্লিসেরিন্ দেশ-বিদেশে রপ্তানি করিবার পক্ষে খুব সুবিধা। কারণ ইহা অত সহজে বিদীর্ণ হয় না, পরন্তু ইহার কার্য্যকারিতা অবিমিশ্র নাইট্রোগ্লিসেরিনের চেয়ে কোন অংশে হীন নহে। সাধারণতঃ কিয়েজেলগুর্ (Kieselguhr) নামক একপ্রকার অতি উৎকৃষ্ট বালি দ্বারা উহা শোষণ করান হয়। ইহাকে কিয়েজেলগুর্ ডাইনামাইট্ বলে। কিন্তু অধুনা ইহা হইতেও উৎকৃষ্টতর একটি শোষক দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। কোলোইডিয়ন্ (Colloidion) নামক (ইহার প্রস্তুত-প্রণালী পরে বিবৃত হইবে) একপ্রকার তুলার (৭ ভাগ) সঙ্গে নাইট্রোগ্লিসেরিন্ (৯৩ ভাগ) ৪০ ডিগ্রি তাপে উত্তমরূপে মিশ্রিত করা হয়। ঠাণ্ডা করিলে ধূম্রবর্ণের যে সঙ্কোচ-প্রসারশীল স্থিতিস্থাপক বস্তু পাওয়া যায় তাহার সহিত

স্থুরা ও দারু-চূর্ণ বা কাঠের গুঁড়া মিশাইয়া এই বিস্ফোরকটি প্রস্তুত হয়। ইহার নাম বিদারক জেলাটিন্।

যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়া মানবের অনেক কল্যাণকর কার্য্যেও এই ডাইনামাইট্ ব্যবহৃত হয়। বড়-বড় খাল কাটা, অনাবশ্যক পাহাড়-পর্ব্বত উচ্ছেদ করা ও তাহার ভিতর দিয়া রেল-পথের জন্য সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করা প্রভৃতি কল্পনাতীত দুষ্কর কার্য্যগুলি আজ মানুষ ডাইনামাইট্ সাহায্যে অক্লেশে সম্পন্ন করিতেছে। বস্তুতঃ এই-সব কার্য্যের জন্য আজকাল বৎসরে হাজার হাজার টন্ ডাইনামাইট্ প্রস্তুত হইতেছে। অবশ্য ইহার যে অপব্যবহারও হয় নাই তাহা নহে। আমেরিকা ও ইউরোপে আজকাল এরূপ একদল ডাকাতের উদ্ভব হইয়াছে, যাহারা ডাইনামাইট্ সাহায্যে অতি অক্লেশে ও অল্প সময়ে তালা, লোহার সিন্ধুকের ডালা প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া গৃহস্থের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া বেড়াইতেছে। এই ত সেদিনও লণ্ডনের হিপোড্রমে এরূপ একটি ডাকাতি হইয়া গিয়াছে।

এই বেলা ডাইনামাইট্ ও বারুদের ডাইনামাইট্-এর কার্য্যকারিতার পার্থক্যের কথা একটু বলা দর্কার। বারুদের শক্তি-বেগ একমুখো, কিন্তু ডাইনামাইট্এর সর্ব্বতোমুখ। সেজন্য প্রক্ষেপণ বস্তু (projective agent), হিসাবে ডাইনামাইট্ ব্যবহৃত হয় না। বারুদকে রুদ্ধ অবস্থায় না রাখিয়া আগুন ধরাইয়া দিলে ইহা বিদীর্ণ হয় না, আস্তে আস্তে পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যায়। এই-জন্যই বন্দুক কামান প্রভৃতিতে ছাড়া বারুদের বড় একটা ব্যবহার হয় না। কিন্তু ডাইনামাইট্ দ্বারা বন্দুক ছুড়িলে উহা মালিক-সমেত বন্দুকটিকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলিবে। কোন পাহাড়ের উপর বারুদ পোড়াইলে পাহাড়ের কিছুই হইবে না। কিন্তু ডাইনামাইট্ পোড়াইলে উহা পাহাড়ের সেই অংশকে ধূলি-মুষ্টিতে পরিণত করিবে।

৬— গান্-কটন

চর্ব্বি (fat ও grease) হইতে মুক্ত বিশুদ্ধীকৃত কার্পাস তূলা, ১ ভাগ নাইট্রিক্ অ্যাসিড্ ও ৩ ভাগ সাল্ফিউরিক্ অ্যাসিডের মিক্শ্চারে প্রায় ৫।৬ মিনিট-কাল নিমজ্জিত করা হয়। অতঃপর তুলা তুলিয়া ইহা হইতে অতিরিক্ত এসিড্ নিংড়াইয়া ফেলা হয়। পরে ইহা উপর নাইট্রিক্ অ্যাসিডের ক্রিয়ার পূর্ণতা প্রাপ্তির জ ইহাকে প্রায় ২৪ ঘণ্টাকাল শীতল মৃৎ-পাত্রে রা হয়। অতঃপর উহাকে যন্ত্র-সাহায্যে কুচি-কুচি করি কাটিয়া জল ও সোডা দ্বারা উত্তমরূপে বার-বার ধৌ করা হয়, যাহাতে লেশমাত্র অ্যাসিড্ও অবশিষ্ট না থাকে পরে ইহাকে ভিজা অবস্থায় জল-পীড়ন-যন্ত্রে বিভি আকার প্রদান করা হয়। দেখিতে ইহা ঠিক তুলারই ম থাকে। ইহাতে শতকরা প্রায় ১৫।১৬ ভাগ জল থাকে কিন্তু ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে ইহাকে উত্তমরূপে জ ডুবাইয়া লওয়া হয়, যাহাতে শতকরা প্রায় ৩৫ ভ জল থাকে। ইহার ব্যতিক্রম হইলেই বিপদ্ অবশ্যম্ভাবী কারণ শুষ্ক গান্-কটন অতি সামান্য আঘাতেই—এ কি জোরে হাওয়া লাগিলেই—বিদীর্ণ হয়। গত ১৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ্চ্ সোমবার নোবেলের আয়ার্শায়া স্থিত কার্খানায় ঠিক এই কারণে অতি নিদারুণ এক বিস্ফুরণ হইয়া গিয়াছে।

ইহার স্বভাব অনেকটা বারুদের মত। অবস্থাতেই ইহার বিদারণ ক্ষমতা প্রকটিত হয়; অনব অবস্থায় ইহা পুড়িয়া শুধু ধোঁয়ার সৃষ্টি করে।

গান্-কটন কার্ট্রিজ টোটা প্রস্তুতে খুব ব্যবহৃত হ এই প্রসঙ্গে একটি কৌতুককর ঘটনার উল্লেখ করিতে নটিংহামের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে একদা রবি অপরাহ্ণে দুইজন খনির মজুর তাহাদের এক বন্ধুকে বি রণের নমুনা দেখাইবার জন্য এক মাঠে গিয়া এ কার্ট্রিজে আগুন ধরাইয়া উহা দূরে নিক্ষেপ করে। প্রভুভক্ত কুকুরটি মনে করিল উহাকে উপলক্ষ করি এই খেলা; উনি অমনি ক্ষিপ্রগতিতে ছুটিয়া গিয়া কার্ মুখে প্রভুদের সমীপে আসিয়া হাজির। এই দেখি তাহারা প্রাণপণে ছুটিতে লাগিল, কুকুরটিও তাহ পিছু পিছু ছুটিয়া চলিল—কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! কিন্তু সৌ গ্যের বিষয় অতি অল্প সময়েই কুকুরের মুখের ল কার্ট্রিজের আগুন নিবিয়া যায় ও সে-যাত্রায় বন্ধুত্রয় পায়।

কার্পাস তুলার উপর যদি নাইট্রিক্ অ্যাসিডের ক্রিয়া পরিণত হইতে না-দেওয়া যায়, তবে যে-জিনিষটি পাওয়া যায়, তাহাকে কলোডিয়ন্ কহে। ইহা ডিনামাইট্ ও কলোডিয়ন্ প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। আজকাল এই কলোডিয়ন্ ও গান্-কটনএর সংযোগ জিল্যাটিনাইজড্ গান্-কটন্-নামক একপ্রকার ধূমহীন বারুদ তৈরী হয়। "ফ্রেঞ্চ বি পাউডার্"-নামক যে বারুদটি তাহা ২ ভাগ গান্-কটন ও এক ভাগ কলোডিয়ন্এর সংযোগে প্রস্তুত। এইপ্রকারের বারুদ সহসা বিদীর্ণ হয় না। কিন্তু পুরাতন হইলে অনায়াসে বড় ভীষণ-ভাবে বিস্ফুরিত হয়। এই জন্যই ফরাসী নৌ-সেনা-কর্ত্তৃপক্ষগণের আদেশ আছে—৪ বৎসরের অধিক দিনের বারুদ সমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়া বিনষ্ট করিতে হইবে। অনেক অনর্থের পরেই তাঁহারা এ শিক্ষাটি পাইয়াছেন। সর্ব্বপ্রথমে জেনা নামক ফরাসী যুদ্ধ-জাহাজটি ধ্বংস হয়। তার পর ১৯১১ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে ভোর টা ৫৫ মিনিটের সময় টুলন্ পোতাশ্রয়ে লিবার্টি নামক যুদ্ধ-জাহাজখানাতেও একটি ভীষণ বিস্ফুরণ হয়। তাহাতে ০০ শত লোক হত ও সমগ্র জাহাজখানা ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়। প্রায় ৩০ মাইল দূর হইতে বিদারণের শব্দধ্বনি শ্রুত হইয়াছিল। অতঃপর অনুসন্ধানের দ্বারা জানা যায়, ৪ বৎসরের অধিক পুরাতন "বি পাউডার"এর ই কাজ।

কার্‌বাইট্ (Carbite) এর উপাদান

Nitroglycerine—৩০ ভাগ
Gun cotton— ৬৫ ভাগ
Vaseline— ৫ ভাগ

এইগুলিকে উত্তমরূপে মিশাইয়া ন্যাল্‌নেলে অবস্থায় বন্তিকাস্বরূপ ছাঁচে গড়িয়া অতি নিপুণতা ও সাবধানের সহিত শুষ্ক করা হয়। ইহা ধূমহীন ও অকালে বিদীর্ণ হইয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই। কামান-বন্দুকের পক্ষে ইহা অতি উত্তম বারুদ।

পিক্‌রিক্ অ্যাসিড :—ফিনল বা কার্ব্বলিক্ অ্যাসিডের সহিত নাইট্রিক্ অ্যাসিড্ মিশাইয়া ইহা প্রস্তুত হয়। ইহার প্রস্তুত প্রণালী খুব সহজ ও আদপেই বিপজ্জনক নহে। ইহা অতি সুন্দর হলুদে রং-বিশিষ্ট। রঞ্জন-কার্য্যে পোড়া-ঘায়ে ও শেল-প্রস্তুত-কার্য্যে ইহা ব্যবহৃত হয়। মার্কারি ফুলমিনেট্-নামক একপ্রকার অতি সাংঘাতিক পদার্থ-সাহায্যে ইহাকে বিদীর্ণ করা হয়। শেল ফাটিয়া ইহা হইতে নানাপ্রকার বিষাক্ত মারাত্মক গ্যাস্ বাহির হয়। নিশ্বাসের সহিত উহা গ্রহণ করিলে অতি অল্প সময়ের ভিতরেই মৃত্যু ঘটে; স্থানীয় গাছ-পালা, ঘাট-মাঠ পীতাভা প্রাপ্ত হয় ও দর্শন-মাত্রেই বুঝা যায়—ইহা পিক্‌রিক্ অ্যাসিডের কার্য্য।

কিন্তু বিস্ফোরক-হিসাবে ইহার এমন একটি মারাত্মক দোষ আছে, যাহার জন্য ট্রিনাইট্রোটোলুয়েন্ নামক আর-একটি বিস্ফোরক ইহার স্থান দখল করিয়াছে। আল্‌কাত্‌রা হইতে প্রাপ্ত টলুয়েন্ নামক একপ্রকার তরল পদার্থের সহিত নাইট্রিক্ এসিড্ মিশাইয়া ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা অসাধারণরকম স্থিতি-স্থাপক ও শক্তি-হিসাবে পিক্‌রিক্ অ্যাসিডের চেয়ে হীন নহে। অতি উৎকৃষ্টধরণের শেল-প্রস্তুতে ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহাকেও মার্কারি ফুল্‌মিনেট্ দ্বারা বিদারণ করা হয়।

মার্কারি ফুলমিনেট্:—ইহা অতি ভীষণরকমের বিস্ফোরক। Percussion cap, detonating fuses প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। পারদের সহিত নাইট্রিক্ অ্যাসিড ও অ্যাল্‌কহল্ মিশাইয়া ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা কাচের ন্যায় স্বচ্ছ ও শক্ত এবং একটু-মাত্র আঘাতেই বিদীর্ণ হয়।

নাইট্রোজেন্ ক্লোরাইড্:—১৮১১ খৃষ্টাব্দে ডুলং নামক ফরাসী রাসায়নিক ইহা আবিষ্কার করেন। কিন্তু ইহা লইয়া পরীক্ষা-কালে তাঁহার একটি চক্ষু নষ্ট ও হাতের তিনটি অঙ্গুলি দেহ-বিচ্যুত হইয়া যায়। অন্যেরও এই বিপদ্ হইতে পারে ভাবিয়া তিনি এই সাংঘাতিক আবিষ্কারের কথা গোপন রাখেন। কিন্তু ২ বৎসর পরে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ফ্যারাডে নামক ইংরেজ রাসায়নিক ইহা স্বাধীনভাবে আবিষ্কার করেন ও পরীক্ষা-কালে ইহা ফাটিয়া তাঁহার দেহ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যায়।

অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড্‌-নামক দ্রব্য জলে গুলিয়া তাহার ভিতরে ক্লোরিন্‌ গ্যাস প্রবেশ করাইলে পাত্রের নীচে একপ্রকার তৈল জমা হয়। ইহা এত বিকার্য্য (sensitive) যে, সূর্য্যের আলোর স্পর্শে বা হাওয়ার স্পন্দনেই ইহা বিদীর্ণ হয়। এরূপ সাংঘাতিক জিনিষ বিস্ফোরকে অবশ্যই ব্যবহার করা চলে না।

অতঃপর হয়ত জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, যদি এতটুকু ডিনামাইট্‌ বা শেলের ভিতর এত প্রচণ্ড শক্তি নিহি[ত] আছে, তবে তাহা শুধু ধ্বংসের কার্য্যে নিয়োজিত ন[া] করিয়া এঞ্জিন কল কারখানা প্রভৃতি চালানোর কার্য্যে কয়লা, তৈল, তাড়িত প্রভৃতির পরিবর্ত্তে কেন ব্যবহৃত হয় না? তাহার উত্তর এই যে, এই শক্তি ঠাণ্ডা ও প্রচণ্ড হইলেও অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ইহা নিঃশেষিত হইয়া যায়—স্থায়ী কাজ পাওয়া ইহা দ্বারা অসম্ভব।

মণিহার

শ্রী সীতা দেবী

(১)

হিমানীর কাছে আকাশটা সে-দিন যেন অস্বাভাবিক-রকম কালো হইয়া উঠিয়াছিল। আষাঢ়ের সন্ধ্যা, মেঘভারাক্রান্ত; কিন্তু আকাশের পশ্চিম প্রান্ত তখনও রক্তপদ্মের পাপ্‌ড়ীর মত রঙীন্‌ হইয়া আছে। কিন্তু হিমানীর বিরক্ত মন তাহার দৃষ্টিকে সেদিকে ফিরিবার কোনো অবকাশই দিল না। সারাদিন তাহার কেবল খাটুনীর উপর খাটুনী, দিনান্তে যদি-বা একটু হাসি বা আমোদের ভিতর সমস্ত দিনের গ্লানিটাকে বিসর্জ্জন দিবার সুবিধা জুটিয়াছিল, অমনই ভগবানের চোখ আসিয়া পড়িল তাহার উপর। বৃষ্টিটা আরো ঘণ্টা-খানেক আগে হইয়া চুকিয়া গেলে, বা ঘণ্টা-দুই পরে আরম্ভ হইলে বিধাতার সৃষ্টি কিছু আর উল্টাইয়া যাইত না।

গাড়ীটা আর্ত্তনাদ করিয়া ঠিক এই সময়ে থামিয়া গেল। রাস্তার বাতি তখনও জ্বলে নাই, আধ-অন্ধকারে কাদায়-ভরা সরু গলি দিয়া হাঁটার ফলে এই তরুণীটির বিরক্তি আরো যেন দুইগুণ বাড়িয়া উঠিল। বাড়ীর সদর দরজা ভেজানো কি বন্ধ তাহা ভাল করিয়া লক্ষ্য না করিয়াই সে সশব্দে করাঘাত করিয়া বলিল, "সবাই কি এখন থেকে কানে তুলো গুঁজে' ঘুমোচ্ছ নাকি?"

দরজাটা ধীরে ধীরে খুলিয়া গেল। খোলা দরজার পথে শাদা থান-পরা একটি রমণী-মূর্ত্তিকে দেখিয়া হিমানী তিক্ত-কণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা, ছোট পিসী, রোজ ব[লি] এখানে একটা আলো রাখ্‌তে, তা কি কিছুতেই হ'[য়ে] ওঠে না তোমার দ্বারা? আমার পা'টা খোঁড়া হ'য়ে গেলে তোমাদেরও কিছু সুবিধা হবে না।"

তাহার ছোট পিসী সাবিত্রী স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "ত[া] ত জানি না। আমি আলো দিতেই আস্‌ছিলাম, এম[ন] সময় তুই এসে পড়্‌লি। চল্‌ উপরে; আমি আবার কড়[া] চড়িয়ে এসেছি। খাবার করাই আছে।"

পিসীর পিছন-পিছন উঠিতে-উঠিতে হিমানী বলিল, "দেখি, খাবারটা এখুনি আর খাব না, বৃষ্টি যদি না আসে তাহ'লে মৃণালের ওখানেই যাব, সে অনেক করে' যেতে বলেছিল। এইটুকু হেঁটে যেতে পাঁচ-ছ' মিনিটের বেশী কখখনো লাগ্‌বে না। তা রাস্তায়, যে কাদা হয়েছে হাঁট্‌তে ইচ্ছাও করে না। খোকার নিশ্চয়ই যাবার মতলব নেই, তাকে ত ধারে-কাছে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।"

সাবিত্রী বলিলেন, "যাবার মতলব যথেষ্টই আছে বেটাছেলে নেমন্তন্ন খাবার লোভ কখনও ছাড়ে নাকি কখন? স্কুল থেকে এসে যেই শুনলে যে, মৃণালদের বাড়ী রাত্রে খাবার জন্তে বলেছে, চা নয়, অম্‌নি লাফাতে লাফাতে আবার বেরিয়ে গেল। এখুনি আস্‌বে।"

কথা বলিতে-বলিতে পিসী-ভাইঝি দু-জনে উপরে আসিয়া পৌঁছিল। রান্নাঘর বলিতে এই দরিদ্র পরিবারের কিছু ছিল না, সঙ্কীর্ণ বারাণ্ডাটার একটা কোণ চট ও দরমার সাহায্যে ঘিরিয়া লইয়া তাহারই ভিতর রান্নার কাজ সারা হইত। চটের পর্দার বাহিরে দাঁড়াইয়া হিমানী বলিল, "আমি কাপড় ছেড়ে আস্‌ছি, তুমি খাবার দাও।"

একটি ভাড়াটে বাড়ীর দো-তলায় একখানি মাঝারী আর একখানি অতি ক্ষুদ্র ঘর লইয়া এই পরিবারটি বাস করে। হিমানীর পিতা অক্ষয়কুমার ধনবান্ কোনো কালেই ছিলেন না, তবে জীবনের প্রথম ভাগে তাঁহার দিন স্বচ্ছলভাবেই কাটিয়াছিল। মধ্য-বয়সে অকস্মাৎ পীড়িত হইয়া পড়িয়া দীর্ঘকাল তাঁহাকে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হয়। নিজের সঞ্চিত অর্থ, পত্নীর অলঙ্কার এবং দেশের ভদ্রাসন বাটীর অংশটুকু সমস্তই এই অবসর-কালে একে একে বিদায় গ্রহণ করিল। শরীরটা যখন অল্প একটুকু সারিয়া উঠিয়া তাঁহাকে আর কিছু ভাবিবার অবকাশ দিল, তখন অক্ষয়কুমার সচেতন হইয়া দেখিলেন, সংসারে সম্পত্তির মধ্যে অতিপরিশ্রমে মৃতপ্রায় পত্নী এবং দুইটি পুত্র-কন্যা ছাড়া বড় বিশেষ-কিছু অবশিষ্ট নাই। ইতিমধ্যে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হইয়া তাঁহার স্ত্রীও পরলোকে প্রস্থান করিলেন। হিমানী তখন বারো বৎসরের, অমিয় তাহার চেয়ে বছর তিনের ছোট।

চারিদিক্ হইতে আঘাতের পর আঘাত খাইয়া অক্ষয়কুমার একেবারে যেন মুষড়াইয়া গেলেন। কিন্তু দরিদ্রের শোক করিবারও অখণ্ড অবসর নাই, ভগ্ন দেহ-মন লইয়াই তাঁহাকে কাজের সন্ধানে বাহির হইতে হইল। কাজ চলন-সইরকম জুটিল বটে, কিন্তু ছেলে-মেয়েকে বাড়ীতে রক্ষকবিহীনভাবে রাখিয়া কাজ করিতে যাওয়াও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার হইয়া উঠিল। এমন সময় তাঁহার ছোট বোন সাবিত্রী বিধবা হইয়া ভাইয়ের আশ্রয়ে আসিয়া পড়িলেন। আশ্রয় যে কে কাহাকে দিলেন, তাহা বলা শক্ত। কিন্তু অক্ষয়কুমার বোনকে পাইয়া বাঁচিয়া গেলেন। মাসান্তে কয়েকটি টাকা আনিয়া বোনের হাতে দিয়া তিনি পরম নিশ্চিন্ত হইয়া ভাবিতেন, তাঁহার সাংসারিক সকল কর্ত্তব্যই সম্পূর্ণভাবে পালন করা হইল। এই টাকায় সংসার চলিতে পারে কি না, এবং পারিলেও সে কিপ্রকার পারা, তাহার খোঁজ করা তিনি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বোধ করিলেন।

সংসার চলিতেই লাগিল। ঠিকা ঝিটিকে সাবিত্রী বিদায় করিয়া দিলেন। হিমানী বই-খাতা ছাড়িয়া তাঁহার সঙ্গে বাসন-মাজা, রান্না-করা এবং ঘর-ঝাঁট দেওয়ার কাজে লাগিয়া গেল। এই বন্দোবস্তের নূতনত্বটা যে ক'দিন রহিল সে ক'দিন তাহার ভালই লাগিল। "লেজেণ্ড্‌স্ অব্ গ্রীস্ এণ্ড্ রোম" এবং গৌরীশঙ্কর দে'র অঙ্কের বইয়ের উপর ধুলার রাশি অবাধে জমিতে লাগিল।

হঠাৎ একদিন দেখা গেল, হিমানীর চোখে জল, মুখ ভার। সাবিত্রী অনেক কষ্টে তাহার মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়া ব্যাপারখানা আবিষ্কার করিলেন। পাশের বাড়ীর মৃণাল এতকাল হিমানীর সঙ্গে এক ক্লাশে পড়িয়াছে। আজ সে স্কুলে যাইবার সময় হিমানীকে ডাকিয়া বলিয়াছিল, "এই হিমু, তুই আর পড়্‌বি না?"

হিমানী গাল ফুলাইয়া বলিল, "পড়্‌ব না, কে বল্‌লে তোকে?"

"তার মানে আমাদের সঙ্গে ত আর পড়্‌বি না?"

হিমানী বলিল, "কেন, মোটে এক মাস ত স্কুলে যাইনি, ঠিক তোদের সঙ্গেই পরীক্ষা দেব আমি।"

মৃণাল বলিল, "হ্যাঁ, পরীক্ষা কিনা অম্‌নি না পড়ে'ই দেওয়া যায়? তুই ত আর মুকুলের মত সব বিষয়ে 'ষ্ট্রং' ন'স, যে ক্লাসে না গেলেও ফার্ষ্ট্ হবি? শেষে পঙ্কজিনীর মত এক-পাল ছোটমেয়ের মধ্যে তালগাছ হ'য়ে বসে' থাক্‌তে হবে।"

স্কুলের সহিস্ এই সময় প্রচণ্ড গর্জ্জন করিয়া ওঠাতে মৃণাল বক্তৃতা থামাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল।

হিমানী রাগে অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার বাবার টাকা নাই বলিয়া যাহার খুসী সেই আসিয়া তাহাকে যা-তা বলিয়া যাইবে নাকি? মৃণালের মত ভারি

বুদ্ধি, তিনটা ভুল না করিয়া সে এক লাইন্ ইংরেজী লিখিতে পারে না। কতদিন সন্দেশ কলা ও আচারের লোভ দেখাইয়া সে হিমানীর কাছে পড়া বলিয়া লইয়াছে, তা না হইলে সরোজিনীদির ক্লাসে রোজ তাহাকে বোর্ডের পাশে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত। সে কাল হইতে রোজ নিশ্চয় স্কুলে যাইবে, বাসন মাজিতে তাহার একটুও ভাল লাগে না, সে কি ঝি হইবে নাকি? তাহার লেখাপড়া শিখিতে হইবে না?

সাবিত্রী মহা ভাবনায় পড়িলেন। তাঁহার দাদাটিকে কোনো বিষয়ে সচেতন করা একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার। আর সচেতন করিয়াই বা হইবে কি? মেয়েকে স্কুলে পড়াইতে হইলে টাকার দরকার, কিন্তু টাকা সংগ্রহ করার বিদ্যা অক্ষয়কুমারের একেবারেই জানা নাই।

হিমানী নিজেই তাঁহাকে অনেকটা নিশ্চিন্ত করিল। তাহার বাবা আপিস হইতে ফিরিবামাত্র সে একটি ছোট-খাটো ঝড়ের মত তাঁহার উপর আছ্ড়াইয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল, "আমি কি শিবির মত ঝি হব, যে তুমি আমাকে আর স্কুলে দিচ্ছ না? খোকা ত রোজ স্কুলে যায়।"

তাও ত বটে। ভাবনার আতিশয্যে অক্ষয়কুমার ঘরে ঢুকিতেই ভুলিয়া গেলেন। অনেক ডাকাডাকি করিয়া সাবিত্রী তাঁহাকে ঘরে আনিয়া বসাইলেন। জলযোগটা সারিয়া তিনি আবার ভাবিতে লাগিলেন।

সাবিত্রী দেখিলেন, এধরণের ভাবনায় কোনো লাভ নাই। ভাত চড়াইয়া আসিয়া তিনি ভাইয়ের কাছে বসিয়া বলিলেন, "বাড়ীর কাজ আমি একলাই চালিয়ে নেব যেমন করে' হয়, ছেলেমানুষ কান্নাকাটি করছে, ওকে স্কুলেই দাও।"

"মাইনে দেব কোথা থেকে? বইয়ের খরচ-টরচও আছে।"

এই-সকল প্রশ্নের উত্তর সাবিত্রী খানিকটা ভাবিয়াই আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "আর ত দু'তিনটে মাস কোনো রকমে দিয়ে দাও। বই ত নূতন কিছু কিনতে হবে না এখন। পরের বছর ওদের ক্লাশে একটা স্কলারশিপ্ আছে, সেটা যদি পায়, তা হ'লে ভাবনাই থাক্বে না। তা ছাড়া ও-স্কুলে বিনে-মাইনেতে ত কত মেয়ে পড়ে, অনেকদিন মাইনে ফেলে রাখ্লেও নাম কাটে না। মাসে মাসে না পার, দু'দিন বাদেই না হয় টাকা ক'টা দিয়ে দিও।"

অক্ষয়কুমার হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। যে কাজ দুদিন পরে করিলেও চলে, তাহার জন্য ভাবনা ভাবিতে বসা অপব্যয় মনে করিয়া তিনি আর সে চেষ্টা করিলেন না। হিমানী আবার পূর্ব্বের মত রোজ স্কুলে যাইতে লাগিল। তাহার মাহিনা দিবার কথা তাহার বাবা বেশ খুসী হইয়া ভুলিয়া রহিলেন।

কিন্তু এ-বিষয়ে স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর স্বভাব একটু উল্টা-রকম দেখা গেল। দিন কয়েক তিনি হিমানীকে টিফিনের ছুটীর সময় ডাকিয়া আনিয়া এ-বিষয়ে তাঁহার বক্তব্য যাহা কিছু ছিল বলিলেন। তাহার পর সহিসের হাতে অক্ষয়কুমারের নামে চিঠি পাঠাইলেন। ইহাতেও ফললাভের কোনো সম্ভাবনা না দেখিয়া তিনি হিমানীকে জানাইয়া দিলেন, যে, সব মাসের মাহিনা শোধ করিতে না পারিলে তাহাকে পরীক্ষা দিতে দেওয়া হইবে না।

হিমানী রাগে জ্বলিয়া গেল। তাহার অক্ষম পিতার প্রতি তাহার মনোভাবটা যে-প্রকার হইয়া উঠিল, তাহার ভিতর পিতৃভক্তি খুবই কম ছিল। পিসীর কাছে গিয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া সে বলিল, "আমার হাতের চুড়ি দু'টো বেচে ফেল্লে বারো টাকা হয় না?"

সাবিত্রী বলিলেন, "ছি মা, খালি হাত কি করে? আর তুমি ছেলেমানুষ, তোমার কি ওসব বেচ্তে আছে? ও তোমার বাবার জিনিষ। দাদা আসুন, আমি তাঁকে ভাল করে' বুঝিয়ে তোমার মাইনের টাকা দিয়ে দিতে বল্ব।"

"বাবা ছাই দেবেন, তাঁর কিনা টাকা আছে?" বলিয়া মুক্তকণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে হিমানী ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

বাস্তবিক অক্ষয়কুমারকে বলিয়া কোনো লাভ ছিল না। নিরুপায় হইয়া সাবিত্রীকে অবশেষে নিজের স্বল্প পুঁজির উপর হাত দিবার উপক্রম করিতে হইল। পাশের বাড়ীর রাঁধুনীর সঙ্গে তিনি একটি সোনার মাকড়ী

বিক্রয় করিবার পরামর্শ করিতেছেন শুনিয়া হিমানী বলিল, "আমার দুটো মল আছে, সেই দুটো বেচে দাও, ও ত আর কেউ পর্‌বে না। তোমার মাকড়ী থাক না, তুমি যে বল্‌ছিলে ওগুলো খোকার বউকে দেবে ?"

ভ্রাতাকে না জানাইয়া ভাইঝির মল বিক্রয় করা ঠিক হইবে কি না সাবিত্রী হঠাৎ তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না। হিমানী কি যেন ভাবিয়া লইয়া বলিল, "ও ত আর বাবার জিনিষ নয়, ও আমার মা দিয়েছিলেন।"

মা ও বাবার জিনিষের তফাৎ বুঝাইবার জন্য সাবিত্রী তখন ব্যস্ত ছিলেন না। অনেক ভাবিয়া তিনি মল-জোড়া বিক্রয় করিয়াই ফেলিলেন। সেবারকার মত হিমানীকে আর মাথা হেঁট করিতে হইল না। পরীক্ষা সে নির্ব্বিঘ্নেই দিল এবং পাশও করিল। দুঃখের বিষয় স্কলারশিপ্‌ সে পাইল না, পাইল বড়লোকের মেয়ে মুকুল। যাক্‌, মৃণাল যে পায় নাই, এই সান্ত্বনাতেই সে কোনোপ্রকারে দুঃখটাকে সহনীয় করিয়া লইল।

পরের বছর অনেক কষ্টে একটা ফ্রি সিট্‌ জোগাড় করিয়া তাহাকে পড়া চালাইতে হইল। স্কুলের গাড়ী ব্যবহার করিতে হইলে মাহিনা ছাড়া আরও দু'টাকা করিয়া দিতে হইত। তাহা দেওয়া সম্ভব হইল না, সুতরাং গাড়ী ছাড়িয়া তাহাকে হাঁটিয়া স্কুলে যাইতে হইত।

ইহার পর কয়েকটা বছর ঠিক একইভাবে যেন কাটিয়া গেল। পিতার অর্থহীনতার অপরাধ সে কিছুতেই ভুলিয়া উঠিতে পারিত না। ইহার ফলে যখন যত বেদনা তাহাকে পাইতে হইল, সব ক'টাকে সে মনে চিরজাগরূক করিয়া রাখিয়া দিল। দরিদ্র হওয়া তাহার কাছে একটা খুব বড় ত্রুটি হইয়াই রহিল, এবং আত্মাভিমানটাও ঘা খাইয়া খাইয়া তাহার মধ্যে অস্বাভাবিকরকম উগ্র হইয়া উঠিল। তাহার ভিতর স্বভাবতঃ মাধুর্য্য বা লালিত্যের অভাব ছিল না, কিন্তু তাহা এমনভাবে আত্মগোপন করিয়া রহিল, যে, উহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কোনো আর প্রমাণ পাওয়া গেল না।

সে ম্যাট্রিকুলেশন্‌ পাশ করিয়া কলেজে পড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু অর্থাভাবে তাহাকে কলেজে না ঢুকিয়া ট্রেনিং ক্লাশে ঢুকিতে হইল। ইতিমধ্যে তাহার সমপাঠিনীর দল কেহ বা বিবাহ করিয়া সংসার করিতে গেল, কেহ বা কলেজে ঢুকিল। মুকুল আর মৃণাল ছিল তাহার সব চেয়ে বন্ধু। মুকুল পরীক্ষায় খুব উচ্চস্থান অধিকার করিয়া সগর্ব্বে কলেজে পড়িতে গেল, মৃণাল শরীর খারাপের ছুতা করিয়া পড়া ছাড়িয়া বাড়ীতে বসিয়া রহিল।

স্কুল হইতে বাড়ী ফিরিয়া একদিন সে শুনিল, মৃণালের নাকি বিবাহের আয়োজন হইতেছে, আজ তাহাকে সন্ধ্যার সময় একজনরা দেখিতে আসিবে। হিমানী অবাক্‌ হইয়া বলিল, "বুড়ো মেয়েকে দেখ্‌তে আস্‌বে আবার! ও কি কচি খুকী যে মুখে পাউডার মেখে আর সিঁদুর-টীপ কেটে দেখা দিতে বেরবে। ওর লজ্জা কর্‌বে না ?"

সাবিত্রী বলিলেন, "হিন্দু-ঘরের মেয়ের আবার ওদিকে লজ্জা বলে' কিছু আছে নাকি ? সোনা রূপোর জিনিষের মত কত লোকে যাচাই করে' দেখ্‌বে, তার পর কারো যদি মনে ধরে, তখন তার ঘরে যাবে।"

হিমানী বলিল, "তাই বলে' আঠারো-উনিশ বছরের মেয়ে—"

বাধা দিয়া সাবিত্রী বলিলেন, "হ্যাঁ, ওর মুখে ওর বয়স লেখা থাক্‌বে কি না ? চোদ্দ-পনেরো বলে' চালিয়ে দেবে।"

মৃণালদের বাড়ী খুবই কাছে। তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুইয়া, দুই টুক্‌রা রুটি কোনোরকমে গিলিয়া হিমানী বলিল, "ছোটপিসি, একটু দেখে' আসি ওরা মৃণালটাকে কেমন সং সাজাচ্ছে।" পিসীর অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই সে দুড়দুড় করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া গেল।

৭

মৃণালের সাজসজ্জা তখনও আরম্ভ হয় নাই। সে হাত-মুখ ধুইতে স্নানের ঘরে গিয়াছে। হিমানী তাহার ঘরে ঢুকিতেই মৃণালের মা হাসিয়া বলিলেন, "এই যে হিমু, বন্ধুর বিয়ের নাম শুনেই ছুটে' এসেছ দেখ্‌ছি।"

হিমানী হাসিয়া বলিল, "মৃণালের সাজ দেখ্‌তে এলাম একটু।"

মৃণালের দিদি কমল বলিল, "সত্যি, তোর মত যদি মৃণালটা দেখ্‌তে হ'ত, তা হ'লে আর আমাদের কোনো ভাবনা থাকৃত না। বড়মানুষের ছেলে, পছন্দ হবে কি না ঠিকানা নেই। হিমুর বিয়ের সময় ওর বাবাকে কিছু ভাব্‌তে হবে না, যা রং তাই দেখে'ই সাহেব-বর জুটে যাবে।

হিমানী ভদ্রতার খাতিরে বলিল, "আহা, কি তোমার কথার ছিরি, কমলদি! বরের জন্য ত আর আমার ঘুম হচ্ছে না!"

মৃণালের মা বলিলেন, "আর বাছা তোরা হ'লি ব্রাহ্মসমাজের মেয়ে, তোদের ওসব বলা সাজে। আমাদের ঘরে মেয়েকে যতই লেখাপড়া শেখাও আর বড় কর, সেই বিয়ে দিতেই হবে, আজ হোক, কাল হোক। এম্‌নিতে কেউ না নেয়, ভিটেমাটি বেচে' টাকা ঢেলে' দিতে হবে।"

কমলের বিবাহে দশ হাজার টাকা পণ দিতে হইয়াছিল, কাজেই কথাটা তাহার গায়ে লাগিল। সে নাক-মুখ সিঁটকাইয়া বলিল, "তা এম্‌নিতে ত তোমরা মেয়েকে আধ পয়সাও দিতে চাও না, সবই ছেলের জন্যে তুলে' রাখ। দায়ে পড়ে' দিতে হয় বলে' তবু মেয়ে বেচারীরা কিছু পায়।"

তাহার মা বলিলেন, "এ কি আর মেয়েকে দেওয়া হ'ল বাছা? ও ত বারো ভূতে লুটে' খায়।"

এমন সময় মৃণাল মুখ ধুইয়া বাহির হইয়া আসিল। অপ্রীতিকর আলোচনাটা চাপা দিবার জন্য তাহার মা বলিলেন, "নে বাছা তাড়াতাড়ি করে', আবার কখন তারা এসে পড়্‌বে। কমল আল্‌মারীর চাবিটা রাখ্‌। আমি যাই একটু রান্না ঘরে, দেখিগে' জলখাবারের কি কর্‌লে তারা।"

মৃণালের দিদি তাহার চুল বাঁধিতে বসিলেন। দুই বোনে এম্‌নি কিছু মনান্তর ছিল না, কিন্তু ছোট মেয়ে বলিয়া মৃণালের প্রতি মা-বাবা একটু অন্যায়রকম পক্ষপাত দেখান্, এই ছিল কমলের বিশ্বাস। তাহা ছাড়া কমলের রং বেশী কাল বলিয়া তাহার বিবাহে যত টাকা লাগিয়াছে, মৃণালের বিবাহে ঠিক তত না লাগিতে পারে এইপ্রকার ইঙ্গিত মাঝে-মাঝে শোনার ফলে তাহার ভগিনী-স্নেহে একটুখানি অম্লরস মিশিয়া গিয়াছিল।

মৃণাল একদৃষ্টে আয়নার দিকে চাহিয়া নিজের চুল-বাঁধার তদারক করিতেছিল। হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল, "ওকি দিদি, আমি কি চিড়িয়াখানার বাঁদর যে আমার সমস্ত কপালটা ঢেকে দিচ্ছ?"

দিদি বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "তবে নিজে বাঁধ্‌না বাপু? আমার যা ভাল মনে হয় তাই ত কর্‌ব?"

দুই বোনে খানিকক্ষণ কথা-কাটাকাটির পর চুলের পাতাকাটা বাহার একটুখানি কমাইয়া হিমানীর কাছে দুই চারিবার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া চুল-বাঁধার পর্ব্ব শেষ হইল। তার পর মুখে ক্রীম্ এবং পাউডার মাখা হইবে কি, শুধু পাউডার; শাড়ী গোলাপী-রঙের পরা হইবে কি, মভ্‌-রঙের; কোন্ ব্লাউসের সঙ্গে কি শাড়ী মানায়, তাহাই লইয়া তর্ক চলিল।

একখানা হাল্কা গোলাপী রঙের বেনারসী কাপড় তুলিয়া ধরিয়া কমল বলিল, "এইটে পর্‌বি, তোর রঙে মানাবে এখন। এর জামাটারও কাট্ বেশ ভাল।"

মৃণাল ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, "মাগো! পচা রঙের কাপড় আজকাল মেথর-চামার সবাইকার ঘরে আছে।"

কমল বলিল, "যে-রঙের কাপড় দুনিয়ার কারো ঘরে নেই তেমন কাপড় পাব কোথায়? তোমার আগে নিজের ঘর হোক্ তখন যত অসাধারণ কাপড় এনে ঘর বোঝাই কোরো। এখন সাধারণ কাপড়গুলোর মধ্যে কোন্‌খানা পর্‌বে?"

মৃণাল গাল ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অনেক বকাবকির পর বাসন্তী-রঙের একখানা ক্রেপের শাড়ী এবং মুক্তার কণ্ঠী ও চুড়ি পরিয়া সে সাজ সাঙ্গ করিল। তাহার উপর একটা ভারী সোনার হার পরাইতে যাওয়াতে, সে রাগ করিয়া সেটা খাটের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া গোঁজ হইয়া বসিয়া রহিল। কমল সেটা তুলিয়া লইয়া বলিল, "বিয়ের নামেই এই মেজাজ, বিয়ে

হ'লে না জানি কি করবে তুমি!" সে ঘর ছাড়িয়া মায়ের সন্ধানে চলিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরেই মৃণালের বড় ভাই আসিয়া তাহাকে বৈঠকখানা-ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেল। পিছন-পিছন কৌতূহলে ফাটিয়া পড়িতে পড়িতে চলিল হিমানী এবং কমল। পাশের একটা ছোট ঘর হইতে দরজার খড়খড়ি তুলিয়া তাহারা উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিল।

বর নিতান্ত আধুনিক ছেলে, সে নিজেই ক'নে দেখিতে আসিয়াছে। তবে প্রাচীনপন্থী বাপ-খুড়োর দলকে একেবারে বাদ দিবার মত সাহস তাহার হয় নাই, তাঁহারাও দুই চারিজন সঙ্গে আসিয়াছেন।

হিমানী ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল, "বরটি বেশ দেখ্‌তে ত ভাই।

কমল বলিল, "অতখানি বেশ না হ'লেও হ'ত। মিনুটাকে পছন্দ হ'লে হয়, অত ফর্‌শা বর, ফর্‌শা ক'নে চাইবে ত?"

হিমানী বলিল, "কি জ্বালাতন বাপু হিন্দু-সমাজের মেয়ে হওয়া! আমার গায়ের রং যা আছে, আমারই আছে, তাই নিয়ে কে কোথাকার সব এসে নাক সিঁট্‌কতে বস্‌বে, এ মনে কর্‌লেই রাগ ধরে।"

সমাজের নিন্দায় ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া কমল বলিল, "তোদের সমাজে বুঝি আর লোকে ফর্‌শা মেয়ে চায় না, সবাই কালো বউ কর্‌তে ছুটে' যায়?"

"তা চাইবে না কেন? তবে আমাদের ত আর বাসন কি আস্‌বাবের মত পছন্দ কর্‌বার জন্যে হাটের মাঝে টেনে নিয়ে বেড়ানো হয় না?"

এমন সময় বরের এক বৃদ্ধ আত্মীয় মৃণাল ক'খানা ইংরেজী বই পড়িয়াছে এবং সে কার্পেটের সেলাই জানে কি না জিজ্ঞাসা করিয়া ক'নের বাড়ীর সকলকে চমক্ লাগাইয়া দিলেন। মৃণালের মুখখানা কেমন যেন হইয়া গেল। তাহার এক ছোট ভাই ফিক্ করিয়া হাসিয়া ঘর ছাড়িয়া ছুটিয়া পলাইল। বর অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইল। অল্পক্ষণ পরেই মৃণাল পরীক্ষা দেওয়া শেষ করিয়া বাড়ীর ভিতরে চলিয়া আসিল। কমল কর্তৃপক্ষের কাছে খবরাখবর শুনিতে দৌড়িল। হিমানী মৃণালকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁরে, বর পছন্দ হ'ল? বেশ দেখ্‌তে ত?"

মৃণাল বলিল, "তোরই দেখ্‌ছি তাকে বেশী পছন্দ, তুইই বিয়ে করে' নে না?"

হিমানী তাহার পিঠে সজোরে এক চড় বসাইয়া দিল।

বরের ক'নেকে খুব বেশী পছন্দ হয় নাই, কিন্তু তাহার উপরওয়ালারা মেয়ের বাপের টাকার গুণে মুগ্ধ হইয়া এইখানেই বিবাহ দেওয়া স্থির করিয়া ফেলিলেন। মহাধুমধাম-সহকারে বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের দিন হিমানীর জ্বর আসাতে তাহার আর বিবাহে যাওয়া ঘটিয়া উঠিল না। অমিয় নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিয়া বিবাহের ঘটার বর্ণনা করিয়া করিয়া দিদির দুই কান বোঝাই করিয়া দিল। মৃণাল বিবাহ করিয়া বেশী দূরে গেল না, তাহার শ্বশুরবাড়ী আবার কাছেই। সে প্রায়ই বাপের বাড়ী বেড়াইতে আসিত, কাজেই পুরাতন বন্ধু-বান্ধবদের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ তাহার বন্ধ হইল না।

আজ মৃণালের জন্মদিন, তাহার বাপের বাড়ীতেই উৎসবটা হইতেছে। তাহার স্বামীর উদ্যোগেই অবশ্য এতটা ঘটা হইতেছে; তাহা না হইলে মেয়ের জন্মদিনে এত আড়ম্বর এ-বাড়ীতে বিশেষ কখনো দেখা যায় নাই। নিজের বাড়ী অতিরিক্ত সেকেলে বলিয়া মৃণালের স্বামীর সেখানে নিজের মনের মত করিয়া কিছু করা শক্ত, তাই তিনি অপেক্ষাকৃত আধুনিক শ্বশুরবাড়ীটাই পছন্দ করেন বেশী। শ্বশুরবাড়ীতেও ইংরেজী ধরণে স্ত্রী-পুরুষ একত্রে বসিয়া খাওয়া-দাওয়া, আলাপাদি করা খুব যে চলিত ছিল তাহা নয়, তবে নূতন জামাইয়ের সখ্, তাঁহারা বিশেষ কোনো আপত্তি তুলেন নাই।

ম্লান বর্ষার সন্ধ্যায় অন্ধকারপ্রায় ঘরে বসিয়া হিমানীর মনে বিগত জীবনের কত কথাই একের পর এক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। দিনগুলা কি দ্রুতবেগেই কাটিয়া চলিয়াছে। এই যেন সে-দিন সে স্কুলে পড়িত, আর আজ আটটা ক্লাশ পড়াইবার ভার তাহার কাঁধে আসিয়া চাপিয়াছে। তাহার সঙ্গিনীর দল এখন কে কোথায় ছিট্‌কাইয়া পড়িয়াছে তাহার ঠিকানা নাই, সেই কেবল পুরাণো স্কুলের চৌ-সীমানার মধ্যে আটক হইয়া আছে।

হঠাৎ বাহির হইতে অমিয় চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "একি দিদি! এখনো রেডী হওনি, তুমি যাবে না বুঝি?"

হিমানী বলিল, "না যাব কি আর! তুমি নিজে রেডী হও ত, আমার তার ঢের আগে হয়ে যাবে।"

"তা আর হ'তে হয় না, মেয়েদের সাজ করতে কখনো পাঁচ ঘণ্টার কম সময় লাগে?" বলিয়া অমিয় চলিয়া গেল।

কার্য্যকালে যদিও দেখা গেল, হিমানী প্রস্তুত হইয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া, আর অমিয় তখনও একমনে চুল আঁচড়াইতেছে। সাবিত্রী রান্নার জায়গা হইতে মুখ বাহির করিয়া বলিলেন, "তোর সেই সিল্কের শাড়ীটা পর্‌লি না কেন মা, বড়মানুষের বাড়ী যাচ্ছিস্।"

হিমানী বলিল, "ভারি ত এক ছাইয়ের সিল্কের শাড়ী, তাই উঠ্‌তে বস্‌তে পর্‌তে হবে। ওটা কম হ'লেও উপরি উপরি দশবার পরেছি। আমার সুতি কাপড়ই ভাল।"

অল্পমূল্যের একখানি কালপেড়ে ঢাকাই শাড়ী ও সেই-রকম পাড়-বসানো একটি হাতকাটা ব্লাউসেই তাহাকে এত ভাল দেখাইতেছিল যে, সাবিত্রী স্বীকার না করিয়া পারিলেন না, যে, তাঁহার ভাইঝিকে সুন্দর করিবার জন্য রেশম বা অলঙ্কারের প্রয়োজন হয় না। এমন সময় অমিয় ঘর হইতে বাহির হইয়া বলিল, "চল, চল, আর সিল্ক্ পর্‌তে হবে না, ঢের হয়েছে। যা না চেহারা, তা সাজ কর্‌লেও কিছু ভাল হবে না।"

হিমানী মুখ বাঁকাইয়া তাহাকে এক তাড়া দিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চলিল। রাস্তায় নামিয়া অমিয় জিজ্ঞাসা করিল, "গাড়ী করব, না হেঁটেই যাবে?"

"এইটুকুর জন্যে আর গাড়ী চড়ে না, চল্‌," বলিয়া হিমানী হাঁটিয়া চলিল।

(২)

মৃণালের বাড়ী পৌঁছিতে যে সময়টুকু লাগে, ভাগ্য-ক্রমে তাহার মধ্যে আর বৃষ্টি আসিল না। ভাই-বোনে উৎসব-ক্ষেত্রে পৌঁছিয়া দেখিল, অভ্যাগতের দলে বসিবার ঘর প্রায় ভরিয়া উঠিয়াছে, বারাণ্ডা ও খাবার-ঘরও খালি নাই। সকলেই এধার ওধার ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, বসিয়া গল্প করিবার আগ্রহ কাহারও বিশেষ দেখা যাইতেছে না। অমিয় বলিল, "এঃ! আমাদের সত্যি দেরি হ'য়ে গেছে, সব শেষে এসেছি দেখ্‌ছি।"

তাহার দিদি বলিল, "সব আগে এসে বসে' থাকা চেয়ে সব শেষে আসাই ভাল।"

বসিবার ঘরে ঢুকিতেই কমল ছুটিয়া আসিয়া তাহার গাল টিপিয়া ধরিয়া বলিল, "কি গো, বড় যে মান বেড়েছে, একেবারে শেষ মুহূর্ত্ত ছাড়া আস্‌তে নেই। মিনু কতক্ষণ বসেছিল তোর অপেক্ষায়, আর কার চুল বাঁধা তার পছন্দই হয় না।"

হিমানী মৃণালের জন্য একখানি বই উপহার লইয়া আসিয়াছিল। সেটা যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিবার উদ্দেশে সে বলিল, "মিনু কই, এখানে ত দেখ্‌ছি না?"

"সে এখনো শোবার ঘরে বসে' সাজ শেষ কর্‌ছে। খুব ভাল সাজ করে' না বেরলে আজ যে তার বরের মান থাক্‌বে না, তার সব বন্ধুরা আজ এসেছে।"

মৃণালের ঘরে ঢুকিয়া হিমানী দেখিল তাহার সাজ সজ্জা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। বিবাহের লাল শাড়ী ও জামা আজ আবার তাহার অঙ্গে উঠিয়াছে, তবে গহনার সংখ্যা কিছু কম। বর নব্য যুবক, অলঙ্কার ভারাক্রান্ত ভাবটা বোধ হয় তাঁহার চোখে ভাল ঠেকে না। মৃণাল কাপড়-পরা শেষ করিয়া, একটি বহুমূল্য জড়োয়া কণ্ঠহার গলায় পরিতে ব্যস্ত ছিল। মোটা সোনার হারের তলায় যাহাতে তাহার অপূর্ব্ব কারুকার্য্য চাপা না পড়ে বা ব্লাউসের উপর তাহা ঝুলিয়া না পড়ে ইহাই দেখিতে সে তখন মহাব্যস্ত।

হিমানী ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "বাপ রে! তোর কি আবার আজ বিয়ে নাকি? এ যে ক'নের সাজকেও হার মানায়!"

মৃণাল সগর্ব্বে হাসিয়া বলিল, "তা ভাই উনি বল-লেন বিয়ের কাপড়গুলো পর্‌তে, না পরে' আর কি করি? আর এই নেক্‌লেস্‌টা উনি সখ্ করে' দিল্লী থেকে করিয়ে এনেছেন, আজ আমাকে দিলেন। এটা ত পর্‌তেই হবে! আর এমন কি বেশী পরেছি?"

মৃণালের গায়ে কম করিয়া চার পাঁচ হাজার টাকার

গহনা। সেটাও তাহার কাছে বেশী কিছু নয়, শুনিয়া হিমানীর হাসি পাইল। অবশ্য মৃণাল ঠিক এই কথাই শুনিবার জন্য যে উক্ত মন্তব্যটি করিয়াছে সে-বিষয়ে হিমানীর সন্দেহ ছিল না। কিন্তু মৃণালের ধনগর্ব্বকে তুষ্ট করিবার ইচ্ছা তখন তাহার মোটেই ছিল না, সে কথা ঘুরাইয়া বলিল, "ওমা! কি সুন্দর কাজ তোর নেক্‌লেস্‌টার, দেখি একটু ভাল করে'।"

মৃণাল অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। এমন সময়, "এই মিনি, তোর কি আজ আর সাজ করা শেষ হবে না?" বলিয়া তিন-চারটি মেয়ে হুড়মুড় করিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। হিমানীদের সমপাঠিনী মুকুল তাহাদের মধ্যে একজন, অন্যগুলিও তাহার অপরিচিত নয়।

সবাই নূতন নেক্‌লেসের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। মৃণালের গলা হইতে সেটা ফস্ করিয়া টানিয়া লইয়া মুকুল সেটা হিমানীর গলার কাছে ধরিয়া বলিল, "বাঃ! কি সুন্দর দেখায় তোকে! তোর বরকে বলিস্ এই-রকম নেক্‌লেস্ কিনে, দিতে।"

হিমানী বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "বরের কি দর্‌কার? আমি নিজেই একটা গড়াব ভাব্‌ছি, মোটে ছ' শ টাকা দাম ত?"

মুকুল বলিল, "তা হ'লে ত ভালই।"

মৃণাল তাহাদের আলোচনায় বাধা দিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "দে ভাই, দেরি হয়ে যাচ্ছে। বেশী দেরি কর্‌লে উনি রাগ কর্‌বেন, ওঁর সব বন্ধু-বান্ধবেরা এসে বসে' আছে।"

মুকুল বলিল, "ইস্! ভারি এক উনি হয়েছে তোমার, আর কারো কখনো হয়নি! আমাদের সঙ্গে দু'টো কথা বলবারও মেয়ের সময় নেই!"

মৃণাল অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "আহা, তোদের যেন আমি এখানে বসিয়ে রেখে বরের কাছে দৌড়চ্ছি আর কি? আমার শোবার ঘরে ত এখন সভা কর্‌বার কথা নয়?"

"সেজ্‌দি, জামাই-বাবু ডাক্‌ছেন তোমায়," বলিয়া মৃণালের ছোট ভাই আসিয়া হাজির হইল।

"ঐ রে! তলব এসেছে!' বলিয়া তরুণীর দল পরস্পরকে ঠেলাঠেলি করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

চারিদিক্ তখন লোকে একেবারে ভরিয়া উঠিয়াছে। এধরণের ব্যাপার এবাড়ীতে নূতন বলিয়া, বাড়ীর ছেলে-মেয়ের দল, যাহার যত বন্ধু ছিল সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছে। হিমানীর চোখ দুটি যেন এই তরুণ তরুণীর মেলায় উৎসুক হইয়া কাহার সন্ধান করিতেছিল। হয়ত তাহাকে দেখা যাইবে, এই আশায় তাহার শুভ্র গণ্ড মাঝে-মাঝে রক্তিম হইয়া উঠিতেছিল।

যখন তাহারা বসিবার ঘরের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে, তখন "এই যে, আপনি কখন্ এলেন?" এই কথাটা শুনিয়া সে দাঁড়াইয়া পড়িল; তাহার সঙ্গিনীর দল অগ্রসর হইয়া গেল।

যে যুবকটি হিমানীর সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল তাহার বয়স আন্দাজ পঁচিশ-ছাব্বিশ হইবে, শ্যামবর্ণ দোহারা চেহারা। মুখের ভাবটা কেমন যেন বিষণ্ণ ও চিন্তাকুল।

হিমানীর বুকের ভিতর একটা পুলকের শিহরণ খেলিয়া গেল। এই একটি মানুষ কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া যে কখন তাহার জগতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, তাহা সে নিজেও জানিতে পারে নাই। বিনয়ের সঙ্গে পরিচয় তাহার বেশীদিনের নয়, বড় জোর এক বৎসর হইবে। মুকুলদের বাড়ীর এক নিমন্ত্রণে তাহার সহিত হিমানীর আলাপ হয়, তাহার পর এখানে-ওখানে মাঝে-মাঝে দেখা হইয়াছে। অক্ষয়কুমারের সহিত পরিচয় না থাকায় সে নিজে কখনও হিমানীদের বাড়ী আসে নাই।

বিনয়কুমার দরিদ্রের সন্তান। অত্যন্ত কষ্ট করিয়া তাহাকে পড়াশুনা চালাইতে হইয়াছে। পড়ার সময়ও তাহাকে গ্রামবাসিনী বিধবা মাতা, ও ছোট ভাই-বোনের সাহায্যার্থে নিজের কষ্টলব্ধ টাকা হইতে অর্দ্ধেকই পাঠাইয়া দিতে হইত। তরুণ জীবনের আনন্দ যেন তাহাকে সযত্নে এড়াইয়া চলিত, হাড়ভাঙ্গা খাটুনি আর শুষ্ক কর্ত্তব্য-পালন ছাড়া তাহার জীবনে আর কিছুরই খোঁজ পাওয়া যাইত না। কিছুদিন হইল সে পড়াশুনা সারিয়া চাক্‌রীর

সন্ধান করিতেছিল। কলিকাতায় বহু চেষ্টায় পঞ্চাশ টাকার মাষ্টারি ছাড়া যখন আর কিছু কোনোপ্রকারেই জুটিয়া উঠিল না, তখন হঠাৎ একদিন সে মাদ্রাজে বেশী মাহিনার এক কাজ জোগাড় করিয়া কলিকাতা ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সে যাইবার কিছু পূর্ব্ব হইতেই হিমানী নিজের কাছে নিজে ধরা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। কর্ম্মহীন অবসর পাইলেই যে বিনয়ের চিন্তা আসিয়া তাহার মন জুড়িয়া বসে, ইহা সে আগেই লক্ষ্য করিয়াছিল। কিন্তু এখন দেখিতে লাগিল অবসর-নিরবসর সবেরই তলায় এই একটি কথা অন্তঃসলিলা ফল্গু-নদীর মত বহিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে—এ পৃথিবীটাতে বিনয় আছে। কিন্তু আছে ত তাহার কি?

তাহার যাহাই হউক, এই কথাটিই সমস্ত জগতের উপর আজকাল মায়া-অঞ্জন মাখাইয়া দিয়াছিল। নিজের জীবনের দৈন্য ও কুশ্রীতার দিক্ হইতে হঠাৎ তাহার মন কখন যেন অলক্ষ্যে ফিরিয়া গেল। এই পৃথিবীর গুপ্ত সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডারের চাবী যেন কখন কে তাহার হাতে দিয়া গেল।

কোথাও যাইবার নামেই আজকাল হিমানীর সর্ব্বাগ্রে মনে হইত, বিনয় কি সেখানে আসিবে? যদি আসার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে সেখানে যাইবার উৎসাহ যেন এই মেয়েটির দশগুণ বাড়িয়া যাইত। তাহার সামান্য পোষাক-পরিচ্ছদের মধ্যে কোন্‌টিতে তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল দেখাইবে, ইহা সে অনেক বিবেচনা করিয়া ঠিক করিত। উৎসবক্ষেত্রে গিয়া তাহার দৃষ্টি উৎসুক হইয়া বিনয়েরই অন্বেষণ করিত। তাহার দেখা না পাইলে সমস্ত ব্যাপারটা তাহার কাছে আগাগোড়া তিক্ততা ও রিক্ততায় ভরিয়া উঠিত। দেখা পাইলে, তাহার সমস্ত অস্তিত্ব জুড়িয়া যেন আনন্দের বান ডাকিয়া যাইত। অথচ এ দেখা-পাওয়ার ভিতর কিই বা ছিল? একটু মুখের হাসি, নিতান্ত দু'চারিটি সাধারণ কথা, ইহার বেশী কিছুই নয়। বিনয় স্বভাবতঃই অল্পভাষী ছিল, হিমানীরও তাহাকে দেখিলে কথার স্রোত হঠাৎ যেন বন্ধ হইয়া যাইত। তাহার অন্তর যতই আনন্দমুখর হইয়া উঠিত, কণ্ঠ ততই যেন নীরব হইয়া আসিত।

নিজের অবস্থা দেখিয়া সে মাঝে-মাঝে নিজেকে তীব্র তিরস্কার করিতে বসিত। এ কি অচ্ছেদ্য জালে সে নিজেকে দিন-দিন এমন করিয়া জড়াইতেছে? ইহা হইতে মুক্তি পাইবার আশা বা আকাঙ্ক্ষা কিছুই তাহার নাই, বরং সেরূপ কোনো সম্ভাবনা মাত্রই তাহার বুকে আতঙ্কের শিহরণ জাগাইয়া তোলে। কিন্তু ইহার পরিণাম কি হইবে? বিনয়ের মনের কথা সে কিছুমাত্র জানে না। তাহার হৃদয় বলে—বিনয়ের অন্তরে একই সুর বাজিতেছে, তাহা না হইলে হিমানীকে দেখিলেই তাহার ম্লানমুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠে কেন? অন্য সকলের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া সে যতটুকু সম্ভব সময় হিমানীর সঙ্গেই কাটাইতে চায় কেন? দূরে থাকিলেও তাহার দৃষ্টি হিমানীকেই আলিঙ্গন করিয়া থাকে কেন?

হইতে পারে সবই হিমানীর কল্পনা। আর যদি কল্পনা নাও হয়, এই দারিদ্র্যপীড়িত জীবনের সঙ্গে তাহার জীবন মিলাইবার সাহস কি হিমানীর আছে? দারিদ্র্যের কলঙ্ক যে তাহার তরুণ জীবনের আগাগোড়াই মসীলিপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। সে কি সাধ করিয়া এই বিভীষিকাকে তাহার চিরজীবনের সঙ্গীরূপে বরণ করিয়া লইবে? সে শক্তি কি তাহার আছে? দারিদ্র্যকে যে সে এতকাল অত্যন্ত বড় পাপেরই মত করিয়া দেখিয়াছে। ক্ষণিকের মোহে কি সে চিরকালের জন্য এই পাপেরই পঙ্কে ডুবিয়া যাইবে? কিন্তু যুক্তি তর্কের উপরে হঠাৎ সে দেখিতে পাইত, বিনয়ের বিষণ্ণ দৃষ্টি তাহাকে দেখিয়া হাসিয়া উঠিতেছে! তাহার পর যুক্তি-তর্কের কোথায় যে সমাধি হইত, উহাদের আর সন্ধানই পাওয়া যাইত না।

বিনয়ের কথার উত্তরে সে হাসিমুখে বলিল, "এই ত এসেছি খানিক আগে। মাদ্রাজ থেকে আস্‌বার পরে আপনার ত আর দেখাই পাওয়া যায় না। কতদিন আছেন?"

বিনয় বলিল, "আপনাদের বাড়ী যাব প্রায়ই ভাবি, তবে আপনার বাবার সঙ্গে আলাপ নেই, তাই যেতে কেমন একটু সঙ্কোচ লাগে। আমি এবার আছি অনেক দিন, কোম্পানীর কাজেই এসেছি। আপনাদের বাড়ীর

কাছেই এবার আমার আড্ডা হয়েছে। রাস্তার উপরেই যে বোর্ডিংটা, তার পাশেই ছোট বাড়ীটাতে উঠেছি।"

হিমানী বলিল, "একদিন এলেই ত পারেন, তা হ'লেই বাবার সঙ্গে আলাপ হ'য়ে যায়। খোকার সঙ্গে ত আলাপ আছেই, আস্‌তে আর কি?" কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই তাহার মনে হইল হয়ত অতিরিক্ত আগ্রহ দেখানো হইতেছে। বিনয় কিছু যদি মনে করে?

কিছু মনে করিবার কোনো লক্ষণ না দেখাইয়া বিনয় বলিল, "হ্যাঁ, তাই যাব। মুস্কিল হয়েছে যে, সন্ধ্যার সময় ছাড়া আমার অবসর থাকে না, আর সেই সময় এমন বৃষ্টি নামে যে, ঘর থেকে বেরনো দায়। মাদ্রাজ থেকে কতগুলো অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিষ নিয়ে এসেছি, আপনাকে দেখাতে নিয়ে যাব। বিকেলে আপনি রোজই কি বাড়ী থাকেন?"

হিমানী হাসিয়া বলিল, "বাড়ী ছেড়ে আর যাব কোথায়?"

ইতিমধ্যে নিমন্ত্রণকারীর দল মহা কোলাহল করিয়া সকলকে বসিবার ঘরে বসিতে লইয়া চলিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও অগত্যা এই দু'টি মানুষ পরস্পরের লোভনীয় সঙ্গ ত্যাগ করিয়া লোকের ভিড়ের মধ্যে গিয়া বসিল।

মৃণালের স্বামী তখন তাহার বন্ধুর দলকে এক এক করিয়া আনিয়া নিজের স্ত্রীর সহিত পরিচয় করাইয়া দিতেছিল। তাহার সঙ্গিনীর দল অল্প একটু দূরে বসিয়া তাহাদের সমালোচনা করিতেছিল। হিমানী আসিয়া তাহাদেরই মধ্যে একটু জায়গা করিয়া বসিয়া পড়িল। মুকুল একটু ঠাট্টার সুরে বলিল, "কি গো! আস্‌তে পার্‌লে? আমি ভাব্‌লাম তোমার বুঝি শিকড় গজিয়ে গেল, আর ওখান থেকে নড়্‌তে পার্‌বে না!"

হিমানী মনে-মনে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "ওসব শিকড়-টিকড় গজানো তোমাদের জন্য ভাই, আমরা গরীব মানুষ, আমাদের পাগুলোকে সচলই রাখ্‌তে হয়।"

ভাগ্যক্রমে আর-একটি মহিলা আবার মৃণালের নেকলেসের কথা তুলিয়া এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ চাপা দিয়া ফেলিলেন। মুকুল বলিল, "স্যাক্‌রাটার মৃণালকে কিছু 'কমিশন্' দেওয়া উচিত, ওর খুব বিজ্ঞাপন হ'য়ে গেল।"

অতঃপর খাওয়ার ডাক আসিল। খাওয়া চুকিয়া যাইবার পর নিমন্ত্রিতের দল আর এক-জায়গায় আসিয়া বসিতে রাজী হইল না। কেহ বা বিদায়-গ্রহণের জোগাড় করিতে লাগিল, কেহ বসিবার ঘরে গান্-বাজনার দলে ভিড়িয়া গেল, কেহ ভিজা মাটি এবং ঘাসের ক্রটিটুকু উপেক্ষা করিয়া বাড়ীর সাম্‌নের ছোট 'লন্'টিতে বাহির হইয়া পড়িল।

'লনের' এককোণে একটি হাস্‌নাহানা ফুলের ঝাড় ফুলে-ফুলে ভরিয়া উঠিয়া তীব্র সৌরভে বাতাসকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। হিমানী কমলের ছোট মেয়েটিকে সাম্‌নে পাইয়া বলিল, "খুকু, গাছটায় কেমন ফুল ফুটেছে দেখেছ? ওটা না তোমার গাছ?"

"হ্যাঁ আমার, চল তোমায় ফুল দেব।" বলিয়া খুকী তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল। হিমানীর যাইতে কোনও আপত্তি ছিল না, কারণ 'লনে' যাহারা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল তাহাদের মধ্যে এই অন্ধকারেই সে বিনয়ের মূর্ত্তি বেশ ভাল করিয়াই চিনিতে পারিয়াছিল।

ফুলের ঝাড়ের কাছে আসিয়া খুকী এক গোছা ফুল ছিঁড়িয়া হিমানীর হাতে গুঁজিয়া দিল। হিমানী বলিল, "এস খুকু, তোমার মাথায় পরিয়ে দিই।"

খুকু মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, আমাকে না, তুমি পর, তোমার যে মস্ত বড় খোঁপা?"

হিমানী হাসিয়া বলিল, "খোঁপা না থাক্‌লে বুঝি ফুল পর্‌তে নেই? আমি যে বুড়ো হ'য়ে গিয়েছি, আমাকে ফুল পর্‌তে দেখ্‌লে সবাই হাস্‌বে।"

খুকু বলিল, "আচ্ছা, তবে ডলীকে ডেকে আনি, তার চুল বেশ এম্‌নি এম্‌নি!" সে নিজের ছোট চাঁপার কলির মত আঙুল ঘুরাইয়া ডলীর চুলের ধরণ দেখাইয়া দিল। তার পর তাহাকে ডাকিবার জন্য বাড়ীর দিকে দৌড় দিল।

খুকী চলিয়া যাইতেই পিছন ফিরিয়া হিমানী দেখিল,

বিনয় দাঁড়াইয়া আছে। একটুখানি অপ্রস্তুত হইয়া সে বলিল, "আপনি কখন এলেন, দেখ্‌তে পাইনি ত?"

বিনয় হাসিয়া বলিল, "চুপচুপি এসে আপনাদের ইণ্টারেষ্টিং আলোচনাটা শুনে' নিলাম। আপনার বুঝি ধারণা হ'য়ে গিয়েছে, যে, আপনি ভয়ানকরকম স্থবির হ'য়ে পড়েছেন?"

হিমানী বলিল, "হ্যাঁ, তিনশ মেয়ে মিলে' প্রতিদিন শ্রদ্ধা-ভক্তির আতিশয্যে আমাকে একেবারে বার্দ্ধক্যের গণ্ডীতে পৌঁছে দিয়েছে।"

হঠাৎ শোনা গেল ফুলের ঝাড়ের ওপাশ হইতে কাহারা যেন কথা বলিতেছে। হিমানী চিনিল একটি কণ্ঠস্বর মৃণালের, আর একটি কাহার সে ঠিক বুঝিতে পারিল না। তখন অন্ধকার বেশ ঘন হইয়া আসিয়াছিল। পত্র পুষ্পের অন্তরালে কেহ যে অন্য কাহাকেও দেখিতে পাইবে, তাহার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। শোনা গেল, মৃণাল বলিতেছে, "হ্যাঁ, ভাই। জিনিষটা সকলেরই খুব পছন্দ হয়েছে। অনেকেই ঠিক্ করেছে এইরকম এক-একটা গড়াবে। তা কল্‌কাতায় ঠিক্ এমনিটি হওয়া শক্ত, যা না ছিরির সব এখানকার স্যাক্‌রাগুলি!"

তাহার সঙ্গিনী বলিল, "তবু একবার চেষ্টা করে' দেখ্‌ব। আর কে-কে গড়াবে বল্‌লে?"

মৃণাল বলিল, "এই মুকুল, রমা, হিমানী—"

বাধা দিয়া তাহার সঙ্গের মেয়েটি বলিল, "হিমানী! ওদের গুষ্টিকে বেচলেও যে ওর দাম উঠবে না। বামন হ'য়ে চাঁদ ধর্‌বার সব আশা!"

হিমানীর মনটা যেন অপমানের আঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া আসিল। তাহার সামান্য ঠাট্টার কথাটাকে উপলক্ষ্য করিয়া এত বড় আঘাতের অস্ত্র যে রচিত হইতে পারে, তাহা আগে কেন সে ভাবিয়া দেখে নাই? আর শেষে বিনয়ের সাম্‌নেই তাহাকে এমন কথাটা শুনিতে হইল! এই দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা কি চিরজীবন তাহাকে অনুসরণ করিয়া ফিরিবে? অল্পক্ষণ আগেই এই পৃথিবী তাহার চোখে কি সুন্দরই ঠেকিতেছিল! হঠাৎ যেন তাহা প্রেতপুরীর মত ভীষণ হইয়া উঠিল।

বিনয় বেচারা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সঙ্কোচ ও অস্বস্তিতে ঘামিয়া উঠিতেছিল। অনেক কষ্টে সে বলিল, "চলুন, ভিতরে যাওয়া যাক্। বেশীক্ষণ ভিজে ঘাসের উপর বেড়ালে আপনার অসুখ কর্‌বে।"

হিমানী বলিল, "থাক্, আর ভিতরে যাব না। একটু যদি খোকাকে ডেকে দেন ত বাড়ী যাবার চেষ্টা দেখি।"

বিনয় অমিয়র সন্ধানে চলিল। হিমানীর তখন বুক ফাটিয়া কান্না আসিতেছিল, সে কোনোপ্রকারে নিজেকে সাম্‌লাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই অমিয় বিনয়ের সঙ্গে আসিয়া হাজির হইল। বলিল, "খেয়ে-দেয়েই অম্‌নি দৌড় মার্‌বার চেষ্টা। একটু যে আড্ডা দেব, তারও জো নেই তোমার জ্বালায় এখুনি যেতে হবে?"

হিমানী বলিল, "আমায় পৌঁছে' দে, তার পর ফিরে' এসে আবার আড্ডা দিস্।"

"হ্যাঁ, তা নয়ত আর কিছু! চল।" বলিয়া মুখ হাঁড়ি করিয়া অমিয় চলিতে আরম্ভ করিল। বিনয় তাহাদের সঙ্গেই চলিল।

বাড়ীর দরজার কাছে আসিয়া বিনয় বলিল, "আমি কাল-পরশুর মধ্যেই একবার আস্‌ব।"

হিমানী অস্ফুটকণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা।"

(৩)

মৃণালদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণের পর প্রায় একমাস কাটিয়া গিয়াছে। হিমানী বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া স্থির করিতে চেষ্টা করিতেছিল, যে, তাহার ভিজা কাপড়গুলা এখানে মেলিয়া দেওয়া চলে কি না। বৃষ্টি তখনও আরম্ভ হয় নাই, কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। পিছন হইতে অমিয় ডাকিয়া বলিল, "দিদি, আমায় একটা টাকা দেবে?"

হিমানী বলিল, "রোজ রোজ টাকা কোথায় পাব এই ত পরশু দিয়েছিলাম, আজ আবার কি কর্‌বি টাকা নিয়ে?"

"সেদিনকার টাকা ত তোমার বন্ধুর সেবাতে উড়ে গিয়েছে। আজ আমার ক্লাশের ছেলেরা বায়স্কোপে যাচ্ছে তাদের সঙ্গে যাব।"

তাহার শেষের কথাটার দিকে একেবারেই মন [illegible]

দিয়া হিমানী জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কোন্ বন্ধুর সেবায় আবার তোমার টাকা গেল?"

অমিয় বলিল, "বিনয়-বাবু! আবার কে? সেদিন রাস্তা দিয়ে আস্তে আস্তে দেখ্‌লাম, যে, র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে শুক্‌নো মুখ করে' দোতলার বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে আছেন। জিগ্‌গেষ করাতে বল্‌লেন, 'জ্বর হয়েছে একটু।' কাল খবর নিতে গিয়ে দেখ্‌লাম, একটু নয়, বেশ বেশীই জ্বর হয়েছে, এবং তাঁর গুণবান্ চাকরটি সময় বুঝে' চম্পট দিয়েছেন। একটু চা করে' দেব ভেবে' ভাঁড়ারের সন্ধানে গিয়ে দেখ্‌লাম, এক হাঁড়ি চাল ছাড়া আর কোথাও কিছু নেই। চা, চিনি, দুধ এই-সব জোগাড় কর্‌তে টাকাটা খরচ হ'য়ে গেল।"

হিমানীর মন আশঙ্কায় কালো হইয়া উঠিল। সেই নিমন্ত্রণের ব্যাপারের পর বিনয় বার-দুই তাহাদের বাড়ী আসিয়াছিল। তাহার পর কি একটা কাজে সে কলিকাতার বাহিরে দিন কয়েকের জন্য যাইতেছে বলিয়া যায়। ইহার পর বিনয়ের আর কোনো খোঁজ খবর সে পায় নাই। হঠাৎ এমন সংবাদ শুনিয়া ভয়ে তাহার বুকের ভিতর কেমন যেন করিয়া উঠিল।

অত্যন্ত উদ্বিগ্নমুখে সে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে আগে বলিস্‌নি কেন? ভদ্রলোক একলা অসুখে পড়ে' কি কর্‌ছেন, তার ঠিক্ নেই। আজ খোঁজ নিয়েছিলি?"

অমিয় বলিল, "বল্‌তে ভুলে' গিয়েছিলাম। পাশের বাড়ীর মেসের একজন ছেলেকে বলে' এসেছি, তারাই দেখ্‌ছে বোধ হয়। টাকা দিতে পার্‌বে এখন?"

অন্যদিন হইলে এত সহজে অমিয়ের আবেদন গ্রাহ্য হইত না। আজ হিমানীর যেন কথা বলিবারও ক্ষমতা ছিল না। সে যন্ত্র-চালিতের মত টাকা বাহির করিয়া দিল। অমিয় খুসি হইয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

বিনয় একলা অসুখে পড়িয়া, কেহ তাহাকে দেখিবার নাই, চাকরটা-সুদ্ধ সরিয়া পড়িয়াছে; এই কথাগুলা ক্রমাগত তাহার মনে ঘুরপাক খাইতে লাগিল। তাহার মনের আঁধার ক্রমেই নিবিড় হইতে নিবিড়তর হইয়া উঠিতে লাগিল। কি করিবে কিছুতেই সে যেন ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না, অথচ কিছু না করাও যেন অসম্ভব মনে হইতেছিল।

বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল। সাবিত্রী ভিতর হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "হিমু, ভিজ্‌ছিস্ কেন সন্ধ্যে-বেলাটা। জ্বরজারির দিন, একটা অসুখ-বিসুখ হ'য়ে পড়্‌লে তখন বিপদ্ হবে।"

হিমানী নিশ্বাস ফেলিয়া ঘরের ভিতর উঠিয়া আসিল। ভিতরটা অন্ধকার, টেবিলের উপর হারিকেন ল্যাম্প্‌টা ঝি রাখিয়া গিয়াছে, সেটা জ্বালিবার কথা এখন পর্য্যন্ত কাহারও মনে হয় নাই। হিমানী একবার দেশলাইয়ের বাক্স হাতে করিয়া সেটা জ্বালিতে গেল, পরমুহূর্ত্তেই দেশলাই ফেলিয়া দিয়া বিছানায় লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

বর্ষা-রজনী তাহার বিপুল অন্ধকারের পসরা লইয়া ধীরে ধীরে ধরণীর বুকে নামিয়া আসিল। নীচে দরজার কপাটের শব্দ শুনিয়া সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "খোকা এলি নাকি রে? দরজাটা দিয়ে আসিস্ ভাল করে', তা না হ'লে ভিতরে এক হাঁটু জল দাঁড়িয়ে যাবে এখন," বলিয়া তিনি আবার অসমাপ্ত রন্ধনকার্য্যে মন দিলেন।

জ্বরের যন্ত্রণায় সারাদিন ছট্‌ফট্ করিয়া সন্ধ্যার দিকে বিনয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। চোখে আলোর স্পর্শ অনুভব করিয়া সে চোখ খুলিল। চাহিয়াই তাহার মনে হইল এখনও তাহার ঘুম ভাঙে নাই, যে স্বপ্নলোকে পরম প্রিয় সাথীটির সঙ্গে সে এতক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, এখনও সেখানেই সে আছে। কিন্তু এ ধারণা তাহার বেশীক্ষণ রহিল না, অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া সে বলিল, "আপনি এখানে এলেন কি করে'? বেশ খানিকটা ভিজে'ও এসেছেন দেখ্‌ছি।"

বিনয় তাহাকে দেখিয়া না জানি কি বলিবে, এই আশঙ্কায় এতক্ষণ হিমানীর বুক কাঁপিতেছিল। কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিবামাত্র বিনয়ের মুখে যে অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল, তাহাতে তাহার সব ভয় দূর হইয়া গেল। সে হাসিয়া বলিল, "খোকার কাছে আপনার অসুখের কথা শুনে' দেখ্‌তে এলাম।

আপনার গুণবান্ চাকরটি ফেরেনি দেখ্‌ছি। কি খেয়েছেন আজ সারাদিন।"

বিনয় বলিল, "খোকা আবার আপনাকে ব্যস্ত করতে গেল কেন?"

হিমানী বলিল, "না করবারই তার ইচ্ছা ছিল, কথায় কথায় হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল। বেশ মানুষ যা হোক্ আপনি, একলাটি অসুখ করে' পড়ে' রয়েছেন, একটু খবর দিতে নেই? এটা বুঝি আপনার বন্ধুদের প্রতি খুব সুবিচার?"

বিনয় বলিল, "এখানে আমার বন্ধু বল্‌তে কেই বা আছে?" একটু থামিয়া বলিল, "এক আপনি ছাড়া। কিন্তু আপনাকে নিজের আরামের জন্যে এখানে আস্‌তে বল্‌ব, এত স্বার্থপর এখনও হইনি। নইলে অসুখে পড়ে' সবার আগে আপনাকে জানাতেই মনটা ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছিল।"

বিনয়ের মুখে এ-ধরণের কথা হিমানী ইহার পূর্ব্বে একটাও শোনে নাই। দু'জনের মনে যাই থাক্, বাহিরের কথায় দুজনেই নিতান্ত সাধারণ পরিচিত মানুষের মতই ব্যবহার করিত। রোগের যন্ত্রণায় আজ কেমন করিয়া যেন বিনয়ের মুখ একটুখানি খুলিয়া গেল। সবার চেয়ে নিকটতম বন্ধু বলিয়া সে হিমানীকে স্বীকার করিয়া লইল।

হিমানী বলিল, "মনেই যদি হয়েছিল ত একটু খবর দিলেই পারতেন? আমি সব সময় আস্‌তে না পারি, খোকাকে পাঠাতাম। কিন্তু সে যাক্, কিছু খেয়েছেন?"

বিনয় বলিল, "না, সকালে মেসের ছেলেরা দুধসাগু দিয়ে গিয়েছিল, খেতে ইচ্ছা করলে না, ঐ টেবিলের উপর ঢাকা আছে।"

"বেশ কাণ্ড! ডাক্তারও নিশ্চয় দেখাচ্ছেন না?"

বিনয় বলিল, "দুই একদিন, না হয়, তিন চার দিনে ছেড়ে যাবে মনে করে' আর ডাক্তার-টাক্তার ডাকিনি, দেখি আর দু'-চার দিন।"

হিমানী আর কিছু না বলিয়া তাহার খাওয়ার জোগাড় করিতে লাগিল। খাওয়া-দাওয়া চুকাইয়া বলিল, "জ্বর নিয়ে একলা থাকবেন, একটা বাড়ীতে? মেসের ছেলেরা কেউ এসে একটু থাকতে পারে না?"

বিনয় বলিল, "তাদের কারো সঙ্গেই আমার তেমন আলাপ নেই, অমিয়র কথায় দু'-একজন এক-আধবার আসে। কিন্তু সে যাই হোক, আপনি আর রাত করবেন না।"

হিমানী বলিল, "তবে খোকাকেই ফিরে' পাঠিয়ে দেব গিয়ে। আপনার এত জ্বর নিয়ে একলা থাকা কিছুতেই ঠিক হবে না।" তাহার ইচ্ছা করিতেছিল, বিনয়ের জ্বর-তপ্ত কপালে একবার হাত বুলাইয়া দিতে, কিন্তু সঙ্কোচ আসিয়া তাহাকে বাধা দিল। এমনি যতটা সে অগ্রসর হইয়াছে, সামাজিক রীতি-অনুসারে তাহা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি, কিন্তু এই বাড়াবাড়িটা না করিয়া তাহার উপায় ছিল না। ইহার পরিণামে তাহাকে যাহাই সহ্য করিতে হউক, তাহার জন্য সে প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল।

দরজার কাছে অমিয়র গলা শোনা গেল, "দিদি, যা হোক্ থেকে থেকে এক কাণ্ড কর। পিসিমাকে বলে এলে না কেন? ভাগ্যে চিঠি লিখে' রেখে এসেছিলে, তা না হ'লে এতক্ষণ আমায় থানায় দৌড়তে হ'ত।"

বিনয় একবার হিমানীর আরক্তিম মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, খানিকটা তাহার অজ্ঞাতসারেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস তাহার বক্ষ ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসিল। তাহার জন্য হিমানী যে কতখানি দুঃখ বরণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা তাহার অজানা রহিল না। কিন্তু এতটা গ্রহণ করিবার যোগ্যতা তাহার কোথায়?

হিমানী বলিল, "আচ্ছা, এখন আসি, গিয়ে অমিয়কে পাঠিয়ে দেব।"

বিনয় বলিল, "না, না, আজকাল যা ইনফ্লুয়েঞ্জার ঘটা, ছেলেমানুষ ওকে আবার ধরবে?"

হিমানী বলিল, "ও পাশের-ঘরে থাকবে না হয়। ভারি ত জ্বর, কাল এসে দেখ্‌ব সেরে গেছে।"

হিমানী এবং অমিয় বাহির হইয়া গেল। পাশ ফিরিয়া শুইয়া বিনয় ভাবিল, অসুখের ভিতরও ভগবান তাহার জন্ম এত সুখ রাখিয়াছিলেন!

কিন্তু পরদিন হিমানী আসিয়া দেখিল, বিনয়ের জ্বর ত ছাড়ে নাইই, বরং বেশ খানিকটা বাড়িয়া উঠিয়াছে। অত্যন্ত ভীত হইয়া সে অমিয়কে বলিল

"খোকা, একজন ভাল ডাক্তার ডাক্‌তেই হবে, কাছে কেউ আছেন ?"

খোকা বলিল, "কাছে না থাক্ দূরে ত আছেই, কল্‌কাতায় আবার ডাক্তারের ভাবনা। তবে 'ফি'টা একটু মোটা-রকমের হবে। এখুনি যাব নাকি ?"

তাহার দিদি বলিল, "একবার টেম্পারেচারটা নিয়ে তবে যা, মুখের চেহারা দেখে' ত মনে হচ্ছে, জর খুব বেশী।"

থার্মোমিটারের সাক্ষ্যেও তাই দেখা গেল। আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া হিমানী বলিল, "তুই এখুনি যা খোকা, বেশ ভাল ডাক্তার নিয়ে আয়।"

অমিয় বলিল, "বিনয়-বাবুকে একবার জিগ্‌গেষ করে' যাব না ?"

হিমানী বলিল, "জরের ঘোরে একেবারে কেমন যেন হ'য়ে রয়েছেন, ওঁকে এখন আর ডাকাডাকি কোরো না।"

খোকা চলিয়া গেল।

ডাক্তার আসিলেন, যথাবিধি পরীক্ষা করিলেন, ঔষধ লিখিয়া দিলেন এবং অন্যান্য ব্যবস্থা দিতেও ক্রটি করিলেন না। তিনি বিদায় হইবার সময় অমিয় মৃদুস্বরে বলিল, "আপনার ভিজিট্‌টা ?"

"সে হবে এখন, তার জন্যে অত ব্যস্ত কেন ? যেরকম দেখ্‌ছি তাতে আমাকে আরো দু-চার বার আস্‌তে হবে।" বলিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন।

সেদিন হিমানী যখন বাড়ী ফিরিল, তখন বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর। সমস্ত সুখ শান্তি যেন তাহার পক্ষে জগৎ হইতে বিদায় লইয়াছিল। স্কুল হইতে সে এক সপ্তাহের ছুটি লইল, এ ছুটিটা তাহার পাওনাই ছিল। বাড়ীতে পিতা ও পিসির বিরক্তিকঠিন মুখ অবস্থাটা আরো অসহ্য করিয়া তুলিল, একমাত্র খোকাই নির্ব্বিচারে দিদির পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহাকে সাহায্য করিতে লাগিল।

বিনয়ের অসুখ শীঘ্র সারিবার কোনো লক্ষণই দেখাইল না। তৃতীয়বার ডাক্তার আসার পর অমিয় চুপিচুপি হিমানীকে বলিল, "দিদি, আর ওঁকে টাকা না দেওয়া ভাল দেখায় না, এর পর ডাক্‌তে যেতে লজ্জা করবে। তোমার কাছে টাকা আছে ?"

হিমানী বলিল, "ওঁর 'ফি' কত ? আমার কাছে বিশেষ কিছু নেই।"

অমিয় বলিল, "ষোল টাকা করে'। তা ছাড়া, ডিস্‌পেন্‌সারীতেও গোটা পনেরো টাকা ধার রয়েছে।"

হিমানী শুষ্কমুখে বলিল, "ওর অর্দ্ধেক টাকাও আমার কাছে নেই। আচ্ছা, তুই যা এই ওষুধটা নিয়ে আয়, আমি দেখি কোথা থেকেও জোগাড় কর্‌তে পারি কি না।"

অমিয় চলিয়া যাইবার পর, সে কিন্তু ভাবিয়া কিছু কূল-কিনারা দেখিতে পাইল না। তাহাদের দরিদ্রের সংসারে অর্থের অনটন চিরকালই, একসঙ্গে পাঁচটার বেশী টাকা কখনও থাকিতে পায় না। বিনয়ের এই সাংঘাতিক অসুখের মধ্যে অর্থের জন্য তাহাকে ব্যস্ত করা চলে না। বিশেষ সে যখন ডাক্তার ডাকিতে বলে নাই, হিমানী নিজেই ডাকিয়াছে। এ অবস্থায় কি করা যায় ?

পাশের ছোট ঘরটাতে বিনয়ের লিখিবার পড়িবার আড্ডা ছিল, জিনিষপত্রও বেশীর ভাগ এইখানেই থাকিত। হিমানী তাহার হাতবাক্সটার কাছে গিয়া ইতস্তত: করিতে লাগিল। ইহার চাবী ত ঐখানেই রহিয়াছে; খুলিয়া দেখিলে হয়, টাকাকড়ি কিছু আছে কি না। রীতিবিরুদ্ধ কাজ করিয়াই ত তাহার দিন কাটিতেছে, অন্যের অজ্ঞাতসারে তাহার বাক্স খোলাটাও না হয় তাহার অদৃষ্টে জুটিল। সংসারের কাছে খানিকটা অপরাধী তাহাকে সাজিতেই হইয়াছে, বাকি যেটুকু আছে বিনয়ের জন্য তাহাও সে সহিতে পারিবে।

চাবী আনিয়া হাত-বাক্সটা সে খুলিয়া ফেলিল। উপরাংশে রাজ্যের আবর্জ্জনা বোঝাই, ছেঁড়া কাগজ, ভাঙা কলম-পেন্সিল, বোতাম, সেফ্‌টিপিন প্রচুর দেখা গেল, কিন্তু পাঁচ-ছ আনা পয়সা ভিন্ন আর বেশী অর্থের সন্ধান মিলিল না। হিমানী উপরের ডালাটা তুলিয়া ফেলিল।

নীচে একটি মখ্‌মলের বাক্স। হিমানী বিস্মিত হইয়া সেটি হাতে করিয়া তুলিতেই বাক্সটা খুলিয়া

গেল। ভিতরে একটি জড়োয়া নেক্‌লেস, মৃণালের গলায় যেরকম দেখিয়াছিল, অবিকল সেই জিনিষ। ছোট এক টুক্‌রা কাগজে হিমানীর নাম লেখা, কাগজটা পিন দিয়া বাক্সের গায়ে আট্‌কানো।

হিমানীর দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। অসুখের সময় কেন যে বিনয় ডাক্তার ডাকিতে বা ঔষধ খাইতে শুদ্ধ চায় নাই, তাহার কারণ বেশ স্পষ্ট করিয়াই সে বুঝিল। বাক্সটা হাতে করিয়া অন্ধকার ঘরে সে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

খানিক পরে হাতবাক্সের ডালা বন্ধ করিয়া সে আবার বিনয়ের ঘরে আসিয়া ঢুকিল। অমিয় ঔষধ আনিতে কেবলই দেরী করিতেছে, হিমানীর মন অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল; সে বিনয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, জ্বরের ঝোঁকে তাহার সমস্ত মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, নিশ্বাসও যেন আগের চেয়ে দ্রুত চলিতেছে। হিমানীর বুকের ভিতরটা ভয়ে যেন কেমন করিতে লাগিল। বিনয়ের অসুখ যদি নাই সারে? তাহা হইলে, জগতে আর কিসের আশায় সে বাঁচিয়া থাকিবে? কিন্তু বাঁচিয়া যে থাকিতে হইবে, সে বিষয়ে তাহার সন্দেহও ছিল না। কারণ বাঁচিয়া যাহাদের কোনোই আনন্দ নাই, তাহাদেরই বাঁচাইয়া রাখিতে বিধাতার যেন উৎসাহের সীমা থাকে না, ইহাই সে চিরকাল দেখিয়া আসিতেছে।

অমিয় গোটা-দুই শিশি হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিয়া তাহার চিন্তা-স্রোতে বাধা দিল। বিনয়ের পাশে বসিয়া তাহার গায়ের তাপ পরীক্ষা করিয়া বলিল, "দিদি, টেম্পারেচার ত আরো উঠেছে। কি করব? ডাক্তারকে আবার খবর দেব?"

হিমানী বলিল, "তাই যা।"

আবার অন্ধকার ঘরে একলা বসিয়া যত কাল্পনিক বিভীষিকার সহিত যুদ্ধের পালা। জ্বরের ঘোরে বিনয় এপাশ ওপাশ করিতেছিল, তাহার মুখ হইতে মাঝে মাঝে এক-একটা অস্ফুট কাতরোক্তিও বাহির হইয়া আসিতেছিল। হিমানী তাহার মাথার পাশে বসিয়া কপালের উপর হাত বুলাইতে লাগিল। বিনয় আরক্ত চোখ মেলিয়া একবার তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর তাহার হাতের উপর জ্বরতপ্ত মুখ রাখিয়া একটু যেন স্থির হইয়াই ঘুমাইয়া পড়িল।

ডাক্তার আসিয়া ঔষধ ব্যবস্থা সবই বদল করিলেন ও রাত্রে রোগীর কাছে একজন লোক থাকিতে বলিয়া বিদায় হইলেন। অমিয় বলিল, 'দিদি, আমিই থাক্‌ব এখন। মেস্‌ থেকে রমেশকে ডেকে আন্‌ব, সে আর আমি পালা করে' রাত জেগে ওষুধ খাওয়াব এখন।"

হিমানীর শরীর সারাদিনের পরিশ্রম আর দুশ্চিন্তায় যেন ভাঙিয়া পড়িতেছিল। সে ক্লান্তকণ্ঠে বলিল, "আমায় তা হ'লে এবার বাড়ী রেখে আয়: তোর বন্ধুকে ডাক ততক্ষণ এখানে একটু বসুক।"

যাইবার সময় হিমানী মখ্‌মলের বাক্সটি লুকাইয়া সঙ্গে লইয়া গেল।

মুকুলের চিরকালই ঘুম হইতে উঠিতে দেরি হইত, বেলা আটটা-নটার সময় সে সবে হাত মুখ ধুইয়া চা খাইতে বসিয়াছে, এমন সময় হিমানীকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া সে বেশ খানিকটা অবাক্‌ হইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল, "এমন প্রেজেণ্ট্‌ সার্‌প্রাইজ্‌ কেন অকস্মাৎ?"

হিমানী জিজ্ঞাসা করিল, "একটা জিনিষ কিন্‌বি কি না, তাই জান্‌তে এলাম।"

সমস্ত মুখ কৌতূহলে ভরিয়া তুলিয়া মুকুল বলিল, "কি জিনিষ আগে দেখি?"

জিনিষটা দেখিয়া তাহার বিস্ময় বাড়িল বই কমিল না, জিজ্ঞাসা করিল, "এ তুই বেচে দিচ্ছিস? কবে গড়ালি?

হিমানী বলিল, "সম্প্রতি একটু টাকার দর্‌কার, তাই বেচছি, আবার সুবিধা হ'লেই গড়াব।"

মুকুলের গহনাটা এত বেশী পছন্দ হইয়াছিল, যে, সে আর বেশী বাক্যব্যয় না করিয়া কেনার কাজটা সারিয়া ফেলিল। যদিও গরীবের মেয়ে হিমানী কোথা হইতে এমন বহুমূল্য গহনা গড়াইল, তাহা জানিবার জন্য কৌতূহলে তাহার মন ভরিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু হিমানী এত তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল, যে, বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসা করিবারও তাহার সময় হইল না।

ডাক্তারের ভিজিটের টাকা, ডিস্‌পেন্‌সারীর বাকি

টাকা সব একসঙ্গে পাইয়া, কিঞ্চিৎ অবাক্ হইয়া অমিয় জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি এত টাকা হঠাৎ জোটালে কি করে'?"

দিদি সংক্ষেপে বলিল, "গহনা বেচে।"

আরো কয়েকদিন সমানে ভুগিয়া বিনয় একটু ভালর দিকে ফিরিবার লক্ষণ দেখাইল। সন্ধ্যার সময় ঘরে ঢুকিয়া হিমানী দেখিল, সে বালিশে ঠেস্ দিয়া উঠিয়া বসিয়াছে। হিমানীকে দেখিয়া বলিল, "আজ যে এত দেরী? কখন থেকে আপনার আশায় বসে' আছি।"

হিমানী বলিল, "আজ আমায় স্কুলে যেতে হয়েছিল, তাই আস্তে দেরী হ'য়ে গেল। আপনি একটু ভাল আছেন মনে হচ্ছে।"

বিনয় একটুখানি হাসিয়া বলিল, "এতেও যদি ভাল না হই, ত আর কিসে হব? যা পেলাম তা পাবার জন্যে যমের বাড়ী থেকেও ফিরে' আস্তাম।"

হিমানী চুপ করিয়া গেল, এমন স্পষ্ট কথার উত্তরে সে কিছু বলিবার খুঁজিয়া পাইল না।

বিনয় বলিল, "আমার একটু কাছে এসে বসবে?"

নীরবে উঠিয়া আসিয়া হিমানী তাহার পাশে বসিল। বিনয় তাহার একটি হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "অমিয়র কাছে যা শুনলাম তা কি সত্যি? তুমি নিজের গয়না বেচে আমার অসুখের খরচ দিয়েছ?"

হিমানী খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "সত্যি কি মিথ্যা আপনিই ভাল করে' বুঝবেন, গয়না বেচেছিলাম বটে, নিজের জেনেই বেচেছিলাম, কিন্তু সে আপনারই দেওয়া। না জানিয়ে আপনার বাক্স খোলা আমার অন্যায় হয়েছিল, কিন্তু সে অন্যায় করা ছাড়া তখন আর আমার উপায় ছিল না।"

বিনয় তাহার হাত ধরিয়া আর-একটু কাছে টানিয়া আনিল। বলিল, "কিছু অন্যায় করনি! আমার কেবল দুঃখ হচ্ছে তোমার গলায় নিজের হাতে পরিয়ে দেব বলে যা কিনেছিলাম, তা অন্য মানুষের গলায় গিয়ে উঠল। যাক, তুমি সেটা নিয়েছিলে এই আমার ঢের।"

হিমানী তাহার দিকে তাকাইয়া চুপ করিয়াই রহিল। তাহার দুই চোখ তাহার হইয়া যাহা কিছু বলিবার বলিয়া দিল।

দু-হাতে তাহার মাথা নিজের বুকের উপর টানিয়া আনিয়া বিনয় বলিল, "আমার সামান্য উপহারটা নিয়েছিলে, সব চেয়ে বড় আমার যা দেবার আছে, তা কি নেবে?" ইহার উত্তর সে যে ভাষায় পাইল, তাহাতে তাহার আর কোনো সন্দেহই রহিল না।

অনেক পরে হিমানীর শুভ্র সুন্দর গ্রীবার উপর হাত বুলাইয়া বিনয় বলিল, "কি সুন্দর দেখাত তোমাকে! টাকা হ'লেই আমি আবার ঐরকম আর-একটা করিয়ে দেব তোমায়।

বিনয়ের হাত নিজের গলায় জড়াইয়া হিমানী বলিল, "এর চেয়ে ভাল কোনো গহনার আমার দরকার নেই।"

রুশ-সাহিত্য

শ্রী বীরেশ্বর বাগ্ছী

রুশ-সাহিত্যের আর সেদিন নাই। এখন আর তাকে জার্মান-ফরাসী সাহিত্যের আসরের দরজায় দাঁড়িয়ে তাম্বুল-করঙ্ক-বাহিকার মতন অপেক্ষা করতে দেখা যায় না—নিজেকে জাহির করবার ব্যর্থ চেষ্টায় জার্মান কিম্বা ফরাসী সাহিত্যের বাঁধা বোলগুলিও তাকে রূপ চাতে হয় না। তাদের আদব-কায়দা, ভাব-ভঙ্গীর জাবর-কাটাও সে বহুদিন ছেড়ে দিয়েছে। সমস্ত ছেড়ে দিয়ে, বিগত একশত বৎসরের মধ্যে রুশ-সাহিত্য নিজের এমনই একটা মনোরম

স্বাতন্ত্র্য গড়ে' নিয়েছে, যে, সমগ্র জগতের যুগপৎ দৃষ্টি আজ তার উপরে গিয়ে পড়েছে। তার ভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠ রত্নগুলি এখন নানা ভাষায় অনুবাদিত হ'য়ে পৃথিবীর সীমা হ'তে সীমান্তরে তারই জয়পতাকা বিজয়গর্ব্বে ওড়াচ্ছে। তাই গোগোলের 'মৃত-আত্মা' এখন আমাদের অবসর-সহচর হ'তে পেরেছে। সুদূর-বঙ্গপল্লীর নিভৃত কোণে বসে' তারই ফলে আজ আমরা টুর্গেনিভের উপন্যাস পড়ি—পুশ্‌কিনের কবিতা কথায় কথায় আওড়াই—ডষ্টয়েভ্‌স্কির সাইবিরিয়ার নির্ব্বাসন-কাহিনী পড়ে' ভয়ে বিস্ময়ে অবাক্‌ হ'য়ে থাকি। সেইজন্য ঋষি টলষ্টয় আর আমাদের পর নন। তাঁর 'শক্তি ও সংগ্রাম' পড়ে' আজ আমরা মুগ্ধ হই, আর 'আনা-কারেনিনা' পড়ে' তাঁর প্রতিভার প্রশংসা আমাদের মুখে ধরে না।

কিন্তু রুশ-সাহিত্যকে উন্নতির এই তুঙ্গশৃঙ্গে আরোহণ করাতে গিয়ে, মহিমাময় দেবীর মতন জগতের সামনে সাদরে তাকে প্রতিষ্ঠিত কর্‌তে গিয়ে তার কত একনিষ্ঠ সাধক যে লাঞ্ছিত অবমানিত এমন কি প্রাণদণ্ডে পর্য্যন্ত দণ্ডিত হয়েছে, তার সংখ্যা নাই।

রাজ-রোষ রুশ-সাহিত্যের স্বাধীনভাবে বেড়ে উঠ্‌বার পক্ষে ছিল মহা-অন্তরায়। রুশিয়ায় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ছিল না, এখনও নাই।

রাজশক্তির দারুণ অত্যাচারে—দুর্ব্বহ করভার ক্রমাগত বহন কর্‌তে কর্‌তে জনসাধারণ অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিল। লোকের মনে শান্তি ছিল না। সম্রাট্‌ বিছানায় শুয়ে বিদ্রোহের স্বপ্ন দেখ্‌তেন—ভাবী বিদ্রোহের আশঙ্কায় প্রধান-সেনাপতি নিয়ত সৈন্যসংখ্যা বাড়াতেন, আর সেই বিপুল বাহিনীর রসদ যোগাবার খরচ সংগ্রহ হ'ত প্রজাদের কাছ থেকে। দুর্ভিক্ষ অসন্তোষ এবং অরাজকতা যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে' রুশিয়ার বুকের উপর দিয়ে তাণ্ডব নৃত্য করে' বেড়াচ্ছিল। দেশের এই অবস্থায় হঠাৎ কে কি লিখে একটা অযথা হাঙ্গামা বাধিয়ে তোলে এই ভয়ে গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাক্‌তেন। সেন্সর্ (যাঁরা ছাপার আগে লেখা পরীক্ষা করেন) বিশেষভাবে পরীক্ষা না করে' সহসা কিছু ছাপাবার অনুমতি দিতেন না। কারো লেখার মধ্যে রাজদ্রোহের সামান্য একটু গন্ধ পেলে অথবা দেশের দুরবস্থার সামান্য দুটো-একটা বর্ণনা থাক্‌লে তাকে সহজে নিষ্কৃতি দেওয়া হ'ত না। তার লেখা ছাপাবার অনুমতি দেওয়া ত দূরের কথা, সেই দিনই তাকে সাইবিরিয়ায় রওনা হওয়ার ব্যবস্থা করে' দিয়ে তবে শাসক-সম্প্রদায় নিশ্চিন্ত হ'তেন। ফলে লেখা-পড়ার আলোচনা দেশ থেকে একরকম উঠে'ই গিয়েছিল। প্রাণ খুলে' স্বাধীন চিন্তা কারো প্রকাশ করার উপায় ছিল না। আড়ষ্ট ধরণের কঙ্কালসার একটা সাহিত্যের নামমাত্র অস্তিত্ব ছিল বটে, কিন্তু কেউ তা পড়ে' কখনও তৃপ্তিলাভ কর্‌ত না। দেশের ধনী এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়েরও এবিষয়ে যথেষ্ট ত্রুটি ছিল। সাহিত্যের উন্নতি-কল্পে কোনরকম চেষ্টা ত তাঁরা কর্‌তেনই না, অধিকন্তু নিজের মাতৃ-ভাষাটাকেও অবজ্ঞার চক্ষে দেখ্‌তেন। খাঁটি রুশ-ভাষা ছিল কুলী-মজুরদের ভাষা; রাজভাষা ছিল—ফরাসী। সম্রাট্‌-সম্রাজ্ঞী থেকে আরম্ভ করে' মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় পর্য্যন্ত—সকলেই ফরাসী ভাষায় কথাবার্ত্তা বল্‌তেন। রুশভাষা যে কখনো ভদ্রলোকের কথ্য, শ্রাব্য, লেখ্য এবং পাঠ্য ভাষা হ'তে পারে শিক্ষিত লোকেরা কেউ একথা মান্‌তেন না। তাঁরা ফরাসী ভাষাটা ভাল করে' শিখ্‌তেন; কেউ কেউ বা জার্ম্মান্‌টাও অতিরিক্ত পড়্‌তেন। চিঠি-পত্র লেখা, বক্তৃতা দেওয়া, মাঝে মাঝে এক-আধখানা বই-টই লেখা এসবই চল্‌ত ফরাসী ভাষায়। মাতৃভাষাটাকে দশজনে যেন হাতাহাতি করে' একেবারে দেশ থেকে বিদায় করে' দেবার জন্যে কোমর বেঁধে লেগেছিলেন।

দীনা ক্ষীণা উপেক্ষিতা রুশভাষা যখন এইরকমভাবে নিজের বাসভূমে প্রবাসী হ'য়ে ভীত-ব্যাকুলচিত্তে সমাজের নিম্নস্তরে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল, তখন সেখান থেকে তাকে সর্ব্বপ্রথম উদ্ধারের চেষ্টা করেন সাইমন্ পোলোটোস্কী। এঁর বাড়ী ছিল কিভ (নগরে)। জার্ থিয়োডোরের গৃহশিক্ষক হ'য়ে ইনি মস্কোতে আসেন। রুশিয়ার মধ্যে মস্কো ছিল তখন শিক্ষার সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র। মস্কোতে এসে পোলোটোস্কীই প্রথমে রুশভাষায় পদ্য-লেখার পথ দেখান। রুশভাষায় যে এমন সুন্দর কবিতা লেখা যেতে পারে, আর সে কবিতাতেও যে অতি প্রীতিপ্রদ মাধুর্য্য থাক্‌তে

পারে, দেশের লোক এর আগে এ কথা জানত না। তাঁর লেখা দুটো-একটা কবিতা পড়ে'ই দেশের সকল শ্রেণীর লোকেরই মাতৃভাষার উপর একটা আন্তরিক টান আসতে সুরু হ'ল। তারপরে 'উড়নচ'ড়ে ছেলে' নামক নাটকখানা যখন তিনি বের করলেন, শিক্ষিত লোকেরা তখন সকলেই ফরাসী-জার্মান ছেড়ে নিজের ভাষার চর্চ্চা করতে আরম্ভ করে' দিলেন। বহুলোক রুশভাষায় বই লিখতে লাগলেন। অনুবাদই হ'তে লাগল বেশীর ভাগ। দু'চারখানা মৌলিক গ্রন্থও লেখা হয়েছিল বটে, কিন্তু ফরাসী সাহিত্য-রথীদের স্পষ্ট প্রভাব সেগুলির উপরেও আগাগোড়া ছিল। সাহিত্য-হিসাব এ-সব বইয়ের কোন স্থায়ী মূল্য না থাকলেও এগুলির খুব বেশী সাময়িক মূল্য ছিল। এদেরই ভিত্তির উপরে বর্ত্তমান রুশ-সাহিত্য গড়ে' উঠেছে।

জার্ম্মান-ফরাসী সাহিত্যের প্রভাব কাটিয়ে নতুনরকমের স্বাতন্ত্র্যলাভের প্রয়াস রুশসাহিত্যে প্রথম দেখা যায় ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে। পথপ্রদর্শক হয়েছিলেন নিকোলাস কারামজিন্‌। কারামজিনের পিতা ছিলেন জারের সেনাদলের একজন সেনানায়ক—জাতিতে তাতার। তাঁর আর্থিক অবস্থা বেশ স্বচ্ছল ছিল। কারামজিনের প্রথম শিক্ষা মস্কোতে আরম্ভ হয়। সেখানকার শিক্ষা শেষ হ'লে সেন্ট্‌ পিটার্স্‌বর্গে এসে তিনি কলেজে ভর্ত্তি হন। তিনি মেধাবী এবং অসাধারণ-প্রতিভা-সম্পন্ন ছিলেন। বিশেষ প্রশংসার সঙ্গে কলেজের পড়া শেষ করে' জার্ম্মানী ফ্রান্স সুইজারল্যাণ্ড এবং ইংলণ্ড্‌ থেকে ঘুরে' এসে তিনি মস্কোতে একখানা খবরের কাগজের সম্পাদনভার গ্রহণ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই 'রুশ-পর্য্যটকের পত্রাবলীর' নামে তিনি একখানা বই লেখেন। গ্রীক-লাটিন, এবং আধুনিক কয়েকটি ভাষার অনেকগুলি বইও তিনি এই সময়ে অনুবাদ করেছিলেন। কিন্তু এসব করে' সাহিত্য-জগতে তেমন খ্যাতি লাভ করতে পারেননি। এগুলি ছিল তখনকার দিনের মামুলী কাজ—এতে সাধারণের দৃষ্টি তেমন আকর্ষণ করা যেত না। কারামজিনের সাহিত্যিক প্রতিভা লোকের কাছে বিশেষভাবে ফুটে' উঠেছিল তাঁর রুশ-সাম্রাজ্যের ইতিহাস নামক বিখ্যাত বইখানা লেখায়। রুশভাষায় ইতিপূর্ব্বে রুশদেশের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস ছিল না। জাতীয় সাহিত্যের এ অভাবটা মর্ম্মে-মর্ম্মে বেশ অনুভব করে' ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে কারামজিনের ইতিহাস লিখতে আরম্ভ করেন।

রুশিয়ায় তখন প্রথম আলেক্‌জাণ্ডারের রাজত্বকাল। আলেক্‌জাণ্ডার সাহিত্যামোদী রসিক পুরুষ ছিলেন। তাঁর সময়ে মুদ্রাযন্ত্রের অবাধ স্বাধীনতা না থাকলেও দেশীয় সাহিত্যের উপর থেকে সরকারী সুদৃষ্টির তীব্রতাটা অনেকখানি কমে' গিয়েছিল। ইতিহাস লেখায় কারামজিনের তিনিই ছিলেন প্রধান উৎসাহদাতা। ইতিহাসের যখন যে-খণ্ড লেখা শেষ হ'ত সেই খণ্ড কারামজিন তাঁকে পড়ে' শোনাতেন। এইরকম করে' ১৮২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এগার খণ্ড লেখা শেষ হওয়ার পরে কারামজিনের মৃত্যু হয়। ইতিহাসও অসম্পূর্ণই থেকে যায়। এমনই সুন্দর সুস্পষ্ট প্রাঞ্জল এবং ওজস্বিনী ভাষায় কারামজিন্‌ তাঁর ইতিহাসে দেশের সুখ-দুঃখের কথা আলোচনা করেছিলেন যে, সেগুলি পড়ে' সমগ্র রুশজাতির ভিতরে জাতীয়তার একটা সার্ব্বজনীন বিকাশ হ'তে আরম্ভ হয়েছিল। সাহিত্যের দিক্‌ দিয়েও এ বইখানার মূল্য হয়েছিল খুব বেশী। এখানা পড়ে'ই রুশ-সাহিত্যিকেরা প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন যে, সাহিত্য-সৃজনের মালমশলা রুশদের নিছক জাতীয় জীবন থেকে গ্রহণ করলে তা বিদেশ থেকে আমদানী জিনিষের চেয়ে ঢের ভাল এবং প্রাণস্পর্শী হবে। কথাটা বোঝা মাত্রই এ-বিষয়ে চারিদিকে চেষ্টা চলতে লাগল। দুদশখানা বইও অনেকে লিখে' ফেললেন। তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়েছিল আলেকজেণ্ডার গ্রিবয়ডভের লেখা 'অতিবুদ্ধির দুর্ভোগ' বলে' একখানা নাটক।

ঠিক্‌ এই সময়ে নতুন একজন লোক এসে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন। এর নাম আলেক্‌জাণ্ডার পুশকিন্‌—রুশিয়ার শ্রেষ্ঠ কবি। এঁরই অক্লান্ত চেষ্টায় শুধু যে রুশ-সাহিত্য বিশেষভাবে পরিপুষ্ট হ'য়ে উঠেছিল তা নয়, রুশ-সাহিত্যের ধারা পর্য্যন্ত বদলে গিয়েছিল। পুশকিনের আগে সাহিত্যে শুধু দুটি জিনিষেরই সৃষ্টি হচ্ছিল—প্রথম, গুরুগম্ভীর—কাজেই সাধারণের দুর্ব্বোধ্য

ভাষায় বিদেশী বইয়ের অক্ষম অনুবাদ ; দ্বিতীয়তঃ যে-গুলি ঠিক্ অনুবাদ নয় সেগুলির ভিতরেও বিদেশী ভাবের অপরিবর্ত্তিত প্রচলন। এ-দুয়ের একটিও দেশের লোকে ঠিক্ নিজের জিনিষ বলে' গ্রহণ করতে পারছিল না। কারামজিনের ইতিহাস এবং গ্রিয়বডভের নাটক অল্প দিনের মধ্যেই জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছে দেখে' পুশ্‌কিন দেশের লোকের রুচি এবং অসুবিধা শীগ গিরই বুঝ্‌তে পেরেছিলেন। এর প্রতিবিধান-কল্পে তিনিই প্রথম সাহিত্যে সাধারণের কথিত ভাষা চালাতে আরম্ভ করলেন। অনুবাদও করতে লাগলেন বটে, কিন্তু সেটা ভাষার না হ'য়ে হ'ল ভাবের। জনসাধারণ এইবার থেকে সাহিত্যের রসাস্বাদ ভালভাবে করতে শিখ্‌লে। রুশ-সাহিত্যও নতুনভাবে নতুন পথে চল্‌তে লাগ্‌ল।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে মস্কো নগরে পুশ্‌কিনের জন্ম হয়। ইনি প্রাথমিক শিক্ষা পেয়েছিলেন সেণ্ট্ পিটার্স্‌বর্গের কাছে একটা ছোট সহরে। ছেলেবেলা থেকেই পুশ্‌কিনের কবিতার উপরে স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল। স্কুলে পড়ার সময়ে অতি অল্প বয়সেই তিনি সুকবি বলে' খ্যাতি লাভ করেছিলেন। পুশ্‌কিনের প্রথম রচনাগুলি সবই ফরাসী ভাষায়। শেষে তিনি রুশ-ভাষায় লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। সরকারী কাজের খাতিরে বহু দিন তাঁকে ককেশাস্ পর্ব্বতের উপরে এক গ্রামে বাস করতে হয়েছিল। অনেকে বলেন এখানকার অতুলনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যই পুশ্‌কিনের স্বাভাবিক কবিত্ব-শক্তিকে বিশেষভাবে বিকশিত করে' তুলেছিল। এখানে থাকার সময়ে তিনি যতগুলি কবিতা লিখেছিলেন তার মধ্যে 'জিপ্‌সী জীন' নামক একটি কবিতাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়েছিল। তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্যের নাম হচ্ছে 'ওনেজিন'। সেক্‌স্‌পিয়রের অনুকরণে বারিস্‌গোডোনোভ্ বলে' একখানা ঐতিহাসিক নাটকও লিখেছিলেন ; কিন্তু সমজদারদের কাছে সেখানা তেমন প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি। ৩৭ বৎসর বয়সে স্ত্রীলোক-ঘটিত একটা কুৎসিত ব্যাপারে তিনি হত হন।

পুশ্‌কিন বড়দরের গীতিকাব্য-লেখক ছিলেন। মৌলিক রচনার ক্ষমতা অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে creative genius বলে সেটা পুশ্‌কিনের খুবই কম ছিল বটে ; কিন্তু তাঁর প্রতিভার অত্যাশ্চর্য্য বিশেষত্ব ছিল এই যে তিনি অপরের ভাব অতি সহজে আপনার করে' নিয়ে নিজের স্বভাব-সিদ্ধ সরল ভাষায় সুন্দর মৌলিকভাবে প্রকাশ করতে পারতেন। তাতে উঁচুদরের সাহিত্যের সরলতা এবং স্বাভাবিকতাও বেশ ফুটে' উঠত।

মাইকেল সেরমন্‌টভ্ এবং আলেক্‌সিস্ কেপট্ নামে আরো দুইজন লিরিক বা গীতিকাব্য-রচয়িতার নাম এখানে করা যেতে পারে। এঁরাও সুকবি ছিলেন, কিন্তু পুশ্‌কিনের যুগে জন্মেছিলেন বলে' তখনকার শিক্ষিত-সমাজে তেমন নাম করতে পারেননি। শেষে দেশের লোক এঁদের লেখার কদর বুঝেছিল।

আমাদের সংস্কৃত কথা-সরিৎসাগর, হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র শ্রেণীর একখানা ভাল বই রুশ-সাহিত্যে আছে। এখানার লেখক হচ্ছেন ইভান্ ক্রাইলভ্। এ-বইখানার অর্দ্ধেকটা হচ্ছে ফরাসী লা ফান্তাজম্ ফাব্‌ল্ নামক বইএর অনুবাদ আর বাকী সমস্তটা তার নিজের লেখা।

রুশ ভাষায় সমালোচনা সম্বন্ধীয় ভাল বই নেই বল্‌লেই চলে। যা বা দুই-একখানা আছে তাও বেশীর ভাগ গালিগালাজেই ভরা। তা পড়ে' নতুন কিছু শেখার উপায় নেই। ইতিহাসের অভাব এখনও যায়নি। কারামজিনের মত ঐতিহাসিকের এখনও প্রয়োজন আছে।

রুশিয়ার প্রথম নামজাদা ঔপন্যাসিক হচ্ছেন নিকোলাস্ গোগোল। ইনি ছিলেন জাতিতে কসাক। এঁর জন্ম ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে—মৃত্যু ১৮৫২ সালে। গোগোল প্রথম-জীবনে গভর্ণমেণ্ট্ আফিসে কেরাণীগিরি করতেন। শেষে সেণ্ট পিটার্স্‌বর্গের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক হয়েছিলেন।

ইনস্‌পেক্টর-জেনেরাল নামে একখানা হাস্যরসাত্মক নাটক লিখে' গোগোল অসামান্য যশ অর্জ্জন করে-ছিলেন। ইউরোপের সকল দেশের নাট্যশালাতেই সেখানার অভিনয় হয়েছিল। তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'মৃত-আত্মা' লিখেছিলেন রোমে। এ-বইখানা

তাঁর তিন খণ্ডে লেখার মতলব ছিল; কিন্তু প্রথম খণ্ড এবং দ্বিতীয় খণ্ডের খানিকটা লেখার পরেই তিনি মারা যান, বই আর শেষ হয়নি। তাঁর উপন্যাস লেখার ক্ষমতা যে অসাধারণ ছিল তা এই বইখানা পড়ে'ই বেশ বোঝা যায়। কিছু বেশী দিন বেঁচে থাক্‌লে রুশ-সাহিত্যকে তিনি আরও সম্পৎশালী করে' তুল্‌তে পার্‌তেন।

রুশিয়ার বাহিরে রুশ-সাহিত্যকে জনসাধারণের কাছে সুপরিচিত করে' দিয়েছিলেন আইভ্যান্ টুর্গেনিভ (১৮১৮—৮৩)। অধিকাংশ রুশ-সাহিত্যিকের মতন তাঁকেও প্রথম-জীবনে সর্‌কারী কটাক্ষের অপ্রীতিকর তীব্রতার ভিতর দিয়ে খ্যাতির পথে অগ্রসর হ'তে হয়েছিল। দুই বছর তাঁর নিজের বাড়ীতেই রুশ-গভর্ণমেণ্ট তাঁকে নজরবন্দী অবস্থায় রেখেছিলেন। খালাস পাওয়ার পর প্রথম কিছু দিন তিনি জার্ম্মানিতে গিয়ে থাকেন। তার পরে সেখান থেকে 'পারীতে' গিয়ে একেবারে স্থায়ী-ভাবে বসবাস করেন।

তাঁর সমস্ত উপন্যাসই পারীতে লেখা। টুর্গেনিভের লেখার কায়দা একটু স্বতন্ত্ররকমের। অতি মার্জ্জিত পরিপাটী ভাষায় তিনি লিখতেন। তাঁর সমসাময়িক রুশ-সামাজের চিত্র আঁক্‌তে গিয়ে তিনি কিন্তু তেমন কৃতকার্য্য হ'তে পারেননি। রুশিয়া থেকে সর্ব্বদাই বেশী তফাতে থাকার দরুন সমাজের অনেক তথ্যই সম্ভবতঃ বুঝ্‌তে ভুল করেছেন। যেখানে বাস কর্‌তেন, লেখার সময় সেখানকার পারিপার্শ্বিক প্রভাবও তাঁর মনের উপর অনেকখানি কাজ কর্‌ত। টল্‌ষ্টয় ডষ্টয়েভ্‌স্কি গোগোল প্রভৃতির উপন্যাস-বর্ণিত রুশ-চরিত্র গুলির সঙ্গে টুর্গেনিভের উপন্যাসের রুশচরিত্রগুলি মিলিয়ে পড়লে তাঁর ভুল বেশ ধরা যায়। উল্লিখিত ঔপন্যাসিকদের বিচিত্র চরিত্রগুলি বিদেশী পাঠকের কাছে নিশ্চিতই অতিরঞ্জিত এবং অস্বাভাবিক বলে' বোধ হবে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সেইগুলিই আসল রুশ-চরিত্রের নিখুঁত চিত্র। টুর্গেনিভ্ মোলায়েম এবং স্বাভাবিক করে' যে চরিত্রগুলি এঁকেছেন, সেগুলি অন্যদেশের অন্য সমাজের হয়ত নিখুঁত প্রতিকৃতি হ'তে পারে, কিন্তু রুশ চরিত্র যাঁরা বোঝেন, তাঁরা পড়ে'ই বলবেন, যে, খাঁটি রুশ-চরিত্রের সঙ্গে এদের বড় বেশী মিল নেই। টুর্গেনিভ বড়দরের ঔপন্যাসিক হ'লেও তাঁর পরিমাণ-জ্ঞানটা একটু কমই ছিল; তিনি পাঠকের ধৈর্য্যের দিকে মোটেই তাকাতেন না। অল্প কথায় বক্তব্য শেষ করাও ছিল তাঁর অভ্যাসবিরুদ্ধ। একটু সুযোগ পেলেই কথার ফোয়ারা ছুটিয়ে দিয়ে তবে ছাড়্‌তেন।

খেলোয়াড়ের নক্‌সা টুর্গেনিভের প্রথম লেখা। 'পূর্ব্ব ও উত্তর পুরুষ' তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা হ'লেও তিনি দেশ-বিদেশে খ্যাতিলাভ করেছিলেন 'ভদ্র-ঘরানা' লিখে'। 'অক্ষত ক্ষেত্র' লেখেন বুড়ো-বয়সে। আগে লেখা অন্যান্য বইয়ের সঙ্গে তুলনায় এখানা তেমন ভাল হয়নি।

রুশ-চরিত্র সম্বন্ধে যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁদের মতে থিওডোর ডষ্টয়েভ্‌স্কিই হচ্ছেন রুশিয়ার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। ডষ্টয়েভ্‌স্কি সমর-বিভাগে চাক্‌রী কর্‌বেন বলে' যৌবনে সামরিক শিক্ষাই পেয়েছিলেন। সাহিত্যচর্চ্চা শেষে আরম্ভ করেছিলেন সখের খাতিরে। সর্ব্বপ্রথম তিনি জনসমাজে পরিচিত হন 'গরীবলোক' লিখে'। তার পরে রাজদ্রোহীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করার অজুহাতে হঠাৎ পুলিশ একদিন তাঁকে গ্রেপ্তার করে। বিচারে প্রথমে তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছিল; শেষে কয়েকজন পদস্থ ব্যক্তির সুপারিশে গভর্ণমেণ্ট্ সে আদেশ প্রত্যাহার করে' চারি বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ সহ তাঁকে সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসিত করেন। এই নির্ব্বাসনের স্মৃতি তাঁর মনের উপর একটা অনপনেয় ছাপ এঁকে দিয়েছিল। নির্ব্বাসন-দণ্ডের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য চিরদিনের জন্য ভগ্ন হয়েছিল—সন্ন্যাস-রোগও জন্মেছিল।

ডষ্টয়েভস্কির চরিত্রে এমনই শান্ত সমাহিত করুণ একটা ভাব ছিল, যে, তাঁর সঙ্গে কথা বল্‌লেই লোকে তা বেশ্ বুঝত এবং তাতে মুগ্ধ হ'য়ে যেত। সাইবিরিয়ার কয়েদীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার হ'তে দেখে' তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, এ-ভাবে মানুষ আর বেশী দিন মানুষের উপর অত্যাচার কর্‌তে সক্ষম হবে না। শীগ্‌গিরই ভগবানের তরফ্ থেকে এর এমন একটা প্রতিক্রিয়া আস্‌বে যাতে সমগ্র মানবজাতির নৈতিক

এবং আধ্যাত্মিক জীবনের আমূল পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভবপর হবে। মানুষ আর তখন কারণে-অকারণে অকাজ-কুকাজ করে' নিজের পাপের বোঝা বাড়াতে ইচ্ছুক হবে না। ভাইও আর তখন তুচ্ছ স্বার্থের জন্য ভাইয়ের বুকে ছুরী বিঁধিয়ে দিতে উদ্যত আগ্রহে ছুটে' আস্‌বে না। মানুষ আবার মানুষ হবে। একদিন বাসন্তী উষার স্নিগ্ধ রক্তিম কিরণে রুদ্ধ পুলকের ফুটন্ত আবেগে জগতের সবাই আবার নতুন প্রাণে প্রাণবন্ত হ'য়ে জেগে উঠ্‌বে, হিংসা দ্বেষ স্বার্থপরতা নীচতা সব ভুলে' গিয়ে পৃথিবীর সমস্ত লোক একান্নবর্ত্তী শান্তিপ্রিয় পরিবারের মতন সুখে-স্বচ্ছন্দে কাল কাটাবে।

'সাইবেরিয়ায় জীবন্তে কবর' নামক পুস্তকে ডষ্টয়েভ্‌স্কি তাঁর কারা-কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। রুশ-গভর্ণ্‌মেণ্টের পৈশাচিক অত্যাচার-বিবরণ যদি কারো জান্‌বার কৌতুহল থাকে, তবে তিনি যেন এই বইখানা পড়ে' দেখেন। এভ্‌রিম্যান্‌স্ লাইব্রেরী পর্য্যায়ে অধিকাংশ রুশ-লেখকদের বইয়েরই ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। 'দোষ ও দণ্ড' নামক পুস্তকে সাইবেরিয়ার অত্যাচারের কথা উপন্যাস-আকারে লিখেছেন। যে বইখানা লেখায় রুশিয়ার একপ্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তাঁর যশ ছড়িয়ে পড়েছিল, সেখানার নাম হচ্ছে 'ইডিয়ট' বা 'বোকা'। ডষ্টয়েভ্‌স্কির লেখায় যদিও টুর্গেনিভের ভাষার পারিপাট্য, টল্‌ষ্টয়ের সরল সোজাভাবে অতি অল্প কথায় বক্তব্য-প্রকাশ, পুশ্‌কিনের হাস্য-রসোদ্দীপক বাছা-বাছা শব্দ-বিন্যাস—এ-সব কিছুই নেই,তথাপি তাঁর রচনার ছত্রে-ছত্রে এমন একটা মধুর করুণ বিষাদের ভাব নিহিত রয়েছে যে, তাই পড়ে' আজ—সমস্ত পৃথিবীর সাহিত্যরসিক চকিত বিস্মিত এবং মুগ্ধ।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ডষ্টয়েভস্কির মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পরেও তিনি স্বজাতির কাছে যে সম্মান পেয়েছিলেন, বোধ হয় এপর্য্যন্ত কোন দেশের কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকই ততখানি সম্মান অর্জ্জন করতে পারেননি। মৃত্যুর পর রুশিয়ার প্রত্যেক প্রদেশ থেকে অসংখ্য নর-নারী তাঁর শবানুগমন করতে এসেছিল। জন-সংখ্যা এতই বেশী হয়েছিল যে,রুশ-গভর্ণমেণ্ট্ সমাধি-ক্ষেত্র থেকে আরম্ভ করে' সারা সহরময় কসাক-সৈন্য সমাবেশ করে' শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। মৃত্যুর এক সপ্তাহ পরে তাঁর দেহ সমাহিত করা হয়।

টুর্গেনিভ এবং ডষ্টয়েভ্‌স্কি ইউরোপের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে গণ্য হ'লেও জগতের লোকে সব-চেয়ে বেশী চেনে কাউণ্ট লিও টল্‌ষ্টয়কে। টল্‌ষ্টয় জনহিতকর বহু বিষয়ে বই লিখেছেন। উপন্যাসের ভিতর দিয়ে ধর্ম্ম রাজনীতি অর্থনীতি সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি জটিল বিষয়ের সরল ভাষায় এমন সুন্দর মীমাংসা করে' লোকের সাম্‌নে ধরেছেন, যে,'সে-সব বই যে পড়েছে সেইই মুগ্ধ হ'য়ে তাঁর শিষ্যত্ব স্বীকার না করে' পারেনি। একজন বিখ্যাত ইংরেজ লেখক তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন—"Tolstoy is the landmark in the world of literature" —টল্‌ষ্টয় সাহিত্য-জগতের এক দর্শনীয় সামগ্রী; কথাটা খুবই সত্যি। শুধু রুশিয়া কেন, সমগ্র পৃথিবীর মধ্যেও আজকাল টল্‌ষ্টয়ের সমকক্ষ লোক মেলা বোধ হয় কঠিন। তিনি যত বই লিখেছেন তার মধ্যে 'শান্তি ও সংগ্রাম' এবং 'আনা-কারেনিনা' হচ্ছে সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা।

টল্‌ষ্টয় ছিলেন খাঁটি রুশ। রুশ-চরিত্রের সঙ্কীর্ণতা একগুঁয়েমি প্রভৃতি দোষগুলি যেমন তাঁর মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল, আবার রুশের সদাশয়তা, ত্যাগস্বীকার আতিথেয়তা দয়া-দাক্ষিণ্যাদি সদ্‌গুণগুলিও তেম্‌নি তাঁর মধ্যে ছিল। তিনি অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন লেখক ছিলেন। রচনা যে বিষয়েরই হোক্ না কেন,তাকে সুস্পষ্ট সহজ ও উচ্চ সাহিত্যের গুণসম্পন্ন করে' তোল্‌বার ক্ষমতা তাঁর ছিল। বক্তব্য সরস করে' বল্‌বার প্রয়োজন থাক্‌লে তিনি তা সরস করে'ই বল্‌তেন, মর্ম্মস্পর্শী করার প্রয়োজন হ'লে তাই কর্‌তেন। 'শান্তি ও সংগ্রাম' রচনাকালেই তাঁর সাহিত্যিক শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা জোরালো হয়েছিল। এই মহাকাহিনীটির দ্বারা বিচার কর্‌লে তাঁকে জগতের একজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বলা যায়। তাঁর অন্যান্য রচনা ও তার ব্যক্তিত্বের প্রকাশ মানুষকে মুগ্ধ করে।

সাইমন পোলোটোস্কী যে ব্রত আরম্ভ করেছিলেন, কাউণ্ট্ টল্‌ষ্টয় তার উদ্‌যাপন করেছেন। আজ রুশ-

সাহিত্যে তারই ফলে উন্নত বিখ্যাত এবং জনপ্রিয় হ'তে পেরেছে। পাশবিক অত্যাচার, যুগান্তব্যাপী অবহেলা, অবজ্ঞা, শতসহস্র বাধা-বিঘ্ন, কিছুই এর স্বাভাবিক পরিণতিকে রুখ্‌তে পারেনি। বাঁধ-ভাঙ্গা নদীর মতন গর্জ্জন করতে করতে সমস্ত অন্তরায় ভাসিয়ে নিয়ে অবশেষে রুশ-সাহিত্য বাঞ্ছিত স্থানে এসে পৌছেছে।

স্বদেশী বাঁশী

শ্রী সনৎকুমার চক্রবর্ত্তী

সন্ধ্যার আলো-আঁধারীর মধ্যে খাদের কুলী-কামিনগুলা যখন শ্রান্তদেহে দিনের কাজ শেষ করিয়া, গাঁইতি কাঁধে ও ঝোড়া মাথায় করিয়া একে একে পৃথিবীর তলে যাতায়াতের সুড়ঙ্গটি দিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, ঠিক্ সেই সময় খাদের হাওয়া-চানকের নিকট হইতে একটি তীক্ষ্ণ করুণ বংশী-ধ্বনি শোনা গেল।

বাঁশীর শব্দের সঙ্গে-সঙ্গেই যেন সেই কর্ম্ম-ক্লিষ্ট অবসন্ন কুলী-কামিনদের হৃদয়ের মধ্যে একটা তড়িৎপ্রবাহ খেলিয়া গেল। যে ন্যুব্জ-দেহে উন্মুক্ত আকাশের তলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে সচকিতে জ্যা-মুক্ত ধনুকের ন্যায় সোজা হইয়া খাদের দিকে মুখ ফিরাইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে লাগিল; সুড়ঙ্গের মুখ পর্য্যন্ত যে আসিয়াছে, সে তাড়াতাড়ি খাদের বাহিরে যাইবার চেষ্টা করায় নিজের অসাবধানতার জন্য আচম্বিতে মাথা উঁচু করিয়া কপালে বিষম ধাক্কা খাইয়া বসিয়া পড়িল; আর যাহারা তখনও মিটমিটে ডিবিয়া হস্তে খাদের ভিতরেই আনাগোনা করিতেছিল, আশঙ্কায় উদ্বেগে তাহাদের মুখ শবের ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়া গেল।

খাদের ভিতর রমণীগণের করুণ চীৎকার ও পুরুষগণের শুষ্ক আশাহীন কণ্ঠের অভয়বাণী,—সমস্ত মিলিয়া একটা বিষম গণ্ডগোল পাকাইয়া উঠিল। এক লহমার মধ্যে যেন একটা অচিন্ত্যপূর্ব্ব বিপর্য্যয়ে সমস্ত ওলট্‌পালট্ হইয়া গেল!

সুকুলা পাঁচ ছয় টব কয়লা কাটিয়া অবসন্ন শরীরে উপরে চলিয়া আসিয়াছিল, ও তাহার স্ত্রী মাহি পার্শ্বে বাতিটি রাখিয়া দিয়া নিজের ধাওড়াতে পুড়াইবার জন্য খাদের ভিতর ঝোড়াটি কয়লা পূর্ণ করিয়া লইতেছিল। মাহি ঝোড়া পূর্ণ করিয়া মাথার উপর সেটি তুলিয়া ডান হাতে ডিবিয়াটি লইয়া চলিয়া আসিবার উপক্রম করিতেই সেই ভীতিপ্রদ তীক্ষ্ণ বংশীধ্বনি শুনিতে পাইল। সে থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তাহার কাছে একটিও মানুষ নাই, একেবারে নীচের গ্যালারীতে সে দাঁড়াইয়া। তাহার ভয় হইল, ঐ অমঙ্গলসূচক বংশীরবের পিছনে-পিছনে যদি কোনও একটা গভীর অমঙ্গল তাহার উপর এই দণ্ডেই আসিয়া পড়ে। বংশীধ্বনিতে সর্ব্বলকেই একইরকম শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে; সে চীৎকার করিলেও কেহ সেখানে আসিবে কি না সন্দেহ।

মাহির পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত এত কাঁপিতেছিল, যে, সে মাথার উপর কয়লার ঝোড়াটি কিছুতেই ঠিক্ রাখিতে পারিল না। হঠাৎ সেটা একদিকে কাৎ হইয়া গেল। যে হাতে তাহার ডিবিয়াটি একটা তারে বাঁধিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল, সেই হাতটির উপর মাথার ঝোড়া হইতে একটা কয়লার চাংড়া আসিয়া পড়িল। উঃ করিয়া হাতটা নাড়িতেই ডিবিয়াটি নিভিয়া গেল। সেই অন্ধকার সঙ্গী-হীন গ্যালারীর মধ্যে আঘাতপ্রাপ্ত হাতখানি অন্য হাতে ধরিয়া মাহি বসিয়া পড়িল।

দূরে—খাদ হইতে বাহির হইবার পথের মুখে—যে বিরাট কোলাহল হইতেছিল, তাহার কিছু কিছু মাহির কানে আসিতেছিল। মাহি সেইখানে বসিয়া-বসিয়াই চীৎকার করিতে লাগিল; আশা,—খাদের মুখের নিকট
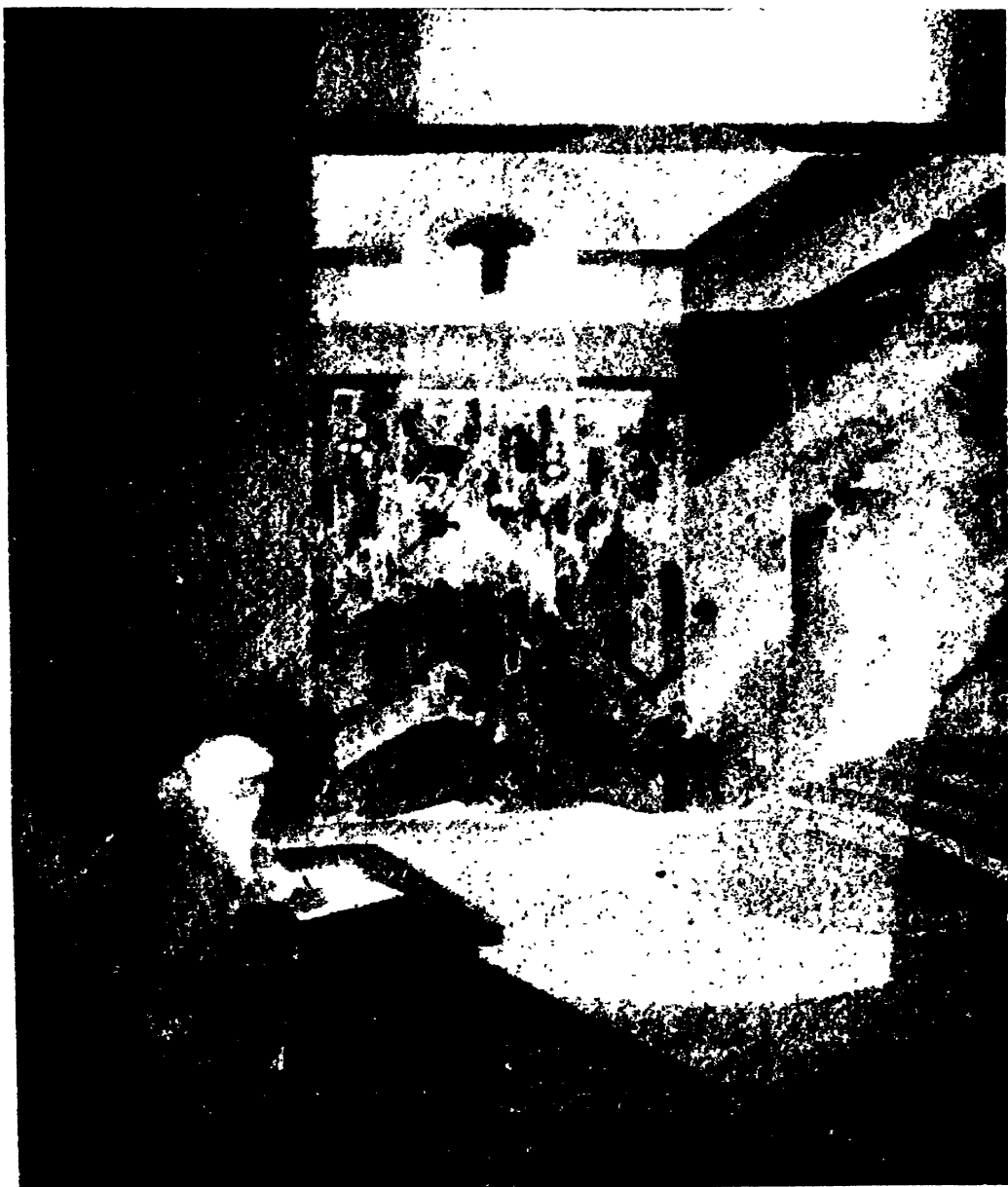
সুরের সৃজনলীলা

চিত্রশিল্পী—শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

হইতে যদি কেহ তাহার কাতর ক্রন্দন শুনিতে পাইয়া বাতি-হস্তে তাহাকে উদ্ধার করিতে আসে। মাহির মনে হইল, এই যে স্বদেশী বাঁশী আজ কোন্ একটা অমঙ্গলের আশু সম্ভাবনা উচ্চরবে সকলকে জানাইয়া সতর্ক করিয়া দিল, সে আর কিছু নয়, সে তাহারই জীবন্ত সমাধির বার্ত্তা।

মিনিট পাঁচেক পরেই সেই জমাট অন্ধকারের বুকে একটুখানি আলোর রশ্মি ফুটিয়া উঠিল। আকুল আগ্রহে মাহি বিস্ফারিত নয়নে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। সেই ক্ষীণ আলোক-রশ্মির প্রত্যেক কম্পনটি মাহির হৃদয় আশায় ভরিয়া দিতে লাগিল। সেই দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার চোখ দুইটা বেদনায় টন্‌টন্ করিয়া উঠিল; তথাপি সেই আলোক-ধারীর দেখা নাই। চোখ দুইটা দুই হাতে একবার রগ্‌ড়াইয়া লইয়া সে সেই কাজল-কাল আঁধারেই হাত্‌ড়াইতে হাত্‌ড়াইতে একটু অগ্রসর হইয়া আসিল।

একটু পরেই সে একটা মানুষকে তাহার দিকে একটা ডিবিয়া হাতে অগ্রসর হইতে দেখিতে পাইল। তখনও মানুষটা বহুদূরে; একটা ছায়ামূর্ত্তির মতই মাহি তাহাকে দেখিতে পাইল। অন্য সময় এইরূপ অন্ধকারময় খাদের দূরতম প্রান্তে মাহির সম্মুখে এরূপ একটি ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাব হইলে, সে হয়ত ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিত। কারণ, খাদের ভিতর অপঘাতে যাহাদের অপূর্ণ আশা ও আকাঙ্ক্ষা সমেত তরুণ জীবনটা পরের জন্য চির-সমাধিস্থ রাখিতে হয়, তাহারা নাকি অপদেবতা হইয়া মাঝে মাঝে কাহারও কাহারও সম্মুখে মূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং সুযোগ ও সুবিধা পাইলে টুঁটি টিপিয়া তাহাকে নিজেদের দলে টানিয়া লয়!

এখন মাহির কিন্তু এরূপ কোন ভয়ই হইল না। সে এই ছায়ামূর্ত্তিটিকে তাহার ত্রাণকর্ত্তা ভাবিয়া লইয়া একটা পরম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

ধীরে ধীরে মানুষটি, মাহি যে গ্যালারীতে ছিল, তাহারই কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মাহি ভাল করিয়া তাহাকে দেখিবার চেষ্টা করিয়াও চিনিতে পারিল না। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—তুঁই কে বটিস্ রে?

মানুষটি হাতের আলোটি মাহির দিকে ফিরাইল; তার পর একটা বিকট হাস্যে সমস্ত খাদটা কম্পিত করিয়া তুলিয়া বলিল,—এই যে, তুঁই এঠিনে বসে' রঁাইছিস্? বাঃ!—তাহার চোখ দুটা সেই অন্ধকারে জল্‌জল্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

মাহির বুকের ভিতরটা ভয়ে ঢিপঢিপ্ করিতে লাগিল। সর্ব্বনাশ! এ যে তাহাদের চিরশত্রু বড়্‌কা মাঝির কণ্ঠস্বর! বিবাহের দিনে সুকলার হাত হইতে তাহাকে ছিনাইয়া না লইতে পারার আক্রোশ জীবনে যে ভুলিতে পারে নাই, সেই তাহাদের ভাগ্য-গগনের চির-রাহুর আজ এমন সময়ে কেন প্রকাশ? এই তার মৃত্যু-দূতের আগমনীই কি তবে আজ বাঁশীর কণ্ঠে বাজিয়াছিল? ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া মাহি সেইখানেই শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল। বড়কা মহানন্দে গ্যালারীর দিকে অগ্রসর হইল।

(২)

তখন নন্‌-কো-অপারেশনের ঢেউ কয়লা-কুঠীর অন্ধকার নিরালা খাদের ভিতর কুলী-কামিনগণের হৃদয়েও বেশ একটা চাঞ্চল্যের সাড়া আনিয়াছিল। মহাত্মার শিষ্যগণের বক্তৃতার জোরে তাহাদের অশিক্ষিত হৃদয়ও এটা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল, যে, খাদের ভিতর তাহারা যে অবিশ্রান্তভাবে খাটিতেছে, তাহার উপযুক্ত পারিশ্রমিক তাহারা পায় না। তাহারা এই যে দিনের পর দিন পৃথিবী-গর্ভে নিজেদের রক্ত ঢালিয়া দিতেছে, তাহা দেশের জন্যও নয়, দশের জন্যও নয়, প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া তাহারা খাদের মালিকগণের লোহার সিন্দুক ভরিয়া দিবার সহায়তা করিতেছে মাত্র।

এতদিনের গোপন-সত্যটি এখন কুলীকামিনরা দেখিতে পাইয়াছে বুঝিতে পারিয়া খাদের মালিকগণ বড় দুর্ভাবনায় পড়িলেন; অনেক চিন্তার পর তাঁহারা টাকার তলে এই সত্যটি গোপন রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন;—দেখিতে দেখিতে খাদের কুলীগণের রেট্ বাড়িয়া গেল। অশিক্ষিত কুলীগণের মদের টাকা হইলেই যথেষ্ট। সুতরাং খাদের মালিকগণের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল না। যেমন হঠাৎ নন্‌-কো-অপারে-

শনের ঢেউ আসিয়া তাহাদের হৃদয়-কপাটে ধাক্কা দিয়াছিল, ঠিক্ তেমনই হঠাৎ সেটি কোথায় মিলাইয়া গেল। নন্-কো-অপারেশনের মহান্ উদ্দেশ্য তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিল না; শুধু বুঝিল, যখন টাকার দর্কার হইবে, তখনই একজোট হইয়া ধর্ম্মঘট করিলেই যথেষ্ট, টাকা তাহারা নিশ্চয়ই পাইবে। আর তখন হইতে বাস্তবিকই এইরূপ হইতে লাগিল; কিছু টাকা চাই, অমনই ধর্ম্মঘট, দু-এক দিন খাদের কাজ বন্ধ হইয়া রহিল; তার পর তাহাদের টাকা আসিয়া পড়িতে লাগিল।—আবার সমস্ত চাপা পড়িয়া গেল।

ইহার কিছুদিন পরেই আবার একটা গুজব উঠিল,—স্বদেশী বাঁশী! একটা কোন্ বহুপুরাতন খাদের এক প্রান্তে একদা একটি সাঁওতাল বালক নিজের মনেই বাঁশীটিতে দুই-চারি বার ফু দিয়াছিল মাত্র, এমন সময় সেই খাদের একটা "পিলার্-কাটিং এরিয়া"র চালটা সশব্দে পড়িয়া গেল। সেখানে বহুলোক কাজ করিতেছিল; হতাহতের সংখ্যাও খুব বেশী হইল। সকলেই সেই বাঁশীর রব দু-একবার শুনিয়াছিল, কিন্তু বংশী-বাদককে কেহ দেখে নাই। সুতরাং তাহাদের একটা ধারণা হইয়া গেল, ঐ বংশী-ধ্বনি কোন অমঙ্গলের পূর্ব্বাভাস।

তাহাদের এই মূলহীন ধারণাটা ফলে-ফুলে শোভিত হইয়া শীঘ্রই সমস্ত কয়লা-কুঠীতে রাষ্ট্র হইয়া গেল, এবং আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকল কুলী-কামিনই তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া লইল। ইহার পর হইতে সেই বংশীধ্বনি অনেক কুঠীতেই শোনা যাইতে লাগিল, ও "খাদের কালী"র রোষে যাহাতে কুলীকামিনরা প্রাণ না হারায়, সেইজন্য বংশীরব হইলেই 'খাসী' দ্বারা মাকে শান্ত করা হইতে লাগিল। কোন কোন রিক্রুটার এই ফাঁকে এক খাদ হইতে অন্য খাদে কুলীদিগকে ভুলাইয়া আনিতে লাগিল, ও তাহাদেরই তীক্ষ্ণবুদ্ধির অনুগ্রহে খাদের মজুররা জানিতে পারিল যে, যুগ প্রবর্ত্তক মহাত্মা গান্ধীই তাহাদের দেবীর রোষ হইতে বাঁচাইবার জন্য ঐ বাঁশী বাজাইয়া সকলকে সতর্ক করিয়া দেন। সেই হইতে ঐ বংশীধ্বনি হইলেই সকলে বলিত, 'স্বদেশী বাঁশী বাজ্‌ল'!

* * *

সুকুলাদের খাদে যখন বাঁশী বাজিয়া উঠিল, তখন সুকুলা খাদ হইতে বাহির হইয়া নিজের ধাওড়ার দিকে অনেকটা চলিয়া আসিয়াছে। বাঁশী শুনিয়া সে একবার থম্‌কাইয়া দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল; তার পর পুনরায় নিজের শ্রান্ত দেহটাকে ধাওড়ার দিকে টানিয়া লইয়া চলিল। সারাদিন কঠিন পরিশ্রমের পর সে খুবই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল; সুতরাং কৌতুহল হইলেও সে আর দাঁড়াইল না। কোনও মতে ধাওড়ায় গিয়া সে তাহার ভাঙ্গা খাটিয়াখানার উপর অসাড় শক্তিহীন হাত-পাগুলোকে একটু ছড়াইয়া দিতে পারিলে যেন এখন বাঁচে!

মাহি যে এখনও খাদের ভিতর আছে, তাহা সে ভাবিতেও পারে নাই। সে মনে ভাবিয়াছিল, যে, মাহি তাহার আগেই হয়ত ধাওড়ায় গিয়া পৌছিয়াছে। ধাওড়ার সম্মুখে আসিয়া ধাওড়া বন্ধ দেখিয়া সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। পাশেই সনাতন মাঝির বৌ ধাওড়ার সম্মুখে বসিয়া ছিল; শঙ্কিতচিত্তে সুকুলা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—এই, মাহি কোথা রইছে রে?

সনাতনের স্ত্রী একটু বিস্মিত হইয়াই উত্তরে বলিল—কেনে? তুর সাথে ত খাদে গেঁইছিল।

—হঁ; খাদে ত গেঁইছিল; ইধারে আসে নাই আখন?—সুকুলার মুখখানি দুর্ভাবনায় শুকাইয়া উঠিল।

—না; সেই তুর সাথে গেঁইছে আর ফিরে নাই।

সুকুলা আর এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াইল না। গাঁইতি-খানা হাতে করিয়াই সে খাদের দিকে ছুটিল। তাহার চোখে-মুখে উৎকণ্ঠা ফুটিয়া উঠিল। মাহির এই মাসেই সন্তান হইবার সম্ভাবনা আছে। সে ত তাহাকে খাদে যাইতেই নিষেধ করে। সেদিন ডাক্তার-বাবুও তাহাকে বলিয়াছিলেন, যে, মাহির এখন খাদে খাটিতে গেলে বিশেষ অনিষ্টের আশঙ্কা আছে; সে কঠিন পরিশ্রম এবং "সিঁড়ি-খাদে" উঠা-নামা করিলে, ভাবী সন্তানের খুবই অনিষ্ট হইবে। মাহি কিন্তু এসব না মানিয়া রোজই খাদে যায়। আজ যদি আচম্‌কা এই বংশীধ্বনি শুনিয়া মাহি ভয় পাইয়া

কোথাও পড়িয়া যায়! সুকলা আর ভাবিতে পারিল না, মরীয়া হইয়া সে খাদের দিকে ছুটিল।

খাদের মুখেই জনকতক সাঁওতাল যুবক জটলা করিতেছিল; সুকলা সেখানে পৌছিয়া উদ্বেগ-ব্যাকুল-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—মাহিকে তুরা দেখেছিস্? সে খাদ হ'তে বারাইছে?

সকলেই মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল; কারণ, তাহারা কেহই মাহিকে দেখে নাই। সুকলা অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। পাশেই বছর-পঁচিশের একটি সাঁওতাল যুবক দাঁড়াইয়াছিল; তাহার কাঁধ ধরিয়া একটা প্রবল ঝাঁকানি দিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—বল্ কেনে; দেখেছিস নাকি?

সে মুখ কাঁচু-মাচু করিয়া জবাব দিল,—না, আমবা ত আগেই…………

তাহার সমস্ত কথা শুনিবার জন্ম আর সুকলা সেখানে দাঁড়াইল না। একজনের হাতে একটা মগ-বাতি মিট্-মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল; সে সেটা ফস্ করিয়া তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া দ্রুতপদে সুড়ঙ্গের ভিতর নামিয়া পড়িল।

সে যেখানে কাজ করিতেছিল, সেইখানে আসিবার পূর্ব্বে খাদের ভিতর যাহার সহিত তাহার দেখা হইল, তাহাকেই মাহির কথা জিজ্ঞাসা করিল; কিন্তু কেহই কোন উত্তর দিতে পারিল না। পাগলের মত সে ছুটিয়া আসিতে আসিতে চীৎকার করিয়া ডাকিল,—মাহি! মাহি!

ঠিক্ সেই সময়েই বড়কা মাহিকে একা দেখিতে পাইয়া উল্লাসের সহিত তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। সুকলার ডাকে সে দাঁড়াইয়া পড়িল, ও মাহির উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—এই ঠিনে আয় জল্‌দি। না হ'লে বড়কা আমাকে মরাই দিবে।

সুকলার চোখ দু'টা ভাঁটার স্থায় বড় হইয়া উঠিল। দৃঢ়হস্তে গাঁইতিটা বাগাইয়া ধরিয়া সে কৃতান্তের স্থায় অগ্রসর হইল।

একটু আসিয়াই সে দেখিল বড়কা পলাইয়া যাইতেছে। সে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া সজোরে গাঁইতিটা ছুড়িল। ভয়ে মাহি চক্ষু মুদিত করিল। কালীর পিপাসা না জানি কি ভীষণভাবে নিবৃত্ত হইবে! লক্ষ্য-চ্যুত গাঁইতিখানা কয়লার দেওয়ালে প্রায় অর্দ্ধেকটা ঢুকিয়া গেল; কাঠের বাঁটখানা ভাঙ্গিয়া গেল। বড়কা উৰ্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলাইয়া গেল।

মাহি তখনও ভয়ে কাঁপিতেছিল। সুকলা গাঁইতিখানা দুচারবার টানাটানি করিয়া বাহির করিতে না পারিয়া মাহির কাছে গেল, ও সন্তর্পণে তাহাকে হাত ধরিয়া খাদের বাহিরে লইয়া আসিল।

(৩)

পরদিন পঞ্চায়েতের নিকট সুকলা যখন বড়কার বিরুদ্ধে তাহার স্ত্রীকে নির্জ্জন খাদের মধ্যে পাইয়া আক্রমণ করিবার চেষ্টার অভিযোগ করিল, তখন বড়কা ইহার কোনও প্রতিবাদ করিতে পারিল না, নীরবে তাহার অভিযোগ মাথা পাতিয়া লইল। তাহার যত দোষই থাকুক, সত্যকে সে বরাবর মানিয়াই আসিয়াছে; যেখানে একট মিথ্যা বলিলেই সে কোনও গুরুতর বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইতে পারে, সেখানেও বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া সকলের সম্মুখে সত্য ঘোষণা করিতে বড়কা এতটুকুও দ্বিধা করে নাই।

পঞ্চায়েতের নেতা অভিযোগ শুনিয়া যখন বড়কার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—সুকলা যা কইছে, সব সত্যি? তখন সে বিনা সঙ্কোচে উত্তর দিল,—হঁ।

বড়কার উত্তরে আশ্চর্য্য হইয়া কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধস্বরেই নেতা জিজ্ঞাসা করিল,—কেনে তুই উয়াকে ধর্‌তে গেঁইছিলি?

অবিচলিতকণ্ঠে বড়কা উত্তর দিল,—উয়াকে এক গাঁইতিতে সাবাড় কর্‌থম্ তখন।—তাহার মুখে-চোখে একটা হিংস্র ভাব ফুটিয়া উঠিল।

পঞ্চায়েত হইতে তাহাকে আর-একটি কথাও জিজ্ঞাসা করা হইল না; সকলেই একমত হইয়া রায় দিল, মাহি আজ হইতে খাদে যাইবে না, এবং আজ হইতে যতদিন পর্য্যন্ত তাহার সন্তান না হয়, রোজ ছয় আনা হিসাবে বড়কাকে দিতে হইবে। বিনা আপত্তিতে বড়কা পঞ্চায়েতের কথা মানিয়া লইল, এবং সেদিনকার

পঞ্চায়েতের মদের খরচটা সুক্‌লা সানন্দচিত্তে দিয়া দিল।

ইহার দিন দুই পরে একদিন খাদের রিক্রুটার সন্ধ্যার পরে সুক্‌লাকে ডাকিয়া পাঠাইল। যথাসময়ে সুক্‌লা অফিসে আসিয়া হাজির হইলে, সে বলিল,—সুক্‌লা তোদের বাড়ী চাষ-গাঁয়ে না রে?

এরূপ প্রশ্নের কোনও কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া সুক্‌লা বিস্মিতভাবে রিক্রুটার-বাবুর মুখের দিকে নীরবে চাহিয়া রহিল।

মিনিট-খানেক তাহার উত্তরের আশায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ রিক্রুটার গর্জ্জিয়া উঠিল,—আচ্ছা পাজী কোথাকার! বল্ না—হাঁ কি না। সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখের টেবিলের উপর হইতে রুলটা উঠাইয়া লইয়া সে টেবিলের উপর এক বিষম আঘাত করিল।

রুলের শব্দে চমকিত হইয়া বোকার মত সুক্‌লা বলিয়া উঠিল,—হঁ বাবু।

তাহার উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া রিক্রুটার মহাশয় রুলটা যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া একটু স্নেহের সঙ্গেই বলিল,—তাই বল্ না কেন বাপু। আমি ত জানি যে তুই খুব চালাক্; তবে অমন হাঁ করে' ছিলি কেন?

হাত কচলাইতে কচলাইতে সুক্‌লা বলিল,—আমি তুথে বুঝতে লারেছিলম বাবু।

ওঃ! বলিয়া রিক্রুটার-বাবু আরম্ভ করিল,—দেখ্, আমি কাল তোদের গাঁয়ে 'মাল্‌কাটা' আন্‌তে যাব। তুই যদি আমার সঙ্গে যাস্ ত বল্। আমারও ভাল হবে, তোর ত খুবই লাভ হবে। যত মাল্‌কাটা আন্‌তে পার্‌বি, সবার কমিশন ত পাবিই, তার উপর তোকে তাদের সর্দ্দার করে' দেব। যাবি ত আমার সঙ্গে?

হঠাৎ এমন অপ্রত্যাশিত কথাটা শুনিয়া সুক্‌লা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সে উভয়সঙ্কটের মধ্যে পড়িল। দু'-চার দিন পরেই মাহির ছেলে হইবে, সে এমন অবস্থায় তাহাকে ফেলিয়া যায়ই বা কিপ্রকারে, আর রিক্রুটার-বাবু যে লোভ দেখাইতেছে, তাহাই বা ত্যাগ করা কিরূপে সম্ভব হয়? সে ভাবিয়া কিছুই ঠিক্ করিতে পারিল না।

এ-নীরবতা রিক্রুটার-বাবুর সহ্য হইল না; সে বিরক্তভাবে বলিয়া উঠিল, বল না বাপু, তুই যাবি কি না। এক-একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব, আর তার উত্তরের জন্য আধ ঘণ্টা হাঁ করে' বসে' থাক্‌তে হবে? আচ্ছা, ফ্যাসাদ বাবা।

সুক্‌লা মুখ কাচুমাচু করিয়া বলিল,—আমি ত বাবু কিছুই ঠিক্ কর্‌তে লার্‌ছি। মাহির বেটা হবেক্; উথে কি করে' ফেলে' যাই?

—সে আমি কি জানি? যেতে হয় যাবি, আর না যেতে হয়, কোন দর্‌কার নেই। মাহির ছেলে হবে ত তোর কি হ'ল রে বাপু? তোকে বল্‌লাম, যদি যেতিস্, দু'দশ টাকা তোর লাভ হ'য়ে যেত, আর মাঝে থেকে সর্দ্দার হ'য়ে যেতিস্।—রিক্রুটার-বাবু উঠিবার উদ্যোগ করিল।

সুক্‌লা একটুখানি কি ভাবিয়া লইল; তার পর একটু ভয়ে-ভয়েই জিজ্ঞাসা করিল,—তুর সাথে গেলে আমায় সর্দ্দার ঠিক্ বানিয়ে দিবি ত বাবু?

অফিস হইতে বাহির হইয়া যাইতে-যাইতে রিক্রুটার-বাবু বলিল,—আচ্ছা ভেড়াকান্ত ত! বলেছি দেব, তাও ঐ এককথা দশবার করে' বলা!

সুক্‌লা ঝাঁ করিয়া বলিয়া উঠিল,—বেশ, তবে কাল বিয়নে তুর বাসাকে আমি যাব। কেমন বাবু?

—হাঁ, তাই যাস্। বলিয়া রিক্রুটার-বাবু বাহির হইয়া গেল।

(৪)

সুক্‌লা রিক্রুটার-বাবুর সহিত মাল্‌কাটা আনিবার জন্য চলিয়া যাইবার দিন দশেক পরেই মাহি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিল। সুক্‌লা যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছিল, তাহার বড় জোর দিন সাতেক দেরী হইবে; সেই সাত দিনের বদলে দশটা দিন কাটিয়া গেল, তথাপিও সে ফিরিল না দেখিয়া, মাহি খুবই চিন্তিত হইয়া পড়িল; কিন্তু প্রসবের পর সেই গোপালের মত কাল কুচ্‌কুচে ছোট্ট শিশুটিকে কোলে পাইয়া সে সুক্‌লার সম্বন্ধে সমস্ত চিন্তাই বিস্মৃত হইল। এতদিন তাহার যে আকাঙ্ক্ষাটা অপূর্ণ ছিল, সেই মাতৃত্বের মাধুর্য্যে তাহার অন্তর-বাহির ভরিয়া উঠিল।

পরদিন প্রাতে কুঠীর সকলেই শুনিল যে, মাহির ছেলে হইয়াছে; একে একে সকলেই তাহার নব-জাত পুত্রকে দেখিতে আসিল—বড়্কাও একটু সময় করিয়া লইয়া মাহির ধাওড়ার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। মাহির ছেলে কেমন হইয়াছে দেখিতে তাহার একটু কৌতূহল হইয়াছিল। সনাতন মাঝির স্ত্রী মাহিকে সূতিকাগারে সাহায্য করিবার ভারটা স্বেচ্ছায় নিজেই লইয়াছিল, এবং হাসিমুখে সকলকেই সন্তান দেখাইতেছিল। বড়্কাকে আসিতে দেখিয়া সে একটু চমকিত হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি ছেলেটাকে মাহির কোলে দিয়া বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি বটে রে বড়্কা?

বড়্কা বেশ প্রফুল্লমনেই আজ ছেলে দেখিতে আসিয়াছিল, সেইজন্য সে হাসি-মুখে বলিল,—মাহির বেটা হয়েছে দেখ্‌তে আলম্।

ভিতর হইতে মাহি শঙ্কিতকণ্ঠে সনাতনের স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—না, না মেঝিয়ান্, উয়াকে আমি ছেল্যা দেখাব না। কি গুণটুন আখুনি করে' দিবেক। সয়তানটাকে তাড়াই দে।

বড়্কা ধাওড়ায় ঢুকিবার উদ্যোগ করিতেছিল; থম্‌কিয়া সে দাঁড়াইয়া পড়িল, তাহার মনের সমস্ত সরসতা মাহির কথার আঘাতে একনিমিষে শুকাইয়া উঠিল। পুরাতন আক্রোশ আবার জাগিয়া উঠিল। সনাতনের স্ত্রীর দিকে একটা অনলবর্ষী দৃষ্টি হানিয়া দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া বলিয়া উঠিল—উ কি কইছে রে? দেখ্‌তে নাই দিবেক?

সনাতনের স্ত্রী তাহার সেই জলন্ত চোখ দুটার সম্মুখে কিরূপ একটু মুষ্‌ড়াইয়া পড়িল। তথাপি বড়্কার উত্তরে বলিল,—না, মাহি কইছে তুখে তাড়াই দিতে। যা, তুই এখান হ'তে পালাই যা।

তেমনইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বড়্কা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—কেনে?

সন্তানের অমঙ্গলের আশঙ্কায় মাহির বুকের ভিতর দুরুদুরু করিতেছিল। বড়্কাকে তখনও কথা কাটা-কাটি করিতে দেখিয়া, সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—বল্‌ছি, তুই পালা, না হ'লে আখুনি আমি চেঁচায়ে সব জড় কর্‌ব আখন। তাদের কয়ে দিব, তুই আমাকে মার্‌তে আইছিস্। তেখন মজাট দেখ্‌বি।

বড়্কার চোখদুটা দপ্‌দপ্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল; লোহার তারের মত তাহার হাতের শিরাগুলা শক্ত হইয়া উঠিল; আরও এক পা অগ্রসর হইয়া সে ধাওড়ার ভিতর মাথাটা ঢুকাইয়া দিয়া ক্রুদ্ধ চাপা-কণ্ঠে বলিল,—দেখে' লিস্ তবে। আমিও বড়্কা মাঝি বটি!—একটা পৈশাচিক ভাব তাহার মুখে-চোখে ফুটিয়া উঠিল। সে সয়তান! আচ্ছা, তাই ভাল!

বড়্কার ঝাঁকড়া মাথাটাকে আচম্বিতে ধাওড়ার ভিতর দেখিতে পাইয়া মাহি সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল; বড়্কা ধীরপদে সেখান হইতে খাদের দিকে চলিয়া গেল।

* * *

ঠিক্ তিন দিন পরের এক নিঝুম অন্ধকার রাত্রির কথা।

রাত প্রায় দুটার সময় হঠাৎ একটা দম্‌কা হাওয়া মাহির ধাওড়ার টিনের দরজা লইয়া হুটোপুটি করার শব্দে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। পার্শ্বেই আর-এক-খানি খাটিয়া বিছাইয়া সনাতনের স্ত্রী নিদ্রা যাইতেছিল; মাহি একটা অজানিত অমঙ্গলের আশঙ্কায় সনাতনের স্ত্রীকে ডাকিয়া উঠাইল ও অভ্যাসমত ছেলেকে নিজের বুকের মধ্যে টানিয়া লইবার জন্য হাত বাড়াইল।

সর্ব্বনাশ!—ছেলে! দুই পাশ, পায়ের দিকে, মাথার কাছে,—সর্ব্বত্রই সে সেই অন্ধকারে খুঁজিতে লাগিল। এত বড় অমঙ্গল যে সে কল্পনাও করিতে পারে না। এতক্ষণ সে নীরব শঙ্কায় ব্যাকুলভাবে ছেলেকে খুঁজিতে-ছিল। হঠাৎ যেন তাহার অন্তরের সমস্ত ব্যাকুলতা, সকল আশঙ্কা মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিল; সে একটা করুণ আর্ত্ত চীৎকার করিয়া উঠিল,—সুমি,—আমার বেটা?

সনাতনের স্ত্রী সুমিকে ইহার পূর্ব্বে ডাকিয়া দিলেও, তাহার ঘুমের ঘোর তখনও কাটে নাই; সে খাটিয়াখানির উপর বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছিল। মাহির কথাগুলি ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিলেও, যে আর্ত্ত চীৎকারটা সুমির কানের উপর আছাড় খাইয়া পড়িল, তাহাই যথেষ্ট।

সে তাড়াতাড়ি খাট হইতে নামিয়া মাহিকে উদ্বেগ-চঞ্চল-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—কি হঁইছে রে?

মাহির মনে হইতে লাগিল,যেন কথা কহিবার সামর্থ্য-টুকুও সে ছেলের সঙ্গে-সঙ্গে কোথায় হারাইয়া ফেলিয়াছে। বহু চেষ্টার পর সে অতি ক্ষীণ স্বরে বলিল,—আমার বেটা-টা কোথা,—পেছি নাই।…

ঝর্ ঝর্ করিয়া তাহার দুই চোখ দিয়া অঝোরে জল পড়িতে লাগিল।

সুমিও পাথরের মূর্ত্তির মত খাটিয়াখানির উপর নির্ব্বাক্-ভাবে বসিয়া রহিল। এক্ষেত্রে কি করা কর্ত্তব্য, তাহা সে ভাবিয়া ঠিক্ করিতে পারিল না।

(৫)

এইরূপ নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে ঘণ্টা দুই কাটিয়া যাইবার পর মাহি হঠাৎ উঠিয়া ধাওড়ার দরজার দিকে টলিতে টলিতে অগ্রসর হইল। প্রসবের ধাক্কা তখনও সে সাম্‌লাইতে পারে নাই; প্রতি-পাদক্ষেপেই তাহার মনে হইতে লাগিল, হয়ত এখনই মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইবে। কিন্তু তাহা ভাবিবার যে সময় নাই।

তাহাকে উঠিতে দেখিয়া সুমি তাড়াতাড়ি আসিয়া তাহার একখান হাত চাপিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কোথা যেছিস্ মাহি?

মাহির মনের অবস্থা তখন ভয়ানক; সে সজোরে হাতখানি ছিনাইয়া লইয়া বলিল,—তুঁই থাক্ এই খেনে; আমি ছেলা-ট লিয়ে আসি।—সে আর এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াইল না; সেই আঁধার রাতে বিজন প্রান্তরে একাই বাহির হইয়া পড়িল।

মাহির ধাওড়া হইতে বড়্‌কার ধাওড়াটা একটু দূরেই ছিল। সে নিজের গৃহ হইতে বাহির হইয়া বরাবর বড়্‌কার ধাওড়ার দিকে ছুটিল। তাহার যেন কেমন একটা দৃঢ়বিশ্বাস হইয়া গিয়াছিল, যে, বড়্‌কাই তাহার ছেলেটাকে লুকাইয়া লইয়া পলাইয়াছে।

বড়্‌কার ধাওড়ায় বার দুই ধাক্কা মারিতেই সে ধড়-মড় করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। তাহার একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, এমন সময় দরজায় ধাক্কা পড়ায় সে একটু ভীতি-জড়িত-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—কে?

বাহির হইতে মাহি ব্যথা-কাতর-কণ্ঠে অনুনয়ের সুরে বলিল,—তুর পায়ে পড়ি বড়্‌কা, আমার ছেলা-ট ফিরাই দে। উ কতখুন দুধ খায়নি।" উদ্বেলিত অশ্রুতে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

মাহির বেদনাপূর্ণ কথাগুলি বড়্‌কার বক্ষে তীক্ষ্ণ ছুরীর মত আঘাত করিল। দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া সে বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িল। মাহির কথার উত্তরে সে কি যেন বলিতে যাইতেছিল। কিন্তু সেদিন-কার অপমানের কথা মনে করিয়া সে তখনই চুপ করিয়া গেল।

বড়্‌কার নিকট কোনও উত্তর না পাইয়া মাহি আবার অনুনয়-পূর্ণ স্বরে বলিল,—দে বড়্‌কা, বোঙ্গা (দেবতা) তুর ভাল করবেক; উয়ার গলা শুকাই যাবে আগুনি।

মাহির কথাগুলিতে ব্যথা যেন ক্ষরিয়া পড়িতেছিল। বিছানার ভিতর মুখ গুঁজিয়া বড়্‌কা বলিল,—তুর ছেলা আমার কাছে নাই।

বড়্‌কার কাছে যাইলেই যে, ছেলের সন্ধান মিলিবে, এ-ধারণাটা মাহির হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। বড়্‌কার কথায় সে ভিতরে-ভিতরে শিহরিয়া উঠিল। যাঃ, তাহা হইলে পুত্রকে ফিরিয়া পাইবার আর কোন আশাই নাই! তাহার চীৎকার করিয়া-করিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইল; কিন্তু কণ্ঠ দিয়া একটি স্বরও তাহার বাহির হইল না। পাগলের মত সে সেখান হইতে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন প্রাতঃকালেই কথাটা রাষ্ট্র হইয়া গেল। সকলেই শুনিতে পাইল যে, মাহির পুত্রটি কোথায় হারাইয়া গিয়াছে; ও গত রাত্রে মাহি যে সন্তানের খোঁজে বাহির হইয়াছে, আর সে ফিরে নাই।

সেই দিনই দুপুর বেলা বন হইতে পাতা কুড়াইয়া ফিরিবার সময় সনাতনের ভাইঝি মাহিকে একটা কাটা গাছের গুঁড়ির পাশে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়াছিল। মাহির জ্ঞান ছিল না। লছ্‌মী বট-পাতায় করিয়া "জোড়ে"র জল আনিয়া তাহার চোখে মুখে দিল। মাহি সতৃষ্ণনয়নে একবার মাত্র লছ্‌মীর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল,—বড়্‌কা, আমার বেটা। তার পর আর সে চোখ মেলে নাই, কথা বলে নাই। ইহ

জগতে এই তার শেষ কথা। এই খবরটাও ছড়াইতে বেশী দেরী হইল না। মাহির কথা বড়্কা যখন শুনিল, তাহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত একবার শিহরিয়া উঠিল। সে গাঁইতি কাঁধে লইয়া খাদে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল; ধপ করিয়া গাঁইতিখানা মাটিতে ফেলিয়া দিয়া সে শুইয়া পড়িল।

পরদিনই সকাল-বেলায় বড়্কা নিকটস্থ জোড়ে হাত মুখ ধুইতেছে, এমন সময় দেখিল, সুকৃলা শ্রান্তপদে এত দিন পরে কুঠীতে ফিরিতেছে। সে দাঁতনটা ফেলিয়া দিয়া তাহার দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তাহার চোখের সাম্‌নে অটুট-যৌবনা মাহির নিকষ-কালো দেহের স্বচ্ছন্দ লীলা যেন ভাসিয়া উঠিতেছিল।

সুকৃলাও বড়্কাকে দেখিতে পাইয়াছিল; কিন্তু তাহাকে কোনও কথা না বলিয়াই সে আপনমনেই জোড়টা পার হইয়া কুঠীর দিকে আসিতেছিল। এমন সময় হঠাৎ বড়্কা ডাকিল,—সুকৃলা, শোন্।

সুকৃলা সাশ্চর্য্যে বড়্কার দিকে চাহিল। দেখিল, তাহার মুখে-চোখে ঈর্ষার কি হিংসার ভাব এতটুকুও নাই, জল-ভর-ভর চোখে সে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। সে ধীরে ধীরে বড়্কার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিল।

কোন ভূমিকা না করিয়াই বড়্কা বলিল,—তুর একটা ছেলা হইছে।

আনন্দে সুকৃলা লাফাইয়া উঠিল। সে বড়্কার একখানি হাত ধরিয়া সাগ্রহে প্রশ্ন করিয়া বসিল,—কেমন হইছে রে? ছেলাট কেমন আছে? মাহি কেমন আছে?

বড়্কার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইয়া আসিতেছিল, সে কোনওক্রমে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া, সুকৃলাকে টানিয়া আনিতে আনিতে বলিল,—এই দিকে আয়, সব আখুনি কইব।

নীরব বিস্ময়ে সুকৃলা বড়্কার সঙ্গে-সঙ্গে চলিল। একটু গিয়াই একটা পোড়ো কুঠীর পাশে প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় সুকৃলাকে বসাইয়া সে বলিল,—তুই টুগ্‌দু বস্; আমি এই এলম্।—সে আর সেখানে না দাঁড়াইয়া নিজের ধাওড়ার দিকে ছুটিল। গভীর বিস্ময়ে সেইস্থানে বসিয়া সুকৃলা এদিক্-ওদিক্ চাহিতে লাগিল।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই একখানা সাবল হাতে করিয়া বড়্কা ছুটিয়া আসিল। মিনিট দুই ধরিয়া কুঠীর পাশের আগাছা কাটিয়া সে যেন অবহেলায় সময় নষ্ট করিতে লাগিল। সুকৃলা কিছু বুঝিতে না পারিয়া, অবাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। তার পর জিজ্ঞাসা করিল,—এঠিনে কি আছেরে?

কোনও কথা না বলিয়া বড়্কা কুঠীর ভিতর ঢুকিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে সে একটি জীর্ণ শিশুকে আনিয়া সুকৃলার পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া বলিল,—এই লে তুর ছেলা! রাগের মাথায় আমি সেদিন ইকে চুরি করে' এনে এইঠিনে রেখে দিইছিলম্। সুকৃলা তাহার কথায় বাধা দিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, মাহি কোথা গেল? বড়্কা নির্ব্বিকারভাবে বলিল, তাকে মর্‌াই দিয়েছি।

একটা আর্ত্ত চীৎকার করিয়া সুকৃলা সেইখানে বসিয়া পড়িল; বড়্কাও ধূলি-ধূসরিত হাত দুইখানির ভিতর মাথাটা গুঁজিয়া চুপ করিয়া রহিল। একটু পরেই মাথা তুলিয়া সে বলিল, মাহি সেই দিনুই কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে চলে' গেঁইছে, আর জ্যান্ত ফিরেনি।

সুকৃলা গর্জ্জন করিয়া উঠিল, এবং সাবলখানি তুলিয়া লইল। বড়্কা যেন প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল; সে নির্ভীক-কণ্ঠে বলিল,—দে আমায় মর্‌াই দে, আমার কিছু দুখ নেই।

সাবলখানা ফেলিয়া দিয়া সুকৃলা হঠাৎ সেই শিশুটিকে আকুল আগ্রহে নিজের বক্ষে চাপিয়া ধরিল।

তুই আমায় নাই মার্‌বি? এই দেখ্ তবে। বলিয়া সাবলখানি বড়্কা এবার নিজে উঠাইয়া লইল, এবং সুকৃলা তাহার দিকে চাহিবার পূর্ব্বেই নিজের মাথায় সজোরে সেই সাবলের দ্বারা আঘাত করিল।

বড়্কার রক্তাক্ত দেহ সুকৃলার পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িল।

শিশুকে বুকে করিয়া সুকৃলা নির্ণিমেষ-নয়নে বড়্কার রক্ত-প্লাবিত দেহের দিকে চাহিয়া-চাহিয়া আপন মনেই বলিয়া উঠিল,—ইয়ার তরেই সেদিন স্বদেশী বাঁশীটে বেজেছিল!

চন্দননগরের সাময়িক পত্র ও গ্রন্থপরিচয়

শ্রী হরিহর শেঠ

[এই প্রবন্ধে অনেক নাম বাদ পড়া সম্ভব এবং ভুলচুক থাকাও অসম্ভব নহে। ভুলগুলি নজরে পড়িলে বা অন্য গ্রন্থাদির নাম কাহারও জানা থাকিলে, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা যদ্যপি লেখককে চন্দননগর ঠিকানায় জানান, তাহা হইলে উপকৃত ও বাধিত হইব।]

পত্র ও পত্র-সম্পাদক

চন্দননগরে কোন সময়ে একত্রে দুই-চারিখানি সংবাদপত্র বা অন্য সাময়িক পত্র প্রকাশিত না হইলেও বহুকাল হইতে এখানে কোন না কোন সংবাদপত্র আছেই। এখানকার 'প্রজাবন্ধু' এক সময়ে খ্যাতনামা সাপ্তাহিক ছিল। উহা ১৮৮২ * খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত হইয়া তাঁহার কয়েকটি বন্ধুর সহায়তায় প্রথম প্রকাশিত হয়। উহার পূর্ব্বে এখানে আর কোন বাঙ্গালা কাগজ বাহির হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় না। উহাতে স্পষ্ট ভাষায় রাজনৈতিক আলোচনা ও বৃটীশ শাসনের তীব্র সমালোচনা প্রকাশ করা হইত। কয়েক বৎসর প্রকাশের পর বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক বৃটীশ ভারতে উহার প্রচার বন্ধ হওয়ায় উহা উঠিয়া যায়। উহা ব্যাস-প্রেসে মুদ্রিত হইত।

প্রজাবন্ধুর প্রায় সমসাময়িক 'সুরভি ও পতাকা'-নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র কলিকাতায় প্রকাশিত হইত। প্রজাবন্ধু উঠিয়া যাওয়ার পর তিনকড়ি-বাবুর চেষ্টায় উহা চন্দননগরে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। কিন্তু অধিক দিন প্রকাশিত হয় নাই। এই পত্রিকা শেষে হিতবাদীর অঙ্গীভূত হইয়াছিল।

প্রজাবন্ধু-সম্পর্কে তিনকড়ি-বাবুর উৎসাহ সৎসাহস ও ত্যাগ-স্বীকার প্রশংসনীয়। তিনি কলিকাতায় শিক্ষা-বিভাগে কর্ম্ম করিতেন; প্রজাবন্ধুর প্রচার-বন্ধের সহিত তাঁহার ঐ পদচ্যুতি ঘটে। প্রজাবন্ধু-পরিচালন-কালে তিনি যেরূপ নির্ভীকতার সহিত গভর্ণমেণ্টের কার্য্যের সমালোচনা করিতেন, তাহা তৎকালে অনুপম ছিল। তাঁহার রচিত গ্রন্থের কথা স্থানান্তরে বলা হইবে।

প্রজাবন্ধুর পর 'ধূমকেতু,' 'বঙ্গবন্ধু,' 'চন্দননগর-প্রকাশ,' 'বঙ্গপ্রভা,' 'হিতসাধিনী,' 'বাহক' ও 'মাতৃভূমি'-নামক পত্রগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। উহার মধ্যে কয়েকখানি খুব অল্পকাল মাত্র জীবিত ছিল। 'বঙ্গপ্রভা' সংবাদপত্র নহে, উহা মাসিক পত্রিকা; ১২৯৮ সালের বৈশাখ মাসে উহা প্রথম প্রকাশিত হয়; অদ্বৈত-প্রেস হইতে মুদ্রিত হইয়া বিপিনবিহারী কোলের দ্বারা প্রকাশিত হইত। 'স্বাস্থ্য-সখা'-নামক স্বাস্থ্য-বিষয়ক একখানি ক্ষুদ্র মাসিক-পত্রিকা ১৩০৮ সালে কয়েক সংখ্যা-মাত্র চুঁচুড়ার ঘোষ-প্রেসে ছাপা হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। উহার সম্পাদক ছিলেন হোমিওপ্যাথি ডাক্তার শ্রীযুক্ত গগনচাঁদ নন্দী।

পূর্ব্বোক্ত পত্রগুলিতে স্থানীয় ও অন্যান্য সংবাদাদি প্রকাশিত হইত। ধূমকেতু সাপ্তাহিক পত্র, সুলভ-প্রেসে মুদ্রিত হইয়া ১২৯৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। উহার সম্পাদক ছিলেন শ্রীযুক্ত শিবকৃষ্ণ মিত্র। সাপ্তাহিক 'বঙ্গবন্ধু' তারা-প্রেসে মুদ্রিত হইয়া, হিতবাদীর সহকারী সম্পাদক সুপরিচিত লেখক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় দ্বারা সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইত। 'হিতসাধিনী' ব্যাস-প্রেস হইতে ছাপা হইত। সম্পাদক ছিলেন শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। 'মাতৃভূমি' কোরাল-প্রেস হইতে মুদ্রিত হইত। সম্পাদক ছিলেন শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র সেন। শুনা যায় প্রায় ৪০।৪২ বৎসর পূর্ব্বে 'চন্দননগর-পত্রিকা'-নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত এবং ৺যদুনাথ পালিত মহাশয় আর একখানি সংবাদপত্র কয়েক সংখ্যা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

* ১৩৩০ সালের ২৫ শে অগ্রহায়ণের 'দৈনিক বসুমতী'তে লিখিত হইয়াছে ১৮৮০।৮১ সাল।

পেতি বঙ্গালী (Le Petit Bengali) নামে ফরাসী ভাষায় একখানি সাপ্তাহিক পত্র চার্লস্ ডুম্যান্-নামক ফরাসী আদালতের একজন উকিল কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইত। উহাও অদ্বৈত-প্রেসে ছাপা হইত। ডুম্যান্ সাহেব এখানে কিছুকাল মেয়ারের কার্য্য করিয়াছিলেন। ইংরেজি ভাষায় ৺ শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'বিভার' (The Beaver) নামক একখানি ও 'এমেচার ওয়ার্কশপ' (Amateur Workshop) নামক আর-একখানি ৺শ্রীশচন্দ্র বসু ও ৺ কুসুমকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইত। প্রথমখানি ভবানীপুরে বিভার-প্রেসে এবং দ্বিতীয়খানি এখানকার ব্যাস প্রেসে ছাপা হইত। Tit for Tat নামে আর-একখানি কাগজ অল্প দিন বাহির হইয়াছিল।

প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস্ হইতে শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র দত্ত-সম্পাদিত 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড বেয়ারার' (Standard Bearer) নামক একখানি ইংরেজি সাপ্তাহিক এখন প্রকাশিত হইয়া থাকে। অরুণ-বাবু বয়সে তরুণ হইলেও পত্র-সম্পাদন-ক্ষমতার ও ইংরেজি এবং বাঙ্গলা ভাষায় লিখিবার খ্যাতি আছে। উক্ত পাবলিশিং হাউস্ হইতে প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের নায়ক শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়-সম্পাদিত 'প্রবর্ত্তক'-নামক বিবিধ বিষয়-সম্বলিত একখানি উচ্চাঙ্গের সচিত্র মাসিক ও শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র দত্ত-সম্পাদিত 'নবসঙ্ঘ'-নামক একখানি সাপ্তাহিক প্রকাশিত হইয়া থাকে। উহাতে এক্ষণে কেবল চন্দননগর-সম্পর্কীয় বিষয়ই স্থান পাইয়া থাকে। 'প্রবর্ত্তক' প্রথমে পাক্ষিক প্রকাশিত হইত এবং সম্পাদক ছিলেন পণ্ডিচারীর জেনারেল কাউন্সিলের অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ নায়েক, বি-এস্সি। উহাতে মধ্যে মধ্যে চন্দননগর-সংবাদ একটি স্বতন্ত্র সংস্করণে বাহির হইত। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন-নামক একজন বিদেশীয় ভদ্রলোক এখানে থাকিয়া মহাত্মা গান্ধীর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'-পত্র অনুবাদ করিয়া 'তরুণ ভারত'-নামে প্রকাশ করিতেছেন।

বর্ত্তমানে এখানে অন্য সাময়িক পত্র না থাকিলেও বাহিরের প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্রাদির লেখক বা অন্যরূপে বিশেষ-সম্পর্কিত লোকের অভাব নাই। হিতবাদীর সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়; Indian Planters Gazetteএর সম্পাদকীয় বিভাগের শ্রীযুক্ত দয়ালকৃষ্ণ বসু; সুপ্রসিদ্ধ 'বন্দেমাতরম্' পত্রের সহকারী সম্পাদক, 'আত্মশক্তি'র প্রতিষ্ঠাতা ও ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক এবং 'অমৃতবাজার-পত্রিকার' সম্পাদকীয় বিভাগের শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিবাস এই স্থানেই। এতদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺কৃষ্ণমোহন মল্লিক * শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সাধু, কৃষ্ণলাল দাস এম্-এ, কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী এম্-এল্-সি, কমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, কবেন্দ্রনাথ দত্ত, ডাক্তার গগনচাঁদ নন্দী, চারুচন্দ্র রায় এম্-এ, স্বর্গীয় জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যানন্দ এম্-এ পি-আর-এস্, তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত তারানাথ ভট্টাচার্য্য, দয়ালচন্দ্র বসু, নীরদবরণ মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি-এ বিদ্যাবিনোদ, ননীলাল দে, পূর্ণচন্দ্র দে, রায় বীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী বাহাদুর, ডাক্তার বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এল্-এম্-এস্, ডাক্তার বিরিঞ্চিমোহন কর, এল্ এম্-এস্, বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সরস্বতী বি-এ, মতিলাল রায়, মণিমোহন ভট্টাচার্য্য বি-এ, কবিরাজ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিদ্যাবিনোদ বৈদ্যশাস্ত্রী, স্বর্গীয় যতীন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বসু বার্-এট্-ল, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, সাগরচন্দ্র কুণ্ডু, হারাধন বক্সী ও হরিহর শেঠ প্রভৃতি লেখক বা সংবাদ-পত্রের রিপোর্টারগণ চন্দননগরবাসী।

গ্রন্থ ও গ্রন্থকার

চন্দননগরবাসী গ্রন্থকারগণের লিখিত সমুদয় গ্রন্থের নাম ও বিবরণ সংগ্রহ করা বা সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা দুরূহ। সর্ব্বসমেত মোট প্রায় একশত পঁচাত্তরখানি পুস্তক ও পুস্তিকার বিষয় আমি জানিতে পারিয়াছি। উহার

* ৺কৃষ্ণমোহন মল্লিক মহাশয়ের নাম এক্ষণে অনেকের নিকট অজ্ঞাত। ইনি পূর্ব্বকালের একজন চিন্তাশীল সুলেখক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি ভারত গভর্ণমেন্টের জুডিসিয়াল সেক্রেটারীর অধীনে কর্ম্ম করিতেন। তিনি মুখোপাধ্যায় ম্যাগাজিনে লিখিতেন জন্ম ১৮০১ খৃষ্টাব্দে, মৃত্যু ১৮৮৩ অব্দে।

প্রজাবন্ধু ২২শে মাঘ, ১২৮৯ সাল।

য়িতা বা সংগ্রাহকগণের নাম ও তৎসহিত পুস্তকের ম, প্রকাশের সময় প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ একটি লিকা প্রদান করিতেছি।

স্বর্গীয় অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-বি,—ইনি জন সুপরিচিত ডাক্তার ছিলেন। 'স্বাস্থ্য-বিধান' মক স্বাস্থ্য-বিষয়ক একখানি পুস্তক ১২৯৪ সালে কাশ করেন। 'গোবিন্দ-গীতামৃত', ইহাতে নিকুঞ্জ-লা (১২৯৯), 'গোপিকা-প্রেম','বস্ত্র-হরণ', 'রাস-লীলা', জলীলা অবসান,' এবং 'রাই উন্মাদিনী' (১৩০৩) নামক খানি একত্রে ও 'মাধব-মধু মাধুরী বা কান্ত-ভাবে পূজা' (১৩০৭) এবং 'প্রভাস-মিলন' (১৩০৮) মক মোট নয়খানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। প্রথম-নি ভিন্ন সকলগুলিই ভক্তি-মূলক কাব্য।

শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, ইনি রুড়্কীর ঞ্জিনীয়ারিং কলেজ হইতে বিশেষ সুখ্যাতির সহিত শ করিয়া এক্ষণে টেলিগ্রাফ-বিভাগে আগ্রায় ivisional Engineer-এর কাজ করেন। 'মোহন-ধুরী' (১৯১৭) নামে একখানি নাটক লিখিয়াছেন।

শ্রী আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়

শ্রী অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র দত্ত,—ইনি 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড-বেয়ারার' (Standard Bearer) ও 'নবসঙ্ঘ' পত্রের সম্পাদক। 'প্রবর্ত্তক', 'নবসঙ্ঘ,' ও 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড বেয়ারার' পত্রে বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ঐ-সকলের মধ্যে কতকগুলি একত্র করিয়া এবং অপরের কোন-কোন প্রবন্ধের সহিত 'Spiritual Communism' (১৯২২) 'অরবিন্দ-মন্দিরে' (১৩২৯) এবং 'উক্তি ও উৎসর্গ-গীতা' (১৩২৫) নামে তিনখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। গ্রন্থ-গুলিতে লেখকের নাম প্রকাশ নাই।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, ইনি শ্রীরামপুর ইউনিয়ন্ স্কুলের প্রধান শিক্ষক। 'Essays on Humour and Genius' (১৯২১) নামে একখানি পুস্তক রচনা করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত কোন একটি প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষার জন্য 'The Bengali Drama as the

Reflexion of National Life and Character' নামে আর-একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহা এখনও মুদ্রিত হয় নাই।

স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ গোস্বামী ভাগবত-ভূষণ;—ইনি ভাগবতের সুবিখ্যাত পণ্ডিত। চন্দননগর পালপাড়ার শ্রীশ্রী৺হরিসভার আচার্য্যরূপে যে-সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহা ১২৮৭, ৮৮, ও' ৯০ সালে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন 'বৈষ্ণবব্রততত্ত্বম্' (১২৯৬) নামে দুই খণ্ড বৈষ্ণবব্রতকৃত্য-বিষয়ক সংগ্রহপুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন।

৺ কালীনাথ ঘোষ

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,—প্রসিদ্ধ বোমার মামলার রাজনৈতিক বন্দীরূপে ইনি পরিচিত। বি-এ পর্য্যন্ত পড়িয়া প্রথমে শিক্ষকতা করেন। সেই সময় তিনি বন্দী হন। মুক্তিলাভের পর তিনি 'আত্মশক্তি'-নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র সম্পাদন ও প্রকাশ করেন। সেই সময়েই তিনি 'জাতের বিড়ম্বনা,' 'অনন্তানন্দের পত্র,' 'নির্ব্বাসিতের আত্মকথা,' 'বর্ত্তমান সমস্যা,' 'ধর্ম্ম ও কর্ম্ম,' 'ঊনপঞ্চাশী,' ও 'সিন্‌ফিন্' নামক গ্রন্থগুলি প্রকাশ করেন। ইহার অনেক অংশ তাঁহার লিখিত সংবাদপত্রের প্রবন্ধসকল হইতে মুদ্রিত। সকল পুস্তকগুলিই ১৩২৮।২৯ সালে প্রকাশিত হয়। এতদ্ভিন্ন ইনি অনেক কাগজে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

শ্রী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৺ কৃষ্ণমোহন মল্লিক,—ইংরেজি ভাষায় ইঁহা অপেক্ষা এখানকার কোন প্রাচীন লেখকের না জানিতে পারা যায় না। একশত পঁচিশ বৎস পূর্ব্বে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতার গভর্ণমেণ্ট অফিসে নকলনবিশী কা করিতেন। তথা হইতেই প্রধানতঃ তাঁহা ইংরেজি ভাষা ভালরূপে লিখিবার অভ্যাস হ তিনি ব্যবসা-সম্বন্ধীয় কতিপয় চিন্তাশীল গবেষণাপ প্রবন্ধ লিখিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। দেশ চিনির ব্যবসায় লোপ পাইবার সম্ভাবনা দেখি তিনি ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলে তৎকালীন গভর্ণর-জেনারেল, লর্ড ডালহাউ উহা দেখিয়া ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং মুদ্রাঙ্কণের অনুমতি প্রদান করেন। ৫০ বৎ

শ্রী কালীপ্রসন্ন বসু

পূর্ব্বে ম্যান্‌চেষ্টারের সুলভ বস্ত্রের আম্‌দানি দেখিয়া এখানকার বস্ত্র-শিল্পের ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে এবং আমাদের রৌপ্য-মুদ্রার পরিবর্ত্তনে আমাদের ক্ষতির সম্ভাবনা দেখিয়া যে প্রবন্ধসকল লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার লিখিবার ক্ষমতার সহিত চিন্তাশীলতার যথেষ্ট পরিচয় ছিল।* তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'Brief History of Bengal Commerce' Part I and II (১৮৭১-৭২)।

৺ কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,—'কুমুদ্বতী ও সুপর্ণা' (১২৯১) নামক উপাখ্যান ইনি কবিতায় রচনা করেন। ইঁহার বিষয় আর কিছুই জানিতে পারা যায় না।

স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস শূর,—ইঁহার লিখিত পুস্তকের নাম বিদ্যুন্মালিনী। ইহা একখানি আখ্যায়িকা, দুই খণ্ডে সমাপ্ত (১৮৭৮)। গ্রন্থের বিজ্ঞাপন ও প্রচ্ছদপত্র দৃষ্টে বুঝা যায় গ্রন্থকারের বাসবাটী এই সহরের নাড়ুয়া সাকিমের মধ্যে ছিল, এবং সম্ভবতঃ তিনি তেলিনীপাড়াস্থ জমিদার স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট কর্ম্ম করিতেন। এই পুস্তক উক্ত জমিদার মহাশয়ের অনুমত্যনুসারে লিখিত হয়।

৺ কালীনাথ ঘোষ,—ইনি একজন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক ছিলেন। বহু সুভাব ও ভক্তিপূর্ণ সঙ্গীত ও কবিতা রচনা করিয়াছেন। 'আত্মদান'-নামে একখানি নাটক, 'নামসুধা' ও 'অনুষ্ঠান-সঙ্গীত' নামক হরিনাম ও অন্য সঙ্গীতের বই লিখিয়াছেন। শেষোক্ত-খানি ১৩২৫ সালে প্রকাশিত হয়। অন্য দুইখানিতে প্রকাশের সময় লেখা নাই।

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সাধু;—ইনি একজন ব্যবসাদার। 'স্পর্শানন্দা' নাটক (১২৭৬) ও 'কল্পনা-প্রসূন' (১২৯১) নামে একখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

শ্রী নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

* প্রজাবন্ধু, ২৫এ মাঘ ১২৯৮।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বসু বি-এ,- ইনি শিক্ষকতা করিয়া থাকেন। দুইএকখানি পুস্তক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য লিখিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়,—ইনিও শিক্ষকতা করিয়া থাকেন। ফ্রিচার্চ ইন্‌ষ্টিটিউশন পত্রিকার ইংরেজি ও বাঙ্গালা কতিপয় প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। মানিকজোড় নামে সম্প্রতি একখানি উপন্যাস প্রকাশ করিয়াছেন।

৺ গোবিন্দরাম দাস,—সতীনারীর কাহিনী-বিষয়ক 'সতীরঞ্জন' নামে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ইনি ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে গতায়ু হইয়াছিলেন এই পর্য্যন্ত জানিতে পারা যায়।* কোথায় কোন পল্লীতে বাস ছিল তাহা বা অন্য কিছু জানা যায় না।

৺ গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,—ইনি জমিদারী সেরেস্তায় নায়েবের কর্ম্ম করিতেন। 'নির্ব্বাণ'-কানন
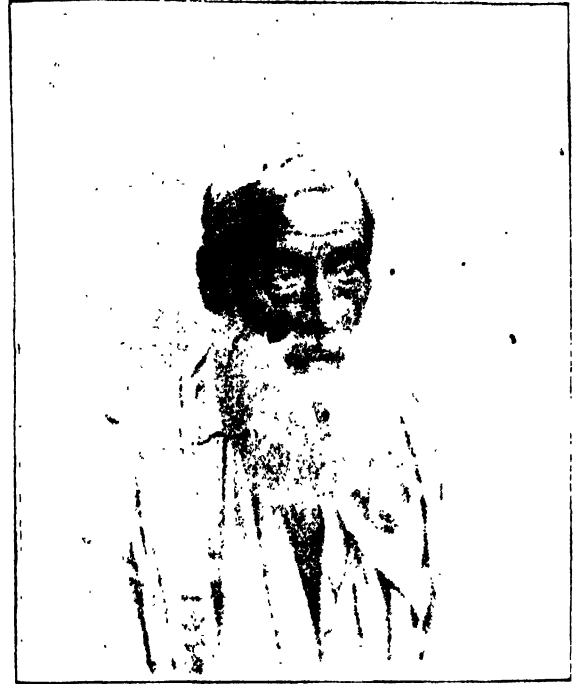
৺ তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

৺ গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৩০১) নামক একখানি কবিতা-পুস্তক এবং 'জ্ঞান ও জগতের সহিত মানবের সম্বন্ধ' (১৩০৩) নামক একখানি প্রবন্ধ- পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন।

৺ জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যানন্দ এম্‌-এ, পি-আর্‌-এস্‌, এফ্‌-আর্‌-এ-এস্‌। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। প্রথমে অধ্যাপক তৎপরে মহীশূর-রাজ্যে দেওয়ান বা অর্থসচিব এবং শেষে কণ্ট্রোলার জেনারেলের কাজ করিতেছিলেন। মহীশূর-রাজকর্তৃক তাঁহাকে রাজ-মন্ত্র-প্রবীণ উপাধি প্রদত্ত হয়। কেবল তথায় তিনি যে বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন তাহা নহে, ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতেও সম্মান-সূচক পদকাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কয়েকমাসমাত্র ইনি স্বর্গীয় হইয়াছেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাদি,—'আহ্নিকম্‌' (১৩১৬) নিত্যকর্ম্ম-বিষয়ক ; সংস্কৃত শ্লোক ও উহার পদ্যানুবাদ ; 'উচ্ছ্বাসাঃ' (১৩১৮) বাঙ্গালায় পদ্যানুবাদ

* ... the Records of the Bengal ...

৺ জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী

লিখিত হইয়াছে; 'লক্ষ্মীরাণী' (১৩১৯) একখানি নাটক; 'লোকালোক' (১৩১৯) কাব্য-গ্রন্থ; 'মধ্যলীলা' (১৩২৩) নাটক। 'পিপাজী' (১৩২৪) নাটক; Solutions of Differential Equations (১৯১০)।

'Agricultural Insurance'—(১৯২০)—ইহা একখানি সুবৃহৎ পুস্তক; মহীশূর ষ্টেট্ ইনশিওরেন্স্ কমিটির যখন সভাপতি ছিলেন, সেই সময় ইহা লিখিত হয়। এতদ্ভিন্ন তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গীয় রায় বীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী বাহাদুর মহাশয়ের দ্বারা ইংরেজিতে অনুবাদিত ভগবদ্গীতা সম্পাদন করেন এবং 'Theory of Thunderstorm,' 'Wastage of Gold in the Manufacture of Jewellery in Bengal,' 'The Language Problem At Home and Abroad * নামক তাঁহার একখানি সুন্দর জীবনীতে, তাঁহার সকল রচনা ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিত আছে। তাঁহার জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য কত উচ্চ ছিল তাহার পরিচয় ঐ গ্রন্থে পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত গুরুদাস ভড়ু এম্-এস্‌সি, পি-আর্-এস্,—ইনি এখানকার আর-একজন রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ-বৃত্তিধারী; জ্ঞানশরণ-বাবুর প্রতিবাসী। ইনিও প্রশংসার সহিত পরীক্ষাসকল উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এক্ষণে গবেষণা-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। 'The Osculating Conic at Infinity,' Geometrical Construction for Limiting Centres of a Cubic,' 'The Osculating Conic in

* At Home and Abroad—by M. Venkata Krishnayya

শ্রী গুরুদাস ভড়

Homogeneous Co-Ordinates' এই তিনখানি পুস্তিকা তাঁহার লিখিত। 'Generalisation of Certain Theorems in the Hyperbolic Geometry of the Triangle' নামক আর-একখানি পুস্তিকা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায় এম-এ মহাশয়ের সহিত একত্রে লেখেন।

শ্রীযুক্ত গৌরকিশোর কর বি-এ, -বহু দিন শিক্ষকতা করিয়া ইনি এক্ষণে পেন্‌শন্‌ পাইতেছেন। কবিতা-রচনায় ইনি সিদ্ধহস্ত এবং বহু কবিতা লিখিয়াছেন। 'প্রাকৃতিক ভূ-বিবরণ' (১২৮৮), 'কথাবলি' প্রথম খণ্ড (১৩০২) ও 'বলিদান' (১৩০৫) নামক তিনখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। শেষোক্ত দুইখানি কবিতায় লিখিত। 'সরলা'-নামক তাঁহার রচিত আর-একখানি অপ্রকাশিত কাব্য আছে।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় এম-এ,—ইনি ডুপ্লে কলেজের সহকারী ডিরেক্টর, একজন বহুদর্শী ও সুদক্ষ অধ্যাপক বলিয়া খ্যাত। সুচিন্তিত বক্তৃতার দ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিবার ইঁহার ক্ষমতা আছে। ইঁহার রচিত বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত বাঙ্গালীর সমাজ জীবন কর্ম্ম সংস্কার শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে রঙ্গরসে ভরা কতকগুলি নক্সা পুনর্ম্মুদ্রিত করিয়া 'কমলাকান্তের পত্র' নাম দিয়া ১৩৩০ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি চন্দননগরের একখানি বিশদ ইতিহাস প্রণয়ন করিতেছেন। সাহিত্য, প্রবাসী, প্রবর্ত্তক ও ইংরেজি বাঙ্গালা সংবাদ-পত্রাদিতে

শ্রী গৌরকিশোর কর

মিঃ দেকস্তা (Fortune Decosta)—ইনি দুপ্লে কলেজের ডিরেক্টর ছিলেন। এখানে অবস্থিতি-কালে তিনি ইংরেজি ফরাসী ও বাঙ্গালায় ইং ১৯০০ সালে একখানি শব্দ-কোষের প্রথম ভাগ মাত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। উহার নাম দিয়াছিলেন 'Vocabulary of French, English and Bengali Words'।

শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস বসু (Lt. Col. D. Basu, I. M. S.)—ইনি বিলাতে ডাক্তারি পাশ করিয়া বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের চাকরী করেন। এক্ষণে পেন্‌শন্ লইয়া বাটীতেই আছেন। 'স্বাস্থ্যরক্ষা ও সাধারণ স্বাস্থ্যতত্ত্ব,' 'পারিবারিক প্রার্থনা' (১৩১০) ও 'ধর্ম্মজীবন'-নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

৺ নন্দলাল বসু,—প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে চন্দননগরে আসিয়া বাস করেন। ইনি পূর্ব্বেকার সিনিয়ার স্কলার্ ছিলেন। এখানকার সেণ্ট্ মেরিস্ ইনষ্টিটিউশন্ (বর্ত্তমান দুপ্লে কলেজ) ও হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠাকল্পে সহায়তা করিয়া-

অনেক লিখিয়াছেন। ইনি ফরাসী গভর্ণমেণ্ট হইতে 'অফিসিয়ে দাকাদেমি' উপাধিতে ভূষিত।

৺তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়,—ইনি চন্দননগরের পুরাতন সংবাদপত্র 'প্রজাবন্ধু'র সম্পাদক ছিলেন। যে যুগে গভর্ণমেণ্টের কাজের তীব্র সমালোচনা এত সুলভ ছিল না, সেই যুগে প্রজাবন্ধুতে বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের কার্য্যের তীব্র সমালোচনা করায় তিনি কার্য্য-চ্যুত হন। 'ফরাসী আইন অনুবাদ' (১৮৮৬) 'পুরাণ-রহস্য' (১৩০২), 'শিশু-রামায়ণ' (দশম সংস্করণ, ১৯১০), 'শিশু-মহাভারত' (চতুর্থ সংস্করণ, ১৯১৬), 'গুরু গোবিন্দ সিং' (১৩২৫) ও পদ্য-ব্যাকরণ' (তৃতীয় সংস্করণ, ১৩২৫) প্রণয়ন করেন। শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচনায় তাঁহাকে একজন অগ্রণী বলা যাইতে পারে। 'শিশু-চৈতন্য'-নামক একখানি পুস্তক রচনা করিয়া প্রকাশের আয়োজন করিতেছিলেন, এমন

ছিলেন। বিবিধ গুণে তিনি এখানে বিশেষ লোকপ্রিয় ছিলেন। বাঙ্গালা ভাষায় ফরাসী বর্ণ-পরিচয় ও ফরাসী-ব্যাকরণ-নামক দুইখানি বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক লিখিয়াছিলেন। ফাদার বার্থের সহিত যুক্তি করিয়া তাঁহারা উভয়ে বাঙ্গালা হইতে ফরাসী এবং ফরাসী হইতে বাঙ্গালা দুইখানি অভিধান প্রস্তত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কোন দৈব বিঘ্নহেতু এই কার্য্য শেষ হয় নাই।

শ্রীযুক্ত নীলমণি দত্ত,—ইনি 'যুগলনায়িকা'-নামক একখানি নাটক লিখিয়াছেন। অভিনয়-বিষয়ে ইঁহার অভিজ্ঞতা আছে; ইনি একটি সখের থিয়েটারের দল সৃষ্টি করিয়াছিলেন। প্রথম কোন অফিসে কর্ম্ম করিতেন, এখন ব্যবসা করিতেছেন।

শ্রী ধর্ম্মদাস বসু

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি-এ কাব্য-বিনোদ,—ইনি এক্ষণে ট্রেনিং একাডেমি-নামক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন। এখানকার মধ্যে তিনি একজন সুকবি বলিয়া পরিচিত। মহাকবি টেনিসনের দুইখানি কাব্য 'গৃহহারা' (১৩১২) ও 'মনীষা' (১৩১৬) নাম দিয়া কাব্যাকারে বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছেন। 'বুদ্ধ' (১৩১৭) ও 'কাকলি' (১৩৩১) নামে আর দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। 'বুদ্ধ' বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ ক্লাশের পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। 'সোরাব রোস্তমের' পদ্যে বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। তাহা আংশিক মুদ্রিত হইয়াছিল মাত্র। 'সাহিত্য,' 'বঙ্গদর্শন' (নবপর্য্যায়), 'পূর্ণিমা', 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি মাসিকে তিনি বহু কবিতা লিখিয়াছেন। শেষোক্ত পুস্তকখানি ঐ-সকল হইতে পুনর্মুদ্রিত।
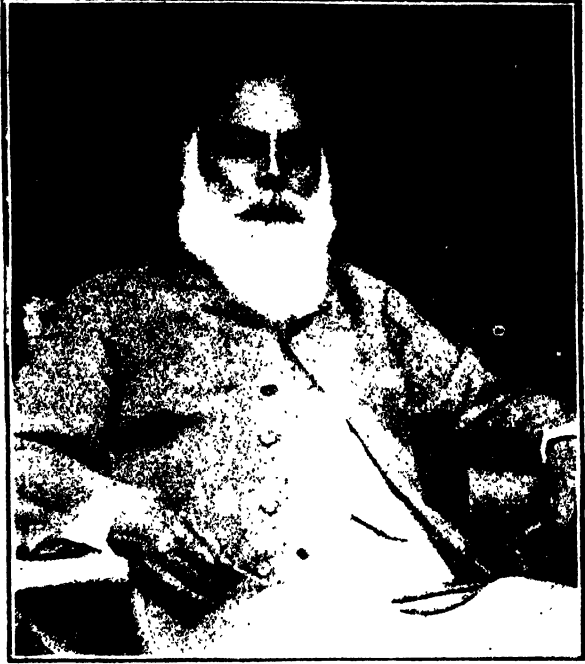
শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র দে বি-এল্,—ইনি দুপ্লে কলেজের অস্থায়ী সহকারী ডাইরেক্টরের কার্য্য করিতেছেন। এক্ষণে চন্দননগরের মেম্বর্ হইয়া ঐ কার্য্যে সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। অন্য কোন কোন জনহিতকর কাজের সহিতও ইনি
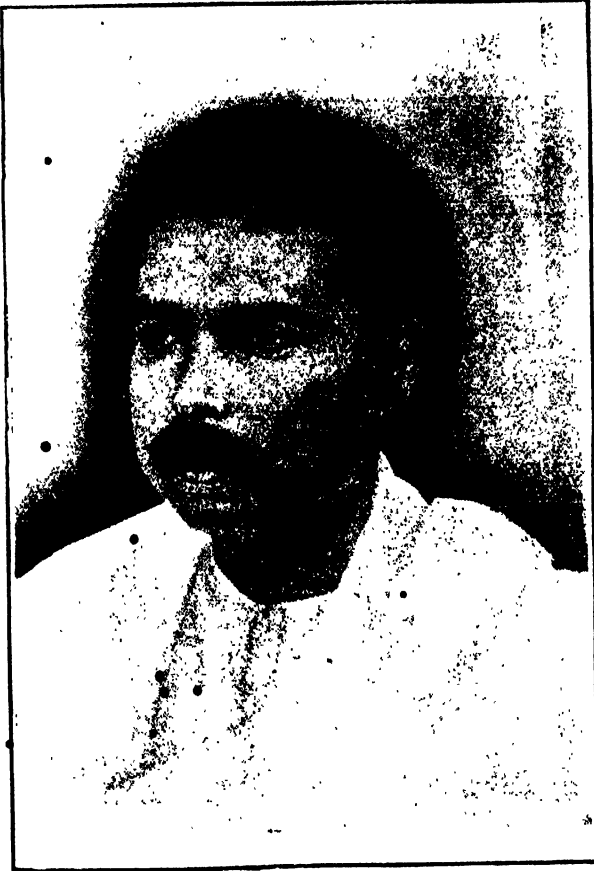
নারায়ণচন্দ্র দে

১৯১৪) নামক একখানি স্কুল-পাঠ্য ইংরেজি পুস্তক ইনি রচনা করিয়াছেন।

৺প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরী,—সামান্ত অবস্থা হইতে ইনি বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। উচ্চ শিক্ষার জন্য নিজ ব্যয়ে একটি অভিনব ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নিজ পল্লীস্থ দরিদ্রদের চিকিৎসা-ব্যবস্থা প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা ও অন্যান্য সদ্‌গুণের জন্য তিনি এখানে বিশেষ যশস্বী ও প্রতিপত্তিশালী হইয়াছিলেন। তখনকার অনেক সাধারণ কার্য্যের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ছিল। চন্দননগরের একটি ব্রাহ্মণ দলের তিনি দলপতি ছিলেন এবং কয়েক বৎসর এখানকার মেয়রের কার্য্য করিয়াছিলেন। ইং ১৮৮৪ সালে তিনি 'ভারতের শিক্ষিত লোকদের ফরাসী শিক্ষার আবশ্যকতা' বিষয়ে ফরাসী ভাষায় একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাই পরে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন। উচ্চশিক্ষা-বিষয়ক তাঁহার ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রসঙ্গান্তরে সবিশেষ লিখিত হইবে।

৺প্রমথনাথ মিত্র,—ইনি সুদীর্ঘ কাল চন্দননগর পুস্তকাগারের অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। উহার দুঃসময়ে প্রমথ-বাবুর পরিচর্য্যার ফলেই পুস্তকাগার রক্ষা পাইয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইনিও চন্দননগরের একজন হিতৈষী ছিলেন। 'মহম্মদ মহসীনের জীবনরচিত' তাঁহার রচিত পুস্তক। ইং ১৮৮০ সালে উহা লিখিত হয়।

৺রায় বীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী বাহাদুর, ইনি পণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া নিজেও একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। প্রথমে শিক্ষকতা করিয়া পরে ছোটনাগপুরে স্কুল ইন্‌স্পেক্টার হইয়াছিলেন। ছোটনাগপুরই তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র। তথায় তিনি ইন্‌স্পেক্টাররূপে গমন করিয়া বহুপ্রকারে তথাকার উন্নতি-সাধন-বিষয়ে যে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহাতে তথায় তিনি স্মরণীয় হইয়া আছেন।

৺প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরী

তিনি যখন ছোটনাগপুরে যান, তখন তথায় কুড়িটির অধিক বিদ্যালয় ছিল না। কিন্তু যে-সময়ে তিনি ঐ স্থান ত্যাগ করেন, তখন তথায় সকলপ্রকারে প্রায় তিন সহস্র বিদ্যালয় সৃষ্ট হইয়াছিল। ইহাতে তাঁহার কৃতিত্ব যথেষ্টই ছিল। হিন্দী ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ঐ ভাষায় 'সাহিত্যসংগ্রহ' নামে একখানি বিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তক রচনা করেন। ইং ১৮৮৬ সালে সম্ভবতঃ উহা লিখিত হয়। 'স্বাস্থ্যসাধন', 'গণিত-বিষয়ক পাঠ্য পুস্তক', 'কোল-দিগের ইতিহাস' রচনা ও ইংরেজিতে ভগবদ্গীতার অনুবাদ করিয়াছিলেন। উহা তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্বনামপ্রসিদ্ধ পুত্র জ্ঞানশরণের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া ইং ১৯০৬ সালে প্রকাশিত হয়। Reis and Rayyet ও অন্যান্য সাময়িক পত্রে তিনি লিখিতেন। তাঁহার 'কাঙ্গালদাসী'
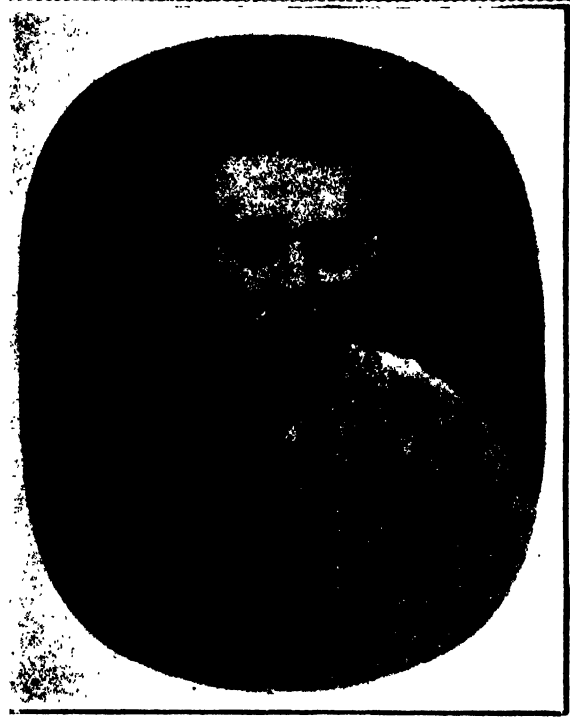
৺ প্রমথনাথ মিত্র

নামক স্তোত্রগুলি বিশেষ আদরণীয় ছিল। বীরেশ্বর-বাবুর মৃত্যুর পর দেশের বহু প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রেই তাঁহার জীবন-কথা আলোচিত হইয়াছিল।

৺ বসন্তলাল মিত্র,—কেবল গ্রন্থকার-রূপে বসন্ত-বাবুর পরিচয় দিলে তাঁহার সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করা হইবে না। তিনি একাধারে লেখক ও সুবিখ্যাত গায়ক ও সুনিপুণ চিত্রকর ছিলেন; চন্দননগরে একটি সঙ্গীত-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। কলিকাতায় "সঙ্গীতমিত্রালয়" সভার তিনি সহকারী সভাপতি ছিলেন। ফটোগ্রাফী বিদ্যায়ও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। 'সঙ্গীত-রত্নাকর' ও 'সঙ্গীত পারিজাত'-নামক দুইখানি সংস্কৃত মূল গ্রন্থ ইং ১৮৭৯ সালে প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং 'গান্ধর্ব্ব সংহিতা' (প্রথম ভাগ) নামক আর-একখানি সঙ্গীত-বিষয়ক ও 'বিবাহ বা উদ্বাহ-তত্ত্বের গূঢ় রহস্য' (১৩১৬) নামক

৺ বসন্তলাল মিত্র

৺ বিশ্বেশ্বর ভাগবতাচার্য্য,—তাঁহার রচিত পুস্তক, 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণগীতা' প্রথম খণ্ড (১৩০৩)। ইহা গীতার সমালোচনা-পুস্তক, চন্দননগর হাটখোলা সাধারণ হরিসভা হইতে প্রকাশিত হয়।

শ্রীযুক্ত বামাচরণ বসু,—ইনি ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু মহাশয়ের সহোদর। ঠিক নিবাস ফরাসী চন্দননগরে নয়, বৃটীশ চন্দননগরে। এখানেও সময়ে-সময়ে বাস করিয়াছেন। ইনি গভর্ণমেণ্টের চাকরী করিতেন, এখন পেন্‌শন্ পাইতেছেন। ইঁহার লিখিত গ্রন্থ 'আরণ্য-প্রসূন' (১২৮৮), 'সুরো যে সন্ন্যাসী বা অষ্টাহে' (১৩১১), 'বিজলী বা নারী-ভাগ্য' (১৯০৪) ও 'জয়চাঁদের চিঠি' প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবক (১৩১২); শেষোক্ত গ্রন্থের শুনিয়াছি তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবকও মুদ্রিত হইয়াছিল; উক্ত গ্রন্থসকলের মধ্যে প্রথমখানি খণ্ড কাব্য, দ্বিতীয়খানি কাব্য, তৃতীয়খানি উপন্যাস এবং চতুর্থখানি পত্রাকারে লিখিত।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সরস্বতী বি-এ, কোন সওদাগর অফিসে ইনি কর্ম্ম করেন। কয়েক বৎসর রাজবন্দীরূপে আবদ্ধ ছিলেন। 'কাশীশ্বরী' নামক বালিকা-বিদ্যালয়ের সম্পাদক-রূপে উহার অনেক উন্নতি করিয়াছেন। 'নিবন্ধ'-নামক একখানি মাসিক পুস্তিকা কয়েক মাস প্রকাশ করিয়াছিলেন। ফরাসী গবর্ণমেণ্টের নিকট অনুমতি না পাওয়ায় উহা বন্ধ হইয়া যায়। তাঁহার রচিত গ্রন্থ,—'গুরুগোবিন্দ সিংহ' (২য় সংস্করণ), 'ঘর ও পর', 'ব্যক্তি ও সমাজ' (১৩২৭), 'স্বরাজ-সাধনা' (১৩২৮), 'সরল হিন্দী শিক্ষা' (১৩২৮), 'সরলা' (২য় সংস্করণ), 'সাবিত্রী' (৩য় সংস্করণ), 'দময়ন্তী' (২য় সংস্করণ), 'ভক্তিকণা' (ইহা শিশুদিগের জন্য খ্যাতনামা কবিদের কয়েকটি কবিতার সংগ্রহ) ও 'সতীসাধনা' নামে ছেলেমেয়েদের জন্য একখানি ক্ষুদ্র উপাখ্যান। এতদ্ভিন্ন তিনি 'প্রবর্ত্তকে' মধ্যে-মধ্যে প্রবন্ধ

৺ শ্রীশচন্দ্র বসু

শ্রী বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

লিখিয়া থাকেন। জেস্থুট্ সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে তিনি একখানি গ্রন্থ লিখিতেছেন।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি-এ, 'বিধির বিধান' নামক একখানি উপন্যাস ১৩২৫ সালে পাঠ্যাবস্থায় রচনা করিয়াছিলেন। 'নিয়তির চক্র' ইঁহার আর-একখানি পুস্তক।

শ্রীযুক্ত ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী, 'জাতি-তত্ত্ব-নিরূপণ'-নামক একখানি পুস্তক ১৩১৪ সালে প্রকাশ করেন।

৺ মহেন্দ্রনাথ নন্দী; অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে ইনি চন্দননগরে নানা বিষয়ের একজন উদ্যোগী লোক ছিলেন। তিনি একখানি অভিধানের কিয়দংশ প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়।

৺ মধুমাধব চট্টোপাধ্যায়,—ইনি বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত যাত্রা কর্ম্ম ও দোকানে মুহুরির কাজ করিতেন। গান বাঁধিবার তাঁহার ক্ষমতা ছিল। চিন্তে মালা ও নবীন গুঁইয়ের পাঁচালীর দলে তিনি পালা বাঁধিয়া দিতেন। নিজেও একটি পাঁচালীর দল করিয়াছিলেন। 'রহস্য-পাঁচালী' নামে বিবিধ রহস্য-সঙ্গীত সহ একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন প্রচলিত প্রবাদসকল সংগ্রহ করিয়া তাহার উৎপত্তি ও অর্থ-নির্ণয় করিয়া ৺ রাখালদাস অধিকারী মহাশয় কর্ত্তৃক সংশোধন করাইয়া ১৩০৫ ও ১৩০ সালে 'প্রবাদ-পদ্মিনী'-নামক তিন খণ্ড গ্রন্থ প্রকাশ করেন এ ভাবের গ্রন্থ বাঙ্গালায় আর নাই। 'হেমোপাখ্যান নামে একখানি উপাখ্যান-পুস্তকের তিনি রচয়িতা।

শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়,—প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া ইনি খ্যাত। এই সঙ্ঘের দ্বারা যে-সব কার্য্যে প্রবর্ত্তন হইয়াছে ও হইতেছে, গঠন-কার্য্যের জন্য যে চেষ্ট

শ্রীমধুমাধব চট্টোপাধ্যায়

শ্রী মতিলাল রায়

আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। 'শ্রীশিব-পূজা-পদ্ধতি' নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছেন।

৺ যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, 'চিত্তরঞ্জন উপন্যাস'-নামে একখানি পুস্তক রচনা করেন। ৺অন্নদাপ্রসাদ ও রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দিগের সাহায্যে গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় দ্বারা সংশোধিত হইয়া ১৩০৩ সালে উহার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

৺ যোগেন্দ্রলাল বসু,—কলিকাতা হইতে এখানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। একজন কৃতবিদ্য লোক ছিলেন, শেষে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তাঁহার বঙ্গ-ভাষায় রচিত গ্রন্থের নাম দিয়াছিলেন 'Original Works of Poor Jogendra Lal Basu.'

যোগেন্দ্রনাথ দে,—চন্দননগর বারাশতের দে বংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন।

হইতেছে, এসকলের মূল মতি-বাবু। বর্ত্তমানে 'প্রবর্ত্তক'-নামক মাসিক পত্রখানি ইঁহার দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। ইঁহার ওজস্বিনী ভাষায় সুন্দর বক্তৃতা করিবারও বেশ ক্ষমতা আছে। 'উদ্বোধন' (১৩২৬) নাটক, 'সাধনা' (১৩২৬), 'যুগবার্ত্তা' (১৩২৭), 'যৌগিক সাধনা' (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩২৮), 'কর্ম্মের ধারা' (১৩২৮), 'লীলা' (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩২৯) নামক প্রবন্ধাদিপূর্ণ পুস্তক ও 'কানাইলাল' (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৩০) নামে চন্দননগরের কানাইলাল সম্বন্ধে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ব্রিটিশ ভারতে শেষোক্ত গ্রন্থের প্রচার বন্ধ হইয়াছে। সাময়িক পত্রাদিতে তিনি বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উল্লিখিত অধিকাংশ রচনাই উহা হইতে পুনর্মুদ্রিত।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিদ্যাবিনোদ, বৈদ্যশাস্ত্রী, ইনি একজন কবিরাজ। 'বৈদ্যবেদ-বিদ্যালয়' নামে ইংরেজি চিকিৎসাবিদ্যা-শিক্ষা-সম্বলিত একটি

শ্রী যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

'নগনন্দিনী'-নামে ইঁহার রচিত একখানি উপন্যাস আছে।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়,—নেড়োর-মনের সুপ্রসিদ্ধ চট্টোপাধ্যায়-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। চন্দননগর হইতে প্রকাশিত 'বঙ্গবন্ধু' পত্রিকার তিনি সম্পাদক ছিলেন, এক্ষণে হিতবাদী পত্রের সহকারী সম্পাদকের কার্য্য করিতেছেন। সরস বক্তৃতার দ্বারা সভাস্থ জনমণ্ডলীকে মোহিত করিবার তাঁহার ক্ষমতা আছে। তিনি একজন সুবক্তা ব'লিয়া খ্যাত। হিতবাদীতে 'বৃদ্ধের বচন'-শীর্ষক যে-সকল সরস বিদ্রূপাত্মক লেখাগুলি প্রকাশিত হয় এবং যাহা হিতবাদীর একটি বিশেষত্ব, তাহা যোগেন্দ্র-বাবুরই লেখা। তিনি উহার কতকগুলি সংগ্রহ করিয়া 'বৃদ্ধের বচন' ১ম খণ্ড ১৩২৫ সালে প্রকাশ করেন। বাঙ্গালায় ঠিক এ ভাবের দ্বিতীয় গ্রন্থ আছে কি না সন্দেহ। তিনি 'সাহিত্য', 'বঙ্গদর্শন' (নবপর্য্যায়), 'ভারতী',

শ্রী ললিতমোহন কর

৺ শঙ্করানন্দ ব্রহ্মচারী

'প্রবাসী' প্রভৃতিতে বহু গল্পাদি লিখিয়াছেন। উহার কতকগুলি লইয়া 'আগন্তুক' (১৩১৩) ও 'জামাই-জাঙ্গাল' (১৩১৬) প্রকাশ করেন। গল্প-গুলির অধিকাংশই জন-প্রবাদ-মূলক। ইহাতেও তাঁহার বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়। 'শ্রীমন্ত সওদাগর' (১৩১৭) নামে তাঁহার একখানি গ্রন্থ ফাষ্ট্ আর্ট্সের পাঠ্য-পুস্তক নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। 'অমিয়উৎস' (১৩২৬) নামে তাঁহার আর-একখানি উপন্যাস আছে।

৺ রামচন্দ্র বসু,—ইঁহার বাটী ছিল গোন্দল-পাড়ায়। 'চেতনকৌমুদী'-নামক একখানি এবং অন্য আর-একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। এই উভয় পুস্তকই ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বের লেখা।*

* Selections from the Records of the Bengal Government, no. xxii.

শ্রী শ্রীশচন্দ্র বসু ব্যারিষ্টার

৺ রামরত্ন দাস সরকার,—যতদূর জানা গিয়াছে ইনিই এখানকার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থকার, অন্ততঃ ইঁহার পূর্ব্বের কোন মুদ্রিত গ্রন্থ পাওয়া যায় না। ১৭৮৬ শকাব্দে 'রসিকরতন' ও 'মানবদেহরতন' নামে পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত ইঁহার দুইখানি গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়।* পদার্থ-সুধাসিন্ধু ও 'চিকিৎসা-রঞ্জন'নামে ইঁহার আর দুইখানি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'মানব-দেহ-রতন' গ্রন্থখানি নানাবিধ গ্রন্থের সার সংগ্রহ করিয়া নব্য সভ্য ভব্য রসজ্ঞ গুণীগণের মনোরঞ্জনার্থ এবং রসিক-রতন গ্রন্থখানি নব্যবিদ্যাব্যবসায়ীবর্গের হিতার্থ লিখিত বলিয়া লেখক গ্রন্থের আদিতে লিখিয়াছেন। 'মানব-রতন' গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায় তাঁহার আদি পুরুষ রামদাস দাস, শাখরালে বাস, পিতার নাম মদনমোহন দাস।

৺ রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,—শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহযোগে ফরাসী ও বাঙ্গালা ভাষায় 'Dictionnaire Francais—Bengali' নামে ইং ১৮৮৫ সালে একখানি অভিধানের কয়েক খণ্ড মাসিক প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন কর, কাব্যতীর্থ, এম-এ, বি-এল,—ইনি সংস্কৃত ও পালি উভয় ভাষায় এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রথমে অধ্যাপনা করিয়া এক্ষণে ওকালতি করিতেছেন। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মহাশয়ের সহিত একত্রে' অশোক-অনুশাসন' নামে সমগ্র অশোক-অনুশাসনের অনুবাদ করিয়া ১৩২২ সালে একখানি গ্রন্থ সম্পাদন করেন। এই গ্রন্থ পালি ভাষায় এম-এর পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচিত হইয়াছে।

৺ শ্রীশচন্দ্র বসু,—ইনি চিকিৎসা-ব্যবসায়ী

শ্রী সাগরচন্দ্র কুণ্ডু

* চন্দননগর পুস্তকাগারে একখানি গ্রন্থ আছে।

ছিলেন। 'প্রজ্ঞাবন্ধু' নামক সংবাদপত্রের একজন সহায় এবং 'Amateur Workshop' নামক পত্রের অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। 'লীলা' (১২৯৫) নামক একখানি প্রবন্ধ-পুস্তক ও 'প্রতাপ' নামক একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। 'সংসার' নামে আর-একখানি গ্রন্থ সম্ভবতঃ তিনি রচনা করিয়াছিলেন। তিনি মাসিকপত্রেও প্রবন্ধ লিখিতেন।

৺শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায়,—স্বর্গীয় রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত একত্রে একখানি ফরাসী ও বাঙ্গালা অভিধানের কিয়দংশ প্রকাশ করেন এবং 'সরল ফলিত পঞ্জিকা' নামে একখানি পঞ্জিকা কয়েক বৎসর প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইনি জ্যোতিষ-শাস্ত্রে জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন।

৺শঙ্করানন্দ ব্রহ্মচারী, ইনি এই নামে গ্রন্থগুলি প্রকাশ করেন, ইঁহার নাম উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। ইনিও নেড়োরমনের চট্টোপাধ্যায়-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বহুদিন শিক্ষকতা

শ্রী হরিহর শেঠ

শ্রী সন্তোষনাথ শেঠ

করিয়াছিলেন, কিছুদিন কাশীর মহা-বিদ্যালয়ের প্রধান আচার্য্য ছিলেন। 'A Brief History of the Bengal Brahmins,' part I, "The Grandeur of the Vedas,' part I (১৯১৯), 'মহারাজ জনমেজয়ের সর্পসত্র' (১৮৪১ শকাব্দ) 'জীবের সাধ্য ও সাধনা' এবং 'চণ্ডীদাসের জন্মস্থান "নান্নুর" গ্রামের প্রাচীনত্ব ও পুরাতত্ত্বের আবিষ্কার'-নামক পুস্তক লিখিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বসু, বার্-এট্-ল,—বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া ইনি পোষ্ট-অফিস্ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের কার্য্য করেন। কতিপয় বৎসর কর্ম্ম করার পর বিলাতে যাইয়া ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া আসেন। এক্ষণে কলিকাতা হাইকোর্টের একজন খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার। বিলাতে অবস্থিতি-কালে তাঁহার স্ব-রচিত 'বুদ্ধ' নামক একখানি ইংরেজি নাটক অভিনয় দ্বারা তথায় বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া-

লন। কলিকাতায় রয়েল থিয়েটার মঞ্চে তাঁহার 'নল-
াস্তী' নামক আর-একখানি ইংরেজি নাটক সুখ্যাতির
ত অভিনীত হয়। ইহাতে তাঁহার অভিনয়-নিপুণতা
শষ ভাবে পরিস্ফুট-হইয়াছিল। উক্ত দুইখানি ইংরেজি
ক ভিন্ন 'পুণ্ডরীক' (১৩২৭) ও 'সন্দিগ্ধা' (১৩৩১) নামে
হার আর দুইখানি নাটক আছে। কোন উৎসবাদির
যাগ ও গঠন বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে।
২২ সালে চন্দননগর-প্রদর্শনীর (Exposition
andernagore) তিনি সহঃসভাপতি হইয়াছিলেন।
হার মত উৎসাহী লোক কম দেখা যায়।

শ্রীযুক্ত শিবকৃষ্ণ মিত্র,—ইনি 'ধূমকেতু' পত্রের সম্পাদক
লেন। ইনি ইঁহার অগ্রজ বসন্ত-বাবুর একখানি সংক্ষিপ্ত
বনী-পুস্তিকা লিখিয়াছেন।

শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী,—ইনি শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র-
মার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভগ্নী। 'উত্তরায়ণে গঙ্গাস্নান'
১৩২৮) নামক একখানি উপন্যাস লিখিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র সুর, বি-এল,—ইনি হুগলী ও শ্রীরাম-
র আদালতে ওকালতি করেন, এবং একজন ভাল
ফৌজদারী উকিল বলিয়া খ্যাতি আছে। 'মোগল-পতন'
১৩১৯) ও 'বরের বাপ' (১৩২১) নামক দুইখানি
াটক রচনা করিয়াছেন। এই উভয় নাটকই অবৈতনিক
াট্য সম্প্রদায় দ্বারা অভিনীত হইয়াছিল। নাট্যাভিনয়েও
হার নিপুণতা আছে।

শ্যামাপ্রসাদ দত্ত,—নালন্দা-নিবাসী রাখালদাস চক্রবর্ত্তী
হাশয়ের সহিত একত্রে রামপ্রসাদ সেনের পদাবলী
প্রকাশ করেন।

৺ সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ,—ইনি বরাবর
শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থ, 'সাধনাষ্টক'
এবং 'নবসদ্ভাব-শতক' প্রথম খণ্ড (১৩০২)।

শ্রীযুক্ত সাগরচন্দ্র কুণ্ডু,—অবস্থার অসচ্ছলতাবশতঃ
ঈপ্সিত সাহিত্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে না
পারিলেও এক্ষণে তাঁহার বৃদ্ধ বয়সেও লিখিবার বিশেষ
আগ্রহ আছে। বহুদিন পূর্ব্বে অনেক সাময়িক পত্রে
ইতিহাস, শিল্প ও ব্যবসা-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধসকল লিখিতেন।
একখানি চন্দননগরের ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন,
তাহা প্রকাশ করিতে পারেন নাই। এখানে তাঁহার
অপেক্ষা প্রাচীন লেখক বোধ হয় এখন আর কেহই নাই।
তাঁহার রচিত পুস্তক 'জলকষ্টাদির কাহিনী' (১৩০১)
ও 'দুগ্ধ কি বস্তু দেখুন' (১৩১৩)।

শ্রীযুক্ত সন্তোষনাথ শেঠ সাহিত্য-রত্ন,—ইনি ব্যবসা-
কার্য্যে লিপ্ত আছেন। বহুদিন এই ক্ষেত্রে থাকিয়া ও
মোকামে অবস্থানহেতু, তিনি ব্যবসা-বিষয়ে যে-সকল
জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাহা বিবিধ গ্রন্থাকারে প্রকাশ
করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকসমূহ হইতে জানিবার
অনেক আছে। ইঁহার রচিত গ্রন্থ, 'মহাজন-সখা' (দ্বিতীয়
সংস্করণ, ১৩২৭) 'মোকামে বাণিজ্যতত্ত্ব' ১ম ও ২য়
ভাগ (১৩২৭ ও ২৯), 'Book-keeping in Bengali'
(১৩২৮) ইহা বাঙ্গালায় রচিত। 'প্রাথমিক ব্যবসা শিক্ষা'
(১৩২৯) 'বিজ্ঞাপন-তত্ত্ব ও ক্যানভাসিং' (১৩৩০),
'অর্থোপার্জ্জনের সহজ উপায়' (১৩৩০), 'Sett's
Guide to Commercial Places', Part I. (১৯২১)।

শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ,—পঠদ্দশার পর প্রথম ব্যবসায়-
কর্ম্মে লিপ্ত হন। প্রায় দশ বৎসর হইতে কতিপয়
সাধারণ কার্য্যের সহিত সম্পর্কিত আছেন। মধ্যে কিছু
কাল চন্দননগরের মেয়রের কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার
'অভিশাপ'-নামক উপন্যাসখানি প্রথম 'বান্ধবে' প্রকাশিত
হওয়ার পর, ১৩১৫ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।
ঢাকার স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর, সি-আই-ই,
মহোদয় প্রকাশের পূর্ব্বে পুস্তকখানি একবার দেখিয়া
দেন। তৎপরে 'প্রমাদ' (১৩১৬), 'অদ্ভুত গুপ্তলিপি ও
অমৃতে গরল' (১৩১৬) নামক ডিটেকৃটিভ. গল্প, 'প্রতিভা'
(১৩২৮), 'স্রোতের ঢেউ' (১৩২৯) ও 'ঘরের কথা' (১৩৩১)
নামক পুস্তকগুলি রচনা করেন। দ্বিতীয় ও শেষখানি
প্রবন্ধ-পুস্তক এবং উহার প্রায় সমস্তগুলিই মাসিকে
প্রকাশিত প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত। 'প্রতিভা' নাটক এবং
'স্রোতের ঢেউ' কতকগুলি চিন্তা একত্র করিয়া প্রকাশিত
হয়। 'বান্ধব', 'ভারতী,' 'প্রদীপ,' 'প্রবাসী,' 'ভারতবর্ষ,'
'মানসী ও মর্ম্মবাণী' প্রভৃতি বিবিধ মাসিকে বহু প্রবন্ধাদি
প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ১৩২০ সালে পিতৃ-
শ্রাদ্ধোপলক্ষে বিতরণের জন্য তাঁহার দ্বারা একখানি

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রকাশিত হইয়াছিল। 'চন্দননগর-পরিচয়' নামে চন্দননগরের বিবিধ বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়-পুস্তক-প্রণয়নে ইনি প্রবৃত্ত আছেন।

এখানকার গ্রন্থাদির সংক্ষেপে পরিচয় দেওয়া হইল। কে প্রকৃত গ্রন্থকারপদবাচ্য,কে নহে, সে সন্ধান বা বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া যাঁহার লিখিত অনুবাদিত বা সম্পাদিত কোন পুস্তক পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহার ও তাঁহার গ্রন্থাদির কথা এই তালিকান্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। অন্যদিকে শক্তিশালী লেখক যাঁহার কোন পুস্তক ছাপা হয় নাই বা হইলেও সে-সংবাদ অবগত নহি, তাঁহাদের কথা বলা হয় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে রাসু, নৃসিংহ, নিত্যানন্দ বৈরাগী, আণ্টুনি ফিরিঙ্গি প্রভৃতি কবিওয়ালাদেব কোন গ্রন্থের কথা না জানা থাকিলেও তাঁহাদের রচিত ভাবময় সঙ্গীতসকল সে-কালের বাঙ্গালা গীত বা পদ্য-রচনার নিদর্শন-হিসাবে মূল্যবান্। তৎপরবর্ত্তী কালের বলরাম কপালী এবং আধুনিক সময়ের মধুপাত্র, রামচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি গীত-রচয়িতাদের কথাও উল্লেখযোগ্য। অন্য প্রসঙ্গে তাঁহাদের কথা বলা হইবে।

উল্লিখিত গ্রন্থসকল ভিন্ন গ্রন্থ-প্রচার-সমিতি, প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস্ এবং বি প্র ভাণ্ডার বসন্ত-কুটীর হইতে আরও পঁচিশ-ত্রিশখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু তাহা বাহিরের লোকের লেখা। সারস্বত-সম্মিলনী হইতে প্রকাশিত 'স্বর্গীয় নন্দলাল বসু মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী,' 'বন্দনা' বা অন্য কোন সভা-সমিতি হইতে প্রকাশিত ঐরূপ বা শ্রীযুক্ত সাগরকালী ঘোষ মহাশয়ের দ্বারা প্রকাশিত ভেল্-দিগ্-দিগ্ বা কপাটি খেলার নিয়মাবলীর ন্যায় পুস্তিকা প্রভৃতির কথাও আলোচিত হইল না।

আর একখানি অতি প্রাচীন গ্রন্থের কথা বলিয়া এই বিষয়টি শেষ করিব। এই গ্রন্থের নাম 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ।' ইহাই সর্ব্ব প্রথম ইউরোপীয় লিখিত, মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তক বলিয়া কেহ কেহ স্থির করিয়াছেন। ফাদার গেরেন (Father J. F. M. Guerin) কর্ত্তৃক ইং ১৮৩৬ খ্রীঃ অব্দে পুনর্লিখিত ও সম্পাদিত হইয়া ইহা প্রকাশিত হয়। ইহার আদি গ্রন্থের পোর্ত্তুগীজ অংশ বাঙ্গালা মিশনের অধ্যক্ষ পর্ত্তুগীজ পাদ্রী মনোয়েল দা আসামসাও (Frey Manoel da Assumpcao) কর্ত্তৃক রচিত বা অনুবাদিত এবং বাঙ্গালা অংশ ভাওয়াল-নিবাসী কোন বাঙ্গালী খৃষ্টান দ্বারা ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে লিখিত বলিয়া সুধীগণ অনুমান করেন। এভোরা (Evora) সাধারণ পুস্তকালয়ে ইহার একখানি হস্ত-লিখিত কপি আছে। ইহা খৃষ্ট-ধর্ম্ম-বিষয়ক ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা-গ্রন্থ, একজন রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান ও হিন্দু ব্রাহ্মণ উভয়ের কথোপকথনচ্ছলে লিখিত এবং ফ্রান্সিস্কো দা সিল্ভা (Francisco da Silva) কর্ত্তৃক লিস্‌বন-নগরীতে ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত। খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ অবস্থায় ইহার এক কপি এসিয়াটিক্ সোসাইটির পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে। কথিত আছে ভূষণা-রাজ্য ধ্বংসের পর তথাকার কোন রাজপুত্র খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইয়া তাঁহার নবগৃহীত ধর্ম্মের বহুল প্রচারের উদ্দেশ্যে বাঙ্গালা ভাষায় ইহা প্রথম রচনা করেন। লিস্‌বন হইতে প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের বাঙ্গালা অংশ রোমান অক্ষরে লেখা।

পাদ্রী গেরেন তাঁহার সম্পাদিত বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত সংস্করণে সমস্ত ভুল ঠিক করিয়া এবং বাজে গল্প বাদ দিয়া পুস্তকের আকার অর্দ্ধেকেরও অপেক্ষা ছোট করিয়া একরূপ সংস্কৃত করিয়াছেন বলিতে পারা যায়। তদ্ভিন্ন তিনি তিনটি নূতন কথোপকথন এবং ১৮৩৬ হইতে ১৯০৪ পর্য্যন্ত সূর্য্য ও চন্দ্র-গ্রহণ-গণনা সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন।*

* প্রথিতনামা ডাক্তার সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর শ্রীমানী, এল্-এম্-এস্ মহাশয়ের নিকট হইতে সম্প্রতি এই পুস্তকের একখণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। উহাতে ১৮৩৬ না ১৯৪০ পর্য্যন্ত গ্রহণ-গণনা দেওয়া আছে। এই পুস্তকের উপরের পরিচয়-পত্র না থাকিলেও উহা চন্দননগর সংস্করণ বলিয়াই মনে হয়। প্রাপ্ত পুস্তকও প্রায় দেখা যায় না। সময়ান্তরে ইহার সুবিশেষ পরিচয় দিতে এবং আবশ্যক মনে হইলে উহার সমস্ত বা অংশবিশেষ প্রকাশিত করিতে ইচ্ছা রহিল। এই অবসরে যজ্ঞেশ্বর-বাবুকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

গেরেন চন্দননগরের সেন্ট লুই (St. Louis) গির্জ্জার পুরোহিত (Vicar) ছিলেন। তিনি একজন জ্যোতিষ-শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত ছিলেন এবং জ্যোতিষ-শাস্ত্রের একখানি পুস্তকও প্রকাশ করিয়াছিলেন। * কৃপাশাস্ত্রের অর্থভেদ গ্রন্থে চন্দননগর ও ফরাশডাঙ্গার কথা কয়েক স্থানে লেখা আছে।

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২২ সাল; Bengal Past and Present, Vol. IX; Bengali Literature in the Nineteenth Century ও মানসী ও মর্ম্মবাণী, ১৩২৩, প্রভৃতিতে এই গ্রন্থের বিষয় লেখা আছে।

চীন-জাপানের চিঠি

(১)

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনাকে পিকিং হ'তে পত্র দিয়েছি ও কতকগুলি পিকিঙের দৃশ্য পাঠিয়েছি। পেলেন কি না জানি না। পিকিং বেশ পুরাতন শহর, তবে বড় শুক্‌না, মরুভূমির নিকট রাত-দিন ধূলা; এখানকার আর্টিষ্টরা কি করে' কাজ করে ভেবে অস্থির হয়েছি। দক্ষিণ চীনে বেশ সরস বড়-বড় নদী গঙ্গার মত, চতুর্দ্দিকে সবুজ পাহাড়। খোঁজ নিয়ে জান্‌লাম দক্ষিণেই বড়-বড় আর্টিষ্ট্ জন্মেছেন। পিকিঙে কতকগুলি আর্টিষ্টের সঙ্গে দেখা হ'ল—দুই-একজন ভাল আর্টিষ্ট আছেন, তাঁরা পাগল। আর্টিষ্ট্, কারো সঙ্গে বেশী কথা বলেন না, যদিও বা অনেক কষ্টে কথা কওয়ান যায়, সে যা-কথা দোভাষীরাও বুঝে না; ইসারায় যা বুঝা গেল - পাগলামি চাই ও হাতেরও কসরৎ চাই। তবে বেশীর ভাগ আর্টিষ্ট কসরৎই করেন। এরা আর্টিষ্টদের এই কয় ভাগে ভাগ করেছেন—

(১) আর্টিষ্ট কারিগর; ইহারা বহু পুরাতন; হাতের অদ্ভুত কুশলতা দেখিয়ে আস্‌ছে।

(২) পাগ্‌লা আর্টিষ্ট—এরা cultured, বড় সাধু, বড় সেনাপতি, বড় বাদশাহ, বড় ফকির; এদের পয়সার বা নামের জন্য ভাবতে হয় না। এরা খেয়ালী লোক।

(৩) অ-পাগল (sane) আর্টিষ্ট্ বা পেশাদার আর্টিষ্ট—এরা শিল্পে দক্ষ, শিল্পের আইন-কানুন জানে, কখন-কখন এরাও পাগলা আর্টিষ্টের পর্য্যায়ে গিয়ে পড়ে। এরা বড় লোক, বাদশাহ প্রভৃতির অধীনে থেকে কাজ করে।

(৪) চোর আর্টিষ্ট।

(৫) পোটো!

প্রথম নম্বর আর্টিষ্টরা শিল্পের যুগ বদ্‌লে দেন। আর এদের ছবি নকল করা যায় না। দ্বিতীয়-তৃতীয় নম্বর আর্টিষ্টদের ছবি নকল করা যেতেও পারে। চতুর্থ নম্বর আর্টিষ্টরা দ্বিতীয়-তৃতীয় নম্বর আর্টিষ্টদের ছবি নকল করে, জাল করে, কেবল মাত্র পয়সার জন্য। পাঁচ নম্বর পোটো চিরকালই আছে।

একজন আর্টিষ্ট্ একটি কাগজে তাঁর বক্তব্য কিছু লিখে' দিয়েছেন। চীনা ভাষার লেখা অনুবাদ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি।

গুরুদেব যে মৈত্রীর কথা বল্‌তে আজ চীনে এসেছেন, এরা তাতে কর্ণপাতও করে না, একেবারে গোঁয়ার-গোবিন্দ হ'য়ে বসে' আছে। এরা মিটিং, লেকচার ইত্যাদি বড় ভালবাসে। সুরেন বাঁড়ুয্যে বা বিপিন পালরা এখানে এসে বেশ তোলপাড় কর্‌তে পার্‌তেন। যাক্ শীঘ্র-শীঘ্র ঘরে ফির্‌লে বাঁচি; গুরুদেবের কতকগুলো ভাল-ভাল লেখা হ'য়ে গেল! সেই সকলের লাভ; আর্ট সম্বন্ধেও অনেক আলোচনা করে' লিখেছেন; আপনারা সেখানে বসে'ই সব দেখ্‌বেন।

১২ই এপ্রিল চীনে এসেছি, আর আজ ৩০শে মে

পিকিঙে একটি পার্শী পরিবারে বিশ্বভারতীর দল

সাংঘাই এলাম—প্রায় দেড় মাস এখানে কাটল! তুলি রং কিছু-কিছু কিনেছি। ফিরবার মুখে হাঙ্কাও হ'তে ইয়াংসিকিয়াং নদী ধরে' সাংঘাইএ এসেছি। প্রায় ৪০০ মাইল পথ। শরীর আর বয় না। নদীগুলো বেশ সুন্দর, যেন পদ্মা নদী দিয়ে আস্‌ছি। দুধারে ধান ও যবের ক্ষেত, আর সবুজ পাহাড়।

৩১শে নাগাদ জাপান যাত্রা করব। জাপান দশ-পনর দিন অথবা একমাস থাকা হবে ঠিক নেই। পরে পত্র দ্বারা জানাব। জাপানে জিনিষপত্র বড় মাগগি। তাই এখান হ'তে সব ক্রয় করলাম। সিল্ক সস্তা নয়, কল্‌কাতা হ'তে বেশী দাম; তবে অল্প নমুনার মত দিয়েছি।

প্রকাণ্ড দেশ। বড় অরাজক। এক প্রদেশ আর-এক প্রদেশের ধার ধারে না। কিন্তু যে-যে প্রদেশের ভিতর দিয়ে গুরুদেব যাচ্ছেন, তারা সৈন্য-পাহারা, স্পেশ্যাল ট্রেন্, থাকার বন্দোবস্ত, সব করছে, এবং বাদশাহের মত খাতির করছে—যেন চীনের বাদশাহ তাঁর গভর্ণরদের দেখ্‌তে এসেছেন।

কতকগুলি লোকের সঙ্গে পিকিঙে দেখা হ'ল—বেশ বুঝদার, তারা একটু মাথা ঘামাচ্ছে। জাপানের লোকেরা যদি বুঝে-সুঝে তবেই কিছু দিন থাকা হবে; কিন্তু তা না হ'লে শীগ্‌গির জাল গুটোনো হবে।

এখানে যেসব কারুকার্য্য হ'ত তা সব হু-হু করে' মরে' আস্‌চে। এদেব মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে। দেখ্‌ছি মাথাটা ঠিক করাই আগে দরকার। হাতের কারিগরিতে মাথা তৈয়ার হ'লে অন্যও হবে। লোকে যেসব বাড়ী ইত্যাদি আজকাল তৈয়ার করছে সব বিলাতী ধাঁচের। পুরাতন চিত্রকলায় পার্‌স্পেক্‌টিভ নেই বলে' এরা লজ্জিত, বড় decorative বলে' নিজেদের অসভ্য মনে করছে, 'সিম্পল্' হবার চেষ্টা করছে। বিলাত হ'তে আর্টিষ্ট্ এসে শেখাচ্ছে, এবং বেশ সভ্য করছে।

মেয়েরা ঘোড়তোলা জুতা পরে' খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চল্‌ছে—লোহার জুতা ছেড়েই ঘোড়তোলা জুতা পরেছে।

দু-একজন নতুনধরণের কবি হচ্ছেন, তাঁরা চাঁদ দেখ্‌লে ক্ষেপে ওঠেন, কোন সুন্দর জিনিষ দেখ্‌লে চেঁচিয়ে ওঠেন, এবং তৎক্ষণাৎ ইংরেজীতে একটা কবিতা লিখে' ফেলেন। কয়েকজন পুরাতন কবিও আছেন,

চীনদেশে শ্রী নন্দলাল বসু ও শ্রী কালিদাস নাগ

শ্রী নন্দলাল বসু ও দুইটি চীন-প্রবাসী পার্শী শিশু

তাঁরা খুব বড়-কবিও বটেন, তবে নূতন হল্লায় পড়ে' হাবুডুবু খাচ্ছেন।

এরা এখনও যা হাতের কাজ করে দেখলে অবাক্ হ'তে হয়। কাজটাই এদের ধর্ম্ম—একটু অবকাশ নেই, মাথা গুঁজে' কাজ করছেই,—দেখলেই প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।

(২)

শ্রদ্ধাভাজনেষু,

আমরা তোকিওতে আছি। আমি আরাই-সানের বাড়ীতে আছি। ক্ষিতি-বাবু কিয়োতোতে একটি মন্দিরে আছেন। কালিদাস-বাবু, এল্‌মহার্ষ্ট্ ও গুরুদেব তোকিও ইম্পিরিয়াল হোটেলে আছেন। তাজিমা বলে' একটি জাপানী ব্যবসাদার অনেকদিন কল্‌কাতায় ছিলেন, আপনাদের সহিতও খুব আলাপ আছে; তাঁর ওখানে কয়েকদিন ছিলাম। সানু-সান, কুসুমোতো-সান, আরাই-সান এবং অনেকগুলি আমাদের পূর্ব্বকার বন্ধু মিলে' আমাদের যত্ন কর্‌ছেন।

তাইকান-সানের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। বাড়ীটি বেশ সুন্দর। একটি চালা-ঘরের মধ্যে একটা গর্ত্ত করে' তাতে ধুনি জ্বালিয়ে তার চতুর্দ্দিকে সকলের বস্‌বার জায়গা করেছেন, বাড়ীটি ছবির মত। বড় অমায়িক লোক। আপনাদের কথা শুনে' আহ্লাদিত হ'য়ে উঠ্‌লেন, সকলের কথা একে-একে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন। তাইকান-সানের শরীর বড় খারাপ হয়েছে—অত্যন্ত মদ খাওয়ায়

শরীর ভেঙে পড়েছে। এখানকার প্রায় সকলেই একটি-একটি ছোট-খাট মাতাল বল্‌লেই হয়। তাইকান-সান সম্প্রতি একখানি ছবি শেষ করেছেন; তারএকটা ফোটো দিয়েছেন। এঁর শরীর ভাল হ'লে আগামী বৎসর ভারতে যাবার বিশেষ ইচ্ছা আছে বল্‌লেন; সঙ্গে পনর-যোল জন আর্টিষ্ট নিয়ে যাবেন। এঁরা সব বিজুতুইন সোসাইটির আর্টিষ্ট। ইনি আমাদের ছবির একটি এক্‌জিবিশন এখানে করতে চান—এবৎসরই করতে চান। ছবিগুলি তথা হ'তে আগষ্ট মাসের প্রথমে পাঠান দরকার—বড় তাড়াতাড়ি হবে। আর এক সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি পাঠালেও হয়। এক্‌জিবিশনের মত ছবি হবে কি না জানি না।—এ বৎসর হবে কি না বল্‌তে পারি না। যদি সম্ভব হয় আপনি তাইকান-সানকে একটা টেলিগ্রাম করে দেবেন।

আমরা এখান হ'তে ২১শে জুন ছাড়ব। মাঝ-পথে যাভা হ'য়ে যাব। কালিদাস বাবু যাভায় থাকবেন। আমরা তিনজন ফির্‌ব—আগষ্ট মাসের গোড়ায় কি মাঝামাঝি ফির্‌ব।

আমাদের শরীর বড় জখম হ'য়ে গেছে—সদাই ছুটো-ছুটি করতে হচ্ছে—বড় তাড়াতাড়ি দেখা হচ্ছে এত তাড়াতাড়ি দেখা অভ্যাস না থাকায় একটু অসুবিধা হচ্ছে।

এ-দেশটা ঠিক বাংলা দেশের মত—তবে বেশীর ভাগ পাহাড়—বোধ হয় মণিপুরের মত; লোকেরাও মণিপুরের মত বড় মিশুক। কিন্তু কোন জিনিস শেখাবার ইচ্ছা এদের বিশেষ নেই।

এখানে এসে তাইকান-সানকে দেখে' মন বড় খুসী হয়েছে।

গুরুদেব ভাল আছেন, তবে বড় ধকল যাচ্ছে, উনি তাই সইছেন—আশ্চর্য্য সহ্য করবার শক্তি।

সেবক
শ্রী নন্দলাল বসু

কয়েকটি বেহারী ছড়া ও তাদের তর্জ্জমা

শ্রী সুনির্ম্মল বসু

হারামণি বিভাগে অনেক সুন্দর ভাব-দ্যোতনা পূর্ণ বাংলার গ্রাম্য ছড়া ও গান বার হয়েছে। এ-গুলি বাস্তবিকই বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্‌। নিরক্ষর অথবা কেবল পাঠশালা-পড়া অজ-পাড়াগেয়ে লোকই ঐ-গুলির রচয়িতা। বেহার-প্রদেশের গ্রামে-গ্রামেও মুখে মুখে প্রচলিত অনেক সুন্দর-সুন্দর গান ও ছড়া শুনতে পাওয়া যায়। সেগুলিও ভাব-বৈভবে বড় কম নয়। এখানে আমি সামান্য কয়েকটি নমুনা দেব। হিন্দি-অনভিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকার সুবিধার জন্য বাংলাতেও তর্জ্জমা করে' দিলাম।

ধান কাটতে কাটতে একসঙ্গে সুর করে' মেয়ের দল হয়ত গান ধরেছে—

আধা রাতি অগেলি
পহর রাতি পিছলি
ভিনুসরি পিয়া ছোড়ি গেল গোই—
জন্মে জন্মে পিয়া গেলে
কুস্‌রা জনমি বন ভেল গোই—
জৈ সেহি সাপবা ছুড়ালে কচুরিয়া
তেসহি পিয়া ছোড়ি গেল গোই—

বাংলা,—

অর্দ্ধ রাতি অতীত হ'ল,
রইল বাকি অর্দ্ধ রাত,
উষায় প্রিয় আসর ছেড়ে
উধাও হ'ল অকস্মাৎ।

যেখান দিয়ে গেল প্রিয়
সেথায় নিবিড় কুশের বন,
সাপের খোলস-ত্যাগের মত
ত্যজ্‌ল আমায় আপন জন।

ধান কাটা হয়ত শেষ হয়েছে। ধানের বোঝা মাথায় করে' পথ চল্‌তে-চল্‌তে তারা আবার গান ধরেছে—

জেঠ্‌রে বৈশাখে পূতা
শুতি বৈঠি রহলে,
ভরলে ভদোইয়া বেটা
কৈসন বরদোংগবা।

বাংলা,—

বৈশাখ আর জ্যৈষ্ঠে বাছা
শুয়ে বসে' থাক্‌লি হায়,
ভাদ্র এল এখন তবে
বউ আন্‌বি কোন্ উপায় ?

মনে করুন অনেকখানি পথ তাদের হাঁটতে হবে। সুর-ফের্তায় আবার আর-একটা বড় গান তারা আরম্ভ করলে—

রতিকে সপনবা ববুয়া
কহকে শুনবা
ভেলহি বিহান ববুয়া
ভেল ঝল্‌মলিয়া।

বৈঠি গেলা ববুয়া
অম্বাকে টেহনবা
অম্বা এহি সপনলিয়ো—
রাণী সিঁদুরমতী
মাগে হো গবনবা।

বাংলা,—

(মা যেন ছেলেকে বল্‌ছে).
রাত্রিকালের স্বপ্ন বাছা
বলে' আমায় শোনাও ঠিক্,—
প্রভাত হ'ল দ্যাখ্‌রে যাদু
ঝল্‌মলিয়ে উঠ্‌ল দিক্।
বস্‌ল ছেলে মায়ের কোলে
বল্‌লে—স্বপন্ শোন্‌রে শোন্
—রাজার-রাণী সিঁদুরমতীর
আস্‌তে ঘরে চাচ্ছে মন।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। রাস্তার দুই পাশে শাল-বনে শিয়াল ডাকৃছে। মেয়ের দল গলা আরো চড়িয়ে দিলে,—

কেতনে কহলে মাতা
একোন সম্‌ঝলে
রাজবা নারায়ণ সিংঘ
চল্‌লে গবনবা।

বাংলা,—

কতই মাতা বলেন তারে
—'কিছুই নাহি বুঝিস্ হায়'—
নারায়ণ সিং রাজা তবু
বধূরে তার আন্‌তে যায়।

এসব মেয়েদের পথ-চলার গান। আমাদের যেমন ভাই-ফোঁটা, ভাইয়ের মঙ্গলের জন্য ওদেশের মেয়েরা তেম্‌নি 'করমা'-উৎসব করে। সন্ধ্যা-বেলা ছেলে-মেয়েদের বাড়ীতে ঘুম পাড়িয়ে রেখে সবাই এসে করমা-উৎসবে যোগ দিয়েছে, আর সুর করে' গান ধরেছে—

করম পূজানে গেলে গোই
সাঁঝকে বেরি—
শুতা বালক ছোড়ি
আইলি গো সাঁঝকে বেরি।

বাংলা,—

সাঁঝের বেলা গেলাম মোরা করম-উৎসবে—
রেখে এলাম সন্তানদের ঘুম পাড়িয়ে সবে।
এলাম মোরা সন্ধ্যা যখন নাম্‌তেছিল নভে।

মেয়েরা দল বেঁধে নদী কিম্বা দীঘিতে জল আন্‌তে যায়। পায়ে বাঁকা মল আর হাতের কাঁচের চুড়ি বাজে ঝনাৎঝন্—ঝিনিক্ ঝিন্। করুণ সুরে তারা গান ধরে—

হো নদীয়া নাহলে হেরা গেলে কাঙ্‌না—
হেরা গেলে কাঙ্‌না—হেরা গেলে কাঙ্‌না—
কে হো যে খোজি দেতো ভাইকে কাঙ্গনুয়া,
উস্‌কো ইলাম দেব এ নব যৌবনয়া।

বাংলা,—

নদীর জলে নাইতে গিয়ে হারিয়ে গেছে কঙ্কণ—
হারিয়ে গেছে কঙ্কণ রে, হারিয়ে গেছে কঙ্কণ—
যে কেহ খুঁজ্‌বে তারে করব রে সমর্পণ
নবীন আমার যৌবন।

ছোকরার দল কাঠি বাজিয়ে গান ধরে—

নদী-কিনারে বগুলা বৈঠে
মছ্‌লি চুনি' চুনি' খায়—
সিঙ্গি মছ্‌লিয়া কাঁটা গারওয়ে
তরপি তরপি উজয়া যায়। ... ...

বাংলা,—

নদীর পাড়ে বগা-মামা বেছে বেছে মৎস্য খায়,
শিঙ্গী মাছের বিঁধ্‌ল কাঁটা ছট্‌ফটিয়ে প্রাণটা যায়।

যৌবন-ধন্যা নারীকে ওদেশের লোকেরাও অনেক উঁচুতে স্থান দিয়েছে—

একতো চিক্‌না পিপরকে পাতিয়া
দোস্‌রা চিক্‌না ঘি
ওহুসে চিক্‌না গরিয়ো যৌবনয়া।

বাংলা,—

একেই চিকণ বটের পাতা,
আরো চিকণ ঘি,
তারো চেয়ে আরো চিকণ
পূর্ণ যুবতী।

এখানে চিকণ মানে চেক্‌নাই। সারাদিন খেটে বিকেল বেলার দিকে শ্রান্ত বালক-বালিকার দল ছাদ পিটোতে পিটোতে গান ধরে—

এক্ দো তিন
দেখো বাবু দিন
গরম্ গরম্ লোটি
দে বাবু ছুট্টি।

ওদের বলার উদ্দেশ্য—একটা, দুটো, তিনটে গেছে, আমাদের ছুটির সময় হ'য়ে এসেছে—'হে বাবু উঠে ছুটি দে, বাড়ী গিয়ে গরম গরম রুটি খেয়ে শ্রান্তি দূর করি।'

হাটের বার ছুটির দিন পুরুষ আর মেয়েরা মিলে' বাঁশী আর মাদলের সঙ্গে ঝুমুর নাচ জুড়ে' দ্যায়। পুরুষেরা বাজায় বাঁশী আর মাদল, আর মেয়েরা হাত-ধরাধরি করে' নাচে। অনেক ঝুমুর-গানের মধ্যে ওরা বাংলা এনে একেবারে জগা-খিচুড়ী পাকিয়ে তুলেছে। এ অবশ্যি সহরের ঝুমুর। যেমন—

নদীয়ামে আইল বান্—
পার কর ভগবান্,
স্বামীর সঙ্গে আসাম চলি যাব।

কিন্তু গ্রামের ঝুমুরে বাংলা কথা মোটেই এসে পড়েনি—

কে মোরা যায়েতে পূরব বনিজবা
কে হোরে লানত হারে যো গোই
একলে কন্‌হাইয়া বিনা।

শ্বশুরা যে যায়তো পূরব বনিজবা
সৈঁয়া লানত হারে যা গোই
একলে কন্‌হাইয়া বিনা। ইত্যাদি—

বাংলা,—

পূর্ব্বদেশে বাণিজ্যেতে যাবে কে আমার ?
কে আন্‌বে আমার তরে একটি ছড়া হার ?
বধূ বিনা একা একা যেতে হ'বে তার।
তোমার শ্বশুর যাবে পূবে বাণিজ্যেতে তার ;
স্বামী তোমার আস্‌বে নিয়ে একটি ছড়া হার।
একলা যাবে, বধূ নাহি সঙ্গে যাবে তার। ইত্যাদি।

প্রবন্ধ ক্রমেই বড় হ'য়ে যাচ্ছে বলে' আজ এইখানেই চুপ্ করলাম। তা ছাড়া পাঠক-পাঠিকাদের ধৈর্য্যচ্যুতিরও বিশেষ সম্ভাবনা।

[এই বিভাগে চিকিৎসা ও আইন-সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে যাঁহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বোত্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। যাঁহাদের নামপ্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাঁহারা লিখিয়া জানাইবেন। অনামা প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না। একটি প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের এক-পিঠে কালিতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিয়া পাঠাইলে তাহা প্রকাশ করা হইবে না। জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ করা সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত। যাহাতে সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্‌দর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত, যাহার মীমাংসায় বহু লোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতূহল বা সুবিধার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংসা পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দাজী না হইয়া যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রশ্ন এবং মীমাংসা দুয়েরই যাথার্থ্য-সম্বন্ধে আমরা কোনরূপ অঙ্গীকার করিতে পারি না। কোন বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোন জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছাধীন—তাহার সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনরূপ কৈফিয়ৎ আমরা দিতে পারিব না। নূতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন করিয়া সংখ্যাগণনা আরম্ভ হয়। সুতরাং যাঁহারা মীমাংসা পাঠাইবেন, তাঁহারা কোন্ বৎসরের কত-সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন।]

জিজ্ঞাসা

(২০)

কলাতলায় বিবাহ

বিবাহের অনুষ্ঠান কদলীতরু-বেষ্টিত মণ্ডপে করিতে হইবে এমন কোনো শাস্ত্রীয় অনুশাসন আছে কি ?

(২১)

চণ্ডালের হাড়

বাজিগরেরা চণ্ডালের হাড় ঠেকাইয়া ভেল্কী দেখায়। চণ্ডালের হাড়ের অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাসের হেতু কি ?

(২২)

রাহু চণ্ডাল

রাহুকে চণ্ডাল বলা হয়। কোন্ শাস্ত্রের উক্তি অনুসারে ও কেন ?

(২৩)

বিবাহের পর কালরাত্রি

বিবাহের পররাত্রিকে কালরাত্রি বলে; সে-রাত্রে বরবধূর সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ। কোন্ শাস্ত্রের বিধানে ?

(২৪)

পৌষ মাসে যাত্রা নিষেধ

পৌষ মাসে যাত্রা করিতে নাই। কাহার নিষেধ ?

(২৫)

দিল্লি

দিল্লি নগরের প্রাচীনতম উল্লেখ কোথায় পাওয়া যায়? কাহার প্রতিষ্ঠিত নগর ও নাম দিল্লি কেন ?

(২৬)

মনকাকরের কাঁটা

মনকাকর কি-রকম গাছ ?

(২৭)

কুড়া পাখী ও তেউর পাখী

কুড়া পাখী ও তৈউর পাখী কিরকম ?

(২৮)

চৈতার বউ

পাপিয়া পাখীর নাম চৈতার বউ হওয়ার উপাখ্যান কি ?

(২৯)

কার্ত্তিকের মতন সুপুরুষ

সুপুরুষকে কার্ত্তিকের সহিত তুলনা করা হয়। কার্ত্তিক যে সকল দেবতা অপেক্ষা সুশ্রী এই বিশ্বাসের মূল ও প্রমাণ কি ?

(৩০)

ফুলদোল

বৈশাখ মাসের পূর্ণিমায় ফুলদোল হয়। কোন্ শাস্ত্রের বিধি-অনুসারে ?

(৩১)

ময়মনসিংহের বাক্যাবলী

(ক) বউগড়া লইল মায় পিড়িতে বসিয়া।

বিবাহের অনুষ্ঠানের সময় মা বউগড়া লইলেন। বউগড়া কি ?

(খ) করিবা আমার কাজ হইয়া সামিনা (সাবধান ?)।

সামিনা শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি কি ?

(গ) শিরে রক্ত উঠে কন্যার অন্তর বাগুনি।

বাগুনি কি ?

(ঘ) এক এক বড়ীর দাম পাঁচ খুরি কড়ি।

এই ঘাটে খেয়া করি, দেন প্রতি নয় খুরী

দিবে ত উচিত খেয়া করি।

খুরি বা খুরী মানে কি ও ব্যুৎপত্তি কি ?

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

—

মীমাংসা

(৮৭)

দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা—এই সম্বন্ধে একখানি পুস্তকে একটি প্রবন্ধ পড়িয়াছিলাম। পুস্তকখানির নাম মনে নাই। যাহা হউক উক্ত প্রবন্ধের বিষয় এই যে আকবরের সময়ে মহেশ ঠাকুর-নামক একজন সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিতের রঘুনন্দন মিশ্রনামে এক সুধী ছাত্র ছিলেন। তিনি পাঠ-সমাপনান্তে গুরুদক্ষিণা দিবার মানসে বহু ধনীর দ্বারে অনর্থক ঘুরিয়া অবশেষে ফতেপুর সিক্‌রিতে বিদ্বজ্জনৈক-শরণ্য মহামতি আকবরের শরণাপন্ন হন। রঘুনন্দনের সহিত আকবরের সভাস্থ পণ্ডিতগণ শাস্ত্রীয় আলাপ করিয়া চমৎকৃত হন। সম্রাট ও সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করেন—

দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা
মনোরথান্ পূরয়িতুং সমর্থঃ।
অন্যেন কিঞ্চিৎ ধনিকেন দত্তন্
শাকায় বা স্যাৎ লবণায় বা স্যাৎ॥

বলা বাহুল্য গুণগ্রাহী সম্রাট রঘুনন্দনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। ত্রিহুত জেলার হাটী পরগণার অন্তর্গত যে-সম্পত্তি রঘুনন্দনকে আকবর দান করেন, তাহা অদ্যাপি মহেশঠাকুরের বংশধরগণ ভোগ করিতেছেন।

শ্রী কালিদাস ভট্টাচার্য্য

(৯৮)

ডবাক রাজ্যের ডবাক নামই এখনও বর্ত্তমান আছে। বীরভুম জেলার গর্ভবাস (বীরচন্দ্রপুর) ও তারা-পীঠের : বা ডাবুক-নামে একটি গ্রাম আছে। ঐ গ্রামে ডাবুকেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। এই ডাবুক-গ্রামই সমুদ্রগুপ্তের ডবাক বলিয়া অনুমান হয়। ডবাক-নামে আর কোন স্থান নাই। শ্রী—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঢাকাকে ডবাক বলেন (বাঙ্গলার ইতিহাস দ্বিঃ সং ৫০ পৃষ্ঠা) এবং শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কাছাড়ের পূর্ব্বদিকে ডবাক বলিয়াছেন ইহা ঠিক নহে। ঢাকা সমতটে। সমুদ্র গুপ্তের এলাহাবাদ-লিপির ২২ পংক্তিতে সমতট ও ডবাক উভয় নামই আছে। কাছাড়ের নিকটও ডবাক নামে কোন স্থান নাই। সুতরাং বীরভূমে ডবাক-নামে স্থান থাকায় অন্যত্র ডবাকের কল্পনা করার আবশ্যকতা দেখা যায় না।

শ্রী বিনোদবিহারী রায়

(১০০)

"—গৃহং প্রবিশেয়ুর্দ্দিবা চেদ্দাহস্তদা রাত্রৌ রাত্রৌ চেদ্দাহস্তদা দিবসে গ্রামপ্রবেশঃ। অশক্তৌ ব্রাহ্মণানুমতিং গৃহীত্বা কাল প্রতীক্ষণং বিনা প্রবিশেয়ুঃ—" ইতি শুদ্ধিতত্ত্বে।

দিবসে দাহ হইলে রাত্রিতে এবং রাত্রিতে দাহ হইলে দিবসে গ্রাম প্রবেশের শাস্ত্রীয় বিধি। অশক্ত হইলে বিধি-নির্দ্দিষ্ট কালের পূর্ব্বেও ব্রাহ্মণানুমতি লইয়া গ্রাম-প্রবেশ করা যায়।

শ্রী কালিদাস ভট্টাচার্য্য

(১২৫)

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ—অনেকানেক সুধীজন এই শ্লোক পাদের বহুবিধ অর্থ করিয়াছেন; আমরা উহার নিম্নলিখিতরূপ অর্থ করি। স্বধর্ম্ম অর্থে আমরা বুঝি আত্মজ্ঞানরূপ ধর্ম্ম আর পরধর্ম্ম অর্থে বুঝি প্রকৃতি-ধর্ম্ম। এক্ষণে এই পরধর্ম্ম বা প্রকৃতি-ধর্ম্মাপেক্ষা স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠেয় কেন তাহা শঙ্করাচার্য্যকৃত গীতার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাতেই পাওয়া যায়। বেদোক্ত ধর্ম্ম দুইপ্রকার, প্রবৃত্তি লক্ষণ ও নিবৃত্তি-লক্ষণ; এই ধর্ম্ম জগতের স্থিতির কারণ ও মুক্তির হেতু। দুঃখ-পূর্ণ সংসার হইতে নিবৃত্তিরূপ নির্ব্বাণ-মুক্তিই এই গীতা-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। এই মুক্তি আত্মজ্ঞানরূপ ধর্ম্ম ও সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ হইতে উদ্ভূত হয়। ভগবানও এই গীতার্থ-ধর্ম্ম উদ্দেশ করিয়া অনুগীতাতে বলিয়াছেন, ব্রহ্মপদ যে নির্ব্বাণ-মুক্তি, তল্লাভই সুপর্য্যাপ্ত ধর্ম্ম এবং সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ-রূপই জ্ঞান। বর্ণাশ্রম-উদ্দেশে অভ্যুদয় সাধক (স্থিতির কারণ) যে প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম (প্রকৃতি ধর্ম্ম বা পরধর্ম্ম) দেবাদিস্থান-প্রাপ্তির নিদান হইলেও ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ও ফলাভিসন্ধিবর্জ্জিত বলিয়া সত্ত্বশুদ্ধির নিমিত্ত হইয়া থাকে। শুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তির জ্ঞান-নিষ্ঠার যোগ্যতা ও জ্ঞানোৎপত্তির হেতুদ্বারা নির্ব্বাণমুক্তি লাভ হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, নির্ব্বাণমুক্তিদায়ক আত্মজ্ঞানরূপ ধর্ম্মই অনুষ্ঠেয়, কেননা উহাই সুপর্য্যাপ্ত ধর্ম্ম, অন্যত্রও ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

শ্রী কালিদাস ভট্টাচার্য্য

(১৩।১২র)

ষড়যন্ত্র—চক্রান্ত; দেশজ শব্দ, আভিধানিক নহে।

"—সম্ভবতঃ শব্দটি এইরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকিবে, যথা—দেহমধ্যে ছয়টি প্রধান চক্র আছে, তাহাদিগকে ষট্‌চক্র বলে। উহারা যখন একভাবে থাকে, তখন মনুষ্যের শারীরিক বা মানসিক স্বাভাবিক অবস্থার বিপর্য্যয় সহজে হয় না, এবং উহাদের বিষয়ও সুনিষ্পন্ন হয়। অথবা উহাদের কার্য্য গুপ্তভাবেই হইয়া থাকে, এইজন্য এই কথাটিতে গুপ্ত মন্ত্রণা বুঝায়"। সুবল মিত্রের বাঙ্গলা অভিধান

শ্রী কালিদাস ভট্টাচার্য্য

তন্ত্রের শান্তি, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষ, উচ্চাটন, মারণ, এই ছয় যন্ত্র ষড়যন্ত্র। রায়বাহাদুর যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির শব্দকোষ।

গান

শ্রাবণ বরিষণ পার হ'য়ে
কি বাণী আসে ওই র'য়ে র'য়ে—
গোপন কেতকীর পরিমলে,
সিক্ত বকুলের বনতলে,
দূরের আঁখি-জল ব'য়ে ব'য়ে।
কি বাণী আসে ওই র'য়ে র'য়ে।

কবির হিয়া-তলে ঘুরে' ঘুরে'
আঁচল ভ'রে লয় সুরে সুরে।
বিজনে বিরহীর কানে কানে
সজল মল্লার গানে গানে
কাহার নামখানি ক'য়ে ক'য়ে…
কি বাণী আসে ওই র'য়ে র'য়ে!

(শান্তিনিকেতন-পত্রিকা, শ্রাবণ।) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

—

চীনদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক

বৌদ্ধধর্ম্ম চীনদেশে প্রচারিত হইবার পর চীন ও ভারতবর্ষের মধ্যে ...র আদান-প্রদান আরম্ভ হয়। বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু চীন দেশ হইতে ...তে আগমন করেন, আবার বহু ভারতবর্ষীয় ভিক্ষু চীনদেশে যাইয়া ...কাল বসবাস করেন। তখনকার দিনে চীন ও ভারতবর্ষের মধ্যে ...য়াতের পথ সুগম ছিল না, বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ...য়া ২০।২৫ জন গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারিত কি না ...হ, অবশিষ্ট পথিমধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইত। দুস্তর বাধা-...ত্তি সত্ত্বেও যাঁহারা জীবনের মায়া তুচ্ছ করিয়া কেবলমাত্র ...জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্তির আকাঙ্ক্ষায় প্রণোদিত হইয়া ভারতবর্ষ অথবা ...দেশে গমনাগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সর্ব্বজন-বরেণ্য ও জগতের ...হাসে চিরস্মরণীয়। আজ কয়েকটি অজ্ঞাত অখ্যাত চীনদেশীয় ...ব্রাজকের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতেছি। ফা-হিয়ান, হুয়েন সাং ... ইং-সিংয়ের ন্যায় ইঁহারা প্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই কিন্তু ...রাও অনুরূপ মহৎ উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত হইয়াই ...তবর্ষের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। অনেকেই দুস্তর ...মধ্যে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন—কয়েকজন মাত্র ভারতবর্ষে ...ছিয়াছিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক ইৎসিং ইঁহাদের আখ্যান সযত্নে সংগ্রহ ...রিয়া তাঁহাদের নাম বিস্মৃতির কবল হইতে রক্ষা করিয়াছেন। ...সিংয়ের গ্রন্থের নাম "যেসকল ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মা তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য ...শ্চম দেশে (অর্থাৎ ভারতবর্ষে) গমন করিয়াছিলেন তাঁহাদের ...বনী।" এই গ্রন্থে প্রায় ষাটজন বৌদ্ধ ভিক্ষুর কাহিনী দেখিতে ...ওয়া যায়। ইঁহারা সকলেই খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ ও মূল বৌদ্ধ ধর্ম্মনীতির অনুসন্ধানে ভারতবর্ষ-অভিমুখে যাত্রা করেন। সুতরাং ইঁহারা সকলেই ইৎসিংএর সমসাময়িক। যে ষাটজন ভিক্ষুর জীবনী ইৎসিং লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সংক্ষেপতঃ তাহাদের মধ্যে বিশিষ্ট বর্ণনা করিব, ও প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য ঐতিহাসিক তথ্যের আলোচনা করিব। এই ভিক্ষুগণের চীনদেশীয় নামের সঙ্গে অনেকস্থলে সংস্কৃত নামও আছে।

১। প্রকাশমতি (ইউয়েন-চাও)

চীনদেশের তই প্রদেশে ইহার জন্ম। বাল্যকালেই ইনি সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু-ব্রত গ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মূল ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন-মানসে ইনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িতে পড়িতে সর্ব্বদাই শ্রাবস্তীর জেতবনের (১) চিত্র ইঁহার মানসপটে সমুদিত হইত। অবশেষে একদিন জন্মভূমির নিকট বিদায় লইয়া খখর (২) হস্তে তিনি ভারতবর্ষ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সীমাহীন মরুভূমি ও দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া ও দৈবকৃপায় দস্যুদলের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া তিনি তিব্বতে উপস্থিত হন। এই সময়ে চীনদেশীয় এক রাজকন্যা (৩) তিব্বতের রাণী ছিলেন—তাঁহার সাহায্যে তিনি ভারতবর্ষের জালন্ধর-প্রদেশে উপস্থিত হন। এখানে তিনি চারি বৎসর পর্য্যন্ত সংস্কৃত বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। জালন্ধরের রাজা তাঁহাকে অত্যন্ত সমাদর করেন। অতঃপর তিনি গয়ার মহাবোধি-বিহারে গমন করেন এবং সেখানেও চারি বৎসর বাস করেন। এখানে মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের একটি অতি সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি ছিল, তাহাকে দেখিলে জীবন্ত মানুষ বলিয়া ভ্রম হইত। অতঃপর তিনি নালন্দা-বিহারে তিন বৎসর কাল জিনপ্রভ ও রত্নসিংহের নিকট মধ্যমক শাস্ত্র, শতশাস্ত্র ও যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অতঃপর ভিক্ষু প্রকাশমতি গঙ্গানদী পার

---

(১) শ্রাবস্তীর বিখ্যাত জেতবন উদ্যান অনাথপিণ্ডদ নামক এক ধনাঢ্য বণিক্ বুদ্ধদেবকে দান করেন। বুদ্ধদেব বহু-বর্ষ তথায় সশিষ্য বাস করেন এবং তাঁহার অনেক ধর্ম্মোপদেশ ঐ স্থানেই উচ্চারিত হয়। এই নিমিত্ত জেতবন বৌদ্ধগণের নিকট পরম পবিত্র তীর্থস্থান। সম্প্রতি শ্রাবস্তী ও জেতবনের ধ্বংসাবশেষ ভারতীয় পুরাতত্ত্ব-বিভাগ কর্ত্তৃক ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত ও সংরক্ষিত হইয়াছে। ইহা অযোধ্যা-প্রদেশের অন্তর্গত এবং সাহেত্ মাহেত্ নামে খ্যাত।

(২) ভিক্ষুগণের ব্যবহৃত যষ্টি বিশেষ। ইহার মাথা টিন দিয়া ঢাকা এবং তাহাতে কয়েকটি টিনের কড়া লাগান থাকিত।

(৩) ৬৩৪ খৃঃ অব্দে তিব্বতের সুপ্রসিদ্ধ রাজা স্রংস্তান্ গ্যাম পো চীনদেশীয় এক রাজকন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য চীনদেশের রাজার নিকট প্রার্থনা করেন। চীনরাজ তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করায় তিনি চীনদেশ আক্রমণ করেন। তিনি যুদ্ধে পরাজিত হন কিন্তু চীনরাজ তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ করেন। ৬৪১খৃঃ অব্দে রাজকুমারী ওয়েনৎ চেঙ্গএর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি নেপালের এক রাজকন্যাকেও বিবাহ করেন। এই দুই বৌদ্ধ রাণীর সহায়তায় তিনি তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করেন। স্রংস্তান্ গ্যাম পো ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া কতকাংশ জয় করেন (বিস্তৃত বিবরণ সিল্ভাঁ লেভি-প্রণীত নেপালের ইতিহাসে দ্রষ্টব্য)।

হইয়া চন-পু (জম্বু কিংবা শম্ভু) (৪) নামক নরপতির রাজ্যে উপনীত হন এবং বিশেষরূপে সমাদৃত হন। এখানে সিন্-চে-নামক মন্দিরে এবং অন্যান্য মন্দিরে তিন বৎসর কাল অতিবাহিত করেন।

ইতিমধ্যে চীন দেশীয় রাজদূত ওয়াঙ্গ-হিউয়েন-সে (৫) ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া প্রকাশমতির গুণাবলীর কথা বিবৃত করিলে রাজা উক্ত ভিক্ষুকে ফিরাইয়া আনিবার নিমিত্ত তাহাকেই প্রেরণ করেন। প্রকাশমতি নেপাল ও তিব্বতের মধ্য দিয়া চীনদেশে প্রত্যাগমন করেন এবং ৬৬৪ খৃঃ অব্দে লো যং নামক রাজধানীতে উপনীত হন। এখানে তিনি স্থানীয় ভিক্ষুগণের নিকট বৌদ্ধশাস্ত্রের সারমর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করেন এবং তাহারা তাঁহাকে সর্ব্বাস্তিবাদ বিনয়ের অনুবাদ করিতে অনুরোধ করেন। এমন সময়ে চীন সম্রাট তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন এবং আয়ুষ্মান্ লোকায়ত (?) নামক ব্রাহ্মণকে (৬) কাশ্মীর হইতে আনয়ন করিবার জন্য অনুরোধ করেন। কারণ এই ব্রাহ্মণ অমরত্ব লাভ করিবার ঔষধ জানিতেন।

রাজাজ্ঞায় প্রকাশমতি আবার ভারতবর্ষ যাত্রা করিলেন। আবার পর্ব্বত ও মরুভূমি পার হইয়া দুইবার দস্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া তিনি সীমান্ত প্রদেশে পৌঁছিলেন। পথিমধ্যে লোকায়তের সহিত দেখা হইল, তিনি চীন-রাজদূতের সঙ্গে চীনদেশ-অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। তখন লোকায়ত সকলকে লইয়া অমরত্ব লাভ করিবার ঔষধ আনিবার জন্য লুয়ো চা (লডক ?) নামক স্থানে যাত্রা করিলেন। ক্রমে ক্রমে কপিশ ও সিন্ধুদেশের মধ্য দিয়া তাঁহারা লডকে পৌঁছিলেন। তথাকার রাজা পরম সমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং তিন চারি বৎসর কাল তথায় বসবাস করেন। অতঃপর তিনি দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়া অনেক ঔষধ-পত্র সংগ্রহ করেন। তথা হইতে বজ্রাসন হইয়া নালন্দা মহাবিহারে উপস্থিত হন। কিন্তু তিনি আর দেশে ফিরিয়া যাইতে পারিলেন না, কারণ নেপালের পথে তিব্বতীয়েরা ও কপিশের পথে আরবেরা বিষম বাধা উপস্থিত করিল। প্রকাশমতি আশা করিয়াছিলেন যে, চীনদেশে ফিরিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃত তথ্যসমূহ জনসমাজে প্রচার করিবেন কিন্তু তাঁহার আশা-পূরণ হইল না। অনেকদিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া অবশেষে ভগ্ন-হৃদয়ে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

২। শ্রীদেব (তও-হি)

ইনিও স্থলপথে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং মহাবোধি, নালন্দা কুশীনগর প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করেন। স্যান-মুও-লুও-পো-নামক স্থানের (৭) রাজা তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। তিনি নালন্দা বিহারে মহাযান শাস্ত্রও কুশীনগরের নিকটবর্ত্তী 'শুভবন' বিহারে বিনয়পিটক অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি শব্দবিদ্যা শিক্ষা করেন। তিনি একজন সাহিত্যিক ছিলেন।

* * * *

৩। চ্যাং মিন—

ইনি সমগ্র প্রজ্ঞাশাস্ত্র লিপিবদ্ধ করিতে মনস্থ করিয়া জলপথে ভারতবর্ষে যাত্রা করেন। প্রথমে তিনি হো-লিং অর্থাৎ যবদ্বীপের পশ্চিমভাগে উপস্থিত হন। সেখান হইতে জলপথে মো-লোউও-যু অর্থাৎ প্যালেম্বাং-এ উপস্থিত হন। সেখান হইতে এক বণিকের জাহাজে ভারতবর্ষে যাত্রা করেন। জাহাজখানি খুব মালপত্রে বোঝাই করা ছিল। গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার অনতিকাল পূর্ব্বে ভীষণ ঝড় উঠিল। তখন জাহাজ রক্ষা অসম্ভব দেখিয়া সকলেই তাড়াতাড়ি জাহাজ সংলগ্ন জালিবোটে উঠিয়া প্রাণ বাঁচাইতে ব্যগ্র হইল। জাহাজের মালিক স্বয়ং বৌদ্ধ ছিলেন, তিনি ভিক্ষু চ্যাংমিনকে জালিবোটে উঠিয়া প্রাণ বাঁচাইতে বলিলেন কিন্তু ভিক্ষু রাজি হইলেন না, বলিলেন "অন্য লোককে বাঁচাও আমার জীবন রক্ষার আবশ্যক নাই।" তারপর পশ্চিমদিকে ফিরিয়া যুক্ত করে তিনি ভগবান বুদ্ধের উপাসনা করিতে লাগিলেন। জাহাজ ডুবিল সঙ্গে সঙ্গে এই মহাপ্রাণ ভিক্ষু জগতে বৌদ্ধধর্ম্মের অতুল মহিমা ঘোষণা করিয়া পরহিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে এক শিষ্য ছিল, তিনিও গুরুর আদর্শ অবলম্বন করিয়া জীবন বিসর্জ্জন দিলেন।

৪। মহাযান-প্রদীপ (তাং চেং তেং)

বাল্যকালে পিতামাতার সঙ্গে ইনি জলপথে দ্বারাবতী রাজ্যে (৮) আসিয়াছিলেন। তৎপর তিনি চীনে প্রত্যাগমন করিয়া বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কিছুকাল পর তিনি জলপথে সিংহলে উপস্থিত হন, সিংহল হইতে দাক্ষিণাত্যের মধ্য দিয়া তিনি তাম্রলিপ্তি অভিমুখে যাত্রা করেন, এইখানে নদীর মোহানায় দস্যুরা তাঁহার নৌকা আক্রমণ করিয়া লুট পাট করে। তিনি কেবলমাত্র প্রাণে বাঁচিয়া কোন ক্রমে তাম্রলিপ্তি পৌঁছেন। তথায় দ্বাদশ বৎসর পো-লুও-হো (বরাহ ?) মন্দিরে বাস করিয়া সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এখানে ইৎ-সিংএর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়।

৫। সংঘবর্ম্ম

ইঁহার বাসস্থান সমরখন্দ (৯)। যৌবনেই ইনি চীনদেশে গমন করেন। ৬৫৬ ও ৬৬০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে কোন সময়ে ইনি চীন সম্রাটের দূতের সঙ্গে ভারতবর্ষে আগমন করেন। বৌদ্ধ গয়ায় উপস্থিত হইয়া বজ্রাসনের নিকটে তিনি ভিক্ষুগণের জন্য এক বিরাট্ ভোজের ব্যবস্থা করেন। তার পর সাত দিন, সাত রাত্রি ধরিয়া এক বিরাট্ বৌদ্ধসংঘের অধিবেশন হয় এবং বজ্রাসন দীপমালায় সজ্জিত হয়। সংঘবর্ম্মই ইহার সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। তারপর মহাবোধির মন্দির সংলগ্ন উদ্যানে এক অশোক বৃক্ষের পাদমূলে তিনি বুদ্ধ ও অবলোকিতেশ্বরের প্রস্তর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তথা হইতে তিনি চীনদেশে প্রত্যাগমন করেন। অতঃপর তিনি সম্রাটের আদেশে কিয়াওচে (বর্ত্তমান হ্যানয়) গমন করেন। সেখানে তখন ভয়ানক দুর্ভিক্ষ। প্রতিদিন অসংখ্য মনুষ্য ও পশু প্রাণত্যাগ করিতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া সংঘবর্ম্মের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি প্রতিদিন বুভুক্ষিত নরনারী ও পশুদিগের জন্য খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মহৎ চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া লোকে

---

(৪) রাজা জম্বু (?) কোন্ দেশে রাজত্ব করিতেন এবং সিন্ চে নামক মন্দির কোথায় ছিল তাহা ঠিক বলা যায় না। ভিক্ষু প্রজ্ঞাবর্ম্মণের জীবনী (৪১ সংখ্যা) হইতে জানা যায় যে উক্ত মন্দির স্যান-মুও-লুও-পো

(৫) ইনি হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিস্তৃত বিবরণ ভিঃ স্মিথের ইতিহাসে দ্রষ্টব্য।

(৬) লোকায়ত (অথবা লোকাদিত্য) উড়িষ্যাবাসী ব্রাহ্মণ। ইনি অমরত্ব লাভ করিবার ঔষধ জানিতেন এরূপ প্রসিদ্ধি ছিল। অমর হইবার লোভেই চীন সম্রাট্ তাঁহাকে আনিতে পাঠান। ৬৬৮ খৃঃ অব্দে তিনি সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হন এবং বিশেষ সম্মানসূচক উপাধি লাভ করেন।

(৭) ৪ পাদ-টীকা দ্রষ্টব্য।

৬। প্রজ্ঞাবর্ম্ম (হুই লুয়েন)।

(৮) দ্বারাবতী সম্ভবতঃ বর্ত্তমান শ্যাম রাজ্য। ক্রমে ক্রমে নালন্দা, বৌদ্ধগয়া, বৈশালী, কুশীনগর প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করেন। কুশীনগরে পরিনির্ব্বাণ মন্দিরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

(৯) সংঘবর্ম্মের জন্ম কোন নাম উল্লিখিত হয় নাই। ইহা হইতে অনুমান হয় যে সমরখন্দে সংস্কৃত ভাষার প্রচলন ছিল এবং হিন্দু নাম ব্যবহৃত হইত।

তাঁহাকে বোধিসত্ত্ব আখ্যা প্রদান করিল। এইখানেই ষাট বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ইনি কোরিয়ার অধিবাসী। বৌদ্ধ তীর্থসমূহ দেখিবার মানসে ইনি ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং দশ বৎসর কাল স্যান-মুও-লুও-পো (১০) নামক দেশে সিন-চে-মন্দিরে অবস্থিতি করেন।

সম্প্রতি তিনি আরও একটু পূর্ব্বে গন্ধার চণ্ড (? কিয়েন্ তু লু চং-চ) নামে একটি মন্দিরে বসবাস করিতেছেন। অনেক দিন পূর্ব্বে তুরুষ্কেরা তাহাদের দেশীয় ভিক্ষুগণের বসবাস করিবার জন্য এই মন্দিরটি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। মন্দিরটির অনেক ধন ঐশ্বর্য্য থাকায় এবং ইহার বিধি ব্যবস্থার উৎকর্ষ হেতু ইহা অন্যান্য মন্দিরের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া পরিগণিত হইত। উত্তরে তুরস্ক দেশ হইতে ভিক্ষুগণ ভারতবর্ষে আসিলে তাঁহারা এই মন্দিরে বাস করেন এবং তাঁহারা ইহার 'বিহার স্বামী' (১১) বলিয়া পরিগণিত হইতেন।

[এই তুরস্ক মন্দিরের উপলক্ষে ইৎসিং এই জাতীয় কতকগুলি বিদেশী ভিক্ষু সম্প্রদায়ের মন্দিরের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এই বিবরণ অতিশয় মূল্যবান্, কারণ ইহা-দ্বারা তৎকালে দূর দেশে দেশান্তরের ভিক্ষু সম্প্রদায়ের একত্র মিলন সূচিত হইতেছে।]

মহাবোধির পশ্চিমে গুণচরিত (কিউ ন চে-লি-তো) মন্দির। ইহা কপিশা বাসীর নির্ম্মিত এবং ঐসমুদয় অঞ্চলের ভিক্ষুরা ভারতবর্ষে আসিলে এই মন্দিরে বসবাস করে। এ-মন্দিরটিও খুব ঐশ্বর্য্যশালী। এখানে বহুসংখ্যক ধর্ম্মপ্রাণ ভিক্ষুক বাস করেন, তাঁহারা সকলেই হীনযান-পন্থী।

মহাবোধির উত্তর পূর্ব্বে কিঞ্চিদধিক দুই যোজন দূরে কিউ লু কিয়া (১২) নামে মঠ। পুরাকালে দক্ষিণ দিকে অবস্থিত কিউ-লু-টীয়া নামে দেশের রাজা ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরটি সম্পদশালী না হইলেও এখানে বৌদ্ধ ধর্ম্মের নিয়মগুলি খুব নিষ্ঠার সহিত পালিত হইয়া থাকে। সম্প্রতি রাজা আদিত্য সেন (১৩) পুরাতন মঠের পার্শ্বেই নূতন একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন, ইহা শীঘ্রই শেষ হইবে। দাক্ষিণাত্যের ভিক্ষুগণ এদেশে আসিলে বেশীর ভাগ এই মন্দিরেই বাস করেন।

প্রায় সকল দেশেরই নিজস্ব একটি মন্দির আছে। কেবল চীন দেশের কোন মন্দির নাই। ইহাতে আমাদের অনেক অসুবিধা হয়। নালন্দের কিঞ্চিদধিক চল্লিশ যোজন পূর্ব্বে গঙ্গার উপকূলে মৃগ-শিখা-বন (মি-লি-কিয়-সি-চিয়-পো-নো) নামে একটি মন্দির আছে। ইহার অনতিদূরে একটি প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইষ্টকময় ভিত্তি ব্যতীত আর ইহার বিশেষ কিছুই নাই। ইহাকে চীনা মন্দির বলে। বৃদ্ধগণের মুখে মুখে বহুকাল হইতে এই প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে প্রায় পাঁচ শত বৎসরেরও অধিক কাল পূর্ব্বে মহারাজ শ্রীগুপ্ত (১৪) (চে-লি-কি-তো) চীনদেশীয় ভিক্ষুগণের জন্য এই মন্দিরটি নির্ম্মাণ করেন। ঐ সময়ে বিংশাধিক চীন দেশীয় ভিক্ষু সং-কাও (১৫) দেশের ভিতর দিয়া মহাবোধিতে উপস্থিত হন। রাজা শ্রীগুপ্ত তাহাদের ধর্ম্মপরায়ণতায় মুগ্ধ হইয়া তাহাদিগের বাসের জন্য এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং ইহার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ২৪ খানি গ্রাম দান করেন।

কালক্রমে চীনদেশীয় ভিক্ষুরা এস্থান পরিত্যাগ করিয়াছে। তিন খানি বাদে অন্যান্য গ্রামগুলিও অন্যের হস্তগত হইয়াছে। এক্ষণে ইহা পূর্ব্ব ভারতবর্ষের অধিপতি দেব বর্ম্মণের (তি-পোউও-পো-মো) রাজ্য-ভুক্ত। তিনি প্রায়ই বলেন যে যদি চীন দেশীয় কোন ভিক্ষু এখানে আসিয়া বসবাস করেন তবে তিনি মন্দিরটির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া পূর্ব্বোক্ত গ্রামগুলি তাহার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ দান করিবেন।

বজ্রাসন মহাবোধি মন্দিরটি সিংহলের রাজা প্রস্তুত করিয়াছেন। সিংহলের ভিক্ষুগণ বহুকাল তথায় বসবাস করিতেছে।

মহাবোধি মন্দিরের কিঞ্চিদধিক সাত যোজন উত্তর-পূর্ব্বে নালন্দা মন্দির। পুরাকালে উত্তর ভারতবর্ষের ভিক্ষু (পি চু) রাজবংশের (হো লুও চে প্যান-চে) জন্য রাজা শ্রীশক্রাদিত্য (চে লি-চে-কিয়ে লুও-তিয়ে-তি) ইহা নির্ম্মাণ করেন। আদিম মন্দিরটি অতিশয় ক্ষুদ্র। মাত্র ৫০ ফুট পরিমিত বর্গভূমি ছিল। পরবর্ত্তী রাজগণ ক্রমে ক্রমে ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করায় এক্ষণে ইহা ভারতবর্ষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মন্দিরে পরিণত হইয়াছে। এই বিশাল বিহারের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ প্রদান করা সম্ভবপর নহে। আমি সংক্ষেপতঃ ইহার বিস্তৃতির একটু আভাস দিব।

[এই খানে ইৎসিং ১৩ পৃষ্ঠা ব্যাপী নালন্দার বর্ণনা ও তাহার একটি মানচিত্র সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। মানচিত্রটি এক্ষণে লুপ্ত হইয়াছে। ইৎসিংএর ভারতভ্রমণ কাহিনীতেও নালন্দার বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক কৌতুহলোদ্দীপক তথ্য আছে। এইসমুদয় একসঙ্গে অন্যত্র আলোচনা করা যাইবে]

৭। তান্ কোয়াং

ইনি সমুদ্র পথে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ক্রমে তিনি হরিকেল রাজ্যে উপস্থিত হন। হরিকেল (হো-লি-কি লোউও) পূর্ব্ব ভারতবর্ষের পূর্ব্ব সীমানায় অবস্থিত (১৬)। হরিকেল হইতে যাওয়ার পর আর তাঁহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ নদীগর্ভে অথবা পর্ব্বত-গহ্বরে তাঁহার প্রাণবিসর্জ্জন হইয়াছে।

৮। হরিকেল দেশীয় একজন ভিক্ষু আমাকে একজন চীনদেশীয় ভিক্ষুর সংবাদ নিবেদন করিল; "এই ভিক্ষুর বয়স পঞ্চাশের উপর। রাজা তাহাকে অত্যন্ত সমাদর করিতেন। তিনি একটি বিহারের সর্ব্বাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। তিনি বহু ধর্ম্ম-পুস্তক ও দেবমূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু হরিকেলেই অসুস্থ হইয়া তিনি প্রাণত্যাগ করেন এবং সেখানেই তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়।

(১০) ৪ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(১১) 'বিহার-স্বামীগণ' মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষ সম্প্রদায়। মন্দিরের ধন সম্পত্তি ও বিধি ব্যবস্থা তাবতীয় বিষয়ে তাঁহাদের সম্পূর্ণক্ষমতা থাকিত। অন্যান্য ভিক্ষুগণ কেবল গ্রাসাচ্ছাদন পাইতেন, মন্দিরের কোন বিষয়ে কোন কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিতেন না।

(১২) সম্ভবতঃ পাণ্ড্য রাজধানী কক্কাই। ইহা তাম্রপর্ণী নদীর তীরে সাগর-সঙ্গমে অবস্থিত ছিল।

(১৩) মগধের পরবর্ত্তী গুপ্ত বংশীয় সম্রাট্।

(১৪) সম্ভবতঃ গুপ্ত সম্রাটগণের আদিপুরুষ শ্রীগুপ্ত।

(১৫) এটি একটি বিশেষ মূল্যবান্ তথ্য। সংকাও চীনদেশের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। সেখান হইতে ইউনান প্রদেশের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষে যাইবার পথ ছিল। ভারতবর্ষ হইতে চীনে যাতায়াতের যত পথ আছে, তন্মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত, কিন্তু নানা অসভ্য জাতির বাস হেতু এই পথ অত্যন্ত বিপৎসংকুল ছিল। ফা হিয়ানের ভারত আগমনেরও শতাধিক বৎসর পূর্ব্বেও এই পথ দিয়া চীন দেশবাসীরা ভারতবর্ষে যাতায়াত করিত। খ্রীষ্ট পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতেও যে এই পথ ব্যবহৃত হইত, তাহার প্রমাণ বিদ্যমান আছে। সময়ান্তরে এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে।

(১৬) চীনদেশীয় মানচিত্র অনুসারে হরিকেল, তাম্রলিপ্তি ও উৎকল এই দুই দেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত। কিন্তু ইৎসিংএর বিবরণ অনুসারে ইহা পূর্ব্ববঙ্গের সহিত অভিন্ন বলিয়া অনুমান হয়।

৯। সেং-চি

ইনি সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া প্রথমে সমতট রাজ্যে উপনীত হন। এই রাজ্যের রাজার নাম হো-লু-চে পো-চ (হর্ষভট অথবা রাজভট)। তিনি ত্রিরত্নের একজন ভক্ত ও পরম উপাসক। প্রতিদিন তিনি মাটি দিয়া লক্ষ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন মহাপ্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র হইতে লক্ষ শ্লোক পাঠ করেন এবং লক্ষ ফুল দান করেন। এই সমুদয় দ্রব্যাদি রাশীকৃত করিলে মানুষের সমান উচ্চ বোঝা হয়। রাজা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া এইগুলি দান করেন। রাজা যখন দলবলসহ যাত্রা করেন তখন অগ্রভাগে অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তি লওয়া হয় ধ্বজ ও পতাকায় সূর্য্যের কিরণ ঢাকিয়া যায় এবং বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত হয়। বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি সহ বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রাবকের দল সর্ব্বপ্রথমে যাত্রা করে, পশ্চাৎ রাজা স্বয় যাত্রা করেন।

রাজধানীতে চারি সহস্রেরও অধিক ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী আছে। ইহাদের সকলের ভরণ-পোষণের ব্যয়ভার রাজা নির্ব্বাহ করেন। প্রতিদিন প্রাতঃকালে রাজদূত প্রত্যেক ভিক্ষুর বাসস্থলের নিকট যাইয়া যুক্তকরে নিবেদন করে "মহারাজ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন রাত্রিতে আপনাদের সুনিদ্রা হইয়াছে কি না।" ভিক্ষুগণ উত্তর করেন "আমরা প্রার্থনা করি মহারাজ নিরাময় ও দীর্ঘজীবি হউন এবং তাঁহার রাজ্যে সর্ব্বদা শান্তি বিরাজ করুক।" রাজদূতেরা ফিরিয়া আসিয়া এই সমুদয় রাজার নিকট নিবেদন করিলে তবে রাজকার্য্য আরম্ভ হয়। সমগ্র ভারতবর্ষে যে সমুদয় শাস্ত্রবিৎ প্রজ্ঞাবান্ ও ধর্ম্মশীল ভিক্ষু আছেন তাঁহারা সকলেই এই রাজ্যে একত্রিত হন। কারণ রাজার দানশীলতার খ্যাতি ভারতের সর্ব্বত্রই ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

সেং-চি এই রাজার মন্দিরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

১০। প্রজ্ঞাদেব (উ তিং)

ইনি সমুদ্রপথে সুমাত্রা ও মলয় উপদ্বীপ হইয়া ন-কিয়া-পো-তন-ন (নেগাপটম্) দেশে উপনীত হন। সেখান হইতে জলপথে দুই দিনে সিংহলে পৌঁছেন। সেখান হইতে সমুদ্র পথে একমাসে হরিকেলে উপস্থিত হন; হরিকেল পূর্ব্ব ভারতবর্ষের পূর্ব্ব সীমান্তে অবস্থিত এবং জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত।

এখানে এক বৎসর থাকিয়া তিনি আর একজন চীনদেশীয় ভিক্ষুসহ নালন্দা গমন করেন। নালন্দা হরিকেল হইতে ১০০ যোজন দূরে। তৎপর তাঁহারা মহাবোধি বিহারে গমন করেন। রাজা তাঁহাদিগকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করেন এবং উভয়কেই বিহার-স্বামীর পদ দান করেন। পশ্চিম দেশে (অর্থাৎ ভারতবর্ষে) বিহার-স্বামীর সংখ্যা অতিশয় অল্প এবং এই পদ পাওয়া অতিশয় কষ্টসাধ্য। যাঁহারা এই পদের অধিকারী তাঁহারাই কেবল সংঘের যাবতীয় দ্রব্যের স্বত্বাধিকারী। অন্যসকলের কেবল ভরণ-পোষণ পাইবার দাবি। তৎপরে তাহারা নালন্দ ও তিলাঢক (১৭) বিহারে গমন করেন। নানা বৌদ্ধশাস্ত্র ব্যতীত তিনি যোগশাস্ত্র, কোষশাস্ত্র ও হেতুবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। নালন্দায়ই তাঁহার মৃত্যু হয়।

শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার।

(১৭) কানিংহামের মতে ফল্গু নদীর তীরবর্ত্তী তিলাঢ়া গ্রাম। এই স্থানের বিস্তৃত বিবরণ হুয়েনসাংয়ের গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

সুসীম চা-চক্র প্রবর্ত্তনা

[পূজনীয় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ চীন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া একটি চা-বৈঠকের প্রবর্ত্তনা করিয়াছেন— ইহার নাম সুসীম চা-চক্র। সু-সুমো নামে বিশ্বভারতীর একজন বিশিষ্ট চীনীয় বন্ধু আশ্রমে একটি চা বৈঠক স্থাপনের জন্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তাঁহারই নাম-অনুসারে ইহার নামকরণ করা হইয়াছে।

পূজনীয় গুরুদেব প্রথমে এই চক্রের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। প্রথমতঃ ইহা আশ্রমের কর্ম্মী ও অধ্যাপকগণের অবসর-সময়ে একটি মিলনের ক্ষেত্রের মত হইবে—যেখানে সকলে একত্র হইয়া আলাপ-আলোচনায় পরস্পরের যোগসূত্র দৃঢ় করিতে পারিবেন।

দ্বিতীয়তঃ চীন দেশে চা পান একটি আর্টের মধ্যে গণ্য। সেখানে ইহা আমাদের দেশের মত যেমন-তেমন-ভাবে সম্পন্ন হয় না। তিনি আশা করেন চীনের এই দৃষ্টান্ত আমাদের ব্যবহারের মধ্যে একটি সৌষ্ঠব ও সুসঙ্গতি দান করিবে।

বর্ষা ঋতুর জন্য শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় চা-চক্রের চক্রবর্ত্তী পদে অভিষিক্ত হইলেন। তৎপরে গুরুদেবের নব-রচিত একটি গান হয়। ইহার পর সমাগত নিমন্ত্রিতগণ চীন হইতে আনিত খাদ্য আনন্দের সহিত ভোজন করেন।]

হায় হায় হায়
দিন চলি যায়।
চা স্পৃহ চঞ্চল
চাতকদল চল
চল চল হে!

টগবগ উচ্ছল
কাথলিতল-জল
কল কল হে!

এল চীন-গগন হ'তে
পূর্ব্ব-পবন-স্রোতে
শ্যামলরসধরপুঞ্জ,
শ্রাবণ-বাসরে
রস ঝরঝর ঝরে
ভুঞ্জ হে ভুঞ্জ
দলবল হে!

এস পুঁথিপরিচারক
তদ্ধিতকারক
তারক তুমি কাণ্ডারী,
এস গণিত ধুরন্ধর
কাব্য পুরন্দর
ভূ-বিবরণ-ভাণ্ডারী।

এস বিশ্বভার নত,
শুষ্ক রুটিন-পথ
মরুপরিচারণক্লান্ত
এস হিসাবপত্তরত্রস্ত
তহবিলমিল-ভুলগ্রস্ত
লোচনপ্রান্ত
ছলছল হে!

এস গীতিবীথিচর
তম্বুরকরধর
তানতালতলমগ্ন,
এস চিত্রী চটপট
ফেলি তুলিকপট
রেখাবর্ণবিলগ্ন।
এস কনষ্টিট্যুষণ-
নিয়ম-বিভূষণ
তর্কে অপরিশ্রান্ত,
এস কমিটি-পলাতক
বিধান-ঘাতক
এস দিগ্‌ভ্রান্ত
টলমল হে!

(শান্তিনিকেতন পত্রিকা, শ্রাবণ) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যাজ্ঞবল্ক্যের বেদোদ্‌গার

শ্রী গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ

যজুর্ব্বেদের শুক্ল ও কৃষ্ণ এই ভাগদ্বয়ের মোটামুটি খবর অনেকেই জানেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের অসাধারণ যোগ-সম্পদ্‌ই যে, এই বিভাগের মূল, তাহা বৈদিক গ্রন্থের সাহায্যে স্থূলতঃ অবগত হওয়া যায়। কিন্তু ইহার বিস্তৃত বিবরণ বিভিন্ন পুরাণের সাহায্য ব্যতীত জানিবার উপায় নাই।

এখানে প্রসঙ্গতঃ বক্তব্য যে—বর্ত্তমান যুগে যেমন বিস্তৃতগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সারসংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হইতেছে, এবং তদনুরূপ সংক্ষেপ-সংগ্রহও হইতেছে, অতি প্রাচীনকালে ঋষিদিগের মধ্যেও এই প্রণালীর অনুসরণের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারা সূত্রাকারে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়েরই সার সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন। ঋষিদিগের মধ্যে কাত্যায়নের সূত্ররচনাপ্রবৃত্তিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইনি শ্রৌতসূত্র, কল্পসূত্র প্রভৃতি বিভিন্ন অনুষ্ঠানাঙ্গ গ্রন্থ লিখিয়াই নিরস্ত হন নাই। কিন্তু বিভিন্ন বেদের স্থূলবিবরণ অনুক্রমণিকাসূত্রে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই গ্রন্থ "সর্ব্বানুক্রমণিকা"—সূত্রনামে পরিচিত হইয়াছে।

ইনি শুক্ল যজুর্ব্বেদের অনুক্রমণিকায় বলিয়াছেন যে, "মণ্ডল (সূর্য্য-মণ্ডল) দক্ষিণ চক্ষু এবং হৃদয় যাঁহার অধিষ্ঠান, যাঁহা হইতে ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য শুক্ল যজুর্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ত্রয়ীময় সেই সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিয়া সপরিশিষ্ট শুক্ল যজুর্ব্বেদের ঋষি-চ্ছন্দঃ দৈবতের অনুক্রমণ করিব। (১)

তাঁহার এই কয়টি কথার মধ্যে বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ-সম্বন্ধ পৌরাণিক আখ্যায়িকার এবং উপনিষদ্‌বর্ণিত কতিপয় বিষয়ের সূচনা হইয়াছে মাত্র। এই উক্তি হইতে এইমাত্র বুঝা যায় যে,ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য সূর্য্য হইতে শুক্ল-যজুর্ব্বেদ লাভ করিয়াছিলেন। কি উপায়ে তিনি শুক্ল-যজুর্ব্বেদ পাইলেন, কেনই বা তাঁহার নূতন বেদপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল, তাহার বিন্দুমাত্রও সূত্রার্থ হইতে বুঝা যায় না। বিষ্ণুপুরাণে (৩অ৫) আছে, ব্যাসের শিষ্য বৈশম্পায়ন গুরু হইতে যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া, উহাকে সপ্তবিংশতি শাখায় বিভক্ত করিয়াছিলেন, এবং বিভক্ত শাখাগুলি শিষ্যদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে ব্রহ্মরাতের পুত্র যাজ্ঞবল্ক্য নিরতিশয় ধর্ম্মবিৎ এবং অত্যন্ত গুরুভক্তিপরায়ণ ছিলেন ঐ সময়ে ঋষিগণ কোনও বিশেষ প্রয়োজন সম্পাদনের অভিপ্রায়ে নিয়ম করিয়াছিলেন যে, মহামেরু মধ্যে নির্দ্ধারিত ঋষি-সমাজে যিনি উপস্থিত না হইবেন, সাত দিবসের মধ্যে তৎকর্ত্তৃক ব্রহ্মহত্যা ঘটিবে। বৈশম্পায়ন এই নিয়ম প্রতিপালন করিলেন না; অতএব সপ্তরাত্র মধ্যেই তাঁহার পদাঘাতে নিজের ভাগিনেয় মৃত্যুমুখে পতিত হইল। তখন তিনি শিষ্যদিগকে বলিলেন যে, তোমরা সকলে আমার পাপক্ষালনার্থ ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত কর। ইহাতে কোনও বিচার করিও না। অর্থাৎ সমর্থ ব্যক্তির জ্ঞানকৃত ব্রহ্মহত্যাপাপের প্রায়শ্চিত্ত প্রতিনিধি-কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইবে কেন? ইত্যাকার সন্দেহ করিও না।

তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে ভগবন্, এই সকল অল্পতেজ ব্রাহ্মণ-দিগকে ক্লেশ দিবার প্রয়োজন কি? আমি একাই ব্রতাচরণ করিব।

ইহাতে বৈশম্পায়ন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন—হে ব্রাহ্মণাবজ্ঞাকারী; এইসকল ব্রাহ্মণকে নিস্তেজ বলিয়া আত্মশ্লাঘা করিতেছ। তোমার মত শিষ্যের দ্বারা আমার কোনও প্রয়োজন নাই। তুমি আমার নিকট হইতে যাহা অধ্যয়ন করিয়াছ, তাহা এখনই প্রত্যর্পণ কর।

তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—আমি ভক্তিবশতঃই এমত বলিয়াছিলাম। কিন্তু তুমি বিপরীত বুঝিয়াছ। তোমার মত গুরুদ্বারা আমারও কোন প্রয়োজন নাই। তোমা হইতে যাহা অধ্যয়ন করিয়াছিলাম, তাহা এখনই পরিত্যাগ করিতেছি, এই বলিয়া তিনি মূর্ত্তিমান্ রুধিরাক্ত যজুর্ব্বেদ উদ্‌গীর্ণ করিলেন। তখন বৈশম্পায়নের কয়জন শিষ্য তিত্তিরি পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া সেই উদ্‌গীর্ণ বেদ গ্রহণ করিলেন। (যাজ্ঞবল্ক্য-কর্ত্তৃক উদ্‌গীর্ণ বেদ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেল। সুতরাং উহার নাম হইল কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ।) তিত্তিরিরূপে বেদ গ্রহণকারী শিষ্যগণ তৈত্তিরীয় নামে পরিচিত হইলেন। যাঁহারা গুরুর আদেশে ব্রহ্মহত্যার ব্রতাচরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম হইল চরকাধ্বর্য্যু।

এদিকে যাজ্ঞবল্ক্য প্রয়তচিত্তে সূর্য্যদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্তবে সূর্য্যদেব সন্তুষ্ট হইয়া অশ্বরূপ ধারণপূর্ব্বক যাজ্ঞবল্ক্য-সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য! তুমি বাঞ্ছিতবর প্রার্থনা কর,

(১) ওঁ মণ্ডলং দক্ষিণমক্ষিহৃদয়ঞ্চাধিষ্ঠিতং যেন, শুক্লানি যজূংষি ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্যো যতঃ প্রাপ তং বিবস্বন্তং ত্রয়ীময়মর্চ্চিষ্মন্তমভিধ্যায় মাধ্যন্দিনীয়ে বাজসনেয়কে যজুর্ব্বেদাম্নায়ে (সর্ব্বে) সখিলে সশুক্রিয়-ঋষি-দৈবত-চ্ছন্দাংস্যনুক্রমিষ্যামঃ।

তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে ভাস্কর! আমার গুরুতে যে যজুঃ নাই, অর্থাৎ তিনি যাহা অবগত নহেন, তাহা আমাকে প্রদান কর। অনন্তর সূর্য্যদেব বৈশম্পায়নের অজ্ঞাত "অযাতযাম" সংজ্ঞক যজুঃ যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রদান করিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যের যেসকল শিষ্য ঐসকল যজুঃ অধ্যয়ন করিলেন, তাঁহাদের নাম হইল বাজী। কারণ ভগবান্ সূর্য্যদেব বাজীর (অশ্বের) রূপ ধারণ করিয়া এই সকল যজুঃ প্রদান করিয়াছিলেন। সূর্য্য হইতে প্রাপ্ত নূতন বেদই "শুক্লযজুঃ" নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিল, কিন্তু বায়ুপুরাণের (৬১অ) মতে গল্পটির আকার অন্যরূপ। উক্ত পুরাণে বলিতেছেন, যেসকল যজুঃ উচ্ছিন্ন হইয়া (অর্থাৎ বমন-সময়ে) আদিত্যমণ্ডলে গিয়াছিল, সেইগুলিই পাইবার জন্য যাজ্ঞবল্ক্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এবং সূর্য্যও তাহাই দিয়াছিলেন। পরন্তু সূর্য্যদেব অশ্বরূপ ধারণ করেন নাই, বাজী হইয়াছিলেন যাজ্ঞবল্ক্য। এই গল্পটি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও স্থান পাইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের এবং বায়ুপুরাণের বচনগুলি একেবারে অভিন্ন।

যাজ্ঞবল্ক্য-সম্বন্ধে এই গল্পটি শ্রীমদ্ ভাগবতেও (১২।৬) অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। ভাগবতের আখ্যানাংশ বিষ্ণুপুরাণের অনুরূপ। অধিকন্তু ইহাতে যাজ্ঞবল্ক "দেবরাতের" পুত্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণোক্ত যাজ্ঞবল্ক্যকৃত সূর্য্যস্তব পদ্যময়, ভাগবতোক্ত স্তব গদ্য। ভাগবতের মতে সূর্য্যপ্রোক্ত শাখাগুলি "বাজসনি" নামে উক্ত হইয়াছে। "বাজসনি" নামের নিরুক্তিনির্দ্দেশ করিতে যাইয়া টীকাকার শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন, যে, অশ্বরূপধারী রবি বাজ হইতে অর্থাৎ কেশর হইতে বেদের শাখাগুলি প্রদান করিয়াছিলেন, অথবা বাজে অর্থাৎ অতিবেগে শাখা নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন। "রবিণা অশ্বরূপেণ বাজেভ্যঃ কেসরেভ্যো বাজেন বেগেন বা সংসৃষ্টাঃ শাখাঃ বাজসনীসংজ্ঞাস্তাঃ শাখা ইতি বা।"

শুক্লযজুর্ব্বেদের পঞ্চদশশাখাকর্ত্তা সমস্ত ঋষির নাম ভাগবতে উক্ত হয় নাই। এইমাত্র বলা হইয়াছে যে "কাণ্ব-মাধ্যন্দিন" প্রভৃতি ঋষিগণ যাজ্ঞবল্ক্যকথিত পঞ্চদশ শাখা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিষ্ণুপুরাণের মতে যজুর্ব্বেদের শাখা সপ্তবিংশতি। টীকাকার শ্রীধরস্বামী অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, যজুর্ব্বেদের সপ্তবিংশতি শাখা প্রধান। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ইহার একাধিক-শতসংখ্যক শাখা কথিত হইয়াছে। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়াধ্যায়ের পঞ্চমাংশে যজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় এবং বাজি-শাখার প্রবর্ত্তন ইতিহাসের সহিত কথিত হইতেছে।

"পঞ্চমেঽথ যজুঃশাখাঃ কথ্যন্তেঽত্র সমাসতঃ।
সেতিহাসং তৈত্তিরীয়ং বাজিশাখা-প্রবর্ত্তনম্।
সপ্তবিংশৎ সপ্তবিংশতিঃ যজুষঃ প্রধানশাখাঃ।
ব্রহ্মাণ্ডে তু একাধিকশতমধ্বর্য্যুশাখা আপস্তম্বোক্তাঃ।"

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বিষ্ণুপুরাণে সপ্তবিংশতিসংখ্যক প্রধান যজুর্ব্বেদশাখা কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্যপ্রোক্ত পঞ্চদশ শাখা শুক্লযজুর্ব্বেদ, এবং অপর দ্বাদশ শাখা কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ। কিন্তু চরণব্যূহ-পরিশিষ্টভাষ্যে বিষ্ণুপুরাণের এবং ভাগবত প্রভৃতির বচন উদ্ধৃত করিয়া ভাষ্যকার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে যজুর্ব্বেদের যে সপ্তবিংশতি শাখা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; উহা প্রধান শাখার সংখ্যানির্দ্দেশ মাত্র। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বড়শীতিসংখ্যক শাখা বলা হইয়াছে। উহা অবান্তর-ভেদ অভিপ্রায়ে বুঝিতে হইবে। শুক্লযজুর্ব্বেদের পঞ্চদশ শাখার সহিত মিলিত হইয়া যজুর্ব্বেদশাখাসংখ্যা একশত এক। ইহাই আপস্তম্বাভিমত। এই ব্যাখ্যা হইতে বুঝা যায় যে, যজুর্ব্বেদের বিষ্ণুপুরাণোক্ত সপ্তবিংশতিসংখ্যক শাখা যাজ্ঞবল্ক্যপ্রাপ্ত পঞ্চদশ শাখা হইতে ভিন্ন। যাজ্ঞবল্ক্যপ্রোক্ত শাখাগুলি "বাজসনেয়" নামেও পরিচিত হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণের শেষভাগে (যাহা বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ নামে প্রসিদ্ধ) যাজ্ঞবল্ক্যকে "বাজসনেয়" নামে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

"আদিত্যানীমানি শুক্লানি যজংষি বাজসনেয়েন যাজ্ঞবল্ক্যেনাখ্যায়ন্তে।" ৫।৫।৩৩।

শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতার ব্যাখ্যাকর্ত্তা মহীধর "বাজসনেয়" নামের নিরুক্তি দেখাইয়াছেন, যিনি বাজের (অন্নের) সনি (দান) করেন তিনি বাজসনি। তাঁহার অপত্য বাজসনেয় "বাজস্য অন্নস্য সনির্দানং যস্য স বাজসনিস্তদপত্যং বাজসনেয়ঃ।" সুতরাং যাজ্ঞবল্ক্যের পিতার নাম বাজসনি। শুক্লযজুর্ব্বেদের পঞ্চদশ শাখাকর্ত্তা ঋষিদিগের নাম বায়ুপুরাণে এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—

"যাজ্ঞবল্ক্যস্য শিষ্যাস্তে কণ্ব-বৈধেয়-শালিনঃ।
মধ্যন্দিনশ্চ শাপেয়ী বিদিগ্ধশ্চাপ্য উদ্দলঃ।
তাম্রায়ণশ্চ বাৎস্যশ্চ তথা গালব-শৈবিরী।
আটবী চ তথা পর্ণী বীরণী স পরায়ণঃ॥
ইত্যেতে বাজিনঃ প্রোক্তাঃ দশ পঞ্চ চ সংস্মৃতাঃ॥

(বায়ু পু। ৭১ অ ২০। ব্রহ্মাণ্ডপু অনুসঙ্গ পাদ; ৬৫ অ। ২৬-২৭)

কণ্ব বৈধেয় শালী মধ্যন্দিন শাপেয়ী বিদিগ্ধ উদ্দল তাম্রায়ণ বাৎস্য গালব শৈবিরী আটবী পর্ণী বীরণী ও পরায়ণ; যাজ্ঞবল্ক্যের এই পনর জন শিষ্য বাজিনামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

তবেই দেখা যাইতেছে যে, মূল গল্পটির ঐক্য সত্ত্বেও বিভিন্ন পুরাণে গল্পের ডাল পালা নানারূপ হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে মনে হয়, ইতিহাস নামে যাহা সংস্কৃত সাহিত্যে অভিহিত হইয়াছে, অন্ধকার যুগের সেই লোকপরম্পরাপ্রাপ্ত গল্প বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে নিবদ্ধ, পুরাণ উপপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। কালের আবর্ত্তন-বশতঃ আখ্যানাংশের কথঞ্চিৎ বিকৃতি দৃষ্টিগোচর হইতেছে।

কিন্তু এই ইতিহাসাংশ উপেক্ষার যোগ্য নহে। কারণ বেদ হইতে পুরাণ পর্য্যন্ত এমন গ্রন্থ নাই, যাহাতে উহার প্রভাব বিস্তৃত হয় নাই। নিরুক্ত গ্রন্থে নিরুক্তসম্মত ব্যাখ্যা প্রদর্শনের পর "ঐতিহাসিকাস্তু" বলিয়া পৌরাণিকগণসম্মত ব্যাখ্যাও প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু এই ইতিহাসের সামঞ্জস্য রক্ষা বড়ই কঠিন। অনেক বিষয়ই নিতান্ত প্রহেলিকাময় প্রতিভাত হয়। বেদোদ্গারবিষয়ক গল্পের সামঞ্জস্য রক্ষা কত দূর সম্ভব হয়, তাহা সুধীগণ বিবেচনা করিবেন। কারণ—পুরাণবচন সাক্ষ্য দান করিতেছে যে, যাজ্ঞবল্ক্য সূর্য্য হইতে নূতন বেদ পাইয়াছিলেন। যাহা পাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার গুরুর অবিদিত। প্রাপ্ত বেদের "অযাতযাম" বিশেষণ সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু শুক্লযজুর্ব্বেদের মন্ত্রসংহিতায় এবং ব্রাহ্মণে যেসকল মন্ত্র নিবদ্ধ হইয়াছে; কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় সংহিতায় ব্রাহ্মণে এবং ঋগ্বেদ সংহিতা প্রভৃতিতেও সেই মন্ত্রগুলি অবিকল দেখিতে পাওয়া যায়।

যেমন,—"মানস্তোকে" ইত্যাদি মন্ত্র বাজসনেয়সংহিতায় আছে। অথচ ঋগ্বেদ ১।৬০।৪।৮। তৈত্তিরীয় ৩।৪।১১।২। ত্র্যম্বকং যজামহে ইত্যাদি। বাজসনেয় ৩।৬। মৈত্রায়নীসংহিতায় তৈত্তেরীয়ং এইরূপ অনেক মন্ত্রই কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে, শুক্ল যজুর্ব্বেদে এবং অথর্ব্ব সামবেদ প্রভৃতিতে অভিন্ন।

রাজপথ

শ্রী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

[৩১]

কয়েকদিন পরে একদিন রাত্রে জয়ন্তীর নিদ্রাভঙ্গ হইয়া মনে হইল পাশের ঘরে কেহ জাগ্রত রহিয়াছে। সুমিত্রা এবং বিমলা তথায় একত্রে শয়ন করিত। কিছু পূর্ব্বে ঘড়িতে দুইটা বাজিয়াছে, জয়ন্তী তাহা শুনিয়াছিলেন। শয্যাত্যাগ করিয়া মাঝের খোলা দ্বার দিয়া অপর কক্ষে শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া জয়ন্তী দেখিলেন সুমিত্রা জাগিয়া রহিয়াছে।

"এত রাত্রে জেগে রয়েছিস্ সুমিত্রা? কোনো অসুখ করেনি ত?"

সুমিত্রা বলিল, "না, অসুখ কিছু করেনি।"

"তবে জেগে রয়েছিস্ যে?"

"কেমন যেন গরম হচ্ছে; ঘুম হচ্ছে না।"

"এপর্য্যন্ত একবারও ঘুমোস্‌নি?"

একটু ইতস্তত করিয়া মৃদু হাসিয়া সুমিত্রা বলিল, "না।"

ব্যস্ত হইয়া জয়ন্তী বলিলেন, "সে কি রে! রাত দুটো বেজে গেল, আর এপর্য্যন্ত একটুও ঘুমোস্‌নি! এই মাঘ মাসে এত গরম হচ্ছে কেন?"

সুমিত্রা তেম্‌নি মৃদু হাসিয়া বলিল, "ও কিছু নয় মা। আর একটু পরেই ঘুম হবে অখন। তুমি ব্যস্ত হোয়োনা, শোওগে।"

এ প্রবোধ-বাক্যে নিরস্ত না হইয়া জয়ন্তী সুমিত্রার ললাট স্পর্শ করিয়া দেখিলেন বিন্দু-বিন্দু ঘর্ম্মে ললাট ভরিয়া গিয়াছে। মাঘ মাসের শেষ; শীত তখনও কিছু ছিল বলিয়া বিজলী পাখাগুলা বস্ত্রাবৃত রহিয়াছে। নিজের ঘর হইতে একটা হাত-পাখা খুঁজিয়া আনিয়া সুমিত্রার নিকটে বসিয়া জয়ন্তী ধীরে ধীরে হাওয়া করিতে লাগিলেন।

সুমিত্রা ব্যস্ত হইয়া মাথা তুলিয়া বলিল, "না মা, ও কর্‌লে আরো আমার ঘুম হবে না! তুমি শোওগে; পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি ঘুমিয়ে পড়্‌ব।"

সুমিত্রার মাথা হাত দিয়া ধীরে ধীরে নামাইয়া দিয়া জয়ন্তী স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, "ঘুমো সুমিত্রা, ঘুমো! পাঁচ মিনিট জেগে বসে' হাওয়া কর্‌লে আমি মারা যাব না। আট বচ্ছর বয়সে তোমার যখন টাইফয়েড্ হয়েছিল তখন যে হাওয়া কর্‌তে কর্‌তে সমস্ত রাত শেষ হ'য়ে যেত। তখন ত' আর তুমি আমাকে শুতে পাঠাতে না!"

মৃদু হাসিয়া সুমিত্রা বলিল, "আচ্ছা, তবে একটু হাওয়া কর, কিন্তু বেশীক্ষণ বসে থেকো না মা, আমি ঘুমিয়ে পড়্‌লেই উঠে' যেয়ো।" তাহার পর সে পাশ ফিরিয়া নিবিষ্টমনে শয়ন করিল।

হাওয়া করিতে-করিতে জয়ন্তী সুমিত্রার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। সমস্ত মুখটা দেখা যাইতেছিল না, যে-টুকু দেখা যাইতেছিল তাহাও স্তিমিত আলোকে স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না, কিন্তু জয়ন্তী তাহারই মধ্যে সুগভীর বেদনার সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখিতে পাইলেন। কৃশ-করুণ মুখের নিঃশব্দ আর্ত্ততার দিকে চাহিয়া চাহিয়া জয়ন্তীর চক্ষে জল আসিল! মনে হইল যেন সরস ক্ষেত্রের লতা, উৎপাটিত হইয়া শুষ্ক ভূমিতে রোপিত হওয়ার পর, অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এখন নিঃশেষ করিয়া স্নেহরস সিঞ্চন করিলেও যদি সঞ্জীবিত না হয় এই আশঙ্কা সহসা মনে উদয় হইবামাত্র জয়ন্তীর নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল!

সুমিত্রা নিদ্রিত হইবার পরও জয়ন্তী বহুক্ষণ চিন্তাবিষ্ট হইয়া তাহার পার্শে বসিয়া রহিলেন। তিনটা বাজিবার পর শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন কিন্তু বাকি রাতটুকু আর ভাল নিদ্রা হইল না, চিন্তায়-চিন্তায় কাটিয়া গেল।

পরদিন প্রাতে জয়ন্তী সুমিত্রার বিষয়ে বিমলার নিকট নানাপ্রকার অনুসন্ধান করিলেন।

বিমলা বলিল, "ঘুম ভাঙিলে আমি প্রায়ই দেখি—মেজদিদি জেগে আছেন। জিজ্ঞাসা করলে বলেন, গরম হচ্ছে। তা ছাড়া,—" কথাটা বলিতে গিয়া বিমলা থামিয়া গেল। প্রশ্নের বহির্ভূত কোনও কথা না বলাই উচিত বলিয়া তাহার মনে হইল।

জয়ন্তী কিন্তু সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন, "তা ছাড়া কি ?"

তখন অগত্যা বিমলা বলিল, "তা ছাড়া, প্রত্যহ শোবার আগে আর ঘুম ভাঙার পর দক্ষিণমুখো হ'য়ে হাত জোড় করে' মেজদিদি অনেকক্ষণ প্রণাম করেন।"

সবিস্ময়ে জয়ন্তী বলিলেন, "প্রণাম করে ? কাকে প্রণাম করে ?"

প্রশ্ন করিয়াই কিন্তু জয়ন্তীর মনে সহসা একটা কথা বিদ্যুতের মত স্ফুরিত হইল। তাহার পর সঙ্গে-সঙ্গেই তৎসংলগ্ন আর-একটা কথা মনে হওয়ায় নিজ অনুমানের সত্যাসত্য নিরূপণের জন্য প্রশ্ন করিলেন, "তুমি ত আগে উত্তর দিকে মাথা করে' শুতে, দক্ষিণদিকে মাথা করে' কবে থেকে শুচ্ছ !"

বিমলা বলিল, "মেজদিদি এঘরে শুতে আরম্ভ করে' পর্য্যন্ত। প্রথম দিনেই মেজদিদি বালিশ উত্তরদিক্ থেকে দক্ষিণদিকে করে' দিয়েছিলেন।"

জয়ন্তী আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। দক্ষিণ মুখ হইয়া সুমিত্রা যে আলিপুর জেলে অবস্থিত সুরেশ্বরকে প্রণাম করে এবং উত্তর দিকে মাথা করিয়া শয়ন না করিবার উদ্দেশ্য সুরেশ্বরের দিকে পদ প্রসারিত করিয়া শয়ন না করা, তদ্বিষয়ে তাঁহার আর কোনও সংশয় রহিল না। ভারাক্রান্ত-চিত্তে জয়ন্তী গৃহকর্ম্মে লিপ্ত হইলেন।

সমস্তদিন ঘুরিতে-ফিরিতে জয়ন্তী সুমিত্রাকে লক্ষ্য করিলেন। যতবার যতভাবে তাহাকে দেখিলেন, ততবারই মনে হইল—পূর্ব্বের সে সুমিত্রা আর নাই; মনে হইল তাহার হাস্যদীপ্ত মুখ-মণ্ডলে বিষাদের সূক্ষ্ম ছায়া পড়িয়াছে। চক্ষের উজ্জ্বল ঘনকৃষ্ণ তারকা ম্লান হইয়া আসিয়াছে এবং তট হইতে জলস্রোতের মত, সমস্ত দেহ হইতে স্বাস্থ্য এবং সৌষ্ঠব দূরে সরিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে! সুমিত্রার শুষ্ক গভীর আকৃতি নিরীক্ষণ করিয়া জয়ন্তী সন্ত্রস্ত হইলেন, সুমিত্রার হাস্য-করুণ মূর্ত্তি দেখিয়া জয়ন্তীর চক্ষে জল আসিল!

তাহার পর কিছুক্ষণ ধরিয়া জয়ন্তীর হৃদয়ে ক্রোধ, অভিমান, সঙ্কোচ, দার্ঢ্য প্রভৃতি বিভিন্ন মনোবৃত্তির সহিত মাতৃ-স্নেহের দ্বন্দ্ব চলিল। অবশেষে বহু বাধা এবং দ্বিধা অতিক্রম করিয়া মাতৃ-স্নেহই জয় লাভ করিল।

বৈকালে গা ধুইয়া সুমিত্রা স্নান-ঘর হইতে বাহির হইতেই জয়ন্তী তাহাকে নিজ কক্ষে ডাকিয়া লইয়া গেলেন।

কক্ষে প্রবেশ করিয়া ঔৎসুক্যের সহিত সুমিত্রা বলিল, "কি মা।"

জয়ন্তী স্নেহভরে সুমিত্রার পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "এমন রোগা হ'য়ে যাচ্ছিস্ কেন সুমিত্রা।"

মাতার কথা শুনিয়া সুমিত্রা হাসিয়া ফেলিল; বলিল, "এই কথা মা! আমি মনে করছিলাম কত বড় কথাই না শুনব!" তাহার পর নিজের দেহের উপর একবার দৃষ্টি বুলাইয়া বলিল, "রোগা হ'য়ে যাচ্ছি। কই আমি ত কিছু বুঝতে পারিনে।"

"আমি যে বুঝতে পারছি! রাত্রে ঘুম হয় না কেন ? বল্ দেখি ?"

সুমিত্রা হাসিয়া বলিল, "ঘুম হবে না কেন ? ঘুম হ'তে দেরি হয়।

সনির্ব্বন্ধে জয়ন্তী বলিলেন, "কেন দেরী হয় সেই কথাই ত জিজ্ঞাসা করছি। শোন্ সুমিত্রা! আমি তোর মা, আমার কাছে কোনো কথা লুকোস্‌নে! বাপের সঙ্গে দেশোদ্ধারের পরামর্শ করতে হয় করিস্, কিন্তু সুখ-দুঃখের কথাটা তোর মার জন্যেই রাখিস্! তুই সত্যি করে' বল্ কেন তুই এমন শুকিয়ে যাচ্ছিস্। এই শীতের রাত্রে গরমই বা তোর কেন হয়, আর ঘুমই বা কেন হয় না আমাকে খুলে' বল্! মিথ্যে কথা বলিস্‌নে।"

সুমিত্রা বলিল, "মিথ্যা কেন বলব মা ? মিথ্যা কথা কখন ত তোমার কাছে বলিনি।"

"তবে বল্।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া তাহার পর মুখ তুলিয়া চাহিয়া স্মিতমুখে সুমিত্রা বলিল, "দিনের বেলা কাজে-

কর্ম্মে তত বুঝ্‌তে পারিনে; কিন্তু রাত্রে বিছানায় শুয়েই কিরকম গা জ্বালা কর্‌তে আরম্ভ করে। আমার বিশ্বাস মা, এ বিলিতী কাপড় পরে' শোবার জন্যে হয়। বিলিতী কাপড়ের চেয়ে খদ্দর অনেক মোটা, কিন্তু খদ্দর পরে কখন ওরকম গরম হ'ত না। এ আমি তৈরী করে' বল্‌ছিনে, মা, যা হয় তাই বল্‌ছি।" বলিতে-বলিতে সুমিত্রার চক্ষু ছলছল করিয়া আসিল। ব্যথিত হইয়া জয়ন্তী বলিলেন, "তবে খদ্দর পরে'ই শুস্‌নে কেন? আমি ত খদ্দর পর্‌তে মানা করিনি।"

"তা করনি; কিন্তু আজ-কালকার খদ্দর পরা ত' শুধু কাপড় পরা নয় মা, এ একটা ব্রত। এর মধ্যে ছোঁয়াছুত চলে না।"

জয়ন্তী স্মিতমুখে বলিলেন, "তোরাও ছোঁয়াছুত মানিস নাকি?"

সুমিত্রা বলিল, "মানি বই কি, মান্‌বার কারণ যেখানে থাকে সেখানে মানি। তুমি যেমন মা, পূজো কর্‌বার সময়ে দিশী গন্ধ-পুষ্প দিয়ে পূজো কর, নিষিদ্ধ ফুল দিয়ে কর না, তেম্‌নি দেশ-পূজার পুষ্প-পাত্রে শুধু খদ্দরই চলে, বিলিতী কাপড় চলে না।" বলিয়া সুমিত্রা নিজের বাক্‌পটুতায় পুলকিত হইয়া হাসিয়া উঠিল। জয়ন্তীর মনে তর্কের স্পৃহা জাগিয়া উঠিল। বিমান-বিহারীর সেই বহু ব্যবহৃত যুক্তি অবলম্বন করিয়া বলিলেন "তোমাদের একথাটা আমি একেবারেই বুঝ্‌তে পারিনে। ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল যখন এক-পঙ্‌ক্তিতে চালাতে চাচ্ছ, তখন দিশী-বিলিতীর ছোঁয়াছুত চলবে না কেন? মানুষের জাত যদি উঠিয়ে দিতে পার, তখন দেশের জাত কেন উঠিয়ে দেবে না? জাতের সঙ্গে জাত মিশ্‌তে পার্‌লে দেশের সঙ্গে বিদেশও মিশ্‌তে পারে।"

এযুক্তির বিরুদ্ধে সুরেশ্বর যে যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছিল তাহা সুমিত্রার মনে পড়িয়া গেল। সে বলিল, "দেশের সঙ্গে বিদেশ নিশ্চয়ই মিশ্‌তে পারে, কিন্তু তার জন্যে সত্যিকার দেশ থাকা দর্‌কার। তোমার দেশের সব জিনিসই যদি বিদেশী হয়, তা হলে' তোমার দেশও বিদেশ হ'য়ে যায়। সেইজন্যে প্রথমে দেশ গড়ে' তুল্‌তে হবে, আর তার জন্যে বিদেশী মশলা ব্যবহার কর্‌লে চল্‌বে না। দেশে যখন দর্‌কারের মত দিশী কাপড় তৈরী হবে তখন সখের মত বিলিতী কাপড় ব্যবহার কর্‌লে কোনও দোষ হবে না।" তর্ক করিবার সমস্ত আগ্রহ সহসা পরিহার করিয়া জয়ন্তী বলিলেন, "আচ্ছা দেশের পূজো যেমন করে' তোমার কর্‌তে ইচ্ছে হয়, তেম্‌নি করে'ই কর, আমি আর কিছু বল্‌ব না। যাও এ-সব কাপড় ছেড়ে তোমার খদ্দরের কাপড় পরে' এস। আর বিপিনকে দিয়ে খদ্দরের শাড়ী সেমিজ আর জামা যদি কিছু দর্‌কার থাকে আনিয়ে নাও।"

জয়ন্তীর কথায় নিরতিশয় বিস্মিত হইয়া সুমিত্রা ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "কেন মা? আমার ওপর রাগ করে' একথা বল্‌ছ?"

জয়ন্তী স্মিতমুখে বলিলেন, "যখন মা হবে, তখন বুঝ্‌বে যে সন্তানের ওপর রাগ করে' মা কত কথা বলে!"

"তবে বিরক্ত হ'য়ে বল্‌ছ বুঝি।"

জয়ন্তী ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "কি বিপদ্! বিরক্ত হব কেন?"

"তবে অভিমান করে' বল্‌ছ!"

এবার জয়ন্তী সহসা উত্তর দিতে পারিলেন না, কারণ কথাটার মধ্যে কিছু সত্য ছিল। প্রবল ঝটিকায় যেমন বড়-বড় গাছ-পালা ভাঙিয়া পড়ে কিন্তু ক্ষুদ্র দূর্ব্বাদল বাঁচিয়া থাকে, তেম্‌নি মাতৃ-স্নেহে কঠোর এবং প্রবল যাহা কিছু সবই ক্ষয় পাইয়াছিল, শুধু অভিমানেরই সামান্য অবশিষ্ট ছিল।

জয়ন্তীর দ্বিধাভাব লক্ষ্য করিয়া সুমিত্রা বলিল, "তোমাকে অসন্তুষ্ট করে' আমি এ-সব কিছুই কর্‌ব না বলে, স্থির করেছি। মনে কষ্ট পেয়ে তুমি আমাকে কিছু কর্‌তে বোলো না মা! কিসের জন্যে তোমার অভিমান হ'ল আমাকে বলো?"

কন্যার নিকট হইতে এ অনুরক্তির কথায় অভিমানটা বৃদ্ধি পাইলেও জয়ন্তী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমি ত আর তোমার মত মেয়ে নই যে মার ওপর অভিমান করে, মার মনে কষ্ট দেবো।"

বিস্মিত হইয়া সুমিত্রা বলিল, 'কেন মা, আমি তোমার ওপর কি অভিমান করেছি?'

জয়ন্তী স্মিতমুখে কহিলেন, 'না কিছু করনি, এম্‌নিই বল্‌ছি।' মনে-মনে বলিলেন, 'আর্‌সীর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে একবার চেহারাটা ভাল করে', দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে কি করেছ।'

সুমিত্রা যখন স্থির বুঝিল যে জয়ন্তী পরিহাস করিতেছেন না, সত্য-সত্যই তাহাকে তাহার অভিপ্রেত জীবন অবলম্বন করিতে বলিতেছেন, তখন আর তাহার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। বহুমূল্য অপহৃত সামগ্রী ফিরিয়া পাইলে যেরূপ আনন্দ হয় ঠিক সেই আনন্দ সুমিত্রা মনের মধ্যে উপলব্ধি করিতে লাগিলেন।

সে প্রফুল্লমুখে বলিল, 'আজ থাক্ মা, কাল একেবারে স্নান করে' আমার ঘরে ঢুকব। সেখানেই আমার সমস্ত কাপড়-টাপড় আছে।'

এ-কয়েক দিন সুমিত্রা তাহার কক্ষে একবারও প্রবেশ করে নাই।

জয়ন্তী সহাস্য-মুখে কহিলেন, 'না বাপু, তুমি আজই তোমার খদ্দরটদ্দর পরো। মিহি কাপড় পরে' আবার আর-এক রাত গরমে ছট্‌ফট্ করবে, তার চেয়ে তোমার ঠাণ্ডা মোটা কাপড়ই ভাল।'

সুমিত্রা হাসিতে-হাসিতে বলিল, 'আজ মিহি কাপড়েও গরম হ'ত না মা।'

জয়ন্তী স্মিতমুখে বলিলেন, "তা জানি। বাপের বাড়ী যাবার দিন স্থির হ'য়ে গেলে তখন আর মেয়েদের শ্বশুরবাড়ী খারাপ লাগে না "

কিছু উত্তর না দিয়া সুমিত্রা উপমার উপযোগিতায় হাসিতে লাগিল।

তাহার পরিধানে একটা শান্তিপুরী শাড়ী ছিল, তৎপ্রতি ইঙ্গিত করিয়া জয়ন্তী বলিলেন, "ছেলে-বেলা থেকে আজ-পর্য্যন্ত এসব কাপড় দিশী কাপড় বলে'ই আমরা শুনে' আস্‌ছি, তোমাদের হাতে পড়ে' আজ এসব বিলিতী হ'য়ে গেল!"

সুমিত্রা স্মিতমুখে বলিল, "হাতে পড়ে' না মা, বিবেচনায় পড়ে'। দিশী সুতো না হ'লে দিশী কাপড় হ'তেই পারে না। বিলিতী সুতো বুনে' যদি দিশী কাপড় হ'ত তা হ'লে কাঁঠালের রস দিয়ে আমসত্ত হবারও কোন বাধা নেই, আর টেম্‌সের জলকেও গঙ্গাজল বলা যেতে পারে।"

[৩২]

ক্ষণকাল পরে খদ্দরের পরিচ্ছদ পরিয়া হাসিতে-হাসিতে সুমিত্রা আসিয়া দুই হস্তে জয়ন্তীর পদধূলি লইয়া মাথায় দিল।

জয়ন্তী চাহিয়া দেখিলেন রৌদ্রদগ্ধ অবসন্ন শস্য-ক্ষেত্রের উপর বর্ষণোন্মুখ শ্যামল মেঘ আসিয়া দাঁড়াইলেই শস্য-শীর্ষ যেমন ঈষৎ সতেজ হইয়া উঠে, সুমিত্রার শীর্ণ-শ্লথ দেহের উপর তেমনই একটা সতেজতা উপস্থিত হইয়াছে। যেন একরাত্রির বর্ষণেই সন্তপ্ত রজনীগন্ধা জীবনীশক্তি পাইয়াছে!

জয়ন্তীর প্রতি সানন্দ দৃষ্টিপাত করিয়া সুমিত্রা বলিল, মা, "তোমার অনুমতি পেয়ে খদ্দর পরে' আজ যেমন, আনন্দ হচ্ছে এমন একদিনও হয়নি! ইচ্ছা হচ্ছে যে একেবারে চরকার প্রথম সুতো দিয়ে তোমার জন্যে একখানা শাড়ী করিয়ে নিই!"

জয়ন্তী হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, "আমাকে এত নাকাল করে'ও যদি সাধ না মেটে তা হ'লে তাও দিয়ো! এখন চলো, বাপের মেয়ে বাপের হাতে দিয়ে আসি!"

ছেলেমানুষের মত দুই বাহু দ্বারা জয়ন্তীর কণ্ঠবেষ্টন করিয়া ধরিয়া সুমিত্রা বলিল, "কেন মা?—আমি কি মা'রও মেয়ে নই?"

মুখে জয়ন্তী কিছু বলিলেন না, মনে-মনে বলিলেন, "মা'র মেয়ে কি না তা জানিনে, কিন্তু তুমি মা'র মাষ্টার!"

ভিতরের দিকে দ্বিতলের বারাণ্ডায় প্রমদাচরণ পদচারণা করিতেছিলেন। জয়ন্তী সুমিত্রাকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "এই নাও তোমার মেয়ে ফিরিয়ে দিতে এসেছি!"

সুমিত্রা হাসিতে-হাসিতে পিতার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।

সুমিত্রার পরিবর্ত্তিত বেশ কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া প্রমদাচরণ বিমূঢ়ভাবে বলিলেন, "তার অর্থ?" তৎপরে,

অর্থ-ভেদ করিবার কোনও চেষ্টা না করিয়া যেখানে অর্থ-ভেদের কোনও সম্ভাবনা ছিল না তথায়, অর্থাৎ জয়ন্তীর মুখের উপর, পরম বিস্ময়ের সহিত নিঃশব্দে চাহিয়া রহিলেন।

অগত্যা কথাটা জয়ন্তীকে বুঝাইয়া দিতেই হইল।

তখন সুমিত্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রমদাচরণের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সুমিত্রার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া স্মিতমুখে কহিলেন, "প্রথম দিন আমি একটু বিচলিত হ'য়ে পড়েছিলাম, কিন্তু তার পরই মনে হয়েছিল যে এইরকমই একটা কিছু অবশেষে ঘট্‌বে, আর তার জন্য আমি বাস্তবিকই অপেক্ষা কর্‌ছিলাম। সুমিত্রা যেপথ অবলম্বন করেছিল আমার মনে হয় সে একটা উৎকৃষ্ট পথ। শক্তিকে আয়ত্ত কর্‌বার একটা প্রধান উপায় হচ্ছে শক্তির বিরুদ্ধাচরণ না-করা। বিরুদ্ধাচরণে শক্তি নিজেকে প্রবল কর্‌বার সুবিধা পায়।" বলিয়া জয়ন্তীর দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন।

আরক্তস্মিতমুখে জয়ন্তী বলিলেন, "এখন তোমরা সুবিধা পেয়েছ, এখন যা বল্‌বে সবই সহ্য কর্‌তে হবে। তোমার মেয়ে ত বলেছে যে আমাকে খদ্দর পরাবে!"

পুলকিত হইয়া প্রমদাচরণ বলিলেন, "তাই ত! দণ্ডবিধানও যে হ'য়ে গিয়েছে দেখ্‌ছি! তুমি কি বল্‌লে?"

সুমিত্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হাসিতে-হাসিতে জয়ন্তী বলিলেন, "কি আর বল্‌ব! বল্‌লাম, যখন তোমার দিনকাল পড়েছে তখন যা বল্‌বে তাই কর্‌তে হবে।"

প্রসন্নমুখে প্রমদাচরণ বলিলেন, "তুমি আমাকে আমার মেয়ে ফিরিয়ে দিতে এসেছ জয়ন্তী, কিন্তু বাস্তবিক তা সত্যি নয়, তুমিই তোমার মেয়েকে আজ ফিরে' পেয়েছ! পাওয়া মানে শুধু হাতের মধ্যে পাওয়া নয়, মনের মধ্যে পাওয়াই আসল পাওয়া!" তৎপরে সুমিত্রার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তোমার পক্ষে আজ একটা শুভদিন সুমিত্রা! আমি আশীর্ব্বাদ করি তোমার জীবন সার্থক আর সফল হোক! এখন থেকে জননী আর জন্মভূমি উভয়কেই তুমি সুস্থমনে সেবা কর্‌তে পার্‌বে। তোমার জীবনে আর কোনও গোলযোগ রইল না!"

জয়ন্তী মুখে কিছু বলিলেন না, মনে-মনে বলিলেন, "তুমি বাপ, তুমি আর কত বুঝবে! এখনও একটা বিষম গোলযোগ বাকি রইল!"

কয়েকদিন পরে সুরমা বেড়াইতে আসিয়াছিল। সমস্ত কথা শুনিয়া সে জয়ন্তীকে কহিল, "ঠাকুর-পোও ত অনেকটা স্বদেশী হ'য়ে এসেছে, এইবার তা হ'লে সুমিত্রার বিয়ে দাও না মা! এখন সম্ভবতঃ সুমিত্রা বিয়ে কর্‌তে রাজি হবে। বলো ত এই ফাগুন মাসেই বিয়ের ব্যবস্থা করি।"

জয়ন্তী মাথা নাড়িয়া বলিলেন, তা-ও কখন হয়? ছেলে-জামাই দেশে না ফির্‌লে হ'তেই পারে না। তা ছাড়া, খদ্দর ছাড়াতে গিয়ে যেশিক্ষা আমার হয়েছে, এখন আমি আর কোনও কথা তুল্‌ছিনে! আগে ওর শরীরটা ধাতে ফিরে' আসুক তার পর অন্য কথা।"

অনেক কথা আন্দাজি আন্দাজি মনে ভাবিয়া লইয়া সুরমা বলিল, "সুরেশ্বরের সঙ্গে সুমিত্রার বিয়ে দেওয়ার কথাও কখন কখন ভাবো কি মা?"

সুরমার কথা শুনিয়া চমকিত হইয়া জয়ন্তী বলিলেন, "ক্ষেপেছিস্ নাকি। তা-ও কখন হয়!" তাহার পর অন্যমনস্ক হইয়া একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তা কখনই হবে না, তবে সুরেশ্বর জেল থেকে খালাস হবার পর সুমির বিয়ে হওয়া ভাল। এ যেন সে মনে না করে যে সুরেশ্বর জেলে রয়েছে বলে' আমরা তাড়াতাড়ি তার বিয়ে দিয়ে দিতে চাচ্ছি।"

সুরমা একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "সে কথা ঠিক বলেছ মা।"

(ক্রমশঃ)

বায়ু-মণ্ডল ঊর্দ্ধে কত দূর বিস্তৃত ?

আষাঢ় সংখ্যা 'প্রবাসী'র বেতালের বৈঠকে৷ মীমাংসার বিমান-পোত ও আহ্নিকগতির প্রসঙ্গে একজন লেখক লিখেছেন যে,পৃথিবী থেকে প্রায় ৪৫ ক্রোশ (৯° মাইল) উর্দ্ধ পর্য্যন্ত বায়ু-মণ্ডল ; আর-এক লেখকের মতে এই বায়ু-মণ্ডলের গভীরতা প্রায় ৫০ মাইল।

এতদিন জানা ছিল, এই বায়ু-মণ্ডল উর্দ্ধে প্রায় ১০০ মাইল গিয়ে শেষ হ'য়ে গেছে ; এই ১০০ মাইলের পর জড়-জগতের কোন অস্তিত্ব নেই, কেবল ফাকা বায়ু-হীন বিশাল শূন্য (perfect vacuum) বিরাজ করছে ! (অবশ্য এই বায়ুহীন অনন্ত শূন্যের মাঝে মাঝে, সমুদ্রে বিন্দুবৎ, গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতি জড়-জগৎ নিজ-নিজ বায়ু-মণ্ডলে আবৃত হ'য়ে ঘুরে' ঘুরে' বেড়াচ্ছে।) এই ১০০ মাইলের মধ্যে আবার প্রথম ৫০ মাইলের পর বাতাস এত বেশীরকম পাতলা (rarefied) হ'য়ে গেছে যে এই ৫০ মাইলের পর যে-বাতাস আছে তাকে সাধারণতঃ আমরা গণ্য বলে'ই ভাবিনে।

বায়ু-মণ্ডলের গভীরতা সম্বন্ধে সম্প্রতি বিখ্যাত ফরাসী জ্যোতিষিক্ আ্যাব্‌বে মোরো (Abbe Moreaux) অভিনব মত প্রকাশ করেছেন, তার বিবরণ জুনের 'পপুউলার সায়েন্স্ মান্থ্‌লি'তে বেরিয়েছে।

তিনি জানিয়েছেন যে, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা এরূপ সূচিত হয় যে বায়ুস্তরের গভীরতা প্রায় ৫৪০ মাইল। অবশ্য বায়ু-মণ্ডলের উপর-অঞ্চলের বাতাসের সঙ্গে, আমরা যে-বাতাসে নিশ্বাস নিয়ে থাকি, তার সঙ্গে সাদৃশ্য খুবই কম। এই জ্যোতিষিকের মতে প্রায় ১০ মাইল উঁচু পর্য্যন্ত বাতাস পাওয়া যায়। সাধারণ বাতাস যার সাথে আমাদের চেনা-পরিচয় আছে আর যা প্রধানতঃ অক্‌সিজেন্, নাইট্রোজেন, কার্ব্বনিক্ এসিড্ ও দু' চার'টি বিরল গ্যাসের (rare gases) মিশ্রণে গঠিত। অবশ্য অক্‌সিজেনের পরিমাণ, যতই উপরে যাওয়া যায়, ততই কম্‌তে থাকে ; উড়ো-জাহাজ-চালক ও উঁচু পাহাড়-চড়িয়েরা এ-রকমই বলে' থাকেন। ১০ মাইলের পর থেকে প্রায় ৬০ মাইল উঁচু পর্য্যন্ত বায়ু-মণ্ডলের প্রধান উপাদান নাইট্রোজেন্ ; এ-অঞ্চলে ঝড়-ঝাপটা বা জোর বাতাস নেই। এই উক্তি নরওয়ের অধ্যাপক ফেগার্ডের (Professor Vegard) নূতন আবিষ্কারকে সমর্থন করে ; অধ্যাপক ফেগার্ড্ আবিষ্কার করেছেন যে বায়ু-মণ্ডলের শেষে একটি নাইট্রোজেন্ স্তর আছে। জ্যোতিষিক মোরোর মতে ৬০ মাইলের পর থেকে ১০০ মাইল বা কিছুদূর আরো উঁচু পর্য্যন্ত আর-একটি স্তর আছে যা প্রধানতঃ হাইড্রোজেনে গঠিত। বিজ্ঞান বরাবর বিশ্বাস করে' এসেছে যে, বায়ু-মণ্ডলের শেষ এইখানে—এই ১০০ মাইল উঁচুতে। কিন্তু আ্যাব্‌বে মোরোর মতে আরও একটি অজ্ঞাত উপাদানের ঘন স্তর আছে যার বিস্তার উর্দ্ধে আরো ৪০০ মাইলেরও বেশী। এই অজ্ঞাত বায়ুস্তরের সুস্পষ্ট অস্তিত্ব নিরূপণ করা হয় উদীচ্য উষা বা অরোরা-বোরীএলিসের নিপুণ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা। নানান্ স্থান থেকে যুগপৎ ৬০০র উপর আলোক-চিত্র গ্রহণ করে' এবং পরে ত্রিকোণমিতির সাহায্যে গণনা করে' জানা গেছে যে, অরোরার বৈদ্যুতিক বিকাশ ভূপৃষ্ঠ থেকে উর্দ্ধে ৫৪০ মাইল পর্য্যন্ত ছড়িয়ে আছে। অরোরার এই বৈদ্যুতিক বিকাশ ফাঁকা বায়ুহীন (জড়বস্তুহীন) শূন্য স্থানে (vacuum) সম্ভবপর নয়। তাই অনুমান করা হয়েছে যে, ৫৪০ মাইল বা আরও উঁচুতে কোনো-না-কোনো-রকমের বায়ুস্তর আছে।

আর এ যদি প্রমাণ হয় যে, উত্তর-মেরুতে বায়ুস্তর উর্দ্ধে ৫৪০ মাইল পর্য্যন্ত আছে, তা হ'লে সঙ্গে সঙ্গে এও প্রমাণ হবে যে পৃথিবীর সর্ব্বত্র বায়ু-মণ্ডলের গভীরতা ৫৪০ মাইল, কারণ বায়ুস্তরের উচ্চতা পৃথিবীর দু' জায়গায় দুরকম হ'তে পারে না ; কোন-রকমে তা হ'লেই বায়ু-সমুদ্রে তীব্র আলোড়ন হ'য়ে শীঘ্রই বায়ুস্তরের উচ্চতা দু'জায়গায় সমান করে' দেবে।

অমিয় বসু

—

ঐতিহাসিক সত্য নির্ণয়ের উপায়

বৈশাখের "প্রবাসী"তে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শীল মহাশয় "নারীর অবরোধ প্রথা" নামক প্রবন্ধে কয়েকটি প্রমাণ দিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, "মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্বেও সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারে অবরোধ প্রথা প্রচলিত ছিল।"

হিন্দু নারীর মধ্যে যে অবরোধ প্রথা ছিল তাহার "ঐতিহাসিক" প্রমাণ দিতে গিয়া তিনি বলিলেন, উত্তর-ভারতে ঝুলন-উৎসবের সময় কুল-কামিনীরা বিবাহার্থী রাজপুত এবং দাসী সংগ্রহার্থী মুসলমান কর্ত্তৃক অপহৃত হইত ; মহাবীরের সময়ে বৈশালীর রাজকুমারীকে এক ধনবান্ দুষ্ট বণিক্ হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল ;—এই দুই ঘটনা হইতে সিদ্ধান্ত করিলেন, হিন্দু-মহিলাদের মধ্যে অবরোধ প্রথা ছিল। ত্রিবাঙ্কুরে নম্বুদ্রি মহিলারা চাদরে আবৃত হইয়া ছাতা মাথায় দিয়া রাস্তায় বাহির হয়। "বাহির হয়" ইহাতে অবরোধ বুঝাইল কোথায় ? কিন্তু এই প্রমাণ হইতে লেখক সিদ্ধান্ত করিলেন, "এই নিয়মে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, প্রাচীন বৈদিক কালে সম্ভ্রান্ত বংশে অবরোধের প্রথা বড় অল্প ছিল না," কেন না, নাম্বুদ্রিরা 'গৈরিক বসন পরিয়া দণ্ডধারণ করিয়া গুরুগৃহে গিয়া বেদ অধ্যয়ন করে' !

তার পর লেখক বলিতে চাহিলেন, ভারতে আসিবার পূর্ব্বে মুসলমান মহিলাদের মধ্যে অবরোধ-প্রথা ছিল না। তাঁহারা শুধু বোর্‌কা দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া মুক্তভাবে চলাফেরা করিতেন। বোর্‌কা কি নারীর মুক্তির পরিচায়ক না তাহার নারীত্বের উপহাস মাত্র ! বোর্‌কা পরা যদি অবরোধ না হয়, তবে নম্বুদ্রী মহিলার চাদর পরিয়া চলা অবরোধ হইল কিরূপে ?

তার পর লেখক বলেন, "তাঁহারাই (মুসলমান মহিলারা) এখানে আসিয়া দেখিলেন, সম্ভ্রান্ত হিন্দু মহিলারা অবরোধে বাস করেন, তাঁহাদের পক্ষে পথে হাঁটা নিন্দনীয়। অতএব তাঁহারাও হিন্দুদের দেখাদেখি অন্তঃপুরবাসিনী হইলেন। এরূপ না করিলে তাঁহাদের সম্মান থাকে না।"

"হিন্দু-মহিলারা অবরোধে বাস করেন" একথা লেখকের উক্তি মাত্র "যথেষ্ট" 'ঐতিহাসিক' দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াও তিনি তাহার ন্যায় প্রমাণ দেন নাই। "হিন্দুদের দেখাদেখি 'অন্তঃপুরবাসিনী হইলেন,' ইহারও কোন প্রমাণ দেওয়া হইল না।

আমি লেখক মহাশয়কে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই।—

১। বর্ত্তমান ভারতে দেখা যায়, গুজরাত ও মহারাষ্ট্র দেশের উচ্চ-নীচ সমস্ত শ্রেণীর হিন্দু নারীরা মুক্ত; তাহাদের মধ্যে পর্দ্দা বা অবরোধ নাই। লেখক বৈদিক ধর্ম্মানুসরণের কথা তুলিয়াছেন; মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণেরা অতি গোঁড়া হিন্দু এবং বৈদিক ধর্ম্মের সংরক্ষক বলিয়া পরিচিত। তাঁহাদের নারীরা মাথায় ঘোমটা পর্য্যন্ত পরে না। এতদ্ভিন্ন সমস্ত দক্ষিণ দেশেই দেখা যায়, হিন্দু নারীরা অল্প-বিস্তর স্বাধীন এবং মুক্তভাবে চলাফিরা করে। ত্রিবাঙ্কুরের কথা বলিতে গিয়াও লেখক বলিয়াছেন, "সাধারণ অব্রাহ্মণ-বংশে, এমন-কি ক্ষত্রিয় নায়ার বংশেও অবরোধ-প্রথা ছিল না, এবং এখনও নাই।" পঞ্জাবেও হিন্দু নারীদের তত পর্দ্দা নাই।

হিন্দুনারীদের এই অবরোধ-হীনতার প্রথা এখন যেমন আছে আধুনিক যুগের পূর্ব্বেও তেমনই ছিল। অতি প্রাচীন কাল হইতেই যে এপ্রথা চলিয়া আসিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই।

সুতরাং দেখা যায় ভারতের যে-যে প্রদেশ চিরকাল হিন্দু সভ্যতার অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে, সেখানে হিন্দু নারীদের পর্দ্দা নাই। অথচ সেইসব দেশের উচ্চশ্রেণীর মুসলমান-নারীদের মধ্যে কঠোর অবরোধ-প্রথা বিদ্যমান। সেখানের নীচশ্রেণীর মুসলমান নারীরা,—যাহাদের অধিকাংশই পূর্ব্বে হিন্দু ছিল, (যেমন মহারাষ্ট্রের নিম্নশ্রেণীর মুসলমান বা কেরল প্রদেশে মোপ্‌লা স্ত্রীরা)—পর্দ্দা রক্ষা করে না। অপর দিকে যে-সকল হিন্দু মুসলমানের সভ্যতা, আচার, পোষাক ইত্যাদি গ্রহণ করিয়াছে, (যেমন উচ্চশ্রেণীর মারাঠা ক্ষত্রিয়েরা) তাহারা পর্দ্দা মানিয়া থাকে।

পঞ্জাব, গুজরাত, মহারাষ্ট্র ও মারাঠা অধ্যুষিত মধ্য প্রদেশের নারীরা এবং সারা দক্ষিণ ভারতের প্রায় সমস্ত হিন্দু এবং হিন্দু হইতে দীক্ষিত অনেক মুসলমান স্ত্রীরা পর্দ্দাহীন; কিন্তু উক্ত দেশসমূহের সমস্ত মুসলমান নারীসমাজ (হিন্দুধর্ম্ম হইতে দীক্ষিত নিম্ন শ্রেণী ছাড়া) অবরোধ ও পর্দ্দায় আবদ্ধ। ইহা হইতে কোন নিরপেক্ষ লোক কি সিদ্ধান্ত করিবেন যে, মুসলমান নারী হিন্দু নারী হইতে পর্দ্দা ও অবরোধ-প্রথা শিখিয়াছে?

২। বর্ত্তমান যুগে দেখা যায়, যুক্তপ্রদেশ, বিহার-উড়িষ্যা ও বাংলা দেশে পর্দ্দার কড়াকড়ি। কিন্তু এইসব দেশেও কেবল মুসলমান নারীর মধ্যেই পূর্ণ অবরোধ বিদ্যমান। হিন্দু নারীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেণীতে, সর্ব্বস্থানে বা সর্ব্বসময়ে পূর্ণ পর্দ্দা রক্ষিত হয় না। উক্ত প্রদেশসমূহে

(ক) উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুনারীর মধ্যেই পর্দ্দার প্রচলন. নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই পর্দ্দা রক্ষা করেন না।

(খ) সহরেই হিন্দু নারীদের পর্দ্দার কঠোরতা; পাড়াগাঁয়ে উচ্চনিম্ন সব শ্রেণীর মেয়েদের ভিতরই অনেকটা মুক্ত ভাব আছে।

(গ) তীর্থে, দেবালয়ে, গঙ্গাস্নানে, মেলায় এবং অন্যপ্রকার ধর্ম্মোৎসবে হিন্দু নারীরা পর্দ্দা রক্ষা করে না। লেখক মুসলমান নারীদের বোর্‌কা পরিয়া মসজিদে যাইবার কথা বলিয়াছেন, কিন্তু উল্লিখিত কারণে যত হিন্দু নারী প্রকাশ্যে বাহির হয়, তাহার তুলনায় কয়জন মুসলমান নারী বাহিরে আসে?

হিন্দু যেখানে পর্দ্দা রক্ষা করে, সেখানেও মুসলমানের মত কঠোরতা নাই। মুসলমান নারীকে পুরুষের দৃষ্টি হইতে পূর্ণভাবে গোপন করিবার যে চেষ্টা হয়, হিন্দুনারীদের পক্ষে তাহা হয় না।

উক্ত প্রদেশসমূহে মুসলমানরাজ্যের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা এবং মুসলমান সভ্যতার বিস্তার হইয়াছিল। যেখানে মুসলমান সভ্যতার প্রভাব যত বেশী, সেখানে হিন্দুনারীর অবরোধের কঠোরতাও তত বেশী। যেখানে মুসলমানের সংখ্যা বেশী, সেখানে হিন্দুনারীর অবরোধের প্রসার বেশী। প্রথমোক্ত কারণে বাংলা হইতে যুক্তপ্রদেশে হিন্দু নারীর পর্দ্দা বেশী। দ্বিতীয় কারণে দেখা যায়, পশ্চিম বাঙ্গলায় হিন্দু নারীরা যেমন পথে-ঘাটে রেলগাড়ীতে একা চলাফিরা করে, পূর্ব্ববাঙ্গলায় সেরূপ করে না।

উপরে উক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করিলে কি নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক বলিবেন, হিন্দু হইতে মুসলমান পর্দ্দার প্রথা শিখিয়াছে?

৩। ভারতের বাহিরে যে-সব দেশে মুসলমান নারীর পর্দ্দা আছে, সেখানে তাহারা তাহা পাইল কাহার নিকট হইতে?

লেখক প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য হইতে প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছেন। রাজরাণীদের লোকচক্ষুর অগোচর থাকা জাতিবিশেষের রীতি-নীতির পরিচায়ক নহে। লেখক সংস্কৃত সাহিত্য হইতে এমন দৃষ্টান্ত দিতে পারেন কি যাহা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, মুসলমানযুগের পূর্ব্বে ভারতের নারী-সাধারণের মধ্যে মুসলমানের মত অবরোধ-প্রথা ছিল? মহাকাব্যে, কাব্যে, নাটকে, পুরাণে, গল্পে, নারীদের মুক্ত গতিবিধির কথাই পাওয়া যায় এবং মনে হয় প্রাচীন হিন্দুনারীরা আধুনিক গুজরাতী মারাঠীর মতই মুক্ত ছিল।

তবে আধুনিক ইউরোপ আমেরিকায় যেমন স্ত্রীপুরুষের মধ্যে মুক্তভাবে মেলা-মেশা কিংবা স্ত্রীলোকের পূর্ণ স্বাবলম্বন এবং স্বাধীনভাব দেখা যায়, তাহা মহারাষ্ট্রাদি দেশের নিম্ন শ্রেণীর নারীদের মধ্যে ভিন্ন, অন্য কোথাও দৃষ্ট হয় না। বোধ হয় প্রাচীন কালেও উচ্চশ্রেণীর নারী-পুরুষের মধ্যে তেমন মেলামেশা বা নারীদের তেমন পূর্ণ স্বাধীনভাব ছিল না। ভারতীয় নারীর মধ্যে চিরকালই একটা সঙ্কোচের ভাব রহিয়াছে, এবং মুক্তির মধ্যেও এই সঙ্কোচ বা লজ্জা হিন্দুনারীর বিশেষত্ব।

সামাজিক কোন একটা প্রথা শুধু বাহিরের জিনিষ নয়, সমাজের মনের সঙ্গেও তাহার যোগ আছে।

হিন্দুর মনোভাব একটা সুপ্রতিষ্ঠিত আদর্শ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। একজন হিন্দু বীর এক কঠোর সন্ধিক্ষণে জগতের সম্মুখে এ-আদর্শের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। কল্যাণ জয় করিয়া সেনানায়ক আবাজী মুসলমান বিজেতার অনুকরণে মুসলমান সুবেদারের রূপসী তরুণী পুত্রবধূকে শিবাজীর নিকট যুদ্ধের আহরণস্বরূপ আনিয়া উপহার দিলেন। তখন শিবাজী সেই তরুণীর মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, "আমার মা যদি তোমার মত সুন্দর হইত, তবে আমার কি সৌভাগ্য হইত, আমিও কত সুন্দর হইতাম।" [এঘটনা মুসলমানের লিখিত গ্রন্থেও লিপিবদ্ধ আছে।]

হিন্দু বিজয়ী এই এক কথায় মুসলমান বিজেতার হস্তে হিন্দুনারীর যুগ-যুগ-ব্যাপী লাঞ্ছনার শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দিয়াছেন। হিন্দুর নারীর প্রতি এই মর্য্যাদার আদর্শ যে বর্ত্তমানে ও অতীতে স্ত্রীস্বাধীনতার সহায় হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ কি?

এআদর্শ যখন ভারতের সর্ব্বশ্রেণীর লোক গ্রহণ ও অনুসরণ করিবে তখন আর কোথাও নারীর অবরোধের প্রয়োজন হইবে না। নারীর স্বাধীনতা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে,—যেমন পূর্ব্বে ভারতে হইয়াছিল।

শ্রী অবিনাশচন্দ্র বসু

অবরোধ-সম্বন্ধে আমি যাহা লিখিয়াছি তাহা যে সর্ব্ববাদি-সম্মত হইবে সে আশা করি নাই, কারণ প্রমাণস্বরূপ সেকালের কোনও ইতিহাস দেখাইতে পারা যায় না। কিন্তু সকল দোষ ইস্‌লামের স্কন্ধে চাপান অন্যায় হইবে। এই ইস্‌লামে পর্দ্দা-সম্বন্ধে কেবল এইমাত্র আছে:—

চৈতন্যদেবের গৃহত্যাগের পর উৎকণ্ঠিতা মাতা ও পত্নী

ঈশ্বর কোরাণে তাঁহার রসুলকে বলিতেছেন

"বিশ্বাসী স্ত্রীলোকদের বল, তাহারা যেন আপন চক্ষুকে
সংযত করেন ও আপন লজ্জাশীলতা রক্ষা করেন ; ও আপনার
অলঙ্কারের যে অংশ বাহির দিকে থাকে তাহা ছাড়া অন্য
অংশ প্রকাশ না করেন। ও আপনার স্বামী, পিতা,
স্বামীর পিতা, পুত্র, স্বামীর পুত্র, স্বামীর ভ্রাতা, ভ্রাতা বা
ভগ্নীর পুত্র বা অতি বৃদ্ধ পুরুষ বা অজ্ঞান বালক ছাড়া
অন্য লোকের সম্মুখে আবরণ দ্বারা আপনার মস্তক [মুখ]
গলা ও বুক আচ্ছাদিত করেন ও আপনার অলঙ্কার
না দেখান ও হাঁটিবার সময়ে অলঙ্কারের শব্দ না করেন।"
[কোরান, ২৪ পরিচ্ছেদ]

এই আজ্ঞা-অনুসারে মুসলমানদের দেশে স্ত্রীলোকেরা বুর্‌কা দ্বারা শরীর আচ্ছাদিত করিয়া প্রয়োজন মত পথে-ঘাটে ঘুরিয়ে বেড়ান।

ভারতে যে মুসলমানেরা রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সিন্ধু-বিজয়ীরা আরব ও অন্যেরা প্রায় সকলেই তুর্ক্। তুর্ক্‌দের সহিত আফ্‌গান সামন্তরা আসিয়াছিলেন ; তাঁহারাও স্থান-বিশেষে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। তুর্ক্‌রা আপনার দেশের সভ্যতা, রীতি, নীতি, দোষ, গুণ সকলই সঙ্গে আনিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে এমন অনেক রীতি-নীতি ছিল, ও এখনও আছে, যাহা ইস্‌লাম-অনুমোদিত নহে, দেশাচার মাত্র, অথচ সেগুলি তাঁহারা এখনও ত্যাগ করেন নাই।

পৃথ্বীরাজ রাসো নামক একখানি গ্রন্থ আছে, তাহার কবি চন্দ্ বরদই। চন্দ্ পৃথ্বীরাজের সভাসদ্ ছিলেন। তিনি পৃথ্বীরাজের যে অন্তঃপুর বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে মোগল হরমের কঠোরতা ছিল। অন্তঃপুরে স্ত্রী-প্রহরী ছাড়া খোজা প্রহরীদের উল্লেখ আছে। পৃথ্বীরাজের অন্তঃপুরে তাঁহার পুত্রও প্রবেশ করিতে পারিতেন না।

লেখক বলিতেছেন, "বোর্‌কা যদি অবরোধ না হয়, তবে নথুরী মহিলার চাদর পরিয়া চলা অবরোধ হইল কিরূপে ?" কিন্তু এরূপ কেন লিখিলেন, বুঝিতে পারিলাম না। আমি ত বলি নাই যে, মুসলমানদের অবরোধ মোটেই ছিল না, ভারতে আসিয়া শিখিয়াছে। আমি বলিয়াছি, উভয়ের প্রথা ছিল, পরে উভয়ে উভয়ের অনুকরণে ও মুসলমানদের অত্যাচারে হিন্দুদের অবরোধ প্রথা কঠোর হইতে কঠোরতর হইয়াছে। মুসলমান দেশে—মিশর, ইরান ইত্যাদি—মুসলমান ভদ্র মহিলারা বোর্‌কা পরিয়া পথে-ঘাটে হাঁটিয়া বেড়ান, কিন্তু ভারতে তাহা করেন না।

ভারতে মুসলমান-আগমনের পূর্ব্বে সম্ভবতঃ ভিন্ন-ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রথা প্রচলিত ছিল। যদি সকল দেশে একই প্রকার প্রথা থাকিত তবে আধুনিক গুজরাটে ও বঙ্গদেশে একই প্রথা হইত, কেননা এই দুই দেশে মুসলমান রাজ্য ও প্রভাব প্রায় একই প্রকার ও সমান-কাল স্থায়ী ছিল। কিন্তু সেরূপ নহে। মহারাষ্ট্রে ১৩৪৭ হইতে মুসলমান রাজ্য, কিন্তু সেখানে অবরোধ নাই বলিলেই হয়। লেখক বলিতেছেন, পঞ্জাবে পর্দা অতি অল্প, কিন্তু লাহোর ও তাহার পশ্চিমাংশ ১০২২ খৃষ্টাব্দে মুসলমানদের অধিকারে আসে ও তাহার পর প্রায় আট শতকের পর প্রথম অ-মুসলমান রাজা রণজিৎ সিংহ। ইহা প্রমাণ করিতেছে যে মুসলমান রাজ্য বা প্রভাব অবরোধের একমাত্র কারণ নহে। এ প্রথার কঠোরতা নানা কারণে কমবেশী হইয়া থাকে ; আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। নগর ও পল্লীগ্রামে এক প্রথা নহে, আবার একই দেশে ভিন্ন-ভিন্ন সম্প্রদায়ে বা জাতিতে ভিন্ন-ভিন্ন নিয়ম দেখা যায়।

মহারাজ শিবাজীর ইরাণী কুলবধূর প্রতি উক্তির অবরোধ প্রথার সহিত কি সম্বন্ধ বুঝিতে পারিলাম না।

শ্রী অমৃতলাল শীল

বায়ুমণ্ডলে হিলিয়াম ও তাহার ব্যবহার

শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র রায়

পুরাতন গ্রীক্ পণ্ডিতগণের মতে ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এই চারিটি মৌলিক পদার্থের সমবায়ে পৃথিবীর যাবতীয় দ্রব্যের উৎপত্তি। ভারতের মনীষিগণ এই চারি ভূত ভিন্ন ব্যোম-নামক সূক্ষ্মতর পঞ্চম পদার্থের কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। বৈজ্ঞানিকের কঠোর হস্তে পড়িয়া অজ্ঞাতকুলশীল "ব্যোম" ভিন্ন অপর চারিভূতের ভূতত্ব ঘুচিয়া গিয়াছে। ক্যাভেণ্ডিশ জলের যৌগিকত্ব প্রমাণ করিয়াছেন, প্রিষ্ট্‌লে, ক্যাভেণ্ডিশ্, শিলে ও লাভোয়াশিয়ের গবেষণায় সাধারণ বায়ু অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন নামক দুই মৌলিক পদার্থের মিশ্রণ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। প্রিষ্ট্‌লে কার্ব্বনিক অ্যাসিড গ্যাসের আবিষ্কার করেন। তিনি লীড্‌সের চ্যাপেলের ধর্ম্ম-যাজক ছিলেন। তাঁহার গির্জ্জার ঠিক পাশেই একটি মদ চোঁয়াইবার কারখানা ছিল। মদ চোঁয়াইবার সময় যে বায়ু বাহির হয়, তাহা পরীক্ষা করিয়া তিনি প্রমাণ করেন যে, এই কার্ব্বনিক অ্যাসিড গ্যাস বায়ুমণ্ডলে বিদ্যমান

বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পও প্রচুর পরিমাণে আছে, তবে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ঋতুর উপর নির্ভর করে। বর্ষাকালে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশী হয়, শীতকালে কম হয়। সাধারণতঃ দেখা গিয়াছে যে বায়ুমণ্ডলে ১০,০০০ বর্গ ফুটের

মধ্যে ৭৮০০ বর্গ ফুট নাইট্রোজেন, ২১০০ বর্গ ফুট অক্সিজেন, ৪ বর্গ ফুট কার্ব্বনিক অ্যাসিড গ্যাস ও বাকী ৯৬ বর্গ ফুট জলীয় বাষ্প প্রভৃতি অন্যান্য গ্যাস।

নাইট্রোজেন বায়বীয় মূল পদার্থ। Gaseous element বায়ু হইতে নাইট্রোজেন পাওয়া যায়, আবার রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা নাইট্রোজেন সমন্বিত যৌগিক পদার্থ হইতেও নাইট্রোজেন প্রস্তুত করিতে পারা যায়। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড্ র‍্যালে ও র‍্যাম্‌জে নানাপ্রকার মৌলিক বায়ুর আপেক্ষিক গুরুত্ব (specific gravity of gaseous elements) নির্দ্ধারণে নিযুক্ত থাকার সময় লক্ষ্য করেন যে, সাধারণ বায়ু হইতে প্রস্তুত নাইট্রোজেনের আপেক্ষিক গুরুত্ব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত নাইট্রোজেনের আপেক্ষিক গুরুত্ব অপেক্ষা সামান্য কিছু বেশী। তিনি প্রথমে ভাবিয়াছিলেন যে, দুই প্রকারে প্রস্তুত নাইট্রোজেনের অণুর মধ্যে পরমাণু সংখ্যার বিভিন্নতা বা পরমাণুসমূহের বিন্যাসের বিভিন্নতার (difference in the number of atoms in the molecule or difference in the intramolecular arrangements of the atoms-Allotropy) জন্য গুরুত্বের পার্থক্য হয়। এইপ্রকার ঘটনা রসায়ন শাস্ত্রে বিরল নয়—হীরক, গ্র্যাফাইট্ ও কয়লা সবই মূল পদার্থ কার্ব্বন ছাড়া কিছুই নয় কিন্তু উপরি উক্ত কারণের জন্যই ইহাদের আপেক্ষিক গুরুত্বের যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

র‍্যাম্‌জে কিন্তু র‍্যালের এই সিদ্ধান্ত মানিয়া না লইয়া অনুমান করিতে লাগিলেন যে, বায়ুমণ্ডল হইতে প্রস্তুত নাইট্রোজেনের মধ্যে অজ্ঞাত নূতন কোন মূল পদার্থ আছে। এই মতদ্বৈধের সুমীমাংসা করিবার জন্য উভয় বৈজ্ঞানিক ভিন্ন-ভিন্ন পথ অবলম্বন করিলেন।

এইসঙ্গে একটা কথা বলা আবশ্যক যে, জলের বিশ্লেষণ কর্ত্তা ক্যাভেণ্ডিস্ প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে দেখাইয়াছিলেন যে, সাধারণ বায়ুর মধ্যে ক্রমাগত তড়িৎ প্রয়োগ করিবার পর নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন মিলিয়া যে যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি হয় উহা ক্ষার দ্বারা শোষণ করিয়া লইলে অতি ক্ষুদ্র একবিন্দু বায়ু অবশিষ্ট থাকে। বায়ু-বিন্দুর পরিমাণ অতিশয় অল্প ছিল, এজন্য তিনি উহা লইয়া পরীক্ষা করিতে পারেন নাই। র‍্যালে আধুনিক যন্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে সামান্যপরিমাণ গ্যাস প্রাপ্ত হন ও প্রমাণ করেন যে, উহা সাধারণ বায়ু অপেক্ষা ঘন। অন্য দিকে র‍্যাম্‌জে বায়ু হইতে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা দূরীভূত করিয়া প্রায় একশত ঘন সেন্টীমিটার পরিমাণ বায়ু প্রাপ্ত হন। তৎপরে রশ্মি-বিশ্লেষণ-যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ করেন যে, নূতন আবিষ্কৃত গ্যাসটি একটি মূল পদার্থ। এই সঙ্গে বর্ণচ্ছত্র ও রশ্মি-বিশ্লেষণ-যন্ত্র দ্বারা নূতন বিশ্লেষণ-প্রথা সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

ত্রিকোণ কাচ-ফলকের মধ্য দিয়া সাধারণ শুভ্রালোক আসিতে দিলে উহা বিশ্লিষ্ট হইয়া লোহিত পীতাদি বর্ণযুক্ত একটি অপূর্ব্ব দৃশ্য রচনা করে, বৈজ্ঞানিকেরা ইহাকেই spectrum বা বর্ণ-ছত্র বলিয়া থাকেন। ত্রিকোণ কাচ ফলকের এই বর্ণবিশ্লেষণী শক্তির কথা সকলেই অবগত আছেন। শুভ্রালোক-বিশ্লেষণজাত বর্ণ-বৈচিত্র্য আমরা রামধনুর অপূর্ব্ব বর্ণবিন্যাসে ও পত্র প্রান্ত সংলগ্ন শিশির বিন্দুতে বাল সৌর-কিরণের অদ্ভুত বর্ণচ্ছটাতেও দেখিতে পাই। বর্ণ-ছত্রের আদিম ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে সার্ আইজ্যাক্ নিউটনের কথা প্রথমেই আসিয়া উপস্থিত হয়। সাধারণ শুভ্রালোক যে রামধনুস্থ কয়েকটি বর্ণের সমষ্টি তাহা নিউটন্‌ই খৃষ্টীয় ১৬৭৫ অব্দে সর্ব্বপ্রথম প্রচার করেন। একটি অন্ধকার গৃহে ক্ষুদ্র ছিদ্র দ্বারা সূর্য্য-কিরণ প্রবিষ্ট করাইয়া পরে পূর্ব্ববর্ণিত ত্রিকোণ কাচ-সাহায্যে আলোক বিশ্লিষ্ট করিয়া লোহিত পীত বেগুনে ইত্যাদি কয়েকটি বর্ণ-ছত্র অর্থাৎ বর্ণ-শ্রেণী ইনিই সর্ব্বপ্রথম বিজ্ঞানের আয়ত্তীভূত করিয়াছিলেন।

সূর্য্যালোক বিশ্লেষণ দ্বারা আমরা যে বর্ণচ্ছত্র প্রাপ্ত হই, তাহাতে লোহিতাদি বর্ণ অবিচ্ছিন্নভাবে সজ্জিত থাকে, কেবল ইহার মধ্যে সৌর বর্ণচ্ছত্রের প্রধান লক্ষণ কতকগুলি কৃষ্ণ রেখা স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়, কিন্তু এই কৃষ্ণ রেখাগুলি অতিশয় সূক্ষ্ম বলিয়া স্থূল দৃষ্টিতে সাধারণ বর্ণচ্ছত্র পর্য্যবেক্ষণ করিলে এগুলি সহসা পরিলক্ষিত হয় না। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে দুইখানি ভিন্নপ্রকৃতির

কাচ লইয়া বিবিধ রশ্মির আলোকপথ পরিবর্ত্তনের পরিমাণ স্থির করিতে গিয়া জার্ম্মাণ পণ্ডিত জোসেফ ফন্ হোফার সৌর বর্ণচ্ছত্রের মধ্যে কৃষ্ণ রেখা আবিষ্কার করেন। এই বিখ্যাত পণ্ডিত কেবল কৃষ্ণ রেখা আবিষ্কার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনিই প্রথম প্রচার করেন যে, সাধারণ সূর্য্যালোক চন্দ্রাদি গ্রহউপগ্রহ ও নক্ষত্রাগত প্রতিফলিত আলোকে এই কৃষ্ণ রেখাগুলির স্থান নির্দ্দিষ্ট ও অপরিবর্ত্তনীয়। ফন্ হোফার কিন্তু কৃষ্ণ রেখাসমূহের উপস্থিতির মূল কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই।

এইত গেল সূর্য্যালোকের কথা। অপর আলোকও বিশ্লিষ্ট হইলে বর্ণচ্ছত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু যে সকল মৌলিক বর্ণ রশ্মি সংযোগে সূর্য্যালোক উৎপন্ন হয় তাহার সকলগুলি উহাতে এক সঙ্গে উপস্থিত থাকে না।

বর্ণচ্ছত্র দ্বারা পদার্থের প্রকৃতি নির্ণয়ের কথা সর্ব্বপ্রথম সার্ জন্ হার্শেল ও ফক্স্ ট্যাল্‌বট, এই পণ্ডিতযুগল প্রচারিত করিয়াছিলেন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে হার্শেল সাহেব বিবিধ জীবন্ত পদার্থের বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষায় নিযুক্ত হন এবং প্রত্যেক পদার্থের বর্ণচ্ছত্রের নির্দ্দিষ্টস্থলে এক-একটি স্থূল বর্ণ-রেখা দেখিয়া এই নির্দ্দিষ্ট রেখাগুলিকেই দাহ্য পদার্থের প্রকৃতিজ্ঞাপক বলিয়া স্থির করেন। সোডিয়াম্-যুক্ত পদার্থের বর্ণচ্ছত্রে সর্ব্বদা দুইটি বিশিষ্ট স্থানে পীতরেখা থাকে (D_1 and D_2 line of sodium) এবং পোটাশিয়াম্-যুক্ত পদার্থের বর্ণচ্ছত্রে সর্ব্বদা ভায়োলেট্ রঙের কয়েকটি রেখা দৃষ্ট হয়। কাজেই দেখা যাইতেছে যে বর্ণচ্ছত্রস্থ স্থির রেখাগুলি পরিদর্শন করিয়া মূল পদার্থের প্রকৃতি নির্ণয় ও অতি জটিল পদার্থের গঠনোৎপাদনও নির্দ্দেশ করা যায়। সোডিয়াম্, পোটাসিয়াম্ প্রভৃতি ধাতু সাধারণ দীপ-শিখায় সহজেই বাষ্পীভূত ও প্রজ্বলিত হয়, এইজন্য ইহার বর্ণচ্ছত্র অতি সহজেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু অপর পদার্থ অল্প তাপে বাষ্পীভূত ও প্রজ্বলিত করা অতি কষ্টসাধ্য বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় এপর্য্যন্ত সাধারণ বিশ্লেষণ-কার্য্যে ব্যবহৃত হইত না; কিন্তু আজকাল বৈদ্যুতিক প্রবাহ ও অক্সি-হাইড্রোজেন দীপ্-শিখার সাহায্যে এইসকল কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, এজন্য এই অভিনব বিশ্লেষণ-প্রথা সর্ব্বাপেক্ষা সরল বলিয়া আদৃত হইতেছে।

বর্ণচ্ছত্র দ্বারা কেবল যে পদার্থ বিশ্লেষণের সুযোগ হইয়াছে তাহা নয়, ইহা দ্বারা কয়েকটি নূতন ধাতুও আবিষ্কৃত হইয়াছে। পোটাসিয়াম্ ধাতুর বর্ণচ্ছত্রে বর্ণরেখা নিরূপণ-কালে কয়েকটি অদৃষ্টপূর্ব্ব বর্ণরেখা দেখিয়া নিশ্চয়ই উহা কোন বিজাতীয় পদার্থ-যোগে উৎপন্ন হইয়াছে স্থির করিয়া বুন্‌সেন্ এই বর্ণোৎপাদক পদার্থটিকে পৃথক্ করিবার চেষ্টা করেন এবং ইহার এই চেষ্টার ফলে রুবিডিয়াম্ ও সিজিয়াম্ নামক দুইটি নূতন ধাতুর আবিষ্কার হয়। এইরূপেই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ক্রুক্স্ থ্যালিয়াম্, বয়স্ বাদ্রো ইণ্ডিয়াম ও ক্রেন্‌বার্গ্ গ্যালিয়াম নামক ধাতু আবিষ্কার করেন।

পূর্ব্ব বর্ণিত সৌরবর্ণ-ছত্রস্থ কৃষ্ণরেখা উৎপাদনের প্রকৃত কারণের আভাসও হার্শেল সাহেব সর্ব্বপ্রথম প্রচারিত করেন। তিনি দেখান যে, প্রত্যেক বাষ্পের যেরূপ বর্ণচ্ছত্রের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট বর্ণরেখা প্রকাশ করিবার ক্ষমতা আছে, সেইরূপ প্রত্যেক বাষ্পের আবার নির্দ্দিষ্ট রশ্মি হরণ করিবার ক্ষমতা আছে। বিজ্ঞানানুরাগী পাঠক পরিষ্কার জানেন যে, আমরা সচরাচর যেসকল পদার্থ প্রত্যক্ষ করি, তাহারা তাহাদের বর্ণ সূর্য্যালোক হইতেই প্রাপ্ত হয়। শুভ্রালোক ঐসকল পদার্থে পতিত হইলে প্রাকৃতিক ধর্ম্মানুসারে ইহারা আলোকস্থ কতকগুলি বর্ণরেখা হরণ করে ও হৃতাবশিষ্ট রশ্মিগুলি প্রতিফলিত করে—এই প্রতিফলিত রশ্মিদ্বারা আমরা পদার্থগণকে তত্তৎবর্ণবিশিষ্ট দেখিতে পাই। লোহিত বর্ণের কাঁচ-খণ্ড লোহিত ব্যতীত পীত, বেগুনিয়া প্রভৃতি শুভ্রালোকের অন্যান্য বর্ণ হরণ করে এবং কেবলমাত্র লোহিত বর্ণ প্রতিফলিত করে, এজন্য আমরা ঐ কাচখণ্ডকে লোহিত বর্ণ দেখি। সূর্য্যের মধ্যে প্রজ্বলিত হাইড্রোজেন, লৌহ প্রভৃতি অনেক ধাতু আছে। সূর্য্যের অভ্যন্তরস্থ আলোকরশ্মি যখন এইসকলের মধ্য দিয়া পৃথিবীতে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন এই সকল প্রজ্বলিত বাষ্পরশ্মি স্বীয় প্রকৃতি-অনুসারে কতকগুলি রশ্মি হরণ করিয়া লয় এবং এইজন্য কৃষ্ণরেখা অর্থাৎ লুপ্ত রেখা উৎপন্ন হয়।

সুতরাং কৃষ্ণ রেখাগুলির অবস্থান এবং কোন-কোন মৌলিক পদার্থ দ্বারা উক্ত বর্ণ লুপ্ত রেখাসমূহ উৎপন্ন হয় স্থির করিয়া সূর্য্য-মধ্যের চতুষ্পার্শ্বস্থ বাষ্পমণ্ডলীর উপাদান স্থির করা যায়। এইরূপে সূর্য্যের, চন্দ্রের ও অন্যান্য অনেক নক্ষত্রের উপাদান স্থির হইয়াছে।

র‍্যাম্‌জে সাহেবের পরীক্ষার বর্ণনা করিতে যাইয়া রশ্মিবিশ্লেষণ-প্রথা-সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম। এখন বেশ স্পষ্ট বোঝা যাইবে যে; র‍্যাম্‌জে কিরূপে আবিষ্কৃত গ্যাসটিকে একটি নূতন মূল পদার্থ বলিয়া স্থির করিলেন।

সাধারণতঃ প্রত্যেক মূল পদার্থ উপযুক্ত-পরিমাণ তাপ অথবা বৈদ্যুতিক শক্তি পাইলে অন্য মূল পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া একটি যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে কিন্তু এই নবাবিষ্কৃত গ্যাসটি কিছুতেই কোন পদার্থের সহিত মিলিত না হওয়ায় উহার নাম জড় বা আর্গন দেওয়া হইল। এই সময় বৈজ্ঞানিক ডেওয়ায় তরল বায়ু প্রস্তুত করিবার পন্থা আবিষ্কার করেন। তরল বায়ুর সাহায্যে আর্গন গ্যাসটিকে তরল করিবার সময় দেখা গেল যে, গ্যাসটির কিয়দংশ বাষ্পীভূত অবস্থায় থাকে, অবশিষ্ট অংশ তরল হইয়া যায়। অ-তরলীকৃত (unliquefied) গ্যাসটিকে রশ্মি বিশ্লেষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, ইহার বর্ণচ্ছত্রে একটি উজ্জ্বল পীতবর্ণ আর একটি উজ্জ্বল হরিৎ বর্ণের—এই দুইটি নূতন রেখা আছে। সুতরাং আর একটি মূল পদার্থ আবিষ্কৃত হইল এবং ইহার নাম হিলিয়াম্ দেওয়া হইল।

এই হিলিয়াম্ নামের অন্য এক ইতিহাস আছে। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ১৮ই আগষ্ট্ তারিখে জ্যান্‌সেন-নামক জ্যোতির্ব্বিদ সৌর ছটার (solar protuberences) বর্ণচ্ছত্র গ্রহণ করিয়া তন্মধ্যে একটি অদৃষ্ট-পূর্ব্ব উজ্জ্বল পীত রেখা দেখিতে পান। ফ্র্যাঙ্ক ল্যাণ্ড ও লকিয়ার্-নামক বৈজ্ঞানিকদ্বয় ইহা হইতে অনুমান করিলেন যে, সূর্য্যের মধ্যে অপার্থিব একটি নূতন মূল পদার্থ আছে এবং গ্রীক্-পুরাণের সূর্য্যদেবতা হিলিয়সের নামানুসারে উহাকে হিলিয়াম্ বলিয়া অভিহিত করিলেন। পরে দেখা গেল যে, র‍্যাম্‌জের আবিষ্কৃত গ্যাস ও লকিয়ার্ বর্ণিত গ্যাস উভয়েই এক পদার্থ। র‍্যাম্‌জে তরল আর্গন হইতে ক্রিপ্টন, (krypton) জেনন্ (xenon), নিয়ন্ (Neon) এই তিনটি নূতন গ্যাস আবিষ্কার করেন ও দেখান যে, উহারা বায়ুমণ্ডলে অতি অল্প-পরিমাণে বিদ্যমান। বায়ুমণ্ডলে দশলক্ষ বর্গফুট বায়ুর মধ্যে মাত্র এক বর্গফুট হিলিয়াম্ আছে।

বৈজ্ঞানিকের নিকট হিলিয়ামের এত বেশী আদর এইজন্য যে,রেডিয়াম্, ইউরেনিয়াম্ প্রভৃতি তেজোনির্গমন-ক্ষম গুরু ধাতুসমূহ (Radio-active elements) অন্তর্নিহিত শক্তি ত্যাগ করিয়া হিলিয়াম্ ও আর একটি লঘুতর পদার্থে পরিণত হয়। ফ্রান্সের বিখ্যাত রসায়নবিদ্ ক্যুরি ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী রেডিয়াম্ লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ইহা স্বতঃই বিশ্লিষ্ট হইয়া পরমাণু অপেক্ষা সূক্ষ্মকণায় বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে। এই আবিষ্কারের পর রাদারফোর্ড, সডি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে বিষয়টি লইয়া গবেষণা আরম্ভ করিয়াছেন—আজও এই গবেষণার বিরাম নাই। ইহার ফলে আজকাল বিজ্ঞানের অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে। ইঁহাদের পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, কেবলমাত্র রেডিয়াম্ এইরূপ বিশ্লিষ্ট হয়, তাহা নয়, থোরিয়াম্ ইউরেনিয়ম্ প্রভৃতি বহু ধাতব মূল পদার্থের এইপ্রকার বিশ্লেষণ হয় এবং এই ধাতুসমূহ বিশ্লিষ্ট হইয়া হইয়া একই অতি সূক্ষ্ম পদার্থে পরিণত হয়, তাহাও সকলে দেখিলেন। পরমাণুর এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভগ্নাংশগুলির নাম দেওয়া হইল, ইলেক্ট্রন বা অতি-পরমাণু। এইসকল আবিষ্কারের পর ড্যাল্‌টনের পরমাণবিক সিদ্ধান্ত (Dalton's Atomic Theory) আর অভ্রান্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিল না। বৈজ্ঞানিকগণ এখন বুঝিয়াছেন যে,হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, প্রভৃতি বিরানব্বইটি ধাতব ও অ-ধাতব মূল পদার্থ জগতে নাই। মূল পদার্থ একটি মাত্র তাহা এই ইলেক্‌ট্রন্ বা অতি-পরমাণু। এইগুলিই অল্প-বা অধিক-পরিমাণে জোট বাঁধিয়া হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, স্বর্ণ, লৌহ প্রভৃতি মূল পদার্থ নির্ম্মাণ করে।

র‍্যাম্‌জে দেখিলেন যে, রেডিয়াম্ রূপান্তরিত হইয়া নাইটনে পরিণত হয় এবং নাইটন বহু তাপ পরিত্যাগ

করিয়া হিলিয়াম ও রেডিয়াম-জাতীয় আর একটি পদার্থে (Radium A) পরিণত হয়। এসমস্তই অন্তর্নিহিত শক্তিরই লীলা। তিনি হিসাব করিয়া দেখাইলেন যে, এক ঘন-সেণ্টিমিটার স্থানে আবদ্ধ নাইটন বিশ্লিষ্ট হইয়া হিলিয়াম ও রেডিয়াম-এ-তে পরিণত হইলে সেই আয়তনের চল্লিশ লক্ষ গুণ হাইড্রোজেনকে পোড়াইলে যে তাপ উৎপন্ন হয়, সেইপ্রকার তাপ আপনা হইতে জন্মে। এই বিপুল শক্তিরাশি খুব নিবিড়ভাবেই রেডিয়ামে লুক্কায়িত থাকে এবং রেডিয়াম নিজেকে ক্ষয় করিয়া যখন লঘুতর পদার্থে পরিণত হয় তখন ঐ শক্তিই তাপরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

রাদারফোর্ড্ ভাবিলেন যে, রেডিয়ামের ন্যায় গুরু ধাতু যখন তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির আধিক্যের জন্য নাইটন ও হিলিয়াম প্রভৃতি লঘুতর পদার্থে পরিণত হয়, তখন নাইট্রোজেন, অক্সিজেন প্রভৃতি সাধারণ মূল পদার্থে অধিক পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করিলে তাহারাও লঘুতর পদার্থে পরিণত হইতে পারে। তিনি নাইট্রোজেনের মধ্যে আল্‌ফা-রশ্মি বৈদ্যুতিক শক্তি (Alpha-rays) প্রয়োগ করিয়া দেখাইলেন যে, নাইট্রোজন-পরমাণু তিনটি হিলিয়াম ও দুইটি হাইড্রোজেনে পরমাণুর সমষ্টি।

আমেরিকার কতিপয় বৈজ্ঞানিক কিন্তু কেবলমাত্র তাপ প্রয়োগ করিয়া পরমাণুকে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশ্য বৈদ্যুতিক চুল্লীতে নানা পদার্থকে এখন সেণ্টিগ্রেডের ৪০০০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উষ্ণ করা যাইতেছে কিন্তু এই উত্তাপে পরমাণুর কোন পরিবর্ত্তন হয় না। এইসকল বৈজ্ঞানিকেরা দেখাইলেন যে, যেসকল নক্ষত্রের উত্তাপ খুব বেশী—প্রায় ১৫,০০০ হইতে ২০,০০০ ডিগ্রী—সেইসমস্ত নক্ষত্রের মধ্যে প্রচুর-পরিমাণে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম প্রভৃতি লঘু পদার্থ বিদ্যমান; অধিকতর শীতল নক্ষত্রে গুরু মূল পদার্থের সংখ্যাই বেশী; তাঁহারা বলিতে লাগিলেন যে, অধিক উত্তাপের জন্য পূর্ব্বোক্ত নক্ষত্রসমূহে গুরু অণুসকল লঘুতর অণুতে পরিণত হইতেছে এবং এই পৃথিবীতেই কৃত্রিম উপায়ে তাপের মাত্রা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সম্প্রতি শিকাগো-নগরীতে উইল্‌সন্ বিজ্ঞানাগারে ১০,০০০ হইতে ৩০,০০০ ডিগ্রী উত্তাপ প্রয়োগ করিবার এক অভিনব পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে। অত্যধিক বৈদ্যুতিক চাপে (Voltage) অধিক-পরিমাণ বৈদ্যুতিক প্রবাহ অতি ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম একটি ধাতব তারের মধ্যে চালনা করিয়া এই অদ্ভুত তাপের সৃষ্টি করা হইয়াছে। বিদ্যুৎপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণও এত ভীষণ নিনাদ হয় যে, তত্রস্থ সকল লোকেরই কর্ণ বিশেষভাবে আবৃত রাখিতে হইয়াছিল, অন্যথায় সকলেরই কর্ণপটহ বিদীর্ণ হইয়া যাইত। প্রথম সেকেণ্ডের প্রথম ৩,০০,০০০ অংশে যে আলোক উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা সূর্য্যালোক অপেক্ষা দুই শত গুণ প্রখর।

এই তাপ প্রয়োগ করিয়া হেবেণ্ট্ ও ইরিডন্ নামক দুই বৈজ্ঞানিক ট্যাংষ্টেন নামক গুরু ধাতু হইতে হিলিয়াম প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। তবে অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকই এই আবিষ্কারের সত্যতা-সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

বৈজ্ঞানিকের নিকট হিলিয়ামের আদর থাকিলেও সাধারণের নিকট ইহার বিশেষ আদর ছিল না। কিন্তু বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে ইহার চাহিদা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইহা অতিশয় দুষ্প্রাপ্য ছিল। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে মাত্র ৫০ ঘন বর্গফুট বিশুদ্ধ হিলিয়াম ছিল এবং একঘন বর্গফুটের মূল্য ছিল প্রায় পাঁচহাজার টাকা। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে নৌ-যুদ্ধের সময় বিমান-বিভাগ বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, যদি হাইড্রোজেনের পরিবর্ত্তে বিশুদ্ধ হিলিয়াম বা হিলিয়াম-মিশ্রিত হাইড্রোজেন ব্যবহার করা যায়, তবে অনেক দুর্ঘটনা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় এবং বিমান-বিভাগ অধিকতর কার্য্যোপযোগী হয়। এপর্য্যন্ত সর্ব্বাপেক্ষা লঘু গ্যাস বলিয়া হাইড্রোজেন বিমান-সমূহে ব্যবহৃত হইত, কিন্তু পেট্রোল-চালিত ইঞ্জিনের তাপের জন্য অনেক সময় হাইড্রোজেন বায়ুস্থ অক্সিজেনের সঙ্গে মিলিত হইয়া জল উৎপাদন করিত ও সঙ্গে-সঙ্গে ভীষণ বিস্ফোরণ হইত।

হিলিয়াম হাইড্রোজেন ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত গ্যাস অপেক্ষা লঘু ও আর্সনের ন্যায় জড়, সুতরাং বিশুদ্ধ

হিলিয়াম বা হলিয়াম-মিশ্রিত হাইড্রোজেন ব্যবহারে বিস্ফোরণের কোন সম্ভাবনা থাকে না। এইজন্য প্রত্যেক যুদ্ধ-নিরত জাতি প্রচুর পরিমাণে হিলিয়াম প্রস্তুতের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রত্যেক স্থানের বায়ু লইয়া পরীক্ষা চলিতে লাগিল, অবশেষে ক্যানাডা দেশস্থ অ্যালবার্টা প্রদেশে উদ্ভূত গ্যাসসমূহে হিলিয়ামের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। দেখা গেল সেখানে বায়ুতে শতকরা ১/৩ অংশ হিলিয়াম আছে ও প্রতিবৎসর এক কোটি বিশ লক্ষ বর্গফুট হিলিয়াম প্রস্তুত হইতে পারে। ইহার পর হইতে বিভিন্নপ্রকার বায়ুযান-সকলে প্রচুর পরিমাণে হিলিয়ামের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। সাধারণ রেলওয়ে ইঞ্জিনের জন্য যেমন জল ও কয়লার দরকার, বিমানের জন্য তেমনই পেট্রোল ও হিলিয়ামের প্রয়োজন; অদূর ভবিষ্যতে যখন বাষ্পীয়যানের পরিবর্ত্তে বিমান-যান ব্যবহৃত হইবে, তখন হিলিয়ামের আদর আরও বেশী হইবে।

উর্দ্ধে সুনীল নভোমণ্ডলে বিচরণ করিবার জন্য হিলিয়ামের যেমন প্রয়োজন, নিম্নে মহাসাগরের গভীর তলে মণি-মাণিক্য প্রবালাদি আহরণের জন্য ডুবুরীদের পক্ষেও ইহা তেমনই উপযোগী। ইলিহু টম্‌সন্‌-নামক বৈজ্ঞানিক দেখাইয়াছেন যে, ডুবুরীরা যদি অক্সিজেনের পরিবর্ত্তে অক্সিজেন মিশ্রিত হিলিয়াম ব্যবহার করে, তাহা হইলে তাহারা অপেক্ষাকৃত অধিক সময় সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত থাকিতে পারে। হিলিয়ামের ব্যবহার আরও অনেক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদিতে হইতেছে তবে সেসকল তথ্য বোঝা সাধারণ পাঠকের পক্ষে সুসাধ্য নয়।

"মার্শো"র বন্দী

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ১৫ই ডিসেম্বরের এক সায়াহ্নে, "স্যাঁ-ক্রেপ্যাঁ" গ্রামের নিকট, যাহার পাদমূলে সোয়ান-নদী বহিয়া যাইতেছে, সেই পর্ব্বতের শিখর-দেশে যদি কোন পথিক দাঁড়াইয়া নীচের দিকে চাহিয়া দেখিত তাহা হইলে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে পাইত।

পথিক দেখিতে পাইত, কুটীরগুলার জানালা হইতে নিবিড় ধূমরাশি উত্থিত হইতেছে, তাহার পর অনল-শিখার ভীষণ লেলিহান জিহ্বা চারিদিক্ হইতে বাহির হইতেছে, সেই অগ্নিকাণ্ডের লোহিত আলোক-চ্ছটায় অস্ত্র-শস্ত্র ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। রিপব্লিকান্ সৈন্যদলের অন্তর্গত ১২।১৫ শো লোক, স্যাঁ-ক্রেপ্যাঁ গ্রামটিকে পরিত্যক্ত দেখিয়া উহাতে আগুন লাগাইয়া দিয়াছিল। অন্য কুটীর হইতে পৃথক্‌ভাবে একটি কুটীর সেখানে ছিল, অনলশিখা উহাকে স্পর্শ করে নাই। উহার দরজায় দুইজন শান্ত্রী দাঁড়াইয়া ছিল। ঘরের ভিতর একটি যুবক একটা টেবিলের সম্মুখে বসিয়াছিল; উহার বয়স ২০।২২ বৎসর হইবে। উহার দীর্ঘ কেশগুচ্ছ উহার খুদিয়া-বাহির-করা সুস্পষ্ট মুখাবয়বের চারিধারে তরঙ্গিত হইতেছিল; নীল জোব্বায় উহার মধ্যদেহ প্রচ্ছন্ন; কেবল সৈনিক-পদের গৌরবচিহ্নস্বরূপ উহার কাঁধের ঝালরওয়ালা বস্ত্র-ভূষণটা দেখা যাইতেছিল। সৈনিকেরা কোন্ পথ দিয়া চলিবে, তাহাই একটা দীপালোকের সাহায্যে একটা ম্যাপের উপর আঙুল চালাইয়া দেখিতেছিল। এই লোকটি সেনাপতি মার্শো। নিদ্রিত সঙ্গীর দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন, "আলেকজান্দার, ওঠো, সেনাপতি ওয়েষ্টারম্যানের কাছ থেকে একটা হুকুম এসেছে।" এই কথা বলিয়া সেই হুকুম-নামাটা তাহার হস্তে দিলেন।

—"কে হুকুম এনেছে?"

—"প্রজার প্রতিনিধি দেল্‌মার।"

—"আচ্ছা বেশ। বেচারীরা কোথায় জমা হয়েছে?"

—"এখান থেকে ২।৩ ক্রোশ দূরে। ম্যাপের এইখানটায়।"

এক সময় সেখানে একটা গ্রাম ছিল, সেই গ্রামের ভস্মরাশির চারিদিক্ ঘিরিয়া এক সৈন্যদল অবস্থিতি করিতেছিল। সেনাপতি অর্দ্ধোচ্চস্বরে হুকুম প্রচার করিলেন। সেই সৈন্যদল সারিবন্দি হইয়া বড় রাস্তা ধরিয়া নামিতে লাগিল; কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই, দুইটা খণ্ড মেঘের ভিতর দিয়া চন্দ্রমা সঙ্গিনের দীর্ঘ পংক্তির উপর কিরণধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এই পংক্তি, ইস্পাতের শল্ক-বিশিষ্ট একটা বৃহৎ কৃষ্ণসর্পের ন্যায় নিঃশব্দে অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করিল।

উহারা এইরূপভাবে আধঘণ্টা ধরিয়া চলিল। উহাদের নেতা—মার্শো। মার্শো পূর্ব্ব হইতেই পথটা ভাল করিয়া চিনিয়া লইয়াছিল, গন্তব্য-স্থান-সম্বন্ধে তাঁহার কোন ভুল হইবার সম্ভাবনা ছিল না। আরও পোয়া ঘণ্টা কুচ করিবার পর, উহারা একটা কৃষ্ণবর্ণ নিবিড় অরণ্যের সম্মুখে আসিয়া পড়িল। উহারা পূর্ব্বেই খবর পাইয়াছিল, কতকগুলা গ্রামের বাসিন্দা এবং অনেকগুলা বাহিনীর শেষাবশিষ্ট লোক ধর্ম্ম-কীর্ত্তন (mass) শুনিবার জন্য ঐখানে সমবেত হইবে। সব-সমেত ১৮০০ রাজবংশ-পক্ষীয় লোক। দুইজন সেনাপতি ঐ ক্ষুদ্র সৈন্য-মণ্ডলীকে, দলে-দলে বিভক্ত হইয়া সমস্ত

অরণ্যটা ঘিরিয়া ফেলিতে আদেশ করিলেন। উহারা যখন চক্রাকারে অগ্রসর হইতেছিল; তখন দেখিতে পাইল, অরণ্যের মধ্যস্থলে যে একটা খোলা জায়গা ছিল, সেই জায়গাটা আলোকিত হইয়াছে। আরও একটু অগ্রসর হইলে উহারা মশালের আলো দেখিতে পাইল। সেই আলোকে সমস্ত পদার্থ যখন স্পষ্ট হইয়া উঠিল, তখন একটা অদ্ভুত দৃশ্য উহাদের নেত্রপথে পতিত হইল।

কতকগুলা প্রস্তর-স্তূপে নির্ম্মিত একটা বেদীর উপর দাঁড়াইয়া গ্রামের পাদ্রী ধর্ম্ম-গ্রন্থের শ্লোক সুর করিয়া পাঠ করিতেছেন। মশাল-হস্তে কতকগুলি বৃদ্ধ তাঁহাকে ঘিরিয়া আছে, এবং তাহাদের কোলের কাছে বসিয়া স্ত্রীলোক ও শিশুরা প্রার্থনা করিতেছে। রিপাব্লিকের দল ও এই দল—এই উভয়ের মধ্যে একসারি সৈনিক স্থাপিত হইয়াছে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, রাজপক্ষীয় লোকেরা পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক হইয়াছিল।

গোলাগুলি একটুও না ছুঁড়িয়া নীরবে রিপাব্লিকান্ সৈন্য যেম্নি অগ্রসর হইল, রাজপক্ষীয় সৈন্যেরা আক্রমণের অপেক্ষা না করিয়াই উহাদের উপর গুলি-বর্ষণ করিতে লাগিল। তখনো পুরোহিত ধর্ম্মশ্লোক সুর করিয়া পাঠ করিতেছিলেন। যখন রিপাব্লিকান্‌রা উহাদের শত্রু হইতে তিন কদম দূরে ছিল,তখন উহাদের মধ্য হইতে প্রথম পংক্তির সৈন্য নতজানু হইল। তিন পংক্তির বন্দুক নীচে নামানো হইল। বন্দুক হইতে সশব্দে গুলি-বর্ষণ হইল। রাজপক্ষীয় সৈন্য-পংক্তির উপর একটা আলোকচ্ছটা ঝিকমিক্ করিয়া উঠিল। এবং বেদীর পাদদেশে যেসকল রমণী ও শিশু নতজানু হইয়াছিল, কতকগুলা গুলি তাহাদের গায়ে লাগিল। মুহূর্ত্তের জন্য একটা হাহাকার-ধ্বনি উত্থিত হইল। তখন পুরোহিত তাঁহার ক্রস তুলিয়া ধরিলেন, আবার সমস্ত নিস্তব্ধ হইল।

রিপাব্লিকান্‌রা তখনও অগ্রসর হইতেছিল; অগ্রসর হইতে হইতে দ্বিতীয়বার গুলিবর্ষণ করিল। এখন কোন পক্ষেরই বন্দুক গাদিবার আর সময় ছিল না। এখন হাতাহাতি সঙ্গিনের যুদ্ধ হইতে লাগিল। অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত রিপাব্লিকান্-পক্ষেরই জয় হইল। রাজকীয় সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল, পংক্তির পর পংক্তি ভূতলশায়ী হইল। পুরোহিত ইহা লক্ষ্য করিয়া একটা ইসারা করিলেন। সমস্ত মশাল নির্ব্বাপিত হইল, সমস্ত অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। তার পরেই একটা লণ্ডভণ্ড হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইল, রোষান্ধ হইয়া পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল, কেহই প্রাণভিক্ষা করিল না, সকলেই যুদ্ধে প্রাণ দিল।

মার্শো যখন মারিতে উদ্যত, হঠাৎ সেই সময়ে তাঁহার পদতলে একটা হৃদয়-বিদারক কণ্ঠস্বর শোনা গেল। কে-একজন বলিয়া উঠিল:— "দয়া কর! দয়া কর!" "ঈশ্বরের দোহাই আমায় রক্ষা কর!" এ একজন নিরস্ত্র বালক।

সেনাপতি নত হইয়া, ঐ হাঙ্গামার জায়গা হইতে তাহাকে টানিয়া কয়েক কদম দূরে সরাইয়া দিলেন। কিন্তু তখন সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। একজন সৈনিকের এতটা ভয় দেখিয়া মার্শো বিস্মিত হইলেন; কিন্তু তথাপি, যাহাতে শ্বাসকষ্ট না হয় এইজন্য তিনি তাহার গলবন্ধ শিথিল করিয়া দিলেন। তাঁর বন্দী একজন বালিকা!

আর একমুহূর্ত্তও সময় নষ্ট করিলে চলিবে না। কর্ত্তৃ-সভার হুকুম অলঙ্ঘনীয়; নিরস্ত্র কি সশস্ত্র রাজপক্ষীয় লোকেরা ধরা পড়িলেই স্ত্রী-পুরুষ বা বয়স-নির্ব্বিশেষে সকলকেই ফাঁসি দেওয়া হইবে। সেনাপতি একটা গাছের তলায় বালিকাকে রাখিয়া আবার যুদ্ধস্থানে ছুটিয়া আসিলেন। মৃতদিগের মধ্যে তিনি একজন তরুণবয়স্ক রিপাব্লিকান্ সেনা-নায়ককে দেখিতে পাইলেন—উহার দৈহিক গঠন অনেকটা তাঁর বন্দিনীর মতো। সেনাপতি চট্‌পট্ তার কোর্ত্তা ও টুপি তার দেহ হইতে খুলিয়া লইয়া, আবার সেই বালিকার নিকট ফিরিয়া আসিলেন। রাত্রির শীতল তাজা বাতাসে বালিকার চৈতন্য ফিরিয়া আসিয়াছিল।

সে প্রথমেই বলিয়া উঠিল, "আমার বাবা! আমার বাবা! আমি তাঁকে ছেড়ে এসেছি, উনি যুদ্ধে নিশ্চয়ই নিহত হবেন।"

ঠিক্ এই সময়ে ঐ গাছের পিছন হইতে, হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বর ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল, "কুমারী ব্লাশ্! বোয়ালোর মার্কিস্ বেঁচে আছেন; তিনি রক্ষা পেয়েছেন।"

যে-লোক এই কথা বলিয়াছিল, সে ছায়ার ন্যায় অন্তর্হিত হইল। সেই লোকটি যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেই দিকে হাত বাড়াইয়া বালিকা বলিয়া উঠিল "তিঙ্গি, তিঙ্গি!"

মার্শো বলিলেন, "চুপ, একটা কথা বল্‌লেই তুমি অপরাধী বলে' সাব্যস্ত হবে। আমি তোমাকে বাঁচিয়ে দিতে চাই। এই কোর্ত্তা ও টুপি পরে' এইখানে অপেক্ষা কর।"

সেনাপতি মার্শো তাঁহার সৈনিকদিগের নিকট ফিরিয়া গিয়া উহাদিগকে "সোলে" গ্রামে চলিয়া যাইতে হুকুম দিলেন এবং তাঁহার সঙ্গীকে সেনাপতির কাজ করিতে বলিয়া তিনি আবার তাঁর বন্দিনীর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। বালিকা তাঁর সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল, তাঁরা বড় রাস্তার দিকে অগ্রসর হইলেন। মার্শোর ভৃত্য সেইখানে ঘোড়া লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। অভ্যস্ত অশ্বারোহীর মতো বেশ শোভনভাবে বালিকা জিনের উপর একলাফে উঠিয়া পড়িল। ঘোড়া খুব ছুটাইয়া দিয়া আধঘণ্টার মধ্যেই উহারা "সোলে"-গ্রামে আসিয়া পৌঁছিল। মার্শো কতকগুলি শরীর-রক্ষী সৈনিকের সহিত "সা-কুলেহ"-হোটেলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দুইটা কামরা ভাড়া করিয়া একটা কামরায় বালিকাকে লইয়া গেলেন এবং তাহাকে বলিলেন, "সেই ভীষণ রাত্রির কষ্টের পর, আজ এইখানে একটু তুমি বিশ্রাম কর।"

বালিকা ঘুমাইয়া পড়িলে, মার্শো বালিকাকে কি করিয়া বাঁচাইবেন, সেই মৎলব আঁটিতে লাগিলেন। তাঁর মা যেখানে আছেন সেই নাৎনগরে তিনি নিজেই বালিকাকে লইয়া যাইবেন, স্থির করিলেন। মার্শো তিন বৎসর তাঁর মাকে দেখেন নাই, তাই ছুটির জন্য অনুমতি চাওয়া তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। প্রায় ভোর হইয়াছে এই সময় মার্শো বড় সেনাপতি ওয়েষ্ট্‌র্‌ম্যানের গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাহার প্রার্থনা তৎক্ষণাৎ মঞ্জুর হইল, কিন্তু হুকুম হইল, অনুমতি পাইবার পূর্ব্বে "দেল্‌মারের" স্বাক্ষর চাই। বড় সেনাপতি, সুপারিশ-পত্রসহ তাঁহাকে "দেল্‌মারের" নিকট পাঠাইবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। মার্শো হোটেলে ফিরিয়া গিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত একটু বিশ্রাম করিয়া লইলেন।

মার্শো ও ব্লাশ্ আহার করিবার নিমিত্ত খাবার-টেবিলে বসিতে যাইতেছেন, এমন সময় দেল্‌মার দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি রব্‌স্‌পিয়েরের একজন প্রতিনিধি কর্ম্মচারী, ইঁহার হাতেই "গিলটিন্" নামক মৃত্যুদণ্ডের যন্ত্র বেশী কার্য্যকারী; কিন্তু কাজটা প্রায়ই সুবিচারের সহিত হয় না। তিনি মার্শোকে বলিলেন "রাষ্ট্রভাই (citizen) তুমি আমাদের ছেড়ে এখন চল্‌লে। কিন্তু তুমি রাত্রের কাজটা এমন ভালরকম করেছিলে যে, তোমার কোন প্রার্থনাই আমি অগ্রাহ্য কর্‌তে পারিনে। আমার কেবল একমাত্র আক্ষেপ, বোয়ালের মার্কিস্ পালিয়েছে। আমি তার মাথাটা পাঠাব বলে' কর্ত্তৃ-মণ্ডলীর কাছে অঙ্গীকার করেছিলুম।"

ব্লাশ্ ভয়ে পাষাণ মূর্ত্তির মতো স্থিরভাবে দাঁড়াইয়াছিল। মার্শো তাহার সম্মুখে আপনাকে স্থাপন করিলেন। দেল্‌মার আরও বলিলেন, "আমরা মার্কিসের পদচিহ্ন অনুসরণ করব। এই নেও তোমার ছুটির

অনুমতি-পত্র। তোমার ইচ্ছামতো তুমি এখান থেকে যেতে পার। কিন্তু আমি রিপাব্লিকের স্বাস্থ্য পান না করে' তোমাকে ছাড়্‌তে পারিনে। এই বলিয়া দেল্‌মার খাবার-টেবিলে ব্লাঁশের পাশে আসিয়া বসিলেন।

উহারা একটা স্বচ্ছন্দ আরামের ভাব অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় বন্দুক-গুচ্ছের ভীষণ ধ্বনি উহাদের কাণে আসিল। সেনাপতি লাফাইয়া উঠিয়া তাঁর অস্ত্রশস্ত্রের দিকে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। কিন্তু দেল্‌মার তাঁকে থামাইয়া দিলেন।

মার্শো জিজ্ঞাসা করিলেন, —"ও কিসের শব্দ ?"

দেল্‌মার উত্তর করিল, "—ও কিছুই না। গত রাত্রের বন্দীদের গুলি করা হচ্চে।"

ব্লাঁশ্‌ একটা ভয়সূচক চীৎকার করিয়া উঠিল। দেল্‌মার আস্তে আস্তে মুখ ফিরাইয়া ব্লাঁশ্‌কে দেখিতে লাগিল। তার পর বলিল, "এ ভারি মজার কথা, সৈনিকেরা যদি স্ত্রীলোকের মতো ভয়ে কাঁপে তা' হ'লে আমাদের স্ত্রীলোকদের সৈনিকের পোষাক পরিয়ে দিতে হবে। একথা সত্যি তোমার বয়স খুব অল্প"—এই কথা বলিয়া দেল্‌মার তাহাকে ধরিয়া ভাল করিয়া আপাদমস্তক নজর করিয়া দেখিতে লাগিল, —তার পর বলিল, "তুমি সময়ক্রমে এইসব ব্যাপারে অভ্যস্ত হবে।"

—"কখ্‌খন না, কখ্‌খন না,"—আমি এইসব বীভৎস কাণ্ডে কখনই অভ্যস্ত হ'ব না।"

ব্লাঁশ্‌ স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, এইপ্রকার সাক্ষীর সম্মুখে হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করা কী বিপদ্‌জনক। দেল্‌মার উত্তর করিল, "বালক, তুমি কি মনে কর রক্তপাত ব্যতীত কোনো দেশের লোক পুনর্জীবিত হ'তে পারে ? আমার পরামর্শ শোন। তোমার মনের কথা মনেই রেখে দেও। যদি কখনো তুমি রাজপক্ষীয়দের হাতে পড়, তা হ'লে, আমরা যেমন তাদের সৈনিকদের রেয়াৎ করিনি, তারাও তেম্‌নি তোমাকে রেয়াৎ করবে না।" এই কথা বলিয়াই দেল্‌মার প্রস্থান করিল। মার্শো বলিলেন, "ব্লাঁশ্‌ যদি ঐ লোকটা তোমাকে চিন্‌তে পেরেছে বলে' একটা চিহ্ন প্রকাশ করত, একটা মুখ-ভঙ্গি কর্‌ত তা হ'লে আমি কি কর্‌তুম জান ?—আমি তখনই গুলি করে' ওর মগজ উড়িয়ে দিতুম।"

ব্লাঁশ্‌ নিজের হাতে মুখ ঢাকিয়া বলিল, "মাগো! যখন আমি ভাবি, বাবা এই বাঘের কবলে পড়্‌তে পারেন, যদি আজ রাত্রে তিনি বন্দী হ'তেন, তা হ'লে আমার চোখের সাম্‌নে—ওঃ কি ভয়ানক! এই পৃথিবীতে কি আর দয়ামায়া একটুও নেই ?" তার পর মার্শোর দিকে ফিরিয়া বলিল, "ওঃ ক্ষমা, ক্ষমা, আমা অপেক্ষা একথা আর কে ভাল জানে ?"

এই সময়ে একজন ভৃত্য ঘরে প্রবেশ করিয়া জানাইল, অশ্ব প্রস্তুত। ব্লাঁশ্‌ বলিয়া উঠিল, "ভগবানের নাম নিয়ে যাত্রা সুরু করা যাক্‌; এখানকার যে-বাতাসে আমরা নিঃশ্বাস নিচ্ছি, সে-বাতাসও রক্তে কলুষিত।"

মার্শো উত্তর করিলেন, "হাঁ চল, যাওয়া যাক্‌।"

এই কথা বলিয়া তাঁহারা দুইজনে নীচে নামিলেন।

২

মার্শো দেখিলেন, দ্বারদেশে ৩০ জন অশ্বারোহী সৈনিক অপেক্ষা করিতেছে—উহারা মার্শো ও ব্লাঁশের রক্ষী হইয়া "নাঁৎ" পর্য্যন্ত উহাদিগকে পৌঁছিয়া দিবে, প্রধান সেনাপতি এই হুকুম দিয়াছেন।

বড় রাস্তা দিয়া যখন উহারা ছুটিয়া চলিতেছিল, সেই সময় ব্লাঁশ্‌ তাহার ইতিহাস বলিল :—মা মারা গেলে তার পিতা কি করিয়া তাকে মানুষ করিয়াছিলেন, পুরুষ মানুষের কাছে শিক্ষা পাওয়ায় সে নানা-প্রকার ব্যবসায়ে কিরূপ অভ্যস্ত হইয়াছিল—এবং সেই-সব অভ্যাসের দরুন্‌, বিদ্রোহ বাধিয়া উঠিলে, তাহার কত সুবিধা হইয়াছিল, সে তাহার পিতার সঙ্গে যাইতে পারিয়াছিল—এইসমস্ত কথা বলিল।

যখন সে তাহার ইতিহাস শেষ করিল, তখন উহারা দেখিতে পাইল "নাঁৎ" নগরের দীপাবলী কুয়াসার মধ্য দিয়া মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছে। ঐ ক্ষুদ্র অশ্বারোহীর দল লোয়ার-নদী পার হইল, তাহার কিয়ৎক্ষণ পরেই মার্শো তাহার জননীর বাহুপাশে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। তাঁহার তরুণ সঙ্গীটির সম্বন্ধে দুই-চার কথা বলিবামাত্রই, তার প্রতি তাঁর মাতা ও ভগিনীদের বেশ একটু টান্‌ হইল। ব্লাশ্‌ কাপড় বদ্‌লাইবার একটু ইচ্ছা প্রকাশ করিবামাত্রই মার্শোর দুই বালিকা ভগিনী উহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া গেল ; এবং দুই জনের মধ্যে ঝগড়া হইতে লগিল, কে উহার পরিচারিকা হইবে। ব্লাঁশ্‌ যখন ফিরিয়া আসিয়া আবার ঘরে প্রবেশ করিল, তখন মার্শো আশ্চর্য্য হইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। প্রথমে সে যে-পোষাক পরিধান করিয়াছিল, তাহাতে তাহার অনুপম শ্রী-সৌন্দর্য্য মার্শো লক্ষ্য করিতে পারেন নাই—এই রমণীর পরিচ্ছদে এক্ষণে সেই শ্রী-সৌন্দর্য্য স্পষ্ট করিয়া তাঁহার নজরে পড়িল। একথা সত্য, যাহাতে তাহাকে সুন্দর দেখায় এইজন্য সে খুব চেষ্টা-যত্ন করিয়াছিল ; এক মুহূর্ত্তের জন্য তাহার আয়নার সামনে সে যুদ্ধ-বিদ্রোহ, রক্তারক্তি কাণ্ড সব ভুলিয়া গিয়াছিল। প্রথম প্রেমের অভ্যুদয়ে খুব নির্দ্দোষ সরলার অন্তরেও একটু ছলা-কলার ভাব আসিয়া পড়ে।

মার্শোর মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইল না ; ব্লাঁশের মুখ স্মিত-হাস্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে দেখিল, সে যতটা চায়, মার্শো তাহাকে ততটাই সুন্দর বলিয়া মনে করিতেছে।

সায়াহ্নকালে মার্শোর ভগিনীর বাগ্‌দত্ত "বর" আসিয়া উপস্থিত হইলেন। "নাঁৎ"নগরে একটি গৃহ ছিল, বোধ হয় একটি মাত্র গৃহ ছিল —চারিদিক্‌কার শোক-পরিতাপের ভিতরেও যেখানে সুখ ও প্রেম ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

এখন হইতে মার্শো ও ব্লাঁশের একটা নূতন জীবন আরম্ভ হইল। মার্শো দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে অধিকতর সুখের ভবিষ্যৎ প্রসারিত ; এবং যেব্যক্তি ব্লাঁশের প্রাণরক্ষা করিয়াছে, ব্লাঁশ যে তাহারই সান্নিধ্য অভিলাষ করিবে, ইহাও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কেবল মধ্যে-মধ্যে সে তাহার পিতার কথা ভাবিত, তখন চোখের জলে তাহার বক্ষ ভাসিয়া যাইত। তখন মার্শো তাকে সান্ত্বনা করিতেন। তাহার চিন্তার গতি অন্যদিকে ফিরাইবার জন্য তিনি তাঁহার প্রথম যুদ্ধবিগ্রহের কথা বলিতেন। তিনি বলিতেন, কি করিয়া পাঠশালার পোড়ো হইয়া তিনি ১৫ বৎসর বয়সে একজন সৈনিক হইলেন ; ১৭ বৎসর বয়সে সেনা-নায়ক, ১৯ বৎসর বয়সে কর্ণেল, ও ২১ বৎসর বয়সে সেনাপতি হইলেন।

এই সময়, কারিএ-নামক রবেস্‌পিয়রের এক অনুচরের কঠোর শাসনের চাপে সমস্ত "নাঁৎ"-নগর ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল। নাতের রাস্তা-গুলায় রক্তের নদী বহিয়া গিয়াছিল। কারিএ সম্ভ্রান্ত লোকের বিশুদ্ধ শোণিতেরই প্রয়াসী ছিল। তরুণ সেনাপতি মার্শো যেরূপ নির্দ্দোষ বলিয়া প্রখ্যাত ছিলেন এমন আর কেহ নহে। এবং তাঁহার মাতা ও ভগিনীরাও এখনো পর্য্যন্ত সন্দেহের পাত্র হন নাই। তার পর এখন, ঐ তরুণীদের মধ্যে একজনের যে-দিন বিবাহ হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল সেই দিনটা আসিয়া পড়িল।

এই উপলক্ষে মার্শো যে-সকল রত্নাভরণ আনাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটি আভরণ তিনি ব্লাঁশকে দিতে চাহিলেন। ব্লাঁশ্‌ প্রথমে তরুণী-সুলভ মুগ্ধতার সহিত উহা নিরীক্ষণ করিল ; তার পর আভরণের

কৌটাটা বন্ধ করিয়া বলিল, "আমার অবস্থার রত্নাভরণ শোভা পায় না। আমার বাবাকে শিকারের পশুর মত ওরা স্থান হইতে স্থানান্তরে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে; হয়ত এক টুকরা রুটির জন্য তাঁকে ভিক্ষা করতে হচ্ছে, রাত্রিবাসের জন্য ধানের গোলায় আশ্রয় নিতে হচ্ছে—এই সময় আমি এই রত্নাভরণ গ্রহণ করতে পারিনে।"

মার্শো উহা লইবার জন্য ব্রাঁশ্‌কে খুব পীড়াপীড়ি করিলেন, কিন্তু তাঁর সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইল। ঐ রত্নগুলির মধ্যে যে একটি কৃত্রিম লাল গোলাপ ছিল, ব্রাঁশ্ শুধু তাহাই লইতে সম্মত হইল।

গির্জ্জাগুলা বন্ধ থাকায় একটা গ্রাম্য হোটেলে বিবাহের অনুষ্ঠানটা সম্পন্ন হইল। হোটেলের দ্বারদেশে একদল নাবিক নব-দম্পতীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। উহাদের মধ্যে একটি লোক যার মুখ মার্শোর নিকট পরিচিত ছিল, তাহার হাতে দুইটি ফুলের তোড়া ছিল। তন্মধ্যে একটা তোড়া সে নূতন ক'নেকে দিল এবং ব্রাশের দিকে অগ্রসর হইয়া দ্বিতীয় তোড়াটি ব্রাঁশ্‌কে উপহার দিল। ব্রাঁশ্ একদৃষ্টে তাহার দিকে তাকাইয়া ছিল। ব্রাশের মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। ব্রাঁশ্ বলিল; "তিঙ্গি, আমার বাবা কোথায়?"

নাবিক উত্তর করিল,—"স্যা-ফ্লোরাঁয়ে। এই তোড়াটি নেও, এর ভিতর একটা চিঠি আছে।"

ব্রাঁশ মনে করিয়াছিল, তাহাকে আট্‌কাইয়া রাখিবে, তাহার সহিত কথা কহিবে, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই সে অন্তর্হিত হইয়াছিল। ব্রাঁশ্ খুব উৎকণ্ঠিত হইয়া চিঠিখানি পড়িল। রাজপক্ষীয়দের পরাভবের পর পরাভব হইয়াছে; ধ্বংসকাণ্ড ও দুর্ভিক্ষের সম্মুখে উহাদিগকে অগত্যা নতশির হইতে হইয়াছে। তিঙ্গির সতর্কতার দরুন্, মার্কিস্ পূর্ব্ব হইতেই সমস্ত অবগত হইয়াছিলেন। ব্রাঁশ্ বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। ঐ পত্রখানা, আবার তাহাকে যুদ্ধের সেইসমস্ত বীভৎসকাণ্ডের মধ্যে আনিয়া ফেলিল। যখন বিবাহের অনুষ্ঠান হইতেছিল সেইসময় একজন অপরিচিত ব্যক্তি আসিয়া বলে, মার্শোকে একটা খুব জরুরী সংবাদ দিবার আছে। তাই তাহাকে দালানের ভিতর আনা হয়। মার্শো যখন ঘরে প্রবেশ করিল, তখন তাঁহার মস্তক ব্রাশের দিকে আনত এবং ব্রাঁশ তাঁহার বাহু অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। তাই মার্শো লোকটাকে দেখিতে পান নাই। হঠাৎ তিনি দেখিলেন, ব্রাঁশ্ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। তিনি উপরে চোখ তুলিয়া দেখিলেন—তিনি ও ব্রাঁশ্ উভয়েই দেলুমারের সম্মুখে। ব্রাঁশের মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া হাসিমুখে দেলুমার উহাদের দিকে আস্তে আস্তে অগ্রসর হইল। উহাকে দেখিয়া মার্শোর ললাটদেশে শীতল স্বেদবিন্দু দেখা দিল।

দেলুমার ব্রাঁশ্‌কে বলিল, "রাষ্ট্র-বহিন্ (citizeness), তোমার কি কোন ভাই আছে?"

ব্রাঁশ্ আম্‌তা-আম্‌তা করিতে লাগিল। দেলুমার বলিল, "আমি যদি ভুল না করে' থাকি, আমার বোধ হচ্ছে আমরা শোলের হোটেলে একসঙ্গে আহার করেছিলুম। সেইঅবধি তোমাকে রিপাব্লিকান্ সৈন্যদলের মধ্যে আর দেখ্‌তে পাইনি কেন বল দিকি?"

ব্রাঁশের মনে হইল যেন সে এখনি পড়িয়া যাইবে,—এম্‌নি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেলুমার যেন তার ভিতর পর্য্যন্ত তলাইয়া দেখিতেছিল। তার পর সে মার্শোর দিকে ফিরিল। কিন্তু ভয়ে দেলুমার একটু কাঁপিয়া উঠিল। তরুণ সেনা-নায়কের হাত তলোয়ারের হাতোলের উপর ন্যস্ত ছিল সেনা-নায়ক একটু সজোরে হাতোলটা মুঠাইয়া ধরিলেন। তখন দেলুমারের মুখে আবার তাহার স্বাভাবিক ভাব ফিরিয়া আসিল। মনে হইল যেন তাহার বক্তব্য কথা সে একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে। সে মার্শোর বাহু ধরিয়া একটি জানালার ধারে টানিয়া লইয়া গেল এবং কয়েক মিনিট ধরিয়া লাভাঁদি প্রদেশের অবস্থা বর্ণনা করিল এবং তাঁহাকে বলিল, রাজপক্ষীয়দের বিরুদ্ধে আরও কি-কি কঠোর উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে, সেইসমস্ত কার্‌িএ-র সহিত পরামর্শ করিবার জন্যই সে এখানে আসিয়াছিল। তার পর দেলুমার একটু হাসিমুখে একটু মাথা নোয়াইয়া ব্রাঁশের পাশ দিয়া প্রস্থান করিল। ব্রাঁশ্ তখন একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়াছিল, তার মুখ সাদা ও শরীর ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছিল।

দুই ঘণ্টা পরে মার্শোর নামে একটা হুকুম আসিল, এখনি তাঁহাকে সৈন্য-মণ্ডলীর সহিত আবার মিলিত হইতে হইবে, যদিও তাঁহার ছুটি ফুরাইতে তখনও ১৫ দিন বাকী ছিল। তাঁহার বিশ্বাস, এই কিছু আগে যে কাণ্ড ঘটিয়াছিল, তাহার সহিত ইহার একটা সংস্রব আছে। যাহাই হোক, হুকুম তামিল করিতেই হইবে; ইতস্ততঃ করিলে সর্ব্বনাশ হইবে।

মার্শো হুকুম-নামা ব্রাঁশের হস্তে অর্পণ করিলেন। বিষণ্ণভাবে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। ব্রাশের পাণ্ডু গণ্ডস্থল দিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল, কিন্তু সে নীরব ছিল। মার্শো বলিলেন,—"যুদ্ধ-বিগ্রহ আমাদের খুনী করে' তোলে, নিষ্ঠুর করে' তোলে। খুব সম্ভব আমরা পরস্পরকে আর দেখ্‌তে পাব না।"

মার্শো ব্রাঁশের হস্ত ধারণ করিলেন, বলিলেন "তুমি আমাকে কথা দেও,—যদি আমি মরি, তুমি আমাকে কখন-কখন স্মরণ করবে এবং আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি ব্রাঁশ্, যদি আমার জীবন-মরণের মাঝখানে, একটি নাম, একটি মাত্র নাম উচ্চারণ করতে সময় পাই সে নাম তোমারই।"

অশ্রুপূর্ণ নয়নে ব্রাঁশ্ নীরব হইয়া রহিল। মার্শো যে অঙ্গীকার চাহিয়াছিলেন, মুখের কথা অপেক্ষা ব্রাঁশের প্রেমার্দ্র-নয়নে সেই অঙ্গীকার সহস্রগুণে বেশী ব্যক্ত হইল। একহাত দিয়া ব্রাঁশ্ মার্শোর হাত টিপিয়া রহিল এবং অন্য হাতটি দিয়া তাহার চুলে গোঁজা গোলাপটি দেখাইয়া দিল। সে বলিল, "ইটি আমাকে কখনই ছেড়ে যাবে না।"

এক ঘণ্টা পরে, তাঁহার সৈন্যের সহিত আবার মিলিত হইবার জন্য, মার্শো বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িলেন। প্রতি পদক্ষেপে তাঁহার মনে পড়িল কেমন করিয়া তাঁহারা দু-জনে একসঙ্গে এই রাস্তা দিয়া আসিয়াছিলেন। এখন আর তাঁহার পার্শ্বে ব্রাঁশ্ থাকিবে না, এখন ব্রাঁশের বিপদাশঙ্কা খুবই বেশী। প্রতি মুহূর্ত্ত তাঁর মনে হইতেছিল, এখনি আবার আমি "নাতে" ফিরিয়া যাই। যদি মার্শো নিজের চিন্তায় একেবারে মগ্ন হইয়া না থাকিতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন একজন অশ্বারোহী রাস্তার শেষ প্রান্ত হইতে তাঁহার অভিমুখে আসিতেছে। সেই অশ্বারোহী, ভুল করিয়াছে কি না দেখিবার জন্য একবার একটু থামিয়া তাহার পর খুব ঘোড়া ছুটাইয়া মার্শোর নিকট আসিয়া পড়িল। মার্শো জেনেরাল্ দ্যুমাকে চিনিতে পারিলেন। বন্ধুদ্বয় ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িয়া পরস্পর বাহু-পাশে আবদ্ধ হইলেন। ঠিক সেই সময় একটি লোক—চুল দিয়া ঘাম ঝরিয়া পড়িতেছে, মুখ রক্তাক্ত হইয়াছে—কাপড়-চোপড় ছিঁড়িয়া গেছে—একটা ঝোপের বেড়া ডিঙ্গাইয়া অর্দ্ধ মূর্চ্ছিতভাবে ঐ বন্ধুদ্বয়ের পদতলে আসিয়া পড়িল এবং বলিয়া উঠিল, "সে গেরেফ্‌তার হয়েছে!" এই লোকটি তিঙ্গি।

"গেরেফ্‌তার! কে? ব্রাঁশ্?"

ঐ চাষা একটা হাঁ-সূচক ইঙ্গিত করিল। তাহার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইতেছিল না। মার্শোর নিকট আসিবার জন্য মাঠ-ময়দান দিয়া বেড়া ডিঙ্গাইয়া সে ১৫ ক্রোশ ছুটিয়া আসিয়াছে।

মার্শো তাহার দিকে ভ্যাল-ভ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিলেন। তাহার পর ক্রমাগত বলিতে লাগিলেন,—"গেরেফ্‌তার হয়েছে?" "ব্রাশ গেরেফ্‌তার হয়েছে?" এই সময় তাঁর বন্ধু তাঁর অলাবু-

বোতলের ভিতর যে সুরা ছিল, তাই সেই চাষার দাঁত-লাগা মুখের ভিতর ঢালিয়া দিতেছিলেন। মার্শো বলিয়া উঠিলেন, "আমি নাতে ফিরে যাব। তাকে আমার অনুসরণ করতেই হবে। আমার জীবন, আমার ভবিষ্যৎ, আমার সুখ শান্তি সমস্তই তা'র হাতে।" তাঁহার দাঁতে দাঁত লাগিয়া খটখট শব্দ হইতে লাগিল, সমস্ত শরীর থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

"যে ব্লাঁশের গায়ে হাত দিতে সাহসী হয়েছে, সে সমুচিত শাস্তি পাবে, আমি নিশ্চয় করে' বল্‌ছি। আমি ব্লাঁশ্‌কে প্রাণের সহিত ভালবাসি। তাকে ছেড়ে আমার বেঁচে থাকা অসম্ভব। আমি কি নির্ব্বোধ, কেন আমি তাকে ছেড়ে এলুম! ব্লাঁশ্‌ গেরেফ্‌তার হয়েছে? কোথায় তাকে নিয়ে গেছে?" মার্শো এই তিঙ্গিকে সম্বোধন করিয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—তিঙ্গি এই সময় একটু ভালো হইয়া উঠিয়াছিল,—সে উত্তর করিল, "বুকের জেল-খানায়।" এই কথা তিঙ্গির মুখ হইতে বাহির হইতে না হইতেই, বন্ধুদ্বয় আবার "নাতে"র দিকে ঘোড়া ছুটাইয়া চলিলেন।

মার্শো জানিতেন, এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিলে চলিবে না। তিনি একেবারেই কারিএ-র গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কি ভয় প্রদর্শন, কি অনুনয়-বিনয়—কোন-প্রকারেই তিনি প্রতিনিধি মহাশয়ের সাক্ষাৎলাভ করিতে পারিলেন না।

মার্শো নীরবে সেখান হইতে ফিরিলেন; ইতিমধ্যে তিনি আর একটা মৎলব আঁটিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গীকে বলিলেন, তিনি যেন ঘোড়া ও গাড়ী লইয়া জেল-খানার ফটকে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করেন।

মার্শোর নাম ও পদবী শুনিবামাত্র জেল-খানার ফটক খুলিয়া দেওয়া হইল। যে ঘরে ব্লাঁশ্‌কে বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে, সেই ঘরে লইয়া যাইবার জন্য মার্শো, জেলের দারোগাকে হুকুম করিলেন। লোকটা একটু ইতস্ততঃ করিতেছিল, কিন্তু আর-একটু বেশী আদেশের স্বরে তাঁহার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, সে তাহার পিছনে-পিছনে আসিতে তাঁহাকে একটা ইসারা করিল। দারোগা একটা কোটরের নিম্ন খিলান-ওয়ালা একটা দরজা খুলিয়া দিল। সেই কোটরটায় ঘোর অন্ধকার দেখিয়া মার্শো শিহরিয়া উঠিলেন। দারোগা বলিল, "মেয়েটি একাকী নাই।" মার্শো ভিতরে প্রবেশ করিলে দারোগা আবার দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল।

হঠাৎ দিবালোক হইতে অন্ধকারের মধ্যে আসিয়া পড়ায়, স্বপ্নদর্শী মানুষের মতো পথ হাত্‌ড়াইতে হাত্‌ড়াইতে মার্শো কোটরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিবামাত্র একটা চীৎকার শুনিতে পাইলেন; তাহার পরেই একটি তরুণী মার্শোর বাহুপাশে ঝাঁপাইয়া পড়িল। সে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে তাঁকে সজোরে জড়াইয়া ধরিল। তার পর বলিয়া উঠিল;—"তা হ'লে, দেখ্‌ছি তুমি আমাকে পরিত্যাগ করনি—ওরা আমাকে গেরেফ্‌তার করে' এখানে টেনে এনেছে। পিছনে যে ভীড় জমেছিল তা'র মধ্যে তিঙ্গিকে চিন্‌তে পেরেছিলুম। আমি মার্শো মার্শো বলে' চীৎকার করে' উঠ্‌লুম—সেও অন্তর্হিত হ'ল। এখন তুমি যখন এখানে এসেছ, আমাকে অবিশ্যি নিয়ে যাবে, এখানে আমাকে কখনই রেখে যাবে না?"

"আমার জীবনের বিনিময়েও এই মুহূর্ত্তে যদি এখান থেকে তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পার্‌তুম—কিন্তু তা অসম্ভব। আমাকে দু-দিনের সময় দেও ব্লাঁশ্‌, কেবল দু-দিনের সময়। এখন শুধু তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই, তার উত্তরের উপর তোমার ও আমার জীবন নির্ভর করছে। যেন ঈশ্বরের কাছে উত্তর করছ—এইভাবে আমাকে উত্তর দেও। ব্লাঁশ্‌ তুমি কি আমাকে ভালোবাসো?'

—"এইরূপ প্রশ্নের এই কি সময় ও স্থান? তুমি কি মনে কর, এই দেয়ালগুলো প্রেমের প্রতিজ্ঞা শুন্‌তে অভ্যস্ত?'

"হাঁ, সেই মুহূর্ত্তই এসেছে, কেননা আমরা এখন জীবন-মরণের সন্ধি-স্থলে, ব্লাঁশ্‌ শীঘ্র উত্তর দেও। এক মুহূর্ত্তে আমরা একটা দিন হারাবো, এক ঘণ্টায় একটা বৎসর হারাবো। আমাকে ভালবাসো কি?'

"হাঁ, হাঁ!"—এই কথাগুলি তরুণীর হৃদয় হইতে বাহির হইয়া পড়িল। সেখানে তার লজ্জা-রঞ্জিত মুখ কেহ দেখিতে পাইবে না, একথা ভুলিয়া গিয়া মার্শোর বুকের উপর তাহার মাথা লুকাইল।

—"দেখ ব্লাঁশ্‌, আমাকে পতিত্বে এখনি তোমার বরণ করতে হবে।"

তরুণী কাঁপিতে লাগিল। "তোমার মৎলবটা কি?'

"আমার মৎলব হচ্ছে তোমাকে মৃত্যু থেকে ছিনিয়ে আনা; "দেখ্‌ব ওরা রিপাব্লিকান্‌ জেনারেলের স্ত্রীকে ফাঁসি দিতে পারে কি না।"

তখন ব্লাঁশ্‌ সমস্ত বুঝিতে পারিল; কিন্তু এই মনে করিয়া সে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল যে, তাকে বাঁচাইতে গিয়া মার্শো কতটা বিপন্ন হইতে পারে। মার্শোর প্রতি তাহার ভালবাসা যেমন বৃদ্ধি পাইল, সেই সঙ্গে তাহার সাহসও বাড়িয়া উঠিল। সে দৃঢ়তার সহিত বলিল, "এ অসম্ভব।"

মার্শোর তার কথায় বাধা দিয়া বলিল। আমার প্রতি তোমার ভালবাসা যখন স্বীকার করেছ, তখন আমাদের সুখের পথে কি অন্তরায় উপস্থিত হ'তে পারে? যে একমাত্র পালাবার পথ ছিল, সে পথ তুমি পরিত্যাগ করছ। শোনো ব্লাঁশ্‌! আমি প্রথম দৃষ্টিতেই তোমাকে ভালোবেসেছিলুম। সেই ভালবাসা এখন জ্বলন্ত আসক্তিতে পরিণত হয়েছে। আমার জীবন তোমারই, তোমার নিয়তি আমারই। সুখ ও মৃত্যু তোমাতে আমাতেই ভাগাভাগি করব। কোন পার্থিব শক্তি আমাদের দু-জনকে পৃথক্‌ করে' দিতে পারবে না। আমি যদি তোমাকে ত্যাগ করি, তা হ'লে শুধু এই কথা বললেই হবে 'দীর্ঘজীবী হোন রাজা।' তোমার কারাগারের দরজা তখনই খুলে' যাবে। এবং আবার যদি এখানে আসতে হয় আমরা দু-জনে একসঙ্গেই আসব। এক ফাঁসি-কাঠেই যদি আমার মৃত্যু হয়, তা' হ'লেই ভাগ্যি বলে' মানব।'

—"না, না, না—ঈশ্বরের দোহাই আমাকে ত্যাগ কর।"

—"ত্যাগ করব তোমাকে? কি বল্‌ছ ভাল করে' ভেবে দেখ; তোমাকে রক্ষা করবার অধিকার হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে আমি যদি এই কারাগার হ'তে চলে' যাই, তা' হ'লে প্রথমেই আমি তোমার পিতাকে খুঁজে' বের করব—তোমার সেই পিতা যাকে তুমি ভুলে' গেছ, তোমার জন্য যিনি সর্ব্বদাই কাঁদেন। তাঁকে আমি বল্‌ব 'বৃদ্ধ! সে নিজেকে বাঁচাতে পারত, কিন্তু বাঁচালে না। তোমার জীবনের অবশিষ্ট দিন তুমি শোক-তাপে অতিবাহিত কর, এই সে চায়; সে চায়, তার রক্তে তোমার শুভ্র কেশ রঞ্জিত হয়। বৃদ্ধ! কাঁদো, তোমার কন্যার মৃত্যুর জন্য নয়, কিন্তু তোমার প্রতি তার যথেষ্ট ভালোবাসা নেই বলে'। যদি তার ভালবাসা থাকত, সে নিশ্চয়ই নিজের প্রাণ বাঁচাত।"

"মার্শো ব্লাঁশকে ঠেলিয়া ফেলিয়াছিলেন, ব্লাঁশ্‌ তাঁহার পাশে নতজানু হইয়াছিল। মার্শো দাঁতে দাঁত টিপিয়া তিক্ত হাসি হাসিয়া সেইখানে পায়চারি করিতেছিলেন। এমন সময় ব্লাঁশের ফোঁপানি শুনিতে পাইলেন; মার্শো ব্যথিত হইয়া অশ্রুসিক্তনয়নে তাহার

সম্মুখে নতজানু হইয়া বলিলেন, "ব্লাঁশ! জগতে সব-চেয়ে যা পবিত্র তার নাম করে', আমাকে পতিত্বে বরণ করতে সম্মত হও।"

এই সময় এই কথার মধ্যে বাধা দিয়া এক অপরিচিত কণ্ঠস্বরে কে একজন বলিয়া উঠিল' "হাঁ বালিকা, সম্মত হ'তেই হবে। তোমার প্রাণ বাঁচাবার এই একমাত্র উপায়। স্বয়ং ধর্ম্ম তোমাকে এই আদেশ করছেন, আর আমি তোমাদের শুভ মিলনে আশীর্ব্বাদ করতে প্রস্তুত আছি।"

মার্শো আশ্চর্য্য হইয়া ফিরিয়া দেখিলেন,—সেদিনকার রাত্রে যে-সব লোককে তিনি আক্রমণ করিয়াছিলেন তার মধ্যে যে একজন পাদ্রী ছিল, সেই পাদ্রীকে চিনিতে পারিলেন। সেই রাত্রের দাঙ্গা-হাঙ্গামে ব্লাঁশ পাদ্রীর বন্দী হইয়াছিল।

মার্শো পাদ্রীর হাত ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন, "পাদ্রী মহাশয়! আপনি ওকে রাজি করান!"

পাদ্রী গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন, "বোতালোর ব্লাঁশ! আমি বৃদ্ধ, আর আমি তোমার পিতার বন্ধু—আমি তোমার পিতার নামে, তোমার পিতার স্থলাভিষিক্ত হ'য়ে তোমাকে আদেশ করছি তুমি এই যুবকের অনুরোধ রক্ষা কর।"

নানাপ্রকার আবেগে ব্লাঁশের মন আন্দোলিত হইতে লাগিল; অবশেষে ব্লাঁশ মার্শোর বক্ষের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। সে বলিল, "মার্শো। আর আমি নিজেকে সামলাতে পারছিনে। মার্শো, আমি তোমাকে ভালোবাসি, তোমাকেই আমি পতিত্বে বরণ করব।" উহাদের ওষ্ঠাধর মিলিত হইল। মার্শোর হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না। মনে হইল আর সমস্তই তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। এই আনন্দ-উচ্ছ্বাসের সময় হঠাৎ পাদ্রীর কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল। পাদ্রী বলিলেন, —"কাজটা আমাদের তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। কেননা, আমার আর অল্প মুহূর্ত্তই অবশিষ্ট আছে।"

প্রেমিক-যুগল কাঁপিয়া উঠিল; এই কণ্ঠস্বর উহাদিগকে আবার মর্ত্যভূমে নামাইয়া আনিল। ব্লাঁশ ভীতি-বিহ্বল হইয়া কারা-কক্ষের চারিধারে নেত্রপাত করিতে লাগিল। সে বলিল, আমাদের মিলনের এ কী অদ্ভুত লগ্নক্ষণ! তুমি কি মনে কর, এই ঘোরদর্শন বিষাদাচ্ছন্ন কারাগারের ভিতর অনুষ্ঠিত আমাদের এই মিলনটা সুখের হবে? সৌভাগ্যযুক্ত হবে?"

মার্শো শিহরিয়া উঠিলেন; কারণ, উপধর্ম্ম-সুলভ একটা ভয়ের ভাবে তাঁরও মন আক্রান্ত হইয়াছিল। তিনি ব্লাঁশকে কারাকক্ষের এমন-একটা জায়গায় টানিয়া লইয়া গেলেন, যেখানে গরাদের ভিতর দিয়া একটু আলোর রশ্মি আসিতেছিল; যেখানে ছায়া ততটা নিবিড় না, এইখানে আসিয়া উহারা নতজানু হইয়া পাদ্রীর আশীর্ব্বাদের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। পাদ্রী উহাদের মস্তকের উপর বাহু প্রসারিত করিয়া শুভ আশীর্ব্বাদ উচ্চারণ করিতে সমুদ্যত এমন সময় অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা ও সৈনিকদিগের পদশব্দ ঢাকা-বারাণ্ডায় শোনা গেল।

ব্লাঁশ ভীত হইয়া মার্শোর বক্ষের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। সে বলিল, —"এরই মধ্যে এরা কি আমাকে নিতে এসেছে! এই সময় মৃত্যু কি ভয়ানক!" তরুণ সেনাপতি মার্শো দুই হাতে দুই পিস্তল লইয়া দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বিস্মিত সৈনিকেরা পিছু হটিল। পাদ্রী বলিলেন, "তোমরা নিশ্চিন্ত হও; ওরা আমাকেই খুঁজবে; আমাকেই মরতে হবে।"

সৈনিকেরা পাদ্রীকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। পাদ্রী প্রেমিক-যুগলকে সম্বোধন করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "তোমরা নতজানু হও। কারণ, আমার একটা পা' গোরের ভিতর রেখে আমি তোমাদের আশীর্ব্বাদ করছি; আর এ বেশ জেনো, যে-ব্যক্তি মরতে যাচ্ছে, তার আশীর্ব্বাদ অতি পবিত্র।"

এই কথা বলিয়া, পাদ্রী তাঁর বক্ষ হইতে একটা "ক্রুশ" বাহির করিলেন এবং উহা উহাদের দিকে বাড়াইয়া দিলেন; তাঁর ত মৃত্যু আসন্ন, এখন তিনি শুধু উহাদের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

একটা গম্ভীর নিস্তব্ধতা বিরাজমান। তাহার পর সৈনিকেরা তাঁকে ঘিরিয়া ফেলিল, দ্বার বন্ধ হইল, সমস্তই অন্তর্হিত হইল।

ব্লাঁশ মার্শোর গলা জড়াইয়া ধরিল।

—"ওঃ! যদি তুমি আমাকে ছেড়ে চলে' যাও, আর ওরা যদি আমাকে খুঁজতে আসে তখন ত তুমি আমাকে আর সাহায্য করতে পারবে না! ওঃ! মার্শো!—একবার মনে করে দেখ, ফাঁসির মঞ্চে উঠে' আমি কাঁদছি, তোমাকে ডাকছি কিন্তু কোন উত্তর পাচ্ছিনে! না মার্শো, যেওনা, যেওনা, আমি তোমার পায়ে পড়ছি, যেওনা। আমি ওদের বলব আমি নিরপরাধী; যদি ওরা আমাকে তোমার সঙ্গে কারাগারে চিরজীবন থাকতে দেয়, তা হ'লে আমি ওদের আশীর্ব্বাদ করব।"

আমি নিশ্চয়ই তোমাকে বাঁচাবো ব্লাঁশ;—তোমার জীবনের জন্য আমার জবাবদিহি। দু-দিনের মধ্যেই মার্জ্জনা-পত্র নিয়ে আমি এখানে উপস্থিত হ'ব: তখন কারাগার ও গারোদ-ঘরের পরিবর্ত্তে, আবার আমরা সুখ-স্বাধীনতা ও প্রেমের মুখ দেখতে পাব!"

দরজা খুলিল, দারোগা প্রবেশ করিল। ব্লাঁশ আরও সজোরে মার্শোর গলা জড়াইয়া ধরিল। কিন্তু তখন প্রত্যেক মুহূর্ত্তটি অতীব মূল্যবান, তিনি তাঁহার কণ্ঠদেশ হইতে তার হাত আস্তে আস্তে ছাড়াইয়া লইলেন। এবং দুই দিনের মধ্যেই ফিরিয়া আসিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। গারোদ-ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া বলিলেন, "চিরদিন যেন তোমার ভালবাসা পাই ব্লাশ।

মার্শোর প্রদত্ত যে লাল গোলাপটি তার চুলে গোঁজা ছিল, সেইটি দেখাইয়া অর্দ্ধমূর্চ্ছিতভাবে ব্লাশ বলিল, "চিরদিন, চিরদিন"। তার পর নরকের ফটকের মত কারাগারের দ্বার বন্ধ হইয়া গেল।

৩

মার্শো দেখিলেন,তাঁহার সঙ্গী দেউড়ীতে তাঁর জন্য অপেক্ষা করিতেছে; তিনি কালি ও কাগজ চাহিলেন। তাঁহার বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমায় এখানে কি করতে হবে?"

"আমি কারিএ-কে এই কথা লিখছি যে, আমি দু-দিনের সময় চাই, আর আমার জীবন, ব্লাঁশের জীবনের উপর নির্ভর করছে।"

তাঁর বন্ধু অসমাপ্ত পত্রখানা তাঁর হস্ত হইতে ছিনাইয়া লইয়া বলিলেন, "নির্বোধ! তুমি সম্পূর্ণ যার আয়ত্তের ভিতর, সৈন্যের সহিত মিলিত হবার যার হুকুম তুমি অমান্য করছ, তা'কেই উল্টে কিনা তুমি ভয় দেখাচ্ছ? তুমি ত এক ঘণ্টার মধ্যে গেরেপ্তার হবে, তখন তোমার নিজের জন্য, ব্লাশের জন্য কিছু করতে পারবে কি?"

মনে হইল, মার্শো দুই হাতের মাঝখানে মাথা নোয়াইয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছেন। হঠাৎ উঠিয়া তিনি বলিলেন, —"তোমার কথাই ঠিক।"

এই কথা বলিয়া তিনি তাঁর বন্ধুকে রাস্তার উপর টানিয়া লইয়া গেলেন।

ডাক-পত্রবাহী একটা গাড়ীর চারিধারে কতকগুলি লোক জমা হইয়াছিল।

মার্শোর কাণে কাণে কে একজন ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "আজকে সন্ধ্যাটা বেশ কুয়াসায় ঢাকা; এই সুযোগে ২০ জন বলিষ্ঠ লোক নিয়ে

সহরে প্রবেশ করে' বন্দীদের উদ্ধার করতে কোন বাধা হবে না। দুঃখের বিষয় নাঁৎ তেমন সুরক্ষিত নয়।'

মার্শো কাঁপিতে লাগিলেন, তার পর ফিরিয়া তিঙ্গিকে চিনিতে পারিলেন—এবং তাহার দিকে একটা অর্থপূর্ণ কটাক্ষপাত করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলেন।

বাহককে হুকুম করিলেন—"প্যারিস্"।

ঘোড়ারা বিদ্যুৎ-বেগে ছুটিয়া চলিল। আট্টার সময় গাড়ী প্যারিসে প্রবেশ করিল। একটা নগর-চত্বরে আসিয়া বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে ছাড়া-ছাড়ি হইল। মার্শো একাকী চলিতে লাগিলেন—তার পর ২৬৬ নং একটা বাড়ীতে পৌঁছিয়া সেইখানে থামিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—"রব্‌স্‌পিয়ের্" আছেন কি না। বাড়ীর লোকেরা বলিলেন, তিনি "জাতীয় থিয়েটারে" গিয়াছেন।

অমন একজন কঠোর-হৃদয় লোক থিয়েটারে গিয়াছেন শুনিয়া মার্শো বিস্মিত হইলেন। তিনিও সেই থিয়েটারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রবেশ করিয়াই রব্‌স্‌পিয়েরকে চিনিতে পারিলেন রব্‌স্‌পিয়ের্ একটা বক্স-এর ছায়ায় অর্দ্ধপ্রচ্ছন্ন ছিলেন। মার্শো বক্সের দরজার বাহিরে যখন উপনীত হইলেন, তখন রব্‌স্‌পিয়ের্ বক্সের ভিতর হইতে বাহির হইতেছিলেন। মার্শো নিজের পরিচয় দিয়া নিজের নাম বলিলেন। রব্‌স্‌পিয়ের্ বলিলেন. "আমি তোমার জন্যে কি করতে পারি?"

"আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।"

"সে কথা এখানে হবে, না, আমার বাড়ীতে?"

—"আপনার বাড়ীতে?"

—"আচ্ছা, এস তবে।"

দুইজনের হৃদয় দুই বিভিন্ন ভাবে আন্দোলিত। দুইজনে পাশাপাশি হইয়া রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিলেন। ব্লাঁশের নিয়তি এই লোকটার হাতেই ছিল।

উঁহারা রব্‌স্‌পিয়েরের বাড়ীতে উপনীত হইলেন। ভিতরে প্রবেশ করিয়া একটা সরু সিঁড়ি বাহিয়া, তে-তালার একটা ঘরে উঠিলেন। "রুসো"র একটা আবক্ষ-মূর্ত্তি,একটা টেবিল—টেবিলের উপর রুসো-প্রণীত দুই-একটা গ্রন্থ, একটা আলমারী, খান-কয়েক চেয়ার—ইহাই ঘরের সমস্ত আস্‌বাব।

রব্‌স্‌পিয়ের্ হাসিমুখে বলিলেন :—

—"এই হচ্ছে সীজারের প্রাসাদ; তুমি এখন কি চাও বল।"

—"কারিএ আমার স্ত্রীর মৃত্যুদণ্ড আদেশ করেছেন; আমি চাই, তাকে ক্ষমা করা হয়।"

"কারিএ তোমার স্ত্রীর মৃত্যুদণ্ড আদেশ করেছেন! সুপ্রসিদ্ধ রিপাব্লিকগণের স্ত্রীর মৃত্যুদণ্ড? কারিএ "নাঁৎ"-নগরে' বসে' কি-সব কাণ্ড করছে?"

কারিএ নাঁৎ-নগরে যে-সব নিষ্ঠুরাচরণ করিতেছিল, মার্শো তার সমস্ত বিবরণ রব্‌স্‌পিয়েরের নিকট বলিলেন। রব্‌স্‌পিয়ের্ আবেগ-কম্পিত কর্কশ-স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"দেখ লোকে আমাকে সর্ব্বদাই ভুল বোঝে। যেখানে আমার চোখ দেখ্‌তে পায় না, যেখানে আমার হাত আট্‌কাতে পারে না—সে-ক্ষেত্রেও আমাকে ভুল বোঝে। রক্তপাত যথেষ্টই হচ্ছে, কিন্তু এর নিবারণের কোন উপায় নেই—এখনো রক্তপাতের শেষ হয়নি।"

"তা হ'লে আমার স্ত্রীর নামে একটা ক্ষমা-পত্র লিখে' দিন্।"

রব্‌স্‌পিয়ের্ এক তাঁ সাদা কাগজ লইলেন।

—"পূর্ব্বে তার নাম কি ছিল?"

—"তা আপনি জানতে চাচ্ছেন কেন?"

"সনাক্ত করা দর্‌কার হবে বলে'।"

"তাঁর নাম বোয়ালোর ব্লাঁশ।"

রব্‌স্‌পিয়েরের হাত হইতে কলমটা পড়িয়া গেল।

—"কী? লা ভাঁদে"-প্রদেশের রাজপক্ষীয়দের প্রধান বোয়ালোর মার্কিসের দুহিতা? তিনি তোমার স্ত্রী কি করে' হ'লেন?"

মার্শো সমস্তই খুলিয়া বলিলেন। রব্‌স্‌পিয়ের্ বলিলেন, —"যুবক তুমি অতি নির্ব্বোধ,—একেবারে উন্মাদ—তুমি"— ? মার্শো তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—"আমি এখানে অপমানিত হ'তে আসিনি, গালি-গালাজ শুনতে আসিনি—আমি আমার স্ত্রীর জন্য ক্ষমা চাইতে এসেছি। আপনি কি ক্ষমা-পত্র লিখে' দেবেন?"

—"পারিবারিক বন্ধন, প্রেমের প্রভাব—এইসমস্ত রিপাব্লিকের প্রতি বিশ্বাসঘাতকা করতে কি তোমাকে প্রলুব্ধ কর্‌বে না?"

—"কখ্‌খনই না।"

—"তুমি যদি নিরস্ত্র অবস্থায়, বোয়ালের মার্কিসের মুখোমুখি হ'য়ে পড়?"

—"আমি যেমন পূর্ব্বেও করেছি তখনো তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কর্‌ব।"

—"যদি তিনি তোমার বন্দী হন?" মার্শো একটু চিন্তা করিয়া তার পর বলিলেন :—

—"তা হ'লে আমি তাঁকে আপনার কাছে নিয়ে আস্‌ব—আপনার বিচারে যা হয় তাই কর্‌বেন।"

"তুমি এই কথা আমার কাছে শপথ করে' বল্‌ছ?"

"হাঁ. ধর্ম্ম সাক্ষী করে' শপথ কর্‌ছি।"

তখন রব্‌স্‌পিয়ের্ কলমটা উঠাইয়া লইয়া লেখা শেষ করিলেন।

তিনি বলিলেন,—"এই লও, তোমার স্ত্রীর নামের এই ক্ষমা-পত্র। এখন তুমি যেতে পার।"

মার্শো, তাঁহার হাতটা লইয়া খুব জোরে টিপিয়া ধরিলেন। কিছু কথা বলিবেন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু অশ্রুধারায় তাঁর কণ্ঠ-রোধ হইল। তখন রব্‌স্‌পিয়েরই তাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"যাও, আর সময় নষ্ট কোরো না। বিদায়!"

মার্শো সবেগে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িলেন এবং যেখানে তাঁর গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল, সেইখানে ছুটিয়া গেলেন।

তাঁর মন হইতে কতটা ভার নামিয়া গেল! কত সুখ তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে! এতটা দুঃখের পর কি আনন্দ! তাঁহার কল্পনা ভবিষ্যতের গর্ভে নিমজ্জিত হইল, এবং যে মুহূর্ত্তে কারাগারের দ্বারদেশে উপনীত হইয়া তিনি বলিতে পারিবেন,—"ব্লাঁশ তুমি রক্ষা পেয়েছ, এখন তুমি স্বাধীন, এখন আমাদের সম্মুখে সুখের জীবন, প্রেমের জীবন প্রসারিত" সেই মুহূর্ত্তটি তিনি মনশ্চক্ষে দেখিতে পাইলেন।

তবু মধ্যে-মধ্যে একটা অস্পষ্ট উৎকণ্ঠা আসিয়া তাঁকে ব্যথিত করিতে লাগিল। হঠাৎ তাঁর বুকটা যেন দমিয়া গেল।

তিনি বাহককে ভালো-রকম বক্‌শিস্ দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন, ঘোড়া খুব ছুটিয়া চলিল। তাঁহার হৃদয়ের দুর্দ্দমনীয় চাঞ্চল্য সকল পদার্থেই যেন সংক্রামিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহার মনে হইল, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কতকগুলা বড় বড় নগর পিছনে ফেলিয়া আসিলেন; আঁজে-র কাছাকাছি আসিয়া তাঁহার গাড়ীটা কাৎ হইয়া পড়িল, তিনিও পড়িয়া গেলেন। আহত ও রক্তাপ্লুত হইয়া একটু পরেই তিনি আবার উঠিয়া, অসির দ্বারা একটা ঘোড়ার জোৎ ছাড়াইয়া দিলেন। তার পর, সেই ঘোড়ার পিঠে লাফ দিয়া

উঠিয়া, পরবর্ত্তী আড্ডায় আসিয়া পৌঁছিলেন। সেখানে ঘোড়া বদ্‌লি করিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন।

তার পর আঁজে পার হইয়া, আরও কতকগুলি সহর অতিক্রম করিয়া "নাঁৎ"-নগরের সম্মুখে আসিলেন। তখন তাঁহার ঘোড়ার শরীর হইতে যেন রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই ফটক পার হইয়া, সহরের ভিতর আসিয়া পড়িলেন। তাহার পর "বুফে"র কারাগারের সম্মুখে আসিয়া ঘোড়া থামাইলেন। যাক্, এখন ত আসিয়া পড়িয়াছেন—আর কিসের চিন্তা? তিনি ব্লাঁশের নাম ধরিয়া ডাক দিলেন—"ব্লাঁশ, ব্লাঁশ!"

জেল-দারোগা আসিয়া উত্তর করিল,—"দুইখানা শকট এইমাত্র জেলখানা-থেকে বের হ'য়ে গেছে। প্রথম শকটটার ভিতরে বোলিয়োর কুমারী ছিলেন।"

একটা কটু কথা উচ্চারণ করিয়া মার্শো ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং চঞ্চল জনতার সহিত সেই বড় চত্বরের দিকে ছুটিয়া চলিলেন। দুই শকটের মধ্যে শেষ শকটটার কাছে তিনি আসিয়া পড়িলেন। তাহার ভিতর যে-সব কয়েদী ছিল, তাহার মধ্যে একজন তাঁকে চিনিতে পারিল। সে—তিঙ্গী। সে বলিয়া উঠিল, "ওকে বাঁচান! ওকে বাঁচান! আমি বাঁচাতে পারলুম না।"

মার্শো ভীড় ঠেলিয়া চলিলেন; লোকেরা তাহার গায়ের উপর আসিয়া পড়িতেছে, তাঁহার চারিধারে ভিড় করিয়া দাঁড়াইতেছে। কিন্তু তিনি তাঁহার পথ হইতে তাহাদিগকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিতেছেন। অবশেষে তিনি মধ্যস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সম্মুখে ফাঁসি-মঞ্চ খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। তিনি এক-টুক্‌রা কাগজ উপর-দিকে নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "ক্ষমা-পত্র! ক্ষমা-পত্র!"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে জল্লাদ, দীর্ঘ কেশগুচ্ছ ধরিয়া একটি বালিকার ছিন্ন মস্তক ভীতি-বিহ্বল জনতার সম্মুখে ধারণ করিল।

হঠাৎ সেই নিস্তব্ধ জনতার মধ্য হইতে একটা চীৎকার শোনা গেল—একটা যন্ত্রণা-সূচক লোমহর্ষণ চীৎকার। ঐ ঊর্দ্ধ উত্তোলিত মস্তকের দন্তপংক্তির মধ্যে মার্শো সেই লাল গোলাপটি দেখিতে পাইলেন, যাহা তিনি তাঁর প্রণয়িনীকে উপহার দিয়াছিলেন। *

* আলেকজাঁদ্‌র্ দুমা হইতে।
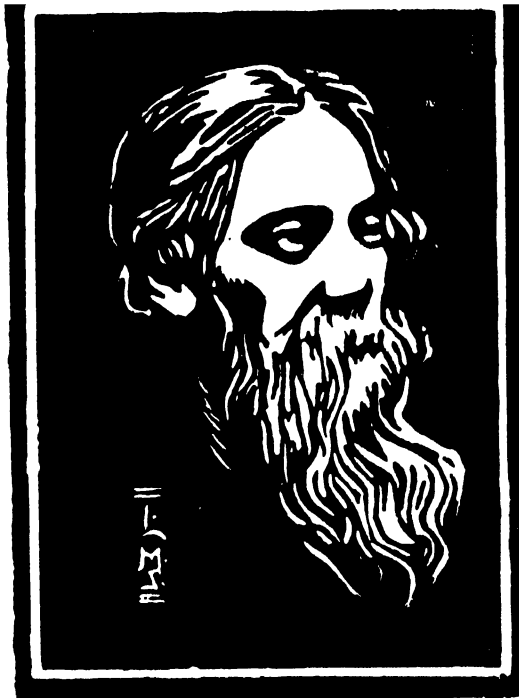
—রবীন্দ্রনাথ—
শ্রীললিতমোহন সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক কাঠ খোদাই

শ্রী হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

কাল্‌স্‌বাড্‌-গুহা—

মেক্সিকোর কাল্‌স্‌বাড-নামক স্থানে কিছুদিন পূর্ব্বে কতকগুলি গুহার আবিষ্কার হইয়াছে। সম্ভবত এই গুহাগুলি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় গুহা লম্বা এবং চওড়া উভয়প্রকারেই। ১৯০১ সাল হইতেই এই গুহার অস্তিত্ব জানা গিয়াছিল, কিন্তু ঐ সময় ইহার

কাল্‌স্‌বাড্‌ গুহার একটি কক্ষ দেখিলে মনে হয় যে উহা মানুষের হাতের তৈরী

গুহার আর-একটি অংশ—দুটি চমৎকার থাম্বা দেখিবার জিনিষ

আবিষ্কারের কথা কেহ ভাবেন নাই বা ভাবিবার দরকার মনে করেন নাই। পাহাড়ের গায়ে একটি গর্ত্ত দিয়া অসংখ্য বাদুড় বাহির হইয়া আসিত। ইহা দেখিয়াই প্রথমে লোকের মনে এই গুহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে।

কিছুদিন পূর্ব্বে ডাঃ উইলিস্‌ টি লি (Dr. Willis T. Lee of the United States Geolgical Survey) একদল লোক লইয়া একটা পাহাড়ে' নদীর হঠাৎ ভূগর্ভে লোপ পাওয়ার কারণ অনুসন্ধানে রত হন, এবং পাহাড়ের মধ্যে একটি ১ মাইল লম্বা এবং ১/২ মাইল চওড়া গুহার আবিষ্কার করেন। এই গুহাটিকে একটি ঘর বলিলেও চলে। এই গুহার মধ্যে বড় এবং ছোট অসংখ্য থাম আছে। এই থামগুলি ২ ইঞ্চি হইতে ১০০ ফুট পর্য্যন্ত উঁচু। গুহা-ঘরের ছাদ গুহাতল হইতে ৩০০ ফুট উপরে। গুহা-ছাদ হইতে হাজার হাজার বছর ধরিয়া নানাপ্রকার ধাতব জল ফোটা-ফোঁটা করিয়া পড়িয়া এই-সমস্ত থামগুলির সৃষ্টি হইয়াছে। গুহার ছাদ হইতেও অনেকগুলি চমৎকার থাম ঝুলিতে দেখা যায়।

এই গুহার মধ্যে অসংখ্য বাদুড় ছাড়া অন্য কোনপ্রকার জীবজন্তু নাই। কোনপ্রকার গাছপালাও নাই। ভোর এবং সন্ধ্যাবেলায় সমস্ত গুহা বাদুড়দের চীৎকার এবং ডানা-ঝাপ্‌টানির শব্দে মুখরিত হইয়া উঠে।

দাড়ি-কামানো মোটরবাইক—

আপিসের তাড়াতাড়ি, কিম্বা ট্রেন ধরিবার সময় প্রায় উৎরাইয়া গেল অথচ দাড়ি গজাইয়া মুখের চারিদিকে বন-বাদাড়ের মত আগাছার সৃষ্টি করিয়াছে। দাড়ি কামাইতে গেলে ট্রেন ধরা কিম্বা আফিস যাওয়া বন্ধ করিতে হয়। কিন্তু আর আপনার ভয় নাই। ছবিতে দেখুন,

দাড়ি-কামানো মোটর-বাইক। সাইড্‌কারে নাপিত দাড়ি কামাইতেছে—মোটর-বাইক ছুটিয়া চলিয়াছে

মোটরবাইক আরোহীকে লইয়া ছুটিয়াছে দাড়ি-না-কামানো অবস্থায়, কিন্তু পাশের একজন লোক তাহার দাড়ি কামাইবার উদ্যোগ করিতেছে, পাঁচ মিনিটেই সব শেষ করিয়া ফেলিবে। আমাদের সোনার দেশে অবশ্য ইহা এখনও হয় নাই। ক্যালিফোর্নিয়া সহরে সম্প্রতি ইহা দেখা গিয়াছে। সেখানের লোকে ইহার সুবিধাটুকু পুরামাত্রায় উপভোগ করিতেছে।

—

জলে-চলা জুতা—

ছবিতে দেখুন কেমন করিয়া দুই ভাই জলের উপর হাঁটিয়া চলিয়াছে।

দুইজনে কেমন জলের উপর চলিয়াছে দেখুন—হাতল

এই জল-জুতা ১০ ফুট লম্বা এবং ১৪ ইঞ্চি চওড়া এবং নৌকার মত করিয়া তৈরী। জুতার গতি বদলাইবার জন্য হ্যাণ্ডেল্ আছে এবং দুটি নৌকাকে সকল সময় কাছাকাছি রাখিবার জন্য একটি ফ্রেম আছে।

জলের উপর চলিবার নৌকা

কেবল পা ঢুকাইবার দুটি গর্ত্ত ছাড়া, নৌকা দুটি আগাগোড়া আবৃত। পণ্টনের উপর বসিবার জন্য দুটি বাইসাইকেল-সিটও লাগান আছে।

—

প্রথম সাব্‌মেরিন্ নৌকা—

১৮৬৪ সালে পৃথিবীর প্রথম সাব্‌মেরিন্ নৌকা মেসার্স্‌ বুশ্‌নেল্

পৃথিবীর আদি সাবমেরিন্—বর্ত্তমানে ইহা নিউইয়র্কের ব্রুক্‌লীন্

রাইস্ অ্যাণ্ড হলষ্টিড্, নিউ যারসি সহরে নির্ম্মাণ করেন। এই নৌকাটি এখন নিউইয়র্কের ব্রুক্লীন নেভি-ইয়ার্ডে রক্ষিত আছে।

এই নৌকাটির গতি ছিল ঘণ্টায় ৪ নট্ অর্থাৎ প্রায় ৫ মাইল এবং ইহাকে হাতের সাহায্যে চালাইতে হইত। নৌকাটি ২৮ ফুট লম্বা এবং ৯ ফুট উচ্চ ছিল। ইহা করিতে খরচ পড়িয়াছিল ২৪০,০০০ টাকা। এই নৌকাতে ১০জন নাবিক থাকিত।

মানবের আদি বাসস্থান মঙ্গোলিয়া—

মঙ্গোলিয়াতে আদি মানবের এবং অন্যান্য অনেকপ্রকার জীবজন্তুর চিহ্ন আবিষ্কার হইয়াছে। এইসকল জীবজন্তু হাজার-হাজার বৎসর
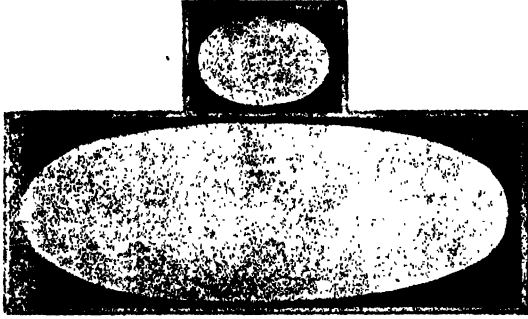
উপরেরটি বর্ত্তমান কালের মুরগীর ডিম—নীচেরটি ডিনোসারের ডিম, মঙ্গোলিয়ায় এই ডিমটি পাওয়া গিয়াছে

পূর্ব্বে এই দেশে বাস করিত। সেই-সময়কার জীবজন্তুদের বংশধরেরা এখন একেবারে অন্যরূপ ধারণ করিয়াছে, তাহাদের চিনিবার উপায়

বাঁদিক হইতে—প্রোফেসর হেন্‌রি কেয়ারফিল্ড্ অসবরণ, রয় চাপ্‌ম্যান্ অ্যাণ্ড্রজ এবং ওয়াণ্টার গ্রিঞ্জার—যুক্তরাষ্ট্র হইতে এই তিনজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক দলবল লইয়া মঙ্গো-লিয়াতে নানাপ্রকার পুরাকালের জীবজন্তুর [illegible]

অবশ্য একেবারে লোপ পায় নাই। কতকগুলি বিশেষ-বিশেষ অস্থি-সংগঠন দেখিয়া ইহাদের বংশ-পরিচয় অবধারণ করা যায়।

মঙ্গোলিয়ায় আরো হাজাররকমের পুরাকালের জীবজন্তুদের অস্থি, অণ্ড, কঙ্কাল ইত্যাদি ভালো অবস্থায় কিম্বা প্রস্তরীভূত অবস্থায় আছে। এইসমস্ত আবিষ্কার করিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্র হইতে একদল প্রাণি- এবং ভূতত্ত্ব-বিৎ পণ্ডিত শীঘ্রই মঙ্গোলিয়ায় গমন করিবেন। এই
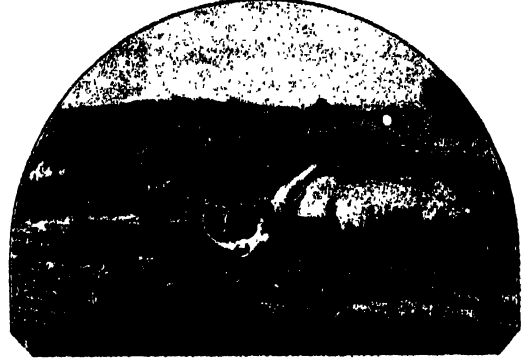
পুরাকালের গণ্ডার—পৃথিবীতে ইহার অপেক্ষা বড় স্তনপায়ী জন্তু আর দেখা যায় নাই

দলের চালক মনে করেন যে, মধ্যএশিয়ায় এমন সমস্ত প্রমাণাদি পাওয়া যাইবে যাহাতে এশিয়া এবং উত্তর আমেরিকা যে একই দেশ ছিল তাহা সহজেই প্রমাণ করা যাইবে। এইখানে আরো এমন অনেক-কিছু পাওয়া যাইবে যাহাতে মধ্যএশিয়াই যে মানবের আদিতম বাসস্থান তাহা একেবারে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইবে।

ইহার পূর্ব্বে যে দল মঙ্গোলিয়াতে যান তাঁহারা ২৫টি ডিনোসারের (Dinosaur) অণ্ড মাটি হইতে আবিষ্কার করেন। কতকগুলি অণ্ডের মধ্যে ভ্রূণাবস্থায় ডিনোসার ছিল। একটি বাসাতে বোধ হয় ১০,০০০,০০০ বছর-পূর্ব্বে-পাড়া কতকগুলি ডিম পাওয়া যায়। এই ডিনোসারগুলি অনেক শত হাজার বছর পূর্ব্বে পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া বেড়াইত। তাহারা দেখিতে গিরগিটির মত ছিল। কিন্তু গিরগিটি হইতে বহুগুণ বড়। যে-বাসাতে ডিনোসারের কতকগুলি ডিম পাওয়া যায়, সেই বাসাতেই ডিনোসারের মাথার খুলিও অনেক-গুলি পাওয়া যায়। আমেরিকাতেও ঠিক এইরকম হাড় পাওয়া গিয়াছে। এই ডিনোসারেরা এক-সময় আমেরিকাতেও তাহাদের আণ্ডা-বাচ্চা লইয়া বাস করিত। ইহাতে মনে হয় যে আমেরিকা এবং এশিয়া মাটির দ্বারা যুক্ত ছিল। তার পর কোন সময় হয়ত একটা ভয়ানক ভূমিকম্প হয়, যাহার ফলে এশিয়া এবং আমেরিকার মাঝখানে সমুদ্র আসিয়া পড়িল এবং বড় পুরাকালের একটি-মহাদেশ, দুইটি মহাদেশে পরিণত হইল।

মঙ্গোলিয়াতে একটা জন্তুর কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে,—দেখিতে হায়নার মত, কিন্তু আকার একটা ঘোড়ার দ্বিগুণ। তার মুখের হাঁ দেখিয়া মনে হয় সে একটা লোককে একেবারে গিলিয়া খাইতে পারে। এইরকম সব জন্তুরা পৃথিবীর আদিকালে এবং আদিমানবের সমসাময়িক কালে বাস করিত। একটি গণ্ডারের মাথার একটি খুলি পাওয়া গিয়াছে। এই খুলির পরিমাণে গণ্ডারটি তাহার বর্ত্তমান বংশধরদের অপেক্ষা বহুগুণ বড় ছিল। তবে বেচারারা বোধ হয় নিরীহ ছিল, কারণ তাহারা গাছপাতা খাইয়াই দিন কাটাইত। পুরাকালে গাছপালা-

পুরাকালের ডিনোসার—তুলনার জন্য একটি মানুষের ছবি দেওয়া হইল

খেগো এত বড় জন্তু আর ছিল বলিয়া মনে হয় না, অন্ততঃ তাহা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

টিটানোথেরেস্ নামক একপ্রকার প্রকাণ্ড জন্তুর ২০টি মাথার খুলি পাওয়া গিয়াছে। এইপ্রকার জন্তুর মাথার খুলি আমেরিকার দক্ষিণ ডাকোটাতেও পাওয়া গিয়াছে। আমেরিকা এবং এশিয়ার পুরাকালে এক-দেশত্বের ইহা আর-একটি বড় প্রমাণ।

পুরাকালের আরো কতপ্রকার জীবজন্তু পশুপক্ষী সরীসৃপাদির নানাপ্রকার চিহ্ন যে পাওয়া গিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই।

পূর্ব্বে যে ডিনোসারের কথা বলিয়াছি তাহারা ৮০ ফুট লম্বা হইত।

আশা আছে, আমরা অতি অল্পদিনের মধ্যেই মঙ্গোলিয়া হইতে আরো নানাপ্রকার অধুনালুপ্ত পৌরাণিক জীবজন্তুর খবর শুনিতে পাইব।

যে বৈজ্ঞানিকের দল এই কার্য্যে রত আছেন, তাঁহাদের কাজটি বিশেষ সুখসাধ্য বলিয়া মনে হইতেছে না।

মঙ্গোলিয়ার একপ্রকার কুকুরের আক্রমণ ইঁহাদিগকে প্রায়ই ভোগ করিতে হয়। এই কুকুরগুলি দেখিতে অতি ভয়ানক এবং প্রকাণ্ড, সাধারণ কুকুরের প্রায় তিনগুণ। ইহারা পোষ মানে না বলিলেই হয়। জঙ্গলে-জঙ্গলে শিকার খুঁজিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। পৃথিবীর মধ্যে এই জাতীয় কুকুরই বোধ হয় সবরকম নিষ্ঠুর জন্তুর মধ্যে নিষ্ঠুরতম জন্তু। ইহারা একরকম মানুষের মাংস খাইয়াই জীবন ধারণ করে। অবশ্য সকল সময় ইহাদের নিজেদের মানুষ শিকার করিতে হয় না। কারণ এক-দল মোঙ্গল তাহাদের মৃতদের মাংস আহার করে; সমস্ত শরীরটা খাইতে পারে না, বেশীর ভাগই ফেলিয়া দেয়। সেই নিক্ষিপ্ত নরমাংস এই কুকুরদের আহার। এই বৈজ্ঞানিক দলকে আরো নানাপ্রকার বিপদ ভোগ করিতে হয়। জুতা মোজার মধ্যে যে কতপ্রকার বিষাক্ত পোকামাকড় ঢুকিয়া বসিয়া থাকে, তাহা বলা যায় না। প্রথম-প্রথম দেশীয় লোকেরাও বড় মিত্রভাব দেখায় নাই। এই-

জীবন বিপন্ন করিয়া, আত্মীয়-স্বজনদের ত্যাগ করিয়া নিঃস্বার্থভাবে পৃথিবীর জন্য নিজেদের দান করিয়াছে। ইঁহাদের কথা মনে হইলেই মনে হয় স্বাধীন জাতি বলিয়া ইঁহারা মনের আনন্দে সমস্ত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়েন।

—

পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য দৃশ্য—

পৃথিবীতে যা এক সময়ে ছিল এবং যাহার চিহ্ন এখনো আছে, অথচ আমরা তাহার অস্তিত্ব-সম্বন্ধে কিছুই জানিতাম না, এই-রকম কোন বিস্ময়কর জিনিষ বা ব্যাপার আমাদের চোখে হঠাৎ পড়িলে আমরা অবাক্ হইয়া যাই। তুতান-খামেনের কবর আবিষ্কারে, সেইজন্য, আমরা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলাম। কারণ আমরা কল্পনা করিতেও পারি নাই যে, এমন কোন জিনিষ মাটির মধ্যে ইটের পাঁজার তলায় লুকান থাকিতে পারে। কিন্তু আমরা আরও অবাক্ হইয়া যাইব, যদি আমরা আমাদের মাথার উপরের অনন্ত আকাশের মধ্যস্থিত অসংখ্য তারকারাজির কথা ভাবি। আমাদের পরমবন্ধু সূর্য্য অপেক্ষা এক-একটি অনেক বড়, কত তারা যে, আকাশে আছে তাহা কেহ বলিতে পারে না। এমন অগণ্য তারা আছে, যাহাদের আলো এখনও এই পৃথিবীতে এবং পৃথিবী-বাসীদের চোখে আসিয়া পৌঁছায় নাই, যদিও তাহারা লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে যাত্রারম্ভ করিয়াছে।

একটি ১০০ ইঞ্চি মুখওয়ালা টেলিস্কোপে অনন্ত আকাশের এক কোণের একটি ছবি তোলা হইয়াছে। এই ছবির মধ্যে একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার ধরা পড়িয়াছে। ছবিতে দেখুন, একটি ঘোড়ার মুণ্ডের মতন কালো একটা-কি দেখা যাইতেছে। বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন এই পদার্থটি একটি নির্ব্বাপিত গ্রহ। ইহাতে কোনপ্রকার আলো এখন নাই বরং পার্শ্বে কোন সময় হয়ত বা ছিল। ইহা অনন্ত আকাশে
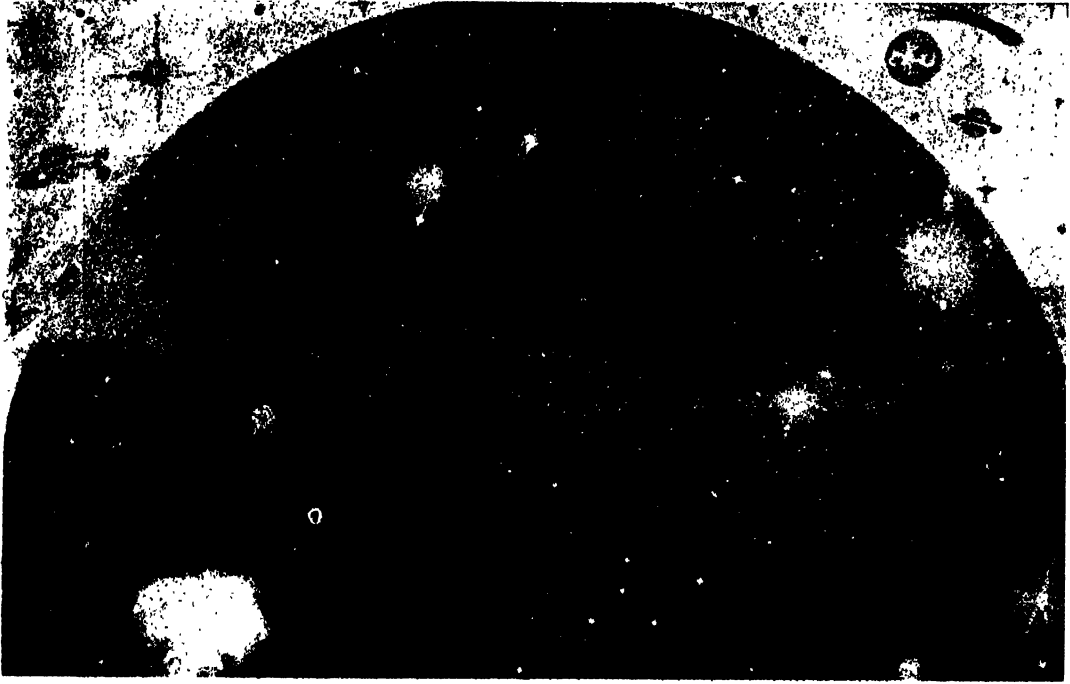
অনন্ত গগনের একটুকরা ছবি। ১০০ ইঞ্চি টেলিস্কোপের সাহায্যে এই ছবি তুলিতে গিয়া মাঝখানে ঘোড়ার মাথার মতন একটি নির্ব্বাপিত গ্রহের ছবি উঠে। পৃথিবী হইতে ইহা কতদূরে ভাসিতেছে, তাহা বলা যায় না। এই ঘোড়ার মুণ্ডটি আকাশের অনেক তারাকে আমাদের দৃষ্টিপথ হইতে ঢাকিয়া রাখিয়াছে

আপন খেয়ালে ভাসিয়া চলিয়াছে, এবং পৃথিবী হইতে যে কত দূরে ইহার বাসস্থান তাহা মানুষের মন কল্পনাতেও আনিতে পারে না। ভাল টেলিস্কোপ না থাকার জন্য এতদিন আকাশের অনেক পুরানো জিনিষ আমাদের চোখে পড়ে নাই। এখন ক্রমে-ক্রমে তাহারা আমাদের চোখের সাম্‌নে আসিতেছে।

টেলিস্কোপের মধ্য দিয়া দেখিলে আকাশে মাঝে-মাঝে একটা একটা স্থান যেন জমাট আলোর মতন দেখায়। এই জমাট আলো আর কিছুই নয়, অসংখ্য তারকারাজির জটলা। এই সমস্ত তারার আলোক-রশ্মি পৃথিবীর দিকে প্রায় ১০,০০০ বছর পূর্ব্বে যাত্রা করিয়াছিল।

ইয়াকেন্ বীক্ষণাগারে ১৯০৮ সালে আলোক চিত্রিত মোরহাউস ধূমকেতু—দূরস্থ তারাগুলি কেমন করিয়া ধূমকেতুর পুচ্ছের ঝাপ্‌সা মেঘবৎ পদার্থের ভিতর দিয়া দেখা যাইতেছে

এতদিনে তাহাদের পৃথিবী-অভিমুখে যাত্রা শেষ হইয়াছে। আলো প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল বেগে চলে। আকাশের মধ্যে এইসমস্ত জমাট আলোর মধ্যে এমন অনেক তারা আছে, যাহারা আমাদের সূর্য্য হইতে বেশ কিছু বড়। এইপ্রকার এক-একটি তারাকে অতিক্রম করিতে একটি আলোক-রশ্মির প্রায় ৬০০০ বছর সময় লাগে

এই চিত্রের মধ্যস্থলে অজ্ঞাতস্বরূপ S আকৃতিবিশিষ্ট-অসংখ্য মণিবৎ

এবং এই আলোক-রশ্মি প্রতি সেকেণ্ডে ১৪৬,০০০ মাইল বেগে চলে। তাহা হইলে ভাবিয়া দেখুন, এক-একটি তারার আকার কিপ্রকার।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, এমন অনেক তারা আছে, যাহাদের আলো পৃথিবীতে আসিতে ২,০০,০০০ বছর লাগিয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে একটি ছোট তারা আকাশের এক কোণে দেখা গিয়াছে। বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, ইহার আলোক-রশ্মি আমাদের পৃথিবীতে আসিতে অন্ততঃ পক্ষে ১০,০০,০০০, বছর সময় লাগিয়াছে। এত দূরে অবস্থিত তারা এখন পর্য্যন্ত মানুষের চোখে আর পড়ে নাই। কিন্তু ইহার পরেও, ইহা হইতে অনেক দূরে আরো অনেক বড়-বড় তারা আছে। তাহাদের আলোক-রশ্মি এখন পৃথিবী হইতে বহু দূরে রহিয়াছে। তবে তাহারা আমাদের দিকেই আসিতেছে।

নক্ষত্র এবং সূর্য্য বিভিন্ন জাতির নহে। আমাদের সূর্য্যও একটি নক্ষত্র এবং আকাশের নক্ষত্রগুলিও আমাদের সূর্য্যের সমান বা তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর

সাগিটারিউস নক্ষত্রপুঞ্জে ট্রিফিড নীহারিকা—আপাতত দেখিতে তপ্তশুভ্র বাষ্পমেঘের ন্যায়; খালি-চোখে প্রায় দৃষ্টিগোচর নহে।

কুণ্ডলীবৎ নীহারিকা—কানেশ ভেনাটিকি। ইহা তারকা-নির্ম্মিত ঘূর্ণায়মান চক্রবিশেষ। ইহার আয়তন এত বৃহৎ যে ইহার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আলোক পৌঁছিতে আলোক-বৎসরের ২৫০০০ হইতে ৫০০০০ বছর লাগে।

সূর্য্য। চন্দ্র-হীন নির্ম্মল আকাশের গায়ে যে ছায়াপথ দেখা যায়, সেই ছায়াপথের ৮০,০০০ তারার টেলিস্কোপিক-ফোটো তোলা হইয়াছে। আকাশের যে-কোন একটি ছোট তারা আমাদের সূর্য্যের দোসর ভাই হইতে পারে। আমাদের সূর্য্যের ব্যাস ৮৬৫,০০০ মাইল মাত্র।

সূর্য্যের চারিদিকে যেমন গ্রহ-উপগ্রহ অনেক-কিছুই ভ্রাম্যমাণ রহিয়াছে, আকাশের এক-একটি তারারও সেইপ্রকার গ্রহ-উপগ্রহাদি আছে। তবে সেইসমস্ত গ্রহে-উপগ্রহে লোক বাস করে কি না, এখনও কেহ বলিতে পারে না। অন্য গ্রহের লোকেরাও, হয়ত মনে করিতেছে কিম্বা বসিয়া ভাবিতেছে যে, সূর্য্যের গ্রহে কোন লোক আছে কি না এবং তাহাদের বুদ্ধির বহরই বা কি-প্রমাণ। তাহারা হয়ত আমাদের অস্তিত্বের কথা জানে। ইহা সমস্তই যদির কথা। সম্প্রতি শোনা গিয়াছে যে, মঙ্গল গ্রহে নাকি আমাদের মত মানুষ আছে এবং তাহাদের বুদ্ধি ভয়ানক এবং তাহারা আমাদের সঙ্গে বেতার কথাবার্ত্তা চালাইবার চেষ্টা করিতেছে।

আকাশের কতকগুলি টেলিস্কোপিক-ফোটো দিলাম—ইহা হইতে আকাশ যে কি এবং তাহাতে যে কত বিস্ময়কর জিনিষ আছে তা কতকটা বোঝা যাইবে। ছবিগুলির পরিচয় ছবিগুলির সঙ্গেই দেওয়া হইল। নানাপ্রকার তারার আলো দেখিয়া-দেখিয়া এবং পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বৈজ্ঞানিকেরা কোন-একটা বিশেষ তারার আলো দেখিয়া তাহার দূরত্ব বলিতে পারেন। "Spectroscope" নামে একটি যন্ত্রে আলো বিশ্লেষণ করা যায়। এই বিশ্লেষণে আলোর মূল উৎপত্তি-স্থানের দূরত্ব হিসাব করিয়া বাহির করা যায়। বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত তারার আলোর প্রকৃতি একরকম নয়। দূরত্ব-অনুসারে আলোরও নানা-প্রকার গুণের তারতম্য হয়। এইসকল অতি সূক্ষ্ম তারতম্য চোখে ধরা পড়ে না, কিন্তু বিশেষ যন্ত্রের মধ্যে এইসমস্ত অতি সত্বর ধরিতে পারা যায়। সূর্য্যের আলোর সাতটি রং আছে ইহা আমরা সকলেই জানি, কিন্তু সকল তারার আলোতেই যে সাতটি রং থাকিবে এমন কোন কথা নাই।

ছায়াপথের ফোটো হইতে বুঝা যায় যে, ছায়াপথটির সব জায়গায় সমানভাবে তারার বাস নাই। কোনখানে হয়ত হাজার-হাজার

আছে, আবার কোন-খানে হয়ত মাত্র কয়েক শত আছে। ছায়াপথটি চওড়া-গোল বলিয়া মনে হয় এবং ইহার ব্যাস বোধ হয় ২৫ হইতে ৫০ হাজার আলো-বছর অর্থাৎ ইহার ব্যাস অতিক্রম করিতে একটি সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০মাইল বেগে ধাবিত আলোক রশ্মির ৫০,০০০, বছর লাগে। ছায়াপথের গভীরতা বোধ হয় ৬০০০ আলো-বছর। আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ এই—কিন্তু আমাদের ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডের মাত্র সামান্য এক অংশ। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ আমাদের কল্পনার বহু অতীত।

শিশুমঙ্গল

শ্রী সুধীরকুমার চৌধুরী

এক স্বপ্ন চক্ষে আজি।—সারা দিনমান
হেরিতেছি সবাকার মাঝারে সমান
কোন্ সে শিশুরে। তার কলহাস্যধ্বনি
দিগন্তের পারে কভু চলে রণরণি'
দক্ষিণ-যাত্রিক পক্ষিদলের মতন
আত্মহারা। বক্ষে তার কি চিরনূতন
আশাস্বপ্ন, অন্তরে কি নিঃশঙ্ক নির্ভর
নির্বাত দীপের মতো। কভু দুটি চক্ষু ভরভর
বাষ্পবিগলিত বেদনায়; শুধু স্নেহ-অভিমানে
বন্দী স্নেহ প্লাবনেরে পলেপলে মুক্ত করি' আনে
বিনা অধিকারে। কভু নিঃশব্দ নিঃঝুম
দুনয়নে হেরি তার যুগান্তের ঘুম
আষাঢ়ের স্তব্ধ রাত্রি সম। তার মাঝে
শান্ত-অনাহত স্বরে অবিরত বাজে
জননীর আশা ভয়-কম্পিত হৃদয়-উৎস হ'তে
উৎসারিত ঘুমের সঙ্গীত-সম অনাবিল স্রোতে
অসীম কালের পথ চাওয়া।
সারাবেলা
হেরিতেছি এ-শিশুর নিরন্তর অন্তহীন খেলা
আপনা বিস্মৃত, বিশ্বে লয়ে'। কভু তারে
হেরিতেছি কৈশোরের উচ্ছ্বসিত প্রীতির পাথারে
দিশে দিশে ভেসে যেতে বিচারবিহীন। বেদনায়
কখনো সে যৌবনের ভারাতুর হৃদয়ে ঘনায়
ঘনচুম্বনের মতো কোমল দংশনে। কভু লাজে
বার্দ্ধক্যের সুগম্ভীর মৌন আত্মপ্রতিষ্ঠার মাঝে
অপরাধী সম রহে।
আজি বারবার
কৈশোর-যৌবন-জরা-মাঝে এ-সবার;
হেরিলাম শৈশবের স্বপ্নময় স্বর্ণসূত্রটিরে
তার পর দুইপ্রান্ত আপনি মিলিয়া আসে ধীরে
একখানি অটুট বন্ধনে। দিবা-নিশি
আমার জনম রহে আমার মরণ-সনে মিশি'।

মানুষের কাছে
তার যে জগৎখানি একান্ত তাহারই হ'য়ে আছে
তার নিজ হাতে গড়া, আজি তার কোলে
সেই মহামানবেরে হেরি যে শিশুর মতো দোলে
ক্ষুদ্র এতটুকু। কভু ভয়ে ওঠে কাঁদি',
সবলে পরাণপণে ধরারে বুকের সনে বাঁধি'
বলে, তুমি আছ আছ আমার জীবন দিয়ে কেনা,
সুখে-দুঃখে পলে-পলে তোমা'র-সনে হ'ল মোর চেনা,
আমারে দেবে না ফেলি' অজানার ভয়ের আঁধারে।
কভু তারে দূরে ঠেলি' অবজ্ঞায় হানে শতধারে
বিপ্লব-বাণের বৃষ্টি। চূর্ণ চূর্ণ করি'
করে সে নূতন সৃষ্টি, দিনে দিনে গড়ি'
অভিনব জগতেরে পুনরায় বসি' তার কোলে
অসহায় নিরুপায় সভয়ে শিশুর মতো দোলে।—

নূতনে ও পুরাতনে, গঠিত ও অগঠিত তার
বিপুল অসীম বিশ্বে যিনি তার হরষ-ব্যথার
চিরসাক্ষী চিরদিন, অন্তরালে তাঁর বক্ষতলে
একটি বাৎসল্য শুধু চিরজন্ম দীপসম জ্বলে ;
উত্থানে-পতনে তার নির্নিমেষে রহে প্রতীক্ষিয়া
বিনিদ্র শয়ন-'পরে একখানি স্তব্ধ মাতৃহিয়া
যুগ হ'তে যুগে।...

সারানিশি সারাদিন আজি
উৎসব-বাঁশীর সুরে বারেবারে উঠিতেছে বাজি'
কোন্ আশা অন্তরের কক্ষে-কক্ষে, কোন্ দীপ জ্বালা,
দুয়ারে দুয়ারে মোর কে দুলাল কুসুমের মালা
কার শুভ জনম-লগনে ! সবাকার মুখে চাহি'
আজি আমি ভাসি অশ্রুধারে।—নাহি নাহি
শত্রু-মিত্র কেহ, আজি আপনে ও পরে
কোথাও বিচ্ছেদ নাহি, দু-দিনের তরে
সবারে কুড়ায়ে পেনু অন্তরের মাতৃ-অঙ্কে মম
অসহায় নিরুপায় অবুঝ শিশুর দল সম
নিত্য নব পরিচয়ে, নিত্য-নিত্য নবজন্ম-মাঝে।
কে রে তুই, ও পাতকী, রয়েছিস্ একি মিথ্যা সাজে
ছদ্মবেশে, দৃষ্টিতে কি ঘৃণা তোর, এ কি অন্ধকার
ভ্রূকুটিতে, বাক্যে তোর হলাহল, কুৎসিত-আকার
সারা জীবনের তোর কুৎসা-ইতিহাস। তবু তুই
আয় আরো কাছে আয়, শিরে তোর ধীরে ধীরে থুই
এ আমার শুভস্পর্শ প্রীতিস্নিগ্ধ। আয় তার পরে;
তাকাইয়া তোর দু'টি সুপ্তবহ্নি দৃষ্টির ভিতরে
হেরি তোর সত্য রূপ।—তোর মাঝে হেরি সে শিশুরে,
একদা যে স্নিগ্ধহাস্তে, অকলঙ্ক নয়নের সুরে,
ক্রন্দনের শঙ্খরবে, জননীর বিগলিত হিয়া
শুভ্র সুধা-উৎসরসে স্তনমুখে আনিল বাহিয়া
ভগীরথ সম।—মম চিত্তমাঝে শুনি
কল্লোলে বহিয়া আসে অনাবিল সেই সুরধুনী,
সে পবিত্র স্নেহরস।—স্পর্শে তার ওঠে সঞ্জীবিয়া
যত ভস্ম-অবশেষ, তোর যত অর্দ্ধদগ্ধ হিয়া,
তোর যত পাপের মরণ দৈবশাপে,

সকলে শিহরি' কাঁপে
জীবনের সঘন স্পন্দনে। আজি কি দুরন্ত আশা,
জাগাইলি বক্ষে মোর, বুঝাব যে কোথা হেন ভাষা,
ওরে তুই প্রবঞ্চক, রে ঘাতক, তস্কর, ভিক্ষুক,
চাহিতেছি যেথা তোর বক্ষমাঝে করে ধুক্‌ধুক্
সুগোপন শিশু-হিয়া, ললাটে ললাট তোর রাখি'
শুনি' স্নিগ্ধ শিশু-হাস্য, হেরি তোর অকলঙ্ক আঁখি।

আন্তর্জাতীয় তত্ত্ববিদ্যাপরিষৎ

ভারতবর্ষ অতি প্রাচীনকাল হইতেই নানা বিষয়ে কৃতিত্ব দেখাইয়া আসিতেছে, কিন্তু তত্ত্ববিদ্যার অনুশীলন চিরদিনই এদেশে শীর্ষস্থানীয় বলিয়া পরিগণিত হইত। এইজন্য ভারতবর্ষ তত্ত্ববিদ্যা বা অধ্যাত্মবিদ্যায় যেরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, এরূপ আর কোনও দেশই নহে। প্রায় সার্দ্ধ-দ্বিসহস্র বৎসর ধরিয়া এই তত্ত্ববিদ্যার আলোচনা শিষ্যপরম্পরায় ধারাবাহিক ক্রমে চলিয়া আসিয়াছে। জৈন, বৌদ্ধ, সাঙ্খ্য, যোগ, মীমাংসা, বেদান্ত, ন্যায়, বৈশেষিক, শৈব ও শাক্ত তন্ত্র, পাঞ্চরাত্র, বিবিধ বৈষ্ণব শাখা প্রভৃতি বিভিন্ন বিভিন্ন দর্শনে ও প্রত্যেক দর্শনের শিষ্যপ্রশিষ্যানুসারিণী শাখা-প্রশাখায় যে ধর্ম্ম, তত্ত্ববিদ্যা, তর্কশাস্ত্র প্রভৃতি সম্পর্কে কত মত প্রচারিত, স্থাপিত ও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। শুধু বাঙ্গলার কথা বলিতেছি না, সমস্ত ভারতবর্ষেই এরূপ কম লোকই আছেন, যাঁহারা সমস্ত মতবাদের ভালরকম খবর রাখেন, এবং দর্শনশাস্ত্রের কোন্ কোন্ বিভিন্ন শাখায় ও অংশে ভারতবর্ষের কতটুকু কৃতিত্ব তাহা জানেন এবং গ্রন্থাদি দ্বারা সকলকে জানাইবার চেষ্টা

করেন। নিজেদের ভিত্তি ও গঠন আমাদের নিজেদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যেও অজ্ঞাত বলিয়া আমরা মনন-শাস্ত্রের পথে ক্রমশঃ মূলহীন হইয়া পড়িতেছি। বিদ্যালয়ে যেটুকু য়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্র পড়ান হয়, সেটুকুর সঙ্গে আমাদের কোনও নাড়ীর যোগ নাই, কাজেই তাহা আমাদিগকে নূতনের পথে প্রোৎসাহিত করিতে পারে না। আমাদের নিজেদের দর্শনের ধারা আমাদের এখনও অতি অল্পই জানা আছে এবং তাহার নিষেক-ভূমি হইতেও আমরা এখন অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছি। কাজেই আমাদের প্রাচীনকে জানা বা নিত্য-নিত্য নূতন-নূতন মৌলিক তত্ত্বালাপের উন্মেষ সাধন করা, ইহার কোনওটিই আমাদের দ্বারা হইতেছে না। অথচ য়ুরোপে জড়বিজ্ঞানের আলোচনার সঙ্গে-সঙ্গে মননশাস্ত্র ও তত্ত্ববিদ্যার আলোচনা ঠিক্ সমান তাল রাখিয়া চলিয়াছে। নিত্য-নিত্য নূতন-নূতন মনীষীরা নূতন-নূতন প্রণালীতে তত্ত্বালোচনার নবোন্মেষ সাধন করিতেছেন, কত-না নূতন-নূতন দার্শনিক সভার সে-দেশে প্রতিষ্ঠা হইতেছে এবং প্রাচীন সভাগুলি জরাকে জয় করিয়া বর্ষে-বর্ষে ওজোভূয়িষ্ঠ ও বলসম্পন্ন হইয়া উঠিতেছে। এমন প্রকাণ্ড যুদ্ধের এত বড় ভাঙ্গন সত্ত্বেও তাহাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনের প্রাচীন সন্ততি-গুলি অবিচ্ছিন্ন-ধারায় পুনরাবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে!

য়ুরোপে নিখিল পৃথিবীর একটি আন্তর্জাতীয় তত্ত্ববিদ্যা-পরিষৎ (International Congress of Philosophy) আছে। যুদ্ধের অনেক পূর্ব্বেই ইহার আরম্ভ হয় ও ইহার অনেকগুলি অধিবেশনও হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু এই পরিষদে কোনও দিনই ভারতবর্ষ নিমন্ত্রণ পায় নাই। যুদ্ধের সময় ইহার আর কোনও অধিবেশন হয় নাই। ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে প্যারিসে জার্ম্মানি ও তাহার মিত্রবর্গকে বাদ দিয়া, ফ্রান্স্ ও তাহার মিত্রবর্গ ও উদাসীনবর্গকে লইয়া এই সভার একটি অধিবেশন হয়, সে-সভায়ও ভারতবর্ষকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। ভারত-বর্ষকে নিমন্ত্রণ করা হইবে কি না একথা তখন উঠিয়া-ছিল, তাহাতে 'সম্পাদক জেভিয়র্ লেয়ঁ নাকি বলেন যে, ভারতবর্ষে এমন কোনও তত্ত্ববিদ্যাপরিষৎ (Philosophical Society) নাই যাহার পত্রিকাদি দ্বারা তাহার আলোচনার স্বরূপ আমরা জানিতে পারি, কোনও তত্ত্ব-বিদ্যার প্রামাণিক গ্রন্থও কোনও ভারতবাসী লিখিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না, এবং আমাদের পরিচিত কোনও দার্শনিকও সেখানে নাই, সেইজন্য ভারতবর্ষকে আমরা নিমন্ত্রণ করিতে পারি না। কথাটা শ্রুতিকটু হইলেও অসত্য বলা যায় না।

গত ৪ঠা মে তারিখে নেপল্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপনের ৭০০ বৎসর পূর্ণ হইল। সেই উৎসব-উপলক্ষে সেখানে যুদ্ধের পর এই প্রথম নিখিল পৃথিবীর আন্তর্জাতীয় তত্ত্ববিদ্যাপরিষদের এক অধিবেশন হয়। পৃথিবীর যেখানে-যেখানে দর্শনশাস্ত্রের চর্চ্চা চলিতেছে, প্রায় তাহার সকল স্থান হইতেই সেই-সেই দেশের প্রতিনিধি-স্থানীয় দার্শনিকেরা এই পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করেন। ভারতবর্ষ হইতে কেবলমাত্র অধ্যাপক ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। নেপল্‌স্ কংগ্রেস্ শুধু তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর্ লাট লিটন্‌কেও সুরেন্দ্র-বাবুকে পাঠাইবার যাহাতে ব্যবস্থা হয়, সেই মর্ম্মে এক অনুরোধ-পত্র লিখেন। ফলে যাতায়াতের ব্যয় দিয়া গবর্ণ্‌মেণ্ট তাঁহাকে নেপল্‌স্ পাঠান। এরূপ কার্য্যেও নানাদিক্ হইতে নানাপ্রকার আপত্তি ও প্রতিবন্ধকতা যে না ঘটিয়াছিল, এমন নহে।

সুরেন্দ্র-বাবু এই সভায় যে বক্তৃতা দেন, তাহা আমরা আগষ্ট্ মাসের মডার্ণ্ রিভিয়ুতে প্রকাশ করিয়াছি। সুরেন্দ্র-বাবুর ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসখানি য়ুরোপের দার্শনিক-সমাজে অসাধারণ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, এবং য়ুরোপীয় একাধিক ভাষায় তাহার তর্জ্জমা আরম্ভ হইয়াছে, এবং উহা পাঠ করিয়া বহু য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ হইয়াছেন। ইহাই তাঁহার এই সম্মানলাভের প্রধান কারণ। ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রের ইতিহাস ছাড়া, ভারতীয় দর্শনের উপর তাঁহার আরও দুইখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া, বর্ত্তমান য়ুরোপীয় দর্শনের উপর এক সুবিস্তৃত মৌলিক গ্রন্থ লিখিয়া তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার উপাধি লাভ করেন। তিনি ঐ বিদ্বৎপরিষদে এই কথা

প্রতিপাদন করেন, যে, বর্ত্তমানকালে য়ুরোপের দার্শনিক-সমাজে যে-সমস্ত তত্ত্ব য়ুরোপের নবাবিষ্কার বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতেছে, তাহার অনেকগুলিই, ভারতবর্ষে বহু পূর্ব্বেই আবিষ্কৃত হইয়াছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বর্ত্তমান য়ুরোপের এক অতি প্রধান এবং ইটালীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক বেনেদেত্তো ক্রোচের বহু গ্রন্থের বিস্তৃত মতের তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম সমালোচনা করিয়া তিনি দেখান, যে, ক্রোচের মতের মোটামুটি প্রধান কথাগুলি সমস্তই ধর্ম্মোত্তর ও পণ্ডিত অশোক কর্ত্তৃক বিবৃত বৌদ্ধ মতে পাওয়া যায়; যেখানে উভয়ের মধ্যে ভেদ দেখা যায়, সেখানে ক্রোচের মতই ভ্রান্ত। ক্রোচে নিজে এই সভায় এই বক্তৃতার সময় সভাপতি ছিলেন, এবং সুরেন্দ্র-বাবুর বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তৎকৃত সমালোচনাগুলি স্বীকার করিয়া লন এবং এই উপলক্ষে সুরেন্দ্র-বাবু দার্শনিক-সমাজে অত্যন্ত সমাদৃত হন। বহুসংখ্যক ইটালীয় ও জার্ম্মান কাগজে তাঁহার সম্বন্ধে প্রচুর প্রশংসাবাদ ও তাঁহার অভ্যর্থনা ও সমাদর প্রকাশিত হইয়াছে; তাহার কয়েকটি আমাদের হাতেও আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বার্লিনের সংস্কৃতাধ্যাপক ডাক্তার গ্লাজেনপ্ তাঁহার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ আমরা জুলাইয়ের মডার্ণ্ রিভিয়ুতে প্রকাশ করিয়াছি। জার্ম্মানির সুপ্রসিদ্ধ "আবেন্দব্লাট্" পত্রিকায় ঐ দার্শনিক কংগ্রেসের সর্ব্বপ্রধান নেতা বলিয়া ৬জনের পেন্‌সিল্-চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে সুরেন্দ্র-বাবুর প্রতিকৃতিও বাহির হইয়াছে, এবং তত্রত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট হইতে তিনি বহু গ্রন্থ উপহার পাইয়াছেন, এবং অভ্যর্থনা নিমন্ত্রণ প্রভৃতি বহুবিধভাবে তিনি প্রচুর সমাদর পাইয়া আসিয়াছেন। নেপল্‌স্ হইতে তাঁহাকে পাডুয়ায় নিমন্ত্রণ করা হয় এবং তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা তাঁহাকে প্রচুর সমাদর ও অভ্যর্থনা করেন। সম্প্রতি রুশদেশের বিজ্ঞান-পরিষৎ (একাডেমি অভ্ সায়েন্স্) তাঁহাকে তথায় বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছেন এবং তৎসহিত
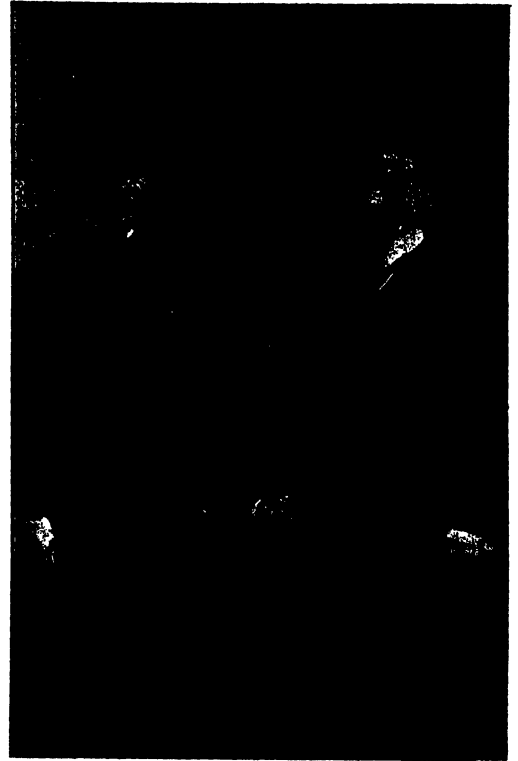
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত ও তাঁহার জনৈক বন্ধু

তাঁহাকে একখানি অতি দুষ্প্রাপ্য ও বহুমূল্য সংস্কৃত-জার্ম্মান্-অভিধান উপহার পাঠাইয়াছেন।

সুরেন্দ্র-বাবুর এবারের য়ুরোপ-গমনে নেপল্‌সের জগতের বিদ্বৎসমাজে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং অনেকেই ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য উৎসুক হইয়াছেন। ভারতবর্ষের কৃতিত্বের কথা ভারতীয়েরাই যথার্থভাবে প্রচার করিবার অধিকারী। পৃথিবীর দার্শনিক-সমাজে ভারতবর্ষের দর্শনশাস্ত্রের প্রতি এই যে গৌরব ও শ্রদ্ধা সুরেন্দ্র বাবু তাঁহার গ্রন্থের দ্বারা ও তাঁহার বিচারের দ্বারা স্থাপন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা সকলেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ এবং তিনি যে সমাদর ও উচ্চ সম্মান সেখানে পাইয়াছেন, তাহাতে আমরা সকলেই সম্মানিত বোধ করিতেছি।

বাংলার কথা

স্বরাজ্য-বৈঠক—

স্বরাজ্য-সম্মিলনীর উদ্বোধন-উপলক্ষে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বক্তৃতা করিয়াছেন। একদিকে কংগ্রেস্ ও অসহযোগ সঙ্ঘ,—অন্যদিকে মডারেট্ বা লিবারেল্ দলের সঙ্গে কোথায় যে স্বরাজ্যদলের সীমারেখা এবং রাজনীতিক্ষেত্রে কোন্ স্বতন্ত্র পন্থা তাঁহারা অবলম্বন করিতে চান, দাশ-মহাশয়ের বক্তৃতা পড়িয়াও আমরা তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। * * * *

দাশ-মহাশয় বলিয়াছেন যে, স্বরাজ্য-দলের উদ্দেশ্য স্বরাজলাভ, আর "স্বরাজ" অর্থ কোন বিশেষ-রকমের শাসন-তন্ত্র নহে। দেশ-বাসীর পক্ষে নিজেদের শাসনপ্রণালী নিজেরাই স্থির করিয়া লইবার যে-অধিকার—তাহাই 'স্বরাজ"। এই অধিকার আয়ত্ত করিতে পারিলে, দেশের শাসনপ্রণালী আমরা অনায়াসেই নির্ণয় করিয়া লইতে পারিব; তাহার জন্য এখন হইতে মাথা ঘামাইবার বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই। এক-কথায় আমরা চাই,—সম্পূর্ণরূপ আত্মকর্তৃত্ব এবং উহাই স্বরাজের প্রধান ভিত্তি। দাশ-মহাশয়ের এই কথার সঙ্গে আমাদের কোন মতভেদ নাই। মহাত্মা গান্ধীও পুনঃপুনঃ এইরূপ কথাই বলিয়াছেন এবং কংগ্রেসেরও মূলনীতি ইহাই,—আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা চাই বা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন চাই।

কিন্তু এই স্বরাজলাভের জন্য, স্বরাজ্যদল কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে চান?

শ্রীযুত দাশ বলিয়াছেন :—

"তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী কি? ইহা কি নন্-কো-অপারেশন্ বা রেস্পন্সিভ্ কো-অপারেশন্ অথবা রেস্পন্সিভ্ নন্ কো অপারেশন্? নামের জন্য তিনি বিন্দুমাত্রও ব্যস্ত নহেন। তিনি অতি পরিষ্কাররূপে তাঁহাদের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিবেন। তাঁহাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যে শাসনপ্রণালী বাধাস্বরূপ দণ্ডায়মান হইবে, তাহাকেই ধ্বংস করিতে তিনি কিছুমাত্র দ্বিধা করিবেন না। কেননা, তাহাকে ধ্বংস না করিলে, অভীষ্ট নূতন শাসনপ্রণালী তাঁহারা গড়িয়া তুলিতে পারিবেন না।...বর্ত্তমান আমলাতন্ত্র শাসনপ্রণালীকে ধ্বংস করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য এবং সেইজন্য সর্ব্বত্র তাহার সঙ্গে অসহযোগ করিতে হইবে।"

তাহার পরেই দাশ-মহাশয় বলিয়াছেন যে, স্বরাজ্যদলের সমস্ত কার্য্য-কলাপের মধ্যে দুইটি প্রধান নীতি আছে। প্রথম, সর্ব্বত্র বিরোধভাব (Resistance) জাগ্রত করা ও বর্ত্তমান শাসনপ্রণালীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এবং দ্বিতীয়, বর্ত্তমান শাসন-প্রণালীর সহিত ক্রমশঃ সহযোগ বর্জ্জন করা। দাশ-মহাশয় বলিতে চান যে, তাঁহারা এপর্য্যন্ত যে-সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন, তাহা আপাতবিরোধী বলিয়া মনে হইলেও, এই দুই প্রধান নীতি তাঁহাদের মধ্যে বর্ত্তমান আছে। এই উদ্দেশ্যেই তাঁহারা কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান শাসনপ্রণালীকে অচল করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

এই পরস্পরবিরোধী বাক্যগুলির দ্বারা দাশ-মহাশয় ও তাঁহার দলের প্রকৃত সঙ্কল্প কি তাহা বুঝা দুষ্কর।

(১) বর্ত্তমান শাসন-প্রণালীর সঙ্গে ক্রমশঃ সহযোগ বর্জ্জন করা; (২) বর্ত্তমান শাসন প্রণালীকে ধ্বংস করা; (৩) সর্ব্বত্র বিরোধভাব জাগ্রত করা; এসমস্ত কি একই বস্তু অথবা এগুলির পরস্পরের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে? স্বরাজ্যদল ইহার সবগুলি কি একসঙ্গে অবলম্বন করিতে চান—অথবা একটির পর একটি অনুসরণ করিতে চান? তার পর, কাউন্সিলের ভিতরে থাকিয়া গবর্ণমেণ্টের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিয়া "সংগ্রাম" করাই কি উহার সহিত সহযোগিতা বর্জ্জনের প্রকৃষ্ট উপায়? ইহাতে একটা "বিরোধভাব" জাগ্রত করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু অসহযোগের লেশমাত্রও উহার মধ্যে নাই।

স্বরাজ্যদলের কাউন্সিলের কার্য্য-প্রণালী 'কনষ্টিটিউশনাল্' আন্দোলন কি না, এপ্রশ্নে দাশ-মহাশয় একটু বিব্রত হইয়াছেন। বিব্রত হইবার কারণ, "কনষ্টিটিউশনাল্ এজিটেশান্" জিনিষটি পুরাতন বস্তু মডারেট্-দলের ঐ জিনিষটা একচেটিয়া ছিল। স্বরাজ্যদল কি সেই বহুনিন্দিত মডারেট্দের প্রণালী বা "ভিক্ষামার্গ" অবলম্বন করিতে চান? দাশ-মহাশয় তাহা স্বীকার করিতে চান নাই। কিন্তু একথা কি সত্য নহে যে, মডারেট্দের মত ভারতে ও বিলাতে আন্দোলন চালাইয়া, গোল-টেবিলের বৈঠক ডাকিয়া, শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের নিকট কিছু অধিকার্ লাভ করা স্বরাজ্যদলেরও অন্যতম উদ্দেশ্য? পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, 'যাহা পাওয়া যাইবে, তাহা ছাড়া হইবে না, আরও অধিক পাইবার জন্য আন্দোলন করিতে হইবে' ইহাই স্বরাজ্য-দলের নীতি। মডারেট্রাও ইহাই করিতে চান। মডারেট্রাও কাউন্সিলে গবর্ণমেণ্টের সাধু প্রস্তাব সমর্থন করেন, আর অহিতকর প্রস্তাবে বাধা দেন। স্বরাজ্যদল তাহার বেশী কিছু করিতে চান কি? ভাল মন্দ সব বিষয়েই কাউন্সিলে বাধা দিবেন, এমন কথা পূর্ব্বে বলিলেও এখন তাঁহারা সাহস করিয়া বলিতেছেন না।

দাশ-মহাশয় বলিয়াছেন যে, কেবল কাউন্সিলের ভিতরে আন্দোলন তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে, কাউন্সিলের বাহিরে গঠন-কার্য্য করাও তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। এই 'গঠন-কার্য্য' কি, তাহা দাশ-মহাশয় খুলিয়া বলেন নাই। ইহা কি অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন, হিন্দু মুসলমান-প্রীতি-স্থাপন, খদ্দর প্রচার ও জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন,—না কাউন্সিলের কার্য্যের আনুষঙ্গিকরূপে মফঃস্বলের কংগ্রেস কমিটিগুলিকে আত্মসাৎ-করা? দাশ-মহাশয়ের দলের গঠনকার্য্য শেষোক্তটি হইলেও হইতে পারে, কিন্তু প্রথমোক্ত বিষয়গুলি নিশ্চয়ই নহে; কেননা, ঐগুলির প্রতি তাঁহাদের মনোযোগ দিবার অবসর কম।

উপসংহারে দাশ-মহাশয় "আদর্শের বিশুদ্ধতা" সম্বন্ধে একটি অভিনব আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে স্বাধীনতার সংগ্রামে কোন-একটা আদর্শ চিরকাল আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকা কোন কাজের কথা নহে। পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার সঙ্গে আমাদের আদর্শেরও একটু-আধটু

পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হইবে। জীবনের ধর্ম্মই ইহা। দুঃখের সঙ্গে বলিতে হইতেছে, দাশ মহাশয়ের এই কথা আমরা মানিয়া লইতে পারিতেছি না। এই মত হুবহু অনুসরণ করিলে, opportunism বা সুবিধাবাদের সঙ্গে আমাদের কার্য্যপ্রণালীর বিশেষ পার্থক্য থাকিবে না। দাশ-মহাশয় যাহাই বলুন, জগতে কোন মহৎ কার্য্যই আদর্শকে ত্যাগ করিয়া হয় নাই। আদর্শ যতই শুষ্ক ও নীরস হোক তাহাই জীবনের উৎস, তাহার জন্যই যুগে-যুগে লোকে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে এবং যত দিন মানুষের মধ্যে মহত্বের বীজ থাকিবে, ততদিন সে তাহাই করিবে।

—আনন্দবাজার-পত্রিকা

আমাদের দেশী গবর্ণমেন্ট কথায়-কথায় অরাজকতার ভয় দেখান, law and order এর দোহাই দিয়া কত ভদ্র সন্তানকে বিনা অভিযোগে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য কারাবাসে পাঠান, কিন্তু রমণীর উপর এই দৈনন্দিন অত্যাচারে তাহারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হন বলিয়া মনে হয় না। যে-পুলিশের সুনাম বজায় রাখিতে লর্ড লিটন্ সমস্ত ভারতবাসীর কুৎসিত দুর্নাম রটাইতে ইতস্ততঃ করেন না রমণীর ধর্ম্মরক্ষা কি সে পুলিশের কর্ত্তব্য নহে? গবর্ণমেন্ট ও পুলিশ যথেষ্ট চেষ্টা করিলে এইরূপ অত্যাচার বিস্তৃতভাবে কখনই সম্ভব হয় না।

ভারতের রমণীদের ইজ্জত রক্ষা করিতে গবর্ণমেন্ট যে মোটেই ব্যস্ত নহে তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। শেষ প্রমাণ, লর্ড লিটনের কুৎসা। লর্ড লিটন্ স্পষ্ট বলিয়াছেন, ভারতের নর-নারীর ইজ্জত জ্ঞান নাই—তজ্জন্যই বোধ হয় ইজ্জত রক্ষা করিতে তাহারা মোটেই ব্যস্ত নহেন। অতঃপর যখন কোন গুণ্ডার বিরুদ্ধে কোন রমণী পাশবিক অত্যাচারের অভিযোগ আনিবে তখন গুণ্ডারা অম্লানবদনে লর্ড লিটনের কথা অনুসরণ করিয়া বলিবে, সে নির্দ্দোষী শুধু তাহার দুর্নাম রটাইবার জন্যই রমণী ঐরূপ মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করিয়াছে।

—সারথি

সাইকেলে পৃথিবী-ভ্রমণ—

কয়েকজন ভারতবাসী সাইকেলে চড়িয়া পৃথিবী ভ্রমণ করিবেন, সঙ্কল্প করিয়াছেন। আপাততঃ তাঁহারা বোম্বে হইতে যোগদাদ পর্য্যন্ত গিয়াছেন। আমরা এই সংবাদে সুখী হইয়াছি। ভারতবাসীদের মধ্যে জীবনের প্রাচুর্য্য নাই, তাই তাহারা আকাশযানে পৃথিবী-ভ্রমণ, উত্তর মেরু-বিজয়, হিমালয় লঙ্ঘন, সাহারা অতিক্রম প্রভৃতির মত 'অনাবশ্যক' অসমসাহসিক কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয় না। পাশ্চাত্যে শত শত লোক এরূপ করিতেছে। ভারতবাসীদের মধ্যে তাই ইহার প্রথম সূচনা দেখিয়া আশান্বিত হইতেছি।

—আনন্দবাজার-পত্রিকা

বিধবা-বিবাহ—

বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি বাঙ্গালা কিন্তু বিধবা বিবাহ ব্যাপারে এ প্রদেশ (পঞ্চনদ) হইতে বহু পশ্চাতে। পঞ্চনদের রাজধানী লাহোর সহর বিধবা-বিবাহ সংস্কারে খুব অগ্রসর হইতেছে। প্রকাশ গত ৭ মাসে ৭ শত বিধবার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। যে বিদ্যাসাগর এই বিধবা-বিবাহ প্রচলনে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র বঙ্গ আজ নীরব। বিদ্যাসাগরের স্মৃতিসভা সেই দিন সার্থক হইবে, যে-দিন বঙ্গবাসী তাঁহার জীবনের প্রিয়তম কার্য্য বালবিধবাগণের বিবাহ দিতে সমাজের শত বাধা-বিঘ্ন পদদলিত করিয়া অগ্রসর হইবে।

—স্বায়ত্তশাসন

পরলোকে যাদবেশ্বর—

বাঙ্গালার আর-একটি ইন্দ্রপাত হইল। গত ৮ই ভাদ্র তারিখে বারাণসী-ধামে দর্শনশাস্ত্রের অদ্বিতীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৫ বৎসর হইয়াছিল।

—হিন্দুরঞ্জিকা

আশুতোষ-স্মৃতি

স্বর্গীয় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি-রক্ষা-কল্পে যে-দিন গড়ের মাঠে ভারতীয় ও ইউরোপীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে যে ফুটবল খেলা হইয়াছিল, তাহাতে টিকিট বিক্রয়ের দরুন ৪,৫০০ টাকা উঠিয়াছে।

স্বরাজ

নারীর অধিকার—

গত ২৬শে আগষ্ট শাসন-সংস্কার তদন্ত কমিটির সমক্ষে ভারতীয় মহিলা-সমাজের পক্ষ হইতে মিসেস্ দীপনারায়ণ সিংহ সাক্ষ্য প্রদান করেন। শাসন-সংস্কার কমিটির কাছে নারী-সমাজের দাবী এই যে, ভারতের যে-সব প্রদেশে মহিলাদিগকে ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচনে ভোটের অধিকার প্রদান করা হইয়াছে, সেইসব স্থানের মহিলাদিগকে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইবার অধিকার দান করা হউক। তাঁহারা জানাইয়াছেন, আমরা ভোট দিতে পারিব যেখানে, সেখানে আমরা সদস্যই বা হইতে পারিব না কেন? ইহা নিতান্তই বিসদৃশ ব্যাপার। ঐ অসুবিধা দূর করা হউক। প্রেসিডেন্ট স্যর আলেকজেণ্ডার মুডিম্যান তাঁহাকে জানাইয়াছেন, এই অসুবিধা দূর করিতে সংস্কার-আইনের সংশোধন আবশ্যক হইবে না। কেবল কয়েকটি রুলের একটু বদল করিলেই চলিতে পারে। তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানের মহিলাদের সমিতি-সমূহের মত তাঁহাদিগকে জানাইতে বলিয়াছেন। মহিলা-সমাজ যে অধিকারের দাবি করিয়াছেন, তাহা যে সম্পূর্ণই যুক্তিযুক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। কয়েকটি মিউনিসিপ্যালিটিতে মহিলারা সদস্য হইয়াছেন এবং তাঁহারা যোগ্যতার সহিত সে-সব ক্ষেত্রে কার্য্য করিতেছেন, ব্যবস্থাপক সভাতেই বা তাঁহারা সে-যোগ্যতা প্রদর্শন করিতে পারিবেন না কেন? আইনে এমন কোন নিষেধমূলক বিধি থাকা উচিত নয় যে, নারীরা ভোট দিতে পারিবেন না বা ভোট দিতে পারিলেও তাঁহারা সদস্য হইতে পারিবেন না। আমরা একথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি যে, যে-সব প্রদেশের মহিলারা ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচনে ভোটের অধিকার লাভ করেন নাই, সে-সব প্রদেশে এ বাধা তুলিয়া দেওয়া আবশ্যক, সেইরূপ যে-সব দেশে মহিলারা ভোটের অধিকার লাভ করিয়াছেন যেমন মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, সে-সব স্থানেও তাঁহাদিগকে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইবার অধিকার দেওয়া উচিত। মহিলা-সমাজ আজ জাগিয়া উঠুন এবং তাঁহাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করুন। জাতির অর্দ্ধাংশ পিছনে পড়িয়া থাকিলে জাতি কখনও জাগিয়া উঠিতে পারে না—মহিলা-সমাজের অধিকার-প্রতিষ্ঠার এইসব প্রচেষ্টায় পুরুষদেরও ঐদিক্ হইতে বড় কর্ত্তব্য রহিয়াছে, তাঁহারাও এবিষয়ে ঔদাস্য পরিহার করুন।

—স্বরাজ

শ্রীযুক্ত দলবাহাদুর গিরি—

দেশপ্রেমিক অক্লান্ত-কর্ম্মী দলবাহাদুর গিরি আজ রোগশয্যায় পড়িয়া রহিয়াছেন, অথচ আজ পর্য্যন্ত দেশবাসী তাঁহার দুঃস্থ পরিবারের ও এই ত্যাগী দেশনেতার সাহায্যের জন্য একটুও চঞ্চল হয় নাই। আজ বিনা চিকিৎসায় মহাপ্রাণ কর্ম্মী কষ্ট পাইতেছেন,—দেশবাসী কি তাহাতে কষ্ট

অনুভব করিতেছেন না? দলবাহাদুর গিরি এখন হাঁসপাতাল হইতে নিজ গৃহে অবস্থান করিতেছেন। যাঁহার শক্তিতে যতটুকু কুলাইবে,—তিনি ততটুকুই সাহায্য করুন। যাহা পারেন ৩৮।২ নং এলগিন্ রোড্, কলিকাতা, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর নিকট প্রেরণ করিবেন।

—সারথি

নারী-অত্যাচারী গুণ্ডা—

বড়ই লজ্জার কথা যে অনেক গণ্যমান্য মুসলমান নারী-অত্যাচারী গুণ্ডাদের সমর্থন করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, স্বেচ্ছায় হিন্দু রমণীরা বাহির হইয়া আসিয়া মুসলমানকে নিকা করিতে চায়ই হাতে মুসলমানের দোষ কি? ভগবান্ জানেন, একথা কতদূর সত্য। পূর্ব্ববঙ্গে কত মুসলমান যে বলাৎকারের মোকদ্দমায় জেলে যাইতেছে নেতাগণ তাহার কি হিসাব রাখিয়াছেন? অনেক সময় রমণীদের উপর যে-সকল ভীষণ অত্যাচারের সংবাদ পাওয়া যায় তাহা কখনই রমণীদের সম্মতিতে হইতে পারে না। আর যদিই কোন রমণী দুর্ব্বলতার বশে কুলের বাহির হইতে চায়—তবে, একার্য্যে যাহারা তাহার সহায় হয় তাহারা কি সমাজের নিন্দার পাত্র নহে? একশত অত্যাচারের মধ্যে একটা ব্যাপারে এমন থাকিতে পারে যে, হয়ত স্ত্রীলোকটির মত ছিল। এইজন্য সমগ্র মুসলমান-সমাজ, মুসলমান নেতাগণ চুপ করিয়া থাকিবেন—আর গুণ্ডারা নির্ব্বিবাদে অত্যাচার করিবে!

—সারথি

দি ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক—

ভারত-গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব-সচিব স্যার্ বেসিল্ ব্ল্যাকেট্ ভারতীয় ব্যবসায়ী-সঙ্ঘের সভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, ইম্পিরিয়াল্ ব্যাঙ্কের কতকগুলি শাখা স্থাপনের প্রধান বিঘ্ন, উপযুক্ত কর্ম্মচারীর অভাব। ইতিপূর্ব্বে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের একশত শাখা খুলিবার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল, তাহা এপর্য্যন্ত পূর্ণ করা হয় নাই। ব্ল্যাকেট্ কৈফিয়ৎ দিতেছেন, অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে স্যার্ ব্ল্যাকেট্ একথা উল্লেখ করেন নাই যে, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে ভারতীয়গণকে শিক্ষানবিসী করিবার জন্য কি সুযোগ প্রদান করা হইয়াছে? ব্যাঙ্কের কার্য্যে অভিজ্ঞ ইংরাজ কর্ম্মচারী পাওয়া যাইতেছে না,—ইহাই কি ব্যাঙ্কের শাখা খুলিবার অন্তরায়? ব্যাঙ্কের বড় কর্ত্তারা যদি স্বজাতি প্রতিপালন করিবার মহৎ উদ্দেশ্য হৃদয়ে পোষণ না করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অভিজ্ঞ ভারতীয় কর্ম্মচারীর দ্বারা অভাব পূর্ণ করিতে উদাসীন থাকিতেন না। ভারতীয়গণ পরিচালিত অনেক ব্যাঙ্ক আজ ব্যবসাক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছে। খোদ ইম্পিরিয়াল্ ব্যাঙ্কে চূড়ার উপর ময়ূরপাখার মত মোটা বেতনভোগী সাহেব লোক থাকিলেও ভারতীয় কর্ম্মচারীই প্রকৃতপক্ষে প্রশংসার সহিত একাল পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কের কার্য্য পরিচালন করিতেছেন। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ভারতীয় কর্ম্মচারীদের কার্য্যদক্ষতা ও সততা প্রশংসনীয়। শ্বেতাঙ্গদের যে কি পরমাশ্চর্য্য যোগ্যতা আছে, তাহা আমরা জানি না; তবে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে পর-পর যে-কয়েকটি জুয়াচুরী ধরা পড়িল, সেদিন কলিকাতাতেও যে একটি এইরূপ প্রতারণার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাই ব্যাঙ্কের অপর্য্যাপ্ত অর্থে পুষ্ট শ্বেতাঙ্গ কর্ত্তাদের কার্য্যদক্ষতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। স্যার ব্ল্যাকেট্ অবশ্য ভারতীয় কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হইবে কি না, অথবা ভারতীয় শিক্ষানবীশদিগকে ব্যাঙ্কের কার্য্যে গ্রহণ করা হইবে কি না, সেসম্বন্ধে কোন কথা কহেন নাই। জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা যে উত্তর দিবেন, তাহা আমরা জানি। গোষ্ঠীবর্গসহ প্রতিপালিত হইবার এমন সুযোগ যে সহজে ব্ল্যাকেটের দল ছাড়িবেন না, তাহাও আমরা জানি।

—আনন্দবাজার-পত্রিকা

লর্ড্ লিটন ও মহাত্মাজী—

মহাত্মা গান্ধী লিখিয়াছেন, লর্ড্ লিটন কোন্ সাহসে এরূপ অপমানকর বাক্য বলিতে সাহস করিয়াছেন? যদি বাঙ্গলাদেশের—তথা ভারতবর্ষের জনমতের কোন কার্য্যকরী শক্তি থাকিত তবে লর্ড্ লীটন এরূপ কথা বলিতে সাহস পাইতেন না। কিন্তু দেশে এখন এমন কোন জনমত নাই যাহা জোরের সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। কিন্তু যতবড় শক্তিশালী ব্যক্তিই হো'ক্, কেহ যেন না মনে করে যে, তাহারা চিরদিনই ভারতবাসীদের আত্মমর্য্যাদাকে এইরূপে আঘাত করিতে পারিবে। হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ এবং পরিবর্ত্তনকামী ও পরিবর্ত্তনবিরোধীদের মতভেদ জাতীয় আন্দোলনের ক্ষণস্থায়ী কলঙ্ক, কিন্তু উচ্চপদস্থ ইংরেজদের এইসব ঘোর অপমান-বাক্য জাতির হৃদয়ে চিরকালের জন্য গভীরভাবে দাগ কাটিয়া দেয়।

—আনন্দবাজার-পত্রিকা

বিশ্বভারতী-সংবাদ—

সমাজশাস্ত্র ও অর্থনীতির বিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীরজনীকান্ত দাস মহাশয় বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনা করিতেছেন। তিনি এক্ষণে আশ্রমের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে ভ্রমণ করিয়া স্বচক্ষে গ্রামবাসিদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। শীঘ্রই তিনি এবিষয়ে ধারাবাহিক-ভাবে লিখিতে সুরু করিবেন।

প্রায় বিশ বৎসরের কঠোর পরিশ্রমের ফলে অধ্যাপক শ্রীযুত হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাংলা ভাষার অভিধান সম্পন্ন হইয়াছে। প্রকাশিত হইলে ইহা একখানি অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ বলিয়া সমাদর লাভ করিবে সন্দেহ নাই।

—শান্তিনিকেতন-পত্রিকা

বাংলায় জল প্লাবন—

নোয়াখালি

প্রথমে অনাবৃষ্টিতে, পরে অতিবৃষ্টিতে আশু ধান্য প্রায় সকলই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অতিবৃষ্টিতে আমন ধান্যের যথেষ্ট ক্ষতি হইবে বলিয়া মনে হয়। সন্দীপে চাউল ৮৷৷০। ৯৲ টাকা। গ্রামে ৮৲ টাকার কম চাউল পাওয়া যায় না। সহরে ৭৸০ আনা ৮৲ টাকা দুগ্ধ।০ আনা।৴০ আনা সের বিক্রী হয়। মৎস্য দুষ্প্রাপ্য বলিলেই হয়। নদীর নোনা জল প্রায় সকল স্থানে প্রবেশ করিয়া পানীয় জলেরও কষ্টের একশেষ করিয়াছে। কালাজ্বর ও ম্যালেরিয়া ক্ষিপ্রগতিতে তাহাদের নিজ-নিজ কর্ম্মে লাগিয়াছে।

—দেশের বাণী

বরিশাল

এই জিলার উত্তরপূর্ব্বাঞ্চল জলমগ্ন হইয়াছে। ফলে আশুধান্য সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়াছে। আমনধান্যের অবস্থাও ভাল নহে—দুর্ভিক্ষের করালছায়া বাখরগঞ্জের উপর আপতিত হইতেছে। অথচ এসময় প্রত্যহ এত অধিক পরিমাণে চাউল ষ্টিমারযোগে রপ্তানি হইতেছে—কেহ ইহার প্রতিবাদের পন্থা খুঁজিয়া পায় না ও আবশ্যকতা উপলব্ধি করে না, তাই আজ ২।৩ সপ্তাহের মধ্যে চাউলের দর ৬৲ ৬৷৷০ টাকা হইতে ১০৲, ১০৷৷০ টাকা দর হইয়াছে।

গত দুর্ভিক্ষের তহবিলে কতক টাকা ছিল, তাহা এখন কোথায় কি-ভাবে আছে, তাহার সংবাদ লওয়াও আবশ্যক।

—বরিশাল-হিতৈষী

চাঁদপুর

চাঁদপুরের সংবাদে প্রকাশ, বর্ষার ভীষণ প্লাবন দেখা দিয়াছে। ৭৫-খানা গৃহ জলমগ্ন। চাউলের সাধারণ দর ৮৲ টাকা। পাটের দর ১০।১২ টাকা।

—ত্রিপুরা-হিতৈষী

রাখাল বালকের অদ্ভুত বীরত্ব—

বিগত জুন মাসের শেষ সপ্তাহে চট্টগ্রাম অঞ্চলে তুমুল ঝড়বৃষ্টিতে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে লাইনের কুমীরা ও ভাটীয়ারী ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী একটি পুলের কিয়দংশ বন্যার স্রোতে ভাঙ্গিয়া পড়ে। নিকটবর্ত্তী গ্রাম-সমূহের কতিপয় বালক নিকটে গরু চরাইতেছিল। হাসনাবাদের একটি বালক পুলের ঐ ভগ্ন অংশ দেখিতে পাইয়া সঙ্গীয় বালকগণের নিকট প্রস্তাব করে, "গাড়ী আসিবার সময় হইয়াছে, ভাঙ্গা পুলের উপর দিয়া গাড়ী গেলে নিশ্চয়ই পড়িয়া যাইবে। চল আমরা দলবদ্ধ হইয়া রেলরাস্তার উপর দাঁড়াইয়া থাকি, তাহা হইলে চালক গাড়ী থামাইবে।" কেহই তাহার এই প্রস্তাবে সম্মত হইল না দেখিয়া সে একাকী গাড়ীর শব্দ শুনিয়া রাস্তার উপরে দাঁড়াইল এবং হাত নাড়িয়া গাড়ী থামাইতে ইঙ্গিত করিতে লাগিল। সঙ্গীয় বালকগণ তাহাকে প্রাণের ভয় দেখাইয়া সরিয়া যাইতে বলিল। সে বলিল, "আমার একটি প্রাণ দিয়াও যদি অনেকগুলি প্রাণ বাঁচাইতে পারি, সে-মরণে আমার কোন কষ্ট হইবে না।" দেখিতে দেখিতে গাড়ী নিকটে আসিয়া পঁহুছিল, সে এক পাও নড়িল না, সাহসের সহিত হাত নাড়িয়া নিষেধ করিতে লাগিল। ক্রমে গাড়ীর বেগ কমিতে-কমিতে বালক হইতে ৪।৫ হাত দূরে গাড়ী থামিলে চালক ও যাত্রিগণ ঔৎসুক্যের সহিত গাড়ী হইতে নামিয়া বালককে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায়, সে ইঙ্গিতে পুলের নীচে ভগ্নস্থান দেখাইয়া দিল। তৎক্ষণাৎ সকলে এই আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া বালককে টাকা, আধুলি, সিকি, দুয়ানী পুরস্কার দিতে লাগিলেন, প্রায় অনেক টাকা আদায় হইল। ট্রাফিক্ ম্যানেজার স্বয়ং আসিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন, পাহাড়তলী হইতে স্বতন্ত্র গাড়ী-যোগে ভাটিয়ারী ষ্টেশন হইতে যাত্রী লওয়া হইল। বালকটিকেও সহরে আনিয়া রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ বহু টাকা পুরস্কার দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আমরা এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ পল্লীবালকের দীর্ঘ জীবন কামনা করিতেছি। আশা করি, দেশবাসী বালকটির সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। —আনন্দবাজার-পত্রিকা

কলিকাতা পাস্তুর ইন্‌ষ্টিটিউট্

কলিকাতা পাস্তুর ইন্‌ষ্টিটিউট্ স্থাপিত হওয়াতে জনসাধারণের কতদূর সুবিধা ও উপকার হইতেছে, তাহা এখনও ঠিক জানা যায় নাই। সরকারী ইস্তাহারে দেখা যাইতেছে যে, ১৯২২ সালে শিলং পাস্তুর ইনষ্টিটিউটে বাঙ্গালা হইতে ৯৮০ জন লোক চিকিৎসিত হইয়াছিল; ১৯২৩ সালে ১৩৬১ জন ঐখানে বাঙ্গালা হইতে চিকিৎসিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে কলিকাতার ইনষ্টিটিউটে এক জুলাই মাসেই ২১৩ জন লোক চিকিৎসিত হইয়াছে। ইহাতে আশা করা যায়, বাঙ্গালা দেশের লোক কলিকাতার ইনষ্টিটিউটের দ্বারা ক্রমেই অধিক-পরিমাণে উপকৃত হইবে।

—আনন্দবাজার-পত্রিকা

খদ্দরের মর্য্যাদা—

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ইতিমধ্যে একটি সভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, খদ্দর একতা ও প্রেমের চিহ্ন—যাঁহারা নিজেদের গরীব ভাইদিগকে সহায়তা করিতে চান, তাঁহারাই উহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিবেন। যতদিন পর্য্যন্ত দেশে গরীব স্ত্রী পুরুষ ও বালক বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন চরকার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এই কারণে হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর খদ্দর পরিধান করেন এবং কেনীয়ার প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় কর্ত্তৃক কর্ত্তিত সূতার ভারতীয় তাঁতে বুনা খদ্দরের নমুনা চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। —আনন্দবাজার-পত্রিকা

জেলখানায় কয়েদী—

১৯২১ সালের সেন্সাস্ রিপোর্টে দৃষ্ট হয় যে, ঐ সময়ে বাংলার নানা জাতিগুলির মধ্যে কত জন জেলখানার কয়েদী ছিল এবং বাংলাদেশে তাহাদের জন-সংখ্যা কত তাহা নিম্নের তালিকায় দেওয়া হইল।—

	জনসংখ্যা	কয়েদী
ব্রাহ্মণ	১৩১৪৪৩০	৪২৫
কায়স্থ	১২৯৫৯০৩	৫৪১
বৈদ্য	১০২৮৭০	৩৫
গন্ধবণিক্	১৩৯৯৮১	৭৬
সুবর্ণবণিক্	১১৬৩২৫	৫২
তিলী	৩৯৫৩৫৩	৫১
বাউরী	৩০৩০১৩	২৫
সাঁওতাল	৭১০৭৩	৬২
বাগ দি	৮৮৬৮২১	২৩৬
সদ্গোপ	৫৩৩২২০	৭০
তাম্বুলি	৪৬০৪৫	৭

—তাম্বুলি পত্রিকা

নিকেলের আট-আনী—

সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ যে, নিকেলের আটআনী ১৯২৪ সালের ১লা অক্টোবর হইতে অচল হইবে। ১৯২৫ সনের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ট্রেজারীতে সেগুলি লওয়া হইবে। ১৯২৫ সনের ১লা অক্টোবর হইতে ট্রেজারীতে সেগুলি লওয়া হইবে না কেবল কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, রেঙ্গুন, লাহোর, কানপুর ও করাচীর কারেন্সি আফিসে সেগুলি গৃহীত হইবে।

যাঁহাদের নিকট নিকেলের আট আনী আছে তাহারা যেন অবিলম্বে অন্ততঃ ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে তাহা ট্রেজারীতে জমা দিবেন।

নিকেলের সিকি, দু-আনী ও এক আনীর সম্বন্ধে নিয়মের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। সেগুলি যেমন চলিতেছে তেম্‌নি চলিবে।

—কাশীপুর-নিবাসী

বিশ্বভারতী গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগ—

বিশ্বভারতীর বিদ্যামঠ হইতে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির মুদ্রণের জন্য সংস্করণ করা হইতেছে। * তারকা-চিহ্নিত পুস্তকগুলির পাণ্ডুলিপি শেষ হইয়া গিয়াছে।

শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়

১। গৌড়পাদের কারিকা * বিস্তৃত সমালোচনা ও বিশেষ ব্যাখ্যা সহ।

২। নাগানন্দ—তিব্বতী অনুবাদ সহ

৩। মিলিন্দ প্রশ্ন (দেবনাগরী অক্ষরে সম্পূর্ণ)

পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী

ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা

পণ্ডিত কপিলেশ্বর মিশ্র

ব্রহ্ম সূত্রের বিভিন্ন পাঠাদি প্রদর্শন। *

শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসু

শিল্পশাস্ত্র *

শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী

১। অভিধর্ম্মার্থ সংগ্রহ—২টি টাকাসহ মূলপালি

২। ঐ সম্পূর্ণ সংস্কৃত অনুবাদ *

৩। ঐ মূলের বঙ্গানুবাদ *

৪। সার-সংগ্রহ।

৫। পালি পাঠ-সঞ্চয়

—শান্তিনিকেতন-পত্রিকা

শ্রীনিকেতন-সংবাদ—

কৃষি বিভাগ—গত বৎসর কৃষিক্ষেত্রের জমিগুলি শৃঙ্খলাবস্থায় না থাকায় ক্ষেত্রে কোনরূপ জল-নিষ্কাশণ ও সেচনের বন্দোবস্ত ছিল না। এবৎসর প্রথমেই ছোট ছোট জমিগুলিকে ভাঙ্গিয়া বড় বড় খণ্ডে পরিণত করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে জমিগুলিকে তৈয়ারি করা হইয়াছে।

কৃষিক্ষেত্রের উত্তর দিকের ডাঙ্গার জল যাহাতে যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয় তজ্জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সমস্ত কৃষিক্ষেত্রটি এমন সুচারু-ভাবে পয়ঃপ্রণালীর দ্বারা গঠিত করা হইয়াছে যে বর্ষার অতিরিক্ত জল ক্ষেত্রের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত জমিগুলিকে সিক্ত করিয়া—যে পুরাতন বৃহৎ পুষ্করিণী এবৎসর খনন করা হইয়াছে—তাহাতে জমিবে। রবি ফসলের ক্ষেত্রগুলিতে যাহাতে একই সময়ের মধ্যে জলসেচন করা যাইতে পারে তজ্জন্য সমস্ত কৃষিক্ষেত্রটি সুশৃঙ্খলভাবে পয়ঃপ্রণালীর দ্বারা বিভক্ত করা হইয়াছে।

গরুর খাবার :—জোয়ার, জোয়ার ও বরবটী একত্রে, ভুট্টা, ভুট্টা ও বরবটী একত্রে ইম্পী (Impea একপ্রকার জোয়ার) ও Soyebean (সয়বীন্)।

এ-অঞ্চলে আদার চাষের প্রচলন না থাকায় আমাদের এই কৃষিক্ষেত্রে অনেকখানি জমিতে আদা লাগাইয়া পরীক্ষা করা হইতেছে। উপস্থিত ফসলের আশা বিশেষ আশাপ্রদ।

এ অঞ্চলে বহুল পরিমাণে আনারসের চাষের এই প্রথম চেষ্টা। আনারসের ক্ষেত্রটিকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। একটি আওতায় (ছায়ায়) অন্যটি খোলা জমিতে। আমেরিকার আধুনিক প্রণালীমতে খোলা জমির চারাগুলির গোড়ায় একপ্রকার কাগজ দিয়া বর্ষার পরে আবৃত করা হইবে।

বাহির হইতে লোক নিযুক্ত না করিয়া সুরুল গ্রামের তিনটি কৃষককে ও একটি ব্রাহ্মণ ভদ্রলোককে কৃষিক্ষেত্র-পরিচালনার প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ইহা ব্যতীত একজন ব্রাহ্মণ ছাত্র কৃষিশিক্ষা করিতেছে; তিনি শিক্ষা সমাপন করিয়া নিজের কৃষিক্ষেত্র পরিচালনা করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এ-বৎসর কৃষিক্ষেত্রের সংলগ্ন পুষ্করিণীতে ৫০০০ মাছ ছাড়া হইয়াছে।

পল্লীসেবা বিভাগ—গত মে মাসে বীরভূম জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয় বীরভূম জিলার দশটি বিভিন্ন মধ্যইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদিগকে পল্লীসেবা-বিভাগের কার্য্যপ্রণালী শিক্ষা করিবার জন্য প্রেরণ করেন। তাঁহারা এখানে একমাস থাকিয়া নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিখিয়াছেন : স্কাউটিং, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, পুনর্গঠনকার্য্য ও পল্লীগঠন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, তাঁহারা নিজ নিজ গ্রামে ফিরিয়া গিয়া পল্লীসেবার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। গত ফেব্রুয়ারী মাসে Scouting শিক্ষা দিবার যে-বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার জমিদারি হইতে দুটি ছাত্রকে এখানে প্রেরণ করেন। ছাত্র দুটি নিজ গ্রামে ফিরিয়া গিয়া শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের অধীনে সর্ব্বসমেত ৬টি সহায়কদল গঠন করিয়াছেন। গত জুলাই মাসে সুরুল হইতে শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ ও শ্রীধীরানন্দ রায় তাঁহাদের কার্য্যাবলী পরিদর্শন করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছেন।

গত জুন মাসে সুরুলের পূর্ব্বদিকে ১২ মাইল দূরে ব্যাংচাত্রা নামক গ্রামে আগুন লাগিয়া ১২৭খানি গৃহ ভস্মীভূত হয়। শ্রীনিকেতনের কর্ম্মীগণ, বোলপুর-সেবা-সমিতির সাহায্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া বোলপুর হইতে চাউল ও অর্থ সংগ্রহ করিয়া পনের দিন পর্য্যন্ত দুঃস্থ গ্রামবাসীদিগকে নানাবিষয়ে সাহায্য করিয়া তাহাদিগকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বসমেত দশটি গ্রামে পল্লীসেবা বিভাগের তরফ হইতে ম্যালেরিয়া নিবারণের কার্য্য চলিতেছে। উক্ত গ্রামগুলিতে গ্রাম-বাসীদিগকে লইয়া সমিতি গঠন করা হইয়াছে। এই সমিতির সভ্যেরা গ্রামের সহায়ক দলের সাহায্যে ম্যালেরিয়া-নিবারণে ব্রতী হইয়াছেন।

বয়ন-বিভাগ (Weaving)—বর্ত্তমান বৎসরে মোট ৪৪ জন ছাত্র সুরুলে আসিয়া বয়ন-বিভাগে নানারূপ কার্য্য শিক্ষা করিয়াছেন। ইহাদের ভিতর বীরভূম জিলার ১০টি মধ্যইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরাও ছিলেন। তাঁহারা এখান হইতে শিক্ষালাভ করিয়া নিজ নিজ বিদ্যালয়ে বয়ন ও অন্যান্য কার্য্য সুরু করিয়াছেন। গত ১লা জুন হইতে বোলপুর গুরুট্রেনিং বিদ্যালয়ের ১৫ জন ছাত্র প্রত্যহ বৈকালে ৩ ঘণ্টা করিয়া এই বিভাগে কার্য্য শিক্ষা করিতেছেন। সুরুলের চারিপার্শ্বস্থ গ্রামে যে-সকল তাঁতি আছে, তাহারা যাহাতে মহাজনের কবলে না পড়ে, অথচ যাহাতে তাহাদের সংসার স্বচ্ছন্দভাবে নির্ব্বাহ করিতে পারে তজ্জন্য ঐসকল তাঁতিদিগকে এখান হইতে সুতা সরবরাহ করা হয় ও উপযুক্ত পারি-শ্রমিক দিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে টুইল, জিন, তোয়ালে ও ধুতি, গামছা, সাড়ী ইত্যাদি তৈয়ারি করিয়া লওয়া হয়। গৃহশিল্পগুলি পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করাই এবিভাগের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই বিভাগের পরিচালনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির কাজ বর্ত্তমানে চলিতেছে :—

Cotton Weaving, Silk Weaving, Blanket Weaving, Durry Weaving, Carpet Weaving, Chemical Vegetable Dying ও Calico Printing.

চামড়া পাকানর কার্য্য (Tannery)—গত মাস হইতে সুরুলে চামড়ার কার্য্য পুনরায় আরম্ভ করা হইয়াছে। গত বৎসর Chrome-tanning বিশেষ লাভজনক না হওয়ায় এবার Bark-tanning সুরু করা হইয়াছে। চারিপাশের গ্রামের মুচিদের ভিতর তাহাদের জাতিগত-ব্যবসা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এই বিভাগের উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান সময়ে গ্রাম হইতে ৩জন মুচি আনাইয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ইতি-মধ্যে মহিদাপুরের একটি মুচি-পরিবার এখানকার কার্য্যপ্রণালী অনুযায়ী নিজের বাড়ীতেও এই ব্যবসা সুরু করিয়াছে। আশা করা যায় ক্রমে অন্যান্য সকল মুচিরাই তাহাদের জাতিগত ব্যবসা পুনরায় আরম্ভ করিয়া এই শিল্পের উন্নতি বিধান করিবে।

চিকিৎসালয়—গত মাসে চিকিৎসালয়ের কার্য্য বেশ ভালই চলিয়াছে, দৈনিক গড়ে ২৬ জন করিয়া রোগী ঔষধ লইয়া যাইত। গতমাসে প্রায় ১৮০৲ টাকার যন্ত্রাদি, ২০০৲ টাকার ঔষধাদি ক্রয় করা হইয়াছে। নিম্ন-লিখিত নিয়মগুলি গ্রামের উন্নতি-বিধানের জন্য চিকিৎসালয়ে প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে।

১। যে-সকল গ্রামবাসী নিজেদের গ্রামে ম্যালেরিয়া নিবারিণী সমিতি গঠন করিয়া তাহার সভ্য হইবেন তাঁহারা ঔষধের মূল্য বাবদ ৴০ এক আনা পয়সা দিলেই চিকিৎসালয় হইতে ঔষধ পাইবেন। তাঁহাদের বাড়ীতে রোগী দেখিতে হইলে, নিজগ্রামের সমিতির ফণ্ডে এক টাকা চাঁদা দিলে সুরুলের স্থানীয় এম্-বি ডাক্তার রোগীর বাড়ীতে গিয়া চিকিৎসা করিয়া আসিবেন।

২। সমিতির যে-সকল সভ্য অত্যন্ত গরীব, সমিতির ফণ্ডে কোন-রূপ চাঁদা দিতে পারেন না, তাঁহাদিগকে মাসে অন্ততঃ একদিন গ্রামের উন্নতির জন্য শারীরিক পরিশ্রম করিতে হইবে। ঐসকল সভ্যগণকে চিকিৎসালয়ের টিকিট বিতরণ করা হইবে। তাঁহারা বিনামূল্যে ও বিনা ভিজিটে ঔষধ ও ডাক্তার পাইবেন।

৩। যে-সকল গ্রামবাসী সমিতির সভ্য হইবেন না তাঁহাদিগকে ঔষধের পুরা মূল্য ও ডাক্তারের ভিজিট বাবদ ৪ টাকা চিকিৎসালয়ের ফণ্ডে জমা দিতে হইবে।

সমাজ-তত্ত্ব (Sociology)—শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দাস, এম্-এস্‌সি, পি-এইচ-ডি, শ্রীনিকেতনে সমাজ-তত্ত্ব ও অর্থনৈতিকের একটি বিভাগ খুলিয়াছেন। তিনি আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০।১২ বৎসর অধ্যাপনা করিয়া ভারতীয় শ্রমিক সম্প্রদায়ের সকলপ্রকার তত্ত্বে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি একটি হিন্দু, একটি মুসলমান, একটি সাওতাল ও একটি হিন্দু-মুসলমান-মিশ্রিত গ্রামের নানাবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহে নিযুক্ত আছেন। তিনি আশা করেন যে, বাংলার সমাজ ও অর্থসমস্যার মূল কারণ একবৎসর পরে দেখাইতে পারিবেন। তিনি সম্প্রতি আশ্রমে ও শ্রীনিকেতনে Village Economy'র ক্লাস খুলিয়াছেন।

ম্যালেরিয়া ও তাহার প্রতীকার—

ম্যালেরিয়ার জ্বর হইতে আমরা নিস্তার পাইতে পারি, অতি অল্প ব্যয়ে ইহার প্রকোপ হইতে উদ্ধার পাইতে পারি, একথা বোধ হয় সবাই জানেন না। ম্যালেরিয়া জ্বরের এক-প্রকার বীজাণু আছে। এই বীজাণু মানুষের শরীরে প্রবেশ করিয়া রক্তের মধ্যে চলাচল করিয়া জ্বরের সৃষ্টি করে; মশা এই বীজাণু একজনের শরীর হইতে অন্য জনকে দেয়—এই-রূপে ম্যালেরিয়ার সময় জ্বরের প্রকোপ বাড়িয়া চলে। এই সময়ে শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে মশা ডিম পাড়ে এবং মশার সংখ্যা বৃদ্ধি হয় বলিয়া জ্বরেরও বিস্তার বাড়িতে থাকে।

ম্যালেরিয়ার হাত হইতে নিস্তার পাইতে হইলে (১) শরীরে প্রবিষ্ট ম্যালেরিয়ার বীজাণুর ধ্বংস করিতে হইবে, (২) মশার কামড় হইতে নিজেকে বাঁচাইতে হইবে, (৩) মশা যাহাতে ডিম পাড়িয়া কুল বৃদ্ধি না করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

প্রতিকারের উপায়—

(১) কুইনাইনই ম্যালেরিয়ার বীজাণু ধ্বংসের একমাত্র ঔষধ—সপ্তাহে তিন বার ৫ গ্রেন্ করিয়া কুইনাইন্ খাইতে হইবে, তাহা হইলে যে বীজাণু শরীরে প্রবেশ করিবে তাহা বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা। দাস্ত পরিষ্কার রাখিতে হইবে—না হইলে ত্রিফলা (হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া) ভিজান জল প্রত্যহ প্রাতে খাওয়া উচিত। জ্বরে ভুগিয়া কাজ বন্ধ করিয়া শরীর খারাপ থাকিলে আয়ের ও শরীরের যে ক্ষতি হয়, তাহা অপেক্ষা নিয়মিতরূপে কুইনাইন্ খাওয়ার খরচ অনেক কম। প্রত্যেক পোষ্টাফিসে সস্তায় কুইনাইনের বড়ি পাওয়া যায়।

(২) মশারী ব্যবহার, অভাবে সন্ধ্যার সময় ঘরে ভাল করিয়া ধুনা জ্বালাইয়া ঘর বন্ধ করিয়া রাখিলে মশার উপদ্রব কম হয়। যথা-সম্ভব এই কয় মাস সন্ধ্যার পর শরীর ঢাকা দিয়া রাখা উচিৎ; তাহা হইলে মশা কম কামড়াইতে পায়। কেরোসিন্ তেলের গন্ধে মশা কম থাকে; হলুদে রংএর কাপড়, জামা ও বিছানায় মশা কম আসে।

(৩) মশা স্থির ময়লা জলে ডিম পাড়ে—যে-সব সার-গাদীর গর্ত্তে, নালায়, ডোবায় মশা ডিম পাড়ে, তাহা ভরাট করা উচিৎ; যেখানে জল জমে, তাহাতে কেরোসিন তেল ছিটাইয়া দিলে মশা আর ডিম পাড়িতে পারে না। ডিম পাড়িতে না পারিলে মশার বৃদ্ধি কমিয়া যায়।

এই তিনটি উপায় এখন হইতে সকলের অবলম্বন করা উচিত; তাহা হইলে জ্বরের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে। জ্বরে প্রত্যেক বৎসর ভুগিয়া লোক হীনবল হইয়া পড়িতেছে, সাধারণের আয়ও কমিয়া যাইতেছে এবং অন্য কোন রোগে সামান্য দিন ভুগিয়া অকালে মারা যাইতেছে। ম্যালেরিয়ার হাত হইতে যাহাতে নিজে পরিত্রাণ পান এবং অন্যকে উদ্ধার করিতে পারেন তাহার চেষ্টা সকলের করা উচিত।

—এডুকেশন-গেজেট

—

ভারতবর্ষ

আচার্য্য গিদ্‌ওয়ানির স্বাস্থ্য—

সিন্ধুপ্রদেশের কংগ্রেস-কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত সি পি গিদ্‌ওয়ানী জানাইয়াছেন যে, নাভা জেলে আচার্য্য গিদ্‌ওয়ানীর স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার শরীরের ওজনও ১৫ সের কমিয়া গিয়াছে। তাঁহার পত্নী প্রায় ১২ বার জেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট পত্র লিখিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি চাহিয়াছেন; কিন্তু এসম্বন্ধে কোনই জবাব পাওয়া যায় নাই।

মানহানির দায়ে বোম্বে ক্রনিকেল্—

১৯২১ সালে ধারওয়ারের গুলিবর্ষণের ব্যাপার-সম্পর্কে বোম্বাই ক্রনিকেলে প্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য ধারওয়ারের পুলিশ সব্-ইন্সেপেক্টর শিবলিঙ্গপ্পা এবং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উক্ত পত্রিকার সম্পাদকের বিরুদ্ধে যে মানহানির মামলা রুজু করিয়াছিলেন, বোম্বাই হাইকোর্টের জজ মিঃ কেম্পের এজ্‌লাসে সেই মামলার আপীলের শুনানী শেষ হইয়া গিয়াছে। জজ নিম্ন আদালতের দণ্ড অর্থাৎ ৫ হাজার এবং ৮ হাজার টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ বহাল রাখিয়াছেন। রায়ে বলা হইয়াছে যে, আসামীপক্ষ নিরপেক্ষ সমালোচনার যে-তর্ক উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। বরং প্রবন্ধটি যে বিদ্বেষ-প্রণোদিত তাহা স্পষ্টরূপেই প্রমাণিত হইয়াছে।

'কেশরী' ও 'বিনোদ'—

বোম্বাই হাইকোর্টে "কেশরী" ও "বিনোদ" পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ আদালতকে অবমাননা করার অভিযোগে যথাক্রমে ৫হাজার এবং ১৫ শত টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। এই পত্রিকা দুইখানি জন-সাধারণের মতামত ব্যক্ত করিতে যাইয়াই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে; বিশেষতঃ এই মামলায় ভারতের সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। এই-সমস্ত কারণে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, মোলনা শৌকৎ আলি প্রভৃতি একটি আবেদন-পত্র প্রকাশ করিয়া উক্ত দুই কাগজকে অর্থ সাহায্য করিবার জন্য জনসাধারণকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীযুক্ত কেল্‌কার সকলকে ধন্যবাদের সহিত জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, পত্রিকা দুইখানি তাহাদের নিজেদের ব্যয়ভার নিজেরাই বহন করিবে, কাহারো সাহায্যের আবশ্যক নাই। 'কেশরী'-অফিসে এই সাহায্যের জন্য মনিঅর্ডার যোগে বা অন্য রকমে যে টাকা আসিয়াছিল তাহা ফেরত দেওয়া হইয়াছে।

বিহার শিক্ষা-সম্মিলনী—

ফুলওয়ারীতে বিশ্ববিদ্যালয়-সম্বন্ধে যে নূতন ব্যবস্থার জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে তাহারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্য গত ১৭ই আগষ্ট বিহার শিক্ষা-সম্মিলনীর এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মিঃ এস খোদাবক্স্ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সম্মিলনীর অধিকাংশ প্রতিনিধির ভোটে পাশ হইয়াছে :—

ফুলওয়ারীর সন্নিকটে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইমারত প্রভৃতি তৈরী করিয়া নূতন ভাবে রেসিডেন্সিয়াল্ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যে

ব্যবস্থা হইতেছে তাহা সম্মিলনীর মতে এই প্রদেশের শিক্ষার অন্তরায়স্বরূপ হইবে। সুতরাং উহার পরিকল্পনা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য এবং ঐ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা এই প্রদেশের প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষার জন্য, সাধারণের সুবিধাজনক ভাবে ব্যয় করিবার ব্যবস্থা করা সঙ্গত। মাত্র বারো জন সদস্য এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন।

সম্প্রতি সরকার হইতে এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করা হইয়াছে।

পুনা মীমাংসা-বিদ্যালয়—

নূতন পুনা কলেজের সংলগ্ন মীমাংসা-মহাবিদ্যালয়ের নূতন গৃহে গত ১০ই আগষ্ট গৃহ-প্রবেশের অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই মহাবিদ্যালয়ের বিশেষত্ব এই যে, ভারতের কোথাও এরূপ প্রতিষ্ঠান আর-একটিও নাই। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় মীমাংসা-দর্শন তাঁহাদের পাঠ্যতালিকা ভুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু এজন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠান কোথাও নাই। এই বিদ্যালয়ের সহিত একটি অগ্নিহোত্রশালাও আছে। অধ্যাপকেরা এখানে হাতে-কলমে কাজের দ্বারা ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকেন।

মান্দালয়ের দাঙ্গা—

গত ১৭ই আগষ্ট্ মান্দালয় সহরে পুলিশের সহিত জনসাধারণের একটি সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। এই সংঘর্ষ-সম্বন্ধে সরকারী এবং বে-সরকারী রিপোর্টে—এই ধরণের অন্যান্য ঘটনাগুলির মতই—কিছু-মাত্র মিল নাই। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ—ভিক্ষু উত্তমের শোভা-যাত্রা নিষিদ্ধ পথ দিয়া যাইবার চেষ্টা করে। পুলিশ রাস্তার দুই ধারে সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছিল। জনতা পুলিশকে আক্রমণ করিলে পুলিশকে বাধ্য হইয়াই রিভলভার চালাইতে হয়। এই সংঘর্ষের ফলে একজন কুলি নিহত হইয়াছে ও একজন সামান্য আহত হইয়াছে। আর পুলিশের পক্ষে নিহত হইয়াছে দুই জন, একজনের আঘাত অত্যন্ত গুরুতর, দশ জন পুলিশ হাঁসপাতালে পড়িয়া আছে, একজন ইন্‌স্পেক্টরের হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং মাথায় গুরুতর জখম হইয়াছে। ইহা ছাড়া আরও ৫১ জন পুলিশ কনেষ্টবল অপেক্ষাকৃত কম জখম হইয়া হাঁসপাতালে চিকিৎসিত হইতেছে। এই দাঙ্গা পূর্ব্ব হইতেই মতলব করিয়া পাকানো হইয়াছিল; মিছিলের পিছনে-পিছনে দুই গাড়ী ইট সেইজন্য নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

ভিক্ষু উত্তম এ-সম্বন্ধে বড়লাটের কাছে যে তার করিয়াছেন তাহার সংবাদ, বলা বাহুল্য অন্য রকমের। তিনি জানাইয়াছেন, মান্দালয়ে ইউনিয়ন্ দল ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্মদেশকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য সভা করিতেছিল—তিনি এই বিভাগের বিরোধী। সুতরাং তাঁহার শোভা-যাত্রা ভাঙ্গিয়া দেওয়ায় ইউনিয়ন্‌দলের স্বার্থ ছিল। ইউনিয়নদলের পৃষ্ঠপোষক ছিল শ্বেতাঙ্গ এবং পুলিশের লোক। আর সেইজন্যই পুলিশের সহিত এই সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। শোভা-যাত্রাটি ভক্স্ রাস্তার মোড়ের নিকট উপস্থিত হইলে সহসা পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্ শোভা-যাত্রাটি অন্যপথে পরিচালিত করিবার আদেশ দেন। এআদেশও জনতা মানিয়া লইয়া পুলিশের নির্দ্দিষ্ট পথে ফিরিয়াছে, এমন সময় রাস্তার মোড়ের দুইটি বাড়ী হইতে তাহাদের উপর ইঁট-পাট্‌কেল পড়িতে থাকে। এই বাড়ীতে যাহারা ছিল তাহারা ইউনিয়ন্ এবং পুলিশের দলের লোক। নিক্ষিপ্ত ইঁটের আঘাতে শোভা-যাত্রার কতকগুলি লোক আহত হয় এবং শোভা-যাত্রা থামিয়া যায়। এই সময় ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্ এবং তাঁহার সহকারীগণ কিছু না বলিয়াই জনতার উপর গুলিবর্ষণ করিতে থাকেন। তাহার পর শোভাযাত্রার লোকেরাও প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করে। পুলিশের হাতে ছিল রিভলভার বেটন ও বাঁশের লাঠি এবং জনতার সম্বল ছিল রাস্তার ইঁট-পাট্‌কেল।

গবর্ণ্‌মেণ্টের তরফ হইতে এই সম্পর্কে ব্যবস্থা হইয়াছে:—

ভিক্ষু উত্তম এবং মিঃ মদনজিতের উপর এই মর্ম্মে নোটিশ জারি করা হইয়াছে যে, তাঁহাদিগকে অবিলম্বে মান্দালয় জেলা পরিত্যাগ করিতে হইবে। পুলিশ তাঁহাদিগকে রেলষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিয়াছে। তাঁহারা রেঙ্গুন রওনা হইয়াছেন। ইয়াদা মোজেন কাউন্সিলের সেক্রেটারীকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

সামরিক পুলিশ বৌদ্ধমঠ-সমূহে খানাতল্লাসী করিতেছে। দাঙ্গার সম্পর্কে এপর্য্যন্ত দুইজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এবং ১৬ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

মান্দালয়ের ডেপুটি কমিশনার নোটিশ জারী করিয়াছেন যে, তাঁহার অনুমতি না লইয়া মান্দালয় সহরে কোনো সাধারণ সভার অধিবেশন হইতে পারিবে না।

গুলবার্গায় দাঙ্গা—

হায়দ্রাবাদের অন্তর্গত গুলবার্গা-নামক স্থানে সম্প্রতি হিন্দু-মুসলমানে এক ভীষণ দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। এই দাঙ্গায় দোষ যে, কোন্ পক্ষের বেশী তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন। মুসলমানেরা বলিতেছেন, হিন্দুদের দ্বারাই দাঙ্গা সুরু হয়। তাহারাই প্রথমে মসজিদ আক্রমণ করিয়া তাহার চূড়া ভাঙ্গিয়া দেয়, তাহাদের নিকট বন্দুক ছিল, এই বন্দুকের গুলিতে গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্ মিঃ মহাম্মদ আজিজুল্লা নিহত হইয়াছেন এবং আরো অনেক মুসলমান হত ও আহত হইয়াছে। হিন্দুদের রিপোর্ট্ ঠিক ইহার উল্টা। তাহারা বলে, মুসলমানেরাই তাহাদের উপর অযথা অত্যাচার করিয়াছে। তাহারা অনেকগুলি মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে, হিন্দুদের দোকান-পশার লুটিয়াছে, গৃহে আগুন লাগাইয়া দিয়াছে।

'টাইম্‌স্ অব্ ইণ্ডিয়া'র স্থানীয় সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, এই হাঙ্গামার সংস্রবে নিজামের পুলিশ দুই শত লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ডাকাতি, দাঙ্গা ও ব্যক্তিগত তহবিল তছরূপ করা—এই তিনটি অভিযোগেই সাধারণতঃ লোকদিগকে গ্রেপ্তার করা হইতেছে। কয়েক জন মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ভিতর সদ্ভাব স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু হিন্দুরা নাকি দেবমূর্ত্তি-ধ্বংসকারী ও মন্দির-অপবিত্রকারী দুর্ব্বৃত্তগণের সাজার জন্যই জেদ ধরিয়াছেন।

নিজাম বাহাদুর দাঙ্গা-সম্পর্কে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত ইস্তাহার জারী করিয়াছেন—যেপর্য্যন্ত কমিশনের তদন্ত শেষ না হয় সে পর্য্যন্ত গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি ইনস্পেক্টর্ জেনারেল মিঃ সি এ্ফোর্ড পুলিশের ইনস্পেক্টর্ জেনারেলের সহিত গুলবার্গে অবস্থান করিবেন। উভয় সম্প্রদায়ের যে-সকল উপাসনা-স্থলের ক্ষতি হইয়াছে, তাহা ধর্ম্ম-বিভাগ হইতে সংস্কৃত হইবে। পূর্ত্ত বিভাগের সেক্রেটারী নবাবালি নবাব জঙ্গ বাহাদুর কাউন্সিলে সভাপতির সম্মতি গ্রহণার্থে আনুমানিক ব্যয়ের হিসাব ও নক্সা দাখিল করিবেন।

পাঞ্জাবে নারী-জাগরণ—

সত্যাগ্রহ-সংগ্রামে শিখেরা যে সংযম, সহিষ্ণুতা এবং সাহসের পরিচয় প্রদান করিতেছেন, তাহা অপূর্ব্ব। সকল প্রকারের দুঃখ-কষ্ট, লাঞ্ছনা, প্রহার, অপমান, কারাবাস, এমন-কি মৃত্যু পর্য্যন্ত ইহাদের কাছে পরাজয় স্বীকার করিয়াছে; পণ ইহাদের টলে নাই। এক নেতা কারারুদ্ধ হইতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পরিত্যক্ত কার্য্য-ভার গ্রহণ করিবার জন্য অন্য নেতা আসিয়া উপস্থিত হইতেছেন। গত

৫ই আগষ্ট শিরোমণি আকালীদের সেক্রেটারী সর্দ্দার কর্ত্তার সিংকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। 'দেশ-সেবক' পত্রের তৃতীয় সম্পাদক সর্দ্দার সিংও পুলিশে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। জাঠার অভিযান পূর্ব্বের মতই চলিতেছে। কিন্তু কেবল পুরুষ নহে, পাঞ্জাবে রমণীর মনও অতি-মাত্রায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি অমৃতসর ষ্টেশনে একজন অকালী রমণীকে দেখা গিয়াছে, তাঁহার পোষাকপরিচ্ছদ যোদ্ধার মত, দুই পার্শ্বে দুইখানি ছোরা, স্কন্ধে কুঠার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, "এবেশে তুমি কোথায় যাইতেছ? স্ত্রীলোকের কর্ম্ম-স্থান তো বাহিরে নয়, ঘরে।" তাহার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "গৃহে আর আমার কোনো আকর্ষণ নাই। আমার স্বামী-পুত্রকে নানকানায় জীবন্ত দগ্ধ করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। ১৯১২ সালে ১৩৮ জন অকালীকে মোহন্তের লোকেরা দেবায়তোর মধ্যে হত্যা করিয়াছে। তাহার প্রতিশোধ চাই!"

কয়েক মাস পূর্ব্বে অমৃতসরে আর-একজন কৃষক রমণীকে দেখা গিয়াছিল, তিনি ১৬ বৎসরের একটি বালকের বস্ত্র ধরিয়া স্বর্ণ মন্দিরের অভিমুখে যাইতেছিলেন। কয়েকদিন মাত্র পূর্ব্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রটি সাহেদী জাঠের দলে যোগ দিয়া প্রাণ হারাইয়াছে। সেদিন তিনি ধর্ম্মের নামে দ্বিতীয় পুত্রটিকেও উৎসর্গ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি আমার এই ছেলেটিকেও দান করিয়া দেখাইতে চাই যে, আমরা কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হইব না। আমরা বিনা বাধায় গুরুদ্বারে প্রবেশ করিতে চাই। এ-ক্ষেত্রে কমিটির আদেশই আমাদের শিরোধার্য্য; বিদেশী গবর্ণমেণ্টের কোনো আদেশেই আমরা কর্ণপাত করিব না।"

অমানুষিক ঔদাসীন্য—

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ সিং জব্বলপুর হইতে একটি রমণীর প্রতি জনৈক গোরা সৈনিকের পাশবিক অত্যাচারের সংবাদ প্রদান করিয়াছেন। সংবাদটির ভিতর বৈচিত্র্য আছে, সেইজন্যই তাহা এখানে প্রকাশ করিতে হইতেছে। সংবাদদাতা জানাইয়াছেন—একজন গোরা সৈনিক রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট দিবাভাগে প্রকাশ্যে একজন ভিখারিণী-বেশী রমণীকে 'এম্বুলেন্স' গাড়ীর ভিতর টানিয়া তুলিয়া তাহার উপর জোরপূর্ব্বক পাশবিক অত্যাচার করিয়াছে! হতভাগিনী যখন যন্ত্রণায় চীৎকার করিতেছিল তখন জন পঞ্চাশেক লোক সেই গাড়ীখানির চারিদিকে জমায়েৎ হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করে নাই। ৫।৬ জন রেলওয়ে পুলিশও সেখানে ছিল, তাহারাও নীরবে সেই দৃশ্য দেখিয়াছে। রেলওয়ে পুলিশের থানায় সংবাদ দেওয়া সত্ত্বেও গোরা সৈনিকটিকে ধরিতে চেষ্টা করা হয় নাই, তাহারা সিভিল্ পুলিশ ষ্টেশনে টেলিফোন্-সংবাদ পাঠাইয়াই তাহাদের কর্ত্তব্য শেষ করে। অবশেষে যখন সৈনিকটি স্ত্রীলোকটিকে গাড়ী হইতে ছুঁড়িয়া রাস্তায় ফেলিয়া দিয়া স্থানত্যাগের উদযোগ করিতেছিল, তখনই একজন ইউরোপীয় সার্জ্জেণ্ট ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া গোরাটিকে গ্রেপ্তার করেন।

কিছু দিন পূর্ব্বে নারায়ণগঞ্জেও একটি এই ধরণের ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। সেখানেও একজন শ্বেতাঙ্গ একটি দেশী রমণীর উপর জঘন্য অত্যাচার করিতেছিল এবং একজন উকিল তাঁহার বন্ধুবর্গকে লইয়া কয়েক হাত মাত্র দূরে বসিয়া এই কুৎসিত, বীভৎস ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়া-ছিলেন, প্রতিবাদের একটি বাক্যটিও উচ্চারণ করেন নাই। যাহারা এইসব অত্যাচার করে তাহারা অমানুষ, কিন্তু আরো অধম তাহারা, যাহারা চোখের উপর এগুলি দেখিয়া প্রতিকারের চেষ্টা করে না। এই ঔদাসীন্য জাতির চরমতম দুর্ভাগ্য।

দাক্ষিণাত্যে বন্যা—

দাক্ষিণাত্যের বন্যার সংবাদ ভাদ্রের 'প্রবাসী'তেও আমরা খানিকটা দিয়াছি। কিন্তু সম্পূর্ণ বিবরণ তখন দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই এখনও সম্ভবপর হইবে না। কারণ ক্ষতির হিসাব-নিকাশ করিতে এখনও ঢের দিন লাগিবে। তবে নানা বিবরণ হইতে ইহার ভয়ঙ্করত্বের কতকটা আভাস পাওয়া যায় মাত্র। ওয়াই এম্ সি এর সেক্রেটারী মিঃ পপলী বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া জানাইয়াছেন—"কাবেরীর জল বৃদ্ধি হইয়া তাবনী সহরটি প্রায় ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। মালাবারে ৫০ সহস্র গৃহ ধ্বংস হইয়াছে বলিয়া সেখানকার কলেক্টর যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা খুব কম বলিয়া বোধ হয়। এই সাহায্য-কার্য্যে বহু লক্ষ টাকার প্রয়োজন।"

আর-একটি সংবাদে প্রকাশ, এলামকুলামে ১৬০টি বাড়ী পড়িয়া গিয়াছে, ৩৫০ একর পরিমিত জমির পাকা ধান নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পালাশডোলেতে ২৫০ একর জমির ধান নষ্ট হইয়াছে। একমাত্র ইলু-ডালাদ তালুকে ২৭ শত বাড়ী নষ্ট হইয়াছে! এইসমস্ত বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে ৩ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হইবে। পাটাম্বি ও মানকাদাস তালুকই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। করিমপেটা তালুকে মোপ্‌লাগণ দুর্দ্দশার শেষ ধাপে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গৃহহীন লোকেরা এখন তালপাতার ছাউনী দেওয়া পর্ণ কুটীরে অতিকষ্টে বাস করিতেছে।

এই বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে রামকৃষ্ণ মিশন যে সেবার কাজ চালাইতেছেন তাহা বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। তাঞ্জোর জেলায় ১৫টি গ্রামে প্রায় ১৭৫০ জন লোককে সাহায্য করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া আরো অনেক স্থানে তাঁহাদের সেবাহস্ত প্রসারিত হইয়াছে। অর্থ সংগ্রহ হইলে আরও সাহায্য-কেন্দ্র মিশনের পক্ষ হইতে খোলা হইবে। ইঁহারা জনসাধারণের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করিয়া আবেদন-পত্র বাহির করিয়াছেন। মিঃ পপলীও বড়লাটকে এজন্য সমস্ত ভারতবর্ষের নিকট আবেদন করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

নিখিল ব্রহ্ম-সম্মিলন—

ব্রহ্মদেশস্থ বার্ম্মিজ্ এসোসিয়েশনের কাউন্সিল-বিরোধী ও কাউন্সিল-পক্ষপাতী দলকে মিলিত করিয়া একযোগে আন্দোলন চালাইবার উদ্দেশ্যে তথায় নিখিল-ব্রহ্ম-ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিগত ১৫ই ও ১৬ই তারিখে উক্ত ইউনিয়নের প্রথম ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় দ্বৈত শাসনতন্ত্রের নিন্দা করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভা হইতে আরও জানান হইয়াছে যে, পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন না পাইলে ব্রহ্মদেশ কিছুতেই সন্তুষ্ট হইবে না। ব্রহ্মদেশে হোম-রুল কিরূপ হইবে, তাহা স্থির করার জন্য একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশে ভিন্নদেশীয় লোকের বসবাস-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্যও একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। ঘরে ঘরে তাঁত ও চরকার ব্যবহার প্রচলন করাও সভায় স্থির হইয়াছে।

বার্ম্মিজ্ এসোসিয়েশনের কাউন্সিল বয়কট্ বিভাগের সম্পাদক মিঃ ইউ, পি, আরাওয়াদি সংস্কার-আইন-তদন্ত কমিটীর কাছে তারযোগে জানাইয়াছেন যে, স্বায়ত্ত শাসন না পাইলে ব্রহ্মদেশ সন্তুষ্ট হইবে না এবং ব্রহ্মদেশকে ভারত হইতে যেন বিযুক্ত করা না হয়।

ভাইকম সত্যাগ্রহ—

ভাইকমে সত্যাগ্রহ পূর্ব্বের ন্যায়ই চলিতেছে। মহিলারাও রীতিমত ভাবে এই সত্যাগ্রহে যোগ দিয়াছেন। শ্রীমতী নাইকার আরো কয়েকটি মহিলাকে সঙ্গে লইয়া অর্থ এবং স্বেচ্ছাসেবিকা সংগ্রহের জন্য ত্রিবাঙ্কুর

পরিভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। উচ্চজাতীয় রমণীদের ভিতর যাঁহারা এই অভিযানে যোগ দিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে বিখ্যাত কর্ম্মী মিঃ সিদ্ধ এম্ পি. নায়ারের পত্নী শ্রীমতী এম্ পি নায়ারও আছেন।

স্বেচ্ছাসেবকগণ তিনটি অবরোধেই চরকা চালাইতেছে। যে ১৪ জনকে পথ অবরোধ, রাস্তা অপরিষ্কার, কর্কশ কণ্ঠে গান গাওয়া ও পথে চরকা চালাইয়া দোকানদারদের অসুবিধা ঘটানোর জন্য পুলিশ অভিযুক্ত করিয়াছিল তাহাদের ভিতর দুই জনের ৫ টাকা করিয়া জরিমানা হইয়া গিয়াছে। ত্রিবান্দ্রাম হাইকোর্টের উকিল মিঃ কে জি বৃন্দুরক পিকাইএর বিরুদ্ধেও অভিযোগ আনা হইয়াছে, কিন্তু পুলিশ এখনও তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে নাই। মিঃ নাইকার পুলিশের সঙ্গে কোট্টায়াম হইতে ত্রিবান্দ্রাম পর্য্যন্ত ১০২ মাইল পথ পদব্রজে যাইতেই মনস্থ করিয়াছেন। কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে গাড়ী দিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদের অনুগ্রহের দান গ্রহণ করিতে তিনি অস্বীকৃত হইয়াছেন। পথি-পার্শ্বস্থ গ্রামসমূহের অধিবাসীগণ তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার আয়োজন করিতেছেন।

মহিলাদের ভোটাধিকার—

বিহার ও উড়িষ্যা ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশনে মিঃ ডি, এন্ মদন যাহাতে স্ত্রীলোকগণও ভোট দিতে এবং সদস্য-পদ প্রার্থী হইতে পারেন, তজ্জন্য একটি প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন। তবে এইজন্য স্ত্রীলোকদিগকে স্বয়ং লিখিত আবেদন পেশ করিতে হইবে।

এলাহাবাদে সভা—বিগত ১০ই তারিখে এলাহাবাদের ভদ্র মহিলা-গণ শ্রীমতী গোদাবরী মালবোর বাড়ীতে সমবেত হইয়া একটি সভাতে এই মর্ম্মে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন যে, মহিলাদের ভোটদানের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার যে ধারা আছে, তাহা দূর করিবার জন্য সংস্কার-আইন-তদন্ত-কমিটীর সদস্যদের কাছে তার করিতে হইবে।

মুসলমান সংগঠন—

পাঞ্জাবের মুসলমানদিগকে সংবদ্ধ করিবার জন্য ডাঃ কিচলু একদল মুসলমান সঙ্গে লইয়া পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিতেছেন। অথচ হিন্দুদের সংগঠনের কাজে এই মুসলমানদের ভয়ানক আপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

সরকারী কাজে ভারত-মহিলা—

শ্রীমতী আনোয়ার ইউসুফ্ফ বিহার ও উড়িষ্যার ব্যবস্থাপক সভায় সহকারী সেক্রেটারীর কাজে নিযুক্ত করা হইয়াছে। বিহার সরকারের এই উদারতা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কর্তৃপক্ষেরও অনুকরণের যোগ্য।

পাঞ্জাবে সমাজ-সংস্কার—

লাহোরে বিধবা-বিবাহ-সহায়ক সভার উদ্যোগে ৭ মাসে ৭ শত বিধবার বিবাহ হইয়াছে।

—

বিদেশ

অসম্ভব লাভের আশায় ভূতপূর্ব্ব ফরাসী প্রধান মন্ত্রী পঁয়কারের জার্ম্মান্ নীতিকে বিফল করিয়া দেওয়াতে জার্ম্মানীর নিকট ক্ষতিপূরণ আদায়ের আশু সম্ভাবনা লুপ্ত হয়। ফলে ঋণভারপ্রপীড়িত ফ্রান্সের মুদ্রার মূল্য পণ্যের হাটে অত্যন্ত কমিয়া যায়; ফ্রান্সের পক্ষে বিশ্বের হাটে কেনা-বেচা করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। ফ্রান্সের এই দুর্দ্দশা হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টাতে পঁয়কারে মন্ত্রী-সভার পতন হইয়া হেরিও মন্ত্রীসভার উদ্ভব হয়। ফরাসীজাতির বৈদেশিক নীতি ইংরেজজাতি আপনার স্বার্থের হানিকর মনে করাতে বিশেষতঃ রুর নীতি ইংরেজের পক্ষে অত্যন্ত আপত্তিজনক বোধ হওয়াতে—ইংরেজ ও ফরাসীর মধ্যে যে মনোমালিন্য জমিয়া উঠিতেছিল, তাহা সর্ব্বাগ্রে দূর করিয়া ইংরেজ ও ফরাসীদিগের লুপ্তপ্রায় হৃদ্যতা পুনরায় জাগাইয়া তুলিতে হেরিও সঙ্কল্প করিলেন। ইংলণ্ডেও রক্ষণশীল মন্ত্রীসভার পতন ঘটিয়া শ্রমিক-মন্ত্রীসভা স্থাপিত হওয়াতে এই মিলন সহজে সম্ভব হইবে বলিয়া রাষ্ট্রনৈতিক মহলে আশার সঞ্চার হয়। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী রাম্‌জে ম্যাক্‌ডোনাল্ড রাষ্ট্রনৈতিক মিলনসূত্র খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য ফ্রান্সে আসিয়া হেরিওর সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ডয়েস্ কমিশনের সিদ্ধান্তকে ভিত্তি করিয়া জার্ম্মান সমস্যার সমাধান সম্ভব কি না তাহাই এই আলোচনার মূল বিষয় ছিল। আলোচনার ফলে ম্যাকডোনাল্ডের বিশ্বাস হয় যে, সেরূপ একটি সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব নহে। শ্রমিক মন্ত্রীসভা এই উপায়টিকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য একটি সার্ব্বজাতিক বৈঠক লণ্ডন শহরে আহ্বান করিলেন।

১৬ই জুলাই বৈঠকের আরম্ভ হইবে বলিয়া, অনুষ্ঠাতারা ঘোষণা করিলেন এবং ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইতালী ও জাপান বৈঠকের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু আমন্ত্রণ-লিপির দুই-একটি ঘোষণা লইয়া ফ্রান্স আপত্তি তুলিলেন। রিপারেশন্ কমিশনের কর্তৃত্ব অস্বীকার করিয়া ডয়েস্ সিদ্ধান্তকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ফ্রান্স এই বৈঠকের সিদ্ধান্তকে শিরোধার্য্য করিতে বাধ্য থাকিবেন এরূপ প্রতিশ্রুতি পূর্ব্ব হইতে দিতে নারাজ হইলেন। ইংরেজ বলিলেন যে, ক্ষতিপূরণ কমিশনের সিদ্ধান্তকে নাকচ করিবার ইচ্ছা তাঁহাদের নাই; কিন্তু ডয়েস্ সিদ্ধান্তে এমন অনেক বিষয়ের মীমাংসার পন্থা দেখানো হইয়াছে যাহা ক্ষতিপূরণ কমিশনের আলোচনার বহির্ভূত, কারণ সে-সমস্ত বিষয়ের আলোচনা-ভারাই সন্ধিসূত্রে নাই। ফ্রান্স জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ডয়েস্ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর যদি জার্ম্মানী স্বীকৃত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে অসমর্থ হয় কিম্বা দিতে অবহেলা করে তখন ক্ষতি-পূরণ কমিশনের তরফ হইতে তাহা আদায় করিয়া লইবার অধিকার স্বীকৃত হইবে কি না এবং এরূপক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়া লইবার জন্য নিজস্ব স্বতন্ত্র নীতি অবলম্বন করিবার অধিকার শক্তি বিশেষের অধিকার থাকিবে কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে ম্যাক্‌ডোনাল্ড্ জানাইলেন যে শক্তি-বিশেষের স্বতন্ত্র অধিকার স্বীকার করিলে ডয়েস্ সিদ্ধান্ত আপনা হইতেই অচল হইয়া পড়ে। কেননা ডয়েস্ সিদ্ধান্ত অনুসারে জার্ম্মানীর নিকট ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে হইলে জার্ম্মানীকে অর্থবলে বলীয়ান করা প্রয়োজন। জার্ম্মানীকে ছয় কোটি টাকা ঋণ দানের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়ার উপরেই এই সিদ্ধান্তের সাফল্য নির্ভর করিতেছে। এই ঋণদান ব্যবস্থাই উহার প্রাণ। ঋণদান করিবার পূর্ব্বে দাতাগণ ভবিষ্যৎ যুদ্ধবিগ্রহের সম্ভা না থাকিবে না এরূপ স্বীকারোক্তি শক্তিবর্গের নিকট হইতে চাহিবেন। এরূপ স্বীকারোক্তির অভাব ঘটিলে জার্ম্মানীর ন্যায় অর্থাভাবে বিপন্ন জামিন-হীন রাজ্যকে ঋণ দিবে কে? সেইজন্য মিত্রশক্তিবর্গের ক্ষতিপূরণ ঠিকমত না করিতে পারিলেই শক্তিবিশেষ আপনার অভিরুচি-অনু-সারে অগ্রধারণ করিতে পারিবেন, এরূপ ব্যবস্থা সঙ্গত নহে।

কিছু কাল বাদানুবাদ চলার পর যখন ফ্রান্স দেখিলেন যে, বেল্‌জিয়াম্ ও ইতালী ডয়েস্ সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা সম্ভবপর কি না তাহা আলোচনা করিয়া সম্মিলিত বৈঠক যে সিদ্ধান্তে আসিবেন তাহাই নির্ব্বিশেষে

মানিয়া লইতে প্রস্তুত হইয়াছেন তখন ফ্রান্স এই বৈঠকে যোগ দিতে একরূপ বাধ্য হইয়াই সম্মত হইলেন, কিন্তু বৈঠকের সিদ্ধান্ত শিরোধার্য্য করিয়া লইতে সম্পূর্ণভাবে সম্মত হইলেন না। শেষ সিদ্ধান্ত ফ্রান্সের ব্যবস্থাপক সভা মানিয়া লইলেই ফ্রান্স তাহাতে রাজি হইবেন, নতুবা উহাতে অস্বীকার করিবার অধিকার ফ্রান্সের থাকিবে এরূপ অঙ্গীকারে ফরাসী বৈঠকে যোগ দিতে সম্মত হইলেন। বিগত ১৬ জুলাই তারিখে লণ্ডন শহরে মিত্র শক্তিবর্গের বৈঠক আরম্ভ হয়। বৈঠকের প্রারম্ভিক সভায় র‍্যাম্‌জে ম্যাক্‌ডোনাল্ড সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। সভাপতির বক্তৃতার সার মর্ম্ম এই যে, ডয়েস্ সিদ্ধান্ত অবিকৃতরূপে গ্রহণ করা আবশ্যক। লাভ-লোকসানকেই মূল ভিত্তি করিয়া এই সিদ্ধান্ত প্রস্তুত করা হয় না; প্রকৃত ব্যবসায়ীর ন্যায় এই সিদ্ধান্তকে অর্থনৈতিক ভূমিতে স্থাপন করা হইয়াছে। ইহাকে অবলম্বন করিলে ইউরোপে বাণিজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা অসম্ভব। সেইজন্য ডয়েস রিপোর্ট যাহাতে কার্য্যকারী হয় সেই দিকে সকলেরই দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। প্রথম দিনের বৈঠক শেষ হইলে পর তিনটি ভিন্ন-ভিন্ন সমস্যার মীমাংসার পন্থা আবিষ্কার করিবার জন্য তিনটি বিভিন্ন কমিটি নিয়োজিত হয়। জার্ম্মানী দেয় ক্ষতিপূরণ সময়মত প্রদান না করিলে কি উপায় অবলম্বন করা শ্রেয় তাহা নির্দ্ধারণের জন্য প্রথমটি, জার্ম্মানীর অর্থনৈতিক ও রাজস্ব-সম্বন্ধীয় উন্নতি সর্ব্বাপেক্ষা সহজে এবং অল্প সময়ে কোন্ উপায় সম্ভব তাহা স্থির করিবার জন্য দ্বিতীয়টি এবং জার্ম্মানীর প্রদত্ত অর্থ সহজে কিরূপে উত্তমর্ণ রাজ্যগুলিতে প্রেরণ করা যায়, তাহার উপায় বাহির করিবার, জন্য তৃতীয়টি সৃষ্ট হয়। প্রথমটির সভাপতি মিঃ ফিলিপ স্নোডেন, দ্বিতীয়টির সভাপতি মিঃ টমাস্ ও তৃতীয়টির সভাপতি স্যার রবার্ট কিণ্ডার্সলি নির্ব্বাচিত হন। কিন্তু শুধু মিত্র-শক্তিবর্গের মধ্যে একটা রফা হইয়া গেলেই ত কার্য্যসিদ্ধি হইবে না। জার্ম্মানী যাহাতে সেই সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে প্রস্তুত হয় তাহার ব্যবস্থাও করিতে হইবে। কিন্তু ডয়েস-সিদ্ধান্তে এমন অনেক বিষয়ের আলোচনা আছে যে সমস্ত বিষয়ের সম্বন্ধে কোনও প্রশ্নই ভার্সাই সন্ধিসূত্রে উঠে নাই। আন্তর্জ্জাতিক আইন-অনুসারে সেইসমস্ত নূতন সিদ্ধান্ত যাহাতে জাতিসমূহের অবশ্য প্রতিপাল্য হইয়া পড়ে তাহার ব্যবস্থা সম্ভব কি না তাহা বিচার করিবার ভার দেওয়া হয় দুইজন প্রসিদ্ধ আইনবেত্তার হস্তে। এই দুইজনের একজন হইলেন প্রসিদ্ধ ফরাসী আইনজ্ঞ ফর্‌মাগেয়ো এবং অপর জন হইলেন ইংরেজ কূটনীতিবিশারদ স্যার সিসিল হার্ষ্ট। ইঁহারা সেরূপ ব্যবস্থা সম্ভব বলিয়া রিপোর্ট দেওয়াতে জার্ম্মানীকে বৈঠকে যোগ দিবার জন্য আহ্বান করা হইল।

বৈঠকের কাজ বেশ চলিতেছিল। এমন সময় ফ্রান্সের তরফ হইতে গোল উঠিল। ফ্রান্স বলিলেন যে, ক্ষতিপূরণ কমিশনের সিদ্ধান্ত-অনুসারে প্রাপ্য টাকা জার্ম্মানী যদি দিতে অস্বীকার করে তাহা হইলে কি ব্যবস্থা হইবে তাহা জানা দরকার। সে প্রশ্নের সুমীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত অন্য কোনও ব্যবস্থা ফ্রান্স মানিয়া লইতে পারেন না। অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর স্থির হইল যে জার্ম্মানীর যে টাকা বাকি পড়িলে তাহা আদায়ের ব্যবস্থা করিবার জন্য একটি নূতন কমিশন উপর থাকিবে। সেই কমিশনে একজন ইংরেজ, একজন ফরাসী ও একজন মার্কিন সভ্য থাকিবেন; বেশীর ভাগ লোক যে মত দিবেন সেই মত-অনুসারে কার্য্য হইবে।

প্রত্যেক কমিটি আপনাদের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়া রিপোর্ট দাখিল করেন। জার্ম্মানীর ক্ষতিপূরণ আদায়ের একটি ব্যবস্থা হইল এই যে, জার্ম্মানীর রেল-লাইনসমূহ রাষ্ট্রতন্ত্রের হাত হইতে মিত্র-শক্তিবর্গের পরিচালনায় গঠিত একটি কোম্পানীর হস্তে ন্যস্ত হইবে। এই কোম্পানী গঠিত হইলে ইহা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ রেল কোম্পানী হইবে। জার্ম্মান প্রতিনিধিগণ বৈঠকে যোগ দিবার পর তিনটি কমিটির রিপোর্ট লইয়া আলোচনা আরম্ভ হয়, এবং কিছু কিছু মতানৈক্য ও বিরোধ ঘটিলেও শেষে সকল জাতিই রিপোর্টের সিদ্ধান্তগুলি মূলতঃ মানিয়া লইতে স্বীকৃত হন; শান্তি যখন প্রায় স্থাপিত হইবার সম্ভাবনা হইল তখন আবার আর-একটি বিষয় লইয়া গোলযোগের সূত্রপাত হয়। জার্ম্মানী ডয়েস্-সিদ্ধান্ত অনুসারে চলিতে আরম্ভ করিবার উদ্যোগ করিলে, ফ্রান্স রুর পরিত্যাগ করিয়া আসিবেন কিনা এই প্রশ্ন লইয়া ফ্রান্সের সহিত বিরোধ বাধিয়া উঠিবার উপক্রম হয়। অনেক তর্ক-বিতর্কের পরে স্থির হয় যে লণ্ডনের বৈঠকের নির্দ্ধারিত মিলনসূত্র-অনুসারে যে নূতন সন্ধিপত্র প্রস্তুত হইল তাহা যেদিন জার্ম্মানী স্বাক্ষর করিবেন তাহার পর দিন ফ্রান্স ও বেলজিয়াম রুর ব্যতীত অন্যান্য দখলি জার্ম্মান রাজ্য ছাড়িয়া দিবেন এবং এক বৎসরের মধ্যে রুর পরিত্যাগ করিয়া আসিবে। ফরাসী জার্ম্মানিকে আল্‌সাসলোরেন ব্যতীত অপহৃত ইউরোপীয় সাম্রাজ্য ফেরৎ দিবেন লণ্ডনের সন্ধিপত্রে স্বাক্ষরিত হইয়া গিয়াছে ইউরোপের নূতন যুগের সূচনা হইল। দেখা যাউক ইহার ফলে ধ্বংসাবশিষ্ট ইউরোপ পুনর্ব্বার আপনার গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয় কি না?

শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি—আদি ব্রাহ্ম সমাজের ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি, বি-এ কর্ত্তৃক বিরচিত এবং 'আলো ও ছায়া' প্রভৃতি গ্রন্থরচয়িত্রী শ্রীমতী কামিনী রায়, বি-এ মহোদয়া লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। পৃঃ ৵+৩+২০+১৬০।' মূল্য এক টাকা।

এই গ্রন্থে ১৫টি অধ্যায়; আলোচ্য বিষয়—(১) ভগবানের আশ্বাস-বাণী, (২) ব্রাহ্মধর্ম্মের বাণী, (৩) ব্রাহ্মধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িকতা, (৪) সত্যধর্ম্ম ও উপধর্ম্ম, (৫) ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি, (৬) ব্রাহ্মধর্ম্ম-বীজ, (৭) ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ (অন্তরে), (৮) ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ (বাহিরে), (৯) সঙ্কট-মোচন, (১০) মামেকং শরণং ব্রজ, (১১) ঈশ্বর ও মানব, (১২) ঈশ্বর মঙ্গলময়, (১৩) ঈশ্বর বিশ্ববিধাতা, (১৪) মাতৃপূজা, (১৫) ঈশ্বর অন্তর্যামী।

গ্রন্থ সুলিখিত। গ্রন্থকার উদার ও অসাম্প্রদায়িক ভাবে নিজ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। যাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন, তাঁহারাই উপকৃত হইবেন।

কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে গ্রন্থকারের সহিত একমত হইতে পারি নাই।

প্রথমতঃ তিনি গীতার দুইটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন, "যখনই এবং যেখানেই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, অধর্ম্ম সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে চাহে, তখনই এবং সেখানেই সাধুদিগের রক্ষার জন্য এবং অসাধুদিগকে বিনাশ করিয়া ধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ভগবান্ প্রয়োজন-মত সময়ে সময়ে আত্মপ্রকাশ করেন।" পৃঃ ১।

ভগবান্ অসাধুদিগকে বিনাশ করেন। এ মতকে উচ্চাদর্শসম্মত বলিতে পারি না। আর তিনি 'সময়ে সময়ে' আত্মপ্রকাশ করেন এমতও সত্য নহে। সর্ব্বকালে তাঁহার প্রকাশ।

বীজমন্ত্র—ব্রাহ্ম ধর্ম্মের 'বীজ মন্ত্র' বিষয়ে গ্রন্থকার এইপ্রকার লিখিয়াছেন—

"ঋষিরা যে-সকল সত্য ব্যক্ত করিয়াছেন, সেইসকলের মূলবীজ হইতেছে—বিশ্বজগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা, নিরবয়ব, সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, আনন্দময়, অমৃতময়, শান্ত, মঙ্গল, অদ্বিতীয়, শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ পরব্রহ্মে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনরূপ একমাত্র তাঁহারই উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়। এই বীজমন্ত্রের উপরই অসাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মধর্ম্ম দণ্ডায়মান।" (৫৩—৫৪)

গ্রন্থকার যাহা বলিয়াছেন তাহা ঠিকই। কিন্তু অপর স্থলে বলিয়াছেন, "ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল প্রকৃতি হইল একেশ্বর-বাদ।" (পৃঃ ৴, নিবেদন)।

ভারতবর্ষে বহু লোকে বহু দেবতার উপাসনা করিয়া থাকে; এই-জন্যই ব্রাহ্মগণ একেশ্বরবাদের দিকে বেশী ঝোঁক দিয়াছেন। কিন্তু একেশ্বরবাদকে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল প্রকৃতি বলিলে ভুল করা হয়। জগতে বহু শ্রেণীর একেশ্বরবাদ আছে—সে-সমুদয় একেশ্বরবাদকে আমরা গ্রহণের উপযুক্ত বলিয়া মনে করি না। যদি দেখি কোন একেশ্বর-বাদের ঈশ্বর ক্রোধ-হিংসা-বিদ্বেষাদিতে পূর্ণ এবং অশুদ্ধ ও পাপবিদ্ধ, তাহা হইলে এইপ্রকার একেশ্বরবাদকে আমরা বর্জ্জন করি। এই প্রকার 'একেশ্বর' অপেক্ষা প্রেম-পবিত্রতা-পূর্ণ বহু দেবতাও শ্রেষ্ঠতর। ব্রাহ্মধর্ম্মের ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, ইহা একটি নিতান্ত সাধারণ সত্য। কিন্তু যদি বলা হয় ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল প্রকৃতি, তাহা হইলে প্রকৃত কথা বলা হয় না। ঈশ্বরের যাহা 'স্ব-রূপ', তাহার অপরাপর দিকেও দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। ঈশ্বর সংখ্যায় এক, কেবল এই দিকে ঝোঁক দিলে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি প্রকৃত ভাবে বর্ণনা করা হয় না।

লক্ষ্য—ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষ্য কি? কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়াছে? গ্রন্থকার বলেন—

"সর্ব্বাঙ্গীন পরাধীনতা হইতে অধর্ম্মের করাল কবল হইতে মুক্তি দিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রেরিত হইয়াছে" (১৩)।

"প্রাচীন পন্থাকে সংস্কৃত করিয়া তাহাতে নবীনযুগের নবীন আলোক, নবীন ভাব প্রবেশ করাইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম মুক্তির নবতর পন্থা দেখাইতে চাহেন" (১৯)।

"একদিকে স্বাধীনতার পথ দেখাইবার জন্য, অপর দিকে সংশয়-সন্দেহ হইতে মুক্তি দিবার জন্যই বর্ত্তমান যুগে ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাব" (২১)

"ভগবান্ সমগ্র জগতকে পরাধীনতা হইতে মুক্তি দিবার জন্যই...... ব্রাহ্মধর্ম্মকে......পাঠাইয়াছেন" (৩)।

ব্রাহ্মধর্ম্ম কেন আসিয়াছে?

"মুক্তি দিবার জন্যই"। ইহার অর্থ 'মুক্তি দেওয়াই একমাত্র লক্ষ্য"।

কিন্তু আমাদিগের মনে হয় মুক্তিই ব্রাহ্মধর্ম্মের শেষ কথা নহে। যাঁহারা মনে করেন "মানবাত্মাই ব্রহ্ম"—তাঁহারা অবশ্যই বলিবেন মুক্তিই একমাত্র লক্ষ্য। তাঁহাদের মতে সংসারাবস্থা বন্ধনের অবস্থা; বন্ধন মোচন কর, মানব আবার ব্রহ্মই হইবে; মুক্তির অবস্থাই ব্রহ্মাবস্থা। কিন্তু গ্রন্থকার এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রায় সকলেই বলেন, মানবাত্মা সৃষ্ট এবং অনন্ত উন্নতিশীল। মানবাত্মা ব্রহ্মত্বের অভিমুখে অগ্রসর হইবে, কিন্তু কখনই 'স্বরূপ' বর্জ্জন করিয়া ব্রহ্মত্ব লাভ করিবে না এবং ব্রহ্মে লীন হইবে না। এই মানবাত্মা নানাপ্রকার বন্ধনে আবদ্ধ রহিয়াছে; এসমুদায় বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতেই হইবে। কিন্তু বাধা-বিঘ্ন, শোক-তাপ, দুর্গতি-দুর্ম্মতি প্রভৃতি হইতে মুক্তি লাভ করিলেই যে মানবাত্মার পূর্ণ বিকাশ হইল তাহা নহে। মুক্তিলাভের পর অগ্রসর, আরও অগ্রসর। মুক্তাত্মা প্রীতি ও ভক্তিতে, কর্ম্মে ও জ্ঞানে দিন দিনই অগ্রসর হইতে থাকেন। তিনি নিজের কেন্দ্রকে ব্রহ্মের কেন্দ্রের সহিত একীভূত করেন এবং দিন-দিনই আত্মার পরিধিকে বিস্তৃত করেন। ব্রহ্ম যে-চক্ষুতে জগৎকে দর্শন করেন, তাঁহার লক্ষ্য তিনিও যথাসম্ভব সেই চক্ষুতে জগৎকে দর্শন করিবেন। ব্রহ্ম যে-ভাবে জগতের কল্যাণ সাধন করেন তাঁহার লক্ষ্য, তিনিও যথাসম্ভব সেই-ভাবে জগতের কল্যাণ সাধন করিবেন। তাঁহার লক্ষ্য তিনি সর্ব্বাবস্থাতে ব্রহ্মকে

অনুভব করিবেন এবং ব্রহ্মের সহিত যুক্ত থাকিয়া ব্রহ্মকে এবং জগৎকে সম্ভোগ করিবেন।

অপরাপর মুখ্য বিষয়ে গ্রন্থকারের সহিত আমাদিগের বিশেষ মতভেদ নাই।

ঋগ্বেদ, প্রথম ভাগ। পৃঃ ৮৶+২৬৪; মূল্য ২॥০

বৈদিক সরস্বতী ও লক্ষ্মী। পৃঃ ॥/০+৭৭; মূল্য ।০

গ্রন্থকার শ্রী দ্বিজদাস দত্ত (কান্দিরপাড়, কুমিল্লা)।

উভয় পুস্তকেই গ্রন্থকার অনেক পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস, ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডল হইতে আরম্ভ করিয়া দশম মণ্ডল পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই সর্ব্বোচ্চ একেশ্বরবাদ; পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বেদের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই; স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন এবং এইজন্য স্বামী দয়ানন্দের পন্থা অবলম্বন করিয়া গ্রন্থকার এই গ্রন্থদ্বয় রচনা করিয়াছেন। আমরা গ্রন্থকারের প্রণালীকে প্রকৃত প্রণালী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। উত্তর কালে যে-সমুদায় মত প্রচলিত হইয়াছিল, গ্রন্থকার প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ঋগ্বেদেই সেই-সমুদায় মত পাওয়া যায়। একই ব্যক্তি—তাহারই মতের কত পরিবর্ত্তন। যাঁহারা সমসাময়িক, যাঁহারা একদেশবাসী, একনগরবাসী বা একগ্রামবাসী, যাঁহারা একই গৃহে বাস করেন তাঁহারাই একমত হইতে পারেন না আর সুবিস্তীর্ণ বৈদিক যুগের সমুদায় ঋষি একই মত পোষণ করিতেন ইহা অসম্ভব কল্পনা। ঐতিহাসিক প্রণালী অবলম্বন না করিলে বৈদিক ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হওয়া সম্ভব নহে।

গ্রন্থকার সংযত ভাষায় প্রতিপক্ষদিগের মতামত সমালোচনা করিতে পারেন নাই।

ভগবানের পথে। পৃঃ ৫৫; মূল্য ।০; প্রাপ্তিস্থল—চন্দননগর, প্রবর্ত্তক-অফিস।

নামেই প্রকাশ—পুস্তিকার বিষয় ধর্ম্ম।

পরলোক-তত্ত্ব—(প্রথম খণ্ড); শ্রী দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত। পৃঃ ৸০+২৩২। মূল্য ১৲

গ্রন্থকার যে-সমুদয় ঘটনাকে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান নাম দিয়াছেন, এখনও সে-সমুদয়কে ভূতের গল্প বলিয়া গ্রহণ করিতে হইতেছে। গ্রন্থকার বলেন এসমুদয় শত শত প্রবীণ প্রখরবুদ্ধি শ্রেষ্ঠতম বৈজ্ঞানিকের দ্বারা প্রত্যক্ষীভূত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত সত্যরূপে পরিগৃহীত বিষয়। (পৃঃ ৫৫)।

অন্ততঃ ৪।৫ শত না হইলে 'শত শত' হয় না। ৪।৫ শত ত দূরের কথা, গ্রন্থকার এইপ্রকার ২০ জন লোকেরও নাম করিতে পারেন না।

যাঁহারা প্রেতবাদী গ্রন্থকার কেবল তাঁহাদেরই কোন-কোন গ্রন্থ পড়িয়াছেন। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে বলিবার কি আছে তাহা না জানিলে প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। একপক্ষের সাক্ষ্যদ্বারা বিচার করিলে সুবিচার হয় না। কিন্তু গ্রন্থকার তাহাই করিয়াছেন।

প্রেততত্ত্বের সত্যাসত্য নিরূপণ করিতে হইলে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি পাঠ করা আবশ্যক—

(১) A Public Debate between Conan Doyle and McCabe (Watts).
(২) Is Spiritualism based on Fraud? by McCabe.
(৩) Spirit Experiences by Dr. Mercier.
(৪) Spiritualism and Sir Oliver Lodge by Dr. Mercier.
(৫) The Question by Clodd.
(৬) Studies in Spiritism by Tanner. ইত্যাদি

আমরা পরলোকে এবং আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করিতে পারি। কিন্তু ইহা প্রমাণ করিবার জন্য অসার যুক্তিকে সার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না।

ধর্ম্মযোগ; 'তত্ত্ব-বিজ্ঞান' প্রণেতা শ্রী প্রকাশচন্দ্র ন্যায়-বাগীশ, বি-এ, প্রণীত। পৃঃ ৷৶+১০+২+২০৬+২। মূল্য ১।০

গ্রন্থের ছয়টি অধ্যায়; বিষয় (১) ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে কয়েকটি কথা; (২) ধর্ম্ম, ধর্ম্মলাভ ও ধর্ম্মজীবন; (৩) ব্রহ্ম, জীব ও ব্রহ্মজ্ঞান; (৪) ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায়; (৫) মোক্ষ এবং (৬) ধর্ম্মের একত্ব।

গ্রন্থকার এই পুস্তকে নানা শাস্ত্র ও নানা ধর্ম্মের ব্যাখ্যা ও সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। উদ্দেশ্য প্রশংসনীয়; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তিনি শাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বুদ্ধের ধর্ম্মের ও যীশুর ধর্ম্মের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহা প্রকৃত ব্যাপার নহে। উপনিষৎ, গীতা ও পুরাণাদির ব্যাখ্যাও বহুস্থলে বিকৃত।

আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ—(মার্গাঙ্গ দীপনী নাম্নী ব্যাখ্যাসহ) এবং আনাপান দীপনী (বা শ্বাস-প্রশ্বাস অবলম্বনে সমাধি ও বিদর্শন ভাবনা); ডাক্তার শ্রী বীরেন্দ্রলাল বড়ুয়া কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও ব্যাখ্যাত। প্রকাশক বি, এল, বড়ুয়া এণ্ড কোং, মিনার্ভা মেডিকেল হল, সিল্‌ভার ষ্ট্রীট, আকিয়াব। পৃঃ ১০+১৪৭; মূল্য ১৲

গোতম বুদ্ধ নির্ব্বাণপ্রাপ্তির যে-পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহার নাম "আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ।" পালি পিটকের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই মার্গের বিবরণ পাওয়া যায়। বঙ্গভাষায় এবিষয়ে আর-কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। ডাক্তার বড়ুয়াই সর্ব্বপ্রথমে এইপ্রকার গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু গ্রন্থ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই। গ্রন্থে অনেক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে যাহা সাধারণের বোধগম্য হইবে না; এসমুদয়ের ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত ছিল। গ্রন্থকার অনেক পালি উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন; কিন্তু কোন্‌কোন্ স্থান হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা লেখেন নাই।

গ্রন্থে অনেক অবান্তর ও অন্ধবিশ্বাসের কথা আছে। আমরা সে-সমুদয় পড়িয়া সুখী হইতে পারিলাম না।

গ্রন্থকারের বিশ্বাস, ত্রিপিটক মাগধী ভাষায় লিখিত। কথাটি ঠিক নহে। ত্রিপিটকের ভাষা পালি; পালি ও মাগধী এক ভাষা নহে।

গ্রন্থকার আমাদিগকে বুঝিতে দিয়াছেন যে গোতম, আলাড় কালাম এবং রামপুত্র উদ্দকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে তিনি উভয়েরই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন (মজ্‌ঝিম নিকায়, অরিয়-পরিবেসন-সুত্তম্)।

গ্রন্থকার একস্থলে বলিয়াছেন, "বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিলেন, রুদ্রকের শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা অতি তুচ্ছ, অতি অকিঞ্চিৎকর" (পৃঃ ৭০)।

ইহাও প্রকৃত কথা নহে। গোতম বলিয়াছিলেন যে, কেবল রামপুত্রেরই যে শ্রদ্ধা বীর্য্য স্মৃতি ও সমাধি আছে তাহা নহে; এসমুদয় আমারও আছে (অরিয়-পরিবেসন-সুত্তম্)।

গ্রন্থে ভুল-ভ্রান্তি থাকিলেও পাঠকগণ ইহা পাঠ করিয়া আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের মৌলিক তত্ত্ব জানিতে পারিবেন।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

শিথিল-কবরী—শ্রীব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ১০৪।৩ বলরাম দে ষ্ট্রীট হইতে শ্রীজীবনকৃষ্ণ সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১।০, পৃঃ ১৫৩ (১৩৩০)।

গ্রন্থখানি সামাজিক উপন্যাস। বইখানির প্লটটি ভাল, তবে শেষের দিকে গোলমেলে হইয়া গিয়াছে। মোটের উপর বইখানি আমাদের মন্দ লাগে নাই। ছাপা ও বাঁধাই মনোরম।

ব্যথিতা—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সাহা প্রণীত। ৮৬নং টালীগঞ্জ রোড হইতে শ্রীমতী প্রীতিঅঞ্জলি সাহা কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১্ টাকা, পৃঃ ১১৬, (১৩৩০)।

এই ক্ষুদ্র উপন্যাসখানিতে লেখক একটি পতিব্রতা নারীর সপত্নীর জন্য সর্ব্বস্বত্যাগের কথা সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই পুস্তকের লভ্যাংশ নিখিল ভারত অনাথ-আশ্রমে প্রদত্ত হইবে। বইখানির ছাপা ও বাঁধাই চমৎকার।

গল্পের আরম্ভ—শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। আর্য্য পাব্‌লিশিং হাউস্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পৃঃ ৯৯, মূল্য এক টাকা।

বইখানিতে পাঁচটি গল্প আছে :—(১) গল্পের আরম্ভ, (২) কালো বউ, (৩) গল্পের আর্ট, (৪) রক্তের লেখা, (৫) প্রিন্স্ অফ্ দি প্রিমরোজ্ গে। এই পাঁচটি গল্পই 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল ও জনসাধারণের সমাদরও লাভ করিয়াছিল। গল্পগুলি বেশ ভাল হইয়াছে। বইখানি অতি সুন্দর কাগজে ছাপা ও সর্ব্বসাধারণের মনের মত করিয়া বাঁধানো। প্রচ্ছদপটটি চমৎকার হইয়াছে।

ছোটদের কৃত্তিবাস (সচিত্র)—শ্রীশিশিরকুমার নিয়োগী সম্পাদিত। ২ কলেজ স্কোয়ার হইতে বরদা এজেন্সী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পৃঃ ৭৮, মূল্য পাঁচ সিকা, (১৩৩০)।

বইখানি কবি কৃত্তিবাস-রচিত রামায়ণের একটি সরল ও সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। পুস্তকখানি যে ছোটদের মনোরঞ্জন করিতে পারিবে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। কৃত্তিবাসের মূল বজায় রাখিয়া ছেলেদের উপযোগী সংক্ষিপ্ত করার কল্পনাই অভিনব ও প্রশংসনীয়। সম্পাদনে যত্ন ও কৃতিত্ব আছে। প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনাটি সুন্দর হইয়াছে।

প্র

বিরহিণী

শ্রী রমেশচন্দ্র দাস

কাল রাতে ঘুম হ'তে উঠিলাম জাগি',
সহসা অন্তর মোর কার কথা লাগি'
উঠিল কাঁদিয়া। চাহিলাম শূন্য-পানে,
কে যেন চাহিয়া আছে করুণ নয়ানে
মোর আঁখি-পানে। মনে হ'ল বিশ্বে এই
যত ব্যথা উঠিয়াছে প্রতি মুহূর্ত্তেই
যত বক্ষ হ'তে,—আজ তারা সারি সারি
কোন্ দূর প্রান্ত পানে দেবে বুঝি পাড়ি!
নীলাম্বরী পরি' যেন কোন্ উদাসিনী
চলিয়াছে,—যেন এক করুণ কাহিনী!
মনে হ'ল ওর লাগি' বাহিরিবে কবে
মোর ব্যথা? একে একে চলে যায় সবে,
আমি শুধু পড়ে' রই লয়ে আকুলতা;
বেড়ে যায় রজনীর তীক্ষ্ণ নীরবতা!
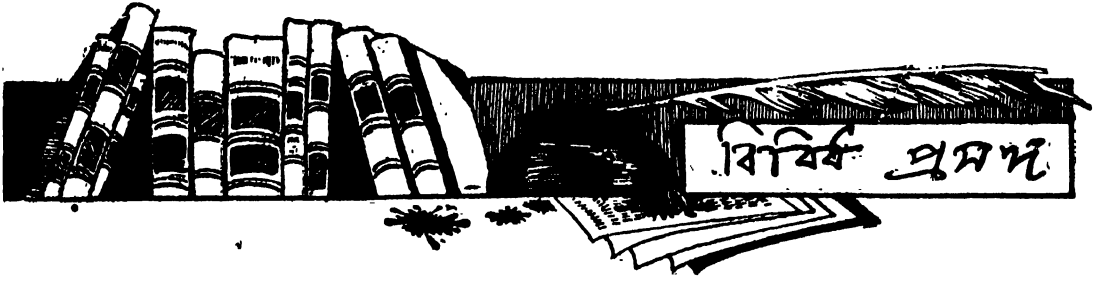
প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব

১৯১৯ সালের নূতন ভারতশাসন আইন-অনুসারে সমগ্র ভারতে ও প্রদেশগুলিতে যেরূপ শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে ছোট-ছোট পরিবর্ত্তন কিরূপ হইলে কাজের আরও সুবিধা হয়, তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। এই কমিটির সমক্ষে প্রদত্ত সাক্ষ্যে অনেকেই প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব চাহিতেছেন এবং অন্য অনেক-রকম পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন জানাইতেছেন।

প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব যে দরকার তাহাতে সন্দেহ নাই। এই উপলক্ষ্যে অন্য-একটি বিষয়ের আলোচনা করা আবশ্যক। প্রাদেশিক আত্ম-কর্তৃত্ব না পাওয়া গেলেও এই বিষয়টি আলোচনা করিবার প্রয়োজন ছিল, এবং তাহা করা হইয়াছেও।

বর্ত্তমানে অনেকগুলি প্রদেশের সীমা যেরূপ আছে, তাহার পরিবর্ত্তন আবশ্যক। উৎকলীয়েরা অনেকদিন হইতে বলিয়া আসিতেছেন, যে, তাঁহাদের বাসভূমির কিয়দংশ বাংলা, কিয়দংশ মান্দ্রাজ, কিয়দংশ মধ্যপ্রদেশ ও কিয়দংশ বিহারের সহিত যুক্ত হইয়া আছে। তাহাতে তাঁহাদের সম্যক্ উন্নতি হইতে পারিতেছে না। তাঁহারা জ্ঞান ও শিক্ষা-বিস্তার, সাহিত্য, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, প্রভৃতি কোন দিকেই উৎকলের উন্নতির জন্য আপনাদের সমবেত শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা সর্ব্বত্র সংখ্যায় ন্যূন বলিয়া কোন প্রদেশের গবর্ণমেণ্টই তাঁহাদের কথায় যথেষ্ট মন দেন না, সুতরাং তাঁহাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না।

বাংলা দেশের সীমার নিকট প্রাকৃতিক বঙ্গের যে সকল জেলা অবস্থিত, তাহার কোন-কোনটি অন্য কোন-কোন প্রদেশের সহিত যুক্ত হইয়াছে। যেমন শ্রীহট্ট জেলা। বহুশতাব্দী ধরিয়া এই জেলায় বাংলা ভাষা প্রচলিত এবং ইহার অধিবাসীরা বাঙালী। কিন্তু ইহা আসামের অন্তর্ভূত, সম্প্রতি আসাম প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় এই জেলাকে বঙ্গের অন্তর্ভূত করিবার অনুকূলে এক প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছে।

বাংলার আর-একটি জেলার দৃষ্টান্ত লওয়া যাক্। ১৯১১ সালের পূর্ব্বপর্য্যন্ত এই জেলা বাংলা প্রদেশের সহিত যুক্ত ছিল। এই ব্যবস্থা সকল দিক্ দিয়া স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত ছিল। কেননা, ইহার অধিকাংশ অধিবাসী বাঙালী ও তাহাদের ভাষা বাংলা।

প্রদেশগুলি আত্মকর্তৃত্ব পাইলে প্রত্যেক প্রদেশের লোকদের এখন যতটুকু ক্ষমতা আছে, তাহা বাড়িবে; তাহারা প্রাদেশিক সকল রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কর্ত্তা হইবে। যে-যে প্রদেশে উৎকলীয়েরা অল্প-অল্প করিয়া আছে, তথায় তাহাদের অসুবিধা বাড়িবে। মানভূমের মত বাঙালী-প্রধান জেলাকে বিহারের সঙ্গে যুক্ত রাখিলে, মানভূম-বাসী বাঙালীদের অসুবিধা স্থায়ী করা হইবে। এইজন্য, আমাদের মনে হয়, প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্বের ব্যবস্থা করিবার পূর্ব্বে সমগ্র ওড়িষ্যাকে একটি প্রদেশে পরিণত করা উচিত, বাংলা সামান্তবর্ত্তী সব বাঙালী-প্রধান স্থান-গুলিকে বাংলা-প্রদেশের সহিত যুক্ত করা উচিত, এবং ভারতবর্ষের আর যে-যে প্রদেশে এইরূপ পরিবর্ত্তন আবশ্যক তাহা করা কর্ত্তব্য।

—

ঘোড়দৌড়ের জুয়াখেলা

জুয়াখেলা আইন-অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু ঘোড়দৌড়ের জুয়াখেলা দণ্ডনীয় নহে। কারণ ইহাতে বড়লাট হইতে আরম্ভ করিয়া সব বড়-বড় রাজপুরুষ যোগ দিয়া থাকেন, এবং ইংলণ্ডের রাজা ও যুবরাজ এইরূপ খেলার মুরুব্বি। ঘোড়দৌড়ে আমাদের আপত্তি নাই, কিন্তু তৎসংক্রান্ত জুয়াখেলায় আপত্তি আছে।

ইহাতে বিস্তর লোকের আর্থিক সর্ব্বনাশ ও নৈতিক অধোগতি হইয়াছে। এইজন্য ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার একজন দেশী সভ্য এই জুয়াখেলার বিরুদ্ধে একটি আইনের পাণ্ডুলিপি তৈয়ার করিয়া তাহা সভায় উপস্থিত করিবার নিমিত্ত বড়লাটের অনুমতি চাহিয়াছিলেন। তিনি অনুমতি দেন নাই। তাহার কারণ নাকি এই, যে, ঘোড়দৌড়ে কোন্ ঘোড়া জিতিবে তাহা স্থির করিয়া তাহার উপর বাজি রাখা দক্ষতা-সাপেক্ষ। যাহা দক্ষতা-সাপেক্ষ, তাহাতে জিত আকস্মিক নহে, সুতরাং তাহা জুয়াখেলা নহে, ইহা বলাই বোধ হয় বড়লাটের অভিপ্রায়। কিন্তু অন্য যত-রকমের জুয়াখেলা আছে, তাহাতেও পাকা জুয়াড়িরা দক্ষতা দ্বারা জিতে। তাহাদের জয়লাভ কেন দণ্ডনীয় বিবেচিত হয়?

মেদিনীপুর বিধবাবিবাহ-সমিতি

১৯২৩ সালের এপ্রিল মাসে মেদিনীপুর বিধবাবিবাহ সমিতি স্থাপিত হয়। তখন হইতে এপর্য্যন্ত এই সমিতির শুভ চেষ্টায় বাইশটি বিধবার বিবাহ হইয়াছে। এইরূপ সমিতি সকল জেলায় স্থাপিত হওয়া উচিত। মেদিনীপুর সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভাগবতচন্দ্র দাসের মত উদ্যোগী লোক সর্ব্বত্র থাকিলে সকল সমিতিই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন।

নূতন ভারতীয় মহিলা মাজিষ্ট্রেট্

বৎসরাধিক কাল পূর্ব্বে মান্দ্রাজের সৈদাপেটে শ্রীমতী মার্গারেট্ কাজিন্স্ অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট্ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি মান্দ্রাজের মদন পল্লেতে শ্রীমতী জয়লক্ষ্মী আম্মল্ বি-এ, অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট্ নিযুক্ত হইয়াছেন। ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে ইঁহার পূর্ব্বে বোম্বাইয়ে লেডী জগমোহনদাস বরজীবনদাস, লেডী কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর এবং দিল্‌শাদ্ বেগম অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট্ নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

দেশ-বিদেশের এইরূপ খবর আমরা অনেক দিয়া থাকি। তাহার উপর আমরা অনেক সময় কোন মন্তব্য প্রকাশ করি না। সাধরণতঃ তাহার একটা কারণ এই, যে, যদিও আমরা বিশ্বাস করি, যে, জগতে পুরুষ ও নারীর দৈহিক গঠন, প্রকৃতি ও কার্য্যক্ষেত্রের কিছু পার্থক্য আছে, তথাপি কোন্-কোন্ বৃত্তি, ব্যবসায়, কার্য্য ইত্যাদি কেবলমাত্র পুরুষদের এবং কোন্‌গুলিই বা কেবলমাত্র নারীদের উপযোগী, অধিকাংশ স্থলে তাহা আমরা জানি না। পৃথিবীর বয়স নিতান্ত কম নয়; কিন্তু তথাপি পুরুষ ও নারীর কার্য্যবিভাগ-সম্বন্ধে এখনও মানুষের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা জন্মে নাই। এই কারণে আমরা নারীগণকে নূতন কিছু করিতে দেখিলেই, সৃষ্টিলোপের আশঙ্কা করি না—যদিও আমাদের প্রকৃতিগত রক্ষণশীলতা-বশতঃ সকলস্থলে উল্লসিতও হইতে পারি না। সম্ভবতঃ তাহা আমাদের দোষ।

রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত কাজ যখন যে-দেশে নারীরা করিয়াছেন, তাঁহারা তখনই তাহাতে অসামর্থ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহা ত বলা চলেই না; বরং ইহাই সত্য, যে, অনেক রাজ্ঞী ও সম্রাজ্ঞী আপনাদিগকে দক্ষতম রাজা ও সম্রাট্‌দের সমশ্রেণীস্থ বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। সুতরাং ঘরের বাহিরের কোনও কাজ নারীদের উপযোগী নহে, বা তাহাতে তাঁহাদের নারীত্বের ব্যত্যয় হইবে, ইহা মানিয়া লইতে পারা যায় না। বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্র ত লক্ষ লক্ষ বৎসর পুরুষদের প্রায় একচেটিয়া ছিল। তাহাতে মানব-সমাজের মধ্য হইতে নানা গুরুতর দোষ-ত্রুটি অন্তর্হিত হয় নাই এবং শ্রী, শুচিতা ও স্বাস্থ্যের পূর্ণ বিকাশ হয় নাই। গৃহস্থালীর বাহিরের কার্য্যক্ষেত্রে নারী পুরুষের সহকারিণী হইলে মানব-জাতির উন্নতির পথ অধিকতর সুগম হইতে পারে কি না, তাহা পরীক্ষা করিলে ক্ষতি নাই। সৃষ্টিসৌধের ভিত্তি এত কাঁচা নয়, যে, এই পরীক্ষায় সৃষ্টি-লোপের আশঙ্কা ঘটিবে।

নারীর আর্থিক স্বাধীনতা

পুরুষদের বেলায় আমরা ইহা সবাই স্বীকার করি, যে, পরমুখাপেক্ষিতায় তাহাদের মনুষ্যত্ব খর্ব্ব হয়, এবং স্বাবলম্বী হইতে পারিলে তাহাতে চারিত্রিক উৎকর্ষের অধিকতর সম্ভাবনা ঘটে। নারীদের বেলায় কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে সকল দেশেই বিলম্ব ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে।

কিন্তু ইহা ধ্রুব সত্য, যে, স্বাবলম্বন নারীদের পক্ষেও মঙ্গলজনক। শৈশব হইতে বার্দ্ধক্যে মৃত্যু-পর্য্যন্ত নারীর পরমুখাপেক্ষী থাকা ভাল নয়। কোন প্রকৃতিস্থ পিতা, স্বামী, ভ্রাতা, বা পুত্র মনে করেন না, যে, তিনি অনুগ্রহ করিয়া কন্যা, পত্নী, ভগিনী, বা মাতার ভরণ-পোষণ করিতেছেন; ইহা সত্য। কিন্তু ইহাও সত্য, যে, সকল পিতা, স্বামী,ভ্রাতা বা পুত্র প্রকৃতিস্থ বা আদর্শস্থানীয় নহে। নারী-মাত্রেরই সকল সময়ে ঐরূপ নিকট-সম্পর্কীয় আত্মীয় থাকে না। নারীর স্বাবলম্বনের উপায় থাকিলেই তিনি পিতার স্নেহ, পতির প্রেম, ভ্রাতার প্রীতি, ও পুত্রের ভক্তি হইতে বঞ্চিত হন না। সুতরাং নারীর স্বাবলম্বিনী হইবার জন্য তাঁহার উপার্জ্জনের ক্ষেত্র বিস্তৃততর হওয়া ভাল। পরিবারের সহিত যুক্ত থাকিয়া উপার্জ্জন করিতে পারা নারী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষেই মঙ্গলকর।

যুদ্ধ বর্ব্বর অবস্থার চিহ্ন—বিলীয়মান চিহ্ন বলিতে পারিলে সুখী হইতাম। পুরুষদের অন্য নানা কর্ম্মক্ষেত্রে নারীর প্রবেশ বাঞ্ছনীয় কি না, তাহার আলোচনা করিতে পারা যায়; কিন্তু যুদ্ধ করা যে নারীর কাজ নয়, সে-বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। পুরুষদিগকেও যখন যুদ্ধ করিতে হইবে না, তখন বুঝিব মানুষ সভ্য হইয়াছে।

তীর-ধনুক খেলা

বহুশতাব্দী পূর্ব্বে সভ্য জাতিরাও যুদ্ধের জন্য তীর-ধনুক ব্যবহার করিত। এক্ষণে কোন সভ্য জাতি যুদ্ধের জন্য, এমন কি শিকারের জন্যও, তীর-ধনুক ব্যবহার করে না। কিন্তু ব্যায়াম, ক্রীড়া, ও লক্ষ্য-ভেদ শিক্ষার জন্য পাশ্চাত্য বহু সভ্য দেশে ও জাপানে এখনও তীর-ধনুক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য বহুদেশে স্ত্রীলোকেরাও এইসকল উদ্দেশ্যে তীর-ধনুক ব্যবহার করিয়া থাকে। প্রয়োজন-মত মনের চাঞ্চল্য নিবারণ করিয়া একাগ্রতা উৎপাদনেরও সাহায্য এই খেলায় হয়।

আমরা অনেক সময় চিন্তা না করিয়াই কতকগুলি কাজকে কেবলমাত্র পুরুষোচিত বলিয়া ধরিয়া রাখি; যেমন অশ্বারোহণ। অথচ অন্য দেশের কথা ছাড়িয়া

সমস্ত সপ্তাহ টাইপিষ্টের কাজ করিয়া, রবিবারে শ্রীমতী সিমন্ ব্রানে তীরধনুক খেলা অভ্যাস করেন (প্যারিস)

দিয়া ভারতবর্ষেই দেখা যায়, যে, মহারাষ্ট্রে বহু সম্ভ্রান্ত মহিলারা পর্য্যন্ত অশ্বারোহণে নিপুণ ছিলেন। ইহার দৃষ্টান্ত ফ্যানী পার্ক্‌সের ভারতভ্রমণ পুস্তকে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়েও মহারাষ্ট্রে ও অন্য অনেক অঞ্চলে নারীরা ঘোড়ায় চড়িয়া থাকেন। দার্জিলিঙে অনেক বাঙালীর মেয়েও ঘোড়ায় চড়েন। যাঁহারা এসব কথা জানেন, তাঁহাদের নিকট বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে শান্তির অশ্বারোহণ বা রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদায়, চিত্রাঙ্গদার ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা অদ্ভুত ঠেকিবে না।

পেন্স্যন্‌ভোগীদের বন্ধন

সর্‌কারী কর্ম্মচারীরা যতদিন চাকরী করেন, ততদিন বেতন-ডোরে বাঁধা থাকেন। চাকরী হইতে অবসর লইবার পরও তাঁহাদিগকে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা দিবার ইচ্ছা মান্দ্রাজ ও বোম্বাই গবর্ণ্‌মেণ্টের নাই। উভয় গবর্ণ্‌মেণ্ট্‌ হুকুম জারি করিয়াছেন, যে, যদি গবর্ণ্‌মেণ্টের পেন্স্যনারগণ গবর্ণ্‌মেণ্টের বিরোধী কোন আন্দোলনে যোগ দেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে সাবধান না করিয়াই তাঁহাদের পেন্‌স্যন্‌ বন্ধ করা হইবে। কোন্‌-কোন্‌ আন্দোলন গবর্ণ্‌মেণ্ট্‌-বিরোধী তাহা বলা হয় নাই; বলা হইয়াছে, যে, প্রত্যেক দোষী ব্যক্তির বিচার তৎকৃত কার্য্য-অনুসারে হইবে। ইহার মানে, গবর্ণ্‌মেণ্ট্‌ যাহা খুসী তাহাই করিবেন; স্বকৃত কোন সংজ্ঞার বাধাও রাখিতে চান না।

একটা মত আছে, যে, পেন্স্যন্‌টা "ডেফার্ড্‌ পে"; অর্থাৎ উহা বেতনের বিলম্বে-প্রদত্ত অংশমাত্র। ইহা সত্য হইলে, মানুষ যখন আর চাকরী করিতেছে না, তখন কেন তাহাকে তাহার ন্যায্য পাওনা হইতে বঞ্চিত করা হইবে! চাকরী করিবার সময় যদি কাহারো দোষ-ত্রুটি হয়, তাহা হইলে তাহার বেতন কাটা যাইতে পারে। কিন্তু যখন চাকরী শেষ হইয়া গিয়াছে, এবং দস্তুরমত কর্ত্তব্য করিয়া যখন কোন কর্ম্মচারী বেতনের অংশস্বরূপ পেন্স্যন্‌ পাইবার অধিকারী হইয়াছেন, তখন তাঁহাকে চাকরীর সহিত সম্পর্কবিহীন কোন কারণে পেন্স্যন্‌ হইতে বঞ্চিত করা অন্যায়।

যদি এরূপ কোন নিয়ম থাকিত, যে, সর্‌কারী চাকরীতে প্রবৃত্ত হইবার সময় কর্ম্মচারীদিগকে আমরণ দাসখত লিখিয়া দিতে হইবে, তাহা হইলে মান্দ্রাজ ও বোম্বাই গবর্ণ্‌মেণ্টের আদেশ, ধর্ম্মসঙ্গত না হইলেও নিয়ম-সঙ্গত হইত; কিন্তু সেরূপ দাসখত কোন সর্‌কারী কর্ম্মচারী লিখিয়া দেয় না। এরূপ দাসখত চাওয়াও অনুচিত। কিন্তু হয়ত অতঃপর ভারতের সর্ব্বত্র মান্দ্রাজ-বোম্বাইয়ের মত হুকুম জারি হইবে, এবং ভবিষ্যতে সকল সর্‌কারী কর্ম্মচারীর নিকট হইতে দাসখতও লওয়া হইবে।

মুদ্রা-যন্ত্র-আইনের নূতন অবতার

কয়েক বৎসর এরূপ আইন ছিল যাহার বলে ম্যাজিষ্ট্রেটেরা বিনা বিচারে মুদ্রাযন্ত্রের মুদ্রাকর ও সংবাদপত্রাদির প্রকাশকদিগের নিকট হইতে বিনা বিচারে অনেক টাকা জামীন লইতে পারিতেন। কখন কখন তাঁহারা বিনা বিচারে প্রেস্‌ বাজেয়াপ্ত করিতেও পারিতেন। গবর্ণ্‌মেণ্টের বিরাগভাজন খবরের কাগজগুলাকে দুর্ব্বল করিবার বা তাহাদের উচ্ছেদসাধন করিবার এইসব অস্ত্র এখন গবর্ণ্‌মেণ্টের হাতে নাই। কিন্তু তাহা না থাকিলেও অন্য অস্ত্রের অভাব নাই। কিছুকাল পূর্ব্বে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ধারোয়ারে পুলিস্‌ জনতার উপর গুলি চালায়। সেই ঘটনা-সম্বন্ধে বোম্বাই ক্রনিক্‌ল্‌ নামক ইংরেজী দৈনিকে প্রবন্ধ বাহির হয়। তজ্জন্য ধারোয়ারের ম্যাজিষ্ট্রেট্‌, পুলিস্‌ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্‌ ও পুলিস্‌ সব্‌-ইন্‌স্‌পেক্টর, ঐ কাগজের বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দমা করেন, তাহাতে হাইকোর্টের বিচারে উক্ত তিন রাজকর্ম্মচারী ক্ষতিপূরণস্বরূপ যথাক্রমে ১৫,০০০, ৮,০০০ ও ৫,০০০ টাকা পাইয়াছেন। শেষোক্ত দুজন ঐ টাকার সুদও পাইবেন। তা ছাড়া প্রতিবাদীকে বাদীদের মোকদ্দমার ব্যয়ও দিতে হইবে। তদ্ভিন্ন বোম্বাই ক্রনিক্লের আত্মপক্ষ সমর্থনের ব্যয়ও হইয়াছে। সুতরাং মোটের উপর ঐ কাগজখানির পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে বলিতে হইবে। হয়ত উহার মূলধন বেশী বলিয়া উহা টিকিয়া

শ্রী নরসিংহ চিন্তামন কেলকার—সম্পাদক, "কেশরী"

আছে, কিন্তু সাধারণতঃ এরূপ অর্থদণ্ড দিয়া টিকিয়া থাকা ভারতীয় সংবাদপত্রসকলের পক্ষে দুঃসাধ্য।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে এইরূপ অর্থদণ্ডের আধুনিক দৃষ্টান্ত আরও আছে। "কেশরীর" সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরসিংহ চিন্তামন কেল্‌কারকে পাঁচ হাজার টাকা দিতে হইয়াছে। তা ছাড়া তাঁহার আত্মপক্ষ সমর্থনের ব্যয় আছে। সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে চাঁদা তুলিয়া এই ৫,০০০ টাকা দিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু কেলকার মহাশয় প্রস্তাবকদিগকে ধন্যবাদ দিয়া জানাইয়াছেন, যে, "কেশরী" নিজের বোঝা নিজেই বহন করিবে।

সরকারী বিচারকগণ আগেকার প্রেস্-নিগ্রহ-আইনের অভাব গবর্ণমেণ্টকে অনুভব করিতে দিতেছেন না।

—

বাংলা গবর্ণমেণ্টের হারজিত

বাংলা গবর্ণমেণ্ট্ মন্ত্রীদের বেতন মঞ্জুর করাইবার জন্য আবার তদ্বিষয়ক প্রস্তাব ব্যবস্থাপক সভার সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছিলেন; কিন্তু মঞ্জুরীর পক্ষে অপেক্ষা বিপক্ষে দুই ভোট বেশী হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট্ পরাজিত হইয়াছেন।

প্রস্তাবের বিপক্ষে যাঁহারা ভোট দিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই এক-কারণে ঐরূপ ভোট দেন নাই। স্বরাজীরা দ্বৈরাজ্যের অর্থাৎ ডায়ার্কির বিনাশ-সাধনের জন্য ভোট দিয়াছিলেন; যাঁহারা স্বরাজী নহেন, তাঁহাদের কেহ-কেহ মন্ত্রী ফজলল হক্ ও গজনবীর উপর আস্থা না থাকায় ভোট দিয়াছিলেন। এইজন্য আমাদের মনে হয়, যে, গবর্ণমেণ্ট্ যদি ঐ দুইজন মন্ত্রীর বেতন এবং তৃতীয় মন্ত্রীর বেতন আলাদা করিয়া মঞ্জুর করাইবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে শেষোক্ত মন্ত্রীর বেতন মঞ্জুর হইতে পারিত। অবশ্য এরূপ আলাদা করিয়া মঞ্জুর করাইবার নিয়ম আছে কি না, জানি না। তাহার পর যদি গবর্ণর্ লিটন ব্যবস্থাপক সভার বড় কোন দলের বা নানাদলভুক্ত অনেক সভ্যের বিশ্বাসভাজন অন্য দুজন সভ্যকে মন্ত্রী মনোনীত করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বেতনও মঞ্জুর হইতে পারিত। এক-ই বাবদে বরাদ্দ পুনঃপুনঃ ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করিবার নিয়ম হইয়াছে বলিয়া একথা বলিতেছি।

এরূপ না করিয়া গবর্ণর্ অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য দ্বৈরাজ্য স্থগিত রাখিয়া মন্ত্রীদের হস্তে ন্যস্ত হস্তান্তরিত শিক্ষা কৃষিস্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি বিষয়গুলির ভার স্বয়ং লইয়াছেন এবং ঐগুলির ভার ভাগ করিয়া শাসন পরিষদের সভ্যদের উপর দিয়াছেন। তা ছাড়া, ইহাও বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন, যে, অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইবে না; কেবল গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজন-অনুসারে ব্যবস্থাপক সভা আহ্বান করা হইবে। ইহাতে এরূপ সন্দেহ করিবার কারণ ঘটিয়াছে, যে, শুধু স্বরাজীরা নয়, গবর্ণমেণ্ট্ও যেন দ্বৈরাজ্যের উচ্ছেদ সাধন করিতে ব্যগ্র ছিলেন। এরূপ

সন্দেহ নিতান্ত অমূলক না হইতেও পারে। কারণ, মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড্‌ শাসনসংস্কারের প্রারম্ভ হইতেই ভারত-শাসনে নিযুক্ত অধিকাংশ ইংরেজ রাজপুরুষ দ্বৈরাজ্য পছন্দ করেন নাই। কেননা, যদিও দ্বৈরাজ্য চূড়ান্ত ক্ষমতা দেশের লোক-প্রতিনিধিদের হাতে দেয় নাই, তথাপি রাজপুরুষদের অনেককে দেশী মন্ত্রীদের তাঁবেদার করিয়াছিল এবং অনেককেই ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের নিকট প্রয়োজন-মত কৈফিয়ৎ দিতে হইত। বিজিত জাতির লোকদের সহিত জেতা জাতির কাহারও এইরূপ সম্বন্ধ ভারতপ্রবাসী ইংরেজদের পক্ষে প্রীতিকর হইতে পারে না। তদ্ভিন্ন, রাজস্বের টাকা যথেচ্ছ ব্যয় করিবার পথেও কিছু বাধা জন্মিয়াছিল। অনেক স্থলে বাধা শেষ পর্য্যন্ত না টিকিলেও, রাজপুরুষদের মনোরথ-সিদ্ধিতে বিলম্ব হইত।

এখন লাট লিটন এবং তাঁহার পরামর্শ-দাতাগণ অবাধে যথেচ্ছ খরচ করিতে পারিবেন; এবং অন্যান্য কাজও তাঁহারা যথেচ্ছ করিতে পারিবেন। কিন্তু যদি তাঁহারা বিজ্ঞ ও বিবেচক হন, তাহা হইলে, যে-সব বিষয়ে লোকমত বিশদরূপে বুঝা গিয়াছে, তাহাতে তাঁহারা লোকমতের বিপরীত কাজ করিবেন না। লিটন নানা ভ্রমবশতঃ লোকের অপ্রিয় হইয়াছেন; আরও অপ্রিয় যাহাতে না হন, সে-চেষ্টা তাঁহার ও তাহার পরামর্শ-দাতাদের করা উচিত।

স্বরাজীরা নিজেদের জয়ে ও গবর্ণমেণ্টের পরাজয়ে খুব উল্লাস প্রকাশ করিতেছেন। বলিতেছেন দ্বৈরাজ্যের প্রাণবধ করিয়াছেন। তাঁহাদের উল্লাসে বাধা দিবার ইচ্ছা বা ক্ষমতা আমাদের নাই। তবে, তাঁহাদের ইহা মনে রাখা উচিত, যে, তাঁহারা একা দ্বৈরাজ্যের উচ্ছেদসাধন করিতে পারেন নাই; অন্য যাহাদের সাহায্যে ইহা সাধিত হইয়াছে, তাঁহাদের উদ্দেশ্য অন্যরূপ ছিল। সকলের চেয়ে বড় কথা এই, যে, গবর্ণর্‌ স্বয়ং দ্বৈরাজ্যের বিনাশ সাধন করিয়াছেন, স্বরাজীরা নহে। কারণ, গবর্ণর্‌ ইচ্ছা করিলে নূতনতম ও তৃতীয় মন্ত্রীর বেতন আলাদা করিয়া মঞ্জুর করাইয়া এবং পরে নূতন দুজন মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া দ্বৈরাজ্য রক্ষা করিতে পারিতেন। এখনও তিনি নূতন মন্ত্রী নিযুক্ত করিতে পারেন।

স্বরাজী সভ্যেরা প্রায় সকলেই এই বলিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, যে, তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভায় গবর্ণমেণ্টের সব কাজে বাধা দিবেন এবং দ্বৈরাজ্যের উচ্ছেদ-সাধন করিবেন। তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের সব কাজে বাধা দিতে না পারিয়া প্রকাশ্যভাবে সে-নীতি ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু, দ্বৈরাজ্যের উচ্ছেদ-সাধন যে-প্রকারেই ঘটিয়া থাকুক, তাহা ঘটিয়াছে ইহা স্বীকার করিতে হইবে। এখন দেখিতে হইবে ইহার ফলাফল।

স্বরাজীরা অনেক-দিন হইতে বলিতেছেন এবং বাংলা গবর্ণমেণ্টের শেষ পরাজয়ের পর আরও জোর গলায় বলিয়াছেন, যে, তাঁহারা দ্বৈরাজ্যের মুখস্‌ খুলিয়া উহার প্রকৃত রূপ বাহির করিয়া দিয়াছেন। ইহা কেবল তাঁহাদের পক্ষেই সত্য, যাহাদের নিকট ইহার প্রকৃত রূপ ঢাকা ছিল। দ্বৈরাজ্য আমাদিগকে কি দিয়াছে ও কি দেয় নাই, আমরা তাহা পাঁচ বৎসর আগে লিখিয়াছিলাম; অন্য অনেক সম্পাদকও লিখিয়া থাকিবেন।

বাস্তবিক দেখিতে হইবে, দ্বৈরাজ্য আপাততঃ স্থগিত থাকায় লাভ কি হইল। গবর্ণমেণ্টের সুবিধা এই হইল, যে, এখন লাট লিটন ও তাঁহার পারিষদেরা নিজেদের অভিপ্রায়-অনুযায়ী কাজ অবাধে করিতে পারিবেন। জবরদস্ত ও জুলুমবাজ রাজকর্ম্মচারীদের এই সুবিধা হইল, যে, আপাততঃ ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন স্থগিত হওয়ায় এবং যখন অধিবেশন হইবে তখন কেবল সরকারী কাজ নির্ব্বাহ হওয়ার ব্যবস্থা হওয়ায়, তাহাদিগকে কোন কৈফিয়ৎ দিতে হইবে না, তাহাদের কোন কাজ-সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সভায় কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইবে না। এই-সব কারণে গবর্ণমেণ্ট্‌ পক্ষও কিছু জিতের দাবি করিতে পারেন।

স্বরাজীদের জিত প্রমাণ করিতে হইলে দেখাইতে হইবে, যে, দেশের লোকদের অধিকার ও ক্ষমতা মন্ত্রীদের বেতন নামঞ্জুর হওয়ার ফলে বাড়িয়াছে কিম্বা বাড়িবে কি না। তাহাদের ক্ষমতা ও অধিকার আপাততঃ বাড়ে নাই, তাহা

সকলেই দেখিতেছেন ; বরং দ্বৈরাজ্যে যতটুকু অধিকার ও ক্ষমতা ছিল তাহা, অন্ততঃ কিছুকালের জন্য, ভোগ ও প্রয়োগের সুযোগ হইবে না, তাহাই দেখা যাইতেছে। তবে, ইহা স্বীকার্য্য, যে, অদূর, দূর বা সুদূর ভবিষ্যতে দেশের লোকেরা আংশিক বা পূর্ণ-আত্মকর্ত্তৃত্ব বা স্বাধীনতা পাইবে। কিন্তু তাহা দ্বৈরাজ্যের বর্ত্তমান উচ্ছেদের ফলেই ঘটিবে, ঠিক ন্যায়শাস্ত্রের নিয়ম-অনুসারে তাহা বলা যায় না। কারণ, এখন দ্বৈরাজ্য থাকিলেও অদূর, দূর বা সুদূর ভবিষ্যতে দেশের লোকেরা আংশিক বা পূর্ণ আত্মকর্ত্তৃত্ব বা স্বাধীনতা পাইত ;--তাহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই। দ্বৈরাজ্য সাময়িকভাবে স্থগিত থাকায়, আমাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভে বাধা দিবার ও বিলম্ব ঘটাইবার প্রবৃত্তি ইংরেজদের মধ্যে বাড়িবে না কমিবে, তাহা পাঠকেরা স্থির করিতে পারিবেন।

—

রাষ্ট্রীয় বিষয়ে দুর্নীতি

ভারতসচিব লর্ড্ অলিভিয়ার পার্লেমেণ্টে এক বক্তৃতায় বলেন, যে, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ খাঁটি লোক ও সাধুতায় ("সেণ্ট্‌লিনেস্-এ") তিনি কেবলমাত্র মহাত্মা গান্ধীরই নীচে ; তাঁর চেয়ে সাধু ভারতে আর কেহ নাই ; এবং তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার দেশের জন্য উচ্চ ও প্রশংসনীয় বহু আদর্শ পোষণ করেন। সেই বক্তৃতাতেই ভারতসচিব আরো বলেন, যে, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজ্যদল নগদ টাকা দিয়া ভোট কিনিয়াছেন। সকলেই জানেন, যে, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ এই দলের নেতা এবং তিনি যাহা স্থির করেন, তদনুসারে কাজ হয়। নগদ টাকা ঘুষ দিয়া (কিম্বা আত্মীয়কে চাকরী দেওয়ার ঘুষ দিয়া) যে-দল নিজেদের কার্য্য উদ্ধার করে বলিয়া লর্ড অলিভিয়ারের বিশ্বাস, তাহার নেতাকে সাধুতার ও খাঁটিত্বের কি মাপ-কাঠি-অনুসারে খাঁটি ও সাধু বলা যায়, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। অবশ্য লর্ড্ অলিভিয়ার তাঁহার কথার কোন প্রমাণ দেন নাই। চিত্তরঞ্জন বাবুও, লর্ড্ অলিভিয়ারের কথার জবাব দিবার চেষ্টা করিয়াও, সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেন নাই। আমরাও সম্পূর্ণ শ্রদ্ধেয় লোকেদের কাছে স্বরাজ্যদলের উৎকোচ-দান ও প্রলোভন-প্রদর্শন-নীতি-সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছি। এসম্বন্ধে আমাদের সাক্ষাৎ জ্ঞান কিছু নাই।

অন্যদিকে গবর্ণমেণ্ট্ পক্ষের বিরুদ্ধেও ঠিক্ ঐরূপ অখ্যাতি রটিয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাস রায় বাহাদুর প্যারীলাল দাসকে যে-চিঠি লিখিয়াছিলেন, ফর্‌ওয়ার্ড্ তাহা মুদ্রিত করে। পত্র-লেখক তাহা লিখিয়াছেন বলিয়া সরলভাবে স্বীকার করেন, প্রাপক সম্পূর্ণ ন্যাকা সাজেন! চিঠিটার দ্বারা গবর্ণমেণ্টের প্রলোভন প্রদর্শন ও "বক্‌শিশ্"-দান-নীতি প্রমাণিত হইতেছে—যদিও প্রমাণের বেশী দর্‌কার ছিল না। কারণ, গবর্ণমেণ্ট্ নিজেই একটা বিজ্ঞাপনী দ্বারা জানান, যে, ব্যবস্থাপক-সভার যেসব সভ্য মন্ত্রীদের বেতন মঞ্জুরীর পক্ষে ভোট দিবেন, তৃতীয় মন্ত্রী তাঁহাদের মধ্য হইতে নিযুক্ত হইবে। ইহা প্রকাশ্যভাবে লোভ দেখান ভিন্ন আর কি?

ফর্‌ওয়ার্ড্ শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাসের যে-চিঠি ছাপিয়াছে তাহা রায়-বাহাদুর প্যারীলাল দাসের কোন বন্ধু বা আত্মীয়ের বিশ্বাসঘাতকতায় বা কাহারও চুরি-বিদ্যার ফলে ঐ কাগজের হস্তগত হইয়া থাকিবে। মৌলবী ফজলল্ হকের নামযুক্ত যে-চিঠি ঐ কাগজে বাহির হইয়াছে, তাহাও ঐরূপ কারণে হস্তগত হইয়া থাকিবে। প্রতারণা, বিশ্বাস-ঘাতকতা ও চৌর্য্য যুদ্ধবিদ্যার অঙ্গ, সুতরাং রাজনৈতিক দলাদলি-নামে অভিহিত রক্তপাত-বিহীন যুদ্ধেও ইহার প্রচলন দেখা যায়। কিন্তু ইহা চারিত্রিক উৎকর্ষের, সাধুতার, খাঁটিত্বের, বা উচ্চ ও প্রশংসনীয় আদর্শের পরিচায়ক নহে।

বস্তুতঃ দেশের রাজনৈতিক হাওয়া এমন দূষিত হইয়াছে যে, তাহার মধ্যে তিষ্ঠিতে পারা কঠিন। অবশ্য যাহারা তিষ্ঠিতে পারিবে না, সেরূপ খুঁতখুঁতে লোকদিগকে কৃতী রাজনৈতিকেরা "শুচিবায়ুগ্রস্ত" "রুচিবাগীশ", ইত্যাদি উপাধি দিবেন। তাঁহাদের এই আমোদে বাধা দিবার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা আমাদের নাই।

—

ভাইকমে সত্যাগ্রহ

ত্রিবাঙ্কুড়ের বৃদ্ধ রাজার মৃত্যুর পর যিনি রাজা হইয়াছেন, তিনি নাবালক। যে-মহারাণী রাজপ্রতিনিধি হইয়া রাজ্যশাসন করিতেছেন, তিনি ভাইকম্ সত্যাগ্রহে কারারুদ্ধ সকল লোককে মুক্তি দিয়া ঠিক কাজ করিয়াছেন। যদি তিনি, ভাইকম্ মন্দিরের যে-রাস্তা দিয়া "অস্পৃশ্যে"রা যাইতে পায় না, তাহাতে তাহাদের যাইবার অধিকার দেন, তাহা হইলে সত্যাগ্রহের অবসান হয়, এবং ভারতবর্ষের একটা কলঙ্ক মোচিত হয়। তাঁহার এই সুবুদ্ধি কি হইবে না?

—

ত্রিবাঙ্কুড়ের পরলোকগত মহারাজা।

ভাইকমে সত্যাগ্রহ হওয়ায় ত্রিবাঙ্কুড়ের ও উঁহার পরলোকগত মহারাজার অখ্যাতি হইয়াছে বটে; কিন্তু তাঁহার অন্য গুণাবলী আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। তিনি বৃহৎ রাজ্যের অধীশ্বর হওয়া সত্ত্বেও অবিলাসী ও সাদাসিধে লোক ছিলেন। তিনি প্রত্যহ দীর্ঘকাল রাজকার্য্যে যাপন করিতেন। তিনি ক্রমাগত দীর্ঘকাল বিদেশ ভ্রমণ না করিলেও নানা দিকে তাঁহার রাজত্বকালে তাঁহার দেশ অগ্রসর হইয়াছে। তাঁহার রাজ্যে শতকরা যতজন লোক লিখনপঠনক্ষম, ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশে বা দেশী রাজ্যে শতকরা ততজন লিখনপঠনক্ষম নহে। নারীদের উচ্চতর শিক্ষাতেও ত্রিবাঙ্কুড় ভারতবর্ষের সব অংশের শীর্ষস্থানীয়। তাঁহার প্রাসাদের ও পরিবারবর্গের ব্যয় বড়োদার মহারাজার ঐরূপ ব্যয়ের একতৃতীয়াংশেরও কম ছিল। ইহা হইতেই তাঁহার জীবনযাপন-প্রণালীর পরিচয় পাওয়া যায়। প্রজাদের নিকট হইতে গৃহীত করের অধিকাংশ রাজ্যের জন্যই তাঁহার দ্বারা ব্যয়িত হইত। ভারতীয় কোন-কোন রাজামহারাজা নানা উপায়ে নিজেদের গুণকীর্ত্তন করাইয়া থাকেন। ত্রিবাঙ্কুড়ের মহারাজা তাহা করেন নাই বলিয়াই সম্ভবতঃ তাঁহার কৃতিত্বের কথা সুবিদিত নহে।

—

তারকেশ্বরে গুলিবর্ষণ।

ভারতবর্ষে বিনা গুলিবর্ষণে কোন কঠিন সমস্যার সমাধান হয় না। সুতরাং তারকেশ্বরেও যে, ঐ উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এখন কথা উঠিয়াছে, যে, জনতার উপর শুধু বাক্ শট্ ছোড়া হইয়াছিল, না বুলেট্ও ছোড়া হইয়াছিল। (ছোট ও বড় এই দুরকম গুলির বাংলা নাম আমরা জানি না—আমরা নিতান্তই "নিরামিষ" এবং যুদ্ধ ও শিকারে অনভিজ্ঞ)। ডাক্তার জে এম্ দাশ গুপ্ত অস্ত্রপ্রয়োগে গুলি বাহির করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহার মতে বুলেট্ও ব্যবহৃত হইয়াছিল। পুলিস্ কিন্তু বলে যে, তাহাদের সঙ্গে শুধু বাক্-শট্ ছিল। ডাঃ দাশগুপ্ত ক্ষতস্থান চিরিবার সময় স্পেশ্যাল্ ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও পুলিস্ ইন্স্পেক্টারকে উপস্থিত থাকিতে আহ্বান করেন, কিন্তু তাঁহারা উপস্থিত ছিলেন না। তাহাতে লোকের এই সন্দেহ প্রবলতর হইতেছে, যে, হয় পুলিসের কাহারও-কাহারও বুলেট্ ছিল, নয় মোহান্তের সশস্ত্র গুণ্ডারা সুযোগ বুঝিয়া বুলেট্ ব্যবহার করিয়াছিল। অনুসন্ধান করিয়া দোষীর দণ্ড দেওয়া গবর্ণ্মেণ্টের কর্ত্তব্য।

—

তারকেশ্বরে মিট্মাটের কথা।

শুনা যাইতেছে, যে, তারকেশ্বরের মোহান্তের সহিত মিট্মাট্ হইবে। যাঁহারা মোহান্তকে নরপশু বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, দেখা যাক্ তাহার সহিত তাঁহারা কিরূপ রফা করেন। লেন্‌দেন্ কিছু হইলে তাহাও প্রকাশ্যভাবে হওয়া উচিত।

গুলি-ছোড়ার পর সত্যাগ্রহ বন্ধ ও রফার কথা উঠায়, এধারণাও গবর্ণ্মেণ্ট্ পক্ষের লোকদের দৃঢ়ীভূত হওয়া বিচিত্র নহে, যে, গুলি সকল রোগের অব্যর্থ ঔষধ।

—

শারদীয় উৎসব।

শারদীয় উৎসব আগতপ্রায়। ইহা সাক্ষাৎভাবে হিন্দু বাঙ্গালীদেরই উৎসব হইলেও, অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরাও, পূজায় যোগ না দিলেও, পরোক্ষভাবে

"উৎসব" উপভোগ করিয়া থাকেন বা করিতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "ধর্ম্ম" নামক পুস্তকে "উৎসব"-শীর্ষক প্রবন্ধে বলিয়াছেন, "উৎসবের মধ্যে মিলন চাই," "উৎসব একলার নহে।" (পৃষ্ঠা ১) এই প্রবন্ধের অন্যত্র তিনি বলিতেছেন :—

"সত্য প্রেমরূপে আমাদের অন্তঃকরণে আবির্ভূত হইলেই সত্যের সম্পূর্ণ বিকাশ হয়। তখন বুদ্ধির দ্বিধা হইতে, মৃত্যুপীড়া হইতে, স্বার্থের বন্ধন ও ক্ষতির আশঙ্কা হইতে আমরা মুক্তিলাভ করি। তখন এই অস্থির সংসারের মাঝখানে আমাদের চিত্ত এমন একটি চরম স্থিতির আদর্শ খুঁজিয়া পায়, যাহার উপর সে আপনার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হয়।"

তাহার পর কবি বলিতেছেন :—

"প্রাত্যহিক-উদ্‌ভ্রান্তির মধ্যে মাঝে-মাঝে এই স্থিতির সুখ, এই প্রেমের স্বাদ পাইবার জন্যই মানুষ উৎসবক্ষেত্রে সকল মানুষকে একত্রে আহ্বান করে। সেদিন তাহার ব্যবহার প্রাত্যহিক ব্যবহারের বিপরীত হইয়া উঠে। সেদিন একলার গৃহ সকলের গৃহ হয়, একলার ধন সকলের জন্য ব্যয়িত হয়। সেদিন ধনী দরিদ্রকে সম্মানদান করে, সেদিন পণ্ডিত মূর্খকে আসন দান করে। কারণ আত্মপর, ধনিদরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ এই জগতে একই প্রেমের দ্বারা বিধৃত হইয়া আছে, ইহাই পরম সত্য —এই সত্যের প্রকৃত উপলব্ধি পরমানন্দ। উৎসবদিনের অবারিত মিলন এই উপলব্ধিরই অবসর। যে-ব্যক্তি এই উপলব্ধি হইতে একেবারেই বঞ্চিত হইল, সে-ব্যক্তি উন্মুক্ত উৎসব-সম্পদের মাঝখানে আসিয়াও দীন-ভাবে রিক্তহস্তে ফিরিয়া চলিয়া গেল।" (পৃষ্ঠা ৩)

যাঁহারা প্রকৃত উৎসব করিতে চান এবং কবির প্রতি যাঁহাদের শ্রদ্ধা আছে, তাঁহারা তাঁহার প্রবন্ধটি আদ্যোপান্ত পড়িয়া দেখিতে পারেন ;—তাঁহার সব কথা উদ্ধৃত করিবার স্থান নাই, কেবল আর কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিতেছি।

"যেখানে অহঙ্কার, যেখানে তর্ক, যেখানে বিরোধ, যেখানে খ্যাতি প্রতিপত্তির জন্য প্রতিযোগিতা, যেখানে মঙ্গলকর্ম্মও লোকে লুব্ধভাবে গর্ব্বিতভাবে করে, যেখানে পুণ্যকর্ম্ম অভ্যস্ত আচার-মাত্রে পর্য্যবসিত—সেখানে সমস্ত আচ্ছন্ন, সমস্ত রুদ্ধ, সেখানে ক্ষুদ্র বৃহৎরূপে প্রতিভাত হয়, বৃহৎ ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে, সেখানে তোমার [বিশ্বযজ্ঞপ্রাঙ্গণের উৎসব দেবতার] আহ্বান উপহসিত হইয়া ফিরিয়া আসে। সেখানে তোমার সূর্য্য আলোক দেয় কিন্তু তোমার স্বহস্ত-লিখিত আলোক-লিপি লইয়া প্রবেশ করিতে পারে না; সেখানে তোমার উদার বায়ু নিঃশ্বাস জোগায় মাত্র, অন্তঃকরণের মধ্যে বিশ্বপ্রাণকে সমীরিত করিতে পারে না।" (পৃঃ ৮-৯)

—

কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর খবরের কাগজ

কলিকাতা মিউনিসিপালিটী নিজের একটা খবরের কাগজ প্রকাশ করিবেন, স্থির করিয়াছেন। ইহার একটা উদ্দেশ্য এইরূপ বলা হইয়াছে, যে, মিউনিসিপালিটীর কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বা উহার কাজ-সম্বন্ধে যে-সকল ভ্রান্ত সংবাদ বা নিন্দা রটে, ইহাতে তাহার সংশোধন ও প্রতিবাদ করা হইবে। এই কাজটি করিবার জন্য একটা খবরের কাগজের প্রয়োজন নাই। দৈনিক কাগজ-সকলে প্রতিবাদ পাঠানই যথেষ্ট। তা ছাড়া, যে-সব কাগজে মিউনিসিপালিটীর সমালোচনা হয়, তাহাদের কাটতি সমুদয় বঙ্গে এবং বাংলা দেশেরও বাহিরে। মিউনিসিপালিটীর কাগজের কাটতি কলিকাতার বাহিরে হইবে না। সুতরাং উহাতে যে সব "খাঁটি" সংবাদ দেওয়া হইবে, তাহা দেশের লোকের কাছে সাক্ষাৎভাবে পৌছিবে না ; অন্য-সব কাগজ যদি উদ্ধৃত করে, তাহা হইলে পৌছিতে পারে। কাগজখানা কোন্ ভাষায় হইবে জানি না। ইংরেজীতে হইলে অধিকাংশ বাঙালী পাঠকের কাজে লাগিবে না। বাংলায় হইলে কলিকাতার অবাঙালীদের কাজে লাগিবে না।

কাগজখানার অন্য যে-সব উদ্দেশ্য বলা হইয়াছে, তাহা সিদ্ধ করিবার জন্য যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত ও পরিশ্রম করিলে কিছু কাজ হইতে পারে। যথা—স্বাস্থ্যতত্ত্বের প্রচার ; খাঁটি দুধ সস্তায় কি-প্রকারে দেওয়া যাইতে পারে, তাহার আলোচনা ; ছেলে-মেয়েদের ব্যায়াম ও খেলার বন্দোবস্তের আবশ্যকতা ; ইত্যাদি। কাগজটি বাংলায় হইলে কলিকাতার অধিকাংশ লোকের উপযোগী হইবে। কিন্তু এই উদ্দেশ্যসিদ্ধি-সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে, যে, কলিকাতার ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর "স্বাস্থ্য" এবং ডাক্তার কার্ত্তিকচন্দ্র বসুর "স্বাস্থ্য-সমাচার" ও তদ্রূপ ইংরেজী কাগজ ত রহিয়াছে ; সেই-গুলিই ত সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে যথেষ্ট উৎসাহ পায় না। তাহার উপর ঐরূপ উদ্দেশ্যের আর-একখানা কাগজের প্রয়োজন নাই।

কাগজখানার জন্য কয়েকজন লোক রাখিতে হইবে ; কাগজের দাম ও ছাপাই খরচ-আদিও আছে। নগদ বিক্রী ও চাঁদা হইতে খরচ উঠিবার সম্ভাবনা কম। তবে যদি মিউনিসিপালিটীর ক্ষমতা-প্রয়োগ ও অন্য

উপায়ে অনেক বিজ্ঞাপন সংগৃহীত হয়, তাহা হইলে লোকসান না হইতে পারে।

—

ব্যবস্থাপক স্বগৃহে অবরুদ্ধ

যে-দিন বাংলার মন্ত্রীদের বেতন-সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের আলোচনা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় হয়, সেদিন উহার অন্যতম সভ্য বাবু ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় সভায় যাইতে পারেন নাই। কতকগুলি লোক রাস্তায় তাঁহার বাড়ীর সদর দরজা হইতে আরম্ভ করিয়া দু-তলার সিঁড়ি আচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার কক্ষের দরজা পর্য্যন্ত শুইয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যেমন অসহযোগ আন্দোলনের হুজুকে মাতিয়া অনেক ছাত্র সেনেট্‌-হাউসের সিঁড়িতে শুইয়া পরীক্ষার্থীদিগকে পরীক্ষা দিবার জন্য উহার ভিতরে ঢুকিতে দেয় নাই, কলেজগুলার ফটকে ও সিঁড়িতে শুইয়া ছাত্রদিগকে কলেজ যাইতে দেয় নাই, ইহাও সেইরূপ ব্যাপার। উভয়ক্ষেত্রেই বাধা প্রদাতাদের স্বাধীনতা ও স্বরাজ-সম্বন্ধে ধারণাটা খুব তোফা। তাহারা অন্যকে আপনাদের মত অনুসারে কাজ করাইবেই; তাহাকে নিজের মত-অনুসারে কাজ করিবার স্বাধীনতা দিবে না! ইহাই হইল স্বরাজ! এরূপ চেষ্টা সাতিশয় নিন্দনীয়, এবং এইরূপ কৌশলে কাজ হাসিল করার কোন মূল্য নাই। ছেলেরা যে, রাস্তায়, ফাটকে, সিঁড়িতে শুইয়া অন্য ছাত্রদিগকে বাধা দিয়াছিল, তাহা কোথায় গেল? যাহারা শুইয়াছিল, তাহারাই আবার দলেদলে কলেজে ঢুকিয়াছে, পরীক্ষা দিয়াছে। যাহারা যুবকদিগকে এইরূপ হুজুকে মাতাইয়া অন্যের স্বাধীনতা লোপ করে, তাহারা দেশের শত্রু। যেন-তেন-প্রকারেণ ছলে-বলে-কৌশলে একটা বড় দলের সঙ্গে বা মাথায় থাকিলেই মুক্তি হয় না; সত্য ও ন্যায়কে, সকলের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ণ রাখিতে না পারিলে সাম্রাজ্য লাভেরও কোন মূল্য নাই। যে-কোন-প্রকারে কার্য্য উদ্ধারের নীতি, যাহাকে ইংরেজীতে বলে এক্সপীডিয়েন্সি, সুনীতি নহে; কারণ উহা সত্য ও ন্যায়ের চিরন্তন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে।

—

বিলাতী কাপড় বর্জ্জন

মুমূর্ষু রোগীর যখন সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইয়া আসিতে থাকে, যখন তাহার হাত-পা অবশ হইয়া আসে, নিজের তাহা নাড়িবার ক্ষমতা থাকে না, তখন যদি কোন হাতুড়িয়া চিকিৎসক মনে করে, যে, কেবলমাত্র রোগীর গায়ে বাহিরের তাপ দেওয়া ও তাহার হাত-পা কৃত্রিম উপায়ে ক্রমাগত নাড়িয়া-চাড়িয়া দেওয়াই তাহাকে বাঁচাইবার জন্য যথেষ্ট, তাহা হইলে সেরূপ চিকিৎসককে লোকে কিরূপ আদর করে, তাহা বলিতে হইবে না। বাহিরে তাপ-প্রয়োগ বা কৃত্রিম উপায়ে অঙ্গ সঞ্চালন রোগবিশেষে ও স্থানবিশেষে অবশ্যই আবশ্যক ও ফলপ্রদ; কিন্তু যদি রোগীর দেহের জীবনী শক্তিরই একান্ত হ্রাস হইয়া থাকে, তাহা হইলে বাহির হইতে যাহাই করা যাক্ না কেন, তাহা ব্যর্থ হইবে।

উপমা বা তুলনা কখন সব বিষয়ে মিলে না, সর্ব্বাঙ্গীণ হয় না। কিন্তু তাহাতে বুঝিবার সুবিধা হয়।

রোগীর সম্বন্ধে যাহা সত্য, জাতির সম্বন্ধেও তাহা কতকটা সত্য। অনেকে জাতীয় জীবনের দৈন্য ঢাকিবার জন্যই হউক, কিম্বা অন্য উদ্দেশ্যেই হউক, ক্রমাগত হুজুকের ও উত্তেজনার ব্যবস্থা করিতেছে। হাত-পা নাড়া, চীৎকার, উত্তেজনা, ক্রমাগত চলিতেছে। কিন্তু তাহাতে জাতির সত্যপ্রিয়তা, শুচিতা, চারিত্রশক্তি, জীবনী শক্তি বাড়িতেছে কি? রেলের ধর্ম্মঘট লইয়া কিছু-দিন খুব সোরগোল হইল। ইস্কুল কলেজ-ছাড়ার হুজুক দিন-কতক খুব চলিল। কংগ্রেস্ স্বেচ্ছাসেবক হইয়া বিলাতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করিয়া কিছু-দিন দলেদলে লোকে জেলে গেল। তারকেশ্বরের সত্যাগ্রহেও বিস্তর লোক জখম হইল এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আহুতি দিয়া জেলে গেল। এখন তাহা আর চলিবে না, বা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার পর আর চালান দরকার নাই। সুতরাং নূতন আর-একটা হুজুক চাই। সেই হুজুক হইতেছে, বিলাতী কাপড় বর্জ্জন করিবার ও করাইবার জন্য বিরাট্ সভা করিয়া বিকট চীৎকার করা এবং বিলাতী কাপড়ের দোকানের সামনে পাহারা দেওয়া।

দেশী জিনিষে আমাদের একটুও অরুচি নাই। বঙ্গের

অঙ্গচ্ছেদের সময় বাংলাদেশে দেশী কাপড় ব্যবহারের প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। তাহারও আগে এলাহাবাদে কর্ণেলগঞ্জে এবং তৎপরে চৌকে দেশী কাপড়ের দোকান স্থাপিত হইয়াছিল; সেখান হইতে আমরা দেশী কাপড় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করি। এখনও তাহা করি। ষোল বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার পরও দেশী কাপড় ব্যবহার করিবার ও করাইবার চেষ্টা এপর্য্যন্ত যথাসাধ্য করিয়াছি। দেশী মিলের কাপড় অপেক্ষা খদ্দর ব্যবহার দেশের অধিকাংশ লোকের পক্ষে উপকারী বুঝিয়া আমরা কয়েক বৎসর হইতে খদ্দর ব্যবহার করিতেছি। ইহাতে কোন বাহাদুরী নাই। কেবল আমাদের অভিজ্ঞতার কথা বলিবার জন্য এই গৌরচন্দ্রিকার অবতারণা। যাহা সহজ-বুদ্ধিতে সহজেই বুঝা যায়, দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতাতেও তাহাই দেখিতেছি। বিরাট্ সভা, বিকট চীৎকার ও পিকেটিঙে বিলাতী কাপড়ের পরিবর্ত্তে দেশী কাপড়ের ব্যবহার চালাইতে পারা যাইবে না, যদি যথেষ্ট দেশী কাপড় উৎপন্ন না হয়, যদি তাহার মূল্য বিদেশী কাপড়ের ঠিক সমান বা অন্ততঃ কাছাকাছি না হয়, যদি কাপড়-বিক্রেতারা লাভের লোভে প্রবঞ্চক না হইয়া সত্য-সত্যই দেশী কাপড় বিক্রী আরম্ভ না করেন, এবং যদি নেতারা ও তাঁহাদের অনুচরেরা ভণ্ডামি না করিয়া সত্য-সত্যই দেশী কাপড় ব্যবহার না করেন। চরিত্রহীনতা, স্থির-বুদ্ধি ও চিন্তাশীলতার অভাব, উপযুক্ত আয়োজন না করিয়াই ফললাভের স্বপ্ন-দেখা, এইরূপ নানাবিধ কারণ ভারতীয় বহু প্রচেষ্টার নিষ্ফলতার মূলীভূত। দেশের অনেক নেতৃস্থানীয় লোকেরও মোটামুটি-রকমের সত্যবাদিতা ও সত্যে দৃঢ়তা নাই, কথায় ও কাজে মিল নাই। দোকানদারদের মধ্যে অনেকেই ছাপহীন জাপানী ও বিলাতী কাপড় দেশী বলিয়া চালায়, দেশী ও বিদেশী মিলের ছাপহীন মোটা কাপড় ধুয়াইয়া খদ্দর বলিয়া বিক্রী করে। দেশী ও বিদেশী মিল-ওয়ালারা এই প্রতারণার উদ্দেশ্য জানিয়াও ঐ-প্রকার ছাপহীন মোটা কাপড় বুনিয়া দেয়। অনেক ক্রেতাও জানিয়া-শুনিয়া মিলের তথাকথিত খদ্দর কিনিয়া ব্যবহার করে।

অথচ আমরা মনে করিতেছি, যে, বিরাট্ সভায় বিকট চীৎকার করিয়া আমরা বিদেশীর পরিবর্ত্তে দেশী চালাইতে পারিব!

সংবাদপত্র-পাঠকেরা জানেন, দেশের সব লোকের জন্য যত কাপড়ের দরকার, তত কাপড় ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয় না। দেশের কাপড় উৎপন্ন দুই-প্রকারে হইতে পারে, মিলের দ্বারা ও হাতের তাঁতের দ্বারা। উৎপাদনের উভয় উপায়ই ব্যর্থ হইবে যদি আমরা যথেষ্ট তুলা না পাই। অথচ ভারতবর্ষেই যথেষ্ট তুলা জন্মাইতে পারা যায়। বঙ্গের অনেক স্থানে, যেমন বাঁকুড়া জেলায়, যথেষ্ট জল-সেচনের বন্দোবস্ত হইলে ভাল তুলা প্রচুর পরিমাণে হইতে পারে। যাঁহারা বিলাতী বর্জ্জনের জন্য এখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চীৎকারের বন্দোবস্ত করিতেছেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা জল-সেচনের ও তুলা-উৎপাদনের জন্য কি চেষ্টা কখন্ ও কোথায় করিয়াছেন?

দেশী মিলের কাপড়ের দ্বারাই যদি কাপড়ের অভাব দূর করিতে হয়, তাহা হইলে আরও মিল স্থাপন করিতে হইবে। বঙ্গবিভাগের সময়কার স্বদেশী আন্দোলনের ফলে তবু একটি মিল বাঙ্গালীরা স্থাপন করিয়াছিল—যদিও তাহা কয়েকবার যায়-যায় হইয়াছিল। তাহার পর বাঙ্গালী নিজের সূতা ও কাপড় মিলে নিজে উৎপন্ন করিবার কি চেষ্টা করিয়াছে? বর্ত্তমান হুজুক-উৎপাদকরা কি করিয়াছেন?

দেশী সূতা ও কাপড় উৎপাদন করিবার দ্বিতীয় উপায় চর্‌খা ও হাতের তাঁত। ইহার প্রচলনের জন্য বাংলাদেশে সকলের চেয়ে বেশী চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়,—চীৎকারকারীরা তাহা করেন নাই। বরং চীৎকারকারীদের দলের লোকেরা রায় মহাশয়কে অপদস্থ করিবারই চেষ্টা করিয়াছেন। ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ টাঁকশালে উচ্চপদ ছাড়িয়া দিয়া হুজুক বর্জ্জন করিয়া চর্‌খার সূতায় বস্ত্রবয়ন-কার্য্যে সময় ও শক্তি নিয়োগ করিয়া আসিতেছেন। তিনিও স্বরাজ্যদলের পৃষ্ঠপোষকতায় বঞ্চিত।

অতএব, ইহা বলিলে অন্যায় হইবে না, যে, চীৎকার-

কারীরা স্থির করিয়াছে, যে, কেবল বাক্যের দ্বারাই তাঁহারা দেশের নগ্নতা দূর করিবেন।

যাহা হউক, চীৎকারকারীরা যে নিপুণ খেলোয়াড় ও চালিয়াৎ, এ তারিফ্‌টা করিতেই হইবে। কিন্তু সেই সঙ্গে-সঙ্গে এই আফ্‌সোসের কথাও বলিতে হইবে, যে, বাংলাদেশে গড্ডলিকা-প্রবাহে যোগদান-পরায়ণ স্মৃতিশক্তি-হীন লোকের সংখ্যাও কম নয়।

—

"স্বরাজ্য"

দেশের কোন-কোন নেতার মতটা যে কি, তাহা জানা ও বুঝা কঠিন। যৌবন হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত মানুষের সব বিষয়ে মত একই থাকে না, থাকিতে পারে না; সুতরাং একবার কেহ একটা মত প্রকাশ করিয়াছে বলিয়া চির-কালই তাহার মত তাহাই থাকিবে, অন্য মত সে প্রকাশ করিলে তাহার নিন্দা করিতে হইবে, আমরা এরূপ মনে করি না। কিন্তু তাই বলিয়া ঘনঘন ডিগ্‌বাজী খাওয়াটাও সত্যনিষ্ঠ, স্থিরবুদ্ধি ও চিন্তাশীল লোকের উপযুক্ত নহে।

আমরা ভয়ে-ভয়ে কোন কোন রাজনৈতিক মত-সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি। ভয়ে-ভয়ে এইজন্য, যে,হয়ত আমাদের কথাগুলা ছাপা হইবার আগেই ঐ মতগুলা বদ্‌লাইয়া যাইবে।

স্বরাজীরা যখন খুব লম্বাচৌড়া অঙ্গীকারের জোরে দলে পুরু হইয়া ব্যবস্থাপক সভাসমূহে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহাদের মত ও কার্য্যপ্রণালী যাহা ছিল, তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে মতের ও কার্য্যপ্রণালীর পরিবর্ত্তন হইতে পারে, স্বীকার করি। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাস্য এই, যে, স্বরাজ্যদলের নেতার বর্ত্তমান মত (অবশ্য যদি এখনও তাহা বর্ত্তমান থাকে) এবং মডারেট্‌দলের মতের পার্থক্য কি? উভয়দলই প্রাদেশিক আত্মকর্ত্তৃত্ব চায়, উভয়দলই ভারতগবর্ণমেণ্টের দেশরক্ষা, এবং রাজনৈতিক-ও বৈদেশিক বিভাগ ছাড়া আর-সব বিভাগে লোকপ্রতি-নিধিদের কর্ত্তৃত্ব চায়। বরং মডারেট্‌দের মধ্যে অনেকে আর-একটু অগ্রসর। তাঁহারা (যেমন মিসেস্ বেসাণ্ট) বলেন, যে 'সামরিক, রাজনৈতিক ও বৈদেশিক বিভাগ কেবল নির্দ্দিষ্ট কয়েক বৎসরের জন্য বড়লাটের হাতে থাকিবে; তাহার শেষে ঐগুলিও ব্যবস্থাপক সভার অধীন হইবে, এবং যতদিন ঐগুলি বড়লাটের হাতে থাকিবে ততদিন সেগুলিকে দেশের লোকের প্রতিনিধি-দের হস্তে নির্দ্দিষ্ট কালান্তে অর্পণ করিবার জন্য দেশকে প্রস্তুত করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রতিবৎসরই বহুসংখ্যক লোককে সামরিক শিক্ষা দিতে হইবে এবং সেনাদলে লেফ্‌টেন্যাণ্ট্ হইতে আরম্ভ করিয়া সামরিক অফিসারের পদে এরূপভাবে নিযুক্ত করিয়া যাইতে হইবে, যাহাতে পূর্ব্বোক্ত নির্দ্দিষ্ট কালান্তে ভারতীয় লোকেরা সিপাহী ও সেনানায়ক উভয়রূপেই দেশরক্ষায় সমর্থ হয়। রাজনৈতিক ও বৈদেশিক বিভাগ-সম্বন্ধেও এইরূপ করিতে হইবে।

এখন আমরা স্বরাজ্যদলের ও মডারেট্‌দলের মতে, লক্ষ্যে ও কার্য্য-প্রণালীতে কোন মৌলিক প্রভেদ দেখি-তেছি না। অথচ স্বরাজ্য দল প্রথম হইতে মডারেট্‌দলকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছে ও তাহাদের নিন্দা করিয়াছে। কিন্তু একদিকে তাহাদের লিটনবিজয়-নিনাদে আকাশ বিদীর্ণ হইলেও অন্যদিকে তাহাদিগকে "পুন-র্মূষিকো ভব" অভিশাপ লাগিয়াছে। চিত্তরঞ্জন-বাবু একটা ইণ্টার্ভিউয়ে অর্থাৎ সাক্ষাৎ-সংবাদে নাকি বলিয়া-ছেন, যে, তিনি কন্‌ষ্টিটিউশ্যন্যাল্ অর্থাৎ বৈধ বা আইন-সঙ্গত উপায়েই স্বরাজলাভ করিতে চান। এবুলিটাও বরাবর মডারেট্‌দলের বুলি ছিল ও আছে। যাঁহারা "দাস-মনোভাব" (দাশ-মনোভাব নহে) কথাটা চালাইয়াছেন, তাঁহাদের ভাষায় ইহারই নাম আবেদন-নিবেদন-মার্গ।

আর-এক বিষয়ে চিত্তরঞ্জন-বাবুর সহিত মডারেট্ দলের মিল্ হইয়াছে। মডারেটরা বরাবর গবর্ণমেণ্ট্‌কে ও ইংরেজজাতিকে এই-ধাঁচের কথা বলিয়া আসিতেছেন, যে, যদি তোমরা আমাদের কথা না শুন, যদি আমাদের প্রার্থিত অধিকার ও ক্ষমতা (কেহ-কেহ ইহাকে "দাবী" নাম দিয়া আত্মপ্রতারণা করেন) না দাও, তাহা হইলে দেশে ভীষণ একটা-কিছু হইবে; অতএব সময় থাকিতে

সাবধান হও, এবং "লেখ্‌খি ছেলে"র মত আমাদের কথা শোন। চিত্তরঞ্জন-বাবুও পূর্ব্বোল্লিখিত সাক্ষাৎ-সংবাদে নাকি বলিয়াছেন, যে, স্বরাজ্যদল যাহা চাহিতেছেন, তাহা না দিলে দেশে একটা ভীষণ বিপ্লব হইবে। তাহা হইলে বলিতে হইবে, যে, তলায়-তলায় দেশে রক্তস্রোত বহাইবার আয়োজন চলিতেছে। সৌভাগ্যের বিষয়, যে, স্বরাজ্যদলের চাঁইয়েরা বাঘের বাচ্চাগুলির গলায় গলাবন্ধ পরাইয়া ও তাহাতে শিকল লাগাইয়া তাহা খোঁটায় আট্‌কাইয়া বা হাতে ধরিয়া রাখিয়াছেন। নতুবা না জানি কি হইত।

আমরা বিপ্লবের সম্ভাবনা-অসম্ভাবনা—কিছু-সম্বন্ধেই কোন খবর জানি না। কিন্তু ইহা বিশ্বাস করি, যে, চালাকি দ্বারা কোন বড় কাজ হয় না, এবং যে-ইংরেজ-জাতি এত বড় সাম্রাজ্য চালাইতেছে ধাপ্‌পাবাজী দ্বারা তাহাদিগকে ঠকাইয়া কিছু আদায় করিতে পারা যাইবে না।

মহাত্মা গান্ধী বলিতেছেন, তিনি বেলগাঁও কংগ্রেসে কাহারও সঙ্গে লড়িবেন না, দেশ যাহাতে দলাদলিতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, এরূপ-কিছু তিনি করিবেন না। এইপ্রকার নানা কথা তিনি বলায় স্বরাজ্যদলে একটা উল্লাসসম্বলিত ধুয়া উঠিয়াছে, যে, মহাত্মা "সারেণ্ডার" করিয়াছেন, আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। কাগজে ইহাও দেখিলাম, যে, তাঁহার সহিত মিসেস্ বেসাণ্টের কথাবার্ত্তা চলিতেছে। মিসেস্ বেসাণ্ট্ বলিয়াছেন, যে, আদালত-বর্জ্জন, আর যে-যে বর্জ্জন (নামে) আছে, সেইগুলি প্রত্যাহার না করিলে তিনি কংগ্রেসে যোগ দিতে পারেন না।

গান্ধী মহাশয় কিন্তু পুনঃপুনঃ চর্‌খায় সূতা-কাটা, খদ্দর-উৎপাদন ও ব্যবহার, অস্পৃশ্যতা পরিহার ও দূরীকরণ, এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব-স্থাপনের উপর জোর দিতেছেন। শেষোক্ত দুইটি চেষ্টা সফল না হইলে, যে, স্বরাজ সমস্ত দেশবাসীর স্বরাজ হইতে পারে না, তাহা বুঝিবার জন্য বেশী বুদ্ধির দরকার নাই! গান্ধী মহাশয়ের কার্য্যতালিকার অন্য কাজগুলি-সম্বন্ধেও আমরা অনেকবার আলোচনা করিয়াছি।

চর্‌খা-সম্বন্ধে প্রসঙ্গতঃ একটা কথা এখানে বলি। প্রত্যেকের আর্থিক স্বাধীনতা স্বরাজের একটা উপাদান। নারীদেরও আর্থিক স্বাধীনতা না হইলে দেশের অর্দ্ধেক লোকের পক্ষে ঠিক্ স্বরাজ্যলাভ হইবে না। চর্‌খা, সামান্য-পরিমাণে হইলেও, যে-পরিমাণে দেশের যত স্ত্রীলোককে উপার্জ্জনক্ষম করিতে পারে, অন্য কোন উপায় আমাদের জানা নাই, যাহাতে তাহা হইতে পারে। তাহা কাহারও জানা থাকিলে তিনি, যেরূপ একাগ্রতার সহিত গান্ধীজী দেশকে চর্‌খার মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে চাহিতেছেন, সেইরূপ উৎসাহে সেই উপায়ের কথা বলিতে থাকুন। আমরা চর্‌খা বা অন্য কোন কলের পূজক নহি। কোন যন্ত্র বা জাদু দ্বারা স্বরাজ পাওয়া যাইবে না। মনুষ্যত্বের উদ্বোধন-ভিন্ন স্বরাজ মিলিবে না। চর্‌খা চালাইলে আর্থিক কি উপকার হইতে পারে না-পারে, আমরা তাহাই ভাবিতেছি। সেই সঙ্গে-সঙ্গে ইহাও বিশ্বাস করি, যে, যে-কোন বিষয়েই আমরা কৃতকার্য্য হই না কেন, তাহা স্বরাজ্যের অঙ্গ—স্বরাজ্য কেবল রাজনৈতিক ব্যাপার নহে—এবং এই সফলতাজনিত আত্ম-বিশ্বাস পরোক্ষভাবে আমাদিগকে অন্যান্য কার্য্যক্ষেত্রেও সিদ্ধির পথে অগ্রসর করিতে পারে।

মহাত্মার পদ্ধতির একটা গুণ এই, যে, ইহাতে আবেদন-নিবেদন নাই। তিনি মানুষকে খাঁটি হইতে, শুচি হইতে সত্যসেবক হইতে উপদেশ দেন এবং নিজেও এই উপদেশ-অনুসারে চলিতে চেষ্টা করেন; এই কারণে তিনি শ্রদ্ধেয়। আমরা জানি না, বলিতেও পারি না, কি করিয়া স্বাধীনতা পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু স্বাধীনতা—পূর্ণ স্বাধীনতা চাই, ইহাই বলিতে পারি। ঈপ্সিতলাভের উপায় জানি না বলিয়া, যাহা বাঞ্ছনীয় নহে তাহাকেই বাঞ্ছনীয় বলিতে পারি না। পরে মাথাটা সোজা করিয়া দাঁড়াইতে পারিবার লোভে এখন মাথা হেঁট করিতে ইচ্ছা হয় না। তবে, কেহ যদি খুলিয়া বলেন, যে, এখন যাহা পাইবার চেষ্টা করা যাইতেছে, তাহা পান্থশালা, লক্ষ্যস্থল নহে, তাহার অর্থ বুঝিতে পারি।

আরও-একটা কথা বুঝি, যে, দেশ স্বাধীন হইলেও দেশের জন্য যাহা-যাহা করা আবশ্যক হইত, জাতীয়

কল্যাণের ও মানবের কল্যাণের জন্য স্বাধীন দেশেও যাহা অনুষ্ঠিত হয়, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাতেও তাহা করা কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়তঃ, যে নিজেকে পরাধীন ভাবে ও পরাধীনের মত কাজ করে, তাহা অপেক্ষা পরাধীন আর কেহ নাই। আমরা ব্যক্তিগতভাবে কাহারও দ্বারা বিজিত, পরাজিত ও বন্দীকৃত হই নাই। স্বাধীন হইলে আমরা শান্ত ও ধীরভাবে নির্ভয়ে অনলসভাবে যাহা বলিতাম, করিতাম, বর্ত্তমান অবস্থাতেও ঠিক্ তাহাই বলা ও করা আমাদের কর্ত্তব্য। ইহা ছাড়া, অন্য কোন পথের সন্ধান জানি না। এই পথে চলিতে পারি বা না পারি, ইহাকেই পথ বলিয়া বিশ্বাস করি। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

—

পূজার ছুটিতে পল্লীগ্রাম-সেবা

পূজার ছুটির সময় যে-সকল ছাত্র নিজ-নিজ গ্রামে যাইবেন, তাঁহারা কি-প্রকারে গ্রামের হিতসাধন করিতে পারেন, সেবিষয়ে অনেক কথা বলা যাইতে পারে। নানা-রকম কাজের ফর্দ্দ না দিয়া আমরা ডাক্তার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ম্যালেরিয়া নিবারণ-প্রণালীর প্রতি যুবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তিনি যে কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারক সমবায় সমিতির অবৈতনিক সম্পাদক, ১৯২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ৮২টি গ্রামে তাহার শাখা ছিল; পরবর্ত্তী আগষ্টে ২৭০টি গ্রামে এইরূপ শাখা হইয়াছে। কি-প্রকারে সমিতি গঠন করিতে হয়, এবং ম্যালেরিয়া দূর করিতে হইলে কি-কি কাজ করিতে হয়, তাহা ডাঃ চট্টোপাধ্যায়কে চিঠি লিখিলে জানা যাইতে পারে। তাঁহার ঠিকানা ১-২-এ, প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

যাঁহারা বিশ্বভারতীর অন্তর্ভূত সুরুল-গ্রামে অবস্থিত শ্রীনিকেতনের নানা-প্রকার কাজ দেখিয়াছেন, গ্রাম-সেবা যত-প্রকারে করা যাইতে পারে, তাহার অনেক উপায় তাঁহাদের সুবিদিত। শ্রীনিকেতনের কার্য্য-সম্বন্ধে মডার্ণ্ রিভিউ ও ওয়েল্‌ফেয়ার্ ইংরেজী মাসিক দুখানিতে অনেক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। বাংলাতেও তাহার কিছু বৃত্তান্ত আমরা পরে প্রকাশ করিব।

শিক্ষা ও চিকিৎসার বরাদ্দ

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার গত অধিবেশনে স্কুল পরিদর্শনের জন্য কিছু টাকা এবং কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সাহায্যের জন্য কিছু টাকা মঞ্জুর হইয়াছে। চিকিৎসা-বিভাগের জন্যও কিছু টাকা মঞ্জুর হইয়াছে। স্বরাজ্যদলের কৃপা না হইলে টাকা মঞ্জুর হইত কি না সন্দেহ। অতএব তাঁহারা অন্যান্য দলের সভ্যদের সহিত বাঙালী জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন।

—

বাংলার জাতীয় শিক্ষাপরিষদ্

কোন দেশেই অধিকাংশ ছাত্র কেবল জ্ঞানলাভের জন্যই জ্ঞানলাভে প্রবৃত্ত হয় না। আমাদের দেশে কেবলমাত্র জ্ঞানান্বেষী ছাত্রের সংখ্যা কম হইবার আরও কারণ আছে। ভারতবর্ষ দরিদ্রের দেশ; জীবন-সংগ্রাম এদেশে অন্য অনেক দেশ অপেক্ষা কঠোরতর। সুতরাং ছাত্রদের প্রায় সকলেই, যেরূপ শিক্ষা উপার্জ্জনের উপায় হইতে পারে, তাহাই পাইতে চায়। সরকারী বা সরকারের অনুমোদিত শিক্ষালয়-সকলে শিক্ষালাভ করিয়া সরকারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে চাকরী পাইবার ও ওকালতী-আদি ব্যবসা অবলম্বন করিবার সুবিধা হয়। পক্ষান্তরে বেসরকারী কোন সাধারণ শিক্ষালয়ে পড়িয়া তাহার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাহাতে সরকারী চাকরী পাইবার বা ওকালতী-আদি করিবার সুযোগ হয় না। জাতীয় বেসরকারী বিদ্যালয়-সকলে ছাত্র বেশী না-হওয়ার ইহা একটি কারণ। আর-একটি কারণ, জাতীয় বিদ্যালয়গুলি অনেক স্থলেই রাজনৈতিক উত্তেজনার সময় প্রতিষ্ঠিত বলিয়া, উত্তেজনা কমিয়া আসিলে তাহাদের প্রতি দৃষ্টি কমিয়া আসে, এবং তৎসমুদয় রাজনৈতিক আন্দোলন-কারীদের দ্বারা পরিচালিত বলিয়া অনেক স্থলে অনন্য-কর্ম্মা হইয়া একাগ্রতার সহিত শিক্ষকগণ তাহাতে শিক্ষা দেন না, এবং ছাত্ররাও অনেকটা রাজনৈতিক বুদ্ধিবশতঃ তাহাতে ভর্ত্তি হওয়ায় শিক্ষালাভই তাহাদের প্রধান লক্ষ্য হয় না সুতরাং শিক্ষালয়-হিসাবে সেগুলির উৎকর্ষ সাধিত হয় না। পরিশেষে আরও-একটা কারণের উল্লেখ করা

দরকার। রাজনৈতিক কারণে জাতীয় বিদ্যালয়-সকলের প্রতি গবর্ণমেণ্ট বিরূপ বলিয়া ছাত্রদের ও শিক্ষকদের, কখন অকারণে কখন বা সকারণে, নিগ্রহ হয়। তজ্জন্য ছাত্র ও শিক্ষক সুলভ হয় না। গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলতা-বশতঃ জাতীয় বিদ্যালয়-সকল সর্ব্বসাধারণের সাহায্যও যথেষ্ট পায় না।

এইপ্রকার নানা কারণে জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-সকল দুর্ব্বল ও অল্পায়ু হইয়া থাকে।

১৯০৬ সালে বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিছু কাল পরে ইহার যে-বিভাগে সাহিত্য দর্শন ইতিহাসাদি শিক্ষা দেওয়া হইত, তাহা উঠিয়া যায়; তাহার একটা প্রধান কারণ এই যে, তাহাতে শিক্ষা লাভ করিয়া উপার্জ্জনের কোন উপায় হয় না। কিন্তু এখনও হৃদয়মনের উৎকর্ষ-বিধানের জন্য ঐরূপ নানা বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া হইয়া থাকে।

এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটির যে-বিভাগে ফলিত বিজ্ঞান ও শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার নাম বেঙ্গল টেক্নিক্যাল্ ইন্স্টিটিউট্। ইহা এখনও টিকিয়া আছে এবং ক্রমশঃ ইহার উন্নতি হইতেছে। টিকিয়া থাকিবার কারণ এই, যে, যদিও ইহা বঙ্গ-বিভাগের পর রাজনৈতিক উত্তেজনার সময় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তথাপি ইহা শিক্ষাদান-কার্য্যে অভিজ্ঞ, স্থিরবুদ্ধি ও টাকাকড়ি-সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য লোকদের দ্বারা পরিচালিত হইয়া আসিতেছে, স্থাপনের কিছু-কাল পর হইতে রাজনৈতিক উত্তেজনার সহিত ইহার সম্পর্ক রহিত হইয়াছে, গবর্ণমেণ্টের শত্রুতা কয়েক বৎসর পর হইতে লক্ষিত হয় নাই, কয়েক জন ধনী লোক ইহাতে বহু লক্ষ টাকা বা টাকার সম্পত্তি দান করিয়াছেন, এবং ইহাতে শিক্ষা-প্রাপ্ত ছাত্রেরা নানা-প্রকারে অর্থ উপার্জ্জনে সক্ষম হয়।

স্যার রাসবিহারী ঘোষ ইহাতে প্রায় এগার লক্ষ টাকার সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী পাঁচলক্ষ টাকার সম্পত্তি দিয়াছেন। পরলোকগত সুবোধচন্দ্র মল্লিক একলক্ষ টাকা, এবং পরলোকগত মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী আড়াইলক্ষ টাকার সম্পত্তি দিয়া গিয়াছেন। ইহা ভিন্ন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দান আরো আছে।

বেঙ্গল টেক্নিক্যাল্ ইন্স্টিটিউট্ শিয়ালদহ হইতে ৫ মাইল দূরবর্ত্তী যাদবপুরে উঠিয়া গিয়াছে। সেখানে ১০০ বিঘা জমির উপর ইহার ঘরবাড়ী নির্ম্মিত হইতেছে। কতক নির্ম্মিত হইয়াছে। সব ইমারৎ সম্পূর্ণ করিতে এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, আস্‌বাব্ ও সরঞ্জাম ক্রয় করিতে দশ লক্ষ লাগিবে বলিয়া কমিটি অনুমান করেন। এই টাকা কমিটি সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে চান। টাকা পাওয়া উচিত। কিন্তু যাহার সঙ্গে বর্ত্তমানে উত্তেজক কোন রাজনৈতিক চীৎকার যুক্ত নাই, তাহা সর্ব্বসাধারণের মুখরোচক হইবে কি না সন্দেহ। রাজনৈতিক চাট্ ও চাট্‌নী থাকিলে অন্ততঃ ক্ষণিক ও মৌখিক আদর সুলভ হয়।

সমুদয় বন্দোবস্ত ঠিক্ হইয়া গেলে ইহাতে এক-হাজার ছাত্র শিক্ষা পাইতে পারিবে।

—

বিশ্বভারতী

বোলপুরের সন্নিহিত শান্তিনিকেতন-পল্লীতে চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি ছাত্র লইয়া ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম স্থাপন করেন। ইহা এখনও চলিতেছে। ইহার উৎপত্তি সম্পূর্ণরূপে বেসরকারী। ইহার জন্য প্রতিষ্ঠাতা কখন কোন সরকারী সাহায্য চান নাই, উপযাচক হইয়া দিতে চাহিলেও গ্রহণ করেন নাই। ইহার শিক্ষা-প্রণালী ও অপরাপর বন্দোবস্তও প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথের উদ্ভাবিত। ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে সেই প্রণালী-অনুসারে শিক্ষা দেওয়া হয়। কেহ যদি সরকারী পরীক্ষা দিতে চায়, অধ্যাপকগণ তাহাকে সাহায্য দেন মাত্র; কিন্তু আশ্রমের শিক্ষার ব্যবস্থা কোন সরকারী পরীক্ষা পাস্ করাইবার নিমিত্ত অভিপ্রেত নহে। এখন ইহা বিশ্বভারতীর অঙ্গীভূত হইয়াছে। তাহাও রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

বিশ্বভারতীর সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাহিতেছি, যে, ইহা যদিও বেসরকারী এবং সর্ব্বপ্রকারে কল্যাণকর, এবং যদিও ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমকে ছাত্রশূন্য করিবার সরকারী চেষ্টাও এক

সময়ে হইয়া গিয়াছে, তথাপি, ইহার সহিত কোন রাজনৈতিক চীৎকার ও হুজুক জড়িত নাই বলিয়া, ইহা বঙ্গের ধনী, মধ্যবিত্ত ও নির্ধনদের দৃষ্টি ভাল করিয়া আকর্ষণ করিতে পারে নাই। ইহার ব্যয়নির্ব্বাহ রবীন্দ্রনাথ প্রায় একাই করিয়া আসিয়াছেন। সম্প্রতি কিছু দিন হইতে যে অল্পস্বল্প টাকা বিশ্বভারতী পাইতেছেন, তাহাও বাংলাদেশের বাহির হইতে। কেহ বিশ পঞ্চাশ এক-শ দু-শ টাকা দান করিলেও তাহার একটা খবর অনেক কাগজে পাঠান হয়? রবি-বাবুর সেরূপ প্রবৃত্তি না থাকায় তাঁহার ত্যাগের পরিমাণ ও ইতিহাস অজ্ঞাত থাকিয়া গিয়াছে। লোকে এখনও মনে করে, তিনি ধনী জমিদার, নোবেল-প্রাইজ পাইয়াছেন, বহি বিক্রীর আয় আছে,—তাঁহার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের জন্য টাকা চান কেন? তিনি যে তাঁহার যথাসাধ্য দিয়াছেন ও দিতেছেন, তাহার বেশী তাঁহার সাধ্যাতীত, সে-খবরটা লোকের জানা নাই। আমরা সব জানি না, কিছু জানি। কিন্তু যাহা জানি, তাহাতেই বুঝিয়াছি, বিশ্বভারতীর টাকার দরকার খুব আছে, এবং টাকার যাহাতে সদ্ব্যয় হয় তাহার মত নিয়মাবলী প্রস্তুত করিয়া প্রতিষ্ঠানটিকে আইনানুসারে রেজিষ্টরী করা হইয়াছে।

ইহার প্রতি সর্ব্বসাধারণের কর্ত্তব্য ত আছেই। প্রাক্তন ও বর্ত্তমান ছাত্রদের কর্ত্তব্য আরও অধিক-পরিমাণে আছে।

—

আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়

মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার এত সমৃদ্ধ হইয়াছে, বিদ্যা এতরকমের হইয়াছে, এবং তাহার শাখাপ্রশাখাও এত হইয়াছে, যে, আধুনিক কোন বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন করা অতিশয় ব্যয়সাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার একটি দৃষ্টান্ত আমেরিকা হইতে দিতেছি।

১৯১৩ সালে কোলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯,৩৭৯ জন ছাত্র ছিল এবং পরীক্ষোত্তীর্ণ ২,১৫৫ জন ছাত্রকে উপাধি দেওয়া হইয়াছিল। দশবৎসর পরে ১৯২৩ সালে ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়া ৩০,৬১৯ হয়, এবং তন্মধ্যে ৩,৫৮৬ জনকে উপাধি দেওয়া হয়। ১৯১৩ সালে ৮৫২ জন অধ্যাপক ও অন্যবিধ শিক্ষাদাতা ছিলেন। ১৯২৩ সালে তাঁহাদের সংখ্যা ছিল ১,৭৮১। বিশ্ববিদ্যালয়ের অট্টালিকার সংখ্যা ৫২টি। ব্যায়াম ও খেলার জায়গা ৮০ বিঘা-পরিমিত। মেডিক্যাল স্কুল বাদে সমুদয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় ২৪০ বিঘা জমির উপর অবস্থিত।

১৯২৩ সালে, বার্ণার্ড কলেজ, শিক্ষা-কলেজ ও ঔষধ-প্রস্তুতি কলেজের ব্যয় বাদে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় পঁচিশ কোটি টাকা হইয়াছিল।

সমগ্র ব্রিটিশ ভারতবর্ষে শিক্ষার জন্য ১৯২২-২৩ সালে মোট ১৯ কোটি ৪ লক্ষ ৪ হাজার ৩৬ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। অর্থাৎ আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩০,৬১৯জন ছাত্রের জন্য যত খরচ হইয়াছিল, তাহা সমগ্র ভারতবর্ষের সব-রকমের ছাত্রের শিক্ষার ব্যয় অপেক্ষা ৬ কোটি টাকা বেশী।

আমেরিকা খুব ধনী দেশ সন্দেহ নাই, এবং ভারতবর্ষ দরিদ্র। কিন্তু তাহা হইলেও, আমেরিকা শুধু একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহা খরচ করিতেছে, সমগ্র ব্রিটিশভারতে প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্য্যন্ত সব-রকম সমুদয় শিক্ষালয়ের জন্য তাহা অপেক্ষা কম ব্যয় করিতেছে, ইহা ভাবিলে বুঝা যায় আমরা শিক্ষায় কত পশ্চাদ্‌বর্ত্তী।

বিশ্বভারতী বা অন্য কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান কয়েক হাজার বা একলাখ দুলাখ টাকা পাইলেই তাহা যথেষ্ট অপেক্ষাও বেশী মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া পড়া যে অজ্ঞতার এবং শিক্ষা সম্বন্ধে আগ্রহের অভাবেরই ফল, তাহাও ইহা হইতে বুঝা যায়।

—

লর্ড লিটনের দ্বিতীয় চিঠি

রবি-বাবুর প্রথম চিঠির উত্তরে লর্ড লিটন যে-চিঠি লেখেন, কবি তাহা সন্তোষজনক মনে না করায় তাহার প্রত্যুত্তর পাঠাইয়া ছিলেন। তাহার উত্তরে লিটন যে-চিঠি লিখিয়াছেন, তাহাও আমাদের বিবেচনায় সন্তোষজনক না হইলেও, আমরা এ-বিষয়ে বেশী কিছু লিখিতে

অনিচ্ছুক। তাহার কারণ, লিটন্ সাহেব তাঁহার প্রথম চিঠিতেই ভারতীয় নারীদের উচ্চপ্রশংসা অকপটে করিয়াছিলেন, এবং দ্বিতীয় চিঠিতে তিনি সরলভাবে দুঃখ-প্রকাশ করিয়াছেন এবং এই আশা করিয়াছেন, যে, ব্যাপারটির যেন এইখানেই পরিসমাপ্তি হয়। কিন্তু একটা কথা না বলিলে আমাদের সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য করা হইবে না বলিয়া বলিতে বাধ্য হইতেছি।

রবিবাবু তাঁহার দ্বিতীয় চিঠিতে লিখিয়াছিলেন :—

"………a considerable number of my countrymen, ………are ready to challenge your government to roduce trustworthy evidence in support of your statement even about those rare cases of a particular type of conspiracy against public officials."

তাৎপর্য্য—"আপনি সরকারী কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে যে-রকম ষড়যন্ত্রের বিরল দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন, আমার স্বদেশবাসীদের অনেকে আপনার গবর্ণমেণ্টকে সেরূপ বিরল মোকদ্দমারও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ উপস্থিত করিবার জন্য আহ্বান করিতে প্রস্তুত!"

শিষ্টভাষায় লিখিত চিঠিতে ইহা অপেক্ষা সুস্পষ্ট "চ্যালেঞ্জ" হইতে পারে না। রবি-বাবুর কথাটা খবরের কাগজের ভাষায় কতকটা এইরূপ দাঁড়ায় :—"আপনি বলিতেছেন যে, ওরূপ ঘটনা হইয়াছে, কিন্তু তাহার সংখ্যা কম। ভারতীয় বিস্তর লোক বলিতেছেন, আমরা ওরূপ-একটি ষড়যন্ত্রেরও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের অস্তিত্ব অবগত নহি। আপনি যে অল্পসংখ্যক ঘটনার কথা জানেন বলিতেছেন, তাহার অন্ততঃ একটারও প্রমাণ উপস্থিত করুন। যদি না পারেন ত, আপনার কথা প্রত্যাহার করুন!" লাটসাহেব একটিরও প্রমাণ দেন নাই—সম্ভবতঃ এইজন্য যে সেরূপ কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই; অথচ তিনি তাঁহার কথা প্রত্যাহারও করেন নাই। কেবল বলিয়াছেন, "incidents which must be familiar to almost every judicial authority," "প্রায় প্রত্যেক বিচারকের নিকট এরূপ ঘটনা সুপরিচিত"। আগে বলিয়াছিলেন, ওরূপ ঘটনা বিরল; এখন হইয়া গেল প্রায় প্রত্যেক বিচারকের নিকট সুপরিচিত! কিন্তু প্রমাণ ত একটারও দিতে পারিলেন না। এইজন্য বলিতেছি তাঁহার জবাব সন্তোষজনক নহে।

লাটসাহেব তাঁহার চিঠি এই বলিয়া শেষ করিয়াছেন—

"I would conclude………with an appeal to all those who desire to maintain the credit of the police force in Bengal to refrain from vilifying the force as a whole and to assist me in my efforts to purge it of the defects the existence of which I have never denied."

তাৎপর্য্য।—"যাঁহারা বঙ্গের পুলিস্ কর্ম্মচারীদের সুখ্যাতি রক্ষা করিতে ইচ্ছক, তাঁহাদিগকে এই অনুরোধ জানাইয়া চিঠি শেষ করিতেছি, যে, তাঁহারা পুলিসকর্ম্মচারী মাত্রেই খারাপ, এরূপ নিন্দা হইতে নিবৃত্ত হউন, এবং পুলিসের যে-সব দোষ-ত্রুটির অস্তিত্ব আমি কখনও অস্বীকার করি নাই, তাহা দূর করিতে আমাকে সাহায্য করুন।"

বিশেষ-বিশেষ ঘটনার বৃত্তান্ত দিয়া পুলিশের বিশেষ-বিশেষ দোষ লাটসাহেবকে দেখাইয়া দিতে স্বয়ং কবি রবীন্দ্রনাথ পারেন, আরও অনেকে পারেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে তাহা করিতেও পারেন; কিন্তু ফল কিছু হইবে কি না সে-বিষয়ে আমাদের গুরুতর সন্দেহ আছে।

—

রুশিয়ায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা

ভারতবর্ষ ইংরেজের অধিকৃত বলিয়া আমাদিগকে ইংরেজী শিখিতে হয়। অন্য অনেক দেশের লোক স্বাধীন হইলেও ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য, কিম্বা রাজনৈতিক পত্র-ব্যবহার ও কথাবার্ত্তা চালাইবার জন্য ইংরেজী শিখে। এবংবিধ কারণে রাষ্ট্রীয়-শক্তিশালী দেশের ভাষা কিম্বা শিল্প-বাণিজ্যে অগ্রসর দেশের ভাষা বিদেশীরাও নানাবিধ কার্য্য-সৌকর্য্যের জন্য শিখিতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের কোন রাষ্ট্রীয় শক্তি নাই, কলকারখানা শিল্পবাণিজ্যেও ইহা অগ্রসর নহে। রুশিয়ার লোকদিগকে ভারতবর্ষে প্রভুত্ব করিবার জন্য রাজকর্ম্মচারী হইয়াও এদেশে আসিতে হয় না। অথচ দেখিতেছি, রুশিয়ায় বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা হইতেছে।

রুশিয়ায় লিথোগ্রাফ্-করা একখানি বাংলা বহির কথা বলিতেছি;—লিথোগ্রাফ্-করা এইজন্য যে সেদেশে ছাপিবার বাংলা অক্ষর নাই। বহিখানি সাড়ে দশ ইঞ্চি লম্বা ও আট ইঞ্চি চৌড়া, ১৩২ পৃষ্ঠা পরিমিত। ইহার আখ্যাপত্রে লেখা আছে :—

"পেত্রোগ্রাদ প্রাচ্য বিদ্যালয়

বাংলা সাহিত্যের উদাহরণ মালা

বিদ্যালয়ের অধ্যাপক

মিকাএল তুবিআঁস্কী কর্তৃক সঙ্কলিতা

পেত্রোগ্রাদ

বঙ্গাব্দ ১৩২৯।"

প্রথমেই বাংলার যে নমুনাটি দেওয়া হইয়াছে, তাহা ইংরেজী অক্ষরে লিথোগ্রাফ্-করা। তাহার পর আছে হিতোপদেশ হইতে করটক ও দমনকের গল্পের অনুবাদ; একপাশে বাংলা অক্ষরে অনুবাদ, অন্য পাশে দেবনাগরী অক্ষরে মূল সংস্কৃত। তাহার পর বাংলা অক্ষরে আরো অনেক নমুনা। কথামালা হইতে অশ্ব ও কুকুরের গল্প উদ্ধৃত হইয়াছে। তোতা ইতিহাস হইতে কিছু উদ্ধৃত হইয়াছে। যে-সব গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের লেখা উদ্ধৃত হইয়াছে, নীচে তাহাদের তালিকা দিতেছি :—

শ্রীবিক্রমাদিত্যের বত্রিশ পুত্তলিকা, পুরুষ-পরীক্ষা, রামমোহন রায়ের সহমরণ-বিষয়ক পুস্তিকা, অক্ষয়কুমার দত্তের চারুপাঠ, সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ইন্দিরা, স্বর্ণ-লতা, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আঁধারে আলো, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

আমরা যদৃচ্ছা নামগুলি লিখিয়াছি, কোন ক্রম-অনুসারে নহে। কিন্তু পুস্তকখানিতে গদ্যের নমুনা এরূপভাবে সাজান হইয়াছে, যাহাতে সংগ্রাহকের মত-অনুসারে বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ বুঝা যায়। সর্ব্বশেষে দুটি কবিতা আছে। তাহা রবীন্দ্রনাথ-রচিত। বহিটি হইতে এই একটা কথার প্রমাণ পাওয়া যায়, যে, রুশিয়া কেবল রক্তস্রোত ও কঙ্কালের দেশ নহে। সেখানকার লোকেরা ভীষণ বিপ্লব সত্ত্বেও এমন একটি দেশের ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা করিবার নিমিত্ত অর্থ, সময় ও শক্তি ব্যয় করিতে সমর্থ, যাহার কোন রাজনৈতিক বা বাণিজ্যিক প্রাধান্য নাই। রুশিয়ার লোকদের বাংলার চর্চ্চার কারণ ভাষা-বিজ্ঞানে অনু-বলিয়া অনুমিত হয়। রুশিয়ার লোকেরা মানুষ, আমরাও মানুষ। তাহাদের সহিত আমাদের এইমাত্র সম্পর্ক। বিদেশীরাও মানুষ বলিয়াই তাহাদের সাহিত্যে তাহাদের প্রাণের পরিচয় পাইবার ইচ্ছা হইতে বুঝা যায়, যে, যাহারা এই পরিচয় পাইতে ব্যগ্র, তাহারা দূরত্ব সত্ত্বেও মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতন ও জাগ্রত। এই সচেতনতা ও জাগৃতির মাত্রা হইতে এক-একটি জাতির আত্মার পরিচয় পাওয়া যায়। এবিষয়ে আমরা জগতের কাছে কি পরিচয় দিতেছি, তাহা ভাবিবার বিষয়! রাজনৈতিক বা বাণিজ্যিক প্রাধান্য যাহাদের নাই, এরূপ জাতির কথা ছাড়িয়াই দিলাম। যাহাদের এরূপ প্রাধান্য আছে, সেই-সব জাতির ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চাই বা আমরা কয়জন করি? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বিশ্বভারতীতে বিদেশী কোন কোন ভাষা শিখিবার যে-বন্দোবস্ত আছে, তাহার সুযোগ কয় জন গ্রহণ করেন?

—

বঙ্গে ইংরেজ-আমলে প্রথম নাটক অভিনয়

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত ফর্ওয়ার্ডে প্রমাণ-সহ লিখিয়াছেন, যে, লেবেডফ্ নামক একজন রুশ ভাগ্যা-ন্বেষী ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রথম বাংলা নাটকের অভিনয় করান। নাটককটি "দি ডিস্গাইস্" বা ছদ্মবেশ-নামক ইংরেজী নাটকের মর্ম্মানুবাদ; তাহাতে দেশ-কালোপযোগী নূতন জিনিষও যোগ করা হইয়াছিল। অনুবাদ গোলোকনাথ দাস নামক একজন বাঙ্গালীর সাহায্যে করা হয়। নাটকটি অভিনেতা ও অভিনেত্রীর দ্বারা অভিনীত হয়। গোলোকনাথ দাসের সাহায্যে অভিনেত্রী সংগৃহীত হইয়াছিল। প্রথম অভিনয়ের রাত্রিতে লেবেডফ্ ৮ টাকার ও ৪ টাকার দু-রকমের টিকিট বিক্রী করিয়াছিলেন। তাহাতে খুব ভীড় হইয়াছিল। দ্বিতীয় রজনীতে এক-এক স্বর্ণ মোহর মূল্যে কেবলমাত্র দুইশত টিকিটের ব্যবস্থা হয়। সমস্ত টিকিটই বিক্রী হইয়াছিল।

বাংলাদেশে ক্ষয়কাশের প্রাদুর্ভাব

সম্প্রতি কলিকাতায় একটি বক্তৃতায় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বলিয়াছেন, বাংলা দেশে ক্ষয়কাশে মৃত্যুর সংখ্যা ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে; প্রতিবৎসর এই রোগে এক লক্ষ লোক মরিতেছে, অর্থাৎ মোটামুটি ঘণ্টায় ১২ জন মরিতেছে। এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তিনি সর্ব্বসাধারণের উপকার করিয়াছেন।

এই রোগের বিস্তৃতির কারণ কি-কি, এবং কি উপায়েই বা ইহার প্রাদুর্ভাব কমাইতে পারা যায়, বাংলা ও ইংরেজী সমুদয় খবরের কাগজে এবং নানা বক্তৃতায় তাহার আলোচনা হওয়া উচিত। গবর্ণমেণ্টের এবং সমুদয় ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ডের, মিউনিসিপালিটির ও গ্রাম্য-ইউনিয়নের এই বিষয়ে মন দেওয়া উচিত।

—

রেলওয়ে বোর্ডে ভারতীয়ের অভাব

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক প্রশ্নের উত্তরে গবর্ণমেণ্ট্ পক্ষ হইতে জানান হইয়াছে, যে, উপযুক্ত কোন ভারতীয় লোক না পাওয়াতেই রেলওয়ে বোর্ডের মেম্বররূপে কোন ভারতীয়কে নিযুক্ত করা হয় নাই! জবাবটা ভিত্তিহীন। শ্রীযুক্ত সাতকড়ি ঘোষের রেলওয়ে-সম্বন্ধে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা খুব বেশী। তাঁহার রচিত রেলওয়ে বিষয়ক বহিগুলি রেলওয়ে বিভাগের ও অন্যান্য বিভাগের কর্ত্তৃস্থানীয় ইংরেজরাও প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। বড়লাট হার্ডিং তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাঁহার রেলওয়ে-বিষয়ক জ্ঞান বিশেষজ্ঞের দ্বারা "আন্‌রাইভ্যাল্ড্" বা অসমকক্ষ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তথাপি, তিনি ইউরোপীয় নহেন বলিয়া তাঁহার গুণের যথোপযুক্ত আদর হইতেছে না।

—

জাতীয় আত্মকর্ত্তৃত্ব ও দেশরক্ষা

ইংরেজদের মুখে একটা তর্ক শুনা যায় (এবং ইংরেজভক্ত কোন-কোন ভারতীয়ও বলিয়া থাকেন), ভারতীয়েরা জাতীয় আত্মকর্ত্তৃত্ব চায়, অথচ ইচ্ছা করে যে, বহিঃশত্রু ও অন্তঃশত্রু হইতে দেশ-রক্ষার কাজ ইংরেজ করুক; অর্থাৎ তাহারা জীবনের সুখ ও ঐশ্বর্য্যের সুখ সবটুকু চায়, কিন্তু জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করিবার সামর্থ্য তাহাদের নাই।

ইহার জবাব দু-রকম। ভারতীয়দিগকে সামরিক নেতৃত্বে অক্ষম ইংরেজই করিয়াছে। সিপাহী-বিদ্রোহের সময়েও গোরা সৈন্যের ভারতীয় নেতা ছিল। তাহার পর দেশী সিপাহীদের নেতৃত্ব পর্য্যন্ত ইংরেজদের হাতে গিয়াছে। এখন "পিণ্ডিরক্ষার" জন্য যে সামান্য ২।১ জন ভারতীয়কে সামরিক অফিসার্ করা হইতেছে, তাহাতে ভারতবর্ষের সৈনিক বিভাগ কখনও পূর্ণমাত্রায় ভারতীয়দের দ্বারা চালিত হইতে পারিবে না।

সুতরাং ইংরেজেরা যে-অবস্থা ঘটাইয়াছে ও যে-অবস্থা কায়েম রাখিতে এখনও সচেষ্ট, তাহার জন্য আমাদিগকে দোষী করা, ভণ্ডামি ভিন্ন আর কিছু নয়।

দ্বিতীয় জবাব এই, যে, ভারতবর্ষ যে, দেশ-রক্ষার ভার অনেকটা ইংরেজ সেনাপতিদের হাতে থাকা সত্ত্বেও অসামরিক অন্যান্য বিষয়ে আত্মকর্ত্তৃত্ব চাহিতেছে, তাহার নজীর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাসেই আছে। কানাডাকে ও অষ্ট্রেলিয়াকে যখন দায়িত্বপূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়, তখন সেখান হইতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সৈন্যদল সরাইয়া লওয়া হয় নাই; কানাডার ও অষ্ট্রেলিয়ার আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে যখন বিলাতের গবর্ণমেণ্টের কোন ক্ষমতা রহিল না, তখনও ঐ বিলাতী গবর্ণমেণ্টের সৈন্যদল ঐ দুই উপনিবেশকে (**বিলাতী গবর্ণমেণ্টেরই ব্যয়ে**) রক্ষা করিবার জন্য তথায় অবস্থিত ছিল। অথচ আমাদের দেশে আমাদেরই ব্যয়ে দেশী সিপাহী ও ইংরেজ সৈন্যকে ইংরেজ সেনাপতির অধীনে কিছু-কাল দেশ-রক্ষা করিতে হইবে বলিয়া আমাদিগকে অসামরিক ও আভ্যন্তরীণ বিষয়ে আত্মকর্ত্তৃত্ব দেওয়ায় আপত্তি হইতেছে।

আমরা চিরকালের জন্য এইরূপ অপমানকর ও অসহায় অবস্থায় থাকিতে চাহিতেছি না। নিজেরাই সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল হইবার জন্য সময় ও ক্ষমতা চাহিতেছি। আমাদের হাতে অন্য বিষয়ে আত্মকর্ত্তৃত্ব

না আসিলে আমরা, দেশ-রক্ষা বিষয়েও প্রস্তুত হইতে পারিব না। ইংরেজরা আমাদিগকে প্রস্তুত হইবার ক্ষমতা ও সুযোগ দিতে চান না, অথচ আমাদের অসহায়তা ও অসামর্থ্য বিষয়ে বিদ্রূপ করিতেও ছাড়িবেন না।

কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ায় প্রধানতঃ ইংরেজদের জা'তভাই খৃষ্টিয়ান্ ও শ্বেতকায় লোকেরা বাস করে। এইজন্য ঐ দুই উপনিবেশ-সম্বন্ধে বিলাতের গবর্ণ্মেণ্ট্ যে-নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে সে-নীতি অবলম্বিত না হওয়াই মানব-সভ্যতা ও মানব-প্রকৃতির বর্ত্তমান অবস্থায় স্বাভাবিক। তথাপি যে আমরা ঐ দুই দেশের নজীরের উল্লেখ করিলাম, তাহার কারণ এই, যে, ইংরেজ জাতি, বিলাতী গবর্ণ্মেণ্ট্ এবং ভারতের ব্রিটিশ গবর্ণ্মেণ্ট বলিয়া থাকেন, যে, জাতিধর্ম্মের বিচার না করিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ন্যায়ানুমোদিত নীতিই অবলম্বিত হইয়া থাকে। অধিকন্তু, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা-পত্রেও লেখা আছে, যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সকল লোকের প্রতি সমান ব্যবহার হইবে—যদিও এই সমান ব্যবহার ইংরেজ রাজপুরুষদিগকে ও অন্য ইংরেজদিগকে করাইবার ক্ষমতা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ছিল না, তাঁহার বংশধরদেরও ছিল না ও নাই।

—

বিলাতী কাপড় বর্জ্জন

বিলাতী কাপড় ব্যবহার না করিয়া দেশী কাপড় ব্যবহার করিলে নানাপ্রকারে দেশের উপকার করা হয়, তাহা আমরা অনেক-বার বলিয়াছি। কাপাসের চাষ এদেশে অন্য কোন দেশ হইতে আমদানী করা হয় নাই, ইহা ভারতের আদিম জিনিষ; বরং যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে ইহাই মনে হয়, যে, কাপাসের চাষ ভারতবর্ষ হইতেই অন্য সব দেশে নীত হইয়াছে। ভারতে প্রচুর তুলা হয়, আরও বেশী হইতে পারে। তাহা হইতে সুতা কাটিবার এবং ঐ সূতা হইতে কাপড় বুনিবার নৈপুণ্যও আমাদের দেশের যথেষ্ট-সংখ্যক লোকে অর্জ্জন করিতে পারে, সুতরাং কাপড়ের জন্য অন্য দেশের উপর নির্ভর করা আমাদের পক্ষে লজ্জার বিষয়।

আমাদের সকলেরই যে দেশী কাপড় ব্যবহার করা উচিত, তাহা বুঝাইবার জন্য এবং এই কর্ত্তব্যের প্রতি সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত সভা আহ্বান করা, তথায় বক্তৃতা করা, দলবদ্ধ হইয়া পতাকা লইয়া রাস্তায়-রাস্তায় গান করা, কাপড়ের দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ক্রেতাদিগকে কেবলমাত্র দেশী কাপড় কিনিতে অনুরোধ করা ও তাহার অনুকূল যুক্তি প্রদর্শন করা—এইপ্রকার নানা চেষ্টার বিরোধী আমরা নহি। এইরূপ চেষ্টার প্রয়োজন আছে। তাহার দ্বারা যত বেশী দেশী কাপড় বিক্রী হইবে, ততই মঙ্গল। কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই, যে, কেবল এইপ্রকার উপায়ে ভারতবর্ষের সর্ব্বসাধারণকে স্বদেশীবস্ত্রপরিহিত করা যাইবে না; আরও বেশী তুলা, সুতা, কাপড় ভারতে উৎপাদন করিতে হইবে। যাঁহারা কেবলমাত্র চীৎকার করিতেছেন, এই-জন্যই আমরা তাঁহাদের সমালোচনা করিয়াছি। চীৎকার করা সোজা কাজ, তাহাতে বাহবাও পাওয়া যায়। কিন্তু শুধু চীৎকারে স্থায়ী ফল হইবে না, এবং আমাদের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইবে না। স্বরাজ্যদল কর্ত্তৃক তাড়াতাড়ি একটা খাদি-সমিতি গঠন করিয়া খাদি-প্রদর্শনী করিলেও প্রমাণ হইবে না যে, তাঁহাদের দ্বারা বস্ত্র উৎপাদনের কাজ বরাবর হইয়া আসিতেছে। বঙ্গ-বিভাগের সময় দেশী কাপড়ের সপক্ষে সভা, গান প্রভৃতি এখনকার চেয়ে অনেক বেশী হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কোন স্থায়ী ফল হয় নাই। যাহা করিব বলিয়া আমরা আস্ফালন করি, তাহা করিতে না-পারা লজ্জার বিষয় ত বটেই, অধিকন্তু বার-বার বিফলপ্রযত্ন হইলে আমরা নিজেই নিজেদের উপর বিশ্বাস হারাইব, নিরুৎসাহ হইয়া পড়িব; সুতরাং ভবিষ্যতে কোন বড় কাজে হাত দিবার সাহস এবং তাহা সম্পন্ন করিবার সামর্থ্য আমাদের থাকিবে না। অতএব বর্ত্তমান চেষ্টা যাহাতে বিফল না হয়, তাহার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে,—যথেষ্ট তুলা, সুতা ও বস্ত্র উৎপাদনে মন দিতে হইবে।

—

মজুরদের চা-বাগান পরিত্যাগ

আসামের অনেক চা-বাগান হইতে আবার বিস্তর মজুর চলিয়া আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার প্রকৃত

কারণ যে কি, তাহা ভারতীয় লোকেরা সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন,—যদিও ঐসব চা-বাগানের মালিক ইংরেজরা ও তাঁহাদের জা'তভাই অনেকে বলিবেন, রাজনৈতিক আন্দোলনকারীরা এই অনর্থ ঘটাইতেছে।

চা-বাগানের ম্যানেজার প্রভৃতি ইংরেজ কর্ম্মচারীরা মোটা বেতন পান এবং বেশ আরামদায়ক স্বাস্থ্যকর গৃহে বাস করেন। যে-সব কোম্পানী চা-বাগানের মালিক, তাহাদের অংশীদারেরাও বেশ লাভ পান। সুতরাং চা-বাগানের মজুরদিগকে গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহের পক্ষে যথেষ্ট বেতন দেওয়া কঠিন নহে। গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া, সন্তানদের শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া, তাহারা যাহাতে কিছু সঞ্চয় করিতে পারে, এরূপ বেতন তাহাদিগকে দেওয়া উচিত, এবং তাহাদিগকে স্বাস্থ্যকর ও সুনীতি-রক্ষার উপযোগী ঘর দেওয়াও উচিত। চায়ের ব্যবসায়ে যেরূপ লাভ হয়, তাহাতে ইহা করা যায়। শুধু চায়ের ব্যবসায়ে নহে, অন্য সব-রকম কারখানার ও মিলের সম্বন্ধেও এইরূপ আইন থাকা দরকার, যে, মালিকগণ শ্রমিকদিগের জন্য যথেষ্ট বেতন এবং স্বাস্থ্যকর ও সুনীতি-রক্ষার উপযোগী বাসগৃহের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য থাকিবেন। এই নিয়ম পালন না করিলে ঐপ্রকার কোন ব্যবসা বা কারখানা-আদি চালাইতে দেওয়া হইবে না, এইরূপ নিয়মও থাকা উচিত। সকল নিয়ম পালিত হইতেছে কি না, তাহা দেখিবার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক পরিদর্শক কর্ম্মচারী থাকা চাই।

চা-বাগানে শ্রমিকদিগের প্রতি দুর্ব্যবহার যাহাতে না হয়, তাহার ব্যবস্থাও করিতে হইবে। প্রাদেশিক সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন এবং সমগ্রভারত-সম্বন্ধে ন্যূনকল্পে আভ্যন্তরীণ সমুদয় বিষয়ে জাতীয় আত্মকর্তৃত্বের ক্ষমতা আমরা না পাইলে প্রয়োজনীয় সমুদয় আইন এবং আইনের বিধি পালিত হইতেছে কি না তাহা দেখিবার ব্যবস্থা করা সম্ভব না হইবারই কথা।

কিন্তু যদিই বা তাহা এখন বা জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব পাইবার পর সম্ভব হয়, তাহা হইলেও কেবলমাত্র আইনের দ্বারা কাহাকেও অত্যাচার ও অন্যায় ব্যবহার হইতে সম্পূর্ণ রক্ষা করা যাইবে না—যদিও কিয়ৎপরিমাণে করা যাইতে পারে। শ্রমিকরা নিজেই নিজেদের ন্যায়তঃ প্রাপ্য বেতন, বাস-গৃহ ও ব্যবহার বুঝিয়া লইতে পারিলে তবে প্রকৃত প্রতিকার হইবে। ইহার জন্য তাহাদের যথোচিত উদ্বোধন ও শিক্ষার প্রয়োজন। তাহাতে আমাদিগকে মন দিতে হইবে। স্বাধীনদেশ-সকলেও শ্রমিকগণ আত্মরক্ষায় অপেক্ষাকৃত মনোযোগী ও সমর্থ হইবার পূর্ব্বে অত্যাচার ও অন্যায় ব্যবহার হইতে রক্ষিত হয় নাই; এখন ক্রমশঃ অধিক-পরিমাণে রক্ষিত হইতেছে।

সম্মিলিত কংগ্রেস্

পরিবর্ত্তন-বিরোধী দল, স্বরাজ্য-দল, মিসেস্ বেসাণ্টের দল ও অন্য সব রাজনৈতিক দলের সম্মিলিত কংগ্রেসের কথা হইতেছে। তাহা হইলে সুখের বিষয় হইবে। আমরা আগেই বলিয়াছি, যে, মূলতঃ, যখন সকল দলের ঈপ্সিত বস্তু এক, তখন তাহা লাভ করিবার সম্মিলিত চেষ্টাই বাঞ্ছনীয়।

জলপ্লাবন

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অনেক জেলায়, মহীশূর ও কোচীনে, সিন্ধু ও পঞ্জাব প্রদেশদ্বয়ে, বাংলার নানা জেলায়,—ভারতবর্ষের বহু অংশে, জলপ্লাবনে অগণিত লোক ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপন্ন হইয়াছে; অনেক জায়গায় বহুসংখ্যক লোকের প্রাণহানিও হইয়াছে। দক্ষিণ-ভারতেই বিপদ্ সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক ও ভয়ঙ্কর হইয়াছে। জনসাধারণের পক্ষ হইতে সর্ব্বত্র সাহায্য দিবার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু গবর্ণ্মেণ্টেরও সাহায্য করা কর্ত্তব্য।

বন্যা দ্বারা এইপ্রকার আকস্মিক বিপদ্ নিবারণের উপায় হইতে পারে কি না, তাহার অনুসন্ধান, এবং উপায় থাকিলে তাহা অবলম্বন, লোকহিতসাধক সভা-সমিতির দ্বারা হওয়া দুর্ঘট। তাহা কেবল গবর্ণ্মেণ্টের দ্বারা হইতে পারে। আমেরিকার এঞ্জিনীয়ারর কোথাও কোথাও, যেমন ওহিওতে, বন্যাদ্বারা জলপ্লাবন নিবারণের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। এবিষয়ে অনুসন্ধান আবশ্যক।

স্থায়ী শান্তি স্থাপন

জেনিভায় আবার ব্রিটিশ ও ফরাসী জাতির রাজনৈতিক দলপতিরা বলিয়াছেন যে, তাঁহারা স্থায়ী শান্তির উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। সত্য হইলে বড়ই আনন্দের বিষয় হইবে। কিন্তু বিশ্বাস হইতেছে না।

মরোক্কোতে স্বাধীনতাকামী রিফ্‌দিগের সহিত স্পেনের যুদ্ধ চলিতেছে। ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি জাতি ত পৃথিবীতে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র স্থাপনের নিমিত্ত মহাযুদ্ধ করিয়াছিলেন; তাঁহারা মধ্যস্থ হইয়া মরোক্কোর যুদ্ধটা থামাইয়া দিন্ এবং মরোক্কোকে স্বাধীন করিয়া দিন্। তাহা হইলে বুঝিব তাঁহারা শান্তি চান।

সাতিশয় পরিতাপের বিষয়, চীনে ভিন্ন-ভিন্ন দলে যুদ্ধ বাধিয়াছে, এবং আত্মরক্ষার (ও স্বার্থসিদ্ধির ?) জন্য ইতিমধ্যেই বার-শত ব্রিটিশ, আমেরিকান্, জাপানী ও ইটালিয়ান্ নৌসৈনিক নিজ নিজ জাতির যুদ্ধজাহাজ হইতে সাংহাইয়ে ডাঙায় নামিয়াছে। পৃথিবীর শক্তিশালী জাতিরা যদি চীনকে এক ও স্বাধীন রাখিয়া যুদ্ধ থামাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে পৃথিবীর কল্যাণ হয়।

—

হিন্দু বিধবার বিবাহ

গৌহাটির হিন্দুদের এক জনসভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে বলিয়া অমৃতবাজার পত্রিকায় দেখিলাম। কেবল চারিজন ইহার বিরোধী ছিলেন।

"এই সভার মত এই, যে, হিন্দু-বিধবাদের পুনর্ব্বিবাহ হিন্দুসমাজের সকল শ্রেণীর পক্ষে হিতকর, এবং ব্রাহ্মণাদি যে-সকল জাতির মধ্যে ইহা প্রচলিত নাই, তাঁহাদেরও বর্ত্তমান সময়ে তরুণবয়স্ক বিধবাদের বিবাহ দিবার রীতি অবলম্বন করা উচিত।"

—

চরখায় মিহি সূতা কাটা

চরখায় সূতা কাটার প্রতিযোগিতায় শ্রীমতী অপর্ণা দেবী নাম্নী অষ্টাদশবর্ষবয়স্কা একটি বাঙালী মহিলা ভারতবর্ষে প্রথম স্থানীয় হইয়াছেন, এই সংবাদ মহাত্মা গান্ধীর ইয়ং ইণ্ডিয়ায় বাহির হইয়াছে। মহাত্মাজী তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। অপর্ণা দেবী নিখিলভারত খদ্দর বোর্ডের নিকট ৭৬ নম্বরের ১০০০ গজ সূতা পাঠাইয়াছিলেন।

—

বিলাতী কাপড় ও "অপবিত্রতা"

যাঁহারা বিলাতী কাপড় বর্জ্জন করিতে বলিতেছেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের কোন ঝগড়া নাই। কিন্তু আমরা তাঁহাদের সহিত একমত নহি যাঁহারা উহাকে অপবিত্র, অস্পৃশ্য, হারাম্ ইত্যাদি বলিতেছেন। স্মরণাতীত কাল হইতে আগত এক "অস্পৃশ্যতা"য় আমরা ভুগিতেছি; তাহার উপর আবার একটা অনর্থ বাড়ান কেন? প্রত্যহ আমরা নানা বিলাতী জিনিষ ব্যবহার করিতেছি; মুদ্রাযন্ত্র-আদি যত কল ভারতে ব্যবহৃত হয়, তাহার বেশীর ভাগ বিলাত হইতে আগত। সেগুলা কেন অস্পৃশ্য হয় না? যদি বলেন, যে, যে-সব জিনিষ ভারতেই হয়, তাহার মত অন্য জিনিষ বিলাত হইতে আসিলে অস্পৃশ্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলে বলি, সেরূপ জিনিষ কাপড় ছাড়া আরও ত অনেক আছে; সেগুলা কিন্তু অস্পৃশ্য বিবেচিত হয় না। দেশী গ্রন্থকারের ইংরেজী ব্যাকরণ, পাটীগণিত, বীজগণিত-আদি আছে বলিয়া বিলাতী ঐ-ঐ বহি কি কেহ স্পর্শ করে না? যদি অপবিত্র কিছু থাকে, তাহা হইলে ছুৎমার্গটাই অপবিত্র।

কার্ত্তিকের প্রবাসী

কার্ত্তিকের প্রবাসী পূজার ছুটির পূর্ব্বেই বাহির হইবে। যাঁহাদের যাণ্মাসিক চাঁদা আশ্বিন মাসে ফুরাইয়াছে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক পরবর্ত্তী যাণ্মাসিক চাঁদা ৩৷৵০ তিন টাকা পাঁচ আনা আগামী ২২শে সেপ্টেম্বরের ভিতর যাহাতে আমাদের অফিসে পৌছে তদনুরূপ মনি-অর্ডার বা অন্য ব্যবস্থা করিয়া বাধিত করিবেন। উক্ত তারিখ-মধ্যে মনি-অর্ডার বা ভিঃ পিঃ প্রেরণের নিষেধপত্র না পাইলে কার্ত্তিক সংখ্যা যথারীতি ভিঃ পিঃতে প্রেরিত হইবে। কার্ত্তিকের প্রবাসীতে বিজ্ঞাপন দিবার শেষ দিন ৬ই আশ্বিন।

আগামী কার্ত্তিক মাস হইতে প্রবাসীতে আর-একখানি উপন্যাস আরম্ভ হইবে।

সিন্ধু

শ্রী প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

উত্তাল ভীম দুর্দ্দম !
যুগে যুগে মহাবিক্রম
কত দেশ রাজদর্পে
গ্রাসিয়াছ তব গর্ভে !—
সেই তেজ রাজতন্ত্র
ফুকারিয়া মহামন্ত্র,
আস্ফালি' মহা আক্রোশ,
দিশি-দিশি তুলি' মহারোষ,
উন্মাদ করে গর্জ্জন
টুটিতে সলিল-বন্ধন !—
নাচে তাই ঢেউ, দোলে জল
আছাড়ি' আকুলি' অবিরল,
দুর্ব্বার ভেঙে ভেঙে ধায়
উদ্দাম ঘোর ঝঞ্ঝায় ।
উন্মাদ ঢেউ উন্মাদ
দোলে দোলে, এল পরমাদ
ওই ওই বুঝি বিশ্বে !—
স্তম্ভিত সব দৃশ্যে !
বাধা-ভাঙা ক্ষ্যাপা সিন্ধু !
বিশ্রাম নাহি বিন্দু ;—
উদ্দাম চল খলখল,
মহারুদ্র ও মহাবল ।
(যেন) সক্রোধ ক্ষ্যাপা শঙ্কর
সতী-কাঁধে ফেরে ধরা 'পর,
হাসে খিলখিল অবিরল—
শাদা ফেনা ঝরে কলকল,
ঘটাবে প্রলয় দুর্জ্জয়,
কাঁপে সৃষ্টি ও কাঁপে ভয় !
সিন্ধু ! মাতায়ে পারাপার
এ কি লীলা তব !—সংহার
খেলিছে, মেলিছে আস্য,
এ যে দানবের হাস্য !
জ্ঞানহীন যেন আদি প্রাণ
সৃষ্টির সেই অভিযান
আজো লভেনিক সংযম,
নাহি ছন্দ ও নাহি ক্রম,
আজো নহে সেই তৃপ্ত,
গড়ে, ভাঙে, ছোটে ক্ষিপ্ত !

* *

কূলে দাঁড়ায়েছি ক্ষুদ্র'
বল বল মোরে, রুদ্র !
কিবা ক্রন্দন, পরিতাপ,
কিবা ব্যথা, শোক, কি প্রলাপ,
ঢেউএ ঢেউএ ফোলে অনিবার.
অজ্ঞেয় কোন্ দুখভার ?
ভেদি' মোর দেহ-চর্ম্মে
ও উচ্ছাস পশে মর্ম্মে,—
নহে ক্রন্দন, নহে শোক,
নহে তাহা ব্যথা, দুখভোগ,—
দুর্জ্জয় মহা উল্লাস
বিশ্বের প্রাণ-উচ্ছ্বাস,
মূক ধরণীর প্রাণমন
মূক বিশ্বের সে গোপন
প্রাণ তব মাঝে চঞ্চল
আলোড়িছে বেগে উচ্ছল ।
তুমি বিশ্ব ও ধরণীর
দৃপ্ত পরাণ তেজী বীর !
নমামি নমামি মহাপ্রাণ !
নমামি সিন্ধু মহীয়ান !

* *

ভোরের বেলা, সিন্ধু, তোমার কূলে
দাঁড়িয়েছি আজ, ঐ ও নভ-মূলে
প্রকাণ্ড এক সোনার থালা ওঠে,—
সূর্য্য না কি !—কী অপরূপ ফোটে !—
আধখানা তার রহে জলের তলে,
আধা'র আলোয় জলের সোনা জ্বলে ;
লাফিয়ে ওঠে দুষ্ট যেন ছেলে—
মায়ের কোলে দাঁড়িয়ে পড়ে ঠেলে !
সোনার আভা ভাসে, দোদুল দোলে
দীর্ঘ দেহে উতল ঢেউএর কোলে !
বসিয়ে দেছে সোনার যেন থাম—
ঢেউর 'পরে দুলছে অবিরাম ।
চোখ মেলে চাই ওই সুদূরে দূরে
পেরিয়ে ফেনা পেরিয়ে সে ঢেউ ঘুরে'
উধাও হেরি চক্রবালের রেখা,
সেইখানেও শেষ তব নেই লেখা !—
অসীম সুনীল অগাধ সুনীল বারি—
চোখ হেরে যায় ধর্‌তে গিয়ে তারি
দেহের আভাস ; মন মানে যে হার
গভীর উদারতার পেতে পার !
সোনার রবি একটি পাশে হাসে,
উধাও বারি চৌদিকে উচ্ছ্বাসে ।

শেষ কোথা নেই!—শেষ কোথা রে শেষ?
আমায় খালি দেছে সীমার বেশ।
ওহে বিরাট্! বিরাট্ আলিঙ্গনে
আমায় চেপে ছড়িয়ে ও-শয়নে
সোনার জলে, ঢেউ-দোলাতে, নীলে
দাও হে মেলে তোমার ও নিখিলে!
বিরাট্ তোমায় করে' নমস্কার
সঁপ্‌ছি আমার ক্ষুদ্র-দেহ-ভার।

* *

গভীর রাতে হঠাৎ এ যে ভাঙ্‌ল আমার ঘুম,
লোকের কথা সব কোলাহল একান্ত নিঝ্‌ঝুম!
গর্জ্জে ওঠে সুদূরে ওই কে যেন আস্ফালে,—
সিন্ধু ডাকে সিন্ধু মাতে গভীর রাত্রিকালে!
ঘুমের বুকে সকল মানুষ অগাধ লভে সুখ,
একলা আমি জাগ্‌নু কেন?—কাঁপ্‌ছে ত্রাসে বুক!
আছ্‌ড়ে' ডাকে, গর্জ্জে' ডাকে, আস্‌ছে যেন ছুটে'
পাগ্‌লা সাগর; করবে কি গ্রাস?—নেবে কি আজ লুটে'
এই সুযোগে ক্ষুদ্র ভবন?—ক্ষুদ্র আমায় ধরে'
টান্‌বে কি ওই ঢেউর বুকে, আছ্‌ড়ে' গুঁড়ো করে'
কর্‌বে বিলোপ?—ভয়ে আমার কাঁপ্‌ছে সারা দেহ!
কি অপরাধ সিন্ধু আমার?—বাঁচাও, কর স্নেহ।
ওই ডাকে ঢেউ, ওই ডাকে জল, ওই সে কলরোল,
ভীম ভীমতর তীব্র নিঠুর যেন মরণ-দোল!
পাগল ভোলার তাল-বেতালে প্রমথ সব নাচে!
আজকে আমায় কে বাঁচাবে?—প্রাণ করুণা যাচে!
স্তব্ধ রাতে সিন্ধু তোলে অত্যাচারের ভেরী,—
একক আমার বুকের মাঝে বাজ্‌ছে ঘুরি' ঘেরি'—
নিশ্বাস্ আসে রুদ্ধ হ'য়ে বিরাট্ ভয়ের চাপে,
হাত কাঁপে মোর, কাঁপ্‌ছে দেহ, প্রাণ হিয়া মন কাঁপে!
রক্ষা কর আমায় আজি, সিন্ধু আমার পিতা!
সন্তানে আজ রোষ কোরো না, বিশ্বভূমির মিতা!
প্রাণ খুলে' আজ এ-প্রাণ ভরে' তোমায় নমস্কার;
রক্ষা কর, আর এস না আছ্‌ড়ে বারংবার!

* *

নমামি নমামি সিন্ধু!
যুগে যুগে রবি, ইন্দু
ভেদি' উঠে তব গর্ভ
অরুণিম শুচি। সর্ব্ব
ভূমি তুমি গড়ে' নিত্য
দিলে বাস, দাও বিত্ত।
আদিম-জীবন-অঙ্কুর
তব মাঝে হ'ল পরিপূর;
ফুৎকারে তার এ মানব
জন্ম লভিল জীব সব।
বীর তুমি কভু শান্ত।
দীপ্ত উজল, ধূমলীন!
এই একরূপ, এই ভিন্!
নিশ্চল, পুন লীলাময়!
নিষ্ঠুর, পুন সদাশয়!
শুভ্র আবার কভু নীল!
গম্ভীর, হাস খিলখিল!
কভু দেব, কভু দৈত্য—
ভাঙো দেশ, ভাঙো চৈত্য!
ফেনমালা গলে চিকচিক
ধরিয়া রত্ন ও মাণিক
সম্রাট্ তুমি সম্রাট্—
পদতলে কাঁপে ধরা-নাট!
শত বাহু তুলে' উচ্চ
বাজাও শাসন-তূর্য্য!
স্তব্ধ অবাক্ শোনে ব্যোম
তব গর্জ্জন, মহা ওম্!
হে মহান্! দিই বিস্ময়
তব পায়ে প্রেম আর ভয়।
তুমি দাও দাও অনুরাগ
ঢেউ-ডোরে বাঁধ দেহভাগ।
ক্ষুদ্র এ দেহ-বন্ধন
ভেঙে দাও, যত ক্রন্দন
ছাড়া পাক্, মিশে' যাক ওই
সীমাহীন জলে থইথই;
তব সন্তানে বুকে নাও
নূতন জন্মে গড়ে' দাও;
করে' দাও নভ-যুক্ত,
বিপুল উদার মুক্ত,
অসীম নিখিলে দাও বাস,
দুখ সুখ কাঁদা হোক্ নাশ;
অতল অগাধে ডুবে যাই,
রতন-শয়ানে শুতে চাই,
দুলে দুলে দুলে ফেনা-সাথ
ভেসে ভেসে যাই দিন-রাত!
বিরাট্! বিরাট্! নিয়ে যাও—
দেহ, মন প্রাণ নাও তাও।
এ আমার যত গর্ব্ব
ঢেউএ ঢেউএ কর খর্ব্ব!
মহা প্রাণে দাও মহা দেশ,
মহা ওঙ্কার, মহা শেষ!
নমামি নমামি মহাপ্রাণ!
হে মহাজনক মহীয়ান্!
প্রণাম প্রণাম প্রণিপাত

রক্তকরবী

[এই নাট্য-ব্যাপার যে-নগরকে আশ্রয় করিয়া আছে তাহার নাম যক্ষপুরী। এখানকার শ্রমিকদল মাটির তলা হইতে সোনা তুলিবার কাজে নিযুক্ত। এখানকার রাজা একটা অত্যন্ত জটিল জালের আবরণের আড়ালে বাস করে। প্রাসাদের সেই জালের আবরণ এই নাটকের একটিমাত্র দৃশ্য। সেই আবরণের বহির্ভাগে সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছে।]

নন্দিনী ও কিশোর (সুড়ঙ্গ-খোদাইকর বালক)

কিশোর

নন্দিনী, নন্দিনী, নন্দিনী !

নন্দিনী

আমাকে এত করে' ডাকিস্ কেন, কিশোর ? আমি কি শুন্‌তে পাইনে !

কিশোর

শুন্‌তে পা'স্ জানি, কিন্তু আমার যে ডাক্‌তে ভালো লাগে। আর ফুল চাই তোমার ? তা হ'লে আন্‌তে যাই।

নন্দিনী

যা, যা, এখনি কাজে ফিরে' যা, দেরি করিস্‌নে।

কিশোর

সমস্ত দিন ত কেবল সোনার তাল খুঁড়ে' আনি, তার মধ্যে একটু সময় চুরি করে' তোর জন্যে ফুল খুঁজে' আন্‌তে পার্‌লে বেঁচে যাই।

নন্দিনী

ওরে কিশোর, জান্‌তে পার্‌লে যে ওরা শাস্তি দেবে।

কিশোর

তুমি যে বলেছিলে—রক্তকরবী তোমার চাই-ই চাই। আমার আনন্দ এই যে, রক্তকরবী এখানে সহজে মেলে না। অনেক খুঁজে-পেতে এক-জায়গায় এখানকার জঞ্জালের পিছনে একটি মাত্র গাছ পেয়েছি।

নন্দিনী

আমাকে দেখিয়ে দে, আমি নিজে গিয়ে ফুল তুলে' আন্‌ব।

কিশোর

অমন কথা বোলো না। নন্দিনী, নিষ্ঠুর হোয়ো না। ঐ গাছটি থাক, আমার একটিমাত্র গোপন কথার মত। বিশু তোমাকে গান শোনায়, সে তার নিজের গান। এখন থেকে তোমাকে আমি ফুল জোগাব, এ আমারই নিজের ফুল।

নন্দিনী

কিন্তু এখানকার জানোয়াররা তোকে শাস্তি দেয়, আমার যে বুক ফেটে যায়!

কিশোর

সেই ব্যথায় আমার ফুল আরো বেশী করে' আমারই হ'য়ে ফোটে। ওরা হয় আমার দুঃখের ধন।

নন্দিনী

কিন্তু তোদের এ-দুঃখ আমি সইব কি করে'?

কিশোর

কিসের দুঃখ? একদিন তোর জন্যে প্রাণ দেবো, নন্দিনী, এই কথা কতবার মনে মনে ভাবি।

নন্দিনী

তুই ত আমাকে এত দিলি, তোকে আমি কি ফিরিয়ে দেবো, বল্ ত কিশোর?

কিশোর

এই সত্যটি কর্ নন্দিনী, আমার হাত থেকেই রোজ সকালে ফুল নিবি।

নন্দিনী

আচ্ছা, তাই সই। কিন্তু তুই একটু সাম্‌লে চলিস্।

কিশোর

না, আমি সাম্‌লে চল্‌ব না, চল্‌ব না। ওদের মারের মুখের উপর দিয়েই রোজ তোমাকে ফুল এনে দেবো।

[প্রস্থান

(অধ্যাপকের প্রবেশ)

অধ্যাপক

নন্দিনী! যেয়ো না, ফিরে' চাও।

নন্দিনী

কি অধ্যাপক!

অধ্যাপক

ক্ষণে ক্ষণে অমন চমক্ লাগিয়ে দিয়ে চলে' যাও কেন? যখন মনটাকে নাড়া দিয়েই যাও, তখন না হয় সাড়া দিয়েই বা গেলে! একটু দাঁড়াও, দুটো কথা বলি!

নন্দিনী

আমাকে তোমার কিসের দর্‌কার?

অধ্যাপক

দর্‌কারের কথা যদি বল্‌লে ঐ চেয়ে দেখ! আমাদের খোদাইকরের দল পৃথিবীর বুক চিরে' দর্‌কারের বোঝা মাথায় কীটের মত সুড়ঙ্গর ভিতর

থেকে উপরে উঠে' আস্‌ছে। এই যক্ষপুরে আমাদের যা-কিছু ধন সব ঐ ধূলোর নাড়ীর ধন,—সোনা। কিন্তু সুন্দরী, তুমি যে-সোনা সে ত ধূলোর নয়, সে যে আলোর। দর্‌কারের বাঁধনে তাকে কে বাঁধ্‌বে?

নন্দিনী

বারে বারে ঐ একই কথা বলো। আমাকে দেখে' তোমার এত বিস্ময় কিসের অধ্যাপক?

অধ্যাপক

সকালে ফুলের বনে যে-আলো আসে তা'তে বিস্ময় নেই, কিন্তু পাকা দেয়ালের ফাটল দিয়ে যে-আলো আসে সে আর-এক কথা। যক্ষপুরে তুমি সেই আচম্‌কা আলো! তুমিই বা এখানকার কথা কি ভাবছ বলো দেখি?

নন্দিনী

অবাক্ হ'য়ে দেখ্‌ছি সমস্ত সহর মাটির তলাটার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে অন্ধকার হাৎড়ে বেড়াচ্ছে। পাতালে সুড়ঙ্গ খুদে' তোমরা যক্ষের ধন বের করে' করে' আন্‌ছ। সে যে অনেক যুগের মরা ধন, পৃথিবী তাকে কবর দিয়ে রেখেছিল।

অধ্যাপক

আমরা যে সেই মরা ধনের শবসাধনা করি। তার প্রেতকে বশ কর্‌তে চাই। সোনার তালের তাল-বেতালকে বাঁধ্‌তে পার্‌লে পৃথিবীকে পা'ব মুঠোর মধ্যে।

নন্দিনী

তার পরে আবার, তোমাদের রাজাকে এই একটা অদ্ভুত জালের দেয়ালের আড়ালে ঢাকা দিয়ে রেখেছ, সে যে মানুষ, পাছে সে-কথা ধরা পড়ে। তোমাদের ঐ সুড়ঙ্গের অন্ধকার-ডালাটা খুলে' ফেলে' তার মধ্যে আলো ঢেলে দিতে ইচ্ছে করে, তেম্‌নি ইচ্ছে করে ঐ বিশ্রী জালটাকে ছিড়ে' ফেলে' মানুষটাকে উদ্ধার করি।

অধ্যাপক

আমাদের মরা ধনের প্রেতের যেমন ভয়ঙ্কর শক্তি, আমাদের মানুষ-ছাঁকা রাজারও তেম্‌নি ভয়ঙ্কর প্রতাপ।

নন্দিনী

এ-সব তোমাদের বানিয়ে-তোলা কথা।

অধ্যাপক

বানিয়ে-তোলাই ত। উলঙ্গের কোনো পরিচয় নেই, বানিয়ে-তোলা কাপড়েই কেউ বা রাজা, কেউবা ভিখিরী। এস আমার ঘরে। তোমাকে তত্ত্বকথা বুঝিয়ে দিতে বড় আনন্দ হয়।

নন্দিনী

তোমাদের খোদাইকর যেমন খনি খুদে' খুদে' মাটির মধ্যে তলিয়ে চলেছে, তুমিও ত তেম্‌নি দিনরাত পুঁথির মধ্যে গর্ত্ত খুঁড়ে'ই চলেছ। আমাকে নিয়ে সময়ের বাজে-খরচ করবে কেন?

অধ্যাপক

আমরা নিরেট নিরবকাশ-গর্ত্তের পতঙ্গ, ঘন কাজের মধ্যে সেঁধিয়ে আছি; তুমি ফাঁকা সময়ের আকাশে সন্ধ্যাতারাটি, তোমাকে দেখে' আমাদের ডানা চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। এস আমার ঘরে, তোমাকে নিয়ে একটু সময় নষ্ট করতে দাও!

নন্দিনী

না, না, এখন না। আমি এসেছি তোমাদের রাজাকে তার ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখ্‌ব।

অধ্যাপক

সে থাকে জালের আড়ালে, ঘরের মধ্যে ঢুকতে দেবে না।

নন্দিনী

আমি জালের বাধা মানিনে, আমি এসেছি ঘরের মধ্যে ঢুকতে।

অধ্যাপক

জানো নন্দিনী, আমিও আছি একটা জালের পিছনে। মানুষের অনেকখানি বাদ গিয়ে পণ্ডিতটুকু জেগে আছে। আমাদের রাজা যেমন ভয়ঙ্কর, আমিও তেম্‌নি ভয়ঙ্কর পণ্ডিত।

নন্দিনী

আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ তুমি। তোমাকে ত ভয়ঙ্কর ঠেকে না। একটা

কথা জিজ্ঞাসা করি, এরা আমাকে এখানে নিয়ে এল, রঞ্জনকে সঙ্গে আন্‌লে না কেন ?

অধ্যাপক

সব জিনিষকে টুক্‌রো করে' আনাই এদের পদ্ধতি। কিন্তু তাও বলি, এখানকার মরা ধনের মাঝখানে তোমার প্রাণের ধনকে কেন আনতে চাও ?

নন্দিনী

আমার রঞ্জনকে এখানে আন্‌লে এদের মরা পাঁজরের ভিতর প্রাণ নেচে উঠ্‌বে।

অধ্যাপক

একা নন্দিনীকে নিয়েই যক্ষপুরীর সর্দ্দাররা হতবুদ্ধি হ'য়ে গেছে, রঞ্জনকে আন্‌লে তাদের হবে কি ?

নন্দিনী

ওরা জানে না ওরা কি অদ্ভুত ! ওদের মাঝখানে বিধাতা যদি খুব একটা হাসি হেসে ওঠেন, তা হ'লেই ওদের চট্‌কা ভেঙে যেতে পারে। রঞ্জন বিধাতার সেই হাসি।

অধ্যাপক

দেবতার হাসি সূর্য্যের আলো, তাতে বরফ গলে, কিন্তু পাথর টলে না; আমাদের সর্দ্দারদের টলাতে গেলে গায়ের জোর চাই।

নন্দিনী

আমার রঞ্জনের জোর তোমাদের শঙ্খিনী-নদীর মত। ঐ নদীর মতই সে যেমন হাস্‌তেও পারে তেম্‌নি ভাঙ্‌তেও পারে। অধ্যাপক তোমাকে আমার আজকের দিনের একটি গোপন খবর দিই। আজ রঞ্জনের সঙ্গে আমার দেখা হবে।

অধ্যাপক

জান্‌লে কি করে' ?

নন্দিনী

হবে, হবে, দেখা হবে। খবর এসেছে।

অধ্যাপক

সর্দ্দারের চোখ এড়িয়ে কোন্ পথ দিয়ে খবর আস্‌বে ?

নন্দিনী

যে-পথে বসন্ত আস্‌বার খবর আসে সেই পথ দিয়ে। তাতে লেগে আছে আকাশের রং, বাতাসের লীলা।

অধ্যাপক

তার মানে আকাশের রঙে বাতাসের লীলায় উড়ো খবর এসেছে !

নন্দিনী

যখন রঞ্জন আস্‌বে তখন দেখিয়ে দেবো উড়ো খবর কেমন করে' মাটিতে এসে পৌঁছল।

অধ্যাপক

রঞ্জনের কথা উঠলে নন্দিনীর মুখ আর থাম্‌তে চায় না। থাক্‌গে, আমার ত আছে বস্তুতত্ত্ব-বিদ্যা, তার গহ্বরের মধ্যে ঢুকে' পড়িগে, আর সাহস হচ্ছে না। (খানিকটা গিয়ে ফিরে' এসে) নন্দিনী, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, যক্ষপুরীকে তোমার ভয় কর্‌ছে না ?

নন্দিনী

ভয় কর্‌বে কেন ?

অধ্যাপক

গ্রহণের সূর্য্যকে জন্তুরা ভয় করে, পূর্ণ সূর্য্যকে ভয় করে না। যক্ষপুরী গ্রহণলাগা পুরী। সোনার গর্ত্তের রাহুতে ওকে খাব্‌লে খেয়েছে। ও নিজে আস্ত নয়, কাউকে আস্ত রাখ্‌তে চায় না। আমি তোমাকে বল্‌ছি এখানে থেকো না। তুমি চলে' গেলে ঐ গর্ত্তগুলো আমাদের সাম্‌নে আরো হাঁ করে' উঠ্‌বে ; তবু বল্‌ছি, পালাও। যেখানকার লোকে দস্যুবৃত্তি করে' মা বসুন্ধরার আঁচলকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে' ছেঁড়ে না, সেইখানে রঞ্জনকে নিয়ে সুখে থাকোগে। (কিছু দূর গিয়ে ফিরে' এসে) নন্দিনী, তোমার ডান হাতে ঐ যে রক্তকরবীর কঙ্কণ, ওর থেকে একটি ফুল খসিয়ে দেবে ?

নন্দিনী

কেন, কি কর্‌বে তুমি ?

অধ্যাপক

কতবার ভেবেছি, তুমি যে রক্তকরবীর আভরণ পরো, তার একটা কিছু মানে আছে।

নন্দিনী

আমি ত জানিনে কি মানে?

অধ্যাপক

হয়ত তোমার ভাগ্যপুরুষ জানে। ঐ রক্ত-আভায় একটা ভয়-লাগানো রহস্য আছে, শুধু মাধুর্য্য নয়!

নন্দিনী

আমার মধ্যে ভয়?

অধ্যাপক

সুন্দরের হাতে রক্তের তুলি দিয়েছে বিধাতা। জানিনে, রাঙা রঙে তুমি কি লিখন লিখ্‌তে এসেছ। মালতী ছিল, মল্লিকা ছিল, ছিল চামেলি; সব বাদ দিয়ে এ-ফুল কেন বেছে নিলে? জানো, মানুষ না জেনে অম্‌নি করে' নিজের ভাগ্য বেছে নেয়।

নন্দিনী

রঞ্জন আমাকে কখনো কখনো আদর করে' বলে রক্তকরবা। জানিনে আমার কেমন মনে হয়, আমার রঞ্জনের ভালোবাসার রং রাঙা, সেই রং গলায় পরেছি, বুকে পরেছি, হাতে পরেছি।

অধ্যাপক

তা আমাকে ওর একটি ফুল দাও, শুধু ক্ষণকালের দান, ওর রঙের তত্ত্বটি বোঝ্‌বার চেষ্টা করি।

নন্দিনী

এই নাও। আজ রঞ্জন আস্‌বে সেই আনন্দে এই ফুলটি তোমাকে দিলুম।

[অধ্যাপকের প্রস্থান

(সুড়ঙ্গ-খোদাইকর গোকুলের প্রবেশ)

গোকুল

একবার মুখ ফেরাও ত দেখি। তোমাকে বুঝ্‌তেই পার্‌লুম না। তুমি কে?

নন্দিনী

আমাকে যা দেখচ তা ছাড়া আমি কিছুই না। বোঝ্‌বার তোমার দর্‌কার কি?

গোকুল

না বুঝ্‌লে ভালো ঠেকে না? এখানে তোমাকে রাজা কোন্‌ কাজের প্রয়োজনে এনেছে?

নন্দিনী

অকাজের প্রয়োজনে।

গোকুল

একটা কি মন্তর তোমার আছে! ফাঁদে ফেলচ সবাইকে! সর্ব্বনাশী তুমি। তোমার ঐ সুন্দর মুখ দেখে' যারা ভুল্‌বে তারা মরবে।

গোকুল

দেখি, দেখি, সীঁথিতে তোমার ঐ কি ঝুল্‌ছে?

নন্দিনী

রক্তকরবীর মঞ্জরী।

গোকুল

ওর মানে কি?

নন্দিনী

ওর কোনো মানেই নেই।

গোকুল

আমি কিচ্ছু তোমাকে বিশ্বাস করিনে। একটা কি ফন্দী করেচ। আজ দিন না যেতেই একটা কিছু বিপদ্‌ ঘটাবে। তাই এত সাজ। ভয়ঙ্করী, ওরে ভয়ঙ্করী!

নন্দিনী

আমাকে দেখে' তোমার এমন ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে কেন?

গোকুল

দেখে' মনে হচ্ছে তুমি রাঙা আলোর মশাল। যাই নির্ব্বোধদের বুঝিয়ে বলিগে, "সাবধান, সাবধান, সাবধান!"

[প্রস্থান

নন্দিনী

(জালের দরজায় ঘা দিয়ে)

শুনতে পাচ্ছ ?

নেপথ্যে

নন্দা, শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু বারে বারে ডেকো না, আমার সময় নেই, একটুও না।

নন্দিনী

আজ খুসিতে আমার মন ভরে' আছে। সেই খুসি নিয়ে তোমার ঘরের মধ্যে যেতে চাই।

নেপথ্যে

না, ঘরের মধ্যে না, যা বলতে হয় বাইরে থেকে বলো।

নন্দিনী

কুঁদ-ফুলের মালা গেঁথে পদ্মপাতায় ঢেকে এনেছি।

নেপথ্যে

নিজে পরো।

নন্দিনী

আমাকে মানায় না. আমার মালা রক্তকরবীর।

নেপথ্যে

আমি পর্ব্বতের চূড়ার মত, শূন্যতাই আমার শোভা।

নন্দিনী

সেই চূড়ার বুকেও ঝর্না ঝরে, তোমার গলাতেও মালা দুলবে। জাল খুলে' দাও, ভিতরে যাবো।

নেপথ্যে

আসতে দেবো না, কি বলবে শীঘ্র বলো। সময় নেই।

নন্দিনী

দূর থেকে ঐ গান শুনতে পাচ্ছ ?

নেপথ্যে

কিসের গান ?

নন্দিনী

পৌষের গান : ফসল পেকেছে, কাট্‌তে হবে, তারি ডাক :

(গান)

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয় রে চলে',
আয়, আয়, আয় !
ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে,
মরি হায়, হায়, হায় !

দেখ্‌ছ না, পৌষের রোদ্দুর পাকা ধানের লাবণ্য আকাশে মেলে' দিচ্ছে।

হাওয়ার নেশায় উঠ্‌ল মেতে
দিগ্‌বধূরা ধানের ক্ষেতে,
রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে—
মরি, হায়, হায়, হায় !

তুমিও বেরিয়ে এস, রাজা, তোমাকে মাঠে নিয়ে যাই।

মাঠের বাঁশি শুনে' শুনে' আকাশ খুসি হ'ল,
ঘরেতে আজ কে র'বে গো ? খোলো দুয়ার খোলো।

নেপথ্যে

আমি মাঠে যাবো ? কোন্ কাজে লাগ্‌ব ?

নন্দিনী

মাঠের কাজ তোমার যক্ষপুরীর কাজের চেয়ে অনেক সহজ !

নেপথ্যে

সহজ কাজটাই আমার কাছে শক্ত। সরোবর কি ফেনার-নূপুর-পরা ঝর্‌নার মত নাচ্‌তে পারে ? যাও, যাও, আর কথা কোয়ো না, সময় নেই।

নন্দিনী

অদ্ভুত তোমার শক্তি। যেদিন আমাকে তোমার ভাণ্ডারে ঢুক্‌তে দিয়েছিলে, তোমার সোনার তাল দেখে' কিছু আশ্চর্য্য হইনি, কিন্তু যে বিপুল শক্তি দিয়ে অনায়াসে সেইগুলোকে নিয়ে চুড়ো করে' সাজাচ্ছিলে তাই

দেখে' মুগ্ধ হয়েছিলুম। তবু বলি, সোনার পিণ্ড কি তোমার ঐ হাতের আশ্চর্য্য ছন্দে সাড়া দেয় যেমন সাড়া দিতে পারে ধানের ক্ষেত? আচ্ছা, রাজা, বলো ত, পৃথিবীর এই মরা ধন দিন-রাত নাড়াচাড়া করতে তোমার ভয় হয় না?

নেপথ্যে

কেন, ভয় কিসের?

নন্দিনী

পৃথিবী আপনার প্রাণের জিনিষ আপনি খুসি হ'য়ে দেয়। কিন্তু যখন তার বুক চিরে' মরা হাড়গুলোকে ঐশ্বর্য্য বলে' ছিনিয়ে নিয়ে আসো, তখন অন্ধকার থেকে একটা কাণা রাক্ষসের অভিসম্পাত নিয়ে আসো। দেখ্‌ছ না এখানে সবাই যেন কেমন রেগে আছে, কিম্বা সন্দেহ করছে, কিম্বা ভয় পাচ্ছে?

নেপথ্যে

অভিসম্পাত?

নন্দিনী

হাঁ, খুনোখুনি কাড়াকাড়ির অভিসম্পাত।

নেপথ্যে

শাপের কথা জানিনে। এ জানি যে আমরা শক্তি নিয়ে আসি। আমার শক্তিতে তুমি খুসি হও, নন্দিন?

নন্দিনী

ভারি খুসি লাগে। তাই ত বলছি আলোতে বেরিয়ে এস, মাটির উপর পা দেও, পৃথিবী খুসি হ'য়ে উঠুক।

আলোর খুসি উঠ্‌ল জেগে
ধানের শীষে শিশির লেগে,
ধরার খুসি ধরে না গো ঐ যে উথলে,
মরি, হায়, হায়, হায়!

নেপথ্যে

নন্দিনী, তুমি কি জানো, বিধাতা তোমাকেও রূপের মায়ার আড়ালে অপরূপ করে' রেখেছেন? তার মধ্যে থেকে ছিনিয়ে তোমাকে আমার মুঠোর ভিতর পেতে চাচ্ছি, কিছুতেই ধরতে পারছিনে। আমি তোমাকে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখতে চাই, না পারি ত ভেঙেচুরে ফেলতে চাই।

নন্দিনী

ও কি বলছ তুমি?

নেপথ্যে

তোমার ঐ রক্তকরবীর আভাটুকু ছেঁকে নিয়ে আমার চোখে অঞ্জন করে' পরতে পারিনে কেন? সামান্য পাপ্‌ড়ি কটা আঁচল চাপা দিয়ে বাধা দিয়েছে। তেমনি বাধা তোমার মধ্যে; কোমল বলে'ই কঠিন! আচ্ছা নন্দিনী, আমাকে কি মনে করো, খুলে' বলো ত।

নন্দিনী

সে আরেক দিন বল্‌ব। আজ ত তোমার সময় নেই, আজ যাই।

নেপথ্যে

না, না, যেয়ো না, বলে' যাও, আমাকে কি মনে করো বলো।

নন্দিনী

কতবার বলেছি, তোমাকে মনে করি আশ্চর্য। প্রকাণ্ড হাতে প্রচণ্ড জোর ফলে' ফলে' উঠেছে, ঝড়ের আগেকার মেঘের মত,—দেখে' আমার মন নাচে।

নেপথ্যে

রঞ্জনকে দেখে' তোমার মন যে নাচে, সেও কি—

নন্দিনী

সে কথা থাক, তোমার ত সময় নেই।

নেপথ্যে

আছে সময়, শুধু এই কথাটি বলে' যাও!

নন্দিনী

সে নাচের তাল আলাদা, তুমি বুঝ্‌বে না।

নেপথ্যে

বুঝ্ব। বুঝ্তে চাই।

নন্দিনী

সব কথা ঠিক বুঝিয়ে বল্তে পারিনে, আমি যাই।

নেপথ্যে

যেয়ো না, বলো আমাকে তোমার ভালো লাগে কি না?

নন্দিনী

হাঁ, ভালো লাগে।

নেপথ্যে

রঞ্জনের মতই?

নন্দিনী

ঘুরে' ফিরে' একই কথা। এ-সব কথা তুমি বোঝো না।

নেপথ্যে

কিছু কিছু বুঝি। আমি জানি রঞ্জনের সঙ্গে আমার তফাৎটা কি। আমার মধ্যে কেবল জোরই আছে, রঞ্জনের মধ্যে আছে জাদু।

নন্দিনী

জাদু বল্‌ছ কা'কে?

নেপথ্যে

বুঝিয়ে বলব? পৃথিবীর নীচের তলায় পিণ্ড পিণ্ড পাথর লোহা সোনা, সেইখানে রয়েছে জোরের মূর্তি। উপরের তলায় একটুখানি কাঁচা মাটিতে ঘাস উঠ্‌ছে, ফুল ফুট্‌ছে—সেইখানে রয়েছে জাদুর খেলা। দুর্গমের থেকে হীরে আনি, মাণিক আনি; সহজের থেকে ঐ প্রাণের জাদুটুকু কেড়ে আনতে পারিনে।

নন্দিনী

তোমার এত আছে, তবু কেবলি অমন লোভীর মত কথা বলো কেন?

নেপথ্যে

আমার যা আছে সব বোঝা হ'য়ে আছে। সোনাকে জমিয়ে তুলে' ত পরশমণি হয় না,—শক্তি যতই বাড়াই, যৌবনে পৌঁছল না। তাই

পাহারা বসিয়ে তোমাকে বাঁধ্‌তে চাই; রঞ্জনের মত যৌবন থাক্‌লে ছাড়া রেখেই তোমাকে বাঁধ্‌তে পার্‌তুম। এম্‌নি করে' বাঁধনের রসিতে গাঁট দিতে দিতেই সময় গেল। হায় রে, আর সব বাঁধা পড়ে, কেবল আনন্দ বাঁধা পড়ে না।

নন্দিনী

তুমি ত নিজেকেই জালে বেঁধেছ, তার পরে কেন এমন ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছ বুঝতে পারিনে।

নেপথ্যে

বুঝ্‌তে পার্‌বে না। আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি;—তোমার মত একটি ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বল্‌ছি—আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত। তৃষ্ণার দাহে এই মরুটা কত উর্ব্বরা ভূমিকে লেহন করে' নিয়েছে, তা'তে মরুর পরিসরই বাড়ছে, ঐ একটুখানি দুর্ব্বল ঘাসের মধ্যে যে প্রাণ আছে তা'কে আপন কর্‌তে পার্‌ছে না।

নন্দিনী

তুমি যে এত ক্লান্ত তোমাকে দেখে' ত তা মনেই হয় না; আমি ত তোমার মস্ত জোরটাই দেখ্‌তে পাচ্ছি।

নেপথ্যে

নন্দিন, একদিন দূরদেশে আমারই মত একটা ক্লান্ত পাহাড় দেখেছিলুম। বাইরে থেকে বুঝ্‌তেই পারিনি তার সমস্ত পাথর ভিতরে ভিতরে ব্যথিয়ে উঠেছে। একদিন গভীর রাতে ভীষণ শব্দ শুন্‌লুম, যেন কোন্‌ দৈত্যের দুঃস্বপ্ন গুম্‌রে' গুম্‌রে' হঠাৎ ভেঙে গেল। সকালে দেখি পাহাড়টা ভূমিকম্পের টানে মাটির নীচে তলিয়ে গেছে। শক্তির ভার নিজের অগোচরে কেমন করে' নিজেকে পিষে' ফেলে, সেই পাহাড়টাকে দেখে' তাই বুঝেছিলুম; আর তোমার মধ্যে একটা জিনিষ দেখ্‌ছি—সে এর উল্টো।

নন্দিনী

আমার মধ্যে কি দেখ্‌ছ?

নেপথ্যে

বিশ্বের বাঁশিতে নাচের যে-ছন্দ বাজে সেই ছন্দ

নন্দিনী

বুঝতে পারলুম না।

নেপথ্যে

সেই ছন্দে বস্তুর বিপুল ভার হাল্‌কা হ'য়ে যায়। সেই ছন্দে গ্রহনক্ষত্রের দল ভিখারী নট-বালকের মত আকাশে আকাশে নেচে বেড়াচ্ছে। সেই নাচের ছন্দেই নন্দিনী তুমি এমন সহজ হয়েছ, এমন সুন্দর। আমার তুলনায় তুমি কতটুকু, তবু তোমাকে ঈর্ষা করি।

নন্দিনী

তুমি নিজেকে সবার থেকে হরণ করে রেখে বঞ্চিত করেছ; সহজ হ'য়ে ধরা দাও না কেন?

নেপথ্যে

নিজেকে গুপ্ত রেখে বিশ্বের বড় বড় মালখানার মোটা মোটা জিনিষ চুরি করতে বসেছি। কিন্তু যে-দান বিধাতার হাতের মুঠির মধ্যে ঢাকা, সেখানে তোমার চাঁপার কলির মত আঙুলটি যতটুকু পৌঁছোয়, আমার সমস্ত দেহের জোর তার কাছ দিয়ে যায় না। বিধাতার সেই বন্ধ মুঠো আমাকে খুলতেই হবে।

নন্দিনী

তোমার এসব কথা আমি ভালো বুঝতে পারিনে, আমি যাই।

নেপথ্যে

আচ্ছা যেয়ো,—কিন্তু জান্‌লার বাইরে এই হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি তোমার হাতখানি একবার এর উপর রাখো।

নন্দিনী

না, না, তোমার সবখানা বাদ দিয়ে হঠাৎ একখানা হাত বেরিয়ে এলে আমার ভয় করে।

নেপথ্যে

কেবল একখানা হাত দিয়ে ধরতে চাই বলেই সবাই আমার কাছ থেকে পালিয়ে যায়। কিন্তু সব দিয়ে যদি তোমাকে ধরতে চাই, ধরা দেবে কি নন্দিন?

নন্দিনী

তুমি ত আমাকে ঘরে যেতে দিলে না, তবে কেন এসব বল্‌ছ?

নেপথ্যে

আমার অনবকাশের উজান ঠেলে' তোমাকে ঘরে আন্‌তে চাইনে। যেদিন পালের হাওয়ায় তুমি অনায়াসে আস্‌বে সেই দিন আগমনীর লগ্ন লাগ্‌বে। সে-হাওয়া যদি ঝড়ের হাওয়া হয় সেও ভালো। এখনো সময় হয়নি।

নন্দিনী

আমি তোমাকে বল্‌ছি রাজা, সেই পালের হাওয়া আন্‌বে রঞ্জন। সে যেখানে যায় ছুটি সঙ্গে নিয়ে আসে।

নেপথ্যে

তোমার রঞ্জন যে-ছুটি বয়ে' নিয়ে বেড়ায় সেই ছুটিকে রক্তকরবীর মধু দিয়ে ভরে' রাখে কে আমি কি জানিনে? নন্দিন, তুমি ত আমাকে ফাঁকা ছুটির খবর দিলে, মধু কোথায় পাবো?

নন্দিনী

আজ আমি তবে যাই।

নেপথ্যে

না, এই কথাটার জবাব দিয়ে যাও।

নন্দিনী

ছুটি কি করে' মধুতে ভরে, তার জবাব, রঞ্জনকে চোখে দেখ্‌লেই পাবে। সে বড় সুন্দর।

নেপথ্যে

সুন্দরের জবাব সুন্দরই পায়। অসুন্দর যখন জবাব ছিনিয়ে নিতে চায়, বীণার তার বাজে না, ছিঁড়ে' যায়। আর নয়, যাও তুমি চলে' যাও—নইলে বিপদ্ ঘটবে।

নন্দিনী

যাচ্ছি, কিন্তু বলে' গেলুম, আজ আমার রঞ্জন আস্‌বে, আস্‌বে, আস্‌বে, কিছুতে তাকে ঠেকাতে পারবে না।

[প্রস্থান

(ফাগুলাল খোদাইকর ও তার স্ত্রী চন্দ্রার প্রবেশ)

ফাগুলাল

আমার মদ কোথায় লুকিয়েছ চন্দ্রা, বের করো !

চন্দ্রা

ও কি কথা ? সকাল থেকেই মদ ?

ফাগুলাল

আজ ছুটির দিন। কাল ওদের মারণ-চণ্ডীর ব্রত গেছে। আজ ধ্বজাপূজা, সেই সঙ্গে অস্ত্রপূজা।

চন্দ্রা

বলো কি ? ওরা কি ঠাকুর-দেবতা মানে ?

ফাগুলাল

দেখনি ওদের মদের ভাঁড়ার, অস্ত্রশালা আর মন্দির একেবারে গায়ে গায়ে।

চন্দ্রা

তা ছুটি পেয়েছ বলে'ই মদ ? গাঁয়ে থাকতে পার্ব্বণের ছুটিতে ত—

ফাগুলাল

বনের মধ্যে পাখী ছুটি পেলে উড়তে পায়, খাঁচার মধ্যে তাকে ছুটি দিলে মাথা ঠুকে' মরে। যক্ষপুরে কাজের চেয়ে ছুটি বিষম বালাই।

চন্দ্রা

কাজ ছেড়ে দাও না, চলো না ঘরে ফিরে'।

ফাগুলাল

ঘরের রাস্তা বন্ধ জানো না বুঝি ?

চন্দ্রা

কেন বন্ধ ?

ফাগুলাল

আমাদের ঘর নিয়ে ওদের কোন মুনফা নেই।

চন্দ্রা

আমরা কি ওদের দরকারের গায়ে আঁট-করে' লাগানো ? যেন ধানের গায়ে তুঁষ ? ফালতো কিছুই নেই ?

ফাগুলাল

আমাদের বিশু-পাগল বলে, আস্ত হ'য়ে থাকাটা কেবল পাঁঠার নিজের পক্ষেই দরকার; যারা তাকে খায়, তার হাড়-গোড়, খুর-ল্যাজ বাদ দিয়েই খায়। এমন কি, হাড়-কাঠের সাম্নে তারা যে ভ্যাঁ করে' ডাকে, সেটাকেও বাহুল্য বলে' আপত্তি করে। ঐ যে বিশু-পাগল গান গাইতে গাইতে আস্‌ছে।

চন্দ্রা

কিছুদিন থেকে হঠাৎ ওর গান খুলে' গেছে।

ফাগুলাল

তাই ত দেখ্‌ছি।

চন্দ্রা

ওকে নন্দিনীতে পেয়েছে, সে ওর প্রাণ টেনেছে, গানও টেনেছে।

ফাগুলাল

তাতে আর আশ্চর্য্যটা কি?

চন্দ্রা

না, আশ্চর্য্য কিছুই নেই। ওগো সাবধান থেকো, কোন্‌ দিন তোমারও গলা থেকে গান বের কর্‌বে—সেদিন পাড়ার লোকের কি দশা হবে? মায়াবিনী মায়া জানে। বিপদ্‌ ঘটাবে।

ফাগুলাল

বিশুর বিপদ্‌ আজ ঘটেনি, এখানে আস্‌বার অনেক আগে থাকৃতেই ও নন্দিনীকে জানে।

চন্দ্রা

বিশু বেয়াই, শুনে' যাও, শুনে' যাও! যাও কোথায়? গান শোনাবার লোক এখানেও এক-আধজন মিল্‌তে পারে, নিতান্ত লোকসান হবে না।

(বিশুর প্রবেশ ও গান)

বিশু

মোর স্বপন-তরীর কে তুই নেয়ে?
লাগ্‌ল পালে নেশার হাওয়া পাগল পরাণ চলে গেয়ে।

আমায়　ভুলিয়ে দিয়ে যা
তোর　দুলিয়ে দিয়ে না,
তোর　সুদূর ঘাটে চল্ রে বেয়ে।

চন্দ্রা

তবে ত আশা নেই, আমরা যে বড় কাছে।

বিশু

আমার　ভাবনা ত সব মিছে,
আমার　সব পড়ে' থাক্ পিছে।
তোমার　ঘোম্‌টা খুলে' দাও,
তোমার　নয়ন তুলে' চাও,
দাও　হাসিতে মোর পরাণ ছেয়ে॥

চন্দ্রা

তোমার স্বপন-তরীর নেয়েটি কে সে আমি জানি।

বিশু

বাইরে থেকে কেমন করে' জানবে? আমার তরীর মাঝখান থেকে তাকে ত দেখনি।

চন্দ্রা

তরী ডোবাবে একদিন বলে' দিলুম, তোমার সেই সাধের নন্দিনী!

(গোকুল খোদাইকরের প্রবেশ)

গোকুল

দেখ বিশু, তোমার ঐ নন্দিনীকে ভালো ঠেক্‌ছে না।

বিশু

কেন, কি করেছে?

গোকুল

কিছুই করে না, তাই ত খট্‌কা লাগে। এখানকার রাজা খামকা ওকে আনালে কেন? ওর রকমসকম কিছুই বুঝিনে।

চন্দ্রা

বেয়াই, এ আমাদের দুঃখের জায়গা, ও যে এখানে অষ্টপ্রহর কেবল সুন্দরীপনা করে' বেড়ায় এ আমরা দেখ্‌তে পারিনে!

গোকুল

আমরা বিশ্বাস করি সাদা মোটাগোছের চেহারা, বেশ ওজনে ভারি।

বিশু

যক্ষপুরীর হাওয়ায় সুন্দরের পরে অবজ্ঞা ঘটিয়ে দেয় এইটেই সর্ব্বনেশে। নরকেও সুন্দর আছে, কিন্তু সুন্দরকে কেউ সেখানে বুঝ্‌তেই পারে না, নরকবাসীর সবচেয়ে বড় সাজা তাই।

চন্দ্রা

আচ্ছা বেশ, আমরাই যেন মূর্খ, কিন্তু এখানকার সর্দ্দার পর্য্যন্ত ওকে দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারে না, তা জানো?

বিশু

দেখো, দেখো চন্দ্রা, সর্দ্দারের দু'চক্ষুর ছোঁয়াচ যেন তোমাকে না লাগে, তা হ'লে আমাদের দেখে'ও তোমার চক্ষু লাল হ'য়ে উঠ্‌বে। আচ্ছা তুই কি বলিস্ ফাগুলাল?

ফাগুলাল

সত্যি কথা বলি, দাদা, নন্দিনীকে যখন দেখি, নিজের দিকে তাকিয়ে লজ্জা করে। ওর সাম্‌নে কথা কইতে পারিনে।

গোকুল

বিশু ভাই, ঐ মেয়েকে দেখে' তোমার মন ভুলেছে সেইজন্যে দেখ্‌তে পাচ্ছ না ও কি অলক্ষণ নিয়ে এসেছে। বুঝ্‌তে বেশি দেরি হবে না, বলে' রাখ্‌লুম।

ফাগুলাল

বিশু ভাই, তোমার বেয়ান জান্‌তে চায় আমরা মদ খাই কেন?

বিশু

স্বয়ং বিধির কৃপায় মদের বরাদ্দ জগতের চারদিকেই, এমন কি, তোমাদের ঐ চোখের কটাক্ষে। আমাদের এই বাহুতে আমরা কাজ জোগাই, তোমাদের বাহুর বন্ধনে তোমরা মদ জোগাও। জীবলোকে মজুরী কর্‌তে হয়, আবার মজুরী ভুল্‌তেও হয়। মদ না হ'লে ভোলাবে কিসে?

চন্দ্রা

তাই বই কি! তোমাদের মত জন্মমাতালেরই জন্যে বিধাতার দয়ার অন্ত নেই। মদের ভাণ্ড উপুড় করে' দিয়েছেন।

বিশু

একদিকে ক্ষুধা মারছে চাবুক, তৃষ্ণা মারছে চাবুক, তারা জ্বালা ধরিয়েছে, বলছে কাজ করো। অন্য দিকে বনের সবুজ মেলেছে মায়া, রোদের সোনা মেলেছে মায়া, ওরা নেশা ধরিয়েছে, বলছে, ছুটি, ছুটি!

চন্দ্রা

এইগুলোকে মদ বলে নাকি?

বিশু

প্রাণের মদ, নেশা ফিকে, কিন্তু দিনরাত লেগে আছে। প্রমাণ দেখ। এরাজ্যে এলুম, পাতালে সিঁধকাটার কাজে লাগলুম, সহজ মদের বরাদ্দ বন্ধ হ'য়ে গেল। অন্তরাত্মা তাই ওঁ হাটের মদ নিয়ে মাতামাতি করছে। সহজ নিঃশ্বাসে যখন বাধা পড়ে, তখনি মানুষ হাঁপিয়ে নিঃশ্বাস টানে।

তোর প্রাণের রস ত শুকিয়ে গেল ওরে,
তবে মরণ-রসে নে পেয়ালা ভরে'।
সে যে চিতার আগুন গালিয়ে ঢালা,
সব ক্রন্দনের মেটায় জ্বালা,
সব শূন্যকে সে অট্টহেসে দেয় যে রঙীন করে'।

চন্দ্রা

এস না, বেয়াই, পালাই আমরা।

বিশু

সেই নীল চাঁদোয়ার নীচে, খোলা মদের আড্ডায়! রাস্তা বন্ধ। তাই ত এই কয়েদখানার চোরাই মদের ওপর এমন ভয়ঙ্কর টান। আমাদের না আছে আকাশ, না আছে অবকাশ; তাই বারো ঘণ্টার সমস্ত হাসিগান সূর্য্যের আলো কড়া করে' চুঁইয়ে নিয়েছি এক-চুমুকের তরল আগুনে। যেমন ঠাস দাসত্ব, তেম্‌নি নিবিড় ছুটি।

তোর সূর্য্য ছিল গহন মেঘের মাঝে,
তোর দিন মরেছে অকাজেরি কাজে,
তবে আসুক না সেই তিমির রাতি,
লুপ্তি-নেশার চরম সাথী,
তোর ক্লান্ত আঁখি দিক সে ঢাকি দিক্-ভোলাবার ঘোরে।

ফাগুলাল

আচ্ছা ভাই বিশু, তুমি ত একদিন পুঁথি পড়ে' পড়ে' চোখ খোয়াতে বসেছিলে, তোমাকে আমাদের মত মুর্খুদের সঙ্গে কোদাল ধরালে কেন?

চন্দ্রা

এতদিন আছি, এই কথাটির জবাব বেয়াইয়ের কাছ থেকে কিছুতেই আদায় করা গেল না।

ফাগুলাল

অথচ কথাটা সবাই জানে।

বিশু

কি বলো দেখি!

ফাগুলাল

আমাদের খবর নেবার জন্যে ওরা তোমাকে চর রেখেছিল।

চন্দ্রা

যাই বলো বিশু বেয়াই, যক্ষপুরীতে এসে তোমরাই মজেছ। আমাদের মেয়েদের ত কিছু বদল হয়নি।

বিশু

হয়নি ত কি? তোমাদের ফুল গেছে শুকিয়ে, এখন সোনা সোনা করে' প্রাণটা খাবি খাচ্ছে।

চন্দ্রা

কখ্খনো না!

বিশু

আমি বল্ছি হাঁ। ঐ যে ফাগু হতভাগা বারো ঘণ্টার পরে আরো চার ঘণ্টা যোগ করে' খেটে মরে, তার কারণটা ফাগুও জানে না, তুমিও জানো না।

অন্তর্য্যামী জানেন। তোমার সোনার স্বপ্ন ভিতরের ভিতরে ওকে চাবুক মারে, সে-চাবুক সর্দ্দারের চাবুকের চেয়েও কড়া।

চন্দ্রা

আচ্ছা বেশ, তা চলো না কেন, এখান থেকে দেশে ফিরে' যাই।

বিশু

সর্দ্দার কেবল যে ফেরবার পথ বন্ধ করেছে তা নয়, ইচ্ছেটা-সুদ্ধ আট্‌কেছে। আজ যদি বা দেশে যাও টিঁক্‌তে পার্‌বে না, কালই সোনার নেশায় ছুটে' ফিরে' আস্‌বে, আফিম্‌খোর পাখী যেমন ছাড়া পেলেও খাঁচায় ফেরে।

বিশু

সবাই জান্‌তিস যদি ত আমাকে জ্যান্ত রাখ্‌লি কেন?

ফাগুলাল

এও জানি একাজ তোমার দ্বারা হ'ল না।

চন্দ্রা

এমন আরামের কাজেও টিঁক্‌তে পার্‌লে না, বেয়াই?

বিশু

আরামের কাজ? একটা সজীব দেহ, তার পিছনে পৃষ্ঠব্রণ হ'য়ে লেগে থাকা? বল্‌লুম, "দেশে যাবো, শরীর বড় খারাপ।" সর্দ্দার বল্‌লেন, "আহা এত খারাপ শরীর নিয়ে দেশে যাবেই বা কেমন করে'? তবু চেষ্টা দেখ।" চেষ্টা দেখ্‌লুম। শেষে দেখি যক্ষপুরীর কবলের মধ্যে ঢুক্‌লে তার হাঁ বন্ধ হ'য়ে যায়, এখন তার জঠরের মধ্যে যাবার একটি-পথ ছাড়া আর পথই নেই। আজ তার সেই আশাহীন আলোহীন জঠরের মধ্যে তলিয়ে গেছি। এখন তোতে-আমাতে তফাৎ এই যে সর্দ্দার তোকে যতটা অবজ্ঞা করে আমাকে তার চেয়েও বেশি। ছেঁড়া কলাপাতার চেয়ে ভাঙা ভাঁড়ের প্রতি মানুষের হেলা।

ফাগুলাল

দুঃখ কি বিশু দাদা? আমরা ত তোমাকে মাথায় করে' রেখেছি।

বিশু

প্রকাশ পেলেই মারা যাবো। তোদের আদর পড়ে যেখানে সর্দ্দারের দৃষ্টি পড়ে সেখানেই। সোনা-ব্যাঙ্ যতই মক্‌মক্ শব্দে কোলা-ব্যাঙের অভ্যর্থনা করে, সেটা কানে গিয়ে পৌঁছয় বোড়া-সাপের।

চন্দ্রা

কতদিনে তোমাদের কাজ ফুরোবে?

বিশু

পাঁজিতে ত দিনের শেষ লেখে না। একদিনের পর দু'দিন, দু'দিনের পর তিনদিন; সুরঙ্গ কেটেই চলেছি, একহাতের পর দু'হাত, দু'হাতের পর তিনহাত। তাল তাল সোনা তুলে' আন্‌ছি, এক-তালের পর দু'তাল দু'তালের পর তিন-তাল। যক্ষপুরে অঙ্কের পর অঙ্ক সার বেঁধে চলেছে, কোনো অর্থে পৌঁছয় না। তাই ওদের কাছে আমরা মানুষ নই, কেবল সংখ্যা। ফাগুভাই, তুমি কোন্ সংখ্যা?

ফাগুলাল

পিঠের কাপড়ে দাগা আছে, আমি ৪৭ ফ।

বিশু

আমি ৬৯ ঙ। গাঁয়ে ছিলুম মানুষ এখানে হয়েছি দশ-পঁচিশের ছক। বুকের উপর দিয়ে জুয়োখেলা চল্‌ছে।

চন্দ্রা

বেয়াই, ওদের সোনা ত অনেক জম্‌ল, আরো কি দর্‌কার?

বিশু

দর্‌কার বলে' পদার্থের শেষ আছে? খাওয়ার দর্‌কার আছে, পেট ভরিয়ে তার শেষ পাওয়া যায়; নেশার দর্‌কার নেই, তার শেষও নেই। ঐ সোনার তালগুলো যে মদ, আমাদের যক্ষরাজের নিরেট মদ। বুঝ্‌তে পার্‌লে না?

চন্দ্রা

না।

বিশু

মদের পেয়ালা নিয়ে ভুলে' যাই ভাগ্যের গণ্ডীর মধ্যে আমরা বাঁধা। মনে

করি আমাদের অবাধ ছুটি। সোনার তাল হাতে নিয়ে এখানকার কর্ত্তার সেই মোহ লাগে। সে ভাবে সর্ব্বসাধারণের টান ও'তে পৌঁছয় না, অসাধারণের আসমানে ও উড়ছে।

চন্দ্রা

নবান্নের সময় এল বলে', গ্রামে গ্রামে তার জোগাড় চলছে। পায়ে পড়ি ঘরে চলো। একবার সর্দ্দারকে গিয়ে আমরা যদি—

বিশু

স্ত্রীবুদ্ধিতে সর্দ্দারকে এখনো চেননি বুঝি?

চন্দ্রা

কেন ওকে দেখে' ত আমার বেশ—

বিশু

হাঁ, বেশ ঝক্‌ঝকে। মকরের দাঁত, খাঁজে খাঁজে বড় পরিপাটি করে' কাম্‌ড়ে ধরে। মকররাজ স্বয়ং ইচ্ছে করলেও আল্‌গা কর্‌তে পারে না।

চন্দ্রা

ঐ যে সর্দ্দার।

বিশু

তবেই হয়েছে! আমাদের কথা নিশ্চয় শুনেছে।

চন্দ্রা

কেন, এমন ত কিছু বলিনি, যা'তে—

বিশু

বেয়ান, কথা আমরা বলি, মানে যে করে ওরা। কাজেই কোন্ কথার টীকে কোন্ চালে আগুন লাগায় কেউ জানে না।

(সর্দ্দারের প্রবেশ)

চন্দ্রা

সর্দ্দার দাদা!

সর্দ্দার

কি নাৎনী, খবর ভালো ত?

চন্দ্রা

একবার বাড়ি যেতে ছুটি দাও।

সর্দ্দার

কেন? যে বাসা দিয়েছি সে ত খাসা, বাড়ির চেয়ে অনেক ভালো। সরকারী খরচে চৌকিদার পর্য্যন্ত রাখা গেছে। কি হে ৬৯ ঙ. তোমাকে এদের মধ্যে দেখ্‌লে মনে হয় সারস এসেছেন বকের দলকে নাচ শেখাতে।

বিশু

সর্দ্দারজি, তোমার ঠাট্টা শুনে' আমোদ লাগ্‌ছে না। নাচাবার মত পায়ের জোর থাক্‌লে এখান থেকে টেনে দৌড় মার্‌তুম। তোমাদের এলাকায় নাচানো ব্যবসা কত সাংঘাতিক তার মোটা মোটা দৃষ্টান্ত দেখেছি, এমন হয়েছে সাদা চালে চল্‌তেও পা কাঁপে।

সর্দ্দার

নাংনী, একটা সু-খবর আছে। এদের ভালো-কথা শোনাবার জন্যে কেনারাম গোসাঁইকে আনিয়ে রেখেছি। এদের কাছ থেকে প্রণামী আদায় করে' খরচটা উঠে' যাবে। গোসাঁইজির কাছ থেকে রোজ সন্ধ্যেবেলায় এরা—

ফাগুলাল

না, না, সে হবে না, সর্দ্দারজি। এখন সন্ধ্যেবেলায় মদ খেয়ে বড় জোর মাৎলামি করি, উপদেশ শোনাতে এলে নরহত্যা ঘট্‌বে।

বিশু

চুপ্, চুপ্, ফাগুলাল!

(গোসাঁইয়ের প্রবেশ)

সর্দ্দার

এই যে বল্‌তে বল্‌তেই উপস্থিত! প্রভু, প্রণাম! আমাদের এই কারিগরদের দুর্ব্বল মন, মাঝে মাঝে অশান্ত হ'য়ে উঠে। এদের কানে একটু শান্তি মন্ত্র দেবেন—ভারি দরকার!

গোসাঁই

এই এদের কথা বল্‌ছ? আহা, এরা ত স্বয়ং কূর্ম্ম অবতার! বোঝার নীচে নিজেকে চাপা দিয়েছে বলেই সংসারটা টিঁকে আছে। ভাব্‌লে শরীর পুলকিত হয়! বাবা ৪৭ ফ, একবার ঠাউরে দেখ. যে-মুখে নাম কীর্ত্তন করি

সেই মুখে অন্ন জোগাও তোমরা ; শরীর পবিত্র হ'ল যে নামাবলীখানা গায় দিয়ে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে' সেখানা বানিয়েছ তোমরাই। এ কি কম কথা! আশীর্ব্বাদ করি সর্ব্বদাই অবিচলিত থাকো, তা হ'লেই ঠাকুরের দয়াও তোমাদের পরে অবিচলিত থাক্‌বে। বাবা, একবার কণ্ঠ খুলে' বলো, হরি, হরি! তোমাদের সব বোঝা হাল্‌কা হ'য়ে যাক্‌! হরিনাম আদাবন্তে চ মধ্যে চ!

চন্দ্রা

আহা, কি মধুর! বাবা, অনেকদিন এমন কথা শুনিনি। দাও, দাও, আমাকে একটু পায়ের ধূলো দাও!

ফাগুলাল

এতক্ষণ অবিচলিত ছিলুম, কিন্তু আর ত পারিনে। সর্দ্দার, এত বড় অপ-ব্যয় কিসের জন্যে? প্রণামী আদায় কর্‌তে চাও রাজি আছি, কিন্তু ভণ্ডামি সইব না।

বিশু

ফাগুলাল ক্ষেপ্‌লে আর রক্ষে নেই, চুপ চুপ্‌!

চন্দ্রা

ইহকাল পরকাল তুমি দুই খোয়াতে বসেছ? তোমার গতি হবে কি? এমন মতি তোমার আগে ছিল না, আমি বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছি তোমাদের উপরে ঐ নন্দিনীর হাওয়া লেগেছে।

গোসাঁই

যাই বলো, সর্দ্দার, কি সরলতা! পেটে-মুখে এক, এদের আমরা শেখাব কি, এরাই আমাদের শিক্ষা দেবে। বুঝেছ?

সর্দ্দার

বুঝেছি বৈ কি! এও বুঝেছি উৎপাত বেধেছে কোথা থেকে। এদের ভার আমাকেই নিতে হচ্ছে। প্রভুপাদ বরঞ্চ ও-পাড়ায় নাম শুনিয়ে আসুন, সেখানে করাতীরা যেন একটু খিট্‌খিট্‌ সুরু কর্‌ছে।

গোসাঁই

কোন্‌ পাড়া বল্‌লে, সর্দ্দার বাবা?

সর্দ্দার

ঐ যে ট-ঠ পাড়ায়ণ সেখানে ৭১ ট হচ্ছে মোড়ল। মূর্দ্ধন্য-ণয়ের ৬৫ যেখানে থাকে তার বাঁয়ে ঐ পাড়ার শেষ।

গোসাঁই

বাবা দন্ত্য-ন-পাড়া যদিও এখনো নড়্‌নড়্‌ করছে, মূর্দ্ধন্য-ণরা ইদানীং অনেকটা মধুর রসে মজেছে। মন্ত্র নেবার মত কান তৈরি হ'ল বলে'। তবু আরো ক'টা মাস পাড়ায় ফৌজ রাখা ভালো। কেননা, নাহঙ্কারাৎ পরো রিপুঃ। ফৌজের চাপে অহঙ্কারটার দমন হয়, তার পরে আমাদের পালা। তবে আসি।

চন্দ্রা

প্রভু, আশীর্ব্বাদ করো, এই এদের যেন সুমতি হয়। অপরাধ নিয়ো না।

গোসাঁই

ভয় নেই, মা লক্ষ্মী, এরা সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে।

~~প্রস্থান~~

সর্দ্দার

ওহে ৬৯ ঙ, তোমাদের ও পাড়ার মেজাজটা যেন কেমন দেখ্‌ছি!

বিশু

তা হ'তে পারে! গোসাঁইজি এদের কূর্ম্ম অবতার বল্‌লেন, কিন্তু শাস্ত্রমতে অবতারের বদল হয়। কূর্ম্ম হঠাৎ বরাহ হ'য়ে ওঠে, বর্ম্মের বদলে বেরিয়ে পড়ে দন্ত, ধৈর্য্যের বদলে গোঁ।

চন্দ্রা

বিশু বেয়াই, একটু থামো। সর্দ্দার দাদা, আমার দরবারটা ভুলো না।

সর্দ্দার

কিছুতেই না। শুনে রাখ্‌লুম, মনেও রাখ্‌ব। প্রস্থান

চন্দ্রা

আহা দেখ্‌লে? সর্দ্দার লোকটি কি সরেস? সবার সঙ্গেই হেসে কথা।

বিশু

মকরের দাঁতের সুরুতে হাসি অন্তিমে কামড়।

চন্দ্রা

কামড়টা এর মধ্যে কোথায় ?

বিশু

জানো না, ওরা ঠিক করেছে এবার থেকে এখানে কারিগরের সঙ্গে তাদের স্ত্রীরা আস্‌তে পার্‌বে না।

চন্দ্রা

কেন ?

বিশু

সংখ্যারূপে ওদের হিসাবের খাতায় আমরা জায়গা পাই, কিন্তু সংখ্যার অঙ্কের সঙ্গে নারীর অঙ্ক গণিতশাস্ত্রের যোগে মেলে না।

চন্দ্রা

ওমা ! ওদের নিজের ঘরে কি স্ত্রী নেই ? তারা কি বলে ?

বিশু

তারাও সোনার তালের মদে বেহুঁস। নেশায় স্বামীদের ছাড়িয়ে যায়। আমরা তাদের চোখেই পড়িনে।

চন্দ্রা

বিশু বেয়াই, তোমার ঘরে ত স্ত্রী ছিল, তার হ'ল কি ? অনেক দিন খবর পাইনি।

বিশু

যতদিন চরের উচ্চপদে ভর্‌তি ছিলুম সর্দ্দারণীদের কোঠাবাড়ীতে তার তাস খেলার ডাক পড়্‌ত। যখন ফাগুলালদের দলে যোগ দিলুম ও-পাড়ায় তার নেমন্তন্ন বন্ধ হ'য়ে গেল। সেই ধিক্কারে আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে' গেছে।

চন্দ্রা

ছি, এমন পাপও করে' !

বিশু

এ-পাপের শাস্তিতে আর-জন্মে সে সর্দ্দারণী হ'য়ে জন্মাবে।

চন্দ্রা

বিশু বেয়াই, দেখ, দেখ, ঐ কা'রা ধুম করে' চলেছে ! সারে সারে ময়ূর-পংখী, হাতির হাওদায় ঝালর দেখেছ ? ঝলমল কর্‌ছে। কি চমৎকার

ঘোড়সওয়ার! বর্ষার ডগায় যেন এক-এক টুক্‌রো সূর্য্যের আলো বিঁধে' নিয়ে চলেছে।

বিশু

ঐ ত সর্দ্দারণীরা ধ্বজাপূজার ভোজে যাত্রা করেছে।

চন্দ্রা

আহা, কি সাজের ধুম! কি চেহারা! আচ্ছা বেয়াই, যদি কাজ ছেড়ে না দিতে, তুমিও ওদের দলে অম্‌নি ধুম করে' বেরতে? আর তোমার সেই স্ত্রী—

বিশু

হাঁ, আমাদেরও ঐ দশা ঘট্‌ত।

চন্দ্রা

এখন আর ফের্‌বার পথ নেই? একেবারে না?

বিশু

আছে, নর্দ্দমার ভিতর দিয়ে!

নেপথ্যে

পাগল ভাই!

বিশু

কি পাগ্‌লী?

ফাগুলাল

ঐ তোমার নন্দিনীর ডাক পড়্‌ল। আজকের মত বিশুদাদাকে আর পাওয়া যাবে না।

চন্দ্রা

তোমার বিশুদাদার আশা আর রেখো না। কোন্ সুখে ও তোমাকে ভুলিয়েছে বলো দেখি, বেয়াই?

বিশু

ভুলিয়েছে দুঃখে।

চন্দ্রা

বেয়াই, অমন উল্‌টিয়ে কথা কও কেন?

বিশু

তোরা বুঝ্‌বিনে। এমন দুঃখ আছে যাকে ভোলার মত দুঃখ আর নেই।

ফাগুলাল

বিশুদাদা, পষ্ট ক'রে কথা বলো, নইলে রাগ ধরে।

বিশু

বল্‌ছি শোন্‌, কাছের পাওনাকে নিয়ে বাসনার যে-দুঃখ তাই পশুর, দূরের পাওনাকে নিয়ে আকাঙ্ক্ষার যে-দুঃখ তাই মানুষের। আমার সেই চিরদুঃখের দূরের আলোটি নন্দিনীর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

চন্দ্রা

এসব কথা বুঝিনে বেয়াই, একটা কথা বুঝি যে, যে-মেয়েকে তোমরা যত কম বোঝো সেই তোমাদের তত বেশি টানে। আমরা সাদাসিধে, আমাদের দর কম, তবু যা হোক্‌ তোমাদের সোজা পথে নিয়ে চলি। কিন্তু আজ বলে' রাখ্‌লুম ঐ মেয়েটা ওর রক্তকরবীর মালার ফাঁসে তোমাকে সর্ব্বনাশের পথে টেনে আন্‌বে।

[চন্দ্রা ও ফাগুলালের প্রস্থান

(নন্দিনীর প্রবেশ)

নন্দিনী

পাগল ভাই, দূরের রাস্তা দিয়ে আজ সকালে ওরা পৌষের গান গেয়ে মাঠে যাচ্ছিল, শুনেছিলে ?

বিশু

আমার সকাল কি তোর সকালের মত, যে গান শুন্‌তে পাবো ? এ যে ক্লান্ত রাত্তিরটারই ঝেঁটিয়ে-ফেলা উচ্ছিষ্ট।

নন্দিনী

আজ মনের খুসিতে ভাব্‌লুম এখানকার প্রাকারের উপর চড়ে' ওদের গানে যোগ দেবো। কোথাও পথ পেলুম না, তাই তোমার কাছে এসেছি।

বিশু

আমি ত প্রাকার নই।

নন্দিনী

তুমিই আমার প্রাকার। তোমার কাছে এসে উঁচুতে উঠে' বাহিরকে দেখ্‌তে পাই।

বিশু

তোমার মুখে এ-কথা শুনে' আশ্চর্য্য লাগে।

নন্দিনী

কেন?

বিশু

যক্ষপুরীতে ঢুকে' অবধি এতকাল মনে হ'ত জীবন হ'তে আমার আকাশ-খানা হারিয়ে ফেলেছি। মনে হ'ত এখানকার টুক্‌রো মানুষদের সঙ্গে আমাকে এক-ঢেঁকিতে কুটে' একটা পিণ্ড পাকিয়ে তুলেছে। তার মধ্যে ফাঁক নেই। এমন সময় তুমি এসে আমার মুখের দিকে এমন করে' চাইলে, আমি বুঝ্‌তে পার্‌লুম আমার মধ্যে এখনও আলো দেখা যাচ্ছে।

নন্দিনী

পাগল ভাই, এই বন্ধ গড়ের ভিতরে কেবল তোমার-আমার মাঝখান-টাতেই একখানা আকাশ বেঁচে আছে। বাকি আর-সব বোজা।

বিশু

সেই আকাশটা আছে বলে'ই তোমাকে গান শোনাতে পারি।

(গান)

তোমায় গান শোনাবো তাই ত আমায় জাগিয়ে রাখো,
ওগো ঘুম-ভাঙানিয়া!
বুকে চমক দিয়ে তাই ত ডাকো,
ওগো দুখ-জাগানিয়া।
এল আঁধার ঘিরে',
পাখী এল নীড়ে,
তরী এল তীরে,
শুধু আমার হিয়া বিরাম পায় নাকো,
ওগো দুখ-জাগানিয়া!

নন্দিনী

বিশু পাগল, তুমি আমাকে বল্‌ছ "দুখ-জাগানিয়া?"

বিশু

তুমি আমার সমুদ্রের অগম পারের দূতী। যে-দিন এলে যক্ষপুরীতে আমার হৃদয়ে লোনা-জলের হাওয়া এসে ধাক্কা দিলে।

আমার কাজের মাঝে মাঝে
কান্নাধারার দোলা তুমি থাম্‌তে দিলে না যে।
আমায় পরশ করে',
প্রাণ সুধায় ভরে',
তুমি যাও যে সরে',
বুঝি আমার ব্যথার আড়ালেতে দাঁড়িয়ে থাকো,
ওগো দুখ-জাগানিয়া।

নন্দিনী

তোমাকে একটা কথা বলি, পাগল। যে-দুঃখটির গান তুমি গাও, আগে আমি তার খবর পাইনি।

বিশু

কেন, রঞ্জনের কাছে?

নন্দিনী

না, দুই হাতে দুই দাঁড় ধরে' সে আমাকে তুফানের নদী পার করে' দেয়; বুনো ঘোড়ার কেশর ধরে' আমাকে বনের ভিতর দিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে যায়; লাফ দেওয়া বাঘের দুই ভুরুর মাঝখানে তীর মেরে সে আমার ভয়কে উড়িয়ে দিয়ে হা হা করে' হাসে। আমাদের নাগাই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে' স্রোতটাকে যেমন সে তোলপাড় করে, আমাকে নিয়ে তেমনি সে তোলপাড় কর্‌তে থাকে। প্রাণ নিয়ে সর্ব্বস্ব পণ করে' সে হার-জিতের খেলা খেলে। সেই খেলাতেই আমাকে জিতে নিয়েছে। একদিন তুমিও ত তার মধ্যে ছিলে, কিন্তু কি মনে করে' বাজি-খেলার ভিড় থেকে একলা বেরিয়ে গেলে। যাবার সময় কেমন করে' আমার মুখের দিকে তাকালে, বুঝতে পার্‌লুম না —তার পরে কতকাল খোঁজ পাইনি। কোথায় তুমি গেলে বলো ত?

বিশু

(গান)

ও চাঁদ, চোখের জলের লাগ্‌ল জোয়ার দুখের পারাবারে,
হ'ল কানায় কানায় কানাকানি এই পারে ঐ পারে।
আমার তরী ছিল চেনার কূলে, বাঁধন তাহার গেল খুলে',
তারে হাওয়ায় হাওয়ায় নিয়ে গেল কোন্ অচেনার ধারে।

নন্দিনী

সেই অচেনার ধার থেকে এখানে যক্ষপুরীর সুরঙ্গ-খোদার কাজে কে তোমাকে আবার টেনে আন্‌লে?

বিশু

একজন মেয়ে। হঠাৎ তীর খেয়ে উড়ন্ত পাখী যেমন মাটিতে পড়ে' যায়, সে আমাকে তেম্‌নি করে' এই ধুলোর মধ্যে এনে ফেলেছে; আমি নিজেকে ভুলে' ছিলুম।

নন্দিনী

তোমাকে সে কেমন করে' ছুঁতে পার্‌লে?

বিশু

তৃষ্ণার জল যখন আশার অতীত হয়, মরীচিকা তখন সহজে ভোলায়। তার পরে দিক্‌হারা নিজেকে আর খুঁজে' পাওয়া যায় না। একদিন পশ্চিমের জান্‌লা দিয়ে আমি দেখ্‌ছিলুম মেঘের স্বর্ণপুরী, সে দেখ্‌ছিল সর্দ্দারের সোনার চূড়া। আমাকে কটাক্ষে বল্‌লে "ঐখানে আমাকে নিয়ে যাও, দেখি কত বড় তোমার সামর্থ্য।" আমি স্পর্দ্ধা করে' বল্‌লুম "যাবো নিয়ে!" আন্‌লুম তাকে সোনার চূড়ার নীচে। তখন আমার ঘোর ভাঙ্‌ল!

নন্দিনী

আমি এসেছি এখান থেকে তোমাকে বের করে' নিয়ে যাবো। সোনার শিকল ভাঙ্‌ব।

বিশু

তুমি যখন এখানকার রাজাকে পর্য্যন্ত টলিয়েছ, তখন তোমাকে ঠেকাবে কিসে? আচ্ছা, তোমার ওকে ভয় করে না?

নন্দিনী

এই জালের বাইরে থেকে ভয় করে। কিন্তু আমি যে ভিতরে গিয়ে দেখেছি।

বিশু

কি-রকম দেখ্‌লে ?

নন্দিনী

দেখ্‌লুম, মানুষ, কিন্তু প্রকাণ্ড। কপালখানা যেন সাতমহলা বাড়ীর সিংহদ্বার। বাহু দুটো কোন্ দুর্গম দুর্গের লোহার অর্গল। মনে হ'ল যেন রামায়ণ-মহাভারত থেকে নেমে এসেছে কেউ।

বিশু

ঘরে ঢুকে' কি দেখ্‌লে ?

নন্দিনী

ওর বাঁ হাতের উপর বাজ-পাখী বসে' ছিল; তা'কে দাঁড়ের উপর বসিয়ে ও আমার মুখে চেয়ে রইল। তার পরে. যেমন বাজ-পাখীর পাখার মধ্যে আঙুল চালাচ্ছিল তেম্‌নি করে' আমার হাত নিয়ে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌ল। একটু পরে হঠাৎ জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "আমাকে ভয় করে না ?" আমি বল্‌লুম, "একটুও না।" তখন আমার খোলা চুলের মধ্যে দুই হাত ভরে' দিয়ে কতক্ষণ চোখ বুজে' বসে' রইল।

বিশু

তোমার কেমন লাগ্‌ল ?

নন্দিনী

ভালো লাগ্‌ল। কি-রকম বল্‌ব ? ও যেন হাজার বছরের বটগাছ, আমি যেন ছোট্ট পাখী। ওর ডালের একটি ডগায় কখনো যদি একটু দোল খেয়ে যাই, নিশ্চয় ওর মজ্জার মধ্যে খুসি লাগে। ঐ একলা প্রাণকে সেই খুসিটুকু দিতে ইচ্ছে করে।

বিশু

তার পরে ও কি বল্‌লে ?

নন্দিনী

এক-সময় ঝেঁকে উঠে' ওর বর্ষাফলার মত দৃষ্টি আমার মুখের উপর রেখে হঠাৎ বলে' উঠ্‌ল—"আমি তোমাকে জান্‌তে চাই।" আমার কেমন গা শিউরে' উঠ্‌ল। বল্‌লুম, "জান্‌বার কি আছে? আমি কি তোমার পুঁথি?" সে বল্‌লে, "পুঁথিতে যা আছে সব জানি. তোমাকে জানিনে।" তার পরে কি-রকম ব্যগ্র হ'য়ে উঠে' বল্‌লে, "রঞ্জনের কথা আমাকে বলো। তাকে কি-রকম ভালোবাসো?" আমি বল্‌লুম, "জলের ভিতরকার হাল যেমন আকাশের উপরকার পালকে ভালোবাসে—পালে লাগে বাতাসের গান, আর হালে জাগে ঢেউয়ের নাচ।" মস্ত একটা লোভী ছেলের মত একদৃষ্টে তাকিয়ে চুপ করে' শুন্‌লে। হঠাৎ চম্‌কিয়ে দিয়ে বলে' উঠ্‌ল "ওর জন্যে প্রাণ দিতে পারো?" আমি বল্‌লুম, "এখ্‌খনি।" ও যেন রেগে গর্জ্জন করে' বল্‌লে, "কখ্‌খনো না।" আমি বল্‌লুম, "হাঁ পারি।" "তা'তে তোমার লাভ কি?" বল্‌লুম, "জানিনে।" তখন ছট্‌ফট্‌ করে' বলে' উঠ্‌ল, "যাও আমার ঘর থেকে যাও, যাও, কাজ নষ্ট কোরো না।" মানে বুঝ্‌তে পার্‌লুম না।

বিশু

সব কথার পষ্ট মানে ও জান্‌তে চায়। যেটা ও বুঝ্‌তে পারে না, সেটাতে ওর মন ব্যাকুল করে' দেয়, তা'তেই ও রেগে ওঠে।

নন্দিনী

পাগল ভাই, ওর উপর দুয়া হয় না তোমার?

বিশু

যেদিন ওর 'পরে বিধাতার দয়া হবে, সেদিন ও মর্‌বে।

নন্দিনী

না, না, তুমি জানো না, বেঁচে থাক্‌বার জন্যে ও কি-রকম মরীয়া হ'য়ে আছে।

বিশু

ওর বাঁচা বল্‌তে কি বোঝায়, সে তুমি আজই দেখ্‌তে পাবে; জানিনে সইতে পার্‌বে কি না।

নন্দিনী

ঐ দেখ, পাগল ভাই, ঐ ছায়া। নিশ্চয় সর্দ্দার আমাদের কথা লুকিয়ে শুনেছে।

বিশু

এখানে ত চারদিকেই সর্দ্দারের ছায়া, এড়িয়ে চল্‌বার জো কি? সর্দ্দারকে কেমন লাগে?

নন্দিনী

ওর মত মরা জিনিষ দেখিনি। যেন বেত-বন থেকে কেটে আনা বেত। পাতা নেই, শিকড় নেই, মজ্জায় রস নেই, শুকিয়ে লিক্‌লিক্ কর্‌ছে।

বিশু

প্রাণকে শাসন কর্‌বার জন্যেই প্রাণ দিয়েছে দুর্ভাগা।

নন্দিনী

চুপ করো, শুন্‌তে পাবে।

বিশু

চুপ করাটাকেও যে শুন্‌তে পায়, তা'তে আপদ্ আরো বাড়ে। যখন খোদাইকরদের সঙ্গে থাকি, তখন কথায় বার্ত্তায় সর্দ্দারকে সাম্‌লে চলি। তাই ওরা আমাকে অপদার্থ বলে' অশ্রদ্ধা করে'ই বাঁচিয়ে রেখেছে। ওদের দণ্ডটা দিয়েও আমাকে ছোঁয় না। কিন্তু পাগ্‌লী, তোর সাম্‌নে মনটা স্পর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠে, সাবধান হ'তে ঘৃণা বোধ হয়।

নন্দিনী

না, না, বিপদকে তুমি ডেকে এনো না। ঐ যে সর্দ্দার এসে পড়েছে।

(সর্দ্দারের প্রবেশ)

সর্দ্দার

কি গো ৬৯ ঙ, সকলেরই সঙ্গে তোমার প্রণয়, বাছবিচার নেই!

বিশু

এমন কি তোমার সঙ্গেও সুরু হয়েছিল, বাছবিচার কর্‌তে গিয়েই বেধে গেল।

সর্দ্দার

কি নিয়ে আলাপ চল্‌ছে?

বিশু

তোমাদের দুর্গ থেকে কি করে' বেরিয়ে আসা যায় পরামর্শ করছি।

সর্দার

বলো কি, এত সাহস? কবুল করতেও ভয় নেই?

বিশু

সর্দার, মনে মনে ত সব জানোই। খাঁচার পাখী শলাগুলোকে ঠোক্‌রায়, সে ত আদর করে' নয়। এ-কথা কবুল করলেই কি, না করলেই কি!

সর্দার

আদর করে' না, সে জানা আছে; কিন্তু কবুল করতে ভয় করে না, সেটা এই কয়েক দিন থেকে জানান্‌ দিচ্ছে।

নন্দিনী

সর্দারজি, তুমি যে বলেছিলে আজ রঞ্জনকে এনে দেবে। কই, কথা রাখ্‌লে না?

সর্দার

আজই তাকে দেখতে পাবে।

নন্দিনী

সে আমি জানতুম। তবু আশা দিলে যখন, জয় হোক তোমার সর্দার, এই নাও কুন্দফুলের মালা।

বিশু

ছি ছি, মালাটা নষ্ট করলে! রঞ্জনের জন্যে রাখ্‌লে না কেন?

নন্দিনী

তার জন্যে মালা আছে।

সর্দার

আছে বই কি, ঐ বুঝি গলায় দুলছে? জয়মালা এই কুন্দফুলের, এ যে হাতের দান, আর বরণমালা ঐ রক্তকরবীর, এ হৃদয়ের দান। ভালো, ভালো, হাতের দান হাতে হাতেই চুকিয়ে দাও, নইলে শুকিয়ে যাবে; হৃদয়ের দান, যত অপেক্ষা করবে তত তার দাম বাড়বে।

[প্রস্থান

নন্দিনী

(জান্‌লার কাছে)

শুন্‌তে পাচ্ছ ?

নেপথ্যে

কি বল্‌তে চাও বলো।

নন্দিনী

একবার জান্‌লার কাছে এসে দাঁড়াও।

নেপথ্যে

এই এসেছি।

নন্দিনী

ঘরের মধ্যে যেতে দাও, অনেক কথা বল্‌বার আছে।

নেপথ্যে

বার বার কেন মিছে অনুরোধ করছ ? এখনো সময় হয়নি। ও কে তোমার সঙ্গে ? রঞ্জনের জুড়ি নাকি ?

বিশু

না, রাজা, আমি রঞ্জনের ও-পিঠ, যে-পিঠে আলো পড়ে না—আমি অমাবস্যা।

নেপথ্যে

তোমাকে নন্দিনীর কিসের দর্‌কার ? নন্দিনী, এ-লোকটা তোমার কে ?

নন্দিনী

ও আমার সাথী, ও আমাকে গান শেখায়। ঐ ত শিখিয়েছে :

(গান)

"ভালোবাসি, ভালোবাসি,"

এই সুরে কাছে দূরে জলেস্থলে বাজায় বাঁশি।

নেপথ্যে

ঐ তোমার সাথী ? ওকে এখনি যদি তোমার সঙ্গছাড়া করি তা হ'লে কি হয় ?

নন্দিনী

তোমার গলার সুর ও কি-রকম হ'য়ে উঠ্‌ল ? থামো তুমি। তোমার কেউ সঙ্গী নেই নাকি ?

নেপথ্যে

আমার সঙ্গী? মধ্যাহ্নসূর্য্যের কেউ সঙ্গী আছে?

নন্দিনী

আচ্ছা, থাক্ ও-কথা! মা গো তোমার হাতে ওটা কি?

নেপথ্যে

একটা মরা ব্যাং।

নন্দিনী

কি করবে ওকে নিয়ে?

নেপথ্যে

এই ব্যাঙ্ একদিন একটা পাথরের কোটরের মধ্যে ঢুকেছিল। তারি আড়ালে তিন হাজার বছর ছিল টিঁকে'। এইভাবে কি করে' টিঁকে' থাকতে হয়, তারি রহস্য ওর কাছ থেকে শিখ্‌ছিলুম; কি করে' বেঁচে থাকতে হয়, তা ও জানে না। আজ আর ভালো লাগ্‌ল না, পাথরের আড়াল ভেঙে ফেল্‌লুম, নিরন্তর টিঁকে'-থাকার থেকে ওকে দিলুম মুক্তি। ভালো খবর নয়?

নন্দিনী

আমারো চারিদিক্ থেকে তোমার পাথরের দুর্গ আজ খুলে' যাবে। আমি জানি, আজ রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হবে।

নেপথ্যে

তোমাদের দুজনকে তখন একসঙ্গে দেখ্‌তে চাই।

নন্দিনী

জালের আড়ালে তোমার চষ্‌মার ভিতর দিয়ে দেখ্‌তে পাবে না।

নেপথ্যে

ঘরের ভিতরে বসিয়ে দেখ্‌ব।

নন্দিনী

তা'তে কি হবে?

নেপথ্যে

আমি জান্‌তে চাই।

নন্দিনী

তুমি যখন জান্‌বার কথা বলো, কেমন ভয় করে।

নেপথ্যে

কেন ?

নন্দিনী

মনে হয়, যে-জিনিষটাকে মন দিয়ে জানা যায় না, প্রাণ দিয়ে বোঝা যায় তার 'পরে তোমার দরদ নেই।

নেপথ্যে

তা'কে বিশ্বাস করতে সাহস হয় না, পাছে ঠকি। যাও তুমি, সময় নষ্ট কোরো না।—না, না, একটু রোসো। তোমার অলকের থেকে ঐ যে রক্তকরবীর গুচ্ছ গালের কাছে নেমে পড়েছে, আমাকে দাও।

নন্দিনী

এ নিয়ে কি হবে ?

নেপথ্যে

ঐ ফুলের গুচ্ছ দেখি আর মনে হয়, ঐ যেন আমারই রক্ত আলোর শনিগ্রহ ফুলের রূপ ধরে' এসেছে। কখনো ইচ্ছে করছে, তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে' ফেলি, আবার ভাবছি নন্দিনী যদি কোনো দিন নিজের হাতে ঐ মঞ্জরী আমার মাথায় পরিয়ে দেয়, তা হ'লে—

নন্দিনী

তা হ'লে কি হবে ?

নেপথ্যে

তা হ'লে হয়ত আমি সহজে মরতে পারব।

নন্দিনী

একজন মানুষ রক্তকরবী ভালোবাসে, আমি তা'কে মনে করে' ঐ ফুলে আমার কানের দুল করেছি।

নেপথ্যে

তা হ'লে বলে' দিচ্ছি, ও আমারো শনিগ্রহ, তারো শনিগ্রহ।

নন্দিনী

ছি ছি, ও কি কথা বলছ ? আমি যাই।

নেপথ্যে

কোথায় যাবে ?

নন্দিনী

তোমার দুর্গ-দুয়ারের কাছে বসে' থাক্‌ব।

নেপথ্যে

কেন ?

নন্দিনী

রঞ্জন যখন সেই পথ দিয়ে আস্‌বে, দেখ্‌তে পাবে আমি তারই জন্মে অপেক্ষা করে' আছি।

নেপথ্যে

রঞ্জনকে যদি দলে' ধুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দিই, আর তা'কে একটুও চেনা যায় না!

নন্দিনী

আজ তোমার কি হয়েছে ? আমাকে মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছ কেন ?

নেপথ্যে

মিছিমিছি ভয় ? জানো না, আমি ভয়ঙ্কর ?

নন্দিনী

হঠাৎ তোমার এ কি ভাব ? লোকে তোমাকে ভয় করে, এইটেই দেখ্‌তে ভালোবাসো ? আমাদের গাঁয়ের শ্রীকণ্ঠ যাত্রায় রাক্ষস সাজে; সে যখন আসরে নামে তখন ছেলেরা আঁৎকে উঠ্‌লে সে ভারি খুসি হয়। তোমারও যে সেই দশা। আমার কি মনে হয়, সত্যি বল্‌ব ? রাগ কর্‌বে না ?

নেপথ্যে

কি বলো দেখি ?

নন্দিনী

ভয় দেখাবার ব্যবসা এখানকার মানুষের। তোমাকে তাই তারা জাল দিয়ে ঘিরে' অদ্ভুত সাজিয়ে রেখেছে। এই জুজুর পুতুল সেজে থাক্‌তে লজ্জা করে না ?

নেপথ্যে

কি বল্‌ছ, নন্দিনী ?

নন্দিনী

এতদিন যাদের ভয় দেখিয়ে এসেছ তারা ভয় পেতে একদিন লজ্জা

করবে। আমার রঞ্জন এখানে যদি থাক্‌ত, তোমার মুখের উপর তুড়ি মেরে সে মর্‌ত তবু ভয় পেত না।

নেপথ্যে

তোমার স্পর্দ্ধা ত কম নয়! এতদিন যা কিছু ভেঙে চুরমার করেছি তারি রাশ-করা পাহাড়ের চূড়ার উপরে তোমাকে দাঁড় করিয়ে দেখাতে ইচ্ছে কর্‌ছে। তার পরে—

নন্দিনী

তার পরে কি?

নেপথ্যে

তার পরে আমার শেষ ভাঙাটা ভেঙে ফেলি। দাড়িমের দানা ফাটিয়ে দশ আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে যেমন তার রস বের করে, তেম্‌নি তোমাকে আমার এই দুটো হাতে—যাও, যাও, এখনি পালিয়ে যাও, এখনি!

নন্দিনী

এই রইলুম দাঁড়িয়ে। কি কর্‌তে পারো, করো। অমন বিশ্রী করে' গর্জ্জন কর্‌ছ কেন?

নেপথ্যে

আমি যে কি অদ্ভুত নিষ্ঠুর, তার সমস্ত প্রমাণ তোমার কাছে প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিতে ইচ্ছে কর্‌ছে। আমার ঘরের ভিতর থেকে কখনো আর্ত্তনাদ শোনোনি?

নন্দিনী

শুনেছি, সে কিসের আর্ত্তনাদ?

নেপথ্যে

সৃষ্টিকর্ত্তার চাতুরী আমি ভাঙি'। বিশ্বের মর্ম্মস্থানে যা লুকোনো আছে তা ছিনিয়ে নিতে চাই, সেইসব ছিন্ন প্রাণের কান্না। গাছের থেকে আগুন চুরি কর্‌তে হ'লে তা'কে পোড়াতে হয়। নন্দিনী, তোমার ভিতরেও আছে আগুন, রাঙা আগুন! একদিন দাহন করে' তা'কে বের কর্‌ব, তার আগে নিষ্কৃতি নেই।

নন্দিনী

কেন তুমি নিষ্ঠুর?

নেপথ্যে

আমি হয় পাবো, নয় নষ্ট করব। যা'কে পাইনে তা'কে দয়া করতে পারিনে! তা'কে ভেঙে ফেলাও খুব এক-রকম করে' পাওয়া।

নন্দিনী

ও কি, অমন মুঠো পাকিয়ে হাত বের করছ কেন?

নেপথ্যে

আচ্ছা, হাত সরিয়ে নিচ্ছি, পালাও তুমি, পায়রা যেমন পালায় বাজ-পাখীর ছায়া দেখে'।

নন্দিনী

আচ্ছা যাই, আর তোমাকে রাগাবো না!

নেপথ্যে

শোনো, শোনো, ফিরে' এস তুমি! নন্দিনী! নন্দিনী!

নন্দিনী

কি, বলো।

নেপথ্যে

সাম্‌নে তোমার মুখে-চোখে প্রাণের লীলা, আর পিছনে তোমার কালোচুলের ধারা মৃত্যুর নিস্তব্ধ ঝরনা। আমার এই হাত-দুটো সেদিন তার মধ্যে ডুব দিয়ে মরবার আরাম পেয়েছিল। মরণের মাধুর্য্য আর কখনো এমন করে' ভাবিনি। সেই গুচ্ছ-গুচ্ছ কালো চুলের নীচে মুখ ঢেকে ঘুমোতে ভারি ইচ্ছে করছে। তুমি জানো না, আমি কত শ্রান্ত।

নন্দিনী

তুমি কি কখনো ঘুমোও না?

নেপথ্যে

ঘুমোতে ভয় করে।

নন্দিনী

তোমাকে আমার গানটা শেষ করে' শুনিয়ে দিই:

ভালোবাসি ভালোবাসি—
এই সুরে কাছে দূরে জলে-স্থলে বাজায় বাঁশি।

আকাশে কার বুকের মাঝে
ব্যথা বাজে,
দিগন্তে কার কালো আঁখি আঁখির জলে যায় গো ভাসি।

নেপথ্যে

থাক্ থাক্, থামো তুমি, আর গেয়ো না।

নন্দিনী

সেই সুরে সাগর-কূলে
বাঁধন খুলে'
অতল রোদন উঠে দুলে'।
সেই সুরে বাজে মনে
অকারণে
ভুলে'-যাওয়া গানের বাণী, ভোলা দিনের কাঁদন-হাসি।

পাগল ভাই, ঐ যে মরা ব্যাঙ্টা ফেলে' রেখে দিয়ে কখন্ পালিয়েছে। গান শুন্তে ও ভয় পায়।

বিশু

ওর বুকের মধ্যে যে বুড়ো ব্যাঙ্টা সকল-রকম সুরের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে আছে, গান শুন্লে তার মর্তে ইচ্ছে করে। তাই ওর ভয় লাগে। পাগ্লী, আজ তোর মুখে একটা দীপ্তি দেখ্ছি, মনের মধ্যে কোন্ ভাবনার অরুণোদয় হয়েছে আমাকে বল্বিনে?

নন্দিনী

মনের মধ্যে খবর এসে পৌঁছেছে, আজ নিশ্চয় রঞ্জন আস্বে।

বিশু

নিশ্চয় খবর এল কোন্ দিক্ থেকে?

নন্দিনী

তবে শোনো বলি। আমার জান্লার সাম্নে ডালিমের ডালে রোজ নীলকণ্ঠ পাখী এসে বসে। আমি সন্ধ্যে হ'লেই ধ্রুবতারাকে প্রণাম করে' বলি, ওর ডানার একটি পালক আমার ঘরে এসে যদি উড়ে' পড়ে ত জানব, আমার রঞ্জন আস্বে। আজ সকালে জেগে উঠে'ই দেখি

উত্তরে'-হাওয়ায় পালক আমার বিছানায় এসে পড়ে' আছে : এই দেখ আমার বুকের আঁচলে।

বিশু

তাই ত দেখ্‌ছি, আর দেখ্‌ছি, কপালে আজ কুঙ্কুমের টিপ পরেছ।

নন্দিনী

দেখা হ'লে এই পালক আমি তার চূড়োয় পরিয়ে দেবো।

বিশু

লোকে বলে নীলকণ্ঠের পাখায় জয়যাত্রার শুভচিহ্ন আছে।

নন্দিনী

রঞ্জনের জয়যাত্রা আমার হৃদয়ের মধ্যে দিয়ে।

বিশু

পাগ্‌লী, এখন আমি যাই আমার নিজের কাজে।

নন্দিনী

না, আজ তোমাকে কাজ কর্‌তে দেবো না।

বিশু

কি কর্‌ব বল্‌?

নন্দিনী

গান করো।

বিশু

কি গান কর্‌ব?

নন্দিনী

পথ-চাওয়ার গান।

বিশু

(গান)

যুগে-যুগে বুঝি আমায় চেয়েছিল সে!
সেই বুঝি মোর পথের ধারে রয়েছে বসে'।
আজ কেন মোর পড়ে মনে, কখন তারে চোখের কোণে

দেখেছিলেম অফুট প্রদোষে,
সেই যেন মোর পথের ধারে রয়েছে 'বসে' ।
আজ ঐ চাঁদের বরণ হবে আলোর সঙ্গীতে,
রাতের মুখের আঁধার-খানি খুলবে ইঙ্গিতে।
শুক্ল রাতে, সেই আলোকে দেখা হবে, এক-পলকে
সব আবরণ যাবে যে খসে'।
সেই যেন মোর পথের ধারে রয়েছে বসে'।

নন্দিনী

পাগল, যখন তুমি গান করো তখন কেবল আমার মনে হয়, অনেক তোমার পাওনা ছিল কিন্তু কিছু তোমাকে দিতে পারিনি।

বিশু

তোর সেই কিছু-না-দেওয়া আমি ললাটে পরে' চলে' যাবো। অল্প-কিছু-দেওয়ার দামে আমার গান বিক্রি করব না।—এখন কোথায় যাবি ?

নন্দিনী

পথের ধারে, যেখান দিয়ে রঞ্জন আসবে। সেইখানে বসে' আবার তোমার গান শুনব।

[উভয়ের প্রস্থান

(সর্দ্দার ও মোড়লের প্রবেশ)

সর্দ্দার

না, এ-পাড়ায় রঞ্জনকে কিছুতে আসতে দেওয়া চলবে না।

মোড়ল

ওকে দূরে রাখব বলে'ই বজ্রগড়ের সুরঙ্গে কাজ করাতে নিয়ে গিয়েছিলুম।

সর্দ্দার

তা কি হ'ল ?

মোড়ল

কিছুতেই পারা গেল না। সে বললে—হুকুম মেনে কাজ করা আমার অভ্যেস নেই।

সর্দার

অভ্যেস এখনি সুরু করাতে দোষ কি ?

মোড়ল

সে-চেষ্টা করা গেল। বড়-মোড়ল এল কোটালকে নিয়ে। মানুষটার ভয়-ডর কিছুই নেই। গলায় একটু শাসনের স্বর লেগেছে কি অম্‌নি হো হো করে' হেসে ওঠে। জিজ্ঞাসা কর্‌লে বলে—গাম্ভীর্য্য নির্ব্বোধের মুখোষ, আমি তাই খসাতে এসেছি।

সর্দার

ওকে সুরঙ্গের মধ্যে দলে ভিড়িয়ে দিলে না কেন ?

মোড়ল

দিয়েছিলুম, ভাবলুম চাপে পড়ে' বশ মান্‌বে। উল্টো হ'ল, খোদাই-করদের উপর থেকেও যেন চাপ নেমে গেল। তাদের মাতিয়ে তুল্‌লে, বল্‌লে—আজ আমাদের খোদাই-নৃত্য হবে।

সর্দার

খোদাই-নৃত্য ? তার মানে কি ?

মোড়ল

রঞ্জন ধর্‌লে গান, ওরা বল্‌লে—মাদল পাই কোথায় ? ও বল্‌লে—মাদল না থাকে কোদাল আছে। তালে তালে কোদাল পড়তে লাগল ; সোনার পিণ্ড নিয়ে সে কি লোফালুফি! বড় মোড়ল স্বয়ং এসে বল্‌লে—"এ কেমন তোমার কাজের ধারা ?" রঞ্জন বল্‌লে—"কাজের রসি খুলে' দিয়েছি, তা'কে টেনে চালাতে হবে না, নেচে চল্‌বে।"

সর্দার

লোকটা পাগল দেখ্‌ছি।

মোড়ল

ঘোর পাগল। বল্‌লুম, কোদাল ধরো। ও বলে, তার চেয়ে বেশী কাজ হবে যদি একটা সারেঙ্গি এনে দাও।

সর্দার

তোমরা ওকে বজ্রগড়ে নিয়ে গিয়েছিলে, সেখান থেকে কুবের-গড়ে এল কি করে' ?

মোড়ল

কি জানি প্রভু। শিকল দিয়ে ত ওকে কষে' বাঁধা গেল। খানিক বাদে দেখি, কেমন করে' পিছলে বেরিয়ে এসেছে—ওর গায়ে কিছু চেপে ধরে না। আর, ও কথায় কথায় সাজ বদল করে' চেহারা বদল করে। আশ্চর্য্য ওর ক্ষমতা। কিছু-দিন ও এখানে থাকলে খোদাইকরগুলো পর্য্যন্ত বাঁধন মানবে না।

সর্দ্দার

ও কি? ঐ না রঞ্জন, রাস্তা দিয়ে চলেছে গান গেয়ে? একটা ভাঙা সারেঙ্গি জোগাড় করেছে। স্পর্দ্ধা দেখ, একটু লুকোবারও চেষ্টা নেই!

মোড়ল

তাই ত! কখন, গারদের ভিত কেটে বেরিয়ে এসেছে! ভেল্কি জানে

সর্দ্দার

যাও, এই বেলা ধরোগে ওকে। এ-পাড়ায় নন্দিনীর সঙ্গে যেন কিছুতে মিলতে না পারে।

মোড়ল

দেখতে দেখতে ওর দল ভারি হ'য়ে উঠছে। কখন্ আমাদের সুদ্ধ নাচিয়ে তুলবে।

(ছোট সর্দ্দারের প্রবেশ)

সর্দ্দার

কোথায় চলেছ?

ছোট সর্দ্দার

রঞ্জনকে বাঁধতে চলেছি।

সর্দ্দার

তুমি কেন? মেজ সর্দ্দার কোথায়?

ছোট সর্দ্দার

ওকে দেখে' তাঁর এত মজা লেগেছে তিনি ওর গায়ে হাত দিতেই চা'ন না। বলেন, আমরা সর্দ্দাররা কি-রকম অদ্ভুত হ'য়ে উঠেছি সে ওর হাসি দেখলে বুঝতে পারি।

সর্দ্দার

শোনো, ওকে বাঁধ্‌তে হবে না, রাজার ঘরে পাঠিয়ে দাও!

ছোট সর্দ্দার

ও ত রাজার ডাক মান্‌তেই চায় না।

সর্দ্দার

ওকে বলোগে রাজা ওর নন্দিনীকে সেবাদাসী করে' রেখেছে।

ছোট সর্দ্দার

কিন্তু রাজা যদি—

সর্দ্দার

কিছু ভাব্‌তে হবে না। চলো আমি নিজে যাচ্ছি।

[সকলের প্রস্থান

(অধ্যাপক ও পুরাণবাগীশের প্রবেশ)

পুরাণবাগীশ

ভিতরে এ কি প্রলয়কাণ্ড হ্চ্ছে বলো ত? ভয়ঙ্কর শব্দ যে!

অধ্যাপক

রাজা বোধ হয় নিজের উপর নিজে রেগেছে। তাই নিজের তৈরী একটা-কিছু চূরমার করে' দিচ্ছে।

পুরাণবাগীশ

মনে হ্চ্ছে বড় বড় থাম হুড়মুড় করে' পড়ে' যাচ্ছে।

অধ্যাপক

আমাদের ঐ পাহাড়তলা জুড়ে' একটা সরোবর ছিল, শঙ্খিনী নদীর জল এসে তা'তে জমা হ'ত। একদিন তার বাঁ দিকের পাথরের স্তূপটা কাৎ হ'য়ে পড়্‌ল, জমা জল পাগলের অট্টহাসির মত খল্‌খল করে' বেরিয়ে চলে' গেল। কিছু-দিন থেকে রাজাকে দেখে' মনে হচ্ছে, ওর সঞ্চয়-সরোবরের পাথরটাতে চাড় লেগেছে, তলাটা ভিতরে ভিতরে ক্ষয়ে' এসেছে।

পুরাণবাগীশ

বস্তুবাগীশ, এ কোন্ জায়গায় আমাকে আন্‌লে, আর কি কর্‌তেই বা আন্‌লে?

অধ্যাপক

জগতে যা-কিছু জান্‌বার আছে, সমস্তই জানার দ্বারা ও আত্মসাৎ কর্‌তে চায়। আমার বস্তুতত্ত্ববিদ্যা প্রায় উজাড় করে' নিয়েছে, এখন থেকে থেকে রেগে উঠে' বল্‌ছে, "তোমার বিদ্যে ত সিঁধকাঠি দিয়ে একটা দেয়াল ভেঙে তার 'পিছনে আরেকটা দেয়াল বের করেছে। কিন্তু প্রাণ-পুরুষের অন্দরমহল কোথায়?" ভাব্‌লুম, এখন কিছু-দিন ওকে পুরাণ-আলোচনায় ভুলিয়ে রাখা যাক—আমার থ'লে ঝাড়া হ'য়ে গেছে, এখন পুরাবৃত্তের গাঁঠকাটা চলুক। ঐ দেখ্‌তে পাচ্ছ, কে যাচ্ছে?

পুরাণবাগীশ

একটি মেয়ে ধানী-রঙের কাপড়-পরা।

অধ্যাপক

পৃথিবীর প্রাণভরা খুসিখানা নিজের সর্ব্বাঙ্গে টেনে নিয়েছে, ঐ আমাদের নন্দিনী। এই যক্ষপুরে সর্দ্দার আছে, মোড়ল আছে, খোদাইকর আছে, আমার মত পণ্ডিত আছে, কোতোয়াল আছে, জল্লাদ আছে, মুর্দ্দফরাস আছে, সব বেশ মিশ খেয়ে গেছে। কিন্তু ও একেবারে বে-খাপ। চার-দিকে হাটের চেঁচামেচি, ও হ'ল সুরবাঁধা তম্বুরা।

অধ্যাপক

এক-একদিন ওর চলে' যাওয়ার হাওয়াতেই আমার বস্তু-চর্চ্চার জাল ছিঁড়ে' যায়। ফাঁকের মধ্যে দিয়ে মনোযোগটা বুনো পাখীর মত হুস্ করে' পালায়।

পুরাণবাগীশ

বলো কি হে, তোমার পাকা হাড়ে এমন ঠোকাঠুকি বাধে নাকি?

অধ্যাপক

জানার টানের চেয়ে প্রাণের টান বেশি হ'লেই পাঠশালা-পালাবার ঝোঁক সাম্‌লানো যায় না।

পুরাণবাগীশ

এখন বলো ত তোমাদের রাজার সঙ্গে দেখা হবে কোথায়?

অধ্যাপক

দেখার উপায় নেই, ঐ জালটার আড়াল থেকে আলাপ হবে।

পুরাণবাগীশ

বলো কি হে ? এই জালের আড়াল থেকে ?

অধ্যাপক

তা নয় ত কি ? ঘোম্‌টার আড়াল থেকে যে-রকম রসালাপ হ'তে পারে সে-ধরণের না, একেবারে ছাঁকা কথা। ওর গোয়ালের গোরু বোধ হয় দুধ দিতে জানে না, একেবারেই মাখন দেয়।

পুরাণবাগীশ

বাজে কথা বাদ দিয়ে আসল কথা আদায় করাই ত পণ্ডিতের অভিপ্রায়।

অধ্যাপক

কিন্তু বিধাতার নয়। তিনি আসল জিনিষ সৃষ্টি করেছেন বাজে জিনিষকে লালন করবার জন্যে। তিনি সম্মান দেন ফলের আঁঠিকে, ভালো-বাসা দেন ফলের শাঁসকে।

পুরাণবাগীশ

আজকাল দেখ্‌ছি তোমার বস্তুতত্ত্ব ধানী রঙের দিকে একটানা ছুটে' চলেছে। কিন্তু অধ্যাপক, তোমাদের এই রাজাকে তুমি সহ্য করো কি করে' ?

অধ্যাপক

সত্যি কথা বল্‌ব ? আমি ওকে ভালবাসি।

পুরাণবাগীশ

বলো কি হে ?

অধ্যাপক

তুমি জানো না, ও এত-বড় যে, ওর দোষগুলোও ওকে নষ্ট করতে পারে না।

(সর্দ্দারের প্রবেশ)

সর্দ্দার

ওহে বস্তুবাগীশ, বেছে বেছে এই মানুষটিকে এনেছ বুঝি ! ওঁর বিদ্যের বিবরণ শুনে'ই আমাদের রাজা ক্ষেপে উঠেছে।

অধ্যাপক

কি-রকম ?

সর্দ্দার

রাজা বলে, পুরাণ বলে' কিছু নেই। বর্ত্তমান কালটাই কেবল বেড়ে বেড়ে চলেছে।

পুরাণবাগীশ

পুরাণ যদি নেই, তা হ'লে কিছু আছে কি করে'? পিছন যদি না থাকে ত সাম্‌নেটা কি থাক্‌তে পারে?

সর্দ্দার

রাজা বলেন, মহাকাল নবীনকে সম্মুখে প্রকাশ করে' চলেছে, পণ্ডিত সেই কথাটাকে চাপা দিয়ে বলে—মহাকাল পুরাতনকে পিছনে বয়ে' নিয়ে যাচ্ছে।

অধ্যাপক

নন্দিনীর নিবিড় যৌবনের ছায়া-বীথিকায় নবীনের মায়া-মৃগীকে রাজা চকিতে চকিতে দেখ্‌তে পাচ্ছেন, ধর্‌তে পার্‌ছেন না, রেগে উঠ্‌ছেন আমার বস্তুতত্ত্বের উপর।

(নন্দিনীর দ্রুত প্রবেশ)

নন্দিনী

সর্দ্দার, সর্দ্দার, ও কি! ও কা'রা!

সর্দ্দার

কি গো নন্দিনী, তোমার কুঁদফুলের মালা পরব যখন ঘোর রাত হবে। অন্ধকারে যখন আমার বারো আনাই অস্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌বে, তখন হয়ত ফুলের মালায় আমাকেও মানাতে পারে।

নন্দিনী

চেয়ে দেখ, ও কি ভয়ানক দৃশ্য! প্রেতপুরীর দরজা খুলে' গেছে নাকি? ঐ কা'রা চলেছে প্রহরীদের সঙ্গে? ঐ যে বেরিয়ে আস্‌ছে রাজার মহলের খিড়্‌কি-দরজা দিয়ে?

সর্দ্দার

ওদের আমরা বলি রাজার এঁটো।

নন্দিনী

মানে কি?

সর্দ্দার

মানে একদিন তুমিও বুঝ্‌বে, আজ থাক্‌।

নন্দিনী

কিন্তু এ-সব কি চেহারা? ওরা কি মানুষ? ওদের মধ্যে মাংস-মজ্জা মন-প্রাণ কিছু কি আছে?

সর্দ্দার

হয়ত নেই।

নন্দিনী

কোনো দিন ছিল?

সর্দ্দার

হয়ত ছিল।

নন্দিনী

এখন গেল কোথায়?

সর্দ্দার

বস্তুবাগীশ, পারো ত বুঝিয়ে দাও, আমি চল্‌লুম।

[প্রস্থান

নন্দিনী

ও কি? ঐ সব ছায়াদের মধ্যে যে চেনা মুখ দেখ্‌ছি। ঐ ত নিশ্চয় আমাদের অনুপ আর উপমন্যু। অধ্যাপক, ওরা আমাদের পাশের গাঁয়ের লোক। দুই ভাই মাথায় যেমন লম্বা, গায়ে তেম্‌নি শক্ত, ওদের সবাই বলে তাল-তমাল। আষাঢ়-চতুর্দ্দশীতে আমাদের নদীতে বাচ খেল্‌তে আস্‌ত। মরে' যাই, ওদের এমন দশা কে কর্‌লে? ঐ যে দেখি শকলু, তলোয়ার খেলায় সব্বার আগে পেত মালা। অনূপ, শকলু—, এই দিকে চেয়ে দেখ, এই আমি, তোমাদের নন্দিন, ঈশানী পাড়ার নন্দিন। মাথা তুলে' দেখ্‌লে না, চিরদিনের মত মাথা হেঁট হ'য়ে গেছে। ও কি! কঙ্কু যে! আহা, আহা, ওর মত ছেলেকেও যেন আখের মত চিবিয়ে ফেলে' দিয়েছে। বড় লাজুক ছিল; যে-ঘাটে জল আন্‌তে যেতুম, তারি কাছে ঢালু পাড়ির 'পরে ব'সে থাক্‌ত, ভাণ কর্‌ত যেন তীর বানাবার জন্যে শর ভাঙতে এসেছে। দুষ্টুমি

করে' ওকে কত দুঃখ দিয়েছি। ও কঙ্কু, ফিরে' চা আমার দিকে! হায় রে, আমার ইসারাতে যার রক্ত নেচে উঠত, সে আমার ডাকে সাড়াই দিলে না! গেল গো, আমাদের গাঁয়ের সব আলো নিবে' গেল! অধ্যাপক, লোহাটা ক্ষয়ে' গেছে, কালো মর্চেটাই বাকি! এমন কেন হ'ল?

অধ্যাপক

নন্দিনী, যে-দিক্‌টাতে ছাই, তোমার দৃষ্টি আজ সেই দিক্‌টাতেই পড়েছে। একবার শিখার দিকে তাকাও, দেখবে তার জিহ্বা লক্‌লক্ কর্‌ছে।

নন্দিনী

তোমার কথা বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে।

অধ্যাপক

রাজাকে ত দেখেছ! তার মূর্ত্তি দেখে' শুন্‌ছি নাকি তোমার মন মুগ্ধ হয়েছে?

নন্দিনী

হয়েছে বই কি। সে যে অদ্ভুত শক্তির চেহারা।

অধ্যাপক

সেই অদ্ভুতটি হ'ল যার জমা, এই কিস্তুতটি হ'ল তার খরচ। ঐ ছোট-গুলো হ'তে থাকে ছাই, আর ঐ বড়টা জ্বল্‌তে থাকে শিখা। এই হচ্ছে বড় হবার তত্ত্ব।

নন্দিনী

ও ত রাক্ষসের তত্ত্ব।

অধ্যাপক

তত্ত্বর উপর রাগ করা মিছে। সে ভালোও নয়, মন্দও নয়। যেটা হয়, সেটা হয়; তার বিরুদ্ধে যাও ত হওয়ারই বিরুদ্ধে যাবে।

নন্দিনী

এই যদি মানুষের হওয়ার রাস্তা হয়, তা হ'লে চাইনে আমি হওয়া। আমি ঐ ছায়াদের সঙ্গে চলে' যাবো—আমাকে রাস্তা দেখিয়ে দাও!

অধ্যাপক

রাস্তা দেখাবার দিন এলে এরাই দেখাবে, তার আগে রাস্তা বলে' কোনো বালাই নেই। দেখ না পুরাণবাগীশ আস্তে আস্তে কখন্ সরে' পড়েছেন,

ভেবেছেন পালিয়ে বাঁচ্‌বেন। একটু এগোলেই বুঝ্‌বেন বেড়া-জাল এখান থেকে স্থুরু করে' বহু যোজন দূর পর্য্যন্ত খুঁটিতে খুঁটিতে বাঁধা। নন্দিনী, রাগ করছ তুমি! তোমার কপোলে রক্তকরবীর গুচ্ছ আজ প্রলয়-গোধূলির মেঘের মত দেখাচ্ছে।

নন্দিনী

(জান্‌লা ঠেলিয়া)

শোনো, শোনো!

অধ্যাপক

কা'কে ডাক্‌ছ তুমি?

নন্দিনী

জালের কুয়াশায় ঢাকা তোমাদের রাজাকে।

অধ্যাপক

ভিতরকার কপাট পড়ে' গেছে, ডাক শুন্‌তে পাবে না।

নন্দিনী

বিশু পাগল, পাগল ভাই।

অধ্যাপক

তা'কে ডাক্‌ছ কেন?

নন্দিনী

এখনো যে সে ফির্‌ল না! আমার ভয় কর্‌ছে।

অধ্যাপক

একটু আগেই তোমার সঙ্গেই ত দেখেছি।

নন্দিনী

সর্দ্দার বল্‌লে, রঞ্জনকে চিনিয়ে দেবার জন্যে তার ডাক পড়েছে। সঙ্গে যেতে চাইলুম, দিলে না। ও কিসের আর্ত্তনাদ?

অধ্যাপক

এ বোধ হচ্ছে সেই পালোয়ানের।

নন্দিনী

কে সে?

অধ্যাপক

সেই যে জগদ্বিখ্যাত গজ্জু, যার ভাই ভজন স্পর্দ্ধা করে' রাজার সঙ্গে কুস্তি করতে এল ; তার পরে তার লঙোটির একটা ছেঁড়া সুতো কোথাও দেখা গেল না। সেই রাগে গজ্জু এল তাল ঠুকে'। ওকে গোড়াতেই বলেছিলুম— এ-রাজ্যে সুরঙ্গ খুদ্‌তে চাও ত এস, মরতে মরতেও কিছুদিন বেঁচে থাকবে। আর যদি পৌরুষ দেখাতে চাও ত একমুহূর্ত্ত সইবে না। এ বড় কঠিন জায়গা।

নন্দিনী

দিনরাত এই মানুষ-ধরা ফাঁদের খবরদারি করে' এরা একটুও কি ভালো থাকে?

অধ্যাপক

ভালোর কথাটা এর মধ্যে নেই, থাকার কথাটাই আছে। এদের সেই থাকাটা এত ভয়ঙ্কর বেড়ে গেছে যে লাখো-লাখো মানুষের উপর চাপ না দিলে এদের ভার সাম্‌লাবে কে? জাল তাই বেড়েই চলেছে। ওদের যে থাক্‌তেই হবে।

নন্দিনী

থাক্‌তেই হবে? মানুষ হ'য়ে থাক্‌বার জন্যে যদি মরতেই হয়, তা'তেই বা দোষ কি?

অধ্যাপক

আবার সেই রাগ? সেই রক্তকরবীর ঝঙ্কার? খুব মধুর, তবুও যা সত্য, তা সত্য। থাক্‌বার জন্যে মরতে হবে, একথা বলে' সুখ পাও ত বলো। কিন্তু থাক্‌বার জন্যে মরতে হবে, একথা যারা বলে তা'রাই থাকে। তোমরা বলো এতে মনুষ্যত্বের ত্রুটি হয়, রাগের মাথায় ভুলে' যাও এইটেই মনুষ্যত্ব। বাঘকে খেয়ে বাঘ বড় হয় না, কেবল মানুষই মানুষকে খেয়ে ফুলে' ওঠে।

(পালোয়ানের প্রবেশ)

নন্দিনী

আহা, ঐ দেখ, কি-রকম টল্‌তে টল্‌তে আস্‌ছে। পালোয়ান, এইখানে শুয়ে পড়ো। অধ্যাপক, দেখ না কোথায় চোট লেগেছে?

অধ্যাপক

বাইরে থেকে চোটের দাগ দেখ্‌তেই পাবে না।

পালোয়ান

দয়াময় ভগবান্, জীবনে যেন একবার জোর পাই, আর একদিনের জন্যেও!

অধ্যাপক

কেন হে?

পালোয়ান

কেবল ঐ সর্দ্দারটার ঘাড় মট্‌কে দেবার জন্যে।

অধ্যাপক

সর্দ্দার তোমার কি করেছে?

পালোয়ান

সমস্তই সেই ত ঘটিয়েছে। আমি ত লড়্‌তে চাইনি। আজ বলে' বেড়াচ্ছে, আমারি দোষ।

অধ্যাপক

কেন? ওর কি স্বার্থ?

পালোয়ান

সমস্ত পৃথিবীকে নিঃশক্তি কর্‌তে পার্‌লে তবে ওরা নিশ্চিন্ত হয়। দয়াময় হরি, একদিন যেন ওর চোখ-দুটো উপ্‌ড়ে ফেল্‌তে পারি, যেন ওর জিভ্‌টা টেনে বের'করি।

নন্দিনী

তোমার কি-রকম বোধ হচ্ছে পালোয়ান?

পালোয়ান

বোধ হচ্ছে ভিতরটা ফাঁপা হ'য়ে গেছে। এরা কোথাকার দানব, জাদু জানে, শুধু জোর নয়, একেবারে ভরসা পর্য্যন্ত শুষে' নেয়।—যদি কোনো উপায়ে একবার—হে কল্যাণময় হরি, আঃ যদি একবার—তোমার দয়া হ'লে কি না হ'তে পারে! সর্দ্দারের বুকে যদি একবার দাঁত বসাতে পারি!

নন্দিনী

অধ্যাপক, ওকে ধরো তুমি, দুজনে মিলে' আমাদের বাসায় নিয়ে যাই।

অধ্যাপক

সাহস করিনে নন্দিনী। এখানকার নিয়ম-মতে তা'তে অপরাধ হবে।

নন্দিনী

মানুষটাকে মর্‌তে দিলে অপরাধ হবে না ?

অধ্যাপক

যে-অপরাধের শাস্তি দেবার কেউ নেই, সেটা পাপ হ'তে পারে, কিন্তু অপরাধ নয়। নন্দিনী, এ সমস্ত থেকে তুমি একেবারে চলে' এস। শিকড়ের মুঠো মেলে' গাছ মাটির নীচে হরণ-শোষণের কাজ করে, সেখানে ত ফুল ফোটায় না। ফুল ফোটে উপরের ডালে, আকাশের দিকে। ওগো রক্তকরবী, আমাদের মাটির তলাকার খবর নিতে এসো না, উপরের হাওয়ায় তোমার দোল দেখ্‌ব বলে' তাকিয়ে আছি। ঐ যে সর্দ্দার। আমি তবে সরি। তোমার সঙ্গে কথা কই এ ও সইতে পারে না।

নন্দিনী

আমার উপরে কেন এত রাগ ?

অধ্যাপক

আন্দাজে বল্‌তে পারি। তুমি ভিতরে ভিতরে ওর মনের তারে টান লাগিয়েছ ; যতই সুর মিল্‌ছে না, বেসুর ততই কড়া হ'য়ে চেঁচিয়ে উঠছে।

[প্রস্থান

(সর্দ্দারের প্রবেশ)

নন্দিনী

সর্দ্দার।

সর্দ্দার

নন্দিনী, তোমার সেই কুঁদফুলের মালাগাছটি আমার ঘরে দেখে' গোসাঁইজির দুই চক্ষু—এই যে স্বয়ং এসেছেন। প্রণাম! প্রভু! সেই মালাটি নন্দিনী আমাকে দিয়েছিল।

(গোসাঁইয়ের প্রবেশ)

গোসাঁই

আহা, শুভ্র প্রাণের দান! ভগবানের শুভ্র কুন্দ-ফুল! বিষয়ী লোকের হাতে পড়ে'ও তার শুভ্রতা ম্লান হ'ল না। এতেই ত পুণ্যের শক্তি আর পাপীর ত্রাণের আশা দেখ্‌তে পাই।

নন্দিনী

গোসাঁইজি, এই লোকটির একটা ব্যবস্থা করো। এর জীবনের আর কতটুকুই বা বাকি।

গোসাঁই

সব দিক্ ভেবে যে-পরিমাণ বাঁচা দর্‌কার, আমাদের সর্দ্দার নিশ্চয় ওকে ততটুকু বাঁচিয়ে রাখ্‌বে। কিন্তু বৎসে, এ-সব আলোচনা তোমাদের মুখে শ্রুতিকটু লাগে, আমরা পছন্দ করিনে।

নন্দিনী

এ-রাজ্যে বাঁচিয়ে রাখার বুঝি পরিমাণ-বিচার আছে?

গোসাঁই

আছে বই কি। পার্থিব জীবনটা যে সীমাবদ্ধ। তাই হিসাব বুঝে' তার ভাগ-বাটোয়ারা করতে হয়। আমাদের শ্রেণীর লোকের 'পরে ভগবান্ দুঃসহ দায়িত্ব চাপিয়েছেন, সেটা বহন করতে গেলে আমাদের ভাগে প্রাণের সারাংশ অনেকটা বেশি-পরিমাণে পড়া চাই। ওদের খুব কম বাঁচ্‌লেও চলে, কেননা ওদের ভার-লাঘবের জন্যে আমরাই বাঁচি। এ কি ওদের পক্ষে কম বাঁচোয়া?

নন্দিনী

গোসাঁইজি, ভগবান্ তোমার উপরে এদের কোন্ উপকারের বিষম ভার চাপিয়েছেন?

গোসাঁই

যে-প্রাণ সীমাবদ্ধ নয়, তার অংশভাগ নিয়ে কারো সঙ্গে কারো ঝগ্‌ড়ার দর্‌কারই হয় না, আমরা গোসাঁইরা সেই প্রাণেরই রাস্তা দেখাতে এসেছি। এতেই যদি ওরা সন্তুষ্ট থাকে, তবেই আমরা ওদের বন্ধু।

নন্দিনী

তবে কি এ-লোকটা ওর সীমাবদ্ধ প্রাণ নিয়ে এই-রকম আধ-মরা হ'য়েই পড়ে' থাক্‌বে।

গোসাঁই

পড়ে'ই বা থাক্‌বে কেন? কি বলো সর্দ্দার?

সর্দ্দার

সে ত ঠিক। পড়ে' থাক্‌তে দেবো কেন! এখন থেকে নিজের জোরে

চল্‌বার ওর দর্‌কারই হবে না। আমাদেরই জোরে চালিয়ে নিয়ে বেড়াবো। ওরে গজ্জু!

পালোয়ান

কি প্রভু!

গোসাঁই

হরি, হরি, এরি মধ্যে গলা বেশ-একটু মিহি হ'য়ে এসেছে, মনে হচ্ছে আমাদের নাম-কীর্ত্তনের-দলে টেনে নিতে পার্‌ব।

সর্দ্দার

হ-ক্ষ পাড়ার মোড়লের ঘরে তোর বাসা হয়েছে, চলে' যা সেখানে।

নন্দিনী

ও কি কথা! চল্‌তে পার্‌বে কেন!

সর্দ্দার

দেখ নন্দিনী, মানুষ-চালানোই আমাদের ব্যবসা। আমরা জানি মানুষ যেখানটাতে এসে মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে, জোরে ঠেলা দিলে আরো খানিকটা যেতে পারে। যাও গজ্জু!

গজ্জু

যে আদেশ!

নন্দিনী

পালোয়ান, আমিও যাচ্ছি মোড়লের ঘরে। সেখানে ত তোমাকে দেখ্‌বার কেউ নেই।

গজ্জু

না, না, থাক্, সর্দ্দার রাগ কর্‌বে।

নন্দিনী

আমি সর্দ্দারের রাগকে ভয় করিনে।

গজ্জু

আমি ভয় করি, দোহাই তোমার, আমার বিপদ্ বাড়িয়ো না।

[প্রস্থান

নন্দিনী

সর্দ্দার, যেয়ো না, বলে' যাও আমার বিশু পাগলকে কোথায় নিয়ে গেছ?

সর্দ্দার

আমি নিয়ে যাবার কে? বাতাস নিয়ে যায় মেঘকে, সেটাকে যদি দোষ মনে করো, খবর নাও বাতাসকে কে দিয়েছে ঠেলা?

নন্দিনী

এ কোন্ সর্ব্বনেশে দেশ গো! তোমরাও মানুষ নও, আর যাদের চালাও তারাও মানুষ নয়? তোমরা হাওয়া, তা'রা মেঘ? গোসাঁই, তুমি নিশ্চয় জানো, কোথায় আমার বিশু পাগল আছে।

গোসাঁই

আমি নিশ্চয় জানি, যে যেখানে থাক সবই ভালোর জন্যে।

নন্দিনী

কার ভালোর জন্যে?

গোসাঁই

সে তুমি বুঝবে না। আঃ, ছাড়ো, ছাড়ো, ওটা আমার জপমালা। ঐ গেল ছিঁড়ে'! ওহে সর্দ্দার, এই যে মেয়েটিকে তোমরা—

সর্দ্দার

কে জানে ও কেমন করে' এখানকার নিয়মের একটা ফাঁকের মধ্যে বাসা পেয়েছে। স্বয়ং আমাদের রাজা—

গোসাঁই

ওহে, এইবার আমার নামাবলীটা-সুদ্ধ ছিঁড়বে! বিপদ্ করলে! আমি চল্লুম!

[প্রস্থান

নন্দিনী

সর্দ্দার, বল্‌তেই হবে কোথায় নিয়ে গেছ বিশু পাগলকে?

সর্দ্দার

তা'কে বিচার-শালায় ডেকেছে—এর বেশি বল্‌বার নেই। ছাড়ো আমাকে, আমার কাজ আছে।

নন্দিনী

আমি নারী বলে' আমাকে ভয় করো না? বিদ্যুৎ-শিখার হাত দিয়ে

ইন্দ্র তাঁর বজ্র পাঠিয়ে দেন। আমি সেই বজ্র বয়ে' এনেছি, ভাঙবে তোমার সর্দ্দারির সোনার চূড়া।

সর্দ্দার

তবে সত্য কথাটা তোমাকে বলে' যাই। বিশুর বিপদ্ ঘটিয়েছ তুমিই!

নন্দিনী

আমি!

সর্দ্দার

হাঁ, তুমিই। এতদিন কীটের মত নিঃশব্দে মাটির নীচে গর্ত্ত করে' সে চলেছিল, তা'কে মর্‌বার পাখা মেল্‌তে শিখিয়েছ তুমিই ওগো ইন্দ্রদেবের আগুন। অনেককে টান্‌বে, তার পরে শেষ বোঝাপড়া হবে তোমাতে-আমাতে! বেশি দেরি নেই!

নন্দিনী

তাই হোক্, কিন্তু একটা কথা বলে' যাও, রঞ্জনকে আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে দেবে কি?

সর্দ্দার

কিছুতে না।

নন্দিনী

কিছুতে না! দেখ্‌ব তোমার সাধ্য কিসের! তার সঙ্গে আমার মিলন হবেই, হবেই, আজই হবে। এই তোমাকে বলে' দিলুম।

[সর্দ্দারের প্রস্থান

নন্দিনী

(জান্‌লায় ঘা দিয়ে)

শোনো, শোনো, রাজা! কোথায় তোমার বিচার-শালা? তোমার জালের এই আড়াল ভাঙ্‌ব আমি। ও কে ও! কিশোর যে! বল্ ত আমায়, জানিস্ কি, কোথায় আমাদের বিশু?

কিশোর

হাঁ নন্দিনী, এখনি তার সঙ্গে দেখা হবে, মনটা ঠিক করে' রাখো। জানিনে, প্রহরীদের কর্ত্তা আমার মুখ দেখে' কেন দয়া কর্‌লে। আমার অনুরোধে এই পথ দিয়ে বিশুকে নিয়ে যেতে রাজি হ'ল।

নন্দিনী

প্রহরীদের কর্ত্তা! তবে কি—

কিশোর

হাঁ, ঐ যে আস্‌ছে।

নন্দিনী

ও কি! তোমার হাতে হাত-কড়ি! পাগল ভাই, তোমাকে ওরা অমন করে' কোথায় নিয়ে চলেছে?

(বিশুকে নিয়ে প্রহরীর প্রবেশ)

বিশু

ভয় নেই, কিছু ভয় করিস্‌নে! পাগ্‌লি, এতদিন পরে আমার মুক্তি হ'ল।

নন্দিনী

কি বল্‌ছ, বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে।

বিশু

যখন ভয়ে ভয়ে পদে পদে বিপদ্ সাম্‌লে চল্‌তুম, তখন ছাড়া ছিলুম। সেই ছাড়ার মত বন্ধন আর নেই।

নন্দিনী

কি দোষ করেছ যে এরা তোমাকে বেঁধে নিয়ে চলেছে?

বিশু

এতদিন পরে আজ সত্যকথা বলেছিলুম।

নন্দিনী

তা'তে দোষ কি হয়েছে।

বিশু

কিচ্ছু না।

নন্দিনী

তবে এমন করে' বাঁধ্‌লে কেন?

বিশু

এতেই বা ক্ষতি কি হ'ল? সত্যের মধ্যে মুক্তি পেয়েছি—এ-বন্ধন তারি সত্য সাক্ষী হ'য়ে রইল।

নন্দিনী

ওরা তোমাকে পশুর মত রাস্তা দিয়ে বেঁধে নিয়ে চলেছে, ওদের নিজেরই লজ্জা করছে না? ছি, ছি, ওরাও ত মানুষ।

বিশু

ভিতরে মস্ত একটা পশু রয়েছে যে; মানুষের অপমানে ওদের মাথা হেঁট হয় না, ভিতরকার জানোয়ারটার ল্যাজ ফুলতে থাকে, দুলতে থাকে।

নন্দিনী

আহা পাগল ভাই, ওরা কি তোমাকে মেরেছে? এ কিসের চিহ্ন তোমার গায়ে?

বিশু

চাবুক মেরেছে, যে-চাবুক দিয়ে ওরা কুকুর মারে। যে-রসিতে এই চাবুক তৈরী সেই রসির সুতো দিয়েই ওদের গোসাইয়ের জপমালা তৈরি। যখন ঠাকুরের নাম জপ করে তখন সে-কথা ওরা ভুলে' যায়, কিন্তু ঠাকুর খবর রাখেন।

নন্দিনী

আমাকেও এম্‌নি করে' তোমার সঙ্গে বেঁধে নিয়ে যাক্, ভাই আমার! তোমার এই মার আমিও যদি কিছু না পাই, তবে আজ থেকে মুখে অন্ন রুচ্‌বে না।

কিশোর

বিশু, আমি যদি চেষ্টা করি নিশ্চয় ওরা তোমার বদলে আমাকে নিতে পারে। সেই অনুমতি করো তুমি।

বিশু

এ যে তোর পাগলের মত কথা।

কিশোর

শাস্তিতে ত আমাকে বাজ্‌বে না, আমার বয়স অল্প, আমি খুসি হ'য়ে সইতে পারব।

নন্দিনী

আহা, না কিশোর, ও-কথা বলিস্‌নে!

কিশোর

নন্দিনী, আমি কাজ কামাই করেছি, ওরা তা টের পেয়েছে। আমার পিছনে ডালকুত্তা লাগিয়েছে। তা'রা যে অপমান কর্‌বে, এই শাস্তি তার থেকে আমাকে বাঁচাবে।

বিশু

না, কিশোর এখনো ধরা পড়্‌লে চল্‌বে না। একটা বিপদের কাজ কর্‌বার আছে। রঞ্জন এখানে এসেছে, যেমন করে' পারিস তা'কে বের কর্‌তে হবে। সহজ নয়।

কিশোর

নন্দিনী, তা হ'লে বিদায় নিলুম। রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হ'লে তোমার কোন্ কথা তা'কে জানাবো?

নন্দিনী

কিছু না। তা'কে এই রক্তকরবীর গুচ্ছ দিলেই আমার সব কথা জানানো হবে।

[কিশোরের প্রস্থান

বিশু

এইবার রঞ্জনের সঙ্গে তোমার মিলন হোক!

নন্দিনী

মিলনে আমার আর সুখ হবে না। এ-কথা কোনোদিন ভুল্‌তে পার্‌ব না, যে তোমাকে শূন্যহাতে বিদায় দিয়েছি। আর ঐ যে বালক কিশোর, ও আমার কাছ থেকে কি বা পেলে?

বিশু

মনে যে-আগুন জালিয়ে দিয়েছ তা'তে ওর অন্তরের ধন সব প্রকাশ পেয়েছে। আর কি চাই? মনে আছে সেই নীলকণ্ঠের পালখ রঞ্জনের চূড়ায় পরিয়ে দিতে হবে?

নন্দিনী

এই যে রয়েছে আমার বুকের আঁচলে।

বিশু

পাগ্‌লি শুন্‌তে পাচ্ছিস ঐ ফসল-কাটার গান?

নন্দিনী

শুন্‌তে পাচ্ছি, প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ছে।

বিশু

মাঠের লীলা শেষ হ'ল, ক্ষেতের মালিক পাকা ফসল ঘরে নিয়ে চল্‌ল। চলো প্রহরী, আর দেরি নয়—

(গান)

শেষ ফলনের ফসল এবার কেটে লও, বাঁধো আঁটি,
বাকি যা নয় গো নেবার মাটিতে হোক্ তা মাটি।

[সকলের প্রস্থান

(চিকিৎসক ও সর্দ্দারের প্রবেশ)

চিকিৎসক

দেখ্‌লুম। রাজা নিজের 'পরে নিজে বিরক্ত হ'য়ে উঠেছেন। এ-রোগ বাইরের নয়, মনের।

সর্দ্দার

এর প্রতিকার কি ?

চিকিৎসক

বড়-রকমের ধাক্কা। হয় অন্য রাজ্যের সঙ্গে, নয় নিজের প্রজাদের মধ্যে উৎপাত বাধিয়ে তোলা।

সর্দ্দার

অর্থাৎ আর কারো ক্ষতি কর্‌তে না দিলে, উনি নিজের ক্ষতি কর্‌বেন।

চিকিৎসক

ওরা বড়লোক, বড় শিশু, খেলা করে। একটা খেলায় যখন বিরক্ত হয়, তখন আরেকটা খেলা না জুগিয়ে দিলে নিজের খেল্‌না ভাঙে। কিন্তু প্রস্তুত থাকো, সর্দ্দার, আর বড় দেরি নেই।

সর্দ্দার

লক্ষণ দেখে' আমি আগেই সব প্রস্তুত রেখেছি। কিন্তু হায়, হায়, কি দুঃখ! আমাদের স্বর্ণপুরী যে-রকম ঐশ্বর্য্যে ভরে' উঠেছিল, এমন কোনোদিন হয়নি, ঠিক এই সময়টাতেই—আচ্ছা যাও, ভেবে দেখ্‌ছি!

[চিকিৎসকের প্রস্থান

(মোড়লের প্রবেশ)

মোড়ল

সর্দ্দার-মহারাজ, ডেকেছেন ? আমি এ-পাড়ার মোড়ল।

সর্দ্দার

তুমিই ত তিনশো একুশ ?

মোড়ল

প্রভুর কি স্মরণ-শক্তি ! আমার মত অভাজনকেও ভোলেন না !

সর্দ্দার

দেশ থেকে আমার স্ত্রী আস্‌ছে। তোমাদের পাড়ার কাছে ডাক বদল হবে, শীঘ্র এখানে পৌঁছিয়ে দেওয়া চাই।

মোড়ল

পাড়ায় গোরুর মড়ক, গাড়ি টান্‌বার মত বলদের অভাব। তা হোক্, খোদাইকরদের লাগিয়ে দেওয়া যাবে।

সর্দ্দার

কোথায় যেতে হবে জানো ত ? বাগানবাড়িতে, যেখানে সর্দ্দারদের ভোজ।

মোড়ল

যাচ্ছি, কিন্তু একটা কথা বলে' দিয়ে যাই। একটু কান দেবেন। ঐ যে ৬৯ ঙ, লোকে যাকে বিশু পাগল বলে, ওর পাগ্‌লামিটাকে শোধন কর্‌বার সময় এসেছে।

সর্দ্দার

কেন ? তোমাদের 'পরে উৎপাত করে নাকি ?

মোড়ল

মুখের কথায় নয়, ভাবে-ভঙ্গীতে !

সর্দ্দার

আর ভাবনা নেই। বুঝেছ ?

মোড়ল

তাই নাকি ? তা হ'লে ভালো। আরেকটা কথা ; ঐ যে ৪৭ ফ, ৬৯-ঙর সঙ্গে ওর কিছু বেশি মেশামেশি।

সর্দ্দার

সেটা লক্ষ্য করেছি।

মোড়ল

প্রভুর লক্ষ্য ঠিকই আছে। তবু নানান্ দিকে দৃষ্টি রাখ্‌তে হয় নাকি—দুই-একটা ফস্‌কিয়ে যেতেও পারে। এই দেখুন না, আমাদের ৯৫,—গ্রাম-সম্পর্কে আমার পিস্‌শ্বশুর—পাঁজরের হাড় ক'খানা দিয়ে সর্দ্দার-মহারাজের ঝাড়ুবর্দ্দারের খড়ম বানিয়ে দিতে প্রস্তুত, প্রভুভক্তি দেখে' স্বয়ং তার সহধর্ম্মিণী লজ্জায় মাথা হেঁট করে, অথচ আজ পর্য্যন্ত—

সর্দ্দার

তার নাম বড় খাতায় উঠেছে।

মোড়ল

যাক্, সার্থক হ'ল এত-কালের সেবা। খবরটা তা'কে সাবধানে শোনাতে হবে, তার আবার মৃগীরোগ আছে, কি জানি হঠাৎ—

সর্দ্দার

আচ্ছা, সে হবে, তুমি যাও শীগ্‌গির।

মোড়ল

আর-একজন মানুষের কথা বল্‌বার আছে—সে যদিচ আমার আপন শ্যালা, তার মা মরে' গেলে আমার স্ত্রী তা'কে নিজের হাতে মানুষ করেছে, তবুও যখন মনিবের নিমক—

সর্দ্দার

তার কথা কাল হবে, তুমি দৌড়ে চলে' যাও।

মোড়ল

মেজো সর্দ্দার-বাহাদুর ঐ আস্‌ছেন। ওকে আমার হ'য়ে দুটো কথা বল্‌বেন। আমার 'পরে ওঁর ভালো নজর নেই। আমার বিশ্বাস প্রভুদের মহলে ৬৯ ঙর যখন যাওয়া-আসা ছিল, তখনি সে আমার নামে—

সর্দ্দার

না, না, কোনো দিন তোমার নাম কর্‌তেও তা'কে শুনিনি।

মোড়ল

সেই ত ওর চালাকি। যে-মানুষ নামজাদা তার নাম চাপা দিয়েই ত

তা'কে মারতে হয়। কৌশলে ইসারায় লাগালাগি করা ত ভালো নয়। ঐ রোগটি আছে আমাদের ত্রৈত্রিশের। তার ত দেখি আর কোন কাজ নেই, যখন-তখন প্রভুদের খাসমহলে যাওয়া-আসা চল্‌ছেই। ভয় হয়, কার নামে কি বানিয়ে বসে। অথচ ওঁর নিজের ঘরের খবরটি যদি—

সর্দ্দার

আজ আর সময় নেই, শীগ্‌গির যাও।

মোড়ল

তবে প্রণাম হই। (ফিরে এসে) একটি কথা! ও-পাড়ার অষ্টআশি সেদিন মাত্র তিরিশ তন্‌খায় কাজে ঢুক্‌ল, দুটো বছর না যেতেই উপরি-পাওনা ধরে' ওর আয় আজ কিছু না হবে ত মাসে হাজার-দেড়হাজার ত হবেই। প্রভুদের সাদা মন, দেবতার মত ফাঁকা স্তবেই ভোলেন। সাষ্টাঙ্গে প্রণামের ঘটা দেখে'ই—

সর্দ্দার

আচ্ছা, আচ্ছা, সে-কথা কাল হবে।

মোড়ল

আমার ত দয়াধর্ম্ম আছে, আমি তার রুটি মারার কথা বলিনে; কিন্তু তা'কে খাতাঞ্চি-খানায় রাখাটা ভালো হচ্ছে কি না, ভেবে দেখ্‌বেন। আমাদের বিষ্ণুদত্ত তার নাড়ি-নক্ষত্র জানে। তা'কে ডাকিয়ে নিন্—

সর্দ্দার

আজই ডাকাবো, তুমি যাও।

মোড়ল

প্রভু, আমার সেজো ছেলে লায়েক হ'য়ে উঠেছে। প্রণাম কর্‌তে এসেছিল, তিন দিন হাঁটাহাঁটি করে', দর্শন না পেয়ে ফিরে' গেছে। বড়ই মনের দুঃখে আছে। প্রভুর ভোগের জন্যে আমার বধূ-মাতা নিজের হাতে তৈরি ছাঁচি কুম্‌ড়োর—

সর্দ্দার

আচ্ছা, পরশু আস্‌তে বোলো, দেখা মিল্‌বে।

[মোড়লের প্রস্থান

(মেজো সর্দ্দারের প্রবেশ)

মেজো সর্দ্দার

নাচওয়ালী আর বাজনদারদের বাগানে রওনা করে' দিয়ে এলুম।

সর্দ্দার

আর রঞ্জনের সেটা কত দূর—

মেজো সর্দ্দার

এসব কাজ আমার দ্বারা হয় না। ছোট সর্দ্দার নিজে পছন্দ করে' ভার নিয়েছে। এতক্ষণে তার—

সর্দ্দার

রাজা কি—

মেজো সর্দ্দার

রাজা নিশ্চয় বুঝতে পারেননি। দশ জনের সঙ্গে মিশিয়ে তা'কে—কিন্তু রাজাকে এ-রকম ঠকানো আমি ত কর্ত্তব্য মনে করিনে।

সর্দ্দার

রাজার প্রতি কর্ত্তব্যের অনুরোধেই রাজাকে ঠকাতে হয়, রাজাকে ঠেকাতেও হয়। সে দায় আমার। এবার কিন্তু ঐ মেয়েটাকে অবিলম্বে—

মেজো সর্দ্দার

না, না, এসব কথা আমার সঙ্গে নয়। যে-মোড়লের উপর ভার দেওয়া হয়েছে, সে যোগ্য লোক, সে কোনো-রকম নোংরামিকেই ভয় করে না।

সর্দ্দার

কেনারাম গোসাঁই কি জানে রঞ্জনের কথা?

মেজো সর্দ্দার

আন্দাজে সবই জানে, স্পষ্ট জান্‌তে চায় না।

সর্দ্দার

কেন?

মেজো সর্দ্দার

পাছে "জানিনে" এই কথা বল্‌বার পথ বন্ধ হ'য়ে যায়।

সর্দ্দার

হ'লই বা!

মেজো সর্দ্দার

বুঝ্‌ছ না? আমাদের ত শুধু একটা চেহারা, সর্দ্দারের চেহারা। কিন্তু ওর যে এক-পিঠে গোসাঁই, আরেক-পিঠে সর্দ্দার। নামাবলীটা একটু ফেঁসে গেলেই সেটা ফাঁস হ'য়ে পড়ে। তাই সর্দ্দারি-ধর্ম্মটা নিজের অগোচরে পালন করতে হয়, তা হ'লে নামজপের বেলায় খুব বেশি বাধে না।

সর্দ্দার

নামজপটা না হয় ছেড়েই দিত।

মেজো সর্দ্দার

কিন্তু এ'দিকে যে ওর মনটা ধর্ম্মভীরু, রক্তটা যাই হোক্‌। তাই স্পষ্ট-ভাবে নামজপ আর অস্পষ্টভাবে সর্দ্দারি করতে পারলে ও সুস্থ থাকে। ও আছে বলে'ই আমাদের দেবতা আরামে আছে, তার কলঙ্ক ঢাকা পড়েছে, নইলে চেহারাটা ভালো দেখা'ত না।

সর্দ্দার

মেজো সর্দ্দার, তোমারো দেখেছি রক্তের সঙ্গে সর্দ্দারির রক্তের মিল হয়নি।

মেজো সর্দ্দার

রক্ত শুকিয়ে এলেই বালাই থাক্‌বে না, এখনো সে-আশা আছে। কিন্তু আজো তোমার ঐ তিনশো-একুশকে সইতে পারিনে। যাকে দূর থেকে চিম্‌টে দিয়ে ছুঁতেও ঘেন্না করে, তা'কে যখন সভার মাঝখানে সুহৃদ্‌ বলে' বুকে জড়িয়ে ধর্‌তে হয়, তখন কোনো তীর্থ-জলে স্নান করে' নিজেকে শুচি বোধ হয় না।—ঐ যে নন্দিনী আস্‌ছে।

সর্দ্দার

চলে' এস, মেজো সর্দ্দার!

মেজো সর্দ্দার

কেন? ভয় কিসের?

সর্দ্দার

তোমাকে বিশ্বাস করিনে; আমি জানি তোমার চোখে নন্দিনীর ঘোর লেগেছে।

মেজো সর্দ্দার

কিন্তু তুমি জানো না, যে তোমার চোখেও কর্ত্তব্যের রঙের সঙ্গে রক্তকরবীর রং কিছু যেন মিশেছে, তা'তেই রক্তিমা এতটা ভয়ঙ্কর হ'য়ে উঠ্‌ল।

সর্দ্দার

তা হবে, মনের কথা মন নিজেও জানে না। তুমি চলে' এস আমার সঙ্গে।

[উভয়ের প্রস্থান

(নন্দিনীর প্রবেশ)

নন্দিনী

দেখ্‌তে দেখ্‌তে সিদুঁরে মেঘে আজকের গোধূলি রাঙা হ'য়ে উঠ্‌ল। ঐ কি আমাদের মিলনের রং? আমার সিঁথের সিঁদুর যেন সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে গেছে!

(জান্‌লায় ঘা দিয়ে)

শোনো, শোনো, শোনো। দিন-রাত্ এখানে পড়ে' থাক্‌ব, যতক্ষণ না শোনো।

(গোসাঁইয়ের প্রবেশ)

গোসাঁই

ঠেল্‌ছ কা'কে?

নন্দিনী

তোমাদের যে-অজগর আড়ালে থেকে মানুষ গেলে তা'কে।

গোসাঁই

হরি, হরি, ভগবান্ যখন ছোটকে মারেন, তখন তার ছোঁট-মুখে বড়-কথা দিয়েই মারেন। দেখ নন্দিনী, তুমি নিশ্চয় জেনো, আমি তোমার মঙ্গল চিন্তা করি।

নন্দিনী

তা'তে আমার মঙ্গল হবে না।

গোসাঁই

এস আমার ঠাকুর-ঘরে, তোমাকে নাম শোনাইগে।

নন্দিনী

শুধু নাম নিয়ে করব কি?

গোসাঁই

মনে শান্তি পাবে।

নন্দিনী

শাস্তি যদি পাই, তবে ধিক্ ধিক্ ধিক্ আমাকে! আমি এই দরজায় অপেক্ষা করে' বসে' থাক্‌ব।

গোসাই

দেবতার চেয়ে মানুষের 'পরে তোমার বিশ্বাস বেশি?

নন্দিনী

তোমাদের ঐ ধ্বজদণ্ডের দেবতা, সে কোনো দিনই নরম হবে না। কিন্তু জালের আড়ালের মানুষ চিরদিনই কি জালে বাঁধা থাক্‌বে? যাও, যাও, যাও! মানুষের প্রাণ ছিঁড়ে' নিয়ে তা'কে নাম দিয়ে ভোলাবার ব্যবসা তোমার।

[গোসাইয়ের প্রস্থান

(ফাগুলাল ও চন্দ্রার প্রবেশ)

ফাগুলাল

বিশু তোমার সঙ্গে এল, সে এখন কোথায়? সত্য করে' বলো।

নন্দিনী

তা'কে বন্দী করে' নিয়ে গেছে।

চন্দ্রা

রাক্ষসী, তুই তা'কে ধরিয়ে দিয়েছিস্! তুই ওদের চর।

নন্দিনী

কোন্ মুখে এমন কথা বল্‌তে পার্‌লে?

চন্দ্রা

নইলে এখানে তোর কি কাজ? কেবল সবার মন ভুলিয়ে ভুলিয়ে ঘুরে' বেড়াস্!

ফাগুলাল

এখানে সবাই সবাইকে সন্দেহ করে, কিন্তু তবু তোমাকে আমি বিশ্বাস করে' এসেছি। মনে মনে তোমাকে—সে-কথা থাক্। কিন্তু আজ কেমনতরো ঠেকছে যে!

নন্দিনী

হবে, তা হবে! আমার সঙ্গে এসেই বিপদে পড়েছে। তোমাদের কাছে নিরাপদে থাক্‌ত, সে-কথা নিজেই বল্‌লে।

চন্দ্রা

তবে কেন আন্‌লি ওকে ভুলিয়ে? সর্ব্বনাশী!

নন্দিনী

ও যে বল্‌লে, ও মুক্তি চায়।

চন্দ্রা

ভালো মুক্তি দিয়েছিস ওকে!

নন্দিনী

আমি ত ওর সব কথা বুঝ্‌তে পারিনে চন্দ্রা। ও কেন আমাকে বল্‌লে, বিপদের তলায় তলিয়ে গিয়ে তবে মুক্তি? ফাগুলাল, নিরাপদের মার থেকে মুক্তি চায় যে-মানুষ, আমি তা'কে বাঁচাবো কি করে'?

চন্দ্রা

ওসব কথা বুঝিনে। ওকে ফিরিয়ে যদি না আন্‌তে পারিস মর্‌বি, মর্‌বি! তোর ঐ সুন্দরপানা মুখখানা দেখে' আমি ভুলিনে।

ফাগুলাল

চন্দ্রা, মিছে বকাবকি করে' কি হবে? কারিগরপাড়া থেকে দলবল জুটিয়ে আনি। বন্দিশালা চুরমার করে' ভাঙ্‌ব।

নন্দিনী

আমি যাবো তোমাদের সঙ্গে।

ফাগুলাল

কি কর্‌তে যাবে?

নন্দিনী

ভাঙ্‌তে যাবো।

চন্দ্রা

ওগো, অনেক ভাঙন ভেঙেছ, মায়াবিনী! আর কাজ নেই।

(গোকুলের প্রবেশ)

গোকুল

সবার আগে ঐ ডাইনিকে পুড়িয়ে মার্‌তে হবে।

চন্দ্রা

মারবে? তা'তে ওর শাস্তি হবে না। যে-রূপ নিয়ে ও সর্ব্বনাশ করে সেই রূপটা দাও ঘুচিয়ে।' ক্ষুরপো দিয়ে যেমন করে' ঘাস নিড়োয়, তেম্নি করে' ওর রূপ দাও নিড়িয়ে।

গোকুল

তা পারি। একবার এই হাতুড়ির নাচনটা—

ফাগুলাল

খবরদার! ওর গায়ে হাত দাও যদি, তা হ'লে—

নন্দিনী

ফাগুলাল, তুমি থামো। ও ভীরু, আমাকে ভয় করে, তাই আমাকে মারতে চায়। আমি ওর মারকে ভয় করিনে। কি করতে পারে করুক কাপুরুষ!

গোকুল

ফাগুলাল, এখনো তোমার চৈতন্য হয়নি! সর্দ্দারকেই তুমি শত্রু বলে জানো! তা হোক্, যে-শত্রু সহজ শত্রু, তা'কে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তোমাদের ঐ মিষ্টিমুখী সুন্দরী—

নন্দিনী

সর্দ্দারকে তোমার শ্রদ্ধা! পায়ের তলাটাকে পায়ের তলার কাদার শ্রদ্ধা যে-রকম! যে দাস সে কখনো শ্রদ্ধা করতে পারে?

ফাগুলাল

গোকুল, তোমার পৌরুষ দেখাবার সময় এসেছে। কিন্তু বালিকার কাছে নয়। চলো আমার সঙ্গে।

[ফাগুলাল, চন্দ্রা ও গোকুলের প্রস্থান

(একদল লোকের প্রবেশ)

নন্দিনী

ওগো, কোথায় চলেছ তোমরা?

১

ধ্বজাপূজার নৈবেদ্য নিয়ে চলেছি!

নন্দিনী

রঞ্জনকে দেখেছ ?

২

তা'কে পাঁচদিন আগে একবার দেখেছিলুম, আর দেখিনি। ঐ ওদের জিজ্ঞাসা করো, হয়ত বল্‌তে পার্‌বে।

নন্দিনী

ওরা কা'রা ?

৩

ওরা সর্দ্দারদের ভোজে মদ নিয়ে যাচ্ছে।

[এইদলের প্রস্থান

(অন্যদলের প্রবেশ)

নন্দিনী

ওগো লাল-টুপিরা, রঞ্জনকে তোমরা দেখেছ ?

১

সেদিন রাতে শম্ভু-মোড়লের বাড়িতে দেখেছি।

নন্দিনী

এখন কোথায় আছে সে ?

২

ঐ যে সর্দ্দারণীদের ভোজে সাজ নিয়ে চলেছে, ওদের জিজ্ঞাসা করো, ওরা অনেক কথা শুন্‌তে পায়, যা আমাদের কানে পৌঁছয় না।

[এইদলের প্রস্থান

(অন্যদলের প্রবেশ)

নন্দিনী

ওগো, রঞ্জনকে এরা কোথায় রেখেছে তোমরা কি জানো ?

১

চুপ্‌, চুপ্‌ !

নন্দিনী

তোমরা নিশ্চয় জানো, আমাকে বল্‌তেই হবে।

২

আমাদের কান দিয়ে যা ঢোকে, মুখ দিয়ে তা বেরোয় না, তাই টিঁকে' আছি। ঐ যে অস্ত্রের ভার নিয়ে আস্‌ছে, ওদের জিজ্ঞাসা করো।

[এইদলের প্রস্থান

(অস্ত্রদলের প্রবেশ)

নন্দিনী

ওগো, একটু থামো, বলে' যাও রঞ্জন কোথায়?

১

শোনো বলি, লগ্ন হ'য়ে এসেছে। ধ্বজাপূজায় রাজাকে বেরতেই হবে। তাঁকেই জিজ্ঞাসা করো। আমরা সুরুটা জানি, শেষটা জানিনে।

[প্রস্থান

নন্দিনী

(জান্‌লায় ঘা দিয়ে)

সময় হয়েছে, দরজা খোলো।

নেপথ্যে

আবার এসেছ অসময়ে। এখনি যাও, যাও তুমি।

নন্দিনী

অপেক্ষা করবার সময় নেই, শুন্‌তেই হবে আমার কথা।

নেপথ্যে

কি বল্‌বার আছে বাইরে থেকে বলে' চলে' যাও।

নন্দিনী

বাইরে থেকে কথার সুর তোমার কানে পৌঁছয় না।

নেপথ্যে

আজ ধ্বজাপূজা, আমার মন বিক্ষিপ্ত কোরো না। পূজার ব্যাঘাত হবে। যাও, যাও! এখনি যাও!

নন্দিনী

আমার ভয় ঘুচে' গেছে। অমন করে' তাড়াতে পার্‌বে না। মরি সেও ভালো, দরজা না খুলিয়ে নড়্‌ব না।

নেপথ্যে

রঞ্জনকে চাও বুঝি ? সর্দ্দারকে বলে' দিয়েছি, এখনি তা'কে এনে দেবে। পূজোয় যাবার সময় দরজায় দাঁড়িয়ে থেকো না। বিপদ্ ঘট্‌বে।

নন্দিনী

দেবতার সময়ের অভাব নেই, পূজোর জন্যে যুগযুগান্তর অপেক্ষা কর্‌তে পারেন। মানুষের দুঃখ মানুষের নাগাল চায় যে! তার সময় অল্প।

নেপথ্যে

আমি ক্লান্ত, ভারি ক্লান্ত। ধ্বজাপূজায় অবসাদ ঘুচিয়ে আস্‌ব। আমাকে দুর্ব্বল কোরো না। এখন বাধা দিলে রথের চাকায় গুঁড়িয়ে যাবে।

নন্দিনী

বুকের উপর দিয়ে চাকা চলে' যাক্, নড়্‌ব না।

নেপথ্যে

নন্দিনী, আমার কাছ থেকে তুমি প্রশ্রয় পেয়েছ, তাই ভয় করো না। আজ ভয় কর্‌তেই হবে।

নন্দিনী

আমি চাই, সবাইকে যেমন ভয় দেখিয়ে বেড়াও, আমাকেও তেম্‌নি ভয় দেখাবে। তোমার প্রশ্রয়কে ঘৃণা করি।

নেপথ্যে

ঘৃণা করো? স্পর্দ্ধা চূর্ণ কর্‌ব। তোমাকে আমার পরিচয় দেবার সময় এসেছে।

নন্দিনী

পরিচয়ের অপেক্ষাতেই আছি, খোলো দ্বার। (দ্বার উদ্‌ঘাটন) ও কি! ঐ কে পড়ে'? রঞ্জনের মত দেখ্‌ছি যেন।

রাজা

কি বল্‌লে? রঞ্জন? কখনই রঞ্জন নয়।

নন্দিনী

হাঁ গো, এই ত আমার রঞ্জন।

রাজা

ও কেন বল্‌লে না ওর নাম? কেন এমন স্পর্দ্ধা করে' এল?

নন্দিনী

জাগো, রঞ্জন, আমি এসেছি তোমার সখী। রাজা, ও জাগে না কেন?

রাজা

ঠকিয়েছে। আমাকে ঠকিয়েছে এরা। সর্ব্বনাশ! আমার নিজের যন্ত্র আমাকে মান্‌ছে না! ডাক্‌ তোরা, সর্দ্দারকে ডেকে আন্‌, বেঁধে নিয়ে আয় তা'কে।

নন্দিনী

রাজা, রঞ্জনকে জাগিয়ে দাও, সবাই বলে তুমি জাদু জানো, ওকে জাগিয়ে দাও!

রাজা

আমি যমের কাছে জাদু শিখেছি, জাগাতে পারিনে! জাগরণ ঘুচিয়ে দিতেই পারি।

নন্দিনী

তবে আমাকে ঐ ঘুমেই ঘুম পাড়াও! আমি সইতে পার্‌ছিনে। কেন এমন সর্ব্বনাশ কর্‌লে?

রাজা

আমি যৌবনকে মেরেছি—এতদিন ধরে' আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে কেবল যৌবনকে মেরেছি। মরা-যৌবনের অভিশাপ আমাকে লেগেছে।

নন্দিনী

ও কি আমার নাম বলেনি?

রাজা

এমন করে' বলেছিল, সে আমি সইতে পারিনি। হঠাৎ আমার নাড়ীতে নাড়ীতে যেন আগুন জ্বলে' উঠ্‌ল।

নন্দিনী

(রঞ্জনের প্রতি) বীর আমার, নীলকণ্ঠ পাখীর পালখ এই পরিয়ে দিলুম তোমার চূড়ায়। তোমার জয়যাত্রা আজ হ'তে সুরু হয়েছে। সেই যাত্রার বাহন আমি। আহা, এই যে ওর হাতে সেই আমার রক্তকরবীর মঞ্জরী!

তবে ত কিশোর ওকে দেখেছিল। সে কোথায় গেল! রাজা, কোথায় সেই বালক?

রাজা

কোন্ বালক?

নন্দিনী

যে-বালক এই ফুলের মঞ্জরী রঞ্জনকে এনে দিয়েছিল।

রাজা

সে যে অদ্ভুত ছেলে। বালিকার মত তার কচি মুখ, কিন্তু উদ্ধত তার বাক্য। সে স্পর্দ্ধা করে' আমাকে আক্রমণ করতে এসেছিল।

নন্দিনী

তার পরে? কি হ'ল তার? বলো, কি হ'ল? বল্‌তেই হবে, চুপ করে' থেকো না।

রাজা

বুদ্বুদের মত সে লুপ্ত হ'য়ে গেছে।

নন্দিনী

রাজা, এইবার সময় হ'ল।

রাজা

কিসের সময়?

নন্দিনী

আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার লড়াই।

রাজা

আমার সঙ্গে লড়াই করবে তুমি? তোমাকে যে এই মুহূর্ত্তেই মেরে ফেল্‌তে পারি।

নন্দিনী

তার পর থেকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আমার সেই মরা তোমাকে মারবে। আমার অস্ত্র নেই, আমার অস্ত্র মৃত্যু।

রাজা

তা হ'লে কাছে এস। সাহস আছে আমাকে বিশ্বাস করতে? চলো আমার সঙ্গে। আজ আমাকে তোমার সাথী করো, নন্দিন।

নন্দিনী

কোথায় যাবো ?

রাজা

আমারি বিরুদ্ধে লড়াই করতে, কিন্তু আমারই হাতে হাত রেখে। বুঝ্‌তে পারছ না ? সেই লড়াই সুরু হয়েছে। এই আমার ধ্বজা, আমি ভেঙে ফেলি ওর দণ্ড, তুমি ছিঁড়ে' ফেলো ওর কেতন। আমারই হাতের মধ্যে তোমার হাত এসে আমাকে মারুক্, মারুক্, সম্পূর্ণ মারুক্, তা'তেই আমার মুক্তি !

দলের লোক

মহারাজ। এ কি কাণ্ড ! এ কি উন্মত্ততা ! ধ্বজা ভাঙ্‌লেন ! আমাদের দেবতার ধ্বজা, যার অজেয় শল্যের একদিক্ পৃথিবীকে, অন্যদিক্ স্বর্গকে বিদ্ধ করেছে সেই আমাদের মহাপবিত্র ধ্বজদণ্ড ! পূজার দিনে কি মহাপাতক ! চল্, সর্দ্দারদের খবর দিইগে।

[প্রস্থান

রাজা

এখনো অনেক ভাঙা বাকি, তুমিও ত আমার সঙ্গে যাবে, নন্দিনী, প্রলয়-পথে আমার দীপশিখা ?

নন্দিনী

যাবো আমি।

(ফাগুলালের প্রবেশ)

ফাগুলাল

বিশুকে ওরা কিছুতেই ছেড়ে দেবে না। এ কে ? এই বুঝি রাজা ? ডাকিনী, ওর সঙ্গে পরামর্শ চল্‌ছে ! বিশ্বাসঘাতিনী !

রাজা

কি হয়েছে তোমাদের ? কি কর্‌তে বেরিয়েছ ?

ফাগুলাল

বন্দিশালার দরজা ভাঙ্‌তে, মরি তব্ ফির্‌ব না।

রাজা

ফির্‌বে কেন ? ভাঙার পথে আমিও চলেছি। ঐ তার প্রথম চিহ্ন। আমার ভাঙা ধ্বজা, আমার শেষ কীর্ত্তি।

ফাগুলাল

নন্দিন, ভালো বুঝ্‌তে পারছিনে। আমরা সরল মানুষ, দয়া করো, আমাদের ঠকিয়ো না। তুমি যে আমাদেরই ঘরের মেয়ে।

নন্দিনী

ফাগু ভাই, তোমরা ত মৃত্যুকেই পণ করেছ, ঠক্‌বার ত কিছুই বাকি রাখ্‌লে না।

ফাগুলাল

নন্দিন, তুমিও তবে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলো।

নন্দিনী

আমি ত সেইজন্যেই বেঁচে আছি। ফাগুলাল, আমি চেয়েছিলুম, রঞ্জনকে তোমাদের সকলের মধ্যে আন্‌তে। ঐ দেখ, এসেছে আমার বীর, মৃত্যুকে তুচ্ছ করে'।

ফাগুলাল

সর্ব্বনাশ! ঐ কি রঞ্জন! নিঃশব্দ পড়ে' আছে!

নন্দিনী

নিঃশব্দ নয়! মৃত্যুর মধ্যে তার অপরাজিত কণ্ঠস্বর আমি যে এই শুন্‌তে পাচ্ছি। রঞ্জন বেঁচে উঠ্‌বে—ও কখনো মর্‌তে পারে না।

ফাগুলাল

হায় রে নন্দিনী, সুন্দরী আমার! এইজন্যই কি তুমি এতদিন অপেক্ষা করে' ছিলে আমাদের এই অন্ধ নরকে?

নন্দিনী

ও আস্‌বে বলে' অপেক্ষা করে' ছিলুম, ও ত এল। ও আবার আসার জন্যে প্রস্তুত হব, ও আবার আস্‌বে। চন্দ্রা কোথায় ফাগুলাল?

ফাগুলাল

সে গেছে গোকুলকে নিয়ে সর্দ্দারের কাছে কাঁদাকাটি কর্‌তে। সর্দ্দারের 'পরে তাদের অগাধ বিশ্বাস। কিন্তু, মহারাজ, ভুল বোঝোনি ত? আমরা তোমারই বন্দিশালা ভাঙ্‌তে বেরিয়েছি।

রাজা

হাঁ, আমারই বন্দিশালা। তোমাতে-আমাতে দুজনে মিলে' কাজ করতে হবে। একলা তোমার কাজ নয়।

ফাগুলাল

সর্দাররা খবর পেলেই ঠেকাতে আসবে।

রাজা

তাদের সঙ্গে আমার লড়াই।

ফাগুলাল

সৈন্যেরা ত তোমাকে মানবে না।

রাজা

একলা লড়ব, সঙ্গে তোমরা আছ।

ফাগুলাল

জিৎতে পারবে?

রাজা

মরতে ত পারব! এতদিনে মরবার অর্থ দেখতে পেয়েছি—বেঁচেছি।

ফাগুলাল

রাজা, শুনতে পাচ্ছ গর্জ্জন?

রাজা

ঐ যে দেখ্‌ছি, সর্দ্দার সৈন্য নিয়ে আস্‌ছে। এত শীগ্‌গির কি করে' সম্ভব হ'ল? আগে থাকতেই প্রস্তুত ছিল, কেবল আমিই জানতে পারিনি। ঠকিয়েছে আমাকে! আমারি শক্তি দিয়ে আমাকে বেঁধেছে।

ফাগুলাল

আমার দলবল ত এখনো এসে পৌঁছল না।

রাজা

সর্দ্দার নিশ্চয় তাদের ঠেকিয়ে রেখেছে। আর তা'রা পৌঁছবে না।

নন্দিনী

মনে ছিল বিশুপাগলকে তা'রা আমার কাছে এনে দেবে। সে কি আর হবে না?

রাজা

উপায় নেই। পথঘাট আটক কর্‌তে সর্দ্দারের মত কাউকে দেখিনি।

ফাগুলাল

তা হ'লে চলো, নন্দিনী, তোমাকে নিরাপদ্‌ জায়গায় রেখে এসে তার পরে যা হয় হবে। সর্দ্দার তোমাকে দেখ্‌লে রক্ষা থাক্‌বে না।

নন্দিনী

একা আমাকেই নিরাপদের নির্ব্বাসনে পাঠাবে? ফাগুলাল, তোমাদের চেয়ে সর্দ্দার ভালো, সেই আমার জয়যাত্রার পথ খুলে' দিলে। সর্দ্দার, সর্দ্দার! দেখ, ওর বর্শার আগে আমার কুন্দ-ফুলের মালা দুলিয়েছে। ঐ মালাকে আমার বুকের রক্তে রক্তকরবীর রঙ্‌ করে' দিয়ে যাবো। সর্দ্দার! আমাকে দেখ্‌তে পেয়েছে। জয় রঞ্জনের জয়!

[দ্রুত প্রস্থান

রাজা

নন্দিনী!

[প্রস্থান

(অধ্যাপকের প্রবেশ)

ফাগুলাল

কোথায় ছুটেছ অধ্যাপক?

অধ্যাপক

কে যে বল্‌লে—রাজা এতদিন পরে চরম প্রাণের সন্ধান পেয়ে বেরিয়েছে —পুঁথিপত্র ফেলে' সঙ্গ নিতে এলুম।

ফাগুলাল

রাজা ত ঐ গেল মর্‌তে, সে নন্দিনীর ডাক শুনেছে।

অধ্যাপক

তার জাল ছিঁড়েছে। নন্দিনী কোথায়?

ফাগুলাল

সে গেছে সবার আগে। তা'কে আর নাগাল পাওয়া যাবে না।

অধ্যাপক

এইবারই পাওয়া যাবে। আর এড়িয়ে যেতে পার্‌বে না, তা'কে ধর্‌ব।

[প্রস্থান

(বিশুর প্রবেশ)

বিশু

ফাগুলাল, নন্দিনী কোথায় ?

ফাগুলাল

তুমি কি করে' এলে ?

বিশু

আমাদের কারিগররা বন্দিশালা ভেঙে ফেলেছে। তা'রা ঐ চলেছে লড়তে। আমি নন্দিনীকে খুঁজতে এলুম। সে কোথায় ?

ফাগুলাল

সে গেছে সকলের আগে এগিয়ে।

বিশু

কোথায় ?

ফাগুলাল

শেষ মুক্তিতে। বিশু, দেখ্‌তে পাচ্ছ ওখানে কে শুয়ে আছে ?

বিশু

ও যে রঞ্জন !

ফাগুলাল

ধূলায় দেখ্‌ছ ঐ রক্তের রেখা ?

বিশু

বুঝেছি, ঐ তাদের পরম মিলনের রক্তরাখী ! এবার আমার সময় এল একলা মহাযাত্রার। হয়ত গান শুন্‌তে চাইবে ! আমার পাগ্‌লী ! আয় রে ভাই, এবার লড়াইয়ে চল্‌ !

ফাগুলাল

নন্দিনীর জয় !

বিশু

নন্দিনীর জয় !

ফাগুলাল

আর ঐ দেখ ধূলায় লুটচ্ছে তার রক্তকরবীর কঙ্কণ। ডান-হাত থেকে কখন্‌ খসে' পড়েছে ! তার হাতখানি আজ সে রিক্ত করে' দিয়ে চলে' গেল।

বিশু

তা'কে বলেছিলুম, তার হাত থেকে কিছু নেবো না। এই নিতে হ'ল, তার শেষদান।

[প্রস্থান

(দূরে গান)

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয় রে চলে',
আয়, আয়, আয়।
ধূলার আঁচল ভরেছে আজ পাকা ফসলে,
মরি, হায়, হায়, হায়।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
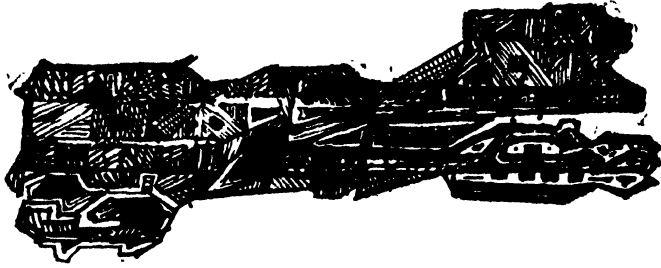
ভ্রম-সংশোধন—২৯ পৃষ্ঠায়—"সর্দ্দার—কিছুতেই না। শুনে' রাখ্‌লুম, মনেও রাখ্‌ব।"
—এই অংশের পরে হইবে—[প্রস্থান